ইওরোপের ইতিহাসের রূপরেখা

(১৭৮৯ খ্রীঃ-১৯৫০ খ্রীঃ)

[কলিকাতা, বর্ধমান, বিদ্যাসাগর, উত্তরবঙ্গ, ত্রিপুরা ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের
দ্বি-বার্ষিক-পাশ ও ত্রৈবার্ষিক অনার্স ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে রচিত]

অধ্যাপক প্রভাতাংশু মাইতি, এম.এ.
কলিকাতা স্কটিশ চার্চ কলেজের ইতিহাস বিভাগের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক
'Studies in Ancient India', 'A History of Europe',
'ভারত ইতিহাস পরিক্রমা, 'আধুনিক ভারত', 'ইওরোপ
ও বিশ্ব ইতিহাস পরিক্রমা', 'ভারতের ইতিহাস' প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা।

শ্রীধর প্রকাশনী
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
২০৩/৪ ডি, বিধান সরণী ● কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রকাশকঃ
শ্রীনীহারেন্দু পান
শ্রীধর প্রকাশনীর পক্ষে
২০৩/৪ ডি, বিধান সরণী
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

প্রথম প্রকাশ ঃ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৯

অক্ষর মুদ্রণে ঃ
প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস্ প্রাঃ লিঃ
৭, জওহরলাল নেহরু রোড
কলিকাতা-৭০০ ০১৩

মুদ্রণে ঃ
ডায়নামিক প্রিন্টার্স
২৪এ, বাগমারি রোড
কলিকাতা-৭০০ ০৫৪

ভূমিকা

ইওরোপের ইতিহাসের রূপরেখা, ১৭৮৯ খ্রীঃ—১৯৫০ খ্রীঃ প্রকাশিত হল। এই গ্রন্থটি রচনার জন্যে ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত বহু প্রামাণ্য গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। পাদটীকায় তার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এজন্য এসকল মনীষী গ্রন্থকারদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। প্রতি অধ্যায়ের শেষে ইচ্ছুক পাঠকদের সাহায্যের জন্যে ইংরাজী ভাষায় প্রধান গ্রন্থগুলির তালিকা দেওয়া হয়েছে। প্রতি বিষয়কে বিভিন্ন দিক হতে বিশ্লেষণ করে সর্বাধুনিক তথ্যগুলি পরিবেশন করা হয়েছে। ইওরোপের ইতিহাসকে কেবলমাত্র বিবরণ-ধর্মী না করে বিশ্লেষণ-ধর্মী করার জন্যে সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। পাঠক-পাঠিকার কৌতূহল বৃদ্ধির জন্যে সমকালীন যুগের কয়েকটি মানচিত্র সংযোজন করা হল। গ্রন্থটি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকস্তরের পাঠ্যসূচী অনুযায়ী লিখিত হয়েছে। পাশ ও অনার্স উভয় শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রী এই গ্রন্থ পাঠে উপকৃত হবে আমি বিশ্বাস করি। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক স্তরে বাংলা ভাষায় উপযুক্ত পাঠ্য পুস্তকের অভাব এই গ্রন্থটি পূরণ করবে বলে আশা করি। প্রচুর শ্রম স্বীকার করে গ্রন্থটি রচনা করেছি। যদি বিজ্ঞ সহকর্মীরা পুস্তকটিকে উপযুক্ত মনে করেন তবে শ্রম সার্থক জ্ঞান করব। সুকুমারমতি ছাত্র-ছাত্রীরা যদি এই গ্রন্থ পাঠে ইওরোপের ইতিহাস সম্পর্কে আগ্রহ বোধ করে তবে বিশেষ আনন্দিত হব।

গ্রন্থটি দ্রুত প্রকাশের জন্যে, প্রুফ সংশোধন ও অন্যান্য ব্যবস্থাদি করার জন্যে আমার ছাত্র অধ্যাপক অমলেন্দু পান, এম·এ· কে ধন্যবাদ জানাই। যদি কোন মুদ্রণ প্রমাদ তার সতর্ক চক্ষু এড়িয়ে যায় তবে সে দোষ আমারই। ইতি—

প্রভাতাংশু মাইতি

সূচীপত্র

ইওরোপের ইতিহাস

বিশ্বের ইতিহাস

ইওরোপের ইতিহাসের রূপরেখা

ইওরোপের ইতিহাস

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্কালে ইওরোপ
(Europe on the eve of the French Revolution)

সূচনা (Introduction) : ১৭৮৯ খ্রীঃ ফরাসী দেশের রাজা ষোড়শ লুই ফ্রান্সের জাতীয় সভার (স্টেটস জেনারেলের) অধিবেশন আহ্বান করার ফলে ফ্রান্সে ফরাসী বিপ্লব দেখা দেয় বলে মনে করা হয়। ফরাসী বিপ্লব কেবলমাত্র ফ্রান্সের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকেনি। এই বিপ্লব সমগ্র ইওরোপের রূপান্তর ঘটায়। ঐতিহাসিক রবার্ট পামারের মত অনুসা র ফরাসী বিপ্লবকে ইওরোপীয় বিপ্লব বলাই সঙ্গত। ফ্রান্সে যাহা ঘটে তাকে ইওরোপীয় বিপ্ল র ফরাসী অধ্যায় বলা যেতে পারে। ফরাসী বিপ্লব কোন আকস্মিক ঘটনা ছিল না। জনৈক ঐ িহাসিক এই বিপ্লবকে "ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা প্রস্তুত ঘটনা" (Most prepared event of history) বলেছেন। আসলে ফরাসী বিপ্লব ছিল ইওরোপীয় ক্ষয়প্রাপ্ত সমাজ ব্যবস্থার পতনের স্বাক্ষর। এই পতন প্রথমে ফ্রান্সে দেখা দেয়, পরে ইওরোপে ইহা প্রসারিত হয়। ফরাসী বিপ্লবের সূচনা অষ্টাদশ শতকের ইওরোপের অবস্থার মধ্যেই নিহিত ছিল। বারনাভ (Barnave) এজন্য মন্তব্য করেছেন যে, "ফরাসী বিপ্লব ইওরোপীয় বিপ্লবেরই চূড়ান্ত প্রকাশ।"

রাজনৈতিক অবস্থা (Political Condition) : অষ্টাদশ শতকে ইওরোপে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র বিদ্যমান ছিল। রাজাই ছিলেন জাতির প্রতিভূ। রাজার ক্ষমতা বৃদ্ধি ও রাজ্য বিস্তারকে জাতির শক্তি ও মর্যাদার চিহ্ন বলে ধরা হত। রাজা স্বর্গীয় অধিকার নীতি অনুসারে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। তিনি দাবী করতেন যে, তাঁর কাজের জন্যে তিনি একমাত্র ঈশ্বরের নিকট দায়ী। পার্থিব কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ অনুযায়ী তিনি চলবেন না। মধ্যযুগে খ্রীষ্টীয় ধর্মগুরু পোপ খ্রীষ্টীয় রাষ্ট্রগুলির ওপর একাধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা করেন। পোপের এই ক্ষমতা লাভের চেষ্টাকে ব্যাহত করার জন্যে ইওরোপীয় রাজারা স্বর্গীয় অধিকার তত্ত্ব প্রচার করেন। এইভাবে স্বর্গীয় অধিকার তত্ত্ব মধ্যযুগের শেষ দিক হতে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত ইওরোপের রাজনৈতিক চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে। এই মতবাদের আশ্রয় নিয়ে রাজারা যার পর নাই স্বৈরাচারী হন। ফ্রান্সের বুরবোঁ রাজবংশ ছিল রাজকীয় স্বৈরাচারী ক্ষমতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। ফরাসী রাজা চতুর্দশ লুই ঘোষণা করেন যে, "রাজাই হলেন রাষ্ট্র" (The State, It is Myself)। রাজশক্তিগুলি বংশানুক্রমিকভাবে শাসন করতেন। তাঁরা কোন কোন ক্ষেত্রে স্থানীয় সভা বা পরিষদ স্থাপন করলেও ইহার সদস্যদের মনোনীত করতেন। ফলে রাষ্ট্রের সকল কিছুই রাজার অঙ্গুলি হেলনে চলত। ইওরোপের জনসাধারণের বা প্রজাদের স্বাধীনতা বলে কিছুই ছিল না। অধিকাংশ দেশের শাসনব্যবস্থা ছিল দুর্নীতিগ্রস্থ ও অত্যাচারী। রাজার অনুগৃহীত সামন্তরা রাজার নামে দেশ শাসন করত। জনসাধারণের ব্যক্তি স্বাধীনতা বা মত প্রকাশের অধিকার ছিল না। রাজা, অভিজাত ও ধর্মযাজকরা একযোগে জনসাধারণকে শাসন করত। ন্যায়বিচার বা আইনের শাসন ছিল না। কারণ বিচার ব্যবস্থা রাজার হুকুমেই চলত।

স্বর্গীয় অধিকার নীতি

অষ্টাদশ শতকের রাজকুল স্বৈরাচারী হলেও তাঁরা "আলোকপ্রাপ্ত স্বৈরাচারী" (Enlightened despot) মতবাদে বিশ্বাস করতেন। এই যুগের দার্শনিকেরা এই তত্ত্ব প্রচার করেন যে, প্রকৃতির নিয়মে "অধিকারের" সহিত "কর্তব্য" অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সুতরাং রাজা যদি ঈশ্বর প্রদত্ত অধিকার পান তবে ঈশ্বরের নিয়ম অনুযায়ী তাঁকে কর্তব্যও করতে হবে (Rights are deduction of duties)। অষ্টাদশ শতকের আলোকিত চিন্তা (Enlightened Thought) বা "বুদ্ধিবিভাসিত দর্শনের" দ্বারা প্রভাবিত হয়ে রাজারা বহু শাসন ও অর্থনৈতিক সংস্কার প্রবর্তন করেন। ঐতিহাসিক লর্ড এ্যাক্টন (Lord Acton) স্বৈরাচারী রাজাদের এই সংস্কার নীতিকে "রাজতন্ত্রের অনুতাপ" (Repentance of the monarchy) বলে অভিহিত করেছেন। প্রাশিয়ার ফ্রেডারিক দি গ্রেট, রাশিয়ার জারিনা ক্যাথারিণ, অষ্ট্রিয়ার দ্বিতীয় যোসেফ প্রভৃতি ছিলেন আলোকিত রাজতন্ত্রবাদের মুখ্য প্রবক্তা। তাঁরা রাজ কর্তব্যের আদর্শে উদ্দীপিত হয়ে নানাবিধ সংস্কার প্রবর্তন করেন। কিন্তু ফ্রান্সের বুরবোঁ রাজারা আলোকিত দর্শনের আদর্শে প্রভাবিত হননি। তাঁরা কেবলমাত্র স্বর্গীয় অধিকারেই বিশ্বাস করতেন। আলোকিত শাসকদের মধ্যে স্পেনের তৃতীয় চার্লস, পর্তুগালের প্রথম যোসেফ, সুইডেনের তৃতীয় গাষ্টাভাস, সার্ডিনিয়ার তৃতীয় ইম্যানুয়েল প্রভৃতির নাম উল্লেখ্য। আলোকিত মতবাদের অনুরাগী মন্ত্রীদের মধ্যে ফ্রান্সের চোইসুল ও টুর্গো, ইতালীর তানুচ্চি (Tanucci) প্রভৃতির নাম করা যায়।

আলোকিত স্বৈরতন্ত্রবাদ

আলোকিত দর্শনের অনুরাগী রাজারা নানাবিধ সংস্কারের প্রবর্তন করলেও তাঁরা কোন প্রকার মৌলিক সংস্কার করতে বিরত থাকেন। পুরাতন ক্ষয়প্রাপ্ত সমাজ ব্যবস্থাকে বদলিয়ে নতুন সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তনের কোন চেষ্টা আলোকিত রাজারা করেননি। প্রজাদের প্রতিনিধি সভা গঠন বা উদারতান্ত্রিক শাসন প্রবর্তন অথবা প্রজাদের মতামত স্বীকার করে শাসন পরিচালনা প্রভৃতি কর্তব্য তাঁরা অগ্রাহ্য করেন। প্রজাদের কোন নায্য দাবী তাঁরা স্বীকার করতেন না। প্রজাদের জন্যে কিছু করা গেলেও প্রজাদের দ্বারা কোন কিছু করা তাঁরা অন্যায় মনে করতেন। আলোকিত রাজাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল ক্ষয়ধরা রাজশক্তিকে দৃঢ় করা। লেফেভারের (Lefebvre) মতে, কেন্দ্রীভূত শাসন, দক্ষ কর্মচারী নিয়োগ ও সংরক্ষণ-পন্থী অর্থনীতির মাধ্যমে আলোকিত রাজারা নিজেদের ক্ষমতাকে দৃঢ় করেন।[১] আলোকিত শাসন ছিল আসলে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রকে স্থায়ী ও জনপ্রিয় করার একটি উপায় মাত্র। এই শাসনব্যবস্থায় আলোক অপেক্ষা স্বৈরাচারের ভাগ ছিল অনেক বেশী। একমাত্র অষ্ট্রিয়ার দ্বিতীয় যোসেফ ছিলেন কিছুটা ব্যতিক্রম। প্রাশিয়ার রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডারিক ও রাশিয়ার রাণী ক্যাথারিণ প্রভৃতি তৃতীয় শ্রেণী বা সাধারণ লোকের উন্নতি বিধানের কোন চেষ্টা করেননি। তাঁরা অভিজাতদেরই শাসন ক্ষমতার অংশীদার করেন। আলোকিত স্বৈরতন্ত্রের সফলতা, রাজার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ওপর নির্ভরশীল ছিল। আলোকিত রাজার মৃত্যুর পর উপযুক্ত উত্তরাধিকারীর অভাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁর প্রচলিত সংস্কারগুলি লোপ পেত। সুতরাং আলোকিত স্বৈরতন্ত্রের দ্বারা ইওরোপে শাসন বা সমাজ ব্যবস্থার কোন মৌলিক পরিবর্তন ঘটে একথা মনে করা যায় না। সামন্ত প্রথা, ভূমিদাস প্রথা প্রভৃতি সামাজিক অন্যায়ের কোন প্রতিকার এই শাসনব্যবস্থার দ্বারা হয়নি।

আলোকিত স্বৈরতন্ত্রের ত্রুটি

আলোকিত স্বৈরতন্ত্রের যুগে ইওরোপীয় রাজারা প্রতিনিধি সভা প্রবর্তন করেননি। ফ্রান্সে ১৬১৪ খ্রীঃ হতে জাতীয় সভা বা স্টেটস জেনারেলের অধিবেশন স্থগিত রাখা হয়। বিচারসভাগুলিও রাজাদের হাতের ক্রীড়নক ছিল। ফ্রেডারিক দি গ্রেট প্রভৃতি রাজা আলোকিত দর্শনের অনুরাগী হলেও মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্রকে ভাঙার জন্যে কোন চেষ্টা করেননি।

১. Lefebvre—The French Revolution. P. 74.

সামাজিক অবস্থা (Social Condition) : অষ্টাদশ শতকে ইওরোপীয় সমাজ প্রধানতঃ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল—যথা যাজক শ্রেণী, অভিজাত শ্রেণী এবং সাধারণ শ্রেণী।-প্রতি শ্রেণীকে এষ্টেট (Estate) বলা হত। যাজক ও অভিজাত শ্রেণী ছিল যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় এষ্টেট। সাধারণ লোকেরা ছিল Third Estate বা তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। যেহেতু ভূমিকেই সম্পদের প্রধান উৎস বলে মনে করা হত, সেহেতু ভূমির মালিকানাই সামাজিক প্রতিপত্তি লাভের চাবিকাটি ছিল। যাজক ও অভিজাত সম্প্রদায় ভূমির মালিকানা ও নানা সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত। যাজকেরা প্রার্থনা ও উপাসনা ছাড়া শিক্ষাদান, দরিদ্র সেবা, জন্ম-মৃত্যুর হিসেব রাখা প্রভৃতি কাজের দায়িত্ব বহন করত। গীর্জার ভূসম্পত্তি হতে গীর্জার প্রচুর আয় হত। এছাড়া গীর্জা টাইদ বা ধর্মকর হতেও বহু অর্থ পেত। গীর্জার আয়ের অপর সূত্র ছিল মৃত্যু-কর, প্রার্থনা-কর বা পিটারের পেনী, বিবাহ নথীবদ্ধ করার দরুণ কর প্রভৃতি। গীর্জার উচ্চ যাজক যথা বিশপ শ্রেণী ছিল সাধারণতঃ অভিজাত পরিবারের লোক। গীর্জাব জমিদারীর আয়, গীর্জাব বিভিন্ন উপস্বত্ব তারা ভোগ করত। সমাজে এদের দারুণ প্রতিপত্তি ছিল। উচ্চ যাজকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি নিয়ন্ত্রণ কংত এবং শাসন কার্যে অংশ নিত।

যাজক শ্রেণী

অভিজাত শ্রেণী ছিল ইওবোপের সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাবান ও সুবিধাভোগী শ্রেণী। মধ্যযুগে সামন্ততন্ত্রের উদ্ভবের ফলে অভিজাত শ্রেণীর উদ্ভব হয়। অভিজাতরা ভূমি ও কৃষকদের ওপর বহু অধিকার ভোগ করত। এরা বংশানুক্রমিকভাবে ভূমির ওপর অধিকার ভোগ কবত। অভিজাত শ্রেণী সরকারকে কর দেওয়ার ব্যাপারে বহু ছাড় ও সুবিধা ভোগ কবত। অভিজাত বংশের জমিদারী যাতে সন্তানদের মধ্যে ভাগ না হয়ে যায় এজন্য Law of primogeniture বা উত্তরাধিকারী আইন দ্বারা একমাত্র জ্যেষ্ঠ পুত্রকে পিতার জমিদারীতে উত্তরাধিকার দেওয়া হত। অভিজাতদের প্রধান অধিকার ছিল বংশ কৌলিন্য। অভিজাতরা তাদের বংশমর্যাদাকে বিশেষভাবে ধরে রাখার চেষ্টা করত। তারা নিজ সম্প্রদায় ছাড়া অন্য সম্প্রদায়ের সহিত বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন করত না। ফ্রান্স ও ইংলন্ড ছাড়া ইওরোপের অন্যান্য দেশে অভিজাতদের নাম সরকারের তালিকাবদ্ধ (registered) করা হত। তৃতীয় শ্রেণী বা থার্ড এষ্টেট কায়িক শ্রমের দ্বারা জীবিকা অর্জন করার জন্যে অভিজাতরা তাদের ঘৃণা করত।[১] অভিজাত শ্রেণী তাদের অধিকার ও মর্যাদা সযত্নে রক্ষা করত। কৃষক ও ভূমিদাসদের নিকট অভিজাতরা নানাপ্রকাব সামন্ত কর পেত। ম্যানর প্রথা বা খামার প্রথার ফলে অভিজাতবা ম্যানর থেকে নানাভাবে অর্থ পেত। এছাড়া তারা রাজার সভাসদ, সেনাপতি, উচ্চ কর্মচারী হিসেবে কাজ করার একচেটিয়া অধিকার ভোগ করত। এরা যুদ্ধবিগ্রহ, শাসনকার্য প্রভৃতির কাজে রাজাব সহায়তা করত। মোট কথা, অষ্টাদশ শতক ছিল ইওরোপে অভিজাত বা সামন্ত শ্রেণীর অধিকারের যুগ।

অভিজাত শ্রেণী

ইংলন্ড ছিল উপরোক্ত নিয়মের একমাত্র ব্যতিক্রম। ইংলন্ডে ব্যবসায়-বাণিজ্য দ্বারা বহু লোক লক্ষ্মীর প্রসাদ লাভ করে। ইংলন্ডের অভিজাতরাও ব্যবসায়-বাণিজ্য করত। ইংলন্ডের বুর্জোয়া শ্রেণী অর্থ উপার্জন করে অভিজাতদের মতই ক্ষমতা ও মর্যাদা ভোগ করত। দ্বিতীয়তঃ, ইওরোপে অভিজাত শ্রেণী জমি ভোগ করলেও, নায্য হারে কব দেওয়ার দায়িত্ব এড়িয়ে যেত। কিন্তু ইংলন্ডে সকল শ্রেণীর ওপর সমানভাবে কর ধার্য করা হত। তৃতীয়তঃ, ইংলন্ডে Enclosure বা জমি বেষ্টন করার প্রথার চলন হলে ম্যানর প্রথা অবলুপ্ত হয়।

ইংলন্ডের সমাজ ব্যবস্থা

তৃতীয় শ্রেণী বা Third Estate বলতে অভিজাত ও যাজক ছাড়া বাকি সকল লোককে বুঝাত। ধনী বুর্জোয়া যথা শিল্পপতি, ব্যাঙ্ক মালিক প্রভৃতির কাঞ্চন কৌলিন্য থাকলেও জন্ম

১· Lefebvre—P. 47.

তৃতীয় শ্রেণীর সংগঠন . কৃষক

কৌলিন্যের অভাবে তারা তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত ছিল। ফরাসী দেশে ধনী বুর্জোয়াদের নাম ছিল haute bourgeois বা হুটে বুর্জোয়া। বুদ্ধিজীবি ও চাকুরীজীবি সম্প্রদায় যথা, শিক্ষক, আইনজীবি, সাধারণ কর্মচারী প্রভৃতিও তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এদের মধ্যবিত্ত বা পাতি বুর্জোয়া বলা হত। এই শ্রেণীও কায়িক শ্রমের দ্বারা জীবিকা অর্জন করত না। তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল কৃষকেরা। কৃষকশ্রেণী দুই ভাগে বিভক্ত ছিল, যথা, স্বাধীন কৃষক ও ভূমিদাস। ভূমিদাস শ্রেণী মালিককে বিভিন্ন কর দিত; যাজককে ধর্ম কর দিত, মালিকের জমিতে বেগার খাটত। এরা অত্যন্ত দুর্দশার মধ্যে দিন কাটাত। তাদের ব্যক্তি স্বাধীনতা, রাজনৈতিক অধিকার কিছুই ছিল না। রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়ায় ভূমিদাস প্রথা ছিল সর্বাপেক্ষা কঠোর। ইংলন্ডে ভূমিদাস প্রথা ছিল না। কৃষক শ্রেণীই ছিল সমাজের সম্পদের উৎপাদনকারী। কিন্তু অভিজাত বুর্জোয়া ও শহরবাসীরা এদের নীচু চক্ষে দেখত।[১] তারা মনে করত যে, কৃষকেরা ছিল নিরক্ষর কুৎসিত শ্রেণী। জমি চাষ করতে, কর দিতে ও উচ্চশ্রেণীর সেবা কবতে কৃষকেরা জন্মগ্রহণ করেছে। কৃষকদের জীবন ছিল শোষিত, করভারে জর্জরিত এবং অভিজাতদেব দ্বারা নির্যাতিত।

অষ্টাদশ শতকে ইওরোপে মধ্যবিত্ত বা বুর্জোয়া শ্রেণীব উদ্ভব ঘটে। এই শ্রেণীব প্রভাব ইওরোপের সকল দেশে সমান ছিল না। ইংলন্ডে ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং শিল্পের বিস্তারের ফলে

বুর্জোযা বা মধ্যবিত্ত শ্রেণী

বুর্জোয়া শ্রেণী বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে। শিল্প-বিপ্লব এবং শহরেব সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ইংলন্ডের অর্থনীতিতে বুর্জোয়াদেব প্রাধান্য লাভ সম্ভব হয়। ফ্রান্সে এই সময়ে বুর্জোয়াদের প্রাধান্য ছিল না। সামন্তপ্রথাব ফলে ফ্রান্সে অভিজাতদেব একচেটিয়া অধিকার ছিল। অভিজাতশ্রেণী জন্মকৌলিন্যেব জোরে সকল কিছুই অধিকার কবত। বুর্জোযা শ্রেণী অর্থকৌলিন্যে বলীয়ান হলেও সমাজে তাদেব প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল না। পূর্ব ইওরোপে বুর্জোয়াদের সংখ্যা ছিল নাম-মাত্র। অন্তঃশুল্ক, বৈষম্যমূলক কর ব্যবস্থা, ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রতি সরকারি উদাসীনতা বুর্জোয়া শ্রেণীকে সামন্ত শাসনের প্রতি বিরূপ করে তুলে। বুর্জোয়ারা ছিল শিক্ষিত, বুদ্ধিজীবি শ্রেণী। এরা এজন্য পুরাতনতন্ত্রেব প্রতি শ্রদ্ধা হারায়।

গ্রামে ও শহরে একশ্রেণীব ভূমিহীন দিন মজুর ও শ্রমিক ছিল। এদের বাসগৃহ বা চাষেব জমি বলতে কিছুই ছিল না। এবা অপরের জমিতে দিন মজুব খাটত। শহরে এলে এরা কাবখানাব

সাঁকুলেৎ বা সর্বহারা শ্রেণী

কাজ বা গৃহভৃত্যেব কাজ করত। অভিজাতরা এই সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীকে সমাজের নিম্ন শ্রেণী বলে গণ্য করত।[২] এছাড়া ভিক্ষুক ও উপজীবিকাহীন লোকও এই যুগে দেখা যেত। ফ্রান্সের জনসংখ্যার ১/৫ অংশ ছিল উপজীবিকাহীন লোক। বিপ্লবেব সময় এরা প্যারিসের জনতায় (Parisian mob) যোগ দিয়ে ধ্বংসকাবী মূর্তি ধাবণ করে। এদের নাম হয় সাঁকুলেৎ (Sansculottes)।

অর্থনৈতিক অবস্থা (Economic Condition) ঃ অষ্টাদশ শতকে ইওবোপের অর্থনীতি একটি পবিবর্তনমুখী অবস্থায় উপনীত হয়। মধ্যযুগের শেষ দিক হতে কৃষিব পাশাপাশি

কৃষি

শিল্প, বাণিজ্য ও উপনিবেশ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। যদিও অষ্টাদশ শতকে কৃষিই ছিল অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি, তবুও শিল্প, বাণিজ্য ও মূলধন নিয়মিতভাবে বেড়ে পুরাতন সমাজের চরিত্রে পরিবর্তনের সূচনা করে। অর্থনীতিতে কৃষিই ছিল অগ্রাধিকাব। সমাজে মর্যাদা লাভের প্রধান উপায় ছিল ভূসম্পত্তির মালিকানা। এমন কি বণিকেরা বাণিজ্যে ভাল অর্থ রোজকার করার পর সেই অর্থে জমি কিনে জমির মালিকানাকে

১ Lefebvre—P 51

২ Ibid—P 51

তাদের আয় ও সম্মান লাভের পথ মনে করত। বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ-আবাদের ব্যবস্থা তেমন ছিল না। দরিদ্র ও নিরক্ষর কৃষকেরা এসকল জিনিস বুঝত না। লেফেভারের মতে, কৃষকেরা সুবৃষ্টি ও প্রকৃতির দয়ার ওপর নির্ভর করে কৃষিকার্য করত। প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটলে কৃষকের দুঃখ-কষ্টের সীমা থাকত না। জমিগুলিকে পালাক্রমে আবাদ করে তার উর্বরতা বৃদ্ধির জন্যে চেষ্টা করা হত না। কেবলমাত্র ফ্ল্যান্ডার্স (Flanders) অঞ্চলে উন্নত প্রথায় কৃষির প্রচলন ছিল।[১]

কৃষির উন্নতির বাধা

মার্কান্টাইল মতবাদ বা সংরক্ষণবাদ অনুযায়ী খাদ্যশস্য দেশের বাইরে রপ্তানি করা নিষিদ্ধ ছিল। খাদ্যশস্য রপ্তানি ও অবাধ বিক্রয় নিষিদ্ধ থাকার জন্যে খাদ্যদ্রব্যের ন্যায্য দাম পাওয়া যেত না। কৃষকেরা উদ্বৃত্ত খাদ্য বিক্রয় করে ন্যায্য দাম পেত না। সরকার এবং লোকে মনে করত যে, খাদ্য চালান দিলে দেশে খাদ্য সঙ্কট দেখা দেবে। এজন্য সরকার খাদ্য চালান নিষিদ্ধ করে দেয়। কৃষক নিজ পরিবারের খাদ্যের প্রয়োজন ও সরকারি খাজনা মেটাবার জন্যেই উৎপাদন করত। কৃষির উন্নতি ঘটিয়ে অধিক ফলনের কোন চেষ্টা দেখা যেত না।

মার্কান্টাইলবাদ

বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সংরক্ষণবাদ বা মার্কান্টাইলবাদকে (Marcantilism) প্রাধান্য দেওয়া হত। আলোকিত রাজারা ছিলেন মার্কান্টাইলবাদের ঘোর সমর্থক। লর্ড এ্যাক্টনের মতে, "মার্কান্টাইলবাদ ছিল আলোকিত স্বৈরতন্ত্রের অনুরূপ বা অনুপূরক অর্থনৈতিক মতবাদ" (Marcantilism was the economic analogue of Enlightened despotism)। মার্কান্টাইলবাদীরা বিশ্বাস করত যে, পৃথিবীতে সম্পদের পরিমাণ সীমিত। সুতরাং বিদেশী মাল অবাধে আমদানি করলে বা খাদ্যদ্রব্য অবাধে রপ্তানী করলে সম্পদ ক্ষয় পাবে। এজন্য মার্কান্টাইলবাদ অনুসারে দেশের শিল্পদ্রব্যের রপ্তানী বাড়িয়ে আমদানি কমাবার চেষ্টা করা হত। যাতে বিদেশী মাল বেশী আমদানি না হয় সেজন্য আমদানি মালের ওপর আমদানি শুল্ক বাড়ান হত। এর ফলে অন্যান্য দেশের সঙ্গে অবাধ বাণিজ্য চলত না। মার্কান্টাইলবাদের ফলে দেশের শিল্প বৈদেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার হাত হতে রক্ষা পেত। কিন্তু শিল্প সংরক্ষণ নীতি নেওয়ার ফলে এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের বাণিজ্য ব্যাহত হত। প্রতি দেশ চেষ্টা করত অন্য দেশে তার মালের বিক্রী বাড়াতে এবং অন্য দেশ থেকে মাল আমদানি কমাতে। এর ফলে আন্তর্জাতিক বিরোধ বাড়ত, বাণিজ্যের ক্ষতি হত।

ফিজিওক্র্যাটবাদ

মার্কান্টাইলবাদ বা সংরক্ষণবাদের বিরুদ্ধে ফিজিওক্র্যাট (Physiocrats) নামক অর্থনীতিবিদরা তীব্র প্রতিবাদ জানায়। অবাধ বাণিজ্যবাদীরা একথা বুঝাতে চেষ্টা করে যে, বিশ্বের সম্পদের সীমা নেই। যতই খাদ্য ও শিল্পবস্তুর উৎপাদন বাড়বে ততই সম্পদ বাড়বে। এজন্যে তারা শিল্প ও বাণিজ্যের ওপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ লোপ এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে অবাধ বাণিজ্যের দাবী জানায়। মার্কান্টাইলবাদ জনিত সংরক্ষণ নীতির ফলে বাণিজ্যে মন্দা এবং দারিদ্র্য বাড়ছে একথা বুঝাতে তারা চেষ্টা করে। অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে ফিজিওক্র্যাটদের তীব্র সমালোচনার ফলে সংরক্ষণবাদের তীব্রতা কিছুটা কমে যায়। তবুও ইওরোপীয় শাসকদের চিন্তা মার্কান্টাইলবাদের প্রভাব হতে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়নি।

ইওরোপীয় বাণিজ্য

মার্কান্টাইলবাদের বাধা সত্বেও অষ্টাদশ শতকে ইওরোপের বিভিন্ন দেশের মধ্যে কিছু পরিমাণ বাণিজ্য চলত। জর্জ রুডে নামক ঐতিহাসিক মনে করেন যে, ইওরোপের সামুদ্রিক দেশগুলি ১৮শ শতকে বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির পথে যাচ্ছিল। এই যুগে নদীগুলির ভাল নাব্যতা ছিল না এবং ক্যানালের সংখ্যা ছিল সীমিত।

১· Lefebe—P. 26.

এজন্য স্থলপথে ও সমুদ্রপথে বাণিজ্য চলত। ফ্রান্স, ইংলন্ড ও হল্যান্ডের রাজপথগুলি মেরামত করা হয়। অন্য দেশগুলিতে ভাল রাস্তাঘাট ছিল না। ফলে মাল চলাচলে বিঘ্ন ঘটত। সমুদ্রপথে মাল পরিবহনে ইংলন্ড, ফ্রান্স ও হল্যান্ড প্রাধান্য ভোগ করত।[১]

ইওরোপের সামুদ্রিক দেশগুলি অষ্টাদশ শতকে উপনিবেশের সঙ্গে বাণিজ্য স্থাপনের জন্যে চেষ্টা চালায়। ইংলন্ড, হল্যান্ড, ফ্রান্স, স্পেন এবিষয়ে বিশেষ কৃতিত্ব দেখায়। ভারত ও উত্তর আমেরিকায় উপনিবেশ দখলের জন্যে ইংলন্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে ১৭৪০—৬৩ খ্রীঃ পর্যন্ত দীর্ঘ যুদ্ধ-বিগ্রহ দেখা দেয়। উপনিবেশের বাজারে মাল বিক্রয় দ্বারা ইওরোপের সামুদ্রিক ও বাণিজ্যিক জাতিগুলি প্রভূত সম্পদ বাড়ায়। ১৭৮৯ খ্রীঃ ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্কালে ফ্রান্স ও ইংলন্ডের শতকরা ৪০ ভাগ বাণিজ্য উপনিবেশের সহিত চলত।[২] উপনিবেশগুলিকে নানাভাবে শোষণ করে বণিক জাতিগুলি শ্রীবৃদ্ধি করে। ইংলন্ডের বাণিজ্য জাহাজের সংখ্যা ছিল ১৭০২ খ্রীঃ ৩৩০০; ১৭৭৬ খ্রীঃ তাহা দাঁড়ায় ৯৪০০তে। ফ্রান্স ছিল ব্রিটেনের প্রধান বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বী। ইওরোপের অন্যান্য দেশের সঙ্গে ফ্রান্সের বাণিজ্য ১৭১৬-৮৮ খ্রীঃ ৪ গুণ বাড়ে।[৩]

উপনিবেশের বাজার

তাছাড়া দক্ষিণ আমেরিকা, বিশেষতঃ মেক্সিকোর সোনা ও রূপার খনি থেকে ইওরোপের বাজারে প্রভূত সোনা ও রূপার আমদানি হয়। অষ্টাদশ শতকে দক্ষিণ আমেরিকা হতে ৫৭,০০০ মেট্রিক টন রূপা ও ১১০০ মেট্রিক টন সোনা আমদানি হয়। ১৭৮০ খ্রীঃ পর এই আমদানির পরিমাণ আরও বাড়ে। এই আমদানি করা সোনা ও রূপার $\frac{৯}{১০}$ ভাগ স্পেন ও পর্তুগালের হাত বদল হয়ে ইংলন্ড, ফ্রান্স ও হল্যান্ডের হাতে বাণিজ্য সূত্রে চলে আসে।

দক্ষিণ আমেরিকা

উপনিবেশের সম্পদ ও দক্ষিণ আমেরিকার সোনা, রূপা আমদানির ফলে ইওরোপের এক শ্রেণীর বণিকের হাতে প্রভূত অর্থ সম্পদ জমা হয়। এরা মূলধনী বা ক্যাপিটালিষ্ট (Capitalist) শ্রেণীতে পরিণত হয়। এই শ্রেণী তাদের উদ্বৃত্ত অর্থ সরকারকে সুদে ধার দিত। বাকী অর্থ শিল্পে ও ব্যাঙ্কে লগ্নী করত। এদের মূলধনের সাহায্যে লন্ডনের বেয়ারিং (Baring), আমষ্টারডামের হোপ (Hope), ফ্রান্সের সুইস (Swiss) ব্যাঙ্ক প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যাঙ্কগুলি চালু হয়।

মূলধনী শ্রেণী

উপনিবেশের সম্পদ ও দক্ষিণ আমেরিকার সোনা-রূপার বাট আমদানির ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। এছাড়া জনসংখ্যা বাড়ায় জিনিসপত্রের চাহিদা বাড়ে। এজন্য জিনিসপত্রের দাম দ্রুত বাড়তে থাকে। রুটি ও অন্যান্য জিনিসের দাম সাধারণ দরিদ্র লোকের ক্রয় সীমার ওপর চলে যায়। ১৭৮৯ খ্রীঃ পর খাদ্যদ্রব্যের দাম শতকরা ৬৫%বাড়ে।[৪] কিন্তু সাধারণ লোকের মজুরী বা আয় সেই অনুপাতে বাড়ে নি। একশ্রেণীর লোকের হাতে সম্পদ ও অর্থ জমা হয়। অপরদিকে দরিদ্র লোক আরও দরিদ্র হতে থাকে।

মূল্যস্ফীতি

মূলধন ও উপনিবেশের বাজার বাড়ার ফলে শিল্পে ধীরে ধীরে উৎপাদন বাড়তে থাকে। ইংলন্ডে শিল্প-বিপ্লবের ফলে শিল্পদ্রব্যের উৎপাদনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে (বিশদ বিবরণ শিল্প-বিপ্লব অধ্যায় দেখ)। ফ্রান্স, হল্যান্ড, জার্মানীতেও শিল্পে ক্রম-পরিবর্তন ঘটতে থাকে। মালের চাহিদা মেটাবার জন্যে বড় আকারের কারখানা গঠিত হয়। সূতী বস্ত্রের উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন বিশেষভাবে দেখা যায়। কারখানায় কাজের জন্যে বাড়তি মজুরের দরকার

১· Ibid—P. 20.

২· Ibid—P. 23.

৩· George Rude

৪· David Themson—Europe Since Napoleon.

হওয়ায় নারী ও শিশুদেরও কাজে লাগান হয়।[১]

মোট কথা, অষ্টাদশ শতকে কৃষির কথা বাদ দিলে শিল্পে-বাণিজ্যে পরিবর্তনের হাওয়া দেখা যায়। বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল এই পরিবর্তনের অগ্রদূত। এই পরিবর্তনের চাপে পুরাতন কৃষিকেন্দ্রিক সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির ধ্বংসেব পথ পরিষ্কার হয়। ফরাসী বিপ্লব ছিল তারই প্রকাশ।

১· Ibid—P. 25.

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
জ্ঞানদীপ্তি (Enlightenment)

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের রেনেসাঁস বা জাগৃতি আন্দোলনের ফলে মধ্যযুগীয় কুসংস্কার ও অন্ধ-বিশ্বাসের পরিবর্তে যুক্তির দ্বারা লোকে সবকিছু বিচার করতে শিখে। সপ্তদশ শতকে রেনেসাঁসের প্রভাবে জ্ঞানের আরও বিকাশ ঘটে। বিজ্ঞান, দর্শনের ক্ষেত্রে নতুনকে জানার আগ্রহ দেখা দেয়। অষ্টাদশ শতকে রেনেসাঁসজাত যুক্তিবাদ ইওরোপের চিন্তাধারাকে পুরোপুরি অধিকার করে। এই যুগে প্রকৃতি বিজ্ঞান, সমাজ ব্যবস্থা, রাষ্ট্র ব্যবস্থা সকল ক্ষেত্রেই মানুষ যুক্তিবাদ প্রয়োগ দ্বারা প্রচলিত ব্যবস্থার সত্যাসত্য যাচাই করে। এজন্য অষ্টাদশ শতককে জ্ঞানদীপ্তির যুগ (Age of Enlightenment) বলা হয়ে থাকে। জনৈক ফরাসী দার্শনিকের মতে, অষ্টাদশ শতক ছিল Siecle de la lumiere (সিয়্যাকল দ্য লা লুমিয়্যার) অর্থাৎ আলোকিত শতাব্দী। এই শতাব্দীর মানুষের নিকট যুক্তি এবং বুদ্ধিই ছিল শ্রেষ্ঠ। এই বুদ্ধিবিভাসাবাদ বা যুক্তিবাদ জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে বিকশিত হয়। এগুলির মধ্যে কয়েকটি সাধারণ দিক ছিল ঃ যথা, (১) প্রকৃতির রহস্যকে যুক্তির দ্বারা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা। দৈব বা অতি প্রাকৃতকে অস্বীকার করা। (২) মানুষের অভিজ্ঞতাকে যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করা। (৩) দার্শনিক ইম্যানুয়েল কান্টের মত ছিল যে, প্রকৃতি যদি নিয়ম (Law) মেনে চলে তবে রাষ্ট্র ও সমাজের শাসনের জন্যে নিয়মের বা Law-এর স্থান থাকা উচিত। দার্শনিকের কাজ হল সেই নিয়মকে আবিষ্কার করা। (৪) যুক্তিবাদকে ধর্মের ওপর স্থান দান করা। (৫) সামাজিক প্রথা ও ধর্ম বিশ্বাসকে যুক্তির দ্বারা যাচাই করে গ্রহণ করা। মোট কথা, অষ্টাদশ শতকে চিন্তাক্ষেত্রে Rationalism বা যুক্তিবাদের ব্যাপক প্রয়োগ দেখা যায়। যুক্তিবাদ থেকে আসে মানবতাবাদ বা হিউম্যানিজম (Humanism)। সমাজের সকল কিছুই মানুষের মঙ্গলের জন্যে এই চিন্তাধারা ছিল মানবতাবাদের মূল কথা। রাষ্ট্র মানবের মঙ্গলের জন্যেই গঠিত। জ্ঞানদীপ্তির এটাই ছিল মূল কথা।

জ্ঞানদীপ্তি কাহাকে বলে

অষ্টাদশ শতকের বিজ্ঞানী ও চিন্তাবিদ্‌দের ফিলজফ (Philosoph) বা দার্শনিক বলে অভিহিত করা হত। ফিলজফ বা দার্শনিকরা বুদ্ধি বা যুক্তি ছাড়া আর কোন কিছুকে স্বীকার করতেন না। পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা ও গবেষণার দ্বারা তাঁরা সত্য নির্ণয়ের চেষ্টা করতেন। কোন পূর্ব-নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তকে তাঁরা বিনা পরীক্ষায় স্বীকার করতেন না।

ফিলজফ বা দার্শনিক সমাজ চেতনা

ঐতিহাসিক ফিশারের মতে, "এই যুগের চিন্তাবিদ্‌দের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে সমাজের উন্নতি সাধনের জন্যে তাঁদের মতবাদকে তাঁরা কাজে লাগান" (A leading feature of the movement of thought was its active concern for the regeneration of the Society)।[১] ফিলজফ বা দার্শনিকেরা ধর্ম, রাষ্ট্রের উৎপত্তি, রাজার অধিকার, অভিজাতদের বিশেষ অধিকার, অর্থনীতি প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁদের বিশ্লেষণ ও যুক্তিগুলি প্রয়োগ করেন। এর ফলে অষ্টাদশ শতকের প্রচলিত সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার বহু ত্রুটি ধরা পড়ে। ফিলজফ বা দার্শনিকদের মতবাদে প্রভাবিত হয়ে লোকে পুরাতন ব্যবস্থার প্রতি আস্থা হারায়। এইভাবে দার্শনিকেরা বিপ্লবের ক্ষেত্র রচনা করেন। "বিপ্লব ছিল আলোকের দুহিতা" (Revolution is the daughter of Enlightenment)।

১· Fisher—History of Europe. P. 697.

অষ্টাদশ শতকের জ্ঞানদীপ্তি বা বুদ্ধি বিভাসার প্রভাব প্রধানতঃ নগরবাসী বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে দেখা দেয়। বুর্জোয়া শ্রেণীর নতুনকে গ্রহণ করার ক্ষমতা তাদের দার্শনিক মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট করে। তারা বুঝতে পারে যে, এই যুক্তিবাদ বা বুদ্ধি বিভাসিত দর্শনের সাহায্যে তারা সমাজের পুরাতন ব্যবস্থাকে লোপ করতে পারবে। আইনজীবি, শিক্ষক, চাকুরিয়া, বণিক প্রভৃতি ছিল নব দর্শনের অনুরাগী। কোন কোন রাজা নব দর্শনের প্রতি অনুরক্ত হয়ে এর চর্চা করেন। প্রাশিয়ার ফ্রেডারিক দি গ্রেট, অষ্ট্রিয়ার দ্বিতীয় যোসেফ, রাশিয়ার দ্বিতীয় ক্যাথারিন ছিলেন আলোকিত রাজা বা Enlightened monarch।

বুর্জোয়া শ্রেণীর ওপর জ্ঞানদীপ্তির প্রভাব

আলোকিত দর্শন বা বুদ্ধি-বিভাসাকে তিনটি পর্বে ভাগ করা যায়, যথা—১৭১৫—১৭৫০; ১৭৫০—১৭৭৪; ১৭৭৪—১৭৮৯ খ্রীঃ। প্রথম পর্বে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে রবার্ট বয়েলের মানবদেহে রক্ত সঞ্চালন তত্ত্ব, স্যার আইজ্যাক নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব বিশেষ খ্যাতি পায়। এছাড়া ফেনেলন, হেলভিসিটিয়াস প্রভৃতি দার্শনিকেরা তাঁদের মতবাদের জন্যে খ্যাতি পান। ইংলন্ডের দার্শনিক জন লক (John Locke) তাঁর সামাজিক চুক্তি তত্ত্ব (Social Contract Theory) প্রচার করেন। লকের বক্তব্য এই ছিল যে, মানুষ যখন প্রাক-রাষ্ট্রীয় সমাজে বাস করত সেই সময় তাদের কতকগুলি বিশেষ অধিকার রক্ষার জন্যে এবং তাদের অবস্থার উন্নতির জন্যে তাঁরা রাষ্ট্র শাসনের অধিকার শাসক বা রাজাকে দান করে। লক এই মতকে প্রতিপন্ন করেন যে, রাজা ঈশ্বরের আদেশের বলে রাজত্ব করেন না। তিনি সামাজিক চুক্তির দ্বারা যে অধিকার পান তার বলেই তিনি রাজত্ব করেন। লকের এই মতবাদ ফ্রান্সের চিন্তাবিদদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। প্রথম পর্বের দার্শনিকদের মধ্যে সর্বপ্রধান ছিলেন মন্তেস্কু্য। "আইনের মর্ম" (Spirit of Laws) নামক গ্রন্থে তিনি যে রাষ্ট্রতত্ত্বের ব্যাখ্যা করেন তা বিশেষ খ্যাতি পায়। এই যুগের দার্শনিকরা ক্যাথলিক ধর্মের অলৌকিক তত্ত্ব ও ধর্মীয় অসহিষ্ণুতাকে সমালোচনা করেন। এই যুগে সমাজের অগ্রগতি ধর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। রক্ষণশীল লোকেরা ধর্মের অজুহাতে প্রগতিকে বাধা দিত। দার্শনিকেরা ক্যাথলিক ধর্মের গোঁড়ামি ও অন্ধবিশ্বাসকে সমালোচনা করায় ক্যাথলিক গীর্জার প্রভাব কমতে থাকে। সমাজে স্বাধীন চিন্তার বিকাশ ঘটে।

জ্ঞানদীপ্তি ঃ প্রথম পর্ব

দ্বিতীয় পর্বে (১৭৪৮—১৭৭৪ খ্রীঃ) জ্ঞানদীপ্তির মহত্তম বিকাশ ঘটে। ফরাসী দার্শনিকরাই ছিলেন জ্ঞানদীপ্তির এই পর্বের প্রধান পুরোহিত। এই পর্বে দার্শনিকেরা রাষ্ট্র, সমাজ ও অর্থনীতির বিশ্লেষণে তাঁদের যুক্তিজাল প্রয়োগ করেন। এই দার্শনিকদের মধ্যে প্রখ্যাত ছিলেন ভলতেয়ার (১৬৯৪—১৭৭৮ খ্রীঃ)। তাঁর বহু বিখ্যাত রচনাগুলির মধ্যে কাঁদিদ (Candide), দার্শনিক অভিধান (Dictionary of Philosophy) বিখ্যাত। ভলতেয়ার সামাজিক ন্যায়বিচার, ধর্মসহিষ্ণুতা, স্বাধীন চিন্তার পক্ষে যুক্তির বিস্তার করেন। এছাড়া রুশো তাঁর "সামাজিক চুক্তি" (Social contract) মতবাদ দ্বারা রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে বৈপ্লবিক তত্ত্ব প্রচার করেন। রুশো ছিলেন দার্শনিককুলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মৌলিক এবং অগ্রগামী। এছাড়া দেনিস দিদেরো (১৭৬৫ খ্রীঃ) বিশ্বকোষ বা এনসাইক্লোপিডিয়া রচনা করেন। এই গ্রন্থে দার্শনিকদের মৌলিক চিন্তাগুলি সঙ্কলিত হয়। এই গ্রন্থের মুখবন্ধ লেখেন দার্শনিক দালেমবেয়ার (D'Alembert)।[১] দিদেরো ও এলেমবার্ট অভিজাত শ্রেণীর বিশেষ অধিকারকে এই গ্রন্থে তীব্র আক্রমণ করেন। ফিজিওক্র্যাট নামক অর্থনৈতিক চিন্তাবিদ্‌রা কোয়েসনের (Quesney) নেতৃত্বে মার্কান্টাইলবাদ ও সংরক্ষণবাদের তীব্র সমালোচনা করেন (বিশদ বিবরণ পরে দ্রষ্টব্য)। জ্ঞানদীপ্তির প্রথম পর্বে মানবতাবাদের বা হিউম্যানিজমেরও প্রসার

দ্বিতীয় পর্ব

১· ফরাসী উচ্চারণ দালেমবেয়ার, ইংরাজী উচ্চারণ ডি' এলেমবার্ট।

ঘটে। বেকারিয়া (Beccaria) নামে জনৈক ইতালীবাসী অধ্যাপক দণ্ডিত অপরাধীদের প্রতি মানবতাময় আচরণের পক্ষে যুক্তি দেখান। এই সময় ইংলন্ডে কোয়েকার সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। এঁরা নিপীড়ন ও নির্যাতনমূলক প্রথাগুলির বিরুদ্ধে জনমত গঠন করেন। দাসপ্রথা ও দাস ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে এঁরা জনমত গঠন করেন।

তৃতীয় পর্বে (১৭৭৪—১৭৮৯ খ্রীঃ) দার্শনিক বা ফিলজফদের চিন্তার বাস্তব প্রয়োগের চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। ফ্রান্সে টুর্গো (Turgot), নেকার (Necker) প্রভৃতি মন্ত্রীরা দার্শনিকদের আলোকিত মতবাদে প্রভাবিত হয়ে মৌলিক সংস্কার প্রবর্তনের (structural reform) চেষ্টা করেন। দার্শনিকদের মতবাদগুলি জনসাধারণের নিকট পত্র-পত্রিকা, সালোঁ (Salon) বা আড্ডাখানা এবং কাফে বা কফিখানার আলোচনার মাধ্যমে জনসমাজে ছড়িয়ে পড়ে। কন্ডরসেট (Condorset)[১], রেনাল (Raynal) প্রভৃতি লেখকেরা দার্শনিকদের মতবাদকে সহজভাবে ব্যাখ্যা করে জনসমাজে প্রচার করেন।

তৃতীয় পর্ব

অষ্টাদশ শতকের জ্ঞানদীপ্তি বা আলোকিত দর্শনের প্রভাবে জনসাধারণের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটে। ক্যাথলিক গীর্জার সর্বাত্মক প্রভাবের বিরুদ্ধে দার্শনিকদের সমালোচনার ফলে ক্যাথলিকতন্ত্র মর্যাদা হারায়। খ্রীষ্টীয় গীর্জা মানুষকে শিক্ষা দিত যে, ইহজীবন হল পাপ। মানুষ ইহজীবনে কৃচ্ছ্রসাধন করলে পরজন্মে ঈশ্বরের করুণা পাবে। কিন্তু দার্শনিকরা আত্মনীপিড়ন ও পাপবোধ হতে মুক্ত হয়ে ঐহিক জীবনকে সুন্দর ও এই জীবনকে ভালবাসার কথা বলেন। দার্শনিকদের এই ব্যাখ্যার ফলে পাপ ও ঈশ্বর সম্পর্কে লোকের ধারণা পরিবর্তিত হয়। বুর্জোয়া শ্রেণী খ্রীষ্টীয় পাপবোধ ও বৈরাগ্য হতে মুক্ত হয়ে ভোগবাদী জীবনের আদর্শ গ্রহণ করে। বুর্জোয়া শ্রেণী ছিল আলোকিত দর্শনের দ্বারা সর্বাপেক্ষা প্রভাবিত। তারা কৃষি অর্থনীতিকে ত্যাগ করে শিল্প-বাণিজ্যের মাধ্যমে সমাজে সম্পদ সৃষ্টি করে। দ্বিতীয়তঃ, দার্শনিকদের যুক্তিবাদের প্রচারের ফলে মানুষের আত্মবিশ্বাস বাড়ে। লোকে বুঝতে পারে যে, প্রতি ব্যক্তির স্বাধীনতা ভোগ করার মৌলিক অধিকার আছে। প্রতি ব্যক্তির নিজ মর্যাদা ও স্বাধীনতা নিয়ে বাঁচার অধিকার আছে। দিদেরো বলেন, "আমাদের শতাব্দীর প্রধান লক্ষণ হল স্বাধীনতা"।[২] জ্ঞানদীপ্তির ফলে ইওরোপীয় সমাজের পুরাতন সংগঠন ভেঙে পড়ে। ট্র্যাডিশন বা পুরাতন প্রথার বিরুদ্ধে দার্শনিকরা যে সমালোচনা করেন তার ফলে স্বৈরতন্ত্র, অভিজাতদের বিশেষ অধিকার, খ্রীষ্টীয় গীর্জার আচার প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে লোকের আস্থা নষ্ট হয়। এর ফলে বিপ্লবী মানসিকতার সৃষ্টি হয়। মাদেলাঁর (Madelin) মতে, "পুরাতনতন্ত্রের ভিত্তি ও প্রাণ ছিল পুরাতন প্রথার প্রতি বিশ্বাস। নিরন্তর সমালোচনার দ্বারা দার্শনিকেরা এতে ফাটল সৃষ্টি করেন।" (Tradition had been the very soul and foundation of ancien regime ; the philosophers created fissures in it by constant criticism)।[৩] বিপ্লব ছিল আলোকেরই সন্তান।

ফলাফল

আলোকিত স্বৈরতন্ত্র বা উদারনৈতিক স্বৈরতন্ত্র (Enlightened Despotism) ঃ অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগ ছিল ইওরোপের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক বন্ধ্যা যুগ। এই যুগে রাজনীতিতে কোন নতুন ভাবধারার প্রবাহ লক্ষ্য করা যায় না। রাষ্ট্রনেতাগণ এই যুগে কেবলমাত্র বাহুবলে রাজ্য জয়কেই কর্তব্য বলে মনে করতেন। ঐতিহাসিক হ্যাসাল এই যুগের অন্ধকারময় রাজনীতির জন্যে মন্তব্য করেছেন যে, "১৭৬৩ খ্রীঃ ইওরোপ যেন ধীরে ধীরে এক অবক্ষয়ের পথে চলছিল।"[৪]

১. ফরাসী উচ্চারণ কঁদরসে।

২. Quoted from P. K. Chakravorty.

৩. Madelin—French Revolution. P. 6.

৪. Hassal—Balance of Power. P. 285.

অষ্টাদশ শতকের প্রকৃত অগ্রগতির ক্ষেত্র ছিল বিজ্ঞান, দর্শন এবং জ্ঞানদীপ্তি বা বুদ্ধি বিভাসা। ইতিহাসের দেবী এই যুগের সম্মানের উত্তরীয় রাজনৈতিক নেতাদের পরিবর্তে চিন্তাবিদ্‌দের কাঁধে চাপিয়ে দেন। এজন্য অষ্টাদশ শতককে আলোকিত শতাব্দী বা জ্ঞানদীপ্তির যুগ বলা হয়। জ্ঞানদীপ্তি বা বুদ্ধি বিভাসার ফলে এই যুগের মনীষা নিউটনের বিজ্ঞান তত্ত্বে, দার্শনিক লক, ফেনেলন, মন্তেস্ক্যুর দার্শনিক ও রাষ্ট্রতত্ত্বের মাধ্যমে বিকাশ লাভ করে। প্রকৃতি বিজ্ঞানীরা অলৌকিক বা অতি প্রাকৃতকে নস্যাৎ করে বিজ্ঞান ও প্রমাণের সাহায্যে প্রকৃতির রহস্যগুলিকে ব্যাখ্যা করেন। এই যুগে যুক্তিবাদ অন্ধবিশ্বাসকে নস্যাৎ করে প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটনে সাহায্য করে। দার্শনিকরা একথা প্রচার করেন যে, যুক্তি বা প্রমাণকে কোন কিছুর দ্বারা সীমাবদ্ধ করা যায় না।

এক শ্রেণীর দার্শনিকরা এই মত প্রচার করেন যে, সকল কিছুর পশ্চাতে নিয়ম বা যুক্তি কাজ করে। প্রকৃতি নিজেই নিয়ম বা Law মেনে চলে। সুতরাং মানব সমাজ ও রাষ্ট্র যাহা প্রকৃতির অধীন তাহাও নিয়ম বা Law মেনে চলতে বাধ্য। দার্শনিকের কাজ হল সেই নিয়মকে খুঁজে বের করা। ইংরাজ দার্শনিক জন লক, ফরাসী দার্শনিক মন্তেস্ক্যু প্রভৃতি রাষ্ট্রের উৎপত্তি এবং রাষ্ট্রীয় নিয়ম আবিষ্কারের জন্যে তাদের গবেষণা ও যুক্তি প্রয়োগ করেন। দার্শনিকরা সাধারণভাবে এই মত প্রচার করেন যে, মানব সমাজের মঙ্গলের জন্যে রাষ্ট্র গড়া হয়েছে। যিনি রাষ্ট্রের পরিচালনা করেন অর্থাৎ রাজা তাঁর যেমন অধিকার আছে, সেই সঙ্গে তাঁর কর্তব্যও আছে। রাজাগণকে অধিকার ভোগ করতে হলে এই সঙ্গে কর্তব্য করতে হবে। কর্তব্যহীন নিছক অধিকার ভোগ করা যুক্তিবাদ ও প্রাকৃতিক নিয়মের বিরোধী।

ইওরোপের রাজশক্তি সপ্তদশ শতক থেকে কেবলমাত্র অধিকার ভোগ করত। তারা স্বর্গীয় অধিকার (Divine Right) বলে শাসন করতেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল যে, যেহেতু তাঁরা ছিলেন ঈশ্বর প্রেরিত সেহেতু তাঁরা পৃথিবীর কোন শক্তির কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য ছিলেন না। প্রজাদের কল্যাণের জন্যে কোন কাজ করতেও তাঁরা বাধ্য নন বলে মনে করতেন। অষ্টাদশ শতকের যুক্তিবাদী দর্শন উপরোক্ত স্বর্গীয় অধিকার নীতির দুর্বলতা উদ্‌ঘাটন করে। দার্শনিকরা বলেন যে, কর্তব্য করলেই তবে অধিকার পাওয়া যায়। ঈশ্বর রাজাদের যেমন অধিকার দিয়েছেন তেমন কর্তব্য নির্দেশ করেছেন। অবিমিশ্র অধিকার যুক্তিসম্মত হতে পারে না।

যুক্তিবাদী বা আলোকিত দর্শনের ফলে অষ্টাদশ শতকের ইওরোপের রাজারা তাঁদের ভুল বুঝতে পারেন। দীর্ঘকাল ধরে ভগবানের দোহাই দিয়ে তাঁরা যে স্বৈরশাসন চালান তার অন্যায় দিকটা ধরা পড়লে তাঁরা ভয় পেয়ে যান। এজন্য এই যুগের রাজারা প্রজাহিতৈষী সংস্কার দ্বারা তাঁদের স্বৈর শাসনকে যুগের উপযোগী করার চেষ্টা করেন। ঐতিহাসিক লর্ড এ্যাক্টন (Lord Acton) এজন্য প্রজাহিতৈষী বা আলোকিত স্বৈরতন্ত্রকে "রাজতন্ত্রের অনুতাপ বা প্রায়শ্চিত্ত" (Repentance of the Monarchy) বলে বর্ণনা করেছেন। নির্ভেজাল স্বৈরাচারের বদলে এঁরা সংস্কারপন্থী স্বৈরাচার প্রবর্তন করেন। অধ্যাপক হেইজ (Hayes) এজন্য আলোকিত স্বৈরাচারকে, "স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের সহিত যুক্তিবাদের সমন্বয়" বলে অভিহিত করেছেন।[১]

এই সকল প্রজাহিতৈষী শাসক দার্শনিকদের রচনা পাঠ করেন। কেহ কেহ দার্শনিকগণের সহিত ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত ছিলেন। তাঁরা ছিলেন চতুর ও বুদ্ধিমান লোক। দার্শনিকদের ভাবধারা অনুযায়ী তাঁরা প্রজার কল্যাণের জন্যে সংস্কার প্রবর্তন করলেও রাজার ক্ষমতা যাতে খর্ব না হয় সেদিকে নজর রাখতেন। আসলে সংস্কার নীতির আড়ালে তাঁরা তাঁদের স্বাধিকার রক্ষা করতে চেষ্টা করেন। জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করলে এই স্বৈর শাসকদের গূঢ় উদ্দেশ্য ধরা পড়বে। মূলতঃ তাঁরা ছিলেন স্বৈরাচারী। যুক্তিবাদ বা

১. Hayes—Political, Social History of Europe. P. 440.

আলোকিত দর্শনের প্রতি অনুরাগ ছিল তাঁদের অলঙ্কার অথবা কৌশল মাত্র।

জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারেব বৈশিষ্ট্যগুলি ছিল এই যে—(১) প্রজাকে কোন মৌলিক অধিকার দান না করা। নির্বাচনমূলক শাসনব্যবস্থা বা প্রতিনিধিমূলক শাসনব্যবস্থাকে এড়িয়ে চলা। প্রজার জন্যে সকল কিছু করলেও প্রজাদের শাসনব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করতে না দেওয়া (Everything for the people and nothing by the people)। (২) রাজার কর্তব্য হল প্রজার মঙ্গলের জন্যে কাজ করা। আলোকিত রাজারা নিজেদের রাষ্ট্রের সেবক বলে মনে করতেন। প্রাশিয়ার দ্বিতীয় ফ্রেডারিক নিজেকে রাষ্ট্রের প্রধান ভৃত্য বলে ঘোষণা করেন। (৩) জ্ঞানদীপ্ত শাসকরা বিশ্বাস করতেন যে, রাষ্ট্রই ছিল সকল কিছুর উর্দ্ধে। রাষ্ট্রের জন্যে রাজা-প্রজা সকলের কাজ করা দরকার। রাষ্ট্র থাকলে তবেই জনসাধারণের নিরাপত্তা ও সুখ-সুবিধা থাকবে। (৪) আলোকিত রাজারা নিজেদের রাষ্ট্রের প্রতিনিধি বলে মনে করতেন। তাঁদের নিকট রাজা ও রাষ্ট্রের অভিন্নতা ছিল না। দেহকে যেরূপ মস্তিষ্ক চালনা করে; রাষ্ট্রকে রাজা চালনা করবেন। রাষ্ট্রের স্বার্থে রাজার আদেশ মান্য করা দরকার একথা তাঁরা বলতেন। রাষ্ট্র যেরূপ সর্বশক্তিমান, সেইরূপ রাষ্ট্রের প্রতিভু রাজাও সর্বশক্তিমান। (৫) তবে রাষ্ট্র ও প্রজার মঙ্গলের জন্যে রাজা সংস্কার প্রচলন করতে বাধ্য। সংস্কার করাই রাজার কর্তব্য। দেহ যেরূপ মস্তিষ্কের নির্দেশ মানে, প্রজা সেরূপ রাজার প্রবর্তিত সংস্কার মেনে নিতে বাধ্য বলে তাঁরা ভাবতেন।

রেড্ডাওয়ের (Reddaway) মতে, "১৭৬৩ খ্রীঃ পর যে ২৫ বছর অতিবাহিত হয় তাকে প্রধানতঃ আলোকিত স্বৈরাচারের যুগ বলা যায়"।[১] এই যুগের সংস্কারব্রতী রাজাদের মুখ্য ছিলেন প্রাশিয়ার রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডারিক। কৈশোরে ও যৌবনে তিনি ভলতেয়ার প্রভৃতি ফরাসী দার্শনিকদের রচনা পড়েন। তিনি সিংহাসনে বসে নিজেকে "রাষ্ট্রের প্রধান ভৃত্য" বলে ঘোষণা করেন। তিনি কেন্দ্রীভূত শাসন, বৈজ্ঞানিক প্রথায় কৃষি, সামরিক সংস্কার প্রচলন করেন। বিচার বিভাগে জুরী প্রথা, আইনের শাসন এবং উদার ফৌজদারী আইন প্রবর্তন করেন। তিনি ধর্মসহিষ্ণুতা ও ন্যায় বিচার প্রবর্তনের চেষ্টা করেন।

রাশিয়ার জারিনা দ্বিতীয় ক্যাথারিন ছিলেন অন্যতম প্রখ্যাত আলোকপ্রাপ্ত শাসিকা। তিনি ভলতেয়ারের সহিত পত্রালাপ করতেন। তিনি রাজধানীকে সুশোভিত করার জন্যে বহু উদ্যান ও প্রাসাদ তৈরি করেন। তিনি রাশিয়ায় পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতা প্রসারের জন্যে চেষ্টা করেন। তিনি শাসনব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত করেন। পশ্চিম ইওরোপের অনুকরণে তিনি শিল্প বিস্তার এবং সমাজে আধুনিক আদব-কায়দা প্রচলনের চেষ্টা করেন।

অষ্ট্রিয়ার দ্বিতীয় যোসেফ ছিলেন আলোকপ্রাপ্ত স্বৈর শাসকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর সম্পর্কে বলা হয় যে, "আলোকপ্রাপ্ত স্বৈরতন্ত্রের যুগে সর্বাপেক্ষা আলোকপ্রাপ্ত শাসক ছিলেন দ্বিতীয় যোসেফ" (A statesman par-excellence in the age of reason)। "যুক্তিবাদের যুগে যুক্তিবাদে প্রভাবিত রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে তিনি চরম উৎকর্ষের পরিচয় দেন।" যোসেফ বলেন, "আমি দর্শন শাস্ত্রকে আমার রাজ্যের আইন রচনার ভার দিয়েছি। দর্শনের যুক্তিবাদী নীতি অষ্ট্রিয়ার জীবনধারাকে বদলিয়ে দেবে।" তিনি যুক্তিবাদের ওপর নির্ভর করে শাসন, বিচার, অর্থনীতি সকল ক্ষেত্রেই সংস্কার প্রবর্তন করেন। শেষ পর্যন্ত বাস্তব জ্ঞানের অভাবে অত্যধিক আদর্শবাদ এবং একসঙ্গে সকল সংস্কারগুলি দ্রুত সম্পন্ন করার চেষ্টা করে তিনি বিফলতা বরণ করেন।

দ্বিতীয় যোসেফই ছিলেন প্রকৃত জ্ঞানদীপ্ত শাসক। প্রাশিয়ার দ্বিতীয় ফ্রেডারিক আলোকপ্রাপ্ত সংস্কার দ্বারা নিজ রাজতন্ত্রের ক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টা করেন। ম্যারিয়ট ও রবার্টসনের মতে,

---

১. Reddaway. P. 239.

ফ্রেডারিক কৌশলে তাঁর স্বৈরতন্ত্রকে জ্ঞানদীপ্তির মোড়কে ভরে ফেলেন। মূলতঃ তিনি ছিলেন স্বৈরতন্ত্রী। রাজশক্তি ছিল তাঁর প্রাণ; উদারতন্ত্র ছিল তাঁর পোষাকী নীতি (fashion)। সেই তুলনায় দ্বিতীয় যোসেফ ছিলেন প্রকৃত আদর্শবাদী। তিনি ধর্মসহিষ্ণুতা নীতি প্রবর্তন করে, ভূমিদাস প্রথা লোপের চেষ্টা করে, গিল্ড বা সঙ্ঘ প্রথা লোপের চেষ্টা করে, সমগ্র সাম্রাজ্যে জার্মান ভাষা প্রবর্তন করে প্রকৃত প্রগতিশীল দৃষ্টির পরিচয় দেন। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরোধিতায় তিনি বিফল হন। ফলে তাঁর বিফলতা ছিল এক মহান প্রচেষ্টার ব্যর্থতা। দ্বিতীয় যোসেফের সংস্কারেব তুলনায় প্রাশিয়ার দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের সংস্কারগুলি ছিল গুরুত্বহীন। ফ্রেডাবিক ভূমিদাস প্রথা লোপের চেষ্টা কবেননি। প্রাশিযায় সামন্তপ্রথার প্রবলতা দূব করার চেষ্টাও তিনি করেননি। তিনি স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিকে লোপ করে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বাড়ান। তাঁর নিকট "রাজাই রাষ্ট্র" এই চিন্তা প্রবল ছিল। তাছাড়া তিনি প্রাশিযার প্রযোজন অপেক্ষা বহু বেশী সৈন্য রাখতেন। এই সৈন্যদলের খরচের জন্যে জনসাধাবণকে কবভারে জর্জরিত করেন। এজন্য ভলতেয়ার মন্তব্য করেন যে—"প্রাশিয়া হল সেই দেশ যেখানে সেনাদলই জনগণকে নিয়ন্ত্রণ কবে; জনগণ সেনাদলকে নিয়ন্ত্রণ করে না।" দ্বিতীয় যোসেফ ও দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের সহিত তুলনামূলকভাবে দ্বিতীয় ক্যাথারিন ছিলেন অনেক অগভীর সংস্কারক। তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল নিজ সিংহাসনের ক্ষমতা বৃদ্ধি করার দিকে। তিনি রুশী অভিজাতদেবও ক্ষমতা বাড়ান। তিনি একটি সংবিধান রচনার উদ্যোগ নিয়ে শেষ পর্যন্ত সেই প্রচেষ্টা ত্যাগ করেন। ভূমিদাসদেব রক্ষাব কোন চেষ্টা তিনি করেননি। তিনি রুশী অভিজাতদের মধ্যে পশ্চিম ইওবোপীয় ফ্যাশন ও চালচলন প্রবর্তনের উদ্যম দেখান। তাঁর শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক সংস্কার ছিল সৌখীন সখেব ব্যাপার মাত্র। রাশিয়ার সমাজ জীবনে এই সংস্কারের কোন প্রভাব ছিল না। ঐতিহাসিক বাইকারেব মতে, "দ্বিতীয় ক্যাথারিনের কোন সৃজনশীল প্রতিভা ছিল না।" অভিজাতদের সমর্থন হাবাবার ভয়ে তিনি কোন মৌলিক সংস্কার প্রবর্তনে বিরত থাকেন।

আলোকপ্রাপ্ত স্বৈরতন্ত্রের বিফলতার কারণ (Weaknesses of the system of Enlightened Despotism)ঃ জ্ঞানদীপ্ত শাসনব্যবস্থার দ্বারা সপ্তদশ শতকের নির্ভেজাল স্বৈরতন্ত্রেব সঙ্গে অষ্টাদশ শতকের যুক্তিবাদকে মিশাবার চেষ্টা কবা হয়। রাজকীয় কর্তব্যবোধের সঙ্গে রাজকীয় অধিকারকে যুক্ত করে আলোকিত স্বৈরতন্ত্রবাদ রচিত হয। প্রকৃত যুক্তিবাদের আলোকে এই জোড়াতালি দেওয়া মতবাদের দুর্বলতা শীঘ্রই ধবা পড়ে।

অষ্টাদশ শতকে লক, মন্তেস্ক্যু প্রভৃতি দার্শনিকরা রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে সামাজিক চুক্তিতত্ত্বের উদ্ভাবন করেন। তাঁরা বলেন যে, সমাজের সহিত চুক্তির দ্বাবা বাষ্ট্রেব উৎপত্তি হয়েছে। রাজা সেই চুক্তি অনুসাবে শাসন করেন। ঈশ্বর বাজাকে নিযুক্ত কবেননি। দার্শনিকদের এই ব্যাখ্যা চিন্তাশীল লোকদের বুঝিয়ে দেয় যে, বাজা তাঁর ক্ষমতা প্রজার কাছ থেকেই পেয়েছেন। এজন্য স্বৈরশাসনের প্রতি জনসাধারণের আস্থা নষ্ট হয। জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচার একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ আদর্শ ছিল না। এই আদর্শে রাষ্ট্র ও সমাজ সম্পর্কে কোন মৌলিক ভাবনা ছিল না। বাজারা তাঁদের স্বৈর ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রেখে কিছু সংস্কার প্রবর্তনের চেষ্টা করেন মাত্র।

জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরতন্ত্রের অপর প্রধান ত্রুটি এই ছিল যে—(১) শাসকরা সংস্কাব প্রবর্তনের জন্যে প্রজাদের কোন সহযোগিতা নিতেন না। "Everything for the people and nothing by the people" অর্থাৎ জনসাধারণের জন্যে সকল কিছু করা হলেও, জনসাধারণের দ্বারা কিছু করা হবে না—এটাই ছিল রাজাগণের মূল নীতি। এজন্য সিংহাসনের দ্বারা ওপর থেকে সংস্কারগুলি প্রজাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। এজন্য সংস্কারগুলি জনপ্রিয়তা হারায়। (২) কেবলমাত্র সরকারের ইচ্ছায় কোন সংস্কারকে সফল করা সম্ভব ছিল

না। প্রজাদের সহযোগীতা যে সংস্কারের সফলতার জন্যে দরকার স্বৈরশাসকগণ একথা বুঝেননি। (৩) স্বৈরশাসনের চাপে দীর্ঘদিন ধরে পিষ্ট হওয়ার ফলে স্বৈরশাসকগণের সদিচ্ছা সম্পর্কে প্রজাদের আস্থা ছিল না। আলোকিত দর্শনের প্রভাবে ইওরোপের রাজাগণ যে প্রজাদের কল্যাণকামী হয়েছেন সেকথা প্রজারা জানত না। বিভিন্ন সংস্কারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রজাদের শিক্ষিত করে তোলা হয়নি। এজন্য রাজাদের দ্বারা প্রবর্তিত সংস্কার সম্পর্কে প্রজারা সন্দেহ পোষণ করত। (৪) দীর্ঘকাল ধরে স্বৈরশাসনের আওতায় থাকার ফলে জনসাধারণের উৎসাহ, উদ্দীপনা স্তিমিত হয়ে যায়। সামন্ততান্ত্রিক সমাজে বেশীর ভাগ লোকের জীবনে হতাশা ও দারিদ্র্য ছাড়া আর কিছুই ছিল না। স্বৈরশাসকরা ভূমিদাস প্রথা উচ্ছেদ ও জমির বণ্টনের কোন চেষ্টা না করায় সাধারণ কৃষকদের মধ্যে সংস্কার সম্পর্কে কোন উৎসাহ দেখা যায়নি। (৫) স্বৈরশাসকরা যে শাসনযন্ত্রের দ্বারা সংস্কার প্রবর্তনের চেষ্টা করেন, তা ছিল দুর্নীতিযুক্ত এবং নিপীড়নমূলক। সরকারি কর্মচারীরা ছিল প্রধানতঃ সামন্তশ্রেণীর লোক। এরা দীর্ঘকাল ধরে প্রজাদের ওপর উৎপীড়ন করেছিল। নতুন সংস্কারের লক্ষ্য ছিল প্রজাদের সেবা করা। এই নীতিতে তারা অভ্যস্ত ছিল না। সরকারী লোকেরা নিজেদের জনসাধারণের প্রভু বলে মনে করতে অভ্যস্ত ছিল। (৬) দ্বিতীয় যোসেফের ন্যায় আদর্শবাদী শাসকেরা বাস্তব বুদ্ধির অভাববশতঃ বিফল হন। দ্বিতীয় যোসেফ এক শতাব্দীর কাজকে কয়েক বছরের মধ্যে শেষ করার চেষ্টা করেন। এজন্য তাঁর সংস্কারগুলির মর্ম জনসাধারণ বুঝতে পারেনি। (৭) ঐতিহাসিক হেইজ মনে করেন যে, অষ্ট্রিয়া, রাশিয়া প্রভৃতি রাজ্যগুলি ছিল বহু জাতির বাসস্থান। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে স্বার্থগত ও ভাষাগত বিরোধ ছিল তীব্র। অসমাধান না করায় সংস্কারকে সফল করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।[১] (৮) জ্ঞানদীপ্ত শাসকেরা ছিলেন সিংহাসনের ওপর বংশানুক্রমিক অধিকারে বিশ্বাসী। তাঁদের মৃত্যু হলে উপযুক্ত উত্তরাধিকারীর অভাবে তাঁদের কাজ চালিয়ে যাবার লোক ছিল না। (৯) জ্ঞানদীপ্ত শাসকেরা তাদের উদ্যমকে দেশের আভ্যন্তরীন সংগঠন অপেক্ষা যুদ্ধ ও রাজ্য বিস্তারের কাজে বেশীর ভাগ নিয়োগ করেন। যুদ্ধের জয় মেটাতে রাজকোষ শূন্য হয়ে গেলে সংস্কার প্রবর্তনের জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ পাওয়া যায়নি।

১· Hayes—*Modern Europe*. P. 424.

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ফরাসী বিপ্লবের কারণ ঃ ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্কালে ফ্রান্সের অবস্থা

(Causes of the French Revolution: Condition of France on the eve of the outbreak of the French Revolution)

ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্কালে ফ্রান্সের অবস্থা (Condition of France on the eve of the outbreak of the French Revolution) ঃ

ফরাসী বিপ্লবের কারণ (Causes of the French Revolution) ঃ কোন সমাজ ব্যবস্থা যখন জরাজীর্ণ এবং গতিহীন হয়ে পড়ে তখন সমাজের মধ্য থেকে এমন শক্তি জেগে ওঠে যে তার আঘাতে পুরাতনতন্ত্র তাসের ঘরের ন্যায় ভেঙ্গে পড়ে। ক্ষয়ধরা সমাজকে ভেঙ্গে পুরাতন ব্যবস্থার স্থলে নতুন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। সমাজের এই দ্রুত মৌলিক পরিবর্তনকে বিপ্লব বলা হয়। মার্কসবাদী ঐতিহাসিকেরা বিপ্লবের একটি বিশেষ অর্থ দেখেন। তাঁদের মতে, সমাজে দুটি শ্রেণী থাকে। একটি শ্রেণী সকল অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে এবং অপর শ্রেণীকে শোষণ করে। শোষিত শ্রেণী শেষ পর্যন্ত অধিকারভোগী শ্রেণীর রাজনৈতিক, সামাজিক ও আর্থিক সকল অধিকার বিপ্লবের মাধ্যমে ধ্বংস করে। শ্রেণীসংগ্রামই হল বিপ্লবের বাহন। ফরাসী বিপ্লবে অধিকারভোগী অভিজাতশ্রেণীকে উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণী ক্ষমতাচ্যুত করে। ঐতিহাসিক লেফেভার এজন্য মন্তব্য করেছেন যে, "ফরাসী বিপ্লব শেষ পর্যন্ত প্যাট্রিসিয়ান বা অভিজাত শ্রেণীকে ক্ষমতাচ্যুত করে বুর্জোযা শ্রেণীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে।"

১৭৮৯ খ্রীঃ ফ্রান্সে যে বিপ্লব দেখা দেয় তাহা কোন আকস্মিক কারণে ঘটেনি। দীর্ঘদিন ধরে ফ্রান্সের রাজনীতি, সমাজ ও অর্থনীতিতে যে ব্যবস্থা চলে আসছিল তার সঙ্গে ফ্রান্সের বৃহত্তর জনসমষ্টির স্বার্থ যুক্ত ছিল না। শেষ পর্যন্ত ফ্রান্সের সাধারণ লোক বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্বে পুরাতন ব্যবস্থা ভেঙে নতুন সমাজ ব্যবস্থা গঠনে তৎপর হয়। ফরাসী বিপ্লবের কারণ ফ্রান্সের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ইতিহাসের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যাবে।

ফ্রান্সের রাজনৈতিক অবস্থা (Political condition of France) ঃ সপ্তদশ শতকের ফরাসী রাজনীতিজ্ঞ রিশেল্যু ও ম্যাজারিন এবং ফ্রান্সের রাজা চতুর্দশ লুই ফরাসী রাজতন্ত্রকে একটি স্বৈরতন্ত্রী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন। এই যুগের রাজারা মনে করতেন যে, ঈশ্বর রাজাকে নিযুক্ত করেছেন। তাঁরা ঈশ্বর ছাড়া আর কারও কাছে দায়ী নন। ঈশ্বর-প্রদত্ত ক্ষমতা নীতির ওপর নির্ভর করে চতুর্দশ লুই ফরাসী রাজতন্ত্রকে সর্বময় ক্ষমতার আধারে পরিণত করেন। রাজার এই ক্ষমতা বুঝাবার জন্যে তিনি একদা মন্তব্য করেন, "যে রাজাই হলেন রাষ্ট্র" (The State—it is Myself)। রাজার ক্ষমতাকে সর্বময় করার জন্যে ফ্রান্সের পার্লামেন্ট সভা স্টেটস জেনারেলের অধিবেশন ১৬১৪ খ্রীঃ হতে বন্ধ করে দেওয়া হয়। যেহেতু রাজা আহ্বান না করলে জাতীয় সভা বা স্টেটস জেনারেলের অধিবেশন বসতে পারত না, সেহেতু ফ্রান্সের বুরবোঁ রাজারা

ফরাসী রাজার স্বৈরাচারী ক্ষমতা

স্বৈরতন্ত্রকে নিরঙ্কুশ করার জন্যে জাতীয় সভার অধিবেশন আহ্বান করেননি। প্রতিনিধি সভা না থাকায়, ফ্রান্সে রাজার নিজ ইচ্ছা অনুসারে শাসনকার্য চলতে থাকে। অষ্টাদশ শতকে ইওরোপের বিভিন্ন দেশের রাজারা জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচার নীতি গ্রহণ করেন। কিন্তু ফ্রান্সের বুরবোঁ বংশীয় রাজা পঞ্চদশ এবং ষোড়শ লুই কেবলমাত্র স্বৈরতন্ত্রকেই গ্রহণ করেন। তাঁরা সমকালীন আলোকিত স্বৈরাচারকে স্বীকার করতেন না। ফরাসী রাজশক্তি শুধু অধিকারের কথাই ভাবত, কর্তব্যের কথা ভাবত না। এজন্য ফ্রান্সে প্রজাদের সঙ্গে রাজশক্তির কোন যোগাযোগ ছিল না। বুরবোঁ রাজারা সকল ক্ষমতা নিজ হাতে নিয়ে প্রজাদের মতামত অগ্রাহ্য করে চলতেন। ঐতিহাসিক শেভিল মন্তব্য করেছেন যে, "স্টেটস জেনারেলের অধিবেশন বন্ধ থাকার ফলে সাধারণ লোকের অসুবিধা ও অভিযোগের কথা রাজার নিকট পৌঁছান সম্ভব হত না। রাজার পক্ষেও দেশের সাধারণ প্রজার অবস্থার কথা জানা সম্ভব হত না। এর ফলে বুরবোঁ রাজতন্ত্র বৃহত্তর জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।"

বুরবোঁ বাজতন্ত্র আইনতঃ সর্বশক্তিমান হলেও বাস্তবক্ষেত্রে রাজার ক্ষমতা নিরঙ্কুশ ছিল না। ফ্রান্সেব সামন্ত অভিজাত ও যাজক শ্রেণী রাজার তরফে সরকারি ক্ষমতা হস্তগত করে ভোগ করত। ফরাসী অভিজাতরা দাবী করত যে, তারা রাজার সমশ্রেণীভুক্ত লোক। সুতরাং দেশ শাসনের কাজে একমাত্র তারাই রাজাকে সাহায্য করার অধিকারী। রাজবংশের মত তাদেরও বংশ-কৌলীন্য ছিল। এই বংশ মর্যাদার জোরে তাঁরা দেশ শাসনের অধিকার ভোগ করত। Hampson[১] মন্তব্য করেছেন যে, "শাসনব্যবস্থায় অভিজাত শ্রেণীর প্রভাব অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির সৃষ্টি করে" (The aristocratic infiltration produced unsavoury results)। লেফেভারের মতে, "ফরাসী রাজতন্ত্র ছিল ইংলন্ডের নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র এবং ইওরোপ মহাদেশেব স্বৈরতন্ত্রের মাঝামাঝি ধরনের ব্যবস্থা" (The French monarchy lay midway between the British constitutionalism and continental despotism)[২]। যে সকল কারণে বুরবোঁ রাজাদের সর্বময় ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ হয় তাহা হল এই যে, চতুর্দশ লুইয়ের পর বুরবোঁ বংশে সুযোগ্য শাসকের অভাব দেখা দেয়। পঞ্চদশ লুই ছিলেন "বিলাসী, রমণীরঞ্জন, প্রজাপতি রাজা" (Butterfly monarch)[৩]। তিনি ছিলেন পরিশ্রম-বিমুখ এবং তাঁর উপপত্নী মাদাম দ্য পম্পাদুরের দ্বারা প্রভাবিত। ষোড়শ লুই সৎ এবং সদিচ্ছাপরায়ণ হলেও ব্যক্তিত্বহীন ছিলেন। তিনি তাঁর সুন্দরী গর্বিতা পত্নী অষ্ট্রিয়ার রাজকুমারী মেরী এ্যান্টোনেটের বশম্বদ ছিলেন। বুরবোঁ রাজাদের এই ব্যক্তিগত অযোগ্যতার ফলে রাজার তরফে সকল ক্ষমতা অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা হস্তগত করে।

শাসনব্যবস্থাব দুর্বলতা অভিজাত শ্রেণীব প্রভাব

(২) ফ্রান্সের গীর্জা (Gallican church) ছিল স্বয়ং-শাসিত সংস্থা। রাজা গীর্জার আভ্যন্তরীণ শাসনে হস্তক্ষেপ করতে পারতেন না। গীর্জার ভূ-সম্পত্তির ওপর রাজা কর ধার্য করতে পারতেন না। ১৫৬১ খ্রীঃ পোইসির চুক্তি অনুসারে যাজকেরা গীর্জার ভূমির ওপর স্বেচ্ছা কর দিত।

যাজক শ্রেণীর স্বায়ত্ব শাসন

(৩) ফ্রান্সেব প্রদেশগুলিতে যে সভা ছিল সেগুলির সম্মতি ছাড়া রাজার কোন নির্দেশ প্রদেশগুলিতে কার্যকরী করা যেত না। প্রাদেশিক সভাগুলিতে স্থানীয় অভিজাতরা প্রাধান্য ভোগ করত। (৪) রাজা কোন নতুন আইন জারী করলে তা পার্লেমেন্ট নামক বিচার সভায় রেজেস্টারী বা নথিবদ্ধ করতে হত। নতুবা এই আইন বৈধ হত না। পার্লেমেন্ট ইচ্ছা করলে রাজার প্রস্তাবিত আইনকে নাকচ

প্রাদেশিক সভার ক্ষমতা

১· Hampson—Social History of French Revolution.

২· Lefebvre P. 88.

৩· Schevill.

করতে পারত। পার্লেমেন্টগুলির বিচারকরা ছিল অভিজাত শ্রেণীর। অভিজাতদের বিরুদ্ধে রাজা কোন আইন রচনা করিলেই পার্লেমেন্ট তা নথিবদ্ধ করত না। তার ফলে আইনটি কার্যকরী করা যেত না। ফ্রান্সের পার্লেমেন্ট (Parlement)-গুলির সংখ্যা ছিল ১২টি। এদের মধ্যে Parlement of Paris বা প্যারিসের বিচারসভা ছিল সর্বাপেক্ষা প্রতিপত্তিশালী। প্যারিসের পার্লেমেন্টের অভিজাত শ্রেণীর বিচারক সদস্যরা এতই ক্ষমতাশালী ছিল যে, তারা মন্ত্রী টুর্গোর প্রস্তাবিত মৌলিক সংস্কারের ব্যবস্থাকে কার্যকরী হতে দেয়নি। রাজা অবশ্য পার্লেমেন্টের বিরোধিতা Lit de Justice প্রথা দ্বারা দমন করতে পারতেন। Lit de Justice হল রাজা নিজে পার্লেমেন্টের সভায় সভাপতিত্ব করে আইন পাশ করিয়ে নেওয়ার প্রথা। কিন্তু পার্লেমেন্টের বিরোধিতা কার্যতঃ রাজা অগ্রাহ্য করতে সাহস করতেন না। সুতরাং ফ্রান্সের রাজারা ঐশ্বরিক ক্ষমতা দাবী করলেও বাস্তবে তাদের ক্ষমতা ছিল সীমিত। ঐতিহাসিক ডেভিড টমসনের মতে, "ফরাসী রাজতন্ত্র ছিল আসলে সামন্ত রাজতন্ত্র" (The French monarchy was a feudal monarchy)। পার্লেমেন্ট বা অভিজাত বিচারসভাগুলি, প্রাদেশিক সভাগুলি ও গীর্জা আদালতগুলি রাজকীয় আইনকে অনুমোদন না দিলে তা কার্যকরী করা যেত না।

অষ্টাদশ শতকে দুর্নীতিপূর্ণ শাসন নীতির জন্যে বুরবোঁ রাজতন্ত্রের মহিমা বিনষ্ট হয়ে যায়। সরকারি কর্মচারীরা ছিল দুর্নীতিগ্রস্থ ও অত্যাচারী। ফ্রান্সের বিচারব্যবস্থা ছিল ত্রুটিপূর্ণ লত্রে দ্য গ্রাস ও লত্রে দ্য কেশে (Letters de Grass and Letters de Cachet) দ্বারা নাগরিকদের বিচারের ক্ষেত্রে রাজা হস্তক্ষেপ করতে পারতেন। প্রথম ক্ষমতা প্রয়োগ করে তিনি আদালত দ্বারা প্রদত্ত শাস্তি মকুব বা মাফ করতে পারতেন। দ্বিতীয় ক্ষমতা দ্বারা তিনি যে কোন নাগরিককে বিনা বিচারে কারাগারে আটক করে রাখতে পারতেন। সরকারি কর্মচারী ও অভিজাত সভাসদরা লত্রে দ্য কেসের অপপ্রয়োগ করত। বিচার ব্যবস্থা ছিল ব্যয়বহুল ও বিলম্বিত। বিচারকরা ছিল পক্ষপাত-দুষ্ট। আইনের নিকট সকলে সমান অধিকার পেত না। প্রদেশগুলিতে রাজস্ব আদায়কারী ইনটেন্ডেন্টরা ছিল ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত অর্থলোলুপ। তারা বহু প্রকার বাড়তি কর আদায় করত। আদায় করা করের বহু অংশ তারা আত্মসাৎ করত। একমাত্র প্রাদেশিক সভা ও পার্লামেন্টগুলিকে তারা ভয় করত। নতুবা তাদের দুর্নীতি ও প্রতাপে তৃতীয় শ্রেণীর লোকেদের দুর্গতির সীমা ছিল না।

বিচার ব্যবস্থার দুর্নীতি

বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে পঞ্চদশ লুই ও ষোড়শ লুই প্রকাণ্ড ব্যর্থতার নজির সৃষ্টি করেন। পঞ্চদশ লুই অষ্ট্রিয়ার উত্তরাধিকারের যুদ্ধে (১৭৪০-৪৮ খ্রীঃ) এবং সপ্তবর্ষের যুদ্ধে (১৭৫৬-৬৩ খ্রীঃ) পরাজয় বরণ করেন। এর ফলে ইওরোপে ফ্রান্সের সামরিক মর্যাদা বিনষ্ট হয়। এই দুই যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে ফরাসী বণিক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী বাণিজ্য ও উপনিবেশ হারিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ষোড়শ লুই এই পরাজয় থেকে শিক্ষা না নিয়ে আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধে ইংলন্ডের বিরুদ্ধে যোগ দেন। এই দীর্ঘ যুদ্ধগুলিতে ফ্রান্সের পরাজয়ে ফ্রান্সের মর্যাদা নষ্ট হয়। ভ্রান্ত বৈদেশিক নীতি ফ্রান্সের জনস্বার্থের ক্ষতি করে এবং রাজকোষ শূন্য করে দেয়।

বৈদেশিক নীতি

অষ্টাদশ শতকে ফ্রান্সের শাসনব্যবস্থায় রাজার তরফে রাজপরিষদ কেন্দ্রীয় শাসন চালাত। অভিজাতরাই ছিল পরিষদের সদস্য। রাজপরিষদের সদস্যরা রাজার প্রিয় পাত্র হওয়ার জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করত। ১০জন মন্ত্রীর মধ্যেও রেষারেষি চলত। এজন্য শাসনব্যবস্থায় দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। প্রদেশগুলিতে ইন্টেনডেন্ট (Intendent) নামে কর্মচারীরাই ছিল সর্বেসর্বা। প্রদেশে এরাই রাজার তরফে ক্ষমতা জাহির করত, রাজস্ব আদায়, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করত। কিন্তু ইন্টেনডেন্টরা ছিল দুর্নীতি পরায়ণ ও

শাসনব্যবস্থা

১. ফরাসী উচ্চারণ—লৎর দ্য কাসে।

ক্ষমতার অপব্যবহারকারী। লেফেভারের মতে, এই ইন্টেন্ডেন্টরা একমাত্র প্রাদেশিক সভাকেই মান্য করত। ফ্রান্সের সকল অঞ্চলে একই প্রকার আইন চালু ছিল না। দক্ষিণ ফ্রান্সে রোমান আইন চলত, উত্তর ফ্রান্সে চিরাচরিত প্রথাগুলিই আইন হিসেবে চালু ছিল। অভিজাতরা তাদের নিজস্ব শ্রেণীর জন্যে আলাদা আইনের সুবিধা ভোগ করত। ফ্রান্সের সর্বত্র একই প্রকার ওজন ও মাপ চালু ছিল না। আইনগত পার্থক্য ও স্থানীয় প্রথার ফলে ফ্রান্সের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ঐক্য ছিল না। রাজা কোন রকমে ইন্টেন্ডেন্টদের সাহায্যে শাসন চালু রাখতেন।

রাজস্ব নীতি

রাজকীয় রাজস্বনীতি ও অর্থনীতি ছিল ত্রুটিপূর্ণ। প্রথমতঃ, যাদের কর প্রদানের ক্ষমতা ছিল যথা—অভিজাত ও উচ্চ যাজক তারা কর প্রদান থেকে অব্যাহতি ভোগ করত। যাদের কর প্রদানের ক্ষমতা ছিল না যথা—কৃষক, পাতি বুর্জোয়া ও উচ্চ বুর্জোয়া তারাই করের ভারে নিষ্পেশিত হত। রাজার আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সমতা ছিল না। রাজা অভিজাত ও যাজকদের ওপর কর বসিয়ে রাজস্ব ঘাটতি দূর করতে সাহস করেননি। এজন্য সরকার সর্বদাই অর্থসঙ্কটে ভুগত।

রাজতন্ত্রের অমিতব্যয়িতা

বুরবোঁ রাজারা ছিলেন ঘোর অমিতব্যয়ী। যুদ্ধ ও অমিতব্যয়ের ফলে সরকারের ঋণ বাড়তে থাকে। আদায়ী রাজস্ব থেকে সরকারি ব্যয় সঙ্কুলান করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। অর্থসঙ্কট হতে মুক্ত হওয়ার উপায় না পেয়ে ষোড়শ লুই অবশেষে স্টেটস জেনারেলের অধিবেশন ডাকেন। এর ফলে বুরবোঁ স্বৈরতন্ত্রের দুর্বলতা প্রকাশিত হয়ে পড়ে। বিপ্লব আরম্ভ হয়।

সামাজিক অবস্থা ঃ বিপ্লবের প্রাক্কালে ফ্রান্সের সামাজিক শ্রেণী ও তাদের সংঘাত ঃ মধ্যযুগে সামন্ত প্রথার ফলে ইওরোপীয় সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভব হয়। ফ্রান্সেও বিভিন্ন শ্রেণী ছিল। অষ্টাদশ শতকে ফ্রান্সে জনগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। (১) যাজক সম্প্রদায় ছিল প্রথম শ্রেণী (First Estate)। ১৭৮৯ খ্রীঃ ফ্রান্সে যাজকদের সংখ্যা ছিল মোট প্রায় ১ লক্ষ ৩০ হাজার। উচ্চ যাজক ও নিম্ন যাজক এই দুই ভাগে যাজকশ্রেণী বিভক্ত ছিল। বিশপ প্রভৃতি উচ্চ যাজকরা ছিল অভিজাত সম্প্রদায় হতে আগত। জ্যেষ্ঠ পুত্রের উত্তরাধিকার আইন বা ল অফ প্রাইমোজেনিচার আইন অনুসারে অভিজাতদের জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতার উপাধি ও সম্পত্তি পেত। অভিজাতদের অন্য পুত্রদের ভরণপোষণের জন্যে তাদের অনেক সময় বিশপের পদে নিয়োগ করা হত। এজন্য উচ্চ যাজকরা ছিল বেশীরভাগ অভিজাত শ্রেণী থেকে আগত। ফ্রান্সের আইন অনুসারে প্রজারা গীর্জাকে টাইদ বা ধর্ম কর আদায় দিত। এছাড়া নানা প্রকার কর নানা উপলক্ষে গীর্জাকে দিতে হত। মৃত্যু কর, নামকরণ কর, বিবাদ কর প্রভৃতি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। এছাড়া গীর্জার বিরাট ভূ-সম্পত্তি থেকে বহু টাকা আয় হত। ফরাসী মন্ত্রী নেকারের মতে, ফরাসী গীর্জার বার্ষিক আয়ের পরিমাণ ছিল আনুমানিক ১৩ কোটি লিভ্র। খাদ্যশস্যের দাম বাড়ার ফলে গীর্জার জমির ফসল চড়া দামে বিক্রয় করে আরও বেশী টাকা পাওয়া যেত। গীর্জার এই বিপুল পরিমাণ অর্থ উচ্চ যাজক বা বিশপ শ্রেণীই প্রধানতঃ ভোগ করত। ১৭৮৯ খ্রীঃ ফ্রান্সে বিশপের সংখ্যা ছিল ১৩৯ জন। গীর্জার সকল ব্যাপার উচ্চ যাজকেরাই নিয়ন্ত্রণ করত। Contract de Poissey বা পোইসির চুক্তি অনুসারে গীর্জার বিশপরা তাঁদের ভূ-সম্পত্তির জন্যে সরকারকে নিয়মিত কর দিত না। তারা স্বেচ্ছা কর দিত। এই স্বেচ্ছা করের পরিমাণ যাজকরাই স্থির করত। উচ্চ যাজক শ্রেণী ছিল অভিজাত ও সুবিধাভোগী শ্রেণী। নিম্নস্তরের যাজকেরা ছিল গ্রামের পাদরী। এরা ছিল দরিদ্র এবং নিষ্ঠাবান। এরা ছিল বেশীরভাগ তৃতীয় শ্রেণীর লোক। গীর্জার আয়ের সিংহ ভাগ বিশপরাই নিত। এজন্য নিম্নস্তরের যাজকরা আর্থিক দুরবস্থায় দিন কাটাত। উচ্চ যাজকদের প্রতি নিম্ন যাজকরা প্রবল ঘৃণা পোষণ করত। ফরাসী বিপ্লবের সময় নিম্ন

যাজকরা পুরাতনতন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। প্রকৃতপক্ষে যাজকরা ছিল একটি সম্প্রদায় বা Order। এরা কোন শ্রেণী বা class ছিল না। যাজক ছিল একটি বৃত্তি। কেহ যাজক হয়ে জন্মাত না। কিন্তু ফ্রান্সের আইনে তাদের শ্রেণী বলে গণ্য করে আলাদা ভোটদানের অধিকার দেওয়া হয়।

সমাজের দ্বিতীয় শ্রেণীতে (Second Estate) ছিল অভিজাত শ্রেণী। ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্কালে ফ্রান্সের মোট অভিজাতদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৩ লক্ষ ৫০ হাজার। দেশের জনসংখ্যার ১ বা ১½ ভাগ ছিল অভিজাত। অভিজাতরা ছিল বংশ কৌলিন্যে নিকষ। এরা নিজ সম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্র্য ও অধিকার রক্ষার জন্যে সর্বদা যত্নবান ছিল। অভিজাতরা বংশ মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার জন্যে প্রধানতঃ নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিবাহ করত। কায়িক বা মস্তিষ্কের শ্রমের দ্বারা জীবিকা অর্জনের কাজকে তারা নিন্দনীয় মনে করত। আলস্য ও অবসরময় ভোগবাদী, বিলাসী জীবনযাত্রাই ছিল আভিজাত্যের নিয়ম। অভিজাতরা দাবী করত যে, মধ্যযুগে যে সকল ফ্রাঙ্কিশ বিজেতা ফ্রান্স অধিকার করে, অভিজাত শ্রেণী ছিল এই বিজেতাদেরই বংশধর।[১] যেহেতু তারা ফ্রাঙ্কিশ বিজেতা অভিজাতদের বংশধর ছিল. সেহেতু তারা বিশেষ অধিকার বা Privilege ভোগ করত। রাজাও ছিলেন এই বিজেতাদের বংশধর সেই সূত্রে তিনি তাঁর Prerogative বা বিশেষ অধিকার ভোগ করতেন। সমানভাবে অভিজাতরাও privilege বা বিশেষ অধিকার পেত। এজন্যই অভিজাতরা বংশ কৌলিন্যের দাবীকে তাদের মর্যাদার চিহ্ন বলে গণ্য করত। অভিজাত শ্রেণী বংশানুক্রমিকভাবে তাদের এই বিশেষ অধিকারগুলিকে সযত্নে রক্ষা করত।

অভিজাত

বিপ্লবের অন্যতম নেতা এ্যাবে সিয়েসের মতে ফ্রান্সে খাঁটি অভিজাতদের মোট সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ১০ হাজার। সম্ভবতঃ তিনি তাঁর হিসেবে একমাত্র বিশেষ সুবিধাভোগী বংশ কৌলিন্যবান অভিজাতদের ধরেন। বাকি সকলকে বাদ দেন। আসলে অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে বিভিন্ন উপগোষ্ঠী ছিল। (১) প্রাচীন বনেদী ঘরের অভিজাত। মোট অভিজাতদের মধ্যে এদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৪ হাজার। এরা রাজার সভাসদ, সেনাপতি ও বিচার বিভাগের উচ্চপদ এবং ইনটেন্ডেন্টের (Intendent) কাজ পেত। এদের দরবারী অভিজাত (Court nobility) বলা হয়। রাজার পারিষদ, মন্ত্রী, রাজদূত, প্রাদেশিক শাসনকর্তা, সামরিক বিভাগের উচ্চপদগুলি এদের একচেটিয়া অধিকারে ছিল। এরা ছিল রাজার সহকারী শাসক শ্রেণীর লোক। এই সকল দরবারী অভিজাত আড়ম্বরময় জীবনে অভ্যস্ত ছিল। বহু দাসদাসী ও অনুচর রাখার খরচায় ঋণগ্রস্ত হলেও এরা আড়ম্বর ত্যাগ করত না। এরা ছিল খুবই গর্বিত। অন্যান্য অভিজাতদের বিশেষতঃ গ্রামীণ অভিজাতদের এরা নীচু চক্ষে দেখত। এরা রাজধানী ভার্সাই নগরে বসবাস করত। এরা একাধারে জমিদারীর আয়, বিভিন্ন পদে চাকুরীর আয় ভোগ করত। (২) গ্রামীণ অভিজাত। এরা গ্রামাঞ্চলে নিজ জমিদারীতে বাস করত এবং প্রাদেশিক সভায় প্রতিপত্তি খাটাত। গ্রামীণ অভিজাতরা জীবনযাত্রার ব্যয়বৃদ্ধি এবং সেই অনুপাতে তাদের আয় না বাড়ায় ক্রমে দরিদ্র হয়ে পড়ে। তবুও এরা কায়িক পরিশ্রম বা বাণিজ্য দ্বারা রোজগার বাড়াতে রাজী ছিল না। অষ্টাদশ শতকে এরা আয় বৃদ্ধির জন্যে কৃষকদের ওপর নিদারুণ নিপীড়ন চালায়। এজন্যে কৃষক শ্রেণী খুবই বিক্ষুব্ধ ছিল। (৩) চাকুরীজীবি অভিজাত। ধনী বুর্জোয়াদের একাংশ সামাজিক মর্যাদা ও ক্ষমতা লাভের জন্যে পার্লেমেন্টের বিচারকের পদ বা প্রদেশে ইন্টেন্ডেন্টের পদ বংশানুক্রমিকভাবে কিনে নিত। এর ফলে এরা পদমর্যাদার জোরে অভিজাত বলে গণ্য হত। এজন্য এদের পোষাকী অভিজাত বলা হয়। এরা প্রশাসক ও আইনবিদ এবং বিচারকের কাজ করত। এরাও বংশানুক্রমে বিভিন্ন পদ ভোগ করত। পার্লেমেন্ট বা বিচারসভাগুলির বিচারকের পদ এদের একচেটিয়া ছিল।

অভিজাত শ্রেণীর উপগোষ্ঠী

১· Hampson—Social History of the French Revolution.

অভিজাত সম্প্রদায় ছিল ফ্রান্সের বিশেষ অধিকার ভোগী (Privileged class) শ্রেণী।[১] এরা বংশ কৌলিন্যের জোরে সরকারি উচ্চ পদগুলির একচেটিয়া অধিকার ভোগ করত। ফ্রান্সের কৃষি জমির $\frac{১}{৩}$ অংশের এরা মালিক ছিল। ফ্রান্সে জমির ওপর প্রত্যক্ষ করের নাম ছিল টাইলে। কিন্তু ফ্রান্সের আইনে অভিজাতরা টাইলে আদায় দিতে বাধ্য ছিল না। ভিটিংএমে ও ক্যাপিটেশন প্রভৃতি প্রত্যক্ষ কর প্রদান থেকেও তারা নানা ভাবে অব্যাহতি পেত। রাস্তাঘাট নির্মাণ বা খাল খননের জন্যে অভিজাত শ্রেণী বাধ্যতামূলক শ্রম (corvee) বা কর দিত না। অভিজাত শ্রেণী তাদের জমিদারীতে নানা প্রকার সামন্ত স্বত্ব ভোগ করত, যথা, জমিদারীর সামন্ত উপসত্ত্ব বা Champart, জমিদারীতে সামন্ত আদালত গঠনেব অধিকার, জরিমানা আদায়ের অধিকার, যে কোন একচেটিয়া ব্যবসায়ের অধিকার, গম পেষাই ও মদ চোলাই কারখানা রাখাব অধিকার, বানালিতে বা উপকর আদায়ের অধিকার ও বেগার খাটাবার অধিকার ইত্যাদি। রাজার সভাসদ হিসেবে ভাতা, পুরস্কার ও পেনসন এরা ভোগ করত। অভিজাত শ্রেণী সমাজে বিশেষ মর্যাদা ভোগ করত। তারা তাদের মর্যাদার প্রতীক হিসেবে সর্বত্র তরবারি বহন করত। তারা তাদের নামের আগে লর্ড বা ব্যরন বা মার্কুইস খেতাব ব্যবহার করত। দার্শনিক মন্তেস্ক্যু অভিজাতদের সম্পর্কে বক্রোক্তি করে বলেন যে, "যারা রাজার সহিত সাক্ষাৎ কবতে পাবে, মন্ত্রীর সহিত বাক্যালাপ করতে পারে, যাদের বংশকৌলিন্য আছে এবং ঋণ ও পেনসন আছে, তাদেরই অভিজাত বলে।"

অভিজাত শ্রেণীর বিশেষ সুবিধা

ফ্রান্সের বাকি লোকেরা তৃতীয় শ্রেণীর (Third Estate) অন্তর্ভুক্ত ছিল। বুর্জোয়া, মধ্যবিত্ত, শ্রমিক, কৃষক, দিনমজুর প্রভৃতি সকলেই ছিল তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তৃতীয় শ্রেণীকে unprivileged বা 'অধিকারহীন' শ্রেণী বলা যায়। ফ্রান্সের মোট লোকসংখ্যা ছিল ২৫ মিলিয়ন। এর মধ্যে শতকরা ৯৩% লোক ছিল তৃতীয় শ্রেণী বা Third Estate-এর অন্তর্ভুক্ত। তৃতীয় শ্রেণীর লোকেরা একটি মাত্র সম শ্রেণী ও সম জীবিকাভুক্ত (Homogenous) ছিল না। বিভিন্ন স্তরের লোকেরা একত্রে তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত হয়। ধনী বুর্জোয়া থেকে চালচুলোহীন ভবঘুরে সকলেই ছিল তৃতীয় শ্রেণীর লোক। এদের নিজেদের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে যথেষ্ট বৈষম্য ছিল। এই শ্রেণীর মধ্যে বিরোধ ও ব্যবধানও কম ছিল না। কিন্তু অভিজাতদের আধিপত্য ও শোষণ নীতির জন্যে এবা বিপ্লবের প্রাক্কালে নিজেদের বিভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধ হয়। তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে যে বিভিন্ন উপশ্রেণী ছিল তাদের কথা বলা দরকার।

তৃতীয় শ্রেণী

বুর্জোয়া শ্রেণী ঃ তৃতীয় শ্রেণীর মুখপাত্র ছিল বুর্জোয়া শ্রেণী। বুর্জোয়া বলতে সাধারণতঃ পুঁজিবাদী বা ধনতান্ত্রিক শ্রেণী বুঝায়। কিন্তু ফরাসী বুর্জোয়াদের সকলেই পুঁজিবাদী ছিল না। মধ্যযুগে যারা Burg বা শহরের উপকণ্ঠে বসবাস করে ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প কারিগরী দ্বারা জীবিকা অর্জন করত তাদের বলা হত Burgess বা বার্গের অধিবাসী। এই Burgess কথাটি থেকে আধুনিক বুর্জোয়া (Bourgeois) কথাটির উদ্ভব হয়। শহরবাসী ধনী বণিক, সাধারণ দোকানদার, কারিগর, বুদ্ধিজীবি, চাকুরিয়া সকলেই বুর্জোয়া। বুর্জোয়াদের মধ্যে স্তরভেদ ও অর্থনৈতিক বৈষম্য ছিল। বুর্জোয়াদের আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকলেও তাদের বংশকৌলিন্য ছিল না। (১) বুর্জোয়াদের বিভিন্ন স্তরে ছিল পাতি বুর্জোয়া Bourgeois de petit। এদের মধ্যে একটি অংশ চাকুরীয়া, আইনজীবি, চিকিৎসক, অধ্যাপক প্রভৃতির পেশা নেয়। তাদের বৃত্তিজীবি বুর্জোয়া বলা যায়। এরা ছিল বুদ্ধিমান, সাহসী এবং সমাজ সচেতন। দার্শনিকদের আলোকিত ভাবধারা এই শ্রেণীর

বৃত্তিজীবি বুর্জোয়া

১· Goodwin.

মধ্যে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। এই শ্রেণীর লোকেরাই অভিজাতদের জন্মকৌলিন্য ও বিশেষ অধিকারকে আক্রমণ করে। বুর্জোয়া শ্রেণীভুক্ত বণিকরাও তাদের সামিল হয়।[১] (২) বুর্জোয়াদের অপর অংশ ব্যবসায়-বাণিজ্যের দ্বারা প্রভূত অর্থ উপার্জন করে। এদের হাতে প্রচুর অর্থ থাকলেও বংশ কৌলিন্যের অভাবে এরা অভিজাতদের সমান মর্যাদা পেত না। এদের ধনী বুর্জোয়া বলা যায়। ধনী বুর্জোয়ারা সরকারকে প্রচুর অর্থ ঋণ দিত। বুরবোঁ সরকার বণিকদের শিল্প, বাণিজ্যের ওপর নানাবিধ বাধানিষেধ জারি করায় এবং মালের ওপর শুল্ক চাপাবার জন্যে এই শ্রেণী সরকারের ওপর ঘোর অসন্তুষ্ট ছিল। (৩) মূলধনী বুর্জোয়া শ্রেণী ছিল ব্যাঙ্কের মালিক, বড় বড় শিল্পের মালিক। ইহাদের হুটে বুর্জোয়া (haute bourgeois) বা পুঁজিপতি শ্রেণী বলা যায়। এরা ছিল অর্থবান। এরা বাণিজ্যে মূলধন লগ্নী করত। সরকারকে এরা সুদের বিনিময়ে ঋণ দিত। জোয়ারেস (Joures) নামক ঐতিহাসিকের মতে, অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে প্যারিস শহরের পুনর্নির্মাণ কাজের জন্যে বিরাট অঙ্কের অর্থ ব্যয় করা হয়। মূলধনী বুর্জোয়া শ্রেণী এই কাজে অর্থ লগ্নী করে প্রচুর মুনাফা পায়। বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত শ্রেণী বুঝাতে সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোক বুঝাত। প্রথম শ্রেণী অর্থাৎ বৃত্তিজীবি বুর্জোয়া বা পাতি বুর্জোয়া ছাড়া অপর সকল বুর্জোয়া ছিল সম্পদশালী। ধনী বুর্জোয়ারা ধনী হলেও বংশ কৌলিন্য না থাকায় সরকারের কাছে মর্যাদা ও সম্মান পেত না। এজন্য বুর্জোয়ারা অভিজাতদের ঈর্ষা করত। পাতি বুর্জোয়া শ্রেণী ছিল দার্শনিকদের চিন্তাধারায় উদ্দীপিত এবং পুরাতনতন্ত্রের তীব্র সমালোচক। হ্যাম্পসনের মতে, "বুর্জোয়া শ্রেণীব সকল শাখাই অভিজাতদের সমালোচনা করত। তারা অভিজাত শ্রেণীর সমান মর্যাদা ও অধিকার লাভের ইচ্ছা পোষণ করত" (All branches of the upper middle class had therefore been inclined both to criticise the aristocracy and to aspire noble status)।[২] বুর্জোয়ারা ছিল ফরাসী সমাজের সর্বাপেক্ষা অসন্তুষ্ট শ্রেণী। শিক্ষা ও অর্থের অধিকারী হলেও সমাজের উচ্চশ্রেণীতে ঢোকার দরজা তাদের কাছে বন্ধ ছিল। হতাশা থেকেই তারা পুরাতনতন্ত্র ভাঙার কাজে অগ্রণী হয়। তারা এমন একটি সমাজ চায় যেখানে অর্থ ও বিদ্যার জোরে তারাই প্রাধান্য পেতে সক্ষম হবে। বুর্জোয়াদের এই অর্থ ও বিদ্যার অহমিকা বোধ বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করে। এজন্যেই নেপোলিয়ন তাঁর বিখ্যাত মন্তব্য করেন যে, "বিপ্লবের মূল কারণ ছিল অহমিকা; স্বাধীনতার দাবী ছিল একটি অজুহাত মাত্র" (Vanity made the Revolution ; Liberty was only an excuse)।

বণিক বুর্জোয়া ও মূলধনী শ্রেণী

কৃষক শ্রেণী ঃ তৃতীয় শ্রেণীর বৃহদংশ ছিল কৃষক সম্প্রদায়। অভিজাত, ধনী বুর্জোয়া, নগরবাসী পাতি বুর্জোয়া সকলের চোখে ফরাসী কৃষকরা ছিল নিম্নশ্রেণী, নিরক্ষর, বর্বর লোক। এরা মনে করত যে উচ্চশ্রেণীর খাদ্য উৎপাদনের জন্যেই কৃষকরা জন্মেছে। রাজকোষে রাজস্ব প্রদান, সামন্ত প্রভুদের কর ও রসদ যোগান ও শহুরে লোকেদের খাদ্য সরবরাহ করতে কৃষকরা বাধ্য ছিল বলে মনে করা হত। বহু বছর ধরে কৃষকরা নানা ভাবে শোষিত হচ্ছিল। কৃষকদের মধ্যে যদিও নানা স্তর ছিল, সামন্ত প্রভু ও ধনী বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে তারা ছিল এককাট্টা। ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্কালে ইংরাজ পর্যটক আর্থার ইয়ং (Arthur Young) ফ্রান্সের গ্রামাঞ্চলে ঘুরেছিলেন। তিনি কৃষকদের মধ্যে দারিদ্র, ক্ষোভ, হতাশা লক্ষ্য করেন। কৃষকদের মধ্যে কয়েকটি ভাগ ছিল, যথা—(ক) স্বাধীন কৃষক নিজের জমি নিজে চাষ করত। আর্থার ইয়ং-এর রচনা থেকে জানা যায় যে, ফ্রান্সে প্রতি ৪ জন কৃষকের ১ জন ছিল নিজ জমির মালিক। এই শ্রেণী ফ্রান্সের $\frac{১}{৩}$ অংশ কৃষি জমির মালিক ছিল। কিন্তু বেশীরভাগ স্বাধীন কৃষক

১· George Rude.

২· Hampson.—P. 17.

পরিবারগুলির জমির পরিমাণ এত কম ছিল যে, তার আয়ে তাদের দিন চলত না। স্বাধীন কৃষকরা যেহেতু জমিদারের তৈরি রাস্তা, জমিদারের পশুচারণের জমি ব্যবহার করত এবং জমিদারের জঙ্গল থেকে জ্বালানী কাঠ নিত, সেহেতু জমিদারের ম্যানর সম্পর্কিত কিছু কর তাকে দিতে হত। এছাড়া কৃষকরা রাজাকে দিত ভূমি কর বা তেইলে (Taille), লবণকর বা গ্যাবালে (Gabelle), তামাক ও মদের ওপর আবগারী কর (Excise), ক্যাপিটেশন (Capitation) বা মাথাপিছু উৎপাদন ভিত্তিক কর, ভিংতিয়েমে (Vingtieme) বা সম্পত্তি কর। তারা গীর্জাকে দিত টাইদ (Tithe) বা ধর্মকর। রাজকীয় ও সামন্ত করের চাপে কৃষকরা নিষ্পেশিত হয়। তদুপরি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হলে তাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের দাম বাড়ে। (খ) এছাড়া কিছু কৃষক ছিল ভাগ চাষী বা বর্গা চাষী বা মেতায়ার (Metayers)। এরা জমিদারদের জমি ভাগে চাষ করত। সকল প্রকার কর প্রদানের পর উৎপন্ন ফসলের মাত্র ২০ শতাংশ এদের হাতে থাকত। (গ) বর্গা বা ভাগচাষী ছাড়া ছিল খাজনা চাষী (Rentier)। এরা জমিদার ও সামন্ত প্রভূর জমি খাজনায় চাষ করত। জমিতে এদের কোন স্বত্ব ছিল না। (ঘ) যে সকল কৃষকের নিজের সামান্য জমি, নিজের লাঙল ও বলদ ছিল এদের বলা হত প্রান্তিক স্বাধীন কৃষক বা লাবুবার (Labourer)। দক্ষিণ ফ্রান্সে এদের সংখ্যা বেশী ছিল। এরা ঠিক সম্পন্ন ও স্বচ্ছল কৃষক ছিল না। (ঙ) এদের নীচে ছিল ভূমিহীন ক্ষেতমজুর বা ঝুপড়িবাসী ক্ষেতমজুর বা (Cottager)। এরা ফসল রোপণ ও ফসল তোলার মরশুমে ক্ষেতে মজুরের কাজ করত। বাকি সময় দিন মজুরী করে অনাহারে, অর্দ্ধাহারে কাটাত। কখনও কখনও এরা জমিদারের জমি খাজনায় অস্থায়ী শর্তে চাষ করত। কৃষকদের $\frac{১}{৪}$ ভাগ ছিল ভূমিহীন দিনমজুর। (চ) সবার নীচে ছিল ভূমিদাস বা Serf। প্রতি ২০ জন কৃষকের ১ জন ছিল ভূমিদাস। ভূমিদাসদের অবস্থা ছিল সর্বাপেক্ষা শোচনীয়। নানা প্রকার সামন্ত কর, টাইদ ও সামন্ত প্রভূর নানা দাবী পূরণ করে ও বেগার খাটার পর ভূমিদাসের ভাগ্যে কিছুই থাকত না। ভূমিদাসদের ওপর আরোপিত কর ছিল বিভিন্ন প্রকার, যথা—রাজার প্রাপ্য টাইলে, গীর্জার প্রাপ্য টাইদ ছাড়া সামন্ত প্রভূর প্রাপ্য স্যামপার্ত (Champart) বা ফসলের ভাগ; সেন্স (Cens) বা সঁস ছিল বাৎসরিক খাজনা; বানালিতে (Banalite) সামন্ত প্রভূর গম পেষাই কলে গম ভাঙান, ভাটিখানায় মদ্য তৈরির বিনিময়ে ময়দা ও মদ্যের কিছু অংশ দিতে হত। এছাড়া ভূমিদাসরা সামন্ত প্রভূর জমিতে বেগার খাটত। এর নাম ছিল কর্ভি (Corvee)। কৃষকদের অভিযোগের সাধারণ কারণ ছিল টাইলে বা ভূমিকর, টাইদ বা ধর্মকর ও সামন্তকরের বোঝা। এই শোষণের ফলে কৃষক শ্রেণীর মধ্যে গভীর অসন্তোষ ছিল। মার্কসবাদী ঐতিহাসিক লাব্রুজের মতে, "অষ্টাদশ শতকের ফরাসী কৃষকরা ছিল সর্বাপেক্ষা শোষিত।"

সাঁকুলেৎ ঃ তৃতীয় শ্রেণীতে ছিল কৃষক ছাড়া নগরবাসী প্রলিতারিয়েত বা শ্রমজীবি, চালচুলোহীন ভাসমান লোক। ফ্রান্সে এদের বলা হত সাঁকুলেৎ (Sans-culottes)। জনসংখ্যা বাড়ার ফলে গ্রাম থেকে আসা ছিন্নমূল লোক শহরে জমা হয়। এছাড়া শহুরে শ্রমিক ও বস্তিবাসীদের সন্তান-সন্ততি এদের সংখ্যা বাড়ায়। ফ্রান্সের সামন্ততান্ত্রিক সমাজে কায়িক শ্রম ছিল ঘৃণার বস্তু। তদুপরি চালচুলোহীন শ্রমিক, মুঠিয়া, অথবা ভবঘুরে শ্রেণী ছিল ততোধিক ঘৃণিত। এদের মধ্যে ছিল গরীব কারিগর ও ছোট দোকানদার। সাঁকুলেৎদের মধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক আশা-আকাঙ্খার পার্থক্য ছিল। যারা ছিল কারিগর বা ছোট দোকানদার তারা চাইত সকলের হাতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি কিছু না কিছু থাকবে। মুষ্টিমেয় লোকের হাতে সম্পত্তি জমা হবে না। যাদের কিছুই ছিল না তারা ভাবত এমন দিন আসবে তারা কিছু সম্পত্তির মালিক হবে। সাঁকুলেৎদের মনে তখনও পর্যন্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ ও সমাজতন্ত্রের ধ্যান-ধারণা দানা বাঁধেনি। সাঁকুলেৎদের প্রধান অভিযোগ ছিল যে, জিনিষপত্রের উঁচু দামের তুলনায় তাদের

মজুরী ছিল ভয়ানক রকম কম। লাব্রুজের মতে, বিপ্লবের প্রাক্কালে খাদ্যশস্যের দাম বাড়ে ৬০-৬৫%। সেই তুলনায় মজুরী বাড়ে ২২% মাত্র। অনেক সাঁকুলেতের পরিবারের লোক খাদ্যের অভাবে ভিক্ষা করত। লেফেভারের মতে, সাঁকুলেৎদের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধতা ও শ্রেণী চেতনা ছিল না। সাঁকুলেৎরা অবশ্য মাঝে মাঝে বয়কট ও দাঙ্গা করে তাদের অর্থনৈতিক অসন্তোষ জানাত। এই উপজীবিকাহীন (Indigent) লোকেরা ছিল ফ্রান্সের মোট জনসংখ্যার $\frac{১}{৫}$ অংশ। সাঁকুলেৎদের দাঙ্গা-হাঙ্গামার ভয়ে অভিজাত ও ধনী বুর্জোয়ারা সন্ত্রস্ত থাকত। এরা বেশী রাগী ও ধ্বংসমুখী শ্রেণী ছিল।[১]

ফ্রান্সে অর্থনৈতিক অবস্থা (Economic Condition) ঃ বিপ্লবের প্রাক্কালে ফ্রান্সের অর্থনীতি প্রগতিশীল অথবা পশ্চাৎপদ ছিল এ সম্পর্কে ফরাসী গবেষকদের মধ্যে মতভেদ আছে। লাদুরি (Ladurie) প্রভৃতি গবেষকরা বলেন যে, ফ্রান্সে কৃষি উৎপাদন না বাড়লে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেত না। তাঁরা কৃষি উৎপাদন কম হচ্ছে বলে মনে করেন না। কৃষিতে নতুন প্রযুক্তি অর্থাৎ ভাল সার প্রদান, পালাক্রমে বিভিন্ন ফসলের চাষ, ভারী লাঙলের ব্যবহার চালু হয়েছিল বলে তাঁরা বলেন। শিল্পের ক্ষেত্রেও ফ্রান্সে সামুদ্রিক রপ্তানি বাণিজ্য বেড়েছিল। ১৭৩০-১৭৭০ খ্রীঃ পর্যন্ত বৈদেশিক বাণিজ্য বাড়ে। লেফেভারও স্বীকার করেছেন যে, মার্সাই, নন্টস প্রভৃতি শিল্প-বাণিজ্যের শহরগুলি অর্থনৈতিক কাজকর্মে মুখর ছিল। চিনি শিল্পে দারুণ অগ্রগতি হয়। রপ্তানি বাণিজ্য ও অন্তর্বাণিজ্যের ফলে বাণিজ্যজাত মূলধন বাড়তে থাকে। ধনী বণিকরা এজন্য রাজাকে খোলা হাতে ঋণ দিত। আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ও শিল্পও বেশ বাড়ছিল। ফ্ল্যান্ডার্স সুতী কাপড়, রেশম; নর্ম্যান্ডি কাপড়; অর্লিয়েন্স হাতে বোনা কাপড়ের উৎপাদনে প্রাধান্য পায়। লাদুরী ও তাঁর মতবাদের ঐতিহাসিকরা বলেন যে, ১৭৭০ খ্রীঃ এর পর অবশ্য উৎপাদনে মন্দা দেখা দেয়। তথাপি অর্থনৈতিক সঙ্কট বলতে যা বুঝায় তা ফ্রান্সে ছিল না।

ফ্রান্সের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন মত

লেফেভার ও তাঁর মতাবলম্বী গবেষকরা এই মত স্বীকার করেন না। লেফেভার বলেন যে, হতে পারে ফ্রান্সের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যের অগ্রগতি অষ্টাদশ শতকে কোন কোন সময় কিছু পরিমাণে দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু ফ্রান্সের মধ্যযুগীয় সমাজ ব্যবস্থায় ও মধ্যযুগীয় মানসিকতায় অর্থনীতির কোন গভীর পরিবর্তন ও অগ্রগতি হয়নি। ইংলন্ডে যা সম্ভব হয়, ফ্রান্সে তা হয়নি। ফ্রান্সের মানসিকতাই ছিল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন বিরোধী। লেফেভাব বলেন, "শিল্প-বাণিজ্যের পালে সামান্য কিছু পরিবর্তনের হাওয়া লাগলেও, ফ্রান্স ছিল আগাগোড়া একটি কৃষি ও হস্তশিল্প প্রধান দেশ। শিল্প-বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে পুঁজিবাদ গড়ে ওঠার বিরুদ্ধে ফ্রান্সে তীব্র বিরোধী মনোভাব বিদ্যমান ছিল। বিপ্লবের সময় এই মানসিকতা কার্যকরী হয়" (France remained a nation of agriculture and of handicrafts. The development of capitalism and economic freedom, met strong resistance on French soil, a fact which was of major importance during the Revolution)। ফ্রান্সের পাতি বুর্জোয়া, শ্রমিক, সাঁকুলেৎ প্রভৃতি মুনাফাভোগী বণিকদের বিরুদ্ধে ছিল। ফরাসী রাজসরকারও শিল্পের বিকাশ সম্পর্কে কোন দৃঢ় অথচ সুস্পষ্ট নীতি নেননি। কৃষির আধুনিকীকরণের জন্যেও পঞ্চদশ ও ষোড়শ লুই কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেননি। এনক্লোজার বা বেষ্টনী দ্বারা ক্ষেতগুলিকে আবদ্ধ করা প্রভৃতি সংস্কার খামখেয়ালীভাবে করা হয়। মোট কথা, বিপ্লবের প্রাক্কালে ফ্রান্সের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল বিকাশশীল ও উন্নতিসূচক এই মতবাদকে লেফেভার নস্যাৎ করেছেন। লাব্রুজে নামে গবেষকও লেফেভারের মতকেই সমর্থন করেন। তিনি ১৭৭০ খ্রীঃ পর থেকে অর্থনৈতিক সঙ্কটের তীব্র ছায়া লক্ষ্য করেছেন। ইতিমধ্যে

১· Lefebvre—French Revolution.

১৭৮৮ খ্রীঃ থেকে পর পর দুবছর শস্যহানি ও আলুর ফসলের ক্ষতি, খাদ্যশস্যের দামের ঊর্দ্ধগতি, নিম্ন মজুরী অর্থনৈতিক সঙ্কটকে আরো তীব্র করে।

ফ্রান্সের বুরবোঁ সরকারের গৃহীত অর্থনীতিই ফ্রান্সের অর্থনৈতিক সঙ্কটের জন্যে দায়ী ছিল। "ফ্রান্স ছিল ভুল অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একটি প্রকাণ্ড যাদুঘর" (France was a vast museum of economic errors)। ফ্রান্সের তিনটি প্রধান কর ছিল, যথা টেইলি বা সম্পত্তি কর[১], ক্যাপিটেশন বা উৎপাদন কর[২] ও ভিটিংয়েমে বা আয়কর[৩]। কিন্তু যাজক ও অভিজাত সম্প্রদায় যারা যথাক্রমে ফ্রান্সের $\frac{১}{১০}$ অংশ ও $\frac{১}{৫}$ অংশ ভূসম্পত্তির মালিক ছিল তারা টাইলে কর দিত না। যাজক সম্প্রদায় পোইসির চুক্তি (১৫৬১ খ্রীঃ) অনুযায়ী স্বেচ্ছা কর দিত। রাজা তাদের ওপর সমানহারে কর বসাতে পারতেন না। এদিকে অভিজাতরাও নানাভাবে ক্যাপিটেশন এবং আয়কর বা ভিটিংয়েমে এড়িয়ে যেত। এজন্য এই তিনটি প্রত্যক্ষ করের প্রধান বোঝা পড়ত তৃতীয় শ্রেণীর ঘাড়ে। যদিও উচ্চ যাজক ও অভিজাতরা ফ্রান্সের জাতীয় সম্পদের ৪০% ভাগের মালিক ছিল, তারা এই বিরাট সম্পদের জন্যে ন্যায্য কর দিত না। কর ধার্য করার ক্ষেত্রে ত্রিবিধ দুর্নীতি যথা "বিশেষ অধিকার", যাদের দেওয়ার ক্ষমতা আছে তাদের ওপর কম হারে কর এবং কর ছাড় (Privilege, concession and exemption) ফ্রান্সের রাজস্ব ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে দেয়। ইন্টেন্ডেন্ট নামে রাজস্ব কর্মচারীরা ছিল ঘোর দুর্নীতিগ্রস্থ, অমিতব্যয়ী। ফলে যেটুকু কর আদায় হত তার বেশীর ভাগ কর্মচারীদের ভরণপোষণে ব্যয় হয়ে যেত।

প্রত্যক্ষ কর ঃ নীতি

ওপরের তিনটি প্রত্যক্ষ কর ছাড়াও ফরাসী সরকার গ্যাবেলা (Gabella) বা লবণ শুল্ক, বাণিজ্য শুল্ক প্রভৃতি পরোক্ষ কর আদায় করত। তৃতীয় শ্রেণী সরকারকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর দিত। তারা গীর্জাকে টাইদ (Tithe) অর্থাৎ ফসলের $\frac{১}{১০}$ ভাগ কর দিত। সামন্ত প্রভূদের জন্যে কর্ভি বা বিনা মজুরীতে কাজ করা, বানালিতে (Banalites) প্রভৃতি বাধ্যতামূলক কর দিত। সরকার, গীর্জা ও সামন্ত প্রভূদের প্রাপ্য দেওয়ার পর তৃতীয় শ্রেণী, বিশেষতঃ কৃষকদের হাতে আর বিশেষ কিছু থাকত না। এদিকে প্রথম দুই শ্রেণী কর এড়িয়ে বহাল তবিয়তে দিন কাটাত।

পরোক্ষ কর ঃ শুল্ক দুর্নীতি

তৃতীয় শ্রেণীর দুর্ভোগ এতেও শেষ হত না। সরকার ও সামন্ত প্রভূরা মালপত্রের ওপর ইচ্ছামত শুল্ক আদায় করার ফলে জিনিষপত্রের দাম বাড়ত। এজন্য সাধারণ লোকেদের চড়া দামে জিনিষপত্র কিনতে হত। শুল্ক ব্যবস্থার অনাচারের জন্যে ফরাসী বণিক ও ব্যবসায়ীরা সরকারের ওপর ঘোর অসন্তুষ্ট ছিল। তারা স্থানীয় শুল্ক বা অন্তঃশুল্ক ব্যবস্থা রদ করে কেন্দ্রীয় শুল্ক ও অবাধ বাণিজ্য ব্যবস্থার জন্যে দাবী জানায়।

ফ্রান্সের অর্থনীতির অপর অন্ধকারময় দিক ছিল সরকারি অপব্যয় এবং রাজপরিবারের অমিতব্যয়িতা। সরকারের রাজস্ব খাতে যা আয় হত কর্মচারীদের বেতন, যুদ্ধের খরচ ও রাজপরিবারের ব্যয় নির্বাহ করতে তাতে সঙ্কুলান হত না। ফ্রান্সের রাজপরিবারের এবং রাজার অমিতব্যয়িতার কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া যেতে পারে। গুডউইনের মতে, ভার্সাইয়ের রাজসভায় ১৮ হাজার কর্মচারী নিযুক্ত ছিল, এদের মধ্যে ১৬ হাজার কর্মচারী কেবল রাজপ্রাসাদের কাজের জন্যেই বহাল ছিল। রাণীর খাস চাকরের সংখ্যা ছিল ৫০০। রাণী নিত্য নতুন ভোজসভা ও পোষাকের জন্যে প্রচুর খরচ করতেন। রাজপরিবারের এই অতিরিক্ত খরচ মিটাতে সরকারের বহু অর্থ ঋণ হয়। এছাড়া

সরকারী অমিতব্যয়িতা

১· ফরাসী উচ্চারণ তেই।
২· ফরাসী উচ্চারণ কাপিতাসিয়, মতান্তরে মাথাপিছু কর।
৩· ফরাসী উচ্চারণ ভ্যাতিয়্যাম।

যুদ্ধের ব্যয় মেটাতে সরকার প্রচুর টাকা ঋণ নেন। শুধু আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধের জন্যে মন্ত্রী নেকার ১০০ কোটি লিভ্র ঋণ নেন। ১৭৮৮ খ্রীঃ সরকারের ঋণের সুদের দরুন ৩১৮,০০০,০০০ লিভ্র দরকার হয়। এ সময় সরকারের গৃহীত জাতীয় ঋণের মোট পরিমাণ ছিল ২৫০ কোটি লিভ্র। এর সঙ্গে সরকারের অন্যান্য খরচ যুক্ত হলে মোট ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৩০,০০০,০০০ লিভ্র। এই অর্থ না থাকায় ষোড়শ লুই স্টেটস জেনারেলের অধিবেশন ডাকতে বাধ্য হন। গুডউইন মন্তব্য করেছেন যে, "ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্কালে অর্থনৈতিক সমস্যার মূল কথা ছিল অমিতব্যয়িতা বন্ধ করার ব্যাপারে সরকারের অক্ষমতা"।[১]

ফ্রান্সে ১৭৬৩ খ্রীঃ পর প্রায় তিন মিলিয়ন লোকসংখ্যা বাড়ে।[১] এর সঙ্গে যুক্ত হয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি। এই মূল্য বৃদ্ধির দুটি প্রধান কারণ ছিল, যথা, দক্ষিণ আমেরিকা থেকে ইওরোপে প্রচুর পরিমাণ সোনা, রূপা আমদানি করা হয়। একটি সূত্র থেকে জানা যায় যে, অষ্টাদশ শতকে ৫৭ হাজাব মেট্রিক টন রূপা এবং ১৯০০ টন সোনা আমেরিকা থেকে ইওরোপে আনা হয়। সর্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণ আসে ১৭৮০ খ্রীঃ পব থেকে। এই ধাতুর অনেকটা ফ্রান্সে চলে আসে। এজন্য মুদ্রাস্ফীতি হয়। জিনিষেব দাম বাড়ে। (২) ১৭৭০ খ্রীঃ পর ফ্রান্সেব কৃষি ও শিল্পদ্রব্যের উৎপাদনে মন্দা দেখা দেয়। ১৭৮৮ খ্রীঃ থেকে ক্রমাগত ফসল হানির জন্যে খাদ্যশস্যের দাম বাড়ে। খাদ্যদ্রব্যের দাম ৬০% বাড়লেও শ্রমিকেব ও দিন মজুরের মজুরী ২২% বেশী বাড়েনি। ফলে খাদ্যের জন্যে দাঙ্গা (Bread riot) আরম্ভ হয়। কেমব্রিজ ঐতিহাসিক জর্জ রুডের মতে, ১৭৭৫—১৭৮৮ খ্রীঃ পর্যন্ত প্যারিস, লায়নস প্রভৃতি শহরে রুটির দাঙ্গা চলে। ১৭৮৮ খ্রীঃ নিদারুণ শিলাবৃষ্টি ও ঝড়ে শস্য হানি ঘটে। গ্রামের নিরন্ন কৃষকেরা খাদ্যের সন্ধানে শহবের দিকে ছুটতে আরম্ভ করে। বুরবোঁ সরকার এই সঙ্কটের মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হন।

মুদ্রাস্ফীতি ও খাদ্য মূল্য বৃদ্ধি

ফ্রান্সে জ্ঞানদীপ্তির প্রভাব (Impact of Enlightenment on France) : অষ্টাদশ শতক ছিল আলোকিত শতাব্দী। এই শতকে ইওরোপে যুক্তিবাদের জাগরণ ঘটে। যা চলছে তাকে মেনে না নিয়ে লোকে প্রচলিত ব্যবস্থার দোষ-ত্রুটি বিচার করতে শিখে। অষ্টাদশ শতকের ফরাসী দার্শনিকদের রচনা ফ্রান্সে যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী গঠনে বিশেষ কার্যকরী হয়। দার্শনিকগণ এই মত প্রচার কবেন যে, প্রজার কল্যাণ করার নিমিত্তই রাজা আছেন। দার্শনিকেরা বলেন যে, প্রকৃতির নিয়মে অধিকারের সহিত কর্তব্যও থাকে। সুতরাং রাজা কেবলমাত্র অধিকার ভোগ করিতে পারেন না, তাঁকে কর্তব্য করতেও হবে।

যুক্তিবাদী দর্শন : রাজতন্ত্রেব কর্তব্য সম্পর্কে নতুন চিন্তা

অষ্টাদশ শতকের দার্শনিকরা মধ্যযুগের অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কারের তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁরা বুদ্ধিবিভাসা ও যুক্তিবাদকেই শীর্ষ স্থান দেন। বিশ্বজগত কোন অলৌকিক শক্তির দ্বারা চলে না। তা যুক্তি বা নিয়ম অনুযায়ী চলে এই মত দার্শনিকরা জোরের সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করেন। মানুষের সমাজও যুক্তি ও নিয়মের দ্বারা শাসিত হওয়া উচিত একথা তাঁরা প্রচার করেন। দ্বিতীয়তঃ, এই দার্শনিকরা তাঁদের দর্শনচিন্তাকে মানব সমাজের মঙ্গলের জন্যে প্রয়োগ করেন। মানবিকতাবাদী চিন্তা ছিল দার্শনিকদের বিশেষ অবদান। ঈশ্বর চিন্তা নয়, মানুষের যাতে মঙ্গল হয় সেই চিন্তাকেই দার্শনিকরা গুরুত্ব দেন। হলব্যাখ্ নামক দার্শনিক এজন্য আধ্যাত্মিক ও ঈশ্বর চিন্তা

১· "The essence of the financial problem on the eve of the Revolution was the impossibility of reducing these heavy items of expenditure." Goodwin—French Revolution. P. 18.

২· Lefebvre—P. 51.

অপেক্ষা বস্তু জগতে মানুষের কল্যাণ চিন্তাকেই প্রাধান্য দেন। তিনি বলেন, "আদিতে মানুষ সুখী ছিল। রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অনাচারের জন্যেই মানুষের দুঃখ-দুর্দ্দশা বেড়েছে।" হেল ভিসিয়াস বলেন যে, "মানুষের মঙ্গলবিধানই হল সকল চিন্তার মূল কথা।" তৃতীয়তঃ, এঁই যুগের দার্শনিকরা বলেন যে, "রাষ্ট্র ও সমাজের পশ্চাতে যে নিয়মগুলি কাজ করে তা আবিষ্কার করলেই চলবে না; তাকে দরকার মত সংস্কার করতে হবে।" এই দার্শনিকরা যুক্তিবাদ ও প্রাকৃতিক আইন (Natural Law)কেই গুরুত্ব দিতেন। তাঁরা কেবলমাত্র জাগতিক ও রাষ্ট্রীয় নিয়মবিধি ব্যাখ্যা করে থেমে থাকেননি। এই নিয়ম বিধির আলোকে তাঁরা প্রচলিত ব্যবস্থার সংস্কার চান। এই সংস্কারের জন্যে তাঁরা প্রাকৃতিক আইনের (Natural Law) আবেদন জানান।[১] তাঁরা ধর্মসহিষ্ণুতার কথাও বলেন। ইংরাজ দার্শনিক ভ্যালক এই উদারনৈতিক বুদ্ধি বিভাষার সূত্রপাত করেন। পরে ফরাসী দার্শনিকরা এই ভাবধারাকে এগিয়ে নিয়ে যান।

এই সকল দার্শনিক সবসময় একই সুরে, একই মত'মত প্রকাশ করেননি। তাঁদের প্রত্যেকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। তবে তাঁরা ছিলেন প্রত্যেকে যুক্তিবাদী, মানবতাবাদী ও সংস্কারে বিশ্বাসী। তাঁরা সকলেই বিশ্বাস করতেন যে, প্রকৃতি যেমন নিয়মে চলে সমাজ ও রাষ্ট্রেরও নিয়মে চলা দরকার। নতুবা সমাজের মঙ্গল হবে না। যেখানে নিয়ম মেনে চলা হয় না, সেখানে সংস্কার বা পরিবর্তন দরকার। তাঁরা দর্শণের ব্যবহারিক প্রয়োগে বিশ্বাসী ছিলেন

ফরাসী দার্শনিকদের মধ্যে মন্তেস্ক্যুর নাম বিশেষ উল্লেখ্য (১৬৮৯-১৭৫৫)। মন্তেস্ক্যু ইংলন্ডের সংবিধানের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। কারণ সেখানে রাজা ছিলেন সংবিধানের অধীন এবং পার্লামেন্ট ইংলন্ডে আইন রচনা করিত। মন্তেস্ক্যু তাঁর যুক্তিবাদী চিন্তাকে ফ্রান্সের প্রচলিত সমাজ ও শাসনব্যবস্থার বিশ্লেষণের কাজে লাগান। তাঁর মতে ফ্রান্সের স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র ও অভিজাতীয় সমাজ ছিল যুক্তি-বহির্ভূত ব্যবস্থা। তাঁর দুই বিখ্যাত গ্রন্থ পারস্যের পত্রাবলী (Persian Letters) ফ্রান্সের সামন্ত সমাজ ও স্বৈরাচারী শাসনের যুক্তিবাদী সমালোচনা। গ্রন্থটি বেনামীতে লেখা হয়। মন্তেস্ক্যুর চিন্তাধারার শ্রেষ্ঠ ফসল ছিল "স্পিরিট অব লজ" (Spirit of Laws) বা আইনের মর্ম নামে গ্রন্থটি। প্রচলিত সমাজ ও রাষ্ট্রের অন্যায় ও অযৌক্তিক দিকগুলি তিনি নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেন। এক্ষেত্রে কি ব্যবস্থা হওয়া উচিত তিনি তা প্রকাশ করেন। তাঁর এই মতবাদকে ক্ষমতা বিভাজন তত্ত্ব (Doctrine of Seperation of Powers) বলা হয়। তিনি স্বর্গীয় অধিকার প্রাপ্ত রাজতন্ত্রের তত্ত্বকে নস্যাৎ করেন। তিনি বলেন যে—"যদি একই ব্যক্তির হাতে সরকারের আইন, বিচার ও কার্যনির্বাহক বিভাগ ন্যস্ত থাকে তবে রাষ্ট্রের ব্যক্তি স্বাধীনতা লোপ পাবে।" তিনি রাষ্ট্রের প্রশাসন, আইন বিভাগকে পৃথক করার পরামর্শ দেন।" Spirit of Laws গ্রন্থ এত জনপ্রিয়তা লাভ করে যে ১৮ মাসে এর ২২টি সংস্করণ বিক্রি হয়। মন্তেস্ক্যু নিজে বুর্জোয়া শ্রেণীর লোক ছিলেন। তাঁর চিন্তাধারা ছিল বুর্জোয়াপন্থী। তিনি ধন বণ্টন বা সর্বসাধারণের ভোটাধিকারের কথা বলেননি। তথাপি স্বৈরতন্ত্রের তিনি যে যুক্তিনিষ্ঠ-সমালোচনা করেন এবং তার বিকল্প হিসেবে ক্ষমতা বিভাজনের প্রস্তাব দেন তা সমকালীন যুগে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। ১৭৯১ খ্রীঃ বিপ্লবী সংবিধানে মন্তেস্ক্যুর ক্ষমতা বিভাজন তথ্যের ব্যবহারিক প্রয়োগ করা হয়।

ফ্রান্সের অপর বিখ্যাত চিন্তাবিদ ও দার্শনিক ছিলেন ভলতেয়ার, যা ছিল তাঁর ছদ্মনাম। তাঁর আসল নাম ছিল মারি ফ্রাঁসোয়া আরুয়েৎ। ভলতেয়ার ছিলেন বহু পঠিত, মহাজ্ঞানী লোক (১৬৯৪—১৭৭৮)। ভলতেয়ার ছিলেন তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ রচনায় পারদর্শী। তাঁহার পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ। তিনি গীর্জার দুর্নীতিগুলি তাঁর শাণিত ব্যঙ্গের কষাঘাতে জর্জরিত করেন। তিনি ছদ্মনামে রচনা লিখতেন। ফ্রান্সের পাঠক সমাজ তাঁর রচনা পড়ার জন্যে ব্যগ্র হয়ে থাকত।

১· Lefebvre—P. 59.

ভলতেয়ার বলেন যে,ইতিহাস কেবল সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের কাহিনী নয়। সভ্যতা ও সমাজের বিবর্তনের চিত্র ইতিহাসে পাওয়া যায়। অতীতের আলোকে বর্তমানকে যাচাই করার হাতিয়ার হল ইতিহাস। ভলতেয়ার ইংলন্ডের সমাজ ব্যবস্থাকে মুক্ত, সহিষ্ণু ও প্রগতিশীল বলে প্রশংসা করেন। ইংলন্ডে অভিজাতরাও বিশেষ কৃতিত্ব ভোগ করে না। তৃতীয় শ্রেণীর যোগ্য লোকেরাও সে দেশে সম্মানিত হয়। ভলতেয়ার চিন্তার স্বাধীনতা ও যুক্তিবাদকে শ্রেয় ভাবতেন। যেহেতু গীর্জা যুক্তিবাদ ও স্বাধীন চিন্তা স্বীকার করত না এজন্য তিনি ক্যাথলিক গীর্জাকে তীব্র আক্রমণ করে বলেন "এই গীর্জা হল কুসংস্কার ও দুর্নীতির ঘাঁটি।" ভলতেয়ারের মতবাদী লেখকদের "ভলতেরিয়ান" (Voltarians) বলা হয়। তাঁরা গীর্জা ও বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় জ্যাশসেনীয়, জেসুইট, গ্যালিক্যানদর মধ্যে ঝগড়াকে নিন্দা করেন। খ্রীষ্ট্রীয় গীর্জার বিশেষ সুবিধাগুলিকেও ভলতেয়ারবাদীরা আক্রমণ করেন। ভলতেয়ারের প্রমাণ্য রচনাগুলির মধ্যে "ফিলসফিক্যাল ডিকসনারী" বা দর্শনের অভিধান এবং কাঁদিদ নামে উপন্যাস বিখ্যাত।

. দার্শনিক চূড়ামণি জাঁ জেকুইস রুশো ছিলেন সর্বাপেক্ষা মৌলিক ও বৈপ্লবিক মতের প্রবক্তা। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন পবিত্র না হলেও তাঁর মতবাদের ব্যাপকতা অস্বীকার করা যায় না। রুশো তাঁহার বিখ্যাত রচনা কনট্রাক্ট সোসিয়েল (Contract Social) গ্রন্থে রাষ্ট্রের উৎপত্তি বিশ্লেষণ করেন। তিনি ঐতিহাসিক প্রমাণের সাহায্যে এই সত্য প্রচার করেন যে, ঈশ্বর রাজা বা রাষ্ট্র সৃষ্টি করেননি। জনসাধারণই রাষ্ট্রের উৎস। রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তি জনসাধারণের হাতেই আছে। রাজা জনমত অনুযায়ী চলতে বাধ্য। তিনি আরও বলেন যে,মানুষ মাত্রেই স্বাধীন হয়ে জন্মায়। সামাজিক অব্যবস্থা মানুষকে দবিদ্র অথবা পরাধীন করে। রুশোর এই বৈপ্লবিক মতবাদ জনমানসে প্রভুত আলোড়ন সৃষ্টি করে।

রুশোব মতবাদ

লেফেভারের মতে, রুশোর আবেগযুক্ত দার্শনিক মত বস্তুবাদী, ব্যবহারবাদী দর্শনকে এক নতুন শক্তি দেয়। তাঁর সম্পর্কে এক সমালোচক বলেন যে, "রুশো আমাদের সমাজে কি হওয়া উচিত সে কথাই বেশী করে বলেছেন. আমাদের সমাজ কিভাবে আছে, তাকে তিনি অতিক্রম করে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়েছেন।" রুশোর অপর বিখ্যাত রচনা "ডিসকোর্স অন ইন ইকোয়ালিটি" বা "অসাম্যের কারণ আলোচনা" ছিল সমাজতন্ত্রবাদের ধ্যান-ধারণার দ্বারা মণ্ডিত। যদি সোস্যাল কনট্রাক্ট বা সামাজিক চুক্তিতত্ত্বেতিনি স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের কথা বলেন, তবে "ডিসকোর্স অন ইন ইকোয়ালিটি" গ্রন্থে তিনি সামাজিক অসাম্যের মূল কারণগুলি অনুসন্ধান করেনি। এই গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে রুশো বলেন যে, আদিতে মানুষ ছিল স্বাধীন ও সমান অধিকার ভোগকারী। কিন্তু মানুষের সম্পত্তির লোভ সমাজে অসাম্যের বীজ বপণ করে। অসাম্য থেকে আসে স্বাধীনতার বিনাশ। রুশো তাঁর সামাজিক চুক্তিতত্ত্বে বলেন যে, মানুষের যত রকম গুণাবলী আছে, তার মধ্যে তার যুক্তিবাদ হল শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এই যুক্তিবাদ থাকে সুপ্ত। স্বাধীন চিন্তাশক্তির দ্বারা তার বিকাশ ঘটে। রুশোর অপর দুই বিখ্যাত গ্রন্থ ছিল হেলোইজ এবং এমিল (Helois and Emile)। লেফেভারের মতে,সামাজিক চুক্তিতত্ত্ব অপেক্ষা এই দুটি গ্রন্থের প্রভাব ছিল বেশী।

এনসাইক্লোপিডিষ্ট (Encyclopaedist) বা বিশ্বকোষ রচয়িতারাও ফ্রান্সে যুক্তিবাদী দৃষ্টি গঠনে সহায়তা করেন। ডেনিস দিদেরো, ডি এলেমবার্ত (D. Alembert) বা দালেমবেয়ার প্রভৃতি পণ্ডিত ছিলেন বিশ্বকোষ গ্রন্থের প্রণেতা। দার্শনিকদের রচনাও এই গ্রন্থে স্থান পায়। ১৭৬৫ খ্রীঃ এই গ্রন্থের ৪ হাজার কপি বিক্রয় হয়। অষ্টাদশ শতকের ফ্রান্সের বিখ্যাত জ্ঞানী মনীষী ছিলেন ডেনিস দিদেরো। তিনি তাঁর নেতৃত্বে সে যুগের ফ্রান্সের চিন্তাশীল মনীষিদের জড় করেন। তাঁদের সহায়তায় তিনি জ্ঞান, বিজ্ঞান ও দর্শনের শ্রেষ্ঠ সঙ্কলন বিশ্বকোষ গ্রন্থমালা রচনা করেন। দার্শনিকরা যে গ্রন্থগুলি

বিশ্বকোষ প্রণেতা ও ফিজিওক্র্যাটবাদীরা

রচনা করেন তার ভাব ও ভাষা ছিল বিমূর্ত। তা সর্বসাধারণের বোধগম্য ছিল না। দার্শনিকদের মতবাদগুলিকে সহজবোধ্য করে বিশ্বকোষ প্রকাশ করা হয়। দিদেরোর নিজস্ব দর্শনও বেশ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তা ছিল একাধারে মানবতাবাদী ও উপযোগবাদী। তিনি বলেন জগতের সকল নৈতিক নিয়মের একমাত্র ধ্রুব লক্ষ্য হল মানুষের মঙ্গলবিধান করা। যা মঙ্গলজনক নয় তা যুক্তিসিদ্ধ নয়। যুক্তির কষ্টি পাথরে সকল কিছুই যাচাই করে গ্রহণ করা উচিত। তিনি মানবের মঙ্গল বলতে কেবলমাত্র ঐহিক মঙ্গল ভাবতেন না, তার নৈতিক মঙ্গলের কথাও তিনি বলেন। বিশ্বকোষ গ্রন্থের অপর লেখক দালেম বেয়ার প্রিলিমিনারী ডিসকোর্স (Preliminary Discourse) বা বিশ্বকোষ গ্রন্থমালার ভূমিকা রচনা করেন। অষ্টাদশ শতকে ফিজিওক্র্যাট (Physiocrat) নামে এক প্রকার অর্থনৈতিক মতবাদের উদ্ভব হয়। ইংলন্ডের এ্যাডাম স্মিথ (Adam Smith) ছিলেন এই মতবাদের প্রবর্তক। ফরাসী অর্থনীতিবিদ কুয়েসনে (Quesney) ছিলেন ফ্রান্সে এই মতবাদের প্রধান প্রচারক। ফিজিওক্র্যাট মতের অনুরাগীরা মার্কান্টাইলবাদকে (Mercantilism) ভ্রান্ত মতবাদ বলে সমালোচনা করে। এরা ফ্রান্সের শুল্ক নীতি, নিয়ন্ত্রণ প্রথার তীব্র সমালোচনা করে একটি অবাধ বাণিজ্য নীতি ও খাদ্যশস্যের খোলা বিক্রয় দাবী করে। ফিজিওক্র্যাট মতবাদী কোয়েসনে মনে করতেন যে, সম্পদের প্রধান উৎস হল ভূসম্পত্তি। এজন্য কারও ভূমিকর প্রদান থেকে অব্যাহতি পাওয়া উচিত নয়।

দার্শনিকদের মতবাদ প্রত্যক্ষভাবে বিপ্লবের সৃষ্টি না করলেও তা পরোক্ষভাবে বিপ্লবের ক্ষেত্র সৃষ্টি করে (বিশদ আলোচনা দ্রষ্টব্য)। পুরাতনতন্ত্র বা ফ্রান্সের পুরাতন সমাজ ও শাসন ব্যবস্থার ত্রুটি উল্লেখ করে দার্শনিকরা এই ব্যবস্থা সম্পর্কে জনসাধারণের আস্থা নষ্ট করেন। সাধারণ লোকে তাদের দুঃখ-দুর্দশার কথা বুঝতে পারে। প্রচলিত ব্যবস্থা সম্পর্কে দার্শনিকদের সমালোচনা এমন একটি প্রেরণা সৃষ্টি করে যে, তার প্রবাহে পুরাতনতন্ত্র ভেঙে পড়ে। বিপ্লবের মানসিক প্রস্তুতি গঠনে দার্শনিকদের রচনা কাজ করে। লেফেভার বলেন যে, ফরাসী দার্শনিকরা অভিজাতদের বিশেষ অধিকার, সামন্ত প্রথা, স্বৈরাচারী শাসনের তীব্র সমালোচনা দ্বারা পুরাতনতন্ত্রের ভিত নড়িয়ে দেন। এই ফিলজফ বা দার্শনিকগণ বিশেষতঃ রুশোর উদাত্ত ঘোষণা যে, "মানুষ স্বাভাবিকভাবে জন্ম গ্রহণ করলেও তাকে সর্বত্র শৃঙ্খলিত করা হয়" ফ্রান্সের তৃতীয় শ্রেণীর বিবেককে জাগায়। দার্শনিকরা অসাম্যের নিন্দা করেন।

বৈদেশিক প্রভাব (Foreign Influences)ঃ ফরাসী বিপ্লব ঘটার জন্যে বৈদেশিক প্রভাবও দায়ী ছিল। ইংলন্ডে ১৬৮৮ খ্রীঃ গৌরবজনক বিপ্লব (Glorious Revolution) ঘটায় ইংলন্ডে স্বৈরতন্ত্র ধ্বংস হয়। ইংলন্ডে পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রিত সাংবিধানিক শাসনব্যবস্থা স্থাপিত হয়। ইংরাজ দার্শনিক লক (Locke)-এর মতবাদ এই বিপ্লবে কার্যকরী হয়। প্রতিবেশী ফরাসী দেশের চিন্তাবিদেরা এর দ্বারা অনুপ্রাণিত হন। তাঁরা ফ্রান্সে অনুরূপ শাসন প্রবর্তনের দাবী করেন। আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধে (American War of Independence) বহু ফরাসী স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করেন। মার্কিন দেশ থেকে তাঁরা টম পেইনের (Tom Paine) ভাবধারা, প্রজাতন্ত্রবাদ এবং মানবাধিকারের আদর্শ গ্রহণ করেন। লাফায়েৎ প্রমুখ ফরাসী নেতা আমেরিকা থেকে ফিরে আসার পর মার্কিন প্রজাতন্ত্র ও স্বাধীনতার আদর্শকে ফ্রান্সে রূপায়িত করার কথা ভাবেন।

লকের মতবাদ ও আমেরিকার বিপ্লবের প্রভাব

এইভাবে ফ্রান্সের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা বিপ্লবের ক্ষেত্র রচনা করে। ইতিমধ্যে অর্থ সঙ্কটের দরুন ষোড়শ লুই ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে স্টেটস জেনারেলের অধিবেশন ডাকলে বিপ্লব আরম্ভ হয়।

ফরাসী বিপ্লবের অর্থনৈতিক কারণ (How far the French economy contributed to the out-break of the French Revolution) : ফরাসী বিপ্লব ঘটার জন্যে অর্থনৈতিক কারণ কতটা দায়ী ছিল এ বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক দেখা যায়। গোটা উনবিংশ শতক ধরে এই বিতর্ক চলেছে। ১৯৮৯ খ্রীঃ ফরাসী বিপ্লবের দ্বিশত বার্ষিকী উপলক্ষে এই বিতর্ক নতুন করে শুরু হয়েছে। উনবিংশ শতকের উদারনৈতিক ঐতিহাসিকরা যথা কার্লাইল প্রভৃতি রাজনৈতিক অসন্তোষকেই ফরাসী বিপ্লবের প্রধান কারণ মনে করেন। থিয়ার্স ও মিনেৎ (Mignet) প্রভৃতি ঐতিহাসিকরাও বলেন যে, ফরাসী রাজার স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদই ছিল ফরাসী বিদ্রোহের কারণ। তেইন (Taine) প্রভৃতি ঐতিহাসিকরা দার্শনিকদের প্রভাবকে বেশী গুরুত্ব দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তেইনের মতে, বুর্জোয়া শ্রেণী দার্শনিকদের ভাবধারায় প্রভাবিত হয়ে জনতার সাহায্যে পুরাতন ব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলে। উনবিংশ শতকের লেখকেরা দার্শনিকদের প্রভাবকেই বেশী গুরুত্ব দেন।

জুলেস মিশেলই সর্বপ্রথম ফরাসী বিপ্লবের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। মিশেল ছিলেন গণতান্ত্রিক ভাবধারার ঐতিহাসিক। তিনিই সর্বপ্রথম বলেন যে, "পুরাতনতন্ত্রের অন্যায়, অবিচার, শোষণ, দরিদ্র শ্রেণীর প্রতি চরম অবহেলার বিরুদ্ধে ক্ষুধার্ত জনতার স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যুত্থান ছিল ফরাসী বিপ্লবের মূল কারণ।" মিশেলের মত ছিল যে, পুরাতনতন্ত্রের শোষণ ও তজ্জনিত দারিদ্রই ফ্রান্সের জনতার জাগরণ ঘটায়।

বিংশ শতকে ফরাসী বিপ্লব সম্পর্কে আরও গভীর গবেষণার ফলে এই বিপ্লবের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণকে এখন বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়। জোরেস (Jaures),মাতিয়ে (Mathiez), লেফেভার (Lefebvre) প্রভৃতি ঐতিহাসিকেরা এবং গুডউইন (Goodwin) প্রভৃতি ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা ফরাসী বিপ্লবের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। মর্স স্টিফেন্স-এর মতে, "এই আন্দোলনের কারণ ছিল প্রধানতঃ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, দার্শনিক ও সামাজিক নয়।"[১]

ফরাসী বিপ্লবের কারণ সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী মত

বিপ্লবের প্রাক্কালে ফ্রান্সের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে এই সকল ঐতিহাসিকরা একমত নন। মিশেল, মরিনো ও লেফেভার প্রভৃতির মতে,ফরাসী তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত সাঁকুলেৎ, কৃষক ও পাতি বুর্জোয়াদের অর্থনৈতিক দুর্দশাই ফরাসী বিপ্লবের প্রধান কারণ। অপর দিকে তকভিল, জোরেস, মতিয়ে প্রভৃতি ঐতিহাসিক অর্থনৈতিক স্বাচ্ছল্যকেই বিপ্লবের কারণ বলে বলেন। প্রথম গোষ্ঠী অর্থনীতিবিদ লাব্রজের দেওয়া তথ্যের ওপর নির্ভর করেন। দ্বিতীয় গোষ্ঠী লাদুরির দেওয়া তথ্যের ওপর নির্ভর করেন। (ফ্রান্সের অর্থনৈতিক অবস্থা বিশদ বিবরণের জন্যে আগে ৪ দ্রষ্টব্য)।

স্বচ্ছলতা বনাম দারিদ্র

তকভিল তাঁর গ্রন্থটি ১৮৪৮ খ্রীঃ ফ্রান্সের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পটভূমিকায় লেখেন। তখনকার সমাজে ফ্রান্সের কৃষক ও বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বচ্ছলতা তাঁকে প্রভাবিত করে। এজন্যে তিনি মনে করেন যে, আর্থিক স্বচ্ছলতাই ছিল বিপ্লবের কারণ। কৃষকদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হচ্ছিল।এজন্যে তারা সামন্ত প্রভুদের বিভিন্ন কর ও বেগার প্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। নগরবাসী বুর্জোয়াদের যথেষ্ট আর্থিক উন্নতির জন্যেই তারা অভিজাত শ্রেণীর বিশেষ অধিকার ও জন্মকৌলিন্যের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতার জন্যেই তারা সামাজিক স্তরে উচ্চাকাঙ্ক্ষী হয়। তিনি বলেন যে, অষ্টাদশ শতকে ফ্রান্সের বৈদেশিক বাণিজ্য বাড়ছিল এবং শিল্প উৎপাদনও বাড়ছিল। আসলে

কৃষক ও বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বচ্ছলতা

১· "The causes of the movement were chiefly economic and political not philosophical or social"— Morse Stephens— Revolutionary Europe, P. 9.

Prosperity বা সম্পদের প্রাচুর্য ছিল বিপ্লবের কারণ। তকভিলের প্রাচুর্য তত্ত্ব জোরেস (Jaures) সমর্থন করেছেন। আলবেয়ার মাতিয়ে (Albert Mathiez) জোরেসের তত্ত্বকে আরও একধাপ এগিয়ে বলেছেন যে অর্থনৈতিক দুর্দ্দশা নয়, অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা ও তজ্জনিত সামাজিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা তৃতীয় শ্রেণীকে পুরাতনতন্ত্রকে ভেঙে ফেলতে প্রেরণা দেয়। কারণ বুর্জোয়ারা ও স্বচ্ছল কৃষকরা বুঝেছিল যে, ফ্রান্সে যে শাসন ও সামাজিক ব্যবস্থা কায়েম আছে তাতে তাদের উন্নতির সম্ভাবনা নেই। উৎপাদনও আর বাড়ান যাবে না। জন্মকৌলিন্যের অভাবে তাদের সমাজে ও রাষ্ট্রে কোন ক্ষমতা ও মর্যাদা লাভের সুযোগ নেই। এই ঐতিহাসিকরা অর্থনীতিবিদ গাজোতের (Guxote) দেওয়া তথ্যের সাহায্যে দেখান যে, অর্থনৈতিকভাবে বাণিজ্য ও কৃষির উন্নতি ঘটছিল। লাদুরি (Ladurie) বলেন যে, খাদ্য উৎপাদন না বাড়লে কখনও ফ্রান্সে জনসংখ্যা বাড়ত না।

লেফেভার ও তাঁর মতবাদী ঐতিহাসিকরা অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা তত্ত্বকে (Prosperity Theory) অগ্রাহ্য করেন। "ফ্রান্সের জনসাধারণের তথাকথিত অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার তত্ত্বে আমরা যেন প্রতারিত না হই।" অর্থনীতিবিদ লাব্রুজের দেওয়া তথ্যের সাহায্যে তিনি বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে অর্থনৈতিক হতাশা, বিশেষতঃ কৃষক ও সাঁকুলেৎদের দারিদ্র ও দুর্দ্দশার কথা বলেছেন। মিশেলের মতকে তিনি দৃঢ় সমর্থন করে বলেছেন যে,দারিদ্র ও ক্ষুধা ফরাসী সমাজের নিম্নতম শ্রেণীগুলিকে বিদ্রোহের পথে ঠেলে দেয়। গ্রামের প্রান্তিক চাষী, ভাগচাষী ও ভূমিহীন ক্ষেতমজুর বা ঝুপড়ীবাসীদের দুর্দ্দশার সীমা ছিল না। ইংরাজ পর্যটক প্রত্যক্ষদর্শী আর্থার ইয়াং ফ্রান্সের গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের ভয়াবহ দুরবস্থা প্রত্যক্ষ করেন। সবাই আশা করেছিল যে, জাতীয় সভা যখন ডাকা হয়েছে তখন একটা কিছু বিহিত হবে। জাতীয় সভা ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা হলে লোকে ক্ষিপ্ত হয়। যদি বলা হয় যে, বুর্জোয়া শ্রেণীর অভিজাতদের বিরুদ্ধে সামাজিক অসন্তোষ, অভিজাতদের সঙ্গে সমকক্ষতা লাভের দাবী পূরণ না হওয়ার জন্যেই তারা বিদ্রোহের পথ বেছে নেয়।তবে প্রশ্ন আসে সাঁকুলেৎ ও কৃষকরা কেন বুর্জোয়াদের সঙ্গে যোগ দেয়। তাদের নিজস্ব শ্রেণীগত দারিদ্র ও প্রতিকারহীন দুর্দ্দশা তাদের বিদ্রোহের পথে ঠেলে দেয়। বুর্জোয়া শ্রেণীর কথাতেই তাঁরা পুরাতনতন্ত্রকে ভাঙতে ঝাঁপিয়ে পড়ে একথা ভাবার কারণ নেই। কারণ সাঁকুলেৎদের ধনী বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধেও অসন্তোষ জমা হয়েছিল। আসল কথা হল বুর্জোয়া, সাঁকুলেৎ ও শ্রমিক প্রত্যেক শ্রেণীর নিজস্ব শ্রেণীগত অর্থনৈতিক অসন্তোষ ছিল। জাতীয় সভার অধিবেশন উপলক্ষে তা সামাজিক ও রাজনৈতিক অসন্তোষে পরিণত হয়। জুলেস মিশেলের "দারিদ্র ও হতাশা নিপীড়িত জনগণের ব্যগ্র অভ্যুত্থানের কারণ" এই তত্ত্বকে অস্বীকার করা যায় না।

দারিদ্র তত্ত্ব ও লেফেভার ব্যাখ্যা

জর্জ রুডেও (George Rude) এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক প্রাচুর্য (Prosperity) এবং অর্থনৈতিক দুর্দ্দশা (Poverty) উভয় কারণকে ফরাসী বিপ্লবের উদ্ভবক্ষেত্র বলে গণ্য করেছেন। তৃতীয় শ্রেণীর একপ্রান্তে ছিল প্রাচুর্য ভোগকারী বুর্জোয়া অপর প্রান্তে ছিল দারিদ্র শোষণে জর্জরিত সাঁকুলেৎ ও কৃষক। উভয় শ্রেণীর মধ্যে ছিল তীব্র অর্থনৈতিক ও সামাজিক অসন্তোষ, যা উভয় শ্রেণীকে পুরাতনতন্ত্র ভঙ্গিতে প্রেরণা দেয়। সুতরাং প্রাচুর্য ও দারিদ্র উভয় কারণই সম্মিলিতভাবে কাজ করেছিল। লেফেভার বলেছেন যে, "যতই শিল্পের অগ্রগতির কথা বলা হোক না কেন, অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্যন্ত ফ্রান্স ছিল মূলতঃ একটি কৃষিপ্রধান, হস্তশিল্পের অর্থনীতির ওপর নির্ভরশীল দেশ। পুঁজিবাদী অর্থনীতি ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ফ্রান্সের প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় বাধাপ্রাপ্ত হয়, যা বিপ্লবের বারুদ সঞ্চার করে" (France remained a

উভয়মতের সামঞ্জস্য বিধান : জর্জ রুডে তৃতীয় শ্রেণীর একাংশের স্বচ্ছলতা

nation of agriculture and handicrafts. The development of Capitalism and of economic freedom met strong resistance on French soil, a fact which was to be of major importance during the Revolution)। অষ্টাদশ শতকের পরিকাঠামোর ভেতর থেকে ফ্রান্সকে ইংল্যান্ডের মত এক শিল্প-বাণিজ্য প্রধান দেশে পরিণত করা যাবে না তা ধনী বুর্জোয়ারা বুঝে ফেলেছিল। কাজেই পুরাতন ব্যবস্থার প্রতি তাদের কোন মোহ ছিল না। ইংলন্ডের মত অভিজাতরা শিল্প-বাণিজ্যের কাজে লেগে অভিজাত-বুর্জোয়ার ব্যবধান দূর করে দিবে অথবা অর্থনৈতিক বিপ্লব ঘটাবে তার সম্ভাবনাও ছিল না। বুর্জোয়াদের অভিজাতের ক্ষমতা ও মর্যাদা পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং প্রাচুর্য থাকলেও বুর্জোয়ারা ছিল অসন্তুষ্ট। সংস্কাব দ্বারা যে এই দুষ্টচক্রকে শোধন করা যাবে না তা স্পষ্ট হয়। কারণ ১৭৭৬ খ্রীঃ টুর্গো যে সংস্কার প্রস্তাব করেন, যাকে কাঠামোগত মৌলিক সংস্কার প্রস্তাব (Structural Reforms) বলা হয়; ষোড়শ লুই তা কার্যকরী করতে পারেননি। ফলে টুর্গোকে চলে যেতে হয়। মন্ত্রী ক্যালোন্নেও সংস্কার কার্যকরী করতে পারেননি। কাজেই ধনী বুর্জোয়া ও বুদ্ধিজীবী পাতি বুর্জোযা সকলেই বুঝে ফেলে যে,সংস্কারের পথে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হবে না। এ কারণে তাদেব হতাশা ও ক্রোধ বাড়ে।

তৃতীয় শ্রেণীর নীচের ধাপে ছিল সাঁকুলেৎ, কৃষক শ্রেণী। এই শ্রেণীর দুর্দ্দশার কথা আগের পরিচ্ছেদে (ফ্রান্সের অর্থনৈতিক অবস্থা বিশদ বিববণের জন্যে পৃঃ ৪) বলা হয়েছে। হতে পারে ১৭৭০ খ্রীঃ পর্যন্ত কৃষিতে কিছু উন্নতিব চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল। সেই উন্নতির গতি ছিল খুব ক্ষীণ, প্রায অদৃশ্য। যেমন আঙ্গুরেব ও আলুর চাষ বাড়ছিল। দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রান্সে খাদ্যশস্যের ফলন বাড়ছিল। গৃহপালিত পশু, ভেড়া ও গাভী পালনেব প্রসার ঘটছিল। কিন্তু জমিতে ভালভাবে চাষ না করে পতিত জমিকে আবাদী জমিতে হাসিল করাব উদ্যোগ ছিল। আসলে কৃষির উন্নতি হয়নি। নতুন জমি আবাদ কবায় কিছু ফসল বাড়ছিল মাত্র। আসল সমস্যা ছিল অতিরিক্ত কর, সামন্ত কর, গীর্জা কর প্রভৃতির চাপ যা স্বাধীন কৃষককে পিষে ফেলছিল। ভাগচাষী, ভূমিহীন ক্ষেত মজুর দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হচ্ছিল। তারা যদি ভূমিদাসদের তুলনায় কিছু স্বাধীনতা ভোগ করত, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না থাকায়, সেই স্বাধীনতা ছিল ইচ্ছামত উপবাস করার ও মৃত্যুবরণ করার স্বাধীনতা মাত্র। (কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থার বিবরণ আসে ফ্রান্সের অর্থনৈতিক অবস্থা শীর্ষক পরিচ্ছেদে পৃঃ ৫ দ্রষ্টব্য)। ভূমিদাসদের অবস্থা ছিল আরও করুণ। মরিন্যো (Morineau) বলেন যে, ফ্রান্সের জনসংখ্যা তেমন উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়েনি এবং কৃষি উৎপাদনও আশানুরূপ বাড়েনি।

তৃতীয় শ্রেণীব অপব অংশেব দাবিদ্র ও হতাশা জুলেশ মিশেল

সাঁকুলেৎদের অবস্থাও যথেষ্ট দুর্দ্দশাগ্রস্থ ছিল। মজুরির হার ২২% বাড়লেও খাদ্যশস্যের দাম বাড়ে ৩০-৩৫%। তদুপরি কাজের নিশ্চয়তা ছিল না। ছাঁটাই, বেকারী ও দুর্দ্দশা ছিল তাদের নিত্যসঙ্গী। যারা শহরে মুটে ও মাল বইবার কাজ করত অর্থাৎ অদক্ষ শ্রমিক তাদের অবস্থা ছিল আরও খারাপ।এদের মধ্যে ছিল শুধু ক্ষুধার তাড়না, দারিদ্র্যের হতাশা ও সমাজের বঞ্চনার জন্যে অভিশাপ। (বিশদ বিবরণ আগে অর্থনৈতিক অবস্থা পৃঃ ৫ দ্রষ্টব্য)। কাজেই দারিদ্র ছিল তৃতীয় শ্রেণীর বেশীরভাগ লোকের নিত্যসঙ্গী। যে কৃষকদের নিজ জমি ছিল তারা ছিল মাত্র কৃষকদের $\frac{১}{৩}$ অংশ। বাকি $\frac{২}{৩}$ অংশের নিজ জমি ছিল না। $\frac{১}{৩}$ অংশেরও করের চাপে হাতে কিছুই থাকত না। এই দরিদ্র শ্রেণীর হারাবার কিছুই ছিল না। এরাই ফরাসী বিপ্লবের বারুদের যোগানদার ছিল।

সাঁকুলেৎ শ্রেণীর হতাশ

১৭৭০ খ্রীঃ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি কিছুটা হলেও, এরপর অর্থনীতিতে ভাঁটার টান দেখা দেয়। কৃষি ও শিল্পে এই ভাঁটার টান অত্যন্ত প্রকট। লাব্রুজের দেওয়া তথ্য তা প্রকাশ করে। এর

একটি প্রধান কারণ ছিল দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি। মেক্সিকোর সোনা-রূপার খনি থেকে ইওরোপে এই মূল্যবান ধাতুর ব্যাপক আমদানির ফলে সকল দেশে দ্রব্যমূল্য বাড়ে। ফ্রান্সেও তা বেড়েছিল।

১৭৭০ খ্রীঃ পর মন্দা ও অজন্মা

তুলনামূলকভাবে সাঁ-কুলেৎ ও কৃষকদের মজুরী ও ফসল উৎপাদন বাড়েনি। এর সঙ্গে ১৭৮৮-১৭৮৯-এর পর পর দু বছর ফসল হানি এই শ্রেণীগুলির দুর্দ্দশাকে সীমাহীন করে।

সুতরাং তৃতীয় শ্রেণীর নীচের ধাপে কৃষক ও সাঁকুলেৎরা তাদের হিংসামূলক প্রবৃত্তির তাড়নায় ১৫ই আগস্ট, ১৭৮৯ থেকে ভাঙচুর শুরু করেনি, অথবা সুবিধাবাদী বুর্জোয়াদের ডাকে তারা ভাঙনের খেলায় যোগ দেয়নি। তারা দারিদ্র ও ক্ষুধার তাড়নায় সব কিছু ভাঙতে

সাঁকুলেৎ ও কৃষকদের ভাঙনের প্রবণতা

শুরু করে। মিশেলের এই মতের সারবস্তু মেনে নেওয়া যায়। সমাজের একদিকে সম্পদের বৃদ্ধি বা স্বচ্ছলতা (Prosperity) অপরদিকে দারিদ্র উভয় অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতিক্রিয়া বিপ্লব সৃষ্টি করে জর্জ রুডের এই মত মূল্যবান।

এর সঙ্গে যুক্ত হয় ফরাসী রাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক সঙ্কট। শূন্য রাজকোষ দিয়ে রাজ্য শাসন করা আর সম্ভব ছিল না। সরকারের ঋণের বোঝা মারাত্মক আকার ধরে (আগে ফ্রান্সের অর্থনৈতিক অবস্থা পৃঃ ৬)। যেহেতু সামন্ত ও যাজকরা কর দিতে রাজী ছিল না, সেহেতু কর বাড়িয়ে ঘাটতি মেটানর পথ ষোড়শ লুই খুঁজে পাননি। এই অবস্থায় তিনি সামন্ত শ্রেণীর

রাজার অর্থনৈতিক সঙ্কট পরিশেষে রাজনৈতিক সঙ্কটে পরিণত হওয়া

ওপর কর চাপাতে মরিয়া হয়ে চেষ্টা করেন। ফ্রান্সের চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী নতুন কর বা নতুন আইন চালু করতে হলে তা হয় জাতীয় সভায় অথবা Parlementগুলিতে নথীবদ্ধ করতে হত। জাতীয় সভা না থাকায় রাজা অর্থ সঙ্কট থেকে ত্রাণ পেতে নতুন কর প্রস্তাব প্যারিসের পার্লেমেন্টের সামনে আনেন নথীবদ্ধ করার জন্যে। অভিজাত তা অগ্রাহ্য করলে রাজা ষোড়শ লুই অর্থসঙ্কটের আঘাতে পরিণাম না ভেবে জাতীয় সভা ডাকেন। সঙ্গে সঙ্গে বুর্জোয়া শ্রেণী তাদের দীর্ঘকালের জমা থাকা বিষবাষ্প অভিজাত শ্রেণী ও তাদের সমর্থক রাজার ওপর প্রয়োগ করে। তাদের সঙ্গে যোগ দেয় নিপীড়িত, ক্ষুধার্ত সাঁকুলেৎ ও কৃষক। শুরু হয় পুরাতনতন্ত্রের ভাঙনের মহা প্রলয়। ফরাসী বিপ্লবের অগ্নিস্রাবের গুরু গুরু ধ্বনি জাতীয় সভার কক্ষে ও বাস্তিল দুর্গ আক্রমণে ধ্বনিত হয়।

যখন সব কথা বলা হল তখনও বলা দরকার যে, অর্থনৈতিক কারণ নিশ্চয়ই ছিল ফরাসী বিপ্লবের মুখ্য কারণ। তৃতীয় এস্টেটের বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থ এক রকম ছিল না। পুরাতনতন্ত্রের

জ্ঞানদীপ্তির প্রভাব

দুর্গের দেয়ালে দার্শনিকরা অনেকদিন ধরে কামান দাগেন, তা বুর্জোয়াদের প্রভাবিত করেছিল। তাদের সামাজিক উচ্চাকাঙ্খা, শ্রেণী চেতনা এবং প্রচলিত ব্যবস্থার প্রতি অনাস্থা দার্শনিকদের রচনাগুলি ও যুক্তিবাদ সৃষ্টি করে।

দার্শনিকদের রচনার প্রধান পাঠক ছিলেন শিক্ষিত বুর্জোয়া শ্রেণী। দার্শনিকদের রচনা তাদের পুরাতনতন্ত্র ভাঙতে অনুপ্রাণিত করে। সুতরাং সামাজিক, রাজনৈতিক এবং দার্শনিক কারণও বিপ্লব সৃষ্টি করেছিল বলা যায়। বার্ণেভ (Barnave) নামক ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছেন যে, "সভ্যতা, জ্ঞানদীপ্তি ও শিল্পে অগ্রগতির জন্যেই ফরাসী বিপ্লব ঘটে।"[১]

ফরাসী বিপ্লবের জন্যে দার্শনিকদের দায়িত্ব এবং এই বিপ্লবের অগ্রগতিতে দার্শনিকদের অবদান (Responsibility of Philosophers

১· "The whole of the French Revolution can be attributed to the progress of civilisation, enlightenment and industry."—Barnave.

for the outbreak of the French Revolution and their contributions on its development) : উনবিংশ শতক থেকে বুদ্ধিজীবি মহলে ফরাসী বিপ্লবের পশ্চাতে দার্শনিকদের ভূমিকা নিয়ে বিতর্ক চলছে। ১৯৮৯ খ্রীঃ ফরাসী বিপ্লবের দ্বিশত বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে এই বিতর্ক পুনরায় জোবদাব হয়েছে। এ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের তিনটি গোষ্ঠীতে ভাগ করা যায়। তেইন (Taine), সোতাব্রিয়াঁ (Chateaubriand), রুস্তাঁ (Roustan), আবে বারুয়েল (Abbe Barruel) প্রভৃতির মতে দার্শনিকদের মতামতের প্রভাব পুরাতনতন্ত্রের দুর্গে ফাটল ধরায়। ফ্রান্সের বুর্জোয়া ও তৃতীয় শ্রেণীর অন্যান্য লোক দার্শনিকদের মতামত পান পাত্র থেকে আকণ্ঠ পান করে। এজন্য তারা পুরাতনতন্ত্রের প্রতি আস্থা হারায়। এভাবে পুরাতনতন্ত্রের পতন হয়। অপরদিকে জর্জ লেফেভার, মসষ্টিফেন্স প্রভৃতি ঐতিহাসিক ফ্রান্সেব জনসাধারণের অর্থনৈতিক অসন্তোষ এবং ষোড়শ লুইয়েব অর্থনৈতিক সঙ্কট ও ফরাসী রাজার স্বৈরশাসনকেও ফরাসী বিপ্লবেব প্রধান কারণ বলে মনে করেন। ফরাসী বিপ্লব ঘটার জন্যে দার্শনিকদের কোন প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল না। যদি তাঁদেব কোন প্রভাব কার্যকরী হয় তা ছিল পরোক্ষ ও গৌণ (Remote and indirect)। তৃতীয় গোষ্ঠীর ঐতিহাসিকরা হলেন উভয় মতের মধ্যে সমন্বয়বাদী। তাঁরা অর্থনৈতিক ও দার্শনিক কারণ উভয় মতকেই গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। জর্জ রুডে ও কোব্বান (George Rube, Cobban) এই গোষ্ঠীর অন্তর্গত।

দার্শনিকদেব প্রভাব সম্পর্কে দুই বিরোধী মত

অর্থনৈতিক মতবাদেব অনুরাগী ঐতিহাসিকরা বলেন যে, ফরাসী বিপ্লব ছিল ফ্রান্সের তৃতীয় শ্রেণীব অন্তর্গত সাঁকুলেৎ ও কৃষকদেব দারিদ্র ও ক্ষুধার জন্যে অভ্যুত্থানেব ফল। বুর্জোয়ারা তাঁদেব সামাজিক ও বাজনৈতিক উচ্চকাঙ্খা পুরণের জন্যে এতে নেতৃত্ব দেয়। তারা ক্ষুধার্ত জনতাকে পুরাতনতন্ত্র ভাঙতে ব্যবহার করে। কারণ বুর্জোযাদের সংখ্যা ও শক্তি ছিল কম। এর পশ্চাতে দার্শনিকদের কোন ভূমিকা ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, লেফেভার বলেন যে, পুরাতনতন্ত্রের ভিত্তি নিজে থেকেই নড়বড়ে হয়েছিল। বাণিজ্য ও শিল্পের অগ্রগতির ফলে মধ্যযুগীয় কৃষি ভিত্তিক সামন্ত সমাজের যৌক্তিকতা ও জোর আর ছিল না। তৃতীয়তঃ, দার্শনিকদের অধিকাংশ প্রধান প্রবক্তাব বিপ্লবের আগেই মৃত্যু হয়। তাঁরা বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করেন নি। চতুর্থতঃ, দার্শনিকদেব মধ্যে প্রখব যুক্তিবাদ থাকলেও তাঁরা সকলে ঐক্যমতে আবদ্ধ ছিলেন না। বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্ন মত পোষণ করতেন। তাঁদের প্রভাব এজন্য তীব্র হতে পারেনি। পঞ্চমতঃ, দার্শনিকবা তাঁদের রচনায় পুরাতনতন্ত্রের সমালোচনা করলেও, তাঁরা সংস্কারের কথা বলেন। জর্জ রুডে বলেছেন যে, প্রলিতারিয়গণ যেভাবে হিংসাত্মক বিপ্লব করে তা রুশো বেঁচে থাকলে কখনও অনুমোদন করতেন না। দার্শনিকরা আসলে পুরাতনতন্ত্রের সংস্কারের কথা ভাবেন, তা ভেঙে ফেলার কথা তাঁরা ভাবেননি। ষষ্ঠতঃ, দার্শনিকরা জ্ঞানদীপ্তির দ্বারা নতুন আদর্শ প্রচার করেন। তার ব্যবহারিক প্রয়োগে তাঁরা বিশেষ উৎসাহী ছিলেন না। দার্শনিকরা ছিলেন তত্ত্ববাদী। সেই তত্ত্বের ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্পর্কে তাঁবা ভিন্নমত পোষণ করতেন। সপ্তমতঃ, ম্যুনিয়ের (Mounier) প্রভৃতি ঐতিহাসিক এই কারণে বিপ্লবের পশ্চাতে দার্শনিকদের অবদান দেখতে পাননি। তাঁরা প্রশ্ন করেছেন যে ফ্রান্সের ঠিক কত সংখ্যক লোক দার্শনিকদেব রচনা পড়ত? গ্রামের কৃষক, শহরের সাঁকুলেৎদের দার্শনিকদের রচনা পড়ার কোন সুযোগ ছিল না। তাছাড়া দার্শনিকরা তাঁদের মতামত অত্যন্ত ঘোরালো, বিমূর্ত ভাষায় ব্যক্ত করেন। তা বোঝা সর্বসাধারণের সাধ্য ছিল না। দার্শনিকদের ভাবধারা কেবলমাত্র শিক্ষিত বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সর্বসাধারণের মধ্যে তার বিস্তার ঘটেনি। ম্যালেট দ্যুপান বলেন যে "দার্শনিকরা পুরাতনতন্ত্রের সমালোচনা করলেও, তার ফলে লোকে বিদ্রোহী হয়, এ কথা মনে করার কারণ নেই।" দার্শনিকদের নেতিবাচক সমালোচনা যদি কিছু লোক পড়ে তার ফলে তারা পুরাতন

ব্যবস্থার প্রতি আস্থা হারায়। এজন্য তারা বিপ্লবের পথে পা বাড়ায় তা মনে করা যায় না। ডেভিড টমসনের মতে "দার্শনিকরা বিপ্লব চাননি।" দার্শনিকদের একাংশ ছিলেন আভিজাত বংশীয়, অথবা বুর্জোয়া আইনজীবি অথবা সরকারি কর্মচারী। তাঁরা পুরাতনতন্ত্রের প্রতি আস্থাবান ছিলেন না। কিন্তু তাঁরা বিপ্লবের কথা বলেন, এ কথা মনে করা যায় না।

এই সমালোচনার উত্তরে বলা হয় যে, দার্শনিকদের মৃত্যু বিপ্লবের আগে হলেও তাঁদেব রচনা ও ভাবধারা বিদ্যমান ছিল। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায় যে, মন্তেস্কুর চিন্তাধারার প্রভাব মিরাবু ও বিপ্লবের অন্যান্য মডারেট নেতাদের ওপর এবং রুশোর চিন্তাধারার প্রভাব রোবসপিয়ার ও অন্যান্য জ্যাকোবিন নেতার ওপর দেখা যায়। অথচ এই দার্শনিকরা তখন জীবিত ছিলেন না। (২) দার্শনিকরা বিপ্লবে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করবেন এ কথা ভাবা যায় না। তাঁদের কাজ হল চিন্তা করা এবং যুক্তিবাদী চিন্তাব দ্বাবা প্রচলিত ব্যবস্থার উপযোগীতা বিচার করা। সেই দায়িত্ব তাঁরা পালন করেন। (৩) দার্শনিকদেব মতামতকে একটি সরলরেখায় আনা যায় না এ কথা সত্য। তাঁদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর, মতামতের পার্থক্য ছিল। দার্শনিকদের পক্ষে সেটাই হল স্বাভাবিক। কারণ প্রত্যেক দার্শনিক মৌলিকভাবে চিন্তা করেন। কাজেই তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য থাকবেই। কিন্তু পুরাতনতন্ত্রের দোষ-ত্রুটির ব্যাপারে তাঁরা একমত ছিলেন এ কথা সত্য। (৪) দার্শনিকরা বিপ্লবের কথা প্রত্যক্ষভাবে না বললেও তাঁরা পুরাতনতন্ত্রের সংস্কার চান। যখন বোঝা যায় যে ফ্রান্সে সংস্কার সফল হওয়ার কোন আশা নেই, তখন অবশ্যই ইতিহাসের নিয়মে বিপ্লব দেখা দেয়। পুরাতনতন্ত্রেব দোষ-ত্রুটি উদ্ঘাটন করে দার্শনিকরা পুরাতনতন্ত্রের ভিত্তিকে নড়বড়ে করে দেন। তাঁরা যে সমালোচনা ও অনাস্থার বাষ্প তৈরি করেন, তার নির্গমনের জন্যে সংস্কারের সেফটিভাল্ব (Safety Valve) না থাকায় বিপ্লবের পথে বিস্ফারিত হয়। নিরন্তব সমালোচনার দ্বারা তাঁবা পুরাতনতন্ত্রেব কবব খুঁড়ে ফেলেন। (৫) দার্শনিকদের রচনা সকলে পড়েননি, কেবলমাত্র বুদ্ধিজীবি বুর্জোয়াদেব মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ ছিল, তা ঠিক নয়। (ক) বুর্জোয়া শ্রেণী দার্শনিকদের সমালোচনাগুলি পানপাত্র হতে আকণ্ঠ পান করে। বুদ্ধিজীবি বুর্জোয়ারা এজন্য বিপ্লবে নেতৃত্ব দেয়। (খ) কোন কোন দার্শনিকের রচনা বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। উদাহরণ-স্বরূপ ভলতেয়ারের রসালো ভাষায় লেখা জনপ্রিয় ব্যঙ্গ রচনাগুলির কথা উল্লেখ্য। মণ্টেস্কুব "আইনের মর্ম" (Spirit of Laws) গ্রন্থটিব ১৮ মাসে ২২টি সংস্করণ হয়। রুশোর রচনা হেলোয়েজ ও এমিল ভয়ানক জনপ্রিয় ছিল। গীর্জাব ওপর ভলতেয়ারেব তীব্র আক্রমণ জনসাধারণকে ধর্মীয় কুসংস্কার থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করে। (গ) দার্শনিকদের রচনা কেবলমাত্র শিক্ষিত বুর্জোয়াদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। ডেভিড ওগের (David Ogg) মতে নিম্ন যাজকরা দার্শনিকদের রচনাগুলি পড়েছিল। তারা প্রার্থনান্তিক ভাষণে দার্শনিকদের কথাই তাদের বুঝিয়ে বলত। প্যারিসের সালোঁ (Saloon) বৈঠকী আড্ডাখানা ও রেস্তোরাঁগুলিতে দার্শনিকদের মতামত নিয়ে তর্ক-বিতর্ক চলত। এখানে যারা আসত তারা এর দ্বারাই দার্শনিকদের মতামত সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করত। মোট কথা, লেফেভারও স্বীকার করেছেন যে, "ফ্রান্সেই অভিজাতদের বিশেষ অধিকার দার্শনিকদের দ্বারা সর্বাধিক সমালোচিত হয়"। (It was in France that witnessed the most vehement attack on privileges")।

দার্শনিকদেব প্রভাবের বিরুদ্ধ যুক্তি

জর্জ রুডে উভয় মতের সামঞ্জস্য বিধান করে বলেছেন যে, এ কথা সত্য যে, যে সমাজ ও রাষ্ট্রে ক্ষমতা ও অধিকারভোগের ক্ষেত্রে এত বৈষম্য ছিল, সেখানে অশান্তি দেখা দিবে। দার্শনিকরা Natural law বা প্রকৃতির নিয়ম ব্যাখ্যা করে এই বৈষম্যের যুক্তিহীনতাকে প্রকটিত করেন। এই দিক থেকে দার্শনিকদের অবদান প্রভূত ছিল তাতে সন্দেহ নেই। দার্শনিকরা অষ্টাদশ শতকে দর্শনের ব্যবহারিক প্রয়োগ করার ফলে ফ্রান্সের বাস্তব অবস্থার অন্যায় ও

যুক্তিহীন দিকগুলির প্রতি সকলের দৃষ্টি পড়ে। জর্জরুডের মতে, তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে যে সকল উপশ্রেণী ছিল তাদের সকলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অসন্তোষকে একটি সরল রেখায় আনা যেত না। কেননা অনেকক্ষেত্রে তা ছিল পরস্পর-বিরোধী। ধনী বুর্জোয়াদের অর্থনৈতিক অসন্তোষের সঙ্গে কৃষক ও সাঁকুলেৎদের অর্থনৈতিক অসন্তোষের পার্থক্য ছিল। তাহলে কিসের প্রভাবে তারা ১৭৮৯ খ্রীঃ একটি বিন্দুতে মিলিত হয় এবং পুরাতনতন্ত্র ধ্বসিয়ে দেয়? জর্জ রুডের মতে তা ছিল তৃতীয় শ্রেণীর বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে "বিপ্লবী মানসিকতার জাগরণ" (Revolutionary Psychology)।এই বিপ্লবী মানসিকতার সৃষ্টি ছিল দার্শনিকদের অবদান।

জর্জ রুডের বিপ্লবী মানসিকতা তত্ত্ব

অষ্টাদশ শতকে প্যারিস ছিল যুক্তিবাদী, উপযোগবাদী দর্শনের বীজক্ষেত্র। ফ্রেডারিখ এঙ্গেলসের মতে, "জ্ঞানদীপ্তির.দর্শনের অন্য নাম ছিল ফরাসী চিন্তাবিদদের বস্তুবাদ। ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্কালে এই সকল বস্তুবাদী, উপযোগীবাদী দার্শনিকদের চিন্তাধারা অষ্টাদশ শতককে ফরাসী দার্শনিকদের শতকেই পরিণত করে" (The Philosophy of Enlightenmen' was the brilliant school of French materialists, which made the 18tk century a French century even before the crowning French Revolution)। দর্শনকে পারলৌকিক ও আধ্যত্মিক বিষয় থেকে মানবজীবনের দৈনন্দিন ব্যবহারিক বিষয়ের প্রতি নিয়োজিত করা ছিল এই দার্শনিকদের প্রধান কৃতিত্ব। তাঁরা ফ্রান্সের রাষ্ট্র, সমাজ, গীর্জা, অর্থনৈতিক সকল বিষয়ের বিচারে তাঁদের যুক্তিবাদী প্রজ্ঞাকে নিয়োজিত করেন। ইংরাজ দার্শনিক ও বিজ্ঞানী ফ্রান্সিস বেকন ও ফরাসী চিন্তাবিদ দেকার্তের ভাবধারাকে তাঁরা আত্মস্থ করেন। বেকন যুক্তিবাদকেই সকল কিছু সম্পর্কে জানার চাবিকাঠি বলে মনে করতেন। দেকার্তে বলেন যে, অভিজ্ঞতা (Experience) ও যুক্তিবাদই হল সত্যকে জানার একমাত্র মানদণ্ড। দেকার্তে গীর্জা কর্তৃক প্রচারিত অলৌকিক ও ঈশ্বরবাদকে নস্যাৎ করেন। তিনি আরও বলেন অভিজ্ঞতা ও যুক্তি প্রয়োগ কোনও বিশেষ শ্রেণীর একচেটিয়া ক্ষমতা নয়। সকলেই তা প্রয়োগ করতে পারে।

দার্শনিকদের প্রভাব : বেকন ও দেকার্তে

উপযোগবাদী দার্শনিকরা বেকন ও দেকার্তের চিন্তাধারার বাস্তব প্রয়োগ করেন। এর ফলে গীর্জা, যাজকদের বিশেষ সুযোগ, সামন্ত প্রথা, সামন্ত শ্রেণীর বিশেষ অধিকার, স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র, বৈষম্যমূলক কর প্রথা, সামাজিক অসাম্য, দরিদ্রদের অর্থনৈতিক দুর্দ্দশা সকল বিষয়ে দার্শনিকদের যুক্তিবাদী সমালোচনা নিযুক্ত হয়। দার্শনিকরা বলেন যে : (১) বিশ্ব একটি নিয়মের ফলে চলে। (২) অভিজ্ঞতা ও যুক্তিবাদী পর্যবেক্ষণ দ্বারা জাগতিক রহস্যের ব্যাখ্যা করা যায়। (৩) বিজ্ঞানের লক্ষ্য হল মানুষের মঙ্গল বিধান করা এবং মানুষের বৈষয়িক ও উন্নতির পথ আবিষ্কার করা। দার্শনিকরা কেবল গীর্জার প্রচলিত কুসংস্কার ও রক্ষণশীলতাকে আঘাত করেননি, তাঁরা সমাজ ও রাষ্ট্রের অন্যায় দিকগুলিকেও সমালোচনা করেন। ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের মতে, "ফ্রান্সের বুদ্ধিজীবি যুবকদের সকলেই দার্শনিকদের দ্বারা প্রভাবিত হয়" (French materialism became the creed of the whole cultured youth of France)। পুরাতনতন্ত্রের প্রতি আস্থাই এই পুরাতনতন্ত্রকে টিকিয়ে রেখেছিল। দার্শনিকদের সমালোচনার কশাঘাত পুরাতনতন্ত্রের প্রতি লোকের আস্থা বিনষ্ট করে। তারপর পুরাতনতন্ত্রকে ধ্বংস করতে লোকের বিবেকে বাধেনি।

বস্তুবাদী ও উপযোগবাদী দর্শনের প্রভাব

এজন্য জর্জ রুডে বলেন যে, তৃতীয় শ্রেণীর বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অসন্তোষ থাকলেও তাদের মধ্যে অর্থনৈতিক স্বার্থের বিরোধ ছিল। দার্শনিকদের রচনাই তাদের

মনে বিপ্লবী মানসিকতা সৃষ্টি করে। ফলে তারা ঐক্যবদ্ধভাবে পুরাতনতন্ত্রের ওপর আঘাত হানে। পুরাতনতন্ত্রের অযৌক্তিক ও অন্যায় দিকগুলিকে উদঘাটন করার ফলে, তৃতীয় শ্রেণীর মনে বিপ্লবী মানসিকতার সৃষ্টি হয়। এই দার্শনিকদের মধ্যে প্রধান ছিলেন মন্তেস্কু, রুশো, ভলতেয়ার, দিদেরো ও ফিজিওক্র্যাটগণ। তাঁরা মানুষের মনের সুপ্ত আশা-আকাঙ্খাকে ভাষা ও রূপ দেন। সমাজের অত্যাচার ও অন্যায় সম্পর্কে তাদের সজাগ করেন। পুরাতনতন্ত্রের পচনের কথা তাঁরা সকলকে বুঝাতে পারেন। এই যুগে ফ্রান্সে এমন কোন রাজনৈতিক দল ছিল না যারা জনসাধারণকে তাদের অভাব, অভিযোগ সম্পর্কে সতর্ক করতে পারে এবং তাদের সংগঠিত করতে পারে। দার্শনিকদের রচনা সেই অভাব পূরণ করে। (দার্শনিকদের মতামতের বিশদ বিবরণ পৃঃ ২৫ ফ্রান্সে জ্ঞানদীপ্তির প্রভাব দ্রষ্টব্য)।

দার্শনিকদের প্রভাব

ফ্রান্সে ১৭৮৯ খ্রীঃ বিপ্লবের কারণগুলি (The causes of the outbreak of Revolution in France in 1789) ঃ ১৭৮৯ খ্রীঃ ফ্রান্সে যে মহাবিপ্লব ঘটে তার কারণ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে কোন ঐক্যমত নেই। প্রশ্ন হল যে বিপ্লব অন্য দেশে না ঘটে ফ্রান্সেই কেন বিপ্লব দেখা দেয়? তুলনা করলে দেখা যাবে যে ফ্রান্সের ভূমিদাসদের অবস্থা রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়ার ভূমিদাস অপেক্ষা ভাল ছিল।[১] রুশ ও জার্মান অভিজাত শ্রেণী ছিল প্রবল পরাক্রমশালী। এই সকল দেশের রাজারা কম স্বৈরাচারী ছিলেন না। তথাপি এই সকল দেশের পুরাতনতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিপ্লব না ঘটে ফ্রান্সে এই বিপ্লব কেন দেখা দেয়, তার কারণ আলোচনা করা দরকার।

ঐতিহাসিক ফিশার বলেন যে, "অভিজাতদের বিশেষ অধিকারগুলি লোপ করতে ফরাসী রাজতন্ত্রের ব্যর্থতাই ফ্রান্সে বিপ্লবের পথ তৈরি করে" (The Revolution came because the French monarchy failed to solve the question of privilege)। ফিশারের এই মতের অর্থ হল যে, যদি রাজা ষোড়শ লুই ফরাসী সামন্তদের ওপর ভূমিকর চাপাতে পারতেন, যদি তিনি তাদের কর প্রদান থেকে অব্যাহতি ভোগ করার বিশেষ অধিকার নস্যাৎ করতে পারতেন তাহলে তাঁর অর্থসঙ্কট দূর হত, তাঁকে জাতীয় সভা ডাকতে হত না। জাতীয় সভা আহুত না হলে তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে বুর্জোয়া শ্রেণী পুরাতনতন্ত্রকে আক্রমণ করার সুযোগ পেত না। ষোড়শ লুই অভিজাতদের এই বিশেষ অধিকার দমনে ব্যর্থ হওয়ায় বিপ্লব ঘটে। দ্বিতীয়তঃ, ফিশারের অভিমতের অপর অর্থ হল যে, বুর্জোয়া শ্রেণী গোড়ায় অভিজাতদের বিশেষ অধিকারের একমাত্র বিরোধী ছিল। তারা তখন রাজকীয় স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিল না। জাতীয় সভা বসার পর যদি তৃতীয় শ্রেণীর দাবী মেনে নিয়ে, ষোড়শ লুই মাথাপিছু ভোটের ব্যবস্থা করতেন তাহলে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে অভিজাতদের আক্রোশ দেখা দিত না। বুর্জোয়া শ্রেণী আসলে চেয়েছিল, হয় অভিজাতদের সঙ্গে সমান অধিকার পেতে, নতুবা অভিজাতদের বিশেষ অধিকার লোপ করে তাদের সকলের সমান করে নীচে নামিয়ে আনতে। ফিশারের মত সমর্থন করে গুডউইন[২] বলেছেন যে, মিরাব্যুর পরামর্শ মেনে নিয়ে ষোড়শ লুই অভিজাতদের স্বতন্ত্রভাবে ভোটদানের অধিকার নসাৎ করলেই বিবাদ আপাততঃ মিটে যেত।

ফিশাবেব অভিমত

ফিশারের এই অভিমতের বেশ কয়েকটি ত্রুটি দেখা যায়। প্রথমতঃ, ডেভিড টমসন বলেছেন যে, বুর্জোয়াগণ কেবলমাত্র অভিজাতদের বিশেষ অধিকার ধ্বংস করে ক্ষান্ত হত, একথা ভাবা ভুল। বুর্জোয়াগণ দার্শনিকদের রচনার তত্ত্বগুলি আকণ্ঠ পান করে। সুতরাং তারা

১· Morse Stephens—Revolutionary Europe.

২· French Revolution.

ফিশারের মতের সমালোচনা

সামন্ত অভিজাতদের বিশেষ অধিকারের সঙ্গে রাজকীয় স্বৈরতন্ত্র এবং গীর্জার বিশেষ অধিকার, পুরাতনতন্ত্রের সকল কিছুই লোপ না করে থামত না। তারা আমূল পরিবর্তন দাবী করে। ষোড়শ লুইয়ের তা পূরণ করার ক্ষমতা ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, ডেভিড টমসন বলেন যে, সামন্তপ্রভূদের বিশেষ অধিকার ও বুরবোঁ রাজার prerogative বা তথাকথিত স্বর্গীয় অধিকার ছিল একই মুদ্রার দুই দিক। একটি লোপ করে অপরটিকে রক্ষা করা সম্ভব ছিল না। তৃতীয়তঃ, ইওরোপের অন্য দেশে সামন্তশ্রেণীর বিশেষ অধিকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ হয়নি। ফ্রান্সেই কেন তা সর্বপ্রথম হয়, ফিশার তার ব্যাখ্যা দেননি।

আসলে ফ্রান্সে ১৭৮৯ খ্রীঃ বিপ্লব ঘটার জন্যে বিশেষ কতকগুলি কারণ দেখা যায়। ফ্রান্সের বুরবোঁ রাজতন্ত্র তার পূর্বতন শক্তি ও ক্ষমতা হারায়। পঞ্চদশ লুই ছিলেন 'প্রজাপতি রাজা' (Butterfly monarch)। স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রকে সফল করতে হলে রাজাকে দক্ষতা ও পরিশ্রমী হতে হয়। নতুবা তিনি নিজ হাতে ক্ষমতা রাখতে পারেন না। পঞ্চদশ লুই ছিলেন রমনীরঞ্জন, পরিশ্রমবিমুখ লোক। তাঁর আমলে প্রশাসনের দায়িত্ব দরবারের বিশিষ্ট অভিজাতদের ওপর বর্তায়। পঞ্চদশ লুই তাঁর ভ্রান্ত বৈদেশিক নীতির দ্বারা ফ্রান্সকে অষ্ট্রিয়ার উত্তরাধিকারের যুদ্ধ (১৭৪৩-৪৮ খ্রীঃ) ও সপ্তবর্ষের যুদ্ধে (১৭৫৬-৬৩ খ্রীঃ) জড়িয়ে ফেলেন। এই দুই যুদ্ধে ভুল মিত্রশক্তি নির্বাচন ও ইওরোপের যুদ্ধকে প্রাধান্য দিয়ে, তিনি ভারত ও কানাডায় ফরাসী উপনিবেশ বিস্তারের সুযোগ হারান।

ফরাসী রাজতন্ত্রের দাযিত্ব স্বৈরাচারী শাসন, দায়িত্বহীনতা

শেষের যুদ্ধে প্রাশিয়ার কাছে পরাস্ত হয়ে ফ্রান্সের সামরিক মর্যাদা বিনষ্ট হয় এবং প্রচুর লোক ও অর্থবলের ক্ষয় হয়। পঞ্চদশ লুই ফ্রান্সকে প্রশাসনিক দুর্নীতি, অর্থনৈতিক সঙ্কট ও সামরিক পরাজয়ের জালে জড়ান। প্রশাসন বিভাগের অভিজাত কর্মচারীদের ইচ্ছাই আইনে পরিণত হয়। সাধারণ নাগরিকদের ব্যক্তি স্বাধীনতা বিনষ্ট হয়ে লত্রে দে কেশে (Letters de Cachet) নামে একটি পরোয়ানার দ্বারা যে কোন নাগরিককে পুলিশ বিনাবিচারে গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ড দিতে পারত। লত্রে দে গ্রাস (Letters de Grace) দ্বারা আদালতে কোন ব্যক্তি অপরাধী সাব্যস্ত হলেও রাজা তাঁর বিশেষ অধিকার বলে তাকে মুক্তি দিতে পারতেন।

স্বৈর শাসনের প্রকৃতি এবং ভ্রান্ত বৈদেশিক নীতি

ফ্রান্সের বুরবোঁ রাজার স্বৈর শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর কোন বৈধ-ব্যবস্থা ছিল না। কারণ ফ্রান্সের জাতীয় সভা বা স্টেটস জেনারেলের অধিবেশন ১৬১৪ খ্রীঃ থেকে ১৭৫ বছর মুলতুবী ছিল। রাজা ষোড়শ লুই ব্যক্তিগতভাবে সচ্চরিত্র ও ভাল লোক ছিলেন। ফ্রান্সকে তিনি ভালবাসতেন। কিন্তু তিনি ছিলেন ব্যক্তিত্বহীন এবং তাঁর সুন্দরী পত্নী অষ্ট্রিয়ার রানী মারিয়া থেরেসার কন্যা, মারিয়া অ্যান্টোনিয়েটের অধীন। তিনি সঙ্কটের সময় কোন সিদ্ধান্ত নিতে অক্ষম ছিলেন। সিদ্ধান্ত গ্রহণে অক্ষমতার দরুন তাঁর আমলে বুরবোঁ রাজতন্ত্র ভয়ানক দুর্বল হয়ে পড়ে। ষোড়শ লুই যদি সংস্কার প্রবর্তনের জন্যে দৃঢ়তা দেখাতেন তাহলে তিনি সংঘর্ষের জালে জড়িয়ে পড়তেন না। সংস্কার প্রবর্তনের জন্যে দৃঢ় উদ্যোগ নিলে তিনি উদারপন্থী বুর্জোয়াদের সহায়তা পেতেন। কিন্তু এই রাজা ছিলেন দূরদর্শিতাহীন, দুর্বল, ভাল মানুষ। শাসক হিসেবে তিনি ছিলেন পুরোপুরি ব্যর্থ। জর্জ রুডের মতে, "ফ্রান্সে বিপ্লব হয় তার কারণ ছিল যে—বুরবোঁ সরকার জনসাধারণের আনুগত্য লাভের জন্যে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা, উদ্যম ও শক্তি দেখাতে পারেন নি।"

ষোড়শ লুই এর দুর্বলতা ও সংস্কার প্রবর্তনে ব্যর্থতা

ফ্রান্সে বিপ্লব শুরু হওয়ার জন্যে সামাজিক কারণগুলিও ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ফ্রান্সের

তৃতীয় শ্রেণীর ভেতর নানা উপশ্রেণী ছিল। এগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা সক্রিয়, সোচ্চার ও প্রভাবশালী ছিল বুর্জোয়াশ্রেণী। এই বুর্জোয়া কথাটি Burg বা শহরের উপকণ্ঠে বার্গ বা ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল থেকে এসেছে। বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অসন্তোষ তীব্র ছিল। (বিশদ বিবরণ আগে ফ্রান্সে সামাজিক অবস্থা পৃঃ ৩ দ্রষ্টব্য)। বুর্জোযা শ্রেণীর মধ্যে অনেক জ্ঞানীগুণী বা বুদ্ধিকৌলীন্যের অধিকারী লোক এবং ধনী, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী থাকলেও জন্মকৌলিন্য না থাকায় তারা অভিজাতদের নিচে থাকতে বাধ্য হত। এজন্য তারা অভিজাতদের জন্মকৌলিন্যের অধিকারগুলিকে ভেঙে ফেলতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। তাছাড়া তাদের মধ্যে অর্থনৈতিক অসন্তোষ ছিল। কৃষকরা ছাড়া বুর্জোয়া শ্রেণীই করের ভার বইত। ব্যবসায়ীদের চুঙ্গি কর, চড়া শুল্ক আদায় দিয়ে ব্যবসা করা দুস্কর ছিল। অবাধ বাণিজ্যের দাবী ফিজিওক্র্যাটরা জানালেও সরকার তাতে কান দেযনি। বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক অসন্তোষ ছিল রাজকীয় স্বৈর শাসনের বিরুদ্ধে। সরকারের দায়িত্বশীল পদে জন্মকৌলিন্য না থাকায় বুর্জোয়াগণ এই কাজ পেত না। দার্শনিকদের রচনা পড়ে বুর্জোয়াবা জ্ঞানদীপ্তি ও যুক্তিবাদের প্রভাবে পুরাতনতন্ত্রের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে। বুর্জোয়া নেতারা আশা করেছিল যে রাজা সংস্কার প্রবর্তন করে তাদের অভিযোগগুলি বিশেষতঃ বৈষম্যমূলক করের প্রথা প্রভৃতির প্রতিকার করবেন। কিন্তু টুর্গো ও ক্যালান্নের প্রস্তাবিত সংস্কারগুলি ব্যর্থ হলে বুর্জোয়ারা সংস্কার চালু হবে না তা বুঝতে পারে। ১৭৮৮-৮৯ খ্রীঃ পরিকাঠামোতে ফ্রান্সে কোন সংস্কার সম্ভব নয় একথা বোঝার পর বুর্জোয়া নেতারা সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। জাতীয় সভার অধিবেশন বসলে তারা পুরাতনতন্ত্রকে আক্রমণ করতে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

সামাজিক কাবণ—তৃতীয় শ্রেণীব—বুর্জোযাদেব অসন্তোষ

লেফেভার প্রভৃতি ঐতিহাসিকদের মতে বুর্জোয়া সম্প্রদায় ছিল স্বার্থপর শ্রেণী। তারা হয়ত অভিজাতদের বিশেষ অধিকার কেড়ে নিয়ে এবং রাজার কাছ থেকে তাদের শ্রেণীগত কিছু সুবিধা আদায় করে থেমে যেত। পুরাতনতন্ত্রের অবশিষ্ট অন্যায়ের প্রতিকারে তারা এগিয়ে আসত না। কিন্তু সাঁকুলেৎ ও কৃষকশ্রেণীর স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহ, বুর্জোয়া নেতাদের ৪ঠা আগষ্টের (১৭৮৯ খ্রীঃ) ঘোষণার দ্বারা পুরাতনতন্ত্রের মৃত্যুর ঘণ্টা বাজাতে বাধ্য করে। অপর একটি মত হল যে, অভিজাত ও বাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাব মত জনবল বুর্জোয়াদের ছিল না। এজন্য ভাঙনের কাজে তারা সাঁকুলেৎ ও কৃষকদের ব্যবহার করে।

ক্ষুধার্ত সাঁকুলেৎ ও কৃষকদের ভূমিকা

ফরাসী বিপ্লবের মূল কারণ অর্থনৈতিক বলে লেফেভার, মনিয়ের, মর্স স্টিফেনস সহ বহু ঐতিহাসিক মনে করেন। জুলেস মিশেঁল বলেছেন যে ফরাসী বিপ্লবের প্রকৃত নায়ক ছিল দরিদ্র, হতভাগ্য, ক্ষুধার্ত জনতা (Hungry People)। দারিদ্র পীড়িত ক্ষুধার্ত জনতার অভ্যুত্থানই ছিল বিপ্লবের পথ রচনাকারী, মিশেলের এই তত্ত্ব এখন বেশীর ভাগ ঐতিহাসিক গ্রহণ করেন। (সাঁকুলেৎ ও কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থার বিশদ বিবরণ আগে ফ্রান্সের অর্থনৈতিক অবস্থা পৃঃ দ্রষ্টব্য)।বুর্জোয়াদের সঙ্গে সাঁকুলেৎ ও কৃষকরা কখনও যোগ দিত না, যদি না তাদের নিজস্ব অসন্তোষ থাকত। এই অসন্তোষ ছিল অর্থনৈতিক। সামন্ত প্রভুদের ও গীর্জার করভারে জর্জরিত কৃষক, ভূমিদাস, বর্গাচাষী বা অর্দ্ধ কৃষক, খাজনা চাষী, ভূমিহীন, ঝুপড়ীবাসী ক্ষেতমজুর দারিদ্রের কশাঘাতে ছিল জর্জরিত। তারা সামন্তপ্রথা, টাইদ, টাইলে, ভিটিংয়েমে প্রভৃতি কর থেকে অব্যাহতি চাইত। সাঁকুলেৎদের মধ্যে ছিল শ্রমিক, মোট বাহক, দিন মজুর যারা নিম্নতম মজুরী ও উচ্চ হারে খাদ্যশস্যের মূল্যের চাপে পিষ্ট হচ্ছিল। মজুরীর হার বৃদ্ধি ছিল ২২% এবং খাদ্যশস্যের মূল্য বৃদ্ধি ঘটে ৬০%। এর সঙ্গে ১৭৮৮-৮৯ খ্রীঃ পর পর দুবছরের অনাবৃষ্টি ও অজন্মার ফলে দীনদরিদ্র ভূমিহীন ও সাঁকুলেৎদের মধ্যে হাহাকার দেখা দেয়। ব্রিটিশ পর্যটক

আর্থার ইয়াং ফ্রান্সের গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের ভয়ানক দুর্দ্দশা প্রত্যক্ষ করেন। এভাবে তৃতীয় শ্রেণীর নীচের তলার মানুষের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ ও দারিদ্র বিপ্লবের বারুদের সঞ্চার করে। জাতীয় সভার অধিবেশনে বুর্জোয়া নেতারা পুরাতনতন্ত্র ও অভিজাতদের বিশেষ অধিকারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হলে এই শোষিত শ্রেণীর বঞ্চনার বিরুদ্ধে ব্যগ্র অভ্যুত্থান ঘটে।

যোড়শ লুই-এর অর্থসঙ্কট ও জাতীয়সভার অধিবেশন

তথাপি একথা সত্য যে যদি যোড়শ লুই অর্থসঙ্কটে বিপর্যস্ত না হতেন, তবে তিনি অভিজাত ও সেনাদলের সাহায্যে প্রচলিত ব্যবস্থাকে আরও কিছুকাল কায়েম রাখতে পারতেন। যোড়শ লুই-এর সরকাবের অর্থনৈতিক ধ্বস ফ্রান্সে এক গভীর অর্থনৈতিক সঙ্কটের সূচনা করে, যা রাজনৈতিক সঙ্কটে পরিণত হয়। জাতীয় ঋণের সুদের ভারে বিপর্যস্ত যোড়শ লুই ৩১৮ মিলিয়ন লিভ্র, জাতীয় ঋণের বার্ষিক সুদের টাকা ও সরকারি খরচের জন্যে মোট ব্যয় ছিল ৬২৯ মিলিয়ন লিভ্র। সরকারের আয় ছিল মোট ৫০৩ মিলিয়ন লিভ্র। এর ফলে ঘাটতি দাঁড়ায় ১২৬ মিলিয়ন লিভ্র। এই ঘাটতি মেটাতে না পেরে যোড়শ লুই অভিজাত সভার ও পার্লেমেন্ট অফ প্যারিসের কাছে সামন্ত শ্রেণীর ওপর কর ধার্য করার প্রস্তাব পেশ করেন। এই সভাগুলি এই প্রস্তাব অনুমোদন না করায়, যোড়শ লুই বাধ্য হয়ে জাতীয় সভার অধিবেশন ডাকলে বুর্জোয়া শ্রেণী বিদ্রোহ ঘোষণা করে। সুতরাং যোড়শ লুইয়ের অর্থসঙ্কট বা রাজতন্ত্রের দেউলিয়া অবস্থা ছিল বিপ্লবের প্রত্যক্ষ কারণ।

এক্ষেত্রে ফরাসী দার্শনিকরা বিপ্লব সৃষ্টিতে কি ভূমিকা নেন সে সম্পর্কে বিতর্ক আছে। (বিশদ বিবরণ আগে বিপ্লবের পশ্চাতে দার্শনিকদের অবদান দ্রষ্টব্য)। দার্শনিকদের প্রভাবেই ফরাসী বুর্জোয়া শ্রেণী "বিপ্লবী মানসিকতায়" অনুপ্রাণিত হয়। অষ্টাদশ শতকের ফরাসী দার্শনিকরা দর্শন বা যুক্তিবাদের ব্যবহারিক প্রয়োগের সূত্রপাত করেন। তাঁরা তাঁদের যুক্তিবাদকে পুরাতনতন্ত্রের প্রধান স্তম্ভগুলির উপযোগীতার পরীক্ষায় নিয়োগ করেন। এর ফলে তাঁরা স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র, বিশেষ সুবিধাভোগী ফরাসী অভিজাত, সামন্ত শোষণের অন্যায় দিকগুলি উদ্‌ঘাটন করেন। তাঁরা কর ব্যবস্থার বৈষম্য, অন্তঃশুল্ক প্রথার অযৌক্তিকতা দেখতে পান। গীর্জাকে তাঁরা সামন্ত শোষণ ও স্বৈরাচারী রাজশাসনের পৃষ্ঠপোষকতা করতে দেখেন। প্রগতি ও সংস্কারের প্রধান প্রতিবন্ধক ছিল ক্যাথলিক গীর্জা। গীর্জা নিজেই ছিল সামন্ত শোষনের অংশীদার, রক্ষণশীলতা ও কুসংস্কারের গর্ভগৃহ। ফ্রান্সে স্বাধীন চিন্তার বিকাশ, সামাজিক প্রগতি ও রাজনৈতিক সংস্কার গীর্জার বিরোধিতায় ব্যর্থ হয়। দার্শনিক হেলভিসিয়াস, মন্তেস্ক্যু, ভলতেয়ার, রুশো, দিদেরো এবং অর্থনীতিবিদ কোয়সনে ও ফিজিওক্র্যাটগণ তীব্র সমালোচনার দ্বারা পুরাতনতন্ত্রের ভিত নড়বড়ে করে দেন। এজন্যই ফ্রান্সে বিপ্লব ঘটে।

দার্শনিকদেব ভূমিকা

ফরাসী বিপ্লবের অনিবার্যতা বিচার (Whether the French Revolution was inevitable?) ঃ ঐতিহাসিক ডেভিড টমসন মন্তব্য করেছেন যে, "ইতিহাস ছক মেনে চলে না, ঐতিহাসিকেরাই ইতিহাসে ছক আবিষ্কার করেন।"[১] ফরাসী বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী ছিল কিনা এ বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিভিন্ন মত দেখা যায়। ঐতিহাসিক ডেভিড টমসন বলেছেন যে, "পরস্পর বিরোধী মনে হলেও একথা সত্য যে, ১৭৮৯ খ্রীঃ ফ্রান্সের দায়িত্বশীল লোকেরা এই বিপ্লব কাম্য মনে করত না।"[২] ডেভিড টমসনের উপরোক্ত অভিমত

ফ্রান্সের পুরাতনতন্ত্রের সহিত নতুন সমাজ ব্যবস্থার সংঘাত

১· "History knows no pattern, it is historians who discover pattern in it."—D. Thomson. P. 4.

২· "It is a paradox that no important people on force in France at 1789 wanted revolution."—D. Thomson P. 4.

মেনেও বলা যায় যে, ফ্রান্সের নেতৃস্থানীয় লোকেরা বিপ্লব না চাইলেও ফ্রান্সের পরিবর্তনহীন অচল মধ্যযুগীয় সমাজ ব্যবস্থায় দীর্ঘদিন ধরে অনুপলব্ধভাবে বিপ্লবের বারুদ জমা হচ্ছিল। সমগ্র অষ্টাদশ শতক ব্যাপী ধীরে ধীরে এক "বৈপ্লবিক পরিস্থিতি" (Revolutionary situation) গড়ে উঠছিল। অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে ফ্রান্সের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে থাকে। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা বিস্তারের ফলে ফ্রান্সের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় বা বুর্জোয়া শ্রেণী আর্থিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে এগিয়ে যাচ্ছিল। ফরাসী সমাজে এই পরিবর্তন ঘটলেও শাসক অভিজাতশ্রেণী ও রাজশক্তি তাকে স্বীকার করতে রাজী ছিল না। ফ্রান্সে মধ্যযুগীয় প্রথা অনুসারে রাজতন্ত্র ও সামন্তশক্তি সকল রাজনৈতিক ক্ষমতা ও সামাজিক প্রতিপত্তি একচেটিয়া ভোগ করতে থাকে। মধ্যযুগের বৈষম্যমূলক এই প্রথাকে উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণী আর সময়োপযোগী মনে করেনি। মধ্যবিত্ত বা বুর্জোয়া শ্রেণী, কৃষক ও শ্রমিকেরা ছিল সমাজের কার্যকরী অংশ। অভিজাতশ্রেণী ছিল ক্ষমতাভোগী অংশ। ডেভিড টমসনের মতে, সমাজের কার্যকরী অংশের সহিত ক্ষমতাভোগী শ্রেণীর বিবাদ বিপ্লবকে অনিবার্য করে। পুরাতন বোতলে তেজী নতুন মদ ভরলে বোতল ফেটে যায়, সেইরূপ ফ্রান্সের পুরাতন রাজনৈতিক এবং শাসনতান্ত্রিক ও সামাজিক কাঠামো সমাজের এই নতুন শক্তি অর্থাৎ মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে ধরে রাখতে পারেনি। ফলে ফ্রান্সে বিপ্লব অনিবার্য হয়।

ফ্রান্সের সামাজিক অবস্থা পর্যালোচনা করে ডেভিড টমসন মন্তব্য করেছেন যে, "জাতির কার্যকরী অর্থনৈতিক অংশের সহিত কার্যকরী রাজনৈতিক অংশের তীব্র ও তিক্ততাময় বৈষম্য দেখা দিয়েছিল।" অভিজাত সমাজের সঙ্গে সমান মর্যাদা এবং ক্ষমতা লাভের জন্যে মধ্যবিত্ত সমাজেব তীব্র ও অপ্রতিরোধ্য আকাঙ্খা দেখা দেয়। অপরদিকে অভিজাতরা তাদের প্রথাসিদ্ধ অধিকার ও সুবিধা না ছাড়ার পণ করে। ফলে সমাজের অভিজাতদের চিরাচরিত ক্ষমতা রক্ষা ও মধ্যবিত্তের মধ্যে ক্ষমতা লাভেব জন্যে চেষ্টা এই বিপ্লবকে অনিবার্য করে। নেপোলিয়ন এই কারণে মন্তব্য কবেন যে, "বিপ্লবের আসল কারণ ছিল অহমিকা, স্বাধীনতার দাবী ছিল একটি অজুহাত মাত্র" (It was vanity that made the Revolution : Liberty was the only excuse)। অহমিকা অর্থাৎ অভিজাতরা তাদের জন্মকৌলিন্য ও বিশেষ অধিকার ছেড়ে দিয়ে তৃতীয় শ্রেণীর সমান না হওয়ার জন্যে জেদ এবং বুর্জোয়া শ্রেণীর অভিজাতদের এই বিশেষ অধিকার চূর্ণ করে তাদের সকলের সমান করার জেদই বিপ্লবের সূচনা করে। এই কারণে অনেকে ফরাসী বিপ্লবের সামাজিক কারণকে বিশেষ গুরুত্ব দেন। তবে শুধুমাত্র অভিজাতশ্রেণীর বিশেষ অধিকার লুপ্ত হলেও বুর্জোয়া শ্রেণী সন্তুষ্ট হত না। তারা সমগ্র পুরাতনতন্ত্রের ধ্বংস কামনা কবত। রাজকীয় স্বৈরতন্ত্রও ছিল তাদের আক্রমণের লক্ষ্য। স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র ও সুবিধাভোগী অভিজাততন্ত্র ছিল শ্যাম দেশীয় যমজ ভ্রাতার ন্যায় অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। একটির ধ্বংস অপরটিকে বাদ দিয়ে আদপেই সম্ভব ছিল না। রাজা অভিজাতদের স্বার্থ এবং অভিজাতরা রাজার স্বার্থ দেখত। সুতরাং স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রকে অক্ষুন্ন রেখে কেবলমাত্র অভিজাতদের বিশেষ ক্ষমতা ধ্বংস করা সম্ভব ছিল না। এই কারণে ফরাসী বিপ্লব রাজার বিরুদ্ধেও দেখা দেয়।

ফ্রান্সের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং তার বিরুদ্ধে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অসন্তোষ 'বৈপ্লবিক পরিস্থিতি' সৃষ্টি করেছিল একথা সত্য। বুরবোঁ রাজতন্ত্র যথোচিত আইন রচনা ও সংস্কার দ্বারা মধ্যবিত্ত সমাজের অসন্তোষ এবং গ্রামীণ কৃষক ও শহুরে শ্রমিকদের অভাব-অভিযোগ দূর করে বিপ্লব এড়াতে পারতেন বলে কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন। ফিশারের মতে, "ফরাসী রাজতন্ত্র সামন্ত

আইন ও সংস্কারের দ্বারা বৈষম্য দূর করার অক্ষমতা

শ্রেণীর বিশেষ অধিকারের সমস্যা দূর করতে ব্যর্থ হওয়ায়, বিপ্লব ঘটে।"[১] যদি ফরাসী রাজতন্ত্র শক্ত হাতে রাষ্ট্রের হাল ধরে অভিজাত শ্রেণীর বিরোধিতা দমন করত এবং তাদের বিশেষ অধিকার লোপ করতে পারত তবে বিপ্লব এড়ান সম্ভব ছিল একথা ম্যাদেলাঁও (Madelin) মনে করেন।

উপরোক্ত মত যুক্তিসহ বলে গ্রহণ করা যায় না। কারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণী কেবলমাত্র অভিজাত সম্প্রদায়ের বিশেষ অধিকার লোপ করে ক্ষান্ত হত না। তারা স্বৈরাচারী বুরবোঁ সরকারের ক্ষমতাকেও সঙ্কুচিত করত। ১৭৯১ খ্রীঃ প্রথম বৈপ্লবিক সংবিধানের দ্বারা সামন্তশ্রেণীর বিশেষ অধিকার লোপ করার সঙ্গে স্বৈরতন্ত্রের অবসান ঘটান হয়। সুতরাং কেবলমাত্র সামন্তশ্রেণীর বিশেষ অধিকার লোপ করলেই বিপ্লব এড়ান যেত একথার স্বপক্ষে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ, ফ্রান্সের পুরাতনতন্ত্রে রাজা ও সামন্তশ্রেণীর স্বার্থ ছিল পরস্পরের পরিপূরক। রাজা নিজেকে সামন্তশ্রেণীর সর্বোচ্চ স্তর বলে গণ্য করতেন। সুতরাং সামন্তদের স্বার্থে আঘাত করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। নিজ শ্রেণীস্বার্থের জন্যে রাজাকে সামন্তদের পক্ষ নিতে হয়। তৃতীয়তঃ, সামন্তশ্রেণী যেরূপ বিশেষ অধিকার ভোগ করত, রাজাও সেরূপ 'স্বর্গীয় অধিকার' (Divine Right) ও স্বৈর শাসনের অধিকার ভোগ করতেন। এই দুটি ব্যবস্থা ছিল পরস্পরের স্বার্থের ওপর নির্ভরশীল। সামন্তশ্রেণীর অধিকার নাশ করলে রাজার 'স্বর্গীয় অধিকারের' ভিত্তিও নষ্ট হত। ফলে পুরাতনতন্ত্র ধ্বসে পড়ত। রাজার পক্ষে এই ঝুঁকি নেওয়া অসম্ভব ছিল। ডেভিড টমসন এজন্য মন্তব্য করেছেন যে, "সুবিধাভোগী শ্রেণীর অধিকার ও বিশেষ সুবিধাগুলি এবং রাজার শাসন করার অধিকার একই ভিত্তির ওপর স্থাপিত ছিল। এই অস্মিভূত কাঠামোর কোন অংশকে ধ্বসালে অপর অংশ এমন কি রাজতন্ত্র ধ্বসে পড়ত।"[২] চতুর্থতঃ, যদি যোড়শ লুই ফলাফল চিন্তা না করে বৈপ্লবিক চিন্তা নিয়ে পুরাতনতন্ত্র ধ্বংস করতেন তবেই বিনা রক্তপাতে, বিনা বিপ্লবে পুরাতনতন্ত্রের পরিবর্তন সম্ভবপর ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে যোড়শ লুই এরূপ দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন ও ব্যক্তিত্বপূর্ণ লোক ছিলেন না।

সামন্ত ও রাজকীয় স্বার্থের অভিন্নতা হেতু রাজার পক্ষে সামন্ত শ্রেণীর অধিকার হরণে ব্যর্থতা বিপ্লবকে অনিবার্য করে

সুতরাং ক্ষয়-ধরা জীর্ণ পুরাতনতন্ত্রের সংস্কার করে তাকে যুগোপযোগী করে তাতে সংস্কারের দ্বারা নবজীবনের প্রবাহ দান করা সম্ভব ছিল না। অগত্যা বিপ্লবের পথে পুরাতনতন্ত্রের ধ্বংস অনিবার্য ছিল। ফ্রান্সে অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে যে পরিস্থিতি দেখা দেয়, তাতে সংস্কার সম্পর্কে চেষ্টাকৃত ঔদাসীন্য বিপ্লবকে ঠেকিয়ে রাখে। কিন্তু অনির্দিষ্টকাল এই পরিস্থিতি চলতে পারত না। অবশেষে স্টেটস জেনারেলের অধিবেশন উপলক্ষ করে এই বৈপ্লবিক পরিস্থিতি ফেটে পড়ে।

সরকারি ঔদাসিন্যের দ্বারা স্থিতাবস্থা বজায় রাখা সম্ভব ছিল না

স্বনামধন্য ফরাসী ঐতিহাসিক থিয়ার্স (Thiers) এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, "বিপ্লব অনিবার্য (inevitable) ছিল"। তিনি মনে করেন যে, যদি যোড়শ লুই, মিরাব্যুর পরামর্শ গ্রহণ করে সংস্কারকে সমর্থন করতেন, তবুও বিপ্লব এড়ান সম্ভব ছিল না। মিগনেটের মতে, "তৃতীয়

১· "The Revolution came because the monarchy was unable to solve the question of privilege." Fisher—History of Europe. P. 765.

২· "The right of the king of rule existed on the same foundation as the rights and immunities of the privileged order. To attack any part of this anomalous and fossilzed structure was to attack......every other part, including the royal power itself."—D. Thomson.

শ্রেণী বিত্ত ও জ্ঞান লাভ করার অনিবার্য পরিণতি হিসেবে বিপ্লব দেখা দেয়।"[১] এই কারণে তিনি ফরাসী বিপ্লবকে, ইতিহাসের তৈরি করা "ঘটনাবলীর পরিণাম" (Most prepared event of History) বলে অভিহিত করেছেন। তাঁদের মতে, "যে বিপ্লব অদৃশ্যভাবে ইতিমধ্যে ঘটেছিল, স্টেটস জেনারেল কেবলমাত্র তাকে আইনতঃ স্বীকৃতি দেয় মাত্র।"[২]

ফরাসী বিপ্লবের জন্যে বুরবোঁ রাজবংশের দায়িত্ব (Responsibility of the Bourbon Monarchy for the Outbreak of the French Revolution) ঃ ফরাসী বিপ্লবের কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পণ্ডিত মতামত প্রকাশ করেছেন। এডমণ্ড বার্ক, যিনি ছিলেন ফরাসী বিপ্লবের সমকালীন, তিনি ফরাসী বিপ্লবকে অনিবার্য মনে করেননি। তাঁর মতে, একটি স্বার্থপর, ভাঙন-সৃষ্টিকারী সামাজিক শ্রেণী, হঠাৎ গজিয়ে ওঠা ধনবান শ্রেণীর অভিজাতদের প্রতি ঈর্ষাকাতরতা এবং দার্শনিক ও শিক্ষিত লোকদের চক্রান্ত, ফরাসী বিপ্লব সৃষ্টি করেছিল। তিনি এই বিপ্লবের জন্যে সমাজের শোষিত জনগণের অভ্যুত্থান, নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পুরাতনতন্ত্র ভাঙার জন্যে মরণপণ প্রতিজ্ঞাকে গুরুত্ব দেননি। বুরবোঁ রাজাদের দায়িত্বও তিনি দেখতে পাননি।

বার্কের অভিমত

ফরাসী বিপ্লবের অন্যান্য কারণগুলি ছিল নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। অর্থনৈতিক, সামাজিক কারণগুলির গুরুত্ব স্বীকার করে কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন ফরাসী বিপ্লব ঘটার জন্যে বুরবোঁ রাজবংশের দায়িত্ব কম ছিল না। বুরবোঁ রাজবংশের স্বৈরাচারী শাসনের ফলেই নব দার্শনিক মতবাদে উদ্দীপিত বুর্জোয়া শ্রেণী এই শাসনব্যবস্থার পতন ঘটাতে সঙ্কল্প নেয়। ইওরোপের অন্যান্য দেশে জ্ঞানদীপ্তির প্রভাবে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র আলোকিত, প্রজা-কল্যাণকামী, সংস্কারবাদী নীতি নেয়। কিন্তু বুরবোঁ রাজতন্ত্র যুগের দাবীকে অস্বীকার করে স্বৈরাচারের স্তম্ভে বসে থাকে। ফরাসী বিপ্লব ঘটার বহু আগেই বিভিন্ন পার্লামেন্টগুলি রাজকীয় স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সমালোচনার সূত্রপাত করে। ফ্রান্সের রাজারা সেদিকে দৃষ্টি দেননি।

ফরাসী বিপ্লব ঘটবার জন্যে বুরবোঁ বংশের দায়িত্ব

বুরবোঁ রাজতন্ত্র বিভিন্ন প্রকার প্রশাসনিক দুর্নীতির জন্যে দায়ী ছিল। বিনা বিচারে গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ড, লেটারস ডি কেসের দ্বারা বিনা বিচারে আটক, ব্যক্তি স্বাধীনতার বিনাশ, পক্ষপাতদুষ্ট বিচার ব্যবস্থা, প্রজাদের আবেদনের প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা না করা প্রভৃতি বিভিন্নভাবে বুরবোঁ শাসনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতির শিকড় বিস্তার লাভ করে। কোন একটি গৃহ নির্মাণের জন্যে সাধারণ একটি দরখাস্ত সরকারি দপ্তরে জমা পড়লে বছরের পর বছর তা চাপা পড়ে থাকত। সরকারি কর্মচারীরা ছিল দুর্নীতিপূর্ণ; অত্যাচারী ও জনস্বার্থ বিরোধী। পঞ্চদশ বা ষোড়শ লুই কেহই প্রশাসনকে কার্যকরী ও ন্যায়-পরায়ণ করার কোন চেষ্টা করেননি।

প্রশাসনিক দুর্নীতি

পঞ্চদশ লুইয়ের আমল হতে শাসনব্যবস্থায় গলদ বৃদ্ধি পায় ও শিথিলতা বাড়ে। 'সূর্য রাজা' (Sun King) চতুর্দশ লুই ছিলেন যেমনই যোগ্য তেমনই পরিশ্রমী। তিনি মন্ত্রী ও কর্মচারীদের পরিচালনা করার ক্ষমতা রাখতেন। কিন্তু পঞ্চদশ লুই ছিলেন, ঐতিহাসিক শেভিলের ভাষায় "প্রজাপতি রাজা" (Butterfly monarch)। তিনি আমোদ-প্রমোদ, সুন্দরী রমণীদের সঙ্গেই সময়ক্ষেপ করতেন। তাঁর স্থায়ী উপপত্নী মাদাম দ্য পম্পাদ্যুর, পঞ্চদশ লুইয়ের দুর্বলতার

১. "The Revolution was the inevitable outcome of a process by which the Third Estate had risen in wealth and intelligence."—Mignet.

২. "The States General only decreed a Revolution already formed." Quoted by New Cambridge Modern History. P. 626.

পঞ্চদশ ও ষোড়শ লুইয়ের অযোগ্যতা

সুযোগে রাজকার্যে হস্তক্ষেপ করতেন। পঞ্চদশ লুই সরকারি কাজের জন্যে কোন পরিশ্রম করতেন না। এজন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত ও পরিচালনা প্রভাবশালী মন্ত্রী ও অভিজাতদের ওপর তিনি ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতেন। এইভাবে প্রশাসন ক্রমে ক্রমে রাজার ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। ঐতিহাসিক শেভিলের মতে, রাজার নাম করে অভিজাতরাই প্রশাসন চালাতে থাকে। ষোড়শ লুই ছিলেন উন্নতমনা ও সৎ স্বভাবের লোক। তিনি চেষ্টা করলে হয়ত প্রশাসনের উন্নতি ঘটাতে পারতেন। কিন্তু ষোড়শ লুইয়ের চরিত্রে কোন দৃঢ়তা ছিল না। তিনি কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে অপারগ ছিলেন। মারিয়া আন্তোনেত ছিলেন অষ্ট্রিয়ার বিখ্যাত সাম্রাজ্ঞী মারিয়া থেরেসার কন্যা। ষোড়শ লুই এতই ভাল মানুষ ছিলেন যে, তিনি অভিজাত কর্মচারী এমন কি তাঁর পত্নীকেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন না। তাঁর পত্নী ও দরবারেব প্রভাবশালী গোষ্ঠীর চাপে তিনি বিখ্যাত সংস্কারবাদী মন্ত্রী টুর্গোকে পদচ্যুত করেন, যদিও ষোড়শ লুই টুর্গোকে বিদায় দেওয়ার সময় আক্ষেপ করে বলেন যে, "কেবলমাত্র টুর্গো ও আমি ফ্রান্সকে ভালবাসি।" যদি ষোড়শ লুই দৃঢ়তা দেখাতেন তবে বিপর্যয় এড়ান যেত।

বুরবোঁ রাজবংশ তাঁদের অদূরদর্শী বৈদেশিক নীতির দ্বারা ফ্রান্সের বহু ক্ষতি করেন। পঞ্চদশ লুই অষ্ট্রিয়ার উত্তরাধিকারের যুদ্ধ (১৭৪০-৪৮ খ্রীঃ), সপ্তবর্ষের যুদ্ধ (১৭৫৬-৬৩ খ্রীঃ) মোট

অদূবদর্শী বৈদেশিক নীতি ও তাব ফলাফল

১৫ বছর ফ্রান্সকে যুদ্ধে লিপ্ত রাখেন। এই দুটি যুদ্ধে ফ্রান্স শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হয়। ফ্রান্সের সামরিক মর্যাদা নষ্ট হয়। রাষ্ট্রের অর্থ ও লোকবলের প্রচুর ক্ষয় ক্ষতি হয়। কোষাগার শূন্য হয়ে যায়। সর্বোপরি, পঞ্চদশ লুই ও তাঁর অভিজাত সভাসদরা ভারত ও কানাডার ইঙ্গ-ফরাসী উপনিবেশ দখলের যুদ্ধকে গৌণ স্থান দিয়ে ইওরোপের যুদ্ধকেই প্রাধান্য দেন। তার ফলে ভারত ও কানাডা হতে ফরাসীরা বহিষ্কৃত হয় ও এই দেশগুলিতে ব্রিটিশ উপনিবেশ স্থাপনের পথ প্রস্তুত হয়। সমুদ্রপথেও ফ্রান্স প্রাধান্য হারায়। বুবর্বোঁ বংশের এই বন্ধ্যা বৈদেশিক নীতির ফলে ফ্রান্সের নাগরিকরা হতাশাগ্রস্ত হয়। বিশেষভাবে ফরাসী বুর্জোয়া শ্রেণী ভারত ও আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন দ্বারা একচেটিয়া বাণিজ্য স্থাপনের যে আশা করত তা বিনষ্ট হয়। ফ্রান্সের রাজকোষ এই দুই যুদ্ধে শূন্য হলেও ষোড়শ লুই তাতে নিরস্ত হননি। তিনি ফ্রান্সকে আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধে জড়ান। এই যুদ্ধে যোগদানের ফলে ফ্রান্সের রাজকোষ একেবারে শূন্য হয়ে যায়। ষোড়শ লুই অর্থ সঙ্কটে পড়ে জাতীয় সভা বা স্টেটস জেনারেলের অধিবেশন ডাকতে বাধ্য হন। এর ফলে বিপ্লব আরম্ভ হয়।

জাতীয় সভা আহ্বানের পর তৃতীয় শ্রেণীর মুখপাত্র হিসেবে বুর্জোয়া শ্রেণী মাথা-পিছু ভোটের অধিকার দাবী করে এবং অভিজাত শ্রেণীর বিশেষ সুবিধা লোপের দাবী জানায়। কোন

ষোড়শ লুই বিপ্লব এড়াতে পারতেন কিনা

কোন ঐতিহাসিক বলেন যে, যদি ষোড়শ লুই এই সকল দাবীর বিরোধিতা না করতেন, যদি তিনি দেয়ালের লিখন পড়ে দাবীগুলিকে দৃঢ় সমর্থন করতেন তবে বিপ্লব এড়ান যেত। কারণ বুর্জোয়া শ্রেণী, অভিজাত শ্রেণীর অধিকারগুলিকেই আক্রমণ করে, রাজতন্ত্রকে তখনও তাঁদের আক্রমণের লক্ষ্য হিসেবে নেয়নি। ষোড়শ লুই তৃতীয় শ্রেণীর বিরোধিতা করায় তিনি তাঁদের আক্রমণের লক্ষ্যে পরিণত হন। মাদেলাঁর মতে, এই সময় মিরাব্যু রাজাকে অনেক বুঝাতে চেষ্টা করেন। কিন্তু কোন ফল হয়নি।

অধুনা গবেষকরা এই অভিমতকে স্বীকার করেন না। ফরাসী বিপ্লব গোটা পুরাতনতন্ত্রের আমূল পরিবর্তনের জন্যে ঘটে। কোন জোড়াতালি দেওয়া সমাধান তৎকালে গ্রহণীয় ছিল না। তাছাড়া কেবলমাত্র অভিজাত শ্রেণীর বিশেষ অধিকার লোপ করা সম্ভব ছিল না। স্বৈরাচারী

বিপ্লবের অনিবার্যতা ও রাজতন্ত্রের স্বতঃসিদ্ধ পতন

রাজতন্ত্রকে অক্ষুণ্ণ রেখে কেবলমাত্র অভিজাত শ্রেণীর বিশেষ ক্ষমতা লোপ করা সম্ভব ছিল না। কারণ স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র ও সুবিধাভোগী অভিজাততন্ত্র ছিল একই মুদ্রার দুটি দিক। রাজা ষোড়শ লুই অভিজাতদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করলে, অভিজাতরাও রাজার স্বৈর ক্ষমতা হ্রাস করার আয়োজন করে। এর ফলে অভিজাত বিপ্লব ঘটে। অভিজাতদের বক্তব্য এই ছিল যে, যদি তাদের বিশেষ সুবিধা অন্যায় হয়, তবে রাজার অন্যায় স্বৈর ক্ষমতাও কেন থাকবে? কারণ মধ্যযুগে এই দুটি ব্যবস্থা এক সঙ্গেই গড়ে ওঠে।

ষোড়শ লুইয়ের দায়িত্ব

ফরাসী বিপ্লব শুধুমাত্র অভিজাতদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয় একথা ঠিক নয়। রাজকীয় স্বৈর শাসনের বিরুদ্ধে দার্শনিক মন্তেস্ক্যু অনেক আগেই সোচ্চার হন। তিনি ক্ষমতা বিভাজনের দ্বারা রাজকীয় ক্ষমতা হ্রাস করার কথা বলেন। ফ্রান্সের পার্লেমেন্টগুলি রাজকীয় স্বৈরশাসন ও ব্যক্তি স্বাধীনতা হ্রাসের বিরুদ্ধে ধ্বনি তুলেছিল। সুতরাং বিপ্লবের সূত্রপাত হলে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের অক্ষত থাকার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। পঞ্চদশ ও ষোড়শ লুইয়ের দুর্বল ও অদূরদর্শী শাসননীতি বুরবোঁ রাজবংশ সম্পর্কে জনসাধারণকে মোহমুক্ত করে। জ্ঞানদীপ্তির যুগে দৈবাধিকার ভোগী বুরবোঁ শাসনব্যবস্থা ছিল এক বিরাট ব্যতিক্রম। এই ব্যবস্থা যুগের অনুপযোগী ছিল। তাছাড়া ষোড়শ লুইয়ের দুর্বলতা বুরবোঁ বংশের পতনকে ত্বরান্বিত করে। মোট কথা, বুরবোঁ রাজতন্ত্রের পতন বিপ্লবের যুগে ছিল স্বতঃসিদ্ধ। ষোড়শ লুইয়ের পক্ষে বিপ্লবকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। এজন্যে বলা হয় যে, বুরবোঁ রাজবংশ নিজের কবর নিজেই খুঁড়ে ফেলে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ফরাসী বিপ্লবের অগ্রগতি ঃ বিপ্লবের বিভিন্ন কারণ
(The Course of the French Revolution : Various Causes of the Revolution)

অভিজাত শ্রেণীর বিদ্রোহ (The Revolt of the Aristocracy) ঃ বিখ্যাত ফরাসী ঐতিহাসিক আলফ্রেড কোব্বান ফরাসী বিপ্লবের নায়ক রোবসপিয়ারের একটি উক্তি উদ্ধৃত করে ফরাসী বিপ্লবের শ্রেণী চরিত্র বুঝাবার চেষ্টা করেছেন। রোবসপিয়ার বলেন যে, "রাষ্ট্রে তিনটি শক্তি দেখা যায়, যথা ঃ রাজা, অভিজাত ও জনসাধারণ; জনসাধারণ হল ক্ষমতাহীন। অভিজাত বা ধনীদের দ্বারাই একমাত্র বিদ্রোহ ঘটতে পারে। ফ্রান্সের বিপ্লবে অভিজাত শ্রেণী এবং ধনী সম্প্রদায় বিপ্লবের প্রথম সূচনা করে। পরবর্তী সময়ে জনসাধারণ রঙ্গমঞ্চে আসে।"[১] রোবসপিয়ারের উপরোক্ত বিশ্লেষণের দ্বারা ফরাসী বিপ্লবের পশ্চাতে ফরাসী অভিজাত শ্রেণীর ভূমিকার কথা জানা যায়। গবেষকরা প্রমাণ করেছেন যে, ফরাসী বিপ্লবের প্রথম পাদে অভিজাত শ্রেণীই মুখ্য ভূমিকা নেয়। বিখ্যাত ঐতিহাসিক গুডউইন মন্তব্য করেছেন যে, "১৭৮৯ খ্রীঃ ফরাসী বিপ্লবের প্রত্যক্ষ কারণ কৃষকশ্রেণীর অর্থনৈতিক অসন্তোষ, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাজনৈতিক অসন্তোষের মধ্যে না খুঁজে, ফরাসী অভিজাতদের প্রতিক্রিয়াশীল উচ্চাকাঙ্খার মধ্যেই খুঁজতে হবে।"[২] প্রখ্যাত ঐতিহাসিক লেফেভার এজন্যে মন্তব্য করেছেন যে, "ফরাসী বিপ্লবের প্রথম পাদে ফরাসী অভিজাতরাই বিপ্লবের সূচনা করে এবং এই প্রচেষ্টায় তারা জয়লাভ করে" (The French Revolution was started and led to victory in its first phase by the aristocracy)।[৩]

ফরাসী বিপ্লবের সূচনা অভিজাত শ্রেণীর বিদ্রোহের দ্বারা সূচিত হয়

গোটা অষ্টাদশ শতক ধরে ফরাসী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে আমরা অভিজাত শ্রেণীর বিদ্রোহের তথ্য পাই। একথা ভাবলে ভুল হবে যে ফরাসী অভিজাতরা কেবলমাত্র বিপ্লবের প্রাক্কালে রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বজা তোলে। এই কাজে পোষাকী অভিজাত বা পার্লেমেন্টগুলির বিচারক সদস্যরাই বেশী তৎপর ছিল। অভিজাতরা দুটি প্রধান উপভাগে বিভক্ত ছিল, যথা জন্মসূত্রে অভিজাত (Noblesse) এবং পদসূত্রে অভিজাত (Nobles by Robe)। এই শেষোক্ত শ্রেণীতে ছিল বেশ কূটিল প্যাঁচালো বুদ্ধির অধিকারী, প্রতিক্রিয়াশীল লোক। ফ্রান্সে ছিল ১২টি পার্লামেন্ট[৪] (মতান্তরে ১৩টি)। এদের মুখপাত্র ছিল পার্লেমেন্ট অব প্যারিস, গোটা ফ্রান্সের $\frac{১}{৩}$ ভাগের ওপর পার্লেমেন্ট অব প্যারিসের এক্তিয়ারে ছিল। বাকীগুলি

পঞ্চদশ লুইয়ের আমলে পার্লেমেন্টগুলির বিদ্রোহের চেষ্টা

১· Quoted by Alfred Cobban—History of France.

২· "The immediate causes of the French Revolution of 1789 must be sought: not in the economic grievances of the peasants, not in the political discontents of the middle class, but in the reactionary aspirations of the French aristocracy" Goodwin—French Revolution. P.I.

৩· Lefebvre—The French Revolution. P. 97.

৪· Cobban—Vol. I. P. 65.

ছিল প্রাদেশিক পার্লেমেন্ট। পার্লেমেন্টের বিচারকরা পদগুলি বংশানুক্রমিকভাবে অধিকার করে থাকত। পার্লেমেন্টে কোন আইন নথীবদ্ধ না করা হলে সেই আইন প্রয়োগ করা যেত না। পার্লেমেন্টগুলি ছিল আসলে প্রতিক্রিয়াশীলতার খনি বিশেষ এবং অভিজাতদের স্বার্থরক্ষার জন্যে তৎপর। তারা এমন একটা ভাব দেখাত যে, স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে ফরাসী জনগণের স্বার্থেই তারা লড়াই করছে। কিন্তু আসলে তারা পুরাতনতন্ত্র, প্রতিক্রিয়াশীলতা ও অভিজাত স্বার্থকেই রক্ষা করতে তৎপর ছিল। এজন্যে ফ্রান্সে পঞ্চদশ লুই ও ষোড়শ লুই কোন সংস্কার কার্যকরী করতে পারেন নি। পার্লেমেন্টের অভিজাতদের বাধাই ছিল তার প্রধান কারণ।

পঞ্চদশ লুই-এর আমলে বিখ্যাত প্রধানমন্ত্রী মপিউ (Maupeou) এবং অর্থমন্ত্রী এ্যাবে টেরেই (Abbe Terray) পার্লেমেন্ট অব প্যারিসের ক্ষমতা ছাঁটাই করেন। বহু ম্যাজিস্ট্রেটকে নির্বাসিত করেন এবং পার্লেমেন্ট অব প্যারিসের এক্তিয়ার হ্রাস করেন। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রাদেশিক পার্লেমেন্টগুলি, অভিজাতগণ ও তাদের আশ্রিত লোকেরা, এমনকি প্যারিসের বুর্জোয়ারাও প্রতিবাদে মুখর হয়। শিক্ষিত নিম্ন বুর্জোয়ারাও পার্লেমেন্টের ক্ষমতা হ্রাসের প্রতিবাদ করে। কারণ তখনও পর্যন্ত লোকের বিশ্বাস ছিল যে, পার্লেমেন্টগুলি রাজকীয় স্বৈরাচার ও কুশাসনের বিরুদ্ধে সাংবিধানিক বাধাস্বরূপ। পঞ্চদশ লুই প্যারিসের পার্লেমেন্টের বিরুদ্ধে তাঁর এই জয়কে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখতে পারেন নি। প্যারিসের পার্লেমেন্ট তাদের সমর্থনে জনমত তৈরি করে এবং রাজার ওপর চাপ সৃষ্টি করে। শেষ পর্যন্ত পঞ্চদশ লুই প্যারিসের পার্লেমেন্টকে পুনর্বহাল করেন। তবে কতকগুলি শর্ত মেনে নেওয়ার পর, তিনি প্যারিসের ম্যাজিস্ট্রেটদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। কাজেই পঞ্চদশ লুই-এর আমল থেকেই রাজার সংস্কার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে অভিজাত বিচারসভা বা পার্লেমেন্টের প্রতিবাদী ভূমিকা দেখা যায়।

পঞ্চদশ লুই-এর সঙ্গে প্যারিসের পার্লেমেন্টের সঙ্ঘাত

ষোড়শ লুই ১৭৬৫ খ্রীঃ মাত্র ২০ বছর বয়সে সিংহাসনে বসেন। তিনি ছিলেন অনভিজ্ঞ, দুর্বলচিত্ত। তাঁর পক্ষে অভিজাতদের সামলে রাখা সম্ভবপর হয় নি। ষোড়শ লুই নিদারুণ অর্থসঙ্কটে অসহায় হয়ে পড়ায় তাঁর দুর্বলতা প্রকটিত হয়। অর্থনৈতিক সংস্কার দ্বারা রাজকীয় অর্থসঙ্কট দূর করার জন্যে ষোড়শ লুই টুর্গো নামে এক বিজ্ঞ ব্যক্তিকে অর্থমন্ত্রীর পদে বসান। টুর্গো ছিলেন বুর্জোয়া শ্রেণীর বুদ্ধিজীবি। তিনি ফিজিওক্র্যাট অর্থনীতির অনুরাগী ছিলেন। তিনি খাদ্যশস্যের রপ্তানি ও অবাধ বিক্রির ওপর বাধা নিষেধ তুলে দেন। দুর্ভাগ্যক্রমে ১৭৭৪ খ্রীঃ অজন্মার ফলে ১৭৭৫ খ্রীঃ খাদ্য সরবরাহে ঘাটতি দেখা দেয় এবং খাদ্যশস্যের দাম বাড়ে। সুযোগ বুঝে পার্লেমেন্ট অব প্যারিস টুর্গো ও ষোড়শ লুইকে খাদ্য সঙ্কটের জন্যে দায়ী করে। সাঁকুলেৎরা এর ফলে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধায়। এই দাঙ্গার নাম ছিল "রুটির দাঙ্গা" (Bread Riot)। টুর্গো বলপ্রয়োগে দাঙ্গা থামান। তাঁর জনপ্রিয়তায় ভাঁটা পড়ে। অভিজাত শ্রেণী ও পার্লেমেন্ট টুর্গোর বিরুদ্ধে প্রচার চালাতে থাকে। টুর্গো কঠোর ব্যয় সঙ্কোচের পরামর্শ দেওয়ায় রাজ পরিবারের লোকেরা, স্বয়ং রাণী তাঁর বিরুদ্ধে চলে যান।

টুর্গোর সংস্কার প্রচেষ্টা

রাজস্বের আয় ও সরকারী ব্যয়ের মধ্যে ভয়ানক ঘাটতি দেখে, টুর্গো ষোড়শ লুইকে বোঝান যে Structural Reform বা কাঠামোগত মৌলিক সংস্কার ছাড়া অর্থসঙ্কট দূর করা যাবে না। এজন্যে তিনি রাজাকে ছটি প্রস্তাব দেন (Six Edicts) (১৭৭৬ খ্রীঃ)। এই ছটি প্রস্তাবের মধ্যে ছিল—(১) প্যারিস সহ রাজ্যের সর্বত্র অবাধে খাদ্যশস্য বিক্রী ও রপ্তানির ব্যবস্থা করা। তিনি আশা করেন যে, এর ফলে কৃষি উৎপাদন বাড়বে এবং খাদ্যশস্যের দাম কমবে। (২) ব্যয় সঙ্কোচের জন্যে অপ্রয়োজনীয়, কর্মহীন সরকারী পদগুলি লোপ করা, রাজ পরিবারের ব্যয় সঙ্কোচ করা। টুর্গো দেখেন যে, স্বয়ং রাণী প্রাসাদে অসংখ্য ভৃত্য বাহিনী নিয়ে সীমাহীন খরচে লিপ্ত আছেন। (৩) সরকারী

টুর্গোর ছটি সংস্কার প্রস্তাব

বেতনভূক কর্মচারীদের জীবনযাত্রার ব্যয় সঙ্কোচ করা। সরকারী অর্থের অপব্যয় বন্ধ করা। (৪) প্রাদেশিক সভাগুলিকে ঢেলে সাজিয়ে ফেলা। কর ধার্যের ব্যাপারে এই সভাগুলির অনুমোদন নেওয়া বন্ধ করা। (৫) বাণিজ্যের প্রসারের জন্যে গিল্ড বা সঙ্ঘ এবং বণিক কর্পোরেশনগুলির একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার লোপ করা। নতুন বণিকদের বাণিজ্যের অধিকার দান করা। (৬) কর্ভি প্রথা লোপ করে, যাদের হাতে জমি আছে তাদের সকলকেই একটি নির্দিষ্ট কর দিতে বাধ্য করা। এর ফলে ভূস্বামীরা কর প্রদান থেকে যে অব্যাহতি ভোগ করত এখন তা লোপ পাবে বলা হয়। কর্ভির পবিবর্তে কৃষক, জমিদাব সকলেই একটি সাধারণ কর প্রদান করতে বাধ্য থাকবে।

টুর্গোর এই ছটি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মন্ত্রীসভার অনেকে স্বয়ং রাণী, রাজভ্রাতা ও প্যারিসের পার্লেমেন্ট প্রচণ্ড প্রতিবাদ জানালে বাজা বাধ্য হয়ে টুর্গোকে পদচ্যুত করেন। আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধে যোগদানের বিরুদ্ধে টুর্গো তীব্র আপত্তি করেন। তিনি বলেন যে, এই দেউলিয়া সরকারের অপ্রয়োজনীয় যুদ্ধের বিলাসিতা সাজে না। "একটি কামানেব গোলা ছুঁড়লে দেউলিয়া ফরাসী সরকারের পতন ঘটবে"। পার্লেমেন্ট অব প্যারিস টুর্গোর বিরুদ্ধে প্রচার চালায় যে তৃতীয় শ্রেণীর ওপব কর্ভি লোপ কবে, ভূস্বামীদের কর প্রদানের প্রস্তাব দ্বারা টুর্গো অভিজাতদেব বিশেষ অধিকার লোপের চক্রান্ত করছেন। হতাশ্ব ষোড়শ লুই টুর্গোকে বিদায় দেন। এই সঙ্গে তিনি মন্তব্য করেন যে, "দেখা যাচ্ছে আমি ও টুর্গো ছাড়া দেশকে কেউ ভালবাসে না"।

টুর্গোর সংস্কাব প্রস্তাবেব বিরুদ্ধে প্যাবিসেব পার্লেমেন্টেব প্রতিবাদ

টুর্গোর পতনের পর ১৭৭৬—১৭৮১ খ্রীঃ পর্যন্ত ষোড়শ লুই নেকার নামে অর্থমন্ত্রীর সাহায্যে শাসনকার্য চালাতে থাকেন। নেকার টুর্গোর কর সংস্কার প্রস্তাবের প্রতি বিরোধিতা লক্ষ্য করে টুর্গোর সংস্কারের প্রস্তাব চাপা দিয়ে দেন। তিনি ছিলেন ব্যাঙ্ক মালিক ও মূলধনী শ্রেণীর আস্থাভাজন লোক। তিনি প্রায় ৫৩০ মিলিয়ন লিভ্র ঋণ নেন। আমেরিকার যুদ্ধের জন্যে তিনি প্রায় ৬০০ মিলিয়ন লিভ্র খরচ করেন। নেকার ৮-১০% সুদে, ৫৩০ মিলিয়ন লিভ্র ঋণ নেওয়ায় এই সুদের চাপে সরকারের ঘাটতি বাজেট আরও প্রচণ্ড ঘাটতির সম্মুখীন হয়। ১৭৭৮খ্রীঃ সরকারী ঋণের বার্ষিক সুদের মোট পরিমাণ ছিল ৯৬ মিলিয়ন লিভ্র। নেকারের আমলে ঋণ গ্রহণের ফলে সেই সুদের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩০০ মিলিয়ন লিভ্র।[১] নেকার নিজেই জানতেন যে, তিনি ফ্রান্সকে অর্থনৈতিক ধ্বংসের মুখে এনে ফেলেছেন। এই অবস্থায় সৈন্য ও নৌ বিভাগের ব্যয় সঙ্কোচের লোক দেখানো প্রস্তাব এনে, তিনি নিজের পদচ্যুতির পথ জ্ঞাতসারে তৈরি করেন। বুরবোঁ রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক তরণীকে নেকার ভালরকম ফুটো করে দিয়ে যান। হতাশাগ্রস্থ ষোড়শ লুই এই বিপদ থেকে রক্ষা পেতে ক্যালোন্নেকে অর্থমন্ত্রীর (১৭৮৩ খ্রীঃ) পদে বসান।

ক্যালোন্নের শাসনকালেই ফরাসী অভিজাত সভা ও পার্লেমেন্ট অফ প্যারিস রাজার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহে নামে। এই বিদ্রোহ ফরাসী বিপ্লবের মুখবন্ধ রূপে কাজ করে। ষোড়শ লুই-এর অর্থসঙ্কট চরম অবস্থায় পৌঁছায়। ক্যালোন্নে দেখেন যে তাঁর তৈরি বাজেটে সরকারের মোট খরচ ৬২৯ মিলিয়ন লিভ্র এবং মোট আয় ৫০৩ মিলিয়ন লিভ্র। ঘাটতি ছিল ১২৬ মিলিয়ন লিভ্র। ৬২৯ মিলিয়ন লিভ্র ব্যয়ের মধ্যে সরকারি ঋণের সুদের পরিমাণ ছিল ৩১৮ মিলিয়ন লিভ্র। ক্যালোন্নে রাজাকে বুঝান যে এক্ষেত্রে তিনি যদি সরকারি ঋণ নাকচ করেন তবে তাঁর অর্থসঙ্কট দূর হতে পারে। ষোড়শ লুই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গে রাজী ছিলেন না। এই ভয়াবহ অর্থসঙ্কট থেকে মুক্তির জন্যে ক্যালোন্নে কতকগুলি মৌলিক কর প্রস্তাব রাজার কাছে পেশ করেন। এই প্রস্তাবগুলির মধ্যে ছিল ঃ—(১) লবণ ও তামাকের ওপর কর সারা দেশে একচেটিয়া ভাবে স্থাপনের ব্যবস্থা করা।

ক্যালোন্নের কর সংস্কার প্রস্তাব

১· Cobban—Vol. I. P. 124

কারণ সকল প্রদেশে লবণ ও তামাক কর আদায় হত না। (২) জমি মালিকরা যে মাথাপিছু কর বা ক্যাপিটেশন কর দিত তা লোপ করে অভিজাত, যাজক ও সাধারণ জমি মালিক সকলের ওপর একপ্রকার কর ধার্য করা। এই প্রস্তাব দ্বারা তিনি অভিজাত ও যাজকদের ভূমিকর প্রদান থেকে অব্যাহতির অধিকার লোপ করতে চান। (৩) খাদ্যশস্যের ব্যবসার ওপর সকল প্রকার নিয়ন্ত্রণ ও বাধা নিষেধ লোপ করা। (৪) আভ্যন্তরীণ শুল্ক ও চুঙ্গি কর লোপ করা। (৫) প্রাদেশিক সভাগুলিতে তিন শ্রেণীর পার্থক্য লোপ করে সম্প্রদায় নির্বিশেষে কর ধার্য করার দায়িত্ব দেওয়া। (৬) যাজকদের গীর্জার জমির ম্যানোরিয়াল স্বত্ব বিক্রয়ের অধিকার দান করা।

ক্যালোন্নের প্রস্তাবগুলি এমন কিছু বৈপ্লবিক ছিল না। কারণ তিনি সকল জমি মালিককে সমান হারে কর দিতে বলেননি। অভিজাত ভূস্বামীরা কিছু ভূমি কর প্রদান করুক এটাই তিনি চান। ক্যালোন্নে আশঙ্কা করেন যে তাঁর প্রস্তাবগুলি অভিজাতরা সহসা মেনে নিবে না। এজন্য তিনি রাজাকে পরামর্শ দেন যে ষোড়শ লুই অভিজাত শ্রেণীর মুখপাত্রদের একটি পরিষদ ডেকে এই নতুন কর প্রস্তাব যেন অনুমোদন করিয়ে নেন। রাজা এই প্রতিনিধিদের নিজ ইচ্ছামত মনোনয়ন করবেন। লুই তাঁর মন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সভা (Council of Notables) ডাকেন (১৭৮৭ খ্রীঃ)। এই সভায় অভিজাত, উচ্চ যাজক, ইন্টেন্ডেন্ট প্রভৃতি মনোনীত হন।

অভিজাত পরিষদ আহ্বান

অভিজাত পরিষদের অধিবেশন বসলে এই সভা রাজস্বের প্রকৃত ঘাটতি আছে কিনা তাতে সন্দেহ প্রকাশ করে।[১] অর্থাৎ তারা রাজার প্রদত্ত ঘাটতির বিবরণে অবিশ্বাস দেখায় এবং বিস্তারিত হিসেব দাখিলের দাবী জানায়। এটা ছিল অভিজাতদের রাজাকে হেয় করার চেষ্টা। অর্থাভাবে ক্লিষ্ট রাজা হিসেব পেশ করলে, অভিজাত সভা সাফ জানায় যে তারা ক্যালোন্নের কর প্রস্তাবকে সংবিধান বিরোধী বলে মনে করে। কারণ এই প্রস্তাবে ভূস্বামীদের ভূমিকর দিতে, গীর্জার ম্যানোরিয়াল ক্ষমতা সঙ্কুচিত করতে চেষ্টা করা হয়েছে। কর সংস্কার প্রস্তাবের সাফল্যের সম্ভাবনা নেই দেখে, ক্যালোন্নের বিরুদ্ধে অভিজাত সভার ক্ষোভ প্রশমনের জন্যে ষোড়শ লুই মাথা নত করেন। তিনি ৮ই এপ্রিল, ১৭৮৭ খ্রীঃ ক্যালোন্নেকে পদচ্যুত করেন। লেফেভার বলেন যে, যে ক্ষেত্রে রাজা তাঁর বিশেষ অধিকার বলে ক্যালোন্নের প্রস্তাবগুলি কার্যকরী করতে পারতেন, সে ক্ষেত্রে অভিজাত সভা ডেকে তার অনুমোদন প্রার্থনা ছিল রাজার নিজের নতজানু হওয়া। ফলে অভিজাতরা রাজার দুর্বলতা দেখে সাহসী হয়। ক্যালোন্নেকে বিদায় দিয়ে ষোড়শ লুই এই সভার আত্মবিশ্বাস বাড়ান। অভিজাতদের বিদ্রোহের এটি ছিল একটি ধাপ। ক্যালোন্নের বিদায় অভিজাতদের মনোবল বাড়ায়। তারা রাজার সংস্কার প্রচেষ্টাকে ধ্বসিয়ে দিতে সঙ্কল্প নেয়।

অভিজাত পবিষদের বিদ্রোহ

পরবর্তী মন্ত্রী ব্রিয়েন বা ব্রিয়ঁ্যা ছিলেন রাণীর মনোনীত লোক। তিনি তুলোঁর আর্কবিশপ হিসেবে প্রগতিশীল চিন্তার পরিচয় দেন। তিনি অভিজাত পরিষদের কাছে রাজস্ব ঘাটতির হিসেব পেশ করেন। এই সঙ্গে তিনি জানান যে, ক্যালোন্নের প্রস্তাবগুলিকে তিনি পুরো সমর্থন করেন। এখন অভিজাত সভা এগুলি অনুমোদন করুক। এই সঙ্গে তিনি ষ্ট্যাম্প কর দাবী করেন। অভিজাত সভা রাজা ও মন্ত্রীর অনুরোধ নাকচ করে দেয়। তারা জানায় যে এই কর প্রস্তাবগুলি সংবিধান সম্মত নয়। ষোড়শ লুই অভিজাত সভা ভেঙে দেন (মে, ১৭৮৭ খ্রীঃ)।

ব্রিয়ঁার নিযুক্তি ঃ অভিজাত পরিষদেব বিলুপ্তি

ব্রিয়ঁার পরামর্শে ষোড়শ লুই, কর সম্পর্কিত প্রস্তাবগুলি নিবন্ধীকরণের জন্যে পার্লেমেন্ট অব প্যারিসের কাছে পেশ করেন। তাঁর বিশেষ অধিকার বলে করগুলি ধার্য না করে ষোড়শ লুই পার্লেমেন্টের কাছে পেশ করে মহা ভুল করেন। কারণ প্যারিসের পার্লেমেন্ট দীর্ঘকাল ধরে

১· *Vide—Goodwin.*

বুরবোঁ রাজতন্ত্রের বিরোধিতা করছিল। পঞ্চদশ লুই-এর আমলে এজন্য পার্লেমেন্টের সঙ্গে তাঁর তীব্র সঙ্ঘাত হয় (আগে বিশদ বিবরণ দ্রষ্টব্য)। পার্লেমেন্ট ছিল অভিজাত বিচার সভা। এই সভা রাজার ক্ষমতা ছাঁটাই করতে আগ্রহী ছিল। এখন অর্থসঙ্কটে হতাশ রাজা তাদের দ্বারস্থ হলে তারা সানন্দিত চিত্তে রাজার এই দুরবস্থার সুযোগ নেয়। এই সময় পার্লেমেন্ট অব প্যারিসের বিচারকদের মধ্যে ছিল ৭ জন রাজবংশীয় লোক, ২৭ জন পোষাকী অভিজাত। উপরোক্ত কর প্রস্তাব কার্যকরী হলে অভিজাতদের কর প্রদান থেকে অব্যাহতির প্রাচীন অধিকার বিনষ্ট হবে, একথা তারা বুঝাতে পারে। তাবা জানায় যে এই প্রস্তাবগুলিতে সকল শ্রেণীর ওপর কর ধার্যের ব্যবস্থা আছে। এই ব্যবস্থা চালু হলে অভিজাতদের অধিকার নষ্ট হবে। সুতরাং এই প্রস্তাব বে-আইনী। অভিজাত বিচার সভা বা প্যারিসের পার্লেমেন্ট ব্রিয়াঁকে "তীব্র ভর্ৎসনা" (Grand Remonstrance) করে এবং বে-আইনী কর প্রস্তাবের জন্যে প্রাণদণ্ডের হুমকি দেয়।

পার্লেমেন্ট অব প্যারিসেব প্রতিবাদী ভূমিকা

রাজার এই দুর্দ্দশার সুযোগে পার্লেমেন্ট তাঁর ক্ষমতা ছাঁটাই করার উদ্যোগ নেয়। যদিও আসলে তারা ছিল প্রতিক্রিয়াশীল এবং অভিজাত শ্রেণীর স্বার্থরক্ষক; এখন তারা ফরাসী দার্শনিকদের বুলিগুলির দোহাই দিয়ে, জনমতকে নিজ পক্ষে আ[illegible]র চেষ্টা করে। পার্লেমেন্ট এমন ভাব দেখায় যেন এই সভা রাজার স্বৈর[illegible]র থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করতে চায়। তারা দার্শনিকদের উচ্চারিত "Nation" বা জাতি; 'People' বা জনগণের কথা বলতে শুরু করে। পার্লেমেন্ট নিজেকে জনসাধারণের প্রতিনিধি সভার মর্যাদা দিতে চায়। তারা বলে যে, "কোন আইন অনুমোদন করা বা না কবাব অর্থ হল, এই আইনের প্রতি জাতির অনুমোদন আছে কি নেই তা জানিয়ে দেওয়া"। এমনকি রুয়েঁর (Roueu) পার্লেমেন্ট রুশোর "General Will" বা সর্বসাধারণের ইচ্ছার কথা বলতে শুরু করে। প্যারিসের পার্লেমেন্ট কতকগুলি পুস্তিকা ছাপিয়ে তত্ত্বগত প্রশ্ন তুলে রাজাকে আক্রমণ করে।

পার্লেমেন্টেব বিদ্রোহ : ভণ্ড তত্ত্ববাদ

অভিজাত পার্লেমেন্টের বিরোধিতার সম্মুখীন হয়ে যোড়শ লুই পার্লেমেন্টের রাজকীয় অধিবেশন (Lit de Justice) দ্বারা কব প্রস্তাবগুলি নিবন্ধীকরণ করেন। এর ফলে আগুনে ঘি পড়াব মতই প্যারিসের পার্লেমেন্ট ও তার সমর্থক অভিজাতরা জ্বলে ওঠে। পার্লেমেন্ট ঘোষণা করে যে এই রাজকীয় নিবন্ধীকরণ বে-আইনী। এই কর প্রস্তাব একমাত্র স্টেটস জেনারেল বা জাতীয় সভা পাশ করতে পারে। পার্লেমেন্টের সোচ্চার প্রতিবাদী সদস্য অর্লিয়েন্সের ডিউক ও অপর দুই সদস্যকে যোড়শ লুই প্যারিস থেকে নির্বাসিত করেন। পার্লেমেন্টের সদস্যরা এতে ক্ষিপ্ত হয়ে Fundamental Laws বা মৌলিক আইনবিধি (৩রা মে, ১৭৮৮ খ্রীঃ) ঘোষণা দ্বারা তৃতীয় শ্রেণীর সমর্থন লাভের চেষ্টা করে। এই মৌলিক আইনবিধিতে বলা হয় যে:—(১) রাজতন্ত্র বংশানুক্রমিক; (২) নতুন কর প্রস্তাব একমাত্র স্টেটস জেনারেল অনুমোদন করতে সক্ষম। (৩) লেটারস দ্য ক্যাশে (Letters de Cachet) দ্বারা রাজার ইচ্ছাক্রমে নাগরিকদের গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ড দান অবৈধ, (৪) বিচারকদের বরখাস্ত বা নির্বাসিত করা অবৈধ; (৫) প্রদেশগুলিতে যে সকল প্রথা প্রচলিত আছে এবং প্রাদেশিক সভাগুলি যে অধিকার ভোগ করে তা ভঙ্গ করা অবৈধ। মোট কথা, মৌলিক আইন বিধির দ্বারা রাজকীয় Prerogative বা রাজার বিশেষ ক্ষমতাকে হ্রাস করার চেষ্টা করা হয়। কোব্বানের (Cobban) মতে, এই লোক দেখানো আইনবিধি ঘোষণা করে অভিজাত পার্লেমেন্ট কার্যতঃ এক শ্রেণীর বিশেষ অধিকার রক্ষা করতে চায় এবং রাজার ক্ষমতাকে খর্ব করার চেষ্টা করে। এটি ছিল রাজার বিরুদ্ধে পার্লেমেন্টের আইনী বিদ্রোহ।

পার্লেমেন্ট অব প্যারিসের আইনী বিদ্রোহ

ক্রুদ্ধ ষোড়শ লুই এবার সামরিক দৃঢ়তা দেখান। তিনি প্যারিসের পার্লেমেন্টের দুই চীৎকারশীল সদস্যকে গ্রেপ্তার করেন। বিভিন্ন পার্লেমেন্টগুলিকে মুলতুবী করেন (৮ই মে, ১৭৮৮)। ৫৭টি নতুন আদালত স্থাপন করে পার্লেমেন্টের স্থলে এই আদালতগুলিকে কাজ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। ফৌজদারী আইন সংশোধন করে সন্দেহভাজন অপরাধীকে দৈহিক নির্যাতন নিষিদ্ধ করা হয়। তৃতীয় শ্রেণীকে সামন্ত প্রভুদের ম্যানর আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে রাজকীয় আদালতে আপীল করার অধিকার দেওয়া হয়।

পার্লেমেন্টের বিদ্রোহ দমনে রাজার চেষ্টা

ষোড়শ লুই-এর গৃহীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রাদেশিক পার্লেমেন্ট ও প্রাদেশিক সভাগুলিতে ভয়ানক প্রতিবাদ দেখা দেয়। ফ্রান্সের ক্যাথলিক গীর্জা তাতে যোগ দেয়। গীর্জার বিশপরা পার্লেমেন্টের ক্ষমতা লোপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। গীর্জার সম্পত্তির ওপর কর স্থাপনের প্রচেষ্টার নিন্দা করা হয়। বংশকৌলিন্যের অধিকারী অভিজাতরা পার্লেমেন্টের পক্ষে [illegible] দেয়। কারণ এই সকল অভিজাতদের স্বার্থরক্ষার জন্যেই প্যারিসের পার্লেমেন্ট লড়াই করছিল। প্রাদেশিক অভিজাতরা পার্লেমেন্টের ক্ষমতা হরণের প্রতিবাদে দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু করে। দ্যাফিনে, দুজোঁ, তুলোঁ প্রভৃতি অঞ্চলে বিদ্রোহ দেখা দেয়। ১৭৮৮ খ্রীঃ ২১শে জুলাই অভিজাত, উচ্চ যাজক ও বুর্জোয়া প্রতিনিধিরা ভিজিলে (Vizille—ভিজেই) নামক স্থানে সভায় মিলিত হয়ে জাতীয় সভা বা ষ্টেটস জেনারেল আহ্বানের জন্যে দাবী জানায়।

অভিজাত বিদ্রোহ : ষ্টেটস জেনারেল আহ্বানের দাবী

দেশব্যাপী প্রতিরোধের ঝড়ে ষোড়শ লুইয়ের মনোবল ভেঙে পড়ে। তিনি ১৭৮৮ খ্রীঃ সেপ্টেম্বরে প্যারিসের পার্লেমেন্টের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাদেশিক সভা ও অন্যান্য পার্লেমেন্টের অধিকার ফিরিয়ে দেন। মন্ত্রী ব্রিয়াঁ ১৭৮৯ খ্রীঃ ১লা মে ষ্টেটস জেনারেল ডাকার প্রতিশ্রুতি দেন। ব্রিয়াঁ ১৭৮৮ খ্রীঃ ২৪শে আগষ্ট পদত্যাগ করেন। তাঁর পদত্যাগের ফলে কর সংস্কারের সকল আশা বিলুপ্ত হয়। বিজয়ী প্যারিসের পার্লেমেন্ট প্রস্তাব নেয় যে, ১৬১৫ খ্রীঃ ষ্টেটস জেনারেল বা জাতীয় সভা যেমন তিনটি শ্রেণীর জন্যে আলাদা প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত ছিল, নতুন জাতীয় সভাকে সেভাবেই গঠন করতে হবে। প্রতি শ্রেণীর জন্যে সমান সংখ্যক সদস্য নির্বাচিত হবে এবং প্রতি শ্রেণীর প্রতিনিধিরা আলাদাভাবে ভোট দিবে। "This was the aristocracy's victory" (Lefebvre)। এই সিদ্ধান্ত অভিজাত শ্রেণীর চূড়ান্ত জয়ের প্রতীক ছিল। এভাবে অভিজাত বিদ্রোহ রাজকীয় ক্ষমতাকে ভেঙে ফেলে এবং সংস্কারের প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেয়। এই বিদ্রোহ ছিল ফরাসী বিপ্লবের সূচনা। অভিজাতদের এই বিজয় ছিল তাদের শেষ সঙ্গীত। এই সঙ্গে অভিজাত শ্রেণীর পতনের সূচনা হয়।

ষোড়শ লু-এর নতিস্বীকার : জাতীয় সভা আহ্বান ব্রিয়াঁর পদত্যাগ

অভিজাত শ্রেণীর এই বিদ্রোহের প্রকৃতি কি ছিল তা আলোচনা করা দরকার। অভিজাত সম্প্রদায় যুগের উপযোগী পরিবর্তন স্বীকার না করে তাদের বিশেষ অধিকারকে রক্ষার চেষ্টাই করে। তারা রাজার ক্ষমতা হ্রাস করে সেই ক্ষমতা নিজ শ্রেণীর হাতে নিতে ব্যগ্র ছিল। অভিজাতদের দাবী ছিল প্রতিক্রিয়াশীল। অভিজাতদের দাবীর মধ্যে কোন গভীর মূল পরিবর্তনের ইঙ্গিত ছিল না। অভিজাত শ্রেণী কেবলমাত্র তাদের পুরাতন শ্রেণীগত অধিকার রক্ষার চেষ্টা করে। যেহেতু অভিজাতরা পার্লেমেন্টের বিদ্রোহের দ্বারা তাদের চিরাচরিত অধিকার রক্ষা করে, সংস্কার বা পরিবর্তনে বাধা দেয়, সেহেতু এই বিদ্রোহকে 'বিপ্লব' বলা যাবে কিনা, এ বিষয়ে মতভেদ আছে। আলবেফুব মাতিয়ে এই ঘটনাকে 'অভিজাত বিদ্রোহ' (Aristocratie Rebellion) আখ্যা দিয়েছেন।

অভিজাত বিদ্রোহের প্রকৃতি ও ফলাফল

লেফেভারের মতে এই ঘটনাগুলি ছিল অভিজাত বিপ্লব (Aristocratie Revolution)। পরোক্ষ ফলের দিক থেকে লেফেভারের অভিমত সত্য মনে হয়। অভিজাত বিদ্রোহের পরোক্ষ ও অপ্রত্যাশিত ফল ছিল গভীর ও সুদূর-প্রসারী। এগ্রেট (Egret) নামক ঐতিহাসিক[১] এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। প্রথমতঃ, রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার ফলে রাজতন্ত্রের মর্যাদা ধ্বসে যায়। রাজকীয় স্বৈরতন্ত্রের ভিত্তি দুর্বল হয়। রাজার ক্ষমতার বিরুদ্ধে অভিজাতরা যে ফাটল সৃষ্টি করে তার ফলে রাজতন্ত্র শীঘ্র ভেঙে পড়ে। রাজার বিরুদ্ধে অভিজাতদের সফল বিদ্রোহ একথা প্রমাণ করে যে রাজার দৈবী অধিকার অভিজাতরা মান্য করে না। দৈবী অধিকারের বলে রাজার ক্ষমতা সীমাহীন একথাও তারা মানে না। বুর্জোয়া শ্রেণী এই শিক্ষা ভোলেনি। দ্বিতীয়তঃ, রাজার বিরুদ্ধে অভিজাতরা তাদের বিদ্রোহকে সফল করার জন্যে যেভাবে সশস্ত্র প্রতিরোধ চালায়, যেভাবে তারা গ্রামীণ ভাগচাষী ও ভূমিদাসদের ক্ষেপায় ও ব্যবহার করে; বুর্জোয়ারা শীঘ্রই অভিজাতদের বিরুদ্ধে একই পন্থা ব্যবহারের পথ খুঁজে পায়। তৃতীয়তঃ, অভিজাতরা যেভাবে রাজার বিশ্বাসভাজন মন্ত্রী ক্যালোন্নেকে বিতাড়িত করে, ব্রিয়াঁকে পদত্যাগে বাধ্য করে এই দৃষ্টান্ত বুর্জোয়ারা পরে গ্রহণ করে। সর্বশেষে, পার্লেমেন্ট জাতীয় সভা গঠনের জন্যে অভিজাতদের বিশেষভাবে অধিকার রক্ষার চেষ্টা করলে বুর্জোয়া শ্রেণী বুঝতে পারে যে অভিজাতরা তাদের বিশেষ অধিকার ছাড়বে না। করের বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা বহাল রেখে নিজ শ্রেণীর স্বার্থকে তারা অগ্রাধিকার দিতে চায়। বুর্জোয়াদের সমান অধিকার তারা দিবে না। এজন্য পার্লেমেন্ট জাতীয় সভায় আলাদাভাবে অভিজাতদের ভোটদানের অধিকার দাবী করছে। সংস্কারের পথে এই সকল বৈষম্য দূর করা ও বুর্জোয়াদের উচ্চাকাঙ্খা পূরণের কোন আশা নেই। কাজেই বিপ্লব ছাড়া এই বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা ধ্বংস করা যাবে না। জাতীয় সভা আহ্বানের ফলে বুর্জোয়া শ্রেণী বিশেষ প্রেরণা পায়। Cahiers বা অভিযোগগুলির মাধ্যমে তারা তাদের দাবীগুলি জানায়। অতি শীঘ্র বুর্জোয়া শ্রেণী জাতীয় সভার নেতৃত্ব অভিজাতদের হাত থেকে কেড়ে নেয়। এজন্য অভিজাত বিদ্রোহকে কেহ কেহ বুর্জোয়া বিপ্লবের ভূমিকা বলেন। সেতোব্রিয়াঁ এজন্য মন্তব্য করেছেন যে, "প্যাট্রিশিয়ান বা অভিজাতগণ বিপ্লবের সুত্রপাত করে, প্লিবিয়ান বা তৃতীয় শ্রেণী এই বিপ্লবকে সম্পূর্ণ করে" (The patricians began the Revolution and the plebeans completed it)।

বুর্জোয়া শ্রেণীর বিপ্লব : বুর্জোয়া বিপ্লবের গতি (The Bourgeois Revolution : The course of the Bourgeois Revolution) : আগের পরিচ্ছেদে আমরা আলোচনা করেছি যে পার্লেমেন্ট অব প্যারিসের মাধ্যমে কিভাবে অভিজাত শ্রেণী রাজকীয় কর সংস্কারের প্রস্তাবকে ব্যাহত করে। পার্লেমেন্ট রাজার দৈবাধিকার স্বত্ব ও বিশেষ অধিকারকে আক্রমণ করে। অর্থসঙ্কটে অসহায় এবং অভিজাত বিদ্রোহে ভীত ষোড়শ লুই অবশেষে ষ্টেটস জেনারেল ১লা মে, ১৭৮৯ খ্রীঃ ডাকার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

পার্লেমেন্টের অভিজাতদের বিদ্রোহের সময় বুর্জোয়া শ্রেণী নীরব দর্শক ছিল না। রাজকীয় স্বৈরতন্ত্র ও বৈষম্যমূলক কর ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাদের শ্রেণীর আপত্তি মোটেই কম ছিল না।

পার্লেমেন্টের বিদ্রোহে বুর্জোয়াদের সমর্থন

প্রদেশে ও প্যারিসে অভিজাতদের হিংসাত্মক বিদ্রোহের সঙ্গে বুর্জোয়ারাও সামিল হয়। যেভাবেই হোক রাজকীয় স্বৈরতন্ত্রকে ধ্বংস করে সাংবিধানিক শাসন প্রবর্তন তারাও চাইত। এজন্য তারা পার্লেমেন্ট অব প্যারিসকেই তাদের মুখপাত্র হিসেবে দেখে। জাতীয় সভা আহ্বানের দাবীকে বুর্জোয়া শ্রেণীর আইনজীবি ও বুদ্ধিজীবিরা দৃঢ় সমর্থন জানায়। অবশেষে ষোড়শ লুই

১· La Pre—Revolution in France.

১৭৮৮ খ্রীঃ আগষ্ট মাসের ঘোষণা দ্বারা জানান যে ১৭৮৯ খ্রীঃ ১লা মে জাতীয় সভার অধিবেশন বসবে।

রাজার বিরুদ্ধে অভিজাতরা এই জয়কে নিজ শ্রেণীর স্বার্থে ব্যবহারের জন্যে তৎপর হয়। অভিজাত বিদ্রোহের মুখপাত্র পার্লেমেন্ট অব প্যারিস ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৭৮৮ খ্রীঃ একটি প্রস্তাব নেয় যে ঃ (১) ষ্টেটস জেনারেলের সদস্যরা তিনটি আলাদা শ্রেণীর ভোটে আলাদাভাবে নির্বাচিত হবে, যেমন ১৬১৪ খ্রীঃ হয়েছিল। (২) তিন শ্রেণীর নির্বাচিত সদস্য আগের মতই আলাদা কক্ষে বসে, আলোচনা ও আলাদা ভাবে ভোট দিবে। শ্রেণী পিছু ভোট আগের মতই চালু থাকবে। (৩) কোন এক শ্রেণী কোন প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিলে সেই প্রস্তাব কার্যকরী করা যাবে না। (৪) প্রতি শ্রেণী থেকে সমান সংখ্যক সদস্য নির্বাচিত হবে এবং আসন সংখ্যা সমান থাকবে। পার্লেমেন্টের এই প্রস্তাবের মর্ম ছিল তৃতীয় শ্রেণী বিশেষতঃ বুর্জোয়াদেব আগের মতই কোণঠাসা করা। জন্মকৌলিন্য রক্ষার জন্যে অভিজাত প্রতিনিধিদের আলাদা কক্ষে বসে আলাদা ভাবে ভোটদান দ্বারা বুর্জোয়াদের দমিত করা এবং বৈষম্যমূলক কর ব্যবস্থা বহাল রাখা। বুর্জোয়ারা পার্লেমেন্ট অব প্যারিসের সেপ্টেম্বর প্রস্তাবে পার্লেমেন্টের প্রতিক্রিয়াশীল চবিত্র এবং নিজ শ্রেণীর সর্বনাশেব ইঙ্গিত দেখতে পায়। সঙ্গে সঙ্গে তারা সুবিধাভোগী অভিজাত শ্রেণীর বিশেষ সুবিধা এবং জন্মকৌলিন্যেব দাবীর বিরুদ্ধে আইনী লড়াই শুরু করে। অভিজাতরা যে পন্থায়, যেভাবে রাজার বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল তা থেকে তাবা ভাল মতই শিক্ষা নেয়। বুর্জোয়া নেতাদেব মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞ, যোগ্য ও বুদ্ধিজীবি, শিক্ষিত লোক ছিল। অভিজাতদের হাত থেকে তারা বঞ্চনা মেনে নিতে রাজী ছিল না। বুর্জোযা বিদ্রোহ শীঘ্রই অভিজাত বিদ্রোহকে পিছনে ফেলে দেয়। ফরাসী বিপ্লবের শ্রেণী সংগ্রামের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়। ম্যালেট দ্যু প্যানের ভাষায় "১৭৮৯ খ্রীঃ জানুয়ারি মাস থেকে বাজকীয় স্বৈরাচাব, সাংবিধানিক অধিকার প্রভৃতি প্রশ্ন গৌণ হয়ে যায়। তৃতীয় শ্রেণীব (তাদেব মুখপাত্র বুর্জোয়া শ্রেণী) সঙ্গে অপর দুটি শ্রেণীর সঙ্ঘাত ফ্রান্সকে কাঁপিয়ে দেয়।" (King, despotism, and constitution have become only secondary questions. Now it is war between the Third Estate and the other two orders—Mallet du Pan)।

পার্লেমেন্ট অব প্যারিসেব সেপ্টেম্বব ঘোষণাব ফলে বুর্জোযা শ্রেণীব অসন্তোষ

বুর্জোযা শ্রেণীর বুদ্ধিজীবি নেতারা দার্শনিকদের বচনা পড়ে যা শিখেছিল এসময় তৃতীয় শ্রেণীর স্বার্থে তার তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রয়োগ শুরু করে। যুক্তি, প্রমাণ, বাস্তব তথ্য দ্বারা তারা দেখায় যে অভিজাতদেব দাবী অসঙ্গত ও অন্যায্য। বুর্জোয়া নেতারা মন্ত্রীসভার কাছে অসংখ্য পুস্তিকা ও প্রচারপত্র দ্বারা অভিজাত ও যাজকদের সঙ্গে তৃতীয় শ্রেণীর সমান অধিকারের দাবী জানায়। তারা জানায় যে যাজক ও অভিজাতদের জাতীয় সভায় যতগুলি আসন থাকবে, তৃতীয় শ্রেণীকে এই দুই শ্রেণীর সম্মিলিত আসনের সমান আসন দিতে হবে। কারণ তৃতীয় শ্রেণীই হল গোটা জাতি (Nation)। এই সময় বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বপক্ষে বুদ্ধিজীবি এ্যাবে সিয়েস তাঁর পুস্তিকা Éssay on Privileges প্রকাশ করেন। বুর্জোয়া শ্রেণীর আবেগ-সর্বস্ব প্রতিবাদকে এ্যাবে সিয়েস যুক্তি ও ভাষা দিয়ে জোরালো করেন। এই যুক্তিগুলি এমন তীব্র ও অকাট্য ছিল যে, বহু অভিজাত ও যাজকও তাতে প্রভাবিত হয়ে, তৃতীয় শ্রেণীর পক্ষ নেন। এ্যাবে সিয়েস বলেন যে ; (১) যদি ফরাসী জাতি বলতে ৩টি এষ্টেট বা শ্রেণীকে ধরা হয়, তাহলে তৃতীয় শ্রেণীই হল প্রকৃত পক্ষে ফরাসী জাতি, অপর দুই শ্রেণী নয়। (২) তিনি বলেন যে, যাজকরা বৃত্তিজীবি। কেউ যাজক হয়ে জন্মায় না। বৃত্তির ওপর নির্ভর করে কোন সুবিধাভোগী শ্রেণীকে জাতির অংশ বলা চলে না। (৩) বাকি থাকে অভিজাত। এক্ষেত্রে এ্যাবে সিয়েস তাঁর অকাট্য যুক্তি ও সংখ্যাতত্ব দিযে

বুর্জোয়া শ্রেণীর সমান অধিকারের দাবী—এ্যাবে সিয়েসের যুক্তিগুলি

দেখান যে, অভিজাতরা কোন সম্পদ উৎপাদন করে না, অথবা মধ্যযুগ থেকে অধিকারের বদলে, দেশরক্ষার জন্যে তারা যে সকল কর্তব্য পালন কবত তাও করে না। সুতরাং তারা তাদের বিশেষ অধিকারের নৈতিক ভিত্তি হারিয়েছে। (৪) বাকি তৃতীয় শ্রেণীই হল আসল ফরাসী জাতি। তারাই দেশের খাদ্য, সম্পদ, শ্রম দ্বারা উৎপাদন করে এবং জনজীবনের সকল দরকারী কাজের দায়িত্ব তারাই বহন করে। এ্যাবে সিয়েস এজন্য বলেন যে, "তৃতীয় শ্রেণীই হল আসল জাতি" তারাই জাতীয় সভার মূল স্তম্ভ। এর ভিত্তিতে তৃতীয় শ্রেণীর আসন সংখ্যা যাজক ও অভিজাতদের যুগ্ম আসন সংখ্যার সমান হওয়া দরকার। জাতীয় সভায় মাথা-পিছু ভোটের অধিকারও থাকা দরকার।

ষোড়শ লুই জাতীয় সভা ডাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর, সকল শ্রেণীর প্রজাদের কাছ থেকে জাতীয় সভা সম্পর্কে তাদের প্রস্তাব ও তাদের অভিযোগগুলি জানতে (Cahiers) কেহিয়ার্স বা আবেদনপত্র পাঠাতে বলেন। এর ফলে তিনটি শ্রেণী থেকে আলাদা আলাদা কেহিয়ার্স পাঠান হয়। তৃতীয় শ্রেণীর পক্ষ থেকে যে কেহিয়ার্সগুলি আসে তা গুরুত্বপূর্ণ। এই কেহিয়ার্সগুলি রচনার সময় বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবিরাই প্রধান ভূমিকা নেয়। ঐতিহাসিক কোব্বানের মতে শহুরে অধিবাসীদের কেহিয়ার্সগুলিতে স্বচ্ছল বুর্জোয়াদের এবং গ্রামের অধিবাসীদের কেহিয়ার্সে স্বচ্ছল কৃষকদের, মোট কথা শহুরে বুর্জোয়া ও গ্রামীণ জেন্ট্রিদের (Gentrv) অভিমত প্রতিধ্বনিত হয়। শহুরে বুর্জোয়ারা জন্মকৌলিন্য লোপ করে অভিজাতদের তৃতীয় শ্রেণীর বুর্জোয়াদের সমান সামাজিক মর্যাদা দানের দাবী জানায়। গ্রামীণ কৃষকরা সামন্ত কর, সামন্ত আধিপত্যের হাত থেকে মুক্তি, অতিরিক্ত রাজকীয় কর থেকে মুক্তি চায়। এছাড়া আলুর ফসলের ক্ষতি, কাবারে নাচের ফলে যুব মানসে অপসংস্কৃতির প্রবেশের বিরুদ্ধেও অভিযোগ ছিল। কেহিয়ার্সগুলিতে জমি বণ্টনের দাবী ছিল না। ষোড়শ লুই যদি বিজ্ঞ হতেন, অথবা তাঁর কোন বিজ্ঞ মন্ত্রী থাকত, তবে তিনি এই অভিযোগগুলির প্রতিকার করে, জাতি ও সিংহাসনের মধ্যে সংহতি আনতে পারতেন। দুর্ভাগ্যক্রমে ষোড়শ লুই-এর সেই যোগ্যতা ছিল না। আপাততঃ মন্ত্রী নেকারের পরামর্শে তিনি তৃতীয় শ্রেণীকে জাতীয় সভায় অপর দুই শ্রেণীর সম্মিলিত আসনের সমান আসন দেন। এর ফলে সন্তুষ্ট বুর্জোয়াগণ বাজার জয় ঘোষণা করে।

তৃতীয় শ্রেণীব পাঠানো অভিযোগপত্র ঃ বুর্জোযাদেব দাবীগুলি ঃ জাতীয সভা আহ্বান

জাতীয় সভার অধিবেশন বসলে দেখা যায় এই সভার ১২১৪ জন মোট সদস্যদের মধ্যে যাজক ও অভিজাতদের মোট সদস্য ছিল ৫৯৩ জন এবং তৃতীয় শ্রেণীর সদস্য ছিল ৬২১ জন। তৃতীয় শ্রেণীর পক্ষে প্রধানতঃ বুর্জোযারাই নির্বাচিত হয়। তৃতীয় শ্রেণীর সদস্যদের মধ্যে আইনজীবি ছিল ২০%, চাকুরিজীবি ৫%, বণিক ও শিল্পপতি ছিল ১৩%, কৃষকের প্রতিনিধি ছিল ৭-৯%। ইতিমধ্যে বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবিদের প্রচার, যুক্তিতে প্রভাবিত হয়ে বেশ কিছু যাজক ও কিছু অভিজাত, নিজ নিজ শ্রেণী ত্যাগ করে বুর্জোয়া সদস্যদের সঙ্গে যোগ দেয়। তাদের মধ্যে অনেকে ঘটনার গতি কোন দিকে যাবে তা অনুমান করতে সক্ষম ছিল। শেষ পর্যন্ত ১৪৯ জন যাজক ও ৪৭ জন অভিজাত তৃতীয় শ্রেণীর সদস্যদের সঙ্গে যোগ দেয়। এই যাজকদের অধিকাংশ ছিল গ্রামীণ যাজক। প্রথম দুই শ্রেণীর দলবল ভাঙতে থাকে। এর ফলে সংখ্যাগত দিক থেকে তৃতীয় শ্রেণীর সদস্যরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়।

জাতীয় সভায় তৃতীয় শ্রেণীর সদস্যদের মধ্যে বুর্জোয়া আধিপত্য অভিজাত সদস্যদের ভাঙন ঃ বুর্জোয়া নেতাগণ

এই সময় তৃতীয় শ্রেণী বা বুর্জোয়া সদস্যরা জাতীয় সভায় নিজেদের সংগঠিত করার জন্যে

পেট্রিয়ট পার্টি গঠন করে। এর ভেতর "ত্রিশজনের সমিতি" (The Committee of Thirty) বেশ প্রভাবশালী ছিল। পেট্রিয়ট গোষ্ঠীকে এরাই চালিত করত। এই "ত্রিশের সমিতির". ভেতর ছিল লিয়ানকুর্ত, লাফায়েৎ, কঁদরসেৎ, ট্যালিয়্যান্ড, এ্যাবে সিয়েস প্রভৃতি। অভিজাত পক্ষ ছেড়ে তৃতীয় শ্রেণীতে যোগদানকারী মিরাব্যুও এর মধ্যে ছিলেন। এ্যাবে সিয়েস ছিলেন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিধর, আইনবিদ লেখক। মিরাব্যু ছিলেন বাগ্মী। এঁরা প্রায় সকলেই ছিলেন দক্ষ ও কৃতী লোক। এঁদের তুলনায় অভিজাতদের প্রতিনিধিরা ছিল গ্রাম্য, গোঁয়ার, যুগধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ। জাতীয় সভার অধিবেশন বসার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ সুবিধাভোগী অভিজাতদের সঙ্গে বুর্জোয়া সদস্যদের আইনী সঙ্ঘাত বেধে যায়। শ্রেণী দ্বন্দ্বের ফলে জাতীয় সভার কাজে অগ্রগতি বন্ধ হয়।

প্রথম থেকেই রাজা জাতীয় সভার অধিবেশনে প্রোটোকোল বা আদব-কায়দা ও প্রথা নিয়ে ভয়ানক কড়াকড়ি করায় তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধিরা অপমানিত বোধ করে। যেমন পোষাকের দিক থেকে তৃতীয় শ্রেণীর সদস্যদের ম্যাড়মেড়ে কালো রং-এর পোষাক পরতে বাধ্য করা হয়। অভিজাতরা পালক লাগানো জমকালো পোষাক পরতে অনুমতি পায়। এই বৈষম্যের জন্যে বুর্জোয়া সদস্যরা অপমানিত বোধ করে। ৪ঠা মে রাজার বক্তৃতা শেষ হলে তৃতীয় শ্রেণীর সদস্যরা জানিয়ে দেয় যে তারা প্রতি শ্রেণীর জন্যে নির্দিষ্ট আলাদা কক্ষে বসতে রাজী নয়। তারা মাথা পিছু ভোট দিতে দাবী জানায়। বলা বাহুল্য যে মাথা পিছু ভোট মেনে নিলে ঃ—(ক) অভিজাত ও যাজকদের গৃহীত প্রস্তাব সংখ্যাগরিষ্ঠ তৃতীয় শ্রেণীর ভোটে নাকচ হয়ে যেত। (খ) অভিজাতরা তাদের জন্মকৌলিন্য হারিয়ে তৃতীয় শ্রেণীতে পরিণত হত। বুর্জোয়া প্রতিনিধিরা এজন্য মাথা পিছু ভোট চালু করার তীব্র দাবী তোলে। তৃতীয় শ্রেণীর অনমনীয় মনোভাবের ফলে জাতীয় সভায় অচল অবস্থা দেখা দেয়। অভিজাতরা এবং রাজা মাথা পিছু ভোটের দাবী মানতে রাজী ছিলেন না।

বুর্জোয়া সদস্যদের মাথাপিছু ভোটের দাবি

প্রায় তিন সপ্তাহ অচল অবস্থার পর, কূটবুদ্ধি এ্যাবে সিয়েসের পরামর্শ অনুযায়ী, তৃতীয় শ্রেণীর সদস্যরা অপর দুই শ্রেণীকে তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে সভার কাজ চালু করতে আহ্বান জানায়। তৃতীয় শ্রেণীর সদস্যরা তাদের অন্যতম সদস্য বেইলীকে সভাপতি নির্বাচন করে ১২ই জুন থেকে তাঁকে সকল সদস্যের হাজিরা নথীবদ্ধ করতে নির্দেশ দেয়। পর পর তিন দিন অনুপস্থিত থাকলে সেই সদস্যের নাম কেটে দেওয়ার হুমকী দেওয়া হয়। এই সময় এ্যাবে সিয়েস What is Third Estate নামে এক পুস্তিকায় "অপরিহার্য মৌলিক উপাদান" তত্ত্ব (Doctrine of Constituent Power) ব্যাখ্যা করেন। এই তত্ত্বে তিনি বলেন যে, "The Third Estate is everything, the other two are nothing"। আসল জাতি হল তৃতীয় শ্রেণী। অপর দুই শ্রেণী গুরুত্বহীন। কারণ যাজকরা বৃত্তিজীবি, তারা কোন শ্রেণী হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না। অভিজাতরা তৃতীয় শ্রেণী থেকে এতকাল নিজেদের বিচ্ছিন্ন রেখে এবং বিশেষ অধিকার ভোগ করে জাতি হিসেবে দাবীর অধিকার হারিয়েছে। বুর্জোয়া প্রতিনিধিরা শুধু তত্ত্ব প্রচার না করে হাতে-কলমে তত্ত্বকে কার্যকরী করে।

তৃতীয় শ্রেণীর সংগঠন ও মৌলিক উপাদান তত্ত্ব ঘোষণা

এ্যাবে সিয়েসের পরামর্শ অনুযায়ী বেইলী ১২-১৪ই জুন সদস্যদের হাজিরা নেন। অভিজাতরা ও অধিকাংশ যাজক হাজিরা দেয়নি। অতঃপর ১৭ই জুন তৃতীয় শ্রেণীর সদস্যরা তাদের সভাকে আসল জাতীয় সভা বা ন্যাশনাল এসেম্বলী নাম দেয়। এই সভার অনুমতি ছাড়া রাজা কর আদায় করতে পারবেন না বলা হয়। রাজার পক্ষে বুর্জোয়া সদস্যদের এই বিদ্রোহী আচরণ মেনে নেওয়া কষ্টকর ছিল। সুতরাং তিনি তৃতীয় শ্রেণীর সদস্যদের তাদের সভায় ঢুকতে না দিতে সিদ্ধান্ত নেন।

টেনিস কোর্টের শপথ নামা

তৃতীয় শ্রেণীর সদস্যরা সভায় ঢুকতে না পেয়ে ডাঃ গিলোটিন নামক সদস্যের পরামর্শে (২০শে জুন, ১৭৮৯ খ্রীঃ) নিকটবর্তী রাজকীয় টেনিস কোর্টে বিখ্যাত টেনিস কোর্টের শপথনামা নেয় (Tennis Court Oath)। এই শপথে বলা হয় যে—(১) যতদিন পর্যন্ত ফ্রান্সের একটি নতুন সংবিধান গৃহীত না হবে ততদিন জাতীয় সভার অধিবেশন রদ হবে না। (২) যে স্থানে এই সভার অধিবেশন বসবে, সেই সভাকে বৈধ বলে গণ্য করা হবে। লেফেভারের মতে, "পার্লেমেন্ট অব প্যারিসের অনুকরণে তৃতীয় শ্রেণী রাজকীয় নির্দেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে"। নামে তৃতীয় শ্রেণী হলেও, এটি ছিল আসলে বুর্জোয়া শ্রেণীর বিদ্রোহ।

বুর্জোয়া সদস্যদের আইনী বিদ্রোহের ফলে ষোড়শ লুই খুবই দ্বিধাগ্রস্থ হন। অভিজাতরা এবং পার্লেমেন্ট অব প্যারিস তাদের শ্রেণীর হাত থেকে নিয়ন্ত্রণ চলে যাচ্ছে দেখে, রাজাকে বলপ্রয়োগের জন্যে কাতর আবেদন জানায়। রাজা শেষ পর্যন্ত ২৩শে জুন তিন শ্রেণীর মিলিত একটি রাজকীয় অধিবেশন ডাকেন। এই সভা বসার সময় ষোড়শ লুই পুনরায় সাবেকী আদব-কায়দা অনুযায়ী সভার কাজ শুরু করেন, যথা, যতক্ষণ না অভিজাত ও যাজকরা সভায় আসন গ্রহণ না করে, ততক্ষণ তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধিদের সভাকক্ষের বাইরে বৃষ্টির মধ্যে কালো পোষাক পরে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। এই বৈষম্যের ফলে বুর্জোয়া সদস্যদের মেজাজ বিগড়ে যায়। রাজা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারের কথা ঘোষণা করেন, যথা ঃ (১) এখন থেকে কব ধার্য করা, রাজার ঋণ গ্রহণ কবা এবং বিভিন্ন খাতে বাজেটে খরচ বরাদ্দ করার অধিকাব

২৩শে জুনেব রাজকীয় অধিবেশন ঃ বুর্জোয়া সদস্যদের রাজাব নির্দেশ অগ্রাহ্যকরণ

স্টেটস জেনারেলেব হাতে থাকবে। অর্থাৎ রাজা তাঁর অর্থনৈতিক অধিকারের ওপর জাতীয় সভার নিয়ন্ত্রণ মেনে নেন। (২) নাগরিকেব ব্যক্তি স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষা করা হবে। (৩) প্রাদেশিক এস্টেটের ক্ষমতা বাড়িয়ে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করা হবে। (৪) সংস্কারের বিশদ শর্তগুলি স্টেটস জেনারেল বিবেচনা করে স্থির করবে। (৫) ধর্ম-সংক্রান্ত সংস্কারে যাজকদের মত নিতে হবে। কিন্তু কয়েকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে রাজা কোন ঘোষণা না করায় বুর্জোয়া সদস্যরা শীতল নীরবতা দ্বাবা রাজার ঘোষণার প্রতি তাদের আপত্তি জানায়। ভোটদান মাথা-পিছু হবে অথবা শ্রেণী-পিছু হবে এ ব্যাপারে রাজা কোন ঘোষণা না করায়, সদস্যরা হতাশ হয়। রাজার কর সম্পর্কিত ঘোষণা তার ফলে মূল্যহীন হয়। কারণ তৃতীয় শ্রেণী সমান হারে কর প্রস্তাব নিলে শ্রেণী-পিছু ভোট থাকায় অভিজাতরা তা নাকচ করত। এর দ্বারা অভিজাতদের অধিকার রক্ষার পরোক্ষ ব্যবস্থা রাজা বহাল রাখেন, যা বুর্জোয়াদের কাছে সহনীয় ছিল না। রাজা সভা ত্যাগ করার পর Master of Ceremony, সভা পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত রাজকীয় মন্ত্রী তিন শ্রেণীর সদস্যদের নিজ নিজ কক্ষে চলে যেতে নির্দেশ দেন। প্রথম দুই শ্রেণী সভা কক্ষ ত্যাগ করে। কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর সদস্যরা অবিচলভাবে সভাকক্ষে বসে থাকে। বুর্জোয়া সদস্য বেইলী জবাব দেন যে, "এই তৃতীয় শ্রেণীর সভাই হল প্রকৃত জাতীয় সভা (Assembly of nation)। এই সভাকে কেহ আদেশ দিতে পারে না।" এ্যাবে সিয়েস আর এক ধাপ এগিয়ে বলেন যে, "আপনাবা আগে যা ছিলেন, এখনও তাই আছেন।" অর্থাৎ তৃতীয় শ্রেণীর সদস্যদের অনুমোদন ছাড়া রাজকীয় ঘোষণা কার্যকরী হবে না, একথা তিনি বলেন। মিরাব্যু যুদ্ধং দেহি সুরে বলেন যে, "সঙ্গীণের সাহায্যে উৎখাত করা না হলে আমরা এখান থেকে কিছুতেই নড়ব না।" এরপর যাজকদের ১৩৯ জন যাজক (কোব্বানের মতে ১৭০ জন) এবং ৪৭ জন অভিজাত (কোব্বানের মতে ৫০ জন) তৃতীয় শ্রেণীর সঙ্গে যোগ দেয়।

রাজা এর পর ভয়ানকভাবে মনোবল হারান। লেফেভারের মতে, "অতঃপর তৃতীয় শ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ভেঙে পড়তে থাকে।" ২৭শে জুন, ১৭৮৯ খ্রীঃ রাজা ষোড়শ লুই অবশেষে

মনঃস্থির করেন। তিনি অপর দুই শ্রেণীর সদস্যদের তৃতীয় শ্রেণীর সদস্যদের সঙ্গে যোগ দিয়ে এক কক্ষে বসে মাথা-পিছু ভোট দিতে আদেশ দেন। বুর্জোয়া বিপ্লবের জয় এর ফলে সূচিত হয়।

লেফেভারের মতে, বুর্জোয়া বিপ্লব হিংসাত্মক পথে চালিত হয় নি। পার্লেমেন্ট অব প্যারিসের দৃষ্টান্ত নিয়ে বুর্জোয়া আইনজীবিরা আইনী ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের (Passive Resistance) বিদ্রোহ করে। আপাতঃদৃষ্টিতে ২৭শে জুনের রাজকীয় ঘোষণা তাদের জয়লাভকে সূচিত করে। এর পর থেকে জাতীয় সভা (National Assembly) সংবিধান সভাতে (Constituent Assembly) পরিণত হয়। এই জয়ের আনন্দে ভার্সাই নগরীকে আলোক দ্বারা সাজানো হয়। কিন্তু বুর্জোয়াদের এই জয়কে রাজা স্থায়ীভাবে মেনে নিবেন তার সম্ভাবনা ছিল কম। কারণ তিনি বেতসীবৃত্তি নিয়ে আপাতঃ বুর্জোয়া বিদ্রোহের সামনে পিছু হঠেন। কিন্তু প্রদেশ থেকে সেনাদলকে রাজধানীতে চলে আসার গোপন নির্দেশ পাঠানো হয়। ভয় ও সন্ত্রাসের আবহাওয়া বুর্জোয়া বিজয়কে ম্লান করে দেয়। ভীতি ও সন্ত্রাসের দেবতা জানুষের করাল হাসি যেন ফ্রান্সের জীবনে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। এই পরিবেশে যদি ক্ষুধার্ত ও ক্ষিপ্ত সাঁকুলেৎ ও কৃষকরা বুর্জোয়া নেতাদের সমর্থনে এগিয়ে না আসত তবে বুর্জোয়ারা সফল হত না।

ষোড়শ লুই এব পশ্চাদপসরন মাথাপিছু ভোট স্বীকাব

বুর্জোয়া শ্রেণীর এই বিদ্রোহকে বিপ্লব বলা যায় কিনা তাহা বিবেচনা করা দরকার। একদিক হতে এই ঘটনাকে বিপ্লব (Revolution) বলা যায়। কারণ অভিজাত ও যাজক এই দুই সুবিধাভোগী শ্রেণীর চিরাচরিত বৈষম্যমূলক অধিকার নাশ করার কাজে বুর্জোয়া শ্রেণী হাত দেয়। যদি শ্রেণীসংগ্রামকে বিপ্লব বলা হয়, তবে বুর্জোয়া শ্রেণীর এই সংগ্রাম ছিল বিপ্লব। তাছাড়া বুর্জোয়া নেতারা যে বিপ্লবী সংবিধান রচনা করে তা সামন্ত প্রথাব মৃত্যুর ঘণ্টা বাজায়। (২) বুর্জোয়া বিপ্লব দ্বারা স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের পতন ত্বরান্বিত হয়। বুর্জোয়া শ্রেণী যে নতুন সংবিধান রচনা করে তাতে মন্তেস্ক্যুর ক্ষমতা বিভাজন নীতি অনুসরণ করে রাজার ক্ষমতা প্রভুত হ্রাস করা হয়। কিন্তু কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন যে, বুর্জোয়া শ্রেণীর জয়লাভের ফলে সমাজ ব্যবস্থায় কোন মৌলিক পরিবর্তন ঘটেনি। বুর্জোয়ারা অভিজাতদের বিশেষ অধিকার কেড়ে নিয়ে রাজনৈতিক ও শাসন ক্ষমতা নিজ শ্রেণীর হাতে ন্যস্ত করে। তারা সর্বসাধারণের ভোটাধিকার দ্বারা, গ্রামীণ কৃষক ও শ্রমিকদের ভোটাধিকার না দিয়ে সম্পত্তির ভিত্তিতে ভোটাধিকার চালু করে। ফলে সম্পত্তিভোগী বুর্জোয়া শ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষমতা করায়ত্ব করে। সুতরাং বুর্জোয়া শ্রেণীর বিপ্লবকে প্রকৃত বিপ্লব বলা যায় না। (৩) কেহ কেহ বুর্জোয়াদের এই বিদ্রোহকে "আইনতান্ত্রিক বিপ্লব" (Constitutional Revolution) বলেছেন। কারণ বুর্জোয়া শ্রেণী অভিজাতদের বিরুদ্ধে রক্তপাত ও হিংসার পথে না গিয়ে রাজনৈতিক ও আইনের চাপে জাতীয় সভায় তাদের অধিকার আদায় করে। তারা দাবী করে যে, অভিজাতদের বদলে তারাই ফ্রান্সের শাসন ক্ষমতা হাতে রাখবে। অবশ্য সাঁকুলেৎ ও জনসাধারণ শীঘ্রই বুর্জোয়াদের ক্ষমতাচ্যুত করে। বুর্জোয়া বিপ্লব শেষ পর্যন্ত জাতীয় বিপ্লবের পথ প্রস্তুত করে। ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস হল কয়েকটি শ্রেণী বিপ্লবের সমষ্টি। বুর্জোয়া বিপ্লব ছিল তার একটি ধাপ মাত্র।

বুর্জোয়া বিপ্লবের প্রকৃতি ও ফল

গণ বিপ্লব ঃ প্যারিসের বিদ্রোহ (Participation of the people in the Revolution: Revolt of Paris) ঃ জাতীয় সভায় যে সময় বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত শ্রেণী অভিজাতদের সঙ্গে সমান অধিকার লাভের সংগ্রামে ব্যস্ত ছিল, সেই সময় প্যারিস

প্যারিসের জনতার মনোভাব

নগরীর অধিবাসীদের মধ্যে এক বিপ্লবী চেতনা দেখা দেয়। প্যারিস নগরীর স্থায়ী লোকসংখ্যা ছিল প্রায় সাত লক্ষ। গ্রামাঞ্চল থেকে হাজার হাজার নিরন্ন, নগ্নকায় সাঁকুলেৎ (Sans culottes) বা সর্বহারা শ্রেণী এসে তার ওপরে প্যারিস নগরীতে জড় হয়। ১৭৮৯ খ্রীঃ ফসল হানির ফলে বহু লোক খাদ্যের সন্ধানে প্যারিসে জমায়েত হয়। এদের সঙ্গে সমাজ বিরোধী ও ফুটপাতের বাসিন্দারা যোগ দেয়। ফলে এক বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখা দেয়। খাদ্যাভাব, গ্রীষ্ম, বাসস্থানের কষ্ট লোকের স্নায়ুকে উত্তেজিত করে তুলে। ঐতিহাসিক লেফেভারের মতে, "স্টেটস জেনারেল সভার আহ্বানের ফলে এই জনতার মনে বিরাট আশাবাদের (Great Hope) উদ্ভব হয়।" তারা আশা করে যে, এবার তাদের দূরবস্থার অবসান ঘটবে। সুতরাং জাতীয় সভার বুর্জোয়ারা প্যারিসের জনতার সমর্থন পুষ্ট হয়ে রাজার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সক্ষম হয়।

এখানে একটি প্রশ্ন আসে যে, জনতার বিপ্লবী অভ্যুত্থান কেন ঘটে? বুর্জোয়া নেতারা ডাক দিলে কেনই বা সাঁকুলেৎ ও কৃষকরা সেই ডাকে সাড়া দেয়? বুর্জোয়াদের শ্রেণী স্বার্থের সঙ্গে তৃতীয় শ্রেণীর অপর লোকেদের শ্রেণী স্বার্থ মোটেই এক ছিল না। জোরেস (Jaures) বুর্জোয়াদের সম্পদ বৃদ্ধির তত্ত্বকেই বুর্জোযাদের বিদ্রোহেব কারণ বলেছেন। এ কথা সত্য যে খাদ্যদ্রব্যেব মূল্যবৃদ্ধি হলেও ফ্রান্সে ১৭৮৯ খ্রীঃ খাদ্যেব অভাবে কেহ মাবা যায়নি। গাকেসাৎ (Guxote) তত্ত্ব অনুযায়ী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য সকল ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক অগ্রগতি হচ্ছিল। তথাপি সমাজে ধন বণ্টন না হওয়ার ফলে দরিদ্রদের অবস্থাব কোন উন্নতি হয়নি, বরং অবনতি হয়েছিল। লেফেভার বলেছেন যে, জলেস মিশেল যে ক্ষুধার্ত জনতার ভযাল-হিংস্র অভ্যুত্থানের কথা বলেছেন তা মিথ্যা নয়। সমাজে কোন কোন শ্রেণীর সম্পদ বৃদ্ধি হলেও, সার্বিক সম্পদ বেড়েছিল, একথা ভেবে আমবা যেন প্রতারিত না হই। পব পর দু বছর অজন্মাব ফলে, দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি খাদ্যশস্যের দাম ৬০% বৃদ্ধি, মজুবীর হার মাত্র ২২% বৃদ্ধিব ফলে সাঁকুলেৎ ও কৃষক শ্রেণীর মধ্যে অর্থনৈতিক দুর্দ্দশার সীমা ছিল না। একেই লোকসংখ্যা প্রচুর বেড়েছিল। গ্রাম থেকে হাজার হাজার বুভুক্ষু লোক প্যারিসের রাস্তায় ভীড় করেছিল। জাতীয় সভা ডাকার ফলে তাদেব মনে আশার মুকুল ফোটে যে, এবার নিশ্চয় তাদের সুদিন আসবে।

এই আশা পূরণের স্বপ্নে মশগুল জনতার কাছে গুজব ছড়ায় যে জাতীয় সভা ভাঙাব জন্যে রাজা সেনাদল এনেছেন। প্যারিসের বাস্তায লোকে সেনাদের চলাচল দেখে সংযম হারায়। ইতিমধ্যে নেকারের পদচ্যুতির খবর ছডায়। শহরের সাঁকুলেৎদের রুটি ও মজুরীর দাবী, গ্রামের কৃষকদের জমির ক্ষুধা তাদের হিংস্র করে তোলে। পেট্রিযট দলের অন্যতম নেতা ক্যামিল ডেসমোলিন এক অগ্নিঝরা বক্তৃতা দ্বারা প্যারিসেব জনতাকে ক্ষিপ্ত করে তোলেন। উত্তেজিত জনতা গীর্জাব ঘণ্টাগুলি বাজিয়ে লোকজন জড কবে। রাজকীয় সৈন্যের প্রতিবোধের জন্যে প্যারিসের অধিবাসীরা রাস্তায় রাস্তায় ব্যাবিকেড বা অবরোধ নির্মাণ করে। প্যারিসের আশেপাশে ৪০টি শুল্ক ঘাঁটি জ্বালান হয়। সাঁ লাজার মঠ লুঠ হয়।[১] প্যাবিসে জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা বিপন্ন হয়।

উন্মত্ত জনতা প্যারিসের আগ্নেয়াস্ত্রের দোকান ও অস্ত্র তৈরির কারখানাগুলি লুঠ করে বহু অস্ত্র হস্তগত করে। ইতিমধ্যে বাস্তিল দুর্গে বহু অস্ত্র জমা আছে এই গুজব ছড়ায়। অস্ত্র দখলের জন্যে জনতা বাস্তিল দুর্গ অভিমুখে ১৪ই জুলাই ছুটে যায। সশস্ত্র জনতা বাস্তিল অধিকার করে আটক বন্দীদের মুক্তি দেয় এবং বাস্তিলের গভর্ণর দলেনি ও প্রহরীদের হত্যা করা হয়। জনতা বহু মজুত অস্ত্র দখল করে।

বাস্তিলেব পতন

বাস্তিল দুর্গের পতনের (১৪ই জুলাই, ১৭৮৯ খ্রীঃ) ফল ছিল গুরুত্বপূর্ণ। বাস্তিল ছিল

১ New Cambridge Modern History Vol. VII. P. 672

স্বৈরতন্ত্রের প্রতীক। এই দুর্গের পতন স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের পতনের সূচনা করে। জনতার রুদ্র রোষ এবং হিংস্র মনোভাব দেখে রাজা এবং তাঁর সভাসদরা আতঙ্কিত হন। জাতীয় সভাকে বলপূর্বক ভেঙে দেওয়ার ইচ্ছা রাজা ত্যাগ করেন। জাতীয় সভা স্থায়িত্ব লাভ করে। বুর্জোয়া বিপ্লব রক্ষা পায়। ষোড়শ লুই পুনরায় নেকারকে মন্ত্রী পদে নিয়োগ করেন এবং প্যারিস থেকে সেনা অপসারণ করেন। প্যারিসের সংবাদ গ্রামাঞ্চলে ছড়ালে গ্রামাঞ্চলেও বিপ্লবের আগুন জ্বলে ওঠে। গুডউইনের মতে, "বাস্তিলের পতনের ন্যায় বিপ্লবের আর কোন একক ঘটনার এত বহুমুখী ও সুদূরপ্রসারী ফল ছিল না।"[১]

বাস্তিলের পতনেব ফল

প্যারিস কমিউন প্রতিষ্ঠা : পৌর বা নগর বিপ্লব (Foundation of the Paris Commune : Municipal Revolution) : প্যারিস নগরীতে সাঁকুলেৎ (Sans culottes) বা সর্বহারা শ্রেণীর হিংস্র আচরণ, ধনী ব্যক্তিদের গৃহ লুঠপাট এবং অস্ত্রের দোকান লুঠের ঘটনা প্যারিসের বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত অধিবাসীদের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করে। সাঁকুলেৎদের জীবন ও সম্পত্তির দ্বারা তাদের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। বুর্জোয়া নেতারা বুঝতে পারে যে, বিপ্লব তাদের হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে। জনতার বিদ্রোহে রাজকীয় শাসনযন্ত্র ভেঙে পড়ে। ফলে নগরের অধিবাসীদের ধনসম্পদ রক্ষার জন্যে বিকল্প ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়।

বুর্জোয়াশ্রেণীর আতঙ্ক

প্যারিসের মধ্যবিত্ত নাগরিকরা ধন-সম্পত্তি রক্ষা ও নগর শাসনের জন্যে প্যারিসে কমিউন বা স্বায়ত্বশাসন প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয়। হোটেল দ্য ভিলে বুর্জোয়া নেতারা একটি পৌর সমিতি গঠন করে। বেইলী এই সমিতির সভাপতি হন। এই সমিতির নাম দেওয়া হয় প্যারিস কমিউন। যেহেতু রাজকীয় শাসন ভেঙে পড়েছিল, প্যারিস কমিউন এই নগরের প্রশাসনের দায়িত্ব নেয়। প্যারিস কমিউনের নির্দেশে একটি নাগরিক সেনাদল বা জাতীয় রক্ষী বাহিনী গঠিত হয়। এর নাম হয় ন্যাশন্যাল গার্ড। লাফায়েতের হাতে এই রক্ষী বাহিনীর দায়িত্ব দেওয়া হয়। এই রক্ষীদলকে প্যারিসের কমিউনের অধীনে রাখা হয়। প্যারিস কমিউন স্বায়ত্বশাসন ঘোষণা করে। বিপর্যস্ত রাজা প্যারিস কমিউন মেনে নেন। এই নাগরিক সেনা ছিল মধ্যবিত্ত বা বুর্জোয়া শ্রেণীর দ্বারা গঠিত এবং বুর্জোয়া স্বার্থের সমর্থক। এই সেনাদল থেকে ভবঘুরে ও শ্রমিকদের বাদ দেওয়া হয়। নগর শাসনের সুবিধার জন্যে প্যারিসকে ৬০টি অঞ্চলে ভাগ করা হয়। এইভাবে প্যারিস নগরী কমিউন বা স্বায়ত্বশাসন লাভ করে। কমিউন ও জাতীয় বাহিনী দ্বারা বুর্জোয়া শ্রেণী প্যারিস নগরীর জনতাকে আয়ত্বে রাখার চেষ্টা করে।

বুর্জোযাশ্রেণীব ন্যাশনাল গার্ড ও কমিউন প্রতিষ্ঠা

ফ্রান্সের অন্যান্য শহরগুলিতেও প্যারিসের অনুকরণে কমিউনের শাসন বা মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সকল শহরের বুর্জোয়া অধিবাসীরা গ্রামাঞ্চল থেকে আগত ক্ষুধার্ত ও রাগী লোকেদের আক্রমণের আশঙ্কায় ভুগছিল। আত্মরক্ষার আশায় তারা প্যারিসের বুর্জোয়াদের ন্যায় কমিউন ও রক্ষীদল গড়ে। এই কমিউনগুলি পরস্পরের সঙ্গে compact বা চুক্তি স্থাপন করে। লেফেভারের মতে, "কমিউনগুলির সমন্বয়ে ফ্রান্স একটি যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত হয়।"[২]

মফস্বলের শহরগুলিতে পৌর বিপ্লব ও রক্ষীদল গঠন

---

১. "No other single event of the Revolution had so many sided and far-reaching results as the fall of the Bastille."—Goodwin. P. 99.

২. "France became a federation of Communcs"—Lefebvre. P. 126.

কৃষকশ্রেণীর বিপ্লব : মহা আতঙ্ক (The Peasants' Revolution : The Great Fear) : সাধারণতঃ ইতিহাস গ্রন্থগুলিতে বলা হয় যে, জাতীয় সভার আহ্বানের পর প্যারিসে জনতার বিদ্রোহ ও বাস্তিলের পতনের খবর পেয়ে ফ্রান্সের গ্রামাঞ্চলে কৃষকেরা বিপ্লবের পথে পা বাড়ায়। কিন্তু এই মত তথ্যসহ নয়। জর্জ রুডের মতে, ১৭৭৫—১৭৭৬ খ্রীঃ ফ্রান্সের গ্রামাঞ্চলে বিভিন্নভাবে কৃষক বিদ্রোহ দেখা যায়। ১৭৮৮ খ্রীঃ ফসল হানির ফলে গ্রামাঞ্চলে কর্মহীন দিনমজুর, ভবঘুরেদের সংখ্যা বাড়ে। কৃষকের ঘরে খাদ্য না থাকায়, খাদ্যদ্রব্যের দাম অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। গ্রামাঞ্চলে দাঙ্গা-হাঙ্গামা চলে। এ সময় ফ্রান্সের ভেতর খাদ্য চলাচলে বাধা নিষেধ শিথিল করা হয়। এই যুগে নদী বা স্থলপথে বেশী মাল চলাচল করত। এর ফলে অশিক্ষিত জনসাধারণ মনে করে যে, ফ্রান্স থেকে খাদ্যশস্য বিদেশে রপ্তানি করা হচ্ছে। এর ফলে ফ্রান্সে খাদ্য-সংকট দেখা দিবে। সুতরাং খাদ্য বোঝাই নৌকাগুলি লোকে জোর করে আটক করে। ইতিমধ্যে প্যারিসে জনতার অভ্যুত্থান এবং বাস্তিলের পতনের খবর গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা দেখা দেয়। অভিজাত ও যাজকশ্রেণীর দ্বারা শতাব্দীর শোষণের বিরুদ্ধে কৃষকদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া জেগে ওঠে। শোষণের সকল যন্ত্রকে ভেঙে ফেলতে তারা চঞ্চল হয়। শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর একাংশ যারা গ্রামাঞ্চলে বসবাস করত তারা সামন্ত প্রথাকে ভাঙার জন্যে কৃষকদের নেতৃত্ব দেয়।[১] ইতিমধ্যে একটি গুজব ছড়ায় যে, শহর থেকে অভিজাতরা ভাড়াটে সেনা ও লুঠেরাশ্রেণী পাঠিয়ে গ্রামেব শস্যক্ষেতগুলি পুড়িয়ে দিচ্ছে। লেফেভারের মতে, "এর ফলে 'মহা আতঙ্ক' (Great Fear) দেখা দেয়।" আতঙ্ক পরিণত হয় ক্রোধে, ক্রোধ পরিণত হয় প্রতিজ্ঞায়।

কৃষক বিপ্লবের কারণ

ফ্রান্সের নর্মাণ্ডি ব্যতীত সকল স্থানে ক্রুদ্ধ কৃষকদের দ্বারা জমিদারদের শাতো (chateau) বা পল্লীভবনগুলি অগ্নিদগ্ধ হয়। বেলিফ বা নায়েবরা লাঞ্ছিত হয়। কৃষকদের নিকট জমিদারদের পাওনার কাগজপত্রগুলি পুড়িয়ে ফেলা হয়। এনক্লোজার বা জমির বেষ্টনীগুলিকে ভেঙে দেওয়া হয়। পশু চারণ ভূমি অধিকার করা হয়। গীর্জার ধর্মকর বা টাইদ এবং সামন্তদের সকল কর প্রদান রদ করা হয়। বাস্তিলের পতনের পর গ্রামাঞ্চলে বিপ্লব তীব্র আকার ধরে। জমির মালিক ও সম্পদশালী লোকেরা সবকিছু ছেড়ে প্রাণভয়ে পালায়। শহরের ব্যবসায়ী ও বুর্জোয়া শ্রেণী যারা জিনিষপত্রের দাম বৃদ্ধি করে দরিদ্র লোকেদের জীবন অতিষ্ঠ করেছিল তারা গ্রামের লোকের আক্রমণের ভয়ে আতঙ্কিত হয়। এইভাবে গ্রামাঞ্চলে কৃষক বিদ্রোহের ফলে সামন্ত প্রথা সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়ে। কৃষক বিপ্লব প্রধানতঃ সামন্তশ্রেণীর বিরুদ্ধে আত্মপ্রকাশ করলেও বুর্জোয়াশ্রেণীও এই বিপ্লবের লক্ষ্য ছিল বলা যায়। হ্যাম্পসনের (Hampson) মতে, সামন্ত শোষণ ছিল প্রত্যক্ষ, বুর্জোয়া শোষণ ছিল পরোক্ষ। বিপ্লবের মুখে অভিজাত ও ধনী বুর্জোয়াদের উভয়কেই কৃষকেরা শোষণকারী বলে গণ্য করত। লেফেভার বলেন যে, সংবিধান সভা ৪ঠা আগষ্টের ঘোষণা করার আগেই গ্রামাঞ্চলে পুরাতনতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র ভেঙ্গে যায়। শহরে কমিউনগুলি গঠিত হলে, ফ্রান্সে এক নতুন সমাজব্যবস্থা ও সভ্যতার সূচনা হয়।

কৃষক বিদ্রোহের গতি

বিপ্লবের অগ্রগতি : সামন্ত প্রথার বিলোপ (Progress of the Revolution : End of Feudalism) : গ্রামাঞ্চলে কৃষক বিদ্রোহ দেখা দিলে জাতীয় সভার বুর্জোয়া নেতারা উভয় সঙ্কটে পড়েন। জাতীয় সভার বুর্জোয়া নেতাদের বিনা নির্দেশে কৃষকরা আইন নিজ হাতে নেওয়ার ফলে বিপ্লব জাতীয় সভার নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেতে থাকে। বুর্জোয়া ও কৃষকদের শ্রেণী স্বার্থও বিপরীত ছিল।

কৃষকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনীয়তা

১· Hampson—Social History of French Revolution. P. 90.

লেফেভারের মতে, "বুর্জোয়ারা কৃষক শ্রেণীর মতিগতি ঠিক বুঝত না।"[১] কৃষকেরা জমিদারদের সম্পত্তি আক্রমণ করলে বুর্জোয়াগণ আশঙ্কা করে যে, তাদের সম্পত্তিও আক্রান্ত হতে পারে। এই অবস্থায় নিষ্ক্রিয় দর্শকের ন্যায় জাতীয় সভার কক্ষে বসে থাকা সম্ভব ছিল না। বুর্জোয়া নেতাদের এমন ক্ষমতা ছিল না যে তারা বিপ্লবী কৃষকদের দমন করতে পারে। কৃষকদের বিরুদ্ধে দমন নীতি নিলে তারা কৃষকদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হত। তার ফলে তারা রাজা ও অভিজাতদের কবলে পড়ত। কৃষকরা জাতীয় সভাকে অমান্য করেনি। তারা শুধু সামন্ত শ্রেণীর অধিকার ধ্বংস করেছিল। পুবাতনতন্ত্রের সকল স্তম্ভগুলি ইতিমধ্যে ধ্বংস হয়েছিল। তা আর ফিরিয়ে আনা, অথবা তাকে রক্ষা করা কঠিন ছিল। এতাবস্থায় কষ্কৃরা গ্রামে এবং সাঁকুলেৎরা শহরে যা করেছিল তা মেনে না নিয়ে উপায় ছিল না। সুতরাং জাতীয় সভার নেতারা উপলব্ধি করে যে, সামন্ত শোষণের বিরুদ্ধে কৃষকদের স্বার্থরক্ষার জন্যে আইন প্রণয়ন করলে কৃষকেরা শান্ত হবে।

৪ঠা আগষ্টেব অধিবেশন ঃ সামন্ত প্রথাব বিলোপ

১৭৮৯ খ্রীঃ ৪ঠা আগষ্ট সোলোমন নামে সদস্য গ্রামাঞ্চলে অরাজকতা সম্পর্কে জাতীয় সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। রোবসপিয়ের নামে এক সদস্য পরামর্শ দেন যে, উদারপন্থী অভিজাতদের উচিত স্বেচ্ছায় তাদের জমিদারী স্বত্ব পরিত্যাগ করা। সভায় যে সকল অভিজাত ও যাজক সদস্য ছিল তারা বুঝতে পারে যে, বাধ্য হযে ছেড়ে দেওয়া অপেক্ষা স্বেচ্ছায় ছেড়ে দেওয়া সম্মানজনক। সুতরাং অধিকাংশ জমিদার তাদের সামন্ত স্বত্ব ত্যাগ করে। যাজকেরাও জমিদারদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে। জাতীয় সভা ১১ই আগষ্টের একটি আদেশনামা (Decree) দ্বারা জানায় 'সামন্ত প্রথা ফ্রান্স থেকে অতঃপর লুপ্ত হল।' সামন্ত কর, ভূমিদাস প্রথা, সামন্ত প্রভুদের জন্যে কৌলিন্যের অধিকার, খেতাব, জমিদারী স্বত্ব প্রভৃতি এবং সরকারি চাকুরী লাভের একচেটিয়া অধিকাব প্রভৃতি এই ঘোষণার দ্বারা লোপ করা হয়। রাজার খাস জমি. গীর্জার জমি বাজেয়াপ্ত কবা হয়। জমিদারদের জমিদারী স্বত্ব লোপের জন্যে ক্ষতিপূরণ দানের কথা বলা হয়। (বিশদ বিবরণ পরের অধ্যায় সংবিধান সভার কার্যাবলী দ্রষ্টব্য)।

১১ই আগষ্ট ঘোষণাব ফলাফল

ঐতিহাসিক হ্যাম্পসনের মতে, জাতীয় সভার ৪ঠা আগষ্টের এই ঘোষণায় বহু ফাঁকি ছিল। এর ফলে ফ্রান্স থেকে সামন্ত প্রথা পুরোপুরি দূর হয়নি। "জাতীয় সভা অনেক দূর এগিয়ে গেলেও, যতোটা যাওয়ার দরকার ছিল তা থেকে বিরত থাকে।"[২] (১) সামন্তপ্রথার লোপ করা হলেও ভূমির ওপর জমিদারদের অন্যান্য অধিকার যথা মৎস্য চাষের অধিকার প্রভৃতি অব্যাহত থাকে। (২) সামন্ত শ্রেণী যে জমিগুলি বিক্রয় করে সে সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। (৩) জ্যেষ্ঠ পুত্রের পিতার সম্পত্তিতে অধিকার (Laws of Primogeniture) অক্ষুন্ন থাকে। (৪) অভিজাতদের বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির বদলে তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। সেনস, কুইটরেন্ট, শ্যাম্পার্ত প্রভৃতি কর লোপ করা হয়নি। সুতরাং ৪ঠা আগষ্ট ও ১১ই আগষ্টের ঘোষণার দ্বারা পুরোপুরি সামন্তপ্রথা বিলুপ্ত হয় একথা মনে করা যায় না। আপাততঃ সামন্তপ্রথার বেশীর ভাগ অংশ লোপের ফলে কৃষক শ্রেণী উপকৃত হয়। কৃষক ও ভাগচাষীরাও সামন্তকর, ধর্মকর. বেগার প্রথার হাত থেকে মুক্ত হয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। ফ্রান্সে সুবিধাভোগী সামন্তশ্রেণী লুপ্ত হওয়ার ফলে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সামন্তশ্রেণীর বিশেষ অধিকারের লোপ হলে শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা সরকারি পদে যোগদানের সুযোগ পায়।[৩] পরে ন্যাশনাল কনভেনশনের

১ Lefebvre. P. 128.

২ 'The National Asssembly went too far but it did not go far enough"—Hampson. P.

৩. Ibid.

শাসনকালে জ্যাকোবিন দল সামন্তপ্রথার অবশিষ্ট অংশগুলি ও জমিদারদের জমিতে ক্ষতিপূরণ লাভের অধিকার লোপ করে।

স্বৈরাচারী রাজশক্তির পতন ঃ ১৭৮৯ খ্রীঃ অক্টোবরের ঘটনা (Decline of Monarchy ঃ October Days, 1789) ঃ ইতিমধ্যে কয়েকটি বিষয় উপলক্ষে জাতীয় সভার সঙ্গে ষোড়শ লুইয়ের মতবিরোধ দেখা দেয়। সামন্ততন্ত্র লোপ করা সম্পর্কে ৪ঠা আগষ্টের জাতীয় সভার ঘোষণাকে ষোড়শ লুই ভেটো দ্বারা নাকচ করার চেষ্টা করেন। এমন কি তিনি মানব অধিকারের ঘোষণাপত্রে (Declaration of the Rights of Man) সম্মতি দিতেও গররাজী হন।[১] জাতীয় সভার নরমপন্থী সদস্যদের মতে, রাজার অনুমোদন ব্যতীত ৪ঠা আগষ্টের ঘোষণার কোন বৈধতা ছিল না। অপরদিকে, এ্যাবে সিয়েস বলেন যে, সংবিধান হল জনগণের ইচ্ছার অভিব্যক্তি। রাজপদ জনগণের সঙ্গে চুক্তির দ্বারা স্থাপিত হয়েছিল। রাজপদ সৃষ্টির আগেই জনগণের সম্মিলিত ইচ্ছার প্রকাশ হিসেবে সংবিধান দেখা দেয়। সুতরাং রাজা সম্মতি দিন বা না দিন তাতে কিছু আসে যায় না। কারণ যারা রাজপদ সৃষ্টি করে সেই জনগণ বা Constituent Power বা মৌলিক শক্তিই সংবিধানের উৎস। কাজেই রাজার অনুমতি ছাড়াই সংবিধান সভার ঘোষণাগুলি বৈধ। এ্যাবে সিয়েসের এই ব্যাখ্যা সংবিধান সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরা মেনে নেয়। জাতীয় সভার কিছু সদস্য মনে করেন যে, ভার্সাই শহরের অভিজাত শ্রেণী রাজাকে জাতীয় সভার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার কু-পরামর্শ দিচ্ছে। ষোড়শ লুইকে ভার্সাই শহরের রাজতন্ত্রী আবহাওয়া থেকে প্যারিস নগরীর বৈপ্লবিক আবহাওয়ায় আনলে, ষোড়শ লুই জাতীয় সভার সঙ্গে সহযোগিতা করবেন।

ষোড়শ লুইকে প্যারিসে আনার কারণ

ইতিমধ্যে প্যারিসে দারুণ খাদ্য-সঙ্কট দেখা দেয়। রুটির দাম দারুণ বেড়ে যায়। দরিদ্র লোকেরা রুটির জন্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা আরম্ভ করে। জাঁ পল ম্যারাটের সম্পাদিত— ফ্রেণ্ড অফ দি পিপল (Friend of the People) নামক পত্রিকা এই সুযোগে জনসাধারণের মধ্যে রাজার বিরুদ্ধে উত্তেজনা ছড়ায়। ফ্রান্সের সকল কিছু অব্যবস্থার জন্যে কিছু লোক ষোড়শ লুইকেই দায়ী করতে থাকে। রাস্তাঘাটে সকল লোক, এমন কি ডুলি বা পাল্কী বাহকেরাও রাজার সমালোচনা আরম্ভ করে।[২] এই পরিস্থিতিতে আত্মরক্ষার জন্যে ষোড়শ লুই ফ্ল্যাণ্ডার্স থেকে রাজভক্ত বাহিনীকে রাজধানী ভার্সাই নগরীতে আনান।

প্যারিসের বার্জবিদ্রোহ

ভার্সাইয়ে সেনা সমাবেশের খবর প্যারিসে ছড়ালে জনতা উত্তেজিত হয়। তারা আশঙ্কা করে যে, রাজা এই সেনাদলের সাহায্যে জাতীয় সভা ভেঙে দিবেন। কর্ডেলিয়ার ক্লাব নামে একটি রাজনৈতিক সংস্থা প্যারিসবাসীদের পরামর্শ দেয় যে, রাজাকে ভার্সাই থেকে প্যারিসে জোর করে ধরে আনলে খাদ্য সমস্যার সমাধান হবে। রাজা অভিজাতদের প্রভাব থেকে মুক্ত হবেন। পেট্রিয়টিক দলও এই অভিমত সমর্থন করে।

রাজাকে প্যারিসে আনয়ন

কয়েক সহস্র প্যারিসের মহিলা (৫ই অক্টোবর, ১৭৮৯ খ্রীঃ) 'রুটি চাই' চীৎকার করে ভার্সাই নগরীর দিকে যাত্রা করে। এদের সঙ্গে ২০ হাজার ন্যাশনাল গার্ড বা জাতীয় রক্ষী বাহিনী লাফায়েতের নেতৃত্বে ভার্সাইয়ে যায়। এই বিক্ষোভের সম্মুখীন হয়ে ষোড়শ লুই, জাতীয় সভার আইনগুলিতে সম্মতি দেন। এই নারী বাহিনী রাজা, রানী ও তাঁদের বালক পুত্রকে তাদের সাথে প্যারিসে আসতে বাধ্য করে। রাজা ও তাঁর পরিবারকে একটি সাধারণ ছ্যাকড়া ঘোড়ার গাড়ীতে

রাজা ও জাতীয় সভার প্যারিসে আগমন : গুরুত্ব

১· Ibid.

২· New Cambridge Modern History—P. 673.

বসিয়ে প্যারিসে আনার সময় এই বিদ্রোহীনিরা ধ্বনি দেয়, "আমরা রুটিওয়ালা, রুটি ওয়ালার স্ত্রী ও তাদের বালক পুত্রকে পেয়েছি।" ঐতিহাসিক রাইকারের মতে, এই ঘটনা ছিল "ফরাসী রাজতন্ত্রের শবযাত্রার প্রতীক" (The funeral march of the monarchy)। রাজাকে প্যারিসে আনার ফলে তিনি বিপ্লবী নেতাদের নিয়ন্ত্রণে থাকতে বাধ্য হন। জাতীয় পরিষদও প্যারিসের জনতার দ্বারা প্রভাবিত হয়। এইভাবে ফ্রান্সে বিপ্লবের প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত হয়। অক্টোবরের জনতার দ্বিতীয় অভ্যুত্থানের গুরুত্ব এই ছিল যে, এর ফলে জাতীয় সভার বুর্জোয়া নেতারা যে বিপ্লবের সূত্রপাত করে তা রক্ষা পায়। এই অভ্যুত্থানের ফলে ফরাসী বিপ্লবের গতি সাংবিধানিক সঙ্কট অতিক্রম করে এগোতে পারে। অভিজাতরা এখন কৃত-নিশ্চয় হয় যে, তাদের অধিকার ও জমিদারী আর কিছুতেই রক্ষা হবে না। এর ফলে এক শ্রেণীর অভিজাত বিপ্লবকে যে কোন প্রকারে ধ্বংসের চেষ্টা শুরু করে। নিম্ন বুর্জোয়া বা পাতি বুর্জোয়া শ্রেণী ধনী বুর্জোয়াদের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিতে চেষ্টা করে। সর্বোপরি, অক্টোবরের ঘটনায় রাজতন্ত্রের অধিকার ও মর্যাদা ধূলিসাৎ হলে, জাতীয় সভাই এখন গোটা জাতির কাছে একমাত্র বৈধ ক্ষমতার উৎস হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

অক্টোবর বিপ্লবের গুরুত্ব

তৃতীয় অধ্যায়
ফরাসী সংবিধান সভা
(The Constituent Assembly of France)

সংবিধান সভার কার্যকলাপ ঃ ব্যক্তি ও নাগরিক অধিকার ঘোষণা (Work of the Constituent Assembly : Declaration of the Rights of Man and Citizen) ঃ জাতীয় সভা (National Assembly) ফ্রান্সের জন্যে একটি সংবিধান রচনার কাজে ব্রতী হলে, এই সভা সংবিধান সভায় (Constituent Assembly) রূপান্তরিত হয়। এই সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরা ছিল বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি। শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণীর প্রতিনিধি এই সভায় সংখ্যালঘু ছিল। কোব্বানের দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, জাতীয় সভায় আইনজীবি সদস্যের সংখ্যা ছিল ২০%, চাকুরীজীবি ৫%, বণিক ও শিল্পপতি ছিল ১৩% এবং কৃষকদের প্রতিনিধি ছিল ৭—৯%। কাজেই সংবিধান সভায় বুর্জোয়া সদস্যরাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। এজন্য সংবিধান সভা প্রধানতঃ মধ্যবিত্ত বা বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে সংবিধান রচনা করে। সংবিধান সভার সভ্যরা দার্শনিকদের ভাবধারাগুলিকে সংবিধানের মাধ্যমে বাস্তব প্রয়োগ করার চেষ্টা করে। সংবিধান সভা ফ্রান্সের পুবাতনতন্ত্রকে ধ্বংস করে ফ্রান্সে একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রবর্তনের প্রচেষ্টা করে।

সংবিধান সভার লক্ষ্য

জাতীয় সভার আমলে ৪ঠা আগষ্ট, ১৭৮৯ খ্রীঃ অধিবেশনে ফ্রান্সে সামন্ততন্ত্র লোপ করা হয়েছিল। (আগে পৃঃ ৫৯ দ্রষ্টব্য)। সংবিধান সভা এই সিদ্ধান্তকে আইনগত স্বীকৃতি দেয়। সামন্ত প্রথা লোপের ফলে ভূমিদাস প্রথা, বেগার বা কর্ভি প্রথা, সামন্ত কর, ম্যানর প্রথা, মেটায়ার বা বর্গা প্রথা, টাইদ বা ধর্ম কর, অভিজাতদের বিশেষ অধিকার যথা সরকারি চাকুরীর অগ্রাধিকার, আইনের হাত থেকে অব্যাহতি, বৈষম্যমূলক কর, অন্তশুল্ক প্রথা প্রভৃতি লোপ পায়। অভিজাতদের বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির জন্যে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হয়। ৪ঠা আগষ্টের ঘোষণা কার্যতঃ ফ্রান্সে সামন্তপ্রথার মৃত্যুর ঘণ্টা বাজায়। কারণ এই ঘোষণার ফলে জমিদারদের অধিকাংশ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়। গীর্জার সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত হয়। এই জমি শেষ পর্যন্ত কৃষকদের হাতে পৌঁছে যায়।

সামন্তপ্রথার বিলোপ

৪ঠা আগষ্টের ঘোষণার কিছু কিছু আইনগত ফাঁক ছিল। হ্যাম্পাসন সোস্যাল হিষ্ট্রি অব দি ফ্রেঞ্চ রেভোল্যুশন (Social History of the French Revolution) গ্রন্থে বলেছেন যে : (১) ৪ঠা আগষ্টের ঘোষণার দ্বারা তিনটি শ্রেণীকে বিলুপ্ত করে ফ্রান্সের সকল নাগরিকদের একটিমাত্র শ্রেণীতে পরিণত করা হয়নি। ফলে তখনও কাগজে কলমে তিনটি এষ্টেট বা শ্রেণী থেকে যায়। লেফেভারও এই কথা বলেছেন। তিনি আরও বলেছেন যে, ৪ঠা আগষ্টের ঘোষণার দ্বারা জেষ্ঠপুত্রের পিতার সম্পত্তিতে অধিকার অবলুপ্ত হয়নি।

৪ঠা আগষ্টের ঘোষণার ত্রুটি

অপরদিকে ৪ঠা আগষ্টের ঘোষণায় আইনের কাছে সকলের সমান অধিকার, আইনে সকল অপরাধীদের জন্যে সমান শাস্তি, ধর্মীয় স্বাধীনতা, যাজকদের একাধিক পদ অধিকারের নিষিদ্ধকরণ, পোপকে প্রদেয় বার্ষিক কর লোপ করা হয়। ওপরে ৪ঠা আগষ্টের ঘোষণার যে ত্রুটিগুলি উল্লেখ করা হল তার অনেকটা ৭ই নভেম্বর, ১৭৮৯ এর ঘোষণার দ্বারা সংবিধান সভা

আইনের সাম্য প্রতিষ্ঠা

নভেম্বর ঘোষণা

সংশোধন করে। নভেম্বর ঘোষণার দ্বারা বলা হয় যে :—(১) অতঃপর ফ্রান্সে তিনটি এস্টেট বা শ্রেণী লুপ্ত হল। (২) ১৭৯০ খ্রীঃ ২৮শে ফ্রেব্রুয়ারির ঘোষণায় বলা হয় যে, সেনাদলে কোন বিশেষ শ্রেণীর জন্যে পদাধিকার থাকবে না। যে কোন সৈন্য যোগ্যতার পরিচয় দিলে উচ্চ পদে উন্নীত হবে। সেনাদলের ওপর অভিজাতদের আধিপত্য লোপ করা হয়। অন্যান্য সরকারি পদগুলিকেও যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগের জন্যে খুলে দেওয়া হয়। অর্থাৎ সরকারি পদগুলির গণতন্ত্রীকরণ করা হয়। ১৭৯০ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারি ঘোষণার দ্বারা গ্রামগুলিতে অভিজাতদের ম্যানেরীয় অধিকার লোপ করা হয়। প্রতি কমিউনের শাসনের জন্যে নির্বাচিত পৌর পরিষদ গঠনের ব্যবস্থা করা হয়। এইভাবে ১৭৮৯, ৪ঠা আগষ্ট থেকে ১৭৯০-এর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পুরাতনতন্ত্রের সকল শিকড়কে উপড়ে ফেলা হয়। ঐতিহাসিক রাইকার সংবিধান সভার এই কাজগুলিকে পুরাতনতন্ত্রের কবর রচনা বলেছেন।

নাগরিক অধিকার ঘোষণা

সংবিধান সভা এর পর 'ব্যক্তি ও নাগরিকের অধিকারগুলি ঘোষণা' (২৬শে আগষ্ট, ১৭৮৯ খ্রীঃ) করে (Declaration of the Rights of Man and citizen)। লেফেভারের মতে, "এই ঘোষণাপত্র ফরাসী বিপ্লবকে পৌরাণিক মর্যাদা দান করে।"[১] আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র এবং লক ও রুশোর দার্শনিক তত্ত্বের ওপর নির্ভর করে এই ঘোষণাপত্র রচিত হয়। এছাড়া এই ঘোষণাপত্রে প্রাকৃতিক আইন বা Natural Lawর প্রভাবও দেখা যায়। ঐতিহাসিক জি·এফ· টেইলারের মতে পুরাতনতন্ত্রের আমলের স্বৈর শাসন এবং অভিজাতদের জাতকৌলিন্যকে এই ঘোষণাপত্র ইতিহাসের আবর্জনা কুণ্ডে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

নাগরিক অধিকারের ঘোষণাপত্র

এই ঘোষণাপত্রে বলা হয় যে ঃ– (১) মানুষ স্বাধীনতা ও সমান অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। মানুষ এই স্বাধীনতা ভোগ করার অধিকারী। (২) মানুষ জন্ম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি প্রকৃতি দত্ত অধিকার লাভ করে। এই অধিকারগুলি হল, স্বাধীনভাবে বাঁচার, সম্পত্তি অর্জন ও ভোগ করার, জীবনের নিরাপত্তা রক্ষা ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের অধিকার। এই অধিকারগুলি কেড়ে নেওয়া যায় না। কারণ এগুলি প্রকৃতির দান। সুতরাং ইহা অলঙ্ঘনীয়, অপরিবর্তনীয়। (৩) আইনের উৎস হল জনমত। জনমতের বিরুদ্ধে আইন রচিত হতে পারে না।[২] (৪) সার্বভৌম ক্ষমতা একমাত্র জাতির মধ্যেই নিহিত আছে। রাজা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী নন। (৫) আইনের চক্ষে সকল নাগরিক সমান। কেহ কোন বিশেষ মর্যাদা বা অধিকার পেতে পারে না। সকল নাগরিক সমান সুযোগ লাভ করার অধিকারী। (৬) সম্পত্তি ভোগের অধিকার হল একটি পবিত্র অধিকার। আইনের সাহায্য এবং ক্ষতিপূরণ ছাড়া কারও সম্পত্তি হরণ করা যায় না। (৭) আইনের সাহায্য ছাড়া কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ড দেওয়া যাবে না। (৮) মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, ধর্মাচরণের স্বাধীনতা হল একটি মৌলিক অধিকার। (৯) পরিশেষে, এই ঘোষণাপত্রে সরকারি ক্ষমতার বিভাজন এবং ব্যক্তি স্বাধীনতাকে মৌলিক অধিকার বলে ঘোষণা করা হয়।

১· "The Declaration unfolded the mythical character of the French Revolution."—Lefebvre. P. 149.

২· David Thomson. P. 12.

ব্যক্তি ও নাগরিকের অধিকার সম্পর্কিত ঘোষণাপত্র ছিল নিঃসন্দেহে একটি উচ্চ আদর্শের পরিচয়। এই আদর্শগুলি কেবলমাত্র ফরাসী জাতিকে অনুপ্রাণিত করেনি। ইওরোপের নিপীড়িত জনসমষ্টি এই ঘোষণার মধ্যে মুক্তির অধিকার খুঁজে পায়। লেফেভারের মতে, "ইওরোপের সর্বত্র এই ঘোষণাপত্রের মর্ম এক নবযুগের সঙ্কেত সূচনা করে।"[১] ঐতিহাসিক ওলারের (Aulurd) মতে, "এই ঘোষণাপত্র ছিল পুরাতনতন্ত্রের মৃত্যুর পরওয়ানা।"[২] এই ঘোষণার মধ্যে জনসাধারণ এক অসীম সম্ভাবনা ও প্রতিশ্রুতির ইঙ্গিত পায়। শত শত বছর ধরে ফরাসী জাতি যে সকল গণতান্ত্রিক, মৌলিক ও মানবিক অধিকারে বঞ্চিত ছিল, এই ঘোষণাপত্র তাদের সেই সকল অধিকার দানের প্রতিশ্রুতি দেয়। ফরাসী বিপ্লবের আশাবাদ (optimism) ও মুক্তির আশ্বাস এই ঘোষণাপত্রে উচ্চারিত হয়।

নাগরিকের অধিকারের ঘোষণার গুরুত্ব

'ব্যক্তি ও নাগরিকের অধিকার' ঘোষণাপত্রের বিশেষ কয়েকটি ত্রুটিও ছিল। বুর্জোয়া শ্রেণী কেবলমাত্র নিজ সম্প্রদায়ের স্বার্থের কথা চিন্তা করে এই ঘোষণাপত্র রচনা করে। যদিও ঘোষণাপত্রে বলা হয় যে, সকল মানুষ স্বাধীনতা ও সমান অধিকার নিয়ে জন্মায়, কিন্তু বুর্জোয়া নেতারা ভোটাধিকার আইন রচনার সময় সে কথা ভুলে যায়। তারা সর্বসাধারণের ভোটাধিকার নীতিকে অগ্রাহ্য করে। এই ঘোষণাপত্রেও সর্বসাধারণের ভোটাধিকারের কথা উল্লেখ করা হয়নি। দ্বিতীয়তঃ, এই ঘোষণাপত্রে সম্পত্তির অধিকার পবিত্র বলে বলা হয়। কিন্তু দরিদ্র জনসাধারণের জীবিকার অধিকার, কাজ পাওয়ার অধিকার স্বীকার করা হয়নি। ফলে সম্পত্তিভোগীদের অধিকার রক্ষিত হলেও সম্পত্তিহীনদের দাবী অনুক্ত থাকে। ব্যক্তির রাজনৈতিক স্বাধীনতার কথা বলা হলেও তার অর্থনৈতিক স্বাধীনতার কথা অনুক্ত থাকে। তৃতীয়তঃ, এই ঘোষণায় নাগরিকের অধিকারের কথা ঘোষিত হলেও, নাগরিকের কর্তব্যের (Duties) কথা অনুক্ত থাকে। জর্জ রুডের মতে, "নাগরিকের অধিকার ঘোষণাপত্রের মহান ভাষা ও আদর্শগুলি স্বত্ত্বেও এটি ছিল একটি বুর্জোয়া শ্রেণীর অধিকারের দলিল"। চতুর্থতঃ, লেফেভারের মতে, সম্পত্তির অধিকার এই ঘোষণাপত্রে পবিত্র বলা হয়। কিন্তু সম্পত্তির ব্যাখ্যা বা সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি। তথাপি এর দ্বারা পুরাতনতন্ত্রের মৃত্যুর ঘণ্টা বাজান হয়। তথাপি এই ঘোষণাপত্রের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। কারণ এই ঘোষণায় বলা হয় যে, নাগরিকদের অধিকার রক্ষাই হল রাষ্ট্রের মূল কর্ত্তব্য। রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা জাতির হাতেই আছে। নাগরিকরা স্বাধীনতা ও সমান অধিকার ভোগ করার অধিকারী। সকলকে সমান সুযোগ দানের ফলে উদ্যোগী বুর্জোয়ারা সম্পদ অর্জনের রাস্তা খোলা পায়। দক্ষ ও করিতকর্মা লোকেরা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুযোগের ব্যবহার করে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হয়।

নাগরিকের অধিকার ঘোষণাপত্রের ত্রুটি

'ব্যক্তি ও নাগরিকের অধিকারের' ঘোষণাপত্র গ্রহণ করিবার পর, সংবিধান সভা ফ্রান্সের জন্যে একটি সংবিধান রচনার কাজে হাত দেয়। এই সংবিধান রচনার কাজ ১৭৯১ খ্রীঃ শেষ হয়। (১) বুরবোঁ রাজবংশের স্বর্গীয় অধিকার নীতিকে নস্যাৎ করে রাজাকে সংবিধানের অধীন করা হয়। রাজার সর্বময় ক্ষমতা লোপ করে তাঁকে কেবলমাত্র কার্য নির্বাহক বিভাগ বা শাসন বিভাগের (Executive department)

রাজার ক্ষমতা

১· Lefebvre. P. 149.
২· "The Declaration was a death certificate of the Old Regime." Aulurd.

দায়িত্ব দেওয়া হয়। (২) অতঃপর ফ্রান্সের রাজার উপাধি হয় "ফরাসী জাতির রাজা" (King of the French)। (৩) রাজার রাজকোষের অর্থ যথেচ্ছ ব্যয় ক্ষমতা লোপ করা হয়। রাজার নিজস্ব ব্যয় নির্বাহের জন্যে বার্ষিক ২৫,০০০,০০০ লিভ্র মঞ্জুর করা হয়। রাজার ব্যক্তিগত জমি ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। (৪) কার্য নির্বাহক বা এক্সিকিউটিভ বিভাগের কর্তা হিসেবে রাজা, তাঁর মন্ত্রী, সেনাপতি, রাজদূত নিয়োগ করার অধিকার পান। কিন্তু সেনাদলের ওপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ লোপ করা হয়। (৫) ক্ষমতা বিভাজন নীতি অনুসারে তাঁর আইন রচনা ও বিচার করার অধিকার লোপ করা হয়। (৬) মন্ত্রীরা আইনসভার সদস্য না হলেও তাদের কাজের জন্যে তারা আইনসভার নিকট দায়িত্ববদ্ধ হয়। রাজার কোন আদেশ ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর সই না থাকলে কার্যকরী করা যেত না। যেহেতু মন্ত্রীরা ছিল আইনসভার কাছে দায়িত্ববদ্ধ সেহেতু আইনসভার স্বার্থবিরোধী কোন আদেশে তারা সই করত না। এজন্য রাজা প্রতি পদে পরোক্ষভাবে আইনসভার অধীনে থাকতে বাধ্য হন। মন্ত্রীদের কার্যকরণ শেষ হলে তারা আইনসভার কাছে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতে বাধ্য থাকে। রাজা আইনসভার কাছে কোন প্রস্তাব দিতে পারতেন না। (৭) রাজা কোন আইন যদি অনুমোদনের অযোগ্য মনে করেন তবে Suspensive Veto বা সাময়িক নিষেধাজ্ঞা দ্বারা তাহা আপাততঃ রদ করতে পারতেন। ঐ একই আইন পরপর তিনবার আইনসভা পাশ করলে রাজার সম্মতি ব্যতিরেকে তাহা স্বতঃসিদ্ধভাবে আইনে পরিণত হত। নতুবা রাজার প্রদত্ত ভেটো ৪ বছর মাত্র বলবৎ থাকত। (৮) প্রাদেশিক শাসক ও বিচারপতিরা স্থানীয় নির্বাচনের দ্বারা নিযুক্ত হওয়ার ফলে তাদের ওপর রাজার কোন বাস্তব এক্তিয়ার ছিল না। (৯) সকল সরকারি কর্মচারীকে জাতির নামে শপথ নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়।

সংবিধান সভা নতুন সংবিধানে আইনসভাকে সার্বভৌম ক্ষমতা অর্পণ করে।[১] আইনসভাটিকে এক কক্ষ বিশিষ্ট করা হয়। আইনসভার সদস্য সংখ্যা ৭৪৫ করা হয়। (১০) আইনসভার সদস্যদের কার্যকালের মেয়াদ হয় ২ বছর। (১১) একবার কোন ব্যক্তি নির্বাচিত হলে তার পুনরায় প্রার্থী হওয়ার অধিকার লোপ করা হয়। (১২) ভোটাধিকার সম্পর্কে আইনে (Electoral law) বলা হয় যে, যে সকল নাগরিক অন্ততঃ তিন দিনের নির্ধারিত মজুরী সরকারকে প্রত্যক্ষ কর হিসেবে দেয় একমাত্র তারাই ভোটাধিকার পাবে। (১৩) এই মাপকাঠির ভিত্তিতে ফ্রান্সের নাগরিকদের 'সক্রিয়' (Active) এবং 'নিস্ক্রিয়' (Passive) এই দুভাগে ভাগ করা হয়। যারা অন্ততঃপক্ষে তাদের তিন দিনের রোজগার সরকারকে কর হিসেবে দিত তাদের সক্রিয় নাগরিক হিসেবে ভোট দানের অধিকার দেওয়া হয়। বাকি লোকেদের ভোটাধিকার নাকচ করা হয়। এদের বলা হয় নিস্ক্রিয় নাগরিক। সক্রিয় নাগরিকদের ভোটে প্রাথমিক স্তরে নির্বাচন হলে ভোটে যারা নির্বাচিত হয় তাদের নিয়ে নির্বাচকমণ্ডলী গঠিত হয়। এই নির্বাচকমণ্ডলীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৫০ হাজার।[২] এই ৫০ হাজার নির্বাচকের ভোটে আইনসভার সদস্যরা চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হবে বলা হয়। এই নির্বাচকমণ্ডলীর তারাই সদস্য নির্বাচিত হতে পারত যারা ৫ দিনের নির্ধারিত মজুরী বা সরকারকে কর দিত। নির্বাচন দুটি স্তরে হওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। যারা ৫২ লিভ্র কর সরকারকে দিত এবং যাদের অন্ততঃ কিছু সম্পত্তি ছিল তারা আইনসভার প্রার্থী হওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়। (১৪) আইনসভাকে আইন রচনার চূড়ান্ত ক্ষমতা দেওয়া হয়। যুদ্ধ ঘোষণা, শান্তি স্থাপন, কর ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ, সংবিধান সংশোধন, মৌলিক অধিকার প্রভৃতি বিষয়ে আইন রচনা, সরকারি কাজকর্ম সম্পর্কে পর্যালোচনার গুরুদায়িত্ব আইনসভার হস্তে ন্যস্ত থাকে। কোববানের মতে সংবিধান সভা ক্ষমতা বিভাজন তত্ত্ব অনুসারে শাসন বিভাগকে, আইনসভা

আইনসভার গঠন ও ক্ষমতা

১. Lefebvre. P. 153.

২. Lefebvre.

থেকে আলাদা করে দেয়। কিন্তু আইনসভার আইন রচনার ক্ষমতা ছাড়া শাসন বিভাগের কাজে দরকার মত হস্তক্ষেপের ক্ষমতা দেওয়া হয়। এর সমর্থনে এ্যাবে সিয়েস যুক্তি দেখান যে, যেহেতু আইনসভা হল জাতির সার্বভৌম ক্ষমতার ধারক, সেহেতু আইনসভার এই ক্ষমতা থাকা উচিত। আইন রচনা, আইনের প্রস্তাব রচনার একমাত্র অধিকার আইনসভার হাতে রাখা হয়। মন্ত্রীদেরও আইনসভার কাছে দায়িত্ববদ্ধ করা হয়।

পুরাতনতন্ত্রের চিহ্ন লোপ করার জন্যেই নতুন করে প্রদেশগুলিকে ভাগ করা হয়। রাজতন্ত্রের যুগের প্রদেশের বিভাগ এবং প্রদেশের শাসনব্যবস্থার বিলোপ জনসাধারণ দারুণভাবে চায়। সংবিধান সভা জনসাধারণের ইচ্ছাকে পূরণের জন্যেই প্রদেশের পুনর্গঠন করে। শাসনের সুবিধার জন্যে সমগ্র ফরাসী দেশকে সমান পরিধির ৮৩টি প্রদেশে বিভক্ত করা হয়। নতুন প্রদেশগুলির নাম হয় ডিপার্টমেন্ট (Department)। (১৫) এই ৮৩টি প্রদেশকে ৫৪৭টি জেলায় এবং জেলাগুলিকে ক্যান্টনে বিভক্ত করা হয়। (১৬) প্রদেশের শাসনের জন্যে পুরাতন ইন্টেন্ডেন্ট প্রথা ও প্রাদেশিক সভা লোপ করা হয়। এর স্থলে প্রদেশ, জেলা, গ্রাম প্রভৃতি স্তরে নির্বাচিত শাসনকর্তা নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। (১৭) প্রতি প্রদেশে ও জেলায় একটি নির্বাচিত সাধারণ পরিষদের ব্যবস্থা করা হয়। (১৮) সক্রিয় নাগরিকদের ভোটে শাসনকর্তা ও পরিষদের সদস্য নির্বাচনের বিধি চালু করা হয়। প্রতি কমিউনে একটি করে নির্বাচিত পরিষদের ব্যবস্থা করা হয়। সক্রিয় নাগরিকদের ভোটে দু বছরের জন্যে এই কমিউন বা পৌর পরিষদ গঠিত হয়। এই পরিষদ স্থানীয় রক্ষী বাহিনী বা ন্যাশনাল গার্ডকে নিয়ন্ত্রণ, পৌরকর আদায় ও নিয়ম শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পায়। গ্রামসভা বা ক্যান্টন সভাগুলিকে অনুরূপ ক্ষমতা দেওয়া হয়। বিচার বিভাগের ক্ষেত্রে পুরাতন বিচার ব্যবস্থার অবলোপ করা হয়। পার্লেমেন্ট অফ প্যারিস এবং প্রাদেশিক সামন্ত বিচারসভাগুলি বিলোপ করা হয়। (১৯) বিচারকদের নির্বাচনের মাধ্যমে নিয়োগের নিয়ম করা হয়। (২০) বিচারালয়কে আইন বিভাগ বা শাসন বিভাগের এক্তিয়ার থেকে মুক্ত করে স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা দান করা হয়। বিচারকদের নিয়মিত বেতন প্রদানের নিয়ম করা হয়। বিচারপ্রার্থীদের নিকট হতে ফি বা উৎকোচ গ্রহণ নিষিদ্ধ করা হয়। বিচারপ্রার্থীকে বিনা খরচায় বিচার দান করার নিয়ম করা হয়। সারা দেশে নির্বাচিত বিচারক নিয়োগ এবং বিনা খরচায় বিচার দ্বারা বিচার ব্যবস্থাকে জনমুখী করা হয়। স্থানীয় বিচারালয়গুলির উপরে আপীল আদালত বা হাইকোর্ট স্থাপন করা হয়। (২১) সরকারি কর্মচারীদের পরীক্ষার দ্বারা যোগ্যতার ভিত্তিতে নির্বাচন করার নিয়ম করা হয়।

প্রাদেশিক শাসন ও বিচার ব্যবস্থা

সংবিধান সভা ফ্রান্সের অর্থনৈতিক জীবনেও সংস্কার প্রবর্তন করে। (২২) সকল প্রকার পরোক্ষ কর যথা গাবালে বা লবণ কর প্রভৃতি রদ করা হয়। (২৩) জমি, আয় ও অস্থাবর সম্পত্তির ওপর নূতনভাবে কর ধার্য করা হয়। গ্রামসভা ও স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে এই কর আদায়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়। বৈষম্যমূলক কর বিলোপ করে নায্য ভিত্তিতে আয়ের উপর লক্ষ্য রেখে সকল শ্রেণীর উপর কর ধার্য করা হয়। বাণিজ্য ও শিল্প থেকে আয়ের ওপর আয়কর বসান হয়। এছাড়া স্বদেশপ্রেমমূলক দাতব্য কর (Patriotic contribution) অর্থসঙ্কট দূর করার জন্যে আদায় করা হয়। (২৪) এ সকল ব্যবস্থার ফলে অর্থসঙ্কটের সুরাহা না হওয়ায় গীর্জার ভূসম্পত্তি জাতীয়করণ করা হয়। এই সম্পত্তির মূল্যের ভিত্তিতে এ্যাসাইন্যাট (Assignat) নামে এক প্রকার কাগজের মুদ্রা চালু করা হয়। প্রায় ১২০ কোটি টাকা মূল্যের কাগজের এস্যাইন্যাট বাজারে ছাড়া হয়। (২৫) বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্যে অবাধ বাণিজ্য চালু করা হয় এবং সংরক্ষণ শুল্ক রাখা হয়। ফরাসী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার লোপ করা হয়। গিল্ড প্রথা

অর্থনৈতিক সংস্কার

লোপ করা হয়। স্বাধীন উদ্যোগে শিল্প-বাণিজ্য গঠনের অধিকার স্বীকার করা হয়। মূলধন বিনিয়োগ এবং মূলধনের জন্যে সুদ আদায়ের অধিকার স্বীকার করা হয়। এই অর্থনৈতিক উদ্যোগ প্রয়োগের স্বাধীনতা বুর্জেয়া শ্রেণীর স্বার্থে চালু করা হয়। (২৬) কর্মহীনের কর্ম সংস্থান আইন দ্বারা শ্রমিকের কর্ম সংস্থানের কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। লা শেপালিয়ার আইন দ্বারা শ্রমিকের ধর্মঘট ও ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার হরণ করা হয়।

সর্বশেষে, সংবিধান সভা ফ্রান্সের ধর্মবিষয়ক ব্যাপারের সমাধানের জন্যে Civil Constitution of the Clergy নামে এক আইন পাশ করে। ফ্রান্সের গীর্জার নাম ছিল গ্যালিকান গীর্জা (Gallican Church)। ক্যাথলিক প্রথা অনুসারে এতদিন ফরাসী গীর্জা রোমের পোপের অধীনে ছিল—বিশপরা তাঁর অনুমতি অনুসারে নিযুক্ত হত। (২৭) নতুন আইনে পোপের নিয়ন্ত্রণ একেবারে লোপ করা হয়। গ্যালিকান গীর্জা জাতীয়করণ করা হয়। (২৮) বিশপ ও অন্যান্য স্তরের ধর্মযাজকরা অতঃপর পোপ কর্তৃক নিযুক্ত না হয়ে, ভোটের দ্বারা নির্বাচিত হবে বলা হয়। (২৯) গীর্জার ভূসম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত করা হয়। গীর্জা সরকারের একটি দপ্তরে পরিণত হয়। যাজকদের সরকার থেকে নিয়মিত মাহিনা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। খ্রীষ্টধর্মের সকল সম্প্রদায়কে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

ধর্মবিষয়ক ব্যবস্থা

এইভাবে সংবিধান সভা ফ্রান্সের প্রথম বিপ্লবী সংবিধান রচনা (১৭৯১ খ্রীঃ) সম্পূর্ণ করে। সংবিধান সভা পুরাতনতন্ত্রকে ধ্বংস করে, রাজার স্বৈরশাসনের ক্ষমতা লোপ করে। ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও সামাজিক সাম্য প্রবর্তন করে এই সভা প্রগতিমূলক দৃষ্টির পরিচয় দেয়। ফ্রান্সের পুরাতনতন্ত্র যখন ভেঙে যাচ্ছিল, সেই ভাঙনের যুগে নতুন ব্যবস্থা গঠন করা সহজ কাজ ছিল না। সামন্তপ্রথার শোষণ, রাজকীয় স্বৈরশাসন ও গীর্জার কুসংস্কার দূর করে সংবিধান সভা এক নতুন সমাজব্যবস্থার পত্তন করে। কিন্তু সংবিধান সভার কাজে বহু ত্রুটি ছিল। এই কারণে ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দের সংবিধান কিছুদিনের মধ্যেই ভেঙে পড়ে। ঐতিহাসিক মাদেলাঁর (Madelin) মতে, "এই বিরাট সংস্কারগুলি ইতিহাসে অদ্বিতীয় হলেও আসলে এগুলি ছিল জীর্ণ ও ভঙ্গুর।"[১] মিরাব্যু মন্তব্য করেন যে, "দেশের মৌলিক গঠন ভেঙে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি, সংবিধান সভার মত আর কারও পক্ষে করা সম্ভব ছিল না।"[২]

সংবিধানের ত্রুটি : ভঙ্গুরতা

রাজার প্রতি অবিশ্বাসবশতঃ ১৭৯১ খ্রীঃ সংবিধানে তাঁর ক্ষমতা বিপুলভাবে হ্রাস করা হয়। অথচ শাসনকার্য চালাবার দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হয়। ফলে তাঁর হাতে দায়িত্ব থাকলেও ক্ষমতা ছিল না। রাজার মন্ত্রীদের আইনসভাকে পরামর্শ দেওয়ার অধিকার ছিল না। অথচ মন্ত্রীরা তাদের কাজের জন্যে আইনসভার কাছে দায়িত্ববদ্ধ ছিল। রাজা ছিলেন কেন্দ্রের প্রশাসনিক প্রধান। অথচ তাঁর আদেশনামায় মন্ত্রীরা সই না করলে তা কার্যকরী হত না। এর ফলে রাজা ঠুঁটো জগন্নাথে পরিণত হন। লেফেভ্রর বলেন যে, সংবিধান অনুযায়ী ফ্রান্সে নিয়মতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র চালু হলেও, আসলে রাজার প্রকৃত ক্ষমতা না থাকায়, এই সংবিধান একটি বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র ছাড়া আর কিছু ছিল না। অধিকাংশ সরকারি কর্মচারী যথা প্রাদেশিক শাসনকর্তা, বিচারপতিরা নির্বাচনের মাধ্যমে নিযুক্ত হওয়ার ফলে তাঁরা রাজার প্রতি আনুগত্য দেখাতে বাধ্য ছিল না। এদের নিয়ন্ত্রণ করার কোন ক্ষমতা রাজার ছিল না। ফলে প্রদেশগুলির ওপর কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ ভেঙে পড়ে।

শাসন বিভাগের পঙ্গুতা

১· "The huge work of reform unique in history was....very poor and fragile in construction."—Madelin.

২· "The disorganisation of the kingdom could not have been better planned"—Madelin.

ফ্রান্স যেন একটি ঐক্যবদ্ধ দেশের পরিবর্তে ৮৩টি আলাদা দেশে ভাগ হয়ে যায়। (২) ক্ষমতা বিভাজন নীতির প্রতি অন্ধ আস্থা বশতঃ সংবিধান রচয়িতারা আইন বিভাগ থেকে শাসন বিভাগকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করেন। শাসন বিভাগের কর্তা হিসেবে রাজার পক্ষে তাঁর সমস্যাগুলিকে আইন সভ্যকে বোঝাবার কোন উপায় ছিল না। এদিকে আইনসভা শাসনকার্যের দায়িত্বে না থাকায়, শাসন বিভাগের সমস্যাগুলিকে বুঝতে পারত না। কাজেই প্রশাসনিক ও আইন বিভাগের মধ্যে কোন সংযোগ ও বোঝাপড়া না থাকায় সংবিধান অচল হয়ে পড়ে। কার্যকরী বলিষ্ঠ শাসন এজন্য রাজা চালু করতে পারেননি। তাঁকে পদে পদে আইনসভা হেনস্থা করার সুযোগ পায়। অথচ রাজা আইনসভাকে তাঁর সমস্যা বোঝাতে পারেননি।

(৩) সংবিধান সভা "নাগরিকের অধিকার" ঘোষণাপত্রে সকল মানুষের সমান অধিকারের কথা ঘোষণা করে। কিন্তু এই নীতি সংবিধান সভা হাতে-কলমে ভেঙে ফেলে। সকল মানুষের সমান অধিকার স্বীকার করলে ফ্রান্সের সকল নাগরিকের ভোটদানের অধিকার থাকা উচিত ছিল। কিন্তু সংবিধান সভার বুর্জোয়া সদস্যরা সম্পত্তির অধিকারকেই একমাত্র পবিত্র অধিকার গণ্য করত। এজন্য এই সভা ফ্রান্সের সকল নাগরিককে ভোটদানের অধিকার না দিয়ে. কেবলমাত্র সক্রিয় নাগরিকদের সম্পত্তির ভিত্তিতে ভোটাধিকার দেয়। দরিদ্র নাগরিকদের ভোটাধিকারে বঞ্চিত করে। বুর্জোয়া শ্রেণীর ভোটের প্রাধান্য বজায় রাখার জন্যে সম্পত্তিবান ব্যক্তিদেরই একমাত্র ভোটের অধিকার দেয়। এর ফলে ফ্রান্সে বুর্জোয়া শ্রেণীর শাসন স্থাপিত হয়। অভিজাতদের বিতাড়িত করে বুর্জোয়ারা শাসন ক্ষমতা নেয়। এই কারণে অক্সফোর্ডের অধ্যাপক টমসন মন্তব্য করেন যে, "যাজক, অভিজাত ও সাধারণ লোকের পরিবর্তে এই সংবিধান পাউন্ড, শিলিং ও পেনীর ভিত্তিতে নতুন শ্রেণী গঠন করে" (In place of clergy, nobility and the commons,—the Constitution brought the pound, the shilling and the pence)। ভোটাধিকার নীতির এই বঞ্চনার ফলে ফ্রান্সের প্রায় ৩০ লক্ষ নাগরিক ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। মানব জাতির ঘোষণাপত্রে সংবিধান সভা রুশোকে অনুসরণ করে বলে যে "সকল মানুষ স্বাধীনতা ও সমান অধিকার নিয়ে জন্মায়। তাহলে এই ৩০ লক্ষ নাগরিককে সমান অধিকার থেকে বঞ্চিত করে সংবিধান সভা পরস্পর বিরোধী কাজ করে।"

বুর্জোয়া শ্রেণীব ক্ষমতা বক্ষা—সমান ভোটাধিকাব স্থাপনে বঞ্চনা

(৪) ফ্রান্সকে ৮৩টি প্রদেশে বিভক্ত করা হয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে প্রাদেশিক সরকারের সম্পর্ক সংবিধানে নির্ণীত হয়নি। প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও কর্মচারীরা স্থানীয় ভোটে নির্বাচিত হওয়ার ফলে তারা নিজ নিজ অঞ্চলে সর্বেসর্বা হয়ে দাঁড়ায়। কেন্দ্রীয় সরকারের আদেশ ও নির্দেশ তারা পালন করতে বাধ্য ছিল না। রাজার পক্ষে এদের নিয়ন্ত্রণ করা দুস্কর ছিল। ফলে শাসনব্যবস্থায় দারুণ বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ফ্রান্স যেন ৮৩টি আলাদা রাজ্যে বিভক্ত হয়। নেপোলিয়নের আমলে গোটা দেশের ওপর পুনরায় কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ ফিরে আসে। এই সংবিধানে নির্বাচনের মাধ্যমে বিচারপতি নিয়োগের ফলে তাঁদের যোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহ থেকে যায়। ভোটে নির্বাচিত বিচারপতিরা নির্ভীক ও নিরপেক্ষভাবে বিচার করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন।

প্রাদেশিক শাসনে বিশৃঙ্খলা

(৫) সংবিধানে এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু বিপ্লবের সময় উত্তেজনা বশতঃ নিম্নপরিষদ কোন হঠকারী আইন পাশ করলে উচ্চকক্ষে তা সংশোধন করার উপায় ছিল না। আইনসভার সদস্যদের পুনঃ নির্বাচন রদ করায় অভিজ্ঞ সদস্যরা তাঁদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে পারেননি। সর্বদা আনকোরা সদস্যদের দ্বারা কাজ চালান কষ্টসাধ্য ছিল। এ্যাসাইন্যাট নামে কাগজের নোট চালু করলে

আইনসভার গঠনে ত্রুটি—মুদ্রাস্ফীতি

ফ্রান্সে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। এদিকে বিপ্লবী সরকার অর্থাভাব দূর করার জন্যে গীর্জার বাজেয়াপ্ত জমি বিক্রয় আরম্ভ করে। ধনী কৃষক ও বুর্জোয়া শ্রেণী যাদের হাতে নগদ টাকা ছিল তারা এই জমি কিনে নেয়। দরিদ্র কৃষকেরা এই জমি থেকে বঞ্চিত হয়। এর ফলে এক নতুন ভূম্যাধিকারী শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। Civil constitution of the Clergy ধর্মবিশ্বাসী ক্যাথলিকদের মনে দারুণ আঘাত দেয়। গীর্জার ওপর রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ এবং নির্বাচনের মাধ্যমে যাজক নিয়োগে বহু লোক অসন্তুষ্ট হয়। ১৭৯১ খ্রীঃ সংবিধানে আইনসভার হাতেই সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা হয়। প্রকৃত ক্ষমতা বিভাজন নীতি প্রয়োগ করলে আইন, প্রশাসন ও বিচার তিন বিভাগের মধ্যে সুষম ও সমতা রেখে ক্ষমতা বন্টন করা হত। তাহলে সংবিধানের স্থিতিশীলতা বাড়ত। কিন্তু বুর্জোয়া সদস্যরা নিজেদের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার জন্যে আইনসভার হাতে প্রধান ও মৌলিক ক্ষমতাগুলি রেখে দেয়। লেফেভার এজন্য মন্তব্য করেছেন যে, "সংবিধান সভা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের কথা বলে। কিন্তু আসলে বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়"।

সংবিধান সভা ভূমিহীন দরিদ্র, দিনমজুর, ভাগচাষী, শ্রমিক প্রভৃতির স্বার্থে কোন আইন পাশ করতে বিরত থাকে। বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার জন্যে সংবিধান সভা বিভিন্ন আইন করে।

দ্বিতীয় বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা

সমাজের বঞ্চিত শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা সম্পর্কে অবহেলা দেখায়। কর্মহীনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, অথবা শ্রমিকদের জন্যে নিম্নতম মজুরী আইন রচনা, দ্রব্যমূল্যের উচ্চতম সীমা বেঁধে আইন রচনা করতে সংবিধান সভা বিরত থাকে। কারণ বুর্জোয়া প্রতিনিধিরা মনে করত যে, এর ফলে তাদের স্বার্থের ক্ষতি হবে। এমন কি তাঁরা শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার হরণ করে। লা-শেপালিয়ার আইন দ্বারা শ্রমিকদের ধর্মঘট ও ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার হরণ করা হয়। সুতরাং ১৭৯১ খ্রীঃ সংবিধান চালু হওয়ার পর দরিদ্র শ্রেণী আর একটি বিপ্লবের দ্বারা এই বুর্জোয়া সংবিধানকে ভেঙে তাদের অধিকার স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা বুঝে ফেলে।

পাঠ্যসূচী

১। Goodwin—The French Revolution.
২। Lefebvre—The French Revolution.
৩। Madelin—The French Revolution.
৪। Aulurd—Political History of the French Revolution.
৫। Mathiez—The French Revolution (English translation by C. A. Philips).
৬। Thomson—The French Revolution.
৭। D. Thomson—Europe since Napoleon.
৮। Hampson—Social History of the French Revolution.
৯। New Cambridge Modern History—Vol. VIII.
১০। Morse Stephens—Revolutionary Europe.
১১। M. Vovelli—The Fall of the French Monarchy.
১২। Aftalion—The French Revolution—An Economic Interpretation.

চতুর্থ অধ্যায়

বিধান সভার শাসন (১৭৯১—৯২ খ্রীঃ) ঃ দ্বিতীয় ফরাসী বিপ্লব ঃ রাজতন্ত্রের পতন

(The Rule of the Legislative Assembly : Second French Revolution : Fall of Monarchy)

দ্বিতীয় ফরাসী বিপ্লব ঃ রাজতন্ত্রের পতন (Second French Revolution : Fall of Monarchy) ঃ ১৭৯১ খ্রীঃ সংবিধান সভার কাজ শেষ হলে এই সভা সেপ্টেম্বর মাসে ভেঙ্গে দেওয়া হয়। নির্বাচনী আইন অনুসারে সক্রিয় নাগরিকদের ভোটে নতুন বিধান সভা বা লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলী (Legislative Assembly) গঠিত হয়। এই সভায় মোট ৭৪৫ জন সদস্য ছিল।

বিধান সভা

ইতিমধ্যে প্যারিসে বিভিন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। এই গোষ্ঠী-রাজনীতি বিধান সভার সদস্যদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। এর ফলে বিধান সভার সদস্যরা ৪টি দলে ভাগ হয়ে যায়, যথা—(১) নিয়মতান্ত্রিক গোষ্ঠী বা ফিউল্যান্ট। এরা আইন সভার সভাপতির বা স্পিকারের ডান দিকে বসত। (২) জিরণ্ডিষ্ট গোষ্ঠী। এই গোষ্ঠীর প্রধান সদস্যরা ফ্রান্সের জিরণ্ড প্রদেশ থেকে আগত বলে এদের নাম হয় জিরণ্ডিষ্ট। এরা স্পিকারের বামদিকে বসত। এরা প্রজাতন্ত্রী আদর্শে বিশ্বাসী ছিল। (৩) জ্যাকোবিন বা মাউন্টেন। এরা ছিল উগ্র বামপন্থী ও প্রজাতন্ত্রী। (৪) মধ্যপন্থী বা মডারেট।[১] নিয়মতান্ত্রিক গোষ্ঠীর লক্ষ্য ছিল ১৭৯১ খ্রীঃ এর সংবিধান অনুযায়ী রাজ্য পরিচালনা করা। বিপ্লবকে আর আগাতে না দিয়ে তার রাশ টেনে ধরা এদের লক্ষ্য ছিল। লাফায়েৎ ছিলেন এই গোষ্ঠীর নেতা। জিরণ্ডিষ্ট ও জ্যাকোবিন দল ছিল পরিবর্তন-পন্থী। এরা স্পিকারের বাম দিকে বসত। আধুনিক যুগে বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থী সম্পর্কে ধারণা বিপ্লবের এই চিন্তাধারা থেকে উদ্ভূত।

বিধান সভাব বিভিন্ন গোষ্ঠী

বিধান সভা প্রথমেই কয়েকটি সমস্যার সম্মুখীন হয়। সংবিধান সভা যে আইনগুলি পাশ করেছিল তার বাস্তব প্রয়োগে বাধা দেখা দেয়। (১) এক শ্রেণীর যাজক Civil Constitution of the Clergy-র প্রতি আনুগত্য জানাতে বিরত থাকে। এই যাজকেরা ছিল পুরাতনতন্ত্রের সমর্থক। গ্রামাঞ্চলে এদের বিশেষ প্রভাব ছিল। (২) এমিগ্রি (Emigres) বা রাজতন্ত্রবাদীরা ফ্রান্স থেকে বিদেশে পালায়। তারা বিপ্লবী সরকারের বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত হয়। এই প্রতিবিপ্লবীরা ইওরোপের রাজশক্তিগুলির সহায়তা চায়। তারা ইওরোপের রাজাদের বুঝায় যে, ফ্রান্সে বুরবোঁ রাজবংশের উচ্ছেদ হলে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র প্রথার ওপর আঘাত পড়বে। ইওরোপের অন্যান্য দেশেও সেই ভাবধারা ছড়িয়ে পড়বে। এই প্রতিবিপ্লবীদের নেতাদের মধ্যে ছিলেন রাজভ্রাতা ডিউক অফ আর্টোয়া। এই সকল সমস্যা সম্পর্কে বিধানসভার ব্যবস্থা গ্রহণের দরকার হয়।

দুইটি সমস্যা

প্রথম সমস্যা সম্পর্কে বিধানসভা সিদ্ধান্ত নেয় যে, যে সকল যাজক Civil Constitution-এর প্রতি আনুগত্য নিতে অসম্মতি জানাবে তাদের ভাতা, বেতন ও অন্যান্য

১ Lord Acton— Cambridge Modern History, P. 212-13.

সুবিধা নাকচ করা হবে। এই বিদ্রোহী ধর্ম যাজকদের রাষ্ট্রবিরোধী বলে গণ্য করা হবে। দ্বিতীয় সমস্যা সম্পর্কে বিধান সভাকে বিশেষ চিন্তা করতে হয়। কারণ এমিগ্রি বা দেশত্যাগী রাজভক্তরা ফ্রান্সের রাইন সীমান্তে সৈন্য সংগঠন করে বিপ্লবী সরকারকে আক্রমণের চেষ্টা করে।[১] এমিগ্রিদের সম্পর্কে বিধানসভা এই সিদ্ধান্ত নেয় যে, ১৭৯২ খ্রীঃ ১লা জানুয়ারির মধ্যে তাদের ফ্রান্সে ফিরে আসতে হবে। যে সকল এমিগ্রি এই আদেশ অমান্য করবে তাদের বিষয়-সম্পত্তি সরকার বাজেয়াপ্ত করবে এবং তাদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

বিদ্রোহী যাজক ও এমিগ্রি বা দেশত্যাগী সম্পর্কে সিদ্ধান্ত

আইন সভার এই দুটি সিদ্ধান্ত রাজার অনুমোদনের জন্যে পাঠান হলে রাজা এই দুটি আইনকে suspensive veto বা সাময়িক নিষেধাজ্ঞা বলে রদ করেন। রাজা আইনসভার সিদ্ধান্তে veto বা নিষেধাজ্ঞা দিলে জিরন্ডিষ্ট ও জ্যাকোবিন গোষ্ঠী ক্রুদ্ধ হয়। এসময় বিপ্লবী আন্দোলন আরও তীব্রতর হচ্ছিল। উগ্রপন্থীরা জাতীয় সভার নরমপন্থীদের আপোষ নীতির বিরোধিতা শুরু করে। মিরাব্যুর মৃত্যুর ফলে নরমপন্থীদের জোর কমে যায়। ১৭৯০ খ্রীঃ কার্ডলিয়ার ক্লাব স্থাপিত হয়। এই গোষ্ঠীর লোকেরা ছিল উগ্রপন্থী। এর সঙ্গে সাঁকুলেৎ শ্রেণীও তাদের নিজ শক্তি সম্পর্কে সচেতন হয়। উগ্রপন্থীদের সংবাদপত্রগুলি যথা লামি-দ্যু-পিউপল প্রভৃতি জনমতকে রাজতন্ত্র-বিরোধী করে। উগ্রপন্থীদের একটি গোষ্ঠী ছিল জ্যাকোবাঁ বা জ্যাকোবিন। এরা প্যারিসের জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করত। রাজা বিধানসভার প্রস্তাবে ভেটো দিলে উগ্রপন্থীরা তাঁকে শায়েস্তা করার কথা ভাবে। উগ্রপন্থীদের প্রভাবে প্যারিসের জনতা (Parisian mob) ষোড়শ লুইয়ের টুইলারিস প্রাসাদ আক্রমণ করে (২০শে জুন, ১৭৯১ খ্রীঃ) এবং রাজাকে অপদস্থ করে। টুইলারিস আক্রমণ বুরবোঁ রাজতন্ত্রের পতনেব সূচনা করে। জনসাধারণের সঙ্গে রাজার বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হয়।

বিধানসভার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে রাজাব ভেটো ঃ প্যারিসের জনতার টুইলাবিস আক্রমণ

টুইলারিস আক্রমণের পর ষোড়শ লুই তাঁর জীবনের নিরাপত্তার জন্যে উদ্বিগ্ন হন। তিনি ফ্রান্স থেকে তার রাণীর পিতৃদেশ, অষ্ট্রিয়ায় পালাবার সঙ্কল্প নেন। অষ্ট্রিয়ারাজ লিওপোল্ড তাঁর ভগিনী ও ভগ্নীপতির নিরাপত্তার জন্যে আশঙ্কিত হন। রাজা ষোড়শ লুই ও রাণী মারিয়া এ্যান্টোনেট এবং তাদের বালক পুত্র ছদ্মবেশ ধরে লাক্সেমবার্গ সীমান্তে মন্টমেডি দুর্গের দিকে পালান। কিন্তু সীমান্তের কাছে ভ্যারেন্নে গ্রামে এক ফরাসী জনতা রাজা ও রাণীকে চিনতে পারে। তারা রাজার শকট আটক করে রাজধানীতে খবর দেয়। তীব্র ধিক্কার ও অপমানের মধ্যে ষোড়শ লুই সপরিবারে প্যারিসে ফিরে আসেন।

ষোড়শ লুইয়ের ভ্যারেন্নে পলায়ন

দ্বিতীয় ফরাসী বিপ্লব (Second French Revolution) ঃ ষোড়শ লুইয়ের ভ্যারেন্নে পলায়নের পর তাঁর সাথে বৈদেশিক শক্তি বিশেষতঃ অষ্ট্রিয়ার গোপন ষড়যন্ত্রের সন্দেহ উগ্রপন্থীদের মধ্যে দেখা দেয়। এই সময় ব্রান্সউইক ঘোষণা (Brunswick Manifesto) দ্বারা অষ্ট্রিয়ার সেনাপতি সতর্ক করে দেন যে, ফরাসী রাজ পরিবারের কোন ক্ষতি হলে তিনি বিপ্লবীদের কঠিন শাস্তি দিবেন। এই ঘোষণার পর উগ্রপন্থীরা রাজার বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ আনে। উগ্রপন্থীরা এই অভিযোগ করে যে, রাজা বিপ্লবী ফ্রান্সের শত্রুদেশ অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন। বিধানসভা রাজার পলায়নের পর তাঁর রাজপদের ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার মুলতুবী

রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ ঃ জিরণ্ডিষ্ট ও জ্যাকোবিন

১ D. Thomson P. 18.

করে দেয় এবং তাঁর ভেটো প্রদানের ক্ষমতা লোপ পায়। এই ব্যবস্থার পর রাজা কার্যতঃ টুই লারিজ প্রাসাদে বন্দীজীবন কাটাতে থাকেন।[১] ইতিমধ্যে রাজতন্ত্র উচ্ছেদ করে প্রজাতন্ত্র স্থাপনের দাবী প্রবল হয়ে ওঠে। কার্ডলিয়ার ক্লাব এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নেয়। পলাতক দেশদ্রোহী এমিগ্রি এবং বৈদেশিক শক্তির সঙ্গে রাজার গোপন যোগাযোগের গুজব ছড়াতে থাকে।

রক্ষণশীল বুর্জোয়ারা প্রজাতন্ত্র স্থাপনের ও গণভোটের বিরোধী ছিল। কারণ তাদের ভয় ছিল যে, তাহলে কৃষকরা মাথা-পিছু ভোট পেয়ে তাদের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিবে। কিন্তু বুর্জোয়াদের মধ্যে মৈতক্য ছিল না। জ্যাকোবিন দল প্রজাতন্ত্রের ঘোর সমর্থক ছিল। ১৭৯১ খ্রীঃ ১৫ই জুলাই জ্যাকোবিনদের প্ররোচনায় শ্যাম্প দ্য মার-এ এক জনসভায় রাজতন্ত্র উচ্ছেদ করে প্রজাতন্ত্র ঘোষণার দাবি জানান হয়। এই মর্মে বিধানসভার কাছে এক গণ দরখাস্ত পাঠান হয়। এর অনুকরণে প্রদেশ থেকেও গণ দরখাস্ত আসতে থাকে।

এই পরিস্থিতিতে অষ্ট্রিয়ার সম্রাট, রাণী মারিয়া এন্টোনেটের ভ্রাতা লিওপোল্ড ২৭শে আগষ্ট, ১৭৯১ খ্রীঃ পিলনিৎসের ঘোষণা দেন যে, যদি ইওরোপের সকল রাজশক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়, তবে অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া ষোড়শ লুইকে রক্ষা ও তাঁর হৃত ক্ষমতা পুনস্থাপনের জন্যে যুদ্ধ ঘোষণা করবে। ঐতিহাসিকরা বলেন যে, পিলনিৎসের ঘোষণা (Declaration of Pilnitz) ছিল একটি ফাঁকা হুমকি মাত্র। কিন্তু এই ঘোষণার পর ফ্রান্সের উগ্রপন্থী বিপ্লবীরা তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠে। তারা রাজাকে বৈদেশিক ষড়যন্ত্রের দায়ে অভিযুক্ত করে এবং রাজতন্ত্রের উচ্ছেদের জন্যে মারমুখী হয়। মডারেটদের হাতে এই সময় প্যারিসের জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করার মত শক্তি ছিল না। জিরন্ডিনদের চাপে বিধানসভা (Legislative Assembly) অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। সভায় জিরান্ডিনরা "পিতৃভূমি বিপন্ন" এই ধ্বনি তুলে যুদ্ধ ঘোষণার অনুকূলে সদস্যদের ভোট পেয়ে যায়। কিন্তু যুদ্ধ শুরুতেই ফ্রান্সের সেনাপতি জেনারেল ডুমরিয়েৎস বেলজিয়াম সীমান্তে পিছু হটেন। ফলে রাজধানী প্যারিস বিপন্ন হয়। সকল লোকের রাগ এজন্য রাজার ওপর পড়ে। অভিযোগ তোলা হয় যে, তিনি শত্রুপক্ষকে গোপনে ফ্রান্সের রণ পরিকল্পনার খবর দিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন।

এদিকে মুদ্রাস্ফীতির ফলে কাগজের মুদ্রা এস্যাইন্যাটের দাম পড়ে যায়। জিনিসপত্রের দাম এজন্য বাড়ে। প্যারিসের সাঁকুলেৎদের মধ্যে এজন্য অসন্তোষ বাড়ে। তারা ধনী বুর্জোয়া ও মজুতদারদের এই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্যে দায়ী করে। আড়তদারদের গুদামে মজুত করা খাদ্য লুঠপাট হতে থাকে। খাদ্যশস্যের কালোবাজারীদের মৃত্যুদণ্ড দানের দাবি ওঠে। জনতা নিজ হাতে আইন তুলে নেয়। প্যারিসে সাঁকুলেৎরা প্যারিস কমিউন গঠন করে প্যারিস শহরে তাদের নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করে। প্যারিস কমিউন গঠনে জ্যাকোবিন দলের হাত ছিল।

এই ভগ্ন ও অস্থির অবস্থার মধ্যে উগ্রপন্থীরা প্রচার চালায় যে, রাজতন্ত্র উচ্ছেদ হলে ফ্রান্স প্রতিবিপ্লবী ষড়যন্ত্র ও বৈদেশিক আক্রমণের বিপদ থেকে রক্ষা পাবে। প্যারিস কমিউনের ৪৭টি সেকসন রাজতন্ত্র উচ্ছেদের স্বপক্ষে স্বতস্ফূর্ত ভোট দেয়। এই গোলমালের মধ্যে একমাত্র রোবসপিয়ের মাথা ঠাণ্ডা করে কাজ করেন। তিনি পরামর্শ দেন যে, প্রজাতন্ত্র স্থাপন করতে হলে চাই সর্বাগ্রে রাজতন্ত্র ও বর্তমান বিধানসভার উচ্ছেদ। তারপরে গণভোটের ভিত্তিতে আইনসভা গঠন করা যেতে পারে।

১০ই আগষ্ট, ১৭৯২ খ্রীঃ প্যারিসের বিপ্লবী কমিউনের নেতৃত্বে প্যারিসের জনতা টুইলারিস প্রাসাদ পুনরায় আক্রমণ করে এবং রাজার সুইস দেহরক্ষী দলকে নিহত করে। রাজা-রাণী প্রাণ

১ Lefebvre—P. 207.

ভয়ে রাজপ্রাসাদ থেকে পালিয়ে নিকটস্থ আইনসভায় আশ্রয় নেন। ক্ষিপ্ত জনতা আইনসভা ঘেরাও করে রাজতন্ত্র বাতিলের দাবী জানায়। বলা দরকার যে, জ্যাকোবিন দল রাজতন্ত্র উচ্ছেদের জন্যে জনতাকে প্ররোচনা দেয়। আইনসভার ৭৮২ জন সদস্যের মধ্যে জ্যাকোবিনদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। কিন্তু ভীতি প্রদর্শন দ্বারা তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের তাদের মতে সম্মতি দিতে বাধ্য করে। ভীতিগ্রস্থ সদস্যরা বাধ্য হয়ে রাজতন্ত্র মুলতুবী করার জন্যে ভোট দেয়। Temple নামক কারাগৃহে রাজাকে বিচারাধীন বন্দী হিসেবে রাখার আদেশ দেওয়া হয়। ইহার ফলে সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের পতন ঘটে। ১৭৯১ খ্রীঃ সংবিধান নাকচ হয়ে যায়। ১১ই আগষ্ট অর্থাৎ পর দিন বিধানসভা প্রস্তাব নেয় যে:- (১) অতঃপর সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় নাগরিকের পার্থক্য লোপ করা হবে। (২) গণভোটের ভিত্তিতে একটি নতুন আইনসভা গঠন করা হবে। (৩) ততদিন জিরণ্ডিন মন্ত্রীসভা ফ্রান্সের শাসনের কাজ চালাবে। (৪) প্যারিসের নিয়ন্ত্রণ প্যারিস কমিউনের হাতে থাকবে। এই সিদ্ধান্তের ফলে ন্যাশন্যাল কনভেনশন গঠিত হলে গণভোট চালু হওয়ায় বুর্জোয়া শ্রেণীর আধিপত্য বিনষ্ট হয়। বুর্জোয়া বিপ্লবের পর্যায় শেষ হয়। লেফেভার ১৭৯২ খ্রীঃ গণভোট প্রথার প্রবর্তন ও প্রজাতন্ত্র ঘোষণা এবং রাজতন্ত্রের উচ্ছেদকে দ্বিতীয় ফরাসী বিপ্লব (Second French Revolution) বলে অভিহিত করেছেন। এই দ্বিতীয় বিপ্লবে প্রথম পর্যায়ের বিপ্লবের মত (১৭৮৯ খ্রীঃ) আবেগ, উত্তাপ, গভীর আশাবাদ ও জাতির অকুণ্ঠ ঐক্যবদ্ধ সম্মতির অনুপস্থিতি লক্ষ্য করেছেন। এই সঙ্গে আসন্ন সন্ত্রাসের পদধ্বনি তিনি শুনতে পেয়েছেন।

বুর্জোয়া শ্রেণীর ভাঙন

এই সময় বুর্জোয়া শ্রেণী ১৭৮৯ খ্রীঃ মত ঐক্যবদ্ধ ছিল না। বুর্জোয়া শ্রেণী উচ্চ বুর্জোয়া এবং নিম্ন বা পাতি বুর্জোয়া এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। উচ্চ বুর্জোয়ারা বিপ্লবকে আর এগোতে না দিয়ে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার চেষ্টা করে। তারা রাজার সঙ্গে একটা মীমাংসায় আসার জন্যেও চেষ্টা করে। নিম্ন বুর্জোয়ারা এতে রাজী ছিল না। তারা সাঁকুলেতের অর্থাৎ দরিদ্র শ্রেণীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিপ্লবকে এগিয়ে দিতে চায়। জ্যাকোবিন দল নিম্ন বুর্জোয়াদের সংগঠিত করে। এদিকে প্যারিসের কমিউন স্থাপিত হলে পৌর শাসন ব্যবস্থার চরিত্রও বদলে যায়। প্যারিস কমিউনে উগ্রপন্থীরা ঢুকে পড়লে এটি বিপ্লবী কমিউনে পরিণত হয়। এই কমিউনের নেতৃত্বে জনতা টুইলারিস আক্রমণ করে রাজতন্ত্রের পতন ঘটায়।

দ্বিতীয় ফরাসী বিপ্লবের গুরুত্ব

১০ই আগষ্টের প্যারিসের জনতার আক্রমণে বিধানসভা, ফ্রান্সে রাজতন্ত্র ও ১৭৯১ খ্রীঃ বুর্জোয়া সংবিধান রদ করতে বাধ্য হয়। দ্বিতীয় ফরাসী বিপ্লবের গুরুত্ব অপরিসীম ছিল।[১] দ্বিতীয় বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সে সর্বসাধারণের ভোটাধিকার প্রবর্তিত হয়। বুর্জোয়া শ্রেণীর সম্পত্তিভিত্তিক ভোটাধিকার পরিত্যক্ত হয়। ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়। প্রজাতন্ত্র স্থাপন আধুনিক যুগের ইতিহাসে এক অভিনব পরীক্ষার সূচনা করে। প্রজাতন্ত্রের মাধ্যমে ফরাসী বিপ্লবকে সমাজ বিপ্লবে পরিণত করা হয়। সমাজতান্ত্রিক আদর্শ অনুসারে জ্যাকোবিন দল বহু সংস্কার প্রবর্তন করে। ফরাসী বিপ্লবের মহৎ যুগ দ্বিতীয় বিপ্লবের পরে আরম্ভ হয়। নদীর দুইকূল ছাপিয়ে যেমন বন্যার স্রোত প্রবাহিত হয়, দ্বিতীয় বিপ্লব অর্থাৎ ১৭৯২ খ্রীঃ পর ফ্রান্সে বিপ্লবের তরঙ্গ সেরূপ প্রবাহিত হয়। এই বিপ্লবের তরঙ্গ ফ্রান্স পার হয়ে ইওরোপকে প্লাবিত করে। ফ্রান্সে বহু মৌলিক সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনের পশ্চাতে চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে জ্যাকোবিন দল দ্বারা প্রভাবিত প্যারিস কমিউন। আইনসভায় জ্যাকোবিনদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকলেও তারা তা গ্রাহ্য করেনি।

১· Lefebvre. P. 227.

১৭৯২ খ্রীঃ আইনসভা রাজতন্ত্র রদ করলে রাজভক্ত কর্মচারীরা দলে দলে পদত্যাগ করে।[১] প্যারিস কমিউন ১০ই আগষ্টের সফল বিপ্লবের পর তাদের ক্ষমতার বিস্তৃত প্রয়োগ করতে চায়।

দ্বিতীয় বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া ঃ সেপ্টেম্বর হত্যাকাণ্ড

বিধানসভায় জিরন্ডিনদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের মতামতের তোয়াক্কা না করে তারা কমিউনের অধীনে একটি ফৌজদারী আদালত গঠন করে সন্দেহভাজন প্রতিবিপ্লবীদের ধ্বংস করতে চায়। আসলে সন্ত্রাসের দ্বারা তারা প্রতিবিপ্লবী ও প্রতিবাদী দলের লোকদের নিশ্চিহ্ন করতে চায়। বিধানসভা কমিউনের চাপে নিস্তেজ হয়ে পড়ে। তারা এই দাবী মেনে নেয়। অনুরূপভাবে অন্যান্য পৌরসভাগুলিকে বাড়ি বাড়ি তল্লাসী করে সন্দেহভাজন প্রতিবিপ্লবীদের গ্রেপ্তারের অধিকার দেওয়া হয়। কমিউনের দাপটে সংবাদপত্রগুলির কণ্ঠরোধ করা হয়, টোল সংগ্রহের ঘাঁটিগুলি ভেঙে ফেলা হয়। যে সকল যাজক Civil Constitution of Clergy মেনে নেয়নি তাদের গ্রেপ্তার করা হয়, সন্দেহভাজন অভিজাতপন্থী ও রাজপন্থীদেরও বন্দী করা হয়। ইতিমধ্যে খবর আসে যে, দক্ষিণ ফ্রান্সের লা ভঁদ (Le Vendee) প্রদেশে যাজকদের প্ররোচনায় কৃষকরা রাজতন্ত্রের সমর্থনে বিদ্রোহ করেছে। ফলে আগুনে যেন ঘি পড়ে। প্যারিসের উন্মত্ত সাঁকুলেৎ ও প্যারিস কমিউনের জ্যাকোবিনপন্থী নেতারা বন্দী অপরাধীদের দ্রুত বিচার করে কঠোর শাস্তিদানের দাবী জানায়। হাওয়ায় একটি গুজব ছড়ায় যে, দক্ষিণের বিদ্রোহ দমন এবং বৈদেশিক আক্রমণকারীদের বাধাদানের জন্যে স্বেচ্ছা সৈনিকরা প্যারিস থেকে চলে গেলেই, এই প্রতিবিপ্লবী বন্দীরা শহরে সশস্ত্র আক্রমণ করবে। লেফেভার বলেছেন যে, গুজবটির আদৌ কোন দাম ছিল না। ২রা সেপ্টেম্বর, ১৭৯২ খ্রীঃ প্যারিসের কিছু বন্দীকে প্রাদেশিক কারাগারে নিয়ে যাওয়ার সময় উন্মত্ত জনতা তাদের আক্রমণ করে হত্যা করে। এদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক সিভিল কনষ্টিটিউশনের প্রতি শপথ গ্রহণে অসম্মত যাজকও ছিল (Non-juring Clergy)। এই সভায় প্যারিসের Sectionগুলিতে অধিবেশন চলছিল। এগুলি ছিল জ্যাকোবিনপন্থীদের নিয়ন্ত্রণে। Section সভায় স্থির হয় যে, কারাগারের তাৎক্ষণিক বিচার করে তাৎক্ষণিক প্রাণদণ্ড, এই সকল অপরাধীদের দেওয়া হবে। ২-৬ই সেপ্টেম্বর কারাগারে ঢুকে উন্মত্ত জনতা বিচারের প্রহসন শেষ করে প্রায় ১০০০ থেকে ১৩৯৫ জন বন্দীকে হত্যা করে। এই সন্ত্রাসের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিপ্লব এখন অসংগঠিত জনতার হাতে চলে গেছে। সেপ্টেম্বর হত্যাকাণ্ডে প্ররোচনা দাতা হিসেবে বহু ঐতিহাসিক জঁা পল মারা (Jean Paul Marat)কে অভিযুক্ত করেন। এজন্য এই ঘটনাকে 'সেপ্টেম্বরের হত্যাকাণ্ড' বলা হয়। বিখ্যাত ইংরাজ ঔপন্যাসিক ডিকেন্সের—A Tale of Two Cities নামক উপন্যাসে এই হত্যাকাণ্ডের মর্মস্পর্শী বিবরণ পাওয়া যায়। সেপ্টেম্বর হত্যাকাণ্ড ফরাসী রাজতন্ত্রের সমাধি রচনা করে।

নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের পতনের কারণ ঃ ১৭৯১ খ্রীঃ সংবিধান দ্বারা ফ্রান্সে সাংবিধানিক রাজতন্ত্র স্থাপিত হলেও কেন তা স্থায়ী হল না তার কারণ আলোচনা করা

ফরাসী জাতির মানসিকতা ঃ রাজার প্রতি অবিশ্বাস

দরকার। ফরাসী জাতির মানসিকতা এজন্য দায়ী ছিল। ফরাসীরা প্রকৃতিতে দক্ষিণ বা বাম যে কোন একটি পন্থায় বিশ্বাসী। তারা মধ্যপন্থা পছন্দ করে না। ইংরাজদের ন্যায় ধীরে ধীরে পরিবর্তন ফরাসীরা পছন্দ করে না। রাজাকে আইনের দ্বারা বেঁধে পার্লামেন্টের শাসন প্রতিষ্ঠার মত ধৈর্য ফরাসীদের ছিল না। ফরাসীরা আবেগপ্রবণ ক্যাথলিক জাতি। ইংলন্ডের এ্যাংলিক্যানদের মত হিসেব-নিকেশ করে কাজ করা তাদের স্বভাবে ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, বুরবোঁ রাজবংশ অতীতে যে স্বৈরশাসন স্থাপন করে তার কালিমা থেকে ষোড়শ লুই মুক্ত হতে পারেননি।

১· D. Thomson. P. 14.

তৃতীয়তঃ, ফ্রান্সের পাতি বুর্জোয়া বা নিম্ন বুর্জোয়া শ্রেণী মনে করত যে, সাংবিধানিক রাজতন্ত্র হল ধনী বুর্জোয়া শ্রেণীর সরকার। এজন্য তারা এই ব্যবস্থাকে ঘৃণা করত। পাতি বুর্জোয়া শ্রেণী ছিল জিরণ্ডিষ্ট ও জ্যাকোবিন দলের প্রধান শক্তি। জিরণ্ডিষ্ট ও জ্যাকোবিনরা মনে করত যে, ষোড়শ লুই মনে-প্রাণে সংবিধান মেনে চলতে রাজী হবেন না। বৈদেশিক শক্তির সহায়তা নিয়ে তিনি লুপ্ত ক্ষমতা পুনঃস্থাপনের চেষ্টা চালাবেন। ষোড়শ লুই নিজ আচরণ দ্বারা এই সন্দেহকে দৃঢ় করেন। তিনি সিভিল কনষ্টিটিউশন অফ ক্লার্জি এবং এমিগ্রি সম্পর্কে আইনসভার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভেটো প্রয়োগ করলে এই সন্দেহ বদ্ধমূল হয়।

ডেভিড টমসনের মতে, সামন্ততন্ত্র এবং স্বৈরাচারী বুরবোঁ রাজতন্ত্র ছিল পরস্পরের পরিপূরক। সামন্ততন্ত্র ধ্বংস হলে এর সহকারী রাজতন্ত্রের টিকে থাকার সম্ভাবনা খুব কম ছিল।

সামন্ত প্রথাব পতনেব ফলে বাজতন্ত্রেব ভিত্তি লোপ : কশোব আদর্শ

জিরণ্ডিষ্ট ও জ্যাকোবিন দল রাজতন্ত্রকে প্রগতির পক্ষে বাধা বলে মনে করত। তারা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করত যে, প্রজাতন্ত্র স্থাপন না করলে ফ্রান্সে প্রকৃত গণতন্ত্র আসবে না। যদিও আইনসভায় এই দলগুলির সদস্য সংখ্যা কম ছিল, তবুও প্যারিসের উগ্রপন্থী জনতার ওপর এদের বিরাট প্রভাব ছিল। এই জনতার সাহায্যে তারা রাজতন্ত্রকে ধ্বংস করে।

রাজতন্ত্রের পতনের জন্যে কর্ডেলিয়ার ক্লাব ও এর প্রতিষ্ঠাতা ড্যান্টনের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। কর্ডেলিয়াব ক্লাবের সদস্য চাঁদা ছিল সর্বাপেক্ষা কম। ফলে সমাজের একেবারে নীচের

ড্যান্টনেব ভূমিকা

তলার লোকেরা এই সমিতির সদস্য হয়। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় ফ্রান্সের দরিদ্র শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না। ১৭৯১ খ্রীঃ সংবিধানে দরিদ্র লোকদের নিস্ক্রিয় নাগরিক বলে চিহ্নিত করা হয় এবং ভোটাধিকারে বঞ্চিত করা হয়। ১৭৯১ খ্রীঃ সংবিধানে দরিদ্র লোকেদের কর্মসংস্থান, নিম্নতম মজুরী দানের জন্যে কোন আইন ছিল না। সুতরাং এই সকল বঞ্চিত লোকেরা কর্ডেলিয়ার ক্লাবের মাধ্যমে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র ও তার সাহায্যকারী ১৭৯১ খ্রীঃ সংবিধান ভাঙতে সঙ্কল্প নেয়।

এছাড়া দেশত্যাগী ফরাসী এমিগ্রিদের জাতীয়তা বিরোধী কার্যকলাপ এবং ইওরোপের রাজশক্তিগুলির বিপ্লবী ফ্রান্সের প্রতি বিরুদ্ধ আচরণ সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের পতন ত্বরান্বিত

বৈদেশিক চক্রান্ত

করে। ফ্রান্সের যে সকল অভিজাত স্বদেশ ত্যাগ করে, তারা ছিল "রাজা অপেক্ষাও বেশী রাজতন্ত্রী"। এই সকল উগ্র-রাজপন্থীরা (ultraroyalist) বৈদেশিক শক্তির সাহায্য নিয়ে ফ্রান্সের বিপ্লবী সরকারকে ধ্বংস করতে সচেষ্ট হয়। ফ্রান্সের এক শ্রেণীর বিপ্লবী নেতা এজন্য বৈদেশিক শক্তির সঙ্গে রাজার গোপন যোগাযোগ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে। শেষ পর্যন্ত এরা মনে করে যে, ফ্রান্সে রাজতন্ত্র ধ্বংস না করলে বৈদেশিক চক্রান্তের মোকাবিলা করা যাবে না। এইরূপ পরিস্থিতিতে রাজতন্ত্রের পতন প্রায় অনিবার্য হয়ে পড়ে।

পাঠ্যসূচী

১। Goodwin—The French Revolution.
২। Lefebvre—The French Revolution.
৩। Madelin—French Revolution.
৪। Cobban—History of France. Vol. I.
৫। Hayes—History of Modern Europe.
৬। Thomson—French Revolution.
৭। Hampson—Social History of the French Revolution.
৮। New Cambridge Modern History—Vol. VIII.

পঞ্চম অধ্যায়

ন্যাশন্যাল কনভেনশন ঃ ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র স্থাপন ঃ সন্ত্রাসের রাজত্ব (১৭৯২—১৭৯৫ খ্রীঃ)

(National Convention : The Republican Revolution : The Reign of Terror (1792—1795)

জাতীয় সম্মেলনের কার্যকলাপ (Activities of National Convention) ঃ রাজতন্ত্র রদ হবার ফলে ফ্রান্সের প্রথম বিপ্লবী সংবিধান (১৭৮৯—৯১ খ্রীঃ) বাতিল হয়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে গণভোটের ভিত্তিতে নতুন আইনসভা গঠনের ব্যবস্থা হয়। ন্যাশন্যাল কনভেনশনের সদস্যদের নির্বাচনের জন্যে গণভোট চালু হলেও, সেপ্টেম্বরের হত্যাকাণ্ড ও সন্ত্রাসের ফলে অবাধ নির্বাচন হয়নি। আইনের বাধা বা ভীতি প্রদর্শন বা সন্ত্রাসের চাপে বহু ভোটদাতা ভোট দেয়নি। গ্রামবাসীরা বেশীর ভাগ ভোট দেয়নি। প্রাথমিক ভোটারদের $\frac{১}{১০}$ অংশ মাত্র ভোট দেয়। সমগ্র ভোটদাতাদের ৭·৫% ভাগ মাত্র নির্বাচনে অংশ নেয়।[১] এই নব নির্বাচিত আইনসভার নাম হয় ন্যাশন্যাল কনভেনশন বা জাতীয় সম্মেলন। ১লা সেপ্টেম্বর, ১৭৯২ খ্রীঃ জাতীয় সম্মেলন (National Convention)-এর অধিবেশন বসে।

ন্যাশন্যাল কনভেনশন

জিরণ্ডিন ও জ্যাকোবিন ঃ জাতীয় সম্মেলনে (National Convention) তিন প্রধান দল ছিল, যথা জিরণ্ডিষ্ট বা জিরণ্ডিন, জ্যাকোবিন বা মাউন্টেন এবং মডারেট বা মধ্যপন্থী। জিরণ্ডিষ্ট দল সভার দক্ষিণ পার্শ্বে আসন নেয়, জ্যাকোবিন দল সভার বাম পার্শ্বে এবং উভয়ের মধ্যে মডারেট বা মধ্যপন্থীরা বসে। জ্যাকোবিন সদস্যরা আইনসভার গ্যালারির উঁচু আসনে বসত বলে অনেকে তাদের মাউন্টেন বলত। আদর্শ ও কর্মপন্থার দিক থেকে এই তিন দলের মধ্যে বহু পার্থক্য ছিল। জিরণ্ডিনদের প্যারিসে প্রভাব ছিল কম। কিন্তু প্রদেশে তাদের প্রভাব বেশী ছিল। জ্যাকোবিনদের সঙ্গে প্যারিস কমিউনের ঘনিষ্ঠতার ফলে, তারা প্যারিসের Sectionগুলির সহায়তা পেত। জিরণ্ডিনদের ন্যাশন্যাল কনভেনশনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। জ্যাকোবিনরা ছিল সংখ্যালঘু। কিন্তু জ্যাকোবিন তাত্ত্বিকদের মতে আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠতা দ্বারা কিছুই প্রমাণিত হয় না। কারণ সার্বভৌম ক্ষমতা ছিল জনসাধারণের হাতে। জ্যাকোবিনরা দাবী করত যে, জনসাধারণের সমর্থন তাদের পক্ষেই আছে। জনসাধারণ বলতে অবশ্য প্যারিসের Section গুলির উগ্রপন্থী সাঁকুলেৎদেরই জ্যাকোবিনরা জনসাধারণ বলে গণ্য করত। প্যারিসের বাইরে গ্রামাঞ্চলের অসংখ্য লোকেদের মতামতকে জ্যাকোবিনরা গ্রাহ্য করত না। কোব্বান প্রভৃতি ঐতিহাসিকদের মতে, জিরণ্ডিনদের হাত থেকে ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে, জ্যাকোবিনরা প্যারিসের জনতাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। দ্বিতীয়তঃ, জিরণ্ডিনরা আইন ও সংবিধানের পবিত্রতায় বিশ্বাস করত। যা কিছু করা দরকার তা আইন ও সংবিধানের মাধ্যমে তারা করতে রাজী ছিল। জ্যাকোবিনদের মতে পুঁথিগত তত্ত্ব ও সঙ্কীর্ণ আইন দ্বারা বিপ্লব আসতে পারে না। তারা প্রয়োজনে আইন ও আইনসভাকে চাপ দিয়ে নিজেদের মতে আনতে প্যারিসের

জিরণ্ডিন ও জ্যাকোবিন

১· Cobban—Vol. I.

জনতাকে ব্যবহার করত। তারা যুক্তি দেখাত যে, আইনসভার বাইরের জনতাই সার্বভৌম শক্তি। তাদের ইচ্ছাকে মান্য করাই হল সার্বভৌম শক্তির কাছে মাথা নত করা। তৃতীয়তঃ, জিরণ্ডিনরা ছিল সম্পত্তির অধিকারে দৃঢ় বিশ্বাসী। বুর্জোয়া শ্রেণীর চিন্তাধারায় তারা বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিল। জ্যাকোবিনরা সমষ্টির স্বার্থে সম্পত্তির ওপর নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী ছিল। সাঁকুলেৎদের স্বার্থকে তারা অবহেলা করতে চায়নি। কারণ তারাই ছিল তাদের ক্ষমতার উৎস। জিরণ্ডিনরা অবাধ বাণিজ্য, অবাধ শিল্পোদ্যোগ, মুনাফায় বিশ্বাসী ছিল। জ্যাকোবিনরা মূল্য বৃদ্ধি, মজুরীর হার হ্রাসের বিরুদ্ধে ছিল। তারা খাঁটি সমাজতন্ত্রী না হলেও, আধা সমাজতন্ত্রী ছিল। এজন্য তাদের অর্থনৈতিক মতবাদকে জ্যাকোবিন সমাজতন্ত্রবাদ বলা হয়। চতুর্থতঃ, রাজনৈতিক মতবাদের দিক থেকে উভয় দল প্রজাতন্ত্রের সমর্থক হলেও, রাজাকে মৃত্যুদণ্ড দানের ব্যাপারে জিরণ্ডিনরা ছিল দ্বিধাগ্রস্থ। জিরণ্ডিনরা দাবী করত যে, ফ্রান্সে কিভাবে শাসন চলবে সে ব্যাপারে গ্রামবাসীদের মতামত নেওয়া উচিত। প্যারিস কমিউনের ইচ্ছা গোটা দেশের ওপর চাপিয়ে দিলে তা গণতন্ত্র হবে না। জ্যাকোবিনরা রাজাকে প্রাণদণ্ড দিতে চায়। নতুবা রাজাকে ঘিরে রাজতন্ত্রী ষড়যন্ত্র চলবে বলে তারা আশঙ্কা করত। প্যারিস কমিউন ও জ্যাকোবিনরাই ছিল দেশের ভাগ্যনিয়ন্তা, এই বাস্তব সত্যকে তারা সার মনে করত। পঞ্চমতঃ, জিরণ্ডিন নেত্রী মাদাম রোলাঁ (Roland) ছিলেন উচ্চাকাঙ্খিনী। তিনি জিরণ্ডিন নেতা ড্যান্টন (Danton—উচ্চারণ দাঁত) ও ভার্জিন্যু(Vergniand)কে সহ্য করতে পারতেন না। ড্যান্টন ছিলেন স্বভাব বাগ্মী। সাঁকুলেৎ ও সাধারণ লোকেদের তাঁর বাগ্মীতা দ্বারা তিনি মোহিত করতে সক্ষম ছিলেন। কিন্তু তাঁর নীতি ও স্বভাবে ছিল পরস্পর বিরোধিতা। তিনি জিরণ্ডিন ও জ্যাকোবিন গোষ্ঠীব মধ্যে আপোষের জন্যে ব্যর্থ চেষ্টা করেন। জিরণ্ডিনদের শীর্ষ নেতৃত্বের মধ্যে বিবাদ, লক্ষ্য সম্পর্কে মতবিরোধ এবং লক্ষ্যপূরণে একাগ্রতার অভাব তাদের পতন ত্বরান্বিত করে। তুলনামূলকভাবে জ্যাকোবিন দল ছিল অনেক বেশী সংগঠিত। জ্যাকোবিন নেতা রোবসপিয়ের ছিলেন ভয়ানক জেদী এবং বাস্তব বুদ্ধির অধিকারী। ষষ্ঠতঃ, জিরণ্ডিনরা বৈদেশিক যুদ্ধের পক্ষপাতি ছিল। তাদের বক্তব্য ছিল যে, বিপ্লবকে কেবল ফ্রান্সের মধ্যে আবদ্ধ না রেখে, গোটা ইওরোপে ছড়িয়ে দিতে হবে। বৈদেশিক যুদ্ধের মাধ্যমে ইওরোপীয় রাজতন্ত্রের সমাধি রচিত হবে। তাছাড়া তাদের আশা ছিল যে, বৈদেশিক যুদ্ধে জয় হলে তাদের ক্ষমতা বাড়বে। কালোবাজারী ও ঠিকাদার বুর্জোয়ারা যুদ্ধের দ্বারা মুনাফা বাড়াতে চায়। জ্যাকোবিন নেতা রোবসপিয়ের বৈদেশিক যুদ্ধের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি সতর্ক করে দেন যে, যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে সাধারণ লোকের ওপর যুদ্ধের খরচার জন্যে কর বাড়বে। যুদ্ধের ফলে খাদ্যদ্রব্যের দাম বাড়বে ; কালোবাজারী, মজুদদারী বাড়বে। এছাড়া যুদ্ধ বিজয় সেনাপতি সামরিক বিজয়ের দ্বারা জনপ্রিয়তা পাবেন। তিনি গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে স্বৈরতন্ত্র স্থাপন করতে পারেন। প্রাচীন রোমে জুলিয়াস সিজারের দৃষ্টান্তের কথা রোবসপিয়ের স্মরণ করিয়ে দেন।

জাতীয় সম্মেলনের সম্মুখে প্রধান কাজ ছিল রাজতন্ত্রী ও ক্যাথলিক প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে দমন করে বিপ্লবকে দৃঢ় করা। ১৭৯১ খ্রীঃ সংবিধান বাতিল হবার ফলে নতুন সংবিধান রচনা করা। বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থে ১৭৯১ খ্রীঃ সংবিধান রচিত হয়েছিল। এই সংবিধান নাকচ হওয়ায় দুর্বল শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্যে বুর্জোয়া কবলিত শাসনব্যবস্থাকে ধ্বংস করে নতুন সমাজ গড়ার জন্যে জাতীয় সম্মেলনকে লক্ষ্য স্থির করতে হয়।

ডলমীর যুদ্ধে জয়লাভের ফলে জিরণ্ডিনদের ক্ষমতা কিছুকালের জন্যে বাড়ে। ন্যাশন্যাল কনভেনশনে জিরণ্ডিনরা এতে উৎসাহিত হয়ে ১৯শে নভেম্বর প্রস্তাব নেয় যে—(১)যে সকল

ইওরোপের পুনর্গঠন পরিকল্পনা

ইওরোপীয় জাতি স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের হাত থেকে স্বাধীনতা (Liberty চায় বিপ্লবী সরকার তাদের সহায়তা দিবে। (২) ইওরোপের যে সকল অঞ্চল ফ্রান্সের বিপ্লবী সরকারের সেনাদল অধিকার করবে, সেখানকার জনগণকে মুক্তিদান করা হবে। এজন্য সেই অধিকৃত অঞ্চল থেকে সামন্ততন্ত্র, ভূমিদাস প্রথা, টাইদ বা গীর্জাকর, গিল্ড লোপ করা হবে। সেই সকল অঞ্চলে জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত সরকার স্থাপন করা হবে। (৩) এই অঞ্চলের রাজতন্ত্রী সরকার ও সমর্থকদের সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে ফরাসী সরকার দখল নিবেন। (৪) ফরাসী সরকার কর্তৃক নিযুক্ত জাতীয় কমিশন অধিকৃত অঞ্চলে নির্বাচন পরিচালনা, নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা শাসন সংগঠনের কাজ পরিচালনা করবে। এই ১৯শে নভেম্বরের ঘোষণা ইওরোপে ফরাসী বিপ্লবকে প্রসারিত করে। নেপোলিয়নের ইওরোপে পূণর্গঠনের নীলনক্সা এই ঘোষণায় রচনা করা হয়।

জাতীয় সম্মেলন রাজা ষোড়শ লুইকে দেশদ্রোহী ঘোষণা করে তাঁর বিচার করে। রাজা জীবিত থাকলে তাঁকে সিংহাসনে পুনঃস্থাপনের জন্যে চক্রান্ত চলতে পারে এই আশঙ্কায় উগ্রপন্থীরা তাঁর প্রাণদণ্ডের জন্যে ব্যগ্র হয়। জিরন্ডিষ্টরা রাজার প্রাণদণ্ডের ন্যায় চরম ব্যবস্থার পক্ষপাতী ছিল না। কিন্তু জ্যাকোবিন দল রাজার প্রাণদণ্ডের জন্যে জেদ প্রকাশ করে। রোবসপিয়ের দাবী করেন যে, যেহেতু জনসাধারণ রাজা ষোড়শ লুইকে দেশদ্রোহী মনে করে পদচ্যুত করেছে সেহেতু তাঁর আর বিচারের দরকার নেই। তাঁর সরাসরি প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত। জিরন্ডিষ্ট দল রাজার বিচার করে শাস্তিদানের দাবী জানায়। রাজাকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হবে কিনা তা স্থির করার জন্যে তারা গণভোট দাবী করে। কিন্তু এই প্রস্তাব তারা পাশ করাতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত স্থির হয় যে, ন্যাশন্যাল কনভেনশনে ষোড়শ লুইকে অভিযুক্ত করে তাঁকে ত্যাগ করবে। এই ব্যবস্থার ফলে রাজাকে বৈদেশিক শক্তির সঙ্গে চক্রান্তের অভিযোগে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। জাতীয় সম্মেলনে মাত্র ১টি ভোটের গরিষ্ঠতায় রাজার প্রাণদণ্ডাদেশ কার্যকরী করা হয়। ২১শে জানুয়ারি, ১৭৯৩ খ্রীঃ ষোড়শ লুই দার্শনিক নিস্পৃহতায় ও আত্মমর্যাদা সহকারে বধ্যভূমিতে প্রাণ বলি দেন। রাজা ষোড়শ লুইয়ের হত্যা ফ্রান্সের ভেতর এবং বাইরে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। আপাতদৃষ্টিতে ফ্রান্সের সাধারণ লোকদের নীরবতা প্রমাণ করে যে জাতি রাজতন্ত্রের পতনকে গুরুত্ব দেয়নি। হয়তো তারা এটাকে অবধারিত মনে করত। কিন্তু যারা রাজতন্ত্রের সমর্থক ছিল তারা এই হত্যার জন্যে ক্ষিপ্ত হয়। প্রজাতন্ত্রের প্রতি তারা বদ্ধমূল ঘৃণা পোষণ করে। দেশের ভেতর গৃহযুদ্ধের জমিন তৈরি হয়। ফ্রান্সের বাইরে রাজতন্ত্রী ইওরোপে শিহরন দেখা দেয়। ষোড়শ লুই-এর শোচনীয় হত্যার ফলে, ইওরোপের রাজতন্ত্রী সরকারগুলি ফ্রান্সের প্রজাতন্ত্রকে উচিত শিক্ষা দিতে মনস্থ করে।

ষোড়শ লুইয়েব প্রাণদণ্ড

জাতীয় সম্মেলন সরকারি প্রশাসনের কাজ চালু রাখার জন্যে আপাততঃ একটি কাজ চলা ব্যবস্থা নেয়। তারা সাধারণ নিরাপত্তা সমিতি (A Committee of General Defence) নামে একটি সমিতিকে যতদিন না সংবিধান রচিত হয়, ততদিন কাজ চালাতে দায়িত্ব দেয়। বৈদেশিক যুদ্ধ চালাবার জন্যে জাতীয় সম্মেলন ৩ লক্ষ সেনার একটি বাহিনী গড়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এই সেনাদলে বাধ্যতামূলকভাবে নাম লেখাবার জন্যে প্রদেশে আদেশ পাঠান হয়। ইতিমধ্যে হল্যান্ডে নিয়ার উইন্ডেনের যুদ্ধে ফরাসী বিপ্লবী বাহিনীর সেনাপতি দ্যুমারিয়েৎস অষ্ট্রিয়া সেনাপতি কোবার্গের হাতে পরাজিত হন। এই পরাজয়ের ফলে জাতীয় সম্মেলনে তীব্র মতবিরোধ দেখা দেয়। দেশের ভেতরেও অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। এ্যাসাইন্যাট নামে কাগজের মুদ্রার দাম পড়ে গেলে পুনরায় মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। ধনী কৃষকরা খাদ্যশস্য বিক্রি কমিয়ে দেয়। লোকে খাদ্য সঙ্কটের ভয়ে ভীত হয়ে দেশের ভেতর খাদ্য চলাচলে বাধা দিতে

থাকে। প্যারিসে সাঁকুলেতরা ধনী বুর্জোয়াদের গৃহ ও জমি আক্রমণ শুরু করে। এই পরিস্থিতিতে জ্যাক রুৎ (Gaeques Roux) নামে ভূতপূর্ব কৃষক বিদ্রোহের এক নেতা প্যারিসের সাঁকুলেৎ জনতার বিপ্লবী সংগঠন গড়ার চেষ্টা করেন। এই রাগী জনতার নাম ছিল এনরেজেস (Enrages)। জ্যাক রুৎ কার্ডলিয়ার ক্লাবের নেতৃত্ব দখল করে নেন। জ্যাক রুৎ শুধু গরম বক্তৃতা দিয়ে ক্ষান্ত থাকেননি। সাঁকুলেৎদের তিনি দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও গুদাম লুঠের জন্যে উৎসাহ দেন। এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে জ্যাকোবিনরা 'এনরেজেস' বা রাগী জনতার সাহায্যে আপোষপন্থী ও প্রতিদ্বন্দ্বী জিরণ্ডিনদের উচ্ছেদ করার সঙ্কল্প নেয়।

ফ্রান্সের একটি নতুন সংবিধানের খসড়া জিরণ্ডিনরা তৈরি করেছিল। জিরণ্ডিনদের নিজেদের মতভেদ ও পারস্পরিক ঝগড়ার ফলে প্রস্তাবিত সংবিধানের ৩৬৮টি ধারার মধ্যে মাত্র ৬টি ধারা জাতীয় সম্মেলনে নিয়ম মাফিক আলোচিত হয়। সংবিধান রচনার কাজে ঢিলা পড়ে। কিন্তু জ্যাকোবিনবা ছিল সংগঠিত। তারা একটি পাল্টা খসড়া সংবিধান দ্রুত তৈরি করে জাতীয় সম্মেলনে তা পেশ কবে দেয। ১৭৯৩ খ্রীঃ এই খসড়াটিই সংবিধান রূপে গৃহীত হয়। সংবিধানটিকে কার্যকরী করা যাযনি। কারণ ফ্রান্সে গভীর অরাজকতা ও গৃহযুদ্ধ দেখা দিলে, সংবিধান মুলতুবী রেখে "সন্ত্রাসের শাসন" (Reign of Terror) নামে এক জরুরী আপৎকালীন শাসন চালু করা হয়। কাজেই সংবিধানটিব বাস্তব মূল্য বিশেষ ছিল না। তবে জ্যাকোবিন দল এই সংবিধানের নীতিগুলিকে তাদের প্রচারের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। সংবিধানে বলা হয় যে ঃ—(১) ফ্রান্স একটি প্রজাতন্ত্রে পরিণত হল। (২) প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের ভোটে নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা ফ্রান্সে একটি এক কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা গঠিত হবে। এই আইনসভাই হবে জাতির সার্বভৌম ক্ষমতার প্রতীক। (৩) আইনসভা দু ধরনের আইন রচনা করতে পারবে, যথা—(ক) আদেশনামা বা ডিগ্রী। এইগুলির দ্বারা সরকার পরিচালনা অথবা কর ব্যবস্থা, অথবা প্রশাসনিক ব্যবস্থার জন্যে আইন রচনা করা যাবে। (খ) মৌলিক আইনবিধি বা (Fundamental Law) এই আইন আইনসভা পাশ করলেও, তা জনসাধারণের মতামত নিয়ে প্রয়োগ করা বাধ্যতামূলক। এজন্যে এই আইনগুলিকে কার্যকর করতে গণভোটে জনমত যাচাই করতে হবে। (৪) সংবিধান পরিবর্তন করতে হলে গণভোটে মত যাচাই করতে হবে। (৫) প্রশাসনিক কাজ চালাবার জন্যে ২৪ জন নির্বাচিত সদস্যের একটি সমিতি বা মন্ত্রীসভা থাকবে। (৬) গণভোটের দ্বারা নির্বাচিত ৮০জন সদস্যের একটি প্যানেল আইনসভা স্থির করবে। এর মধ্য থেকে যে ২৪ জন সার্বোচ্চ ভোট আইনসভার সদস্যদের কাছ থেকে পাবে, তারা মন্ত্রীসভা বা প্রশাসনিক সমিতি গড়বে। (৭) এই মন্ত্রীসভা তার কাজের জন্যে আইনসভার কাছে দায়ী থাকবে। (৮) সংবিধানে নাগরিকের কয়েকটি মৌলিক অধিকার ঘোষণা করা হয়, যথা—(ক) যারা নিজ নিজ ধর্ম স্বাধীনভাবে পালনের অধিকার; (খ) কর্মের অর্থাৎ জীবিকার অধিকার; (গ) বিকলাঙ্গ বা অক্ষম লোকদের পালন রাষ্ট্রের কর্তব্য বলা হয়। (ঘ) নাগরিকদের শিক্ষার অধিকার স্বীকার করা হয়। এই সংবিধান সম্পর্কে ঐতিহাসিক ফিশার মন্তব্য করেছেন যে—"বিপ্লব বিশেষ অধিকার ধ্বংস করে, কিন্তু সম্পত্তির অধিকারে হাত দেয়নি" (The Revolution destroyed privileges not property)। জ্যাকোবিনরা দরিদ্রদের বন্ধু বলে দাবী করলেও তারা প্রকৃত সমাজতন্ত্রী ছিল না। তারা সম্পত্তির অধিকারকে এই সংবিধানে নস্যাৎ করার কোন চেষ্টা করেনি। ফলে সমাজে ধনবণ্টনের কোন পরিকল্পনা তারা নেয়নি।

যাই হোক, ইতিমধ্যে জ্যাকেবিন দল, জাতীয় সম্মেলনে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকলেও প্রতিদ্বন্দ্বী জিরণ্ডিনদের বিতাড়িত করে ক্ষমতা দখলের কাজে নেমে পড়ে। যুদ্ধে পরাজয়ের সংবাদ আসায় জিরণ্ডিনরা দুর্বল হয়ে পড়ে। জ্যাকেবিনরা মনে করত যে, বিপ্লবকে তাদের

পরিকল্পিত পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে জিরণ্ডিনরা হল প্রধান বাধা। ১৭৯২ খ্রীঃ যেভাবে আইনসভা বা লেজিলেটিভ এ্যাসেম্বলীকে ভাঙা হয়, সেই একই কায়দায় এবারে জাতীয় সম্মেলন থেকে জিরণ্ডিন নেতাদের বহিস্কারের পরিকল্পনা জ্যাকোবিনরা নেয়।[১] জাতীয় সম্মেলনকে রক্ষা করে, এই সভাকে জিরণ্ডিন প্রাধান্যমুক্ত করাই ছিল তাদের লক্ষ্য। জাঁ পল মারা (Jean Paul Marat) জাতীয় সম্মেলনে যে সকল সদস্য রাজার প্রাণদণ্ডের বিরোধিতা করে, তাদের গ্রেপ্তারের দাবী তোলেন। সেই ধূয়া ধরে প্যারিসের ৩৩টি section থেকে সাঁকুলেৎ জনতা হ্যানরি ওটের (Hanriot উচ্চারণ আরিত্তত) নেতৃত্বে ২রা জুন গরম মাথা চীৎকারশীল সাঁকুলেৎ জনতা টুইলারিজ প্রাসাদ, যেখানে জাতীয় সম্মেলনের অধিবেশন চলছিল, তা ঘেরাও করে উগ্র জিরণ্ডিন সদস্যদের গ্রেপ্তারের দাবী জানায়। শেষ পর্যন্ত রোবসপিয়েরের সহযোগী কুথনের (Couthon) প্রস্তাব অনুসারে ২৯জন জিরণ্ডিন সদস্য ও ২জন মন্ত্রীকে বহিস্কার ও গ্রেপ্তার করা হয়। এই Purge বা বহিস্কারের ফলে জিরণ্ডিনরা ভেঙে পড়ে। জাতীয় সম্মেলনে জ্যাকোবিন প্রাধান্য স্থাপিত হয়। জিরণ্ডিন দল দ্রুত ভাঙতে থাকে। ক্ষমতা হাতে আসার পর প্যারিসের section গুলিকে হাতে রাখার জন্যে জ্যাকোবিন া আদেশ দেয় যে, বিপ্লবী মিছিলকারীদের মিছিলের দরুন প্রত্যহ ৪০ স্যু ক্ষতিপূরণ দেওয়া বে। এতে সন্তুষ্ট হয়ে মিছিলকারীরা তাদের বিদ্রোহী সমিতি ভেঙে দেয়।

২রা জুনের অভ্যুত্থান ও জিরণ্ডিনদের বহিস্কারের পর জ্যাকোবিনরাই বিপ্লবী ফ্রান্সের ভাগ্য নিয়ন্তায় পরিণত হয়। কোব্বানের মতে, তাদের হাতে সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়। শাসনকার্য পরিচালনার জন্যে জ্যাকোবিন দল জননিরাপত্তা সমিতি (Committee of Public Safety) গঠন করে। এই সমিতির বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন ম্যাক্সি মিলিয়ান রোবসপিয়ের। জন নিরাপত্তা সমিতি প্যারিসের section গুলিকে শান্ত করার পর প্রদেশের দিকে দৃষ্টি দেয়। কারণ ফ্রান্সের ওপর প্যারিস কমিউনের প্রাধান্য স্থাপনেব জন্যে প্রদেশে অসন্তোষ দেখা দেয়। এজন্য ৩রা জুন ১৭৯৩ খ্রীঃ ঘোষণা করা হয় যে—(১) দেশত্যাগী অভিজাত বা এমিগ্রিদের বিষয়-সম্পত্তি দরিদ্র কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। (২) কৃষকরা এই জমির দাম ১০ বছরে শোধ করবে। (৩) সামন্ত প্রভুদের বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির জন্যে ক্ষতিপূরণ দানের যে আইন সংবিধান সভা করে তা রদ করা হয়। (৪) সামন্ত প্রভুদের ক্ষতিপূরণ লাভের অধিকার লোপ করা হয়। জাতীয় সম্মেলনের নেতারা আশা করেন যে, এর ফলে প্রদেশের অসন্তোষ দূর হবে। কিন্তু তাঁদের এই আশা ফলবতী হয়নি।

প্রদেশে ফেডারেস (Federes) বা যুক্তরাষ্ট্র পন্থী গোষ্ঠীদের ওপর জিরণ্ডিনদের প্রভাব বেশী ছিল। ফেডারেস পন্থীরা বলত যে, ফ্রান্স একটি যুক্তরাষ্ট্র। প্রদেশের বা ৮৩টি ডিপার্টমেন্টের প্রতিনিধিদের সম্মতিক্রমে শাসন পরিচালনা ও আইন রচনা করতে হবে। প্যারিস কমিউনের ইচ্ছায় দেশ শাসন চলবে না। ঐতিহাসিক কোব্বানের মতে, প্রদেশে এই বিচ্ছিন্নতার জন্যে জননিরাপত্তা সমিতিও দায়ী ছিল।[২] যেভাবে মাউন্টেন বা জ্যাকোবিনরা জিরণ্ডিন ও ব্রিশোবাদীদের বহিস্কার করে জাতীয় সম্মেলন অধিকার করে, তার ফলে গৃহযুদ্ধ দেখা দেয়। দক্ষিণ ফ্রান্সে ন্যাশন্যাল কনভেনশনের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ দেখা দেয়। পশ্চিম ফ্রান্সের লোকেরা ছিল গোঁড়া ক্যাথলিক। এই অঞ্চলে সংবিধান বিরোধী যাজকদের ও রাজতন্ত্রীদেরও প্রভাব বেশী ছিল। ব্রিটানী প্রদেশ ছিল এই প্রতিবিপ্লবীদের হৃদপিণ্ড। ন্যাশন্যাল কনভেনশন তিন লক্ষ সেনা গঠনের জন্যে লাভেঁদ অঞ্চলে বলপূর্বক সেনা সংগ্রহের চেষ্টা করায় ক্যাথলিক

১· Cobban Vol. I.

২· Cobban Vol. I. P. 222.

প্রজারা ক্ষেপে যায়। ক্রমে এই বিদ্রোহ ছাড়িয়ে পড়ে। নন্টস, লায়নস প্রভৃতি শহরে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। লায়নসের বেকার রেশম তাঁতীরা বিদ্রোহে যোগ দেয়। শহরের মেয়রকে বন্দী করা হয়; ২০০ জ্যাকোবিনকে হত্যা করা হয়। প্যারিস থেকে বহিস্কৃত কোন কোন জিরণ্ডিন নেতা এই বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেয়। নর্মাণ্ডী প্রদেশেও বিদ্রোহের আওয়াজ শোনা যায়। ফ্রান্সে এক শ্রেণীর লোক সরকারকে কর দেওয়া বন্ধ করে এবং সেনাদলে যোগ দিতে অস্বীকার করে। দেশের ভেতর এই প্রতিবিপ্লবের সুযোগে উত্তর-পূর্ব ফ্রান্সের সীমান্তে বৈদেশিক আক্রমণকারীরা ঢুকে পড়ে। তুলোঁ বন্দরকে বিদ্রোহীরা ইংরাজ নৌসেনার হাতে তুলে দেয়। খোদ প্যারিস শহরে উগ্র জ্যাকোবিন জাঁ পল মারাকে জনৈকা বিক্ষুব্ধ আততায়িনী ছুড়িকাঘাতে হত্যা করেন। মারার হত্যার ফলে ন্যাশন্যাল কনভেনশনের নরমপন্থী সদস্যরাও চটে যান এবং কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে জ্যাকোবিনদের সুপারিশ মেনে নেয়। এর ফলে ১৭৯৩-এর সংবিধান মুলতুবী রেখে আপৎকালীন জরুরী শাসন চালু করা হয়। এই আপৎকালীন শাসনব্যবস্থাকে সন্ত্রাসের রাজত্ব বলা হয়।

জাতীয় সম্মেলনের নেতারা দেশের এই দারুণ সংকটে উপস্থিত বুদ্ধি হারাননি। তাঁরা বিপ্লবকে রক্ষা করার জন্যে সন্ত্রাসের রাজত্ব বা Reign of Terror চালু করেন। দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয় ও সংবিধান রদ করা হয়। আইনসভার সদস্যদের দ্বারা কয়েকটি কমিটি গঠন করে এদের হাতে সন্ত্রাসের রাজত্ব পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। এই কমিটিগুলির মধ্যে প্রধান কমিটি দুটির নাম ছিল জন-নিরাপত্তা সমিতি (Committee of Public Safety) ও সাধারণ নিরাপত্তা সমিতি (Committee of General Security)। প্রথম সমিতির ৯ জন সদস্য প্রতি মাসে জাতীয় সম্মেলন দ্বারা নির্বাচিত হয়ে ফ্রান্সের শাসনকার্য চালাত। দ্বিতীয় সমিতি পুলিশ ও আইন-শৃঙ্খলার কাজ দেখত। প্রতিবিপ্লবী সন্দেহে বহু লোককে এই দুই সমিতি গিলোটিনে নিহত করলে ফ্রান্সে প্রতিবিপ্লব দমিত হয় (সন্ত্রাসের রাজত্বের বিশদ আলোচনা পরে পৃঃ ৮৭ দেখ)।

সন্ত্রাসের রাজত্ব : জন নিরাপত্ত সমিতি

সন্ত্রাসের রাজত্বের জন্যে স্থাপিত উপরোক্ত দুই সমিতির নিয়ন্ত্রণ ক্রমে রোবসপিয়ের (Robespere) ও তাঁর সহযোগী সাঁ জ্যুস্ত (Saint Just)-এর হাতে চলে যায়। এই দুই প্রধানের তৃতীয় সহকারী ছিলেন কুথো (Cuthon)। এই ত্রিমূর্তির স্বেচ্ছা শাসনের চাপে বহু লোক সন্ত্রাসে প্রাণ হারায়। ঐতিহাসিক ডোন্যাল্ড গ্রীয়ারের মতে ৩৫-৪০ হাজার লোক সন্ত্রাসের বলি হয়। সন্ত্রাসের রাজত্বের শেষদিককে বলা হয় Great Terror বা মহাসন্ত্রাস। রোবসপিয়েরের একনায়কত্বের আমলে এই মহাসন্ত্রাস চলে। ১৭৯৩ খ্রীঃ আগষ্ট থেকে ১৭৯৪-এর জুলাই পর্যন্ত এই মহাসন্ত্রাস চালু ছিল। এর ফলে যেমন প্রতিবিপ্লব দমিত হয়, তেমন বহু সংখ্যক নিরপরাধ ব্যক্তিরও প্রাণ যায়। বৈদেশিক যুদ্ধে ফ্রান্স সাফল্য লাভ করে। আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও বৈদেশিক আক্রমণকারীর হাত থেকে বিপ্লব রক্ষা পায়। ঐতিহাসিক রাইকারের মতে, "সন্ত্রাস বিপ্লবকে রক্ষা করে" (The Terror saved the Revolution)।

সন্ত্রাসের রাজত্বের সুফল

রোবসপিয়েরের নেতৃত্বে পুরাতনতন্ত্রকে পুরোপুরি ধ্বংস করে 'সাম্য' বা Equality স্থাপনের দিকে লক্ষ্য দেওয়া হয়। সন্ত্রাসের শাসন ও ন্যাশন্যাল কনভেনশনের জ্যাকোবিনপন্থী সদস্যরা তাঁদের শাসনকালে বহু মূল্যবান সংস্কার প্রবর্তন করেন। লেফেভারের মতে, ফরাসী বিপ্লবের মহত্তম অধ্যায় এই পর্যায়ে রচিত হয়। গণহত্যার পাশাপাশি ফ্রান্সে স্বাধীনতা ও সাম্যের আদর্শকে প্রতিষ্ঠার জন্যে কনভেনশন কাজ করে।[১] কোব্বানের মতে, সন্ত্রাসের ফলে গোটা

১· Lefebvre.

ফ্রান্সে বিপ্লবের পর কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ফেডারিসরা দমিত হলে প্রদেশের ওপর কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ বাড়ে। ৪ঠা ডিসেম্বর এক আইন দ্বারা কনভেনশন আদেশ দেয় যে সকল শ্রেণীর কর্মচারী ও প্রাদেশিক শাসকরা জননিরাপত্তা সমিতির আদেশ মেনে চলতে বাধ্য থাকবে। নতুবা অবাধ্য কর্মচারীরা গিলোটিনে প্রাণ দিবে। একমাত্র পুলিশ বিভাগ সাধারণ নিরাপত্তা সমিতির নির্দেশ মেনে চলবে। এজন্য বিভিন্ন আইনের প্রচলন করা হয়। (১) দেশত্যাগী অভিজাত বা এমিগ্রিদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে তাহা দরিদ্র নাগরিকদের নিকট বিক্রি করা হয়। (২) বাজেয়াপ্ত জমির দরুন Legislative Assembly জমিদারদের যে ক্ষতিপূরণ বরাদ্দ করে তা লোপ করা হয়। (৩) ধনী ব্যক্তিদের ওপর করভার বাড়িয়ে দরিদ্র ব্যক্তিদের করের হার কমান হয়। (৪) ছোট দোকানদার, ছোট কারখানার মালিক ও কৃষকদের ওপর সরকারি কর কমিয়ে দেওয়া হয়। সাধারণ লোকের সম্পত্তিকে রক্ষার চেষ্টা করা হয়। (৫) পিতার সকল সন্তানদের মধ্যে সম্পত্তি সমানভাবে ভাগ করার আইন করা হয়। কেবলমাত্র জ্যেষ্ঠ পুত্রের অধিকার প্রথা' লোপ করা হয়। (৬) শিশু, বৃদ্ধ ও অসহায় বিধবাদের সরকারি সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। (৭) জন শিক্ষার জন্যে অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের জন্যে আইন করা হয়। (৮) জাতীয় সেনাদলে যোগদান বাধ্যতামূলক করা হয়। (৯) সেনাদলে সামরিক আইন দ্বারা কঠোর শৃঙ্খলা স্থাপন করা হয়। সেনাদের গণতান্ত্রিক চরিত্র রক্ষার দিকে নজর দেওয়া হয়। এর পরিবর্তে নাগরিকদের "সিটিজেন" নামে সম্বোধন করার নির্দেশ দেওয়া হয়।[১] (১০) ল অব ম্যাক্সিমাম দ্বারা জিনিষপত্রের দাম বেঁধে দেওয়া হয়। (১১) ল অব মিনিমাম দ্বারা সর্বনিম্ন মজুরীর হার বেঁধে দেওয়া হয়। এতে গরীব সাঁকুলেতদের বিশেষ উপকার হয়। কাজেই ন্যাশন্যাল কনভেনশনের জ্যাকোবিন প্রজাতন্ত্র আপাততঃ সফলতা পায়।

জাতীয় সম্মেলনের সমাজতান্ত্রিক সংস্কার

এভাবে জাতীয় সম্মেলন (National Convention) ফ্রান্সে "দ্বিতীয় ফরাসী বিপ্লব" (Second French Revolution) সম্পূর্ণ করে। যদিও জাতীয় সম্মেলন সন্ত্রাসের রাজত্বের অপব্যবহারের জন্যে জনপ্রিয়তা হারায় তবুও সাম্য ও স্বাধীনতার আদর্শকে জাতীয় সম্মেলনই প্রকৃত কার্যকরী করার আন্তরিক চেষ্টা করে। ফরাসী বিপ্লবের প্রকৃত মহিমা এই সময়েই বিকশিত হয়। সন্ত্রাসের রাজত্বের রক্তাক্ত উচ্ছ্বাসে জাতীয় সম্মেলনের প্রগতিশীল কাজগুলি চাপা পড়ে গেছে। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখলে বোঝা যাবে যে, ধনী বুর্জোয়াদের কবল থেকে শাসনব্যবস্থাকে মুক্ত করে গণভোট দ্বারা জাতীয় সম্মেলন প্রকৃতপক্ষে বিপ্লবকে সম্পূর্ণতা দান করে।

জাতীয় সম্মেলনেব কৃতিত্ব

জাতীয় সম্মেলনের পতন ঃ থার্মিডরীয় প্রতিক্রিয়া (Fall of the National Convention : Thermidorian Reaction) ঃ সন্ত্রাসের রাজত্বের মাত্রাহীন নিষ্ঠুরতা জাতীয় সম্মেলন ও জ্যাকোবিন দলের জনপ্রিয়তা নষ্ট করে। মাদাম রোল্যান্ড, ড্যান্টন প্রভৃতি বিপ্লবীদের গিলোটিনে হত্যা হতাশা সৃষ্টি করে। লোকে বলতে থাকে যে, "বিপ্লব নিজ সন্তানদের গিলে ফেলছে" (The Revolution is devouring its own children)। রোবসপিয়ের পরিচালিত বিপ্লবী সমিতিগুলির নিষ্ঠুরতায় লোকে শিউরে ওঠে।

তাছাড়া সন্ত্রাসের শাসনের সৃষ্টিকারিনী মাতা জাতীয় সম্মেলন বা ন্যাশন্যাল কনভেনশনকে উপেক্ষা করে জননিরাপত্তা সমিতি রোবসপিয়েরের নির্দেশে চলতে থাকায় কনভেনশনে অসন্তোষ দেখা দেয়। কনভেনশনের বহু সদস্য সন্ত্রাসের রাজত্বের অবসান ঘটাতে সঙ্কল্প করে। তাছাড়া প্রতিবিপ্লব দমিত হওয়ায় এবং বৈদেশিক শত্রুরা পরাজিত হওয়ায় আর সন্ত্রাসের

---

১. Morse Stephens—Revolutionary Europe.

প্রয়োজন ছিল না বলে বহু লোক বলতে থাকে। ২৬শে জুলাই, ১৭৯৪ জাতীয় সম্মেলনের সদস্যরা রোবসপিয়ের ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের গ্রেপ্তারের আদেশ দেয়। রোবসপিয়েরকে আত্মপক্ষ সমর্থনে সভাকক্ষে কথা বলতে দেওয়া হয়নি। প্যারিস কমিউন রোবসপিয়েরের সমর্থক জনতাকে জড় করতে ব্যর্থ হয়। ১০ই তরমিদর রোবসপিয়ের, সাঁ জুস্ত, ক্যথন ও আরও ১৮ জন নেতৃস্থানীয় জ্যাকোবিন নেতাকে গিলোটিনে হত্যা করা হয়। পরদিন রোবসপিয়েরের সমর্থক আরও ৭০ জন প্যারিস কমিউনের নেতাকে হত্যা করা হয়। রোবসপিয়েরের পতনের ফলে সন্ত্রাসের রাজত্বের অবসান ঘটে। মাদেলাঁর মতে, "প্রচন্ড জ্বরের পর, জ্বরের বিরাম হলে রোগী যেমন দুর্বল ও ঝিমধরা হয়, সন্ত্রাসের অবসানের পর ফ্রান্স সেরূপ অবসাদগ্রস্থ হয়ে পড়ে।" ম্যালেট দ্যুপানের মতে, "উন্মাদের মস্তিষ্ক বিকৃতি কেটে গেলে, যুক্তিবোধ ফিরলে, যেরূপ দুর্বল হয়ে পড়ে, ফ্রান্সের সেরূপ অবস্থা হয়" (The nation seems worn out, just as a mad man is worn out, when reason returns)।

জাতীয় সম্মেলন সন্ত্রাস রদ করার জন্যে বিপ্লবী পরিষদ, গণ নিরাপত্তা সমিতি ভেঙে দেয়। ফ্রান্সের জনমত সন্ত্রাসের বিপক্ষে গেলে, কনভেনশনের আদেশে সন্ত্রাস সম্পর্কিত সকল ব্যবস্থার লোপ করা হয়। জাতীয় সম্মেলনে মধ্যপন্থী জিরণ্ডিষ্টরা পুনরায় প্রাধান্য স্থাপন করে। এর ফলে জাতীয় সম্মেলন তার বৈপ্লবিক চরিত্র হারায়। ফ্রান্সের শাসনভার বুর্জোয়া শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। কোব্বানের মতে, "তরমিদরীয় ঘটনা ছিল প্রতিবিপ্লবের জয়।" জ্যাকোবিন বিপ্লব একদা যারা ঘটায় সেই সকল কাঁচামাল মহাসন্ত্রাসে ধ্বংস হয়। এই কাঁচামালেব অভাবে তরমিদরের প্রতিবিপ্লব রোখা যায়নি।

জাতীয় সম্মেলনের বুর্জোয়া চবিত্র

কোবানের মতে, থার্মিডরের প্রতিক্রিয়ার ফলে প্রতিক্রিয়াশীল শাসন ফিরে আসে।[১] সন্ত্রাসের আমলের বহু জনহিতকর আইন রদ করা হয়। (১) সন্দেহভাজন ব্যক্তি যারা কারারুদ্ধ ছিল তাদের মুক্তি দেওয়া হয়। (২) প্যারিসের রাজনৈতিক ক্লাবগুলিকে নিষিদ্ধ করা হয়। (৩) অর্থনৈতিক সংস্কারগুলি লোপ করা হয়। (৪) Law of Maximum বা খাদ্যদ্রব্যের সর্বোচ্চ মুল্য সংক্রান্ত আইন আর কার্যকর ছিল না। এজন্য খাদ্যদ্রব্যের দাম আকাশ ছোঁয়া হয়। (৫) অবাধ বাণিজ্য নীতি গ্রহণ করা হয়। বুর্জোয়াশ্রেণী অবাধে বাণিজ্য ও মুনাফা শিকারের সুযোগ পায়। (৬) সন্ত্রাসের আমলে যারা দণ্ডিত হয় তাদের সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়া হয়। (৭) ধর্মবিশ্বাসী ক্যাথলিকরা রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য জানাবার পর তাদের ধর্মপ্রচারের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

জাতীয় সম্মেলনের প্রতিক্রিয়াশীল আইন

থার্মিডরীয় প্রতিবিপ্লবের ফলে জ্যাকোবিন দমনের জন্যে পাল্টা সন্ত্রাস আরম্ভ হয়। যদি জ্যাকোবিনদের পরিচালিত সন্ত্রাসকে, "লাল সন্ত্রাস" (Red Terror) বলা হয়, এই প্রতিবিপ্লবী সন্ত্রাস ছিল "শ্বেত সন্ত্রাস" (White Terror)। শ্বেত সন্ত্রাসের ফলে ফরাসী বিপ্লবের কাঁচামাল যথা, জ্যাকোবিন ও সাঁকুলেৎ শ্রেণী নিহত হয়।[২] কেরাণী, দোকান কর্মচারী ও বেকার যুবকদের সাহায্যে এক প্রতিবিপ্লবী বাহিনী গঠন করা হয়। এদের চলতি নাম ছিল "মাস্কাদিন" (Masscadin)। মাস্কাদিনদের হাতে প্যারিসের বহু জ্যাকোবিন নিহত হয়। কোম্পানী অফ জিসাস (Company of Jesus) নামে এক ধর্মোন্মাদ গোষ্ঠী গ্রামাঞ্চলে জ্যাকোবিনদের নিহত করে। কিছুকাল পরে 'শ্বেত সন্ত্রাস' থেমে যায়।

শ্বেত সন্ত্রাস

প্রতিবিপ্লবের সুযোগে ব্যবসায়ীরা মুনাফা লুটতে থাকে। এ্যাসাইন্যাট নামক কাগজের

১· Cobban—History of France. P. 27.

২· Madelin—French Revolution.

আমিন্যাল বিপ্লব

নোটের দাম ভয়ানক রকম কমে যায়। কৃষকেরা এই মুদ্রার বিনিময়ে খাদ্য বিক্রয় করতে অস্বীকার করে। ফলে প্যারিসে হাহাকার দেখা দেয়। রুটির দোকানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা আরম্ভ হয়। ১৭৯৫ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে সাঁকুলেৎ শ্রেণী রুটি ও সংবিধানের দাবীতে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বিদ্রোহীরা আইনসভা বা জাতীয় সম্মেলন আক্রমণ করে। কিন্তু কনভেনশনের অনুগত সেনাদল বন্দুকের গুলি বৃষ্টি করে বিদ্রোহীদের হঠিয়ে দেয়। ১৭৯৫ খ্রীঃ ২২শে মে প্যারিসের বিদ্রোহী জনতা কনভেনশনকে পদানত করতে শেষ চেষ্টা করে। ১৭৯৩ খ্রীঃ সংবিধান প্রবর্তন তাদের দাবী ছিল। কিন্তু সেনাদল কামান দেগে জনতাকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করে। প্যারিসের সংগ্রামী জনতার চূড়ান্ত পতন হয়। এরপর তাদের চিহ্ন আর দেখা যায়নি। ফরাসী বিপ্লবের গণ বিপ্লবের অধ্যায় এই রক্তপাতের মধ্যে শেষ হয়। বুর্জোয়া শ্রেণী পুনরায় ক্ষমতা অধিকার করে।

নব সংবিধান ঃ ডাইরেক্টরী

জাতীয় সম্মেলন এর পর নতুন সংবিধান (১৭৯৫ খ্রীঃ) গড়ার কাজে হাত দেয়। এই সংবিধানকে তৃতীয় বর্ষের সংবিধান বলা হয়। এই সংবিধানে গণভোটের মাধ্যমে আইনসভার সদস্য নির্বাচনকে খর্ব করা হয়। সম্পত্তিবান লোকেরাই এর ফলে ভোটাধিকার পায়। সন্দেহভাজন জ্যাকোবিন পন্থীদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হয়। দুই কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা গঠন করার ব্যবস্থা হয়। উচ্চকক্ষের নাম হয় প্রবীন পরিষদ এবং নিম্ন কক্ষের নাম হয় ৫শতের পরিষদ। পাঁচ শতের সভায় পাশ করা আইন প্রবীন পরিষদ অনুমোদন না করলে তা আইন হতে পারবে না বলা হয়। প্রতি কক্ষের $\frac{১}{৩}$ সদস্য এক বছর পর পদত্যাগ করলে নির্বাচন দ্বারা এই শূন্য আসন পূরণের ব্যবস্থা হয়। জাতীয় কনভেনশনের সদস্যারা নিজেদের ক্ষমতা ছাড়তে চাননি। এজন্য এই সংবিধানে বলা হয় যে, কনভেনশনের সদস্যদের মধ্য থেকে নতুন সংবিধানের আইনসভার $\frac{২}{৩}$ সদস্য নিতে হবে। প্রশাসনিক দায়িত্ব ৫ জন ডাইরেক্টরের ওপর ন্যস্ত করা হয়।

সন্ত্রাসের রাজত্বকাল ঃ ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হবার পর আভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক পরিস্থিতি প্রজাতন্ত্রের প্রতিকুল হয়ে ওঠে। ওলারের (Aulurd) মতে, "ইওরোপের রাজতন্ত্রগুলি নবজাত প্রজাতন্ত্রকে ধ্বংস করতে সমুদ্যত হয়।"[১]

বৈদেশিক আক্রমণ

বৈদেশিক শক্তিগুলি প্রথম কোয়ালিশন (First Coalition) বা জোট গঠন করে বিপ্লবী ফ্রান্সকে ধ্বংস করতে চেষ্টা করে। বৈদেশিক আক্রমণকারীদের হাতে বিপ্লবী ফ্রান্সের সেনাদল পরাজয় বরণ করে পিছু হঠতে থাকে। ফ্রান্সের সেনাপতি ডুমারিয়েৎস বিশ্বাসঘাতকতা করে শত্রুপক্ষে যোগ দেন। ফলে শত্রু সেনা প্যারিস নগরীর ১০০ মাইলের মধ্যে এসে যায়। প্রজাতন্ত্র ভয়ানকভাবে বিপন্ন হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে বিপ্লবী সরকারকে আক্রমণকারীদের হাত থেকে রক্ষার জন্যে ফরাসী জনসাধারণের মধ্যে জাগরণ দেখা যায়নি। সাধারণ নাগরিকরা জাতীয় সেনাদলে যোগ দিতে অনাগ্রহ দেখায়। দেশরক্ষার জন্যে ফরাসী জাতি একপ্রাণ, একমন না হয়ে উদাসীন থাকে। জনসাধারণের একাংশ সরকারের বিরুদ্ধে শত্রুপক্ষে যোগ দেয়।

এদিকে দেশের অভ্যন্তরে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি প্রজাতন্ত্রকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়। ফ্রান্সের ব্রিটানী প্রদেশের লা ভেঁদ[২] অঞ্চলে প্রচণ্ড কৃষক বিদ্রোহ দেখা দেয়। এই কৃষকেরা বিরোধী ধর্মযাজকদের প্ররোচনায় প্রজাতন্ত্রী সরকারকে অস্বীকার করে। তারা সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস করে এবং কর দেওয়া বন্ধ করে। অনেকে মনে করেন যে, এই বিদ্রোহের পশ্চাতে

১. Aulurd—French Revolution.

২. ফরাসী উচ্চারণ ল ভাঁদ।

লা ভেন্ডির বিদ্রোহ

রাজতন্ত্রীদের প্রভাব ছিল। এই সঙ্গে লায়নস, তুলোঁ, বোর্দো প্রভৃতি শহরগুলিতেও সরকার বিরোধী অভ্যুত্থান ঘটে। বুর্জোয়া শ্রেণী এই বিদ্রোহে ইন্ধন দেয়। প্রজাতন্ত্রী সরকার মুনাফা বিরোধী আইন পাশ করায় বুর্জোয়া স্বার্থে আঘাত পড়ে। এভাবে ফ্রান্সের গ্রামাঞ্চলে ও শহরাঞ্চলে প্রজাতন্ত্রী শাসনের বিরোধী শক্তি মাথা তুলে। বিপ্লবী নেতা জাঁ পল মারাকে আততায়ী হত্যা করে।

সন্ত্রাসের উদ্ভব

ফ্রান্সের সীমান্তে শত্রুসেনা ও দেশের ভেতর প্রতিবিপ্লবী বিদ্রোহের সম্মুখীন হয়ে জাতীয় সম্মেলনের নেতারা প্রজাতন্ত্র রক্ষার জন্যে সঙ্কল্প নেন। তাঁরা এক জরুরী বা আপৎকালীন শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। এর নাম ছিল সন্ত্রাসের রাজত্ব (Reign of Terror)।

জন-নিরাপত্তা সমিতি ও সন্ত্রাসের গঠন

ন্যাশনাল কনভেনশন বা জাতীয় সম্মেলনের হাতে আইনতঃ জাতির প্রতিনিধিসভা হিসেবে চূড়ান্ত ক্ষমতা ছিল। কিন্তু জাতীয় সম্মেলনের তরফে সন্ত্রাসের শাসন চালু রাখার জন্যে কয়েকটি সমিতি সম্মেলনের সদস্যদের দ্বারা গঠন করা হয়। এই সমিতিগুলির মধ্যে জন নিরাপত্তা সমিতি (Committee of Public Safety) ছিল প্রধান। কনভেনশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৯ জন সদস্য নিয়ে এই সমিতি গড়ার ব্যবস্থা করা হয়। এই সদস্যদের প্রতি মাসে কনভেনশন নির্বাচন করবে বলা হয়। কার্যতঃ কনভেনশনের মুখ্য জ্যাকোবিন নেতারা জন নিরাপত্তা সমিতির সদস্যপদ ধারাবাহিকভাবে অধিকার করেন। এই সমিতির সভ্যরা ফরাসী জাতির ওপর দন্ডমুন্ডের ক্ষমতা লাভ করে। জন নিরাপত্তা সমিতি মন্ত্রীদের নিয়ন্ত্রণ করত, সেনাপতিদের নিয়োগ করত, বৈদেশিক নীতি স্থির করত। মূল নীতি নির্ধারণের ক্ষমতা এই সমিতির হাতে দেওয়া হয়। এই সমিতির হাতে সর্বোচ্চ প্রশাসনিক ক্ষমতা দিয়ে শাসন ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত করা হয়। এছাড়া সাধারণ নিরাপত্তা সমিতি (Committee of General Security) নামে আর একটি সমিতির হাতে পুলিশ বিভাগীয় ক্ষমতা দেওয়া হয়। আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষা, আইন-শৃঙ্খলা স্থাপন, পুলিশ বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি দায়িত্ব এই সমিতি পালন করে। সন্দেহভাজন প্রতি বিপ্লবীদের দমনের জন্যে বিপ্লবী বিচারালয় (Revolutionary Tribunal) স্থাপন করা হয়। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের এই বিচারালয়ের সাহায্যে দ্রুত দন্ডদানের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া গ্রামাঞ্চলে কনভেনশনের সদস্যদের দ্বারা গঠিত কয়েকটি ভ্রাম্যমান সমিতি পাঠিয়ে সন্ত্রাস চালু করা হয়।

সন্ত্রাসের আইন এবং গঠনমূলক কাজ

কনভেনশন বা জাতীয় সম্মেলনই ছিল দেশের সার্বভৌম প্রতিনিধি সভা। এজন্য জাতীয় সম্মেলন কয়েকটি আইন পাশ করে। এই আইনগুলি ছিল যথা, সর্বোচ্চ মূল্যের আইন (Law of Maximum), বাধ্যতামূলকভাবে সেনাদলে যোগ দেওয়ার আইন (Law of Conscription), সন্দেহের আইন (Law of Suspects) অনুযায়ী সন্দেহভাজন যে কোন প্রতিবিপ্লবী এবং কালোবাজারীকে গ্রেপ্তার করে বিপ্লবী বিচারসভায় অভিযুক্ত করে শাস্তি দেওয়া যেত। কনভেনশন জন-নিরাপত্তা সমিতিকে এই আইনগুলিকে কার্যকরী করার দায়িত্ব দেয়। জন-নিরাপত্তা সমিতি তার সহকারী সমিতিগুলোর সাহায্যে এই আইনগুলিকে প্রয়োগ করে। সন্দেহের আইনের বলে কোন ব্যক্তি গ্রেপ্তার হলে বিপ্লবী আদালত তার বিচার করে কঠোর শাস্তিদানের ব্যবস্থা করা হয়। ১৭৯২ খ্রীঃ হতে ১৭৯৩ খ্রীঃ জিরন্ডিষ্ট ও জ্যাকোবিন দল একযোগে সন্ত্রাসকে কার্যকরী করে। কিন্তু জিরন্ডিষ্টদের মধ্যপন্থা বুর্জোয়া ঘেঁষা নীতি জ্যাকোবিনদের পছন্দ হয়নি। ১৭৯৩ খ্রীঃ গোড়ার দিকে জ্যাকোবিন দল সন্ত্রাসের সাহায্যে জিরন্ডিষ্টদের দমিয়ে ফেলে। (আগে ন্যাশনাল কনভেনশনের কার্যাবলী শীর্ষক অধ্যায়— জিরন্ডিষ্ট বহিষ্কার—বিশদ বিবর ণ ৮১ পৃঃ।)

এর ফলে ফ্রান্সে জ্যাকোবিন দলের একাধিপত্য স্থাপিত হয়। জ্যাকোবিন নেতা রোবসপিয়ের, সাঁ জুস্ত, ক্যুথন, অরিয়েঁৎ (Henriot), এবার (Hebert) প্রভৃতি সন্ত্রাসের শাসনের ওপর তাঁদের নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করেন। এঁদের মধ্যে এবারপন্থী বা এবারবাদী (Hebertist) রা ছিল ভয়ানক উগ্র। রোবসপিয়ের অপেক্ষাও এবারবাদীরা ছিল বেশী উগ্রপন্থী। প্যারিসের section গুলির ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ থাকায় তাদের দমন করা সহজ কাজ ছিল না। এই উগ্রপন্থীরা সন্ত্রাসের সাহায্যে বিপ্লবকে তাদের লক্ষ্যে নিয়ে যেতে চায়। জ্যাকোবিন নেতারা বিশেষতঃ রোবসপিয়ের পরিবর্তনকামী; তিনি সীমিত পরিবর্তন চাইতেন। জিরণ্ডিনরা রাজনৈতিক বিপ্লবের পর স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে চান। কোব্বান বলেছেন যে, জন-নিরাপত্তা সমিতি ও ন্যাশনাল কনভেনশনের প্রধান সমস্যা ছিল প্যারিসের হিংস্রজাতি সম্পর্কে তারা কি দৃষ্টিভঙ্গি নেবে তা স্থির করা। যেহেতু জ্যাকোবিন নেতারা আইনসভা অপেক্ষা প্যারিসের জনতার ওপর বেশী নির্ভবশীল ছিল, সেহেতু তারা তাদের দাবীগুলিকে নস্যাৎ করতে পারেনি। জ্যাকোবিন দল একচেটিয়া ক্ষমতা পাওয়ার পর প্যারিসের জনতাকে নিয়ন্ত্রণে আনার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পাবে। আপাততঃ প্যারিসেব বিপ্লবী জনতাকে দৈনিক ৪০ ফঁা ক্ষতিপূরণ দিয়ে শান্ত করা হয়।

১৭৯৩ খ্রীঃ থেকে সন্ত্রাসের রাজত্বে ভয়ঙ্করতা বাড়তে থাকে। জ্যাকোবিন দল এই সময়ে সন্ত্রাসের সহায়তায় বিপ্লব বিবোধীদের ধ্বংস করে। তারা সাফল্যের সঙ্গে বৈদেশিক যুদ্ধ চালায়।

সন্ত্রাসেব দ্বিতীয় পর্যায় ঃ ভয়ঙ্কবতা বৃদ্ধি

সেনাপতি কার্ণোৎ (Carnot) বৈদেশিক যুদ্ধে সফলতা পান। শাস্তির ভযে লোকে সেনাদলে যোগ দেয় এবং সরকারি আইন মেনে চলে। সবকাবকে নিযমত কব আদায় দিতে থাকে। দেশত্যাগী এমিগ্রিদের ভূ-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। লা ভেদ, লায়নস, বোর্দো শহরের প্রতিবিপ্লব দমন করে জ্যাকোবিন আধিপত্য স্থাপন করা হয়। মফঃস্বলে জ্যাকোবিন কমিশন পাঠিয়ে বিবোধীদের ধ্বংস করা হয। বহু জিরন্ডিষ্ট ও রাজতন্ত্রবাদীকে গিলোটিনে হত্যা করা হয়। এবের (Hebert) পন্থীদের পশ্চাতে প্যারিসের section গুলির সমর্থন থাকায় তাদের অগ্রাহ্য করা সহজ ছিল না। এবেরপন্থীরা (Hebertist) দাবী করে যে Law of Suspects বা সন্দেহের আইনকে ব্যাপক প্রয়োগ করে সন্দেহভাজন প্রতিবিপ্লবীকে ধ্বংস করতে হবে। বৈদেশিক যুদ্ধ ঠিকমত চালু রাখতে হবে। Law of Maximum বা দ্রব্যমূল্য আইনকে কঠোরভাবে প্রয়োগ করে জিনিষপত্রের দাম বাঁধতে হবে। আইনভঙ্গকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। সাধারণ নিরাপত্তা সমিতির হাতে পুলিশ ও আইন-শৃঙ্খলার ভার আছে। এই সমিতিকে কার্যকরী হতে হবে। রাণীর দেশ ছেড়ে পালাবার ষড়যন্ত্র আবিষ্কৃত হলে সাধারণ নিরাপত্তা সমিতির ওপর চাপ বাড়তে থাকে। ন্যাশনাল কনভেনশনে জ্যাকোবিনরা এবং জন নিরাপত্তা সমিতিব জ্যাকোবিন সদস্যরা এবেরপন্থীদের চাপে ধনী ব্যক্তিদের কাছ থেকে এক কোটি টাকা বাধ্যতামূলক ঋণ হিসেবে সরকারকে দিতে বাধ্য হয়। বিপ্লবী বিচারালয়কে উগ্রপন্থীদের দাবীমত বিচারের কাজে খুঁটিনাটি বিষয় ছেড়ে দ্রুত শাস্তিদানে বাধ্য করা হয়। সন্দেহের আইন বা ল অফ সাসপেক্টস (Law of Suspects) ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করে, যে কোন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে দমন করা হয়। রানী মারিয়া এ্যান্টোনেট, মাদাম রোলাঁ, ডিউক অফ আর্লিয়েন্স প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তিদের গিলোটিনে হত্যা করা হয়। ক্যারিয়ের নামক জনৈক জ্যাকোবিন নেতার নির্দেশে লায়ন্স শহরের লয়ার নদীর জলে সন্দেহভাজন বিদ্রোহীদের পাইকারীভাবে হত্যা করা হয়। লয়ার নদীর জল মৃতদেহের পচনের ফলে দূষিত হয়।[১] মর্সস্টিফেনসের মতে, গড়ে প্রতি সপ্তাহে ১৯৪ জন ব্যক্তিকে সন্ত্রাসের দ্বারা হত্যা করা হয়। ১৭৯৪ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে বিপ্লবী নেতা ড্যান্টনের গিলোটিন দ্বারা শিরচ্ছেদ করা হয়। ড্যান্টন

১· Robinson and Beard—Documents of European History. Vol II.

বিপ্লবের প্রতি একনিষ্ঠ ছিলেন না বলে রোবসপিঁয়ের সন্দেহ করেন। ড্যান্টন তাঁর মৃত্যুদণ্ডের সময় প্রতিদ্বন্দ্বী রোবসপিয়েরকে সতর্ক করে বলেন যে, "দুষ্ট রোবসপিয়ের, তোমার শির, আমার শিরের পিছু নিয়ে শীঘ্র ঝুড়িতে পড়বে, অপেক্ষা কর" (Vile Robespierre, Thy head shall follow mine to the basket)।

ড্যান্টনের মৃত্যুর পর, সন্ত্রাসের রাজত্ব ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। এই সময় রোবসপিয়ের একচ্ছত্র ক্ষমতা লাভ করেন। তিনি বিপ্লবকে তাঁর অভিপ্সীত রূপ দানের জন্যে মহাসন্ত্রাস গ্রহণ করেন। ১৭৯৩ খ্রীঃ সেপ্টেম্বর থেকে ১৭৯৪ খ্রীঃ পর্যন্ত রোবসপিয়েরের নেতৃত্বে মহাসন্ত্রাস চলে। এই পর্যায়ে রাজনৈতিকভাবে শুধু বিরোধীদের গিলোটিনে নিশ্চিহ্ন করা হয়নি। বহু ব্যক্তি নিছক সন্দেহের বলি হয়ে প্রাণ দেয়। সমালোচকদের মতে এই পর্যায়ে সন্ত্রাসের আদৌ কোন প্রয়োজন ছিল না। কারণ তখন দেশের ভেতর প্রতিবিপ্লবীরা এবং বৈদেশিক আক্রমণবাদীরা সম্পূর্ণ পর্য্যুদস্ত হয়েছিল। রোবসপিয়ের সন্ত্রাসের সাহায্যে তাঁর একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে বিপ্লবকে এক মহৎ লক্ষ্যে নিয়ে যেতে চান। এই পর্যায়ে ক্ষেতের ফসলের মত মানুষের মাথা কাটা পড়ে (Harvest of human heads)। শুধু সন্দেহের আইনে ৪৫২৫ জন বন্দী হন। ঠিক কত লোক নিহত হন তা বলা যাবে না। ডোন্যাল্ড গ্রীয়রের মতে ৩৫-৪০ হাজার লোক বিনা বিচারে নিহত হন। বিপ্লবী বিচারালয়ে ১৭৯৩ খ্রীঃ মার্চ থেকে ১৭৯৪ খ্রীঃ জুলাই পর্যন্ত ১৩,৮৬৪ কে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। এই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত লোকেদের মধ্যে অভিজাত ৮½%, যাজক ৩½%, বুর্জোয়া ২৫%, কৃষক ২৮%। বেশীর ভাগ হতভাগ্য তৃতীয় শ্রেণীর লোক। যাদের জন্যে বিপ্লব, তারাই সন্ত্রাসের বলি হয়। মহাসন্ত্রাসের আমলে কমিউনগুলির হাতে প্রচুর ক্ষমতা দেওয়া হয়। তারা খাদ্য সরবরাহ ও বন্টনের দায়িত্ব পায়। এই সময় Bread card বা পারিবারিক খাদ্য বরাদ্দের টিকিট চালু হয়। সেকসনে সেকসনে ব্যবসায়ী ও মজুদদারদের গুদাম, ঘরবাড়ি সাধারণ লোকেরা তল্লাসী করে। মজুদদারদের নিগৃহীত, এমনকি প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। Law of Maximum বা সর্বোচ্চ মূল্য দৃঢ়ভাবে চালু করা হয়। দশমিক প্রথায় ওজন, মাপ ও দশমিক মুদ্রা চালু করা হয়। মজুরীর নিম্নতম হার বেঁধে দেওয়া হয়। খ্রীষ্টিয় বর্ষপঞ্জী বাতিল করে ফুল-ফল- গাছপালার নামে নতুন মাসের নাম যুক্ত বর্ষ পঞ্জী চালু করা হয়। খ্রীষ্টধর্মের প্রতি আস্থা লোপ পায়। রোবসপিয়ের এক নতুন ধর্মমত প্রবর্তন করার উদ্যোগ নেন। তিনি বুঝেছিলেন যে প্রাচীন ধর্মকে লোপ করা হলে তার স্থানে নৈতিক নিয়মকে চালু রাখার জন্যে নতুন বিধান প্রবর্তন করা দরকার। নীতিবোধ ভেঙে গেলে সমাজ ও সভ্যতা ভেঙে যাবে। এজন্য তিনি Supreme Being বা পরম পুরুষের উপাসনা প্রবর্তনের চেষ্টা করেন। রোবসপিয়ের এইসঙ্গে হঠকারী ও অতি উগ্রপন্থী বিপ্লবীদের গিলোটিনে পাঠান। ১৭৯৪-এর জুন মাসে রোবসপিয়ের একটি আইন দ্বারা Summary Trial চালু করেন। কোন ব্যক্তি অভিযুক্ত হয়ে গ্রেপ্তার হলে, তাঁর তথাকথিত অপরাধের জন্যে বিপ্লবী বিচারালয়ে সাক্ষী-সাবুদ গ্রহণ নাকচ করা হয়। অভিযুক্তদের পক্ষে সাওয়াল করার জন্যে উকিল নিয়োগ নিষিদ্ধ হয়। অভিযুক্তকে জেরা করাও বিচারকের ইচ্ছাধীন করা হয়। ১০ই জুনের আইনের বলে রোবসপিয়েরের একনায়কতন্ত্র দৃঢ় হয় বলে অভিযোগ ওঠে। রোবসপিয়েরের বিরুদ্ধে ন্যাশানাল কনভেনশন ও জননিরাপত্তা সমিতির অন্যান্য সদস্যরা প্রতিবাদী হন। শেষ পর্যন্ত ন্যাশনাল কনভেনশন রোবসপিয়েরের মৃত্যুদণ্ডের বিধান দেয়।

রোবসপিয়েরের স্বৈরতন্ত্র

সন্ত্রাসের যৌক্তিকতা বিচার : ১৭৯৪ খ্রীঃ জুলাই মাসে রোবসপিয়েরের মৃত্যুর পর সন্ত্রাসের শাসনের অবসান হয়। সন্ত্রাসের শাসনের বিরুদ্ধে দক্ষিণপন্থী লেখকেরা বহু যুক্তি দেখান। তাঁদের মতে, "সন্ত্রাসের দ্বারা বিপ্লব তার নিজ সন্তানদের গিলে ফেলে"; প্রকৃত বিপ্লবী ও বহু সর্বহারা সন্ত্রাসের বলি হন। (The Revolution devoured its own children)। মাদাম

রোলাঁ, ড্যান্টন প্রভৃতি বিপ্লবীরাও সন্ত্রাসের কবল হতে রক্ষা পাননি। মাদাম রোলাঁ এজন্য আক্ষেপ করে বলেন যে, "হায় স্বাধীনতা, তোমার নাম নিয়ে কত অনাচার না করা হচ্ছে" (Liberty, How many crimes are committed in thy name)। মহাসন্ত্রাসের আমলে রুশোর মানসপুত্র, দালেমবেয়ারের ছাত্র ক্ষুরধার বুদ্ধির অধিকারী রোবসপিয়ের যে হারে পাইকারীভাবে অভিজাত, যাজক, তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিকদের প্রতিবিপ্লবী ভেবে নির্বিচারে গিলোটিনে পাঠান, সেই হত্যার উৎসবের কোন তুলনা নেই। বিধানসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ এই দেখে বলেন যে, "ভয় হয় এই সন্ত্রাস শনি গ্রহের মত আপন সন্তানদের সংহার করে ফেলবে।" রোবসপিয়ের বিপ্লবী বিচারালয়কে যে ক্ষমতা দেন তার ফলে অপরাধী দোষী কিনা তা বিচারের প্রয়োজনীয়তা লোপ করা হয়। গিলোটিনের খাদ্য হওয়ার জন্যে উল্লেখযোগ্য অপরাধের আর দরকার হয়নি। কিভাবে নরমুণ্ড নিয়ে গেণ্ডুয়া খেলা হয়, আর একটি করুণ উদাহরণ হল ক্যামিল দেমুল্যার ২৩ বছরের সুন্দরী পত্নী লুসিয়েন তাঁর স্বামীর প্রাণ ভিক্ষার অপরাধে প্রতিবিপ্লবী চিহ্নিত হয়ে গিলোটিনে প্রাণ দিলেন। ক্ষমতার কিরূপ স্বৈরাচারী নিকৃষ্ট ব্যবহার করা হয় এই ঘটনা তার প্রমাণ। দ্বিতীয়তঃ, দেশের সঙ্কট ও অরাজকতার সময় সন্ত্রাসের কিছু পরিমাণ প্রয়োজনীয়তা ছিল সত্য। কিন্তু সন্ত্রাস পরিচালনায় অহেতুক বাড়াবাড়ি করা হয়। ১৭৯৩ খ্রীঃ সেপ্টেম্বরের পর আর সন্ত্রাসের প্রয়োজনীয়তা ছিল না। রোবসপিয়ের ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্যে সন্ত্রাস চালান। রোবসপিয়েবের উদ্ভট আদর্শবাদকে রূপায়িত করিবার জন্যে অকারণে বহু মূল্যবান প্রাণ বলি দেওয়া হয়। পূণ্যের শাসন (Reign of Virtue) প্রতিষ্ঠার জন্যে, পরমপুরুষের (Supreme Being)-এর পূজা চালু করার উদ্ভট খেয়ালের জন্যে এতগুলি প্রাণ বলি দেওয়ার অধিকার রোবসপিয়েরকে কারা দিল, এই প্রশ্ন ঐতিহাসিকরা তুলেছেন। ট্যালমন বলেন যে, "রোবসপিয়ের যেন নিজেকে এক ত্রাণকর্তা বলে ভাবতে থাকেন"। তৃতীয়তঃ, অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিনা বিচারে বা বিচারের নামে প্রহসন করে বহু লোককে অপরাধী সাব্যস্ত করা হয়। বহু নির্দোষী লোকেরাও সন্ত্রাসের বলি হয়। চতুর্থতঃ, সন্ত্রাসের রাজত্বের সুযোগে এক শ্রেণীর উচ্ছৃঙ্খল জনতা আইন নিজ হাতে তুলে নেয়। ঐতিহাসিক লেফেভার প্যারিসে এইরূপ উচ্ছৃঙ্খল জনতার উল্লেখ করেছেন।[১] তেইন (Taine) এই সকল হঠাৎ গজিয়ে ওঠা স্বয়ং-নিযুক্ত নেতাদের ওপর ঘৃণা বর্ষণ করেছেন। তাঁর মতে "এই সকল জ্যাকোবিন নেতারা ছিল পচা সমাজের গোবরের গাদায় গজানো ব্যাং-এর ছাতা বিশেষ।" এই সকল দায়িত্বহীন, অপদার্থ লোকেরা নাগরিকদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়। সমাজের পক্ষে এটা ছিল এক ভয়াবহ ব্যাপার। এই সকল লোকেরা সর্বরকম সংযম ও শালীনতাকে বিসর্জন দিয়ে হত্যার উৎসবে মেতে ওঠে। এদের গড়ার ক্ষমতা ছিল না। তাই ধ্বংস করার সহজ কাজ এরা বেছে নেয়। সন্ত্রাসের শাসন ছিল নজীরবিহীন। জননিরাপত্তা সমিতি শেষ পর্যন্ত অপর সকল সংবিধান-সম্মত প্রতিষ্ঠানগুলিকে পদানত করে একক আধিপত্য স্থাপন করে। নির্বাচিত সমিতিগুলি অকেজো হয়ে যায়। জননিরাপত্তা সমিতি শেষ পর্যন্ত রোবসপিয়েরের একনায়কত্বের অধীনে চলে আসে। ফ্রান্সের সকল প্রকার সাংবিধানিক নিয়ম ভেঙে এই ব্যাপার চলতে থাকে। এই কাজ গণতন্ত্র ও সংবিধানসম্মত ছিল না।[২] পঞ্চমতঃ, ডেভিড টমসন প্রশ্ন করেছেন, ফ্রান্সের রাজা ষোড়শ লুইকে হত্যা, পুরাতনতন্ত্র ধ্বংস করে যে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জয় ঘোষণা করা হয়, রোবসপিয়েরের মহাসন্ত্রাস, তাঁর একনায়কত্ব তার সঙ্গে কতটা সঙ্গতিসম্পন্ন। এজন্যই কি ফরাসী জাতি এত আত্মত্যাগ করে? কিসের জোরে, কিসের আইনে ব্যক্তির জীবনকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হয়

সন্ত্রাসের ফলাফল ও আলোচনা

১· Lefebvre—P. 242.

২· George Rude.

অথচ মানবজাতির অধিকারের ঘোষণায় বলা হয়েছিল, "সকল মানুষ স্বাধীন ও সমান অধিকার নিয়ে বাঁচার "অধিকারী"। এই মহান ঘোষণার প্রতি মহাসন্ত্রাসে কতটা সম্মান দেখানো হয়? শুধু মতপার্থক্যের জন্যে এবং ক্ষমতা দখলের জন্যে কি বিরোধী নেতাদের গিলোটিনে চড়ানো হয়নি? তাহলে সাধারণ নাগরিকের নিরাপত্তা কোথায় ছিল? ষষ্ঠতঃ, সন্ত্রাসের প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়ার পর কেন তা চালু রাখা হয়? হাতে ক্ষমতা পেয়ে তার প্রয়োগে কি বাড়াবাড়ি করা হয়নি? যদি বলা হয় যে দেশের সামনে জরুরী অবস্থা দেখা দেওয়ায় সন্ত্রাস চালু করা হয়, তাহলে জরুরী অবস্থা কেটে যাওয়ার পর কেন সন্ত্রাস তীব্রতর করে চালু করা হয়। আসলে শেষের দিকে জরুরী অবস্থার সঙ্গে সন্ত্রাসের আর কোন সম্পর্ক ছিল না। দলীয় ও ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে সিদ্ধ করার জন্যে সন্ত্রাসকে চালু করা হয়। সর্বশেষে, কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন যে সন্ত্রাসের ফলে বিপ্লব রক্ষা পায়। বৈদেশিক আক্রমণের হাত থেকে ফ্রান্স বেঁচে যায়। এর উত্তরে লুই ব্লা (Louis Blanc) বলেছেন যে, "সন্ত্রাস ফ্রান্সকে বাঁচায়নি। সন্ত্রাস বিপ্লবকে পঙ্গু করে দেয়।"

সন্ত্রাসের সমর্থনে যুক্তি

সন্ত্রাসের শাসনের পক্ষে ঐতিহাসিকেরা নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি দেখান। প্রথমতঃ, ওলার (Aulurd) নামক স্বনামধন্য ঐতিহাসিক বলেন যে, "সন্ত্রাসের রাজত্ব ছিল পরিস্থিতির চাপে উদ্ভূত স্বৈর শাসনব্যবস্থা" (A dictatorship of distress)। ফ্রান্সে আভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক উভয়ক্ষেত্রে যে সঙ্কট ঘনায়, সন্ত্রাস ছাড়া আর কোনমতেই তার সামাল দেওয়া সম্ভব ছিল না। নাগরিকেরা যখন দেশ রক্ষার জন্যে সৈন্যদলে যোগ দিতে অরাজী হয় এবং সরকারি ব্যয় নির্বাহের জন্যে করদানে অসম্মতি জানায় এবং সরকারের আইনগুলিকে অগ্রাহ্য করে; তখন সন্ত্রাস ছাড়া আর অন্য কোনো উপায়ে বিপ্লবকে রক্ষা করা সম্ভব ছিল না। নির্মম ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ সরকার ছাড়া এই অরাজকতা দমন এবং ফ্রান্সের ঐক্য রক্ষা করার আর কোনো পথ খোলা ছিল না। কাজেই পরিস্থিতিই সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে। ফরাসী বিপ্লবের সংস্কারগুলি এবং প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান সন্ত্রাসের ফলে রক্ষা পায়। নতুবা আবার পচনশীল অভিজাততন্ত্র ও স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র ফিরে আসত। রাইকারের মতে "সন্ত্রাস বিপ্লবকে রক্ষা করে" (The Terror saved the Revolution)। দ্বিতীয়তঃ, মাতিয়ে (Mathiez)[১] নামক বিখ্যাত ঐতিহাসিকের মতে, সমাজে বিপ্লবের আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্যে এবং অর্থনৈতিক সংস্কারের জন্যে সন্ত্রাসের প্রয়োজনীয়তা ছিল। গুডউইনের মতে, সন্ত্রাসের শাসনের ফলে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ, নিম্নতম মজুরী আইন প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক আইনগুলি প্রচলন করা সম্ভব হয়। মুদ্রাস্ফীতি দমন করা, জমিদারদের প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ নাকচ করে কৃষককে রেহাই দেওয়া, ক্ষুদ্র কৃষকের হাতে জমি পৌঁছান: প্রতিবিপ্লবীদের বাজেয়াপ্ত জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টন করা প্রভৃতি জনকল্যাণমূলক আইনগুলি সন্ত্রাসের সাহায্যে চালু করা সম্ভব হয়। এই আইনগুলি না থাকলে ফরাসী বিপ্লবের কোন মূল্য থাকত না।[২] লেফেভারের মতে, সন্ত্রাসের সাহায্যে ফরাসী বিপ্লবের অর্থনৈতিক ও সামাজিক আদর্শ সমাজে শিকড় বিস্তার করতে পারে। একদা রুশো বলেন যে, অজ্ঞ সমাজ স্বাধীনতা না চাইলে তা ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া উচিত। সন্ত্রাসের দ্বারা সেই প্রচেষ্টা করা হয়। শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা বা ভোটাধিকার নয়, অর্থনৈতিক স্বাধীনতাও বিস্তৃত করতে চেষ্টা করা হয়। যদিও জর্জ সোবুল প্রভৃতি বলেন যে হিংসা ও রক্তপাত বিপ্লবের ওপর চাপান হয়। সন্ত্রাস বিপ্লবের অঙ্গ ছিল না। কিন্তু আমরা যদি রুশোর উপরোক্ত মতকে গ্রহণ করি তবে লোকে তাদের ভালো না বুঝলেও, তাদের জন্যে ওপর থেকে সংস্কার চাপান উচিত। লক্ষ

১· Mathiez—French Revolution.

২· Goodwin—French Revolution. P. 168.

লক্ষ লোকের মঙ্গলের জন্যে যদি কিছু অল্পসংখ্যক লোকের প্রাণ দুর্ভাগ্যজনকভাবে যায় তাতে পরিণামে মঙ্গলই হয়েছিল। পুরাতনতন্ত্রের মূল শিকড়গুলি সন্ত্রাসের ফলে কাটা পড়ে। তৃতীয়তঃ, ডিকেন্স প্রভৃতি ঔপন্যাসিক সন্ত্রাসের রাজত্বের ভয়াবহতা সম্পর্কে অতিশয়োক্তি করেছেন মনে করা যায়। সাধারণতঃ রাজনীতি ঘেঁষা লোকেরাই সন্ত্রাসের শিকার হয়, সাধারণ নির্বিরোধী লোকেদের সন্ত্রাস স্পর্শ করেনি। প্যারিসের সাধারণ নাগরিকেরা সন্ত্রাসের আমলে সর্বদা আতঙ্কে দিন কাটাত এমন কথা মনে করার কারণ নেই। সন্ত্রাসের আমলে প্যারিসের থিয়েটার ও অপেরা হলগুলি দর্শকে পূর্ণ থাকত। রেস্তোরাঁগুলি আড্ডাবাজ লোকে ভর্তি থাকত। বিলাসিনী নারীরা সোনার তৈরি গিলোটিনের মডেল গলার হারের লকেট হিসেবে ব্যবহার করত। জিনিষপত্র সস্তা হওয়ায় লোকের উপকার হয়।

যাই হোক, সন্ত্রাসের রাজত্বের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিগুলির মধ্যে কিছু কিছু সত্য আছে। জুলেস মিশেল বলেন গোটা ফরাসী বিপ্লবের প্রক্রিয়া থেকে সন্ত্রাসকে আলাদা করে বিচার করা উচিত নয়। হিংসা শুধু সন্ত্রাসের আমলে দেখা দেয়নি। বিপ্লবের শুরু থেকে কম বেশী হিংসার প্রকাশ ঘটেছিল। দ্বিতীয়তঃ, নতুন সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে পুরাতন যুগের অবশিষ্ট যে সকল লোকেরা কিছুতেই নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারেনি, সন্ত্রাস তাদের ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে ঝেঁটিয়ে ফেলতে সাহায্য করে। শুধু ভুল এটা হয় যে, সন্ত্রাসে যতটা রক্তপাত হয়, ততটা রক্তপাতের কোন দরকার ছিল না। সন্ত্রাসের দরকার মিটে গেলে তা চালিয়ে যাওয়া উচিত হয়নি। এর ফলে লোকে হতাশাগ্রস্থ হয়। যাদের জন্যে বিপ্লব, তাদেরই হত্যা করায় বিপ্লব লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়। এই কারণে বিপ্লবের মহিমা সন্ত্রাসের ফলে নষ্ট হয়। লোকে নেপোলিয়নীয় স্বৈরতন্ত্রকে সন্ত্রাসের অনিশ্চয়তা থেকে বেশী কাম্য বলে মনে করে। (It was hope that made the Revolution. It was despair that led it at the feet of Napoleon.) লুই ব্লাঁ বলেছেন যে, সন্ত্রাস ফ্রান্সকে বাঁচায় নি এবং বিপ্লবকে পঙ্গু করেছে।

জ্যাকোবিন দলের বিবরণ (The Jacobins) : ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাসে জ্যাকোবিন দলের ভূমিকা এবং জ্যাকোবিন নেতা রোবসপিয়েরের ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। স্টেটস জেনারেল বা জাতীয় সভা আহ্বানের পর বিভিন্ন মতবাদের সদস্যরা বিভিন্ন ক্লাব বা রাজনৈতিক গোষ্ঠী স্থাপন করে। এই সময়ে ব্রিটানী প্রদেশের সদস্যরা "সংবিধান সমর্থক সমিতি" (Society of the Friend of the Constitution) নামে এক সমিতি স্থাপন করে। এই সমিতির চলতি নাম ছিল ব্রেটন ক্লাব। ব্রেটন ক্লাবের সদস্যদের সমাবেশের জন্যে জ্যাকোবিন সম্প্রদায়ের গীর্জার একটি ঘর ভাড়া নেওয়া হয়। জ্যাকোবিন মঠে ব্রেটন ক্লাবের সভা হত বলে লোকে এই দলকে জ্যাকোবিন[১] দল নামে দেয়। এই নামেই এই দল সমধিক প্রসিদ্ধ হয়। জ্যাকোবিন দলের সদস্যদের চাঁদা ছিল কম। ফলে প্যারিসের নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী এই দলের সদস্য হওয়ার সুযোগ পায়। ১৭৯০ খ্রীঃ জ্যাকোবিন ক্লাবের সভায় সর্বসাধারণকে যোগ দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হলে এই দলের জনপ্রিয়তা আরও বাড়ে।[২] ক্রমে এই দলের শাখা ফ্রান্সের অন্যান্য শহর ও গ্রামে স্থাপিত হয়। সমাজের দরিদ্র শ্রেণী এই ক্লাবের আদর্শকে সমর্থন জানায়। ১৭৯২ খ্রীঃ এই ক্লাবের এক হাজার শাখা সারা ফ্রান্সে স্থাপিত হয়। ১৭৯৩ খ্রীঃ এই ক্লাবের শাখার সংখ্যা ছিল অন্ততঃ ৫ হাজার।[৩]

জ্যাকোবিন দলের প্রতিষ্ঠা

১· ফরাসী উচ্চারণ জ্যাকোবাঁ।

২· ঐতিহাসিক কোব্বানের মতে জ্যাকোবিন দলের সদস্য চাঁদা মোটেই কম ছিল না। গোড়ার দিকে সদস্য চাঁদা ছিল ৩৬ লিভ্র পরে কমিয়ে ১২ লিভ্র করা হয়। জ্যাকোবিন নেতারা সরকারকে যে সম্পত্তি কর দিত তা সাধারণের অনেক উপরে ছিল। Vide—Cobban—Vol I.

৩· Cobban. Vol. I.

জ্যাকোবিন দলের সদস্যরা প্রধানতঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক ছিল। তবে নীতিবাদী জ্যাকোবিনরা মধ্যবিত্ত নীতির দিক থেকে বুর্জোয়া শ্রেণীর সমর্থক ছিল না। জ্যাকোবিন দলের অধিকাংশ সদস্য ছিল বামপন্থী। জিরন্ডিষ্ট দল বিপ্লবকে একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ধরে রাখতে চেষ্টা করে। জিরন্ডিনরা মনে করত যে, রাজনৈতিক বিপ্লবই ছিল জরুরী। ন্যাশন্যাল কনভেনশন গণভোটে গঠিত হলে তারা সন্তুষ্ট হয়। বিপ্লবকে স্থিতিশীল করতে চায়। জিরন্ডিষ্ট দল রাজনৈতিক বিপ্লব অর্থাৎ সর্বসাধারণের ভোটাধিকার, প্রজাতন্ত্র প্রভৃতি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে চায়। কিন্তু জ্যাকোবিনরা বিপ্লবকে যুক্তিসম্মত পরিণতিতে (logical end) এগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। জ্যাকোবিন দল বিপ্লবের অর্থনৈতিক লক্ষ্য সম্পর্কে সচেতন ছিল। রুশোর প্রচারিত সাম্য, রাজনৈতিক ও সামাজিক আদর্শে তাঁরা বিশ্বাস করত। যেক্ষেত্রে জিরন্ডিষ্ট গোষ্ঠী বণিক ও ধনী বুর্জোয়াদের স্বার্থের কথা ভাবত; সেক্ষেত্রে জ্যাকোবিন দল নিম্নবিত্ত লোক যথা পাতি বুর্জোয়া, কারিগর, ছোট দোকানদার, সাধারণ কৃষকের ও সাঁকুলেতদেব স্বার্থের কথা ভাবত। মোট কথা. জ্যাকোবিন দলেব অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্য ছিল সমাজতন্ত্র ঘেঁষা।

লেফেভারের মতে, জ্যাকোবিনরা ছিল আসলে বুর্জোয়া শ্রেণীর সমর্থক। কারণ তাবা সম্পত্তিব অধিকার লোপ করেনি। উগ্র জ্যাকোবিনরা সম্পত্তি ও মুনাফাকে জনস্বার্থে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। কিন্তু সম্পত্তি পুনর্বন্টনের কথা ভাবেনি। কোব্বানের মতে জ্যাকোবিন নেতাদের অনেকের মোটামুটি ভাল সম্পত্তি ছিল। কারণ সন্ত্রাসের সময় যখন কর ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস হয় তখন জ্যাকোবিনরা সর্বসাধারণ অপেক্ষা বেশী কর দেয়। কারণ তাদের সম্পত্তির মালিকানা ছিল। তা হলেও একথা বলা দরকাব যে, রাজনৈতিক স্বার্থের জন্যেই হোক অথবা সুবিধাবাদের জন্যেই হোক জ্যাকোবিনরা প্রলিতারিয়েতের স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করে। এজন্য প্যারিসের sectionগুলিতে তাদের অসাধারণ জনপ্রিয়তা ছিল। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে জ্যাকোবিনরা আদর্শের কারণে দরিদ্রের বন্ধু হয়নি। তারা ছিল প্রখর বাস্তববুদ্ধির লোক। কিন্তু তারা বুঝতে পারে যে, জনসাধারণের সাহায্য না পেলে তারা আইনসভায় গুরুত্ব পাবে না।

জ্যাকোবিন দলের চরিত্র

জনতার সমর্থন আদায়ের জন্যে বাধ্য হয়ে তারা সমাজতান্ত্রিক নীতি গ্রহণ করে।[১] এই কারণে তারা সাঁকুলেতদের সঙ্গে দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হয়। জ্যাকোবিনরা সাঁকুলেতের সাহায্যে আইনসভাকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে এনে ফেলে।

যাহা হোক, জ্যাকোবিন দল দরিদ্র শ্রেণীর স্বার্থের জন্যে বিপ্লবকে ব্যবহার করে। আইনসভায় আইনের সঙ্কীর্ণ ব্যাখ্যা অপেক্ষা তারা জনতার মতামতকে অনেক বেশী দাম দিত।

রুশোব আদর্শেব বাস্তব প্রয়োগ : কব প্রয়োগ

রুশোর সার্বভৌম ক্ষমতাতত্ত্বের (Doctrine of popular Sovereignty) তারা এক বৈপ্লবিক ব্যাখ্যা করে। জ্যাকোবিনরা মনে করত যে. আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের মতের সঙ্গে জনসাধারণের মতের গরমিল হলে আইনসভাকে জনতার মত মানতে বাধ্য করা উচিত। কারণ জনসাধারণই হল আসল সার্বভৌম শক্তি। জাতীয় সম্মেলনে (National Convention) জিরণ্ডিষ্ট ও মডারেটদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেও জ্যাকোবিনরা প্যারিসের জনতার দ্বারা চাপ দিয়ে আইনসভাকে জ্যাকোবিনের দাবী মানতে বাধ্য করে। শেষ পর্যন্ত প্যারিসের জনতার সাহায্যে বল প্রয়োগ দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বী জিরণ্ডিষ্টদের তারা আইনসভা থেকে বহিস্কার করে। জ্যাকোবিন দল এই কাজকে সংবিধান ও গণতন্ত্র বিরোধী বলে মনে করত না।

১. "They were not wedded to economic controls, But to break with the people was to fall into the hands of the moderates."—Lefebvre. P. 246.

জ্যাকোবিন দল প্রজাতন্ত্রের আদর্শে বিশ্বাস করত। ১৭৯১ খ্রীঃ সংবিধানে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রকে তারা সমর্থন করত না। জ্যাকোবিন দলের প্ররোচনায় প্যারিসের জনতা টুইলারিস প্রাসাদ আক্রমণ করে। ১০ই আগস্ট, ১৭৯২ খ্রীঃ আইনসভাকে ঘেরাও করে সংবিধান রদ করা হয়। জনতার চাপে তারা বিধানসভাকে রাজতন্ত্র উচ্ছেদ করতে বাধ্য করে। লেফেভারের মতে, ইহা ছিল দ্বিতীয় ফরাসী বিপ্লব (Second French Revolution)। জ্যাকোবিন পত্রিকা সম্পাদক মারা (Marat), সাঁ-জুসত (Saint-Just), রোবসপিয়ের প্রভৃতি এতে বিশেষ ভূমিকা নেন।

বাজতন্ত্রের উচ্ছেদ

জাতীয় সম্মেলনকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনার পর, জ্যাকোবিন দল সন্ত্রাসের রাজত্ব স্থাপন করে প্রতিবিপ্লব দমন করে। তারা সাফল্যের সঙ্গে বৈদেশিক যুদ্ধকে চালায়। যদিও জ্যাকোবিনরা বৈদেশিক যুদ্ধের বিরোধী ছিল, কিন্তু যুদ্ধের দায়িত্ব তারা ভালভাবে বহন করে। দ্রব্যের সর্বোচ্চ মূল্য, সর্বনিম্ন মজুরী আইন, বাজেয়াপ্ত জমির বণ্টন ব্যবস্থা, বাজেয়াপ্ত জমির ক্ষতিপূরণ লোপ, প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার, মুনাফা বিরোধী আইন প্রভৃতির দ্বারা তারা সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লবকে এগিয়ে দেয়। তথাপি জ্যাকোবিন নেতাদের অর্থনৈতিক চিন্তাধাবায় সীমাবদ্ধতা ছিল। জর্জ রুডের মতে, তাঁরা ব্যক্তিগত সম্পত্তির ওপব নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করলেও, ব্যক্তিগত সম্পত্তি লোপ অথবা বাড়তি সম্পত্তি বণ্টন করার কথা ভাবেননি। জ্যাকোবিন দলের সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধাবা যথেষ্ট অগ্রগামী ছিল না। তাঁরা সম্পত্তির অধিকারকে পবিত্র মনে করতেন। তাঁরা এবারবাদী গোষ্ঠীর উগ্রপন্থী নীতি সমর্থন করতেন না। তথাপি একথা সত্য যে, ফরাসী বিপ্লবের মহত্তম রূপ এই দলের প্রচেষ্টায় বাস্তবতা লাভ করে।

জ্যাকোবিন সংস্কাব সমূহ

জ্যাকোবিন দলেব পতন বেদনাদায়ক ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু এই দলের নেতাদের দোষেই তা ঘটে। সন্ত্রাসেব রাজত্বের ভয়াবহতা জ্যাকোবিনদের জনপ্রিয়তা বিনষ্ট করে। এদিকে জ্যাকোবিনদের মধ্যে ক্ষমতা, লোভ ও অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। প্রতিদ্বন্দ্বীদের ধ্বংস করার জন্যে গিলোটিনের যথেচ্ছ ব্যবহার করা হয়। ফলে বিপ্লব নিজ সন্তানদের গিলে ফেলে। এই কারণে জ্যাকোবিনদের পতন ঘটে।

জ্যাকোবিন দলেব পতন

রোবসপিয়েরের কৃতিত্ব বিচার (Estimate of Robespierre) ঃ ফরাসী বিপ্লবের অগ্নিময় পুরুষ হিসেবে ম্যাক্সিমিলিয়েন রোবসপিয়ের ইতিহাসে স্থায়ী আসন পেয়েছেন। এ্যারাস প্রদেশের এক আইনজীবির গৃহে তাঁর জন্ম হয়। বাল্যকালে পিতৃ-মাতৃহীন হয়ে তিনি এক বিশপের নিকট মানুষ হন। তিনি বিদ্যাশিক্ষা সাঙ্গ করে আইনজীবির জীবিকা নেন। ১৭৮৯ খ্রীঃ জাতীয় সভায় তিনি প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হয়ে ইতিহাসের পাদপ্রদীপের সামনে আসেন।

প্রাক-জীবন

ব্যক্তিগত জীবনে রোবসপিয়ের ছিলেন সন্ন্যাসী-সুলভ সততা ও ন্যায় নীতিতে বিশ্বাসী। তাঁর জীবনে অর্থ ও নারীঘটিত কোন পাপের ছায়া পড়েনি। সমুদ্রের জল যেরূপ সবুজ ও দূষণহীন সেরূপ রোবসপিয়েরের চরিত্র ছিল সমুদ্রের ন্যায় সবুজ ও নিষ্কলঙ্ক। তাঁর চরিত্রে অহেতুক নারী বিদ্বেষের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এমন কি তিনি নিজ ভগিনী সার্লোৎকেও (Charlotter) ঘৃণা করতেন। মাদাম রোঁলাকে গিলোটিনে পাঠাবার জন্যে রোবসপিয়ের সকল প্রকার চেষ্টা চালান। ইহা ছিল তাঁর চরিত্রের দুঃখজনক দিক। রোবসপিয়েরের অন্যতম দুর্বলতা এই ছিল যে, তিনি সর্বদাই নিজ মতকে শ্রেষ্ঠ মনে করতেন। তিনি মনে করতেন যে, পৃথিবীর সকলই সৎ হতে বাধ্য। যদি কেউ তা না হয়, তবে তার যত গুণই থাকুক না কেন, তাকে তিনি ধ্বংস করে ফেলবেন। সমাজকে সততা ও ন্যায় নীতির ভিত্তিতে শাসন করা তিনি কর্তব্য বলে মনে করতেন। তাঁর বাল্যবন্ধুদের তিনি গিলোটিনে

বোবসপিয়েরেব চবিত্র

পাঠাতে দ্বিধা করেননি। এ বিষয়ে তিনি ছিলেন বিধাতার ন্যায় নিষ্ঠুর, নিয়তির ন্যায় অমোঘ। রোবসপিয়ের ছিলেন ঘোর আদর্শবাদী। রাজনীতিতে তিনি ন্যায়নীতিকে সর্বোচ্চ স্থান দিতেন। এজন্য আপোষ বা নমনীয়তাকে তিনি পাপ বলে মনে করতেন। তিনি যেমন সৎ, তিনি চাইতেন সকলেই সৎ হতে বাধ্য। কোব্বানের মতে, তিনি ছিলেন এক ধরনের রাজনৈতিক ক্যালভিনবাদী, যাঁর কাছে নীতিই হল সব। মানুষের দুর্বলতা ছিল ক্ষমার অযোগ্য। ধর্মগুরুর মত গোঁড়ামি নিয়ে তিনি ফ্রান্সে এক নতুন সভ্যতা ও সমাজের পত্তন করতে চান।

রোবসপিয়ের ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন গভীব পড়াশোনা করা লোক। রুশোর মুগ্ধ পাঠক, ভলতেয়ারের রচনার অনুরাগী, মস্তিষ্কবান, ক্ষুদ্রাকৃতি এই ব্যক্তিটিকে কারও পক্ষে উপেক্ষা করা কঠিন ছিল। পোষাকে-আশাকে তিনি ছিলেন ছিমছাম। তাঁর পরিপাটী পোষাক তাঁর মানসিক শৃঙ্খলার পরিচয় দিত। পরিচ্ছন্নভাবে জীবন কাটালেও তাঁর জীবনে কোনো সম্পদের প্রাচুর্য ছায়াপাত করেনি। মৃত্যুকালে তিনি বিত্তহীন ছিলেন। রোবসপিয়েরের চিন্তাধারায় রুশোর প্রভাব থাকলেও, গ্রীক দার্শনিকদের প্রভাব কম ছিল না। তিনি এবং তাঁর কাছের লোকেরা এই সকল দার্শনিকদের রচনাগুলি থেকে ধ্রুপদী ভাবধারা আত্মসাৎ করেন।

দীর্ঘকাল ধরে একশ্রেণীর ঐতিহাসিকদের কলমে রোবসপিয়ের কলঙ্কিত খলনায়ক রূপে চিত্রিত হয়েছেন। লর্ড এ্যাক্টনের মতে, "ম্যাকিয়াভেলী জননেতাদের নৈতিক স্খলন ক্ষমার যোগ্য বলেন। এই পটভূমিকায় ইতিহাসে আমরা যত দুর্নীতিপরায়ণ জননেতার কথা জানি রোবসপিয়ের ছিলেন তাঁদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ঘৃণ্য চরিত্র।" এই সকল লেখকেরা রোবসপিয়েরের সমকালীন শত্রুদের কথায় প্রভাবিত হয়েছেন। তাঁদের চোখে রোবসপিয়েরের আসল গুণগুলি ধরা পড়েনি।

রোবসপিয়েরের আদর্শবাদ

রোবসপিয়ের ছিলেন রুশোর মানস পুত্র। রুশোর আদর্শকে বাস্তবায়িত করার জন্যে তিনি যে নির্মমতা দেখান, তাহা রুশোকেও হয়ত কম্পিত করত। তিনি মনে করিতেন যে, জাতির সমষ্টিগত ইচ্ছা হল সকল প্রশ্নের উর্ধ্বে। জনসাধারণের দারিদ্র্য যে সামাজিক অসাম্যের ফল, রুশোর এই মতবাদকে তিনি বিশ্বাস করতেন। যদিও তিনি সম্পত্তির অধিকারে বিশ্বাস করতেন, তবুও সম্পত্তির ওপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করেন। প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার স্থাপন ও প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে তিনি সক্রিয় আন্দোলন করেন। বিপ্লবী বিরোধী শক্তিকে ধ্বংস করার জন্যে জনতাকে ক্রোধ ও হিংসা প্রকাশে তিনি প্ররোচনা দেন। রোবসপিয়ের জনতাকে বলেন যে, "যখন জনতা অত্যাচারিত হয়, তখন জনতাকেই তার প্রতিকার করতে হয়। যখন স্বৈরাচার চলে তখনই জনতার উচিত বিদ্রোহ করা।" রোবসপিয়ের আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ মতের বিরুদ্ধে জনতাকে প্ররোচিত করে আইনসভাকে নিয়ন্ত্রণে আনেন। তিনি মনে করতেন যে, জনতাই হল প্রকৃত সার্বভৌম শক্তি। যদি কোনো আইনসভা জনতার স্বার্থবিরোধী কাজ করে তবে জনতা সেই আইনসভাকে নিবারণ করতে সক্ষম।

যুদ্ধ ঘোষণা সম্পর্কে রোবসপিয়েরের মতামত

জ্যাকোবিন দল স্থাপিত হলে রোবসপিয়ের এই দলের সদস্য হন। বক্তা হিসেবে খুব উচ্ছ্বাসময় না হলেও তিনি তাঁর বক্তব্যকে যুক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করতেন। জ্যাকোবিন ক্লাবের বক্তাদের মধ্যে তাঁর বিশিষ্ট স্থান ছিল। তিনি যখন বক্তৃতা করতেন তখন তিনি এই বিশ্বাস নিয়ে কথা বলতেন যে তাঁর কণ্ঠে জনতার অনুচ্চারিত বক্তব্য ধ্বনিত হচ্ছে। তিনি ডান্টনের মত লোক মাতানো বক্তৃতা (demagogue) দিতেন না। তিনি বিপ্লবী ফ্রান্সের ইওরোপীয় যুদ্ধে যোগদানের বিরুদ্ধে বহু যুক্তি দেখান। তাঁর মতে, বিপ্লবীদের উচিত বিপ্লবকে ফ্রান্সে দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করা। যুদ্ধ বাধলে যুদ্ধের খরচার দরুন জনসাধারণের ওপর কর ভার বাড়বে।

যুদ্ধের সময় সেনাপতিদের প্রভাব বাড়তে পারে বলে তিনি আশঙ্কা করেন। এই সকল সেনাপতিরা গণতন্ত্রকে ধ্বংস করবে বলে তিনি মনে করতেন।

রোবসপিয়েরের জাতীয় সম্মেলনের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন। তিনি লক্ষ্য করেন যে, জ্যাকোবিন দল জাতীয় সম্মেলনে সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছে। এই দলের মতামত সংখ্যাগুরু জিরণ্ডিষ্ট ও মধ্যপন্থীরা নিবে না। তিনি রুশোর জনতার সার্বভৌম শক্তি মতবাদের প্রয়োগ করে প্যারিসের বিপ্লবী জনতার সাহায্যে ভীতি প্রদর্শন দ্বারা জাতীয় সম্মেলনকে জ্যাকোবিনদের অভিমত মানতে বাধ্য করেন। সংবিধানের আক্ষরিক অর্থ অপেক্ষা সংবিধানের গণতান্ত্রিক মর্মকে তিনি বেশী গুরুত্ব দেন। তাঁর মতে প্যারিসের দরিদ্র জনতার কথা জাতীয় সম্মেলন যখন শুনছিল, তখন এই জাতিই হল আসল সার্বভৌম শক্তি। আইনসভাকে ঘেরাও করে তত্ত্ববাদী জিরণ্ডিষ্টদের বহিষ্কার করাকে তিনি বেআইনী কাজ বলে কখনও মনে করেননি। তাঁর পরিচালিত জ্যাকোবিন দল প্যারিসের সেকসন থেকে আনা জনতার সাহায্যে জাতীয় সম্মেলন থেকে কট্টর জিরণ্ডিনদের বহিষ্কার করে। জাতীয় সম্মেলনে সংখ্যালঘু জ্যাকোবিনদের কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়।

রোবসপিয়েরের বিপ্লবী ধারণা

বিপ্লবী সরকার বা ন্যাশনাল কনভেনশন ফ্রান্সের ভেতর প্রতিবিপ্লব ও অরাজকতা দমন এবং বাইরে থেকে রাজতন্ত্রের সমর্থক বৈদেশিক শক্তির আক্রমণ ঠেকাবার জন্যে সন্ত্রাসের রাজত্ব বা জরুরী অবস্থাকালীন শাসন চালু করে। এই পর্যায়ে রোবসপিয়ের কনভেনশন নিযুক্ত জননিরাপত্তা সমিতির একজন প্রধান সদস্যে পরিণত হন। সন্ত্রাস চালু হওয়ার পর দেশের ভেতর প্রতিবিপ্লব সহজে দমিত হয়। কিন্তু জননিরাপত্তা সমিতির মধ্যে দলীয় গণ্ডগোল দেখা দেয়। রোবসপিয়ের ও জ্যাকোবিন নেতারা তীব্র কেন্দ্রীকরণ নীতির পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি দুর্নীতি দূরীকরণ ও ন্যায়নীতি প্রবর্তনের জন্যে সন্ত্রাসের প্রয়োগের দাবী করেন।[১] সমাজের নীচুতলার দরিদ্রদের জন্যে তিনি উঁচুতলার দুর্নীতি বন্ধ করতে সন্ত্রাসকে ব্যবহার করতে চান। আইনের আক্ষরিক সীমার মধ্যে না থেকে আদর্শ ও বিবেক অনুযায়ী সন্ত্রাসের সাহায্যে বিপ্লবের প্রতিবাদী শক্তিকে দমন করে বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চান। তিনি বলেন যে, "আমাদের এখন প্রয়োজন হল সরকারকে একটিমাত্র নীতি ও একটিমাত্র লক্ষ্য নিয়ে পরিচালনা করা।" (What we need at this hour is a government of single will)।

রোবসপিয়ের ১৭৯৩ খ্রীঃ এপ্রিল থেকে যে সন্ত্রাস পরিচালনা করেন তাকে রোবসপিয়েরের সন্ত্রাস বা জ্যাকোবিন সন্ত্রাস বলা হয়। এই পর্যায়ে সন্ত্রাসকে কার্যকরী করার জন্যে তিনি জননিরাপত্তা সমিতিকে প্রধান যন্ত্রে পরিণত করেন। এই সমিতির তিনিই ছিলেন প্রধান নিয়ন্তা। তাঁর সহকারী ছিলেন সাঁজুস্ত, ক্যুথঁ এবং জননিরাপত্তা সমিতির বাইরে কিছুকালের জন্যে প্যারিস কমিউন, এবেরপন্থীগণ (Herbertist)। তিনি একটি সংশোধনী দ্বারা বিপ্লবী বিচারালয়ের কর্মধারাকে সন্ত্রাস প্রয়োগের সহায়ক করেন। তাঁর সংশোধনীর বলে এই বিচারালয় সন্দেহভজন ব্যক্তিদের অপরাধ প্রমাণের জন্যে সাক্ষী-সাবুদ গ্রহণ না করে, প্রয়োজন হলে কিছু জেরার পর শাস্তি দিতে অধিকারী হয়। অর্থাৎ রোবসপিয়ের যান আইনের ফাঁক দিয়ে যেন প্রতিবিপ্লবী পালাতে না পারে। প্রশ্ন দেখা দেয়. প্রকৃত প্রতিবিপ্লবী এবং রোবসপিয়েরের বিরোধীদের মধ্যে কি কোন পার্থক্য থাকবে? রোবসপিয়ের মনে করতেন তিনিই হলেন একমাত্র জাতির বিবেক। তাঁর মতের বিরোধিতা করার অর্থ হল বিপ্লবের বিরোধিতা। এক্ষেত্রে অপরাধীকে গিলোটিনের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করাই সঙ্গত।

কাজেই সকল বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানগুলিকে রোবসপিয়ের তাঁর Government of Single Will বা তাঁর একার ব্যক্তিগত মতামতের কাছে নতজানু হতে বাধ্য করেন। বিরোধীদের

১· George Rude—Revolutionary Europe.

সন্ত্রাসের সাহায্যে বিনাশ করা হয়। জননিরাপত্তা সমিতি, সাধারণ নিরাপত্তা সমিতি, প্যারিস কমিউন, বিপ্লবী বিচারালয়, ভ্রাম্যমান কমিশন, সন্ত্রাসের সকল প্রতিষ্ঠানগুলিকে তিনি তাঁর পাথরের মত কঠিন ইচ্ছার কাছে নতজানু করে, বিপ্লব সম্পর্কে তাঁর নিজলক্ষ্যে পৌঁছবার কাজে নির্বিচারে ব্যবহার করেন। এমনকি যে ন্যাশন্যাল কনভেনশনই সন্ত্রাসের উৎস ছিল, যে সার্বভৌম সভা জননিরাপত্তা সমিতির সদস্যদের নিয়োগ করত, তিনি সেই সভার প্রতিবাদী সদস্যদের সন্ত্রাসের দ্বারা বিনাশ করতে দ্বিধা করেননি। এই পর্যায়ে মাদাম রোঁলা, বাগ্মী ড্যান্টন, সাঁজুস্ত প্রভৃতি গিলোটিনে নিহত হন। ঐতিহাসিক কোব্বানের মতে, "রাজনৈতিক সফলতা রোবসপিয়েরের বিপ্লবী আদর্শে স্ববিরোধিতা সৃষ্টি করে।" যে রোবসপিয়ের ছিলেন জ্যাকোবিনবাদের মনন ও বিবেকের ধারক, তাঁর নিজের মধ্যেই স্ববিরোধিতা দেখা দেয়। এক ধরনের বিষধর সর্পমাতা যেমন ডিম থেকে তার বাচ্চাগুলি বের হলে গিলে ফেলে, তেমনই জ্যাকোবিন রোবসপিয়ের বিপ্লবের কারখানার কাঁচামাল (Raw materials) উগ্রপন্থী সাঁকুলেতদেরও সন্ত্রাসের বলি হিসেবে গ্রহণ করেন। এই পর্যায়ে খ্রীষ্টধর্ম বিরোধী সন্ত্রাসকে আরও তীব্রতর করার দাবীকারী এবারবাদী (Herbertist) ও প্যারিস কমিউনের বহু সক্রিয় কর্মীদেরও গিলোটিন মঞ্চে পাঠান হয়। এক সময় মনে হয় তিনি যেন এক খামখেয়ালী স্বৈরাচারীতে পরিণত হয়েছেন। সঙ্গত ও যুক্তিপূর্ণ কারণ ছাড়া তিনি খামখেয়ালীভাবে যথেচ্ছ গিলোটিনের ব্যবহার করেন ১৭৯৩, এপ্রিল থেকে ১৭৯৪ খ্রীঃ জুলাই পর্যন্ত। এই খামখেয়ালী স্বৈরাচারেব একটি করুণ দৃষ্টান্ত হল যে, রোবসপিয়েরের একদা সহকর্মী ক্যামিল দোমুল্যাঁর সুন্দরী ২৩ বর্ষীয়া স্ত্রী, তাঁর প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত স্বামীর প্রাণ ভিক্ষার অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন।[১] ১৭৯৩ খ্রীঃ এপ্রিল থেকে ১০ই জুন ১৭৯৪ খ্রীঃ পর্যন্ত কেবলমাত্র প্যারিসেই ১২৫১ জনকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। ১০ই জুন থেকে ২৭শে জুলাই ১৩৭৬ জন প্রাণদণ্ডে

রোবসপিয়েরের সন্ত্রাসের যেমন এই ভয়ঙ্কর দিক ছিল, তেমন তার একটি উজ্জ্বল, কল্যানী দিক ছিল। একথা ভুলে যাওয়া যাবে না যে, তাঁরই সন্ত্রাসের আমলকে ফরাসী বিপ্লবের মহত্তম যুগ বলা যায়। জর্জ রুডের মতে, তিনিই ফাটকাবাজী ও মুদ্রাস্ফীতি রোধ করেন। ১৭৯১ খ্রীঃ পর তাঁর আমলেই প্যারিসে খাদ্যসঙ্কট লোপ পায়। লোকে বাঁধাদরে খাদ্যশস্যের নিয়মিত সরবরাহ পেতে থাকে। জমিদারদের কাছে কৃষকের বকেয়া ঋণ মকুব করা হয়। প্রতিবিপ্লবীদের বাজেয়াপ্ত জমি ছোট ছোট খণ্ডে দশ বছরের কিস্তীতে কৃষকদের কাছে সস্তাদরে বিক্রি করা হয়। কঁদরসেত অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার খসড়া রচনা করেন। রোবসপিয়ের অনুভব করেন যে, খ্রীষ্টধর্মের অবনয়নের ফলে সমাজে নীতিবোধ নষ্ট হচ্ছে। নীতিবোধ নষ্ট হলে সভ্যতা থাকবে না। এজন্য তিনি পরমপুরুষের উপাসনা চালু করেন।

রোবসপিয়ের সব কিছু ভাল কাজ করার দায়িত্ব একাকী নেন এবং ধর্ম প্রচারকদের গোঁড়া নিয়ে তিনি সংস্কার চালু করায় নিজ দলের লোকেদেরও তিনি আস্থা হারান। জননিরাপত্তা সমিতির সঙ্গে সাধারণ নিরাপত্তা সমিতির এক্তিয়ার নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়। এবারবাদীদের ধ্বংস করায় সাঁকুলেতদের বিশ্বাস তিনি হারান। সাঁজুস্ত বলেন যে, "বিপ্লব শীতলতা প্রাপ্ত হয়েছে।" ন্যাশন্যাল কনভেনশনে তাঁর বিরুদ্ধে একনায়কতন্ত্র ও সন্ত্রাসের অপ্রয়োজনীয় ব্যবহারের অভিযোগ তোলা হয়। ধর্মবিশ্বাসী খ্রীষ্টানরা তাঁর পরমপুরুষের উপাসনাকে ধর্মদ্রোহিতা বলে ঘৃণা প্রকাশ করে। ফলে ন্যাশন্যাল কনভেনশন তাঁকে গ্রেপ্তারের আদেশ দেয়। যে প্যারিস কমিউন তাঁকে ক্ষমতার পর্বতচূড়ায় স্থাপন করে এবং বহু ঝড়ঝাপ্টা থেকে রক্ষা করে, ১৭৯৪ খ্রীঃ জুলাই মাসে রোবসপিয়ের গ্রেপ্তার হলেও, তারা মুখ ফিরিয়ে থাকে। প্যারিস কমিউন বিপদের ঘন্টা বাজানো মাত্র হাজার তিনেক লোক জড় হয়। কনভেনশনের আদেশে

১· Vide Cobban.

সেনাদল তাঁদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। সাঁকুলোতদের জঙ্গী নেতাদের রোবসপিয়ের গিলোটিনে পাঠিয়ে নিজের পায়ে কুড়ুল মারেন। রোবসপিয়ের ২৩শে জুলাই গিলোটিনে প্রাণ দেন। তবরমিদরীয় প্রতিক্রিয়ার ফলে রোবসপিয়েরের সংস্কারগুলি হারিয়ে যায়।

ঐতিহাসিকরা অধুনা রোবসপিয়েরের পুর্ণমূল্যায়ণ করেছেন। একদা ওলার (Aulurd) তাঁকে রক্তপাগল স্বৈরাচারী বল্লেও, ওলারের ছাত্র আলবেয়ার মাঁতিয়ে তাঁর গুরুর মতের তীব্র বিরোধিতা করেন। যদিও ওলারের মতে রোবসপিয়ের ছিলেন দাম্ভিক, ফাঁপা আদর্শবাদী।[১]

ডেভিড টমসনের মতে, "রোবসপিয়েরের মধ্যেই ফরাসী বিপ্লব প্রকৃতপক্ষে রূপায়িত হয়।" (The Great French Revolution was personified in Robespierre)। তিনিই ছিলেন ফরাসী বিপ্লবের নায়ক। ঐতিহাসিক আলবেয়ার মাঁতিয়ের মতে, "রোবসপিয়ের ছিলেন গণতন্ত্রবাদী ও সমাজতন্ত্রবাদী।" মাতিয়ের মতে, ফরাসী বিপ্লবের মহত্তম দিকগুলি তাঁর নেতৃত্বেই বিকশিত হয়। তিনি রুশোর গ্রন্থ পাঠ করে জনগণের সার্বভৌম তত্ত্বের যে শিক্ষা পান তাকে তিনি বাস্তব রূপ দেন। কুসংস্কার থেকে ধর্মকে বিচ্ছিন্ন করে তিনি ধর্মের সাহায্যে সামাজিক নীতিবোধের উন্নয়নের চেষ্টা করেন। ধনীদের দ্বারা কলুষিত সরকারের পরিবর্তে, খেটে-খাওয়া সাধারণ মধ্যবিত্তদের প্রজাতন্ত্র তিনি কাম্য মনে করেন। তিনি ছিলেন দরিদ্রের বন্ধু। তাদের জন্যে তিনি বহু সংস্কার করেন। প্রথম জীবনে বাক স্বাধীনতার পূজারী হলেও ফ্রান্সের অরাজকতা দমনের জন্যে তিনি সন্ত্রাসের প্রয়োজনীয় ব্যবহার করেন। তিনি প্রজাতন্ত্র ও সাঁকুলেতদের ঐক্যের ওপর জোর দেন। Government of Single Will অর্থাৎ সরকার ও জাতি একমন, একপ্রাণ হয়ে কাজ করার ওপর তিনি জোর দেন। যাঁরা তাঁর বিরোধিতা করে তিনি তাহাদের ক্ষমা করেননি। রোবসপিয়েরের নেতৃত্বে সাঁকুলেৎ শ্রেণীর জাগরণ ঘটে। অনেকের মতে তিনি সন্ত্রাসের অপ্রয়োজনীয় প্রয়োগ ও নির্বিচার হত্যার দ্বারা বিপ্লবের মহিমাকে মলিন করেন। দরিদ্র লোকেরা বিপ্লব সম্পর্কে এজন্য আগ্রহ হারায়। তথাপি রোবসপিয়েরই যে বিপ্লবের প্রকৃত সন্তান ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর সম্পর্কে ধর্মীয় গোঁড়ামির অভিযোগ ভ্রান্ত। তিনি ধর্মসহিষ্ণুতার অনুরাগী ছিলেন।[২] রোবসপিয়েরের তীব্র সমালোচক ব্যারিয়ে (Barrier) যখন রোগশয্যায় মৃত্যুপথযাত্রী, তখন বিখ্যাত চিত্রকর দাভদ তাঁর পোট্রেট আঁকতে যান। ব্যারিয়ে বলেন, "অগ্রে রোবসপিয়েরের পোট্রেট আঁক। তাঁকে বাদ দিয়ে ফরাসী বিপ্লবের কথা ভবিষ্যতে কেউ ভাবতেই পারেনি।" রোবসপিয়েরের সমালোচকের এই উক্তি প্রমাণ করে যে, রোবসপিয়েরের মূল্য সম্পর্কে ঠাণ্ডামাথা লোকেরা অবহিত ছিলেন।

বিপ্লবী ফ্রান্স এবং বৈদেশিক যুদ্ধের কারণ ও প্রকৃতি (Revolutionary France and the causes of its wars with Europe) ঃ

ফবাসী বিপ্লবের প্রবাহে যখন ফ্রান্সের পুরাতনতন্ত্র ভেঙে পড়ে, সেই সময় ইওরোপের বুদ্ধিজীবিরা এবং ইওরোপের রাজশক্তি এই বিপ্লবের গতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করেন। বুদ্ধিজীবিরা এই বিপ্লবকে ফ্রান্সের জনগণের মুক্তির আলোড়ন বলে অভিনন্দন জানান। ইংলন্ডের কবিকুল যথা শেলী ও কোলরিজ এই বিপ্লবকে ফরাসী দেশের নতুন যুগের সূচনা বলে অভিহিত করেন। ইওরোপের রাজশক্তিগুলি প্রবল প্রতাপান্বিত বুরবোঁ ফ্রান্সের দুর্বলতার সূচনা দেখে খুসি হয়। তারা মনে করে যে, বিপ্লবের ফলে দুর্বল ফরাসী রাজশক্তি আর ইওরোপে তার কর্তৃত্ব স্থাপন করতে সক্ষম হবে না। ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রী উইলিয়াম পিট এই আশা প্রকাশ করেন যে, গণতন্ত্রী ইংলন্ডের সঙ্গে বিপ্লবী ফ্রান্সের

ইওরোপে আশাবাদ

১· Aulurd—Franch Revolution.

২· Cobban. Vol. I

মিত্রতা এবার সম্ভব হবে।

অতি অল্পকালের মধ্যে ইওরোপীয় রাজশক্তি বুঝতে পারে যে, বিপ্লবী ফ্রান্সের সম্পর্কে তাদের ধারণা ভুল ছিল। ফরাসী বিপ্লব রুদ্রমূর্তিতে প্রকাশিত হলে ইওরোপের রাজশক্তিগুলি উদ্বেগ বোধ করে। ফ্রান্সের অভিজাত শ্রেণী পালিয়ে বিদেশে আশ্রয় নেয়। অভিজাতদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়। ইওরোপীয় রাজশক্তিগুলি উপলব্ধি করে যে, ফরাসী বিপ্লবের প্রজাতন্ত্রী আদর্শ তাদের দেশে ছড়িয়ে পড়বার সম্ভাবনা আছে। এজন্য ইওরোপের অন্যান্য দেশে রাজতন্ত্র বিপন্ন বোধ করে। ইওরোপের রাজশক্তিগুলি এই কারণে ফ্রান্সের বিপ্লবী সরকারের ধ্বংস কামনা করে। দেশত্যাগী অভিজাতরা ইওরোপের বিভিন্ন রাজধানীতে ফরাসী বিপ্লবের বিরুদ্ধে প্রচার চালায়।

এমিগ্রিদের প্রভাব

ইওরোপীয় রাজশক্তিগুলির এই শত্রুতাপূর্ণ মনোভাবের কারণ সম্পর্কে সোরেল (Sorel) নামক ঐতিহাসিক[১] একটি যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা দিয়াছেন। সোরেলের মতে, "বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সে যে নতুন সমাজ ও রাষ্ট্র স্থাপিত হয় তার সঙ্গে ইওরোপের রাজতন্ত্রী ও সমাজের সহাবস্থান সম্ভব ছিল না। এই বিরোধের মূলে ছিল ফরাসী বিপ্লবের আদর্শের সঙ্গে ইওরোপীয় প্রতিক্রিয়াশীলতার সংঘাত।" ফ্রান্সে সামন্ততন্ত্রের ধ্বংস, রাজতন্ত্রের স্বর্গীয় অধিকার লোপের ফলে যে নতুন সমাজ গঠিত হয়, তা ইওরোপীয় গণমানসে নতুন আশাবাদ সৃষ্টি করে। ইওরোপীয় রাজারা আশঙ্কা করেন যে, বিপ্লবের এই রাজতন্ত্রবিরোধী ভাবাদর্শ দাবানলের মত তাঁদের দেশে ছড়াবে। তাঁর আগেই, ফ্রান্সের সীমানার মধ্যেই এই বিস্তারকে ধ্বংস করা দরকার বলে তাঁরা ভাবেন।

ইওরোপীয় রাজশক্তির সহিত বিপ্লবী ফ্রান্সের আদর্শগত বিরোধ

ফ্রান্সে বিপ্লবের পতাকা উড়লে ইওরোপের অন্যান্য দেশে বুদ্ধিজীবিদের সকলে এই বিপ্লবকে মানুষের মুক্তি বলে ভাবেননি। বাগ্মী এডমন্ড বার্ক সমাজের শিকড় ছিঁড়ে ফেলা এই বিপ্লবে নৈরাজ্যের আশঙ্কা প্রকাশ করেন। কিছু উচ্চাকাঙ্ক্ষী লোক ও বুদ্ধিজীবীদের ষড়যন্ত্রে ফ্রান্সে রাজতন্ত্রের পতন ঘটায়, তিনি উদ্বেগ বোধ করেন। তাঁর Reflections in French Revolution শীর্ষক বক্তৃতাগুলি ইংলন্ডের শাসকশ্রেণী, টোরী দলকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

এদিকে ফ্রান্সের জিরন্ডিষ্ট দল বিপ্লবকে ইওরোপে ছড়িয়ে দিয়ে ফরাসী বিপ্লবকে একটি আন্তর্জাতিক মুক্তি আন্দোলনে পরিণত করার সঙ্কল্প নেয়। জিরন্ডিষ্ট দল মনে করত যে, বিপ্লবী ফ্রান্সকে রক্ষা করতে হলে ফ্রান্সের বাইরে বিপ্লব ছাপিয়ে দেওয়া উচিত। নতুবা ফ্রান্সের নিঃসঙ্গ বিপ্লবী দ্বীপ রাজতন্ত্রী সমুদ্রতরঙ্গের আঘাতে ক্ষয়প্রাপ্ত হবে। উগ্রপন্থী বিপ্লবী নেতা ব্রিসো ও তাঁর সমর্থকরা বলেন যে, বিপ্লবী ফ্রান্স প্রতিক্রিয়াশীল রাজতন্ত্রগুলিকে আক্রমণ করলে, ইওরোপের জনগণ এই প্রতিক্রিয়াশীল সরকারগুলির বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। ইওরোপের সর্বত্র রাজতন্ত্রের পতন ঘটবে। ফরাসী বিপ্লবের আদর্শ ছড়িয়ে পড়বে।[২] দ্বিতীয়তঃ, বিপ্লবী ফ্রান্সকে সুরক্ষিত করার জন্যে বেলজিয়াম ও রাইন নদী পর্যন্ত ফ্রান্সের প্রাকৃতিক সীমা বিস্তার করা দরকার। জিরন্ডিষ্ট দল ফরাসী সীমান্ত নেদারল্যান্ড বা বেলজিয়াম পর্যন্ত বিস্তৃত করার জন্যে ব্যস্ত হয়। এদিকে নেদারল্যান্ড ছিল অষ্ট্রিয়ার হ্যাপসবার্গ সম্রাটের রাজ্যভুক্ত। ফরাসী সেনা নেদারল্যান্ড আক্রমণের চেষ্টা করলে অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়ে। তৃতীয়তঃ, জিরন্ডিষ্ট গোষ্ঠী ছিল বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিনিধি। বুর্জোয়া ব্যবসায়ী ও ঠিকাদার শ্রেণী যুদ্ধের ঠিকাদারীতে প্রচুর

জিরন্ডিষ্ট দলের যুদ্ধের প্রতি আগ্রহ

১· "Basically it was a conflict between the forces of Revolution and those of Reaction."—A. Sorel—L Europe et la Revolution Francaise.

২· Fisher—A History of Europe.

মুনাফার সম্ভাবনায় পুলকিত হয়। এদের স্বার্থরক্ষার জন্যে এবং মুদ্রার দামে স্থিরতা আনার জন্যে জিরন্ডিষ্টরা যুদ্ধনীতিকে গ্রহণ করে।

বৈদেশিক যুদ্ধে ফ্রান্সের জড়িয়ে পড়ার আরও একটি কারণ ছিল। কিছু সংখ্যক ফরাসী নেতা মনে করতেন যে, ষোড়শ লুইয়ের সঙ্গে দেশত্যাগী ফরাসী অভিজাত ও বৈদেশিক রাজশক্তিগুলির গোপন চক্রান্ত আছে। বৈদেশিক শক্তিগুলি দেশত্যাগী অভিজাতদের সাহায্যে বিপ্লবকে ধ্বংস করবে বলে তাঁরা আশঙ্কা করেন। দেশত্যাগীরা রাইনল্যান্ড হতে ফ্রান্স আক্রমণ করবার উদ্যোগ করে। এমিগ্রিদেব দমন করার জন্যে যুদ্ধের প্রয়োজন হয়।

ফবাসী দেশপ্রেমিকদেব এমিগ্রি বিদ্বেষ

এদিকে ফ্রান্সের মহাপরাক্রান্ত বুরবোঁ বংশীয় নৃপতি ষোড়শ লুইয়ের বন্দীদশা এবং প্রাণনাশের আশঙ্কা দেখা দিলে ইওরোপীয় নৃপতিরা চঞ্চল হন। কারণ বুরবোঁ বংশের সঙ্গে ইওরোপেব অধিকাংশ রাজপরিবারের আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। অষ্ট্রিয়া রাজ দ্বিতীয় লিওপোল্ড ও কোলোনের ইলেক্টর ছিলেন ষোড়শ লুইয়ের রানী মারিয়া এ্যান্টোনেটের নিজ ভ্রাতা। ইতালীর সার্ডিনিয়ার রাজা ছিলেন ষোড়শ লুইয়ের ভ্রাতার শ্বশুর। স্পেন ও নেপলসের বুরবোঁ রাজারা ছিলেন ফ্রান্সের রাজার জ্ঞাতি। সুতরাং ফরাসীরাজ ষোড়শ লুই ও তাঁর রানীর প্রাণবক্ষাব জন্যে তাঁরা বিপ্লবী ফ্রান্সকে আক্রমণ করার সঙ্কল্প নেন। ফ্রান্সের দেশপ্রেমিকরা সন্দেহ কবে যে, ষোড়শ লুই গোপনে এই সকল বৈদেশিক শক্তির সহযোগিতা চান। এই পটভূমিকায় ১৭৯১ খ্রীঃ পিলনীৎসের ঘোষণা এবং ব্রান্সউইক ঘোষণা (আগে দেখ পৃঃ ৭৫ বিস্তাবিত বিবরণ) জারী করা হলে বিপ্লবী ফ্রান্সের সঙ্গে বৈদেশিক রাজাদের যুদ্ধাবস্থা সৃষ্টি হয়। অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার রাজা সর্বপ্রথম ষোড়শ লুইয়ের ও তাঁহার পরিবারের প্রাণ রক্ষার হুশিয়ারী দেন।

ইওবোপীয় শক্তিব ষোড়শ লুইয়েব প্রাণ বক্ষাব চেষ্টা

অবশ্য একথা সত্য যে, লিওপোল্ড একা অষ্ট্রিয়ার ঘাড়ে বিপ্লবী ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার দায়িত্ব নিতে ইতঃস্তত করেন। তিনি বলেন যে ইওরোপের অন্য রাজারা তাঁর সঙ্গে যোগ দিলে তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করবেন। লিওপোল্ড জানতেন যে, রাশিয়ার জারিনা ক্যাথারিন অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়াকে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে দিয়ে পোল্যান্ড দখল করতে উদ্‌গ্রীব ছিলেন। এজন্য ক্যাথারিন ফ্রান্সের বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে কড়া কথা বলেন। লিওপোল্ডের সন্দেহ ছিল যে তা আন্তরিক কথা নয়। সুতরাং পিলনীৎস ঘোষণা দ্বারা বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে ফাঁকা হুমকী দিয়ে তিনি নিশ্চেষ্ট থাকেন। তাঁর ধারণা ছিল যে এতেই বিপ্লবীরা সংযত হবে। ষোড়শ লুই-এর ক্ষতি করা হবে না।

কিন্তু ফ্রান্সের জ্যাকোবিনরা লিওপোল্ডের হুমকিকে সত্য সত্যই আক্রমণের জন্যে চরমপত্র বলে ধরে নেয়। ঐতিহাসিকরা বলেন জিরন্ডিষ্টরা ও জ্যাকোবিনরা এক্ষেত্রে লিওপোল্ডের সঙ্গে কূটনৈতিক আলোচনার দ্বারা পরিষ্কার সিদ্ধান্তে আসতে পারত। কিন্তু জ্যাকোবিনদের ধারণা হয় যে রাজতন্ত্রীরা বিপ্লবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে। বিশেষতঃ প্রাশিয়া এই আক্রমণাত্মক নীতির মুখপাত্র হিসেবে কাজ করছে। লেফেভাব বলেন জ্যাকোবিনদের এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল ছিল।

এ্যাভিগননের (Avignon) সমস্যা ফ্রান্সের সঙ্গে বৈদেশিক শক্তির বিরোধের অন্যতম কারণ ছিল। (১) এ্যাভিগনন ছিল পোপের রাজ্য। এ্যাভিগননের অধিবাসীরা পোপের অধীনতা মুক্ত হয়ে বিপ্লবী ফ্রান্সের সঙ্গে যুক্ত হবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে বিপ্লবী সরকার এ্যাভিগননকে ফ্রান্সের সীমাভুক্ত করে। এতে ইওরোপের রাজারা

অন্যান্য কারণ

মনে করেন যে, বিপ্লবী ফ্রান্স, রাজতন্ত্রী ফ্রান্সের ন্যায় রাজ্যগ্রাস নীতি গ্রহণ করেছে। (২) ঐতিহাসিক গুডউইনের (Goodwin) মতে, ফরাসী যুদ্ধমন্ত্রী নারবোন এবং সেনাপতি ডুমারিয়েৎস (Dumouriz) ফরাসী সেনাদলের সাহায্যে ফ্রান্সে তাঁদের স্বৈর শাসন স্থাপনের চক্রান্ত করেন। এই কারণে যুদ্ধমন্ত্রী নারবোন বিপ্লবী সরকারকে যুদ্ধ ঘোষণার জন্যে উৎসাহ দেন।[১] (৩) ফ্রান্সের কোন কোন বিপ্লবী নেতা মনে করতেন যে, অষ্ট্রিয়া হল ইওরোপের সর্বাপেক্ষা প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্র। যুদ্ধের দ্বারা অষ্ট্রিয়ার দর্প চূর্ণ করলে বিপ্লবের আদর্শ সফল হবে। তাছাড়া বিপ্লবী ফ্রান্সের বহু নেতার মনে ইওরোপে বিপ্লবের বিস্তারের সঙ্গে, ফরাসী সীমান্তে স্যাভয়, নীস, রাইন অঞ্চল ও বেলজিয়াম গ্রাস করার প্রবল ইচ্ছা ছিল। ঐতিহাসিক ফিশারের ভাষায়, "ফরাসী বিপ্লবের আদর্শের প্রভাবে, বিপ্লবী ফ্রান্সের অর্থসঙ্কট ফ্রান্সকে একাধারে বিপ্লবের আদর্শের প্রচারক ও রাজ্য অপহরণকারী দস্যু উভয় ভূমিকায় কাজ করতে বাধ্য করে।" কারণ বেলজিয়ামের স্বর্ণখনির প্রচ্ছন্ন লোভ ফরাসী নেতাদের পক্ষে উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না। এখানে উল্লেখ্য যে আইনসভায় একমাত্র ব্যক্তি যিনি যুক্তির সাহায্যে যুদ্ধ ঘোষণা প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন তিনি ছিলেন ম্যাক্সি মিলিয়েন রোবসপিয়ের।

অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার সঙ্গে বিপ্লবী ফ্রান্সের যুদ্ধের কারণগুলি আলোচনার পর ইংলন্ডের সঙ্গে ফ্রান্সের কেন বিরোধ হয় তাও এ প্রসঙ্গে আলোচ্য। ব্রিটেনের অধিবাসীরা নেদারল্যান্ড অর্থাৎ বেলজিয়াম ও হল্যান্ডের নিরপেক্ষতার ওপর বিশেষ জোর দিত। কারণ ইংলন্ডের উপকূল থেকে বেলজিয়াম ও হল্যান্ডের দূরত্ব ছিল সামান্য। ইওরোপের কোন বৃহৎ শক্তি নেদারল্যান্ড অধিকার করলে সহজে ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে ইংলন্ড আক্রমণ করতে পারত। এদিকে জিরণ্ডিন দল ঘোষণা করে যে, ফ্রান্সের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে বেলজিয়াম ও দক্ষিণ-পূর্ব স্যাভয়, নীস এবং পূর্ব সীমান্তে রাইনল্যান্ড মুক্ত করার পর এই অঞ্চলগুলি ফ্রান্সের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। তাহলে ফ্রান্স তার প্রাকৃতিক সীমারেখা পাবে। এই ঘোষণা কোন ফাঁপা ব্যাপার ছিল না। ১৭৯৩ খ্রীঃ ফ্রান্সের বিপ্লবী সরকারের প্রেরিত ৩০ জন কমিশনার বেলজিয়ামে এক সাজানো ভোটের দ্বারা ফ্রান্সের সঙ্গে বেলজিয়ামের সংযুক্তি চূড়ান্ত করেন। অতঃপর বেলজিয়াম ফ্রান্সের একটি প্রদেশে পরিণত হয়। বেলজিয়াম দখলের পর বিপ্লবী সরকার হল্যান্ডের দিকে হাত বাড়ালে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে আর নিরপেক্ষ থাকা সম্ভব ছিল না। ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রী পিট ক্ষোভ প্রকাশ করেন যে, বেলজিয়ামকে ফ্রান্সের অন্তর্ভুক্ত করার সময় ইংলন্ডের কাছে সম্মতি না চেয়ে ফ্রান্স ব্রিটিশ সরকারকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। এখন হল্যান্ডে ফরাসী সেনা ঢুকে পড়ায় তিনি ব্যস্ত হন। হল্যান্ডের শেল্ট নদীর মোহানা অবাধ বাণিজ্যের জন্যে উন্মুক্ত না রাখতে ইংলন্ড ও হল্যান্ড চুক্তিবদ্ধ ছিল। ফরাসী সেনাদল শেল্ট নদীর মোহানা অবাধে বাণিজ্য জাহাজ চলাচলের জন্যে খুলে দিলে, হল্যান্ডের শাসনকর্তা ইংলন্ডের সাহায্য চান। কোন কোন জিরণ্ডিন নেতা আমষ্টারডামের আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কগুলির অর্থ আত্মসাৎ করে ফ্রান্সের যুদ্ধের খরচা নির্বাহ করার দাবী জানান। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী পিট ফরাসী রাষ্ট্রদূতকে সতর্ক করেন এবং বিপ্লবী সরকারকে সংযত হতে পরামর্শ দেন। এমন সময় ষোড়শ লুই-এর প্রাণদণ্ডের খবর এলে রাজতন্ত্রী ইংলন্ড স্তম্ভিত হয়। পার্লামেন্টে বিরোধী হুইগ দলও সরকারকে যুদ্ধ ঘোষণার পরামর্শ দেন। এরপর ব্রিটেন ইওরোপের শক্তিগুলির সাহায্যে ফরাসী বিরোধী জোট গঠনে তৎপর হয়।

ইংলন্ডের যুদ্ধে যোগদানের কারণ

উপরোক্ত ঘটনাবলীর সম্মিলিত প্রভাবে বিপ্লবী ফ্রান্সের সঙ্গে ইওরোপের রাজশক্তিগুলির যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ডেভিড টমসনের মতে, ১৭৯২ খ্রীঃ জানুয়ারি মাসে বিপ্লবী ফরাসী সরকার অষ্ট্রিয়াকে এক চরমপত্র দেয়। অষ্ট্রিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রান্সিস এই চরমপত্র অগ্রাহ্য করলে ফরাসী বিধান সভা (Legislative

উপসংহার

১· Goodwin—French Revolution. P. 113.

Assembly) ২০শে এপ্রিল, ১৭৯২ খ্রীঃ অষ্ট্রিয়া ও তার মিত্র প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এই যুদ্ধের ফলে ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব ইওরোপের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।[১] ফিলিপ গডেলার (Philip Guedella) মতে, এই যুদ্ধ ছিল আসলে বিপ্লবী ফ্রান্সের আদর্শবাদের সঙ্গে রাজতন্ত্রী ইওরোপের সংঘাত (The war of 1792 was a war in which both sides were aggressor)[২] ডেভিড টমসনের মতে, "বিপ্লবী ফ্রান্স ইওরোপকে আক্রমণ করে অথবা ইওরোপ বিপ্লবী ফ্রান্সকে আক্রমণ করে এই প্রশ্নের মীমাংসা সম্ভব নয়।"[৩]

জাতীয় সম্মেলনের নেতৃত্বে বৈদেশিক যুদ্ধ পরিচালনা (The conduct of the war under the National Convention) : ফরাসী জাতীয় সম্মেলন (National Convention) অষ্ট্রিয়া ও তার মিত্র প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে ১৭৯২ খ্রীঃ যুদ্ধ ঘোষণা করে। বিপ্লবী ফ্রান্স এই যুদ্ধের মোকাবিলার জন্যে নাগরিক সেনাদল (Citizen Army) গঠন করে। ১৮—২৫ বছর বয়স্ক অবিবাহিত যুবক বা মৃতদারদের সেনাদলে যোগ দিতে বাধ্য করা হয়। সামরিক ইতিহাসে এই ব্যবস্থা ছিল এক অভূতপূর্ব ঘটনা। কেননা এর আগে দেশের নাগরিকদের দ্বারা এরূপ ব্যাপকভাবে সেনা সংগঠনের কোন নজির ছিল না। জ্যাকোবিন নেতা কার্নোতের (Carnot) পরামর্শে লেভি-এন-মাসে (Leve en masse) বা সামরিক কার্যে ব্যাপক যোগদানের আইন পাশ করা হয়। এই নাগরিক সেনারা ছিল বিপ্লবের আদর্শে উদ্দীপ্ত রাজনৈতিকভাবে মগজধোলাই করা সেনা। জ্যাকোবিন দল নির্দেশ দেয় যে, সমগ্র জাতি, প্রতি ব্যক্তিকে দেশ রক্ষার জন্যে কাজ করতে হবে। যুবকেরা অবশ্যই বাধ্যতামূলকভাবে সেনাদলে যোগ দিবে, প্রৌঢ় ব্যক্তিরা অস্ত্র তৈরির কাজ করবে, নারীরা তাঁবু ও সেনাদের পোষাক সেলাই করবে, বালক-বালিকারা ব্যান্ডেজ তৈরি করবে। বৃদ্ধ ব্যক্তিরা যুদ্ধের পক্ষে প্রচার চালাবে।[৪] ইওরোপীয় রাজশক্তির আদর্শহীন বেতনভোগী সেনাদলকে ফ্রান্সের বিপ্লবী বাহিনী সহজে লন্ড-ভন্ড করে। বিপ্লবী সরকার "ভ্রাতৃত্বের ঘোষণাপত্র" (Edict of Fraternity) প্রকাশ করে ইওরোপের নিপীড়িত মানুষের প্রতি বিপ্লবী ফ্রান্সের সৌভ্রাত্র জানায়। এর ফলে ইওরোপের রাজতন্ত্রী সেনাদের মনোবল ভেঙে পড়ে। ফরাসী বিপ্লবের "সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার" বাণী লোকমুখে ধ্বনিত হয়।

বিপ্লবী ফ্রান্সের যুদ্ধ ঘোষণা

বৈদেশিক যুদ্ধের গোড়ার দিকে সেনাপতি ডুমারিয়েৎস সরকারের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করে শত্রুপক্ষে যোগ দিলে প্রথম দিকে বিপ্লবী সরকারের পরাজয়ের উপক্রম হয়। এই সময় পোল্যান্ডের দ্বিতীয় ব্যবচ্ছেদ, ১৭৯৩ খ্রীঃ আরম্ভ হয়। রাশিয়া যাতে সমগ্র পোল্যান্ড না অধিকার করে, এজন্য প্রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়া ব্যস্ত হয়ে সেই দিকে বেশী নজর দেয়। এজন্য ফ্রান্সের বিরুদ্ধে অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার যুদ্ধে শিথিলতা দেখা দেয়। এই শিথিলতার সুযোগে ফ্রান্সের বিপ্লবী সরকার সেনা সংগঠন ও আত্মরক্ষার কাজ সম্পূর্ণ করে ফেলে। ভলমি (Valmy) ও জেমেপ্পার (Jemeppar) যুদ্ধে বিপ্লবী ফ্রান্স, অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়াকে পরাস্ত করতে সক্ষম হয়। ফরাসী সেনা বেলজিয়াম অধিকার করে এই দেশকে

যুদ্ধে জয়লাভ

১· David Thomson—Europe since Napoleon. P. 14.

২· Philip Guedella.

৩· "Whether it was the Revolution which attacked Europe, or Europe which attacked the Revolution is a question almost impossible and unprofitable to answer."—David Thomson. P. 21.

৪· George Rude.

অষ্ট্রিয়ার কবর্ল মুক্ত করে। পূর্ব সীমান্তে ফরাসী বাহিনী আলসাস ও লোরেন অধিকার এবং রাইন ল্যান্ড দখল করে। ফরাসী সীমান্ত রাইন নদী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। দক্ষিণে ফরাসী বাহিনী স্যাভয় ও নীস অধিকার করে।

ইংলন্ড সর্বদা ইংলিশ চ্যানেলের দক্ষিণে বেলজিয়ামকেই তার নিরাপত্তার সীমারেখা মনে করত। ফ্রান্সের মত একটি পরাক্রান্ত রাষ্ট্র বেলজিয়াম অধিকার করলে ব্রিটিশ মন্ত্রীসভায় চাঞ্চল্য দেখা দেয়। বেলজিয়াম ও হল্যান্ডের মধ্যবর্তী শেল্ট নদী (The Scheldt) ছিল বেলজিয়ামের সঙ্গে সমুদ্রের যোগাযোগের পথ। এই নদীর মোহানা হল্যান্ড বন্ধ রাখত। ফলে বেলজিয়ামের বাণিজ্য হল্যান্ড নিয়ন্ত্রণ করত। বিপ্লবী ফ্রান্স জোর করে শেল্ট নদীর মোহানা খুলে দেয় এবং সকল দেশের জাহাজ চলাচলের অনুমতি দেয়। এতে হল্যান্ড ক্রুদ্ধ হয়।

ইংলন্ড ও হল্যান্ডের বিরোধিতা

ইতিমধ্যে বিপ্লবী সরকার ষোড়শ লুইয়ের প্রাণদণ্ড দিলে, ইওরোপীয় রাজশক্তিগুলি একযোগে বিপ্লবী ফ্রান্সকে ধ্বংস করার পণ করে। ইংলন্ডের চেষ্টায় ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ১৭৯৩ খ্রীঃ প্রথম শক্তি জোট (First Coalition) গঠিত হয়। এতে অষ্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, সার্ডিনিয়া, ইংলন্ড, হল্যান্ড, স্পেন ও পর্তুগাল যোগ দেয়। এইভাবে ফ্রান্সের যুদ্ধ ইওরোপের যুদ্ধ এবং ফ্রান্সের বিপ্লব ইওরোপের বিপ্লবে পরিণত হয়।

প্রথম জোট গঠন

পাঠ্যসূচী

১। Lefevre—French Revolution.
২। Goodwin—French Revolution.
৩। Cobban—History of France (Penguine Edition). Vol.I.
৪। David Thomson—Europe since Napoleon.
৫। Carlyle—French Revolution.
৬। Madelin—The French Revolution.
৭। Madelin—Danton.
৮। Stern—Mirabeau.
৯। Thomson—Rebespierre.
১০। Mathiez—Robespierre Terrorist.

ষষ্ঠ অধ্যায়

ডাইরেক্টরীর শাসন (১৭৯৫—১৭৯৯ খ্রীঃ) ও ফরাসী বিপ্লবের ফলাফল

[The Government of the Directory (1795—1799) and the Results of the French Revolution]

রোবসপিয়েরের পতনের পর জাতীয় সম্মেলন (National Convention) একটি নতুন সংবিধান (১৭৯৫ খ্রীঃ) গ্রহণ করে। এই সংবিধান বলে যে নতুন সরকার গঠিত হয় তার নাম ছিল ডাইরেক্টরী বা পরিচালক সমিতির শাসন। (১) এই নতুন সংবিধানে সরকারের কার্যনির্বাহক ক্ষমতা বা শাসন ক্ষমতা পাঁচ-সদস্যবিশিষ্ট এক সমিতির হাতে দেওয়া হয়।

ডাইরেক্টরীর শাসনতন্ত্র

নিম্ন পরিষদ ৫০ জন সদস্যের নামের একটি তালিকা উচ্চকক্ষে পাঠাত। উচ্চকক্ষ বা প্রবীণ পরিষদের সদস্যরা তার মধ্যে থেকে ৫ জনকে ডাইরেক্টর হিসেবে ৫ বছরের জন্যে নির্বাচন করে। ডাইরেক্টররা ক্ষমতা বিভাজন তত্ত্ব অনুযায়ী কেবলমাত্র প্রশাসনিক ক্ষমতা ভোগ করত। আইন রচনার কাজে তারা হাত দিতে পারত না। তাদের কর্তব্য ছিল আইনসভা কর্তৃক পাশ করা আইনগুলিকে যথাযথ প্রয়োগ করা। (২) ১৭৯৫ খ্রীঃ সংবিধানে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভার ব্যবস্থা করা হয়। নিম্নকক্ষের নাম হয় পাঁচশতের পরিষদ। এতে ৫১১ জন সদস্য ছিল।[১] এছাড়া প্রাচীনদের বা প্রবীণদের পরিষদ (Council of Ancients) নামে একটি উর্ধ্বকক্ষ ছিল। সংবিধানের রচনাকারী Bandin বলেন যে "উচ্চকক্ষে "যুক্তি" নিম্নকক্ষে "কল্পনা" প্রতিফলিত হবে।" প্রবীণের যুক্তি ও নবীনের কল্পনার আলোকে ফ্রান্সের নতুন আইনগুলি রচিত হবে। প্রবীণ পরিষদের সদস্যপদ প্রার্থীদের কমপক্ষে ৪০ বছর বয়স এবং পাঁচশতের পরিষদের সদস্যপদ প্রার্থীদের ৩০ বছর বয়স ধার্য করা হয়। পাঁচশতের পরিষদ আইন রচনা ও গ্রহণ করে তা প্রবীণ পরিষদে পাঠাবে। প্রবীণ পরিষদ তা অনুমোদন করলে তবে তা আইনে পরিণত হত। ডাইরেক্টরীর আইনসভার নির্বাচনে সর্বসাধারণের ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়নি। সম্পত্তির ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নিম্নকক্ষের সদস্য নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। এর ফলে প্রকৃত গণতন্ত্রকে হত্যা করা হয়। ধনী বুর্জোয়া শ্রেণী পুনরায় ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়।[২] আইনসভার দুইকক্ষ থেকে প্রতি বছর $\frac{১}{৩}$ সদস্যদের আসন শূন্য হলে, নতুন সদস্য দ্বারা তা পূর্ণ করার ব্যবস্থা করা হয়। নতুন আইনসভা গঠিত হলে, যাতে উগ্রপন্থী জ্যাকোবিনরা তাতে ঢুকে না পড়ে এজন্য ন্যাশন্যাল কনভেনশনের ৫০০ সদস্যকে ডাইরেক্টরীর আইনসভায় আসন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। সংবিধানটি গণভোটে পাশ করিয়ে চালু করা হয়। মাত্র ২ লক্ষ লোকের সংখ্যাগরিষ্ঠতা দ্বারা সংবিধানকে কার্যকরী করা হয়। প্যারিসের ৩৩টি সেকসন ভোটদানে বিরত থাকে। ১৭৯৫-এর এই সংবিধানের প্রধান ত্রুটি ছিল যে এই সংবিধান পুনরায় সম্পত্তিভোগী বুর্জোয়াদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। তরমিদরীয় প্রতিক্রিয়ার সন্তান ছিল এই সংবিধান। ক্ষমতা বিভাজন নীতির ফলে প্রশাসনের কর্তা ৫ ডাইরেক্টরের সঙ্গে আইনসভার কোন যোগ ছিল না। প্রশাসন ও আইনসভার মধ্যে ক্ষমতার বিরোধ দেখা দিলে তার সাংবিধানিক পথে মীমাংসার

১· মতান্তরে ৫০০ সদস্য।

২· Fisher—A History of Europe.

কোন বিধান ছিল না। এজন্য ডাইরেক্টরগণ সঙ্কট দেখা দিলে বলপ্রয়োগ দ্বারা আইনসভার বিরোধী সদস্যদের বহিষ্কারের নীতি নেন। সংবিধানের এই দুর্বলতাই ডাইরেক্টরীর পতন শেষ পর্যন্ত ঘটায়। দ্বিতীয়তঃ, গণভোট প্রথা রদ করায় সাধারণ লোক ডাইরেক্টরীর সংবিধানকে অন্যায় মনে করত। তার সুযোগে উগ্রপন্থীরা ভোটাধিকারহীন জনতার সাহায্যে আইনসভাকে ভাঙতে চেষ্টা চালায়। ১৭৯৫ খ্রীঃ ৫ই অক্টোবর প্যারিসের সেকসনগুলি থেকে জনতা আইনসভা আক্রমণের চেষ্টা করে। এই বিদ্রোহের নাম ছিল তঁদারমিয়ারের বিদ্রোহ (13th Vendermiaare)।এই বিদ্রোহে Sectionগুলির পক্ষে গণতন্ত্রীরাও যোগ দেয়। এই জনতা ১৭৮৯ খ্রীঃ জুলেশ মিশেলের বর্ণিত ক্ষুধার্ত ধ্বংস পাগল জনতা ছিল না। মাত্র ২৫ হাজার লোক আইনসভা ঘেরাও করার চেষ্টা করলে, একদা জ্যাকাবিনপন্থী যুবক সেনাপতি নেপোলিয়ন কামান দেগে জনতাকে বাড়ি ফিরিয়ে দেন। সামরিক বাহিনীর কামানের নলের আশ্রয়ে ডাইরেক্টরীর শাসন শুরু হয়।

আভ্যন্তরীণ নীতি ঃ পাঁচ ডাইরেক্টর বা পরিচালক ছিলেন এই সরকারের প্রশাসনিক প্রধান। এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ছিলেন বারাস (Barras) নামক সদস্য।

ডাইরেক্টরীর দুর্নীতিপূর্ণ বুর্জোয়া শাসন

'ডাইরেক্টরগণ দক্ষিণপন্থী অভিজাত ও বামপন্থী জ্যাকোবিনদের মধ্যে শক্তিসাম্য রেখে ফ্রান্সের শাসন পরিচালনার চেষ্টা করে। এই দুই বিপরীত পন্থীদের মধ্যে শক্তিসাম্য রক্ষার নীতির নাম ছিল—"বাসকুল" (Bascule) নীতি। ডাইরেক্টরা জানতেন যে, যদি বাম ও দক্ষিণের মধ্যে কোন পক্ষ প্রবল হয় তবে ডাইরেক্টরীর সংবিধান ভেঙে ফেলবে। ডাইরেক্টররা ছিল ধনী বুর্জোয়া শ্রেণীর অনুগত। ডাইরেক্টরগণ শেষ পর্যন্ত এই 'বাসকুল' নীতিকে সাফল্যমণ্ডিত করতে ব্যর্থ হয়। মাদেলাঁ প্রভৃতি ঐতিহাসিকেরা ডাইরেক্টরীর দুর্নীতিপূর্ণ বুর্জোয়া শাসনের তীব্র নিন্দা করেছেন। রাজতন্ত্রের গলিত অংশগুলির সঙ্গে বুর্জোয়াতন্ত্রের গলিত অংশের মিলনে ডাইরেক্টরীর শাসন সংগঠিত হয় (Vices of the Court mixed with vices of the Court-yard)। নবোদিত ধনীরা অপসংস্কৃতিকে বড়াই করে প্রচার করে। মাদাম যোসেফিন, মাদাম থেরেশা তালিয়েন প্রভৃতি রঙ্গিনী রমণীরা ডাইরেক্টরগণের প্রেরণাদাত্রীতে পরিণত হন। মাদাম থেরেশা তালিয়েন তাঁর একটি গাউন নির্মাণের জন্যে ১২ হাজার লিভ্র ব্যয় করে তার বুর্জোয়া চরিত্রের পরিচয় দেন। মাদাম তালিয়েন ছিলেন ডাইরেক্টর বারাসের উপপত্নী। জোনেস দ্রোরি (Jeunesse Dorie) বা সাজানো যৌবনকে প্রদর্শনীকারিনীরা সাংস্কৃতির প্রচারকারিনীতে পরিণত হন। সম্পদের বড়াই করা এখন একটা ফ্যাশনে পরিণত হয়। পঞ্চ ডাইরেক্টর কার্যক্ষেত্রে নির্বাচিত সদস্যের ন্যায় আচরণ না করে "পঞ্চ রাজায়" (Five Majesties) পরিণত হন।

ডাইরেক্টরী প্রথম থেকে নিদারুণ অর্থনৈতিক সঙ্কটে পড়ে। তথাপি ডাইরেক্টরী ব্যয় সঙ্কোচের চেষ্টা করেনি। ১৭৯৫ খ্রীঃ ডাইরেক্টরীর প্রাত্যহিক খরচা ছিল ৮০-৯০ মিলিয়ন এবং প্রাত্যহিক আয় ছিল ৬-৮ মিলিয়ন ফাঁ। ১০০ এ্যাসাইনাটের দাম ১৫ স্যুতে নেমে যায়। বাজার

মুদ্রাস্ফীতি

হাটগুলি খাঁ খাঁ করতে থাকে। সর্বত্র ভবঘুরে ও গুণ্ডারা ঘুরে বেড়ায়। সেনাদল লুঠপাট করে খরচা চালায়। কৃষকেরা শস্য বিক্রয় করে মূল্য হিসেবে এই এ্যাসাইন্যাট নিতে অস্বীকার করে। ডাইরেক্টরী এ্যাসাইন্যাটই বাতিল করে ম্যাণ্ডেট টেরিটারিয়ান[১] (১৭৯৭ খ্রীঃ) নামে এক নতুন কাগজের মুদ্রার প্রচলন করে। কিন্তু এই মুদ্রাও অচল হয়। ফলে ডাইরেক্টরী বাধ্য হয়ে ধাতব মুদ্রা প্রবর্তন করে। কিন্তু ফ্রান্সে যথেষ্ট রূপা না থাকায় মুদ্রার সংখ্যা হ্রাস পায়। দেশে মুদ্রা সঙ্কট দেখা দেয়। ধাতু মুদ্রার

১· ফরাসী উচ্চারণ মাঁদা তেরিতোরিয়া হবে।

অভাবে ব্যবসায়-বাণিজ্য অচল হতে থাকে। কৃষকদের ও ছোট দোকানদারের দারুণ ক্ষতি হয়। রুটির দাম দারুণভাবে বেড়ে যায়। দরিদ্র জনসাধারণ ও বামপন্থী দলগুলি অসন্তুষ্ট হয়।

ডাইরেক্টরীর বিরুদ্ধে যে বিভিন্ন অন্তর্বিদ্রোহ ঘটে তার মধ্যে বামপন্থী ব্যাবেয়ুফের (Babeuf) বিদ্রোহ সমধিক বিখ্যাত। সমগ্র ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাসে ব্যাবেয়ুফ হলেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি প্রকৃত সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করতেন। ব্যাবেয়ুফ মনে করতেন যে, সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা থাকলে সমাজে ধনী-দরিদ্রের প্রভেদ থাকবে। এজন্য সম্পত্তির ব্যক্তিগত অধিকার লোপ করে সম্পত্তিকে রাষ্ট্রের মালিকানায় স্থাপনের কথা তিনি বলেন। সমাজে সকল ব্যক্তির সমান অর্থনৈতিক অধিকারের কথাও তিনি বলেন। ব্যাবেয়ুফ সর্বসাধারণের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবী করেন। তিনি সহিংস সংগ্রামের মাধ্যমে বুর্জোয়া সমাজকে ভাঙার চেষ্টা করেন। কিন্তু ডাইরেক্টরী ব্যাবেয়ুফের বিপ্লবী আন্দোলনকে দমন নীতির দ্বারা ধ্বংস করে। ব্যাবেয়ুফের ১৭৯৬ খ্রীঃ মৃত্যুদণ্ড হয়। ফরাসী বিপ্লবের একমাত্র সমাজতন্ত্রীর এইভাবে জীবনাবসান হয়। ব্যাবেয়ুফকে অনেকে কার্লমাক্সের অগ্রদূত বলেন।

ব্যাবেয়ুফের সমাজ তান্ত্রিক বিদ্রোহ

এছাড়া ডাইরেক্টরী কয়েকটি দক্ষিণপন্থী বিদ্রোহ এবং ষড়যন্ত্র দমন করে। সোসাইটি অফ দি কোম্পানি অফ জেহু (Society of the Company of Jehu) নামে এক ধর্মোন্মাদের দল লুঠপাট দ্বারা বিভীষিকা সৃষ্টি করে। রাজতন্ত্রী ক্লিশিয়ান দলও ডাইরেক্টরীকে ধ্বংসের চেষ্টা করে। ডাইরেক্টরীর নির্দেশে সেনাপতি হোসি (Hoche) এই সকল দক্ষিণপন্থী বিদ্রোহগুলি দৃঢ় হস্তে দমিয়ে ফেলেন।

অন্যান্য বিদ্রোহ

ডাইরেক্টরী এভাবে বাম ও দক্ষিণপন্থীদের দমন করে একটি মধ্যপন্থা বা "বাসকুল" নীতির দ্বারা ফ্রান্সে স্থিতিশীলতা আনাব চেষ্টা করে। কিন্তু অর্থনৈতিক সঙ্কটের দরুণ ডাইরেক্টরীর "বাসকুল" বা মধ্যপন্থা নীতি ব্যর্থ হয়। এই সময়ে সেনাপতি পিশেগ্রুর (Pichegru) নেতৃত্বে পুনরায় এক বাজতন্ত্রী বিদ্রোহ ঘটে। ১৭৯৭ খ্রীঃ নির্বাচনে বহু রাজতন্ত্রী আইনসভায় নির্বাচিত হয়। ৫ ডাইরেক্টরের মধ্যে অন্ততঃ দুজন ডাইরেক্টর রাজতন্ত্রের সমর্থন করায় ফ্রুক্তিদরের (Fructidor) সন্ত্রাস যা ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৭৯৭ খ্রীঃ ডাইরেক্টরী সেনাপতি নেপোলিয়নের সহায়তায় এই বাজতন্ত্রীদের বহিষ্কার করে। কার্নোৎ ও বার্থেলেমি বহিষ্কৃত হন এবং আইনসভায় ১১৮ জন নবনির্বাচিত সদস্যকে বহিষ্কার করা হয়। এখন থেকে এই ডাইরেক্টরীকে সেনাদলের ওপর নির্ভর করতে হয়। ডাইরেক্টরী ক্রমশঃ গণসমর্থন অপেক্ষা সামরিক শক্তির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এভাবে এই সরকারের পতনের পথ প্রস্তুত হয়।

ডাইবেক্টবীব সামবিক শক্তিব সাহায্য গ্রহণ ও ফল

অধিকাংশ ঐতিহাসিক মনে করেন যে, ডাইরেক্টরীর আমলে দুর্নীতি ও কুশাসন ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কিন্তু অনেকে মনে করেন যে, নেপোলিয়ন বোনাপার্টির বিখ্যাত শাসন সংস্কারগুলির রূপরেখা বা ব্লু প্রিন্ট (Blue print) ডাইরেক্টরীর আমলেই দেখা যায়। ডাইরেক্টরীকে নেপোলিয়নের শাসন সংস্কারের প্রস্তাবনা বলা যায়। প্রথমতঃ, ডাইরেক্টরী উগ্র অর্থনৈতিক জ্যাকোবিন মতবাদ এবং মডারেটদের বুর্জোয়া মতবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। দ্বিতীয়তঃ, ইংলন্ড থেকে আমদানি মালের ওপর উচ্চ হারে শুল্ক চাপিয়ে ডাইরেক্টরী ইংলন্ডকে পরোক্ষভাবে অর্থনৈতিক বয়কট করার চেষ্টা করে। ডাইরেক্টরী এই সংরক্ষণ নীতিকে সফল করার জন্যে শুধু ফ্রান্স নয়, ফ্রান্সের অধীনস্থ অন্যান্য দেশগুলিতেও সংরক্ষণ নীতি চালু করে। ইংলন্ডের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক বয়কটের সূচনা করে। নেপোলিয়নের আমলে ইহা কন্টিনেন্ট্যাল সিষ্টেমে (Continental system) পরিণত হয়। তৃতীয়তঃ, ডাইরেক্টরী সরকারি ব্যয় সঙ্কোচ চালু করে। ঋণের ওপর

ডাইরেক্টরীব শাসনের কৃতিত্ব

সুদের হার কমিয়ে প্রত্যক্ষ করের হার কমিয়ে পরোক্ষ কর বাড়ায়। এর ফলে ধীরে ধীরে অর্থনৈতিক স্থিতি আসে। চতুর্থতঃ, সংবিধান সভার আমল থেকে প্রদেশ ও জেলাগুলির ওপর কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ বিনষ্ট হয়। ডাইরেক্টরী এই ভাঙনকে রোধ করার জন্যে গ্রামে কমিউন ও শহরে মিউনিসিপ্যালিটির কর্মচারী নিয়োগের দায়িত্ব নিজ হাতে নেয়। এতে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব দৃঢ় হয়। এই কেন্দ্রীয়করণ নীতি নেপোলিয়নের আমলে পূর্ণতা পায়। মোট কথা, গোটা দেশে কেন্দ্রীয় আমলা নিয়োগ দ্বারা দেশের প্রশাসনিক ঐক্যস্থাপনের প্রচেষ্টা শুরু হয়। উপরোক্ত কারণে কেহ কেহ ডাইরেক্টরীর শাসনব্যবস্থার প্রশংসা করেন।

ডাইরেক্টরীর পতনের প্রধান কারণ এই ছিল যে, নিদারুণ অর্থসংকট ও মুদ্রাস্ফীতির দরুণ ডাইরেক্টরীর বহু পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। এই সরকারের প্রতি জনসাধারণের আস্থা নষ্ট হয়।

ডাইরেক্টরীর পতনের কারণ

দ্বিতীয়তঃ, ডাইরেক্টরগণ ছিলেন বুর্জোয়া শ্রেণীর লোক। ফ্রান্সের সাঁকুলেৎ শ্রেণীর প্রতি তাঁরা সদয় ছিলেন না। ফলে ডাইরেক্টরগণ দরিদ্র শ্রেণীর সমর্থন হারায়। তৃতীয়তঃ, ডাইরেক্টরীর আমলে সর্বসাধারণের ভোটাধিকার ছিল না। এজন্য এর প্রকৃত গণতান্ত্রিক চরিত্র ছিল না। চতুর্থতঃ, ডাইরেক্টরদের ব্যক্তিগত চরিত্র ছিল কলঙ্কজনক। জনসাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করার মত ক্ষমতা তাঁদের ছিল না। পঞ্চমতঃ, ডাইরেক্টরী বিদ্রোহ দমনের জন্যে সামরিক শক্তির ওপর নির্ভর করার ফলে, এর অস্তিত্ব উচ্চাকাঙ্ক্ষী সেনাপতিদের হাতে চলে যায়। ষষ্ঠতঃ, নেপোলিয়ন বোনাপার্টের উদয় ও তাঁর বিস্ময়কর সামরিক সাফল্য ডাইরেক্টরীর কৃতিত্বকে ম্লান করে দেয়।

ডাইরেক্টরীর বৈদেশিক নীতি (Foreign Policy of the Directory) : বিপ্লবী ফ্রান্সের সঙ্গে ইওরোপীয় রাজশক্তিগুলির যুদ্ধ বাধলে এবং ফ্রান্স বেলজিয়াম দখল করলে, আতঙ্কিত ইংলন্ড ফ্রান্সের বিরুদ্ধে প্রথম শক্তি জোট গঠন করে। কিন্তু এই শক্তি জোট স্থায়ী হয়নি। প্রাশিয়া, হল্যান্ড, স্পেন প্রভৃতি দেশ এই জোট ত্যাগ করে। কিন্তু অষ্ট্রিয়া ও ইংলন্ড এতে না দমে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাতে থাকে।

প্রথম জোটের কারণ

ইংলন্ড ও অষ্ট্রিয়ার এই বিরোধিতার কারণ ছিল। বেলজিয়ামে ফরাসী সেনার উপস্থিতি অষ্ট্রিয়া সহ্য করতে প্রস্তুত ছিল না। বেলজিয়াম ছিল আইনতঃ অষ্ট্রিয়ার হ্যাপসবার্গ বংশের রাজ্য। বেলজিয়ামে ফরাসী সেনার উপস্থিতি ইংলন্ডের নিরাপত্তার পক্ষে বিঘ্ন হয়। তদুপরি শেল্ট নদীকে অবাধ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্যে ফরাসীরা খুলে দেওয়ায় হল্যান্ড ও ইংলন্ডের বাণিজ্য বিপন্ন হয়। ব্রিটিশ মালের ওপর ফরাসী সরকার চড়া হারে শুল্ক ধার্য করায় ইংলন্ড ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাতে বাধ্য হয়।

এই সময়ে ফ্রান্সে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট নামে এক প্রতিভাবান সেনাপতির উদয় হয়। নেপোলিয়ন চিরাচরিত যুদ্ধের কায়দা-কৌশল ত্যাগ করে তাঁর নিজ কৌশলে যুদ্ধ করে বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করেন। নেপোলিয়ন প্রথমে কয়েকটি খণ্ডযুদ্ধে তাঁর প্রতিভার পরিচয় দিয়ে খ্যাতি পান। ইতিমধ্যে প্রধান ডাইরেক্টর ব্যারাসের উপপত্নী মাদাম থেরেশো তালিয়েনের সুনজরে এই যুবক সেনাপতি পড়েন।[১] এজন্য তাঁর দ্রুত উন্নতি ঘটে। প্রতিভার সঙ্গে সৌভাগ্যের সংমিশ্রণে নেপোলিয়নের উন্নতির পথ প্রশস্ত হয়।

নেপোলিয়নের অভ্যুত্থান

অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যে ডাইরেক্টরী সরকার যে নতুন রণ-পরিকল্পনা রচনা করে তাতে দুদিক হতে অষ্ট্রিয়াকে আঘাত হানার ব্যবস্থা করা হয়। (১) একটি ফরাসী বাহিনীকে জার্মানীর কৃষ্ণ অরণ্যের (Black Forest) ভেতর দিয়ে সরাসরি অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা আক্রমণের জন্যে পাঠান হয়। এই

ফরাসী বাহিনীর বিফলতা

১· Vincent cronin—Napoleon.

অভিযান তেমন উল্লেখযোগ্য সাফল্য পায় নি। (২) অপর একটি ফরাসী বাহিনী সেনাপতি নেপোলিয়ন বোনাপার্টের নেতৃত্বে আল্পস পর্বতের গিরিপথ ধরে ইতালীতে অবস্থিত অষ্ট্রিয়ার প্রধান সেনাদলকে আক্রমণ করে। তখনকার ইতালী ছিল ধনসম্পদে পরিপূর্ণ। ফ্রান্সের যুদ্ধপ্রিয় ছিন্নবস্ত্র সেনাদল এই সম্পদ লুট করার জন্যে চিনির ডালার ওপর একসারি পিঁপড়ের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে।

নেপোলিয়নের ইতালী অধিকাব

নেপোলিয়ন যখন ইতালী অভিযানে যান তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ২৭ বছর। অন্যান্য সেনাপতিদের মত তাঁর যুদ্ধ পরিচালনার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। রণশাস্ত্রের পণ্ডিত ক্লাউসিৎসের (Clausewitz) মতে, "বিপ্লবী যুদ্ধে নেপোলিয়ন নিজের কাছেই নিজে যুদ্ধ শিক্ষা করেন।" ক্লাউসিৎসের মতে, নেপোলিয়ন ইতালীর যুদ্ধে যে রণ-পরিকল্পনা নেন তাহা একমাত্র নেপোলিয়নের পক্ষেই রূপান্তরিত করা সম্ভবপর ছিল।

লোদী ও রিভোলীব যুদ্ধ জয়

নেপোলিয়ন ইতালীতে one by one বা একের পর এক, যুদ্ধ করার পরিকল্পনা নেন।তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সার্ডিনিয়া মৈত্রী থেকে অষ্ট্রিয়াকে বিচ্ছিন্ন করে উভয় শক্তিকে ধ্বংস করা। তিনি মন্ডোভির্ র যুদ্ধে সার্ডিনিয়াকে পরাস্ত করে স্যাভয় ও নিস দখল করেন। সার্ডিনিয়া এর ফলে যুদ্ধ ত্যাগ করে। অতঃপর লোদীর যুদ্ধে অষ্ট্রিয়াকে পরাস্ত করে নেপোলিয়ন অষ্ট্রিয়াকে মিলান থেকে হঠিয়ে দেন। অষ্ট্রিয় বাহিনী ম্যাস্টুয়া দুর্গে আশ্রয় নিলে, নেপোলিয়ন এই দুর্গ অবরোধ করেন। অবরুদ্ধ অষ্ট্রিয় বাহিনীর উদ্ধারের জন্যে অষ্ট্রিয়ার নতুন সৈন্য ইতালীতে আসলে, নেপোলিয়ন পর পর আরকোলা (Arcola) ও রিভোলীর (Rivoli) যুদ্ধে তাদের বিধ্বস্ত করেন। ১৭৯৭ ম্যাস্টুয়া দুর্গের পতন ঘটে। অষ্ট্রিয় সেনাদল পিছু হটে স্বদেশের দিকে পালাতে থাকলে তাদের পিছু নিয়ে নেপোলিয়ন ভিয়েনা নগরীকে বিপন্ন করেন। অন্যদিকে পোপ তলেনতিনোর (Treaty of Tolentino) সন্ধির দ্বারা এ্যাভিগননের ওপর তাঁর দাবী ছাড়েন। মধ্য ইতালীর বোলেগনা, রোমানা প্রভৃতি অঞ্চলে নেপোলিয়ন ফরাসী বিজয় পতাকা ওড়ান।

তলেন তিনোব সন্ধি

ক্যাম্পো ফোর্মিওব সন্ধি

এই পরাজয়ের ফলে অষ্ট্রিয়া বাধ্য হয়ে ক্যাম্পো ফোর্মিও (Campo Formio)-এর সন্ধি (১৭৯৭ খ্রীঃ) স্বাক্ষর করে। ক্যাম্পো ফোর্মিও ছিল নেপোলিয়নের প্রথম বিজয় বৈজয়ন্তী। এই সন্ধির দ্বারা বেলজিয়াম, আয়োনীয় দ্বীপপুঞ্জে ফ্রান্সের অধিকার অষ্ট্রিয়া স্বীকার করে। (২) রাইন নদী পর্যন্ত ফ্রান্সেব সীমারেখা অষ্ট্রিয়া স্বীকার করে। (৩) রাইন নদী পর্যন্ত ফরাসী সীমান্ত বিস্তারের ফলে যে সকল জার্মান রাজা রাজ্য হারান, জার্মানীর অবশিষ্ট ভূমি থেকে তাঁদের ক্ষতিপূরণ দানে অষ্ট্রিয়া স্বীকৃত হয়। (৪) উত্তর ইতালীর লম্বার্ডির ওপর অষ্ট্রিয়া অধিকার ত্যাগ করে। (৫) এর বিনিময়ে ইতালীর ভিনিসিয়া অঞ্চলে অষ্ট্রিয়ার অধিকার স্বীকৃত হয়। (৬) নেপোলিয়নের পোপের সঙ্গে টোলেনটোর (Tolento) সন্ধি অষ্ট্রিয়া মেনে নেয়। এই সন্ধির দ্বারা পোপ এ্যাভিগননের ওপর দাবী ত্যাগ করেন। তিনি যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসেবে অর্থ ও প্রাচীন ঐতিহাসিক চিত্র এবং পাণ্ডুলিপি ফ্রান্সকে দিতে বাধ্য হন। (৭) অষ্ট্রিয়ার কবল থেকে মুক্ত ইতালীতে নেপোলিয়ন দুটি প্রজাতন্ত্র স্থাপন করেন। (ক) এর একটির নাম ছিল সিসআলপাইন বা সিজালপাইন প্রজাতন্ত্র (Cis Alpine Republic)। লম্বার্ডি, মিলান প্রভৃতি অঞ্চল নিয়ে এটি গঠিত হয়। (খ) অপরটি ছিল লাইগুরিয়ান প্রজাতন্ত্র (Ligurian Republic)। জেনোয়া নিয়ে এটি গঠিত হয়। এই প্রজাতন্ত্রগুলি ছিল আসলে ফ্রান্সের আশ্রিত রাজ্য এবং অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার বেষ্টনী। যেহেতু ফ্রান্সে তখনও প্রজাতন্ত্র ছিল, সেহেতু এই রাজ্যগুলিতে প্রজাতন্ত্র

স্থাপিত হয়। অষ্ট্রিয়ার রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে নেপোলিয়নের সংগ্রামকে ইওরোপের জনগণ অভিনন্দন জনায়। বিপ্লবী ফ্রান্স মুক্তিদাতার ভূমিকা নেয়। ক্যাম্পো ফোর্মিও সন্ধির ফলে নেপোলিয়ন স্বদেশে অসাধারণ জনপ্রিয়তা পান। তিনি ফ্রান্সে ফিরে আসলে ল্যোকে তাঁকে জুলিয়াস সিজারের ন্যায় সম্মান জানায়। নেপোলিয়ন ইতালী বিজয়ের পুরস্কার রূপে ঘোড়ার গাড়ি বোঝাই করে স্বর্ণমুদ্রা ও দুষ্প্রাপ্য শিল্পদ্রব্য প্যারিসে নিয়ে আসেন। তার মধ্যে ছিল ভিনিসের সেন্টমার্ক গীর্জার সুবর্ণ কেশরী বা ঢালাই সোনার সিংহ মূর্তি। ঐতিহাসিক ফিশার মন্তব্য করেছেন যে, পোল্যান্ডের ভূমি অন্যায়ভাবে দখলকারী অষ্ট্রিয়া এখন ফ্রেডারিক্ দি গ্রেটের ভাবশিষ্য নেপোলিয়নের হাতে পরাস্ত হলে ইতিহাসের ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়। অষ্ট্রিয়া তার অহমিকা ছেড়ে তার নিজ বাজ্য বেলজিয়াম ফ্রান্সকে উপহার দিতে বাধ্য হয়। যে জার্মান রাষ্ট্রের রক্ষাকর্তা বলে নিজেকে দাবী করত, এখন ক্যাম্পো ফোর্মিওর সন্ধির দ্বারা সেই জার্মান রাষ্ট্রের আংশিক পতন তাঁকে স্বীকার করতে হয়। কারণ বাইন অঞ্চল পর্যন্ত জার্মানীর ভূমি অষ্ট্রিয়াকে ছেড়ে দিতে হয় ফ্রান্সকে। ইতালীর লম্বার্ডিও অষ্ট্রিয়াকে হাতছাড়া করতে হয়। এভাবে ফ্রেডারিক দি গ্রেটের ফরাসী ভাবশিষ্য, ইতিহাসের নিয়তির মতই, অষ্ট্রিয়াকে তার অতীত কৃতকর্মের জন্যে শাস্তি দেন।

ইতালীর যুদ্ধে, ফ্রান্সের জয়লাভের ফলে প্রথম শক্তি জোটের (First Coalition) পতন ঘটে। একমাত্র ইংলন্ড নির্ভীকভাবে যুদ্ধ চালাতে থাকে। ইংলন্ডের বিরুদ্ধে ক্যান্ট্রিবের নৌ-অভিযান ব্যর্থ হলে এবং সেন্ট ভিনসেন্টের যুদ্ধে ইংরাজ নৌ-বহর ফরাসী নৌ-বহরকে পবাস্ত করায় ডাইরেক্টরী ইংলন্ডকে পবাজিত করা সম্পর্কে হতাশ হযে পড়ে। এর পরিবর্তে ভূমধ্যসাগর পার হয়ে মিশরের পথে ভারত অভিযানের পরিকল্পনা ডাইরেক্টরী নেয়। ইতালীর যুদ্ধে জয়লাভের ফলে নেপোলিয়নের জনপ্রিয়তায় ডাইরেক্টররা ঈর্ষাকাতর হয়ে পড়ে। ডাইরেক্টরী সভার আশা ছিল যে, দুরূহ মিশর অভিযানে হয় নেপোলিয়নের পতন ঘটবে, নতুবা ইংলন্ডের পরাজয় হবে। ফলে যে কোন দিক হতে তারা লাভবান হবে। এ সময় ফ্রান্সের সীমান্ত ছিল সুরক্ষিত। প্রতিবেশী অঞ্চলগুলি ছিল ফ্রান্সের পদানত। সুতরাং সুদূর মিশরে অভিযান পাঠাতে বাধা ছিল না।

প্রথম জোটেব পতন

ইংলন্ডের সম্পদ সমুদ্রপথে ভারত হতে আসত। ভারত ছিল ইংলন্ডের শ্রেষ্ঠ উপনিবেশ। ভারত থেকে সম্পদ আনা বন্ধ করার জন্যে স্থলপথে মিশর হতে ভারত আক্রমণ করার পরিকল্পনা ফরাসী সরকার গ্রহণ করে। ১৭৯৮ খ্রীঃ তুর্লো বন্দর থেকে ৪০ হাজার সেনা, ৪০০ রণতরী সহ নেপোলিয়ন মিশর যাত্রা করেন। ১৭৯৮ খ্রীঃ নেপোলিয়ন মিশরে সসৈন্যে অবতরণ করে পিরামিডের যুদ্ধে মিশরের ম্যামেলুকদের পরাজিত করেন। কিন্তু ইংরাজ সেনাপতি নেলসন নীলনদের যুদ্ধে ফরাসী নৌ-বাহিনী ধ্বংস করলে, নেপোলিয়নের বাহিনীর সঙ্গে ফরাসী দেশের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়। ফ্রান্স থেকে সৈন্য ও রসদ সরবরাহ বন্ধ হলে নেপোলিয়নের অগ্রগতি বন্ধ হয়। তুরস্ক নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে চলে যায়। মিশর অভিযান নিষ্ফল দেখে নেপোলিয়ন ফ্রান্সে ফিরে আসেন।

মিশর অভিযান

নেপোলিয়নের অনুপস্থিতির সময় ডাইরেক্টরী তার ইওরোপীয় নীতি পরিচালনার ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। ডাইরেক্টরী পোপের প্রতি দুর্ব্যবহার করে পোপকে নজরবন্দী করায় ক্যাথলিক ইওরোপে ফ্রান্সের প্রতি ঘৃণার সঞ্চার হয়। ডাইরেক্টরী ইতালী ও সুইজারল্যান্ডে প্রচলিত শাসনব্যবস্থা লোপ করে প্রজাতান্ত্রিক শাসন স্থাপন করে। এজন্য ইওরোপীয় রাজশক্তিগুলি বিরক্ত হয়। এই সুযোগে ইংলন্ড ফ্রান্সের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় শক্তিজোট বা সেকেন্ড কোয়ালিশন গঠন করে। রাশিয়া, তুরস্ক, অষ্ট্রিয়া ও ইংলন্ড এই শক্তি জোটে যোগ দেয়।

ডাইরেক্টরীর পতন

নেপোলিয়ন ৯ই অক্টোবর, ১৭৯৯ খ্রীঃ মিশর থেকে ফ্রান্সে ফিরে আসেন। এই মাসটি ছিল বিপ্লবী ক্যালেন্ডারের ভঁদেরমিয়ের মাস। ডাইরেক্টরদের অন্যতম এ্যাবে সিয়েস ডাইরেক্টরীকে ধ্বংস করার জন্যে একটি পরিকল্পনা রচনা করেন। তিনি প্রধান ডাইরেক্টর ব্যারা (Barass) ও নেপোলিয়নের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করেন। এ্যাবেসিয়েসের চক্রান্তে নেপোলিয়নের ভ্রাতাকে পাঁচশতের সভার সভাপতি নিয়োগ করা হয়। বিপ্লবী ক্যালেণ্ডারের ১৮ ব্রুমিয়ারী বা ১৭৯৯-এর ৯ই নভেম্বর পাঁচশতের পরিষদে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে আক্রমণের চেষ্টা হলে, পরিষদের সভাপতি লুসিয়েন সেনাদল ডাকেন। সেনাদল ৫০০-এর পরিষদ ভেঙে দিলে ডাইরেক্টরীর পতন ঘটে। এই ঘটনাকে ব্রুমিয়ারীর অভ্যুত্থান বলা হয়।

যদিও কোন কোন ঐতিহাসিক ডাইরেক্টরীর শাসনকে নিরবচ্ছিন্ন দুর্নীতির যুগ বলেন, কোব্বানের মতে ডাইরেক্টরীর কার্যকলাপের নিরপেক্ষ মূল্যায়ন কখনও করা হয়নি। এর ফলে নেপোলিয়নের কনস্যুলেটের কৃতিত্ব সম্পর্কে অতিশয়োক্তি এবং ডাইরেক্টরীর কৃতিত্ব সম্পর্কে খাটো করার প্রবণতা দেখা যায়।

একথা মনে বাখা দরকার যে, অসম্ভব মুদ্রাস্ফীতিকে লাগাম পরিয়ে ডাইরেক্টরী মুদ্রার মান স্থায়ী করে। বাজেটে সমতা আনা হয়। আয় ব্যয়ের মধ্যে ফারাক কমান হয়। ১৭৯৬-৯৭-এর ভাল ফসলের পর খাদ্য সরবরাহ ও খাদ্যশস্যের দাম কমে। ব্রিটেনের সঙ্গে সামুদ্রিক যুদ্ধের জন্যে বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রচুর ঘাটতি হয় এবং মিশর অভিযান ব্যর্থ হলে প্রাচ্যদেশ বা লেভান্তে রপ্তানি হ্রাস পায়। জ্যাকোবিন উগ্রপন্থী ও প্রতিক্রিয়াশীল রাজতন্ত্রীদের 'বাসকুল' (Bascule) শাসননীতি চালু করা হয়। ফ্রান্স বৈদেশিক আক্রমণের আশঙ্কা থেকে মুক্ত হয়। অপরদিকে সাঁ কুলেতদের সঙ্গে ডাইরেক্টরী বুর্জোয়া সদস্যদের সংযোগ ছিল না। সর্বসাধারণের ভোট না থাকায় গ্রামীণ কৃষকদের সমর্থন ডাইরেক্টরী পায়নি। সামরিক বাহিনীর ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা ডাইরেক্টরীর পতন ঘটায়।

ডাইবেক্টবীব কৃতিত্ব

ফরাসী বিপ্লবের ফলাফল (Results of the French Revolution) : রুশ বিপ্লব ছাড়া, মানব জাতির ইতিহাসে ফরাসী বিপ্লবের ন্যায় ব্যাপক ও গভীর মূল বিপ্লব আর ঘটেনি। "দানবীয় ঝাঁটা"র (Giants' sweep) ন্যায় এই বিপ্লব বহু পুরাতন জরাজীর্ণ ব্যবস্থাকে ঝেঁটিযে ফেলে এবং নতুন সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করে। একশ্রেণীব ঐতিহাসিক এই বিপ্লবেব গুরুত্বকে লঘু করে দেখেন। যাহা হোক, কিন্তু এই বিপ্লবের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না।

মধ্য যুগ থেকে ফ্রান্সে অভিজাত ও সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। অভিজাতদের পূর্বপুরুষেরা অনেকেই বিজয়ী যোদ্ধা ছিল। সেই সুবাদে তাদের বংশধরেরা জমিদারী, সামন্ত কর, সরকারি চাকুরীর একাধিপত্য প্রভৃতি বিশেষ অধিকার ভোগ করত। এই বিশেষ অধিকারগুলিকে এক কথায় প্রিভিলেজ বলা যায়। এই বিশেষ অধিকার থাকায় সমাজে প্রকাণ্ড অসাম্য দেখা দেয়। ফরাসী বিপ্লব এই জরাজীর্ণ প্রথাকে ধ্বংস করে[১] ১৩ আগষ্ট, ১৭৮৯ খ্রীঃ ফরাসী বিধানসভা সকল প্রকার সামন্ত কর, সামন্ত স্বত্ব বিলোপ করে। দেশত্যাগী সামন্ত বা এমিগ্রিদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নতুনভাবে বন্দোবস্ত করা হয়। সামন্তশ্রেণীর বিশেষ অধিকার, সামাজিক মর্যাদা লোপ করা হয়। এইভাবে একটি বৈষম্যমূলক সমাজ ব্যবস্থার অবসান ঘটে। সামাজিক সাম্য স্থাপিত হয়। ঐতিহাসিক আলফ্রেড কোব্বানের মতে, "ফ্রান্সের অষ্টাদশ শতক ছিল আধুনিক যুগের

সামন্ত প্রথাব লোপ

১· Hayes—Social, Cultural and Political History of Europe. Vol. I.

সূতিকাগার" (The eighteenth Century...... in France, was, the nursery of modern world)* আধুনিক যুগের সমাজব্যবস্থায় সামন্তপ্রথা থেকে মুক্তি একটি উজ্জ্বল দিক। ফ্রান্সেই সর্বপ্রথম সামন্তপ্রথার মৃত্যুর দলিল রচিত হয়। ক্রমে তা ইওরোপের অন্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে। মধ্যযুগের এই অচলায়তনকে ফ্রান্সেই ভেঙে ফেলা হয়।

সামন্ত প্রথা বিলোপের ফলে ফ্রান্সে নতুন সমাজব্যবস্থা এইভাবে গড়ে ওঠে। স্বাধীন কৃষকশ্রেণী সামন্তদেব বাজেয়াপ্ত ভূমি ক্রয় করে সম্পদশালী হয়। এরাই গ্রামাঞ্চলের প্রধান শক্তিতে পবিণত হয়। ভূমিদাসশ্রেণী সার্ফডম বা ভূমিদাস প্রথা হতে মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জনের সুযোগ পায়। কর্ভি বা বেগার প্রথার কবল হতে এরা মুক্ত হয়। এদের ওপর শোষণমূলক কর যথা টাইদ বা ধর্মকর, ব্যানালিতে বা সামন্ত কর প্রভৃতি রদ হলে এরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। ম্যানর প্রথা লুপ্ত হয়। যোগ্যতার ভিত্তিতে কাজ পাওয়ার (Career open to talent) অধিকার প্রচলিত হলে এদের মধ্যে অনেকেই স্বাধীন জীবিকা গ্রহণ করে। একথা ঠিক যে ফরাসী বিপ্লবের ফলে সংবিধান সভার ৪ঠা আগস্টের ঘোষণা ও ১০ই আগস্টের বিধান এবং জাতীয় সম্মেলনের দেশত্যাগী এমিগ্রিদের বাজোয়াপ্ত ভূমির বণ্টন ও ক্ষতিপূরণ প্রদান লোপ সামন্ত প্রথার মৃত্যুর ঘণ্টা বাজায়। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সকল শ্রেণীর কৃষক তাতে সুখী, স্বচ্ছল জীবন-যাপনের সুযোগ পায়। ধনী ও স্বচ্ছল কৃষকরা সরকারের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত জমি কিস্তিতে খরিদ করে গ্রামে এক নতুন ধরনের বুর্জোয়া জমি মালিকে পরিণত হয়। এরা ছিল খাজনাভোগী রেন্টিয়ার বা বড় চাষী। ভাগচাষী বা মেটায়াব এবং ভূমিহীন ক্ষেতমজুব ও কটেজাব বা ঝুপড়ীবাসীরা আগের মতই ভূমির স্বত্ব থেকে বঞ্চিত থাকে।এই নতুন জমি মালিকশ্রেণী তাদের নীচে যারা ছিল অর্থাৎ ভাগচাষী, ক্ষেতমজুর প্রভৃতি তাদের সঙ্গে জমির স্বত্ব ভাগ করে নেয়নি। ফরাসী বিপ্লবের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের জোয়ার এই মধ্যবিত্ত কৃষকদের হাতে আসার পর তার গতি ও তেজ হারিয়ে ফেলে। এই নতুন জমি মালিকশ্রেণী তাদের নতুন মালিকানার কায়েমী স্বার্থকে হারাতে কিছুতেই রাজী ছিল না। ১৭৯৩ খ্রীঃ পর থেকে এই শ্রেণী আর বিপ্লব বা পরিবর্তন চায়নি। কারণ তারা যা পেয়েছিল তা রক্ষা করতেই তারা ব্যস্ত হয়। নতুন আন্দোলন হলে তাদের অর্জিত জমির স্বত্ব হারাবার ভয় ছিল। ১৭৯৩ খ্রীঃ থেকে একদা বিপ্লবী, লণ্ডভণ্ডকারী এই শ্রেণী ভয়ানক রক্ষণশীল ও পরিবর্তন বিরোধী হয়। বিপ্লব এর ফলে শীতলতা প্রাপ্ত হয়। এই শ্রেণীর হাত থেকে জমির মালিকানা কেউ কেড়ে নিতে পারেনি। 'কোব্বানের মন্তব্য স্মরণীয় "ফরাসী বিপ্লবের প্যারাডক্স বা আপাত-বিরোধী দিক এই যে, বিপ্লবের ভূমি ব্যবস্থা সমাজে একটি অত্যন্ত রক্ষণশীল শ্রেণী সৃষ্টি করে।" লেফেভার এই শ্রেণীকে "কৃষক বুর্জোয়া" বলেছেন। তাদের রক্ষণশীলতার সুযোগ নিয়ে নেপোলিয়ন তাঁর একনায়কতন্ত্র কায়েম করতে পারেন। কারণ তিনি এই ধনী কৃষিকার্যের জমির অধিকার রক্ষা করেন। তারাই তাঁর কনসুলেট ও সাম্রাজ্যের সহায়ক ছিল। ফলে ফ্রান্সে ভূমি স্বত্বের পরিবর্তন একটি স্তরে এসে থমকে যায়।

স্বাধীন কৃষকশ্রেণীব উদ্ভব

ফরাসী বিপ্লবের ফলে সাঁকুলেৎ বা শহরের সর্বহারা দিন মজুরদের তেমন কোন স্থায়ী উপকার হয়নি। ল অব ম্যাক্সিমাম এবং ল অব মিনিমাম দ্বারা কিছুদিনের মত তাদের উন্নতির চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তরমিদরীয় শাসনের আমলে এই আইনগুলি রদ করা হয়। ফলে সাঁকুলেতশ্রেণীর দুরবস্থা বিদ্যমান থাকে। লেফেভারের মতে, সাঁকুলেতশ্রেণী জীবিকার অধিকার ও কাজের অধিকার প্রভৃতি যে সকল দাবী জানায় তরমিদরীয় ফরাসী বিপ্লবের বুর্জোয়া নেতারা এই সকল দাবী পূরণ করতে মোটেই ইচ্ছুক ছিল না। এজন্য সাঁকুলেতশ্রেণীর স্বার্থ উপেক্ষিত হয়। মুক্ত অর্থনীতির ফলে

সাঁকুলেৎশ্রেণীর উপেক্ষিত স্বার্থ

ছোট দোকানদার বা ক্ষুদ্রশিল্পের অধিকারিরা কিছুটা উপকৃত হয়। শহরে যে অসংখ্য শ্রমিক, মুটিয়া, বেকার ছিল তরমিদীয় বিপ্লবের পর তাদের জন্যে কিছুই করা হয়নি। যতদিন অভিজাত ও প্রতিবিপ্লবীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ চালছিল, ততদিন বুর্জোয়া নেতারা এইগুলি প্রলেতারিয়েতদের ব্যবহার করে। তাদের দ্বারা রাস্তায় অবরোধ বা ব্যারিকেড তৈরি, আইনসভা ঘেরাও ও খণ্ডযুদ্ধ চালান হয়। ততদিন তাদের জন্যে মূল্যবৃদ্ধি আইন প্রভৃতি চালু রাখা হয়। যে মুহূর্তে বুর্জোয়া বিপ্লবীরা পেশাদারী সেবাদল গঠন করে, সেই মুহূর্তে তারা সাঁকুলেৎদের পোকা মাকড়ের মত পিষে ফেলে। সুতরাং সাঁকুলেতদের স্বার্থের জন্যে বিপ্লবী বুর্জোয়া নেতারা ১৭৯২—৯৪ খ্রীঃ পর্যন্ত যে আইনগুলি পাশ করে তা স্থায়ী করা হয়নি। আলফ্রেড কোব্বানের মতে, "সাঁকুলেতদের ও বুর্জোয়াদের স্বার্থ ছিল মূলতঃ পরস্পর-বিরোধী। সাঁকুলেতদের সঙ্গে বুর্জোয়াদের আঁতাত ছিল আকস্মিক এবং অস্থায়ী" (Fortuitous)।

ফরাসী বিপ্লব ছিল আসলে 'বুর্জোয়া বিপ্লব'। এই বিপ্লবে বুর্জোয়া শ্রেণীই প্রধান ভূমিকা নেয়। বিপ্লবের ফলে সমাজে যে নতুন ফসল ফলে তা এই শ্রেণীই প্রধানতঃ ঘরে তুলে।

বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থরক্ষা

ব্যবসায়-বাণিজ্যের ওপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও অন্তঃশুল্ক লোপ হওয়ার ফলে অবাধ বাণিজ্য নীতি স্বীকৃত হয়। এর ফলে পুঁজিবাদী অর্থনীতি বিকাশের পথ তৈরি হয়। পুঁজিবাদী বুর্জোয়াশ্রেণী সরকারকে তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখার আশায় সম্পত্তির ভিত্তিতে ভোটাধিকার স্থাপন করে। নাগরিকদের 'সক্রিয়' ও 'নিষ্ক্রিয়' দুভাগে ভাগ করে সম্পত্তিহীন নাগরিকদের 'নিষ্ক্রিয়' নাগরিকে পরিণত করে। জাতীয় সম্মেলনের আমলে কিছুদিন চরমপন্থীরা বিপ্লবের নেতৃত্বকে বুর্জোয়া শ্রেণীর হাত থেকে ছিনিয়ে নেয় এবং গণভোট চালু করে ডাইরেক্টরীর শাসনে বুর্জোয়া শ্রেণী তাদের লুপ্ত ক্ষমতা ফিরে পায়। তারা সর্বসাধারণের ভোট লোপ করে পুনরায় সম্পত্তির ভিত্তিতে ভোটাধিকার প্রবর্তন করে। জাতীয় সম্পত্তির ক্রয়-বিক্রয়, ফাটকাবাজী, যুদ্ধের ঠিকাদারী প্রভৃতি কাজে তারা হঠাৎ বহু অর্থ লাভ করে। ফ্রান্সের অর্থনীতি এই সকল 'ভুঁইফোড়, হঠাৎ ধনী' বা 'নুভো রিশে'র (Nouveaux riches) নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। ফ্রান্সের শিল্প ব্যবস্থা এই শ্রেণীর করায়ত্ব হয়। লেনোয়ার, জেনেৎ, পেরিয়ে প্রভৃতি নতুন মূলধনী কোম্পানীর উদ্ভব হয়। বিপ্লব এই শ্রেণীর ক্ষমতালাভের হাতিয়ারে পরিণত হয়। বুর্জোয়াদের মধ্যে শ্রেণীগত পার্থক্য ছিল। যারা পাতি বুর্জোয়া বা চাকুরীজীবি বা বৃত্তিজীবি ছিল বিপ্লবের ফলে তাদের অবস্থার তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি। একমাত্র যে সুবিধা তারা পায় তা হল জন্ম কৌলিন্য লোপ পেলে এবং পুরাতনতন্ত্রের তিন শ্রেণী লোপ পেলে পাতি বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবিদের পক্ষে সরকারি চাকুরী লাভের সুযোগ বাড়ে, সামাজিক হীনতা ও বৈষম্য থেকে তারা মুক্তি পায়। এছাড়া আর কোন ব্যবহারিক লাভ এদের হয়নি। পুরাতনতন্ত্রের যুগে যারা প্রকৃত ধনী বুর্জোয়া ছিল যাদের জন্ম কৌলিন্য না থাকলেও, ছিল বিরাট ভূ-সম্পত্তি, শিল্প কারখানা তাদের অনেকের ক্ষতিই হয়। কারণ বিপ্লবের সময় যখন ভূসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়, তখন এরাও রেহাই পায়নি। তদুপরি জ্যেষ্ঠ পুত্রের একমাত্র পিতার সম্পত্তি ভোগ করার অধিকার (Law of Primogeniture) লোপ পেলে, এই ধনী বুর্জোয়াদের সম্পত্তি ভাগ হয়ে যায়। ১৭৮৯-৯৪ খ্রীঃ পর্যন্ত কালোবাজারী ও মজুতদারদের ওপর সাঁকুলেৎ জনতা হামলা করায় এবং Law of Suspect বা সন্দেহের আইন প্রয়োগের জন্যে সন্ত্রাসের আমলে বাড়ি বাড়ি তল্লাসী করায়, এরা অনেকে ফ্রান্স থেকে চলে যায়। কাজেই ফরাসী বিপ্লবের ফলে সকল শ্রেণীর বুর্জোয়ারা লাভবান হয়নি।

তাহলে প্রশ্ন আসে ফরাসী বিপ্লবকে কেন বুর্জোয়া বিপ্লব বলা হয়। এই নামকরণের কারণ হল যে, এই বিপ্লবে গ্রামের ধনী, সচ্ছল কৃষক বা "গ্রামীণ ভূমি বুর্জোয়া" এবং উৎপাদনের সঙ্গে সংযুক্ত শহুরে বুর্জোয়ারাই স্থায়ীভাবে লাভবান হয়। আলফ্রেড কোব্বানের মতে, এই

বুর্জোয়াদের মধ্যে ছিল অর্থের বিনিময়ে আত্মবিক্রয়কারী উচ্চ আমলা (Venal officials), আইনজীবি, উচ্চ চাকুরিজীবি, উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত শিল্পপতি, ব্যাঙ্ক মালিকবা পুঁজিপতি শ্রেণী ও ধনী বণিক। এরাই বিপ্লবের সুফল ভোগ করে।

রাষ্ট্রের গঠন ও রাষ্ট্রীয় আদর্শের দিক থেকে ফরাসী বিপ্লবের ফলাফল ছিল নিঃসন্দেহে সুদূর-প্রসারী। ফরাসী বিপ্লবের ফলে বংশানুক্রমিক ফরাসী রাজতন্ত্রের আদর্শের ভিত্তি চিরতরে বিনষ্ট হয়। এতদিন রাজারা স্বর্গীয় অধিকার বলে রাজত্ব করতেন। চতুর্দশ লুই ছিলেন সূর্য রাজা (Sun King); যিনি নিজেকেই রাষ্ট্র বলে দাবী করতেন। ফরাসী বিপ্লব তার দানবীয় ঝাটার আঘাতে ফরাসী ইতিহাসের অঙ্গন থেকে এই রাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণাকে ফেলে দেয়। এখন থেকে ১৭৮৯-৯২ খ্রীঃ রাজা ছিলেন জাতির সেবক। ১৭৯২ খ্রীঃ থেকে রাজতন্ত্রের আদর্শ বাতিল হয়। গণভোটের ভিত্তিতে প্রজাতন্ত্র গঠিত হয়। ডাইরেক্টরীর আমলে ভোটাধিকার সঙ্কুচিত হলেও প্রজাতন্ত্রের আদর্শ চালু থাকে। যদিও নেপোলিয়ন বংশানুক্রমিক শাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন তা ব্যর্থ হয়। বুরবোঁ রাজারা ১৮১৫-৩০ খ্রীঃ পুনরায় রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। মোট কথা, ফ্রান্সে শেষ পর্যন্ত গণভোট এবং প্রজাতন্ত্রের আদর্শ জয়লাভ করে। ফরাসী বিপ্লবের ফলে ফরাসী জাতির মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনার সৃষ্টি হয়। বুদ্ধি-বিভাসা বা যুক্তিবাদ ও দার্শনিকদের প্রভাব ফ্রান্সের রাষ্ট্রচিন্তার ক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে।

বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের আদর্শেব প্রতি আস্থা লোপ

ফবাসী বিপ্লবের ফলে জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস এই মতবাদের বাস্তব প্রয়োগ ঘটে। নানা ঘাত-প্রতিঘাতেব ভেতর অবশেষে এই আদর্শ উনবিংশ শতকে ইওরোপের সর্বত্র গৃহীত হয়। এই সঙ্গে ক্ষমতা বিভাজন তত্ত্বের উপযোগিতাও স্বীকৃত হয়। স্বৈরশাসনের প্রতিষেধক হিসেবে ক্ষমতা বিভাজন তত্ত্ব জনপ্রিয়তা পায়। কার্যনির্ব্বাহী বিভাগ (Executive, আইন বিভাগের গুরুত্ব ১৭৯১-এর সংবিধানে ফ্রান্সে প্রতিষ্ঠিত হয়। তদবধি গণতন্ত্রের ভিত্তি হিসেবে আইনসভাকেই সার্বভৌম ক্ষমতার আধার বলে গণ্য করা হয়। ১৭৮৯ খ্রীঃ মানুষ ও নাগরিকের অধিকার ঘোষণার দ্বারা নাগরিকেরা রাষ্ট্রে কয়েকটি মৌলিক অধিকার ভোগের অধিকারী এই নীতি স্বীকৃত হয়। এই অধিকারগুলির মধ্যে নাগরিকের জীবন ও সম্পত্তির অধিকার এবং বাক্ স্বাধীনতার অধিকার ছিল। এই ঘোষণা মাঝে মাঝে লঙ্ঘিত হলেও, রাষ্ট্র যে নাগরিকের জন্যে এই মৌলিক নীতি ইতিহাসে স্থান পায়। কোন স্বৈরাচারী শাসক অন্ততঃ প্রকাশ্যে এই নীতিকে আর উপেক্ষা করতে পারেননি। ফরাসী বিপ্লবের এটি একটি উল্লেখযোগ্য ফল ছিল বলা যায়।

সামাজিক আচার-আচরণের ক্ষেত্রে বিপ্লব একটি নতুন যুগের সূচনা করে। সামন্ততান্ত্রিক সম্বোধন "মঁশিয়ে"র স্থলে বিপ্লবী সম্বোধন "সিটিজেন" চালু হয়। পুরুষেরা ব্রিচেস পরা ছেড়ে ট্রাউজার ও কোট পরা শুরু করে। এটা ছিল সাঁকুলেতশ্রেণীর পোষাক। নারীরা কোমর ফোলানো মাটি ছাপানো স্কার্ট ছেড়ে আঁট সাট ছোট স্কার্ট পরতে আরম্ভ করে। লোকে বিপ্লবের প্রতীক তিন-রঙা পোষাক ও লালটুপি বা বন্নে রূজ পরতে আরম্ভ করে। পোষাকের সঙ্গে বিপ্লবের আদর্শের সমন্বয় করা হয়। মহিলাদের গলার হারের লকেটের মডেল হিসেবে গিলোটিন ঝোলানো জনপ্রিয়তা পায়। মহিলাদের সৌখীন হাত পাখায় মিরাব্যু, লাফায়েৎ, রোবসপিয়েরের ছবি ছাপান চালু হয়। পুরাতন ওজন ও মাপের বদলে দশমিক ওজন চালু হয়। কোড নেপোলিয়ন দ্বারা রেজিষ্ট্রি বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, সম্পত্তিতে সকল সন্তানের সমান অধিকার স্বীকার করা হয়। ইওরোপের বহু দেশে কোড নেপোলিয়ন গৃহীত হয়। বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশে এখনও এর প্রভাব দেখা যায়।

নতুন পোষাকের প্রচলন

ফরাসী বিপ্লবের অপর অবদান ছিল মানবতাবাদী ও উপযোগবাদী সংস্কারের প্রবর্তন। এর ফলে ক্রীতদাস প্রথা, ভূমিদাস প্রথা লোপ করা হয়। ফরাসী বিপ্লবের আমলে খ্রীষ্টিয় গীর্জার প্রতি অনাস্থা বহুক্ষেত্রে দেখা যায়। প্যারিস কমিউনে এই মতবাদ প্রবল হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে ধনবন্টনের অসাম্যের নিন্দা দেখা দেয়। সাহিত্যে, শিল্পে ও বিজ্ঞানের সৃজনী ক্ষেত্রে এই বিপ্লব গতিবেগ সৃষ্টি করে। যুক্তিবাদের পাশাপাশি রোমান্টিক আবেগ রক্ষণশীল ভাবধারাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। শিল্পী ও চিত্রকর দাভদ (David) এই যুগের ভাবধারা তাঁর শিল্পকলায় ধরে রাখেন। ফ্রান্সের বাইরে এই বিপ্লব বিরাট আশাবাদের সৃষ্টি করে। বিপ্লবী ফ্রান্সের সেনাদল নেদারল্যান্ড, রাইনল্যান্ড, স্যাভয় প্রভৃতি অধিকৃত অঞ্চলে প্রজাতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা করে।

পাঠ্যসূচী

১। Madelin—The French Revolution.

২। Morse Stephens—Revolutionary Europe.

৩। Riker—Short History of Europe.

৪। Cobban—History of France.

৫। Fisher—History of Europe.

৬। Carlyle—The French Revolution.

৭। Legg—Select documents of the History of the French Revolution.

৮। Tocquville—The Ancien Regime and Revolution.

৯। J. Rude—The crowd in the French Revolution

১০। Mathtez—Le Directoire.

১১। Sydenham—The French Revolution.

১২। Greenlow—The Economic Origins of The French Revolution.

১৩। Lefebvre—The Thermidorians and the Directors.

সপ্তম অধ্যায়
নেপোলিয়নের সংস্কার ঃ কনসুলেটের শাসন
(The Reforms of Napoleon : The Government of the Consulate)

কনসুলেটের সংবিধান (The Constitution of the Consulate) ঃ নেপোলিয়ন ডাইরেক্টরীর শাসনব্যবস্থা ধ্বংস করার পর একটি সংবিধানের সাহায্যে ফ্রান্স শাসন করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি সংবিধান রচনার জন্যে এ্যাবে সিয়েসের ওপর ভার দেন। এ্যাবে সিয়েস নতুন সংবিধান রচনার জন্যে যে নীতি গ্রহণ করেন তার মূল কথা ছিল, "জনসাধারণের কাছ থেকে সরকার আস্থা নেবে, কিন্তু তাদের ওপর শাসন আরোপ করা হবে" (Confidence must come from below and Power from above)[১]। এ্যাবে সিয়েস বলেন যে, ফ্রান্সে একটি মজবুত ও কার্যকরী শাসনব্যবস্থা গড়তে হলে শাসন বিভাগকে শক্তিশালী করা ছাড়া উপায় ছিল না। নেপোলিয়ন ছিলেন সেই ব্যক্তি যিনি শাসন বিভাগের কর্তা হিসেবে ফ্রান্সকে নতুনভাবে গড়তে সক্ষম ছিলেন। এই সংবিধানে নির্বাচন নীতি স্বীকৃত হলেও আইনসভার ওপর শাসন বিভাগকে অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা দেওয়া হয়। আইনসভাকে শক্তিহীন করে গণতন্ত্রের আদর্শকে একটি মুখের কথায় পরিণত করা হয়। কনসুলেট প্রকৃতপক্ষে নেপোলিয়নীয় স্বৈরতন্ত্রের পথ প্রস্তুত করে। এই কারণে বলা হয় যে, "নেপোলিয়ন বিপ্লবকে তাঁর স্বৈরতন্ত্রের রথের চাকা টানার কাজে লাগান" (Napoleon harnessed the Revolution to the chariot of autocracy)।

কনসুলেটের মূল নীতি

কনসুলেটের সংবিধানে তিনজন কনসাল থাকার ব্যবস্থা হয়। এই কনসালেরা আপাতত দশ বছরের জন্যে মনোনীত হন। (২) সংবিধানে প্রথম কনসাল হিসেবে নেপোলিয়নের নাম উল্লেখ করা হয়।[২] অপর দুই কনসাল সহযোগী হিসেবে নিযুক্ত হন। প্রথম কনসাল শাসন বিভাগের সকল ক্ষমতার অধিকারী হন। তিনি মন্ত্রী ও কর্মচারীদের নিয়োগের অধিকার পান। (৩) প্রথম কনসাল সেনাদল ও বৈদেশিক নীতির উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব পান। (৪) তিনি কাউন্সিল অফ স্টেটের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে আইন রচনায় হস্তক্ষেপ করতে পারতেন। প্রথম কনসাল তাঁর কাজের জন্যে আইনসভার নিকট দায়ী ছিলেন না। তাঁর ক্ষমতার ওপর কোন সাংবিধানিক নিয়ন্ত্রণ ছিল না। সিনেট, কাউন্সিল অব স্টেটের সদস্যদের তিনিই মনোনয়ন করতেন। (৫) আইনসভাকে ৪টি কক্ষে ভাগ করার ফলে এর ক্ষমতা হ্রাস পায়। এই ৪টি কক্ষ ছিল সেনেট; কাউন্সিল অব স্টেট; ট্রিবিউনেট ও লেজিসলেটিভ বডি। (৬) আইনসভার সদস্য নিয়োগের ক্ষেত্রে নির্বাচন ও মনোনয়ন দুই প্রকার ব্যবস্থা রাখা হয়। সেনেট ও কাউন্সিলের সদস্যরা প্রথম কনসাল দ্বারা মনোনীত হত। ট্রিবিউনেট ও লেজিসলেটিভ বডির সদস্যরা নির্বাচিত হওয়ার পর, সেনেট কর্তৃক নিযুক্ত হত। ট্রিবিউনেট ও লেজিসলেটিভ বডির সদস্যরা সরকারি প্রত্যক্ষ নির্বাচনে নিযুক্ত হত না। প্রথমে প্রতি কমিউনের প্রাপ্ত বয়স্ক নির্বাচকরা তাদের মোট সংখ্যার $\frac{১}{১০}$ প্রতিনিধিকে নির্বাচন করত। এই নির্বাচিত কলেজ থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের $\frac{১}{১০}$ অংশ সদস্য

কনসুলেটের সংবিধান · স্বৈরতন্ত্র

১· David Thomson. P. 28

২· V. Cronin—Napoleon.

প্রদেশ স্তরে নির্বাচক কলেজ গঠন করত। এই প্রদেশ স্তরের নির্বাচিত কলেজের প্রতিনিধিদের $\frac{১}{১০}$ জাতীয় প্রতিনিধিতে পরিণত হত। এই জাতীয় প্রতিনিধিদের তালিকা থেকে সিনেট সদস্যদের ট্রিবিউনেট ও লেজিসলেটিভ বডির সদস্য হিসেবে মনোনীত করত। এই ত্রিস্তর নির্বাচনের ফলে আইনসভার প্রতিনিধিরা মূল নির্বাচক জনসাধারণের প্রভাব থেকে বিচ্ছিন্ন হত। দ্বিতীয়তঃ, সিনেটের সদস্যরা যেহেতু প্রথম কনসালের মনোনীত ছিল, তারা আইনসভার চূড়ান্ত প্রতিনিধি মনোনয়নের সময় প্রথম কনসালের ইঙ্গিতে কাজ করত। এর ফলে গণতন্ত্র কাগুজে গণতন্ত্রে পরিণত হয়। (৭) আইন রচনার প্রক্রিয়াকে এই ৪টি কক্ষের মধ্যে ভাগ করা হয়। কাউন্সিল অব স্টেট আইনের প্রস্তাব রচনা করত। ট্রিবিউনেট সেই প্রস্তাবের বিস্তৃত আলোচনা করত, কিন্তু ভোট দিতে পারত না। লেজিসলেটিভ বডি সেই প্রস্তাব ভোটের দ্বারা গ্রহণ করত কিন্তু তারা সেই প্রস্তাবের ভাল-মন্দ আলোচনা করতে পারত না। আইন পাশ হওয়ার পর সেনেট সেই আইনের সাংবিধানিক যৌক্তিকতা বিচার করে চূড়ান্ত অনুমোদন দান বা নাকচ করতে পারত।

কনসুলেটের সংবিধানের সমালোচনা

আইন রচনার প্রক্রিয়াকে এভাবে ভাগ করায় আইনসভা দুর্বল হয়। কাউন্সিল ও সিনেটের মনোনীত সদস্যদের সাহায্যে প্রথম কনসাল আইনসভাকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হন। আইনসভার আইন রচনার সার্বভৌম অধিকার হরণ করা হয়। কনসুলেটের সংবিধানের দ্বারা ফরাসী বিপ্লবের Liberty বা স্বাধীনতার আদর্শ লোপ পায়। নেপোলিয়ন এদিক থেকে বিপ্লবের গণতান্ত্রিক আদর্শকে ধ্বংস করেন। পরবর্তীকালে নেপোলিয়ন নিজেই বলেন যে, "I destroyed the Revolution" অর্থাৎ "আমিই বিপ্লব ধ্বংস করেছিলাম"। যদিও কনসুলেট ছিল কাগজে কলমে একটি প্রজাতন্ত্র; কিন্তু এই প্রজাতন্ত্র ছিল অন্তঃসার-শূন্য। কারণ এতে প্রজার দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কোন ক্ষমতা ছিল না। কনসুলেটের সংবিধান ছিল প্রাচীন রোমান সম্রাট জুলিয়াস সিজারের একনায়কতন্ত্রের ন্যায় একটি ছদ্ম রাজতন্ত্র (A Caesarism on a popular basis)। ফরাসী ঐতিহাসিক কোব্বানের মতে, "কনসুলেটের শাসন যন্ত্রের ইঞ্জিন ও বাষ্প ছিলেন প্রথম কনসাল।"[১] যাহা হোক, কনসুলেটের সংবিধান সম্পর্কে জনমত যাচাই করার জন্যে নেপোলিয়ন এই সংবিধানকে গণভোটে দেন। প্রায় তিন মিলিয়ন ভোট এর স্বপক্ষে ও ১৫৬২ ভোট বিপক্ষে পড়ে। এখানে বলা দরকার যে, প্রথম কনসাল রূপে নেপোলিয়ন নিজ হাতে এত ক্ষমতা নিয়েও সন্তুষ্ট হননি। তাঁর লক্ষ্য ছিল আরও সুদূর-প্রসারী। আইনসভার হাতে প্রকৃত ক্ষমতা না থাকায় জ্যাকোবিন সদস্যরা তাঁর তীব্র সমালোচনা করায় তিনি বেশ বিরক্ত হন। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে তাঁর কোন মাথাব্যথা ছিল না। একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর অভিলাষ। ম্যারোঙ্গোর যুদ্ধে জয়লাভের ফলে তাঁর জনপ্রিয়তা তুঙ্গে উঠলে, নেপোলিয়ন তার সুযোগ নিয়ে ট্রিবিউনেট ও লেজিসলেটিভ বডি থেকে কটূভাষী, সমালোচনায় মুখর জ্যাকোবিন সদস্যদের বহিস্কার করেন। ষড়যন্ত্রের অজুহাতে পুলিশমন্ত্রী ফুসের সাহায্যে বিরোধীদের কারা প্রাচীরের ভেতর ঢোকান। ১৮০২ খ্রীঃ কনসুলেটের সংবিধান সংশোধন করে নেপোলিয়ন যাবজ্জীবনের জন্যে কনসালের ক্ষমতা পান। নেপোলিয়ন সিনেটের সভাপতির পদ পান। আর তাদের উত্তরাধিকারীও তিনি মনোনয়নের অধিকার পান। শুধু মুকুটহীন সম্রাট হওয়া নেপোলিয়নের বাসনা ছিল না। নেপোলিয়নকে রাজতন্ত্রীরা হত্যার ষড়যন্ত্র করায় তিনি সেই ষড়যন্ত্র চূর্ণ করেন। ১৮০৪ খ্রীঃ সিনেটের ঘোষণা ক্রমে নেপোলিয়ন বংশানুক্রমিক সম্রাটে পরিণত হন। প্রস্তাবটি গণভোটে দেওয়া হলে ৩৫,৭২,৩২৯ × ২৫৭৯ ভোটে তা গৃহীত হয়।

১· Cobban—History of France. Vol. II. P. 16.

কিন্তু শুধু ভোটের দ্বারা সম্রাট পদ পেয়ে নেপোলিয়ন তৃপ্ত হননি। তিনি একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান দ্বারা পুরাতন রাজাদের মত অভিষিক্ত হন। নত্রেদামে গির্জায় তাঁর অভিষেক অনুষ্ঠানে স্বয়ং পোপ সপ্তম পায়াস তাঁকে অভিষিক্ত করেন। ফ্রান্সে আবার সম্রাটতন্ত্র ও তার আনুষঙ্গিক দরবার, সাড়ম্বরে ফিরে আসে। শুধু বুরবোঁ বংশের বদলে নেপোলিয়ন বংশের শাসন চালু হয়।

কনসালরূপে নেপোলিয়নের শাসন সংস্কার (The Reforms Under Napoleon) : নেপোলিয়ন প্রথম কনসাল পদে অধিষ্ঠিত হয়ে প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্কারের কাজে হাত দেন। নেপোলিয়ন তাঁর শাসন সংস্কারের কাজ চালু করার জন্যে প্রধানতঃ কাউন্সিল অব স্টেটের ওপর নির্ভর করেন। তিনি প্রশাসনিক দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন ব্যক্তিদের মনোনীত করে তাঁর কাউন্সিলকে গঠন করেন। রাজতন্ত্রী অথবা জ্যাকোবিন হলেও তিনি পিছিয়ে যাননি। দক্ষ প্রশাসক যোগাড় করাই তাঁর লক্ষ্য ছিল। এই কাউন্সিলের অভিজ্ঞ সদস্যদের তিনি গুরু দায়িত্ব দেন। এই কাউন্সিলের সাহায্যে তিনি তাঁর স্বৈর শাসনকে দৃঢ় করেন।

কেন্দ্রীকরণ নীতি

এরপর নেপোলিয়ন প্রদেশের ওপর কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করে জাতীয় ঐক্য ও কেন্দ্রীকরণ নীতিকে প্রসারিত করার উদ্যোগ নেন। (১) ১৭৮৯ খ্রীঃ সংবিধান সভার আমল থেকে ৮৩টি ডিপার্টমেন্টের বিকেন্দ্রীকরণের ফলে প্রদেশ ও জেলার ওপর কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়। নেপোলিয়ন বুরবোঁ যুগের কেন্দ্রীকরণ চালু করে প্রদেশের বিচ্ছিন্নতাবাদকে দমন করেন। অবশ্য এক্ষেত্রে নেপোলিয়ন খালি শ্লেটে লেখেননি। জাতীয় সম্মেলনের আমলে রোবসপিয়ের প্রশাসনিক কেন্দ্রীকরণ করার উদ্যোগ নেন। এখন নেপোলিয়ন তাঁর এক কলমের আঁচড়ে প্রদেশের, জেলার স্বায়ত্ব শাসনের অধিকার কেড়ে নেন। তিনি যদিও ৮৩টি প্রদেশ ও ৫৪৭টি জেলাকে রেখে দেন; প্রদেশ ও জেলার শাসনকর্তা প্রিফেক্ট ও সাব-প্রিফেক্টদের তিনিই মনোনয়ন ও নিয়োগ করার অধিকার হাতে নেন। আগে এই শাসনকর্তারা স্থানীয় ভোটে নির্বাচিত হত। এখন নেপোলিয়ন নির্বাচনের স্থলে মনোনয়নকেই প্রাধান্য দেন। পৌরসভাগুলির শাসনকর্তা হিসেবে মেয়রদেরও তিনি নিয়োগের অধিকার নিজ হাতে নেন। (২) স্থানীয় নির্বাচিত প্রাদেশিক সভাগুলিকে লোপ না করা হলেও, প্রদেশের শাসনে এই সভার ক্ষমতাকে ছেঁটে ফেলা হয়। নেপোলিয়নের ভ্রাতা লুসিয়েন বলেন যে, "প্রশাসনিক রেলপথের পাশের সাইডিং-এ এই স্থানীয় সভাগুলিকে রাখা হয়েছে। যাতে প্রশাসনে দ্রুত গতি আসে, সেজন্যে এই ব্যবস্থা করা হল"। (৩) এখন থেকে ডিপার্টমেন্ট বা প্রদেশগুলির যাবতীয় ক্ষমতা প্রথম কনসাল দ্বারা নিযুক্ত প্রিফেক্টদের হাতে রাখা হয়। স্থানীয় সভাগুলিকে মাত্র বছরে ১৫ দিনের অধিবেশনের সুযোগ দেওয়া হয়। গ্রাম ও শহরের ওপর রাজস্বের হার যা ধার্য করা হয়, এই সভা তা অনুমোদন করত। (৪) নেপোলিয়ন প্রিফেক্টদের নিয়োগের সময় যোগ্যতাকে একমাত্র মাপকাঠি ধার্য করেন। ফলে, যোগ্যতার জোরে জ্যাকোবিন অথবা রাজতন্ত্রীরাও এই পদ পায়। ক্রমে তারা নেপোলিয়নের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য দেয়। বুরবোঁ যুগের ইনটেন্ডেদের মতই প্রিফেক্টরা কেন্দ্রের আঙ্গুলি হেলনে চলতে থাকে। আলফ্রেড কোব্বানের মতে, "বুরবোঁ ইন্টেন্ডেন্ট অপেক্ষা প্রিফেক্টদের দুটি ক্ষেত্রে ক্ষমতা কম ছিল" (ক) ইন্টেন্ডেদের মত প্রিফেক্টরা কেন্দ্রের আইনের নিজস্ব ব্যাখ্যা করে সেইভাবে আইনের প্রয়োগ করতে পারত না। (খ) সেনাদলের অফিসারদের মতই শৃংখলা রক্ষার জন্যে কেন্দ্রের আদেশে প্রিফেক্টদের বিশেষ ধরনের পোষাক পরতে হত। এই পোষাক কেন্দ্র সরবরাহ করত। (৫) প্রিফেক্টের অধীনে উপ-প্রিফেক্টরা কাজ করত। এরাও প্রথম কনসাল দ্বারা নিযুক্ত হত। প্রিফেক্ট প্রথার দ্বারা প্রাদেশিক শাসনকে বোনাপার্ট কেন্দ্রের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনেন। বুরবোঁ যুগে যেমন ফ্রান্সে এককেন্দ্রিক স্বৈরশাসন ছিল, নেপোলিয়ন তা ফিরিয়ে আনেন। এদিক থেকে তাঁর এই শাসন

সংস্কারকে বিপ্লবের বিকেন্দ্রীকরণ আদর্শের বিরোধী এবং রাজতান্ত্রিক যুগের অনুসারী বলা চলে। (৬) সকল শ্রেণীর সরকারি কর্মচারী, বিচারক প্রভৃতিকে প্রথম কনসাল দ্বারা নিযুক্ত করার ব্যবস্থা হয়। (৭) নির্বাচনের মাধ্যমে সরকারি কর্মচারী নিয়োগ প্রথা রদ করা হয়।

নেপোলিয়নের প্রিফেক্ট প্রথার দ্বারা সারা দেশে প্রশাসনিক ঐক্য ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ মজবুত হয় একথা সত্য। কিন্তু নেপোলিয়নীয় রাষ্ট্র নিরন্তর যুদ্ধে লিপ্ত থাকায় প্রিফেক্টগণ জনকল্যাণমূলক কাজ অপেক্ষা যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে সফল করার কাজে ব্যস্ত হয়। নেপোলিয়ন মাঝে মাঝে গণভোট নিয়ে তাঁর ক্ষমতা দৃঢ় করতেন। এই গণভোট যাতে প্রথম কনসালের অনুকূলে যায় এজন্য প্রিফেক্টদের প্রভাব খাটাতে হত। যুদ্ধের জন্যে বাধ্যতামূলকভাবে সেনাদল সংগ্রহ, যুদ্ধের ঘোড়া সংগ্রহ তাদের করতে হত। এই কারণে কৃষকদের ওপর বহু জবরদস্তি করা হয়। যুদ্ধবন্দীদের দেশে আনা হলে প্রদেশের বন্দী শিবিরে এই বন্দীদের দেখাশোনার কাজ প্রিফেক্টদের করতে হত। তাছাড়া যুদ্ধের আর্থিক দায় মেটাবার জন্যে নিয়মিত কর আদায় করতে হত। এরপর প্রিফেক্টদের পক্ষে জনকল্যাণমূলক কাজ করার মত সময় ও লোকবল ছিল না। নেপোলিয়নের স্বৈরতন্ত্রের যন্ত্র হিসেবে প্রিফেক্টগণ কাজ করতে বাধ্য হয়। দ্বিতীয়তঃ, প্রিফেক্ট ও কাউন্সিলের সদস্যদের দ্বারা নেপোলিয়ন যে আমলাতন্ত্র গড়েন তার ক্ষমতার একমাত্র উৎস ছিলেন নেপোলিয়ন নিজে। প্রিফেক্টগণের স্থানীয় কোন শিকড় ছিল না। ১৮১০ খ্রীঃ এরপর যখন নেপোলিয়নের জীবনে দুর্দিন শুরু হয়, তখন এই প্রিফেক্টদের মধ্যেই অনেকে তাঁর প্রতি আনুগত্যহীনতার পরিচয় দেয়। প্রিফেক্টদের মধ্যে ভূতপূর্ব রাজতন্ত্রী ও জ্যাকোবিন ছিল। জাহাজের তলায় ছেঁদা হয়ে জল ঢুকলে জাহাজে আশ্রিত ইঁদুরগুলি যেমন অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে আশ্রয়দাত্রী জাহাজ ছেড়ে বাইরে ডাঙ্গাজমি আছে এই ভেবে লাফ দেয়, এই প্রিফেক্টদের মধ্যে অনেকেই নেপোলিয়নের ডুবন্ত তরণী ছেড়ে লাফ দেয়। প্রিফেক্টদের যদি স্থানীয় শিকড় থাকত তবে তারা সম্রাটের জন্যে স্থানীয় শাসনকে রক্ষা করতে পারত। এই কারণে আলফ্রেড কোব্বান মন্তব্য করেছেন যে, "প্রিফেক্ট ব্যবস্থার সাফল্যের দিক থাকা সত্ত্বেও, এই ব্যবস্থায় অত্যধিক কেন্দ্রীয়তা ও কঠোরতার সঙ্গে অত্যধিক অনিশ্চয়তা জড়িত ছিল" (The prefectural system, for all its merits, combined the vices of excessive regidity and excessive instability)।

প্রিফেক্ট প্রথায় ত্রুটি

ষোড়শ লুইয়ের আমল থেকে ফ্রান্সের অর্থব্যবস্থা একেবারে ভেঙে পড়ে। নেপোলিয়ন জানতেন যে, দৃঢ় অর্থব্যবস্থা হল প্রশাসন যন্ত্রের প্রাণশক্তি। এজন্য তিনি ফ্রান্সের অর্থ ব্যবস্থাকে গড়ার কাজে হাত দেন। (১) নেপোলিয়ন সরকারি দপ্তরগুলিতে ব্যয় সঙ্কোচের দৃঢ় নির্দেশ দেন। তিনি স্বয়ং সরকারি বাজেট পরীক্ষা করে বিভিন্ন খাতে ব্যয়ের হার স্থির করে দেন। (২) তিনি অর্থ দপ্তরকে দুভাগ করে রাজস্ব দপ্তর ও অডিট দপ্তর গঠন করেন। অডিট বিভাগ সরকারি ব্যয়ের হিসেব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করত।[১] নেপোলিয়ন অডিট রিপোর্টগুলি পাঠ করতেন। যে সকল দপ্তরের ব্যয় সম্পর্কে রিপোর্টে সমালোচনা থাকত, তিনি সেই দপ্তরকে সতর্ক করে দিতেন। (৩) নেপোলিয়ন ফরাসী জনসাধারণকে বুঝিয়ে দেন যে, সরকারকে কর আদায় দেওয়া প্রতি নাগরিকের কর্তব্য। তিনি নিয়মিতভাবে কর আদায়ের ব্যবস্থা করেন। তিনি সকল প্রকার বাড়তি কর রহিত করে কয়েকটি নির্দিষ্ট কর আদায়ের নিয়ম করেন। (৪) তিনি আয়কর বাবদ ৬৬০ মিলিয়ন ফ্রাঁ আদায়ের ব্যবস্থা করেন। এছাড়া ভূমি-রাজস্ব প্রভৃতি অন্যান্য করও আদায় করা হত। তিনি প্রত্যক্ষ করের বদলে পরোক্ষ করের দিকে বেশী আগ্রহ দেখান। তিনি মদ ও সিডার

অর্থনৈতিক ও রাজস্ব সংস্কার

১· V. Cronin—Napoleon. P. 241.

বা আপেলের মদের ওপর এবং তামাকের ওপর শুল্ক চাপান। তিনি চুঙ্গি করও চালু করেন। নিয়মিত কর আদায়ের ফলে এবং ব্যয় সঙ্কোচের ফলে সরকারের অর্থ সঙ্কট দূর হয়। (৫) নেপোলিয়ন নিয়ম করেন যে, প্রাদেশিক সভাগুলি জনসাধারণের কাছ থেকে কর আদায় করতে পারবে না। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীরা সরাসরি কর আদায় করবে। (৬) নেপোলিয়ন ১৮০০ খ্রীঃ ব্যাঙ্ক অব ফ্রান্স স্থাপন করেন। ৩০ মিলিয়ন ফ্রাঁ মূলধন নিয়ে এই ব্যাঙ্ক স্থাপন করা হয়। এই ব্যাঙ্ক থেকে শতকরা ৬% হারে অর্থ ঋণদানের ব্যবস্থা করা হয়। এই ব্যাঙ্কের সাহায্যে মুদ্রা ব্যবস্থার সংগঠন এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নয়ন করা সম্ভব হয়। ব্যাঙ্ক অব ফ্রান্স নোট ছাপাবার অধিকার পায়। নেপোলিয়ন ধাতু মুদ্রা প্রবর্তন করেন। ১৮০৩ খ্রীঃ তিনি ৫ গ্রাম ওজনের জর্মিন্যাল ফ্রাঁ চালু করেন। (৭) নেপোলিয়নের অর্থ সংস্কারের ফলে ফ্রান্সে কৃষি ও শিল্পের উন্নতি ঘটে। শিল্প উৎপাদন ব্যবস্থাকে জোরদার করা হয়। জিনিসপত্রের দাম কমার ফলে লোকের স্বস্তি ফিরে আসে। নেপোলিয়ন ফ্রান্সে নিজ নামে স্বর্ণ মুদ্রার প্রবর্তন করেন। ষ্টক এক্সচেঞ্জ স্থাপন করে ফাটকা ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর নিরন্তর যুদ্ধের চাপে তাঁর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে।

আইনবিধি রচনা

নেপোলিয়নের অন্যতম বিখ্যাত সংস্কার ছিল ফ্রান্সের আইন সংস্কার অথবা কোড নেপোলিয়নের প্রবর্তন। বিপ্লবের পর ফ্রান্সে বহু নতুন আইন পাশ হয়। আবার বুরবোঁ সরকারের অনেক পুরাতন আইনও বহাল ছিল। এছাড়া প্রতি প্রদেশে স্থানীয় প্রথাগত আইন ছিল। এছাড়া ছিল গীর্জার আইন। এই সকল আইনগুলির মধ্যে কোন সামঞ্জস্য ছিল না। বুরবোঁ যুগের আইনে নাগরিক ও সম্পত্তির অধিকার সম্পর্কে যে আইনগুলি ছিল, বিপ্লবের যুগের এই সকল বিষয় সম্পর্কিত আইন ছিল তার বিপরীত। এই অবস্থায় বিচারক ও সরকারি কর্মচারীরা কোন আইন মেনে চলবে তা নিয়ে সমস্যা দেখা দিত। নেপোলিয়ন স্থির করেন যে, বিপ্লবের অন্যতম মূল আদর্শ সামাজিক সাম্য বা Social Equality-কে স্বীকার করে ফ্রান্সে নতুন সমাজ গঠনের জন্যে আইনগুলিকে সঙ্কলন ও পরিমার্জনা করা দরকার। এই উদ্দেশ্যে তিনি আইনজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটির বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন ট্রনসেট (Tronchet) নামে আইনবিদ্। নেপোলিয়ন নিজে এই কমিটির ৩৬টি সভায় যোগ দিয়ে আইনবিধি সম্পর্কে আলোচনায় অংশ নেন। নেপোলিয়ন নিজে আইনজ্ঞ ছিলেন না। সুতরাং কোড নেপোলিয়ন নামক আইনবিধি গঠনে তাঁর অবদান ছিল এই কোড গঠনে বিলম্ব দূর করে তা দ্রুত রূপায়িত করা ও আইনজ্ঞদের উৎসাহ দেওয়া। ডেভিড টমসনের মতে, নেপোলিয়নের কাউন্সিল অব ষ্টেট এই আইনবিধি রক্ষায় প্রত্যক্ষ ভূমিকা নেয়। ৮৪টি অধিবেশনে এই আইনবিধির মূল সূত্রগুলিকে স্থির করা হয়। এই আইনবিধির সর্বাপেক্ষা উল্লেখ্য দিক ছিল জ্ঞানদীপ্তির যুগের যুক্তিবাদী প্রাকৃতিক আইন বিধির সঙ্গে ফ্রান্সের প্রথাগত এবং বিপ্লবী আমলের উদারনৈতিক আইনবিধির সমন্বয় সাধন করা। রোমান আইনবিধি যা প্রধানতঃ রাজতান্ত্রিক যুগে প্রচলিত ছিল তার তত্ত্বের সঙ্গে বিপ্লবের যুগের আইনের তত্ত্বের সমন্বয় করা। এই দুই মতবাদের আইনবিধির মধ্যে বোঝাপড়ার ভিত্তিতে কোড নেপোলিয়ন তৈরি হয়। এর ফলে রোমান আইনের সম্পত্তির অধিকার ও রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের অধিকারের সঙ্গে বিপ্লবের যুগের সামাজিক সাম্য ও যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ নীতি গৃহীত হয়।

কোড নেপোলিয়ন

কোড নেপোলিয়নে মোট ২২৮৭টি (মতান্তরে ২২৮১টি) ধারা ছিল। কোড নেপোলিয়নের তিনটি অংশ ছিল যথা, দেওয়ানী কোড, ফৌজদারী কোড এবং বাণিজ্যিক কোড। নেপোলিয়নের আইনগুলি সরল এবং স্পষ্ট ভাষায় রচিত হয়। দেওয়ানী আইনগুলিতে (১) আইনের চক্ষে সকল ব্যক্তির সমান অধিকার স্থাপিত হয়। (২) সামাজিক সাম্য স্থাপিত হয়। কোন ব্যক্তি বা পরিবারের বিশেষ অধিকার বিলোপ

করা হয়। সকল নাগরিকের সমান মর্যাদা ও সুযোগ লাভের অধিকার স্বীকৃত হয়। (৩) বংশ কৌলিন্য বা কাঞ্চন কৌলিন্য বাদ দিয়ে যোগ্যতার ভিত্তিতে যে কোন নাগরিককে চাকুরী লাভের অধিকার মেনে নেওয়া হয় (Career open to talents)। (৪) পৈত্রিক সম্পত্তিতে সকল সন্তানের সমান অধিকার দান করা হয়। (৫) বিপ্লবের ফলে সামন্ততন্ত্র লোপ করে যে নতুন ভূমি বন্দোবস্ত চালু করা হয়, আইনে তাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এর ফলে কৃষক ও মধ্যবিত্ত যারা বিপ্লবের আমলে ভূমি লাভ করে তারা জমিতে বৈধ স্বত্ব লাভ করে।[১] ভূমিদাস প্রথা, কর্ভি, টাইদ, ম্যানর প্রথা প্রভৃতি সকল শোষণমূলক ব্যবস্থার অবসান ঘটান হয়। মোট কথা, বিপ্লবের সময় বিশেষ অধিকার ও বৈষম্যমূলক অধিকার লোপ করে যে সকল আইন করা হয়, নেপোলিয়ন তা বহাল রাখেন। (৬) রোমান আইন অনুসারে কোড নেপোলিয়নের সম্পত্তির অধিকার পরিগণিত হয়। (৭) বিপ্লবের যুগে পারিবারিক বন্ধন শিথিল হয়েছিল। স্ত্রীর ওপর স্বামীর স্বাভাবিক কর্তৃত্ব বিনষ্ট হয়। কোড নেপোলিয়ন দ্বারা পুনরায় পরিবারে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা হয়। স্ত্রী ও সন্তানদের উপর স্বামীর বা পিতার কর্তৃত্ব পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হয়। রোমান আইন অনুসারে স্বামীর সম্মতি ছাড়া স্ত্রীরা স্বামীর সম্পত্তি দান-বিক্রয়ের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। পরিবারের বাঁধন দৃঢ় করার জন্যে বিবাহ আইনকে মজবুত করা হয়। যদিও রেজিষ্ট্রি বিবাহ ও ডাইভোর্স বা বিবাহ বিচ্ছেদ প্রথা স্বীকার করা হয় কিন্তু এই প্রথাগুলির ওপর নানা বাধা-নিষেধ আরোপ করা হয়। ফলে খেয়ালখুসী মত বিবাহ বিচ্ছেদ করা দুষ্কর হয়। পরিবারের বন্ধন এর ফলে দৃঢ় হয়। (৯) সন্তানদের ভরণ-পোষণ পিতার বৈধ দায়িত্ব বলে ঘোষিত হয়। (১০) গীর্জার বাজেয়াপ্ত করা সম্পত্তি বিপ্লবের আমলে যারা কিনে নেয় কোড নেপোলিয়নে তাদের অধিকারকে বৈধতা দেওয়া হয়। (১১) বিচার ব্যবস্থার সংগঠন করে জুরি প্রথা চালু করা হয়। (১২) রাজনৈতিক অপরাধীদের সাধারণ অপরাধী অপেক্ষা স্বতন্ত্র মর্যাদা দেওয়া হয়। (১৩) পৈত্রিক সম্পত্তিতে সকল বৈধ সন্তানের সমান অধিকার দেওয়া হয়। (১৪) ফৌজদারী আইনবিধি যুক্তিবাদ ও প্রাকৃতিক আইনের আলোকে রচনা করা হয়। অপরাধীর প্রতি বর্বর শাস্তির প্রথা লোপ করা হয়। আইনের সূক্ষ্ম বিচারে অপরাধী প্রমাণিত হলে তবে শাস্তি দিতে বলা হয়। ফৌজদারী আইনের সাহায্যে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। (১৫) প্রাকৃতিক আইন (Natural Law) এবং রোমান আইনের (Roman Law) সমন্বয় করে কোড নেপোলিয়ন রচনা করার ফলে ইওরোপের অনেক দেশে এই আইন গৃহীত হয়। কোড নেপোলিয়ন ফ্রান্সের সীমা ছাড়িয়ে ইওরোপে স্বীকৃতি পায়। বেলজিয়াম ও লাক্সেমবার্গে এই আইন এখনও প্রচলিত আছে।[২] নেপোলিয়নের কোড বা আইনবিধি ত্রুটিহীন ছিল না। তিনি এই আইনবিধির দ্বারা পুরাতনতন্ত্রের যুগের রোমান আইন চালু করায় সমাজে স্থিতি আসে। কিন্তু এর ফলে প্রগতিশীল পরিবর্তনের পথ রুদ্ধ হয়। নেপোলিয়নের কর্তৃত্ব দৃঢ় হলেও, বিপ্লবের স্রোত রুদ্ধ হয়। দ্বিতীয়তঃ, বিপ্লব ফ্রান্সের নারী সমাজের কাছে বন্ধনমুক্তি ও সমান অধিকার লাভের যে আশ্বাস আনে, কোড নেপোলিয়ন দ্বারা তা বিনষ্ট হয়। নারীদের পুনরায় গৃহকোণে স্বামীর অধীনে জীবন কাটাতে বাধ্য করা হয়। নারীদের সম্পত্তির অধিকারকেও সঙ্কুচিত করা হয়। তৃতীয়তঃ, পারিবারিক সংগঠন দৃঢ় করার জন্যে পিতাকে পরিবারের ওপর সামন্ততান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা দেওয়া হয়। ফলে স্ত্রী ও সন্তানদের ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব হয়। চতুর্থতঃ, নেপোলিয়নের কোডে শ্রমিকদের জন্যে কোন অধিকার স্বীকার করা হয়নি। তাদের কাজের অধিকার, নিম্নতম মজুরীর অধিকার অবহেলিত হয়। শ্রমিকদের ধর্মঘটের অধিকারও

১. D. Thomson—P. 38.

২. Vincent Cronin—P. 245.

দেওয়া হয়নি। কোড নেপোলিয়ন সম্পত্তিভোগী বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার বাহন ছিল, কিন্তু বিপ্লবের উত্তরাধিকার এই আইন বিধিতে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে রক্ষা করা হয়নি। মানব জাতির অধিকার ঘোষণাপত্রে যে সকল অধিকারের কথা বলা হয় তা রক্ষা করা হয়নি। সুতরাং কোড নেপোলিয়ন স্থিতাবস্থার রক্ষার কবচ হিসেবে কাজ করে।

শিক্ষা সংস্কার

নেপোলিয়ন ফ্রান্সে জাতীয় শিক্ষার সংস্কার করেন। শিক্ষা সংগঠনের ক্ষেত্রেও তাঁর লক্ষ্য ছিল রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য-সম্পন্ন সুনাগরিক সৃষ্টি করা। অবশ্য এক্ষেত্রে রাষ্ট্র বলতে নেপোলিয়নকেই বুঝাত। শিক্ষকদের কর্তব্য ছিল ছাত্রদের রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যে দীক্ষা দেওয়া। কঁদরসেত (Condarset) নামে শিক্ষাবিদ জাতীয় শিক্ষার যে কাঠামো নির্মাণ করেন নেপোলিয়ন তার ওপর ভিত্তি করে শিক্ষা সংগঠন করেন। প্রতি কমিউনে প্রিফেক্ট বা সাবপ্রিফেক্টের অধীনে একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করার চেষ্টা করা হয়। মাধ্যমিক বা গ্রামার বিদ্যালয়ে ভাষা, বিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষার নিয়ম করা হয়। শহরে কয়েকটি আদর্শ সরকারি বিদ্যালয় বা লিসে (Lycee) স্থাপন করা হয়। নেপোলিয়ন এই সকল বিদ্যালয়ে প্রাচীন ল্যাটিন ভাষা শিক্ষা আবশ্যিক করেন। লিসে (Lycee)গুলি ছিল আধা সামরিক বিদ্যালয়। পোপের সঙ্গে কনকর্ড্যার্ট (Concordat) বা আপোষমূলক চুক্তির পর গীর্জার পরিচালিত মাধ্যমিক বিদ্যালয় আবার ফিরে আসে। কাজেই নেপোলিয়নের শাসনকালে আমরা তিন ধরনের গ্রামার স্কুল বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কথা জানতে পারি, যথা, (ক) ন্যাশন্যাল কনভেনশনের আমলে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়, যেখানে শিক্ষা ছিল ধর্ম নিরপেক্ষ; (খ) লিসে বা আধা সামরিক বিদ্যালয়, যা নেপোলিয়ন প্রতিষ্ঠা করেন; (গ) গীর্জা বিদ্যালয় যা কনকর্ড্যার্টের পর পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হয়। নেপোলিয়ন অবশ্য তাঁর প্রতিষ্ঠিত লিসেগুলির পেছনে টাকা ঢালতেন ও নজর রাখতেন। যাতে সকল বিদ্যালয়ে একই মানের পাঠ্যসূচী বা সিলেবাস চালু হয়, তিনি সেদিকে দৃষ্টি দেন। বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী রচনায়, নেপোলিয়ন ব্যবহারিক শিক্ষার ওপর জোর দেন। তিনি চান যে প্রশাসক, কারিগরী বিদ্যার অধিকারী, চিকিৎসক প্রভৃতি তৈরি করাই হবে শিক্ষা লাভের প্রধান উদ্দেশ্য। ভাবুক, শিল্পী, সাহিত্যিক ও চিন্তাবিদদের তিনি তেমন দরকারী মনে করেননি। তিনি চান বিদ্যালয়ের ছাত্ররা যেন কঠোর শৃঙ্খলাপরায়ণ, রাষ্ট্রের ও জাতির প্রতি আনুগত্য পরায়ণ ও কাজকর্ম জানা লোকে পরিণত হয়। কোব্বানের মতে, তিনি লিসে ছাড়া আর সকল বিদ্যালয়ে যে পাঠ্যসূচী চালু করেন তার সঙ্গে বুরবোঁ যুগের পাঠ্যসূচীর কোন পার্থক্য ছিল না। একমাত্র লিসে (Lycee) গুলিতে কিছু ব্যতিক্রম ছিল। এখানে সামরিক ও অসামরিক কর্মচারীদের সন্তানরা পড়ত। এ গুলি ছিল এলিট (Elite) বিদ্যালয়। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এনে কঠোর নিয়ন্ত্রণ করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে যদিও কমিউন বিদ্যালয় ছিল, তিনি প্রধানতঃ গীর্জার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ওপরে নির্ভর করেন।[১] নেপোলিয়নের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি ছিল যে, গীর্জা বিদ্যালয় ধর্মীয় প্রভাব ও সাধারণ বিদ্যালয়ে ধর্মনিরপেক্ষ প্রভাবের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। ফ্রান্সের জীবনে Clericalism ও anti-clericalism অর্থাৎ যাজকবাদী শিক্ষা ও ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার দীর্ঘ বিরোধের বীজ এভাবে রোপিত হয়। বিপ্লবের ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাকে তিনি পুরো রক্ষা করেননি। দ্বিতীয়তঃ, সৃজনশীল চিন্তাধারা ও মৌলিক সৃষ্টি ও গবেষণাকে উৎসাহ না দেওয়ার ফলে ফ্রান্সে এক গাদা ইঞ্জিনীয়ার, ডাক্তার, আমলা, সেনাপতি তৈরি হয়।

১· Cobban—Vol. II.

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে শিক্ষা লাভ করার ব্যবস্থা করা হয়। বিদ্যালয় স্তরে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাসের পাঠ্যসূচীকে ঢেলে সাজান হয়। যাতে ছাত্রদের মনে কনসুলেট সম্পর্কে বিতর্ক ও স্বাধীন চিন্তা না দেখা দেয়, এজন্য এই দুটি বিষয়কে সতর্কতার সঙ্গে পড়ান হত। ইঞ্জিনিয়ারিং, কারিগরী, সামরিকবিদ্যা ও চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার জন্যে স্বতন্ত্র বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। শিক্ষক-শিক্ষিণ বিদ্যালয় বা নর্ম্যাল স্কুল স্থাপন করা হয়। নেপোলিয়নের শিক্ষা ব্যবস্থায় স্বাধীন চিন্তার স্থান ছিল না। সংবাদপত্র, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রের অধীনে আনা হয়। কিন্তু প্রকৃত কবি, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, ঐতিহাসিকের অভাব দেখা দেয়। এই যুগের অধিকাংশ লেখক ছিলেন মৌলিকতাহীন, কনসালের স্তাবক। অর্থনীতি, ইতিহাস, বিজ্ঞানের গভীর গবেষণার ছাপ এই যুগে দেখা যায়নি। সংবাদপত্রগুলি ছিল রাষ্ট্রের প্রচার মাধ্যম। নাট্যশালাগুলি কোন গভীর সামাজিক সমস্যাকে তুলে ধরেনি। এগুলি নিছক রঙ্গশালায় পরিণত হয়। দাভিদের মত প্রতিভাবান শিল্পী যিনি একদা টেনিস কোর্টের শপথনামা আঁকেন, তিনি বিপ্লবের বিষয়বস্তু ছেড়ে প্রাচীন রোমের ইতিহাসের কল্পিত কাহিনীকে চিত্রায়িত করেন। এটি ছিল পলায়নী মনোবৃত্তি। দাভিদ নেপোলিয়নের মহিমায় আচ্ছন্ন হয়ে সম্রাট রূপে তাঁর অভিষেকের চিত্র আঁকেন। প্রকৃত সুস্থ সংস্কৃতি কিছুদিনের জন্যে ফরাসী জীবনধারা থেকে নির্বাসিত হয়।

নেপোলিয়ন রাষ্ট্রের সেবা ও অন্যান্য যোগ্যতার পুরস্কারের জন্যে লিজিয়ন অব অনার (Legion of Honour) নামে একপ্রকার উপাধির প্রবর্তন করেন। যেক্ষেত্রে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্যে ১৭৮৯ খ্রীঃ সংবিধান সভা সকল প্রকার উপাধি ও খেতাব লোপ করে, সেক্ষেত্রে 'লিজিয়ন অব অনার' খেতাব প্রবর্তন করে নেপোলিয়ন বিপ্লবের সাম্য নীতিকে ভাঙেন। আসলে সম্রাট পদ গ্রহণের 'পর নেপোলিয়ন তাঁর দরবার নতুন অভিজাতদের দ্বারা সাজাতে চান। এজন্য গণ্যমান্য ব্যক্তিদের এই খেতাব দিয়ে নেপোলিয়ন নতুন অভিজাত তৈরি করেন। সামাজিক সাম্যের কথা তিনি এক্ষেত্রে ভুলে যান। তিনি ফ্রান্সে বহু রাস্তাঘাট ও পুল নির্মাণ করেন। ২২৯টি সামরিক রাস্তা ও ইতালীর সঙ্গে যোগাযোগের জন্যে আল্পস পর্বতের গিরিপথ দিয়ে দুটি রাস্তা তাঁর আমলে নির্মিত হয়। লুভর Louvre) যাদুঘরকে নেপোলিয়ন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ যাদুঘরে পরিণত করেন। ফ্রান্সে বহু উদ্যান, প্রাসাদ নির্মিত হয়। সমগ্র ফ্রান্স কর্মমুখর হয়।

জনহিতকব কাজ

নেপোলিয়ন অন্যতম বিখ্যাত সংস্কার ছিল ধর্ম বিষয়ক সংস্কার। এর নাম ছিল কনকর্ড্যাট (Concordat) বা মীমাংসা নীতি। বিপ্লবী আমলে সিভিল কনষ্টিটিউশন অব ক্লার্জি (Civil Constitution of Clergy) (১৭৯১ খ্রীঃ) দ্বারা গীর্জার জাতীয়করণ করে পোপের ক্ষমতা সমূলে লোপ করা হয়। পোপ এই ব্যবস্থা মেনে নের্নান। এজন্য বিপ্লবী ফ্রান্সের সঙ্গে তাঁর স্থায়ী বিরোধ চলে। ধর্মবিশ্বাসী ফরাসী ক্যাথলিকরা সিভিল কনষ্টিটিউশনকে মেনে নিতে দ্বিধা করে। নেপোলিয়ন বিপ্লবী ফ্রান্সের জাতীয় গীর্জার নীতির সঙ্গে পোপের দাবীর সামঞ্জস্য করে মীমাংসা (Concordat) রচনা করেন। ১৮০১ খ্রীঃ এই কনকর্ড্যাট বা মীমাংসা দ্বারা স্থির হয় যে, ফরাসী গীর্জার যাজকেরা রাষ্ট্র দ্বারা নিযুক্ত হবার পর পোপ এই নিয়োগ অনুমোদন করবেন অর্থাৎ কনষ্টিটিউশন দ্বারা নিযুক্ত বিশপদের পোপ মেনে নেবেন। বাকি বিশপদের ক্ষেত্রে কনসাল নিয়োগ করলেও, চূড়ান্ত নিয়োগ পোপ করবেন। যাজকেরা রাষ্ট্রের নিকট বেতন পাবেন। গীর্জার সম্পত্তি যা বিপ্লবী আমলে রাজেয়াপ্ত হয় পোপ তা স্বীকার করে নেন। ফ্রান্সে ক্যাথলিক ধর্ম বজায় থাকবে, কিন্তু তাহা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। ফ্রান্সে এই ধর্মকে "সংখ্যা গরিষ্ঠের ধর্মমত" এই নামে সরকার স্বীকৃতি দিবেন। ক্যাথলিকরা স্বাধীনভাবে ধর্মাচরণের অধিকার পাবে। কিন্তু পোপের সঙ্গে

কনকর্ড্যাট বা ধর্ম সংস্কার

কনকর্ডাটি চুক্তির পরেনেপোলিয়ন কতকগুলি আইন চালু করেন, যার নাম ছিল অর্গানিক শর্তাবলী। এই অর্গানিক শর্তে বলা হয় যে, ফ্রান্সে পোপের আদেশনামা ও পোপের কোন প্রতিনিধি প্রেরণ সরকারের অনুমতি ছাড়া বৈধ হবে না। (২) বিশপগণ জেলার প্রিফেক্টদের নিয়ন্ত্রণে থাকবেন। (৩) পোপের নির্দেশক্রমে রবিবার ছুটির দিন বলে ধার্য হবে। (৪) প্রটেষ্টান্ট ও অন্য সম্প্রদায়ের খ্রীষ্টানরাও ধর্মীয় স্বাধীনতা পাবে। তাদের সম্প্রদায়ের বিশপদেরও সরকার থেকে বেতন দেওয়া হবে। নেপোলিয়নের এই অর্গানিক আইনের বিরুদ্ধে পোপ সপ্তম পায়াস প্রতিবাদ করলেও কোন ফল হয়নি। দু বছর পরে পোপ অর্গানিক আইনগুলি মেনে নেন। এভাবে তিনি গ্যালিক্যান মতবাদের সঙ্গে ভ্যাটিক্যান মতবাদের সমন্বয় করেন।

নেপোলিয়নের সংস্কারগুলির সুফল এবং বৈশিষ্ট্য

নেপোলিয়নের শাসন ও সামাজিক সংস্কারগুলিকে পর্যালোচনা করে ঐতিহাসিক ফিশার মন্তব্য করেছেন যে, "যদিও নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য স্থায়ী হয়নি, তাঁর অসামরিক সংস্কারগুলি গ্রানাইট প্রস্তরের ভিত্তির ওপর স্থায়ীভাবে নির্মিত হয়" (If the conquests of Napoleon were ephemaral, his Civilian work in France was built upon granite)।[১] নেপোলিয়নের এই সংস্কারগুলি কেবলমাত্র ফ্রান্সের পুনরুজ্জীবন ঘটায়নি, সমগ্র ইওরোপে তাহা নতুন সমাজ সংগঠনের সূচনা করে। ঐতিহাসিক রেড্ডাওয়ের (Reddaway) মতে, "যেখানেই নেপোলিয়নের সেনাদল যায়, সেখানে আর পূর্বাবস্থা ফিরে আসেনি" (Whereever the Napoleonic army went, things were not the same again)।[২] নেপোলিয়ন শৃঙ্খলার সঙ্গে স্বাধীনতা ও সাম্যের সমন্বয় সাধন করেন। ফ্রান্সের বিপ্লবী প্রজাতন্ত্র সন্ত্রাসের রাজত্বের আমলে যে সংহার মূর্তি ধরে, নেপোলিয়ন সেই আত্মনাশী অরাজকতা ও স্বৈরাচারকে শৃঙ্খলায় বেঁধে ফেলেন। তাঁর শাসনে ফ্রান্সে স্বস্তি ও রাজনৈতিক শান্তি ফিরে আসে; বহু উন্নয়নমূলক কাজ হয়। ডেভিড টমসনের মতে, "বোনাপার্ট ফ্রান্সকে শৃঙ্খলায় আবদ্ধ করে শান্তি স্থাপন করেন" (Bonaparte disciplined France and established order)।[৩]

বিপ্লবের মূল আদর্শ হতে বিচ্যুতি

ফরাসী বিপ্লবের দুই প্রধান আদর্শ স্বাধীনতা ও সাম্যের মধ্যে তিনি স্বাধীনতা বা গণতন্ত্রকে ধ্বংস করেন। কনসুলেটের সংবিধান দ্বারা তিনি প্রথম কনসালরূপে প্রকৃতপক্ষে একনায়কতন্ত্র স্থাপন করেন। (বিশেষ আলোচনা আগের পরিচ্ছেদ দেখ)। কনসুলেটের অধীনে গণতন্ত্রকে একটি মুখোশ হিসেবে রক্ষা করা হয়। আইনসভাকে সার্বভৌম ক্ষমতা হতে বঞ্চিত করা হয়। নেপোলিয়ন সরকারি কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে নির্বাচন প্রথার পরিবর্তে মনোনয়ন প্রথা প্রবর্তন করেন। তিনি প্রাদেশিক সভাগুলির ক্ষমতা লোপ করেন। প্রদেশ ও জেলার শাসনকর্তাদের নির্বাচনের দ্বারা নিযুক্তির বদলে তিনি নিয়োগ প্রথা চালু করেন। ব্যক্তি স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা লুপ্ত হয়। তিনি সরকারের ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করার বদলে সকল ক্ষমতা নিজ হাতে কেন্দ্রীভূত করেন। এই কারণে তাঁকে "বিপ্লবের ধ্বংসকারী" বা প্রতিক্রিয়াশীল বলা যায়। নেপোলিয়ন স্বয়ং একথা উপলব্ধি করে বলেন যে, "I destroyed the Revolution," আমিই বিপ্লব ধ্বংস করেছিলাম"। ঐতিহাসিক ওলারের মতে, সম্রাট পদ গ্রহণ করার সঙ্গে বিপ্লবের বা গণতন্ত্রের যে ক্ষীণ ধারাটুকু ছিল নেপোলিয়ন তা রুদ্ধ করেন। শুধু তাই নয় ওলার (Aulurd) বলেন যে, গণতন্ত্র বা লিবার্টির সঙ্গে সাম্য বা Equality কেও নেপোলিয়ন ধ্বংস করেন। কারণ তাঁর

১· Fisher—P. 836.

২· Reddaway—A History of Europe. Vol. VII.

৩· *D. Thomson—P. 39.*

কোড নেপোলিয়ন ও লিজিয়ন অব অনার খেতাব দ্বারা তিনি বিশেষ সুবিধাভোগী বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করেন। খেটে-খাওয়া শ্রমিক ও ভূমিহীন দিন মজুরের স্বার্থ বিসর্জ্জন দেন। কোড নেপোলিয়নকে এজন্য বলা হয় যে লাশে পালিয়ার আইন বা শ্রমিকের ধর্মঘটের অধিকার নিষিদ্ধ করা হয়। শ্রমিককে মালিকের দেওয়া পরিচয় পত্র বহাল করতে বাধ্য করা হয়। শ্রমিকের মজুরী সংক্রান্ত বিরোধে পুলিশকে মালিকের স্বার্থ রক্ষার অধিকার দেওয়া হয়। কোড নেপোলিয়ন দ্বারা স্বচ্ছল কৃষকরা জমিদার ও গীর্জার জমির মালিকানা পেলেও ভূমিহীন কৃষকদের জন্যে কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। কাজেই Equality বা সাম্য নেপোলিয়ন প্রকৃতপক্ষে রক্ষা করেননি। জর্জ রুডেও মনে করেন যে, নেপোলিয়ন না গণতন্ত্র না সাম্য বিপ্লবের কোন নীতিকে সম্মান জানান নি। আসলে তিনি তাঁর সংস্কারের সংবিধান সভার বুর্জোয়াপন্থী কিছু সংস্কার যথা সিভিল কনষ্টিট্যুশন এবং সামন্ততন্ত্র বিরোধী আইনগুলি নেন। এর সঙ্গে তিনি বুরবোঁ বা রাজতন্ত্রী যুগের একনায়কতন্ত্র, কেন্দ্রীকরণ, প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন লোপ, রোমান আইন প্রভৃতি বেছে নেন। সুতরাং নেপোলিয়নকে বিপ্লবের ধ্বংসকারী বলাই সঙ্গত। লেফেভারের মতে, আসলে নেপোলিয়ন জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরশাসকের আদর্শকেই বেছে নেন। পুরানো রাজতন্ত্রকেই তিনি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে স্থাপন করেন। নতুন বোতলে পুরাতন মদ্য তিনি পরিবেশন করেন। জঁা তুলার বলেন যে, তিনি ছিলেন সিজারতন্ত্রবাদী এবং বুর্জোয়া শ্রেণীকে নিজপক্ষে এনে একনায়কের মতই শাসন চালান। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে নেপোলিয়নের সাংগঠনিক সংস্কারগুলি বিপ্লবের অপর আদর্শ সাম্যের (Equality) ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি বিপ্লবের যুগের ভূমি সংস্কার রক্ষা করেন। সামন্ততান্ত্রিক বৈষম্যমূলক' ব্যবস্থা ও বিশেষ অধিকার লোপ করেন। Career open to talent বা যোগ্যতাকেই একমাত্র স্বীকৃতি দিয়ে তিনি সামাজিক সাম্যকে স্থাপন করেন। যাদের বংশ কৌলিন্য, কাঞ্চন কৌলিন্য ছিল না এমন বহু লোক বিভিন্ন উচ্চ পদে যোগ দিয়ে তাদের যোগ্যতার প্রমাণ দিতে সক্ষম হয়। তিনি নিজেই সাধারণ পরিবারের সন্তান হলেও বিপ্লবের ফলেই নেতৃত্ব প্রদর্শনের সুযোগ পান। কোড নেপোলিয়নের মাধ্যমে পিতার সম্পত্তিতে সকল সন্তানের অধিকার দেওয়া হয়। ধর্ম নিরপেক্ষতা নীতি চালু রাখা হয়। আইনের চক্ষে সকলের সমান অধিকার স্বীকার করা হয়। নেপোলিয়ন যে সংস্কার প্রবর্তন করেন তার ফলে ফরাসী কৃষক ও বুর্জোয়া শ্রেণী বিশেষভাবে উপকৃত হয়। এই কারণে অনেকে তাঁকে "Heir and executor of the Revolution" বা বিপ্লবের উত্তরাধিকারী এবং ইহার নির্বাহক বলেন। ফিলিপ গডেলার (Philip Guedella) মতে নেপোলিয়নের রাজত্বকাল ছিল বিপ্লবের আদর্শের প্রসারের যুগ (Nepoleon's reign was an extention not an interruption of the Revolution).

নেপোলিয়ন যে সাম্যের নীতি নেন তাহা পুরোপুরি বিপ্লবের উত্তরাধিকার ছিল না। তিনি জ্যাকোবিন বিপ্লবের আদর্শকে পরিত্যাগ করেন। এজন্য তিনি নিম্নতম মজুরী আইন বা দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ আইন গ্রহণ করেননি। তিনি ১৭৯১ খ্রীঃ বুর্জোয়া বিপ্লবের কিছু কিছু আদর্শকে গ্রহণ করেন মাত্র। ১৭৯১ খ্রীঃ সংবিধানে সিভিল কনষ্টিটিউশন অব ক্লার্জিকে তিনি রক্ষা করেন। কিন্তু জ্যাকোবিন যুগের গণভোট, প্রজাতন্ত্র, সমাজতন্ত্রকে তিনি ত্যাগ করেন। সুতরাং নেপোলিয়নকে প্রকৃতপক্ষে বিপ্লবের উত্তরাধিকারী বলা যায় না।[১]

নেপোলিয়ন ও ফরাসী বিপ্লবের আদর্শ (Napoleon and the Ideas of the French Revolution) : নেপোলিয়ন ছিলেন বিপ্লবের সন্তান। নেপোলিয়নের জন্ম কোন ফরাসী অভিজাত পরিবারে হয়নি। কর্সিকার এক মধ্যবিত্ত পরিবারের

১· George Rude.

নেপোলিয়নের সহিত বিপ্লবের সম্পর্ক

সন্তানের পক্ষে ফ্রান্সের সম্রাট পদে আরোহণ করা সাধারণ অবস্থায় আদপেই সম্ভব ছিল না। কারণ রাজতন্ত্র ছিল বংশানুক্রমিক। নেপোলিয়ন নিজেই বলেন যে, "আমি ফ্রান্সের রাজমুকুটকে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখি। আমি তরবারির দ্বারা তা মাথায় তুলে নিই" (I found the crown of France lying on the ground, I picked it up with my sword)। যদি বিপ্লবের তরঙ্গ পুরাতনতন্ত্রকে না ভেঙে ফেলত, তবে সাধারণ পরিবারের এই সন্তানের পক্ষে কোনদিন ফ্রান্সের শাসকের পদ লাভ করা সম্ভব হত না।

যেহেতু বিপ্লব তাঁকে ক্ষমতা লাভের সুযোগ করে দেয়, সেহেতু বিপ্লব সম্পর্কে নেপোলিয়নের দৃষ্টিভঙ্গী কি ছিল তা বিশ্লেষণ করা দরকার। সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসনে বসে

নেপোলিযনের মন্তব্য

নেপোলিয়ন যে আত্মজীবনী রচনা করেন, তাকে নেপোলিয়নের লিজেন্ড (Napoleonic legend) বা উপাখ্যান বলা হয়। এই গ্রন্থে তিনি দুটি পরস্পর-বিরোধী উক্তি করেন। তিনি বলেন যে, "আমিই বিপ্লব" (I am the Revolution); আবার তিনি বলেন যে, "আমিই বিপ্লবকে ধ্বংস করেছি" (I destroyed the Revolution)।

নেপোলিয়নের উপরোক্ত দুটি মন্তব্য পরস্পর-বিরোধী মনে হলেও এক অর্থে সত্য। নেপোলিয়নের উক্তির তাৎপর্য উপলব্ধি করতে হলে বিপ্লবের মূল আদর্শ কি ছিল সর্বপ্রথম তা

বিপ্লবেব মূল আদর্শ

আলোচনা প্রয়োজন। (১) সর্বসাধারণের ভোটের ভিত্তিতে প্রজাতন্ত্রের আদর্শ ছিল বিপ্লবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফল। এই অধিকারকে বলা হয় Liberty বা স্বাধীনতা বা গণতন্ত্র। (২) ব্যক্তি স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা প্রভৃতিও ছিল লিবার্টি বা 'স্বাধীনতা' আদর্শের অঙ্গ। (৩) স্বৈরতন্ত্রকে লোপ করার জন্যে বিপ্লবের আমলে সরকারের ক্ষমতা বিকেন্দ্রিত করা হয়। প্রাদেশিক সভা, পৌরসভা ও কমিউনগুলির ক্ষমতা বাড়ান হয়। স্থানীয় শাসনকর্তাদের নির্বাচনের মাধ্যমে নিয়োগের ফলে তাদের ওপর স্থানীয় জনগণের নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত হয়। (৪) দরিদ্র জনসাধারণের মঙ্গলের জন্যে Law of Maximum দ্বারা জিনিষপত্রের সর্বোচ্চ মূল্য বেঁধে দেওয়া হয়। Law of Minimum দ্বারা মজুরীর সর্বনিম্ন পরিমাণ স্থির করে দেওয়া হয়। দরিদ্র ব্যক্তিরা নির্দিষ্ট হারে মজুরী পাওয়ার সুযোগ পায়। (৫) বিপ্লবের ফলে সামন্ত প্রথার বিলোপ হয়। সামন্তশ্রেণীর বিশেষ অধিকার লোপ করে সামাজিক সাম্য স্থাপন করা হয়। সামন্তদের ভূমিগুলি কৃষকদের মধ্যে পুনর্বণ্টন করা হয়।গীর্জার সম্পত্তিও জাতীয়করণ করা হয়। যাজকদের সরকারি কর্মচারীর ন্যায় বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। (৬) আইনের নিকট সকল নাগরিকের সমান অধিকার স্থাপিত হয়। মোট কথা, বিপ্লবের আমলে স্বাধীনতা বা লিবার্টি (Liberty) বা গণতন্ত্র এবং সাম্য বা Equality দুই প্রধান আদর্শ হিসেবে গৃহীত ও তার বাস্তব রূপ দেওয়া হয়।

নেপোলিয়ন তাঁর শাসনব্যবস্থায় এই আদর্শগুলিকে কিরূপ ভাবে গ্রহণ করেন তা বিচার

বিপ্লবের মূল আদর্শ ও নেপোলিয়নের স্বৈরতান্ত্রিক নীতি

করলে বিপ্লবের প্রতি তাঁর আনুগত্য বোঝা যাবে। (১) নেপোলিয়ন কনসুলেট নামে যে সংবিধান স্থাপন করেন তার দ্বারা সর্বসাধারণের প্রত্যক্ষ ভোটে আইনসভা গঠন রদ করা হয়। তিনি আইনসভার ক্ষমতা বিভিন্ন কক্ষে ভাগ করে আইনসভাকে দুর্বল করেন। সিনেট ও কাউন্সিল অব ষ্টেটের সদস্যদের মনোনয়ন করার ব্যবস্থা চালু করে আইনসভার এই দুই কক্ষকে তাঁর Puppet বা হাতের পুতুলে পরিণত করেন। নিম্নকক্ষ বা লেজিসলেটিভ বডির সদস্যদের প্রত্যক্ষভাবে সর্বসাধারণের ভোটে নিযুক্ত না করে পরোক্ষ নির্বাচন দ্বারা নিয়োগের ব্যবস্থা করে Liberty বা গণতন্ত্রকে হত্যা করেন। কনসুলেটের সংবিধানে আইনসভার আইন রচনার

সার্বভৌম অধিকার ছিল না। প্রথম কনসালের ঈঙ্গিতে তাঁর বশম্বদ সিনেট যে কোন আইনকে নাকচ করতে পারত। কাজেই প্রথম কনসালরূপে নেপোলিয়ন স্বৈর ক্ষমতা হাতে নেন। কনসুলেট দ্বারা নামে মাত্র প্রজাতন্ত্র রেখে কার্যতঃ তিনি স্বৈরতন্ত্র স্থাপন করেন (বিশদ বিবরণ পৃঃ ১১৪ দেখ)। (২) নেপোলিয়ন তাঁহার স্বৈর ক্ষমতা বাড়ানোর জন্যে প্রাদেশিক সভাগুলির ক্ষমতা লোপ করেন। প্রাদেশিক কর্মচারীদের বিশেষতঃ প্রিফেক্টদের তিনি নিয়োগ করেন। নেপোলিয়নের অতিকেন্দ্রিকতার ফলে স্বৈরাচার বৃদ্ধি পায়। বিপ্লবের আদর্শ বিনষ্ট হয়। (৩) নেপোলিয়ন কনসুলেটের সংবিধানে সন্তুষ্ট না হয়ে, ১৮০২ খ্রীঃ প্রথম কনসালের পদকে যাবজ্জীবন কনসালের পদে রূপান্তরিত করেন। ১৮০৪ খ্রীঃ কনসুলেটের সংবিধান লোপ করে তিনি প্রথম সম্রাট পদ গ্রহণ করেন। এর ফলে প্রজাতন্ত্রের যে মুখোসটুকু ছিল তাও খুলে পড়ে। নেপোলিয়নের অধীনে নগ্ন স্বৈরতন্ত্র স্থাপিত হয়। অ্যালফ্রেড কোব্বানের মতে, নেপোলিয়ন তাঁব স্বৈরতন্ত্রকে ঢাকা দেওয়ার জন্যে মুখোস হিসেবে আইনসভা ও নির্বাচনকে ব্যবহার করেন।[১] আসলে তিনি ফরাসী বিপ্লবের আদর্শ Liberty বা স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রকে ধ্বংস করেন। বুর্জোয়া যুগের রাজতন্ত্রকেই ফিরিয়ে আনেন। এই স্বৈরশাসনকে সহনীয় করার জন্যে এবং একটি সমর্থক শ্রেণী গঠনের জন্যে তিনি স্বচ্ছল কৃষকদের জমির অধিকার দেন এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ প্রথার দ্বারা একটি দক্ষ আমলাতন্ত্র গড়েন। এদের সাহায্যেই তিনি শাসন চালান। সাঁকুলেৎ বা ভূমিহীন কৃষকদের জন্যে তাঁর কোন মাথা ব্যথা ছিল না। বুর্জোয়া গণতন্ত্র বা পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রকেও তিনি অগ্রাহ্য করেন। সুতরাং বিপ্লবের প্রধান আদর্শ বা Libertyর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল না। এজন্যই ওলার (Aulurd) বলেছেন যে, নেপোলিয়নের কনসুলেট বা সম্রাটপদ লাভের ঘটনাকে ফবাসী বিপ্লবের সমাধি দান বলেই গণ্য করা উচিত। তাঁকে বিপ্লবের সন্তান (Child of the Revolution) বলে স্বীকার করা যায় না। এইচ· জি· ওয়েলস বলেন যে, "ইতিহাস নেপোলিয়নকে যে সুযোগ এনে দেয়, তিনি যদি তার সদ্ব্যবহার করতেন, তাহলে তিনি হতেন ইতিহাসের সূর্য। ক্ষমতার লোভ দেখিয়ে, মুরগীর বাচ্চা যেমন গোবরের গাদায় খাদ্য খুঁজে, তিনি ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে স্বৈরক্ষমতা খুঁজে বেড়ান"।

নেপোলিয়ন ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম আদর্শ সাম্য (Equality)-কে গ্রহণ করেন। তিনি বলেন যে, "ফরাসী জাতি স্বাধীনতা বা গণতন্ত্র চায় না; তারা সাম্য চায়" (What the nation wants is not Liberty but Equality)। তিনি বিভিন্ন আইন দ্বারা সাম্য নীতিকে স্থায়িত্ব দেন। (১) ১৭৯১—৯৪ খ্রীঃ পর্যন্ত বিপ্লবী শাসনের দ্বারা সামন্ত প্রথা, সামন্ত কর, স্থানীয় শুল্ক প্রভৃতি বিশেষ অধিকার লোপ করা হয়। নেপোলিয়ন এই বিপ্লবী আইনগুলি বহাল রাখেন। (২) বিপ্লবের যুগের ভূমি ব্যবস্থাকেও তিনি স্বীকৃতি দেন। (৩) বিপ্লবের আমলে ধনী, দরিদ্র নির্বিশেষে যোগ্যতার ভিত্তিতে চাকুরী ও অন্যান্য সুযোগ (Career open to talent) যে নিয়ম চালু হয় তিনি তাকে স্বীকৃতি দেন। (৪) তিনি সামাজিক সাম্য স্থাপন করেন। (৫) কোড নেপোলিয়ন দ্বারা আইনের চক্ষে সকলের সমান অধিকার স্থাপন করেন। ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে রক্ষা করা হয়। (৬) Concordat দ্বারা তিনি গীর্জার সম্পত্তির জাতীয়করণকে স্বীকৃতি দেন। সাম্য নীতি গ্রহণ করার ফলে তাঁর দাবী "I am the Revolution" আংশিকভাবে যুক্তিযুক্ত বলে কেহ কেহ মনে করেন।

নেপোলিযন কর্তৃক সাম্য আদর্শ গ্রহণ

কেহ কেহ মনে করেন যে, নেপোলিয়ন ছিলেন বিপ্লবের সন্তান (Child of the Revolution)। কারণ তিনি বিপ্লবের অন্যতম প্রধান নীতি সাম্যকে গ্রহণ করেন। ফিলিপ গডেলার (Philip Guedella) মতে, "নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যে বিপ্লব ব্যাহত না হয়ে বিস্তৃত হয়" (The Empire was not an

বিপ্লবের সন্তান

interruption but an extention of the Revolution)।[১] কারণ তাঁর সংস্কারগুলি তাঁর সাম্রাজ্যের মাধ্যমে বিস্তৃত হয়।

এই অভিমত যুক্তিসম্মত মনে করা যায় না। নেপোলিয়ন Liberty বা প্রজাতন্ত্রের আদর্শকে ত্যাগ করেন। তিনি সাম্য নীতিকেও প্রকৃতপক্ষে গ্রহণ করেননি। তিনি দরিদ্র সাধারণের স্বার্থে Law of Maximum এবং Law of Minimum-এর পুনঃ প্রবর্তন করেননি। জর্জ রুডের মতে, নেপোলিয়নের সংস্কারগুলি বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার জন্যে প্রবর্তিত হয়। কিন্তু সমাজের দরিদ্রতম লোকেরা তাঁর সংস্কারের ফলে উপকৃত হয়নি। এই কারণে তাঁর শাসনব্যবস্থায় একটি স্ববিরোধিতা (contradiction) ছিল। ১৭৯১ খ্রীঃ বুর্জোয়া সংবিধানের বিভিন্ন নীতির প্রতি তাঁর বেশী আনুগত্য দেখা যায়। জ্যাকোবিন যুগের অগ্রগামী সংস্কারগুলি তিনি গ্রহণ করেননি। তিনি ১৭৯১ খ্রীঃ সিভিল কনষ্টিটিউশন অফ ক্লার্জির সংস্কার করে কনকর্ডাট স্থাপন করেন। ১৭৯১ খ্রীঃ সংবিধানের সীমাবদ্ধ ভোটাধিকার নীতি গ্রহণ করেন। জ্যাকোবিন যুগের সর্বসাধারণের ভোটাধিকার ও সমাজতন্ত্র তিনি গ্রহণ করেননি। কোড নেপোলিয়ন দ্বারা সম্পত্তির অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়ে বুর্জোয়া শ্রেণীর আনুগত্য তিনি পান।ঐতিহাসিক ওলারের (Aulurd) মতে, নেপোলিয়ন সামাজিক সাম্য অপেক্ষা সামাজিক বৈষম্যই সৃষ্টি করেন। তিনি বুর্জোয়াশ্রেণীকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুযোগগুলি ভোগ করার ব্যবস্থা করেন এবং স্বচ্ছল কৃষকদের জমির মালিকানা দেন। এইভাবে তিনি একটি নতুন সুবিধাভোগী শ্রেণী সৃষ্টি করেন। বাকি লোকেদের বঞ্চনা করা হয়।

লেফেভার, গুডউইন, জোয়ারেস, মাঁতিয়ে প্রভৃতি ঐতিহাসিকেরা ডাইরেক্টরীর শাসনকালকেই বিপ্লবেব শেষ পর্যায় বলে গণ্য করেন। তাঁদের মতে, নেপোলিয়নের স্বৈরতন্ত্রের ফলে বিপ্লব ধ্বংস হয়। নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যের মাধ্যমে ইওরোপে বিপ্লবের আদর্শ ছড়ায়, এই মতও সঠিক নয়। কারণ তাঁর সাম্রাজ্য ছিল শোষণ ও স্বৈরাচারের ওপর স্থাপিত। এটা ছিল বিপ্লবের Fraternity বা মৈত্রী বা সৌভ্রাত্র নীতির পরিপন্থী। নেপোলিয়ন ইওরোপের জনগণকে রাজতন্ত্রের শাসন থেকে মুক্ত করে নিজ আধিপত্যে আনেন। তাঁর সাম্রাজ্যের মধ্যে একটি স্ব-বিরোধ ছিল। ডেভিড টমসনের মতে, "নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যের অন্তর্নিহিত ও আত্মঘাতী স্ব-বিরোধ এই সাম্রাজ্যের পতন আনে।"[২] সুতরাং নেপোলিয়নকে প্রকৃতপক্ষে "বিপ্লবের সন্তান" (Child of the Revolution) বলা যায় না।

ফ্রান্সে একনায়কতন্ত্র স্থাপনে নেপোলিয়নের সাফল্যের কারণ (Causes of Napoleon's success in establishing his dictatorship on France) : বিপ্লবী ফ্রান্স সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার আদর্শ ত্যাগ করে নেপোলিয়নের স্বৈরতন্ত্রের বেদীর নিকট কি কারণে নতজানু হয় তা ইতিহাসের ছাত্রের শিক্ষণীয় বিষয়। নেপোলিয়নের একনায়কতন্ত্রের উৎপত্তির একটি প্রধান কারণ ছিল বিপ্লব সম্পর্কে ফরাসী জাতির হতাশাবোধ। "বিপ্লবের আশাবাদ, শেষ পর্যন্ত হতাশায় পরিণত হয়ে নেপোলিয়নের পদতলে পতিত হয়" (It was hope that made the Revolution, it was despair that led it at the feet of Napoleon)। সন্ত্রাসের রাজত্বের রক্তাক্ত ও ভয়ঙ্করী রূপ সাধারণ ফরাসীদের মনে বিপ্লব সম্পর্কে হতাশা জাগায়। রাইকারের (Riker) মতে, লোকে ভাবতে থাকে যে, "যদি বিপ্লবের অর্থই হয় অজস্র রক্তপাত তবে এই শাসন রাজতন্ত্র অপেক্ষা ক্ষতিকর।" সন্ত্রাসের রাজত্বের

সন্ত্রাসের শাসনের ভয়াবহতা এবং থর্মিডরীর প্রতিক্রিয়া

১· P. Guedella. P. 225.

২· D. Thomson—P. 24

বাড়াবাড়ি বিপ্লবের আশাবাদকে বিনষ্ট করে। দ্বিতীয়তঃ, সন্ত্রাসের রাজত্বের পতনের পর যে থর্মিডোরীয় প্রতিক্রিয়া (পৃঃ দেখ) আরম্ভ হয় তা ছিল এমনই প্রতিক্রিয়াশীল যে তা বিপ্লবের মূল শিকড়গুলিকে ধ্বংস করে দেয়। জ্যাকোবিন দমনের নামে বুর্জোয়াশ্রেণী ক্ষমতা দখল করে এক প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থার পত্তন করে। মাদেলাঁর মতে, "বিপ্লবের প্রকৃত সন্তানেরা দমিত হয়। সাঁকুলেৎশ্রেণী রঙ্গমঞ্চ হতে প্রস্থান করে।" এর ফলে ডাইরেক্টরীর শাসনকালে বুর্জোয়াশ্রেণী পুনরায় ক্ষমতায় আসে। সাধারণ লোকে ডাইরেক্টরীর শাসনে বিরক্ত অথবা উদাসীন হয়।

জনসাধারণের এই হতাশার মধ্যে নেপোলিয়ন রঙ্গমঞ্চে নতুন নায়ক হিসেবে আবির্ভূত হন। লোকে মনে করে যে, এই প্রতিভাবান সেনাপতি ফ্রান্সের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি, রাজনৈতিক অস্থিরতার অবসান ঘটিয়ে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হবেন। কৃষক ও মধ্যবিত্তশ্রেণী মনে করেন যে, বিপ্লবের আমলে জমিতে তাঁরা যে অধিকার পান নেপোলিয়ন তা রক্ষা করবেন। নেপোলিয়ন গণসমর্থনের সাহায্যে তাঁর একনায়কত্ব কায়েম করেন। ডেভিড টমসনের মতে, ১৮ই ব্রুমিয়ারের অভ্যুত্থানে নেপোলিয়নের সফলতার মূলে ছিল ডাইরেক্টরগণ ও ডাইরেক্টরীর আইনসভার প্রতি জনগণের কোন আস্থা ছিল না। অধুনা বহু গবেষক ডাইরেক্টরীর পুনর্মূল্যায়ণ করেন। তাঁরা বলেন যে, যদিও ডাইরেক্টরী বুর্জোয়া শাসন স্থাপন করে, কিন্তু তারা বিপ্লবের গভীর মূল পরিবর্তনগুলিকে রক্ষা করতে চেষ্টা করে। কিন্তু বাস্তবে ডাইরেক্টরীর আমলে তারমিদরীয় প্রতিক্রিয়া এত তীব্র ছিল যে, ডাইরেক্টরীর ভাল কাজগুলি লোকের চোখে পড়েনি। যে প্যারিসের জ্যাকোবিন জনতা একদা বিপ্লবী সরকারের মাংসপেশী রূপে কাজ করত, সন্ত্রাস ও তারমিদরীয় প্রতিক্রিয়ায় তারা ধ্বংস হয়। ডেভিড টমসনের মতে, হতাশাগ্রস্থ প্যারিসবাসী সেনাপতি বোনাপার্টের উত্থানকে অনিবার্য ভেবে নীরবে মাথা নত করে।

নেপোলিয়নের দ্বারা সামাজিক স্থিতিশীলতা লাভের বাসনা

ফ্রান্সের সঙ্গে ইওরোপের রাজশক্তিগুলির যে বৈদেশিক যুদ্ধ চলছিল, সেই যুদ্ধে নেপোলিয়নের অসাধারণ সাফল্য জাতিকে মোহিত করে। ডাইরেক্টরগণ অপেক্ষা নেপোলিয়নের জনপ্রিয়তা অনেক বেশী ছিল। নেপোলিয়নই ফ্রান্সের একমাত্র ত্রাণকর্তা—একথা অনেকে ভাবতে থাকে। বৈদেশিক যুদ্ধে তিনি যে পারদর্শিতা দেখান, আভ্যন্তরীণ শাসন সংগঠনের ক্ষেত্রে তিনি তা দেখাতে পারবেন, এই বিশ্বাস লোকের মনে জন্মায়। একদা প্রাচীন রোমে জুলিয়াস সিজার তাঁর সামরিক গৌরবকে সম্বল করে যেরূপ রোমের প্রজাতন্ত্রকে ধ্বংস করেন, নেপোলিয়ন তাঁর সামরিক গৌরবের প্রেক্ষাপটকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার কাজে লাগান।

নেপোলিয়নের সামরিক সাফল্য

নেপোলিয়ন সাধারণ পরিবারের সন্তান ছিলেন। নেপোলিয়নের শাসনে বিপ্লবের মূল পরিবর্তনগুলি রক্ষা পাবে অথচ শৃঙ্খলা ফিরে আসবে এই আশা ফরাসী জাতিকে প্রভাবিত করে। এ্যাবে স্রিয়েস প্রভৃতি প্রবীণ বিপ্লবী নেতারা নেপোলিয়নকে সমর্থন করায় এই ধারণা বলবতী হয়। এ্যাবে সিয়েস কনসুলেটের সংবিধান রচনার প্রাক্কালে ঘোষণা করেন যে, নতুন সংবিধানে জনগণের আস্থার সঙ্গে শৃঙ্খলার সমন্বয় করা হবে (Confidence from below and authority from above)। ফ্রান্সের সেনাদলও নেপোলিয়নের উত্থানকে স্বাগত জানায়।

নেপোলিয়ন কর্তৃক বিপ্লবের মূল্যবান পরিবর্তনগুলি রক্ষার আশা

নেপোলিয়নের ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভাও তাঁর সাফল্যের মূলে কাজ করে। বাস্তববাদী নেপোলিয়ন উপলব্ধি করেন যে, ফরাসী জাতির একটি বৃহৎ অংশের যথা কৃষক ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর হাতে বিপ্লবের ফলে যে সকল সুযোগ আসে তারা তা বজায় রাখতে আগ্রহী ছিল। নেপোলিয়ন এই সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা করেন। তিনি বলেন যে, "লোকে যেরূপ শাসনব্যবস্থা চায়; আমি

নেপোলিয়ন কর্তৃক সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা

তাই করেছি" (My policy consists in governing men as they wish to be governed)। ঐতিহাসিক ফিশার মনে করেন যে, "বিপ্লবের চরমপন্থী আদর্শের প্রতি সাধারণ লোকের সমর্থন ছিল না। সাধারণ লোক ছিল বিপ্লবের সার্থকতা সম্বন্ধে উদাসীন, নিজ স্বার্থরক্ষায় আগ্রহী। কয়েকজন মুষ্টিমেয় লোকই ছিল বিপ্লবের চরমপন্থী মতবাদের অনুরাগী" (Revolutions are worked by small fanatics)।[১] নেপোলিয়ন জনসাধারণের এই শান্তিপ্রিয়তা ও ঔদাসীন্যের সুযোগ নেন।

তাছাড়া তিনি ছিলেন প্রকৃতই প্রতিভাবান শাসক। বিপ্লবের মন্থনে যে গরল উঠেছিল তাকে শোষণ করে তিনি অমৃতে পরিণত করেন। সাম্য প্রভৃতি বিপ্লবের আদর্শগুলিকে তিনি রূপায়িত করেন এবং স্বাধীনতার আদর্শকে ত্যাগ করেন। তিনি তাঁর অন্তর্দৃষ্টিতে উপলব্ধি করেন যে, "ফরাসী জাতি সাম্য চায়, স্বাধীনতা চায় না" (What the French people want is equality, not Liberty)। তাছাড়া সামরিক জয়ের গৌরবের মদিরা তিনি জাতিকে পানপাত্র ভরিয়ে পান করান।

পাঠ্যসূচী

১। Thomson—Napoleon Bonaparte.
২। Markham—Napoleon and Awakening of Europe.
৩। A. Cobban—History of France.
৪। V. Cronin—Napoleon.
৫। Fisher—History of Europe.
৬। D. Thomson—Europe since Napoleon.
৭। Lefebvre—French Revolution.

১· Fisher.

অষ্টম অধ্যায়

নেপোলিয়নের বৈদেশিক নীতি ঃ সাম্রাজ্য সংগঠন ঃ মহাদেশীয় প্রথা ঃ নেপোলিয়নের পতন

(The Foreign Policy of Napoleon : Organisation of the Empire : Continental System : Napoleon's Downfall)

নেপোলিয়নের বৈদেশিক নীতি ও সাম্রাজ্যের লক্ষ্য (The motives behind Napoleon's Foreign Policy and Empire) ঃ নেপোলিয়ন কেবলমাত্র সংগঠক বা শাসক হিসেবে তাঁর প্রতিভার পরিচয় দেননি। (বৈদেশিক যুদ্ধের কারণ পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। বৈদেশিক নীতি, রণ পরিকল্পনা ও সৈনাপত্যের ক্ষেত্রেও তিনি তাঁর অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দেন। নেপোলিয়নের নেতৃত্বে ইওরোপের বিভিন্ন দেশে ফরাসী সেনার বিজয় বৈজয়ন্তী উড়ে। ইওরোপের বৃহত্তর অঞ্চল তাঁর অধীনতা স্বীকারে বাধ্য হয়। ইংলন্ড ব্যতীত ইওরোপের সকল বৃহৎ শক্তি তাঁর সঙ্গে সন্ধি স্থাপনে বাধ্য হয়।

নেপোলিয়নের বৈদেশিক নীতির লক্ষ্য পণ্ডিতেরা বিভিন্ন দিক থেকে বিচার করেন। (১) কেহ কেহ মনে করেন যে, নিছক রাজ্য গ্রাস বা সাম্রাজ্যবাদই ছিল নেপোলিয়নের বৈদেশিক নীতির লক্ষ্য। তিনি তাঁর রাজ্যলিপ্সাকে আদর্শের ছদ্ম আবরণে ঢেকে রাখেন। প্রথমতঃ, তিনি ফ্রান্সের প্রাকৃতিক সীমান্ত স্থাপনের লক্ষ্য নিয়ে রাইন সীমান্ত, বেলজিয়াম, ইতালীর আল্পস উপত্যকা ও সুইজারল্যান্ড অধিকার করেন। ক্যাম্পো ফোর্মিও, লুনভিল ও প্রেসবার্গের সন্ধির দ্বারা তাঁর এই উদ্দেশ্য পরিপূরিত হয়। কিন্তু প্রাকৃতিক সীমারেখা স্থাপনের পর তাঁর উচ্চাকাঙ্খা বৃদ্ধি পায়। সমগ্র ইওরোপকে পদানত করার উচ্চাশা তিনি পোষণ করেন। মধ্য যুগের সম্রাট শার্লামেইনের সর্বইওরোপীয় সাম্রাজ্যের আদর্শ তাঁকে আচ্ছন্ন করে।[১] তিনি নিজেকে শার্লামেইনের ন্যায় পবিত্র রোমান সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করেন। নেপোলিয়ন তাঁর নগ্ন সাম্রাজ্যবাদকে মহিমামণ্ডিত করার জন্যে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের ক্ষয় পাওয়া আদর্শকে গ্রহণ করেন।

নেপোলিয়নের বৈদেশিক নীতিব লক্ষ্য ঃ (১) সাম্রাজ্যবাদ ঃ বিপরীত যুক্তি

নেপোলিয়নের গুণগ্রাহী ঐতিহাসিকেরা মনে করেন যে, "নেপোলিয়ন ছিলেন বিপ্লবের অগ্নিময় তরবারি" (Napoleon is the sword of the Revolution)। ফরাসী বিপ্লবের 'সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার' বাণী তিনি ইওরোপে নিপীড়িত জনসাধারণের নিকট পৌঁছে দেন। ইওরোপের স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রগুলি তাঁর আক্রমণে ভেঙে পড়ে। এই ধ্বংসপ্রাপ্ত রাজতন্ত্রের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপের ওপর তিনি জনসাধারণের সাম্য ও স্বাধীনতার ধ্বজাকে উড়িয়ে দেন। রেড্ডাওয়ের (Reddaway) মতে, "যেখানে নেপোলিয়নের ঈগল লাঞ্ছিত পতাকা উড়ে, সেখানেই পুরাতনতন্ত্র আর ফিরে আসেনি।" (Whereever Napoleonic Eagles flew, things were not the same again)।[২] তিনি ইওরোপের জনসাধারণকে সামন্ত শাসন ও স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের হাত হতে মুক্ত করে তাদের সমান সামাজিক অধিকার দেন।

(২) বিপ্লবের আদর্শ প্রচার

১· Fisher—A History of Europe.

২· Reddaway—History of Europe.

নেপালিয়নের রাজ্য জয়ের ফলে ইওরোপে ফরাসী বিপ্লবের আদর্শ ছড়ায় এতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি বিপ্লবের আদর্শ প্রচার করার ব্রত পালনের জন্যে তরবারি ধারণ করেন একথা মনে করা যায় না। বিজিত রাজ্যে জনপ্রিয়তা লাভের জন্যে, পুরাতন রাজবংশগুলির বিরুদ্ধে জনমতকে প্রভাবিত করার জন্যেই বিপ্লবের কিছু কিছু আদর্শকে তিনি কাজে লাগান। তিনি জানতেন যে, বিজিত দেশের অভিজাতরা তাঁর বিপক্ষে থাকবে। সুতরাং তৃতীয় শ্রেণী বা সাধারণ লোক ও বুর্জোয়াদের নিজ পক্ষে আনার জন্যেই তিনি সাম্য নীতি ও সামাজিক সংস্কার প্রবর্তন করেন। কিন্তু তিনি ইওরোপীয় জাতিগুলির Liberty বা স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করেন। ঐতিহাসিক ডেভিড টমসনের মতে, "নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যের মধ্যে একটি আত্মঘাতী স্ব-বিরোধিতা ছিল।" তিনি সাম্যের আদর্শকে স্বীকার করলেও, স্বাধীনতার আদর্শকে বাতিল করেন। কিন্তু বিজিত দেশের লোকেরা শীঘ্রই তাঁর উদ্দেশ্য বুঝে ফেলে। ফলে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে জাগরণ ঘটে। (The Napoleonic Empire was doomed because of its inherent and selfdefeating contradictions)।[১] ঐতিহাসিক ফিশারও মনে করেন যে, "মেডেলের দুই পিঠে যেমন দুইরূপ ছাপ থাকে, নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যের মেডেলের একটি উজ্জ্বল ও একটি অন্ধকারময় দিক ছিল" (It is easy to forget that the medal, has a dark as well as shining face)।[২] বিজিত দেশগুলিতে নেপোলিয়ন তাঁর সংস্কারের আড়ালে স্বৈর শাসন স্থাপন করেন। তিনি বিজিত দেশগুলিকে স্বায়ত্ব শাসন না দিয়ে, নিজ ভ্রাতা বা সেনাপতির শাসন চাপিয়ে দেন। যুদ্ধের প্রয়োজনে বিজিত দেশ হতে সম্পদ লুঠ করেন এবং জনসাধারণকে সেনাদলে যোগ দিতে বাধ্য করেন। তাঁর সাম্রাজ্যের স্বার্থে এই দেশগুলির ওপর Continental System বা মহাদেশীয় অবরোধ প্রথা (বিশদ বিবরণ পরে দেখ) চাপিয়ে দেন। ইওরোপে জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্থাপন করার মিথ্যা আশা সৃষ্টি করে, ইওরোপে তিনি নিজ স্বৈর শাসন স্থাপন করেন। এই অন্তর্নিহিত স্ব-বিরোধই নেপোলিয়নের বৈদেশিক নীতিকে ব্যর্থ করে দেয়। ঐতিহাসিক ডেভিড টমসন নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যনীতির একটি যুক্তিবাদী ও তথ্যযুক্ত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। নেপোলিয়নের রাজ্য জয়ের পশ্চাতে সাম্রাজ্যবাদী অভিলাষ ছিল তাতে সন্দেহ নেই। এজন্য তাঁকে দোষ দেওয়া বৃথা। তাঁর প্রতিপক্ষ শক্তিগুলি এতকাল যা করেন এবং তখনও করতে চেষ্টা করেন, নেপোলিয়ন সফলতার সঙ্গে সেই কাজই করেন। ব্রিটেনের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য স্থাপন, প্রাশিয়ার উত্তর জার্মানীতে আধিপত্য লাভের চেষ্টা, হ্যাপসবার্গ রাজাদের দানিয়ুব উপত্যকায় আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা ও রাশিয়ার পোল্যান্ড ব্যবচ্ছেদের কাজগুলিকে কি আমরা উদার, জাতীয়তাবাদী কাজ বলব? এই কাজগুলিকে যদি নিন্দনীয় মনে না করা হয় তবে নেপোলিয়নের কাজ কেন নিন্দনীয়? পার্থক্য শুধু এইটুকু যে, উপরোক্ত রাজারা আঞ্চলিকভাবে রাজ্য বিস্তারে চেষ্টা করেন, নেপোলিয়ন সেক্ষেত্রে গোটা ইওরোপে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করেন। সুতরাং তাঁর সঙ্গে ইওরোপের অন্যান্য শাসকদের কোন মৌলিক তফাৎ নেই। তফাৎ যা ছিল তা হল নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যের পরিকল্পনা ছিল যেমন বিশাল ও চমকপ্রদ, তাঁর সাংগঠনিক ক্ষমতা ও উদ্যমও ছিল অপরিমেয়।

(৩) বিরুদ্ধ যুক্তি : সাম্রাজ্যবাদী শোষণ

দ্বিতীয়তঃ, নেপোলিয়নের ইওরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের দুটি স্তর ছিল। ফ্রান্স ও তার প্রতিবেশী অঞ্চলে তিনি যেভাবে কোড নেপোলিয়ন, সংগঠন ও শৃঙ্খলা স্থাপন করেন তাতে অনিচ্ছাকৃত ভাবেও বিপ্লবের কিছু কিছু ফল এই অঞ্চলে ছড়ায়। বেলজিয়াম, হল্যান্ড; জার্মানী ও উত্তর

১· David Thomson—P.42.
২· Fisher—Bonapartism.

ইতালীকে তিনি তাঁর প্রত্যক্ষ পরিকল্পনার ভেতর আনেন। এই সকল অঞ্চলে তিনি সমতাসম্পন্ন শাসন ও আইন ব্যবস্থা চালু করেন। তিনি জানতেন লোকে বিপ্লবের সতত পরিবর্তনশীল ব্যবস্থা ও নৈরাজ্য অপেক্ষা স্থিতিশীল শাসন, অধিকার ও শৃঙ্খলা পছন্দ করে। তিনি তাঁর কোড নেপোলিয়ন ও শিক্ষিত প্রশাসকদের সাহায্যে এই অধিকৃত অঞ্চলে তা চালু করেন। বিপ্লবের জন্যে নয়, সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বের জন্যেই তাঁকে একাজ করতে হয়। এর বাইরে পূর্ব ইওরোপে ছিল সাম্রাজ্যেব দ্বিতীয় স্তর। এলব নদী এবং আড্রিয়াটিক উপসাগরের পূর্ব দিকে তিনি তাঁর সংস্কার প্রবর্তনের জন্যে মাথা ঘামাননি। কাজেই সাম্রাজ্যবাদী লক্ষ্যই ছিল তাঁর রাজ্য বিস্তারের মূল কারণ।

ইংরাজ ঐতিহাসিকেরা নেপোলিয়নের বৈদেশিক নীতির তৃতীয় ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁদের মতে, ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ইংলন্ডের নিরবচ্ছিন্ন বিরোধিতার ফলে নেপোলিয়ন বাধ্য হয়ে রাজ্য জয় নীতি গ্রহণ করেন।[১] নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে অষ্ট্রিয়া, প্রাশিয়া ও রাশিয়াকে নিয়ে ইংলন্ড জোটের পব জোট গড়ে তুলে। ইংলন্ডের নৌবহর, ফরাসী সামুদ্রিক আধিপত্যকে চূর্ণ করিয়া দেয়।

(৪) ইংলণ্ডেব বিবোধিতা

উপরোক্ত অভিমতে ইংলন্ডকে অহেতুক প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। নেপোলিয়ন নিজ উচ্চাকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির জন্যেই রাজ্য জয় নীতি গ্রহণ করেন। তাঁর রাজ্য বিস্তার নীতির ফলেই ইংলন্ডের সঙ্গে ফ্রান্সের বিরোধ তীব্রতর হয়। ইংলন্ডের বিরোধিতার জন্যে নেপোলিয়ন সাম্রাজ্যবাদী নীতি নেন একথা বলা যায় না। নেপোলিয়ন বেলজিয়াম, রাইন সীমান্ত, ইতালী অধিকার করলে এবং অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়াকে পরাস্ত করলে ইংলন্ড আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। মোট কথা, নেপোলিয়নের বৈদেশিক নীতির লক্ষ্য ছিল রাজ্যলিপ্সা। যদিও ইতিহাস তাঁকে ইওরোপে একটি নতুন সমাজ বিধান স্থাপনের সুযোগ করে দেয়, শেষ পর্যন্ত রাজ্যলিপ্সাই তাঁকে পেয়ে বসে। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক H. G. Wells-এর মতে, "মুরগীর বাচ্চা হীরক খন্ড পড়ে থাকলে তাতে আকৃষ্ট না হয়ে যেমন গোবরের গাদা খুঁজে বেড়ায়, তেমনি ইতিহাস তাঁকে নতুন সমাজ স্থাপনের সুযোগ দিলেও তিনি তা ত্যাগ করে চিরাচরিত রাজ্য বিস্তার নীতিতে আসক্ত হয়ে পড়েন" (He crouched like a cockerel on a dunghill)[২]।

বিরুদ্ধ যুক্তি : ক্ষমতার লোভ

সাম্রাজ্য স্থাপনে নেপোলিয়নের সফলতার কারণ এবং এই সাম্রাজ্যের প্রকৃতি ও ফলাফল (The Causes of the success of Napoleonie Imperialism and its significance and the significance of his empire) : নেপোলিয়ন যেরূপ বিস্ময়কর দ্রুততার সঙ্গে ইওরোপ মহাদেশের এক বিরাট অংশ তাঁর পদানত করেন তার ব্যাখ্যা ঐতিহাসিকরা খোঁজার চেষ্টা করেছেন। উনবিংশ শতকে নেপোলিয়নের জীবনীকারগণ এবং ঐতিহাসিকেরা বীরপূজার মনোভাব নিয়ে নেপোলিয়নের এই সাফল্যকে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁরা নেপোলিয়নের সামরিক প্রতিভাকেই তাঁর সাফল্যের একমাত্র কারণ বলেন। পরবর্তীকালে সমর বিজ্ঞানের গবেষকরা ও যুক্তিবাদী ঐতিহাসিকরা নেপোলিয়নের সাফল্যের ভিন্নতর ব্যাখ্যা দেন। নেপোলিয়নের সামরিক প্রতিভা যে অসাধারণ ছিল তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর জীবনের শেষদিকে কেন এই প্রতিভা কাজে লাগেনি সেকথাও ভেবে দেখা দরকার। স্থলযুদ্ধের রণপরিকল্পনায় ও কামানের যুদ্ধে

১· Ibid.
২· H. G. Well—Outlines of World History.

তিনি তাঁর সময়ে যে অদ্বিতীয় ছিলেন তা সত্য। তিনি কেবলমাত্র সাহস ও বীরত্ব খাটিয়ে যুদ্ধ জয়ের কথা ভাবতেন না। মৌলিক সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ, আগ্নেয়াস্ত্রের সফল প্রয়োগ, সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি এবং সেনাদলের মনোবল অক্ষুণ্ন রাখতে জানতেন। এক কথায় রণকৌশলের বুদ্ধিদীপ্ত প্রয়োগের সঙ্গে নিজ সেনাদলের মনোবলকেও তিনি সমান গুরুত্ব দিতেন। নেতৃত্বদানে তাঁর অসাধারণ ক্ষমতাও ছিল।

একমাত্র এই সকল গুণাবলীর দ্বারা, তাঁর বিরুদ্ধে ইওরোপের জোট বা কোয়ালিশনগুলিকে ভেঙে ফেলা নেপোলিয়নের পক্ষে সহজ কাজ ছিল না। নেপোলিয়নের সেনাদল কেবলমাত্র বেতনভোগী পেশাদার সেনা ছিল না। তাঁর সেনাদল ছিল রাজনৈতিক আদর্শে উদ্দীপিত। তারা বিশ্বাস করত যে, তারা বিপ্লবী ফ্রান্সের পতাকা ইওরোপের দিকে দিকে বহন করছে। ইওরোপে মুক্তিযোদ্ধা রূপে তারা নিজেদের ভাবত। গিবার্ত (Guibert) নামে রণবিজ্ঞানী এই তত্ত্ব প্রচার করেন যে, আদর্শে উদ্দীপিত নাগরিক সেনা সাধারণ বেতনভোগী সেনাদল অপেক্ষা অনেক বেশী কার্যকরী। দ্বিতীয়তঃ, নেপোলিয়ন সেনাদের রসদপত্র ও যুদ্ধের খরচা প্রধানতঃ অধিকৃত দেশ থেকেই আদায় করতেন। কাজেই তাঁকে স্বদেশ থেকে দীর্ঘ পথ পার হয়ে রসদ আনতে হত না। তাঁর বিপ্লবী প্রচারে প্রভাবিত হয়ে আক্রান্ত দেশের লোকেরাই তাঁকে রসদ যোগাত। তৃতীয়তঃ, তিনি এবং তাঁর অধীনস্থ সেনাপতিরা আক্রান্ত দেশের সাধারণ মানুষের প্রতি অত্যন্ত উদার ব্যবহার করতেন। নেপোলিয়ন তাঁর ভ্রাতাকে জার্মানীর শাসনভার গ্রহণের আগে নির্দেশ দেন যে, সাধারণ মানুষরাই ফরাসীদের মিত্র হতে পারে একথা ভুললে চলবে না। নেপোলিয়ন সামন্ত শাসক ও স্বৈরাচারী রাজাদের হাত থেকে তাদের মুক্তি দিতে এসেছেন এই ধারণা জনসাধারণের মনে ঢুকিয়ে দিতে হবে। কাজেই অন্ততঃ ১৮০৭ বা ১৮১০ খ্রীঃ পর্যন্ত নেপোলিয়ন তাঁর বিপ্লবী ভাবমূর্তিকে এমনভাবে ব্যবহার করেন যে, ইওরোপের জনগণ তাঁকে মুক্তিদাতা রূপে বরণ করে নেয়। ইওরোপের রাজশক্তিগুলি নিজ দেশের প্রজাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় আত্মরক্ষা করিতে পারেননি। চতুর্থতঃ, ইওরোপীয় রাজারা বেতনভোগী সেনার সাহায্যে নেপোলিয়নকে বাধা দেন। প্রজাদের স্বতঃস্ফূর্ত সহায়তা তাঁরা পাননি। দু-একটি যুদ্ধে তাঁদের বেতনভোগী সেনারা পরাস্ত হলে তাঁরা নতিস্বীকারে বাধ্য হন। তাঁরা নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে জাতীয় প্রতিরোধ গড়তে পারেননি। যতদিন নেপোলিয়নের বিপ্লবী ভাবমূর্তি বজায় ছিল ততদিন ইওরোপের রাজশক্তিগুলি বিফলতা বরণ করতে বাধ্য হয়।

গভীরভাবে দেখলে বোঝা যাবে যে, নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যে ইওরোপীয় শক্তিজোটগুলি গঠিত হয়, সেগুলি তেমন মজবুত ছিল না। এগুলি কেবলমাত্র ভঙ্গপ্রবণ ছিল না, পারস্পরিক অবিশ্বাস ও নিজ নিজ রাজ্য বিস্তারকে গুরুত্ব দানের ফলে, এই শক্তিজোটগুলি নেপোলিয়নকে ঠিকমত বাধা দিতে পারেনি। "ইওরোপীয় শক্তিজোটগুলির সংশোধনের অতীত স্থায়িত্বহীনতা এবং পারস্পরিক আস্থাহীনতাই নেপোলিয়নের কয়েকটি ঐতিহাসিক জয়ের জন্যে দায়ী ছিল"।[১]

নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে শক্তিজোট ভেঙে যাওয়ার ফলেই তিনি "one by one policy" বা একের পর এক নীতি নিয়ে শত্রুদের পরাস্ত করেন।

নেপোলিয়ন ইওরোপীয় রাজাদের পারস্পরিক অবিশ্বাস ও রাজ্য লিপ্সার পুরো সুযোগ নেন। শুধু অস্ত্রের দ্বারা তিনি সাম্রাজ্য স্থাপন করেননি। তিনি অস্ত্রের মতই তাঁর কূটনীতিকেও ব্যবহার করেন। তিনি কোন কংগ্রেস বা শক্তি সম্মেলনে যোগদানের চেষ্টা করেননি। তিনি ভেদনীতি দ্বারা ব্রিটেনকে অধিকাংশ সময় মিত্রহীন করেন।

১· David Thomson.

নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য কেবলমাত্র সামরিক বলের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। যদিও তৃতীয় কোয়ালিশনের বিরুদ্ধে তাঁর চমকপ্রদ সামরিক জয় তাঁর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে। কিন্তু তাঁর প্রচারযন্ত্র, তাঁর কূটনীতি এবং তাঁর বিপ্লবী ভাবমূর্তি তাঁর ক্ষমতা বিস্তারের পক্ষে সর্বাপেক্ষা সহকারী ছিল। তাঁর বিপ্লবী ভাবমূর্তির ফলে ১৮০৭ খ্রীঃ পর্যন্ত ইওরোপে তাঁর বিরুদ্ধে কোন জাতীয় প্রতিরোধ গড়ে উঠেনি। ডেভিড টমসনের মতে, "নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য ছিল বিদ্যুৎগতি আক্রমণ, কূটনৈতিক আগ্রাসন এবং কতকগুলি জরুরী সংস্কারের ক্ষণস্থায়ী ফল"।

নেপোলিয়নের এই সাম্রাজ্য স্থায়ী হতে পারেনি। এই সাম্রাজ্য ইওরোপে যা ধ্বংস করে সেগুলিই ছিল এই সাম্রাজ্যের স্থায়ী ফল। নেদারল্যান্ড, পশ্চিম জার্মানী এবং ইতালীতে নেপোলিয়ন সামন্ততন্ত্রকে ধ্বংস করে ফরাসী বিপ্লবের সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর এই কাজের সুফল এই সকল অঞ্চলের অধিবাসীরা ভোগ করে। নেপোলিয়ন সামন্ততন্ত্রকে ধ্বংস করেন এজন্য যে ইওরোপের প্রাচীন বংশের মতই, সামন্তশ্রেণী ছিল তাঁর জাতশত্রু। এই সামন্তদের ধ্বংস করে তিনি যে বুর্জোয়াকেন্দ্রিক সমাজ গড়েন, তা তাঁর নিজের আধিপত্যের ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। কাজেই বিপ্লবের এই সামন্ততন্ত্র বিরোধী আদর্শকে তিনি নিজ স্বার্থেই ব্যবহার করেন। তা সত্ত্বেও তাঁর এই সংস্কার পশ্চিম ইওরোপে মধ্যযুগের সামন্তশাসিত ঘুণ ধরা সমাজ ভেঙে এক নতুন প্রাণশক্তিতে উদ্দীপিত বুর্জোয়া সমাজের ভিত্তি স্থাপন করে। অর্থনৈতিক ঐতিহাসিক ট্রেবিলককের মতে, জার্মানীর শিল্প-বিপ্লবের ভিত্তিপট নেপোলিয়নই তাঁর অজ্ঞাতে রচনা করেন।

দ্বিতীয়তঃ, পশ্চিম জার্মানী, নেদারল্যান্ড ও ইতালীর কৃষকরা সামন্ত কর ও সামন্ত সেনার দায়িত্ব হতে মুক্ত হয়ে নতুন জীবন লাভ করে। নিজের জমি নিজে চাষ করা আত্মনির্ভর, স্বয়ং-সম্পূর্ণ কৃষক শ্রেণীর উদ্ভব এর ফলে সম্ভব হয়। এরাই গ্রামীণ সমাজের খুঁটিতে পরিণত হয়। বুর্জোয়া মধ্যবিত্ত ও কৃষকশ্রেণী এর পর থেকে এই রাষ্ট্রগুলির সক্রিয় নাগরিকে পরিণত হয়। তাদের মতামত উপেক্ষা করা সম্ভব হয়নি। এমন কি নেপোলিয়নের পতনের পর পুরাতনতন্ত্র কিছুকাল প্রতিষ্ঠিত হলেও ১৮৩০ খ্রীঃ জুলাই বিপ্লবে রাইন নদীর পশ্চিম পারের দেশগুলি পুরাতনতন্ত্রকে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে। এই অঞ্চলগুলিতে উদারতন্ত্র দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হয়। কাজেই নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যের অনাকাঙ্খিত, অপ্রত্যাশিত ফল ছিল পশ্চিম ইওরোপের সমাজ ব্যবস্থার দিক পরিবর্তন। ডেভিড টমসন এজন্য বলেছেন যে, "১৮১৫ খ্রীঃ নেপোলিয়নের পতনের পর যতই নিষ্ঠাভরে এবং ব্যাপকভাবে পুরাতনতন্ত্রের পুনঃ-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হোক না কেন, ইওরোপ আর কোনদিন বিপ্লবের আগের যুগে ফিরে যায়নি" (Europe could never be the same again, however earnest and extensive the attempts of 'restoration' after his fall)। রেড্ডাওয়ের মতে, "যেখানেই নেপোলিয়নের সেনাদল মার্চ করে যায়, সেখানে আগের অবস্থা আর ফিরতে পারেনি"।

ক্যাথলিক গীর্জার নৈতিক, ধর্মীয় ও আর্থিক আধিপত্য নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য বিস্তারের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। টাইদ ও অন্যান্য ধর্মীয় কর লোপ পায়। গীর্জার জমিও কৃষকরা অনেক স্থানে অধিকার করে নেয়। বিপ্লবের তরঙ্গে গীর্জার কুসংস্কার-মূলক শিক্ষাগুলি ভেসে যায়। পশ্চিম ইওরোপে যুক্তিবাদী হাওয়া বইতে থাকে। নবোদিত বুর্জোয়া সমাজ ছিল এই যুক্তিবাদের বাহক।

নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যে নতুন শাসনব্যবস্থা, কোড নেপোলিয়নপ্রবর্তন ও নতুন অর্থনীতি এক আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী গঠন করে। ফিশারের মতে, নেপোলিয়ন ছিলেন "বিপ্লবের অগ্নিময় তরবারি"। তিনি গিল্ড প্রথা ভেঙে দেন, বহু রাস্তাঘাট তৈরি করে বাণিজ্যপথ খুলে দেন। তিনি

আল্পস পর্বতের ওপর দিয়ে দুটি আলপাইন রাজপথ নির্মাণ করেন। সর্বত্র Career open to talent বা যোগ্যতাকেই স্বীকৃতি দেন। Code Napoleon-এর প্রভাবে রোমান আইনের ওপর নির্ভরশীল সামাজিক আইন বিধি ইওরোপ সাগ্রহে গ্রহণ করে। এই সঙ্গে সকল সন্তানের পিতার সম্পত্তিতে অধিকার দান, রেজেষ্ট্রি বিবাহ, পরিবার প্রথার গুরুত্বমূলক আইন দ্বারা তিনি ইওরোপীয় জীবনের আধুনিকীকরণ করেন। কৃষি ছাড়া শিল্প-বাণিজ্যকেও লোকে জীবিকা হিসেবে বেছে নেয়। ইওরোপীয় সমাজের এই আধুনিকীকরণ ছিল নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যের অবদান। নেপোলিয়ন পুরাতন মধ্যযুগীয় ইওরোপীয় সমাজের যে জরাজীর্ণ অংশ ভেঙে ফেলেন তা আর কোনদিন ফিরিয়ে আনা যায়নি।

জার্মানী ও ইতালীর পুনর্গঠণ ছিল নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ ফল। হতে পারে এই পুনর্গঠণের পশ্চাতে নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য রক্ষা ও আধিপত্য স্থাপনের অভিলাষ ছিল চরম লক্ষ্য। কিন্তু এই দুই দেশের পুরাতন রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও সামাজিক কাঠামো তিনি যে রূঢ় হাতে ভাঙেন তা পরিণামে এই দুই দেশের ইতিহাসকে নতুন গতিশীলতা দেয়। জার্মানীর ৩০০টি রাজ্য ভেঙে তিনি যে কনফেডারেশন অব রাইন গড়েন, তা নেপোলিয়নের পতনের পরেও স্থায়ী হয়। তিনি জার্মানীর জটিল রাজনৈতিক মানচিত্রের সরলীকরণ করেন। র‍্যাল্ফ ফ্লেনলের (Ralph Flenley) মতে, জার্মানীর জীবনধারা হতে বিচ্ছিন্নতাবাদ, সঙ্কীর্ণতা ও স্থানীয়তার অভিশাপকে তিনি মুছে দেন। জার্মানীতে কোড নেপোলিয়ন ও সামন্ত প্রথা ধ্বংসের কথা আগেই বলা হয়েছে। নেপোলিয়নের শাসনের পরোক্ষ ফল ছিল জার্মান জাতীয়তাবাদের জাগরণ। নেপোলিয়নের এটা অনভিপ্রেত হলেও, তাঁর সংস্কারগুলিই জার্মান জাতীয়তাবাদকে ধাত্রীর মতই স্তন্যদান করে। ইতালীর ক্ষেত্রেও একই ফল ফলে।

তথাপি নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য ছিল ক্ষণস্থায়ী, ভঙ্গুর। ডেভিড টমসনের মতে, "নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যের অন্তর্নিহিত, আত্মধ্বংসকারী স্ব-বিরোধ এই সাম্রাজ্যের পতনকে অনিবার্য করে" (Napoleon's Empire was doomed because of its inherent and self-defeating contradictions)। প্রথমতঃ, তিনি ব্রিটেনের সঙ্গে কোন সমঝোতায় না আসতে পারায়, তিনি বাধ্য হয়ে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে মহাদেশীয় অবরোধ জারি করেন। এই অবরোধ কার্যকরী করতে তাঁকে ইওরোপের নিরপেক্ষ দেশগুলিকে অধীনে আনতে হয়। এভাবে তিনি স্পেনের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। ইওরোপে তাঁর "মুক্তিদাতার ভাবমূর্তি" বিনষ্ট হয়। তিনি স্বৈরাচারী রূপে গণিত হন। তাঁর সম্পর্কে ইওরোপীয় জনগণের মোহ দূর হয়। যে বিপ্লবের ও মুক্তির যাদুকাঠির দ্বারা তিনি ইওরোপের জনগণকে আবিষ্ট করেন তা নষ্ট হয়ে যায়। তাঁকে এরপর সর্বত্র বলপ্রয়োগ দ্বারা আধিপত্য রাখতে হয়। এর ফলে তাঁর সামরিক ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা প্রকটিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, তাঁর সাম্রাজ্যের ভেতর ছিল এক প্রচণ্ড আদর্শগত স্ব-বিরোধ। যে নেপোলিয়ন ছিলেন মুক্তির দূত, যিনি ছিলেন ইওরোপের স্বৈরশাসন থেকে মুক্তিদাতা, তিনিই ছিলেন ইওরোপীয় জাতীয়তাবাদের শত্রু। তাঁর কাছ থেকেই ইওরোপের জাতিগুলি Liberty বা স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের শিক্ষা নেওয়ার পর দেখে যে নেপোলিয়ন তাদেরই পদানত করে সামরিক শাসন চালাচ্ছেন। এর ফলে তাঁর বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহ দেখা দেয়। নেপোলিয়নের ভ্রাতাগণ ছিলেন নেদারল্যান্ড, স্পেন প্রভৃতি দেশের শাসনকারী। এতে ইওরোপীয় জাতিগুলি অনুভব করে যে, স্বদেশীয় স্বৈরাচারী রাজার স্থলে তারা বিদেশী স্বৈরাচারীর কবলে পড়েছে। স্পেন, জার্মানীতে এজন্য তাঁর বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী প্রতিরোধ দেখা দেয়। ডেভিড টমসনের ভাষায়, "নেপোলিয়নের জাতীয়তাবাদী ও বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রবাদী নীতি ছিল স্ববিরোধী এবং আত্মহননকারী" (The Empire was self-defeating too, in the inner contradictions between Napoleon's

dynastic and nationalistic policies)। তৃতীয়তঃ, খোদ ফ্রান্সেই নেপোলিয়নের শাসন যুদ্ধের প্রয়োজনে তার প্রাথমিক উদারতা ও জনহিতৈষণা ত্যাগ করে একটি পুরাদস্তুর পুলিশী স্বৈরশাসনে পরিণত হয়। ফ্রান্সের বাইরে যুদ্ধের প্রয়োজনে এই শাসন ছিল অধিকতর কঠোর, নিষ্ঠুর। যুদ্ধের ও সাম্রাজ্যের স্বার্থে নেপোলিয়ন তাঁর বিদেশী প্রজাদের কাছে যে আত্মত্যাগ ও দুঃখকরণ দাবী করেন, তা তাঁর বৈপ্লবিক ভাবমূর্তিকে কলুষিত করে। তিনি তাঁর যুদ্ধের জন্যে সেনাদলে যোগ দিতে বেলজিয়াম ও ইতালী বাসীদের বাধ্য করেন। স্বাধীনতা হারাবার সঙ্গে সঙ্গে উপরি হিসেবে তাদের রক্ত শুল্ক দিতে বাধ্য করা হয়। ১৮১০ খ্রীঃ একটি ডিক্রী দ্বারা ফ্রান্স ও সাম্রাজ্যের সর্বত্র যে কোন নাগরিককে কাউন্সিল অব ষ্টেটের নির্দেশে বিনা বিচারে আটক করার ব্যবস্থা হয়। সুতরাং নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যের এই স্ব-বিরোধিতাই তাঁর সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করে দেয়।

সকল কথা বলার পরেও পুনরায় বলা দরকার যে, নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য ইওরোপে পুনর্জীবন ঘটায়। সি· ডি· হ্যাজেনের মতে, "ঝড়ে যেমন চালের টালি উড়ে যায়, নেপোলিয়নীয় ঝড়ে তেমনি ইওরোপের বহু পুরাতনতন্ত্রের ব্যবস্থা উড়ে যায়।" ডেভিড টমসনের মতে, "যদি ফরাসী বিপ্লবের প্রভাবে ইওরোপ একটি দ্রবণ বা জিনিসপত্র গলিয়ে ফেলার ফুটন্ত পাত্রে নিক্ষিপ্ত হয়, তবে নেপোলিযন সেই গলিত ফুটন্ত পদার্থকে নাড়া দিয়ে তার গাদ বা বর্জ পদার্থকে ছেঁকে ফেলেন। এর ফলে ইওরোপকে তিনি যে আকৃতি দেন তা আর কখনও হারিয়ে যায়নি" (If the French Revolution had thrown Europe into the melting pot, Napoleon stirred it about, making sure that much of the drops was removed and giving it a shape it was never to lose.)।[১]

নেপোলিয়নের সঙ্গে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের সম্পর্ক (The Relations of Napoleon with the European powers) ঃ নেপোলিয়ন যে সময় (১৭৯৯ খ্রীঃ) ডাইরেক্টরীর হাত থেকে রাজ্য শাসনের ভার গ্রহণ করেন সেই সময় দ্বিতীয় শক্তিসঙ্ঘের সঙ্গে ফ্রান্সের যুদ্ধ চলছিল। তিনি কূটনীতি দ্বারা রাশিয়াকে দ্বিতীয় শক্তিসঙ্ঘ থেকে বিচ্ছিন্ন করেন। এর ফলে যুদ্ধ চালাবার দায়িত্ব শক্তিসঙ্ঘের অবশিষ্ট সদস্য অষ্ট্রিয়া, ইংলন্ড ও প্রাশিয়ার ওপর বর্তায়। সমুদ্রপথে ইংলন্ডের সঙ্গে ফ্রান্সের যুদ্ধাবস্থা চলতে থাকে।

দ্বিতীয় শক্তিসঙ্ঘ

১৮০০ খ্রীঃ আল্পস পর্বত অতিক্রম করে উত্তর ইতালীর ম্যারেঙ্গো (Marengo) নামক স্থানে নেপোলিয়ন অষ্ট্রিয় বাহিনীকে অতর্কিত আক্রমণে পরাস্ত করেন। তিনি অষ্ট্রিয় সেনাদের পিছু নিয়ে দক্ষিণ জার্মানীর হোহেনলিন্ডনে তাদের পুনরায় পরাস্ত করলে ভিয়েনা অরক্ষিত হয়। পরাজিত অষ্ট্রিয়া ১৮০১ খ্রীঃ লুনভিলের সন্ধি (Treaty of Lunevilles) স্বাক্ষর করে। এই সন্ধির দ্বারা ক্যাম্পো ফোর্মিও সন্ধির শর্তগুলি পুনরায় স্বীকৃত হয়। ফ্রান্সের প্রতিবেশী অঞ্চলে ফ্রান্স কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রজাতন্ত্রগুলিকেও অষ্ট্রিয়া স্বীকার করে। এই সন্ধি ইংলন্ডের পক্ষে মেনে নেওয়া অসম্ভব ছিল। কারণ ইংলন্ডে ফ্রান্সের একক প্রাধান্য স্থাপনকে তার শক্তিসাম্য নীতির বিরোধী মনে করত। তাছাড়া নেদারল্যান্ডে ফরাসী আধিপত্য ইংলন্ডের নিজের নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক ছিল। ইংলন্ড একাকী ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালায়। ইংলন্ড বুঝতে পারে যে, স্থলযুদ্ধে তার পক্ষে এককভাবে ফ্রান্সকে পরাস্ত করা সম্ভব নয়। দীর্ঘ যুদ্ধে ইংলন্ড ক্রমে অবসন্ন হয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে ইংলন্ডের সুযোগ্য মন্ত্রী উইলিয়াম পিট ইংলন্ডের রাজার সঙ্গে মতভেদের জন্যে পদত্যাগ করলে ইংলন্ডের যুদ্ধ পরিচালনা ব্যাহত হয়। ইংলন্ডের নৌ নীতি ১৮০০ খ্রীঃ ঘোষিত হয়। এই নীতির ফলে নিরপেক্ষ দেশের জাহাজগুলিকে শত্রুদেশ

অষ্ট্রিযাব সঙ্গে যুদ্ধ
লুনভিলেব সন্ধি ঃ
ইংলন্ডের সঙ্গে
এ্যামিয়েন্সেব সন্ধি

১· David Thomson

অর্থাৎ ফ্রান্সের মালপত্র বহনে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়। শত্রুদেশের মাল আছে কিনা তা পরীক্ষার জন্যে ইংলন্ডের যুদ্ধ জাহাজগুলিকে তল্লাসীর অধিকার দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র আন্তর্জাতিক প্রতিবাদ দেখা দেয়। এই অবস্থায় ইংলন্ড ১৮০২ খ্রীঃ এ্যামিয়েন্সের সন্ধি (Treaty of Amiens) দ্বারা ফ্রান্সের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করে। ফ্রান্স এই সন্ধির ফলে মিশর, পর্তুগাল ও দক্ষিণ ইতালি থেকে সৈন্য সরিয়ে নেয়।

এ্যামিয়েন্সের সন্ধি মাত্র এক বছর স্থায়ী হয়। এজন্য বলা হয় যে এ্যামিয়েন্সের সন্ধিকে সন্ধি না বলে Truce বা যুদ্ধ বিরতি বলা উচিত। ১৮০৩ খ্রীঃ এই সন্ধি ভেঙে গেলে নেপোলিয়নের সঙ্গে ইংলন্ডের পুনরায় যুদ্ধ-বিগ্রহ আরম্ভ হয়। ইতিমধ্যে পিট পুনরায় ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রীত্ব নেন। এ্যামিয়েন্সের সন্ধি ভাঙার জন্যে কয়েকটি প্রত্যক্ষ ঘটনা দায়ী ছিল। (১) নেপোলিয়ন পিডমন্ট, জেনোয়া এবং সুইজারল্যান্ডের ওপর ফরাসী আধিপত্য বিস্তার করায় ইংলন্ড বিরক্ত হয়। (২) ইংলন্ড এর প্রতিবাদে মাল্টা ছেড়ে দিতে রাজী হয়নি। (৩) ইংলন্ডের নৌবহর ফরাসী বাণিজ্য জাহাজগুলিকে আক্রমণ করলে, ফ্রান্স প্রতিশোধের জন্যে ফ্রান্সে ইংরাজ ভ্রমণকারীদের বন্দী করে। (৪) ইংলন্ডের সংবাদপত্রগুলিতে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে প্রচার চালান হলে তিনি ক্রুদ্ধ হন। উপরোক্ত কারণগুলি বস্তুতপক্ষে তেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। আসলে ইংলন্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে আদর্শগত, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিরোধ এত প্রবল ছিল যে, এই দুই রাষ্ট্রের মধ্যে সংঘাত অনিবার্য ছিল। তাছাড়া নেপোলিয়নের মত উচ্চাকাঙ্ক্ষী সেনাপতির পক্ষে এই সন্ধি দীর্ঘ দিন মেনে চলা সম্ভব ছিল না। কারণ নেপোলিয়নের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল ইওরোপে তাঁর আধিপত্য স্থাপন। ফলে এ্যামিয়েন্সের সন্ধি ভেঙে যায়।

এ্যামিয়েন্সের সন্ধি ভঙ্গ ঃ ইংলন্ডের সহিত পুনরায় যুদ্ধ

নেপোলিয়ন ইংলন্ড আক্রমণের জন্যে তোড়জোড় করেন। স্পেনের নৌবহরের সহায়তায় তিনি ইংলিশ চ্যানেল পার হওয়ার সঙ্কল্প করেন।তিনি ইংলিশ চ্যানেল ও উত্তর সমুদ্রের তীরে এজন্য ২ লক্ষ ১০ হাজার সেনা সমাবেশ করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এই বাহিনীকে চ্যানেল পার করে ইংলন্ডের উপকূলে নামিয়ে দেওয়া। যেহেতু স্থলযুদ্ধে তখনও পর্যন্ত ফরাসী বাহিনী ছিল অপরাজেয় সেজন্য নেপোলিয়নের আশা ছিল যে, একবার ইংলন্ডের উপকূলে নামতে পারলে তিনি তাঁর প্রাচীন ও নাছোড়বান্দা শত্রু ইংলন্ডের হাড়গোড় চূর্ণ করবেন। ইংলন্ডের এই বিপদের সময় মন্ত্রী পিট শক্ত হাতে হাল ধরেন। তিনি বুঝতে পারেন যে, ইওরোপ মহাদেশের সীমান্তে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে বড় রকম স্থলযুদ্ধ আরম্ভ করলে, ফ্রান্স, ইংলন্ড থেকে তার দৃষ্টি সরিয়ে ইওরোপের যুদ্ধে তা দিতে বাধ্য হবে। এমতাবস্থায় ফ্রান্সকে বিব্রত করার জন্যে তিনি অষ্ট্রিয়া, রাশিয়া, সুইডেন, নেপলস ও ইংলন্ডের জোট গড়েন। এই জোটের নাম ছিল তৃতীয় শক্তিজোট (১৮০৫ খ্রীঃ)। এই জোট পেছন থেকে ফ্রান্সকে আঘাত হানার চেষ্টা করে।

তৃতীয় শক্তিসঙ্ঘ

তৃতীয় শক্তিজোট ভাঙার জন্যে নেপোলিয়ন বিদ্যুৎগতিতে অষ্ট্রিয়াকে আক্রমণ করে উল্মের (Battle of Ulm) যুদ্ধে পরাস্ত করেন। এই পরাজয়ের ফলে ৫০ হাজার অষ্ট্রিয় সেনা নেপোলিয়নের হাতে বন্দী হয়। তিনি অষ্ট্রিয়ার রাজধানী অরক্ষিত ভিয়েনা নগরী অধিকার করেন। এর পর অষ্টারলিজের (Austerlitz) মহাযুদ্ধে তিনি অষ্ট্রিয় ও রুশীয় যুগ্ম বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পর্যুদস্ত করলে ইওরোপ স্তম্ভিত হয়। অষ্টারলিজের বিজয় ছিল নেপোলিয়নের রণ-পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক।

অষ্টারলিজের যুদ্ধ ঃ অষ্ট্রিয়ার যুদ্ধ ত্যাগ

ইংলন্ড অবশ্য তার আত্মরক্ষার জন্যে নৌ যুদ্ধে ফরাসী নৌ-বহর ধ্বংসের চেষ্টা চালায়। সুযোগ এক সময় ইংলন্ডের হাতে এসে যায়। অষ্টারলিজের যুদ্ধের অল্পকাল আগে ইংরাজ সেনাপতি নেলসন ট্রাফালগারের নৌযুদ্ধে ১৮০৫ খ্রীঃ ফরাসী

নৌ-বহরকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করেন। ট্রাফালগারের নৌযুদ্ধে নেপোলিয়নীয় ও স্প্যানিশ নৌ-বহরের ধ্বংস গোটা যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। এরপর নেপোলিয়নের পক্ষে আর কোনভাবে ইংলন্ড আক্রমণ করা সম্ভব ছিল না। ট্রাফালগারের যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে নেপোলিয়নের ইংলন্ড আক্রমণের পরিকল্পনা বিনষ্ট হয়। ট্রাফালগারের পরাজয়কে নেপোলিয়নের পতনের প্রথম ধাপ বলা হয়। ইংলিশ চ্যানেল ও সমুদ্রপথের ওপর নেপোলিয়ন চিরদিনের মত তাঁর নিয়ন্ত্রণ হারান। ইংলন্ড আসন্ন আক্রমণ থেকে রক্ষা পেয়ে পাল্টা ইওরোপীয় জোট গড়ে স্থলযুদ্ধের দ্বারা নেপোলিয়নের স্থল শক্তিকে ধ্বংসের চেষ্টা করে। নেপোলিয়ন যে মহাদেশীয় অবরোধ চালু করেন তা নৌ-বহরের অভাবে সফল হয়নি। মোট কথা, এতদিন নেপোলিয়নই যুদ্ধের গতি নিয়ন্ত্রণ করতেন। এখন থেকে যুদ্ধের গতির ওপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ হ্রাস পায়। তখনও পর্যন্ত তাঁর স্থল শক্তি ছিল বিশাল। কিন্তু তিনি একের পর এক ভুল সিদ্ধান্ত নিতে থাকেন। এর দাম তাঁকে দিতে হয়।

ট্রাফালগারের নৌযুদ্ধ : ইংলন্ডের জয়লাভের গুরুত্ব

যাহা হোক, অষ্টারলিজের যুদ্ধে নেপোলিয়নের চমকপ্রদ সাফল্যের ফলে নেপোলিয়ন স্থলভাগে অপরাজেয় থাকেন। অষ্ট্রিয়া পরাজিত হয়ে তৃতীয় শক্তিজোট ত্যাগ করে। অষ্ট্রিয়া নেপোলিয়নের সঙ্গে প্রেসবার্গের সন্ধি (Treaty of Presburg, 1805) স্বাক্ষর করে। এই সন্ধির দ্বারা অষ্ট্রিয়া ইতালীর ভেনেসিয়া অঞ্চল ফ্রান্সকে, টাইরল নামক স্থান ব্যাভেরিয়াকে, পশ্চিম জার্মানীর একাংশ উর্টেমবার্গকে ছেড়ে দেয়। প্রেসবার্গের সন্ধির ফলে অষ্ট্রিয়া একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর শক্তিতে পরিণত হয়। কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন যে, নেপোলিয়ন অষ্ট্রিয়ার ওপর প্রেসবার্গের কঠোর শর্ত স্থাপন করে অদূরদর্শিতার পরিচয় দেন। নেপোলিয়নের মন্ত্রী ট্যালির‍্যান্ড, নেপোলিয়নকে উদার শর্তমূলক সন্ধির দ্বারা অষ্ট্রিয়ার মিত্রতা লাভের পরামর্শ দেন। কিন্তু নেপোলিয়ন এই পরামর্শে কর্ণপাত না করে ভুল করেন। অষ্ট্রিয়ার ওপর এই অপমানজনক সন্ধি স্থাপন অষ্ট্রিয়া ক্ষমা করেনি।

প্রেসবার্গের সন্ধি : অষ্ট্রিযাব শক্তিসঙ্ঘ ত্যাগ

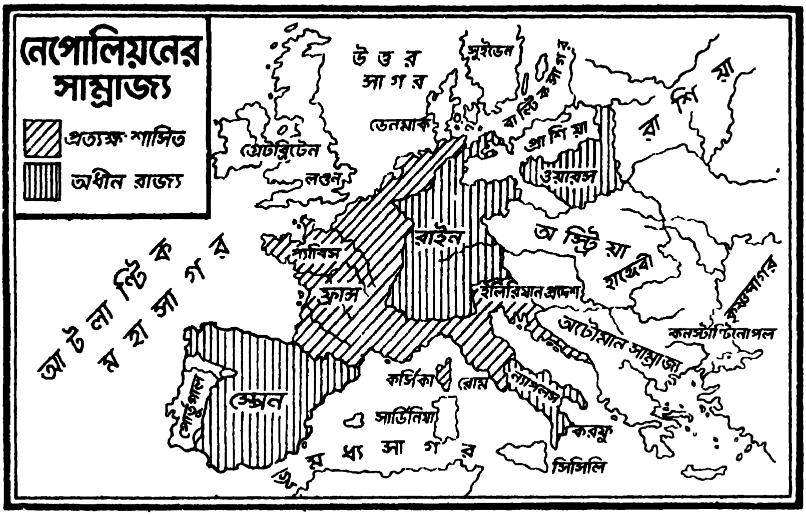
প্রেসবার্গের সন্ধির ফলে জার্মানিতে নেপোলিয়নের প্রভাব বৃদ্ধি পেলে প্রাশিয়া আতঙ্কিত হয়। প্রাশিয়া রাজ তৃতীয় ফ্রেডারিক উইলিয়ামের রানী লুইসা তাঁর স্বামীকে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে উৎসাহ দেন। ফ্রেডারিক দি গ্রেটের আমলে গঠিত প্রাশিয়ার বাহিনী অজেয় ছিল বলে সকলে ধারণা করত। কিন্তু জেনার যুদ্ধে নেপোলিয়নের রণকৌশলে প্রাশিয় বাহিনী বিধ্বস্ত হয়। প্রাশিয়ার রাজধানী বার্লিন নগরী নেপোলিয়নের অধিকারে আসে। পরাজিত প্রাশিয়া শনব্রনের সন্ধি (Schonbron) দ্বারা যুদ্ধ ত্যাগ করে। প্রাশিয়ার পরাজয়ের পর নেপোলিয়ন তৃতীয় শক্তি জোটের অবশিষ্ট সদস্য রাশিয়ার দিকে নজর দেন। ১৮০৭ খ্রীঃ ফ্রীডল্যান্ডের যুদ্ধে রাশিয়া ফরাসী বাহিনীর নিকট পরাস্ত হয়ে টিলজিটের সন্ধি স্বাক্ষর করে। একমাত্র ইংলন্ড ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাতে থাকে। তৃতীয় শক্তিজোট ভেঙে যায়।

জেনাব যুদ্ধ : প্রাশিযাব যুদ্ধ ত্যাগ

টিলজিটের সন্ধির দ্বারা নেপোলিয়ন তাঁর সামরিক গৌরবের স্বর্ণ শিখরে আরোহণ করেন। টিলজিটের সন্ধি (Treaty of Tilsit) ১৮০৭ খ্রীঃ দ্বারা (১) নেপোলিয়ন ইওরোপে যে সকল রাজনৈতিক সংগঠন স্থাপন করেন, রাশিয়ার জার তা মেনে নেন। (ক) জার্মানির পূর্বপ্রান্তে ওয়ারস রাজ্য নামে এক তাঁবেদার রাজ্য; (খ) পশ্চিম প্রান্তে ওয়েষ্টফেলিয়া রাজ্য নামে অপর এক তাঁবেদার রাজ্য; (গ) রাইন নদীর পশ্চিমদিকে জার্মান রাজ্যের ফ্রান্সের অন্তর্ভুক্তি; (ঘ) জার্মানীর ৩০০টি রাজ্য ভেঙে ৩৯টি রাজ্য গঠন; (ঙ) জার্মানীর দুই শক্তি অষ্ট্রিয়া ও

টিলজিটের সন্ধি ১৮০৭ : টিলজিটের সন্ধির গুরুত্ব

প্রাশিয়ার অবনতিকরণ, (চ) পরাজিত শক্তির কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় প্রভৃতি শর্ত জার মেনে নেন। জার্মানীর এই রাজনৈতিক পরিবর্তন ফ্রান্সকে ইওরোপে এক ভয়ানক শক্তিধর রাষ্ট্রে পরিণত করে। রাশিয়া, অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া অবনতশিরে এই পরিবর্তন মেনে নেয়। এছাড়া ইতালী, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশের ওপরে নেপোলিয়নের আধিপত্য জার স্বীকার করেন। (২) ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে আত্মরক্ষামূলক মিত্রতা স্থাপিত হয়। (৩) রাশিয়ার সঙ্গে তুরস্কের দ্বন্দ্বে নেপোলিয়ন জারের পক্ষ নিতে রাজী হন। (৪) ইংলন্ডের সঙ্গে ফ্রান্সের দ্বন্দ্বে জার মধ্যস্থতায় রাজী হন। (৫) ইংলন্ড এই মধ্যস্থতার শর্ত অগ্রাহ্য করলে ইংলন্ডকে শাস্তি দিতে রুশ



বন্দরগুলিতে ব্রিটিশ বাণিজ্য রদ করতে জার অঙ্গীকার করেন। জার আরও অঙ্গীকার করেন যে, ইংলন্ড তাঁর মধ্যস্থতা অগ্রাহ্য করলে তিনি তাঁর মিত্র সুইডেন, ডেনমার্ক ও পর্তুগালকে ইংলন্ডের বিরুদ্ধে অবরোধ ঘোষণায় যোগ দিতে বাধ্য করবেন। টিলজিটের সন্ধির দ্বারা নেপোলিয়নের গৌরব সর্বোচ্চ সীমায় উপনীত হয়। নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে তৃতীয় শক্তিজোট ধ্বংস হয়। ইতালী, জার্মানি ও মধ্য ইওরোপ নেপোলিয়নের পদানত হয়। রাশিয়া নেপোলিয়নের বশম্বদ মিত্রে পরিণত হয়। অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া নেপোলিয়নের হাতে পরাস্ত হয়ে আহত সর্পের ন্যায় গর্জাতে থাকে। পশ্চিমে ফ্রান্স হতে পূর্বে পোল্যান্ড এবং উত্তরে বাল্টিক সমুদ্র হতে দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত ভূভাগে নেপোলিয়নের নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত হয়। কেবলমাত্র ইংলন্ড তখনও নেপোলিয়নকে অগ্রাহ্য করতে সক্ষম থাকে। টিলজিটের সন্ধি স্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। এই সন্ধির দ্বারা রাশিয়ার জার লাভবান হননি। তিনি শীঘ্রই একথা উপলব্ধি করেন। ইংলন্ডের প্ররোচনায় তিনি এই সন্ধি অগ্রাহ্য করেন। টিলজিটের সন্ধি স্বাক্ষরের পর নেপোলিয়নের আত্মপ্রত্যয় অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। তিনি তাঁর সতর্কতামূলক নীতি ত্যাগ করে পেনিনসুলার যুদ্ধ ও রুশ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। পরিণামে তাঁর পতন ঘটে। রাইকারের মতে, "টিলজিটের সন্ধি একদিক থেকে নেপোলিয়নের সৌভাগ্যের অবসান সূচনা করে।"[১]

১· "Tilsit was in a sense, the turning point of his fortunes". Riker—Short History of Europe.

টিলজিটের সন্ধির পর নেপোলিয়ন প্রাশিয়ার সঙ্গে একটি সন্ধি স্থাপন করেন। এই সন্ধির দ্বারা—(১) এলব নদীর পশ্চিম তীরের ভূভাগ নেপোলিয়নকে ছেড়ে দেওয়া হয়। নেপোলিয়ন এই স্থান নিয়ে ওয়েষ্টফেলিয়া রাজ্য গঠন করেন। (২) পোল্যাণ্ডের যে অংশ প্রাশিয়ার অধিকারে ছিল তা নবগঠিত জার্মানীকে ছেড়ে দেওয়া হয়। (৩) রাশিয়া পোল্যাণ্ডের কিছু অংশ লাভ করে। (৪) প্রাশিয়া তার পরাজয়ের ফলে এক বিরাট অঙ্কের ক্ষতিপূরণ, ফ্রান্সকে দিতে অঙ্গীকার করে। (৫) প্রাশিয়ার সৈন্যসংখ্যা হ্রাস করা হয় এবং প্রাশিয়ার বন্দরগুলিতে ইংরাজের বাণিজ্য রদ করা হয়। মোট কথা, এই সন্ধির ফলে প্রাশিয়ার সীমানা অর্ধেক হয়ে যায়।

প্রাশিয়াব সহিত সন্ধি

জার্মানী ও ইতালীতে নেপোলিয়নের পুনর্গঠন নীতি (Napoleon's reorganisation of Germany and Italy): নেপোলিয়ন কেবলমাত্র রণপণ্ডিত ছিলেন না; বিজিত অঞ্চলকে সংগঠিত ও সুশাসিত করার গঠনমূলক প্রতিভা তাঁর ছিল। তিনি "বিপ্লবের অগ্নিময় তরবারির" ন্যায় ইওরোপের বিভিন্ন দেশে রাজতন্ত্র, সামন্ত শক্তিগুলিকে ধ্বংস করে নতুন সমাজ ব্যবস্থার পত্তন করেন। এই নতুন সমাজ ব্যবস্থার মূল কথা ছিল Third Estate বা সাধারণ শ্রেণীর সমান অধিকার লাভ। তাঁর কামানের নল আদর্শবাদ উদ্গীরণ করে। এই আঘাত পুরাতনতন্ত্রের ভিত্তিকে ঝাঁঝরা করে দেয়। নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও, তিনি যে নতুন ব্যবস্থার পত্তন করেন তা লোকের মনে স্থায়ী আসন পায়।

নেপোলিয়ন কর্তৃক ইওবোপে ফরাসী বিপ্লবের আদর্শ প্রচাব

নেপোলিয়ন অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়াকে বিভিন্ন যুদ্ধে পরাস্ত করে ব্যসলের সন্ধি, ১৭৯৫ খ্রীঃ; ক্যাম্পোফের্মিওর সন্ধি, ১৭৯৭ খ্রীঃ এবং লুনভিলের সন্ধি, ১৮০১ খ্রীঃ স্থাপন করেন। এই সন্ধিগুলির দ্বারা নেপোলিয়ন যে ভৌমিক অধিকার লাভ করেন, তার দ্বারা তিনি জার্মানীকে পুনর্গঠন করেন। রাষ্ট্র সংগঠক হিসেবে নেপোলিয়ন জার্মানীতে তাঁর প্রতিভার পরিচয় দেন। অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া ছিল জার্মানীর প্রবল শক্তি। জার্মানীকে পুনর্গঠন করার সময় এই দুই শক্তির প্রাধান্য নাশ করার তিনি ব্যবস্থা করেন।[১] এছাড়া নেপোলিয়ন জার্মানীর সংগঠনে "ক্লায়েন্টেল নীতি" বা "স্যাটেলাইট নীতি" (Clientele or Satellite policy) অনুসরণ করেন।[২] এই নীতি অনুসারে জার্মানীকে এমনভাবে পুনর্গঠন করা হয় যাতে নবগঠিত রাজ্যগুলি ফ্রান্সের উপগ্রহ বা আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হয়।

জার্মানীর পুনর্গঠন: তাঁহার রাষ্ট্রগঠন নীতি

কেহ কেহ মনে করেন যে, নেপোলিয়ন জার্মানী ও ইতালীর পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে এই সকল দেশের জাতীয় ঐক্য স্থাপনের নীতিকে গ্রহণ করেন।[৩] তিনি ৩০০টি রাজ্যে বিভক্ত জার্মানীকে (মতান্তরে ২৫০) ৩৯টি রাজ্যে পরিণত করেন। জার্মানীর জটিল মানচিত্রের তিনি সরলীকরণ করেন। নেপোলিয়ন ন্যাশন্যালিটি (Nationality) বা জাতীয়তাবাদকে জার্মানীর সংগঠনে গ্রহণ করেন একথা মনে করা ভুল। তাঁর আসল লক্ষ্য ছিল জার্মানীকে ফ্রান্সের তাঁবেদার রাষ্ট্রে (client state) পরিণত করা। তাঁর সংগঠনের পরোক্ষ ফল হিসেবে জার্মানী এবং ইতালীতে জাতীয়তাবাদ জাগ্রত হয়। ঐতিহাসিক ফিশার বলেছেন যে, "নেপোলিয়ন

জার্মানীর পুনর্গঠনে জাতীয়তাবাদের প্রভাব কি ছিল?

১· New Cambridge Modern History. Vol. VIII.
২· Fisher—Bonapartism.
৩· V. Cronin—Napoleon.

জার্মান জাতিকে জাতীয়তাবাদ শিক্ষা দেন, এটি একটি পরস্পর-বিরোধী মতামত। এই রাজ্যগুলির স্বাধীনতা বা স্বায়ত্বশাসন লাভ নেপোলিয়নের কাম্য ছিল না।"[১]

জার্মানীতে নেপোলিয়নের সংগঠন সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় ছিল। ক্যাম্পোফোর্মিও ও লুনভিলের সন্ধির শর্ত অনুযায়ী নেপোলিয়ন রাইন নদীর পশ্চিম তীর পর্যন্ত জার্মানীর ভূভাগ ফ্রান্সের অন্তর্ভুক্ত করেন। (১) নেপোলিয়ন স্থির করেন যে, এই অঞ্চলে যে সকল বিশপের রাজ্য ছিল তাঁর জন্যে ভৌমিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে না। একমাত্র বংশানুক্রমিক রাজাদেরই এই ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। (২) অবশিষ্ট জার্মানীতে অর্থাৎ রাইনের পূর্বতীরে যে সকল বিশপের রাজ্য অথবা স্বায়ত্বশাসিত শহর আছে সেগুলিকে লোপ করে সেই ভূমি দ্বারা বংশানুক্রমিক রাজাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। এই ব্যবস্থার ফলে ১১২টি বিশপের রাজ্য ও স্বাধীন শহর লোপ পায়। এই ভূমিতে রাইনের পশ্চিম তীর থেকে উৎখাত-প্রাপ্ত রাজাদের পুনর্বাসন করা হয়। এই ভাঙা গড়ার ফলে ৩০০টি রাজ্যে বিভক্ত জার্মানী ৩৯টি রাজ্যে পরিণত হয়। (৩) এই রাজ্য গঠন করার সময় নেপোলিয়ন ব্যাভেরিয়া, ব্যাডেন, উটেমবার্গ রাজ্যগুলির সীমানা এমনভাবে গঠন করেন যে, তাঁরা ফরাসী সরকারের আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হয়। (৪) জার্মানীর ব্যাভেরিয়া, ব্যাডেন, উটেমবার্গ, স্যাক্সনি এবং আরও ২৮টি ক্ষুদ্র রাজ্যের দ্বারা নেপোলিয়ন কনফেডারেশন অব দি রাইন (Confederation of the Rhine) নামে এক রাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠন করেন। এই সংগঠনের ফলে জার্মানী থেকে অষ্ট্রিয়ার প্রভাব লোপ পায়। কনফেডারেশন অব রাইন ফ্রান্স ও অষ্ট্রিয়ার মধ্যে ফ্রান্সের আশ্রিত বাফার রূপে কাজ করে।

জার্মানীর পুনর্গঠন কনফেডারেশন অব দি রাইন স্থাপন

অতঃপর নেপোলিয়ন জার্মানী থেকে প্রাশিয়ার প্রভাব দূর করার কাজে হাত দেন। তিনি পোল্যান্ডের কিয়দংশ এবং পশ্চিম প্রাশিয়া নিয়ে কিংডম অব ওয়েস্টফেলিয়া (Kingdom of West Phalia) এবং গ্র্যান্ড ডাচি অফ ওয়ারস (Grand Duchy of Warsaw) নামে দুটি রাজ্য গঠন করেন। প্রথমটির শাসক হিসেবে তিনি তাঁর ভ্রাতা জেরোমকে স্থাপন করেন এবং শেষের রাজ্যটি স্যাক্সনির রাজার অধীনে রাখেন। এর ফলে উত্তর জার্মানীতে প্রাশিয়ার প্রভাব বিনষ্ট হয়।

ওয়েস্টফেলিয়া ও ওয়ারস রাজ্য গঠন

মোট কথা, জার্মানী তিনটি ফরাসী প্রোটেকটোরেটে পরিণত হয়। যথা—(ক) কনফেডারেশন অব রাইন; (খ) কিংডম অব ওয়েস্টফেলিয়া; (গ) কিংডম অব ওয়ারস। জার্মানীতে নেপোলিয়ন তাঁর বিখ্যাত সংস্কারগুলি প্রবর্তন করেন। পশ্চিম জার্মানীতে নেপোলিয়ন সামন্তপ্রথা ধ্বংস করেন। সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কোড নেপোলিয়ন চালু করা হয়। তিনি তাঁর ভ্রাতা জেরোম ও অন্যান্য শাসকদের নির্দেশ দেন যে, তাঁরা যেন সর্বত্র তৃতীয় শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করে। কারণ এরাই ছিল একমাত্র তাঁর শাসন ব্যবস্থার অনুরাগী। নেপোলিয়ন জার্মানিতে বহু রাস্তাঘাট তৈরি করেন। ফলে জার্মানীতে শিল্পের সূচনা হয়। একটি আলোকপ্রাপ্ত বুর্জোয়া শ্রেণী নতুন জার্মানীর নতুন শাসক শ্রেণীতে পরিণত হয়।

নেপোলিয়ন ইতালীকেও পুনর্গঠন করেন। ক্যাম্পোফোর্মিও ও প্রেসবর্গের সন্ধির দ্বারা তিনি ইতালীতে অষ্ট্রিয়ার যে রাজ্য ছিল তা অধিকার করেন। (ক) তিনি এই অধিকৃত অঞ্চলগুলিকে ফরাসী আশ্রিত রাজ্যে পরিণত করেন। নেপোলিয়ন স্বয়ং King of Italy বা ইতালীর রাজা উপাধি গ্রহণ করেন। (খ) তাঁর সৎপুত্র

ইতালীর পুনর্গঠন

১· "It is a wild paradox to assert that Napoleon had any intention of education a German nation..... That these states should develop in independent as liberal life was the last thing that Napoleon intended". Fisher—Bonapartism.

ইউজিনকে তিনি উত্তর ইতালীর শাসনকর্তা হিসেবে নিয়োগ করেন। (গ) উত্তর ইতালীর টাস্কানী, পিডমন্ট ও জেনোয়াকে ফ্রান্সের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে রাখা হয়। (ঘ) পোপকে বন্দী করা হয়। রোম নগরীকে ফ্রান্সের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। এর ফলে ইতালীর ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী রোম পর্যন্ত এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল ফ্রান্সের প্রত্যক্ষ শাসনে চলে আসে। উত্তর ইতালীর অবশিষ্ট অংশে তাঁর সৎপুত্র ইউজিন রাজত্ব করতে থাকেন। (ঙ) ইতালীর দক্ষিণ ভাগে অর্থাৎ নেপলস থেকে তিনি বুরবোঁ রাজবংশের শাখা বংশীয় রাজা চতুর্থ ফির্দ্দিনান্দকে বিতাড়িত করে নিজ ভ্রাতা জোসেফকে দক্ষিণ ইতালীর রাজা হিসেবে স্থাপন করেন। পরে জোসেফ স্পেনের রাজা হিসেবে নিযুক্ত হলে নেপোলিয়ন তাঁর সেনাপতি মুরাবকে দক্ষিণ ইতালীর রাজা হিসেবে বসিয়ে দেন। জার্মানীর মতই ইতালীতে তিনি বহু রাস্তাঘাট তৈরি করেন। কোড নেপোলিয়ন সহ বহু সংস্কার চালু করা হয়। নেপোলিয়নের এই সংস্কারের ফলে ইতালীতে আধুনিক জীবনধারার সূচনা হয়।

নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যের ভেতর এক ভয়ঙ্কর আত্মনাশী স্ব-বিরোধিতা ছিল। তিনি কিছুকাল ইতালী ও জার্মানীর মুক্তিদাতার ভূমিকা নেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্যবাদ ও স্বৈরশাসনের প্রকৃত রূপ ধরা পড়ে যায়। যে জাতীয়তাবাদের বীজ তিনি জার্মানীতে ছড়ান, তা ফলবতী হয়ে তাঁর শাসনের বিরুদ্ধে তা সক্রিয় হয়। লাইপজিগের যুদ্ধে জার্মানরা তাদের একদা. মুক্তিদাতার পতন ঘটায়।

নেপোলিয়নীয় সাম্রাজ্যের সংগঠন (The organisation of the Napoleonic Empire) ঃ নেপোলিয়ন কেবলমাত্র ফ্রান্সের মুকুট ধারণ করে ক্ষান্ত থাকেননি। ডাইরেক্টরীর সেনাপতি রূপে, প্রথম কনসাল এবং ফ্রান্সের সম্রাট রূপে নেপোলিয়ন ইওরোপের বিভিন্ন দেশ জয় করেন। ইওরোপের প্রধান রাজশক্তিগুলিকে তিনি বিভিন্ন যুদ্ধে পরাস্ত করে ইওরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ফরাসী আধিপত্য স্থাপন করেন।

(১) বেলজিয়াম, স্যাভয়, নীস, জেনোয়া, ডালমাশিয়া ও ক্রোশিয়া সরাসরি ফ্রান্সের রাজ্যভুক্ত করা হয়। (২) হল্যান্ডে নেপোলিয়নের ভ্রাতা লুই বোনাপার্টের অধীনে এক তাঁবেদার সরকার গঠিত হয়। (৩) জার্মানীর একাংশে কনফেডারেশন অব রাইন (১৮০৬ খ্রীঃ) বা রাইন রাষ্ট্রমন্ডল ফ্রান্সের তত্ত্বাবধানে গঠিত হয়। (৪) এছাড়া জার্মানীর অপর অংশে ওয়েস্টফেলিয়া রাজ্য গঠন করে (১৮০৭ খ্রীঃ) নেপোলিয়নের ভ্রাতা জেরোম বোনাপার্টকে সিংহাসনে বসান হয়। (৫) জার্মানীর উত্তর-পশ্চিম অংশে ওয়ারসর গ্র্যান্ড ডাচী স্থাপন করে ফ্রান্সের বশংবদ স্যাক্সনীর রাজবংশকে স্থাপন করা হয়। (৬) নেপোলিয়ন নিজে ইতালীর রাজমুকুট নেন। তাঁর অধীনে উত্তর ইতালীতে ইউজিন এবং দক্ষিণে নেপোলিয়নের ভ্রাতা যোসেফকে নিয়োগ করা হয়। (৭) এছাড়া সুইজারল্যান্ড, স্পেনকেও নেপোলিয়নের অধীনস্থ করা হয়। জার্মানীর ব্যাভেরিয়া, উর্টেমবার্গ, ডেনমার্ক, সুইডেন ফ্রান্সের মিত্ররাজ্যে পরিণত হয়। ১৮১১ খ্রীঃ পর্যন্ত নেপোলিয়ন পূর্ব ইওরোপে তাঁর মিত্রের সংখ্যা বাড়িয়ে যান।

কন্টিনেন্টাল সিষ্টেম বা মহাদেশীয় অবরোধ প্রথা (The Continental system) ঃ এ্যামিয়েন্সের সন্ধি ভঙ্গ হলে কিভাবে তাঁর পরম শত্রু ইংলন্ডকে ধ্বংস করা যায় নেপোলিয়ন তা গভীরভাবে ভাবতে আরম্ভ করেন। তিনি একথা উপলব্ধি করেন যে, নৌ শক্তির অভাববশতঃ ফ্রান্সের পক্ষে ইংলন্ডের বিরুদ্ধে নৌ-যুদ্ধে জয়লাভের কোন

মহাদেশী প্রথার কারণ · ইংলন্ডের নৌ আধিপত্য

সম্ভাবনা নেই। সমুদ্রের রানী ইংলন্ড তাঁর দ্বীপময় সিংহাসনে বসে তার প্রবল নৌ-শক্তির সাহায্যে সমুদ্র, উপনিবেশ ও বাণিজ্য শাসন করছিল। ফ্রান্সের পক্ষে ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে ইংলন্ড আক্রমণ করা অসম্ভব। কারণ ব্রিটিশ নৌ-বহর চ্যানেল পাহারায় রত ছিল। এক্ষেত্রে ফ্রান্স ছিল অসহায়।

এই সময়ে, ১৮০৫ খ্রীঃ নেপোলিয়নের বিশ্বস্ত সেনাপতি মন্টজেলার্ড (Montgaillard) তাঁর কাছে একটি রিপোর্টে অর্থনৈতিক অবরোধের দ্বারা ইংলন্ডের শক্তি ধ্বংসের প্রস্তাব দেন।[১]

মন্টজেলার্ড রিপোর্ট

মন্টজেলার্ড রিপোর্টকেই কন্টিনেন্টাল সিস্টেমের খসড়া বলা যায়। নেপোলিয়ন অনুভব করেন যে, মার্কান্টাইলবাদী অর্থনীতি অনুসারে ইংলন্ডের অর্থনৈতিক অবরোধ ফ্রান্সে জনপ্রিয় হবে। মার্কান্টাইল অর্থনীতিবাদের নিয়ম ছিল যে, অন্য রাষ্ট্র হতে নিজ দেশে মাল আমদানি কমিয়ে নিজ রাষ্ট্রের মালের রপ্তানি বাড়ান। এজন্য অন্য রাষ্ট্রের আমদানি মালের ওপর চড়া শুল্ক আদায়ের নিয়ম ছিল। কন্টিনেন্টাল সিস্টেম দ্বারা ইংলন্ড থেকে মাল আমদানি একেবারে নিষিদ্ধ করলে এই ব্যবস্থা প্রচলিত মার্কান্টাইল অর্থনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে বলে নেপোলিয়ন মনে করেন।

এখানে বলা দরকার যে, ফ্রান্সে বিদেশী মালের আমদানি কম করে অথবা আমদানি মালের ওপর চড়া হারে শুল্ক চাপাবার নীতি নেপোলিয়নের আগে থেকেই চালু ছিল। বিশেষতঃ

মহাদেশীয় প্রথার উৎপত্তি · পূর্বতন নিয়মের প্রভাব

ইংলন্ডের আমদানি মালের বিরুদ্ধে এই ব্যবস্থা নেপোলিয়ন উদ্ভাবন করেন এ কথা সত্য নয়। সপ্তদশ শতকে ফরাসী মন্ত্রী কলবেয়ার (Colbert) সর্বপ্রথম এই শুল্কনীতি বা আমদানি নীতি চালু করেন। এ্যামিয়েন্সের সন্ধি ভেঙে গেলে বোনাপার্টবাদী কলবেয়ার প্রথা চালু করা হয় (Bonapartist Colbertism)। ফ্রান্সের বিপ্লবী সরকারও ইংলন্ড থেকে মাল আমদানির ওপর বাধা নিষেধ চাপান। ১৭৮৬ খ্রীঃ ফ্রান্স-ব্রিটেনের বাণিজ্য চুক্তি নাকচ করা হয়। ডাইরেক্টরীর শাসনকালে ১৭৯৬ খ্রীঃ ফ্রান্স ও তার উপনিবেশে ব্রিটিশ মাল আমদানি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। নেপোলিয়ন ক্ষমতায় আসার পর এই সংরক্ষণ নীতি চালু রাখেন। হ্যানোভার দখলের পর তিনি এলব ও ওয়েজার নদীতে ব্রিটিশ পণ্যবাহী জাহাজের অনুপ্রবেশ বন্ধ করেন (১৮০৩ খ্রীঃ)। সুতরাং ব্রিটেনের বিরুদ্ধে বাণিজ্যিক অবরোধ নতুন কথা ছিল না। যা নতুন ছিল তাহল নেপোলিয়ন এখন নতুন উদ্যমে এবং ব্যাপকভাবে গোটা ইওরোপ মহাদেশ জুড়ে এই অবরোধ চালু করেন। প্রধানতঃ ব্রিটেনকে সামরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্যে মন্টজেলার্ড পরিকল্পনার দ্বারা এই প্রয়োজন সিদ্ধ করার লক্ষ্য নেওয়া হয়।

ঐতিহাসিকরা বলেন যে, সামরিক অথবা অর্থনৈতিক ঠিক কোন উদ্দেশ্যে নেপোলিয়ন মহাদেশীয় অবরোধ চালু করেন তা বলা কঠিন। সামরিক উদ্দেশ্য অবশ্যই ছিল। তা হল

মহাদেশীয় অবরোধের সামরিক পটভূমি

ব্রিটেনকে নৌ আক্রমণে ধ্বংস করতে সক্ষম না হয়ে, ব্রিটেনের অর্থনীতিকে ধ্বংস করে ব্রিটেনের পরাজয় ঘটান। এক কথায় হাতে না মারতে পারলেও ভাতে মেরে ফেলা। এই যুগে সকলেই বিশ্বাস করত যে, "ইংরাজরা হল দোকানদারের জাতি"। ব্রিটেন উপনিবেশ থেকে সস্তাদরে মাল কিনে ইওরোপের বাজারে বিরাট মুনাফায় তা পুনর্বিক্রয় করে। ব্রিটেনের মোট বৈদেশিক বাণিজ্যের $\frac{১}{৩}$ অংশ ছিল এই ঔপনিবেশিক মালের পুনর্বিক্রয়। ইংলন্ডে উৎপন্ন মালের $\frac{১}{৩}$ অংশ ইওরোপে রপ্তানি হত। এই বাণিজ্যিক সমৃদ্ধিই ছিল ব্রিটেনের শক্তির উৎস। ইওরোপের বাজারে ইংলন্ডের এই রপ্তানি বন্ধ হলে ইংলন্ডের অর্থনীতি ধ্বসে পড়বে বলে নেপোলিয়ন মনে করেন। মন্টজেলার্ড তাঁকে

১· Vincent Corronin—Napoleon. P. 258.

বোঝান যে, ইংলন্ডের রপ্তানি বাণিজ্য বন্ধ হলে ম্যাঞ্চেস্টার, লিভারপুলের কারখানাগুলি মালের চাহিদার অভাবে বন্ধ হয়ে যাবে। হাজার হাজার শ্রমিক বেকার হবে। ইংলন্ডের বুর্জোয়া শ্রেণীর মাথায় বাজ পড়বে। এই সামাজিক শ্রেণীগুলির অসন্তোষ ব্রিটিশ সরকারকে নতি স্বীকার বাধ্য করবে। ব্রিটেন বাধ্য হয়ে তাঁর সঙ্গে সুবিধাজনক শর্তে সন্ধি স্থাপনে বাধ্য হবে। মহাদেশীয় অবরোধ ছিল এক ধরনের অর্থনৈতিক যুদ্ধ।

এখন গবেষকরা মনে করনে যে, নিছক সামরিক প্রয়োজন সিদ্ধ করার জন্যে নেপোলিয়ন মহাদেশীয় অবরোধ চালু করেননি। আলফ্রেড কোব্বান মহাদেশীয় প্রথার দুটি দিকের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। সামরিক দিকের কথা আগেই বলা হয়েছে। এই সঙ্গে অর্থনৈতিক দিকটির কথা ভোলা চলে না। নেপোলিয়ন চান যে, ইওরোপে যদি ব্রিটেনের মাল আমদানি বন্ধ হয়, সেই শূন্যস্থান ফ্রান্স পূরণ করবে। ইওরোপীয় বাণিজ্য থেকে ব্রিটেন যে মুনাফা ভোগ করত এখন থেকে তা ফ্রান্স শুষে নেবে। আলফ্রেড কোব্বান বলেন যে, ব্রিটেনকে কেবলমাত্র নৌ-শক্তির দ্বারা পদানত করার লক্ষ্য থাকলে নেপোলিয়নের পক্ষে দ্বিতীয় বার একটি নৌ-বহর গড়ে তোলা কঠিন ছিল না। কিন্তু তিনি "একটি ঢেলা ছুড়ে দুটি পাখী এক সঙ্গে মারতে চান"।[১] মহাদেশীয় অবরোধের লক্ষ্য ছিল একাধারে গ্রেট ব্রিটেনকে রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে নতজানু করা এবং একই সঙ্গে মহাদেশীয় অবরোধের সুযোগে ফ্রান্সের রপ্তানি ও সম্পদ বৃদ্ধি করা। ১৮০৬-৭ খ্রীঃ টিলজিটের সন্ধির পর রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া নেপোলিয়নের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করে। এর ফলে নেপোলিয়ন আশা করেন যে, ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যে অবরোধ নীতি ফ্রান্স সীমিত আকারে এতদিন চালাচ্ছিলু এখন তা এই দুই শক্তির সহায়তায় গোটা ইওরোপে চালু করা সম্ভব হবে। রাশিয়ার সহযোগীতায় বাল্টিক ও অস্ট্রিয়ার সহযোগিতায় এ্যাড্রিয়াটিক উপকূলে ব্রিটিশ বাণিজ্য বিনষ্ট করা যাবে। এই শূন্যস্থান ফ্রান্স তার নিজ রপ্তানি বাণিজ্য দ্বারা পূরণ করবে। ফান্টানা অর্থনৈতিক ইতিহাসের লেখক ক্লদ ফোলেনও একই কথা বলেন। আলফ্রেড কোব্বান বলেছেন যে, নিছক সামরিক প্রয়োজন নয়, ইওরোপে ফ্রান্সের অর্থনৈতিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাও ছিল বোনাপার্টের গভীর লক্ষ্য। এই মতের সমর্থনে কোব্বান বলেন যে, ফ্রান্সের নিজস্ব উৎপাদনকে চাঙ্গা করার জন্যে বোনাপার্ট সবরকম চেষ্টা করেন। তিনি কারিগরী উদ্ভাবনের জন্যে পুরস্কার ঘোষণা করেন, শিল্পমেলা চালু করেন। এ্যামিয়েন্সের সন্ধির সুযোগে ফরাসী প্রযুক্তিবিদরা ব্রিটেনের শিল্প কারখানা পরিদর্শন করেন। ব্রিটেন থেকে প্রচুর যন্ত্রপাতি আমদানি করা হয়। রিচার্ড লেনোয়ার, তের্নো প্রভৃতি শিল্পপতিগণ ফ্রান্সে শিল্পদ্রব্য উৎপাদনে জোয়ার আনার চেষ্টা করেন। যতদিন না ব্রিটেন থেকে আমদানি বন্ধ করার ফলে মাল সরবরাহের ঘাটতি ফ্রান্স পূরণ না করতে পারে, ততদিন তিনি বিকল্প জিনিষ ব্যবহারের পরামর্শ দেন। এজন্য নীলের বদলে তিনি woad নামে এক প্রকার রং, কফির বদলে চিকোরী, আখের চিনির বদলে বিটের চিনি ব্যবহারে উৎসাহ দেন। তাঁর আশা ছিল ফ্রান্স শীঘ্রই এই ঘাটতি পূরণে সক্ষম হবে। বস্তুতঃ কেবল রাজনৈতিক লক্ষ্যপূরণের জন্যে নয়, অর্থনৈতিক লক্ষ্য পূরণও ছিল নেপোলিয়নের মহাদেশীয় নীতির লক্ষ্য। তবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যই মুখ্য ছিল বলা চলে। কারণ নেপোলিয়নের মত একনায়ক শাসক সর্বাগ্রে ক্ষমতা (Power)কেই স্থান দেন। অর্থনৈতিক প্রাচুর্যকে তাঁর মতো ডিক্টেটর রাজনৈতিক ক্ষমতার অনুষঙ্গ বলেই ভাবেন বলা যায়।

মহাদেশীয় অবরোধের অর্থনৈতিক লক্ষ্য

নেপোলিয়ন তাঁর এই অভিনব অর্থনৈতিক যুদ্ধ কয়েকটি ঘোষণা জারির দ্বারা শুরু করেন। নেপোলিয়ন বার্লিন ডিক্রী (Berlin Decree), ১৮০৬ খ্রীঃ দ্বারা ঘোষণা করেন যে—(১) ইংলন্ডের ওপর নৌ অবরোধ জারী করা হল। (২) ফ্রান্স বা তার মিত্র বা নিরপেক্ষ

১· Cobban—Vol. II.

বার্লিন ডিক্রী

দেশের বন্দরগুলিতে ইংলন্ডের কোন জাহাজকে ঢুকতে দেওয়া হবে না; ইংলন্ডের কোন মাল এই সকল দেশের বন্দরে নামতে দেওয়া হবে না। (৩) যদি ইংলন্ডের কোন মাল অন্য দেশের জাহাজ মারফৎ নামান হয় তা বাজেয়াপ্ত করা হবে।

ইংলন্ড এর প্রত্যুত্তরে অর্ডারস ইন কাউন্সিল (Orders in Council) নামক এক ঘোষণাপত্র দ্বারা বলে যে—(১) ফ্রান্স ও তার মিত্র দেশগুলিতে ইংলন্ডের নৌ অবরোধ ঘোষিত হল। (২) এই সকল দেশের বন্দরে কোন দেশের এমন কি নিরপেক্ষ দেশের জাহাজ ঢুকতে পারবে না। যদি এই আদেশ লঙ্ঘন করা হয় তবে সেই জাহাজ ও তার মালপত্র ইংলন্ড বাজেয়াপ্ত করবে। (৩) যদি কোন নিরপেক্ষ দেশের জাহাজ নিতান্তই ফ্রান্স ও তার বন্দরে যেতে চায় তবে সেই জাহাজকে ইংলন্ডের কোন বন্দরে প্রথম আসতে হবে। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে উপযুক্ত ফি ও শুল্ক দাখিল করে লাইসেন্স নিলে তবে সেই জাহাজ ফ্রান্সের বন্দরে যেতে পারবে। ইংলন্ডের নবনিযুক্ত বিদেশ মন্ত্রী ক্যানিং বুঝতে পারেন যে, এই অবরোধ কার্যকরী করার একমাত্র পথ হল নৌশক্তির সাহায্য। ফ্রান্স যদি তার নৌশক্তি বাড়াতে পারে, তবে ইংলন্ডের ঘোষিত অবরোধ ফ্রান্স ভেঙে ফেলবে। ডেনমার্কের অধীনে একটি শক্তিশালী নৌ-বহর ছিল। পাছে এই নৌ-বহর ফ্রান্স অধিকার করে আপন শক্তি বাড়ায়, এজন্য ইংলন্ড এই নৌ-বহর ধ্বংস করে দেয়। ইংলন্ডের ট্রাফালগারের নৌযুদ্ধে ফ্রান্সের নৌশক্তির প্রথম পতনের পর কোপেনহ্যাগেনে চূড়ান্ত পতন হয়। ডেনমার্কের নৌবলের পতনের ফলে বাল্টিক সাগরের বাণিজ্য ইংলন্ডের জন্যে মুক্ত হয়।

অর্ডারস ইন কাউন্সিল

অর্ডাবস ইন কাউন্সিলের প্রত্যুত্তবে নেপোলিয়ন মিলান ডিক্রী, ১৮০৭ খ্রীঃ ঘোষণা করেন। এতে বলা হয় যে, যে সকল জাহাজ তা মিত্র অথবা নিরপেক্ষ যে দেশেরই হোক না কেন, অর্ডারস ইন কাউন্সিল অনুযায়ী ইংলন্ডের কাছ থেকে লাইসেন্স [illegible] তাদের যে কোন বন্দরে বা সমুদ্রের বুকে ব্রিটিশ সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করে ফ্রান্স বাজেয়াপ্ত করবে। ব্রিটেনের কোন বন্দরে সেই নিরপেক্ষ দেশের জাহাজ ঢুকলেই তাকে শত্রু দেশের জাহাজ বলে গণ্য করা হবে। নেপোলিয়ন এর পর ওয়ারস ডিক্রী (Warsaw Decree) ও ফন্টেনব্লু ডিক্রী (Fontainebleau Decree) ঘোষণা করেন। এতে বলা হয় যে, এই আদেশ ভঙ্গ করার অপরাধে যে সকল ইংরাজ মাল ধৃত হবে তা প্রকাশ্যে আগুনে পোড়ান হবে। বার্লিন ডিক্রী, মিলান ডিক্রী এবং ওয়ারস ও ফন্টেনব্লু ডিক্রীর নীতিগুলিকে একযোগে কন্টিনেন্টাল সিস্টেম বা মহাদেশীয় অবরোধ প্রথা বলা হয়।

মিলান ও ওয়াবস ডিক্রী

কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন যে বার্লিন, মিলান, ফনটেনব্লু আদেশনামা জারীর পর কিছুদিন নেপোলিয়ন বেশ সফলতা পান। ব্রিটেন প্রথম ধাক্কায় বেশ বেসামাল হয়ে পড়ে। ফরাসী প্রাইভেটিয়ারগুলি বা বেসরকারি যুদ্ধ জাহাজগুলি ব্রিটিশ বাণিজ্যের বেশ ভাল রকম ক্ষতি করে। এগুলির মধ্যে সাবক্যুফে-র (Sarcouf) নাম উল্লেখ্য। ইংলণ্ডের লাইসেন্সধারী গড়ে প্রায় ৪৫০ টি ব্রিটিশ বা নিরপেক্ষ দেশের জাহাজ বছরে বাজেয়াপ্ত করা হয়। ব্রিটেনে এজন্য আর্থিক সঙ্কট দেখা দেয়। ১৮০৮ খ্রীঃ নাগাদ ব্রিটেনের রপ্তানি বাণিজ্য বেশ হ্রাস পায়। ১৮০৮ থেকে ১৮১১ খ্রীঃ পর্যন্ত ব্রিটেন অর্থনৈতিক সঙ্কটের মধ্যে পড়ে। আলফ্রেড কোববানের মতে, ব্রিটেনের এই অর্থনৈতিক সঙ্কট নিয়ে বাড়াবাড়ি করা উচিত হবে না। যদিও একশ্রেণীর ঐতিহাসিক বলেন যে, মহাদেশীয় অবরোধে ব্রিটেন বা ফ্রান্স কার বেশী অর্থনৈতিক ক্ষতি হয় বলা কঠিন। তাঁরা বলেন যে, ব্রিটেনের উৎপাদিত মাল রপ্তানি বাজারের অভাবে গুদামে পচতে থাকে। কর্মহীন হস্তশিল্পীরা বড় কারখানায় আক্রমণ করে লাডাইট (Luddite) বিদ্রোহ সৃষ্টি করে। আমেরিকা থেকে ইওরোপে মাল রপ্তানির বিরুদ্ধে অর্ডারস ইন কাউন্সিল জারী করায় ইঙ্গ-মার্কিন সম্পর্ক নষ্ট হয়। এমন কি ব্রিটিশ নৌ-বহর হাডসন নদীতে ঢুকে নিউইয়র্কের ওপর

ব্রিটেনের উপর মহাদেশীয় অবরোধের প্রভাব : বৃটেনের সঙ্কট

গোলাবর্ষণ করে। এদিকে ইংলণ্ডে অনাবৃষ্টির ফলে ফসল হানি ও দুর্ভিক্ষের অবস্থা দেখা দেয়। তাঁরা বলেন যে নেপোলিয়ন এই সময় একটি ভুল করেন। তিনি ইংলণ্ডের খাদ্য সঙ্কটের মোচনের জন্যে ফ্রান্স থেকে উদ্বৃত্ত গম রপ্তানির আদেশ দেন। তিনি ইংলণ্ডকে ভাতে মারার সুযোগ হারান। নেপোলিয়ন ছিলেন ঘোর মার্কেন্টাইল বাদী। তিনি ইংলণ্ড থেকে আমদানিতে রাজী না থাকলেও, ফ্রান্স থেকে ইংলণ্ডে খাদ্যশস্য রপ্তানি করে ইংলণ্ডের সঞ্চিত সম্পদ শুষে নিতে প্রস্তুত ছিলেন। এর ফলে ১৮১১ খ্রীঃ তিনি খাদ্য সঙ্কটে বিব্রত ইংলণ্ডকে নতজানু করার বিরল সুযোগ নষ্ট করেন।

আলফ্রেড কোব্বানের মতে, ইংলণ্ডের এই অর্থনৈতিক সঙ্কট ও খাদ্য সঙ্কট নিয়ে বাড়াবাড়ি করার কোন জায়গা নেই। প্রথমতঃ, মহাদেশীয় অবরোধের একমাত্র প্রতিক্রিয়া হিসেবে ১৮০৮-১১ খ্রীঃ ইংলণ্ডে অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দেয়। ইওরোপের লোকেরা অবশ্য এই সঙ্কটের জন্যে মহাদেশীয় অবরোধকেই দায়ী করে। দ্বিতীয়তঃ, ফ্রান্সেও এই সময় অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দেয়। সে কথা ভোলা ঠিক নয়। মুল হাউজে ৬০ হাজার শ্রমিকের মধ্যে ৪০ হাজার শ্রমিক বেকার ছিল। লায়নসে ২৫ হাজারের ২০ হাজার শ্রমিক বেকার ছিল। ক্ষুং র্ত বিপ্লবী জ্যাকোবিন জনতার সংহার মুর্তি নেপোলিয়ন ১৭৯২ খ্রীঃ দেখেছিলেন। ১৮১১-১ ، খ্রীঃ তিনি তার পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা দেখে ভয় পান। তৃতীয়তঃ, ব্রিটেন শীঘ্রই তার সঙ্কট কাটিয়ে মহাদেশীয় অবরোধকে ভেঙে ফেলে। নেপোলিয়ন শাসিত ফ্রান্স অবরোধ রক্ষা করতে পারেনি। ব্রিটেন এই সঙ্কট থেকে রক্ষা পেতে অর্ডারস-ইন-কাউন্সিল শিথিল করে। ইওরোপে বাণিজ্যে

মহাদেশীয় অবরোধে ভাঙ্গন : ফ্রান্সের অর্থনৈতিক সঙ্কট

উন্মুখ নিরপেক্ষ দেশের জাহাজগুলিকে উদার শর্তে লাইসেন্স দিতে থাকে। এতে ইওরোপে ব্রিটেনের প্রতি সদিচ্ছা দেখা দেয়। চতুর্থতঃ, ব্রিটেন তার উদ্বৃত্ত মাল রপ্তানির জন্যে নতুন বাজার আবিস্কার করে, যথা ল্যাটিন আমেরিকার আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল এবং এশিয়ার তুরস্কে। তুরস্কের স্যালেনিকা বন্দরে ব্রিটেনের মাল ভালই রপ্তানি হতে থাকে। এছাড়া বালটিক সমুদ্র উপকূল ও আটলান্টিক উপকূলে ব্রিটেনের রপ্তানি বাজার ভালই ছিল। সর্বোপরি, ইওরোপের গোটা উপকূল জুড়ে ব্রিটেনের মাল চোরাপথে আমদানি হতে থাকে। নেপোলিয়নের নৌবল না থাকায় ব্রিটেন থেকে মালের চোরাই আমদানি বন্ধ করা যায় নি। সুইডেনের গোটেনবার্গ থেকে, বেলিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জ, জিব্রালটার, হেলিগোল্যাণ্ড সর্বত্রই ব্রিটেনের আমদানি মাল চোরাপথে ইওরোপে ঢুকতে থাকে। কখনও বল প্রয়োগের দ্বারা, কখনও নেপোলিয়নের কর্মচারীদের দুর্নীতির ফলে চোরাপথে ব্রিটিশ মালের আমদানি চলতেই থাকে। ফন্টেনব্লু আদেশ নামা অনুযায়ী ব্রিটেনের বাজেয়াপ্ত মাল পোড়াবার আদেশকে লোক দেখানোভাবে কার্যকরী করার জন্যে অপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্র পোড়ানা হয়। পঞ্চমতঃ, ইওরোপের লোকেরা এমন কি ফরাসীরাও ব্রিটেনের মালের ওপর এত নির্ভরশীল ছিল যে, নেপোলিয়নকে বাধ্য হয়ে তাঁর ঘোষিত অবরোধ আলগা করতে হয়। তিনি তাঁর ভ্রাতা লুইকে এক গোপন আদেশ দ্বারা হল্যাণ্ড থেকে 'ডাচ-জিন' বা মোটা কাপড় খরিদের সুযোগ ইংরাজ বণিকদের দিয়ে দেন। তিনি নিজে তাঁর ফরাসী সেনার জুতা ও পোষাক ইংলণ্ড থেকে গোপনে কিনেন।

শেষ পর্যন্ত ইংলণ্ড থেকে মাল আমদানি পুরোপুরি বন্ধ করা সম্ভব নয় দেখে ইংলণ্ড থেকে মাল আমদানিকারকদের নেপোলিয়ন অর্থের বিনিময়ে লাইসেন্স দিতে শুরু করেন। নৌবলের অভাব বশতঃ ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে অবরোধ কার্যকরী করা দুস্কর ছিল। একথা বুঝতে পেরে

নেপোলিয়নের লাইসেন্স প্রথা

নেপোলিয়ন লাইসেন্স প্রথা চালু করেন। নীতিগতভাবে তাঁর অবরোধের ভাঙন হয়েছে নেপোলিয়ন তা মেনে নেন।

অনেকে বলেন যে, মহাদেশীয় প্রথার পশ্চাতে নেপোলিয়নের উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটেনকে বাদ দিয়ে ইওরোপীয় জাতিগুলির একটি অর্থনৈতিক জোট গঠন করা। এই জোটের মধ্যমণি হিসেবে তিনি ফ্রান্সকে স্থাপন করতে চান। আলফ্রেড কোব্বান এই ধরনের ব্যাখ্যার কোন মূল্য নেই বলে মনে করেন। নেপোলিয়নের মত একজন ডিক্টেটর রাজনৈতিক ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ছাড়া আর কিছুই বুঝতেন না। অর্থনীতিকে তিনি তাঁর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন। ইওরোপের সকল জাতির সমান স্বার্থরক্ষা করে অর্থনৈতিক জোট গঠন কখনও তাঁর কাম্য ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, তাঁর অর্থনীতিতে তিনি ইওরোপের অন্যদেশ অপেক্ষা ফ্রান্সের স্বার্থকেই সেরা মনে করতেন। "ফ্রান্সের স্বার্থই এবং ফ্রান্সই শেষ কথা।" এটাই ছিল তাঁর নীতি। এক্ষেত্রে European economic union বা ইওরোপের দেশগুলির অর্থনৈতিক সঙ্ঘ গঠন কখনও তাঁর কল্পনায় ছিল না। ব্রিটেনের বাণিজ্যিক প্রাধান্য থেকে ইওরোপকে নেপোলিয়ন মুক্তি দিতে চান, এই সকল প্রচারের কোন মূল্য ছিল না। বরং অবরোধ শিথিল করে নেপোলিয়ন লাইসেন্স দিতে শুরু করলে তাতে ফরাসীদেরই প্রধান সুযোগ দেওয়া হয়। এর ফলে ইওরোপে ফরাসী বণিকরাই প্রাধান্য পেতে থাকে।

ইওরোপীয় অর্থনৈতিক সঙ্ঘ নয় ফ্রান্সের স্বার্থ রক্ষা নীতি

এই অবস্থায় নেপোলিয়নের ঘোষিত মহাদেশীয় অবরোধ, যা আগেই হাতে-কলমে ভেঙে পডছিল, এখন তা কাগজে-কলমে ভেঙে পড়তে থাকে। শুধু নৌ শক্তির অভাবের জন্যে নয়, ফ্রান্সের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট একপেশে বাণিজ্য নীতি ইওরোপের অন্য জাতিগুলির বিরোধিতা সৃষ্টি করে। নেপোলিয়ন ফরাসীদের বেশীর ভাগ লাইসেন্স দিলে এবং "ফ্রান্সের দাবীই সর্বাগ্রগণ্য" (France first) এই নীতি নিলে রাশিয়া, অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশ ক্ষুব্ধ হয় এবং মহাদেশীয় অবরোধ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। তাদের বন্দর ইংলন্ডের বাণিজ্য জাহাজের জন্যে খুলে দেওয়া হয়। নেপোলিযনের প্রচারণা যে "ব্রিটেনের বাণিজ্যিক আধিপত্যের জন্যে ইওরোপের একই নীতি নিয়ে চলা উচিত"— এই প্রচারে তারা আস্থা হারায়। লাইসেন্স প্রাপ্ত ফরাসী বণিকরা ইওরোপে মাল সরবরাহের সময় চড়া হারে দাম নিলে গভীর অসন্তোষ দেখা দেয়।

ফ্রান্সের বাণিজ্যেব প্রতি পক্ষপাতের জন্য অবরোধে ভাঙন

ফ্রান্সের ভেতরে এক শ্রেণীর বণিক ও শিল্পপতি মহাদেশীয় অবরোধের বিরোধিতা শুরু করে। নেপোলিয়ন তাঁর যুদ্ধ-বিগ্রহ ও ইওরোপে অবরোধকে কার্যকরী করার জন্যে বিরাট ব্যয়ের ভার নির্বাহের জন্যে বণিক ও শিল্পপতিদের ওপরে চড়া হারে কর চাপান। ইংলন্ড তার নৌশক্তির জোরে অডারস-ইন-কাউন্সিল চালু করার ফলে ফ্রান্সের যথেষ্ট অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতি হতে থাকে। নেপোলিয়ন ফ্রান্সে শিল্প গঠনের যে উদ্যোগ নেন তার গতি ছিল অত্যন্ত ধীর। ফ্রান্সের কৃষিভিত্তিক, রক্ষণশীল সমাজে তখনও শিল্প-বিপ্লবের গুরুত্ব অনেকে বোঝেনি। ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে অগ্রগতি হলেও, বৃহৎ শিল্পের দ্বারা উদ্বৃত্ত উৎপাদনের আশা পূরণ হয়নি। ফলে ইওরোপের দেশগুলিতে ফ্রান্সের একচেটিয়া বাজার দখলের আশা দিবাস্বপ্নে পরিণত হয়। নেপোলিয়ন ইওরোপবাসীদের ইংলন্ডের মালের বদলে ফরাসী মাল যোগাতে না পেরে কফির বদলে চিকোরী, আখের চিনির বদলে বিটের চিনি প্রভৃতি বিকল্পের ওপর নির্ভর করতে পরামর্শ দেন। স্বদেশে মধ্যবিত্তশ্রেণীর সমর্থন হারিয়ে এবং বিদেশে ইওরোপীয় জনমতের দ্বারা ধিকৃত হলে নেপোলিয়নের মহাদেশীয় অবরোধ ভেতর থেকেই ভাঙতে থাকে।

ফ্রান্সের অবরোধের বিরোধিতা

এই পরিস্থিতিতে তিনি অবরোধকে কার্যকরী করার জন্যে এবং ইংলন্ড থেকে চোরাপথে মাল আমদানি বন্ধ করার জন্যে ইওরোপের উপকূলের দেশগুলিতে ও নিরপেক্ষ দেশে তাঁর

সেনাদল ছডিযে দিতে চান। স্থল শক্তি দ্বাবা তিনি সামুদ্রিক বাণিজ্যকে বোধ কবতে এক মরীযা প্রচেষ্টা চালান। এই প্রচেষ্টাব ফল ছিল তাঁব পক্ষে মাবাত্মক। প্রথমতঃ তিনি ভুলে যান যে, ঊনবিংশ শতকেব গোডায জলপথে পবিবহনেব খবচ ছিল অনেক কম, স্থলপথে পবিবহণেব খবচা ছিল ভযানক বেশি। তিনি ইতালিব ওপব শুল্ক প্রাচীব তুলে সামুদ্রিক মালেব শস্তা আমদানি বদ কবে, স্থলপথে ফ্রান্স থেকে বপ্তানিব চেষ্টা কবেন। এতে ইতালিব লোক চটে যায। (২) তিনি বাইনল্যান্ডেব গ্র্যান্ড ডাচিকে বাল্টিক উপকূল ও নেদাবল্যান্ডস থেকে শস্তা পণ্য না কেনাব জন্যে এই অঞ্চলে চডা হাবে শুল্ক চাপান। তিনি পিডমন্টেব কাঁচামাল একই দেশ ইতালিব লম্বার্ডিতে ঢুকতে না দিযে, ফ্রান্সেব স্বার্থে লাযনসে নিযে আসেন। এই জববদস্তি ব্যবস্থাকে টিকিযে বাখতে এবং ইওবোপেব উপকূলে যাতে ব্রিটেনেব চোবাই মাল না ঢুকে এজন্য তিনি একেব পব এক ইওবোপেব নিবপক্ষ দেশে ফবাসী সেনাদল ঢোকান। প্রথমে তিনি পর্তুগাল ও স্পেনে তাঁব সেনা ঢুকিযে তাঁব ভ্রাতা যোসেফকে স্পেনেব সিংহাসনে বসান। এব ফলে স্পেনেব সঙ্গে তাব দীর্ঘস্থাযী যুদ্ধ শুরু হয। পোপ মহাদেশীয অববোধ চালু কবতে বাজী না হলে, তিনি পোপকে বন্দী কবে পোপেব বাজ্য দখল কবেন। তাঁব এই জববদস্তিব ফলে অষ্ট্রিযা ও বাশিযা অববো থেকে বিচ্ছিন্ন হয। নেপোলিযন এজন্য বাশিযা আক্রমণ কবেন। মস্কোব যুদ্ধে তাঁব মহান বাহিনী ধ্বংস হয। এইভাবে মহাদেশীয অববোধ শুধু ব্যর্থ হযনি, এই অববোধকে কার্যকবী কবতে গিযে নেপোলিযন স্পেন, বাশিযা প্রভৃতি দেশেব সঙ্গে যুদ্ধে জডিযে পডেন। এব ফলে তাব পতন ঘটে।

মহাদেশীয অববোধেব ফলাফল ঃ নেপোলিযনেব পতনেব সূচনা

পেনিনসুলার যুদ্ধ ও ফলাফল (The Peninsular war and Results) ঃ নেপোলিযন কর্তৃক ঘোষিত কন্টিনেন্টাল সিস্টেমে পর্তুগাল সহযোগিতা কবতে অস্বীকাব কবলে, নেপোলিযন পর্তুগাল আক্রমণেব জন্যে স্পেনেব ভেতব দিযে তাব সেনাদল পাঠান। ফন্টেনব্ল্যুব সন্ধিব দ্বাবা নেপোলিযন ফ্রান্সেব পর্তুগাল আক্রমণে স্পেনকে সাহায্য দিতে বাধ্য কবেন। পর্তুগাল অভিযানকাবী ফবাসী সেনাব একাংশ অকস্মাৎ স্পেনেব দুর্গগুলি অধিকাব কবে। এতে ভীত হযে স্পেন বাজ চতুর্থ চার্লস স্পেন থেকে পালাবাব চেষ্টা কবেন। কিন্তু তিনি ফবাসী সেনাব হাতে বন্দী হন। স্পেনবাসীবা চতুর্থ চার্লসেব পুত্র ফার্দিনান্দকে বাজা ঘোষণা কবে ফবাসী সেনাদলকে স্পেন ত্যাগেব জন্যে দাবী জানায। চতুর্থ চার্লসও যুববাজ ফার্দিনান্দেব অনুকূলে স্পেনেব সিংহাসনেব ওপব তাঁব দাবী ছেডে দেন। নেপোলিযন স্পেনেব সিংহাসন দখলেব পবিকল্পনা কবেন। স্পেনেব প্রজাদেব মতামতকে তিনি গ্রাহ্য কবতে বাজী ছিলেন না। তিনি Bayoune বেকনে চার্লস ও ফার্দিনান্দেব সঙ্গে সাক্ষাৎকাবেব পব উভযকে তাঁব অনুকূলে স্পেনেব সিংহাসন ছেডে দিতে বাধ্য কবেন। স্পেনেব উভয বাজাকে তিনি নির্বাসনে পাঠান। সেনাপতি মুবাটেব (Murat) অধীনে তিনি এক শক্তিশালী সেনাদল স্পেনে পাঠান। তিনি তাঁব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যোসেফ বোনাপার্টকে স্পেনেব বাজা ঘোষণা কবেন। ফবাসী সেনা পবিবৃত হযে যোসেফ স্পেন শাসনেব চেষ্টা কবেন। যোসেফ নেপোলিযনেব উদাবনৈতিক সংস্কাবগুলি স্পেনে প্রবর্তন কবে জনমতকে প্রশমিত কবাব চেষ্টা কবেন। তিনি একটি উদাবনৈতিক সংবিধান প্রবর্তনেব প্রতিশ্রুতি দেন।

নেপোলিযনেব স্পেন অধিকাব

নেপোলিযনেব এই নগ্ন সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপে স্পেনবাসীব মর্যাদা ও দেশপ্রেমে আঘাত কবে। স্পেনবাসীবা ফবাসীদের বহিষ্কাবেব জন্যে আমবণ সংগ্রামেব সঙ্কল্প নেয। যদিও স্পেনবাজ ফার্দিনান্দ অপদার্থ লোক ছিলেন, স্পেনেব জনসাধাবণ তাঁকে তাদেব জাতীয বাজাব মর্যাদা দেয এবং আগ্রাসী ফবাসী বাহিনীকে স্পেন

স্পেনেব জাতীয যুদ্ধেব সূচনা

থেকে দূর করার চেষ্টা চালায়। স্পেনের কৃষকরা গেরিলা যুদ্ধ শুরু করে। স্পেনের বিভিন্ন অঞ্চলে জুন্টা বা কমিউন স্থাপন করে আপাততঃ দেশপ্রেমিক নেতারা স্থানীয় শাসন নিজ হাতে নেয় এবং আগ্রাসী ফরাসী সেনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাতে থাকে। স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে একটি কেন্দ্রীয় জুন্টা স্থাপিত হয়। এই জুন্টার আমন্ত্রণে স্পেনের একটি জাতীয় পার্লামেন্ট বসে (১৮১০ খ্রীঃ)। এই পার্লামেন্ট বিপ্লবী ফ্রান্সের ১৭৯১ খ্রীঃ সংবিধানের অনুকরণে একটি এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা এবং গণভোটে সদস্যদের নির্বাচনের ব্যবস্থা করে। এই সংবিধান ১৮১২ খ্রীঃ থেকে চালু হয়। এই সংবিধানের নামে স্পেনবাসী নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে জাতীয় প্রতিরোধ চালায়। ক্ষুদ্র স্পেনের জাতীয়তাবোধকে আমল না দিয়ে নেপোলিয়ন সামরিক শক্তির দ্বারা একে দমাবার চেষ্টা করেন। তিনি ভুলে যান যে, একটি জাতিকে বলপ্রয়োগ দ্বারা দমিয়ে রাখা যায় না। ধনী-নির্ধন-জমিদার-কৃষক-যাজক নির্বিশেষে সকল স্পেনবাসী স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপ দেয়।

স্পেনের এই প্রতিরোধ প্রকৃত জাতীয় প্রতিরোধ ছিল কিনা ঐতিহাসিকরা এ বিষয়ে বিভিন্ন মত দেন। ডেভিড টমসনের মতে, স্পেনের অধিবাসীদের গভীর আঞ্চলিক ও স্থানীয় স্বাধীনতা বোধ ছিল। তাদের অতীতের মহান ইতিহাসের জন্যে তারা এক ধরনের গর্ববোধ করত। তাছাড়া জার্মানী বা হ্যাপসবার্গ সাম্রাজ্যের মত স্পেন বিভিন্ন রাজ্যের সমষ্টি ছিল না। স্পেন ছিল এক ঐক্যবদ্ধ রাজতান্ত্রিক-দেশ। যদিও রাজা চতুর্থ চার্লস ছিলেন অপদার্থ তথাপি স্পেনের একটি রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ঐক্যবোধ ছিল। অপরদিকে বলা হয় যে, নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে স্পেনের প্রতিরোধে যাঁরা নেতৃত্ব দেন তাঁরা ছিলেন যাজক ও সামন্ত শ্রেণীর লোক। এঁরা কোড নেপোলিয়ন, গীর্জা সংস্কার ও ভূমি সংস্কারকে ভয় করতেন। মোট কথা, তাঁদের চিন্তাধারা প্রগতিশীল ছিল না, তাঁদের স্বার্থ ও লক্ষ্য ছিল সঙ্কীর্ণ। তাঁরা নেপোলিয়নের আধিপত্যকে যেমন ভয় করতেন, ফরাসী বিপ্লবের মূল আদর্শকেও তাঁরা শ্রদ্ধা করতেন না। এই ব্যাখ্যার ভিত্তিতে স্পেনের প্রতিরোধকে অনেকে জাতীয়তাবাদী প্রতিরোধ বলে মনে করেন না। মার্কহ্যামের মতে, স্পেনের প্রতিরোধে Liberalism বা উদারনৈতিক ভাবধারার প্রভাব ছিল সীমাবদ্ধ। তথাপি বলা চলে যে, স্পেনবাসীরা বৈদেশিক শাসনকে সহ্য করতে রাজী ছিল না। নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে স্পেনের কৃষক থেকে যাজক ও সামন্তরা ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম চালায়। এজন্য ডেভিড টমসন বলেছেন, "এতদিন নেপোলিয়ন বেতনভোগী সেনাদলকে পরাজিত করেন, এখন তিনি একটি ঐক্যবদ্ধ জাতীয় প্রতিরোধের মুখোমুখি হন" (Hitherto Napolcon had defeated professional salaried soldiers, now he faced a nation)।

ইতিমধ্যে ইংলন্ডের বৈদেশিক মন্ত্রী জর্জ ক্যানিং ঘোষণা করেন যে, "ইওরোপের যে কোন জাতি যদি নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরে, তবে ইংলন্ড তার পিছনে দাঁড়াবে।" এই ঘোষণাকে কার্যে পরিণত করার জন্যে ইংরাজ বাহিনী স্যার জন মুরের (Sir John Moor) নেতৃত্বে পর্তুগালে নামে এবং স্পেনে প্রবেশ করে। ফলে স্পেনের যুদ্ধের ব্যাপকতা বাড়ে। ইওরোপ রুদ্ধশ্বাসে এই যুদ্ধের ফলাফল লক্ষ্য করে।

ইংলন্ডের হস্তক্ষেপ

নেপোলিয়নের রাজনৈতিক বিচক্ষণতার অভাবের ফলেই পেনিনসুলার যুদ্ধ বা স্পেনীয় উপদ্বীপের যুদ্ধ ঘটে। ইওরোপের বৃহৎ শক্তিগুলিকে একনাগাড়ে পরাস্ত করার পর তাঁর মনে একপ্রকার অন্ধ আত্মবিশ্বাস দেখা দেয়। তিনি স্পেনের অধিবাসীদের আবেগ ও জাতীয়তাকে উপেক্ষা করে স্পেনে হস্তক্ষেপ করেন। তিনি ভাবেননি যে, ক্ষুদ্র স্পেন মরণপণ প্রতিজ্ঞায় তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই করবে। সর্বোপরি, ইংলন্ড স্পেনের যুদ্ধে যোগ দিলে স্পেনবাসীদের পরাস্ত করা কঠিন হয়।

ইতিমধ্যে ইংরাজ সেনাপতি স্যার আর্থার ওয়েলেসলি বা স্বনামধন্য ডিউক অফ ওয়েলিংটন

ডিউক অফ ওয়েলিংটনের রণকৌশল : টলভেরার যুদ্ধ

স্পেনের যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব নেন। তিনি ছিলেন ভারতের বড়লাট লর্ড ওয়েলেসলির মধ্যম ভ্রাতা। তিনি ১৮০৮ খ্রীঃ ভিমিয়েরোর (Vimiero) যুদ্ধে এবং টলভেরার যুদ্ধে (১৮০৮ খ্রীঃ) ফরাসী বাহিনীকে পর পর দুবার পরাজিত করেন। তিনি নেপোলিয়নের রণকৌশল অনুধাবন করে তাঁরই কৌশলে ইংরেজ সেনাদের শিক্ষিত করেন।

টোরেস ভেড্রাব আত্মরক্ষা ব্যূহ

স্পেনের ইংরাজ সেনাদের বিরক্তিকর যুদ্ধের প্রতিকারের জন্যে নেপোলিয়ন তাঁর শ্রেষ্ঠ সেনাপতি ম্যাসেনাকে (Massena) স্পেনে যুদ্ধ পরিচালনার জন্যে পাঠান। ম্যাসেনা আসবার পর ইংরাজ সেনা সম্মুখ যুদ্ধ ত্যাগ করে পর্তুগালে টোরেস ভেড্রা (Tores Vedras) নামে এক আত্মরক্ষা ব্যূহ তৈরি করেন। তিনি এর আড়ালে যুদ্ধ চালান। ম্যাসেনা শত চেষ্টা করেও এই ব্যূহ ভাঙতে অপারগ হন। ইওরোপে নেপোলিয়নের মর্যাদা বিনষ্ট হয়।

স্যালামাঙ্কা ও ভিত্তোবিযাব যুদ্ধ

এদিকে নেপোলিয়ন রুশ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। এই সুযোগে ১৮১২ খ্রীঃ ডিউক অফ ওয়েলিংটন স্যালামাঙ্কার যুদ্ধে ফরাসীদের শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করেন। মাদ্রিদ ইংরাজ সেনার অধিকারে আসে। যোসেফ বোনাপার্ট স্পেন থেকে পালাতে বাধ্য হন। ১৮১৩ খ্রীঃ ডিউক অফ ওয়েলিংটন ভিত্তোরিয়ার (Vittoria) যুদ্ধে ফরাসী সেনাপতি মার্শাল জুর্দানকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করলে ফরাসী বাহিনী স্পেন ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এর পর ওয়েলিংটন ফ্রান্স আক্রমণের উপক্রম করেন।

ফলাফল

পেনিনসুলার যুদ্ধের বিফলতা নেপোলিয়নের সামরিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে। স্পেনেই নেপোলিয়ন সর্বপ্রথম নতুন ধরনের প্রতিরোধের সম্মুখীন হন। স্পেনেই সর্বপ্রথম একটি জাতি তাঁর বিরুদ্ধে সামগ্রিকভাবে রুখে দাঁড়ায়। জাতীয় প্রতিরোধের সম্মুখে নেপোলিয়নের রণকৌশল বিফল হয়। ১৮০৮ খ্রীঃ বেইলেনে ২৩ হাজার ফরাসী সেনা স্পেনীয়দের হাতে বন্দী হয়। দ্বিতীয়তঃ, স্পেনের সিংহাসনে তাঁর ভ্রাতাকে বসাবার ফলে নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যবাদ নগ্নভাবে প্রকাশিত হয়। এজন্য ইওরোপে তাঁর বিরুদ্ধে ঘৃণা জাগে। নেপোলিয়নের স্বৈরাচারী, সাম্রাজ্যবাদী নীতি প্রকট হয়ে ওঠে। স্পেনের দৃষ্টান্তে ইওরোপের নানা দেশে জাতীয়তাবাদী জাগরণের সূচনা হয়। তৃতীয়তঃ, কন্টিনেন্টাল সিস্টেম স্পেনে বিফল হলে, রাশিয়া প্রভৃতি দেশেও এই প্রথাকে অগ্রাহ্য করা আরম্ভ হয়। চতুর্থতঃ, স্পেনের যুদ্ধে ফ্রান্সের প্রভূত ক্ষয়ক্ষতি হয়। ১৮০৮-১৮১০ খ্রীঃ পর্যন্ত নেপোলিয়নকে গড়ে ৩ লক্ষ সেনা স্পেনে সর্বদা হাজির করতে হয়। স্পেনের দীর্ঘ, ব্যয়সাপেক্ষ যুদ্ধে তাঁর সেনাদলের একটি বড় অংশ আটক থাকায়, ইওরোপের অন্যত্র নেপোলিয়নের সামরিক শক্তি দুর্বল হয়ে যায়। নেপোলিয়ন এতকাল যে যুদ্ধকৌশলে জয়লাভ করতেন তা হল, তাঁর বিরাট বাহিনীকে একটি ক্ষিপ্র আক্রমণ দ্বারা শত্রুকে সম্মুখ যুদ্ধে পরাস্ত করা। অধিকৃত দেশ থেকে অর্থ, সম্পদ নিয়ে তাঁর সেনাদের খরচা নির্বাহ করা। স্পেনে তাঁর এই কৌশল কার্যকরী হয়নি। কারণ স্পেনীয়রা গেরিলা যুদ্ধ চালায়। একসঙ্গে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তারা যুদ্ধ চালায়। স্পেনের পার্বত্যভূমিতে দ্রুত আক্রমণ চালান সম্ভব ছিল না। স্পেনের যুদ্ধে তাঁকে ফ্রান্সের অর্থ ও সেনা খরচ করে যুদ্ধ চালাতে হয়। তাঁর বিপ্লবী ভাবমূর্তিকে স্পেনবাসী আমল দেয়নি। সাধারণ লোক তাঁর পক্ষে যোগ দেয়নি। স্পেনের প্রতিরোধের ফলে অষ্ট্রিয়ার মনোবল জেগে ওঠে। স্পেনের যুদ্ধের সুযোগে অষ্ট্রিয়া ফ্রান্সের বিরুদ্ধে নতুন উদ্যমে যুদ্ধ আরম্ভ করে। নেপোলিয়ন চতুর্দিকে শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হন। নেপোলিয়ন এজন্য বলেন যে, "স্পেনের ক্ষত আমার সর্বনাশ ডেকে আনে" (The Spanish ulcer ruined me)। ফিশারের মতে, "ফরাসী সাম্রাজ্যের সংগঠনে নেপোলিয়নের স্পেনীয় অভিযান প্রথম ফাটল সৃষ্টি করে।"[১]

---

১ "With Napoleon's Spanish enterprise the tracks began to open in the fabric of the French Empire"—Fisher.

রাশিয়ার সহিত মিত্রতা ভঙ্গ ঃ মস্কো অভিযান (The breakdown of Alliance with Russia : Moscow Campaign) ঃ টিলজিটের সন্ধির (Treaty of Tilisit) ১৮০৭ খ্রীঃ দ্বারা নেপোলিয়নের প্রতি জারের যে শ্রদ্ধা দেখা দেয় তা শীঘ্র ক্ষয় পায়। জার বুঝতে পারেন যে, টিলজিটের সন্ধির দ্বারা রাশিয়ার কোন প্রকৃত লাভ হয়নি। এই সন্ধির দ্বারা তুরস্কের বিরুদ্ধে রাশিয়াকে সাহায্য করার জন্যে যে প্রতিশ্রুতি নেপোলিয়ন দেন তা তিনি পালন করেননি। রুশ-তুরস্ক যুদ্ধের সময় তিনি রাশিয়াকে প্রত্যাশিত সহায়তা দেননি। এতে জার প্রথম আলেকজান্ডার ক্ষুব্ধ হন। তিনি বুঝতে পারেন যে, নেপোলিয়ন রাশিয়াকে তাঁর তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করতে চান। প্রাশিয়ার নির্বাসিত দেশপ্রেমিক স্টাইন এই সময় মস্কোতে বাস করতেন। তিনি রুশ মন্ত্রীদের বুঝান যে, জার শাসিত রাশিয়ার ফরাসী তোষণ নীতিব পরিবর্তন করা দরকার, নতুবা রাশিয়া নিজেই বিপন্ন হবে। ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতও জারকে একই কথা বুঝাতে থাকেন। তিনি নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে বিভিন্ন রাষ্ট্রের জোটে যোগ দেওয়ার জন্যে জারকে পরামর্শ দেন। ফলে জার প্রথম আলেকজাণ্ডার নেপোলিয়নের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নতুন করে পর্যালোচনা করেন। টিলজিটের সন্ধির পর জারের সঙ্গে এরফুট (Erfurt)-এর চুক্তি নেপোলিয়ন করেন। এই চুক্তির পরেও উভয় নেতার মধ্যে সন্দেহ ও অবিশ্বাস দেখা দেয়।

টিলজিটেব সন্ধিব বিফলতা ঃ স্টাইনের প্রভাব

এছাড়া রুশ জার প্রথম আলেকজান্ডার বিশেষ কয়েকটি কারণে নেপোলিয়নের প্রতি অসন্তুষ্ট হন। (১) রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়াকে পরাস্ত করার পর নেপোলিয়ন পোল্যান্ডের গ্যালিশিয়া অঞ্চল অধিকার করেন। এই অধিকৃত স্থান নিয়ে নেপোলিয়ন গ্রান্ড ডাচি অফ ওয়ারস নামক রাজ্য গঠন করেন। এই রাজ্য রক্ষার জন্যে কয়েক লক্ষ ফরাসী সেনাকে পোল্যান্ডে রাখা হয়। এর ফলে পোল্যান্ড কার্যতঃ ফরাসী উপনিবেশে পরিণত হয়। পোল্যান্ডকে ফরাসী তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করায় রাশিয়ার নিরাপত্তা বিপন্ন হয়। এ বিষয়ে জারের প্রতিবাদ নেপোলিয়ন অগ্রাহ্য করেন। রুশ অভিজাতরা আশঙ্কা করেন যে, বিভক্ত পোল্যান্ডকে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ করার অজুহাত তুলে রাশিয়ার অধিকৃত পোল্যান্ডের ভূমি নেপোলিয়ন ফেরত চাইতে পারেন। জার দাবী করেন যে, ঐক্যবদ্ধ ও স্বাধীন পোল্যান্ড গঠনের দাবী নেপোলিয়ন করবেন না এই মর্মে তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। নেপোলিয়ন তাতে রাজী হননি।

(২) জারের ভগ্নীপতি ডিউক অফ ওল্ডেনবার্গ, কন্টিনেন্টাল সিস্টেম অগ্রাহ্য করলে নেপোলিয়ন তাঁর রাজ্য দখল করেন। ওল্ডেনবার্গের ডিউকের পত্নী ক্যাথারিন ছিলেন জারের প্রিয় ভগিনী। ক্যাথারিন, তাঁর ভ্রাতার নিকট নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে আবেদন জানালে, রুশ অভিজাত মহল অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। তাঁরা নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার জন্যে জারকে পরামর্শ দেন।

(৩) জার তাঁর ভগিনী আনাকে (Anna) নেপোলিয়নের সঙ্গে বিবাহ দিতে রাজী না হলে নেপোলিয়ন অপমানিত জ্ঞান করেন। এর পর নেপোলিয়ন অষ্ট্রিয়ার হ্যাপসবার্গ রাজকন্যা মারিয়া লুইসাকে বিবাহ করেন। কিন্তু জার এই বিবাহের ফলে রাশিয়ার বিপদ আশঙ্কা করেন। তিনি মনে করেন যে, ফ্রান্স ও অষ্ট্রিয়া এককাট্টা হয়ে রাশিয়ার ক্ষতিসাধন করবে।

(৪) রুশ জার লক্ষ্য করেন যে, কন্টিনেন্টাল সিস্টেমের ফলে রাশিয়ার প্রভুত অর্থনৈতিক ক্ষতি ঘটছে। ইংলন্ডের শিল্পদ্রব্যের অভাবে রাশিয়ার লোকের দুঃখ-দুর্দশা বাড়ছে। রাশিয়ায় জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেছে। ব্রিটিশ বাণিজ্য বয়কট করায় রাশিয়া বিশ্ববাণিজ্য হতে বিচ্ছিন্ন হয়। রুশ কারখানাগুলি অচল হয়। তিনি দেখেন যে, নেপোলিয়ন নিজে অবরোধ ভেঙে ফরাসী বণিকদের মাল আমদানির লাইসেন্স দিচ্ছেন। অথচ রাশিয়াকে অবরোধ মানতে বাধ্য করছেন।

এমতাবস্থায় জার আলেকজান্ডার ধীরে ধীরে রুশ বন্দরগুলি ব্রিটিশ বাণিজ্যের জন্যে খুলে দেন। জার ইংলন্ডের বিরুদ্ধে অবরোধ ত্যাগ করলে নেপোলিয়ন অত্যন্ত বিরক্ত হন। তাঁর পক্ষে রাশিয়া আক্রমণ করা ছাড়া অন্য পথ খোলা ছিল না। এদিকে স্পেনের যুদ্ধে নেপোলিয়নের হয়রানি জারকে উৎসাহিত করে। নেপোলিয়নের ন্যায় রণপণ্ডিত ক্ষুদ্র স্পেনের নিকট ব্যর্থ হলে, নেপোলিয়নের ক্ষমতা সম্পর্কে ভীতি দূর হয়।

(৫) সুইডেন ছিল রাশিয়ার প্রতিবেশী দেশ। বাল্টিক সমুদ্রের ওপর অধিকার নিয়ে রাশিয়া ও সুইডেনের মধ্যে বিরোধ ছিল। জার সুইডেনকে রুশ নিয়ন্ত্রণে এনে বাল্টিক সমুদ্রের ওপর রাশিয়ার একচ্ছত্র অধিকার স্থাপনের চেষ্টা করেন। কিন্তু নেপোলিয়ন সুইডেনের সিংহাসনে তাঁরই অনুগত সেনাপতি বার্ণাডোটকে বসালে জার বিপদ বোধ করেন। এই সকল কারণে ফ্রান্সের সঙ্গে রাশিয়ার মিত্রতায় ভাঁটা পড়ে।

মর্স ষ্টিফেনস ও ভিনসেন্ট ক্রোনিনেব অভিমত

ঐতিহাসিক মর্স ষ্টিফেনসের মতে, কন্টিনেন্টাল সিস্টেম কার্যকরী করতে জারের অস্বীকৃতিই ছিল নেপোলিয়নের রুশ অভিযানের মূল কারণ। কিন্তু নেপোলিয়নের জীবনীকার ভিনসেন্ট ক্রোনিনের মতে, পোল্যান্ড উপলক্ষে মতভেদই ফ্রান্স ও রাশিয়ার মৈত্রী নাশের মুখ্য কারণ।[১] মর্স ষ্টিফেনস হলেন ইংরাজ ঐতিহাসিক। স্বভাবতই তিনি কন্টিনেন্টাল সিস্টেমের ওপর জোর দিয়েছেন। অনেকে মনে করেন যে, পোল্যান্ডেব ঘটনাই উভয় দেশের মধ্যে বিভেদের প্রধান প্রাচীর রচনা করে। তাছাড়া নেপোলিয়ন এমন ভাব দেখাতেন যে, রাশিয়া হল একটি অনগ্রসর দেশ। নেপোলিয়ন হলেন ইওরোপের সম্রাট। রাশিয়া ফ্রান্সের তাঁবেদার দেশ। নেপোলিয়নের এই অহমিকা জারের মনে ঘৃণার সঞ্চার করে।

রাশিয়ার দিক থেকে যেমন নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ক্ষোভ ছিল, নেপোলিয়নের দিক থেকেও রাশিয়ার বিরুদ্ধে ক্ষোভের উদ্রেক হয়। নেপোলিয়ন গোপন সূত্রে জানতে পারেন যে, রাশিয়ার শাসক শ্রেণীর উঁচু মহলে নেপোলিয়নকে আক্রমণের জন্যে চিন্তা-ভাবনা চলছে। রুশ সেনার প্রস্তুতি শুরু করা হচ্ছে। রাশিয়া সুইডেনের রাজা বার্ণাডোটকে হাতে রাখার চেষ্টা করছে এবং ব্রিটেনের সঙ্গে এজন্য গোপন আলোচনা চলছে। অষ্ট্রিয়ার কাছ থেকে রাশিয়া প্রতিশ্রুতি আদায় করেছে যে ফ্রাঙ্কো-রুশ যুদ্ধের সময় অষ্ট্রিয়া নিরপেক্ষ থাকবে। এই সকল কারণে নেপোলিয়ন যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা দেখেন।

নেপোলিয়নের মস্কো অভিযানের কোন প্রয়োজন ছিল না বলে কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন। তিনি হঠকারী সিদ্ধান্ত নিয়ে রাশিয়া আক্রমণ করে নিজের সর্বনাশ ঘটান। আলফ্রেড কোব্বানের মতে, ইওরোপের স্থল শক্তিগুলির মধ্যে রাশিয়া ছাড়া আর সকল শক্তি ফ্রান্সের বশ্যতা স্বীকার করে। নেপোলিয়ন রাশিয়াকেও তাঁর সাম্রাজ্য ব্যবস্থার অধীনে আনতে চান। ১৮১২ খ্রীঃ রাশিয়া তুরস্ককে পরাজিত করার পর নেপোলিয়নের আশঙ্কা হয় যে, এবার রাশিয়াই তাঁকে আক্রমণ করবে। কারণ তার ওপর আর তুর্কী যুদ্ধের চাপ নেই। রাশিয়াকে প্রথম আক্রমণের সুযোগ না দিয়ে তিনি "আক্রমণ ঠেকাতে আক্রমণ" বা প্রতিষেধক আক্রমণ করেন। রাশিয়া অভিযান ছিল নেপোলিয়নের অবধারিত নিয়তি (Manifest Destiny)। অপরদিকে কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন যে, জার্মানী ও পোল্যান্ডের সংগঠনের পর নেপোলিয়নের আত্মবিশ্বাস ও রাজ্যলোভ সীমা ছাড়ায়। তিনি রাশিয়া জয় করে গোটা মহাদেশকে পদানত করতে চান।

নেপোলিয়নের রাশিয়া অভিযান ছিল সামরিক ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা। অতীতে উত্তর ইওরোপ হতে আগত যোদ্ধা জাতিগুলি দক্ষিণ ইওরোপ জয় করে বসবাস করে। দক্ষিণ

১· Vincent Cronin. P. 385.

দক্ষিণ উত্তর ইওরোপে অভিযান

ইওরোপ হতে উত্তর ইওরোপ অভিযান ছিল এক বিরল ঘটনা। নেপোলিয়ন সেই নজীরবিহীন বিরল ঘটনার নায়ক ছিলেন। তাঁর রাশিয়া অভিযান এজন্য ইওরোপকে স্তম্ভিত করে। নেপোলিয়ন রাশিয়ার প্রতিকূল আবহাওয়া ও যোগাযোগের অসুবিধার কথা স্মরণ রেখে তাঁর রণপরিকল্পনা রচনা করেন।

নেপোলিয়ন ১৮১২ খ্রীঃ ২৪শে জুন ৬ লক্ষ সেনা সহ রুশ সীমান্ত পার হন। তাঁর পরিকল্পনা ছিল যে, তিনি সম্মুখ যুদ্ধে রুশদের সাবাড় করে দিবেন। কিন্তু রুশ সেনাপতি কুটুজফ

রুশ সেনাপতি কুটুজফের পরোক্ষ রণকৌশল

নেপোলিয়নের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধ এড়িয়ে পিছু হঠে, ফরাসী সেনাদের রুশ দেশের ভেতরে টেনে আনেন। ফরাসী সেনা রাশিয়ার ভেতরে ঢোকার পর তিনি সম্মুখ যুদ্ধ ও পাল্টা আক্রমণ দ্বারা ফরাসী সৈন্যদলকে ধ্বংস করার ব্যবস্থা করেন। রুশ সেনারা সকল প্রকার খাদ্যদ্রব্য ও যোগাযোগের রাস্তা ধ্বংস করে ফেলে। ফলে নেপোলিয়ন সমুদায় সরবরাহ স্বদেশ থেকে আনতে বাধ্য হন। রাশিয়ার ন্যায় দূর দেশে এই সরবরাহ নিয়মিতভাবে বজায় রাখা সহজ কাজ ছিল না।

নেপোলিয়ন রাশিয়ার ভেতর অগ্রসর হলে রুশ সেনাদল পিছু হঠতে থাকে। স্পেনের যুদ্ধ থেকে সেনাপতি কুটুজক এই শিক্ষা নেন যে, নেপোলিয়নকে সম্মুখ যুদ্ধে জয়লাভের সুযোগ দিলে তিনি ফ্রান্সের পেশাদারী সুদক্ষ সেনার সাহায্যে রুশদের পরাজিত করবেন। এজন্য তিনি "পোড়ামাটি প্রতিরোধ নীতি" (Scorched earth policy) নেন। ফলে নেপোলিয়ন দুটি বড় অসুবিধায় পড়েন। প্রথম, তিনি তাঁর দ্রুতগামী সেনাদলের সাহায্যে একটি সম্মুখ যুদ্ধ দ্বারা চমকপ্রদ জয় লাভে বঞ্চিত হন। দ্বিতীয়, তাঁর সরবরাহ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। তাঁর আশা ছিল তিনি রাশিয়ার যুদ্ধ দ্রুত শেষ করবেন। এখন রুশরা যুদ্ধে না গিয়ে পিছু হঠায় এবং পোড়ামাটি নীতি নেওয়ায় তাঁর খাদ্য সরবরাহ বিপর্যস্ত হয়। বোরোডিনের যুদ্ধের আগে তাঁর হাতে মাত্র ১৩ দিনের ময়দা সঞ্চিত ছিল। তিনি মরীয়া হয়ে রুশ সেনাপতি বার্কলের বাহিনীকে ঘিরে ফেলতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। অবশেষে, রুশ জনমত ও জারের অভিজাতদের চাপে সেনাপতি কুটুজুক তাঁর পিছু হঠার পরিকল্পনা বদলে অকস্মাৎ যুদ্ধ করতে মনস্থ করেন। ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮১২ খ্রীঃ মস্কোর নিকটে বোরোডিনো (Borodino) গ্রামে কুটুজফ রুখে দাঁড়ান। বোরোডিনোর

বোরোডিনোর যুদ্ধ মস্কো অধিকার : নেপোলিয়নের পরিচালনার বিফলতা

রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে নেপোলিয়ন জয়লাভ করলেও তাঁর সৈন্য ও রসদের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। নেপোলিয়নের ৩০ হাজার সেনা নিহত হয়। কিন্তু কুটুজকের পরিকল্পনা অনুযায়ী রুশ সেনা আত্মসমর্পণ না করে পুনরায় পিছু হটে যায়। নেপোলিয়ন অরক্ষিত মস্কো নগরী অধিকার করেন। নেপোলিয়নের এই বিজয় ছিল শূন্য বিজয়। কারণ তিনি রাশিয়ার ভূমি অধিকার করলেও, জারের সেনাদল অক্ষত থাকে। ফলে রুশ বাহিনী পাল্টা আঘাত হানতে পারে। ইতিমধ্যে একটি দুর্ঘটনার ফলে ঐতিহাসিক মস্কো নগরী অগ্নিদগ্ধ হয়। মস্কো অধিকারের পর নেপোলিয়ন আশা করেন যে, পরাজিত ও অপমানিত রুশ জার তাঁর সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করবেন। কিন্তু তাঁর আশা বিফল হয়। জার সন্ধি প্রস্তাব না দিয়ে, আসন্ন শীতে পাল্টা আক্রমণের জন্যে প্রস্তুতি চালান।

ইতিমধ্যে নেপোলিয়নের স্পেনের যুদ্ধে বিফলতার খবরও বাতাসে ছড়ায়। এদিকে রাশিয়ায় শীত আরম্ভ হয় ও বরফ পড়ে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে নেপোলিয়নের যেটুকু সরবরাহ ব্যবস্থা ছিল

নেপোলিয়নের প্রত্যাবর্তন : রুশ পাল্টা আক্রমণ : গ্র্যান্ড আর্মি ধ্বংস

তা ভেঙ্গে পড়ে। নেপোলিয়ন বুঝতে পারেন যে, তিনি ভয়ঙ্কর বিপদের জালে পড়েছেন। রুশরা শীতকাল পর্যন্ত তাঁকে ব্যস্ত রেখে পাল্টা আঘাত হানবে। অক্টোবর মাসের ১৯ তারিখে তিনি সেনাদের স্বদেশে দ্রুত ফেরার

হুকুম দেন। নেপোলিয়নের শিবিরে খাদ্যাভাব, শীতের কাপড়ের অভাব ও টাইফাস রোগের মহামারী দেখা দেয়। এই দুঃখ-কষ্টে তাঁর সেনাদলের মনোবল ভেঙ্গে যায়। এদিকে রুশ সেনাদের পাল্টা হানায় রুগ্ন ও ক্ষুধার্ত বহু ফরাসী সেনা মারা পড়তে থাকে। রাশিয়ায় নেপোলিয়নের বহু জাতিক গ্র্যান্ড আর্মি ধ্বংস হয়। ৬ লক্ষ সেনার মধ্যে মাত্র ৫০ হাজার সেনা দেশে ফিরতে পারে। নেপোলিয়নের Grand Army বা বিশাল সেনাদলের এই শোচনীয় পরিণতি ইওরোপে দারুণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। নেপোলিয়নের অপরাজেয় প্রবাদ বিনষ্ট হয়। সর্বত্র তাঁর বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী উত্থান ঘটে। তাঁর সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়ে। ফ্রান্সের ভিতরেও তাঁর বিরুদ্ধে জনমত জাগ্রত হয়। রাজধানী প্যারিসে ম্যালেট নামে এক প্রজাতন্ত্রী সেনাপতি নেপোলিয়নের মিথ্যা মৃত্যু সংবাদ রটিয়ে সরকার দখলের চেষ্টা করে। ম্যালেট ষড়যন্ত্র বিফল হলেও, নেপোলিয়ন আশঙ্কা করেন যে তাঁর সিংহাসন বিপন্ন। মস্কো অভিযান ছিল নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যবাদের "শেষ সঙ্গীত' (swan song)। "ইওরোপের পূর্ব সীমায় রাশিয়াতেই নেপোলিয়ন তাঁর জীবনের সর্বাপেক্ষা বড় বিপদের ঝুঁকি নেন এবং এই পূর্ব দেশের যুদ্ধেই তিনি তাঁর জীবনের প্রথম মারাত্মক বিফলতা বরণ করেন" (It was from the direction of Russia that the greatest threat came, and it was in the east that Napoleon's empire suffered its first shattering blow.—David Thomson)।

নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধ ঃ নেপোলিয়নের পতন (The War of Liberation : Fall of Napoleon) ঃ নেপোলিয়নের মস্কো অভিযানের বিফলতা সমগ্র ইওরোপে নব উন্মাদনা সৃষ্টি করে। নেপোলিয়ন যে অজেয় নন তা প্রমাণিত হলে ইওরোপীয় শক্তিগুলি পুনরায় তাঁর বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হয়। রাশিয়া, প্রাশিয়া, ইংলন্ড চতুর্থ কোয়ালিশন বা শক্তিজোট (Fourth Coalition) গঠন করে নেপোলিয়নের পতন না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালাবার প্রতিজ্ঞা নেয়। নেপোলিয়নের পিছু নিয়ে রুশ বাহিনী তৎক্ষণাৎ ফ্রান্সে ঢুকে পড়তে পারে এমন সম্ভাবনা ছিল। তা সম্ভব হয় নি কারণ, রুশীদেরও প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। প্রাশিয়ার রাজা তখনও ইতস্তত করেন ও অষ্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী মেটারনিক সুবিধাবাদী মনোভাব নেন। এজন্য রাশিয়া আপাততঃ ফ্রান্স আক্রমণে বিরত থাকে।

নেপোলিয়ন হতাশ না হয়ে দ্রুতগতিতে বাধ্যতামূলকভাবে সেনাদলে যোগদান আইন কার্যকর করে নতুন বাহিনী গঠনের উদ্যোগ নেন। তিনি এইভাবে প্রায় ১$\frac{১}{২}$ লক্ষ সেনা সংগ্রহ করেন। নেপোলিয়ন এই সময় বাস্তববুদ্ধি হারিয়ে ফেলেন। তিনি যদি আপোষের চেষ্টা করতেন তবে ঘা-খাওয়া অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া আপোষ প্রস্তাব লুফে নিত। রাশিয়া একা কিছুই করতে পারত না। নেপোলিয়নের হিমালয় প্রমাণ অহমিকা ও আত্মবিশ্বাস তখনও অটুট ছিল। তিনি পুনরায় অস্ত্রের দ্বারা জয়-পরাজয়ের মীমাংসা চান।এদিকে নেপোলিয়নের কঠোর শোষণে তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত জাতিগুলি স্বাধীনতা লাভের জন্যে মরিয়া হয়। তাঁর যুদ্ধের ব্যয় মেটাবার জন্যে তিনি তাঁর সাম্রাজ্যকে শোষণ করে ছিবড়ে করে ফেলেন। তিনি যুদ্ধ ও অন্যান্য কর বাবদ দক্ষিণ ইতালী থেকে ৪$\frac{১}{২}$ কোটি ফ্রাঁ আদায় করেন। ইতালী থেকে ১ লক্ষ সেনা যোগাড় করা হয়। জার্মানীর ওয়েষ্টফ্যালিয়া থেকে তিনি প্রচুর অর্থ ও সেনা যোগাড় করেন। জার্মানীতে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী বিক্ষোভ তীব্র হয়। জার্মান জাতীয়তাবাদের এই জাগরণে প্রাশিয়ার বিশেষ ভূমিকা ছিল। নেপোলিয়নের হাতে শোচনীয় পরাজয়ের পর প্রাশিয়ার পুনর্গঠন আরম্ভ হয়। প্রাশিয়ার দেশপ্রেমিক স্টাইন, হার্ডেনবার্গ প্রভৃতি

জার্মানীতে জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহ : চতুর্থ কোয়ালিশন গঠন

শাসন ও শিক্ষা সংস্কারের মাধ্যমে জার্মান জাতির মনে নব প্রেরণা সঞ্চার করেন। কৃষকেরা লাঙল ফেড়ে, শ্রমিকেরা হাতুড়ি ফেলে, ছাত্ররা বই ছেড়ে জার্মান মুক্তি সংগ্রামে যোগ দেয়। নেপোলিয়ন এর আগে এরূপ জাতীয় বিক্ষোভের সম্মুখীন হন নি। জার্মানীর এই জাগরণ উপলব্ধি করে অপর জার্মান রাষ্ট্র অষ্ট্রিয়া শেষ পর্যন্ত চতুর্থ শক্তিজোটের সামিল হয়। ব্রিটেন ও রাশিয়া এই জোটে সামিল হয়।

চতুর্থ শক্তিজোটের অন্তর্ভুক্ত শক্তিগুলি ফ্রান্স আক্রমণের পরিকল্পনা নেয়। এই উদ্দেশ্যে প্রাশিয়া ও রাশিয়ার সেনাদল প্রাশিয় সেনাপতি ব্লুকারের অধীনে ফরাসী সীমান্তের দিকে এগোয়। দক্ষিণ দিক হতে অষ্ট্রিয়ার বাহিনী এগোতে থাকে। উত্তর দিক থেকে সুইডেনের সেনা যাত্রা করে। নেপোলিয়ন চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত হয়ে তাঁর বিখ্যাত One by One বা 'একের পর এক' নীতি নিয়ে ঝড়ের গতিতে অষ্ট্রিয়াকে আক্রমণ করেন। অষ্ট্রিয়াকে ড্রেসডেনের (Dresden) যুদ্ধে (১৮১৩ খ্রীঃ) তিনি পরাস্ত করেন। কিন্তু নেপোলিয়নের সাফল্য ছিল ক্ষণস্থায়ী। মিত্রশক্তি তাঁকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে। লাইপজিগে (Leipzig) তিনদিন অবিশ্রান্ত যুদ্ধের পর নেপোলিয়ন জার্মানী থেকে পিছু হঠে ফ্রান্সে চলে আসেন। এই যুদ্ধে নেপোলিয়নের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। মাত্র দেড় হাজার সেনা তিনি ফিরিয়ে আনতে পারেন। জার্মানী নেপোলিয়নের শাসন থেকে মুক্ত হয়। নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে। লাইপজিগের যুদ্ধকে জাতিসমূহের যুদ্ধ (Battle of Nations) বলা হয়। কারণ এই যুদ্ধে বিভিন্ন জাতি একযোগে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। তাছাড়া এই যুদ্ধে জনসাধারণের মধ্যে জাতীয়তাবাদী প্রতিক্রিয়া নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে দারুণভাবে দেখা যায়।

লাইপজিগের যুদ্ধ : নেপোলিয়নের পরাজয়

বিজয়ী মিত্রশক্তি নেপোলিয়নের সঙ্গে একটি সম্মানজনক শর্তে সন্ধি স্থাপনের প্রস্তাব করে। এই প্রস্তাবে নেপোলিয়নকে ফ্রান্সের রাজা হিসেবে স্বীকৃতি দান; ফ্রান্সকে রাইন সীমান্ত পর্যন্ত প্রাকৃতিক সীমা স্থাপনের উদার শর্ত দান করা হয়। এই প্রস্তাবের নাম ছিল ফ্রাঙ্কফুর্ট প্রস্তাব। কিন্তু নেপোলিয়ন বেলজিয়াম ছাড়তে রাজী না হওয়ায় এই প্রস্তাব ব্যর্থ হয়। ব্রিটেন, বেলজিয়াম ও হল্যান্ড নেপোলিয়নকে দিতে রাজী ছিল না। নেপোলিয়ন সন্ধি প্রস্তাব নাকচ করলে বিজয়ী মিত্রবাহিনী ফরাসী সীমান্তের পাঁচটি স্থান দিয়ে ফ্রান্সে প্রবেশ করে। ফরাসী জনসাধারণ নেপোলিয়নের স্বৈরশাসনের প্রতি বিরাগ বশতঃ দেশ রক্ষার জন্যে আক্রমণকারীদের বাধাদানে বিরত থাকে। ফলে বিজয়ী মিত্র বাহিনী অনায়াসে প্যারিস নগরী অধিকার করে।

নেপোলিয়ন কর্তৃক সন্ধির প্রস্তাব নাকচ মিত্রশক্তির প্যারিস অধিকার

এদিকে ফ্রান্সের ভেতর আগুয়ান জার্মান বাহিনীর অধিনায়ক সেনাপতি ব্লুকারকে নেপোলিয়ন কয়েকটি খণ্ডযুদ্ধে পরাস্ত করলেও, জার্মান বাহিনীর ক্ষমতা অটুট ছিল। ইংলন্ডের উদ্যোগে শোম্যের সন্ধি (Treaty of Chaumont) দ্বারা মিত্রশক্তির অন্তর্বিরোধ দূর হয়। মিত্রশক্তি প্রতিজ্ঞা করে যে, যতদিন ফ্রান্স সম্পূর্ণ নতজানু না হবে, ততদিন অন্ততঃ কুড়ি বছর এই সন্ধি চালু রাখা হবে। ইংলন্ড আপাতত ৩০ লক্ষ পাউন্ড মিত্রশক্তিকে অর্থ সাহায্য দেয়। প্রতি শক্তি নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে ১$^1/_2$ লক্ষ সৈন্য প্রস্তুত রাখে। শোম্যের সন্ধি এবং প্যারিসে মিত্র সেনার অবস্থান এবং ফ্রান্সে নেপোলিয়নের ভাগ্য সম্পর্কে উদাসীনতা নেপোলিয়নের পতন ঘটায়। মিত্রশক্তির হাতে পরাস্ত ও হতমান নায়ক নেপোলিয়ন ফন্টেনব্লুর সন্ধি (Treaty of Fontainebleau) (১৮১৪ খ্রীঃ) স্বাক্ষর করতে বাধ্য হন। এই সন্ধির ফলে তিনি ফ্রান্সের সিংহাসন ত্যাগ করে এলবা দ্বীপে নির্বাসনে চলে যান। তাঁকে ২ মিলিয়ন ফ্রাঁ পেনসন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। তাঁকে এলবা

ফন্টেনব্লুর সন্ধি ১৮১৪ খ্রীঃ

দ্বীপের রাজা হিসেবে স্বীকার করা হয়। নেপোলিয়নের রাজনৈতিক জীবনের ওপর আপাততঃ যবনিকা নেমে আসে।

নেপোলিয়নের প্রত্যাবর্তন ঃ একশত দিবসের রাজত্ব (Return of Napoleon : The Hundred Days) ঃ ইওরোপীয় শক্তিজোটের দ্বারা পরাস্ত হয়ে এলবা দ্বীপে নির্বাসিত হলেও নেপোলিয়ন তাঁর উচ্চাকাঙ্খা ত্যাগ করেননি। এলবা দ্বীপ থেকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তিনি ফ্রান্সের পরিস্থিতি লক্ষ্য করেন। বিজয়ী মিত্রশক্তিবর্গ ফ্রান্সের সিংহাসন থেকে নেপোলিয়নকে সরিয়ে বুরবোঁ বংশীয় অষ্টাদশ লুইকে স্থাপন করে। নেপোলিয়নের পতনের পর দেশত্যাগী এমিগ্রি বা উদ্বাস্তু অভিজাতরা ফ্রান্সে ফিরে এসে তাদের বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি উদ্ধারের জন্যে মহা গোলযোগ সৃষ্টি করায়, ফরাসী জনসাধারণ বুরবোঁ শাসনের প্রতি বিরক্ত হয়। নেপোলিয়ন এই সুযোগে এলবা ত্যাগ করেন। তিনি ব্রিটিশ নৌ-বহরের দৃষ্টি এড়িয়ে দক্ষিণ ফ্রান্সে নেমে পড়েন। বুরবোঁ সরকারের অধিকাংশ সেনা নেপোলিয়নের প্রতি আনুগত্য জানায। নেপোলিয়ন তাঁর অনুগত সেনাদলসহ প্যারিসের দিকে এগোলে বুরবোঁ রাজা অষ্টাদশ লুই ফ্রান্স ছেড়ে প্রাণভয়ে পালান। নেপোলিয়ন পুনরায় ফ্রান্সের সিংহাসনে বসেন।

এলবা হতে নেপোলিযনেব প্রত্যাবর্তন

বিজয়ী মিত্রশক্তি এই সময় অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা নগরীতে ইওরোপের পুনর্গঠনের আলোচনায় ব্যস্ত ছিল। নেপোলিযনের ফ্রান্সে ফিরে আসবার খবর পেয়ে তারা ফ্রান্স আক্রমণের জন্যে দ্রুত সেনা সন্নিবেশ করে। ডিউক অফ ওয়েলিংটনের নেতৃত্বে ইংরাজ বাহিনী বেলজিয়ামের পথে ফরাসী সীমান্তের দিকে আগায়। প্রাশিয়ার সেনাপতি ব্লুকারের নেতৃত্বে প্রাশিয় বাহিনী ফরাসী সীমান্তের দিকে ছুটে চলে। ইতালী থেকে অষ্ট্রিয়া ও সার্ডিনিয়ার বাহিনী দক্ষিণ ফ্রান্সে ঢোকার চেষ্টা করে।

মিত্রশক্তি ফ্রান্স অভিযান

নেপোলিযন দেখেন যে, তাঁর সৈন্য সংখ্যা অপেক্ষা শত্রুর সৈন্য সংখ্যা বহু গুণ বেশী। তিনি এতে হতবুদ্ধি না হয়ে One by One Policy বা 'একের পর এক' নীতি অনুসরণ করেন। তিনি সর্বপ্রথম ডিউক অফ ওয়েলিংটনকে যুদ্ধ দানের জন্যে বেলজিয়ামের অভিমুখে যাত্রা করেন। কোয়াত্রা ব্রার (Quatre Brass) যুদ্ধে ফরাসী সেনাপতি মার্শাল নে, ইঙ্গ-বেলজীয় সেনাদলকে পরাস্ত করেন। এর পর নেপোলিয়ন এগিয়ে বেলজিয়ামের ওয়াটার্লু গ্রামের নিকট ডিউক অফ ওয়েলিংটনের পরিচালনাধীন ইংরাজ ফৌজের সম্মুখীন হন। নেপোলিয়নের সঙ্গে যুদ্ধ আসন্ন দেখে ইংরাজ সেনাপতি ডিউক অফ ওয়েলিংটন দ্রুতগামী অশ্বারোহী দ্বারা প্রাশিয় সেনাপতি ব্লুকারকে তাঁর সঙ্গে যোগদানের জন্যে বার্তা পাঠান। সেনাপতি ব্লুকারকে পথে আটকাবার জন্যে সেনাপতি গ্রুসিকে পাঠান। কিন্তু ব্লুকারের গতিরোধ করা গ্রুসির পক্ষে সম্ভব হয়নি। ওয়াটার্লুর যুদ্ধ চলার সময় ব্লুকার সসৈন্যে ডিউক অফ ওয়েলিংটনের সঙ্গে যোগ দিলে নেপোলিয়ন এই দুই বাহিনীর সাঁড়াশী আক্রমণে হতবল হন। তিনি ২৫ হাজার ফরাসী সৈনিকের প্রাণ বলি দিয়ে, ওয়াটার্লু রণক্ষেত্র (১৮১৫ খ্রীঃ) থেকে প্যারিসে পালিয়ে আসেন। ওয়াটার্লুর যুদ্ধ ছিল মহাবীর নেপোলিয়নের জীবনের শেষ যুদ্ধ। এই যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে তাঁর ভাগ্যরবি চিরতরে অস্তমিত হয়।

ওয়াটার্লু যুদ্ধ নেপোলিযনেব পবাজয়

নেপোলিয়ন প্যারিস থেকে দক্ষিণ ফ্রান্সের রচিফোর্ট বন্দরে পালান। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল জাহাজ যোগে ফ্রান্স থেকে সরে পড়া। তিনি হতাশার সঙ্গে দেখেন যে, ব্রিটিশ নৌ-বহর তাঁর পালাবার পথ বন্ধ করে দক্ষিণ ফ্রান্সের উপকূল অবরোধ করেছে। স্থলভাগে এবং জলভাগে বেষ্টিত হয়ে নেপোলিয়নকে বাধ্য হয়ে

নেপোলিয়নের সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসন

আত্মসমর্পণ করতে হয়। তিনি রচিফোর্ট বন্দরে বেলারোফোন যুদ্ধ জাহাজের ইংরাজ ক্যাপ্টেন হোওয়ার্ডের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে ভূমধ্যসাগরের সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসিত করেন। এই স্থানে নিষ্ঠুর হৃদয় ইংরাজ গভর্ণরের তত্ত্বাবধানে তিনি নজরবন্দী থাকেন। সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নেপোলিয়ন ৬ বছর ছিলেন। এই সময় তিনি অন্ত্রের ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হলেও তিনি তাঁর আত্মজীবনী রচনা করেন। উদ্যান রচনা, বৃক্ষরোপণ, নাটক অনুষ্ঠান প্রভৃতি কাজের মধ্যে তিনি তাঁর হতাশাকে দমিয়ে রাখতেন। অবশেষে ১৮২১ খ্রীঃ ৫ই মে তিনি দেহত্যাগ করেন।

পাঠ্যসূচী

১। Markham—Napoleon and the Awakening of Europe.
২। Thomson—Napoleon Bonaparte; His Rise and Fall.
৩। Cobban—History of France (Penguine Edition). Vol. II
৪। David Thomson—Europe since Napoleon.
৫। V. Cronin—Napoleon.
৬। Fisher—Bonapatism.
৭। Emil Ludwig—Napoleon.

অষ্টম অধ্যায়

নেপোলিয়নের পতনের কারণ ঃ তাঁর কৃতিত্ব বিচার
(Causes of Napoleon's downfall : Assessment of his achievements)

নেপোলিয়নের পতনের কারণ (The Causes of Napoleon's downfall) ঃ নেপোলিয়ন বিপ্লবের তরঙ্গ চূড়ায় আরোহণ করে ফরাসী সিংহাসনে উপনীত হন। বিপ্লবের বাতাস তাঁর পালে লাগিয়ে তিনি ইওরোপে তাঁর বিজয় তরণী ভাসিয়ে দেন। একে একে ইওরোপের বৃহৎ শক্তিগুলি তাঁর নিকট নতশির হয়। কিন্তু এক দশকের মধ্যেই নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে। লাইপজিগ ও ওয়াটার্লুর যুদ্ধে পরাজিত নেপোলিয়ন হতমান হয়ে সেন্ট হেলেনায় নির্বাসনে প্রাণত্যাগ করেন।

নেপোলিয়নের পতনের সূচনা পর্ব

ঐতিহাসিক টমসনের মতে [১] এ্যামিয়েন্সের সন্ধি ভঙ্গের পর (১৮০২ খ্রীঃ) নেপোলিয়নের পতনের সূচনা হয়। গ্র্যান্ট ও টেম্পারলির মতে, ১৮০৭ খ্রীঃ টিলজিটের সন্ধির পর নেপোলিয়নের পতনের সূচনা দেখা যায়।[২] নেপোলিয়নের শাসননীতি ও সাম্রাজ্যের গঠনের মধ্যেই তাঁর পতনের বীজ লুকান ছিল। ১৮০২ খ্রীঃ অথবা ১৮০৭ খ্রীঃ থেকে তাহা প্রকট হতে থাকে। নেপোলিয়নের পতনের কারণগুলিকে বিভিন্ন দিক থেকে বিচার করা যায়।

নেপোলিয়নের ক্ষমতার মূল উৎস ছিল ফ্রান্স। এই দেশের জনসাধারণ বিশেষতঃ বুর্জোয়া শ্রেণীর সমর্থন এবং এই দেশের সম্পদের ওপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ তাঁকে ইওরোপের ওপর আধিপত্য এনে দেয়। ১৭৯৯ খ্রীঃ নেপোলিয়ন ফরাসী জাতির কাছে ছিলেন বিপ্লবের মূল্যবান সংস্কারের সংগঠক এবং শৃঙ্খলা স্থাপক। ১৮১৪ খ্রীঃ সেই নেপোলিয়ন ছিলেন ফরাসী জাতির ঘৃণার পাত্র। তাঁর স্বৈরশাসন ফরাসী জাতির নিকট জনপ্রিয়তা বিনষ্ট করে। গণতন্ত্রকে ধ্বংস করার জন্যে ফরাসী জনসাধারণের নিকট তাঁর মহিমা বিনষ্ট হয়। গোড়ার দিকে বৈদেশিক যুদ্ধে জয়লাভের ফলে তাঁর কিছুটা জনপ্রিয়তা থাকলেও, ক্রমে তা নষ্ট হয়। ডেভিড টমসনের মতে, "নেপোলিয়নের স্বৈর শাসনে ফ্রান্স ক্রমে একটি পুলিশ রাষ্ট্রে পরিণত হয়।"[৩] পেনিনসুলার এবং রুশ যুদ্ধে বিফলতার ফলে তাঁর স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখা দেয়। তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীরাও তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্তে যোগ দেয়। তাঁর পুলিশ বিভাগের প্রধান ফুশে (Fouche) এবং তাঁর কূটনৈতিক দপ্তরের কর্তা ট্যালির‍্যান্ড (Talleyrand) এমন কি তাঁর ভ্রাতা যোসেফ বোনাপার্টও (Joseph Bonaparte) এই চক্রান্তের বাইরে ছিলেন না। ফরাসী নেতারা বুঝতে পারেন যে, নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য জয়ের ফলে ফরাসী জাতির কোন লাভ হয়নি। বরং এজন্য তাদের জীবন ও অর্থ বলি দিতে হচ্ছে।

নেপোলিয়নের পুলিশ রাষ্ট্র ঃ তাঁর জনপ্রিয়তা হ্রাস

---

১. Thomson—Nepoleon Bonaparte; His Rise and Fall.

২. "The year 1807 marks the zenith of Napoleon's power". Grant and Temperley—Europe in the 19th and the 20th Century.

৩. "France relapsed more and more into a police state under an autocracy." David Thomson—Europe since Napoleon. P. 41.

ফ্রান্সের সাধারণ নাগরিকদের কাছ থেকে ১৮১৪ খ্রীঃ নেপোলিয়ন সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। ১৭৯৩ খ্রীঃ বৈদেশিক আক্রমণের মুখে যে ফরাসী জাতি অদম্য উৎসাহে শত্রুদের বিতাড়িত করে, ১৮১৩ খ্রীঃ লাইপজিগে তাঁর পরাজয়ের পর শত্রুসেনা ফ্রান্সে ঢুকে পড়লে সেই ফরাসী জাতি ছিল উদাসীন, অবিচল। এমনকি "পিতৃভূমি বিপন্ন" (La Patrie endanger) এই ধ্বনি নেপোলিয়ন তুললেও তাতে কোন ফল হয়নি। হাস্যকরভাবে মুষ্টিমেয় শত্রুসেনার কাছে ফ্রান্সের এক একটি শহর নীরবে আত্মসমর্পণ করে। গোটা দেশে এই নীরব দাবী ওঠে যে, "আর যুদ্ধ নয়। শান্তিই এখন জাতি চায়।" নেপোলিয়ন সেই জাতির সেই নীরব দাবী শোনেননি। তাই এপিন্যাল শহর ৫৩ জন কসাক সেনা, রেইমস শহর এক প্রেটুন জার্মান, শেনমো মাত্র একজন শত্রু অশ্বারোহীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। জাতি প্রায় বিনা প্রতিরোধে শত্রুসেনাকে ফ্রান্সে ঢুকতে দেয়। এর মূল কারণ ছিল যে, নেপোলিয়ন সাধারণ জনগণের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। লেজিসলেটিভ বডি ২২৩×৫১ ভোটে প্রস্তাব নেয় যে—"আজ পিতৃভূমির দ্বারে শত্রুসেনা···· আমাদের বাণিজ্য, শিল্প ধ্বংস প্রায়···· আজ একটি বিরক্তিকর শাসনব্যবস্থা, অতিরিক্ত করভার, নিষ্ঠুরভাবে সৈন্য সংগ্রহ এবং এক বর্বর যুদ্ধের চাপে ফরাসী জাতি ধ্বংসের মুখে।" আইনসভার এই প্রস্তাব প্রমাণ করে যে, নেপোলিয়ন গোটা জাতির সমর্থন হারান। এটাই ছিল তাঁর পতনের আসল কারণ।[১]

ফরাসী জাতির আনুগত্য থেকে বিচ্ছিন্নতা

নেপোলিয়নের ইওরোপ জয়ী সেনাদলের চরিত্র ক্রমে ক্রমে বদলে যায়। নিরন্তর যুদ্ধ-বিগ্রহ চলার জন্যে নেপোলিয়নের অভিজ্ঞ ও যুদ্ধপটু সেনানীরা নিহত হয়। অনভিজ্ঞ লোক নিয়ে সেনাদল গঠন করায় সেনাদলের গঠন দুর্বল হয়। নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য যতই বিস্তৃত হয়, ততই বিভিন্ন দেশে যুদ্ধ ও পাহারার জন্যে বহু সেনার দরকার হয়। ফ্রান্সের লোকবল যথেষ্ট না থাকায়, তিনি পদানত ইতালী, জার্মানী, বেলজিয়াম থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে এই অভাব পূরণ করেন। এর ফলে সেনাদলের জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট হয়। এই সকল বিদেশী সেনার মধ্যে বৈপ্লবিক উন্মাদনা ও নেপোলিযনের প্রতি ব্যক্তিগত আনুগত্য ছিল না। রাশিয়ার যুদ্ধে নেপোলিয়নের হার আরম্ভ হলে এই বাহিনীর ঐক্য ও মনোবল ভেঙে যায়। নেপোলিয়নের যুদ্ধ কৌশলগুলির চমকপ্রদ ক্ষমতা ক্রমে নষ্ট হয়। এই যুদ্ধ কৌশল শত্রুপক্ষের সেনাপতিরা শিখে নেয়। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী সেনাপতিরা এই রণকৌশল আয়ত্ব করে এই কৌশল তাঁর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে। ফলে নেপোলিয়ন গোড়ার দিকে তাঁর রণকৌশলের যে সকল সুবিধা ভোগ করতেন তা আর বিদ্যমান ছিল না।[২]

নেপোলিযনেব সেনাদলেব ক্রমিক দুর্বলতা

কূটনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে নেপোলিয়ন কয়েকটি মারাত্মক ভুল করেন। তাঁর আত্মপ্রত্যয় ও অহমিকা এমনই বেড়ে যায় যে, তিনি কারও পরামর্শ গ্রাহ্য করতেন না। গোড়ার দিকে তাঁর মধ্যে যে সাবধানতা ও রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি দেখা যায়, পরবর্তীকালে তার স্থলে একটি জেদী ও হঠকারী মনোভাব প্রবল হয়ে ওঠে। তিনি জীবনের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ সুযোগ তাঁর জেদের বশে হারান। তিনি অন্ধভাবে ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত অনুসরণ করেন। এই জেদ ও অহঙ্কারবশতঃ তিনি একটির পর একটি ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত নেন। প্রথমতঃ, নেপোলিয়নের স্পেন আক্রমণ ছিল নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। দ্বিতীয়তঃ, রাশিয়া আক্রমণ ছিল তাঁর দ্বিতীয় ভ্রান্তি। তৃতীয়তঃ, লাইপজিগের যুদ্ধের পর বিজয়ী মিত্রশক্তি তাঁকে ফ্রাঙ্কফুর্ট প্রস্তাব দ্বারা সম্মানজনক সন্ধির শর্ত

নেপোলিয়নের অহমিকাবোধ : কূটনৈতিক ও সামরিক ভ্রান্তি

১· Cobban—Vol. II.

২· David Thomson. P. 51.

দেয় তাহা অগ্রাহ্য করে তিনি চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেন। লাইপজিগের যুদ্ধের পর মিত্রশক্তি তাঁকে ফ্রান্সের রাজপদ দিতে রাজী হয়। কেবলমাত্র তাঁকে বেলজিয়াম ও হল্যান্ড ছাড়তে বলা হয়। নেপোলিয়ন তখনও পর্যন্ত তাঁর শক্তিকে অজেয় মনে করতেন। তিনি বেলজিয়াম ছাড়তে রাজী হননি। তিনি এই সন্ধি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে জীবনের শ্রেষ্ঠ ভুল করেন।

নেপোলিয়নের শাসনেব দুর্বল ভিত্তি

নেপোলিয়ন বংশানুক্রমিক রাজা ছিলেন না। তিনি তাঁর সামরিক প্রতিভাবলে ফ্রান্স ও ইওরোপে আধিপত্য স্থাপন করেন। তাঁর এই ভুঁইফোড় সামরিক একনায়কতন্ত্রের (upstart military dictatorship) গৌরবময় অতীতের মহিমা অথবা বংশ গরিমা ছিল না। তাঁর সাম্রাজ্য ও শাসন নিরন্তর সামরিক সাফল্য অথবা ফরাসী জনসাধারণের অকুণ্ঠ সমর্থন পেলে তবেই টিকে থাকতে পারত। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি সামরিক সাফল্য এবং ফরাসী জাতির আনুগত্য এই দুটিই ১৮১০ খ্রীঃ পর থেকে হাবান। নেপোলিয়ন এজন্য তাঁর ভ্রাতা জোসেফকে বলেন, "আমি যতদিন শক্তিশালী থাকব ততদিন আমাব সাম্রাজ্য থাকবে।" কিন্তু স্পেনের যুদ্ধ বিশেষতঃ রাশিয়া অভিযানের পর থেকে নেপোলিয়নের সামরিক বিফলতা দেখা দেয়। স্বদেশে তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত শুরু হয়। তাঁর শাসনব্যবস্থার এই দুর্বল ভিত্তিই ছিল তাঁর পতনের কারণ।

নেপোলিয়ন প্রথমদিকে যে সামরিক সাফল্য লাভ করেন তার অন্যতম কারণ ছিল শত্রুপক্ষের দুর্বলতা এবং একতার অভাব। এই সময় নেপোলিয়ন ভেদনীতি ও সামরিক চাপ দ্বারা শত্রু জোটগুলি ভাঙতে সক্ষম হন। কিন্তু চতুর্থ শক্তিজোট গঠিত হলে নেপোলিয়নের

মিত্রশক্তিব জোট ও নেপোলিযনেব বিবোধিতা

পক্ষে তা ভাঙা সম্ভব হয়নি। কারণ এই জোটের সদস্যরা নেপোলিয়নের পতন না ঘটা পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাতে সঙ্কল্প নেয়। ইংলন্ড এই জোটকে অর্থ ও নেতৃত্ব দেয়। ইওরোপের সম্মিলিত শক্তিগুলির বিরুদ্ধে নেপোলিয়নের জনবল ও সম্পদ ছিল নগণ্য। কোন কোন ঐতিহাসিক এজন্য বলেন যে, জাতীয়তাবাদী বিক্ষোভের ফলে নয়, অথবা স্পেনের গেরিলা যুদ্ধের ফলে নয়, ইওরোপীয় বৃহৎ শক্তিগুলির জোট বিশেষতঃ চতুর্থ জোট গঠনের ফলেই নেপোলিয়নের পতন ঘটে। মহাদেশীয় অবরোধের কুফলের জন্যে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রজোট গড়া হয়নি। ইওরোপীয় রাজশক্তিগুলি বুঝতে পারে যে, যতক্ষণ নেপোলিয়ন ক্ষমতায় থাকবেন ততক্ষণ তাঁদের সিংহাসন নিরাপদ নয়। এই রাজশক্তিগুলির সামরিক জোটই নেপোলিয়নের পতন ঘটায়। প্রথম তিনটি জোট তিনি কূটনীতি ও সামরিক জয় দ্বারা ভাঙতে পারলেও চতুর্থ জোট ও শোমোর সন্ধি (Treaty of Chaumont) তাঁর পতন অনিবার্য করে।

নেপোলিয়নের পতনের অপর কারণ ছিল তাঁর বিরুদ্ধে ইওরোপের বিভিন্ন দেশে জাতীয়তাবাদী অভ্যুত্থান। ডেভিড টমসনের মতে, নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যের "অন্তর্নিহিত, আত্মঘাতী স্ব-বিরোধ, তাঁর পতনের জন্যে দায়ী ছিল।"[১] ফরাসী বিপ্লবের যে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের আদর্শের প্রচার করে নেপোলিয়ন ইওরোপ জয় করেন, তাঁর সাম্রাজ্য ছিল সেই আদর্শের বিরাট ব্যতিক্রম। তিনি ইওরোপীয় রাজাদের স্বৈরশাসন ও বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে ঘোষণা দিলেও, নিজে স্বৈরশাসন ও বংশানুক্রমিক অধিকার স্থাপন করেন। তিনি

সাম্রাজ্যেব অন্তর্নিহিত স্ববিরোধ

স্বাধীনতার কথা বলেন অথচ অন্য জাতির ওপর ফরাসী শাসন চাপান। ইতালী, জার্মানী প্রভৃতি দেশের অধিবাসীরা বুঝতে পারে যে, নেপোলিয়নের শাসন পুরাতন রাজশক্তি অপেক্ষা কম স্বৈরাচারী নয়। দ্বিতীয়তঃ, নেপোলিয়ন তাঁর অধিকৃত রাজ্য হতে বাধ্যতামূলক সৈন্য সংগ্রহ, যুদ্ধ কর এবং

১· "The Napoleonic Empire was doomed because of its inherent and self defeating contradictions."—David Thomson. P. 42.

সম্পদ আহরণ করার ফলে তাঁর সাম্রাজ্যবাদী শোষণ প্রকট হয়। তদুপরি, তিনি অধিকৃত দেশে কন্টিনেন্টাল সিস্টেম চালু করায় এই দেশগুলির দুর্দশার একশেষ হয়। নেপোলিয়নের শাসনব্যবস্থা ঘৃণিত হয়। এই কারণে তাঁর বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত গণ-অভ্যুত্থান দেখা দেয়। ইওরোপের বিভিন্ন দেশে জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহ নেপোলিয়নের পতন ঘটায়।

কোন কোন ঐতিহাসিক নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী প্রতিরোধকে গুরুত্বহীন মনে করেন। তাঁরা বলেন যে, তাঁর বিরুদ্ধে ইওরোপের সর্বত্র গণঅভ্যুত্থান হয়নি। স্পেনে গেরিলা যুদ্ধ দেখা দিলেও তা কখনও নেপোলিয়নের পতন ঘটাতে পারত না, যদি না বৃহৎ শক্তির রাষ্ট্রজোট নেপোলিয়নকে ধ্বংস করতে এগিয়ে আসত। নেপোলিয়নের হাতে যে সেনাদল ছিল তার দ্বারা তিনি এই জাতীয়তাবাদী প্রতিরোধকে চূর্ণ করতে পারতেন। তিনি বৃহৎ শক্তির জোটের সম্মুখীন হতে বাধ্য হলে তাঁর পক্ষে জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহ দমন করার সময় ও সুযোগ কমে যায়। ডেভিড টমসন প্রভৃতি ঐতিহাসিক জাতীয়তাবাদী প্রতিরোধকে বিশেষ গুরুত্ব দেন। ইওরোপের বৃহৎ শক্তির বেতনভোগী পেশাদারী সেনাদের তাঁর চমকপ্রদ রণকৌশল ও ঝটিকা আক্রমণ দ্বারা নেপোলিয়ন ছত্রভঙ্গ করতে পারতেন। কিন্তু গোটা একটি জাতি তাঁর বিরুদ্ধে মরণপন দীর্ঘ সংগ্রাম চালালে তার মোকাবিলা করার ক্ষমতা তাঁর ছিল না।

স্পেন আক্রমণ ছিল নেপোলিয়নের একটি মারাত্মক ভুল। তিনি স্পেনের ন্যায় একটি ক্ষুদ্র দেশকে পরাস্ত করতে না পারায় তাঁর সামরিক মর্যাদা বিনষ্ট হয়। স্পেনের যুদ্ধে ফ্রান্সের বিখ্যাত

স্পেনের যুদ্ধ ঃ মারাত্মক ফল

সেনাপতি মেসানা পর্যন্ত পরাস্ত হন। ১৮০৮ খ্রীঃ নেপোলিয়নের ২৩ হাজার সেনা স্পেনীয়দের হাতে বন্দী হয়। স্পেনের যুদ্ধে নেপোলিয়নের মোট অর্দ্ধ মিলিয়ন সেনা নিহত হয়।[১] স্পেনে হস্তক্ষেপ করার ফলে তিনি ইংরাজ সেনার স্পেনে আসার পথ প্রস্তুত করেন। ইংরাজ সেনাপতি ডিউক অফ ওয়েলিংটন স্পেনবাসীদের গেরিলা যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন। স্পেনের যুদ্ধ ছিল জাতীয়তাবাদী যুদ্ধ। স্পেনেই নেপোলিয়ন সর্বপ্রথম একটি সমগ্র জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বাধ্য হন। এই জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহের নজির অন্য দেশগুলিকে প্রেরণা যোগায়। এছাড়া স্পেনের যুদ্ধ শেষ না করে নেপোলিয়ন রুশ যুদ্ধে লিপ্ত হন। ইহা ছিল তাঁর মারাত্মক ভুল।[২] রাশিয়ার যুদ্ধে তাঁর প্রচুর সেনার দরকার হলেও তার বৃহৎ ভাগ স্পেনে আটকে থাকে। ১৮১২-১৩ খ্রীঃ গড়ে ২ লক্ষ ৯০ হাজার থেকে ২ লক্ষ ২৪ হাজার সেনা স্পেনে নিয়োজিত থাকায় পূর্ব ইওরোপের যুদ্ধে তিনি পূর্ণশক্তি প্রয়োগ করতে পারেননি। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন যে, নেপোলিয়নের স্পেনের যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি বিষয়ে অতিশয়োক্তি করা হয়। নেপোলিয়নের ভাগ্য স্পেনের যুদ্ধে নির্দ্ধারিত হয়নি, তা হয় রাশিয়ার যুদ্ধে। কিন্তু নেপোলিয়ন নিজে মনে করতেন যে, "স্পেনের ক্ষতেই তাঁর সর্বনাশ হয়" (The Spanish ulcer ruined me)। স্পেনের যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ফল অপেক্ষা পরোক্ষ ফল ছিল মারাত্মক। স্পেনেই নেপোলিয়ন সর্বপ্রথম পরাজয়ের তিক্ত স্বাদ গ্রহণ করেন। স্পেনেই তাঁর মুক্তিদাতার মুখোশ খুলে পড়ে। স্পেনের যুদ্ধে তাঁর ঝটিকা আক্রমণের রণকৌশল ব্যর্থ হয়। নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে স্পেনের সফলতা গোটা ইওরোপকে অনুপ্রাণিত করে।

কেহ কেহ বলেন যে, রাশিয়া অভিযান ছিল নেপোলিয়নের Manifest destiny বা অবধারিত নিয়তি। পশ্চিম ইওরোপে ইংলন্ড ব্যতীত অন্য শক্তিগুলি তাঁর পদানত হলে,

১. David Thomson. P. 50.
২. David Thomson. P. 45.

মস্কো অভিযানের যৌক্তিকতা বিচার

শক্তিসাম্যের জন্যে নেপোলিয়ন রাশিয়া আক্রমণ করতে বাধ্য হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলারকেও এই অনিবার্য নিয়তির সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু এই অভিমত গ্রহণীয় নহে। ইংলন্ডকে অপরাজিত রেখে পূর্বে রাশিয়া আক্রমণ ছিল প্রকাণ্ড ভুল। তাছাড়া নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যের ভিত্তি ছিল দুর্বল। তাঁর বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। এই অবস্থায় রাশিয়া আক্রমণ ছিল প্রকাণ্ড ভুল। রাশিয়ার সঙ্গে মিত্রতা রক্ষা করলে নেপোলিয়ন অধিকতর লাভবান হতেন এমনকি রাশিয়া ও ফ্রান্স যুগ্মভাবে আফগান কাবুলের পথে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আক্রমণ করার পরিকল্পনায় হাত দিলে ইংরাজ নাস্তানাবুদ হত। কিন্তু নেপোলিয়ন এই সকল বিবেচনা না করে মস্কো অভিযান করেন।

রাশিয়া ছিল একটি বৃহৎ দেশ। বিশাল জনবল ও সম্পদের অধিকারী রুশ জারকে পরাস্ত করা সহজ কাজ ছিল না। রুশ সেনাপতি কুটুজফ ছিলেন এক অভিজ্ঞ রণপণ্ডিত। তিনি

মস্কো অভিযানের ফলাফল

নেপোলিয়নকে বাধা না দিয়ে পিছু হঠতে থাকেন নেপোলিয়ন তাঁর পিছু নিয়ে রাশিয়ার গভীরে প্রবেশ করেন। অতঃপর কুটুজফ আঘাত হানলে নেপোলিয়ন বিভ্রান্ত হন। রুশ ভল্লুকের মরণ আলিঙ্গনে নেপোলিয়নের ঈগলের মৃত্যু হয় নেপোলিয়নের গ্র্যান্ড আর্মি বা বিখ্যাত সেনাদল রাশিয়ার বরফ, শীত ও কসাক আক্রমণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। রাশিয়ায় নেপোলিয়নের বিরাট পরাজয় ঘটলে ইওরোপের সর্বত্র তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দেয়। মস্কো অভিযান ছিল নেপোলিয়নের সর্বাপেক্ষা নাটকীয় এবং ক্ষতিকারক পরাজয়।

নেপোলিয়নের প্রবর্তিত কন্টিনেন্টাল সিস্টেম বা মহাদেশীয় প্রথা তাঁর পতনের পথ তৈরি করে। ইংলন্ডের বিরুদ্ধে অবরোধ কার্যকরী করার জন্যে নেপোলিয়নকে ইওরোপের উপকূলবর্তী

কন্টিনেন্টাল সিস্টেমের ফলাফল

নিরপেক্ষ দেশগুলিকে একের পর এক অধিকার করতে হয়। এর ফলে তাঁর সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র প্রকট হয়। দ্বিতীয়তঃ, ইওরোপের বৃহৎ অঞ্চল জুড়ে সৈন্য সংস্থান করলে তাঁর সেনাদল দুর্বল হয়ে পড়ে। তৃতীয়তঃ, পোপ কন্টিনেন্টাল সিস্টেম গ্রহণ করতে অরাজী হলে নেপোলিয়ন পোপকে বন্দী করে ক্যাথলিক জগতের জনপ্রিয়তা হারান। স্পেন কন্টিনেন্টাল সিস্টেম গ্রহণে অরাজী হলে নেপোলিয়ন স্পেনের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। চতুর্থতঃ, এই অবরোধের ফলে জার্মানী প্রভৃতি দেশগুলিতে লোকের দুঃখ-দুর্দশা দেখা দেয়। এর ফলে নেপোলিয়নের শাসনব্যবস্থার প্রতি আস্থা নষ্ট হয়। তাঁর বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী বিক্ষোভ তীব্র হয়। রুশ জার অবরোধ ত্যাগ করায় নেপোলিয়নের সঙ্গে জারের বিরোধ দেখা দেয়। নেপোলিয়ন বিজিত ও মিত্র দেশগুলির স্বাভাবিক বাণিজ্য বন্ধ করেন। এই দেশগুলির উৎপাদন ব্যবস্থার তাতে দারুণ ক্ষতি হয়। স্পেনের যুদ্ধ বা রাশিয়ায় পরাজয় না ঘটলেও নেপোলিয়নের এই অবরোধ নীতির ফলে শেষ পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে সর্বত্র গণবিদ্রোহ ঘটত। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন যে, মহাদেশীয় অবরোধের কুফল সম্পর্কে অতিশয়োক্তি করা হয়। নেপোলিয়নের পতনের মূল কারণ রাজনৈতিক। অর্থনৈতিক কারণ তাঁর জনপ্রিয়তার ক্ষতি করলেও তাঁর পতন এজন্য হয়নি। ফ্রান্সের ভেতর তাঁর শাসনের প্রতি গভীর অনাস্থা এবং তাঁর বিরুদ্ধে ইওরোপীয় রাজাদের শক্তিজোটই তাঁর পতনের জন্যে দায়ী ছিল।

সর্বশেষে, ইংলন্ডের নৌশক্তি নেপোলিয়নের কন্টিনেন্টাল সিস্টেমকে ভেঙে ফেলে। ট্রাফালগারের যুদ্ধে জয়লাভের পর ইংলন্ড সমুদ্র পথে অপরাজেয় হয়। ফ্রান্সে মালের আমদানি-রপ্তানি ইংলন্ড একেবারে বন্ধ করে। ফ্রান্স কর্তৃক ইংলন্ডকে অবরোধের বদলে,

ইংলণ্ডের নৌ-শক্তির প্রভাব

ইংলণ্ডই ফ্রান্সকে অবরোধ করে। ইংলণ্ড বুঝতে পারে যে, নেপোলিয়নের অবরোধ সফল হলে ইংলণ্ডের বাণিজ্য ও বাজার ধ্বংস হবে। সুতরাং নেপোলিয়নের ক্ষমতা ধ্বংসের জন্যে ইংলণ্ড প্রভূত চেষ্টা ও অর্থ ব্যয় করে একের পর এক শক্তিজোট গড়ে তুলে। ইংলণ্ড চতুর্থ শক্তিজোট গড়লে এই জোট নেপোলিয়নকে চূড়ান্তভাবে পরাস্ত করে।

নেপোলিয়নের পতন বিভিন্ন কারণে ঘটলেও তাঁর সাম্রাজ্যের মধ্যে স্ব-বিরোধিতা, তাঁর স্বৈরশাসন এবং তাঁর বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী প্রতিরোধ ছিল তাঁর পতনের মূল কারণ। ইংলণ্ডের বিরোধিতাও অন্যতম মূল কারণ ছিল।

নেপোলিয়নের কৃতিত্ব বিচার (Assessment of Napoleonic Rule) ঃ "১৭৯৯ খ্রীঃ হতে ১৮১৪ খ্রীঃ পর্যন্ত ফ্রান্সের ইতিহাসকে কেন্দ্র করে ইওরোপের ইতিহাস আবর্তিত হয়। এই যুগে ফ্রান্সের ইতিহাস বলতে নেপোলিয়নের কর্মধারা বোঝায়।"[১]

নেপোলিয়নের শাসনব্যবস্থার প্রকৃতি

ঐতিহাসিক ফিলিপ গডেলা এই মন্তব্য করেছেন। নেপোলিয়নের স্থাপিত শাসনব্যবস্থা ছিল ফরাসী ইতিহাসের এক উল্লেখযোগ্য যুগ। নেপোলিয়ন ফ্রান্সে যে রাজতন্ত্র স্থাপন করেন তা ছিল অভিনব। এটি চিরাচরিত বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র ছিল না। তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাজতন্ত্র ছিল একটি ভুঁইফোড় সামরিক স্বৈরতন্ত্র (An upstart military dictatorship)।[২] তিনি সামরিক শক্তির ওপর নির্ভর করে ফরাসী সিংহাসন অধিকার করেন। সিংহাসনে বসার পর তিনি দুভাবে এই শাসনকে মজবুত করেন। প্রথম, গণভোটের দ্বারা তাঁর রাজতন্ত্রকে তিনি বৈপ্লবিক ভিত্তি দানের চেষ্টা করেন। অপরদিকে বংশানুক্রমিক রাজাদের ন্যায় দরবার, সভাসদ ও অনুষ্ঠান দ্বারা তিনি এই শাসনব্যবস্থাকে লোকচক্ষে শ্রদ্ধেয় করার চেষ্টা করেন। কিন্তু মূলতঃ সামরিক শক্তিই ছিল তাঁর ক্ষমতার উৎস। বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের যুগে নেপোলিয়নের এই সামরিক রাজতন্ত্র এক অভিনব পরীক্ষা ছিল তাতে সন্দেহ নেই। পরবর্তী যুগে, ইহা বহু ডিক্টেটরকে অনুপ্রাণিত করেছে।

নেপোলিয়নের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে মূল্যায়ন একটি বিতর্কিত প্রশ্ন। তাঁর সমকালীন লেখক শাতোব্রিয়াঁ ও মাদাম দ্য স্তালের লেখনীতে তিনি কালো রং-এ রঞ্জিত হয়েছেন। শাতোব্রিয়াঁর মতে, নেপোলিয়ন ছিলেন আসলে জন্মসূত্রে একজন বদ্ধ কর্সিকান। ফরাসীদের তিনি কখনও আন্তরিকভাবে ভালোবাসেন নি। এজন্যে তিনি তাঁর উচ্চাকাঙ্খামূলক যুদ্ধে ফরাসীদের ব্যাপক রক্তদানে বাধ্য করেন; করের চাপে তিনি তাদের নিঃস্ব করেন এবং তাদের ওপর স্বৈর শাসনের জোয়াল চাপান। মাদাম দ্য স্তালের মতে, এই ভয়ানক অহঙ্কারী কর্সিকান নিজেকে শ্রেষ্ঠ ভাবতেন। তিনি ছিলেন এক নিছক স্বৈরাচারী শাসক। কাছে থেকে এই দুই লেখক নেপোলিয়নকে দেখেন। তাই তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। পরবর্তীকালের লেখক জুলেশ মিসেলও নেপোলিয়নের সমালোচনা করে নেপোলিয়নকে বিপ্লবের আদর্শ ও নিপীড়িত মানুষের প্রতি বিশ্বাসঘাতক রূপে চিহ্নিত করেছেন। ঐতিহাসিক এইচ· জি· ওয়েলসও নেপোলিয়নের ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্খাকে কঠোর ভাষায় আক্রমণ করেছেন। অপরদিকে ঊনবিংশ শতকের ইতিহাসকার থিয়ার্স (Thiers—ফরাসী উচ্চারণ তিয়ের) এবং আলবেয়ার সোরেল নেপোলিয়নকে মুগ্ধদৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করেছেন। সোরেলের মতে, বিপ্লবের

১· "From 1799—1814 the history of Europe was the history of France and the history of France was the biography of Napoleon Bonaparte," Philip Guedella.

২· David Thomson. P. 40.

আদর্শের জীবন্ত প্রতীক ছিলেন নেপোলিয়ন। তিনি বিপ্লবের আদর্শকে আত্মস্থ করে তার বিষময় দিকগুলি হজম করে, মঙ্গলময় দিককেই প্রতিষ্ঠা দেন। জ্যাকোবিন যুগের শ্রেণীসংগ্রামের ঝড়ে যখন সবকিছু তছনছ হচ্ছিল, কাজের কাজ কিছুই হচ্ছিল না; সেই সঙ্কটময় সময়ে তিনি আসেন। তিনি কৃষকদের হাতে জমি রেখে দিয়ে, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের শাসনের দায়িত্ব দেন এবং বুর্জোয়াদের জাতি গঠনের জন্যে কাজ করার সুযোগ দেন। এর ফলে অল্পদিনের মধ্যে ফ্রান্সের অভূতপূর্ব উন্নতি হয়। নেপোলিয়নের রাজ্যজয়কে তাঁর উচ্চাকাঙ্খার প্রকাশ বা নিছক সাম্রাজ্যবাদ বলে আলবেয়ার সোরেল মনে করেন না। তিনি বলেন যে, সপ্তদশ শতকে চতুর্দ্দশ লুই একদা ফ্রান্সের জন্যে প্রাকৃতিক সীমান্ত লাভ করতে চান। বিপ্লবী ফ্রান্স রাইন নদী পর্যন্ত অঞ্চল ফ্রান্সের অন্তর্ভুক্ত করে, ফ্রান্সের প্রাকৃতিক সীমারেখা স্থাপনের চেষ্টা করে। নেপোলিয়নের রাজ্যজয় ছিল সেই ভাবধারার উত্তরসাধনা। এ্যামিয়েন্সের সন্ধির পর যুদ্ধ শুরু হওয়ার দায়িত্ব নেপোলিয়নের ছিল না। ফ্রান্সের শক্তিবৃদ্ধি অসহনীয় হলে ইংলন্ড ফ্রান্সকে ছিঁড়ে ফেলতে চায়। মোট কথা, ইতিহাসের অঙ্গনে নেপোলিয়ন তাঁর যে গভীর পদচিহ্ন রেখে গেছেন তা ইওরোপ বহু চেষ্টা করেও মুছে ফেলতে পারেনি। তাই রেড্ডাওয়ে বলেন, "যেখানেই নেপোলিয়নের সেনাদল যায়, সেখানে আব পূর্বের অবস্থা কোনদিন ফিরে আসেনি"।

নেপোলিয়নেব শাসন ব্যবস্থায সাম্যবাদী প্রভাব

নেপোলিয়ন নিজে তাঁর স্থাপিত রাজতন্ত্রের দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। এজন্যে তিনি বিপ্লবের অন্যতম আদর্শ "সামাজিক সাম্য নীতিকে" গ্রহণ করেন। সামাজিক সাম্য নীতি প্রয়োগ ক'রে তিনি তাঁর শাসনকে জনপ্রিয় করার চেষ্টা করেন (আগে পৃঃ দেখ)। অপরদিকে বিপ্লবের স্বাধীনতার আদর্শকে তিনি বর্জন করেন। কারণ 'স্বাধীনতা অর্থাৎ গণতন্ত্রের' আদর্শ এবং তাঁর স্বৈর শাসন ছিল পরস্পর-বিরোধী। রাজতন্ত্র স্থাপন করে তিনি পুরাতনতন্ত্রকেই ফিরিয়ে আনেন। ডেভিড টমসনের মতে, বিপ্লবের সন্তান নেপোলিয়ন ছিলেন অভিষিক্ত, মুকুটধারী জ্যাকোবিন (A crowned and annointed Jacobin)।

নেপোলিয়ন বিপ্লবের আদর্শকে প্রকৃতপক্ষে কতদূর গ্রহণ করেন এ সম্পর্কে অধুনা গবেষকরা নতুনভাবে আলোচনা করেছেন। জর্জ রুডের মতে, নেপোলিয়ন সাম্য নীতিকে পুরোপরি গ্রহণ করেন বলে যে অভিমত প্রকাশ করা হয় তা ঠিক নয়। তাঁকে "মুকুটধারী জ্যাকোবিন"ও বলা চলে না। কারণ জ্যাকোরিন দল যে সাম্য নীতির আদর্শে বিশ্বাস করত, নেপোলিয়ন তা বর্জন করেন। তিনি জ্যাকোবিনদের মত সাঁকুলেৎ বা দরিদ্র, সর্বহারা শ্রেণীর উন্নতির জন্যে কোন চেষ্টা করেননি। তিনি সর্বনিম্ন মজুরী আইন, সর্বোচ্চ মূল্যমান আইন, কর্ম সংস্থান আইন বর্জন করেন। তিনি ১৭৯১ খ্রীঃ বুর্জোয়া সংবিধানের কিছু কিছু আদর্শ গ্রহণ করেন। কিন্তু ১৭৯২ খ্রীঃ পর জ্যাকোবিন যুগের সংবিধান ও সাম্যকে তিনি বর্জন করেন। সুতরাং নেপোলিয়ন ছিলেন মূলতঃ বুর্জোয়াতন্ত্রের সমর্থক।

ফ্রান্সের সম্রাট পদে বসার পর নেপোলিয়ন কোড নেপোলিয়ন, শিক্ষা সংস্কার প্রভৃতি সংস্কার চালু রাখেন। গোড়ার দিকে তাঁর শাসন ছিল জনপ্রিয় ও কল্যাণমুখী। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী

দমন নীতি

যুদ্ধের চাপে তাঁর উদার শাসন এক দমন-মূলক স্বৈরাচারে পরিণত হয়। ডেভিড টমসনের মতে, "নেপোলিয়ন ফ্রান্সে পুলিশী রাষ্ট্র স্থাপন করেন।" যোসেফ ফুসের (Joseph Fouche) নেতৃত্বে পুলিশী মন্ত্রীর দপ্তর, বিনা বিচারে গ্রেপ্তার, সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ, জনমত নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি ব্যবস্থা চালু করা হয়। ফ্রান্সের মাত্র ৪টি সংবাদপত্রকে প্রকাশের অনুমতি দেওয়া হয়। অবশ্য নেপোলিয়ন তাঁর এই রাষ্ট্রে সংগঠনশক্তি, শৃঙ্খলা স্থাপন, ব্যয় সঙ্কোচ, ফরাসী জাতির ওপর নিম্নতম কর স্থাপনের দ্বারা শাসন ব্যবস্থার

উৎকর্ষতা দেখান। তিনি নিয়ম করে দেন যে, সেনাদল ও যুদ্ধের জন্যে ব্যয় ফরাসী জাতির ওপর না চাপিয়ে অধিকৃত দেশগুলি থেকে আদায় করা হবে। ফরাসী জাতির গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করলেও তিনি তাদের অনুশাসন দান করেন। তাঁর কোড নেপোলিয়ন, আইনের চক্ষে সমান অধিকার দান ও যোগ্যতার ভিত্তিতে কর্ম দান ফ্রান্সে জনপ্রিয় ছিল। ডেভিড টমসনের মতে, "নেপোলিয়নের একনায়কতন্ত্র ছিল জনহিতকর, উপযোগিতাবাদী, সুদক্ষ, পরিশ্রমী, বুদ্ধিপূর্ণ।"[১]

নেপোলিয়নের একনায়কতন্ত্র রোবসপিয়েরের একনায়কতন্ত্রের ন্যায় অন্ধ বা উন্মত্ত ছিল না অথবা হিটলারী একনায়কতন্ত্রের ন্যায় নিষ্ঠুর ও বর্বর ছিল না। এই শাসনব্যবস্থা উগ্রপন্থী জ্যাকোবিনদের নিকট অপ্রিয় হলেও মধ্যবিত্ত, সাধারণ লোক ও কৃষকদের নিকট জনপ্রিয় ছিল। যতদিন ফরাসী জনসাধারণ বুরবোঁপন্থী রাজতন্ত্রবাদীদের পুনরায় ক্ষমতালাভ এবং জ্যাকোবিন পন্থীদের সন্ত্রাসের ভয়ে ভীত ছিল ততদিন বোনাপার্টবাদ লোকের নিকট গ্রহণীয় ছিল। কারণ বোনাপার্টবাদ ছিল মধ্যপন্থা এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থের উপযোগী। কিন্তু ক্রমে লোক লাল সন্ত্রাস ও শ্বেত সন্ত্রাসের কথা ভুলে যায়। তারা নেপোলিয়নের স্বৈর শাসনের সমালোচনা আরম্ভ করে। ১৮০৮ খ্রীঃ পর নেপোলিয়নের বৈদেশিক নীতিতে বিপর্যয় দেখা দিলে তার অশুভ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ফলে তাঁর শাসনের আকর্ষণ নষ্ট হয়। নেপোলিয়নের শাসনের গুণগত দিকগুলি জনসাধারণের নিকট ম্লান হয়। তবুও একথা সত্য যে, নেপোলিয়ন ফরাসী জাতিকে পানপাত্র ভরে যুদ্ধজয়ের গৌরবময় মদিরা পান করান। সাম্য নীতির স্বর্ণপাত্রে তিনি কোড নেপোলিয়ন, বিচারের সংস্কার, শিক্ষা সংস্কার প্রভৃতি খাদ্য পরিবেশন করেন।

স্বৈরতন্ত্রী চরিত্র

ফ্রান্সের বাইরে নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য ইওরোপে বিপ্লবের আদর্শ প্রচারের সহায়ক হয়। তিনি ছিলেন বিপ্লবের অগ্নিময় তরবারি। (১) তিনি ইওরোপের পুরাতন রাজবংশগুলিকে অন্ততঃ কিছুদিনের জন্যে নির্বাসনে পাঠান। স্বর্গীয় অধিকারের আদর্শকে নস্যাৎ করেন। (২) তিনি সামন্ততন্ত্র, সার্ফ প্রথা ধ্বংস করে ইওরোপের মধ্যযুগীয় শোষণমূলক সমাজ ব্যবস্থাকে ধ্বংস করেন। (৩) কোড নেপোলিয়ন দ্বারা তিনি নতুন সমাজ ব্যবস্থাকে আইনগত রূপ দেন। নেপোলিয়নের পতনের পরেও তাঁর সংস্কারগুলি অব্যাহত থাকে। (৪) তিনি ৩০০টি রাজ্যে বিভক্ত জার্মানীর পুনর্গঠন করে একে ৩৯টি ভাগে বিভক্ত করেন। এর পরোক্ষ ফল হিসেবে জার্মান জাতীয়তাবাদ ও ঐক্য চিন্তার উদয় হয়। নেপোলিয়ন তাঁর অধীনে ইতালীকে ঐক্যবদ্ধ করে ইতালীয় ঐক্যের আদর্শ স্থাপন করেন। (৫) তিনি স্বয়ং জাতীয়তাবাদের বিরোধী হলেও তাঁর শাসনের কঠোরতা অধিকৃত দেশগুলিতে জাতীয়তাবাদী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ফিশারের মতে, "তাঁর সাম্রাজ্য স্বল্পায়ু হলেও তাঁর অসামরিক সংস্কারগুলির ভিত্তি গ্রানাইট প্রস্তরের ওপর স্থাপিত ছিল।"[২] এছাড়া নেপোলিয়ন সমর

ফ্রান্সের বাহিরে সাম্রাজ্যের আদর্শগত প্রভাব

নেপোলিয়নের ত্রুটি

১. "The dicratorship of Napoleon in France was a utilitarian, efficient, industrious, hand-headed government"—David Thomson. P. 51.

২. "Though the Empire of Napoleon was transitory, his civilian reforms were built on granite." Fisher—History of Europe.

বিশারদ হিসেবে অনন্য সাধারণ কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন। উলম্ ও অষ্টারলিজের যুদ্ধে তাঁর যে বিজয় বৈজয়ন্তী উড়ে তা মস্কো যুদ্ধ পর্যন্ত অম্লান ছিল। অষ্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, রাশিয়া প্রভৃতি ইওরোপের বৃহৎ শক্তিগুলিকে পরাস্ত করে তিনি অসাধারণ খ্যাতির অধিকারী হন। তাঁর সংগঠনী প্রতিভাও ছিল অসামান্য। ফ্রান্স ও সর্বত্র তাঁর সংগঠনের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর প্রধান দুর্বলতা ছিল এই যে, তিনি ছিলেন অতিশয় উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং আপন শক্তিকে অজেয় ভাবতেন। ইওরোপের জাতীয়তাবাদকে তিনি সম্মান দেখাননি।

পাঠ্যসূচী

১। David Thomson—Europe since Napoleon.
২। Thomson—Napoleon Bonaparte—His Rise and Fall.
৩। Fisher—Bonapartism.
৪। V. Cronin-- Napoleon.

নবম অধ্যায়

ভিয়েনা সম্মেলন ও ইওরোপের শক্তি সমবায়
(The Vienna Congress, 1815 : The Concert of Europe)

ভিয়েনা সম্মেলন ঃ ইওরোপীয় সমস্যা (The Vienna Congress : The Problems) ঃ নেপোলিয়নের পতনের পর ইওরোপের পুনর্গঠনের জন্যে বিজয়ী মিত্রশক্তিবর্গ অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা নগরীতে এক সম্মেলন আহ্বান করে। ইওরোপের সকল শক্তি (কেবলমাত্র পোপ ও তুরস্ক ব্যতীত) এতে যোগ দেয়। বিভিন্ন দেশের রাজা, রাজনীতিজ্ঞ এবং সাংবাদিকদের উপস্থিতির ফলে ভিয়েনা সম্মেলন এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের রূপ পায়। ইওরোপে এর আগে জাঁকজমকপূর্ণ কোন কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়নি। অষ্ট্রিয়ার সম্রাট ফ্রান্সিস ভিয়েনায় আগত রাজা ও কূটনীতিকদের আপ্যায়নে প্রত্যহ ১০ হাজার পাউন্ড মুদ্রা ব্যয় করেন।

এই সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিবর্গ যোগ দিলেও আসল ক্ষমতা চার বিজয়ী শক্তির হাতেই ছিল। চার বিজয়ী একটি ক্ষমতাচক্র বা "Trade union of victorious kings" গঠন করে ইওরোপের পুনর্গঠনের সময় তাদের মধ্যে নিজস্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখে। ইওরোপের পুনর্গঠনের যে ছক এই বিজয়ী শক্তিগুলি গোপনে স্থির করে, প্রকাশ্যে কংগ্রেসের মাধ্যমে তাকেই রূপায়িত করে। ফরাসী মন্ত্রী ট্যালির্যান্ড এই চার বিজয়ী শক্তির একাধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। তিনি বলেন যে, প্যারিসের প্রথম সন্ধিতে উপরোক্ত চার বিজয়ী শক্তি ছাড়া ফ্রান্স, স্পেন, সুইডেন ও পর্তুগাল স্বাক্ষরকারী ছিল। সুতরাং চার বিজয়ী শক্তি ও এই চার শক্তি মোট আট শক্তির মধ্যে আলোচনার ভিত্তিতে সন্ধি স্বাক্ষরিত হওয়া উচিত। চতুর মেটারনিক ফ্রান্সকে অন্যতম বৃহৎ শক্তি হিসেবে গ্রহণ করলে ফ্রান্স সহকারী শক্তিগুলির দাবীর প্রতি সমর্থন জানাতে বিরত থাকে। ট্যালির্যাণ্ড পরাজিত ফ্রান্সের প্রতিনিধি হিসেবে অবাঞ্ছিতভাবে ভিয়েনা সম্মেলনের ৪ কার্যকরী শক্তিজোটে ৫ম সদস্য হিসেবে যোগ দেন। কিন্তু তিনি তাঁর কূটনীতির প্রভাবে এই সম্মেলনের অন্যতম নিয়ন্তায় পরিণত হন। নেপোলিয়ন যেহেতু ইওরোপের রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ধ্বংস করেছিলেন, সেহেতু এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে ভিয়েনা কংগ্রেসে রক্ষণশীলতা বা পুরাতনতন্ত্রের প্রবক্তাগণ একথা বলেন যে ইওরোপের বিভিন্ন রাজবংশগুলির বৈধ বংশানুক্রমিক অধিকার নস্যাৎ করে নেপোলিয়ন ইওরোপে একটি বেআইনী ব্যবস্থা কায়েম করেন। সুতরাং বিভিন্ন রাজবংশের নিজ নিজ সিংহাসনের ওপর আইন-সঙ্গত অধিকারকে এই সম্মেলনের মাধ্যমে পুণঃ-প্রতিষ্ঠা করা দরকার। ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারাকে নস্যাৎ করে বিপ্লব পূর্ববর্তী সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা পুণঃ-স্থাপনের প্রবণতা ভিয়েনা বৈঠকে প্রবল হয়।

ভিয়েনা সম্মেলনের রক্ষণশীল দৃষ্টি

বিজয়ী চতুঃশক্তি "ইওরোপের সমাজ ব্যবস্থার পুনর্গঠন; ইওরোপের রাজনৈতিক জীবনের পুনরুজ্জীবন" প্রভৃতি গালভরা বাক্য দ্বারা সম্মেলনের মহৎ উদ্দেশ্য ঘোষণা করেন। কিন্তু এই সোচ্চার ঘোষণার অন্তরালে বিজয়ী শক্তিগুলির মধ্যে রাজ্য ভাগের জন্যে গোপন রেষারেষি চলছিল। এজন্য প্রধান শক্তিগুলির মতভেদ গোড়া থেকে দেখা দেয়। রুশ জার আলেকজাণ্ডার চান সম্ভব হলে গোটা

ভিয়েনা সম্মেলনের সম্মুখে সমস্যা

পোল্যাণ্ডকে গ্রাস করতে। নতুবা পোল্যাণ্ডের বৃহদংশ নিয়ে প্রাশিয়ার প্রাপ্য অংশকে স্বাধীন পোল্যাণ্ডরূপে রুশ তাঁবেদারী রাজ্য পরিণত করতে। প্রাশিয়ার দাবী ছিল জার্মানীর স্যাক্সনী প্রদেশকে প্রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত করা। অপরদিকে অষ্ট্রিয়া ও ইংলণ্ড মনে করত রাশিয়া ও প্রাশিয়ার এই দাবী মেনে নিলে শক্তিসাম্য ভেঙে পড়বে। এছাড়া অন্যান্য সমস্যাগুলির মধ্যে ছিল (১) ফ্রান্সকে এমন সীমানায় আবদ্ধ করা যাতে ভবিষ্যতে ফ্রান্স ইওরোপের শান্তি পুনরায় ভাঙতে না পারে। (২) জার্মানী, ইতালী, পোল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে নেপোলিয়ন যে সংগঠন করেন তাহা ভেঙে নতুনভাবে সংগঠন করা। (৩) নেপোলিয়ন কর্তৃক বিতাড়িত রাজবংশগুলি সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করা। (৪) ইওরোপে স্থিতাবস্থা, শক্তিসাম্য স্থাপন করে শান্তি বজায় রাখা। সর্বোপরি, বিজয়ী চতুঃশক্তি নিজেদের ক্ষতিপূরণের জন্যে রাজ্য ভাগ করে নিতে স্থির করে। কিন্তু এই রাজ্যভাগের ফলে কোন একটি শক্তি যাতে বেশী ক্ষমতাশালী না হয় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়। এই লক্ষ্যগুলি নিয়ে সম্মেলনের কাজ পরিচালিত হয়।

ভিয়েনা সম্মেলনে নেতৃবর্গের বৈশিষ্ট্য

ভিয়েনা সম্মেলনের মধ্যমণি ছিলেন অষ্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স মেটারনিক। "মাছ যেমন ঘূর্ণি জলে অবাধে চলাফেরা করে, তিনি তেমনই ভিয়েনা সম্মেলনের স্বচ্ছ রাজনৈতিক ঘূর্ণি জলে মাছের ন্যায় অবলীলাক্রমে সঞ্চরণ করতেন"। মেটারনিক ছিলেন কংগ্রেসে রক্ষণশীলতার ধারক ও বাহক। মেটারনিক দেখেন যে, নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-বিগ্রহে অষ্ট্রিয়ার প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতি হয়। এখন তিনি চান নতুন ভূমি দখল করে সেই ক্ষয়-ক্ষতি পূরণ করতে। অষ্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যে বিভিন্ন জাতি ও ভাষা গোষ্ঠীর লোক বসবাস করত। জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রকে স্বীকৃতি দিলে অষ্ট্রিয়ার সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ত। এজন্যই মেটারনিক কংগ্রেসে তীব্র রক্ষণশীলতা দেখান। তিনি চিন্তাধারায় কংগ্রেসের অন্যান্য নেতাদের মতই অষ্টাদশ শতকের লোক ছিলেন। এজন্য তিনি রক্ষণশীল মতবাদকে স্থাপনের চেষ্টা করেন। মেটারনিকের বিপরীত মেরুতে ছিলেন রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজাণ্ডার। নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে রাশিয়ার যুদ্ধ জয়ের সাফল্যের জন্যে ইওরোপীয় জনসাধারণের নিকট তিনি "বিজেতার বিজেতা" (Conqueror of conqueror) রূপে প্রতিভাত হন। রাশিয়ার বিশাল সেনাদলের জন্যে তিনি ইওরোপের সর্বশক্তিমান নৃপতিদের মর্যাদা পান। জার উদারতান্ত্রিক মতামত প্রকাশ করে ভিয়েনা সম্মেলনে নিপীড়িত জাতিগুলির শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। কেটেলবির মতে, "ইওরোপের ইতিহাসে সর্বপ্রথম ভিয়েনা সম্মেলনেই রুশ জার ইওরোপের ওপর নেতৃত্ব স্থাপন করেন।"[১] এছাড়া সম্মেলনের উদ্যোক্তা ছিলেন ঢিলাঢালা নীল কোট পরিহিত অষ্ট্রিয়ার সম্রাট প্রথম ফ্রান্সিস, শান্ত প্রকৃতির ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কাসলরি, "পাঁকাল মাছের ন্যায় পিচ্ছিল" (slippery like an eel)[২] ফরাসী মন্ত্রী ট্যালির্যাণ্ড, প্রাশিয়ার মন্ত্রী হামবোল্ড প্রভৃতি।

ভিয়েনা সম্মেলনের গৃহীত নীতি এবং কার্যাবলী (The Principles and work of the Vienna Congress) : ভিয়েনা সম্মেলনের নেতৃবর্গ ইওরোপের পুনর্গঠনের জন্যে এবং ফ্রান্সের ভবিষ্যৎ আক্রমণ হতে ইওরোপকে রক্ষার জন্যে ও ইওরোপের পুর্নগঠনের জন্যে কয়েকটি নীতি গ্রহণ করেন। যদিও ভিয়েনা সন্ধির শর্তগুলি বিভিন্ন শক্তির মধ্যে দর-কষাকষি, কূটনৈতিক চাপ ও কূটকৌশলের প্রয়োগ দ্বারা শেষ পর্যন্ত স্থির করা হয়; তথাপি বলা যায় যে প্রধানতঃ তিনটি নীতিকে সামনে রেখে সন্ধিকর্তারা সন্ধির শর্তগুলি স্থির করেন। ডেভিড টমসনের মতে[৩], এই তিন নীতি প্রয়োগের সময় বিজয়ী শক্তিগুলি আগে

১· "For the first time in history, Russia asssumed leadership in Europe"—Ketelbey—History of Modern Times. P. 145.

২· Schevill—History of Europe.

৩· "Like any general settlement of the kind, the Settlement of Vienna was a net work of bargains and negotiated compromises".—D. Thomson. P. 74.

পরস্পরের স্বার্থরক্ষার পর নীতিগুলি প্রয়োগ করেন। যেক্ষেত্রে এই নীতির সঙ্গে তাঁদের স্বার্থের বিরোধ দেখা দেয়, সেক্ষেত্রে তাঁরা নীতিগুলিকে গৌণ স্থান দেন। ঐতিহাসিক গর্ডন ক্রেইগ এজন্য বলেছেন যে, এই নীতিগুলির আক্ষরিক প্রয়োগের কথা না ভাবাই উচিত। সাধারণভাবে এই নীতিগুলি যখন সুবিধা হয় তখন প্রয়োগ করা হয়, একথা মনে রাখা দরকার। যাই হোক এই নীতিগুলি ছিল ঃ (১) ন্যায্য অধিকার (Ligitimacy), (২) ক্ষতিপূরণ (Compensation) এবং শক্তিসাম্য (Balance of power)। এছাড়া ইওরোপে পুরাতনতন্ত্র ও স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্যে বিপ্লবের প্রতি ঘৃণা (hatred of Revolution) এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা (international co-operation) নীতিও গৃহীত হয়।

যেহেতু নেপোলিয়ন ইওরোপের পরিবর্তনগুলি বলপ্রয়োগে করেন তাহা অবৈধ বলে ঘোষণা করা হয়। ন্যায্য অধিকার নীতি অনুসারে নেপোলিয়নের আগে ইওরোপের যে দেশগুলিতে যে সকল রাজবংশের শাসন ছিল তাহা পুনঃস্থাপন করা হয়। (১) ন্যায্য অধিকার নীতি অনুসারে ফ্রান্সের সঙ্গে প্যারিসের দ্বিতীয় সন্ধি (নভেম্বর, ১৮১৫ খ্রীঃ) (Second Treaty of Paris) স্বাক্ষরিত হয়। এই সন্ধির দ্বারা বুরবোঁ রাজবংশকে ফ্রান্সের সিংহাসনে পুনঃ-স্থাপন করা হয়। বুরবোঁ অষ্টাদশ লুই ফরাসী সিংহাসনে বসেন। ফ্রান্সকে ১৭৯০ খ্রীঃ অর্থাৎ বিপ্লব পূর্ববর্তী বৈধ সীমানায় ফিরিয়ে দেওয়া হয়। ফ্রান্স বিজয়ী মিত্রশক্তিকে যুদ্ধের দরুন ৭০ কোটি ফ্রাঁ ক্ষতিপূরণ দেয়। নেপোলিয়ন যে সকল মূল্যবান ঐতিহাসিক সামগ্রী বিভিন্ন দেশ থেকে আনেন তাহা ফেরৎ দিতে হয়। ফ্রান্স যাতে পুনরায় গণ্ডগোল সৃষ্টি করতে না পারে এজন্য বিজয়ী মিত্রপক্ষের দখলকারী সেনাদল ৩ বছর ফরাসী ভূমি দখল করে থাকবে বলা হয়। প্যারিসের দ্বিতীয় সন্ধির দ্বারা ফ্রান্সের সীমানা নির্দ্ধারণ এবং ফ্রান্সে বুরবোঁ রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার পর, সন্ধি কর্তারা নিজেদের ভৌমিক ক্ষতিপূরণ লাভের ব্যাপারে মন দেন। এক্ষেত্রে রুশ জার প্রথম আলেকজাণ্ডার গোটা পোল্যাণ্ড দখলের জন্যে চাপ দিলে এবং প্রাশিয়া স্যাক্সনী রাজ্য গ্রাস করার জন্যে দাবী জানালে সমস্যা দেখা দেয়। মেটারনিক ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মনে করতেন যে, এই দুই শক্তির দাবী মেনে নিলে ইওরোপের শক্তিসাম্য নষ্ট হবে। শেষ পর্যন্ত রাশিয়া ও প্রাশিয়া তাদের দাবী কিছুটা ছাড়লে ক্ষতিপূরণের সমস্যা মিটে যায়। এখন ক্ষতিপূরণ নীতি অনুসারে রাশিয়া পায় গ্রাণ্ড ডাচি অব ওয়ারস নামে পোল্যাণ্ডের প্রায় $\frac{৩}{৪}$ অংশ নিয়ে নেপোলিয়ন যে অঞ্চল গড়েন, তার সবটা। রাশিয়া এছাড়া পায় তুরস্কের কাছ থেকে বেসারাবিয়া এবং বাল্টিক অঞ্চলে ফিনল্যাণ্ড দেশটিও রাশিয়া পায়। এর ফলে পূর্ব ইওরোপে রাশিয়ার প্রভাব ভীষণ বাড়ে। (২) অষ্ট্রিয়া তার ভূতপূর্ব রাজ্য বেলজিয়াম ছেড়ে দেয়। এই ফ্লেমিশ দেশটি ছিল একেই অজার্মান, তদূপরি অষ্ট্রিয়ার সীমানা থেকে বিচ্ছিন্ন। এর ক্ষতিপূরণ হিসেবে উত্তর ইতালীর লম্বার্ডি ও ভেনেসিয়া প্রদেশ অষ্ট্রিয়া পায়। তাছাড়া ব্যাভেরিয়া অষ্ট্রিয়ার যে অঞ্চল দখল করেছিল তা ফিরিয়ে দেয়। এছাড়া অষ্ট্রিয়া টাইরল, সালজবার্গ্ ও ইল্লিরিয়া অঞ্চল পায়। ম্যারিয়টের মতে, অষ্ট্রিয়া ফ্লেমিশ অঞ্চল ত্যাগ করে ইতালীর বিরাট অঞ্চল পেয়ে লাভবান হয়। অষ্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর মেটারনিক এজন্য আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। কারণ উত্তর ইতালী থেকে এ্যাড্রিয়াটিক অঞ্চল পর্যন্ত অষ্ট্রিয়ার অধিকারে থাকে। এছাড়া নেপোলিয়নের আক্রমণের আগে পোল্যাণ্ডের যে অংশ অষ্ট্রিয়ার হাতে ছিল, অষ্ট্রিয়া তা ফিরে পায়। (৩) প্রাশিয়া গোটা স্যাক্সনী দাবী করলেও ইংলণ্ড ও অষ্ট্রিয়ার তীব্র বিরোধিতায় তা পায়নি। শেষ পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রাশিয়া স্যাক্সনীর অর্দ্ধেক (মতান্তরের $\frac{২}{৫}$ অংশ) এবং সুইডেনের কাছ থেকে পোমিরানিয়া প্রদেশ পায়। তাতেও প্রাশিয়ার মনোমত ক্ষতিপূরণ না হওয়ায় জার্মানীর ওয়েষ্টফ্যালিয়া অঞ্চলের কিছু অংশ প্রাশিয়াকে দেওয়া হয়। প্রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী হামবোল্ড তবে সন্তুষ্ট হন। এর ওপরে প্রাশিয়া রাইনল্যাণ্ডে আধিপত্য পায়। কারণ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কাসলরি চান যে, ভবিষ্যতে ফ্রান্স

জার্মানী আক্রমণ করতে চাইলে ফ্রান্সকে বাধা দেওয়ার জন্যে শক্তিধর দেশ হিসেবে এখানে প্রাশিয়ার অবস্থান থাকা উচিত। এছাড়া পোল্যাণ্ডের পশ্চিম প্রাশিয়া অঞ্চল যা প্রাশিয়া নেপোলিয়নের আগে দখল করত তাও প্রাশিয়া ফেরৎ পায়। ক্ষতিপূরণ ও শক্তিসাম্য উভয় নীতির ফলে ভৌমিক ক্ষতিপূরণ পেয়ে প্রাশিয়ার আয়তন প্রায় দ্বিগুণ হয়। (৪) ইংলণ্ড



ক্ষতিপূরণ হিসেবে তার সাম্রাজ্যের স্বার্থে ইওরোপের বাইরের স্থান নেয়। ইংলণ্ড পায় সিংহল বা শ্রীলঙ্কা, কেপ কলোনি, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, মাল্টা ও আইওনীয় দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি। এর ফলে বিশ্বের নানাস্থানে ইংলণ্ডের উপনিবেশ ও নৌঘাটি বিস্তৃত হয়। (৫) সুইডেন প্রাশিয়াকে পোমিরানিয়া ছেড়ে দেয়, এজন্য ক্ষতিপূরণ হিসেবে সুইডেনকে নরওয়ে দেশটি দেওয়া হয়।

ক্ষতিপূরণ নীতি ছাড়া ভিয়েনার শান্তি সম্মেলনে শক্তিসাম্য নীতিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই সম্মেলনের অধিকাংশ সিদ্ধান্ত এই নীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়। এমন কি, বিভিন্ন বিজয়ী শক্তির মধ্যে ভৌমিক ক্ষতিপূরণ দানের সময়ও যাতে পরস্পরের মধ্যে শক্তিসাম্য থাকে তা বিশেষভাবে দেখা হয়। কাজেই চার বিজয়ী শক্তির মধ্যে যাতে সমান ক্ষমতা থাকে তা বিশেষভাবে মনে রাখা হয়। ফ্রান্সের সঙ্গে প্যারিসের দ্বিতীয় সন্ধির শর্তগুলিও শক্তিসাম্যের জন্যে রচনা করা হয়। ফ্রান্সকে এজন্য ১৭৯০ খ্রীঃ সীমান্ত মেনে নিতে বাধ্য করা হয়। ফ্রান্স যাতে ভবিষ্যতে ইওরোপ আক্রমণ না করতে পারে এজন্য ফ্রান্সের প্রতিবেশী দেশগুলিকে শক্তিশালী করে শক্তিসাম্য স্থাপন করা হয়। (২) ফ্রান্সে কিছুদিনের জন্যে বিজয়ী শক্তির সেনাদল স্থাপন করা হয়। (৩) ফ্রান্সের প্রতিবেশী দেশগুলিকে শক্তিশালী করে ফ্রান্সের চারদিকে বেষ্টনী প্রাচীর রচনা করা হয়। (৪) ফ্রান্সের উত্তর-পূর্বে লাক্সেমবার্গ ও বেলজিয়ামকে হল্যাণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। ভবিষ্যতে ফ্রান্স বেলজিয়াম অধিকারের চেষ্টা করলে হল্যাণ্ডকে তা ঠেকাবার দায়িত্ব দেওয়া হয়। (৫) ফ্রান্সের পূর্ব সীমান্তে জার্মানীর রাইন প্রদেশগুলিকে প্রাশিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত করে ফ্রান্সের পূর্ব সীমান্তকে চেপে রাখা হয়। জার্মানীর ৩৮টি রাজ্যের সমবায়ে এক শিথিল রাষ্ট্রজোট বা বুণ্ড গঠন করে, ফ্রান্স জার্মানীতে ঢোকার চেষ্টা করলে যাতে বাধা পায় তার ব্যবস্থা করা হয়। এভাবে ফ্রান্সের পূর্ব সীমায় রক্ষা প্রাচীর তৈরি করা হয়। (৬) ফ্রান্সের দক্ষিণ-পূর্বে সুইজারল্যাণ্ডকে ফ্রান্সের তিনটি ক্যান্টন বা জেলা দেওয়া হয়। সুইজারল্যাণ্ড মোট ২২টি ক্যান্টন সহ একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ দেশে পরিণত হয়। ফ্রান্সের দক্ষিণ-পূর্ব সীমায় সুইজারল্যাণ্ড এক রক্ষা প্রাচীরে পরিণত হয়। (৭) ফ্রান্সের দক্ষিণ সীমান্তে সার্ডিনিয়ার সঙ্গে জেনোয়াকে সংযুক্ত করা হয়। এভাবে শক্তিসাম্য নীতির প্রয়োগ করে ফরাসী সীমান্তে বেষ্টনী রচনা করা হয়।

শক্তি সাম্য নীতির প্রয়োগ

ক্ষতিপূরণ ও শক্তিসাম্য নীতি প্রয়োগের পর সন্ধি কর্তারা এবার নায্য অধিকার নীতির প্রয়োগ দ্বারা ইওরোপের অবশিষ্ট অঞ্চলের পুর্নগঠন করেন। মনে রাখা দরকার যে, তাঁরা শক্তিসাম্য ও ক্ষতিপূরণ নীতিকে অগ্রাধিকার দেন। তারপর তাঁরা হাল্কা হাতে নায্য অধিকার নীতিকে কাজে পরিণত করেন। ঐতিহাসিক গর্ডন ক্রেইগ নায্য অধিকার নীতির ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, এই নীতির মর্ম ছিল যে, "প্রাক-নেপোলিয়ন যুগে যে সকল বংশানুক্রমিক রাজা ছিলেন, তাঁরা যদি নেপোলিয়নের দ্বারা সিংহাসন চ্যুত হয়ে থাকেন, তবে তাঁদের নায্য অধিকার মেনে নিয়ে তাঁদের রাজ্য-সিংহাসন ফিরিয়ে দেওয়া হবে"। তবে এই নিয়ম আংশিকভাবে প্রয়োগ করা হয়নি। বহু ক্ষেত্রে শক্তিসাম্য অথবা ক্ষতিপূরণ নীতির স্বার্থে নায্য অধিকার নীতিকে অগ্রাহ্য করা হয়। অনেকের মতে ফরাসী মন্ত্রী ট্যালির‍্যাণ্ডই ছিলেন নায্য অধিকার নীতির উদ্ভাবন কর্তা। রক্ষণশীল মেটারনিক পুরাতনতন্ত্রকে পুনঃ-স্থাপনের এই নীতিকে সমর্থন জানান। এই নীতি অনুসারে ফ্রান্সের সিংহাসনে পুরাতন বুরবোঁ রাজবংশকে ফিরিয়ে আনা হয় একথা আগেই বলা হয়েছে। হল্যাণ্ডের অরেঞ্জ রাজবংশকে হল্যাণ্ডের সিংহাসন ফেরৎ দেওয়া হয়। পোপকে ইতালীতে তাঁর রাজ্য ফেরৎ দেওয়া হয়। সার্ডিনিয়া-পিডমন্ট স্যাভয় রাজবংশকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। স্পেনের সিংহাসন নেপোলিয়নের দ্বারা উৎখাত হওয়া বুরবোঁ রাজবংশের শাখাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। দক্ষিণ ইতালীর নেপলস-সিসিলীতে বুরবোঁ বংশের অপর শাখাকে স্থাপন করা হয়।

ভিয়েনা সম্মেলনে জার্মানীর পুনর্গঠন নিয়ে বিশেষ জটিলতা দেখা দেয়। মেটারনিক জার্মানীতে ফরাসী বিপ্লবের পূর্বাবস্থা ফিরিয়ে আনার পক্ষপাতী হলেও, জার প্রথম আলেকজাণ্ডার এর বিরোধিতা করেন। নেপোলিয়নের জার্মানী দখলের আগে জার্মানী ছিল ৩০০ রাজ্যের সমষ্টি। নেপোলিয়ন এই ৩০০টি রাজ্য ভেঙে ৩৯টি রাজ্য গঠন করেন। নায্য অধিকারনীতি আংশিকভাবে মেনে

জার্মানী ও ইতালীর পুনর্গঠন

নিলে জার্মানীকে পুনরায় ৩০০টি রাজ্যেই বিভক্ত করা হত। কিন্তু সন্ধিকর্তারা স্থির করেন যে, জার্মানীর যে অপ্রয়োজনীয় বিভাজন নেপোলিয়ন নস্যাৎ করেছেন তার পুনরুদ্ধারের আর দরকার নেই। কাজেই জার্মানীকেও ৩৮টি রাজ্যেই (মতান্তরে ৩৯টি) বিভক্ত রাখা হয়। জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করায় অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার তীব্র আপত্তি ছিল। শেষ পর্যন্ত জার্মানীকে ৩৮টি রাজ্যে বিভক্ত করে এর ওপর বুণ্ড (Bund) বা একটি শিথিল যুক্তরাষ্ট্র স্থাপন করা হয়। অষ্ট্রিয়াকে এই রাষ্ট্রমণ্ডলের সভাপতি পদ দান করা হয়। ইতালীর ক্ষেত্রে নেপোলিয়নের অবলম্বিত ব্যবস্থাকে নস্যাৎ করে ইতালীকে মোট ৫টি রাজনৈতিক ভাগে বিভক্ত করা হয়। পোপ, স্যাভয়, বুরবোঁ প্রভৃতি রাজবংশের অধিকার ইতালীতে পুনঃ-স্থাপন করা হয়। এর ফলে ঐক্যবদ্ধ ইতালীর আদর্শ লুপ্ত হয়। মেটারনিক বলেন যে, "অতঃপর ইতালী হল একটি ভৌগোলিক সংজ্ঞা" মাত্র (Geographical expression)। ভিয়েনা চুক্তির দ্বারা ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারা গণতন্ত্রবাদ, উদারতন্ত্রবাদ ও জাতীয়তাবাদকে দমন করে ইওরোপে পুরাতনতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করা হয়। ন্যায্য অধিকার প্রভৃতি নীতির সাহায্যে এই কাজ ভালভাবে করা হয়। ইওরোপের সর্বত্র পুরাতন রাজবংশগুলিকে ফিরিয়ে আনা হয়। তার সঙ্গে আসে পুরাতন স্বৈর শাসন, অভিজাতশ্রেণী ও যাজক সম্প্রদায়। এভাবে ইওরোপের প্রগতিকে ভিয়েনা চুক্তির দ্বারা পিছিয়ে দেওয়া হয়।

ভিয়েনা সম্মেলনের কার্যাবলীর সমালোচনা (Assessment of the Work of the Vienna Congress) ঃ ইওরোপের ইতিহাসে যে কোন বৃহৎ যুদ্ধের শেষে সন্ধি স্থাপিত হতে দেখা যায়। নেপোলিয়নের যুদ্ধের পর এরূপ ভাবেই ভিয়েনা সন্ধি স্থাপিত হয়। ভিয়েনা সন্ধি হল ইতিহাসের একটি বিতর্কিত সন্ধি। গ্রান্ট ও টেমপারলির মতে, ভিয়েনা সন্ধি প্রণেতাদের "প্রতিক্রিয়াশীল ও উদারতন্ত্র বিরোধী" বলা এখন একটি রেওয়াজে পরিণত হয়েছে।[১] ভিয়েনা সম্মেলনের প্রাক্কালে "ইওরোপের সমাজ ব্যবস্থার পুনর্গঠন, ইওরোপের রাজনৈতিক ব্যবস্থার পুনর্জাগরণ" প্রভৃতি যে সকল গালভরা আদর্শ প্রচার করা হয়, বাস্তবে তাহা মোটেই পালন করা হয়নি। আসলে বিজয়ী শক্তিগুলির উদ্দেশ্য ছিল আদর্শের আড়ালে পরাজিত দেশের রাজ্য গ্রাস করা মাত্র। ইওরোপের ইতিহাসের অন্যান্য সন্ধিগুলি থেকে ভিয়েনা সন্ধির কোন মৌলিক পার্থক্য ছিল না। বিজয়ী যেমন চিরকাল বিজিতের রাজ্য গ্রাস করে এক্ষেত্রেও তাই ঘটে।

ভিয়েনা সম্মেলনে প্রতিক্রিয়াশীল নীতি

সন্ধি নির্মাতাদের অদূরদর্শিতার ফলে ভিয়েনা সন্ধি স্থায়ী হতে পারেনি। প্রায় অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে ভিয়েনা সন্ধির মূল কাঠামোগুলি ভেঙে পড়ে। এর দ্বারা সন্ধি নির্মাতাদের রাজনৈতিক বিচক্ষণতার অভাব প্রমাণিত হয়। ১৮৩০ খ্রীঃ জুলাই বিপ্লবের পর বেলজিয়াম হল্যান্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ভিয়েনা সন্ধির দ্বারা বিভক্ত ইতালী ১৮৬১-৬৬ খ্রীঃ ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত হয়। এই সন্ধির দ্বারা বিভক্ত জার্মানী ১৮৭০ খ্রীঃ ঐক্যবদ্ধ হয়। সুতরাং ভিয়েনা সন্ধির ভিত্তি মজবুত ছিল না একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।[২]

ভিয়েনা চুক্তির স্থায়িত্বের অভাব

এই সন্ধির প্রধান দুর্বলতা ছিল পুরাতন রাজবংশগুলির প্রতি অন্ধ আনুগত্য এবং ফরাসী বিপ্লবী-জাত নতুন ভাবধারার প্রতি উগ্র বিরোধিতা। ইতিহাসের বাতিল হওয়া ন্যায্য অধিকার

১· "It is been customary to denounce the peace-makers of Vienna as reactionary and illiberal in the extreme." Grant and Temperly—Europe in the 19th and 20th centuries. P. 117.

২· Quoted by Lipson—Europe in the 19th and 20th Centuries.

নীতি প্রয়োগ করে পুরাতন রাজবংশগুলিকে নিজ নিজ সিংহাসনে ফিরিয়ে আনা হয়। দুষ্ট ঘোড়া যেমন সওয়ারকে পিঠ থেকে ফেলে দেয়, সেরূপ নেপোলিয়নের যুদ্ধের সময় প্রজাপুঞ্জ এই অত্যাচারী রাজবংশগুলিকে বরখাস্ত করেছিল। কিন্তু ন্যায্য অধিকার নীতির জিন কষিয়ে ভিয়েনা সম্মেলন প্রজাদের ঘাড়ে এই রাজবংশগুলিকে পুনরায় চাপায়। স্বৈর শাসন হতে মুক্তিকামী লোকেদের পুনরায় স্বৈর শাসনের অধীনে আনা হয়। জনসাধারণের স্বাধীনতার ইচ্ছাকে এভাবে দমিয়ে রাখা সম্ভব ছিল না। অল্পকালের মধ্যে ফ্রান্সে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত বুরবোঁ রাজবংশের পতন ঘটে। ফরাসী বিপ্লবের উদ্ভূত আদর্শগুলি যথা জাতীয়তাবাদ, উদারতন্ত্র এবং গণতন্ত্র ইওরোপকে এক পরিবর্তনের স্রোতে ঠেলে দিচ্ছিল। সম্মেলনের নেতৃবর্গ এই যুগধর্মকে অস্বীকার করে মারাত্মক ভুল করেন। এর ফলে ভিয়েনা সম্মেলনের আদর্শগত ভিত্তি দুর্বল হয়ে যায়। জুলাই বিপ্লব ও ফেব্রুয়ারি বিপ্লবে ভিয়েনা চুক্তির কাঠামো ভেঙে পড়ে।

জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের প্রতি ঘৃণা

ন্যায্য অধিকার নীতির বড়াই করা হলেও সন্ধিকর্তারা অনেক ক্ষেত্রে এই নীতিকে অগ্রাহ্য করেন। গর্ডন ক্রেইগের মতে, বৃহৎ শক্তিগুলির রাজ্য গ্রাসের পথে ন্যায্য অধিকার নীতি বাধা হলে, তাঁরা সেক্ষেত্রে এই নীতিকে সম্মান দেননি। তাই দেখা যায়, ইতালীর ভেনিস ও জেনোয়াতে যে প্রজাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা নেপোলিয়নের আগে চালু ছিল তা তাঁরা ফিরিয়ে দেননি। ভেনিসের প্রতিনিধিরা তাদের পূর্বতন সংবিধান ফেরৎ চাইলে মেটারনিক বলেন, "প্রজাতন্ত্রের ফ্যাশনের এখন চলন নেই"। ভেনিস অষ্ট্রিয়া অধিকার করে। জেনোয়াকে স্যাভয় রাজবংশের হাতে দেওয়া হয়। মধ্য জার্মানীর রাজবংশগুলিকেও ন্যায্য অধিকার অনুযায়ী ফিরিয়ে আনা হয়নি।

সন্ধিকর্তারা ফরাসী বিপ্লব থেকে উদ্ভূত জাতীয়তাবাদকে বিষবৎ বর্জন করেন। জার্মানীর ক্ষেত্রে জার্মান জাতীয়তাবাদের দাবী অগ্রাহ্য করে মেটারনিকের হস্তক্ষেপে জার্মানীকে ৩৮টি রাজ্যে বিভক্ত করা হয়। প্রাশিয়ার রাষ্ট্রনীতিবিদ হার্ডেনবার্গ জার্মানীতে একটি জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব দেন। কিন্তু মেটারনিকের এই প্রস্তাবকে "বুদ্ধিহীন বস্তু" বলে আখ্যা দেন। মেটারনিকের প্রভাবে ন্যায্য অধিকার নীতি অনুসারে জার্মানীতে অষ্ট্রিয়ার কর্তৃত্ব পুনঃ-স্থাপন করা হয়। জার্মানীকে ৩৮টি রাজ্যে বিভক্ত করা হয়। এই কারণে জার্মান জাতীয়তাবাদীরা ভিয়েনা চুক্তিকে "প্রকাণ্ড প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা" (A great deception and a betrayal) বলে অভিহিত করে। ১৮৭০ খ্রীঃ জার্মানীর ঐক্য স্থাপিত হলে জার্মানীতে ভিয়েনা চুক্তির অব্যবস্থা দূর করা হয়। দ্বিতীয়তঃ, বেলজিয়ামকে শক্তিসাম্যের খাতিরে হল্যান্ডের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। কিন্তু কেল্টিক ও ক্যাথলিক বেলজিয়াম, ১৮৩০ খ্রীঃ টিউটন ও প্রটেস্ট্যান্ট হল্যান্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। পোল্যান্ডকে ব্যবচ্ছেদ করা হয়, নরওয়েকে সুইডেনের অধীনে রাখা হয়। ইতালীর জাতীয়তার দাবীকে অগ্রাহ্য করে উত্তর ইতালীতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অষ্ট্রিয়ার আধিপত্য স্থাপন করা হয়। মধ্য ইতালীতে স্বৈরাচারী রাজাদের পুনঃ-স্থাপন করা হয়। মেটারনিক বলেন, "এখন থেকে ইতালীর নাম শুধু ভূগোলের বইয়ে থাকবে"। জাতীয়তাবাদকে উপেক্ষা করার ফলেই ভিয়েনা চুক্তি স্থায়ী হয়নি। ভিয়েনা চুক্তির দ্বারা ইওরোপের যে রাজনৈতিক মানচিত্র রচিত হয় তা অল্পদিনের মধ্যেই ছেঁড়া কাগজে পরিণত হয়।

ইওরোপীয় জাতীয়তাবাদের অস্বীকৃতি

ভিয়েনা সম্মেলনের নেতারা ছিলেন প্রতিক্রিয়াশীল। অষ্টাদশ শতকের ক্ষয়ধরা মানসিকতা নিয়ে তাঁরা ইওরোপের পুনর্গঠনের কাজে হাত দেন। তাই বিপ্লবের তরঙ্গে ভেসে আসা জাতীয়তাবাদের মহিমা তাঁরা বুঝতে অপারগ ছিলেন। জনসাধারণের ইচ্ছা-অনিচ্ছা ছিল তাঁদের

কাছে অবান্তর প্রশ্ন। সামরিক সুবিধা, সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ প্রভৃতি এই সকল প্রাচীনপন্থীদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাঁরা ক্ষুদ্র দেশগুলিকে দাবা খেলার ঘুটির মতই ব্যবহার করেন। ডেভিড টমসনের মতে, অষ্টাদশ শতকের মানসিকতায় গড়া ভিয়েনা সন্ধি এজন্য ঊনবিংশ শতকের দ্রুতগামী ঐতিহাসিক জগতে বাতিল হয়ে যায়।

ভিয়েনা চুক্তির বিপক্ষে যুক্তি ও প্রমাণগুলি স্বীকার করলেও এই চুক্তির স্বপক্ষে কয়েকটি কথা বলা যায়। ইতিহাসে দেখা যায় যে, প্রত্যেক যুদ্ধের পর বিজয়ী শক্তি যে সকল সন্ধি স্থাপন করে তাতে বিজয়ী শক্তিগুলির স্বার্থরক্ষার প্রশ্নই প্রধান স্থান পায়। ন্যায় বিচার প্রভৃতি নীতি গৌণ হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ইউট্রেক্টের সন্ধির (১৭১৭ খ্রীঃ) দ্বারা হ্যাপসবার্গ শক্তিকে খণ্ডিত করা হয়, ভার্সাই সন্ধির (১৯১৯ খ্রীঃ) দ্বারা জার্মানীর রক্ত মোক্ষণ করা হয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পটসডাম চুক্তির দ্বারা জার্মানীকে বিভক্ত করা হয়। ভিয়েনা সন্ধি এই নিয়মের ব্যতিক্রম ছিল না। ভিয়েনা সন্ধি ভার্সাই সন্ধি অপেক্ষা উদার ছিল একথা বলা যায়। যেক্ষেত্রে ভার্সাই সন্ধির দ্বারা জার্মানীকে একটি তৃতীয় শ্রেণীর রাষ্ট্রে পরিণত করা হয়, ভিয়েনা সন্ধিতে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সেইরূপ প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ভিয়েনা সন্ধির দ্বারা ফ্রান্সকে ব্যবচ্ছেদ না করে তার ন্যায্য সীমান্ত ফেরৎ দেওযা হয়। যেক্ষেত্রে ভার্সাই সন্ধি জার্মানীর ওপর জোর করে চাপান হয় (dictated peace); সেক্ষেত্রে ভিয়েনা সন্ধির শর্ত আলোচনায় ফ্রান্সকে অংশীদার করা হয়।

ভিয়েনা চুক্তিব স্বপক্ষে যুক্তি

ভিয়েনা সন্ধির দ্বারা জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রকে উপেক্ষা করা হয় ইহা সত্য। কিন্তু পরিস্থিতি বিচাব করলে এজন্য সন্ধি-স্থাপয়িতাদের দোষ দেওয়া যায় না। এই নবজাত ভাবধারাগুলি তখনও গঠনমূলক রূপ পায় নি। এই ভাবধারাগুলির বিপ্লব ও সন্ত্রাসের পথে উদ্ভব হয়। এজন্য রক্ষণশীল নেতৃবর্গ এগুলির মূল্য উপলব্ধি করতে পারেননি। ডেভিড টমসনের মতে, "১৮১৫ খ্রীঃ খুব কম লোকেই এই গণতন্ত্র ও উদারতন্ত্রবাদের তাৎপর্য বুঝেছিল। সুতবাং সন্ধি নির্মাতাদের ওপর দোষারোপ নিষ্ফল।"[১] গর্ডন ক্রেইগের মতে, "যদি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে ইতালী ও জার্মানীকে ১৮৯৫ খ্রীঃ গঠন করা হত তবে, ইওরোপে প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলা দেখা দিত।"[২] ভিয়েনা সম্মেলনে জার্মানীকে পুনর্গঠনের জন্যে মোট ছটি প্রস্তাব দেওয়া হয়। প্রতি প্রস্তাবের কোন না কোন ত্রুটি ছিল। অপরদিকে জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করলে হয় অষ্ট্রিয়া অথবা প্রাশিয়ার স্বার্থ ক্ষতি করে তা করতে হত। তাহলে এই বৃহৎশক্তিগুলি যুদ্ধ বাধিয়ে দিত। মারিয়েটের (Marriot) মতে, জার্মান জাতীয়তাবাদী স্টাইন জার্মানীর ঐক্য দাবী করলে মেটারনিক তার মধ্যে বিপ্লবী জ্যাকোবিনবাদের গন্ধ পান। এমতাবস্থায় জার্মানীকে ৩৮টি রাজ্যে ভাগ করে একটি শিথিল রাষ্ট্রজোটে পরিণত করা ছাড়া উপায় ছিল না। এই ব্যবস্থার মধ্যে থেকেই মারিয়েটের মতে ১৮৬৬ খ্রীঃ ঐক্যবদ্ধ জার্মানী জয়লাভ করতে সক্ষম হয়। তাছাড়া ইওরোপের জটিল পরিস্থিতিতে কাহারও পক্ষে পরিষ্কার স্লেটে লেখা সম্ভব ছিল না। বৃহৎ শক্তিগুলি ভিয়েনা সম্মেলনের আগেই এ্যাবো (Abo), কালিশস্ক (Kalisch), টেপলিৎস (Taplitz) প্রভৃতি গোপন সন্ধির দ্বারা তাদের মধ্যে বিভিন্ন রাজ্য ভাগ করেছিল। ভিয়েনা সম্মেলনে এই গোপন

ভিয়েনা চুক্তির দ্বারা ইওরোপে শান্তি ও স্থিতি স্থাপন

১· "It would be wrong to blame the makers of the Settlement for failing to appreciate the power of nationalism and liberalism, which few understood in 1815."—David Thomson. P. 75.

২· "Chaos would follow any attempt to free the Italians or to unite the Germans in 1815."—Gordon Craig. P. 16.

সন্ধিগুলিকে স্বীকৃতি দিতে হয়। সন্ধিকর্তাদের স্বাধীনভাবে কাজ করার মত অবকাশ ছিল না। যদিও জার্মানী ও ইতালীতে কোন কোন ক্ষেত্রে নায্য অধিকার নীতি ভাঙা হয়, তা যুক্তিহীন ছিল না। জার্মানীর ৩০০টি রাজ্য ভেঙ্গে ১৮০৩ খ্রীঃ পুনর্গঠন করা হয়। ইতালীর জেনোয়া ও ভিনিসের প্রজাতন্ত্র ১৭৯৮ খ্রীঃ উচ্ছেদ হয়। যদি ন্যায্য অধিকার বলতে নেপোলিয়ন সম্রাট হয়ে যা উচ্ছেদ করেন তাকে ফিরিয়ে আনা হয়, তবে নেপোলিয়ন সম্রাট হওয়ার আগেই জার্মানী ও ইতালীতে এই পরিবর্তন ঘটে। সুতরাং আইনের নতুন ধারা বিচারে এক্ষেত্রে ন্যায্য অধিকার লঙ্ঘিত হয়নি।

ভিয়েনা চুক্তি অস্থায়ী হয়েছিল একথা সত্য। তবে ইতিহাসে কোন সন্ধি চিরস্থায়ী হয় না। খুব কম কংগ্রেসেই এক শতাব্দীর জন্যে ইতিহাসের ছক নির্মাণ করতে সক্ষম হয়। তবুও ৪০ বছরের জন্যে এই ভিয়েনা কংগ্রেস ইওরোপে শান্তি স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিল। এই ৪০ বছরের ইওরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বহু উন্নতি দেখা যায়। ভিয়েনা সন্ধির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শান্তির ফলেই তা সম্ভব হয়। ডেভিড টমসনের মতে, "মোটামুটিভাবে ভিয়েনা চুক্তি ছিল একটি ন্যায্য ও রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ মূলক চুক্তি।"[১] ভিয়েনা সন্ধির দ্বারা কতকগুলি বাস্তব ঘটনা স্বীকার করে ভবিষ্যৎ ইতিহাসের পথ প্রস্তুত করা হয়। (১) রাশিয়াকে এক বৃহৎ ইওরোপীয় শক্তি হিসেবে এই সম্মেলনে প্রথম স্বীকার করা হয়। (২) জার্মানীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তি হিসেবে প্রাশিয়াকে গণ্য করা হয়। (৩) জার্মানীতে বুণ্ড বা শিথিল যুক্তরাষ্ট্র স্থাপন করে ভবিষ্যতে জার্মানীর ঐক্যের ইঙ্গিত দেওয়া হয়। (৪) ব্রিটেন ছিল এক শক্তিশালী সামুদ্রিক ও ঔপনিবেশিক শক্তি। ভিয়েনা সম্মেলনে ব্রিটেনের এই মর্যাদাকে স্বীকার করা হয়। এইজন্য ইওরোপের বাইরে বড় নৌ ও সামরিক ঘাঁটিগুলি ব্রিটেনকেই দেওয়া হয়। (৫) সুইডেন প্রভৃতি দেশগুলির ইওরোপে আর গুরুত্ব ছিল না। এজন্য ভিয়েনা চুক্তিতে সুইডেনকে তেমন প্রাধান্য দেওয়া হয় নি।

ভিয়েনা সন্ধির দুইটি প্রধান ত্রুটির জন্যে এই সন্ধি শেষ পর্যন্ত ভেঙে যায়। প্রথমতঃ, এই সন্ধির দ্বারা ফ্রান্সের ন্যায় বৃহৎ শক্তিকে দমিয়ে রাখার চেষ্টা করা ভুল হয়েছিল। এজন্য ফ্রান্স এই সন্ধিকে স্বীকার করেনি। পরবর্তীকালে ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন এই সন্ধি ভেঙে ফেলেন। দ্বিতীয়তঃ, জাতীয়তাবাদকে নির্মমভাবে উপেক্ষা করার ফলে ভবিষ্যতে জাতীয়তাবাদী ভাবধারা ভিয়েনা চুক্তির ভিত্তিকে ধ্বসিয়ে দেয়। ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন ইতালী ও জার্মানীর জাতীয়তাবাদকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে ভিয়েনা চুক্তি ভেঙে ফেলেন।[২]

ভিয়েনা সন্ধির প্রতি ফ্রান্সের বিরোধীতা

পরিশেষে বলা যায় যে, ইতিহাসে কোন সন্ধি ত্রুটিহীন এবং স্থায়ী হয়নি। ভিয়েনার সন্ধি কর্তাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ফ্রান্সের ভবিষ্যৎ আক্রমণ থেকে ইওরোপকে রক্ষার ব্যবস্থা করে ইওরোপে শান্তি স্থাপন করা। বৃহৎ শক্তিগুলির পরস্পরবিরোধী স্বার্থের সামঞ্জস্য করে শান্তিকে দৃঢ় করা। এই কাজ সন্ধিকর্তারা ভালভাবেই করেন। গর্ডন ক্রেইগের মতে, "সন্ধি রচয়িতারা বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যে একটি যুক্তিপূর্ণ শক্তি সমতা স্থাপন করেন যার ফলে কোন শক্তি গভীরভাবে অসন্তুষ্ট হয়নি।" এজন্যই ইওরোপে অর্ধ শতাব্দীর শান্তি নেমে আসে। ইওরোপের সমকালীন লোকেরা, ডেভিড টমসনের মতে, এই শান্তির প্রত্যাশী ছিল। জাতীয়তাবাদ তখনও তারা ভালভাবে বুঝত না। হয়ত সন্ধিকর্তারা পুরাতনতন্ত্র ও বিপ্লবের ভাবধারার মধ্যে সমন্বয়

১· "Ontheewhole it was a reasonable and statesman-like arrangement"—D. Thomson. P. 75.

২· Kctelbey—History of Modern Times. P. 149.
A. J. P. Taylor—Struggle for Mastery of Europe.

করতে পারেননি। এজন্য তাঁদের বিশেষ দোষও দেওয়া যায় না। হয়ত ভিয়েনা সন্ধির পরে দু-একটি ছোটখাট যুদ্ধ হয়। কিন্তু বৃহৎশক্তির মধ্যে ব্যাপক লড়াই এই সন্ধি ৫০ বছর না হলেও ৪০ বছর বন্ধ করতে পেরেছিল।

ইওরোপীয় শক্তি সমবায়
(The Concert of Europe)

ইওরোপীয় শক্তি সমবায়ের উদ্ভব (The idea of the Concert of Europe) ঃ ভিয়েনা চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর ইওরোপীয় নেতৃবর্গের কাছে প্রধান সমস্যা ছিল এই চুক্তিকে স্থায়ী করা এবং ইওরোপে শান্তি বজায় রাখা। ঐতিহাসিক ফিশারের মতে, "ফরাসী বিপ্লবের ফলে ইওরোপীয় শক্তিগুলি বহু কষ্টভোগ করে। এজন্য ১৮১৫ খ্রীঃ তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, আর কোনভাবে ফরাসী বিপ্লব বা নেপোলিয়নের অভ্যুত্থান ঘটতে দেওয়া হবে না।"[১] সুতরাং ইওরোপীয় নেতৃবর্গ, ভিয়েনা চুক্তি রক্ষা, ইওরোপে শান্তি রক্ষা এবং নেপোলিয়নের পুনরায় উত্থান রদ এই তিন প্রধান সমস্যার সমাধানের জন্যে একটি স্থায়ী আন্তর্জাতিক সংগঠন স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন।

ইওরোপেব স্থিতাবস্থা রক্ষাব সমস্যা

পবিত্র চুক্তি (Holy Alliance) ঃ রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজান্ডার সর্বপ্রথম পবিত্র চুক্তি (Holy Alliance) নামে এক পরিকল্পনা রচনা করেন। জার ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৮১৫ খ্রীঃ এক পবিত্র চুক্তির ঘোষণা করে ইওরোপের খ্রীষ্টীয় রাজাদের এতে যোগদানের জন্যে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান। জার প্রথম আলেকজান্ডার ছিলেন ভাবপ্রবণ, আদর্শবাদী। তিনি মনে করতেন যে, ফরাসী বিপ্লবের ন্যায় প্রজা বিদ্রোহ ছিল খ্রীষ্টীয় ধর্মশাস্ত্র বিরোধী। ইওরোপীয় রাজাগণ খ্রীষ্টীয় ধর্মনীতি অনুসারে রাজ্য শাসন না করার ফলেই এরূপ ঘটনা সম্ভব হয়। যদি তাঁরা ভবিষ্যতে খ্রীষ্টীয় ধর্মশাস্ত্র অনুসারে রাজ্য শাসন ও বৈদেশিক নীতি পরিচালনা করেন তবে ইওরোপের সকল অশান্তি দূর হবে বলে তিনি মনে করতেন। জনৈক জার্মান সন্ন্যাসিনী ফন ক্রুডেনার (Von Krudener) এর প্রভাবে জার প্রথম আলেকজান্ডারের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়।

জাব আলেকজান্ডাবেব ভাবধারা

বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টে খ্রীষ্টীয় রাজধর্ম সম্পর্কে যে সকল আদর্শগুলির উল্লেখ আছে ইওরোপীয় রাজাদের তা পালন করার জন্যে জার আহ্বান জানান। পবিত্র চুক্তিতে বলা হয় যে—(১) ইওরোপের রাজাগণ পরস্পরকে খ্রীষ্টীয় সমাজের অধীন ভ্রাতা হিসেবে বিবেচনা করবেন। এর অর্থ হল যে, কেহ কাহারও স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করবেন না এবং পরস্পরকে ভ্রাতার ন্যায় জ্ঞান করবেন। (২) তাঁরা নিজ নিজ প্রজাপুঞ্জকে নিজ সন্তানের ন্যায় দেখবেন। অর্থাৎ পিতৃতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের আদর্শকে কার্যকরী করবেন। (৩) খ্রীষ্টীয় রাজারা "ন্যায়, মানবপ্রেম ও শান্তি" (Justice, Charity and Peace)-কে অবলম্বন করে রাজ্য শাসন করবেন। (৪) ইওরোপীয় রাজারা অঙ্গীকার করবেন যে, শাসনকার্যে তাঁরা "ধর্মের মহান তত্ত্বগুলিকে" (Sublime Truths of Religion) পালন করবেন। (৫) প্রাশিয়া, রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়ার সম্রাট বিশেষভাবে পরস্পরকে ভ্রাতা জ্ঞান করে উপরোক্ত আদর্শগুলিকে নিজ নিজ রাজ্যে কার্যকরী করবেন।

পবিত্র চুক্তিব আদর্শ

পবিত্র চুক্তির আদর্শ ঘোষিত হলে প্রাশিয়া, অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়া এতে যোগ দিয়ে পরস্পরের

১· Fisher—History of Europe. P. 873.

স্বার্থ বক্ষায প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয। এব ফলে এই তিন শক্তি একটি গোপন বক্ষণশীল জোটেব অঙ্গীভূত হয। এদেব আসল উদ্দেশ্য ছিল পবিত্র চুক্তিব মাধ্যমে ইওবোপে পুবাতনতন্ত্রকে স্থাযী কবা এবং বৈপ্লবিক ভাবধাবাকে নির্মূল কবা। কাবণ বৈপ্লবিক ভাবধাবা ছিল 'খ্রীষ্টধর্মেব মহান আদর্শ বিবোধী'। পবিত্র চুক্তিব মাধ্যমে জাব 'শান্তি মানবপ্রেম ও ন্যায নীতিব" কথা বলা সত্ত্বেও এব আসল অর্থ ছিল ইওবোপীয বাজাদেব স্বৈবশাসন ব্যবস্থাকে ধর্মেব আদর্শ দ্বাবা মজবুত কবা। এই চুক্তি নতুন বোতলে পুবাতন মদ্য বিশেষ। এতে পবোক্ষভাবে ফবাসী বিপ্লবজাত ভাবধাবাকে অগ্রাহ্য কবা হয এবং বক্ষণশীলতাকে প্রাধান্য দেওযা হয।

পবিত্র চুক্তিব আসল মর্ম

বাস্তবক্ষেত্রে পবিত্র চুক্তি ছিল অকার্যকবী। কাবণ এটি চুক্তিব আকাবে বচিত না হযে কযেকটি বিমূর্ত (abstract) জটিল নীতিব ঘোষণায পর্যবসিত হয। এইরূপ বিমূর্ত নীতিব ওপব নির্ভব কবে বাজ্য শাসন কবা সম্ভবপব ছিল না। পবিত্র চুক্তিতে বাস্তব বুদ্ধিব অভাব ছিল। এটি চুক্তি আকাবে বচিত না হযে একটি ঘোষণাপত্র রূপে প্রচাবিত হয। এব ফলে এই চুক্তি ছিল অস্পষ্ট এবং ধোঁযাটে কযেকটি নীতিবাক্যেব সমন্বয মাত্র।

এই চুক্তিব দুর্বলতা

পবিত্র চুক্তিতে ইওবোপেব তিন প্রধান এবং কতিপয বাজা যোগদান কবেন, কিন্তু ইংলন্ডেব প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট ও দৃঢভাবে এই চুক্তিতে যোগদানে অস্বীকৃতি জানান। তিনি এই চুক্তিব লক্ষ্যগুলিব অস্পষ্টতাব জন্যে অভিযোগ কবেন। ইংলন্ড এই চুক্তিতে যোগ দিলে কি ধবনেব দাযিত্ব পালন কবতে বাধ্য থাকবে তা চুক্তিতে পবিষ্কাব না থাকায তিনি বিবক্তি পকাশ কবেন। পবিশেষে তিনি পবিত্র চুক্তিকে "একটি মহান বহস্যপূর্ণ অর্থহীন পাগলামি' (A piece of subline mysticism and nonsense) বলে নাকচ কবে দেন। মেটাবনিক পবিত্র চুক্তিব সমালোচনা কবে বলেন যে, পবিত্র চুক্তি হল 'একটি অর্থহীন উচ্চ ঘোষণা মাত্র' (A loud sounding nothing) এবং এটি হল "ধর্মীয ছদ্মবেশে একটি বাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা (A political aspiration clothed in religious garb)। মেটার্নিক তাব দিনলিপিতে এই মন্তব্য কবেন যে, "বাশিযাব জাবকে খুশি কবাব জন্যে অষ্ট্রিযা ও প্রাশিযা এতে স্বাক্ষব কবে।' মোট কথা, অষ্ট্রিযা ও প্রাশিযা পবিত্র চুক্তিব প্রতি আন্তবিক ছিল না। ইংলন্ড, অষ্ট্রিযা প্রভৃতি দেশেব বিবোধিতাব ফলে পবিত্র চুক্তি বিফলতায পর্যবসিত হয।

অষ্ট্রিযা ও ইংলন্ডেব বিবোধিতা

পবিত্র চুক্তিব বিফলতব প্রধান কাবণ ছিল এব অস্পষ্টতা ও বিমূর্ত নীতিগুলি। ইংলন্ড আশঙ্কা কবে যে, এই চুক্তিতে যোগ দিলে ইংলন্ডকে 'বিপজ্জনক ও অদৃষ্টপূর্ব দাযিত্বে" (Dangerous and unforeseen commitments) পডতে হবে। ইংলন্ডেব বিবোধিতা এবং অষ্ট্রিযাব আপত্তিব ফলে পবিত্র চুক্তি বানচাল হয। দ্বিতীযতঃ, ইংলন্ড, অষ্ট্রিযা প্রভৃতি শক্তিগুলি বাশিযাব ক্ষমতা বৃদ্ধিতে ঈর্ষান্বিত ছিল। পবিত্র চুক্তিব দ্বাবা জাবেব নৈতিক ক্ষমতা বাডবে এই আশঙ্কা তাঁবা কবতেন। পবিত্র চুক্তিকে একমাত্র জাব আলেকজান্ডাব ছাডা আব কোন শক্তি আন্তবিকভাবে গ্রহণ কবেনি। ধর্মনিবপেক্ষ বাজনীতিব যুগে ধর্মীয অনুশাসন অনুযাযী বাজ্য শাসন কবা ছিল হাস্যকব প্রচেষ্টা। তবে শক্তি সমবাযেব বিভিন্ন কাজেব সমর্থনে মাঝে মাঝে পবিত্র চুক্তিব নাম ব্যবহাব কবা হয। এজন্য শক্তি সমবাযেব সঙ্গে এই চুক্তিব নাম জডিত হয। আসলে এই চুক্তি প্রথমাবধি বিফলতায পর্যবসিত হয।

ইংলন্ডেব বিবোধিতাব কাবণ

চতুঃশক্তি সন্ধি ও শক্তি সমবায়ের কার্যকলাপ (The Quadruple Alliance and the work of the Concert of Europe) : পবিত্র চুক্তিব

বিফলতার পর, ইওরোপীয় শক্তি সমবায় গঠনের জন্যে বাস্তবপন্থী মেটারনিক চতুঃশক্তি সন্ধির খসড়া রচনা করেন। শোমোর চুক্তি (Treaty of Chaumont) অনুকরণে চতুঃশক্তি সন্ধি রচিত হয় ২০শে নভেম্বর, ১৮১৫ খ্রীঃ। অষ্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, রাশিয়া, ইংলন্ড এতে স্বাক্ষর করে। ইওরোপীয় শক্তি সমবায় প্রকৃতপক্ষে চতুঃশক্তি সন্ধির দ্বারা স্থাপিত হয়। এই সন্ধিতে স্বাক্ষরকারী শক্তিগুলি অঙ্গীকার করে যে—(১) ভিয়েনা সন্ধিকে রক্ষা করা হবে। (২) ইওরোপে যুদ্ধ-বিগ্রহ রদ করে শান্তি অব্যাহত রাখা হবে। বিভিন্ন শক্তির মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে তা আলাপ-আলোচনার দ্বারা মিটিয়ে ফেলা হবে। (৩) বিপ্লবী ভাবধারা ইওরোপের শান্তির বিঘ্ন সৃষ্টি করলে তা দমন করা হবে। (৪) চতুঃশক্তি সন্ধির ৬নং ধারায় বলা হয় যে, ইওরোপের পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্যে চার শক্তি মাঝে মাঝে কংগ্রেস বা বৈঠকে সমবেত হবেন।

চতুঃশক্তি সন্ধির শর্ত ও লক্ষ্য

চতুঃশক্তি সন্ধির গুরুত্ব আধুনিক যুগের ইতিহাসে অস্বীকার করা যায়নি। গ্রান্ট ও টেম্পারলির মতে, "কংগ্রেস কূটনীতি" (Congress diplomacy) বলতে যা বোঝায় তা চতুঃশক্তি সন্ধির ফলেই সৃষ্টি হয়। ইওরোপীয় শক্তিগুলি পরস্পরের মধ্যে বিরোধীয় বিষয়গুলিকে বাহুবলে সমাধান না করে কংগ্রেসের দ্বারা শান্তিপূর্ণভাবে সমাধান করবে, "এই মনোভাবকেই কংগ্রেস কূটনীতি" বলা হয়। ইওরোপীয় শক্তি সমবায় প্রকৃতপক্ষে চতুঃশক্তি সন্ধির ওপর ভিত্তি করে গঠিত হয়। সকল শক্তি ঐক্যমত হয়ে কাজ করে বলে এই জোটকে শক্তি সমবায় বলা হয়।

চতুঃশক্তির সন্ধির গুরুত্ব

শক্তি সমবায়ের কার্যাবলী (The work of the Concert of Europe) : ইওরোপীয় শক্তি সমবায় ১৮১৮ খ্রীঃ প্রথম পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। ফ্রান্স ভিয়েনা সন্ধি অনুসারে তার প্রদেয় ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করায় ফ্রান্স থেকে বিজয়ী সেনাদল অপসারণের প্রশ্ন আলোচনার জন্যে শক্তি সমবায়ের বৈঠক এ-লা-শ্যাপেলে (Aix-la-Chapelle) আহূত হয়। ফ্রান্স সম্পর্কে চতুঃশক্তি বাস্তবতা-সম্মত সিদ্ধান্ত নেয়। ফ্রান্সের ন্যায় বৃহৎ শক্তিকে বাইরে রেখে শক্তি সমবায় চলতে পারে না একথা তারা উপলব্ধি করেন। ফ্রান্সের রাজা অষ্টাদশ লুই ফ্রান্সকে বিপ্লবী মনোভাব গ্রহণ করা থেকে নিরস্ত করতে সমর্থ হন একথা সদস্যগণ বিশ্বাস করেন। সুতরাং সদস্যরা একমত হয়ে ফ্রান্স থেকে তাদের দখলদারী সেনা অপসারণ ও ফ্রান্সকে শক্তি সমবায়ের প্রথম সদস্য হিসেবে গ্রহণ করেন। এই কঠিন প্রশ্নের ব্যাপারে সদস্যরা একমত হলে তাদের মধ্যে উৎসাহ দেখা দেয়। তাঁরা ইওরোপের ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির অভিভাবকের ভূমিকা নিয়ে তাদের ওপর নৈতিক আধিপত্য বিস্তার করেন। (ক) সুইডেনের রাজার বিরুদ্ধে নরওয়ে কুশাসনের অভিযোগ জানালে সুইডেনরাজ বার্নাদোতকে শক্তি সমবায় ভর্ৎসনা করেন এবং পবিত্র চুক্তির আদর্শ অনুসরণ করতে পরামর্শ দেন। (খ) মোনাকো নামে ক্ষুদ্র দেশের প্রজাগণ তাদের রাজার বিরুদ্ধে অত্যাচারের অভিযোগ আনলে তাঁকে ভর্ৎসনা করা হয়। (গ) জার্মানীর ব্যাডেন রাজ্যের উত্তরাধিকারের সমস্যা এবং অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার ইহুদী প্রজাদের সমস্যা সম্পর্কেও শক্তি সমবায় ঐক্যমতে উপস্থিত হয়।

এ-লা-শ্যাপেলের বৈঠক

ইতিমধ্যে চতুঃশক্তির মধ্যে স্বার্থগত কলহ প্রকটিত হলে শক্তি সমবায়ের পতনের ঘণ্টা বেজে ওঠে। ঐতিহাসিক কেটেলবীর মতে, 'শক্তি সমবায়ের বাঁশীর গায়ে ফুটা দেখা দেয়' (The rift in the lute of the Concert)। ফলে শক্তি সমবায়ের সভায় বেসুরো আওয়াজ শোনা যায়। (১) স্পেনরাজ ফার্দিনান্দ শক্তি সমবায়ের নিকট আবেদন দ্বারা ন্যায্য অধিকার নীতি অনুসারে দক্ষিণ আমেরিকায়, অবস্থিত স্পেনের বিদ্রোহী উপনিবেশের ওপর তাঁর কর্তৃত্ব ফিরিয়ে দেওয়ার দাবী

সদস্যদের মধ্যে বিভেদ

জানান। এদিকে বিদ্রোহী উপনিবেশগুলিতে স্পেনের ক্ষমতা লোপের সুযোগে ইংলন্ড এই দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করেছিল।[১] এই কারণে ইংলন্ড দক্ষিণ আমেরিকার উপনিবেশের ওপর স্পেনের কর্তৃত্ব পুনঃ-প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে আপত্তি জানায়।ইংলন্ডের আপত্তির ফলে এই প্রশ্ন আপাততঃ মুলতুবী রাখা হয়। তবে শক্তি সমবায়ের অন্তর্বিরোধের এটি ছিল অশুভ ইঙ্গিত। (২) আরব জাতীয় বারবারী জলদস্যুদের উপদ্রব দমনের জন্যে রাশিয়া ভূমধ্যসাগরে নৌবহর পাঠাবার প্রস্তাব দিলে ইংলন্ড স্বীয় নৌ প্রতিপত্তি নষ্টের ভয়ে এর বিরোধিতা করে। ফলে এই প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়। (৩) আন্তর্জাতিক আইনে ক্রীতদাসের ব্যবসায় ছিল নিষিদ্ধ। ইংলন্ড প্রস্তাব দেয় যে, জাহাজের খোলে করে ক্রীতদাসের চোরা চালান বন্ধ করার জন্যে, সন্দেহজনক জাহাজ তল্লাসীর অধিকার ব্রিটিশ নৌবহরকে দেওয়া হোক। কিন্তু ইংলন্ডের এই প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য করা হয়। জ্যাক ড্রজ নামক ঐতিহাসিকের মতে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ব্রিটেনের সঙ্গে রাশিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয়। এজন্যে রুশ প্রস্তাবকে ইংলন্ড অগ্রাহ্য করে। এইভাবে এ-লা-শ্যাপেলের বৈঠক গভীর মনোমালিন্যের মধ্যে শেষ হয়।

স্পেন ও নেপলসে বিদ্রোহ ঃ শক্তি সমবায়কে স্থিতাবস্থা রক্ষার যন্ত্রে পরিণত করার জন্যে মেটারনিকের চেষ্টা

ইতিমধ্যে ১৮২০ খ্রীঃ স্পেনে গণবিদ্রোহ ঘটে। স্পেনরাজ ফার্দিনান্দ এই বিদ্রোহের ফলে প্রজাদের একটি উদারপন্থী সংবিধান দানে বাধ্য হন। স্পেনে প্রজা বিদ্রোহের সংবাদ পেয়ে জার প্রথম আলেকজান্ডার স্পেনে রুশ সৈন্য পাঠাবার জন্যে প্রস্তাব দেন। কিন্তু ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কাসলরি একটি রাষ্ট্রনীতি বিষয়ক চিঠির দ্বারা (State Paper) এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেন। তিনি ইহা বলেন যে, নেপোলিয়নের পুনরাক্রমণের বিরুদ্ধে চতুঃশক্তি সন্ধি গঠিত হয়। স্পেনের বিদ্রোহের সঙ্গে নেপোলিয়নের কোন সম্পর্ক নেই। সুতরাং স্পেনের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার এক্তিয়ার শক্তি সমবায়ের নেই। এর কিছু পরেই দক্ষিণ ইতালীর নেপলসে (Naples) এবং পর্তুগালে স্পেনের মতোই উদারপন্থী বিদ্রোহ ঘটে। জার্মানীতে রক্ষণশীল নাট্যকার কোৎবু (Kotzebue) কার্ল স্যান্ড নামে এক ছাত্র দ্বারা নিহত হন। মেটারনিক এই সকল সমস্যা বিবেচনার জন্যে শক্তি সমবায়ের দ্বিতীয় বৈঠক (১৮২০ খ্রীঃ) ট্রপো শহরে ডাকেন।

মেটারনিক ইতিমধ্যে তাঁর পরিকল্পনা স্থির করে ফেলেন। তিনি ছিলেন রক্ষণশীল নীতির প্রধান পুরোহিত। ইওরোপে উদারপন্থী ভাবধারার বিস্তার তাঁর ঘোর আশঙ্কার কারণ হয়। তিনি ইওরোপে রক্ষণশীলতাকে সুপরিকল্পিতভাবে কায়েম করার জন্যে শক্তি সমবায়কে ব্যবহার করার সঙ্কল্প নেন। তিনি শক্তি সমবায়কে ইওরোপে গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ দমনের একচেটিয়া হাতিয়ারে পরিণত করার ব্যবস্থা করেন। যাতে সকল সদস্য তাঁর প্রবর্তিত নীতি গ্রহণ করে এজন্য মেটারনিক প্রোটোকোল অফ ট্রপো বা ট্রপোর ঘোষণাপত্র নামে এক দলিল রচনা করেন। তিনি সদস্যদের এই ঘোষণাপত্রে স্বীকৃতি দিতে আহ্বান জানান।

ট্রপোর ঘোষণাপত্র

ট্রপোর ঘোষণাপত্রে বলা হয় যে—(১) রাজা স্বেচ্ছায় ও বিনা প্ররোচনায় যে সংবিধান দান করবেন একমাত্র সেই সংবিধান বৈধ বলে বিবেচিত হবে। (২) যদি ইওরোপের কোন দেশে বিপ্লব ঘটে যার ফলে সেই দেশের রাজা তাঁর ন্যায্য অধিকারে বঞ্চিত হন, তবে সেই দেশকে ইওরোপীয় শক্তি সমবায় থেকে বহিষ্কৃত বলে গণ্য করা হবে। (৩) যদি এই বিপ্লবের ফলে প্রতিবেশী রাজ্যের শান্তি বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়, তবে শক্তি সমবায় এই বিপ্লবকে বলপূর্বক দমন করে সেই দেশের শান্তি ও স্থিতাবস্থা ফিরিয়ে আনবে। ট্রপোর ঘোষণাপত্রের দ্বারা শক্তি সমবায় কার্যতঃ ইওরোপে সকল প্রকার অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমনের দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং ইওরোপে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রগুলিকে স্থায়ী করার সিদ্ধান্ত

১· Gordon Craig.

নেয়। এছাড়া ইওরোপের গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী সকল আন্দোলনকে দমাবার আয়োজন করা হয়।

ইংলণ্ডের আপত্তি

ইংলন্ড আগেই স্টেট পেপার বা রাষ্ট্রনীতির ঘোষণাপত্রের দ্বারা এরূপ কাজের প্রতিবাদ জানিয়েছিল। ট্রপোর বৈঠকে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কাসলরি ট্রপোর ঘোষণাপত্রের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট আপত্তি জানিয়ে বলেন যে—(১) এই ঘোষণাপত্র চতুঃশক্তি সন্ধির আদর্শের বিরোধী। ইংলন্ড এতে যোগ দেবে না। (২) স্পেনের বিপ্লব স্পেনের অভ্যন্তরীণ ঘটনা। এতে বহিঃশক্তি হস্তক্ষেপ করলে সার্বভৌম দেশগুলির সার্বভৌম ক্ষমতা বিনষ্ট হবে। এর ফলে ভয়ানক খারাপ নজীরের সৃষ্টি হবে। শক্তি সমবায় শেষ পর্যন্ত সকল দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে। (৩) এরূপ কাজ চতুঃশক্তি সন্ধির বিরোধী হবে। (৪) ইংলন্ড মনে করে যে, অত্যাচারী রাজার বিরুদ্ধে প্রজার বিদ্রোহ করার আইনগত ও নীতিগত অধিকার আছে। সপ্তদশ শতকে ইংলন্ডের প্রজাবর্গ এরূপ বিদ্রোহের দ্বারা গণতান্ত্রিক সংবিধান লাভ করে। ইংলন্ড নিজে যা করেছে, তা অপরকে করতে নিষেধ করবে না। কিন্তু কাসলরির প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে অষ্ট্রিয়া, প্রাশিয়া ও রাশিয়া এই তিন রক্ষণশীল শক্তি সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে ট্রপোর ঘোষণাপত্র পাশ করালেও শক্তি সমবায় ট্রপোর ঘোষণাপত্রের নীতিকে সফল করার চেষ্টা করে। ফ্রান্স ভোটদানে বিরত থাকে। ইংলন্ডের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করায় ইংলন্ড শক্তি সমবায় থেকে দূরে সরে যায়। শক্তি সমবায়ের পতন আরম্ভ হয়.

লাইব্যাকের বৈঠক (১৮২১ খ্রীঃ)

ট্রপোর বৈঠকের পর ১৮২১ খ্রীঃ লাইব্যাকে শক্তি সমবায়ের তৃতীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ট্রপোর ঘোষণাপত্রের নীতি অনুসারে নেপলসের বিদ্রোহ দমনের জন্যে অষ্ট্রিয়াকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। অষ্ট্রিয়ার সেনাদল বুরবোঁ ফার্দিনান্দকে নেপলসের সিংহাসনে পূর্বক্ষমতা সহ পুনঃ-প্রতিষ্ঠা করে। তারা পিডমন্টের উদারনৈতিক সংবিধান দমন করে এবং ইতালীতে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রকে পূরা সক্রিয় করে। কিছুদিনের জন্যে গোটা ইওরোপে মেটারনিকতন্ত্র জয়যুক্ত হয়।

ইংলণ্ডের বৈদেশিক মন্ত্রী ক্যানিং-এর নতুন চিন্তা

অতঃপর ভেরোনা নগরে ১৮২২ খ্রীঃ শক্তি সমবায়ের চতুর্থ বৈঠক বসে। ইতিমধ্যে ইংলণ্ডের বিদেশ মন্ত্রীর পদে ক্যানিং বসেন। ক্যানিং-এর আমলে শক্তি সমবায় সম্পর্কে ইংলণ্ডের নীতির পরিবর্তন ঘটে। ঐতিহাসিক টেমপারলি (Temperley) ক্যানিং-এর নীতির ব্যাখ্যা করেছেন। ক্যানিং মনে করতেন যে, শক্তি সমবায়ে যোগদানের ফলে ইংলণ্ড স্বাধীনভাবে বৈদেশিক নীতি পরিচালনা করিতে সক্ষম হয়নি। যুদ্ধের সময় শক্তি সমবায়-এর প্রয়োজনীয়তা থাকলেও শান্তির সময় এর অস্তিত্ব ছিল ইংলণ্ডের স্বার্থবিরোধী।[১] সুতরাং ক্যানিং শক্তি সমবায়ের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের কথা চিন্তা করেন।

ভেরোনার বৈঠক ১৮২২ খ্রীঃ ইংলণ্ডের শক্তি সমবায় বর্জন

ভেরোনা বৈঠকে তিনি ডিউক অফ ওয়েলিংটনকে ইংলণ্ডের প্রতিনিধি হিসেবে পাঠান। ভেরোনায় মেটারনিক ইংলণ্ডের আপত্তি অগ্রাহ্য করে স্পেনের বিদ্রোহ দমনের জন্যে স্পেনে ফরাসী সেনা পাঠাবার প্রস্তাব পাশ করান। রক্ষণশীল শক্তিগুলির সমর্থন পেয়ে তিনি ইংলণ্ডকে কোণঠাসা করে শক্তি সমবায়কে নিজ ইচ্ছায় চালাতে থাকেন। ফরাসী সেনা স্পেনে প্রবেশ করে স্পেন ও পর্তুগালের উদারনৈতিক বিদ্রোহ দমন করে। এই স্থানে তারা স্বৈরশাসন পুনঃ-স্থাপন করে। আত্মতৃপ্ত মেটারনিক এইবার আমেরিকায় স্পেনের উপনিবেশের প্রশ্ন ভেরোনা বৈঠকে পুনরায় উত্থাপন করেন। এই প্রশ্ন এ-লা-শ্যাপেলের বৈঠকে ইংলণ্ডের আপত্তির ফলে মুলতুবী

১· Temperley—Cambridge History of British Foreign policy.

ছিল। এই প্রশ্ন পুনরায় উত্থাপিত হলে এর প্রতিবাদে ইংলণ্ড ভেরোনা বৈঠক বর্জন করে। এই সময় থেকে ইংলণ্ড শক্তি সমবায় থেকে চিরবিদায় নেয়। ইংলণ্ডের পদত্যাগের ফলে চতুঃশক্তির সন্ধি ভেঙে পড়ে।

শক্তি সমবায়ের বিরুদ্ধে ইংলন্ডের বিরোধিতা : মনরো নীতি (১৮২৩) ঘোষণা

ক্যানিং আশঙ্কা করেন যে, ভেরোনার প্রস্তাব অনুযায়ী শক্তি সমবায়ের সেনাদল দক্ষিণ আমেরিকায় পাঠান হবে। এর প্রতিরোধের জন্যে তিনি স্পেনের বিদ্রোহী উপনিবেশগুলির স্বাধীনতাকে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে স্বীকৃতি দেন। ইংরাজ নৌবহরকে আটলান্টিক মহাসাগরে শক্তি সমবায়ের জাহাজগুলিকে আটকাবার জন্যে নির্দেশ দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জেমস মনরো তাঁর বিখ্যাত মনরো নীতি (Monroe Doctrine) (১৮২৩ খ্রীঃ) ঘোষণা করে শক্তি সমবায়কে সতর্ক করেন। মনরো নীতির দ্বারা মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন যে—(১) "আমেরিকা হল আমেরিকাবাসীদের জন্যে।" (২) আমেরিকায় ইওরোপীয় শক্তির হস্তক্ষেপ মার্কিন দেশ সহ্য করবে না। (৩) আমেরিকায় ইওরোপের উপনিবেশ বিস্তারে মার্কিন দেশ বিরোধিতা করবে। (৪) আমেরিকা ইওরোপের ব্যাপারে জড়িত থাকবে না। মনরো নীতি ঘোষণার ফলে ও ক্যানিংয়ের সক্রিয় বিরোধিতায় শক্তি সমবায় দক্ষিণ আমেরিকায় হস্তক্ষেপে বিরত থাকে। বক্তৃতাবাজ ক্যানিং হতমান মেটারনিকের কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিয়ে বলেন যে, "আমি পুরাতন পৃথিবীর (অর্থাৎ ইওরোপের) ভারসাম্য রক্ষার জন্যে একটি নতুন পৃথিবী (অর্থাৎ স্বাধীন আমেরিকা) সৃষ্টি করলাম" (I have brought a New World into existence to redress the balance of the Old)। ক্ষুব্ধ মেটারনিক প্রত্যুত্তরে ক্যানিংকে, "ইওরোপের ক্ষতিকারক উল্কাপিণ্ড" (Malevolent Meteor) বলে অভিহিত করেন।

সেন্ট পিটার্সবার্গের বৈঠক (১৮২৫) গ্রীসের বিদ্রোহ : শক্তি সমবায়ের পতন

ভেরোনা বৈঠকের পর শক্তি সমবায় কার্যতঃ ভেঙে যায়। গ্রীসের বিদ্রোহের সমস্যা সমাধানের জন্যে জার প্রথম আলেকজাণ্ডার সেন্ট পিটার্সবার্গে শক্তি সমবায়ের পঞ্চম সম্মেলন (১৮২৫ খ্রীঃ) আহ্বান করেন। ইংলণ্ড এই বৈঠক বর্জন করে। তুরস্কের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা লাভের জন্যে গ্রীস বিদ্রোহ করলে জার গ্রীসের পক্ষ নিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু মেটারনিক প্রভৃতি ঝানু নেতারা মনে করেন যে, জার তুরস্ককে হটিয়ে নিজ ক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টায় আছেন। সুতরাং তাঁরা বলেন যে, ট্রপোর ঘোষণাপত্র অনুসারে বিদ্রোহী গ্রীসকে রাশিয়া সাহায্য দিতে পারে না। তাছাড়া গ্রীস হল তুরস্কের রাজ্য। তুরস্ক হল এশিয়ার দেশ। ইওরোপীয় শক্তি সমবায়ের সঙ্গে এশিয়ার কোন সম্পর্ক নেই (Greece lies outside Europe)। জারের সঙ্গে শক্তি সমবায়ের অপর সদস্যদের এজন্যে মনোমালিন্য দেখা দেয়। ফলে শক্তি সমবায়ের পতন ঘটে।

ইওরোপীয় শক্তি সমবায়ের বিফলতার কারণ (Causes of the collapse of the Concert of Europe) : নেপোলিয়নের পতনের পর ইওরোপের শান্তি ও স্থিতি রক্ষার জন্যে শক্তি সমবায় স্থাপিত হলেও প্রায় দেড় দশকের মধ্যে এই সংগঠন ভেঙে পড়ে। শক্তি সমবায়ের পতনের প্রধান কারণ এই ছিল যে, এটি নেপোলিয়নের পুনরাক্রমণের ভয়ে গঠিত হয়। যতদিন নেপোলিয়নের আক্রমণের আশঙ্কা বিদ্যমান ছিল ততদিন সদস্যরা ঐক্যবদ্ধ থাকেন। যে মুহূর্তে নেপোলিয়নের আক্রমণের আশঙ্কা তিরোহিত হয়, সেই মুহূর্তে সদস্যদের পরস্পরের স্বার্থগত বিরোধ প্রকট হয়ে ওঠে। এছাড়া শক্তি সমবায়ের এমন কোন গঠনমূলক উদ্দেশ্য ছিল না, যেজন্যে সদস্য

নেপোলিয়নের আক্রমণের সম্ভাবনা দূর হলে শক্তি সমবায়ের প্রয়োজনীয়তা লোপ

দেশগুলি একে প্রয়োজনীয় মনে করতে পারে। ফলে নেপোলিয়নের পতনের পর শক্তি সমবায়ের ভিত্তি দুর্বল হতে থাকে।

জ্যাক ড্রজ (Jack Droz) নামক ঐতিহাসিকের মতে, শক্তি সমবায়ের পতনের প্রধান কারণ এই ছিল যে, পবিত্র চুক্তি ও চতুঃশক্তি সন্ধি ছিল পরস্পর-বিরোধী। পবিত্র চুক্তি দ্বারা জার প্রথম আলেকজাণ্ডার ইওরোপের স্থলশক্তিগুলিকে নিজ পক্ষে এনে, নৌশক্তি ইংলন্ডকে কোণঠাসা করার চেষ্টা করেন। অপরদিকে ইংলন্ড চতুঃশক্তি সন্ধির দ্বারা ইওরোপের স্থলশক্তিগুলির মিত্রতা লাভ করে রাশিয়ার উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করে। রাশিয়া ও ইংলন্ডের এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগে অস্ট্রিয়ার মেটারনিক শক্তি সমবায়কে নিজ উদ্দেশ্য সাধনের কাজে লাগান। ইংলণ্ড ও রাশিয়ার এই গুপ্তদ্বন্দ্বের ফলে শক্তি সমবায় অকার্যকরী হয়ে যায়। ইংলন্ড শেষ পর্যন্ত ইহা ত্যাগ করে।

নৌ-শক্তি ইংলন্ডের সহিত স্থলশক্তি অষ্ট্রিয়া-রাশিয়ার বিরোধ

জাহাজ যেমন সমুদ্রের ভেতর ডুবো পাহাড়ে ধাক্কা লেগে নিমজ্জিত হয়, শক্তি সমবায় সেরূপ সদস্যদের পরাস্পরিক স্বার্থের সংঘাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। নেপোলিয়ন ভীতি দূর হলে সদস্যদের মধ্যে ঈর্ষা ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব নগ্নভাবে প্রকট হয়। ইংলন্ডের নৌ-শক্তির প্রতাপ এবং তুরস্কের সঙ্গে ইংলন্ডের মিত্রতার জন্যে রাশিয়ার জার ক্রুদ্ধ হন। এদিকে রাশিয়ার বিরাট স্থলবাহিনীর ভয়ে অষ্ট্রিয়া আশঙ্কিত হয়। এই কারণে গ্রীসের বিদ্রোহ উপলক্ষে গ্রীসে রাশিয়ার হস্তক্ষেপে অষ্ট্রিয়া বিরোধিতা করে। এদিকে ইংলন্ড ট্রপোর ঘোষণাপত্রের বিরোধিতা করায়, ইংলন্ডের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়া স্পেনের বিদ্রোহ দমনে ফরাসী সেনা পাঠায়। ইংলন্ডের আপত্তি অগ্রাহ্য করে স্পেনের আমেরিকার উপনিবেশ পুনরুদ্ধারের জন্যে সিদ্ধান্ত নেয়। এভাবে দেখা যায় যে, শক্তি সমবায়ের সদস্যদের মধ্যে সমস্বার্থ না থাকায় শক্তি সমবায়ের পতন ঘটে। কেটেলবির মতে, "সদস্যদের মধ্যে সাধারণ স্বার্থ না থাকলে কোন রাষ্ট্রজোট স্থায়ী হয় না" (No federation can endure without a modicum of common interest)।[১]

শক্তি সমবায়েব সদস্যদের স্বার্থগত দ্বন্দ্ব

শক্তি সমবায়ের সদস্যদের মধ্যে রাষ্ট্রীয় আদর্শের পার্থক্য থাকায় সদস্যদের মধ্যে ঐক্য ছিল না। ব্রিটিশ সরকারের চরিত্র ছিল সাংবিধানিক, অপরদিকে অষ্ট্রিয়া, প্রাশিয়া ও রাশিয়া ছিল স্বৈরতান্ত্রিক। এজন্যে উদারতন্ত্রী ইংলন্ডের সঙ্গে রক্ষণশীল শক্তিগুলির দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য দেখা দেয়। উদারতন্ত্রী ইংলন্ডকে তার সংবিধান, পার্লামেন্ট ও জনমতের সমর্থন নিয়ে বৈদেশিক নীতি পরিচালনা করতে হত। অপরদিকে স্বৈরতন্ত্রী শক্তিগুলির এই দায়িত্ব ছিল না। তারা কেবলমাত্র রাজার ইচ্ছাতেই নীতি নির্ধারণ করত। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কাসলরি শক্তি সমবায়ের প্রতি ইংলন্ডের দুর্বলতার জন্যে পার্লামেন্টে সমালোচিত হন। ট্রপোর ঘোষণাপত্রের দ্বারা স্বাধীন দেশের ব্যাপারে শক্তি সমবায় হস্তক্ষেপের সিদ্ধান্ত নিলে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ঘোর সমালোচনা হয়। ইংলন্ডের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে ট্রপোর ঘোষণাপত্র গৃহীত হলে এবং স্পেনে ফরাসী সৈন্য পাঠান হলে ব্রিটিশ মন্ত্রীসভা পার্লামেন্টে তিরস্কৃত হয়। পার্লামেন্টকে অগ্রাহ্য করে স্বৈরতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলা ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এই কারণে ইংলন্ড শেষ পর্যন্ত শক্তি সমবায় ত্যাগ করে।[২]

সাংবিধানিক রাষ্ট্র ইংলন্ডের সহিত স্বৈরতান্ত্রিক শক্তিগুলির আদর্শগত বিরোধ

ইংলন্ডের নতুন বিদেশমন্ত্রী ক্যানিং-এর নীতির ফলে শক্তি সমবায়ের দ্রুত পতন ঘটে। ভূতপূর্ব মন্ত্রী কাসলরির ন্যায়, ক্যানিং শক্তি সমবায়কে অপরিহার্য মনে করতেন না। তিনি মনে

১· Ketelbey—History of Modern Times. P.185.

২· Temperley—Cambridge History of British foreign Policy.

শক্তি সমবায়ের প্রতি ইংলন্ডের বিদেশ মন্ত্রী ক্যানিং-এর আস্থা হ্রাস

করতেন যে, শক্তি সমবায়ে যোগ দিয়ে ইংলন্ড অপদস্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ইংলন্ড স্বাধীনভাবে তার বৈদেশিক নীতি পরিচালনায় বাধা পাচ্ছে। সুতরাং স্পেনের আমেরিকার উপনিবেশে শক্তি সমবায়ের হস্তক্ষেপ উপলক্ষে, তিনি শক্তি সমবায়ের সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করলে সমবায় ভেঙে যায়। ইংলন্ডের ন্যায় শক্তিশালী রাষ্ট্রের বিরোধিতাকে অগ্রাহ্য করা শক্তি সমবায়ের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ১৮৩০ খ্রীঃ জুলাই বিপ্লবের পর ফ্রান্সও শক্তি সমবায় ছেড়ে ইংলন্ডের দিকে ঢলে পড়ে। ফলে শক্তি সমবায় শেষ পর্যন্ত অস্ট্রিয়া-প্রাশিয়া-রাশিয়া তিন রক্ষণশীল শক্তিজোটে পরিণত হয়।[১] উপরোক্ত তিন শক্তির রক্ষণশীল জোটও শেষ পর্যন্ত ভেঙে যায়। তুরস্কের বিরুদ্ধে গ্রীসের পক্ষে রুশ হস্তক্ষেপে অস্ট্রিয়া বিরোধিতা করলে জার প্রথম আলেকজান্ডার হতাশ হয়ে পড়েন।

মেটারনিক শক্তি সমবায়কে ট্রপোর বৈঠকের পর রক্ষণশীলতার তল্পিবাহকে পরিণত করেন।

শক্তি সমবাযকে সংস্কারবাদী সংস্থা না করিয়া রক্ষণশীলতার যন্ত্রে পরিণত কবা

শক্তি সমবায়ের মূল লক্ষ্য চতুঃশক্তি সন্ধিতে গৃহীত হয়েছিল। মেটারনিকের প্রভাবে শক্তি সমবায় তার মূল আদর্শ থেকে সরে যায়। ইংলন্ড এজন্যে হতাশ হয়ে পড়ে। ডেভিড টমসনের মতে, শক্তি সমবায়ের উচিত ছিল ভিয়েনা চুক্তিকে অলঙ্ঘনীয় না ভেবে, ন্যায্য ঐতিহাসিক পরিবর্তনগুলিকে স্বীকার করা। যেক্ষেত্রে প্রকৃত জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র দেখা দেয় তাকে স্বীকৃতি না দেওয়ার অর্থ ছিল ইতিহাসের গতির বিরুদ্ধে যাওয়া। সম্মার্জনীর আঘাতে যেমন সমুদ্র তরঙ্গ ঠেকান যায় না, সেরূপ ট্রপোর ঘোষণাপত্র দ্বারা ইতিহাসের অগ্রগতিকে রুদ্ধ করা সম্ভব হয়নি। শক্তি সমবায়ের এই প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র এর পতন ত্বরান্বিত করে।

১৮১৫ খ্রীঃ হতে ইওরোপে ও ব্রিটেনে পর পর কয়েক বছর শস্যহানি, খরা, শিল্পে মন্দা দেখা দেয়। বহু ব্যাঙ্ক ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এজন্যে বন্ধ হয়ে যায়। সরকারগুলি ব্যয় নির্বাহের জন্যে জনসাধারণকে করভারে জর্জরিত করে। এরূপ অর্থনৈতিক মন্দার ফলে রক্ষণশীল সরকারগুলির প্রতি জনসাধারণের আস্থা নষ্ট হয়। উদারনৈতিক ও জাতীয়তাবাদী দাবী প্রবল হয়। এমতাবস্থায় মেটারনিকের প্রভাবে শক্তি সমবায় দমন নীতি নেয়। দমন নীতি গ্রহণের ফলে শক্তি সমবায় তার নৈতিক শক্তি হারিয়ে একটি দমনের যন্ত্রে পরিণত হয়। ব্রিটেন কংগ্রেস ব্যবস্থা বা শক্তি সমবায়কে মেনে নেয় এজন্যে যে, এর দ্বারা নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য আগ্রাসন নিরোধ ও ইওরোপীয় শক্তিগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের বিরোধ শান্তিপূর্ণভাবে মেটানো যাবে। ব্রিটেন শক্তি সমবায়কে এমনভাবে ব্যবহার করতে চায় যাতে প্রকৃত জাতীয়তাবাদী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে স্বীকৃতি দিয়ে বাস্তবকে মেনে নেওয়া হয়। কিন্তু মেটারনিক শক্তি সমবায়কে একটি দমন নীতির অচলায়তনে পরিণত করায়, ব্রিটেন তার বিরোধিতা করে।

তাছাড়া মার্কিন প্রেসিডেন্ট মনরো তাঁর নীতি ঘোষণা করে আমেরিকা মহাদেশে শক্তি সমবায়ের হস্তক্ষেপে বাধা দিলে শক্তি সমবায়ের মর্যাদা নষ্ট হয়। এই সুযোগে ইংলন্ড দক্ষিণ আমেরিকার বিদ্রোহী স্পেনীয় উপনিবেশগুলির স্বাধীনতাকে স্বীকার করে। ইংলন্ড ও মার্কিন দেশের এই যুগ্ম বিরোধিতার জন্যে শক্তি সমবায়ের হস্তক্ষেপ নীতি ব্যর্থ হয়।

শক্তি সমবায়ের গুরুত্ব (The significance of the Concert of Europe) ঃ সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে ইওরোপীয় রাজনীতি সামরিক শক্তিকে আশ্রয় করে পরিচালিত হয়। যে দেশ সামরিক শক্তির অধিকারী হয়, সেই দেশ আন্তর্জাতিক আইন অগ্রাহ্য করে বাহুবলে প্রতিবেশী রাজ্যগুলিকে পদানত করার চেষ্টা করে। নগ্ন রাজ্য লোভ, গোপন

১· Jack Droz—Europe between Revolutions. P.221.

অষ্টাদশ শতকের আন্তর্জাতিক অরাজকতা

কূটনীতিই ছিল এই যুগের বৈশিষ্ট্য। সপ্তদশ শতকে বুরবোঁ রাজা চতুর্দশ লুই নেদারল্যান্ড, জার্মানীর রাইন প্রদেশ ও স্পেন দেশ অধিকারের জন্যে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ চালান। অষ্টাদশ শতকে প্রাশিয়ার রাজা ফ্রেডারিক দি গ্রেট বলপূর্বক সাইলেসিয়া অধিকার করেন। তিনি পোল্যান্ড ব্যবচ্ছেদে রাশিয়ার জারিনা দ্বিতীয় ক্যাথারিণের সঙ্গে হাত মেলান। নেপোলিয়ন রাজ্যগ্রাস নীতিকে সফল করার জন্যে ব্যাপক বল প্রয়োগ করে ইওরোপের রাজতন্ত্রগুলিকে পরাস্ত করেন। তিনি জার্মানী, ইতালী ও পোল্যান্ডে নিজ সাম্রাজ্য স্থাপন করেন।

কংগ্রেস কূটনীতির মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক বিরোধ নিষ্পত্তির চেষ্টা

নেপোলিয়নের পতনের পর বিজয়ী ইওরোপীয় শক্তিগুলি একথা বুঝতে পারে যে—প্রতি দেশ যদি নিজ স্বার্থকেই একমাত্র শ্রেষ্ঠ মনে করে তবে আন্তর্জাতিক অরাজকতা ও যুদ্ধ বারে বারে ঘটবে। ইওরোপে শান্তি রক্ষা করতে হলে আন্তর্জাতিক বিরোধের বিষয়গুলিকে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে "কংগ্রেস কূটনীতির" (Congress diplomacy) সূচনা করা হয়। এ-লা-শাপেল, ট্রপো, লাইব্যাক, ভেরোনা ও সেন্ট পিটার্সবার্গ কংগ্রেসের মাধ্যমে বৃহৎ শক্তিবর্গ ঐক্যমত প্রতিষ্ঠার দ্বারা ইওরোপের সমস্যাবলী সমাধানের চেষ্টা করে। যদিও শক্তি সমবায় বিফল হয়, তবুও 'কংগ্রেস কূটনীতির' মূল ছিল সুদুর-প্রসারী। পরবর্তীকালে ইওরোপের বহু সমস্যা 'কংগ্রেস কূটনীতির' দ্বারা সমাধান করা সম্ভব হয়। ইওরোপীয় শক্তি সমবায় যুদ্ধ না করে শান্তিপূর্ণভাবে সমস্যা সমাধানের নতুন পথ দেখায়। লন্ডন কংগ্রেসের দ্বারা ১৮৩২ খ্রীঃ বেলজিয়ামের স্বাধীনতার প্রশ্নের, প্যারিস কংগ্রেসের দ্বারা ১৮৫৪ খ্রীঃ পূর্বাঞ্চল সমস্যার, বার্লিন কংগ্রেসের দ্বারা ১৮৭৮ খ্রীঃ পুনরায় পূর্বাঞ্চল সমস্যার আপাততঃ সমাধান করা সম্ভব হয়। ল্যাংসামের মতে, কংগ্রেস প্রথা বিলোপের ফলেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ঘটে।[১]

শক্তি সমবায়ের কৃতিত্ব

শক্তি সমবায় কয়েকটি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখায়। নরওয়ে ও সুইডেনের মধ্যে বিরোধে, মনাকোর রাজার সঙ্গে প্রজাদের বিরোধে, ব্যাডেনের উত্তরাধিকারের প্রশ্নে, দাস ব্যবসায় নিষিদ্ধ করা এবং জলদস্যুতাকে আন্তর্জাতিক অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করে এই সমবায়কে সাময়িকভাবে কৃতিত্ব দেখায়। তবে শক্তি সমবায় ছিল কেবলমাত্র বৃহৎ শক্তির সংগঠন। ক্ষুদ্র শক্তিগুলিকে এতে যথাযোগ্য সমতা ও অধিকার দান করা হয়নি। তাছাড়া শক্তি সমবায় ইওরোপের বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যে শক্তিসাম্য (Equilibrium) স্থাপন করে ইওরোপের শান্তি রক্ষার নতুন পন্থা রচনা করে। পরবর্তীকালে এই নীতিকে গ্রহণ করা হয়।

পাঠ্যসূচী

১। Jacques Droz—Europe between Revolutions.

২। Gordon Craig—Europe Since 1815.

৩। Hearnshaw—The Era of Congress.

৪। Nicholson—The Congress of Vienna.

৫। A. Philips—Modern Europe.

৬। D. Thomson—Europe Since Napoleon.

৭। C. D. Hazen—Europe Since 1815.

৮। Ketelby—History of Modern Times.

৯। Temperley—Cambridge History of British Foreign Policy.

১· Langsham—World Since 1919.

দশম অধ্যায়
স্থিতাবস্থা ও পরিবর্তনশীলতার পরস্পর-বিরোধী শক্তি
(The Forces of Continuity and the Forces of Change)

স্থিতাবস্থার উপাদান সমূহ (Forces of Continuity) ঃ ১৮১৫ খ্রীঃ পর ইওরোপের ইতিহাসের দুই পরস্পর-বিরোধী ভাবধারাকে সক্রিয় দেখা যায়। একদিকে বিপ্লব পূর্ববর্তী ভাবধারাগুলিকে রক্ষার জন্যে চেষ্টা চলে। অপর দিকে সমাজে যে সকল পরিবর্তন ঘটে তার ফলে পুরাতনতন্ত্র বা রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এই প্রতিক্রিয়াগুলি পুরাতনতন্ত্রকে ধ্বসিয়ে পরিবর্তনের পথ রচনা করে। ১৮১৫ খ্রীঃ থেকে প্রায় অর্ধশতাব্দী ইওরোপে এই ঘাত-প্রতিঘাত চলে।

রক্ষণশীল গোষ্ঠী ১৮১৫ খ্রীঃ চুক্তি ও প্রাক্-বিপ্লব যুগের আদর্শকে স্থায়ী রাখার চেষ্টা চালায়। রক্ষণশীলতার অপর নাম ছিল স্থিতাবস্থা। পরিবর্তন বিরোধীতাই ছিল রক্ষণশীলতার প্রাণশক্তি। এজন্যে প্রাক্-বিপ্লব যুগের স্বর্গীয় রাজতন্ত্রবাদকে স্থিতাবস্থার একটি প্রধান খুঁটি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। রাজা ঈশ্বরের নির্দেশে বংশানুক্রমিক অধিকারে শাসন করবেন, এই তত্ত্বকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। জনসাধারণের ও রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষাই ছিল রাজার প্রধান কর্তব্য। এই দায়িত্ব পালনের বিনিময়ে রাজা তাঁর প্রজাদের নিঃশর্ত আনুগত্য দাবী করতে পারবেন। নেশন্ বা জাতি বলতে রাজবংশের মধ্যেই তা প্রতিফলিত হবে, রাষ্ট্র বলতে রাজাকেই বুঝাবে, এই মতবাদ প্রাধান্য পায়। রাজার ক্ষমতা ছিল নিরঙ্কুশ ও সর্বাত্মক। কারণ তিনি ছিলেন ঈশ্বর কর্তৃক নিয়োজিত। রাজার এই অধিকারকে ন্যায্য অধিকারবাদ (Legitimism) বলে অভিহিত করা হয়। বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রই একমাত্র ন্যায্য একথাই স্বীকার করা হয়। ন্যায্য অধিকারের অনুষঙ্গী হিসেবে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রকে মহান আদর্শরূপে প্রচার করা হয়।

স্থিতাবস্থা নীতির অপর প্রধান থাম ছিল ক্যাথলিক গীর্জা। বিপ্লবের সময় ক্যাথলিক গীর্জার ওপর বিশেষ আক্রমণ হয়। কারণ ক্যাথলিক গীর্জা ছিল স্বাধীন চিন্তার ঘোর বিরোধী এবং স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের সমর্থক। বিপ্লবের পরে ক্যাথলিক গীর্জাকে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করা হয়। ক্যাথলিক গীর্জা বিপ্লবের আদর্শগুলির বিরুদ্ধে প্রচার চালায় এবং জনসাধারণকে নবোদিত ভাবধারার পথ থেকে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করে। বিপ্লবের যুগে ফ্রান্সে গীর্জার যে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়, এজন্যে ১৮১৫ খ্রীঃ পর গীর্জাকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।[১] জাতীয় শিক্ষানীতির ওপর গীর্জার নিয়ন্ত্রণ পুনঃ-স্থাপন করা হয়। এর ফলে স্বাধীন চিন্তার পথ রুদ্ধ হয়। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সকল স্তরে গীর্জাই শিক্ষা নীতি নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। ইওরোপের কোন কোন দেশে বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে ইনকুইজিশন বা ধর্মীয় বিচার ও শাস্তির ব্যবস্থা চালু হয়। ধর্মবিরোধী যুক্তিবাদীদের জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ করার দণ্ড প্রদত্ত হয়। স্পেন, সার্ডিনিয়া, ব্যাভেরিয়া, নেপলসে ক্যাথলিক গীর্জার দোর্দণ্ড প্রতাপ ফিরে আসে। ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের সরকার বাধ্য হয়ে গীর্জার অত্যাচারকে আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করে।

ক্যাথলিক গীর্জার এই প্রতাপে বিপ্লবের যুগের যুক্তিবাদ ও ধর্ম-নিরপেক্ষ চিন্তাধারা অনেক

১. David Thomson, P. 84

পরিমাণে পিছনে হঠে যায়। বুদ্ধিজীবী শ্রেণী তাঁদের যুক্তিবাদকে বাধাহীনভাবে প্রকাশে অসমর্থ হন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি গীর্জা কবলিত হওয়ায় স্বাধীন চিন্তার অঙ্কুর প্রস্ফুটিত হতে বাধা পায়।

১৮১৫ খ্রীঃ পর সামন্ততন্ত্র তার হৃত-ক্ষমতা ফিরাতে বিশেষ চেষ্টা চালায়। যেহেতু তখনও ইওরোপে শিল্প-বিপ্লবের প্রকৃত পদক্ষেপ ঘটেনি, সেহেতু কৃষি অর্থনীতিই ছিল সমাজের মেরুদণ্ড। ফরাসী বিপ্লব ও নেপোলিয়নীয় ঝড় ফ্রান্সে ও ইওরোপে ভূমির ওপর সামন্ত শ্রেণীর অধিকারকে চূর্ণ করেছিল। নেপোলিয়নের পতনের পর সামন্তশ্রেণী তাদের লুপ্ত ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা চালায়। ফ্রান্সে উচ্ছেদ প্রাপ্ত অভিজাতরা উগ্র রাজতন্ত্রী দল গঠন করে বিপ্লবের যুগের ভূমি ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার চেষ্টা করে। শেষ পর্যন্ত পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত বুরবোঁ সরকার সামন্তদের আর্থিক ক্ষতিপূরণ দানের চেষ্টা করে। ১৮৩০ খ্রীঃ জুলাই বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সে এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

ব্রিটেনেও অভিজাত ভূমি মালিক শ্রেণী ও ধনী-বুর্জোয়া শ্রেণী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা করায়ত্ত রাখার চেষ্টা চালায়। ভোটাধিকার সম্পত্তির ভিত্তিতে নির্ধারিত হওয়ায় ধনিক শ্রেণীই নির্বাচনে ক্ষমতা পায়। জার্মানী, স্পেন, ইতালী ও হ্যাপসবার্গ সাম্রাজ্যে ধনী অভিজাত ভূ-স্বামীরাই ছিল অধিকাংশ ভূমির মালিক। তারা সামন্ত প্রথা অনুসারে নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত এবং সামন্ত কর আদায় করত। রাশিয়া ও পোল্যাণ্ডে সামন্ত অভিজাত শ্রেণীই ছিল শাসক শ্রেণী। তারা সকল প্রকার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা একচেটিয়া ভোগ করত।

পরিবর্তনশীলতার উপাদানসমূহ (The Forces of Change) : ঐতিহাসিক ডেভিড টমসন মন্তব্য করেছেন যে, "ওয়াটার্লু যুদ্ধের পরবর্তী যুগে স্থিতাবস্থার উপাদানগুলির অগ্রগতি ও পরিবর্তন বিরোধিতার আভাষ বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ঐতিহাসিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে পরিবর্তনশীলতার অগ্রগতি পাশাপাশি দেখা যায়।" এই পরিবর্তনশীলতার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সুদূর-প্রসারী উপাদান ছিল ইওরোপে লোকসংখ্যার বিস্ফোরণ। ১৭৫০ থেকে ১৯৫০ এই দুই শতকের মধ্যে ইওরোপের লোকসংখ্যা নিম্নলিখিত হারে বাড়ে। ১৭৫০ খ্রীঃ ইওরোপের মোট লোকসংখ্যা ছিল ১৪০ মিলিয়ন; ১৮৫০ খ্রীঃ তাহা দাঁড়ায় ২৬৬ মিলিয়নে। এক শতাব্দীতে ১২৬ মিলিয়ন লোকসংখ্যা বাড়ে। এই অনুপাতে জীবিকার, গৃহের, চাকুরী, জমির সংস্থান হয় নি। এই লোকসংখ্যা বৃদ্ধির নানা কারণ দেখান হয়, যথা :—(১) আইন-শৃঙ্খলার উন্নতি ও নিরাপত্তা বাড়ার ফলের মৃত্যুর সংখ্যা হ্রাস; (২) ধর্মীয় যুদ্ধ ও গৃহযুদ্ধের লোপের ফলে মৃত্যুর সংখ্যা হ্রাস; (৩) চিকিৎসা বিজ্ঞান ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্যে মৃত্যুর হার হ্রাস; (৪) ১৮০০ খ্রীঃ থেকে উন্নত প্রথায় কৃষির ফলে অধিক ফলন ও অধিক খাদ্য সরবরাহ; (৫) পশু খাদ্যের অধিক ফলন এবং পশুপালনে উন্নতির দরুন বেশী মাংস, দুধের সরবরাহ।

এই জনসংখ্যার বিস্ফোরণ ইওবোপের সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রচণ্ড অস্থিরতা সৃষ্টি করে। পুরাতন বোতল যেমন নতুন মদ ধরে রাখতে পারে না, সেরূপ ইওরোপের পুরাতন সমাজব্যবস্থা সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি এই জনসংখ্যার চাপ ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়। স্বৈরতান্ত্রিক রাজতন্ত্রও এই জনসংখ্যার সমস্যা সমাধানে বিফল হয়। ডেভিড টমসনের মতে, "এই জনপ্রবাহের সম্মুখে কোন সামাজিক ও রাজনৈতিক বাঁধ অক্ষুণ্ণ থাকেনি।" পুরাতনতন্ত্রের পুনঃ-প্রতিষ্ঠার দ্বারা এই জনসমস্যার সমাধান করা সম্ভব ছিল না। পরবর্তী সময়ে শিল্প-বিপ্লবের দ্বারা এই সমস্যার সমাধান হয়।

১৮১৫ খ্রীঃ পর ইওরোপের অর্থনীতিতে বিরাট বিপ্লব ঘটে এবং তার প্রভাব ইওরোপের রাজনীতির ওপর পড়ে। কুটির শিল্পের স্থলে বৃহৎ যন্ত্রায়িত কারখানায় শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন আরম্ভ হয়। শিল্প-বিপ্লব ব্রিটেনে প্রথম শুরু হলেও ফ্রান্স, জার্মানী, রাশিয়া প্রভৃতি দেশে এর

বিস্তার হয়। শিল্প-বিপ্লব ইওরোপের জীবনধারা, রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সমাজকে আমূল রকম বদলে দেয়। লোকে গ্রাম শহরে বাস আরম্ভ করে। ইওরোপে শহরগুলির সংখ্যা ও পরিধি দ্রুত বাড়তে থাকে। শিল্পে মজুর ও মালিক উভয় পক্ষের সংগঠন তৈরি হয়। সমাজে বুর্জোয়াশ্রেণীর উদ্ভব হয়। এই বুর্জোয়াশ্রেণী ছিল নতুন সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা স্থাপনের অগ্রদূত। ডেভিড টমসন এই শ্রেণীকে পরিবর্তনশীলতার প্রধান কর্মী বলেছেন (Prime mover of change)। ধনী বুর্জোয়া শ্রেণীর দ্বারা পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিকাশ হয়। সামন্ততন্ত্রের প্রভাব এর ফলে বিনষ্ট হয়। শিল্প-বিপ্লব কারখানায় কাজে জীবিকা অর্জনকারী এক শ্রমিকশ্রেণী সৃষ্টি করে। এরা ছিল শোষিত শ্রেণী। এরা তাদের অধিকার আদায়ের জন্যে সরকারের ওপর চাপ দেয়।

১৮১৫ খ্রীঃ পর আদর্শের দিক হতে জাতীয়তাবাদ, উদারতন্ত্র, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রবাদের প্রসার হয়। ভিয়েনা চুক্তির দ্বারা জার্মানী, ইতালী প্রভৃতি দেশে জাতীয়তাবাদকে দমিয়ে রাখা হয়। এজন্যে জার্মানী, ইতালী, বেলজিয়াম, পোল্যান্ডে জাতীয়তাবাদের স্ফুরণ দেখা যায়। এর ফলে ভিয়েনাতন্ত্র ভেঙ্গে পড়ে। শিল্প-বিপ্লবের ফলে পুঁজিবাদী বুর্জোয়া শ্রেণীর উদ্ভব হয়। এই শ্রেণী উদারতন্ত্রবাদের প্রতি অনুরক্তি জানায়। কারণ উদারতন্ত্রবাদের সম্পত্তিভিত্তিক ভোটাধিকার, আইনের শাসন, পার্লামেন্টারী ব্যবস্থা এই শ্রেণীর স্বার্থের অনুকূল ছিল। উদারতন্ত্রবাদ প্রকৃত গণতন্ত্র ছিল না। নিম্ন বুর্জোয়া শ্রেণী গণতন্ত্রবাদ, অর্থাৎ সর্বসাধারণের, ভোটাধিকার, প্রজাতন্ত্রের অনুরাগী ছিল। শিল্প-বিপ্লবের ফলে শ্রমিকশ্রেণীর শোষণ ঘটে। এজন্যে সমাজতন্ত্রবাদের প্রসাব হয়। সমাজতন্ত্রবাদের দুটি পর্যায় ছিল, যথা ইওরোপীয় বা বাস্তবতাহীন সমাজতন্ত্রবাদ এবং মার্কসবাদ। প্রথম মতবাদ ১৮৪৮ খ্রীঃ পর্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। এর পর মার্কসবাদের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় সমাজতন্ত্রবাদ নতুন ভিত্তি ও পরিসর লাভ করে। (বিশেষ বিবরণ সমাজতন্ত্রবাদ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য)।

একাদশ অধ্যায়

ফরাসী বিপ্লবের পর ইওরোপ (১৮১৫—১৮৪৮ খ্রীঃ) ঃ জুলাই বিপ্লব ঃ মেটারনিকতন্ত্র

(Europe after the French Revolution 1815—1848: The July Revolution : The Metternich System)

ফরাসী বিপ্লবের পর ফ্রান্সের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা

(Social and Economic condition of France in 1815) ঃ নেপোলিয়নের পতনের পর প্যারিসের প্রথম ও দ্বিতীয় সন্ধির দ্বারা ফ্রান্সের বুরবোঁ রাজতন্ত্রকে ফ্রান্সের সিংহাসনে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করা হয়। বুরবোঁ শাসন পুনঃ-স্থাপনের ফলে ১৮১৫ খ্রীঃ পরবর্তী যুগকে Restoration বা পুনঃ-স্থাপনের যুগ বলা হয়। গর্ডন ক্রেইগের মতে, "১৮১৫ খ্রীঃ ফ্রান্সে বুরবোঁ রাজবংশ ছাড়া প্রকৃতপক্ষে আর কিছুই পুনঃ-স্থাপন সম্ভব হয়নি (Very little was restored except the Bourbon dynasty)।[১] ফরাসী বিপ্লব ও নেপোলিয়নের যুগে মোট ২৫ বছর ফ্রান্সে যে বিপুল পরিবর্তনের স্রোত দেখা দেয়, তাকে এক কথায় মুছে ফেলা সহজ ছিল না। ফলে নব-প্রতিষ্ঠিত বুরবোঁ রাজা অষ্টাদশ লুইকে বাধ্য হয়ে পুরাতনতন্ত্রের সঙ্গে বিপ্লব-প্রসূত সমাজ-ব্যবস্থার সামঞ্জস্য সাধনের নীতি লইতে হয়।

Restoration বা ফ্রান্সে বুরবোঁ রাজবংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা

বিপ্লবের যুগে ফ্রান্সে সামন্ত প্রথার পূর্ণ সমাধি ঘটে। সামন্তদের জমিগুলি কৃষকদের মধ্যে বণ্টিত হয়। গীর্জার সম্পত্তিগুলিও কৃষকদের হাতে পড়ে। এই জমি পুনরায় সামন্তশ্রেণী ও গীর্জার হাতে ফেরৎ দেওয়া সম্ভবপর ছিল না। বিপ্লবের যুগে বহু স্বাধীন কৃষক, সামন্ত শ্রেণী বা গীর্জার জমি পেয়ে স্বচ্ছলভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। গ্রাম জীবনে এদের প্রভাব-প্রতিপত্তি খুব ছিল। এই শ্রেণীকে উচ্ছেদ করা ছিল প্রায় অসম্ভব।

নবোদিত কৃষকশ্রেণী

ফ্রান্সের নবোদিত কৃষকশ্রেণী আশঙ্কা করত যে, বুরবোঁ রাজা এবং অভিজাতরা ফিরে এলে তাদের জমিগুলি হাতছাড়া হতে পারে। এই আশঙ্কা তাদের মনে বেশ প্রবল থাকায় তারা পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত বুরবোঁ সরকারকে সন্দেহের চক্ষে দেখত। অষ্টাদশ লুই তাঁর সনদ দ্বারা কৃষকদের জমির ওপর ব্যক্তিগত অধিকার স্বীকার করলেও এদের জমি হারাবার আশঙ্কা দূর হয়নি। যেহেতু কৃষকদের ভোটাধিকার ছিল না, তারা মনে করে যে, আইনসভায় যাদের ভোট আছে তারা আইন রচনা করে কৃষকদের স্বার্থ নষ্ট করতে পারে।

বিপ্লবের ভূমি বন্দোবস্ত বিনষ্ট হবার আশঙ্কা

জ্যাক ড্রজের মতে, ১৮১৫-১৮৪৮ খ্রীঃ ছিল বুর্জোয়াদের যুগ।[২] ফ্রান্স এই নিয়মের ব্যতিক্রম ছিল না। বিপ্লবের পূর্বে সামন্তশ্রেণী বংশকৌলিন্য ও জমির জোরে সমাজে মান্যগণ্য

১· Langsham—World Since 1919.

২· "The period 1815—48 was characterised in all countries of Europe, by steady rise of bourgeous". Jack Droz—Europe between Revolutions. P. 37.

বুর্জোয়াশ্রেণীর উদ্ভব

ছিল। বিপ্লবের পর তারা প্রাধান্য হারায়। সমাজে লোকের মর্যাদা টাকার দ্বারা নির্ণীত হয়।[১] শিল্প-বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সে কলকারখানা ও ব্যবসায়ের দ্রুত প্রসার হয়। বুর্জোয়ারাই ছিল শিল্প-বিপ্লবের সন্তান। শিল্প-বিপ্লবের ফলে বুর্জোয়া শ্রেণীর চমকপ্রদ সমৃদ্ধি বাড়ে।[২] বুর্জোয়া শ্রেণী তাদের সম্পদের তারতম্য অনুসারে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়, যথা বৃহৎ বুর্জোয়া বা হুটে বুর্জোয়া (haute bourgeois); বনে বুর্জোয়া (bonne bourgeois) বা মাঝারি বুর্জোয়া; পাতি বুর্জোয়া বা নিম্ন বুর্জোয়া (Petite bourgeois)। হুটে বুর্জোয়া বা ধনী বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে ছিল ব্যাঙ্ক মালিক, শিল্পপতি বা জাহাজ কোম্পানিগুলির মালিকেরা। এরা ছিল খুব দাম্ভিক ও নাক উঁচু লোক। এরা অভিজাতদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে কাঞ্চন-কৌলিন্যের সঙ্গে বংশ-কৌলিন্যের যোগ স্থাপন করে। পাতি বুর্জোয়া শ্রেণী ছিল সাধারণতঃ দোকানদার, চাকুরিয়া, শিক্ষক, আইনজীবি প্রভৃতি। এদের সংখ্যাই ছিল বেশী।

বুর্জোয়া শ্রেণীর নীচে ছিল শহরের শ্রমিক ও গ্রামের কৃষক শ্রেণী। শিল্প-বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সে বহু লোক শিল্প শ্রমিকের জীবিকা নেয়। ফরাসী বিপ্লবের যুগে যাদের সাঁকুলেৎ (Sans culottes) বলা হত তাদের অনেকেই এখন প্রলিটারিয়ান বা শ্রমিক বা মজদুরে পরিণত হয়। ফ্রান্সে শ্রমিকদের অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। শ্রমিকেরা ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করে নিজেদের ভাগ্য ফিরাবার কোন ব্যবস্থা করতে পারত না। ফ্রান্সে ধর্মঘট নিষিদ্ধ ছিল। বুর্জোয়াদের প্রভাবে ফরাসী সরকার শ্রমিক কল্যাণমূলক আইন রচনায় বিরত থাকে। ফলে শ্রমিক অসন্তোষ বাড়ে। শিল্প শহরগুলির শ্রমিক জনতা বিপ্লবমুখী হতে থাকে। গ্রামের দরিদ্র কৃষকদের অবস্থাও বেশ খারাপ ছিল। তারা উচ্চ সুদে মহাজনের নিকট ঋণ নিত। গ্রামীণ ব্যাঙ্ক না থাকায় কৃষকেরা মহাজনের কুক্ষিগত হত। দরিদ্র চাষীকে রক্ষার জন্যে কোন আইন না থাকায় তাদের শোষণ অব্যাহত থাকে।

শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর অসন্তোষ

ফ্রান্সের মোট জনসংখ্যা ছিল তিন মিলিয়ন। এদের বেশীর ভাগ তখনও গ্রামে বসবাস করত।[৩] শহরগুলি তখন স্ফীতকায় হয়ে উঠেনি। প্যারিসের জনসংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৪২ হাজার, ভার্সাইয়ের জনসংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৯৫ হাজার। এই সময়ে শহরের লোকসংখ্যা দ্রুত বাড়ছিল। ফলে শহরগুলিতে বাসগৃহ, স্বাস্থ্য, জল প্রভৃতির সঙ্কট দেখা দেয়। শিল্প শহরগুলিতে জনসংখ্যা বাড়ার ফলে বস্তীর সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে।

শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি : বাসগৃহের সমস্যা

ফ্রান্সে শিল্পের বিস্তার দ্রুত ঘটছিল। ফ্রান্সে সূতী ও লিনেন শিল্পে দ্রুত উন্নতি ঘটে। লায়নস শহরে রেশম শিল্পের কারখানাগুলি খ্যাতিলাভ করে। ধাতু ও কয়লা শিল্পের অগ্রগতি ঘটে। ১৮৪৬ খ্রীঃ ফ্রান্সে প্রায় ৫ হাজার বাষ্প চালিত ইঞ্জিন নির্মিত হয়। ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন বাড়িয়ে বিদেশ থেকে ভোগ্যপণ্যের আমদানি কমিয়ে ফেলা হয়। শিল্পের পাশাপাশি রাস্তাঘাট ও যোগাযোগ ব্যবস্থারও উন্নতি ঘটে। রাস্তাঘাট নির্মাণের জন্যে পরিবহন দপ্তর বা Ministry of Public Works স্থাপিত হয়। ফলে প্যারিস থেকে বোর্দো ৩৫ ঘণ্টায় যাতায়াত করা সম্ভব হয়। ফ্রান্সে বহু খাল খনন করে বিভিন্ন নদনদীগুলিকে যুক্ত করা হয়। খালপথে মাল চলাচল এবং খাল থেকে কৃষির জন্যে জল সরবরাহ সহজ হয়। ফ্রান্সে রেলপথ নির্মাণের কাজও পিছিয়ে থাকেনি। ১৮৪৮ খ্রীঃ

শিল্প ও যোগাযোগ ব্যবস্থা

১· Gordon Craig. P. 46.

২· Ibid P. 38. "It was in France that the rise of the bourgeois was most spectacular."

৩· Gordon Craig. P. 46.

প্রায় ১½ হাজার মাইল রেলপথ নির্মিত হয়। ফ্রান্সে নূতন বন্দরও স্থাপিত হয়। বাষ্পীয়পোতের দ্বারা বন্দরগুলি থেকে মাল ও যাত্রী চলাচল আরম্ভ হয়।

এভাবে ফরাসী বিপ্লবের পরে ফ্রান্সে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটে।

পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত বুরবোঁ সরকারের শাসন ঃ অষ্টাদশ লুই ও দশম চার্লস (France under the Restored Bourbons : Louis XVIII and Charles X) ঃ নেপোলিয়নের পতনের পর বংশানুক্রমিক শাসননীতি অনুসারে ফরাসী সিংহাসনে বুরবোঁ বংশকে ফিরিয়ে আনা হয়। ভূতপূর্ব বুরবোঁ রাজা ষোড়শ লুইয়ের ভ্রাতা অষ্টাদশ লুই (Louis XVIII) ফরাসী সিংহাসনে বসেন। অষ্টাদশ লুই যখন সিংহাসনে বসেন তখন তিনি প্রৌঢ় বয়স পার হয়েছিলেন। বুরবোঁ বংশের স্বভাব-সুলভ স্বর্গীয় অধিকার নীতিতে তিনি আস্থাশীল ছিলেন। এই স্বর্গীয় অধিকার ও বংশানুক্রমিক শাসননীতিকে বলবৎ করার জন্যে তিনি ১৮১৪ খ্রীঃ তাঁর রাজত্বের প্রথম বছরকে কাগজে-কলমে তাঁর রাজত্বের ঊনবিংশ বছর বলে গণ্য করেন। অর্থাৎ তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা ষোড়শ লুই-এর মৃত্যুর পর থেকে তিনি তাঁর রাজত্বকাল শুরু হয় বলে গণ্য করেন। এর দ্বারা তিনি তাঁর বংশানুক্রমিক অধিকার ও অবিচ্ছিন্ন শাসন প্রমাণ করতে চান। এর মধ্যে যে বিপ্লবী শাসন স্থাপিত হয় তাকে তিনি গণ্য করেননি। যদিও তিনি এভাবে তাঁর বংশানুক্রমিক শাসনের অধিকার জাহির করেন, তথাপি অষ্টাদশ লুই বাস্তব অবস্থাকে মেনে চলেন। দীর্ঘকাল নির্বাসনে কাটাবার ফলে তার মনে বাস্তব বুদ্ধির স্ফূরণ হয়। প্রজাদের অগ্রাহ্য করে শাসন চালাবার দিন চলে গেছে একথা তিনি বুঝতেন। তিনি স্পষ্টই বলেন যে, "আর আমি ভ্রমণ কবতে পাবব না। সিংহাসন হল সকল আসন অপেক্ষা আরামদায়ক। এই জিনিস আমি হাবাতে চাই না" (Throne is the softest of all chairs)।

অষ্টাদশ লুইয়ের লক্ষ্য

ফ্রান্সের সিংহাসনে বসার পর অষ্টাদশ লুই একটি আপোষমুখী নীতি নিয়ে দেশ শাসন আরম্ভ করেন। বিপ্লবের ফলে সমাজে যে সকল পরিবর্তন ঘটেছিল তাঁর সঙ্গে পুরাতনতন্ত্রের সামঞ্জস্য বিধানের কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। "অষ্টাদশ লুই বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লবেব মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের নীতি নেন।"[১] ফ্রান্সেব জনগণকে আশ্বস্ত করার জন্যে অষ্টাদশ লুই ১৮১৪ খ্রীঃ একটি চার্টাব বা সনদ দান করেন। (১) এই সনদের দ্বারা রাজা সনদ মেনে শাসন করতে প্রতিশ্রুতি দেন। জ্যাক ড্রজেব মতে, এর ফলে ফ্রান্সে সাংবিধানিক রাজতন্ত্র স্থাপিত হয়।[২] (২) রাজা কার্যনির্বাহক বা শাসন ক্ষমতার দায়িত্ব পান। বৈদেশিক নীতি পরিচালনা, সন্ধি স্থাপন ও যুদ্ধ ঘোষণার দায়িত্ব এবং কর্মচারী ও মন্ত্রী নিয়োগের ক্ষমতা তাঁর হাতে থাকে। (৩) আইনসভা আইন রচনা করলেও আইনকে চূড়ান্ত অনুমোদনের ক্ষমতা রাজার হাতে রাখা হয়। (৪) ফ্রান্সে দুই কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা স্থাপিত হয়। উচ্চ কক্ষের নাম হয় কাউন্সিল অফ পিয়ারস এবং নিম্নকক্ষের নাম হয় প্রতিনিধি সভা বা চেম্বারস অফ ডেপুটিজ। (৫) ভোটাধিকার আইন দ্বারা বলা হয় যে সকল নাগরিক সরকারকে বছরে ৩০০ ফ্রাঁ প্রত্যক্ষ কর দেয় তাদেরই একমাত্র ভোট দানের অধিকার থাকবে। আইনসভার সদস্যের পদপ্রার্থীদের ১০০০ ফ্রাঁ সরকারকে দিলে এবং ৪০ বছর বয়স হলে তবেই প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে দাঁড়াতে পারবে। এর ফলে গোটা ফ্রান্সে মাত্র ৯০ হাজার লোক ভোটাধিকার পায়। এই সভা আইন রচনা ও পুরাতন আইনের সংশোধন করতে পারবে। তবে রাজার সম্মতি

মধ্যপন্থা নীতি

১. Robert Irgang—Europe Since Waterloo.

২. Jack Droz—Europe between Revolutions. P. 98.

সাপেক্ষে এই কাজ করতে হবে। (৬) এই চার্টারে কোড নেপোলিয়নকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং আইনের চক্ষে সকল নাগবিকেব সমান অধিকার স্বীকৃত হয়। (৭) বিপ্লবের আমলের ভূমি সংস্কারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। (৮) ফরাসী নাগরিকদের ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকারকে এবং ধর্ম সহিষ্ণুতা নীতিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

চার্টার বা সনদ দ্বারা অষ্টাদশ লুই যে শাসন ব্যবস্থার সূত্রপাত করেন তার ফলে বিপ্লবের পূর্বাবস্থা পুনঃস্থাপিত হয় একথা বলা যায় না। জ্যাক ড্রজের মতে, চার্টার প্রবর্তনের ফলে Restoration বা বিপ্লব-পূর্ব অবস্থায় ফ্রান্স ফিরে আসেনি। বিপ্লবের পূর্বের বুরবোঁ রাজারা ছিল স্বৈরাচারী।[১] অষ্টাদশ লুই সনদ মেনে শাসন করার প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় তাঁর স্বৈরক্ষমতা সীমিত হয়।

কিন্তু এই সনদের এমন কয়েকটি ত্রুটি ছিল যার ফলে ভবিষ্যতে ঘোর বিরোধ দেখা দেয়। প্রথমতঃ, সনদে স্বর্গীয় অধিকার নীতিকে নাকচ করা হয়। রাজার হাতে শাসন পরিচালনার ক্ষমতা, আইন অনুমোদনের ক্ষমতা, মন্ত্রী নিয়োগের ক্ষমতা এবং সনদের ১৪ নং ধারা অনুসারে বিশেষ ক্ষমতা বলে আইনসভা ভঙ্গ করার ক্ষমতা থাকায়, রাজাই প্রধান ক্ষমতার আধার হন। দ্বিতীয়তঃ, মন্ত্রীসভা তাদের কাজের জন্যে আইনসভার নিকট দায়িত্ববদ্ধ ছিল না। শাসন বিভাগের ওপর আইনসভার নিয়ন্ত্রণ না থাকায় শাসন বিভাগ দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ করার সুযোগ পায়। তৃতীয়তঃ, ভোটাধিকার কেবলমাত্র ৩০০ ফ্রাঁ কর প্রদানকারীদের দেওয়ার ফলে ৩০ মিলিয়ন জনসংখ্যার মধ্যে মাত্র ৯০ হাজার লোক ভোটদানের অধিকার পায়। বাকি লোকেরা ভোটদানের অধিকারে বঞ্চিত হয়। মোট কথা, উচ্চ বুর্জোয়া শ্রেণীই ভোটদানের অধিকার পায়। সনদের এই ত্রুটিগুলি বুরবোঁ শাসনের সাফল্যকে ব্যাহত করে।

অষ্টাদশ লুইয়ের শাসনকালে ফ্রান্সে কয়েকটি রাজনৈতিক দল গড়ে ওঠে। এই দলগুলির মধ্যে তীব্র বিরোধিতা ফ্রান্সকে গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দেয়। এরূপ অস্থির পরিবেশে অষ্টাদশ লুইয়ের সাংবিধানিক শাসনকে সফল করা সম্ভবপর ছিল না।

ফ্রান্সে শ্রেণী সংঘাত : বিভিন্ন রাজনৈতিক দল

(১) আলট্রা-রয়ালিষ্ট বা উগ্র রাজতন্ত্রী দল দেশত্যাগী অভিজাত শ্রেণী ও ধর্মযাজকদের নিয়ে গঠিত হয়। বুরবোঁ বংশের শাসন পুনঃ-স্থাপিত হলে এই সকল অভিজাত ফ্রান্সে ফিরে আসে। এরা রাজভ্রাতা ডিউক অফ আরটোইসের নেতৃত্বে উগ্ররাজতন্ত্রী দল গড়ে। এই দলের লক্ষ্য ছিল ১৮১৪ খ্রীঃ সনদ নস্যাৎ করে ফ্রান্সে অভিজাততন্ত্র, যাজকতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্রকে পুনঃস্থাপিত করা। এই দল বিভিন্ন গুপ্ত সমিতি গঠন করে বিপ্লব বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল লোকেদের সংগঠিত করে। এরা Throne and Altar অর্থাৎ রাজা ও যাজকদের সহযোগিতায় পুরাতনতন্ত্রকে পুনঃ-স্থাপনের সঙ্কল্প নেয়।

(২) এছাড়া ছিল সংবিধানপন্থী দল (Constitutionalist)। এরা ১৮১৪ খ্রীঃ সনদ অনুসারে আপোষ-মূলক শাসন চালাবার পক্ষপাতী ছিল। উদারপন্থী অভিজাত ও উচ্চ বুর্জোয়াশ্রেণী ছিল এই দলের সমর্থক।

(৩) এছাড়া ছিল লিবার‍্যাল (Liberal) বা উদারপন্থী দল। এরা মনে করত যে, ১৮১৪ খ্রীঃ-এর সনদ যথেষ্ট উদারপন্থী ছিল না। তাঁরা এই সনদের সংশোধন করে আইনসভাকে বেশী ক্ষমতা দান, মন্ত্রীসভাকে আইনসভার নিকট দায়িত্ববদ্ধ করার জন্যে দাবী করে। আপাততঃ, এরা সনদকে পরীক্ষামূলকভাবে গ্রহণ করতে রাজী ছিল। মধ্য বুর্জোয়া শ্রেণী ছিল এই দলের সমর্থক।

১· Jack Droz. P. 98.

(৪) সর্বশেষে, চরমপন্থী বা র‍্যাডিক্যাল নামে একটি দল গড়ে ওঠে। এই দলের সদস্যরা ছিল নিম্ন বুর্জোয়া শ্রেণী। এরা মনে করত যে, ১৮১৪ খ্রীঃ-এর সনদের দ্বারা ফ্রান্সের জনসাধারণের কোন উপকার হবে না। এরা দাবী করত যে, গণভোট প্রবর্তন এবং প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করলে ফ্রান্সে স্থিতি আসবে। এদের একাংশ শ্রমিকশ্রেণীর দুর্দশা দূর করার জন্যে শ্রমিক কল্যাণমূলক আইন প্রচলনের কথা ভাবত। এদের সমাজতন্ত্রী বলা হত। এই প্রজাতন্ত্রবাদীরা বুরবোঁ শাসনের পতন কামনা করত। এদের সঙ্গে বোনাপার্টবাদী দল যোগ দেয়।

অষ্টাদশ লুই ফ্রান্সের পরিস্থিতি বিবেচনা করে অভিজ্ঞ ট্যালিরয়াণ্ডের সাহায্যে মন্ত্রীসভা গঠন করেন। পরে তিনি ডিউক ডি রিশেল্যুর নেতৃত্বে মন্ত্রীসভা গঠন করেন। ইতিমধ্যে উগ্র রাজতন্ত্রীরা নির্বাচনে জয়লাভ করে আইনসভায় (১৮১৫ খ্রীঃ) সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। উগ্রপন্থী আলট্রারা তাদের বিরোধী উদারতন্ত্রীদের হত্যা আরম্ভ করে। তারা নেপোলিয়নের সমর্থক মার্শাল নে (Ney)-কেও হত্যা করে। বিপ্লবের সমর্থক কয়েক শত ব্যক্তি তাদের হাতে নিহত হলে ফ্রান্সে "শ্বেত সন্ত্রাস" (White Terror) দেখা দেয়। অষ্টাদশ লুই এই গৃহযুদ্ধে ভীত হয়ে আলট্রা বা উগ্র রাজতন্ত্রী আইনসভা ভেঙে দেন এবং নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত করেন।

শ্বেত সন্ত্রাস : উগ্রপন্থী শাসন

ফ্রান্সের ভোটদাতাগণ এবার মধ্যপন্থীদের বেশি ভোট দিলে এদের সহায়তায় আইনসভা গঠন করা হয়। মন্ত্রী রিশেল্যু এদের সাহায্যে ক্ষতিপূরণের অর্থ চুকিয়ে দেন এবং ফ্রান্সের ভূমিকে বিদেশী সৈন্য হতে মুক্ত করেন।ফ্রান্স ইওরোপীয় শক্তি সমবায়ের সদস্য পদ পায়। রিশেল্যুর পর দেকাজে মন্ত্রীসভা পরিচালনা করেন। ভোটাধিকার সম্প্রসারণ, ফৌজদারী আইন সংশোধন প্রভৃতির দ্বারা দেকাজে উদারপন্থীদের সমর্থন লাভের চেষ্টা করেন।[১] এই সময় লোভেল নামে এক প্রজাতন্ত্রী ফরাসী সিংহাসনের ভবিষ্যতে উত্তরাধিকারী ডিউক ডি বেরীকে হত্যা করলে দারুণ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। লোভেল স্বীকার করেন যে, বুরবোঁ বংশের অধিকার লোপ করার জন্যে সে এই হত্যাকাণ্ড করেছে।

ডিউক ডি বেরীর হত্যা

ডিউক ডি বেরীর হত্যার ফলে ফ্রান্সে উগ্র-রাজতন্ত্রী প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এর ফলে আলট্রা দলের আস্থাভাজন ভিলীল (Villele) মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। ভিলীল ছিলেন ঘোর রাজতন্ত্রী। তাঁর মন্ত্রীত্বকালে বর্ষীয়ান অষ্টাদশ লুই ২৭ বছরের এক বিধবা মহিলা, মাদাম দ্যু শায়লার (Madam du Cyla) সঙ্গে অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত হন। ভিলীল এই মহিলার মাধ্যমে অষ্টাদশ লুইকে হাত করে ফেলেন।[২] ভিলীল ছিলেন অর্থনীতির যাদুকর। তিনি বহু মূল্যবান অর্থনৈতিক সংস্কার করেন। এর ফলে ফরাসীদের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছল্য বাড়ে। ভিলীল আশা করেন যে, ফরাসী জাতি আর্থিক স্বচ্ছলতার মদিরা পান করে তাঁর প্রতিক্রিয়াপন্থী শাসন নীতিকে বরণ করবে।[৩] এই লক্ষ্য নিয়ে ভিলীল ধাপে ধাপে পুরাতনতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনার কাজে হাত দেন। তিনি সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করে সেন্সারশিপ বা নিয়ন্ত্রণ প্রথা প্রবর্তন করেন। তিনি ধর্মযাজকদের ক্ষমতা ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করেন। গীর্জার সাহায্যে জনমতকে প্রভাবিত করে তিনি রাজতন্ত্রের ভিত্তি শক্ত করার কাজে হাত দেন। ফ্রান্সের ধর্ম নিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থাকে রদ করে, শিক্ষাকে গীর্জার নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি পদে বিশপদের নিয়োগ করা হয়। গীর্জার হাতে মাধ্যমিক শিক্ষার ভার ছেড়ে দেওয়া হয়। নির্বাচন আইনকে সংশোধন করে অধিক সম্পদশালী ব্যক্তিদেরই একমাত্র ভোটাধিকার দানের ব্যবস্থা করা হয়।

ভিলীল মন্ত্রীসভা : পুরাতনতন্ত্রের প্রত্যাবর্তন

১· Jack Droz. P. 105.

২· Cobban—History of France.

৩· Jack Droz. P. 106.

ভিলীলের প্রতিক্রিয়াশীল শাসনব্যবস্থার নিরসনে অষ্টাদশ লুই কোন চেষ্টা করেননি। এজন্য তাঁর রাজত্বের শেষ দিকে উগ্রপন্থী রাজতান্ত্রিক দল প্রাধান্য বিস্তার করে। এর প্রতিবাদে প্রজাতন্ত্রী দল বুরবোঁ রাজবংশকে উচ্ছেদ করার জন্যে লা-রচেল, বেলফোর্ট প্রভৃতি স্থানে নিষ্ফল বিদ্রোহ করে। সরকারি সেনা এই বিদ্রোহ দমন করে। ১৮২৪ খ্রীঃ অষ্টাদশ লুইয়ের মৃত্যু হয়।

অষ্টাদশ লুইয়ের অযোগ্যতা

অষ্টাদশ লুইয়ের পর তাঁর ভ্রাতা ডিউক অফ আর্টোয়িস, দশম চার্লস উপাধি নিয়ে ফ্রান্সের সিংহাসনে বসেন। সিংহাসনে বসার আগে তিনি ছিলেন আলট্রা বা উগ্র রাজপন্থীদলের নেতা। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল অষ্টাদশ লুইয়ের মধ্যপন্থা নীতি নাকচ করে অভিজাত ও যাজকদের সাহায্যে পুরাতনতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনা। এজন্য ফরাসী জনমতের বিরোধিতা, বিরোধী দলগুলির প্রতিক্রিয়া, কোন কিছুকেই তিনি গ্রাহ্য করতে রাজী ছিলেন না। ১৮২৪ খ্রীঃ যখন দশম চার্লস সিংহাসনে বসেন তখন আইনসভায় উগ্র রাজতন্ত্রীদের সংখ্যাধিক্য ছিল। উগ্র রাজতন্ত্রীদের সাহায্যে দশম চার্লস তাঁর উদ্দেশ্য পূরণের চেষ্টা করেন। তিনি ভিলীলের সাহায্যে প্যারিসের বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ গীর্জার হাতে ছেড়ে দেন। স্যাক্রিলেজ আইন দ্বারা গীর্জায় চুরি প্রভৃতি অপরাধের জন্যে কঠোর দণ্ড দানের ব্যবস্থা করা হয়। ফ্রান্সের সমাজ ব্যবস্থাকে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের অধীনে আনার জন্যে যাজক শ্রেণী প্রচার চালাতে থাকে।

দশম চার্লসের প্রতিক্রিয়াশীলতা : পুরাতনতন্ত্র প্রবর্তনের চেষ্টা

দশম চার্লস অতীত ইতিহাস হতে কোন শিক্ষা নেননি। তিনি ১৮১৪ খ্রীঃ সনদ মান্য করে রাজত্ব করতে একেবারেই রাজী ছিলেন না। তিনি বলেন যে, "আমি বরং কাঠ চেরাই করে জীবিকা নির্বাহ করব, কিন্তু ইংলণ্ডের রাজার ন্যায় সংবিধান মেনে চলতে পারব না" (I would rather saw wood, than be a king like the king of England)।[1] তিনি ভিলীলের সহায়তায় এমিগ্রী বা দেশত্যাগী অভিজাতদের সন্তুষ্ট করার জন্যে ক্ষতিপূরণ আইন পাশ করেন। এই আইনের দ্বারা যে সকল অভিজাতদের জমি বিপ্লবের সময় বাজেয়াপ্ত হয়, তাদের ১ বিলিয়ন ফ্রাঁ ক্ষতিপূরণ দানের ব্যবস্থা করা হয়। এদিকে ক্ষতিপূরণের অর্থ যোগাড়ের জন্যে সরকার জাতীয় ঋণের সুদের হার ৫% থেকে কমিয়ে ৩% করেন। এর ফলে ছুটে বুর্জোয়া শ্রেণী বা ব্যাঙ্ক মালিকদের আয় কমে যায়। কারণ তারাই সরকারকে নির্দিষ্ট হারে সুদ পাওয়ার প্রতিশ্রুতিতে ঋণ দিয়েছিল। এই শ্রেণী সরকারের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গে বিরক্ত হয়। রাজনৈতিক দলগুলি অভিযোগ করে যে, দেশদ্রোহী অভিজাতদের ক্ষতিপূরণ দানের নজির বিপজ্জনক। এই ব্যবস্থা পুরাতনতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনবে।

অভিজাতদের ক্ষতিপূরণ আইন : জাতীয় ঋণের সুদের হ্রাস : বুর্জোয়া শ্রেণীর নৈরাশ্য

ভিলীলের ধাপে ধাপে পুরাতনতন্ত্র পুনঃ-স্থাপনের নীতি দশম চার্লসের পছন্দ ছিল না। তিনি ভিলীলকে পদচ্যুত করে, ম্যার্তিগন্যাকে মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করেন। ম্যার্তিগন্যার কাজে সন্তুষ্ট না হলে তিনি উগ্র রাজপন্থী পলিন্যাককে মন্ত্রীসভার দায়িত্ব দেন। পলিন্যাক ছিলেন প্রতিক্রিয়াপন্থী। তাঁর প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব কারও অজানা ছিল না। গর্ডন ক্রেইগের মতে, "পলিন্যাক তাঁর প্রতিক্রিয়াপন্থী নীতিকে চাপা রাখার কৌশল জানতেন না।" তিনি খোলাখুলি বলেন যে, "আমার লক্ষ্য হল সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে ধর্মযাজকদের লুপ্ত অধিকার দান এবং অভিজাতদের বিশেষ অধিকারের পুনঃ-স্থাপন।"[2]

১· Quoted by Lipson—Europe in the 19nth and 20eth Centuries.

২· Gordon Craig P. 51. "My policy is to reorganise the society, to restore the clergy-its former preponderence in the state, and to create a powerful aristocracy and surround it with privileges".

পলিন্যাকের এই প্রতিক্রিয়াশীল নীতি উদারপন্থী ও প্রজাতন্ত্রী দলগুলির মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ইতিমধ্যে ১৮৩০ খ্রীঃ নির্বাচনে আইনসভার উদারপন্থীরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। তারা একটি প্রস্তাব দ্বারা পলিন্যাক মন্ত্রীসভাকে বরখাস্ত করার জন্যে রাজার নিকট দাবী জানায়।[১] এদিকে প্রজাতন্ত্রী সংবাদপত্র ট্রিবিউন (Tribune), ন্যাশন্যাল (National) প্রভৃতি গোঁড়া স্বৈরতন্ত্রী বুরবোঁ বংশের স্থলে অর্লিয়েন্স বংশের লুই ফিলিপকে সাংবিধানিক রাজা হিসেবে ফ্রান্সের সিংহাসনে স্থাপনের প্রস্তাব দেয়।

পলিন্যাক মন্ত্রীসভার প্রতিক্রিয়াশীল নীতি

আইনসভায় উদারপন্থীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং প্যারিসে প্রজাতন্ত্রীদের বিরোধিতার সম্মুখীন হয়ে, দশম চার্লস পলিন্যাকের পরামর্শে আইনসভা ভেঙে দেন। সনদের ১৪নং ধারা অনুযায়ী রাজার বিশেষ অধিকার প্রয়োগ করে, দশম চার্লস জুলাই অর্ডিন্যান্স (July Ordinances) জারী করেন। এই অর্ডিন্যান্স অনুসারে—(১) সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করা হয় ; (২) আইনসভা ভঙ্গ করা হয় ; (৩) নির্বাচন আইন পরিবর্তন করে বুর্জোয়া শ্রেণীকে ভোটাধিকারে বঞ্চিত করা হয়। কেবলমাত্র সম্পত্তিবান অভিজাতদের ভোট থাকে।[২] (৪) নতুন নির্বাচন আইন অনুসারে নির্বাচনের দিন ঘোষণা করা হয়। (৫) অষ্টাদশ লুইয়ের ১৮১৪ খ্রীঃ-এর সনদ রদ করা হয়। এভাবে জুলাই অর্ডিন্যান্স দ্বারা দশম চার্লস পুরাতনতন্ত্র স্থাপনের উদ্যোগ নেন।

জুলাই অর্ডিন্যান্স

জুলাই অর্ডিন্যান্সের বিরুদ্ধে উদারপন্থী ও প্রজাতন্ত্রী দলগুলি সক্রিয় প্রতিবাদ জানায়। তারা প্যারিসের রাস্তায় অবরোধ গড়ে রাজকীয় বাহিনীর সঙ্গে সংগ্রাম আরম্ভ হয়। প্যারিসের মধ্যবিত্তশ্রেণী বিদ্রোহীদের পক্ষে যোগ দেয়। প্যারিসের জনতার সংহার মূর্তি দেখে দশম চার্লস জুলাই অর্ডিন্যান্স প্রত্যাহার করলেও, বিদ্রোহীরা তাঁর পদত্যাগ দাবী করে। শেষ পর্যন্ত ৩০শে জুলাই দশম চার্লস তাঁর পৌত্র ডিউক অফ বোর্দোর অনুকূলে পদত্যাগ করেন। কিন্তু বিপ্লবীরা বুরবোঁ বংশের দাবী উপেক্ষা করে অর্লিয়েন্স বংশীয় লুই ফিলিপকে মনোনীত করে। আইনসভা লুই ফিলিপকে সাংবিধানিক রাজা হিসেবে ঘোষণা করে। দশম চার্লস ফ্রান্স থেকে পালিয়ে ইংলন্ডে আশ্রয় নেন। ফ্রান্স ছাড়ার সময় পৈত্রিক সিংহাসন হারিয়ে তিনি অবিরল ক্রন্দন করেন। তিনি এখন স্বীকার করেন যে, "যত রকম আসন বা পদ আছে তার মধ্যে সিংহাসন বা রাজপদ সর্বাপেক্ষা নরম বা আরামপ্রদ।" কিন্তু তা তিনি হারিয়ে ফেলেন। জুলাই বিপ্লব সম্পন্ন হয়।

জুলাই বিপ্লব

জুলাই বিপ্লবের কারণ ও এর অনিবার্যতা (The causes and inevitability of the Revolution of 1830) : ঐতিহাসিক ডেভিড টমসনের মতে, "পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত বুরবোঁ বংশের পতন পূর্বনির্ধারিত সিদ্ধান্ত ছিল একথা কোন ক্রমেই বলা চলে না।"[৩] ডেভিড টমসন মনে করেন যে, যদি অষ্টাদশ লুই জীবিত থাকতেন, যদি ১৮২৪ খ্রীঃ তাঁর মৃত্যু না হত তবে জুলাই বিপ্লব না ঘটতেও পারত। অষ্টাদশ লুই উদারতন্ত্রের সঙ্গে বংশানুক্রমিক অধিকার নীতির সামঞ্জস্য স্থাপন করেন। তিনি ১৮১৪ খ্রীঃ-এর চার্টার বা সনদ দ্বারা বিপ্লবের আদর্শের সঙ্গে রাজার বিশেষ ক্ষমতার সমন্বয় ঘটান। ফরাসী

ডেভিড টমসন কর্তৃক জুলাই বিপ্লবের অনিবার্যতা তত্ত্বের বিরোধিতা

---

১ Jack Droz. P. 110.

২ Gordon Craig. P. 52.

৩ "The failure of the Restored monarchy in France was by no means a foregone conclusion" D. Thomson—P. 125.

জনগণ ক্রমে এই মধ্য পন্থায় অভ্যস্ত হয়ে উঠছিল। অষ্টাদশ লুই কেবলমাত্র চার্টার বা সনদ প্রবর্তন দ্বারা উদারতন্ত্রকে স্বীকার করেননি। তিনি নেপোলিয়নের যুগের ভূমি ব্যবস্থা, কোড নেপোলিয়ন, প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থার নিয়মগুলি বহাল রাখেন। এজন্য উদারপন্থী ও মধ্যপন্থীদের সন্তুষ্ট হওয়ার আকাশ ছিল। তিনি যদি জীবিত থাকতেন তাহলে উভয় ধারার মধ্যে সমন্বয় নীতি জোরদার হলে ফ্রান্সের জাতীয় জীবনে শিকড় বিস্তার করতে পারত। দুর্ভাগ্যক্রমে ১৮২৪ খ্রীঃ অষ্টাদশ লুইয়ের মৃত্যু হলে এই সমন্বয় ও মীমাংসাপন্থী নীতি পরিত্যক্ত হয়। পরবর্তী রাজা দশম চার্লস ইংলন্ডের দ্বিতীয় জেমসের ন্যায় ইতিহাসের ঘড়ির কাঁটা পিছনে ঘুরিয়ে পুরাতনতন্ত্র পুনঃ-স্থাপনের চেষ্টা করেন। তিনি যদি বাস্তব বুদ্ধি নিয়ে চলতেন, যদি তিনি এই মধ্যপন্থা মেনে নিতেন তবে বিপ্লব অনিবার্য হত না।

ডেভিড টমসন আরও বলেন যে, বুরবোঁ শাসনব্যবস্থা আইনসভায় দুটি বিরোধী দল ছিল; যথা উদারতন্ত্রী এবং প্রজাতন্ত্রী। কিন্তু ১৮৩০ খ্রীঃ এই দুটি দলের কোন দলই তেমন শক্তিশালী ছিল না। উদারতন্ত্রী দলের সমর্থক ছিল হুটে বুর্জোয়া বা উচ্চ বুর্জোয়া শ্রেণী। তারা নিজ শ্রেণীর স্বার্থ বক্ষায় তৎপর ছিল। যদি দশম চার্লস জুলাই অর্ডিন্যান্সের দ্বারা তাদের ভোটাধিকার নাকচ না করতেন এবং ১৮১৪ খ্রীঃ সনদ মেনে নিতেন তবে এই ধনী বুর্জোয়ারা সাধারণ লোকের সঙ্গে যোগ দিত না। ডেভিড টমসন মনে করেন যে, প্রজাতন্ত্রী দল এবং বোনাপার্টবাদী দলও এই সময় তেমন প্রবল ছিল না। সুতরাং বুরবোঁ বংশীয় দশম চার্লস বুঝে চললে এই বংশের শাসন স্থায়ী হত। তাছাড়া ইংলন্ডের ন্যায় ফ্রান্সের পার্লামেন্টারী শাসনের ঐতিহ্য ছিল না। বুরবোঁদের আমলে তা ধীরে ধীরে গড়ে উঠছিল। দশম চার্লসের হঠকারিতা ফ্রান্সকে বিপ্লবের মুখে ঠেলে দেয়। নতুবা এই বিপ্লব এড়ান যেত। কারণ ফ্রান্সের ইতিহাসে এই বিপ্লবের প্রস্তুতি ছিল না।

বুরবোঁ শাসনের বিরুদ্ধে বিরোধী দলগুলির দুর্বলতা

ডেভিড টমসনের উপরোক্ত অভিমত উদারপন্থী ঐতিহাসিকেরা সমর্থন করেন না। তাঁদের মতে, এই বিপ্লব অনিবার্য ছিল। প্রথমতঃ, বুরবোঁ বংশের স্বর্গীয় অধিকার নীতির সঙ্গে বিপ্লবের যুগের সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের আদর্শের মিলন সম্ভব ছিল না। এই কারণে ১৮১৫ খ্রীঃ পর আইনসভায় বার বার রাজার সাংবিধানিক অধিকার সম্পর্কে প্রশ্ন উঠে। উদারতন্ত্রী ও প্রজাতন্ত্রীরা জানতে চান যে অষ্টাদশ লুই সংবিধানের অধীন কিনা? অষ্টাদশ লুই নিজের ইচ্ছামত বার বার আইনসভা ভেঙে দিয়ে সাংবিধানিক শাসনকে হাস্যাস্পদ করে তুলেন।[১] দ্বিতীয়তঃ, ১৮১৪ খ্রীঃ-এর সনদের বহু ত্রুটি ছিল।[২] ক্রমে এই ত্রুটিগুলি বড় হয়ে দেখা দেয়। জ্যাক ড্রজের মতে, "সনদের ত্রুটিগুলি ১৮১৫ খ্রীঃ ফ্রান্সের রাজনীতিকে প্রভাবিত করে।" এজন্য শাসনব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এই ত্রুটিগুলির মধ্যে প্রধান ছিল যে :— (ক) মন্ত্রীসভা আইনসভার নিকট দায়িত্ববদ্ধ থাকবে কিনা সনদে তা স্পষ্ট ছিল না। অষ্টাদশ লুই নিয়ম করেন যে, মন্ত্রীসভা সিংহাসনের নিকট দায়িত্ববদ্ধ থাকবে। এর ফলে সরকারের ও মন্ত্রীসভার ওপর আইনসভা কোন নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করতে পারেনি। এজন্য প্রকৃত দায়িত্ববদ্ধ পার্লামেন্টারি শাসনব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। এজন্য লিবারেল বা উদারতন্ত্রীরা অসন্তুষ্ট হয়। (খ) সনদে ভোটাধিকার কেবলমাত্র ধনী বুর্জোয়াদের সম্পত্তির ভিত্তিতে দেওয়া হয়। ফ্রান্সের তিন মিলিয়ন লোকের মধ্যে মাত্র ৯০ হাজার লোক ভোটাধিকার পায়! এই সঙ্কীর্ণ ভোটাধিকার নীতির ফলে নিম্ন বুর্জোয়ারা ভোটাধিকারে বঞ্চিত হয়। ফ্রান্সের পাতি বা নিম্ন

উদারপন্থী ঐতিহাসিকের অভিমত : ডেভিড টমসনের যুক্তি খণ্ডন

১· Jack Droz. P. 98. "Gaps in the Character left unanswered important questions which dominated public life after 1815."

২· Bury. History of France

বুর্জোয়ারা ছিল শিক্ষিত, রাজনীতি ও অধিকার সচেতন শ্রেণী। এই শ্রেণীকে ভোটাধিকারে বঞ্চিত করে বুরবোঁ রাজতন্ত্রের পক্ষে বেশীদিন সরকার চালান সম্ভবপর ছিল না। (গ) সনদের ১৪ নং ধারায় রাজাকে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়। এই বিশেষ ক্ষমতা ঠিক কোন জরুরী অবস্থায় রাজা ব্যবহার করতে পারবেন তা সনদে স্পষ্ট ছিল না। ফলে ১৪নং ধারার অপব্যবহার করা হয়। এতে সংসদীয় গণতন্ত্র ধাক্কা খায়। ১৮৩০ খ্রীঃ জুলাই অর্ডিন্যান্স ছিল ১৪ নং শর্তের অপপ্রয়োগ মাত্র। সুতরাং ডেভিড টমসনের যুক্তি গ্রহণীয় নয়। ঐতিহাসিক কোব্বানের মতে, ১৮৩০-এর আগে প্রজাতন্ত্রী দলের গণ সমর্থন কম ছিল একথা ঠিক নয়। পাতি বুর্জোয়ারা ছিল মূলতঃ প্রজাতন্ত্রবাদী। তারা আপ্যাততঃ সাংবিধানিক রাজতন্ত্র কেমন চলে তা পরীক্ষা করে দেখছিল। ছাত্র ও শ্রমিকরাও প্রজাতন্ত্রীদের সমর্থন করত। ১৮৩০ খ্রীঃ জুলাই বিপ্লবের সময় রাস্তার ব্যারিকেডগুলি এরাই তৈরি করে। এই প্রজাতন্ত্রী দল বুরবোঁ শাসনের পতন কামনা করত। নিম্ন বুর্জোয়াদের সমর্থনে এই দল দ্রুত শক্তি লাভ করছিল।

অষ্টাদশ লুই জীবিত থাকলে অথবা পরবর্তী রাজা মধ্যপন্থী নীতি অনুসরণ করলে বিপ্লব ঘটত না—ডেভিড টমসনের এই অভিমত প্রমাণসিদ্ধ নয়। অষ্টাদশ লুই-এর রাজত্বের শেষ দিকে উগ্রপন্থী দল প্রবল হয়ে ওঠে। তাঁর মন্ত্রী ভিলীল ধাপে ধাপে পুরাতনতন্ত্র ফিরিয়ে আনার নীতি নেন। অষ্টাদশ লুই এই প্রতিক্রিয়াশীলতাকে নিয়ন্ত্রণ করবার কোন চেষ্টা করেননি। ডিউক ডি বেরীর হত্যার পর, তিনি উগ্র রাজতন্ত্রীবাদীদের হাতের মুঠোয় চলে যান। ফলে মধ্যপন্থী আপোষনীতি ক্ষয় পেতে থাকে। সুতরাং অষ্টাদশ লুই জীবিত থাকলেও বিপ্লব ঘটত। গর্ডন ক্রেইগের মতে, "অষ্টাদশ লুই আলট্রাদের দাবীর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেননি।" বেরীর হত্যার পর তিনি আলট্রাদের মতাবলম্বী হন। তাঁর নবতম উপপত্নী (মাদাম ডু শায়লা) ছিলেন কট্টর আলট্রাপন্থী।[1] এমতাবস্থায় প্রজাতন্ত্রীরা হতাশ হয়ে কয়েকটি নিষ্ফল বিদ্রোহ করে। এই কারণে অষ্টাদশ লুইয়ের মধ্যপন্থী নীতি সফল হয়েছিল একথা বলা চলে না। বৃদ্ধ অষ্টাদশ লুইয়ের পর তাঁর উত্তরাধিকারী ছিলেন তাঁর ভ্রাতা ডিউক অব আর্টোইস। তিনি ছিলেন উগ্র রাজতন্ত্রী নেতা এবং কট্টর রক্ষণশীল। অষ্টাদশ লুইয়ের মধ্যপন্থা নীতি তাঁর মৃত্যুর পর অনুসৃত হওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না।

অষ্টাদশ লুইয়েব মধ্যপন্থা নীতিব বিফলতা

আসলে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত বুরবোঁ বংশের পতন অনিবার্য ছিল। ১৮৩০ খ্রীঃ যদি এই বিপ্লব না ঘটত তবে পরে যে কোন সময়ে তাহা ঘটত। মধ্যপন্থা বা আপোষ নীতি স্থায়ী হওয়ার তেমন কোন সম্ভাবনা ছিল না। কারণ আলট্রা বা উগ্র রাজপন্থী দলের ১৮১৪ খ্রীঃ এর সনদের প্রতি প্রকৃত আনুগত্য ছিল না। তারা সুযোগ পেলেই এই সনদ নস্যাৎ করে দিত। তার প্রমাণ এই যে, অষ্টাদশ লুইয়ের রাজত্বের শেষ দিকে তারা এই সনদের বিরোধিতা করে। অষ্টাদশ লুই এবং তার পর দশম চার্লস সনদটির পবিত্রতা রক্ষার জন্যে কোন চেষ্টা করেন নি। অপরদিকে প্রজাতন্ত্রী দল বুরবোঁ রাজতন্ত্রের পতন ঘটিয়ে ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী ছিল। এই দুই বিপরীত আদর্শ ফ্রান্সকে এক সংঘাতের পথে ঠেলে দিচ্ছিল। এই উভয় গোষ্ঠীর সংঘাতের ফলে যারা মধ্যপন্থী ছিল তারা পরিস্থিতির ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। যারা মধ্যপন্থী ছিল তাদের ফরাসী সমাজে বিশেষ প্রভাব ছিল না। কারণ মধ্যপন্থীরা ছিল ধনিক শ্রেণী ও সমাজের ভগ্নাংশ মাত্র। ১৮১৪ খ্রীঃ সনদের দ্বারা তাদের উপকার হলেও সমাজের বৃহত্তর শ্রেণীর এই সনদে কোন লাভ হয়নি। কারণ এই সনদে তারা ভোটাধিকারে বঞ্চিত ছিল। নিম্ন মধ্যবিত্ত, কৃষক ও শ্রমিকেরা এই সনদ

ফ্রান্সে দুই বিপরীত আদর্শবাদের সংঘাত

১· Gordon Craig. P. 80.

দ্বারা ভোটাধিকার লাভে বঞ্চিত হয়। এই বিরাট সংখ্যক লোককে বঞ্চিত করে মধ্যপন্থায় দীর্ঘদিন ধরে শাসন চালান সম্ভব ছিল না।

মধ্যপন্থা নীতির প্রতি অনুরক্তি অষ্টাদশ লুই-এর রাজত্বের শেষদিকে ক্ষয় পেতে থাকে। ভিলীল মন্ত্রিসভার আমল থেকে প্রতিক্রিয়াশীলতা তীব্রতর হয়। এজন্য প্রজাতন্ত্রী সংবাদপত্রগুলি বিকল্প সরকার গঠনের দাবী জানায়। মধ্যপন্থার স্থায়ী হওয়ার যেটুকু সম্ভাবনা ছিল তা অষ্টাদশ লুইয়ের মৃত্যুর পর লোপ পায়। দশম চার্লস ইতিহাসের শিক্ষা না নিয়ে নিজের পতন নিজেই ডেকে আনেন। তিনি যে কোন উপায়ে পুরাতনতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি পলিন্যাকের ন্যায় প্রতিক্রিয়াপন্থীকে মন্ত্রীসভার দায়িত্ব দিলে, আইনসভা পলিন্যাকের পদত্যাগ দাবী করে। আইনসভার মত নিয়ে দশম চার্লস পলিন্যাককে নিয়োগ করেননি। সুতরাং তিনি আইনসভাকে গ্রাহ্য করতে চাননি। দশম চার্লস দেয়ালের লিখন পড়তে রাজী ছিলেন না। তিনি ইতিহাসের ঘড়ির কাঁটাকে পিছিয়ে দিতে চান। তিনি সামন্ত শ্রেণীর অধিকার ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে ভোটাধিকার আইন পরিবর্তন করে ধনী বুর্জোয়াদেরও ভোটাধিকার লোপ করেন। তার ফলে তিনি সমাজের ধনী ও প্রভাবশালী গোষ্ঠীর বিরাগভাজন হন। শেষ পর্যন্ত দশম চার্লস জুলাই অর্ডিন্যান্স দ্বারা আইনসভা ভঙ্গ করলে এবং ভোটের অধিকার সঙ্কুচিত করলে উদারপন্থী ও প্রজাতন্ত্রী দল সম্মিলিতভাবে দশম চার্লসের পতন ঘটায়।

দশম চার্লসের প্রতিক্রিয়াশীলতা

ফ্রান্সে জুলাই বিপ্লবের ফল ও তার গুরুত্ব (Results and significance of the July Revolution in France) : ১৮৩০ খ্রীঃ ফ্রান্সে জুলাই বিপ্লবের ফলে বুরবোঁ বংশীয় দশম চার্লস সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হন। ফ্রান্সের সিংহাসনে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত বুরবোঁ রাজবংশের পতন ঘটে। ফ্রান্সের সিংহাসনে এই রাজবংশের বংশানুক্রমিক শাসনের অধিকার স্থায়ীভাবে লুপ্ত হয়। দশম চার্লসকে পদচ্যুত করে ফ্রান্সের আইনসভা অর্লিয়েন্স বংশীয় লুই ফিলিপকে সাংবিধানিক শাসক হিসেবে নির্বাচন করে।

রবিনসন ও বিয়ার্ডের মতে, "জুলাই বিপ্লবকে সঠিকভাবে বিপ্লব বলা যায় না। বিপ্লবের অর্থ হল গভীর মূল পরিবর্তন অতি দ্রুতভাবে ঘটা। কিন্তু জুলাই বিপ্লবে সামান্য কয়েকটি অগভীর পরিবর্তন সাধিত হয়।" (The Revolution of 1830 made few innovations)।[১] ঐতিহাসিক কোব্বানও মন্তব্য করেছেন যে, "জুলাই বিপ্লব ছিল মূলতঃ একটি রক্ষণশীল বিপ্লব"(The July Revolution was essentially a conservative one)।[২] জুলাই বিপ্লবের ফলে একটি রাজবংশের স্থলে মাত্র আর একটি রাজবংশ সিংহাসনে বসে। এই বিপ্লবের দ্বারা সংবিধান, ভোটাধিকার, সমাজ ব্যবস্থার কোন মৌলিক পরিবর্তন ১৮৩০ খ্রীঃ ঘটেনি। রাজতন্ত্রের স্থলে প্রজাতন্ত্র আসেনি। কোন গভীর মূল অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন এই বিপ্লবে ঘটে নি। জুলাই বিপ্লব ছিল বুর্জোয়া শ্রেণীর বিপ্লব। ফ্রান্সের উচ্চ বুর্জোয়ারা (Haute bourgeois) ১৮১৪ খ্রীঃ সনদে ভোটাধিকার পায়। জুলাই অর্ডিন্যান্স দ্বারা দশম চার্লস এই শ্রেণীকে ভোটাধিকারে বঞ্চিত করলে বিপ্লব ঘটে। ১৮৩০ খ্রীঃ জুলাই বিপ্লবের পর উচ্চ বুর্জোয়া শ্রেণীর অধিকার পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৩০ খ্রীঃ সনদে ৩০০ ফ্রাঁ প্রত্যক্ষ করদাতাদের ভোটাধিকার ছিল। এই ধারা সংশোধন করে ২০০ ফ্রাঁ করদাতাদের ভোটাধিকার দেওয়া হয়।

জুলাই বিপ্লবের অগভীর রক্ষণশীল চরিত্র : কোবানের অভিমত

১· Robinson and Beard. Vol. II. P. 10.

২· Cobban. P. 96.

এতে ধনী বুর্জোয়ারাই উপকৃত হয়। নিম্ন বুর্জোয়া এবং সাধারণ লোকে ভোটাধিকার পায়নি। জুলাই বিপ্লবের ফলে রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে পেয়ে বুর্জোয়া শ্রেণী ফ্রান্সে শিল্প গঠনের কাজে নেমে পড়ে। জুলাই বিপ্লবের ফলে লুই ফিলিপ সিংহাসনে বসেন। তাঁকে 'বুর্জোয়া রাজা' বলা হত। কারণ তিনি বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থ দেখতেন। কিন্তু বঞ্চিত নিম্ন বুর্জোয়ারা এই বঞ্চনা সহ্য করেনি। এই বিপ্লবের ফলে লুই ফিলিপের যে সরকার গঠিত হয় তা গণভোট বা সাধারণ নির্বাচন দ্বারা গঠিত হয়নি। জুলাই বিপ্লবের এই অসম্পূর্ণতার জন্যে ফ্রান্সে আর একটি বিপ্লবের দরকার হয়। ১৮৪৮ খ্রীঃ বিপ্লব এই কারণে ঘটে। সুতরাং অনেকে মনে করেন যে, জুলাই বিপ্লবকে একটি প্রকৃত বিপ্লব বলা যায় না।

বেশীর ভাগ ঐতিহাসিক জুলাই বিপ্লবকে প্রকৃত বিপ্লব বলেই মনে করেন। কারণ এই বিপ্লবের দ্বারা কেবলমাত্র আগেকার অবস্থা ফিরিয়ে আনা হয় নি। অবস্থার অনেক পরিবর্তনও করা হয়। (১) অষ্টাদশ লুইয়ের সনদকে সংশোধন করে ভোটাধিকারের পরিবর্তন করা হয়। ৩০০ ফ্রাঁর স্থলে ২০০ ফ্রাঁ কর প্রদানকারীদের ভোটের অধিকার দেওয়া হয়। (২) বুরবোঁ রাজাদের বংশানুক্রমিক অধিকার ও ন্যায্য অধিকার নাকচ হয়ে যায়। এই বিপ্লবের ফলে লুই ফিলিপের যে সরকার গঠিত হয় তা গণভোট বা সাধারণ নির্বাচন দ্বারা গঠিত হয়নি। নতুন রাজা লুই ফিলিপ সংবিধান মেনে শাসন করার শপথ নেন। ফলে ফ্রান্সে সাংবিধানিক রাজতন্ত্র স্থাপিত হয়। লুই ফিলিপ ছিলেন অর্লিয়েন্স বংশের লোক। তাঁকে পার্লামেন্টই সিংহাসন দেয়। ফলে সার্বভৌম ক্ষমতা রাজার পরিবর্তে পার্লামেন্টের হাতে বর্তায়। অষ্টাদশ লুইয়ের সনদের ১৪নং ধারা নাকচ করা হয়। এই ধারায় রাজার বিশেষ ক্ষমতা ছিল। বিশেষ ক্ষমতা না থাকায় রাজা সংবিধানের অধীন হন। (৩) জুলাই বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সে উগ্র রাজপন্থীদের প্রতিক্রিয়াশীল নীতির পতন ঘটে। আর কোন দিন ফ্রান্সে উগ্র রাজপন্থী বা আলট্রারা প্রাধান্য পায়নি। উগ্র রাজপন্থীরা ছিল অভিজাত ও সামন্তশ্রেণীর লোক। জুলাই বিপ্লব তাদের পতন ঘটায়। ফ্রান্সে সামন্ত প্রথা ফিরে আসার সম্ভাবনা দূর হয়। (৪) যাজক শ্রেণীর প্রাধান্য পুনস্থাপনের যে চেষ্টা ১৮১৫ খ্রীঃ পর চলছিল তার অবসান ঘটে। শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর গীর্জার প্রাধাণ্য বিনষ্ট হয়। ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা স্থায়ী হয়। মোট কথা, অভিজাতবাদ, যাজকবাদ (Aristocracy, clericalism) এবং স্বৈরাচারবাদ (Absolutism)-এর চিরতরে অবসান হয়। ফ্রান্সে পুরাতনতন্ত্র পুনঃ-স্থাপিত হওয়ার সম্ভাবনা লুপ্ত হয়। গর্ডন ক্রেইগের মতে, "দশম চার্লস যে ধরনের স্বৈরাচার স্থাপনের চেষ্টা চালান জুলাই বিপ্লব তা ধ্বংস করে।" (The July Revolution destroyed the system of absolutism, that Charles X had been seeking to consolidate)[১].

সাংবিধানিক শাসনেব প্রবর্তন

জুলাই বিপ্লব ফ্রান্সে বুর্জোয়াতন্ত্রকে স্থাপন করেন। ভোটাধিকার সম্পত্তিশালী লোকেদের হাতে থাকায় তারাই সরকার গঠন করে। সাধারণ লোক ভোটাধিকারে বঞ্চিত হয়। গর্ডন ক্রেইগের মতে, "জুলাই বিপ্লবের পর ফ্রান্স এমন একটি রাষ্ট্রে পরিণত হয় যাতে ধনী বুর্জোয়ারা রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হয়" (France became a state in which wealthier bourgeois exercised political power)।[২] এই উচ্চ বুর্জোয়া শ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করে ফ্রান্সে

বুর্জোয়াতন্ত্রের উদ্ভব শিল্প-বিপ্লব

১· Gordon Craig. P. 22.
২· Gordon Craig. P. 22.

শিল্প-বিপ্লবের সূচনা করে। লুই ফিলিপ নিজে এমন অর্থনীতি নেন যার ফলে শিল্পের বিকাশ সম্ভব হয়। জুলাই বিপ্লবের ফলে ফ্রান্স শিল্প অর্থনীতির পথে পা বাড়ায়। ফ্রান্সে রেলপথের বিস্তার ঘটে। বিভিন্ন বাণিজ্যিক সংগঠন গঠিত হয়।

জুলাই বিপ্লবে ফ্রান্সের সাধারণ লোক, যাদের মেনু পিউপল (Mennue Peuple) বলা হয় তারা ক্ষমতা না পেলেও তাদের রাজনৈতিক জাগরণ ঘটে। রাজনৈতিক ক্লাব বা আড্ডাখানাগুলিতে নিম্ন বুর্জোয়া ও শ্রমিকরা জড় হয়ে উত্তপ্ত রাজনীতির আলোচনা আরম্ভ করে। রাস্তায় শ্রমিক মিছিলগুলিকে জাতীয় রক্ষীদল অস্ত্র নামিয়ে সম্মান দেখায়।[১] জুলাই বিপ্লব নিশ্চিতভাবে নিম্ন বুর্জোয়া শ্রেণী ও শ্রমিক জাগরণের সূচনা করে। সমাজতন্ত্রী সেন্ট সাইমনের মতবাদ এই সময় জনসাধারণের মধ্যে ছড়ায়।

সাধারণ লোকের মধ্যে রাজনৈতিক জাগরণ

জুলাই বিপ্লব কেবলমাত্র ফ্রান্সের ভৌগোলিক সীমায় আবদ্ধ থাকেনি। ঐতিহাসিক ফিশারের মতে, "প্যারিসের বিপ্লবী চুল্লী হতে উড়ন্ত অগ্নি স্ফুলিঙ্গ কংগ্রেস বা কনসার্ট শাসিত ইওরোপের সারহীন কাষ্ঠখণ্ডগুলির ওপর পড়লে এক দাবানল সৃষ্টি হয়" (Sparks from the Paris furnace flew fast and fell among unsound timbers of Congress Europe)।[২] জুলাই বিপ্লব প্রধানতঃ ভিয়েনা চুক্তির বিরুদ্ধেই আঘাত হানে। ন্যায্য অধিকারবাদ ছিল ভিয়েনা চুক্তির প্রধান স্তম্ভ। জুলাই বিপ্লব বুরবোঁ বংশকে উচ্ছেদ করে এবং সার্বভৌম ক্ষমতা জাতির তরফে পার্লামেন্টের হাতে স্থাপন করে নায্য অধিকারবাদকে কবরস্থ করে। ফ্রান্সের বাইরে এই বিপ্লব জাতীয়তাবাদী, উদারতান্ত্রিক ভাবধারার প্রসার করে। বেলজিয়াম হল্যাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। বেলজিয়ামের স্বাধীনতা ঘোষণার দ্বারা বেলজিয়াম জাতীয়তবাদ স্বীকৃত হয়। জুলাই বিপ্লবের ফলে সুইজারল্যাণ্ড, স্পেন, হল্যান্ড, ইতালী ও ইংলণ্ডের সংবিধান অধিক উদারপন্থী হয়। ইংলন্ডে চার্টিস্ট আন্দোলন তীব্রতর হয়। ইংলন্ডের পার্লামেন্টের নির্বাচনে ভোটাধিকার সম্প্রসারিত হয়। সুইডেনের রাজা স্বৈরশাসন প্রত্যাহার করে নরওয়েকে স্বায়ত্ব শাসন প্রদান করেন। ইতালীতে ইয়ং ইতালী দল সঙ্ঘবদ্ধ হয়। মোট কথা, ১৮১৫ খ্রীঃ ভিয়েনা ব্যবস্থায় এক বিরাট ফাটল সৃষ্টি হয়। ডেভিড টমসনের মতে, ইওরোপ দুই আদর্শগত শিবিরে বিভক্ত হয়ে যায়। রাইন নদীর পশ্চিম দিকস্থ দেশগুলি রক্ষণশীলতা ত্যাগ করে উদারপন্থার প্রতি আনুগত্য জানায়। এই অঞ্চলে বুর্জোয়া শ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হয়। রাইনের পূর্ব দিকস্থ দেশগুলি স্বৈরতন্ত্রের অধীনে থাকে। এই অঞ্চলে অভিজাতশ্রেণীর ক্ষমতা বিদ্যমান থাকে।[৩]

ফ্রান্সের বাহিরে জুলাই বিপ্লবের অগ্রগতি

বেলজিয়ামের স্বাধীনতার বিদ্রোহ, ১৮৩০-৩২ খ্রীঃ (War of Belgian Independence, 1830-32)ঃ ১৮১৫ খ্রীঃ ভিয়েনা চুক্তির দ্বারা বেলজিয়ামকে হল্যান্ডের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। ভিয়েনা চুক্তির রচয়িতারা উপরোক্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় বেলজিয়ামের অধিবাসীদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রতি দৃষ্টিপাত করেননি। এদিকে বেলজিয়ামের অধিবাসীরা এই সংযুক্তির ঘোর বিরোধী ছিল। বেলজিয়ানরা ছিল ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী। ক্যালভিনপন্থী ডাচদের সঙ্গে তাদের মিলন হওয়া সম্ভব ছিল না। ডাচরা ছিল শিল্প ও বাণিজ্যজীবি। তারা অবাধ বাণিজ্য নীতির ভক্ত ছিল। বেলজিয়ামের নতুন শিল্পগুলিকে রক্ষার জন্যে সংরক্ষণ ব্যবস্থার দরকার ছিল। অবাধ বাণিজ্যের প্রবর্তনে বেলজিয়ামের অঙ্কুরিত শিল্পগুলি ধ্বংস হওয়ার উপক্রম হয়[৪] সরকারি চাকুরীগুলিতে বেলজিয়ানদের বদলে ডাচরা

ভিয়েনা চুক্তি ও বেলজিয়ামের স্বাধীনতা লোপ

১. Jack Droz. P. 116.
২. Fisher. P. 891.
৩. David Thomson.
৪. Gordon Graig. P. 22

নিযুক্ত হলে শিক্ষিত বেলজিয়ানদের মনে ক্ষোভ দেখা দেয়। ভাষাগত দিক থেকে বেলজিয়ানরা ছিল কেল্টিক বা লাতিন ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত এবং ডাচরা ছিল টিউটনিক ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এই কারণে ভিয়েনা কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত বেলজিয়ানবাসীদের মনঃপুত ছিল না।

১৮৩০ খ্রীঃ-এর জুলাই বিপ্লবে ফ্রান্সে বুরবোঁ বংশ সিংহাসনচ্যুত হলে বেলজিয়ানদের আত্মবিশ্বাস বাড়ে। ব্রাসেলস শহরে (২৫ আগস্ট, ১৮৩০ খ্রীঃ) এক অভ্যুত্থান ঘটে। হল্যান্ডের রাজা এই বিদ্রোহ দমনের জন্যে সেনাদল পাঠালে ব্রাসেলসের জনসাধারণ তাদের বিতাড়িত করে। বিদ্রোহী বেলজিয়ানরা একটি বিকল্প সরকার গঠন করে। এই সরকার ৪ঠা অক্টোবর, ১৮৩০ খ্রীঃ বেলজিয়ামের স্বাধীনতা ঘোষণা করে।

বেলজিয়ামের বিদ্রোহ

বেলজিয়ামের স্বাধীনতা ঘোষণা ছিল ভিয়েনা চুক্তির প্রতি খোলাখুলি চ্যালেঞ্জ। বেলজিয়ামের এই নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদকে ইওরোপের রক্ষণশীল শক্তিগুলির পক্ষে সহ্য করা সহজ ছিল না। রুশ জার এই বিদ্রোহ দমনের জন্যে ৬০ হাজার সৈন্য পাঠাতে প্রস্তাব দেন। প্রাশিয়া তার সেনাদলকে প্রস্তুত করে। বেলজিয়ামবাসীরা আত্মরক্ষার জন্যে ফ্রান্সের সাহায্য প্রার্থনা করে।

প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরোধিতা

এদিকে ইংলন্ডের নিকট বেলজিয়ামে ফরাসী হস্তক্ষেপ অথবা রুশ-জার্মান হস্তক্ষেপ দুইই অনভিপ্রেত ছিল। ইংলন্ড মনে করত যে, এই দেশে যে কোন বৃহৎ শক্তির হস্তক্ষেপ হলে ইংলন্ডের স্বার্থ বিপন্ন হবে। ব্রিটিশ সরকার বেলজিয়ামের স্বাধীনতার দাবীকে সমর্থন জানান। তবে কোন বৃহৎ-শক্তি যাতে বেলজিয়ামে প্রবেশ না করে সেদিকে নজর দেন। এদিকে পোল্যান্ড, জার্মানী ও ইতালীতে জুলাই বিপ্লবের বিদ্রোহ দেখা দিলে রক্ষণশীল শক্তিগুলি নিজ নিজ দেশে বিপ্লব দমনে ব্যস্ত হন। বেলজিয়ামে তাদের হস্তক্ষেপের প্রশ্ন আপাততঃ চাপা পড়ে যায়।

ইংলন্ডের ভূমিকা

বেলজিয়ানরা রক্ষণশীল শক্তিগুলির আক্রমণের ভয়ে ফ্রান্সের সহায়তা প্রার্থনা করে। এজন্য ফরাসী সীমান্তের নিকট কিছু স্থান বেলজিয়াম ফ্রান্সকে ছেড়ে দিতে রাজী হয়। কিন্তু ফরাসী রাজা লুই ফিলিপ বেলজিয়ামে একক হস্তক্ষেপ করতে সাহসী ছিলেন না। তিনি ইংলন্ডের মন্ত্রী লর্ড পামারস্টোনের বেলজিয়াম নীতিকে সমর্থন জানান। ফ্রান্স ও ইংলন্ড যুগ্মভাবে বেলজিয়াম সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসে। ১৮৩২ খ্রীঃ লন্ডন সম্মেলনে বেলজিয়ামের স্বাধীনতাকে সকল শক্তি স্বীকৃতি জানায়। জার্মানীর স্যাক্সকোবার্গ বংশের লিওপোল্ড বেলজিয়ামের রাজা হিসেবে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের দ্বারা মনোনীত হন। বেলজিয়ামকে নিরপেক্ষ দেশ হিসেবে ঘোষণা করা হয়। বৃহৎ শক্তিগুলি বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতা রক্ষা করতে প্রতিশ্রুতি দেয়। বেলজিয়ামের স্বাধীনতা লাভ ছিল ফরাসী বিপ্লব হতে উদ্ভুত জাতীয়তাবাদের জয়। বেলজিয়ামের স্বাধীনতা লাভ ভিয়েনা ব্যবস্থার ভাঙন সূচনা করে। জুলাই বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সে ন্যায্য অধিকারবাদ ও বেলজিয়ামে শক্তিসাম্য ভিয়েনা চুক্তির এই দুই নীতি পরিত্যক্ত হয়।

ইংলন্ডের নীতির প্রতি ফরাসীরাজ লুই ফিলিপের সমর্থন

ইওরোপের অন্যান্য দেশে জুলাই বিপ্লবের বিস্তার; জুলাই বিপ্লবের সামগ্রিক ফলাফল (Impact of the July Revolution on other countries of Europe : The Total Impact of the Revolution) : জুলাই বিপ্লবের তরঙ্গ ইওরোপের পূর্বপ্রান্তে পোল্যান্ডেও পৌঁছিয়ে যায়। ভিয়েনা চুক্তির দ্বারা পোল্যান্ডের বৃহদংশ রাশিয়ার অধীনে, বাকি অংশ প্রাশিয়ার অধীনে রাখা

হয়। রুশ জার প্রথম আলেকজান্ডার উদারতা নীতি বশতঃ রুশ অধিকৃত পোল্যান্ডকে স্বায়ত্ব-শাসন দেন। তাঁর মৃত্যুর পর জার দ্বিতীয় নিকোলাস পোল জাতির স্বায়ত্ব-শাসনের অধিকার হরণ করেন। এজন্য পোলদের মনে ঘোর অশান্তি দেখা দেয়। জুলাই বিপ্লবে ফ্রান্সের বুরবোঁ বংশ বিতাড়িত হলে পোল জাতীয়তাবাদীরা এতে উৎসাহ বোধ করে। পোলেরা একটি সংবিধান ঘোষণা করে। কিন্তু জার নিকোলাস পোল বিদ্রোহ দমন করে পোলদের শাসনতন্ত্র নাকচ করেন।

জুলাই বিপ্লবের প্রভাবে জার্মানীতেও জাতীয়তাবাদী ও গণতান্ত্রিক বিপ্লব আরম্ভ হয়ে যায়। গটিংজেন, কাসেল, ড্রেসডেন, লাইপজিগ ও ব্রান্সউইক নগরে উদারনৈতিক বিদ্রোহ ঘটে। হ্যানোভার, হেসে, স্যাক্সনী প্রভৃতি রাজ্যের শাসনকর্তারা প্রজাদের দাবীর ফলে উদারতান্ত্রিক সংবিধান প্রবর্তন করেন। কিন্তু মেটারনিকের প্রভাবে এই সকল সংবিধান বাতিল হয়ে যায়। দমনমূলক কার্লসবাড ডিক্রীতে আরও ছয়টি দমনমূলক শর্ত জোড়া হয়। জার্মানীতে স্বৈরতন্ত্র পুনরায় ফিরে আসে।

জুলাই বিপ্লবের ঢেউ ইতালীতে এলে ইতালীর জাতীয়তাবাদীরা বৈদেশিক শাসন থেকে ইতালীকে মুক্ত করার জন্যে চেষ্টা করেন। কার্বোনারী ও অন্যান্য গুপ্ত দলগুলি এজন্য সক্রিয় হয়ে ওঠে। মধ্য ইতালীর পার্মা, মডেনা প্রভৃতি অঞ্চলে বৈদেশিক শাসকদের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহ দেখা দেয়। কিন্তু মেটারনিকের নির্দেশে অষ্ট্রিয় বাহিনী এই বিদ্রোহগুলিকে দমন করে ইতালীতে স্থিতাবস্থা ফিরিয়ে আনে।

স্পেন, পর্তুগাল, সুইডেন ও সুইজারল্যান্ডেও উদারতান্ত্রিক সংবিধান প্রবর্তিত হয়। গণভোটের দাবীতে ইংলন্ডে চার্টিষ্ট (Chartist) আন্দোলন আরম্ভ হয়। ক্ষুদ্র নরওয়ে ভিয়েনা চুক্তির দ্বারা সুইডেনের সঙ্গে সংযুক্ত হলেও, নরওয়েবাসীরা তাদের জাতীয়তাবাদ ভোলেনি। ১৮৩০ খ্রীঃ জুলাই বিপ্লবের সময় নরওয়ে তার প্রাচীন এইডসভোল্ড (Eidsvold) সংবিধান দাবী করে। সুইডেন রাজ বার্ণাডোট নরওয়ের দাবী নাকচ করলেও শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে নরওয়ের স্বায়ত্ব-শাসনের দাবী ও এইডসভোল্ড সংবিধান মেনে নেন। জার্মানীতে জাতীয়তাবাদী ও উদারনৈতিক বিদ্রোহ দমিত হলেও জার্মান বুর্জোয়াদের উদ্যোগে জার্মানীর শুল্কসংঘ বা জোলভেরাইন প্রতিষ্ঠিত হয়। জার্মানীর অর্থনৈতিক ঐক্য তার রাজনৈতিক ঐক্যের পথ প্রদর্শন করে। গ্রীসের স্বাধীনতার যুদ্ধ ১৮২৯ খ্রীঃ এড্রিয়ানোপলের সন্ধি এবং ১৮৩০ খ্রীঃ গ্রীসের জাতীয় স্বাধীন রাজতন্ত্র স্থাপনের মধ্যে পরিণতি পায়। এমনকি ইতালী, জার্মানী, পোল্যান্ড যেসকল স্থানে জুলাই বিপ্লব দমিত হয় ও পুরাতন রাজবংশ ক্ষমতায় ফিরে আসে, জুলাই বিপ্লবের ফলে সাময়িক ক্ষমতাচ্যুতি ও ন্যায্য অধিকারবাদের বিলুপ্তি প্রমাণ করে যে। পুরাতনতন্ত্রের ভিত্তি ইওরোপে কত নড়বড়ে হয়ে গেছে। ভিয়েনা সন্ধি যে ন্যায্য অধিকারবাদ ও শক্তিসাম্য স্থাপন করেছিল তা কেবলমাত্র মেটারনিকতন্ত্রের দমন নীতির জোরে টিকে আছে তা প্রমাণিত হয়। এই ব্যবস্থা যে ক্ষয় পাচ্ছে জুলাই বিপ্লবের মৃদু রাজনৈতিক ভূকম্পন তা বুঝিয়ে দেয়। কারণ অল্প সময়ের জন্যে হলেও জার্মানী, ইতালীর এই সকল ন্যায্য অধিকারবাদী শাসক তাদের অধিকার হারিয়ে ফেলেছিল।

সার্বিকভাবে আমরা যদি ফ্রান্স সহ জুলাই বিপ্লবের পর গোটা ইওরোপের দিকে তাকাই - তাহলে একথা স্পষ্ট ধরা পড়বে যে, ১৮১৫ খ্রীঃ ভিয়েনা সন্ধির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ইওরোপের রাজনৈতিক মানচিত্র অনেক স্থানে উবে গেছে, অনেক স্থানে দুমড়ে মুচড়ে গেছে, অনেক স্থানে ভঙ্গুর (fragile) ও পতনশীল হয়েছে। জুলাই বিপ্লব ভিয়েনা চুক্তির মারাত্মক ক্ষতি করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। যে উদারতান্ত্রিক, জাতীয়তাবাদী শক্তিকে ১৮১৫ খ্রীঃ সন্ধির দ্বারা দমিয়ে ফেলার চেষ্টা করা হয়, তা যে সফল হয়নি তা বোঝা যাচ্ছিল। ইংলন্ডে ১৮৩২ খ্রীঃ রিফর্ম বিল

(Reform Bill) বা ভোটাধিকার আইন পাশ হওয়ার পর ইওরোপ দুটি আদর্শগত শিবিরে, দুটি রাজনৈতিক মেরুতে বিভক্ত হয়ে যায়। রাইন নদীর পশ্চিম দিকের শিবিরের নেতৃত্ব দেয় ব্রিটেন ও ফ্রান্স। এই দুই দেশ সাংবিধানিক, পার্লামেন্টারী, উদারনৈতিক শাসন ব্যবস্থাকে বরণ করে নেয়। রাইনের পশ্চিম দিকের দেশগুলির মধ্যে স্পেন, পর্তুগাল, সুইজারল্যান্ড, হল্যান্ড, বেলজিয়াম, সুইডেন ও নরওয়ে একই উদারতন্ত্রকে গ্রহণ করে। এই অঞ্চলে ভিয়েনা চুক্তির ন্যায্য অধিকারবাদ ও স্বৈরতন্ত্রবাদ বর্জিত হয়। রাইনের পূর্ব দিকের দেশগুলি অর্থাৎ, জার্মানী, অষ্ট্রিয়া, পোল্যান্ডে তখনও পর্যন্ত ১৮১৫ খ্রীঃ নায্য অধিকারবাদ ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা নড়বড়ে হলেও টিকে থাকে। শক্তিসাম্যের দিক থেকে কনসার্ট অব ইওরোপ দ্বিধাবিভক্ত হয়। ব্রিটিশ মন্ত্রী লর্ড পামারষ্টোনের মতে, ১৮৩০ খ্রীঃ পর এক প্রকার দ্বৈত শক্তি সমবায় ইওরোপে দেখা দেয়। একদিকে ছিল সংবিধানপন্থী, উদারতন্ত্রী ফ্রান্স ও ব্রিটেন অপরদিকে ছিল পবিত্র চুক্তির রক্ষণশীলতা ও স্থিতাবস্থাপন্থী অষ্ট্রিয়া, প্রাশিয়া ও রাশিয়া। ১৮৩০ খ্রীঃ ইওরোপে নতুন শক্তিসাম্য বা ব্যালান্স অব পাওয়ার সৃষ্টি করে।

মেটারনিকের যুগ ঃ মেটারনিকের ভূমিকার বিচার (The Age of Metternich : His role) ঃ ১৮১৫—১৮৪৮ খ্রীঃ পর্যন্ত ইওরোপের ইতিহাসের কেন্দ্রে ছিলেন অষ্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স ক্রেমেন্স ফেন মেটারনিক। কেহ কেহ এই যুগকে "মেটারনিকের যুগ" (Era of Metternich) বলে অভিহিত করেন। যদি ব্যক্তির দ্বারা ইতিহাসের গতি প্রভাবিত হয়ে থাকে তবে নিঃসন্দেহে মেটারনিক ছিলেন সেই ব্যক্তি যিনি এই সময়ে ইওরোপের ইতিহাসের গতিকে প্রভাবিত করেন।

মেটারনিকের যুগ

প্রিন্স মেটারনিক[১] ছিলেন অষ্ট্রিয়ার হ্যাপসবার্গ সাম্রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী বা চ্যান্সেলর। তাঁর প্রভু ছিলেন অষ্ট্রিয়ার সম্রাট প্রথম ফ্রান্সিস এবং প্রথম ফার্দিনান্দ। তিনি রাইনল্যান্ডের অভিজাত বংশীয় লোক ছিলেন। তিনি অষ্ট্রিয়ার বিখ্যাত প্রবীণ অভিজাত রাজীনতিজ্ঞ কাউন্ট কৌনিজের পৌত্রীকে বিবাহ করেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ছিলেন। আইন ও ভাষাতত্ত্বে তাঁর পারদর্শিতা ছিল। তিনি ভলতেয়ারের মতবাদ, নিউটনের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, বিঠোফেনের সঙ্গীত এবং শেক্সপিয়ারের নাটকের রসাস্বাদন করতেন। পোষাক-পরিচ্ছদ ও বাচনভঙ্গীত তিনি ছিলেন অত্যন্ত মার্জিত। তাঁর বাকধারা ছিল বুদ্ধিদীপ্ত। তিনি জটিল রাজনৈতিক সমস্যাগুলিকে চমৎকারভাবে ভাষায় প্রকাশ করতে পারতেন। ভিয়েনা সম্মেলনের তিনি ছিলেন সভাপতি। "মাছ যেমন ঘূর্ণি জলে অবাধে চলাফেরা করে তিনি ভিয়েনা সম্মেলনের কূটনৈতিক ঘূর্ণি জলে মাছের মতই অবাধে বিচরণ করতেন।"

মেটারনিক খুবই মার্জিত রুচির লোক হলেও তাঁর চরিত্রে একটি স্বভাব-সিদ্ধ চাতুর্য ছিল। তিনি প্রতিপক্ষকে জব্দ করতে নীচ কাজ করতে কুণ্ঠিত হতেন না। জার প্রথম আলেকজান্ডারের মতে মেটারনিক ছিলেন "মিথ্যাবাদী"। ট্যালির্যান্ডের মতে, "মেটারনিক ছিলেন রেশমের মোজায় মণ্ডিত নোংরা পদার্থ।" কাসলরি তাঁকে "রাজনৈতিক ভাঁড়" বলে অভিহিত করেন। নেপোলিয়নের মতে "মেটারনিক ছিলেন একজন চক্রান্তকারী, তিনি রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন না" (An Intriguer not a statesman)। তিনি ছিলেন আসলে ভয়ানক আত্মম্ভরী ও দাম্ভিক প্রকৃতির লোক। তিনি বলতেন যে, "আমার এমনই বৈশিষ্ট্য যে আমি যেখানেই থাকি না কেন সকলের চক্ষু ও আশা-আকাঙ্ক্ষা সেই স্থানেই আবদ্ধ হয়।" ১৮৪৮ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের সময় তিনি স্বদেশ থেকে পালিয়ে ইংলন্ডে আশ্রয় নেন। তবু তিনি নিজ ভুল স্বীকার না করে বলেন যে, "এই পৃথিবীতে হয় আমি অনেক আগে অথবা অনেক পরে এসেছি" (I have come in this world either too early or too late)।

মেটারনিকের ধূর্ততা এবং দম্ভ

১· অষ্ট্রিয়ার অভিজাত বংশীয়দের প্রিন্স বলে সম্বোধন করা হত।

অধুনা মেটারনিকের রাজনৈতিক প্রতিভা এবং তাঁর রক্ষণশীল মতামতের পক্ষে ও বিপক্ষে ঐতিহাসিকরা বিতর্কে লিপ্ত হয়েছেন। ঐতিহাসিক লিপসনের মতে "মেটারনিক এক শতকের বেশী সময় মৃত হলেও তাঁর সম্পর্কে উত্তপ্ত বিতর্ক শেষ হয়নি।" এই বিতর্ককে আমরা দুভাগে ভাগ করতে পারি। মেটারনিকের বিপক্ষে উদারতন্ত্রী ঐতিহাসিকরা মেটারনিককে এক অন্ধ রক্ষণশীল বলে গণ্য করেন। তাঁর প্রভাবে ইওরোপের রাজনৈতিক অগ্রগতি অন্ততঃ এক প্রজন্ম পিছু হঠে যায়। তিনি ছিলেন ঘোরতর সংস্কার বিরোধী (Obscurantist)। অষ্টাদশ শতকের মানসিকতা তাঁকে এমন আচ্ছন্ন করে যে, তিনি ঊনবিংশ শতকের চিন্তাধারা বুঝতে চাননি। অষ্টাদশ শতকের ভাবধারা তিনি ঊনবিংশ শতকের ওপর চাপাতে চান। তিনি ইতিহাসের ঘড়ির কাঁটা পিছনে চালাতে চান। রবার্ট কাণ (Robert Kann) প্রভৃতির মতে, মেটারনিকতন্ত্র বা মেটারনিক প্রথা কথাটিই ভুল। তাঁর কোন নির্দিষ্ট নীতিই ছিল না। তিনি যখন যে রকম দরকার সেই নীতি নিতেন। যদি কোন নীতিই তিনি নেন তা হল একমাত্র রক্ষণশীলতা ও স্থিতাবস্থা নীতি। অধুনা কোন কোন ঐতিহাসিক মেটারনিকের চরিত্র সম্পর্কে দ্বিতীয় চিন্তা করেন। তাঁরা বলেন যে, মেটারনিককে তাঁর প্রভু প্রথম ফ্রান্সিস ও প্রথম ফার্দিনান্দকে খুশী রেখে নিজ পদ বজায় রাখতে হত। এই দুই সম্রাট ছিলেন ঘোর স্বৈরতন্ত্রী ও প্রতিক্রিয়াশীল। তাঁদের চাপে মেটারনিককে এরূপ প্রতিক্রিয়াশীল নীতি নিতে হয় নতুবা মেটারনিক ব্যক্তিগতভাবে প্রতিক্রিয়াশীল ছিলেন না। তিনি অষ্ট্রিয়ায় শাসন সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন। মেটারনিক হ্যাপসবার্গ সাম্রাজ্যকে একটি যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত করার প্রস্তাব দেন। তা ফ্রান্সিস নাকচ করেন। আসলে কোন রাষ্ট্রনীতিবিদের পরিচয় তাঁর কাজের দ্বারাই হয়; তিনি কি ইচ্ছা করেন তার দ্বারা হয় না। সুতরাং মেটারনিক ব্যক্তিগতভাবে কি চাইতেন তা বিচার করা অপেক্ষা তাঁর কাজের দ্বারা তাঁকে বিচার করা উচিত। এই দিক হতে তাঁকে ঘোর প্রতিক্রিয়াশীল বলা যায়।

রক্ষণশীলতার সমর্থনে মেটারনিকের যুক্তি

মেটারনিকতন্ত্র (Metternich System) ঃ অষ্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স মেটারনিক তাঁর প্রতিক্রিয়াপন্থী রক্ষণশীল মতবাদের জন্যে বিখ্যাত। মেটারনিকের কোন System বা বাঁধাধরা প্রথা বা 'তন্ত্র' ছিল না বলে অনেক ঐতিহাসিক বলেন। তাঁরা বলেন যে, মেটারনিকের কতকগুলি বিশেষ রাজনৈতিক বিশ্বাস বা মতামত ছিল। সেই মতামতগুলিকে কার্যকরী করার জন্যে তিনি বিভিন্ন ব্যবস্থা নেন। কাইটেলের (Kittel) মতে, তাঁর নীতিগুলিকে কার্যকরী করতে তিনি সর্বদাই একটি বাঁধা ছক অনুসরণ করতেন না। যে দেশে যেমনভাবে এই নীতিগুলিকে কার্যকরী করা যায়, সেই দেশে সেরকম নীতি তিনি নেন। কিন্তু তিনি তাঁর এই রাজনৈতিক মতবাদকে এমন ভাবে প্রয়োগ করেন যে লোকে তাকে মেটারনিকতন্ত্র আখ্যা দেয়।

মেটারনিকতন্ত্র বুঝতে হলে আগে মেটারনিকের রাজনৈতিক দর্শন বা মতামত জানা দরকার। ন্যায্য অধিকার, সিংহাসনে রাজার স্বর্গীয় অধিকারতত্ত্বকে মেটারনিক অভ্রান্ত বলে ঘোষণা করেন। শাসকের প্রতি প্রজা আনুগত্য জানাতে বাধ্য বলে তিনি মনে করতেন। এছাড়া রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে সাধারণ লোক বা Third Estate-এর কোন ভূমিকা থাকতে পারে বলে মেটারনিক মনে করতেন। তিনি অভিজাততন্ত্র, সামন্ততন্ত্র ও পুরোহিততন্ত্রকেও অন্ধ সমর্থন করেন। এক কথায় বিপ্লবের পূর্বের পুরাতনতন্ত্রকে স্থায়ী করার জন্যেই তিনি সকল প্রকার চেষ্টা করেন। মেটারনিক বলেন যে, সমাজ ও রাষ্ট্র সর্বদা ভাল ও মন্দের সংঘাতের দ্বারা চালিত হয়। মন্দের হার বেশী হলে সভ্যতা ভেঙে পড়ে। ফরাসী বিপ্লব থেকে উদ্ভূত ভাবধারাগুলি ছিল সভ্যতা-বিরোধী ধ্বংসকারী শক্তি। এগুলি ছিল "রাজনৈতিক মহামারী", "বহু মস্তকবিশিষ্ট দৈত্য"-এর মতই সভ্যতাকে গ্রাস করতে উদ্যত। তাঁর মতে, রাজা ও অভিজাতরাই ছিলেন সমাজ ব্যবস্থার ধারক। কারণ দীর্ঘকাল তাঁরাই ছিলেন সমাজের চালিকা শক্তি।

অভিজাতশ্রেণীই একমাত্র স্বার্থহীনভাবে রাষ্ট্রের সেবা করতে সক্ষম ছিল। রাজা ও জনসাধারণের মধ্যে তারাই ছিল যোগসূত্র। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, নবোদিত ভাবধারা এই শ্রেণীকে ধ্বংস করে সভ্যতাকে বিনষ্ট করতে উদ্ধত হয়েছে।[১]

ফরাসী বিপ্লব মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জাগরণ ঘটায়। মন্তেস্কু ও রুশোর আদর্শে এই শ্রেণী প্রভাবিত হয়। এই শ্রেণী রাজতন্ত্র, স্বৈরশাসন, অভিজাততন্ত্র ও পুরোহিততন্ত্রের অবসান কামনা করত। তাব স্থলে নিয়মতান্ত্রিক শাসন, ব্যক্তি স্বাধীনতা, যোগ্যতার ভিত্তিতে চাকুরী, অবাধ বাণিজ্য, জাতীয় রাষ্ট্রের আদর্শ তারা প্রতিষ্ঠাব চেষ্টা করে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এই ভাবধারাকে মেটারনিক সভ্যতা-বিরোধী, অশুভ শক্তি বলে ঘোষণা করেন। মেটারনিক মনে করতেন যে, অভিজাত শ্রেণীকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্যে বুর্জোয়া শ্রেণী এই সকল বিধ্বংসী মতবাদ প্রচার করে। বুর্জোয়াদের আসল লক্ষ্য ছিল ক্ষমতা দখল করা। এজন্য মেটারনিক এই নবোদিত ভাবধারাগুলিকে দমনের জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। ইওরোপের সর্বত্র ভিয়েনা সম্মেলনের দ্বারা স্থাপিত স্থিতাবস্থাকে রক্ষা কবাই ছিল তাঁর প্রধান নীতি। তিনি ইওরোপের রাজশক্তিকে পরামর্শ দেন যে. "বাজত্ব করুন, সংস্কার বা পরিবর্তন করবেন না।" সংস্কার স্বীকার করলে পুরাতনতন্ত্র ধ্বংস হবে। মেটারনিকেব নীতির মূল কথা ছিল অষ্ট্রিয়ার হ্যাপসবার্গ সাম্রাজ্যের ঐক্য এবং হ্যাপসবার্গ রাজবংশেব স্বৈরক্ষমতাকে যে কোন উপায়ে বক্ষা করা। কারণ তিনি আশঙ্কা করতেন যে, নবোদিত ভাবধারা গণতন্ত্র বা জাতীয়তাবাদ এই সাম্রাজ্যে অনুপ্রবেশ করলে সাম্রাজ্য ভেঙে পড়বে। তিনি মনে করতেন যে, এই নবোদিত ভাবধারা মহামারীর মত এক দেশ থেকে অন্য দেশে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। রাজনৈতিক সীমান্তের বাঁধ দ্বারা তা রোধ করা যায় না। সুতরাং অষ্ট্রিযাব স্বার্থে অন্য প্রতিবেশী দেশে বৈপ্লবিক ভাবধারা আত্মপ্রকাশ করলে তা ছড়িয়ে পড়ার আগেই হস্তক্ষেপ করে দমিয়ে ফেলা দরকার। এজন্য মেটারনিক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সীমান্তের বাধা না মেনে অন্যদেশের আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহে হস্তক্ষেপ করা উচিত মনে করতেন। এছাডা মেটারনিক ইওরোপে যাতে পুনরায় কোন বড় ধরনের যুদ্ধ-বিগ্রহ না বাধে সেজন্য চেষ্টা করেন। জন সিম্যানের (From Vienna to Versailles) মতে, মেটারনিক ভাবতেন যে আবার একটি ইওরোপীয় যুদ্ধ শুরু হলে তার সুযোগে বিপ্লবী ভাবধারাগুলি শক্তিলাভ করবে। এজন্য তিনি ইওবোপীয় শক্তি সমবায় গড়েন। ইংলন্ড এই সমবায় থেকে বিচ্ছিন্ন হলে তিনি অষ্ট্রিয়া, প্রাশিয়া ও রাশিয়া এই তিন মহাদেশীয় শক্তির জোট দ্বাবা ফ্রান্স থেকে পুনরায় বিপ্লব যাতে ইওরোপে না ছড়ায় সেজন্য চেষ্টা চালান।

মেটারনিকের ইওবোপীয় নীতি

ইওরোপে ভিয়েনা চুক্তির দ্বারা পুরাতনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে তিনি বিপ্লবী ভাবধারার প্রবাহ রোধের জন্যে বাঁধ তৈরি করেন। তিনি ন্যায্য অধিকার, ক্ষতিপূরণ ও শক্তিসাম্য নীতির দ্বারা ইওরোপে পুরাতন স্বৈরাচারী রাজবংশগুলির শাসন ফিরিয়ে আনেন। উদারতন্ত্র, জাতীয়তাবাদকে তিনি সমাধিদানের ব্যবস্থা করেন। ইওরোপে অষ্ট্রিয়ার স্বার্থ ও প্রভাবকে রক্ষার করার জন্যে তিনি বিশেষ চেষ্টা চালান। ভিয়েনা সম্মেলনের মধ্যমণি রূপে তিনি বিরাজ করেন। এই সম্মেলনের কূটনৈতিক ঘূর্ণিজলে তিনি মাছের ন্যায় অবলীলায় সাঁতার কাটতে থাকেন। তিনি ভিয়েনা সন্ধির দ্বারা ইতালীতে অষ্ট্রিয়ার পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ অধিকার স্থাপন করেন। ইতালীর জাতীয়তাবাদকে দমিয়ে তিনি এই দেশটির রাজনৈতিক ব্যবচ্ছেদ করেন। এর ফলে ইতালীর নাম কেবলমাত্র ভূগোলের বইতে পাওয়া যেত (A geographical expression)। এই সঙ্গে জার্মানী যাতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে শক্তিশালী না হয় সেদিকে তিনি দৃষ্টি দেন। জার্মানী ৩৮টি রাজ্যে বিভক্ত হয়। জার্মানীর সঙ্ঘের সভাপতির পদ পায় অষ্ট্রিয়া। এভাবে মেটারনিকের প্রভাবে ভিয়েনা সম্মেলনে

১· Jack Droz—Europe between Revolutions. 1815-48.

বিপ্লবী আদর্শ—উদারতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদকে দমান হয়। অষ্ট্রিয়ার প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়ান হয়। ইওরোপের সর্বত্র পুরাতনতন্ত্র স্থাপিত হয়।

মেটারনিক ছিলেন ঘোর বাস্তববাদী। তিনি আশঙ্কা করেন যে, ভবিষ্যতে ইওরোপে উদারতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী বিপ্লব দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা আছে। ইওরোপের কোন দেশে উদারনৈতিক শাসন স্থাপিত হলে তার ছোঁয়াচ অষ্ট্রিয়ায় আসবে বলে তিনি মনে করতেন। এমতাবস্থায় মেটারনিক ইওরোপে বিপ্লবের সম্ভাবনা দূর করার জন্যে ইওরোপীয় শক্তি সমবায়ের সাহায্য নেন। শক্তি সমবায়ে ইংলন্ড ও রাশিয়ার দ্বন্দ্বের সুযোগে তিনি রাশিয়ার পক্ষ নিয়ে জার প্রথম আলেকজান্ডারকে নিজ মতের স্বপক্ষে আনেন। তিনি আশঙ্কা করেন যে, অষ্ট্রিয়া এবং তার পূর্ব দিকের প্রতিবেশী রাশিয়া ও তুরস্কের দ্বন্দ্বে ফ্রান্স ভেদনীতি খাটাতে পারে। প্রাশিয়া ও পিডমন্টের সঙ্গে অষ্ট্রিয়ার বিরোধের সুযোগ ফ্রান্স নিতে পারে। তাহলে ভিয়েনা সন্ধির শর্ত দ্বারা ফ্রান্সকে যেভাবে দুর্বল করা হয়েছে, ফ্রান্স সেই ভিয়েনা শক্তিসাম্য ভেঙে ফেলবে। এজন্য তিনি ইওরোপীয় শক্তি সমবায়ের সহায়তায় এই বিরোধগুলির মীমাংসার ব্যবস্থা করেন। ফ্রান্স যাতে ভিয়েনা শক্তিসাম্যকে নষ্ট করে রাজনৈতিক ও আদর্শগত প্রভাব খাটাতে না পারে সেজন্য তিনি শক্তি সমবায়কে ব্যবহার করেন। তিনি এই মত প্রকাশ করেন যে, কোন দেশের আভ্যন্তরে বিপ্লব ঘটলে সেই ঘটনাকে সেই দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয় বলে গণ্য করা হবে না। ইওরোপীয় শক্তি সমবায়কে তিনি সেই দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ দ্বারা বিপ্লব দমন করার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন যে, যেহেতু বিপ্লব এক দেশ থেকে অন্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে সেজন্য আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঘটনার কোন পার্থক্য স্বীকার করা সম্ভব নয়। মেটারনিক কর্তৃক রচিত প্রটোকোল অফ ট্রপো বা ট্রপোর ঘোষণাপত্রের দ্বারা ঘোষণা করা হয় যে, বিপ্লবের দ্বারা সরকার পরিবর্তন বা সংবিধান স্থাপন বে-আইনী। ট্রপোর প্রতিক্রিয়াশীল ঘোষণাপত্রের বিরুদ্ধে তিনি ইংলন্ডের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করেন। এই ঘোষণাপত্রের নীতি অনুসারে অষ্ট্রিয়ার সেনাদল দক্ষিণ ইতালীর নেপলস ও উত্তর ইতালীর পিডমন্টের উদারতান্ত্রিক বিপ্লব দমন করে। মেটারনিকের প্ররোচনায় শক্তি সমবায় স্পেনের উদারতন্ত্রী বিদ্রোহ দমনে ফরাসী সেনাদল পাঠায়। এজন্য ডেভিড টমসন মন্তব্য করেছেন যে, "কংগ্রেস প্রথা রক্ষণশীল শক্তির লক্ষ্য পূরণের হাতিয়ার হয়।"

মেটারনিক জার্মানীতে তাঁর রক্ষণশীল মতবাদকে প্রয়োগের জন্যে বিশেষ যত্ন নেন। জার্মানী ছিল অষ্ট্রিয়ারই প্রতিবেশী ও অঙ্গরাজ্য। মেটারনিক তাঁর রক্ষণশীল স্থিতাবস্থা নীতিকে জার্মানীতে কায়েম করার জন্যে বিশেষ উদ্যোগ নেন। এজন্য ভিয়েনা কংগ্রেসে জার্মান জাতীয়তাবাদী ষ্টাইন জার্মান ঐক্যের পরিকল্পনা পেশ করলে মেটারনিক তা নাকচ করে দেন। তাঁরই উদ্যোগে জার্মানীকে ৩৮টি রাজ্যে বিভক্ত করে একটি বুন্ড বা ফেডারেশন গড়া হয়। অষ্ট্রিয়া এই বুন্ডের সভাপতি হিসেবে জার্মানীতে জাতীয়তাবাদী ও উদারনৈতিক ভাবধারাকে দমিয়ে দেন। প্রাশিয়ার রাজা তৃতীয় ফেডারিক উইলিয়াম যাতে বুন্ডের সংবিধানের ১৩নং ধারা প্রয়োগ করে প্রাশিয়ায় উদারনৈতিক সংবিধান চালু না করেন এজন্য তিনি প্রাশিয়ার রাজার ওপর চাপ সৃষ্টি করেন। ব্যাভেরিয়া, উটেমবার্গ প্রভৃতি রাজ্যকেও তিনি উদারপন্থা থেকে বিচ্ছিন্ন করেন। জার্মানীর ছাত্র ও বুদ্ধিজীবিরা জাতীয়তাবাদী ও উদারপন্থী সংবিধানের জন্যে আন্দোলন করে। মেটারনিক এই ভাবধারার প্রতি তীব্র ঘৃণা বর্ষণ করেন। এই তথাকথিত নৈরাজ্যবাদী শক্তিকে দমনের জন্যে তিনি দমনমূলক কার্লসবাড ডিক্রী জার্মানীতে চালু করেন। এই ডিক্রীর বলে জার্মানীর উদারপন্থী ছাত্র, অধ্যাপকদের নিগ্রহ করা হয়। বারশেনশাফট (Burschenschaft) প্রভৃতি উদারপন্থী, দেশপ্রেমী ছাত্র সংগঠন নিষিদ্ধ করা হয় ও সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা হয়। রাজনৈতিক দলগুলিকে

জার্মান নীতি

নিষিদ্ধ করা হয়। জার্মান ছাত্ররা যাতে জার্মান জাতীয়তাবাদের দ্বারা প্রভাবিত না হয় এজন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করা হয়। দমন নীতি প্রয়োগের জন্যে মেইনজ শহরে এক বিশেষ দপ্তর স্থাপিত হয়। ১৮৩০-এর জুলাই বিপ্লবের পর দমনমূলক কার্লসবাড ডিক্রীতে আরও ছয়টি ধারা যোগ করা হয়।

ভিয়েনা চুক্তির দ্বারা জার্মানীতে অন্ততঃ একটি শিথিল যুক্তরাষ্ট্র গড়া হয়। ইতালীর জাতীয়তাবাদকে অগ্রাহ্য করে ভিয়েনা চুক্তিতে মেটারনিক ইতালীতে এরকম কোন ব্যবস্থা গড়ার সুযোগ দেননি। তিনি রাজনৈতিকভাবে ইতালীর ঐক্য বা জাতীয়তাবাদী চিন্তাকে সমাধি দেন। প্রধান পাঁচটি ভাগে ও কয়েকটি ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত ইতালীর ওপর তিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাঁর রক্ষণশীল নীতি কায়েম করেন। মধ্য ইতালীর হ্যাপসবার্গ শাসকরা ছিল তাঁর ক্রীড়নক। মেটারনিকের গুপ্ত পুলিশ বাহিনী অষ্ট্রিয়া শাসিত লম্বার্ডি ও ভেনিসিয়া এবং হ্যাপসবার্গ শাসিত অঞ্চলে প্রচণ্ড দমন চালাত। অষ্ট্রিয়া শাসিত ইতালীতে জার্মান এবং স্লাভ জাতীয় শাসনকর্তা ও কর্মচারীদের ইচ্ছাপূর্বক নিয়োগ করা হত। ইতালীর জাতীয়তাবাদীদের দমিয়ে রাখার জন্যে নেপোলিয়নের আমলে কোড নেপোলিয়ন ও যোগ্যতার ভিত্তিতে চাকুরীতে নিয়োগের যে প্রথা চালু হয়, মেটারনিকের হস্তক্ষেপে তা লোপ করা হয়। যোগ্য, দক্ষ ইতালীয় বুদ্ধিজীবিরা অবহেলিত হয়। নেপোলিয়নের আমলে যে সকল পৌর ব্যবস্থা চালু হয়, যথা রাস্তাঘাট তৈরি, রাস্তায় বাতিস্তম্ভ স্থাপন প্রভৃতি মেটারনিকের ক্রীড়নক রক্ষণশীল শাসকরা তা লোপ করেন। সর্বত্র গুপ্ত পুলিশ, নিয়ন্ত্রণ, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ ও আঞ্চলিকতাতে সমর্থন করা হয়।

ইতালীয় নীতি

অষ্ট্রিয়ার সাম্রাজ্য ছিল মেটারনিকের হাতের মুঠোয়। সুতরাং তাঁর রক্ষণশীল নীতির পূর্ণ প্রকাশ হ্যাপসবার্গ সাম্রাজ্যে দেখা যায়। অষ্ট্রিয়ায় সকল প্রকার সংস্কার ও প্রগতিশীল ভাবধারা নিষিদ্ধ করা হয়। ছাত্রদের ও অধ্যাপকদের গতিবিধির ওপর নজর রাখার জন্যে গোয়েন্দা নিয়োগ করা হয়। ছাত্রদের বিদেশে অধ্যয়ন বা বিদেশী অধ্যাপকদের অষ্ট্রিয়ায় অধ্যাপনা করা নিষিদ্ধ হয়। অষ্ট্রিয়ার ভেতর 'স্থিতিবস্থা' (Status quo) বজায় রাখাই ছিল মেটারনিকের একমাত্র লক্ষ্য। ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পঠন-পাঠন নিষিদ্ধ করা হয়। ছাত্রদের মধ্যে স্বাধীন ও যুক্তিবাদী চিন্তার যাতে বিস্তার না হয় এজন্য চেষ্টা করা হয়। শিক্ষা ব্যবস্থাকে ক্যাথলিক গীর্জা ও যাজকদের অধীনে আনা হয়। বিদেশ হতে আনীত পুস্তকের মাধ্যমে যাতে বিপ্লবী ভাব ছাত্রদের মধ্যে না ছড়ায় এজন্য বৈদেশিক পুস্তক নিয়ন্ত্রণ পরিষদ স্থাপন করা হয়।

অষ্ট্রিয় নীতি

হ্যাপসবার্গ সাম্রাজ্যে প্রজা বিদ্রোহ দমনের জন্যে মেটারনিক বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে ভেদনীতি খাটান। চেক পুলিশ দ্বারা অষ্ট্রিয়দের, জার্মান পুলিশ দ্বারা চেকদের, হাঙ্গেরীয় পুলিশ দ্বারা ইতালীয়দের শাসন করা হয়। কার্ল মার্কস অষ্ট্রিয়ার অবস্থা সম্পর্কে লিখেছেন যে "সকল প্রকার কায়েমী স্বার্থকে মেটারনিক সমর্থন করতেন।" কারণ তারা ছিল পুরাতনতন্ত্রের প্রধান খুঁটি। এজন্য তিনি প্রজাদের বিরুদ্ধে জমিদার, ক্রেতার বিরুদ্ধে বিক্রেতা, শ্রমিকের বিরুদ্ধে মালিকের পক্ষ নিতেন। অষ্ট্রিয়ার অধীনস্থ পোল্যান্ডে সামন্তশ্রেণী ছিল অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে। এজন্য তিনি গ্যালিসিয়ার কৃষকদের এই সামন্তদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে প্ররোচনা দেন। বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী দ্বারা গঠিত হ্যাপসবার্গ সাম্রাজ্যে ঐক্য ও পুরাতনতন্ত্র রক্ষা করার জন্যে তিনি কঠোর পরিশ্রম করতেন। তাছাড়া মেটারনিক অষ্ট্রিয়ার সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে যাতে কোন পরিবর্তন না হয় সেজন্য যত্ন নেন। অষ্ট্রিয়া যাতে একটি কৃষি অর্থনীতির অনগ্রসর সামন্ততান্ত্রিক দেশ হিসেবে থাকে, সেজন্য তিনি চেষ্টা চালান। অষ্ট্রিয়াতে তিনি শিল্প-বিপ্লবের অগ্রগতিতে বাধা দেন। কারণ তিনি আশঙ্কা

কায়েমী স্বার্থের সমর্থন

করতেন যে, শিল্প-বিপ্লব হলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হবে এবং স্থিতিশীল সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে।

মেটারনিকতন্ত্রের পতন

মেটারনিকতন্ত্র ১৮১৫-১৮৪৮ খ্রীঃ পর্যন্ত মোটামুটিভাবে চলে। অবশেষে ১৮৪৮ খ্রীঃ বিপ্লবের আঘাতে এর পতন ঘটে। অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনাতে ১৮৪৮ খ্রীঃ যে ছাত্র ও শ্রমিক বিদ্রোহ ঘটে ক্রমে তাহা প্রদেশগুলিতে ছড়ায়। মেটারনিক ইংলন্ডে পলায়ন করেন। মেটারনিকতন্ত্রের পতন ঘটে।

মেটারনিকের নীতির সমালোচনা ও মেটারনিকতন্ত্রের পতনের কারণ (Criticisms of Metternich's Policy and the causes of its failure) : ঐতিহাসিকেরা অষ্ট্রিয়ায় রক্ষণশীল নীতির জন্যে মেটারনিককে দায়ী করেন। ঐতিহাসিক গর্ডন ক্রেইগ বলেন যে, প্রকৃতপক্ষে এই রক্ষণশীল নীতির জন্যে মেটারনিককে দায়ী করা উচিত হবে না। যে রক্ষণশীল নীতির জন্যে মেটারনিক নিন্দিত, তা ছিল আসলে তাঁর প্রভু প্রথম ফ্রান্সিস ও প্রথম ফার্দিনান্দের অনুমোদিত পন্থা। অষ্ট্রিয়ার রাজতন্ত্রের ক্ষমতা অব্যাহত রাখার জন্যে এরা এই নীতি নেন। সুতরাং একে মেটারনিক নীতি না বলে "ফ্রান্সিস যোসেফ" নীতি বলাই সঙ্গত।[১] মেটারনিক তাঁর প্রভুকে কয়েকবার অষ্ট্রিয়ার শাসনব্যবস্থাকে সংস্কার করার প্রস্তাব দেন। পিটার ভিরেক ও আর্থার হাস নামক ঐতিহাসিকদের মতে, মেটারনিকের প্রস্তাব ছিল প্রাদেশিক সামন্তদের প্রতিনিধি সভা, বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর সহায়তায় একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা। সম্রাট ফ্রান্সিস এই প্রস্তাব নাকচ করে দেন। সুতরাং মেটারনিককে হ্যাপসবার্গ সাম্রাজ্যে প্রতিক্রিয়াশীল শাসনের জন্যে দায়ী করা যায় না। জ্যাক ড্রজের মতে, "মেটারনিককে জাতীয়তাবাদের অন্ধ বিরোধী ভাবা ভুল।"[২] অষ্ট্রিয়ার বিভিন্ন জাতি-অধ্যুষিত প্রদেশগুলিকে মেটারনিক স্বায়ত্ব-শাসন দানের প্রস্তাব দিলেও, প্রথম ফ্রান্সিস তাতে কর্ণপাত করেননি।

মেটারনিকতন্ত্র দ্বারা অষ্ট্রিয়ার স্বার্থরক্ষা

কাউন্ট কোলোভার্ট (Count Kolourat) নামে এক ব্যক্তি অষ্ট্রিয়ার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর পদে বসে মেটারনিকের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ান। কাউন্ট কোলোভার্ট ছিলেন অষ্ট্রিয়ার দমন নীতির প্রধান পুরোহিত।[৩] কাউন্ট সেভনিটস্কী ছিলেন পুলিশ প্রধান। তিনি ছিলেন অষ্ট্রিয়ার দমন নীতির রূপকার। গুপ্তচর নিয়োগ, চরিত্রহনন, গোপন বিচারের মাধ্যমে শাস্তিদান, বিনা বিচারে দণ্ডদান প্রভৃতি ফ্যাসিষ্ট ধরনের দমন নীতিতে তাঁর কৃতিত্ব ছিল। তিনিই বিশ্ববিদ্যালয় ও বুদ্ধিজীবীদের ওপর দমন চালান। এ ব্যাপারে মেটারনিকের কোন হাত ছিল না। স্বয়ং সম্রাট এই দমন নীতির পক্ষপাতী ছিলেন। ফ্রান্সিসের পরবর্তী সম্রাট ফার্দ্দিনান্দ তাঁর সরকার প্রধানতঃ তিন ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত করেন, যথা সম্রাটের ভ্রাতা লুডভিস, কোলোভার্ট এবং মেটারনিক। এই তিন প্রধানের মধ্যে ক্ষমতার জন্যে লড়াই চলত। কাজেই মেটারনিকের হাতে সব ক্ষমতা ছিল না।

মেটারনিকের প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি

অপরদিকে পল শ্রোডার প্রভৃতি ঐতিহাসিকরা উপরোক্ত মূল্যায়ণ নাকচ করেন। তাঁরা বলেন যে, মেটারনিক জানতেন তিনি প্রতিক্রিয়াশীল নীতিকেই প্রয়োগ করছেন। হয়ত হ্যাপসবার্গ সাম্রাজ্যের স্বার্থে তিনি এই কাজ করেন। কিন্তু দমন নীতি ও স্থিতাবস্থা নীতি ছিল তাঁরই অবদান। তিনিই ইওরোপের রাজাদের পরামর্শ দেন, "রাজত্ব করুন, সংস্কার করবেন না।" মেটারনিক তাঁর মূল নিশ্চলতা নীতি থেকে কখনও বিচ্ছিন্ন হননি। তাঁর মানসিকতাই ছিল অষ্টাদশ শতকের। পুরাতন পন্থাকেই তিনি সমাজ ও রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতার প্রধান উপাদান ভাবতেন। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা বোঝার মানবিকতা তাঁর ছিল না।

১· Peter Viereck—Metternich Reconsidered.

২· Jack Droz. P. 171.

পরিবর্তন হল ইতিহাসের ধর্ম। মেটারনিক তা অস্বীকার করে ইতিহাসের স্রোতের বিরুদ্ধে চলার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। মেটারনিকের নীতি ছিল যুগের অনুপযোগী। ঐতিহাসিক কার্লটন হেইজের (Carlton Hayes) মতে, "মেটারনিক যদিও শেক্সপীয়ারের নাটক, বিঠোফেনের সঙ্গীত ও গ্যেটের কাব্যগ্রন্থ পড়তেন তবুও তিনি তাঁব সমকালীন যুগের ভাবধারাকে স্বীকার করেননি।" এটাই ছিল মেটারনিকের বিফলতার প্রধান কারণ। দ্বিতীয়তঃ, মেটারনিকতন্ত্রে কোন গঠনমূলক দিক ছিল না। এই ব্যবস্থা পুরোপুরি নেতিবাচক ও সংস্কার-বিমুখ। মেটারনিক বিপ্লবের ভাবধারার সঙ্গে পুরাতনতন্ত্রের সমন্বয় সাধনের কোন চেষ্টা করেননি।[১] তৃতীয়তঃ, মেটারনিক ইওরোপের সকল রাজাদের সহযোগিতা পাননি। ইংলণ্ড গোড়া থেকে তাঁর বিরোধিতা করে। ১৮৩০ খ্রীঃ জুলাই বিপ্লবের পর ফ্রান্সও তাঁর পক্ষ ত্যাগ করে। জার্মানীতে তাঁর নীতির বিরুদ্ধে ছাত্র ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন চলে। জুলাই বিপ্লবের ফলে মেটাবনিকের ন্যায্য অধিকাববাদী নিশ্চলতা নীতি বিরাটভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ফ্রান্স ও বেলজিয়ামে ভিয়েনা তন্ত্র ও মেটারনিকতন্ত্র ভেঙে পড়ে। ইওরোপীয় শক্তি সমবায়ের অবশিষ্ট তিন প্রধানের সাহায্যে মেটারনিক ফ্রান্সে হস্তক্ষেপ করতে পারেননি। ফ্রান্সে অলির্য়েন্স রাজতন্ত্র সংবিধান মেনে স্থাপিত হয। ফ্রান্স অতঃপব মেটারনিকতন্ত্র থেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে ইংলন্ডেব সঙ্গে যোগ দিয়ে উদাবতন্ত্রী শিবির গঠন করে। অষ্ট্রিয়ায় তাঁর কর্তৃত্ব ক্রমে ক্ষয় পেতে থাকে। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী কোলোভার্ট তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করাব চেষ্টা করেন। মেটারনিকতন্ত্র ছিল মেটারনিকের ব্যক্তিগত যোগ্যতার ওপর নির্ভরশীল। ক্রমশঃ তাঁর জনপ্রিয়তা ও দক্ষতা ক্ষয় পেতে থাকে। তিনি যুগের প্রয়োজন উপলব্ধি না করতে পারায় তাঁর প্রভাব হ্রাস পায়। এ্যালিসন ফিলিপসের মতে, "তাঁর প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলেও তিনি বেঁচে থাকেন। তিনি ভুলে যান যে, যতই তাঁর বয়স বাড়ছিল, পৃথিবীর যৌবন ততই নতুনভাবে গড়ে উঠছিল।"

সমকালীন যুগের ভাবধারার প্রতি বিরোধিতা

শেষ পর্যন্ত প্রশ্ন আসে যে, মেটাবনিকতন্ত্র কি পুরোপুরি নিস্ফল ছিল? ইওরোপে তথা অষ্ট্রিয়ায় মেটারনিকের অবদান কি ছিল? প্রসঙ্গতঃ, তাঁর পতনই তাঁর নীতির ব্যর্থতার পরিচায়ক। কারণ তাঁর পতনের পরে তাঁর নীতি দ্রুত পরিত্যক্ত হয়। এর ফলে ইওরোপ উদারতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের পথে এগিয়ে যেতে পারে। ঐতিহাসিক লিপসনের মতে, তিনি যতদিন ক্ষমতায় ছিলেন তিনি তাঁর স্থিতাবস্থা, নিশ্চলতা ও সংস্কার বিরোধী নীতির ফলে ইওরোপের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রগতির স্রোত রুখে দেন। এজন্যে ১৮১৫-১৮৪৮ পর্যন্ত ইওরোপের ইতিহাস ছিল প্রত্যাশা বা আকাঙ্খার যুগ, পরিপূরণের যুগ নয়। (Age of aspitarions rather than achievement)। দ্বিতীয়তঃ, মেটারনিকের নীতির হয়ত কিছুদিনের জন্যে প্রয়োজন ছিল। যতদিন ইওরোপে আবার বিপ্লব ও যুদ্ধের আশঙ্কা এবং নেপোলিয়নের প্রত্যাবর্তনের আশঙ্কা ছিল ততদিন মেটারনিকতন্ত্র স্থিতিশীলতা রক্ষা করে। ইওরোপকে যুদ্ধের হাত থেকে মেটারনিকতন্ত্র রক্ষা করে বলে Seaman মনে করেন। ঐতিহাসিক এ্যালিসন ফিলিপও বলেন যে, "রণক্লান্ত, ভীত ইওরোপীয় প্রজন্মকে তিনি প্রয়োজনীয় শান্তি ও স্থিতি দেন"। কিন্তু এই প্রয়োজন শীঘ্রই ফুরিয়ে যায়। তখন মেটাবনিকের সংস্কার বিরোধী নিশ্চল নীতি ইওরোপের পায়ে শিকলের মতই অগ্রগতিকে বেঁধে ফেলে।

তিনি যদি পুরাতনতন্ত্রের মঙ্গলময় দিকগুলির সঙ্গে নবোদিত ভাবধারার সমন্বয়ের চেষ্টা করতেন তাহলে তাঁর বিধান ইওরোপের হিতসাধন করতে পারত। মেটারনিকের নীতির বিয়োগান্ত দিক এই ছিল যে, পরিবর্তনের প্রয়োজনকে তিনি উপলব্ধি করতে পারেননি।

১· Fisher—History of Europe. P. 929.

মেটারনিকের পক্ষে একমাত্র যুক্তি এই যে, "তিনি ছিলেন অষ্ট্রিয়ার মন্ত্রী; সুতরাং অষ্ট্রিয়ার স্বার্থ রক্ষাই তাঁর লক্ষ্য ছিল" (Metternich was an Austrian minister, it was Austrian interest that guided his policy)।[১] বহু জাতি অধ্যুষিত অষ্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যকে ভাঙন থেকে রক্ষা করতে হলে রক্ষণশীলতা ছাড়া পথ ছিল না।

অষ্ট্রিয়ার স্বার্থে প্রতিক্রিয়াশীল নীতি গ্রহণ

মেটারনিকের সমর্থনে উপরোক্ত যুক্তি গ্রহণীয় নহে। মেটারনিক অষ্ট্রিয়ার স্বার্থে প্রতিক্রিয়াশীলতা অনুসরণ করেন, ইহা মনে করা ভুল। তিনি তাঁর প্রভু প্রথম ফ্রান্সিস এবং প্রথম ফার্দিনান্দের স্বার্থেই প্রতিক্রিয়াশীল নীতি অনুসরণ করেন। হ্যাপসবার্গ সম্রাটের স্বার্থ এবং অষ্ট্রিয়াবাসীর স্বার্থ অভিন্ন ছিল না। সম্রাট প্রথম ফ্রান্সিস ছিলেন অন্ধ প্রতিক্রিয়াপন্থী। ফ্রান্সিসের উত্তরাধিকারী ফার্দিনান্দও ছিলেন অন্ধ রক্ষণশীল। মেটারনিক তাঁর বিদ্যা ও বুদ্ধিকে এই দুই সম্রাটের ইচ্ছা পুরণের কাজে খাটান। মেটারনিক তাঁর প্রভুদের চালাতেন না। তাঁর প্রভুরাই মেটারনিককে চালাতেন বলা যায়। মেটারনিক সংবিধান এবং মধ্যবিত্ত শাসনকে ঘৃণা করতেন। তাঁর রুচি ছিল পুরাতনপন্থী (obscurantist)। তিনি ভুলে যান যে, "তিনি ধীরে ধীরে বার্ধক্য দশাগ্রস্থ হলেও পৃথিবী ও সমাজে নব যৌবনের স্রোত দেখা দেয় (While he grew old, the world was renewing its youth)।[২] হ্যাপসবার্গ সাম্রাজ্যের ঐক্য তিনি রক্ষা করলেও, এই সাম্রাজ্য তথা অষ্ট্রিয়ার প্রকৃত প্রগতির কাজকে তিনি উপেক্ষা করেন। এজন্য তাঁর পতনের পর তুরস্কের মতই অষ্ট্রিয়া ইওরোপের রুগ্ন মানুষে পরিণত হয়। সাম্রাজ্যের জাতিগোষ্ঠীগুলিকে স্বায়ত্ব-শাসন না দেওয়ার ফলে ১৮৪৮ খ্রীঃবিপ্লবে হাঙ্গেরী, বোহেমিয়া ও ইতালী বিচ্ছিন্ন হতে চেষ্টা করে। শেষ পর্যন্ত ইতালী ও জার্মানী অষ্ট্রিয়ার হাতছাড়া হয়। এই দুই দেশের জাতীয়তাবাদীরা অষ্ট্রিয়ার অধীনতা অস্বীকার করে। শিল্প-বিপ্লব, জনসংখ্যার বিস্ফোরণ, নগর জীবনের প্রসার, বুর্জোয়া শ্রেণীর অভ্যুত্থান গোটা ইওরোপের তথা হ্যাপসবার্গ সাম্রাজ্যের অস্থিরতা সৃষ্টি করে। মেটারনিকতন্ত্রের পুরাতন ক্ষয় ধরা বোতলে এই পরিবর্তনের তাজা মদকে ধরে রাখা সম্ভব ছিল না। মেটারনিক এই পরিবর্তন ও বাস্তব অবস্থাকে উপলব্ধি করেননি। এটাই ছিল তাঁর নীতির বিয়োগান্ত দিক।

অষ্ট্রিয়ার সম্রাটের আজ্ঞাবাহী হিসাবে মেটারনিকের নীতি

পাঠ্যসূচী

১। Alfred Cobban—History of France.
২। Bury—History of France.
৩। Gordon Craig—Europe Since 1815.
৪। D. W. Brogan—The French Nation 1814-1940.
৫। Gordon Wright—Modern France.
৬। J. Plamanetz—The Revolutionary Movement in France.
৭। Peter Viereck—Conservatism : Metternich Reconsidered.
৮। A. J. P. Taylor—The Hapsburg Monarchy.
৯। Woodward—Three Studies in Europian Conservation.
১০। Seton Watson—Metternich and Internal Austrain Policy.
১১। A. Sked—Metternich and the Federation Myth.
১২। A. Cecil—Metternich 1773—1859.

১· Ketelbey—History of Modern Times

২· Alison Philips.

দ্বাদশ অধ্যায়
শিল্প-বিপ্লব
(The Industrial Revolution)

শিল্প-বিপ্লব কাকে বলে (The Meaning of the Industrial Revolution)ঃ শিল্প-বিপ্লব কথাটি সর্বপ্রথম ফরাসী সমাজতান্ত্রিক লেখক আগস্ট ব্ল্যাঙ্কি ব্যবহার করেন। পরে ইংরাজ ঐতিহাসিক আর্নল্ড টয়েনবি তাঁর অক্সফোর্ড বক্তৃতামালায় এই নাম ব্যবহার করেন। অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে ইংলণ্ড ও ক্রমে ইওরোপের অন্যান্য দেশে শিল্পদ্রব্যের উৎপাদনে যে বিপুল পরিবর্তন ঘটে তাকেই শিল্প-বিপ্লব বলা হয়। শিল্প-বিপ্লব বলতে শিল্পের উৎপাদন ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন বুঝায়। যে ক্ষেত্রে লোকে হাতে কাজ করে শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন করত, সে ক্ষেত্রে যন্ত্রের দ্বারা উৎপাদন; কুটির শিল্পের স্থলে কল-কারখানার মাধ্যমে ব্যাপক শিল্প উৎপাদন আরম্ভ হলে তাকে সাধারণভাবে শিল্প-বিপ্লব বলা হয়। মোট কথা শিল্প-বিপ্লবের আগে শিল্প উৎপাদন ছিল একান্তই প্রকৃতি ও মানুষের দৈহিক শ্রমের ওপর নির্ভরশীল। অষ্টাদশ শতকের শেষ দিক থেকে খরস্রোতা নদীর স্রোতের অথবা তীব্র বায়ুপ্রবাহের দ্বারা চাকা ঘুরিয়ে শিল্পদ্রব্য তৈরির জন্যে যা যন্ত্র ছিল তা চালু করা হত। যেখানে সে ব্যবস্থা ছিল না সেখানে পুরো দৈহিক শ্রমের দ্বারা শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন হত। কিন্তু এই উৎপাদন প্রথায় শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন ছিল সীমাবদ্ধ, প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল। বায়ুপ্রবাহ ছিল প্রকৃতির খেয়ালের ওপর নির্ভরশীল, এবং জলস্রোতের সুবিধা বছরে সব সময় লভ্য ছিল না। দৈহিক শ্রমও ছিল সীমাবদ্ধ। দুর্ভিক্ষ, মহামারী দেখা দিলে শ্রমিকের সরবরাহে ভাঁটা পড়ত। কাজেই অপরিমিত শিল্প সামগ্রীর উৎপাদন এই ব্যবস্থায় কিছুতে সম্ভব ছিল না। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে ইংলণ্ডে সর্বপ্রথম বস্ত্রশিল্পের জন্যে নতুন করে আবিষ্কার হয়। কিন্তু যন্ত্রগুলি চালাবার জন্যে সমস্যা ছিল। অবিরাম যন্ত্রগুলিকে চালু রাখার কোন উপায় ছিল না। এই সমস্যা দূর হয় জেমস ওয়াট বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিস্কার করায়। যেখানে খুসী যতক্ষণ দরকার ততক্ষণ এই বাষ্পীয় ইঞ্জিন দ্বারা শিল্প উৎপাদনের যন্ত্রগুলি চালনার ফলে শিল্প উৎপাদন শত শত গুণ বৃদ্ধি পায়। এই উৎপাদন ব্যবস্থার বিপ্লব বৃহত্তর শিল্প-বাণিজ্যের বিপ্লব এবং পরিণামে সমাজ বিপ্লব ঘটায়। প্রকৃতির সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত হয়ে শিল্প-উৎপাদনের এই বিরাট ও গভীর মূল পরিবর্তনকেই শিল্প-বিপ্লব বলা হয়।[১] কোন সমাজে উৎপাদনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত কয়েকটি পরিবর্তন দেখা গেলে তবেই শিল্প-বিপ্লব ঘটছে বলা যাবে; যথা ঃ—(১) কুটির শিল্পের পরিবর্তে যন্ত্রচালিত পুঁজিবাদী শিল্পের বিকাশ। অর্থাৎ মূলধনী শ্রেণীর মূলধন দ্বারা কারখানা স্থাপন করে তাতে যন্ত্রের দ্বারা মাল উৎপাদনের ব্যবস্থা। (২) এই উৎপাদিত মাল বাজারে বিক্রয় করে মুনাফা লাভের ব্যবস্থা। (৩) কলকারখানায় শ্রমিকের সাহায্যে মাল উৎপাদনের ব্যবস্থা। (৪) উৎপাদিত মাল বিক্রয়ের জন্যে উপযুক্ত বাজার গঠন। (৫) মাল উৎপাদনের জন্যে কাঁচামাল ও শ্রমিকের সরবরাহের ব্যবস্থা। (৬) মূলধন সরবরাহের জন্যে ব্যাঙ্ক প্রভৃতি অর্থনৈতিক সংস্থার উদ্ভব। (৭) সর্বোপরি, উৎপাদনের জন্যে নতুন যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার। (৮) যন্ত্র চালাবার জন্যে বাষ্পের প্রয়োগ; মাল পরিবহনের জন্যে যন্ত্রের ব্যবহার। পরিবহন

শিল্প বিপ্লবে কি পবিবর্তন ঘটে

১· David Thomson. P. 140-141.

ব্যবস্থার অগ্রগতিও শিল্প-বিপ্লবের একটি শর্ত। এই কয়েকটি ব্যবস্থার একত্র সমন্বয় ঘটলে তবেই শিল্প-বিপ্লব ঘটেছে বলা যায় [১] গর্ডন ক্রেইগের মতে, "যখন কোন দেশের সমাজে চিরাচরিত কৃষি অর্থনীতির স্থলে শিল্প-নির্ভর অর্থনীতি গড়ে ওঠে, তখন সেই দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটে[২] মাথাপিছু আয়ও বাড়ে"।

শিল্প-বিপ্লব মানব সভ্যতার অগ্রগতিকে প্রভাবিত করেছে। কৃষিকেন্দ্রিক-অর্থনীতির স্থলে এই পরিবর্তন শিল্পকেন্দ্রিক অর্থনীতির সৃষ্টি করেছে। শিল্পকে কেন্দ্র করে নতুন শহর ও নগর গড়ে উঠেছে। বহু লোক তাদের গ্রামীণ জীবন ছেড়ে শহরে বাস করছে। শহরগুলি শিল্প-বাণিজ্যকে আশ্রয় করে সমৃদ্ধি লাভ করেছে। শিল্প-বিপ্লবের ফলে মূলধনী শ্রেণী শিল্প উৎপাদনের মালিকানা লাভ করে সম্পদ বাড়াতে পারে। অপরদিকে কারখানা শ্রমিকেরা কম মজুরীর ফলে দারিদ্র্য দশাগ্রস্থ হয়। ফলে সমাজে ধনবন্টনে বৈষম্য ঘটেছে। একদল লোক ধনী হতে আরও ধনী হয়, অপর লোকেরা দারিদ্র্যের পাঁকে ডুবে যায়। কারখানায় তৈরি মালের অবাধ সরবরাহের ফলে লোকের জীবনযাত্রা আরামদায়ক হয়। এভাবে শিল্প-বিপ্লব সমাজ ও সভ্যতার চরিত্রকে আমূল বদলে দেয়। ব্র্যাঙ্কি এজন্য মন্তব্য করেছেন যে "শিল্প-বিপ্লব উনবিংশ শতকের সভ্যতাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে।"

সমাজের ওপর শিল্প বিপ্লবের প্রভাব

শিল্প-বিপ্লব সর্বপ্রথম ইংলণ্ডে আরম্ভ হয়। পরে বেলজিয়াম, ফ্রান্স, জার্মানী প্রভৃতি দেশে শিল্প-বিপ্লব ছড়িয়ে পড়ে। ইতালী ও পূর্ব ইওরোপ এবং রাশিয়ায় শিল্প-বিপ্লব বহু পরে দেখা দেয়।

শিল্প-বিপ্লবের কালপঞ্জী (The chronology of the Industrial Revolution) ঃ শিল্প-বিপ্লবের আগে ইংলণ্ডে কুটির শিল্প বিদ্যমান ছিল। ক্রমে ইংলণ্ডের কুটির শিল্প লোপ পায়। তার স্থলে কারখানাভিত্তিক যন্ত্রশিল্প গড়ে ওঠে। কুটির শিল্প ধ্বংস হয়ে যখন কারখানাকেন্দ্রিক শিল্প গড়ে ওঠে, তাকে Take off বা সূচনাকাল বলা হয়। ঐতিহাসিক রোস্টো (Rostow) শিল্পের এই অবস্থাকে Take off নাম দিয়েছেন। ইংলণ্ডের শিল্পের ক্ষেত্রে এই Take off কবে ঘটে সে সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। ঐতিহাসিক নেফ (Nef) ১৫৪০—১৬৪০ খ্রীঃ অর্থাৎ ইংলণ্ডে টিউডর ও স্টুয়ার্ট বংশের শাসনকালকে ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লবের Take off বা উড্ডয়ন কাল বা সূচনাকাল বলে মনে করেন। অধিকাংশ ঐতিহাসিক নেফের (Nef) অভিমত সমর্থন করেন না। ঐতিহাসিক আর্নল্ড টয়েনবি তাঁর অক্সফোর্ড বক্তৃতামালায় ১৭৪০-১৭৮০ খ্রীঃ-কে ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লবের সূচনাকাল বলে সর্বপ্রথম অভিমত দেন। বেশীরভাগ ঐতিহাসিকরা বলেন যে, ১৭৬০—১৭৮০ খ্রীঃ-কে ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লবের উড্ডয়ন কাল (Take off) বলে ধরা উচিত। ফ্রান্সে তখনও পর্যন্ত মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতা চালু ছিল। সামন্ত মানসিকতার ফলে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদই একমাত্র মর্যাদার বিষয়, শ্রমের দ্বারা জীবিকা অর্জনকে ছোট কাজ মনে করা হত। এজন্য শিল্প গঠনের প্রয়োজনীয় উদ্যোগের অভাব ছিল। তাঁরা বলেন যে, অষ্টাদশ শতকে ছয়ের থেকে আটের দশক পর্যন্ত

ইংলণ্ডে শিল্প বিপ্লবের সূচনাকাল

১· Phyllis Deane—Fantana Economic History of Europe. Vol. I. P. 161.

২· "When a society succeeds in abandoning its traditional static agricultural economy and commits itself to a future of Industrialism, economic growth becomes largely automatic".—Gordon Craig. P. 291.

ইংলণ্ডের জনসংখ্যার মাথাপিছু আয় অকস্মাৎ দ্রুত বৃদ্ধি পায়। শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধিই ছিল তার কারণ। যদিও কোন কোন রক্ষণশীল বুদ্ধিজীবি শিল্প-বিপ্লবকে কোন একটি নির্দ্দিষ্ট কালসীমায় বাঁধতে চান না। তাঁরা শিল্প-বিপ্লবকে এক ধারাবাহিক ও ক্রমিক বিকাশ হিসেবে দেখেন।

ইংলণ্ডে সর্বপ্রথম শিল্প-বিপ্লব ঘটার কারণ (The Causes of the beginning of the Industrial Revolution, first in England) : ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লব সর্বপ্রথম কেন দেখা দেয় ঐতিহাসিকেরা তার কারণ আলোচনা করেছেন। এক শ্রেণীর ঐতিহাসিকেরা মনে করেন যে—(১) ইংলণ্ডের সঙ্গে স্কটল্যাণ্ডের সংযুক্তির পর উভয় দেশের ভেতর অন্তর্দেশীয় শুল্ক লোপ পায়। ফলে ব্যবসায়-বাণিজ্য বাড়ে, এতে শিল্পেরও উন্নতি ঘটে। (২) ইংলণ্ডের পিউরিটান সম্প্রদায় ছিল কঠোর পরিশ্রমী। ক্রমওয়েলের পতনের পর এই সম্প্রদায় রাজনীতি থেকে মুখ ফিরিয়ে শিল্প সংগঠনে আত্মনিয়োগ করে। পিউরিটান সম্প্রদায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে শিল্প সংগঠনের কাজে লেগে যায়। যেহেতু ইংলণ্ডের পেনসন পার্লামেন্ট আইন করে পিউরিটানদের চাকুরী, শিক্ষকতা প্রভৃতি বৃত্তিমূলক জীবিকা থেকে বঞ্চিত করে, সেহেতু তারা ধর্ম বিশ্বাসের মতই দৃঢ়তা নিয়ে শিল্প-বাণিজ্যে তাদের শ্রম ও বুদ্ধি বিভাসা খাটায়। এজন্যেই ইংলণ্ডের শিল্প-বিপ্লবের মূলে ইংলণ্ডের পিউরিটানদের অবদান বেশী দেখা যায়। (৩) ইংলণ্ডের অভিজাত সম্প্রদায় ফরাসী অভিজাতদের ন্যায় ব্যবসায়-বাণিজ্যকে ঘৃণার চক্ষে দেখত না। তুলনামূলকভাবে ইংলন্ডের অভিজাতশ্রেণী ব্যবসায় ও শিল্পে উৎপাদনের কাজে নেতৃত্ব দেয়। এই সকল কারণে ইংলন্ডে সর্বপ্রথম শিল্প-বিপ্লব ঘটে বলে মনে করা হয়।

প্রাচীন পন্থীদের অভিমত

অর্থনৈতিক ঐতিহাসিকেরা উপরোক্ত অভিমত অগ্রাহ্য করেছেন। তাঁদের মতে, ইংলন্ডের সঙ্গে স্কটল্যাণ্ড সপ্তদশ শতকে যুক্ত হয়! তবে শিল্প-বিপ্লব সপ্তদশ শতকে ঘটা উচিত ছিল। কিন্তু তার বহু পরে ১৭৬০—৮০ খ্রীঃ কেন ইংলন্ডে শিল্প-বিপ্লব ঘটে তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ, অভিজাতদের প্রভাবে শিল্প-বিপ্লব ঘটলে ১৭৬০ খ্রীঃ-এর আগে তা ঘটতে পারত। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। আসলে শিল্প-বিপ্লব ঘটার আলাদা কারণ ছিল।

কেহ কেহ মনে করেন যে, ইংলন্ডের প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক সুযোগ-সুবিধাগুলি শিল্প-বিপ্লবের বিকাশে সহায়ক হয়। ইংলন্ডের স্যাঁৎসেঁতে আবহাওয়া বস্ত্রশিল্পের সহায়ক ছিল। এই ভেজা আবহাওয়ার ফলে কাপড়ের সুতাগুলি বোনার সময় সহসা ছিড়ত না। উত্তর ইংলন্ডের নদী ও জলপ্রপাতগুলির জলশক্তিকে যন্ত্র চালানার কাজে লাগাতে সুবিধা হয়। দক্ষিণ ইংলন্ডে প্রবল বেগে বহমান বায়ুশক্তির দ্বারা বায়ু কলগুলি চালাতে সুবিধা হয়। ইংলন্ডের মাটির নীচে কয়লা ও লোহার অফুরন্ত সঞ্চয় থাকায় শিল্প গঠনে দারুণ সাহায্য হয়। কয়লা ও লোহার খনিগুলির অবস্থান কাছাকাছি থাকায় শিল্পের সংখ্যা বাড়ে। ইংলন্ডের খালগুলি দেশের বিভিন্ন নদীকে যুক্ত করেছিল। এই খালের দ্বারা কয়লা, লোহা ও মাল পরিবহণে সাহায্য হয়। এই কারণগুলির জন্যে ইংলন্ডে সর্বপ্রথম শিল্প-বিপ্লব আরম্ভ হয়।

ইংলন্ডের শিল্প বিকাশে প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাব

হব্‌স বম (Hobsbawm) নামক ঐতিহাসিক ওপরের মতের তীব্র সমালোচনা করেছেন। যদি কয়লা ও লোহার প্রাচুর্য শিল্প-বিপ্লবের কারণ হয়, তবে সাইলেসিয়ার কয়লা ও রুর জেলার লোহা থাকা সত্ত্বেও কেন জার্মানীতে শিল্পের বিকাশ হয়নি? যদি জলশক্তির সাহায্য শিল্পবিকাশে কার্যকরী হয় তবে স্কটল্যাণ্ডে জলশক্তি থাকলেও কেন তা কার্যকরী হয়নি? হল্যাণ্ডের বায়ুশক্তি

ছিল কিন্তু সেই দেশে শিল্প-বিপ্লবের স্ফুরণ হয়নি। ইংলন্ডে এই সকল প্রাকৃতিক সুযোগ থাকলেও কেন ১৭৬০—১৭৮০ খ্রীঃ আগে ইংলন্ডে শিল্প বিপ্লব হয়নি? হবস বম মনে করেন যে, ইংলন্ডের শিল্প বিকাশে প্রাকৃতিক সুযোগ-সুবিধার ব্যাখ্যা বিজ্ঞানসম্মত নয়।

অর্থনৈতিক ঐতিহাসিকেরা ইংলন্ডে সর্বপ্রথম শিল্প-বিপ্লবের জন্যে কয়েকটি বিশেষ বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেন। (১) শিল্প স্থাপন করতে হলে মূলধনের প্রয়োজন হয়। যদি মূলধনের যোগান না থাকে তবে শিল্প গঠিত হতে পারে না। ইংলন্ডের বণিকেরা ইওরোপে পশম বিক্রয় করে এবং উপনিবেশ থেকে মাল এনে তা ইওরোপের বাজারে পুনঃ-বিক্রয় করে প্রভূত অর্থলাভ করে। ইংলন্ডের সনদপ্রাপ্ত চাটার্ড কোম্পানীগুলি তাদের বিশাল মুনাফা ব্যাঙ্কে লগ্নী করে।উন্নত প্রথায় কৃষিখামার পরিচালনা দ্বারা একশ্রেণীর জমি মালিক বহু অর্থ লাভ করে। কৃষি বিপ্লবের ফলে খামার মালিকদের উদ্বৃত্ত অর্থ ব্যাঙ্কে লগ্নী হয়। এভাবে রথচাইল্ড, বেয়ারিং প্রভৃতি বিখ্যাত মূলধনী সংস্থা দেখা দেয়, যারা শিল্পে মূলধন বিনিয়োগে প্রস্তুত ছিল। ইংলন্ডের ব্যাঙ্কগুলির মানসিকতা ছিল আধুনিক। এই ব্যাঙ্কগুলি দীর্ঘমেয়াদী শর্তে কম সুদে ঋণদানে আগ্রহী ছিল। মূলধনের এই সহজ সরবরাহ শিল্প গঠনে বিশেষ সহায়ক হয়। বাণিজ্য ও কৃষির উদ্বৃত্ত অর্থ ব্যাঙ্কে আমানত করা হয়। ইংলন্ডের ব্যাঙ্কগুলি এই বাড়তি আমানতের টাকা শিল্প গঠনের জন্যে কম সুদে লগ্নী করে।

অর্থনৈতিক ঐতিহাসিকদের অভিমত : ইংলন্ডে মূলধনের উদ্ভব

(২) অষ্টাদশ শতকে লোকসংখ্যার সঙ্গে সমতা রেখে ইংলন্ডের মাথাপিছু খাদ্য উৎপাদনও বাড়তে থাকে। ১৭৩০-৭০ খ্রীঃ লোকসংখ্যা ৭% বাড়ে। ঐ সঙ্গে খাদ্য ও কৃষিজ দ্রব্যের ১০% উৎপাদন বাড়ে।[১] কৃষিজ পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ইংলন্ডে স্বচ্ছলতা সৃষ্টি করে। কৃষির এই অভূতপূর্ব উন্নতির ফলে শিল্পের জন্যে কাঁচামাল পাওয়া যায়। শ্রমিকের জন্যে সস্তা দরে খাদ্যের যোগান পাওয়া যায়। শিল্প-বিপ্লবের গোড়ার দিকে কল-কারখানায় মজুরীর হার ছিল খুবই নীচু। যদি কৃষি বিপ্লবের ফলে শিল্প শ্রমিককে সস্তা দরে খাদ্যের যোগান না দেওয়া যেত, তবে এই কম মজুরীতে শ্রমিক সরবরাহ সম্ভব হত না। শিল্প-বিপ্লবের ফলে শহরের লোকসংখ্যা দ্রুত বাড়ে। কৃষি বিপ্লবের ফলে শহরের বাড়তি লোকেদের খাদ্য সরবরাহের সমস্যার সমাধান হয়। কৃষি বিপ্লবের ফলে গ্রামাঞ্চলে কৃষকের স্বচ্ছলতা আসে। স্বচ্ছল কৃষকেরা হাতে পয়সা থাকায় শিল্পদ্রব্য কিনতে সক্ষম হয়। ফলে দেশের ভেতর শিল্পদ্রব্যের বাজার সৃষ্টি হয়। কৃষি খামারের মালিকরা শহরে খাদ্যশস্য রপ্তানি ও পশুপালন দ্বারা মাংস ও পশম রপ্তানি করে বিরাট মুনাফা পায়; সেই অর্থ ব্যাঙ্কের মাধ্যমে শিল্পে লগ্নী করা সম্ভব হয়। যদি কৃষির ক্ষেত্রে এই বিপ্লব না ঘটত তবে শিল্প-বিপ্লবের ভিত্তি গঠিত হতে পারত না।

(৩) ইংলন্ডে লোকসংখ্যা বাড়লে গ্রামে উদ্বৃত্ত লোকের কাজের অভাব হয়। এই বাড়তি লোক কাজের সন্ধানে গ্রাম থেকে শহরে আসে। এরা কল-কারখানায় শ্রমিক হিসেবে যোগ দেয়। গ্রামাঞ্চলে এনক্লোজার (Enclosure) বা ভূমির বেষ্টনী প্রথার প্রসার ঘটলে বড় জমির মালিকেরা বেষ্টনী আইনের সাহায্যে ছোট জমিগুলি গ্রাস করে। এর ফলে বহু প্রান্তিক চাষী ভূমিহীন দিন মজুরে পরিণত হয়। এরা দিন-মজুর হিসেবে কাজ করার জন্যে শহরে চলে আসে। কারখানায় এভাবে গ্রাম থেকে আগত এই ভাসমান দিন মজুররা কারখানায় সস্তাদরের অদক্ষ শ্রমিক হিসেবে যোগ দেয়। শিল্প কারখানাগুলির শ্রমিক সরবরাহের সমস্যা এই জনসংখ্যার

১· Fantana Economic History. Vol. I. P. 167.

স্ফীতি ও বেষ্টনী প্রথার ফলে মিটে যায়। জনসংখ্যা বৃদ্ধি আর একটি দিক থেকে শিল্প-বিপ্লবের উদ্ভয়ন ঘটায়। লোকসংখ্যা বাড়ার ফলে কাপড়-চোপড়, ঔষধ প্রভৃতি দ্রব্যের চাহিদা লোকসংখ্যার সঙ্গে বৃদ্ধি পায়। এজন্য শিল্পদ্রব্যের চাহিদা ধাপে ধাপে বাড়ে।

অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ হতে ইংলন্ডের ঔপনিবেশিক বাণিজ্যের অসাধারণ অগ্রগতি দেখা যায়। নেভিগেশন আইন প্রভৃতি আইন দ্বারা ইংলন্ড ঔপনিবেশের বাণিজ্যে একচেটিয়া কর্তৃত্ব স্থাপন করে। ইংলন্ডের উৎপাদিত মালগুলি উপনিবেশের বাজারে বিক্রয়ের সুযোগ ইংলন্ড পুরো ব্যবহার করে। অপরদিকে উপনিবেশ থেকে বিপুল কাঁচামালের সরবরাহ আসায় কলকারখানাগুলি চালু থাকে। ইংলন্ডের শিল্প-বিপ্লবে বস্ত্রের উৎপাদনই ছিল প্রধান। আমেরিকার উপনিবেশগুলি স্বাধীন হলেও এখান থেকে ব্যাপক তুলা সরবরাহ ইংলন্ড পায়। সামুদ্রিক আধিপত্য থাকায় ব্রিটেন সহজে কাঁচামাল আনতে পারে। ব্রিটেন তার উৎপাদিত মাল ভারত প্রভৃতি উপনিবেশে একচেটিয়া বিক্রির সুযোগ পায়।

ঔপনিবেশিক বাণিজ্য

সর্বশেষে, অষ্টাদশ শতকে ইংলন্ডে কয়েকটি নতুন আবিষ্কার ঘটলে শিল্প-বিপ্লব আরম্ভ হয়। ইংলন্ডে বস্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে প্রথমে এই প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ ঘটে। ক্রমে অন্যান্য শিল্পেও যন্ত্রের আবিষ্কার হয়। ১৭৩৩ খ্রীঃ কে· (Kay) উড়ন্ত মাকু আবিষ্কার করেন। ১৭৬৪ খ্রীঃ হারগ্রীভস সুতা বুনবার যন্ত্র স্পিনিং জেনি আবিষ্কার করেন। এতে হাতের পরিবর্তে যন্ত্রে সুতো তৈরির ব্যবস্থা হয়। ১৭৬৯ খ্রীঃ আর্করাইট "Waterframe" ওয়াটার ফ্রেম নামে এক প্রকার জলশক্তি চালিত বয়ন যন্ত্র আবিষ্কার করেন। স্যামুয়েল ক্রম্পটন ১৭৭৪ খ্রীঃ স্পিনিং জেনীর সুতো বোনা ও ওয়াটার ফ্রেমের কাপড় বোনার কৌশলকে একত্র করে "মিউল" নামে একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেন। এতে একসঙ্গে সুতা তৈরি ও কাপড় বোনা হত। বস্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রেই প্রথম দিকে আবিষ্কারের কাজ বেশী হয়। ক্রম্পটনের মিউল আবিষ্কৃত হওয়ার পর এডমাণ্ড কার্টরাইট এক প্রকার শক্তি দ্বারা চালিত তাঁত (Powerloom) আবিষ্কার করেন। এতে দ্রুত কাপড় বোনা যেত। একই সঙ্গে কাপড় ছাপাইয়ের যন্ত্র (Cylinderical Press) আবিষ্কৃত হয়, যাতে একটি যন্ত্রে ১০০ জনের ছাপাইয়ের কাজ একদিনে করা যেত। কোরা কাপড় ধোলাই করার জন্যে চাঁপান যন্ত্র (bleaching machine) আবিষ্কৃত হয়। এলি হুইটনে সাধারণ তুলা থেকে "জিন কাপড়" তৈরির প্রণালী আবিষ্কার করেন। ইংলন্ডে প্রচুর পশম উৎপাদন হত। বয়ন যন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে পশমের কাপড় বোনার যন্ত্রেরও আবিষ্কার হয়। জেমস ওয়াট ১৭৮২ খ্রীঃ বাষ্পীয় বা ষ্টীম ইঞ্জিন আবিষ্কার করলে বাষ্প চালিত ইঞ্জিন দ্বারা যন্ত্র চালাবার ব্যবস্থা হয়। বাষ্পের ব্যবহারের ফলে ইচ্ছামত ইঞ্জিন দ্বারা যন্ত্র চালান সম্ভব হয়। বাষ্পীয় ইঞ্জিনের ব্যবহারের ফলে বস্ত্রের উৎপাদন দারুণভাবে বাড়ে। ১৭৬৪ খ্রীঃ ইংলন্ডে ৪ মিলিয়ন পাউন্ড তুলা আমদানি হত; ১৮৩৩ খ্রীঃ তাহা দাঁড়ায় ২ হাজার মিলিয়ন পাউন্ডে। ডেভি সেফটি ল্যাম্প বা নিরাপদ বাতি দ্বারা খনিতে নিরাপদে আলো জ্বালাবার ব্যবস্থা করলে কয়লা উৎপাদন বাড়ে। কয়লা ছাড়া ইঞ্জিন চালান ও ইঞ্জিনের বাষ্প উৎপাদন করা সম্ভব ছিল না। এই যুগে তেলের দ্বারা চালিত ইঞ্জিন ছিল না। সুতরং প্রচুর কয়লা ছাড়া কারখানার রাক্ষুসে বয়লারগুলি অথবা অন্যান্য ইঞ্জিনগুলি চালু রাখা যেত না। এডমান্ড ডার্বি খনিজ কয়লাকে পুড়িয়ে কোক কয়লা তৈরির প্রণালী আবিষ্কার করায়, যন্ত্রচালিত কাঠ কয়লার ব্যবহার লোপ পায়। কাঠ কয়লার সরবরাহ ছিল সীমাবদ্ধ। খনিজ কয়লার সরবরাহ ছিল প্রচুর। তাকে কোক কয়লায় পরিণত করলে ইঞ্জিনে বাষ্প উৎপাদনের জন্যে বেশী তাপ দিতে পারত। কয়লার সঙ্গে লোহার উৎপাদন না বাড়লে ভারী শিল্প গঠিত হতে পারত না। লোহা ও ইস্পাতের উৎপাদনের ওপরেই আসল

যন্ত্রের আবিষ্কার

শিল্প-বিপ্লব নির্ভরশীল ছিল। ইংলন্ডের লোহার মান ভাল ছিল না। এজন্য ভাল ইস্পাতের তৈরিতে প্রথমে বাধা ছিল। শেফিল্ডের হেনরী বেসামার আকরিক লোহা শোধন করে তা থেকে মাটি ও কার্বন বিচ্ছিন্ন করে বিশুদ্ধ লোহা ও ইস্পাতের পিন্ড তৈরি করার এক শোধন প্রথা বা বেসামার প্রথা আবিষ্কার করায় লোহা উৎপাদনে বিপ্লব ঘটে। লোহা গালাবার জন্যে চুল্লী বা বয়লার ১৭৬০ খ্রীঃ জন স্মীটন আবিষ্কার করেন। ইংলন্ডের শেফিল্ড, বার্মিংহাম প্রভৃতি অঞ্চলে আকরিক লোহা থেকে ভাল মানের লোহা ও ইস্পাত প্রচুর উৎপাদন হয়। ১৭৮৮ খ্রীঃ ইংলন্ডে লোহার উৎপাদন ছিল ৬৮ হাজার টন, ১৮৩৩-এ তা দাঁড়ায় অর্দ্ধ মিলিয়ন টনে। লোহা ও কয়লার উৎপাদন বাড়লে শিল্প-বিপ্লবের বিশেষ অগ্রগতি হয়। অত্যন্ত সস্তা দরে লোহার উৎপাদন সম্ভব হয়। এই লোহার দ্বারা যন্ত্রপাতি তৈরি করা সম্ভব হয়।

রাস্তাঘাট ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি না হলে মাল চলাচলে বাধা দেখা দেয়। টেলফোর্ড ও ম্যাকাডাম ইট, পাথর ও গলান পিচের সাহায্যে সকল ঋতুতে পরিবহন যোগ্য রাস্তা নির্মাণের প্রণালী আবিষ্কার করেন। তাছাড়া ইংলন্ডের বিভিন্ন ক্যানাল বা খালগুলিতে নৌকা দ্বারা পরিবহনের ব্যবস্থা করা হয়। ফিলিস ডীন এজন্য এই যুগকে "ক্যানাল পরিবহনের যুগ" বলেছেন। অবশেষে জর্জ স্টিফেনসন লোহার পাতের ওপর চলার উপযোগী রেল ইঞ্জিন আবিষ্কার করলে পরিবহনের ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটে। স্টিফেনসনের এই ইঞ্জিনের নাম ছিল রকেট। ম্যাঞ্চেষ্টার থেকে লিভারপুল পর্যন্ত সর্বপ্রথম রেল চালু হয়। এরপর "সাভানা" নামে প্রথম বাষ্পীয় জাহাজ তৈরি হয়। ১৮১৯ খ্রীঃ এই জাহাজ প্রথম আটলান্টিক মহাসমুদ্র পাড়ি দেয়।

ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লবের অগ্রগতি (The Progress of the Industrial Revolution in England) ঃ আগেই বলা হয়েছে যে, ১৭৬০ খ্রীঃ নাগাদ ইংলন্ডে শিল্প-বিপ্লবের Take off বা গতিশীলতা আরম্ভ হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, মূলধন প্রভৃতির সমন্বয়বশতঃ ইংলন্ডে শিল্প-বিপ্লবের ক্ষেত্র (infra structure) তৈরি হয়েছিল। বয়ন শিল্পে ইংলন্ডের লোক দক্ষ ছিল। সুতরাং বস্ত্র শিল্পের ক্ষেত্রেই প্রথমে নতুন যন্ত্রের উদ্ভাবন আরম্ভ হয়।

বয়ন যন্ত্রের আবিষ্কার

অষ্টাদশ শতকে ইংলন্ডে সূতা তৈরি করার লোকের অভাব দেখা দেয়। আগে নারীরাই অবসর সময়ে সূতো কাটত। এই সূতোয় বস্ত্র বোনা হত। কিন্তু পরিবারে লোকসংখ্যা বাড়ায় নারীদের গৃহকর্মের চাপ বাড়ে। ফলে সূতা তৈরির জন্যে অবসর সময় কমে যায়। সূতোর অভাবে বস্ত্র শিল্পে মন্দা দেখা দেয়। ১৭৬৪ খ্রীঃ জেমস হারগ্রীভস স্পিনিং জেনি নামে একটি যন্ত্র আবিষ্কার করলে এই অসুবিধা দূর হয়। এই যন্ত্রে অল্প সময়ে বেশী পরিমাণ সূতো কাটার ব্যবস্থা ছিল। ১৭৬৯ খ্রীঃ রিচার্ড আর্করাইট ওয়াটারফ্রেম নামক যন্ত্র আবিষ্কার করেন। স্পিনিং জেনিকে জলশক্তির দ্বারা চালনাকারী আর্করাইট দৈহিক শ্রমের পরিবর্তে যন্ত্রটি জলশক্তির দ্বারা চালনার ব্যবস্থা করেন। এর পর এডমান্ড কার্টরাইট মিউল (Mule) নামে এক যন্ত্র আবিষ্কার করেন। এতে এক সঙ্গে সূতো কাটা ও কাপড় বোনা যেত। এটি জলশক্তির দ্বারা চালিত হত। এভাবে দৈহিক শ্রমের পরিবর্তে যন্ত্রের ব্যবহার আরম্ভ হয়।

বাষ্পের আবিষ্কার ও বাষ্পীয় ইঞ্জিন

জলশক্তি বা বায়ুশক্তি চালিত যন্ত্রের নানা অসুবিধা ছিল। কারণ সকল স্থানে জল বা বায়ুশক্তি সহজলভ্য ছিল না। জল বা বায়ু প্রকৃতির খেয়ালের ওপর নির্ভরশীল ছিল। ফলে সবসময় জল বা বায়ুর সাহায্য পাওয়া যেত না। এই সময় জেমস ওয়াট নামক এক ব্যক্তি একটি পিষ্টন চালিত বাষ্পীয় ইঞ্জিন নির্মাণ করেন। এই ইঞ্জিন এমন শক্তিশালী ছিল যে, এর সাহায্যে ভারী ভারী যন্ত্র চালান

যেত। ওয়াটের বাষ্পীয় ইঞ্জিন প্রকৃতপক্ষে শিল্পের ক্ষেত্রে বিপ্লব সৃষ্টি করে। ডেভিড টমসনের মতে, "শিল্প-বিপ্লবের ভিত্তিই ছিল বাষ্পের দ্বারা যন্ত্রের চালনা।"[১] বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কারের ফলে তা সম্ভব হয়। রোটারী প্রথায় এই মেশিন গঠিত হলে খুবই কার্যকরী হয়। খনির ভেতর থেকে কয়লা তোলা, ভারী যন্ত্র চালনা প্রভৃতি কাজে এই ইঞ্জিন ব্যবহৃত হয়। দেশের যে কোন স্থানে এই ইঞ্জিনের সাহায্যে কারখানা স্থাপন করা সম্ভব হয়।

বৈজ্ঞানিক প্রথায় লোহার উৎপাদন

এদিকে শিল্পের জন্যে লোহা ও কয়লার প্রচুর দরকার পড়ে। ইংলন্ডে খনিজ লোহা প্রচুর ছিল। কিন্তু তার মান ছিল নীচু। ফলে সুইডেন থেকে ইংলন্ডে বহু বছর ভাল লোহা আমদানি করত। ইতিমধ্যে লোহা গালাবার এক উন্নত প্রণালী যথা বেসামার প্রথা (Bessamer process) আবিষ্কৃত হলে ইংলন্ডের খনিজ লোহা গালাই করে উৎকৃষ্ট লোহা তৈরি হয়। এই উন্নত লোহার দ্বারা চুল্লী, রেলের পাত, ইঞ্জিন, যন্ত্র প্রভৃতি তৈরি করা সম্ভব হয়। শেফিল্ড, বার্মিংহাম, ল্যাঙ্কাশায়ার প্রভৃতি অঞ্চলে বড় বড় লোহার কারখানা গড়ে ওঠে।

খনিজ কয়লার উৎপাদন ও ব্যবহার

আগে কাঠ কয়লা দ্বারা লোহা গালান হত। কাঠ-কয়লার সরবরাহ বেশী না থাকায় লোহার পিণ্ড বা খণ্ড বেশী উৎপাদন করা যেত না। লোহার অভাবে সব কাজে বাধা পড়ত। ইতিমধ্যে খনিজ কয়লার সাহায্যে লোহা গালাবার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হলে এবং খনিজ কয়লার দ্বারা ইঞ্জিনে বাষ্প তৈরির ব্যবস্থা হলে শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটে। কারখানার ইঞ্জিনের জ্বালানি হিসেবে কয়লা ব্যবহৃত হয়। যন্ত্রের দ্বারা মাটির নীচ থেকে কয়লা উপরে টেনে, রেলের দ্বারা পরিবহনের ব্যবস্থা করা হয়। ডেভিড "নিরাপদ বাতি" (Safety Lamp) আবিষ্কৃত হলে খনি মজুরেরা নিরাপদে এই বাতির সাহায্যে খনির ভেতর কাজ করার সুযোগ পায়।

পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি

শিল্পের পর পরিবহন ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও বিপ্লব সাধিত হয়। টেলফোর্ড ও ম্যাকাড্যাম পিচের দ্বারা রাস্তা তৈরির প্রথা আবিষ্কার করলে পিচের তৈরি সড়ক নির্মাণ আরম্ভ হয়। এই রাস্তাগুলিতে শীত, বর্ষা সকল সময় গাড়ী চলতে থাকে। ১৮১৩ খ্রীঃ উইলিয়াম হেডলী পাফিং বিলী (Puffing Billy) নামে একটি গাড়ীর ইঞ্জিন নির্মাণ করেন। ১৮১৪ খ্রীঃ জর্জ স্টিফেনসন একটি কার্যকরী ইঞ্জিন নির্মাণ করেন। এই ইঞ্জিন লোহার পাতের ওপর ৮টি কামরা নিয়ে ঘন্টায় ৩০ মাইল বেগে ছুটতে পারত। এর ফলে রেলপথের নির্মাণ আরম্ভ হয়। রেলপথের আবিষ্কার শিল্পের ক্ষেত্রে যুগান্তর ঘটায়। প্রথমতঃ, দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কাঁচামাল রেলের সাহায্যে বহন করা সম্ভব হয়। কারখানায় তৈরি মাল বিক্রয়ের জন্যে রেলযোগে পাঠান সম্ভব হয়। ১৮৭০ খ্রীঃ ফুলটন বাষ্প চালিত নৌকা আবিষ্কার করেন। ইহা ঘন্টায় ৪মাইল বেগে চলত। ক্রমে বাষ্পীয় পোত নির্মিত হয়। বাষ্প চালিত জাহাজ আবিষ্কারের ফলে এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে পণ্য চলাচল দ্রুত ও নিরাপদ হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়।

ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার প্রসার

শিল্প-বিপ্লবের অন্যতম মৌলিক উপাদান ছিল মূলধনের বা পুঁজির সরবরাহ। হোপ, লাফিট, রথচাইল্ড, পিয়ের ব্রাদার্স, ব্যাঙ্ক অব ইংলন্ড প্রভৃতি ব্যাঙ্ক কোম্পানীগুলি শিল্পে মূলধনের যোগান দেয়। ম্যাথু বোল্টন নামক ধনকুবের ওয়াটের বাষ্পীয় ইঞ্জিন তৈরির জন্যে সোহোর (Soho) কারখানা স্থাপন করেন। এই সকল

১. "The basis of Industrial Revolution was the application of steam power to machinery."—David Thomson. P. 95

মূলধনী শ্রেণীর আনুকূল্যে ব্যাপক আকারে কারখানা স্থাপন করা সম্ভব হয়। রেলপথগুলিও এদের আনুকূল্যে নির্মিত হয়। এভাবে শিল্প-বিপ্লব ঘটে। ইংলন্ডে রেলপথ নির্মাণ ব্যবস্থার প্রসার ছিল ইংলন্ডের শিল্প-বিপ্লবের উড্ডয়নের প্রতীক। ১৮৩৮ খ্রীঃ ইংলন্ডে রেলপথের দৈর্ঘ্য ছিল মাত্র ৪৯০ মাইল। ১৮৫০ খ্রীঃ ইংলন্ডের রেলপথের দৈর্ঘ্য ছিল ৬,৬২১ মাইল। এই রেলপথ নির্মাণ করতে বিরাট পরিমাণ লোহা এবং রেল চালু রাখতে বিরাট পরিমাণ কয়লার দরকার হয়। অন্যান্য সহকারী জিনিষও ছিল। সুতরাং রেলকে কেন্দ্র করে লোহা ও কয়লা শিল্পের অগ্রগতি ঘটে। ইংলন্ডে রেলপথ নির্মাণের প্রধান উদ্যোগী প্রযোজক ছিলেন জর্জ হাডসন। রেলের প্রসারের সঙ্গে কয়লার উৎপাদন ১৮১৫ খ্রীঃ ৩০ মিলিয়ন টন থেকে ১৮৪৮ খ্রীঃ দাঁড়ায় ৫০ মিলিয়ন টন। ১৮১৫ খ্রীঃ ব্রিটেনে লোহার উৎপাদন ছিল মাত্র ১ মিলিয়ন টন। ১৮৫০ খ্রীঃ বিশ্বের যত লোহার উৎপাদন হয় তার অর্দ্ধেক ব্রিটেন একাই উৎপাদন করতে থাকে। ব্রিটেন বিশ্বের বাজারে তার তৈরি যন্ত্রপাতি প্রায় একচেটিয়া সরবরাহ করতে থাকে। রেলপথের প্রসার ও কলকারখানার বিস্তারের ফলে হাজার হাজার লোকের কর্মসংস্থান হয়।

ব্রিটেনের শিল্প প্রধানতঃ বস্ত্র, লোহা ও কয়লাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। এর মধ্যে বস্ত্রই ছিল প্রধান। হবস বম মন্তব্য করেছেন, "ইংলন্ডে শিল্প-বিপ্লব বলতে একমাত্র বুঝায় বস্ত্র এবং বস্ত্র এবং বস্ত্র"। ১৮৫০ খ্রীঃ নাগাদ ব্রিটেনের প্রায় অর্ধ মিলিয়ন লোক শুধু বস্ত্রশিল্পে নিযুক্ত ছিল। বস্ত্রশিল্পের প্রয়োজনে তুলা আমদানি ও তৈরি কাপড় রপ্তানির জন্যে জাহাজ পরিবহনের উন্নতি হয়। ১৮৫০ খ্রীঃ সমুদ্রে যত মালবাহী জাহাজ চলত তার ৬০% ছিল ইংরাজ জাহাজ। এই পরিসংখ্যানগুলি শিল্প-বিপ্লবের ফলে ব্রিটেনের অগ্রগতির সূচক। এর ফলে ১৮৫০ খ্রীঃ নাগাদ ব্রিটেন "বিশ্বের প্রধান কারখানায় পরিণত হয়" (Britain became the workshop in the world)।

ফ্রান্সে শিল্প-বিপ্লব ঃ ইংলণ্ড অপেক্ষা ফ্রান্সের পিছিয়ে থাকার কারণ (Industrial Revolution in France : Why France started late than England in the race for industrialisation?) সপ্তদশ শতকে ফরাসী মন্ত্রী কলবেয়ার (Colbert) ফ্রান্সে কৃষি-বিপ্লব ও শিল্প প্রসারের চেষ্টা করেন। কিন্তু কলবেয়ারের এই চেষ্টা সফল হয় নি। কারণ ফ্রান্সের সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ও স্বৈর শাসনের চাপে কৃষি ও শিল্পের বিকাশ সম্ভব হয়নি। অষ্টাদশ শতকে ফ্রান্সের বুরবোঁ রাজারা ফ্রান্সে শিল্প গঠনের কিছু চেষ্টা করেন। ষোড়শ লুইয়ের মন্ত্রী ক্যালোন ফ্রান্সে শিল্প গঠনের জন্যে বিশেষ যত্ন নেন। তিনি শিল্পপতিদের সহায়তা নেন। ক্যালোনের প্রচেষ্টায় ফ্রান্সের বিখ্যাত লোহা ঢালাইয়ের কারখানা (Creusot foundry) ক্রুশোর ফাউন্ড্রি স্থাপিত হয়। ফরাসী শিল্পপতিরা ওয়াটের বাষ্পীয় ইঞ্জিনের মডেল ইঞ্জিন নির্মাণ করান। ইংলন্ড থেকে মিলনে, হোল্কার, উইলকিনসন প্রভৃতি বিখ্যাত যন্ত্রবিদ্‌দের আনিয়ে ফ্রান্সে যন্ত্রশিল্প গঠনের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু এই প্রচেষ্টার ফলে ফ্রান্সে ব্যাপক অর্থে শিল্প বিস্তার হয়নি। নেপোলিয়নের আমলে কন্টিনেন্টাল সিস্টেম বা মহাদেশীয় অবরোধ আরম্ভ হলে কিছুদিনের জন্যে ইওরোপের বাজার ফ্রান্সের একচেটিয়া অধিকারে আসে। কিন্তু এই সুযোগ পেলেও ফ্রান্স তার শিল্প বিস্তার করতে পারেনি। ১৮৪৮ খ্রীঃ আগে ফ্রান্সে প্রকৃতপক্ষে শিল্প-বিপ্লব হয়নি। ১৮৫০ খ্রীঃ নাগাদ তৃতীয় নেপোলিয়নের শাসনকালে ফরাসী শিল্পে Take off বা উড্ডয়ন আরম্ভ হয়।[১]

শিল্পে ফ্রান্সের অনগ্রসরতা

ফ্রান্সে দেরীতে শিল্প-বিপ্লব ঘটার ব্যাখ্যা হিসেবে বলা যায় যে, (১) ইংলন্ডের ন্যায় শিল্প

১ Claude Fohlen—Industrial Revolution in France.

গঠনের পরিবেশ ফ্রান্সে ছিল না।[১] খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, মূলধন সংস্থান, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার প্রভৃতি বিষয় যার ওপর নির্ভর করে শিল্প-বিপ্লব ঘটে, সেই উপাদানগুলি অষ্টাদশ শতকে ফ্রান্সে ছিল না। ফ্রান্সের অভিজাতরা ছিল রক্ষণশীল, কায়িক পরিশ্রম-বিমুখ। তারা শিল্প-বাণিজ্যের কাজকে ঘৃণা করত। সামন্ত প্রথার দরুন লোকে পৈত্রিক জমিদারীর অধিকার অথবা ভূমি মালিকানাকেই সম্মানজনক মনে করত। (২) ফ্রান্সের বুর্জোয়া ও ধনী ব্যবসায়ীদের সামাজিক মর্যাদা ছিল না। বুর্জোয়ারা কৃষক-শ্রমিক প্রভৃতি তৃতীয় শ্রেণীর বা Third Estate-এর সমতুল্য ছিল। এজন্যে ফ্রান্সের সামাজিক পরিবেশ শিল্প গঠনের অনুকূল ছিল না। (৩) ফ্রান্সের অন্তর্শুল্ক ব্যবস্থা এবং শিল্পের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ শিল্পের বিস্তারের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। মোট কথা, ফ্রান্সের মধ্যযুগীয় ব্যবস্থা শিল্প বিস্তারের পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। (৪) ফ্রান্সে গিল্ড বা নিগমগুলি মধ্যযুগ হতে শিল্প, বাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করত। গিল্ডগুলি শিল্প উৎপাদনকে এরূপ বিশদভাবে নিয়ন্ত্রণ করত যে, স্বাধীনভাবে শিল্পের গড়ে ওঠার পথ খোলা ছিল না। সর্বোপরি, ফ্রান্সে মার্কান্টাইলবাদী অর্থনীতির কুফলের জন্যে শিল্পের বিকাশ ব্যাহত হয়। ফ্রান্স মার্কাইন্টাইলবাদ অনুযায়ী রপ্তানিতে যত আগ্রহী ছিল, আমদানিতে ততই অনাগ্রহী ছিল। ফ্রান্সে বৈদেশিক মালের আমদানির ওপর কড়াকড়ি করায় ফ্রান্সের বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তাছাড়া ফ্রান্সের রাজতন্ত্রী সরকার শিল্প-বাণিজ্যের ওপর পিতৃতান্ত্রিক প্রভাব কাটাত। শিল্পোদ্যোগী শ্রেণীকে স্বাধীনভাবে শিল্পের বিকাশের সুযোগ দিত না।

ফ্রান্সের পুরাতনপন্থী সমাজ ও অর্থনীতির প্রভাব

(৫) ফরাসী বিপ্লবের সময় যুদ্ধ-বিগ্রহের দরুন শিল্প উপেক্ষিত থাকে। ফরাসী বিপ্লবের পর ফ্রান্সের উপনিবেশগুলি হাতছাড়া হওয়ার ফলে কাঁচামালের সরবরাহ এবং উৎপাদিত মালের বাজার না থাকায় ফ্রান্সে শিল্প বিস্তারে বাধা পড়ে।[২] (৬) ফরাসী বিপ্লবের যুদ্ধে ফ্রান্সের জাহাজগুলি ব্রিটিশ নৌবহর দ্বারা ধ্বংস হলে মাল পরিবহনে বাধা দেখা দেয়। এর ফলে ফ্রান্সের বৈদেশিক বাণিজ্যে মন্দা দেখা দেয়। (৭) কন্টিনেন্টাল সিস্টেম বা মহাদেশীয় প্রথা চালু থাকার সময় জার্মানী ও ইতালীর বাজার ফ্রান্সের হাতে ছিল। নেপোলিয়নের পতনের পর এই বাজার ফ্রান্সের হাতছাড়া হলে শিল্পে মন্দা দেখা দেয়। শিল্প-কারখানা চালু রাখার জন্যে প্রচুর কয়লার উৎপাদন দরকার হয়। ফ্রান্সে কয়লা সরবরাহ সীমাবদ্ধ থাকায় শিল্প উৎপাদনে বিলম্ব হয়। ফ্রান্সের অধিকাংশ লোক ছিল গ্রামীণ। সামান্য কয়েকটি আধুনিক শিল্প শহর ফ্রান্সে ছিল। শ্রমিকরা ২৩% কৃষি খামারে কাজ করত। ফরাসী কৃষকরা ছিল রক্ষণশীল। নতুন প্রথা তারা সহজে নিতে চায়নি। ফ্রান্সের বেশীর ভাগ লোক শেষ পর্যন্ত গ্রামেই থেকে যায়। ফ্রান্স ছিল এক বিশালদেশ। আয়তনে ইংলন্ডের দ্বিগুণ। রেলপথের বিস্তার না হওয়ায় দেশের ভেতর পরিবহন ও যোগাযোগের কোন ভাল ব্যবস্থা ছিল না। ফ্রান্সের উত্তর-পূর্বে আলসানা থেকে ১৮৫০-এর আগে কয়লা তোলার কোন ব্যবস্থা হয়নি। (৮) তাছাড়া ইংলন্ডের ন্যায় ফ্রান্সে যন্ত্রপাতির আবিষ্কার হয়নি। (৯) সর্বোপরি, ফ্রান্সে মূলধনের সরবরাহে ঘাটতি ছিল। সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন ফ্রান্সে শিল্প ব্যাঙ্ক স্থাপন করে পেরিয়ার কোম্পানী প্রভৃতির সাহায্যে মূলধন সরবরাহের ব্যবস্থা করলে তবেই ফ্রান্সে শিল্প-বিপ্লব হয়। ফরাসী বুর্জোয়া বা শিল্পপতিশ্রেণী লুই ফিলিপ ও তৃতীয় নেপোলিয়নের আমলে নানা সুযোগ-সুবিধা পায়। ব্যাঙ্ক থেকে এদের দীর্ঘ মেয়াদের কম সুদে শিল্প ঋণ দেওয়া হয়। সংরক্ষণ নীতির দ্বারা বিদেশ হতে আমদানি মালের

ফরাসী বিপ্লবের ফল শিল্প উৎপাদনে মন্দা. মূলধনেব অভাব

১· Ibid.

২· Fantana—Economic History. P. 20.

ওপর শুল্ক চাপিয়ে স্বদেশী শিল্পকে রক্ষার চেষ্টা করা হয়। ১৮০০ খ্রীঃ পর ফ্রান্সে রেলপথের প্রসার ঘটলে ও রাজনৈতিক স্থিতি আসলে তবেই শিল্পে Take off বা গতিশীলতা দেখা দেয়। ১৮৫০ খ্রীঃ তৃতীয় নেপোলিয়নের শাসনকালে ফ্রান্সে শিল্প-বিপ্লবের 'স্বর্ণযুগ' আরম্ভ হয়[১]

ফ্রান্সে শিল্প-বিপ্লবের প্রসার (Growth of Industries in France) ঃ ১৮১৫ খ্রীঃ ফ্রান্সে যান্ত্রিক শিল্পের ভিত্তি ছিল খুবই দুর্বল। একটি সমীক্ষায় জানা যায় যে, এই খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের মাত্র ১৫টি শিল্প কারখানায় বাষ্পীয় পাম্প ইঞ্জিন ব্যবহার করা হত। যন্ত্র চালনার জন্যে তখনও বাষ্পীয় ইঞ্জিনের ব্যবহার ছিল খুবই সীমাবদ্ধ। ফ্রান্সের এই অনগ্রসরতার কারণ আগে আলোচনা করা হয়েছে।

ফরাসী বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সে অন্তঃশুল্ক, গিল্ড প্রথা ও শিল্পের ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ লোপ পায়। ফ্রান্সের মধ্যযুগীয় সমাজ বিপ্লবের আঘাতে ভেঙে যায়। নেপোলিয়ন সমগ্র ফ্রান্সে একই আইন ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালু করে ফ্রান্সের আধুনিককরণ করেন। নেপোলিয়নের পতনের পরেও এই প্রগতিশীল ব্যবস্থাগুলি অক্ষুণ্ণ থাকে। এভাবে ফ্রান্সে শিল্প-বিপ্লবের উপযোগী সামাজিক পটভূমি তৈরি হয়। ১৮১৫—১৮৪৮ খ্রীঃ পর্যন্ত ফ্রান্সে শিল্পের প্রসার ছিল মন্থর। ১৮২৫ খ্রীঃ পর ব্রিটেন থেকে নানা ধরনের যন্ত্র ফ্রান্সে আমদানি করা হয়। ১৮৩০ খ্রীঃ থেকে ফ্রান্সের বিজ্ঞানী ও কারিগর শ্রেণী যন্ত্রপাতি তৈরির দিকে দৃষ্টি দেয়। ফ্রান্সে এভাবে কারিগরী বা প্রযুক্তি বিদ্যার প্রসার ঘটে। ১৮২১—১৮৪৭ খ্রীঃ মধ্যেই ঢালাই লোহার উৎপাদন তিন গুণ বাড়ে। ৩০ হাজার কিঃ মিঃ পাকা রাস্তা তৈরি হয়। ১৮৪৩ খ্রীঃ প্যারিস থেকে সেন্ট জার্মেইন পর্যন্ত প্রথম রেলপথ স্থাপিত হয়। ১৮৪৮ খ্রীঃ ফ্রান্সে ২ হাজার মাইল রেলপথ তৈরি হয়। ১৮৩৭ খ্রীঃ বস্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে যন্ত্রের দ্বারা উৎপাদন আরম্ভ হয়।

১৮৫১ খ্রীঃ পর দ্বিতীয় সাম্রাজ্য স্থাপিত হলে ফ্রান্সে শিল্পের উড্ডয়ন আরম্ভ হয়। যে ক্ষেত্রে ১৮১৫ খ্রীঃ বাষ্পীয় ইঞ্জিনের ব্যবহার সীমাবদ্ধ ছিল, ১৮৭১ খ্রীঃ ২৬,১৪৭টি বাষ্পীয় ইঞ্জিন ফরাসী শিল্পে ব্যবহার করা হয়। ১৮৫০ খ্রীঃ ফ্রান্সে মোট ২ হাজার মাইল রেলপথ ছিল; ১৮৭০ খ্রীঃ তা দাঁড়ায় ১০ হাজার মাইলে। ফ্রান্সে লা ক্রুশোর লোহার কারখানা ছাড়া আরও বহু লোহার কারখানা স্থাপিত হয়। ফ্রান্সে রেলপথ তৈারর জন্যে প্রচুর লোহার দরকার হয়। এই কারখানাগুলি থেকে তা সরবরাহ করা সম্ভব হয়। তৃতীয় নেপোলিয়ন বিভিন্ন ব্যবস্থার দ্বারা শিল্প গঠনে উৎসাহ দেন। প্রথমতঃ, তিনি মূলধন সরবরাহের জন্যে পেরিয়ার ব্রাদার্স, লাফিত, হোপ প্রভৃতি মূলধনী কোম্পানীগুলিকে সরকারি সহায়তায় শিল্পে বিনিয়োগে প্রণোদিত করেন। এই কোম্পানীগুলি কয়লা, লোহা প্রভৃতি এক একটি মূল শিল্পে অর্থলগ্নী করে। তিনি ব্যাঙ্ক অব ফ্রান্সকে ঋণ দানের জন্যে নির্দেশ দেন। ক্রেডিট মবিনিয়ার, ক্রেডিট ফঁসিয়ার প্রভৃতি শিল্প ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। এখান থেকে দীর্ঘমেয়াদে, কমসুদে শিল্পে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। দ্বিতীয়তঃ, তৃতীয় নেপোলিয়ন রেলপথ নির্মাণের জন্যে সর্বাধিক গুরুত্ব দেন। এ্যালোনের মতে, রেলকে আশ্রয় করেই ফ্রান্সে শিল্পের উড্ডয়ন হয়। রেল নির্মাণের জন্যে কয়লা ও লোহার প্রয়োজন হলে এই দুই শিল্পের প্রসার ঘটে। ১৮৫০ খ্রীঃ থেকে আলসাসের কয়লা খনি থেকে কয়লা তোলা শুরু হলে কয়লার উৎপাদন ৫০,০০,০০০ মেট্রিক টনে দাঁড়ায়। লোরেনের লোহার খনি থেকে বিপুল পরিমাণ আকরিক লোহার উৎপাদন হতে থাকে। বেসামার পদ্ধতির দ্বারা আকরিক লোহাকে শোধন করে উন্নত মানের লোহা ও ইস্পাত তৈরি হতে থাকে। ফ্রান্সে বহু লোহা ঢালাইয়ের কারখানা লোরেন অঞ্চলকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। এছাড়া ফ্রান্সে রেশম শিল্পেরও বিশেষ অগ্রগতি হয়। লায়নস শহরকে কেন্দ্র করে ফ্রান্সের রেশম শিল্পের কারখানাগুলি গড়ে

১. Ibid.

ওঠে। ১৮৪৫ খ্রীঃ ফ্রান্সের বিভিন্ন শিল্পে প্রায় ১ মিলিয়ন শ্রমিক নিযুক্ত ছিল। ফ্রান্সের শিল্প কারখানাগুলি এক একটি এলাকায় ঘনসংবদ্ধভাবে গড়ে উঠেছিল। আলসাসে সুতীবস্ত্রের কারখানা, লোরেনে ধাতু শিল্পের কারখানা, লয়ার উপত্যকায় রাসায়নিক কারখানা এবং লায়নসে রেশম শিল্পের কারখানা কেন্দ্রীভূত হয়। ফ্রান্সে রেলপথ নির্মাণের সময় এজন্যে বিভিন্ন শিল্প অঞ্চলগুলিকে রেলপথ দ্বারা মালার মতো এক সুতোয় গেঁথে ফেলা হয়। ফ্রান্স তার আভ্যন্তরীণ বাজারের চাহিদাকে সামনে রেখেই প্রধানতঃ শিল্প গঠন করে। বিলাসদ্রব্যের শিল্প অবশ্য প্রধানতঃ রপ্তানির জন্যে উৎপাদিত হয়। সুগন্ধি, প্রসাধন দ্রব্য প্রভৃতির উৎপাদনে ফ্রান্স বিশ্বে উৎকর্ষতা লাভ করে। এছাড়া ফরাসী রেশমের কাপড়ের ভাল রপ্তানি বাজার ছিল।

ফ্রান্সে কৃষির ক্ষেত্রে ব্রিটেনের বিপরীত প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। যেক্ষেত্রে ব্রিটেনে Enclosure বা বেষ্টনী আন্দোলনের মাধ্যমে বৃহৎ পুঁজিবাদী খামার গড়ার ঝোঁক দেখা যায়; সেক্ষেত্রে ফ্রান্সে বৃহৎ খামার ভেঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষেতে পরিণত করে কৃষকদের মালিকানা দিয়ে আবাদ করবার প্রবণতা দেখা যায়। ফলে ১৮৬২ খ্রীঃ ফ্রান্সে ১০০ একরওয়ালা খামারের সংখ্যা ছিল ৪·৭৭% এবং ১২½ একরওয়ালা জমির মালিকের সংখ্যা ছিল ৫০%। ফলে ফ্রান্সে, ব্রিটেনের মত কৃষিতে দ্রুত উৎপাদন বৃদ্ধি দেখা যায় না। কিন্তু ১৮৭০ খ্রীঃ ফ্রাঙ্কো-জার্মান যুদ্ধের পর ফ্রান্স তার শিল্প ও খনিসমৃদ্ধ অঞ্চল আলসাস ও লোরেন জার্মানীকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হলে ফ্রান্সের শিল্পে অগ্রগতি ব্যাহত হয়। এই হস্তান্তরের পর জার্মানীর লোকসংখ্যা দাঁড়ায় ৪১ মিলিয়ন; ফ্রান্সের ৩৬ মিলিয়ন। জার্মানীর জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ছিল ৮%, ফ্রান্সের ৭·৫%। ফলে ফ্রান্স পিছিয়ে পড়ে।

জার্মানীতে শিল্প-বিপ্লব (Industrial Revolution in Germany) ঃ নেপোলিয়নের পতনের পর (১৮১৫ খ্রীঃ) ব্রিটেনের শিল্পের উড্ডয়ন যখন একটি চূড়া থেকে পরবর্তী উন্নত চূড়ায় পৌঁছে যাচ্ছিল, তখন জার্মানী ছিল ৩৮টি রাজ্যে বিভক্ত, সমস্যাসঙ্কুল এক কৃষি-প্রধান অঞ্চল। সেই জার্মানী এক শতকের মধ্যে (১৯১৪ খ্রীঃ) ব্রিটেন ও ফ্রান্সের প্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পে-বাণিজ্যে শক্তিধর, সামরিক বলে বলীয়ান এক রাষ্ট্র হিসেবে দেখা দেয়। জার্মানীর এই অগ্রগতি শুধু রাজনৈতিক ছিল না। এই অগ্রগতির মূলে ছিল জার্মানীর শিল্পশক্তি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দক্ষতা এবং তার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি। এজন্যেই অর্থনীতিবিদ কেইন্‌স (Keynes) মন্তব্য করেছেন যে, "রক্ত ও লৌহের দ্বারা নয়, কয়লা ও লৌহের দ্বারাই জার্মানীর ঐক্য ও প্রাধান্য অর্জিত হয়" (Germany was made not by blood and iron, but by coal and iron)।

জার্মানীর এই চমকপ্রদ অগ্রগতি কিন্তু গোটা এক শতক ধরে হয়নি। এই অগ্রগতির ইতিহাসকে আমরা দুভাগে ভাগ করতে পারি—যথা ১৮১৫-১৮৭০ খ্রীঃ পর্যন্ত প্রাক ঐক্যবদ্ধ জার্মানীর শিল্প গঠনের যুগ এবং ১৮৭০-১৯২৪ খ্রীঃ ঐক্যবদ্ধ জার্মানীর শিল্পগঠনের যুগ। প্রথম পর্যায় ছিল বিলম্বিত, মন্থরগতি এবং জার্মানীর বিভিন্ন রাজ্যে উন্নয়নের গতি ছিল সমতাহীন। দ্বিতীয় পর্যায়ে ঐক্যবদ্ধ জার্মানীর শিল্পজগতে অগ্রগতি ছিল অসাধারণ দ্রুত, চমকপ্রদ ও তুলনাহীন। একমাত্র জাপানের শিল্পায়নের সঙ্গে তার তুলনা হতে পারে।

১৮১৫ খ্রীঃ জার্মানীতে শিল্প গঠনের পথে বাধা-বিঘ্ন ছিল প্রচুর। এই কারণে ব্রিটেনের তুলনায় জার্মানী ছিল এক অনগ্রসর কৃষিপ্রধান দেশ। জার্মানীতে শিল্প গঠনের পথে প্রধান বাধাগুলি ছিল :—(১) জার্মানীর রাজনৈতিক বিভাজন। অন্ততঃ ৩৮টি রাজ্যে জার্মানী বিভক্ত হওয়ার ফলে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে কাঁচামাল সরবরাহে অসুবিধা দেখা দেয়। বিভিন্ন রাজ্যের আলাদা শুল্ক প্রাচীর থাকায় মালের ওপর শুল্কের হার বৃদ্ধি পায়। সারা জার্মানীর জন্যে কোন কেন্দ্রীয় শুল্ক নীতি ছিল না। (২) কেন্দ্রীয় মুদ্রা না থাকায় বিভিন্ন রাজ্যের মুদ্রার বিনিময়

হারে তারতম্য ছিল। এজন্যে এক অঞ্চলের মাল অন্য অঞ্চলে রপ্তানি করা দুস্কর ছিল। (৩) জার্মানীতে কোন কেন্দ্রীয় আইন ছিল না। এক রাজ্যের আইন অন্য রাজ্যে চলত না। এর ফলে বাণিজ্যিক ও শুল্ক বিরোধের নিষ্পত্তি করা কষ্টকর ছিল। (৪) জার্মানীতে যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থা ছিল না। ভৌগোলিক দিক থেকে জার্মানীর তিন প্রধান নদী রাইন, রোন ও এলব ছিল উত্তরবাহিনী। এই নদীগুলি উত্তরে বাল্টিক সাগরে মিশেছিল। এই তিন নদী ও তাদের শাখানদীগুলি জার্মানীকে যেন তিনটি পৃথক ভৌগোলিক অঞ্চলে ভাগ করেছিল। জার্মানীর পূর্ব সীমায় সাইলেসিয়ায় ছিল প্রধান কয়লা খনিগুলি এবং পশ্চিম সীমায় রূঢ় অঞ্চলে ছিল লোহার খনিগুলি। কয়লাকে লৌহ অঞ্চলে পরিবহণ করার কোন ব্যবস্থা ছিল না। নদীগুলি পার করে এই কাঁচামাল আনা ছিল দুস্কর। এক অঞ্চলের উদ্বৃত্ত মাল অন্য অঞ্চলে আনা কঠিন ছিল। (৫) জার্মানীর কোন উপনিবেশ ছিল না। জার্মানীর আভ্যন্তরীণ বাজারের চাহিদা ছিল সীমাবদ্ধ। কাজেই শিল্প উৎপাদনের incentive বা প্রেরণা জার্মানীতে দেখা যায়নি। (৬) কৃষিপ্রধান জার্মানীতে ছিল মূলধনের অভাব। মূলধনের অভাবে শিল্প গঠনের কাজ পিছিয়ে যায়। এত অসুবিধা সত্ত্বেও জার্মানীর অর্থনীতিতে কয়েকটি লাভজনক দিক ছিল। প্রথমতঃ, নেপোলিয়নের আমলে পশ্চিম জার্মানীতে সামন্ত প্রথা, ভূমিদাস প্রথা প্রভৃতি ক্ষয় পায়। কোড নেপোলিয়ন চালু করার ফলে পশ্চিম জার্মানীর সমাজে আধুনিক চিন্তাধারা ও জীবনবোধ দেখা দেয়। শিল্প গঠনের জন্যে সামাজিক পরিকাঠামো নেপোলিয়নের সংস্কারের ফলে এবং প্রাশিয়ায় ষ্টাইনের সংস্কারের ফলে গড়ে ওঠে। ট্রেবিল ককের (Trebil cock) মতে, রাইন জেলাগুলি ১৮১৫ খ্রীঃ থেকে শিল্পায়নের পথে আগুয়ান হয়।

(ক) ১৮১৫—১৮৭০ খ্রীঃ পর্যন্ত পশ্চিম জার্মানীর বিভিন্ন রাজ্যে শিল্পায়নের হাওয়া বইতে শুরু করে। জার্মানীর শিল্পায়নের প্রধান বাহন ছিল রেলপথের নির্মাণ। ডেভিড টমসনের মতে, "ব্রিটেন ও বেলজিয়াম প্রভৃতি অধিকতর শিল্পায়ত দেশ অপেক্ষা জার্মান জীবনধারার ওপর জার্মান রেলপথ নির্মাণের প্রভাব ছিল অনেক বেশী বৈপ্লবিক ও গভীর।" যেহেতু পূর্ব-পশ্চিমে বেশী বিস্তৃত জার্মানীকে যুক্ত করার জন্যে কোন জাতীয় রাজপথ ও সহকারী পথ জার্মানীতে ছিল না, সেহেতু জার্মানীর অর্দ্ধগ্রামীণ নগরগুলিকে রেলপথের দ্বারাই সংযুক্ত করা সম্ভব হয়। তিন নদীর ভৌগোলিক বাধা পার হয়ে রেলপথগুলি পূর্ব-পশ্চিম সহ জার্মানীর অন্যান্য অঞ্চলকে সংযুক্ত করে। (খ) গ্রামাঞ্চলের লোকেরা তাদের সঙ্কীর্ণ, কুসংস্কারময় জীবনের খোলস ছেড়ে রেলপথের মাধ্যমে গোটা দেশের বৃহত্তর জীবনধারার সঙ্গে যুক্ত হয়। (গ) জার্মান রেলপথ তৈরি হলে পূর্ব ও পশ্চিম ইওরোপের মধ্যে পরিবহণ ও যোগসূত্র হিসেবে গৃহীত হয়। (ঘ) আমেরিকার বিশাল ভৌগোলিক অঞ্চল যেমন রেলপথ দ্বারা যুক্ত হয়, জার্মানীর দুর্গম ও সম্পদশালী অঞ্চলগুলি রেলপথের মাধ্যমে গোটা দেশের সঙ্গে অর্থনৈতিকভাবে যুক্ত হয়। ডেভিড টমসনের মতে, "জোলভেরাইন দ্বারা যেমন জার্মানীর বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে কৃত্রিম অর্থনৈতিক ও শুল্ক প্রাচীর লোপ করা হয়, জার্মান রেলপথ সেরূপ জার্মানীর প্রাকৃতিক বাধা দূর করে জার্মানীর সংহতি ও অর্থনৈতিক ঐক্য স্থাপন করে।"

জার্মানীর রেলপথ গঠনে ফ্রেডারিক লিষ্ট সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন। তাঁরই উদ্যোগে সর্বপ্রথম লাইপজিগ থেকে ড্রেসডেন পর্যন্ত রেলপথ নির্মিত হয়। প্রাশিয়ার যুবরাজ ফ্রেডারিক লিষ্টের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে প্রাশিয়ায় রেলপথ নির্মাণে উদ্যোগ নেন। ক্রমে বার্লিনকে কেন্দ্র করে আরও নতুন নতুন রেলপথ তৈরি হয়। ১৮৫০ খ্রীঃ জার্মানীতে ৩০০০ মাইলের বেশী রেলপথ তৈরি হয়। এই রেলপথগুলি জার্মানীর প্রধান শহরগুলিকে যুক্ত করে। কাঁচামাল রেলযোগে শহরের কারখানায় পৌঁছায়, তৈরি মাল কারখানা থেকে শহরের বাজারে বাহিত হয়।

এরপর জার্মান বুর্জোয়া ও বণিকশ্রেণী জার্মানীর ১৮টি রাজ্য নিয়ে ১৮৩৫ খ্রীঃ সর্বপ্রথম জোলভেরাইন বা শুল্কসঙ্ঘ গঠন করে। ক্রমে জার্মানীর প্রায় সকল রাজ্য জোলভেরাইনে যোগ দিলে সারা জার্মানীতে একই হারে শুল্ক; মাপ-ওজন ও মুদ্রা বিনিময়ের হার চালু হয়। জোলভেরাইনে প্রাশিয়াই প্রধান ভূমিকা নেয়। জার্মানীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে মাল চলাচলে যে বাধা ছিল জোলভেরাইন স্থাপনের ফলে তা দূর হয়। জার্মানীতে কয়লা ও লোহার উৎপাদন বাড়ে। জার্মানীর গৌরব লোহা চালাই ও অস্ত্র তৈরির কারখানা ক্রাপ (Krupp) কোম্পানি স্থাপিত হয়। ১৮৫০ খ্রীঃ জার্মানীর লোহার উৎপাদন ছিল ২০০,০০০ টন। জার্মানীর শিল্পের বিকাশ শুরু হলেও তা তখনও পূর্ণতা পায়নি।

জার্মানী ১৮৭০ খ্রীঃ তার রাজনৈতিক ঐক্যের পরই দানবের মত বিশাল পদক্ষেপে শিল্পজগতে ঢুকে পড়ে। ১৮৭০-১৯০০ খ্রীঃ এই ত্রিশ বছরে জার্মানীর অগ্রগতি ছিল চমকপ্রদ ও অতুলনীয়। এই সময় জার্মানী ৬০০০ মাইল রেলপথ নির্মাণ করে। জার্মানীর এই শিল্পায়নে বেসরকারি মূলধনীরাই মুখ্য ভূমিকা নেয়। সরকার কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় আইন ও পরামর্শ দ্বারা সংহতি সাধন করে। জার্মান ব্যাঙ্কগুলি এই শিল্পায়নে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। বিসমার্কের পরামর্শে বিভিন্ন ছোট ও মাঝারি ব্যাঙ্কগুলি মিলিত হয়ে Hyper Bank বা বিবিধমুখী ব্যাঙ্ক গড়ে। এই ব্যাঙ্কগুলি এক সঙ্গে আমানতকারীর টাকা জমা রাখে। অপরদিকে মূলধন শিল্পে লগ্নী করে এবং বিভিন্ন শিল্প পরিচালনায় ব্যাঙ্কগুলি অংশ নেয়। জয়েন্ট ষ্টক ব্যাঙ্কগুলিকে সরকার নোট ছাপাইয়ের অধিকার দেন। এই ব্যাঙ্কগুলি হাইপার ব্যাঙ্ক হিসেবে শিল্পে মূলধন সরবরাহ ও শিল্প গঠনের কাজ একই সঙ্গে করে। জার্মানীতে ১৮৭১ খ্রীঃ এই প্রকার ৩৩টি ব্যাঙ্ক শিল্প গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করে। দ্বিতীয়তঃ, জার্মানীর শিল্প গঠনের জন্যে ট্রাষ্ট, কম্বাইন, কার্টেল গঠনে উৎসাহ দেওয়া হয়। একই শিল্পে নিযুক্ত বিভিন্ন বেসরকারি কোম্পানীগুলি যাতে প্রতিযোগিতায় শক্তি ক্ষয় না করে এসোসিয়েশনের মাধ্যমে একত্রে মিলিত হয়ে উৎপাদন বাড়ায় এবং একচেটিয়া বাজারের সুবিধা ভোগ করে সেজন্যে কার্টেল গঠন করা হয়। শিল্প-বাণিজ্যের অগ্রগতির জন্যে ডয়েৎসার হ্যান্ডেলষ্ট্যাগ, ডয়েৎসার ন্যাশনাল ভেরাইন প্রভৃতি জাতীয় বাণিজ্য শিল্প সঙ্ঘ গঠিত হয়। ১৮৪৭ খ্রীঃ সমগ্র জার্মানীতে টেলিগ্রাফ চালু হয়। ওয়ার্নার সিমেনস জার্মানীতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিশেষ ব্যবস্থা চালু করেন।

জার্মানীতে ১৮৭১ খ্রীঃ কয়লার উৎপাদন ছিল ২৯,৩৯৮,০০০ মেট্রিক টন। আকরিক লোহার উৎপাদন ছিল ১,৫৬৪,০০০ মেট্রিক টন। ১৯১৩ খ্রীঃ তা বেড়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ১০১,৫০০,০০০ এবং ১৪,৭৯৪,০০০ মেট্রিক টনে। এই লোহার সাহায্যে জার্মানী শুধু রেলপথ বা যন্ত্রপাতি তৈরি করেনি, তার বিখ্যাত সমরাস্ত্রের শিল্পও গঠন করে। জার্মান সেনাপতি ফন মোল্টকে গুরুত্বপূর্ণ সামরিক রেলপথ ও অস্ত্র কারখানা নির্মাণে উৎসাহ দেন। জার্মানীর ভারী কামানগুলি এই যুগে নির্মিত হয়। লৌহ ও কয়লা উৎপাদনের ক্ষেত্রে জার্মানী যেমন ব্রিটেনকে ধরে ফেলার উপক্রম করে, রসায়ন শিল্পে জার্মানীই বিশ্বে শ্রেষ্ঠ স্থান পায়। কৃত্রিম রবার বা প্লাষ্টিক, কৃত্রিম রঞ্জন দ্রব্য, নাইট্রেট, সোডা এ্যাশ ও বিভিন্ন জীবনদায়ী ঔষধ নির্মাণে জার্মানী প্রাধান্য পায়। যেক্ষেত্রে ফ্রান্স কেবল তার আভ্যন্তরীণ বাজারের চাহিদা মেটাতে উৎপাদন করত, জার্মানী বিশ্বের বাজারে রপ্তানির জন্যে উদ্বৃত্ত উৎপাদন করে। ক্রমে বিশ্বের বাজারে জার্মানী, ব্রিটেনের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীতে পরিণত হয়। যন্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে জার্মানী গোড়ার দিকে উদ্ভাবন অপেক্ষা অনুকরণকেই প্রাধান্য দেয়। ব্রিটেন থেকে বিভিন্ন এঞ্জিন ও যন্ত্র এনে জার্মানী তার বিভিন্ন অংশ খুলে ছাঁচে ঢালাই করে নতুন নতুন যন্ত্রাংশ তৈরি করতে সক্ষম হয়। এভাবে ব্রিটিশ, ফরাসী ও মার্কিনীদের মূল্যবান আবিষ্কারগুলিকে জার্মানী আত্মসাৎ করে নেয়। আবিষ্কারক অপেক্ষা অনুকরণকারক এতে বেশী লাভবান হয়। পরবর্তীকালে জার্মানী নিজের

প্রযুক্তিবিদ্যাকে গঠন করে বিস্ময়কর আবিষ্কার দ্বারা জগৎজোড়া নাম পায়।

জার্মানীর শিল্প বিকাশে এই অসাধারণ সাফল্যের ব্যাখ্যা নানাভাবে দেওয়া হয়। কেবলমাত্র ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার উন্নতি বা যন্ত্রের প্রয়োগ দ্বারা জার্মানীর এই অগ্রগতি হয়নি। নবোদিত ঐক্যবদ্ধ জার্মান জাতির জাতীয়তাবাদ ও ইওরোপের সেরা জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশের বাসনা জার্মান জাতির কর্মক্ষমতা ও সৃজনী প্রতিভাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। জার্মান শ্রমিকরা তাদের টিউটন জাতিসুলভ শৃঙ্খলা ও নিষ্ঠা নিয়ে কারখানায় কাজ করে। জার্মান শিল্পপতিরা শুধু মুনাফার কথা না ভেবে জাতির আর্থিক উন্নতির জন্যে কাজ করে। সর্বোপরি, বিসমার্ক যতদিন ক্ষমতায় ছিলেন তিনি বিভিন্ন আইন, পরামর্শ, নির্দেশ ও সংরক্ষণ নীতির দ্বারা শিল্পের বিকাশে উদ্যোগ নেন।

রাশিয়ায় শিল্প-বিপ্লব (The Industrialization in Russia) ঃ পশ্চিম ইওরোপের শিল্প-বিপ্লবের অনেক পরে রাশিয়ায় শিল্প-বিপ্লব ঘটে। জারের শাসনকালে রাশিয়া একটি কৃষি-প্রধান দেশ ছিল। এই যুগে কৃষি ও কৃষকের অবস্থা খুবই অনুন্নত ছিল। কোন কোন মার্ক্সবাদী লেখক মনে করেন যে, জার শাসনের যুগে রাশিয়ায় শিল্প সংগঠন হয়নি। বলশেভিক বিপ্লবের পর রুশ সরকার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা আরম্ভ করলে তবেই রাশিয়ায় প্রকৃত শিল্পায়ন আরম্ভ হয়। গ্রেগরী গ্রসম্যান (Gregory Grossman), গারশেনক্রন (Gerschenkron) প্রভৃতি অর্থনৈতিক ঐতিহাসিকেরা উপরোক্ত মতের বিরোধিতা করেছেন। এদের মতে, জার শাসনের শেষ দিকে ১৯শ শতকের শেষ ভাগে রাশিয়ায় শিল্পের ভিত্তি গড়ে ওঠে।[১] যদি রাশিয়াতে জারতন্ত্রের যুগে শিল্প-বিপ্লব না ঘটত, তবে কিভাবে বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণী পেট্রোগ্রাড শহরে লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পতাকার নীচে সমবেত হয়? তথ্য ও প্রমাণ থেকে ইহা জানা যায় যে, জার সরকার বহুদিন ধরে রুশদেশে শিল্প বিস্তারের চেষ্টা চালায়। জার শাসনের যুগে রাশিয়ায় বিরাট রেলপথ পরিকল্পনা রূপায়িত হয়। বৈদেশিক ঋণের সাহায্যে শিল্পগঠন এবং পেট্রোগ্রাডের বিশাল ইস্পাত কারখানাগুলিও স্থাপিত হয়।

জারের আমলে শিল্পের অবস্থা ঃ গারশেনক্রনের অভিমত

ইংলন্ডের সঙ্গে রাশিয়ার শিল্প বিকাশের কিছু পার্থক্য দেখা যায়। যেক্ষেত্রে ইংলন্ডে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিল্পের বিকাশ ঘটে; সেক্ষেত্রে রাশিয়ায় রাষ্ট্রিক প্রচেষ্টায় শিল্পের প্রসার ঘটে। গারশেনক্রন এই ব্যবস্থাকে বিকল্প প্রক্রিয়া বা Substitution Process বলেছেন।

রাশিয়ায় কেন এত দেরীতে শিল্প-বিপ্লব আরম্ভ হয় তার কারণ হিসেবে জার সরকারের রক্ষণশীল নীতি, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা, সার্ফ প্রথা প্রভৃতির উল্লেখ করা যায়। রাশিয়ায় বেশীর ভাগ লোক ভূমিদাসের জীবন-যাপন করত। এদের ব্যক্তি স্বাধীনতা না থাকায় স্বাধীন অর্থনৈতিক জীবন গঠনের ক্ষমতা ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, ভারী শিল্প গঠনে এই যুগে জার সরকার উপেক্ষা দেখায়। ভারী শিল্প যথা, লোহা, কয়লা প্রভৃতি মূল শিল্পের বিকাশ ছাড়া শিল্প-বিপ্লব সম্ভব নয়। জার সরকার গোড়ার দিকে এই কথা না বুঝে ভোগ্যপণ্যের যথা, চিনি, কাপড় প্রভৃতি শিল্প গঠনে আগ্রহ দেখায়। তৃতীয়তঃ, শিল্প বিস্তারের জন্যে যে আভ্যন্তরীণ সংগঠন দরকার তা জারতন্ত্রের যুগে বিদ্যমান ছিল না। রুশদেশে নিরক্ষরতার হার ছিল বেশী। শতকরা ৮০ ভাগ লোক কৃষিকেই জীবিকার প্রধান উপায় মনে করত। সরকারি ও সামন্ত কর প্রদানের পর

রাশিয়ায় দেরীতে শিল্প-বিপ্লব ঘটিবার কারণ ঃ ভারী শিল্পের অভাব ঃ মূলধনের অভাব ঃ ভূমিদাস প্রথা ইত্যাদি

১· Gregory Grossman.

লোকের হাতে এমন কিছু উদ্বৃত্ত থাকত না যার দ্বারা তারা শিল্প-দ্রব্য ক্রয় করতে পারে। এর ফলে রাশিয়ায় শিল্পদ্রব্যের বাজার তেমন ছিল না। চতুর্থতঃ, দক্ষ মজুর বলতে যা বোঝায় রাশিয়ায় তার অভাব ছিল। ভূমিদাসদের শিল্পে মজুর হিসেবে খাটাবার চেষ্টা করে দেখা যায় যে, তাদের মধ্যে দক্ষতা ও উদ্যমের অভাব ছিল। একমাত্র ভূমিদাস প্রথা উচ্ছেদের পর রাশিয়ায় শিল্পজীবি দক্ষ শ্রমিকের উদ্ভব হয়। পঞ্চমতঃ, রাশিয়ার পরিবহন ব্যবস্থা ছিল মধ্যযুগীয়। ঘোড়ার গাড়ীতে বা মাথায় মাল পরিবহন দ্বারা শিল্প গঠন করা সম্ভব ছিল না। রাশিয়ায় সর্বদা ভূমিদাস বিদ্রোহ, যুদ্ধ-বিগ্রহ চলত। এজন্য সরকার আইন-শৃঙ্খলার সমস্যা ও বৈদেশিক যুদ্ধ নিয়ে ব্যাপৃত থাকত। শিল্প প্রসারের দ্বারা বৈষয়িক উন্নতির দিকে লক্ষ্য দিত না। ষষ্ঠতঃ, রাশিয়ার অন্তঃশুল্ক ব্যবস্থাও শিল্প প্রসারের বাধা ছিল। সর্বোপরি, রাশিয়ায় মূলধনের সরবরাহ আদপেই ছিল না। আধুনিক ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা না থাকায় মূলধনের সঞ্চয় ছিল না। রাশিয়া ছিল দরিদ্র দেশ।

যাই হোক, ১৮৬১ খ্রীঃ পর রাশিয়ার উপরোক্ত অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। ১৮৬১ খ্রীঃকে গোল্ড স্মিথ প্রভৃতি ঐতিহাসিকরা রাশিয়ার অর্থনৈতিক বিবর্তনের পথে একটি জল-বিভাজিকা বলে মনে করেন। মার্কসবাদী ঐতিহাসিকরাও ১৮৬১ খ্রীঃ জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের ভূমিদাস মুক্তি আইনকে রাশিয়ায় পুঁজিবাদী শিল্প গঠনের প্রথম পদক্ষেপ বলে মনে করেন। রাশিয়ার মুক্তিপ্রাপ্ত ভূমিদাসদের একাংশ গ্রাম ছেড়ে জীবিকার সন্ধানে শহরে চলে আসায়, এরাই শিল্প শ্রমিকের কাজে যোগ দেয়। অনেকে বলেন যে, এই সকল শ্রমিক প্রকৃত শিল্পজীবি দক্ষ শ্রমিক ছিল না। এরা ছিল আধা কৃষক, আধা শিল্প শ্রমিক। এরা কৃষক মানসিকতা থেকে মুক্ত হয়ে শিল্প-কারখানার কাজকে ধ্যান-জ্ঞান করেনি। ১৯০০ খ্রীঃ শতাব্দীর শেষে এই শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল মাত্র ২ মিলিয়ন। রাশিয়ার মোট জনসংখ্যার একটি ভগ্নাংশ মাত্র। যাই হোক, ভূমিদাস প্রথা উচ্ছেদের ফলে সামন্ত শ্রেণী যেমন ক্ষয় পায়, তেমন মধ্যবিত্ত, বুর্জোয়া শ্রেণীর উদ্ভব হয়। শিল্প গঠনে এই শ্রেণীর ভূমিকা ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

১৮৬০ খ্রীঃ পর রাশিযায় কৃষির ক্ষেত্রে অগ্রগতি

১৮৬১ খ্রীঃ পর জার সরকার শিল্প প্রসারের জন্যে আন্তরিক প্রচেষ্টা আরম্ভ করেন। ১৮৬১ খ্রীঃ ভূমিদাস প্রথার উচ্ছেদের ফলে জমিতে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। এরপর ষ্টোলিপিন সংস্কার দ্বারা কুলাক বা জোতদার শ্রেণী জমির মালিক হলে জমিতে উৎপাদন আরও বাড়ে। গ্রেগরী গ্রসম্যানের মতে, কৃষির উন্নতির ফলে দেশে কাঁচামাল, সম্পদ ও মূলধন জমা হয়। শিল্প-বিপ্লবের সামাজিক ভিত্তি গঠিত হয়। কৃষির অগ্রগতির সাথে পাল্লা দিয়ে, এই সময় রাশিয়ায় জনসংখ্যাও

জনসংখ্যা বৃদ্ধি

বাড়তে থাকে। উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা গ্রামাঞ্চল ছেড়ে নগরমুখী হয়। এই জনসংখ্যার একাংশ শিল্প শ্রমিকে পরিণত হয়।

অধ্যাপক গারশেনক্রনের (Gerschenkron) মতে, এই সময়ে জার সরকারও শিল্প প্রসার নীতি গ্রহণ করেন। ইংলন্ড ও ফ্রান্সে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় শিল্পের বিকাশ ঘটে। কিন্তু রাশিয়ার ক্ষেত্রে সরকার শিল্প প্রসারে প্রধান ভূমিকা নেন। রুশ মন্ত্রী কাউন্ট উইটি (Witte) এই বিষয়ে

সরকারি প্রচেষ্টায় শিল্প গঠন : ভারী শিল্প : উইটির শিল্প নীতি

উল্লেখ্য ভূমিকা নেন। জার সরকার শিল্পগুলিকে ঋণ দান দ্বারা অথবা বৈদেশিক ঋণ যোগাড় করে দিয়ে শিল্পে মূলধন সরবরাহ করেন। ফ্রান্সের ব্যাঙ্কগুলি রাশিয়ায় রেলপথ নির্মাণে, জার্মান মূলধন অন্যান্য শিল্প নির্মাণে নিযুক্ত হয়। কাউন্ট উইটি ভারী শিল্পগুলি যথা, লোহা, কয়লা, ইস্পাত, রেলপথ প্রভৃতি গঠনে বিশেষ নজর দেন। অস্ত্র শিল্প নির্মাণে সরকার থেকে উৎসাহ দেওয়া হয়। কাউন্ট উইটি মূলধন যোগাড়ের জন্যে আমদানি কমিয়ে রপ্তানি বাড়ান। তিনি কৃষকদের ওপর শিল্প কর চাপিয়ে সেই অর্থ শিল্পে বিনিয়োগ করেন। শিল্পের উড্ডয়ন দেখা দিলে,

ব্যক্তিগত উদ্যোগে ও মালিকানায় শিল্প গঠনের জন্যে জার সরকার উৎসাহ দেন। এভাবে ১৮৮০-৯০ খ্রীঃ নাগাদ রাশিয়ায় পুরোদামে শিল্প সংগঠন আরম্ভ হয়। এই সময় জার সরকার যেমন শিল্প কারখানা গঠন করেন, তেমন রেলপথ নির্মাণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেন। রাশিয়ার মত বিশাল দেশে মাল পরিবহনের সমস্যা ছিল জটিল। ইংলন্ডের মত খাল পরিবহনের সুযোগ রাশিয়ায় ছিল না। এজন্য রেলপথ নির্মাণ ছিল রাশিয়ায় শিল্পায়নের চাবিকাঠি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে রাশিয়ায় রেলপথের দৈর্ঘ্য ছিল ১০ হাজার কিঃ মিঃর বেশী। বিখ্যাত ট্রান্স-সাইবেরিয় রেলপথ রাজধানী সেন্ট পিটার্সবার্গকে প্রশান্ত মহাসাগরের ভ্লাডিভোষ্টক বন্দরেব সঙ্গে সংযুক্ত করে। তাছাড়া ট্রান্স-সাইবেরীয় রেলপথ থেকে বিখ্যাত শাখা রেলপথ দক্ষিণ-মাঞ্চুরীয় রেলপথ ফরাসী মূলধনের সাহায্যে তৈরি হলে বরফ বিহীন পোর্ট আর্থার বন্দর পর্যন্ত রাশিয়ার রেলপথ প্রসারিত হয়। মাঞ্চুরিয়া ও মোঙ্গোলিয়ার কাঁচামাল রুশ কারখানায় ব্যবহৃত হয়। রাশিয়ার তৈরি রপ্তানি মালের ইওরোপে বাজার না থাকায় রেলযোগে তা মোঙ্গোলিয়া ও মাঞ্চুরিয়ার বাজারে পাঠিয়ে বিক্রি করা সম্ভব হয়। রাশিয়া তার শিল্প গঠনের জন্যে এত বিরাট পরিমাণ বিদেশী ঋণ নেয় যে, ১৯১৬ খ্রীঃ তার পরিমাণ দাঁড়ায় ২ বিলিয়ন রুবলে। এই ঋণের বেশীরভাগ ফরাসী মূলধনীদের কাছ থেকে এসেছিল। মার্কসবাদী সমালোচকরা এজন্য জার সরকারের সমালোচনা করে বলেন যে, এই সরকার বিদেশী ঋণ নিয়ে বিদেশী মূলধনীদের কাছে রাশিয়াকে বিক্রি করে দেয়। অবশ্য বলশেভিক বিপ্লবের পর কমিউনিষ্ট সরকার এই ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব নাকচ করে দেয়।

যেহেতু রাশিয়ায় প্রযুক্তিবিদ্যা ছিল না, সেহেতু জার সরকার পশ্চিমী যন্ত্রবিদদের সহায়তায় বিশালকায় কারখানা তৈরি করেন। তাঁরা প্রধানতঃ ভারী শিল্প গঠনের দিকেই নজর দেন। রাশিয়ায় অতিকায় লোহা ঢালাইয়ের কারখানার পাশাপাশি অস্ত্র তৈরির কারখানাও স্থাপিত হয়।

১৮৯০ খ্রীঃ পর জার সরকার শিল্প গঠনের কাজে বেসরকারি উদ্যোগকে প্রাধান্য দিতে থাকেন। সরকারি উদ্যোগক্রমে পরামর্শদানও নিয়ন্ত্রণে পর্যবসিত হয়। বেসরকারি উদ্যোগ প্রাধান্য পেলে পুঁজিবাদ তীব্র হয় এবং শ্রমিকের শোষণ বাড়ে। এজন্য নয়ের দশক থেকে কলকারখানায় ধর্মঘট তীব্র হয়।

শিল্প-বিপ্লবের ফলাফল (The results of the Industrial Revolution) ঃ শিল্প-বিপ্লব হল আধুনিক যুগের অন্যতম প্রধান ঘটনা। ফরাসী দার্শনিক বার্গসঁর (Bergson) মতে, এই বিপ্লব মানবিক সম্পর্ককে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। (১) শিল্প-বিপ্লবের ফলে পুরাতন কৃষি-নির্ভর, কুটীর-শিল্পমুখী সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তে নগর-কেন্দ্রিক, যন্ত্র-নির্ভর সভ্যতার সৃষ্টি হয়। মানুষ যন্ত্রের সাহায্যে জীবনযাত্রার উপকরণগুলিকে প্রচুরভাবে উৎপাদন করে জীবনযাত্রাকে আরামপ্রদ করে। পরিধেয় হতে পরিবহণ সর্বক্ষেত্রে মানুষের আরাম ও বিলাসের অজস্র উপকরণ যন্ত্রের সাহায্যে নির্মিত হয়। লোকে অর্থ দ্বারা সেই সকল সামগ্রী কিনে আরামে দিন কাটাতে পারে। (২) বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে মানুষ প্রকৃতিকে জয় করে আপন বশে আনার কাজে লিপ্ত হয়। প্রকৃতির অন্তর্নিহিত বিদ্যুৎ, জল-শক্তিকে মানুষ যন্ত্র চালনার কাজে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়। (৩) শিল্প-বিপ্লবের ফলে লোকে কায়িক শ্রমের স্থলে যন্ত্র দ্বারা কাজ করে। লাঙলের বদলে ট্রাক্টর দ্বারা চাষ-আবাদ, তাঁতের বদলে যন্ত্র দ্বারা কাপড় বুনন, রাসায়নিক সারের দ্বারা খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, মোটর, রেল, বায়ুযান, জাহাজ দ্বারা যাতায়াত প্রভৃতি নানা ক্ষেত্রে শিল্প-বিপ্লব মানুষের জীবন-যাত্রাকে আরামপ্রদ করে। (৪) কলকারখানায় লোকে কাজ পাওয়ার

শিল্প-বিপ্লবের সুফল ঃ
জীবনযাত্রার উন্নতি ঃ
দৈহিক শ্রমের পরিবর্তে যন্ত্রের ব্যবহার

ফলে জীবিকার নতুন নতুন ক্ষেত্রের উন্মেষ ঘটে। এই ভাবে শিল্প-বিপ্লব এক নতুন সভ্যতার সৃষ্টি করে। অর্থনীতিবিদ এ্যাষ্টনের (Ashton) মতে, ইওরোপের জনসংখ্যা যে হারে বাড়ছিল তাতে শিল্প-বিপ্লবের ফলে কলকারখানায় লোকের কর্মসংস্থান না হলে ইওরোপ দারিদ্রের পাঁকে ডুবে যেত। এশিয়া, আফ্রিকার মত অনগ্রসর দেশে পরিণত হত। শিল্প-বিপ্লব ইওরোপকে বিশ্বের অনগ্রসর অঞ্চলে প্রাধান্য স্থাপনের সুযোগ করে দেয়। এশিয়া, আফ্রিকার দেশগুলি ইওরোপের শিক্ষায়ত জাতিগুলির অধীনস্থ বাজাবে পরিণত হয়। যে জাতির হাতে যুদ্ধজাহাজ মারণাস্ত্র ছিল তারা বাণিজ্য জাহাজ বোঝাই করে শিল্পদ্রব্য এই সকল অনগ্রসর দেশে আ জোরে বিক্রি করে। শিল্প-বিপ্লব নব সাম্রাজ্যবাদের জন্ম দেয়।

অপরদিকে শিল্প-বিপ্লব সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি সকল ক্ষেত্রে বহু জটিলতা ও সঙ্কট সৃষ্টি করে। শহবের সংখ্যা বাড়লে গ্রামীণ জীবনের প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে বহুলোক গ্রাম হতে শিল্প শহরগুলিতে ভিড় করে। এরা কলে-কারখানায় শ্রমিকের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। এভাবে ভূমিহীন, গৃহহীন কারখানার চাকুরী-সম্বল শ্রমজীবি শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। এরা কারখানায় উদয়াস্ত খেটে কম মজুরীতে জীবিকা নির্বাহ করত। এই শ্রমিক-শ্রেণীকে মালিকের দয়ার ওপর নির্ভর করে চলতে হত। একার মজুরীতে সংসার চলত না, এজন্য বাড়ীর নারী ও শিশুরা কারখানায় কাজ করত। পুরুষ শ্রমিকদের ১৬—১৭ ঘণ্টা প্রত্যহ পবিশ্রম করতে হত। কল-কারখানায় ছাঁটাই হলে এরা অর্ধাশন বা অনশনে দিনাতিপাত করত। শিল্প-বিপ্লবের গোড়ার দিকে শ্রমিকের স্বার্থরক্ষার জন্যে আইনগুলি না থাকায়, শ্রমিকের অবস্থা ছিল খুবই করুণ।

শিল্প বিপ্লবেব কুফল, শ্রমিকশ্রেণীব উদ্ভব

এদিকে শহরগুলিতে হঠাৎ লোকসংখ্যা বাড়ায় বাসস্থান, জল সরবরাহ ও অন্যান্য সমস্যা দেখা দেয়। শিল্প শহরগুলির স্বাস্থ্য ও নগর রক্ষার ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। শ্রমিকেরা বাসগৃহের অভাবে বস্তিতে বাস করতে বাধ্য হয়। ফলে নগর জীবনের অবনতি ঘটে। বস্তিবাসী শ্রমিকেরা নোংরা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করতে বাধ্য হয়। বস্তির নৈতিক জীবন ছিল পঙ্কিল ও ক্লেদাক্ত। শ্রমিক পরিবারের শিশুরা এই পরিবেশে বেড়ে উঠত। শ্রমিকের জীবন ছিল নিরানন্দময়। একঘেয়ে জীবনে বৈচিত্র্যের লোভে শ্রমিক তার সাপ্তাহিক উপার্জনের একাংশ ভাঁটিখানায় ব্যয় করত। শিশুদের শিক্ষাদান, পরিবারের স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা না থাকায়, শ্রমিক বস্তিগুলি ধীরে ধীরে নৈতিক অবক্ষয়ের পথে চলে যায়। দারিদ্র্য, হতাশাবোধ ও অশিক্ষা শ্রমিকের জীবনকে চুরমার করে দেয়। মার্কসের মতে, "সূর্যালোকিত দিনের মাঝেও শ্রমিকের জীবনে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে।" হ্যালেভি (Halevy) নামক অর্থনৈতিক ঐতিহাসিক এই যুগে শ্রমিকের জীবনের এক করুণ ও বাস্তব চিত্র এঁকেছেন। ভ্যান গগের (Van Gaugh) লাষ্ট ফর লাইফ (Lust for Life) উপন্যাসে ইংলন্ডের ওয়েলস প্রদেশের কয়লাখনি অঞ্চলের খনি শ্রমিকদের দুর্দশাগ্রস্থ জীবন-যাত্রার বাস্তব চিত্র পাওয়া যায়।

শহবেব জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঃ গৃহ ও অন্যান্য সমস্যাব উদ্ভব

শ্রমিকেব জীবনযাত্রাব মানেব অবনতি ঃ শ্রমিকের দুর্দশা

শিল্প-বিপ্লবের ফলে শ্রমিকের অর্থনৈতিক জীবনে নানা সমস্যার উদ্ভব হয়। যন্ত্রের দ্বারা শিল্প উৎপাদন আরম্ভ হলে যে সকল কারিগর নিজ হাতে শিল্পদ্রব্য তৈরি করত তারা বেকার হয়ে পড়ে। কুটীর-শিল্প ধ্বংস হলে তাঁতী, কামার প্রভৃতি শ্রেণীর লোকের জীবিকা অর্জনের পথ বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে এই শ্রেণীর লোকেরা ক্ষিপ্ত হয়ে মেশিন ও কারখানা ভাঙবার চেষ্টা করে। ১৮১১—১৬ খ্রীঃ ইংলন্ডে মেশিন ভাঙার দাঙ্গা আরম্ভ হয়। এই বিদ্রোহকে লাডাইট রায়ট (Luddite Riots) বলা হয়। ক্রমে এই সকল লোকেরা বাধ্য হয়ে দিন-মজুরের কাজে লাগে; নতুবা নিস্ফল আক্রোশে ফুলতে থাকে।

কুটির শিল্পেব ধ্বংস ঃ কারিগর শ্রেণীর দুর্দশা

অদক্ষ শ্রমিকের দুর্দশা

শিল্প-বিপ্লবের ফলে শ্রমিকেরা দক্ষ ও অদক্ষ দুই শ্রেণীতে ভাগ হয়ে যায়। দক্ষ শ্রমিকেরা শিল্প-কারখানায় বিশেষ বিভাগে দক্ষতা বা (specialisation) অর্জন করে বেশী হারে মজুরী পায়। বাকি শ্রমিকেরা সাধারণ কাজ করে এবং কম মজুরী পায়।

শিল্প-বিপ্লবের অপর একটি সামাজিক কুফল ছিল শিশু শ্রমিকদের কারখানার কাজে নিযুক্তি। যেহেতু অল্পবয়স্ক বালক-বালিকারা প্রতিবাদ করতে জানত না এবং কম মজুরিতে তাদের বেশি সময় খাটান যেত, সেহেতু মিল মালিকরা শিশু শ্রমিক নিয়োগ করে বেশী মুনাফা লুটত। সাধারণতঃ সরকারি ভবঘুরে আশ্রয়স্থল অথবা দরিদ্র নিবাস থেকে তারা এই বালক-বালিকাদের থোক টাকায় কিনে নিয়ে কারখানার কাজে নিয়োগ করত। এদের নাম ছিল "শিক্ষানবীসি শিশু শ্রমিক" (Apprentice Children)। শেষ পর্যন্ত শিশু শ্রমিকদের ওপর নির্যাতন রদ করতে সরকার কয়েকটি আইন পাশ করেন।

গ্রামে জনসংখ্যা হ্রাস

শহরে চাকুরীর আরামদায়ক জীবনের লোভে লোকে চলে আসার ফলে গ্রামগুলি জনহীন ও শ্রীহীন হয়ে পড়ে। ইংলন্ডের উত্তর ও মধ্যাঞ্চলে কল-কারখানা বাড়লে দক্ষিণাঞ্চল থেকে লোক এই অঞ্চলে চলে যায়। দক্ষিণ ইংলন্ড তার গুরুত্ব হারায়।

বুর্জোয়া শ্রেণীর উদ্ভব

শিল্প-বিপ্লবের ফলে বুর্জোয়া শ্রেণীর ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। অভিজাত শ্রেণী এতকাল যে সকল ক্ষমতা ভোগ করত তা লোপ পায়। বুর্জোয়া শ্রেণী কাঞ্চন-কৌলিন্যের জোরে সমাজে মর্যাদা ও ক্ষমতা অধিকার করে। ইতিহাসে বুর্জোয়া যুগের আরম্ভ হয়। বুর্জোয়া শ্রেণী লক্ষ্য করে যে, রাজনৈতিক অধিকার হাতে না পেলে, রাষ্ট্রকে তাদের শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার কাজে ব্যবহার করা যাবে না। এজন্য রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের কাজে বুর্জোয়ারা এগিয়ে আসে। তারা এমন সংবিধান রচনা করে যে, তার ফলে ভোটাধিকার বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতেই থাকে। এভাবে ইওরোপের বহু দেশে বুর্জোয়াতন্ত্র স্থাপিত হয়।

পুঁজিবাদী ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির উদ্ভব : শোষণ

শিল্প-বিপ্লবের ফলে পুঁজিবাদের উদ্ভব হয়। শিল্প-বিপ্লবের পর দেশের শিল্প উৎপাদন ব্যবস্থার সমগ্র অংশ মালিক বা পুঁজিপতিদের কুক্ষিগত হয়। কুটির শিল্পের যুগে উৎপাদন ছিল ক্ষুদ্র উৎপাদকের হাতে। এরা তাদের উৎপাদিত দ্রব্যের দ্বারা স্থানীয় চাহিদা মিটাত। ক্ষুদ্র উৎপাদকরা চাহিদামত মাল হাতে তৈরি করত। চাহিদার তুলনায় অনেক সময় উৎপাদন ছিল কম। উদ্বৃত্ত শিল্পদ্রব্য ব্যাপক বিক্রি করে মুনাফা করার কোন সুযোগ ছিল না। শিল্প-বিপ্লবের পর পুঁজিপতি শিল্প মালিকেরা বিশ্বের বাজারে মাল বিক্রয়ের জন্যে দেশের চাহিদা অপেক্ষা বেশী উৎপাদন করে। এই মালের দাম তারা ইচ্ছামত বেঁধে দেয়। এই মাল স্বদেশে ও বিদেশে বিক্রি করে শিল্প মালিকেরা মুনাফার পাহাড় জমিয়ে ফেলে। জমা মূলধন দ্বারা তারা আরও নতুন নতুন শিল্প গড়ে। এভাবে একচেটিয়া পুঁজিবাদী শ্রেণীর হাতে দেশের উৎপাদন ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ চলে যায়। এরা এমনই ক্ষমতাশালী শ্রেণীতে পরিণত হয় যে, কোন সরকার সহসা এদের চটাতে সাহস করত না।

পুঁজিবাদী শোষণ

মূলধনী পুঁজিপতি শ্রেণীর লক্ষ্য হয় শ্রমিকদের কম মজুরী দিয়ে বেশী মুনাফা করা। মূলধনী পুঁজিপতি শ্রেণী এভাবে নিরন্তর মুনাফা বাড়িয়ে ধনী হতে থাকে। অপরদিকে শ্রমিক ও ক্রেতা সকলেই তাদের হাতে শোষিত হয়। মার্কসের পরিভাষায় "ধনী আরও ধনী হয়, গরীব আরও গরীব হয়" (The rich became richer and the poor poorer)। এজন্য সমাজের সাম্য বিনষ্ট হয়।

শিল্প-বিপ্লবের ফলে সমাজতন্ত্রবাদ নামক মতবাদের উদ্ভব হয় (বিশদ বিবরণের জন্যে স্বতন্ত্র

অধ্যায় দেখ)। চিন্তাবিদ দার্শনিকেরা শিল্প-বিপ্লবের ফলে সমাজে ধন বন্টনের ঘোর বৈষম্য, শ্রমিকের দারিদ্র্যের কথা ভেবে এর প্রতিকারের চিন্তা করেন। সমাজতন্ত্রবিদরা এই মত প্রচার করেন যে, শ্রমই হল সম্পদের উৎস। কাঁচামাল হল প্রাকৃতিক সম্পদ। এতে সকলের সমান অধিকার আছে। শ্রমিক কাঁচামাল নিয়ে তার শ্রমের দ্বারা যা উৎপাদন করে তার মুনাফা শ্রমিকেরই প্রাপ্য। কারখানার মালিক প্রকৃতপক্ষে মুনাফার হক্‌দার নয়। কারখানার পরিচালক কেবলমাত্র ম্যানেজারের কাজ করে। শিল্পের মুনাফা শ্রমিকেরই প্রাপ্য। রাষ্ট্রের উচিত শিল্পের রাষ্ট্রায়ত্বকরণ করে শ্রমিকের ন্যায্য প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা। সমাজতান্ত্রিক মতবাদের প্রধান প্রবক্তা হলেন দার্শনিক কার্ল মার্কস। মার্কসীয় মতবাদের প্রভাব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পৃথিবীর বহু রাষ্ট্রের চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করে। শ্রমিকশ্রেণী সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ধর্মঘট প্রভৃতির দ্বারা মালিকের কাছ থেকে তাদের দাবী আদায়ের চেষ্টা করে। ধর্মঘটের চাপে মালিকশ্রেণী শ্রমিকের ন্যায্য দাবী অনেক ক্ষেত্রে মানতে বাধ্য হয়। ইংলন্ড প্রভৃতি দেশে শ্রমিকশ্রেণী তাদের ভোটাধিকার লাভের জন্যে আন্দোলন চালায়। ভোটাধিকার লাভ করে শ্রমিকেরা আইনসভায় আইন রচনা করে সরকারকে শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার কাজ করতে বাধ্য করে। শ্রমিকের নিম্নতম মজুরী, কম সময় কাজ, বাসস্থান, বীমা প্রভৃতি আইন পাশ হয়। রুশদেশে বলশেভিক দল শ্রমিকের রাষ্ট্র স্থাপন করে।

সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব

শিল্প-বিপ্লবের ফলে, বেশী মুনাফার লোভে মালিকশ্রেণী দেশের প্রয়োজন অপেক্ষা বাড়তি মাল উৎপাদন করে। এই বাড়তি মাল বিক্রয়ের জন্যে উপনিবেশ দখলের প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। ইংলন্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশগুলি অন্য দেশের বাজারে একচেটিয়া অধিকারের আশায় উপনিবেশ স্থাপনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জড়িয়ে পড়ে। এর পরিণামে বিভিন্ন ধনতান্ত্রিক দেশের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ দেখা দেয়। লেনিনের মতে, "পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ যমজ ভ্রাতার ন্যায় হাত ধরাধরি করে চলে।" প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম প্রধান কারণ হল সাম্রাজ্যবাদী এবং পুঁজিবাদী দেশগুলির উপনিবেশ দখলের লড়াই। লেনিন এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে তাঁর Imperialism the Highest Stage of Capitalism গ্রন্থ রচনা করেন।

উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব

ফ্যাক্টরী আইন বিধিসমূহ (The Factory Legislations)ঃ কল-কারখানায় শিশু শ্রমিকের নিয়োগ ও তাদের ওপর নির্যাতন ইংলন্ডে জনমত অনুমোদন করেনি। জনমতের চাপে নারী ও শিশুরা কারখানায় কি অবস্থায় কাজ করে তা জানার জন্যে পার্লামেন্ট কমিশন নিয়োগ করে। কমিশনগুলির রিপোর্ট পাওয়ার পর পার্লামেন্ট ১৮০২, ১৮১৯, ১৮২৫ এবং ১৮৩১ খ্রীঃ শিশু শ্রমিককে রক্ষার জন্যে কয়েকটি আইন পাশ করে। কিন্তু এই আইনগুলিকে কার্যকরী রূপদানের জন্যে কোন প্রশাসনিক ব্যবস্থা না থাকায়, আইনগুলি ছিল মৃত। ১৮৩৫ খ্রীঃ আইনটিকে এজন্য প্রথম কার্যকরী আইন বলা চলে। ৯—১২ বছরের শিশুদের সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টার বেশী সময় কাজ করান যাবে না বলা হয়। এই শিশু শ্রমিকদের প্রত্যহ ২ ঘণ্টা স্কুলে পড়ার জন্যে ছুটি দিতে বলা হয়। যাদের বয়স ১৮ বছরের নীচে ছিল তাদের সপ্তাহে ৬৯ ঘণ্টা এবং কোনদিন ১২ ঘণ্টার বেশী খাটান নিষিদ্ধ হয়। আইনগুলি ভাঙা হচ্ছে কিনা তা লক্ষ্য রাখার জন্যে পরিদর্শক নিয়োগ করা হয়। আইনভঙ্গকারীদের শাস্তিদানের ফলে আইনটি কার্যকরী হয়। ১৮৪২ খ্রীঃ খনি আইনে বলা হয় যে, ১০ বছরের নীচে কোন বালক-বালিকাকে খনিগর্ভে কাজ করান যাবে না। ১৮৪৭ খ্রীঃ দশ আইনে ১৮ বছরের নীচে কোন ব্যক্তিকে দিনে ১০ ঘণ্টার বেশী কারখানায় কাজ করান নিষিদ্ধ হয়।

বয়স্ক শ্রমিকদের কাজের সময় কমান প্রথমে সহজ ছিল না। রক্ষণশীল লোকেরা বলে যে, এই অশিক্ষিত শ্রমিকরা তাদের অবসর কোন গঠনমূলক কর্মে কাটাতে জানত না। অবসরের

সময় বাড়লে তারা মদ্যপান ও অন্যান্য নীতিহীন কাজে লিপ্ত হবে। সরকার বুর্জোয়া মালিকদের প্রভাবে দীর্ঘকাল নিশ্চেষ্ট থাকে। শ্রমিকরা যাতে ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমে সঙ্ঘবদ্ধভাবে দাবী জানাতে না পারে এজন্য ১৭৯৯ এবং ১৮০০ খ্রীঃ কম্বিনেশন আইন দ্বারা ট্রেড ইউনিয়ন গঠন দণ্ডযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষিত হয়। শ্রমিকরা এই কালা আইনের বিরুদ্ধে দাঙ্গা-হাঙ্গামা চালালেও তাতে কোনো ফল হয়নি। আইনভঙ্গ করে গোপনে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের কাজ চালু করা হয়। ফ্রান্সিস প্লেস নামে এক দর্জি ১৭৯৯ খ্রীঃ ট্রেড ইউনিয়ন বিরোধী আইনের বিরুদ্ধে এমন আন্দোলন চালান যে, ১৮২৪ খ্রীঃ পার্লামেন্ট এই আইনটি প্রত্যাহার করে। শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধি ও কাজের সময় হ্রাস করার জন্যে শান্তিপূর্ণ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে বৈধতা দেওয়া হয়।

যুগের হাওয়া ক্রমশঃ শ্রমিকের অনুকূলে বইতে থাকে। শিল্প-বিপ্লবের ফলে পুঁজিবাদ ও শ্রমিক শোষণের বিরুদ্ধে নিম্ন মধ্যবিত্ত জনমত আলোড়িত হয়। শেষ পর্যন্ত ১৮৫০ খ্রীঃ এক আইন দ্বারা বস্ত্রশিল্পের শ্রমিকদের সপ্তাহে ৬০ ঘণ্টা কাজের সময় বেঁধে দেওয়া হয়। ১৮৬৭ খ্রীঃ অপর এক আইন দ্বারা অন্যান্য শিল্পেও সপ্তাহে ৬০ ঘণ্টা কাজের জন্যে আইন করা হয়। এবার শ্রমিকরা মজুরী বৃদ্ধির জন্যে আন্দোলন শুরু করে। এই আন্দোলনের ইতিহাস দীর্ঘ। ১৮৭০ খ্রীঃ "ট্রাক প্রথা" (Truck system) নিষিদ্ধ করা হয়। এই প্রথা অনুসারে শ্রমিকদের মজুরী নগদে না দিয়ে জিনিষ দ্বারা দেওয়া হত। তা বিক্রি করে শ্রমিকদের তার পরিবারের অন্ন বস্ত্র যোগাতে হত। এই ব্যবস্থা ছিল নিঃসন্দেহে অন্যায়। এরপব শ্রমিক নেতারা উপলব্ধি করেন যে, পার্লামেন্টে যথেষ্ট সংখ্যক শ্রমিক সমর্থক সদস্য না পেলে পার্লামেন্টে আইন রচনার দ্বারা শ্রমিকের নায্য দাবীপূবণ করা যাবে না। ফরাসী সমাজতন্ত্রবিদ লুই ব্লাঙ্ক তাঁর Organisation of Labour গ্রন্থে এই মত প্রচার করেন যে, শ্রমিকদের ভোটাধিকার দিলে তবেই শ্রমিকরা আইনসভায় তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন দ্বারা শ্রমিক কল্যাণমূলক আইনবিধি পাশ করতে পারবে। ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে শ্রমিকরা সর্বসাধারণের বিশেষতঃ শ্রমিকেব ভোটাধিকারের জন্যে দীর্ঘকাল আন্দোলন চলে। ইংলন্ডে ১৮৩২ খ্রীঃ রিফর্ম বিল পাশ হলে এবং ১৮৬৭ খ্রীঃ ভোটাধিকার আইন পাশ হলে শ্রমিকের ভোটাধিকাব সম্প্রসারিত হয়। শ্রমিকের প্রত্যহ ৮ ঘণ্টা কাজের দাবী আদায় করতে দীর্ঘকাল ধরে সংগ্রাম করতে হয়।

পাঠ্যসূচী

১। Hobsbawm—Industry and Empire.
২। Phyllis Deane—The First Industrial Revolution.
৩। Halevy—Economic History of Europe.
৪। Fantana—Economic History of Europe.
৫। Hobson—The Evolution of Modern Capitalism.
৬। C. Beard—The Industrial Revolution.
৭। V. I. Lenin—Imperialism—The Highest stage of Capitalism.

চতুর্দশ অধ্যায়

ফ্রান্স ও ইওরোপে ১৮৪৮ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারি বিপ্লব (The February Revolution of 1848 in France and in Europe)

ফ্রান্সে ফেব্রুয়ারি বিপ্লব ঃ জুলাই রাজতন্ত্রের পতন, ১৮৩০-৪৮ খ্রীঃ (The February Revolution in France : The Fall of the July Monarchy, 1848) ঃ ১৮৩০ খ্রীঃ জুলাই বিপ্লবের ফলে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত বুরবোঁ রাজবংশের পতন ঘটে। জুলাই বিপ্লবের নেতারা অর্লিয়েন্স বংশীয় লুই ফিলিপকে সাংবিধানিক রাজা হিসেবে নির্বাচন করলে তিনি সংশোধিত চার্টার বা সংবিধান মেনে শাসন চালাতে শপথ নেন। যেহেতু লুই ফিলিপ জুলাই বিপ্লবের ফলে সিংহাসন পান এজন্য তাঁহার শাসনব্যবস্থাকে জুলাই রাজতন্ত্র বলা হয়। লুই ফিলিপ ১৮৩০-৪৮ খ্রীঃ এই ১৮ বছর শাসন করার পর ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের ফলে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। কি কারণে ফ্রান্সে মাত্র ১৮ বছর পরে অর্লিয়েন্স বংশীয় লুই ফিলিপের পতন ঘটে তার ব্যাখ্যা ঐতিহাসিকেরা দেন।

জুলাই রাজতন্ত্র

কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন যে, ১৮৪৬-৪৭ খ্রীঃ-এর খাদ্য সঙ্কট জুলাই রাজতন্ত্রের পতনের প্রধান কারণ ছিল। ১৮৪৬ খ্রীঃ আলুতে পোকা লাগলে আলুর ফসল বিনষ্ট হয়। এর পর বছর অনাবৃষ্টির ফলে গমের ফসল বিনষ্ট হয়। ময়দা ও রুটির দাম বেড়ে যায়। এজন্য ফ্রান্সে তীব্র খাদ্য সঙ্কট দেখা দেয়। ফ্রান্সের সমাজ তখনও পর্যন্ত ছিল গ্রামীণ। খাদ্য সঙ্কট ফ্রান্সের বৃহত্তর জনসাধারণকে হতাশাগ্রস্থ করে। খাদ্যের দাম বাড়ায় লোকের শিল্প-দ্রব্য কেনার ক্ষমতা কমে যায়। এজন্য শিল্পে মন্দা দেখা দেয়। জিনিসপত্রের দাম বাড়লে শহরের খেটেখাওয়া লোকেদের দুর্দশার একশেষ হয়। এই কারণে ১৮৪৮ খ্রীঃ-এর বিদ্রোহে লুই ফিলিপের পতন ঘটে।

কৃষি ব্যবস্থার সঙ্কটের ফলে জুলাই রাজতন্ত্রের পতন

ফেব্রুযারি বিপ্লবের উপরোক্ত ব্যাখ্যা জ্যাক ড্রজ (Jack Droz) নামক ঐতিহাসিক অগ্রাহ্য করেছেন। তাঁর মতে, যদি কৃষি ও শিল্পে সঙ্কটের জন্যে বিপ্লব ঘটে তবে তাহা ১৮৪৭ খ্রীঃ ঘটা উচিত ছিল। ১৮৪৮ খ্রীঃ এই মন্দা কেটে যায়। বিপ্লব ঘটার জন্যে সমাজের একশ্রেণীর লোকের অপর শ্রেণীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও বিদ্বেষ থাকা দরকার। সাময়িক খাদ্য সঙ্কটের ফলে এরূপ শ্রেণী-বিদ্বেষ জাগে না। জ্যাক ড্রজ মনে করেন যে, ফেব্রুয়ারি বিপ্লব ছিল ফ্রান্সের বুর্জোয়া (haute bourgeois) শ্রেণীর বিরুদ্ধে নিম্ন বা পেটি বুর্জোয়া শ্রেণীর বিদ্রোহ। ধনী বুর্জোয়ারা ছিল একচেটিয়া মুনাফাভোগী শ্রেণী। ১৮৩০ খ্রীঃ জুলাই বিপ্লবের পর ফ্রান্সে ধনী বুর্জোয়া শ্রেণীর আধিপত্যের সূচনা হয়। এই শ্রেণীই একমাত্র ভোটাধিকার লাভ করে। ঐতিহাসিক তকভিল এজন্য মন্তব্য করেছেন যে, "ধনী বুর্জোয়া শ্রেণী লুই ফিলিপের সরকারকে একটি শিল্পোদ্যোগ হিসেবে গণ্য করে। বুর্জোয়া মানসিকতা গোটা সরকারকে আচ্ছন্ন করে"। এজন্য লুই ফিলিপের সরকারকে লোকে "বুর্জোয়া রাজতন্ত্র" নাম দেয়। লুই ফিলিপ এই শ্রেণীর স্বার্থই একমাত্র দেখাতেন। ১৮৪৮ খ্রীঃ ফ্রান্সের ধনী বুর্জোয়ারা পাতি বুর্জোয়াদের চোখে সন্দেহভাজন শ্রেণীতে পরিণত হয়।[১]

জ্যাক ড্রজের অভিমত

---

১. "In 1848 this grande bourgeois found itself an object suspicion to the petite bourgeois, which considered the former as monopolist class."—Jack Droz. P. 251.

লুই ফিলিপের সহায়তায় উচ্চ বুর্জোয়া শ্রেণী ফ্রান্সে একটি অর্থনৈতিক অভিজাত শ্রেণীতে (financial aristocracy) পরিণত হয়। লুই ফিলিপ শুল্ক সংরক্ষণ নীতি এদের মুনাফা লাভের সুযোগ করে দেন। তিনি এমন সব আইন করেন যার ফলে মিল মালিক ও মূলধনীদেরই সুবিধা হয়। তারা কল-কারখানায় কম মজুরীতে শ্রমিকদের বেশী সময় খাটাবার সুযোগ পায়। লুই ফিলিপের আমলে ফ্রান্সে কল-কারখানার দ্রুত প্রসার হচ্ছিল। ১৮৪৭ খ্রীঃ ছোট ছোট কারখানায় নিযুক্ত শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল পবিবার-পরিজন সহ প্রায় ৫০ লক্ষ। বড় কারখানাগুলিতে প্রায় দশ লক্ষ শ্রমিক কাজ কবত। শ্রমিকের জীবন-যাত্রা ছিল করুণ। শ্রমিকেরা শহরেব বস্তী এলাকায় এক অস্বাস্থ্যকব পঙ্কিল জীবন-যাপন করতে বাধ্য হত। শ্রমিকদের মজুবী বাড়ান ও কাজের সময় কমাবার দাবীতে লুই ফিলিপ কর্ণপাত করেন নি। ফ্রান্সের পুঁজিবাদী মালিকদের মুনাফা বৃত্তি এবং শ্রমিকদের সীমাহীন দারিদ্র এক বিরাট সামাজিক সঙ্কট সৃষ্টি করে। চিন্তাবিদ সেন্ট সাইমন যাঁকে সমাজতন্ত্রবাদের আদি গুরু বলা হয় প্রথম উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমিকের নব মূল্যায়ণ করেন। শ্রমিককে তিনি উৎপাদন ব্যবস্থার অংশীদাররূপে গণ্য করে তার ন্যায্য মজুরী দানের কথা বলেন। এঁরা সমাজতন্ত্রের কথা ও ধন বন্টনের কথা বলেন। সমাজতান্ত্রিক দল তাঁর নিকট শ্রমিকের স্বার্থরক্ষার জন্যে আইন প্রবর্তনের দাবি জানালে, লুই ফিলিপ Laissez faire বা শিল্পে হস্তক্ষেপ না করার নীতি ঘোষণা করেন। নণ্টস, লায়নস ও বোর্দো শহরে শিল্প শ্রমিকেরা দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধালে লুই ফিলিপ তা দমন করে ধনী বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করেন। এই সময় সমাজতান্ত্রিক নেতা লুই ব্ল্যাঙ্ক অর্গানাইজেশন অফ লেবার (Organisation of Labour) নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে লুই ব্ল্যাঙ্ক বলেন যে ঃ—(১) শ্রমিক শ্রেণী ভোটাধিকার দ্বারা আইন সভায় নিজ প্রতিনিধি নির্বাচন করে, শ্রমিকের স্বার্থে আইন রচনায় সরকারকে বাধ্য না করলে শ্রমিকের উন্নতি হবে না। (২) কর্মহীন ব্যক্তিদের কর্ম সংস্থান হল রাষ্ট্রের দায়িত্ব। এজন্য জাতীয় কর্মশালা (National Workshop) খুলে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা দরকার। লুই ফিলিপ এই দুটি দাবীর কোনটিকেই গ্রহণ করেননি। ফলে সমাজতান্ত্রিক দল ও শ্রমিক শ্রেণী তাঁর সরকারের পতন কামনা করে। তারা প্রজাতন্ত্রীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে বিদ্রোহের জন্যে গুপ্ত সমিতি গঠন করে। লুই ফিলিপ এর উত্তরে কতকগুলি শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী আইন পাশ করান। যথা, (ক) মজুরী বৃদ্ধি আন্দোলন নিষিদ্ধকরণ; (খ) ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন নিয়ন্ত্রণ মূলক আইন প্রভৃতি। জর্জ রুডের মতে, ফ্রান্সের ইতিহাসে এই প্রথম শ্রমিকদের মধ্যে রাজনৈতিক ও শ্রেণী চেতনার প্রকাশ দেখা যায়। শ্রমিকরা সমাজতান্ত্রিকবাদের প্রভাবে সক্রিয়ভাবে লায়নস, নন্টস প্রভৃতি শহর বিদ্রোহে অংশ নেয়। লুই ফিলিপ ইতিহাসের এই ইঙ্গিত উপেক্ষা করেন।

ধনী বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতি লুই ফিলিপেব সমর্থন

সিংহাসনে বসার পর লুই ফিলিপ যদি ভোটাধিকার আইন সংস্কার করে সর্বসাধারণকে ভোটাধিকার দিতেন, তবে তাঁর সিংহাসনের বুনিয়াদ মজবুত হত। কিন্তু লুই ফিলিপ পাতি বুর্জোয়া বা নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আস্থা হারান। তিনি যে ভোটাধিকার আইন চালু করেন তার দ্বারা প্রতি ১৫০ জন পুরুষ নাগরিকের মধ্যে মাত্র ১ জনের ভোটাধিকার ছিল। নিম্ন মধ্যবিত্তদের ভোটাধিকার না থাকায় তারা জুলাই রাজতন্ত্রকে উচ্চ বুর্জোয়া শ্রেণীর পুঁজিবাদী সরকার বলে অভিহিত করত। সাধারণ মধ্যবিত্তরা শিক্ষিত, বুদ্ধিদীপ্ত ও সাহসী শ্রেণী। এরা অধ্যাপনা, আইন ব্যবসায় ও সরকারি চাকুরী দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করত। এই শ্রেণীর মুখপাত্র ছিলেন লা-মার্টিন, থিয়ার্স প্রভৃতি নেতা। এঁরা বুর্জোয়া শ্রেণীর রাজনৈতিক আধিপত্য নাশের জন্যে ভোটাধিকার সম্প্রসারণ দাবী করেন।

সাধারণ মধ্যবিত্ত বা পাতি বুর্জোয়া শ্রেণী কর্তৃক ভোটাধিকার বাড়াইবার দাবী

১৮৩০ খ্রীঃ পর ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্রবাদ বলবতী হওয়ার সামাজিক কারণ ছিল পাতি বুর্জোয়া শ্রেণীর রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি। এই যুগের বহুচিন্তাবিদ ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাসকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করেন। তাঁরা জ্যাকোবিনদের উগ্র প্রজাতন্ত্রবাদের সমর্থক ব্যাখ্যা দেন।সন্ত্রাসের রাজত্বের রক্তপাতে ও ভয়াবহতা অতিক্রম করে তার কল্যাণমূলক দিকগুলির উল্লেখ করেন। জুলেস মিশেল ও লা-মার্টিন ফরাসী বিপ্লবেব যুগের প্রজাতন্ত্রের বন্দনা করেন। লা-মার্টিন জ্যাকোবিনদের ইতিহাস রচনা করেন। এই রচনাগুলি পাতি বুর্জোয়া মানসিকতাকে প্রভাবিত করে। ১৮৩০ খ্রীঃ এর জুলাই বিপ্লবকে প্রজাতন্ত্রীরা যোগ দেয়। তারপর তাদের শক্তি ধাপে ধাপে বাড়তে থাকে। ১৮৩০-এর সাংস্কৃতিক রাজতন্ত্র যা লুই ফিলিপ চালু করেন তাকে তারা একটি সাময়িক ব্যবস্থা বলেই মনে করত। চিরদিনের জন্যে ফ্রান্সে এই সংবিধান মেনে চলতে প্রজাতন্ত্রী দল রাজী ছিল না। লুই ফিলিপের ধনী বুর্জোয়া তোষণ নীতি ও বন্ধ্যা বৈদেশিক নীতিকে প্রজাতন্ত্রীরা সহ্য করতে প্রস্তুত ছিল না। প্যারিসের জনতার মধ্যে প্রজাতন্ত্রী মনোভাব দ্রুত ছড়িয়ে পড়লে, লুই ফিলিপের সিংহাসনের সামাজিক ভিত্তিভূমি টলে যায়। মরিস আগুনহন (Mourice Agulhon) "প্রজাতন্ত্রবাদকে সম্মান জ্ঞাপন না করে ১৮৩০-এর জুলাই বিপ্লবে প্রজাদের জঙ্গী অভ্যুত্থানকে সম্মান জানানো সম্ভবপর ছিল না।" সমাজতান্ত্রিক নেতা লুই ব্ল্যাঙ্কের গ্রন্থ Organisation of Labour এই সময় শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। লুই ব্ল্যাঙ্ক পুঁজিবাদের এবং একচেটিয়া বাণিজ্যের অবসান দাবী করেন। জীবিকার সংস্থান এবং বেকারের কাজের ব্যবস্থা করার দাবীও তিনি করেন। লুই ব্ল্যাঙ্কের ভাবধারা চিন্তাশীল লোকদের নাড়া দেয়। ভোটাধিকার বাড়িয়ে পার্লামেন্টে শ্রমিক ও নিম্ন মধ্যবিত্তের প্রতিনিধিদের সংখ্যা বাড়ালে পার্লামেন্টে নতুন আইন দ্বারা এই সকল সংস্কার করা যাবে মনে করা হয়। নিম্ন মধ্যবিত্ত সমর্থিত প্রজাতন্ত্রী দল—"মানব অধিকার রক্ষার সমিতি" নামে এক সমিতি স্থাপন করে ভোটাধিকার বাড়াবার জন্যে তীব্র প্রচার চালায়। সমাজতন্ত্রীরাও এর সামিল হয়। এক শ্রেণীব উদারতন্ত্রীরাও এই ভোটাধিকার আন্দোলনের সামিল হয়। এই গোষ্ঠীর দাবী ছিল ভোটাধিকার বাড়িয়ে সংস্কার প্রবর্তন করা। ফলে ভোটাধিকার সম্প্রসারণের দাবী প্রবল হয়ে ওঠে। এই উদ্দেশ্যে সর্বত্র সভা-সমিতি করা হয় । এই সভাগুলির নাম ছিল—"সংস্কারের ভোজসভা" (Reform Bauquet)। ২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৪৮ খ্রীঃ প্যারিসের ময়দানে (Boulevard) ভোটাধিকার সম্প্রসারণের দাবীতে এক কেন্দ্রীয় জমায়েত আহুত হয়। লুই ফিলিপের মুখ্যমন্ত্রী গুইজো (Guizot) এই সভা নিষিদ্ধ করেন। এই নিষেধের ফলে ক্ষিপ্ত জনতা গুইজোর বাসভবন আক্রমণ করলে রক্ষীদল গুলি চালায় এবং কিছু লোক নিহত হয। এই ঘটনার প্রতিবাদে প্যারিসের বাম উদারতন্ত্রী দল, প্রজাতন্ত্রী দল এবং সমাজতন্ত্রী দল বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ফলে লুই ফিলিপ ২৪শে ফেব্রুয়ারি তাঁর পৌত্রের অনুকূলে পদত্যাগ করেন। লুই ফিলিপের পতনের ফলে ধনী বুর্জোয়া শ্রেণীর আধিপত্য ধ্বংস হয়। সর্বসাধারণের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়। জ্যাক ড্রজ ও ম্যারিয়ট প্রভৃতি ঐতিহাসিকেরা এই কারণে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অসন্তোষকেই ফ্রান্সে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের প্রধান কারণ বলে মনে করেন। প্রজাতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক দল এই অসন্তোষের সুযোগে জুলাই রাজতন্ত্রের পতন ঘটায়। নিম্ন মধ্যবিত্ত ও শ্রমিক শ্রেণী রাস্তায় অবরোধ গড়ে যুদ্ধ চালায়।

লুই ফিলিপের পতনের জন্যে পাতি বুর্জোয়া ও শ্রমিক শ্রেণীর বিক্ষোভ প্রধানতঃ দায়ী হলেও অন্যান্য কয়েকটি কারণ ছিল।

লুই ফিলিপেব জনপ্রিয়তার অভাব

লুই ফিলিপের কোন ব্যক্তিগত প্রতিভা ছিল না। তিনি ছিলেন প্রকৃতই নাগরিক রাজা (Citizen King)। পাণ্ডিত্য অথবা বক্তব্যের চটক তাঁর ছিল না। জনসাধারণকে আকর্ষণ করার মত কোন গুণের তিনি অধিকারী ছিলেন না। ফ্রান্সের ন্যায় দেশ শাসন করতে যে ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন তার অভাব

তাঁকে জনপ্রিয়তা লাভে বঞ্চিত করে। তাঁর মধ্যে রাজকীয় আড়ম্বর ছিল না। বরং তাঁর সাদাসিদা মধ্যবিত্ত জীবনধারা জনসাধারণকে ক্লান্ত করে। তিনি রঙিন ছাতা মাথায় প্যারিসের রাস্তায় হাঁটতেন, কফিখানায় ঢুকে কফি খেতেন। তাঁর পুত্র-কন্যাদের পাবলিক বিদ্যালয়ে পড়তে পাঠান। এজন্যে ফরাসীরা বলতে থাকে তাঁর মধ্যে মহিমাময় কিছু নেই। তাঁর বংশ গরিমাও ছিল না। বিদ্যার গৌরবে তিনি ছিলেন বঞ্চিত। জনতাকে আকর্ষণ করার মত ক্ষমতা তাঁর ছিল না।

১৮৩০-১৮৪০ খ্রীঃ পর্যন্ত লুই ফিলিপকে বিভিন্ন বিদ্রোহ ও রাজনৈতিক অভ্যুত্থানের মোকাবিলা করতে হয়। নায্য অধিকারবাদী বুরবোঁ শাসনপন্থী দলের চোখে তিনি ছিলেন সিংহাসনে জবরদখলকারী। ক্যাথলিক দল তাঁর ধর্মনিরপেক্ষতা নীতিকে ঘৃণা করত। প্রজাতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রীরা যে তাঁর তীব্র বিরোধী ছিল তা আগেই বলা হয়েছে। ১৮৩০-৪০ খ্রীঃ পর্যন্ত এই দলগুলি এবং লুই নেপোলিয়নের বোনাপার্টবাদী দল কয়েকবার নিস্ফল বিদ্রোহ করে। এই বিদ্রোহের আঘাত থেকে তাঁর সিংহাসন রক্ষার জন্যে ১৮৪০ খ্রীঃ পর্যন্ত লুই সংবিধান মেনে চলেন। ১৮৪০ খ্রীঃ পর তাঁর আসল চরিত্র প্রকাশিত হয়।

লুই ফিলিপ ছিলেন "ভণ্ডামির অবতার" (Master in the art of dissimulation)।[১] তিনি মুখে সাংবিধানিক রাজা হিসেবে শপথ নেন। কিন্তু অন্তরে স্বৈরতন্ত্র স্থাপনের জন্যে তিনি আগ্রহী ছিলেন। জ্যাক ড্রজের মতে, "জেদী, বাস্তববাদী, নীতিজ্ঞানহীন লুই ফিলিপ তাঁর বাহ্যিক ভালোমানুষীর তলায় ক্ষমতা লাভের অদম্য আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতেন।" ফ্রান্সের সাধারণ মানুষ আশা করত যে, লুই ফিলিপ ভোটাধিকার সম্প্রসারণ করে নিম্ন মধ্যবিত্ত ও শ্রমিক শ্রেণীর আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবেন। ভিক্টর হিউগোর লে মিজারেবলস নামক উপন্যাসে, জর্জ স্যাণ্ডের উপন্যাসে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিধ্বনিত হয়। কিন্তু লুই ফিলিপ সংবিধানী শাসনের আড়ালে স্বৈরতন্ত্র স্থাপনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৮৪০ খ্রীঃ পর লুই ফিলিপ তাঁর মন্ত্রী গুইজোর সাহায্যে সরকাবি অর্থ বিতরণ করে নির্বাচকমণ্ডলীকে প্রভাবিত করেন। নিজ সমর্থক দ্বারা পার্লামেন্টের সদস্য পদগুলি পূর্ণ করেন। এর ফলে ফরাসী পার্লামেন্ট তার স্বাধীন চরিত্র হারিয়ে লুই ফিলিপের দরবারী সভায় (Courtiers) পরিণত হয়। থিয়ার্স এজন্যে পার্লামেন্টের সদস্যদের ধিক্কার জানিয়ে বলেন যে, "ফরাসী পার্লামেন্ট হল একটি বাজার, যেখানে সদস্যরা তাঁদের বিবেক বিক্রি করেন।" এরূপ বংশবদ পার্লামেন্টের সাহায্যে ফিলিপ নিজ ইচ্ছামত শাসন চালাতে থাকেন।[২]

লুইফিলিপের স্বৈর-শাসন নীতি : মধ্যবিত্ত হতাশা

লুই ফিলিপের এই স্বৈরশাসন রাজনৈতিক দলগুলি আদপেই পছন্দ করত না। প্রজাতন্ত্রী সংবাদপত্রগুলি তাঁর সমালোচনা করে। প্রজাতন্ত্রী Tribune পত্রিকাকে তিনি দমন করার জন্যে এই পত্রিকার বিরুদ্ধে শতাধিক মামলা করেন এবং ১ লক্ষ ৩৭ হাজার ফ্রাঁ জরিমানা আদায় করেন। লুই ফিলিপের এই স্বৈর শাসনকে Personal Government বা ব্যক্তি শাসন বলা হত। বুদ্ধিজীবি এবং মন্ত্রী গুইজো এই ব্যবস্থার সমর্থনে যুক্তি দেখান যে, "সিংহাসন খালি চেয়ার নয়" (Throne is not an empty chair) অর্থাৎ রাজার হাতে ক্ষমতা থাকাই নিয়ম। লুই ফিলিপের এই স্বৈরনীতির ফলে তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির সমর্থন হারান। তাঁর পতন আসন্ন হয়।

লুই ফিলিপের নির্দেশে মন্ত্রী সভার পদচ্যুতি

লুই ফিলিপের বৈদেশিক নীতিও জাতির পক্ষে দুর্বিসহ ছিল। ফ্রান্সের জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকেরা বলেন যে, গৌরবপিয়াসী ফরাসী জাতি ওয়াটার্লুর যুদ্ধের পরাজয় ও ভিয়েনা

১· C. D. Hazen—Europe Since Napoleon
২· Quoted by C. D. Hazen.

লুই ফিলিপের বন্ধ্যা বৈদেশিক নীতি

চুক্তির অপমান মোচনের জন্যে একটি শক্তিশালী বৈদেশিক নীতি কামনা করত। লুই ফিলিপ জাতির এই ইচ্ছাকে সম্মান দেননি। তিনি শান্তি নীতি ও স্থিতাবস্থা বজায় রাখার (Peace at any price policy) পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি জানতেন যে, ইওরোপের বংশানুক্রমিক রাজারা তাঁর ন্যায় হঠাৎ রাজাকে (King by accident) পছন্দ করত না। ফ্রান্সে যুদ্ধ বাঁধলে তাঁরা তাঁর পতন ঘটাত। এমতাবস্থায় তিনি বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শান্তি বজায় রাখার নীতি গ্রহণ করেন। তাছাড়া যুদ্ধ-বিগ্রহ বাঁধলে বুর্জোয়া শ্রেণীর বাণিজ্যের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কায় গুইজোর পরামর্শে তিনি অখণ্ড শান্তির নীতি অনুসরণ করেন। বৈদেশিক শক্তিগুলির মধ্যে লুই ফিলিপ একমাত্র ব্রিটিশ সরকারের নিকট কিছুটা সমর্থন পান। এজন্যে যে কোন মূল্যে ইংলণ্ডের সঙ্গে মিত্রতা বজায় রেখে তিনি তাঁর সিংহাসনকে সুরক্ষিত করার চেষ্টা করেন।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ফ্রান্সের ক্ষমতা বিস্তারের অনুকূল হলেও লুই ফিলিপ যুদ্ধ বাঁধবার ভয়ে নিস্ক্রিয় নীতি নেন। তিনি থিয়ার্সের সমালোচনার উত্তরে জানান যে, "প্রয়োজন হলে তিনি ১০০ টি পার্লামেন্ট ভঙ্গ করবেন কিন্তু তিনি যুদ্ধ করবেন না।" (১) জুলাই বিপ্লবের পর বেলজিয়াম হল্যাণ্ডের অধীনতা ত্যাগ করে স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং ফ্রান্সের সাহায্য প্রার্থী হয়। কিন্তু ইংলণ্ডের অসন্তুষ্টির ভয়ে লুই ফিলিপ বেলজিয়াম থেকে হাত গুটিয়ে নেন। পার্লামেন্টকে তিনি জানান যে, বেলজিয়ামে ফ্রান্স যা কিছু করবে তা ইংলন্ডের সহযোগিতা নিয়েই করবে। (২) অস্ট্রিয়ার বিরূপতার ভয়ে তিনি ইতালি ও পোল্যাণ্ডের জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহে সহায়তা দিতে বিবত থাকেন। (৩) মিশরের পাশা ও মহম্মদ আলি তুরস্কের সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে ফ্রান্স মিশরের পক্ষ নেয়। ফরাসী মন্ত্রী থিয়ার্স মহম্মদ আলিকে সাহায্য দেওয়াব জন্যে চেষ্টা করলে লুই ফিলিপ তাঁকে পদচ্যুত করেন। ইংলন্ড তুরস্কের পক্ষ নিলে ইংলন্ডেব বিরূপতার ভয়ে লুই ফিলিপ মহম্মদ আলির পক্ষ ত্যাগ করেন। ফলে মিশরে ফরাসী প্রভাব বিস্তারের সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট হয়। (৩) লুই ফিলিপের পুত্র ফ্রান্সের যুবরাজ বা দ্যফিনের সঙ্গে স্পেনের সিংহাসনের উত্তবাধিকারিণী স্পেনের রাজকন্যা লুইসার বিবাহ সম্পর্ক স্থির হয়। এর ফলে ফ্রান্স ও স্পেনের সিংহাসন মিলিত হওয়ার সুযোগ দেখা দেয়। কিন্তু ইংলণ্ডের প্রতিবাদে লুই ফিলিপ এই বিবাহ সম্পর্ক ভেঙে দেন। ফিলিপের এই নিস্ক্রিয় ও ক্লীব বৈদেশিক নীতিব বিরুদ্ধে বোনাপার্ট দল তীব্র প্রতিবাদ জানায়। জনমত লুই ফিলিপের বিরুদ্ধে যায়।

আলফ্রেড কোব্বানেব মতে, স্বদেশে ও বিদেশে সর্বক্ষেত্রে লুই ফিলিপের এই নিস্ফলা নীতিতে হতাশ হয়ে কবি লা-মার্টিন মন্তব্য করেন যে, "ফ্রান্স বিরক্ত ও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে" (La France cest ennui)। এমতাবস্থায় উদারপন্থী দল ভোটাধিকার সম্প্রসারণের দাবীতে আন্দোলন গড়ে তুলে। ফ্রান্সের কোন রাজনৈতিক দল লুই ফিলিপের সমর্থনে এগিয়ে না আসায় তাঁর পতন ত্বরান্বিত হয়। ১৮৪৮ খ্রীঃ ২২শে, ২৩শে ফেব্রুয়ারিতে দাঙ্গা ও বিক্ষোভের পর লুই ফিলিপ ২৪শে ফেব্রুয়ারি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। জুলাই রাজতন্ত্রের পতন ঘটে।

ফবাসী জাতিব হতাশা ঃ
কোবানেব অভিমত ঃ
বাজনৈতিক দলগুলিব বিরোধিতা

এক্ষণে দুটি প্রশ্ন আসে। প্রথমতঃ, লুই ফিলিপের পতন তাঁর আভ্যন্তরীন নীতির বিফলতা অথবা বৈদেশিক নীতির নিস্ফলতার জন্যে ঘটে। এক শ্রেণীর জাতীয়তাবাদী ফরাসী ঐতিহাসিক বলেন যে, গৌরব-পিপাসু ফরাসী জাতিকে যুদ্ধজয়ের মদিরা লুই ফিলিপ পানপাত্র ভরে পান করাতে ব্যর্থ হন। এ জন্যেই তাঁর পতন ঘটে। লা-মার্টিন যখন মন্তব্য করেন যে, "ফ্রান্স ক্লান্ত ও বিরক্ত, " তখন তিনি বৈদেশিক নীতির ব্যর্থতার জন্যেই একথা বলেন। আলফ্রেড কোব্বান প্রভৃতি ঐতিহাসিকের মতে, লা-মার্টিনের এই মন্তব্য প্রধানতঃ লুই

ফিলিপের বন্ধ্যা আভ্যন্তরীন নীতির প্রতিই প্রযোজ্য। এই অভিমত মরিস আগুনহান প্রভৃতি ঐতিহাসিক সমর্থন করেন। দ্বিতীয় প্রশ্ন হল যে, ফেব্রুয়ারি বিপ্লবে ফ্রান্সের গ্রামাঞ্চলের লোকেদের কোন ভূমিকা ছিল না। ১৮৪৮ খ্রীঃ বিপ্লব ছিল কেবলমাত্র প্যারিসের, যে শহরের লোক সংখ্যা ৮লক্ষ ৬০ হাজার থেকে বেড়ে ১২ লক্ষ ৫০ হাজারে দাঁড়ায়। এই সঙ্গে গৃহ, জল সরবরাহ, স্বাস্থ্য সমস্যা প্যারিসের নিম্ন মধ্যবিত্ত ও শ্রমিকদের গভীরভাবে বিপর্যস্ত করে। প্যারিসের নাগরিকরাই গোটা ফ্রান্সের ভাগ্য নির্দ্ধারণ করে। এটাই ছিল ১৮৪৮-এর বিপ্লবের শিক্ষা।

ফ্রান্সে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের ফলাফল (Results of the February Revolution in France) ঃ ফ্রান্সে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের (১৮৪৮ খ্রীঃ) কয়েকটি পর্যায় লক্ষ্য করা যায়। ২২শে ফেব্রুয়াবি (১৮৪৮ খ্রীঃ) উদারপন্থী দল ভোটাধিকার সম্প্রসারণের দাবীতে বিক্ষোভ দেখায় এবং মন্ত্রী গুইজোর পদচ্যুতি দাবী করে। লুই ফিলিপ গুইজোকে পদচ্যুত করেন। ফলে বিপ্লবের প্রথম ধাপে উদারপন্থী দলই জয়লাভ করে। উদারপন্থীরা লুই ফিলিপের পৌত্রকে ফ্রান্সের পরবর্তী রাজা বলে ঘোষণা করে। কিন্তু ২৪শে ফেব্রুয়ারি প্রজাতন্ত্রীরা পার্লামেন্টে প্রবেশ করে সদস্যদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে বাধ্য করে। ফলে ফ্রান্সে দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হয় এবং সর্বসাধারণের ভোটাধিকার আইন গৃহীত হয়। বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রজাতন্ত্রবাদ জয়যুক্ত হয়। পাতি বুর্জোয়া শ্রেণী ছিল প্রজাতন্ত্রী দলের প্রধান সমর্থক। সুতরাং ২৪শে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের ফলে এই শ্রেণী জয়লাভ করে। ২৪শে ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ একই দিনে ফ্রান্সের সমাজতন্ত্রী দলও বিদ্রোহ ঘোষণা করে। সমাজতন্ত্রীরা লাল পতাকা নিয়ে প্যারিসের উপকণ্ঠে কল-কারখানায় শ্রমিকদের নিয়ে প্যারিসের রাস্তায় শোভাযাত্রা করে। কিন্তু পাতি বুর্জোয়া প্যারিসের অধিবাসীরা এই শোভাযাত্রার সামিল হয়নি। তারা প্রজাতন্ত্রীদের পক্ষেই থাকে। প্রজাতন্ত্রীরা পার্লামেন্ট ভবনের দখল নিয়েছিল। সমাজতন্ত্রীরা তাদের বাধায় পার্লামেন্টে প্রবেশ কবতে সক্ষম হয়নি। বিপ্লবেব তৃতীয় পর্যায়ে সমাজতন্ত্রীরা অংশ নেয়। প্রজাতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে এক গৃহযুদ্ধ বাধার সম্ভাবনা দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত প্রজাতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রী দল একত্রে এক অস্থায়ী প্রজাতন্ত্র স্থাপন করে। আপাততঃ গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনা দূর হয়। ফ্রান্সে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের তিন পর্যায় যথা উদারতন্ত্রী, প্রজাতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রী পর্যায়গুলি লক্ষ্য করা যায়।

ফ্রান্সের প্রজাতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রী দলেব যুক্ত সমর্থনে দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র ঘোষণা

দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হলে ফ্রান্সে সর্বসাধারণের ভোটাধিকার স্থাপিত হয়। এই সঙ্গে ক্রীতদাস প্রথা লোপের আইন করা হয়। ফ্রান্সের উপনিবেশে যে সকল ক্রীতদাস ছিল তাদের মুক্তি দেওয়া হয়। ফ্রান্সের জাতীয় রক্ষী বাহিনীর গণতন্ত্রীকরণ সম্পন্ন হয়। ন্যাশন্যাল গার্ড বা জাতীয় রক্ষী বাহিনী আগে কেবলমাত্র বুর্জোয়া শ্রেণীর লোকদের দ্বারা গঠিত ছিল। এখন সকল নাগরিক এতে যোগদানের অধিকার পায়।

সর্বসাধাবণের ভোটাধিকার স্থাপন ঃ জাতীয় রক্ষীবাহিনী গঠন

সমাজতন্ত্রবাদীদের দাবী অনুযায়ী প্রজাতান্ত্রিক সরকার Right to work বা সকলের জীবিকা অর্জনের অধিকার আপাততঃ স্বীকার করে। বেকার লোকেদের কর্মসংস্থানের জন্যে জাতীয় কর্মশালা বা ন্যাশন্যাল ওয়ার্কশপ (National workshop) স্থাপিত হয়। প্যারিসে ১০ ঘন্টা ও প্রদেশে ১১ ঘন্টা শ্রমিকদের প্রত্যহ কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। সমাজতান্ত্রিক নেতা লুই ব্ল্যাঙ্ক (Louis Blanc) শ্রমের মূল্য ও শ্রমের মর্যাদা স্থাপনের কথা ঘোষণা করেন।

বেকারদের কর্মসংস্থান ঃ জাতীয় কর্মশালা

অতঃপর ফ্রান্সের প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান রচিত হয়। সর্বসাধারণের ভোটের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন এবং আইনসভার সদস্যদের নির্বাচনের ব্যবস্থা হয়। এই সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন হলে পাতি বুর্জোয়া ও কৃষকের সমর্থন পেয়ে প্রজাতন্ত্রী দল বিপুল জয়লাভ করে। সমাজতন্ত্রী দল নির্বাচনে পরাজিত হয়। এই বিপুল জয়লাভের ফলে প্রজাতন্ত্রীরা আর সমাজতন্ত্রীদের আদর্শ মানতে প্রস্তুত ছিল না। প্রজাতান্ত্রিক নেতা লা-মার্কিন বলেন যে, ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের মূল উদ্দেশ্য ছিল গণভোট প্রবর্তন ও প্রজাতন্ত্র গঠন। যেহেতু এখন সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়েছে, এখন আর বিপ্লব নয় সংহতি স্থাপন প্রয়োজন। লুই ব্লাঙ্ক প্রভৃতি বলেন যে, বিপ্লবের ধ্বংসাত্মক কাজ শেষ হলেও এখন গঠনাত্মক কাজ বাকি। কর্মের অধিকার, ধনবন্টন প্রভৃতির দ্বারা অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা দরকার। প্রজাতন্ত্রীরা রাজনৈতিক গণতন্ত্র নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন। এজন্য তাঁরা লুই ব্লাঙ্ক প্রভৃতিকে মন্ত্রীসভা থেকে বাদ দেয়। তাঁরা বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্যে স্থাপিত সরকারী কর্মশালাগুলি বন্ধ করে দেন। এর ফলে সমাজতন্ত্রীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। শ্রমিকশ্রেণী এঁদের ডাকে রাস্তায় অবরোধ রচনা করে। প্যারিসের রাস্তায় ১৮৪৮ খ্রীঃ জুন মাসে ভয়ঙ্কর দাঙ্গা-হাঙ্গামা আরম্ভ হয়। প্রজাতান্ত্রিক সেনাপতি ক্যাভিগন্যাক সেনাদলের দ্বারা প্রায় ১০ হাজার শ্রমিককে হত্যা করে এই বিদ্রোহ দমান। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবে শেষ পর্যন্ত পাতি বুর্জোয়া শ্রেণী, ধনী বুর্জোয়া এবং শ্রমিক উভয়কে হঠিয়ে ক্ষমতা অধিকার করে।

প্রজাতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিকদের গৃহযুদ্ধ

ঐতিহাসিক গ্রেণভিল এজন্য ফ্রান্সের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবকে "অর্দ্ধ বিপ্লব' বা Half Revolution বলে অভিহিত করেছেন। লিপসনের মতে, "১৮৩০ খ্রীঃ জুলাই বিপ্লবে অভিজাততন্ত্রের পতন ঘটে; ১৮৪৮ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারি বিপ্লবে মূলধনী উচ্চ বুর্জোয়া (Haute bourgeois) শ্রেণীর হাত থেকে ক্ষমতা চলে যায়। বুদ্ধিজীবি নিম্ন বুর্জোয়া বা পাতি বুর্জোয়া শ্রেণী ক্ষমতা করায়ত্ব করে।"[১]

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ক্ষমতা লাভ

ফ্রান্সের বাইরে ইওরোপের অন্যান্য দেশে ফেব্রুয়ারি বিপ্লব (The February Revolution in Europe outside France) : উনবিংশ শতকে ফ্রান্স ছিল ইওরোপীয় বিপ্লবী ভাবধারার স্নায়ুকেন্দ্র। ফ্রান্সে বিপ্লব হলে ইওরোপের অন্যান্য দেশে এই বিপ্লবের স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে অগ্নিকাণ্ড সৃষ্টি করে। সমগ্র মধ্য ইওরোপে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পর বিপ্লবী অগ্নি ছড়িয়ে পড়ে। ঐতিহাসিক লজ (Lodge)-এর মতে, "ফ্রান্সের বিপ্লবী চুল্লী হতে উড়ন্ত স্ফুলিঙ্গ ইওরোপের ফাঁপা কাঠের গুদামে পড়লে অগ্নিকাণ্ড সৃষ্টি হয়।"[২] মেটারনিকের মতে, "ফ্রান্সের সর্দি হলে ইওরোপ হাঁচতে আরম্ভ করে" (Europe sneezes when France catches cold)।

জার্মানীর প্রাশিয়া, ব্যাভেরিয়া, ব্যাডেন, স্যাক্সনী, হ্যানোভার, হেসে, উর্টেমবার্গ প্রভৃতি রাজ্যে বিপ্লব ছড়িয়ে পড়ে। এই সকল দেশের প্রজাবর্গ তাদের স্বৈরাচারী শাসকদের মেটারনিকের স্থিতাবস্থা নীতি ত্যাগ করে পার্লামেন্টারী শাসন প্রবর্তনে বাধ্য করে। প্রাশিয়ার রাজা চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়াম প্রাশিয়ায় সাংবিধানিক শাসন স্থাপনের প্রতিশ্রুতি দেন। জার্মানীর ব্যাডেন রাজ্যে সর্বপ্রথম পার্লামেন্টারী শাসন, বাক স্বাধীনতা প্রভৃতি অধিকার সম্বলিত সংবিধান চালু হয়। ক্রমে জার্মানীর আরও রাজ্যে এই সংবিধান চালু হয়। জার্মান জাতীয়তাবাদীরা ফ্রাঙ্কফুর্ট নগরে গণভোটের ভিত্তিতে একটি স্ব-আহুত জাতীয় সভা আহ্বান করে। ১৮১৫ খ্রীঃ স্থাপিত জার্মানীর

জার্মানীতে ফেব্রুয়ারি বিপ্লব

১· Lipson—Europe in the 19nth and 20eth centuries, P. 25.

২· "The Spark that flew from the French furnace fell on unsound timbers of Europe and caused a great conflagration."

ভিয়েনা সংবিধান বাতিল করে, ঐক্যবদ্ধ জার্মান রাষ্ট্র গঠনের জন্যে এই জাতীয় সভা কাজ আরম্ভ করে। শেষ পর্যন্ত ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্ট ঐক্যবদ্ধ জার্মান রাষ্ট্র থেকে অষ্ট্রিয়াকে বাদ দিয়ে, প্রাশিয়ার নেতৃত্বে একটি জাতীয় রাজতন্ত্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়। জার্মানীর এই জাতীয় রাজতন্ত্রকে একটি সাংবিধানিক রাজতন্ত্র হিসেবে ঘোষণার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রাশিয়ার রাজা চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়ামকে জার্মানীর সাংবিধানিক জাতীয় রাজপদ গ্রহণের জন্যে নির্বাচন করা হয়। কিন্তু প্রাশিয়া রাজ চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়াম ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্টের এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলে জার্মানীর ঐক্য প্রচেষ্টা বিফল হয় (ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্ট সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পরে অষ্টাদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

অষ্ট্রিয়ার হ্যাপসবার্গ সাম্রাজ্যে ১৮৪৮ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারি বিপ্লব দাবানল সৃষ্টি করে। অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা নগরীতে ১৩ই মার্চ, ১৮৪৮ খ্রীঃ ছাত্র ও শ্রমিকেরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। রাস্তায় অবরোধ তৈরি করা হয়। সরকারী সম্পত্তি লুঠ হতে থাকে। মেটারনিক দেখেন যে, অষ্ট্রিয়ার শাসকশ্রেণী ও অভিজাতরাও তাঁর পক্ষে নেই। সুতরাং মেটারনিক পদত্যাগ করে ইংলন্ডে পালান। মেটারনিকতন্ত্রের পতন ঘটে। অষ্ট্রিয়ার নতুন সংবিধান রচনার জন্যে একটি জাতীয় সভা আহ্বানের প্রতিশ্রুতি সম্রাট দেন। সম্পত্তির ভিত্তিতে ভোটাধিকার গৃহীত হয়। সাধারণ লোকে ভোটাধিকারে বঞ্চিত হয়ে পুনরায় বিদ্রোহ করলে অষ্ট্রিয়ায় সর্বসাধারণের ভোটাধিকার স্থাপিত হয়। এভাবে ভিয়েনাতে গণতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটে। অষ্ট্রিয়ায় মেটারনিকতন্ত্রের পতন হলে লন্ডন টাইমস মন্তব্য করে যে, "পুরাতনতন্ত্রের শেষ রশ্মি আজ নিভে গেল" (The last beam of the Old System has given way)।

ভিয়েনায় বিপ্লব

এর পর অষ্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হাঙ্গেরীতে জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহ দেখা দেয়। হাঙ্গেরীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসীরা ছিল মডিয়ার (Magyar) গোষ্ঠীর লোক। হাঙ্গেরীর মডিয়ার (Magyar)[১] জাতীয়তাবাদের প্রাণপুরুষ লুই কসাথের (Louis Kossuth) নেতৃত্বে মডিয়াররা মার্চ সংবিধান (March Laws) দ্বারা হাঙ্গেরীয় স্বাধীনতা ঘোষণা করে। হ্যাপসবার্গ সম্রাট হাঙ্গেরীর সাংবিধানিক শাসক হিসেবে স্বীকৃত হন। হাঙ্গেরীয়দের একটি জাতীয় পার্লামেন্ট নির্বাচনের জন্যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। প্রকৃত ক্ষমতা হাঙ্গেরীয় পার্লামেন্টের হাতে ন্যস্ত হয়। সম্পত্তির ভোটাধিকারের ভিত্তিতে এই পার্লামেন্ট নির্বাচিত হয়।

হাঙ্গেরীতে বিপ্লব

দক্ষিণ হাঙ্গেরীতে ক্রোট ও সার্ব জাতি বাস করত। হাঙ্গেরীর স্বাধীনতা ঘোষিত হলে তারা আশঙ্কা করে যে, অষ্ট্রিয়ানদের স্থলে উত্তর হাঙ্গেরীর মডিয়াররা তাদের ওপর আধিপত্য করবে। সুতরাং তারা যোসেফ জেলাকিকের (Joseph Jellacic) নেতৃত্বে দক্ষিণ হাঙ্গেরীর স্বাধীনতা ঘোষণা করে। দক্ষিণ হাঙ্গেরীর এই বিপ্লব ছিল ক্রোশিয় জাতীয়তাবাদের প্রকাশ। পরে এই অঞ্চলের নাম হয় যুগোস্লাভিয়া।

দক্ষিণ হাঙ্গেরী

অষ্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যের অন্যতম প্রদেশ বোহেমিয়াতে চেক্ ও শ্লাভ জাতিই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। বোহেমিয়াতে জার্মানরা ছিল সংখ্যালঘু শাসক জাতি। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের প্রভাবে বোহেমিয়ার চেকগণ এই প্রদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ইয়াংচেক নামে একটি গোষ্ঠী সম্রাটের কাজে চেক এবং জার্মান জাতি ও ভাষার সমান মর্যাদা ও চেক জাতির জন্যে একটি স্বতন্ত্র পার্লামেন্ট ও সংবিধান দাবী করে। হ্যাপসবার্গ সম্রাটকে সাংবিধানিক শাসক হিসেবে স্বীকার করে বোহেমিয়ায় একটি শ্লাভ জাতীয় রাষ্ট্র ঘোষণা করা হয়। হ্যাপসবার্গ সম্রাট আপাততঃ অন্য কোন উপায় না থাকায় চেকদের দাবী মেনে নেন।

বোহেমিয়ায় চেক বিপ্লব

১· এই Magyar শব্দটির বিশুদ্ধ উচ্চারণ মডিয়ার হবে—See Oxford Dictionary.

অষ্ট্রিযার সাম্রাজ্যভুক্ত উত্তর ইতালীর লম্বার্ডি ও ভিনিসিয়া প্রদেশেও জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহ দেখা দেয়। ১৮ই মার্চ মিলানে এক বিরাট গণ অভ্যুত্থানের ফলে অষ্ট্রিয়ার ১৩ হাজার সেনা বিনা যুদ্ধে মিলান ছেড়ে চলে যায়। ভেনিসের এক জাতীয়তাবাদী আইনজীবি ড্যানিয়েল ম্যানিনের নেতৃত্বে গণ বিক্ষোভের ফলে ভেনিস থেকে অষ্ট্রিয় নৌ ও স্থল সেনা চলে যায়। মিলান ও ভেনিসের অনুকরণে লম্বার্ডি ও ভিনিসিয়ার সকল কমিউন বা পৌরসভাগুলিতে বিদ্রোহের ফলে হ্যাপসবার্গ শাসকরা পালান। লম্বার্ডি হতে অষ্ট্রিয় সেনাপতি রাডেটেস্কি (Radetezky) পশ্চাদপসরণ করে ভিনিসিয়া প্রদেশের কোয়ড্রিল্যাটার‍্যাল দুর্গে আশ্রয় নেন। ইতালীতে জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহ প্রবলবেগে ছড়িয়ে পড়ে।

অষ্ট্রিয়া অধিকৃত উত্তব ইতালী

ইতালীর পিডমন্টের রাজা চার্লস এলবার্ট প্রজাদের দাবী মেনে নিয়ে স্ট্যাটুটো (Statuto) নামে এক সংবিধান গ্রহণ করেন। তিনি সম্পত্তির ভিত্তিতে ভোটাধিকার ও পার্লামেন্ট প্রবর্তন করেন। অষ্ট্রিয়ার হাত থেকে ইতালীকে মুক্ত করার মানসে তিনি অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এদিকে ইতালীয় বিপ্লবী ম্যাৎসিনী রোমে এক প্রজাতন্ত্র স্থাপন করে ইয়ং ইতালীয় দলের নেতৃত্বে ইতালীকে ঐক্যবদ্ধ করার সঙ্কল্প নেন। ইতালীতে পিডমন্ট রাজ চার্লস এলবার্টের নেতৃত্বে রাজতান্ত্রিক ও ম্যাৎসিনীর নেতৃত্বে প্রজাতান্ত্রিক মুক্তিযুদ্ধ আরম্ভ হয়।

অবশিষ্ট ইতালীতে বাজতন্ত্রী ও প্রজাতন্ত্রী বিপ্লব

ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের বিফলতা ও তার কারণ (The collapse of the February Revolution and its causes) : ফেব্রুয়ারি বিপ্লব প্রায় সমগ্র ইওরোপকে প্লাবিত করলেও শেষ পর্যন্ত অধিকাংশ স্থানে এই বিপ্লব বিফলতায় পর্যবসিত হয়। ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রী দলের মধ্যে বিরোধের ফলে, ফ্রান্সে বিপ্লবের গতি স্তব্ধ হয়। ফ্রান্সের নতুন সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর বোনাপার্ট দলের নেতা লুই নেপোলিয়ন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। তিনি ২রা ডিসেম্বর, ১৮৫১ খ্রীঃ ফ্রান্সের প্রজাতন্ত্রকে ধ্বংস করে নিজেকে সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করেন। ইওরোপের অন্যান্য দেশের বিপ্লবের প্রতি ফ্রান্স যথাযোগ্য নেতৃত্ব ও সহায়তা দিতে বিরত থাকে। বিপ্লবের পিতৃভূমি হিসেবে ফ্রান্সেরই কর্তব্য ছিল অন্যান্য দেশের বিপ্লবে সাহায্য করা। কিন্তু ফ্রান্সের ঔদাসীন্য বিপ্লবের সফলতাকে ব্যাহত করে। এমন কি ইতালীতে ম্যাৎসিনীর প্রজাতন্ত্র ধ্বংস করার জন্যে ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন তাঁর বাহিনী পাঠান। তৃতীয় নেপোলিয়নের এই প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা ফ্রান্সে ও ইতালীতে বিপ্লবকে ধ্বংস করে।

ফ্রান্স ও জার্মানীতে বিপ্লবেব বিফলতা

জার্মানীতে বিপ্লবের বিফলতার কয়েকটি কারণ ছিল। প্রাশিয়া রাজ চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়াম জার্মানীর জাতীয়তাবাদের পক্ষে মৌখিক সমর্থন জানালেও বাস্তব ক্ষেত্রে তিনি নেতৃত্ব দানে বিরত থাকেন। ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্ট তাঁকে জার্মানীর সাংবিধানিক রাজপদ গ্রহণের প্রস্তাব দিলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। অষ্ট্রিয়ার সেনাদল ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্ট ভেঙে দিলে তিনি নীরব দর্শকের ভূমিকা নেন। ফলে জার্মানীর জাতীয়তাবাদী বিপ্লব অষ্ট্রিয়ার দ্বারা দমিত হয়। ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্ট ছিল বুর্জোয়া ও বুদ্ধিজীবীদের সমাবেশ। এই পার্লামেন্টের পশ্চাতে শ্রমিক ও সাধারণ লোকদের সমর্থন না থাকায় এই পার্লামেন্টকে দমন করা সহজ হয়। এই পার্লামেন্টের পশ্চাতে কোন সরকারের সমর্থন না থাকায়, এই পার্লামেন্টের সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করা সম্ভব হয় নি।

ইতালীতে বিপ্লবের ব্যর্থতার কারণ ছিল অষ্ট্রিয়ার সামরিক প্রাধান্য। অষ্ট্রিয়ার সেনাপতি রাডেটস্কি ছিলেন পোড় খাওয়া নেতা। তিনি কোয়াড্রিল্যাটার‍্যাল দুর্গ থেকে ইতালীর জাতীয়

বাহিনীর মধ্যে অনৈক্য লক্ষ্য করে ঠিক সময়ে পাল্টা আঘাত হানেন। কাস্টোৎসার যুদ্ধে তিনি পিডমন্টের রাজা চার্লস এলবার্টকে পরাস্ত করেন। চার্লসের সহযোগী নেপলস রাজ ফার্দিনান্দ দ্রুত তাঁর পক্ষ ত্যাগ করেন। চার্লস পুনরায় আক্রমণের উদ্যোগ নিলে নোভারার যুদ্ধে পিডমন্টের রাজার চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে। রাডেটস্কি চার্লস এলবার্টকে পদত্যাগে বাধ্য করেন। ভিক্টর ইম্যানুয়েল পিডমন্টের রাজা হয়ে অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে স্থিতাবস্থা রক্ষা করায় বাধ্য করেন। মধ্য ও উত্তর ইতালীতে অষ্ট্রিয়ার আধিপত্য পুনঃ-স্থাপিত হয়। এদিকে ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন ফরাসী সেনাদল পাঠিয়ে রোমে ম্যাৎসিনীর প্রজাতান্ত্রিক সরকারকে দমন করলে ইতালীর বিপ্লবের পতন ঘটে। তাছাড়া ইতালীয় জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে মতের মিল ছিল না। এক শ্রেণীর নেতা পিডমন্টের নেতৃত্বে রাজনৈতিক ঐক্য চান। অপর দিকে ম্যাৎসিনী ও তাঁর সমর্থকরা ইয়ং ইতালী দলের নেতৃত্বে প্রজাতান্ত্রিক ঐক্য চান।

ইতালীর বিপ্লব দমন

ইতিমধ্যে অষ্ট্রিয়ার সেনাপতি ভিন্দিসগ্রাৎস (Windischgratz) ভিয়েনার বিদ্রোহ দমন করে হ্যাপসবার্গ সম্রাটের স্বৈরশাসন ফিরিয়ে আনেন। সম্রাট ফার্দিনান্দ পদত্যাগ করেন। অষ্ট্রিয়ায় নতুন সম্রাট ফ্রান্সিস যোসেফ বিপ্লবী সংবিধান নাকচ করে অষ্ট্রিয়ায় পুনরায় স্বৈরশাসন স্থাপন করেন। বোহেমিয়ার বিদ্রোহ এই সঙ্গে দমিত হয়। ভিন্দিসগ্রাৎস ও রাডেটস্কি এবং সেনাপতি জেলাকিক চেক বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে তাঁদের সামরিক উদ্যম সফলভাবে প্রয়োগ করেন। চেক ও স্লাভদের মধ্যে বিরোধ থাকায় তাদের প্রতিরোধ দুর্বল হয়ে পড়ে। চেকদের স্লাভ জাতীয়তাবাদের উগ্রতায় চেক দেশের জার্মানরা বিরুদ্ধে চলে যায়। একমাত্র হাঙ্গেরী তখনও স্বাধীনতা বজায় রাখে। কিন্তু রাশিয়ার জার নিকোলাস পুরাতনতন্ত্র পুনঃ-প্রতিষ্ঠার জন্যে অষ্ট্রিয়ার সাহায্যে এগিয়ে আসেন। রাশিয়া থেকে ১ লক্ষ ৪০ হাজার সেনা পাঠান হলে অষ্ট্রিয়ার সেনাপতি ভিন্দিসগ্রাৎসের শক্তি বৃদ্ধি হয়। দক্ষিণে হাঙ্গেরীতে অষ্ট্রিয় সেনাপতি জেলাকিক ক্রোট ও রুমানিয়ানদের বিদ্রোহ দমন করেন। এবার অষ্ট্রিয় ও রুশ সেনা দুদিক থেকে উত্তর হাঙ্গেরীতে সাঁড়াশী আক্রমণ চালায়। হাঙ্গেরীয় জাতীয় বাহিনীর সেনাপতি আর্থার গোরগে আত্মসমর্পণ করেন। হাঙ্গেরীয় জাতীয়তাবাদের নায়ক লুই কসাথ তুরস্কে আশ্রয় নেন। হাঙ্গেরীর বিপ্লব দমিত হলে হ্যাপসবার্গ সাম্রাজ্যে পুনরায় রক্ষণশীলতা কায়েম হয়।

অষ্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরীর বিপ্লব দমন

১৮৪৮ খ্রীঃ বিপ্লবের বিফলতার অন্যতম কারণ ছিল ইওরোপের বিপ্লবী শক্তিগুলির মধ্যে সংগঠনের অভাব। ফ্রান্স, ইতালী, জার্মানী, হাঙ্গেরী প্রভৃতি দেশের বিপ্লবীদের মধ্যে কোন যোগাযোগ ও যৌথ পরিকল্পনা ছিল না। ফলে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি এই বিভেদের সুযোগ নেয়। দ্বিতীয়তঃ, এক দেশে যখন বিপ্লবীরা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল তখন প্রতিবেশী দেশের বিপ্লবীরা নিষ্ক্রিয় থাকে। ফলে ইতালীর বিপ্লবীদের সাহায্যে হাঙ্গেরী আগিয়ে আসে নি, অথবা বোহেমিয়ার সাহায্যে হাঙ্গেরী এগোয় নি। তৃতীয়তঃ, এই বিপ্লব ছিল প্রধানতঃ বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত এবং বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর দ্বারা পরিচালিত। Namier-এর মতে, ইহা ছিল "বুদ্ধিজীবীদের বিপ্লব" (Revolution of intellectuals)। ফলে শ্রমিক, কৃষক প্রভৃতি এতে বহুল পরিমাণে নিরপেক্ষ থাকে। সম্পত্তির ভিত্তিতে ভোটাধিকার এই শ্রেণীকে উদ্দীপিত করতে ব্যর্থ হয়। সমাজের সকল শ্রেণীকে একত্রে মিলিত করে পুরাতনতন্ত্র ভাঙার মত দৃঢ়ভাবে গঠন করা যায়নি। সর্বশেষে, অষ্ট্রিয়া, রাশিয়া প্রভৃতি দেশের নিয়মিত, সুশিক্ষিত সেনাদলের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করার ক্ষমতা বিপ্লবীদের ছিল না। ডেভিড টমসনের মতে, এই সময় ইওরোপে এক মড়ক দেখা যায়। ফলে লোকে মৃত্যুভয়ে বিপ্লব সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়ে। তবুও বলা যায়, ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের আঘাতে ভিয়েনা চুক্তির ভিত্তি একেবারে দুর্বল হয়ে যায়। ইওরোপে জাতীয়তাবাদ তীব্রতর হয়।

ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের বিফলতার কারণ

ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের ফলাফল ও গুরুত্ব (The Results and Significance of the February Revolution) : একথা মনে রাখা দরকার যে, ফেব্রুয়ারি বিপ্লব আপাতদৃষ্টিতে ব্যর্থ হলেও তা ভিয়েনা ব্যবস্থা বা Vienna System-এর মৃত্যুর ঘণ্টা বাজিয়ে দেয়। সর্বত্র পুরাতনতন্ত্রের শিকড় ভযানক রকম আলগা হয়ে যায়। ১৮৪৮ খ্রীঃ এব পূর্ববর্তী ইওরোপের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা ১৮৪৮ খ্রীঃ এর পরে হুবহু ফিরে আসেনি। জার্মানীতে ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্টের ব্যর্থতা সত্ত্বেও জার্মান জাতীয়তাবাদ এখন একটি ফুটন্ত লাভায় পরিণত হয়। মেটারনিকতন্ত্রের মজবুত কড়াই না থাকায় তাকে ধরে বাখা সম্ভব হয়নি। প্রাশিয়া এই সুযোগে জার্মান জাতীয়তাবাদীদের স্বাভাবিক ও কাঙ্খিত নেতার পদ নেয়। হ্যাপসবার্গ সাম্রাজ্য যে একটি ভয়ানক নড়বড়ে ও ভঙ্গুর সাম্রাজ্য তা ফেব্রুয়ারি বিপ্লব প্রমাণ কবে দেয়। ১৮৪৮-খ্রীঃ এর পব থেকে অষ্ট্রিয় সম্রাট বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে প্রতিহত করে সাম্রাজ্যের ঐক্য রক্ষায তাঁর সর্বশক্তি নিযোগ কবতে বাধ্য হন। কিন্তু তাতেও কোন ফল হয়নি। শেষ পর্যন্ত হাঙ্গেরীর স্বায়ত্ব-শাসনের দাবী তাঁকে মানতে হয়। ইতালী তাঁব হাতছাড়া হয। স্বাধীন ইতালীর দাবী ক্রমে শক্তিশালী হয়। পিডমন্টই স্বাধীন ইতালীর স্বপ্নকে সফল করে। জার্মানীতে উদীয়মান প্রাশিযা হ্যাপসবার্গ সম্রাটকে কোণঠাসা করে। শেষ পর্যন্ত প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মানী ঐক্যবদ্ধ হয়। সামাজিক দিক থেকে ১৮৪৮ খ্রীঃ-এর বিপ্লব নিঃসন্দেহে বুদ্ধিজীবি ও পাতি বুর্জোযা শ্রেণীর আধিপত্যের সূচনা করে।

ফেব্রুযাবী বিপ্লবেব ফলাফল

মধ্য ইওবোপে সামন্ততন্ত্রের শেষ সংগ্রাম ছিল ১৮৪৮ খ্রীঃ। এর পর আসে বুর্জোয়া যুগ। ১৮৪৮ খ্রীঃ-এর বিপ্লবের ফলে হ্যাপসবার্গ সাম্রাজ্যে বিশেষতঃ অষ্ট্রিয়ার কৃষকরা সামন্ত প্রভুদের নিয়ন্ত্রণ এবং শোষণ থেকে মুক্তি পায়। ভূমিদাস প্রথা দ্রুত ক্ষয় পায়। এর ফলে অষ্ট্রিয়া সহ হ্যাপসবার্গ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশে স্বচ্ছল রাজনীতি সচেতন নিজ জমির মালিক কৃষক শ্রেণীর উদ্ভব হয়। ১৮৪৮ খ্রীঃ বিপ্লব হ্যাপসবার্গ সাম্রাজ্যে এই বিরাট পরিবর্তন ঘটায়।

ইওরোপের সামাজিক কাঠামো ১৮৪৮ খ্রীঃ থেকে এত ভয়ঙ্করভাবে বদলে যায় যে, তার ফলে পুরাতনতন্ত্রী শাসনব্যবস্থা অবান্তর হয়ে পড়ে। নগরগুলি ও নগরবাসী বুর্জোয়া, ছাত্র, শ্রমিকরা এই বিপ্লবে রাস্তায় অবরোধগুলিতে পাশাপাশি লড়াই করে। ইওরোপের বিবর্তনে এখন থেকে গ্রামীণ কৃষক অপেক্ষা নগরবাসীদের ভূমিকা প্রধান হয়ে পড়ে। এ· জে· পি· টেইলারের মতে, ১৮৪৮ খ্রীঃ-এর পর রাজনীতি ও দেশের শাসন সংক্রান্ত বিষয় এখন থেকে আর ধনী ব্যক্তিদের ড্রয়িংরুমে নিয়ন্ত্রিত হত না। এখন তা রাস্তার সাধারণ লোকদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে। এই সাধারণ লোকেদের মধ্যে বুদ্ধিজীবি, পাতি বুর্জোয়া ও শ্রমিকরাই প্রধান ছিল। এদের মধ্যে দুর্দশাগ্রস্ত, অর্দ্ধমজুরী ভোগী অথবা বেকার শ্রমিকরাই ছিল একটি বড় অংশ। শিল্প-বিপ্লবের ফলে এদের সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে। শ্রমিকদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনাও দেখা দেয়। ফ্রান্সে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পর দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা রদ করলে জুন মাসে প্যারিসের রাস্তায় শ্রমিক বিদ্রোহ ছিল শ্রমিকদের সংগঠিত রাজনৈতিক চেতনার প্রকাশ। কার্ল মার্কসের মতে, "জুন মাসে প্যারিসের বিদ্রোহ ছিল আধুনিক সমাজের দুই শ্রেণীর প্রথম সংগ্রাম" যথা বুর্জোয়া পুঁজিবাদী শ্রেণী বনাম শ্রমিক। অন্যান্য স্থানে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবে শ্রমিকরা পাতি বুর্জোয়াদের সঙ্গেই লড়াই-এ অংশ নেয়। বার্লিন, মিলান, প্রাগ প্রভৃতি শহরের বিদ্রোহে শ্রমিকরাও যোগ দেয়।

নেমিয়ার ফেব্রুয়ারি বিপ্লবকে "Revolution of intellectuals" বা বুদ্ধিজীবিদের বিপ্লব বলেছেন। আসলে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের মস্তিষ্ক হিসেবে অনেক স্থানে বুদ্ধিজীবিরাই প্রধান ভূমিকা নেন। ফ্রান্সে কবি লা-মার্টিন, জার্মানীতে অধ্যাপক, ছাত্রগণ, বোহেমিয়াতে ঐতিহাসিক

প্যালাকি, হাঙ্গেরিতে কবি ও সাহিত্যিক পেটোফ্রি এবং ইতালীতে বাগ্মী, পণ্ডিত, আদর্শবাদী দেশপ্রেমিক ম্যাৎসিনী এই বিপ্লবকে প্রেরণা ও নেতৃত্ব দেন। বুদ্ধিজীবি শ্রেণী ইওরোপে ১৮১৫ খ্রীঃ ভিয়েনার স্থিতাবস্থাকে ভেঙে ইওরোপকে জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র, উদারতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক শাসনের অধীনে আনার উদ্যোগ নেন। এই বিপ্লবের বিফলতা দ্বারা তাঁদের কাজের মূল্যায়ণ করা সম্ভব নয়। ভবিষ্যৎ ইওরোপের নীল নক্সা তাঁরাই রচনা করেন। বিপ্লব ব্যর্থ হলেও যে আদর্শের বীজ তাঁরা বপন করেন তা পরবর্তী সময়ে সঞ্জীবিত হয়।

মোট কথা, ১৮৪৮ খ্রীঃ এর ফেব্রুয়ারি বিপ্লবকে ইওরোপের ইতিহাসে একটি যুগ-সন্ধিক্ষণ বলা চলে (A turning point of history)। ট্রেভালিয়নের মতে, "ইতিহাস ইওরোপকে ১৮৪৮ খ্রীঃ এক নতুন যুগে ঢোকার সুযোগ করে দেয়; কিন্তু ইওরোপ সেই সুযোগ নিতে ব্যর্থ হয়।" কিন্তু এই ব্যর্থতাকেই আমরা যেন চূড়ান্ত বলে মনে না করি। ১৮৪৮ খ্রীঃ ইওরোপের ইতিহাসের জমিতে যে বীজ রোপিত হয়, উত্তরকালে তা মহীরুহে পরিণত হয়। ১৮৪৮ খ্রীঃ বিপ্লবী চুল্লীতে পোড়াই হয়ে ইওরোপের নেতাদের মানসিকতা অনেক বেশী পরিণত ও বাস্তবমুখী হয়। ১৮৪৮ খ্রীঃ এর বিপ্লবের ফলেই জাতীয়তাবাদ জোরদার হয়। শেষ পর্যন্ত জার্মানী ও ইতালীতে জাতীয়তাবাদ বিজয়ী হয়। আমরা যদি পরবর্তী ফলের ভিত্তিতে বিচার করি তবে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবকে ব্যর্থ বলতে পারি না। ১৭৮৯ খ্রীঃ মহান ফরাসী বিপ্লবে যার সূচনা, ফেব্রুয়ারি বিপ্লবে তা পরিণতি লাভ করে।

বিভিন্ন দেশে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের ধারা ও বৈশিষ্ট্য (Common elements of the February Revolution of 1848-49) : ১৮৪৮ খ্রীঃ ফ্রান্সে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে জার্মানী, অষ্ট্রিয়া ও হ্যাপসবার্গ সাম্রাজ্যে, ইতালী প্রভৃতি দেশে বিপ্লব আরম্ভ হয়। ঐতিহাসিক লজের মতে, ফ্রান্সের বিপ্লবী চুল্লী থেকে উত্থিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ইওরোপের দাহ্য পদার্থের ওপর পড়লে দাবানল সৃষ্টি হয়। ফ্রান্সে বিপ্লব শুরু হওয়ার অল্পদিনের মধ্যে প্রায় গোটা ইওরোপে বিশেষতঃ মধ্য ইওরোপে বিপ্লবের ঝড় বইতে থাকে। অষ্ট্রিয়া ও জার্মানীতে মেটারনিকতন্ত্র ভেঙে পড়ে। হ্যাপসবার্গ সাম্রাজ্যে জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহ দেখা দেয়। জার্মানীতে ঐক্যবদ্ধ জার্মানী গঠনের উদ্যোগ শুরু হয়। ইতালীর স্বাধীনতার জন্যে অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী যুদ্ধ শুরু হয়। এভাবে প্রায় গোটা ইওরোপ আলোড়িত হয়। যে বিপ্লব ১৮১৫ খ্রীঃ ভিয়েনা মানচিত্র ও সমাজ ব্যবস্থাকে বদলে দিতে উপক্রম করে তার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে ঐতিহাসিকরা আলোচনা করেন। বিভিন্ন দেশে যে একই সঙ্গে বিপ্লব শুরু হয় তার মধ্যে কোন সম-চরিত্র ও সম-আদর্শ ছিল কিনা তা আলোচনা করা দরকার। ঐতিহাসিকদের মতে, কোন কোন ক্ষেত্রে সাদৃশ্য ও সম-চরিত্র ছিল সন্দেহ নেই। আবার বিভিন্ন বিপ্লবগুলির মধ্যে পার্থক্যও ছিল।

ডাঃ চার্লস পাউথাসের অভিমত : ফেব্রুয়ারি বিপ্লবগুলির স্বাতন্ত্রতা ও বিভিন্নতা

কেমব্রিজ অধ্যাপক ডাঃ চার্লস পাউথাসের মতে, প্রতি দেশে ১৮৪৮ খ্রীঃ-এর বিপ্লব স্থানীয় কারণে স্বতন্ত্রভাবে ঘটেছিল। "যদিও এই বিপ্লবগুলি ছিল সমকালীন এবং সম-আদর্শে উদ্দীপিত তবুও এগুলি ছিল স্বতন্ত্র ঘটনা।"[১] ডাঃ পাউথাসের মতে, বিভিন্ন বিপ্লবগুলির মধ্যে কোন যোগসূত্র ছিল না। এই বিপ্লবগুলিকে পরিচালনার জন্যে কোন কেন্দ্রীয় বিপ্লবী পরিষদ ছিল না। এক দেশের বিপ্লবীরা অন্য দেশের বিপ্লবীদের সঙ্গে কোন যোগাযোগ রাখত না। ইওরোপের বিপ্লবীদের সাহায্যের জন্যে ফ্রান্স এগিয়ে আসেনি। বোহেমিয়ার বিপ্লবের

১· "Although the Revolutions of 1848 were simultaneous and inspired by a common ideology, yet they were isolated phenomena."

দমন আরম্ভ হলে হাঙ্গেরীর বিপ্লবীরা নিষ্ক্রিয় থাকে। আসলে ১৮৪৮ খ্রীঃ বিপ্লবগুলি ছিল শিল্প-বিপ্লবের ফলে উদ্ভূত অর্থনৈতিক ও সামাজিক সঙ্কটের ফল। বিভিন্ন দেশে বিপ্লব স্থানীয় কারণেই ঘটে এবং স্থানীয় প্রভাবে পরিচালিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, বিপ্লব পরিচালনার জন্যে কোন কেন্দ্রীয় বিপ্লবী সংগঠন বিভিন্ন দেশের বিপ্লবীদের মধ্যে সংহতি ও সমন্বয় করার কোন ব্যবস্থা করেনি। তৃতীয়তঃ, যে দেশগুলি স্বাধীন ছিল অথচ সেখানে স্বৈর-শাসন ছিল, সেখানে বিপ্লবীদের লক্ষ্য ছিল উদারতন্ত্রী অথবা গণতন্ত্রী শাসনের প্রবর্তন করা। যে দেশগুলি পরাধীন ছিল সেই দেশে বিপ্লবীদের প্রধান লক্ষ্য ছিল জাতীয়তাবাদী বিপ্লবের দ্বারা স্বাধীনতা অর্জন। কাজেই স্বাধীন দেশগুলির উদারতন্ত্রী বিপ্লবের সঙ্গে পরাধীন দেশগুলির জাতীয়তাবাদী বিপ্লবের আদর্শগত পার্থক্য ছিল। আদর্শগত পার্থক্যের জন্যে বিপ্লবীদের মধ্যে সংহতি ছিল না। চতুর্থতঃ, ফ্রান্স ছিল ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন দেশ। ফরাসী জাতীয়তাবাদীরা ছিল তৃপ্ত। তাদের ১৮৪৮ খ্রীঃ বিপ্লবে লক্ষ্য ছিল গণভোট ও প্রজাতন্ত্র স্থাপন। ফ্রান্সের সামাজিক বিবর্তন ছিল এই চরমপন্থী রাজনৈতিক আদর্শের ভিত্তি। জার্মানী, অষ্ট্রিয়া ও হ্যাপসবার্গ সাম্রাজ্যে বিপ্লবীরা ছিল মূলতঃ উদারপন্থী। তারা গণভোট বা প্রজাতন্ত্রের মত চরমপন্থী আদর্শকে গ্রহণ করেনি। কারণ এই সকল দেশে পাতি বুর্জোয়ারা তখনও ক্ষমতা পায়নি। এই সকল দেশে সম্পত্তির ভিত্তিতে ভোটাধিকার ও সাংবিধানিক শাসন, পার্লামেন্ট প্রভৃতি উদারপন্থী আদর্শ ধ্বনিত হয়। মোট কথা, রাজনৈতিক আদর্শের দিক থেকেও সকল দেশের বিপ্লবে ঐক্য দেখা যায়নি। পঞ্চমতঃ, বিভিন্ন দেশে বিপ্লবের বিভিন্ন কারণ ছিল। সর্বত্র একই কারণে বিপ্লব হয়নি। ফ্রান্সে পাতি বুর্জোয়া শ্রেণী ও ইতালীতে জাতীয়তাবাদীদের হতাশা থেকেই এই দুই দেশে ফেব্রুয়ারি বিপ্লব ঘটে। জার্মানী, অষ্ট্রিয়া ও হ্যাপসবার্গ সাম্রাজ্যে বিপ্লবের মূলে ছিল শহরগুলিতে শিল্প-বিপ্লব জনিত সমস্যা যথা, লোকসংখ্যা বৃদ্ধি, বাসস্থান, জল সরবরাহ, খাদ্য সমস্যা, বেকারী ও কর্মসংস্থানগত সমস্যা। অষ্ট্রিয়ার গ্রামাঞ্চলে সামন্ত প্রথার বিরুদ্ধে জমির ক্ষুধায় তাড়িত কৃষকদের বিক্ষোভ। বিভিন্ন স্থানে বিপ্লবের প্রকৃতি ছিল আলাদা। এই সকল কারণে ডঃ চার্লস পাউথাস মনে করেন যে, ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের সময় বিভিন্ন দেশে একই সময় বিপ্লব দেখা দিলেও এগুলি ছিল আলাদা এবং যোগাযোগহীন। গ্রেনভীল এজন্য মন্তব্য করেছেন যে, "হ্যাপসবার্গ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে বিপ্লবীদের কর্মধারা, লক্ষ্যের মধ্যে কোন স্বীকৃত, সমভাবাপন্ন, সাধারণ ছক দেখা যায় নি" (The activities and purposes of the many centres of revolutionary and national activities in the empire.... .reveal no general and settled pattern)।

ঐতিহাসিক ডেভিড টমসন উপরোক্ত মতকে সমর্থন করেন না। তিনি বলেন যে, "যদিও ১৮৪৮ খ্রীঃ বিপ্লবগুলি এবং তাদের পরিণতিগুলি বিভিন্নমুখী, কিন্তু এই বিপ্লবগুলি ছিল মূলতঃ একাত্ম এবং এই বিপ্লবগুলির উদ্ভব, লক্ষ্য, গতি এবং পরিণতির মধ্যে সমচরিত্র দেখা যায়।" (Although the revolutions of 1848 and their sequels in 1849 and 1850 are so diversified, they are also of one piece; and their origins and aims, their course and their outcomes, have certain common features)। যদি ১৮৪৮ খ্রীঃ বিভিন্ন বিপ্লবের মধ্যে ঐক্য ও পার্থক্য উভয় দিকই ছিল, তা ইওরোপীয় সভ্যতার অন্তর্লীন ঐক্য ও পার্থক্যের প্রতিভাস মাত্র। ইওরোপীয় সভ্যতার মধ্যে যে পরিবর্তন বিরোধী ও পরিবর্তন কামী (Forces of continuity and forces of change) শক্তির ঘাত-প্রতিঘাত চলছিল এবং ১৮১৫-৪৮ খ্রীঃ পর্যন্ত যে অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাত চলছিল তার ফলেই ১৮৪৮ খ্রীঃ বিপ্লবগুলির মধ্যে পার্থক্য ও সাদৃশ্য দেখা যায়।

এই বিপ্লবগুলির মধ্যে বেশ কিছু সম-চরিত্রের ও সম-আদর্শের ছক বা প্যাটার্ন দেখতে পাওয়া যায়। এই প্যাটার্নগুলি একটি সূত্রে গ্রথিত নয়। বরং একথা বলা যায় যে, কতকগুলি প্যাটার্নকে একত্রিত করে ১৮৪৮-এর মূলসূত্র দ্বারা গেঁথে ফেলা হয়।

সময়কালের দিক হতে বিচার করলে ১৮৪৮কে 'Year of Revolutions' বা বিপ্লবের বছর বলা যায়। একই বছর, একই সময়ে প্যারিস থেকে প্রাগ এবং বার্লিন থেকে মিলান সর্বত্র একই সঙ্গে বিপ্লবের লেলিহান আগুনের শিখা দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে। এই বিপ্লবের জন্যে মধ্য ইওরোপে আগে থেকেই ক্ষেত্র তৈরি ছিল। ১৮১৫ খ্রীঃ পর থেকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন সেই ক্ষেত্র তৈরি করে। ফ্রান্সের বিপ্লবী চুল্লীতে আগুন লাগামাত্র ইওরোপের সর্বত্র এই দাবানল ছড়িয়ে পড়ে। এই কালপঞ্জী নিরর্থক ছিল না। ফ্রান্সের বাইরে ভিয়েনা ব্যবস্থার (Vienna System) বিরুদ্ধে নীরক্ত প্রতিবাদ ধূমায়িত ছিল। ১৮৪৮ খ্রীঃ তা দপ করে জ্বলে ওঠে। ফ্রান্সে মহান ফরাসী বিপ্লবের গণতান্ত্রিক আদর্শের সঙ্গে লুই ফিলিপের উদারপন্থী রাজতন্ত্র খাপ খেতে পারেনি। সেই অসন্তোষ প্রজাতন্ত্রী পাতি বুর্জোয়ারা ১৮৪৮ খ্রীঃ প্রকাশ করে।

১৮৪৮ খ্রীঃ বিপ্লবগুলি প্রথম পর্যায়ে কেবলমাত্র একটি দেশ থেকে বিপ্লবের প্রেরণা লাভ করে। সেই দেশ ছিল ফ্রান্স এবং সেই বিপ্লবের কেন্দ্র ছিল প্যারিস। ১৭৮৯ খ্রীঃ ইওরোপে পুরাতনতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রধান দুর্গ ছিল প্যারিস। প্যারসে পুরাতনতন্ত্র বা রক্ষণশীলতার দুর্গে আক্রমণ হলে, অন্যান্য দেশের পরিবর্তনকামী উদারপন্থী ও জাতীয়তাবাদীরা প্রেরণা লাভ করত। কাজেই ১৮৪৮-এ প্যারিসের বিপ্লব ছিল গোটা ইওরোপীয় বিপ্লবের ঝটিকাকেন্দ্র।

১৮৪৮ খ্রীঃ বিপ্লবের গতি থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে, এই বিপ্লবের দুটি ঝটিকাকেন্দ্র ছিল। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবগুলির প্রথম ঝড়ের দাপট ছুটে আসে প্যারিসের বিপ্লবী ঘূর্ণী থেকে। ফ্রান্স দীর্ঘকাল ধরেই ছিল ইওরোপীয় বিপ্লবের ঝটিকাকেন্দ্র, বিপ্লবের বীজক্ষেত্র। সুতরাং ইওরোপ যতই বিপ্লবের জন্যে প্রস্তুত থাকুক না কেন এবং যতই স্থানীয় অসন্তোষ জমা হোক না কেন, যতদিন না প্যারিসের বিপ্লবের ঘণ্টাধ্বনি শোনা যায়, ততদিন ইওরোপ বজ্রগর্ভ হলেও, তা ছিল আসন্ন অগ্নুৎপাতের প্রতীক্ষারত। ফ্রান্সের সীমান্ত পার হয়ে বিপ্লবী ঘণ্টার ধ্বনি ১৮৪৮-এর ফেব্রুয়ারিতে মধ্য ইওরোপে শোনা গেলে শুরু হয় বিপ্লবের কালবৈশাখীর সংহারলীলা। এই বিপ্লবগুলি ছিল ফ্রান্সের বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া।

ক্রমে ফ্রান্সের বিপ্লবী ঘূর্ণী স্তিমিত হয়ে যায়। গণভোট ও প্রজাতন্ত্র লাভ করে ফরাসী পাতি বুর্জোয়ারা পরিতৃপ্ত হয়। ইওরোপের অন্যান্য দেশের বিপ্লবে প্রত্যক্ষ সহায়তা দূরে থাক নৈতিক সহায়তাও ফ্রান্স দেয়নি। ইতালীর বিপ্লবীরা ফ্রান্সের সহায়তা চাইলে ফরাসী প্রজাতন্ত্রের কর্ণধার লা মার্টিন বলেন যে, "ফরাসীদের রক্ত একমাত্র ফ্রান্সের স্বার্থেই ব্যয় করা হবে" (French blood belongs to France alone)। এই পর্যায়ে বিপ্লবের দ্বিতীয় ঝটিকাকেন্দ্র হিসেবে ইতালী প্রধান ভূমিকা নেয়। প্যারিসে ফেব্রুয়ারি বিপ্লব শুরুর আগেই ইতালীর প্যালেরমো ও অন্যান্য শহরে জাতীয়তাবাদী অভ্যুত্থান ঘটেছিল। ফ্রান্সের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের অনুকূল বাতাসে তা আরও বেশী প্রজ্জ্বলিত হয়। ১৮৪৯ খ্রীঃ থেকে ইতালীয় জাতীয়তাবাদ ও প্রজাতন্ত্রবাদের প্রাণপুরুষ ম্যাৎসিনীর নেতৃত্বে ইতালী ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের দ্বিতীয় ঝটিকাকেন্দ্রে পরিণত হয়। ফ্রান্স যদি ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের সবুজ পতাকা দেখায় তবে ইতালী বিপ্লবের মহত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে (If Italy set the example, it was France that gave the signal)। জার্মানী, অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরীতে ১৮৪৮ খ্রীঃ মার্চের বিদ্রোহের প্রেরণা আসে প্যারিস থেকে, অনুকূল বায়ু আসে ইতালী থেকে।

১৮৪৮ খ্রীঃ বিপ্লবগুলি ছিল মুখ্যতঃ ভিয়েনা চুক্তির বিরুদ্ধে বিপ্লবী প্রতিক্রিয়া।[১] ভিয়েনা চুক্তির দ্বারা ইওরোপে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্র স্থাপন করা হয়। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের ধাক্কায় ভিয়েনা কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়াশীল ইমারত ভেঙে পড়ে। জার্মানীকে ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্টের দ্বারা ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা জার্মান জাতীয়তাবাদের জয় ঘোষণা করে। হ্যাপসবার্গ সাম্রাজ্যের জাতীয়তাবাদী প্রভাবে মড়িয়ার, ক্রোট ও চেক প্রভৃতি জাতিগুলি স্বাধীন রাজ্য গঠনের চেষ্টা করে। ইতালীতেও জাতীয় স্বাধীনতা এবং ঐক্যকে স্থাপনের চেষ্টা করা হয়। এভাবে ফেব্রুয়ারি বিপ্লব ভিয়েনা চুক্তিতে দারুণ ফাটল সৃষ্টি করে। তাছাড়া ফেব্রুয়ারি বিপ্লবে মেটারনিকতন্ত্রেরও পতন ঘটে। মেটারনিক অষ্ট্রিয়া থেকে পালাতে বাধ্য হন।

ভিয়েনা চুক্তির বিরুদ্ধতা

১৮৪৮ খ্রীঃ বিপ্লব ছিল প্রধানতঃ নিম্ন বুর্জোয়া বা পাতি বুর্জোয়া শ্রেণী ও বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা পরিচালিত। Namier এজন্য এই বিপ্লবকে "Revolution of Intellectuals" বা বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর বিপ্লব বলেছেন। কবি, অধ্যাপক, সাংবাদিক, আইনজীবিরাই এই বিপ্লবে নেতৃত্ব দেয়। ধনী বুর্জোয়া বা (haute bourgeois) শ্রেণীর বিরুদ্ধে নিম্ন বুর্জোয়া (Petit bourgeois) শ্রেণীর বিপ্লব ছিল এই বিপ্লবের শ্রেণী চরিত্র। শ্রমিক শ্রেণী বিপ্লবের সামিল হলেও নিম্ন বুর্জোয়ারা তাদের ক্ষমতা লাভে বঞ্চিত করে।

পাতি বুর্জোয়া শ্রেণীর অভ্যুত্থান

১৮৪৮ খ্রীঃ বিপ্লব ছিল প্রধানতঃ নগরকেন্দ্রিক। প্যারিস, বার্লিন, ফ্রাঙ্কফুর্ট, ভিয়েনা, রোম প্রভৃতি শহরই ছিল এই বিপ্লবের স্নায়ুকেন্দ্র। নাগরিক মধ্যবিত্ত ও শ্রমিক শ্রেণীর অসন্তোষই ছিল এই বিপ্লবের কারণ। গ্রামাঞ্চলের কৃষকদের মধ্যে এই বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। কৃষক, জমিদার শ্রেণী এই বিপ্লব থেকে দূরে ছিল। যদিও অষ্ট্রিয়ায় কৃষকরা সামন্ত অধিকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, অষ্ট্রিয়ায় সামন্ত অধিকার বিলুপ্ত হলে, কৃষকরা জমির মালিকানা পায়। তৃপ্ত কৃষকরা বিপ্লবকে সমর্থন করতে ভুলে যায়।

নাগরিক বিপ্লব

ভৌগোলিক দিক থেকে ১৮৪৮ খ্রীঃ বিপ্লব ছিল প্রধানতঃ মধ্য ইওরোপে সীমাবদ্ধ। মধ্য ইওরোপের শিল্প-প্রধান শহরগুলিতেই এই বিপ্লব দেখা দেয়। ইওরোপের প্রান্তিক রাষ্ট্রগুলি যথা রাশিয়া, পোল্যান্ড, স্পেন, বেলজিয়াম, হল্যান্ড ও ইংলন্ডে এই বিপ্লব ঘটেনি। এর প্রধান কারণ ছিল যে, কৃষি-প্রধান পূর্ব ইওরোপ ও স্পেনে শিল্প-বিপ্লবের সমস্যা ছিল না। শিল্প-প্রধান ইংলন্ড ও হল্যান্ডে সরকার আইন দ্বারা শ্রমিকের স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করে। বেলজিয়াম, হল্যান্ড ও ইংলন্ডে সাংবিধানিক শাসন চালু থাকায়, চরমপন্থী মতামত দানা বাঁধতে পারেনি। তাছাড়া এই সকল দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে আমেরিকা ও অন্যান্য দেশে উদ্বৃত্ত লোকেরা বসবাসের জন্যে চলে যায়। পোল্যান্ডে জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহ প্রত্যাশিত হলেও বিদ্রোহ হয়নি। সম্ভাব্য কারণ ছিল যে, তিন শক্তি পোল্যান্ড অধিকার করায় এবং অষ্ট্রিয়া অধিকৃত পোল্যান্ড বা গ্যালিশিয়াতে সামন্ত কর বা রোবোট লোপ করায় কৃষকরা বিপ্লবে উৎসাহ পায়নি। রাশিয়ার উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা পূর্ব দিকে এশিয়ায় বসতি স্থাপন করায় এবং শিল্প-বিপ্লব না ঘটায় রাশিয়াতেও বিপ্লব ঘটেনি। অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীতেই জনসংখ্যার চাপ ছিল সর্বাপেক্ষা বেশী এবং শিল্প-বিপ্লবের অগ্রগতি ছিল মন্থর। এজন্য হ্যাপসবার্গ সাম্রাজ্যে বিপ্লব এত ঘনীভূত হয়।

মধ্য ইওরোপীয় বিপ্লব

রাজনৈতিক আদর্শের দিক থেকে ১৮৪৮ খ্রীঃ বিপ্লবে আমরা জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র এবং

১· **"Although the Revolutions of 1848 are so diversified, they are one piece, their origin, course have certain common features."**

উদারতন্ত্রের ব্যাপক প্রভাব দেখতে পাই। এই জাতীয়তাবাদ দুই প্রকারের ছিল। যে জাতিগুলি ছিল বিভক্ত অথচ পরাধীন নয়, যথা জার্মানী, সেই ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদ আত্মপ্রকাশ করে। যে জাতিগুলি ছিল পরাধীন এবং বিভক্ত যথা, ইতালী অথবা শুধু পরাধীন যথা, বোহেমিয়া, হাঙ্গেরী সেক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদ ছিল বৈদেশিক শাসন থেকে মুক্তি এবং ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র গঠনের আদর্শে উচ্চারিত। এছাড়া উদারতন্ত্রী বিপ্লবের মাধ্যমে সর্বত্র সাংবিধানিক শাসন প্রবর্তনের চেষ্টা করে। জাতীয়তাবাদ ও উদারতন্ত্রীবাদী বিপ্লব ব্যর্থ হলে, বিফল হয়। ১৮৫০ খ্রীঃ থেকে ইওরোপে এই ধারণা দেখা দেয় যে, শক্তিশালী সামরিক শাসক যথা, কাভ্যুর বা বিসমার্কই জাতীয়তাবাদকে যুদ্ধের দ্বারা সমান করবেন।

সর্বশেষে, এই বিপ্লব ব্যর্থ হওয়ার প্রধান কারণ এই ছিল যে, কৃষক ও শ্রমিক এই বিপ্লবে সামিল হয়নি। বুদ্ধিজীবিরা মস্তিষ্ক দিলেও, পেশী ব্যতীত বিপ্লবকে ধরে রাখা সম্ভব ছিল না। তাছাড়া ইওরোপে এক ব্যাপক মহামাবী দেখা দিলে লোক বিপ্লবী উদ্যম হারিয়ে ফেলে।

শ্রমিক ও কৃষকের অসম্মতি

ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের সঙ্গে জুলাই বিপ্লবের তুলনা (Comparison of the February Revolution of 1848 with the July Revolution of 1830) ঃ ১৮৩০ খ্রীঃ জুলাই বিপ্লব এবং ১৮৪৮ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারি বিপ্লব, উভয় বিপ্লবের ওপরেই ফরাসী বিপ্লবের মূল প্রভাব দেখা যায়। জুলাই বিপ্লবের ক্ষেত্রে উদারনৈতিক ভাবধারাই প্রবলতা পায়। ফরাসী বিপ্লবের গোড়ার দিকে ১৭৯০ খ্রীঃ যেমন নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের কথা ভাবা হয়; সেরূপ ১৮৩০ খ্রীঃ নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের কথাই ভাবা হয়। লুই ফিলিপ নিয়মতান্ত্রিক রাজা হিসেবে শপথ নেন। ফ্রান্সের বাইরে হল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, স্পেন, সুইডেনেও নিয়মতান্ত্রিক আদর্শ প্রাধান্য পায়। জুলাই বিপ্লবে প্রজাতন্ত্র বা গণভোটের দাবি সফল হয়নি। জুলাই বিপ্লব ছিল মোটামুটিভাবে একটি উদারনৈতিক বক্ষণশীল বিপ্লব।

উদারনৈতিক বিপ্লব

এই তুলনায় ফেব্রুয়ারি বিপ্লব ছিল অনেক চরমপন্থী। কারণ এই বিপ্লবেব ফলে ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র ও গণভোট স্থাপিত হয়। ফ্রান্সের বাইরে এই বিপ্লবেব জাতীয়তাবাদী চরিত্র লক্ষণীয়। সুতরাং ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের সঙ্গে ফরাসী বিপ্লবের ১৭৯২ খ্রীঃ জ্যাকোবিন পর্যায়ের অনেকটা মিল দেখা যায়। ফেব্রুয়ারি বিপ্লব ছিল নিঃসন্দেহে জুলাই বিপ্লবের তুলনায় চরমপন্থী।

প্রজাতন্ত্রবাদ ও সর্বসাধাবণেব ভোট

শ্রেণীগত দিক থেকে বিচার করলে, জুলাই বিপ্লবকে ধনী বুর্জোয়াদের বিপ্লব বলা যায়। একমাত্র বেলজিয়াম ছিল এর ব্যতিক্রম। অপর দিকে ফেব্রুয়ারি বিপ্লব ছিল পাতি বুর্জোয়া, বুদ্ধিজীবি ও সাধারণ লোকের বিপ্লব। এই বিপ্লবে এই সকল শ্রেণীই ছিল কর্ণধার। তাছাড়া ফ্রান্সে এই বিপ্লবের একটি সমাজতান্ত্রিক দিকও ছিল। ফরাসী শ্রমিক ও সমাজতন্ত্রবাদীরা ফ্রান্সে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। বেকারের কর্ম সংস্থানের জন্যে জাতীয় কর্মশালা স্থাপিত হয়।

দুই বিপ্লবের শ্রেণী চবিত্র

ফলাফলের দিক থেকে জুলাই বিপ্লবের দ্বারা বেলজিয়ামের স্বাধীনতা লাভ সম্ভব হয়। ফ্রান্সে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের পতন ঘটে। সাংবিধানিক রাজতন্ত্র স্থাপিত হয়। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের দ্বারা ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র ও গণভোট স্থাপিত হয়। জার্মানীর ব্যাভেরিয়া, ব্যাডেন, প্রাশিয়া ও ইতালীর পিডমন্টে নিয়মতান্ত্রিক শাসন স্থাপিত হয়। তবে শেষের বিপ্লবের ফলে ভিয়েনা চুক্তির প্রতিক্রিয়াশীল ভিত্তি ধ্বসে যায়। ঐতিহাসিক সি· ডি· হ্যাজেন ফ্রান্সে উভয় বিপ্লবের তুলনার পর বলেছেন যে, "ফ্রান্সে ফেব্রুয়ারি বিপ্লব ছিল অসাধারণভাবে দ্রুতগতি সম্পন্ন, ভয়ঙ্করভাবে চরমপন্থী এবং সম্পূর্ণভাবে অপ্রত্যাশিত"

ফলাফল

(Extraordinarily swift, extremely radical and entirely unexpected)। বহু গবেষক হ্যাজেনের এই মতের সঙ্গে একমত হননি। কোব্বান বলেছেন ১৮৪৮-এ বিপ্লব না ঘটলে তা অন্য সময় নিশ্চয় ঘটত। হয়ত তার ফলাফল হত আলাদা। তবে বিপ্লব ঘটার মত পরিবেশ ১৮৩০-এর পর থেকে দানা বেঁধেছিল। পাতি বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রী ও শ্রমিকের সমর্থক প্রজাতন্ত্রীদের হতাশাবোধ ফ্রান্সে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবকে অনিবার্য করে। সুতরাং বিপ্লব অপ্রত্যাশিত ছিল না। এই বিপ্লব নিঃসন্দেহে জুলাই বিপ্লবের তুলনায় চরমপন্থী ছিল। তার কারণ ফ্রান্স শিল্প-বিপ্লবের পথে দ্রুত আগাচ্ছিল এবং লুই ফিলিপের শিক্ষানীতির ফলে ফ্রান্সে শিক্ষাবিস্তার হচ্ছিল। তাছাড়া মিশেল, থিয়ার্স প্রভৃতি ঐতিহাসিক মহান ফরাসী বিপ্লবের পুনর্মূল্যায়ণ করায় প্রজাতন্ত্রী আদর্শ প্রবল হয়।

পাঠ্যসূচী

১। Jack Droz—Europe Between Revolutions.
২। Gordon Craig—Europe Since 1815.
৩। David Thomson—Europe Since Napoleon.
৪। Priscilla Robertson—The Revolutions of 1848.
৫। Namier—The Revolution of Intellectuals.
৬। Georges Duvean—The Making of a Revolution.
৭। New Cambridge Modern History. Vol. X.
৮। R. Postgate—Story of a Year : 1848.
৯। M. Kranzberg—1848 : A Turning Point.

পঞ্চদশ অধ্যায়

দ্বিতীয় ফরাসী প্রজাতন্ত্রের উত্থান ও পতন, ১৮৪৮—৫২ খ্রীঃ

(The Rise and Fall of the Second French Republic, 1848-52)

চতুর্দশ অধ্যায়ে ১৮৪৮ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সে অর্লিয়েন্স রাজতন্ত্রের পতন এবং দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কাহিনী বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে (পৃঃ ২২৯ দেখ)। লুই ফিলিপের পতনের পর প্রজাতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক দলের যৌথ সহযোগিতায় ফ্রান্সে দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়। ফেব্রুয়ারি বিপ্লব ছিল প্রধানতঃ প্যারিসের নাগরিক বিপ্লব। প্যারিসের নাগরিকরাই ছিল এই প্রজাতন্ত্রের সমর্থক। ফ্রান্সের গ্রামাঞ্চলে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের বিশেষ কোন প্রভাব ছিল না। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের ফলে প্যারিসের প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হলে এই প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে গ্রামের কৃষকদের কোন আত্মিক যোগ ছিল না। এই কারণে দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের ভিত্তি ছিল খুবই দুর্বল। দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের সংবিধান অনুসারে ফ্রান্সে সর্ব-সাধারণের ভোটাধিকার স্থাপিত হয়। এই সংবিধান চালু হলে ভোটাধিকার সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকদের হাতে চলে যায়। প্যারিসের অধিবাসীদের ভোট ছিল মোট ভোটদাতাদের ভগ্নাংশ মাত্র। কৃষকদের সমর্থন ছাড়া এই প্রজাতন্ত্রের স্থায়িত্ব রক্ষা করা কষ্টকর ছিল। প্রজাতন্ত্রী দল কৃষকদের সমর্থন লাভের জন্যে গ্রামে প্রচার করেনি। ফরাসী কৃষক সমাজের সমর্থন লাভে ব্যর্থ হওয়ায় এই প্রজাতন্ত্র স্থায়িত্ব হারায়।[১]

দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের পশ্চাতে কৃষক সম্প্রদায়ের সমর্থনের অভাব

দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র স্থাপনের পর প্রজাতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক দলের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। প্রজাতান্ত্রিক দল ছিল নিম্ন বুর্জোয়াদের দ্বারা সমর্থিত। এই দলের নেতা লা-মার্টিন সর্বসাধারণের ভোট দ্বারা প্রজাতন্ত্র স্থাপনকেই বিপ্লবের মূল লক্ষ্য বলে ঘোষণা করেন। "আমি প্রজাতন্ত্রকেই একমাত্র বিপ্লবের লক্ষ্য বলে মনে করি এর বেশী কিছু নয়।"[২] অপর দিকে সমাজতান্ত্রিক দলের নেতা লুই ব্ল্যাঙ্ক (Louis Blanc) সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকেই বিপ্লবের লক্ষ্য হিসেবে নেন। কর্মহীনের কর্মসংস্থান, জীবিকার অধিকার, শিল্পে মালিক ও শ্রমিকের মিলিত সমবায় স্থাপন, শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি প্রভৃতি দাবী সমাজতান্ত্রিক দল দাবী করে। বুদ্ধিজীবি ও নিম্ন বুর্জোয়া সমর্থিত প্রজাতান্ত্রিক দল এই দাবীগুলিকে সমর্থন করত না। এই দুই দলের পরস্পর বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে জন্মলগ্ন থেকে দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র এক সঙ্কটে পড়ে।

প্রজাতান্ত্রিক দলের সহিত সমাজ-তান্ত্রিকদের বিরোধ

দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হওয়ার পর লুই ব্ল্যাঙ্ক ও আলবেয়ার নামে দুই সমাজতান্ত্রিক মন্ত্রী দাবী করেন যে, শ্রম সংস্থানের জন্যে সরকারের একটি স্বতন্ত্র শ্রম দপ্তর গঠন করতে হবে। কিন্তু প্রজাতন্ত্রীরা এই দাবী অগ্রাহ্য করে। সমাজতন্ত্রী দল রক্তবর্ণ পতাকাকে জাতীয় পতাকা হিসেবে গ্রহণের দাবী জানালে তাও প্রত্যাখ্যাত হয়। এদিকে বেকার শ্রমিকদের আপাততঃ কাজ না দিলে সমাজতন্ত্রীরা

প্রজাতন্ত্রের শ্রমিক-বিরোধী নীতি

১· D. Thomson.

২· "I regard the Republican Government as the sole aim of Civilization.

গন্ডগোল সৃষ্টি করতে পারত। যাতে শ্রমিক অসন্তোষ আপাততঃ চাপা থাকে এজন্য প্রজাতন্ত্রীরা জাতীয় শ্রম শিবির স্থাপন করে। এই শিবিরে যে সকল শ্রমিক নাম লেখায় তাদের প্রত্যহ ২ ফাঁ হারে ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। সমাজতন্ত্রীরা আপত্তি জানায় যে, শ্রমিকদের জীবিকার অধিকার দানের পরিবর্তে কর্মসংস্থান শিবিরে মাত্র ২ ফ্রাঁ ভাতা দেওয়ার ফলে এই শিবিরকে ত্রাণ শিবিরে পরিণত করা হয়েছে। এই ব্যবস্থার ফলে কর্মহীন শ্রমিকরা বেকার ভাতা ভোগ করে বৃত্তিভোগী ভিক্ষুকে পরিণত হবে। কিন্তু প্রজাতন্ত্রীরা এই প্রতিবাদে কান দেয়নি।

ইতিমধ্যে জাতীয় সভা বা ফরাসী পার্লামেন্টের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে সমাজতান্ত্রিক দল শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হয়। গ্রামের কৃষকরা সমাজতান্ত্রিকদের বিরুদ্ধে প্রজাতান্ত্রিকদের পক্ষে ভোট দেয়। ভোটে জয়লাভের পর সংখ্যাগুরু প্রজাতান্ত্রিক দল শ্রমিক কল্যাণমূলক পরিকল্পনাগুলি রদ করে। সমাজতন্ত্রীদের মন্ত্রীসভা ও সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে উৎখাত করা হয়। বেকার শ্রমিকদের জন্যে যে জাতীয় কর্মসংস্থান শিবির খোলা হয় তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই শিবিরগুলি বন্ধ হলে বহু শ্রমিক বেকার হয়ে পড়ে। বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীদের এই নীতির বিরুদ্ধে শ্রমিকরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বেকার ও ক্রুদ্ধ শ্রমিকেরা সমাজতন্ত্রীদের নেতৃত্বে প্যারিসের রাস্তায় অবরোধ রচনা করে। তারা সরকারি সেনাদের সঙ্গে রক্তাক্ত সংগ্রাম চালায়। প্রজাতন্ত্রের সেনাপতি ক্যাভিগন্যাকের সেনাদল প্রায় ১০ হাজার শ্রমিককে গুলি করে হত্যা করে এবং ৪ হাজার শ্রমিককে আলজেরিয়ায় নির্বাসনে পাঠায়। শেষ পর্যন্ত প্রজাতন্ত্রীরা জয়লাভ করে। এই গৃহযুদ্ধের নাম ছিল জুন মাসের গৃহযুদ্ধ। ডেভিড টমসনের মতে, "জুনের গৃহযুদ্ধের ফল ছিল শোচনীয় ও সুদূরপ্রসারী।" (১) এর ফলে দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র সাঁকুলেৎ ও দরিদ্র শ্রেণীর সমর্থন হারায়। (২) দরিদ্র জনগণের নিষ্ঠুর রক্তপাত সাধারণ নাগরিকদের মনে প্রজাতন্ত্র সম্পর্ক ঘৃণা সঞ্চার করে। ভিক্টর হিউগো মন্তব্য করেন যে, "জুনের রক্তঝরা দিনে বর্বরতার দ্বারা সভ্যতাকে রক্ষা করা হয়; এটা ছিল পরিতাপের বিষয়।" (৩) গৃহযুদ্ধের ফলে ব্যবসায়-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হলে, বুর্জোয়া শ্রেণী হতাশ হয়ে পড়ে। তারা প্রজাতন্ত্রের স্থলে শক্তিশালী শাসনব্যবস্থা কামনা করে। (৪) গ্রামীণ কৃষকশ্রেণী এই ধারণা নেয় যে, প্রজাতান্ত্রিক সরকার দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপনে ব্যর্থ হয়েছে। প্রজাতন্ত্রী সরকার হয়ত তাদের জমির অধিকার রক্ষা করতে পারবে না। সমাজতন্ত্রীদের চাপে হয়ত শেষ পর্যন্ত সম্পত্তির অধিকার কেড়ে নেবে। এই আকাঙ্ক্ষা কৃষকদের প্রজাতন্ত্রে আস্থাহীন করে। লুই নেপোলিয়নের স্বৈর শাসনের দিকে তারা তাকাতে থাকে।

জুন মাসের রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধ

ইতিমধ্যে প্রজাতন্ত্রী দলের দুটি ভ্রান্ত নীতি এই প্রজাতন্ত্রের পতন অনিবার্য করে। গৃহযুদ্ধের ফলে প্রজাতন্ত্রী সরকারের অর্থসঙ্কট দেখা দেয়। এই অর্থসঙ্কট মোচনের জন্যে সরকার কৃষকদের প্রদেয় করের ওপর প্রতি ফ্রাঁ পিছু ৪৫ সেন্টিম পরিমাণ কর বৃদ্ধি করে। এই কর বৃদ্ধির জন্যে কৃষক সমাজ অসন্তুষ্ট হয়। প্রজাতন্ত্রের নতুন সংবিধানে রাষ্ট্রপতিকে শাসন বিভাগের সর্বময় ক্ষমতার অধীশ্বর করা হয়। রাষ্ট্রপতির এই ক্ষমতার ওপর কোন নিয়ন্ত্রণ রাখা হয়নি। মার্কিন দেশের ন্যায় তাঁকে সরাসরি গণভোটে ৪ বছরের জন্যে নির্বাচনের নিয়ম করা হয়। সংবিধানে তাঁর ওপর আইনসভার নিয়ন্ত্রণ রাখা হয়নি। রাষ্ট্রপতিকে এরূপ নিরঙ্কুশ, নিয়ন্ত্রণহীন ক্ষমতাদানের কুফল অচিরেই ফলে।

নতুন কর নীতি : কৃষকদের অসন্তোষ : ভ্রান্ত সংবিধান

রাষ্ট্রপতির পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে বোনাপার্ট দলের প্রার্থী লুই নেপোলিয়ন, প্রজাতান্ত্রিক দলের প্রার্থী ক্যাভিগন্যাককে বহু ভোটে পরাস্ত করে রাষ্ট্রপতির পদ অধিকার করেন। বোনাপার্টবাদী নেতা লুই নেপোলিয়ন রাষ্ট্রপতি পদে বসলে প্রজাতন্ত্রের পতন আসন্ন হয়। কারণ লুই নেপোলিয়ন প্রজাতন্ত্রের

লুই নেপোলিয়নের রাষ্ট্রপতি পদে- নির্বাচন

আদর্শের অনুরাগী ছিলেন না। নতুন সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতির যে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ছিল, লুই নেপোলিয়ন তাঁর সেই ক্ষমতার অপব্যবহার করেন। তিনি ১৮৫১ খ্রীঃ ২রা ডিসেম্বর বিশেষ ক্ষমতা বলে আইনসভা ভেঙে দেন। আইন সভা ভাঙার পর তিনি পুনরায় রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচন প্রার্থনা করেন। জনপ্রিয়তার সুযোগে তিনি দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। লোকে প্রজাতন্ত্র অপেক্ষা নেপোলিয়নের অধীনে স্থিতিশীল সরকার কাম্য বলে মনে করে। কৃষকরা আশা করে যে, লুই নেপোলিয়ন তাদের সম্পত্তির অধিকার রক্ষা করবেন। এজন্য তাঁকেই ভোট দেয়। নেপোলিনয়ন বংশের উত্তরাধিকারী হিসেবে তাঁর মহিমাও জাতিকে আচ্ছন্ন করে। রাষ্ট্রপতি হিসেবে পুনঃনির্বাচনের পর লুই নেপোলিয়ন ২রা ডিসেম্বর, ১৮৫২ খ্রীঃ দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের অবসান ঘোষণা করেন। তিনি নিজেকে ফ্রান্সের দ্বিতীয় সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করেন। এভাবে তিনি একনায়কতন্ত্র স্থাপন করেন। গৌরবলিপ্সু ফরাসী জনসাধারণ মনে করে যে, লুই নেপোলিয়নই একমাত্র ব্যক্তি যিনি ইওরোপে ফ্রান্সের হৃতমর্যাদা পুনরুদ্ধার করতে পারবেন। কৃষকেরা মনে করে যে, লুই নেপোলিয়ন ফ্রান্সে আইন-শৃঙ্খলা স্থাপন করতে পারবেন। তাঁর একনায়কতন্ত্রকে তাঁরা গণভোটের দ্বারা স্বীকৃতি দেয়। এভাবে দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের পতন ঘটে।

পাঠ্যসূচী

১। Cobban—History of France.
২। Hazen—Europe Since Napoleon.
৩। G.A.S. Grenville—Europe Reshaped.
৪। Gordon Craig—Europe Since 1815.

ষোড়শ অধ্যায়
ফ্রান্সের দ্বিতীয় সাম্রাজ্য ঃ সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের শাসন (১৮৫২—১৮৭০ খ্রীঃ)
(Second French Empire : Reign of Napoleon III, 1852—1870)

দ্বিতীয় ফরাসী সাম্রাজ্যের বৈশিষ্ট্য (Significance of the Second French Empire of Napoleon III) ঃ ১৮৪৮ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের ফলে উদ্ভূত দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি পদে লুই নেপোলিয়ন নির্বাচিত হন। লুই নেপোলিয়ন ছিলেন মহাবীর নেপোলিয়নের ভ্রাতুষ্পুত্র। তিনি প্রজাতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি অনুগত ছিলেন না। প্রজাতান্ত্রিক সংবিধানে তিনি মাত্র ৪ বছরের জন্যে রাষ্ট্রপতি হতে পারতেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল তাঁর পিতৃব্যের ন্যায় একনায়কতন্ত্র স্থাপন করা। তিনি তাঁর জনপ্রিয়তার সুযোগে সংবিধান সংশোধন করে দশ বছরের জন্যে রাষ্ট্রপতি হন। এই সংশোধনীকে তিনি গণভোট দ্বারা জনসাধারণের অনুমোদন নেন। পরে তিনি প্রজাতন্ত্র ধ্বংস করে নিজেকে দ্বিতীয় সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করেন (২রা ডিসেম্বর ১৮৫১ খ্রীঃ)। বিরোধী দলগুলিকে তিনি প্রচণ্ড দমননীতির দ্বারা উৎখাত করেন। তিনি তাঁর সম্রাটতন্ত্রের সমর্থনে পুনরায় ২৪শে ডিসেম্বর গণভোট চান। যদিও প্যারিসের অধিবাসীরা তাঁকে বিশেষ সমর্থন জানায়নি, কিন্তু গ্রামাঞ্চলে তিনি ৭·৫ মিলিয়ন ভোট পেয়ে সম্রাটতন্ত্রকে কায়েম করেন (১৮৫২ খ্রীঃ)। সম্রাট হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণের পর তিনি নিজেকে তৃতীয় নেপোলিয়ন বলে ঘোষণা করেন। গ্রেনভিল (Grenville) নামক ঐতিহাসিক মনে করেন যে, ইওরোপের বংশানুক্রমিক রাজারা নেপোলিয়নের বংশকে সহ্য করতে পারত না। তাদের উত্যক্ত করে নিজ বংশের গৌরব প্রচারের জন্যে লুই নেপোলিয়ন—"তৃতীয় নেপোলিয়ন" উপাধি নেন। তাছাড়া চতুঃশক্তি সন্ধির (Quadruple Alliance) একটি শর্ত ছিল যে, নেপোলিয়নের বংশের কাহাকেও ফ্রান্সের শাসনভার নিতে দেওয়া হবে না। লুই নেপোলিয়ন তৃতীয় নেপোলিয়ন উপাধি নিয়ে এই নীতিকে অগ্রাহ্য করেন। গ্রেনভিলের মতে, "তৃতীয় নেপোলিয়নের সম্রাট খেতাব গ্রহণ ছিল আসলে একটি আদর্শের প্রতীক। ইওরোপকে এর দ্বারা জানিয়ে দেওয়া হয় যে, ভিয়েনা চুক্তির নায্য অধিকারকে অগ্রাহ্য করা হল।"[১]

তৃতীয় নেপোলিয়নের সিংহাসনারোহণের তাৎপর্য

তৃতীয় নেপোলিয়নের শাসনকাল ছিল উনবিংশ শতকের ইওরোপের ইতিহাসের একটি ঘটনাবহুল যুগ। তাঁর শাসনকালে ফ্রান্স তার ৪০ বছরব্যাপী ইওরোপের ব্যাপারে পিছিয়ে থাকার নীতি ত্যাগ করে হঠাৎ প্রবল বিক্রমে ইওরোপীয় শক্তিগুলির প্রথম সারিতে আসন গ্রহণ করে। তৃতীয় নেপোলিয়ন বুঝতেন যে, তাঁর যুগে জাতীয়তাবাদ হল ঐতিহাসিক শক্তি। তিনি এই নীতিকে সমর্থন করে ইতালী, জার্মানীতে জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় মুখ্য ভূমিকা নেন। এর ফলে ইওরোপের মানচিত্র পরিবর্তিত হয়। তাঁর শাসনকালে ভিয়েনা সন্ধির দ্বারা স্থাপিত ইওরোপীয় শক্তিসাম্য ভেঙে পড়ে। তৃতীয় নেপোলিয়ন ফ্রান্সে তাঁর প্রগতিবাদী শাসন ও অর্থনৈতিক

তৃতীয় নেপোলিয়ন কর্তৃক জাতীয়তাবাদের সমর্থন

১· Grenville—Europe Reshaped.

সংস্কার দ্বারা ইওরোপে জনকল্যাণমূলক শাসনব্যবস্থার অভূতপূর্ব নজীর স্থাপন করেন। এই কারণে বলা হয় যে, "যদিও তৃতীয় নেপোলিয়ন নিজে বিপ্লবী ছিলেন না, তবুও তিনি ইওরোপে বহু বিপ্লব সৃষ্টি করেন।"[১] তৃতীয় নেপোলিয়নের গুণগ্রাহী অপেক্ষা তাঁর জীবিতকালে তাঁর সমালোচকের সংখ্যা ছিল বেশী। প্রজাতন্ত্রের প্রতি আনুগত্যের শপথ ভঙ্গ করে প্রজাতন্ত্র ধ্বংস করায় তাঁর সমকালীন বহু চিন্তাবিদ তাঁকে ক্ষমা করেননি। কার্ল মার্কস তাঁকে মূর্খ বলে ভাবতেন। তাঁর সমকালীন সাহিত্যিক ভিক্টর হুগো তৃতীয় নেপোলিয়নকে "আধ পাইট নেপোলিয়ন, পাতি নেপোলিয়ন" বলে ব্যঙ্গ করেছেন। ঐতিহাসিকদের মতে তিনি ছিলেন "হঠকারী ও সুবিধাবাদী" (adventurer and opportunist)। পরবর্তী যুগে তৃতীয় নেপোলিয়ন সম্পর্কে নতুন করে মূল্যায়ন করা হয়েছে। মহাবীর নেপোলিয়নের সঙ্গে তাঁর তুলনা করা উচিত নয়। কারণ এইরকম প্রতিভা ইতিহাসে বেশী দেখা যায় না। এই অনুচিত তুলনা না করলে তৃতীয় নেপোলিয়নকে যথেষ্ট প্রতিভাবান, নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তনে আগ্রহী, আধুনিক মনস্ক ব্যক্তি ও ইওরোপীয় জাতীয়তাবাদের প্রধান পুরোহিত বলা যায়।

তৃতীয় নেপোলিয়নের আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থা (Domestic Policy of Napoleon III) : তৃতীয় নেপোলিয়নের আভ্যন্তরীণ শাসন নীতি ফরাসী ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য যুগ রূপে গণ্য হয়ে থাকে। (১) হ্যাজেন (Hazen) প্রভৃতি ঐতিহাসিকেরা মনে করেন যে, তৃতীয় নেপোলিয়নের শাসনব্যবস্থা ছিল তাঁর পিতৃব্য প্রথম নেপোলিয়নের অন্ধ অনুকরণ মাত্র। তৃতীয় নেপোলিয়ন Ideas of Napoleon নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে তিনি প্রচার করেন যে, তাঁর পিতৃব্য মহাবীর নেপোলিয়ন ছিলেন আসলে ফরাসী বিপ্লবের সন্তান। তিনি ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারার আলোকেই শাসন পরিচালনার চেষ্টা করেন। এজন্য তিনি দৃঢ় হাতে শাসন চালিয়ে বিপ্লবের আদর্শগুলিকে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর অকস্মাৎ পতনের ফলে তাঁর কাজ অসমাপ্ত থেকে যায়। তৃতীয় নেপোলিয়ন বলেন যে, নেপোলিয়নের উত্তরাধিকারী হিসেবে তিনিও এই আদর্শ পালন করবেন। সি· ডি· হ্যাজেনের মতে, ১৮৫২—১৮৬০ খ্রীঃ পর্যন্ত আভ্যন্তরীণ শাসনের ক্ষেত্রে তৃতীয় নেপোলিয়ন একনায়কতন্ত্র ও সংস্কার নীতি নেন এবং ১৮৬০—১৮৭০ খ্রীঃ পর্যন্ত সংস্কার সফল হলে তিনি উদারতন্ত্রী শাসন প্রবর্তনের চেষ্টা করেন। তৃতীয় নেপোলিয়ন মনে করতেন যে, সংস্কারকে সফল করতে হলে গোড়ায় একনায়কতন্ত্রের দরকার। সংস্কার স্থায়ী হলে উদারতন্ত্র প্রবর্তিত হতে পারে। এই বিশ্লেষণের ভিত্তিতে হ্যাজেন, বিউরী প্রভৃতি ঐতিহাসিক তৃতীয় নেপোলিয়নের রাজত্বকালকে ১৮৫২—৬০ খ্রীঃ এবং ১৮৬০—৭০ খ্রীঃ দুটি পর্যায়ে ভাগ করেন। ঐতিহাসিক গ্রেনভিল বলেন যে, তৃতীয় নেপোলিয়ন মুখে যাই বলুন না কেন তাঁর আভ্যন্তরীণ নীতি প্রথম নেপোলিয়নের অন্ধ অনুকরণ ছিল না। তিনি প্রথম থেকেই মূল্যবান সংস্কার ও পরিবর্তনকে গ্রহণ করেন। মেটারনিকের সঙ্গে তাঁর মূল পার্থক্য এই ছিল যে, মেটারনিক যেক্ষেত্রে সকল প্রকার সংস্কারের বিরোধী ছিলেন, সেক্ষেত্রে তৃতীয় নেপোলিয়ন ব্রিটেনের মতো ধাপে ধাপে প্রয়োজন বুঝে মূল্যবান সংস্কার নীতি অনুসরণ করেন।

তৃতীয় নেপোলিয়নের আভ্যন্তরীণ নীতির লক্ষ্য

তৃতীয় নেপোলিয়ন মনে করতেন যে, শাসনব্যবস্থা মজবুত ও দৃঢ় না হলে সংস্কারগুলিকে ধরে রাখা যাবে না। "তৃতীয় নেপোলিয়ন বিশ্বাস করতেন যে, ফ্রান্স হল এক বিরাট গণতন্ত্র যাতে শৃঙ্খলা নেই।"[২] এজন্য তিনি যে সংবিধান প্রবর্তন করেন তার মুখ্য নীতি ছিল

১· "Through Napoleon III himself was not a revolutionary, he caused many revolutions in Europe."

২· 'France is a vast democracy which needed discipline." Lipson—Europe in the 19th & 20th Centuries. P. 81.

শৃঙ্খলার সহিত স্বাধীনতার সমন্বয়

"শৃঙ্খলাবোধের সঙ্গে গণতান্ত্রিক অধিকারের সমন্বয় সাধন" (Reconciliation of·order with Liberty)। কার্যতঃ এটি ছিল স্বৈরতান্ত্রিক শাসন। কিন্তু জনসাধারণের নিকট প্রিয় থাকার জন্যে তিনি একটি পার্লামেন্ট বা নির্বাচিত আইনসভা রাখেন। আসল ক্ষমতা তিনি নিজ হাতেই রাখেন। এই সঙ্গে তিনি সর্বসাধারণের ভোটাধিকার বা গণভোট ব্যবস্থাকে বহাল রাখেন। নেপোলিয়ন বলতেন যে, "তাঁর যুগ হল জনসাধারণের যুগ" (Age of the Masses)। জনসাধারণকে পুরো অবহেলা করে শাসন পরিচালনা করা যাবে না। এজন্য তিনি গণভোট বা প্লিবিসিট (Plebescite) এবং সর্বসাধারণের ভোটাধিকারকে রক্ষা করেন। তার সঙ্গে তিনি Authority বা শৃঙ্খলাকে জুড়ে দেন। ফলে তাঁর স্বৈরতন্ত্র ছিল এক জনসমর্থন পুষ্ট স্বৈরতন্ত্র।

তৃতীয় নেপোলিয়ন আইনসভাকে সিনেট এবং লেজিসলেটিভ বডি এই দুই কক্ষে ভাগ করেন। প্রথম সিনেটের সদস্যরা সম্রাট কর্তৃক মনোনীত হত। লেজিসলেটিভ বডির ২৬০ জন সদস্য সর্বসাধারণের ভোটের দ্বারা নির্বাচিত হত। নেপোলিয়ন আইনসভার গঠনে মনোনয়ন প্রথা ও নির্বাচন প্রথার সমন্বয় করেন। তিনি আইন রচনার অধিকারকে আইনসভার দুটি কক্ষের মধ্যে ভাগ করে দেন। কিন্তু নির্বাচিত সভা বা লেজিসলেটিভ বডির আইন রচনার বিষয়ে পূর্ণ অধিকার ছিল না। এই সভা মাত্র বছরে তিন মাস বসতে পারত। কাউন্সিল অব ষ্টেট যে বিলের খসড়া পেশ করত তা বিনা বিতর্কে আইনসভা গ্রহণ অথবা বর্জন করতে পাবত। ২৬০ জন সদস্যের আইনসভায় সদস্য হতে সাধারণ নির্বাচনের সময় নেপোলিয়নের প্রিফেক্টরা নানাভাবে নির্বাচন প্রভাবিত করত। অবাধ নির্বাচন আদপেই হত না। তদুপরি আইনসভার কোন স্বাধীন ক্ষমতা ছিল না। মনোনীত পরিষদ বা সিনেট যে কোন আইনকে নাকচ করতে পারত। সিনেট তৃতীয় নেপোলিয়নের নির্দেশেই চলত। প্রয়োজন হলে সম্রাট অর্ডিন্যান্স দ্বারা বিশেষ ক্ষমতা বলে আইন রচনা করতে পারতেন। আসল ক্ষমতা ছিল কাউন্সিল অব ষ্টেটের হাতে। এই কাউন্সিল অব ষ্টেটের সদস্যদের সম্রাট তাঁর বিশ্বস্ত কর্মচারীদের মধ্য থেকে মনোনয়ন করেন। কাউন্সিল আইনবিধি ও অর্ডিন্যান্সের খসড়া তৈরি করলে তা লেজিসলেটিভ বডি বা নির্বাচিত সদস্যের আইনসভায় অনুমোদনের জন্যে পেশ করা হত। সম্রাট তাঁর মন্ত্রীদের নিযোগ করতেন। মন্ত্রীরা আইনসভার কাছে তাদের কাজের জন্যে দায়িত্ববদ্ধ ছিল না। আইনসভা ছিল একটি গণতন্ত্রের মুখোস মাত্র। আসল ক্ষমতা সংবিধানে সম্রাট ও তাঁর আমলাদের হাতেই ছিল। সম্রাট মন্ত্রীদের নিয়োগ ও পদচ্যুতি করতেন; যুদ্ধ-বিগ্রহ ও শান্তি ঘোষণা, নতুন আইন ও কর প্রবর্তন তাঁর ইচ্ছাতেই হত। তিনি ছিলেন সেনাদলের সর্বাধিনায়ক। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন ২,৫০,০০০ দায়িত্বশীল কর্মচারীকে তিনিই মনোনীত করতেন এবং এরা তাঁর নির্দেশে চলত। এরাই ছিল তাঁর Espirit de Corps। প্রদেশের প্রিফেক্ট বা প্রাদেশিক শাসনকর্তারা নেপোলিয়ন দ্বারা নিযুক্ত হয়। তিনি তাদের ক্ষমতা এত বাড়ান যে, তারা প্রদেশে দণ্ডমুণ্ডের কর্তায় পরিণত হয়। নির্বাচনের সময় তারা দুর্নীতি অথবা ভীতি প্রদর্শন করে নেপোলিয়নের সমর্থনে ভোট যোগাড় করত। নেপোলিয়নের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ডিউক দ্য প্রেসিগনি ছিলেন এক ঘোর স্বৈরাচারী। তিনি কেন্দ্রে ও প্রদেশে সকল স্তরে স্বাধীন মতপ্রকাশ রোধ করেন। তাছাড়া তিনি সংবাদপত্র ও রাজনৈতিক দলগুলির মতামত প্রকাশের অধিকার হরণ করেন। সংবাদপত্রগুলি সরকারের কোন কাজের সমালোচনা করতে পারত না। সেনসরশিপ বা নিয়ন্ত্রণ পরিষদ দ্বারা সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা হয়। লেজিসলেটিভ বডি যদি সরকারি বিলের কোন সমালোচনা করত তবে তা সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হত না। তিনি বিরোধী দলগুলি ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির স্বাধীনতা হরণ করেন। দমন নীতির দ্বারা তিনি বিরোধীদের দমিয়ে ফেলেন।

আইন সভাব সংগঠন ঃ সম্রাটেব অধিকার

সুতরাং তৃতীয় নেপোলিয়ন কর্তৃক প্রবর্তিত সংবিধান খাঁটি গণতন্ত্র ছিল না। ঐতিহাসিক লিপসন এই ব্যবস্থাকে "উল্টা গণতন্ত্র" (Inverted Democracy) আখ্যা দিয়েছেন। লিপসনের মতে, নেপোলিয়নের সংবিধান ছিল "জনপ্রিয়তার ওপর প্রতিষ্ঠিত সিজারতন্ত্র" (Caesarism on a popular basis)।

তৃতীয় নেপোলিয়নের প্রবর্তিত সংবিধানের সমালোচনা

ডেভিড টমসনের মতে, তৃতীয় নেপোলিয়নের প্রতিষ্ঠিত স্বৈরতন্ত্র বেশি দিন স্থায়ী হয় নি। ফ্রান্সের জনমত ধীরে ধীরে তাঁর স্বৈরতন্ত্রের স্বরূপ বুঝতে পারে। আইনসভায় ক্রমে বিরোধী সদস্য অধিক সংখ্যায় নির্বাচিত হতে থাকেন। ১৮৫৭ খ্রীঃ যেখানে মাত্র ৭ জন সদস্য ছিল, ১৮৬৯ খ্রীঃ সেখানে ৯৩ জন বিরোধী সদস্য নির্বাচিত হয়। প্যারিস, মার্সাই, লায়ন্স, বোর্দো প্রভৃতি শহরের নিম্ন মধ্যবিত্ত অধিবাসীরা তাঁর স্বৈরতন্ত্রের স্থলে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করে। এদিকে ১৮৬০ খ্রীঃ পর বৈদেশিক যুদ্ধে বিফলতার দরুন তাঁর জনপ্রিয়তা হ্রাস পেলে তৃতীয় নেপোলিয়ন বাধ্য হয়ে উদার শাসন নীতি নেন। পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচনকে যদি নেপোলিয়নের শাসনব্যবস্থার জনপ্রিয়তা মাপার তাপমান যন্ত্র বা ব্যারোমিটার ধরা হয়, তবে নির্বাচনের ফলাফল তাঁর জনপ্রিয়তার নিম্নমুখী হওয়ার ইঙ্গিত দেয়। ১৮৫২ খ্রীঃ পার্লামেন্টের নির্বাচনে তাঁর বিরুদ্ধে ভোট পড়ে মাত্র ৬ লক্ষ। ১৮৬৩ খ্রীঃ এই বিরুদ্ধ ভোটের সংখ্যা ছিল ২ মিলিয়ন বা ২০ লক্ষ। ১৮৬৯ খ্রীঃ তাঁর পক্ষে ছিল ৪৪ লক্ষ ৩৮ হাজার, বিপক্ষে ভোট ছিল ৩৩ লক্ষ ৫৫ হাজার। নেপোলিয়ন এই অবস্থায় উদারতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু করে সংবিধানের কঠোরতা হ্রাস করে জনপ্রিয়তা পেতে চেষ্টা করেন। ১৮৬০ খ্রীঃ থেকে এজন্য তাঁর শাসনব্যবস্থাকে "উদারতন্ত্রের পথে প্রত্যাবর্তন" বলা হয়। তার ফলে তাঁর ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা কিছু বাড়লেও, তাঁর শাসনব্যবস্থার প্রতি জনসাধারণের আস্থা বাড়েনি। যাই হোক, নেপোলিয়ন উদারতন্ত্র নীতি অনুসারে ঃ—(১) লেজিসলেটিভ বডির সদস্যরা সম্রাটের প্রস্তাবের ওপর বিতর্ক করার অধিকার পায়। (২) আইনসভায় মন্ত্রীদের আত্মপক্ষ সমর্থনে বিবৃতি দিতে বাধ্য করা হয়। (৩) পার্লামেন্টের বিতর্কের বিবরণ সংবাদপত্রে ছাপার অধিকার দেওয়া হয়। ১৮৬৬ খ্রীঃ নেপোলিয়ন সংবাদপত্রের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করেন এবং রাজনৈতিক দলগুলিকে সমালোচনার অধিকার দেন। মন্ত্রীসভাকে আইন সভার নিকট কাজের জন্যে দায়িত্ববদ্ধ করেন। প্রিফেক্টরা নির্বাচনে কারচুপি করা সত্ত্বেও বিশিষ্ট বিরোধী নেতাদের নির্বাচন আটকান যায়নি। এডোল্ফি থিয়ার্স, জুলেস ফেরি, লিয়ঁ গ্যামবেটা প্রভৃতির মত আগুন ঝরানো প্রজাতন্ত্রীরা আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন। প্রজাতন্ত্রবাদের জ্বলন্ত মশাল নিয়ে গ্যামবেটা বেলভিল ম্যানিফেস্টো ঘোষণা করে ফরাসী জনমতকে প্রভাবিত করেন। শেষ পর্যন্ত তৃতীয় নেপোলিয়ন তাঁর বিরোধী প্রজাতন্ত্রীদের শান্ত করতে আরও বেশী রাজনৈতিক জমি ছেড়ে দেন। ১৮৭০ খ্রীঃ জানুয়ারি মাসে তিনি অন্যতম প্রধান প্রজাতন্ত্রী নেতা এমিল ওলিভিয়েরকে মন্ত্রীসভা গঠনের দায়িত্ব দেন। সামরিক বিষয় ছাড়া অন্য সব বিষয়ে তিনি এই মন্ত্রীসভাকে স্বাধীনভাবে কাজ করার অধিকার দেন।[1] এর ফলে ফ্রান্সে এক প্রকৃত দায়িত্বশীল মন্ত্রীসভা ও পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র স্থাপিত হওয়ার পথ তৈরি হয়। কিন্তু দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের এই শেষ প্রহরে এই প্রত্যাশিত সংস্কার তাঁর শাসনব্যবস্থাকে রক্ষা করতে পারেনি। বৈদেশিক যুদ্ধের বিপর্যয় এবং তাঁর অতীতের স্বৈরশাসনের দায়িত্ব তিনি এড়াতে পারেননি। ১৮৭০ খ্রীঃ দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের পতন হয়। তথাপি শেষ প্রহরে নেপোলিয়নের এই সাংবিধানিক সংস্কারকেই আধুনিক ঐতিহাসিকরা প্রশংসা করেছেন। ডেভিড টমসনের মতে, "১৮৬০ খ্রীঃ পর থেকে নেপোলিয়নের শাসন প্রকৃত পার্লামেন্টারী শাসনের চরিত্র ধরছিল। ১৮৪৮ খ্রীঃ সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের পথে তা ফিরে

১· Gordon Craig.

যাচ্ছিল।" কিন্তু প্রজাতন্ত্রীরা প্রজাতন্ত্র ছাড়া আর কিছুতে সন্তুষ্ট হয়নি। এখানেই ছিল তৃতীয় নেপোলিয়নের ব্যর্থতা। তৃতীয় নেপোলিয়ন একনায়কতন্ত্র (Dictatorship) স্থাপন করলেও ইহা ছিল উদারনৈতিক একনায়কতন্ত্র। গ্রেনভিলের মতে, আধুনিক যুগের ডিক্টেটর বা একনায়করা যেরূপ একটি দলের মাধ্যমে এবং সন্ত্রাসের দ্বারা শাসনকার্য চালান, তৃতীয় নেপোলিয়ন তা থেকে বিরত ছিলেন। আধুনিক ডিক্টেটররা যেরূপ ব্যক্তি স্বাধীনতাকে ধ্বংস করে, নেপোলিয়ন আদপেই তা করেন নি।[১]

গ্রেনভিল (Grenville) প্রভৃতি ঐতিহাসিক বলেন, "দ্বিতীয় সাম্রাজ্য, প্রথম সাম্রাজ্যের অন্ধ-অনুকরণ ছিল না।"[২] তৃতীয় নেপোলিয়ন জানতেন যে, (১) যুগের পরিবর্তনের ফলে গঠনমূলক পরিবর্তনগুলি তাঁকে স্বীকার করতে হবে। তৃতীয় নেপোলিয়ন শিল্প-বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিশেষ সচেতন ছিলেন। মরিস সিপোলা প্রভৃতি অর্থনৈতিক ঐতিহাসিকের মতে, তৃতীয় নেপোলিয়নের আমলেই ফ্রান্সে প্রকৃত শিল্প-বিপ্লবের উড্ডীন শুরু হয়। (২) তৃতীয় নেপোলিয়ন শ্রমিকশ্রেণীর দারিদ্র্য ও অসন্তোষের খবর রাখতেন। তিনি সিংহাসনে বসার আগেই How to Destroy Poverty বা দারিদ্র্যকে কিভাবে ধ্বংস করা যায়, এ সম্পর্কে পুস্তক রচনা করেন। সি· ডি· হ্যাজেনের মতে, তৃতীয় নেপোলিয়ন ছিলেন মানবতাবাদী। তিনি সমাজের সকল শ্রেণীর স্বার্থের কথা ভাবতেন। লুই ফিলিপের ন্যায় বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা তাঁর লক্ষ্য ছিল না। (৩) তিনি লক্ষ্য করেন যে, ফ্রান্সে বিপ্লব ও প্রতিক্রিয়াশীলতার আবর্তন চলছে। সমাজে স্থিতি আসছে না। এজন্য তিনি মঙ্গলজনক নীতিগুলিকে আইনের দ্বারা চালু করে স্থিতি আনার কথা ভাবেন।[৩] গ্রেনভিল বলেন যে, নেপোলিয়ন বিশ্বাস করতেন যে, ফ্রান্সকে ক্রম পরিবর্তনের পথে পরিচালিত করে তিনি শেষ পর্যন্ত শৃঙ্খলা, স্বচ্ছলতা এবং রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক স্বাধীনতা দিতে পারবেন। তিনি এই সঙ্গে ফরাসী বিপ্লবের মূল্যবান ফলাফলগুলিকেও রক্ষা করতে চেষ্টা করেন। সকল নাগরিকের সমান মর্যাদা, যোগ্যতার ভিত্তিতে কর্মে নিয়োগ, ব্যক্তি স্বাধীনতা তিনি রক্ষা করতে চান। তিনি কোন বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থে শাসন পরিচালনা করতে চাননি।

দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র ধ্বংস করে তৃতীয় নেপোলিয়ন ফরাসী জাতির যে স্বাধীনতা হরণ করেন, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্কার দ্বারা তিনি তা পূরণের চেষ্টা করেন। তৃতীয় নেপোলিয়ন ছিলেন মানবতাবাদী। সমাজের সকল শ্রেণীর লোকের মঙ্গল সাধন তাঁর কাম্য ছিল। তিনি দাবী করতেন যে, সমাজের সকল শ্রেণীর তিনি প্রতিনিধি এবং তিনি জাতীয় রাজা। তিনি সকল শ্রেণীর স্বার্থ দেখতে চেষ্টা করেন। ১৮৫২ খ্রীঃ তিনি তাঁর বিখ্যাত বোর্দো বক্তৃতায় বলেন যে, "ফ্রান্সে চাষের উপযোগী অকর্ষিত বিশাল ভূখণ্ডকে খাদ্য উৎপাদনের কাজে লাগাতে হবে, রাস্তা তৈরি ও খাল খনন করতে হবে, নদীগুলিকে নৌ-বহনযোগ্য করতে হবে এবং রেলপথ নির্মাণ সম্পূর্ণ করতে হবে। আমার সাম্রাজ্যের হবে এগুলিই প্রধান কর্তব্য··· যদি যুদ্ধ জয়ের কথা বলা হয়, তবে এই যুদ্ধগুলিই আমি জয় করতে আগ্রহী।" তিনি শুধু ফাঁকা বক্তৃতা দেননি। এই নীতিগুলি কার্যকরী করে তিনি ফ্রান্সের আর্থিক ও সামাজিক পরিবর্তন করতে চেষ্টা করেন।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন

মরিস সিপোলার মতে, তাঁর আমলেই ফ্রান্সের প্রকৃত শিল্প-বিপ্লব ঘটে।[৪] ফ্রান্স তখনও গ্রামীণ সমাজ ও কৃষি অর্থনীতিতে নির্ভরশীল ছিল। ১৮৫২ খ্রীঃ ফ্রান্সের জনসংখ্যার ৪/৫ অংশ

১· Grenville—Europe Reshaped. P. 171.

২· "The Second Empire was no slavish imitation of the First."

৩· Grenville—Ibid, P. 173.

৪· Maurice Cipalla—Economic History of Europe.

গ্রামে বাস করত। নেপোলিয়নের শাসনের শেষ দিকে ফ্রান্সের মাত্র $\frac{২}{৩}$ অংশ লোক গ্রামে বাস করত। এর অর্থ হল যে, কলকারখানা বাড়ার ফলে শহরে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং লোকের জীবনযাত্রার উন্নতি ঘটে। ফ্রান্সের ফৌজদারী ও অর্থনৈতিক আইনগুলির সংশোধন করে যৌথ উদ্যোগে শিল্প কারখানা স্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়।

শিল্প স্থাপনের জন্যে নেপোলিয়ন শিল্প উদ্যোগীদের বিশেষ উৎসাহ দেন। ফ্রান্সে নতুন শিল্প স্থাপনের প্রধান বাধা ছিল মূলধনের অভাব। ফ্রান্সের পুরাতন ব্যাঙ্কগুলি শিল্পে টাকা লগ্নী করতে ইচ্ছুক ছিল না। নেপোলিয়ন এজন্য পেরিয়ার ব্রাদার্স (Pereire Brothers), হোপ, লাফিত, এমিল আইজ্যাক, পলিন ট্যালবট প্রভৃতি মূলধনীদের সহায়তায় ক্রেডিট মেবিলিয়ার নামে এক শিল্প ব্যাঙ্ক স্থাপন করেন। এই ব্যাঙ্কের শাখা বিভিন্ন শহরে স্থাপিত হয়। নতুন শিল্পে অর্থ লগ্নী করতে এবং কারখানা স্থাপনের জন্যে এই ব্যাঙ্ক থেকে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দেওয়া হত। এছাড়া ক্রেডিট ফঁাসিয়ার (Credite Foucier) নামে এক ব্যাঙ্ক স্থাপন করে সম্পত্তি বন্ধক রেখে শিল্পের জন্যে ঋণ দানের ব্যবস্থা করা হয়। এই ব্যাঙ্কের শাখা দেশের সর্বত্র স্থাপন করা হয়। তাছাড়া তিনি ব্যাঙ্ক অফ ফ্রান্সকে পুনর্গঠন করে মুদ্রা ব্যবস্থার ওপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করেন। ব্যাঙ্ক অফ ফ্রান্স সিকিউরিটী বা সম্পত্তি প্রভৃতি জামিনের পরিবর্তে ঋণ দান করে। নতুন ব্যাঙ্কগুলির সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে পুরাতন ব্যাঙ্কগুলিও শিল্পে অর্থলগ্নী আরম্ভ করে। এভাবে মূলধনের সরবরাহ বৃদ্ধি করে নেপোলিয়ন শিল্পের দ্রুত প্রসার ঘটান। ফরাসী বুর্জোয়া শ্রেণী এর ফলে প্রভূত অর্থ উপার্জনের সুযোগ পায়। ফ্রান্সে আর্থিক স্বচ্ছলতা দেখা দেয়। কৃষকদেরও তৃতীয় নেপোলিয়ন বঞ্চিত করেননি। তিনি জানতেন যে, বিপ্লবের যুগ হতে কৃষকেরা ভূমির মালিকানা পেলেও মূলধনের অভাবে উন্নত প্রথায় কৃষির উৎপাদন করতে পারত না। তিনি ক্রেডিট এগ্রিকোল নামে কৃষি ব্যাঙ্ক স্থাপন করে কৃষকদের কম সুদে ঋণদানের ব্যবস্থা করেন। তিনি আধুনিক রোটেশন প্রথায় চাষ এবং সার প্রদান করে ফলন বাড়াবার জন্যে কৃষকদের অনুপ্রাণিত করেন। তিনি আদর্শ কৃষি খামার স্থাপন, উন্নত বীজের উৎপাদন, কৃষি মেলার সংগঠন দ্বারা কৃষকদের উৎসাহিত করেন। তিনি উন্নত প্রথায় পশুপালনের ওপরেও জোর দেন। তিনি পতিত জমির পুনরুদ্ধার, জলাজমির জলনিকাশী ব্যবস্থা ও অরণ্যভূমির সংরক্ষণ করেন। এর দ্বারা বহু লোকের কর্মসংস্থান হয় এবং কৃষির উন্নতি হয়। রেলপথ নির্মিত হলে গ্রামের কৃষকরা তাদের উদ্বৃত্ত শস্যাদি শহরে রপ্তানি করে লাভবান হয়।

ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার প্রসার ঃ শিল্প সংগঠন, শিল্প বিপ্লব

তৃতীয় নেপোলিয়নের শিল্প নীতির ক্ষেত্রে রেলপথের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখ্য। জুলাই রাজতন্ত্রের শাসনকালে রেলপথ নির্মাণ আরম্ভ হলেও তার প্রসার ঘটেনি। পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি ছাড়া শিল্পের বিকাশ সম্ভব নয় একথা তিনি জানতেন। জুলাই রাজতন্ত্রের আমলে রেলপথ নির্মাণ আরম্ভ হলেও তার গতি ছিল মন্থর। ১৮৪৮ খ্রীঃ ফ্রান্সের মোট রেলপথ ছিল ১৮০০ কিঃ মিঃ। নেপোলিয়নের বিরাট রেল নির্মাণ প্রকল্পের ফলে রেলপথের দৈর্ঘ হয় ১৭,৫০০ কিঃ মিঃ। রেল নির্মাণকে কেন্দ্র করে সহকারী লোহা ও কয়লা শিল্পের বিরাট প্রসার ঘটে। তাছাড়া ভারী শিল্প, যথা, লোহা ও কয়লার উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। বিখ্যাত লোহার কারখানা লা ক্রুসোর পুনর্গঠন করা হয়। ফ্রান্সে জাহাজ নির্মাণ শিল্প এবং অস্ত্রশিল্পেরও বিকাশ ঘটে। ফ্রান্সে নতুন নতুন শিল্প শহর গড়ে ওঠে। ফ্রান্সে সুগন্ধি বিলাসদ্রব্যের শিল্পেরও বিশেষ প্রসার ঘটে। শিল্প বিস্তারের ফলে কর্মসংস্থান বাড়ে। বহু লোক কলকারখানায় চাকুরী পায়।

রেলপথ, লৌহ ও কয়লা শিল্পের অগ্রগতি

গ্রেনভিল তৃতীয় নেপোলিয়নের রাজত্বকালে শিল্পের বিস্তার সম্পর্কে দ্বিতীয় মত পোষণ করেন। তিনি বলেন যে, তৃতীয় নেপোলিয়নের আমলে শিল্পের বিস্তৃতি সম্পর্কে অতিশয়োক্তি

করা হয়। গোটা উনবিংশ শতকের সাধারণ পটভূমিকায় বিচার করলে দ্রুত শিল্পায়নের জন্যে দ্বিতীয় সাম্রাজ্যকে কোন অসাধারণ উন্নতির সময় বলে মনে করা যায় না। কিন্তু এ্যালেন, ট্রেবিল্ল কক প্রভৃতি অর্থনৈতিক ঐতিহাসিক দ্বিতীয় সাম্রাজ্যকেই ফ্রান্সে শিল্পের উড্ডয়নকাল বলে গণ্য করেন।

তৃতীয় নেপোলিয়ন শ্রমিক সমাজের দুর্দশাব কথা ভাবতেন। আলফ্রেড কোব্বানের মতে, "তৃতীয় নেপোলিয়ন ছিলেন ঘোড়ায় চড়া সেন্ট সাইমন" (St. Simon on horseback) ; তিনি সমাজতন্ত্রবাদের পিতামহ সেন্ট সাইমনের আদর্শে প্রভাবিত হন। শ্রমিক কল্যাণের জন্যে তিনি বেশ কয়েকটি আইন প্রণয়ন করেন। তিনি শ্রমিকদের ট্রেড-ইউনিয়ন গঠনের অধিকারকে স্বীকৃতি দেন। এছাড়া মজুরী বৃদ্ধি ও কাজের সময় কমাবার জন্যে শ্রমিকদের ধর্মঘট করার অধিকারকেও তিনি বৈধতা দান করেন (১৮৬৪ খ্রীঃ)। বৃদ্ধ, অবসরপ্রাপ্ত, রুগ্ন এবং দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকের ত্রাণের জন্যে তিনি বিভিন্ন প্রকার বাধ্যতামূলক বীমা চালু করেন। দরিদ্রশ্রেণীর জন্যে তৃতীয় নেপোলিয়ন সাহায্য সংস্থা গঠন করেন। তিনি মাংসের দাম বেঁধে দেন এবং খাদ্যের দাম যাতে সস্তা হয় তার চেষ্টা করেন। তিনি জাতীয় কর্মসংস্থান কেন্দ্র স্থাপন করে বেকার সমস্যা দূর করার চেষ্টা করেন।

শ্রমিক কল্যাণমূলক ব্যবস্থা

১৮৬০ খ্রীঃ তৃতীয় নেপোলিয়ন ব্রিটেনের সহিত কবডেন চুক্তি (Cobden Treaty) নামে এক অবাধ বাণিজ্যমূলক চুক্তি সম্পাদন করেন। এই চুক্তির উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটেন থেকে সস্তা দরের শিল্পদ্রব্য এনে ফরাসী জনসাধারণের সুবিধা করা। কিন্তু এই ব্যবস্থার ফলে সংরক্ষণ নীতি ত্যাগ করা হয়। ফ্রান্সের নবীন শিল্পগুলি সস্তা ব্রিটিশ মালের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ধ্বংস হতে থাকে। শিল্পপতিরা এ বিষয়ে সম্রাটের নিকট দরবার করলেও তিনি এতে কর্ণপাত করেননি। গর্ডন ক্রেইগের মতে, অবাধ বাণিজ্য চুক্তির দ্বারা সম্রাট ইংলন্ডকে সন্তুষ্ট করতে চান।

অবাধ বাণিজ্য চুক্তি

তৃতীয় নেপোলিয়ন প্যারিস নগরীকে ভেঙে পুনর্গঠন আরম্ভ করেন। ব্যারন হজম্যান (Baron Hausman) ছিলেন প্যারিসের পুনর্গঠনের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। তাঁর পরিকল্পনা অনুসারে নতুন রাস্তাঘাট ও ঘরবাড়ি তৈরি করা হয়। উদ্যান ও জল সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি করে শহরের জীবনযাত্রার উন্নতি করা হয়। আদি প্যারিসের উপকণ্ঠের বহু গ্রামগুলিকে নিয়ে নব প্যারিস গঠিত হয়। ১৮৫১ খ্রীঃ প্যারিসের জনসংখ্যা ছিল ১০ লক্ষ। ১৮৭০ খ্রীঃ তা দাঁড়ায় ১৮ লক্ষে। প্যারিসের পুনর্গঠনের ফলে তার পুরাতন সরু বাঁকা চোরা রাস্তাগুলি ভেঙে চওড়া নতুন ম্যাকাডাম রাস্তা ও ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী তৈরি করা হয়। এর ফলে শ্রমিকদের বাসস্থান শহরের কেন্দ্রস্থল হতে উপকণ্ঠে অপসারিত হয়। প্যারিসের উন্নয়নে মূলধনী পেরিয়ার, হোপ প্রভৃতি কোম্পানীগুলি প্রচুর টাকা ঢালে। কল-কারাখানাগুলিকে শহরের বাইরে স্থানান্তরিত করা হয়। পুরাতন সরু গলি লোপ পাওয়ায় রাস্তায় অবরোধ রচনা করে বিদ্রোহ করার সুযোগ নষ্ট হয়। চওড়া রাস্তায় সরকারি সেনা সহজে দখল নিতে পারে। প্যারিসের রাস্তায় অবরোধ তৈরির যুগ শেষ হয়। শহরে পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। বহু বুলেভার বা পার্ক জনাকীর্ণ শহরের ফুসফুসের কাজ করে। এই নির্মাণ কার্যে বহু লোক নিযুক্ত হয় এবং রুজি-রোজগারের পথ পায়। প্যারিস নগরীতে এক আন্তর্জাতিক শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন করে, ইওরোপে ফ্রান্সের মর্যাদা বাড়ান হয়।

প্যারিস নগরীর পুনর্গঠন

তৃতীয় নেপোলিয়নের আভ্যন্তরীন শাসন নীতি সম্পর্কে ফরাসী ঐতিহাসিক গর্স (M Le Gorce) মন্তব্য করেছেন যে, "এই শাসন ব্যবস্থা ছিল একাধারে প্রতিক্রিয়াশীল ও

তৃতীয় নেপোলিয়নের শাসন নীতির সমালোচনা

প্রগতিশীল।"[১] তিনি প্রজাতান্ত্রিক শাসনের পরিবর্তে একনায়কতন্ত্র স্থাপন করে প্রতিক্রিয়াশীলতার পরিচয় দেন। তিনি নির্বাচিত পার্লামেন্ট রাখলেও সেই পার্লামেন্টের হাতে প্রকৃত ক্ষমতা দেননি। তাঁর দমন নীতির চাপে ব্যক্তি স্বাধীনতা বিপন্ন হয়। রাজনৈতিক দলগুলি তাঁর পতন কামনা করে। এই রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে ন্যায্য অধিকারবাদীরা বুরবোঁ বংশের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা চাইত। তাদের চোখে তৃতীয় নেপোলিয়ন ছিলেন সিংহাসনে বে-আইনী জবর দখলকারী। সাংবিধানিক রাজতন্ত্রবাদী এডল্ফি থিয়ার্স চাইতেন যে, অন্ততঃপক্ষে তৃতীয় নেপোলিয়ন যেন ১৮৪৮ খ্রীঃ এর আগের সংবিধান মেনে চলেন। সমাজতন্ত্রবাদী আগাষ্ট ব্লাঙ্কি তৃতীয় নেপোলিয়নের বুর্জোয়া-ঘেঁসা নীতির কঠোর সমালোচক ছিলেন। সর্বোপরি, প্রজাতন্ত্রীরা ১৮৫২ খ্রীঃ প্রজাতন্ত্র ধ্বংস করার জন্যে তাঁকে ক্ষমা করতে প্রস্তুত ছিল না। পাতি বুর্জোয়া সমর্থিত প্রজাতন্ত্রী দল ছিল ভয়ানক শক্তিশালী। লিঁয় গ্যামবেটা, জুলেস ফেবী প্রভৃতি প্রজাতন্ত্রীরা ছিলেন আগুনখোর প্রজাতন্ত্রী। তৃতীয় নেপোলিয়ন যদি তাঁর বৈদেশিক নীতিতে বিফল নাও হতেন, তাহলেও এই প্রজাতন্ত্রীরা তাঁর পতন ঘটাত। প্রজাতন্ত্রী পত্রিকা লে সিকেলের পাঠক সংখ্যা দ্রুত বাড়ছিল। লুই নেপোলিয়নের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যতই প্রজাতন্ত্রী দল ও তাদের কর্মীদের ওপর দমন-পীড়ন চালান, ততই তাদের জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে। তিন আইনজীবি জুলেস ফেরি, জুলেস ফেভার ও জুলেস সাইমন এই সময় প্রজাতন্ত্রবাদকে জনপ্রিয়তা দেন। প্যারিসে জুলিয়েট এ্যাডামস নামে এক ভদ্রমহিলার সাঁলোতে প্রজাতন্ত্রীরা সংগঠনের কেন্দ্র স্থাপন করেন। জুলেস সাইমনের পত্রিকা পলিটিক র‍্যাডিকেল পঞ্চ স্বাধীনতার দাবী ছড়িয়ে দেন। এই পঞ্চ স্বাধীনতার মধ্যে ছিল, (ক) সর্বসাধারণের ভোটাধিকার; (খ) গীর্জা ও রাষ্ট্রের পৃথকীকরণ; (গ) সর্বসাধারণের জন্যে ধর্মনিরপেক্ষ অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা, (ঘ) স্থায়ী সেনাদল রদ করা; (ঙ) সকল দায়িত্বশীল সরকারি পদে নির্বাচিত কর্মচারী নিয়োগ। লিঁয় গ্যামবেটা প্রজাতন্ত্রের প্রভাব নিম্ন মধ্যবিত্ত ও গ্রামের স্বচ্ছল কৃষকদের মধ্যেও ছড়িয়ে দেন। এদিকে সম্রাটের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ার ফলে শাসন ব্যবস্থার ওপর তিনি নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছিলেন। ফ্রান্সের জাগ্রত প্রজাতন্ত্রবাদের সঙ্গে আপোষ রফা করার মত ক্ষমতা তাঁর ছিল না। তিনি ক্রমে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। এই পটভূমিকায়, ১৮৭০ খ্রীঃ বৈদেশিক নীতিতে তাঁর বিপর্যয় না ঘটলেও তাঁর পতন ঘটা অবশ্যম্ভাবী ছিল। বৈদেশিক যুদ্ধে বিপর্যয় তা ত্বরান্বিত করে মাত্র। দ্বিতীয়তঃ, তৃতীয় নেপোলিয়নের আভ্যন্তরীণ নীতির মধ্যে সামঞ্জস্য ছিল না। তিনি এক দিকে শিল্পে বিস্তার নীতি গ্রহণ করেন। এজন্য তাঁর উচিত ছিল শিল্প সংরক্ষণ নীতি নেওয়া। কিন্তু তিনি অবাধ বাণিজ্য নীতি গ্রহণ করলে শিল্পগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তৃতীয়তঃ, তাঁর শাসনের ফলে দেশে স্থিতি ও সমৃদ্ধি স্থাপিত হয় ইহা সত্য। কিন্তু সমাজে ধন বণ্টনের ব্যবস্থা না করার ফলে ধনীরা আরও ধনী হয়, গরীবেরা আরও গরীব হয়। ঐতিহাসিক বিউরি (Bury) মনে করেন যে, তৃতীয় নেপোলিয়ন শেষ পর্যন্ত আভ্যন্তরীন শাসনের ক্ষেত্রে জনপ্রিয়তা হারাতে থাকেন। জনপ্রিয়তা বজায় রাখার জন্যে তিনি বৈদেশিক যুদ্ধে যোগ দেন। এর ফলে দেশে কর ভার বাড়ে। শেষ পর্যন্ত তাঁর ভ্রান্ত বৈদেশিক নীতি তাঁর পতনকে ত্বরান্বিত করে।

তৃতীয় নেপোলিয়নের বৈদেশিক নীতি (Foreign Policy of Napoleon III) : তৃতীয় নেপোলিয়নের বৈদেশিক নীতির লক্ষ্য কি ছিল এ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক দেখা যায়। জাতীয়তাবাদী ফরাসী ঐতিহাসিকেরা বলেন যে, গৌরব-পিয়াসী ফরাসী জাতিকে যুদ্ধ জয়ের গৌরবের মদিরা পান করিয়ে তৃতীয় নেপোলিয়ন

১. "It was progressive and retrogade at the same time."

বৈদেশিক নীতিব লক্ষ্য : জনপ্রিযতা বৃদ্ধি কবা

নিজ জনপ্রিযতা বৃদ্ধিব কথা ভাবেন। লুই ফিলিপেব নিষ্ক্রিয় বৈদেশিক নীতিব স্থলে কার্যকবী নীতি গ্রহণ কবে তিনি জনপ্রিযতা পাওযাব আশা কবেন।[১] তাছাডা তিনি ভাবেন যে, বৈদেশিক ক্ষেত্রে জযলাভেব ফলে ফবাসী জাতি স্বদেশে তাঁব স্বৈব শাসনেব বিফলতা ভুলে যাবে। তকভিল নামক প্রখ্যাত ফবাসী ঐতিহাসিকেব মতে, তৃতীয নেপোলিযন যদিও মুখে শান্তি নীতিব কথা বলতেন কাজে তিনি তাঁব খুল্লতাতকে অনুসবণেব চেষ্টা কবেন। তিনি ইওবোপে ফ্রান্সেব আধিপত্য বৃদ্ধিব দ্বাবা স্বদেশে জনপ্রিযতা লাভেব চেষ্টা কবেন। মোট কথা, এই সকল ঐতিহাসিকেব মতে, তৃতীয নেপোলিযনেব বৈদেশিক নীতিব মূল লক্ষ্য ছিল গৌববজনক বিদেশ নীতিব দ্বাবা স্বদেশে নিজ জনপ্রিযতাব বৃদ্ধি কবা। অপব কোন উচ্চতব লক্ষ্য এই সকল জাতীযতাবাদী ঐতিহাসিক দেখতে পাননি। অপবদিকে কোন কোন মধ্যপন্থী ঐতিহাসিক বলেন যে তিনি ব্রিটিশেব সহাযতায ভিয়েনা সন্ধিব পূর্ণ পবিবর্তন ঘটিযে, ইওবোপে জাতীযতাবাদী বাষ্ট্র গঠন দ্বাবা নতুন শক্তিসাম্য স্থাপন কবতে চান। এই শক্তিসাম্যেব মধ্যমণি হিসেবে ফ্রান্সকে তিনি স্থাপন কবতে চান। নব গঠিত জাতীযতাবাদী বাষ্ট্রগুলি তাদেব কপকাব ও স্রষ্টা ফ্রান্সেব প্রতি নৈতিক আনুগত্য জানাবে, এই আশা তিনি পোষণ কবতেন। তিনি এই পবিবর্তনকে যতদূব সম্ভব যুদ্ধেব পথে নয কূটনীতিব পথে সিদ্ধ কবতে চান।

গ্রেনভিলেব মন্তব্য

গ্রেনভিল প্রভৃতি ঐতিহাসিকেবা উপবোক্ত অভিমতকে অতি সবলীকবণ দোষে দুষ্ট বলে মনে কবেন।[২] তৃতীয নেপোলিযন তাঁব পিতৃব্যেব ন্যায যুদ্ধ-বিশাবদ লোক ছিলেন না। যুদ্ধ এবং তাব প্রতিক্রিযাকে তিনি ভয কবতেন। তিনি বংশানুক্রমিক বাজা ছিলেন না ইওবোপেব বাজশক্তিগুলিব বিরুদ্ধে যুদ্ধে জডিযে পডলে তাঁব সিংহাসন বিপন্ন হওযাব সম্ভাবনা ছিল। তৃতীয নেপোলিযন ঘোষণা কবেন যে, "আমাব সাম্রাজ্যেব অর্থই হল শান্তি" (My Empire means peace)। ফলে তিনি স্বেচ্ছায যুদ্ধ নীতি নেন ইহা বলা যায না। গ্রেনভিল বলেন যে, তৃতীয নেপোলিযনেব বিদেশ নীতি এত পবস্পব বিবোধী ছিল যে তাকে একটি ছকে বেঁধে ব্যাখ্যা কবা কঠিন। শুধু এইমাত্র বলা যায যে, ইংলন্ডেব সহাযতায তিনি ভিযেনাব মানচিত্র বদলে ফেলতে চান। তাব স্থলে তিনি তাঁব জাতীযতাবাদী বাষ্ট্র সমন্বিত নতুন ইওরোপ গঠন কবতে চান। কিন্তু তিনি এমন জটিলতাব মধ্যে জডিযে পডেন যে গোডায তাঁব উদ্দেশ্য যা ছিল, তা অনেকটা চাপা পড়ে যায।

অপব একটি মত এই যে, তৃতীয নেপোলিযনেব বৈদেশিক নীতিব লক্ষ্য ছিল ইওবোপে জাতীযতাবাদেব বিজয স্থাপন। ঐতিহাসিক কার্লটন হেইজেব মতে, "তৃতীয নেপোলিযন ছিলেন প্রকৃষ্ট জাতীয়তাবাদী" (A Nationalist par-excellence)।[৩]

জাতীয়তাবাদ তৃতীয় নেপোলিয়নেব বৈদেশিক নীতির লক্ষ্য ছিল কিনা

ইতালী, জার্মানী, পোল্যান্ড, রুমানিযা প্রভৃতি দেশেব জাতীযতাবাদী মুক্তি আন্দোলনকে তিনি দৃঢ় সমর্থন জানান। এ· জে পি টেইলার নামক ঐতিহাসিক বলেন যে, তৃতীয় নেপোলিয়ন মূলতঃ ভিয়েনা সন্ধিকে (১৮১৫ খ্রীঃ) ভাঙার জন্যে ব্যগ্র ছিলেন। যেহেতু ভিয়েনা সন্ধি ছিল জাতীযতাবাদ-বিরোধী সেহেতু তিনি জাতীয়তাবাদকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে ভিয়েনা সন্ধিকে ভাঙার আয়োজন করেন।[৪] তিনি উপলব্ধি কবেন যে, উনবিংশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে ইওরোপের সর্বাপেক্ষা সক্রিয় আদর্শ ছিল জাতীয়তাবাদ। বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা

---

১ Gordon Craig

২· Grenville—Europe Reshaped. P 178

৩· Carlton Hays—Modern Europe P 71

৪· A J P Taylor—Struggle for Mastery of Europe P 90

এবং জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলির অভ্যুত্থানের সুযোগ নিয়ে তিনি ইওরোপের ওপর চাপিয়ে দেওয়া ভিয়েনার স্থিতাবস্থা ভাঙতে চান।[১]

তৃতীয় নেপোলিয়ন সিংহাসনে বসবার পরেই রোমে ফরাসী সেনা পাঠান। ইতালীর দেশপ্রেমিক ম্যাৎসিনী রোমে প্রজাতন্ত্র স্থাপন করে পোপকে বহিষ্কার করেন। এজন্য ফ্রান্সের ক্যাথলিক সম্প্রদায় দুঃখিত ছিল। তৃতীয় নেপোলিয়ন পোপকে পুনঃস্থাপন করে ক্যাথলিকদের নিকট জনপ্রিয়তা পান।

ইতিমধ্যে তিনি রুশ জারের কাছে গোপন প্রস্তাব দেন যে, বলকানে তুরস্কের সাম্রাজ্য ব্যবচ্ছেদ করে জাতীয়তাবাদী ভিত্তিতে গঠন করা হোক। জার এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন।

ক্রিমিযাব যুদ্ধ ঃ তৃতীয় নেপোলিয়নেব নীতি

নেপোলিয়নের পরস্পর-বিরোধী নীতির দৃষ্টান্ত হল, যে তুরস্ককে তিনি ব্যবচ্ছেদের প্রস্তাব জারের কাছে দেন, সেই তুরস্ককে রক্ষা করার জন্যে তিনি ক্রিমিয়ার যুদ্ধে রাশিয়াব বিরুদ্ধে নেমে পড়েন। তাঁর আভ্যন্তরীণ নীতির মতই, তাঁর বৈদেশিক নীতিতে স্ব-বিরোধিত: লক্ষ্য করা যায়। তৃতীয় নেপোলিয়ন রাশিয়ার আক্রমণ থেকে তুরস্ককে রক্ষার জন্যে ক্রিমিয়ার যুদ্ধে যোগ দেন। যদিও তাঁর এই যুদ্ধে যোগদানের উপলক্ষ্য ছিল গ্রোটোর গীর্জার পবিত্র চাবি ক্যাথলিক খ্রীষ্টা দের ধর্মগুরু পোপের হাতে রাখা এবং গ্রীক গীর্জার ধর্মগুরুকে এই চাবির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা; আসলে তিনি ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের নিকট জনপ্রিয়তা লাভের জন্যে এই চাবির ওপর ক্যাথলিকদের দাবী সমর্থন করেন। ইংলন্ডের সমর্থন লাভ করা ছিল তাঁর বৈদেশিক নীতির প্রধান অঙ্গ। যেহেতু তুরস্কের সমর্থনে ইংলন্ড রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দেয়, সেহেতু ইংলন্ডের পক্ষ নিয়ে তিনি যুদ্ধে নামেন। তাঁর একটি ব্যক্তিগত কারণও এই যুদ্ধের সঙ্গে জড়িয়েছিল। রুশ জার নিকোলাস তাঁকে "ভুঁইফোড় রাজা" বলে অপদস্থ করেন। এজন্য তিনি জারকে শিক্ষা দিতে চান। ১৮৫৬ খ্রীঃ স্বাক্ষরিত প্যারিসের সন্ধির দ্বারা এই যুদ্ধের অবসান ঘটে। তৃতীয় নেপোলিয়ন প্যারিসের বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পর ফ্রান্স প্রথম সারির রাষ্ট্র হিসেবে ইওরোপে স্বীকৃত হয়। তৃতীয় নেপোলিয়নের রাজনৈতিক প্রভাব বিশেষভাবে বাড়ে। প্যারিস ইওরোপের কূটনীতির কেন্দ্রে পরিণত হয়। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ফ্রান্সের নিষ্ফলা গৌরব বৃদ্ধি ছাড়া বাস্তবে ফ্রান্সের লাভ বিশেষ কিছু হয়নি। বরং তিনি এই যুদ্ধের ফলে রুশ জারের শত্রুতা অর্জন করেন। প্যারিসের সন্ধির দ্বারা তিনি মোলদাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া প্রদেশ দুটিকে নিয়ে রুমানিয়া রাজ্য গঠনে সাহায্য করেন। সকল দিক থেকে খতিয়ে বিচার করলে ক্রিমিয়ার যুদ্ধে নেপোলিয়ন যে পরিকল্পনা নিয়ে যোগ দেন তা পূরণ হয়নি। এই যুদ্ধে ফ্রান্সের ভয়াবহ অর্থ ও লোক ক্ষয় হয়। যদি জার প্যারিসের সন্ধিতে যোগ দিতে রাজি না হতেন তবে নেপোলিয়নকে এই ক্ষতিকারক যুদ্ধ বহুদিন চালাতে হত। ফ্রান্সের পক্ষে সামরিক গৌরব লাভ সম্ভব হত না। নেপোলিয়নের বিদেশমন্ত্রী এজন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেন যে, ব্রিটেন তার শুরু করা যুদ্ধের দায়িত্ব ফ্রান্সের ঘাড়ে ফেলে দেয়। নেপোলিয়ন ব্রিটেনের মিত্রতা রক্ষার জন্যে এই যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি বহন করেন। যদি জাতীয়তাবাদের স্বার্থে নেপোলিয়ন ক্রিমিয়ার যুদ্ধে যোগ দেন, সেই আশাও পূরণ হয়নি। তিনি রাশিয়ার হাত থেকে পোল্যান্ডকে ছিনিয়ে নিয়ে ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন পোল্যান্ড গঠন করতে পারেননি। সুতরাং ক্রিমিয়ার যুদ্ধ নেপোলিয়নের ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করা ছাড়া আর কোন দিক থেকে লাভজনক ছিল না।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পর সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন ইতালীর দিকে দৃষ্টি দেন। জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকদের মতে, তৃতীয় নেপোলিয়ন ইতালীর জাতীয় ঐক্য আন্দোলনকে আন্তরিক সমর্থন

১· Grenville—Europe Reshaped.

ইতালীয় নীতি

করতেন। তিনি যদিও ফরাসী ছিলেন তবুও ইতালীকে তাঁর দ্বিতীয় জন্মভূমি বলে মনে করতেন। এ· জে· পি· টেইলারের মতে, তৃতীয় নেপোলিয়ন মনে করতেন যে, ভিয়েনা চুক্তি ভাঙতে হলে, ইতালীই ছিল সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক স্থান। জার্মানীতেও ভিয়েনা সন্ধি ভাঙা যেত। কিন্তু এ· জে· পি· টেইলার বলেন যে, জার্মানী ছিল ইওরোপের সদর দরজা। এখানে এই সন্ধি ভাঙলে অন্যান্য বৃহৎ শক্তি বিশেষতঃ প্রাশিয়ার সঙ্গে সঙ্ঘাতকে নেপোলিয়ন বেশী বিপজ্জনক মনে করেন। তুলনামূলকভাবে ইতালীর ব্যাপারে অষ্ট্রিয়া ছাড়া অন্যান্য বৃহৎ শক্তিগুলি ছিল উদাসীন। ইতালীতে তিনি দ্রুত ও চমকপ্রদ সাফল্য আশা করেন। ইতালী থেকে অষ্ট্রিয়াকে বহিস্কার দ্বারা ফ্রান্সের নৈতিক আধিপত্য তিনি এই দেশে প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতেন। ইতালীয় জাতীয়তাবাদের প্রধান রূপকারের খ্যাতিও তাঁর কাম্য ছিল। নেপোলিয়নের এই বিচারে দুটি বড় ভুল ছিল যার জন্যে ইতালীর মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়ে তিনি ভয়ানক বিপদে পড়েন। প্রথমতঃ, ইতালী ও জার্মানীর জাতীয়তাবাদী সমস্যা ছিল পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত। নেপোলিয়ন ইতালীর যুদ্ধে অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে লিপ্ত হলে, প্রাশিয়া ফ্রান্সকে আক্রমণের জন্যে রাইন সীমান্তে সেনা সন্নিবেশ করে। নেপোলিয়ন এই বিপদের কথা অনুমান করতে পারেননি। দ্বিতীয়তঃ, ফ্রান্সের দক্ষিণে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতীয়তাবাদী ইতালীর উত্থান ফ্রান্সের নিজের নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক বলে অধিকাংশ ফরাসী নেতা মনে করতেন। এজন্য তাঁরা নেপোলিয়নের ইতালী অভিযানকে অপ্রয়োজনীয়, বিপজ্জনক সিদ্ধান্ত বলে সমালোচনা করেন। ক্যাথলিক ফ্রান্স ক্যাথলিক ধর্মগুরু পোপ ইতালীর ঐক্য যুদ্ধে হেনস্থা হলে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে সমালোচনায় মুখর হয়। নেপোলিয়ন এই সমস্যাগুলি ভালভাবে বিবেচনা না করে ইতালীর যুদ্ধে জড়িয়ে নানা পরস্পর-বিরোধী কাজ করে তাঁর ভাবমূর্তি নষ্ট করেন। ইতালীয় জাতির কাছ থেকে মুক্তিদাতা হিসেবে যে কৃতজ্ঞতা এবং ইতালীতে ফ্রান্সের যে আধিপত্য লাভের তিনি আশা করেন তা কোনদিন পূর্ণ হয়নি। স্বদেশে তিনি নিন্দিত হন। বৃহৎ শক্তিগুলি তাঁর হস্তক্ষেপ নীতিকে ইওরোপের স্থিতাবস্থার বিঘ্নকারী বলে। ইতালীয়রা ইতালীর মুক্তি যুদ্ধে তাঁর সুবিধাবাদী নীতির জন্যে তাঁকে ধিক্কার জানায়। তিনি চিরতরে অষ্ট্রিয়ার শত্রুতা ভাজন হন। ১৮৭০ খ্রীঃ ফ্রাঙ্কো-জার্মান যুদ্ধের সময় তাঁর ভয়ানক বিপদের সময় তিনি অষ্ট্রিয়ার সাহায্য লাভে ব্যর্থ হন। ইতালীয় যুদ্ধের জন্যে তাঁকে কঠিন ও নিষ্ঠুর মূল্য দিতে হয়।

ইতালীর মুক্তি যুদ্ধের জন্যে নেপোলিয়ন পিডমন্টের সঙ্গে এক গোপন সন্ধি করেন। এই সন্ধি অনুযায়ী তৃতীয় নেপোলিয়ন ইতালীর মুক্তিযুদ্ধে অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে অঙ্গীকার

প্লেমাবিয়ারের চুক্তি :

ভিল্লাফ্রাঙ্কার সন্ধি

করেন। এর বিনিময়ে ইতালীর দুটি স্থান স্যাভয় ও নিস (Savoy and Nice) ফ্রান্স পাবে স্থির হয়। ইতালীর স্বাধীনতার যুদ্ধে ফরাসী বাহিনী ১৮৫৯ খ্রীঃ অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে অংশ নেয়। ফরাসী সেনা অষ্ট্রিয় বাহিনীকে লম্বার্ডি প্রদেশ থেকে বহিষ্কার করে। অষ্ট্রিয় বাহিনী পিছু হঠে ভিনিসিয়া প্রদেশে রুখে দাঁড়ায়। যুদ্ধের গতি যখন সাফল্যের পথে চলছিল সেই সময় তৃতীয় নেপোলিয়ন, পিডমন্টের সঙ্গে কোন আলোচনা না করে অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে ভিল্লাফ্রাঙ্কার (Villafranca) যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এর ফলে লম্বার্ডি প্রদেশ পিডমন্টের সঙ্গে সংযুক্ত হয়, ভিনিসিয়া অষ্ট্রিয়ার অধীনে থাকে। ইতালীর অন্যান্য অঞ্চলে স্থিতাবস্থা রক্ষিত হয়। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য প্রাশিয় আক্রমণের আশঙ্কায় তৃতীয় নেপোলিয়ন ভিল্লাফ্রাঙ্কার সন্ধির দ্বারা যুদ্ধ বিরতি করেন। ইতালীর যুদ্ধের আগুনে হাত পুড়িয়ে নেপোলিয়ন ইতালীর ঐক্যের আশাকে অপূর্ণ রাখেন। এজন্য ইতালীর জাতীয়তাবাদীরা তাঁকে ধিক্কার জানায়। এদিকে ফরাসী ক্যাথলিকদের পোপকে রক্ষা করার দাবী মেনে তিনি রোমে কিছু ফরাসী সেনা রাখতে বাধ্য হন।

ইতালীর ঐক্যের প্রশ্নকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা তৃতীয় নেপোলিয়নের পক্ষে সম্ভব হয়নি। কিছুকাল পরে স্যাভয় ও নিসের বিনিময়ে পিডমন্টের সঙ্গে মধ্য ইতালীর সংযুক্তিতে তিনি সম্মতি দেন। ১৮৬৬ খ্রীঃ অষ্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধের সময় তাঁর কূটনৈতিক চাপে ভিনিসিয়া পিডমন্টের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। ১৮৭০ খ্রীঃ তৃতীয় নেপোলিয়ন রোম থেকে ফরাসী সেনা উঠিয়ে নিলে রোম ইতালীর অধিকারে আসে।

ইতালীর ঐক্যে তৃতীয় নেপোলিয়নের ভূমিকা

নেপোলিয়নের ইতালীয় নীতি পরিণামে তাঁর পক্ষে ক্ষতিকর ছিল। জাতীয়তাবাদী ইতালীয়রা ভিল্লাফ্রাঙ্কার সন্ধিকে ইতালীর প্রতি ফ্রান্সের বিশ্বাসঘাতকতা বলে চিহ্নিত করে। স্যাভয় ও নিস অধিকারের জন্যে তাঁকে দায়ী করে। অতৃপ্ত ইতালীয় জাতীয়তাবাদ এই দুটি স্থান ফেরৎ পাওয়ার দাবী জানায়।

ইতালীয় নীতির ফলাফল

তৃতীয় নেপোলিয়ন ১৮৬৩ খ্রীঃ পোলগণকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে স্বাধীনতামূলক বিদ্রোহে উৎসাহ দেন। তবে জারের হুমকির ফলে তিনি সক্রিয় সহায়তা দানে বিরত থাকেন। নেপোলিয়নের নীতির ফলে রুশ-ফরাসী সম্পর্কের দারুন অবনতি ঘটে। ইতালীর যুদ্ধে ইংলন্ডকে সঙ্গে না নিয়ে একক হস্তক্ষেপের ফলে তিনি ইংলন্ডের মূল্যবান মিত্রতা হারান। এখন তাঁর পোলিশ নীতির জন্যে তিনি রুশ জারের মিত্রতা হারান। অথচ পোল্যান্ডে তিনি সফল হননি।

পোলিশ নীতি

তৃতীয় নেপোলিয়ন ইওরোপে জাতীয়তাবাদের সমর্থক হলেও ইওরোপের বাইবে ফরাসী সাম্রাজ্য বিস্তারে উদাসীন ছিলেন না। ইওরোপের বাইরে তাঁর নীতি নগ্ন সাম্রাজ্যবাদ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। অথচ ইওরোপের ভেতর তিনি জাতীয়তাবাদের পৃষ্ঠপোষকের ভূমিকা নেন। তিনি আলজেরিয়াকে পুরা ফরাসী উপনিবেশে পরিণত করেন। পশ্চিম আফ্রিকার সেনেগাল তাঁর অধিকারে আসে। তিনি দূর প্রাচ্যে দ্বিতীয় ইঙ্গ-চীন যুদ্ধে যোগ দিয়ে চীনের ওপর ১৮৬০ খ্রীঃ পিকিং-এর সন্ধি স্থাপন করেন। ফরাসী মিশনারীদের ওপর অত্যাচারের অজুহাতে তিনি ইন্দোচীন বা ভিয়েতনাম অধিকার করেন। তিনি মিশরের সঙ্গে যোগ স্থাপন করে ফার্দিনান্দ দ্য লেসেপ্সের সাহায্যে সুয়েজ খাল খনন আরম্ভ করেন। ফরাসী মূলধনীরা এই খালে বিরাট অঙ্কের অর্থ লগ্নী করে।

সাম্রাজ্যবাদী নীতি

তৃতীয় নেপোলিয়ন মধ্য আমেরিকার মেক্সিকো দেশে সাম্রাজ্য স্থাপনের পরিকল্পনা নেন। মেক্সিকোর প্রজাতন্ত্রী সরকার ফরাসী ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে, ঋণ আদায়ের অজুহাতে তিনি ফরাসী সেনা মেক্সিকোয় পাঠান। হ্যাপসবার্গ বংশীয় ম্যাক্সিমিলিয়ানকে তিনি মেক্সিকোর রাজা হিসেবে মনোনীত করেন। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিবাদে তিনি পিছু হঠতে বাধ্য হন। হতভাগ্য ম্যাক্সিমিলিয়ান মেক্সিক্যানদের হস্তে (১৮৬৭ খ্রীঃ) নিহত হন। ঐতিহাসিক সি· ডি· হ্যাজেনের মতে, "মেক্সিকো অভিযান ছিল নিতান্তই অপ্রয়োজনীয়, প্রচণ্ড মূর্খতা এবং সম্পূর্ণভাবে বিপজ্জনক।"[১] মেক্সিকোর বিফলতা ছিল দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের প্রথম সামরিক পরাজয়।

মেক্সিকো নীতি : ফলাফল

তৃতীয় নেপোলিয়নের জার্মান নীতি তাঁর পতনকে ত্বরান্বিত করে। ফ্রান্সের স্থায়ী নীতি ছিল ফ্রান্সের পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত জার্মানীকে বিভক্ত করে দুর্বল রাখা। এই নীতিকে ওয়েষ্টফেলীয় নীতি বলা হয়। ১৬৪৮ খ্রীঃ হতে ১৮৬২ খ্রীঃ পর্যন্ত ফ্রান্স এই নীতি অনুসরণ করে চলে। কিন্তু তৃতীয় নেপোলিয়ন এই সনাতন নীতিকে অগ্রাহ্য করে জার্মানীর ঐক্য প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানান। তিনি মনে করতেন যে, জার্মানী ঐক্যবদ্ধ

জার্মান নীতি

১· "The Mexican adventure was most unnecessary, extremely unwise and untimely."—C. D. Hazen.

হলে ভিয়েনা চুক্তি একেবারে ভেঙে পড়বে। জার্মানী থেকে বহিষ্কৃত হয়ে অষ্ট্রিয়া একটি দুর্বল রাষ্ট্রে পরিণত হবে। ঐক্যবদ্ধ ইতালীর ন্যায় ঐক্যবদ্ধ জার্মানী ফ্রান্সের অনুগত মিত্রে পরিণত হবে। নেপোলিয়নের আশা ছিল যে, জার্মানীর পুনর্গঠন তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী হবে, বিসমার্কের পরিকল্পনা অনুযায়ী নয়। প্রাশিয়া-অষ্ট্রিয়া যুদ্ধ তিনি নিরপেক্ষ থাকলে দীর্ঘদিন চলবে। উভয় শক্তি দীর্ঘ যুদ্ধে হতবল হলে, তিনি মধ্যস্থের ভূমিকায় নেমে তাঁর পরিকল্পনা উভয় শক্তির ওপর চাপিয়ে দিবেন। তাঁর পরিকল্পনা ছিল রাইনল্যান্ড অঞ্চলে ফ্রান্সের আধিপত্য স্থাপন এবং উত্তর জার্মানীর একাংশকে প্রাশিয়ার সঙ্গে যুক্ত করা এবং দক্ষিণের ক্যাথলিক অঞ্চলকে স্বাধীন ও তৃতীয় জার্মানীতে পরিণত করা। নেপোলিয়নের এই পরিকল্পনা ছিল অবাস্তব। প্রথমতঃ, প্রাশিয়ার বিরাট সামরিক শক্তি সম্পর্কে তাঁর সার্বিক ধারণা ছিল না। ফলে তাঁর কাঙ্খিত দীর্ঘায়ত অষ্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধের স্থলে ৬ সপ্তাহের মধ্যে প্রাশিয়া অষ্ট্রিয়াকে ধরাশায়ী করে। ফলে নেপোলিয়ন মধ্যস্থের ভূমিকায় তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী জার্মানীর পুনর্গঠনের সুযোগ পাননি। নেপোলিয়নের হস্তক্ষেপকে প্রাশিয়া অনধিকার চর্চা এবং জার্মান জাতীয়তাবাদীরা পুরাতন ওয়েষ্টফেলীয় নীতির নব সংস্করণ বলে গণ্য করে। দ্বিতীয়তঃ, ফ্রান্সের পূর্ব সীমান্তে এক যুদ্ধবাজ, মারকুটে ঐক্যবদ্ধ জার্মানী গড়ে ওঠায়, নেপোলিয়নের স্বদেশবাসীরা তাঁর নীতিকে ধিক্কার জানায়।

যাই হোক, ১৮৬৪ খ্রীঃ ডেনমার্কের যুদ্ধের সময় নেপোলিয়ন নিরপেক্ষতা রক্ষা করেন (বিস্তারিত বিবরণ জার্মানীর ঐক্য অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। অষ্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধের (১৮৬৬ খ্রীঃ) প্রাক্কালে বিসমার্ক তৃতীয় নেপোলিয়নের নিরপেক্ষতা প্রার্থনা করেন। ফ্রান্সের নিরপেক্ষতার অর্থই ছিল প্রাশিয়ার অধীনে জার্মানীর ঐক্যের প্রতি ফ্রান্সের সম্মতি। তৃতীয় নেপোলিয়ন ও বিসমার্কের মধ্যে বিয়ারিৎসের মৌখিক চুক্তির ফলে তৃতীয় নেপোলিয়ন অষ্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকার প্রতিশ্রুতি দেন। এর বিনিময়ে ভিনিসিয়া প্রদেশ যাতে অষ্ট্রিয়া ইতালীকে ছেড়ে দেয় তার দায়িত্ব প্রাশিয়াকে নিতে হয়।[১] তাছাড়া জার্মানীর সীমান্তে কিছু স্থান ফ্রান্সকে ছেড়ে দেওয়ার জন্যে বিসমার্ক মৌখিক প্রতিশ্রুতি দেন। বিয়ারিৎসের চুক্তি সম্পাদন করে তৃতীয় নেপোলিয়ন মহা ভুল করেন। প্রাশিয়া ছয় সপ্তাহের মধ্যে অষ্ট্রিয়াকে যুদ্ধে পরাস্ত করে মেইন নদীর উত্তর পর্যন্ত জার্মানীর সকল স্থান প্রাশিয়ার সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ করে। এর ফলে ঐক্যবদ্ধ জার্মানী গঠিত হয়।

ডেনিশ ও অষ্ট্রো প্রাশিয় যুদ্ধে নিরপেক্ষতা রক্ষা

অষ্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধের দ্বারা উত্তর জার্মানী ঐক্যবদ্ধ হলে ফ্রান্সে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ফ্রান্সের জাতীয়তাবাদী জনমত ঐক্যবদ্ধ জার্মানীর দ্বারা ফ্রান্সের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হওয়ার জন্যে নেপোলিয়নকে দায়ী করে। নেপোলিয়ন এই অবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যে জার্মানীর নিকট একে একে রাইন প্রদেশ, বেলজিয়াম, লাক্সেমবার্গ ক্ষতিপূরণ দাবী করেন। কিন্তু বিসমার্ক প্রতিটি দাবী নাকচ করে দেন। এজন্য ফ্রান্সের সঙ্গে জার্মানীর সম্পর্কের দ্রুত অবনতি ঘটে। ইতিমধ্যে বিসমার্ক স্পেনের সিংহাসনে প্রাশিয়ার হোহেনজোলার্ন বংশের এক রাজপুত্রকে বসিয়ে ফ্রান্সকে বেষ্টন করবার চেষ্টা করেন। এর ফলে ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয় যুদ্ধ আরম্ভ হয়। সেডানের যুদ্ধে ১৮৭০ খ্রীঃ মিত্রহীন ফ্রান্সকে জার্মানী পরাস্ত করলে তৃতীয় নেপোলিয়ন জার্মান সেনার হাতে বন্দী হন। ফরাসী পার্লামেন্ট তৃতীয় নেপোলিয়নকে পদচ্যুত করে ফ্রান্সে তৃতীয় প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করেন।

ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয় যুদ্ধ : তৃতীয় নেপোলিয়নের পতন

১· A. J. P. Taylor. P. 159.

১৮৭০ খ্রীঃ ফ্রান্সের পররাষ্ট্র নীতির বিফলতার কারণ (Causes of the collapse of the French Foreign policy in 1870 : Isolation of France) : ১৮৭০ খ্রীঃ ফরাসী বৈদেশিক নীতি এক প্রকাণ্ড বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। ফ্রাঙ্কো-জার্মান যুদ্ধের সম্মুখীন হয়ে ফ্রান্স ইওরোপে মিত্রশক্তি লাভের জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ফ্রান্স মিত্রহীন হয়ে পড়ে। ডেভিড টমসনের মতে, "ফ্রাঙ্কো-জার্মান যুদ্ধ ছিল একটি দ্বৈত যুদ্ধ; এতে কোন তৃতীয় শক্তি জড়িত ছিল না।"[১] যে ফ্রান্স তৃতীয় নেপোলিয়নের নেতৃত্বে ইতালীর মুক্তিযুদ্ধে মুখ্য সহায়ক ছিল; যে ফ্রান্স ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পর ইওরোপে এক প্রবল শক্তিতে পরিণত হয়; ১৮৭০ খ্রীঃ তার মিত্রহীনতা বিস্ময়জনক মনে হতে পারে।

১৮৭০ খ্রীঃ ফ্রান্সের মিত্রহীনতা

বিসমার্কের গুণমুগ্ধ ঐতিহাসিকেরা মনে করেন যে, ১৮৭০ খ্রীঃ ফ্রান্সের এই মিত্রহীনতা ছিল বিসমার্কের কূটনীতির ফল অথবা ফরাসী বৈদেশিক নীতির বিফলতা। কেটেলবির (Ketelbey) মতে, "বিসমার্ক ছিলেন কূটনীতির শিল্পী। তিনি রাজনীতিকে অঙ্কের ন্যায় নির্ভুলভাবে গণনা করতে পারতেন।"[২] বিসমার্কের কোন কোন জীবনীকারের মতে, বিসমার্ক ১৮৬২ খ্রীঃ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডিসরেইলীর সঙ্গে এক ভোজসভায় তিনটি যুদ্ধের দ্বারা জার্মানীর ঐক্য স্থাপন এবং ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয় যুদ্ধে ফ্রান্সকে মিত্রহীন করার পরিকল্পনা ব্যক্ত করেন। সুতরাং এই যুদ্ধের ৮ বছর আগেই বিসমার্ক তাঁর পরিকল্পনা রচনা করেন। বিসমার্ক তাঁর আত্মজীবনীতেও ফ্রান্সকে মিত্রহীন করার জন্যে নিজের কৃতিত্ব জাহির করেছেন।

বিসমার্কপন্থীদের অভিমত

ডেভিড টমসন প্রভৃতি ঐতিহাসিক উপরোক্ত অভিমতকে সমর্থন করেন না। গবেষকরা প্রমাণ করেছেন যে, ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয় যুদ্ধের সম্ভাবনার কথা বিসমার্ক ১৮৬৭ খ্রীঃ আগে আদপেই ভাবতে পারেননি।[৩] ফ্রান্সকে মিত্রহীন করার মূল দায়িত্ব বিসমার্কের ছিল না। "ফ্রাঙ্কো-জার্মান যুদ্ধ ছিল নেপোলিয়নের অশান্ত, হস্তক্ষেপমূলক বৈদেশিক নীতির পরিণাম মাত্র।"[৪] নেপোলিয়নের ভ্রান্ত নীতির জন্যেই ফ্রান্স ১৮৭০ খ্রীঃ মিত্রহীন হয়। ১৮৭০ খ্রীঃ জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধের প্রাক্কালে নেপোলিয়ন ফ্রান্স-ইতালী-অষ্ট্রিয়ার মধ্যে এক জোট গঠনের চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর এই প্রচেষ্টা বিফল হয়।

ডেভিড টমসনের অভিমত

ইতালী থেকে অষ্ট্রিয়া নেপোলিয়নের দ্বারা বহিষ্কৃত হয়েছিল। ইতালীর যুদ্ধে নেপোলিয়নের শত্রুতাপূর্ণ ভূমিকাকে অষ্ট্রিয়া ভুলেনি। দক্ষিণ জার্মানীর রাজ্যগুলি ১৮৭০ খ্রীঃ ফ্রান্সের বিরুদ্ধে প্রাশিয়ার পক্ষে চলে যায়। একটি জার্মান রাষ্ট্র হিসেবে অষ্ট্রিয়ার পক্ষে দক্ষিণ জার্মান রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে যাওয়া কঠিন ছিল। তাছাড়া অষ্ট্রো-হাঙ্গেরীয় যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থা গঠিত হওয়ার পর অষ্ট্রিয়া একার মতে এই যুদ্ধে নেপোলিয়নের পক্ষে যোগ দিতে সক্ষম ছিল না। হাঙ্গেরীর মডিয়ার জনমত প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দিতে রাজী ছিল না। সুতরাং পুরাতন শত্রুতা ও নবতর পরিস্থিতির জন্যে অষ্ট্রিয়ার কাছ থেকে নেপোলিয়নের মিত্রতার আশা নির্মূল হয়। তদুপরি, অষ্ট্রিয়ার আশঙ্কা ছিল যে জার্মানীর যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে, অষ্ট্রিয়া অধিকৃত গ্যালিশিয়া প্রদেশে রাশিয়া অকস্মাৎ

অষ্ট্রিয় নীতির বিফলতা

১. "The Franco-German war was a duel. It involved no third power"—D. Thomson. P. 290.

২. Ketelbey—History of Modern Times.

৩. Eyck—Bismarck. P. 155-57.

৪. "It was the nemesis of Napoleon's restless foreign policy that France found herself friendless in Europe."—D. Thomson.

আক্রমণ করতে পারত। নেপোলিয়নের নিজ কৃতকর্ম তাঁকে অষ্ট্রিয়ার মিত্রতা লাভের সম্ভাবনা থেকে বঞ্চিত করে। ইতালী যুদ্ধের পর নেপোলিয়ন অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতির চেষ্টা করেননি। তিনি অষ্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধের সময় নিরপেক্ষ থাকেন। অষ্ট্রিয়া তার এই সঙ্কট সময়ে নেপোলিয়নের সাহায্য চেয়ে তা পায়নি। অধিকন্তু নেপোলিয়ন ভিনিসিয়া প্রদেশ ইতালীকে ছেড়ে দিতে অষ্ট্রিয়াকে বাধ্য করেন। এ সত্ত্বেও অষ্ট্রিয়ার সরকার ১৮৭০ খ্রীঃ নেপোলিয়নের নিকট প্রস্তাব দেন যে, যদি তিনি আসন্ন যুদ্ধের সময় রাশিয়াকে অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে নিরপেক্ষ রাখতে পারেন, তবে অষ্ট্রিয়া তাঁর পক্ষ নেবে। কিন্তু নেপোলিয়ন রাশিয়ার নিকট হতে এরূপ আশ্বাস লাভে বিফল হন। ফলে ফ্রাঙ্কো-জার্মান যুদ্ধে অষ্ট্রিয়া নিরপেক্ষতা গ্রহণ করে।

ইতালীয় নীতির ফল

এদিকে ইতালী ভিল্লাফ্রাঙ্কার সন্ধি ও নেপোলিয়ন কর্তৃক স্যাভয় ও নিস অধিকারকে বিস্মৃত হয়নি। তদুপরি ফরাসী সেনাদল তখনও রোম অধিকার করেছিল। ইতালীয় জাতীয়তাবাদীদের চোখে নেপোলিয়ন ছিলেন বিশ্বাসঘাতক। নেপোলিয়ন ইতালীতে যে পরস্পর-বিরোধী নীতি অনুসরণ করেন, সেই কৃতকর্মের ফল তাঁকে পেতে হয়। ইতালীয় সরকার নেপোলিয়নের মিত্রতা প্রস্তাব থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন।

রুশ নীতির বিফলতা

অতঃপর নেপোলিয়ন রুশ মৈত্রীলাভের চেষ্টা করেন। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পর তিনি রাশিয়ার সঙ্গে মিঠা কড়া সম্পর্ক রাখেন। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পর প্যারিসের বৈঠকে তিনি রাশিয়ার মিত্রতা কামনা করলেও রাশিয়ার বিরুদ্ধে পোল্যান্ডের বিদ্রোহে উস্কানী দিয়ে তিনি রাশিয়ার বিরাগভাজন হন। আসলে তিনি ছিলেন দোলাচল চিত্তবৃত্তির মানুষ। ১৮৭০ খ্রীঃ রাশিয়া প্রস্তাব দেয় যে, যদি নেপোলিয়ন প্যারিসের সন্ধির সামুদ্রিক শর্ত ভাঙতে রাশিয়াকে অনুমতি দেন, তবে তাঁর পক্ষে রুশ মৈত্রী লাভ সম্ভব হতে পারে। কিন্তু নেপোলিয়ন ইংলন্ডের অসন্তুষ্টির ভয়ে এই প্রস্তাবে রাজী হননি। এদিকে বিসমার্ক সুযোগ বুঝে রাশিয়ার এই শর্ত পূরণে এগিয়ে আসলে ফ্রাঙ্কো-জার্মান যুদ্ধে রাশিয়া নিরপেক্ষ থাকে। নেপোলিয়ন নিজ নীতির কুফল ভোগ করেন।

ইংলন্ড নীতির ব্যর্থতা

তৃতীয় নেপোলিয়নের আশা ছিল যে, এই সঙ্কটের সময় তিনি অন্ততঃ ইংলন্ডের সাহায্য পাবেন। কারণ ক্রিমিয়ার যুদ্ধের আমল থেকে ইঙ্গ-ফরাসী মিত্র জোট ইওরোপে নতুন শক্তিসাম্য স্থাপন করেছিল। কিন্তু ইতালীতে নেপোলিয়নের ক্ষতিপূরণ গ্রহণ নীতি এবং বেলজিয়ামে ক্ষতিপূরণ দাবীর ফলে ইংলন্ড বিরক্ত হয়ে ফ্রাঙ্কো-জার্মান যুদ্ধের সময় নিরপেক্ষতা নীতি নেয়।

বিসমার্কের কূটনীতি

নেপোলিয়নের ভুলগুলিকে বিসমার্ক নিজ স্বার্থে ব্যবহার করেন। তিনি তৎপরতার সহিত ফ্রান্সের সঙ্গে জার্মানীর বিরোধে যাতে অন্য শক্তিগুলি নিরপেক্ষ থাকে তার ব্যবস্থা করেন। দক্ষিণ জার্মানীর রাজ্যগুলি এতদিন (১৮৬৬ খ্রীঃ থেকে) প্রাশিয়ার নেতৃত্বে গঠিত উত্তর জার্মান কনফেডারেশন থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে প্রাশিয়ার প্রাগের সন্ধির সময় (১৮৬৬ খ্রীঃ) নেপোলিয়ন তিন জার্মানী পরিকল্পনা জোর করে চাপান। এই তিন জার্মানী ছিল, (ক) প্রাশিয়ার নেতৃত্বে গঠিত উত্তর জার্মান কনফেডারেশন; (খ) দক্ষিণ জার্মানীর স্বাধীন রাজ্যগুলি; (গ) জার্মানী থেকে বিচ্ছিন্ন অষ্ট্রিয়া। দক্ষিণ জার্মানীর রাজ্যগুলি যথা, ব্যাভেরিয়া, ব্রাডেন, উটেমবার্গ প্রভৃতি রাজ্যগুলির স্বাধীন অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে নেপোলিয়ন পৃষ্ঠপোষকের ভূমিকা নেন। নেপোলিয়নের নীতি ছিল পরস্পর-বিরোধী। তিনি অষ্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধের পর বিসমার্কের কাছে রাইন অঞ্চলে অথবা লাক্সেমবার্গে ক্ষতিপূরণ দাবী করেন। এই অঞ্চলগুলি ছিল দক্ষিণ জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত। যে নেপোলিয়ন দক্ষিণ জার্মানীর স্বাধীনতার রক্ষাকর্তা ছিলেন এখন তিনি ভক্ষকের ভূমিকা নেন। বিসমার্ক নেপোলিয়নের ক্ষতিপূরণের দাবীপত্র দক্ষিণ জার্মান রাজ্যগুলিকে দেখালে, তারা

নেপোলিয়নের বিপক্ষে, প্রাশিয়ার পক্ষে চলে যায়। নিজ কৃতকর্মের ফল নেপোলিয়নকে ভোগ করতে হয়। নেপোলিয়ন, রুশ জারকে ইংলন্ডের ভয়ে প্যারিসের সন্ধির সামুদ্রিক শর্ত ভাঙতে অনুমোদন দেননি। বিসমার্ক রাশিয়াকে এই শর্ত ভঙ্গে সহায়তা দিলে অষ্ট্রিয়ার গ্যালিশিয়া সীমান্তে রাশিয়া সেনা সমাবেশে রাজী হয়। এর ফলে অষ্ট্রিয়া ইচ্ছা থাকলেও নেপোলিয়নের পক্ষে যেতে পারেনি। এভাবে তৃতীয় নেপোলিয়নের কূটনৈতিক ভুলগুলিকে বিসমার্ক নিজ দেশের স্বার্থে ব্যবহার করেন। ফ্রান্স মিত্রহীন হয়ে পড়ে।

তৃতীয় নেপোলিয়নের চরিত্র ও কৃতিত্ব (Character and Achievement of Napoleon III)ঃ ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন ছিলেন এক বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব। সমকালীন যুগের লেখক ভিক্টর হুগো প্রভৃতির নিকট তিনি স্বৈরশাসনের জন্যে নিন্দা-ভাজন হন। তাঁর আমলে কোন সহানুভূতিশীল ঐতিহাসিক তাঁর জন্যে লেখনী ধরেননি। তিনি যে যুগে রাজত্ব করেন সেই যুগে বিসমার্ক ও কাভ্যুরের ন্যায় নৈতিকতাহীন রাজনীতিজ্ঞের উদ্ভব হয়। তিনি এই সকল ধুরন্দরদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারেননি। রবার্ট এরগ্যাং নামক ঐতিহাসিকের মতে, শিশু যেমন খেলনা নিয়ে খেলা করে, চতুর বিসমার্ক ও কাভ্যুর তৃতীয় নেপোলিয়নকে নিয়ে সেরূপ কূটনীতির খেলা খেলেন। এর ফলে তৃতীয় নেপোলিয়ন বিফলতা বরণ করেন। ডেভিড টমসনের মতে, "বিসমার্ক ও কাভ্যুরের যুগে তৃতীয় নেপোলিয়ন তাঁর সমতুল্য রাজনীতিজ্ঞদের প্রতিযোগিতা থেকে বঞ্চিত হন।"[১] ইতিহাসের দেবী তৃতীয় নেপোলিয়নের প্রতি বিরূপ ছিলেন বলা যায়। ঐতিহাসিক রাইকারের মতে, "ইতিহাস ও ঐতিহাসিকেরা তৃতীয় নেপোলিয়নের প্রতি যৎসামান্য ন্যায় বিচার করেছেন।"[২] সুতরাং পরবর্তী যুগের নিকট তৃতীয় নেপোলিয়ন সুবিচার দাবী করতে পারেন।

সমকালীন যুগের লেখকদের তৃতীয় নেপোলিয়নের প্রতি বিরূপতা

তৃতীয় নেপোলিয়নের কৃতিত্ব বিচার করতে হলে তাঁর সম্পর্কে সমকালীন লেখকদের কি অভিযোগ ছিল তা জানা দরকার। কার্ল মার্কসের মতে, "তৃতীয় নেপোলিয়ন ছিলেন এক মহামূর্খ।" ভিক্টর হিউগো তাঁকে "আধ পাঁইট নেপোলিয়ন" এবং "ক্ষুদ্র নেপোলিয়ন" বলে অভিহিত করেছেন। তাঁদের মতে, তৃতীয় নেপোলিয়ন ছিলেন এক সাধারণ বুদ্ধির মানুষ। তাঁর জীবনের একটিমাত্র লক্ষ্য ছিল ফ্রান্সের রাজা হওয়া। রাজা হওয়ার পর তাঁর আর কোন আইডিয়া বা আদর্শ ছিল না।[৩] তিনি ছিলেন অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্খী স্বৈরাচারী। ইংরাজ লেখক কিংলেকের মতে, "তৃতীয় নেপোলিয়ন ছিলেন ইওরোপের জ্বলন্ত মশাল।"[৪] তিনি ঠাণ্ডা মাথায় সুপরিকল্পিতভাবে ইওরোপের শান্তি বিনষ্ট করে যুদ্ধ-বিগ্রহ আরম্ভ করেন।

তৃতীয় নেপোলিয়ন সম্পর্কে সমকালীন লেখকদের সমালোচনা

গভীরভাবে বিচার করলে ইহা বোঝা যায় যে, তৃতীয় নেপোলিয়ন ডন কুইকজোটের ন্যায় হাস্যকর ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি চিন্তাশীল লোক ছিলেন। ফ্রান্সের জনগণের দারিদ্র্য কিভাবে দূর করা যায়, এজন্য তিনি গ্রন্থ রচনা করেন। তাছাড়া Ideas of Napoleon নামে একটি গ্রন্থ তিনি রচনা করেন।তাঁর পিতৃব্য প্রথম নেপোলিয়নের ন্যায় তাঁর প্রতিভা না থাকলেও তাঁর সমকালীন বহু

তৃতীয় নেপোলিয়নের গুণাবলী

---

১. "In the Age of Cavour and Bismarck, Napoleon III was out of his class."
২. "History and Historians have done scant justice to Napoleon III"—Riker.
৩. C. D. Hazen—Europe since 1815.
৪. "Napoleon III was the fire brand of Europe."

রাজনীতিজ্ঞ অপেক্ষা তিনি প্রতিভাবান ছিলেন। প্রথম নেপোলিয়নের ন্যায় মানুষ ইতিহাসে খুবই কমই জন্মগ্রহণ করেছেন। সুতরাং তৃতীয় নেপোলিয়নকে প্রথম নেপোলিয়নের সঙ্গে তুলনা করা অনুচিত। তৃতীয় নেপোলিয়নের মস্তিষ্ক খুবই উর্বর ছিল। "খরগোসের গর্তগুলি যেমন খরগোসের বাচ্চা দ্বারা পূর্ণ থাকে তৃতীয় নেপোলিয়নের মস্তিষ্ক তেমন নানা উদ্ভাবনী পরিকল্পনায় পূর্ণ ছিল।"

তিনি উচ্চাকাঙ্খী ছিলেন ইহা সত্য। তবে তিনি ফ্রান্সের জনগণের প্রকৃত কল্যাণ কামনা করতেন। তিনি মানবতাবাদী শাসক ছিলেন। তাঁর ক্ষমতার তুলনায় তিনি অনেক বড় পরিকল্পনায় হাত দেন। তাঁর বাস্তবজ্ঞানের অভাব অনেক সময় দেখা যেত। তাঁর উচ্চাকাঙ্খা ও ভাবাবেগ তাঁর বিচারশক্তিকে অনেক সময় আচ্ছন্ন করত। তিনি কোন নীতিতে দৃঢ় থাকতে পারতেন না। তিনি ছিলেন পরস্পর-বিরোধী নীতির অনুরাগী। এজন্য তাঁর বিভিন্ন কাজের সঙ্গতি থাকত না। তাঁর ব্যর্থতার এটি একটি বড় কারণ ছিল। একে তাঁর চিন্তাধারা ছিল পরস্পর-বিরোধী তদুপরি তিনি একই সঙ্গে অনেকগুলি পরিকল্পনায় হাত দেন। এগুলির মধ্যে সঙ্গতি ও সমন্বয় না থাকায় তিনি ব্যর্থ হন। তাছাড়া তাঁর স্বাস্থ্য ছিল দুর্বল। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কর্ম ক্ষমতা হ্রাস পায়। তাঁর অধিকাংশ কাজের দায়িত্ব তাঁর মন্ত্রীদের হাতে বর্তায়। মন্ত্রীদের ওপর তিনি ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্যে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। তাছাড়া তাঁর দুর্ভাগ্য যে, বিসমার্ক বা কাভ্যুরের ন্যায় কোন যোগ্য লোককে তিনি তাঁর মন্ত্রী হিসেবে পাননি। তাঁর মন্ত্রীরা ছিল খুবই সাধারণ শ্রেণীর। ফলে তাঁর পক্ষে সফলতা লাভ করা সম্ভব হয়নি।

চরিত্রের ত্রুটি

থিয়োডোর জেল্ডিন নামক ঐতিহাসিকের মতে, তৃতীয় নেপোলিয়ন যে সংবিধান প্রবর্তন করেন তাহা আধুনিক ডিক্টেটরশিপ বা একনায়কতন্ত্র অপেক্ষা অনেক উদার ও প্রগতিশীল ছিল। তিনি গণভোটের অধিকার রক্ষা করেন ও শৃঙ্খলার সঙ্গে স্বাধীনতার সমন্বয়ের চেষ্টা করেন।[২] গ্রেনভিলের মতে, তৃতীয় নেপোলিয়নকে আধুনিক যুগের প্রথম ডিক্টেটর বলা হয়। তিনি স্বৈর শাসক হলেও আধুনিক ডিক্টেটরদের মত পার্টি নির্ভর এক দলীয় শাসক ছিলেন না। আধুনিক ডিক্টেটর যথা হিটলার, ষ্ট্যালিন প্রভৃতির মত তিনি সন্ত্রাস দ্বারা শাসন চালাননি। তাঁর পতনের আগে পর্যন্ত ফরাসী জনগণের কাছে তাঁর ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা ছিল তীব্র। ১৮৬৯ খ্রীঃ গণভোটে তা প্রমাণিত হয়। ১৮৬০ খ্রীঃ পর তাঁর স্বৈরশাসনের ব্যবস্থাকে তিনি উদারতন্ত্রের দ্বারা আলোকিত করেন। তিনি গণভোট ব্যবস্থা ও নির্বাচিত আইনসভা (Legislative Body) কে রক্ষা করেন। কোন আধুনিক ডিক্টেটর তা করেননি। আধুনিক ডিক্টেটররা সর্ব প্রযত্নে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের অধিকারকে দমন করেন। ১৮৬০ খ্রীঃ পর নেপোলিয়ন এই দুটি অধিকার কায়েম করেন। সুতরাং তাঁকে হিটলার বা মুসোলিনীর পূর্বসূরী বলা অনুচিত। আসলে বিপ্লব ও প্রতিক্রিয়াশীলতার চক্রের মধ্যে ফ্রান্স নিস্ফলভাবে ১৭৮৯-১৮৪৮ খ্রীঃ পর্যন্ত আবর্তন করছিল। নেপোলিয়ন এই দুষ্টচক্র ভেঙে ফ্রান্সকে তাঁর শাসনব্যবস্থা ও সংবিধান দ্বারা ধাপে ধাপে পরিবর্তনের পথে এগিয়ে দিতে চান। চরমপন্থা ও রক্ষণশীলতার মাঝে তিনি মধ্যপন্থা আবিষ্কারের চেষ্টা করেন। বিপ্লবের বসন্তের বিলাসে ক্লান্ত ফরাসী জনগণের কাছে তাঁর শাসন ছিল স্বাস্থ্যকর স্থিতিশীলতার প্রতীক। এজন্যই তৃতীয় নেপোলিয়ন এত জনপ্রিয় ছিলেন। তিনি ফরাসী বিপ্লবের মূল্যবান ফলাফলগুলির সংরক্ষক বলে দাবী করতেন। যদিও তিনি প্রজাতন্ত্রকে ধ্বংস করেন, তিনি বংশ মর্যাদাকে নস্যাৎ করে যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ প্রথা, সকল

শৃঙ্খলার সহিত স্বাধীনতার সমন্বয় : শ্রমিক কল্যান

১· Ketelbey—History of Modern Times.

২· History Today—January, 1958.

নাগরিকের সমান অধিকার, বিপ্লবের ভূমি সংস্কার ব্যবস্থাকে রক্ষা করেন। সর্বোপরি, তিনি ছিলেন ইওরোপের নিপীড়িত জাতিগুলির মুক্তিদাতা।

স্বদেশে তিনি তাঁর অর্থনৈতিক সংস্কার দ্বারা Liberty বা গণতন্ত্র হ্রাসের ক্ষতিপূরণ করতে চেষ্টা করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, সাধারণ ফরাসী জাতির কাছে গণতন্ত্র বা রাজনৈতিক অধিকার অপেক্ষা কর্মসংস্থান ও রুজির সমস্যা ছিল অনেক বেশী জরুরী। তিনি বিশেষ কোন সামাজিক শ্রেণীর স্বার্থের কথা না ভেবে সমাজের সকল শ্রেণীর মঙ্গলের জন্যেই তাঁর সংস্কারগুলি চালু করেন। ফরাসী সমাজে এতদিন ধরে যে শ্রেণী সংঘাত চালু ছিল তিনি তার নিরসনের চেষ্টা করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি দরিদ্র শ্রেণীর স্বার্থে বহু কল্যাণমূলক সংস্কার চালু করেন। শ্রমিকদের কথা তিনি ভোলেন নি। এজন্য লোকে তাঁকে "অশ্বারোহী সেন্ট সাইমন" বলত।[১]

তাঁর আমলেই ফ্রান্সে শিল্প-বিপ্লবের উড্ডয়ন হয়। কৃষিতে আধুনিক প্রথা প্রযুক্ত হয়। মূলধনের সববরাহ বৃদ্ধি পায়। পাশাপাশি তিনি শ্রমিককে ট্রেড ইউনিয়ন ও ধর্মঘটের অধিকার দেন। অবাধ বাণিজ্য নীতি গ্রহণ করে তিনি সস্তা দরে ব্রিটিশ পণ্য আমদানি করে গরীব লোকেদের সুবিধা করে দেন।

দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের আমলে সংস্কৃতি

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দ্বিতীয় সাম্রাজ্য বন্ধ্যা ছিল না। তাঁর আমলে বলজ্যাক তাঁর বিশ্ববিখ্যাত গল্প ও উপন্যাসগুলি রচনা করেন। বলজ্যাকের রচনায় রোমান্সবাদের বিরুদ্ধে বাস্তববাদের প্রভাব দেখা যায়। ফ্লবেয়ার মাদাম বোভারি নামক উপন্যাস রচনা করেন। বোদালিয়ার তাঁর অমর সাহিত্য কীর্তি দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের আমলে রচনা করেন। এমিল জোলার সাহিত্য কীর্তির সূচনা দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের আমলে দেখা যায়। ভিক্টর হিউগো তৃতীয় নেপোলিয়নকে আক্রমণ করে তাঁর কবিতাবলী রচনা করেন। চিত্রশিল্পে জাঁ বাপ্তিস্তা কোরোত নিস্বর্গ চিত্রাবলী রচনায় বাস্তবতা (Realism) বোধের সঞ্চার করেন। তাঁর চিত্রশৈলী বারবিজোঁ (Barbizon) শৈলী নামে খ্যাত। সেজানেও তাঁর চিত্রগুলি আঁকেন।

তৃতীয় নেপোলিয়নের আভ্যন্তরীণ নীতির বেশ কিছু ত্রুটি ছিল। তিনি সর্বদাই আবেগ ও উচ্চাকাঙ্খা তাড়িত হয়ে কাজ করতেন। কোন কাজ শুরু করার পর তিনি তা ধৈর্য ধবে অনুশীলন করতে পারতেন না। সর্বোপরি, তাঁর নীতিগুলি ছিল পরস্পর-বিরোধী। তিনি একহাতে শিল্প গঠনের জন্যে নানাবিধ ব্যবস্থা চালু করেন। অপর হাতে তিনি অবাধ বাণিজ্য নীতি নিয়ে সংরক্ষণ লোপ করায় সস্তাদরের ব্রিটিশ মাল ফ্রান্সের বাজারে হুড় হুড় করে ঢুকে পড়ে। ফরাসী শিল্পের নাভিশ্বাস ওঠে। শিল্পপতিরা এজন্য নেপোলিয়নকে ক্ষমা করেনি। তিনি

আভ্যন্তরীণ নীতির ত্রুটি

১৮৫২-৬০ খ্রীঃ পর্যন্ত স্বৈরশাসন চালু করে এক নায়কের মতই শাসন চালান। ১৮৬০ খ্রীঃ পর তিনি উদারতন্ত্র চালু করলে রাজনৈতিক দলগুলি এই কাজকে তাঁর উদারতার পরিবর্তে দুর্বলতা বলে গণ্য করে। তারা গণ্ডগোল সৃষ্টি করে। তিনি তাঁর সাম্রাজ্যকে শান্তি নীতির যুগ বলে দাবী করা সত্ত্বেও, তিনি একটির পর একটি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে থাকেন। তিনি কোন রাজনৈতিক দলকে নিজ পক্ষে আনতে না পারায় তাঁর শাসন ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে যায়।

পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে তিনি জাতীয়তাবাদকে সমর্থন জানিয়ে ভিয়েনা সন্ধিকে ভাঙার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর হস্তক্ষেপমূলক নীতির ফলে ইওরোপের বৃহৎ শক্তিগুলির সহানুভূতি তিনি

বৈদেশিক নীতির বিফলতা

হারান। ১৮৬০ খ্রীঃ ইতালীর যুদ্ধের পর থেকে তাঁর পররাষ্ট্রনীতির বিফলতা প্রকট হয়ে উঠে। বিসমার্কের কূটনৈতিক চালে তিনি অষ্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকেন। এজন্য তিনি স্বদেশবাসীর ধিক্কার

১· Cobban—History of France.

লাভ করেন। তাঁর ভুল নীতির সুযোগে বিসমার্ক ১৮৭০ খ্রীঃ তাঁহাকে মিত্রহীন করেন এবং সেডানের যুদ্ধে পরাজিত করেন। কিন্তু ফ্রান্স ও ইওরোপের ইতিহাসে তাঁর দান সামান্য ছিল না। তিনি ইওরোপের নিপীড়িত জাতীয়তাবাদের প্রধান সমর্থক ছিলেন। তিনি ফ্রান্সকে প্রথম শ্রেণীর শক্তিতে পরিণত করেন। কিন্তু তাঁর আভ্যন্তরীণ নীতির ফলে ব্যাঙ্কার ও ধনী বুর্জোয়ারা প্রাধান্য পায়।[১] তিনি প্রজাতন্ত্র ধ্বংস করে যে স্বৈর-শাসন স্থাপন করেন ফরাসী জনসাধারণ দীর্ঘদিন তা সহ্য করতে প্রস্তুত ছিল না। তাঁর আভ্যন্তরীণ নীতির দুর্বলতাই তাঁর পতনকে অনিবার্য করে।

তৃতীয় নেপোলিয়নের পতনের কারণ (The causes of the downfall of Napoleon III) : দ্বিতীয় ফরাসী সাম্রাজ্যের অধিপতি তৃতীয় নেপোলিয়ন ছিলেন এক অসাধারণ সম্রাট যিনি গণভোটের সমর্থনপুষ্ট হয়ে সিংহাসন লাভ করেন। তাঁর রাজত্বের গোড়ার দিকে তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল অসাধারণ। এমনকি ১৮৬৯ খ্রীঃ গণভোটেও তাঁর জনপ্রিয়তা অটুট ছিল বলে দেখা যায়। তথাপি ১৮৭০ খ্রীঃ তাঁর পতন ঘটে। কোন কোন ঐতিহাসিক তৃতীয় নেপোলিয়নের বৈদেশিক নীতিকে তাঁহার পতনের প্রধান কারণ বলে মনে করেন। ফিলিপ গডেলার মতে, "তৃতীয় নেপোলিয়নের পতনের প্রধান কারণ ছিল তাঁর হস্তক্ষেপমূলক বৈদেশিক নীতি" (Meddlesome foreign Policy)।

বৈদেশিক শক্তির প্রভাব

বিউরী (Bury) প্রভৃতি ঐতিহাসিক উপরোক্ত মতের বিরোধিতা করেন। বিউরীর মতে, "১৮৬০ খ্রীঃ থেকেই দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের পতনের সূচনা হয়।"[২] তৃতীয় নেপোলিয়নের আভ্যন্তরীণ নীতির দুর্বলতাই তাঁর পতনের পথ প্রশস্ত করে। তিনি সর্বসাধারণের ভোটাধিকার বজায় রেখে গণতন্ত্রের যে ক্ষুধাকে জাগ্রত করেন, তা পূর্ণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। এদিকে তাঁর একনায়কতন্ত্র ছিল দুর্বল ও মৃদু। এই স্বৈরশাসন জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে দমিয়ে রাখার মত যথেষ্ট কঠোর ছিল না। তাঁর সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারগুলি চালু হয়ে গেলে, তাঁর হাতে জনসাধারণকে মোহিত করার মত আর কোন পরিকল্পনা ছিল না। ফলে তাঁর স্বৈরশাসনে লোক হতাশ হয়ে পড়ে। তাঁর রাজত্বকালে প্রজাতন্ত্রবাদীরা ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী। ফ্রান্সের নিম্ন বুর্জোয়া শ্রেণী ছিল এই দলের সমর্থক। এই দল ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। ১৮৬০ খ্রীঃ পর নেপোলিয়নের উদার শাসনের সুযোগে জুলেস ফেরী, জুলেস অলিভিয়ার, লিয় গ্যামবেটা প্রভৃতি আগুনখেকো প্রজাতন্ত্রবাদী আইনসভায় নির্বাচিত হয়ে তাঁদের বাগ্মীতা ও গণআন্দোলন দ্বারা জনতাকে প্রভাবিত করেন। বৈদেশিক যুগে পরাজয়ের ফলে নেপোলিয়নের জনপ্রিয়তা কমে গেলে প্রজাতন্ত্রবাদীরা তাঁর পতন ঘটায়।

স্বৈরতন্ত্রের ব্যর্থতা
বিউরীর অভিমত

১৮৬০ খ্রীঃ পর তাঁর শাসনব্যবস্থার চমৎকারিত্বের অভাব উপলব্ধি করে জনসাধারণের প্রশংসা কুড়াবার জন্যে তৃতীয় নেপোলিয়ন বৈদেশিক যুদ্ধে লিপ্ত হন। গর্ডন ক্রেইগের মতে, তৃতীয় নেপোলিয়নের ইওরোপীয় নীতির মধ্যে একটি স্ব-বিরোধ ছিল। তিনি জানতেন যে, প্রথম নেপোলিয়ন ইওরোপে মিত্রহীন হলে তাঁর পতন ঘটে। এই কারণে তৃতীয় নেপোলিয়ন ১৮৫৩-১৮৬০ খ্রীঃ পর্যন্ত ইংলন্ডের মিত্রতা, ১৮৫৬ খ্রীঃ হতে রাশিয়ার মিত্রতা লাভের চেষ্টা করেন। কিন্তু ইতালীতে তিনি মুক্তি যুদ্ধে সমর্থনের জন্যে স্যাভয় ও নিস দ্বারা ক্ষতিপূরণ নেন।

তৃতীয় নেপোলিয়নের মিত্রহীনতা : বৈদেশিক নীতির ভুল

১· Grenville—Europe Reshaped.

২· "The year 1860 marked the beginning of the end of the second Empire" Bury—History of France.

ইতালীতে একক হস্তক্ষেপ নীতি এবং ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করায় ইংলন্ডের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কে ফাটল ধরে। যে ইংলন্ডের মিত্রতার আশায় তিনি ক্রিমিয়ার যুদ্ধে যোগ দিয়ে প্রচুর লোক ও অর্থ ক্ষতি করেন, তাঁর ইতালীয় নীতির ফলে সেই ইংলন্ডের মিত্রতা তিনি হারাতে বসেন। নেপোলিয়ন তখনও সাবধান হননি। জার্মানীর ঐক্য যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে তিনি অষ্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধে নিরপেক্ষতার মূল্য হিসেবে বেলজিয়ামকে ফ্রান্সের অন্তর্ভুক্ত করার দাবী জানান। বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতা ও স্বাধীনতা রক্ষা ছিল ব্রিটেনের এক স্থায়ী নীতি। নেপোলিয়ন বেলজিয়ামে ক্ষতিপূরণ দাবী করায় ব্রিটেনের সঙ্গে তার মিত্রতা বিনষ্ট হয়। এরপর নেপোলিয়ন রাশিয়ার সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনের চেষ্টা করেন। তিনি অষ্ট্রিয়াকেই তাঁর প্রধান শত্রু হিসেবে বেছে নিয়ে ভুল করেন। তিনি রাশিয়ার মিত্রতার সাহায্যে পিছন থেকে রুশ আক্রমণের ভীতি সৃষ্টি করে ইতালীর যুদ্ধে অষ্ট্রিয়াকে বহিষ্কার করেন। এখানে তাঁর কয়েকটি ভুল হয়েছিল : (ক) ইতালী ও জার্মানীর ঐক্যের সম্পর্ক যে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত তা তিনি বোঝেননি। (খ) প্রাশিয়া যে ইতালীর যুদ্ধের সময় অষ্ট্রিয়ার পক্ষে ও ফ্রান্সের বিপক্ষে যাবে তা তিনি ভাবেননি। (গ) রাশিয়ার মিত্রতা যে নির্ভরযোগ্য নয় তা তিনি বুঝেননি। তিনি পোল্যান্ডবাসীদের স্বাধীনতার যুদ্ধে সমর্থন জানালে রাশিয়ার সঙ্গে তাঁর বিরোধ দেখা দেয়। এভাবে তিনি নিজ ভুলে ১৮৭০ খ্রীঃ মিত্রহীন হয়ে পড়েন। ডেভিড টমসনের মতে, "১৮৭০ খ্রীঃ তৃতীয় নেপোলিয়নের মিত্রহীনতা ছিল তাঁরই অনুসৃত নীতির পরিণতি মাত্র" (Nemesis of his policy)।

ইতালী, মেক্সিকো ও জার্মান নীতির পরিণাম

তৃতীয় নেপোলিয়ন জাতীয়তাবাদের সমর্থনে ইতালী ও জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করতে সহায়তা করেন। তিনি ভুলে যান যে, ফরাসী জনমত ফ্রান্সের দুই পার্শ্বে দুই বৃহৎ রাষ্ট্রের গঠন ফ্রান্সের নিরাপত্তার ক্ষতিকারক মনে করবে।[1] এই কারণে তৃতীয় নেপোলিয়ন জনপ্রিয়তা হারান। তিনি ইতালীতে অত্যন্ত স্ব-বিরোধী নীতি গ্রহণ করেন। ভিল্লাফ্রাঙ্কার সন্ধি পর্যন্ত তিনি ছিলেন ইতালীর মুক্তিদাতা। ভিল্লাফ্রাঙ্কার সন্ধির পর তিনি ইতালীর জাতীয়তাবাদের নিকট বিশ্বাসঘাতকে পরিণত হন। স্যাভয় ও নিস অধিকার করে এবং রোমে ফরাসী সৈন্য রেখে তিনি ইতালীবাসীর কৃতজ্ঞতা হারান। মেক্সিকো অভিযানে দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের প্রথম সামরিক পরাজয় ঘটে। সি· ডি· হ্যাজেনের মতে, "মেক্সিকো অভিযান ছিল সম্পূর্ণ অনাবশ্যক এবং সম্পূর্ণ বিপজ্জনক।"[2] এর পর তৃতীয় নেপোলিয়ন বিসমার্কের কূটনীতির প্যাঁচে পড়ে অষ্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকেন। এজন্য তিনি ফরাসী দেশ-প্রেমিকদের নিকট ধিকৃত হন। ১৮৭০ খ্রীঃ সেডানের যুদ্ধে তৃতীয় নেপোলিয়ন পরাজিত ও বন্দী হলে তাঁর শাসনব্যবস্থার পতন ঘটে।

আভ্যন্তরীণ নীতির বিফলতাই প্রধান কারণ

এক্ষেত্রে বিচার্য বিষয় হল যে, তাঁর আভ্যন্তরীণ নীতির ব্যর্থতা ঢাকার জন্যে তৃতীয় নেপোলিয়ন যুদ্ধনীতি গ্রহণ করেন। কিন্তু কাভুর ও বিসমার্কের যুগে তাঁর পক্ষে বৈদেশিক নীতিতে সফলতা লাভ সম্ভব হয়নি। বৈদেশিক যুদ্ধ চালাবার দক্ষতা তাঁর ছিল না।

রাজনৈতিক দলের ও বুদ্ধিজীবিদের সমর্থন লাভে ব্যর্থতা

তৃতীয় নেপোলিয়ন ফ্রান্সের কোন শক্তিশালী রাজনৈতিক দলের সমর্থন পাননি। তাঁর মন্ত্রীসভায় কোন উপযুক্ত লোক ছিল না। ফরাসী বুদ্ধিজীবি মহল তাঁর একনায়কতন্ত্রকে সহ্য করতে প্রস্তুত ছিলেন না। সমাজে ধনবণ্টন না করায় তাঁর আমলে ব্যাঙ্কার ও শিল্পপতিগোষ্ঠী ধনকুবেরে পরিণত হয়। তিনি বোনাপার্টবাদকে আশ্রয় করে জনপ্রিয়তা পেলেও, বোনাপার্টের

১· Gordon Craig. P. 132-33.

২· "The Mexican adventure was entirely unnecessary and totally disastrous."—C. D. Hazen.

ন্যায় কৃতিত্ব অর্জন করাব ক্ষমতা তাঁর ছিল না। বোনাপার্টবাদ বলতে ফরাসী জাতি যুদ্ধক্ষেত্রে গৌরব অর্জন বুঝত। এই আশা পূরণ করার সাধ্য তাঁর ছিল না। এদিকে ভ্রান্ত বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করে তিনি ১৮৭০ খ্রীঃ মিত্রহীন হয়ে পড়লে জার্মানী সহজে তাঁকে পরাজিত করে। তৃতীয় নেপোলিয়ন ছিলেন ইতিহাসের ভাগ্যবিড়ম্বিত ব্যক্তি। তাঁর বহু মহৎ গুণ ও কর্ম থাকা সত্ত্বেও যুগের কাছে তিনি উপযুক্ত স্বীকৃতি পাননি।

পাঠ্যসূচী

১। F. A. Simpson—The Rise of Louis Napoleon.
২। Do—Louis Napoleon and the Recovery of France.
৩। T. Zelden—The Political System of Napoleon III.
৪। Do—An Article in History Today (1958).
৫। David Kulsteen--Napoleon III and the Working class.
৬। J. M. Thompson—Louis Napoleon and the Second Empire.
৭। Grenville—Europe Reshaped.

সপ্তদশ অধ্যায়
ইতালীর ঐক্য আন্দোলন
(Italian Unification Movement)

ইতালীয় জাতীয়তাবাদের উদ্ভব (Background of Italian Nationalism) ঃ ইওরোপের দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত ইতালী হল এক প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি। প্রাচীন যুগে রোমান সভ্যতা এবং পঞ্চদশ খ্রীঃ রেনেসাঁস আন্দোলনের উদ্ভবক্ষেত্র ছিল ইতালী। কিন্তু রাজনৈতিক দিক থেকে ইতালী ছিল দুর্ভাগ্যের শিকার। প্রতিবেশী অষ্ট্রিয়া, ইতালীর ওপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আধিপত্য স্থাপন করে। ইতালীয়রা তাদের বিরাট ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির কথা ভুলে পর-পদানত জাতিতে পরিণত হয়।

নেপোলিযনেব শাসনে ইতালীব পবিবর্তন

স্যালভাতোরেল্লি ও অন্যান্য ঐতিহাসিকেরা বলেন যে, ইতালীর জাতীয়তাবাদী জাগরণ ইতালীতে নেপোলিয়নের পদক্ষেপের আগেই দেখা দেয়। কিন্তু প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ওমেদিও এই মত অগ্রাহ্য করেন। তিনি নেপোলিয়নের ইতালীর পুনর্গঠন দ্বারা ইতালীর নব জাগরণের (Risorgimento) বা রিসঅর্গিমেন্টোর প্রথম সূত্রপাত হয় বলেন। ইতালীর সকল আধুনিক ইতিহাসকাররা ওমেদিওর অভিমতকেই সমর্থন করেন। ডেনিস ম্যাকস্মিথ ১৭৯০ খ্রীঃ-কেই আধুনিক ইতালীর জাতীয়তাবাদের জন্মকাল বলে অভিহিত করেছেন। নেপোলিযন ইতালীর মূল ভূখণ্ডকে তাঁর অধীনে ঐক্যবদ্ধ করেন। ঐক্যবদ্ধ ইতালীর আদর্শ ইতালীবাসীর মনে তিনিই প্রথম জাগান। তাছাড়া নেপোলিয়ন ফরাসী বিপ্লবের আদর্শ অনুসারে ইতালীতে সামাজিক সাম্য, আইনের সাম্য প্রভৃতি সংস্কার প্রবর্তন করেন। তিনি ইতালীতে কোড নেপোলিয়ন চালু করেন। নেপোলিয়নের আমলেই ইতালীর প্রথম জাতীয় পতাকা উড়ান হয়। ইতালীর অন্তর্শুল্ক ব্যবস্থা লোপ করা হয়। নেপোলিয়ন বহু রাস্তাঘাট তৈরি করে ইতালীর বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ বাড়ান। সমগ্র ইতালীতে একই প্রকার আইন প্রবর্তিত হয়। ধর্মযাজকদের ও পোপের প্রাধান্য নাশ করা হয়। ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। নেপোলিয়নের পতনের পরেও তাঁর প্রবর্তিত সকল সংস্কারগুলিকে রদ করা সম্ভব হয়নি। নেপোলিয়নের শাসনে ঐক্য ও প্রগতিশীল নীতির আস্বাদ ইতালীকে জাতীয়তাবাদী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে। অন্যান্য যে সকল প্রভাব ইতালীয় জাতীয়তাবাদের উদ্ভবে বীজক্ষেত্রের কাজ করে তা ছিল ইতালীর বণিক ও বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে ঐক্যবদ্ধ ইতালীর জন্যে আকাঙ্খা। অন্তশুল্কহীন ঐক্যবদ্ধ ইতালীতে বাণিজ্যের সুবিধা ও বাজারের বৃদ্ধির সম্ভাবনা বণিকদের উৎসাহিত করে। ইতালীতে রেল নির্মাণ ও ভূমধ্যসাগরীয় বন্দরগুলির সঙ্গে রেল যোগাযোগ দ্বারা ভূমধ্যসাগরীয় বাণিজ্যকে অধিকার করার আকাঙ্খাও বুর্জোয়া শ্রেণীকে প্রভাবিত করে। রাজনৈতিক দিক থেকে ইতালীর ওপর অষ্ট্রিয়ার আধিপত্য ইতালীয় বুদ্ধিজীবিদের মনে অষ্ট্রিয়া সম্পর্কে ঘৃণা জাগায়। ইতালীর উদারতন্ত্রী ও জাতীয়তাবাদীদের ওপর অষ্ট্রিয়ার দমন-পীড়ন এবং মেটারনিকতন্ত্রের উৎপীড়নের প্রতিক্রিয়া হিসেবে ইতালীর মুক্তি ও ঐক্যের দাবী প্রবল হয়ে ওঠে। ইতালীয় জাতীয়তাবাদী সিলিভা পেল্লিকোর অষ্ট্রিয়ার কারাগারে বন্দী জীবনের দিনলিপি 'মাই প্রিজনস' (My Prisons) নামক গ্রন্থটিতে লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ পেল্লিকোর কথাকে জীবনের স্মৃতিচারণ, ইতালীয় জাতীয়তাবাদী ও যুবশক্তিকে অনুপ্রেরণা দেয়।

নেপোলিয়নের পতনের পর ভিয়েনা সম্মেলনের রক্ষণশীল শক্তিবর্গ ইতালীয় জাতীয়তাবাদকে অগ্রাহ্য করে পুরাতনতন্ত্র ফিরিয়ে আনেন। ন্যায্য অধিকার ও ক্ষতিপূরণ নীতির প্রয়োগের ফলে ইতালী রাজনৈতিক দিক হতে পুনরায় খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যায়। ইতালী মোট ৫টি (মতান্তরে ৯টি) ভাগে বিভক্ত হয়। ঐতিহাসিক লিপসনের মতে, "ভিয়েনা চুক্তির দ্বারা ইতালীর ওপর তিন প্রকার অন্যায় ব্যবস্থা কায়েম করা হয়।" প্রথমতঃ, ইতালীকে রাজনৈতিক দিক হতে বিভক্ত করে ফেলা হয়। ইতালীর ঐক্য ধ্বংস হয়। মেটারনিক গর্বের সঙ্গে বলেন যে, "ইতালী একটি ভৌগোলিক সংজ্ঞায় পরিণত হয়েছে।"[১] দ্বিতীয়তঃ, ইতালীর ওপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে অষ্ট্রিযার আধিপত্য স্থাপন করা হয়। অষ্ট্রিয়া উত্তর ইতালীর লম্বার্ডি ও ভেনেসিয়া প্রদেশ অধিকার করে। এছাড়া মধ্য ইতালীর টাস্কানী, মডেনা প্রভৃতি স্থান অষ্ট্রিয়ার হ্যাপসবার্গ বংশীয় রাজকুমার ও রাজকুমারীদের দেওয়া হয়। দক্ষিণ ইতালীর বুরবোঁ রাজাদের বৈদেশিক নীতি অষ্ট্রিয়ার নির্দেশে পরিচালিত হয।[২] তৃতীয়তঃ, ভিয়েনা চুক্তির দ্বারা ইতালীতে বৈদেশিক শাসন স্থাপন করা হয়। একমাত্র পিডমন্টেব স্যাভয় রাজবংশ ব্যতীত ইতালীর সকল রাজারা ছিল বিদেশী: এমনকি পোপও ছিলেন বহিরাগত। এভাবে ভিযেনা বৈঠকে ইতালীর অঙ্কুরিত জাতীযতাবাদকে ধ্বংস করার ব্যবস্থা হয়।

ভিয়েনা চুক্তির দ্বারা ইতালীর জাতীযতাবাদের অবদমন

ইতালীর ঐক্য আন্দোলন ঃ প্রথম পর্যায় ঃ রিসঅর্গিমেন্টো

(The Movement for Italian Unification : The First Phase : The Risorgimento) ঃ ভিয়েনা সম্মেলনে ইতালীব রাজনৈতিক ঐক্য ও জাতীয়তাবাদকে ধ্বংস করাব চেষ্টা হলেও পৌরাণিক ফিনিক্স (Phoenix) পাখীর মত ইতালীর জাতীয়তাবাদ ভস্মশয্যা হতে নব-শক্তিতে জেগে ওঠে। ইতালীর মুক্তি আন্দোলনের প্রথম ঝড়ের পাখী ছিল কার্বোনারী সম্প্রদায়। এটি ছিল একটি গুপ্ত বিপ্লবী সমিতি। খ্রীষ্টীয় গুপ্ত সমিতি ফ্রিম্যাসন সমিতির সঙ্গে কার্বোনারী সম্প্রদায়ের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল।[৩] এই সমিতির সদস্যরা কার্বন বা অঙ্গার বহন করে ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মত আচরণ করত। কিন্তু আসলে এরা ছিল রাজনৈতিক দল। ঐতিহাসিক বোল্টন কিং-এর মতে, "ইতালীর মুক্তিকে কার্বোনারীরা ব্রত হিসেবে গ্রহণ করে।" এদের প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল দক্ষিণ ইতালীর নেপলস (Naples)।

কার্বোনারীদেব আন্দোলন

১৮২০ খ্রীঃ কার্বোনারী সঙ্ঘ নেপলসের বুরবোঁ বংশীয় রাজা চতুর্দশ ফার্দিনান্দের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। গাছ যেমন ঝড়ের সময় নত হয় এবং ঝড় থামলে সোজা হয়ে দাঁড়ায়, ফার্দিনান্দ সেরূপ বেতসী-বৃত্তি নিয়ে কার্বোনারীদের চাপে একটি উদারতান্ত্রিক সংবিধান দেন। এদিকে তিনি গোপনে ইওরোপীয় শক্তি সমবায়ের সহায়তা প্রার্থনা করেন। ইওরোপীয় শক্তি সমবায়ের নির্দেশে অষ্ট্রিয় সেনাদল নেপলসের কার্বোনারী বিদ্রোহকে দমন করে। ফার্দিনান্দের স্বৈরাচারী শাসন পুনঃ-স্থাপিত হয়। নেপলসের পর, পিডমন্টের কার্বোনারী বিদ্রোহীরা রাজা ভিক্টর ইম্যানুয়েলকে ১৮২১ খ্রীঃ একটি সংবিধান দানে বাধ্য করে। কিন্তু অষ্ট্রিয় বাহিনী শক্তি সমবায়েব সম্মতিক্রমে পিডমন্টের বিদ্রোহ দমন করে স্থিতাবস্থা ফিরিয়ে আনে।

নেপলসে বিদ্রোহ

১· "Italy is a geographical expression."
২· Hazen. P. 42.
৩· Bolton King. P. 19.

১৮৩০ খ্রীঃ ফ্রান্সে জুলাই বিপ্লব দেখা দিলে ইতালীর জাতীয়তাবাদীরা পুনরায় বিদ্রোহমুখী হয়ে ওঠে। ১৮৩১ খ্রীঃ পোপ শাসিত মধ্য ইতালীতে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। কিন্তু পোপের আহ্বানে অষ্ট্রিয় বাহিনী পোপের রাজ্যে প্রবেশ করে এই বিদ্রোহ দমন করে। কার্বোনারী বিদ্রোহীরা ফ্রান্সের সাহায্য ভিক্ষা করলে, লুই ফিলিপ অষ্ট্রিয়ার সহিত সঙ্ঘর্ষের ভয়ে হাত গুটান। তিনি বলেন যে, "ফ্রান্সের জনগণের রক্ত ফ্রান্সের স্বার্থরক্ষার জন্যে ব্যয় করা হবে।" কার্বোনারী দল ইতালীকে মুক্ত কবতে চায়। কিন্তু তারা জাতীয় স্তরে আন্দোলন না করে নিতান্ত স্থানীয় স্তরে আন্দোলন করত। এজন্য তাদের বিক্ষিপ্ত আন্দোলন সফলতা পায়নি। কার্বোনারী গোষ্ঠীর মধ্যে আদর্শের ঐক্য ছিল না। তাদের বিভিন্ন শাখার মধ্যে সংহতিও ছিল না। তারা ইতালীকে মুক্ত করার পর কি রকম শাসনব্যবস্থা গঠনে আগ্রহী সেকথা তারা জানাতে ব্যর্থ হয়। ফলে আন্দোলন লক্ষ্যহীন ছিল। তদুপরি কার্বোনারী গুপ্ত সমিতির গণসংযোগ না থাকায় তারা জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল: এই সকল কারণে কারবোনারী আন্দোলন ইতালীয়দের মধ্যে সাড়া জাগাতে পারেনি এবং অষ্ট্রিয়ার প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারেনি।

১৮৩০ খ্রীঃ উদারনৈতিক বিদ্রোহ

ইয়ং ইতালী আন্দোলন ও ম্যাৎসিনী এবং ১৮৪৮-এর মুক্তিযুদ্ধ (The Young Italy Movement and Mazzini and the struggle for Liberation in 1848) ঃ ১৮৩১ খ্রীঃ পর ইতালীর মুক্তি আন্দোলনে প্রাণপুরুষ হিসেবে জোসেফ ম্যাৎসিনী আবির্ভূত হন। তাঁর নেতৃত্বে ইতালীর মুক্তি আন্দোলন গণ আন্দোলনের চরিত্র ধারণ করে। ম্যাৎসিনী কোন রাজা বা কোন সরকারের সাহায্যে ইতালীকে মুক্ত করার কথা ভাবেননি। ইতালীয় জনগণই ইতালীর মুক্তি অর্জনে সক্ষম এই ধ্রুব বিশ্বাস তিনি সর্বদাই রাখতেন। শুধুমাত্র আঞ্চলিক বিপ্লব দ্বারা আঞ্চলিক স্বৈরশাসন থেকে মুক্তি তাঁর লক্ষ্য ছিল না। সমগ্র ইতালীকে বৈদেশিক শাসন থেকে মুক্ত এবং ঐক্যবদ্ধ করার স্বপ্ন তিনি দেখতেন। এজন্য তাঁর বাণী ছিল, "কেবলমাত্র সমগ্র ইতালী; ঐক্যবদ্ধ ইতালীর জন্যেই বিপ্লব কর; অন্য কোন খণ্ডিত আদর্শের জন্যে বিপ্লব করিও না।" তিনি কার্বোনারী দলের গুপ্ত সমিতি ও আঞ্চলিক বিদ্রোহের পথ ত্যাগ করে জাতীয় স্তরে মুক্তি আন্দোলনকে তুলে আনেন। ইতালীর যুব শক্তিকেই তিনি তাঁর পরিকল্পিত বিপ্লবের প্রধান যোদ্ধা হিসেবে বেছে নেন। বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন ইতালীতে তিনি জাতীয়তাবাদ ও ঐক্যের প্রাণ প্রবাহ সঞ্চার করে মৃত ইতালীকে নবজীবন দেন। তিনি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দ্বারা জনসাধারণকে প্রকৃত স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার দিতে চান। রাজতন্ত্রের দ্বারা ইতালী মুক্ত হলে রাজতান্ত্রিক শাসনে রাজবংশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলেও, জনগণের প্রকৃত মুক্তি প্রজাতন্ত্র ছাড়া আর কিছুর দ্বারা সম্ভব নয় বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। ম্যাৎসিনী ছিলেন মানবতাবাদী এবং ইওরোপের সকল জাতির মুক্তির কথা তিনি ভাবতেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল যে, ইওরোপের সকল দেশে স্বাধীন ও মুক্ত প্রজাতন্ত্র গঠিত হলে, ইওরোপ রাজতান্ত্রিক যুদ্ধ-বিগ্রহ ও হানাহানি থেকে মুক্তি পাবে। ঐক্যবদ্ধ প্রজাতান্ত্রিক ইতালী জনগণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়ে ইওরোপকে পথ দেখাবে। এই স্বপ্নকে সফল করার জন্যেই তিনি ইতালীর যুবশক্তির ওপর নির্ভর করেন।

ম্যাৎসিনীর মতামত

ম্যাৎসিনী কেবলমাত্র ইতালীকে কিভাবে মুক্ত ও গঠন করা হবে সেকথা ভাবেননি। তাঁর লক্ষ্য পূরণের কথাও তিনি ভাবেন। তিনি বলেন যে, স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ ইতালীয় প্রজাতন্ত্র গঠনের পথে অষ্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যবাদ ও ইতালীর ওপর তার আধিপত্যই হল প্রধান বাধা। সুতরাং ইতালী থেকে অষ্ট্রিয়ার বহিষ্কার দ্বারাই ইতালীর মুক্তি আসবে। অষ্ট্রিয়া বহিষ্কৃত হলে ইতালীতে অবস্থিত অন্য সকল বিদেশী শাসক শুকনো পাতার মতই ঝরে পড়বে। দ্বিতীয়তঃ, ম্যাৎসিনী ইতালীর মুক্তির জন্যে জনমত

ইয়ং ইতালী আন্দোলনের কর্মধারা

ও জাতীয় চেতনার জাগরণের ওপর বিশেষ জোর দেন। এই কর্মধারাকেই প্রকৃত Risorgimento বলা যায়। ম্যাৎসিনী দাবী করেন যে, তাঁর ইয়ং ইতালী (Geovine Italia) দলে অন্ততঃ ৫০ হাজার সদস্য যোগ দেয়। গ্রেনভিলের মতে, এই সংখ্যাতত্ত্বে বিশ্বাস করা কঠিন। কারণ সেই যুগে ইতালীতে নিরক্ষরতা ও আঞ্চলিকতা বেশ তীব্র ছিল। বহু আধুনিক অ-ইতালীয় ঐতিহাসিক মনে করেন যে, ম্যাৎসিনীর বাণী নিরক্ষর ইতালীয় কৃষক সমাজের কাছে বিশেষ আবেদন সৃষ্টি করেনি। অপরদিকে সম্পত্তির অধিকারকে পবিত্র বলে দাবীকারী



বুর্জোয়ারা তাঁর প্রজাতন্ত্র ও গণভোটের দাবীকে বিপজ্জনক মনে করত। কাভুর ছিলেন বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের লোক। তাঁর চোখে ম্যাৎসিনীর এই ভাব বিলাসের কোন মূল্য ছিল না। কিন্তু

ইতালীয় জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা, যথা, স্যালভেমিনি প্রভৃতি এই মত অগ্রাহ্য করেন। তাঁরা বলেন যে, ম্যাৎসিনীর প্রভাবেই ইতালীতে জাতীয়তাবাদী জাগরণ ঘটে। তিনিই ইতালীর জনগণের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক ও আত্মিক ঐক্য স্থাপন করেন, যার ওপরে কাভুর রাজনৈতিক ঐক্যের ইমারত গড়েন। ইতালীয় বুদ্ধিজীবি ও দেশপ্রেমিক যুবকদের ওপর তাঁর আদর্শের প্রভাব ছিল নিঃসন্দেহে গভীর। তাঁর নির্দেশে যে প্রজাতান্ত্রিক বিদ্রোহগুলি পরিচালিত হয় তা হয়ত সফল হয়নি। কিন্তু ইতালীর ঐক্য আন্দোলনের যে প্রবল হাওয়া তিনি সৃষ্টি করেন তা বিফলে যায়নি। গ্রেনভিল এজন্য মন্তব্য করেছেন যে, "ইতালীর ঐক্যের প্রধান প্রবক্তা হিসেবে ইতালীয় দেশপ্রেমিক এবং শ্রেষ্ঠ অনুরাগী গ্যারিবল্ডীর ওপর তাঁর প্রভাব ছিল অসীম" (As the leading propagandist of Italian unity his influence on a section of Italian patriots and on his greatest disciple, Garibaldi, was enormous)।

১৮০৫ খ্রীঃ জেনোয়াতে ম্যাৎসিনীর জন্ম হয়। তিনি কিছুকাল চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করলেও, তাঁর জন্মগত প্রতিভা ছিল সাহিত্য, দর্শন ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে। তাঁর বাগ্মীতা ছিল অসাধারণ। তাঁর লেখনীর জোর ছিল তাঁর ভাষণ অপেক্ষা অনেক বেশী। তাঁর রচনাগুলিই ইতালীয় রিসঅর্গিমেন্টোর বিস্তার ঘটায়। কার্বোনারী দলের কার্যকলাপে বীতশ্রদ্ধ হয়ে তিনি ইয়ং ইতালী দল গড়েন। এই দলের নিষ্ঠাবান সদস্যদের জাতির মুক্তির জন্যে আত্মোৎসর্গের প্রতিজ্ঞা নিতে হত। ইয়ং ইতালীর মূল সদস্যরা ছিল নিষ্ঠাবান এবং তাদের আদর্শ রূপায়ণের জন্যে উৎসর্গীকৃত প্রাণ। ১৮৩৩ খ্রীঃ তিনি পিডমন্টের সেনাদলকে বিদ্রোহে প্ররোচনা দানের অপরাধে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হলেও, তিনি কিছুকাল সুইজারল্যান্ডের জেনিভা, কিছুকাল ফ্রান্সের প্যারিসে এবং শেষ পর্যন্ত লন্ডনে আশ্রয় নেন। নির্বাসনে থাকলেও তিনি জাতির মুক্তির কথা কোনদিন ভুলেননি। তিনি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে, বিশেষতঃ ইয়ং ইতালী পত্রিকার মাধ্যমে তাঁর ভাবধারা ইতালীতে ছড়ান।

১৮৪৮-এর বিদ্রোহে ইতালীর মুক্তিযুদ্ধ কয়েকটি শাখা-প্রশাখায় প্রসারিত হয়। প্রথমতঃ, ম্যাৎসিনী ও তাঁর অনুগামী গ্যারিবল্ডী, চ্যান্দিরা ভ্রাতাদ্বয় ও অন্যান্য অনুগামীদের নেতৃত্বে, প্রজাতান্ত্রিক গণবিদ্রোহ; দ্বিতীয়তঃ, পিডমন্টের রাজা চার্লস এলবার্ট ও সহযোগী রাজাদের দ্বারা ইতালীর সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ; তৃতীয়তঃ, ভিনিস নগরে ভিনিসের জনগণের প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। যদিও এই তিন ধারার বিপ্লব ছিল ইতালীর মুক্তির জন্যে নিবেদিত, যদিও এই তিন ধারার মধ্যে একমাত্র সাদৃশ্য ছিল যে এই তিন আন্দোলনই ছিল অষ্ট্রিয়া বিরোধী, এখানেই এই তিন ধারার মিল শেষ। তিন ধারার মধ্যে পার্থক্য ছিল আদর্শগত, মত ও পথের মধ্যেও পার্থক্য প্রকটিত হয়।

১৮৪৮ খ্রীঃ প্যারিসে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের আগেই ১৮৪৮ খ্রীঃ জানুয়ারি মাসে দক্ষিণ ইতালীর সিসিলীর প্যালেরমো শহরে গণবিদ্রোহ দেখা দেয়। দারিদ্র-তাড়িত জনগণের বিক্ষোভের সঙ্গে নেপলসের বুরবোঁ রাজা ফার্দিনান্দের সেনাদল যোগ দিলে, ধূর্ত ফার্দিনান্দ বেতসী বৃত্তি নিয়ে নেপলসের জনসাধারণকে একটি উদারতন্ত্রী সংবিধান দিয়ে নিজের সিংহাসন বাঁচান। ইতালীতে জাতীয়তাবাদের তীব্র প্রবাহ এবং গভীর সামাজিক অসন্তোষ লক্ষ্য করে ইতালীর অন্যান্য রাজারাও ফার্দিনান্দের দৃষ্টান্ত নিয়ে সংবিধান চালু করেন। এই উদারতন্ত্রী রাজাদের মধ্যে ছিলেন পিডমন্টের রাজা চার্লস্ এলবার্ট, টাস্কানীর রাজা এবং স্বয়ং পোপ নবম পিউস (ইতালীয় উচ্চারণ পিয়ো নোনো = Pius IX)। ইতালীতে উদারতন্ত্রের এই জয়, ফ্রান্সে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের আগেই ঘটে।

ইতিমধ্যে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের ঢেউ অষ্ট্রিয়ার হ্যাপসবার্গ সাম্রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে। মেটারনিকের পতন হয়। ১৮৫৮-এর মার্চ মাসে অষ্ট্রিয়া অধিকৃত লম্বার্ডির মিলান শহরে অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে

জাতীয়তাবাদী গণ-অভ্যুত্থান দেখা দেয়। ৫ দিনের তীব্র গণ বিক্ষোভে পরাস্ত হয়ে অষ্ট্রিয় সেনাপতি রাডেটস্কী পিছু হঠে কোয়ড্রিল্যাটার্যাল দুর্গে আশ্রয় নেন। মিলানের জাতীয়তাবাদী জনতা পিডমন্টের রাজা চার্লস এলবার্টকে তাঁদের মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার ডাক দেয়। চার্লস এলবার্ট ইতালীকে রাজতন্ত্রের অধীনে মুক্ত ও ঐক্যবদ্ধ করার মানসে অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তাঁর সঙ্গে টাস্কানী, নেপলসের রাজারাও যোগ দেন। এমনকি পোপ নবম পিউসও যোগ দেন। কিছুদিনের মধ্যে রাডেটস্কি শক্তি সঞ্চয় করে পাল্টা আঘাতের প্রস্তুতি নিলে পোপ, নেপলস ও টাস্কানি চার্লস এলবার্টের পক্ষ ত্যাগ করেন। চার্লস এলবার্টও ইতালীর ঐক্য অপেক্ষা লম্বার্ডি-ভেনেসিয়া, পার্মা ও মডেনা দখলে বেশী আগ্রহ দেখান। তার ফলে অন্য রাজারা ভয় পেয়ে যান। রাডেটস্কি এই সুযোগে কাষ্টোৎসার (Custozza) যুদ্ধে চার্লস এলবার্টকে পরাস্ত করলে, তিনি পিছু হঠে মিলানে আশ্রয় নেন। নোভারার যুদ্ধে ১৮৪৯ খ্রীঃ, রাডেটস্কি চার্লস এলবার্টকে চূড়ান্তভাবে পরাস্ত করেন। হতমান হয়ে চার্লস এলবার্ট তাঁর পুত্র ভিক্টর ইম্যানুয়েলের অনুকূলে পিডমন্টের সিংহাসন ত্যাগ করেন এবং অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেন। অষ্ট্রিয় সেনাদল মধ্য ইতালীতে ঢুকে পার্মা, টাস্কানী, মডেনার বিদ্রোহ দমন করে স্থিতাবস্থা বহাল করে। রাজতান্ত্রিক যুদ্ধের দ্বারা ইতালীর মুক্তি প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

এবার প্রজাতন্ত্রী ম্যাৎসিনী ইতালীর মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব নেন। তিনি ১৮৪৮-এ মিলানের বিদ্রোহের সময় মিলানে আসেন। কিন্তু মিলানবাসীরা তখন চার্লস এলবার্টের প্রতি আনুগত্য দেখালে তিনি হতাশ হয়ে মিলান ত্যাগ করেন। এখন চার্লস এলবার্টের পতন হলে, ম্যাৎসিনী ঘোষণা করেন যে, "রাজাদের যুদ্ধ শেষ হয়েছে; এবার প্রজাদের যুদ্ধ শুরু হবে।" তাঁর আদর্শ ও প্রজাতন্ত্রবাদী প্রভাব বহু ইতালীয় স্বদেশ প্রেমিককে উদ্বুদ্ধ করে। গ্যারিবল্ডী তাঁর দেশপ্রেমিক স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী নিয়ে ম্যাৎসিনির শক্তি বৃদ্ধি করেন। রোমের জনসাধারণ বিভেদকামী পোপের মুক্তিযুদ্ধে যোগদানে বিরত থাকায় বিরক্ত হয়ে তাঁকে রোম থেকে বিতাড়িত করে। রোমের জনসাধারণ একটি প্রজাতন্ত্র বা রোমান প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করে। এই প্রজাতন্ত্রের তিন শাসকের অন্যতম ছিলেন ম্যাৎসিনী। তিনি এই পদে যোগ দিয়ে অন্ততঃ কিছুদিনের জন্যে তাঁর আদর্শকে রূপায়িত করার চেষ্টা করেন। প্রশাসক ও সংস্কারক হিসেবে এই সময় তিনি তাঁর উজ্জ্বল কৃতিত্বের সাক্ষর রাখেন। তিনি ভূমিসংস্কার, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, নিম্নতম মজুরীর হার প্রবর্তন, নাগরিকদের সমান মর্যাদা ও অধিকার প্রবর্তন প্রভৃতি সংস্কার দ্বারা এবং গণভোট প্রবর্তন দ্বারা তাঁর আদর্শের রূপায়ণে চেষ্টা করেন। ম্যাৎসিনীর রোমান প্রজাতন্ত্রের ভিত্তি কেবলমাত্র রাজনৈতিক গণতন্ত্রের ওপর স্থাপিত ছিল না, এটি ছিল জ্যাকোবিন সমাজতন্ত্রের দ্বারা অনুপ্রাণিত।[১]

রোম প্রজাতন্ত্রের পতন

ম্যাৎসিনীর দ্বারা প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হলে রাজতন্ত্রী ইওরোপ এতে প্রমাদ গণে। পোপের রাজ্য বেদখল হওয়ায় ক্যাথলিকরা ভীষণ চটে যায়। ম্যাৎসিনীর প্রজাতন্ত্রবাদকে ইওরোপের রাজারা বিপজ্জনক ও ছোঁয়াচে আদর্শ বলে গণ্য করে। স্পেনের সেনাদল রোমান প্রজাতন্ত্রকে একদিক থেকে আক্রমণ করে। অন্যদিক থেকে ফরাসী রাষ্ট্রপতি লুই নেপোলিয়নের সেনাদল রোম আক্রমণ করে। গ্যারিবল্ডী রোমান প্রজাতন্ত্র রক্ষার জন্যে প্রাণপণ বাধা দিয়ে পরাস্ত হন। ম্যাৎসিনী শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে ইংলন্ডে আশ্রয় নেন। ইয়ং ইতালী আন্দোলনের এই নিবেদিত প্রাণ নেতা বাকি জীবন লন্ডনেই কাটান। ম্যাৎসিনীর বিফলতা দিয়ে তাঁকে বিচার করা যায় না। ইতালীতে তিনি যে প্রভাব রেখে যান তা পরবর্তী সময়ে ইতালীর ঐক্য ও স্বাধীনতা লাভের কাজে বিরাট সহায়ক হয়।

১· Edgar Halt—Risorgimento.

ইতালীর মুক্তি আন্দোলনের তৃতীয় ধারা ভেনিস নগরীতে বইতে থাকে। নেপোলিয়নের ইতালী অধিকারের আগে ভেনিসে প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান চালু ছিল। ভিয়েনা কংগ্রেসে ভেনিসকে সেই সংবিধান ফিরিয়ে না দিয়ে, এই নগরকে অষ্ট্রিয়ার অধীনে স্থাপন করে। ১৮৪৯ খ্রীঃ ভেনিস অষ্ট্রিয়ার অধীনতা অস্বীকার করে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করে। অষ্ট্রিয় নৌ-বহর ভেনিস অবরোধ করলে শেষ পর্যন্ত ভেনিসের পতন হয়। ইতালীতে স্থিতাবস্থা ফিরে আসে।

ম্যাৎসিনীর কৃতিত্ব (The achievements of Mazzini)ঃ ইতিহাসের কোন কোন ঘটনা পরিস্থিতির চাপে ঘটলেও, ঘটনার পশ্চাতে ব্যক্তি বা নেতার প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। ইতালীর মুক্তি আন্দোলনে ম্যাৎসিনীর অবদান স্মরণ করা দরকার। গ্রেনভিলের মতে, ম্যাৎসিনী ছিলেন "ইতালীর প্রজাতান্ত্রিক ঐক্যের মস্তিষ্ক এবং বিধিপ্রেরিত নায়ক।"[১] সি· ডি· হ্যাজেনের মতে, "ম্যাৎসিনী ছিলেন ইতালীর পুর্নজাগরণের আধ্যাত্মিক শক্তি, নব ইতালীর প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ।"[২]

ম্যাৎসিনীর দ্বারা ইতালীর ভাবগত ঐক্য স্থাপন

ইতালীর জেনোয়া নগরীতে এক চিকিৎসকের গৃহে ১৮০৫ খ্রীঃ ম্যাৎসিনীর জন্ম হয়। ম্যাৎসিনী ছিলেন ভাবুক প্রকৃতির এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ। তিনি ছিলেন স্বভাব সাহিত্যিক। বাইবেল, দান্তে, শেকসপীয়ার, গ্যেটে ও শিলার প্রভৃতি সাহিত্যিকের তিনি ছিলেন অনুরাগী পাঠক। তাঁর লেখনী ছিল যুক্তিতে ক্ষুরধার, আবেগে সিঞ্চিত। ইয়ং ইতালীয় পত্রিকায় তাঁর প্রকাশিত রচনাবলী ইতালীর যুব শক্তিকে অনুপ্রাণিত করে। তিনি ১৮৩০ খ্রীঃ ইতালী থেকে নির্বাসিত হন। দীর্ঘকাল পিতৃভূমি থেকে দূরে থাকলেও তিনি সংবাদপত্রের মাধ্যমে ইতালীর মুক্তির জন্যে জনগণের মানসিক প্রস্তুতি করেন। ইয়ং ইতালী দল গঠন এবং আন্দোলন ছিল ম্যাৎসিনীর শ্রেষ্ঠ অবদান।

ম্যাৎসিনীর কৈশোর জীবন

ইয়ং ইতালী দল গঠন

ম্যাৎসিনী মনে করতেন যে, ইতালীর জনসাধারণের মধ্যে ইতালীর মুক্তি ও ঐক্যেব চেতনা না জাগলে প্রকৃত ঐক্য আসবে না। এজন্য তাঁর দল ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ ইতালীর আদর্শ ছড়িয়ে দেয়। তিনি শ্বেত, রক্ত ও সবুজ রং-এ সজ্জিত ইতালীর জাতীয় পতাকার প্রবর্তন করেন। এই পতাকার এক পিঠে "গণতন্ত্র, সাম্য ও মানবতা" এবং অপর পিঠে "স্বাধীনতা ও ঐক্য" কথাগুলি লিখিত ছিল। ইয়ং ইতালী দলের মুখপত্রের নাম ছিল "ইয়ং ইতালী"। এই পত্রিকা জনসমাজে বিশেষ প্রিয় ছিল। ইয়ং ইতালী আন্দোলনের প্রভাবে প্রাদেশিকতা, আঞ্চলিকতায় খণ্ডিত ইতালী নতুন ঐক্যবোধে জেগে ওঠে। ইতালীর মানসিক ও ভাবগত ঐক্যের বনিয়াদ রচিত হয়। ম্যাৎসিনী জানতেন যে, ইতালীকে ঐক্যবদ্ধ করার পথে প্রধান বাধা হল ইতালীতে অষ্ট্রিয়ার আধিপত্য। এজন্য তিনি বল প্রয়োগ দ্বারা অষ্ট্রিয়াকে বহিষ্কার করার কথা বলেন। অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে মুক্তি যুদ্ধে ইতালীবাসীরা নিজ শক্তিতে জয়লাভ করতে সক্ষম বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। তিনি বৈদেশিক শক্তির সহায়তা গ্রহণের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁর নীতিই ছিল "ইতালীকে নিজ শক্তিতে মুক্ত হতে হবে" (Italia fara de se)। তিনি গণ বিদ্রোহ ও গেরিলা যুদ্ধের ওপর গুরুত্ব দেন। তাঁর মতে, "Education and insurrection" অর্থাৎ জনগণের সঠিক রাজনৈতিক শিক্ষা এবং বিদ্রোহের মাধ্যমেই ইতালীর মুক্তি আসবে। ম্যাৎসিনী মনে করতেন যে, বৈদেশিক শাসন থেকে ইতালীর মুক্তিই শেষ কথা

ম্যাৎসিনীর ভাবধারা ও ইতালীর ঐক্যের আদর্শ

১· "The intellectual apostle of republican unity." Grenville—Europe Reshaped. P. 23.

২· "Spiritual force of resurrection, the prophet of a state."—C. D. Hazen.

নয়। ইতালীর ঐক্য হল এই আন্দোলনের আসল লক্ষ্য। তিনি ইয়ং ইতালী স্বেচ্ছাসেবকদের বলেন যে, "কেবলমাত্র ইতালী, ঐক্যবদ্ধ ইতালীই তোমাদের মন্ত্র হবে।" ইতালীতে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ছিল ম্যাৎসিনীর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। ঐক্যবদ্ধ ইতালীতে প্রজাতন্ত্র ও গণভোট ব্যবস্থা স্থাপন দ্বারা ইতালীয় রিসঅর্গিমেন্টো (Risorgimento) বা মুক্তি আন্দোলন সম্পূর্ণ হবে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন।

ম্যাৎসিনী কেবলমাত্র অলস আদর্শবাদের পূজারী ছিলেন না। তিনি আদর্শের সঙ্গে কর্মের সমন্বয় করার চেষ্টা করেন। তাঁরই প্রভাবে ইতালীর যুব সমাজের মধ্যে ইয়ং ইতালী দল বিশেষ অনুপ্রেরণা সঞ্চার করে। তিনি ইতালীর মুক্তি আন্দোলনকে রাজা ও অভিজাত শ্রেণীর কবল মুক্ত করে জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেন। বোল্টন কিং নামক ঐতিহাসিকের মতে, জাতীয় মুক্তির সঙ্গে জনসাধারণের যোগসূত্র স্থাপন ছিল ম্যাৎসিনীর মুখ্য কৃতিত্ব।[১] ইতালীর জনসাধারণের মধ্যে দেশপ্রেমের এবং স্বদেশের ঐক্য চিন্তার জাগরণ দ্বারা তিনি ইতালীর ভাবগত ঐক্য সম্পন্ন করেন।

ম্যাৎসিনীব কর্মপন্থা

ম্যাৎসিনী কেবলমাত্র প্রজাতন্ত্রবাদী ছিলেন না। তাঁর মধ্যে সমাজতান্ত্রিক চিন্তার স্ফুরণ লক্ষ্য করা যায়। যদিও তিনি মার্কসীয় সমাজতন্ত্রবাদের অনুরাগী ছিলেন না; তিনি জ্যাকোবিন সমাজতন্ত্রবাদকে অনুসরণ করেন। তিনি সম্পত্তির অধিকার লোপ না করে সম্পত্তির ওপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ স্থাপনের কথা ভাবেন। রোমান প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর তিনি তাঁর সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে রূপদানের চেষ্টা করেন। এই প্রজাতন্ত্রের স্বল্পকালীন শাসনকালে ম্যাৎসিনী দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ আইন, নিম্নতম মজুরী আইন প্রভৃতি জনকল্যাণমূলক আইনগুলি পাশ করেন। তিনি ধর্মনিরপেক্ষতা নীতি গ্রহণ করেন। সর্বোপরি, ম্যাৎসিনী ছিলেন মানবতাবাদী। তিনি পৃথিবীতে এক নৈতিক নিয়মে শাসিত সমাজ ব্যবস্থা ও সামাজিক ন্যায় বিচারের স্বপ্ন দেখতেন। মানব জাতির ঐক্যের আদর্শে তিনি বিশ্বাস করতেন।

ম্যাৎসিনীব সমাজতন্ত্রবাদ ও মানবতাবাদ

ম্যাৎসিনীব প্রধান কৃতিত্ব ছিল যে, ইতালীর দেশপ্রেমিকদের তিনিই ছিলেন শিক্ষক ও প্রেবণাদাতা। বাস্তবক্ষেত্রে তাঁর পরিকল্পনার বিশেষ সাফল্য দেখা যায় না। কিন্তু তাঁর আদর্শবাদী প্রভাবেই ইতালীতে বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী অভ্যুত্থান ঘটে এবং কাভ্যুর তা ব্যবহার করে ইতালীর ঐক্যস্থাপন কবেন। নতুবা বৈদেশিক সহায়তা নিয়ে কাভ্যুরের মুক্তিযুদ্ধের সফলতা আসত না। ম্যাৎসিনীব প্রত্যক্ষ আন্দোলনগুলি সফল হয়নি। তিনি বেশীরভাগ সময় নির্বাসনে জীবন কাটান। ১৮৪৮ খ্রীঃ তিনি রোমান প্রজাতন্ত্র গঠন করলেও তা ফরাসী সেনার আক্রমণে ধ্বংস হয়। কিন্তু তিনিই ছিলেন নব ইতালীর প্রাণপুরুষ। তাঁরই প্রভাবে মধ্য ইতালীর প্রজাতান্ত্রিক দেশপ্রেমিকবা হ্যাপসবার্গ শাসকদের বিতাড়িত করে এবং পিডমন্টের সঙ্গে সংযুক্তি ঘোষণা কবে। তাঁরই ভাবশিষ্য গ্যারিবল্ডী দক্ষিণ ইতালী জয় করেন। পরে তা পিডমন্টের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। ইতালীর বৃহত্তর নিরক্ষর কিষাণ ও উচ্চ বুর্জোয়ারা তাঁকে সমর্থন করেনি। এজন্য তাঁর প্রজাতান্ত্রিক আদর্শ রূপায়িত হয়নি। কিন্তু ইতালীতে প্রজাতন্ত্র স্থাপিত না হওয়ার ফলে কাভ্যুর কর্তৃক স্থাপিত ইতালীর রাজতান্ত্রিক ঐক্য ইতালীয়দের আশা-আকাঙ্খা পূরণে ব্যর্থ হয়। কারণ কাভ্যুর কর্তৃক রাজতান্ত্রিক ঐক্য ছিল অসম্পূর্ণ এবং ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া ব্যবস্থা। ম্যাৎসিনীই ছিলেন ইতালীর রিসঅর্গিমেন্টোর আত্মা। গ্রেনভিলের মতে, যদি ম্যাৎসিনীর বিপ্লবী ভাবধারা কার্যকরী না থাকত তবে মধ্য ইতালী ও দক্ষিণ ইতালী পিডমন্টের সহিত সংযুক্ত হত না।

১ Bolton King. P. 128. Edgar Halt—P. 83.

ম্যাৎসিনীর প্রজাতান্ত্রিক আদর্শকে কাভ্যুর পরিত্যাগ করেন। ইতালীয় বিপ্লবীদের স্বপ্নের ইতালী কাভ্যুর গঠন করেননি। গণভোট ও প্রজাতন্ত্রের আদর্শ ত্যাগ করে কাভ্যুর সম্পত্তির ভোটাধিকারের ভিত্তিতে একটি বুর্জোয়া রাজতন্ত্র স্থাপন করেন। এর ফলে বুর্জোয়া শ্রেণীই রাজনৈতিক ক্ষমতা পায়। সমাজের দরিদ্র ও বঞ্চিত লোকেরা পদানত থাকে। ম্যাৎসিনী ইতালীর সর্বসাধারণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির যে চিন্তা করতেন কাভ্যুর তা ত্যাগ করেন।

কাভ্যুরের সহিত পার্থক্য

ম্যাৎসিনীর প্রধান ত্রুটি এই ছিল যে, তিনি আদপেই বাস্তবপন্থী ছিলেন না। তিনি কাভ্যুরের ন্যায় চতুর ও সুবিধাবাদী রাজনৈতিক বুদ্ধির অধিকারী ছিলেন না। তিনি প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক বা মার্কসবাদীও ছিলেন না। এজন্য তাঁর পরিচালিত বিপ্লব ব্যর্থ হয়। তিনি আদর্শবাদকে এত বেশী মূল্য দিতেন যে, অন্য পন্থার মুক্তি আন্দোলনকারীদের সঙ্গে তিনি আপোষ করতে পারেননি। তিনিই ইতালীর যুবকদের শেখান যে, "যখন শহীদের রক্ত ঝরে তাতে আদর্শের বীজ দ্রুত বৃদ্ধি পায়" (Ideas grow quickly when watered by the blood of martyrs)। তিনি তাঁর সমকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক দুষ্ট ক্ষতের নিরাময়ের জন্যে প্রজাতন্ত্রকেই একমাত্র মহৌষধ বলে মনে করতেন। তিনি সমগ্র ইওরোপের বিভিন্ন দেশে জাতীয়তাবাদের জয় কামনা করতেন। তিনিই ছিলেন খাঁটি রাজনৈতিক বিপ্লবী। তাঁর সমাজতন্ত্র ছিল ফরাসী বিপ্লবের জ্যাকোবিন পন্থী সমাজতন্ত্র।[১] ডেনিস ম্যাকস্মিথের মতে, ম্যাৎসিনী ইতালীর সকল শ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যে জাতীয়তাবাদী ভাব সঞ্চার করেন এই ধারণার কোন ভিত্তি নেই।[২] ১৮৪৮ খ্রীঃ বিদ্রোহে, ডেনিস ম্যাকস্মিথের মতে, কেবলমাত্র ইতালীয় জাতীয়তাবাদের স্ফুরণ দেখা যায়নি। এই বিপ্লবের নেতিবাচক দিকগুলি, যা ইতালীতে দেখা যায়, তা হল, ইতালীতে প্রাচীনপন্থী পোপের সঙ্গে নব্যপন্থী ম্যাৎসিনীবাদীদের সংঘাত, কৃষক ও শহুরে বুর্জোয়াদের সংঘাত এবং সার্বিক জাতীয়তাবাদের সঙ্গে স্থানীয় আঞ্চলিকাতাবাদের সংঘাত। তবুও বলা যায় যে, ম্যাৎসিনী ছিলেন ইতালীয় জাতীয়তাবাদের প্রাণপুরুষ। ওমেদিওর মতে, ম্যাৎসিনীর ইয়ং ইতালীবাদের মধ্যে ইতালীর স্বাধীনতা লাভের জন্যে সংগ্রামী চেতনা, সমকালীন সমাজতন্ত্রবাদ, জ্যাকোবিন প্রজাতন্ত্রবাদ মিলিত হয়ে একটি রাজনৈতিক ভাবধারায় পরিণত হয়। ম্যাৎসিনী এই ভাবধারার স্রষ্টা ছিলেন। তিনি একে রোমান্সবাদের আবরণে মোহময় করেন। ইতালীয় জনগণ এই ভাবধারার মদিরা আকণ্ঠ পান করে। তাদের মধ্যে যে চেতনার স্ফুরণ হয় তা নব ইতালীকে জন্মদান করে।

ম্যাৎসিনীর ত্রুটি

কাভ্যুরের নেতৃত্বে ইতালীর মুক্তিযুদ্ধ (War of Italian Liberation under Cavour) : ইতালীর ঐক্য আন্দোলনের রক্ষণশীল ধারার প্রবর্তকরূপে কাউন্ট ক্যামিলো ডি কাভ্যুর পরিচিত ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ইতালীর মুক্তির জন্যে বিভিন্ন পন্থার প্রচার চলছিল। প্রথম, ম্যাৎসিনীর প্রজাতন্ত্রবাদী ইয়ং ইতালী আন্দোলনের কথা আগে বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে। দ্বিতীয় ধারা ছিল নিও গাল্ফ (Neo Gulph) গোষ্ঠী। এই মতবাদের প্রবর্তক ছিলেন ডি এ্যাজেগলিও (D' Azeglio) নামে পিডমন্টের এক মন্ত্রী। তাঁর মতে ভিয়েনা সন্ধিদ্বারা ইতালীর যে রাজ্যগুলি গঠিত হয় সেগুলির সমন্বয়ে এক যুক্তরাষ্ট্র গঠন করে রোমের পোপকে যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতির পদ দান করা। জিওবার্টি তাঁর প্রাইমেট (Primate) গ্রন্থে এই মতবাদ প্রচার করেন। ১৮৪৮-এর বিপ্লবের সময় পোপ ইতালীর স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগদান না করায় পোপবাদী যুক্তরাষ্ট্রীয় ঐক্য আন্দোলনে

১· Edgar Halt. P. 85.

২· Denis Mack Smith—Victor Emmanuel, Cavour & Risorgimento.

ভাঁটা পড়ে। তৃতীয় ধারার প্রবর্তক ছিলেন সিজারো বালবো (Caesaro Balbo)। তাঁর মতে সামরিক শক্তির দ্বারা যেহেতু অষ্ট্রিয়াকে ইতালী থেকে বহিষ্কার করা যাচ্ছে না, সেহেতু অষ্ট্রিয়াকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিলে অষ্ট্রিয়া বিনাযুদ্ধে স্বেচ্ছায় ইতালী ত্যাগ করতে পারে। এজন্য তাঁর প্রস্তাব ছিল যে, বলকানে তুরস্কের সাম্রাজ্যের একাংশ অষ্ট্রিয়াকে ক্ষতিপূরণ দিলে অষ্ট্রিয়া ইতালী থেকে তার আধিপত্য তুলে নিতে পারে। কিন্তু এই ক্ষতিপূরণ প্রস্তাবকে কার্যকরী করা যায়নি।

ইতালীর ঐক্য আন্দোলনের চতুর্থ ও সফল ধারার প্রবক্তা ছিলেন কাউন্ট ক্যামিলো ডি কাভ্যুর। তিনি পিডমন্টের রাজবংশের অধীনে ইতালীকে ঐক্য স্থাপনই একমাত্র বাস্তব ও যুক্তিযুক্ত পন্থা বলে ঘোষণা করেন। ইতালীর রাজতান্ত্রিক ঐক্যের সঙ্গে উদারতান্ত্রিক সংবিধান, সম্পত্তির ভোটাধিকার ভিত্তিতে নির্বাচিত পার্লামেন্ট গঠনের লক্ষ্য কাভ্যুর ঘোষণা করেন। এছাড়া তিনি পিডমন্টে আধুনিক শিল্পায়ন, শাসন ও আইন সংস্কার, আইনের সাম্য প্রতিষ্ঠা করে পিডমন্টকে এক আদর্শ রাষ্ট্ররূপে ইতালীবাসীর কাছে গ্রহণীয় করে তুলতে চান। কাভ্যুর Risorgimento নামে এক পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে ইতালীর মুক্তির জন্যে একটি বাস্তবমুখী পরিকল্পনা প্রচার করেন। তিনি বৈজ্ঞানিক প্রথায় কৃষি এবং রেলপথ নির্মাণের ওপর বিশেষ জোর দেন। কাভ্যুরের বক্তব্য এই ছিল যে ইতালীতে রেলপথ বিস্তৃত হলে প্রাদেশিকতা লোপ পাবে। জাতীয় ঐক্য স্বভাবতই বাড়বে।[১] কাভ্যুরের প্রধান লক্ষ্য ছিল পিডমন্টের রাজবংশের অধীনে ইতালীকে ঐক্যবদ্ধ কর্মা। ম্যাৎসিনীর প্রজাতন্ত্রবাদ ইতালীতে কার্যকরী হবে না বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। পিডমন্টে উদারতান্ত্রিক সংবিধান প্রবর্তন এবং উদারপন্থী সংস্কারের ফলে পিডমন্টের রাজবংশের জনপ্রিয়তা বাড়ে। ইতালীর রাজ্যগুলির মধ্যে একমাত্র পিডমন্টই ইতালীর নেতৃত্ব দিতে সক্ষম বলে কাভ্যুর ঘোষণা করেন। পিডমন্টের রাজবংশই ছিল একমাত্র ইতালীয় রাজবংশ। ইতালীর অন্যান্য রাজবংশ ছিল বহিরাগত। সুতরাং এই রাজবংশকে কেন্দ্র করে স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ ইতালী গঠন করা যাবে বলে কাভ্যুর বিশ্বাস করতেন। দ্বিতীয়তঃ, কাভ্যুর মনে করতেন যে, বৈদেশিক সাহায্য ছাড়া পিডমন্টের পক্ষে একক চেষ্টায় অষ্ট্রিয়াকে ইতালী হতে বিতাড়ন করা সম্ভব নয়। কার্বোনারী ও ইয়ং ইতালী আন্দোলনের বিফলতা একথা প্রমাণ করে যে, ইতালীর সামরিক শক্তি অষ্ট্রিয়ার অপেক্ষা নিকৃষ্ট। সুতরাং বৈদেশিক শক্তির সাহায্য ছাড়া ভিয়েনা চুক্তি ভেঙে ইতালীকে ঐক্যবদ্ধ করা যাবে না, একথা কাভ্যুর বলেন। ইতালীর সমস্যার দিকে ইওরোপীয় জনমতকে আকৃষ্ট করার প্রয়োজনীয়তা তিনি বুঝান। কাভ্যুর পিডমন্টের মন্ত্রী হিসেবে মনে করতেন যে, ম্যাৎসিনীবাদী আন্দোলন ইতালীতে কেবলমাত্র নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে। তিনি ম্যাৎসিনীর চরমপন্থী আন্দোলনকে ঘৃণা করতেন। জাতীযতাবাদী আন্দোলন যাতে ম্যাৎসিনীবাদীদের নিয়ন্ত্রণে না চলে যায় এজন্য তিনি তাঁর নিজস্ব পন্থায় ইতালীর ঐক্য স্থাপনের জন্যে বিশেষ সচেষ্ট হন। কারণ তিনি আশঙ্কা করতেন যে, ম্যাৎসিনীর প্রজাতান্ত্রিক আন্দোলন জোরদার হলে ইতালীর রাজতান্ত্রিক ঐক্যই শুধু ব্যাহত হবে না, ইওরোপের রাজশক্তিগুলি ইতালীর মুক্তির প্রশ্নকে চাপা দিয়ে দেবে অথবা বিরোধিতা করবে। কাভ্যুর অবশ্য সম্পূর্ণ গোটা ইতালীকে পিডমন্টের অধীনে আনার আশা গোড়ায় করতেন না। উত্তর ইতালীকে অষ্ট্রিয়ার শাসনমুক্ত করে পিডমন্টের সঙ্গে যুক্ত করার পরিকল্পনা তিনি প্রাথমিকভাবে গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন Real politik বা বাস্তববাদী কূটনীতিতে বিশ্বাসী। পিডমন্টকে যদি ইতালীর ঐক্যে নেতৃত্ব দিতে হয় তবে পিডমন্টকে তার যোগ্য করে তোলার জন্যে তিনি নবনির্মাণ পরিকল্পনা চালু করেন। তিনি বলেন যে, Civilisation অর্থাৎ আধুনিক সভ্যতা বিস্তারের দ্বারাই তিনি ইতালীকে অর্থনৈতিক ও

১· C. D. Hazen—Europe Since Napoleon.

কার্যকরী দিক থেকে ঐক্যবদ্ধ করে ফেলবেন। পিডমন্টের রেলপথ নির্মাণ এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রে তার বিস্তারকে তিনি "সভ্যতার বিস্তার" বলে মনে করতেন। পিডমন্টের সংবিধানকে উদারতান্ত্রিক ভাবধারায় প্রভাবিত করে তিনি পার্লামেন্ট ও সম্পত্তির অধিকারের ভিত্তিতে সদস্য নির্বাচন চালু করেন। বুর্জোয়াতন্ত্রবাদী কাভ্যুর গণভোটের ঘোর বিরোধী ছিলেন। পিডমন্টের সেনাদল প্রাশিয়া ও ফরাসী আদলে এবং নৌ-বহর ব্রিটিশ আদলে গঠন করা হয়। পিডমন্টের আধুনিকীকরণের ফলে বহু ইতালীয় দেশপ্রেমিক পিডমন্টকেই ইতালীর ঐক্য আন্দোলনের নেতারূপে মেনে নেয়।

অতঃপর কাভ্যুর বৈদেশিক শক্তির মিত্রতা লাভের জন্যে চেষ্টা চালান। ইংলন্ড ও ফ্রান্স ছিল তখন ইওরোপে দুই উদারনৈতিক শক্তি। কাভ্যুর এই দুই শক্তির সহায়তা নিয়ে ইতালীকে বৈদেশিক শাসন মুক্ত করার সঙ্কল্প নেন। তিনি ক্রিমিয়ার যুদ্ধে পিডমন্টের বাহিনীকে ইংলন্ড ও ফ্রান্সের পক্ষে নিয়োজিত করেন। তিনি এই সেনাদের উৎসাহ দিয়ে বলেন যে, "হে যুবকেরা প্রাণ দিয়ে যুদ্ধ কর। ঈশ্বরের আশীর্বাদে এই ক্রিমিয়ার মাটি থেকেই নব ইতালীর জন্ম হবে।"[১]

ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের সঙ্গে যোগাযোগ

ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পর ১৮৫৫ খ্রীঃ প্যারিসের শান্তি বৈঠকে পিডমন্ট যোগ দেয়। প্যারিসের শান্তি বৈঠকে ইতালীর সমস্যা আলোচিত হয়। ইতালীর জাতীয়তাবাদের পক্ষে ইংলন্ড ও ফ্রান্স সহানুভূতি প্রকাশ করে। ঐতিহাসিক গ্রেনভিলের মতে, "কাভ্যুর প্যারিসের বৈঠকে একথা বুঝতে পারেন যে, পূর্বাঞ্চল সমস্যার (Eastern Question) ন্যায় ইওরোপে ইতালীর সমস্যা (Italian Question) বিদ্যমান।[২] এই সমস্যার ন্যায্য সমাধান না হলে ইওরোপের শান্তি বিনষ্ট হবে।" ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পর থেকে তৃতীয় নেপোলিয়ন ইতালীর মুক্তিযুদ্ধের প্রতি আগ্রহ দেখাতে থাকেন।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পর ইতালীর মুক্তিযুদ্ধে ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের সহযোগিতা লাভের জন্যে কাভ্যুর চেষ্টা করেন। ইতিমধ্যে ইতালীয় নাগরিক ওরসিনি (Orsini) বোমা ছুঁড়ে তৃতীয় নেপোলিয়ন ও তাঁর রাণীর প্রাণনাশের ব্যর্থ চেষ্টা করেন। ওরসিনি বিচারে প্রাণদন্ডে দন্ডিত হন। তিনি মৃত্যুর আগে তৃতীয় নেপোলিয়নকে পত্র দ্বারা জানান যে, যতদিন ইতালীর স্বাধীনতার সমস্যা অমীমাংসিত থাকবে, ততদিন তাঁর জীবন নিরাপদ নয়। ওরসিনি ঘটনা তৃতীয় নেপোলিয়নকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। তাছাড়া তৃতীয় নেপোলিয়নের বৈদেশিক নীতির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল ইওরোপের নিপীড়িত জাতিগুলির জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সাহায্য দিয়ে ভিয়েনা সন্ধিকে ভেঙে ফেলা। ইতালীয় জাতীয়তাবাদকে তিনি এজন্য সাহায্য করতে ইচ্ছা করেন। ম্যাৎসিনীর প্রজাতন্ত্রবাদ ছিল তাঁর চক্ষুশূল। কারণ তিনি নিজে ফরাসী প্রজাতন্ত্রকে ধ্বংস করেন। কাজেই কাভ্যুরের রাজতান্ত্রিক ঐক্যের প্রতি তিনি সহানুভূতিশীল ছিলেন। কাভ্যুর ও তৃতীয় নেপোলিয়ন গোপনে প্লোমবিয়ারের চুক্তি (Pact of Plombiers) ১৮৫৮ খ্রীঃ স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তির দ্বারা নেপোলিয়ন অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে পিডমন্টকে সামরিক সাহায্য দিতে অঙ্গীকার করেন। কাভ্যুর অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার জন্যে একটি বৈধ কারণ (Honourable casus belli) সৃষ্টি করার দায়িত্ব নেন। (১) উত্তর ইতালীর লম্বার্ডি ও ভেনেসিয়াকে এবং পোপের রাজ্যের কিছু অংশ পিডমন্টের সঙ্গে যুক্ত করতে তৃতীয় নেপোলিয়ন প্রতিশ্রুতি দেন। (২) রোম ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল পোপের অধীনে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। (৩) টাস্কানী ও

প্লোমবিয়ারের সন্ধি ১৮৫৮ খ্রীঃ

১· Quoted by C. D. Hazen.

২· Grenville—Europe Reshaped. P 239

পোপের রাজ্যের অবশিষ্ট অংশ নিয়ে মধ্য ইতালীয় রাজ্য গঠন করার পরিকল্পনা করা হয়। (৪) নেপলস ও সিসিলীতে বুরবোঁ বংশীয় রাজার অধিকার বহাল থাকবে বলা হয়। (৫) পরিবর্তে স্যাভয় ও নিস নেপোলিয়নকে দেওয়া হবে বলা হয়। (৬) পিডমন্টের রাজা ভিক্টর ইম্যানুয়েলের কন্যার সঙ্গে নেপোলিয়নের সম্পর্কিত ভ্রাতার বিবাহ স্থির কবা হয়।

প্লোমবিয়ারের চুক্তির পর, অষ্ট্রিয়ার সহিত যুদ্ধের বৈধ কারণ সৃষ্টির জন্যে কাভ্যুব অষ্ট্রিয়ার অধিকৃত লম্বার্ডি ও ভেনেসিয়া অঞ্চলে গোলযোগ সৃষ্টি করেন। এতে অষ্ট্রিয়া বিরক্ত হয়ে পিডমন্টের কাছে এক চরমপত্র দেয়। পিডমন্ট এই চরমপত্র অগ্রাহ্য করলে অষ্ট্রিয়া পিডমন্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ফলে অষ্ট্রিয়া আক্রমণকারী রূপে সূচিত হয়। নেপোলিয়নের নির্দেশে ফরাসী বাহিনী, পিডমন্টের পক্ষ নিয়ে অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দেয়। ম্যাজেন্টা ও সলফেরিনোর যুদ্ধে ফরাসী বাহিনী অষ্ট্রিয়াকে পরাস্ত করে লম্বার্ডি অধিকার করে। অষ্ট্রিয় বাহিনী পিছু হঠে ভিনিসিয়া প্রদেশে আশ্রয় নেয়। সমগ্র ইতালীতে প্রবল আলোড়ন দেখা দেয়।

ইতালীব স্বাধীনতা যুদ্ধেব আবম্ভ ঃ অষ্ট্রিযাব পবাজয়

ইতালীর মুক্তিযুদ্ধ যখন বিজয়ের পথে এগোচ্ছিল তখন তৃতীয় নেপোলিয়ন পিডমন্টের সকল আশা নির্মূল করে হঠাৎ অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে ভিল্লাফ্রাঙ্কার সন্ধি (Truce of Villafranca) স্বাক্ষর করে যুদ্ধ ত্যাগ করেন (বিশদ বিবরণ পৃঃ ২৫৯ দেখ)। পিছন থেকে প্রাশিয়ার আক্রমণেব ভয় এবং ইতালীর যুদ্ধ দীর্ঘায়ত হওয়ার ভয়ে নেপোলিয়ন সরে দাঁড়ান। ভিল্লাফ্রাঙ্কার সন্ধির দ্বারা লম্বার্ডি প্রদেশ পিডমন্টের সঙ্গে যুক্ত হয। ভেনেসিয়া অষ্ট্রিয়ার অধীনে থাকে। অবশিষ্ট ইতালীতে স্থিতাবস্থা বহাল রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ইতালীয় জাতীয়তাবাদীরা ভিল্লাফ্রাঙ্কার সন্ধিকে ইতালীর প্রতি তৃতীয় নেপোলিয়নের বিশ্বাসঘাতকতা বলে মনে করে। কারণ নেপোলিয়ন ইতালীর মুক্তির কাজ অর্দ্ধসমাপ্ত রেখে দায়িত্ব ত্যাগ করেন। কাভ্যুর তাঁর প্রভু ভিক্টর ইম্যানুয়েলকে এই সন্ধি অগ্রাহ্য করার পরামর্শ দেন। কিন্তু বাস্তববাদী ভিক্টর ইম্যানুয়েল এই সন্ধি স্বীকার করে লম্বার্ডি অধিকার করেন। ইতালীর মুক্তি যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ের অবসান ঘটে।

ভিল্লাফ্রাঙ্কাব সন্ধি

ইতিমধ্যে মধ্য ইতালীর টাস্কানী, পার্মা, মোডেনা প্রভৃতি মধ্য ইতালীয় অঞ্চলে গণ-অভ্যুত্থান ঘটে। ম্যাৎসিনীপন্থী প্রজাতান্ত্রিকদের প্রভাবেই এই অভ্যুত্থানগুলি ঘটে। টাস্কানীর রাজা লিওপোল্ড এবং পার্মার ডাচেস ও মোডেনার ডিউক যাঁরা ছিলেন অষ্ট্রিয়ার আশ্রিত তাঁরা পালাতে বাধ্য হন। এই সকল স্থানের অধিবাসীরা পিডমন্টের সঙ্গে সংযুক্তির পক্ষে মত প্রকাশ করে। কাভ্যুর এই সুযোগকে কাজে লাগান। তিনি উপলব্ধি করেন যে, সরাসরি মধ্য ইতালীর রাজ্যগুলিকে পিডমন্টের সঙ্গে সংযুক্ত করার অর্থ হল ভিয়েনা চুক্তি ও ভিল্লাফ্রাঙ্কার চুক্তিকে নস্যাৎ করা। এজন্য অষ্ট্রিয়া বাধা দিতে পারে। সুতরাং তিনি ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নকে স্যাভয় ও নিস ছেড়ে দিয়ে, পিডমন্টের সঙ্গে মধ্য ইতালীর এই রাজ্যগুলির সংযুক্তিতে তাঁর সমর্থন আদায় করেন। তৃতীয় নেপোলিয়ন এই শর্ত দেন যে, এই রাজ্যগুলির পিডমন্টের সঙ্গে সংযুক্তির পক্ষে অভিমত গণভোট দ্বারা নিতে হবে। গণভোট সংযুক্তির অনুকূলে যাওয়ায় মধ্য ইতালীর এই রাজ্যগুলি পিডমন্টের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। ইতালীর ঐক্যের দ্বিতীয় পর্যায়ের অবসান ঘটে।

মধ্য ইতালীব পিডমন্টেব সহিত সংযুক্তি

এর পর দক্ষিণ ইতালীর সিসিলীতে ১৮৬০ খ্রীঃ বুরবোঁ রাজা দ্বিতীয় ফ্রান্সিসের বিরুদ্ধে কৃষক আন্দোলন দেখা দেয়। ইতালীর জাতীয়তাবাদী নেতা গ্যারিবল্ডী দক্ষিণ ইতালীর

গ্যারিবল্ডীর নেপলস বিজয়

কৃষকদের অত্যাচারী বুরবোঁ সরকারের অধীনতা হতে মুক্ত করার জন্যে অভিযান করার পরিকল্পনা করেন। ১০৯০ জন লাল পোষাকে সজ্জিত গেরিলা স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে গ্যারিবল্ডী সিসিলীর মার্শেলা বন্দরে অবতরণ করেন। সিসিলীর কৃষকেরা গ্যারিবল্ডীকে মুক্তিদাতা মনে করে তাঁর পতাকার তলে সমবেত হয়। ২৫ হাজার বুরবোঁ সেনাদের প্রায় বিনা যুদ্ধে তিনি বিতাড়িত করে সিসিলী দ্বীপকে বুরবোঁ শাসন থেকে মুক্ত করেন। অতঃপর তিনি নেপলসে অবতরণ করেন। সিসিলীর বিদ্রোহী কৃষক সেনা তাঁর অনুগমন করে। নেপলসে বুরবোঁ রাজা দ্বিতীয় ফ্রান্সিসের সেনাদল তাঁকে নামমাত্র বাধা দিয়ে যুদ্ধ ত্যাগ করে। গ্যারিবল্ডী নেপলস নগরী অধিকার করে নিজেকে দক্ষিণ ইতালীর ডিক্টেটর ঘোষণা করেন। তিনি রোম নগরী আক্রমণ করার সঙ্কল্প ঘোষণা করেন।

দক্ষিণ ইতালীতে গ্যারিবল্ডীর বিস্ময়কর সাফল্য কাভ্যুরের সম্মুখে এক দারুণ সঙ্কট সৃষ্টি করে। প্রথমতঃ, গ্যারিবল্ডী ছিলেন ম্যাৎসিনী পন্থী। তিনি অধিকৃত দক্ষিণ ইতালীতে প্রজাতন্ত্র

কাভ্যুরের সমস্যা

ঘোষণা করতে পারেন এমন সম্ভাবনা দেখা দেয়। পিডমন্টের রাজতন্ত্রের অধীনে সমগ্র ইতালী ঐক্যবদ্ধ না হয়ে যদি গ্যাবিবল্ডীর দ্বারা দক্ষিণ ইতালীয় প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হত তবে ইতালী আংশিক রাজতন্ত্রী ও আংশিক প্রজাতন্ত্রী হত। রাজতন্ত্রী ও প্রজাতন্ত্রীদের মধ্যে গৃহ-যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দিত। দ্বিতীয়তঃ, গ্যারিবল্ডী পোপের রাজ্য আক্রমণ করলে পোপের রাজ্য রক্ষার জন্যে রোমে উপস্থিত ফরাসী সেনার সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ বাধার সম্ভাবনা ছিল। তৃতীয়তঃ, কাভ্যুর গ্যারিবল্ডীকে পছন্দ করতেন না। তাঁর সাফল্য কাভ্যুরকে ঈর্ষান্বিত করে।[১] কাভ্যুর বলেন যে, "গ্যারিবল্ডীর হৃদয় সিংহের মত সাহসী ও বীরত্বপূর্ণ হলেও, তাঁর মস্তিষ্ক ষাঁড়ের মস্তিষ্কের মত নিরেট" (Garibaldi has the heart of a lion, but the brain of an ox)।

এমতাবস্থায় কাভ্যুর তৃতীয় নেপোলিয়নের সম্মতিক্রমে, পোপ অধিকৃত রোম নগরী বাদ দিয়ে পোপের অবশিষ্ট রাজ্যাংশ এবং দক্ষিণ ইতালীকে পিডমন্টের সঙ্গে সংযুক্ত করার সিদ্ধান্ত

দক্ষিণ ইতালীব পিডমন্টেব সহিত সংযুক্তি

নেন। তিনি তৃতীয় নেপোলিয়নকে বোঝান যে, গ্যারিবল্ডী পোপের রাজ্য আক্রমণ করলে মহা অনর্থ হবে। এজন্য আগেই পোপের রাজ্যাংশ পিডমন্টের দখল করা উচিত। নেপলস ও সিসিলীকে তিনি গ্যারিবল্ডীর পরিকল্পিত প্রজাতন্ত্র থেকে মুক্ত করে পিডমন্টের সঙ্গে সংযুক্তির দ্বারা ইতালীর রাজতন্ত্রী সংযুক্তিকে পূর্ণতা দিতে চান। এজন্য প্রয়োজনে গ্যারিবল্ডীর সঙ্গে যুদ্ধের জন্যে তিনি পিডমন্টের রাজা ভিক্টর ইম্যানুয়েলকে পরামর্শ দেন। ভিক্টর ইম্যানুয়েল রোম ব্যতীত পোপের রাজ্যাংশ অধিকার করে নেপলসে উপনীত হন। দেশপ্রেমিক গ্যারিবল্ডী ভিক্টর ইম্যানুয়েলের সঙ্গে গৃহযুদ্ধে লিপ্ত না হয়ে, নেপলস ও সিসিলীর অধিকার তাঁকে ছেড়ে দেন। এই দুটি প্রদেশ পিডমন্টের সঙ্গে সংযুক্ত হয়।

কাভ্যুর ১৮৬১ খ্রীঃ ১৭ই মার্চ একটি ইতালীয় জাতীয় পার্লামেন্ট সভার অধিবেশন আহ্বান করেন। এই পার্লামেন্টে পিডমন্টের উদারতন্ত্রী সংবিধান ঐক্যবদ্ধ ইতালীর সংবিধানে পরিণত হয়।

কাভ্যুরের আরব্ধকার্য তখনও অসমাপ্ত ছিল। ভেনেসিয়া তখন ছিল অষ্ট্রিয়ার অধীনে এবং রোম ছিল ফরাসী সেনার নিয়ন্ত্রণে। ইতিমধ্যে কাভ্যুরের মৃত্যু ঘটে। ১৮৬৬ খ্রীঃ অষ্ট্রো-প্রাশিয়

অবশিষ্ট ইতালীর পিডমন্টের সহিত সংযুক্তি

যুদ্ধে ইতালী প্রাশিয়ার পক্ষ নেয়। যুদ্ধ শেষে তৃতীয় নেপোলিয়নের প্রভাবে ভেনেসিয়া ইতালীর সঙ্গে সংযুক্ত হয়। ১৮৭০ খ্রীঃ ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয় যুদ্ধের সময় ফরাসী সেনাদল রোম থেকে অপসারিত হয়। এই সুযোগে ভিক্টর ইম্যানুয়েল রোম অধিকার করে, রোমকে ইতালীর রাজধানী

১· Grenville. Ibid.

ঘোষণা করলে ইতালীর ঐক্য সম্পূর্ণ হয়। স্যাভয় ও নিস নামক দুটি স্থান ফ্রান্সের অধিকারে রয়ে যায়। ইওরোপের ইতিহাসে নবীন ইতালী জন্মলাভ করে।

কাউন্ট কাভ্যুরের কৃতিত্ব (The Achievements of Cavour) : ইতালীর মুক্তি আন্দোলনের প্রধান স্থপতি ছিলেন কাউন্ট ক্যামিলো ডি কাভ্যুর। ইয়ং ইতালী আন্দোলনের বিফলতার পর যখন ইতালীর মুক্তি আন্দোলন পথ হারিয়ে ফেলে তখন কাভ্যুর তাকে নতুন পথে পরিচালিত করে সফলতা লাভ করেন। কাভ্যুর ছিলেন ঘোর বাস্তববাদী এবং ঠাণ্ডা মাথার লোক। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, নীচু তলার দিক থেকে জনতার মাধ্যমে ঐক্য সাধন অপেক্ষা, ওপর থেকে রাজশক্তির সাহায্যে ইতালীর মুক্তি সাধন সফল হবে। ইতালীতে ম্যাৎসিনীর চরমপন্থী আন্দোলন সফল হবে না বলে তিনি বুঝতে পারেন। এজন্য তিনি বলেন যে, "মধ্যপন্থা নীতি (Moderate) একমাত্র ইতালীতে সাফল্য আনতে সক্ষম।"[১]

কাভ্যুরের মধ্যপন্থা নীতি

কাভ্যুর ছিলেন Juste-milieu অর্থাৎ মধ্যপন্থী শাসনব্যবস্থার অনুরাগী। প্রজাতন্ত্রের নৈরাজ্যবাদ ও স্বৈরতন্ত্রের একনায়কত্ববাদ হতে মুক্ত মধ্যপন্থাই ছিল তাঁর পছন্দসই শাসনব্যবস্থা।[২] তিনি ছিলেন ইংলন্ডের ন্যায় সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের ভক্ত যদিও তিনি পিডমন্টের রাজবংশকে ইতালীর শাসনের দায়িত্ব দেন। তিনি এই রাজবংশকে সাংবিধানিক শাসন নীতি গ্রহণে বাধ্য করেন। ইতালীর অভিজাত সম্প্রদায়েব আশা ছিল স্বাধীন ইতালীতে একটি অভিজাততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা স্থাপন করা। অভিজাতদের সেই চেষ্টাও কাভ্যুর দমন করেন। কারণ অভিজাত সম্প্রদায়ের সামন্ততান্ত্রিক শাসনকে তিনি যুগেব অনুপযোগী মনে করতেন। এর পরিবর্তে তিনি ইতালীতে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র স্থাপন করেন। রাজার ক্ষমতাকে তিনি পার্লামেন্টের দ্বারা খর্ব করেন। ১৮৬০ খ্রীঃ দক্ষিণ ইতালীর সংযুক্তি সম্পন্ন হলে সর্ব ইতালীয় পার্লামেন্টের আহ্বান করে তিনি ইতালীতে সাংবিধানিক রাজতন্ত্রকে কায়েম করেন।

সাংবিধানিক রাজতন্ত্র ও অভিজাত শাসন

কাভ্যুর পার্লামেন্টারী শাসনব্যবস্থায় বিশ্বাস করতেন একথা সত্য; কিন্তু তিনি দেশের সকল শ্রেণীর নাগরিকের ভোটদানের অধিকার স্বীকাব করতেন না। তিনি ছিলেন মূলতঃ বুর্জোয়া গণতন্ত্রের ভক্ত। তিনি জীবিকা সূত্রে বুর্জোয়া ব্যাঙ্ক মালিক ও শিল্পপতি ছিলেন। কাজেই সম্পত্তির অধিকার রক্ষা এবং সম্পত্তিব অধিকারের ভিত্তিতে ভোটের বেশী কিছু তিনি ভাবতে বাজী ছিলেন না। Mass অর্থাৎ জনসাধারণের ভোটাধিকাবের দাবীকে তিনি লাল চরমপন্থী মত বলে দূরে সরিয়ে রাখেন। এক্ষেত্রে তিনি ম্যাৎসিনীর চিন্তাধারা বর্জন কবেন। কাভ্যুর মনে করতেন যে, সর্বসাধারণেব ভোটাধিকার ইতালীতে অরাজকতা সৃষ্টি করবে। প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হলে প্রতিবেশী রাজতন্ত্রগুলি সেক্ষেত্রে ইতালীতে হস্তক্ষেপ করবে। তিনি মধ্যপন্থা অনুযায়ী সম্পত্তির ভিত্তিতে ভোটদানের আইন প্রবর্তন করেন। এই দিক হতে তাঁর চিন্তাধারা বুর্জোয়া মতবাদের দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল বলা যায়। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, জনসাধাবণের কল্যাণ কেবলমাত্র আলোকপ্রাপ্ত শাসকের (Enlightened leader) দ্বারাই হতে পারে।[৩] যে ক্ষেত্রে ম্যাৎসিনী মনে করতেন যে, জনগণই হল শক্তির উৎস, সে ক্ষেত্রে কাভ্যুর জনগণকে উপরতলা হতে আলোকপ্রাপ্ত দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালনার কথা ভাবেন। এজন্য অনেকে কাভ্যুরকে রক্ষণশীল বুর্জোয়াতন্ত্রের সমর্থক বলে অভিহিত করেন। তিনি ইতালীতে যে গণতন্ত্র স্থাপন করেন তা ছিল আসলে বুর্জোয়া শাসন। কাভ্যুরের আদর্শ নেতা ছিলেন অলিভার ক্রমওয়েল। কাভ্যর গ্ল্যাডষ্টোনীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাস করতেন না।

ম্যাৎসিনীব সহিত কাভ্যুবেব পার্থক্য : উদাবতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা

১· Quoted by H. Hearder—Cavour. P. 12.

২· Quoted by H. Hearder—Cavour, Journal' Historical Association. P. 12.

ম্যাৎসিনীর চিন্তাধারাকে অবাস্তব বলে কাভ্যুর অগ্রাহ্য করেন। তিনি Ill Resorgimento পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে এই তত্ত্ব প্রচার করেন যে, ইতালীতে প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হলে অরাজকতা নেমে আসবে। ইওরোপীয় রাজশক্তিগুলি এই প্রজাতন্ত্রকে ধ্বংস করবে। দ্বিতীয়তঃ, তিনি বলেন যে, বৈদেশিক শক্তির সহায়তা ব্যতীত ইতালীর মুক্তি সাধন সম্পন্ন হবে না। কারণ কার্বোনারী ও ইয়ং ইতালীর বিপ্লবের ব্যর্থতা একথা প্রমাণ করে যে, অষ্ট্রিয়ার সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে ইতালীর শক্তি ছিল দুর্বল। তৃতীয়তঃ, পিডমন্টের রাজবংশকেই তিনি ঐক্যবদ্ধ ইতালীর জাতীয় রাজবংশ হিসেবে গণ্য করেন। চতুর্থতঃ, তিনি ইতালীর সমস্যাকে একটি ইওরোপীয় সমস্যায় পরিণত করার কথা বলেন। যেরূপ পূর্বাঞ্চল সমস্যা (Eastern Question) ইওরোপের সকল শক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সেরূপ ইতালীর সমস্যাকে ইওরোপের সকল শক্তির সমস্যায় পরিণত করার কথা কাভ্যুর বলেন।[১]

প্রজাতন্ত্র বিরোধীতা ; পিডমন্টের রাজতন্ত্রকে জাতীয় রাজতন্ত্রের মর্যাদা দান

কাভ্যুর কেবলমাত্র অলস পরিকল্পনা করে বসে থাকবার লোক ছিলেন না। তিনি পিডমন্টের কৃষিমন্ত্রী ও পরে প্রধানমন্ত্রীর পদ লাভ করে তাঁব আদর্শকে বাস্তবায়িত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ইতালীর স্বাধীনতার স্বপক্ষে ইওরোপীয় জনমত গঠনের জন্যে বিভিন্ন দেশের সংবাদপত্রের মাধ্যমে তীব্র প্রচার চালান। পিডমন্টে বিভিন্ন উদারপন্থী সংস্কার, পার্লামেন্ট, নির্বাচন, উন্নত কৃষিব্যবস্থা, রেলপথ নির্মাণ প্রভৃতি প্রগতিমূলক কাজের দ্বারা ইতালীর ওপর পিডমন্টের প্রভাব বৃদ্ধি করেন। তিনি রেলপথ নির্মাণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেন। কারণ তিনি মনে করেন যে, এর ফলে ইতালীর বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ঐক্য বাড়বে। ম্যাৎসিনীর আদর্শবাদ ত্যাগ করে বাস্তবপন্থী কাভ্যুর প্লেমাবিয়ারের সন্ধির দ্বারা ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের সামরিক সহায়তা লাভ করেন। ফরাসী সেনার সহায়তায় অষ্ট্রিয়া লম্বার্ডি হতে বহিষ্কৃত হয়। ভিল্লাফ্রাঙ্কার সন্ধির দ্বারা কেবলমাত্র লম্বার্ডি পিডমন্টের সঙ্গে যুক্ত হয়। অতঃপর তৃতীয় নেপোলিয়ন যুদ্ধ ত্যাগ করেন। মধ্য ইতালীর গণঅভ্যুত্থানে স্বৈরাচারী শাসকরা বহিষ্কৃত হলে, জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে পিডমন্টের সঙ্গে সংযুক্তি চায়। তৃতীয় নেপোলিয়নের সম্মতিক্রমে কাভ্যুর মধ্য ইতালীর রাজ্যগুলি পিডমন্টের সঙ্গে সংযুক্ত করেন। বিনিময়ে তিনি তৃতীয় নেপোলিয়নকে স্যাভয় ও নিস ছেড়ে দেন। অতঃপর গ্যারিবল্ডী দক্ষিণের নেপলস ও সিসিলী বুরবোঁ শাসন থেকে মুক্ত করলে, তৃতীয় নেপোলিয়নের অনুমোদনক্রমে কাভ্যুর পোপের রাজ্যের একাংশ আমব্রিয়া ও মার্চেস পিডমন্টের সঙ্গে যুক্ত করেন এবং তাঁরই পরামর্শে ভিক্টর ইম্যানুয়েল গৃহযুদ্ধের চাপ সৃষ্টি করে গ্যারিবল্ডীর হাত থেকে নেপলস ও সিসিলীর আধিপত্য নেন। গণভোটের দ্বারা এই সংযুক্তিগুলিকে বৈধতা দেওয়া হয়। কাভ্যুরের তীক্ষ্ম কূটনৈতিক দক্ষতা, পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সুযোগ বুঝে তা ব্যবহারের ক্ষমতা এবং সর্বোপরি ইতালীর রক্ষণশীল রাজতান্ত্রিক ঐক্যস্থাপনের জন্যে তাঁকে উচ্চ প্রশংসা করা হয়। উনবিংশ শতকের জীবনীকাররা বিসমার্ক ও কাভ্যুরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন। এই দুজনাকেই Real politik-এর রূপকার বলে অভিহিত করা হয়। কিন্তু ডেনিস ম্যাকস্মিথের মতে, ইতালীর ঐক্য স্থাপনের জন্যে কাভ্যুর তাঁর প্রাপ্য প্রশংসা অপেক্ষা বেশী পেয়েছেন। প্রথমতঃ, ম্যাৎসিনীর রাজনৈতিক ব্যর্থতা সত্বেও তিনি ইতালীর ভাবগত ঐক্য গঠন করেন। এর ফলে ভিল্লাফ্রাঙ্কার সন্ধির পর মধ্য ইতালীতে গণঅভ্যুত্থানের দ্বারা মধ্য ইতালীর সংযুক্তি ঘটে। যে গণঅভ্যুত্থানকে কাভ্যুর ঘৃণা করতেন, তার দ্বারাই শেষ পর্যন্ত ইতালীর ঐক্য আন্দোলন অচল অবস্থা থেকে মুক্ত হয়। দ্বিতীয়তঃ, ভিল্লাফ্রাঙ্কার সন্ধির পর নেপোলিয়ন যুদ্ধ ত্যাগ করায় কাভ্যুরের পরিকল্পনা

উদারপন্থী ক্ষমতার প্রবর্তন

১· Grenville.

কাদায় আটকে অচল হয়। তিনি হতাশ হয়ে পদত্যাগ করেন। মধ্য ইতালীর দেশপ্রেমিক জনগণ গণবিপ্লব দ্বারা এবং গ্যারিবল্ডী দক্ষিণ ইতালী অভিযান দ্বারা ঐক্য আন্দোলনকে নতুন গতি দেন। নতুবা ভিল্লাফ্রাঙ্কার সন্ধিতেই এই ঐক্য আন্দোলন থেমে যেত। এই অপ্রত্যাশিত পথে আন্দোলন পরিচালনায় কাভ্যুরের মূলতঃ কোন হাত ছিল না। গণআন্দোলন ও গ্যারিবল্ডীর অভিযান সফল হলে তিনি তাকে কূটনীতির সাহায্যে পরিণতি দেন মাত্র। অথবা এই আন্দোলনের সুযোগগুলির সদ্ব্যবহার করেন। তাঁর নিজস্ব পরিকল্পনা ভিল্লাফ্রাঙ্কার ডুবো পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে চুরমার হয়ে যায়। তৃতীয়তঃ, দক্ষিণ ইতালীতে গ্যারিবল্ডীর সাফল্যকে তিনি যেভাবে রাজতান্ত্রিক ঐক্যের স্বার্থে ব্যবহার করেন, ডেনিস ম্যাকস্মিথের মতে, সে বিষয়ে কাভ্যুরকে তাঁর প্রাপ্য অপেক্ষা বেশী প্রশংসা করা হয়। (ক) গ্যারিবল্ডীর অভিযানে কাভ্যুর কোন সাহায্য করেন নি, বরং বিরোধিতা করেন। (খ) তিনি গ্যারিবল্ডীকে উন্মাদ প্রজাতন্ত্রীবাদী বলতেন। (গ) যদি গ্যারিবল্ডীকে সংযত করার জন্যে প্রশংসা করতে হয়, তা ভিক্টর ইম্যানুয়েলেরই প্রাপ্য। কাভ্যুরের এজন্য প্রশংসা করার জায়গা নেই। (ঘ) কাভ্যুর তৃতীয় নেপোলিয়নের সাহায্য লাভের বিনিময়ে স্যাভয় ও নিস তাঁকে ছেড়ে দেন। বৈদেশিক সাহায্য যে কন্টকময় গোলাপ, তা আহরণের জন্যে ইতালীকে সাহায্য দাতার খামখেয়াল সহ্য করতে হবে এবং ক্ষতিপূরণ দিতে হবে তা কাভ্যুর বোঝেননি। ঐতিহাসিক এ· জে· পি টেইলারের মতে "তৃতীয় নেপোলিয়ন ছিলেন এক তৈলাক্ত পিচ্ছিল যষ্টি। তাঁর ওপের নির্ভর করার জন্যে কাভ্যুরকে অনুতাপ করতে হয়"।[১]

কাভ্যুর তাঁর মৃত্যুকালে সমগ্র ইতালীকে ঐক্যবদ্ধ করে যেতে পারেননি। তখনও ভেনেসিয়া ও রোম বৈদেশিক শক্তির অধীনে থেকে যায়। তাঁর স্বপক্ষে একমাত্র বলা যায় যে, তিনি যে বাজতান্ত্রিক ঐক্যের ধারা তৈরি করেন, তার জোবে এবং তৃতীয় নেপোলিয়নেব আনুকূল্যে তাঁর মৃত্যুর পর এই স্থানগুলি ইতালীর সঙ্গে যুক্ত হয়। তথাপি তাঁর মৃত্যুকালে তিনি ইতালীর ঐক্যকে সম্পূর্ণ রূপ দিতে পারেননি। কাভ্যুর তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ম্যাৎসিনীর আদর্শবাদ ও আত্মত্যাগের মহিমায় মণ্ডিত ছিলেন না। সমকালে এবং পরবর্তী যুগে তাঁকে ম্যাকিয়াভেলীয় কূটনীতি ও ধূর্ততায় পারঙ্গম এক ধূরন্ধর রাজনীতিবিদ বলেই গণ্য করা হয়েছে। জাতিব পিতা হওয়ার মত প্রতিভা ও নৈতিক গুণাবলী তাঁর আদপেই ছিল না। এখানেই তিনি ম্যাৎসিনীর কাছে হেরে বসেন। পরবর্তী প্রজন্ম ম্যাৎসিনীকে স্বাধীন ইতালীর আত্মা বলে গণ্য করে, কাভ্যুবকে এক সফল কূটনীতিবিদ ও রাজনীতিবিদের শিরোপা দেয়। গর্ডন ক্রেইগের মতে, "কাভ্যুরের কূটনীতি ছিল পরিকল্পিতভাবে কপটতাযুক্ত, চিরায়ত মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাহীন এবং আন্তর্জাতিক আইন ও ন্যায়নীতির প্রতি দায়িত্বজ্ঞানহীন"। তাঁর প্রশাসনিক ও সাংবিধানিক মূল্যবোধও ছিল নিন্দাভাজন। কারণ দক্ষিণ ইতালীর সঙ্গে সংযুক্তির জন্যে গণভোটের সময় তিনি যে প্রতিশ্রুতি দেন তা তিনি রক্ষা করেননি। ডেনিস ম্যাকস্মিথ, এডগারহোল্ট প্রভৃতি ঐতিহাসিক এজন্য কাভ্যুরের তীব্র নিন্দা করেছেন। সকল ইতালীয়দের সমান অধিকার ও সমান গণতান্ত্রিক জীবনধারার জীবন-যাপনের সুযোগ, যা ম্যাৎসিনী ঘোষণা করেন, তিনি তা থেকে বিচ্যুত হন। ম্যাৎসিনীর ভাবধারাকে তিনি মূল্য দেননি। গ্যারিবল্ডী দক্ষিণ ইতালীয়দের যে প্রজাতন্ত্রিক শাসন দিতে চান তিনি তা বিনষ্ট করে, দক্ষিণ ইতালীকে তিনি পিডমন্টের উপনিবেশে পরিণত করেন। দরিদ্র, অনগ্রসর দক্ষিণ ইতালী তাঁর শাসন ও সংবিধানের ফলে যেন একটি আফ্রিকার উপনিবেশে পরিণত হয়। শিল্প-প্রধান ধনী উত্তর ইতালীর জন্যে কাঁচামাল ও শ্রমিকের যোগানদার হিসেবে দক্ষিণকে গণ্য করা হয়। এজন্য কাভ্যুরের নেতৃত্বে পিডমন্টের সঙ্গে সংযুক্তিকে নেপলসবাসীরা অন্তরের সঙ্গে মেনে নেয়নি। দক্ষিণ ইতালী এই বৈষম্যমূলক

১· A. J. P. Taylor—Struggle for Mastery of Europe.

নীতির বিরুদ্ধে মাফিয়া বিদ্রোহ ও বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রতিবাদ জানায়। কাভ্যুরের বুর্জোয়া গণতন্ত্রে জাতির প্রত্যয়ের ও আস্থার জমিতে ভালভাবে শিকড় বিস্তার কোনদিন করতে পারেনি। তিনি ম্যাৎসিনীর গণভোটের ভিত্তিতে সংবিধান রচনার আদর্শ ত্যাগ করায়, ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া, মুষ্টিমেয় সম্পত্তিভোগী সমর্থিত তাঁর গণতন্ত্রের প্রাণশক্তি ছিল নিস্তেজ। তাই ফ্যাসিস্ট মুসোলিনী এই সংবিধানকে নস্যাৎ করেন।[১]

ডেভিড টমসন, গ্রেনভীল প্রভৃতি ঐতিহাসিকরা ভবিষ্যতের জন্যে পরিকল্পনাকারী, দূরদর্শী রাষ্ট্রনীতিবিদরূপে কাভ্যুরকে স্বীকৃতি দেননি। তিনি ছিলেন তাঁর সমকালীন বিসমার্কের মতই Real politik-এর রাজনীতিবিদ। তাঁর মূল পরিকল্পনা ছিল উত্তর ইতালীতে অষ্ট্রিয়ার রাজ্য গ্রাস করে এক পরিবর্দ্ধিত পিডমন্ট রাজ্য গঠন। সমগ্র ইতালীর সংযুক্তির কথা তিনি কখনও গোড়ায় আশা করেন নি। পরে পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে Real politik-এর পরিসর হিসেবে তিনি সুযোগ বুঝে পরিকল্পনা বদল করেন। ডেভিড টমসনের মতে, কাভ্যুর এবং বিসমার্কের কৃতিত্ব হল যে তাঁরা বাস্তব রাজনীতি ও পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে, ন্যায়-অন্যায়ের কথা না ভেবে, আন্তর্জাতিক রাজনীতির সুযোগ নিয়ে কার্যসিদ্ধি করার ক্ষমতা দেখান। তাঁরা কোন দীর্ঘমেয়াদী সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনাকে রূপায়িত করতে চেষ্টা করেননি। "উভয়ে ছিলেন দক্ষ, সুনিপুণ রাষ্ট্রনীতিবিদ, ভবিষ্যতের নিয়ন্ত্রক অতিমানব তাঁরা ছিলেন না।" (They were masterly statesmen, not masterful supermen)। তবে তাঁরা জাতিগঠনকারী ভবিষ্যতের জন্যে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন পরিকল্পনাকারী না হলেও তাঁদের জামার অস্তিনের ভেতর কিছু কিছু নিম্নতম কর্মসূচী ছিল। উত্তর ইতালীতে পিডমন্টের নেতৃত্বে একটি ঐকব্যাদ্ধ রাজ্য স্থাপন, মেইন নদীর উত্তরে জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করা ছিল উভয়ের নিম্নতম পরিকল্পনা। ইতালী থেকে অষ্ট্রিয়াকে ঠেলে আল্পসের অপর পারে এবং মেইন নদীর অপর পারে অষ্ট্রিয়াকে হটিয়ে দেওয়া কোন অবাস্তব পরিকল্পনা ছিল না। যদি অন্য বৃহৎ শক্তিগুলি নিরপেক্ষ থাকে তবে তা সম্ভব ছিল। ঘটনার গতি অন্যদিকে গেলে তাঁরা দ্রুত পরিকল্পনা বদল করেন। কাভ্যুর গোটা ইতালী, বিসমার্ক গোটা জার্মানীর ঐক্যের জন্যে প্রস্তুত হন। উভয়ের তীক্ষ্ণবুদ্ধি, বাস্তবজ্ঞান ও ঠাণ্ডামাথা প্রশংসার দাবী রাখেন নতুবা এই ঐক্য আন্দোলনের তরী সফলতার কূলে হয়ত পৌঁছত না, নাবিকবিহীন নৌকার মত তা মাঝপথে থেমে যেত।

গ্যারিবল্ডীর কৃতিত্ব (Achievements of Garibaldi) : ইতালীর মুক্তি যুদ্ধের অন্যতম প্রবাদ-পুরুষ ছিলেন গ্যারিবল্ডী। ১৮০৭ খ্রীঃ উত্তর ইতালীর নিস প্রদেশে তাঁর জন্ম হয়। তিনি কাভ্যুর অপেক্ষা তিন বছরের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। গ্যারিবল্ডী ছিলেন আবেগপ্রবণ, স্বাধীনতাপ্রিয়, কবিপ্রাণ মানুষ। তাঁর চরিত্রে কাব্য ও স্বদেশপ্রীতির সঙ্গে দুঃসাহসিকতার সমন্বয় ঘটেছিল। সাধারণ রাজনীতিকের ন্যায় দল গঠন অথবা কূটনীতি পরিচালনায় তাঁর আগ্রহ ছিল না। তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা ছিল সাধারণ স্তরের। তিনি তীক্ষ্ণ মনীষার অধিকারী ছিলেন না। তাঁর মধ্যে চিন্তাশীলতা অপেক্ষা আবেগপ্রবণতা ও দুঃসাহসিকতার ঝোঁক বেশী ছিল। হিসেব করে কাজ করা তাঁর স্বভাব ছিল না; কিন্তু তাঁর স্বদেশপ্রেম ছিল অত্যন্ত খাঁটি। "সন্ন্যাসীরা যেরূপ ঈশ্বরকে ধ্রুব সত্য বলে জ্ঞান করেন, গ্যারিবল্ডী স্বদেশকে সেরূপ ধ্রুব জ্ঞান করতেন।"

গ্যারিবল্ডীর চরিত্র : আবেগপ্রবণতা ও স্বদেশপ্রেম

১· Langsham—World since 1914.

গ্যারিবল্ডীর জীবন ছিল দুঃসাহসিতায় পূর্ণ। তিনি কিছুকাল ভূমধ্যসাগরে নৌ-পরিচালনা শিক্ষা করেন। এর পর পিডমন্টের নৌ-সেনাদলে একটি বিদ্রোহ ঘটাতে ব্যর্থ চেষ্টা করে তিনি দক্ষিণ আমেরিকায় পালান। দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিলের এক দুঃসাহসিকা রমণী, এ্যানিটার প্রেমে পড়ে তিনি তাঁকে সঙ্গিনী হিসেবে গ্রহণ করেন। উভয়ে নানা দুঃসাহসিক অভিযানে অংশ নেন।

দুঃসাহসিক অভিযানের প্রতি আগ্রহ

দক্ষিণ আমেরিকা হতে ফিরে এসে তিনি ইতালীর মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে নিজ জীবনকে সম্পূর্ণ জড়িয়ে ফেলেন। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের সময় তিনি কিছুকাল পিডমন্টের রাজা চার্লস এলবার্টের পক্ষ নিয়ে অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে স্বাধীনতার যুদ্ধ করেন। এই সময় তিনি গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনায় বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেন। চার্লস এলবার্ট এই যুদ্ধে অষ্ট্রিয়ার নিকট পরাস্ত হন। অতঃপর গ্যারিবল্ডী রোমে এসে ম্যাৎসিনীর রোম প্রজাতন্ত্র রক্ষার জন্যে অস্ত্র ধরেন। এই সময় থেকে তিনি ম্যাৎসিনীর প্রজাতন্ত্রবাদী শিষ্য রূপে পরিচিতি পান। তৃতীয় নেপোলিয়নের নির্দেশে ফরাসী সেনা রোম আক্রমণ করলে, গ্যারিবল্ডী অসীম বীরত্ব সহকারে রোম রক্ষার জন্যে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। তিনি ফরাসী বাহিনীর বেড়া জাল ছিন্ন করে, প্রায় ৫ হাজার প্রজাতান্ত্রিক সৈন্যকে নিরাপদে রোমের বাইরে আনতে সক্ষম হন। গ্যারিবল্ডীর দেশপ্রেম ও আত্মোৎসর্গের কাহিনী ইতালীয়দের নিকট তাঁকে এক প্রবাদ-পুরুষে পরিণত করে। ইতালীর যুবশক্তি গ্যারিবল্ডীর নামে অনুপ্রাণিত হয়। তিনি ইতালীর যৌবনের প্রতীকে পরিণত হন।

ম্যাৎসিনীর শিষ্যত্ব গ্রহণ : রোম প্রজাতন্ত্রের প্রতি আনুগত্য

১৮৫৯ খ্রীঃ কাভ্যুরের নেতৃত্বে ইতালীর মুক্তিযুদ্ধ আরম্ভ হলে, গ্যারিবল্ডী ইতালীর মুক্তি যুদ্ধে যোগ দেন। তাঁর প্রভাবে মধ্য ইতালীতে পিডমন্টের সঙ্গে সংযুক্তিবাদী আন্দোলন গড়ে ওঠে। ফ্রান্সকে এই সংযুক্তিতে সাহায্যের বিনিময়ে স্যাভয় ও নিস ছেড়ে দেওয়ার জন্যে কাভ্যুর যে চুক্তি করেন, গ্যারিবল্ডী তার তীব্র বিরোধিতা করেন। গ্যারিবল্ডীর জন্মস্থান ছিল নিস। তিনি নিসে গণভোট গ্রহণের সময় ব্যালট বাক্সগুলিকে ধ্বংস করার হুমকি দেন।[১] তিনি কাভ্যুরের সমালোচনা করে বলেন যে, "কাভ্যুর আমাকে নিজ দেশে পরবাসী করছেন।"

মধ্য ইতালীর সংযুক্তিতে গ্যাবিবল্ডীব ভূমিকা

গ্যারিবল্ডীকে নিস থেকে অন্যত্র সরাবার জন্যে, দক্ষিণ ইতালীর সিসিলী অভিযানে তাঁকে উৎসাহ দেওয়া হয়। কাভ্যুর মনে করতেন যে, এই দুঃসাহসিক অভিযানে গ্যারিবল্ডী বিফল হবেন। ফলে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতে তিনি মুক্ত হবেন। কিন্তু গ্যারিবল্ডীর অভিযানে "অসম্ভব" শব্দটি অজ্ঞাত ছিল। তিনি মাত্র ১০৯০ জন লালকুর্তায় সজ্জিত গেরিলা স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে সিসিলীর মার্শালা বন্দরে অবতরণ করেন। সিসিলীতে ২৫ হাজার বুরবোঁ সৈন্য তাঁকে বাধা দিতে তৈরি ছিল।

দক্ষিণ ইতালী অভিযান

গ্যারিবল্ডীর অবতরণের পর সিসিলীর নির্যাতিত কৃষকেরা তাঁর পক্ষে নেয়। গেরিলা ও কৃষক বাহিনীর সাহায্যে গ্যারিবল্ডী এক মাসের মধ্যে বুরবোঁ বাহিনীকে সিসিলী থেকে হঠিয়ে দেন। সিসিলীর কৃষকদের অভ্যুত্থানের ফলে বুরবোঁ বাহিনী প্রাণভয়ে নেপলসে পালায়। গ্যারিবল্ডী নিজেকে সিসিলীর ডিক্টেটর হিসেবে ঘোষণা করেন।

সিসিলি জয়

সিসিলী অভিযানে গ্যারিবল্ডীর সাফল্য এবং নেপলসে অবতরণের জন্যে তাঁর সঙ্কল্প ঘোষণা কাভ্যুরকে বিভ্রান্ত করে। কাভ্যুর আশঙ্কা করেন যে, গ্যারিবল্ডী নেপলস জয় করে একটি স্বতন্ত্র প্রজাতন্ত্র স্থাপন করবেন। তা হলে ইতালীর রাজতান্ত্রিক ঐক্য প্রচেষ্টা বিনষ্ট হবে। গ্যারিবল্ডী যাতে নেপলসে অবতরণ না করতে পারেন এজন্য

নেপলস বিজয়

১· I. A S. Grenville, P 255.

২· Ibid.

কাভুর নেপলসের নৌ-বহরকে বাধা দিতে উৎসাহ দেন।[১] কিন্তু গ্যারিবল্ডী Torino এবং Franklin নামক দুইটি জাহাজে তাঁর সেনাদল নিয়ে নেপলসে অবতরণ করেন। তিনি সিসিলী থেকে গেরিলা কৃষক সেনা আনিয়ে নিজ শক্তি বৃদ্ধি করেন। একটি সম্মুখ যুদ্ধে তিনি নেপলসের বুরবোঁ বাহিনীকে পরাস্ত করে নেপলসের রাজধানী অধিকার করেন। গ্যারিবল্ডী অতঃপর নিজেকে নেপলসের ডিক্টেটর রূপে ঘোষণা করেন। তিনি পোপ শাসিত রাজ্যকে পোপের কবল থেকে মুক্ত করার সঙ্কল্প ঘোষণা করেন। এই সঙ্গে দক্ষিণ ইতালীতে এক স্বাধীন প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা তাঁর চূড়ান্ত লক্ষ্য বলে গ্যারিবল্ডী ঘোষণা করেন।

গ্যারিবল্ডীর এই সিদ্ধান্তের ফলে ইতালীর ঐক্য আন্দোলন এক সঙ্কটের সম্মুখীন হয়। যদি গ্যারিবল্ডী তাঁর ঘোষণা কার্যকরী করতেন তবে ইতালী উত্তরে পিডমন্টের রাজতন্ত্র ও দক্ষিণে প্রজাতন্ত্রে দ্বিধা-বিভক্ত হত। অবশ্য একথা সত্য যে গ্যারিবল্ডী যাই বলুন না কেন বুরবোঁ বাহিনীর ব্যূহ ভেদ করে নেপলস থেকে পোপের সাম্রাজ্য অধিকার করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। ভিক্টর ইম্যানুয়েল কাভুরের পরামর্শ ক্রমে গ্যারিবল্ডীর বশ্যতা দাবী করলে গ্যারিবল্ডী বিনা দ্বিধায় নেপলস ও সিসিলীর অধিকার তাকে ছেড়ে দেন। গ্যারিবল্ডীর এই সিদ্ধান্ত ইতালীর মুক্তিযুদ্ধকে রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনা থেকে মুক্ত করে।

ভিক্টর ইম্যানুয়েলের নিকট বিজিত রাজ্য হস্তান্তর

এডগার হোল্ট প্রভৃতি ঐতিহাসিকেরা মনে করেন যে গ্যারিবল্ডী ভিক্টর ইম্যানুয়েলের অধীনে ইতালীর ঐক্যের বিরোধী ছিলেন একথা মনে করা ভুল। ম্যাৎসিনীর প্রজাতন্ত্রবাদের প্রতি গ্যারিবল্ডী প্রথমে আস্থাশীল হলেও পরে তিনি মত পালটান। প্রজাতন্ত্র স্থাপনের জন্যে গৃহযুদ্ধ অপেক্ষা ইতালীর ঐক্যকেই তিনি প্রধান লক্ষ্য বলে গ্রহণ করেন। প্রজাতন্ত্রবাদকে অগ্রাধিকার দিয়ে ইতালীর ঐক্যকে বিনষ্ট করা তিনি যুক্তিযুক্ত মনে করেননি।[২] এজন্য তিনি ভিক্টর ইম্যানুয়েলের প্রতি বশ্যতা জ্ঞাপন করেন।

গ্যারিবল্ডীর নিকট প্রজাতান্ত্রিক আদর্শ অপেক্ষা জাতীয় ঐক্যের গুরুত্ব

গ্যারিবল্ডীর নিকট ইতালীর স্বাধীনতা ও ঐক্য অন্ধ আদর্শবাদ অপেক্ষা অনেক বড় ছিল। তিনি স্বদেশের স্বাধীনতা অপেক্ষা নিজ স্বার্থকে গৌণ বলে মনে করতেন। এই স্বার্থত্যাগী, নিরভিমান দেশপ্রেমিক তাঁর কর্মের ও ত্যাগের জন্যে কোন ব্যক্তিগত পুরস্কার লাভের আশা করতেন না। তিনি ভিক্টর ইম্যানুয়েলের হাতে নেপলস ও সিসিলীর দায়িত্ব অর্পণ করে, ক্যাপ্রেরা দ্বীপে, তাঁর খামারে বাকি জীবন দারিদ্র্যের মধ্যে অতিবাহিত করেন।

গ্যারিবল্ডীর কৃতিত্ব

ইতালীর ঐক্য আন্দোলনে বৈদেশিক শক্তির ভূমিকা (Role of external powers in the making of Italy) ঃ ইতালীর ঐক্য আন্দোলন কেবলমাত্র ইতালীর জাতীয়তাবাদীদের চেষ্টায় সফল হয় একথা বলা যায় না। ইতালীর মুক্তি আন্দোলনে কয়েকটি বৈদেশিক শক্তির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা ছিল। নেপোলিয়ন ইতালীতে যে শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন তার ফলে ইতালীবাসীদের মনে সর্বপ্রথম জাতীয়তাবাদী ভাব জাগে। নেপোলিয়ন ইতালীতে কোড নেপোলিয়ন ও অন্যান্য আধুনিক সংস্কার প্রচলন করেন। স্যালভেমিনি প্রভৃতি সকল প্রখ্যাত ঐতিহাসিকেরা স্বীকার করেন যে, নেপোলিয়নের ইতালীয় সংগঠনকেই ইতালীয় রিসঅর্গিমেন্টোর প্রথম ধাপ

নেপোলিয়নের প্রভাব

১ Grenville—Europe Reshaped P 257

২ Grenville P 237

বলা যায়। কারণ ইতালীর প্রান্তীয়তা, আঞ্চলিকতার বাঁধন ভেঙে তিনিই সর্বপ্রথম কেন্দ্রীভূত শাসন ও কেন্দ্রীভূত আইনের প্রবর্তন করেন। ইতালীর বিভিন্ন অঞ্চলকে বিভিন্ন রাস্তার দ্বারা যুক্ত করেন। সামন্তপ্রথা ভেঙে ভূমি সংস্কার করেন। যোগ্যতার ভিত্তিতে পদ লাভের নিয়ম চালু করে তিনি এক বুদ্ধিজীবি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংগঠন করেন। নেপোলিয়নের পতনের পর ইতালীর জাতীয়তাবাদীদের মনে জাতীয়তাবাদী ও গণতান্ত্রিক ভাবধারা ছড়িয়ে পড়ে। এভাবে ইতালীর জাগরণের পথ তৈবি হয়।

নেপোলিয়নের পতনের পর ভিয়েনা চুক্তির দ্বারা ইতালীতে অষ্ট্রিয়ার আধিপত্য স্থাপিত হয়। অষ্ট্রিয়ার প্রতিক্রিয়াশীল শাসনে আসার ফলে ইতালীবাসীদের মনে জাতীয়তাবাদী প্রভাব বিশেষভাবে জাগে। ম্যাৎসিনীর ইয়ং ইতালী আন্দোলনের বিফলতার পর কাভ্যুর বৈদেশিক সাহায্য দ্বারা অষ্ট্রিয়াকে ইতালী থেকে বহিষ্কারের পরিকল্পনা করেন।

অষ্ট্রিযাব শাসকেব প্রতিক্রিযা

তৎকালীন ইওরোপীয় পরিস্থিতিতে ইওরোপ একমাত্র উদারপন্থী শক্তি ছিল ইংলন্ড ও তৃতীয় নেপোলিয়ন-শাসিত ফ্রান্স। এই দুটি দেশ থেকে সাহায্য পাওয়া সম্পর্কে কাভ্যুর আশা করেন। ইতিমধ্যে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ বাধলে পিডমন্ট উপরোক্ত দুই শক্তির মিত্রতা লাভের সুযোগ পায়। ক্রিমিয়ার যুদ্ধ ইতালীর মুক্তি আন্দোলনের পথ তৈরি করে। পিডমন্ট এই যুদ্ধে ইঙ্গ-ফরাসী শক্তির পক্ষে যোগ দেয় এবং এই দুই শক্তির নৈতিক সমর্থন পায়। যদিও ঐতিহাসিক এ· জে· পি টেইলার বলেন যে, ক্রিমিয়ার যুদ্ধে যোগ দিয়ে ইতালীব মুক্তির কোন অগ্রগতি হয় নি, তথাপি অধিকাংশ ঐতিহাসিক এই মত অস্বীকার করেন। প্যারিসের সন্ধি বৈঠকে ইতালীর প্রশ্ন আলোচিত হয়। কাভ্যুর এই বৈঠকে ঘোষণা করেন যে, পূর্বাঞ্চল সমস্যার মত, ইতালীর সমস্যা একটি ইওরোপীয় সমস্যা। যদিও কাভ্যুর ব্রিটেনের সাহায্য বেশী কাম্য বলে মনে করতেন, কিন্তু ব্রিটিশমন্ত্রী লর্ড পামারষ্টোন শক্তিসাম্যের খাতিরে ইতালীর স্থিতাবস্থায় কোন গুরুতর পরিবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি মনে করতেন যে, ফ্রান্স ও রাশিয়ার বিরুদ্ধে শক্তিসাম্য রক্ষার জন্যে অষ্ট্রিয়ার সাম্রাজ্য রক্ষা করা উচিত। কাজেই কাভ্যুরকে বাধ্য হয়ে ফরাসী সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল হতে হয়। প্যারিসের সন্ধি বৈঠকের পর তৃতীয় নেপোলিয়ন ইতালীর সমস্যার প্রতি আগ্রহ দেখান। দ্বিতীয়তঃ, ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন হয়ত শীঘ্রই ইতালীর কথা ভুলে যেতেন। কারণ তাঁর বৈদেশিক নীতি ছিল সদাই অস্থির ও চঞ্চল। ফরাসী সেনার রক্তক্ষয় করে ইতালীকে মুক্ত করার দায়িত্ব তিনি সম্ভবতঃ বিস্মৃত হতেন। ১৮৫৮ খ্রীঃ গোড়ার দিকে ইতালীয় বিপ্লবী ওরসিনি (Orsini) সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন ও তাঁর পত্নীকে হত্যার ব্যর্থ চেষ্টা করায়, সম্রাটের বিবেকে খোঁচা লাগে। ওরসিনী তাঁর প্রাণদণ্ডের আগে সম্রাটকে সম্বোধন করে ইতালীর ঐক্যে সহায়তা দানের জন্যে যে পত্র লেখেন তা নেপোলিয়নের মনকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। তিনি স্থির করেন যে, ইতালীর সমস্যা সমাধানে·তাঁকে কিছু করতেই হবে। নতুবা কাভ্যুর চাইলেই যে তৃতীয় নেপোলিয়ন সামরিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন তা ভাবা উচিত নয়। কোন দেশ সহসা অন্য দেশকে সামরিক সাহায্য দিতে চায় না, যদি না তার নিজস্ব কিছু বাধ্য-বাধকতা থাকে। ইতালীতে ভিয়েনা সন্ধি ভেঙে নতুন করে ইতালীর রাজনৈতিক সংগঠন দ্বারা নেপোলিয়ন ইওরোপে তাঁর প্রভাব বিস্তার করতে চান। তিনি এজন্য অষ্ট্রিয়াকেই তাঁর প্রতিপক্ষ হিসেবে বেছে নেন। এ· জে· পি টেইলারের মতে, জার্মানী অপেক্ষা ইতালীতে ভিয়েনা চুক্তি ভঙ্গ বেশী নিরাপদ ছিল। কারণ তখনকার যুগে ইতালী ছিল ইওরোপের খিড়কী দরজা। নেপোলিয়ন আশা করেন যে, ইতালীতে হস্তক্ষেপ হলে রাশিয়া ও ব্রিটেন নিরপেক্ষ থাকবে। সম্ভবতঃ প্রাশিয়াও নিরপেক্ষ থাকবে। এই সকল হিসেব-নিকেশে সন্তুষ্ট হয়ে তবেই নেপোলিয়ন ইতালীতে হস্তক্ষেপের সিদ্ধান্ত নেন।

ক্রিমিযাব যুদ্ধ

প্লোমবিয়ারের গোপন চুক্তির দ্বারা তৃতীয় নেপোলিয়ন অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে পিডমন্টকে সশস্ত্র সাহায্য দিতে সম্মত হন। কিন্তু শর্ত থাকে যে, কাভুরকে অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যে একটি বৈধ কারণ সৃষ্টি করতে হবে যার ফলে ফ্রান্স বৈধভাবে এই যুদ্ধের সামিল হতে পারে। ফরাসী সামরিক সাহায্যের বিনিময়ে ফ্রান্সকে স্যাভয় ও নিস ছেড়ে দিতে হবে। এভাবে প্লোমবিয়ারের সন্ধির দ্বারা তৃতীয় নেপোলিয়ন ইতালীর মুক্তিযুদ্ধের দায়িত্ব হাতে নেন। তবে শর্ত থাকে যে, পিডমন্টের সঙ্গে কেবলমাত্র লম্বার্ডি ও ভিনিসিয়া যুক্ত হবে। মধ্য ইতালীর কিছু অংশ ও পার্মা প্রভৃতি অঞ্চল পিডমন্টের সঙ্গে যুক্ত হবে। টাস্কানী, মডেনা ও পোপের রাজ্যের কিছু অংশ নিয়ে মধ্য ইতালীয় রাজ্যে পরিণত হবে। বাকি পোপের রাজ্য পোপের হাতেই থাকবে। নেপলস ও সিসিলীতে স্থিতাবস্থা থাকবে। সুতরাং তৃতীয় নেপোলিয়ন প্লোম্বিয়ারের সন্ধির দ্বারা সমগ্র ইতালীকে সংযুক্ত করতে প্রতিশ্রুতি দেন একথা বলা যায় না।[১] তৃতীয় নেপোলিয়ন সম্ভবতঃ শক্তিশালী স্বাধীন ঐক্যবদ্ধ ইতালী গঠন অপেক্ষা পিডমন্টকে ফরাসী তাঁবেদার রাজ্যে পরিণত করতে চান। তিনি ইতালী থেকে অষ্ট্রিয়ার প্রভাব দূর করার কথা ভাবেন। তাছাড়া ফ্রান্সের ক্যাথলিকদের জনমতের কথা তিনি ভাবেন। ১৮৪৯ খ্রীঃ ক্যাথলিক জনমতকে সন্তুষ্ট করবার জন্যেই তিনি পোপকে রক্ষার অজুহাতে রোমে সেনাদল পাঠিয়ে ম্যাৎসিনীর প্রজাতন্ত্র ধ্বংস করেন। তদবধি রোমে ফরাসী সেনাদল মজুদ ছিল। এই সকল কারণে তৃতীয় নেপোলিয়ন প্লোমবিয়ারের সন্ধিতে সাবধানতার সঙ্গে শর্ত আরোপ করেন। প্লোমবিয়ারের সন্ধিব শর্ত বিচার করলে সমগ্র ইতালীর ঐক্যের কথা নেপোলিয়ন ভাবেন একথা বলা চলে না। কাভুরও সম্ভবতঃ লম্বার্ডি ও ভিনিসিয়া যোগ করে বর্দ্ধিত পিডমন্ট রাজ্যের বেশী কিছু ভাবেননি। কাজেই বৈদেশিক সাহায্য দ্বারা সমগ্র ইতালীর ঐক্য স্থাপনের চিন্তা ১৮৫৮-৫৯ খ্রীঃ ছিল সুদূরের স্বপ্ন। কিন্তু তা কার্যে পরিণত হয় এজন্য যে যুদ্ধে অষ্ট্রিয়ার পরাজয় হলে, ইতালীর জাতীয়তাবাদ তার নিজস্ব পথে চলতে শুরু করে। এই জাতীয়তাবাদকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা নেপোলিয়ান বা কাভুর কারোরই ছিল না।

প্লোমবিয়ারের চুক্তি

প্লোমবিয়ারের সন্ধির শর্ত অনুসারে অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার জন্যে বৈধ কারণ সৃষ্টি করা সহজ কাজ ছিল না। কাভুর কূটনীতির জাল ছড়িয়ে এবং অষ্ট্রিয়াকে প্ররোচনা দিয়েও যুদ্ধের বৈধ কারণ সৃষ্টি করতে পারেননি। ফলে প্লোম্বিয়ারের সন্ধি অকার্যকরী হওয়ার উপক্রম হয়। ইতিমধ্যে ব্রিটেনের হস্তক্ষেপে এক আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে ইতালীর সমস্যা সমাধানের প্রস্তাব দেওয়া হয়। অষ্ট্রিয়া অহমিকা বশতঃ এই কংগ্রেসের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করায়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অষ্ট্রিয়া একঘরে হয়ে পড়ে। তাতে নেপোলিয়নের হস্তক্ষেপের সুবিধা হয়। নতুবা তিনি হস্তক্ষেপে রাজী হতেন কিনা সন্দেহ। অষ্ট্রিয়া পিডমন্টের বিরুদ্ধে তার সেনাদল ভেঙে দিতে দাবী করে এক চরমপত্র দিলে পিডমন্ট তা অগ্রাহ্য করলে, অষ্ট্রিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করে। এভাবে যুদ্ধের বৈধ কারণ সৃষ্টি হলে তবেই নেপোলিয়ন ফরাসী সেনা অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে নামান। যদি অষ্ট্রিয়া গোঁয়ার্তুমী না করে কংগ্রেসের প্রস্তাব মেনে নিত তবে প্লোম্বিয়ারের সন্ধি কার্যকরী হত না। নেপোলিয়ন তাঁর প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে যেতেন। বিউরীর মতে, সকালের দেওয়া প্রতিশ্রুতি সন্ধ্যায় ভুলে যেতে নেপোলিয়ন অভ্যস্ত ছিলেন। ফরাসী সেনা ম্যান্টুয়া, সলফেরিনোর যুদ্ধে অষ্ট্রিয়াকে লম্বার্ডি থেকে বিতাড়িত করে। কিন্তু তৃতীয় নেপোলিয়ন সন্ধির শর্ত মত ভিনিসিয়াকে অষ্ট্রিয়ার অধিকারমুক্ত না করে অকস্মাৎ অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে ভিল্লাফ্রাঙ্কার সন্ধি স্বাক্ষর করেন। এর ফলে লম্বার্ডি পিডমন্টের সঙ্গে যুক্ত হয়। বাকি ইতালীতে স্থিতাবস্থা বহাল থাকে।

ভিল্লাফ্রাঙ্কার সন্ধি

১· Ketelbey—History of Modern Times.

ভিল্লাফ্রাঙ্কার সন্ধি প্রমাণ করে যে, বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ ইতালীর ঐক্যস্থাপনের পুরা অনুকূলে ছিল না। এ· জে· পি, টেইলারের মতে, ফরাসী সাহায্য গ্রহণের বিনিময়ে কাভ্যুরকে ভিল্লাফ্রাঙ্কার সন্ধি মানতে বাধ্য হতে হয়। ভিনিসিয়া তখনও পরাধীন থাকে। কাভ্যুর ইতালীর মুক্তি সম্পর্কে তাঁর নিজ পরিকল্পনাকে কার্যকরী করতে অক্ষম হন। প্রকৃতপক্ষে ভিল্লাফ্রাঙ্কার সন্ধির পর কাভ্যুরের সামনে ইতালীর অবশিষ্ট অঞ্চল ঐক্যবদ্ধ করার কোন পথ খোলা ছিল না। বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ কাভ্যুরকে বন্ধ্যা নীতিতে আবদ্ধ করে। ভিল্লাফ্রাঙ্কার সন্ধির একটি নেতিবাচক দিক ছিল, যা ইতালীর ঐক্য আন্দোলনের কাজকে উজ্জীবিত করে। ইতালীর জাতীয়তাবাদীরা এই সন্ধিকে জাতীয় অপমান হিসেবে গণ্য করে, মধ্য ইতালীতে গণ বিদ্রোহের দ্বারা হ্যাপসবার্গ শাসকদের বিতাড়িত করে। নেপোলিয়ন ও কাভ্যুর তাঁদের অজ্ঞাতসারে ইতালীর জাতীয়তাবাদী ঐক্য আন্দোলনকে খুঁচিয়ে দেন। এই আন্দোলনের গতি এমনই তীব্র ও স্বপরিচালিত ছিল যে, কাভ্যুর ও নেপোলিয়ন এই আন্দোলনের ফলাফলকে কূটনৈতিক ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হন। নেপোলিয়ন ভিল্লাফ্রাঙ্কার পরিকল্পনাকে সংশোধন করতে বাধ্য হন। কাভ্যুর পরিবর্তিত পরিস্থিতির সুযোগ নেন। স্যাভয় ও নিস ক্ষতিপূরণ হিসেবে গ্রহণের পর নেপোলিয়ন পিডমন্টের সঙ্গে মধ্য ইতালীর পার্মা, টাস্কানী, মডেনা প্রভৃতি রাজ্যের সংযুক্তিতে সম্মতি দেন। নেপোলিয়নের অনুমোদন থাকায় অষ্ট্রিয়া ভিল্লাফ্রাঙ্কার সন্ধি ভাঙার অজুহাতে পুনরায় যুদ্ধ ঘোষণা থেকে বিরত থাকে। অষ্ট্রিয়া তার ইতালীর ক্ষতকে নীরবে চাটতে থাকে। এই পর্যায়ে বৈদেশিক শক্তি তথা ফ্রান্সের ভূমিকা ছিল পরোক্ষ মাত্র।

আগেই বলা হয়েছে যে, ইতালীর জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ভিল্লাফ্রাঙ্কার হতাশা থেকে নতুন প্রাণশক্তির জোয়ারে বাণ ডাকিয়ে দেয়। জাতীয়তাবাদী গ্যারিবল্ডীর দক্ষিণে সিসিলী ও নেপলস বিজয় ছিল এই উগ্র জাতীয়তাবাদের দুঃসাহসিক ও শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ। ম্যাৎসিনীর আত্মা যেন তাঁর শিষ্যের ওপর ভর করে এই সাফল্য এনে দেয়। গ্যারিবল্ডীর সাফল্য পুনরায় বৈদেশিক শক্তির সমস্যা সৃষ্টি করে। প্রথমতঃ, নেপলসে গ্যারিবল্ডীর জয় এবং প্রজাতন্ত্র স্থাপনের সম্ভাবনা কাভ্যুরের মতই নেপোলিয়নের উদ্বেগের কারণ হয়। তৃতীয় নেপোলিয়নের এক্ষেত্রে একক হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা দেখা দিলে, ব্রিটেনের আপত্তিতে তিনি নিরস্ত্র হন। তৃতীয় নেপোলিয়ন গ্যারিবল্ডীকে বাধাদানের জন্যে ইঙ্গ-ফরাসী যৌথ নৌ অভিযানের প্রস্তাব দিলে ব্রিটেন তা নাকচ করে। নেপোলিয়নের পক্ষে ইংলন্ডের মিত্রতা হারাবার ভয় ছিল। এজন্য তিনি একা কিছু করতে সাহস না করায় গ্যারিবল্ডীর সফলতা আসে। ইতিমধ্যে গ্যারিবল্ডী রোম আক্রমণের হুমকি দিলে রোমে পোপকে রক্ষার জন্যে ২৫ হাজার ফরাসী সেনার সঙ্গে সংঘাতের আশঙ্কা দেখা দেয়। এই সংঘাত নেপোলিয়নের অভিপ্রেত ছিল না। কারণ তাতে আন্তর্জাতিক জটিলতা দেখা দিত। গ্যারিবল্ডী সমস্যা থেকে মুক্তির জন্যে কাভ্যুরের প্রস্তাব বাধ্য হয়ে তৃতীয় নেপোলিয়ন মেনে নেন।

কাভ্যুরের প্রস্তাব ছিল যে, রোম ব্যতীত অবশিষ্ট পোপের রাজ্য পিডমন্ডের সেনাদল দখল করলে গ্যারিবল্ডী রোমে আসতে সক্ষম হবেন না। নেপোলিয়ন অনাকাঙ্ক্ষিত জটিলতা থেকে মুক্তি পাবেন। নেপোলিয়নের ভয় ছিল যে, কাভ্যুর এই সুযোগে পোপের গোটা রাজ্য গ্রাস করতে পারেন। এজন্য তিনি শর্ত দেন যে, আমব্রিয়া ও মার্চেস অঞ্চলই একমাত্র পিডমন্ট দখল করতে পারবে। পিডমন্ডের সেনাদল পোপের বাহিনীকে পরাস্ত করে এই অঞ্চল দখল করে। এই পর্যায়ে ইতালীর ঐক্যে নেপোলিয়ন পরোক্ষ ভূমিকা নেন এবং গ্যারিবল্ডীর বিজয়ে ইংলন্ড পরোক্ষ সহায়তা দেয়। নতুবা নেপোলিয়ন গ্যারিবল্ডীকে নৌ বল দ্বারা সিসিলীতে আটক করে ফেলতেন।

ভিক্টর ইম্যানুয়েল গ্যারিবল্ডীর হাত থেকে নেপলস ও সিসিলীর অধিকার বিনা যুদ্ধে গ্রহণ

করলেও নেপোলিয়ন সুখী হননি। কারণ ফরাসী জাতীয় বুরবোঁ বংশের রাজাকে নেপলস থেকে উৎখাত করা তাঁর পছন্দ সই কাজ ছিল না। নেপোলিয়ন পুনরায় শর্ত দেন যে, নেপলস ও সিসিলীতে গণভোট দ্বারা এই সংযুক্তিকে বৈধ করতে হবে। স্বদেশবাসীর কাছে মুখ রক্ষার জন্যেই নেপোলিয়ন গণভোট দাবী করেন। তাঁর আশা ছিল যে, গণভোট হয়ত অনুকূলে যাবে না। যাই হোক, গণভোট দ্বারা নেপলস ও সিসিলীর পিডমন্টের সঙ্গে সংযুক্তিকে বৈধতা দেওয়া হয়। কারণ ভিয়েনা সন্ধি অনুযায়ী এই অঞ্চলের বৈধ শাসক ছিলেন বুরবোঁ রাজবংশ। তাঁকে বলপূর্বক উৎখাত করাকে বহিঃশক্তিগুলি ভাল চোখে দেখেনি। গণভোটই ছিল এক্ষেত্রে সংযুক্তিকে বৈধতা দানের রাজনৈতিক অস্ত্র। অবশ্য তৃতীয় নেপোলিয়নের অনিচ্ছাপূর্ণ সম্মতিও এই সংযুক্তিকে সম্ভবপর করে।

বাকি ছিল ভেনেসিয়া ও রোম। ততদিনে কাভ্যুরের মৃত্যু হয়। এ· জে· পি টেইলারের মতে, অষ্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধে ১৮৬৬ খ্রীঃ তৃতীয় নেপোলিয়ন তাঁর নিরপেক্ষতার বিনিময়ে ভেনেসিয়ার পিডমন্টের সঙ্গে সংযুক্তি দাবী করেন। তিনি এই যুদ্ধে অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রাশিয়ার মিত্র হিসেবে যোগ দিতে পিডমন্টকে পরামর্শ দেন। অষ্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধের পর ভেনেসিয়া ইতালীর সঙ্গে যুক্ত হয়। ১৮৭০ খ্রীঃ ফ্রাঙ্কো-জার্মান যুদ্ধের সময় নেপোলিয়ন রোম থেকে ফরাসী বাহিনী যা ১৮৪৯ খ্রীঃ থেকে রোম দখল করেছিল, তা সরিয়ে নিলে. রোম ঐক্যবদ্ধ ইতালীর রাজধানীতে পরিণত হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, কেবলমাত্র বৈদেশিক সহায়তাই ইতালীকে ঐক্যবদ্ধ হতে সাহায্য করে এই কথা বলা যায় না। ইতালীর ঐক্য ছিল আংশিক ক্যাভুরের কূটনীতি ও বৈদেশিক সাহায্যকে গঠনমূলকভাবে ব্যবহারের ক্ষমতা; আংশিক মধ্য ইতালীর জাতীয়তাবাদীদের বিদ্রোহ, আংশিক গ্যারিবল্ডীর হঠকারী অভিযান এবং বিশেষভাবে তৃতীয় নেপোলিয়নের সক্রিয় ও পরোক্ষ সহায়তার যুক্ত ফল। ইতালীয় জাতীয়তাবাদের দ্বারা ক্ষেত্র তৈরি না হলে কাভ্যুর চেষ্টা করলেও গোটা ইতালীকে কখনও ঐক্যবদ্ধ করতে পারতেন না। এজন্য ইতালীর ঐক্য আন্দোলনে কোন বিশেষ ব্যক্তির ভূমিকাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া যায় না।

বৈদেশিক সহায়তা গ্রহণ ইতালীর পক্ষে সুখকর অভিজ্ঞতা ছিল না। প্রথমতঃ, স্যাভয় ও নিস নেপোলিয়নকে হস্তান্তর করতে হয়। স্যাভয় অঞ্চলে ফরাসী ভাষা কিছুটা কথ্য ভাষা হলেও নিসের ক্ষেত্রে ইতালীয় ছিল কথ্য ভাষা। স্যাভয় ও নিস ফ্রান্সের হাতে চলে গেলে ইতালীয় জাতি এই ক্ষতের কথা কোনদিন ভুলেনি। ভবিষ্যৎ ফ্রাঙ্কো-ইতালীয় সম্পর্ককে এই প্রশ্ন তিক্ততাপূর্ণ করে। দ্বিতীয়তঃ, বৈদেশিক সাহায্যদাতা তাঁর নিজ পরিকল্পনা মত ইতালীকে আংশিক ঐক্যবদ্ধ করে শক্তিসাম্য রক্ষা করতে চান। ইতালীর আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে তাঁর কোন দায় ছিল না। বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণের বিপত্তি এই ছিল যে, সাহায্যদাতার পরিকল্পনা ইতালীর ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। তৃতীয়তঃ, নেপোলিয়ন পিডমন্টকে অন্য অঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত করে, তাঁর তাঁবেদার অঞ্চলে পরিণত করতে চান। যদি ইতালীয় জাতীয়তাবাদীরা নিজ চেষ্টায় ঐক্য আন্দোলনে চালিকা শক্তি না যোগাতেন, তবে ভিল্লাফ্রাঙ্কা সন্ধির কাদায়, ইতালীর ঐক্যের রথের চাকা আটকে থাকত।

পাঠ্যসূচী

১। Denis Mack Smith—Cavour and Garibaldi.

২। Edgar Holt—Risorgimento.

৩। Bolton King—History of Italian Unity.

৪। Omodeo—Risorgimento.

৫। Salveminni—Mazzini.

৬। Jasper—Ridley—Garibaldi.

৭। Derek Beales—The Risorgimento and the Unification of Italy.

৮। H. Hearder—Pamphlet on Cavour in the Journal of Historical Association.

৯। J. A. S. Grenville—Europe Reshaped.

অষ্টাদশ অধ্যায়

বিসমার্কের পূর্বে জার্মানীর ঐক্য আন্দোলন

(Movement for Unification of Germany before Bismarck)

জার্মান ঐক্যের সমস্যা (Problem of German unity) ঃ ইওরোপীয় সভ্যতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি হল জার্মান সভ্যতা। জার্মান জাতি বাহুবলে, শৌর্যে এবং প্রতিভায় সমগ্র বিশ্বকে চমকিত করেছে। জার্মান জাতি প্রায় দুই শত বছর ধরে রাজনৈতিকভাবে বিভক্ত থাকার পর উনবিংশ শতকে ঐক্যবদ্ধ হয়।

১৬৪৮ খ্রীঃ ওয়েষ্টফ্যালিয়ার সন্ধির দ্বারা জার্মানীকে প্রায় দুই শতের অধিক ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত করা হয়। নেপোলিয়ন জার্মানী জয় করার পর এই রাজ্যগুলিকে ভেঙে প্রায় ৩৯টি রাজ্য গঠন করেন। এই ৩৯টি রাজ্য নিয়ে তিনি রাইন প্রজাতন্ত্র (Confederation of the Rhine) নামে এক যুক্তরাষ্ট্র গঠন করেন। নেপোলিয়নের আসল উদ্দেশ্য ছিল সংগঠিত জার্মানীকে ফ্রান্সের একটি বশ্যতামূলক তাঁবেদার রাজ্যে পরিণত করা। নেপোলিয়নের পতনের পর ভিয়েনা সন্ধির দ্বারা জার্মানীকে ৩৯টি রাজ্যে বিভক্ত রাখার ব্যবস্থা করা হয়। এই রাষ্ট্রমন্ডল জার্মানীর ওপর একটি বুন্ড (Bund) বা রাষ্ট্রমন্ডল স্থাপন করা হয়, রাষ্ট্রমন্ডল ছিল অত্যন্ত শিথিল। এই ৩৯টি রাজ্যের শাসকদের প্রতিনিধি নিয়ে এটি গঠিত ছিল। প্রত্যেক জার্মান রাজ্যের স্বতন্ত্রতা অব্যাহত থাকায় এই যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থার দ্বারা জার্মানীর প্রকৃত ঐক্যকে অগ্রাহ্য করা হয়। দ্বিতীয়তঃ এই রাষ্ট্রমন্ডলের সভাপতি পদে অষ্ট্রিয়ার হ্যাপসবার্গ সরকার অধিষ্ঠিত থাকায়, এতে অষ্ট্রিয়ার আধিপত্য প্রতিফলিত হয়। অঙ্গরাজ্যগুলির আভ্যন্তরীন শাসনে রাষ্ট্রমন্ডলের কোন হাত না থাকায়, অঙ্গরাজ্যগুলিতে স্বৈরতন্ত্রী ব্যবস্থা বহাল থাকে। এই কারণে জার্মান জাতীয়তাবাদীরা ভিয়েনা চুক্তিকে জার্মানীর প্রতি "প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা" বলে অভিহিত করে।

নেপোলিয়নেব দ্বাবা জার্মানীর সংগঠন ঃ ভিয়েনা সন্ধি

জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ এক রাষ্ট্রে পরিণত করার প্রধান বাধা ছিল ভিয়েনা চুক্তি। ভিয়েনা চুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত জার্মান বুন্ড বা রাষ্ট্রমন্ডল ধ্বংস না করলে জার্মানীকে প্রকৃতভাবে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব ছিল না। যেহেতু অষ্ট্রিয়া ছিল এই চুক্তির প্রধান সমর্থক সেহেতু অষ্ট্রিয়ার সম্মতি ছাড়া জার্মানীর ঐক্য স্থাপন করা ছিল দুষ্কর।

ভিয়েনা চুক্তির প্রভাবে জার্মানীর ঐক্যের বাধা

জার্মানীর ঐক্যের পথে অপর প্রধান বাধা ছিল, জার্মানীর ৩৯টি রাজ্যের বিচ্ছিন্নতা-প্রবণতা। প্রাশিয়ার রাজ পরিবার প্রাশিয়ার স্বাতন্ত্র বিসর্জন দিয়ে জার্মানীতে মিশে যেতে রাজী ছিল না। অনুরূপভাবে ব্যাভেরিয়া, স্যাক্সনী প্রভৃতি রাজ্যগুলির স্বাতন্ত্রবাদ জার্মান ঐক্যের আশাকে ব্যাহত করে। জার্মান জনসাধারণের মধ্যে আঞ্চলিকতা, প্রাদেশিকতা ও স্বাতন্ত্রতা অত্যন্ত প্রবল ছিল। যদিও জার্মানীর বিভিন্ন রাজ্যের অধিবাসীদের সঙ্গে ভাষাগত, ভাবগত, জাতিগত কোন ব্যবধান ছিল না, তবুও তারা বিচ্ছিন্নতাবাদে ভূগত।

জার্মানীর প্রাদেশিকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদ

জার্মানদের মধ্যে ধর্মীয় ব্যবধান একটি প্রধান বাধা ছিল। ওয়ার্মসের সন্ধির দ্বারা জার্মানীর

উত্তরাঞ্চল প্রধানতঃ প্রটেষ্টান্ট এবং দক্ষিণাঞ্চল প্রধানতঃ ক্যাথলিক ধর্মের প্রতি আস্থা জানায়।

ধর্মীয় ব্যবধান

উত্তরের প্রটেষ্টান্টদের সহিত দক্ষিণের ক্যাথলিকদের ভাবগত বিরোধ ছিল। স্বয়ং বিসমার্ক এই ব্যবধান দূর করতে ব্যর্থ হন। হিটলারের শাসনকালেও এই বিরোধ দেখা দেয়।

জার্মানীর ঐক্যের অপর প্রধান বাধা ছিল জার্মানীর উদারনৈতিক (Liberal) দলের সঙ্গে চরমপন্থীদের (Radical) আদর্শের তফাৎ। উদারনৈতিকেরা সম্পত্তির ভিত্তিতে ভোটাধিকার

উদারপন্থী গোষ্ঠীর সহিত চরমপন্থী গোষ্ঠীর মত-পার্থক্য

পছন্দ করত। উদারনৈতিক দলের প্রধান সমর্থক ছিল ধনী সম্পত্তিভোগী বুর্জোয়াগণ অপর দিকে চরমপন্থী জার্মান জাতীয়তাবাদীরা সর্বসাধারণের ভোটাধিকার প্রবর্তন, প্রজাতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রবাদের দ্বারা জার্মানীর ঐক্যকে দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপনের চিন্তা করত।

সর্বোপরি, অষ্ট্রিয়ার হ্যাপসবার্গ সাম্রাজ্যের সংগঠন, জার্মানীর ঐক্যের একটি প্রধান বাধা ছিল। অষ্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যে জার্মান ও অ-জার্মানরা বসবাস করত। খাস অষ্ট্রিয়ায় কেবল জার্মান

অষ্ট্রিয়ার সমস্যা ও হ্যাপবার্গ বংশেব বিবোধিতা

জাতিই বসবাস করত, কিন্তু অষ্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বোহেমিয়ায় চেক ও শ্লাভ জাতি, হাঙ্গেরীতে মডিয়ার ও ক্রোট জাতি বসবাস করত। অষ্ট্রিয়া সহ জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করলে অষ্ট্রিয়ার অধীনস্থ চেক, শ্লোভাক, মডিয়ার প্রভৃতি জাতি জার্মানীর সঙ্গে যুক্ত হলে জার্মান ঐক্য গড়ে উঠত না। অপর দিকে অষ্ট্রিয়াকে বাদ দিয়ে জার্মানীরঐক্যের চেষ্টা করা হলে অষ্ট্রিয়া তাতে বাধা দিত। অষ্ট্রিযাকে বাদ দিয়া জার্মানীর ঐক্যের কথা তখনও অকল্পিত ছিল। এই সকল সমস্যাগুলি জার্মানীর ঐক্যকে ব্যাহত করে।

জার্মান জাতীয়তাবাদের জাগরণ ও জার্মানীর ঐক্যের জন্যে উদারপন্থী আন্দোলন (The emergence of German Nationalism and the Liberal Movement in Germany) ঃ অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি জার্মানীতে একটি রোমান্টিক বা ভাববাদী জাগরণ ঘটে। কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক,

জার্মান সাংস্কৃতিক ঐক্য জার্মান বিশ্ববিদ্যালযগুলির প্রভাব

সঙ্গীত-সাধকেরা এমন এক সংস্কৃতির সৃষ্টি করেন, যাহার স্তন্য পান করে সমগ্র জার্মানী অনুপ্রাণিত হয়। জার্মানীর হাল (Halle), গটিংজেন, লাইপজিগ্ ও জেনা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয় এই নবসংস্কৃতি চর্চার পীঠস্থানে পরিণত হয়। জার্মানীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ছাত্ররা এই সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে এই সংস্কৃতির বাণীকে নিজ নিজ রাজ্যে বহন করে নিয়ে যায়। এর ফলে জার্মান জাতির ঐক্যবোধ দৃঢ় হয়।

মার্টিন লুথার জার্মান ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ করেন। জার্মান ভাষায় অনুদিত এই বাইবেল গ্রন্থটি আপামর জার্মানদের মনে ধর্মীয় ও ভাবগত ঐক্যের পটভূমি সৃষ্টি করে। জার্মান সঙ্গীতকার সেবাষ্টিয়ান বাখ্ তাঁর সঙ্গীতগুলির দ্বারা সমগ্র জার্মানীকে অনুপ্রাণিত করেন। ফরাসী

বাথ হার্ডার, গ্যেটে প্রভৃতি সাহিত্যিকদের প্রভাব

সাহিত্যের প্রভাব মুক্ত হয়ে, জার্মান জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টির কাজে লেসিং (Lessing) ছিলেন অগ্রণী। হার্ডার (Herder) নামক সাহিত্যিক জার্মানীর লোকসাহিত্য ও ব্যালাড বা বীরগাথাকে সঙ্কলন করে সাহিত্যের দরবারে হাজির করেন। সকল যুগের শ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম, মহাকবি গ্যেটে (Goethe) জার্মান সাহিত্যকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মর্যাদা দেন। গ্যেটের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ ফাউষ্ট (Faust) ছিল জার্মান জাতির অতি আদরের জিনিষ। জার্মানীর দুই বিখ্যাত রোমান্টিক কবি ছিলেন ফ্রিওবিশ নোভালিশ এবং ফ্রিওরিশ শ্লেগেল। ইংলন্ডের লেক বা হ্রদ

অঞ্চলের কবিদের মতই তাঁরা কাব্যে আত্মতত্ত্ববাদ ও প্রকৃতিবাদকে ছড়িয়ে দেন। এছাড়া সাহিত্যিক শিলার (Schiller) এবং ফিশ্‌টে (Fichte), কান্ট, হেগেল প্রভৃতি দার্শনিকরাও জার্মান জাতীয়তাবাদের জাগরণ তাঁদের মনীষাকে নিয়োগ করেন। কান্ট ঐক্যবদ্ধ জার্মানীর কথা বলেন। ফিশ্‌টে জার্মান জাতির শ্রেষ্ঠত্বের তত্ত্ব প্রচার করেন। ভাগনার (Wagnér) বিখ্যাত সুরলহরী দ্বারা জার্মান জাতির মনে ঐক্যতান সৃষ্টি করেন। এইভাবে সাহিত্যিক, সঙ্গীতগুরু ও দার্শনিকদের রচনাগুলি জার্মান জাতির সাংস্কৃতিক ঐক্যের বন্ধনকে দৃঢ়তর করে এবং জার্মান জাতিকে ঐক্যসূত্রে বাঁধে। অষ্টাদশ শতকে ফরাসী সংস্কৃতি ও সাহিত্য জার্মানীতে প্রতিষ্ঠা পায়। প্রাশিয়ার রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডারিক ফরাসী ভাষায় কাব্য রচনা করতেন। এখন জার্মান সাহিত্য ও সঙ্গীতের জাগরণের ফলে জার্মানীর জাতীয় সংস্কৃতি প্রবল হয়। ফরাসী প্রভাব মুক্ত হয়ে জার্মানীর সংস্কৃতি জাতীয় জীবনকে খণ্ডিত করে। জার্মান দার্শনিক হাডার ফোকজাইষ্ট (Volkszeist) বা জার্মানীর জাতীয় চরিত্র ও সংস্কৃতির বন্দনা গান করেন।

নেপোলিয়ন জার্মানী জয় করে রাইন যুক্তরাষ্ট্র গঠন করার ফলে জার্মান জাতির মধ্যে পরোক্ষভাবে ঐক্যবোধ জাগে। নেপোলিয়ন জার্মানীর ৩০০টি রাজ্য ভেঙ্গে ৩৯টি রাজ্যে পরিণত করেন। ওয়েষ্টফেলিযা রাজ্য ও রাইন রাষ্ট্রমণ্ডল গঠন করে তিনি শতধা বিভক্ত জার্মানীতে রাজনৈতিক ঐক্যের পথ দেখান। তথাপি নেপোলিয়নের শাসন ছিল বিদেশী শাসন। প্রাশিয়ার রাষ্ট্রনেতাগণ, যথা, ষ্টাইন, ডাহ্‌লম্যান (Dahlman), কেহমার প্রভৃতি ফরাসী শাসনের বিরুদ্ধে জার্মানীতে এক তীব্র প্রতিবাদী মনোভাব সৃষ্টি করেন। জার্মানীর এই নবজাগরণের প্রধান কেন্দ্র ছিল প্রাশিয়া। জেনার যুদ্ধে পরাজয়ের পর জার্মান জাতীয়তাবাদী হাডেনবার্গ বলেন যে, "ফরাসীরা বিপ্লবের দ্বারা নীচ থেকে যে সংস্কারগুলি চালু করেছে, প্রাশিয়ায় তা ওপর থেকেই চালু করা এখন দরকার।" প্রাশিয়ার সংস্কারকরা ফ্রান্সের অনুকরণে কেন্দ্রীভূত শাসন, নাগরিকদের ঐচ্ছিক যোগদান দ্বারা জাতীয় সেনাদল এবং জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেন। এইসব শিক্ষার মাধ্যমে জার্মান জাতীয়তাবাদ, জার্মান জাতির নিজস্ব ভাবধারাকে শিক্ষার্থীদের মতো ছড়িয়ে দেওয়া হয়। শার্নহিষ্ট ও নিকেশু প্রাশিয়ার সামরিক সংগঠন করেন। ষ্টাইন ও হাডেনবার্গ প্রাশিয়ার শাসন সংগঠন করেন। এর ফলে লাইপজিগের যুদ্ধে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে জার্মান জাতীয়তাবাদের অভূতপূর্ব স্ফুরণ ঘটে। লাইপজিগের যুদ্ধে (১৮১৩) জার্মানীর জয় ছিল আসলে প্রাশিয়ার নবগঠিত সেনা ও নব সেনাপতি ব্লুকারের জয়। কিন্তু প্রাশিয়ার এই জয়কেই নবজাগ্রত জার্মান জাতীয়তাবাদের জয় বলে মনে করা হয়। লাইপজিগের পর জার্মানীতে একটি দেশপ্রেমের তরঙ্গ সৃষ্টি করে এবং ভবিষ্যতে জার্মান জাতির ঐক্য স্থাপনে এই যুদ্ধে স্মৃতি রোমান্টিক উপাদানের কাজ করে। জার্মান জাতির আত্মবিশ্বাস এই যুদ্ধের পর তীব্র হয়। তাছাড়া নেপোলিয়নের শাসনের ফলে জার্মানীতে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার ভাঙন ঘটে। ভূমিদাস প্রথা বিলুপ্ত হতে থাকে। জার্মানীতে এক বুদ্ধিজীবি বুর্জোয়া শ্রেণীর উদ্ভব হয়। এরা পুরাতন সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণী প্রথা ভেঙে নতুনভাবে জার্মান শক্তির ঐক্যবোধ প্রচার করে। এরা ছিল জার্মানীর নবজাগরণের অগ্রদূত।

নেপোলিযনেব শাসনে জাতীয জাগবণ

১৮১৫ খ্রীঃ পর, জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রমণ্ডলী বারসেনশাফট (Burschenschaft) নামে এক জাতীয়তাবাদী সংগঠন স্থাপন করে। জার্মানীর ১৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের (মতান্তরে ১৫টি) অধিকাংশ ছাত্র ও অধ্যাপক এই সংগঠনে যোগ দেন। এই সংস্থার কর্মসূচী ছিল জার্মান যুবশক্তির মধ্যে জাতীয়তাবাদী ভাবধারা প্রচার করা। মুক্তিযুদ্ধ ফেরত জার্মান ছাত্ররা জাতীয়তাবাদের যে শিক্ষা গ্রহণ করে তা তারা ভোলেনি। তারাই প্রধানতঃ বারসেনশাফটের সদস্য হয়। জার্মানীর

বারখেন শাফট আন্দোলন : ওয়ার্টবার্গ উৎসব

১· Ralph Flenley—Modern German History.

ঐক্য ও জাতীয়তাবাদের স্বার্থে প্রচার চালান হয়। ১৮১৯ খ্রীঃ মার্টিন লুথারের ৩০০ শততম জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠান উপলক্ষে তাঁর জন্মস্থান ওয়ার্টবার্গে, এক মহতী উৎসবের আয়োজন করা হয়। ওয়ার্টবার্গ উৎসবে ছাত্র ও অধ্যাপকেরা জার্মানীর ঐক্য ও জাতীয়তাবাদের সমর্থনে আবেগপূর্ণ বক্তৃতা দেন। স্বয়ং মহাকবি গ্যেটে এই উৎসবে ভাষণ দেন। ওয়ার্টবার্গে মেটারনিকের কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। এর দুই বছর পর প্রতিক্রিয়াশীল জার্মান সাংবাদিক ও কবি কোৎসেবুকে (Kotzebue)-কে কার্ল স্যান্ড (Karl Sand) নামে এক ছাত্র হত্যা করে।

মেটারনিক প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াশীল নেতারা জার্মানীতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ফলে ভীত হয়ে পড়েন। মেটার্রনিকের প্রভাবে দমনমূলক কার্লসবাড ডিক্রী (বিশদ বিবরণ আগে পৃঃ দেখ) জার্মানীতে জারি করা হয়। জার্মানীর ছাত্র আন্দোলন ও রাজনৈতিক আন্দোলনকে দমন করা হয়। বারসেনশাফট সংগঠন বেআইনী ঘোষিত হয়। উদারপন্থী অধ্যাপক ও ছাত্রদের বন্দী ও নিগ্রহ করা হয়। এর ফলে জার্মানীতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন কিছুকাল স্তিমিত হয়। ১৮৩০ খ্রীঃ জুলাই বিপ্লবের প্রভাবে হ্যানোভার, হেসো প্রভৃতি বাজ্যে উদারনৈতিক আন্দোলন দেখা দেয়। হ্যানোভার বিশাল জন সমাবেশে জার্মানীর ঐক্য ও সংহতির শপথ নেওয়া হয়। কিন্তু মেটারনিকতন্ত্রের চাপে এই আন্দোলন অঙ্কুরে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। মেটারনিকের প্রভাবে দমনমূলক কার্লসবার্ড ডিক্রীতে আরও ছটি দমনমূলক শর্তযোগ কবা হয়। হ্যানোভারের রাজা সংবিধান নাকচ করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের সংবিধানের পরিবর্তে রাজার প্রতি আনুগত্যের শপথ নিতে নির্দেশ দেন। এর ফলে জার্মানীর বিখ্যাত জাতীয়তাবাদী উদারপন্থী অধ্যাপক ডালম্যান সহ আরও ৬ জন অধ্যাপক পদত্যাগ করেন। জার্মান বুদ্ধিজীবিরা এতে আরও অনুপ্রাণিত হয়। জার্মানিতে সংস্কৃতিগত, ভাষা ও ভাবগত ঐক্যের প্লাবন বইতে থাকে। সঙ্গীতে সাহিত্যে এই ঐক্যের প্রকাশ ঘটে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী এই ভাবধারায় ভেসে যায়। উত্তর জার্মানীতে জাতীয়তাবাদীরা প্রাশিয়াকেই তাদের নেতৃবলে মেনে নেয়। দক্ষিণ জার্মানির তখনও ব্যাভেরিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে কিছুটা দ্বিধা ও আঞ্চলিকতা ছিল।

মেটাবনিকের দমন নীতি

জার্মানীর রাজনৈতিক ঐক্য ব্যাহত হলেও জার্মানীতে অর্থনৈতিক ঐক্যের কাজ অনেক দূর এগিয়ে যায়। জার্মানীতে শিল্প-বিপ্লব ধীরে ধীরে ঘটছিল। অর্থনৈতিক ঐতিহাসিক ন্যুট করকষ্ট্যাডের মতে, ১৮১৫—১৮৫০ খ্রীঃ পর্যন্ত জার্মানীতে শিল্প-বিপ্লবের প্রাথমিক পর্যায় চলে। ইংলন্ডের অনুকরণে যন্ত্রপাতির দ্বারা শিল্প উৎপাদনের কাজ শুরু হয়। এজন্য মাল চলাচল ও কাঁচামাল প্রভৃতির সরবরাহের জন্যে জার্মানীর বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে সহযোগিতার দরকার হয়। জার্মানী ৩৯টি রাজ্যে বিভক্ত হওয়ায় এবং প্রতি রাজ্যে আলাদা শুল্ক ব্যবসা থাকায়, মাল চলাচলে বিঘ্ন দেখা দেয়। একমাত্র প্রাশিয়াতেই ৬৭ রকমের শুল্ক ছিল। এমতাবস্থায় সমগ্র জার্মানীতে একটি সর্বজনগ্রাহ্য শুল্কনীতি গ্রহণের দরকার দেখা দেয়। এই প্রয়োজন মিটাবার উদ্দেশ্যে প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জোলভেরাইন (Zollverein) (১৮১৯ খ্রীঃ) নামে এক শুল্ক সংঘ গঠিত হয়। প্রাশিয়া সর্বপ্রথম তার অন্তঃশুল্ক লোপ করে, অন্য জার্মান রাজ্যগুলিকে পথ দেখায়। এই সঙ্গে প্রাশিয়া ঘোষণা করে যে, জার্মানীর অন্য রাজ্যের শুল্ক ও বাণিজ্য নীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রাশিয়া তার বাণিজ্য নীতি পরিচালনা করবে। প্রাশিয়া এই শুল্ক সঙ্ঘ গঠনে এতই উদারতা ও নিস্বার্থ ভাব দেখায় যে, সে শীঘ্রই অন্য রাজ্যগুলির আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়। প্রাশিয়া প্রথমে কয়েকটি প্রতিবেশী রাজ্যের সঙ্গে যৌথ শুল্ক চুক্তি সম্পাদন করলে, উত্তর জার্মানীর অধিকাংশ রাজ্য এই চুক্তির উপযোগীতা বুঝে তাতে যোগ দেয়। ১৮২৮ খ্রীঃ উত্তর জার্মানীর প্রায় সবকটি রাজ্য এই

জার্মানীব অর্থনৈতিক ঐক্য ঃ জোলভেরাইন

শুল্ক সঙ্ঘে অর্ন্তভুক্ত হয়। দক্ষিণের ব্যাভেরিয়া প্রভৃতি রাজ্য কিছুকাল নিজেদের নেতৃত্বে দক্ষিণ জার্মানী রাজ্য নিয়ে শুল্কসঙ্ঘ গঠন করে। প্রাশিয়ার ধৈর্য ও সহনশীলতার ফলে দক্ষিণের রাজ্যগুলির অবিশ্বাস দূর হয়। প্রথমে ১৮ সদস্য নিয়ে জোলভেরাইন শুল্কসঙ্ঘ গঠিত হলেও, ১৮৩৪ খ্রীঃ জার্মানীর প্রায় সকল রাজ্য প্রাশিয়ার নেতৃত্বে যোগ দেয়। একমাত্র অষ্ট্রিয়াকে এই শুল্ক সংঘের বাইরে রাখা হয়। প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মানীর এই অর্থনৈতিক ঐক্য জার্মানীর রাজনৈতিক ঐক্যের পথ প্রস্তুত করে। ঐতিহাসিক কেটেলারির মতে, "জার্মানীর অর্থনৈতিক ঐক্য তার রাজনৈতিক ঐক্যের পথ প্রস্তুত করে"। জার্মান জাতি অষ্ট্রিয়ার নেতৃত্বে দীর্ঘকাল অভ্যস্ত হলেও, জোলভেরাইনের প্রভাবে প্রাশিয়ার নেতৃত্ব গ্রহণে শীঘ্রই অভ্যস্ত হয়। জার্মান বুর্জোয়াশ্রেণী জোলভেরাইনের উপযোগিতা দেখে একধাপ এগিয়ে জার্মানীর রাজনৈতিক ঐক্যের জন্যে সচেষ্ট হয়।

ইতিমধ্যে জার্মানীতে রেলপথ নির্মাণের কাজ জার্মানীর ঐক্যকে মজবুত করে। এই রেলপথ নির্মাণের মুখপাত্র ছিলেন ফ্রেডারিখ লিষ্ট (Frederick List)। পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানীর মধ্যে উত্তরবাহিনী তিন বিশাল নদীর সমান্তরাল প্রবাহধারা জার্মানীর যে ভৌগোলিক বিভাজন করে, রেলপথ নির্মাণের ফলে সেই ভৌগোলিক বাধা দূর হয়। দূরত্বের বাধা দূর হলে কৃষি-প্রধান, শৌর্যশীল পূর্ব জার্মান জনগোষ্ঠী শিল্প-প্রধান, বুদ্ধিজীবি-সমৃদ্ধ পশ্চিমের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত হয়। উত্তরের প্রটেস্টান্ট জার্মানী দক্ষিণের ক্যাথলিক জার্মানীকে কাছে টেনে নেয়। এজন্যই অর্থনীতিবিদ কেইনসের মতকে সত্য বলা যায় যে, "জার্মানী রক্ত ও লৌহের পরিবর্তে কয়লা ও লৌহের দ্বারাই ঐক্যবদ্ধ হয়।" (Germany was made by coal and iron not by blood and iron)।

এইভাবে জার্মান জাতীয়তাবাদ মেটারনিকের দমন নীতির অন্তরালে আপন বেগ সঞ্চয় করতে থাকে। ফেব্রুয়ারি বিপ্লব জার্মানীতে প্রধানতঃ দুটি ধারায় প্রবাহিত হয়। জার্মানীর মানসক্ষেত্র উদারতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের প্রভাবে এই বিপ্লবের জন্যে প্রস্তুত ছিল। যদিও র‍্যাডিক্যাল বা প্রজাতন্ত্রবাদী এবং নিও-হেগেলীয়গণ বা সমাজতন্ত্রবাদী বুদ্ধিজীবিরাও জার্মানীতে ছিলেন, কিন্তু ১৮৪৮ খ্রীঃ তাঁদের প্রভাব বেশী ছিল না। প্রধানতঃ উদারতন্ত্রী ও জাতীয়তাবাদীরাই জার্মানীতে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবে নেতৃত্ব দেন। উদারতন্ত্রীদের প্রভাবে ব্যাভেরিয়া, ব্যাডেন, উর্টেমবার্গ, হেসে, স্যাক্সনী প্রভৃতি রাজ্যে উদারতান্ত্রিক সংবিধান এই সকল দেশের রাজারা ঘোষণা করেন। তাঁরা সীমিত ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত পার্লামেন্ট গঠন করেন। প্রাশিয়াতে রাজা চতুর্থ ফ্রেডারিখ উইলিয়াম নানা অজুহাতে সংবিধান দিতে টাল-বাহানা করেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর রাজ্যে দাঙ্গা শুরু হলে তিনি প্রাশিয়ায় একটি উদারনৈতিক সংবিধান দেন। একটি প্রতিনিধি সভা গঠন করেন। ফ্রেডারিক উইলিয়াম জনরোষের ভয়ে জার্মানীর জাতীয়তাবাদী ঐক্য আন্দোলনের সামিল হতে রাজী হন। তিনি বলেন যে, "অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে, অথবা অষ্ট্রিয়া ছাড়া এবং দরকার হলে অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে তিনি ঐক্যের জন্যে লড়াই করবেন।" (With Austria, without Austria, if necessary against Austria)। ফ্রেডারিক উইলিয়াম যত সহজে প্রতিশ্রুতি দেন, তত সহজে তা প্রত্যাহারে অভ্যস্ত ছিলেন। যাই হোক, ইতিমধ্যে ১৮৪৮ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারি বিপ্লব আরম্ভ হলে জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করে নতুন সংবিধান রচনার জন্যে ফ্রাঙ্কফুর্ট নগরে এক জাতীয় পার্লামেন্টের অধিবেশন আহুত হয়। (বিশদ বিবরণ পৃঃ ২৯৯ দ্রষ্টব্য)। ঐতিহাসিক কেটেলবির মতে, ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্ট ছিল, "বিপ্লবী জাতীয়তাবাদের প্রস্ফুটিত পুষ্প" (Flower of revolutionary patriotism)। ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্টের সদস্যারা গণভোটের ভিত্তিতে নির্বাচিত হয়ে জার্মানীর নতুন সংবিধান রচনার চেষ্টা করে। এই

ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্ট আহ্বান ও ইহার বিফলতা

পার্লামেন্ট অষ্ট্রিয়াকে বাদ দিয়ে সমগ্র জার্মানীকে নিয়ে এক ঐক্যবদ্ধ রাজ্য গঠনের প্রস্তাব নেয়। ঐক্যবদ্ধ জার্মানীর সাংবিধানিক সম্রাট পদে প্রাশিয়া রাজ্জ চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়ামের নাম প্রস্তাব করা হয়। তিনি জার্মানীর সাংবিধানিক সম্রাট হিসেবে স্বীকৃত হন। কিন্তু প্রাশিয়ার রাজা চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়াম পার্লামেন্টের উপরোক্ত প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। তিনি ছিলেন স্বৈরতন্ত্রবাদী। জার্মানীর সাংবিধানিক শাসকের পদ তাঁর পছন্দ ছিল না। ইতিমধ্যে অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার সামরিক হস্তক্ষেপে ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্টের পতন ঘটে। এর ফলে সাংবিধানিক ও গণ-আন্দোলনের পথে জার্মানীর ঐক্যের প্রচেষ্টা চিরতরে বিনষ্ট হয়। প্রাশিয়ার রাজা চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়াম আরফুর্টে অপর এক পার্লামেন্ট ডেকে জার্মানীর ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা করলে অষ্ট্রিয়ার প্রতিবাদে তিনি পিছু হটেন। শেষ পর্যন্ত ওলমুৎসের (Convention of Olmutz) চুক্তির দ্বারা জার্মানীর ওপর ভিয়েনা চুক্তির স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে ফ্রেডারিক উইলিয়াম অষ্ট্রিয়াকে প্রতিশ্রুতি দেন। জার্মানীর উদারনৈতিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সমাধি ঘটে।

ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্ট, ১৮৪৮ খ্রীঃ (The Frankfurt Parliament, 1848)ঃ জার্মানীকে একটি ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্যে উদারপন্থী জার্মান জাতীয়তাবাদী নেতারা প্রাণপণ চেষ্টা করেন। জার্মানীর সংযুক্তির পথে প্রধান বাধা ছিল ভিয়েনা চুক্তির দ্বারা জার্মানীর ব্যবচ্ছেদ। জার্মান জাতীয়তাবাদীরা জার্মানীতে এক ঐক্যবদ্ধ সংবিধান চালু করে ভিয়েনা চুক্তি বাতিল করার কথা ভাবেন। এজন্য এক জাতীয় পার্লামেন্ট আহ্বানের কথা চিন্তা করা হয়। ১৮৪৮ খ্রীঃ ফ্রান্সে ফেব্রুয়ারি বিপ্লব ঘটিবার পর জার্মানীর ৫১ জন জাতীয়তাবাদী নেতা এক জাতীয় পার্লামেন্ট আহ্বান করে, জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রে রূপদানের প্রস্তাব দেন। এই পার্লামেন্ট কিভাবে আহ্বান করা হবে তা আলোচনার জন্যে একটি প্রস্তুতি সভা (Vorparliament) বসে।[১] প্রস্তুতি সভার পরামর্শে জার্মানীর প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ নাগরিকদের ভোটে জাতীয় পার্লামেন্টের সদস্যরা নির্বাচিত হয়। এই পার্লামেন্টের অধিবেশন ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরে বসে বলে একে ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্ট বলা হয়ে থাকে। ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্টের লক্ষ্য ছিল শান্তিপূর্ণ ও সাংবিধানিক পথে ও গণতান্ত্রিক পথে জার্মানীকে একটি ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করা।

ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্ট

ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্টের সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় ৫৮৬। এর অধিকাংশ সদস্যরা ছিল বুদ্ধিজীবি, আইনজীবি, শিক্ষক ও সাংবাদিক। পাতি বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবিরাই ছিল এই পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠ। অর্থাৎ ৫৮৬ জন সদস্যের মধ্যে ছিল ১০৪ জন অধ্যাপক, ৯৫ জন আইনজীবি, ১২৪জন সরকারি কর্মচারী, ১০০ জন বিচারক। কিন্তু শ্রমিক বা কৃষক প্রতিনিধি এই পার্লামেন্টে ছিল না। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল সাইলেশিয়া প্রদেশ থেকে নির্বাচিত একজন কৃষক সদস্য। অভিজাত, জমিদার ও বণিক শ্রেণীও এই পার্লামেন্টে অনুপস্থিত ছিল। ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্টের শ্রেণীচরিত্র ছিল প্রধানতঃ পাতি বুর্জোয়া মধ্যবিত্ত। ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্টের অধিবেশন বসার পর উদারনৈতিক জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে চরমপন্থী জাতীয়তাবাদীদের গভীর মত পার্থক্য দেখা দেয়। হেকার (Hecker) ও স্ট্রুভে (Struve) প্রভৃতি চরমপন্থী নেতাদের দাবী ছিল যে, জার্মানীকে একটি ঐক্যবদ্ধ প্রজাতন্ত্রে পরিণত করতে হবে। জার্মানীর বর্তমান রাজ্যগুলির সীমানা ভেঙে নতুন প্রদেশ গঠন করতে হবে। জার্মানীর সকল প্রদেশ থেকে রাজতন্ত্রকে লোপ করতে হবে। শ্রমিক

ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্টের সমস্যা

১· J A S Grenville. P. 59.

ও কৃষকের স্বার্থ রক্ষার জন্যে সমাজতান্ত্রিক সংস্কার চালু করতে হবে। কিন্তু উদারনৈতিক নেতারা এই দাবীগুলির বিরোধিতা করলে চরমপন্থীদের একাংশ এই পার্লামেন্ট ত্যাগ করে। জার্মানীর ব্যাডেন প্রদেশে চরমপন্থী নেতা হেফার একটি প্রতিবাদী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করেন। কিন্তু উদারপন্থীরা ব্যাডেন ও হেসে রাজ্যের সেনাদের সহায়তায় প্রজাতন্ত্রকে ধ্বংস করে দেয়।

অতঃপর ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্টে ঐক্যবদ্ধ জার্মানীর সংবিধান রচনা সম্পর্কে (১৮ই মে, ১৮৪৮ খ্রীঃ) বিতর্ক আরম্ভ হয়। যেহেতু ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্টে অধ্যাপক ও আইনজীবীরাই ছিল সংখ্যা গরিষ্ঠ, তারা ছিল তত্ত্ববাদী। বিখ্যাত ঐতিহাসিক আইক (Eyck) এজন্য ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্টকে "উকিলদের পার্লামেন্ট" বলেছেন। বাস্তবে এই পার্লামেন্টের হাতে কোন প্রশাসনিক বা সামাজিক ক্ষমতা ছিল না। জার্মানীর বিভিন্ন রাজ্যের শাসকদের সহায়তার ওপরেই এই পার্লামেন্টের সফলতা নির্ভর করত। একমাত্র জনমতের সমর্থন ও নৈতিক শক্তি ছাড়া এই পার্লামেন্টের হাতে কোন কার্যকরী ক্ষমতা ছিল না। ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্টের সদস্যরা সর্বপ্রথম জার্মান নাগরিকদের কতকগুলি মৌলিক অধিকার ঘোষণা করে। অতঃপর জার্মানীর বিভিন্ন রাজ্যে যে পার্লামেন্ট আছে তার সঙ্গে এই জাতীয় পার্লামেন্টের সম্পর্ক কি হবে এই জটিল প্রশ্ন আলোচিত হয়। অঙ্গ রাজ্যগুলির পার্লামেন্টের সদস্যরা সহজে তাদের অধিকার ছাড়ত না। এই প্রশ্নে ফ্রাঙ্কফুর্ট সভা স্থির করে যে, এই সভার গৃহীত সংবিধান হবে সার্বভৌম। অঙ্গরাজ্যগুলির পার্লামেন্টের আইন এই সংবিধানের বিরোধী না হলে তা বৈধ হবে। অতঃপর ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্ট ঐক্যবদ্ধ জার্মানীর জন্যে একটি আপাততঃ অস্থায়ী সরকার গঠন করে। অষ্ট্রিয়ার উদারপন্থী আর্কডিউক জনকে তারা সম্রাটের প্রতিনিধি খেতাব দেয়। প্রধানমন্ত্রীর পদে প্রিন্স লেনিনগ্রেন নির্বাচিত হন। কিন্তু ফ্রাঙ্কফুর্ট সরকারের কোন আমলাতন্ত্র না থাকায় এই সরকারের সিদ্ধান্তগুলিকে কার্যে পরিণত করা যায়নি। এই সরকারের নিজস্ব কোন সেনাদল ছিল না।

ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্টের সামনে আসল প্রশ্নগুলি ছিল :—(১) জার্মানীতে কেবলমাত্র রাজনৈতিক ঐক্যই এই বিপ্লবের লক্ষ্য হবে কিনা। র‍্যাডিক্যাল বা চরমপন্থীরা সমাজ বিপ্লবের দাবী তুলেছিল। কিন্তু তারা ছিল সংখ্যালঘু। বেশীরভাগ সদস্য জার্মানীর প্রচলিত রাষ্ট্রব্যবস্থাকে অক্ষত রেখে একটি যুক্তরাষ্ট্র বা federation গঠনের পক্ষপাতী ছিল। জার্মানীর বিভিন্ন রাজ্যের শাসকদের অধিকারকে তারা নস্যাৎ করে জটিলতা বাড়াতে চায়নি। তাদের আশা ছিল যে, নির্বাচিত ফ্রাঙ্কফুর্টের কেন্দ্রীয় পার্লামেন্ট ধীরে ধীরে জার্মান রাজ্যগুলিকে তার অধীনে সংযুক্ত করতে পারবে। জার্মানীতে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবীকে বেশীর ভাগ সদস্য অবাস্তব বলে নাকচ করে দেয়। শেষ পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধ জার্মানীতে জার্মান অঙ্গরাজ্যগুলির বর্তমান অস্তিত্ব

ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্টের কার্যকলাপ

থাকবে কিনা এই প্রশ্নে সদস্যদের মধ্যে গভীর বিভেদ দেখা দেয়। দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠীগুলি তাদের নিজ নিজ রাজ্যের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার চেষ্টা করে। ফলে কেন্দ্রীয়তা ও প্রাদেশিকতার মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। (২) জার্মানীতে রাজতন্ত্র অথবা প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হবে এবিষয়ে তীব্র বিতর্ক আরম্ভ হয়। অবশেষে সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের পক্ষে অধিকাংশ সদস্য মত প্রকাশ করায়, প্রজাতন্ত্র গঠনের প্রস্তাব বর্জিত হয়। (৩) এখন সমস্যা দেখা দেয় যে, নবগঠিত জার্মানীর সীমা কিভাবে স্থির করা হবে। গ্রেট জার্মান গোষ্ঠী দাবী করে থাকে যে, অষ্ট্রিয়া ও তার সাম্রাজ্যের অ-জার্মান প্রদেশগুলি নিয়ে জার্মানীর সীমা স্থির করতে হবে। লিটল জার্মান গোষ্ঠী এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করে। কারণ অষ্ট্রিয়ার সাম্রাজ্য জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত হলে এই সাম্রাজ্যের অ-জার্মান চেক, স্লাভ, মাডিয়ার, ক্রোট প্রভৃতি জাতিগুলিও জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত হত। তার ফলে জার্মান জাতীয়তাবাদ ক্ষতিগ্রস্থ হত। তাছাড়া অষ্ট্রিয়ার সম্রাটই তাহলে জার্মান সম্রাট হতেন। শেষ পর্যন্ত এই মত পরিত্যক্ত হয়। একমাত্র জার্মান ভাষাভাষী অঞ্চল নিয়ে নব জার্মান রাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ

করা হয়। এর অর্থ এই ছিল যে, অষ্ট্রিয়া জার্মানীর যে অংশের ওপর আধিপত্য রেখেছিল অষ্ট্রিয়ার হস্তচ্যুত হয়ে প্রস্তাবিত জার্মান রাষ্ট্রের সঙ্গে সংযুক্ত হবে। (৪) জার্মানীর আঞ্চলিক রাজ্যগুলির বিলুপ্তি ঘোষণা না করলেও ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্ট এই সিদ্ধান্ত নেয় যে, জাতীয় পার্লামেন্টের গঠিত সংবিধান জার্মানীর সার্বভৌম সংবিধান রূপে বিবেচিত হবে।কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টের আইন জার্মানীর সর্বত্র সার্বভৌম আইন হিসেবে স্বীকৃত হবে। শেষ পর্যন্ত বহু বির্তকের পর ঐক্যবদ্ধ জার্মানীর সাংবিধানিক রাজপদ প্রাশিয়ার রাজা চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়ামকে দেওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ইতিমধ্যে শ্লেজভিগ ও হলষ্টিন সমস্যা নিয়ে পার্লামেন্ট ব্যস্ত হয়ে পড়ে। শ্লেজভিগ ও হলষ্টিন ছিল জার্মানী ও ডেনমার্কের মধ্যে অবস্থিত দুটি ডাচি বা প্রদেশ। এই দুটি স্থানে জার্মান ও ডেন জাতির লোকেরা বসবাস করত। ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্টের অধীনে জার্মানীর ঐক্যের সম্ভাবনা দেখা দিলে, এই দুটি প্রদেশের অধীনে জার্মানরা জার্মানীর সঙ্গে এই দুই প্রদেশের সংযুক্তি দাবী করে।

শ্লেজভিগ ও হলষ্টিন সমস্যা

কিন্তু ডেনমার্ক এবং ইওরোপীয় শক্তিগুলির বিরোধিতার জন্যে প্রাশিয়া রাজ চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়াম আপাততঃ ডেনমার্কের অধীনে এই দুই প্রদেশ রাখার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি ডেনমার্কের সঙ্গে এই মর্মে ম্যালমো চুক্তি (Treaty of Malmo) সম্পাদন করেন। ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্ট ফ্রেডারিক উইলিয়ামকে সন্তুষ্ট রাখার জন্যে ম্যালমো চুক্তি অনুমোদন করে। ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্টের বিরুদ্ধে জার্মানীর জনমত চলে যায়।

ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্টের সদস্যরা প্রায় এক বছর কাল তর্ক-বিতর্কে অতিবাহিত করার পর, ঐক্যবদ্ধ জার্মানীর সিংহাসন গ্রহণের জন্যে প্রাশিয়া রাজ চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়ামকে অনুরোধ

ফ্রাঙ্কফুর্ট প্রস্তাব প্রাশিয়া রাজ কর্তৃক নাকচ

জানায়। কিন্তু প্রাশিয়া রাজ চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়াম এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। (১) তিনি স্বর্গীয় অধিকার নীতিতে আস্থাশীল ছিলেন। তিনি ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্টের নিকট থেকে জার্মানীর সাংবিধানিক রাজপদ গ্রহণে ইচ্ছুক ছিলেন না। তিনি বলেন যে, এইরূপ সিংহাসনকে তিনি "কুকুরের গলাবন্ধনী" (dog collar) বলে মনে করেন।ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্টের সদস্যদের তিনি নিম্ন শ্রেণীর লোক বলে মনে করতেন। এদের হাত থেকে রাজমুকুট নিতে তিনি রাজী ছিলেন না। তিনি বলেন যে, "ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্টের প্রস্তাব গ্রহণ করলে তিনি ১৮৪৮ খ্রীঃ বিপ্লবের নায়কদের ভূমিদাসে পরিণত হবেন।"[১] (২) ইওরোপীয় রাজশক্তিগুলি বংশানুক্রমিক অধিকারে বিশ্বাস করত। এই সকল রাজার মতের বিরুদ্ধে প্রাশিয়ার রাজা ফ্রাঙ্কফুর্ট প্রস্তাব গ্রহণে সাহস করেননি। (৩) জার্মানীর ৪টি বৃহৎ রাজ্যের রাজারা যথা হ্যানোভার, স্যাক্সনী, উটেমবার্গ ও ব্যাভেরিয়া ফ্রাঙ্কফুর্টের প্রস্তাবে সম্মতি দেয়নি। (৪) বিশেষতঃ অষ্ট্রিয়ার সম্রাট ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্টের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ঘোর আপত্তি জানান। তিনি ঘোষণা করেন যে, ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্ট ঘোষিত জার্মানীর সীমানাকে অষ্ট্রিয়া কখনও স্বীকার করবে না। এই সীমানার ভেতর অষ্ট্রিয়া তাঁর রাজ্য পড়লে অষ্ট্রিয়া ছাড়বে না। এমতাবস্থায় যদি চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়াম ফ্রাঙ্কফুর্ট প্রস্তাব গ্রহণ করতেন তাঁকে অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধের ঝুঁকি নিতে হত। এই সকল কারণে প্রাশিয়ার রাজা চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়াম ফ্রাঙ্কফুর্ট প্রস্তাব নাকচ করেন।

প্রাশিয়ার রাজা ফ্রাঙ্কফুর্ট প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলে প্রাশিয়ার প্রতিনিধিরা ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্ট ত্যাগ করে। ব্যাভেরিয়া প্রভৃতি ৪টি রাজ্যের প্রতিনিধিরা আগেই এই সভা ত্যাগ করেছিল।

ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্টের পতন

ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্টের অবশিষ্ট ১৩০ জন সদস্য এতে না দমে সংবিধান অনুসারে জার্মানীর জাতীয় পার্লামেন্টের নির্বাচন অনুষ্ঠানের নোটিশ দেয়। কিন্তু প্রাশিয়া ও উটেমবার্গের প্রেরিত সেনাদল ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্ট ভেঙে

দেয়।[১] অষ্ট্রিয়াও এই পার্লামেন্ট ভাঙতে এগিয়ে আসে। ফলে ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্টের পতন ঘটে।

ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্টের মাধ্যমে জার্মানীর গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক উপায়ে ঐক্যবদ্ধ হবার প্রচেষ্টা বিফল হওয়ার কারণ হিসেবে বলা যায় যে ঃ—(১) ন্যায্য অধিকার ও বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের যুগের চিন্তাধারা অনুযায়ী ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্টের কোন বৈধ অধিকার ছিল না। এটি ছিল একটি বিপ্লবী পার্লামেন্ট। শান্তিপূর্ণভাবে, আইনসম্মত পথে স্থাপিত হয় নি। এজন্য জার্মানীর রাজ্য সরকারগুলি এই পার্লামেন্টের প্রস্তাবকে মানতে বাধ্য ছিল না। (২) জার্মানীর রাজ্য সরকারগুলির সঙ্গে প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পর্ক কি হবে এ সম্পর্কে ফ্রাঙ্কফুর্ট সংবিধান পরিষ্কার ছিল না। জার্মানীর বৃহৎ রাজ্যগুলি যথা ব্যাভেরিয়া, প্রাশিয়া, হ্যানোভার প্রভৃতিতে স্বাতন্ত্রবাদ তীব্র ছিল। ফলে বৃহৎ রাজ্যগুলি যথা ব্যাভেরিয়া প্রভৃতির সহযোগিতা পাওয়া যায়নি। জার্মানীর ৪টি বৃহৎ রাজ্য যথা ব্যাভেরিয়া, সাক্সনী, উটেনবার্গ ও হ্যানোভার ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্ট স্বীকার করে নি। (৩) আসলে জার্মান জাতীয়তাবাদের মধ্যে মত বিরোধ ছিল। প্রজাতন্ত্রীরা সংখ্যালঘু হলেও তারা সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের বিরোধিতা করে। এদিকে গ্রেট জার্মান গোষ্ঠী অষ্ট্রিয়াকেই ঐক্যবদ্ধ জার্মানীব নেতৃত্ব দিতে চায়। প্রস্তাবিত জার্মান রাষ্ট্রের সীমা নিয়ে সদস্যদের মধ্যে মত বিরোধ ছিল। গ্রেট জার্মান গোষ্ঠী অষ্ট্রিয়ার অন্তর্ভুক্তি সমর্থন করত। অষ্ট্রিয়া ফ্রাঙ্কফুর্ট সংবিধান মেনে জার্মানী ত্যাগ করতে বাজী ছিল না। সুতরাং প্রাশিয়ার রাজ ফ্রাঙ্কফুর্ট সংবিধান গ্রহণ করলে তাকে অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধের ঝুঁকি নিতে হত। প্রাশিয়ার রাজা চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়ামের সেই সাহস ছিল না। (৪) র‍্যাডিক্যাল বা চরমপন্থী গোষ্ঠী মনে করত যে, জনসাধারণের হাতে ক্ষমতা পৌঁছিয়ে না দিলে এবং সম্পত্তির অধিকার হরণ না করলে শুধুমাত্র জার্মানীর ঐক্যের দ্বারা কোন কাজ হবে না। র‍্যাডিক্যালরা সামাজিক বিপ্লব চাইত। র‍্যাডিক্যাল গোষ্ঠীর মত গৃহীত না হলে তারা ফ্রাঙ্কফুর্টের সভার প্রতি আস্থা হারায়। (৫) ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্টের সিদ্ধান্ত মানতে বাধ্য করবার মত কোন ক্ষমতা এই সভার ছিল না। এই সভার অধীনে কোন সৈন্য বা পুলিশ ছিল না। এর হাতে ছিল একমাত্র নৈতিক ক্ষমতা। কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণে কালহরণের ফলে এই পার্লামেন্ট সম্পর্কে জনসাধারণের আগ্রহ বিনষ্ট হয়। এই পার্লামেন্টের সদস্যরা ছিল মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী। এরা তত্ত্বকথা ও বক্তৃতায় দক্ষ হলেও কূট রাজনীতিতে দক্ষ ছিল না। এই পার্লামেন্টে শ্রমিকদের কোন প্রতিনিধি ছিল না। শ্রমিক শ্রেণীর মঙ্গলের জন্যে এই পার্লামেন্ট কোন আইন করেনি। কেমব্রিজ ঐতিহাসিকের মতে, শ্রমিক শ্রেণীর সহযোগিতা না পাওয়ার ফলে এই সভার মস্তিষ্ক থাকলেও পেশী ছিল না। সুতরাং রাজশক্তির বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগের দরকার হলে এই পার্লামেন্ট সফল হয়নি। জার্মানীর রাজাদের পেশাদারী বেতনভোগী সৈন্যকে দমিয়ে ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্টের সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করা ছিল প্রায় অসম্ভব। এই সকল কারণে ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্টের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে জার্মানীর ঐক্যলাভের প্রচেষ্টা ব্যাহত হয় এবং বিসমার্কের "রক্ত ও লৌহ নীতি"র (Blood and Iron Policy) প্রয়োজন হয়। ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্ট বিফল হলেও, এই পার্লামেন্টের কার্যাবলী এই কথা প্রমাণ করে যে, জার্মানীর ঐক্য স্থাপন করা সম্ভবপর এবং প্রাশিয়ার অধীনে তা সম্ভব হবে। জার্মানীর ভাবগত ঐক্যবোধ এই পার্লামেন্টের কাজের দ্বারা এগিয়ে যায়।

ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্টের পতনের কারণ

১· J. A. S. Grenville. P. 144.

ঊনবিংশ অধ্যায়
বিসমার্কের নেতৃত্বে জার্মানীর ঐক্য এবং বিসমার্কের পররাষ্ট্রনীতি (১৮৬২-৭০ খ্রীঃ)
(Unification of Germany under Bismark and the Foreign Policy of Bismark, 1862-70)

জার্মানীর ঐক্য স্থাপনে বিসমার্কের প্রস্তুতি (Preparation for German Unification by Bismark) : ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্টের বিফলতার ফলে শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক পথে জার্মানীর ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা বিফল হয়। ইতিহাসের দেবীর নির্দেশে বিসমার্ক তাঁর "রক্ত ও লৌহ" (Blood and Iron) নীতির দ্বারা জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করেন।

উদাবতন্ত্রীদেব সহিত সংঘাত : বক্ত ও লৌহ নীতি ঘোষণা

নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, জার্মানীর ঐক্য ছিল দুই বিশেষ ধারার আন্দোলনের ফল। একদিকে ঐক্যবাদী, জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক আন্দোলন জার্মানীর বিভিন্ন রাজ্যের বংশানুক্রমিক রাজাদের শিকড় আলগা করে দেয়। জার্মানীর ঐক্যই যে জার্মানীর ভবিতব্য সেই দৃষ্টিভঙ্গী গঠন করে। এই দিক থেকে জার্মানীর ঐক্য ছিল ইতিহাসের গতির পরিণাম। অপর দিকে ১৬শ শতকের ধর্ম বিপ্লব বা রিফর্মেশানের যুগ থেকে সমগ্র জার্মানীর ওপর একাধিপত্য স্থাপনের জন্যে জার্মান বাজবংশগুলির কূটনৈতিক ও সশস্ত্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা দীর্ঘকাল ধরে চলছিল। শেষ পর্যন্ত উদীয়মান প্রাশিয়ার জোহেনজোলার্ন বংশের সঙ্গে ক্ষয়িষ্ণু অষ্ট্রিয়ার হ্যাপসবার্গ বংশের চূড়ান্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা জার্মানীর ঐক্যকে প্রতিষ্ঠিত করে। একদিক থেকে এই দুই ধাবা পরস্পর বিরোধী হলেও তাদের লক্ষ্য ছিল এক। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে এই শেষ ধারাটির শক্তি লাভ ঘটে ও পরিণামে প্রাশিয়ার অধীনে জার্মানীর ঐক্য স্থাপিত হয়।

প্রাশিয়ার রাজা প্রথম উইলিয়ামের সঙ্গে তাঁর পার্লামেন্টের উদারপন্থী সদস্যদের ১৮৬২ খ্রীঃ প্রাশিয়ার সেনাদল সংগঠন সম্পর্কে ঘোর মতভেদ হয়। পার্লামেন্ট প্রাশিয়ার রাজাকে সামরিক সংস্কারের জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্ধ করতে অস্বীকার করে। এই পরিস্থিতিতে প্রথম উইলিয়াম বিসমার্ককে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ১৮৬২ খ্রীঃ নিয়োগ করেন। বিসমার্ক প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণের সময় বলেন যে, "তিনি কিছুতেই প্রাশিয়ার রাজশক্তির ক্ষমতা হ্রাস করতে দিবেন না।" বিসমার্ক এ বিষয়ে স্থির নিশ্চয় ছিলেন যে, প্রাশিয়ার রাজবংশের নেতৃত্বে এবং প্রাশিয়ার সামরিক ক্ষমতার দ্বারা জার্মানীর রাজ্যগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্যে যুদ্ধ নীতি গ্রহণের যৌক্তিকতা সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত ছিলেন। প্রাশীয় পার্লামেন্টে এক ঐতিহাসিক বক্তৃতায় তিনি বলেন যে, "জার্মানী প্রাশিয়ার উদারতন্ত্রের দিকে তাকিয়ে নেই। প্রাশিয়ার শক্তির দিকেই তাকিয়ে আছে। বিতর্ক বা ভোটের দ্বারা জাতীয় সমস্যার (অর্থাৎ জার্মানীর ঐক্য) সমাধান হবে না, রক্ত ও লৌহের দ্বারা একমাত্র সমাধান হবে।" বিসমার্ক আরও বলেন যে, "জার্মানী একটি ছোট দেশ। অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া দুই শক্তির স্থান এই দেশে সঙ্কুলান হবে না। সুতরাং প্রাশিয়ার স্বার্থে অষ্ট্রিয়াকে জার্মানী ত্যাগ করতে হবে।" এজন্য দরকার হলে যুদ্ধ করার নীতি গ্রহণে তিনি অনিচ্ছুক নন, একথা বিসমার্ক স্পষ্টভাবে বলেন। বিসমার্ক পার্লামেন্টের সাংবিধানিক বিরোধিতা অগ্রাহ্য করে

প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করেন। প্রাশিয়ার সেনাদলকে বিখ্যাত সমর বিজ্ঞানী ফন মোল্টকির (Von Moltke) সাহায্যে এক শক্তিশালী সমরযন্ত্রে পরিণত করেন।

ঐতিহাসিক এরিখ আইকের (Erich Eyek) মতে, বিসমার্ক একথা জানতেন যে, যতদিন জার্মান রাজ্যগুলি ভিয়েনা চুক্তির দ্বারা স্থাপিত বুন্ড বা কেন্দ্রীয় সভা ও অষ্ট্রিয়ার নেতৃত্বের প্রতি আস্থাশীল থাকবে, ততদিন প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মানীর ঐক্য স্থাপন সম্ভব হবে না।[১] এজন্য তিনি বুন্ডের সভায় অষ্ট্রিয়ার মর্যাদা নষ্ট করে অষ্ট্রিয়ার প্রতি জার্মান রাজ্যগুলির আস্থা নষ্ট করার নীতি নেন। অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে বুন্ডের সভায় তিনি প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মানীর ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিকে সংগঠনের চেষ্টা করেন। এছাড়া বিভিন্ন ইওরোপীয় শক্তির সঙ্গে প্রাশিয়ার মিত্রতা স্থাপন করে তিনি কূটনৈতিক দিক থেকে অষ্ট্রিয়াকে মিত্রহীন করার চেষ্টা করেন। বিসমার্ক এরূপ সতর্কতার সঙ্গে (১৮৬২-১৮৬৪ খ্রীঃ) তাঁর কূটনীতি পরিচালনা করেন যে, অষ্ট্রিয়া তাঁর আসল উদ্দেশ্য বুঝতে ব্যর্থ হয়। জার্মান বুন্ড বা কেন্দ্রীয় সভায় অষ্ট্রিয়ার জনপ্রিয়তা হ্রাসের উদ্দেশ্যে তিনি গণভোটের ভিত্তিতে জার্মান যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান সংশোধনের কথা বলেন। এর ফলে জার্মানীর ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির উৎসাহ বাড়ে। ১৮৬২ খ্রীঃ তিনি ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয় বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করে, ফ্রান্সের সঙ্গে প্রাশিয়ার মিত্রতার সোপান রচনা করেন। ১৮৬২ খ্রীঃ পোল জাতি স্বাধীনতা লাভের জন্যে রাশিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে, বিসমার্ক রাশিয়াকে এই বিদ্রোহ দমনে বিশেষ সাহায্য করেন। এভাবে রাশিয়া ও ফ্রান্স এই দুই বৃহৎ শক্তির মিত্রতা তিনি প্রাশিয়ার অনুকূলে পান।

১৮৬২ খ্রীঃ বিসমার্কের কূটনীতি—অষ্ট্রিয়ার মিত্রতাহীনতা

ডেনমার্কের সঙ্গে যুদ্ধ (The Danish War) : ১৮৬৩ খ্রীঃ বিসমার্কের মস্তিষ্কে তিনটি যুদ্ধের দ্বারা জার্মানীকে পুরোপুরি ঐক্যবদ্ধ করার কোন পূর্বপরিকল্পনা সম্ভবতঃ ছিল না। তবে এরকম কোন বৃহৎ পূর্ব-নির্দিষ্ট পরিকল্পনা না থাকলেও, মেইন নদীর উত্তর তীর পর্যন্ত উত্তর জার্মানীর ভূ-ভাগকে আপাততঃ প্রাশিয়ার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ করার জন্যে একটি বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা তাঁর মাথায় দীর্ঘকাল ধরে ছিল। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে তিনি একাধিক পন্থাকে ব্যবহার করার কথা ভাবেন। জার্মান ঐতিহাসিক Muller বলেছেন যে, "বিসমার্ক তিনটি যুদ্ধকে ঐক্যবদ্ধ জার্মানী প্রতিষ্ঠার এক অবিচ্ছিন্ন ঐতিহাসিক শর্ত" বলে গোড়ায় ভাবেন। কিন্তু এখন বিসমার্কের লেখা চিঠিপত্র ও অন্যান্য উপাদানের সাহায্যে ঐতিহাসিকরা অন্য সিদ্ধান্তে এসেছেন। বিসমার্ক কোন ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা দৈবশক্তি সম্পন্ন রাজনীতিবিদ ছিলেন না যে, তিনি রাজনীতিকে অঙ্কশাস্ত্রের মত নির্ভুল গণনা দ্বারা, ১৮৬২ খ্রীঃ আগেভাগেই তিনটি যুদ্ধের পরিকল্পনা তৈরি করে ফেলবেন। বিসমার্ক ছিলেন পরিস্থিতি বুঝে সঠিক সিদ্ধান্ত তাৎক্ষণিকভাবে গ্রহণের ক্ষমতার অধিকারী। অগ্রগামী কলাকৌশল তাঁর তৈরি না থাকলেও, পরিস্থিতির সুযোগ নিতে তাঁর মত দক্ষ নেতা খুব কমই ছিলেন। তিনি নিজে বলেন, 'ধোপা যেমন একসঙ্গে আগুনে একাধিক ইস্ত্রি গরম করে কাপড় ইস্ত্রি করে, তিনি পরিস্থিতি বুঝে সেইরকম একাধিক পরিকল্পনা তৈরী করতেন। তারপর যেটি বেশী কার্যকরী মনে হত তা প্রয়োগ করতেন। (One must have always two irons in fire)। স্লেজভিগ-হলষ্টিন সমস্যাকে জার্মানীর ঐক্যের কাজে ব্যবহার ছিল তাঁর এই একসঙ্গে একাধিক পরিকল্পনা নীতির অন্যতম। ১৮৬৩ খ্রীঃ স্লেজভিগ ও হলষ্টিনের প্রশ্ন নিয়ে সঙ্কট দেখা দিলে, বিসমার্ক এই সমস্যাকে জার্মানীর ঐক্য স্থাপনের কাজে ব্যবহার করেন। স্লেজভিগ্ প্রদেশে কিছু সংখ্যক ডেন

১· Eyck—Bismarck, Grenville—P 284.

শ্লেজভিগ ও হলষ্টিন সমস্যা

বসবাস করত। হলষ্টিনের অধিবাসীরা ছিল বেশীরভাগ জার্মান। একটি পুরাতন চুক্তি অনুসারে ডেনমার্কের রাজবংশ, এই দুটি ডাচির ওপর স্বতন্ত্রভাবে রাজত্ব করতেন। এই চুক্তি অনুসারে তাঁরা এই দুই ডাচিকে ডেনমার্কের সঙ্গে সংযুক্ত করতে পারতেন না। ডেনমার্কের রাজা সপ্তম ফ্রেডারিকের অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হলে, তাঁর বংশ লোপ হয়। নবম ক্রিশ্চিয়ান তাঁর পর ডেনমার্কের সিংহাসনে বসেন। লন্ডনের প্রোটোকল ১৮৫১ খ্রীঃ অনুসারে তিনিও এই দুটি ডাচিকে স্বতন্ত্রভাবে শাসন করতে অঙ্গীকাব দেন। কিন্তু ড্যানিশ জাতীয়তাবাদীরা এই দুটি ডাচিকে ডেনমার্কের সঙ্গে সংযুক্ত করার দাবী জানাতে থাকে। ডেনমার্কের রাজা নবম ক্রিশ্চিয়ান লন্ডন প্রোটোকল ভেঙে এই দুটি ডাচিকে ১৮৬৩ খ্রীঃ ডেনমার্কের সঙ্গে সংযুক্ত করেন।

ডেন সরকারের উপরোক্ত কাজের ফলে জার্মানীতে তীব্র জাতীয়তাবাদী প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। কারণ জার্মান অধ্যুষিত হলষ্টিন প্রদেশ ছিল জার্মান বুন্ডের বা জার্মান রাষ্ট্রমন্ডলের সদস্য। কিন্তু শ্লেজভিগ জার্মান বুন্ডের সদস্য ছিল না। জাতীয়তাবাদী জার্মানদের মতে শ্লেজভিগ ছিল হলষ্টিনের অন্তর্গত প্রদেশ। এজন্য আলাদা করে তার বুন্ডের সদস্যপদ ভাবা হয়নি। অপরদিকে ড্যানিশ জাতীয়তাবাদীদের মতে শ্লেজভিগ অবশ্যই ডেনমার্কের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত ছিল। কারণ এই অঞ্চলটি হল ডেন-প্রধান। সেই সূত্রে হলষ্টিনের ওপরেও ডেনমার্ক দাবী জানায়। জার্মান বুন্ড বা রাষ্ট্রমণ্ডলের সভায় শ্লেজভিগ ও হলষ্টিনকে ডেনমার্কের কবল থেকে মুক্ত করে

অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে সন্ধি

জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত করার সঙ্কল্প নেওয়া হয়। বিসমার্ক জার্মান জাতীয়তাবাদের এই বিস্ফোরণকে সুকৌশলে প্রাশিয়ার অনুকূলে ব্যবহার করেন। তিনি ডেনমার্কের রাজা নবম ক্রিশ্চিয়ানকে লন্ডন চুক্তি মেনে চলতে আহ্বান জানান। ক্রিশ্চিয়ান তা অগ্রাহ্য করে ডাচি দুটি ডেনমার্কের সঙ্গে যুক্ত করলে ডেনমার্ক লন্ডনের সন্ধি ভাঙল বলে বিসমার্ক ঘোষণা করেন। বিসমার্ক ছিলেন কূটনীতির যাদুকর। জার্মান বুন্ডের সিদ্ধান্ত ছিল যে, প্রাশিয়ার সেনাদল বুন্ডের নির্দেশে ডেনমার্ককে পরাজিত করে ডাচি দুটি ছিনিয়ে নিবে। তারপর বুন্ড এই ডাচি দুটি জার্মান অভিজাত ডিউক অব অগাষ্টেনবার্গকে দিবে। কারণ বংশগত সূত্রে এই ডাচি দুটির ওপর অগাষ্টেনবার্গের ডিউকেরও কিছু দাবী ছিল। বিসমার্ক বুন্ডের এই ইচ্ছাপূরণে রাজী ছিলেন না। তাঁর পরিকল্পনা ছিল আপাততঃ অষ্ট্রিয়াকে নিজ পক্ষে নিয়ে যুদ্ধ দ্বারা ডাচি দুটি দখল করা। ডাচি দুটির ওপর বুন্ডের এক্তিয়ারকে নস্যাৎ করে উভয়ের মধ্যে তা ভাগ করে নেওয়া। এজন্য তিনি অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে এক সন্ধি স্বাক্ষর করেন। এই সন্ধির দ্বারা স্থির হয় যে, বুন্ড বা জার্মান জাতীয় সভার বাইরে অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া দ্বি-পাক্ষিক ভিত্তিতে ডাচি দুটির সমস্যার সমাধান করবে।

অতঃপর প্রাশিয় ও অষ্ট্রিয় যুগ্মবাহিনী ডেনমার্কের সঙ্গে যুদ্ধে ডেনমার্ককে পরাজিত করে ডাচি দুটি অধিকার করে। পোল বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত থাকায় রাশিয়া এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে

ডেনমার্কের পরাজয় ও গ্যাষ্টিনের সন্ধি

অসমর্থ হয়। বিসমার্ক কূটনৈতিক চাল দ্বারা ফ্রান্সকে নিরপেক্ষ রাখেন।[১] ডেনমার্ককে পরাস্ত করে ডেনরাজ নবম ক্রিশ্চিয়ানের হাত থেকে প্রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়ার যুগ্ম অধিকারে, ডাচি দুটিকে বিসমার্ক আনেন। অতঃপর অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার মধ্যে গ্যাষ্টিনের সন্ধি, ১৮৬৫ খ্রীঃ দ্বারা (Convention of Gastein) আপাততঃ শ্লেজভিগ প্রাশিয়ার অধিকারে এবং হলষ্টিন অষ্ট্রিয়ার অধিকারে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। হলষ্টিনের অন্তর্গত লাউয়েনবার্গ অঞ্চল অর্থের বিনিময়ে অষ্ট্রিয়া প্রাশিয়াকে ছেড়ে দেয়। গ্যাষ্টিনের সন্ধির দ্বারা অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া স্থির করে যে, ভবিষ্যতে দ্বি-পাক্ষিক ভিত্তিতে ডাচি দুটি সম্পর্কে পাকা ব্যবস্থা করা হবে। অষ্ট্রিয়া এই ডাচি দুইটির প্রশ্ন জার্মানীর কেন্দ্রীয় সভা ও বুন্ডে উত্থাপন করবে না।

১· Eyck—Bismark. P. 88.

গ্যাষ্টিনের চুক্তির বিশেষ গুরুত্ব ছিল। জার্মানীর কেন্দ্রীয় সভা বা বুন্ডের অভিমতের বিরুদ্ধে ডাচি দুটিকে অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া নিজেদের মধ্যে বিভক্ত করায় বুন্ডেব সভায় অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ঘোর প্রতিবাদ ওঠে। কারণ অষ্ট্রিয়া ছিল জার্মান বুন্ড বা রাষ্ট্রমণ্ডলের সভাপতি। তার এই স্বার্থপর আচরণ তার মর্যাদা নষ্ট করে। ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির তীব্র প্রতিবাদের ফলে অষ্ট্রিয়া উত্যক্ত হয়ে পড়ে এবং গ্যাষ্টিনের সন্ধির একতরফা পরিবর্তনের চেষ্টা করে। অষ্ট্রিয়া বুন্ড বা কেন্দ্রীয় সভার নিকট প্রস্তাব দেয় যে, ডাচি দুটি ডিউক অব অগাষ্টেনবার্গকে দেওয়া হোক। অষ্ট্রিয়া এই প্রস্তাব দিলে বিসমার্ক অষ্ট্রিয়াকে জানিয়ে দেন যে, গ্যাষ্টিনের সন্ধির দ্বারা অষ্ট্রিয়া অঙ্গীকারবদ্ধ ছিল যে, ডাচি দুটির প্রশ্ন কেন্দ্রীয় সভায় তোলা হবে না। এখন এই প্রশ্ন কেন্দ্রীয় সভায় তুলে অষ্ট্রিয়া সন্ধির শর্ত ভাঙল। বিসমার্ক গ্যাষ্টিনের সন্ধি ভাঙার দায়ে অষ্ট্রিয়াকে অভিযুক্ত করেন। এজন্য অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রাশিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করে। এভাবে বিসমার্ক স্লেজভিগ্ ও হলষ্টিন সমস্যাকে অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে প্রাশিয়ার যুদ্ধের উপলক্ষ হিসেবে ব্যবহার করেন। এই কারণে গ্যাষ্টিনের সন্ধির পর বিসমার্ক ঘোষণা করেন যে, "আমি মাত্র কাগজ দ্বারা ফাটল বন্ধ করেছি; আমি আগামী দিনের জন্যে বড় ফাটল সৃষ্টির চেষ্টায় আছি।"[১]

গ্যাষ্টিনেব সন্ধিব গুরুত্ব

ঐতিহাসিক এ· জে· পি· টেইলারের মতে, গ্যাষ্টিনেব সন্ধির অব হিত পরেই বিসমার্ক অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধের জন্যে কূটনৈতিক ও সামরিক প্রস্তুতি আরম্ভ করেন। বিসমার্কের গুণগ্রাহী ঐতিহাসিকদের মতে, বিসমার্ক তাঁর মন্ত্রীত্বের প্রথম দিন থেকেই অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধকে অবশ্যম্ভাবী মনে করতেন। সেজন্যে তিনি আগাগোড়া এই যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন। আসলে বিসমার্ক প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্যে যুদ্ধকেই বা "রক্ত-লৌহ" নীতিকেই একমাত্র পন্থা ভাবতেন তা নয়। যুদ্ধ ছাড়া অন্য উপায়ে যদি অষ্ট্রিয়া নেতৃত্বের দাবী ত্যাগ করত তাতেও বিসমার্ক রাজী ছিলেন। তিনি সর্বদাই আগুনে দুটি বা তিনটি ইস্ত্রি গরম করতেন। প্রয়োজনমত তার মধ্যে সঠিকটিকে ব্যবহার করতেন। ক্রমশঃ তিনি দেখেন যে, যুদ্ধের পথই যুক্তিযুক্ত। এজন্য তিনি অষ্ট্রিয়াকে মিত্রহীন করে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন। আপাততঃ তিনি তাঁর কূটনৈতিক জাল বিস্তার করে অষ্ট্রিয়াকে মিত্রহীন করার জন্যে সর্বপ্রকার চেষ্টা করেন। তিনি বিয়ারিৎসের গোপন চুক্তির (Pact of Biarritz) দ্বারা আসন্ন অষ্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধে ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের নিরপেক্ষতা লাভ করেন। (বিশদ বিবরণ পৃঃ দেখ)। ঐতিহাসিক গ্রেনভিলের মতে বিসমার্ক, তৃতীয় নেপোলিয়নকে একথা বুঝান যে জার্মান জাতীয় রাষ্ট্র গঠিত হলে, ফ্রান্স যদি নিরপেক্ষ থাকে, তবে ফ্রান্সও লাভবান হবে। জার্মান সীমান্তে যেখানে ফরাসী ভাষী লোকগোষ্ঠী আছে, সেই অঞ্চল হয়ত ফ্রান্সে যুক্ত হতে পারে। যদিও বিসমার্ক কোন সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দেননি, তবে ইঙ্গিতটি ছিল যে হয় ফরাসী ভাষী বেলজিয়াম অথবা রাইন সীমান্তে লাক্সেনবুর্গ ফ্রান্সে যুক্ত হতে পারে। এ·জে·পি· টেইলার ও ডেভিড টমসনের মতে, নেপোলিয়ন তাঁর নিরপেক্ষতার জন্যে স্পষ্ট ভাষায় যে মূল্য দাবী করেন তা ছিল যে, ভিনিসিয়া প্রদেশ ইতালীকে ছেড়ে দিতে অষ্ট্রিয়াকে বাধ্য করাতে হবে।

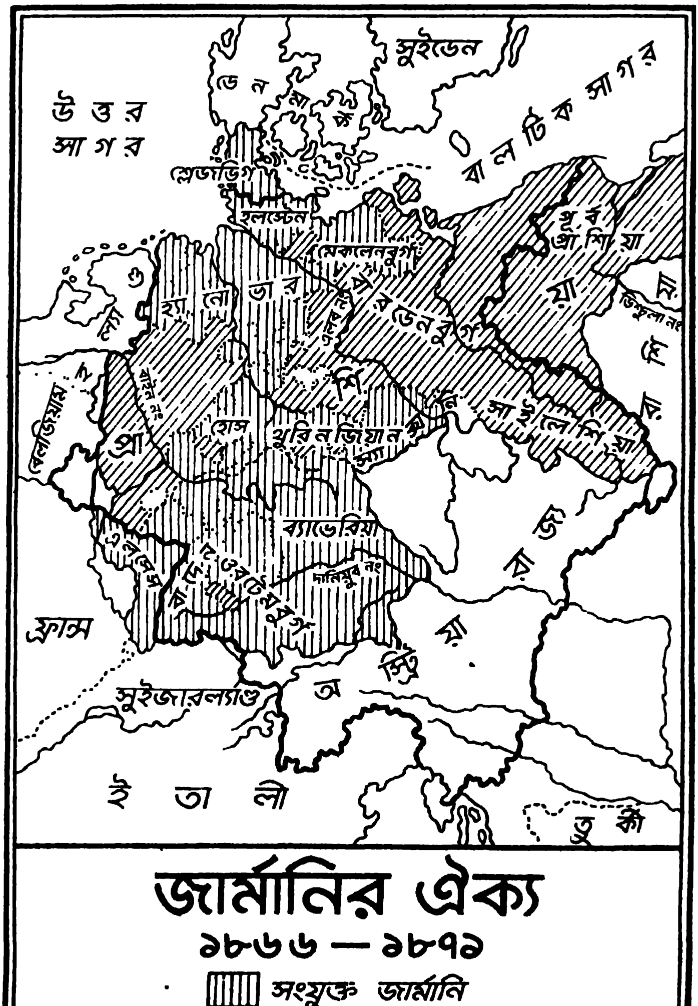
অষ্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধের প্রস্তুতি

যাই হোক, তৃতীয় নেপোলিয়নও মনে করেন যে, অষ্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হবে। তিনি এই যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করার যথেষ্ট সুযোগ পাবেন এবং রাইন অঞ্চলে ফ্রান্সের সীমান্ত পুনর্গঠনের সুযোগ পাবেন। বিসমার্ক ইতালীর সঙ্গে এক চুক্তির (৮-৯ই এপ্রিল, ১৮৬৬ খ্রীঃ) দ্বারা

[১] "I have prepared over the cracks; I am preparing for the coming fissure."

A. J. P. Taylor—Struggle for Mastery of Europe. P. 157-158. See foot notes on, P. 157.

ইতালীকে ভিনিসিয়া ছেড়ে দেওয়ার শর্তে প্রাশিয়ার পক্ষে ইতালীর মিত্রতা লাভ করেন। ইতালীর রাজা ভিক্টর ইম্যানুয়েল অবশ্য বলেন যে, তিনি শুধু প্রাশিয়ার কথা বিশ্বাস করেন না। নেপোলিয়নকে গ্যারান্টি দিতে হবে যে যুদ্ধের পর অস্ট্রো-প্রাশিয় সন্ধির শর্ত হিসেবে অস্ট্রিয়া ইতালীকে ভিনিসিয়া ছাড়বে। নেপোলিয়ন সেই গ্যারান্টি দেন। ফলে প্রাশিয়া ও ইতালী সন্ধির দ্বারা একই সঙ্গে অস্ট্রিয়াকে আক্রমণে প্রতিশ্রুতি নেয়। এদিকে ক্রিমিয়ার যুদ্ধের সময় অস্ট্রিয়ার



জার্মানির ঐক্য
১৮৬৬ — ১৮৭১

শত্রুতাপূর্ণ আচরণের জন্যে রাশিয়া অস্ট্রিয়ার ওপর বিরক্ত ছিল। পোল্যাণ্ডের বিদ্রোহের সময় রাশিয়াকে প্রাশিয়ার উদার সাহায্যের কথা রুশ জার মনে রেখেছিলেন। সুতরাং অস্ট্রো-প্রাশিয়

যুদ্ধের সময় রাশিয়ার নিরপেক্ষতাও বিসমার্ক লাভ করেন। ফলে ইওরোপ মহাদেশে অষ্ট্রিয়া মিত্রহীন হয়ে পড়ে।

অষ্ট্রিয়াকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মিত্রহীন করার পর, বিসমার্ক জার্মান বুন্ডের অন্য জার্মান সদস্যদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্যে কূটনীতি প্রয়োগ করেন। যদিও ব্যক্তিগতভাবে তিনি জার্মানীর ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলিকে হেয় জ্ঞান করতেন, তথাপি জার্মানীর জনমতকে অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে কাজে লাগাতে তিনি ভুলেননি। এজন্য তিনি প্রস্তাব দেন যে, এখন জার্মানীতে যে জাতীয় সভা আছে তার সদস্য জার্মানীর রাজারা। এর বিকল্প হিসেবে তিনি প্রস্তাব দেন যে, বর্তমান বুন্ড ভেঙে দিয়ে, গণভোটের ভিত্তিতে জার্মানীর জাতীয় পার্লামেন্ট ও সংবিধান গঠনের ব্যবস্থা করা হোক। বিসমার্ক জানতেন যে, অষ্ট্রিয়া কখনও এই প্রস্তাবে রাজী হবে না। কারণ জার্মানীতে গণভোট প্রবর্তিত হলে অষ্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যে ভাঙন দেখা দিত। স্বভাবতঃ অষ্ট্রিয়া এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে। ফলে বিসমার্ক ঘোষণা করেন যে, অতঃপর প্রাশিয়া জার্মানীর বুন্ড বা জাতীয় সভার সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে না। কারণ এতে প্রকৃত গণতন্ত্র নেই। জার্মানীর সকল রাষ্ট্রকে এই সভা ত্যাগ করে, প্রাশিয়ার সঙ্গে যোগ দিয়ে জার্মানীর নতুন সংবিধান চালু করার জন্যে বিসমার্ক আহ্বান জানান। যে সকল রাষ্ট্র এই আহ্বান উপেক্ষা করবে তাদের শত্রুদেশ হিসেবে গণ্য করার হুমকি দেওয়া হয়। অষ্ট্রিয়া তার জনপ্রিয়তা পুনরুদ্ধারের জন্যে গ্যাষ্টিনের সন্ধি ভেঙে শ্লেজভিগ-হলস্টিন প্রশ্নটি বুন্ডের সভায় পেশ করে। অষ্ট্রিয়া শ্লেজভিগ্ ও হলষ্টিনের প্রশ্ন জার্মান জাতীয় সভায় উত্থাপন করলে, গ্যাষ্টিনের সন্ধিভঙ্গের জন্যে প্রাশিয়া অষ্ট্রিয়াকে দায়ী করে। প্রাশিয় সেনাদল হলষ্টিন থেকে অষ্ট্রিয় সেনাদলকে বিতাড়িত করে হলষ্টিন অধিকার করে। ক্রুদ্ধ অষ্ট্রিয়া জার্মান জাতীয় সভায় প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রস্তাব আনলে তা সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হয়। জার্মানীর অন্ততঃ ৯টি রাজ্য যথা, ব্যাভেরিয়া, স্যাক্সনী, হ্যানোভার, উর্টেমবার্গ প্রভৃতি অষ্ট্রিয়ার পক্ষ নেয়। এর পর বিসমার্ক ঘোষণা করেন যে, প্রাশিয়া জার্মান জাতীয় সভার অস্তিত্ব স্বীকার করবে না।

অষ্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধ এবং প্রাগের সন্ধি

এর ফলে অষ্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধ (১৮৬৬ খ্রীঃ) আরম্ভ হয়। মাত্র সাত সপ্তাহের মধ্যে প্রাশিয়ার সমরনায়ক ফন মোল্টকি এবং সেনাপতি ফন রুণ অষ্ট্রিয়া এবং তার সহযোগী জার্মান রাজ্যগুলিকে পরাস্ত করেন। ১৮৬৬ খ্রীঃ স্যাডোয়ার যুদ্ধে অষ্ট্রিয়ার চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে। অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা নগরীর পথ বিজয়ী প্রাশিয় সেনাদলের জন্যে উন্মুক্ত হয়। প্রাশিয়ার রাজা প্রথম উইলিয়াম ও তাঁর সেনাপতিমণ্ডলী ভিয়েনা অধিকারের জন্যে উদগ্র হলেও, বিসমার্ক তাঁদের অষ্ট্রিয়ার রাজ্যগ্রাস থেকে নিরস্ত করেন। তিনি অষ্ট্রিয়াকে সম্মানজনক ব্যবহার দ্বারা মিত্রভাবাপন্ন রাখতে ব্যস্ত হন। তিনি জানতেন যে, এক জার্মান রাষ্ট্র দ্বারা অপর এক জার্মান রাষ্ট্রের অপমান জার্মান জাতীয়তাবাদকে আহত করবে। অষ্ট্রিয়া এই অপমান সহজে ভুলবে না। তাছাড়া স্যাডোয়ার জয়ের ফলে তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য জার্মান রাষ্ট্রসঙ্ঘ থেকে অষ্ট্রিয়ার বহিষ্কার সিদ্ধ হয়। এরপর অষ্ট্রিয়াকে শত্রু ভাবা উচিত ছিল না। বিসমার্ক প্রাগের সন্ধির দ্বারা (১৮৬৬ খ্রীঃ) অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে শান্তি স্থাপন করেন। এই সন্ধির আলোচনার সময় তৃতীয় নেপোলিয়ন হস্তক্ষেপের চেষ্টা করলেও তা বিশেষ কার্যকরী হয়নি। ঐতিহাসিক সীম্যানের মতে, তৃতীয় নেপোলিয়নের হস্তক্ষেপের ফলে বিসমার্কের দুই জার্মানী (যথা জার্মানী ও অষ্ট্রিয়া) পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়। নেপোলিয়নের চাপে বিসমার্ককে তিন জার্মানী পরিকল্পনা (যথা, মেইন নদী পর্যন্ত প্রাশিয়ার নেতৃত্বে উত্তর জার্মানী; স্বাধীন দক্ষিণ জার্মান রাজ্যগুলি; অষ্ট্রিয়া) মেনে নিতে বাধ্য হন। প্রাগের সন্ধির দ্বারা স্থির হয় যে ঃ (১) অষ্ট্রিয়া, জার্মানী থেকে সরে দাঁড়াবে এবং জার্মানীর বুন্ড বা জাতীয় সংগঠনের অবলুপ্তিতে স্বীকৃতি দিবে। (২) মেইন নদীর উত্তরে অবস্থিত জার্মান

রাজ্যগুলিকে নিয়ে প্রাশিয়ার নেতৃত্বে উত্তর জার্মান কনফেডারেশনের গঠনকে অষ্ট্রিয়া স্বীকৃতি দিবে। (৩) মেইন নদীর দক্ষিণে অবস্থিত জার্মান রাজ্যগুলিকে নিয়ে দক্ষিণ জার্মান রাষ্ট্রসঙ্ঘ উত্তর জার্মানী থেকে পৃথক থাকবে। দক্ষিণ জার্মানীর আন্তর্জাতিক স্বীকতি থাকবে। (৪) অষ্ট্রিয়া যুদ্ধের জন্যে প্রাশিয়াকে ক্ষতিপূরণ দিবে। (৫) উত্তর জার্মানীর হ্যানোভার, হেসি, ফ্রাঙ্কফুর্ট ও ন্যাসো (Nassau) প্রভৃতি রাজ্যগুলি প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে অষ্ট্রিয়ার পক্ষে যুদ্ধে যোগ দেওয়ায়, প্রাশিয়া এই রাজ্যগুলিকে তার ভূখণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত করবে। (৬) অষ্ট্রিয়া ইতালীকে ভেনিসিয়া প্রদেশ ছেড়ে দিবে। (৭) প্রাশিয়া স্লেজভিগ ও হলষ্টিন নিজ রাজ্যের সঙ্গে সংযুক্ত করবে। স্যাক্সনীর ভৌগোলিক সীমা অক্ষুণ্ণ রাখার প্রতিশ্রুতি বিসমার্ক দেন।

প্রাগের সন্ধির গুরুত্ব

প্রাগের সন্ধির গুরুত্ব এই ছিল যে, এই সন্ধির দ্বারা প্রকারান্তরে উত্তর জার্মানীর সকল রাজ্য প্রাশিয়ার অধীনে চলে যায়। অষ্ট্রিয়া জার্মানী হতে সরে গেলে উত্তর জার্মানীর রাজ্যগুলির পক্ষে প্রাশিয়ার আধিপত্য স্বীকার করা ছাড়া উপায় ছিল না। দক্ষিণ জার্মানীর রাজ্যগুলি তৃতীয় নেপোলিয়নের হস্তক্ষেপের ফলে বিচ্ছিন্ন থাকে। বিসমার্ক দক্ষিণ জার্মানীর ক্যাথলিক রাজ্যগুলিকে সংযুক্ত করতে বিশেষ ইচ্ছুক ছিলেন না। তিনি বলেন যে, "আমি আমার গৃহে এতগুলি ক্যাথলিক আনতে চাই না" (I do not want so many Catholics in my house)।[১] প্রাশিয়ার নেতৃত্বে গঠিত উত্তর জার্মানী ছিল সমগ্র জার্মানীর মোট $\frac{২}{৩}$ অংশ। বিসমার্ক আপাততঃ এই অঞ্চল নিয়ে সন্তুষ্ট থাকেন।[২]

বিসমার্কের আশা ছিল যে, যদি তৃতীয় পক্ষ অর্থাৎ ফ্রান্স বাধা না দেয়, তবে শেষ পর্যন্ত জার্মানীর অবশিষ্ট $\frac{১}{৩}$ অংশ অর্থাৎ দক্ষিণ জার্মানী ভবিষ্যতে উত্তর জার্মান সঙ্ঘে যোগদান করতে বাধ্য হবে। এজন্য বিসমার্কের কোন তাড়া ছিল না। তিনি সময় ও সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে রাজী ছিলেন। আপাততঃ দক্ষিণের সর্ব বৃহৎ রাজ্য ব্যাভেরিয়ার সঙ্গে একটি মিত্রতা চুক্তি স্বাক্ষর করে সন্তুষ্ট হন।

ফ্রান্সের প্রতিক্রিয়া এবং তৃতীয় নেপোলিয়নের ক্ষতিপূরণ নীতি

স্যাডোয়ার যুদ্ধের পর ফ্রান্সে জার্মানীর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ফ্রান্স তার প্রতিবেশী জার্মানীকে বিভক্ত রেখে তার নিজের নিরাপত্তা রক্ষা করত। জার্মানীকে খণ্ডিত রাখার নীতি ফ্রান্স কয়েক শতাব্দী ধরে অনুসরণ করে আসছিল। এখন স্যাডোয়ার যুদ্ধের দ্বারা উত্তর জার্মানী ঐক্যবদ্ধ হলে ফরাসী জাতীয়তাবাদী নেতারা মনে করেন যে, ফ্রান্সের নিরাপত্তা নষ্ট হতে বসেছে। ফ্রান্সের রাজনীতিবিদ্ থিয়ার্স ঘোষণা করেন যে, "স্যাডোয়ার যুদ্ধে অষ্ট্রিয়া পরাজিত হয়নি। প্রকৃতপক্ষে ফ্রান্সই এই যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে। ফ্রান্সকে এর প্রতিরোধ করতে হবে।" ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন অষ্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধের সময় নিরপেক্ষ থাকার জন্যে স্বদেশবাসীর নিকট ধিকৃত হন। ঐতিহাসিক আর. এইচ. লর্ড বলেন যে, ফরাসী জনমতের চাপে, ফরাসী পার্লামেন্টে ফরাসী জাতীয়তাবাদী সদস্যদের ধিক্কারে নেপোলিয়ন মাথা ঠিক রাখতে পারেননি। অষ্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধে তিনি তাঁর নিরপেক্ষতা নীতি ছেড়ে, ফরাসী জনমতকে সন্তুষ্ট করার জন্যে জার্মানীর কাছে ক্ষতিপূরণ দাবী করেন। কিন্তু গবেষক ম্যালকম ক্যারল বলেন যে, ফরাসী জনমত ও সাংসদরা তীব্র জার্মান বিরোধী ১৮৬৬ খ্রীঃ হয়ে ওঠে এরকম কোন প্রমাণ নেই। সমকালীন ফরাসী সংবাদপত্রগুলি যে জনমতের প্রতিফলন করে তাতে জার্মান ঐক্যের বিরুদ্ধে ক্রুসেড বা জেহাদের কোন ডাক তাতে দেখা যায় না।

তৃতীয় নেপোলিয়ন তাঁর ক্ষীয়মান জনপ্রিয়তা বাঁচাবার জন্যে অষ্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধের সময় তাঁর

---

১. Grenville. P. 304.
২. Ibid. P. 310.

নিরপেক্ষতার মূল্য-স্বরূপ জার্মানীর নিকট ক্ষতিপূরণ দাবী করেন। তিনি মেইনজ (Mainz) প্রস্তাব দ্বারা ১৮১৪ খ্রীঃ ফ্রান্সের সীমান্ত রাইন নদের নিকট যে স্থানে ছিল তাহা ফিরিয়ে দেওয়ার দাবী জানান। বিসমার্ক লিখিতভাবে এই দাবী গ্রহণ করেন। তারপর তিনি জানিয়ে দেন যে, জার্মানীর একটিও গ্রাম ফ্রান্সকে ছেড়ে দেওয়া হবে না।[১] প্রশ্ন হল বিসমার্ক কেন তৃতীয় নেপোলিয়নের কাছে লিখিত দাবী চান এবং কেনই বা সেই দাবী পাওয়ার পর তিনি নাকচ করেন। প্রকৃতপক্ষে বিসমার্কের উদ্দেশ্য সম্পর্কে পরিস্কার কোন তথ্য -প্রমান নেই। পরবর্তীকালে বিসমার্ক তাঁর আত্মজীবনীতে তৃতীয় নেপোলিয়নকে কূটনীতির খেলায় কোনঠাসা করার দাবী করেছেন। বহু ঐতিহাসিক তা অতিশয়োক্তি বলে মনে করেন। ১৮৬৭ খ্রীঃ আগে পর্যন্ত বিসমার্ক ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধ বাধার কোন সম্ভাবনা নেই বলেই ভাবতেন। আইক (Eyek) বহু যুক্তি প্রমাণ দ্বারা তা দেখিয়েছেন। গ্রেনভিল বলেন, ক্ষতিপূরণ নিয়ে নেপোলিয়নকে নাস্তানাবুদ করা ছিল বিসমার্কের সেই বিখ্যাত আগুনে ইস্ত্রি একসঙ্গে গরম করার পুরানো কৌশলের পুনরাবৃত্তি মাত্র। নেপোলিয়নকে ক্ষতিপূরণের সম্ভাবনা দেখিয়ে হাতে রাখা। যদি কোন কারণে ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধ বাঁধে তাহলে ক্ষতিপূরণ দাবীকে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা। তিনি দক্ষিণ জার্মানীতে প্রচার শুরু করে দেন যে, রাইন জেলায় নেপোলিয়ন ক্ষতিপূরণ দাবী করে দক্ষিণ জার্মানীকে ফ্রান্সের অধীনে আনতে চেষ্টা করছেন। নেপোলিয়নের দাবীপত্র তিনি প্রমাণ হিসেবে কাজে লাগান। এর ফলে দক্ষিণ জার্মান রাজ্যগুলি নেপোলিয়নের আশ্রয় ছেড়ে প্রাশিয়ার পক্ষ নেয়। অতঃপর তৃতীয় নেপোলিয়ন বেলজিয়ামে লিখিতভাবে ক্ষতিপূরণ দাবী করেন। বিসমার্ক এর প্রত্যুত্তরে বলেন যে, যদি তৃতীয় নেপোলিয়ন দক্ষিণ জার্মানীতে প্রাশিয়ার অবাধ হস্তক্ষেপে সম্মতি দেন তবে তিনি ফরাসী প্রস্তাব বিবেচনা করবেন। তৃতীয় নেপোলিয়ন এতে অসম্মত হন। কারণ দক্ষিণ জার্মানীর ক্যাথলিক রাজ্যগুলিকে তৃতীয় নেপোলিয়ন ঐক্যবদ্ধ জার্মানীর বিরুদ্ধে শক্তিসাম্য রক্ষার জন্যে ব্যবহার করতে চান। অতঃপর তৃতীয় নেপোলিয়ন জার্মানীর সীমান্তে লাক্সেমবার্গ প্রদেশ ক্ষতিপূরণ হিসেবে (১৮৬৭ খ্রীঃ) দাবী করেন। জার্মান জাতীয়তাবাদীরা এর তীব্র প্রতিবাদ করায় বিসমার্ক এই দাবী নাকচ করেন। তৃতীয় নেপোলিয়নের ক্ষতিপূরণ দাবী নাকচ করায় ফ্রান্সের সঙ্গে জার্মানীর সম্পর্কের দ্রুত অবনতি ঘটে।

কোন কোন ঐতিহাসিক যথা আর· এইচ·লর্ড মনে করেন যে, বিসমার্ক অষ্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধের (১৮৬৬ খ্রীঃ) সময় থেকে ফ্রান্সের সঙ্গে পরবর্তী যুদ্ধের পরিকল্পনা করেন। উইলহেলর্স মূলার (Wilhelus Muller) বলেন, "বিসমার্কের তিনটি যুদ্ধ ছিল তাঁর কাছে জার্মানীর ঐক্যস্থাপনের আবশ্যকীয় শর্ত"। অষ্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধই ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয় যুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। আধুনিক গবেষকদের মতে, এই ধারণা হল ভ্রান্ত। আসলে ১৮৬৭ খ্রীঃ পর্যন্ত তৃতীয় নেপোলিয়ন অথবা বিসমার্ক কেহই যুদ্ধের কথা ভাবেন নি। ১৮৬৭ খ্রীঃ পরেও বিসমার্ক ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধ এড়াবার চেষ্টা করেন। লাক্সেমবার্গের ঘটনার আগে পর্যন্ত তৃতীয় নেপোলিয়নও জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধের কথা ভাবেন নি। হয়ত, এই যুদ্ধ এড়ান যেত। কিন্তু তৃতীয় নেপোলিয়নের উগ্র মেজাজী মন্ত্রী গ্রামোঁ এমনভাবে জার্মানীর সঙ্গে ব্যবহার করেন যে, যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়ে। অধ্যাপক লর্ডও স্বীকার করেন যে, তৃতীয় নেপোলিয়নের ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্যে তিনি তখনও পর্যন্ত যুদ্ধকামী না হলেও, বিদেশনীতির ওপর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেননি। তাঁর গরম মাথা মন্ত্রীরা যুদ্ধ হয়ত চাননি, কিন্তু যুদ্ধের হুমকি দিয়ে পরিস্থিতির অবনতি ঘটান। এ· জে· পি টেইলারও বলেন যে, "ফরাসী মন্ত্রী গ্রামোঁ মনে করতেন যে, তিনি হলেন ফ্রান্সের বিসমার্ক"। এভাবেই ফ্রাঙ্কো-জার্মান যুদ্ধের ক্ষেত্র ১৮৬৭

ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয় যুদ্ধের দায়িত্ব

১· Eyck—Bismarck. P. 137.

পর তৈরি হয়! তার আগে এই যুদ্ধের কথা নেপোলিয়ন বা বিসমার্ক ভাবেননি। লাক্সেমবার্গের ওপর দাবী প্রদানে ব্যর্থ হলে, ফ্রান্সের স্নায়ু স্পর্শকাতর হয়ে পড়ে। লণ্ডন প্রোটোকোল দ্বারা আন্তর্জাতিক শক্তিগুলি জার্মানী ও ফ্রান্সের সেনাদলকে লাক্সেমবার্গ ত্যাগ করতে বাধ্য করে এবং স্থিতাবস্থা বহাল করে। ফ্রান্সের মন্ত্রীরা এজন্য এতই স্পর্শকাতর হয় যে, লাক্সেমবার্গের ঘটনাকে তারা ফ্রান্সের হেনস্থার ঘটনা বলেই মনে করে, এজন্য তারা যুদ্ধের হুমকি দিতে থাকে। পরিস্থিতির চাপে যুদ্ধ অনিবার্য বুঝে বিসমার্ক ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয় যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হন। তিনি কূটনীতির দ্বারা ফ্রান্সকে মিত্রহীন করেন।

বিসমার্ক ফ্রান্সকে বিপদগ্রস্থ করার উপায় শীঘ্রই আবিষ্কার করেন। বিসমার্কের অর্থ এবং প্ররোচনায় স্পেনের পার্লামেন্টের সদস্যরা তাদের রাণী ইসাবেলাকে ১৮৬৮ খ্রীঃ সিংহাসন থেকে বিতাড়িত করে। এই সিংহাসনে প্রাশিয়ার হোহেনজোলার্ন বংশের যুবরাজ লিওপোল্ডকে বসাবার প্রস্তাব স্পেনের পার্লামেন্ট নেয়। যদি এই প্রস্তাব কার্যকরী হত তবে ফ্রান্স পূর্বে হোহেনজোলার্ন রাজবংশ শাসিত জার্মানী এবং পশ্চিমে একই বংশের শাসনে স্পেন দ্বারা বেষ্টিত হয়ে পড়ত। ঐতিহাসিক আইখের মতে, "ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধ ঘটাবার ইচ্ছায় বিসমার্ক স্পেনের সমস্যা সৃষ্টি করেন।"[১]

স্পেনের সিংহাসনের সমস্যা

বিসমার্কের আকাঙ্ক্ষিত পথে ঘটনা স্রোত প্রবাহিত হয়। ফ্রান্সের সংবাদপত্রে ও পার্লামেন্টে স্পেনে হোহেনজোলার্ন উত্তরাধিকারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জেগে ওঠে। ফরাসী মন্ত্রী গ্রামোঁ জার্মানীর রাজা প্রথম উইলিয়ামের নিকট তীব্র প্রতিবাদ জানালে, প্রাশিয়া রাজার আদেশে ১২ই জুলাই লিওপোল্ড স্পেনের সিংহাসন গ্রহণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু উগ্রপন্থী মন্ত্রী গ্রামোঁ এতে সন্তুষ্ট না হয়ে জার্মানীর রাজা প্রথম উইলিয়ামের নিকট থেকে এই মর্মে এক গ্যারান্টি পত্র দাবী করেন যে, প্রাশিয়ার রাজবংশের কেহ কোনদিন স্পেনের সিংহাসনে বসবে না। ফরাসী রাষ্ট্রদূত বেনেদিতিকে অবিলম্বে এই গ্যারান্টিপত্রে জার্মান রাজ প্রথম উইলিয়ামের স্বাক্ষর আদায় করার জন্যে নির্দেশ দেওয়া হয়। বেনেদিতি এমস নামক স্থানে হাজির হয়ে গ্যারান্টিপত্র স্বাক্ষরের জন্যে প্রথম উইলিয়ামকে অনুরোধ করেন। জার্মান সম্রাট ভদ্র অথচ দৃঢ়ভাবে এই দাবী নাকচ করেন। তিনি বলেন যে, "স্পেনের সিংহাসন গ্রহণে তাঁর অসম্মতিই যথেষ্ট। এর পর তাঁর পক্ষে মুচলেখা দেওয়া সম্ভব নয়।" প্রথম উইলিয়াম এমসের আলোচনার কথা টেলিগ্রাফ যোগে রাজধানীতে বিসমার্ককে জানিয়ে দেন। ধুরন্ধর বিসমার্ক এই টেলিগ্রামের কিছু অংশ বাদ দিয়ে সম্পাদনা করে সংবাদপত্রে প্রকাশ করেন। এর ফলে ফ্রান্সে ধারণা জন্মায় যে, ফরাসী রাষ্ট্রদূতকে প্রাশিয়ার রাজা অপদস্থ করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার দাবী তীব্র হয়ে ওঠে। তৃতীয় নেপোলিয়ন ফরাসী রাষ্ট্রদূত বেনেদিতির নিকট এই খবরের সত্যতা যাচাই না করে মহা ভুল করেন। জনমতের চাপে ফ্রান্স ১৮৭০ খ্রীঃ ১৫ই জুলাই জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

এমস টেলিগ্রাম

এর আগেই বিসমার্ক কূটনীতির দ্বারা ফ্রান্সকে ইওরোপে মিত্রহীন করেন। তিনি রাইনল্যাণ্ডের ওপর বাতিল হওয়া ফ্রান্সের লিখিত দাবীর কথা প্রকাশ করলে ব্যাভেরিয়া প্রভৃতি দক্ষিণ জার্মানীর রাজ্যগুলির মনোভাব পাল্টায়। তারা ফ্রান্সের পক্ষ ছেড়ে, উত্তর জার্মানীর পক্ষ নেয়। বেলজিয়াম ও লাক্সেমবার্গের ওপর তৃতীয় নেপোলিয়নের পুরাতন বাতিল হওয়া দাবীকে বিসমার্ক তারিখ না দিয়ে ইংলন্ডের টাইমস পত্রিকায় প্রকাশ করেন। এই কারণে ইংলন্ডের মন্ত্রীসভা মনে করে যে, তৃতীয় নেপোলিয়ন নতুনভাবে ক্ষতিপূরণ দাবী করছেন। এর ফলে ব্রিটিশ

ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয় যুদ্ধ : সেডানের পরাজয় : ফ্রাঙ্কফুর্টের সন্ধি

১· "Bismarck raised the affair with the itention and expectation of it leading to war."—Eyck. P. 170.

মন্ত্রীসভা ফ্রাঙ্কো-জার্মান যুদ্ধ রোধ করার জন্যে আন্তর্জাতিক কংগ্রেস ডাকার চেষ্টা ত্যাগ করে। এদিকে রাশিয়া এই যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকার প্রতিশ্রুতি দেয়। এর বিনিময়ে প্যারিসের সন্ধির সামুদ্রিক শর্ত রাশিয়াকে ভাঙতে বিসমার্ক সাহায্য করেন। অষ্ট্রিয়া ও ইতালী তাদের প্রতি নেপোলিয়নের অতীত শত্রুতা ভুলেনি। এই যুদ্ধে তারা নিরপেক্ষ থাকে। জার্মান বাহিনী ফরাসী বাহিনীকে সেডানের যুদ্ধক্ষেত্রে (১লা সেপ্টেম্বর, ১৮৭০ খ্রীঃ) ভয়ঙ্করভাবে পরাজিত করে। তৃতীয় নেপোলিয়ন এই যুদ্ধে বন্দী হন। ফ্রান্সে তৃতীয় প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়। ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস নগরী জার্মান সেনা অধিকার করে। ফ্রাঙ্কো-জার্মান যুদ্ধের সময় দক্ষিণ জার্মানীর রাজ্যগুলি জার্মানীর সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়। অবশেষে ফ্রাঙ্কফুর্টের সন্ধির দ্বারা ফ্রাঙ্কো-জার্মান যুদ্ধের অবসান ঘটে। জার্মানী ফ্রান্সের নিকট হতে আলসাস ও লোরেন প্রদেশের একাংশ পায়। ফ্রান্স জার্মানীকে ৫০০ কোটি ফ্রাঁ ক্ষতিপূরণ দেয়। ক্ষতিপূরণ শোধ না হওয়া পর্যন্ত জার্মান সেনা ফ্রান্সের একাংশ অধিকার করে। এভাবে তিনটি যুদ্ধের মাধ্যমে বিসমার্কের "রক্ত ও লৌহ" নীতির দ্বারা জার্মানীর ঐক্য সম্পূর্ণ হয়।

অষ্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধের (১৮৬৬ খ্রীঃ) গুরুত্ব (Significance of the Austro-Prussian War of 1866) ঃ ১৮৬৬ খ্রীঃ স্যাডোয়ার যুদ্ধে প্রাশিয়ার নিকট অষ্ট্রিয়ার পরাজয় ছিল ইওরোপের সামরিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই যুদ্ধের ফলে ইওরোপের শক্তিসাম্যের স্থায়ী পরিবর্তন ঘটে। বিভক্ত জার্মানীর পরিবর্তে ঐক্যবদ্ধ জার্মানীর উদ্ভব হলে ইওরোপের পুরাতন শক্তিসাম্য ভেঙে পড়ে। এই যুদ্ধের আগে ইওরোপ মহাদেশে ফ্রান্স ও অষ্ট্রিয়ার মধ্যে শক্তিসাম্য রাখার চেষ্টা করা হত। এখন এই দুই শক্তির মাঝখানে ঐক্যবদ্ধ জার্মানীর উত্থানের ফলে পুরাতন শক্তিসাম্য ভেঙে যায়। অষ্ট্রিয়া জার্মানী থেকে মুখ ফিরিয়ে বলকানের দিকে দৃষ্টি দেয়। এর ফলে ফ্রান্স ও নবোদিত জার্মানীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয়। দীর্ঘকাল এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইওরোপের রাজনীতিকে ভারাক্রান্ত করে।

ফ্রান্স ও জার্মানীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা

নবোদিত জার্মানীকে মানিয়ে নিতে ফ্রান্স অস্বীকৃতি জানায়। ফরাসী জাতীয়তাবাদীরা মনে করে, প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মানীর ঐক্য ফ্রান্সের নিরাপত্তাকে বিনষ্ট করবে। এজন্য ফরাসী জাতীয়তাবাদী নেতা যথা থিয়ার্স প্রভৃতি "স্যাডোয়ার বিজয়ের জন্যে" জার্মানীর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ দাবী করেন। ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন স্বদেশের জঙ্গী জনমতের চাপে বিসমার্কের নিকট ক্ষতিপূরণ দাবী করেন। এর ফলে ফ্রাঙ্কো-জার্মান যুদ্ধের সূচনা হয়।

ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয় যুদ্ধ

অষ্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধের ফলে অষ্ট্রিয়া জার্মানী থেকে সরে যেতে বাধ্য হয়। অষ্ট্রিয়া পূর্ব ইওরোপের বলকানের দিকে মনোযোগ দেয়। অষ্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হাঙ্গেরীতে এক জাতীয় ভাবের জাগরণ ঘটে। ফলে হ্যাপসবার্গ সম্রাট আউসগ্লেইক (Ausgleich) নামে এক সংবিধান দ্বারা অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে হাঙ্গেরীকে সম-মর্যাদা দানে বাধ্য হন।

অষ্ট্রিয়ার নতুন সংবিধান

অষ্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধে বিসমার্কের "রক্ত ও লৌহ নীতির" সফলতার জন্যে প্রাশিয়ায় তাঁর জনপ্রিয়তা দারুণ বাড়ে। উদারপন্থী দল তাঁর প্রতি বিরোধিতা ত্যাগ করে তাঁকে সম্মান ও শ্রদ্ধা জানায়। প্রাশিয়ার প্রতি অন্য জার্মান রাজ্যগুলির আনুগত্য বৃদ্ধি পায়। এই যুদ্ধের ফলে ইতালীর ঐক্যের কাজ আরও এগিয়ে যায়। প্রাগের সন্ধির দ্বারা ইতালী ভেনেসিয়া প্রদেশ অষ্ট্রিয়ার নিকট থেকে পায়। এই সকল কারণে অষ্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধকে ঐতিহাসিক সি· ডি· হ্যাজেন 'প্রাশিয়া, অষ্ট্রিয়া, ফ্রান্স ও ইওরোপের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা' বলে অভিহিত করেছেন।[১]

বিসমার্কের জনপ্রিয়তা ও ইতালীর ঐক্যের অগ্রগতি

১· "The year 1866 was a turning point in the history of Prusia, Austria, France and

১৮৭০ খ্রীঃ ইওরোপের অবস্থা : ফ্রাঙ্কো-জার্মান যুদ্ধের (১৮৭০ খ্রীঃ) ফলাফল (The Condition of Europe in 1870 : Results of the Franco-German War of 1870) : ফ্রাঙ্কো-জার্মান যুদ্ধের ফলাফল অষ্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধ অপেক্ষা অনেক গভীর ও সুদূর-প্রসারী ছিল। ফ্রাঙ্কো-জার্মান যুদ্ধের ফলে ইওরোপের রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থায়ীভাবে পরিবর্তিত হয়। জার্মানীর ওপর এই যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া ছিল ব্যাপক। ঐতিহাসিক কেটেলবির মতে, "ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয় যুদ্ধের ফলে বিসমার্ক জার্মানীর প্রভুত্ব এবং জার্মানী, ইওরোপের প্রভুত্ব পায়।"[১] বিসমার্কের "রক্ত ও লৌহ নীতির" চূড়ান্ত সাফল্য সূচিত হয়। দক্ষিণ জার্মানীর বিচ্ছিন্ন অঞ্চলগুলি শেষ পর্যন্ত জার্মানীর সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়। ঐক্যবদ্ধ জার্মানী ইওরোপে একটি প্রধান শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। যেক্ষেত্রে ফ্রান্সের লোকসংখ্যা ছিল ৩৬ মিলিয়ন, ঐক্যবদ্ধ জার্মানীর লোকসংখ্যা ৪১ মিলিয়নে দাঁড়ায়। জার্মানীর সামরিক শক্তি ইওরোপে শ্রেষ্ঠ বলে প্রমাণিত হয়। এই সামরিক রাষ্ট্রের আগ্রাসনের ভয়ে অন্যান্য ইওরোপীয় শক্তিগুলি ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ইওরোপের পুরাতন শক্তিসাম্য ভেঙে যায়। ভিয়েনা চুক্তি জার্মানীতে ছেঁড়া কাগজে পরিণত হয়। জাতীয়তাবাদ ইওরোপে অতঃপর এক প্রবল শক্তিরূপে দেখা দেয়। তৃতীয় নেপোলিয়নের নেতৃত্বে ফ্রান্স ইওরোপে আগে যে প্রতিষ্ঠা ভোগ করত, এখন সেই কর্তৃত্ব বিসমার্কের জার্মানীর ওপর বর্তায়। ডেভিড টমসনের মতে, "১৮৭১ খ্রীঃ পর ইওরোপের রাজনৈতিক ইতিহাসের মূলকথা ছিল যে, জার্মান রাইখ বা রাষ্ট্র ইওরোপের একটি শ্রেষ্ঠ শক্তি হিসেবে দেখা দিয়েছে।" জার্মানী তার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, সামরিক শক্তি, লোকসংখ্যা, ভারী শিল্প ও রেলপথের সাহায্যে ইওরোপে এক নব "কলোসাস" (Colossus) রূপে আবির্ভূত হয়। ১৮৭১ খ্রীঃ পর জার্মানীতে শিল্প-বিপ্লব দ্রুত বিস্তৃত হয়। শিল্পায়ত ও সমৃদ্ধ জার্মানী ক্রমে উপনিবেশ বিস্তারের পথে পা বাড়ায়। নবোদিত জার্মানী ইংলন্ড ও ফ্রান্সের উপনিবেশ এবং বাণিজ্যের বৃহৎ প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখা দেয়।

জার্মানীর উত্থান

ফ্রাঙ্কো-জার্মান যুদ্ধ ফ্রান্সের ইতিহাসে বিরাট গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল। সেডানের যুদ্ধে জার্মানীর নিকট পরাজয়ের ফলে ফ্রান্সের তৃতীয় নেপোলিয়নের শাসনব্যবস্থার পতন ঘটে। ফ্রান্সে তৃতীয় প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়। তৃতীয় ফরাসী প্রজাতন্ত্র ফ্রাঙ্কফুর্টের সন্ধির দ্বারা জার্মানীকে আলসাস ও লোরেন প্রদেশ দুটি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। ফরাসী জাতীয়তাবাদী রাজনীতিক থিয়ের-ফ্রান্সের ওপর প্রতিশোধমূলক সন্ধি না চাপাতে বিসমার্ককে সতর্ক করেন। তিনি বলেন যে, "এ ধরনের সন্ধি স্বাক্ষরে বাধ্য করা হলে দেশপ্রেমিক ফরাসী জাতি সেই অপমান ভুলতে পারবে না"। বিসমার্ক থিয়েরের সতর্ক বাণীতে কর্ণপাত করেননি। ভিক্টর হুগো জাতির উদ্দেশ্যে বলেন যে, ফরাসী জাতির হতাশ হওয়ার দরকার নেই। অপরাজেয় ফ্রান্স পুনরায় উঠে দাঁড়াবে। তখন নবজাগ্রত ফ্রান্স শুধু তার হৃদপিণ্ড আলসাস-লোরেন পুনরুদ্ধার করে ক্ষান্ত থাকবে না। ফ্রান্স জার্মান সম্রাটের পতন ঘটিয়ে জার্মানীকে প্রজাতন্ত্র উপহার দিবে। তৃতীয় নেপোলিয়নের পদচ্যুতির মহত্তম প্রতিশোধ তা হবে। ফ্রান্স পুনরায় রাইনল্যাণ্ড, মেইনজ অধিকার করবে। আসলে ভিক্টর হুগো অপমানিত, ক্ষুব্ধ ফরাসী জাতির হৃদয় বেদনা ব্যক্ত করেন। ফ্রাঙ্কো-জার্মান যুদ্ধ ফ্রান্স ও জার্মানীর মধ্যে এক দুষ্ট ক্ষত সৃষ্টি করে। ফ্রান্স ১৮৭০ খ্রীঃ থেকে এই অবমাননার প্রতিশোধের জন্যে নিরন্তর চেষ্টা চালায়। ফলে ফ্রাঙ্কো-জার্মান সম্পর্কের দারুণ অবনতি ঘটে। শেষ পর্যন্ত ইহা প্রথম মহাযুদ্ধে পরিণত হয়। ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয় যুদ্ধের

ফ্রান্সের প্রতিশোধ নীতি ও জার্মান বিরোধিতা : প্যারিস কমিউন

১· "The Franco-Prussian war made Bismarck the master of Germany and Germany the mistress of Europe." Ketelbey—History of Modern Times. P. 282.

অব্যবহিত পরে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে কমিউনিস্ট বিদ্রোহ (১৮৭১ খ্রীঃ) আরম্ভ হয় (বিশদ বিবরণের জন্যে ত্রয়োবিংশ অধ্যায় দেখ)। একে প্যারিস কমিউনের বিদ্রোহ বলা হয়। প্রজাতন্ত্রী সরকারের সঙ্গে কমিউনিষ্টদের গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয়। শেষ পর্যন্ত কমিউনের পতন ঘটে।

ফ্রাঙ্কো-জার্মান যুদ্ধের ফলে ইতালীর ঐক্য সম্পূর্ণ হয়। রোম থেকে ফরাসী সেনা অপসারিত হলে রোম ইতালীর সঙ্গে যুক্ত হয়। ফ্রাঙ্কো-জার্মান যুদ্ধের সুযোগে রাশিয়া প্যারিসের সন্ধির সামুদ্রিক শর্তগুলি ভেঙে ফেলে। রাশিয়া ইওরোপের রাজনীতিতে তার প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়। রাশিয়া কৃষ্ণসমুদ্র ও দার্দ্দানালিশ প্রণালীতে সামুদ্রিক শর্তগুলি ভাঙলে ব্রিটেনের সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্কের অবনতি ঘটে। ব্রিটেন রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইওরোপীয় শক্তি সমবায় গঠনের ব্যর্থ চেষ্টা করে। এছাড়া ১৮৭০-এর যুদ্ধের দ্বারা জার্মানী ও ইতালীর ঐক্য সম্পূর্ণ হলে ইওরোপের রাজনৈতিক মানচিত্রের জটিলতা দূর হয়। ফ্রাঙ্কো-জার্মান যুদ্ধের ফলে ইওরোপে জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র গঠনের কাজের অগ্রগতি হয়। বিসমার্ক সামরিক শক্তির দ্বারা সন্ধিগুলি ভেঙে জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করার ফলে ইওরোপের রাজনীতিতে ঘোর অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। 'আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে' আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানের যে প্রথা ভিয়েনা কংগ্রেসের আমল থেকে চালু হয়েছিল তা লোপ পায়। ইওরোপের রাজনীতিতে 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতি প্রবল হয়ে ওঠে। ১৮১৫ খ্রীঃ ভিয়েনা সন্ধির ভিত্তি এর ফলে একেবারে ভেঙে যায়। জার্মানী থেকে মুখ ফিরিয়ে অষ্ট্রিয়া বলকানে রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করে। পূর্বাঞ্চল সমস্যা এর ফলে তীব্রতর হয়। ১৮৭১ খ্রীঃ-এর যুদ্ধের ফলে ইওরোপের রাজনৈতিক মানচিত্রের জটিলতা দূর হয়। ১৮৭১ খ্রীঃ পর ৪৩ বছর ইওরোপে বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যে কোন যুদ্ধ হয় নি। ১৮১৫ খ্রীঃ ইওরোপের যে মানচিত্র গঠিত হয় ১৮৭১ খ্রীঃ তা অপেক্ষা সরলীকৃত মানচিত্রই ছিল তার কারণ। সুতরাং যে কোন বড় যুদ্ধের পর ইওরোপে যেমন একটি দীর্ঘস্থায়ী রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে, ১৮৭১ খ্রীঃ পরও সেই রকম একটি ব্যবস্থা স্থাপিত হয়।

ইতালী ও প্রাশিয়ার প্রভাব

জার্মানীর ঐক্য অথবা প্রাশিয়ার বিস্তৃতি? (Whether German Unification or Prussian Expansion?) : বিসমার্ক তাঁর রক্ত ও লৌহ নীতির দ্বারা ৩৯টি রাজ্যে বিভক্ত জার্মানীকে প্রাশিয়ার সামরিক শক্তির দ্বারা ঐক্যবদ্ধ করেন। ইতিহাসে এই ব্যবস্থাকে জার্মানীর জাতীয়তাবাদী ঐক্য বলা হয়। কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন যে, এই ধারণা সঠিক নয়। বিসমার্ক জার্মান জাতিকে প্রকৃতপক্ষে ঐক্যবদ্ধ করেননি। যাকে জার্মানীর ঐক্য বলা হয় তা ছিল আসলে "প্রাশিয়ার সীমাহীন বিস্তার"। জার্মানীকে তথাকথিতভাবে ঐক্যবদ্ধ করার জন্যে তিনি প্যান জার্মান ভাবধারাকে (Pan-German Sentiment) নাকচ করেন। প্যান জার্মানবাদের অর্থ ছিল অষ্ট্রিয়ার জার্মানগণ সহ সকল জার্মান জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে একই সরকারের অধীনে আনা। বিসমার্ক প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মানীকে আনার জন্যে প্যান জার্মানবাদকে নস্যাৎ করেন। প্যান জার্মানবাদ ছিল একটি ঐতিহাসিক ভাবধারা। ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্টে Great Germans বা বিশাল জার্মানবাদীরা এই ভাবধারাকে স্থাপনের চেষ্টা করেন। বিসমার্ক এই ভাবধারাকে নস্যাৎ করলেও, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর হিটলার 'আনস্লুস' (Ans chluss) নীতির দ্বারা পুনরায় জার্মানী অষ্ট্রিয়ার ঐক্য স্থাপন করেন। তিনি বলেন যে, "প্রাশিয়ার চ্যান্সেলর বিসমার্ক অষ্ট্রিয়াকে জার্মানী থেকে বহিষ্কার করেন, আমি অষ্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর আবার দুই জার্মানীর মিলন ঘটাচ্ছি"। অষ্ট্রিয়ার বহু বুদ্ধিজীবি ও জাতীয়তাবাদী বিসমার্ক দ্বারা অষ্ট্রিয়ার বহিষ্কারকে বেদনাদায়ক মনে করতেন। ঐতিহাসিক সীম্যান (From Vienna to Versailles) বলেন, যদি বিসমার্ক সত্যই জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করেন তাহলে তিনি অপর জার্মান জাতি অর্থাৎ অষ্ট্রিয়গণকে জার্মানী থেকে কেন বহিষ্কার করেন? অষ্ট্রিয়ার

জার্মানরাও অবশ্য খাঁটি জার্মান ছিল। সুতরাং তিনি বস্তুত যা করেন, তা হল জার্মান জাতির স্থায়ী বিচ্ছেদকরণ। প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মানীর জার্মানদের ঐক্যবদ্ধ করে তিনি অষ্ট্রিয়ার জার্মানদের স্বতন্ত্র রাজ্যে থাকতে বাধ্য করেন।

বিসমার্ক জার্মান রাজ্যগুলির সংযুক্তি গণতান্ত্রিক পথে আনেননি। ১৮৪৮ খ্রীঃ পর ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্ট গণভোটের ভিত্তিতে নির্বাচিত হয়ে জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করে। এই পার্লামেন্ট সংযুক্ত জার্মানীর সাংবিধানিক শাসকের পদ নিতে প্রাশিয়ার রাজা চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়ামকে অনুরোধ করে। বিসমার্ক তখন প্রাশিয়ার মিনিষ্টার প্রেসিডেন্ট না হলেও, দরবারের গণ্যমান্য লোক ছিলেন। তিনি ফ্রাঙ্কফুর্ট প্রস্তাবের ঘোর বিরোধিতা করেন। তিনি প্রাশিয়ার রাজাকে বলেন যে, "ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্টের মুকুট হয়ত গৌরবজনক, কিন্তু প্রাশিয়ার রাজার পৈত্রিক রাজমুকুট গলিয়ে ফেলে তবে তাঁকে এই মুকুট পরতে হবে।" (Your Majesty! the Frankfurt Crown may be a glorious one. You will have to get it by smelting your own paternal crown—quoted by Ketelbey—History of Modern Times) অর্থাৎ প্রাশিয়ার রাজার বংশানুক্রমিক সিংহাসনের অধিকারকে বিসমার্ক গণতান্ত্রিক পথে ঐক্যবদ্ধ জার্মানীর সাংবিধানিক রাজপদ অপেক্ষা মূল্যবান ভাবতেন। সুতরাং গণতান্ত্রিক ও জনমতের সহায়তায় জার্মানীর ঐক্যকে বিসমার্ক বাঞ্ছনীয় ভাবতেন না। তিনি প্রাশিয়ার পেশী বলে অর্জিত যুদ্ধ জয় দ্বারা উপর থেকে জার্মানীর উপর প্রাশিয়ার আধিপত্য চাপিয়ে দেন। জার্মান জনগণ এই ঐক্য চাইত কিনা তা তিনি গণভোট দ্বারা যাচাই করেননি। অনেকে বিসমার্কের এই সাফল্যকে প্রাশিয়ার সামরিকবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বলেন।

আমরা যদি অষ্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধের সময় বিভিন্ন জার্মান রাজ্যগুলির অবস্থান লক্ষ্য করি তাহলে বিসমার্ক স্থাপিত জার্মান ঐক্যের প্রকৃতি বোঝা যাবে। জার্মানীর অধিকাংশ বৃহৎ ও ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি অষ্ট্রিয়ার পক্ষে যুদ্ধে যোগ দেয়। এগুলির মধ্যে ছিল ব্যাভেরিয়া, ব্যাডেন, উটেমবার্গ, হ্যানোভার প্রভৃতি বিখ্যাত রাজ্যগুলি। উত্তর জার্মানীর কয়েকটি ক্ষুদ্র রাজ্য ওল্ডেনবার্গ, ম্যাকলেনবার্গ, ব্রান্সউইক প্রাশিয়ার ভয়ে নিরপেক্ষ থাকে। যুদ্ধে তার বিশাল সামরিক শক্তির দ্বারা প্রাশিয়া জয়লাভ করে, এই রাজ্যগুলির ওপর তার আধিপত্য চাপিয়ে দেয়। গ্রেনভিলের মতে, ১৮৬৬ খ্রীঃ প্রাশিয়া কেবলমাত্র অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেনি; জার্মানীর সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্যগুলি যারা অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে ছিল তাদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ ঘোষণা করে। যুদ্ধে জয়লাভের পর প্রাশিয়ার আধিপত্য গ্রহণ তাদের বাধ্য করে। এই কাজকে ঐক্য স্থাপন না বলে প্রাশিয়ার বিজয় (Prussian Conquest) বলাই সঙ্গত বলে সীম্যান মনে করেন।

অষ্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধে জয়লাভের পর যদিও অষ্ট্রিয়ার প্রতি বিসমার্ক ওদার্য্য দেখান, অন্য জার্মান রাজ্যগুলি যারা অষ্ট্রিয়ার মিত্র হিসেবে যুদ্ধে যোগ দেয়, তাদের প্রতি তিনি ঔদার্য্য দেখান নি। একথা ভোলা উচিত নয় যে, উত্তর ও মধ্য জার্মানীর যে সকল প্রিন্স তাঁদের সার্বভৌম অধিকার ছাড়তে রাজী হননি, তিনি তাঁদের সিংহাসনচ্যুত করে সেই রাজ্যগুলিকে প্রাশিয়ার অধীনে আনেন। এক্ষেত্রে তিনি ঐক্য স্থাপনকারী অপেক্ষা বিজেতার ভূমিকাতেই দেখা দেন। তিনি বুঝিয়ে দেন যে, প্রাশিয়ার বিরোধিতাকে শত্রু-জনোচিত কাজ বলে গণ্য করা হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, স্বাধীন সনদভোগী ফ্রাঙ্কফুর্ট নগরের অধিবাসীরা বিসমার্কের সংযুক্তি প্রস্তাবে রাজী না হলে, তাদের ওপর পাইকারী জরিমানা ধার্য ও কঠোরতা দেখান হয় এবং শেষ পর্যন্ত একতরফাভাবে প্রাশিয়ার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। হ্যানোভার রাজ্যের রাজাকে পদচ্যুত করে প্রাশিয়ার সঙ্গে যুক্ত করে, প্রাশিয়করণ করা হয়। স্লেজভিগ-হলষ্টিনকেও একইভাবে গ্রাস করা হয়। হেসে, নাসো রাজ্যগুলিকে শত্রুদেশ ঘোষণা করে, যুদ্ধ জয়ের অধিকারে, প্রাশিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। ব্যাভেরিয়া ও উটেমবার্গকে তিনি সংযুক্তিতে যোগ দিতে বাধ্য করেননি।

কারণ এই দুই রাজ্য গোপনে সংযুক্তিমূলক চুক্তি করেছিল। এই দুই রাজ্যের ক্যাথলিকদের বিসমার্ক তাঁর প্রোটেস্টান্টবাদী সঙ্ঘে আপাততঃ অপ্রয়োজনীয় ভাবতেন।

বিসমার্ক যে উত্তর জার্মান করফেডারেশন গঠন করেন এবং যা ৪ বছর বিদ্যমান ছিল এবং যে সংবিধানকে তিনি ১৮৭০-৭১ খ্রীঃ ফ্রাঙ্কো-জার্মান যুদ্ধের পর গোটা জার্মানীর ওপর চাপান তা সংবিধানবাদী পণ্ডিত ম্যাক্স ওয়েবারের মতে ছিল একটি "ভণ্ড সংবিধান" (A Sham Constitution)। এই সংবিধানে জার্মানীর সকল রাজ্যকে সমান অধিকার দেওয়া হয়নি। প্রাশিয়ার রাজাই হন জার্মান কাইজার; প্রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী হন জার্মানীর চ্যান্সেলার।

সকল কথা বলার পরে বলা যায় যে, একদিক থেকে দেখলে বিসমার্কের স্থাপিত ঐক্যকে "বৃহত্তর প্রাশিয়া সাম্রাজ্য (Enlarged Prussian empire) বলে মনে হতে পারে। কিন্তু সার্বিক বিচারে এই যুক্তি গ্রহণীয় নয়। প্রথমতঃ, দীর্ঘকাল ধরে জার্মানীর ঐক্য আন্দোলন দুটি সমান্তরাল ধারায় প্রবাহিত ছিল, যথা গণতান্ত্রিক পথে ঐক্যস্থাপন, বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের দ্বারা ঐক্যস্থাপন। প্রাশিয়ার অধীনে জার্মানীর সংযুক্তি ছিল এই দ্বিতীয় ধারার চরম পরিণতি মাত্র। Reformation বা ১৬শ শতকের ধর্ম-বিপ্লবের যুগ থেকে জার্মানীর ওপর আধিপত্যের জন্যে বিভিন্ন রাজবংশের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছিল। অষ্টাদশ শতকে ফ্রেডারিক দি গ্রেটের আমল থেকে জার্মানীর আধিপত্যের জন্যে অষ্ট্রো-প্রাশিয় দ্বন্দ্ব শুরু হয়। ফ্রেডারিক ও মারিয়া থেরেসার অষ্ট্রিয়ার উত্তরাধিকারের যুদ্ধ ও সপ্তবর্ষের যুদ্ধ নিছক সাইলেশিয়ার অধিকার নিয়ে ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব ছিল না। এই দুই যুদ্ধে প্রাশিয়ার জয়, প্রাশিয়াকে উত্তর জার্মানীতে নৈতিক আধিপত্য এনে দেয়। ১৮৬৬ খ্রীঃ অষ্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধকে হ্যাসাল (Hassal) ফিশার (Fisher) প্রভৃতি ঐতিহাসিক সেই ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বের চূড়ান্ত পরিণতি বলে মনে করেন। সুতরাং জার্মানী থেকে অষ্ট্রিয়ার বহিষ্কারকরণকে প্রাশিয়ার সাম্রাজ্যবাদ না বলে, প্রাচীন প্রতিদ্বন্দ্বিতার চূড়ান্ত পরিণতি বলা ভাল।

প্রাশিয়া অকস্মাৎ তার পেশীবলে জার্মানীর আধিপত্য নেয় নি। ইতিহাসের গতি প্রাশিয়ার নেতৃত্বের অনুকূলেই ছিল। জেনার (Jena) যুদ্ধের পর প্রাশিয়াতে যে জার্মান জাতীয়তাবাদের জাগরণ ঘটে তা গোটা জার্মানীকে প্লাবিত করে। প্রাশিয়ার চিন্তাবিদ স্টাইনের পরামর্শে প্রাশিয়ার উদারনৈতিক সংবিধান জার্মানীতে একটি আদর্শ হিসেবে কাজ করে। জার্মান সংস্কৃতি ও জাতীয়তাবাদকে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে প্রাশিয়াই তুলে ধরে। প্রাশিয়ার সেনাদল, সেনাপতি ব্লুকারের অধীনে লাইপজিগের যুদ্ধে প্রধান ভূমিকা নেয়। নেপোলিয়নের পতনের পর নবোদিত জার্মানীতে প্রাশিয়ার নেতৃত্বকে কেহই অস্বীকার করতে পারেনি। ১৮৪৮ খ্রীঃ ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্টে যদিও Pan-German বা বৃহৎ জার্মানরা ঐক্যবদ্ধ জার্মানীতে অষ্ট্রিয়ার নেতৃত্ব দাবী করে, কিন্তু বহু বিতর্কের পর সদস্যরা প্রাশিয়ার রাজাকেই ঐক্যবদ্ধ জার্মানীর সাংবিধানিক রাজার পদ দিতে একমত হন। কাজেই ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্ট অবিসংবাদিভাবে প্রাশিয়ার নেতৃত্ব মেনে নেয়। যে নেতৃত্ব গণতান্ত্রিক পথে আসতে পারেনি, তা বিসমার্কের নেতৃত্বে প্রাশিয়ার বাহু বলে স্থাপিত হয় মাত্র। কিন্তু প্রাশিয়ার নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত ঐতিহাসিক নিয়মে ফ্রাঙ্কফুর্টের পার্লামেন্টেই স্থির হয়ে যায়।

ফ্রাঙ্কফুর্টের সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করতে হলেও অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ অনিবার্য ছিল। কারণ শুধুমাত্র জার্মান ভাষাভাষী জার্মানীকে নিয়ে তার জার্মানী গঠনের যে সিদ্ধান্ত এই পার্লামেন্ট নেয়, তা অষ্ট্রিয়া মানতে রাজী ছিল না। বিসমার্কও এজন্য অষ্ট্রিয়াকে বহিষ্কার নীতি নিতে বাধ্য হন। তাছাড়া প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জোলভেরাইন গঠন প্রাশিয়ার দাবীকে জোরালো করেছিল।

সর্বশেষে বলা যায় যে, ১৮৬৬ খ্রীঃ অষ্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধে যে সকল রাজ্য অষ্ট্রিয়ার পক্ষে ছিল, তা সেই সকল দেশের রাজাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী করা হয়েছিল। সেই সকল রাজ্যের জনগণের

ইচ্ছার অভিব্যক্তি হিসেবে এই সকল রাজ্য অষ্ট্রিয়ার পক্ষে যোগ দেয়নি। প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মানীর সংযুক্তি ঘোষিত হলে প্রজাগণ তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখায়নি। বিসমার্ক জন্মসূত্রে জাঙ্কার (Junker) হলেও তিনি প্রাদেশিকতা ও সংকীর্ণতার ঊর্দ্ধে উঠে গোটা জার্মান জাতির ঐক্যের কথা ভাবেন। তিনি যে সংবিধান স্থাপন করেন তার দ্বারা নিম্নকক্ষে গণভোটের ভিত্তিতে সদস্যারা নিবাচিত হত। কাজেই তিনি জনমত প্রকাশকে ব্যাহত করেননি।

ইতালী ও জার্মানীর ঐক্যের তুলনা (Comparison between the German and Italian Unification) : ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে ইতালী ও জার্মানী এই দুই দেশের জাতীয়তাবাদী ঐক্য ইওরোপের ইতিহাসকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। দুটি দেশে নেপোলিয়নের শাসন স্থাপিত হয়েছিল। ফরাসী বিপ্লবের জাতীয়তাবাদী প্রভাব উভয় দেশের ওপরেই গভীরভাবে কাজ করে। নেপোলিয়নের পতনের পর দুটি দেশেই ভিয়েনা চুক্তির প্রতিক্রিয়াশীল নীতি প্রযুক্ত হয়। এর ফলে জার্মানী ৩৯টি রাজ্যে বিভক্ত হয় এবং ইতালী ৫টির অধিক রাজ্যে বিভক্ত হয়। তবে জার্মানীতে বৈদেশিক শাসন স্থাপিত হয়নি। কিন্তু ইতালীতে অস্ট্রিয়ায় হ্যাপসবার্গ এবং বুরবোঁ রাজবংশের শাসন স্থাপিত হয়। ভিয়েনা সন্ধির বিরুদ্ধে সর্বাধিক প্রতিবাদ ইতালী ও জার্মানীতে দেখা যায়।

১৮১৫ খ্রীঃ পর ইতালী ও জার্মানীর দুটি দেশে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দেখা দেয়। এক্ষেত্রে ইতালী ও জার্মানীর মত ও পথ পৃথক ছিল। জার্মানীতে বিদেশী শক্তির শাসন ছিল না। জার্মানীর সমস্যা ছিল বিভক্ত জার্মান রাজ্যগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করা। অপর দিকে ইতালীর সমস্যা ছিল বিদেশী শক্তির শাসন থেকে মুক্তি এবং মুক্তি লাভের পর ইতালীর বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ঐক্য স্থাপন। যেক্ষেত্রে জার্মান বুদ্ধিজীবিরা জার্মানীর জাতীয় সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতির দ্বারা জার্মান জাতির নিজস্ব সংস্কৃতির কথা বলেন, ইতালী দীর্ঘকাল বিদেশী শাসনে থাকায় তার এরূপ কোন ঐতিহ্য ছিল না।

জার্মানীতে যেরূপ প্রাশিয়াকে কেন্দ্র করে জার্মানীর ঐক্য স্থাপিত হয়, ইতালীতে সেরূপ পিডমন্টকে কেন্দ্র করে ইতালীর ঐক্য স্থাপিত হয়। দুটি রাজ্যের দুই মন্ত্রী যথা বিসমার্ক ও কাভ্যুর এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন। তবে ইতালীকে বৈদেশিক শক্তির সাহায্যে অষ্ট্রিয়ার হাত থেকে দেশকে মুক্ত করতে হয়। জার্মানীর ক্ষেত্রে কেবলমাত্র বৈদেশিক শক্তিগুলির নিরপেক্ষতাই যথেষ্ট ছিল। প্রাশিয়া তার নিজ শক্তির দ্বারা জার্মানীর ঐক্যযুদ্ধগুলিতে জয়লাভ করে। তবে লক্ষ্যণীয় যে, জার্মানী ও ইতালী উভয় দেশের ক্ষেত্রে উভয় দেশের ঐক্যের বাধা ছিল অষ্ট্রিয়া। অষ্ট্রিয়ার পরাজয়ের ফলেই ইতালীর ঐক্য ও জার্মানীর ঐক্য সম্পন্ন হয়।

কাভ্যুর ইতালীকে ঐক্যবদ্ধ করে তাকে পিডমন্টের রাজবংশের অধীনে এক উদারতান্ত্রিক সংবিধানে আবদ্ধ করেন। যদিও তিনি গণভোট স্বীকার করেননি তথাপি উদারতন্ত্রী সীমাবদ্ধভোটে গঠিত পার্লামেন্টারী শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ ছিল সুবিদিত। অপর দিকে বিসমার্ক জার্মানীকে প্রাশিয়ার রাজবংশের অধীনে ঐক্যবদ্ধ করেন। কিন্তু তিনি স্বৈরতন্ত্রের প্রতি আগ্রহশীল ছিলেন। যদিও তিনি এক সংবিধান প্রবর্তন করেন, তাতে আসল ক্ষমতা ছিল জার্মান সম্রাটের হাতে। মন্ত্রীসভা তাঁর নিকট দায়িত্ববদ্ধ ছিল। তবে কাভ্যুর ইতালীর সকল অঞ্চলের সমান উন্নতির চেষ্টা করেননি। দক্ষিণ ইতালী একটি অনগ্রসর অঞ্চল হিসেবে থাকে। বিসমার্কও জার্মানীতে প্রাশিয়াকে সকল বিষয়ে অগ্রাধিকার দেন।

পরিশেষে, বিসমার্ক ও কাভ্যুর উভয়েই ছিলেন Real Politik-এর অনুরাগী। বিসমার্ক ইতিহাসে কাভ্যুর অপেক্ষা অনেক বেশী খ্যাতি পেয়েছেন। কাভ্যুর তাঁর জীবনকালে সমগ্র ইতালীকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারেননি। ঐক্যবদ্ধ ইতালীর সংগঠন ও উন্নতি করতে কাভ্যুর জীবিত থাকেননি। বিসমার্ক ছিলেন দীর্ঘজীবি। তিনি জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করার পর আরও ২০

বছর সংগঠন ও উন্নতির জন্যে কাজ করেন। বিসমার্ক ছিলেন কূটনীতিতে কাভ্যুর অপেক্ষা ধুরন্ধর। তবে বিসমার্ক ছিলেন অপেক্ষাকৃত নীতিজ্ঞান-হীন ও প্রভাবশালী। কাভ্যুর তুলনামূলকভাবে ছিলেন অনেকটা ম্লান ও আত্মপ্রচার-বিমুখ।

জার্মানীর ঐক্য স্থাপনের জন্যে বিসমার্কের পূর্ব-পরিকল্পিত সুসংহত পরিকল্পনা তত্ত্বের বিচার (The Theory of an advanced, coherent, prepared plan of German Unification made by Bismarek) ঃ বিসমার্কের বিমুগ্ধ জীবনীকারগণ এবং উনবিংশ শতকের কোন কোন উদারপন্থী ঐতিহাসিকেরা মনে করেন যে, বিসমার্ক ১৮৬২ খ্রীঃ প্রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী পদে যোগদানের আগেই অন্ততঃপক্ষে ১৮৬২ খ্রীঃ থেকে জার্মানীর ঐক্যের জন্যে, তিনটি যুদ্ধের একটি সুসংহত পরিকল্পনা আগে থেকেই রচনা করেন। ১৮৬২ খ্রীঃ প্রধানমন্ত্রীর পদে বসার পর তাঁর পূর্ব-নির্দিষ্ট সময় তালিকা অনুযায়ী, তিনি তাঁর প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি ও তীক্ষ্ণ দূরদৃষ্টির সাহায্যে, তিনটি যুদ্ধের মাধ্যমে জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করেন। বিসমার্ক তাঁর আত্মজীবনীতে মোটামুটি এরূপ একটি পরিকল্পনার অস্তিত্বের আভাষ দিয়েছেন। তিনি বলেন যে, তিনি যখন ফ্রাঙ্কফুর্টে জার্মান বুন্ডে প্রাশিয়ার প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দেন তখন থেকেই তাঁর বিশ্বাস জন্মায় যে অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে প্রাশিয়ার যুদ্ধ অনিবার্য। "দ্বৈতনীতির মৃদু পদ্ধতির সাহায্যে জার্মানীর ভবিতব্যের জটিল গর্জিয়ান গ্রন্থি খোলা যাবে না। একমাত্র তরবারির আঘাতে এই গ্রন্থি ছিন্ন করা সম্ভব" একথা তিনি গোড়া থেকেই বিশ্বাস করতেন। অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধের ও এই যুদ্ধ জয়ের স্বপ্ন তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলে।

বিসমার্ক যে তিনটি যুদ্ধের দ্বারা জার্মানীর ঐক্য স্থাপনের পূর্ব পরিকল্পনা করেন, সে সম্পর্কে এক প্রত্যক্ষ শ্রোতার সাক্ষ্যকে এই সকল ঐতিহাসিকেরা গুরুত্ব দেন। রুশ রাষ্ট্রদূত সাবুরোভের জবানবন্দী অনুযায়ী ১৮৬২ খ্রীঃ বিসমার্ক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এক ভোজসভায় মিলিত হন। অর্দ্ধ ঘণ্টার আলাপচারিতার মাধ্যমে বিসমার্ক তিন যুদ্ধের মাধ্যমে জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করার পুরো পরিকল্পনা তিনি ডিসরেইলীকে বোঝান। সেইদিন সন্ধ্যায় ডিসরেইলীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় প্রধানমন্ত্রী সাবুরোভকে বলেন, "এই বিসমার্ক এক অসাধারণ লোক। তিনি প্রথমে ডেনমার্ক, তারপরে অষ্ট্রিয়াকে জার্মান রাষ্ট্রমণ্ডল থেকে বহিষ্কার এবং সবশেষে ফ্রান্সকে আক্রমণ করতে চান।" সাবুরোভ ডিসরেইলীর এক জীবনীতে এই কাহিনী দিয়েছেন।

এই বিবরণ যদি সত্য হয় তবে অবশ্য স্বীকার করতেই হবে যে, জার্মানীর ঐক্যের জন্যে বিসমার্ক পূর্ব-পরিকল্পনা রচনা করেন এবং তদনুযায়ী তিন যুদ্ধের দ্বারা জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করেন। কিন্তু প্রশ্ন আসে যে, কোন রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ তিনি যত বড়ই হোন না কেন, ১০ বছর আগে. পূর্ব পরিকল্পনা ছকে, ১০ বছর পরে তা কার্যে পরিণত করেন, এরকম দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল। পরিকল্পনা অনুযায়ী ইতিহাসের গতিকে নিয়ন্ত্রিত করা কি কারও পক্ষে সম্ভব? কারণ ইতিহাস তার নিজের নিয়মেই চলে। কোন ব্যক্তি এই নিয়মকে হয়ত সামান্য প্রভাবিত করতে সক্ষম হন। প্রধানতঃ দূরদর্শী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা ইতিহাসের ভবিষ্যৎ গতিকে আন্দাজ করে সেইমত কাজ করতে সক্ষম হন। সম্ভবতঃ বিসমার্কের গুণমুগ্ধ লেখকরা তাঁর সম্পর্কে উপরোক্ত কল্প কথা সৃষ্টি করেছেন।

আধুনিক গবেষকদের মতে, মেটারনিক বা জার প্রথম আলেকজান্ডারের মত বিসমার্ক কোন system বা নিয়ম বাঁধা পদ্ধতি রচনা করে সেইমত সকল কিছুকে চালনা করার চেষ্টা করেননি। তিনি ছিলেন আসলে ঘোরতর বাস্তববাদী ও প্রয়োগবাদী (Pragmatist) এবং সুযোগবাদী (Opportunist)। পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি বাস্তবতাকে সামনে রেখে তাঁর নীতি বদলে নিতেন। বিসমার্ক নিজেই বলেছেন যে, "তিনি আগুনে সর্বদাই একাধিক ইস্ত্রি গরম

করতেন। যখন যেটির সঠিক প্রয়োগ করা তিনি যুক্তিযুক্ত ভাবতেন, সেইমত কাজ তিনি করতেন।" তাঁর নীতির বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, পিছন ফিরে দেখলে মনে হত, যেন বিসমার্ক গোড়া থেকেই সুসংহত পরিকল্পনা নিয়েই এগিয়ে চলেন।

আধুনিক ঐতিহাসিকরা বিশ্বাস করেন যে, ইতিহাসের অগ্রগতিতে ব্যক্তির ভূমিকা খুব বেশী করে দেখা উচিত নয়। যে সমাজে সেই ব্যক্তি বাস করেন, সেই সমাজে, সেই দেশের বাণিজ্যিক স্বার্থ, তার অর্থনৈতিক ও সামরিক ক্ষমতা ব্যক্তির কাজকে নিয়ন্ত্রিত করে। বিসমার্কের ক্ষেত্রে বলা যায় যে, তাঁর তিন যুদ্ধের সাফল্য বিসমার্ক নাও পেতে পারতেন, যদি না ফন রুণ (Von Roon) ও ফন মোল্টকির (Von Moltke) মত সেনাপতি ও সামরিক পরিকল্পনাকারী তার সাহায্যে এগিয়ে না আসতেন। বিসমার্কের তথাকথিত পূর্ব-পরিকল্পিত যুদ্ধের জয়ের জন্যে এঁরাই ছিলেন প্রধান স্থপতি। প্রাশিয়ার রাজা প্রথম উইলিয়াম যদি বিসমার্কের পরিকল্পনায় সম্মতি না দিতেন তবে তাঁর তথাকথিত পূর্ব-পরিকল্পনা কোনদিন বাস্তবায়িত হত না। সুতরাং এত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে বিসমার্কের পক্ষে জার্মানীর ঐক্যের পূর্ব-পরিকল্পনা করা সম্ভব ছিল না বলাই ভাল।

রাজনীতিকে অঙ্কশাস্ত্রের মত নির্ভুলভাবে গণনা করা যায় না। ভবিষ্যতের গর্ভে যে সকল অজ্ঞাত ও অদৃশ্যমান ঘটনাবলী জন্ম নেয় তা কারও পক্ষে আগে থেকে অনুমান করা সম্ভব নয়। বিসমার্ক নিজেই বলেন যে, "কেবলমাত্র বিজ্ঞানের অধ্যাপকরাই বৈজ্ঞানিক সূত্রাবলী আবিষ্কার করেন, যা ভবিষ্যতে বিজ্ঞানকে নিয়ন্ত্রিত করে...অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যক্তি কখনও ভবিষ্যতের ঘটনাবলীকে নিয়ন্ত্রিত করতে সক্ষম হয় না। ব্যক্তিকে অপেক্ষা করতে হয়। সময় ও সুযোগ এলে তাকে নীতি নির্দ্ধারণ করতে হয়।"[১] বিসমার্কের লেখা চিঠি পত্রাবলীর যে সঙ্কলন অধুনা প্রকাশিত হয়েছে[২] তাতে বিসমার্কের উপরোক্ত চিন্তাধারার সমর্থন পাওয়া যায়। বিসমার্ক একটি পত্রে বলেন যে, "রাজনীতি কোন অপরিবর্তনীয় যুক্তি-নির্ভর বিজ্ঞান নয়। প্রতি মুহূর্তের পরিবর্তনশীল ঘটনাবলীর পটভূমিকায় যা কম ক্ষতিকারক এবং বেশী সুবিধাজনক সেই নীতি নির্দ্ধারণ করাকেই রাজনীতি বলা যায়।"[৩] সুতরাং বিসমার্কের আত্মজীবনীর ওপর নির্ভর করে কোন কোন ঐতিহাসিক জার্মানীর ঐক্যের জন্যে বিসমার্কের যে আগাম পরিকল্পনার তত্ত্ব উল্লেখ করেন, তা গ্রহণীয় নয়। বিশেষতঃ বিসমার্ক তাঁর অবসর জীবনে লিখিত আত্মজীবনীতে কিছু অতিকথন করেন একথা মনে রাখা দরকার। জার্মানীর ঐক্য যে কেবলমাত্র তাঁর আগাম পরিকল্পনার ফসল তাঁর এই দাবীর বাস্তবতা নেই।

বিসমার্ক সর্বদাই ঘটনার গতি-প্রকৃতি বুঝে তাৎক্ষণিকভাবে একাধিক পরিকল্পনা নিতেন। তারপর সুযোগ বুঝে যেটি যুক্তিযুক্ত মনে হত তা প্রয়োগ করতেন। তিনি নিজেই বলেন, "আমি সর্বদাই আগুনে একাধিক ইস্ত্রি গরম করি।" বিসমার্ক ছিলেন বাস্তবপন্থী প্রয়োগবাদী রাজনীতিক। পরিস্থিতি বুঝে তাঁর একাধিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও তা রূপায়িত করার ক্ষমতা ছিল। তিনি ৮/১০ বছর আগে থেকেই অষ্ট্রো-প্রাশিয় বা ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয় যুদ্ধের পরিকল্পনা ছকে ফেলেন একথা তাঁর গুণমুগ্ধ জীবনীকারগণ বললেও, তা গ্রহণীয় নয়। তিনি অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে বিনা যুদ্ধে সমস্যার সমাধান হলে অখুশি হতেন না। শান্তিপূর্ণ পথে সমাধান না হলে তিনি যুদ্ধের পথে সমাধানেও প্রস্তুত ছিলেন। বিসমার্ক ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয় যুদ্ধের পরিকল্পনা ১৮৬৭-৬৮ খ্রীঃ আগে করেননি বলাই ভাল। ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধের স্থলে তিনি ১৮৬৭ খ্রীঃ পর্যন্ত যুদ্ধ এড়াতেই চেষ্টা করেন। ১৮৬৭-৬৮ পর এই যুদ্ধ অনিবার্য দেখে তিনি কূটনৈতিক প্রস্তুতি নেন।

---

১. Pflanze—Bismarck and Development of German Nation.

২. Friedrich ruhe Ausgalu.

৩. Pflanze—Bismarck.

সবশেষে বলা দরকার যে, বিসমার্ক কোন সুদূরপ্রসারী, সুসংহত, বিস্তৃত আগামী পরিকল্পনা জার্মানীর ঐক্যের জন্যে যাদুকরের মত তাঁর জামার আস্তিনের মধ্যে লুকিয়ে রাখেন নি। একথা যেমন সত্য, তেমন একথাও সত্য যে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর একটি নিম্নতম পরিকল্পনা বা লক্ষ্য ছিল। তিনি লক্ষ্যহীনভাবে যখন যেমন সেইরকম ভাবে কাজ করার লোক ছিলেন না। তৃতীয় নেপোলিয়ন বরং বিনা পরিকল্পনায় পরস্পর-বিরোধী নীতি নিতেন। বিসমার্ক এদিক থেকে এক সুশৃঙ্খল, যুক্তিবাদী, বাস্তববাদী লক্ষ্য নিয়ে কাজ করতেন। তা ছিল এই যে, তিনি ছিলেন প্রাশিয় জাতীয়তাবাদী। প্রাশিয়ার স্বার্থে জার্মানীর ওপর প্রাশিয়ার আধিপত্য স্থাপন করা উচিত, এই চিন্তাধারা তাঁর মাথায় সর্বদাই ছিল। জার্মানীতে প্রাশিয়াকে বিস্তৃত করতে হলে অষ্ট্রিয়াকে জার্মানী থেকে সরে যেতে হবে বলে তিনি ভাবতেন। তাঁর সীমিত ও মূল পরিকল্পনা ছিল উত্তর জার্মানীতে প্রাশিয়াকে কেন্দ্র করে একটি রাজ্যমণ্ডলী গঠন। প্রাশিয়ার স্বার্থেই তিনি ডেনমার্ক, অষ্ট্রিয়া ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেন। "জার্মানীর ঐক্য ছিল তাঁর কাছে একটি ঘটনাচক্রে লভ্য, তাঁর সীমাহীন প্রাশিয় স্বার্থ অনুসরণের অপ্রার্থিত উপজাত ফল মাত্র" (The Unification of Germany was incidental, a by-product of his never ending pursuit of Prussian interests)। এ· জে· পি· টেইলার বলেন যে, "ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধের প্রয়োজনেই বিসমার্ক দক্ষিণ জার্মানীর রাজ্যগুলির উত্তর জার্মানীর সঙ্গে একীকরণ করেন, ঐক্যের প্রয়োজনে তিনি ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হননি" (Far from using the war to promote unification, he sought unification in order to continue the war)। দক্ষিণের ব্যাভেরিয়া, উর্টেমবার্গ প্রভৃতি ক্যাথলিক রাজ্যকে তিনি অবিশ্বাস করতেন। সামরিক ও কূটনৈতিক প্রয়োজনে তিনি এগুলিকে জার্মান রাষ্ট্রমণ্ডলের অঙ্গীভূত করেন। অনুরূপভাবে ফ্রাঙ্কো-জার্মান যুদ্ধ জয়ের পর তিনি আলসাস ও লোরেনের ফরাসী অধ্যুষিত অঞ্চলকে জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত করতে চাননি। সেনাপতিদের সামরিক প্রয়োজনের চাপে তিনি সিদ্ধান্ত পাল্টান। দেখা যাচ্ছে বিসমার্ক পরিস্থিতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত পাল্টাতেন । তাত্ত্বিক নিয়মে পূর্ব-পরিকল্পনা গঠন ও প্রয়োগ তিনি কখনও করেন নি।

পাঠ্যসূচী

১। Eyck—Bismarck and His System of Alliances.
২। A. J. P. Taylor—Struggle for Mastery of Europe.
৩। Agatha Ramm—Germany.
৪। New Cambridge Modern History. Vol. X.
৫। Langer—Bismarck and His System of Alliances.
৬। Chapman—The Third Republic of France.
৭। Brogan—The Development of Modern France.
৮। T. Zeldyn—France.
৯। Prison—Modern Germany.

বিংশ অধ্যায়

...র্কের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ জার্মানী (১৮৭১-১৮৯০ খ্রীঃ)

...nified Germany under Bismarck, 1871-1890)

বিসমার্কের আভ্যন্তরীণ শাসন নীতি, ১৮৭১-১৮৯০ খ্রীঃ (The Internal Administration of Germany by Bismarck, 1871—1890) ঃ জার্মানী ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পর বিসমার্ক জার্মানীর জন্যে একটি নতুন সংবিধান রচনা করেন। এই সংবিধানে জার্মানীকে একটি যুক্তরাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ২৫টি অঙ্গরাজ্যের সমন্বয়ে এই যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়। ৫টি গ্র্যান্ড ডাচি, ১৩টি ডাচি, ৩টি মুক্ত নগর ও ৪টি রাজা শাসিত রাজ্য—এই মোট ২৫টি অঙ্গরাজ্য নিয়ে জার্মান রাইখ (Reich) বা রাষ্ট্রমণ্ডল গড়া হয়। জার্মানী যদিও একটি যুক্তরাষ্ট্র ছিল কিন্তু কাগজ-কলমে জার্মানীকে জার্মান সাম্রাজ্য (German Empire) বলা হয়। জার্মান যুক্তরাষ্ট্রে অঙ্গরাজ্যগুলির স্বায়ত্ব শাসনের অধিকার স্বীকৃত হয়। অঙ্গরাজ্যগুলিতে পুরাতন রাজতান্ত্রিক শাসন বজায় থাকে। প্রতি অঙ্গরাজ্যের নিজস্ব শাসনব্যবস্থা অব্যাহত রাখা হয়। তবে কয়েকটি সাধারণ বিষয়ে কেন্দ্রের এক্তিয়ার স্থাপিত হয়। দেশরক্ষা, সেনা বাহিনী, রেলপথ, বৈদেশিক নীতি, ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা, রাজস্ব ও শুল্ক প্রভৃতি বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রাখা হয়।

জার্মান যুক্তরাষ্ট্র

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান হিসেবে জার্মান সম্রাট কাইজার থাকেন। সংবিধানে তাঁর বিশেষ ক্ষমতা স্বীকৃত হয়। শাসন বিভাগের প্রধান হিসেবে তিনি থাকেন। তিনি বংশানুক্রমিভাবে রাজত্ব করার অধিকার পান। তিনি তাঁর প্রধানমন্ত্রী বা রাইখ চ্যান্সেলর এবং মন্ত্রীসভাকে নিয়োগ ও বরখাস্তের অধিকার পান। সংবিধানে বলা হয় যে, চ্যান্সেলর বা প্রধানমন্ত্রী তাঁর কাজের জন্যে দায়িত্ববদ্ধ থাকবেন। কিন্তু তিনি কার কাছে দায়িত্ববদ্ধ থাকবেন তা বলা হয়নি। কাজেই আইনসভা দাবী করে যে, তিনি আইনসভার কাছেই দায়িত্ববদ্ধ থাকবেন। কিন্তু বিসমার্ক জানান যে, তিনি জার্মান সম্রাটের কাছেই দায়িত্ববদ্ধ। কারণ তিনিই তাঁকে নিয়োগ করেছেন। সংবিধানে জার্মানীর ৪ লক্ষ সেনার ব্যয়বরাদ্দ পার্লামেন্ট প্রতি ৭ বছর অন্তর করবে বলা হয়। একবার বরাদ্দ হলে ৭ বছরের জন্যে সামরিক খাতের খরচার জন্যে প্রধানমন্ত্রী আইনসভার দ্বারস্থ হবেন না। এই আইনটির নাম ছিল Septiennat।

কাইজারের ক্ষমতা

কেন্দ্রে দুই কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা গঠিত হয়। উর্ধ্ব কক্ষের নাম ছিল বুন্ডসরাট (Bundesrat)। জার্মানীর বিভিন্ন রাজ্যের রাজারা বা শাসকরা তাদের মনোনীত প্রতিনিধিকে এই সভার সদস্য হিসেবে পাঠাত। প্রাশিয়া এই সভায় তার প্রাধান্য রক্ষার জন্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক সদস্য মনোনয়ন করত। কেন্দ্রীয় আইনসভার নিম্নকক্ষের নাম ছিল রাইখষ্ট্যাগ (Reichstag)। জার্মানীর জনসাধারণের ভোটে এই সভাসদস্যরা নির্বাচিত হত। এই সভার ৩৯৭ জন সদস্যের মধ্যে প্রাশিয়া থেকে ২৩৫ জন সদস্য নির্বাচিত হত। এভাবে বিসমার্ক জার্মানীর আইনসভার ওপর প্রাশিয়ার প্রাধান্য স্থাপন করেন। বিসমার্ক এই সংবিধানে কেন্দ্রীয় আইনসভার উর্ধ্ব কক্ষে জার্মানীর রাজাদের স্বার্থ এবং নিম্ন কক্ষে জনসাধারণের স্বার্থের সমন্বয় করেন। কেন্দ্রীয় যুক্তরাষ্ট্রের বাজেট রচনা ও আয়ব্যয়ের হিসেব প্রভৃতি উর্ধ্ব কক্ষ বুন্ডসর্যাট করতে পারত। এই সকল আইনের সমালোচনা নিম্ন কক্ষও করতে পারত। বাজেট পাশের অধিকার নিম্নকক্ষের ছিল। এই বাজেট পাশ না করে রাইখষ্ট্যাগ ইচ্ছা করলে চ্যান্সেলরকে বিব্রত করতে পারত।

. নতুন সংবিধানে আইনসভাকে সার্বভৌম ক্ষমতা দান করা হয় নি। জার্মানীর মন্ত্রীসভা তার কাজের জন্যে আইনসভার নিকট দায়ী ছিল না। মন্ত্রীসভা সম্রাটের নির্দেশে চলত। সম্রাট ও প্রধানমন্ত্রীর হাতে সরকারের কার্য নির্বাহক ক্ষমতা ন্যস্ত ছিল। সম্রাট কোন নির্দেশ দিলে তাতে রাইখ চ্যান্সেলর স্বাক্ষর না দিলে তা বৈধ হত না। আইনসভা এঁদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারত না। আইনসভা কেবলমাত্র আইন রচনা ও বাজেট পাশ করত। কিন্তু সেই আইনগুলিকে কার্যকরীভাবে প্রয়োগের জন্যে তাদের মন্ত্রীসভার মর্জির ওপর নির্ভর করতে হত। আইনসভায় মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ হলেও চ্যান্সেলর পদত্যাগ করতে বাধ্য ছিলেন না। কারণ তিনি তাঁর কাজের জন্যে সম্রাটের নিকট একমাত্র দায়ী ছিলেন। ম্যাক্স ওয়েবার নামক ঐতিহাসিক এজন্যে বিসমার্কের সংবিধানকে "ভণ্ড সংবিধান" (Sham Constitution) আখ্যা দিয়েছেন।[১] বিসমার্ক যে সংবিধান প্রবর্তন করেন তার দ্বারা জার্মানীকে যুক্তরাষ্ট্র রূপে গঠন করা হলেও কার্যতঃ এই সংবিধানের ওপর প্রাশিয়ার আধিপত্য স্থাপিত হয়। অন্যান্য অঙ্গরাজ্যগুলি সমান অধিকার পায়নি। প্রাশিয়ার রাজাই হন জার্মান সম্রাট এবং প্রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রীই হন জার্মান রাইখ চ্যান্সেলর। যুক্তরাষ্ট্রের সকল কার্যনির্বাহক ক্ষমতা তাঁদের হাতে দেওয়া হয়। রাইখষ্ট্যাগের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য প্রাশিয়া থেকে নির্বাচিত হত। ফলে সর্বক্ষেত্রে প্রাশিয়ার আধিপত্য স্থাপিত হয়। যেহেতু চ্যান্সেলর তাঁর কাজের জন্যে আইনসভার কাছে দায়ী ছিলেন না, সেহেতু এই সংবিধানে একনায়কতন্ত্র প্রবল হয়। বিসমার্ক তাঁর ২০ বছরের শাসনকালে অঙ্গরাজ্যগুলির অধিকার খর্ব করে কেন্দ্রের ক্ষমতা বাড়াতে থাকেন। বিসমার্ক নব গঠিত জার্মানীর প্রশাসন বা আমলাতন্ত্রকে বিভিন্ন জাঙ্কার পরিবারের সন্তান অথবা পেশাদারী চাকুরীজীবি বুর্জোয়াদের দ্বারা গঠন করেন। এই সকল উচ্চপদে অধিষ্ঠিত কর্মচারীদের Von বা ফন সম্বোধন দ্বারা বিসমার্ক তাঁদের মর্যাদা বা আভিজাত্য বাড়ান। বিসমার্ক তাঁর অতীতের সংবিধান বিরোধী কাজের জন্যে আইনসভার উদারপন্থী সদস্যদের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেন। কৃতজ্ঞ বিরোধী সদস্যরা বিসমার্কের বদান্যতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে ক্ষমাপত্র দিয়ে দেন।

জার্মান সংবিধানের ত্রুটি : স্বৈরতন্ত্রী শাসন

ঐক্যবদ্ধ জার্মানীর বৈষয়িক উন্নতির জন্যে বিসমার্ক বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। যদিও বিসমার্ক নিজে ছিলেন সামন্তশ্রেণীর লোক তবুও তিনি শিল্প গঠনের উপযোগিতা বুঝতেন। ডেভিড ল্যান্ডস[২] নামক অর্থনৈতিক ঐতিহাসিকের মতে, এই সময় ইওরোপের সমাজ ব্যবস্থা এমন ছিল যে, লোকে শিল্প-বাণিজ্যের দ্বারা জীবিকা নির্বাহকে অসম্মানজনক মনে করত। বিসমার্কের আমলে জার্মানীর এই মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর অবসান ঘটে। জার্মানীতে শিল্পের বিকাশ দ্রুত ঘটতে থাকে। বিসমার্ক মুদ্রা সংস্কার করে সমগ্র জার্মানীতে কেন্দ্রীয় মুদ্রার প্রচলন করেন। তিনি রাইখ ব্যাঙ্ক (১৮৭৬ খ্রীঃ) স্থাপন করে জার্মানীর ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ করেন। জার্মানীতে বৃহদায়তন শিল্প ব্যাঙ্ক বা হাইপার ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। এই ব্যাঙ্কগুলি একদিকে মূলধন সরবরাহ, অন্যদিকে শিল্প গঠনের কাজে পরামর্শ দিত। শিল্প বিস্তারের জন্যে বিসমার্ক জার্মানীতে একচেটিয়া শিল্প বা কার্টেল প্রথা গঠনের অনুমতি দেন। রেলপথ নির্মাণকে অগ্রাধিকার দিয়ে তিনি যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটান। জার্মানীতে কেন্দ্রীয় ডাক ও তার ব্যবস্থা চালু করেন। সর্বোপরি, জার্মানীর নবগঠিত শিল্পগুলিকে রক্ষার জন্যে তিনি শিল্পে সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করেন। বিদেশ থেকে মাল আমদানি কমার ফলে, জার্মানীর স্বদেশী জিনিষের বিক্রয় বাড়ে। বিদেশী জিনিষের ওপর চড়া হারে শুল্ক ধার্য করায় লোকে সস্তায়

জার্মানীতে শিল্প বিস্তার : শিল্প সংরক্ষণ আইন

১· Codd—Modern Constitution. I. P. 325-51

১· David Landes.

স্বদেশী মাল কিনতে আগ্রহ বোধ করে। বিসমার্কের এই শিল্প সংরক্ষণ নীতির ফলে জার্মানীর শিল্পগুলির দ্রুত বিকাশ ঘটে। সমগ্র দেশে একই প্রকার ফৌজদারী ও দেওয়ানী আইন এবং বিচার ব্যবস্থা গঠন করায় জার্মানীর ঐক্য দৃঢ় হয়।

ঔপনিবেশিক নীতি

১৮৭০-১৮৮০ খ্রীঃ বিসমার্ক উপনিবেশ স্থাপনের প্রতি ঔদাসীন্য দেখান। কিন্তু ১৮৮০ খ্রীঃ পর বিসমার্ক তাঁর নীতির পরিবর্তন ঘটাতে বাধ্য হন। কারণ জার্মানীতে শিল্প বিস্তারের ফলে উদ্বৃত্ত মাল বিক্রয়ের জন্যে বাজারের প্রয়োজন দেখা দেয়। জার্মান বুর্জোয়া শ্রেণী এজন্যে উপনিবেশ স্থাপনের প্রতি আগ্রহ দেখায়। এই কারণে বিসমার্ক আফ্রিকায় জার্মান উপনিবেশ স্থাপনের দিকে নজর দেন। স্যামোয়া, টোগোল্যান্ড, ক্যামেরুণ, নিউগিনি প্রভৃতি স্থানে জার্মান উপনিবেশ স্থাপিত হয়। তবে সাধারণভাবে বিসমার্ক উপনিবেশ বিস্তারের পক্ষপাতী ছিলেন না। কারণ তিনি ইওরোপের প্রধান ঔপনিবেশিক শক্তি ইংলন্ডের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে দূরে থাকতে চাইতেন।

জার্মানীকরণ নীতি

জার্মানীতে যে সকল অ-জার্মান জাতি ছিল যথা পোল, ডেন, ফরাসী প্রভৃতি তাদের জার্মান করণের জন্যে বিসমার্ক বিশেষ চেষ্টা করেন। তিনি জার্মানীর সকল অধিবাসীদের জার্মান ভাষা শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার চেষ্টা করেন এবং জার্মান উত্তরাধিকার আইন মানতে বাধ্য করেন। জার্মানকরণ নীতির জন্যে বিসমার্ক পোল ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের ঘোর বিরোধের সম্মুখীন হন। তথাপি তিনি দৃঢ়ভাবে এই সকল সংখ্যালঘু জাতির জার্মানীকরণের চেষ্টা চালান।

ক্যাথলিক বিচ্ছিন্নতাবাদ

জার্মানীর ঐক্য স্থাপনের পর বিসমার্ককে সর্বাপেক্ষা যে সমস্যা বিব্রত করে তাহা ছিল ক্যাথলিক গীর্জার সঙ্গে জার্মান রাষ্ট্রের সম্পর্ক। মধ্যযুগ থেকে জার্মান রাষ্ট্রের সঙ্গে ক্যাথলিক ধর্মগুরু পোপের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব চালু ছিল। প্রটেস্টান্ট ধর্মাবলম্বী প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মানী ঐক্যবদ্ধ হলে, দক্ষিণ জার্মানীর ক্যাথলিকরা আশঙ্কা করে যে, তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হবে। এজন্যে জার্মান ক্যাথলিকরা সেন্টার পার্টি (Centre party) নামে এক রাজনৈতিক দল গঠন করে আইনসভার ক্যাথলিকদের স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করেন। হ্যানোভারের ক্যাথলিক নেতা লাডভিগ উইণ্ডহর্স্টের নেতৃত্বে সেন্টার পার্টি সংহত হয়ে ক্ষমতা বিস্তার করে।

পোপের অভ্রান্ততা ঘোষণা

পোপ নবম পায়াস বা পাই সিলেবাস অব্ এররস (Syllabus of Errors) এবং ইনফ্যালিবিলিটি ডিক্রী (Infallibility Decree) নামে দুটি ঘোষণা জারী করেন। এই ঘোষণা দুটিতে পোপ আধুনিক যুগের রাষ্ট্রনৈতিক তত্ত্বগুলিকে খ্রীষ্টধর্ম বিরোধী বলে অভিহিত করেন। তিনি আরও বলেন যে, পোপ হলেন ঈশ্বরের প্রতিনিধি। সুতরাং তাঁর মতামত হল অভ্রান্ত। রাষ্ট্রের আইন অপেক্ষা পোপের আইন শ্রেষ্ঠ এবং অলঙ্ঘনীয় বলে তিনি ঘোষণা করেন। সুতরাং খাঁটি ক্যাথলিকরা রাষ্ট্রের আইনের সঙ্গে পোপের আইনের বিরোধ দেখা দিলে গীর্জার আইন মান্য করতে বাধ্য বলে পোপ ঘোষণা দেন। ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের এই বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাবের জন্যে বিসমার্ক শঙ্কিত হন। পোপের এই দাবীর ফলে ইতালীয় জাতীয়তাবাদী ও পিডমন্টের মন্ত্রী কাভ্যুরের সঙ্গে তার আগেই বিবাদ দেখা দেয়। ক্রমে পোপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জার্মানীতেও ছড়ায়। বিসমার্ক গোপনে পোপকে প্রস্তাব দেন যে, পোপ যদি জার্মান রাষ্ট্রের আইনগুলির বিরোধিতা না করেন, তবে তিনি পোপকে সমর্থন করবেন। তিনি পোপের অনুমোদন নিয়ে জার্মানীর ক্যাথলিক সেন্টার দলকে দমাতেও চান। কিন্তু পোপ বিসমার্কের এই প্রস্তাবে রাজী না হলে, বিসমার্ক রাজনৈতিক কারণেই পোপের বিরুদ্ধে জার্মান জাতীয়তাবাদী ও রাইখষ্ট্যাগের উদারপন্থী, প্রগতিশীল সদস্যদের সাহায্য নিয়ে পোপের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেন।

জনগণকে নিজপক্ষে আনার জন্যে তিনি কুলটুর ক্যাম্ফ (Kultur Kampf) বা সংস্কৃতির সংগ্রাম নামে এক গালভরা নাম দেন। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন যে, বিসমার্ক বিভিন্ন উদ্দেশ্যে কুলটুর ক্যাম্ফ শুরু করেন। (১) তাঁর আশঙ্কা ছিল যে, ক্যাথলিক সেন্টার পার্টির ক্ষমতা বাড়লে জার্মান রাষ্ট্রে তাঁর ও প্রাশিয়ার প্রভাব ক্ষয় পাবে। যেহেতু তিনি নিজে এবং প্রাশিয়াকে অভিন্ন মনে করতেন, তাই তাঁর বিরুদ্ধে সেন্টার পার্টির প্রতিবাদকে তিনি প্রাশিয়া বিরোধী ভাবতেন। (২) তাঁর ভয় ছিল যে, পোপের ঘোষণার ফলে জার্মান ক্যাথলিক গীর্জা শক্তিশালী হলে রাষ্ট্রকে অমান্য করতে পারে। (৩) ক্যাথলিক ফ্রান্স ছিল পোপের সমর্থক। যেহেতু সেডানের যুদ্ধের পর থেকে ফ্রান্স ও জার্মানীর মধ্যে অহি-নকুল সম্পর্ক ছিল সেহেতু তিনি ফ্রান্স সমর্থিত পোপকে সহ্য করতে পারতেন না। দেশের ভেতর ও দেশের বাইরে বিসমার্কের সমর্থকও কম ছিল না। কারণ বিসমার্ক তাঁর আসল মতলব চাপা দিয়ে, ক্যাথলিক গীর্জাকে প্রগতি ও জাতীয়তা-বিরোধী রূপে প্রচার চালান। জার্মান রাইখষ্ট্যাগের উদারপন্থী সদস্যরা সাধারণভাবে বিসমার্ক বিরোধী হলেও, এক্ষেত্রে তাঁরা প্রগতির স্বার্থে পোপের মধ্যযুগীয় দাবীর বিরোধিতা করেন এবং বিসমার্ককে সমর্থন করলে তাঁর হাত শক্ত হয়।

জার্মানীর মিউনিখ্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ ডলিঞ্জার (Dr. Dollinger) পোপের ঘোষণার প্রতিবাদ জানালে, তিনি ক্যাথলিক গীর্জা থেকে বহিষ্কৃত হন। ডঃ ডলিঞ্জারের সমর্থনে জার্মান জাতীয়তাবাদী ক্যাথলিক গোষ্ঠী এগিয়ে আসে। এদের নাম ছিল পুরানো ক্যাথলিক। তারা পোপের হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে জার্মান রাষ্ট্রের প্রতিরোধ প্রার্থনা করে। এদিকে সেন্টার পার্টি দাবী জানায় যে, ক্যাথলিক ধর্মীয় ব্যাপারে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ চলবে না। রাষ্ট্রের সঙ্গে গীর্জার এই সংঘাতকে অধ্যাপক রুডলফ ভিরচাও (Rudolph Virchow) কুলটুর ক্যাম্ফ (Kultur Kampf) বা সংস্কৃতির সংগ্রাম আখ্যা দেন। জার্মান ভাষায় Culture বা সংস্কৃতিকে Kultur বা কুলটুর বলা হয়। বিসমার্ক উপলব্ধি করেন যে, জার্মান গীর্জার ওপর পোপের আধিপত্য স্বীকার করলে জার্মান রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ হবে। এজন্যে তিনি দমনমূলক আইনের সাহায্য নেন। তিনি আইন দ্বারা জেসুইটদের জার্মানী থেকে বহিষ্কার করেন। তিনি সেন্টার দলকে নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি May Laws বা "মে আইন" দ্বারা জার্মান ক্যাথলিকদের জার্মানীর নাগরিক আইন মান্য করতে বাধ্য করেন। ক্যাথলিক বিদ্যালয়গুলিতে সরকারি পরিদর্শক নিয়োগ করা হয়। স্কুল ও কলেজের শিক্ষকদের জার্মানীর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট ডিগ্রী নিতে বাধ্য করা হয়। সিভিল ম্যারেজ (Civil marriage) বা রেজেষ্ট্রী প্রথায় বিবাহ করার নিয়ম চালু করা হয়। প্রটেস্টান্ট ও ক্যাথলিকদের মধ্যে অন্তর্বিবাহ বিবাহ রেজেষ্ট্রী দ্বারা বৈধ বলে ঘোষণা করা হয়। বিসমার্ক ঘোষণা করেন যে, "কানোসার আত্মসমর্পণের দিন আর আসবে না" (The Days of Canossa are over)।

কুলটুর ক্যাম্ফ

জার্মান বিশপদের শাস্তিদানের ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়। গীর্জার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার নাকচ করা হয়। পোপের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করা হয়। ফ্রান্স পোপকে সমর্থন করায় ১৮৭৫ খ্রীঃ ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধের হুমকি দেওয়া হয়।

এদিকে পোপের নির্দেশে ধর্ম বিশ্বাসী ক্যাথলিকরা বা সেন্টার পার্টি সরকারের দমন নীতির বিরুদ্ধে অহিংস প্রতিরোধ চালায়। তারা স্বেচ্ছায় সরকারের নিকট থেকে কারাদণ্ড ও জরিমানা

১· প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে, একাদশ শতকে জার্মান সম্রাট চতুর্থ হেনরীর সঙ্গে রোমের পোপ সপ্তম গ্রেগরীর বিরোধ বাধলে পোপ সম্রাট চতুর্থ হেনরীকে excommunicate বা একঘরে করেন। প্রজারা নরকে যাবার ভয়ে তাঁকে আনুগত্য দিতে অস্বীকার করে। চতুর্থ হেনরী আল্পস অতিক্রম করে কানেসা গ্রাম গিয়ে পোপের পদতলে ক্ষমা ভিক্ষা করেন। কানেসার ঘটনা ছিল জার্মান জাতীয়তাবাদের পরাজয়। বিসমার্ক এজন্যে কানেসার নাম উল্লেখ করেন।

বরণ করে। ক্যাথলিকদের এই নৈতিক প্রতিরোধ জনমতের ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। রাইখষ্ট্যাগের নির্বাচনে সেন্টার পার্টির সদস্য সংখ্যা বাড়তে থাকে। ১৮৭৪ খ্রীঃ নির্বাচনে রাইখষ্ট্যাগে সেন্টার পার্টির ৯৬জন নতুন সদস্য আসন দখল করলে বিসমার্ক ক্যাথলিকদের বিরুদ্ধে নিস্ফলা যুদ্ধের পরিণাম বুঝতে পারেন। জার্মানীর প্রটেস্টানরাও চ্যান্সেলরের উগ্র ক্যাথলিক বিদ্বেষ পছন্দ করত না। ইতিমধ্যে সোসালিষ্ট বা সমাজতন্ত্রীদের সঙ্গে জার্মান সরকারের বিরোধ বাধে। বিসমার্কের এই কূটনীতি ছিল যে, তাঁর প্রকৃতপক্ষে কোন শত্রু না থাকলেও, তিনি শত্রু আবিষ্কার করে নির্বাচনের সময় নির্বাচক মণ্ডলীকে প্রভাবিত করতেন। এজন্য তিনি তাঁর পরিকল্পিত সামাজিক সংস্কারের জন্যে পার্লামেন্টে সেন্টার পার্টির সহযোগিতা চান। তিনি জানতেন যে, তাঁর এই সংস্কারে পার্লামেন্টের সমাজতন্ত্রী ও উদারপন্থী সদস্যরা বাধা দেবে। এখন তিনি অকস্মাৎ সোস্যালিষ্টদের শত্রু হিসেবে গণ্য করেন। এই বিরোধে ক্যাথলিক সেন্টার দলের সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা বুঝে বিসমার্ক ক্যাথলিকদের সম্পর্কে নমনীয় নীতি নেন। পোপ নবম পায়াসের মৃত্যুর পর, পোপ ত্রয়োদশ লিওর সঙ্গে বিসমার্কের আপোষ হয়। বিসমার্ক ক্যাথলিক বিরোধী আইনগুলির প্রয়োগ মুলতুবী রাখেন। এভাবে কুলটুর ক্যাম্ফের অবসান ঘটে।

ক্যাথলিকদের প্রতিরোধ

পোপের সঙ্গে আপোষ

জার্মানীতে সোসিয়েল ডেমোক্র্যাট বা সমাজতন্ত্রবাদী গণতান্ত্রিক দল ছিল খুবই জনপ্রিয় ও শক্তিশালী। এই দলের নেতা লাইবনেষ্ট ও বেবেল, কাইজারের স্বৈরতন্ত্র ও যুদ্ধনীতির ঘোর বিরোধী ছিল। এরা বিসমার্কের রক্ত ও লৌহ নীতির, আলসাস অধিকার ও ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধের ঘোর বিরোধিতা করেন। কাইজার প্রথম উইলিয়াম সমাজতন্ত্রীদের ওপর এমন ক্ষিপ্ত ছিলেন যে, এদের দমন করা তিনি তাঁর জীবনের অন্যতম কর্তব্য মনে করতেন। জার্মানী ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পর সমাজতন্ত্রী দল দুটি শাখায় বিভুক্ত হয়। মার্কসপন্থী সমাজতন্ত্রীরা আন্তর্জাতিক সাম্যবাদের আদর্শে বিশ্বাস করত। লাসেল পন্থীরা (Lassel) কেবলমাত্র জার্মানীতেই সমাজতন্ত্রবাদের বিকাশের কথা ভাবত। লাসেলপন্থীরা বিশ্বাস করত যে, কেবলমাত্র ধর্মঘট বা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন দ্বারা শ্রমিকের মুক্তি হবে না। এর সঙ্গে শ্রমিকের রাজনৈতিক অধিকারের বিস্তার, বিশেষতঃ পার্লামেন্টে সদস্যপদ দখল, মন্ত্রীসভায় শ্রমিকপন্থী সদস্য ন ঢুকলে, শ্রমিকের কোন স্থায়ী উপকার হবে না। শেষ পর্যন্ত ১৮৭৫ খ্রীঃ জার্মানীর গোটাতে (Gotha) উভয় গোষ্ঠী সমবেত হয়ে উভয় দল মিলিত হয়। এর ফলে মার্কসবাদী ও লাসেলবাদী ধারা যুক্ত হয়। মার্কসবাদী ও লাসেলপন্থীরা মিলিত হয়ে জার্মান সোসিয়েল ডেমোক্রেটিক দল গঠন করে। এই দল গঠিত হলে বিসমার্ক আতঙ্কিত হন। সোসিয়েল ডেমোক্রেটিক দল আইনসভায় ১২টি পদ অধিকার করে এবং তারা পার্লামেন্টারী প্রথার মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। পার্লামেন্টে তাদের ক্ষুরধার সমলোচনায় বিসমার্কের স্বৈরনীতি ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। বিসমার্ক এজন্যে দমন নীতির দ্বারা এই জনপ্রিয় দলকে ধ্বংসের চেষ্টা করেন। সম্রাট প্রথম কাইজারকে হত্যা করার চেষ্টা করা হলে, বিসমার্ক এজন্যে সমাজতান্ত্রিক দলকে দায়ী করেন। যদিও সমাজতান্ত্রিক দল এই ঘটনার নিন্দা করে, তবুও বিসমার্ক সমাজতান্ত্রিক দলের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড দমন নীতি চালান। গ্রেপ্তার, কারাদণ্ড ও নির্বাসন দ্বারা তিনি সমাজতন্ত্রীদের মেরুদণ্ড ভেঙে দেন। তাদের সভাসমিতি, পুস্তক প্রকাশ ও দলীয় প্রচার নিষিদ্ধ হয়। ৯০০ ব্যক্তিকে নির্বাসিত করা হয়। ১৪টি সংবাদপত্র নিষিদ্ধ করা হয়। পুলিশের হাতে সমাজতন্ত্রীদের দমনের জন্যে তাদের ক্ষমতা দেওয়া হয়।

সমাজতন্ত্রবাদীদের সঙ্গে সংঘাত

সমাজতান্ত্রিক দল জার্মানীতে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্যে বিভিন্ন দাবী জানাত। বিসমার্ক দেখেন যে, শ্রমিকদের মঙ্গলের জন্যে সংস্কার না করলে জনমতকে

বিসমার্কের শ্রমিক কল্যাণ আইনগুলি

সরকারের পক্ষে আনা যাবে না। এজন্যে বিসমার্ক কিছু কিছু শ্রমিক কল্যাণমূলক আইন প্রবর্তন করেন। তিনি শ্রমিকদের বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, সরকার সমাজতন্ত্রীদের অপেক্ষা শ্রমিকদের কম ভালবাসে না। তিনি এই উদ্দেশ্যে State Socialism বা রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রবাদ প্রবর্তন করেন। শ্রমিক শ্রেণীকে রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত রাখার জন্যে বিসমার্ক শ্রমিকদের দুর্ঘটনা, বার্দ্ধক্য ও রোগের জন্যে বীমা ব্যবস্থা চালু করেন। এই বীমার জন্যে প্রদেয় প্রিমিয়াম বা কিস্তির বৃহদংশ রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত হত। কারখানায় শ্রমিকদের কাজের সময় কমান হয়। কিন্তু বিসমার্কের আইনগুলি যথেষ্ট নয় বলে সমাজতন্ত্রীরা সমালোচনা করে। শ্রমিকশ্রেণীও বিসমার্কের আইনগুলি অপর্যাপ্ত মনে করত। তারা সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শের প্রতি অবিচল থাকে। গোপনে এই দল সভা ও সংগঠনের মাধ্যমে শক্তি বৃদ্ধি করে। আইনসভার নির্বাচনে সমাজতন্ত্রবাদীদের শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৮৯০ খ্রীঃ সোস্যালিষ্ট পার্টি নির্বাচনে রাইখষ্ট্যাগে ১০০ সদস্য পদ পায় এবং জাতীয় ভোটের ৪২ লক্ষ ৫০ হাজার ৪ শত ১টি ভোট পায়। কাজেই ক্যাথলিক সেন্টার দলের ক্ষেত্রে যেমন হয়েছিল তেমনই সোস্যালিষ্টদের ক্ষেত্রে বিসমার্ক সফল হতে পারেননি। তিনি মেটারনিকের মত প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিতে সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রকে দেখতেন। শ্রমিক কল্যাণমূলক কিছু আইন তিনি পাশ করলেও তাঁর এই নীতিকে "কিশমিশ ও বেত্রাঘাত" নীতি বলে সমালোচনা করা হয়। জাতীয় উদারপন্থীরাও তাঁর সমাজতন্ত্র দলের বিরুদ্ধে দমনমূলক আইনকে পার্লামেন্টে সমর্থন করেনি। তিনি অবশ্য রক্ষণশীল সদস্যদের ভোটের সাহায্য পান। কিন্তু সার্বিকভাবে বলা যায় যে, তাঁর আভ্যন্তরীণ শাসননীতির ব্যর্থতা ক্রমে স্পষ্ট হতে থাকে।

বিসমার্কের নীতির ত্রুটি

জার্মান রাইখের চ্যান্সেলর (১৮৭০-৯০ খ্রীঃ) হিসেবে বিসমার্কের আভ্যন্তরীণ শাসন নীতির সমালোচনা প্রসঙ্গে বলা যায় যে, বিসমার্ক জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করলেও তিনি জার্মানীতে স্বৈরতন্ত্র স্থাপন করার ফলে জার্মানীর প্রগতি ব্যাহত হয়। তিনি গণতান্ত্রিক আদর্শকে অগ্রাহ্য করায় জার্মান জাতির আশা-আকাঙ্খা অপূর্ণ থাকে। ঐতিহাসিক সিম্যান (Seaman) এর মতে, বিসমার্ক জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ না করে জার্মানীর ওপর প্রাশিয়ার সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। জার্মানীর ঐক্য অপেক্ষা প্রাশিয়ার আধিপত্য স্থাপন ছিল বিসমার্কের প্রধান লক্ষ্য, একথা বলা অধিক সঙ্গত।[১] কারণ ঐক্যবদ্ধ জার্মানীর সংবিধানে বিসমার্ক সমগ্র জার্মানীর ওপর প্রাশিয়ার আধিপত্য বজায় রাখার সুব্যবস্থা করেন। তাছাড়া সীম্যান (Seaman) এর মতে, জার্মান ভাষা-ভাষী অষ্ট্রিয়াকে জার্মানী থেকে বহিষ্কার করে বিসমার্ক জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করার স্থলে বিভক্ত করেন। কারণ অষ্ট্রিয়ার জার্মানদের বাদ দিয়ে কিভাবে জার্মানীর ঐক্য স্থাপিত হয় তা বোঝা কঠিন। জার্মানীর ক্যাথলিক ও সোস্যালিষ্টদের দমন করে বিসমার্ক তাঁর প্রতিক্রিয়াশীল নীতির পরিচয় দেন। ১৮৯০ খ্রীঃ কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম অকস্মাৎ তাঁর শিক্ষক বিসমার্ককে পদচ্যুত করলে বিসমার্কের রাজনৈতিক জীবনে যবনিকা পড়ে। বিসমার্কের পদচ্যুতিকে Dropping of the Pilot 'জাহাজের কাপ্তেনকে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ' বলে অভিহিত করা হয়।

বিসমার্কের অধীনে ঐক্যবদ্ধ জার্মানীর বৈদেশিক নীতি : ত্রিশক্তি চুক্তি, ১৮৭০-১৮৯০ খ্রীঃ (Foreign policy of unified Germany under Bismarck : Triple Alliance, 1870-1890) : ১৮৭০ খ্রীঃ পর বিসমার্ক কুড়ি বছর জার্মানীর চ্যান্সেলর হিসেবে শাসন চালান। ইওরোপের ইতিহাসে এই

১· Seaman—Vienna to Versailles. P. 115.

ঐক্যবদ্ধ জার্মানীর সমস্যা

সময়কে "বিসমার্কের যুগ" (The Age of Bismarck) বলা হয়। বিসমার্ক ছিলেন অত্যন্ত বাস্তব বুদ্ধির লোক। তিনি উপলব্ধি করেন যে, ইওরোপের দুই বৃহৎ শক্তি অষ্ট্রিয়া ও ফ্রান্সকে পরাস্ত করে জার্মানীর ঐক্য স্থাপনের ফলে ইওরোপের পুরাতন শক্তিসাম্য ভেঙে গেছে। অষ্ট্রিয়া ও ফ্রান্সের স্থলে ইওরোপে জার্মানীর যে নেতৃত্ব স্থাপিত হয়েছে তাকে স্থায়ী করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, সেডানের যুদ্ধে পরাজিত ফ্রান্স, জার্মানীর ওপর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে এবং আলসাস ও লোরেন পুনরুদ্ধারের জন্যে আহত সর্পের ন্যায় ফুঁসছিল। ফ্রান্সের প্রতিহিংসামূলক আক্রমণ থেকে নবগঠিত জার্মানীকে রক্ষা করা ছিল বিসমার্কের প্রধান লক্ষ্য। তৃতীয়তঃ, সাত বছরের মধ্যে (১৮৬৪-১৮৭০ খ্রীঃ) তিনটি যুদ্ধে জার্মানী ইওরোপের বৃহৎ শক্তিগুলিকে পরাস্ত করার ফলে জার্মানীর সামরিক ক্ষমতা সম্পর্কে ভীতি দেখা দেয়। এর ফলে ইওরোপে জার্মান-বিরোধী জোট গড়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দেয়। বিসমার্কের লক্ষ্য ছিল ইওরোপে জার্মান-বিরোধী জোট গঠন বন্ধ করা এবং ইওরোপে শান্তি এবং ১৮৭১ খ্রীঃ স্থিতাবস্থা বজায় রাখা।

১৮৭০ খ্রীঃ পর জার্মানীর সমস্যা ঃ ফ্রান্সের প্রতিবোধ নীতি

বিসমার্ক তাঁর কূটনৈতিক দক্ষতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে উপরোক্ত সমস্যাগুলির মোকাবিলা করেন। তিনি জার্মানীর আগ্রাসী মনোভাব সম্পর্কে ইওরোপের আশঙ্কা নিরসনের জন্যে ঘোষণা করেন যে, "জার্মানী হল পরিতৃপ্ত দেশ" (Germany is a satiated country)। জার্মানীর আর রাজ্য বিস্তার এবং যুদ্ধের প্রয়োজন নেই। জার্মানী শান্তিকামী রাষ্ট্র হিসেবে থাকতে চায়। বিসমার্কের এই দৃঢ় ঘোষণা রাশিয়া, ইংলন্ড প্রভৃতি দেশের আশঙ্কা দূরে করে। এর ফলে জার্মান-বিরোধী জোট গঠনের চেষ্টা বন্ধ হয়। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ও বিসমার্কের মধ্যে এক্ষেত্রে তুলনা করা চলে। নেপোলিয়ন কোথায় থামতে হয় তা জানতেন না। ১৮০২ খ্রীঃ তিনি যদি স্থিতাবস্থা মেনে নিতেন তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে শক্তিজোট গঠিত হত না। বিসমার্ক ১৮৭১এর সফলতার পর স্থিতাবস্থা রক্ষাই তাঁর লক্ষ্য হিসেবে নিলে ইওরোপের কাছে নবোদিত জার্মানী ক্রমে গ্রহণীয় হয়।

জার্মানীর শান্তিকামী নীতি

অতঃপর জার্মানীকে কেন্দ্র করে ইওরোপের প্রধান শক্তিগুলির সাহায্যে মৈত্রী জোট গঠনের জন্যে বিসমার্ক চেষ্টা করেন। এই জোট গড়ার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ফ্রান্সকে মিত্রহীন করে দুর্বল করা। জার্মানীকে কেন্দ্র করে জোট স্থাপিত হলে ফ্রান্স, জার্মানীর বিরুদ্ধে প্রতিহিংসামূলক আক্রমণ করতে সাহস পাবে না বলে বিসমার্ক মনে করেন। বিসমার্ক রাশিয়া, অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি রক্ষণশীল শক্তিগুলিকে নিয়ে জার্মানীর সঙ্গে এই জোট গঠনের পরিকল্পনা করেন। ফ্রান্সের প্রজাতন্ত্রের প্রতি অষ্ট্রিয়ার হ্যাপসবার্গ এবং রাশিয়ার রোমানভ রাজবংশের ঘৃণাকে তিনি জাগিয়ে তোলেন। রেনে কেরি (Rene Carrie)[১] নামক ঐতিহাসিকের মতে, বিংশ শতকের গোড়ার দিকে রাশিয়ার সাম্যবাদকে যেরূপ সন্দেহের চোখে দেখা হত, উনবিংশ শতকে প্রজাতন্ত্রী ফ্রান্সের বিপ্লবী ভাবধারাকে সেরূপ ইওরোপের রাজতন্ত্রী দেশগুলি সন্দেহের চোখে দেখত। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ইওরোপের রাজাদের এই সন্দেহকে বিসমার্ক জার্মানীর স্বার্থে ব্যবহার করেন। তিনি জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার এবং হ্যাপসবার্গ সম্রাট ফ্রান্সিস যোসেফের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ফ্রান্সের প্রজাতন্ত্রবাদ এবং প্যারিস কমিউনের সাম্যবাদ, রাশিয়ার নিহিলিষ্টবাদ ও জার্মান সমাজতন্ত্রবাদ প্রভৃতি বৈপ্লবিক ভাবধারা ইওরোপের রাজতন্ত্রগুলির পক্ষে কিরূপ বিপজ্জনক তা তিনি সবিস্তারে বর্ণনা করেন।

ফ্রান্সকে মিত্রহীন করায় বিরোধ

১· Rene Carrie—Diplomatic History of Europe. P. 212.

তিন সম্রাটের জোট

বিসমার্কের প্রভাবে জার্মান সম্রাট কাইজার প্রথম উইলিয়াম, অষ্ট্রিয়ার কাইজার ফ্রান্সিস যোসেফ এবং রুশ জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার এক মৈত্রী জোট গঠন করেন। এর নাম ড্রে-কাইজার বুণ্ড (Drei-Kaiser Bund) অর্থাৎ তিন কাইজারের লীগ, ১৮৭৩ খ্রীঃ। এই সন্ধির নেতিবাচক দিকটি জার্মানীর স্বার্থ রক্ষা করে। এই চুক্তিতে জার্মানীকে কোন সামরিক সাহায্যের দায়িত্ব নিতে হয়নি। এই চুক্তির ফলে ইওরোপে ফ্রান্স মিত্রহীন হয়। বিসমার্কের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। ১৮৭১ খ্রীঃ পর থেকে তিনি ফ্রান্সকেই জার্মানীর প্রধান শত্রু হিসেবে গণ্য করেন। যাতে ফ্রান্স মিত্রশক্তি লাভ দ্বারা শক্তিশালী না হয়, এটাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। ১৮১৫ খ্রীঃ-এর পবিত্র চুক্তি (Holy Alliance)-এর ন্যায় তিন কাইজারের লীগ ১৮৭১ খ্রীঃ এর স্থিতাবস্থাকে রক্ষা করে। অতঃপর ইংলন্ড যাতে ফ্রান্সের পক্ষ না নেয় এজন্যে বিসমার্ক সাবধানতা নেন। জার্মানী তাঁর নৌবাহিনী গঠন এবং উপনিবেশ বিস্তারের নীতি গ্রহণ না করায়, ইংলন্ড সন্তুষ্ট থাকে। বিসমার্ক বলেন যে, ইংলন্ড হল "সমুদ্রের ইঁদুর এবং জার্মানী হল স্থলের ইঁদুর। উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নেই।" মোট কথা, তিন কাইজারের চুক্তির ফলে ফ্রান্স মিত্রহীন হয়। জার্মানীর শক্তি অব্যাহত থাকে।

কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন যে, ফ্রাঙ্কো-জার্মান যুদ্ধের পর ফ্রান্সকে মিত্রহীন করার জন্যে বিসমার্কের যতটা প্রশংসা করা হয়, ততটা তাঁর প্রাপ্য নয়। প্রথমতঃ, তিন সম্রাটের লীগের প্রাথমিক উদ্যোগ অষ্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী কাউন্ট এ্যাণ্ড্রাসীই নেন। বিসমার্ক গোড়ায় এরকম সন্ধির চেষ্টা করেননি। পরে অবশ্য তিনি এ্যাণ্ড্রাসীর উদ্যোগকে সফল করেন। কারণ এরকম জোট দ্বারা জার্মানী ফ্রান্সকে মিত্রহীন করতে সক্ষম হবে তা তিনি বুঝতে পারেন।[1] দ্বিতীয়তঃ, ইংলন্ড তার নিজস্ব নীতির কারণে ইওরোপের জটিলতা থেকে দূরে থাকতে চায়। ইংলন্ডকে ফ্রান্স থেকে দূরে রাখার জন্যে বিসমার্কের বিশেষ কৃতিত্ব নেই। ডেভিড টমসনের মতে, তখনও পর্যন্ত ইংলন্ডের রাজনীতিকরা ফ্রান্সকেই ইওরোপের শক্তিসাম্যের পক্ষে বিপদ বলে ভাবতে অভ্যস্ত ছিল। একদা নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে ইংলন্ড যে বিদ্বেষ পোষণ করত, ১৮৭১ খ্রীঃ পরেও সেই মনোভাব থেকে ইংলন্ড মুক্ত হয়নি। জার্মানীর উত্থানের ফলে যে ইওরোপের শক্তিসাম্য বদলে গেছে, তা বুঝতে ইংলন্ডের সময় লাগে। সুতরাং জার্মানী নৌবাহিনী গঠন ও উপনিবেশ বিস্তার না করার প্রতিশ্রুতি দিলে ইংলন্ড নিরপেক্ষ থাকতে রাজী হয়।

War-scare বা যুদ্ধাতঙ্ক ও ফলাফল

বিসমার্ক কর্তৃক গঠিত তিন কাইজারের লীগের মধ্যে শীঘ্রই ফাটল দেখা দেয়। রুশ মন্ত্রী গোরচাকফ্ (Gorchakoff) তিন কাইজারের চুক্তির বিরোধী ছিলেন। তিন কাইজারের চুক্তির ফলে ইওরোপে জার্মানীর একাধিপত্যের পথ প্রস্তুত হবে বলে গোরচাকফ্ আশঙ্কা করেন। ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি ম্যাকমেহন ফ্রান্সের সামরিক শক্তি বৃদ্ধির জন্যে ফরাসী পার্লামেন্টে একটি বিল আনেন। বিসমার্ক সর্বদা তাঁর একটি চক্ষু ফ্রান্সের দিকে নিবদ্ধ রাখতেন। ফ্রান্সের সামরিক ক্ষমতা বাড়লে জার্মানীর বিরুদ্ধে ফ্রান্স প্রতিহিংসামূলক যুদ্ধে লিপ্ত হবে বলে তিনি আশঙ্কা করেন। সুতরাং বিসমার্ক ঘোষণা করেন যে, আক্রমণের জন্যে ফ্রান্স তোড়জোড় আরম্ভ করেছে। ডাই পোষ্ট (Die Post) "To War in Sight?" "যুদ্ধ কি আসন্ন?" এই মর্মে একটি প্রবন্ধ তিনি প্রকাশ করেন। ফ্রান্স জার্মানীর বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারে এই অজুহাতে তিনি জার্মানী থেকে ফ্রান্সে যুদ্ধের ঘোড়া রপ্তানি নিষিদ্ধ করেন। এই অজুহাতে তিনি ফ্রান্সের বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক আক্রমণ চালাবার সঙ্কল্প করেন। একে War Scare বা "যুদ্ধের আতঙ্ক" বলা হয়। বিসমার্কের আশা ছিল যে, তিন কাইজারের চুক্তির সাহায্যে তিনি ফ্রান্সকে কোণঠাসা করতে পারবেন। কিন্তু

১· Grenville—Europe Reshaped.

রুশ মন্ত্রী গোরচাকফ্ মনে করতেন যে, ফ্রান্সের পতন ঘটলে ইওরোপে জার্মানীর একাধিপত্য স্থাপিত হবে। গোরচাকফ্ বিসমার্ককে সতর্ক করে বলেন যে, যদি জার্মানী ফ্রান্সকে আক্রমণ করে তবে রাশিয়া নিরপেক্ষ থাকবে না। ইংলন্ডও জার্মানীর নিকট এই বিষয়ে একটি প্রতিবাদ পত্র পাঠায়। ব্রিটেন এই প্রতিবাদপত্রে জানায় যে, "ইংলন্ডের মতে এখন যে ব্যাধি ইওরোপকে পীড়িত করছে তা হল জার্মানীর আত্মম্ভরিতা ও আগ্রাসী নীতি।" বিসমার্ক বুঝতে পারেন যে, ইওরোপীয় শক্তিগুলি ফ্রান্সকে হীনবল করে জার্মানীর আধিপত্য স্থাপনে রাজী নয়। ফরাসী মন্ত্রী দেকাজে (Descaze) ইওরোপের বিভিন্ন শক্তিকে বুঝান যে, ফ্রান্সের আত্মরক্ষা ও ইওরোপে শক্তিসাম্য রক্ষার জন্যে ফ্রান্সের সামরিক শক্তির আধুনিকীকরণ দরকার। এতে ইওরোপের শান্তি মজবুত হবে। একতরফা জার্মান আক্রমণের ভয় দূর হবে। বিসমার্ক অবশেষে উপলব্ধি করেন যে, ফ্রান্সকে চিরদিনের জন্যে দুর্বল ও পদানত রাখা যাবে না।

"যুদ্ধের আতঙ্ক" বা war scare সম্পর্কে রুশ প্রতিবাদ তিন কাইজারের সন্ধিতে প্রথম ফাটল রচনা করে। এদিকে পূর্বাঞ্চল সমস্যা উপলক্ষে রাশিয়ার সঙ্গে ইংলন্ড ও অষ্ট্রিয়ার ঘোর বিরোধ দেখা দেয়। ঐতিহাসিক ল্যাঙ্গারের (Langer) মতে[১], অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ বাধলে তিন সম্রাটের চুক্তি ধ্বংস হবে। এর ফলে ফ্রান্সের মিত্রহীনতা দূর হবে। এই আশঙ্কায় বিসমার্ক অস্থির হন। বিসমার্ক বলেন যে, বলকান অঞ্চল থেকে তুরস্ককে বিতাড়িত করে অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে তা ভাগ করে দেওয়া উচিত। ইংলন্ডের প্রতিবাদে তাঁর এই প্রচেষ্টা বিফল হয়। অবশেষে যুদ্ধ এড়াবার জন্যে বিসমার্ক জার্মানীর রাজধানী বার্লিনে একটি আন্তর্জাতিক কংগ্রেস ডাকেন (১৮৭৮ খ্রীঃ)। বিসমার্ক দাবী করেন যে, তিনি এই কংগ্রেসে "নিরপেক্ষ দালালের" (Honest Broker) কাজ করবেন। তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল, অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধের সম্ভাবনা দূর করে তিন সম্রাটের লীগকে (১৮৭৩ খ্রীঃ) রক্ষা করা। এই সঙ্গে অষ্ট্রিয়া বা রাশিয়ার মধ্যে কোন পক্ষে জার্মানী যোগ দিবে সেই বিরক্তিকর প্রশ্নের সম্ভাবনাকেও দূর করা। তিন সম্রাটের জোট রক্ষা পেলে ফ্রান্স মিত্রহীন থাকত এবং ইওরোপের শক্তিসাম্যের কোন ক্ষতি হত না। বার্লিনের সন্ধি (১৮৭৮ খ্রীঃ) স্বাক্ষরিত হলে রুশ জার অভিযোগ করেন যে, বিসমার্ক এই সন্ধিতে অষ্ট্রিয়ার প্রতি পক্ষপাত দেখিয়েছেন। তিনি রাশিয়ার স্বার্থ রক্ষার কোন চেষ্টা করেন নি। রুশ মন্ত্রী গোরচাকফ্ বলেন যে, "জার্মানী রাশিয়ার কাঁধে চড়ে এত বড় হয়েছে। অথচ এজন্য জার্মানী রাশিয়ার প্রতি কৃতজ্ঞ নয়।"[২] এজন্য রাশিয়া তিন কাইজারের চুক্তি বর্জন করে।

পূর্বাঞ্চল সমস্যা ও বার্লিনের সন্ধি

তিন সম্রাটের লীগ ভেঙে গেলে বিসমার্ক অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে দ্বিশক্তি মৈত্রী চুক্তি (Dual Alliance) ১৮৭৯ খ্রীঃ সম্পাদন করেন। দ্বিশক্তি চুক্তি সম্পাদনের জন্যে অষ্ট্রিয়ার মন্ত্রী কাউন্ট এ্যান্ড্রাসী হ্যাপসবার্গ সম্রাটকে চাপ দেন। এ্যান্ড্রাসী বলেন যে, জার্মানীর হাতে ১৮৬৬ খ্রীঃ পরাজয়ের গ্লানি ভুলে, এখন দুই জার্মানীর জোটবদ্ধ হওয়া উচিত। জার্মানীর মিত্রতার জোরে অষ্ট্রিয়া বলকানে তার ঈপ্সিত আধিপত্য স্থাপন করতে সক্ষম হবে। বিসমার্কের উদ্দেশ্য ছিল এই চুক্তির দ্বারা অষ্ট্রিয়াকে ফ্রান্সের মিত্রতা থেকে দূরে রাখা। এই চুক্তির দ্বারা স্থির হয় যে, (১) জার্মানী ও অষ্ট্রিয়া এই দুই স্বাক্ষরকারীর মধ্যে কেহ (অর্থাৎ অষ্ট্রিয়া) যদি রাশিয়ার দ্বারা আক্রান্ত হয় তবে অপর পক্ষ আক্রান্ত মিত্রকে সবরকম সাহায্য দিবে। (২) যদি দুই স্বাক্ষরকারীর মধ্যে কেহ (অর্থাৎ জার্মানী) রাশিয়া ব্যতীত অন্য

দ্বিশক্তি চুক্তি, ১৮৭৯ খ্রীঃ

১· Langer—Bismarck and His system of Alliances.

২· Langer—Ibid.

তৃতীয় শক্তির সঙ্গে (অর্থাৎ ফ্রান্সের সঙ্গে) যুদ্ধে লিপ্ত হয় তবে অপর পক্ষ (অর্থাৎ অষ্ট্রিয়া) নিরপেক্ষ থাকবে। (৩) যদি এই আক্রমণকারীর সঙ্গে রাশিয়া যোগ দেয় তবে অপর পক্ষ (অর্থাৎ অষ্ট্রিয়া) নিরপেক্ষ না থেকে মিত্র রাষ্ট্রের পক্ষ নিবে। (৪) এই সন্ধির শর্তাবলী দুই পক্ষ অত্যন্ত গোপনে রাখবে। দ্বিশক্তি চুক্তি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত জার্মানীর বৈদেশিক নীতির প্রধান স্তম্ভে পরিণত হয়।

বিসমার্ক বুঝতে পারেন যে, রাশিয়াকে স্বপক্ষে না রাখলে রাশিয়া ফ্রান্সের পক্ষে যোগ দিবে। এজন্য তিনি পুনরায় জার্মানী-অষ্ট্রিয়া-রাশিয়ার মধ্যে দ্বিতীয় তিন সম্রাটের মিত্রতা গড়ার চেষ্টা চালান। এর ফলে ১৮৮১ খ্রীঃ দ্বিতীয় তিন সম্রাটের চুক্তি (Alliance of Three Emperors) অষ্ট্রিয়া, জার্মানী ও রাশিয়ার মধ্যে বিসমার্ক স্থাপন করেন। ১৮৭৩ খ্রীঃ প্রথম তিন সম্রাটের লীগের নাম ছিল জার্মান ভাষায় Drei-Kaiser-Bund অর্থাৎ তিন সম্রাটের লীগ। ১৮৮১ খ্রীঃ দ্বিতীয় তিন সম্রাটের জোটের নাম ছিল Drie-Kaiser-bund-nis অর্থাৎ তিন সম্রাটের মিত্র জোট (Alliance of Three Emperors)। এই সন্ধিতে বলা হয় যে, এই তিন শক্তির মধ্যে যে কোন শক্তিকে কোন চতুর্থ শক্তি আক্রমণ করলে অপর দুই মিত্র নিরপেক্ষ থাকবে। তুরস্ককে বসফোরাস ও দার্দানালিস প্রণালীতে তার নিজ আধিপত্য স্থাপন করার জন্যে চাপ দেওয়া হবে। অর্থাৎ এই অঞ্চল থেকে ব্রিটিশ নৌবহর সরিয়ে দিতে তুরস্ককে বাধ্য করা হবে। এই শর্তের ফলে রাশিয়া কিছুটা সন্তুষ্ট হয়। দার্দানালিস অঞ্চল থেকে ব্রিটিশ প্রভাব দূর করার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু দ্বিতীয় তিন সম্রাটের চুক্তি প্রথম চুক্তির (১৮৭৮ খ্রীঃ) ন্যায় মজবুত ছিল না। পরস্পরের স্বার্থগত বিরোধ এই চুক্তিকে দুর্বল করে ফেলে। বলকান অঞ্চলে অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়ার বিরোধ থাকায় এই চুক্তির গুরুত্ব কমে যায়।

দ্বিতীয় তিন সম্রাটের লীগ

বিসমার্কের আশঙ্কা ছিল যে, ইতালী, ফ্রান্সের পক্ষ অবলম্বন করতে পারে। কারণ ইতালী তার ঐক্যের জন্যে ফ্রান্সের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিল। ইতালীয় গণতন্ত্র স্বাভাবিকভাবে আদর্শগত দিক থেকে ফ্রান্সের প্রতি অনুগত ছিল। বিসমার্ক ইতালীকে ফ্রান্স থেকে বিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্য নেন। ফ্রান্স ও ইতালীর মধ্যে আফ্রিকার টিউনিস উপনিবেশ নিয়ে বিবাদ ছিল। ফ্রান্সকে এই স্থান অধিকার করতে বিসমার্ক গোপনে উৎসাহ দেন। ফ্রান্স টিউনিস অধিকার করলে ইতালী ভয়ানক চটে যায়। ইতালী বিসমার্কের প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে ত্রিশক্তি চুক্তিতে (১৮৮২ খ্রীঃ) যোগ দেয়। জার্মানী ও অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে ইতালী ত্রিশক্তি চুক্তি সম্পাদন করে। এই চুক্তির দ্বারা স্থির হয় যে, (১) যদি ফ্রান্স ইতালীকে আক্রমণ করে তবে জার্মানী ও অষ্ট্রিয়া একযোগে ইতালীর পক্ষ নিবে। (২) যদি ফ্রান্স, জার্মানীকে আক্রমণ করে তবে ইতালী, জার্মানীর পক্ষ নিবে। (৩) যদি একাধিক শক্তি কোন মিত্রকে আক্রমণ করে তবে তিন মিত্র একত্রে যুদ্ধ করতে অঙ্গীকার করে। ত্রিশক্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে বিসমার্ক স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন। ক্রমে বিসমার্ক ত্রিশক্তি চুক্তির পরিধি আরও বাড়ান। ইতালীর পর রুমানিয়া (১৮৮৩ খ্রীঃ) এবং তুরস্কও ত্রিশক্তি চুক্তিতে যোগ দেয়। যদিও তুরস্ক ও ইতালীর স্বার্থ ছিল পরস্পর-বিরোধী তবুও ইতালী এই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল একথা গোপন থাকায় তুরস্ক এই চুক্তিতে যোগ দেয়।

ইতিমধ্যে বুলগেরিয়ার ঘটনা উপলক্ষে অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। এর ফলে দ্বিতীয় তিন সম্রাটের সন্ধি (১৮৮১ খ্রীঃ) ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়। জার্মান জনমত ছিল অষ্ট্রিয়ার পক্ষে। এজন্য রাশিয়া বিরক্ত হয়ে যাতে ফ্রান্সের পক্ষে না যায় এজন্য বিসমার্ক রাশিয়ার সঙ্গে ১৮৮৭ খ্রীঃ রিইনসিওরেন্স সন্ধি স্বাক্ষর করেন। বিসমার্ক এই সন্ধির দ্বারা রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়ার মধ্যে শক্তিসাম্য স্থাপন করতে চান। দ্বিতীয়তঃ, যদি জার্মানী ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ রাধে তবে এই যুদ্ধে যাতে রাশিয়া নিরপেক্ষ থাকে

রি-ইনসিওরেন্স সন্ধি

তার ব্যবস্থা তিনি করেন। বিনিময়ে তিনি রাশিয়ার বিরুদ্ধে বুলগেরিয়াকে সমর্থন না করার প্রতিশ্রুতি দেন। দার্দানালিস ও বসফোরাস প্রণালীতে রুশ আধিপত্য মেনে নেন। এই সন্ধিতে স্থির হয় যে, রাশিয়া ও জার্মানী এই দুই স্বাক্ষরকারীর মধ্যে কেহ যদি কোন তৃতীয় বৃহৎ শক্তির সঙ্গে (অর্থাৎ ফ্রান্স) যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে, তবে অপর পক্ষ নিরপেক্ষ থাকবে। বিসমার্ক বলেন যে, "যদিও বার্লিন ও সেন্টপিটার্সবার্গের মধ্যে সরকারি সংযোগ ছিন্ন হয়েছে, আমি একটি গোপন তারে কথাবার্তা বলছি।"[১]

এভাবে বিসমার্ক প্রায় ৭টি চুক্তির মাধ্যমে জার্মানীর নিরাপত্তা রক্ষা এবং ফ্রান্সকে মিত্রহীন করেন। "বিসমার্ক সর্বদা পাঁচটি বল নিয়ে খেলতেন এবং তিনটি বলকে হাতে রেখে, দুটি বলকে শূন্যে রাখতেন।"[২] ফ্রান্সে যাতে প্রজাতন্ত্র কায়েম থাকে সেজন্য বিসমার্ক চেষ্টা চালান। কারণ তিনি জানতেন যে, ইওরোপের রাজারা প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে মিত্রতা করবে না। ফলে ফ্রান্স মিত্রহীন হবে। বিসমার্ক ইংলন্ডের সঙ্গে মিত্রতা রাখার জন্যে, আফ্রিকার উপনিবেশের ব্যাপারে ইংলন্ডের সঙ্গে বিরোধগুলি ১৮৯১ খ্রীঃ আপোষে মিটিয়ে নেন। তাঁর শাসনকালের শেষ দিকে জার্মানীতে শিল্প উৎপাদন বাড়লে বিসমার্ক উপনিবেশের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারেন। কিন্তু জার্মানী দেরীতে উপনিবেশ দখলের নীতি নেওয়ায় এই বিষয়ে জার্মানী তেমন সুবিধা করতে পারেনি।

ইংলন্ডের সম্প্রতি নিরপেক্ষতা

বিসমার্কের অনুরাগী লেখকরা, বীরপূজার অনুসরণ করে, বিসমার্ককে "কূটনীতির যাদুকর", "রাজনীতির শিল্পী" প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত করেছেন। এ· জে· পি· টেইলার প্রভৃতি ঐতিহাসিক বিসমার্কের পররাষ্ট্র নীতির বহু ত্রুটি দেখান। প্রথমতঃ, বিসমার্কের সম্পাদিত অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে দ্বিশক্তি চুক্তি এবং রাশিয়ার সঙ্গে দ্বিতীয় তিন সম্রাটের চুক্তি (১৮৮১ খ্রীঃ) ছিল পরস্পর-বিরোধী। প্রথম চুক্তিতে অষ্ট্রিয়া রাশিয়ার দ্বারা আক্রান্ত হলে জার্মানী অষ্ট্রিয়ার পক্ষ নিতে অঙ্গীকার করে। দ্বিতীয় সন্ধিতে এরূপ ক্ষেত্রে জার্মানী নিরপেক্ষ থাকতে প্রতিশ্রুতি দেয়। প্রথম সন্ধিতে অষ্ট্রো-রুশ যুদ্ধের কথা ভাবা হয়, দ্বিতীয়টিতে অষ্ট্রো-রুশ মিত্রতার কথা ভাবা হয়। বলকানে আধিপত্য নিয়ে অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে রাশিয়ার তীব্র বিরোধ দেখা দেয়। এমতাবস্থায় দ্বিতীয় ত্রি-সম্রাট চুক্তির দ্বারা অষ্ট্রিয়ার ও রাশিয়ার মিত্রতা, জার্মানী রক্ষা করতে পারেনি। অধিকন্তু দ্বিশক্তি চুক্তি অনুযায়ী অষ্ট্রিয়ার পক্ষ জার্মানী নিতে বাধ্য হয়। দ্বিতীয়তঃ, এবার অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে জার্মানীর দ্বিশক্তি চুক্তির (১৮৭৯ খ্রীঃ) কথায় আসা যাক। বিসমার্কের বৈদেশিক নীতির এটি ছিল একটি মূল ভিত্তি। এই দ্বিশক্তি চুক্তির দ্বারা বিসমার্ক অষ্ট্রিয়ার স্বার্থ রক্ষার দায়িত্ব বহন করেন। এই সন্ধির শর্ত অনুসারে অষ্ট্রিয়াকে রাশিয়া আক্রমণ করলে, জার্মানী অষ্ট্রিয়ার পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করতে বাধ্য থাকে। অপরদিকে, জার্মানীকে ফ্রান্স আক্রমণ করলে, অষ্ট্রিয়া নিরপেক্ষ থাকতে রাজি হয়। এই চুক্তির মধ্যে Quid Pro Quo অর্থাৎ পারস্পরিক সমদায়িত্ব ও সমস্বার্থ রক্ষার নীতি ছিল না। দ্বিশক্তি চুক্তির দ্বারা অষ্ট্রিয়ার দিকেই পাল্লা ভারী হয়। অষ্ট্রিয়ার মন্ত্রী কাউন্ট এ্যান্ড্রাসী এই দিক থেকে বিসমার্কের ওপর টেক্কা দেন। তাছাড়া দ্বিশক্তি চুক্তির দ্বারা অষ্ট্রিয়ার পক্ষ নিয়ে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধের দায়িত্ব স্বীকার করে জার্মানী মারাত্মক ভুল করে। এ· জে· পি· টেইলারের মতে, "দ্বিশক্তি চুক্তির দ্বারা বিসমার্ক প্রাশিয়ার দ্রুতগামী ফ্রিগেটকে পোকা খাওয়া অষ্ট্রিয়ার পুরাতন জাহাজের সঙ্গে জুড়ে দেন"।[৩] অষ্ট্রিয়া ছিল একটি সমস্যা-সঙ্কুল ক্ষয়িষ্ণু দেশ। এর সঙ্গে জার্মানীর ভাগ্য জুড়ে

সমালোচনা

১· "Though the public telegraph line between Berlin and St. Petersburg is broken, I have kept open a private wire."

২· Ketelbey—History of Modern Times. P. 351.

৩· "Bismarck tied the Prussian frigate to the worm-eated Austrian galleon."

বিসমার্ক ভুল করেন। অষ্ট্রিয়া বলকানে আগ্রাসী নীতি নিয়ে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ বাধায়। পরিণামে জার্মানীকেও এই যুদ্ধে টেনে নামায়।[১] তৃতীয়তঃ, বিসমার্কের সন্ধিগুলি ছিল অত্যন্ত জটিলতা-পূর্ণ। বিসমার্কের ন্যায় মস্তিষ্কবান লোকই এর পরিচালনায় সক্ষম ছিলেন। তাঁর পতনের পর ফ্রেডারিক, হলষ্টিন প্রভৃতি মোটামাথা মন্ত্রীরা এই সন্ধিগুলিকে ঠিকমত পরিচালনা করতে বিফল হয়। ইউলিসিসের (Ulysses) ধনুতে অপর কারও গুণ দেওয়ার সামর্থ ছিল না। যদিও কোন কোন ঐতিহাসিক বিসমার্কের পরস্পর-বিরোধী সন্ধি নীতিকে সমর্থন করে যুক্তি দেখান যে, যেহেতু ইওরোপের কেন্দ্রস্থলে জার্মানী অবস্থিত ছিল, সেহেতু দ্বিমুখী নীতি নিতে জার্মানী বাধ্য হয়। এই যুক্তি হল দুর্বল অক্ষম যুক্তি। বিসমার্কের পরস্পর-বিরোধী নীতি পরে জার্মানীর বিরুদ্ধে ঘোর সন্দেহ ও অবিশ্বাস সৃষ্টি করে। চতুর্থতঃ, ইতালীর সঙ্গে ত্রিশক্তি চুক্তিতে ইতালীর আন্তরিকতা ছিল না। আসলে অষ্ট্রিয়া ও ইতালী ছিল পরস্পরের স্বভাবশত্রু। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ক্ষোভবশতঃ ইতালী সাময়িকভাবে ত্রিশক্তি চুক্তিতে যোগ দেয়। কিন্তু এতে অষ্ট্রিয়া বা ইতালী কারও লাভ হয়নি। শেষ পর্যন্ত প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হলে ইতালী এই চুক্তি ত্যাগ করে। পঞ্চমতঃ, বিসমার্ক ফ্রান্সকে আলসাস প্রদেশ ফেরৎ না দেওয়ায় ফ্রান্সের প্রতিহিংসা জাগ্রত থাকে। যদি বিসমার্ক ফ্রান্সের প্রতি ন্যায্য ব্যবহার করতেন তবে তিনি ফ্রান্সের নিরপেক্ষতা লাভ করতে সমর্থ হতেন। ফলে ইওরোপের পরিস্থিতি এত ঘোরালো হত না। ষষ্ঠতঃ, বিসমার্ক যে চুক্তিগুলি করেন তা ছিল সামরিক ধরনের চুক্তি। এর দ্বারা ইওরোপে প্রকৃত শান্তি স্থাপিত হওয়া সম্ভব ছিল না। যদি বিসমার্ক ইওরোপের সকল শক্তিকে নিয়ে একটি কংগ্রেস স্থাপন করতেন তবে যে কোন বিরোধ এই কংগ্রেস দ্বারা শান্তিপূর্ণভাবে মিটান যেত। তার পরিবর্তে তিনি জার্মানীকে কেন্দ্র করে একটি শক্তিজোট গড়েন। কিছুদিন বাদে এর বিকল্প শক্তিজোট ত্রিশক্তি আঁতাত নাম নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই গড়ে ওঠে। জোটের রাজনীতির বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বী জোট গড়ে উঠতে বাধ্য ছিল। সর্বশেষে, বিসমার্ক ইওরোপ মহাদেশের ভেতরেই তাঁর দৃষ্টিকে আবদ্ধ রাখেন। ইওরোপের বাহিরে ঔপনিবেশিক বাজার দখলের যে প্রতিযোগিতা চলছিল তাতে তিনি প্রয়োজনীয় মনোযোগ দেননি। তাঁর পতনের পর কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামকে এই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। কাইজারের স্থূল হস্তক্ষেপে জার্মানীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অত্যন্ত জটিল হয়। ইংলন্ডের সঙ্গে জার্মানীর ঔপনিবেশিক বিরোধ দেখা দেয়। বিসমার্ক এই সমস্যাকে ইচ্ছাপূর্বক অমীমাংসিত রাখেন। বিসমার্কের বৈদেশিক নীতির উপরোক্ত ত্রুটিগুলি স্বীকার করেও, একথা বলা যায় যে, তিনি তাঁর শাসনকালে ফ্রান্সকে মিত্রহীন রেখে ইওরোপে শান্তি রক্ষা করতে ও জার্মানীর নিরাপত্তা রক্ষা করতে সমর্থ হন।[২] ডেভিড টমসন নামক ঐতিহাসিক মনে করেন যে, অষ্ট্রো-জার্মান দ্বিশক্তি চুক্তি যা বিসমার্ক স্থাপন করেন তা ছিল মূলতঃ আত্মরক্ষামূলক। অষ্ট্রিয়া যাতে এই চুক্তি ব্যবহার করে রাশিয়ার বিরুদ্ধে আগ্রাসনে না নামে সেজন্য বিসমার্ক সতর্ক ছিলেন।

বিসমার্কের চরিত্র ও কৃতিত্ব (Character and Achievements of Bismarck) ঃ উনবিংশ শতকের ইওরোপীয় রাজনীতির প্রবাদ-পুরুষ অটো ফন বিসমার্ক, বহু ঐতিহাসিকের নিকট তাঁর অসাধারণ কূটনৈতিক প্রতিভার জন্যে বন্দিত হয়েছেন। বিসমার্ক তাঁব সমকালীন যুগের রাজনীতির উপর এমনই ছাপ রাখেন যে, ১৮৭০-১৮৯০ খ্রীঃ, যে সময়ে বিসমার্ক ঐক্যবদ্ধ জার্মানীর প্রধানমন্ত্রী ছিলেন সেই সময়টিকে Age of Bismarck বা বিসমার্কের যুগ বলা হয়।

বিসমার্কের যুগ

১· Fay—Origin of World War I. P. 85.

২· Gordon Craig—Europe since 1815·

"রক্ত ও লৌহ নীতির" (Blood and Iron Policy) মাধ্যমে ইওরোপের তিনটি শক্তিকে যুদ্ধে পরাস্ত করে জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করা ছিল, বিসমার্কের রাজনৈতিক প্রতিভার সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল কৃতিত্ব। এজন্য বিসমার্ক জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকদের দ্বারা উচ্চ প্রশংসিত হয়েছেন। বিসমার্কের কোন কোন জীবনীকারের মতে, বিসমার্ক তিনটি যুদ্ধের মাধ্যমে জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্যে ১৮৬১ খ্রীঃ হতে পূর্ব পরিকল্পনা করেন। লন্ডনে এক ভোজসভায় ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রী ডিসরেইলীর নিকট ১৮৬২ খ্রীঃ তিনি নাকি তাঁর পরিকল্পনা ব্যক্ত করেন।[১] ঐতিহাসিক ডেভিড টমসন এই তথ্যের সত্যতায় সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কারণ কোন মানুষের পক্ষে অন্ততঃ ৮ বছর আগে ফ্রাঙ্কো-জার্মান যুদ্ধের কথা ভাবা সম্ভবপর ছিল না। অপরদিকে এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ১৮৬৭ খ্রীঃ আগে বিসমার্ক ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয় যুদ্ধের কথা আদপেই চিন্তা করেননি। (বিশদ বিবরণ আগের অধ্যায় দেখ উনবিংশ অধ্যায় জার্মানীর ঐক্যের জন্যে বিসমার্কের পূর্ব-পরিকল্পনা তত্ত্ব) বিসমার্কের কূটনৈতিক দক্ষতা সম্পর্কে অতিভাষণ অনেক ক্ষেত্রে করা হয় তাতে সন্দেহ নেই।

বিসমার্কের দূরদৃষ্টি সম্পর্কে বিতর্ক

বিসমার্কের কূটনৈতিক দক্ষতা সম্পর্কে বীরপূজা ও অতিশয়োক্তি বাদ দিলেও কূটনীতিতে তাঁর অসাধারণ প্রতিভা ছিল তাতে সন্দেহ নেই। যদিও জার্মান ইতিহাসের গতি জার্মান ঐক্যের দিকেই চলছিল, তবুও বিসমার্কের হস্তক্ষেপ ব্যতীত জার্মানীব ঐক্য নিঃসন্দেহে অপূর্ণ থাকত। নবীন জার্মানীর রূপকার হিসেবে বিসমার্ক নিঃসন্দেহে কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন। যদিও তিনি তাঁর আত্মজীবনী Reflections and Recollections-এ কিছু পরিমাণ আত্মপ্রচার করেছেন, তবুও গবেষকরা বিসমার্কের অবদানকে অস্বীকার করিতে পারেননি। তবে এই সঙ্গে বলা দরকার যে, জার্মানীর ঐক্যে ব্যক্তির ভূমিকাই শুধু প্রধান নয়। জার্মান জনগণও ঐক্য পিয়াসী ছিল। তারা বিসমার্কের স্থাপিত ঐক্যকে বাধা দেয়নি। বরং বরণ করে নেয়। দ্বিতীয়তঃ, ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্টের সিদ্ধান্ত পরোক্ষভাবে বিসমার্ককে সাহায্য করে। তৃতীয়তঃ, ব্যক্তির ভূমিকার দিক থেকে দেখলে দুই প্রাশিয় সেনাপতি ফনরুন ও ফন মোল্টকের ভূমিকাও কম কার্যকরী ছিল না। তাঁরা যদি যুদ্ধে না জয়লাভ করতেন তবে বিসমার্কের সকল পরিকল্পনা বিফলে যেত।

জার্মানীর ঐক্য স্থাপন

বিসমার্ক জার্মানীকে যেভাবে ঐক্যবদ্ধ করেন, ঐতিহাসিক সীম্যান (Seaman) তার সমালোচনা করেছেন। সীম্যানের মতে, বিসমার্ক জার্মানীর বিভিন্ন রাজ্যগুলির মধ্যে গণতান্ত্রিক ঐক্য স্থাপন না করে, প্রাশিয়ার রাজতন্ত্রের অধীনে জার্মানীতে এক স্বৈরশাসন স্থাপন করেন। দ্বিতীয়তঃ, তিনি জার্মানীর নতুন সংবিধানে জার্মানীর বিভিন্ন রাজ্যের সমান অধিকার স্থাপন না করে প্রাশিয়ার আধিপত্য রক্ষার ব্যবস্থা করেন। প্রাশিয়ার রাজবংশ জার্মানীর শাসনকর্তার পদ পায়। প্রাশিয়ার চ্যান্সেলর বিসমার্ক জার্মানীর লৌহ চ্যান্সেলরে (Iron Chancellor) পরিণত হন। জার্মানীর আইনসভায় জার্মানীর অন্য রাজ্যগুলি অপেক্ষা প্রাশিয়ার সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট রাখার ব্যবস্থা করা হয়। সীম্যানের মতে, এই কাজকে জার্মানীর ঐক্য না বলে প্রাশিয়ার বিজয় (Prussian Conquest) বলা উচিত। তৃতীয়তঃ, জার্মান ভাষাভাষী অষ্ট্রিয়াকে জার্মানী থেকে বহিষ্কার করে বিসমার্ক জার্মানীর প্রকৃত জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট করেন বলে সীম্যান মনে করেন।[২] বিসমার্ক জার্মানীর জনমতের পরোয়া না করে, প্রাশিয়ার সামরিক শক্তির দ্বারা তথাকথিত ঐক্যকে ওপর থেকে চাপিয়ে দেন। প্রাশিয়ার সামরিক জয়ের পর তিনি গণভোট দ্বারা প্রাশিয়ার অধীনে ঐক্যকে যাচাই করেননি। তাছাড়া জার্মানীর যে সকল রাজ্য অষ্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধের সময় অষ্ট্রিয়ার পক্ষে ছিল, সেই পরাজিত রাজ্যগুলির ওপর তিনি উদ্ধত বিজেতার মত আচরণ করেন। ফ্রাঙ্কফুর্টের জনগণের ওপর তিনি পাইকারী জরিমানা ধার্য করেন। হ্যানোভার রাজ্যের অস্তিত্ব বিলোপ করেন।

বিসমার্ক দ্বারা জার্মানীর ওপর প্রাশিয়ার আধিপত্য স্থাপন

১· Eyck—Bismarck

ঐতিহাসিক সীম্যানের উপরোক্ত অভিমত একটি নৈরাশ্যজনক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে উদ্ভূত। তথ্যগত দিক থেকে এই বিশ্লেষণ সত্য মনে হলেও, ভাবগত দিক হতে এই অভিমত সমর্থনীয় নয়। জার্মান ঐতিহাসিক বোহমার (Bohmer)-এর অভিমত এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। তাঁর মতে, জার্মানীর আসল সমস্যা অষ্ট্রিয়া-প্রাশিয়ার দ্বন্দ্ব ছিল না। জার্মানীর ঐক্যের আসল সমস্যা ছিল জার্মানীর বিভিন্ন রাজ্যগুলির স্বাতন্ত্র্যবাদ। ভিয়েনা চুক্তি জার্মানীকে ৩৮টি রাজ্যে বিভক্ত করে এই স্বাতন্ত্র্যবাদকে স্বীকৃতি দেয়। বিসমার্কের কৃতিত্ব হল এই স্বাতন্ত্র্যবাদকে দমিয়ে তিনি প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মানীর ঐক্য সংস্থাপন করেন।[১] সুতরাং জার্মানীর ঐক্য স্থাপনের ক্ষেত্রে বিসমার্কের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মানীর ঐক্য স্থাপন জার্মান ইতিহাসের গতির বিরোধী ছিল না। ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্ট ১৮৪৮-৪৯ খ্রীঃ প্রাশিয়ার রাজা চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়ামকেই জার্মানীর সিংহাসন দান করেছিল। জোলভেরাইন নামক সর্ব-জার্মান অর্থনৈতিক সংগঠন প্রাশিয়ার নেতৃত্বেই গঠিত হয়েছিল। জার্মান জাতির ভবিষ্যৎ প্রাশিয়াকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠবে, ইতিহাসের এই ইঙ্গিত বিসমার্ক ভালভাবে বুঝেন। বিসমার্কের একমাত্র ত্রুটি হল যে, ঐক্যবদ্ধ জার্মানীতে প্রকৃত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন না করে, তিনি গণতন্ত্রের আড়ালে এক স্বৈরতন্ত্র স্থাপন করেন। এমনকি ১৮৮৮-৯০ খ্রীঃ তিনি আইনসভায় জার্মান উদারপন্থী এবং সমাজতন্ত্রীদের দমন করতে না পেরে, সামরিক শক্তি প্রয়োগে তাদের দমনের কথা ভাবেন।[২] তাছাড়া তিনি জার্মানীর ওপর প্রাশিয়ার প্রাধান্যও স্থাপন করেন।

প্রাশিয়ার আধিপত্যতত্ত্বের খণ্ডন : বোহমারের অভিমত

জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করলেও দুঃখজনকভাবে বিসমার্ক দমন নীতির দ্বারা জার্মানীর সমাজতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক দলগুলিকে পদানত রাখেন। কুলটুর ক্যাম্ফ দ্বারা ক্যাথলিক ও সোস্যালিষ্টদের সঙ্গে তিনি অকারণে বিরোধে লিপ্ত হন। উভয়ক্ষেত্রে তাঁকে পিছু হটতে হয়। আইনসভায় তাঁর প্রভুত্ব রাখার জন্যে তিনি এক দলকে অন্যদলের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতেন। প্রকৃত গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ তিনি দেখান নি। সমাজতন্ত্রী লাসাল ও লাসালবাদীদের বিরুদ্ধে তিনি ষড়যন্ত্র করেন বলে ঐতিহাসিক আইখ মনে করেন। তিনি ছিলেন প্রচণ্ড রক্ষণশীল ও স্বৈরতান্ত্রিক লোক। তিনি ছিলেন সামন্ততান্ত্রিক জাঙ্কার শ্রেণীর লোক। এই শ্রেণীর স্বার্থের বাইরে জার্মান বুদ্ধিজীবি, নিম্নবুর্জোয়া, শ্রমিক ও কৃষকের মৌলিক অধিকারের কথা তিনি ভাবতেন না। সংখ্যালঘু অ-জার্মানদেরও তিনি জার্মানকরণের চেষ্টা করেন। তাঁর আমলে জার্মানীর সামরিক ও অসামরিক বিভাগের চাকুরীতে রক্ষণশীল উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে নিয়োগ করা হয়। তিনি স্বাধীন চিন্তার অধিকারী, প্রতিভাবান কর্মচারীদের বহিষ্কার করে, নিজ স্বৈরশাসন বজায় রাখেন। উচ্চশ্রেণীর দ্বারা সরকারি পদগুলি একচেটিয়াভাবে অধিকৃত হওয়ার ফলে এই শ্রেণীর রক্ষণশীল চিন্তাধারা সরকারি নীতিকে প্রভাবিত করে। অপরদিকে নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী যোগ্যতা থাকলেও তারা উচ্চ চাকুরী লাভে বঞ্চিত হয়। একদিকে সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিকশ্রেণী ও অপরদিকে সুবিধাভোগী উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মাঝে পড়ে, নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণী বঞ্চিত ও হতাশ হয়ে পড়ে।[৩] এর ফলে নিম্ন মধ্যবিত্তরা হয় কমিউনিষ্ট নতুবা সোস্যাল ডেমোক্র্যাট দলে যোগ

নবীন জার্মানীর পুনর্গঠন : নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর হতাশা

১· "The real struggle is not between Prussia and Austria, but between unity and particularism. What Bismarck set out to overcome in the wars of 1866 and 1870 was the particularism enshrined in 1815" Bohmer—Quoted by Barracklough-Origins of Modern Germany. P. 412

২· Gordon Craig—Europe Since 1815. P. 254

৩· Ibid.

দিয়ে তাদের ন্যায্য অধিকার লাভের চেষ্টা করে। বিসমার্ক বলপ্রয়োগে তাদের দমিয়ে ফেলেন। শ্রমিকদের মঙ্গলের জন্যে বিসমার্ক যে সকল সংস্কার চালু করেন তা তেমন মৌলিক ছিল না। যাতে শ্রমিকরা সমাজতান্ত্রিকদের সঙ্গে যোগ না দেয় এজন্য তিনি এই সকল সংস্কার চালু করেন। নতুবা আদর্শের দিক হতে তিনি সমাজের মেহনতী শ্রেণীর কথা মোটেই ভাবতেন না। এজন্য বিসমার্কের শাসন শেষের দিকে জনপ্রিয়তা হারায়।

সামরিক শক্তিকেই বিসমার্ক রাষ্ট্রের শক্তির উৎস মনে করতেন। জনসাধারণের সমর্থন সরকারকে যে প্রকৃত শক্তিশালী করে এ তত্ত্ব তিনি গ্রাহ্য করতেন না। তৎকালীন ইওরোপে প্রজাতন্ত্রবাদ, গণভোট ও সমাজতন্ত্রবাদ প্রভৃতি ভাবধারা নতুন যুগের বাণী বহন করে। বিসমার্ক তার মর্ম অনুধাবন করতে অক্ষম ছিলেন। এজন্য ঐতিহাসিক ফয়েটার (fueter) বিসমার্কের মধ্যে সৃজনশীল প্রতিভার অভাব ছিল বলে মন্তব্য করেছেন।

বিসমার্কের বৈদেশিক নীতি (১৮৭০-৯০ খ্রীঃ) ইওরোপে মোটামুটি শান্তি রক্ষা করতে সমর্থ হয় এবং ফ্রান্সকে মিত্রহীন করে। তবে তাঁর মৈত্রী চুক্তিগুলি ছিল জটিল ও পরস্পর-বিরোধী। বিসমার্ক ছাড়া আর কারও পক্ষে তাহা সফলভাবে চালান সম্ভব ছিল না। তাঁর পরবর্তী মন্ত্রী ফেডারিক হোলষ্টিন, ঐতিহাসিক গুচ (Gooch), যাঁকে "জার্মানীর দুষ্টগ্রহ" (Evil star) বলেছেন, তিনি এই সন্ধির ভিত্তি ভেঙে ফেলেন।

বিসমার্কের বৈদেশিক নীতি : ফ্রান্সের মিত্রহীনতা

বিসমার্কের বহু ব্যক্তিগত গুণ ছিল। যদিও তিনি ছিলেন ক্ষমতাপ্রিয় কূটকৌশলী এবং রাজনীতির স্বার্থে মিথ্যাচার করতে দ্বিধা করতেন না, তবুও ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন নিজ পরিবারের সদস্যদের প্রতি স্নেহপরায়ণ, সদালাপী। তাঁর পাঠস্পৃহা ছিল অসীম। তাঁর পাঠাগার ছিল বিশাল। প্রতি পুস্তক তিনি যত্ন সহকারে পড়তেন ও নোট করতেন। তিনি ছিলেন অসাধারণ বাগ্মী এবং উপযুক্ত বাক্য ব্যবহারে পারদর্শী। তাঁর আত্মজীবনী একটি সুখপাঠ্য গ্রন্থ। নিজ পদের দায়িত্ব সম্পর্কে তিনি ছিলেন সচেতন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর বাস্তববাদী। আদর্শবাদ ও ভাবালুতা তাঁর চিন্তাধারাকে আচ্ছন্ন করেনি। মেটারনিকের ন্যায় আত্মগরিমায় তিনি আবদ্ধ ছিলেন না।

বিসমার্কেব ব্যক্তিগত গুণাবলী

পাঠ্যসূচী

১। Eyck—Bismarck and the German Empire.
২। Langer—Bismarck and His system of Alliances.
৩। Ralph Flenlcy—Modern German History.
৪। J. Hemerow—The Social Foundations of German Unification.
৫। Pinson–The Making of Módern Germany.
৬। Seaman—Vienna to Versailles.
৭। Simon—Germany in the Age of Bismarck.
৮। Eyck—Bismarck.
৯। Medlicott—Bismarck and The Modern Germany.
১০। Pflanze—Bismarck and the Development of Germany.

একবিংশ অধ্যায়

জারতন্ত্রের শাসনে রাশিয়া (১৮১৫—১৯১৭ খ্রীঃ)
(Russia under the Czars, 1815—1917)

উনবিংশ শতকের প্রাক্কালে রাশিয়া (Russia on the Eve of the 19th Century) ঃ রাশিয়ার আধুনিক যুগের ইতিহাস রোমানভ বংশের শাসনকালে আরম্ভ হয়। জার পিটার দি গ্রেট বা মহান পিটার (১৬৮২—১৭২৫ খ্রীঃ) রাশিয়ার আধুনিকীকরণ আরম্ভ করেন। এই কারণে তাঁকে আধুনিক রাশিয়ার জনক বলা হয়। এর পর অষ্টাদশ শতকে জারিনা দ্বিতীয় ক্যাথারিন (১৭৬২—১৭৯৬ খ্রীঃ) উদারনৈতিক আভ্যন্তরীণ সংস্কার এবং বৈদেশিক ক্ষেত্রে রাজ্য বিস্তার নীতি গ্রহণ করে রাশিয়াকে একটি ইওরোপীয় শক্তিতে পরিণত করেন। নেপোলিয়নের আমলে রুশ জার প্রথম আলেকজান্ডার (১৮০১—১৮২৫ খ্রীঃ) নেপোলিয়নকে মস্কোর যুদ্ধে পরাস্ত করে ইওরোপে বিরাট খ্যাতি লাভ করেন। রুশ জার প্রথম আলেকজান্ডার বিরাট জনপ্রিয়তা এবং ক্ষমতা নিয়ে ভিয়েনা সম্মেলনে যোগ দেন। রাশিয়ার জনবল, বিরাট ভৌগোলিক সীমানা এবং স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র, ইওরোপীয় শক্তিগুলির ঈর্ষার উদ্রেক করে। ভিয়েনা সম্মেলনের পর ইওরোপের রক্ষণশীল শক্তিগুলির প্রধান স্তম্ভ হিসেবে রাশিয়া পবিত্র চুক্তি (Holy Alliance) ঘোষণা করে। এইভাবে রাশিয়া ইওরোপের শক্তিগুলির মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তি রূপে পরিগণিত হয়।

জার পিটার ও জারিনা ক্যাথারিনের আমলে রাশিয়া

উনবিংশ শতকের প্রাক্কালে রাশিয়ার সমাজ-ব্যবস্থা ছিল মধ্যযুগীয়। রাশিয়ার জনসংখ্যার মধ্যে ইওরোপীয় ও এশিয় জাতিগোষ্ঠীর লোক ছিল। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী ছিল স্লাভ (Slav) গোষ্ঠীর লোক। তাতার বা তুর্কী, মোঙ্গোল, পোল, ইউক্রেণীয় প্রভৃতি জাতিগোষ্ঠীর লোকও রাশিয়াতে বসবাস করত। রাশিয়ার জনগণের প্রধান ধর্মমত ছিল অর্থোডক্স গ্রীক খ্রীষ্টধর্ম। পূর্ব ইওরোপের কয়েকটি দেশও একই ধর্মীয় সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। কনস্টান্টিনোপলের প্যাট্রিয়ার্ক ছিলেন এই সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু। রুশ জারেরা এই গীর্জাকে তাঁদের স্বৈরতন্ত্র স্থাপনের যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতেন। গীর্জা রুশ জনসাধারণকে শিক্ষা দিত যে, জার ছিলেন ঈশ্বরের আদিষ্ট পুরুষ। তাঁর বিরোধিতা করার অর্থ ছিল ঈশ্বরের বিরোধিতা। গীর্জার প্রচারের ফলে সাধারণ লোকের মধ্যে জারের স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ইচ্ছা নষ্ট হয়।[১] রাশিয়ার সাম্রাজ্যে বসরাসকারী তুর্কী ও মোঙ্গোল প্রভৃতিরা ছিল ইসলাম ধর্মাবলম্বী।

রাশিয়ার জাতিগোষ্ঠী ও ধর্মমত

রাশিয়া ছিল মূলতঃ এক বিরাটকায় অনগ্রসর দেশ। উনবিংশ শতকের প্রাক্কালে রাশিয়ার সমাজ ছিল প্রধানতঃ দুইটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত, যথা অভিজাত ও কৃষক সম্প্রদায়। রাশিয়াতে ১,৪০,০০০ অভিজাত পরিবার ছিল। অভিজাতদের অধীনে বিরাট জমিদারী, ম্যানর এবং বহু সার্ফ বা ভূমিদাস ছিল। অভিজাত শ্রেণী বংশানুক্রমিকভাবে জমিদারীর স্বত্ব ভোগ করত। এই অভিজাতরা তাদের বংশ মর্যাদার জন্যে বিশেষ

অভিজাত শ্রেণী

১· Robert Ergang—Europe Since Waterloo.

গর্বিত ছিল। অভিজাত বংশীয়দের অধিকাংশ লোক সরকারের সামরিক ও অসামরিক পদে কাজ করত।[১]

উনবিংশ শতকের প্রাক্কালে রাশিয়ায় বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়নি। রাশিয়া ছিল এক কৃষি-প্রধান দেশ। শিল্প গঠন ও নগর গঠন না হওয়ার ফলে রাশিয়াতে বুর্জোয়া শ্রেণীর উদ্ভব হয়নি। রাশিয়ার অধিকাংশ লোক ছিল কৃষিজীবি। সেটন ওয়াটসন[২] নামক ঐতিহাসিকের মতে, রাশিয়ার অধিবাসীরা প্রধানতঃ ভূমিদাস ও স্বাধীন কৃষক এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। কৃষকদের চাষের জমিগুলি ছিল খুবই ছোট। এই জমির উৎপাদন এত কম হত যে, ক্ষুদ্র কৃষকরা অনেক ক্ষেত্রে নিজ নিজ জমি বড় মালিককে লিজ দিয়ে সেই মালিকের খামারে দিন মজুর হিসেবে জীবিকা নির্বাহ করত। রাশিয়ার কৃষকরা ছিল মোট জনসংখ্যার ৯৪·৫% ভাগ।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অনুপস্থিতি

রাশিয়ার বেশীর ভাগ কৃষক ছিল সার্ফ বা ভূমিদাস শ্রেণীর অন্তর্গত। ষোড়শ শতক থেকে রাশিয়ার সার্ফ বা ভূমিদাস প্রথার চলন হয়। দ্বিতীয় ক্যাথারিনের আমলে রাশিয়ায় ব্যাপকভাবে সার্ফ প্রথার প্রচলন হয়। ভূমিদাসরা জমিদারদের ম্যানর বা খামারের সংলগ্ন গ্রামে বসবাস করত। ভূমিদাসদের জীবনযাত্রা ছিল অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত। ম্যানর প্রথা অনুসারে এরা জমিদারদের জমির একখন্ড চাষ করত। এর বিনিময়ে সপ্তাহে অন্ততঃ তিন দিন এদের জমিদারদের জমিতে বিনা পারিশ্রমিকে চাষ-আবাদের কাজ করতে হত। এছাড়া এরা কর্ভি বা বেগারের কাজ করতে বাধ্য ছিল। বাঁধ নির্মাণ, খাল খনন বা পুল নির্মাণের জন্যে এদের বিনা পারিশ্রমিকে বাধ্যতামূলক শ্রমদান করতে হত। এরা জমিদারকে নানাপ্রকার কর ও শ্রম দিত। এরা গীর্জাকে ধর্ম কর বা টাইদ (Tithe) আদায় দিত। রাশিয়ার আইনে সার্ফ বা ভূমিদাসরা ছিল জমিদারদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। গৃহপালিত পশুর মতই ভূমিদাসকে গণ্য করা হত। কারণ আইনে ভূমিদাসদের কোন অধিকার স্বীকার করা হত না। তারা ছিল আইনের চোখে নির্জীব পদার্থ মাত্র। ভূমিদাস পরিবারে লোকসংখ্যা বাড়লে এদের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে, বাজারে বিক্রি করা হত। দৈহিক নির্যাতন ভূমিদাসদের রাষ্ট্র রক্ষা করলেও তাদের রক্ষায় রাষ্ট্র এগিয়ে আসত না।[৩] বিদ্রোহী ভূমিদাসদের শাস্তি-স্বরূপ নির্বাসনে পাঠান হত। রাশিয়ার আদালতে ভূমিদাসদের মামলা দ্বারা অধিকার রক্ষা করা সম্ভব ছিল না। ভূমিদাসদের ব্যক্তি স্বাধীনতা বলতে কিছুই ছিল না। ম্যানর কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে তারা ম্যানর ত্যাগ করে অন্যত্র যেতে পারত না। রুশ সার্ফ বা ভূমিদাসদের জীবন ছিল মার্কিন দেশের তুলা খামারের ক্রীতদাসদের ন্যায়। এই অসহনীয় অবস্থা থেকে মুক্তি লাভের জন্যে তারা মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করত। ১৮২৬—১৮৫৪ খ্রীঃ মধ্যে রাশিয়ায় ৭১২টি ভূমিদাস ও কৃষক বিদ্রোহ ঘটে। ভূমিদাসদের মুক্তির জন্যে ১৮৬১ খ্রীঃ আগে জার সরকার কোন কার্যকরী ব্যবস্থা নেয়নি।

সার্ফ বা ভূমিদাস শ্রেণী

রাশিয়ার অর্থনীতি ছিল কৃষিভিত্তিক। ডেভিড ল্যান্ডস ও গারশেনক্রন[৪] নামক প্রখ্যাত অর্থনৈতিক ঐতিহাসিকদের মতে, সামন্ত প্রথার প্রভাবে রাশিয়াকে লোকে কায়িক পরিশ্রমের কাজকে নীচু চোখে দেখত। ফ্রান্সের ন্যায় রাশিয়ার লোকে শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্যকে হীন কাজ মনে করত। ফলে বাণিজ্য ও শিল্পে, ইংলন্ড প্রভৃতি দেশ অপেক্ষা রাশিয়া অনেক পিছনে পড়েছিল। ধনবন্টন না হওয়ায় সমাজে মুষ্টিমেয় ধনী অভিজাত এবং বাকি দরিদ্র চাষী নিয়ে রাশিয়ার সমাজ গঠিত

অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা

১· এই যুগের অভিজাতদের জীবনধারার চিত্র টলস্টয়ের রিসারেকসন উপন্যাসে জীবন্তভাবে চিত্রিত হয়েছে।

২· Seton Watson—Decline of Imperial Russia.

৩· Lipson—Europe in 19th and 20th Centuries.

৪· David Landes & Gerechenkron.

ছিল। ইংলন্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে যেরূপ ধনী বুর্জোয়া ও নিম্ন মধ্যবিত্ত বা পাতি বুর্জোয়া ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর উদ্ভব হয় রাশিয়ায় তা হয়নি।

অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে রুশ জারিনা দ্বিতীয় ক্যাথারিন, জার্মানীর সহযোগিতায় রাশিয়ায় কিছু কিছু শিল্প স্থাপনের চেষ্টা করেন। ফলে উরাল (Ural) ও রোস্টোভ অঞ্চলে দু-একটি শিল্পের কেন্দ্র স্থাপিত হয়। অষ্টাদশ শতকে রাশিয়ায় কয়লা ও তেল উৎপাদনের চেষ্টাও আরম্ভ হয়। শিল্পকে কৃষির বিকল্প হিসেবে স্থাপন করার কোন প্রচেষ্টা এই সময় দেখা যায়নি।

শিল্প ব্যবস্থা

আগেই বলা হয়েছে যে, জারের অধীনে রাশিয়ায় এক স্বৈরতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত ছিল। জার ও তাঁর সৈন্যবাহিনী এবং অনুগামী অভিজাতরাই ছিলেন শাসন ব্যবস্থার প্রধান কাঠামো। ডুমা (Duma) বা জাতীয় পার্লামেন্ট নামক একটি সংসদ থাকলেও তার অধিবেশন জারের ইচ্ছামত আহূত হত। ডুমা বা জাতীয় পরিষদের সদস্যরা ছিল অভিজাত শ্রেণীর লোক। সর্বসাধারণের ভোটে গণতান্ত্রিক প্রথায় ডুমার সদস্যরা নির্বাচিত হত না। রাশিয়ার শাসনব্যবস্থা ছিল প্রধানতঃ অভিজাত কর্মচারীদের কুক্ষিগত। ব্যক্তিগত যোগ্যতার কোন সমাদর ছিল না। বংশমর্যাদাই ছিল স্বীকৃতির মাপকাঠি। সরকারি কর্মচারীরা ছিল দুর্নীতিপরায়ণ। এই যুগের রুশ ঐতিহাসিক ওয়ালেসের মতে, "সকল ব্যবস্থাই ছিল দুর্নীতিপূর্ণ; সকল কিছুই ছিল অবিচারমূলক এবং অসৎ।"[১] বিচারকেরা উৎকোচ গ্রহণ করতে দ্বিধা করত না; রাজস্ব বিভাগের কর্মচারীরা সরকারি অর্থ আত্মসাৎ করত। সমাজের নীচু তলার লোকেদের ভাগ্য ছিল অন্ধকারময়।

জারের স্বৈরতন্ত্র

ঊনবিংশ শতকের রাশিয়ায় এই হতাশাময় চিত্রের মধ্যেও পরিবর্তনের স্রোত দেখা দেয়। রুশ জনগণ ছিল স্বভাবতই স্বদেশপ্রেমী। অভিজাত, কৃষক সকলেই স্বদেশকে ভালবাসত।[২] রুশ অভিজাতদের মধ্যে একাংশ যারা সামরিক বিভাগে যোগ দিয়ে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দেয়, তারা পশ্চিম ইওরোপে এসে উদারনৈতিক ভাবধারায় দীক্ষিত হয়। পশ্চিম ইওরোপের উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থার সঙ্গে জারের স্বৈরতন্ত্রের তুলনা করে তারা রাশিয়ায় সাংবিধানিক পরিবর্তনের জন্যে কামনা করে। টলস্টয়ের ভুবন বিখ্যাত রচনা ওয়্যার এ্যান্ড পিস (War and Peace) নামক উপন্যাসে দেখা যায় যে, রুশ অভিজাতদের একাংশ ফরাসী বিপ্লব উদ্ভূত উদারতন্ত্রবাদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। তাঁর রিসারেকসান উপন্যাসেও উদারপন্থী অভিজাতের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এই সকল উদারপন্থীদের ধারণা ছিল যে, রাশিয়ায় স্বৈরশাসনের পরিবর্তন না ঘটলে রাশিয়ার আধুনিকীকরণ সম্ভব হবে না। ১৮২৫ খ্রীঃ ডেকাব্রিস্ট বা ডিসেম্ব্রিস্ট বিদ্রোহের মাধ্যমে বিপ্লবী ভাবধারার প্রথম স্ফুরণ ঘটে।

উদারতন্ত্রবাদের প্রসার

জার প্রথম আলেকজান্ডারের আভ্যন্তরীণ শাসন নীতি, ১৮০১-১৮২৮ খ্রীঃ (Home Policy of Czar Alexander I, 1801-1828) : জারিনা দ্বিতীয় ক্যাথারিনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র প্রথম পল কিছুকাল জার হিসেবে রাজত্ব করেন। জার প্রথম পল জনৈক রুশ সেনাপতির দ্বারা নিহত হলে, তাঁর পুত্র

১· "Everything was corrupt, everything unjust and everything dishonest."—Wallace.

২· বিখ্যাত রুশ সাহিত্যিক সোলঝিনিৎসিনের বিখ্যাত রচনা ১৯১৪ খ্রীঃ দ্রষ্টব্য।

জার প্রথম আলেকজান্ডারের উদারতন্ত্রবাদের প্রতি অনুরাগ

প্রথম আলেকজান্ডার ১৮০১ খ্রীঃ রোমানভ বংশের উত্তরাধিকারী হিসেবে জারের সিংহাসনে বসেন। জার প্রথম আলেকজান্ডারের গৃহ শিক্ষক ছিলেন উদারতান্ত্রিক চিন্তাবিদ লা হার্প (La Harpe)। তাঁর প্রভাবে আলেকজান্ডারের মনে উদারতন্ত্রের প্রতি অনুরাগ জন্মায়। তবে রুশ জারেরা ছিলেন স্বভাবতই স্বৈরশাসক। সুতরাং প্রথম আলেকজান্ডার উদারতন্ত্রবাদে দীক্ষিত হলেও তাঁর শাসনব্যবস্থায় এর প্রভাব গভীর ছিল না। ১৮১৮ খ্রীঃ পর্যন্ত তিনি শাসননীতিতে কিছু কিছু উদারনীতির পরিচয় দেন। ১৮১৮ খ্রীঃ পর তিনি উদারনীতির পথ ত্যাগ করে পুরোপুরি স্বৈরতন্ত্রকে অনুসরণ করেন।

ধর্মীয় প্রভাব ঃ প্রতিক্রিয়াশীলতা

জার প্রথম আলেকজান্ডারের চরিত্রে ছিল একটি স্ববিরোধিতা। তিনি উদারতন্ত্রে বিশ্বাস করলেও সাহস করে শাসননীতিতে এই নীতিকে প্রয়োগ করতে পারেননি। লা হার্পের প্রভাবে তিনি উদারতন্ত্রের অনুরাগী হলেও, কিছুকাল পরে ফন ক্রুডেনার নামে এক খ্রীষ্টীয় সন্ন্যাসিনীর প্রভাবে তিনি গীর্জার অধিকার নীতিকে আঁকড়ে ধরেন। জারের চরিত্রে এই পরস্পর-বিরোধিতার দরুন তিনি কার্যকরীভাবে কোনো একটি বিশেষ নীতি অনুসরণ করতে ব্যর্থ হন।

উদারতান্ত্রিক সংস্কার

১৮০১ খ্রীঃ পর জার কিছুকাল শাসনব্যবস্থায় উদারনৈতিক হাওয়া বইয়ে দেন। এজন্য তিনি "উদারনৈতিক জার" (Liberal Czar) হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। (১) তিনি রাশিয়াতে গুপ্ত ও দমনমূলক পুলিশ বাহিনীকে লোপ করেন। (২) বৈদেশিক ভ্রমণ এবং বৈদেশিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠন-পাঠনের জন্যে তিনি রুশ ছাত্র ও বুদ্ধিজীবিদের অনুমতি দেন। (৩) শিক্ষা বিস্তারের জন্যে তিনি গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। (৪) মস্কো, ভিল্না এবং ডোরনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি সাধন করা হয়। (৫) সেন্ট পিটার্সবার্গ, কাজান ও খারকোভে তিনি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। (৬) তিনি দুর্ভিক্ষ পীড়িত রুশ কৃষকদের সাহায্যের জন্যে দুর্ভিক্ষ ত্রাণ নীতি গ্রহণ করেন। (৭) রুশ কারাগার, হাসপাতালগুলির উন্নতির জন্যে তিনি বাড়তি অর্থ বরাদ্দ করেন।

ভূমিদাস প্রথা সংস্কারে অনাগ্রহ

রাশিয়ার প্রধান সামাজিক সমস্যা ছিল সার্ফ বা ভূমিদাসদের সমস্যা। জার প্রথম আলেকজান্ডার ভূমিদাসদের স্বার্থরক্ষার জন্যে আইন রচনার উপযোগিতা স্বীকার করেন। কিন্তু তিনি এই উদ্দেশ্যে কোন মৌলিক আইন প্রণয়ন করতে বিরত থাকেন। তিনি আশঙ্কা করতেন যে, ভূমিদাস প্রথার উচ্ছেদ ঘটালে রাশিয়ার জারতন্ত্র ভেঙে পড়বে। জারতন্ত্র ছিল অভিজাতদের ওপর নির্ভরশীল। ভূমিদাস প্রথার উচ্ছেদ ঘটলে অভিজাতরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং জারতন্ত্র ভেঙে পড়বে। ভূমিদাসদের দৈহিক নির্যাতন তিনি আইন করে বন্ধ করেন। তিনি আইন করে ভূমিদাসদের নির্বাসনে পাঠান। ভূমিদাসদের পণ্যসামগ্রীর মত বাজারে বিক্রয় নিষিদ্ধ করা হয়।

সংবিধান সংস্কার

জার প্রথম আলেকজান্ডার, সংবিধান সংশোধনের জন্যে, সুপারিশ রচনার উদ্দেশ্যে, একটি কমিটি নিয়োগ করেন। এই কমিটি সরকারের ক্ষমতার বিভাজন, ব্যক্তি স্বাধীনতা স্থাপন প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে একটি খসড়া রচনা করে। কিন্তু জার সংবিধান সংশোধনে প্রকৃত আগ্রহী ছিলেন না। তিনি এই খসড়াকে অকার্যকরী করেন। তিনি পোল্যান্ডে একটি সংবিধান প্রবর্তন করে পোলদের স্বায়ত্ত শাসন দান করেন। পোলদের জাতীয় পরিষদ বা ডায়েটকে বাজেট পাশ ও আইন রচনার অধিকার দেন। পোলদের ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং জাতীয় ভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

জার প্রথম আলেকজান্ডার তাঁর শাসননীতিতে কিছুকাল উদারতন্ত্র অবলম্বন করলেও, ক্রমে তিনি স্বৈরতন্ত্রের দিকে ঝুঁকে পড়েন। ভিয়েনা কংগ্রেসে এবং ইওরোপীয় শক্তি সমবায়ে মেটারনিকের সঙ্গে তিনি মিলিত হন। মেটারনিকের প্রভাবে তাঁর মধ্যে রক্ষণশীল চিন্তা জাগ্রত হয়। পোলরা স্বায়ত্ব শাসনের অধিকার পেলেও তাতে শান্ত না হয়ে স্বাধীনতা দাবী করলে জার উদারনীতির পথ পরিত্যাগ করেন। তিনি পোলজাতিকে প্রদত্ত সংবিধানের বহু অধিকার নাকচ করেন। ১৮১৮ খ্রীঃ পর জার উদারতন্ত্রের পথ ত্যাগ করে পুরোপুরি রক্ষণশীলতার নীতি গ্রহণ করেন।

রক্ষণশীল নীতিতে প্রত্যাবর্তন

জার প্রথম আলেকজান্ডারের বৈদেশিক নীতি (The Foreign Policy of Czar Alexander I) ঃ জার প্রথম আলেকজান্ডারের আভ্যন্তরীণ নীতির ন্যায় তাঁর বৈদেশিক নীতি ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, জার প্রথম আলেকজান্ডারের আমলে রাশিয়া ইওরোপীয় রাজনীতিতে কেন্দ্রস্থান অধিকার করে। সিংহাসনে বসার পর জারের সম্মুখে প্রধান সমস্যা ছিল নেপোলিয়নের সম্পর্কে নীতি নির্ধারণ। তিনি ১৮০১-০৪ খ্রীঃ পর্যন্ত নেপোলিয়নের সম্পর্কে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করেন। কিন্তু নেপোলিয়ন জার্মানী জয় করার পর আলেকজান্ডার নিরপেক্ষতা নীতি ত্যাগ করেন। তিনি তৃতীয় শক্তিজোটে যোগ দিয়ে নেপোলিয়নের হাতে ফ্রিডল্যান্ডের যুদ্ধে পরাজয় বরণ করেন।

নেপোলিয়ন বিরোধী গোষ্ঠীতে যোগদান ও পরাজয়

১৮০৭ খ্রীঃ জার প্রথম আলেকজান্ডার, নেপোলিয়নের সহিত বিখ্যাত টিলজিটের সন্ধি স্বাক্ষর করেন। এই সন্ধির দ্বারা পোল্যান্ডে নেপোলিয়নের আশ্রিত রাজ্য, কিংডম অব ওয়ারসকে, জার মেনে নেন। তিনি নেপোলিয়নের প্রচারিত মহাদেশীয় প্রথা (Continental System) সমর্থন করে ইংলন্ডের বিরুদ্ধে বাণিজ্যিক অবরোধে যোগ দেন। নেপোলিয়ন কর্তৃক জার্মানী ও ইতালীর পুনর্গঠন ব্যবস্থাকেও জার মেনে নেন। এর বিনিময়ে পূর্ব ইওরোপে রুশ আধিপত্য স্থাপনের দাবীকে নেপোলিয়ন মেনে নেন। ফিনল্যান্ড, বেসারাবিয়া এবং ককেশাসের তৈল সমৃদ্ধ অঞ্চলে রুশ অধিকার স্থাপিত হয়।

টিলজিটের সন্ধি ১৮০৭ খ্রীঃ

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে জারের সঙ্গে নেপোলিয়নের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। রুশ মন্ত্রীরা জারকে একথা বুঝান যে, রুশ জারের মিত্রতার সাহায্যে নেপোলিয়ন ইওরোপে একাধিপত্য স্থাপন করেছেন। নেপোলিয়নের মহাদেশীয় প্রথা গ্রহণের ফলে রুশ বাণিজ্যের ক্ষতি হচ্ছে। পোল্যান্ডে ফরাসী প্রভাব বিস্তারের ফলে রুশ নিরাপত্তা বিপন্ন হচ্ছে। এই সকল কারণে জার মহাদেশীয় প্রথা অগ্রাহ্য করেন। এর ফলে নেপোলিয়নের সঙ্গে রাশিয়ার যুদ্ধাবস্থা দেখা দেয়।

নেপোলিয়নের সহিত বিরোধ

১৮১২ খ্রীঃ নেপোলিয়ন তাঁর গ্র্যান্ড আর্মি (Grand Army) নিয়ে রাশিয়া আক্রমণ করেন। কিন্তু নেপোলিয়নের ইওরোপ বিজয়ী সেনাদল মস্কো অভিযানে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। নেপোলিয়ন হতমান ও হতবল হয়ে স্বদেশে ফিরে আসেন। তাঁর পিছু নিয়ে রুশ বাহিনী জার্মানীতে উপস্থিত হয়।

মস্কো অভিযান ঃ জারের প্রতিরোধ

নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যে, পশ্চিম ইওরোপে, বিরাট সংখ্যক রুশ বাহিনীর অবস্থান রাশিয়াকে এক বিরল সামরিক মর্যাদা দান করে। নেপোলিয়ন বিজেতা হিসেবে জার আলেকজান্ডার ইওরোপের জনসাধারণের নিকট অসাধারণ জনপ্রিয়তা পান। এই সময় ইওরোপে রুশ প্রভাব অভূতপূর্ব বৃদ্ধি পায়। নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে জয়লাভ করলেও জার তাঁর মাথা ঠাণ্ডা রাখেন। তিনি ভিয়েনা সম্মেলনে উদারতান্ত্রিক আদর্শের প্রতিনিধি হিসেবে

নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে জয় : জারের উদারতান্ত্রিক নীতি

নিজেকে মনে করতেন। মেটারনিক প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতিজ্ঞদের বিরুদ্ধে তিনি উদারতন্ত্রের সমর্থক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। সামরিক শক্তি ও আদর্শবাদ উভয় নীতির দ্বারা তিনি রাশিয়ার মর্যাদা বিশেষ বৃদ্ধি করেন। তিনি পোল্যান্ডকে স্বায়ত্বশাসনমূলক সংবিধান দিয়ে ইওরোপের নিপীড়িত জাতিগুলির মুক্তির দূত হিসেবে বন্দিত হন।

ভিয়েনা সম্মেলনে জার উদারতন্ত্রের সমর্থকের ভূমিকা নিলেও, তিনি রাশিয়ার স্বার্থের কথা ভুলেননি। তাঁর প্রভাবে সন্ধিকর্তারা ফ্রান্সকে উদার শর্ত দান করতে বাধ্য হন এবং জার্মানীর ৩৯টি রাজ্য নিয়ে একটি Bund বা রাষ্ট্রমণ্ডল গঠিত হয়। অপরদিকে জার অষ্ট্রিয়া ও ব্রিটেনের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে পোল্যান্ডের $\frac{3}{4}$ অংশ এবং ফিনল্যান্ড ও বেসারাবিয়া অধিকার করতে সমর্থ হন। তিন লক্ষ রুশ সৈন্য জার্মানীতে উপস্থিত থাকার ফলে মিত্রশক্তির পক্ষে রাশিয়ার দাবী অগ্রাহ্য করা সম্ভব হয়নি।

ভিয়েনা সম্মেলনে জারের নীতি

কিন্তু মেটারনিকের কূটনীতির ফলে জার আলেকজান্ডার ক্রমে ক্রমে তাঁর ইওরোপীয় প্রভাব, প্রতিপত্তি হারিয়ে ফেলেন। ধূর্ত মেটারনিক বুঝতে পারেন যে, জারকে রক্ষণশীল মতে দীক্ষিত না করলে, ইওরোপে তাঁর পরিকল্পিত রক্ষণশীলতাকে স্থাপন করা যাবে না। তিনি জারকে একথা বোঝাতে সমর্থ হন যে, উদারতন্ত্র হল একটি বৈপ্লবিক শক্তি। এর প্রভাবে জারের স্বর্গীয় অধিকার নীতি বিনষ্ট হবে। তিনি ফ্রান্সে সমাজতন্ত্রবাদীদের প্রভাব, জার্মানীর ছাত্র সমাজের বিদ্রোহী মনোভাব, রাশিয়ায় বুদ্ধিজীবিদের সংবিধান পরিবর্তনের দাবী উল্লেখ করে বলেন যে—এই আন্দোলনগুলির উদ্দেশ্য হল ইওরোপীয় রাজশক্তিগুলিকে ধ্বংস করা। জার আলেকজান্ডার পবিত্র চুক্তি ঘোষণা করে ইওরোপে রক্ষণশীলতা স্থাপন করার পরিকল্পনা করেন। অষ্ট্রিয়া, রাশিয়া ও প্রাশিয়া এই তিন রক্ষণশীল শক্তি এর ফলে জোটবদ্ধ হয়।

জারের প্রতিক্রিয়াশীলতা নীতি গ্রহণ

ইওরোপীয় শক্তি সমবায়ের সদস্য হিসেবে জার আলেকজান্ডার, মেটারনিকের রক্ষণশীল নীতির ঘোর সমর্থকে পরিণত হন। জারের উদারতন্ত্রী ভাবমূর্তি বিনষ্ট হয়। কিন্তু জার শীঘ্রই উপলব্ধি করেন যে, শক্তি সমবায়ে যোগদানের ফলে, তিনি রাশিয়ার বৈদেশিক নীতি স্বাধীনভাবে পরিচালনার অধিকার হারিয়ে ফেলেছেন। তিনি যাই করুন না কেন, তাঁকে শক্তি সমবায়ের অনুমোদন নিয়ে করতে হবে। ১৮২০ খ্রীঃ মেটারনিক কর্তৃক রচিত প্রতিক্রিয়াশীল দলিল প্রোটোকল অব ট্রপোতে জার স্বাক্ষর দেন। স্পেনে উদারতান্ত্রিক বিদ্রোহ দেখা দিলে তিনি তা দমনের জন্যে সৈন্য পাঠাবার প্রস্তাব দেন। কিন্তু ইংলন্ড ও অষ্ট্রিয়া স্পেনে রুশ সেনার অনুপ্রবেশ সমর্থন না করায় তিনি হতাশ হন। এদিকে তুরস্কের বিরুদ্ধে গ্রীসে বিদ্রোহ দেখা দেয়। গ্রীসে রুশ প্রভাব বিস্তারের জন্যে রুশ জার, গ্রীক বিদ্রোহীদের সহায়তা করতে অভিপ্রায় জানান। কিন্তু অষ্ট্রিয়া বা ইংলন্ড, কেহই রাশিয়ার এই প্রস্তাবে সম্মত হয়নি। ফলে জার আলেকজান্ডারকে নিরস্ত হতে হয়। জারের আহত অভিমানকে শান্ত করার জন্যে, মেটারনিক তাঁকে বলেন যে, "মনে করুন গ্রীস ইওরোপের অন্তর্গত নয়।"

শক্তি সমবায়

জারের ব্যর্থতা

ডেকাব্রিষ্ট বা ডিসেম্ব্রিষ্ট বিদ্রোহ, ১৮২৫ খ্রীঃ (Decabrist or Decembrist Revolt, 1825) ঃ জার প্রথম আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর তাঁর সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে গোলযোগ ঘটে। প্রথম আলেকজান্ডারের অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু ঘটলে, তাঁর দুই ভ্রাতা কনস্টান্টাইন ও নিকোলাস সিংহাসনের বৈধ উত্তরাধিকারী হন। জার আলেকজান্ডার অবশ্য তাঁর মৃত্যুর আগে নিকোলাসকেই উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনীত করে যান। কিন্তু বয়সের দাবীতে কনিষ্ঠ নিকোলাস অপেক্ষা জ্যেষ্ঠ কনস্টানটাইনের দাবী জোরালো ছিল। কনস্টান্টাইন ছিলেন

সিংহাসনে উত্তরাধিকারের সমস্যা

উদার প্রকৃতির ও জনপ্রিয়। দেশীপ্রেমিকরা তাঁকে সিংহাসনে বসাতে সঙ্কল্প নেয়। তাঁদের দাবী ছিল "কনস্টান্টাইন এবং কনষ্টিটিউশন" বা সংবিধান (Constantine and Constitution)। কিন্তু কনস্টান্টাইন তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিকোলাসের অনুকূলে পদত্যাগ করায়, নিকোলাস রুশ সিংহাসনে (১৮২৫ খ্রীঃ) বসেন।

নিকোলাস সিংহাসনে বসার ফলে রুশ সেনাদলের একাংশ এবং বহু দেশপ্রেমিক হতাশ হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ২৬শে ডিসেম্বর, ১৮২৫ খ্রীঃ এই বিদ্রোহ ঘটে। এজন্য একে ডিসেম্ব্রিষ্ট বা ডেকাব্রিষ্ট বিদ্রোহ বলা হয়। নিকোলাস কর্তৃক জারের পদ গ্রহণের বিরোধিতা, এই বিদ্রোহের আপাত কারণ হলেও এই বিদ্রোহের মূল কারণ গভীর ছিল। বহু রুশ দেশপ্রেমিক, জারের স্বৈরতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে রাশিয়ায় সাংবিধানিক শাসন প্রবর্তনের দাবী করেন। ডেকাব্রিষ্ট বিদ্রোহের মূলে তাঁদের অবদান ছিল। কোন কোন রুশ সেনাপতি নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ উপলক্ষে পশ্চিম ইওরোপে যান। তাঁরা পশ্চিমের সাংবিধানিক প্রথা ও উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থা দেখে প্রভাবিত হন। তাঁরা স্বদেশে অনুরূপ ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবী জানান। বহু উদারপন্থী দেশপ্রেমিক অভিজাতও এই আন্দোলনে যোগ দেন। ১৮১৬ খ্রীঃ রাজধানী সেন্টপিটার্সবার্গে ইউনিয়ন অব স্যালভেশন (Union of Salvation) নামে একটি গুপ্ত সমিতি স্থাপিত হয়। ক্রমে উত্তর রাশিয়ার জন্যে একটি সমিতি (Northern Society) এবং দক্ষিণ রাশিয়ার একটি স্বতন্ত্র সমিতি স্থাপিত হয়। কর্ণেল পেষ্টেল (Col. Pestel) নামে এক অভিজাত সেনাপতি দক্ষিণের সমিতি সংগঠন করেন। দক্ষিণের সমিতি জারের স্বৈরতন্ত্রের বিলোপ, প্রজাতন্ত্র স্থাপন, ভূমিদাস প্রথার বিলোপ, সর্বসাধারণের ভোটাধিকার প্রবর্তন প্রভৃতি মৌলিক সংস্কার দাবী করে।[১] এই সমিতি আশা করত যে, উদারপন্থী কনস্টান্টাইন সিংহাসনে বসলে এই সকল সংস্কার প্রবর্তিত হবে। নিকোলাস সিংহাসনে বসার ফলে তাদের আশা বিফল হয়।

ডেকাব্রিষ্ট বিদ্রোহের কারণ

উপরোক্ত কারণে ডেকাব্রিষ্ট বিদ্রোহ ঘটে। জার প্রথম নিকোলাস তাঁর অনুগত গোয়েন্দা ও কসাক বাহিনীর সাহায্যে নিষ্ঠুরভাবে এই বিদ্রোহ দমন করেন। হত্যা, নির্বাসন ও কারাদণ্ডের দ্বারা দেশপ্রেমিক বিপ্লবীদের শাস্তি দেওয়া হয়। ডেকাব্রিষ্ট বিদ্রোহ ছিল উনবিংশ শতকের রাশিয়ার জাগরণের প্রভাতী সঙ্গীত। পরবর্তীকালের পপুলিষ্ট, এ্যানার্কিষ্ট এমন কি মাকসিষ্ট বিপ্লবগুলি এই বিপ্লব থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করে। জারের স্বৈরতন্ত্র সম্পর্কে মোহমুক্ত হয়ে একশ্রেণীর দেশপ্রেমিক বুদ্ধিজীবির আত্মত্যাগ একেবারে ব্যর্থ হয় একথা বলা যায় না।

বিদ্রোহ দমন

জার প্রথম নিকোলাসের রাজত্বকাল, ১৮২৫-১৮৫৫ খ্রীঃ (Czar Nicholas I, 1825-1855) ঃ রুশ জার প্রথম নিকোলাস ছিলেন লৌহ মানব। জারতন্ত্রের স্বৈরশাসন তাঁর মধ্যে প্রকৃতভাবে প্রতিফলিত হয়। কিশোর বয়স থেকে সেনা বিভাগে কাজ করার ফলে তাঁর মধ্যে সুকুমার মনোবৃত্তিগুলি বেড়ে ওঠার সুযোগ পায়নি। তিনি ছিলেন ঘোর রক্ষণশীল, সংস্কার বিরোধী এবং শৃঙ্খলাপরায়ণ ব্যক্তি। তবে তাঁর প্রখর বাস্তব জ্ঞান ছিল। তাঁর বিরুদ্ধে সমালোচনা থেকে শিক্ষা নিতে তিনি সমর্থ ছিলেন। তাঁর স্বদেশপ্রীতিও কম ছিল না। তবে তিনি স্বদেশ বলতে তাঁর শাসিত সরকারকে বুঝতেন।

জার নিকোলাসের রক্ষণশীলতা

ডেকাব্রিষ্ট বিদ্রোহীদের কঠোর হাতে দমন করে, নিহত ডেকাব্রিষ্টদের পায়ে মাড়িয়ে, জার প্রথম নিকোলাস রুশ সিংহাসনে বসেন। তিনি রাশিয়ার শাসন ও সমাজ ব্যবস্থায় স্থিতাবস্থা

১· Lionel Kochan—The Making of Modern Russia.

স্বৈরতন্ত্র

বজায় রাখার জন্যে নিশ্ছিদ্র দমন নীতি প্রয়োগ করেন। তাঁর নীতি ছিল, "গোঁড়ামি, স্বৈরতন্ত্র এবং রুশী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্ব" প্রচার (Orthodoxy, Autocracy and Nationality)। তিনি স্বাধীন চিন্তা ও সমালোচনাকে বন্ধ করার জন্যে বোর্ড অব সেন্সরসিপ (Board of Censorship) বা নিয়ন্ত্রণ পরিষদ স্থাপন করেন। শিক্ষামন্ত্রী কাউন্ট উভারভ (Count Uvarov) ছিলেন এই পরিষদের সর্বেসর্বা। বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও বিদ্যালয়গুলিকে দৃঢ় হাতে এই পরিষদের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। ছাত্রদের বিদেশে পঠন-পাঠন নিষিদ্ধ করা হয়। বিদেশী অধ্যাপকদের রুশী বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ দান নিষিদ্ধ করা হয়। উদারনৈতিক পাঠ্যবস্তুগুলির চর্চা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিষিদ্ধ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠন-পাঠনের জন্যে ছাত্রদের যোগদানে বাধানিষেধ আরোপ করা হয়। নিকোলাস দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষার বিস্তার চাইতেন না। তাঁর আশঙ্কা ছিল যে, তার ফলে দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে জাগরণ ঘটবে। মোট কথা মেটারনিক যেরূপ অষ্ট্রিয়া ও জার্মানীতে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দ্বারা স্বাধীন মতামত গঠন ও প্রকাশের পথ বন্ধ করেন, জার নিকোলাসও রাশিয়াতে তাই করেন।

জার নিকোলাস থার্ড সেকসন (Third Section) নামে এক গুপ্ত পুলিশ ও গোয়েন্দা বাহিনী গঠন করেন। জেনারেল বেক্কেনডর্ফের অধীনে এই গুপ্ত বাহিনী সমগ্র দেশে সন্ত্রাসের

দমন নীতি

রাজত্ব সৃষ্টি করে। বিনা বিচারে কারাদণ্ড, হত্যা, নির্বাসন দ্বারা এই বাহিনী বিপ্লবী গুপ্ত সমিতিগুলির মেরুদণ্ড ভেঙে দেয়।

প্রথম নিকোলাসের দমন নীতির ফলে রুশ বুদ্ধিজীবিরা রাজনীতির সম্পর্ক ত্যাগ করে, সাহিত্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে সৃজনশীল কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এর ফলে নিকোলাসের

রুশ সাহিত্যের অগ্রগতি

রাজত্বকালে রুশী সাহিত্যের বিরাট অগ্রগতি ঘটে। নিকোলাসের শাসনকালকে রুশী সাহিত্যের "অগাষ্টিয়ান যুগ" (Augustian Age of Russian literature) বলা হয়। রুশী সাহিত্যে একটি গোষ্ঠী ফরাসী সাহিত্যের অনুকরণে সাহিত্য রচনার চেষ্টা করেন। তুর্গেনিভ, বাকুনিন, হার্জেন প্রভৃতি ছিলেন এই গোষ্ঠীর লেখক। অপর গোষ্ঠী ছিল স্লাভবাদী। রাশিয়ার জাতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে আশ্রয় করে এই গোষ্ঠী সাহিত্য রচনা করেন। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক দস্তয়েভস্কি, পুশকিন, গোগোল প্রভৃতি ছিলেন এই গোষ্ঠীর লোক। রোমান দেবতা জানুসের (Janus) যেমন দুটি মস্তক ছিল, নিকোলাসের যুগের রুশী সাহিত্য তেমনই পাশ্চাত্যবাদী ও জাতীয়তাবাদী এই দুই শাখায় পল্লবিত হয়।

জার নিকোলাস স্বৈরাচারী হলেও ঘোর জাতীয়তাবাদী ছিলেন। তিনি জাতীয়তাবাদী সাহিত্য রচনার দৃঢ় সমর্থন করেন। এমনকি রাশিয়ায় বসবাসকারী অন্য জাতিগোষ্ঠীর লোকেদের তিনি

নিকোলাসের জাতীয়তাবাদ

রুশীকরণের জন্যে বিশেষ চেষ্টা করেন। তিনি ঘোর রক্ষণশীল হলেও রাশিয়ায় শিল্প বিস্তারের কাজে মনোযোগ দেন। ক্ষুদ্র শিল্পের উৎপাদন তাঁর রাজত্বকালে ৭ গুণ বৃদ্ধি পায়। সুতী বস্ত্র এবং চিনি শিল্পের উৎপাদন বিশেষ বাড়ে।

যা হোক, জার প্রথম নিকোলাসের স্বৈর শাসনে রুশ জনগণ বিশেষভাবে দমিত হয়। ১৮৫৫ খ্রীঃ তাঁর মৃত্যু ঘটলে লোকে হাঁফ ছাড়তে পারে।[১]

জার প্রথম নিকোলাসের বৈদেশিক নীতি (The foreign policy of Czar Nicholas I) : জার প্রথম নিকোলাস ছিলেন ঘোর রক্ষণশীল ও সাম্রাজ্যবাদী। তাঁর

ইওরোপে রক্ষণশীলতার প্রতি সমর্থন

বৈদেশিক নীতিতে উপরোক্ত ভাবধারার ছাপ দেখা যায়। তিনি মেটারনিকের ন্যায় ইওরোপীয় রক্ষণশীলতার অন্যতম প্রধান স্তম্ভ ছিলেন। ১৮১৫ খ্রীঃ ভিয়েনা সন্ধির দ্বারা গঠিত ইওরোপের স্থিতাবস্থাকে

১· L. Kochan. P. 162.

রক্ষা করার জন্যে তিনি চেষ্টা করেন। ১৮৩০ খ্রীঃ জুলাই বিপ্লবের প্রভাবে পোল্যান্ডে জাতীয় বিদ্রোহ দেখা দিলে তিনি তা কঠোর হাতে দমন করেন। তিনি পোলদের স্বায়ত্ব শাসনের অধিকার নাকচ করেন। পোল্যান্ডে রুশীকরণ নীতিকে বলবৎ করেন। ১৮৪৮ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের তরঙ্গ ইওরোপের বিভিন্ন দেশে ছড়ালে রক্ষণশীল নিকোলাস বিশেষ চিন্তিত হন। অষ্ট্রিয়ার হ্যাপসবার্গ সাম্রাজ্যে এই বিপ্লব দমনের জন্যে জার নিকোলাস হ্যাপসবার্গ সম্রাটকে তাঁর সামরিক সহায়তা দেন। রুশ বাহিনী হাঙ্গেরীর বিদ্রোহ দমন করে এই দেশে হ্যাপসবার্গ শাসন পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করে। প্রাশিয়ার রাজা চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়াম যাতে জার্মানীর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে সমর্থন না করেন এজন্য নিকোলাস তাঁর ওপর কূটনৈতিক চাপ সৃষ্টি করেন। মোট কথা, মেটারনিকের পতনের পর ইওরোপে রক্ষণশীল ব্যবস্থার প্রধান পুরোহিত হিসেবে জার নিকোলাস তাঁর ভূমিকা পালন করেন।

সাম্রাজ্যবাদী নিকোলাস তুরস্কের রাজ্য গ্রাস করে রুশ সাম্রাজ্য ও প্রতিপত্তি বাড়াবার চেষ্টা করেন। তুরস্কের বিরুদ্ধে গ্রীস দেশে বিদ্রোহ দেখা দিলে জার প্রথম নিকোলাস হস্তক্ষেপের জন্যে উদ্যত হন। নাভারিনোর যুদ্ধে তুরস্ক পরাজিত হলে, জার প্রথম নিকোলাস তুরস্কের ওপর এ্যাড্রিয়ানোপলের সন্ধি (১৮২৩ খ্রীঃ) চাপিয়ে দেন। এই সন্ধির দ্বারা গ্রীসের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয় এবং গ্রীস পরোক্ষভাবে রাশিয়ার আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হয়। ইংলন্ড এই সন্ধির বিরোধিতা করে লন্ডনের সন্ধির দ্বারা গ্রীসের ওপর রুশ প্রভাব নাশ করা হয়।

গ্রীসের বিদ্রোহ জারের ভূমিকা

গ্রীসে বিদ্রোহ দেখা দিলে তা দমন করার জন্যে তুর্কী সুলতান তাঁর সামন্ত মিশরের শাসনকর্তা মহম্মদ আলির সহায়তা নেন। এই সাহায্যের বিনিময়ে মহম্মদ আলি সিরিয়া অধিকার করেন এবং তাঁর প্রভু তুরস্কের সুলতানের রাজ্যের অপর অঞ্চলও অধিকার করতে উদ্যত হন। বিদ্রোহী সামন্ত মহম্মদ আলিকে দমন করার জন্যে তুর্কী সুলতান রাশিয়ার সাহায্য নেন। এই সাহায্যের বিনিময়ে জার নিকোলাস্ উনকিয়ার স্কেলেসির (Unkair Skelessi) সন্ধির (১৮৩২ খ্রীঃ) দ্বারা দার্দানালিস প্রণালীতে অবাধে রুশ জাহাজ চলাচলের অধিকার লাভ করেন। এই সন্ধির দ্বারা দার্দানালিস প্রণালী দিয়ে রাশিয়া ছাড়া অন্য দেশের জাহাজ চলাচল নিষিদ্ধ হলে কৃষ্ণসমুদ্র রুশ হ্রদে পরিণত হয়।

উনকিয়ার স্কেলেসির সন্ধি

তুরস্কের বিরুদ্ধে রাশিয়ার এই আগ্রাসন নীতির, ইংলন্ড ঘোর বিরোধিতা করে। কারণ ইংলন্ড মনে করত যে, বলকানে রুশ আধিপত্য স্থাপিত হলে ইংলন্ডের স্বার্থ বিপন্ন হবে। এজন্যে ইংলন্ডের সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্কের দ্রুত অবনতি ঘটে। এমতাবস্থায় জার নিকোলাস ইংলন্ড ও রাশিয়ার মধ্যে তুরস্কের সাম্রাজ্য ব্যবচ্ছেদের জন্যে প্রস্তাব দিলেও, ইংলন্ড তাতে কর্ণপাত করেনি। এদিকে যীশুখ্রীষ্টের জন্মস্থানে অবস্থিত পবিত্র গ্রোটোর গীর্জার চাবির অধিকার নিয়ে ক্যাথলিক গীর্জার সঙ্গে অর্থোডক্স গ্রীক গীর্জার বিরোধ ঘটে। নিকোলাস শেষোক্ত গীর্জার পক্ষ নেন এবং ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন ক্যাথলিক গীর্জার পক্ষ নেন। এই উপলক্ষে তুরস্কের সঙ্গে জার নিকোলাসের যুদ্ধ বাধলে ইংলন্ড ও ফ্রান্স তুরস্কের পক্ষ নেয়। এই দুই শক্তি ক্রিমিয়ার যুদ্ধে যোগ দেয়।

ইংলন্ডের বিরোধিতা ক্রিমিয়ার যুদ্ধ

ক্রিমিয়ার যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয় হয়। প্যারিসের সন্ধির (১৮৫৬ খ্রীঃ) দ্বারা ক্রিমিয়ার যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। বিজয়ী শক্তিবর্গ এই সন্ধিতে তুরস্কের বিরুদ্ধে ভবিষ্যতে রুশ আক্রমণ বন্ধ করার জন্যে বিভিন্ন শর্ত যোগ করে। (পরবর্তী 'পূর্বাঞ্চল সমস্যা' অধ্যায়ে এই সন্ধির বিশদ বিবরণ দেখ)। রাশিয়া বেসারাবিয়া প্রদেশ তুরস্ককে ফেরত দেয়। মোলদাভিয়া ও ওয়ালেচিয়া অঞ্চল থেকে রুশ সেনা প্রত্যাহার

প্যারিসের সন্ধি : নিকোলাসের হতাশা

করতে হয়। দার্দানালিস প্রণালীর পথে রুশ যুদ্ধ জাহাজ চলাচল নিষিদ্ধ হয়। কৃষ্ণ সমুদ্রের তীরে রাশিয়ার নৌ-ঘাঁটি নির্মাণ নিষিদ্ধ হয়। মোট কথা, তুরস্কের ব্যবচ্ছেদ সম্পর্কে রুশ পরিকল্পনা প্যারিসের সন্ধির দ্বারা বিনষ্ট হয়। রাশিয়ার সামরিক মর্যাদা ও রাজনৈতিক প্রতিপত্তির ক্ষতি হয়। রাশিয়ার পরাজয়ের ফলে জার নিকোলাসের স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে দেশপ্রেমিক রুশরা সোচ্চার হয়ে ওঠেন। জার স্বয়ং এই পরাজয়ের ফলে দারুণ হতাশ হন। তিনি বুঝতে পারেন যে, রাশিয়ার মধ্যযুগীয় সমাজ এবং ভূমিদাস সেনা নিয়ে আধুনিক রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ জয় সম্ভব হবে না। তিনি তাঁর উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় আলেকজান্ডারকে ভূমিদাস প্রথা সংস্কারের আবশ্যকতা বুঝিয়ে বলেন।[১] ইতিমধ্যে ১৮৫৫ খ্রীঃ জার নিকোলাসের মৃত্যু হয়।

জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের আভ্যন্তরীণ শাসন সংস্কার নীতি এবং কৃতিত্ব বিচার, ১৮৫৫-৮১ খ্রীঃ (The internal policy of reforms of Czar Alexander II and his achievements, 1855-81) ঃ

আধুনিক রাশিয়ার ইতিহাসে জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের রাজত্বকালকে একটি যুগ সন্ধিক্ষণ বলা যায়। ঐতিহাসিক সেটন ওয়াটসনের (Seton Watson)[২] মতে, ক্রিমিয়ার যুদ্ধে জার সরকারের পরাজয়ের ফলে রুশ রাষ্ট্র ব্যবস্থার যে পচনশীল অবস্থা প্রকাশিত হয়, জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার শাসন সংস্কারের প্রলেপ দ্বারা সেই ক্ষত নিরাময়ের জন্যে আন্তরিক চেষ্টা করেন। জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার ছিলেন মানবতাবাদী এবং দেশপ্রেমিক শাসক। তাঁর পিতা নিকোলাসের শাসনকালে ক্রিমিয়ার যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয়ের গ্লানি তিনি ভুলতে পারেন নি। স্বৈরাচারী ও হৃদয়হীন শাসনব্যবস্থা এবং ভূমিদাস প্রথা রাশিয়ার জাতীয় জীবনে অবক্ষয় সৃষ্টি করেছিল একথা তিনি বুঝতে পারেন। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের সময় রাশিয়ার শিল্প ও কারিগরীক্ষেত্রে অনগ্রসরতা ধরা পড়ে। যেক্ষেত্রে ইঙ্গ-ফরাসী সেনার রাইফেলের পাল্লা ছিল ১২ শত পেস, সেক্ষেত্রে রুশ সেনার রাইফেলের পাল্লা ছিল মাত্র ৩৫০—৪০০ পেস। বিজ্ঞানীরা বলেন যে, রাশিয়ার পিছিয়ে পড়া সমাজ, জনসাধারণের নিরক্ষরতা এবং ভূমিদাস প্রথার জন্যে রাশিয়ায় আধুনিক শিল্প গঠনের পরিবেশ নেই। সমকালীন যুগে পশ্চিম ইওরোপে জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের বিস্তার ঘটেছিল। মরুভূমিতে বালুর ঝড়ের সময় উটপাখী যেরূপ বালুর স্তূপে মুখ লুকিয়ে আত্মরক্ষার বৃথা চেষ্টা করে, সেরূপ এই পরিবর্তনশীল যুগে রাশিয়া রক্ষণশীলতা ও স্বৈরতন্ত্রের কবচ ধারণ করে রক্ষা পাবে না একথা তিনি বুঝতে পারেন। জারের স্বৈরতন্ত্রকে সহনীয় করতে হলে কিঞ্চিৎ উদারনৈতিক সংস্কার প্রবর্তন করতে হবে এই বাস্তব বুদ্ধির তিনি পরিচয় দেন। তিনি একদা মন্তব্য করেন যে, "আমরা যে যুগে বাস করছি, সেই যুগের মর্মকথা বুঝে যদি আমরা ওপর থেকে সংস্কারের চেষ্টা না করি, তবে নীচ তলার লোকেরাই ওপরের লোকেদের ওপর সংস্কার চাপিয়ে দেবে। নীচতলা থেকে সংস্কারের দাবী মেনে নেওয়া অপেক্ষা, ওপর থেকে সংস্কার করা ভাল"।[৩]

জার আলেকজান্ডারের উদারতন্ত্রীবাদ

জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার প্রথমে তাঁর পূর্ববর্তী জারের আমলের দমন নীতিকে রদ করার ব্যবস্থা করেন। তিনি ডেকাব্রিষ্ট বিদ্রোহীদের নির্বাসন দণ্ড মকুব করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ওপর নিয়ন্ত্রণ রহিত করেন। থার্ড সেকসন নামক গুপ্ত অত্যাচারী পুলিশবাহিনীকে লোপ করা হয়। বোর্ড অব সেন্সর বা সেন্সর দপ্তরের ক্ষমতা হ্রাস করা হয়। সংবাদপত্রের ওপর নিয়ন্ত্রণ হ্রাস করা হয়। এইভাবে উদারনৈতিক নীতি

দমন নীতি প্রত্যাহার

১· Lipson—Europe in the 19th and 20th centuries.

২· Seton Watson—The decline of Imperial Russia. P. 41.

৩· Quoted by Seton Watson.

অনুসরণ করে দ্বিতীয় আলেকজান্ডার জনসাধারণের শ্রদ্ধা পান।

জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের প্রধান এবং গভীর মূল সংস্কার ছিল ভূমিদাস প্রথার বিলোপ ভূমিদাস প্রথার ত্রুটি সম্পর্কে সমাজ বিজ্ঞানী এবং অর্থনীতিবিদরা সরকারকে বহুদিন ধরে সচেতন করেন। মার্কসবাদী ঐতিহাসিকদের মতে, রাশিয়ার উদীয়মান বুর্জোয়াশ্রেণী ও ক্ষেত মালিকরা বুঝতে পারে যে, ভূমিদাস মজুর অপেক্ষা নগদ বেতনের স্বাধীন মজুরদের দ্বারা ক্ষেতে ও কারখানায় উৎপাদন অনেক বেশি বাড়ে। জার নিজেও একথা বোঝেন যে নিরক্ষর, উদ্যমহীন ভূমিদাস মজুর, দক্ষ মজুরের তুলনায় অত্যন্ত কম উৎপাদন করে। বড় থেকে ছোট সকল জমিদার বুঝতে পারে যে ভূমিদাস প্রথা লাভজনক ছিল না। নগদ বেতনের শ্রমিক উদ্যমহীন, নেতিয়ে পড়া, হতাশাজনক ভূমিদাসদের চেয়ে অনেক বেশি কর্মঠ। ছোটখাট জমিদাররা বুঝেছিল যে, তাঁদের জমির অর্ধাংশ ভূমিদাসদের ছেড়ে দিয়ে বাকি অর্ধাংশ চাষের জন্যে ভূমিদাসরা যে শ্রম দেয় তা মোটেই লাভজনক নয়। এইভাবে উনবিংশ শতকের গোড়া থেকেই ভূমিদাস প্রথা যে অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভজনক নয়, সেই ধারণা গড়ে উঠেছিল। জার নিকোলাসের আমল থেকে রাশিয়ায় ক্ষুদ্র শিল্পের গঠন শুরু হয়। উত্তর রাশিয়ার ভূস্বামীরা তাদের শিল্প কারখানায় ভূমিদাস মজুর খাটাত। কিন্তু শিল্প শ্রমিক হিসেবে ভূমিদাসরা ছিল ভয়ানক অদক্ষ ও অলাভজনক। রাশিয়ায় বড় শিল্প গঠনের জন্যে চিন্তা-ভাবনা শুরু হলে, প্রশ্ন দেখা দেয় যে শিল্পে শ্রমিক সরবরাহ কিভাবে হবে? যেহেতু রাশিয়ার অন্ততঃ ৫০% বেশি লোক হল ভূমিদাস এবং ভূমিদাস হিসেবে তারা মালিকের জমির সঙ্গে বাঁধা ছিল, সেহেতু শিল্পে শ্রমিক সরবরাহ কিভাবে হবে এই প্রশ্ন দেখা দেয়। তাছাড়া শিল্প শ্রমিক হিসেবে ভূমিদাসরা ছিল অনুপযুক্ত। যদি তাদের ভূমিদাস প্রথা থেকে মুক্তি দেওয়া হয়, তবেই তাঁরা নিজেদের পুরোপুরি শিল্প-শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ করে, দক্ষতা অর্জন করতে পারবে। মোট কথা, স্থানীয় দক্ষ শিল্প শ্রমিকের সরবরাহ পেতে হলে ভূমিদাস প্রথার উচ্ছেদ ছিল একটি আবশ্যিক শর্ত।

ভূমিদাস প্রথা বিলোপ ১৮৬১ খ্রীঃ

রাশিয়াতে মুদ্রা অর্থনীতির চল হওয়ার ফলে ধনী ভূস্বামীরা তাদের খামারে প্রচুর ফলন ঘটিয়ে, উদ্বৃত্ত শস্য রপ্তানি করে পুঁজি জোগাড় করতে চাইত। এই ধরনের বাজার-ভিত্তিক উৎপাদনের কাছে ভূমিদাসদের শ্রম লাভজনক ছিল না। এজন্যে রাশিয়াতে অর্থনৈতিক নিয়মেই ভূমিদাস প্রথা ক্ষয় পাচ্ছিল। জার প্রথম আলেকজান্ডারের আমলে রুশ জনসংখ্যার ৫৮% ছিল ভূমিদাস। জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের আমলে ৪৪·৫% জনসংখ্যা ছিল ভূমিদাস। সামাজিক দিক থেকেও ভূমিদাস প্রথা সামাজিক অসন্তোষ, শ্রেণীবিরোধ ও তিক্ততা সৃষ্টি করে। রুশী আইনে ভূমিদাসরা ছিল আসলে ভূস্বামীর দাস মাত্র। জার প্রথম আলেকজান্ডারের আগে তাদের মালিকের গৃহপালিত পশুর মতই গণ্য করা হত। ইচ্ছামত দৈহিক শাস্তি, অতিরিক্ত বেগার খাটানো, পরিবারের লোকেদের ইচ্ছামত বিচ্ছিন্ন করে বিক্রি করা, খনি ও কারখানায় ভাড়া খাটানো হত। জার প্রথম আলেকজান্ডার আইন করে এই সকল শোষণ নীতি রদ করলেও, ভূমিদাসদের মৌলিক অধিকার রক্ষা করা হয়নি। ১৮৬০ খ্রীঃ পর্যন্ত রুশী আইনে ভূমিদাসদের আইনের চোখে কোন স্বীকৃতি ছিল না। আইনের চোখে তখনও তারা ছিল নির্জীব পদার্থ (Thing)। এজন্যে সমাজে তিক্ততা ও বিদ্বেষ বাড়তে থাকে। ঘন ঘন ভূমিদাস ও কৃষক বিদ্রোহ দ্বারা ভূমিদাস শ্রেণী তাদের অসন্তোষ জানাতে থাকে।

রাশিয়ায় ঘন ঘন ভূমিদাস বিদ্রোহের ফলে রাষ্ট্রের সামাজিক ও রাজনৈতিক শান্তি বিপন্ন হয়। সরকারি হিসেব মত ১৮০১ খ্রীঃ ১৮৬১ খ্রীঃ পর্যন্ত ৬০ বছরে রাশিয়ায় ৫৫০টি কৃষক বিদ্রোহ ঘটেছিল। অপর একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী এই সময়ের মধ্যে ১৪৬৭টি কৃষক বিদ্রোহ ঘটে। রুশ ইতিহাসের গবেষক লাওনেল কোচান অবশ্য সরকারি পরিসংখ্যানটাই বেশি নির্ভরযোগ্য

মনে করেন; জারের প্রতি অনুগত সেনাদল ও কসাক অশ্বারোহী সেনার বেত্র ও ধারালো অসির আঘাতে কৃষক বিদ্রোহগুলি ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। তথাপি ঘন ঘন কৃষক বিদ্রোহ এমন একটি বৈপ্লবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে যে, জার ও তাঁর ঘনিষ্ঠ পরামর্শদাতারা বোঝেন যে অবিলম্বে কোন সুদূরপ্রসারী স্থায়ী ব্যবস্থা না নিলে রাশিয়াতে স্থিতাবস্থা ও স্বৈরশাসন ব্যবস্থা ধ্বসে পড়তে পারে। সাহিত্যিক তুর্গেনিভ ও পুশকিন প্রভৃতি ভূমিদাসদের সমর্থনে কলম ধরায়, বুদ্ধিজীবিরা এই প্রথার অবলুপ্তিকে কাম্য মনে করে।

জারের ভূমিদাস উচ্ছেদের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যেটুকু দ্বিধা ছিল তা ক্রিমিয়ার যুদ্ধে রাশিয়ার শোচনীয় পরাজয় দূর করে দেয়। জার নিকোলাসের মত রক্ষণশীল জারও তাঁর মৃত্যুর আগে বুঝে ফেলেন যে, উদ্যমহীন, হতাশাগ্রস্থ ভূমিদাস সেনা নিয়ে আধুনিক যুদ্ধে জয়লাভ সম্ভব নয়। ঐতিহাসিক লিপসনের মতে, তিনি তাঁর উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় আলেকজান্ডারকে বলেন যে, "আমি এখন বৃদ্ধ আমার পক্ষে এই সাহসী পরিবর্তন আশা সম্ভব নয়। তোমাকেই রাশিয়ার অবস্থার পরিবর্তনের দায়িত্ব নিতে হবে"।

রাশিয়ায় জারের শাসনের প্রধান স্তম্ভ ছিল রুশ অভিজাতকূল। সেহেতু ভূমিদাস উচ্ছেদের ফলে জার তাদের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কা করেন। তিনি প্রথমে পরীক্ষামূলকভাবে ১৮৫৭ খ্রীঃ ৩রা ডিসেম্বর একটি আদেশনামার দ্বারা লিথুয়ানিয়া প্রদেশের সকল সার্ফ বা ভূমিদাসদের মুক্ত বলে ঘোষণা করেন। ইতিমধ্যে তিনি সেনাপতি রোষ্টোভস্টেভের নেতৃত্বে একটি কমিটি নিয়োগ করে ভূমিদাস প্রথা উচ্ছেদের পরিকল্পনা রচনার কাজ শুরু করেন।[১] এই কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হলে ১৮৬১ খ্রীঃ ১৯শে ফেব্রুয়ারি জার ভূমিদাসদের মুক্তির ঘোষণাপত্র (Edict of Emancipation) জারী করেন।

মুক্তির ঘোষণাপত্র

ভূমিদাস মুক্তির ঘোষণাপত্র (১৮৬১ খ্রীঃ) ৪টি নীতির ওপর রচিত হয়, যথা, (১) ভূমিদাসদের স্বাধীন ও মুক্ত নাগরিক হিসেবে গণ্য করা হবে; (২) মুক্ত ভূমিদাসদের জীবিকার জন্যে জমি দিতে হবে; (৩) সমগ্র ব্যবস্থাটি শান্তিপূর্ণ উপায়ে পরিচালিত হবে; (৪) অভিজাত বা সামন্তদের আর্থিক ক্ষতি না করে ভূমিদাসপ্রথা উচ্ছেদ করা হবে। ভূমিদাস প্রথার উচ্ছেদ আইনে (১৮৬১ খ্রীঃ) বলা হয় যে ঃ—(১) রাজকীয় জমি ও সামন্ত জমিতে যে সকল ভূমিদাস আছে তারা সকলে এখন থেকে স্বাধীন প্রজার মর্যাদা পাবে। (২) মুক্ত ভূমিদাসদের ওপর জমিদারদের আর কোন অধিকার থাকবে না। তারা রাশিয়ার স্বাধীন নাগরিকের ন্যায় সকল রাজনৈতিক ও অন্যান্য অধিকার ভোগ করতে পারবে। (৩) জমিদারদের জমির প্রায় অর্দ্ধেক মুক্তিপ্রাপ্ত ভূমিদাসদের দেওয়া হবে। অর্থাৎ জমিদারদের যে জমি ভূমিদাসরা জীবিকার জন্যে চাষ আবাদ করত, সেই জমি এখন থেকে তারাই স্থায়ী স্বত্বে আবাদ করতে পারবে। এই জমি আবাদ করে কৃষকেরা জীবিকা নির্বাহ করবে। (৪) এই জমির জন্যে জমিদারেরা ক্ষতিপূরণ পাবে। এই ক্ষতিপূরণের জন্যে প্রদেয় অর্থ আপাততঃ সরকার থেকে জমিদারদের দেওয়া হবে। (৫) কৃষকেরা ৪৯ বছরের কিস্তিতে এই অর্থ সরকারকে পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবে। (৬) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অর্থের ওপর কৃষকেরা সরকারকে ৬½% হারে সুদ দিবে। যদি কোন কৃষক জমিদারের অর্দ্ধেক জমির বদলে সিকি জমি চায় তবে তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। (৭) কৃষকদের যে জমি দেওয়া হবে তার পরিচালনা এবং মালিকানা গ্রাম পঞ্চায়েৎ বা মীর বা কমিউনগুলির ওপর বর্তাবে। কৃষকেরা এই জমি কেবলমাত্র চাষ-আবাদ করবে। তারা এই জমি দান করতে পারবে না। (৮) প্রতি গ্রামের গৃহস্থরা মিলে গ্রাম প্রধান বা ষ্টারকোষ্টাকে নির্বাচন করবে। (৯) কয়েকটি কমিউন মিলে ক্যান্টন বা ভোলোষ্ট গঠিত হবে। (১০) ক্যান্টন আদালতে জমি-সংক্রান্ত বিবাদের বিচার হবে। (১১) জমিদারদের জমির কোন অংশ এবং কতখানি জমি কৃষকেরা পাবে

১· Quoted by Seton Watson.

তা স্থির করার দায়িত্ব একটি কমিশনের হাতে দেওয়া হয়। গ্রাম্য মীর বা কমিউন সরকারি কর আদায়, সরকারে সেই কর জমা করা, সেনা সংগ্রহ, জমি বণ্টন প্রভৃতির দায়িত্ব বহন করবে।

জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার ভূমিদাস প্রথা উচ্ছেদ আইনের জন্যে রুশ জনগণের নিকট "মুক্তিদাতা জার" (Czar Liberator) হিসেবে পরিচিত হন। রাশিয়ার সমাজ ব্যবস্থার একটি গভীর কলঙ্ক ও অন্যায় দূর করে তিনি নিঃসন্দেহে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ নেন। রাশিয়ার আধুনিকীকরণে তাঁর দান অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু ভূমিদাস প্রথা উচ্ছেদ আইনের কয়েকটি ত্রুটির জন্যে তাঁর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

ভূমিদাস প্রথা উচ্ছেদ আইনের ত্রুটি

(১) জমিদাররা কৃষকদের যে জমি হস্তান্তর করে তার জন্যে যে অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসেবে বরাদ্দ করা হয়, তা হস্তান্তরিত জমির ন্যায্য দাম অপেক্ষা অনেক বেশী ছিল। ঐতিহাসিক সেটন ওয়াটসনের[১] (Seton Watson) মতে, দক্ষিণ রাশিয়ার কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চলে যে জমি কৃষকদের দেওয়া হয় তার মোট ন্যায্য দাম ছিল ২৮৪ মিলিয়ন রুবল। কিন্তু কৃষকেরা এই জমির বাবদ ক্ষতিপূরণ হিসেবে মোট ৩৪১ মিলিয়ন রুবল দিতে বাধ্য হয়। উত্তর রাশিয়ার হস্তান্তরিত জমির মোট ন্যায্য দাম ছিল ১৮০ মিলিয়ন রুবল। সেই জমির জন্যে কৃষকদের দিতে হয় ৩৪০ মিলিয়ন রুবল। এজন্য কৃষকেরা অসন্তুষ্ট হয়। (২) রাশিয়ার অ-কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চলে ভূমিদাসরা জমিদারদের জমিতে বেগার চাষ না করে মালিকদের শিল্প কারখানায় কাজ করত। ভূমিদাস মুক্তি আইন দ্বারা ভূমিদাসরা মুক্ত হলে, এই সকল মালিক দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ তাদের শিল্পগুলিতে বিনা মজুরীতে কাজ করবার লোক ছিল না। অপরদিকে তারা হস্তান্তরিত জমির দরুন যে ক্ষতিপূরণের অর্থ পায় তার দ্বারা তাদের প্রকৃত ক্ষতিপূরণ হয়নি। (৩) দক্ষিণ রাশিয়ার উর্বরা কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চলে জমিদাররা ভূমিদাসদের প্রাপ্য জমি হস্তান্তর না করে বেশী জমি ধরে রাখার চেষ্টা করে। এজন্য ১৮৬১ খ্রীঃ পর দক্ষিণে বারংবার কৃষক বিদ্রোহ ঘটে। মোটামুটিভাবে ক্ষতিপূরণ প্রদানের শর্ত কৃষকদের গভীর অসন্তোষের কারণ ছিল। ক্ষতিপূরণের দাবী মেটাতে মুক্তিপ্রাপ্ত ভূমিদাসদের প্রায় গোটা জীবন কেটে যায়। তারা স্বাধীনতার স্বাদ অনুভব করার সুযোগ পায়নি। (৪) ভূমিদাস উচ্ছেদ আইনে মুক্তিপ্রাপ্ত ভূমিদাসদের হাতে জমির মালিকানা স্বত্ব দেওয়া হয়নি। অথচ এই জমির জন্যে তাদের ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা হয়। জমির স্বত্ব কৃষকদের হাতে না দিয়ে গ্রামীণ কমিউন বা মীরগুলির হাতে দেওয়ার ফলে কৃষকেরা কমিউনগুলির দ্বারা নির্যাতিত হয়। অগ্রে জমির মালিকানা ছিল ব্যক্তিগত বা জমিদারের হাতে, এখন যৌথ মালিকানা বা গ্রামসভার হাতে মালিকানা দেওয়া হয়। জনৈক রুশ ঐতিহাসিকের মতে, জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের সংস্কারের ফলে রাশিয়ার জেন্ট্রী বা জোতদার প্রথা বৃদ্ধি পায়। সাধারণ কৃষকদের অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি। সর্বোপরি, জমিদারগণকে প্রদেয় ক্ষতিপূরণের বোঝা তাদের নিকট ভয়ানক কষ্টদায়ক মনে হয়। (৫) তাছাড়া ভূমিদাসদের জমি বন্দোবস্ত করার সময় ম্যাজিস্ট্রেট ও গ্রাম সভাগুলি দুর্নীতির আশ্রয় নেয়। ভাল জমিগুলি জমিদারের ভাগে রেখে খারাপ জমিগুলি মুক্তিপ্রাপ্ত ভূমিদাসদের দেওয়া হয়। (৬) ক্ষতিপূরণের অর্থ আদায়ের ভার গ্রাম সভাগুলির হাতে দেওয়া হয়। গ্রাম সভাগুলি ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্যে কৃষকের ওপর ভীষণ চাপ দেয়। ভূমিদাস উচ্ছেদ আইনের ফলে জমিদারদের বিশেষ কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। অর্দ্ধেক জমির মালিকানা তখনও তাদের হাতে ছিল। তাছাড়া ক্ষতিপূরণ বাবদ তাঁরা এককালীন মোটা টাকা পায়। ক্ষতিপূরণের অর্থ জমির ন্যায্য মূল্য অপেক্ষা বেশীই ছিল। তখনও ৯৫ মিলিয়ন ডেসিয়াটিন জমি জমিদারদের হাতে থেকে যায়। সেই জমিগুলি ছিল উচ্চ ফলনশীল। এজন্য জনৈক জমিদার মন্তব্য করে যে, "আমাদের বিশেষ কোন ক্ষতি হয়নি। আগে আমরা শেরী, শ্যাম্পেন খেতাম, কোন হিসাবপত্র রেখে চলতাম না, এখন ভদকা খাই, হিসাব রেখে চলি।"

---

১. Seton Watson. P. 42.

ক্ষতিপূরণের অর্থ পরিশোধ করতে ভূমিদাসদের প্রাণান্ত হয়। এই অর্থ পরিশোধ করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করা ছিল দুষ্কর। পরবর্তীকালে জার সরকার ক্ষতিপূরণের শর্তের ত্রুটি বুঝতে পারেন। ১৯০৫ খ্রীঃ যখন ক্ষতিপূরণের শর্ত লোপ করা হয়, তখন ক্ষতিপূরণের ⅘ অংশ অর্থ পরিশোধ করা হয়েছিল। সুতরাং ক্ষতিপূরণের শর্ত লোপ করলে কৃষকদের কোন লাভ হয়নি। ভূমিদাস উচ্ছেদ আইনের কতকগুলি ত্রুটির জন্যে হয়তো বিশেষ জনপ্রিয় হয়নি। কৃষকরা প্রতিবাদে বিদ্রোহ হয়ত করে। তবুও সার্বিক দিক হতে দেখলে ভূমিদাস উচ্ছেদ আইনকে রাশিয়ার প্রগতি ও আধুনিকীকরণের প্রধান ধাপ বলা যায়। যদিও কোন কোন ঐতিহাসিক ভূমিদাস আইনকে জার সরকার ও জমিদার শ্রেণীর মিলিত চক্রান্ত বলেন। এই মন্তব্য হতাশা-প্রসূত। ভূমিদাস উচ্ছেদ আইন একদিকে রাশিয়ার ৪৮% লোককে রাজনৈতিক পরিণামে অর্থনৈতিক মুক্তি দেয়। কৃষকের জমির মালিকানা লাভের পথ, শেষ পর্যন্ত প্রস্তুত করে।

জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার স্বায়ত্ব শাসনব্যবস্থার উন্নতি সাধন করেন। (১) স্বায়ত্ব শাসন সংস্কার (১৮৬৪ খ্রীঃ) দ্বারা জার রুশ জনগণের গণতান্ত্রিক ক্ষুধাকে মিটাবার চেষ্টা করেন। তিনি অভিজাত ও কৃষকদের জন্যে স্বতন্ত্র সভা লোপ করে একই সভায় সকল শ্রেণীর সদস্য গ্রহণের নিয়ম চালু করেন।[১] (২) সর্বসাধারণের ভোটে জেলা পরিষদের সদস্যদের নির্বাচনের নিয়ম করা হয়। এক্ষেত্রে সর্বসাধারণ বলতে তিন শ্রেণীর নির্বাচক ছিল যথা—(ক) নগরবাসী; (খ) জমির ব্যক্তিগত মালিকানাযুক্ত কৃষক; (গ) গ্রামীণ কমিউন। জেলা পরিষদ বা ভোলোস্ট (Volost) ছিল স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থার প্রথম ধাপ। (৩) জেলা পরিষদে সদস্যদের ভোটে প্রাদেশিক সভা বা জেমেষ্টভোর (Zemestvo) সদস্য নির্বাচনের নিয়ম প্রচলন করা হয়। (৪) জেলা পরিষদের সদস্যদের রাস্তা নির্মাণ, পুল নির্মাণ, প্রাথমিক শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়। (৫) বছরে একবার প্রাদেশিক সভা বা জেমেষ্টভোর অধিবেশন ডাকা হত। এই সভায় সারা প্রদেশের জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, রাস্তাঘাট প্রভৃতি সমস্যা আলোচিত হত। প্রাদেশিক পরিষদে বাজেট ও নীতি নির্দ্ধারণ করা হত; সেই নীতি অনুযায়ী জেলা স্তরে কাজকর্ম হত। জেলা পরিষদের কার্য নির্বাহের জন্যে বেতনভোগী কর্মচারীদের দ্বারা প্রশাসনিক কাঠামো তৈরি করা হয়।

স্বায়ত্ব শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন

জারের প্রবর্তিত স্বায়ত্ব শাসন আইন জনপ্রিয়তা পায়নি। রাশিয়ায় দায়িত্বশীল গণতান্ত্রিক শাসন বা পার্লামেন্টারী প্রথা প্রবর্তন না করে, কেবলমাত্র স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করায় উদারপন্থী ও সংস্কারবাদীরা হতাশ হয়। (৬) প্রাদেশিক ও জেলা সভাগুলির হাতে জনকল্যাণমূলক কাজের দায়িত্ব থাকলেও তাদের হাতে প্রয়োজন মাফিক অর্থ ও ক্ষমতা ছিল না। জনকল্যাণ কাজের জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থের জন্যে তাদের সরকারের দাক্ষিণ্যের ওপর নির্ভর করতে হত। জিমেষ্টভো সভার পরিকল্পনার ব্যয় নির্বাহের জন্যে কর আদায়ের ক্ষমতা ছিল না। কাজেই এই সভাগুলিকে সরকারের কৃপণ অর্থ বরাদ্দের ওপর নির্ভর করতে হত। প্রাদেশিক সভাগুলির কাজে সরকারি কর্মচারীরা হস্তক্ষেপ করায় এই সভাগুলির স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হত। জেমেষ্টভো সভায় সাধারণ লোকের প্রতিনিধি অপেক্ষা, জমি মালিকের সংখ্যাই বেশী ছিল। কাজেই সাধারণ লোকের স্বার্থ অপেক্ষা জমি মালিক শ্রেণীর স্বার্থই বেশী রক্ষা করা হত। জেলা স্তরের নীচে স্বায়ত্ব শাসনের কোন পরিষদ না থাকায়, গ্রামগুলির প্রয়োজন বুঝে কাজ করা সম্ভব হত না। আসলে রাশিয়ার বুদ্ধিজীবি ও উদারতন্ত্রীরা চেয়েছিল পশ্চিম ইওরোপের মত নির্বাচিত কেন্দ্রীয় পার্লামেন্ট ও দায়িত্বশীল মন্ত্রীসভা। তার স্থলে জার কেন্দ্রে স্বৈরতন্ত্র বহাল রেখে প্রদেশ স্তরে স্বায়ত্ব শাসন প্রবর্তন করলেও, আসল গণতন্ত্রের দাবী তাতে পূরণ হয়নি।

স্বায়ত্ব শাসন আইনের দুর্বলতা

১· Lipson—Europe in the 19th & 20th centuries.

জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার রাশিয়ায় আধুনিক বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্যে জুরী প্রথা এবং নির্বাচনের মাধ্যমে ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করেন। তিনি বিচার ব্যবস্থাকে শাসন ব্যবস্থা থেকে পৃথক করার ব্যবস্থা করেন। এর ফলে বিচার বিভাগের ওপর প্রশাসনিক আমলাদের নিয়ন্ত্রণ দূর হয়। বিচারকদের আমৃত্যু নিয়োগের নিয়ম করা হয়। এর ফলে বিচারকদের চাকুরীর নিরাপত্তা থাকায় তারা নির্ভীক ও নিরপেক্ষ বিচার করতে পারে। গোপন বিচার নিষিদ্ধ হয়। অভিযুক্ত ব্যক্তি আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্যে বিচারের সময় উকিল নিয়োগের অধিকার পায়। বিচার ব্যবস্থার সর্বোচ্চ আপীল আদালত হিসেবে সিনেটকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। এর নীচে কেন্দ্র, প্রদেশ ও জেলা স্তরে ক্রমিক পর্যায়ে স্থাপিত হয়। আগে বিচার ব্যবস্থা ছিল পক্ষপাতদুষ্ট ও জনস্বার্থ বিরোধী। টলষ্টয়ের রিসারেকসান উপন্যাসে তার পরিচয় পাওয়া যায়। এখন জার আলেকজান্ডারের সংস্কারের ফলে ব্যক্তি স্বাধীনতা অনেক পরিমাণে রক্ষিত হয়। নাগরিকরা অনেকটা নিরপেক্ষ বিচারের সুবিধা ভোগ করতে পারে। তবে যথেষ্ট সংখ্যক আইনজ্ঞ বিচারকের অভাবে বিচার বিলম্বিত হতে থাকে।[১]

বিচার বিভাগের সংস্কার, অন্যান্য সংস্কার

জার আলেকজান্ডার রাশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের জন্যে বিশেষ উদ্যম দেখান। শিক্ষা মন্ত্রী গোলাভনিন (Golovnin) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার জন্যে একটি কোড বা বিধান প্রণয়ন করেন। রাশিয়ায় মোট আটটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বায়ত্ব শাসন দান করা হয়। অধ্যাপকদের ভোটে রেক্টর নির্বাচন করার ব্যবস্থা হয়। জারের অনুমোদন সাপেক্ষে নির্বাচিত ব্যক্তি রেক্টর হিসেবে নিযুক্ত হত। অধ্যাপকের পদে, অধ্যাপক সমিতি প্রার্থী মনোনয়ন করত এবং শিক্ষা মন্ত্রী তাদের নিয়োগ করতেন। অধ্যাপকদের পাঠদানের ব্যাপারে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা দেওয়া হয়। নতুন শিক্ষামন্ত্রী দিমিত্রি তলস্তয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী সংশোধন করেন। তিনি গ্রীক ভাষা ও অঙ্কশাস্ত্র পাঠের ওপর জোর দেন। বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষার গুরুত্ব হ্রাস করা হয়। আধুনিক বিষয়ে ছাত্রদের জ্ঞান লাভকে তিনি সন্দেহের চক্ষে দেখতেন। প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব প্রাদেশিক পরিষদ বা জেমেষ্টভার ওপর বর্তায়। শিক্ষামন্ত্রী তলস্তয় স্ত্রী-শিক্ষার সমর্থন করেন। ছাত্রীদের মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ দেওয়া হয়। দরিদ্র মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করা হয়। জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের শিক্ষা নীতির ফলে রাশিয়ায় স্বাক্ষরতার প্রসার হয়। শতকরা ১৩·৮% শিশু বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠনের সুযোগ পায়। ৩·৫% বালিকা স্বাক্ষরতা জ্ঞান লাভ করে।

শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার

জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের আমলে শিল্প ব্যবস্থার অগ্রগতি ঘটে। সেটন ওয়াটসনের মতে, ভূমিদাসদের মুক্তির ফলে রুশ শিল্প ব্যবস্থায় বিশেষ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। যে শিল্পগুলি ভূমিদাস মজুরের পরিবর্তে নগদ মজুরের ওপর নির্ভরশীল ছিল তাদের বিশেষ সুবিধা হয়। ভূমিদাস প্রথা উচ্ছেদের ফলে গ্রাম থেকে বহু কৃষক শিল্প শ্রমিকের কাজ নিয়ে শহরে চলে আসে। রেলের বিস্তারের ফলে শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি ঘটে। রাশিয়ার মত বৃহৎ দেশে পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি না হলে কোন অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব ছিল না। যদিও ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পর থেকে রাশিয়ায় রেলপথ নির্মাণের কাজে জোয়ার আসে। জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার রেলপথ ও অস্ত্র নির্মাণের শিল্পকে অগ্রাধিকার দেন। তবে এই সঙ্গে ভোগ্যপণ্যের শিল্প বিশেষতঃ বস্ত্রশিল্প গঠনে নজর দেওয়া হয়। প্রধানতঃ ভারী শিল্প গঠনের জন্যেই বেশী উদ্যোগ নেওয়া হয়। রুশ শিল্প গঠনের জন্যে রাষ্ট্রই

শিল্প নীতি

১· Seton Watson—The decline of Imperial Russia. P. 125.

প্রধান ভূমিকা নেয়। রাষ্ট্রের প্রচেষ্টাতেই মূলধন সরবরাহ ও শিল্পের উদ্যোগ শুরু হয়। বিদেশী মূলধনের অনুপ্রবেশ ঘটান হয়। ভূমিদাস প্রথার উচ্ছেদ, বিচার ব্যবস্থার সংস্কার, শুল্ক সংস্কারের ফলে শিল্প গঠনের উপযুক্ত পরিকাঠামো তৈরি করা হয়।

জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের কৃতিত্ব ও তাঁর নীতির বিফলতা (The Achievements of Czar Alexander II and the failure of his policy) : একটি পিছিয়ে পড়া, মধ্যযুগীয় ভূমিদাস ও কৃষি অর্থনীতির দেশকে আধুনিক মনস্ক ও শিল্প অর্থনীতির দেশে পরিণত করা সহজ কাজ ছিল না। দীর্ঘদিনের পঙ্কিল ও ক্লেদাক্ত শাসন, সমাজ ও অর্থনীতিকে সংস্কার করে রাশিয়ার আধুনিক যুগে অনুপ্রবেশ জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারই ঘটান। হয়ত তাঁর সংস্কারের বেশ কিছু ত্রুটি ছিল, হয়ত তিনি সাহসী হয়ে আরও বেশী অগ্রগামী সংস্কার করেননি, কিন্তু সার্বিকভাবে বিচার করলে তাঁকে 'মুক্তিদাতা জার' (Czar Liberator) বলাই সঙ্গত। জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের সংস্কার নীতি নিশ্চয়ই মৌলিক সংস্কার অর্থাৎ রুশ গণতন্ত্রীকরণের প্রশ্নকে এড়িয়ে যায়। ফলে তিনি সংস্কারের ক্ষুধা আরও বাড়িয়ে দেন। সর্বস্তরে অসন্তোষ বৃদ্ধি পায়। না কৃষক, না বুদ্ধিজীবি, কেহই তাঁর সংস্কারে সন্তুষ্ট হয়নি। কৃষক সমাজ ভূমিদাস প্রথা থেকে মুক্ত হলেও তাদের আর্থিক দুর্দশা ক্ষতিপূরণের চাপে আরও বাড়ে। ভূমিদাস প্রথা উচ্ছেদের প্রথম ৪ মাসের মধ্যে ৪৬৯টি কৃষক বিদ্রোহ ঘটে। অপরদিকে সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে পার্লামেন্ট গঠন ও সংবিধান প্রবর্তন না করায় দেশপ্রেমী ও চরমপন্থীরা হতাশ হয়ে বিদ্রোহের পথ ধরে। জার আলেকজান্ডার আন্তরিকভাবে সংস্কার চাইলেও জারের স্বৈরতন্ত্রকে খর্ব করতে তিনি আদপেই রাজী ছিলেন না। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যে, বহু বিস্তৃত, বহু জাতি অধ্যুষিত রাশিয়ায় সাম্রাজ্যের ঐক্য তাহলে ভেঙে যাবে। কিন্তু চরমপন্থীরা তার সঙ্গে এ ব্যাপারে একমত ছিল না। তারা মনে করত যে, ক্রিমিয়ার যুদ্ধে পরাস্ত হওয়ার ফলে রাশিয়ার পুরাতনতন্ত্র যে অকার্যকারী তা প্রমাণিত হয়। জার সেই পুরাতনতন্ত্রকে জোড়াতালি সংস্কার দ্বারা রক্ষার চেষ্টা করছেন। তাঁর উদার নীতি একটি কৌশলমাত্র। তিনি প্রকৃত সংস্কার এড়িয়ে যাচ্ছেন। এজন্য চরমপন্থী বিপ্লবী বা নিহিলিষ্টরা জারের প্রাণনাশের চেষ্টা করে। তারা বিশ্বাস করত জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার হলেন পুরাতনতন্ত্রের প্রতীক। তাকে হত্যা করলে পুরাতনতন্ত্র ধ্বসে পড়বে। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন যে, জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার যদি ব্যাপক সংস্কারের দাবী মেনে নিতেন তবে হয়ত জারের সাম্রাজ্যে শান্তি ও স্থিতি আসত। লাওনেল কোচান এই মত অগ্রাহ্য করেছেন। তিনি বলেন যে, জারের সাম্রাজ্যে রুশ জাতি ছাড়া পোল, তুর্কী, ইউক্রেণীয় প্রভৃতি বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী ছিল। স্বশাসনের দাবী মেনে নিলে হ্যাপসবার্গ সাম্রাজ্যের মতই জারের সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ত। শুধু পোল্যান্ডের কথা ধরলে বোঝা যাবে যে, জারের পক্ষে সাম্রাজ্যের ঐক্য ও জারতন্ত্রের অস্তিত্ব রক্ষা করে সাম্রাজ্যে গণতান্ত্রিক শাসন প্রবর্তন কত দুঃসাধ্য কাজ ছিল। পোল্যান্ডের ক্যাথলিক গোষ্ঠী ছিল ঘোর রুশ বিরোধী বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী। এছাড়া ছিল পোল জমিদার ও বুদ্ধিজীবিদের সংগঠন যা ছিল শুধু রুশ বিরোধী নয়; সশস্ত্র বিদ্রোহে এরা বিশ্বাসী ছিল। জার আলেকজান্ডার উদার নীতি অনুসরণ করে পোলদের স্বায়ত্বশাসনের অধিকার দিলে রুশ বিরোধী ক্যাথলিক গোষ্ঠী ও উদারপন্থী জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠী তাতে সন্তুষ্ট হয়নি। স্বাধীন ও বৃহত্তর পোল্যান্ডের দাবীতে ১৮৬৩ খ্রীঃ তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ফ্রান্সের সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন নিজে ক্যাথলিক দেশের শাসক ও ইওরোপীয় জাতীয়তাবাদের প্রধান সমর্থক হিসেবে পোলিশ ক্যাথলিক ও জাতীয়তাবাদীদের প্রতি সমর্থন জানান। এমনকি ব্রিটেনের সহানুভূতিও ছিল পোল জাতীয়তাবাদীদের প্রতি। কিন্তু জার সরকার পোল ভূমিহীন কৃষকদের জমিদানের লোভ দেখালে, জাতীয়তাবাদীরা পোল কৃষকদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এই

সুযোগে রুশ সেনা পোল বিদ্রোহ দমন করে। জার তাঁর ভূমিদাস মুক্তির ঘোষণা পোল্যান্ডে প্রয়োগ করে পোল জাতীয়তাবাদী জমিদারদের জমি বাজেয়াপ্ত করে পোল কৃষকদের কম ক্ষতিপূরণ প্রদানের শর্তে বণ্টন করেন। পোল কৃষকরা স্বাধীনতার পরিবর্তে জমি পেয়ে নিশ্চেষ্ট হয়। প্রাশিয়ার চ্যান্সেলর বিসমার্কও জার শাসন নীতিকে জার্মানীর ভবিষ্যৎ স্বার্থের জন্যে দৃঢ় সমর্থন করেন। স্বদেশে নিহিলিষ্ট বিপ্লবীদের চরমপন্থী নীতি ও তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টা, বুদ্ধিজীবিদের তিক্ততা এবং পোল্যান্ডে সংবিধান দান স্বত্বেও বিদ্রোহের ফলে জার শেষ পর্যন্ত উদারপন্থায় আস্থা হারান। তিনি পোল্যান্ডের সংবিধান নাকচ করেন। পোল্যান্ডে রুশী-করণ নীতি জোরদার করেন। জাতীয়তাবাদী ও ক্যাথলিকদের ওপর দমন-পীড়ন চালাতে থাকেন। পোল্যান্ডের সরকারি ভাষা হিসেবে রুশ ভাষা চালু করা হয়। রাশিয়াতে তিনি দমন নীতি গ্রহণ করেন। শেষ পর্যন্ত ১৮৮২ খ্রীঃ নিহিলিষ্ট বিপ্লবীদের হাতে জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার নিহত হন।

জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের বৈদেশিক নীতি, ১৮৪৮—১৮৮১ খ্রীঃ (The Foreign Policy of Czar Alexander II)ঃ

জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার ক্রিমিয়ার যুদ্ধের শেষ দিকে সিংহাসনে বসেন। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে

এশিয়ায় বিস্তার নীতি

রাশিয়ার পরাজয়ের ফলে যে হতাশাপূর্ণ পরিস্থিতি দেখা দেয় তা সামলাবার দায়িত্ব তাঁর ওপর বর্তায়। জাব আলেকজান্ডার প্যারিসের সন্ধি স্বাক্ষর করে ক্রিমিয়ার যুদ্ধের অবসান করেন। জারের বৈদেশিক মন্ত্রী প্রিন্স গোরচাকফ্ (Gortchakff) ইওরোপে স্থিতাবস্থা বজায় রেখে, এশিয়ায় রুশ সাম্রাজ্য বিস্তার নীতির ওপর জোর দেন। গোরচাকফ্ এই আশা করেন যে, রাশিয়া ইওরোপ থেকে আপাততঃ হাত উঠালে, ইওরোপীয় শক্তিগুলির অন্তর্বিরোধ দেখা দিবে। এই সুযোগে রাশিয়া পুনরায় ইওরোপীয় রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারবে।

এদিকে ঐক্যবদ্ধ জার্মানীর চ্যান্সেলর বিসমার্ক রাশিয়া এবং অষ্ট্রিয়ার সহিত এক শক্তিজোট গঠনের সঙ্কল্প করেন। বিসমার্কের উদ্দেশ্য ছিল রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে জোট গড়ে জার্মানীর

তিন সম্রাটের চুক্তিতে যোগদান

শত্রু ফ্রান্সকে বিচ্ছিন্ন রাখা। এই উদ্দেশ্যে ১৮৭৯ খ্রীঃ ড্রে-কাইজার বুণ্ড বা তিন কাইজারের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু রুশমন্ত্রী গোরচাকফ্ অনুভব করেন যে, বিসমার্ক রাশিয়ার মিত্রতার সুযোগে ইওরোপীয় শক্তিসাম্য জার্মানীর অনুকূলে এনেছেন। ১৮৭৫ খ্রীঃ War Scare বা ফ্রান্স কর্তৃক জার্মানী আক্রমণের সম্ভাবনার অজুহাতে, জার্মানী ফ্রান্স আক্রমণের উদ্যোগ করলে গোরচাকফ্ বিসমার্ককে সতর্ক করে দেন। তিনি বলেন যে, জার্মানী ফ্রান্সকে আক্রমণ করলে রাশিয়া নিরপেক্ষ থাকবে না। গোরচাকফ্-এর এই সতর্কবাণীর ফলে বিসমার্কের পরিকল্পনা বানচাল হয়। এজন্য রুশ-জার্মান সম্পর্কে ফাটল দেখা দেয়।

ইতিমধ্যে ১৮৭৭ খ্রীঃ রাশিয়া-তুরস্কের যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধে তুরস্ককে পরাস্ত করে রাশিয়া তুরস্কের ওপর ১৮৭৮ খ্রীঃ স্যানস্টিফ্যানোর সন্ধি চাপিয়ে দেয়। এই সন্ধি পরিবর্তন করতে

বার্লিনের সন্ধি : জার্মানীর সহিত মিত্রজোট ভঙ্গ

রাশিয়া রাজী না হওয়ায়, রাশিয়ার সঙ্গে অষ্ট্রিয়া ও ইংলণ্ডের যুদ্ধ বাধার উপক্রম হয়। বিসমার্কের প্রভাবে রাশিয়া বার্লিন কংগ্রেসে যোগ দিয়ে বার্লিন চুক্তির (১৮৭৮ খ্রীঃ) দ্বারা স্যানস্টিফ্যানোর সন্ধির শর্তগুলোর পরিবর্তন করে। কিন্তু বার্লিন কংগ্রেসের পর রাশিয়ার সঙ্গে জার্মানীর তিন সম্রাটের জোট ভেঙে যায়। রুশ মন্ত্রী গোরচাকফ্ মনে করেন যে, বিসমার্ক বার্লিন কংগ্রেসে রাশিয়ার স্বার্থ না দেখে অষ্ট্রিয়ার প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন। রুশ নেতারা বলেন যে, "রাশিয়ার কাঁধে চড়ে জার্মানী বড় হয়েছে।"[১]

১· "Germany is so big because she has climbed Russia's shoulder."

ক্রিমিয়ার-যুদ্ধের পর জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার ইওরোপের বাইরে এশিয়ায় রাজ্য বিস্তার নীতি নেন। তিনি দূর প্রাচ্যে শাখালিন দ্বীপপুঞ্জ (১৮৭৫ খ্রীঃ) অধিকার করেন। আইগুনের সন্ধির (১৮৫০ খ্রীঃ) দ্বারা জার চীনের মাঞ্চু সম্রাটের কাছ থেকে মঙ্গোলিয়ার আমুর উপত্যকার বিশাল অঞ্চল অধিকার করেন। প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে রাশিয়ার ভ্লাডিভোস্টক বন্দর স্থাপিত হয়। ট্রান্স-সাইবেরীয় রেলপথের দ্বারা এই বন্দর রাজধানী সেন্ট পিটার্সবার্গের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। (২) মধ্য এশিয়ার তুর্কী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি, যথা, খিভা, বোখারা, খোকন্দ রুশ সাম্রাজ্যের সাথে যুক্ত হলে রুশ সীমান্ত আফগানিস্থানের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এর ফলে ইংরাজ অধিকৃত ভারতে রুশ অনুপ্রবেশের সম্ভাবনা দেখা দেয়। এজন্য ইঙ্গ-রুশ বিরোধ বাড়ে।

দূর প্রাচ্যে ও মধ্য এশিয়ায় রাজ্য বিস্তার

ইতিমধ্যে জার আলেকজাণ্ডার পুনরায় পূর্ব ইওরোপের দিকে দৃষ্টি ফেরান। ১৮৬৩ খ্রীঃ পোল বিদ্রোহ দমনে তিনি প্রাশিয়ার সহায়তা পেয়ে প্রাশিয়ার প্রতি সন্তুষ্ট হন। এজন্যে ১৮৬৬ খ্রীঃ অস্ট্রো-প্রাশিয় এবং ১৮৭০ খ্রীঃ ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয় যুদ্ধের সময় জার প্রাশিয়ার স্বার্থে নিরপেক্ষ থাকেন। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পর প্যারিসের সন্ধির দ্বারা রাশিয়ার ওপর শুল্ক নিয়ন্ত্রণমূলক সামুদ্রিক শর্ত ব্রিটেন চাপায়। জার ১৮৭০ খ্রীঃ ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয় যুদ্ধের সুযোগে তিনি প্যারিসের সন্ধির সামুদ্রিক শর্তগুলি ভেঙে ফেলেন। ফলে কৃষ্ণ সমুদ্র হতে দার্দানালিস প্রণালীর পথে রুশ যুদ্ধ জাহাজ ভূমধ্যসাগরে প্রবেশ করতে সমর্থ হয়। রাশিয়া এই সামুদ্রিক শর্ত ভাঙ্গলে ইঙ্গ-রুশ বিরোধ বাড়ে। সামুদ্রিক শর্ত ভাঙার জন্যে ইংলণ্ড অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেও এককভাবে রাশিয়াকে নিরস্ত করতে অসমর্থ হয়। জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার তুরস্কের বিরুদ্ধে আগ্রাসন নীতি চালিয়ে যান। তুরস্কের শাসন থেকে স্লাভ জাতিগুলির মুক্তি আন্দোলনকে (Pan Slav Movement) তিনি সমর্থন করে তুরস্ককে দুর্বল করার চেষ্টা করেন। ইতিমধ্যে তুরস্কের শাসনের বিরুদ্ধে বুলগেরিয়ার খ্রীষ্টানদের বিদ্রোহ দেখা দেয়। এই বিদ্রোহের জন্যে তুরস্ক বুলগেরিয়ার ওপর অমানুষিক অত্যাচ্যার চালায়। এজন্যে ইওরোপীয় খ্রীষ্টিয় জনমত আলোড়িত হয়। বুলগেরিয়ার ওপর অত্যাচার উপলক্ষে জারের সেনাদল তুরস্ক আক্রমণ করে। তুরস্ক পরাজিত হয়। স্যানস্টিফ্যানোর সন্ধির (১৮৭৮ খ্রীঃ) দ্বারা তুরস্ক রাশিয়াকে বাটুম, বেসারাবিয়া ও দোব্রুজা অঞ্চল ছেড়ে দেয়। কিন্তু জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের এই সাফল্য স্বল্পস্থায়ী ছিল। ইংলণ্ড, অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি শক্তিগুলির রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধং দেহি মনোভাবের ফলে জার বাধ্য হয়ে ১৮৭৮ খ্রীঃ বার্লিনের সন্ধির দ্বারা স্যানস্তিফ্যানোর সন্ধিকে পরিবর্তন করেন। বার্লিনের সন্ধির ফলে বলকান উপদ্বীপে রুশ প্রভাব ক্ষুণ্ণ হয়। বার্লিনের সন্ধির দ্বারা রাশিয়া কারস, বাটুম ও বেসারাবিয়া অঞ্চল রাখতে পারলেও দার্দানালিস প্রণালীতে রুশ জাহাজ চলাচলের অধিকার নিয়ন্ত্রিত হয়। সর্বোপরি বৃহত্তর বুলগেরিয়াকে রাশিয়া এক তাঁবেদার রাষ্ট্ররূপে স্যানস্তিফ্যানোর সন্ধিতে গঠন করলেও, বার্লিনের সন্ধির দ্বারা বুলগেরিয়াকে ব্যবচ্ছেদ করা হয় এবং রুশ প্রভাব খর্ব করা হয়। অষ্ট্রিয়া, বসনিয়া-হার্জেগোভিনা অধিকার করলে বলকানে রাশিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিরূপে দেখা দেয়। (বিস্তৃত বিবরণ পূর্বাঞ্চল সমস্যা শীর্ষক অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। মোটামুটিভাবে বার্লিনের সন্ধিকে রাশিয়ার একটি বড় ধরনের কূটনৈতিক পরাজয় বলে গণ্য করা হয়। বার্লিনের সন্ধিতে বিসমার্ক অষ্ট্রিয়ার পক্ষ সমর্থন করায় জার্মানীর সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্কের অবনতি হয়। ফলে প্রথম তিন সম্রাটের জোট যাতে রাশিয়া অন্যতম সদস্য ছিল তা ভেঙে যায়।

রুশ-তুর্কী যুদ্ধ : স্যানষ্টিফেনোর সন্ধি

সার্বিকভাবে বিচার করলে জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের বৈদেশিক নীতি ইওরোপে সফল না হলেও, ইওরোপের বাইরে এশিয়ায় রাজ্য বিস্তারে উল্লেখ্য সফলতা পায়। মধ্য এশিয়ায় ও মোঙ্গোলিয়ায় এবং ককেশাসে রাশিয়ার রাজ্যসীমার উল্লেখ্য বিস্তার ঘটে। ইওরোপে ক্রিমিয়া

পরবর্তী রুশ বিরোধী বন্দোবস্ত তিনি নস্যাৎ করতে অক্ষম হন। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন যে, পশ্চিম ইওরোপে রুশ বিস্তার নীতি প্রতিহত হওয়ার ফলেই রাশিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞভাবে ইওরোপের বাইরে বিস্তার নীতি নেয়। ১৮৬৭ খ্রীঃ জার সরকার প্রচুর ডলারের বিনিময়ে আলাস্কা অঞ্চল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে হস্তান্তর করেন। রুশ সমর্থক ঐতিহাসিকরা জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের ইওরোপীয় নীতির সমর্থনে বলেন যে, জারের বলকান বিস্তার নীতি বাধাপ্রাপ্ত হলেও, জার সরকার প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মানীর ঐক্য স্থাপনের যুদ্ধের সময় যথেষ্ট দূরদর্শিতা দেখান। জার সরকার জার্মানীর ঐক্যকে ঐতিহাসিক শক্তির পরিণতি মেনে নিয়ে জার্মানীর ঐক্য যুদ্ধের সময় নিরপেক্ষতা নীতি নেন। এজন্য এই ঐতিহাসিকরা জার সরকারের প্রশংসা করে বলেন যে, জার্মানীর ঐক্যের ব্যাপারে অন্যান্য শক্তিগুলি ভুল করলেও, রাশিয়া নিরপেক্ষ থেকে ইওরোপের রাজনীতির গতি সম্পর্কে তার গভীর অন্তঃদৃষ্টির পরিচয় দেয়। কিন্তু এই মন্তব্যকে প্রেক্ষাপটহীন মন্তব্য বলা যায়। জার্মানীর ঐক্যযুদ্ধের সময় রাশিয়ার ইতিহাসের গতি পুরো নিরপেক্ষ ছিল না, নিজ স্বার্থেই নিরপেক্ষ ছিল। প্রথমতঃ, ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ব্রিটেন, ফ্রান্সের প্রত্যক্ষ প্রতিরোধ ও অষ্ট্রিয়ার শত্রুতামূলক নিরপেক্ষতার জন্যে জার সরকার অসন্তুষ্ট ছিলেন। এজন্য অষ্ট্রো-প্রাশিয় বা ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয় যুদ্ধে জার নিরপেক্ষ থাকেন। অষ্ট্রিয়া বা ফ্রান্সের প্রতি জার সরকার তখনও অনুকূল মনোভাব নেননি। দ্বিতীয়তঃ, বিসমার্ক তার তোষণ নীতির দ্বারা জার সরকারকে প্রাশিয়ার প্রতি নরম মনোভাব নিতে রাজী করান। তৃতীয়তঃ, প্যারিসের সন্ধির সামুদ্রিক শর্তগুলি ছিল জার সরকারের গলার কাঁটা। এই কাঁটা তুলতে ফ্রান্স (১৮৭০ খ্রীঃ) রাজী হয়নি। বিসমার্ক কিন্তু একটি আন্তর্জাতিক সন্ধি বা প্যারিসের সন্ধির তোয়াক্কা না করে রাশিয়াকে এই সামুদ্রিক শর্তগুলি ভাঙ্গতে কূটনৈতিক সহায়তা দেন। তার ফলে ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয় যুদ্ধে বিসমার্ক রাশিয়ার নিরপেক্ষতা কিনতে পারেন। সুতরাং জার্মানীর ঐক্য যুদ্ধে রাশিয়ার নিরপেক্ষতা ঐতিহাসিক নিয়মের কাছে স্বার্থশূন্য আত্মসমর্থন ছিল, এই মতের সারবস্তু নেই। সর্বোপরি, পরবর্তী সময় রুশমন্ত্রী গোরচাকফ বার্লিনের সন্ধিতে হতাশ হয়ে বরং জার্মানীর ঐক্যে নিরপেক্ষ থাকা ভুল হয়, একথাই বলেন। গোরচাকফ বলেন যে, "জার্মানী রাশিয়ার কাঁধে চড়ে বড় হয়েছে। আজ জার্মানী রাশিয়াকে নিরাশ করতে ভয় পায় না"। যাই হোক, জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার, তাঁর ইওরোপীয় নীতিতে ব্যর্থতা বরণ করেন, একথাই বলা দরকার। তিনি প্যারিসের সন্ধির পরিবর্তন ও অষ্ট্রিয়া বিরোধিতা জয় করতে পারেননি। তিনি তিন সম্রাটের জোটে যোগ দিয়ে কিছুকাল বিসমার্কের ক্রীড়নকে পরিণত হন। অন্ধ ফরাসী বিরোধিতার জন্যেই তিনি এই জোটে যোগ দেন। পরবর্তীকালে রুশ নীতি দিক পরিবর্তন করে এবং জার্মানীর বিরুদ্ধে শক্তিসাম্য রক্ষার জন্যে ফ্রান্সের মিত্রতা বরণ করে।

নিহিলিষ্টবাদ ও নৈরাজ্যবাদী আন্দোলন (Nihilism And Anarchist Movement in Russia) ঃ রোমান্টিকবাদ, মানবতাবাদ ও ধ্রুপদী সাহিত্য, সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ পশ্চিম ইওরোপের মত রাশিয়াতেও জাতীয়তাবাদী মনোভাব সৃষ্টি করে। জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার যে সংস্কার চালু করেন তার পটভূমিতে কোন গণজাগরণ বা বুদ্ধিজীবিদের অবদান ছিল না। এই সংস্কার অভিজাত শ্রেণী ওপর থেকে চাপায়। তার দ্বারা জনসাধারণের মধ্যে কোন সার্থক প্রতিক্রিয়া ঘটেনি। রুশ জাতীয়তাবাদী মানসিকতা ছিল চরমপন্থী বিপ্লববাদের ফল। এই বিপ্লবী চরমপন্থীবাদ দুটি ধারায় রাশিয়াতে প্রবাহিত হয়। টুর্গেনিভের "পিতা ও পুত্র" (Father and Sons) উপন্যাসে তার চিত্ররূপ দেখা যায়। ৪০ এর দশকের প্রবীণ বিপ্লবী জাতীয়তাবাদীরা চাইকোভস্কির সঙ্গীতের সুরমূর্চ্ছনা, রিমস্কি কোসাকভের সঙ্গীত লহরী, দস্তয়েভস্কি, তুর্গেনিভ ও টলষ্টয়ের মানবতাবাদী সাহিত্যের রসাস্বাদন করে গড়ে ওঠেন। এই সকল সঙ্গীতকার ও সাহিত্যকারগণ তাঁদের রচনায় মানবতাবাদী ভাবাবেগের সঙ্গে

জনকল্যাণ প্রচার এবং সামাজিক বৈষম্য ও অর্থনৈতিক দুর্দ্দশার বিরুদ্ধে প্রচার করেন। কৃষকদের নিদারুণ দুর্দ্দশার কথা তাঁরা গানে, সুরমূর্চ্ছনায়, সঙ্গীতে ও সাহিত্যে প্রকাশ করেন। এই সঙ্গে তাঁরা জাতীয়তাবাদী আবেগ ছড়ান। বুদ্ধিজীবি শ্রেণী তাঁদের এই ভাবধারা সাগ্রহে বরণ করে। মস্কো ও সেন্টপিটার্সবার্গ নগরীতে ১৮৬০-এর দশকে জাতীয় সঙ্গীতালয় স্থাপিত হয়। চাইকোভস্কির সঙ্গীত ও ব্যালে শুধু রাশিয়ার নয়, সমগ্র পশ্চিম ইওরোপে সানন্দ গ্রহণ পায়। এই সকল সঙ্গীত ও সাহিত্যে একই অমলিন বিষয়ের ছায়া ছড়িয়ে থাকত যা শ্রোতা ও পাঠককে মানবিক মূল্যবোধে আপ্লুত করত, জাতীয় চেতনার অনুরণন ছড়িয়ে দিত। তুর্গেনিভের পিতা ও পুত্র (Father and Sons) উপন্যাসে এই ধরনের ভাববাদী জাতীয়তাবাদীদের "পিতা" অর্থাৎ প্রবীণ জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী বলা হয়।

দ্বিতীয় ধারার বিপ্লবী জাতীয়তাবাদীরা ছিলেন ৬০-এর দশকের। তুর্গেনিভের ভাষায় এঁরা ছিলেন (Sons) বা পুত্রগণ বা নবীন ভাবধারার বিপ্লবী। প্রবীণদের সঙ্গে নবীনদের মানসিকতার বহু ফারাক ছিল। এঁরা ছিলেন বস্তুবাদ, হিতবাদ বা উপযোগবাদ ও দৃষ্টবাদে আস্থাশীল। এঁরা রাশিয়ার ঐক্য ও স্বাধীনতা নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। তাঁরা শোষনহীন সমাজ, জনগণের শান্তি ও মঙ্গল চাইতেন। তাঁরা অদৃষ্টবাদকে ঘৃণা করতেন। তাঁরা ভূয়া ভাবাবেগ-প্রসূত দেশপ্রেমে বিশ্বাস করতেন না। ১৮১২ খ্রীঃ বৈদেশিক আক্রমণের বিরুদ্ধে রাশিয়ার জয়ের স্মৃতি ছিল তাঁদের কাছে ধূসর ও মূল্যহীন। তাঁরা বর্তমানকেই বেশী করে আলোচনা করেন। তাঁরা জনগণের কথাই বেশী করে বলেন ও ভাবেন। অভিজাত দেশপ্রেমীদের চিন্তাধারাকে তাঁরা বর্জন করেন। তাঁরা কার্নিসেভস্কি, আলেকজাণ্ডার হার্জেন, বেলিনস্কি প্রভৃতির চিন্তাধারায়, বিশেষতঃ মাইকেল বাকুলিনের নৈরাজ্যবাদের দ্বারা প্রভাবিত হন। তাঁরা পুস্তিকা ও প্রচারপত্রের দ্বারা জারের ভূমি সংস্কার ও ভূমিদাস প্রথা উচ্ছেদ আইনের তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁরা পুরাতনতন্ত্র ভেঙে ফেলার ডাক দেন। তাঁরা বিজ্ঞানী, বাস্তবাদী, যুক্তিবাদী ও শোষণহীন সমাজের স্বপ্ন দেখতেন।

এঁদের মধ্য থেকেই নিহিলিষ্ট বা নৈরাজ্যবাদীরা উঠে আসেন। কার্নিসেভস্কি (Chernyshevoski) কৃষকদের কমিউন বা সমাজতান্ত্রিক সংগঠন করার কথা বলেন। হার্জেন আমূল অর্থনৈতিক সংস্কারের কথা বলেন। পিজারেভ রাশিয়ার বুদ্ধিজীবিদের গণবিপ্লবের স্বার্থে আগে নিজেদের সংগঠিত করার কথা বলেন। তুর্গেনিভের রচনার নিহিলিষ্ট নামটি পিজারেভই একটি রাজনৈতিক মতবাদের নামকরণ হিসেবে চালু করেন।

নিহিলিজম বা শূণ্যবাদকে নৈরাজ্যবাদও বলা হয়। মাইকেল বাকুলিন ছিলেন শূণ্যবাদের প্রবক্তা। সিণ্ডিকবাদ, নৈরাজ্যবাদ ও ফাসিবাদের মধ্যে মূলতঃ কিন্তু আদর্শগত সংযোগ আছে।[১] নিহিলিষ্ট হল সেই বিপ্লবী যে নিপীড়ন সত্ত্বেও আদর্শ ও ব্যক্তিকে বলি দেয় না। নিহিলিষ্ট বা শূণ্যবাদীদের মতে, রাশিয়ায় ৬০-এর দশকে যা কিছু ছিল সবই পুরাতনতন্ত্র এবং বেশীর ভাগ মন্দ। সামান্য কিছু যদি ভাল থাকে তাকে রক্ষা করার দরকার নেই। মন্দের সঙ্গে যদি কিছু ভাল থাকে তাকেও ধ্বংস করতে হবে। নতুবা নতুন সমাজ গড়া যাবে না।[২] সুতরাং জারতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র, গীর্জাতন্ত্র সকল কিছুকে ধ্বংস করে পুরাতনতন্ত্রের শিকড় উপড়ে ফেলতে হবে। পুরাতন ভাববাদী শিক্ষা ব্যবস্থাকেও তাঁরা নস্যাৎ করতে চান। বস্তুবাদী নিহিলিষ্টরা বলতেন যে, যে শিক্ষার দ্বারা কোন অর্থনৈতিক বা বস্তুবাদী লাভ হবে না, সে শিক্ষার দরকার নেই। কাজেই বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষাকেই তারা সারবস্তু বলেই ভাবতেন। মানবিক বিদ্যা, সঙ্গীত, কলা, সাহিত্য, নন্দন তত্বকে তারা অপ্রয়োজনীয় বলতেন। কারণ সাধারণ মানুষের তাতে বৈষয়িক

১· David Thomson—*Ibid.*

২· Seton Watson—P. 62. L. Cochan. Suepulak—Underground Russia.

উন্নতির সম্ভাবনা ছিল না। তাঁদের মতে একজন পাদুকা প্রস্তুতকারী সমাজের জন্যে শেকসপীয়ার বা রাফায়েল অপেক্ষা মূল্যবান ও দরকারী কাজ করত। মানুষের জৈবিক প্রয়োজনের জন্যে শেকসপীয়ার অপরিহার্য ছিলেন না। ঐতিহাসিক সেটন ওয়াটসনের মতে, জার্মান দার্শনিক ফিউয়ারবাখের (Feurbach) প্রভাবে রুশ বিপ্লবীদের মধ্যে এরূপ অদ্ভুত ধারণা গড়ে ওঠে। তারা ভুলে যায় যে, কেবলমাত্র বস্তুবাদী শিক্ষা মানুষকে নীতিজ্ঞানহীন স্বার্থসর্বস্ব জীবে পরিণত করবে। সমাজের ও সভ্যতার অগ্রগতি বলতে কেবলমাত্র রুটি, কাপড়ের সংস্থান বুঝায় না। মানুষের সৃজনী শক্তির কলা ও শিল্পের দ্বারা বিকাশের সম্ভাবনার কথা তারা ভুলে যায়।

নিহিলিষ্ট মতবাদের অন্যতম উদ্ভাবক বাকুনিন মার্কসবাদী সমাজতন্ত্রের থেকে একটি স্বতন্ত্রবাদ প্রচার করেন। তিনি মার্কসীয় মত অনুযায়ী "শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কতন্ত্র" (Dictatorship of the Proletariat) তত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না। ফরাসী চিন্তাবিদ প্রতধোঁর (Proudhon) মতই তিনি প্রচার করতেন যে, পুরাতনতন্ত্রের সব কিছু এমন কি রাষ্ট্র ব্যবস্থাকেও ভেঙে ফেলা দরকার। কারণ রাজার বদলে, যে শ্রেণীর হাতে রাষ্ট্রযন্ত্রের দায়িত্ব থাকবে, তারা যদি শ্রমিকের প্রতিনিধি হয়, তবুও তারা শোষণ চালাবে। তিনি স্থানীয় ভিত্তিতে ঐচ্ছিক শাসন সংগঠন বা মিউনিসিপ্যাল শাসনের কথা বলেন। তাঁর সঙ্গে সিণ্ডিকবাদীদের পার্থক্য এই ছিল যে, তিনি সমাজ ও রাষ্ট্রে শ্রমিকের সংগঠনকে রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি বলে বিশ্বাস করতেন না। মার্কসীয় তত্ত্বের সঙ্গে তার মতবাদের পার্থক্য এই ছিল যে, তিনি সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কতন্ত্রের বিরোধী ছিলেন, সোস্যাল ডেমোক্র্যাটদের পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রেও তিনি বিশ্বাস করতেন না। তাঁর মতে রাশিয়ার মুক্তি শিল্প শ্রমিকের একনায়কতন্ত্র আনতে পারবে না। গ্রামের ভূমিহীন দরিদ্র কৃষক এবং শহুরে চালচুলোহীন শ্রমিকরাই পুরাতনতন্ত্র ধ্বসিয়ে এই মুক্তি আনতে সক্ষম। রাশিয়া, স্পেন ও ইতালীতে যে সামাজিক পরিস্থিতি ছিল তাতে একমাত্র এই শ্রেণীই মুক্তি আনতে সক্ষম বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। এজন্য পূর্ব ও দক্ষিণ ইওরোপে কৃষক নৈরাজ্যবাদের তাঁকেই প্রবক্তা বলা হয়। নৈরাজ্য বা শূণ্যবাদী মতের সর্বাপেক্ষা উগ্র প্রবক্তা ছিলেন মাইকেল বাকুনিন। অপর দিকে কার্নিসেভস্কি, লাভরোভ প্রভৃতির মতে গ্রামে কিষাণ কমিউন এবং শহরে শ্রমিকের আরতেল (Artel) দ্বারা শ্রমিক ও কৃষকের সংগঠন দ্বারাই শোষণের অবসান ঘটানো সম্ভব।

যাই হোক, জার সরকার নিহিলিষ্ট ও পপুলিষ্ট বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে তীব্র দমন নীতি চালান। অবশেষে ১৮৮১ খ্রীঃ ১৩ ই মার্চ সেন্টপির্টাসবার্গের রাস্তায় পপুলিষ্ট বিপ্লবীদের ছোঁড়া বোমার আঘাতে জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু হয়। পরবর্তী জার এক দমন নীতির দ্বারা বিপ্লবী আন্দোলন দমিয়ে ফেলেন।

নারোদনিকি বা পপুলিষ্ট বা জনবাদী আন্দোলন (Narodniki or Populist or Land and Liberty Movement) : রাশিয়ায় ষাটের দশকে যে বিপ্লবী আন্দোলনের সূচনা হয়, যে আন্দোলনের প্রধান শাখার নাম ছিল নৈরাজ্যবাদী বা শূন্যবাদী বা নিহিলিষ্ট আন্দোলন তা ক্রমে নারোদনিকি আন্দোলনে পরিণত হয়। রুশ ভাষায় নারোদ (Narod) কথাটির অর্থ হল জনসাধারণ (People)। নৈরাজ্যবাদীরা ক্রমে পরিণত ও গঠনমূলক দৃষ্টি নেয়। তারা জনতা (People) বিশেষতঃ কৃষকদের অবলম্বন করে একটি বিপ্লবের কর্মসূচী গ্রহণ করে। নিস্ফলা ধ্বংসাত্মক বিপ্লবের কথা না বলে কৃষক বিপ্লবের মাধ্যমে পুরাতনতন্ত্রকে ভেঙে নতুন জনবাদী সমাজ গড়ার কথা এই বিপ্লবীরা ভাবেন। যেক্ষেত্রে মার্কসবাদীরা কারখানা শ্রমিকদের রাজনৈতিক শিক্ষা ও তাদের বিপ্লবের দ্বারা রাশিয়ার নতুন সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের কথা ভাবেন, সেক্ষেত্রে পপুলিষ্টরা কৃষকদের মধ্যে রাজনৈতিক শিক্ষার

বিস্তার ও কৃষক বিপ্লবের দ্বারা রাশিয়ায় নতুন ব্যবস্থা গড়তে চান। এই পপুলিষ্ট বিপ্লবীরা মনে করত যে, শহুরে সংস্কৃতি মানুষকে তার প্রকৃতিদত্ত সারল্য থেকে বঞ্চিত করে। একমাত্র কৃষকরাই ছিল সৎ, পবিত্র ও কৃত্রিমতাবিহীন। কৃষকদের কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার আছে বলে তারা মনে করত। নারোদনিকিরা বিশ্বাস করত যে, কৃষক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে রাশিয়া সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে যেতে পারত। গ্রামীণ কমিউনগুলিই হবে সেই সমাজতন্ত্রের বিকাশের বীজ।

এই পর্যন্ত নারোদনিকিদের মধ্যে মতৈক্য দেখা যায়। কিন্তু কিভাবে কৃষকদের বিপ্লবে অনুপ্রাণিত করা যাবে, এই কৌশলগত বিষয়ে জনবাদী বা পপুলিষ্টরা বিভিন্ন গোষ্ঠীতে ভাগ হয়ে যান। বাকুনিনপন্থীরা মনে করত যে, কৃষকদের ডাক দিলেই তারা বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়বে। এখন সমস্যা হল দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষকদের মধ্যে সংহতি ও সংগঠন দ্রুত তৈরি করা। যাতে গোটা দেশে কৃষক বিদ্রোহ দপ করে একসঙ্গে, একই সময়ে জ্বলে ওঠে। অপর একটি গোষ্ঠী মনে করত যে, কৃষকদের প্রস্তুতি ঘটাতে দীর্ঘ সময় লাগবে। সেজন্য ষড়যন্ত্র ও গেরিলা যুদ্ধের দ্বারা বুদ্ধিজীবি বিপ্লবীদের উচিত ক্ষমতা দখল করে, কৃষকদের নেতৃত্ব দান করা। মস্কো, কিয়েভ, সেন্ট পিটার্সবার্গে পপুলিষ্টরা শহুরে শ্রমিকদের মধ্যে প্রচার চালায়। তারা "Back to the people" নীতি নিয়ে কৃষকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। কৃষকদের পোষাক ধারণ করে তারা কৃষকদের কুটিরে কুটিরে বিপ্লবের ডাক পৌঁছে দেয়। কিন্তু শীঘ্রই নারোদনিকিরা বুঝতে পারে যে, কৃষকদের আস্থা তারা পায়নি। কৃষকেরা ছিল পোড় খাওয়া শ্রেণী। সুতরাং বিপ্লবে যোগ দিলে তাদের কি লাভ হবে তা বোঝাতে না পারায় অধিকাংশ কৃষক বিপ্লবের ডাকে সাড়া দেয়নি। কৃষকদের সঙ্গে পপুলিষ্টদের ভালভাবে বোঝাপড়াও হয়নি। ১৮৭৪ খ্রীঃ পপুলিষ্ট বিপ্লবীরা মরীয়া হয়ে চেষ্টা চালায়। কিন্তু তাতে রাশিয়ার কোন কোন অঞ্চলে ভাল সাড়া পাওয়া গেলেও তা গোটা দেশের সামান্য অংশ ছিল। নারোদনিকি পপুলিষ্টরা কৃষকদের মানসিকতা ভালভাবে না বোঝার ফলে তারা ব্যর্থতা বরণ করে। ইতিমধ্যে তাদের ওপর সরকারের দমন নীতির খাড়া নেমে আসে।

এই ব্যর্থতা থেকে পপুলিষ্টরা কিছুটা শিক্ষা নেয়। প্রথমতঃ, এখন থেকে পপুলিষ্টরা সন্ত্রাসবাদী পন্থায় জারের দমন নীতির জবাব দিতে প্রতিজ্ঞা নেন। গণ আন্দোলন অপেক্ষা সন্ত্রাসবাদকেই তাঁরা আন্দোলনের প্রধান মাধ্যম হিসেবে নেন। পিটার তুকাচেভ বলেন যে, "কৃষকরা যদি বিপ্লবে যোগ না দেয়, তবে বিপ্লবীদেরই সন্ত্রাস বা গুপ্ত হত্যা ও সম্ভব হলে যুদ্ধের দ্বারা সরকারকে হঠাতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, এখন থেকে বিপ্লবী আন্দোলনের কর্মসূচী হিসেবে Land and Liberty, কৃষকদের জন্যে জমি ও কৃষকদের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠাকেই গ্রহণ করা হয়। তৃতীয়তঃ, কৃষকদের সহানুভূতি লাভের জন্যে (ক) ক্ষতিপূরণ প্রদান রদ করা; (খ) গ্রামীণ কমিউনের নিয়ন্ত্রণ থেকে কৃষকদের স্বাধীনতা লাভ; (গ) কৃষকদের জমির মালিকানা প্রদানের দাবী তোলা হয়।

নারোদনিকিরা এই সময় থেকে দুটি গোষ্ঠীতে ভাগ হয়, যথা : নারোদনিয়া ভলিয়া বা জনতার ইচ্ছানুসারী (Peoples Will) গোষ্ঠী এবং কৃষ্ণ বিচ্ছিন্নতাবাদী (Black Partition)। প্রথম গোষ্ঠী বা নারোদনিয়া ভলিয়াই ছিল বেশী প্রভাবশালী। বুদ্ধিজীবি, ছাত্র, বিপ্লবীরা বেশীর ভাগ এই গোষ্ঠীতে যোগ দেয়। গ্রেগরী প্লেখানভ ছিলেন নারোদনিকিদের প্রধান তাত্ত্বিক ও সংগঠনকারী। এই গোষ্ঠী সন্ত্রাসের মাধ্যমে জার সরকারকে উৎখাতের চেষ্টা চালায়। গুপ্ত হত্যার দ্বারা জারের বহু কর্মচারীকে নিহত করে সরকারি আমলাতন্ত্রে ত্রাসের সৃষ্টি করে। চিকিৎসা বিদ্যার ছাত্রী ভেরা সেন্ট পিটার্সবার্গের শাসনকর্তাকে পিস্তলের গুলিতে আহত করেন এবং দৃপ্ত পদক্ষেপে ফাঁসীর দড়ি গলায় পরেন (১৮৭৮ খ্রীঃ)। নারোদনিয়া ভলিয়ার একটি উগ্রপন্থী গোষ্ঠী

পুলিশী দমন নীতির প্রতিবাদে জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারকে হত্যার সঙ্কল্প নেয়। তিন বার সম্রাট হত্যার চেষ্টা ব্যর্থ হলে তারা চতুর্থ বারে বোমার আঘাতে জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারকে নিহত করে (১৮৮১ খ্রীঃ)। এর ফলে পরবর্তী জার তৃতীয় আলেকজান্ডার নারোদনিকিদের বিরুদ্ধে এমন তীব্র দমন নীতি চালান যে, নারোদনিকি আন্দোলন শীঘ্রই স্তব্ধ হয়।

জার তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের শাসনকাল, ১৮৮১-১৮৯৪ খ্রীঃ (The Reign of Czar Alexander III, 1881-94) : দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার বিপ্লবীদের দ্বারা নিহত হলে, ১৮৮১ খ্রীঃ তাঁর পুত্র তৃতীয় আলেকজাণ্ডার জারের সিংহাসনে বসেন। জার তৃতীয় আলেকজাণ্ডার ছিলেন দারুণ প্রতিক্রিয়াশীল স্বভাবের লোক। তিনি তাঁর পিতামহ নিকোলাসের মত "এক জার, এক গীর্জা ও এক রাশিয়া"র (One Czar, One Church, One Russia) আদর্শ ঘোষণা করেন। সংবিধানবাদ, উদারতন্ত্র ও গণতন্ত্রকে তিনি বিজাতীয় ও রুশবিরোধী ভাবধারা বলে বাতিল করে দেন। সংবাদপত্র, বিশ্ববিদ্যালয়, রাজনৈতিক দলগুলির ওপর তিনি কঠোর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্ব শাসনের অধিকার লোপ করেন। জিমন্যাশিয়া বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ওপরে কঠোর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করা হয়। যদি কোন ছাত্র অর্থোডক্স গীর্জার বিরোধিতা করত, তবে তার নাম বিদ্যালয় থেকে কেটে দেওয়া হত। জার তৃতীয় আলেকজাণ্ডার প্রাদেশিক ও জেলা পরিষদ বা জেমেষ্টভোর ক্ষমতা লোপ করেন। তিনি স্থানীয় পরিষদগুলির সদস্যদের নির্বাচনের পরিবর্তে মনোনয়ন করার নিয়ম চালু করেন। স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন সভাগুলিতে তিনি ভূস্বামীদের প্রাধান্য ফিরাতে চেষ্টা করেন। জেমেষ্টভোর কর্মচারীদের তিনি সিভিল সার্ভিসের অধীনে এনে তাদের ওপর প্রাদেশিক শাসনকর্তার নিয়ন্ত্রণ চাপান।

জার আলেকজাণ্ডারের প্রতিক্রিয়াশীলতা

জার তৃতীয় আলেকজাণ্ডার মনে করতেন যে, অভিজাত ও সামন্ত শ্রেণীই হল জারতন্ত্রের আসল শক্তি। এজন্য তিনি ভূমিদাস প্রথার উচ্ছেদের আইনকে পছন্দ করতেন না। তিনি "বাষ্টার্ড ফিউডালিজম" (Bastard Feudalism) বা অবৈধ সামন্ততন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে চেষ্টা চালান। ল্যান্ড ক্যাপটেন (Land captain) নামে এক শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ করে তিনি সামন্তপ্রথা ফিরাবার চেষ্টা করেন। জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের ভূমিদাস উচ্ছেদ আইনের বিরুদ্ধে কৃষকদের দুটি প্রধান অভিযোগ ছিল, যথা :—(১) জমির জন্যে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ক্ষমতা কৃষকদের ছিল না। প্রতি বছর ক্ষতিপূরণের টাকা যোগাড় করতে কৃষকদের ক্ষেতের ফসল নীচু দামে বিক্রি করতে হত এবং ঋণ নিতে হত। (২) কৃষকদের যে জমি দেওয়া হত তাহা ছিল প্রধানতঃ পতিত বা অনুর্বরা জমি এবং তার পরিমাণ ছিল খুব কম। জার তৃতীয় আলেকজাণ্ডার কৃষকদের এই সকল অভিযোগের প্রতিকার করেন নি। অধিকন্তু তিনি তাদের ওপর পুনরায় সামন্ত প্রথা চাপাবার চেষ্টা চালান। রাশিয়ায় ভূমিদাস প্রথা উচ্ছেদের পর গ্রামীণ জনসংখ্যা দ্রুত বাড়ছিল। ১৮৬১ খ্রীঃ এই জনসংখ্যা ছিল ৭৩ মিলিয়ন। ১৮৯৭ খ্রীঃ তা ১২৫ মিলিয়নে পৌঁছে যায়। এর ফলে জমির চাহিদা ও জমির দাম বহুগুণ বাড়ে। কৃষকদের ক্ষতিপূরণ ও রাজস্বের মিলিত অর্থ দিয়ে খাদ্য সঙ্কুলান হত না। এজন্য ঘন ঘন কৃষক বিদ্রোহ হতে থাকে। জার তৃতীয় আলেকজাণ্ডার কৃষকদের ক্ষোভ দূর করার কোন চেষ্টা করেননি।

সামন্ততন্ত্র ও রুশীকরণ

রাশিয়ায় পোল, ফিন, ইহুদী প্রভৃতি বহু অ-রুশ জাতি বসবাস করত। জার তৃতীয় আলেকজাণ্ডার এই জাতি গোষ্ঠীগুলির স্বায়ত্ব শাসনের দাবী অগ্রাহ্য করেন। তিনি তাদের মাতৃভাষা ও সংস্কৃতিকে দমিয়ে রুশীকরণ নীতি নেন। তিনি এই জাতিগোষ্ঠীগুলিকে রুশ ভাষা শিখতে বাধ্য করেন। তাদের মাতৃভাষার

রুশীকরণ নীতি

চর্চাকে নিরুৎসাহিত করা হয়। ইহুদিদের ওপর নির্মম নীতি চালান হয়। জার আলেকজাণ্ডারের বাল্যকালে তাঁর শিক্ষকরা তাঁর মনে নিষ্ঠুর ইহুদি বিদ্বেষ ছড়ান। জার মনে করতেন যে, রাশিয়ার যাবতীয় বিপ্লবী মতগুলি ইহুদিরাই ছড়ায়। এজন্য তিনি ইহুদিদের পেইল বা বস্তী এবং গ্রামে বসবাস করতে বাধ্য করেন। তিনি তাদের শহর থেকে হঠিয়ে দেন।

শিল্প নীতি

জার তৃতীয় আলেকজাণ্ডার শিল্প গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতেন। তাঁর অর্থমন্ত্রী কাউন্ট উইটি ব্যাপক শিল্প স্থাপনের কাজে হাত দেন। ফরাসী মূলধনের সহযোগিতায় ব্যাপক রেল নির্মাণ এবং শিল্প স্থাপনের কাজ আরম্ভ হয়। সূতীবস্ত্র, লৌহ ও তৈল শিল্পের অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটে। রাশিয়ায় কাপড়ের কলগুলির এত উন্নতি ঘটে, যে ক্ষেত্রে ১৮৮১ খ্রীঃ তারা ৯.৭ মিলিয়ন টন তুলা আমদানি করা হত সেক্ষেত্রে ১৮৯৪ খ্রীঃ ১৫.৪ মিলিয়ন টন তুলা আমদানি করা হয়। আশির ও নব্বুই-এর দশকে রুশ শিল্পের অভূতপূর্ব বিস্তার ঘটে। জার্মান ও ফরাসী মূলধন লগ্নী দ্বারা রাশিয়ার শিল্পে মূলধনের সরবরাহ করা হয়। ১৮৯০ খ্রীঃ রাশিয়ায় লগ্নী করা বিদেশী মূলধনের পরিমাণ ছিল প্রায় ২০০ মিলিয়ন রুবল। রেলপথ, অস্ত্র কারখানা, লোহা ঢালাই কারখানা প্রভৃতি ভারী শিল্পের অসাধারণ বিকাশ ঘটে। কৃষকদের ওপর শিল্প কর চাপিয়ে শিল্পের মূলধন আদায় করা হয়। ইউক্রেনে কয়লা, লোহা ও তৈল শিল্প, পোল্যাণ্ডে বস্ত্র, ধাতু শিল্প গড়ে ওঠে। রুশ শিল্পে পুঁজিবাদী বিকাশ তীব্র হতে থাকে।

জার তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের রাজত্বকালে বৈদেশিক নীতি এক নতুন মোড় নেয়। ফ্রান্সের সঙ্গে রাশিয়া নিরপেক্ষতা ত্যাগ করে ১৮৯৪ খ্রীঃ ফ্রাঙ্কো-রুশ সামরিক চুক্তি সম্পাদন করে। এর ফলে ত্রিশক্তি আঁতাতের প্রথম ধাপ রচিত হয়। (বিশদ বিবরণ সপ্তবিংশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

জার দ্বিতীয় নিকোলাসের শাসনকাল, ১৮৯৪-১৯১৭ খ্রীঃ (The reign of Czar Nicholas II) : জার দ্বিতীয় নিকোলাস ছিলেন রোমানভ বংশের শেষ সম্রাট। তিনি সিংহাসনে বসার পর দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন যে, "আমার পরলোকগত পিতার ন্যায় আমি দৃঢ় ও অবিচলিতভাবে স্বৈরতান্ত্রিক নীতি অনুসরণ করব।" তিনি তাঁর পিতার মতই স্বর্গীয় অধিকারের আদর্শে বিশ্বাস করতেন। কিন্তু জার নিকোলাস স্বৈরতন্ত্রী হলেও, এই শাসনব্যবস্থা পরিচালনার জন্যে উপযুক্ত ব্যক্তিত্ব তাঁর ছিল না।

স্বৈরতন্ত্রবাদ

জার নিকোলাসের শাসনকালে ক্যাডেট, সোস্যাল ডেমোক্র্যাট প্রভৃতি বিভিন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়। এরা রাশিয়ায় বিপ্লব ঘটাতে তৎপর ছিল। ১৮৯৮ খ্রীঃ মার্কসপন্থী দলগুলি মিলিত হয়ে রুশ সোস্যাল ডেমোক্র্যাট দলের প্রতিষ্ঠা করে। রাশিয়া থেকে নির্বাসিত বিপ্লবীরাই ছিল এই দলের প্রাণশক্তি। কারণ রাশিয়ার ভেতর জারের দমন নীতির জন্যে এই দলের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। ১৯০৩ খ্রীঃ সোস্যাল ডেমোক্র্যাটরা দুটি প্রধান গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়। যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল তাদের নাম হয় বলশেভিক এবং সংখ্যালঘুদের নাম ছিল মেনশেভিক। (এদের মধ্যে আদর্শগত প্রভেদের জন্যে উনত্রিংশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। এছাড়া ছিল সোস্যাল রেভোল্যুশনারী নামে বুদ্ধিজীবি পরিচালিত দল।

অক্টোবর ঘোষণা নীতি

১৯০৫-এর বিপ্লব (The Revolution of 1905) : জার দ্বিতীয় নিকোলাসের রাজত্বকালে ১৯০৫-এর বিপ্লব ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই বিপ্লবের ক্ষেত্র অনেক দিন ধরেই তৈরি হচ্ছিল। নিহিলিষ্ট, নারোদনিকি আন্দোলনকে দমন করা হলেও বিপ্লবীদের অসন্তোষ প্রশমিত হয়নি। ইতিমধ্যে বিপ্লবীরা কৃষকদের কাছে ভাল সাড়া না পেয়ে শ্রমিক সংগঠনের ওপরেই জোর দেয়। ১৯০৫-এর বিপ্লবে সোস্যাল ডেমোক্র্যাটরাও অংশ নেয়। ১৯০৪-৫ খ্রীঃ

রুশ-জাপান যুদ্ধে জার সরকারের শোচনীয় পরাজয়ের ফলে জারতন্ত্রের জনপ্রিয়তা দারুণভাবে হ্রাস পায়। শ্রমিকদের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ফলে শ্রমিকদের জঙ্গী চেতনা বাড়ে। জার নিকোলাসের আমলে পুঁজিবাদী শিল্পের চূড়ান্ত বিকাশ ঘটে। এজন্য শ্রমিকদের ওপর শোষণ তীব্র হয়। শ্রমিকরা তাদের দাবী জ্ঞাপনের জন্যে ১৯০৫ খ্রীঃ ৫ই জানুয়ারি এক বিশাল মিছিল জারের উইন্টার প্যালেসের অভিমুখে নিয়ে যেতে চেষ্টা করে। ফাদার গ্যাপন নামে এক ভণ্ড শ্রমিক দরদী যাজক, যে ছিল আসলে পুলিশের গোয়েন্দা, তারই পরামর্শে এই মিছিল আইন ভেঙে জারের প্রাসাদের দিকে আগালে রক্ষীরা গুলি চালিয়ে ১৩০ জন শ্রমিককে নিহত করে এবং বহু লোক আহত হয়। এই নির্মম হত্যার ফলে গোটা দেশে উত্তেজনা দেখা দেয় এবং জনসাধারণ ক্রোধে ফেটে পড়ে। সারা দেশের কলকারখানায় শ্রমিক ধর্মঘট, সংখ্যালঘু জাতিগুলির বিদ্রোহ, কৃষক বিদ্রোহ একসঙ্গে দেখা দিলে জার সরকার ধ্বসে পড়ার উপক্রম হয়। সবচেয়ে মারাত্মক ছিল সেনাদলের একাংশের মধ্যেও এই বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। রুশ নৌ-বহরের যুদ্ধ জাহাজ পোটেমকিনের নাবিকরাও বিদ্রোহে যোগ দেয়। রুশ শ্রমিকদের ওপর বলশেভিকদের প্রভাব ছিল সর্বাধিক। তাদের ডাকে অক্টোবর মাসে রাশিয়ার কারখানাগুলিতে ১০ দিন লাগাতার ধর্মঘট চলে। কৃষকরাও পিছিয়ে থাকেনি। শেষ পর্যন্ত জার নিকোলাস কৌশলগত পশ্চাদপসরণ করেন। তিনি ৩০শে অক্টোবর মন্ত্রী কাউন্ট উইটির পরামর্শে অক্টোবরের ঘোষণাপত্র দ্বারা রুশ জাতীয় সভা বা ডুমার (Duma) অধিবেশন ডাকার প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি সমগ্র রাশিয়ায় অর্থাৎ রুশ সাম্রাজ্যের সকল অঞ্চলের লোকেদের ডুমায় প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার দেন। জারের প্রস্তাবিত আইনকে ডুমার গ্রহণ অথবা বর্জনের অধিকার দেওয়া হয়। অক্টোবর ঘোষণার ফলে বিপ্লবীদের মধ্যে তীব্র মতভেদ দেখা দেয়। বিপ্লবীদের মধ্যে যারা নরমপন্থী ছিল তারা আপাততঃ জারের ঘোষণা অনুযায়ী সংবিধান চালু করতে চায়। চরমপন্থীরা জারতন্ত্রের উচ্ছেদ চায়। বলশেভিক বিপ্লবীরা ইতিমধ্যে রাজধানী সেন্টপিটার্সবার্গে একটি সোভিয়েত বা শ্রমিকদের বিপ্লবী কমিউন গঠন করেছিল। বিপ্লবীদের মধ্যে মতভেদের ফলে তাদের আন্দোলন স্তিমিত হলে জার তার সুযোগে সেন্টপিটার্সবার্গের সোভিয়েত ভেঙে দেন ও বিপ্লবী সদস্যদের গ্রেপ্তার করেন। অন্যান্য স্থানেও সেনাদল বিপ্লবীদের দমিত করে। সেন্টপিটার্সবার্গের সোভিয়েতের সমর্থনে মস্কোতে দাঙ্গা শুরু হলে পুলিশ তা দমিত করে। সরকার সামরিক আইন প্রয়োগ করে বিদ্রোহী এলাকায় শান্তি স্থাপন করেন। বহু বিপ্লবী ও সংখ্যালঘু শ্রেণীকে হত্যা করা হয় অথবা নির্বাসনে পাঠান হয়। মন্ত্রী কাউন্ট উইটি বিপ্লবীদের প্রতি সহানুভূতিশীল নীতি প্রয়োগের পরামর্শ দিলে ক্রুদ্ধ জার তাঁকে পদচ্যুত করেন। নতুন মন্ত্রী স্টোলিপিন কৃষক বিদ্রোহীদের কড়া হাতে দমন করেন। ১৯০৬ খ্রীঃ ৮ মাসের মধ্যে ৬৮৩ জন ব্যক্তিকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। সাহিত্যিক টলষ্টয়ের মতে, "জার দ্বিতীয় নিকোলাসের রাজ্যে টেলিগ্রাফের মত আধুনিক ব্যবস্থা চালু থাকলেও, শাসননীতির ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন চেঙ্গিজ খাঁর মতই স্বৈরাচারী" (He was a Chengiz Khan with a telegraph)।

১৯০৫ খ্রীঃ বিপ্লব ব্যর্থ হলেও, এই বিপ্লবের পরোক্ষ ফল ছিল সুদূর-প্রসারী। ট্রটস্কির মতে, ১৯০৫ খ্রীঃ বিপ্লবকে ১৯১৭ খ্রীঃ বিপ্লবের অভিনয়ের পোষাকী মহড়া (Dress Rehearsal) বা পূর্বাভিনয় বলা যায়। ঐতিহাসিক রদেনষ্টিনের মতে, যে তিনটি বিপ্লবের আঘাতে রাশিয়ায় জারতন্ত্রের চূড়ান্ত পতন ঘটে, ১৯০৫-এর বিপ্লব ছিল তার প্রথম ধাপ। জার তাঁর অনুগত সেনাদের দ্বারা ১৯০৫ এর বিপ্লব আপাততঃ দমন করেন। কিন্তু এই বিপ্লব প্রমাণ করে যে ঃ—(ক) জারতন্ত্রের প্রতি রুশ শ্রমিক সমাজের আর আনুগত্য নেই। ৫ই জানুয়ারির গুলিচালনা বা রক্তাক্ত রবিবারের ঘটনা (Bloody Sunday) শ্রমিক সম্প্রদায় ও জার

সরকারের মধ্যে ব্যবধানের প্রাচীর তুলে দেয়। রুশ কৃষকরা জানিয়ে দেয় যে, আমূল ভূমি সংস্কার না হলে তারা কোন জোড়াতালি সংস্কারে সন্তুষ্ট হবে না। অক্টোবরে যে সংবিধান জার ঘোষণা করেন তাতে বুদ্ধিজীবিরা সন্তুষ্ট হয়নি। কারণ গণ নির্বাচনের মাধ্যমে একটি সার্বভৌম পার্লামেন্টের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়ে জার একজন নিয়মতান্ত্রিক রাজা হিসেবে থাকতে রাজী ছিলেন না। ১৯০৫-এর পর বিপ্লবের উড়ন্ত স্ফুলিঙ্গ নিভে গেলেও, ছাইচাপা আগুনের মতই বিপ্লবের আগুন ধিকি ধিকি করে জ্বলতে থাকে। অক্টোবরের ঘোষণা অনুযায়ী জার দুটি ডুমার নির্বাচন পর পর করেন। ডুমা আমূল ভূমি সংস্কার চাইলে জার দুটি ডুমাই ভেঙে দেন। এর ফলে বিপ্লবীরা দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেন যে, জারতন্ত্রের পতন না ঘটলে রাশিয়ায় কোন সংস্কার সফল হবে না। ১৯০৫-এর বিপ্লবের সাময়িক সাফল্য বিপ্লবীদের কাছে কয়েকটি সত্য উদঘাটন করে ঃ—(ক) শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে বিপ্লবী চেতনা জেগে উঠছে। উপযুক্ত প্রস্তুতি, নেতৃত্ব ও সংগঠন করলে পরবর্তী বিপ্লব ব্যর্থ হবে না। ১৯০৫-এর বিপ্লবে শ্রমিকরা যে জঙ্গী মনোভাব দেখায় ও লাগাতার ধর্মঘট চালায় তা বিপ্লবীদের চোখ খুলে দেয়। (খ) কৃষক শ্রেণীও ভবিষ্যত বিপ্লবে সহযোগীতা করবে তা ১৯০৫-এর বিপ্লব থেকে বোঝা যায়। কৃষকদের সহায়তায় মার্কসীয় তত্ত্ব অনুযায়ী শ্রমিকদের আন্দোলনের মুখপাত্র হিসেবে নিয়ে জারতন্ত্রের পতন ঘটানো সম্ভব বলে ১৯০৫-এর বিপ্লবের থেকে শিক্ষা বিপ্লবীরা নেয়। (গ) শ্রমিকের দ্বারা লাগাতর ধর্মঘট যে সরকারকে অচল করতে সক্ষম ১৯০৫-এর বিপ্লব তা প্রমাণ করে। কাজেই ১৯০৫-এর বিপ্লব পরবর্তী বিপ্লবের পূর্বাভিনয় ছিল। ১৯১৭ খ্রীঃ এই পথ ধরেই বিপ্লবকে সফল করা হয়।

১৯০৫ খ্রীঃ বিপ্লবের পরবর্তী যুগ (The Period after the Revolution of 1905) ঃ জার নিকোলাসের শাসনব্যবস্থায় স্বৈরতন্ত্র বহাল থাকলেও, এতে জারের একাধিপত্য ছিল না।[১] অভিজাত ভূস্বামী, বুর্জোয়া বণিকশ্রেণী এবং কুলাক বা জোতদার শ্রেণীর সঙ্গে জারকে ক্ষমতা ভাগ করে নিতে হয়। ১৯০৫-এর বিপ্লবের পর দুটি ডুমার অধিবেশন জার নিকোলাস ভেঙে দেন। তৃতীয় ডুমায় সম্পত্তির অধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচনের ফলে জমিদার, কুলাক বা জোতদার, আমলা ও গীর্জার প্রতিনিধিরা বেশী আসন পায়। জাতীয় সভায় এই তিন শ্রেণী প্রতিনিধিদের সমর্থন নিয়ে মন্ত্রী স্টোলিপিন শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করেন। স্টোলিপিন কৃষকদের সমর্থন লাভের জন্যে চেষ্টা করেন। তিনি একটি ভূমি আইন পাশ করেন (Stolypin's Reforms)। এই আইন দ্বারা জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের ভূমি সংস্কার আইন সংশোধন করে কৃষকদের জমির স্বত্ব বিক্রয়ের ও খরিদের অধিকার দেওয়া হয়। স্টোলিপিন চেয়েছিলেন গ্রামীণ কমিউনগুলির অধিকার খর্ব করে, নিজ জমির মালিক গৃহস্থ কৃষক শ্রেণী সৃষ্টি করতে। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, এর ফলে গ্রামাঞ্চলে সুস্থিতি ফিরে আসবে। কৃষকদের ওপর গ্রাম কমিউন যে নিয়ন্ত্রণ চাপায়, এজন্য স্টোলিপিন কৃষকদের তা থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করেন। জমির শর্তহীন মালিকানা প্রদান ছিল সেই প্রচেষ্টার অঙ্গ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছড়ান ভূমিখণ্ডগুলিকে তিনি এজন্য একত্র করে কৃষকদের দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। এই ব্যবস্থার ফলে ইওরোপীয় রাশিয়ার $\frac{১}{১০}$ ভাগ জমি বড় বড় প্লটে পরিণত হয়। প্রায় ১$\frac{১}{২}$ মিলিয়ন কৃষক পরিবার কমিউন প্রথা থেকে মুক্ত হয়ে নিজ জমির মালিকানা পায়।[২] স্টোলিপিনের ১৯১০ খ্রীঃ দ্বিতীয় ভূমি সংস্কার আইন দ্বারা প্রায় সকল কৃষক জমির মালিকানা পায়। স্টোলিপিনের ভূমি সংস্কার আইনকে এজন্য জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের ভূমিদাস উচ্ছেদ আইনের পর সর্বাপেক্ষা

স্টোলিপিন আইনে ভূমি ব্যবস্থা সংস্কার

১· Seton Watson. P. 26.

২· Seton Watson—The Decline of Imperial Russia.

উল্লেখযোগ্য ভূমি সংস্কার আইন বলা হয়। ওর্গানস্কি (Organsky) প্রভৃতি বিখ্যাত ঐতিহাসিকেরা এজন্য স্টোলিপিনের প্রশংসা করেন। ট্রেডগোল্ডের মতে, স্টোলিপিন প্রকৃতপক্ষে জারের ভেঙে পড়া সাম্রাজ্যকে রক্ষার জন্যে আন্তরিক চেষ্টা করেন। গারশ্যেণক্রণ প্রভৃতি আর্থনীতিক ঐতিহাসিকেরাও বলেন যে, স্টোলিপিন জীবিত থাকলে রাশিয়ার কৃষি ও শিল্পের চেহারা বদলে যেত। কিন্তু মার্কসবাদী সমালোচকদের মতে, স্টোলিপিন জমি মালিকদের স্বার্থই দেখার চেষ্টা করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল কমিউনের অধিকার খর্ব করা। তিনি জমির পুনর্বন্টন দ্বারা কৃষির আসল সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করেননি। অধিকন্তু কৃষকরা জমির মালিকানা পেয়ে দ্রুত জমিগুলি বিক্রি করে ফেলে। গরীব কৃষকদের জমি কুলাক বা জোতদাররা কিনে নেয় এবং এই জমির সাহায্যে বড় খামার তৈরি করে। স্টোলিপিনের সংস্কারের ফলে রাশিয়ায় জোতদার প্রথা জোরদার হয়।

স্টোলিপিনের জনপ্রিয়তায় জার দ্বিতীয় নিকোলাস ঈর্ষা বোধ করেন। তিনি এই আশঙ্কা করেন যে, স্টোলিপিন ডুমা বা জাতীয় সভার সাহায্যে জারের ক্ষমতা হরণ করবেন এবং জারকে সাংবিধানিক রাজায় পরিণত করবেন। এই আশঙ্কা বশতঃ জার নিকোলাস স্টোলিপিনকে মন্ত্রীপদ থেকে সরাতে মনস্থ করেন। ১৯১১ খ্রীঃ স্টোলিপিন, বোগরভ (Bogrov) নামে এক গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত হন। স্টোলিপিনের মৃত্যুর ফলে জারের মন্ত্রীসভা থেকে শেষ যোগ্য ব্যক্তির তিরোধান ঘটে।

স্টোলিপিনের হত্যা

জার দ্বিতীয় নিকোলাসের শাসনকালে রাশিয়ায় শিল্পের বিস্তার ঘটে। গ্রেগরী গ্রসম্যানের[1] মতে, জারের আমলে শিল্প বিস্তার ও শ্রমিক অসন্তোষ এই দুই বিষয়কে উপেক্ষা করা যায় না। কাউন্ট উইটির অর্থনীতির ফলে রুশ শিল্প, রুশ-জাপান যুদ্ধের মন্দা কাটিয়ে তেজী হয়ে ওঠে। রাশিয়ার ডোনেৎস উপত্যকায় কয়লা শিল্পের এত উন্নতি ঘটে যে, ১৯১৩ খ্রীঃ সমগ্র দেশের প্রয়োজনীয় কয়লার ৫৫% এই স্থানে উৎপাদিত হত।[2] উরাল, সাইবেরিয়া, তুর্কীস্থান প্রভৃতি অঞ্চলে কয়লার উৎপাদনের হার দাঁড়ায় ১৯০৫ খ্রীঃ যে ক্ষেত্রে ১০৩ মিলিয়ন পুড এবং ১৯১৩ খ্রীঃ ১৮৯৭ মিলিয়ন পুড। রাশিয়ার বস্ত্র শিল্পে যেক্ষেত্রে ১৯০৫ খ্রীঃ ২৪৬ মিলিয়ন পাউন্ড মূল্যের বস্ত্র উৎপাদিত হত; ১৯১০ খ্রীঃ সেক্ষেত্রে ৪০৫ মিলিয়ন পাউন্ড মূল্যের বস্ত্র উৎপাদিত হয়। ১৮৯৮ খ্রীঃ রাশিয়ায় ২৮,৪৪৬ মাইল রেলপথ চালু ছিল। আরও ৬৯৭৩ মাইল নির্মীয়মান অবস্থায় ছিল। শহরাঞ্চলে লোকের সংখ্যা ৪৫% বাড়ে। বিভিন্ন কলকারখানায় ১,৭২,০০০ শ্রমিক কাজ করত। রাশিয়ায় শিল্প বিস্তারের জন্যে বৈদেশিক মূলধন নিয়োজিত হয়। ১৯১৪ খ্রীঃ রাশিয়ার বৈদেশিক লগ্নী ছিল ১২০০ মিলিয়ন রুবল। এই মূলধনের শতকরা ৩২ ভাগ ফ্রান্স এবং ২২·৫% ভাগ ইংলন্ড এবং ১৬% জার্মানী থেকে আসে।

রুশ শিল্প ব্যবস্থার অগ্রগতি

শিল্প বিস্তারের ফলে কলকারখানায় শ্রমিকের সংখ্যা দারুণভাবে বাড়ে। রাশিয়ার প্রকৃত শ্রমজীবি শ্রেণী বা প্রলিতারিয়েত শ্রেণীর উদ্ভব হয়। কিন্তু জার নিকোলাস এই বিরাট উৎপাদক শ্রেণীর উন্নতি সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন। শ্রমিকদের কমপক্ষে ১২ ঘণ্টা কাজ করতে হত। কারখানায় আলো-বাতাসের সুবন্দোবস্ত না থাকায় শ্রমিকরা অধিক পরিশ্রম ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করে শীঘ্র মারা যেত। শ্রমিকদের বাসস্থানের অবস্থা ছিল ভয়াবহ। তাদের মজুরী ছিল নিম্নতম। জার নিকোলাস শ্রমিকদের ৮ ঘণ্টা কাজ ও উন্নত মজুরীর দাবীতে কর্ণপাত করেননি। এজন্য তাঁর শাসনকালে দারুণ শ্রমিক অসন্তোষ ও ধর্মঘট চলতে থাকে। এই সুযোগে

১· Foutana—Economic History of Europe.
২· Seton Watson.—P. 281.

বলশেভিক দল শ্রমিকদের মধ্যে তাদের প্রভাব বিস্তার করে। ১৯১২ খ্রীঃ লেখা স্বর্ণখনিতে ধর্মঘটী শ্রমিকদের ওপর সেনারা গুলি চালালে প্রায় ২০০ শ্রমিক নিহত হয়। জার সরকারের দমন নীতির চাপে সোস্যালিষ্ট ও কমিউনিষ্ট কর্মীরা দেশ ত্যাগে বাধ্য হন। বশশেভিক নেতা লেনিনও এই সময় দেশ ত্যাগ করেন। কাজেই মার্কসবাদী সমালোচকরা বলেন যে, জার দ্বিতীয় নিকোলাসের আমলে শিল্পবিস্তারের আসল চেহারা ছিল হতাশাজনক। প্রথমতঃ, ১৮৯০ খ্রীঃ পর থেকে রুশ শিল্পে পুঁজিবাদ ভয়ানক বৃদ্ধি পায়। মালিকরা মুনাফার পাহাড় জমাতে চেষ্টা করে। রুশ শিল্পের প্রায় ⅔ ভাগ ছিল বিদেশী মূলধন ও বিদেশী মালিকানায় গঠিত। তৈল শিল্পে ব্রিটিশ, রসায়ন ও এঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে জার্মান এবং রেল ও কয়লা শিল্পে ফরাসী মূলধন খাটত। এদিকে দুর্দশাগ্রস্থ শ্রমিকদের জন্যে জার সরকারের কোনই মাথাব্যথা ছিল না। জার রুশ সংখ্যালঘু শ্রেণীর ওপর নির্মম রুশীকরণ নীতি চাপাবার ফলে সংখ্যালঘু শ্রেণী ভয়ানক অসন্তুষ্ট ছিল।

শ্রমিক অসন্তোষ : দমন নীতি

জারের ওপর রাসপুটিন নামক এক ভণ্ড সন্ন্যাসীর অশুভ প্রভাব পড়লে ব্যক্তিত্বহীন জার তাঁর কথায় চলতে আরম্ভ করেন। গ্রেগরী রাসপুটিন ছিল জনৈক জর্জিয়ান খ্রীষ্টীয় সন্ন্যাসী। রাসপুটিন অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিল বলে দাবী করত। এই ভণ্ড সাধু তার তন্ত্র-মন্ত্রের জোরে জারিনা আলেকজান্দ্রার একমাত্র বালক পুত্রের দুরারোগ্য রক্তপাত রোগ নিরাময় করে। এর ফলে রাসপুটিন রানী আলেকজান্দ্রার ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে।[১] রাসপুটিনের প্রভাবে রাজপরিবার চালিত হলে রোমনভ রাজবংশের সম্মান বিনষ্ট হয়। রাসপুটিনকে দমনে ব্যর্থ হওয়ায় জনসাধারণ নিকোলাসের প্রতি বিরক্ত হয়। রাসপুটিন রানীকে হাত করে মন্ত্রী ও সেনাপতিদের তার কথামত চলতে বাধ্য করে। এজন্য সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে দারুণ ক্ষোভ দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত কয়েকজন সেনাপতি রাসপুটিনকে হত্যা করেন।

রাসপুটিনের ঘটনা

জার দ্বিতীয় নিকোলাসের শাসনকালে দূর প্রাচ্যে মাঞ্চুরিয়ার ওপর অধিকার নিয়ে রুশ-জাপান বিরোধ বাধে। ১৯০৪-০৫ খ্রীঃ রুশ-জাপান যুদ্ধে ক্ষুদ্র জাপানের নিকট দৈত্যাকৃতি রাশিয়ার পরাজয় ঘটলে জার সরকারের বিরুদ্ধে ধিক্কার ওঠে। জার সরকারের এই দুরবস্থার সুযোগে রুশ সোস্যাল ডেমোক্র্যাট, নারোদনিক এবং বলশেভিকরা ১৯০৫ খ্রীঃ বিপ্লব ঘোষণা করে। কিন্তু জার দৃঢ় হাতে তা দমন করেন। (১৯০৫-এর বিপ্লবের বিশদ বিবরণ আগে দ্রষ্টব্য)। এই বিপ্লবের ফলে জার দ্বিতীয় নিকোলাস বাধ্য হয়ে ১৯০৬ খ্রীঃ প্রথম ডুমা বা জাতীয় পরিষদ আহ্বান করেন। কিন্তু ডুমার সভায় রাশিয়ার সংবিধান প্রবর্তনের দাবী উঠলে জার প্রথম ডুমা ভেঙে দেন। পরের বছর (১৯০৭ খ্রীঃ) তিনি দ্বিতীয় ডুমা আহ্বান করেন। কিন্তু মন্ত্রীসভার সঙ্গে ডুমার সদস্যদের বিরোধ দেখা দিলে, ৪ মাসের মধ্যে জার এই ডুমাও বাতিল করেন। ১৯০৭ খ্রীঃ জার তৃতীয় ডুমার অধিবেশন ডাকেন। তিনি ভোটাধিকার সঙ্কোচন করে তৃতীয় ডুমার নির্বাচন করেন। ফলে এই ডুমায় মডারেটরা সংখ্যা-গরিষ্ঠতা পায়। অনেকের মতে, ডুমার নির্বাচনে জার সরকার দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে বামপন্থী ও বিরোধীদের পরাস্ত করেন। তৃতীয় ডুমার পাশ করা আইন দ্বারা রুশ কুলাক বা জোতদার শ্রেণী, দরিদ্র কৃষকদের জমি ক্রয় করার অধিকার পায়। ১৯১২ খ্রীঃ তৃতীয় ডুমার কার্যকাল শেষ হয়।

ডুমার অধিবেশন আহ্বান : কুলাক শ্রেণীর ক্ষমতা বৃদ্ধি

১৯১২ খ্রীঃ চতুর্থ ডুমা বা জাতীয় পরিষদ আহুত হয়। এই ডুমার অধিবেশন কালে ১৯১৪ খ্রীঃ জার সরকার প্রথম মহাযুদ্ধে যোগ দেয়। রাশিয়ার শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর অসন্তোষ,

১· Seton Watson.—P. 271.

রাশিয়ার প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগদান : রাশিয়ার পরাজয়

বুদ্ধিজীবি শ্রেণীর হতাশা, বামপন্থী দলগুলির বিদ্রোহী মনোভাব উপেক্ষা করে জার সরকার যুদ্ধে যোগ দিয়ে মহা ভুল করে। এই যুদ্ধে যোগদানের পশ্চাতে রুশ জনগণের সমর্থন ছিল না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মান কাইজারের সেনা বাহিনী রুশ সেনাদলকে বিতাড়িত করে রাশিয়ায় ঢুকে পড়ে। ইউক্রেন ও দক্ষিণ রাশিয়ার বিরাট অঞ্চল জার্মানরা অধিকার করে। এমতাবস্থায় রুশ জনমত শান্তি স্থাপনের জন্যে ব্যগ্রতা জানায়। কিন্তু জার সরকার জনমতের দাবী উপেক্ষা করে যুদ্ধ চালিয়ে যান। এদিকে যুদ্ধজনিত মূল্যবৃদ্ধি, বেকারীর দরুন রুশ জনসাধারণ হতাশ হয়ে পড়ে।

এমতাবস্থায় জার সরকারের পতন ঘটাবার জন্যে বামপন্থী বলভেশিক দল সঙ্কল্প নেয়। বলশেভিকদের আহ্বানে পেট্রোগ্রাড শহরে ১৯১৭ খ্রীঃ এক ঐতিহাসিক ধর্মঘট পালিত হয়।

পেট্রোগ্রাড ধর্মঘট, ১৯১৭ খ্রীঃ

সংগ্রামী শ্রমিক ও নাগরিকদের সঙ্গে পেট্রোগ্রাড শহরের সেনাদল যোগ দিয়ে সরকারি অফিসগুলি অধিকার করে। বলশেভিক নেতা লেনিন রুশ দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত সোভিয়েতগুলিকে, সরকারি ক্ষমতা অধিকার করার নির্দেশ দেন। সেনা ও নৌ-বাহিনীকে বলশেভিক সরকারের প্রতি আনুগত্য জানাতে নির্দেশ দেওয়া হয়।

এদিকে দেশের পরিস্থিতি বিবেচনা করে চতুর্থ ডুমা জার দ্বিতীয় নিকোলাসকে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্যে আহ্বান জানায়। ক্রুদ্ধ নিকোলাস এজন্য ডুমার অধিবেশন রদ ঘোষণা করলেও

চতুর্থ ডুমা : জারতন্ত্রের পতন

ডুমা জারতন্ত্রের বিলুপ্তি ঘোষণা করে। জার ও তাঁর পরিবারবর্গকে বন্দী করা হয়। ডুমার ১০ জন সদস্য নিয়ে অস্থায়ী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা হয়। এর ফলে জার দ্বিতীয় নিকোলাস পদত্যাগ করেন। এইভাবে ফেব্রুয়ারি ১৯১৭ খ্রীঃ বিপ্লবে জারতন্ত্রের অবসান ঘটে। ফেব্রুয়ারি ১৯১৭ খ্রীঃ থেকে অক্টোবর ১৯১৭ খ্রীঃ পর্যন্ত ডুমা কর্তৃক ঘোষিত অস্থায়ী প্রজাতন্ত্র কেন্দ্রীয় সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করে। ইতিমধ্যে বলশেভিক দল লেনিনের নেতৃত্বে এই প্রজাতন্ত্রকে উচ্ছেদ করে রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রী সরকার স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯১৭ খ্রীঃ অক্টোবর বিপ্লবে বলশেভিক দল ক্ষমতা অধিকার করে। এইভাবে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক সরকার স্থাপিত হয়। (বলশেভিক বিপ্লবের বিস্তারিত বিবরণ উনত্রিংশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

পাঠ্যসূচী

১। Seton Watson—The Decline of Imperial Russia.
২। L. Kochan—Making of Modern Russia.
৩। Pares—Fall of Russian Monarchy.
৪। E. H. Carr—Bolshevik Revolution.
৫। Rothensiten—History of USSR.
৬। Lipson—Europe in the 19nth and 20eth Centuries.
৭। Vingoradoff—Lectures on the Nineteenth century.
৮। Richard Charques—The Twilight of Imperial Russia.
৯। Byasonovsky—History of Modern Russia.
১০। Cambridge Modern History—Vol. XI.

দ্বাবিংশ অধ্যায়

পূর্বাঞ্চল সমস্যা

(The Eastern Question)

পূর্বাঞ্চল সমস্যার প্রকৃতি (The Character of the Eastern Question) ঃ পঞ্চদশ শতকের শেষ দিক হতে তুরস্ক ইওরোপের পূর্ব ভাগের দেশগুলির ওপর আধিপত্য স্থাপন করে। গ্রীস, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, যুগোশ্লাভিয়া প্রভৃতি আধুনিক ইওরোপীয় দেশগুলি এই শতক থেকে বহু শত বছরের জন্যে তুর্কী সুলতানের অধীনে চলে যায়। দীর্ঘকাল তুর্কী শাসনে থাকলেও কৃষ্ণকায়, ইসলাম ধর্মাবলম্বী শাসক তুর্কী জাতির সঙ্গে শ্বেতকায়, খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী, স্লাভ জাতীয় ইওরোপীয় প্রজাদের কোন সাংস্কৃতিক ঐক্য গড়ে উঠতে পারেনি। তুরস্ক কেবলমাত্র তার সামরিক শক্তির জোরে এই বিজাতীয় প্রজাদের নিজ অধিকারে রাখত।

খ্রীষ্টীয় প্রজাদের সহিত মুসলিম তুর্কীদের বিরোধ

উনবিংশ শতক থেকে তুরস্কের সামরিক শক্তি ক্ষয় পেতে থাকে। মোল্লাতন্ত্র এবং ধর্মীয় গোঁড়ামির ফলে তুরস্কে আধুনিক যুগের উপযোগী শাসনব্যবস্থা, সামরিক এবং সামাজিক সংস্কার প্রচলিত হয় নি। তুরস্ক তার মধ্যযুগীয় শাসনব্যবস্থা এবং সেনাদল নিয়ে, আধুনিক মারণাস্ত্রে সজ্জিত শক্তিগুলি যথা রাশিয়া প্রভৃতির সঙ্গে এঁটে উঠতে অপারগ হয়। তুরস্কের সামরিক দুর্বলতার জন্যে তাকে "ইওরোপের রুগ্ন মানুষ" (Sick man of Europe) বলা হত।

তুরস্কের সামরিক দুর্বলতা

এদিকে সপ্তদশ শতক থেকে রুশ জার পিটার দি গ্রেট তুরস্কের বলকান অঞ্চলের রাজ্য গ্রাস করে কৃষ্ণ সমুদ্রের উপকূল পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার নীতি গ্রহণ করেন। জারের এই বিস্তার নীতির নাম ছিল "উষ্ণ জল নীতি" (Warm Water Policy)। পিটার দি গ্রেটের প্রদর্শিত পথ ধরে অষ্টাদশ শতকে জারিনা দ্বিতীয় ক্যাথারিন তুরস্ককে যুদ্ধে পরাস্ত করে তুরস্কের ওপর কুচুক কাইনার্ডজির সন্ধি (১৭৭৪ খ্রীঃ) এবং জ্যাসির সন্ধি (১৭৯২ খ্রীঃ) চাপান। এর ফলে ইউক্রেন, ক্রিমিয়া প্রভৃতি অঞ্চল রুশ রাজ্যসীমার অন্তর্ভুক্ত হয়। রাশিয়া কৃষ্ণ সাগরীয় শক্তিতে পরিণত হয়। তুরস্কের হাত থেকে পূর্ব ইওরোপের বলকান রাজ্য গ্রাস করার নীতি উনবিংশ শতকেও রাশিয়া অব্যাহত রাখে। ১৮১৫ খ্রীঃ ভিয়েনা সন্ধির দ্বারা রাশিয়া তুরস্কের নিকট থেকে বেসারাবিয়া অধিকার করে। তুরস্কের বিরুদ্ধে রাশিয়ার সাম্রাজ্যলোলুপতা, রুশ-তুর্কী দ্বন্দ্বের সূচনা করে। এর ফলে পূর্বাঞ্চল সমস্যার উদ্ভব হয়।

রুশ জারদের উষ্ণ জল নীতি ঃ তুরস্কের বিরুদ্ধে আগ্রাসন

পূর্বাঞ্চল সমস্যার অপরদিক ছিল বলকান জাতিগুলির তুরস্কের শাসনমুক্ত হয়ে স্বাধীনতা লাভের ইচ্ছা। ফরাসী বিপ্লবের জাতীয়তাবাদী আদর্শের প্রভাবে[১] বলকান জাতীয়তাবাদ প্রখর হয়ে ওঠে। ইসলাম ধর্মাবলম্বী তুর্কীদের সঙ্গে খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী, ইওরোপীয় স্লাভ জাতিগুলির ধর্ম ও বর্ণগত পার্থক্য ছিল। প্যানস্লাভ আন্দোলনের মাধ্যমে বলকানে জাতীয়তাবাদ তীব্র হয়ে ওঠে। তুরস্কের সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করার জন্যে রাশিয়া বলকান জাতীয়তাবাদকে সমর্থন জানায়। অতৃপ্ত বলকান জাতীয়তাবাদ পূর্বাঞ্চল সমস্যাকে আরও জটিল করে। বৃহৎ শক্তিগুলি নিজ নিজ স্বার্থে মাঝে মাঝে বলকান জাতীয়তাবাদকে

বলকান জাতীয়তাবাদ

১· J. A. R. Marriot—Eastern Question.

সমর্থন জানিয়ে তুরস্কের ব্যবচ্ছেদের চেষ্টা চালায়। এব্যাপারে রাশিয়া দুমুখো ভূমিকা নেয়।

এদিকে ইংলন্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশগুলি পূর্বাঞ্চল সমস্যার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। ইংলন্ডের নীতি এই ছিল যে, পূর্ব ইওরোপে রুশ প্রাধান্য বাড়লে ইংলন্ডের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবে। ইংলন্ড আশঙ্কা করত যে, যদি রুশ যুদ্ধ জাহাজ কৃষ্ণ সাগর থেকে দার্দানালিস প্রণালী দিয়ে ভূমধ্যসাগরে ঢুকতে



বলকান অঞ্চল

পারে, তবে এই অঞ্চলে ব্রিটিশ নৌ প্রাধান্য বিপন্ন হবে। মিশরে ইংরাজ প্রাধান্যের ক্ষতি হবে। ফ্রান্সও মনে করত যে, ভূমধ্যসাগরে রুশ বিস্তার ঘটলে উত্তর আফ্রিকার ফরাসী আধিপত্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এজন্য ইংলন্ড, ফ্রান্স, অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্র তুরস্কের সাম্রাজ্যের স্থিতাবস্থা রক্ষা

ইংলন্ড, ফ্রান্স প্রভৃতির রুশ বিরোধিতা : তুরস্কের সাম্রাজ্যের স্থিতাবস্থা রক্ষার নীতি

করতে সঙ্কল্প নেয়। রাশিয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে আগ্রাসন চালালে এই শক্তিগুলি রাশিয়াকে বাধা দানে এগিয়ে আসে। এইভাবে পূর্বাঞ্চল সমস্যা জটিলতা ধারণ করে। লর্ড মর্লি পূর্বাঞ্চল সমস্যার জটিলতা বোঝাবার জন্যে ব্যাখ্যা (definition) দিয়াছেন।[১] তাহল এই যে, "পূর্বাঞ্চল সমস্যা হল একটি পরিবর্তনশীল, সমাধানবিহীন, পাকানো গ্রন্থি, যাতে পরস্পর সংঘাতশীল ধর্মমত, পরস্পর বিরোধী জাতি-গোষ্ঠী এবং পরস্পর বিরোধী স্বার্থ জটিলতা সৃষ্টি করেছে।"

গ্রীসের স্বাধীনতা যুদ্ধ (The War of Greek Independence) : প্রাচীন যুগে গ্রীস ছিল ইওরোপীয় সভ্যতার জন্মভূমি। এজন্য ইওরোপীয়রা গ্রীসকে ইওরোপের সংস্কৃতির পীঠস্থান বলে মনে করে। কালক্রমে গ্রীস তার পূর্ব গৌরব হারিয়ে ফেলে এবং তুরস্কের পদানত হয়। গ্রীক জাতি তাদের অতীত গৌরবের কথা ভুলে গিয়ে পরাধীন জীবনে অভ্যস্ত হয়। (১) অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে কোয়ারেস (Koares) নামে এক গ্রীক পণ্ডিতের চেষ্টায় প্রাচীন গ্রীসের ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস ও সংস্কৃতির চর্চা আরম্ভ হয়। গ্রীক কবি বিগাস তাঁর স্বদেশপ্রেম মূলক কবিতাবলীর দ্বারা গ্রীকদের সুপ্ত জাতীয় চেতনাকে জাগান। গ্রীক জাতির মধ্যে এই রেনেসাঁস বা জাগৃতি আন্দোলন গ্রীক জাতীয়তাবাদী মনোভাবের সৃষ্টি করে। প্রাচীন গৌরবে উদ্দীপিত গ্রীক জাতি তুরস্কের অধীনতা ছিন্ন করার জন্যে ব্যগ্র হয়। (২) গ্রীক জাতির মধ্যে ছিল এক দুর্দম শক্তি। এরা ছিল নৌ-বিদ্যা, বাণিজ্য এবং গেরিলা যুদ্ধে পারদর্শী। পাহাড় অঞ্চলের গ্রীকরা ছিল সাহসী ও যুদ্ধবাজ। সুতরাং তুরস্কের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা লাভের জন্যে সশস্ত্র সংগ্রামে এই সকল সাহসী বীর সাগ্রহে যোগ দেয়। (৩) গ্রীকরা তুর্কী সরকারের কাছ হতে বিভিন্ন সুবিধা ও অধিকার ভোগ করত। তুর্কী নৌ-সেনাদলে গ্রীকরা বেশীর ভাগ কাজ করত। তুর্কী সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে তারা ব্যবসায়-বাণিজ্যের অধিকার ভোগ করত। তুরস্কের কাছ থেকে এই সকল সুবিধা পাওয়ার ফলে গ্রীক জাতির মনে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের বাসনা উদগ্র হয়। (৪) ফরাসী বিপ্লবের প্রভাবে জাতীয়তাবাদী ভাবধারা বলকানে ছড়িয়ে পড়ায় গ্রীসে স্বাধীনতার আদর্শ বলবতী হয়।[২] গ্রীসের আর্থোডক্স গীর্জা গ্রীক জাতির স্বাতন্ত্র্যবাদকে তীব্রতর করে। গ্রীসের পূর্বদিকে ঈজিয়ান সাগরের অসংখ্য দ্বীপে গ্রীক নৌ-বণিক ও সাহসী নৌ-যুদ্ধে দক্ষ কাপিতানি বা জাহাজ নাবিকরা বসবাস করত। যেহেতু এরা ছিল যুদ্ধবাজ শ্রেণী সেহেতু এরাই বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেয়।

ফিলকি হেটোইরিয়া প্রতিষ্ঠা

জাতীয়তাবাদী গ্রীকরা ফিলকি হেটোইরিয়া (Philke Hetaria) বা গ্রীক জাতীয় ভ্রাতৃসঙ্ঘ নামে এক প্রতিষ্ঠান (১৮১৪ খ্রীঃ) স্থাপন করে। এই সঙ্ঘের লক্ষ্য ছিল তুরস্কের হাত থেকে গ্রীসের স্বাধীনতা অর্জন করা। গ্রীসের বিভিন্ন অঞ্চলে এই সঙ্ঘের শাখা স্থাপিত হয়। ফলে সমগ্র গ্রীসে মুক্তি আন্দোলনের ভাবধারা ছড়িয়ে পড়ে। এই সঙ্ঘের নেতারা তুরস্কের বিরুদ্ধে জার প্রথম আলেকজান্ডারের সহায়তা প্রার্থনা করে। জার আলেকজান্ডার গ্রীক স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি তাঁর সমর্থন দিতে রাজী হন।

গ্রীসের মোলদাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া প্রদেশে আলেকজান্ডার ইপসিল্যান্টি নামক দেশপ্রেমিকের নেতৃত্বে ১৮২১ খ্রীঃ গ্রীসের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম প্রকাশ ঘটে। জার

১ "It is a shifting, intractable, interwoven tangle of conflicting faiths, rival people and antagonistic interests".—Lord Morley.

২ J. A. R. Marriot—Eastern Question.

মোলদাভিয়ার বিদ্রোহ ঃ গ্রীসের স্বাধীনতার যুদ্ধ

আলেকজান্ডার মোলদাভিয়ার বিদ্রোহীদের সাহায্য করতে চাইলে অষ্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী মেটারনিক শক্তি সমবায়ের সাহায্যে জারকে নিরস্ত করেন। তিনি জারকে বুঝান দেন যে, ভিয়েনা সম্মেলন ও শক্তি সমবায় ন্যায্য অধিকার নীতিকে গ্রহণ করেছে। তুরস্ক গ্রীসে ন্যায্য অধিকারের বলে শাসন করছে। সুতরাং তুরস্কের ন্যায্য অধিকারের বিরোধিতা করা রাশিয়ার পক্ষে উচিত নয়। জারের হস্তক্ষেপ রদ হলে, তুর্কী সেনাদল মোলদাভিয়ার বিদ্রোহ নিষ্ঠুরভাবে দমন করে। ইতিমধ্যে গ্রীসের মেরিয়া দ্বীপে গ্রীসের স্বাধীনতার যুদ্ধ ছড়ায়। মেরিয়া থেকে গ্রীসের প্রধান ভূখণ্ডে তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দাবানলের ন্যায় বিস্তৃত হয়। গ্রীক বিদ্রোহীরা বহু সংখ্যক তুর্কীকে হত্যা করে। ১৮২২ খ্রীঃ গ্রীক দেশপ্রেমিকরা গ্রীসের স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি চায়।

তুর্কী সুলতান গ্রীক বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করার জন্যে তাঁর সামন্ত মিশরের পাশা মহম্মদ আলির সহায়তা চান। এর বিনিময়ে তিনি মহম্মদ আলিকে সিরিয়া ও দামাস্কাস দানের

তুরস্কের বর্বর দমন নীতি

প্রতিশ্রুতি দেন। মহম্মদ আলির পাশ্চাত্য কায়দায় শিক্ষিত নৌ ও স্থল বাহিনী তাঁর পুত্র ইব্রাহিম আলির নেতৃত্বে গ্রীসে ঢুকে পড়ে। তুর্কী বাহিনী মিশরীয় সেনার সাহায্যে নিষ্ঠুরভাবে গ্রীক বিদ্রোহীদের দমন করতে থাকে। হাজার হাজার নিরপরাধ গ্রীক, ধর্মোন্মত্ত তুর্কী সেনাদলের হাতে নিহত হয়। গ্রীক অর্থোডক্স গীর্জার ধর্মগুরু, কনস্টান্টিনোপলের প্যাট্রিয়ার্ককে হত্যা করে তুর্কী সেনারা তাঁর দেহ বস্ফোরাস সাগরের জলে নিক্ষেপ করে। তুরস্ক যেন গ্রীক জাতিকে পৃথিবী থেকে মুছে ফেলতে চায়। মহম্মদ আলির বাহিনী ছিল ধর্মোন্মত্ত। অ-মুসলিম গ্রীকদের নিধনে তারা প্রয়োজনের অতিরিক্ত নিষ্ঠুরতা দেখায়।

খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী গ্রীকদের ওপর ইসলাম ধর্মাবলম্বী তুর্কীদের অত্যাচারের ফলে ইওরোপীয় জনমত গ্রীসের অনুকূলে চলে যায়। এই সুযোগে নতুন রুশ জার প্রথম নিকোলাস ঘোষণা

তুরস্কের বিরুদ্ধে রাশিয়ার যুদ্ধ ঘোষণা

করেন যে, তিনি গ্রীকদের অধিকার রক্ষার জন্যে তুরস্কের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা নিবেন। বলা বাহুল্য, রাশিয়ার এই ঘোষণার মধ্যে গ্রীসকে সাহায্য করা অপেক্ষা বলকানে রুশ প্রভাব বিস্তারের লক্ষ্য বেশী কার্যকরী ছিল। আপাততঃ জারের লক্ষ্য ছিল সার্বিয়া এবং দানিয়ুব অঞ্চলের মোলদাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া অঞ্চল দখল করা। তুরস্ক গ্রীসের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে জার সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন। তিনি তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার অজুহাত হিসেবে গ্রীসের স্বাধীনতাকে সমর্থন জানান। জার দানিয়ুব রাজ্য দুটি থেকে তুর্কী সেনা অপসারনের দাবী জানিয়ে চরমপত্র দেন। তুর্কী সুলতান বাধ্য হয়ে ইনকারম্যানের (Inkerman) সন্ধির দ্বারা এই রাজ্য দুটিতে রুশ দাবী মেনে নেন এবং সার্বিয়ার স্বাধীনতা দিতে স্বীকৃতি দেন।

ইংলন্ডের বিদেশ মন্ত্রী ক্যানিং বলকানে রুশ হস্তক্ষেপের জন্যে বিচলিত হন। ঐতিহাসিক টেমপারলির (Temperley) মতে, ক্যানিং আশঙ্কা করেন যে, রাশিয়াকে বলকানে একক হস্তক্ষেপের সুযোগ দিলে রাশিয়া তুরস্কের সাম্রাজ্য ভাগ করবে। এর ফলে ইংলন্ড ফাঁকে পড়বে।[১] এছাড়া ইংলন্ডের জনমত গ্রীসে তুরস্কের অত্যাচার নিবারণের জন্যে ব্রিটিশ সরকারের

ইংলন্ডের ভূমিকা

হস্তক্ষেপ চায়। ক্যানিং-এর উদ্দেশ্য ছিল তুরস্ককে ধ্বংস না করে বলকানে অত্যাচার করা থেকে নিরস্ত করা এবং এই সঙ্গে বলকানে রাশিয়ার বিস্তৃতি প্রতিহত করা। এই উদ্দেশ্যে তিনি রাশিয়ার সঙ্গে লন্ডনের সন্ধির দ্বারা (১৮২৭ খ্রীঃ)

১· Temperley—Cambridge History of British Foreign Policy.

এক বোঝাপড়ায় আসেন। এতে স্থির হয়, রুশ-ব্রিটেন-ফ্রান্সের সম্মিলিত নৌ-বাহিনী গ্রীসের নাভারিনো উপসাগরে গিয়ে ইব্রাহিম আলির তুর্কী বাহিনীকে গ্রীস ত্যাগে বাধ্য করবে। তুর্কী সুলতানের কাছ থেকে গ্রীসের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়ে নেওয়া হবে।

মিত্রশক্তির সম্মিলিত নৌবহর নাভারিনো উপসাগরে গিয়ে ইব্রাহিম আলিকে গ্রীস ত্যাগের জন্যে চরমপত্র দিলে, ইব্রাহিম আলি তা অগ্রাহ্য করেন। এর ফলে গরম মাথা ইংরাজ নৌ সেনাপতি এ্যাডমিরাল কডরিংটন নাভারিনোর নৌ-যুদ্ধে তুর্কী নৌ-বহর ধ্বংস করে ফেলেন। তিনি ভুলে যান যে, ব্রিটিশ সরকারের উদ্দেশ্য ছিল তুরস্ককে ভয় দেখিয়ে যুদ্ধত্যাগে বাধ্য করা, তুরস্ককে দুর্বল ও ধ্বংস করা নয়। কাজেই নাভারিনোর যুদ্ধের পর ব্রিটিশ ও ফরাসী নৌ-বাহিনী গ্রীস থেকে চলে যায়। ইনকারম্যানের সন্ধি ভঙ্গের অজুহাতে রুশ সেনাদল একক যুদ্ধ চালিয়ে তুরস্কের সুলতানকে এ্যাড্রিয়ানোপলের সন্ধি (১৮২৯ খ্রীঃ) (Treaty of Adrianople) স্বাক্ষরে বাধ্য করে। এই সন্ধির দ্বারা (১) রুশ আশ্রয়াধীনে গ্রীস স্বায়ত্ব শাসন লাভ করে। (২) বসফোরাস ও দার্দানালিস প্রণালীর ওপর রাশিয়ার অবাধ অধিকার স্বীকৃত হয়। (৩) মোলদাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া প্রদেশের ওপর রুশ প্রোটোকটোরেট বা রক্ষণাধিকার স্থাপিত হয়। এ্যাড্রিয়ানোপলের সন্ধির দ্বারা বলকানে রুশ ক্ষমতা বৃদ্ধির দরুন ইংলন্ড, অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি এই সন্ধির তীব্র বিরোধিতা করে। ফলে রুশ জার বাধ্য হয়ে এই সন্ধির শর্ত পরিবর্তন স্বীকার করেন। লন্ডনের সন্ধি ১৮২৭ খ্রীঃ দ্বারা এই পরিবর্তন করা হয়। এই পরিবর্তনের ফলে ঃ—(১) গ্রীস একটি পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা পায়। ব্যাভেরিয়ার রাজপুত্র অটো গ্রীসের রাজা হিসেবে নির্বাচিত হন। গ্রীসের ওপর রুশ প্রভাব স্থাপনের সম্ভাবনা দূর করা হয়। (২) ইংলন্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া গ্রীসের স্বাধীনতা রক্ষা করতে প্রতিশ্রুতি দেয়। (৩) মোলদাভিয়া ও ওয়ালাচিয়ার ওপর তুরস্কের আধিপত্য ফিরিয়ে দেওয়া হয়। তবে এই স্থানের খ্রীষ্টানদের রক্ষার দায়িত্ব রাশিয়া পায়। সার্বিয়ার স্বাধীনতা মোটামুটি স্বীকৃত হয়। রাশিয়া পায় জর্জিয়ার সংলগ্ন অখালটসিক অঞ্চল ও ককেসাসে কিছু স্থান।

এ্যাড্রিয়ানোপলের সন্ধি

গ্রীসের স্বাধীনতা যুদ্ধে, তুরস্কের দুর্বলতা বিশেষভাবে প্রকটিত হয়। রাশিয়ার সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবও এই যুদ্ধে প্রকাশিত হয়। তবে একথাও বোঝা যায় যে, ইওরোপীয় শক্তিগুলি সহজে রাশিয়াকে বলকানে এগোতে দিবে না। এভাবে গ্রীসের স্বাধীনতা যুদ্ধে তুরস্কের দুর্বলতা, রাশিয়ার আগ্রাসন নীতি ও ইওরোপীয় শক্তিগুলির দ্বারা তার বিরোধিতা এবং বলকানে জাতীয়তাবাদী স্ফূরণ প্রভৃতি পূর্বাঞ্চল সমস্যার সকল দিকগুলিই প্রকট হয়। তুরস্কের সাম্রাজ্যের ভাঙন এই যুদ্ধ হতে সূচিত হয়।

গ্রীসের স্বাধীনতা যুদ্ধের গুরুত্ব

তুরস্কের সমস্যা ও লন্ডনের সন্ধি, ১৮৪০ খ্রীঃ (The Problem of Turkey and the Treaty of London) ঃ গ্রীসের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর মিশরের পাশা মহম্মদ আলির সঙ্গে তুর্কী সুলতানের বিরোধ দেখা দেয়। গ্রীসের যুদ্ধে সহায়তা করার জন্যে তুর্কী সুলতান, তাঁর সামন্ত মহম্মদ আলিকে ক্রীট দ্বীপ দিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু মহম্মদ আলি এতে সন্তুষ্ট না হয়ে সুলতানের রাজ্য সিরিয়া অধিকার করেন। এজন্য তুর্কী সুলতানের সঙ্গে তাঁর পাশা বা সামন্ত সেনাপতি মহম্মদ আলির যুদ্ধ বাধে। এই যুদ্ধে সুলতানী সেনাদল, মহম্মদ আলির আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত সেনার নিকট পরাজিত হওয়ার উপক্রম হয়।

মহম্মদ আলির সিরিয়া আক্রমণ

এমতাবস্থায় তুর্কী সুলতান ইওরোপীয় শক্তিগুলির কাছে সামরিক সাহায্য চান। মিশরে তার প্রভাব স্থাপনের জন্যে ফ্রান্স চেষ্টায় ছিল। উত্তর আফ্রিকায় ফ্রান্সের বিরাট উপনিবেশ ছিল।

রুশ হস্তক্ষেপ : উনকিয়ার স্কেলেসির সন্ধি, ১৮৩৩ খ্রীঃ

ফরাসী সেনাপতিরা মিশরীয় সেনাদের তালিম দেয়। মিশরে তামাকের ক্ষেতে ফরাসী মূলধন খাটছিল। স্বভাবতঃই ফ্রান্স তার স্বার্থ রক্ষার জন্যে মিশরের শাসক মহম্মদ আলির পক্ষ নেয়। ফ্রান্স মিশরের পক্ষ নিলেও ব্রিটেন এই বিবাদে নিরপেক্ষ থাকে। অপর দিকে রুশ জার প্রথম নিকোলাস মহম্মদ আলির বিরুদ্ধে তুরস্কের সুলতানের পক্ষ নেন। উনকিয়ারস্কেলেসি (Unkair Skelessi) সন্ধির (১৮৩৩ খ্রীঃ) দ্বারা (১) রাশিয়া তুরস্কের স্বাধীনতা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেয়। (২) দার্দানালিস প্রণালীতে রুশ যুদ্ধ জাহাজের অবাধ চলাচলের অধিকার সুলতান স্বীকার করেন। (৩) যুদ্ধের সময় এই প্রণালীতে অন্য জাতির যুদ্ধ জাহাজ চলাচল নিষিদ্ধ করা হয়।

উপরোক্ত সন্ধির দ্বারা তুরস্কের ওপর রুশ আধিপত্য বাড়বে বলে ইংলন্ড আশঙ্কা করে। ঐতিহাসিক টেমপারলির[১] মতে, "উনকিয়ারস্কেলেসির সন্ধি রাশিয়া সম্পর্কে ব্রিটিশ রাজনীতিকদের মনোভাবের পরিবর্তনের সূচনা করে।" ইতিমধ্যে মহম্মদ আলি ফরাসী সহায়তা নিয়ে তুরস্কের সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। মিশর ও আফ্রিকায় এর ফলে ফরাসী প্রভাব বাড়ে। ইংলন্ড বা রাশিয়া মিশরে ফরাসী প্রভাব বৃদ্ধি সহ্য করতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত ইংলন্ড ও রাশিয়ার চাপে ফ্রান্সকে মিশরের পক্ষ ত্যাগ করতে হয়। ব্রিটেন তুরস্কের ওপর

লন্ডনের সন্ধি, ১৮৪০ খ্রীঃ

রাশিয়ার প্রভাব বৃদ্ধিরও বিরোধিতা করে। শেষ পর্যন্ত লন্ডনের কনভেনশন (১৮৪০ খ্রীঃ) দ্বারা উনকিয়ারস্কেলেসি সন্ধির আপত্তিজনক শর্তগুলির পরিবর্তন করা হয়। (১) মহম্মদ আলি মিশরের স্বাধীন বংশানুক্রমিক শাসক হিসেবে স্বীকৃত হন। (২) মহম্মদ আলি সিরিয়া, ক্রীটের ওপর তাঁর দাবী ত্যাগ করেন। মহম্মদ আলি লন্ডনের সন্ধি মানতে অস্বীকার করলে ইঙ্গ-অষ্ট্রিয় নৌ-বহর বেইরুট ও সিডন বন্দর আক্রমণ করে মহম্মদের পুত্র ইব্রাহিমকে বিতাড়িত করে। ইংরাজ সেনাপতি স্যার চার্লস নেপিয়ার আকার দুর্গ দখলের পর আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরের সমানে হাজির হলে মহম্মদ আলি বাধ্য হয়ে দ্বিতীয় লন্ডনের সন্ধি, ১৮৪১ খ্রীঃ স্বাক্ষর করেন। আরব দেশ ও সিরিয়া সুলতানকে ফেরৎ দেওয়া হয়। মহম্মদ আলিকে সুলতানের নামেমাত্র অধীনতায় মিশরের বংশানুক্রমিক পাশা নিযুক্ত করা হয়। তুরস্ক কোন যুদ্ধে লিপ্ত না থাকলে দার্দ্দানালিস ও বস্কোরাস অঞ্চলে কোন দেশের যুদ্ধ জাহাজ ঢুকতে পারবে না বলে স্থির করা হয়।[২] লন্ডনের সন্ধি প্রমাণ করে যে, ইংলন্ডকে বাদ দিয়ে পূর্বাঞ্চল সমস্যার কোন সমাধান সম্ভব নয়।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ, ১৮৫৪-১৮৫৬ খ্রীঃ (The Crimean War) : ভিয়েনা সন্ধির দ্বারা ইওরোপে প্রায় ৪০ বছর যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ থাকার পর ১৮৫৪ খ্রীঃ

গ্রোটোর গীর্জার চাবির প্রশ্ন

ইওরোপের বৃহৎ শক্তিগুলি, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্রিমিয়ার যুদ্ধে লিপ্ত হয়। ক্রিমিয়ার যুদ্ধ ছিল এক আন্তর্জাতিক যুদ্ধ যার ফলে ইওরোপের ৪০ বছরের স্থায়ী শান্তি বিনষ্ট হয়। এই যুদ্ধের আপাততঃ কারণ ছিল খুবই তুচ্ছ। ফরাসী রাজনীতিজ্ঞ থিয়ার্স মন্তব্য করেন যে, "কয়েকজন হতভাগ্য সন্ন্যাসীকে গ্রোটোর গীর্জার চাবি হস্তান্তর করার জন্যে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ বাধান হয়।" (The War was declared to give the key of Grotto to a few wretched monks)। যীশুখ্রীষ্টের জন্মস্থান জেরুজালেমের গ্রোটোর গীর্জা ও অন্যান্য পবিত্র স্থানগুলির রক্ষণাবেক্ষণ এবং চাবির অধিকার

১. Temperly—England and the Near East. P. 72-73.

২. Marriot—A History of Europe P. 171.

তুর্কী সুলতান ১৭৪০ খ্রীঃ এক চুক্তির দ্বারা ক্যাথলিক গীর্জাকে দেন। ক্যাথলিক ধর্মগুরু পোপ এই দায়িত্ব বহন করেন। ক্যাথলিক দেশ ফ্রান্স এই দায়িত্বের রক্ষাকারী ছিল। ফরাসী বিপ্লবের সময় ফ্রান্স দুর্বল হয়ে পড়লে, পূর্ব ইওরোপের অর্থোডক্স গীর্জার তরফে, রাশিয়া এই অধিকার সুলতানের কাছ থেকে হস্তগত করে। গ্রোটোর চাবি হাতছাড়া হওয়ায় ক্যাথলিক সম্প্রদায় দীর্ঘকাল ধরে ক্ষুব্ধ ছিল। ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন ফরাসী ক্যাথলিকদের নিকট জনপ্রিয়তার লোভে গ্রোটোর চাবি পুনরায় ক্যাথলিক গীর্জার হাতে ফিরিয়ে দিতে সুলতানকে বাধ্য করেন (১৮৫২ খ্রীঃ)।

তৃতীয় নেপোলিয়ন গ্রোটোর চাবি ক্যাথলিক গীর্জার স্বপক্ষে দখল করলে অর্থোডক্স গীর্জার নেতা রাশিয়া অপমানিত বোধ করে। গ্রোটোর চাবির অধিকার একটি মর্যাদার প্রশ্নে পরিণত হয়। রাশিয়ার জার নিকোলাস তাঁর প্রতিনিধি মেনশিকভকে তুর্কী সুলতানের নিকট পাঠিয়ে দাবী করেন যে; (১) যীশুখ্রীষ্টের জন্মস্থানের পবিত্র তীর্থগুলির রক্ষণের অধিকার অর্থোডক্স গীর্জাকে ফিরিয়ে দিতে হবে। (২) পূর্ব ইওরোপে সুলতানের অর্থোডক্স খ্রীষ্টান প্রজাদের ওপর রাশিয়াকে রক্ষণাধিকার দিতে হবে। সুলতান প্রথম দাবীটি বিবেচনা করার আশ্বাস দেন। কিন্তু দ্বিতীয় দাবীটি তিনি অগ্রাহ্য করেন। জার এর উত্তরে তুরস্কের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত মোলদাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া প্রদেশ অধিকার করেন। এর ফলে রুশ-তুর্কী যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার উপক্রম হয়।

রুশ চরমপত্র ঃ মোলাদাভিয়া অধিকার

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ ঘটার জন্যে ব্রিটিশ বা রাশিয়া বা ফ্রান্সের কতখানি দায়িত্ব ছিল এ বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। টেমপারলি তাঁর কেমব্রিজ হিস্ট্রি অব ব্রিটিশ ফরেন পলিসি গ্রন্থে ব্রিটিশ দৃষ্টিভঙ্গী ব্যাখ্যা করেছেন। অধিকাংশ ইওরোপীয় ঐতিহাসিক এই মত সমর্থন করেন। অপর দিকে রুশ ঐতিহাসিকরা রুশ দৃষ্টিকোণ থেকে এই যুদ্ধের দায়িত্ব বিচার করেছেন। আসলে ১৮৫২-১৮৫৪ খ্রীঃ এই দু বছর ধরে রুশ-তুরস্ক সমস্যা নিয়ে ঘোঁট পাকানোর পর ১৮৫৪ খ্রীঃ ক্রিমিয়ার যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধ আকস্মিকভাবে শুরু হয়নি। এজন্যই ঐতিহাসিক ডেভিড টমসনের মতে, "এই যুদ্ধ ছিল অপরিকল্পিত এলোমেলোভাবে শুরু করা যুদ্ধ, সম্ভবতঃ অনাবশ্যক, বৃহৎভাবে নিস্ফলা" (It was a fumbling war, probably unnecessary, largely futile)।

যুদ্ধটি গ্রোটোর গীর্জার চাবির অধিকার উপলক্ষে ঘটলেও, গভীরে ছিল মূল কারণগুলি। জার নিকোলাস তুরস্কের খ্রীষ্টান প্রজাদের রক্ষণের যে দাবী তোলেন তার পশ্চাতে জারের কিছু পূর্ব পরিকল্পনা ছিল। রাশিয়ার জার প্রথম নিকোলাস বিশ্বাস করতেন যে, তুরস্কের সাম্রাজ্যের একটি বৃহৎ অংশ গ্রাস করার জন্যে ফরাসী সরকার চেষ্টায় আছেন। তুরস্কের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীকে এই উদ্দেশ্যে ফ্রান্স বিদ্রোহের জন্যে প্ররোচনা দিচ্ছে। এমতাবস্থায় জার দ্বিতীয় নিকোলাস রাশিয়া ও ইংলন্ডের মধ্যে তুরস্কের সাম্রাজ্য ব্যবচ্ছেদ করার পরিকল্পনা করেন। ১৮৪৪ খ্রীঃ জার ইংলন্ড পরিভ্রমণে যান। তৎকালীন বিদেশ মন্ত্রী লর্ড এবার্ডিনকে বোঝান যে, যদি তুর্কী সাম্রাজ্যের সংহতি ও ঐক্য সকল শক্তি রক্ষা করে তাতে তিনি বাধা দিবেন না। যদি কোন বিশেষ শক্তি তুর্কী সাম্রাজ্যে অধিকার বিস্তারের চেষ্টা করে তবে তার আগেই তিনি তুর্কী সাম্রাজ্য ব্যবচ্ছেদ করবেন। এই ব্যবচ্ছেদে তিনি ব্রিটেনকে প্রধান অংশীদার বলে গণ্য করবেন। ব্রিটেনের বিনা সম্মতিতে তিনি ব্যবচ্ছেদের উদ্যোগও নিবেন না। লর্ড এবার্ডিন জারের এই প্রস্তাবকে নাকচও করেননি অথবা, সরকারিভাবে গ্রহণও করেননি। ফলে জারের এই দৃঢ় ধারণা জন্মায় যে, ব্রিটেন উপযুক্ত সময়ে তুরস্কের ব্যবচ্ছেদে সম্মত হবে। ব্রিটিশ নীতি সম্পর্কে জারের এই ধারণা ছিল সম্পূর্ণ ভুল। টেমপারলির মতে, ব্রিটেন কূটনৈতিক

রুশ জার কর্তৃক তুরস্কের ব্যবচ্ছেদ প্রস্তাব

সৌজন্য বশতঃ জারের প্রস্তাব সরাসরি নাকচ করেনি।[১] তার অর্থ এই নয় যে, ব্রিটেন জারের প্রস্তাবে মৌন সম্মতি দেয়। দ্বিতীয়তঃ, জারের প্রস্তাব ছিল স্ব-বিরোধী। তিনি একদিকে তুর্কী সাম্রাজ্যের সংহতির কথা বলেন, অন্যদিকে ব্যবচ্ছেদের কথাও বলেন। এরকম প্রস্তাব ব্রিটেন কখনও মানতে পারেনি। তৃতীয়তঃ, যদি এবার্ডিন জারের প্রস্তাবে ১৮৪৪ খ্রীঃ নীরব সম্মতি দেন বলে ধরা যায়, তাহলে ১৮৫২ খ্রীঃ সেই সিদ্ধান্ত ব্রিটিশ মন্ত্রীসভা মানতে বাধ্য ছিল না। ইতিমধ্যে এবার্ডিন প্রধান মন্ত্রী হলেও তাঁর মন্ত্রীসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদে ছিলেন পামারস্টোন। পামারস্টোনের পূর্বাঞ্চল সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী ১৮৫২-৫৪ খ্রীঃ প্রধান মন্ত্রী লর্ড এবার্ডিন ও বিদেশমন্ত্রী ক্ল্যাবেণ্ডনের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত কোণে ছিল। এবার্ডিনের সঙ্গে পামারস্টোনের মতভেদ ছিল রাশিয়ার সুবিদিত। সুতরাং ১৮৫২ খ্রীঃ জার নিকোলাস যদি ধারণা করেন যে, ১৮৪৪ খ্রীঃ তাঁর দেওয়া ব্যবচ্ছেদ প্রস্তাবে ১৮ বছর পরেও লর্ড এবার্ডিন সম্মত ছিলেন, তাহলে তা ছিল জারের ভ্রান্ত ধারণা মাত্র। এই ভ্রান্ত ধারণা পোষণের জন্যে জারই দায়ী ছিলেন, ব্রিটিশ মন্ত্রীরা নয়।

জার তাঁর পূর্ববর্তী ১৮৪৪ খ্রীঃ ধারণাই বজায় রাখেন। ১৮৪৫ খ্রীঃ তিনি ইংলন্ডের কাছে ব্যবচ্ছেদ প্রস্তাব আর একবার তোলেন। ১৮৫৩ খ্রীঃ গ্রোটোর গীর্জার চাবির অধিকার নিয়ে ফ্রান্সের সঙ্গে বিরোধ বাধলে জার মনে করেন যে, তুরস্ককে ব্যবচ্ছেদ করার উপযুক্ত সময় এসে গেছে। তিনি ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত স্যার হ্যামিলটন সেম্যুরকে (Sir Hamilton Seymour) (৯ই জানুয়ারি, ১৮৫৩ খ্রীঃ) প্রস্তাব দেন যে, "আমাদের হাতে একটি অত্যন্ত রোগগ্রস্থ ব্যক্তি আছে। আমাদের উচিত তার মৃত্যুর আগেই তার বিষয় সম্পত্তি সম্পর্কে ব্যবস্থা করা।" জার এইভাবে তুরস্কের সাম্রাজ্য ব্যবচ্ছেদের প্রস্তাব দিলে, ব্রিটিশ বিদেশ মন্ত্রী লর্ড জন রাসেল প্রত্যুত্তরে বলেন যে, " এই রুগ্ন ব্যক্তির মৃত্যু এখন হবে না। এই ব্যক্তি এখনও ১০০ বছর জীবিত থাকবে।"

সুতরাং দেখা যায় যে, জার নিকোলাসের উদ্দেশ্য ছিল ইংলন্ডের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তুরস্কের ব্যবচ্ছেদ করা। তুরস্কের রাজ্য বল প্রয়োগে গ্রাস করা জারের উদ্দেশ্য ছিল না।[২] জার নিকোলাসের প্রধান ভুল এই ছিল যে, তাঁর প্রস্তাবে ইংলন্ড অরাজী নয় বলে তিনি মনে করতেন। ব্রিটিশ সরকার স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থবিহীন ভাষায় জারকে তাঁদের অসম্মতি জানালে সম্ভবতঃ জার তুরস্কের সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত হতেন না। টেমপারলি বলেন যে, ব্রিটিশ সরকারের দোলাচল নীতি জারকে ভুল পথে পরিচালিত করে। (Vacillating policy of the British Government)।

ইংলন্ডের ভূমিকা

এই সময় ব্রিটিশ মন্ত্রীসভায় ভীষণ প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন পামারস্টোন্। তিনি প্রধানমন্ত্রী এবার্ডিনের কূটনীতির মাধ্যমে রুশ-তুর্কী বিরোধ নিষ্পত্তির নীতিকে পছন্দ করতেন না। পামারস্টোন বিশ্বাস করতেন যে, তুরস্কের বিরুদ্ধে রাশিয়া আগ্রাসনে সর্বদাই উন্মুখ। ব্রিটেন তা পছন্দ করে কিনা তাতে জার মাথা ঘামান না। সুতরাং রাশিয়াকে একটি প্রবল সামরিক চপেটাঘাত না করলে রুশ সরকার তাঁদের গোঁ ছাড়বেন না, পামারস্টোন মনে করতেন। টেমপারলির ভাষায় "পামারস্টোন ক্রিমিয়ার যুদ্ধকে এড়িয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টাকে এড়িয়ে চলেন" (Palmerston prevented the prevention of Crimean War)। তুরস্কের রাজধানী কনস্টান্টিনোপলে নিযুক্ত ব্রিটিশ দূত লর্ড স্ট্র্যাটফোর্ডের ভূমিকাও ক্রিমিয়ার যুদ্ধ বাধাতে সাহায্য করে। এই রাষ্ট্রদূত ছিলেন রুশ বিরোধী এবং তুরস্কের প্রতি পক্ষপাত পুষ্ট। তিনি তুর্কী সুলতানকে যে সকল পরামর্শ দেন, তাতে যুদ্ধ এড়ান কঠিন ছিল। সুতরাং ১৮৫২-৫৪ খ্রীঃ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকারের দোলাচল নীতি এবং লর্ড পামারস্টোনের যুদ্ধং দেহি নীতি ছিল ক্রিমিয়ার

১· Quoted by Temperley.
২· Ibid—P. 279.

যুদ্ধের অন্যতম গভীর কারণ। ইংলন্ডের টাইমস (The Times) প্রভৃতি প্রভাবশালী পত্রিকাগুলি রাশিয়ার বিরুদ্ধে "যুদ্ধং দেহি" মনোভাব জাগিয়ে তুলে। টাইমস পত্রিকা এই তত্ত্ব প্রচার করে যে, রাশিয়া পূর্ব ইওরোপ গ্রাস করে ভূমধ্যসাগরের পথে ভারতের সঙ্গে যোগাযোগের রাস্তা বন্ধ করতে উদ্যত হয়েছে। ইংলন্ডের উদারপন্থী রাজনীতিকরা রাশিয়ার জার সরকারকে ইওরোপে প্রতিক্রিয়াশীলতার প্রধান স্তম্ভ মনে করতেন। সুতরাং তাঁরা রাশিয়ার পরাজয় কামনা করেন। এইভাবে ইংলন্ডে রুশ বিরোধী জনমত জেগে ওঠে।

জারের সমর্থনে রুশ লেখক পুরিয়ার (Puriyear) কিছু যুক্তি দেখালেও, এই যুদ্ধের প্রধান দায়িত্ব ছিল জার প্রথম নিকোলাসের। কেন তিনি ব্রিটিশ সরকারের দেওয়া ১৮৪৪ খ্রীঃ সন্দেহজনক সমর্থনকে মূলধন করে ১৮৫২ খ্রীঃ মোলদাভিয়া, ওয়ালাচিয়া আক্রমণ করেন তা বোঝা দুস্কর। রুশ বিদেশ দপ্তর থেকে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে নির্দিষ্ট আলোচনার দ্বারা ব্রিটিশ সরকারের মনোভাব যাচাই করা উচিত ছিল। দ্বিতীয়তঃ, জার তাঁর ব্যক্তিগত মর্যাদাকে বড় করে তুরস্কের ওপর ভীতিপ্রদর্শন, মেনশেভিকের মত উদ্ধত, দুর্বিনীত ব্যক্তির দ্বারা সুলতানকে হুমকি দিয়ে ভুল করেন। এর ফলে ইওরোপীয় জনমত তাঁর বিরুদ্ধে যায়। তৃতীয়তঃ, জার ফ্রান্সের প্রতি রুষ্ট ছিলেন। কিন্তু অষ্ট্রিয়াও যে তাঁর নীতির বিরোধী সেকথা তিনি বুঝেননি। দানিয়ুব দেশ দুটিতে রুশ দখলদারী ছিল অষ্ট্রিয়ার পক্ষে অসহনীয়। সুতরাং অষ্ট্রিয়া ব্রিটেনের সঙ্গে সম্মতি নিয়ে রুশ বাহিনীকে এই দুই প্রদেশ থেকে বিতাড়িত করে।

ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন ব্যক্তিগত কারণে জার নিকোলাসের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নীতি গ্রহণ করেন। তৃতীয় নেপোলিয়ন বংশানুক্রমিক অধিকারের বলে সিংহাসন লাভ না করায়, জার নিকোলাস তাঁকে তাচ্ছিল্য করেন। এই কারণে তৃতীয় নেপোলিয়ন জার নিকোলাসকে শিক্ষা দিতে চান। (২) ঐতিহাসিক এ· জে· পি· টেইলারের মতে, জার নিকোলাস ছিলেন ইওরোপে ভিয়েনা সন্ধির খুঁটি। তৃতীয় নেপোলিয়ন রাশিয়াকে যুদ্ধে পরাস্ত করে এই সন্ধির ভিত্তি ভাঙতে চেষ্টা করেন। (৩) ফরাসী জাতিকে যুদ্ধ জয়ের গৌরবের তীব্র মদিরা পান করিয়ে তৃতীয় নেপোলিয়ন তাঁর স্বৈরশাসনকে জনপ্রিয় করার চেষ্টা করেন। (৪) ইংলন্ডের মিত্রতা লাভ ছিল তৃতীয় নেপোলিয়নের বিদেশনীতির অন্যতম লক্ষ্য। তিনি ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ইংলন্ডের পক্ষ নিয়ে ইংলন্ডের মিত্রতা পেতে চেষ্টা করেন। এই সকল কারণে ফ্রান্স ক্রিমিয়ার যুদ্ধে যোগ দেয়।

তৃতীয় নেপোলিয়নের উদ্দেশ্য

অষ্ট্রিয়া এই যুদ্ধে প্রত্যক্ষ যোগ না দিলেও রাশিয়ার বিরুদ্ধে "শত্রুতাপূর্ণ নিরপেক্ষতা" (Hostile Neutrality) নীতি অনুসরণ করে। অষ্ট্রিয়া মনে করত যে, পূর্ব ইওরোপে রুশ শক্তি বাড়লে অষ্ট্রিয়ার নিরাপত্তা ও স্বার্থ বিপন্ন হবে। এজন্য রাশিয়ার বিপক্ষে অষ্ট্রিয়া, ইংলন্ড ও ফ্রান্সকে সমর্থন দেয়। সার্ডিনিয়ারের প্রধানমন্ত্রী কাভ্যুর ইতালীর স্বাধীনতার যুদ্ধে ইংলন্ড ও ফ্রান্সের সমর্থন লাভের আশায়, এই যুদ্ধে ইংলন্ড ও ফ্রান্সের পক্ষে সৈন্যদল পাঠিয়ে দেন। এই সকল জটিল স্বার্থের ঘাত-প্রতিঘাতে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

অষ্ট্রিয়ার উদ্দেশ্য

কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন যে, ক্রিমিয়ার যুদ্ধ অনিবার্য ছিল না। ঐতিহাসিক এ· জে· পি· টেইলার মনে করেন যে, এই যুদ্ধ ছিল অনিবার্য। কারণ জার নিকোলাস তুরস্কের বশ্যতা চান; অপরদিকে তৃতীয় নেপোলিয়ন রাশিয়াকে পরাস্ত করে স্বদেশে জনপ্রিয়তা চান; ব্রিটেন চাইত তুরস্কের স্বাধীনতা ও অখণ্ডতা। এই পরস্পরবিরোধী স্বার্থের সংঘাতে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়ে। তবে বেশীর ভাগ ঐতিহাসিকের মতে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ অনিবার্য ছিল না। এজন্য স্যার রবার্ট মাপিয়ার মন্তব্য করেছেন যে "আধুনিক যুগের সর্বাপেক্ষা একমাত্র, অপ্রয়োজনীয় নিষ্ফলা যুদ্ধ

ক্রিমিয়ার যুদ্ধের অপরিহার্য অবস্থা

ছিল ক্রিমিয়ার যুদ্ধ"। লর্ড সলসবেরী মন্তব্য করেন যে, "এই যুদ্ধে ইংলন্ড হেরে যাওয়া ঘোড়ার ওপর বাজী ধরেছিল।"।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধের বিবরণ (The events of the Crimean war) ঃ তুরস্কের সুলতান জারের চরমপত্র অগ্রাহ্য করলে জার মোলদাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া অধিকার করেন। এর প্রতিবাদে সুলতান রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। সিলিষ্ট্রিয়া অঞ্চলে তুরস্ক ও রাশিয়ার মধ্যে তীব্র যুদ্ধ চলতে থাকে। ইতিমধ্যে ইঙ্গ-ফরাসী সেনাদল রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামলে রাশিয়া দানিয়ুব অঞ্চল থেকে সেনা সরায়। মিত্রশক্তির সেনাদল দক্ষিণ রাশিয়ার ক্রিমিয়াতে প্রবেশ করে এবং বিখ্যাত রুশ দুর্গ সেবাস্তোপোল অবরোধ করে। বালাক্লাভা ও ইনকারমেইনের যুদ্ধে ইঙ্গ-ফরাসী বাহিনী জয়লাভ করে। ফরাসী সেনাদল ক্রিমিয়ার যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব দেখায়। শেষ পর্যন্ত মিত্র শক্তির আক্রমণে রুশ দুর্গ সেবাস্তোপোলের পতন ঘটে। ইতিমধ্যে অষ্ট্রিয়া রাশিয়ার নিকট চরমপত্র পাঠিয়ে শর্ত সাপেক্ষে সন্ধি স্থাপনের প্রস্তাব দেয়। নতুন জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার সন্ধি স্থাপনে রাজী হলে প্যারিসের সন্ধির দ্বারা ক্রিমিয়ার যুদ্ধের অবসান ঘটে। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে যত সংখ্যক সৈন্য মারা পড়ে, টাইফাস ও কলেরার আক্রমণে তার চেয়ে অনেক বেশী সেনা মারা যায়। বালাক্লাভার যুদ্ধে মাত্র ৬০০ ইংরাজ সেনার মৃত্যুপণ লড়াইকে উপলক্ষ করে মহাকবি টেনিসন তাঁর চার্জ অব দি লাইট ব্রিগেড নামে এক ব্যালাড কবিতা রচনা করেন। মানুষের মন যখন অকপট ও সরল ছিল, যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর জটিলতা ও ক্ষয়প্রাপ্ত মূল্যবোধ তাকে বিনষ্ট করেনি, তখন কিশোর ও যুবকরা এই কবিতাটি পড়ে অনুপ্রাণিত বোধ করত।

বালাক্লাভা ও ইনকারমেইনের যুদ্ধ

প্যারিসের সন্ধি (১৮৫৬ খ্রীঃ) ও ক্রিমিয়ার যুদ্ধের ফলাফল (The Treaty of Paris and results of the Crimean War) ঃ প্যারিসের সন্ধির (১৮৫৬ খ্রীঃ) দ্বারা ক্রিমিয়ার যুদ্ধের অবসান ঘটে। এই সন্ধির দ্বারা পূর্বাঞ্চল সমস্যার দুটি প্রধান সমস্যা; যথা, তুরস্কের দুর্বলতা এবং রাশিয়ার আগ্রাসন নীতিকে রুদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়। প্যারিসের সন্ধির দ্বারা ঃ (১) তুরস্কের সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষা এবং তুরস্কের স্বাধীনতা রক্ষার নীতি গৃহীত হয়। ভবিষ্যতে রাশিয়া প্রভৃতি কোন দেশ তুরস্ককে আক্রমণ করলে প্যারিসের সন্ধি স্বাক্ষরকারী শক্তিগুলি তা প্রতিরোধের দায়িত্ব নেয়। ব্রিটেন, অষ্ট্রিয়া ও ফ্রান্স একটি স্বতন্ত্র সন্ধির দ্বারা স্বতন্ত্র ও যৌথভাবে অটোমান সাম্রাজ্যের ঐক্য ও স্বাধীনতা রক্ষার গ্যারান্টি দান করে। এই শর্ত কোন শক্তি ভাঙলে তা যুদ্ধের কারণ হিসেবে গণ্য করা হবে বলা হয়।[১] (২) তুরস্ককে ইওরোপের আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে আনতে ইওরোপীয় শক্তিগুলি সম্মত হয়। এর অর্থ হল যে, ইওরোপীয় দেশগুলি নিজেদের মধ্যে যেরূপ আন্তর্জাতিক আইন মাফিক সম্পর্ক রাখে, তুরস্কের ক্ষেত্রেও তা করা হবে। ইওরোপীয় শক্তি সমবায়ের সদস্য হিসেবে তুরস্ককে গ্রহণ করা হবে। তুরস্কের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বহিঃশক্তি হস্তক্ষেপ করবে না। প্যারিসের সন্ধিতে বলা হয় যে, কোন শক্তি একক বা যৌথভাবে এখন থেকে তুরস্কের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। এই শর্ত ভাঙলে তা আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গের অপরাধ বলে গণ্য হবে।

প্যারিসের সন্ধির শর্ত

(৩) তুর্কী সুলতান দ্বিতীয় মহম্মদ, তুরস্কের শাসনব্যবস্থা ও সামরিক বাহিনীর আধুনিকীকরণ দ্বারা তুরস্কের দুর্বলতা দূর করার জন্যে প্রতিশ্রুতি দেন। তুরস্কের ইওরোপীয় প্রদেশগুলির ক্ষেত্রে উদারনৈতিক শাসননীতি গ্রহণ, ধর্মীয় স্বাধীনতা দান, তুর্কী সেনাদলের আধুনিকীকরণের জন্যে তিনি অঙ্গীকার দেন। (৪) রাশিয়া তার আগ্রাসন নীতি পরিত্যাগের প্রমাণ-স্বরূপ

১· Marriot—History of Europe.

তুরস্ককে বেসারাবিয়া ফিরিয়ে দেয়। (৫) সুলতানের খ্রীষ্টীয় প্রজাদের ওপর রাশিয়া রক্ষণাধিকারের দাবী ত্যাগ করে। (৫) রাশিয়া ককেশাস অঞ্চলে কারস দুর্গটি তুরস্ককে ফেরত দেয়। মোলদাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া থেকে রুশ দাবী তুলে নেওয়া হয়। এর ফলে দানিয়ুব অঞ্চল থেকে রাশিয়াকে পূরা হঠে যেতে হয়। (৬) প্যারিসের শান্তি বৈঠকে ষ্টেইটস কনভেনশন দ্বারা দার্দানালিস প্রণালী ও সন্নিহিত অঞ্চল সম্পর্কে ১৮৪১ খ্রীঃ দ্বিতীয় লন্ডনের সন্ধির শর্তগুলি পরিবর্তন করা হয়। (আগে দেখ বিস্তৃত বিবরণের জন্যে)। এখন নতুন ষ্টেইটস কনভেনশন দ্বারা স্থির হয় যে—(ক) শান্তির সময় দার্দানালিস প্রণালীতে সকল দেশের বাণিজ্য জাহাজ অবাধে চলাচল করতে পারবে। (খ) শান্তির সময় দার্দানালিস প্রণালীতে কোন দেশের যুদ্ধ জাহাজ চলাচল করতে পারবে না। (গ) কৃষ্ণসাগরকেও নিরপেক্ষ এলাকা বলে গণ্য করা হয়। কৃষ্ণ সাগরে কোন দেশের যুদ্ধ জাহাজ শান্তির সময় চলাচল করতে পারবে না। (ঘ) কৃষ্ণ সাগরের উপকূলে রুশ ঘাটি ও দুর্গ রাখা চলবে না।(৭) তুরস্ক ও বৃহৎ শক্তিগুলি ক্রিমিয়া অঞ্চল রাশিয়াকে ফিরিয়ে দেয় নেই। (৮) অপর একটি কনভেনশন দ্বারা দানিয়ুর নদীতে সকল দেশের বাণিজ্য জাহাজ চলাচলের জন্যে অবাধে খুলে দেওয়া হয়। এই শর্ত কার্যকরী করার জন্যে একটি আন্তর্জাতিক কমিশন নিযুক্ত হয়। বেসারাবিয়া অঞ্চল ছিল দানিয়ুর নদীর মোহনায় অবস্থিত। তুরস্ককে বেসাবাবিয়া ফেরৎ দেওয়ার ফলে দানিয়ুবে অবাধ বাণিজ্য জাহাজ চলাচলের অধিকার তুরস্ককে মেনে নিতে হয়। (৯) রাশিয়া ফিনল্যান্ড উপসাগরে আল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জে কোন নৌ-ঘাঁটি নির্মাণের অধিকার ত্যাগ করে। (১০) দক্ষিণ বেসারাবিয়া অঞ্চল মোলদাভিয়ার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। (১১) মোলদাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া প্রদেশ দুটি তুরস্কের অধীনে থাকলেও স্বায়ত্ব শাসনের অধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতা লাভ করে। এমনকি এই দুই দেশের নিজস্ব শাসন ব্যবস্থা ও সেনাদল গঠনের অধিকার দেওয়া হয়। কার্যতঃ এই দুটি দেশ প্রায় স্বাধীনতা পায়। (১২) সার্বিয়াকেও অনুরূপভাবে তুরস্কের নামমাত্র অধীনে রেখে পূর্ণ স্বায়ত্ব শাসনের অধিকার দেওয়া হয়। (১৩) "প্যারিসের ঘোষণা" (Declaration of Paris) নামে এক ঘোষণার দ্বারা প্যারিসের সন্ধি স্বাক্ষরকারী দেশগুলি ঘোষণা করে যে:—(ক) জলদস্যুতাকে আন্তর্জাতিক অপরাধরূপে গণ্য করে তা দমনের ব্যবস্থা করা হয়। (খ) যুদ্ধের জন্যে প্রয়োজনীয় সামগ্রী ছাড়া নিরপেক্ষ দেশের জাহাজে শত্রুদেশের মালবহন বৈধ ঘোষিত হয়। (গ) নৌ-অবরোধকে শুধু কাগজে ঘোষণা করলে চলবে না, তাকে প্রকৃত নৌ শক্তির সাহায্যে প্রয়োগ করলে তবে তা বৈধ গণ্য হবে।

প্যারিসের সন্ধির দ্বারা পূর্বাঞ্চল সমস্যা সমাধানের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়। পূর্বাঞ্চল সমস্যার দুটি প্রধান দিক ছিল, যথা, তুরস্কের দুর্বলতা এবং রাশিয়ার আগ্রাসন নীতি।

প্যারিসের সন্ধির বিফলতা

প্যারিসের সন্ধির দ্বারা এই দুটি সমস্যার সমাধানের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়। কিন্তু কিছুকালের মধ্যে দেখা যায় যে, এই সকল ব্যবস্থা অকার্যকরী হয়ে গেছে। পূর্বাঞ্চল সমস্যা পুনরায় ইওরোপের শান্তি বিনষ্ট করে। তুরস্ক প্যারিসের সন্ধিতে তার প্রতিশ্রুত আলোকপ্রাপ্ত সংস্কার প্রবর্তন করতে ব্যর্থ হয়। সুলতান দ্বিতীয় মহম্মদ তাঞ্জিমৎ সংস্কার বা আলোকিত সংস্কার প্রবর্তনের চেষ্টা করলেও, গোঁড়া মোল্লাদের বিরোধিতায় তিনি বিফল হন। ফলে তুরস্ক দুর্বল থেকে যায়। তুর্কী সাম্রাজ্যে খ্রীষ্টান প্রজাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা দান ও প্রতিনিধি সভায় সদস্য নির্বাচনের অধিকার তিনি দিতে অপারগ হন। ফলে তুর্কী সাম্রাজ্যে অশান্তি ও ভাঙন-প্রবণতা অব্যাহত থাকে।এদিকে রাশিয়া কিছুকাল তুরস্কের বিরুদ্ধে আগ্রাসন নীতি ত্যাগ করলেও, ১৮৭০ খ্রীঃ প্যারিসের সন্ধির সামুদ্রিক শর্ত পুনরায় ভেঙে ফেলে। ১৮৭৭ খ্রীঃ রাশিয়া পুনরায় তুরস্ককে আক্রমণ করে ১৮৭৮ খ্রীঃ তুরস্কের ওপর স্যানস্টিফ্যানোর সন্ধি চাপায়। সুতরাং পূর্বাঞ্চল সমস্যার স্থায়ী সমাধান 'প্যারিসের

সন্ধির দ্বারা করা সম্ভব হয়নি। এই কারণে অনেকে ক্রিমিয়ার যুদ্ধকে অপ্রয়োজনীয় ও অকিঞ্চিৎকর যুদ্ধ বলেন। এর একমাত্র প্রত্যক্ষ ফল এই ছিল যে, তুরস্কের সাম্রাজ্য ১৮৫৩ খ্রীঃ ধ্বংস না হয়ে আরও কিছুকাল টিকে থাকে। প্যারিসের সন্ধির দ্বারা নৌ-যুদ্ধ সম্পর্কে কয়েকটি আন্তর্জাতিক আইন গৃহীত হয়। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের অপর প্রত্যক্ষ ফল ছিল যে, ১৮১৫ খ্রীঃ ভিয়েনা সন্ধির দ্বারা ইওরোপে অন্ততঃ ৪০ বছরের জন্যে যে দীর্ঘ শান্তি ও শক্তিসাম্য স্থাপিত হয়, ক্রিমিয়ার যুদ্ধ তাতে যবনিকা টেনে দেয়। এই যুদ্ধ ছিল আধুনিক যুগের প্রথম লোকক্ষয়কারী বৃহৎ যুদ্ধ যাতে ইওরোপের প্রধান শক্তিগুলি জড়িত ছিল। এই যুদ্ধে রাশিয়ার সেনা ক্ষয় হয় তিন লক্ষ, ফ্রান্সের ২ লক্ষ ও ব্রিটেনের ৩০ হাজার সেনা মারা পড়ে। তখনকার যুগের লোকসংখ্যার অনুপাতে এই লোক ক্ষয় কম ছিল না। অপর প্রত্যক্ষ ফল ছিল রাশিয়ার ভয়ানক মর্যাদা হানি। নেপোলিয়ন বিজয়ী রাশিয়া যে সামরিক সম্মান ও সম্ভ্রম ভোগ করত, মধ্য ইওরোপের রাষ্ট্রগুলি রুশ সামরিক শক্তির ভয়ে যেভাবে গুটিয়ে থাকত, ক্রিমিয়ার যুদ্ধে রাশিয়ার শোচনীয় পরাজয়ে তা ধূলিসাৎ হয়। রাশিয়ার সামারিক মর্যাদা হানি ও যুদ্ধজনিত আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির ফলে রাশিয়া ভিয়েনা ও বার্লিনে তার এত দিনের প্রভাব-প্রতিপত্তি হারিয়ে ফেলে। রুশ রাজনীতিকরা বলেন যে, ক্রিমিয়ার যুদ্ধে তুরস্ককে রক্ষা করা অপেক্ষা রাশিয়াকে হতমান করতে ব্রিটেন ও ফ্রান্স ব্যস্ত হয়। তবে সার্বিকভাবে ক্রিমিয়ার যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ফল ছিল প্রায় শূন্য ও গুরুত্বহীন। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের মূল লক্ষ্য তুরস্কের সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষা ও তুরস্কের আধুনিকীকরণ এবং তুরস্কের বিরুদ্ধে রুশ আগ্রাসন রোধ করা প্যারিসের সন্ধির দ্বারা সম্ভব হয়নি। এই কারণে থিয়ার্স মন্তব্য করেন যে, "কয়েকটি হতভাগ্য সন্ন্যাসীকে গ্রোটোর গীর্জার চাবি পাইয়ে দেওয়ার জন্যে এই যুদ্ধ করা হয়।" লর্ড সলসবেরী মন্তব্য করেন যে, "ইংলন্ড এই যুদ্ধে ভুল ঘোড়ায় বাজি ধরেছিল।" ক্রোমারের মতে "আধুনিক যুগের সর্বাপেক্ষা অপ্রয়োজনীয় যুদ্ধ ছিল এই ক্রিমিয়ার যুদ্ধ।" ডেভিড টমসনের মতে, "ক্রিমিয়ার যুদ্ধের সূচনা ছিল যেমন যত্নহীন, উদ্দেশ্যহীন, এই যুদ্ধের ফলাফল ছিল তেমনই অসম্পূর্ণ ও নিস্পত্তিহীন" (The outcome of the Crimean War was as undecisive as its outset was casual)। এই যুদ্ধে যোগদানকারী শক্তিগুলি এই যুদ্ধ থেকে শিক্ষা নিতে বাধ্য হয় যে, সেনাদল ও অস্ত্রশস্ত্রের আধুনিকীকরণ করা ছাড়া আধুনিক যুদ্ধে অভীষ্ট লক্ষ্য লাভ করা সম্ভব নয়।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পরোক্ষ ফল ছিল সুদূরপ্রসারী। এই কারণে কেহ কেহ ক্রিমিয়ার যুদ্ধকে "ইওরোপের জলবিভাজিকা" (Water-shed of European history) বলেন। ডেভিড টমসনের মতে "এই যুদ্ধ ছিল ইওরোপের ইতিহাসে এক দুই যুগের মধ্যবর্তী অন্তর্বর্তী অধ্যায়"।প্রথমতঃ, এই যুদ্ধের ফলে রাশিয়ার ইতিহাসে গুরুতর পরিবর্তন ঘটে। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে পরাজয়ের কারণ হিসেবে, জার সরকার রাশিয়ার পিছিয়ে-পড়া সমাজ ব্যবস্থাকে দায়ী করেন। এজন্য জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার ১৮৬১ খ্রীঃ রুশ ভূমিদাস প্রথা লোপ করে, রাশিয়ার নবজাগরণের সূচনা করেন। অতঃপর রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ ইতিহাসে সংস্কারের যুগ শুরু হয়। বৈদেশিক ক্ষেত্রে এই পরাজয়ের ফলে রাশিয়া কিছুকাল ইওরোপ থেকে মুখ ফিরিয়ে, এশিয়ায় সাম্রাজ্য বিস্তার নীতি অনুসরণ করে। চীনের কাছ হইতে মঙ্গোলিয়ার একাংশ, মধ্য এশিয়ার ককেশাস অঞ্চল ও তুর্কী খানদের রাজ্য যথা সমরখন্দ, বোখারা, খোকন্দ রুশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এর ফলে রুশ সীমান্ত আফগানিস্থান স্পর্শ করে। রুশ সীমান্ত আফগানিস্থান স্পর্শ করলে ভারতে ব্রিটিশ শক্তি রুশ আক্রমণের ভয়ে কম্পিত হয়। এছাড়া ইওরোপের সম্পর্কে রাশিয়ার দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন ঘটে। এতকাল জার সরকার ছিল ১৮১৫ খ্রীঃ ভিয়েনা চুক্তির স্থিতাবস্থার দৃঢ় ও ঘোর

ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পরোক্ষ ফল ঃ রাশিয়ার প্রতিক্রিয়া

সমর্থক। প্যারিসের সন্ধির দ্বারা রাশিয়ার বিজিত অঞ্চল কেড়ে নেওয়ার ফলে এবং বলকানে ভবিষ্যতে রুশ আগ্রাসন সম্পর্কে বৃহৎ শক্তিগুলির হুঁশিয়ারী দানের ফলে রাশিয়াকে পূর্ব ইওরোপে কার্যতঃ বেষ্টনীবদ্ধ (contained) করা হয়। সমুদ্রপথে কৃষ্ণসমুদ্র ও দার্দানালিসে রুশ যুদ্ধ জাহাজের অনুপ্রবেশ নিষিদ্ধ হলে, সমুদ্র পথেও রাশিয়াকে বেড়ার সীমায় বেঁধে ফেলা হয়। এজন্য রাশিয়া তার এতদিনের গৃহীত স্থিতাবস্থা রক্ষার নীতি ত্যাগ করে "সন্ধি পরিবর্তন বা সংশোধন" নীতি (Revisionism) গ্রহণ করে। স্থিতাবস্থাবাদী রাশিয়ার সংশোধনবাদী রাশিয়ায় পরিণত হওয়ার ফলে ইওরোপের শক্তিসাম্য দুর্বল হয়। রাশিয়ার প্রধান লক্ষ্য ছিল প্যারিসের সন্ধির সামুদ্রিক শর্তের পরিবর্তন করে কৃষ্ণ সাগরে তার হারিয়ে যাওয়া আধিপত্যের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা। ১৮৭০ খ্রীঃ বিসমার্কের সহযোগিতায় রাশিয়া প্যারিসের সন্ধির সামুদ্রিক শর্তকে ভেঙে ফেলে।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের ভাগ্যরবিকে উজ্জ্বল করে। এই যুদ্ধে ফরাসী সেনাদল তাদের সমরকুশলতার পরিচয় দিলে ওয়াটার্লুর যুদ্ধে ফ্রান্সের পরাজয়ের কলঙ্ক মুছে যায়। ফ্রান্স ইওরোপে প্রথম শ্রেণীর শক্তির মর্যাদা পায়। তৃতীয় নেপোলিয়ন এই সামরিক মর্যাদা ব্যবহার করে বিসমার্কের ইওরোপের নিয়ন্তা হয়ে দাঁড়ান। ফ্রান্সের অভ্যন্তরে তাঁর জনপ্রিয়তা বাড়ে।ইওরোপের সকল আন্তর্জাতিক বিরোধে তিনি হস্তক্ষেপ করে ভিয়েনা সন্ধিকে ভাঙার ব্যবস্থা করেন।প্রকৃতপক্ষে ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ফ্রান্সের ১ লক্ষ লোকক্ষয় ছাড়া লাভ কিছু হয়নি। ঐতিহাসিক ম্যারিয়টের মতে, ক্রিমিয়ার যুদ্ধে নেপোলিয়নের ব্যক্তিগত লাভ ভালই হয়। রাশিয়ার মত তিনিও সংশোধনবাদী (Revisionism) নীতি নেন। তাঁর নীতি ছিল ভিয়েনা চুক্তিকে সংশোধন করা। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে তিনি ইংলন্ডের সঙ্গে কাঙ্ক্ষিত মিত্রতা লাভ করলেও, যুদ্ধের পর তাঁর আত্মম্ভরিতার জন্যে তাঁর প্রতি ইংলন্ডের আস্থা দ্রুত ক্ষয় পায়।আশ্চর্যভাবে তাঁর হাতে পরাজিত রাশিয়ার সঙ্গেই তাঁর মিত্রতার বাড়বাড়ন্ত ঘটে।[১]

ফ্রান্সের প্রভাব বৃদ্ধি

ইংলন্ডের ক্ষেত্রে ক্রিমিয়ার যুদ্ধের ফল সুখকর হয়নি। এই যুদ্ধে ব্রিটিশ সেনাদল তেমন যোগ্যতা দেখাতে পারেনি। ইংলন্ড এই যুদ্ধে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়ে। প্রথম নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ইংলন্ড যে মর্যাদা পায়, ক্রিমিয়ার যুদ্ধে তা রক্ষিত হয়নি। এই যুদ্ধের পর ইংলন্ড, ইওরোপে মিত্রহীন হয়।

ইংলন্ডের মর্যাদা হানি

ক্রিমিয়ার যুদ্ধের অন্যতম পরোক্ষ ফল ছিল ফ্রান্স ও ইংলন্ডের সঙ্গে পিডমন্টের মিত্রতা। এর ফলে ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন ইতালীর স্বাধীনতার যুদ্ধে পিডমন্টের পক্ষ নেন। পিডমন্টের মন্ত্রী কাভ্যুরের উক্তি "ক্রিমিয়ার মাটি থেকে নবীন ইতালীর জন্ম হবে" তাহা সফল হয়।

ইতালীয় ঐক্য

ক্রিমিয়ার যুদ্ধে অষ্ট্রিয়া রাশিয়ার বিরুদ্ধাচরণ করায় জারের মনে অষ্ট্রিয়ার প্রতি বিরূপতা দেখা দেয়। অষ্ট্রিয়া এই যুদ্ধের শেষ দিকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যোগদানের জন্যে প্রস্তুতি নেয়। এজন্য অষ্ট্রিয়ার প্রচুর আর্থিক ক্ষতি হয়। অষ্ট্রিয়ার মর্যাদাও নষ্ট হয়। প্রাশিয়া এই যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকায় বৃহৎ শক্তির ক্লাব থেকে প্রাশিয়ার নাম কাটা যাওয়ার উপক্রম হয়। প্রাশিয়া এজন্য বিরক্ত ও আতঙ্কিত হয়ে অস্ত্রসজ্জার ওপর জোর দেয়। এদিকে প্রাশিয়া এই যুদ্ধে নিরপেক্ষতা রাখায়, জার প্রাশিয়ার প্রতি প্রীত হন। ১৮৬৬ খ্রীঃ বিসমার্ক যখন জার্মান ঐক্যের জন্যে অষ্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধের পরিকল্পনা করেন তখন ক্রিমিয়ার যুদ্ধে প্রাশিয়ার নিরপেক্ষতার প্রতিদানে, রাশিয়া এই যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকে। ফলে জার্মানীর ঐক্য সহজ হয়।

জার্মানীর ঐক্য

১· Vide-Marriot—Ibid.

প্যারিসের সম্মেলনে ইওরোপের প্রায় সকল বৃহৎ শক্তির যোগদান এবং তুরস্ককে শক্তি সমবায়ের সদস্য হিসেবে স্বীকৃতিদান দ্বারা এই ধারণা জন্মায় যে, ইওরোপীয় শক্তি সমবায় আবার কার্যকরী হতে চলেছে। শক্তি সমবায়ের নীতি ছিল ইওরোপের ব্যাপারে যৌথ সিদ্ধান্ত ও যৌথ দায়িত্ব গ্রহণ। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই বোঝা যায় যে, এই দুই নীতিকে আপাততঃ কার্যকরী করা যাবে না। ১৮৪৮এর ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পর থেকে ইওরোপের বিভিন্ন শক্তিগুলির মধ্যে যে পারস্পরিক সন্দেহ ও বিদ্বেষের বিষ দেখা দেয় তা ক্রিমিয়ার যুদ্ধে আরও বাড়ে। এর ফলে যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্থলে প্রতি রাষ্ট্র নিজ নিজ স্বার্থকেই বড় করে দেখে এবং সেই স্বার্থ পূরণের জন্যে অস্ত্র ব্যবহার করে। এজন্য গর্ডন ক্রেইগ মন্তব্য করেছেন যে "অতঃপর ইওরোপের ভবিষ্যৎ ইওরোপীয় শক্তি সমবায়ের স্থলে, বিভিন্ন শক্তির ব্যক্তিগত নীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়" (The future of Europe was to be determined not by Concept of Europe but by the actions of individual power)। পিডমন্ট তার নিজ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইতালীর ঐক্য, প্রাশিয়া জার্মানীর ঐক্য, সর্বোপরি তৃতীয় নেপোলিয়ন ভিয়েনা সন্ধি ভাঙতে চেষ্টা করেন।ইওরোপের পুরাতন শক্তিসাম্য ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পর ভেঙে পড়ে।ডেভিড টমসন মন্তব্য করেছেন, "পুরাতন শক্তি সমবায় ক্ষয় পাচ্ছিল, শক্তিসাম্য পরিবর্তিত হচ্ছিল এবং একটি বাস্তববাদী নীতির নবযুগের সূচনা হচ্ছিল।(The old concept was dying, the balance of power was beginning to shift, the new era of relation was dawning). ক্রিমিয়ার যুদ্ধের বিরাট পরোক্ষ ফল এবং গুরুত্বহীন কারণ বিবেচনা করে ঐতিহাসিক ডেভিড টমসন মন্তব্য করেছেন যে, "ইহা ছিল একটি বানানো যুদ্ধ, সম্ভবতঃ অপ্রয়োজনীয়, অনেকাংশে মূল্যহীন কিন্তু এর অপরিকল্পিত ও অভাবনীয় ফলগুলি ছিল গভীর ও মূল্যবান।"[১]

পূর্বাঞ্চল সমস্যার সঙ্কট ঃ রুশ-তুর্কী যুদ্ধ ঃ স্যানষ্টিফেনোর সন্ধি (The crisis of Eastern Question : Russo-Turkish war : The Treaty of Sanstefano) ঃ প্যারিসের সন্ধির (১৮৫৬ খ্রীঃ) দ্বারা কিছুদিনের জন্যে পূর্বাঞ্চল সমস্যা চাপা থাকে। স্বল্পকালের মধ্যে পূর্বাঞ্চল সমস্যা নিয়ে আবার আন্তর্জাতিক সঙ্কট দেখা দেয়।

তুরস্কের গোঁড়ামি : প্রজা অসন্তোষ

প্যারিসের সন্ধির দ্বারা তুর্কী সুলতান, তুরস্কে আলোকিত শাসনব্যবস্থা ও ধর্ম নিরপেক্ষতা এবং সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেন।তুর্কী সাম্রাজ্যের খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী প্রজারা যাতে সমান মর্যাদা সহকারে ইসলামীয় প্রজাদের সঙ্গে বসবাস করতে পারে, সেজন্য এই সংস্কার নীতির প্রয়োজনীয়তা ছিল। সুলতান দ্বিতীয় মহম্মদ তাঞ্জিমৎ সংস্কার বা আধুনিক আলোকিত সংস্কার প্রবর্তনের আয়োজন করেন। তিনি আধুনিক শিক্ষা, ফরাসী ভাষা শিক্ষা, সামরিক সংস্কার প্রভৃতি কাজ আরম্ভ করেন। পরবর্তী সুলতান আবদুল আজিজ আইনের চক্ষে সমান অধিকার,ধর্ম-সহিষ্ণুতা, প্রাদেশিক সভায় সকল ধর্মের প্রজাদের প্রতিনিধিত্ব প্রভৃতি আইন প্রবর্তন করার ব্যবস্থা করেন। এর ফলে অ-তুর্কী প্রজাদের সঙ্গে সরকারের সংযুক্তি গড়ে ওঠার সুযোগ দেখা দেয়। কিন্তু মোল্লা সমাজ প্রচার করে যে, এই সকল সংস্কার প্রবর্তিত হলে তুরস্কে ইসলামীয় ভাবধারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। পুরাতনপন্থীদের বিদ্রোহের ফলে আবদুল আজিজ পদচ্যুত হন। এর পর কিছুদিন প্রথম মুরাদ সুলতানের সিংহাসনে বসেন। মুরাদের পর দ্বিতীয় আবদুল হামিদ সুলতানী সিংহাসনে বসেন।

১."It was a tumbling war, probably unnecessary, largely futile, yet, rich with unintended consequences."—David Thomson.

সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদ ছিলেন অত্যন্ত ধূর্ত ও কূটকৌশলী লোক। তিনি ছিলেন স্বৈরতন্ত্রের একনিষ্ঠ সমর্থক। ইওরোপীয় শক্তিগুলির চাপে তিনি কেবলমাত্র মুখে সংস্কার প্রবর্তনের কথা বলেন।[১] হাতে-কলমে তিনি খ্রীস্টান প্রজাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক অধিকার নাশ করে তাদের ওপর বলপূর্বক তুর্কীকরণ নীতি চাপান। তাঁর ইঙ্গিতে তুর্কী কর্মচারীরা বলকানের খ্রীস্টীয় প্রজাদের ওপর বাড়তি কর, অর্থনৈতিক শোষণ ও ইসলামীকরণ চালাতে থাকে। এজন্য বলকানে দারুণ অসন্তোষ ধূমায়িত হয়।

দ্বিতীয় আবদুল হামিদের দমন নীতি

এদিকে বলকান জাতিগুলির মধ্যে জাতীয়তাবাদী ভাবধারা তীব্র হয়ে ওঠে। বলকানের অধিকাংশ অধিবাসী ছিল স্লাভ জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এরা ছিল অর্থোডক্স গীর্জার অনুরাগী খ্রীস্টান। এদের মধ্যে প্যান স্লাভ আন্দোলন (Pan-Slav movement) নামে এক আন্দোলন প্রবল হয়ে ওঠে। উত্তর ও দক্ষিণ স্লাভগোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করা ও বলকানের অন্যত্র ছড়িয়ে থাকা স্লাভদের ঐক্যবদ্ধ করা ছিল এই আন্দোলনের লক্ষ্য। যেহেতু রাশিয়ার অধিবাসীরাও ছিল স্লাভ গোষ্ঠীর, সুতরাং রাশিয়ার প্রভাবে প্যান-স্লাভ আন্দোলন তীব্র হয়।

প্যান স্লাভ আন্দোলন

ইতালীর জাতীয়তাবাদী ঐক্য লাভ ও জার্মানীর ঐক্য আন্দোলন বলকান জাতিগুলিকে তুর্কী অধীনতা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে প্রেরণা দেয়। মোলদাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া দুই প্রদেশের অধিবাসীরা সংযুক্ত রুমানিয়া রাজ্যে পরিণত হয়। রুমানিয়ার স্বাধীনতা লাভ বলকান জাতিগুলিকে জাতীয়তাবাদী প্রেরণা দেয়। মাইলোস ওব্রনোভিচ নামক জনৈক সার্বিয় নেতা বলকানের তুর্কী রাজ্য বসনিয়া ও হার্জেগোভিনাকে সার্বিয়ার সঙ্গে যুক্ত করার জন্যে আন্দোলন আরম্ভ করেন। কারণ এই দুই রাজ্যের অধিবাসীরাও ছিল সার্ব জাতিগোষ্ঠীর লোক। এইভাবে সুলতান আবদুল হামিদের ধর্মান্ধতার দরুণ বলকানে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তীব্রতর হয়।

বলকান জাতীয়তাবাদ

তুর্কী সুলতান হামিদের স্বৈরশাসনের প্রতিবাদে বলকানের বসনিয়া ও হার্জেগোভিনাতে জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহ দেখা দেয়। এই অঞ্চলের লোকেরা ছিল সার্ব অর্থাৎ দক্ষিণ স্লাভ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। সার্বিয়া স্বাধীনতা পেলে রুমানিয়া হার্জেগোভিনাতে সার্বিয়ার সঙ্গে সংযুক্তি ও স্বাধীনতা লাভের জন্যে আলোড়ন দেখা দেয়। হার্জেগোভিনার জমিদার শ্রেণী তুর্কী সরকারের সাহায্যপুষ্ট হয়ে স্বজাতীয় কৃষকদের নির্মমভাবে শোষণ করলে কৃষকেরা কর প্রদান ও বেগার খাটা বন্ধ করে। হার্জেগোভিনার কৃষক বিদ্রোহ দমনের জন্যে একটি তুর্কী সেনাদল পাঠান হলে ক্রুদ্ধ কৃষকেরা এই বাহিনীকে পরাস্ত করে। বসনিয়া, বুলগেরিয়া প্রভৃতি স্থানেও তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। সার্বিয়া ও মন্টিনেগ্রো প্রভৃতি সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বলকান রাষ্ট্রগুলি স্লাভ জাতীয়তার সমর্থনে তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। কিন্তু তুর্কী সেনাপতি ওসমান পাশা সম্মুখ যুদ্ধে সার্বিয়া ও মন্টিনিগ্রোর বাহিনীকে বিধ্বস্ত করেন। নিরুপায় সার্বিয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে বৃহৎ শক্তিগুলির সাহায্য চায়।

হার্জে গোভিনায় কৃষক বিদ্রোহ

সুলতান আবদুল হামিদ নিষ্ঠুর অত্যাচার দ্বারা বলকান বিদ্রোহ দমিয়ে ফেলার নীতি নেন। তুর্কী সেনাদের নির্মম হত্যাকান্ডের ফলে প্রায় ১২ হাজার নিরস্ত্র বুলগার নরনারী নিহত হয়। বুলগেরিয়ার গ্রামগুলি ছারখার হয়ে যায়। বুলগার খ্রীস্টানদের এই নৃশংস হত্যাকান্ডের ফলে ইওরোপীয় জনমত তুরস্কের বিরুদ্ধে চলে যায়। ইংলন্ডের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী গ্ল্যাডস্টোনের ন্যায় শান্তিবাদী লোকও চটে

বুলগেরিয়ায় হত্যাকাণ্ড ও প্রতিক্রিয়া

১· Sherif Marden.

গিয়ে দাবী জানান যে, "তুরস্ককে পোঁটলা-পাঁটলিসহ ইওরোপ থেকে চলে যেতে বাধ্য করা দরকার।"[১] গ্ল্যাডস্টোন তাঁর "বুলগেরিয়ায় নৃশংস হত্যাকাণ্ড" নামে এক পুস্তিকা রচনা করেন।

ইওরোপীয় শক্তিগুলি নিজ নিজ দেশে জনমতের চাপে আংশিক সক্রিয় হন। কনস্টানটিনোপলে তাঁদের প্রতিনিধিরা সমবেত হয়ে একটি আপোষসূত্র রচনা করেন। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের গোপন ইঙ্গিতে তুরস্ক সেই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলে রাশিয়া ধৈর্য্য হারিয়ে তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।[২] যুদ্ধ ঘোষণার আগে রাশিয়া তার প্রতিপক্ষ শক্তি অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে এক গোপন সন্ধি করে যার নাম ছিল রাইখষ্ট্যাডের সন্ধি। রাইখষ্ট্যাডের (Reichstadt) সন্ধির দ্বারা অষ্ট্রিয়াকে বসনিয়া ও হার্জেগোভিনায় রক্ষণাবেক্ষণের অধিকার দানের প্রতিশ্রুতি রাশিয়া দেয়। এর বিনিময়ে অষ্ট্রিয়া এই যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকে। জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার ঘোষণা করেন যে, "বুলগেরিয়ার হত্যাকাণ্ডের পর, রাশিয়ার পক্ষে উদাসীন থাকা সম্ভব নয়। যদি ইওরোপ এ বিষয়ে উদাসীন থাকে তবে রাশিয়া একাই এই অন্যায়ের প্রতিবিধান করবে।" রুশ সেনাদল তুর্কী বাহিনীকে সহজে পরাস্ত করে প্লেভনা অধিকার করে এবং তুরস্কের রাজধানী কনস্টানটিনোপলের দিকে এগোতে থাকে। তুর্কী সুলতান বাধ্য হয়ে ১৮৭৮ খ্রীঃ রাশিয়ার সঙ্গে স্যানষ্টিফেনোর সন্ধির (Treaty of Sanstefano 1878) দ্বারা যুদ্ধের অবসান ঘটান। স্যানষ্টিফেনোর সন্ধির শর্তগুলি তুরস্কে অবস্থিত রুশ দূত কাউন্ট ইগনাটিয়েফ প্রধানতঃ একতরফাভাবে স্থির করেন। ইগনাটিয়েফ ছিলেন ঘোর স্লাভবাদী কূটনীতিক। তিনি অন্য কোন শক্তির প্রতিক্রিয়াকে গ্রাহ্য না করে দার্দানালিশ থেকে এ্যাড্রিয়াটিক পর্যন্ত প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ রুশ আধিপত্য বিস্তারের নীতি নেন। এমন কি তিনি বিখ্যাত রুশমন্ত্রী গোরচাকফের সম্মতিও নেননি। তাঁর বিশ্বাস ছিল জার তাঁকে নিশ্চয়ই সমর্থন করবেন।

রাশিয়ার যুদ্ধ ঘোষণা; ১৮৭৭ খ্রীঃ

স্যানষ্টিফেনোর সন্ধির (১৮৭৮ খ্রীঃ) দ্বারা স্থির হয় যে ঃ— (১) রুমানিয়া, সার্বিয়া ও মন্টেনিগ্রোর স্বাধীনতাকে তুরস্ক স্বীকৃতি দেবে। (২) পশ্চিমে দানিয়ুব নদী হতে পূর্বে ঈজিয়ান সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ নিয়ে "বৃহৎ বুলগেরিয়া" (Big Bulgaria) রাজ্য গঠন করা হবে। এই পরিকল্পিত রাজ্য তুরস্কের করদ রাজ্য হলেও, আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার পাবে। রাশিয়া এই রাজ্যের রক্ষাকর্তা হবে। (৩) তুরস্কের কয়েকটি স্থান যথা, কারস, বাটুম, বেসারাবিয়া এবং দোব্রুজা রাশিয়া লাভ করবে। এই স্থানগুলি ছিল সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং তৈল সম্পদে সমৃদ্ধ। (৪) যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ রাশিয়া তুরস্কের নিকট অর্থ পাবে।

স্যানষ্টিফেনোর সন্ধি ঃ

বার্লিন কংগ্রেস ও বার্লিনের সন্ধি, ১৮৭৮ খ্রীঃ (The Congress of Berlin and the Treaty of Berlin, 1878) ঃ পূর্বাঞ্চল সমস্যার অন্যতম প্রধান সমস্যা ছিল পূর্ব ইওরোপে তুরস্কের বিরুদ্ধে রাশিয়ার আগ্রাসন নীতি। ইওরোপে শক্তিসাম্য রক্ষার জন্যে ইওরোপীয় শক্তিগুলি পূর্ব ইওরোপে রুশ সাম্রাজ্যবাদী প্রসারের ঘোর বিরোধী ছিল। ইওরোপীয় শক্তিগুলি এই আগ্রাসনকে প্রতিহত করার জন্যে ক্রিমিয়ার যুদ্ধে যোগ দেয়। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পর প্যারিসের সন্ধির দ্বারা ১৮৫৬ খ্রীঃ এই অঞ্চলে রুশ রাজ্য বিস্তারকে প্রতিহত করা হয়। ১৮৭৭ খ্রীঃ রুশ-তুরস্ক যুদ্ধের ফলে তুরস্কের পরাজয় ঘটলে, পূর্ব ইওরোপে পুনরায় রুশ আগ্রাসনের সূচনা হয়। বিজয়ী রাশিয়া স্যানষ্টিফেনোর সন্ধির দ্বারা বলকানে একতরফাভাবে

বৃহৎ শক্তির শক্তিসাম্য নীতি

১· "Let the Turks leave Europe bag and baggage."

২· Gordon Craig.

স্যানষ্টিফেনোর সন্ধির বিরুদ্ধে ইংলণ্ড, অষ্ট্রিয়ার বিরোধীতা

সন্ধি স্থাপন করলে প্যারিসের সন্ধির দ্বারা যে শক্তিসাম্য স্থাপিত হয়েছিল তা ভেঙে পড়ে। রাশিয়ার এই সাম্রাজ্যবাদী অচরণের প্রতিবাদে বৃহৎ শক্তিগুলি যুদ্ধং দেহি মনোভাব নেয়। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশগুলি বলে যে, পূর্বাঞ্চল সমস্যা হল একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা। রাশিয়া একতরফাভাবে প্যারিসের সন্ধি নাকচ করে স্যানষ্টিফেনোর সন্ধি স্থাপন করলে তা সহ্য করা যাবে না। দ্বিতীয়তঃ, ইংলণ্ড প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলি তুরস্কের অখণ্ডতা নীতিকে স্বীকার করে চলত। স্যানষ্টিফেনোর সন্ধির দ্বারা রাশিয়া একতরফাভাবে তুরস্কের সাম্রাজ্যের আংশিক ব্যবচ্ছেদ করায় এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠে। তৃতীয়তঃ, রাশিয়া তুরস্কের অন্তর্গত কারস, বাটুম ও বেসারাবিয়া অধিকার করায় এবং নব-প্রতিষ্ঠিত বুলগেরিয়ার অভিভাবকত্ব নেওয়ায়, পূর্ব ইওরোপে রুশ শক্তির প্রসার হয়। এতে ইংলণ্ড, অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশে ঈর্ষা দেখা দেয়।

দানিয়ুব উপত্যকায় রুশ-আশ্রিত বহুৎ বুলগেরিয়া রাজ্য গঠিত হলে অষ্ট্রিয়া তার নিজের নিরাপত্তার জন্যে চিন্তিত হয়। ঐতিহাসিক ল্যাঙ্গারের[১] মতে, অষ্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যের ভেতর স্লাভ জাতিগোষ্ঠীর লোক ছিল। বৃহৎ বুলগেরিয়া গঠিত হলে অষ্ট্রিয়া আশঙ্কা করে যে, এই সকল স্লাভ জনগোষ্ঠী অষ্ট্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে বুলগেরিয়ার ন্যায় স্বাধীন রাজ্য গঠনের চেষ্টা করবে। রাইখষ্ট্যাডের সন্ধির দ্বারা অষ্ট্রিয়াকে বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি রাশিয়া দিয়েছিল (আগে পৃঃ ৩৮০ দেখ)। কিন্তু স্যানষ্টিফেনোর সন্ধিতে রাশিয়া এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করায় অষ্ট্রিয়া ভয়ানক ক্রুদ্ধ হয়। এদিকে ম্যাসিডোনিয়া প্রদেশ নবগঠিত বুলগেরিয়া রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত হলে গ্রীস এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। বেসারাবিয়া ও দোবরুজা নামক দুটি স্থান রাশিয়া অধিকার করায় রুমানিয়া অসন্তুষ্ট হয়।[২]

অষ্ট্রিয়ার বিরোধিতা

গ্রীস ও রুমানিয়া

স্যানষ্টিফেনোর সন্ধির বিরুদ্ধে এই সকল প্রতিবাদী রাষ্ট্রগুলির নেতৃত্ব গ্রহণ করে ব্রিটেন, রাশিয়াকে স্যানষ্টিফেনোর সন্ধি পরিবর্তনের জন্যে দাবী জানায়। ১৭ হাজার গুর্খা সৈন্য ভারত থেকে আনিয়ে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডিসরেইলী মাল্টা দ্বীপে নামিয়ে দেন। ব্রিটিশ রণতরীগুলি দার্দানালিস প্রণালী দিয়ে কৃষ্ণসাগরে ঢুকে রাশিয়াকে আক্রমণের ভয় দেখাতে থাকে। এর ফলে ইওরোপে একটি বড় ধরনের যুদ্ধ বাধার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

ইংলণ্ডের যুদ্ধং দেহি মনোভাব

পূর্বাঞ্চল সমস্যা নিয়ে ইওরোপে একটি যুদ্ধ বাধার আশঙ্কা দেখা দিলে, জার্মানীর প্রধানমন্ত্রী অটো ফন বিসমার্ক ভয়ানক চিন্তিত হন। ফ্রান্সকে মিত্রহীন করার জন্যে বিসমার্ক তিন কাইজারের চুক্তি গঠন করেন। (আগে পৃঃ ৩১০ দেখ)। এই তিন শক্তির দুই শক্তি ছিল অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়া। পূর্বাঞ্চল সমস্যা উপলক্ষে অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়া পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামলে তিন কাইজারের সন্ধি ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়। এজন্য বিসমার্ক ভয়ানক চিন্তিত হন। এমতাবস্থায় যে কোন উপায়ে যুদ্ধ বন্ধ না করলে জার্মানী গণ্ডগোলে জড়িয়ে পড়বে এমন আশঙ্কা দেখা দেয়। পূর্বাঞ্চল সঙ্কটকে শান্তিপূর্ণভাবে মিটিয়ে ফেলার জন্যে তিনি ইংলণ্ড ও রাশিয়ার নিকট এক আন্তর্জাতিক কংগ্রেস আহ্বানের প্রস্তাব দেন। বিসমার্ক আশা করেন যে, এর ফলে যুদ্ধ এড়ান সম্ভব হবে এবং তিন কাইজারের চুক্তি রক্ষা পাবে। তিনি নিরপেক্ষভাবে বিবাদী শক্তিগুলির মধ্যে মধ্যস্থতা করার আশ্বাস দেন এবং বার্লিন নগরে এক সম্মেলন ডাকার পরামর্শ দেন।

বিসমার্কের সমস্যা

রাশিয়া প্রথম দিকে ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের প্রতিবাদে কর্ণপাত করতে রাজী ছিল না। কিন্তু রুশ মন্ত্রীসভায় মতভেদ দেখা দেয়। রুশমন্ত্রী কাউন্ট ইগনাটিয়েভ (Ignatieff) প্রধানমন্ত্রী

১· Langer—Bismarck and His system of Alliances.

২· A.J.P. Taylor—Struggle of Mastery of Europe.

রাশিয়ার মীমাংসা নীতি

গোর্‌চাকফের (Gortchakoff) সঙ্গে পরামর্শ না করে স্যানষ্টিফেনোর সন্ধি স্বাক্ষর করায় গোরচাকফ বিরক্ত হন। স্যানষ্টিফেনোর সন্ধি উপলক্ষে আন্তর্জাতিক সঙ্কট দেখা দিলে, গোরচাকফ এই সন্ধি পরিবর্তন করে যুদ্ধ এড়াবার নীতি নেন।[১] এজন্য তিনি বিসমার্কের প্রস্তাবে সাড়া দেন। রুশ দূত সাবুরভ (Saburov) লণ্ডনে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী ডিসরেইলীর সঙ্গে সন্ধির প্রধান শর্তগুলি মোটামুটি স্থির করে ফেলেন। এর পর ১৮৭৮ খ্রীঃ বার্লিন কংগ্রেসে স্যানষ্টিফেনোর সন্ধি নাকচ করে বার্লিনের সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। বিসমার্ক বার্লিন বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। তিনি নিজেকে "সাধু দালাল" (Honest broker) বলে অভিহিত করেন।

বার্লিনের সন্ধির শর্তাবলী

বার্লিনের সন্ধির (১৮৭৮ খ্রীঃ) দ্বারা ঃ—(১) সার্বিয়া, মন্টিনেগ্রো ও রুমানিয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা তুর্কী সুলতান স্বীকার করেন। (২) রুমানিয়াকে দোবরুজার একাংশ দেওয়া হয়। (৩) কারস, বাটুম, বেসারাবিয়া ও আর্মেনিয়ার একাংশ রাশিয়া পায়। (৪) বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা প্রদেশে অষ্ট্রিয়ার শাসন স্থাপিত হয়। (৫) বৃহৎ বুলগেরিয়া রাজ্য যা স্যানষ্টিফেনোর সন্ধির দ্বারা সৃষ্টি হয়েছিল তাকে তিনটি খণ্ডে বিভক্ত করা হয় ঃ—(ক) ম্যাসিডোনিয়া অঞ্চল বুলগেরিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে তুর্কী সুলতানের প্রত্যক্ষ শাসনে রাখা হয়। (খ) বৃহৎ বুলগেরিয়ার অপর কিছু অংশ নিয়ে পূর্ব রুমোলিয়া রাজ্য গঠন করা হয়। পূর্ব রুমোলিয়াকে নামেমাত্র তুরস্কের অধীনে রেখে স্বায়ত্ব শাসনের অধিকার দেওয়া হয়। পূর্ব রুমোলিয়ার শাসনকর্তা খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী হবে বলে স্থির করা হয়। (গ) অবশিষ্ট বুলগেরিয়া নিয়ে বুলগেরিয়া রাজ্য গঠিত হয়। বুলগেরিয়ার শাসনকর্তা বুলগারদের দ্বারা নির্বাচিত হবে বলে স্থির হয়। তুরস্কের সুলতান বুলগারদের নির্বাচিত প্রার্থীকে অনুমোদন দিতে বাধ্য থাকবেন স্থির হয়। এই ব্যবস্থার ফলে বুলগেরিয়া কার্যতঃ একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। (৬) ইংলণ্ড তুরস্কের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত সাইপ্রাস দ্বীপ অধিকার করে। (৭) ইংলণ্ড তুরস্কের অবশিষ্ট সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষার সঙ্কল্প ঘোষণা করে। (৮) বার্লিন সন্ধিতে ফ্রান্স ও গ্রীসকে কোন ক্ষতিপূরণ দানের ব্যবস্থা ছিল না। তবে তুরস্কের আফ্রিকার সাম্রাজ্য টিউনিস ভবিষ্যতে ফ্রান্সকে দেওয়ার জন্যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। গ্রীসকেও ভবিষ্যতে থেসালী প্রদেশ দানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।

বার্লিন চুক্তির সমালোচনা (Criticism of the Treaty of Berlin) ঃ (১) বার্লিন সন্ধির দ্বারা পূর্বাঞ্চল সমস্যার অন্যতম প্রধান বিষয় বলকান জাতিগুলির স্বাধীনতা

বলকান জাতীয়তাবাদী অসন্তোষ

লাভের আকাঙ্খাকে পুরো উপেক্ষা করা হয়। বৃহৎ শক্তিগুলি নিজ নিজ স্বার্থ ও ক্ষতিপূরণ বিষয়ে এমন ব্যস্ত থাকে যে, বলকানের নিপীড়িত জাতীয়তাবাদ তাদের মনোযোগ পায় নি। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডিসরেইলী বার্লিন বৈঠকে বলকান জাতিগুলির আশা-আকাঙ্ক্ষাকে অগ্রাহ্য করেন। বলকান জাতিগুলির মনে এজন্য ঘোর অসন্তোষ দেখা দেয়। এই কারণে বার্লিন সন্ধির স্বল্পকাল পরেই পূর্বাঞ্চল সমস্যা সঙ্কটজনক হয়ে ওঠে। (২) বুলগার জাতি বার্লিনের সন্ধির দ্বারা বুলগেরিয়ার ব্যবচ্ছেদ তাদের প্রতি ঘোর অবিচার বলে গণ্য করে। (ক) বুলগার জাতীয়তাবাদীরা পূর্ব রুমেলিয়ার বিচ্ছিন্নতাকে মেনে নেয়নি। কিছুকাল বাদে ১৮৮৫ খ্রীঃ বুলগেরিয়া পূর্ব রুমেলিয়াকে বুলগেরিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত করে বার্লিন সন্ধির ব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলে। (খ) ম্যাসিডোনিয়া অঞ্চলকে তুরস্কের অধিনে রাখার ফলে ম্যাসিডোনীয়দের প্রতি ঘোর অবিচারের বিরুদ্ধেই ১৯১২ খ্রীঃ ও ১৯১৩ খ্রীঃ দুটি বলকান যুদ্ধ ঘটে। (গ) বুলগেরিয়াকে ঈজিয়ান সমুদ্র হতে বিচ্ছিন্ন করার জন্য বুলগেরিয়ায় তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়। বুলগার জাতি বুঝতে পারে যে,

---

১· Langer. Seton Watson.

বৃহৎ শক্তিগুলি বলকান জাতিগুলির সমস্যার প্রতি ন্যায় বিচার করবেন না। বুলগার জাতি মনে করে যে অষ্ট্রিয়ার স্বার্থের জন্যেই বৃহৎ বুলগেরিয়াকে ব্যবচ্ছেদ করা হয়। তুরস্ককে টিকিয়ে রাখার জন্যে পূর্ব রুমেলিয়া বুলগেরিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। বুলগার জাতি এই ব্যবস্থা ভবিষ্যতে ভেঙে ফেলতে সংকল্প নেয়। বার্লিনের সন্ধি বুলগেরিয়ার সমস্যা সমাধানে সক্ষম হয়নি। (৩) বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা প্রদেশ দুটির অধিবাসীরা ছিল জাতিতে সার্বিয় বা দক্ষিণ স্লাভজাতীয়। এই দুটি স্থান অষ্ট্রিয়াকে দেওয়ার জন্যে সার্বিয়া ক্রুদ্ধ হয়। সার্বিয়া যে কোন উপায়ে বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা লাভের চেষ্টা করে। এজন্য অষ্ট্রো-সার্ব প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয়। (৪) বার্লিন সন্ধির দ্বারা রুমানিয়ার বেসারাবিয়া অঞ্চল রাশিয়াকে দেওয়ায় রুমানিয়া ক্ষুব্ধ হয়। ক্রীট দ্বীপকে গ্রীসের সঙ্গে যুক্ত না করায় ক্রীটবাসীরা ভয়ানক ক্ষুব্ধ হয়। ক্রীটের বেশীরভাগ অধিবাসী ছিল গ্রীক। তারা তুর্কী শাসনে থাকতে রাজী ছিল না। ক্রীটে গ্রীক ও তুর্কীদের মধ্যে ভয়াবহ সংঘাত চলতে থাকে। অবশেষে ১৯০৫ খ্রীঃ ক্রীট দ্বীপ গ্রীসের সঙ্গে যুক্ত হয়।ঐতিহাসিক গ্রান্ট ও টেমপারলির মতে, বৃহৎ শক্তিগুলি তুরস্কের রাজ্য বৃহৎ শক্তির মধ্যে ভাগ না করে যদি বলকান জাতিগুলিকে স্বাধীনতা দান করত তবে বলকান জাতিগুলির প্রতিরোধে রাশিয়া পূর্ব ইওরোপে এগোতে পারত না। এই অঞ্চলে স্থায়ী শান্তি স্থাপিত হত।

ঐতিহাসিক এ জে· পি· টেইলারের মতে, বার্লিন চুক্তির দ্বারা বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি হয়। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে ইওরোপের শান্তি ভেঙে পড়ে। (ক) অষ্ট্রিয়া বলকানে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করায় অষ্ট্রো-রুশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্র হয়ে ওঠে। অষ্ট্রো-রুশ প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে কেন্দ্র করে শেষ পর্যন্ত প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়। (খ) অষ্ট্রিয়া, বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা অধিকার করায় অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে সার্বিয়ার বিরোধ দেখা দেয়। এই দুই স্থানের অধিবাসীরা ছিল সার্ব। অতৃপ্ত সার্ব জাতীয়তাবাদ অষ্ট্রিয়ার বিরোধী হয়ে উঠলে অষ্ট্রো-সার্ব দ্বন্দ্ব বাধে। ১৯১৪ খ্রীঃ জনৈক বসনিয়া ছাত্র অষ্ট্রিয় যুবরাজ ফার্দিনান্দকে গুলিতে নিহত করলে এই হত্যাকাণ্ডের জন্যে অষ্ট্রিয়া সার্বিয়াকে দায়ী করে যুদ্ধ ঘোষণা করে। অপর দিকে রাশিয়া, সার্বিয়ার পক্ষ নিয়ে অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে পড়ে। (গ) বুলগেরিয়াকে ব্যবচ্ছেদ করার ফলে অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে বুলগেরিয়ার বিরোধ দেখা দেয়।

আন্তর্জাতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা বৃদ্ধি

জার্মানীর চ্যান্সেলর বিসমার্ক বার্লিন বৈঠকে নিজেকে "সাধু দালাল" বলে অভিহিত করেন। কিন্তু সন্ধির শর্তগুলি রচনার সময় তিনি অষ্ট্রিয়ার প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখান বলে রাশিয়া অভিযোগ করে। এজন্যে রাশিয়া বিরক্ত হয়ে তিন কাইজারের চুক্তি (Drei-Kaiser Bund) ত্যাগ করে। বার্লিন বৈঠকে অষ্ট্রিয়ার প্রতি পক্ষপাত দেখাবার পশ্চাতে বিসমার্কের একটি গভীর পরিকল্পনা ছিল। অষ্ট্রিয়া ছিল একটি জার্মান রাজ্য। অষ্ট্রিয়াকে বলকানে প্রাধান্য বিস্তারের সুযোগ দিয়ে বিসমার্ক ভবিষ্যতে অষ্ট্রিয়ার মাধ্যমে বলকান অঞ্চলে জার্মানীর আধিপত্য বিস্তারের পথ প্রস্তুত করেন। তিনি ত্রিশক্তি চুক্তির দ্বারা অষ্ট্রিয়াকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে জার্মান সাহায্য-দানের প্রতিশ্রুতি দেন। (আগে পৃঃ ৩ ১০ দেখ)।

বিসমার্কের পক্ষপাত আচরণ ঃ রাশিয়ার তিন সম্রাটের চুক্তি ত্যাগ

বার্লিন কংগ্রেসে ইংলণ্ডের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা দরকার। বার্লিন কংগ্রেসে যোগদানের আগেই ডিসরেইলি রুশ দূত সাবুরভের সঙ্গে বার্লিন সন্ধির প্রধান শর্তগুলি স্থির করেন। বার্লিন কংগ্রেসে বিসমার্ক যাতে ইংলণ্ডের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ না করতে পারেন এই উদ্দেশ্যে ডিসরেইলি আগেই সন্ধির মূল শর্তগুলি স্থির করেন।[১] এজন্যে বিসমার্ক বার্লিন বৈঠকে ডিসরেইলিকে লক্ষ্য করে বলেন যে "আমাদের পরিচিত ইহুদিই হল আসল লোক" (ডার

১· Langer—Bismarck and His System of Aliiances.

আল্টে জুড়ে, ডাস ইষ্টডারম্যান : Der Alti Jude das estder Mann or The old Jew, That is the Man)। ডিসরেইলি বার্লিন কংগ্রেস থেকে ফিরে এসে বলেন যে, "বার্লিন বৈঠক থেকে আমি ইংলণ্ডের জন্যে শান্তি ও সম্মান এনেছি"। ("I have brought peace with honour")। তিনি আরও বলেন যে, "ইওরোপে তুর্কী সাম্রাজ্য রক্ষা করা হয়েছে।" কিন্তু একটু গভীরভাবে দেখলে বোঝা যায় যে, ডিসরেইলির এই আত্মপ্রসাদ ছিল ভিত্তিহীন। যদিও রাশিয়ার এককভাবে স্বাক্ষরিত স্যানষ্টিফেনোর সন্ধি পরিবর্তনে রাশিয়াকে বাধ্য করিয়ে ডিসরেইলি অসাধারণ মর্যাদা পান, রাশিয়াকে প্রায় নতজানু হতে বাধ্য করে তবুও বার্লিন সন্ধির দ্বারা ইওরোপে প্রকৃত শান্তি স্থাপিত হয়নি। ডিসরেইলি যদি বলকানে বৃহৎ শক্তিগুলির অধিকার স্থাপনের দ্বারা রাশিয়ার বিস্তার রোধ করার পরিবর্তে বলকান জাতিগুলির স্বাধীনতা স্বীকার করতেন তবে তার দ্বারা রাশিয়ার বিস্তার রোধ করা যেত এবং প্রকৃত শান্তি স্থাপিত হত। কিন্তু তিনি বলকান জাতিগুলির স্বাধীনতার প্রশ্নকে আমল না দিয়ে অদূরদর্শিতা দেখান। অতৃপ্ত বলকান জাতীয়তাবাদ বলকানকে অগ্নিকুণ্ডে পরিণত করে। কাজেই যে peace বা শান্তি স্থাপনের বড়াই তিনি করেন, সেই শান্তি স্থাপিত হয়নি। অতৃপ্ত বলকান জাতীয়তাবাদ থেকে প্রথম ও দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ম্যারিয়ট প্রভৃতি ঐতিহাসিক ডিসরেইলীর সমর্থনে নেতিবাচক যুক্তি দেখান। তা হল এই যে, যদি ডিসরেইলী রুশ স্থাপিত স্যানষ্টিফেনোর সন্ধিকে ছিড়ে ফেলে বার্লিনের সন্ধি স্থাপন না করতেন তবে ভবিষ্যতে বলকান জাতিগুলিকে রাশিয়াই গ্রাস করত, বলকান জাতিগুলি ভবিষ্যতে মুক্তির স্বপ্ন দেখতে পারত না। তাহলে সার্বিয়া, গ্রীস স্বাধীনতার আস্বাদ অনুভব করতে পারত না। কিন্তু এই যুক্তি মোটেই জোরালো নয়। বার্লিন কংগ্রেসে ডিসরেইলীর লক্ষ্য ছিল : (ক) বলকানে রাশিয়ার প্রসারের সম্ভাবনা রোধ করা; (খ) তুরস্ককে টিকিয়ে রাখা; (গ) রাশিয়ার বিরুদ্ধে শক্তিসাম্য স্থাপনের জন্যে তুরস্কের রাজ্যাংশে অষ্ট্রিয়া, ব্রিটেনের আধিপত্য স্থাপন করা। বলকান জাতিগুলির স্বাধীনতার প্রশ্নকে তিনি অবান্তর বলে মনে করতেন। এজন্য পরে বলকান জাতির বিদ্রোহ দেখা দিলে তাঁকে অনুতাপ করতে হয়। ডিসরেইলি অষ্ট্রিয়াকে, রাশিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে খাড়া করার ফলে অষ্ট্রো-রুশ দ্বন্দ্ব[১] শেষ পর্যন্ত প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হয়। বার্লিনের সন্ধির দ্বারা কয়েক দশকের জন্যে ডিসরেইলি তুরস্কের চূড়ান্ত পতন বিলম্বিত করেন। কিন্তু তুরস্কের পতন ছিল অনিবার্য। বার্লিন সন্ধির দ্বারা তা রোধ করা সম্ভব হয়নি। শেষ পর্যন্ত ১৯১২-১৩ খ্রীঃ তুরস্কের ইওরোপীয় সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়। ইতিহাসের এই অনিবার্য পরিণতিকে ডিসরেইলি উপলব্ধি না করায়, বার্লিন চুক্তি একটি অস্থায়ী চুক্তিতে পরিণত হয়।

ইংলন্ডের ভূমিকা

তৃতীয়তঃ, ডিসরেইলি বার্লিন সন্ধি স্বাক্ষর করে "সম্মান" (Honour) দাবী করলেও, তিনি কার্যতঃ এই সম্মান হারিয়ে ফেলেন। ইংলন্ড বরাবর "তুরস্কের সাম্রাজ্যের অখণ্ডতার" নীতিকে অনুসরণ করত। প্যারিসের সন্ধিতে ইংলন্ড তুরস্ককে তার সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষার জন্যে প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু বার্লিনের সন্ধিতে ইংলন্ড সাইপ্রাস অধিকার করে এবং রাশিয়াকে কারস, বাটুম, বেসারাবিয়া দিয়ে এবং বুলগেরিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করে কার্যতঃ তুরস্ককে ব্যবচ্ছেদ করে। তুরস্ক ইংলন্ডের এই কাজকে বিশ্বাসঘাতকতা বলে মনে করত। এজন্যে বার্লিনের সন্ধির পর তুরস্ক, ইংলন্ডের মিত্রতা ত্যাগ করে। ডিসরেইলীর তুরস্ক ব্যবচ্ছেদ নীতিকে মোটেই সম্মান জনক বলা যায়নি। এ· জে· পি· টেইলারের মতে, বার্লিনের বৈঠকে কূটনৈতিক জয়ের ফলে ইংলন্ডের আত্মবিশ্বাস বাড়ে। ইংলন্ড নিজেকে মহা শক্তিধর বলে মনে করে। কিছুদিনের মধ্যে কাইজারের জার্মানীর সামরিক আস্ফালন আরম্ভ হলে ইংলন্ডের গর্ব খর্ব হয়। মোট কথা,

ব্রিটেন কর্তৃক তুরস্কের অখণ্ডতা নীতি ত্যাগ : তুরস্কের হতাশা

১· A.J.P. Taylor—Struggle for Mastery of Europe.

বার্লিনের সন্ধির দ্বারা ইওরোপে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এই সন্ধির দ্বারা বলকান একটি অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হয়। বলকানের অশান্তি থেকেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়। বার্লিন সন্ধির দ্বারা যে অষ্ট্রো-রুশ ও অষ্ট্রো-সার্বো প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হয়, জার্মানী অষ্ট্রিয়ার পক্ষ নিলে তা তীব্র হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত সেরাজেভো হত্যাকাণ্ড উপলক্ষে অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে সার্বিয়ার যুদ্ধ বাধলে রাশিয়া সার্বিয়ার পক্ষ নেয় এবং জার্মানী অষ্ট্রিয়ার পক্ষ নেয়। ইংলন্ডও রাশিয়ার সঙ্গে ত্রিশক্তি আঁতাতের ফলে এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। সুতরাং এই সন্ধির দ্বারা পূর্বাঞ্চল সমস্যার সমাধান আদৌ হয়নি। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর ইংলন্ডের জন্যে সম্মান এবং শান্তি আনার দাবী ছিল অযৌক্তিক।

প্রথম বলকান যুদ্ধ, ১৯১২ খ্রীঃ (The First Balkan war) : বার্লিনের সন্ধির (১৮৭৮ খ্রীঃ) দ্বারা পূর্বাঞ্চল সমস্যার সমাধান না হওয়ায় ক্রমে ক্রমে সঙ্কট বাড়তে থাকে। বুলগেরিয়া বার্লিনের সন্ধির দ্বারা তার ব্যবচ্ছেদকে অস্বীকার করে পূর্ব রুমানিয়াকে বুলগেরিয়ার সহিত ১৮৮৫ খ্রীঃ সংযুক্ত করে। বুলগেরিয়ার শক্তি বৃদ্ধির ফলে, বলকানের অপর বিকাশশীল রাজ্য সার্বিয়া ঈর্ষা বোধ করে। সার্বিয়া বুলগেরিয়াকে আক্রমণ করলেও বুলগেরিয়ার হাতে সার্বিয়া পরাস্ত হয়ে বুখারেষ্টের সন্ধি স্বাক্ষর করে। ইতিমধ্যে ইংলন্ড প্রভৃতি শক্তি উপলব্ধি করে যে, বুলগেরিয়ার সহিত পূর্ব রুমেলিয়ার সংযুক্তি সমর্থন না করলে মহা গোলযোগ হবে। সুতরাং ইংলন্ড প্রভৃতি শক্তির চাপে বুলগেরিয়ার সহিত পূর্ব রুমানিয়ার সংযুক্তি তুর্কী সুলতান মেনে নেন। কিন্তু বুলগেরিয়ার শক্তি বৃদ্ধির ফলে বলকানের অপর জাতিগুলি আশঙ্কা বোধ করে।

বুলগেরিয়ার শক্তি বৃদ্ধি : বলকানে আশঙ্কা

ইতিমধ্যে ক্রীট দ্বীপ নিয়ে গ্রীস ও তুরস্কের মধ্যে সঙ্ঘর্ষ বাধে। বার্লিন সন্ধির দ্বারা ক্রীট দ্বীপকে তুরস্কের অধীনে রাখা হয়। কিন্তু এই দ্বীপের গ্রীক অধিবাসীরা গ্রীসের সঙ্গে সংযুক্তির দাবী জানায়। শেষ পর্যন্ত ক্রীট দ্বীপের ওপর অধিকার উপলক্ষে গ্রীক-তুরস্ক যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ইংলন্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি শক্তিগুলির হস্তক্ষেপে তুর্কী সুলতান ক্রীটের স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার স্বীকার করেন। এই ব্যবস্থায় গ্রীস দারুণ অসন্তুষ্ট হয়।

ক্রীট দ্বীপের সমস্যা

এইভাবে বার্লিন সন্ধির পর বলকানের জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহে তুরস্কের সাম্রাজ্যে ভাঙন দেখা দেয়। তুর্কী সুলতান বলকানের এই বিদ্রোহ দমনে ব্যর্থ হন। সুলতান আবদুল হামিদের এই ব্যর্থতার জন্যে তুর্কী জাতীয়তাবাদী কর্মচারী ও সেনাদের মধ্যে দারুণ বিক্ষোভ দেখা দেয়। এরা অনেকেই ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত। এরা তুরস্কে নির্বাচিত সরকার প্রবর্তন এবং তুর্কী সাম্রাজ্য রক্ষার জন্যে দাবী জানায়। এই নব ভাবে উদ্দীপিত তুর্কী যুবকদের নাম ছিল "তরুণ তুর্কী" (Young Turks)। ১৯০৮ খ্রীঃ তরুণ তুর্কীদের বিদ্রোহের ফলে সুলতান আবদুল হামিদ পদচ্যুত হন। তরুণ তুর্কী গোষ্ঠী সরকারি ক্ষমতা অধিকার করে দৃঢ় হাতে বলকান বিদ্রোহীদের মোকাবিলার চেষ্টা করে। তরুণ তুর্কীরা খ্রীষ্টীয় প্রজাদের বলপূর্বক তুর্কীকরণ আরম্ভ করে এবং তাদের ওপর দারুণ অত্যাচার চালায়।

তরুণ তুর্কীদলের উদ্ভব : সাম্রাজ্যে দমন নীতি

এদিকে তুরস্কের শাসন ক্ষমতার জন্যে তরুণ তুর্কীদের সঙ্গে সুলতানের বিরোধের সুযোগে বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা প্রদেশ দুটিকে অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যভুক্ত করে নেয়। বলকানের জাতিগুলিও এই সুযোগে সঙ্ঘবদ্ধভাবে তাদের স্বাধীনতা অর্জনের সঙ্কল্প নেয়। বলকান জাতিগুলি একথা উপলব্ধি করে যে, বৃহৎ শক্তিগুলি তাদের স্বাধীনতা লাভে সাহায্য করবে না। বলকানের জাতিগুলিকে নিজ চেষ্টায় স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে। ভেনিজোলেস

বলকান লীগ গঠন

(Venizoles নামে এক গ্রীক রাজনীতিবিদ বলকান জাতিগুলিকে তাদের মধ্যে ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা বুঝাতে সক্ষম হন। এর ফলে ১৯১২ খ্রীঃ বলকান লীগ গঠিত হয় এই সঙ্ঘের লক্ষ্য ছিল তুরস্কের হাত থেকে বলকান জাতিগুলির মুক্তি অর্জন করা।

দার্দানালিস প্রণালীতে অবাধে রুশ জাহাজের চলাচল আন্তর্জাতিক কনভেনশন দ্বারা নিষিদ্ধ করায় রাশিয়া অসন্তুষ্ট ছিল। ঐতিহাসিক ফে-র মতে (John Fay) রুশ মন্ত্রী আইভোলস্কী মনে করেন যে, বলকানে নতুনভাবে যুদ্ধ-বিগ্রহ না বাধলে রাশিয়া জাহাজ চলাচল সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা ভাঙার সুযোগ পাবে না। এজন্য রুশ মন্ত্রী আইভোলস্কি (Izvolski) বলকানে গোলযোগ সৃষ্টির পক্ষপাতী ছিলেন। এজন্য তিনি বলকান লীগকে গোপনে সমর্থন দেন।

রুশ নীতি

ইতিমধ্যে উগ্রপন্থী জাতীয়তাবাদী তরুণ তুর্কীদের দ্বারা ম্যাসিডোনিয়ার অধিবাসীরা নির্যাতিত হয়। বলকান লীগ দাবী জানায় যে, তুর্কী সুলতানকে ম্যাসিডোনিয়ায় উদারনৈতিক শাসন ও অন্যান্য প্রতিশ্রুত সংস্কার চালু করতে হবে। তুর্কী সরকার এই দাবী অগ্রাহ্য করলে বলকান লীগ তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। গ্রীস, সার্বিয়া, বুলগেরিয়া ও মন্টিনেগ্রো বলকান লীগের এই চার সদস্য তুরস্ককে চারদিক থেকে আক্রমণ করায় তুরস্কের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। এই যুদ্ধের নাম ছিল প্রথম বলকান যুদ্ধ (১৯১২ খ্রীঃ)।

প্রথম বলকান যুদ্ধ

তুর্কী সরকার লণ্ডনের সন্ধি (Treaty of London), ১৯১৩ খ্রীঃ দ্বারা প্রথম বলকান যুদ্ধের অবসান ঘটান। কনস্টান্টিনোপল ও থ্রেস বাদে বলকানের অপর সকল অঞ্চল থেকে তুরস্ক তার অধিকার প্রত্যাহার করে। তুরস্কের ইওরোপীয় সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। ঈজিয়ান সমুদ্র থেকে কৃষ্ণ সাগর পর্যন্ত সকল স্থান তুরস্ক বলকান লীগের হাতে ছেড়ে দেয়। আলবানিয়াকে একটি স্বয়ং-শাসিত রাজ্য হিসেবে স্বীকার করা হয়। ক্রীট দ্বীপ গ্রীসকে ছেড়ে দেওয়া হয়। বলকান যুদ্ধের ফলাফল ছিল সুদূর-প্রসারী। বলকানে তুর্কী সাম্রাজ্য ধ্বংসের ফলে ইওরোপের শক্তিসাম্যের ক্ষেত্রে অস্থিরতা দেখা দেয়। কারণ তুরস্কের অধীনতা থেকে মুক্ত বিরাট ভূভাগের আধিপত্য এখন বলকান লীগের ওপর বর্তায়।

লণ্ডনের সন্ধি ঃ ১৯১৩ খ্রীঃ

দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধ, ১৯১৩ খ্রীঃ (The Second Balkan War) ঃ

তুরস্কের হাত থেকে বলকানকে মুক্ত করার পর (১৯১৩ খ্রীঃ) বলকান লীগের সদস্যদের মধ্যে মুক্ত অঞ্চলের অধিকার নিয়ে ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ঈর্ষা দেখা দেয়। তুরস্ক যে সকল স্থান বলকান লীগের হাতে ছেড়ে দেয়, তার অধিকার নিয়ে সার্বিয়া ও বুলগেরিয়ার মধ্যে ভয়ানক বিবাদ আরম্ভ হয়। সার্বিয়া ছিল সমুদ্র সংযোগহীন রাজ্য। সুতরাং সার্বিয়া দাবী করে যে, মুক্তিপ্রাপ্ত ম্যাসিডোনিয়ার বৃহৎ অংশ সার্বিয়ার সঙ্গে যুক্ত হলে সার্বিয়া ঈজিয়ান সমুদ্র পর্যন্ত যোগাযোগ স্থাপন করতে পারবে। কিন্তু বুলগেরিয়া, সার্বিয়ার এই দাবী অগ্রাহ্য করে। এদিকে ম্যাসিডোনিয়ায় সার্ব, বুলগার ও গ্রীক জাতির লোক বাস করত। এই কারণে এই জাতিগুলি ম্যাসিডোনিয়ার ব্যবচ্ছেদ দাবী করে। বুলগেরিয়া এই দাবীকে অগ্রাহ্য করে।

সার্বো-বুলগেরিয়া দ্বন্দ্ব ঃ

ম্যাসিডোনিয়ার সমস্যা

১৯১৩ খ্রীঃ বুলগেরিয়ার সেনাদল গ্রীস ও সার্বিয়াকে আক্রমণ করলে দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধ শুরু হয়। বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধরত গ্রীস ও সার্বিয়ার সঙ্গে রুমানিয়া ও মন্টিনেগ্রো যোগ দেয়। সম্মিলিত আক্রমণের ফলে বুলগেরিয়া পরাস্ত হয়ে বুখারেস্টের সন্ধি (১৯১৩ খ্রীঃ) স্বাক্ষর করে।

দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধ

বুখারেস্টের সন্ধির দ্বারা ম্যাসিডোনিয়ার বৃহৎ ভাগ সার্বিয়া, গ্রীস ও মন্টিনেগ্রো পায়। বুলগেরিয়া, রুমানিয়াকে দোবরুজা ও সিলিষ্টিয়া ছেড়ে দেয়। তুরস্ক এ্যাড্রিয়ানোপল পায়। দুই বলকান যুদ্ধের ফলে তুরস্কের ইওরোপীয় সাম্রাজ্য চূড়ান্তভাবে ধ্বংস হয়। তুরস্ক অতঃপর একটি এশীয় শক্তিতে পরিণত হয়। বলকান যুদ্ধের ফলে সার্বিয়া প্রবল হয়ে ওঠে।অতঃপর সার্বিয়া বসনিয়া ও হার্জেগেভিনা উদ্ধারের জন্যে অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হয়। বলকান যুদ্ধ ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তাবনা বিশেষ। এই যুদ্ধের ফলে উদ্ভূত অষ্ট্রো-সার্বিয়া দ্বন্দ্ব প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করে।

পাঠ্যসূচী

১। Seton Watson—The Rise of Nationalities in the Balkan.
২। A. J. P. Taylor—Struggle of Mastery of Europe.
৩। Devies—History of the Near East.
৪। Temperley—Cambridge History of British Foreign Policy.
৫। Temperley—England and the Near East.
৬। J. A. R. Marriot—Eastern Question.
৭। Langer—Bismarck and His system of Alliances.

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়
তৃতীয় ফরাসী প্রজাতন্ত্র
(The Third French Republic)

তৃতীয় প্রজাতন্ত্র ও থিয়ার্সের নীতি (The Third Republic and the policy of Thiers) : ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয় যুদ্ধে ১৮৭০ খ্রীঃ ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন পরাজিত ও বন্দী হলে ফ্রান্সে দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের (Second Empire) অবসান ঘটে। ফরাসী প্রজাতান্ত্রিক দল ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৮৭০ খ্রীঃ ফ্রান্সে তৃতীয় প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করে। তৃতীয় প্রজাতন্ত্রের সংবিধান রচিত হওয়া সাপেক্ষে ফ্রান্সে এক অস্থায়ী সরকার স্থাপিত হয়। থিয়ার্স নামক প্রখ্যাত রাজনীতিজ্ঞ এই অস্থায়ী প্রজাতন্ত্রী সরকারের রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হন। থিয়ার্স সর্বপ্রথম বিজয়ী জার্মান সরকারের সঙ্গে ফ্রাঙ্কফুর্টের সন্ধি (Treaty of Frankfurt) স্বাক্ষর করেন। সন্ধি প্রস্তাব আলোচনার সময় থিয়ার্স বারবার বিসমার্ককে সতর্ক করেন যে, ফ্রান্সের ন্যায় আত্মবর্গী দেশকে অপমানজনক সন্ধি স্বাক্ষরে বাধ্য করলে, ফ্রান্স জার্মানিকে কখনও ক্ষমা করবে না। কিন্তু বিসমার্ক থিয়ার্সের এই সতর্কবাণীতে কর্ণপাত করেননি। পরাজিত এবং বিধ্বস্ত ফ্রান্স ফ্রাঙ্কফুর্ট সন্ধির ১৮৭১ খ্রীঃ দ্বারা জার্মানীকে অলসাস ও লোরেন প্রদেশ ছেড়ে দিতে এবং বিরাট অঙ্কের অর্থ ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হয়। আলসাসের ফরাসী অধিবাসীরা জার্মানীর অধীনতা স্বীকারে বাধ্য হয়। এই সন্ধি ভবিষ্যতে ফ্রাঙ্কো-জার্মান সম্পর্ককে বিষময় করে তুলে এবং শেষ পর্যন্ত প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ফ্রান্স এই দুই প্রদেশ জার্মানীর হাত থেকে পুনরুদ্ধার করে।

তৃতীয় প্রজাতন্ত্র : ফ্রাঙ্কফুর্টের সন্ধি

থিয়ার্স লক্ষ্য করেন যে, জার্মানীকে ক্ষতিপূরণের অর্থ পরিশোধ না করলে জার্মান সেনা ফরাসী ভূমি ত্যাগ করবে না। এজন্য থিয়ার্স বহু চেষ্টায় ১৮৭৩ খ্রীঃ মধ্যে জার্মান ক্ষতিপূরণ প্রদান করে ফ্রান্সকে শত্রু সেনা মুক্ত করেন। ফরাসীরা এর ফলে হাঁফ ছাড়তে পারে এবং প্রজাতন্ত্রী সরকারের জনপ্রিয়তা বাড়ে।

প্যারিস কমিউনের বিদ্রোহ (Revolt of the Paris Commune) : অস্থায়ী প্রজাতন্ত্রী সরকারের সম্মুখে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ সমস্যা ছিল প্যারিস কমিউনের বিদ্রোহ (Revolt of the Paris Commune)।প্যারী কমিউনের বিদ্রোহ পরবর্তী কালে এক রোমান্টিক ভাবালুতায় মণ্ডিত হয়ে, কমিউনিষ্ট আন্দোলনের এক উজ্জ্বল উত্থানরূপে পরিগণিত হয়ে থাকে। কার্ল মার্কস তাঁর সিভিল ওয়ার ইন ফ্রান্স (Civil war in France) নামক গ্রন্থে প্যারী কমিউনের বিদ্রোহকে প্রলিতারিয় বনাম বুর্জোয়া শ্রেণী যুদ্ধের নিদর্শন রূপে ব্যাখ্যা করায় প্যারিস কমিউনের বিদ্রোহ বহু সমাজতন্ত্রীর কাছে আবেগপূর্ণ ঘটনা বলে পরিগণিত হয়। অপর দিকে, ডেভিড টমসনের মতে প্যারিস কমিউনের বিদ্রোহে প্রলিতারিয় শ্রেণী সংগ্রামের ছিটে ফোঁটা ছিল না। প্যারিস কমিউনের বিদ্রোহে ব্যক্তিগত সম্পত্তি লোপ করে তা রাষ্ট্রীয়করণের কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ডেভিড টমসনের মতে, প্যারিস কমিউনের বিদ্রোহকে শ্রেণী সংগ্রাম রূপে ব্যাখ্যা করা কেবলমাত্র তথ্যের বিকৃতি ছাড়া আর কিছু নয়। এমন কি "কমিউনার" অর্থাৎ কমিউনের সমর্থকদের কমিউনিষ্ট বলে মনে করা হয়। ক্যাপিচুলার অর্থাৎ যাঁরা জার্মানীর কাছে আত্মসমর্পণ করেন কথাটিকে ক্যাপিটালিষ্ট বা পুঁজিবাদী বলে চালু করার চেষ্টা করা হয়। ডেভিড টমসনের

প্যারিস কমিউনের বিদ্রোহের কারণ

মতে, প্যারিস কমিউনের বিদ্রোহ ছিল আসলে প্যারিসের অতীত বিপ্লবী ঐতিহ্যবাদী জনতার শেষতম অভ্যুত্থান। যারা একদা ১৭৮৯ ও ১৮৪৮ খ্রীঃ প্যারিসের পথে ব্যারিকেড রচনা করে লড়াই করেছিল, তাদেরই উত্তরাধিকারীরা ১৮৭০-৭১ খ্রীঃ অবশিষ্ট ফ্রান্সের ওপর প্যারিসের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে, ১৮৭০-৭১ খ্রীঃ শেষতম অভ্যুত্থান ঘটায়।

ডেভিড টমসন বলেন যে প্যারিস কমিউনের কার্য নির্বাহক সমিতির ৩০ জন সদস্য ছিল তার মধ্যে মাত্র ২জন ছিলেন মার্কসবাদী এবং এঁদের সঙ্গে মার্কসের যোগাযোগ ছিল। বাকি সব ছিল অমার্কসীয় যথা আগষ্ট ব্ল্যাঙ্কি ও তাঁর নৈরাজ্যবাদী বিপ্লবী শিষ্যগণ, সমাজতন্ত্রবাদী কুরিয়ে, লুই ব্ল্যাঙ্ক এবং সর্বোপরি জ্যাকোবিন দল ও তাদের নেতা ফেনিক্স পিয়াউ প্রভৃতি। জ্যাকোবিনরা ফরাসী বিপ্লবের আদর্শে প্যারিস কমিউন গঠন করে এবং ব্যারিকেড স্থাপন করে জ্যাকোবিন কায়দায় প্রজাতন্ত্রের সেনাদের সঙ্গে লড়াই চালায়। যদিও প্যারিসে কমিউন স্থাপিত হয়, প্রতিগোষ্ঠীর কাছে কমিউন কথাটির স্বতন্ত্র অর্থ ছিল।

প্যারিস কমিউনের বিদ্রোহের কারণ সম্পর্কে রক্ষণশীল ঐতিহাসিকরা যে ব্যাখ্যা দেন তা প্রথমে উল্লেখ্য। (১) প্যারিস নগরী ছিল বিপ্লবের তীর্থভূমি। এই শহরে প্রজাতান্ত্রিক দলের শক্তি সর্বাধিক বেশী ছিল। ফলে প্যারিস নগরীর লোকেরা মনে করত যে, প্রজাতন্ত্রী ফ্রান্সের যোগ্য রাজধানী হল প্যারিস নগরী। কিন্তু প্রজাতন্ত্রী সরকার প্যারিসকে রাজধানী হিসেবে নির্বাচন না করে ভার্সাই নগরীতে প্রতিনিধিসভা স্থাপন করলে প্যারিসের আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগে। প্রজাতন্ত্রী সরকার জার্মানীর বিজয়ী বাহিনীকে প্যারিসের রাস্তায় বিজয় কুচকাওয়াজের অনুমতি দিলে প্যারিসবাসীর আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগে। (২) অস্থায়ী সরকারের জাতীয় সভার (National Assembly) নির্বাচনে প্রজাতন্ত্রী দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। জাতীয় সভায় বহু রাজতন্ত্রী নির্বাচিত হয়। ভার্সাই নগরী ছিল রাজতন্ত্রী ফ্রান্সের ঐতিহাসিক রাজধানী। ভার্সাই শহরের লোকেরাও ছিল রাজতন্ত্রবাদী। সুতরাং প্যারিসের প্রজাতন্ত্রীরা আশঙ্কা করে যে, ভার্সাইয়ে রাজধানী স্থাপিত হলে প্রজাতন্ত্র ধ্বংস হয়ে রাজতন্ত্র ফিরে আসবে। (৩) জার্মান আক্রমণের বিরুদ্ধে প্যারিসের নাগরিকরা তাদের জীবন পণ করে বাধা দেয়। প্যারিসের প্রতি গৃহে দুর্গের ন্যায় জার্মানদের প্রতিরোধ করে। শেষ পর্যন্ত খাদ্যাভাবে প্যারিস জার্মানদের নিকট আত্মসমর্পণ করে। এই ঐতিহাসিক প্রতিরোধের ও ত্যাগ স্বীকারের বিনিময়ে প্যারিসকে রাজধানী হিসেবে নির্বাচন না করায় এই নগরের ঘোর হতাশা দেখা দেয়।

(৪) ভার্সাই শহরে রাজধানী স্থাপিত হবার ফলে প্যারিসের বণিক ও দোকানদারেরা আশঙ্কা করে যে, তাদের ব্যবসায় মন্দা দেখা দেবে। ভার্সাই সরকারি আনুকূল্যে ফুলে-ফেঁপে উঠবে। বিপ্লবী, দেশপ্রেমী প্যারিসের নাগরিকরা হতাশায় ও দারিদ্র্যে নিমজ্জিত হবে। জার্মান সেনা প্যারিস অবরোধ করলে প্যারিসের কল-কারখানা বন্ধ হয়ে যায়। বেকার শ্রমিকরা প্যারিস রক্ষার জন্যে ন্যাশন্যাল গার্ডে নাম লিখিয়ে নামে মাত্র ভাতায় প্যারিসকে রক্ষার চেষ্টা করে। প্যারিসের বেকার ও দরিদ্র নাগরিকদের নিয়ে জাতীয় রক্ষীবাহিনী বা ন্যাশানাল গার্ড গঠিত হয়েছিল। এরা দৈনিক ১½ ফ্রাঁ ভাতা পেত। প্রজাতন্ত্রী সরকার প্যারিসের এই রক্ষীবাহিনীর ভাতা বন্ধ করলে বহু লোক এই সামান্যতম জীবিকা হতে বঞ্চিত হয়। (৫) এদিকে অস্থায়ী সরকার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিয়ে প্যারিসের নাগরিকদের বকেয়া কর, বাড়ির খাজনা প্রভৃতি অবিলম্বে শোধ দিতে বলেন। এতে প্যারিসের লোক ভয়ঙ্কর চটে যায়। এই সকল কারণে প্যারিস তারা নির্বাচিত কমিউনকে স্বাধীন সরকার হিসেবে ঘোষণা করে কেন্দ্রীয় প্রজাতন্ত্রী সরকারের অধীনতা অগ্রাহ্য করে। জ্যাকোবিন বিপ্লবীরা রাষ্ট্রের অধীনে কমিউন চায়নি, কমিউনের অধীনে রাষ্ট্রের কথা ভেবেছিল। তারা চেয়েছিল যে, ফরাসী প্রজাতন্ত্র হবে কতকগুলি স্বাধীন কমিউনের দ্বারা গঠিত যুক্তরাষ্ট্র (A federation of Communes)। তারা ফরাসী বিপ্লবের সাম্য, গণতন্ত্রের আদর্শে বিশ্বাসী ছিল। রুশোর

অর্থনৈতিক কারণ

সমাজতন্ত্রবাদ তখনও তাদের অনুপ্রাণিত করত। ডেভিড টমসন বলেন যে, ১৮৪৮ খ্রীঃ বিপ্লবে প্যারিসের শ্রমিক ও সমাজতন্ত্রীদের হাত থেকে বুর্জোয়ারা বিপ্লবের রশি ছিনিয়ে নেয়। শ্রমিকরা সেকথা ভোলেনি। ১৮৭০ খ্রীঃ তারা এজন্য কমিউনকে দৃঢ় সমর্থন জানায়।

(৬) ঐতিহাসিক থিওডোর জেল্ডিন উপরোক্ত কারণগুলিকে স্বীকার করলেও, প্যারিসের বিদ্রোহের পশ্চাতে আরও গভীর মূল কারণ ছিল বলে মনে করেন। প্যারিস ছিল বামপন্থী ও বিপ্লবী চিন্তাধারার পীঠস্থান। ভার্সাইয়ের জাতীয় সভার নেতৃত্বে প্যারিসের জ্যাকোবিন ও নৈরাজ্যবাদী গোষ্ঠীর আস্থা ছিল না। এরা এই কারণে প্যারিসে একটি সমাজতান্ত্রিক সরকার স্থাপনের চেষ্টা করে। (৭) জেল্ডিন বলেন যে, প্যারিস কমিউনের বিদ্রোহ ছিল একটি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। এদের নিকট কেবলমাত্র প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই শেষ কথা ছিল না। ধনবণ্টন, উৎপাদন ব্যবস্থার ওপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ, জীবিকার অধিকার প্রভৃতি মৌলিক অধিকার অর্জনও ছিল এই বিপ্লবের লক্ষ্য। এক কথায় ফ্রান্সের নিপীড়িত ও অধিকারহীন শ্রেণীর আত্মপ্রকাশ ছিল এই বিপ্লবের মূল। ফরাসী সমাজতান্ত্রিক লুই ব্লাঙ্ক মন্তব্য করেন যে, "ফ্রান্সে একটি শ্রেণী যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে।" (৮) প্যারিসের বিপ্লবীদের দাবী ছিল সরকারের ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ। রাজতন্ত্রী যুগে ফ্রান্সের গ্রাম ও শহরগুলির স্বায়ত্বশাসনের অধিকার লোপ করে শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রীকরণ করা হয়। প্যারিসের বিপ্লবীদের মতে, কেন্দ্রীয় সরকার ছিল স্বৈরাচারী ও স্থানীয় স্বার্থের প্রতি উদাসীন। তারা দাবী করে যে, প্রতি অঞ্চলে নির্বাচিত প্রতিনিধি নিয়ে কমিউন গঠন করে এদের হাতে স্থানীয় শাসনের দায়িত্ব দিতে হবে। কমিউনগুলির প্রতিনিধি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করতে হবে। ৯০ জন সদস্যের দ্বারা প্যারিসে কমিউন গঠন করা হয়। প্যারিসের কমিউনিষ্ট সোস্যালিষ্ট ও প্রজাতন্ত্রীরা এই কমিউনের সমর্থনে দাঁড়ায়। বিক্ষুব্ধ ও বিতাড়িত জাতীয় রক্ষী বাহিনী অস্ত্র হাতে নিয়ে এই কমিউনের পাশে দাঁড়ায়।

সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রভাব

অস্থায়ী প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি থিয়ার্স সর্বপ্রথম জাতিকে বুঝিয়ে দেন যে, তৃতীয় প্রজাতন্ত্র স্থায়ী হয়েছে। ফ্রান্সে আর রাজতন্ত্র স্থাপিত হওয়ার সম্ভাবনা আদপেই নেই। প্যারিস কমিউনের বিদ্রোহ দমন না করা হলে ফ্রান্সের জাতীয় ঐক্য ভেঙে পড়বে। অতঃপর তিনি সেনাপতি ম্যাকমেহনকে প্যারিসের বিদ্রোহ দমনে নিয়োগ করেন। তিন সপ্তাহব্যাপী প্রচণ্ড যুদ্ধ ও হত্যাকাণ্ডের পর প্যারিস নগরী ম্যাকমেহনের নিকট আত্মসমর্পণ করে। এই গৃহযুদ্ধে প্রায় ২০ হাজার ফরাসী নাগরিক নিহত হয়। লাল সমাজতন্ত্রীদের মৃতদেহের ওপর দিয়ে হেঁটে বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রী সেনা প্যারিসে তাদের বিজয় পতাকা উড়িয়ে দেয়। বিদ্রোহী কম্যুনারেসগণ শত্রু প্রজাতন্ত্রীদের প্রতি ভীষণ নিষ্ঠুরতা দেখায়। মার্কসবাদীদের মতে, এই নিষ্ঠুরতা ছিল তাদের শ্রেণীগত ঘৃণার প্রকাশ। তারা যে সকল ব্যক্তিকে Hostage বা জামিন হিসেবে বন্দী রেখেছিল, কমিউন আত্মসমর্পনের আগে তাদের নৃশংসভাবে হত্যা করে। প্যারিসের আর্ক বিশপকেও তারা হত্যা করে। প্যারিস কমিউনের প্রতিরোধ দমিত হলে রাষ্ট্রপতি থিয়ার্স নিষ্ঠুর প্রতিহিংসা নীতি গ্রহণ করেন। বিপ্লবী কম্যুনারেসদের রক্তে তিনি তাঁর হাত রাঙা করেন। জাতীয় রক্ষীদের পোষাক পরা কোন লোক দেখা গেলে নির্বিচারে গুলিতে তাকে ঝাঁঝরা করে দেওয়া হয়। প্রায় $1\frac{1}{2}$ লক্ষ লোককে কোন না কোন ভাবে শাস্তি দেওয়া হয়। প্যারিসের বিপ্লবী এবং প্রতিবিপ্লবী প্রজাতান্ত্রিক সরকারের পারস্পরিক নৃশংসতা সমগ্র ইওরোপকে স্তম্ভিত করে। সম্পত্তিবান লোকেরা সোস্যালিষ্ট ও কম্যুনিষ্টদের নিজ নিজ দেশে সন্দেহের চোখে দেখতে থাকে। সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন এজন্য ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্থ হয়। অপর দিকে সমাজতন্ত্রবাদীরা প্যারিসের বিদ্রোহকে একটি রোমান্টিক দৃষ্টিতে আবেগপূর্ণভাবে সমাজতন্ত্রীদের আত্মদান বলে মনে করে। দীর্ঘকাল ধরে প্যারিস যা

প্যারিসের বিদ্রোহ দমন

বলত গোটা ফ্রান্স তা শুনত। এখন প্যারিস কমিউনের পতন হলে ফ্রান্সের ওপর প্যারিসের প্রভাব বিনষ্ট হয়।

রাষ্ট্রপতি থিয়ার্স ফরাসী জনসাধারণকে সন্তুষ্ট করার জন্যে কিছু কিছু সংস্কার প্রবর্তন করেন। (১) তিনি শাসন ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করে ছোট ছোট শহরগুলির মেয়র ও নগরসভার সদস্যদের নির্বাচনের মাধ্যমে নিয়োগের প্রথা চালু করেন। বড় শহরগুলির মেয়র বা নগরপ্রধানকে কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা নিযুক্ত করার ব্যবস্থা বহাল রাখা হয়। (২) স্থানীয় নির্বাচিত সভাগুলির ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়। (৩) তিনি গণভোটে নির্বাচিত জাতীয় সভাকে ফ্রান্সের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলে ঘোষণা করেন। (৪) প্রাপ্তবয়স্ক ফরাসী পুরুষদের বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা গ্রহণের নিয়ম চালু করা হয়। (৫) ফরাসী বাহিনীকে সর্বাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত করা হয়।

থিয়ার্সের সংস্কার নীতি

১৮৭৩ খ্রীঃ তৃতীয় প্রজাতন্ত্রের সংবিধান গৃহীত হয়। ফ্রান্সে দ্বিকক্ষ-বিশিষ্ট আইনসভা এবং গণভোট প্রথা চালু হয়। এই সংবিধানে রাষ্ট্রপতিকে শাসন বিভাগের প্রধান করা হয়। তাঁর কার্যকাল ৭ বছর স্থির করা হয়। মন্ত্রীসভাকে তার কাজের জন্যে আইনসভার নিকট দায়িত্ববদ্ধ করা হয়। নতুন সংবিধান অনুসারে জেনারেল ম্যাকমেহন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। প্রয়োজন বোধ করলে রাষ্ট্রপতি, সিনেটের অনুমোদনক্রমে নিম্নকক্ষ বা প্রতিনিধি সভা ভেঙে দিতে পারবেন বলা হয়।

নূতন সংবিধান গ্রহণ

প্রেসিডেন্ট ম্যাকমেহনের শাসনকালে, রাজতন্ত্রীদের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের জন্যে যে বিল আনা হয়, তিনি তার বিরোধিতা করায় ফ্রান্সে শাসনতান্ত্রিক সঙ্কট দেখা দেয়। প্রজাতান্ত্রিকরা অভিযোগ করে যে, প্রেসিডেন্ট ম্যাকমেহন ফ্রান্সে রাজতন্ত্র ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় আছেন। এদিকে বিসমার্ক আশঙ্কা করেন যে, ফ্রান্সে রাজতন্ত্র ফিরলে ইওরোপের অন্যান্য দেশের রাজশক্তিগুলি ফ্রান্সের প্রতি সহানুভূতি জানাবে। প্রজাতন্ত্রী ফ্রান্স ইওরোপে যে মিত্রহীনতায় ভুগছে তার অবসান ঘটবে। ফ্রান্স মিত্রলাভ করলে শক্তিশালী হয়ে ১৮৭০ খ্রীঃ পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে আক্রমণ করবে। সুতরাং ফ্রান্সে যাতে প্রজাতন্ত্র বহাল থাকে এজন্য বিসমার্ক প্রভাব খাটান। এই সঙ্গে তিনি ফ্রান্সের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি লক্ষ্য করে "যুদ্ধাতঙ্ক" (War scare) সৃষ্টি করেন। যাহোক, রাশিয়া ও ইংলন্ডের চাপে বিসমার্ক ফ্রান্সে হস্তক্ষেপ করতে বিরত থাকেন। ১৮৭৯ খ্রীঃ ম্যাকমেহন রাষ্ট্রপতির পদে ইস্তফা দেন।

রাষ্ট্রপতি ম্যাকমেহনের শাসনকাল : যুদ্ধাতঙ্ক

পরবর্তী রাষ্ট্রপতি ছিলেন জুলেস গ্রেভী (Jules Grevy)। গ্রেভী, ফ্রান্সের রাজধানী রাজতন্ত্রী শহর ভার্সাই থেকে প্রজাতন্ত্রী প্যারিসে স্থানান্তর করেন। তিনি শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের অধিকার এবং মিউনিসিপ্যালিটিগুলির অবাধ নির্বাচনের অধিকার দিলে ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্রের ভিত্তি শক্ত হয়। জুলেস গ্রেভীর পর জুলেস ফেরী রাষ্ট্রপতির পদে বসেন। জুলেস ফেরীর শাসনকালে সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতি-প্রবণতা বাড়লে এবং পানামা খাল সম্বন্ধে অর্থনৈতিক কেলেঙ্কারি ঘটলে প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে রাজতন্ত্রীরা সোচ্চার হয়।

জুলেসের শাসন

বুলাঞ্জিষ্ট আন্দোলন (The Boulangist Movement) : জুলেস ফেরী রাষ্ট্রপতি পদ হতে পদত্যাগ করার পর, তৃতীয় প্রজাতন্ত্র এক অভূতপূর্ব বিপদের সম্মুখীন হয়। জুলেস ফেরীর শাসনকালে মন্ত্রীসভা ও উচ্চ কর্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতি-প্রবণতা বাড়ায় প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে দারুণ সমালোচনা দেখা দেয়। পানামা খাল সম্পর্কিত কেলেঙ্কারির দরুন সরকারের খুব বদনাম হয়। জুলেস ফেরীর পর কার্নোত (Carnot) তৃতীয় প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির পদে বসেন। বিখ্যাত প্রজাতান্ত্রিক নেতা

দুর্নীতির প্রবণতা

গ্যামবেটার (Gambetter) মৃত্যু ঘটায় প্রজাতান্ত্রিক দলের শৃঙ্খলায় ভাঙন ধরে। এদিকে সরকারের বাড়তি ব্যয় নির্বাহের জন্যে করের হার বাড়লে লোকে প্রজাতন্ত্রী সরকারের ওপর খাপ্পা হয়ে ওঠে।

এই সময়ে ফ্রান্সের অন্যতম জনপ্রিয় ও বক্তৃতাবাজ সেনাপতি বুলাঞ্জার (Boulanger) সামরিক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী নিযুক্ত হন। বুলাঞ্জার ছিলেন ছদ্ম স্বৈরতন্ত্রী। তিনি মুখে প্রজাতন্ত্রের প্রতি আনুগত্য জানালেও তাঁর লক্ষ্য ছিল সামরিক একনায়কতন্ত্র স্থাপন করা। এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্যে তিনি প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে তুমুল সমালোচনা এবং ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা বাড়াবার চেষ্টা করেন। বিশেষতঃ প্রজাতন্ত্রী সরকারের উচ্চস্তরে দুর্নীতির জন্যে লোকে বিরক্ত ছিল। বুলাঞ্জার সেই দুর্নীতির বিরুদ্ধে মুখর হলে লোকে তাঁর কথায় আকৃষ্ট হয়। রাষ্ট্রপতি জুলেস গ্রেভীর জামাতা ড্যানিয়েল ও উইলসন তাঁর শ্বশুরের পদ মর্যাদার সুযোগ নিয়ে লিজন অব অনার প্রভৃতি খেতাব অর্থের বিনিময়ে দেওয়ার কাজে লিপ্ত ছিলেন। বুলাঞ্জার এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোরগোল তুলে তাঁর ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা ভয়ানক বাড়িয়ে ফেলেন। সামরিক বিভাগের সমর্থন লাভের জন্যে তিনি সামরিক সংস্কার প্রবর্তন করেন। সাধারণ সেনাদের বেতন বৃদ্ধি করেন। ক্রমে তিনি সংবিধান সংশোধনের দাবী তোলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ব্যাপক প্রচার চালান। তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল সংবিধানের সংশোধনের ছলে নিজ একনায়কতন্ত্র স্থাপন করা।

বুলাঞ্জারের স্বৈরতন্ত্রবাদ

এরপর বুলাঞ্জার আইনসভার সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়ে সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা চালিয়ে যান। প্রজাতন্ত্র বিরোধী সকল গোষ্ঠী জেনারেল বুলাঞ্জারের পিছনে এসে দাঁড়ায়। রাজতন্ত্রী ক্যাথলিক দলও বুলাঞ্জারের পক্ষ নেয়।

প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর উদ্ভব

অতঃপর প্রজাতন্ত্রবাদীরা উপলব্ধি করেন যে, সেনাপতি বুলাঞ্জার প্রজাতন্ত্রের বাক্‌স্বাধীনতা প্রভৃতির সুযোগ নিয়ে প্রজাতন্ত্র ধ্বংস করার আয়োজন করছেন। এমন কি তিনি প্রজাতন্ত্র ধ্বংসের জন্যে একটি "কুদ্যেতা (Coup'd'etat) বা অতর্কিত আগ্রাসনের ব্যর্থ পরিকল্পনাও করেন। এই অবস্থায় রাষ্ট্রদ্রোহী চক্রান্তের অভিযোগে সেনেটের নিকট তাঁকে অভিযুক্ত করা হয়। বুলাঞ্জার বিপদ বুঝে ফ্রান্স থেকে পলায়ন করলে বুলাঞ্জিষ্ট আন্দোলন ঝিমিয়ে পড়ে।

প্রজাতন্ত্রের জয়লাভ

ঐতিহাসিক থিওডোর জেল্ডিনের (Theodore Zeldin) মতে, "বুলাঞ্জিষ্ট আন্দোলন ছিল ফ্রান্সে তৃতীয় প্রজাতন্ত্রের অগ্নিপরীক্ষা।" এই পরীক্ষায় প্রজাতন্ত্র অগ্নিস্নান করে শুদ্ধ হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে দুর্বলতা, ত্রুটি, এমন কি দুর্নীতি থাকলেও সাধারণভাবে প্রজাতন্ত্র ফরাসীদের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা গ্রহণীয় ছিল বুঝা যায়। ফ্রান্সে আর রাজতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র ফিরবে না একথা স্পষ্ট হয়ে যায়। বুলাঞ্জারের পতন একথা প্রমাণিত করে যে, কোন ব্যক্তি যতই কৃতিত্ববান হোন না কেন, তিনি রাষ্ট্রের উর্দ্ধে নন। দ্বিতীয়তঃ, ফ্রান্সের ক্যাথলিক ধর্মযাজকেরাও বুঝেন যে, প্রজাতন্ত্র স্থায়ী হয়েছে। এই সরকারকে স্বীকার না করে উপায় নেই। তৃতীয়তঃ, ফেলিক্স-ফ্যুর (Felix-Faure) নামক ব্যক্তি ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি পদে বসলে রাশিয়া ও ইংলন্ড প্রভৃতি রাজতন্ত্রী দেশগুলি ফ্রান্সের প্রতি তাদের ঔদাসীন্য ত্যাগ করে ফ্রান্সের প্রতি মিত্রতার হাত বাড়িয়ে দেয়।

বুলাঞ্জারের আন্দোলনের গুরুত্ব

ড্রেইফুস ঘটনা (The Dreyfus Case) : ক্যাপ্টেন ড্রেইফুস ছিলেন জনৈক ফরাসী ইহুদি এবং ফরাসী সেনাদলের সুযোগ্য অফিসার। কিন্তু তিনি ইহুদি বলে বহু খ্রীষ্টান ক্যাথলিক সহকর্মীর অশ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। ইতিমধ্যে এষ্টারহেইজি (Ester Hazy) নামক সামরিক অফিসার ড্রেইফুসের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেন যে, ড্রেইফুস জার্মানীকে ফ্রান্সের সামরিক গুপ্ত তথ্য সরবরাহ

ড্রেইফুসের পদচ্যুতি ও লাঞ্ছনা

করেছেন। সামরিক আদালত ড্রেইফুসকে ইহুদি বলে, তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের ভালভাবে তদন্ত না করে তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করে এবং সেনাদলের সমক্ষে ড্রেইফুসের পোষাকের সামরিক পদমর্যাদার প্রতীক চিহ্ন ছিড়ে নিয়ে তাঁকে অপদস্থ করা হয়। সামরিক আদালতের রায় অনুসারে ড্রেইফুস পদচ্যুত হয়ে, আফ্রিকায় (১৮৯৪ খ্রীঃ) নির্বাসিত হন। ড্রেইফুস এই অপমানজনক ঘটনার সময়, ফরাসী রাষ্ট্রের প্রতি তাঁর আনুগত্য জানিয়ে ধ্বনি দেন, যে "ফরাসী প্রজাতন্ত্র দীর্ঘজীবি হোক।" কিন্তু তাঁর এই আনুগত্য ঘোষণাকে কোন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।

এই ঘটনার দুই বছর পরে কর্ণেল পিকার্ট (Cornel Picquart) নামে সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের এক কর্মচারী কাগজপত্র পরীক্ষা করে দেখেন যে ড্রেইফুস নির্দোষ। তিনি ড্রেইফুসের পুনর্বিচারের দাবী উপরওয়ালাদের নিকট জানালে, তিনি পদচ্যুত ও কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। কর্ণেল পিকার্টের পদে, কর্ণেল হেনরী নামক এক ব্যক্তি নিযুক্ত হন। ইতিমধ্যে ড্রেইফুসের ঘটনার কথা প্রকাশ হয়ে যায়। ফ্রান্সের উপরাষ্ট্রপতি স্বয়ং ড্রেইফুসের নির্দোষিতার কথা বলেন। বিখ্যাত সাহিত্যিক এমিল জোলা (Emile Zola) সংবাদপত্রে ড্রেইফুস ঘটনা সম্পর্কে তথ্যপূর্ণ ও ঝাঁঝালো প্রবন্ধ রচনা করে এই অন্যায়ের তীব্র প্রতিবাদ জানান। ক্রুদ্ধ কর্তৃপক্ষ জোলার বিরুদ্ধে আদালতে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ আনলে, জোলা ফ্রান্স থেকে লন্ডনে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেন। ইতিমধ্যে উচ্চ আদালত জোলাকে নির্দোষ ঘোষণা করে। এদিকে কর্ণেল পিকার্ট কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে ড্রেইফুসের নির্দোষিতার স্বপক্ষে সংবাদপত্রে পুনরায় প্রবন্ধ লেখেন।

ড্রেইফুসের নির্দোষিতা প্রচার ও মুক্তি দাবী

এই সময় ফরাসী জনমত স্পষ্টতঃ দুই ভাগ হয়ে যায়। একদল ড্রেইফুসের দণ্ড বহাল রাখার স্বপক্ষে যায়, অপর দল ন্যায়বিচার দাবী করে। সমগ্র ফ্রান্স ড্রেইফুস ঘটনার জন্যে উত্তাল হয়ে ওঠে।

জনমত

ইতিমধ্যে কর্ণেল হেনরী হঠাৎ সংবাদপত্রের মাধ্যমে স্বীকারোক্তি দেন যে, তিনি ও কর্ণেল এষ্টারহেইজী ড্রেসফুসের বিরুদ্ধে কাগজপত্র জাল করেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ড্রেইফুসের পুনর্বিচার ও সসম্মানে মুক্তির দাবী প্রবল হয়। অবস্থার সামাল দেওয়ার জন্যে রাষ্ট্রপতি ল্যুবেৎ (Loubet) ড্রেইফুসকে মুক্তি দেন। কিন্তু জনমত দাবী জানায় যে, ড্রেইফুসের পুনর্বিচার করে দোষী অথবা নির্দোষী তা সাব্যস্ত করতে হবে। শেষ পর্যন্ত বিচারে ড্রেইফুস নির্দোষ প্রমাণিত হন। ড্রেইফুস সসম্মানে তাঁর পদে বহাল হন।

ড্রেইফুসের মুক্তি

ড্রেইফুস ঘটনার গুরুত্ব হিসেবে থিওডোর জেল্ডিন মনে করেন যে, ফ্রান্সের রক্ষণশীল নেতারা মনে করতেন যে ড্রেইফুসের প্রতি ন্যায় বিচার অপেক্ষা সেনাদলের শৃঙ্খলার প্রশ্ন অনেক বড়।[১] সেই কারণে তাঁরা ড্রেইফুস ঘটনার পুনর্বিচারের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁদের আশঙ্কা ছিল যে, ড্রেইফুস ঘটনার কেলেঙ্কারি প্রকাশিত হলে সামরিক বিভাগের শৃঙ্খলা নষ্ট হবে। (১) যাহোক, ড্রেইফুস ঘটনা এই সত্য উদঘাটন করে যে, ফ্রান্সের একশ্রেণীর লোকের মধ্যে ইহুদি বিদ্বেষ কত তীব্র ছিল। সুতরাং গণতান্ত্রিক ফ্রান্সে সকল নাগরিক সমান অধিকার পেলেও ইহুদিদের সেই অধিকার ছিল না।

ড্রেইফুসের ঘটনার গুরুত্ব

১· Theodore Zeldin—France. 1848—1945. Vol. I.

(২) এই সঙ্গে এটাও প্রমাণিত হয় যে, প্রজাতন্ত্রী ফ্রান্সের বহু নাগরিক যুক্তিবাদী ও গণতান্ত্রিক আদর্শে উদ্দীপিত ছিল; তবে রক্ষণশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীর প্রভাব কম ছিল না। শেষোক্ত শ্রেণীই ছিল ড্রেইফুস কলঙ্কের জন্যে দায়ী।

পাঠ্যসূচী

১। Theodore Zeldin—France 1848-1945. Vol. I.
২। Cobban—History of France. Vol. III. (Penguine).
৩। Bury—History of France.
৪। Cambridge Modern History. Vol. XI.

চতুর্বিংশ অধ্যায়

ধনতন্ত্রবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদঃ শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন

(Capitalism and Socialism: Labour and Trade Union Movement)

ধনতন্ত্রবাদের উৎপত্তি (The growth of Capitalism) : ইওরোপে শিল্প-বিপ্লবের ফলে আধুনিক ধনতন্ত্রবাদের উৎপত্তি হয়। ইংলন্ডে ১৭৬০-৮০ খ্রীঃ নাগাদ শিল্প-বিপ্লবের উড্ডয়ন হলেও ১৮১৫ খ্রীঃ পর এর দ্রুত বিকাশ ঘটে। ফ্রান্স ও জার্মানী প্রভৃতি দেশে উনবিংশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে শিল্প-বিপ্লবের দ্রুত বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। শিল্প-বিপ্লবের ফলে যে বিরাট সম্পদের ও মূলধনের সৃষ্টি হয়, তা মুষ্টিমেয় মালিক শ্রেণীর হাতে থাকার ফলে ধনতন্ত্রের উৎপত্তি হয়। শিল্প-বিপ্লবের আগে আধুনিক কল-কারখানা না থাকায় উৎপাদন ব্যবস্থা কুটির শিল্পের মাধ্যমে ছড়িয়েছিল। কুটির শিল্পে যে ব্যক্তি উৎপাদক সেই ব্যক্তি শিল্পদ্রব্যের মালিক হওয়ায় শোষণের সম্ভাবনা ছিল না। বিক্রিত মালের মূল্য উৎপাদকই পেত। শিল্প-বিপ্লবের ফলে কল-কারখানা স্থাপিত হলে কুটির শিল্প ধ্বংস হয়। শিল্প উৎপাদন কারখানাগুলিতে কেন্দ্রীভূত হয়। যাদের হাতে মূলধন ছিল তারা কারখানা স্থাপন করে উৎপাদিত শিল্পদ্রব্যের মুনাফায় ফুলে ফেঁপে উঠে। এইভাবে এক পুঁজিবাদী শ্রেণীর উদ্ভব হয়। এই শ্রেণী শিল্পদ্রব্যের মূলধন এবং উদ্যোগ লাভ করে শিল্পদ্রব্য উৎপাদন করে এবং তার বিপণন দ্বারা মুনাফা কুক্ষিগত করে। এই শিল্প মালিকশ্রেণী শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরী দিয়ে তাদের মুনাফা বাড়াত। উৎপাদিত মাল খুসীমত দামে বিক্রি করে লাভ বাড়াত।

শিল্প-বিপ্লবের প্রভাব

ধনতন্ত্রবাদের উৎপত্তির পশ্চাতে উনবিংশ শতকের ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির ভূমিকা কিছু ছিল। যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি ছাড়া শিল্পের প্রকৃত বিকাশ হতে পারে না। কাঁচামালের পরিবহন ও তৈরি মাল দেশের ভেতরে ছড়িয়ে দিতে হলে, পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি বিশেষ প্রয়োজন ছিল। পরিবহনের উন্নতি না হলে শিল্প অকালে ঝরে যেতে বাধ্য ছিল। ইওরোপীয় সরকারগুলি রেলপথ নির্মাণ, রাস্তা নির্মাণ, খাল খনন করে পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি ঘটালে ধনতন্ত্র ব্যবস্থা শক্তিশালী হয়। ফ্রান্সে সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন যে বিরাট রেলপথ নির্মাণ পরিকল্পনা রূপায়িত করেন তার ফলে ফ্রান্সে পুঁজিবাদী শিল্পগুলির প্রসার ঘটে। রাশিয়ার জার সরকারও রেলপথ নির্মাণ দ্বারা এবং জার্মানীর বিসমার্ক সরকারও অনুরূপ ব্যবস্থার দ্বারা পুঁজিবাদের বিকাশে সহায়তা করেন।

ধনতন্ত্রবাদের উৎপত্তিতে রাষ্ট্রের ভূমিকা

এছাড়া ফ্রান্স, জার্মানী ও রাশিয়ার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, শিল্প স্থাপনের জন্যে দেশে মূলধনের সরবরাহ যথেষ্ট ছিল না। এজন্য এই রাষ্ট্রগুলি ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার পুনর্গঠন করে শিল্পে মূলধন বিনিয়োগের ব্যবস্থা করে। জার সরকার বৈদেশিক ঋণ যোগাড় করে শিল্পে লগ্নী করেন। কিন্তু এই শিল্পগুলির মুনাফা শিল্প মালিকদের হাতে যায়।

রাষ্ট্র কর্তৃক শিল্পে পুঁজি সরবরাহ : ব্যাঙ্ক স্থাপন

ইওরোপীয় সরকারগুলি পুঁজিবাদের বিকাশে আরও এক প্রকারে সহায়তা করে। তা হল সংরক্ষণ শুল্ক নীতির প্রবর্তন। কোন দেশের বিকাশশীল শিল্প যাতে শিল্পে উন্নত দেশের

সরকার কর্তৃক শুল্ক নীতির দ্বারা পুঁজিবাদীদের শিল্প রক্ষা

কারখানায় তৈরি সস্তা মালের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, এই উন্নত দেশ থেকে আমদানি সস্তা মালের ওপর বাড়তি শুল্ক চাপিয়ে সেই মালের চাহিদা কমিয়ে ফেলা হত। ফলে স্বদেশের কারখানায় উৎপাদিত মাল বাজারে একচেটিয়া বিক্রয় হয়ে তার মুনাফা মালিকের হাতে পৌঁছাত। বিসমার্ক তাঁর বিখ্যাত সংরক্ষণ নীতির দ্বারা জার্মানীর পুঁজিবাদী শিল্পগুলিকে এই অসাধারণ সুযোগ করে দেন।[১]

মালিক শ্রেণী যদি কারখানার শ্রমিককে ন্যায্য হারে মজুরী দিত এবং কম সময় কারখানায় খাটাতে বাধ্য হত, তবে তাদের মুনাফার পরিমাণ বাড়তে পারত না। শিল্প-বিপ্লবের গোড়ার দিকে পুঁজিবাদী শ্রেণী শ্রমিককে ন্যায্য মজুরী হতে বঞ্চিত করে এবং তাদের নিজ মুনাফা অবাধে বাড়াবার সুযোগ পায়। এই সময় বিভিন্ন সরকারগুলি শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার জন্যে কোন আইন রচনা করতে রাজী ছিল না। এরা Laissez faire বা হস্তক্ষেপ না করা নীতি গ্রহণ করায় পুঁজিবাদী শোষণ তীব্র হয়ে ওঠে। ফ্রান্সে লুই ফিলিপের সরকার শিল্পে হস্তক্ষেপ না করার নীতি নিলে, ফরাসী মূলধনী ও শিল্পপতিদের মুনাফার জমাবার সুযোগ করে দেয়। লুই ফিলিপের নীতির বিরুদ্ধে শ্রমিক বিদ্রোহ দেখা দিলে তিনি তা কঠোর হাতে দমন করেন। এইভাবে সরকারের সহযোগিতায় পুঁজিবাদ উৎপাদন ব্যবস্থাকে কুক্ষিগত করে।

সরকার কর্তৃক শিল্পে হস্তক্ষেপ না করা নীতি গ্রহণ

পুঁজিবাদের বিকাশের অপর একটি দিক সম্পর্কে আলোচনা দরকার। শিল্প-বিপ্লবের যথেষ্ট অগ্রগতি হলে বিভিন্ন শিল্প মালিকদের মধ্যে মাল বিক্রয়ের জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হয়। ব্যাঙ্কগুলিও জনসাধারণের টাকা আমানত পাবার আশায় পরস্পরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়। এই সময় একই প্রকার শিল্পের বিভিন্ন সংস্থাগুলিকে সংযুক্ত করে ট্রাষ্ট বা কমবাইন নামক বিরাট একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান গঠনের রেওয়াজ দেখা দেয়। কয়েকটি বৃহৎ কোম্পানী একত্রিত হয়ে শিল্প গঠন করলে তাদের সঙ্গে নতুন কোন কোম্পানীর প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করা অসম্ভব হয়। ফলে একচেটিয়া উৎপাদন ব্যবস্থা বা মনোপলি ব্যবসার উদ্ভব হয়। ছোট শিল্পগুলি এর ফলে ধ্বংসের সম্মুখীন হয়। একচেটিয়া শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি শ্রমিককে ইচ্ছামত কম দরে মজুরী দিয়ে এবং মালের ইচ্ছামত দাম ধার্য করে বিরাট মুনাফা লাভের সুযোগ পায়। একে একচেটিয়া পুঁজি প্রথা বলা হয়। কোন যোদ্ধা যেরূপ বাহুবলে একের পর এক দেশ দখল করে সাম্রাজ্য স্থাপন করে, সেরূপ এই সকল একচেটিয়া পুঁজিবাদীরা একের পর এক শিল্পগুলিকে কুক্ষিগত করে শিল্প সাম্রাজ্য (Industrial Empire) স্থাপন করে। ইংলন্ড, মার্কিন দেশ, জার্মানীতে এরূপ বহু একচেটিয়া শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। বটগাছ যেরূপ তার ঝুরি নামিয়ে চতুর্দিক ছেয়ে ফেলে সেরূপ এই সকল পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠানগুলি প্রথমে নিজ দেশ পরে অন্য দেশে অনুপ্রবেশ করে বিরাট পুঁজি আহরণ করে। ইংলন্ডের বিভিন্ন কোম্পানীগুলি এরূপ জোটবদ্ধ হয়। জার্মানীতে এরূপ জোটবদ্ধ শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল কার্টেল (Cartel)।

একচেটিয়া বাণিজ্য ও যৌথ কারখানা প্রথার প্রসার

ব্যাঙ্ক শিল্পে এরূপ একচেটিয়া পুঁজিবাদের উদ্ভব বিশেষভাবে দেখা যায়। ১৮২৪ খ্রীঃ ইংলন্ডে প্রায় ৬০০ ব্যাঙ্ক কোম্পানী ছিল। ১৯১৪ খ্রীঃ এগুলি সংযুক্ত হয়ে ৫৫টি কোম্পানীতে পরিণত হয়। ১৯৩৭ খ্রীঃ পুনরায় জোটবদ্ধ হয়ে ১১টি কোম্পানী গড়ে ওঠে। এদের মধ্যে পাঁচটি যৌথ ব্যাঙ্ক ইংলন্ডের সমগ্র মূলধনের $\frac{৪}{৫}$ অংশ নিয়ন্ত্রণ করে। এই পাঁচটি পুঁজিবাদী ব্যাঙ্ক ছিল, (ক) মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক; (খ) ওয়েষ্টমিনিষ্টার ব্যাঙ্ক; (গ) বার্কলেইজ ব্যাঙ্ক; (ঘ) লয়েডস ব্যাঙ্ক; (ঙ)

১· Gordon Craig. P. 93.

মূলধনের ওপর একচেটিয়া অধিকার স্থাপন

ন্যাশনাল প্রভিন্সিয়াল ব্যাঙ্ক। জার্মানীতেও অনুরূপভাবে "ডি" নামধারী ব্যাঙ্কগুলি যথা ডয়েশ ব্যাঙ্ক; ড্রেসডেনার ডিসকন্টো গেসেল শাস্ট, ডার্মস্ট্যাডার ব্যাঙ্ক প্রভৃতি কয়েকটি ব্যাঙ্ক সকল মূলধন একচেটিয়া করে।

শিল্পের ক্ষেত্রেও অনুরূপভাবে একচেটিয়া পুঁজিবাদী প্রথা প্রবল হয়ে ওঠে। ক্রমে দেখা যায় যে, একচেটিয়া পুঁজিবাদী শিল্পগুলি এত বেশী উদ্বৃত্ত মাল উৎপাদন করে তা ছিল দেশের চাহিদা অপেক্ষা অনেক বেশী। পুঁজিবাদী শিল্পের লক্ষ্য ছিল সর্বাধিক উৎপাদন ও সর্বাধিক মুনাফা। স্বদেশের চাহিদা পূরণের পর বাড়তি মাল বিক্রয় করার জন্যে এই শিল্পপতিরা বিদেশের বাজারের দিকে নজর দেয়। নিজ দেশের সরকারকে এজন্য এই উপনিবেশ দখলের জন্যে এই শিল্প মালিকরা চাপ দেয়। উপনিবেশের বাজারে মাল বিক্রয় করে এবং উপনিবেশের সস্তা দরের কাঁচামাল শিল্পে বিনিয়োগ দ্বারা এই পুঁজিবাদী সংস্থাগুলি স্ফীতকায় হয়ে ওঠে। লেনিনের মতে, বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশ এভাবে বাজার দখলের প্রতিযোগিতায় নামলে বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশের মধ্যে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয় তা বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হয়।

পুঁজিবাদী শিল্পে বাড়তি মাল বিক্রয়ের জন্যে উপনিবেশ দখলের চেষ্টা

পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার স্বপক্ষে কেহ কেহ যুক্তি দেখান যে, এই ব্যবস্থায় প্রতিযোগিতা থাকায় শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। উৎপাদনের ব্যয় অনেক কম পড়ে। কারণ শিল্প মালিকরা কম খরচে বেশী উৎপাদনের চেষ্টা করে। ফলে দেশের সামগ্রিক স্বার্থের দিক থেকে এতে লাভ হয়। দ্বিতীয়তঃ, কেহ কেহ বলেন যে, শিল্পে উদ্যোগ ও শিল্প গঠন করার জন্যে দরকার হল বিশেষ ধরনের প্রতিভা। এই প্রতিভা সকলের পক্ষে লাভ করা সম্ভব নয়। রথচাইল্ডস বা ফোর্ড বা ডেইমলার বা বোল্টন প্রভৃতির ন্যায় শিল্প প্রতিভা ব্যক্তিগত উদ্যোগের সুযোগ থাকলে তবেই এই প্রতিভার বিকাশলাভ সম্ভব। এর ফলে রাষ্ট্রের লাভ হতে বাধ্য। তৃতীয়তঃ, শিল্প মালিকমাত্রেই শ্রমিক শোষণ করে মুনাফা বৃদ্ধি করে এই তত্ত্ব আদপেই ঠিক নয়। আধুনিক যুগে অধিকাংশ রাষ্ট্র শ্রমিক স্বার্থ রক্ষার জন্যে বহু আইন প্রবর্তন করেছে। সুতরাং ব্যক্তিগত শিল্পগুলিতে মালিকদের পক্ষে শ্রমিক শোষণ করা সহজ কাজ নয়। তাছাড়া সার্থক ও প্রতিভাবান শিল্প উদ্যোগীরা শ্রমিকের সহযোগিতা লাভ করলে তবেই সফল হতে পারে। সুতরাং প্রকৃত শিল্প সংগঠনকারীরা শ্রমিকের স্বার্থ অবহেলা করে না। চতুর্থতঃ, রাষ্ট্র বিভিন্ন আইন যথা আয়কর প্রভৃতির দ্বারা মুনাফা নিয়ন্ত্রণ করায় এবং কোম্পানী আইন দ্বারা একচেটিয়া প্রথা নিয়ন্ত্রণ করায় পুঁজিবাদী শিল্পগুলির খারাপ দিক এখন অনেকটা লোপ পেয়েছে।

পুঁজিবাদী শিল্প ব্যবস্থার স্বপক্ষে যুক্তি

পুঁজিবাদী প্রথার কুফলগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মধ্যযুগে সামন্ততন্ত্রের দ্বারা ধন বৈষম্য রক্ষা করা হত। আধুনিক যুগে ধনতন্ত্র দ্বারা এক শ্রেণীর হাতে সম্পদ ও অর্থ জমা হয়। বাকি সকলে বঞ্চিত হয়। সুতরাং সামন্ততন্ত্রের ন্যায় ধনতন্ত্র হল একটি বৈষম্যমূলক, অন্যায় সমাজ ব্যবস্থা। (১) পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সম্পদ সমাজের মুষ্টিমেয় লোকের হাতে সীমাবদ্ধ হয়, বাকি লোকেরা পুঁজিবাদীদের দ্বারা নানাভাবে শোষিত হয়। এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সাম্যের বিরোধী। (২) পুঁজিবাদী শ্রেণী তাদের মুনাফা বৃদ্ধির জন্যে শ্রমিককে শোষণ করে এবং ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করে। এরা শ্রমিক অসন্তোষের সম্মুখীন হলে শ্রমিক ছাঁটাই, লক-আউট প্রভৃতি দমনমূলক নীতির সাহায্যে শ্রমিকদের পদানত করে। মালিকশ্রেণী জোটবদ্ধ হয়ে সরকারকে চাপ দিয়ে মালিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্যে আইন রচনা করতে বাধ্য করে। (৩) মার্কসবাদী চিন্তাবিদদের মতে, শিল্পের মুনাফা আদপেই মালিকের প্রাপ্য নয়। শিল্প গঠন ও পরিচালনায় মালিক বা পুঁজিপতিদের কোন

পুঁজিবাদ ব্যবস্থার কুফল

ভূমিকা থাকাই আদপে বাঞ্ছনীয় নয়। মার্কসীয় মূল্যতত্ত্ব (Marxian Theory of Value) অনুসারে শিল্পের উৎপাদন খরচ বাদ দিয়ে যে মুনাফা থাকে তা একমাত্র শ্রমিকেরই প্রাপ্য। কারণ শ্রমিকের শ্রমের ফলেই শিল্পদ্রব্য উৎপাদিত হয়।[১] এতে মালিকের মুনাফার দাবী অযৌক্তিক। (৪) ধনতান্ত্রিক প্রথায় একচেটিয়া পুঁজি ও শিল্পের উদ্ভব হয়। একচেটিয়া পুঁজিপতিরা শিল্পে উৎপাদিত মালের দাম মুনাফার লোভে ইচ্ছামত বৃদ্ধি করে। এর ফলে সাধারণ ক্রেতারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মোট কথা, পুঁজিবাদী প্রথার ফলে ধনীরা ধনী হতে থাকে আর গরীবেরা আরও গরীব হয়। সমাজে ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট হয়। (৫) ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রয়োজন অপেক্ষা মুনাফার লোভে বেশী মাল উৎপাদন করা হয়। এই বাড়তি মাল বিক্রির জন্যে পুঁজিপতিরা বাইরের বাজার দখলের চেষ্টা করে। এজন্য উপনিবেশ দখলের লড়াই আরম্ভ হয়। পুঁজিবাদীশ্রেণী বাজার দখল এবং কাঁচামালের জন্যে রাষ্ট্রকে উপনিবেশ অধিকারে বাধ্য করে। লেনিনের মতে, সাম্রাজ্যবাদ হল পুঁজিবাদী ব্যবস্থার চূড়ান্ত পরিণাম মাত্র। এর ফলে আন্তর্জাতিক বিরোধ ও যুদ্ধ বাধে। জাপানী পুঁজিপতিদের তাড়নায় জাপান ১৯৩১ খ্রীঃ মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করে। জার্মান পুঁজিপতিদের স্বার্থে কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম উপনিবেশ দখল ও নৌ-শক্তি বৃদ্ধির সঙ্কল্প নেন। ফলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধে। (৬) পুঁজিবাদ শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হয়। ভারত, চীন ও আফ্রিকায় পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি উপনিবেশ স্থাপন করে।

সমাজতন্ত্রবাদের উৎপত্তি ও তার মূলনীতি (The Growth and the Basic Principles of Socialism) : শিল্প-বিপ্লবের ফলে কারখানাভিত্তিক শিল্পের দ্রুত প্রসার ঘটলে কারখানা মালিকরা শিল্পের মুনাফা ভোগ করে স্ফীত হয়ে ওঠে। এই মালিকরা শ্রমিককে কম মজুরীতে বেশী সময় খাটাত যাতে তাদের মুনাফা বাড়ে। এদিকে শ্রমিকেরা নামমাত্র মজুরীতে তাদের শ্রম বিক্রি করতে বাধ্য হয়। শ্রমিক পরিবারগুলি অনাহারে, অর্ধাহারে পশুর ন্যায় জীবন-যাপন করে। শ্রমিক বস্তীগুলির অন্ধকারময় পরিবেশে, শ্রমিক পরিবারগুলি রোগে, বিনা চিকিৎসায়, অশিক্ষায় ও নৈতিক অধঃপতনে ধ্বংস হতে থাকে।

শ্রমিকদের দুরবস্থা

এই সময় একশ্রেণীর চিন্তাবিদ সম্পদের উৎপাদন এবং তাতে সমাজের অধিকার সম্পর্কে গভীর চিন্তা করেন। এর ফলে সমাজতন্ত্রবাদ নামক ভাবধারার উদ্ভব হয়। অষ্টাদশ শতকে বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক রুশো যেরূপ রাষ্ট্রের উৎপত্তি তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে জনগণের সার্বভৌমত্বের রূপ দেন, সমাজতান্ত্রিক চিন্তাবিদরা সম্পদের উৎপত্তি এবং তাতে সমাজের অধিকার সম্পর্কে গবেষণা করে সমাজতন্ত্রবাদের সৃষ্টি করেন।

আধুনিক যুগে সমাজতান্ত্রিক মতবাদের উদ্ভবের আগে, প্রাচীন ও মধ্যযুগেও এক ধরনের অস্পষ্ট সমাজতান্ত্রিক চিন্তার কথা জানা যায়। বাইবেলে নাকি এক ধরনের আদিম সমাজতন্ত্রের কথা আছে বলে কিছু লোক বিশ্বাস করেন। ষোড়শ শতকে ধর্ম-বিপ্লবের সময় এ্যানা ব্যাপ্টিষ্ট আন্দোলনে এক ধরনের সমাজতান্ত্রিক চিন্তার প্রকাশ দেখা যায়। সপ্তদশ শতকে টমাস মোর তাঁর ইউটোপিয়া গ্রন্থে এক কাল্পনিক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার কথা ভাবেন। ফরাসী বিপ্লবের যুগে ওরিজিন তার ইনইকোয়্যালিটি গ্রন্থে সমাজতান্ত্রিক চিন্তার আভাষ দেখা যায়। জ্যাকোবিন এবের (Hebert) ও ব্রিসো (Brissot) ফরাসী বিপ্লবের সময় সমাজতন্ত্রের ও ধন-বণ্টনের কথা বলেন। ব্যাবেউফ, ডাইরেক্টরীর শাসনকালে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের চেষ্টা করেন।

কিন্তু এই সমাজতন্ত্রবাদ ছিল প্রাক্ শিল্পবিপ্লব যুগের। এই সমাজতন্ত্রবাদে যুক্তিবাদ ও স্পষ্ট তত্ত্বের অভাব ছিল। শিল্প-বিপ্লবের বাতাবরণেই আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদের উদ্ভব হয়।

১· Karl Marx—P. N. Fedoseyev & others. P. 129.

সমাজতন্ত্রবাদের দুটি পর্যায় আমরা লক্ষ্য করতে পারি যথা, আদি সমাজতন্ত্রবাদ বা ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রবাদ এবং মার্কসবাদ। সকল আধুনিক সমাজতন্ত্রীরা কয়েকটি মূলনীতিতে বিশ্বাস করেন। এই মূল নীতিগুলিকে আমরা সমাজতন্ত্রবাদের মূল সূত্র বলতে পারি। এই মূল সূত্রগুলি হল, (১) ভূমি, জল ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদে সকল ব্যক্তির সমান অধিকার রয়েছে। এগুলি কারও ব্যক্তিগত সম্পদ বলে পরিগণিত হতে পারে না। কারণ এগুলি কারও পরিশ্রমের দ্বারা সৃষ্ট হয়নি। প্রকৃতিই এই সকল বস্তুকে সৃষ্টি করেছে। যদি কোন গোষ্ঠী বা শ্রেণী এই সকল সম্পদকে একচেটিয়া অধিকার করে তা হল সামাজিক অপরাধ ও অন্যায়। (২) প্রতি নাগরিকের জীবিকার অধিকার আছে (Right to work)। রাষ্ট্রের কর্তব্য হল বেকারের জন্যে কর্মসংস্থান করা। রাষ্ট্রের কর্তব্য হল নাগরিকদের জীবিকার ব্যবস্থা করা। (৩) ধনতন্ত্রী সমাজে মুষ্টিমেয় লোকের হাতে সম্পদ জমা হয় এবং বাকি লোকেরা থাকে বঞ্চিত, অভাবগ্রস্ত ও দরিদ্র। রাষ্ট্রের কর্তব্য হল এই সঞ্চিত সম্পদের পুর্নবন্টন করা। কারণ সমাজতন্ত্রের অর্থই হল সমান অধিকার স্থাপন। (৪) সমাজতন্ত্রে উৎপাদন ব্যবস্থার নেতৃত্বে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণকে স্থাপন করে ব্যক্তিগত শিল্প উদ্যোগ ও সম্পত্তির অধিকার লোপ করা হয়। ব্যক্তিগত উদ্যোগের অর্থই হল মুনাফাভিত্তিক শিল্প স্থাপন। উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানা শোষণ ব্যবস্থার ওপর স্থাপিত। এই কারণে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় Private enterprize বা ব্যক্তিগত উদ্যোগকে লোপ করা হয়। উৎপাদন ব্যবস্থার ওপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করা হয়। এর ফলে পুঁজিবাদ লোপ পায়। (৫) সর্বশেষে মার্কসবাদীদের মতে, সমাজতন্ত্রবাদের লক্ষ্য হল শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থা স্থাপন। নাগরিকদের শ্রম দ্বারা যে সম্পদ উৎপন্ন হবে তা রাষ্ট্রের অধিকারে আসবে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হল শ্রমিকের রাষ্ট্র। শ্রমিকের স্বার্থরক্ষাই হল এই রাষ্ট্রের মৌলিক লক্ষ্য।

সমাজতন্ত্রবাদের মূল সূত্রগুলি

আদি সমাজতন্ত্রবাদঃ ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রবাদ (Early Socialism: Utopian Socialism)ঃ সমাজতন্ত্রবাদের সংজ্ঞা সম্পর্কে বিভিন্ন চিন্তাবিদদের মধ্যে মত পার্থক্য দেখা যায়। কার্ল মার্কসের পূর্ববর্তী সমাজতান্ত্রিকদের আদি সমাজতন্ত্রবাদী বলা হয়ে থাকে। মার্কস এঁদের ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রবাদী বা অবাস্তব সমাজতন্ত্রবাদী আখ্যা দিয়েছেন।

ফরাসী সমাজতন্ত্রবিদ সেন্ট সাইমনকে (১৭৩০—১৮২৫ খ্রীঃ) সমাজতন্ত্রবাদের আদি প্রবক্তা বলা যেতে পারে। তাঁর জন্ম হয় এক অভিজাত পরিবারে। কিন্তু তিনি ছিলেন প্রকৃত মানব-প্রেমিক। শিল্প-বিপ্লবের ফলে শ্রমিকদের দুর্দশার কথা তিনি বুঝেন। সেন্ট সাইমন সর্বপ্রথম এই তত্ত্ব প্রচার করেন যে—(১) শিল্প যুগের সমাজের সমস্যা বুঝতে হলে সমাজের অর্থনৈতিক সমস্যার দ্বারা তা বিচার করতে হবে। (২) সেন্ট সাইমন ঘোষণা করেন যে, সমাজে ধন বন্টনের অসাম্য হেতু, লোকে ধনী ও দরিদ্র প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়েছে। এর ফলে শ্রেণীদ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। ধনবন্টন দ্বারা ধনী-দরিদ্রের ফারাক না কমলে সমাজে শান্তি ও স্থিতি আসবে না। (৩) সমাজে নীতিবোধ ও শিক্ষার প্রসার হলে মানুষ আপন শুভবুদ্ধির দ্বারা দরিদ্র ও অবহেলিত শ্রেণীর উন্নয়নে ব্রতী হবে [১] এর ফলে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সদ্ভাব বাড়বে। (৪) সমাজে এই নৈতিক বিপ্লব ঘটাবার জন্যে আদর্শবাদী, আবেগপ্রবণ লোকের প্রয়োজন। মার্টিন লুথারের ন্যায় আবেগপ্রবণ প্রতিভার সমাজে প্রয়োজন আছে। এজন্য তিনি মহৎ ও মানবতাবাদী বুদ্ধিজীবিদের হাতে সমাজের দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়ার কথা বলেন। (৫) তিনি শ্রমিক ও

সেন্ট সাইমনের সমাজতন্ত্রবাদ

১· Gordon Craig. P. 55.

মালিকের সহযোগিতা এবং সমবায়ের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেন। এর ফলে পরস্পর পরস্পরের অসুবিধা বুঝতে পারবে এবং তা দূর করা সম্ভব হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। (৬) সেন্ট সাইমন, মার্কসের ন্যায় শ্রেণী সংগ্রামের কথা ভাবেননি। তিনি মালিক ও শ্রমিক উভয়ের স্বার্থের সমতা রক্ষার জন্যে রাষ্ট্রকে এগিয়ে আসতে বলেন। এই রাষ্ট্র মানবতাবাদীদের দ্বারা পরিচালিত হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। তবে সেন্ট সাইমন সম্পত্তির উত্তরাধিকার লোপের কথা বলেন। নতুবা কিছু লোক বিনা প্রতিভা ও বিনা পরিশ্রমে পৈত্রিক সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে ভোগ করে আরামে থাকবে, আর উত্তরাধিকারহীন লোকেরা বঞ্চিত হবে বলে তিনি বলেন। সেন্ট সাইমন উৎপাদন ব্যবস্থার ওপর ব্যক্তি মালিকানার স্থলে সামাজিক মালিকানা অন্ততঃ পক্ষে সমবায় ভিত্তিক মালিকানার কথা ভাবেন। শিল্পের প্রশাসনের দায়িত্ব তিনি মানবিক বোধসম্পন্ন বৈজ্ঞানিকদের হাতে দেওয়ার কথা বলেন। তিনি বলতেন যে, প্রচলিত খ্রীষ্টধর্ম সামাজিক অসাম্য ও শোষণ রদ করতে অক্ষম। এজন্য তিনি নব খ্রীষ্টধর্মের কথা বলেন।

সেন্ট সাইমনের সমসাময়িক ইংরাজ সমাজতন্ত্রবাদী ছিলেন রবার্ট আওয়েন (১৭১১-১৮৫৮ খ্রীঃ)। উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে ইংলন্ডে শ্রমিকদের ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলন জোরদার হয়। সমাজ সংস্কারক রবার্ট আওয়েনের প্রচেষ্টায় বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নগুলি গ্র্যান্ড ন্যাশন্যাল কনসলিডেটেড ট্রেড ইউনিয়ন (Grand National Consolidated Trade Union) নামে এক কেন্দ্রীয় ট্রেড উইনিয়ন গঠন করে।[১] ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে রবার্ট আওয়েন শ্রমিকদের অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে বিশেষ ওয়াকিবহাল ছিলেন। তাছাড়া তিনি সমবায় আন্দোলন, কিণ্ডারগার্ডেন শিক্ষা প্রভৃতি নানা সমাজহিতকর আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

রবার্ট আওয়েন

ইতিমধ্যে রবার্ট আওয়েন, স্কটল্যাণ্ডের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ কাপড়ের কল, নিউ ল্যানার্ক (New Lanark) কারখানায় ম্যানেজার নিযুক্ত হন। এই পদে বসে তিনি তাঁর সমাজতন্ত্রবাদী আদর্শকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করেন। শ্রমিকদের ভাল মজুরী, স্বাস্থ্যকর বাসস্থান, অবসর বিনোদনের সুযোগ, শ্রমিক পরিবারের সন্তানদের বিনামূল্যে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করে তিনি নিউ ল্যানার্কে এক আদর্শ উদ্যোগের আয়োজন করেন। শ্রমিকেরা যাতে তাদের মজুরীর পয়সায় ন্যায্য মূল্যে খাদ্য, বস্ত্র পায় এজন্য তিনি স্বয়ং-শাসিত সমবায় বিপনি গঠন করেন। এই সমবায়গুলি বিনা-লাভ, বিনা-ক্ষতি নীতিতে ব্যবসা করত। এই সমবায়গুলি থেকে শ্রমিকেরা সস্তা দরে খাদ্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্য পেত। শ্রমিক ইউনিয়নগুলিই এগুলির পরিচালনা করত। ১৮৩০ খ্রীঃ এরূপ ৩০০ সমবায় স্থাপিত হয়। মোট কথা, রবার্ট আওয়েন এটা দেখাবার চেষ্টা করেন যে, মালিকের স্বার্থের ক্ষতি না করে শ্রমিকের উন্নতি করা সম্ভব। শ্রমিকের উন্নতি ঘটলে কাজের উন্নতি হবে এবং তাতে মালিকেরই শেষ পর্যন্ত লাভ হবে। দ্বিতীয়তঃ, তিনি শ্রমিকদের স্ব-শাসিত সমবায় গঠনের ওপর জোর দেন। এই সমবায়গুলি শ্রমিকের জীবন-যাত্রা আরামপ্রদ করতে পারে বলে তিনি মনে করতেন। রবার্ট আওয়েন দেখাবার চেষ্টা করেন যে, শ্রমিক ও দরিদ্র শ্রেণী তাঁদের বাসস্থান ও কর্মস্থলের পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হয়। পরিবেশের উন্নতি ও শিক্ষা পেলে দরিদ্র লোকেদের চারিত্রিক উন্নতি হতে পারে। শ্রমিকরা মূলতঃ অকর্মণ্য বা অযোগ্য শ্রেণী নন। উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা পেলে শ্রমিকরা তাদের যোগ্যতার প্রমাণ দিতে পারেন। এই কারণে নিউ ল্যানার্কে তিনি একটি আদর্শ শ্রমিক ও শিল্প সমাজ গঠনের চেষ্টা করেন। রবার্ট আওয়েন বিশ্বাস করতেন যে, ধর্ম মানুষকে অদৃষ্টবাদীতে পরিণত করে। সমাজ ও পরিবেশ সংস্কারের কথা ধর্মে বলা হয় না। রবার্ট আওয়েন চান যে, সমাজের চাপে রাষ্ট্র এমন আইন বিধি প্রবর্তন করবে যাতে শ্রমিকের অধিকার

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ

১. Gardon Craig. P. 75.

রক্ষিত হয়। ১৮৩৪-এর পর শিল্প শ্রমিকের সমবায় আন্দোলনে মন্দা দেখা দিলে তাঁর সমর্থকরা গ্রাম সমবায় প্রতিষ্ঠায় জোর দেন। ইংলন্ডের হ্যাম্পশায়ার, আমেরিকায় নিউ হারমনি প্রভৃতি গ্রাম সমবায় স্থাপিত হয়।

রবার্ট আওয়েনের সমালোচনা

রবার্ট আওয়ানের সমাজতান্ত্রিক মত খুব সুসংগঠিত ছিল না, বলা যায়। তাঁকে সমাজতান্ত্রিক না বলে সমাজ সংস্কারক বলা যেতে পারে। তিনি সেন্ট সাইমনের ন্যায় শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে নৈতিক সম্পর্ক স্থাপন দ্বারা শোষণ ব্যবস্থা লোপ করার কথা ভাবেননি। রবার্ট আওয়েনের আদর্শ অন্য কোন মিল মালিক গ্রহণ না করায় তিনি হতাশ হন। তিনি বুঝতে পারেন যে, ধনতন্ত্রবাদকে আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রণ না করলে, মালিকশ্রেণী স্ব-ইচ্ছায় শ্রমিকের জন্যে কোন কিছু করবে না। ইংলন্ডের শ্রমিকেরা বুঝতে পারে যে, মালিকের দয়ার ওপর নির্ভর করলে তাদের অবস্থার কোন পরিবর্তন হবে না। এজন্য তারা চার্টিস্ট আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ভোটাধিকার লাভ করে সরকারি আইনের সাহায্যে শ্রমিক কল্যাণ আইন পাশ করা তারা বাঞ্ছনীয় মনে করে। তবে চার্টিস্ট আন্দোলনের কোন সমাজতান্ত্রিক তত্ত্ব ছিল না। দরিদ্র ব্যক্তিরা ভোটাধিকার লাভের জন্যে এই আন্দোলন করে।

চার্লস ফুরিয়ের

আদি সমাজতন্ত্রবাদীদের মধ্যে ফরাসী চিন্তাবিদ চার্লস ফুরিয়ের-এর (Charles Fourier)-(১৭৭২—১৮৩৭ খ্রীঃ) নাম উল্লেখ্য। চার্লস ফুরিয়ের সেন্ট সাইমনের সমসাময়িক ও তাঁর শিষ্য হলেও তাঁর কিছু নিজস্ব ভাবধারা ছিল। তাঁর মতে, সমাজে সম্পদের বিকেন্দ্রীকরণ না করা হলে পুঁজিবাদ সকল কিছুই গ্রাস করে নেবে। অর্থনৈতিক শোষণ বন্ধ করতে হলে প্রয়োজন, নিজের শ্রমে প্রস্তুত দ্রব্য নিজে ভোগ করা। এজন্য দরকার স্বয়ংকমিউন বা ফ্যালানস্টারি (Phalanstery) স্থাপন করা। এজন্য তিনি ১৫০০ শত লোক নিয়ে এক একটি ফ্যালানস্টারি বা কমিউন গঠনের কথা বলেন। এই কমিউনের জনগণ নিজ পরিশ্রমে খাদ্য-বস্ত্র প্রভৃতি উৎপাদন ও ভোগ করবে বলে তিনি বলেন। ফুরিয়ের বিশ্বাস করতেন যে, ফ্যালানস্টারিগুলি হবে নিম্নতম জনসংগঠন। বিভিন্ন আয়ের, বিভিন্ন পেশার লোক এই ফ্যালানস্টারিতে একত্র বসবাস করে তাদের আয় এই সংগঠন বা ফ্যালানস্টারির জন্যে দান করবে। ফ্যালানস্টারি তাঁর সদস্যদের মধ্যে প্রয়োজন মত তা বন্টন করবে। ফুরিয়ের বৃহৎ কারখানা ও পুঁজিবাদী সংগঠনগুলির মুনাফা বন্টন করে দিতে বলেন। তিনি বলেন যে, জাতীয় সম্পত্তির আয়ের $\frac{৪}{১২}$ ভাগ পাবে মালিক বা পুঁজিপতিশ্রেণী। $\frac{৫}{১২}$ ভাগ পাবে শ্রমিক এবং কলাকুশলী, বিজ্ঞানী, পরিচালকরা পাবে $\frac{৩}{১২}$। ফুরিয়েরকে অনেক সমাজতান্ত্রিক তত্ত্ববাদী অপেক্ষা সমবায়পন্থী সংগঠনের ব্যাখ্যাকার বলা যায়।

আগস্ট ব্ল্যাঙ্কি

এছাড়া ফিলিপ বুওনারোটি (১৭৬৭—১৮৩৭ খ্রীঃ) এবং আগস্ট ব্ল্যাঙ্কি (১৮০৫—১৮৮১ খ্রীঃ) প্রভৃতি লেখকও সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা প্রচার করেন। আগস্ট ব্ল্যাঙ্কিই সর্বপ্রথম বলেন যে, ধনী বুর্জোয়া শ্রেণী তাদের মুনাফা ও শোষণমূলক মনোবৃত্তি ত্যাগ করবে না। শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে স্বার্থের সমন্বয় সাধন সম্ভব নয়। সুতরাং শ্রমিকের Wage বা "পারিশ্রমিক" এবং মালিকের Dividend বা "মুনাফার" মধ্যে কোন আপোষ সম্ভব নয়। এই কারণে ব্ল্যাঙ্কিকে কেহ কেহ এ্যানার্কিষ্ট বা নৈরাজ্যবাদী বলেন।[১]

আদি সমাজতন্ত্রবাদীদের মধ্যে বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন লুই ব্ল্যাঙ্ক (Lovis Blanc) (১৮১১-১৮৮২ খ্রীঃ)। লুই ব্ল্যাঙ্ক শিল্প-বিপ্লবের ফলে ফ্রান্স ও ইংলন্ড প্রভৃতি দেশে পুঁজিবাদের

১· Gordon Craig. P. 65.

লুই ব্যাঙ্কের সমাজতান্ত্রিক মতবাদ

প্রভাব লক্ষ্য করে আশঙ্কিত হন। তিনি Organisation of Labour নামে এক গ্রন্থ রচনা করে যশস্বী হন। (১) লুই ব্ল্যাঙ্ক সর্বপ্রথম বলেন যে, গণভোটের দ্বারা শ্রমিক ভোটাধিকার পেলে রাষ্ট্র বাধ্য হয়ে শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষার জন্যে আইন রচনা করবে। সুতরাং কেবল কল-কারখানায় ধর্মঘাট করে ফল হবে না। গণভোটের অধিকার শ্রমিককে লাভ করতে হবে। রাষ্ট্র শ্রমিকের পক্ষ সমর্থন করে আইন রচনা না করলে মালিকশ্রেণী স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে শ্রমিক শোষণ বন্ধ করবে না। (২) লুই ব্ল্যাঙ্ক বলেন যে, শ্রমিক যদি ভোটাধিকার পায় তবে তার নির্বাচিত প্রতিনিধিরা শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষার জন্যে আইন রচনা করবে। গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন ছিল তাঁর অন্যতম উদ্দেশ্য। (৩) লুই ব্ল্যাঙ্ক ব্যক্তিগত উদ্যোগে শিল্প স্থাপনের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি মনে করতেন যে, ব্যক্তিগত উদ্যোগের অর্থই হল মুনাফালাভের প্রতিযোগিতা। এতে শ্রমিক শোষণ ঘটতে বাধ্য। তাছাড়া এই প্রতিযোগিতার ফলে শিল্পে সঙ্কট দেখা দেয় এবং শ্রমিক ছাঁটাই ঘটে। (৪) এজন্য লুই ব্ল্যাঙ্ক রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে শিল্প স্থাপনের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি মনে করতেন যে, রাষ্ট্র কর্তৃক স্থাপিত কারখানা দ্বারা উৎপাদন হলে ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং তজ্জনিত শোষণ বন্ধ হবে। রাষ্ট্রীয় কারখানায় যোগ্যতা অনুযায়ী শ্রম করে প্রয়োজন অনুযায়ী পারিশ্রমিক পেলে শ্রমিক শ্রেণীর উন্নতি ঘটবে (Each according to his ability, each according to his need)। জাতীয় কারখানা স্থাপন (National Workshop) ছিল লুই ব্যাঙ্কের উল্লেখযোগ্য চিন্তা। ১৮৪৮ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পর ফ্রান্সে কিছুকাল এই পরীক্ষা চলে। কিন্তু বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরোধিতায় তা পরিত্যক্ত হয়। (আগে পৃঃ দেখ)। (৫) লুই ব্ল্যাঙ্ক নাগরিককে রাষ্ট্র কাজ দিতে বাধ্য এই তত্ত্ব প্রচার করেন। একে তিনি Right to work বা কর্মসংস্থানের মৌলিক অধিকার বলতেন। আদি সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে লুই ব্ল্যাঙ্ক বিশেষ উল্লেখ্য। যদিও মার্কসবাদের সঙ্গে তাঁর মতবাদের পার্থক্য ছিল, তথাপি তাকে সমাজতন্ত্রবাদের গুরু বলা হয়। এছাড়া জার্মান সমাজতন্ত্রবাদী ফার্দিনান্দ নাসালের নাম করা যায়। তাঁর বক্তব্য ছিল যে, শিল্প-কারখানার মালিকানা শ্রমিক বা শ্রমিক সমবায়ের হাতেই থাকা দরকার। এজন্য রাষ্ট্রের দ্বারা আইন রচনা করা উচিত। শিল্প পরিচালনার জন্যে শ্রমিক সমবায়কে রাষ্ট্রের উচিত ঋণ দান করা। শ্রমিকরা তাদের সমবায় চালিত কারখানা থেকে ন্যায্য মজুরী ছাড়া মুনাফার অংশ পেতে হকদার। প্যারিস কমিউনের অন্যতম নেতা ছিলেন প্রধোঁ (Proudhon)। তিনি ছিলেন মূলতঃ অ্যানার্কিষ্ট বা নৈরাজ্যবাদী।

আদি সমাজতন্ত্রবাদীদের চিন্তাধারার অবাস্তবতার জন্যে মার্কস এঁদের ইউটোপীয়ান (Utopian) বা বাস্তবতাহীন, ভাববাদী বলেছেন। সেন্ট সাইমন ও ফুরিয়ের ছিলেন অনেক

সমালোচনা

পরিমাণে কল্পনাবিলাসী ও অবাস্তব। এই সকল চিন্তাবিদরা ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ববাদ তত্ত্ব জানতেন না। মালিকশ্রেণী শ্রমিককে শোষণ করে স্ফীত হয় এই তত্ত্বকে তারা স্বীকার করেননি। শিল্পে শ্রমিকের স্বার্থই হল আসল, মালিকের কোন ন্যায্য দাবী নেই এই মার্কসীয় তত্ত্ব তারা জানতেন না। ফলে তাঁরা শ্রেণী সংগ্রামের কথা বলেন নি। তাঁরা মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে ভাল সম্পর্ক স্থাপনের কথা বলেন। ইতিহাসের নিয়মে বুর্জোয়াতন্ত্রের পতন ও শ্রমিকতন্ত্রের উদ্ভব হবে একথা তাঁরা বুঝেননি। দ্বিতীয়তঃ, মার্কস যে মূল্যতত্ত্ব (Marxian theory of value) ব্যাখ্যা করেছেন তাতে উৎপাদনের ব্যাপারে মালিকের কোন ভূমিকা নেই। শ্রমিকের শ্রম দ্বারাই উৎপাদন হয়। সুতরাং মার্কসের মতে, উৎপাদনের যে মুনাফা তাহা শ্রমিকেরই প্রাপ্য। তৃতীয়তঃ, শ্রমিকের অবস্থার উন্নতি ঘটাতে হলে রাষ্ট্রকে আইন দ্বারা মুনাফা নিয়ন্ত্রণ ও শ্রমিক কল্যাণমূলক আইন করতে হবে। আদি সমাজতান্ত্রিকরা এই দিকে চিন্তা করেননি। সর্বশেষে, উৎপাদন ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে আনলে শ্রমিকের শোষণ কমবে একথাও তাঁরা ভাবেন নি।

কার্ল মার্কসের জীবন কাহিনী (The Life of Karl Marx) : বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের জন্মদাতা হিসেবে আধুনিক যুগে দার্শনিক কার্ল মার্কস বিখ্যাত। জার্মানীর এক ইহুদি পরিবারে ১৮১৮ খ্রীঃ মার্কসের জন্ম হয়। তাঁর পূর্বপুরুষেরা ছিলেন ইহুদি পুরোহিত (Rabbi)। জার্মানীর ট্রিয়ার শহরের বিদ্যালয়ে পাঠ সাঙ্গ করে তিনি বন ও বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ নেন। এই সময় জার্মান দার্শনিক হেগেলের প্রভাবে তিনি দর্শন শাস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হন। এই সময় থেকে হেগেলীয় তত্ত্বকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে মার্কস তাঁর বিখ্যাত ডায়ালেকটিকাল মেটিরিয়ালিজম বা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন। এই তত্ত্ব তিনি ইতিহাসের ব্যাখ্যায় প্রয়োগ করে সমাজ ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক পরিবর্তন তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন।

কার্লমার্কসের শিক্ষা ও হেগেলের সহিত সম্পর্ক

মার্কস রেইনিশ জেইটুং নামে এক পত্রিকা সম্পাদন করেন। এই পত্রিকায় তাঁর প্রথম দিকের রচনাগুলি প্রকাশিত হয়। প্রাশিয়া সরকার তাঁর বিপ্লবী মতবাদের জন্যে দেশত্যাগের আদেশ দিলে, তিনি প্যারিসে চলে আসেন। প্যারিসে অবস্থানকালে অপর জার্মান চিন্তাবিদ ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব জন্মায়। এই বন্ধুত্ব আমৃত্যু অক্ষুণ্ণ ছিল। মার্কসের জীবনের বহু আপদে-বিপদে এঙ্গেলস সর্বদা তাঁর পাশে থাকতেন। দুজনে বহু দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা করেন। ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, মার্কসের বহু দার্শনিক তত্ত্বকে সম্পূর্ণতা দান করেন।

মার্কস ও এঙ্গেলস

১৮৪৭ খ্রীঃ তাঁর বৈপ্লবিক মতবাদের জন্যে মার্কস ফ্রান্স থেকে বহিষ্কৃত হয়ে বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে আশ্রয় নেন। ব্রাসেলসে বসবাস কালে তিনি কমিউনিস্ট লীগ স্থাপন করেন। পরে ব্রাসেলস থেকে বহিষ্কৃত হয়ে তিনি জীবনের শেষ দিনগুলি ইংলন্ডে কাটান। লন্ডন ও ম্যাঞ্চেষ্টার উভয় স্থানে তিনি বাস করতেন। ম্যাঞ্চেষ্টার লাইব্রেরীতে মার্কস তাঁর পঠন-পাঠন চালাতেন।

লণ্ডনে নির্বাসিত জীবন

মার্কসের প্রকাশিত ভুবন-বিখ্যাত গ্রন্থগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম তাঁর কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো (১৮৪৮ খ্রীঃ) তাঁকে খ্যাতির শিখরে পৌঁছে দেয়। এই গ্রন্থ ছিল মার্কসীয় সমাজতন্ত্রবাদের প্রথম তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। অতঃপর তাঁর ক্রিটিক অব পলিটিক্যাল ইকনমি (১৮৫৯ খ্রীঃ) প্রকাশিত হয়। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ড্যাস ক্যাপিটাল (Das Capital) ১৮৬৭ খ্রীঃ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে তিনি তাঁর দার্শনিক তত্ত্বগুলির পূর্ণ বিশ্লেষণ করেন। এছাড়া তিনি বহু প্রবন্ধ রচনা করেন। ১৮৮৩ খ্রীঃ এই মনীষির মৃত্যু হয়।

মার্কসের বিখ্যাত গ্রন্থসমূহ

মার্কসের প্রকাশিত গ্রন্থগুলির মধ্যে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো খুবই বিখ্যাত রচনা। এক কথায় এই গ্রন্থটিকে সমাজতন্ত্রবাদী দর্শনের বাইবেল বলা হয়। গ্রন্থটি ৪টি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে সমাজের বিবর্তন এবং শ্রেণী সংগ্রামের পথে সমাজের অগ্রগতির কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্যে সম্পত্তির রাষ্ট্রীয়করণ, উৎপাদন ব্যবস্থার রাষ্ট্রীয়করণ প্রভৃতির কথা বলা হয়। তৃতীয় খণ্ডে ইওরোপীয় সমাজতন্ত্রের সমালোচনা করে তাঁর দুর্বলতা দেখানো হয়েছে। চতুর্থ খণ্ডে কমিউনিস্টদের কর্তব্য এবং প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের কৌশল বলা হয়েছে। তবে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো গ্রন্থে মার্কসের উদ্বৃত্ত মূল্যতত্ত্ব আলোচিত হয়নি। অধ্যাপক হ্যারল্ড লাস্কীর মতে, "মার্কসের রচিত কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো একটি অসাধারণ গ্রন্থ। সামাজিক শোষণের বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্ন প্রতিবাদী মতগুলিকে এই গ্রন্থ একটি দার্শনিক প্রতিবাদে উদ্ভাসিত করে। সমাজতন্ত্রবাদকে এই গ্রন্থ একটি ঐতিহাসিক পটভূমিকা ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি দান করে।"

কমিউনিষ্ট ম্যানিফেস্টো

মার্কসবাদী সমাজতন্ত্র বা কমিউনিজম (Marxian Socialism or Communism) : বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের প্রচারক হিসেবে দার্শনিক কার্ল মার্কস সমগ্র পৃথিবীতে খ্যাতিলাভ করেছেন। মার্কসীয় তত্ত্ব অনুসারে অধুনা পৃথিবীর বহু দেশ সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা গঠন করেছে। ফরাসী চিন্তাবিদ রুশো যেরূপ জন-সার্বভৌমত্ব তত্ত্ব দ্বারা গণতান্ত্রিক ভাবধারাকে স্থায়ী রূপ দেন কার্ল মার্কস সেরূপ তাঁর সমাজতান্ত্রিক তত্ত্ব দ্বারা সমাজতন্ত্রের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করেছেন। কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো ও ড্যাস ক্যাপিটাল এই দুটি গ্রন্থে মার্কসীয় দর্শনের প্রধান দিকগুলি পাওয়া যায়।

মার্কসের মতে, যে কোন সমাজ ব্যবস্থায় সম্পদের উৎপাদন ব্যবস্থাই সমাজকে চালিত করে। প্রতি সমাজে সম্পদের উৎপাদন ব্যবস্থা ও সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ দ্বারা সমাজ চালিত হয়। এই উৎপাদনী শক্তি ও সম্পদকে দখল করবার জন্যে ইতিহাসে নিরন্তর বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সংগ্রাম চলে। উৎপাদন শক্তি দখলের জন্যে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্বই হল ইতিহাসের প্রধান বিষয়বস্তু। ইঞ্জিন যেমন গাড়িকে চালায়; শ্রেণী দ্বন্দ্ব ইতিহাসকে চালায়। মার্কসের এই তত্ত্বকে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ (dialectical materialism) বলা হয়। যে ক্ষেত্রে হেগেল নামক জার্মান দার্শনিক মনে করতেন যে, পরস্পর বিরোধী আদর্শের সংঘাত (Ideas) ইতিহাসকে চালিত করে, সে ক্ষেত্রে মার্কস হেগেলের মত অস্বীকার করেন। মার্কস অর্থনৈতিক শক্তিকেই ইতিহাসের চালিকা শক্তি বলে মত প্রকাশ করেন। (The mode of production in material life determines the general character of the social, political and spiritual process of life—Communist Manifesto)। মার্কসের মতে, সমাজে সর্বদা শোষক ও শোষিত এই দুই শ্রেণী থাকে। এই দুই শ্রেণীর সংঘাতের ফলে যে পরিবর্তন ঘটে তার ফলে ইতিহাসের অগ্রগতি ঘটে। পুরাতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে নতুন ব্যবস্থার দ্বন্দ্ব চলে। এই দ্বন্দ্বের ফলে যে পরিবর্তন ঘটে তা কিছুদিন চলবার পর, তা আবার পুরাতন ব্যবস্থায় পরিণত হয়। তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ব্যবস্থা জেগে ওঠে।

যতদিন না এক মহা-বিপ্লবের তরঙ্গের অভিঘাতে এই প্রচলিত সমাজব্যবস্থা ভেঙে না পড়ে ততদিন শোষক শোষিতের দ্বন্দ্ব চলতেই থাকবে। মার্কস একটি Law of Negation বা তত্ত্ব দিয়েছেন যাকে থিসিস বা প্রস্তাব, anti-thesis বা বিপ্রস্তাব এবং synthesis বা সমন্বয় বলা হয়। প্রথমে একটি ব্যবস্থা কিছুদিন চলতে থাকে তা হয় থিসিস। আভ্যন্তরীন স্ব-বিরোধিতার ফলে সেই ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে আর একটি ব্যবস্থা আসে যাতে আগের স্ব-বিরোধীতা থাকে না। যেহেতু বিকল্প প্রস্তাব বা বিপ্রস্তাব হল পূর্ববর্তী প্রস্তাবের নেতিবাচক দিক তাও শেষ পর্যন্ত ক্ষয় পায়। শেষ পর্যন্ত প্রস্তাব ও বিপ্রস্তাবের সমন্বয় ঘটে, যাকে তিনি synthesis বলেছেন। এই বিবর্তন হল ইতিহাসের গতির বিভিন্ন পর্যায় মাত্র। সমন্বয় বা synthesis হল পূর্ববর্তী ব্যবস্থা অপেক্ষা উচ্চতর ব্যবস্থা।

প্রাচীন যুগে গ্রীস ও রোম প্রভৃতি দেশে দাসশ্রম ও দাস ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে একশ্রেণীর লোক সমাজকে শাসন করত। এই সমাজে দাস শ্রেণীকে উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা হত। উৎপাদিত সম্পদ দাস মালিকরা ভোগ করত এবং দাসদের পদানত রেখে এই ব্যবস্থা চালনা করা হত। ক্রমে সমাজে উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে। এর ফলে দাস প্রথা ও দাস শ্রম দ্বারা উৎপাদন লোপ পায়। মধ্য যুগে সামন্ত প্রথার উদ্ভবের ফলে এই পরিবর্তন ঘটে। ভূমিদাস ও কৃষক শ্রেণী জমিতে তাদের শ্রম দ্বারা যা উৎপাদন করত তার সিংহ ভাগ সামন্তশ্রেণী অধিকার করত; কারণ সামন্তশ্রেণী এই জমির ওপর মালিকানা দাবী করত। সমাজের বৃহত্তর লোক ভূমিদাস অথবা দিনমজুর হিসেবে অর্ধাশনে ও অনশনে থাকত। সামন্তশ্রেণী রাষ্ট্রশক্তি অধিকার করে রাষ্ট্রযন্ত্রকে তাদের স্বার্থে ব্যবহার করত। রাষ্ট্রের আইন ও

সেনা দ্বারা এই শোষণ ব্যবস্থাকে নিজ শ্রেণীর স্বার্থে রক্ষা করত। ক্রমে অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের ফলে ব্যবসায়-বাণিজ্য বাড়লে নগরবাসী বুর্জোয়াশ্রেণীর উদ্ভব হয়। এই বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত শ্রেণী কৃষি অর্থনীতির ওপর নির্ভরশীল ছিল না। বাণিজ্য, শিল্প, চাকুরী ছিল তাদের জীবিকা। বুর্জোয়া শ্রেণী দেখে যে, রাষ্ট্র ও অর্থনৈতিক শক্তি সামন্তশ্রেণীর হাতে আছে। তা ধ্বংস না করলে নিজ শ্রেণীর স্বাধীনতা আসবে না। ফলে বুর্জোয়াশ্রেণী নির্যাতিত লোকেদের নেতৃত্ব দিয়ে সামন্তপ্রথাকে ধ্বংস করে ফেলে। ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস হল সামন্তশ্রেণীর বিরুদ্ধে বুর্জোয়াশ্রেণীর ক্ষমতা লাভের সংগ্রাম। বুর্জোয়াশ্রেণীর এই সংগ্রামে, সাধারণ মানুষ বুর্জোয়াশ্রেণীর সামিল হয়।

বুর্জোয়া বিপ্লবের ব্যাখ্যা

সামন্ততন্ত্র ধ্বংস হলে মূলধনী বা বুর্জোয়া শ্রেণী শিল্প-বাণিজ্য ও উৎপাদন ব্যবস্থার একচেটিয়া অধিকার গ্রহণ করে। তারাও সামন্তদের ন্যায় রাষ্ট্রকে নিজ নিয়ন্ত্রণে আনে এবং রাষ্ট্রের সাহায্যে তাদের অধিকার কায়েম করে। শ্রমিক শ্রেণী কলে-কারখানায় শোষিত হয়, মালিকের মুনাফা স্ফীত হতে থাকে। এভাবে ধনী আরও ধনী হয় এবং দরিদ্র আরও দরিদ্র হয়।

শ্রমিক বিপ্লব ঃ শ্রেণী সংগ্রাম তত্ত্ব

মার্কস বিশ্বাস করতেন যে, ইতিহাসের দ্বন্দ্বতত্ত্ব অনুসারে নির্যাতিত শোষিত শ্রমিক শ্রেণী মালিকদের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিবে। কারণ ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক নিয়মে কোন শোষক শ্রেণী চিরকাল ক্ষমতায় থেকে শোষণ করতে পারে না। সুতরাং শ্রমিকের প্রাপ্য অধিকার আদায় করার দিন সমাগত হয়েছে। ধনতান্ত্রিক শোষণ যতই বাড়বে ততই শ্রমিক বিরোধ তীব্র হবে। এই Contradiction বা দ্বন্দ্ব থেকেই নতুন শ্রমিক সমাজের জন্ম হবে। ইতিহাসের এই নিয়ম কার্যকরী হতে বাধ্য। মার্কস এজন্য তাঁর কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো গ্রন্থে পৃথিবীর শ্রমিকদেরও ডাক দিয়ে বলেন যে, "সকল দেশের মেহনতী শ্রমিক এক হও। তোমাদের বন্ধন শৃঙ্খল ভেঙে পড়বে।"[১] মার্কসের মতে, ইতিহাস শুধুমাত্র কতকগুলি ঘটনার সমষ্টি নয় বা ব্যক্তির জীবনী নয়। ইতিহাসের কার্যকারণ সম্পর্ক আছে অনেক গভীরে—সমাজের উৎপাদন শক্তির ওপর কোন এক বিশেষ শ্রেণীর অধিকার এবং অপর শ্রেণীর বঞ্চনা ও শোষণ এবং তজ্জনিত শ্রেণীবিদ্রোহের ভেতর। ইতিহাস নির্দিষ্ট দ্বান্দ্বিক নিয়মে চলবে। শেষ পর্যন্ত শোষক শ্রেণী ইতিহাসের নিয়মে লোপ পাবে। যেরূপ ভাবে দাস যুগের ও সামন্ত যুগের অবসান ঘটেছে সেই ভাবে ধনতন্ত্রী সমাজের পতন ঘটবে। মার্কস শ্রেণীসংগ্রামকেই ইতিহাসের পরিবর্তনের হাতিয়ার (tools of history) মনে করতেন। অতীতে যেরূপ বুর্জোয়া শ্রেণী ইতিহাসের অচেতন হাতিয়ার হিসেবে সামন্ত প্রথা ধ্বংস করে ক্ষমতা নেয়, সেরূপ শিল্প সমাজে, শ্রমিকেরা বুর্জোয়া শ্রেণীর হাত থেকে ক্ষমতা নিবে।

আদি সমাজতন্ত্রের সঙ্গে পার্থক্য

ধনতন্ত্রী বা পুঁজিপতি শ্রেণী উৎপাদন ব্যবস্থা ও যন্ত্রপাতির ওপর নিয়ন্ত্রণ করে। শ্রমিকেরা তাদের নিকট কেবলমাত্র শ্রম বিক্রয় করে। কিন্তু শ্রমিকেরাই হল প্রকৃত পণ্য উৎপাদনকারী। মার্কসীয় মূল্যতত্ত্ব অনুসারে শিল্প উৎপাদন ব্যবস্থায় তথাকথিত মালিক শ্রেণীর কোন ভূমিকা থাকতে পারে না। কোন উৎপাদিত শিল্পদ্রব্যের মূল্য শ্রমের মূল্য দ্বারাই নির্ধারিত হওয়া উচিত। উৎপন্ন মালের খরচা মিটিয়ে যা উদ্বৃত্ত থাকবে তা শ্রমিকেরই প্রাপ্য। কিন্তু ধনতান্ত্রিক সমাজে মালিকেরা উৎপাদন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে এবং সকল মুনাফা অধিকার করে। শ্রমিককে অনাহারে থাকতে হয়। এজন্য মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে স্বার্থ সমন্বয় ঘটতে পারে না। কারণ তাদের মধ্যে খাদ্য-খাদক সম্পর্ক আছে। তিনি আদি সমাজতন্ত্রবাদীদের ইউটোপীয়ান বা কল্পনা-বিলাসী বলেন। কারণ এঁরা শ্রমিক-মালিকের স্বার্থের দ্বন্দ্বে আপোষ রফায় বিশ্বাস করতেন। মার্কস তাঁর সমাজতান্ত্রিক

১· Karl Mark—P. N. Fecoseyev. & other P. 148—49.

মতবাদকে আদি সমাজতান্ত্রিকদের মতবাদ থেকে পৃথক করার জন্যে কমিউনিজম বা সাধারণতন্ত্র নাম দিয়েছেন। মার্কস মনে করতেন যে, শ্রমিক বিপ্লব ছাড়া ধনতন্ত্রকে ধ্বংস করা যাবে না। মার্কস বলেন যে, যাদুকর অশরীরিকে সৃষ্টি করার পর তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হলে, সেই অশরীরির স্রষ্টা যাদুকর তার সৃষ্টির হাতে যেমন নিহত হয়; সেরূপ ধনতন্ত্র শ্রমিক শক্তিকে সৃষ্টি করে, সেই শ্রমিক বিপ্লবের ফলেই ধ্বংস হবে।

মার্কসীয় মূল্যতত্ত্ব ও শ্রেণী তত্ত্ব

মার্কস তাঁর মূল্যতত্ত্ব (Theory of Value) ব্যাখ্যা করে বলেন যে, উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য নিরূপণের সময় ও তাহা বিক্রয় করে বন্টনের সময় মুনাফা মূলধনের অংশ হিসেবে আসা উচিত নয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মূলধনকেই প্রধান অংশ দেওয়া হয়। মার্কসের মতে, শ্রমিকের শ্রমের দ্বারা উৎপন্ন মালই হইল মূলধন। কাঁচামালও শ্রম দ্বারা উৎপাদিত হয়। সুতরাং দেখা যায় যে, শ্রমিকের শ্রম প্রযুক্ত হলে তবেই শিল্প সামগ্রী উৎপাদিত হয়। সুতরাং শিল্পের দ্বারা আয় হলে তাহা একমাত্র শ্রমিকেরই প্রাপ্য।[১] মার্কসের মতে, তাদের উৎসের ভিত্তিতে সমাজে তিনটি শ্রেণী দেখা যায়। যথা শক্তির ওপর নির্ভরশীল মজুরীভোগী শ্রমিক, পুঁজির নিয়ন্ত্রণকারী পুঁজিপতি বা শিল্প মালিক শ্রেণী এবং জমির খাজনার ওপর নির্ভরশীল জমি মালিকশ্রেণী। শিল্প-বিপ্লবের ফলে জমি মালিকশ্রেণী ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত থাকে দুটি শ্রেণী যথা পুঁজিপতি ও শ্রমিক, যাদের মধ্যে খাদ্য-খাদক সম্পর্ক ছাড়া আর কিছু নেই। মার্কস কৃষককে প্রকৃত শ্রেণী বলে গণ্য করেননি। কারণ কৃষকদের মধ্যে উৎপাদন পদ্ধতির সমতা থাকায় তাদের মধ্যে শ্রেণীগত বিচ্ছিন্নতা গড়ে উঠেনি। কৃষকদের মধ্যে অন্য শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামী মনোভাবের তিনি সম্ভাবনা দেখেননি।

বুর্জোয়া সমাজের ভাঙন

মার্কসের মতে, ধনতন্ত্রের প্রধান ত্রুটি এই যে, এই ব্যবস্থা শোষণ ও অসাম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো গ্রন্থে মার্কস ধনতান্ত্রিক শোষণের বিশদ ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন যে, পুঁজিবাদী সমাজ হল শ্রমিক শোষণ, অমানুষিক নির্যাতন এবং মুনাফার লোভের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই সমাজে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক অর্থের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। নগরগুলি গ্রামকে শোষণ করে স্ফীতকায় হয়। মার্কস বলেন যে, গ্রাম ও শহরের ব্যবধান হ্রাস করে কৃষির সঙ্গে শিল্পকে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে এনে সম্পদের বণ্টন করা দরকার।

মার্কসীয় সমাজতত্ত্ব

মার্কসের মতে জমি, সম্পদ প্রভৃতি সকল বস্তুই হল প্রকৃতির দান। এতে সকলের সমান অধিকার আছে। কোন বিশেষ শ্রেণী এগুলি একচেটিয়া করলে সমাজে ধনবৈষম্য ও শোষণ দেখা দেয়। মার্কসের মতে, শ্রমিকের দ্বারা গঠিত রাষ্ট্র উৎপাদন ব্যবস্থা ও সম্পদের জাতীয়করণ করে এই সম্পদ সমাজের সামগ্রিক স্বার্থে ব্যবহার করবে। উৎপাদন ব্যবস্থার ওপর সামাজিক মালিকানা স্থাপন করা হলে তবেই শ্রমিক তার শ্রমের ন্যায্য মূল্য পাবে।এজন্যে শিল্প উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার ওপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ স্থাপনের কথা তিনি বলেন। অবশ্য এই রাষ্ট্র হবে শ্রমিকের স্বার্থে পরিচালিত শ্রমিক রাষ্ট্র।

শ্রেণীহীন সমাজবাদ

মার্কস বলেন যে, সম্পদের জাতীয়করণ ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি লোপ করা হলে শ্রেণীহীন সমাজ (Classless society) স্থাপিত হবে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও সকল প্রকার সম্পদের জাতীয়করণ বা সামাজিক অধিকারে আনলে ধনীর সম্পত্তি সমাজ বা রাষ্ট্রের দখলে যাবে। ধনী আর ধনী থাকবে না। শোষণ বন্ধ হবে। সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তি লুপ্ত হলে কেউ কাহাকেও শোষণ করতে পারবে না। উৎপাদন ব্যবস্থার সকল

১. "The one thing common to all commodities is labour; hence labour is the only source of value."—Marx.

সূত্রগুলি সমাজ বা রাষ্ট্রের হাতে চলে এলে এবং সেই রাষ্ট্র শ্রমিকের দ্বারা পরিচালিত হলে শোষণের অবসান হবে। তাহলে শেষ পর্যন্ত শ্রেণী সংগ্রামও লোপ পাবে। শ্রেণীহীন সমাজে মানুষ তার প্রয়োজন অনুযায়ী সামাজিক সম্পদের অংশ ভোগ করতে পারবে। সকলে সমান হলে শ্রেণীহীন সমাজ স্থাপিত হবে। শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা হল মার্কসীয় শ্রেণী বিপ্লব তত্ত্বের চূড়ান্ত লক্ষ্য। শ্রেণীহীন সমাজে আর শ্রেণীগত দ্বন্দ্ব থাকবে না। সকলে সমান অধিকার ভোগ করবে। মার্কস মনে করতেন যে, "পরিমাণগত পরিবর্তনের শেষে গুণগত পরিবর্তন" আসবে (From quantitative change will come qualitative change)। মার্কস একটি সুন্দর উদাহরণ দ্বারা একথা বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। একটি পাখীর ডিম শুধুমাত্র ডিমই থাকে। কিন্তু তাতে পক্ষীমাতা দেহের উত্তাপ দ্বারা ডিমকে পাখীর বাচ্চায় পরিণত করে। অথবা জলকে ফুটান হলে জল ক্রমে বাষ্পে পরিণত হয়। সেই রকম সমাজে শ্রেণী সংগ্রামের পূর্ণতা আসলে তখন পুরাতনতন্ত্র ভেঙে নতুন সমাজ ব্যবস্থা আসে। শ্রেণী সংগ্রাম হল ইতিহাসের বিবর্তনের হাতিয়ার। শেষ পর্যন্ত শ্রেণীহীন সমাজ স্থাপন দ্বারা এর অবসান ঘটবে।

মার্কস মনে করেন যে, শোষিত শ্রমিকের জাতিগত ও দেশগত পার্থক্য থাকতে পারে না। শোষিত শ্রমিকের মধ্যে সাদা ও কালো ভেদ নেই। দুনিয়ার সকল শ্রমিকের একমাত্র শত্রু হল মুনাফাজীবি বুর্জোয়া শ্রেণী। সুতরাং পৃথিবীর সকল শ্রমিকের মুক্তি না ঘটলে শোষণের অবসান হবে না। মার্কস এই উদ্দেশ্যে ১৮৬৪ খ্রীঃ প্রথম ইন্টারন্যাশনাল বা আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী সংস্থা স্থাপন করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল বিশ্ব শ্রমিক বিপ্লব ঘটাবার আয়োজন করা। মার্কসবাদীরা এজন্যে জাতীয়তাবাদকে সঙ্কীর্ণ মত বলে মনে করেন।

বিশ্ব শ্রমিক বিপ্লবের আদর্শ

মার্কসবাদী মতের বিরুদ্ধে কোন কোন লেখক সমালোচনা করেছেন। (১) মার্কস ইতিহাসের যে অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা করেছেন তা অনেকে ভ্রান্ত বলে মনে করেন। ইতিহাস নানা বিষয়ের প্রভাবে এগিয়ে চলে। অর্থনীতি হল এই সকল প্রভাবের অন্যতম। ব্যক্তিগত প্রতিভা, আদর্শ, ধর্ম, জলবায়ু, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার প্রভৃতি নানা বিষয় দ্বারা ইতিহাসের গতি নিয়ন্ত্রিত হয়। তাছাড়া ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা শ্রেণীগত উচ্চাকাঙ্খা দ্বারাও ইতিহাসের গতি প্রভাবিত হয়। আলেকজান্ডার, নেপোলিয়ন প্রভৃতি ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্খার ফলে সাম্রাজ্য জয় করেন। সুতরাং ইতিহাসকে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক তত্ত্ব দ্বারা ব্যাখ্যা করা অবৈজ্ঞানিক বলে মনে করেন।

মার্কস বলেন যে, মানুষের সকল কিছু ক্রিয়াশীলতার মধ্যে অর্থনৈতিক শক্তির প্রভাব আছে। কিন্তু সভ্যতা ও সমাজের বিকাশে আবিষ্কারের মূল্য অপরিসীম। আবিষ্কারের পশ্চাতে সৃজনশীলতাই ক্রিয়াশীল, অর্থনৈতিক শক্তি নয়। আইনষ্টাইন তাঁর আপেক্ষিক তত্ত্ববাদ অর্থনৈতিক কারণের চাপে আবিষ্কার করেননি। শেক্সপিয়ার তাঁর নাটকগুলি অর্থনৈতিক কারণে রচনা করেননি। সুতরাং কেবল অর্থনৈতিক ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করায় সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে মানুষের বৌদ্ধিক শক্তিকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে, যা ঠিক নয়। এজন্য জনৈক সমালোচক ব্যঙ্গ করে বলেছেন যে, মার্কসীয় অর্থনৈতিক তত্ত্বকে যদি আমরা একটি প্রাসাদ বলি তবে তার নীচ তলায় আছে উৎপাদন ব্যবস্থা, ওপর তলায় বুদ্ধি ও প্রতিভা। মাঝখানে যোগাযোগের সিঁড়ি নেই।[১] তাছাড়া মার্কসীয় সমাজ কেবলমাত্র ধনী ও দরিদ্র এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। মার্কস মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে গ্রাহ্য করেননি। তাঁর মতে মধ্যবিত্ত শ্রেণী শেষ পর্যন্ত ধ্বংস হতে বাধ্য; থাকবে শুধু দুই মেরুতে দুটি শ্রেণী, যথা ধনী ও দরিদ্র। সমাজের এই মার্কসীয় মেরুকরণ আদপেই বাস্তবতা-সম্মত নয়। মার্কসীয় তত্ত্বের ব্যাখ্যার পর লক্ষ্য করা গেছে যে, মধ্যবর্তী শ্রেণী লোপ পাওয়ার স্থলে আরও শক্তিশালী হয়েছে।

১. Arthur Koestler,

একমাত্র মার্কসীয় দ্বন্দ্ববাদ দ্বারাই ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করা যায় না। দ্বন্দ্ববাদ তত্ত্ব যথা থিসিস, এ্যান্টিথিসিস ও সিন্থেসিস ইতিহাসে একটি ধারাবাহিক অবিচ্ছিন্ন অগ্রগতির আভাষ দেয়। কিন্তু ইতিহাস পাঠক মাত্রেই জানেন যে, ইতিহাসে উত্থান ও পতন বা অবক্ষয়ও আছে। একই প্রকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থায় একটি দেশের পতন না হলেও আরেকটি দেশের পতন হয়। একই রকম সামাজিক অবস্থায় তুরস্কে কামাল আতার্তুক সফল হন, আফগানিস্থানে আমীর আমানুল্লা বিফল হন। এর ব্যাখ্যা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে নেই। ইতিহাস অনেক জটিল ও দুর্বোধ্য পথে চলে। ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক ব্যাখ্যা একটি সরলীকরণ সূত্র ছাড়া আর কিছু নয়।

মার্কসীয় দর্শনের সমালোচনা

মার্কস মনে করেন যে, সাম্যবাদী রাষ্ট্র স্থাপিত হলে শোষণ বন্ধ হবে এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে শোষণ ও সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা লোপ পাবে। এক দেশের শ্রমিকের সঙ্গে অন্য দেশের শ্রমিকের কোন প্রভেদ নেই। কারণ উভয়েই শোষিত ও নির্যাতিত। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে, সাম্যবাদী দেশগুলিও জাতীয় স্বার্থ ও জাতীয়তাবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়। ভারতে ব্রিটিশ সরকার শোষণ চালালেও, ইংলন্ডের শ্রমিক দল ও শ্রমিক সরকার তাদের নিজ স্বার্থের জন্যে এর সমর্থন করে। সাম্যবাদী রাশিয়ার সঙ্গে সাম্যবাদী চীনের বিরোধ এবং সাম্যবাদী ভিয়েতনামের সঙ্গে সাম্যবাদী চীনের বিরোধ মার্কসীয় তত্ত্বের ভ্রান্তির পরিচয় দেয়। শ্রমিক শ্রেণী কেবলমাত্র অর্থনৈতিক স্বার্থের দ্বারা পরিচালিত হয় না। জাতীয়তাবাদ, ধর্ম ইত্যাদিও তাদের প্রভাবিত করে।

মার্কসীয় মূলতত্ত্বের ত্রুটি

কোন কোন অর্থনীতিবিদ মনে করেন যে, মার্কসীয় মূলতত্ত্ব ভ্রান্ত। মার্কস কেবলমাত্র শ্রমিকের শ্রমের ফলে উৎপাদন হয় বলে মনে করতেন। কিন্তু শিল্প পরিচালনা, বিজ্ঞাপনের খরচ, মূলধনের জন্যে সুদ প্রভৃতি বিষয় মার্কস অগ্রাহ্য করেছেন। তাঁদের মতে, মূলধন না থাকলে শিল্প গঠন করা যায় না। মার্কস এই বিষয়টি অগ্রাহ্য করেছেন। এই সমালোচকরা বলেন যে, মার্কস উৎপাদনের জন্যে মূলধন বা পুঁজির গুরুত্ব বোঝেননি। শুধু শ্রমিককে তার প্রাপ্য ফাঁকি দিয়ে পুঁজি যোগাড় হয়, এটি একটি অসার তত্ত্ব। শিল্প গঠন করতে হলে প্রথমেই পুঁজির দরকার হয়। তখন শিল্প গঠিত না হওয়ায়, শ্রমিককে তথাকথিত "ফাঁকি দেওয়ার" প্রশ্নই নেই। সেই প্রারম্ভিক পুঁজি কিভাবে আসবে সেকথা মার্কস বলেননি। দ্বিতীয়তঃ, পুঁজি এমনি পাওয়া যায় না। পুঁজিও শ্রম দ্বারা তা অর্জন করতে হয়। সেই পুঁজি যদি কোন ব্যক্তি বিলাসে ব্যয় না করে সঞ্চয় করে তাকে কি শোষণজাত পুঁজি বলা যাবে? যেহেতু সকলে পরিশ্রম, বুদ্ধি ও ত্যাগ স্বীকার করে পুঁজি যোগাড়ে সক্ষম নয় সেজন্য পুঁজি সহজলভ্য নয়। পুঁজি উৎপাদন রদ হলে শিল্প গঠন হবেই না। সুতরাং মূল্যতত্ত্বের ভেতর পুঁজির স্থান মেনে নেওয়া দরকার। তাছাড়া ধনতান্ত্রিক উৎপাদনে প্রতিযোগিতা থাকায় উৎপাদনের ব্যয় কম পড়ে। সাম্যবাদী উৎপাদনে রাষ্ট্র দ্বারা ইহা একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণে থাকায় উৎপাদনে ব্যয়ের হার বেশী পড়ে।

শ্রমিক কল্যাণমূলক আইন দ্বারা শ্রেণী সংগ্রামের বিলুপ্তি

ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি শ্রমিক কল্যাণমূলক আইন দ্বারা, কাজের সময় হ্রাস করে ও মজুরি বৃদ্ধি করে, ছাঁটাই রদ করে এবং নানা প্রকার কল্যাণমূলক ব্যবস্থার দ্বারা শ্রমিক অসন্তোষের তীব্রতা হ্রাস করে চলেছে। মার্কস যে যুগে তাঁর মতামত রচনা করেন, তা ছিল শিল্প-বিপ্লবের গোড়ার যুগ। সেই যুগ অধুনা গত হয়েছে। শ্রমিকের হাতে ভোট থাকার ফলে কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পক্ষে এই বৃহত্তর শ্রমিক শ্রেণীকে অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। সুতরাং রাষ্ট্র বিভিন্ন কল্যাণমূলক আইন দ্বারা শ্রমিক শোষণ নিয়ন্ত্রণ করে। গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ শিল্পে অগ্রসর হলেও সেই দেশে শ্রমিক বিপ্লব ঘটেনি। ব্রিটেনের ফেবিয়ানবাদী সমাজতন্ত্রীরা মনে করেন যে, রাষ্ট্রের

আইনের দ্বারা শ্রমিকের ও জনসাধারণের কল্যাণ করা সম্ভব। এজন্য শ্রেণী বিপ্লবের প্রয়োজন নেই। রুশ নেতা ক্রুশ্চেভ মার্কসবাদের সংশোধন করে নির্বাচনের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক দল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পেতে পারে বলে অভিমত দিয়েছেন।

মার্কসবাদের প্রযুক্তির ঐতিহাসিক প্রাসঙ্গিকতা

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি বিভিন্ন প্রকার আইন যথা আয় কর, সম্পত্তি কর প্রভৃতির দ্বারা ধনতন্ত্রের বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এদিকে শ্রমিক কল্যাণ আইন দ্বারা শ্রমিকের উন্নতি ঘটায়। ফলে মার্কসীয় তত্ত্ব অনুসারে ধনী আরও ধনী হয় এবং গরীব আরও গরীব হয় তা বর্তমান যুগে প্রযোজ্য নহে। রাষ্ট্র মূল শিল্পগুলিকে ব্যক্তিগত মালিকানায় না রেখে জাতীয়করণ করায় পুঁজিবাদের অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছে।

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতি

মার্কস বলেছেন যে, ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের খাদ্য-খাদক সম্পর্ক। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি সমাজতন্ত্রকে বিনাশের চেষ্টা করবে। কিন্তু সাম্যবাদী রাশিয়া ক্রুশ্চেভের আমল হতে ধনতন্ত্রবাদী মার্কিন দেশের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতি গ্রহণ করেছে।

মার্কসবাদের বিচ্যুতি

মার্কসের ব্যাখ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন মত দেখা যায়। রাশিয়ায় বিপ্লব শিল্প শ্রমিকের সাহায্যে ঘটে। ইহাই সঠিক মার্কসতন্ত্র বলে রাশিয়া দাবী করে। অপরদিকে চীনে কৃষি শ্রমিকের দ্বারা বিপ্লব সাধিত হয়; একে মার্কসবাদের নতুন প্রয়োগ বলা হয়। সুতরাং মার্কসবাদ এখনও বিবর্তনের স্তরে আছে বলা যায়।

নৈরাজ্যবাদী বা এ্যানার্কিষ্টরা (Anarchist) মনে করেন যে, কোন সমাজে রাষ্ট্র ব্যবস্থা হল একটি অশুভ ও স্বৈরাচারী শক্তি। মার্কসবাদের প্রধান স্তরে শ্রমিকের স্বার্থে শ্রমিক প্রতিনিধি চালিত রাষ্ট্রের হাতে সকল প্রকার উৎপাদন কেন্দ্রীভূত করার ফলে রাষ্ট্রই একটি শোষণ যন্ত্রে পরিণত হয়। এই রাষ্ট্র হল সর্বগ্রাসী ও সর্বাত্মক ক্ষমতাসম্পন্ন। এজন্য জনসাধারণের স্বাধীন বিকাশ ব্যাহত হয়। সিণ্ডিক্যালিষ্টরা মনে করেন যে, শ্রমিক শ্রেণী বিভিন্ন শিল্পে ইউনিয়ন গঠন করলেই তাদের স্বার্থ সিদ্ধ হবে। এজন্য তাদের রাজনৈতিক দল গঠনের প্রয়োজন নেই। ইউরো কমিউনিষ্ট নেতারা এছাড়া আরও বলেন যে—সোভিয়েত রাশিয়ায় শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কতন্ত্র (Dictatorship of the proletariates) স্থাপিত হয়। কিন্তু সোভিয়েত দেশে শ্রেণীহীন সমাজ হয়নি। এই রাষ্ট্রে যারা শ্রমিক নয় তারা অধিকারহীন হয়ে পড়েছে। কেহ কেহ মনে করেন যে, মার্কসবাদের ওপর ডারউইনবাদের প্রভাব দেখা যায়। ডারউইনবাদের মতই মার্কসবাদে পরিবেশের ওপর জোর দেওয়া হয়। প্রাণীজগতে যেমন প্রাকৃতিক পরিবেশের কথা ডারউইন বলেছেন, মনুষ্যজগতে মার্কস সেরূপ সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের কথা বলেছেন। প্রাণীজগতে যেরূপ বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাণীর মধ্যে সংঘাত চলে বলে ডারউইন মনে করেন; মানব সমাজে তেমনই মার্কস শ্রেণী সংগ্রামের কথা বলেছেন। এঙ্গেলস এজন্য বলেন যে, "ডারউইন যেভাবে প্রাণীজগতে বিবর্তনের নিয়ম আবিষ্কার করেন, মার্কস সেভাবে মানব ইতিহাসে বিবর্তনের নিয়ম আবিষ্কার করেন।"

মার্কসবাদের গুরুত্ব

মার্কসবাদের উপরোক্ত সমালোচনার জবাবে বলা যায় যে, মার্কসবাদের কিছু ভুল ত্রুটি দেখা গেলেও এই মতবাদের মূল নীতিগুলি স্বীকৃতি পেয়েছে। ঊনবিংশ শতকে মার্কসবাদ প্রচারিত হয়। তখনকার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই তত্ত্ব রচিত হয়। সময়ের পরিবর্তনের ফলে এতে সামান্য অসঙ্গতি দেখা গেলেও মূলতঃ ইহা সঠিক ও নির্ভুল বলে বহু লোক মনে করেন। শোষণহীন সমাজব্যবস্থা স্থাপনের ডাক দিয়ে, মার্কস নিপীড়িত জনগণ ও ঔপনিবেশিক শোষিত দেশগুলিতে স্থায়ী আসন পেয়েছেন। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ত্রুটি উদ্‌ঘাটন করে মার্কস এর শোষণমূলক চরিত্র উদ্‌ঘাটন করেছেন। আজকার যুগে

ধনতন্ত্রী দেশগুলিও শ্রমিকের কল্যাণকে কর্তব্য মনে করে। পৃথিবীর ভবিষ্যৎ ইতিহাস মার্কসবাদের দ্বারা অনিবার্যভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে বলে অনেকে এখনও মনে করেন।

নৈরাজ্যবাদ : প্রুধোঁ ও বাকুনিন (Anarchism : Proudhon and Bakunin) : নৈরাজ্যবাদের জনক ছিলেন ফরাসী চিন্তাবিদ প্রুধোঁ (Proudhon) (১৮০৯—১৮৬৫ খ্রীঃ)। প্রুধোঁ সমাজতন্ত্রবাদী হলেও কমিউনিজমের ঘোর সমালোচক ছিলেন। অবশ্য ইহা সত্য যে, প্রুধোঁর চিন্তাধারায় পরস্পর-বিরোধিতা দেখা যায়। তবু প্রুধোঁ তীব্র ভাষায় মার্কসবাদের সমালোচনা করেন। তিনি মনে করতেন যে, কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রে, সকল ক্ষমতার আধার হল রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রই মেহনতী জনগণের প্রধান শোষকে পরিণত হয়। তাঁর মতে "সম্পত্তির অধিকারের অর্থ যদি প্রবল দ্বারা দুর্বলের শোষণ হয়; তবে সাম্যবাদ হল দুর্বলের দ্বারা যৌথভাবে প্রবলকে শোষণ করা।"[১] মার্কসের সঙ্গে প্রুধোঁর এজন্য তীব্র মতভেদ ঘটে এবং মার্কস প্রুধোঁর মতবাদকে "ভণ্ডামি ও বাজে" বলে মন্তব্য করেন।

প্রুধোঁবাদ

নৈরাজ্যবাদের অন্যতম প্রধান প্রবক্তা ছিলেন মাইকেল বাকুনিন। মাইকেল বাকুনিনের দেহে রুশ অভিজাত পরিবারের রক্ত থাকলেও তিনি ছিলেন চিন্তায় বিপ্লবী। সামরিক বিভাগে কিছুকাল কাজ করার পর তিনি বিপ্লবী দলে যোগ দেন। ১৮৪৮ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের সময় তিনি প্যারিসের রাস্তায় শ্রেণী যুদ্ধে যোগ দেন। তিনি পরে বোহেমিয়ার বিদ্রোহে অংশ নেন। ৮ বছর কারাদণ্ড ভোগ করার পর, তিনি সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হন। তিনি সাইবেরিয়া থেকে জাপানের পথে পলায়ন করেন এবং পশ্চিম ইওরোপে নৈরাজ্যবাদী সঙ্ঘ গঠন করেন। ১৮৭১ খ্রীঃ প্যারিস কমিউনের বিপ্লবের সময় তিনি ফ্রান্সের লায়নস (Lyons) শহরে একটি কমিউন স্থাপন করেন। ১৮৭৬ খ্রীঃ ৬২ বছর বয়সে এই বিখ্যাত বিপ্লবীর মৃত্যু হয়।

বাকুনিনের জীবন

বাকুনিনের ভাবধারায় নৈরাজ্যবাদী দর্শনের চিন্তা বিশদভাবে বোঝা যায়। নৈরাজ্যবাদী হিসেবে বাকুনিন মনে করতেন যে, মানুষ মৌলিকভাবে সৎ হলেও বিভিন্ন সংস্থার দ্বারা দুর্নীতিগ্রস্ত হয়েছে। রাষ্ট্র, গীর্জা, ধনতন্ত্র প্রভৃতি মানুষকে শোষণ করে। বাকুনিন বলেন যে, রাষ্ট্রের উৎপত্তি বল বা শক্তি এবং রক্তপাতের দ্বারা হয়েছে। সুতরাং রাষ্ট্র যাহা কিছু করে তার পশ্চাতে বল বা জবরদস্তির প্রকাশ থাকে। এমন কি যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র উৎপাদন ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করে সেই রাষ্ট্রও ক্ষমতার মদমত্ততায় ক্ষমতার অপব্যবহার করে। এজন্য রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে বিকেন্দ্রিক্রীত না করলে ব্যক্তির স্বাধীনতা রক্ষিত হবে না।

নৈরাজ্যবাদ : বিকেন্দ্রীকরণ

বাকুনিন ধনতন্ত্রবাদের কুফল সম্পর্কে উল্লেখ করেন। কারণ ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মুষ্টিমেয় লোক বৃহত্তর জনগণকে শোষণ করে। এটি হল একটি বৈষম্যমূলক অন্যায় ব্যবস্থা। খ্রীষ্টীয় গীর্জা সম্পর্কেও বাকুনিন বলেন যে, গীর্জা মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতা ও চিন্তার স্বাধীনতা হরণ করে তাকে আবদ্ধ করেছে। গীর্জা হল একটি শোষণমূলক সংস্থা। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যারও বাকুনিন তীব্র সমালোচনা করেন। বিজ্ঞান প্রকৃতির নিয়ম আবিষ্কার করার ফলে, এর অনুকরণে সামাজিক নিয়ম নামে কয়েকটি প্রথা চালু করা হয়। মানুষের স্বাধীনতা হরণের জন্যে রাষ্ট্র এই নিয়মগুলি জোর করে চালু করে। বাকুনিন সকল প্রকার সংগঠন ও সংস্থার এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থার লোপ কামনা করতেন। কারণ এর মাধ্যমে কিছু লোক বাকি লোকেদের পদানত করে।

ধনতন্ত্রবাদ ও প্রযুক্তি বিজ্ঞানের বিরোধিতা

১· "Property is the exploitation of the weak by the strong. Communism is the exploitation of the strong by the weak."

সিন্ডিক্যালিষ্ট বা সিণ্ডিকবাদীদের মতবাদের সঙ্গে বাকুনিনের চিন্তার মৌলিক তফাৎ ছিল। সিণ্ডিকবাদীরা শ্রেণী সংগ্রাম ও শ্রমিকের অধিকারের তত্ত্বে বিশ্বাস করত। তারা মনে করত যে, শ্রেণী সংগ্রামের হাতিয়ার হল শ্রমিকদের দ্বারা অনুষ্ঠিত সাধারণ ধর্মঘট। শ্রমিকদের রাজনৈতিক দলের স্থলে শ্রমিক ইউনিয়নের সংগঠনের ওপর সিণ্ডিকবাদীরা জোর দেন। বাকুনিন সিণ্ডিকবাদের এই চিন্তাকে অগ্রাহ্য করেন। যদিও তিনি মার্কসবাদীদের মত শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্বে বিশ্বাস করতেন; কিন্তু তিনি মার্কসের মত "শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কতন্ত্রের আদর্শে বিশ্বাস করতেন না।"[১] বাকুনিন রাষ্ট্র যন্ত্রকে শোষণের হাতিয়ার বলে গণ্য করতেন। তিনি সিণ্ডিকবাদীদের মতকেও অগ্রাহ্য করেন। তিনি শিল্পক্ষেত্রে সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লব অপেক্ষা দরিদ্র কৃষক ও দরিদ্র সাঁকুলেৎ শ্রেণীর বিপ্লবের ওপর বেশী গুরুত্ব দেন। দক্ষিণ-পূর্ব ইওরোপ ও স্পেনের কৃষক আন্দোলনে বাকুনিনের চিন্তাধারার প্রভাব দেখা যায়।

মার্কসবাদ হতে নৈরাজ্যবাদের পার্থক্য

বাকুনিন মার্কসবাদ-এর সমালোচনায় বলেন যে, মার্কসবাদ দ্বারা সমাজে ও রাষ্ট্রে এক ধরনের স্বৈরতন্ত্র গড়ে ওঠে। মার্কসবাদের প্রয়োগ দ্বারা রাষ্ট্রশক্তি ও অর্থনীতি এমন একটি গোষ্ঠীর কবলিত হয় যারা বাকি লোকদের পদানত করে।[২] মার্কসীয় ব্যবস্থায় শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কতন্ত্র স্থাপিত হয় (Dictatorship of the Proletariat)। এটি বুর্জোয়া গণতন্ত্রের ন্যায় একটি শ্রেণী শাসন স্থাপন করে। এর ফলে রাষ্ট্রের ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়ে স্বৈরশাসন প্রকাশ পায়।

মার্কসবাদের সমালোচনা

আলবেয়ার কামু নামক ফরাসী চিন্তাবিদের মতে, মার্কসের ন্যায় বাকুনিন বিপ্লবের স্বপ্ন দেখতেন। বাকুনিন সকল প্রকার প্রচলিত সংস্থার ধ্বংস কামনা করতেন। তিনি মনে করতেন যে, এক ধরণের শিক্ষিত শ্রেণী এই বিপ্লবের অগ্রদূত হিসেবে কাজ করবে।

বাকুনিনের ধ্বংসাত্মক নীতি

ক্রপোটকিন (১৮৮২-১৯২১ খ্রীঃ) ছিলেন অপর এক নৈরাজ্যবাদী। তিনি জাতিতে রুশ ছিলেন। তিনি জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের আমলে নিহিলিষ্ট আন্দোলনে (বিশদ বিবরণ পৃঃ দেখ) যোগ দেন। তাঁর বিখ্যাত রচনাগুলির মধ্যে মর্ডান সায়েন্স ও এ্যানার্কিজম (Modern Science and Anarchism) প্রভৃতি গ্রন্থ বিখ্যাত। ক্রপোটকিনের ব্যক্তিগত ব্যবহার ছিল মধুর এবং আকর্ষণীয়। স্বামী বিবেকানন্দ বিলাতে কিছুকাল তাঁর সংস্পর্শে আসেন। রাশিয়ার লেনিন সরকার তাঁর মৃত্যুতে তাঁকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাধি দানের প্রস্তাব দেন।

ক্রপোটকিন

শ্রমিক ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন (Labour and Trade Union Movements)ঃ শিল্প-বিপ্লবের ফলে ইওরোপে ধনতন্ত্রবাদী শিল্প উৎপাদন ব্যবস্থা এবং তজ্জনিত সামাজিক ও শ্রমিক অসন্তোষের কথা আগের প্রবন্ধগুলিতে আলোচনা করা হয়েছে। পুঁজিবাদীরা সংগঠিতভাবে শিল্পে একচেটিয়া আধিপত্য স্থাপন ও একচেটিয়া মুনাফা লাভের যে নীতি নেয়, তার প্রতিক্রিয়া হিসেবে শ্রমিকরা তাদের দাবী আদায় ও অধিকার রক্ষার জন্যে সঙ্ঘ বা ইউনিয়ন গঠনের উদ্যোগ নিতে বাধ্য হয়। ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রবাদীরা দীর্ঘকাল ধরে শ্রমিক সমবায় ও শ্রমিক গঠনের তত্ত্ব প্রচার করে শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা বোঝান। তৎকালীন সরকারগুলি ছিল পুঁজিবাদীদের সমর্থক। সুতরাং সরকারের বিরোধিতা অগ্রাহ্য করে বে-আইনীভাবে শ্রমিক সংগঠন তৈরি করা সহজ কাজ ছিল না। এ্যান্ড্রু কার্ণেগী বলেন যে, "শিল্প

১· David Thomson.
২· Gordon Craig. P. 204.

মালিক বা শিল্প উৎপাদক শ্রেণীর পক্ষে জোটবদ্ধ হওয়া যেমন একটি পবিত্র অধিকার, শ্রমিকদের পক্ষে জোটবদ্ধ হওয়া সেরূপ একটি পবিত্র অধিকার বলে গণ্য করা উচিত।" যাতে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে বদলায়, এজন্য বুদ্ধিজীবি ও সমাজতন্ত্রী নেতারা শ্রমিকদের ভোটাধিকার দাবী করেন। ফরাসী সমাজতন্ত্রবাদী লুই ব্ল্যাঙ্ক বলেন যে, শ্রমিকরা পার্লামেন্টের সদস্য হতে পারলে তারা আইনকে শ্রমিকের স্বার্থের অনুকুলে আনতে পারবে। তার ফলে শুধু শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষাই হবে না, শ্রমিক ইউনিয়ন বা শ্রমিক সংগঠনের বিরোধীতার পথ থেকে সরকার সরে আসতে বাধ্য হবে। গণভোটের প্রবর্তন হলে তার সুযোগ নিয়ে শ্রমিক প্রতিনিধিরা পার্লামেন্টে নির্বাচিত হতে পারবে।

লুই ব্ল্যাঙ্ক, ইংলন্ডে সিডনী ও বিয়াট্রিস ওয়েব প্রভৃতির চিন্তাধারার সুফল ফলতে থাকে। কিন্তু সরকারের রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গীকে বদলান সহজ কাজ ছিল না। কারণ পুঁজিবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে পার্লামেন্ট তথা সরকারগুলি শ্রমিক আন্দোলনের ওপর হাজার রকমের নিয়ন্ত্রণমূলক শর্ত চাপাত। সরকারের মনোভাব ছিল যে, শ্রমিকরা মালিকের সঙ্গে কারখানায় কাজ করতে চুক্তিবদ্ধ। সেক্ষেত্রে ধর্মঘট করা শুধু বেআইনী কাজ নয়, চুক্তিভঙ্গ করার সামিল। এজন্য ট্রেড-ইউনিয়ন ও ধর্মঘটের ওপর বাধা-নিষেধ চাপান হয়। ১৯০০ খ্রীঃ ব্রিটেনের টাকভেল রেল কোম্পানীতে বর্দ্ধিত বেতনের দাবীতে শ্রমিকরা ধর্মঘট করায় ট্রেড-ইউনিয়নগুলির ওপর চুক্তি ভঙ্গের অজুহাতে আদালত ২৩ হাজার পাউন্ড জরিমানা ধার্য করে। এর থেকেই বোঝা যায় যে, শ্রমিকদের দাবী পূরণের জন্যে বৈধ আন্দোলন গঠন করা ছিল কত কঠিন।

ইংলন্ডে সর্বসাধারণের ভোটাধিকারের দাবীতে চার্টিষ্ট আন্দোলন শুরু হলে শ্রমিকরাও তাতে সাগ্রহে যোগ দেয়। ১৮৩২ খ্রীঃ ইংলন্ডে ভোটাধিকার আইন দ্বারা শহরাঞ্চলে ভোটাধিকার সম্প্রসারণ করা হলেও, সম্পত্তির ভিত্তিতে ভোটাধিকার চালু থাকায় শ্রমিকরা তাতে উপকৃত হয়নি। ক্রমে ইংলন্ডের উদারপন্থী লিবারেল ও নব টোরী দলগুলি ভোটাধিকার সম্প্রসারণ নীতি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। উনবিংশ শতকের ৬০-এর দশকে ভোটাধিকারের দাবীতে ইংলন্ডে তুমুল গণ আন্দোলন দেখা দেয়। এই সময় ইংলন্ডের কোয়েকার সম্প্রদায় শ্রমিকের ভোটাধিকার লাভের জন্যে তীব্র প্রচার চালায়। জন ব্রাইট ন্যাশন্যাল রিফর্ম লীগ গঠন করে তাতে শ্রমিক ও ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে সামিল করেন। ১৮৬৬ খ্রীঃ হাইড পার্কে ভোটাধিকারের দাবীতে এক জনসভা ডাকা হলে সরকার তা নিষিদ্ধ করায়, ক্রুদ্ধ শ্রমিকরা হাইড পার্কের রেলিং (Railing) টেনে ভেঙে ফেলে। পুলিশের সঙ্গে শ্রমিকদের এক খণ্ডযুদ্ধ বাধে। এই ঘটনা গোটা ইওরোপে দারুণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ফরাসী চিত্রকরের আঁকা হাইড পার্কের শ্রমিকদের রেলিং ভাঙার দৃশ্য এই ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী হয়ে আছে। ফরাসী সংবাদপত্র "লা-ইলাসস্ত্রাসিও"র পৃষ্ঠায় এই চিত্রটি ইতিহাসের সাক্ষী। ১৮৬৬ খ্রীঃ যখন বিজয়ী প্রাশিয়ার বাহিনীর অষ্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধে জয়ের ফলে ইওরোপের রাজনৈতিক মহল আলোড়িত ছিল, তখন ইংলন্ডে শ্রমিকদের এই বিদ্রোহ ইওরোপের ধনতন্ত্রবাদী শাসকদের কাছে এক অশুভ ইঙ্গিতের মত দেখা দেয়। ইংলন্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের শাসক শ্রেণী উপলব্ধি করেন যে, শ্রমিকদের দাবীগুলি অংশত পূরণ না করলে, শিল্প-সমৃদ্ধ ইওরোপের সমাজে নতুন ধ্বস দেখা দিবে।

এই সচেতনতা ইংলন্ডে অনুভূত হয়। এর ফলে ১৮৬৭ খ্রীঃ ভোটাধিকার আইন পাশ হলে শ্রমিক সহ বেশীর ভাগ লোক ভোটাধিকার লাভ করে। শ্রমিকরা ভোটাধিকার পেলে ১৮৭০ খ্রীঃ গ্ল্যাডষ্টোন তাঁর বিখ্যাত শিক্ষা সংস্কার আইন দ্বারা শ্রমিকদের অন্ততঃ প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ দানের চেষ্টা করেন। পার্লামেন্টে গ্ল্যাডষ্টোন বলেন যে, "We must educate our masters" "যেহেতু এখন শ্রমিকদের হাতে ভোটাধিকার চলে গেছে, সেহেতু তারাই আমাদের প্রভু। আমাদের প্রভুদের শিক্ষার ব্যবস্থা না করলে গণতন্ত্র প্রহসনে পরিণত হবে।" এই সঙ্গে

১৮৭১ খ্রীঃ গ্ল্যাডস্টোন এক আইন দ্বারা ইংলণ্ডের শ্রমিকদের বৈধ ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের অধিকারকে স্বীকৃতি দেন। শেষ পর্যন্ত ইংলন্ডে শ্রমিক দল গঠিত হয়।

ইংলন্ডে ফেবিয়ান সমাজতন্ত্রবাদীরা এই মতবাদ প্রচার করেন যে, ডারউইন জীবজগতে বিবর্তন তত্ত্বের মাধ্যমে যেরূপ পরিবেশ ও পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে জীবজগতে বিবর্তন তত্ত্ব প্রমাণ করেছেন, মনুষ্য সমাজে সেরূপ বিবর্তনের পথেই সমাজতন্ত্র আসবে। শিল্প যুগ আরম্ভ হওয়ার ফলে শ্রমিকের দাবীকে অগ্রাহ্য করে সমাজ কখনও চলতে পারবে না। ফেবিয়ানবাদ ইংলন্ডের শ্রমিক আন্দোলনকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে। এজন্য ইংলন্ডের শ্রমিক আন্দোলনে মার্কসবাদের প্রভাব সীমাবদ্ধ। ফেবিয়ান সিডনী ওয়েব, সাহিত্যিক জর্জ বার্নাড শ প্রভৃতি প্রস্তাব দেন যে, অন্ততঃ ৫০ জন শ্রমিক নেতাকে নির্বাচনে নির্বাচিত করে হাউস অব কমনসে সদস্য হিসেবে যোগ দিতে চেষ্টা করা হোক। তাহলে পার্লামেন্ট শ্রমিকদের অবজ্ঞা করতে সাহস পাবে না। এই সময় জেমস কায়ার হার্ডি ইংলন্ডে শ্রমিক দল স্থাপন করেন। বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নগুলি শ্রমিক দলের প্রতি আনুগত্য জানায়। শ্রমিক দল ইংলন্ডের শিল্প শহরগুলি যথা বার্মিংহাম, ম্যাঞ্চেষ্টার, লিভারপুল প্রভৃতি ও কয়লাখনি অঞ্চলে অতি দ্রুত জনপ্রিয়তা পায়। শ্রমিক দল পার্লামেন্টে শ্রমিক সদস্যের সংখ্যা দ্রুত বাড়াতে সক্ষম হয়। পার্লামেন্টের সদস্যদের বেতন চালু হলে শ্রমিকরা অধিক সংখ্যায় সদস্য হতে থাকে। ১৯১০ খ্রীঃ হাউস অব কমন্সে ৪০ জন সদস্য ছিল শ্রমিক দলের। শ্রমিক সদস্যদের দাবীতে পার্লামেন্ট ইংলন্ডে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনকে বৈধতা দানের আইন পাশ করতে বাধ্য হয়।

ফ্রান্সে সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন ফরাসী শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার দেন। কোন কোন ক্ষেত্রে তারা ধর্মঘট করতে পারবে বলা হয়। কিন্তু ১৮৭০-৭১ খ্রীঃ প্যারিস কমিউনের বিদ্রোহের ফলে তৃতীয় প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি থিয়ার্স শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ওপর বহু নিষেধাজ্ঞা চাপান। তথাপি সাধারণভাবে ১৮৮০-র দশক থেকে ইওরোপে বৈধ বা অবৈধভাবে ট্রেড ইউনিয়ন গঠিত হতে থাকে। অদক্ষ শ্রমিকরা অধিক সংখ্যায় ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমে সংগঠিত হয়। শ্রমিক আন্দোলনগুলি ক্রমে জঙ্গী চরিত্র নিতে থাকে। ১৮৮৬ খ্রীঃ বেলজিয়ামের শার্লেরয় অঞ্চলে খনি ও কাঁচের কারখানায় শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশের কয়েকদিন ধরে খণ্ডযুদ্ধ চলে। ১৮৮৯ খ্রীঃ লন্ডনে শ্রমিক-পুলিশ যুদ্ধ হয়। এই শ্রমিকরা ছিল ডক শ্রমিক। সরকার বাধ্য হয়ে ডক শ্রমিকদের মজুরী বাড়ান। এই ধর্মঘটে ইংলন্ডের ডক শ্রমিকরা দীর্ঘকাল ধৈর্য, ত্যাগ স্বীকার ও শৃঙ্খলার পরিচয় দেয়। ইংলণ্ডের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে জার্মানীর হ্যামবুর্গের ডক শ্রমিকরা ধর্মঘট ও আন্দোলন করলে জার্মান মালিকশ্রেণী দৃঢ়তার সঙ্গে তা প্রতিহত করে।

৮০ বা ৯০-এর দশক থেকে ইওরোপ মহাদেশের শ্রমিক আন্দোলনে মার্কসবাদী সংগঠনগুলির প্রভাব বাড়ে। জার্মান সোস্যাল ডেমোক্র্যাট দলই বেশীরভাগ ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে পরিচালিত করতে থাকে। রাশিয়ায় শ্রমিক আন্দোলনকে জার সরকার দৃঢ় হাতে দমন করলেও প্রতি কল-কারখানায় বলশেভিক ও সোস্যাল ডেমোক্র্যাটরা বে-আইনী গুপ্ত সংগঠন গড়ে তোলে। একমাত্র ইংলন্ডে ট্রেড ইউনিয়নগুলি শ্রমিক দল বা Labour Party-র নিয়ন্ত্রণে ছিল। ইংলন্ডের শ্রমিক আন্দোলন ফেবিয়ানবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়, একথা আগেই বলা হয়েছে। ১৯০৫-এ রাশিয়ায় শ্রমিকরা সংঘাতের পথে পা বাড়ালে ১৯০৫-এর বিদ্রোহকে জার সরকার কঠোর হাতে দমন করেন। তথাপি রাশিয়ায় ১৯০৫-এর বিদ্রোহ প্রমাণ করে যে, লাগাতার ধর্মঘট দ্বারা শ্রমিকরা সরকার ও দেশকে অচল করে দিতে সক্ষম। বলশেভিকরা এর থেকে ভবিষ্যৎ বিপ্লবের শিক্ষা নেয়। ফ্রান্সের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন উনিশ শতকের শেষ দিকে সিণ্ডিক্যালিষ্ট মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত ছিল।

উনিশ শতকের শ্রমিক আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি রাশিয়া বাদে অন্য দেশগুলিতে পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, যদিও শ্রমিক নেতারা তাঁদের বক্তৃতা ও প্রবন্ধগুলিতে বিপ্লবের ডাক দেন ও পুরাতনতন্ত্র ভেঙে ফেলার কথা বলেন, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাঁদের জঙ্গীপনা ছিল দুর্বল, তাঁরা ছিলেন আপোষপন্থী। শ্রমিকদের কিছু দাবী-দাওয়া পূরণ হলেই তাঁরা সন্তুষ্ট হতেন। তাঁদের এই প্র্যাগম্যাটিক (Pragmatic) দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে তাঁরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমর্থন পান এবং ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার লাভ করেন। সংঘর্ষের পথে গেলে তাঁদের হয় জয় নতুবা চির পরাজয় ঘটত। দ্বিতীয়তঃ, ট্রেড ইউনিয়ন বা শ্রমিক সংগঠনগুলির নিজস্ব সম্পদ বহু বাড়ে। শ্রমিকের চাঁদা ও অন্যান্য অনুদান থেকে শ্রমিক সংগঠনগুলি আর্থিক দিক থেকে পুষ্ট হয়। তাদের নিজস্ব সংবাদপত্র, অফিস, আমলাতন্ত্র গড়ে ওঠে। শ্রমিকদের জীবনের মানের উন্নয়ন ও মজুরী বৃদ্ধিই ছিল এই যুগের আন্দোলনের লক্ষ্য। মার্কসবাদীরা ছাড়া কেহই সমাজব্যবস্থা বদলের জন্যে আন্তরিক ছিল না। তৃতীয়তঃ, সকল শ্রমিককে এই যুগে ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য পদভুক্ত করা সম্ভব ছিল না। ১৯০০ খ্রীঃ ব্রিটেনে ২ মিলিয়ন, জার্মানীতে ৮৫০,০০০, ফ্রান্সে ২৫০,০০০ শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য ছিল। বাকি শ্রমিকরা ছিল অসংগঠিত।

পাঠ্যসূচী

১। G. W. Schumpeter—Capitalism, Socialism and Democrcy.
২। I. D. H. Cole—History of Socialist Thought.
৩। Emil Burns—Handbook of Marxism.
৪। Laski—Karl Marx.
৫। Bertrand Russel—History of Western Philosophy.

ইওরোপের ইতিহাসের রূপরেখা

বিশ্বের ইতিহাস

প্রথম অধ্যায়

গ্রেট ব্রিটেন ঃ সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি
(Great Britain : Social and Economic Progress)

নেপোলিয়নের পরবর্তী যুগে গ্রেট ব্রিটেনে রক্ষণশীল শাসন

(Great Britain after the Napoleonic wars) ঃ নেপোলিয়নের যুদ্ধের সময় ইংলন্ডে অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটে। ইংলন্ড শিল্পে ও বাণিজ্যে বিশ্বের মুখ্য দেশ হিসেবে স্থান করে নেয়। শিল্পের প্রসারের ফলে ইংলন্ডে নতুন নতুন শিল্প শহর গড়ে ওঠে। রুশ, ব্রিটিশ, জার্মান সেনাদলে যাঁরা নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিল তাদের জন্যে অস্ত্র নির্মাণ, তাঁবু, কম্বল, পোষাক প্রভৃতি নির্মাণের জন্যে ইংলন্ডের শিল্প আরও স্ফীত হয়। আয়ারল্যান্ড থেকে দলে দলে দরিদ্র শ্রমিক এসে ইংলন্ডের কল-কারখানায় কাজের সুযোগ পায়।

শিল্প-বিপ্লব

কৃষির ক্ষেত্রেও ইংলন্ডে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রভাব বৃদ্ধি পায়। এনক্লোজার বা বেষ্টনী ব্যবস্থার প্রসারের ফলে ক্ষুদ্র চাষীর জমি বড় খামারের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। বৈজ্ঞানিক প্রথায়, আধুনিক যন্ত্রপাতির দ্বারা আবাদ চালু করে কম খরচে বেশী উৎপাদন আরম্ভ হয়। ইংলন্ডের কৃষি ব্যবস্থায় বড় জমিদারীর মালিক বা পুঁজিপতিদের প্রাধান্য বাড়ে।

কৃষিতে পুঁজিবাদ; ম্যানর প্রথা

নেপোলিয়নীয় যুদ্ধের অবসানে ইংলন্ডের অর্থনীতিতে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। প্রথমতঃ, যুদ্ধের অস্ত্র ও সংশ্লিষ্ট যুদ্ধ সামগ্রীর চাহিদা না থাকায় যুদ্ধের শিল্পদ্রব্যের কারখানাগুলি বন্ধ হয়ে যায়। হাজার হাজার শ্রমিক এর ফলে ছাঁটাই হয়। দ্বিতীয়তঃ, যুদ্ধের পর ইওরোপ ও আমেরিকায় নিজ নিজ দেশজ শিল্প গড়ে উঠলে ইংলন্ডের পণ্যের চাহিদা অন্ততঃ ½ ভাগ কমে যায়। ফলে ইংলন্ডের অর্থনীতিতে মন্দা দেখা দেয়। তৃতীয়তঃ, সরকারী শাসনযন্ত্র প্রধানতঃ জমিদার শ্রেণীর হাতে থাকায় শিল্পপতিদের স্বার্থ রক্ষার জন্যে প্রয়োজনীয় আইন রচনা করা কষ্টকর হয়। ফলে ইংলন্ডে শিল্পক্ষেত্রে অসন্তোষ দেখা দেয়।

নেপোলিয়নের যুদ্ধের পর অর্থনীতিতে মন্দা

ইংলন্ডে ১৮১৫ খ্রীঃ পর এক প্রকার রক্ষণশীলতা নীতি অনুসৃত হয়। এই রক্ষণশীলতার লক্ষ্য ছিল ইংলন্ডের সংবিধান, ভোটাধিকার ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে পরিবর্তন না করা। সাংবিধানিক রাজতন্ত্র, পার্লামেন্টে অভিজাত শ্রেণীর প্রাধান্য, এ্যাংলিক্যান গীর্জা এবং পার্লামেন্টের অধিকার রক্ষা প্রভৃতি ছিল ইংলন্ডের রক্ষণশীলতার অঙ্গ।

রক্ষণশীলতা ঃ অভিজাততন্ত্র

ইংলন্ডের টোরী দল নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জয়ের ফলে প্রভূত জনপ্রিয়তা পায়। এই দল ছিল অভিজাত ও জমিদারদের দ্বারা পরিচালিত। টোরী দল উপরোক্ত রক্ষণশীল নীতিকে গ্রহণ করে ইংলন্ড শাসন করতে থাকে। টোরী নেতা কাসলরি, নেপোলিয়ন-বিজয়ী ডিউক অফ ওয়েলিংটন এবং চতুর্থ জর্জ ছিলেন এই রক্ষণশীল নীতির প্রধান সমর্থক। পার্লামেন্টে বিরোধী সদস্যরা ভোটাধিকার সম্প্রসারণ, শিল্প আইন প্রভৃতি দাবী করলে শাসক রক্ষণশীল বা টোরী দল তার তীব্র বিরোধিতা করে।

টোরী ঃ রক্ষণশীলতা

টোরী রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে ইংলন্ডে যে প্রতিবাদী মতগুলি জেগে ওঠে তাহা ক্রমে ক্রমে জনমতকে প্রভাবিত করে ঃ—র‍্যাডিক্যাল বা চরমপন্থী মতবাদের প্রবক্তা ছিলেন উইলিয়াম

গডউইন ও বেন্থামের হিতবাদ : টোরী নীতির সমালোচনা

গডউইন, জেরেমি বেন্থাম প্রভৃতি। এঁরা ছিলেন প্রধানতঃ চিন্তাবিদ। গডউইন তাঁর Inquiry Concerning Political Justice গ্রন্থে সর্বপ্রথম সমাজতান্ত্রিক মতবাদ ব্যাখ্যা করেন। তিনি প্রচার করেন যে, জমিতে সকল নাগরিকের সমান অধিকার আছে। অভিজাত বা জমিদার শ্রেণী কেবলমাত্র জমির মালিক হতে পারে না। যে সরকার অভিজাত শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করে, সেই সরকার দুর্নীতিগ্রস্ত। জেরেমি বেন্থাম তাঁর ইউটিলিটারিয়ান তত্ত্ব বা হিতবাদ প্রচার করে বলেন যে, প্রতি রাষ্ট্রের কর্তব্য হল সর্বোচ্চ সংখ্যক লোকের সর্বাপেক্ষা অধিক মঙ্গল সাধন করা। যে সরকার তা করে না তার সংস্কার করা উচিত। তিনি পার্লামেন্টের গণতান্ত্রিকরণের কথাও বলেন। ইংরাজ কবি শেলী ও বায়রণের চিন্তাধারায় চরমপন্থী মতবাদ যথা স্বাধীনতা বা লিবার্টির ছাপ পড়ে।[১] টোরী নেতারা এই চরমপন্থীদের দেশদ্রোহী বলে মনে করতেন।

ইংলন্ডের ক্যাথলিক ও পিউরিটান ধর্মসম্প্রদায়ের লোকেরাও টোরী নীতির ঘোর বিরোধী ছিল। ইংলন্ডের এ্যাংলিক্যান গীর্জার যারা অনুগত ছিল না, সরকার তাদের বহু অধিকার হরণ করে। তারা সরকারি চাকুরী, ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রভৃতি অবাধে ভোগ করতে পারত না। এজন্য তাবা খুবই অসন্তুষ্ট ছিল। চরমপন্থীদের সমর্থন জানিয়ে তারা তাদের অসন্তোষ প্রকাশ করে।

ক্যাথলিকদের প্রতিবাদ

ইংলন্ডের নবোদিত বুর্জোয়া সম্প্রদায়, টোরী রক্ষণশীলতার তীব্র বিরোধী ছিল। শিল্প বিস্তারের ফলে এই শ্রেণী অর্থ সম্পদে স্ফীত হলেও, তারা দেখে যে ভোটাধিকার না থাকায় পার্লামেন্টে তাদের কোন প্রভাব নেই। সরকারি আইনগুলি তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্যে রচিত হয় নি। অভিজাতশ্রেণী বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানি করতে রাজী ছিল না। তারা পার্লামেন্টে শস্য আইন পাশ করে বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানি নিষিদ্ধ করে। এই আইনের ফলে তাদের খামারের উৎপন্ন খাদ্যশস্য বেশী দামে বিক্রি করে অভিজাতরা স্ফীত হতে থাকে। কিন্তু খাদ্যের চড়া দাম থাকায় কলকারখানার মজুরদের চড়া হারে মজুরী দিতে হয়। এজন্য বুর্জোয়ারা ক্ষিপ্ত হয়। ইংলন্ডের হুইগ দল বুর্জোয়া ও শ্রমিকদের পক্ষ নিয়ে টোরী দলের নীতির তীব্র সমালোচনা করে।

বুর্জোয়াশ্রেণীব টোবী বিরোধিতা

ইংলন্ডে যান্ত্রিক শিল্পের প্রসার দ্রুত বাড়ার ফলে, যে সকল কারিগর হাতে শিল্পদ্রব্য তৈরি করে জীবিকা অর্জন করত, তারা বেকার হয়ে যায়। এই ক্ষতিগ্রস্ত শ্রেণীর কোন বিকল্প জীবিকা না থাকায় তাদের দুর্দশার একশেষ হয়। বেকার শ্রমিক ও কারিগররা এজন্য ক্ষিপ্ত হয়ে কলকারখানা আক্রমণ করে মেশিনগুলি ভাঙতে আরম্ভ করে। ১৮১১ খ্রীঃ, ১৮১৬ খ্রীঃ ইংলন্ডে মেশিন ভাঙার দাঙ্গা আরম্ভ হয়। একে লাডাইট রায়ট বা দাঙ্গা বলা হয়। ইংলন্ডের লিসেষ্টার জেলায় নেডলাড নামে এক মোটাবুদ্ধির বালক ছিল। গ্রামের ছেলেরা তাকে ক্ষেপালে নেডল্যাড ক্ষিপ্ত হয়ে কাপড় তৈরির কয়েকটি তাঁত ভেঙে ফেলে। এই সময় হতে কেহ ক্রোধ বশতঃ কোন যন্ত্র ভাঙলে বলা হত যে "নেডলাড একাজ করেছে।" এজন্য ১৮১১ খ্রীঃ, ১৮১৬ খ্রীঃ বিরাট যন্ত্র ভাঙার দাঙ্গাকে লাডাইট দাঙ্গা বলা হয়।

কুটির শিল্পের ধ্বংস : বেকারত্ব

টোরী পার্লামেন্ট চরমপন্থী (Radical) প্রতিবাদীদের দমন করতে বিভিন্ন রকমের ব্যবস্থা নেয়। হেবিয়াস কর্পাস আইন রদ করে আন্দোলনকারীদের বিনা বিচারে গ্রেপ্তার ও জেল দেওয়া হয়। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সঙ্কুচিত করা হয়। উইলিয়াম কবেট (Wiliam Cobbet) নামক সমাজতন্ত্রবাদী লেখক তাঁর দুই পেনী মূল্যের জনপ্রিয় পত্রিকা বা পলিটিক্যাল রেজিষ্টার (Political Register) এর প্রকাশ রদ করতে বাধ্য হন। ম্যাঞ্চেষ্টার শহরে একটি প্রতিবাদী জনসভায় পুলিশ গুলি

প্রতিবাদী আন্দোলন দমনে টোরী দমন নীতি

১· Hayes—Political, Social History of Europe.

চালায়। পিটারলুতে শ্রমিক হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়। চরমপন্থী আন্দোলন দমনের জন্যে রক্ষণশীল পার্লামেন্ট (১৮১৯ খ্রীঃ) কুখ্যাত ছয় আইন (Six Acts) পাশ করে। এই ছয় আইনকে ব্রিটেনে প্রতিক্রিয়াশীলতার চূড়ান্ত বলা হয়। এই আইনে বলা হয় যে :—(১) বেসরকারি ব্যক্তিরা সামরিক কুচকাওয়াজ করতে পারবে না। (২) সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের দ্রুত বিচার করে শাস্তি দেওয়া হবে। (৩) বে-আইনী অস্ত্রের খোঁজে পুলিশ যে কোন লোকের বাড়ি তল্লাসী করতে পারবে। (৪) রাষ্ট্রদ্রোহমূলক পুস্তক-পুস্তিকা পুলিশ বাজেয়াপ্ত করতে পারবে এবং তার লেখককে দেশ থেকে বহিষ্কার করবে। (৫) সরকারি অনুমতি নিয়ে জনসভা করতে হবে। (৬) সংবাদপত্রের ওপর বিরাট অঙ্কের জামানত চাপিয়ে দেওয়া হয়।

সরকারের এই দমন নীতির প্রতিবাদে মন্ত্রীসভার কয়েকজন সদস্যকে হত্যার জন্যে চরমপন্থীরা চক্রান্ত করে। পুলিশ চক্রান্ত আবিষ্কার করলে তা ব্যর্থ হয়। এই চক্রান্তের নাম ছিল "ক্যাটো স্ট্রীট চক্রান্ত" (Cato Street Conspiracy), ১৮২০ খ্রীঃ।

রক্ষণশীলতার শিরোমণি প্রধানমন্ত্রী ক্যাসলরির ১৮২২ খ্রীঃ মৃত্যু হলে টোরী নেতৃত্ব দুর্বল হয়ে পড়ে। ইংলন্ডের রক্ষণশীলতায় ভাঁটা পড়ে। পরবর্তী টোরী নেতারা যথা, ক্যানিং ও রবার্ট

সামন্ত যুগের অবসান

পীল প্রভৃতি ছিলেন অপেক্ষাকৃত উদারপন্থী। তাঁরা বুঝতে পারেন যে, ব্রিটেনে সামন্তযুগ শেষ হয়ে শিল্প যুগ আরম্ভ হয়েছে। সুতরাং এই পরিবর্তনশীল সামাজিক পরিস্থিতির সঙ্গে টোরী দলকে খাপ খাইয়ে চলতে হবে। এজন্য নূতন টোরী নেতারা উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণীকে সমর্থন করা যুক্তিযুক্ত মনে করেন।

এই পরিস্থিতিতে টোরী সরকার ধীরে ধীরে দমন নীতি ত্যাগ করে। চতুর্থ জর্জের রাজত্বের শেষ দিকে পিউরিটান ক্যাথলিকদের ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয় (১৮২৮-২৯ খ্রীঃ)।

১৮২৮ খ্রীঃ পর উদারতন্ত্রের জয়লাভ

ক্যানিং বিদেশ মন্ত্রী নিযুক্ত হয়ে ইংলন্ডকে ইওরোপীয় শক্তি সমবায় থেকে সরিয়ে নেন। ইংলন্ডের বিরোধিতায় শক্তি সমবায়ের প্রভাব নষ্ট হয়। ইংলন্ড মেটারনিকতন্ত্রের প্রভাব মুক্ত হয়। মেটারনিকের প্রভাবে শক্তি সমবায় দক্ষিণ আমেরিকায় হস্তক্ষেপ করতে উদ্যত হলে, ইংলন্ড তার তীব্র প্রতিবাদ করে। ব্রিটিশ নৌ-বহর আটলান্টিক মহাসমুদ্রে শক্তি সমবায়ের জাহাজগুলিকে আটক করতে প্রস্তুত হয়। দক্ষিণ আমেরিকায় উপনিবেশগুলির স্বাধীনতাকে ইংলন্ড স্বীকৃতি দেয়। মার্কিন রাষ্ট্রপতি মনরো, আমেরিকা মহাদেশে ইওরোপীয় শক্তি সমবায়ের হস্তক্ষেপের আশঙ্কায়, মনরো নীতি (১৮২২ খ্রীঃ) (Monroe Dectrine) ঘোষণা করেন। মার্কিন রাষ্ট্রপতি তাঁর ঘোষণায় বলেন যে "আমেরিকা হল আমেরিকাবাসীদের জন্যে। আমেরিকায় ইওরোপীয় হস্তক্ষেপ সহ্য করা হবে না।" এর ফলে শক্তি সমবায় দক্ষিণ আমেরিকায় হস্তক্ষেপে ব্যর্থ হয়। ক্যানিং আত্মপ্রসাদ দেখিয়ে বলেন যে, "পুরাতন জগতের সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষা করার জন্যে আমি নতুন জগৎ সৃষ্টি করলাম" (I have brought a New world into existence to redress the balance of the Old)।

লিপসন প্রভৃতি ঐতিহাসিক, ইওরোপীয় শক্তি সমবায়ের রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে ক্যানিং-এর প্রতিবাদকে ব্রিটেনের প্রগতিশীলতার পরিচয় বলে অভিহিত করেছেন।[১] বস্তুতঃপক্ষে ক্যানিং

ক্যানিং-এর বৈদেশিক নীতির ব্যাখ্যা

তাঁর পূর্বসূরী ক্যাসলরির ন্যায় রক্ষণশীল ছিলেন। টেম্পারলে (Temperley) নামক ঐতিহাসিকের মতে, ক্যানিং-এর সঙ্গে ক্যাসলরির কোন মৌলিক পার্থক্য ছিল না। উভয়েই ছিলেন রক্ষণশীল দলের সদস্য। উভয়েই অভিজাতশ্রেণীর প্রাধান্য, এ্যাংলিক্যান গীর্জা এবং নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের অনুরাগী ছিলেন। বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে একমাত্র তফাৎ ছিল যে, ক্যাসলরি ইওরোপীয় শক্তি-সমবায়ের সঙ্গে ইংলন্ডের যুক্ত থাকা পছন্দ করতেন; ক্যানিং মনে করতেন যে, "শান্তির

১· Lipson—Europe in the 19th and 20 Centuries.

সময় শক্তি সমবায়ের প্রয়োজনীয়তা নেই"।[১] তাছাড়া ক্যানিং ইংলন্ডের বুর্জোয়া বণিকদের স্বার্থ রক্ষা করা দরকার মনে করতেন। দক্ষিণ আমেরিকায় ব্রিটিশ বণিকদের বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষার জন্যেই তিনি এই স্থানে ইওরোপীয় শক্তি-সমবায়ের হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করেন। উদারতন্ত্রের সমর্থনের জন্যে তিনি শক্তি-সমবায়ের বিরোধিতা করেননি।[২]

জুলাই বিপ্লবের পর ব্রিটেনের উদারতন্ত্রের অগ্রগতি (Progress of Liberalism in England after July Revolution) : ইংলন্ডের রক্ষণশীল নেতারা ১৮৩০ খ্রীঃ পর্যন্ত ইংলন্ডের স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে সক্ষম হন। তাঁরা ভোটাধিকার সম্প্রসারণের জন্যে বিশেষ চেষ্টা করেননি।

পীল ও ক্যানিং-এর সংস্কার নীতি

ক্যাসলরির মৃত্যুর পর নতুন রক্ষণশীল নেতারা যথা রবার্ট পীল, ক্যানিং প্রভৃতি ছোটখাট সংস্কার প্রবর্তন করে জনমতকে শান্ত রাখার চেষ্টা করেন। ইতিমধ্যে ১৮৩০ খ্রীঃ জুলাই বিপ্লবে ফ্রান্সে দ্বিতীয় বুরবোঁ বংশের পতন ঘটলে ইংলন্ডে তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। শিল্প-বিপ্লবের পর ইংলন্ডে বহু নতুন শিল্প শহর গড়ে উঠেছিল। কিন্তু সম্পত্তির ভিত্তিতে ভোটাধিকার থাকায় ইংলন্ডে এই শিল্প শহরে বুর্জোয়া শিল্পপতি ও শ্রমিক কারও ভোটাধিকার ছিল না। পার্লামেন্টে এই শ্রেণীগুলির প্রতিনিধি না থাকায় এদের স্বার্থ রক্ষার জন্যে আইন রচনা করা হত না। অভিজাত শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার জন্যে বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানি বিরোধী আইন (Corn Law) প্রভৃতি ব্যবস্থাকে পার্লামেন্ট চালু রাখত।

সাধারণ লোকের হতাশা

শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ-রক্ষার জন্যে এই যুগের পার্লামেন্ট কোন কাজ করত না। এদিকে শিল্প বিস্তারের ফলে গ্রাম থেকে লক্ষ লক্ষ লোক কল-কারখানায় কাজের আশায় শহরে চলে আসে। তারা কলকারখানায় কম মজুরীতে অশেষ কষ্টে বস্তীতে জীবন কাটাতে বাধ্য হয়। সামন্ত শাসিত পার্লামেন্ট সস্তা দরের বিদেশী খাদ্যশস্য আমদানি নিষিদ্ধ করায় তাদের দুর্দশার সীমা ছিল না। ইংলন্ডের সামন্ত শ্রেণীর জমিতে উৎপন্ন চড়া দামের খাদ্যশস্য তাদের কিনতে বাধ্য করা হয়। বিদেশ থেকে সস্তা দরে খাদ্য আমদানি করলে অভিজাতদের খামারের উৎপন্ন খাদ্যের দাম কমে যেত। এজন্য পার্লামেন্ট বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানি করতে পারত না। শ্রমিকদের দুরবস্থা ও শহরবাসীদের দুঃখ-কষ্ট সম্পর্কে পার্লামেন্ট উদাসীন থাকে।

চরমপন্থী মতবাদ

এই সময় জেরেমি বেন্থাম, জন ষ্টুয়ার্ট মিল, রিচার্ড কবডেন প্রভৃতি চিন্তাবিদ্‌রা সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের স্বার্থ রাষ্ট্রের রক্ষা করা উচিত এই মতবাদ প্রচার করেন। নতুন শহরগুলির অধিবাসীরা বুঝতে পারে যে, পার্লামেন্টের নির্বাচনে তাদের নিজ শ্রেণীর প্রতিনিধি না পাঠালে পার্লামেন্ট তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্যে আইন করবে না। এজন্য চরমপন্থীরা (Redicals) ভোটাধিকার বাড়াবার দাবী জানায়। শ্রমিক সমাজও এই দাবীর সামিল হয়।

ভোটাধিকার প্রসার আন্দোলন

এই ভোটাধিকার দাবীর চাপে রক্ষণশীল মন্ত্রী, ডিউক অফ ওয়েলিংটন মন্ত্রীসভার পদত্যাগপত্র দাখিল করেন। রক্ষণশীল মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করলে হুইগ বা উদারপন্থী দলের নেতা লর্ড গ্রে নতুন মন্ত্রীসভা গঠন করেন। লর্ড গ্রে ভোটাধিকার সংস্কার প্রস্তাব (Reform Bill) হাউস অব কমন্সে পেশ করেন। কিন্তু রক্ষণশীলদের ভোটে নতুন ভোটাধিকার প্রস্তাব নাকচ হলে, পার্লামেন্ট

১· Temperley—Cambridge History of British Foreign Policy.

২· Hayes—Political, Cultural History of Europe.

সভার পুনঃ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নতুন নির্বাচনে হুইগ দল হাউস অব কমন্সে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলে লর্ড গ্রে দ্বিতীয়বার ভোটাধিকার সংস্কার প্রস্তাব (Reform Bill) পেশ করেন। হাউস অব কমন্সে এই প্রস্তাব পাশ হলেও হাউস অব লর্ডসে সংখ্যাগরিষ্ঠ টোরী সদস্যরা বিলটিকে নাকচ করেন। এর ফলে হুইগ মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করে এবং ডিউক অফ ওয়েলিংটনের নেতৃত্বে পুনরায় টোরী মন্ত্রীসভা গঠিত হয়।

টোরী সরকারের রক্ষণশীল নীতির বিরুদ্ধে ব্রিটেনের জনসাধারণ প্রতিবাদে উত্তাল হলে টোরী মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করে। ১৮৩২ খ্রীঃ লর্ড গ্রে পুনরায় হুইগ মন্ত্রীসভা গড়েন। লর্ড গ্রে পুনরায় পার্লামেন্টের নিকট ভোটাধিকার প্রস্তাব পেশ করেন।

ভোটাধিকার আইন ১৮৩২ খ্রীঃ পাশ

ইংলন্ডের ভোটাধিকার সংস্কার প্রস্তাবটি ১৮৩২ খ্রীঃ আইনে পরিণত হয়। এর নাম ছিল ১৮৩২ খ্রীঃ-এর সংস্কার আইন (The Reform Act of 1832)। এই আইনে বলা হয় যে ঃ—(১) অভিজাতদের জমিদারীর ভেতর যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পকেট ভোটকেন্দ্র ছিল তা লোপ করা হল। কারণ এই সকল পকেট ভোটকেন্দ্রের অধিবাসীরা অভিজাতদের নির্দেশে তাদের মনোনীত লোকেদের ভোট দিতে বাধ্য হয়। এই কৃত্রিম ব্যবস্থার দ্বারা হাউস অব কমন্সে অভিজাতরা সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন দখল করে। (২) এই সকল ভোটকেন্দ্রের মধ্যে যাতে ২০০০ লোকের কম লোক বাস করত সেই কেন্দ্রের ভোট লোপ করা হল। (৩) যে কেন্দ্রে ২০০০ থেকে ৪০০০ লোক বাস করত সেগুলির দুটি সদস্য পদের মধ্যে একটি পদ লোপ করা হল। (৪) নতুন শিল্প শহরগুলি যথা—বার্মিংহাম, ম্যানচেষ্টার, শেফিল্ড, লীডস প্রভৃতির অধিবাসীদের ভোটাধিকার দেওয়া হল। (৫) জনবহুল কাউন্টিগুলিকেও ভোটাধিকার দেওয়া হল। (৬) ভোটাধিকারের যোগ্যতার পরিচয় হিসেবে সম্পত্তি বা আয়করের পরিমাণ হ্রাস করা হল। নতুন ভোটাধিকার আইনের ফলে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে অভিজাত শ্রেণীর একচেটিয়া আধিপত্য বিনষ্ট হয়। এর স্থলে নিম্ন বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রাধান্য স্থাপিত হয়। ১৬৮৮ খ্রীঃ-এর গৌরবজনক বিপ্লবের যুগ থেকে ব্রিটিশ অভিজাত ও ধনী বুর্জোয়ারা পার্লামেন্টে যে শ্রেণীগত প্রভাব স্থাপন করেছিল এই আইনের ফলে তা লোপ পায়। পার্লামেন্টের পুরা গণতন্ত্রীকরণ না ঘটলেও, পার্লামেন্টে উদারতন্ত্রী ভাবধারা অনুপ্রবেশ করে। এই সঙ্গে ১৮৩৫ খ্রীঃ পুরসভা আইন (Municipal Act) পাশ হলে পুরসভাগুলিতে নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণী ভোটাধিকার লাভ করে।

১৮৩২ খ্রীঃ রিফর্ম বা ভোটাধিকার আইন

১৮৩২ খ্রীঃ সংস্কার আইন পাশ হবার পর ব্রিটেনে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তা নানা দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। প্রথমতঃ, হুইগ দল এই নির্বাচনের ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে সরকার গঠন করে। অতঃপর হুইগ দল উদারতন্ত্রের প্রতি প্রকাশ্য সমর্থন জানায়। হুইগ দল নিম্ন বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থকে সমর্থন করে।

হুইগ দলের জয়লাভ

১৮৩২ খ্রীঃ টোরী দল দুটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়। একটি গোষ্ঠী সামন্ত বা জমিদার শ্রেণীর স্বার্থকে রক্ষার চেষ্টা করে। স্যার রবার্ট পীলের নেতৃত্বে অপর গোষ্ঠী বুর্জোয়া শিল্পপতিদের সমর্থন করে টোরী দলকে শিল্প যুগের উপযোগী করার চেষ্টা করে। এর ফলে টোরী উদারতন্ত্র বা নবটোরীবাদের উদ্ভব হয়।

টোরী দলের দ্বন্দ্ব

রাণী ভিক্টোরিয়া ইংলন্ডের সিংহাসনে বসার পর ইংলন্ডে ভিক্টোরীয় মধ্যপন্থা নীতি (Victorian compromise) অনুসৃত হয়। এই নীতি অনুসারে গ্রামাঞ্চল থেকে জমিদার, জোতদার শ্রেণীর প্রতিনিধি এবং শহরাঞ্চল থেকে উচ্চ-মধ্যবিত্ত ও বুর্জোয়াদের প্রতিনিধি নিয়ে পার্লামেন্ট গঠনের নীতি গৃহীত হয়। মধ্যপন্থা নীতি ইংলন্ডে জনপ্রিয়তা পায়। ১৮৩২-১৮৩৭ খ্রীঃ পর্যন্ত এই নীতি কার্যকরী ছিল।

ভিক্টোরীয় যুগের মধ্যপন্থা

১৮৩২ খ্রীঃ ভোটাধিকার আইন দ্বারা বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত শ্রেণী ভোটাধিকার পেলেও দরিদ্র শ্রেণী, শ্রমিক, কৃষক প্রভৃতি লোকেরা ভোটাধিকারে বঞ্চিত হয়। কল-কারখানার শ্রমিকরা বুঝতে পারে যে, তারা যদি ভোটাধিকার না পায় তবে পার্লামেন্ট তাদের স্বার্থরক্ষার জন্যে আইন রচনা করবে না। এজন্য চরমপন্থীরা ১৮৩৮ খ্রীঃ একটি জনসাধারণের চার্টার বা সনদ দাবী করে। এই সনদের দাবীতে বলা হয় যে :—(১) ব্রিটেনে প্রাপ্তবয়স্কের ভিত্তিতে ভোটাধিকার চালু করতে হবে। (২) প্রতি বছর পার্লামেন্ট সভার নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে হবে। (৩) নির্বাচনে সকল কেন্দ্রে সমান সংখ্যক নির্বাচক বা ভোটার রাখতে হবে। (৪) ব্যালট বা গোপনে ভোটদানের প্রথা চালু করতে হবে। (৫) সম্পত্তির ভিত্তিতে ভোটাধিকার আইন বাতিল করতে হবে। (৬) পার্লামেন্টের সদস্যদের জন্যে বেতনক্রম চালু করতে হবে।

চার্টিষ্ট আন্দোলন : সর্বসাধারণের ভোটাধিকার দাবী

যেহেতু এই দাবীগুলি একটি সনদ বা চার্টার হিসেবে পেশ করা হয়, এজন্য এই আন্দোলনকে চার্টিষ্ট আন্দোলন বলা হয়। ইংলন্ডের শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক শ্রেণী এই দাবীগুলির সমর্থনে জনসভায় সমবেত হয়। পার্লামেন্টের নিকট এই চার্টার প্রদানের জন্যে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয়। চার্টিষ্টরা এক বিরাট শোভাযাত্রা সহকারে তাদের দাবীপত্র পার্লামেন্টে পেশের সঙ্কল্প ঘোষণা করে। এজন্য দাঙ্গা-হাঙ্গামার আশঙ্কায় সরকার সেনা সমাবেশ করেন। ইতিমধ্যে চার্টিষ্ট আন্দোলনে ভাঁটা পড়ে।

১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের পর পার্লামেন্ট কয়েকটি উদারপন্থী আইন রচনা করে জনমতকে প্রভাবিত করে। এই সকল আইন দ্বারা ব্রিটেনে নিগ্রোদের ক্রীতদাসরূপে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ হয়। বেসরকারি বিদ্যালয়গুলিকে সরকারি অনুদানের ব্যবস্থা করা হয়। ফৌজদারী আইনের কঠোরতা হ্রাস করা হয়। ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে ঋণ-গ্রহীতার ওপর সদয় ব্যবহারের আইন করা হয়। এই পার্লামেন্টের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব ছিল ১৮৩৪ খ্রীঃ দরিদ্র পুনর্বাসন আইন। এই আইনে নিঃস্ব ও দরিদ্র ব্যক্তিদের সাহায্য দানের দায়িত্ব সরকারি কর্মচারীদের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে, স্থানীয় কমিশনের হাতে দেওয়া হয়। যাতে ভবঘুরে লোকেরা কাজকর্ম না করে কেবলমাত্র সরকারী খয়রাতির ওপর নির্ভর না করে, এজন্য সরকারি খয়রাতির পরিমাণ হ্রাস করা হয়।

হুইগ সংস্কার

উদারপন্থী পার্লামেন্টের শাসনকালে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল "শস্য আইনের" (Corn Law) প্রত্যাহার। জমিদার শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার জন্যে পূর্ববর্তী রক্ষণশীল পার্লামেন্ট শস্য আইন বা কর্ন ল (Corn Law) নামক আইন দ্বারা বিদেশ থেকে সস্তা দরে খাদ্য ও অন্যান্য কৃষি পণ্য আমদানি নিষিদ্ধ করে। এদিকে ইংলন্ডের শিল্পপতিরা দেখে যে, বিদেশ থেকে সস্তা দরে খাদ্য আমদানি করে খাদ্যের মূল্য কমালে শ্রমিকদের কম হারে মজুরী দিয়ে বেশী মুনাফা করা যাবে। বিদেশ থেকে সস্তা দরে তুলা আমদানি করতে পারলে সস্তা দরে কাপড় উৎপাদন করা যাবে। এজন্য শিল্প মালিক ও বণিক শ্রেণী অবাধ-বাণিজ্য নীতি অনুসারে অবাধে খাদ্য আমদানি এবং কর্ন ল বা খাদ্য আইনের প্রত্যাহার দাবী করে।

শস্য আইন

শিল্প মালিকরা শস্য আইন বিরোধী সঙ্ঘ (Anti-Corn Law League) গঠন করে শস্য আইন লোপের জন্যে তীব্র প্রচার চালায়। রিচার্ড কবডেন (Richard Cobden) এবং জন ব্রাইট (John Bright) নামে দুই সমাজতন্ত্রবাদী শস্য আইনের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গঠন করেন। তাঁরা শ্রমিকদের একথা বুঝাতে সক্ষম হন যে, শস্য আইন লোপ হলে শ্রমিকরা সস্তা দরে খাদ্য কিনতে পারবে। ইতিমধ্যে ১৮৪৫ খ্রীঃ অতিবৃষ্টি ও পোকার আক্রমণে ইংলন্ডে গমের উৎপাদন ও আয়ারল্যান্ডে

শস্য আইনের বিরোধিতা

আলুর চাষ দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আয়ারল্যান্ডের লোকেরা ছিল খুবই গরীব। তারা প্রধানতঃ আলু খেয়ে থাকত। ফলে আয়ারল্যান্ডে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। শস্য আইন রদ করে বিদেশ থেকে সস্তাদরে শস্য আমদানির জন্যে জনমত প্রবল হয়ে ওঠে।

এমতাবস্থায় টোরী প্রধানমন্ত্রী রবার্ট পীল তাঁর দলীয় সমর্থকদের রক্ষণশীলতা অগ্রাহ্য করে শস্য আইন রদ করেন (১৮৪৬ খ্রীঃ)। এজন্য রবার্ট পীল তাঁর দলের নেতৃত্ব পদ হারান। এর পর টোরী দল দুটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়। একদল জমিদার ও ধনী কৃষকদের আগের মতই সমর্থন করে। এদের বলা হত কৃষিগোষ্ঠী। অপর গোষ্ঠী শিল্প মালিক ও শ্রমিকের সমর্থন লাভের কথা বলে। এদের বলা হত "পীলপন্থী" (Peelites)। এভাবে ইংলন্ডের টোরী দলের রূপান্তর আরম্ভ হয়।

শস্য আইন প্রত্যাহার

১৮৩০ খ্রীঃ পর ব্রিটেনের বৈদেশিক নীতি (Foreign Policy of Great Britain after 1830) : ১৮৩০ খ্রীঃ জুলাই বিপ্লবের পর ব্রিটেনের বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে উদারতন্ত্রবাদের প্রভাব দেখা যায়। ঐতিহাসিক ডেভিড টমসনের মতে, জুলাই বিপ্লবের পর রাইন নদীর পশ্চিম দিকে অবস্থিত ইওরোপের দেশগুলিতে উদারতন্ত্রের হাওয়া বইতে থাকে। ইংলন্ড এই হাওয়ার সামিল হয়। ব্রিটিশ সরকার ১৮৩০ খ্রীঃ বেলজিয়ামের স্বাধীনতার বিদ্রোহকে সমর্থন জানান। ফ্রান্স ও ইংলন্ডের উদ্যোগে বেলজিয়ামের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়। এই সঙ্গে ইংলন্ড শক্তিসাম্য রক্ষার দিকে বিশেষ নজর দেয়। স্পেন এবং মিশরে যাতে ফরাসী প্রভাব বিস্তৃত না হয় সেজন্য ইংলন্ড সতর্ক থাকে। গ্রীসের স্বাধীনতার যুদ্ধে যাতে রাশিয়ার জার সরকার তুরস্কের বিশেষ ক্ষতি করতে না পারে সেদিকে ইংলন্ড নজর রাখে। তুরস্ককে যুদ্ধে পরাস্ত করে রাশিয়া এ্যাড্রিয়ানোপলের সন্ধি স্থাপন করলে ইংলন্ডের চাপে রাশিয়া লন্ডনের সন্ধির দ্বারা এই সন্ধি পরিবর্তন করে। গ্রীসের সিংহাসনে ইংলন্ডের রাজ পরিবারের আত্মীয় বংশ বসে এবং গ্রীস থেকে রুশ প্রভাব লোপ পায়।

বৈদেশিক নীতিতে উদারতন্ত্রবাদকে সমর্থন

ফরাসীরাজ লুই ফিলিপের সঙ্গে ইংলন্ড মিত্রতা রক্ষা করে। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবে লুই ফিলিপের পতন হয়। পরবর্তী শাসক ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের সঙ্গে ইংলন্ড মিত্রতা স্থাপন করে।

ফ্রান্সের সহিত মিত্রতা রক্ষা

ইতিমধ্যে তুরস্কের বিরুদ্ধে রুশ আগ্রাসন পুনরায় দেখা দেয়। ইংলন্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রী পামারস্টোন মনে করতেন যে, যদি জার শাসিত রাশিয়া তুরস্কের অধীনস্থ বলকান সাম্রাজ্যে আধিপত্য স্থাপন করে, তবে শক্তিসাম্য বিনষ্ট হবে। বলকানে ও পূর্ব ভূমধ্য সাগরে রুশ নৌ আধিপত্য স্থাপিত হলে ব্রিটেনের ভারতে আসার জলপথ বিপন্ন হবে। জার প্রথম নিকোলাসের আদেশে রুশ সেনা তুরস্কের সাম্রাজ্যভুক্ত মোলদাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া প্রদেশ অধিকার করে। এজন্য ইংলন্ড রাশিয়ার বিরুদ্ধে বাধাদানে এগিয়ে আসে। ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের সঙ্গে ইংলন্ড মিত্রতা স্থাপন করে একযোগে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে (বিস্তৃত বিবরণ পৃষ্ঠা   দেখ)। প্যারিসের সন্ধির দ্বারা ক্রিমিয়ার যুদ্ধের অবসান হয়। রাশিয়া বলকান থেকে পিছু হঠতে বাধ্য হয়। প্যারিসের সন্ধির দ্বারা দার্দানালিস প্রণালী ও কৃষ্ণ সমুদ্রে রুশ যুদ্ধ জাহাজের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়। ফলে পূর্ব ভূমধ্যসাগরে ব্রিটিশ নৌ আধিপত্য রক্ষিত হয়।

পূর্বাঞ্চল সমস্যা : ক্রিমিয়ার যুদ্ধ

ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পর ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন ইওরোপে তাঁর প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করেন। শক্তিসাম্য রক্ষার জন্যে ব্রিটেন তৃতীয় নেপোলিয়নের সঙ্গে মিত্রতা ত্যাগ করে নিরপেক্ষতা নীতি গ্রহণ করে। ফ্রান্সের সঙ্গে প্রাশিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ব্রিটেন নিরপেক্ষ থাকে। ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয় (১৮৭০ খ্রীঃ) যুদ্ধের সময় ব্রিটেন নিরপেক্ষতা নীতি গ্রহণ করে। ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়

শক্তিসাম্য নীতি

যুদ্ধে তৃতীয় নেপোলিয়নের পতন ঘটে। এর পর বিসমার্কের নেতৃত্বে জার্মানী ইওরোপে প্রভাবশালী হয়ে উঠলে, ব্রিটেন শক্তিসাম্য রক্ষার জন্যে ফ্রান্সের তৃতীয় প্রজাতন্ত্রকে সমর্থন জানায়। ১৮৭৫ খ্রীঃ বিসমার্ক যুদ্ধাতঙ্ক (War scare) সৃষ্টি করে পুনরায় ফ্রান্স আক্রমণের আয়োজন করলে (বিস্তৃত বিবরণ আগে পৃঃ দেখ) ব্রিটেন ফ্রান্সের প্রতি তার কূটনৈতিক সমর্থন জানায়।

বার্লিনের সন্ধি

১৮৭৭ খ্রীঃ পুনরায় পূর্বাঞ্চল সমস্যায় জটিলতা দেখা দেয়। রাশিয়া তুরস্ককে (১৮৭৮ খ্রীঃ) আক্রমণ করে স্যানষ্টিফেনোর সন্ধি স্থাপন করলে, ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ডিসরেইলী রুশ শক্তি বৃদ্ধির আশঙ্কায় অত্যন্ত ব্যস্ত হন। রাশিয়া স্যানষ্টিফেনোর সন্ধি পরিবর্তনে অরাজি হলে, ব্রিটেন রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি আরম্ভ করে। ভারতীয় গুর্খা বাহিনী সাইপ্রাসে প্রেরিত হয়। ব্রিটিশ-নৌ-বহর দার্দানালিসের পথে কৃষ্ণসাগরে উপনীত হয়। অবশ্য ডিসরেইলী প্রকৃত যুদ্ধ ঘোষণা অপেক্ষা, যুদ্ধের হুমকী দ্বারা রাশিয়াকে মত পরিবর্তনে বাধ্য করেন। অবশেষে ১৮৭৮ খ্রীঃ বার্লিনের সন্ধির দ্বারা স্যানষ্টিফেনোর সন্ধি পরিবর্তিত হয়। ব্রিটেন সাইপ্রাস দ্বীপ লাভ করে। বলকানে রাশিয়ার বিরুদ্ধে অষ্ট্রিয়াকে প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে ব্রিটেন স্থাপন করতে সমর্থ হয়।[১] যদিও বিসমার্ক বার্লিনের বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন, তবুও ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ডিসরেইলী এই সম্মেলনে তাঁর প্রভাব স্থাপন করতে সমর্থ হন। এজন্য বিসমার্ক মন্তব্য করেন যে, "আসল লোক হল—সেই পরিচিত ইহুদিটি" (The old Jew, is the man)।

ডিসরেইলীর নীতির সমালোচনা

ডিসরেইলী বার্লিন বৈঠক থেকে ব্রিটেনে ফিরে এসে ঘোষণা করেন যে, "আমি ব্রিটেনের জন্যে শান্তি ও সম্মান এনেছি" (I have brought peace with honour)। অবশ্য ডিসরেইলীর এই দম্ভ ছিল অসার। কারণ বার্লিনের সন্ধির দ্বারা পূর্বাঞ্চল সমস্যার স্থায়ী মীমাংসা হয়নি। বলকান জাতিগুলি বার্লিন চুক্তির দ্বারা সন্তুষ্ট হয়নি। (বার্লিন কংগ্রেসে ডিসরেইলীর নীতির সমালোচনা আগে পূর্বাঞ্চল সমস্যা অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। ফলে ১৯১২ খ্রীঃ বলকান যুদ্ধ বাধে। তাছাড়া বার্লিন চুক্তির পর অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে রাশিয়ার বলকানে ক্ষমতা বিস্তারের দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয়। শেষ পর্যন্ত এই দ্বন্দ্ব বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হয়। সুতরাং ডিসরেইলী বার্লিন সন্ধির দ্বারা প্রকৃত শান্তি স্থাপন করতে ব্যর্থ হন।

আমেরিকার গৃহযুদ্ধে ব্রিটিশ নীতি

উনবিংশ শতকে আমেরিকার গৃহযুদ্ধ (১৮৬১-৬৫ খ্রীঃ) বাধলে ব্রিটেন এই যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকেনি। কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে দক্ষিণ আমেরিকার বিদ্রোহী সরকারকে ব্রিটেন নানা প্রকার সাহায্য দেয়। ব্রিটেনের উদ্দেশ্য ছিল বিদ্রোহী অঞ্চলে তার বাণিজ্য প্রতিষ্ঠা। তবে ব্রিটেন এই গৃহযুদ্ধে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে বিরত থাকে।

কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের সাম্রাজ্যবাদ ঃ ব্রিটেনের সমস্যা

১৮৯০ খ্রীঃ পর মিশর, সুদান ও উত্তর আফ্রিকার অন্যান্য উপনিবেশ নিয়ে ব্রিটেন-ফ্রান্সের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয়। অপর দিকে আফগানিস্থান উপলক্ষে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে রাশিয়ার দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয়। বিসমার্ক জার্মানীর উপনিবেশ বিস্তারের বিষয়ে চিন্তা করেননি। এজন্য তাঁর আমলে উপনিবেশ নিয়ে জার্মানীর সঙ্গে ব্রিটেনের বিরোধ ছিল না। কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম বিসমার্কের উপনিবেশ বিস্তার না করার নীতি ত্যাগ করেন। তিনি ব্রিটিশ উপনিবেশ ট্রান্সভালে বিদ্রোহী বুয়ারদের সমর্থন জানালে ব্রিটেন আতঙ্কবোধ করে। কাইজার নৌ-আইন দ্বারা জার্মান নৌ-বহর নির্মাণ আরম্ভ করায় ব্রিটেনের নৌ-আধিপত্য বিনষ্ট

১. A. J. P. Taylor—Struggle for Mastery of Europe.

হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। জার্মান নৌ-সেনাপতি তিরপিৎস হেলিগোল্যান্ড থেকে ব্রিটেনের উপকূল পর্যন্ত জার্মানীর এক কার্যকরী নৌ-বহর গঠনের পরিকল্পনা করেন।[১] ব্রিটেনের নৌ-মন্ত্রী চার্চিল জার্মানীকে সতর্ক করে বলেন যে—"ব্রিটেনের পক্ষে নৌ-শক্তি হল আত্মরক্ষার প্রশ্ন; জার্মানীর নৌ-শক্তি হল বিলাসিতা মাত্র।"[২]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে ব্রিটেন এক বিপজ্জনক অবস্থায় পড়ে। একদিকে ফ্রান্স ও রাশিয়ার সঙ্গে উপনিবেশ নিয়ে বিরোধ, অপর দিকে জার্মানীর সঙ্গে নৌ-প্রতিযোগিতা ও জার্মান আগ্রাসনের সম্ভাবনা ব্রিটেনকে বিপন্ন করে। মিত্রহীন ব্রিটেন এই পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্যে প্রথমে জার্মানীর সঙ্গে গোলযোগ মিটিয়ে মিত্রতা স্থাপনের চেষ্টা করে। লর্ড সলিসবেরী, জোসেফ চেম্বারলেইন প্রভৃতি একদল ব্রিটিশ নেতা মনে করতেন যে, ব্রিটেনের উচিত জার্মানীর সঙ্গে বিরোধের আপোষ করে জার্মানীর সঙ্গে জোট গঠন করা। এজন্য জার্মানীতে হলডেন মিশন পাঠান হয়। কিন্তু এই মিশন সফল হয়নি। অধিকন্তু কাইজারের বিদেশ মন্ত্রী ফ্রেডারিখ্ হলষ্টিনের ঔদ্ধত্যে ব্রিটেন বিরক্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত ফ্রান্স ও রাশিয়ার দিকে মুখ ফেরায়।[৩] ইংলন্ডের রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড ও তাঁর মন্ত্রীসভা স্থির করে যে, ব্রিটেনের উচিত ফ্রান্স ও রাশিয়ার সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করা। ফরাসী মন্ত্রী ডেলক্যাসির দূরদৃষ্টির ফলে ফ্রান্স ও ব্রিটেনের বিরোধীয় বিষয়গুলির মীমাংসা হয়। ১৯০৪ খ্রীঃ ইঙ্গ-ফরাসী চুক্তির দ্বারা মিশরে ব্রিটেন ও মরক্কোয় ফ্রান্স ঔপনিবেশিক স্বত্ব লাভ করে। ১৯০৭ খ্রীঃ ফ্রান্সের মধ্যস্থতায় ব্রিটেনের সঙ্গে রাশিয়ার বিরোধীয় বিষয়ের মীমাংসা হয়। আফগানিস্থান ও তিব্বতে উভয় শক্তি হস্তক্ষেপ না করতে প্রতিশ্রুত হয়। পারস্যে ব্রিটেন ও রাশিয়ার নিজ নিজ প্রভাবের এলাকা স্থির করা হয়। এই দুই চুক্তির ফলে ব্রিটেন-ফ্রান্স-রাশিয়ার ত্রিশক্তি আঁতাত গঠিত হয়।

ত্রিশক্তি আঁতাত গঠন

ব্রিটেনের ঔপনিবেশিক নীতি (The Colonial Policy of Great Britain) : ১৮৩০ খ্রীঃ পর ব্রিটেনের উদারতন্ত্রবাদ তার শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশগুলির ক্ষেত্রেও প্রসারিত হয়। নিগ্রো ক্রীতদাস ব্যবসা লোপের আইন দ্বারা এই উদারতন্ত্রবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। রিচার্ড কবডেন ও জন ব্রাইট প্রভৃতি সমাজতন্ত্রবাদীরা প্রচার করেন যে, ব্রিটেনের সাম্রাজ্যের আর প্রয়োজন নেই। অবাধ বাণিজ্যের যুগে ব্রিটেনকে তার বাণিজ্যের জন্যে সাম্রাজ্যের ওপর নির্ভর করতে হবে না। ব্রিটেনের রক্ষণশীল নেতারা ওপরের মতবাদে সায় না দিলেও, ব্রিটেনের শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশগুলির সঙ্গে নতুনভাবে সম্পর্ক স্থির করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। আমেরিকার ত্রয়োদশ উপনিবেশের বিদ্রোহ ও স্বাধীনতা লাভ থেকে তাঁরা এই শিক্ষা লাভ করেন যে, শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশগুলির ওপর নিয়ন্ত্রণ শিথিল না করলে অসন্তোষ দেখা দেবে।

নব ঔপনিবেশিক নীতির উদ্ভব

কানাডার উপনিবেশে ইংরাজ গভর্ণরের সঙ্গে কানাডার নির্বাচিত সভার বিরোধ দেখা দিলে, দক্ষিণ কানাডার ফরাসী ভাষাভাষী অঞ্চলে বিদ্রোহ দেখা দেয়। এই বিদ্রোহ দমন করার পর ব্রিটিশ সরকার লর্ড ডারহামকে হাই-কমিশনার নিয়োগ করে কানাডার সমস্যা সমাধানের জন্যে সুপারিশ করতে নির্দেশ দেন। ১৮৩৯ খ্রীঃ ডারহাম রিপোর্ট প্রকাশিত হলে এর সুপারিশগুলি কানাডার শাসনব্যবস্থায় প্রযুক্ত হয়। ডারহাম রিপোর্টের নীতি অনুসারে অন্যান্য শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশগুলিতেও উদার নীতি প্রযুক্ত হয়। ডারহাম রিপোর্টের মূল নীতি এই ছিল যে, কানাডার শাসন কর্তৃপক্ষকে কানাডার পার্লামেন্টের নিকট দায়িত্ববদ্ধ থাকতে হবে। একমাত্র বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে কানাডা ব্রিটেনের পরামর্শ অনুসারে

ডারহাম রিপোর্ট

১· Gordon Craig. P. 307.

২· "Navy to Britain is a necessity and Navy to Germany is a luxury".

৩· Gooch—Modern Europe.

চলবে। আভ্যন্তরীণ শাসনের ক্ষেত্রে কানাডা পুরো স্বায়ত্বশাসন ভোগ করবে। কানাডার ব্রিটিশ গভর্ণর নিয়মতান্ত্রিক শাসক রূপে কাজ করবেন। তিনি কানাডার পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে মন্ত্রীসভা গঠন করবেন। এই মন্ত্রীসভা পার্লামেন্টের নিকট দায়ী থাকবে। মোট কথা, ব্রিটেনের আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থার ছাঁচে কানাডার শাসনব্যবস্থা গঠন করা হয়।

ডারহাম রিপোর্টকে ব্রিটেনের শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশগুলির ম্যাগনাকার্টা বলা হয়। এর অনুকরণে ব্রিটেনের অন্যান্য শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশ নোভাস্কেশিয়া, নিউ ফাউন্ডল্যান্ড ও ব্রিটিশ কলম্বিয়ায় ১৮৫০ খ্রীঃ শাসনব্যবস্থা গঠিত হয়। অষ্ট্রেলিয়ায় ১৮৫৬ খ্রীঃ অনুরূপভাবে শাসনব্যবস্থা গঠিত হয়। নিউজিল্যান্ডে ১৮৫৪ খ্রীঃ একই প্রকার শাসনব্যবস্থা প্রচলিত হয়। তবে দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণকায় অধিবাসীরা ভোটাধিকারে বঞ্চিত থাকে।

ডারহাম নীতির প্রয়োগ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটেন উপলব্ধি করে যে, শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশগুলিকে আর ব্রিটেনের অধীনে ধরে রাখা যাবে না। সুতরাং উদারনীতির দ্বারা তাদের সমর্থন লাভ করতে হবে। এছাড়া বিশ্ব অর্থনৈতিক সঙ্কট থেকে মুক্ত হতে হলে ব্রিটেনকে এই উপনিবেশগুলির সাহায্য লাভ করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ১৯৩১ খ্রীঃ স্ট্যাটুট অব ওয়েষ্টমিনিষ্টার (Statute of Westminister, 1931) নামে এক আইন পাশ করে। এই আইন দ্বারা স্থির হয় যে, ব্রিটেনের শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশগুলি যথা কানাডা, নিউজিল্যান্ড, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও আইরিশ ফ্রিষ্টেট অতঃপর স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে পরিগণিত হবে। তারা স্ব-ইচ্ছায় স্বাধীনভাবে ইংলন্ডের রাজার প্রতি আনুগত্য জানাবে। ইংলন্ড যেরূপ ব্রিটেনের রাজার অধীন, সেরূপ এই উপনিবেশগুলিও ব্রিটেনের রাজার প্রতি আনুগত্য জানিয়ে ব্রিটেনের সমান মর্যাদা ভোগ করবে। এভাবে ব্রিটিশ সিংহাসনের অধীনে এক কমনওয়েলথ গঠিত হয়। কমনওয়েলথের সদস্যদের স্বায়ত্ব-শাসন ও স্বাধীনতা দেওয়া হলেও অ-শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশগুলির ক্ষেত্রে ব্রিটেনের উদারতা দেখা যায়নি। ভারত প্রভৃতি উপনিবেশে ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদী নীতি বহাল থাকে।

স্ট্যাটুট অব ওয়েষ্টমিনিষ্টার
১৯৩১ খ্রীঃ নব উপনিবেশ নীতি

ব্রিটেনে গণতন্ত্রের প্রসার ঃ ভোটাধিকারের বিস্তৃতি ঃ সমাজতন্ত্রবাদ (Progress of Democracy in Britain : The extension of Franchise : Socialism) ঃ ব্রিটেনে ১৮৩২ খ্রীঃ ভোটাধিকার আইন পাশ হলে শিল্পাঞ্চলে কিছু কিছু লোক ভোটের অধিকার পায়। কিন্তু তাতে সর্বসাধারণের ভোটাধিকারের দাবী পূরণ হয়নি। রক্ষণশীল দলের বিরোধিতার জন্যে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটের দাবী পূরণ হয়নি। ইতিমধ্যে রক্ষণশীল দলের ঐক্য ভেঙে যায়। পীলপন্থীরা এই অভিমত দেয় যে, যুগের দাবী মেনে নিয়ে রক্ষণশীল দলের পুরাতন নীতি বদলান উচিত। ক্রমে কট্টর রক্ষণশীল নেতাদের পতন হলে নবীন নেতা বেঞ্জামিন ডিসরেইলী প্রভৃতি রক্ষণশীল দলে নব টোরীবাদ (New Toryism) চালু করেন। ডিসরেইলী জনসাধারণকে একথা বোঝাবার চেষ্টা করেন যে টোরী দল, উদারতন্ত্রী বা লিবারেল দল অপেক্ষা জনস্বার্থ কম দেখে না। তারা শিল্পজীবি শ্রেণী ও সাধারণ লোকের স্বার্থের দিকে নজর দিবে। যাতে জাতি ধনী ও দরিদ্র দুই শ্রেণীতে বিভক্ত না হয় সেজন্য টোরী দল কাজ করবে। ডিসরেইলীর এই মতবাদকে নব টোরীবাদ বলা হয়। তাঁর Sybil গ্রন্থে ডিসরেইলী তাঁর মতবাদ প্রচার করেন। যদিও কট্টর টোরী অভিজাতরা ডিসরেইলীকে সন্দেহ করতেন; যদিও তাঁরা ডিসরেইলীর বিলাসী পোষাক ও বাগ্মীতাকে ঘৃণা করতেন; তবুও এই

নব টোরীবাদ ঃ উদার পন্থা

তরুণ নেতা অপ্রতিহত গতিতে পার্লামেন্টে টোরী দলের নেতৃত্ব-পদ লাভ করেন। ডিসরেইলীর উদারপন্থী নীতির ফলে ব্রিটেনে ভোটাধিকার বিস্তারের পথ প্রস্তুত হয়।

এদিকে লিবারেল বা উদারপন্থী দলেরও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটে। লর্ড পামারস্টোনের মৃত্যুর পর উইলিয়াম গ্ল্যাডস্টোন লিবারেল দলের নেতৃত্ব পান। তিনি আগেই অর্থমন্ত্রী হিসেবে কর হ্রাস ও গরীব শ্রেণীর প্রতি উদার নীতির জন্যে বিশেষ নাম করেন। তিনি লিবারেল দলের নেতার পদ পেলে লিবারেল দল আরও উদারপন্থী নীতি নেয়। গ্ল্যাডস্টোন ১৮৬৬ খ্রীঃ ভোটাধিকার বৃদ্ধির জন্যে একটি বিল আনেন। পার্লামেন্টে এই বিল নাকচ হলে গ্ল্যাডস্টোন মন্ত্রীসভা (১৮৬৬ খ্রীঃ) পদত্যাগ করে এবং লর্ড ডার্বির নেতৃত্বে একটি টোরী মন্ত্রীসভা গঠিত হয়।

গ্ল্যাডস্টোনীয় গণতন্ত্রবাদ

এদিকে ভোটাধিকার সম্প্রসারণের দাবীতে ব্রিটেনের শিল্প শ্রমিক ও ট্রেড ইউনিয়নগুলি যোগ দেয়। জন ব্রাইট নামক জনৈক কোয়েকার পন্থী সমাজতান্ত্রিক তাঁর অসাধারণ সংগঠন শক্তির দ্বারা শ্রমিকদের এই দাবীর সামিল করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় জাতীয় সংস্কারপন্থী সঙ্ঘ বা ন্যাশন্যাল রিফর্ম লীগ (National Reform League) গঠিত হয়। এই লীগ প্রচার করে যে, ব্রিটেনে ৬ জন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের মধ্যে একমাত্র একজন ভোটাধিকার পেয়েছে।[১] ন্যাশন্যাল রিফর্ম লীগ টোরী রক্ষণশীল নীতির প্রতিবাদে লন্ডনের হাইড পার্কে এক জনসভা ডাকে। টোরী সরকার এই সভা নিষিদ্ধ করে হাইড পার্কের গেটে তালা-চাবি দিলে ক্রুদ্ধ জনতা রেলিং ভেঙে পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ বাধায়।

রিফর্ম লীগ : ভোটাধিকারের দাবী

এমতাবস্থায় ডিসরেইলী ভোটাধিকার সম্প্রসারণ অনিবার্য বুঝে ১৮৬৭ খ্রীঃ দ্বিতীয় রিফর্ম বা ভোটাধিকার আইন পাশ করেন। তিনি লিবারেল দলের সংশোধনগুলিও গ্রহণ করেন। এই আইন দ্বারা ভোটাধিকার সম্প্রসারিত হয়। তবে তখনও পর্যন্ত ব্রিটেনে গণভোট চালু হয়নি। তখনও পর্যন্ত সম্পত্তির ভিত্তিতে ভোটাধিকার চালু থাকে। শহরবাসী নিম্ন মধ্যবিত্ত, গ্রামের কৃষকরা ১৮৬৭ খ্রীঃ ভোটাধিকার আইনে ভোটাধিকার লাভ করে।

দ্বিতীয় রিফর্ম বিল : ভোটাধিকার সম্প্রসারণ

নতুন ভোটাধিকার অনুসারে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে নির্বাচকরা লিবারেল বা উদারপন্থী দলকেই ভোট দেয়। লিবারেল দলের সমর্থনে গ্ল্যাডস্টোন মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। গ্ল্যাডস্টোন বহু উদারপন্থী সংস্কার চালু করে জনপ্রিয়তা পান। তিনি চার্টিস্টদের দাবী মেনে ১৮৭২ খ্রীঃ গোপন ব্যালটে ভোটদানের ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার দ্বারা সরকারি কর্মচারী নিয়োগ করার আইন ১৮৭০ খ্রীঃ চালু হয়। ১৮৭০ খ্রীঃ গ্ল্যাডস্টোন মন্ত্রীসভার বিখ্যাত শিক্ষা আইন পাশ হয়। গ্ল্যাডস্টোন বলেন যে, "যেহেতু শ্রমিকদের হাতে ভোটাধিকার চলে গেছে, সেহেতু শ্রমিকরাই আমাদের প্রভু। আমাদের প্রভুদের শিক্ষার ব্যবস্থা না করলে গণতন্ত্র প্রহসনে পরিণত হবে।" (We must educate our masters)। সুতরাং নতুন শিক্ষা আইনে ইংলন্ডের সর্বত্র স্কুল স্থাপন ও স্কুলগুলিকে সরকারি সাহায্য দানের ব্যবস্থা করা হয়। ১৮৭১ খ্রীঃ ট্রেড ইউনিয়ন আইন দ্বারা শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের অধিকার দেওয়া হয়।

গ্ল্যাডস্টোনের শাসন : সর্বসাধারণের শিক্ষা বিস্তার

আয়ারল্যান্ডের দরিদ্র কৃষকদের যাতে জমি থেকে উচ্ছেদ না করা হয় সেজন্য গ্ল্যাডস্টোন আইন রচনা করেন। এভাবে ইংলন্ডে গ্ল্যাডস্টোনের শাসনকালে উদারতন্ত্রবাদ কার্যকরী হয়। ব্রিটেনের ভোটাধিকার বৃদ্ধি পায়। কিন্তু একথা স্মর্তব্য যে, তখনও পর্যন্ত ব্রিটেনে সর্বসাধারণের ভোটাধিকার ও নারীদের ভোটাধিকারের দাবী

সমালোচনা

১. Asa Briggs—Victorian people.

স্বীকৃত হয়নি। লিবারেল দলের আদর্শ অনুসারে গ্ল্যাডষ্টোন সম্পত্তির অধিকারে হস্তক্ষেপও করেননি।

সমাজতন্ত্রবাদ ও শ্রমিক দলের উদ্ভব (Socialism and the rise of the Labour Party) : ১৮৬৭ খ্রীঃ ভোটাধিকার আইন দ্বারা ভোটাধিকারের বিস্তৃতি ঘটলেও ব্রিটেনের সকল নাগরিক তখনও ভোটাধিকারে বঞ্চিত ছিল। ১৮৮৪ খ্রীঃ গ্ল্যাডষ্টোন মন্ত্রীসভা নতুন ভোটাধিকার পাশ করলে কৃষক ও দিনমজুররাও ভোটাধিকার পায়। ১৮৮৫ খ্রীঃ ভোটকেন্দ্রগুলি পুনর্গঠন করার ফলে সকল অঞ্চলে লোকসংখ্যা অনুপাতে নির্বাচকের সংখ্যা স্থির হয়। ফলে মোটামুটিভাবে ব্রিটেনে গণতন্ত্র স্থাপিত হয়। তাছাড়া কোন কেন্দ্র হতে একটির বেশী আসন থাকবে না এই ব্যবস্থা চালু হলে ধনী ব্যক্তিদের বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে নিজ প্রার্থী নির্বাচন করার সুযোগ দূর হয়। কেবলমাত্র ব্রিটেনের নারী সমাজ ভোটাধিকারে বঞ্চিত থাকে।

তৃতীয় ভোটাধিকার আইন : সর্বসাধারণের ভোটাধিকার

ব্রিটেনে প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের ভোটাধিকার প্রবর্তিত হলেও সামাজিক অসন্তোষ দূর হয়নি। ১৮৭৩-১৮৯০ খ্রীঃ খাদ্যশস্যের দাম খুব কমে যায়। রেল ও জাহাজযোগে বিদেশ থেকে সস্তাদরের খাদ্য ব্রিটেনে আনায় সস্তা বিদেশী খাদ্যে বাজার প্লাবিত হয়। ব্রিটেনের খামার মালিকদের ক্ষতি হয়। ফলে তারা খাদ্য উৎপাদন না করে খামারে পশুপালন ও দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদন আরম্ভ করে। ক্ষেতে, খামারে কাজ না থাকায় গ্রাম থেকে বহু লোক শহরের বস্তিতে চলে আসতে বাধ্য হয়। যারা গ্রামে থাকে তারা কম মজুরীতে কাজ করতে বাধ্য হয়। কৃষিতে এরূপ মন্দা দেখা দেওয়ায় বহু লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং বেকার সমস্যা দেখা দেয়। শিল্পের ক্ষেত্রেও এই সময়ে মন্দা দেখা দেয়। জার্মানী, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে ব্রিটেনের শিল্পদ্রব্যের ভাল বাজার ছিল। কিন্তু ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের পর এই দেশগুলিতে শিল্প বিস্তার শুরু হলে, ব্রিটেনের মাল আমদানি নিয়ন্ত্রণ করা হয়। অন্যান্য দেশের উৎপন্ন মালের সঙ্গে ব্রিটিশ মালকে প্রতিযোগিতা করতে হয়। এজন্য ব্রিটিশ শিল্পগুলিতেও মন্দা দেখা দেয়। কৃষি ও শিল্প উভয় ক্ষেত্রে মন্দার ফলে ব্রিটিশ অর্থনীতিতে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বেকার সমস্যা, নিম্ন হারে মজুরী, শ্রমিক ছাঁটাই প্রভৃতির ফলে ইংলন্ডের জনসংখ্যার ৩০% দুর্দশায় পড়ে।[১]

কৃষি ও শিল্পে সঙ্কট : অর্থনৈতিক মন্দা

সাধারণ লোকদের, বিশেষতঃ শ্রমিক ও কৃষকদের এই অর্থনৈতিক দুরবস্থার প্রতিকারের জন্যে টোরী বা হুইগ কোন দলই বিশেষ নজর দেয়নি। ডিসরেইলীর মৃত্যুর পর তাঁর প্রবর্তিত 'নব টোরীবাদ' টোরী দল পরিত্যাগ করে। লর্ড সলিসবেরী দলকে হুটে বুর্জোয়া বা ধনী বুর্জোয়া এবং বণিক শ্রেণীর স্বার্থে পরিচালনা করেন। দরিদ্র শ্রমিক ও কৃষকের কথা টোরী দল ভুলে যায়। উদারপন্থী বা লিবারেল দলেও সাধারণ লোকের দুঃখকষ্ট সম্পর্কে চেতনার অভাব দেখা দেয়। লিবারেল দল ছিল বুর্জোয়া স্বার্থের সমর্থক। সুতরাং তারা গরীব লোকদের জন্যে মাথা ঘামাতে রাজী ছিল না। যোসেফ চেম্বারলেইন ছিলেন একমাত্র লিবারেল নেতা যিনি বুঝতে পারেন যে, ব্রিটেন একটি ভাঙনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তিনি উপনিবেশের সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত থাকায় উপরোক্ত সমস্যা সম্পর্কে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয়নি।

টোরী ও লিবারেল দলের বুর্জোয়াবাদ

টোরী ও হুইগ দলের সমাজ চেতনার অভাবের জন্যে, দরিদ্র শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করবে এমন একটি নতুন দলের কথা লোকে ভাবতে আরম্ভ করে। যেহেতু ব্রিটেনে সর্ব-সাধারণের ভোটাধিকার চালু হয়েছিল, সেহেতু সর্বসাধারণের স্বার্থ দেখবে এমন একটি নতুন রাজনৈতিক দলের উদ্ভব অনিবার্য হয়। এই সময় সোস্যাল ডেমোক্রেটিক ফেডারেশন নামে একটি মার্কসবাদী দল গঠিত হয়। কিন্তু

ফেবিয়ান সমাজতন্ত্রবাদ

১· Charles Booth—Life and Labour of the people of London.

এই দল ব্রিটিশ জাতির আস্থা অর্জন করতে পারেনি। এই সময় ফেবিয়ান সমাজতন্ত্রবাদ (Fabian Socialism) নামে এক মতবাদ ব্রিটেনে বিশেষ জনপ্রিয় হয়। সিডনী ওয়েব ও তাঁর পত্নী বিয়াট্রিস ওয়েব ফেবিয়ান পার্টি স্থাপন করেন। প্রখ্যাত নাট্যকার জর্জ বার্নার্ড শ ছিলেন ফেবিয়ান দলের প্রধান সমর্থক। অন্যান্য বুদ্ধিজীবিরা যথা, মিসেস এ্যানি বেশান্ত, এইচ· জি· ওয়েলস প্রভৃতি ছিলেন ফেবিয়ান দলের সমর্থক। এঁরা সকলেই ছিলেন পাতি বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবি। এঁরা সমাজতন্ত্রবাদী রবার্ট আওয়েন ও জন স্টুয়ার্ট মিলের অনুরাগী ছিলেন। এঁরা ফেবিয়ান প্রবন্ধাবলী (Fabian Essays) দ্বারা এই মতবাদ জনসমাজে ছড়ান।

ফেবিয়ানদের মতে, বিবর্তনের পথে ধাপে ধাপে সমাজতন্ত্রের উদ্ভব হবে। ফেবিয়ান চিন্তাবিদ্‌রা ডারউইনের বিবর্তনতন্ত্রের সামাজিক প্রয়োগ করেন। তাঁরা বলেন যে, ডারউইনের তত্ত্ব অনুসারে জীবজগতে বিবর্তনের মাধ্যমে সকল পরিবর্তন ঘটে। সুতরাং একই নিয়ম অনুসারে সমাজে বিবর্তনের পথে সমাজতন্ত্র আসবে। বিপ্লব দ্বারা অকস্মাৎ পরিবর্তন প্রকৃতির নিয়ম বিরোধী। অপর দিকে মার্কসবাদীরা মনে করে যে, বিপ্লবের দ্বারা শোষিত শ্রেণী শোষকদের ক্ষমতাচ্যুত করবে। ফেবিয়ানরা দুটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেয়; যথা ঃ—(১) রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জনসাধারণের ভোটাধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা; (২) অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা। গণতান্ত্রিক উপায়ে সরকারের আইনের সাহায্যে সমাজতন্ত্র স্থাপনের সম্ভাবনায় তারা বিশ্বাস করত। মার্কসবাদীদের ন্যায় বিপ্লবের পথে শ্রেণী বৈষম্য লোপ তাদের পছন্দ ছিল না। তারা ভূমি ও মৌল শিল্পগুলির রাষ্ট্রীকরণ দাবী করত। রেল, যোগাযোগ ব্যবস্থা, কয়লা, বিদ্যুৎ, ব্যাঙ্ক প্রভৃতির রাষ্ট্রীকরণ তাদের লক্ষ্য ছিল। অবৈতনিক উচ্চশিক্ষা, নিখরচায় চিকিৎসা প্রভৃতি তারা দাবী করত।

শ্রমিক দলের গঠন

ফেবিয়ান ভাবধারার ওপর নির্ভর করে ব্রিটেনের শ্রমিক দল গড়ে ওঠে। ফেবিয়ান চিন্তাবিদ সিডনী ওয়েব ও সাহিত্যিক বার্নার্ড শ নির্বাচনের মাধ্যমে ৫০ জন ফেবিয়ান শ্রমিক নেতাকে পার্লামেন্টে পাঠিয়ে পার্লামেন্টকে শ্রমিকদের অনুকূলে প্রভাবিত করার সিদ্ধান্ত নেন। জেমস কায়ার হার্ডি (James Keir Hardie) নামে এক ব্যক্তি I. L. P. (Independent Labour Party) বা স্বাধীন শ্রমিক দল নামে একটি সংস্থা গঠন করেন। বিভিন্ন শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়নগুলি এই সংস্থার সামিল হয়। ক্রমে ফেবিয়ান গোষ্ঠী, স্বাধীন শ্রমিক দল জোটবদ্ধ হয়ে শ্রমিক দল নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করে। বিখ্যাত রাজনীতিবিদ র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড এই দলের সম্পাদক নিযুক্ত হন। ক্রমে এই দলের প্রার্থীরা পার্লামেন্টের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হতে থাকে।

শ্রমিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে দমন নীতি

রক্ষণশীল গোষ্ঠী শ্রমিকদের সংগঠনকে ধ্বংস করার চেষ্টায় ছিল। ১৯০০ খ্রীঃ টাফ্‌ভেল রেল কোম্পানীতে শ্রমিকরা বাড়তি বেতনের দাবীতে ধর্মঘট করে। ট্রেড ইউনিয়নগুলি এই ধর্মঘটকে সমর্থন জানায়। কোম্পানী ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করলে ধর্মঘটে কোম্পানীর ক্ষতির জন্যে আদালত ট্রেড ইউনিয়নকে ২৩ হাজার পাউন্ড ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করে। এর ফলে শ্রমিক আন্দোলন দমে যায়।

শ্রমিক দলের জয়

এমতাবস্থায় শ্রমিক দল বুঝতে পারে যে, পার্লামেন্টে অধিক সদস্য পাঠিয়ে আইন দ্বারা শ্রমিকের অধিকার রক্ষা না করলে দরিদ্র শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা হবে না। ফলে শ্রমিক দল ব্যাপকভাবে নির্বাচনে প্রতিযোগিতা আরম্ভ করে। লিবারেল বা উদারপন্থীদের কিছু সদস্যও শ্রমিক দলে যোগ দিলে এই দলের শক্তি বাড়ে। এই সময় পার্লামেন্টের সদস্যদের জন্যে বেতনের ব্যবস্থা চালু হলে দরিদ্র ব্যক্তিদের পক্ষে পার্লামেন্টের সদস্য হিসেবে কাজ করা সহজ হয়। ১৯১০ খ্রীঃ হাউস অব কমন্সে ৪২ জন

শ্রমিক সদস্য নির্বাচিত হলে তাদের চাপে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন বৈধ বলে আইন রচিত হয়। এভাবে ব্রিটেনে সমাজতন্ত্র এবং শ্রমিক দলের উত্থান ঘটে।

পাঠ্যসূচী

১। Woodwards—The Age of Reform.
২। Ensor—England 1870—1914.
৩। Rostow—British Economy in the 19th century.
৪। Henry Pelling—Origins of the Labour Party.
৫। Halevy—History of English People in the 19th century.

দ্বিতীয় অধ্যায়
সাম্রাজ্যবাদ ও ইওরোপের উপনিবেশ বিস্তার
(Imperialism and Expansion of Europe)

নব সাম্রাজ্যবাদ কাহাকে বলে (New Imperialism and its causes) : ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে সাম্রাজ্যবাদের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচীন যুগে মহাবীর আলেকজান্ডার দি গ্রেট ও জুলিয়াস সিজার, মধ্যযুগে চিঙ্গীজ খান, আধুনিক যুগে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী বিজেতার নাম করা যায়। তবে এই ধরনের সাম্রাজ্যবাদ ছিল ভৌমিক অধিকার (Territorial domination) স্থাপনের চেষ্টা মাত্র। আধুনিক সাম্রাজ্যবাদ বলতে যা বোঝায় তা এই ধরনের সাম্রাজ্যবাদ থেকে পৃথক। আধুনিক সাম্রাজ্যবাদকে নব-সাম্রাজ্যবাদ (New Imperialism) বলা চলে।[১] ১৮৭০ খ্রীঃ পর থেকে ইওরোপের বৃহৎ অথবা শিল্পায়ত জাতিগুলি, ইওরোপের বাইরে বিশেষতঃ পূর্ব এশিয়া এবং আফ্রিকায় উপনিবেশ দখলের জন্যে যে উন্মাদ প্রতিযোগীতায় লিপ্ত হয়; যার ফলে, ইওরোপের বাইরের অনধিকৃত, অনাবিষ্কৃত, কাঁচামাল-সমৃদ্ধ এবং সম্ভাব্য বাজার যুক্ত দেশগুলি ইওরোপীয় জাতিগুলির উপনিবেশে পরিণত হয় তাকেই নব সাম্রাজ্যবাদ (New Imperialism) বলা হয়।

আধুনিক সাম্রাজ্যবাদ কাহাকে বলে

১৮৭০ খ্রীঃ পর উদ্ভূত এই নব সাম্রাজ্যবাদের আগে ৪০০ বছর ধরে স্প্যানিশ, ডাচ, ইংরাজ, ফরাসী প্রভৃতি সামুদ্রিক জাতি এবং অষ্ট্রিয়ার হ্যাপসবার্গ, রাশিয়ার জার প্রভৃতি স্থলশক্তি গুলিও উপনিবেশ বিস্তারে রত ছিল। কিন্তু এই প্রাক ১৮৭০ খ্রীঃ যুগে উপনিবেশ স্থাপনে সরকারগুলির তেমন আগ্রহ ছিল না, জনমতও এ ব্যাপারে উদাসীন ছিল। এমনকি ১৮২০ খ্রীঃ মধ্যে ফ্রান্স ও স্পেনের অধিকাংশ উপনিবেশ হাত ছাড়া হলেও এই দেশগুলি তাতে চিন্তিত হয়নি। ১৮২২ খ্রীঃ ব্রাজিল পর্তুগালের হাতছাড়া হয়। ব্রিটেন, আমেরিকার ত্রয়োদশ উপনিবেশ হারায়। তথাপি এ্যাডাম স্মিথ বলেন যে—উপনিবেশ রক্ষার জন্যে ব্যয়, উপনিবেশের আয় অপেক্ষা বেশী। গ্ল্যাডস্টোন উপনিবেশগুলিকে মুক্ত করার কথা বলেন (১৮৫২ খ্রীঃ)। ডিসসরেইলী বলেন যে, "এই হতভাগ্য উপনিবেশগুলি শীঘ্রই মুক্ত হবে। এগুলি ব্রিটেনের গলায় ভারী পাথরের মতই ঝুলে আছে।" মোট কথা ১৮৭০ খ্রীঃ পর্যন্ত একটি উপনিবেশ বিরোধী মনোভাব প্রবল ছিল।

১৮৭০ খ্রীঃ পর অকস্মাৎ নাটকীয়ভাবে এই উপনিবেশ বিরোধী মনোভাব লুপ্ত হয়। শকুনি যেরূপ মৃতদেহের ওপর আকাশ থেকে অকস্মাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে, ইওরোপীয় জাতিগুলি এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলিকে নিজ নিজ উপনিবেশে পরিণত করার জন্যে সেরূপ ঝাঁপ দেয়। কোন ভাল জিনিস দখলের জন্যে লোকে যেরূপ কাড়াকাড়ি করে, সেরূপ উপনিবেশ দখলের জন্যে কাড়াকাড়ি (scramble) আরম্ভ হয়। ১৮৭০-১৯১৪ খ্রীঃ পর্যন্ত সময়কালকে এজন্য Age of imperialism বা সাম্রাজ্যবাদের যুগ বলা হয়। এই নব সাম্রাজ্যবাদ (New Imperialism) দৈত্যের ন্যায় জেগে ওঠে।

১৮৭০ খ্রীঃ সাম্রাজ্যবাদের বিস্তার

সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভবের কারণ (The Causes of the rise of Imperialism) : ১৮৭০ খ্রীঃ পর সাম্রাজ্যবাদের বিস্ফোরণের জন্যে পণ্ডিতেরা নানাবিধ কারণ দেখান। ব্রিটিশ অর্থনৈতিক ঐতিহাসিক জে. এ. হবসন (J. A. Hobson) তাঁর

---

১. David Tompson—Europe since Napoleon. P. 57.

সাম্রাজ্যবাদ (Imperialism a Study) গ্রন্থে (১৯০২ খ্রীঃ) সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। হবসন বলেন যে, নব সাম্রাজ্যবাদের পশ্চাতে কোন উচ্চতর লক্ষ্য ছিল না। অর্থনৈতিক লক্ষ্যই ছিল এই নব উপনিবেশবাদের মূলে। হবসনের মতে, এই পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় পুঁজিবাদীরা মুনাফা ভোগ করে বহু মূলধন জমা করে। এর ফলে মূলধনের পাহাড় জমে যায় (Glut of Capital)। এই মূলধন উপনিবেশে বিনিয়োগ করে আরও মুনাফা বৃদ্ধির জন্যে মূলধনীরা তাদের নিজ দেশের সরকারকে উপনিবেশ দখলে বাধ্য করে। উপনিবেশের নতুন শিল্পে মূলধন লগ্নী দ্বারা মূলধনী শ্রেণী মুনাফার পাহাড় জমায়। উপনিবেশের কাঁচামাল ও বাজারকে একচেটিয়া দখল করে তারা ফুলে ফেঁপে ওঠে। সুতরাং নব সাম্রাজ্যবাদের মূল অর্থনৈতিক শিকড় ছিল উপনিবেশে লগ্নীর জন্যে "বাড়তি মূলধনের চাপ" (The economic tap root of imperialism was glut of capital in search of investment)। অর্থাৎ বাড়তি মূলধনের চাপই সাম্রাজ্য বা উপনিবেশ দখলের মূল কারণ।

হবসন কর্তৃক সাম্রাজ্যবাদের পন্থা ব্যাখ্যা

হবসনের মতে, এই ব্যবস্থার প্রতিকার করতে হলে ধনবণ্টন দ্বারা মূলধনী শ্রেণীর বাড়তি মূলধনকে দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করা দরকার এবং সমাজের বিভিন্ন উন্নয়নশীল কাজে এই মূলধন বিনিয়োগ করা দরকার। যদি লোকের জীবনযাত্রার মান বাড়ে, তবে তারা কলকারখানায় তৈরি বাড়তি জিনিস কিনে উদ্বৃত্ত মালকে ব্যবহার করতে পারবে। ফলে উদ্বৃত্ত মালের বিক্রির জন্যে আর উপনিবেশের দরকার হবে না।

হবসনের তত্ত্বের দুর্বলতা

নব সাম্রাজ্যবাদ উদ্ভবের জন্যে হবসন যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, অনেকে তার সমালোচনা করেন। শিল্প-বিপ্লবের পর শিল্প মালিকদের মূলধন স্ফীতির ফলে সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব হয় হবসন একথা বলেছেন। কিন্তু শিল্প-বিপ্লবের আগের যুগে কেন সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়, তার ব্যাখ্যা হবসন দেন নি। ১৮৭০ খ্রীঃ নব সাম্রাজ্যবাদ দেখা দিলে তা ব্যাখ্যা করার জন্যে হবসন উপরোক্ত উদ্বৃত্ত মূলধনের যুক্তি দেন। হবসন পরে বুঝেছিলেন যে তাঁর ব্যাখ্যা অতি সরলীকরণ দোষে দুষ্ট।[১] হবসনের মতবাদের ত্রুটি যাই থাকুক, তবুও একথা সত্য যে, মূলধনের স্ফীতি এবং বাজার দখলের ইচ্ছা সাম্রাজ্যবাদকে জোরদার করে। শিল্প-বিপ্লব এবং ধনতন্ত্রবাদ সাম্রাজ্যবাদের পথ প্রস্তুত করে। সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা অনেকাংশে সত্য।

সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব সম্পর্কে লেনিনের অভিমত পুঁজিবাদী শিল্পের ফল

বিখ্যাত রুশ কমিউনিস্ট নেতা লেনিন, তাঁর "সাম্রাজ্যবাদ হল ধনতন্ত্রবাদের সর্বোচ্চ স্তর" (Imperialism, the Highest Stage of Capitalism) নামক গ্রন্থে সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যাকে আরও বিশদভাবে তুলে ধরেছেন। লেনিনের মতে, ধনতন্ত্র বা পুঁজিবাদের ভেতরেই সাম্রাজ্যবাদের বীজ নিহিত আছে. পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির বৈদেশিক নীতি পুঁজিবাদীশ্রেণীর স্বার্থেই পরিচালিত হয়। অধিক মুনাফার আশায় শিল্প মালিকরা দেশের লোকের প্রয়োজন অপেক্ষা বাড়তি মাল উৎপাদন করে। এই বাড়তি মাল বিক্রয় এবং সস্তায় কাঁচামাল পাওয়ার জন্যে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র উপনিবেশ দখল করে। বিশ্বে উপনিবেশের সংখ্যা সীমিত। পুঁজিবাদী দেশগুলি উপনিবেশ দখলের চেষ্টা করায় বিভিন্ন দেশের মধ্যে প্রতিযোগিতা ও যুদ্ধ আরম্ভ হয়। যুদ্ধ হল পুঁজিবাদী অর্থনীতির চূড়ান্ত পরিণতি। লেনিন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ হিসেবে বিভিন্ন পুঁজিবাদী শক্তির উপনিবেশ দখলের প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে দায়ী করেন। লেনিনের মতে, ধনী বুর্জোয়া দেশের লোকেরা উপনিবেশের দরিদ্র শ্রমিকদের তাদের শাসনের দ্বারা শোষণ করে। বুর্জোয়া দেশের শ্রমিকশ্রেণী উপনিবেশের আয়ে বেশী মজুরী পাওয়ার আশায় এই শোষণের সামিল

১· Gordon Craig.

হয়। তারা ভুলে যায় যে, তাদের এই সুবিধা হল সাময়িক।সাম্রাজ্যবাদের জন্যে লেনিন যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন এর মূল কথা হল : (১) নতুন বাজার দখল অপেক্ষা মূলধনের বিনিয়োগের জন্যেই উপনিবেশ দখলের আগ্রহ বাড়ে। (২) পুঁজিবাদী অর্থনীতির পরিণামই হল সাম্রাজ্যবাদ। (৩) নিজ দেশের শ্রমিক অপেক্ষা অনগ্রসর উপনিবেশের শ্রমিকদের শোষণ পুঁজিমালিকরা বেশী লাভজনক মনে করে। (৪) এই মুনাফার একাংশ নিজ দেশের শ্রমিককে দেওয়ায় পুঁজিবাদী দেশের শ্রমিকরাও মুনাফার শরিকে পরিণত হয়। এর ফলে "অভিজাত শ্রমিক" ও "শোষিত শ্রমিক" দুই ভাগ দেখা দেয়। অভিজাত শ্রমিকরা শোষক বুর্জোয়াদের সামিল হয়।

কোন কোন ঐতিহাসিক লেনিনের এই মতবাদের সমালোচনা করেন। তাঁরা বলেন যে, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মূলধন লগ্নী করার ইতিহাস পরীক্ষা করলে লেনিনের মত প্রমাণিত হয় না। ১৮৭০ খ্রীঃ পর ইংলন্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী দেশের মূলধনের প্রধান অংশ লগ্নী করা হয় দক্ষিণ আমেরিকা ও রাশিয়ায়। আমেরিকা বা রাশিয়া কোনদিন ইংলন্ড বা ফ্রান্সের উপনিবেশ ছিল না। অথচ এই বাড়তি মূলধন সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি তাদের নিজ উপনিবেশে ১৮৭০ খ্রীঃ পর তেমন লগ্নী করেনি। সুতরাং Glut of Capital বা বাড়তি মূলধন বিনিয়োগের জন্যে উপনিবেশ স্থাপিত হয় একথা প্রমাণিত হয় না। যে সকল দেশের উপনিবেশ ছিল না, যথা, ডেনমার্ক ও সুইডেন প্রভৃতি সেই সকল দেশের শ্রমিকদের জীবন-যাত্রার মান ছিল বেশ উঁচু। অপর দিকে ফ্রান্স ও বেলজিয়াম প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী দেশের শ্রমিকের জীবন-যাত্রার মান ছিল নীচু। লেনিন তত্ত্ব অনুযায়ী এই সাম্রাজ্যবাদী শিল্পোন্নত দেশগুলির শ্রমিকের জীবন-যাত্রার মান উন্নত হওয়াই উচিত ছিল। সুতরাং লেনিন তত্ত্বের বাস্তব প্রমাণ দেখা যায় না। শিল্প-বিপ্লব ও পুঁজিবাদী অর্থনীতির উদ্ভব উনবিংশ শতকে হয়। তার আগে কেন উপনিবেশ স্থাপিত হয়, লেনিন তত্ত্বে তার ব্যাখ্যা নেই। ডেভিড টমসন বলেন যে, উপনিবেশ বিস্তারের ইতিহাস লেনিন তত্ত্বকে সমর্থন করেনি। ১৮১৫-১৮৭০ পর্যন্ত ফ্রান্স শিল্পগঠনের দিক থেকে ছিল ব্রিটেন ও জার্মানীর অনেক পিছনে। অথচ এই সময়ে ফ্রান্স তার উপনিবেশের পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ বাড়ায়। এই সময় ফ্রান্সের হাতে না ছিল উদ্বৃত্ত মূলধন, না ছিল উদ্বৃত্ত শিল্প সম্পদ যা সে উপনিবেশে লগ্নী করতে পারত। ১৮৭০ খ্রীঃ পরও ফরাসী জনমত ঘোরতর উপনিবেশ বিরোধী হলেও লিঁও গ্যামবেটা, জুলেস ফেরি আনাম, টংকিং, টিউনিসিয়ায় উপনিবেশ স্থাপন করেন। ব্রিটেনের কথা বিচার করলে দেখা যাবে যে, ব্রিটেন তার উপনিবেশ কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডকে উপনিবেশবাদের কঠোর নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করে "ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস" দান করে। তার কারণ ছিল যে, ব্রিটেন বুঝতে পারে এই উপনিবেশগুলিকে অর্দ্ধ স্বাধীনতা দিলে তাদের সঙ্গে বাণিজ্য বাড়বে। উপনিবেশের একচেটিয়া কাঠামোর মধ্যে ধরে রাখলে এই সকল দেশে ব্রিটেনের মাল রপ্তানি হ্রাস পাবে। ব্রিটেন জানত যে, আমেরিকা স্বাধীনতা লাভ করার পর সেই দেশে ব্রিটিশ মালের রপ্তানি বহুগুণ বাড়ে। এই অভিজ্ঞতা ব্রিটেন, কানাডা প্রভৃতি উপনিবেশের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে উপনিবেশে একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকার বিস্তার অপেক্ষা শিথিল উপনিবেশ রপ্তানির বেশি অনুকূল ছিল। উপনিবেশ না থাকলেও রপ্তানি বাণিজ্য অব্যাহত ছিল। ভারতের রেলপথ নির্মাণের জন্যে ব্রিটিশ মূলধনের লগ্নী লাভজনক হলেও, আর্জেন্টিনার রেলপথ নির্মাণের জন্যে ব্রিটিশ লগ্নী কম লাভজনক ছিল না। অথচ আর্জেন্টিনা ব্রিটেনের উপনিবেশ ছিল না। জার্মানীর মূলধন ও রপ্তানি বিস্তারের ক্ষেত্রেও লেনিন তত্ত্ব কার্যকরী নয়। বলকান, পূর্ব ইওরোপ ও তুর্কী সাম্রাজ্যে জার্মানীর উদ্বৃত্ত মূলধন লগ্নী হয় ও উদ্বৃত্ত শিল্পদ্রব্য রপ্তানি হয়। অথচ এই দেশগুলি কোনদিন জার্মানীর উপনিবেশ ছিল না। ব্রিটেন বা ফ্রান্সের মত আমেরিকা চীনের ভূখণ্ড অধিকার না করেও তার "Open door" বা "খোলা দ্বার" নীতির সাহায্যে চীনে প্রচুর শিল্পদ্রব্যের রপ্তানি বাজার লাভ করে।

এই সকল যুক্তি প্রয়োগ দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে, সাম্রাজ্যবাদের পশ্চাতে অর্থনৈতিক কারণ একমাত্র কারণ নয়। অন্যান্য কারণেরও যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর লেনিন তাঁর মতবাদ অনুযায়ী প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পশ্চাতে অর্থনৈতিক কারণকে বিশ্বাসযোগ্য করার জন্যে উদ্বৃত্ত মূলধন বিনিয়োগ ও উদ্বৃত্ত মাল বিক্রির তত্ত্ব প্রচার করেন।

অর্থনৈতিক তত্ত্ব নব সাম্রাজ্যবাদের একমাত্র কারণ না হলেও, একটি প্রধান কারণ ছিল এতে সন্দেহ নেই। জনসংখ্যার বিস্তার অথবা কাঁচামালের প্রয়োজন মেটাতে ১৮৭০ খ্রীঃ পর উপনিবেশ বিস্তারের ধুম পড়ে যায়, এই মত সমর্থনযোগ্য নয়। কারণ এশিয়া, আফ্রিকার জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি শ্বেতাঙ্গদের বসবাসের অনুকূল ছিল না। যদিও এশিয়া, আফ্রিকায় উৎপন্ন রাবার, রেশমতন্তু, উদ্ভিজ্য তৈল, খনিজ সম্পদ প্রভৃতি কাঁচামাল ইওরোপীয় শিল্প কারখানার পক্ষে প্রয়োজনীয় ছিল, তথাপি সেই কাঁচামাল শিল্প সামগ্রীর বিনিময়ে লভ্য ছিল। এর জন্যে উপনিবেশ স্থাপনার দরকার ছিল না। তুলনামূলকভাবে এই সকল উপনিবেশে উদ্বৃত্ত মূলধন লগ্নী করে, অথবা কারখানায় তৈরি শিল্পদ্রব্য একচেটিয়া বিক্রি করে বেশি মুনাফা লভ্য ছিল। সুতরাং যখন আমরা সাম্রাজ্যবাদ বা উপনিবেশ বিস্তারের পশ্চাতে অর্থনৈতিক কারণের কথা বলি তখন একচেটিয়া ব্যাপারটিকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতে পারি।

প্রশ্ন হল অকস্মাৎ ১৮৭০ খ্রীঃ পর শিল্পদ্রব্যের রপ্তানি বাজার দখলের জন্যে এত মারাত্মক প্রতিযোগীতা কেন শুরু হল। কেন ১৮৭০ খ্রীঃ এর আগে তা দেখা যায়নি। এই প্রশ্নের উত্তর আংশিক অর্থনৈতিক ও আংশিক রাজনৈতিক তথ্যের মধ্যে পাওয়া যাবে। শিল্প-বিপ্লবের আগে জার্মানী ছিল প্রচুর ব্রিটিশ শিল্পজাত পণ্যের বাজার। ফ্রান্সও ছিল ইংলন্ডের পশম ও যন্ত্রপাতির খরিদ্দার। কিন্তু নিজ দেশে শিল্প-বিপ্লব হলে ফ্রান্স, জার্মানি প্রভৃতি দেশে ব্রিটিশ মালের চাহিদা কমে। জার্মানী সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করে বিদেশ থেকে আমদানি মালের ওপর চড়া হারে শুল্ক বসালে এই সকল দেশে ব্রিটেনের বাজার নষ্ট হয়। এজন্য ব্রিটেনকে আফ্রো-এশিয় ঔপনিবেশিক বাজার দখল করতে হয়। সেই বাজারে অন্য দেশের প্রতিযোগীতা বন্ধ করে নিরাপদ একচেটিয়া বাজার দখলে রাখার জন্যে উপনিবেশগুলিকে রাজনৈতিক অধিকার স্থাপন করা হয়। ১৮৭০ খ্রীঃ পর উপনিবেশ দখলের প্রতিদ্বন্দ্বিতার এটি একটি বড় অর্থনৈতিক কারণ ছিল। নতুন শিল্পজাত দেশগুলি যথা জার্মানী প্রভৃতি দেশেও উদ্বৃত্ত মাল বিক্রির জন্যে বাজারের দরকার হয়। এজন্য এশিয়া-আফ্রিকার দেশগুলির দিকে সকলের নজর পড়ে।

অর্থনৈতিক কারণের সঙ্গে রাজনৈতিক কারণ যুক্ত হলে উপনিবেশ দখলের উদ্যম দ্বিগুণ হয়। ১৮৭০ খ্রীঃ ফ্রাঙ্কো-জার্মান যুদ্ধের পর ইওরোপের প্রধান দেশগুলির মধ্যে রাজনৈতিক প্রাধান্যের জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয়। ফ্রান্স-জার্মান যুদ্ধের পর ইওরোপের বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যে এক অঘোষিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা, পারস্পরিক সন্দেহ থাকায় বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটি উপনিবেশের সম্পদ দখল করে নিজ নিজ রাষ্ট্রের শক্তি ও সম্পদ বৃদ্ধির জন্যে প্রতিযোগীতা শুরু হয়। এই সময় (১৮৮৩ খ্রীঃ) জন সিলী (John Seeley) নামক চিন্তাবিদ এই মত প্রচার করেন যে, মার্কিন দেশ ও রাশিয়ার যেরূপ দ্রুত ক্ষমতা বাড়ছে তার ফলে শীঘ্রই তারা, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জার্মানীকে ছাড়িয়ে যাবে। ভবিষ্যতে এমন দিন আসতে পারে যেদিন ডেনমার্ক বা গ্রীসের ন্যায় ইংলন্ড বা ফ্রান্স একটি সাধারণ দেশে পরিণত হবে। সুতরাং উপনিবেশ দখল করে লোকবল, সম্পদ, সামরিক ঘাঁটি না বাড়ালে ব্রিটেন বা ফ্রান্স বা জার্মানী তাদের বর্তমান মর্যাদা ও আধিপত্য বজায় রাখতে পারবে না। এই মতবাদ দেশের শাসকগোষ্ঠীকে বিশেষ প্রভাবিত করে। ফলে অর্থনৈতিক স্বার্থের সঙ্গে রাজনৈতিক স্বার্থ সংযুক্ত হয়।

ইতালী, রাশিয়া প্রভৃতি দেশগুলির ক্ষেত্রে উপনিবেশ দখলের উদ্যোগ ছিল প্রধানতঃ রাজনৈতিক কারণে। এই দুই দেশের মূলধন ও সম্পদ এমন উদ্বৃত্ত ছিল না যে তা অন্য দেশে

লগ্নী করা ছিল বাধ্যতামূলক। নরওয়ের হাতে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম নৌ-বহর থাকলেও নরওয়ে উপনিবেশ বিস্তারে আগ্রহ দেখায়নি। জার্মানী শিল্পে ফ্রান্স ও বেলজিয়াম অপেক্ষা অনেক বেশী এগিয়ে থাকলেও, এই দুই দেশ অপেক্ষা অনেক দেরীতে উপনিবেশ দখলেরপ্রতিদ্বন্দ্বিতায়যোগ দেয়। অর্থাৎ নিছক অর্থনৈতিক কারণে সাম্রাজ্যবাদ ঘটলে নরওয়ে বা জার্মানী সবার আগেই উপনিবেশ দখলের কাজে ঝাঁপ দিত। আসলে রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা দেখা দিলে তবেই অর্থনৈতিক বাধ্য-বাধকতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। যতদিন না রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা দেখা দেয় ততদিন রাজনীতিকরা অর্থনৈতিক কারণকে গুরুত্বহীন মনে করেন।

এই রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা কি ছিল? ডেভিড টমসনের মতে, "উপনিবেশ দখলের জন্যে নগ্ন ক্ষমতার লড়াই (১৮৭০ খ্রীঃ পর ছিল) ইওরোপের মধ্যে বৃহৎ শক্তিগুলির আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংঘাত ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রতিফলন" (The naked power politics of the new colonialism were the projection unto an overseas screen, of the inter-state fictions and rivalries of Europe)। ইওরোপের ক্ষেত্রে নগ্ন রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব উপনিবেশের ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়। জার্মানী, ইতালী প্রভৃতি দেশগুলি মনে করত যে, উপনিবেশ অধিকার না করলে তাদের শক্তি বাড়বে না; আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাদের সম্মান থাকবে না। এজন্যে এই দেশগুলি উপনিবেশ দখলের জন্যে বিশেষ চেষ্টা করে। ফ্রান্স মনে করত যে, জার্মানী অপেক্ষা তার লোকবল কম। উপনিবেশ অধিকার করে সেই দেশের লোকদের সামরিক শিক্ষা দিয়ে নিজ সামরিক ক্ষমতা বৃদ্ধি ছিল ফ্রান্সের অভিলাষ। ব্রিটেনও ভারতীয় সেনার দ্বারা তাহার বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য রক্ষা করত। উপনিবেশের সম্পদ আহরণ করে তার নিজ নিজ দেশের অর্থবল বৃদ্ধির চেষ্টা করে বিশ্বের বিভিন্ন জলপথের ওপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন; নৌ-শক্তির আধিপত্য স্থাপনের জন্যে সামরিক ঘাঁটি দখলও ছিল উপনিবেশবাদের অন্যতম কারণ। এই সামরিক ঘাঁটিগুলির সাহায্যে বাণিজ্য ও রাজনৈতিক আধিপত্যকে সুরক্ষিত করা যেত। ব্রিটেন পূর্ব ভূমধ্যসাগরের জলপথ সুরক্ষিত করতে সাইপ্রাস ও পশ্চিম ভূমধ্যসাগরে মাল্টাদ্বীপ অধিকার করে। ফ্রান্স উত্তর আফ্রিকায় আলজেরিয়াকে কেন্দ্র করে তার আধিপত্য স্থাপন করে। পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ব্রিটিশ আধিপত্যের জন্যে ব্রিটেন ভারত, সিংহল, মালয়কে ব্যবহার করে।

রাজনৈতিক কারণ

সাম্রাজ্যবাদের বিস্তারের অন্যান্য কারণগুলির মধ্যে মিশনারী বা খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারকদের প্রভাব এবং আবিষ্কারকদের প্রচেষ্টার কথাও উল্লেখ্য। ব্রিটিশ ধর্ম প্রচারক ডেভিড লিভিংস্টোন, ষ্ট্যানলি, ফরাসী ধর্ম প্রচারক ল্যাভিজেরিক (Cardinal Lavigeric) প্রভৃতি ধর্মপ্রচারের জন্যে আফ্রিকায় যান। তাঁদের পিছু পিছু ইওরোপীয় বণিক শ্রেণী আফ্রিকায় ঢুকে পড়ে।

মিশনারীদের ধর্মপ্রচারে আগ্রহ

উদ্যমী প্রশাসকগোষ্ঠী যথা—সেসিল রোডস, ট্রান্সভালে; লর্ড ক্রেমার, মিশরে; লর্ড লুগার্ড, নাইজেরিয়ায়; লর্ড লিনার, উত্তমাশা অন্তরীপে; জার্মান কার্ল পিটারস, পূর্ব আফ্রিকায় নিজ উদ্যমে সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি ও বেকার সমস্যার সমাধানের জন্যেও উপনিবেশ স্থাপনের আগ্রহ দেখা দেয়। সাম্রাজ্য স্থাপন বৃহৎ শক্তিগুলির পক্ষে মর্যাদার প্রশ্ন হিসেবে দেখা দেয়। কোন দেশের উপনিবেশ না থাকলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাকে মর্যাদা দেওয়া হত না। এই কারণেও সাম্রাজ্য বিস্তারের উদ্যম দেখা দেয়। সর্বশেষে, এশিয়া ও আফ্রিকায় ১৮৭০ এর পর উপনিবেশবাদ ঘনীভূত হয়।তার কারণ ছিল এই দুই মহাদেশে বিভিন্ন শক্তির মধ্যে ভাগ করার মত প্রচুর উপনিবেশ ছিল। আর ছিল শিল্পের প্রয়োজনে বিরাট কাঁচামালের সম্ভার এবং বিশাল বাজার।

অভিযান স্পৃহা

ডেভিড টমসন এজন্যে মন্তব্য করেছেন যে, সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব ও প্রকৃতি কেবল অর্থনৈতিক কারণে ঘটেনি। একাধিক কারণে ঘটে। ১৯১৮ খ্রীঃ পর যদিও বলা হয় যে "সাম্রাজ্য দখলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ডেকে আনে" তা হল একটি অর্দ্ধসত্য মাত্র। যুদ্ধ-জনিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলেই সাম্রাজ্য অর্জিত হয় একথাও সাম্রাজ্যবাদের ক্ষেত্রে অপর একটি সত্য। অর্থনৈতিক কারণ ও রাজনৈতিক কারণের সহবস্থান (Co-Existence) সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব ঘটায়। এই সঙ্গে বলা দরকার যে আবিস্কারক, বৈজ্ঞানিক, অনুসন্ধানকারী ও ধর্মপ্রচারকরা নিজ নিজ প্রেরণায় অজ্ঞাত দেশ আবিষ্কার অথবা সেই সকল দেশে ধর্মপ্রচারের মানবিক আবেগে জীবন বিপন্ন করে চলে যান। তাঁরা বণিক বা সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে আফ্রিকার গহন অরণ্যে, কঙ্গো নদীর অজানা, ভয়ঙ্কর উপত্যকায় একাকী ঢুকে পড়েন একথা ঠিক নয়। মানবিক প্রেরণায়, দাস প্রথার প্রতিবাদে, ধর্মপ্রচারের জন্যেই তাঁরা অভিযান করেন। পরে তাঁদের পিছু নিয়ে বণিক ও সাম্রাজ্যবাদীরা সেই সকল অঞ্চলে ঢুকে পড়ে। সুতরাং, পতাকা বাণিজ্যকে অনুসরণ করেনি, বাণিজ্যই পতাকাকে অনুসরণ করে। উদ্ভিদ বিজ্ঞানী, জলদস্যু, ধর্ম প্রচারকের পদচিহ্ন ধরে পতাকা অনুসরণ করে। পতাকাটিকে অনুসরণ করে বাণিজ্যের হস্ত প্রসারিত হয়।"[১]

ইওরোপের ঔপনিবেশিক বিস্তৃতি (The Colonial Expansion of Europe) : উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে ইওরোপীয় জাতিগুলির সাম্রাজ্য স্থাপনের বিষয়ে আগ্রহ কিছুটা কম দেখা যায়। তথাপি এই সময় ফ্রান্স উত্তর আফ্রিকার আলজেরিয়ায় উপনিবেশ স্থাপন করে। ব্রিটেন অহিফেন যুদ্ধের দ্বারা চীনের দক্ষিণে অনুপ্রবেশ করে। নানকিং ও পিকিং-এর সন্ধির দ্বারা (১৮৪০-৬০ খ্রীঃ) দক্ষিণ চীনের বন্দরগুলি ও নদীপথের ওপর ব্রিটেন তার বাণিজ্যিক ও কনসুলার অধিকার স্থাপন করে। ব্রিটেনকে অনুসরণ করে ফ্রান্স ও অন্যান্য ইওরোপীয় জাতিগুলি চীনে অনুপ্রবেশ করে। উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকে শিল্প বিস্তার, সামরিক ঘাঁটি দখল প্রভৃতি কারণে ইওরোপীয় জাতিগুলি অকস্মাৎ সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মত্ত হয়।

দূরপ্রাচ্যে চীনের উপনিবেশ স্থাপন

আফ্রিকার ব্যবচ্ছেদ (The Partition of Africa) : আফ্রিকা মহাদেশে ইওরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের নগ্ন প্রকাশ এই যুগে লক্ষ্য করা যায়। ১৮৭০ খ্রীঃ পর্যন্ত আফ্রিকা মহাদেশ ছিল প্রধানতঃ অনাবিষ্কৃত (unexplored) অঞ্চল। এজন্যে একে অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ বা Dark Continent বলা হত। ১৮৭০ খ্রীঃ পর্যন্ত কেবলমাত্র সাহারার উত্তরে আলজেরিয়ায় ফরাসী এবং আফ্রিকার দক্ষিণ সীমায় উত্তমাশা অন্তরীপ ও ট্রান্সভালে ব্রিটিশ উপনিবেশ ছিল। অবশিষ্ট মহাদেশটি ছিল অনাবিষ্কৃত। ফরাসী স্থপতি ও উদ্যোগী ফার্দিনান্দ ডি লেসেপ্স সুয়েজ খাল খনন করে ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগরকে সংযুক্ত করার পর আন্তর্জাতিক জলপথরূপে সুয়েজখাল ও তার উপকূল মিশরের সামরিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব বাড়ে। ১৮৭০ খ্রীঃ পর ইওরোপে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা বাড়লে প্রতি শক্তি সুবিধাজনক উপনিবেশ দখল করে নিজ নিজ শক্তি বৃদ্ধির দিকে নজর দেয়। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডিসরেইলীও এই নীতি থেকে দূরে থাকেননি। ফ্রান্সের তত্ত্বাবধানে সুয়েজ খাল খোদাই হলে মিশরে ফরাসী প্রভাব বাড়ায় তিনি ঈর্ষা বোধ করেন। এই খালের ওপর ব্রিটেনের নিয়ন্ত্রণ স্থাপন দ্বারা ভারতের সঙ্গে যোগাযোগের এই গুরুত্বপূর্ণ জলপথ তিনি নিয়ন্ত্রণ করতে চান। ১৮৭৫ খ্রীঃ মিশরের খেদিভ ইসমাইল পাশা তাঁর অর্থাভাবের জন্যে সুয়েজ খালে মিশরের শেয়ার বিক্রির প্রস্তাব দিলে, ব্রিটেনের স্বার্থে তিনি এই

আফ্রিকায় ইওরোপীয় উপনিবেশ

১· David Thomson.

খালের ১৭৬৬০২ টি শেয়ার ৪০৮০০০০ পাউণ্ড মূল্যে কিনে নেন। সুয়েজ খালে এভাবে ব্রিটিশ অনুপ্রবেশ ঘটায় ফ্রান্স তীব্র আপত্তি জানালে, সুয়েজ খাল এলাকায় যুগ্ম ইঙ্গ-ফরাসী কনডো মিনিয়াম (১৮৭৬ খ্রীঃ) স্থাপিত হলে মিশরে পরোক্ষভাবে ইঙ্গ-ফরাসী ঔপনিবেশিক অনুপ্রবেশ ঘটে। ইতিমধ্যে খেদিভ ইসমাইল পাশার কুশাসন ও মিশরে পশ্চিমী শক্তির অনুপ্রবেশের প্রতিবাদে আরবী পাশার নেতৃত্বে মিশরে জাতীয়তাবাদী প্রতিরোধ দেখা দেয়। ইসমাইল পাশার মৃত্যুর পর তৌফিক পাশার আমলে বিসমার্কের জার্মানীর প্রচ্ছন্ন প্ররোচনায় আরবী পাশার জাতীয় দল শ্বেতাঙ্গ-বিরোধী দাঙ্গা শুরু করে। কিছু গ্রীক শ্বেতাঙ্গ এর ফলে নিহত হয়। ফ্রান্সে এ সময় মন্ত্রীসভায় ঘন ঘন রদবদল চলছিল। এজন্যে উপযুক্ত সময়ে হস্তক্ষেপ করতে ফ্রান্স ব্যর্থ হয়। এই সুযোগে ব্রিটেন তার নৌ ও স্থল বাহিনী সুয়েজখাল দিয়ে আলেকজান্দ্রিয়া পাঠায়। ব্রিটিশ বাহিনী আরবী পাশার জাতীয় সেনাদলকে পরাস্ত করে আলেকজান্দ্রিয়া ও কাইরো ১৮৮২ খ্রীঃ অধিকার করলে মিশরের জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহে ভাঁটা পড়ে। এরপর ব্রিটিশ সেনাদল মিশরে অবস্থান করে এবং এই অজুহাত দেখায় যে, "খেদিভের রাজ্যে শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্যেই" ব্রিটিশ সেনাদল অবস্থান করছে। শৃঙ্খলা স্থাপিত হলে এই সেনাদল প্রত্যাহার করা হবে। ব্রিটিশ দূত লর্ড মিলনার খেদিভের পরামর্শদাতা হিসেবে নিযুক্ত হন। আসলে খেদিভকে Puppet বা পুতুল হিসেবে রেখে ব্রিটিশ মিশর ও সুয়েজখাল অঞ্চল দখল করে। ১৯৫৪ খ্রীঃ মিশরের জাতীয়তাবাদী নেতা গামাল আব্দুল নাসের মিশর ও সুয়েজ অঞ্চল থেকে ব্রিটেনকে বহিষ্কার করেন।

সাহারার উত্তরে সুদানের ওপরেও ইঙ্গ-ফরাসী শক্তির নজর পড়ে। কারণ সুদান ছিল নীল নদের উৎসভূমি। সুদান ছিল মিশরের ইসমাইল পাশার অধীন। সেই অজুহাতে ইংরাজ সেনাপতি জেনারেল সুদানের শাসক নিযুক্ত হন। ব্রিটিশ আধিপত্যের বিরুদ্ধে সুদানী মুসলিমদের জাতীয়তাবাদী উত্থান দেখা দেয়। মহম্মদ আমেদ নামে এক ব্যক্তি নিজেকে আল মাহাদি বা ত্রাণকর্তা ঘোষণা করে এই বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন। যদিও ইংরাজ লেখকরা সুদানের মাহাদি বিদ্রোহকে ধর্মোন্মত্ত মুসলিমদের বিদ্রোহ বলেন, এই বিদ্রোহ ছিল মূলতঃ সুদানী জাতীয়তাবাদীদের বিদ্রোহ। ধর্মীয় প্রভাবে জনজাগরণ ঘটেছিল মাত্র। মাহাদীরা ভ্যালেনটাইন, হিক্স প্রভৃতি ইংরাজ সেনাপতিকে পরাজিত ও নিহত করে, ১৮৮৪ খ্রীঃ সুদানের রাজধানী খার্টুম দখল করে। সেনাপতি গর্ডন নিহত হন। পরে ব্রিটিশ সেনা খার্টুম অধিকার করে নিষ্ঠুরভাবে মাহাদী জাতীয়তাবাদীদের হত্যা করে। ব্রিটিশ মন্ত্রীসভার দোলাচল নীতির জন্যেই সুদানের বিপর্যয় ঘটে। ব্রিটিশ সরকার দক্ষিণ সুদানে আধিপত্য ত্যাগ করলেও, নীলনদের উৎসসহ উত্তর সুদান দখলে রাখেন। আফগান সীমান্তে রাশিয়া পাঞ্জদে অঞ্চল দখল করায় ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে যুদ্ধের আশঙ্কায় ব্রিটেন দক্ষিণ সুদানে যুদ্ধ চালাতে চায়নি। এভাবে সাহারার উত্তরে মিশর, সুদান, ব্রিটেন; আলজেরিয়া, টিউনিস ফ্রান্স অধিকার করে। মরক্কোর ওপরেও ফরাসী আধিপত্য স্থাপিত হলে ভূমধ্যসাগরের উপকূল জুড়ে ফরাসী উত্তর আফ্রিকা সাম্রাজ্য গঠিত হয়।

সাহারার দক্ষিণে কৃষ্ণ আফ্রিকার প্রতি ইওরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের দৃষ্টি পড়ে। আফ্রিকার এই অঞ্চল ছিল তখনও পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত ও অনাধিকৃত, কিন্তু দামী কাঠ, খনিজ সম্পদ, রবার, চামড়া প্রভৃতি সম্পদে ভরপূর। একমাত্র দক্ষিণ আফ্রিকার শেষ প্রান্তে ছিল ব্রিটিশ উপনিবেশ কেপ অব গুড হোপ বা উত্তমাশা অন্তরীপ ও ট্রান্সভাল। এখনকার স্থানীয় অধিবাসীরা ছাড়া ছিল ডাচ জাতীয় কৃষক যাদের "বুয়্যার" (Boers) বলা হত। পশ্চিম আফ্রিকায় নাইগার নদের মোহানায় সেনোগালে ছিল ব্রিটিশ ও ফরাসী উপনিবেশ।

ইতিমধ্যে বেলজিয়ামের রাজা দ্বিতীয় লিওপোল্ড গহন আফ্রিকায় বেলজিয়ামের উপনিবেশ

বিস্তারের জন্যে উদ্যোগ নেন। ইতিমধ্যে ষ্ট্যানলি, লিভিংষ্টোন, জ্যারোটা পার্ক প্রভৃতি আবিষ্কারক ও অভিযানকারী গহন কৃষ্ণ আফ্রিকায় ঢুকে ভৌগোলিক তথ্য আহরণ করেন। বেলজিয়াম রাজ দ্বিতীয় লিওপোল্ড আন্তর্জাতিক আফ্রিকা সঙ্ঘ (International African Association) নামে ব্রাসেলসে এক সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। সমিতির প্রকাশ্য উদ্দেশ্য



ইওরোপীয় উপনিবেশ (আফ্রিকা)

সম্পর্কে বলা হয় যে, আফ্রিকার দুর্গম অঞ্চল সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার জন্যেই সমিতি কাজ করবে। আসলে আবিষ্কারক ষ্ট্যানলিকে মুখাপাত্র করে ব্রাসেল সমিতি নাইগার নদীর উপত্যকায় বিশাল কঙ্গো (Congo) দেশের খনিজ সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলিতে বেলজিয়ামের আধিপত্য স্থাপন করে। কঙ্গোর বিভিন্ন উপজাতি সর্দ্দারের সঙ্গে স্ট্যানলি, রাজা লিওপোল্ডের তরফে সন্ধি স্থাপন করেন। কঙ্গো অঞ্চল ও নাইগার নদীর উপত্যকায় বেলজিয়ামের আধিপত্য বিস্তারে ব্রিটেন রুষ্ট

হয়। বেলজিয়ামের এই নতুন সাম্রাজ্যবাদ তরুণ গরুড়ের ক্ষুধা নিয়ে বিস্তৃতি নিলে পুরাতন সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেনের স্বার্থ হানির আশঙ্কা দেখা দেয়।

বেলজিয়ামের বিস্তৃতি রোধের জন্যে ব্রিটেন পর্তুগালের সঙ্গে যোগ দেয়। নাইগার নদীর মোহানা অঞ্চলে দীর্ঘকাল ধরে অ্যাঙ্গোলায় পর্তুগালের একটি উপনিবেশ ছিল। এখন ব্রিটেন ও পর্তুগাল একটি যুক্ত সমিতি স্থাপন করে নাইগার নদীতে অবাধ নৌ-বহন এবং এই নদীর মোহানায় পর্তু-ব্রিটিশ একাধিপত্য স্থাপন করে নাইগার নদীর মুখ বন্ধ করতে চেষ্টা করে। ফ্রান্সও বসে থাকেনি। ব্রিটেন ও বেলজিয়ামের মতই ফ্রান্সেরও ঔপনিবেশিক ক্ষুধা জেগে ওঠে। ফরাসী মন্ত্রী লিও গ্যামবেটা ও জুলেস ফেরী অস্থির হয়ে পড়েন। ফরাসী বুর্জোয়ারা বেলজিয়ামের ন্যায় একটি সমিতি গঠন করে। ব্রিটিশ বুর্জোয়া শ্রেণীও প্রিম রোজ লীগ (Prim Rose League) এবং ইমপিরিয়াল ফেডারেশন লীগ (Imperial Federation League) স্থাপন করেন। বলা বাহুল্য যে, এই সমিতিগুলির পিছনে ছিল নিজ নিজ সরকারের পরোক্ষ হস্ত। এই সমিতিগুলি আফ্রিকায় তথ্য আহরণের ছলে নিজ নিজ দেশের পতাকা উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করে।

বিসমার্কের জার্মানী এতদিন উপনিবেশ বিস্তারের কাজে নজর দেয়নি। বিসমার্ক ঘোষণা করেন যে "আমি উপনিবেশবাদী নই" (I am no colony man)। কিন্তু স্বদেশের উদীয়মান বুর্জোয়াদের চাপে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষমতার লড়াই-এ যাতে জার্মানী পিছিয়ে না পড়ে সেজন্যে মত বদলান। কূটকৌশলী বিসমার্ক প্রকাশ্যে ঔপনিবেশিক নীতি না নিলেও পরোক্ষভাবে আফ্রিকার দিকে তির্যক দৃষ্টিতে তাকান। জার্মানীতে এই যুগে আফ্রিকায় উপনিবেশ স্থাপনের জন্যে বিভিন্ন সরকারি সমর্থনপুষ্ট সমিতি যথা ফ্লোটেনভেরাইন (Flotten Verein) স্থাপিত হয়। আর্নেষ্ট ফন ওয়েবার জার্মানীর আফ্রিকায় উপনিবেশ বিস্তারের জন্যে দাবী জানান। তিনি বলেন যে, "দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকা কেবলমাত্র জার্মান উপনিবেশের উপযোগী"। জার্মানী দ্রুতগতিতে ডেলাগোয়া উপসাগর অঞ্চল, সেন্ট লুসিয়া উপসাগরীয় অঞ্চল, জ্যাম্বোবি টোগোল্যান্ড,ক্যামেরুন অধিকার করে। জার্মান দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা উপনিবেশ গঠনের ফলে ৩৮৪,১৪০ বর্গমাইল অঞ্চল নিয়ে জার্মানীর আফ্রিকা উপনিবেশ স্থাপিত হয়। ইতালীও পিছিয়ে থাকেনি। অ্যাবিসিনিয়া উপকূলে ইতালীর উপনিবেশ স্থাপিত হয়।

মোট কথা, ১৮৭৫ খ্রীঃ যেখানে আফ্রিকার মাত্র $\frac{১}{১০}$ অংশ ছিল ইওরোপীয় উপনিবেশ, ১৮৯৫ খ্রীঃ মধ্যে আফ্রিকার $\frac{৯}{১০}$ ভাগ ইওরোপীয় উপনিবেশে পরিণত হয়। বাকি থাকে মাত্র $\frac{১}{১০}$ ভাগ অঞ্চল। ১৮৭১-১৯০০ খ্রীঃ মধ্যে ব্রিটেন ৪$\frac{১}{২}$ মিলিয়ন, ফ্রান্স ৩$\frac{১}{২}$ মিলিয়ন, জার্মানী ১ মিলিয়ন, বেলজিয়াম ৯ লক্ষ বর্গমাইল স্থান আফ্রিকায় অধিকার করে। কোন বিশেষ রাজনৈতিক দল আফ্রিকার এই ব্যবচ্ছেদের জন্যে দায়ী ছিল না।

১৮৮৪ পর্যন্ত আফ্রিকায় ব্যবচ্ছেদ চলার পর ইওরোপীয় শক্তিগুলি যাতে শান্তিপূর্ণভাবে আফ্রিকা ব্যবচ্ছেদ করতে পারে এজন্যে বিসমার্ক উদ্যোগ নেন। তাঁর আগ্রহে ১৮৮৪ খ্রীঃ বার্লিনে এক সম্মেলন আহ্বান করেন। বার্লিন কংগ্রেসে (১৮৮৫ খ্রীঃ) স্থির হয় যে :—(১) কঙ্গোর বৃহত্তর অঞ্চল আন্তর্জাতিক আফ্রিকা সঙ্ঘের অধীনে থাকবে। এর ফলে কঙ্গোর বৃহত্তর অঞ্চল প্রকারান্তরে বেলজিয়ামের উপনিবেশে পরিণত হয়। (২) বেলজিয়াম রাজ লিওপোল্ড এই অঞ্চল অধিকার করেন। (৩) কঙ্গো ও নাইজার নদীতে সকল দেশ অবাধে নৌ-চলাচল ও বাণিজ্যের অধিকার পাবে। (৪) এই সন্ধিতে স্থির হয় যে আফ্রিকার অনধিকৃত অঞ্চল কোন শক্তি দখল করলে, অন্য শক্তিগুলিকে তা জানিয়ে দিতে হবে। (৫) সেই শক্তির অধিকৃত অঞ্চল তার নিজস্ব spheres of influence বা প্রভাবাধীন এলাকায় পরিণত হবে। ইওরোপের ১৪টি দেশ বার্লিন সন্ধিতে স্বাক্ষর দেয়। এই সন্ধিতে আফ্রিকান দাসদের ব্যবসায় কঠোরভাবে নিষিদ্ধ হয়। ডেভিড টমসনের মতে সাম্রাজ্যবাদীরা বার্লিন কংগ্রেসে এই প্রথম "Spheres of

influence" নামে এক নীতি উদ্ভাবন করে, যা ছিল আফ্রিকার এক একটি অঞ্চলকে এক একটি শক্তির উপনিবেশে পরিণত করার কূটকৌশলমাত্র।

বার্লিনের সন্ধির দ্বারা আফ্রিকায় ইওরোপীয় শক্তিগুলি কিভাবে বিনা যুদ্ধে উপনিবেশ বিস্তার করতে পারবে সে সম্পর্কে নীতি নির্ধারণ হয়। তারপর ইওরোপীয় শক্তিগুলি ক্ষুধার্ত শকুনের মত আফ্রিকার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। Spheres of Influence নীতি নিয়ে বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্তার নীতি নেয়। ব্রিটেন, দক্ষিণ আফ্রিকায় কেপ বা অন্তরীপ থেকে উত্তর দিকে বেচুয়ানাল্যাণ্ড, রোডেশিয়া, নিয়াসাল্যাণ্ড দখল করে কঙ্গোর সীমান্তে এগিয়ে আসে। ব্রিটেন, জার্মানীকে উত্তর সমুদ্রে হেলিগোল্যাণ্ড ছেড়ে দিয়ে ১৮৯০ খ্রীঃ এর বিনিময়ে আফ্রিকায় জাঞ্জিবার লাভ করে। দক্ষিণ আফ্রিকার ব্রিটিশ প্রশাসক সেসিল রোডস কেপ থেকে কায়রো (Cape to Cairo) অর্থাৎ দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে উত্তরে নীল নদের দেশ মিশরের কায়রো পর্যন্ত অবিচ্ছেদ্য ব্রিটিশ উপনিবেশ স্থাপনের পরিকল্পনা করেন। এই দক্ষিণ-উত্তর বিস্তার নীতির প্রথম পর্বে সেসিল রোডস বেচুয়ানাল্যাণ্ড দখল করে পূর্বে জার্মান পূর্ব আফ্রিকা, পশ্চিমে জার্মান দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা উপনিবেশের মাঝখানে একটি করিডর তৈরি করে ফেলেন। এতে জার্মানীর সঙ্গে ব্রিটেনের মন কষাকষি দেখা দেয়। সেসিল রোডস ব্রিটিশ উপনিবেশ বিস্তারের জন্যে একটি নিজস্ব কোম্পানী বা চাটার্ড কোম্পানী গঠন করেন। দক্ষিণ আফ্রিকার ওলন্দাজ কৃষক বা বুয়ারদের সঙ্গে এজন্য ব্রিটেনের সংঘাত দেখা দেয়।বুয়াররা ব্রিটেনের আধিপত্য অস্বীকার করে পল ক্রুগারের নেতৃত্বে বুয়ার প্রজাতন্ত্র গঠন করলে বুয়ার যুদ্ধ শুরু হয়। জার্মান কাইজার ব্রিটেনকে ঘায়েল করার জন্যে ক্রুগারকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে টেলিগ্রাম পাঠালে ব্রিটেনের হুমকিতে তিনি পিছু হটেন।

কেপ থেকে কায়রো পরিকল্পনা : ব্রিটেনের আফ্রিকা নীতি

সেসিল রোডসের কেপ থেকে কায়রো পরিকল্পনার সাফল্যের পথে দুটি বাধা দেখা দেয়। (১) মধ্য আফ্রিকায় বেলজিয়াম শাসিত কঙ্গো ও জার্মান শাসিত পূর্ব-আফ্রিকা রাজ্য থাকায় একে অতিক্রম করে এই পরিকল্পনা সফল করায় বাধা দেখা দেয়। (২) পশ্চিম আফ্রিকায় ফ্রান্স এক বিরাট উপনিবেশ স্থাপন করে। সেনেগাল, আইভরি উপকূল ও গিনি নিয়ে পশ্চিম আফ্রিকার ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়। ফরাসী সরকার পশ্চিমে ডাকার বন্দর থেকে পূর্বে এ্যাডেন বন্দর পর্যন্ত অবিচ্ছেদ্য ফরাসী উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টা করে। এই কারণে সেসিল রোডসের কেপ-কাইরো পরিকল্পনা সফল হয়নি।

ব্রিটিশ পরিকল্পনায় বাধা

ইংরাজ সেনাপতি লর্ড কিচেনার নীল নদের উৎসক্ষেত্রের দিকে মিশর থেকে ব্রিটিশ অধিকার প্রসারিত করার চেষ্টা করেন। নীল নদের উৎসক্ষেত্রে যাতে ব্রিটেন প্রবেশ করতে না পারে সেজন্যে কাপটেন মারচান্দ (Capt Marchand) নামে এক দুঃসাহসী ফরাসী সেনাপতি নীল নদের উৎসের নিকটে ফ্যাশোডা নামক স্থানে একটি দুর্গে ফরাসী পতাকা উড়িয়ে দেন। তিনি এক বছর পরিশ্রম করে ফেইডহার্বি (Faidherbe) নামে একটি বাষ্পীয় পোতের বিভিন্ন অংশকে সাহারা মরুভূমি পার করে ফ্যাশোডায় আনেন। ফ্যাশোডায় বসে তিনি এই জাহাজের যন্ত্রগুলি জোড়া লাগিয়ে ফেইডহার্বিকে নীল নদে ভাসিয়ে সকলকে তাক লাগিয়ে দেন। স্থানীয় সর্দারদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করে তিনি ফরাসী আধিপত্য স্থাপন করেন। এদিকে লর্ড কিচেনার ব্রিটিশ বাহিনী সহ ফ্যাশোডায় উপস্থিত হলে ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধ বাধার উপক্রম হয়। শেষ পর্যন্ত উভয় পক্ষ আপোষের দ্বারা সমস্যার সমাধান করে। নীল নদ ও কঙ্গোর অববাহিকা ধরে উভয় পক্ষ নিজ নিজ অঞ্চল ভাগ করে নেয়।

ফ্যাশোডার ঘটনা : ইঙ্গ-ফরাসী আপোষ

ফ্রান্স আফ্রিকার অভ্যন্তরে কঙ্গো নদের উত্তরাঞ্চলে ঢুকে পড়ে এবং মাদাগাস্কার দ্বীপও অধিকার করে।

অন্যান্য শক্তিগুলি বার্লিনের সন্ধির পর নিশ্চেষ্ট ছিল না। পর্তুগাল তার পুরাতন উপনিবেশ এ্যাঙ্গোলায় অধিকার রক্ষা করে। এই সঙ্গে পর্তুগাল মোজাম্বিক দখল করে। ইতালী ইরিট্রিয়া ও সোমালিল্যাণ্ডের একাংশ অধিকার করে। ইতালী অ্যাবিসিনিয়া দখলের চেষ্টা করলে ১৮৯৬ খ্রীঃ এ্যাডোয়ার যুদ্ধে ফারসীদের হাতে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হয়। জার্মানী টোগোল্যান্ড ও ক্যামেরুন দখল করে। ১৮৯৮খ্রীঃ নাগাদ প্রায় গোটা আফ্রিকায় বিভিন্ন ইওরোপীয় শক্তির উপনিবেশ স্থাপিত হয়। একমাত্র অ্যাবিসিনিয়া ও লাইবেরীয়া তাদের স্বাধীনতার রক্ষা করতে সক্ষম হয়।আফ্রিকা ব্যবচ্ছেদের ফলে বিভিন্ন শক্তির মধ্যে তীব্র সংঘাত দেখা দেয়।

এশিয়ায় সাম্রাজ্য বিস্তার (Expansion in Asia) ঃ আফ্রিকার মতই দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ও এশিয়ার মূল ভূখণ্ডে উনবিংশ শতকে ইওরোপীয় জাতিগুলির সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন চলে। দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে নৌ-আধিপত্য ও বাণিজ্যিক সুবিধার জন্যে ইওরোপীয় জাতিগুলি সামুদ্রিক সাম্রাজ্য স্থাপনে রত হয়। ব্রিটেন, ফ্রান্স, ডাচ প্রভৃতি সামুদ্রিক জাতিগুলি পথ দেখায়। জার্মানী এমন কি মার্কিন দেশও তাদের অনুসরণ করে। (১) অষ্ট্রেলিয়া ছিল ব্রিটেনের উদ্বৃত্ত অধিবাসীদের বাসস্থান। অষ্ট্রেলিয়ার জলপথকে নিরাপদ রাখার জন্যে ব্রিটেন নিউগিনি ও সলোমন দ্বীপপুঞ্জ দখল করে। ফিজি দ্বীপপুঞ্জের ওপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করে। ডাচরা নিউগিনি দখলে আগ্রহ দেখালে কিছুকাল প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর নিউগিনি দ্বীপপুঞ্জ ডাচ, ব্রিটিশ ও জার্মানীর মধ্যে বাঁটোয়ারা করা হয়। হল্যাণ্ড তার পূর্ববর্তী উপনিবেশ বোর্ণিও ও সেলিবিসের সঙ্গে ডাচ নিউগিনি যুক্ত করে ডাচ প্রশান্ত মহাসাগরীয় সাম্রাজ্য গড়ে। (২) ফ্রান্স এই অঞ্চলে তাহিতি, সোসাইটি দ্বীপপুঞ্জ, মারকুয়েশাস ও টুয়ামাতো অঞ্চল অধিকার করে শক্তিসাম্য স্থাপন করে। (৩) জার্মানী নিউগিনির প্রাপ্ত অংশ ছাড়া, বিসমার্ক দ্বীপপুঞ্জ, মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ দখল করে। স্পেনের কাছ থেকে ক্যারোলাইন ও মারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জ ক্রয় করে। সামেয়ান দ্বীপটি বহু ঝগড়া-বিবাদের পর জার্মানী ও মার্কিন দেশ ভাগ করে নেয়। (৪) ব্রিটেন উত্তর বোর্ণিওতে একটি চাটার্ড কোম্পানীর সাহায্যে এই অঞ্চল দখল করে। দক্ষিণ সলোমন, টোঙ্গা ও গেলবার্ট দ্বীপপুঞ্জ ব্রিটেন অধিকার করে। (৫) স্প্যানিশ আমেরিকান যুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পুয়েটোরিকো, ক্যারিবিয়ান অঞ্চল, ফিলিপিন ও হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করে। এভাবে বিংশ শতক শুরু হওয়ার আগেই গোটা দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল ইওরোপীয় জাতিগুলির উপনিবেশে পরিণত হয়। (৬) দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মালয় উপদ্বীপ ছিল ব্রিটেনের মূল ক্ষমতাকেন্দ্র এবং পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ছিল ডাচ ক্ষমতাকেন্দ্র।

দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে ইওরোপীয় উপনিবেশ

এশিয়ার মূল ভূখণ্ডে উপনিবেশ বিস্তারের জন্যে ইওরোপীয় জাতিগুলির মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে। যেহেতু ভারতীয় ভূখণ্ড ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যমণি, সেহেতু ভারতের সীমান্ত অঞ্চলের কাছাকাছি অন্য কোন ইওরোপীয় শক্তিকে ঘেঁসতে দিতে ব্রিটেন রাজী ছিল না। ভারত সীমান্তকে নিরাপদ রাখার জন্যে ব্রিটেন ভারতের পূর্ব সীমান্তে বেষ্টনী বলয় গঠনের উদ্যোগ নেয়। ফ্রান্স ইন্দোচীন বা ভিয়েতনাম দখল করার পর ব্রিটেন এজন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ব্রিটেন দ্রুতগতিতে ভারতের পূর্ব সীমান্তে ব্রহ্মদেশ দখল করে ভারতের সীমান্তে একটি রক্ষা মূলক ঢাল স্থাপন করে। ব্রিটিশ অধিকৃত ব্রহ্মদেশ ও ফরাসী অধিকৃত ইন্দোচীনের মধ্যে ছিল থাইল্যাণ্ড বা শ্যামদেশ। ফ্রান্স শ্যামদেশে আধিপত্য বিস্তারের জন্যে ১৮৯৩ খ্রীঃ এক নৌ-অভিযান পাঠায়। কিন্তু ব্রিটেনের আপত্তিতে ফ্রান্সকে পিছু হঠতে হয়। শেষ পর্যন্ত উভয় দেশ শ্যামদেশে নিরপেক্ষতা রক্ষার নীতি নেয়।

এবার চীনের মূল ভূখণ্ডের ওপর ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক আধিপত্য স্থাপনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়। চীনের দক্ষিণ উপকূল ধরে এই অনুপ্রবেশ শুরু হয়। ১৮৩৯-৪০খ্রীঃ প্রথম অহিফেন যুদ্ধে চীনকে পরাস্ত করে ব্রিটেন চীনের ওপর ১৮৪২ খ্রীঃ নানকিং-এর সন্ধি স্থাপন করে । (বিশদ বিবরণ পরে পূর্ব এশিয়া-চীন-জাপান শীর্ষক অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। এই সন্ধি ছিল চীনের চীং বা মাঞ্চু সরকারের ওপর প্রথম বৈষম্যমূলক সন্ধি। হংকং, কৌলুন দ্বীপ ব্রিটেনকে চীন এই সন্ধিতে ছেড়ে দেয়। দক্ষিণ চীনের ক্যান্টন সহ ৫টি বন্দর ব্রিটেনকে বাণিজ্যের জন্যে খুলে দিতে হয়। এই ৫টি বন্দরে ব্রিটিশ বণিকরা অতিরাষ্ট্রিক অধিকার (Right of Exterritoriality) পায়। সকল আমদানি, রপ্তানি মালের ওপর মাঞ্চু সরকার ৫% শুল্ক পাবে বলা হয়। ব্রিটেনের পথ ধরে ফ্রান্স প্রভৃতি অন্যান্য ইওরোপীয় দেশগুলি নানকিং সন্ধির অনুরূপ শর্ত চীনের ওপর চাপায়। চীং সরকার নানকিং-এর সন্ধিকে মানতে না চাইলে দ্বিতীয় অহিফেন যুদ্ধ শুরু হয়। ক্যাথলিক মিশনারীদের হত্যার অজুহাতে ফ্রান্সও ব্রিটেনের সহকারী রূপে দ্বিতীয় অহিফেন যুদ্ধে অংশ নেয়। আসলে যে কোন অজুহাতে চীনকে উন্মুক্ত করে অবাধ বাণিজ্য ও একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠাই ছিল ইওরোপীয় জাতিগুলির মূল লক্ষ্য। ইংরাজ ও ফরাসী নৌ-বহরের আক্রমণে পর্যুদস্ত হয়ে টিয়েন্টসিন ও পরে ১৮৬০ খ্রীঃ পেকিং-এর সন্ধির দ্বারা মাঞ্চু সরকার দক্ষিণ চীনের আরও ১১ টি বন্দর নানকিং সন্ধির শর্ত অনুযায়ী খুলে দেয়। ইয়াংসি নদীপথে ইওরোপীয় বণিকদের জাহাজ চলাচলের অধিকার স্বীকৃত হয়। তাইকিং বিদ্রোহের ফলে মাঞ্চু সরকার ব্যাপক নড়বড়ে হওয়ায় আত্মরক্ষায় অসমর্থ হয়।

এই সুযোগে ফ্রান্স ১৮৮০ খ্রীঃ ইন্দোচীন অধিকার করে। রাশিয়া আমুর নদীর উপকূলে মঙ্গোলিয়ার একাংশ অধিকার করে ট্রান্স-সাইবেরীয় রেলপথের নির্মাণ সমাপ্ত করে।

চীনে যখন পশ্চিমী শক্তির অনুপ্রবেশ ঘটছিল তখন জাপানের দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টি পড়ে। মার্কিন নৌ-সেনাপতি কমোডোর পেরী সরকারের নির্দেশে ১৮৫৪ খ্রীঃ জাপানের ওপর অবাধ অনুপ্রবেশ ও বৈষম্যমূলক সন্ধি চাপান। অন্যান্য ইওরোপীয় শক্তিগুলিও জাপানের ওপর বৈষম্যমূলক সন্ধির শর্ত (unequal treaties)) চাপায়। কিন্তু জাপান দ্রুতগতিতে তার আধুনিকীকরণ, আধুনিক সমরসজ্জা ও পার্লামেন্টারী সংবিধান প্রবর্তন করে আত্মশক্তি বৃদ্ধি করে।, (বিশদ বিবরণ পরে চীন-জাপান শীর্ষক অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। জাপান তার ওপর চাপান বৈষম্য-মূলক সন্ধিগুলিকে আত্মশক্তির জোরে ছিঁড়ে ফেলে। অতঃপর জাপান, চীনের অধীনস্থ সামন্ত রাজ্য কোরিয়া চীনের হাত থেকে অস্ত্রের জোরে কেড়ে নিতে উদ্যত হয়। পূর্ব এশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদী ক্লাবে বা সমিতেতে নতুন সদস্য হিসেবে জাপান যোগ দেয়। জাপান তার নবোদিত শক্তি নিয়ে ১৮৯৪ খ্রীঃ চীন আক্রমণ করলে দূরপ্রাচ্যে জাপানী সাম্রাজ্যবাদের উদয় হয়। প্রথম চীন-জাপান যুদ্ধে জাপান, চীনকে পরাস্ত করে সিমনোসেকির সন্ধি, ১৮৯৫ খ্রীঃ স্থাপন করে। এই সন্ধির দ্বারা জাপান, চীনের মাঞ্চুরিয়া প্রদেশের লিয়াও টুং উপদ্বীপ, ফরমোজা, পেস্কাডোরেস দ্বীপপুঞ্জ পায়। কোরিয়া নামমাত্র স্বাধীন থাকলেও শেষ পর্যন্ত জাপানের দ্বারা অধিকৃত হয়।

দূর প্রাচ্যে জাপানের অভিযান

জাপানের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে রাশিয়া ঈর্ষান্বিত হয়। রাশিয়া নিজে মাঞ্চুরিয়া অধিকারের জন্যে ব্যস্ত ছিল। এখন জাপান মাঞ্চুরিয়ার লিয়াও টুং উপদ্বীপ দখলের চেষ্টা করলে রাশিয়া বাধাদানে এগিয়ে আসে। জাপানের বিরুদ্ধে রাশিয়া সামরিক আক্রমণের ভয় দেখালে জাপান লিয়াও-টুং উপদ্বীপ ত্যাগ করে। কিছুদিন পর রাশিয়া চীনের কাছ থেকে লিয়াও-টুং উপদ্বীপ গ্রাস করে। এছাড়া চীনের উত্তর সীমান্তে মঙ্গোলিয়ার আমুর উপত্যকা দখল করে রাশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরে ভলাডিভোষ্টক বন্দর স্থাপন করে। ভলাডিভোষ্টক বন্দরকে সেন্ট-পিটারসবার্গের সঙ্গে এক রেলপথ দ্বারা সংযুক্ত করা হয়। লিয়াও-টুং উপদ্বীপের পোর্ট আর্থার বন্দর, দক্ষিণ মাঞ্চুরিয় রেলপথ দ্বারা

পূর্ব এশিয়ায় রুশ সাম্রাজ্যবাদ

রাশিয়ার ট্রান্স-সাইবেরীয় রেলপথের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। এই ভাবে রাশিয়া দূরপ্রাচ্যে তার সাম্রাজ্য বিস্তার করে। রুশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাপান সামরিক বাধা সৃষ্টি করে। ফলে রুশ-জাপান প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হয়। চীনের ওপর রুশ ও জাপানী সাম্রাজ্যবাদের থাবার আঘাত পড়লে ব্রিটেন প্রভৃতি পুরাতন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির আশঙ্কা দেখা দেয় যে, হয়ত গোটা চীনদেশকে রাশিয়া ও জাপান মিলে গ্রাস করবে। সুতরাং চীনের ভূখণ্ডে ঔপনিবেশিক লুটপাট শুরু হয়। ঐতিহাসিক ভিন্যাকের (Vinacke) মতে, "তরমুজকে যেমন লোকে খণ্ড খণ্ড করে আহার করে, ঔপনিবেশিক শক্তিগুলি চীনা তরমুজকে (Chinese Melon) বাঁটোয়ারা করতে উদ্যত হয়।" (ক) রাশিয়া লিয়াও-টুং উপদ্বীপ ও পোর্ট আর্থার বন্দর দখল করে। (খ) জার্মানী কিয়াওচো বন্দর দখলের পর শাংটুং প্রদেশে তার Spheres of Influence বা প্রভাবাধীন অঞ্চল স্থাপন করে। (৩) ব্রিটেন ওয়াইহ্যাওয়ে অধিকার করে। এর ফলে ইয়াংসি উপত্যকায় ব্রিটেন আধিপত্য পায়। (৪) ফ্রান্স ইন্দোচীনের আনাম থেকে চীনের ভেতর পর্যন্ত তার নিয়ন্ত্রিত রেলপথ গঠনের অধিকার পায়। এর ফলে ইউনান, কোয়াংশি অঞ্চলের খনিজ সম্পদ ফ্রান্স রেলযোগে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ পায়।

এমতাবস্থায় আশঙ্কা দেখা দেয় যে, মাঞ্চুচীনের পতন হতে আর বেশী দেরী নেই। এই সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আশঙ্কা দেখা দেয় যে, বিভিন্ন দেশ চীনের বিভিন্ন অংশ দখল করলে চীনে মার্কিন বাণিজ্যের কোন সুযোগ থাকবে না।এজন্য মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব স্যার জন হে তাঁর Open Door Doctrine বা খোলা দ্বার নীতি ১৮৯৯ খ্রীঃ ঘোষণা করেন। এতে বলা হয় যে, চীনে বিভিন্ন শক্তির দ্বারা অধিকৃত অঞ্চলে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সমান বাণিজ্যিক অধিকার দিতে হবে নতুবা মার্কিন দেশ বাধা দেবে।

মার্কিন খোলা দ্বার নীতি

Open Door বা খোলা দ্বার নীতি ছিল মার্কিন অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের প্রকাশ। এর উদ্দেশ্য ছিল চীনে বিভিন্ন জাতির উপনিবেশগুলিতে মার্কিন দেশের স্বার্থে সমান বাণিজ্যিক অধিকার লাভ করা। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু তাঁর Glimpses of World History গ্রন্থে এই নীতিকে অদৃশ্য সাম্রাজ্যবাদ বা Invisible Imperialism বলেছেন। অন্যান্য দেশগুলি জায়গা দখল, সন্ধি প্রভৃতি কাজের দ্বারা সাম্রাজ্যবাদকে স্থূল ও নগ্নভাবে প্রকাশ করলেও, মার্কিন দেশ তা না করে, অপর দেশের উপনিবেশে সমান অর্থনৈতিক সুযোগ লাভ করে।

রুশ জাপান যুদ্ধ

মাঞ্চুরিয়ায় রুশ বিস্তারের বিরুদ্ধে জাপান ১৯০৪ খ্রীঃ যুদ্ধ ঘোষণা করে। রুশ-জাপান যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয় ঘটে। পোর্টসমাউথের সন্ধির (১৯০৫ খ্রীঃ) দ্বারা জাপান লিয়াও-টুং উপদ্বীপ পুনরায় লাভ করে। এর পর জাপান ধাপে ধাপে কোরিয়া ও উত্তর চীনের বিভিন্ন অঞ্চল দখলে এগিয়ে যায়। ব্রিটেনের সঙ্গে ইঙ্গ-জাপান চুক্তির সাহায্যে জাপান তার ক্ষমতা দ্রুত বাড়ায়। ১৯১১ খ্রীঃ জাপান কোরিয়াকে সম্পূর্ণভাবে জাপানের সাম্রাজ্যভুক্ত করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ইঙ্গ-জাপান চুক্তি অনুযায়ী জাপান তার মিত্র ব্রিটেনের শত্রু জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এই সূত্রে চীনে অবস্থিত জার্মান ঔপনিবেশ শাং-টুং অঞ্চল দখল করে। আসলে জার্মানীর বিরুদ্ধে জাপানের যুদ্ধ ঘোষণার উদ্দেশ্য ছিল শাং-টুং দখল করা। তারপর বিশ্বযুদ্ধের সুযোগে চীনের ওপর একুশ দফা দাবী চাপিয়ে দেয়। এর ফলে মাঞ্চুরিয়া জাপানের Spheres of Influence বা প্রভাবাধীন অঞ্চলে পরিণত হয়। চীনের ওপর জাপান আরও কয়েকটি অধীনতামূলক শর্ত চাপায়।

এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলে ইওরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী প্রসার (Expansion of European Imperialism in other parts of Asia) : ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত আফগানিস্থানে রুশ অনুপ্রবেশের আশঙ্কায় ভারতীয়

ব্রিটিশ সরকার অস্থির হয়। উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে এই উপলক্ষে প্রথম ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধ বাধে। এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য ছিল আফগানিস্থানে ব্রিটেনের Puppet হিসেবে এক আফগান শাসককে সিংহাসনে স্থাপন করা। এই নীতি ব্যর্থ হলে ব্রিটেন কিছুকাল নিরস্ত থাকে। লর্ড লিটন যখন ভারতের বড়লাট ছিলেন সেই সময় পুনরায় ব্রিটিশ সরকার আফগানিস্থানে রুশ আতঙ্কে ভুগতে থাকেন। এর ফলে দ্বিতীয় ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধ বাধে। শেষ পর্যন্ত ব্রিটেন ও রাশিয়া আফগানিস্থানকে নিরপেক্ষ বা বাফার দেশ হিসেবে গণ্য করতে রাজী হয়। লর্ড কার্জনের আমলে ইঙ্গ-রুশ কনভেনশন দ্বারা আফগানিস্থান ও তিব্বতে উভয় দেশ হস্তক্ষেপ না করতে রাজী হয়।

নিকট প্রাচ্যেও উপনিবেশগত সংঘাত দেখা দেয়। জার্মানী তুর্কী সাম্রাজ্যে অনুপ্রবেশের উদ্যোগ নিলে ব্রিটেনের সঙ্গে জার্মানীর তীব্র বিরোধ বাধে। ১৮৫০-এর দশক থেকে ১৮৭০-এর দশক পর্যন্ত জার্মানী তুর্কী সাম্রাজ্যের অন্তর্গত আনাতোলিয়া, মেসোপোটামিয়ায় ব্যাঙ্ক ও কোম্পানীর দ্বারা মূলধন লগ্নী শুরু করে। কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম তুর্কী সাম্রাজ্যের মধ্য দিয়ে বার্লিন-বাগদাদ রেলপথ নির্মাণের পরিকল্পনা করেন। জার্মানীর অনুপ্রবেশের আশঙ্কায় পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে ব্রিটেন তার সামরিক ঘাঁটি এবং নৌ-আধিপত্য স্থাপন করে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ হিসেবে সাম্রাজ্যবাদের গুরুত্ব (How far Imperialism was a valid cause of the First World War) : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ ব্যাখ্যা করে ভি· আই· লেনিন তাঁর Imperialism-the Highest Stage of Capitalism পুস্তক রচনা করেন। এই পুস্তিকায় লেনিন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অর্থনৈতিক কারণ হিসেবে নব সাম্রাজ্যবাদকে দায়ী করেন। তিনি বলেন যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ছিল পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার পরিণতি মাত্র। পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় উৎপাদন এবং মুনাফা অর্জনের ওপর কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না। সেহেতু মুনাফার লোভে নিজ দেশের চাহিদা অপেক্ষা অধিক শিল্পদ্রব্য উৎপাদন করা হয়। এই উদ্বৃত্ত শিল্পদ্রব্য উপনিবেশের একচেটিয়া বাজারে বিক্রির জন্যে পুঁজিবাদী মালিকরা তাদের নিজ নিজ সরকারকে উপনিবেশ দখলে বাধ্য করে। ধনতন্ত্রবাদী দেশগুলিতে কোন সরকারের পক্ষে পুঁজিপতিদের বিরোধিতা করা সম্ভব নয়। কারণ সরকার তাদের অর্থ সাহায্যেই টিকে থাকে। দ্বিতীয়তঃ, লেনিন বলেন যে Finance Capital বা উদ্বৃত্ত মূলধন উপনিবেশের বাজারে লগ্নী করে বেশি মুনাফা পাওয়া যায়। শিল্পোন্নত দেশের শ্রমিকদের চড়া হারে বেতন ও অন্যান্য সুবিধা দিয়ে বেশি মুনাফা হয় না। উপনিবেশের অনুন্নত শ্রমিককে কম মজুরী দিয়ে বেশী মুনাফা ভোগ করা যেত। এজন্য মূলধনীরা উপনিবেশে মূলধন বিনিয়োগের জন্যে অস্থির হয়। যাতে মূলধন নিরাপদে লগ্নী করা যায় এজন্য উপনিবেশে রাজনৈতিক আধিপত্য স্থাপনের দরকার ছিল। রাজনৈতিক আধিপত্যের ছাতার নীচে থেকে নিরাপদে মূলধন লগ্নী করে মুনাফা লোটা সহজ ছিল। মূলধনীরা এজন্য উপনিবেশ দখলে উদ্যোগী হয়ে নিজ নিজ সরকারকে উপনিবেশ নীতি নিতে বাধ্য করে। লেনিন বলেন ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি শিল্পায়ত দেশগুলি অনেক আগে থেকেই বিশ্বের বেশির ভাগ উপনিবেশ দখল করে নেয়। ১৮৭০ খ্রীঃ পর জার্মানী সামরিক বলে বলীয়ান হলে, ইওরোপীয় শক্তিগুলির মধ্যে উপনিবেশ দখলের ধুম পড়ে যায়।

ঐক্যবদ্ধ জার্মানী তার প্রাথমিক সমস্যাগুলির সমাধান করে দ্রুতগতিতে শিল্প গঠন করে। জার্মানী শিল্প গঠনের ক্ষেত্রে শীঘ্রই ব্রিটেনকে ধরে ফেলে। জার্মানীর পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় যে উদ্বৃত্ত মাল উৎপন্ন হয়, তা বিক্রির জন্যে এবং জার্মানীর মূলধন লগ্নীর জন্যে উপনিবেশ দখলের নীতি জার্মানী নেয়। ইতিমধ্যে অধিকাংশ উপনিবেশ ব্রিটেন ও ফ্রান্স দখল করেছিল। ফলে জার্মানীর সঙ্গে এই প্রাচীন সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির উপনিবেশের অধিকার নিয়ে তীব্র

প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয়। পরিণামে তা বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হয়। লেনিনীয় ব্যাখ্যা অনুসারে সাম্রাজ্যবাদ হল পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার চূড়ান্ত পর্যায়; এই পর্যায়ে পৌঁছবার পর সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে উপনিবেশের একচেটিয়া দখল নিয়ে যুদ্ধ বাধে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের এটাই ছিল আসল কারণ।

১৯১৮ খ্রীঃ পর যখন বিভিন্ন চিন্তাবিদ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করেন, তখন লেনিনের এই অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা বহু লোককে চমকিত করে। দীর্ঘকাল ধরে বিশ্বাস করা হত যে, পুঁজিবাদী দেশগুলি মুনাফা, মূলধন লগ্নী ও একচেটিয়া বাজার দখলের জন্যে যুদ্ধ বাধায়। সাম্রাজ্যবাদকে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির চূড়ান্ত বিকাশ এবং পরিণামে তা যুদ্ধ সৃষ্টি করে এই ধারণা দৃঢ় হয়। উপনিবেশ দখলের দ্বন্দ্ব ইওরোপীয় শক্তিগুলির জাতীয় নীতিকে এমনভাবে প্রভাবিত করে যে সাম্রাজ্য বিস্তারকে উপলক্ষ করেই ত্রিশক্তি আঁতাত ও ত্রিশক্তি জোটভুক্ত দেশগুলি যুদ্ধে নেমে পড়ে।

ডেভিড টমসন লেনিনীয় তত্ত্বকে দুভাবে খণ্ডন করার চেষ্টা করেছেন। প্রথমে তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, অর্থনৈতিক কারণে নব সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব হয় এই মত ভ্রান্ত। তিনি বলেন যে, যদি মূলধন লগ্নী ও শিল্পদ্রব্যের বাজারের জন্যে সাম্রাজ্য বিস্তার করা হয়, তাহলে শিল্প-বিপ্লবের আগের যুগে কেন সাম্রাজ্য বিস্তার হয়। তখন মূলধন লগ্নী বা বাজার দখলের সমস্যা মোটেই ছিল না। (২) ঔপনিবেশিক শক্তিগুলি তাদের মূলধন প্রধানতঃ রাশিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকায় লগ্নী করে, উপনিবেশে করেনি। এর কারণ কি? ব্রিটিশ মূলধনীরা ভারতে রেলপথ নির্মাণ অপেক্ষা, দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনায় রেলপথ নির্মাণে লগ্নী করা পছন্দ করত। (৩) উপনিবেশবাদী ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের শ্রমিক অপেক্ষা উপনিবেশহীন সুইডেন, ডেনমার্কের শ্রমিকদের মজুরীর হার ছিল উচু। (৪) ১৮১৫-১৮৭০ খ্রীঃ পর্যন্ত ফ্রান্স তার উপনিবেশের আয়তন দ্বিগুণ করে। অথচ তখন ফ্রান্স শিল্পের দিক থেকে বেশ পিছনে ছিল। তার উদ্বৃত্ত মূলধন বা শিল্পদ্রব্য বিক্রির সমস্যা তখন ছিল না। (৫) ব্রিটেনের হাতে যতদিন কানাডা, ত্রয়োদশ উপনিবেশ শাসিত ছিল ততদিন এই সকল স্থানে ব্রিটেনের মালের চাহিদা ছিল কম। যখন ব্রিটেন আমেরিকা ও কানাডাকে উপনিবেশের বাঁধন থেকে মুক্তি দিল তারপরেই এই সকল দেশে ব্রিটিশ মালের চাহিদা বাড়ে। কাজেই উপনিবেশ দ্বারা শিল্পদ্রব্যের বাজার তৈরি করা হয়-এই তত্ত্ব প্রমাণিত হয় না। (৬) জার্মানী বলকান ও পূর্ব ইওরোপে উপনিবেশ স্থাপন না করেও ব্যাপক মাল বিক্রি ও মূলধন লগ্নী করতে সক্ষম হয়।

এই সকল যুক্তিতে ডেভিড টমসন লেনিনের তত্ত্বের একাংশকে খণ্ডন করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে পুঁজিবাদী শিল্প উৎপাদন ব্যবস্থার কোন কার্য, কারণ সম্পর্ক নেই। যদি তা না থাকে তবে উদ্বৃত্ত মাল বিক্রির জন্যে সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়, এই লেনিনীয় তত্ত্ব খাটে না।

অতঃপর ডেভিড টমসন দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ঘটার জন্যে ১৮৭০ খ্রীঃ পর নতুনভাবে সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রতিযোগিতা মূল কারণ হিসেবে গণ্য হতে পারে না। তাঁর ওপরের প্রতিপাদ্য দ্বারা তিনি পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা সাম্রাজ্যবাদের একমাত্র কারণ নয় একথাই বলেছেন। এরপর ডেভিড টমসন দেখিয়েছেন যে, (১) যদি উপনিবেশ দখলের জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা যুদ্ধের কারণ বলে ধরা হয়, সকল উপনিবেশ অধিকারের ক্ষেত্রে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়নি। মাত্র কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। ফ্রান্স যখন আলজেরিয়া অধিকার করে, অথবা ১৮৭৪ খ্রীঃ ইন্দোচীনে আনাম দখল করে, অথবা ব্রিটেন আফ্রিকায় নাইজেরিয়া ও আশান্তি দখল করে ১৮৯০-এর দশকে, তখন অন্য শক্তির সঙ্গে কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়নি। বিসমার্ক ফ্রান্সকে টিউনিস অধিকারে সহায়তাই দেন। (২) একমাত্র ১৮৮৪-৮৫ খ্রীঃ পর আফ্রিকা ও দূর

প্রাচ্যের উপনিবেশ দখল নিয়ে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা দেখা দেয়। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও রেষারেষি বিভিন্ন রাষ্ট্রের জটিল সম্পর্ককে আরও জটিলতা দেয়। (৩) তথাপি, ডেভিড টমসনের মতে, ঔপনিবেশিক বিরোধের জন্যেই ইওরোপীয় শক্তিগুলি ত্রিশক্তি জোট বনাম ত্রিশক্তি আঁতাত এই দুই পরস্পর-বিরোধী যুদ্ধমান শিবিরে বিভক্ত হয়, এরকম কোন প্রমাণ নেই। ইওরোপের শক্তিসাম্য, ইওরোপের প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্যেই শক্তিগুলির মেরুকরণ ঘটেছিল। এর সঙ্গে সাম্রাজ্য বা ঔপনিবেশিক সমস্যার কোন সম্পর্ক নেই। (৪) বরং এমন বিপরীত প্রমাণ আছে যে, ঔপনিবেশিক স্বার্থের জন্যেই ইওরোপে প্রতিদ্বন্দ্বী জোট গঠন বিলম্বিত হয়েছিল। ফ্রান্সের সঙ্গে মিশর নিয়ে বিরোধ এবং রাশিয়ার সঙ্গে আফগানিস্থান ও তিব্বত সংক্রান্ত বিরোধের ফলে ইংলন্ডের সঙ্গে ইঙ্গ-ফরাসী আঁতাত ও রাশিয়ার সঙ্গে ইঙ্গ-রুশ আঁতাত গড়ে উঠতে দেরী হয়। (৫) যখন ঔপনিবেশিক বিরোধী মিটে যায় এবং পূর্বাঞ্চল সাম্রাজ্য সঙ্কটজনক হয়, তখনই ত্রিশক্তির আঁতাত গঠন ত্বরান্বিত হয়। সুতরাং ঔপনিবেশিক বিরোধিতা নয়, সমাধানই ইওরোপে শক্তিজোট গঠনের পথ প্রস্তুত করে। (৬) আফ্রিকায় অথবা প্রাশিয়ায় এত বিশাল অনাধিকৃত ও অনাবিষ্কৃত ভূমি ও সম্পদ ছিল যে, বিভিন্ন ইওরোপীয় শক্তিগুলি যুদ্ধ না করে আপোষে নিজেদের অঞ্চল বা spheres of influence ভাগ করে নিতে পারে। উপনিবেশের জন্যে ১৯০৪ খ্রীঃ পর্যন্ত যুদ্ধের প্রয়োজন দেখা যায় নি। এমনকি অটোম্যান তুর্কীর সাম্রাজ্যকে ব্যবচ্ছেদ করে বিভিন্ন শক্তি তাদের ক্ষতিপূরণ নিতে সুযোগ পেয়েছিল। (৬) ১৯০৪ খ্রীঃ পর ঔপনিবেশিক ক্ষতিপূরণ লাভের সুযোগ কমে যায়। কারণ আর ভাগ করে নেওয়ার মত উপনিবেশ বেশী ছিল না এবং ইওরোপের বিভিন্ন শক্তির মধ্যে ইওরোপীয় কারণে প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্র হলে তখন বিশ্বযুদ্ধের ছায়া ইওরোপের ওপর পড়ে। তার আগে নয়। বিংশ শতকের শুরু থেকেই দেখা যায় যে, আর উদ্বৃত্ত স্থান এশিয়া বা অন্য দেশে নেই যা দিয়ে ইওরোপীয় শক্তিগুলির বিরোধ এবং ভূমির ক্ষুধাকে নতুন নতুন উপনিবেশ দখলের সুযোগ দিয়ে নিবৃত্ত করা যাবে। তার ফলেই বিভিন্ন শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা ১৯০৪-এর পর এত তীব্র হয়। একমাত্র আফ্রিকার মরক্কোতে তখনও কোন শক্তির নিরঙ্কুশ অধিকার স্থাপিত হয়নি। এজন্য মরক্কোর ওপর আধিপত্যের জন্যে মরক্কো সঙ্কট বা মরক্কো নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়। কারণ তখন উদ্বৃত্ত উপনিবেশ হাতে না থাকায় ইওরোপীয় শক্তিগুলির কৌশলগত কূটনীতি পরিচালনার সুযোগ সীমাবদ্ধ হয়।

ঔপনিবেশিক বা সাম্রাজ্যবাদী প্রতিদ্বন্দ্বিতা যুদ্ধকে ডেকে আনে, একথা বলার চেয়ে বলা দরকার যে, ইওরোপের ভেতর বৃহৎ শক্তিগুলির প্রতিদ্বন্দ্বিতাই যুদ্ধকে ডেকে আনে। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার সঙ্গে ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার কোন যোগ ছিল না। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতাগুলি যাকে আমরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম মূল কারণ বলব, তা ছিলঃ (১) ১৮৭১ খ্রীঃ আলসাস-লোরেন পুনরুদ্ধারের জন্যে ফ্রাঙ্কো-জার্মান প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ফ্রান্স যাতে আলসাস-লোরেন হারাবার দুঃখ ভুলে যায় এজন্য বিসমার্ক ফ্রান্সকে টিউনিস, ইন্দোচীনে ক্ষতিপূরণ পেতে সাহায্য করেন। কিন্তু আলসাস-লোরেন হারাবার ক্ষত ফ্রান্সের দগদগে ক্ষত সৃষ্টি করেছিল। ফ্রান্স কখনও তা ভোলেনি। কাইজার জার্মানীর নতুন আগ্রাসী মনোভাব দেখালে ফ্রান্সের পুরাতন ক্ষত আবার সঙ্কট সৃষ্টি করে, যা পরিণামে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হয়। (২) ব্রিটেনের লর্ড হ্যান্ডেন প্রভৃতি একশ্রেণীর নেতা মনে করতেন যে, কাইজারের সঙ্গে ঔপনিবেশিক বিরোধ মিটিয়ে ফেলা শক্ত নয়। আসল বিরোধ ছিল নৌ-সংক্রান্ত। কাইজারের নব নৌ-নির্মাণ পরিকল্পনার ফলে বাল্টিক ও উত্তর সাগরে জার্মানীর নৌ-আধিপত্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখা দেয়। এর ফলে ব্রিটেনের দ্বীপপুঞ্জের নিরাপত্তা বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। এই ইঙ্গ-জার্মান নৌ-প্রতিযোগিতাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগ দিতে ব্রিটেনকে বাধ্য করে। (৩) বরঞ্চ

দেখা যায় যে, ঔপনিবেশিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তির ফলেই ইওরোপে প্রতিবাদী শক্তিজোট গঠনের কাজকে ত্বরান্বিত করে। সুতরাং তথাকথিত ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিশ্বযুদ্ধ ঘটার জন্যে কোন পূর্বশর্ত বা সুনির্দিষ্ট কারণ ছিল না।

কূটনীতির দিক থেকে ঔপনিবেশিক ঝগড়া বিরক্তিকর হলেও, কখনও এই বিরোধ ১৯১৪ খ্রীঃ পূর্ববর্তী প্রতিদ্বন্দ্বী জোট গঠন ও মহাযুদ্ধকে অনিবার্য করেছিল বলা যাবে না। বরঞ্চ ১৯১৪ খ্রীঃ মহাযুদ্ধ ঘটার আগেই প্রধান ঔপনিবেশিক বিরোধগুলির সমাধান হয়ে যায়। ঔপনিবেশিক বিরোধগুলির মধ্যে যেগুলি আন্তর্জাতিক সঙ্কটের সৃষ্টি করে তা ছিল ঃ (ক) মিশর উপলক্ষে ইঙ্গ-ফরাসী বিরোধ; (খ) মরক্কো সংক্রান্ত বিরোধ; (গ) পারস্যে আধিপত্য নিয়ে ইঙ্গ-রুশ বিরোধ; (ঘ) বলকানে রুশ-জার্মান বিরোধ; (ঙ) চীন-জাপান বিরোধ; (চ) দক্ষিণ আফ্রিকায় ইঙ্গ-জার্মান বিরোধগুলির পশ্চাতে বাণিজ্য বা অর্থনৈতিক প্রশ্ন অপেক্ষা রাজনৈতিক প্রশ্ন ছিল বেশী গুরুত্বপূণ।[১] এগুলির মধ্যে ইওরোপের বিরোধে বলকানে রুশ-জার্মান বিরোধের কথা বাদ দিলে বাকিগুলি প্রায় ১৯১৪ খ্রীঃ আগে প্রায় মিটে যায়। বলকানের সমস্যা ছিল ইওরোপীয় সমস্যা এবং পূর্বাঞ্চল সমস্যা। বাকি সমস্যাগুলির জন্যে মহাযুদ্ধ ঘটেনি। কারণ সেগুলির সমাধান হয়ে যায়। তাহলে বিশ্বযুদ্ধের জন্যে সাম্রাজ্যবাদ দায়ী ছিল তা প্রমাণিত হচ্ছে না।

সকল কথা বলার পরে পুনরায় প্রশ্ন আসে যে, তাহলে দীর্ঘকালের লালিত ধারণা যে উপনিবেশের বাজার দখলের জন্যেই যুদ্ধ হয়, তা কি একেবারেই ভিত্তিহীন? নির্মোহ দৃষ্টিতে বিষয়টিকে বিচার করলে দেখা যাবে যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ হিসেবে ঔপনিবেশিক বাজার দখলের প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে একমাত্র কারণ হিসেবে প্রচার ছিল বাড়াবাড়ি বা অতিশয়োক্তি। অর্থনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসীরা একটি বিশেষ মতবাদের প্রভাবে অর্থনৈতিক কারণেই একমাত্র গুরুত্ব দেন। তাঁরা বিশ্বযুদ্ধের জন্যে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রভৃতি অন্যান্য কারণগুলিকে উপেক্ষা করেন। আসলে বিশ্বযুদ্ধ নানা কারণে ঘটে। অর্থনৈতিক কারণ তার মধ্যে একমাত্র না হলেও অন্যতম প্রধান কারণ বলা যায়।

পাঠ্যসূচী

১। Hobson—Imperialism; A study.
২। V. I. Lenin—Imperialism : the Highest Stage of Capitalism.
৩। Hobsbawm—Industry and Empire.
৪। David Thompson—Europe Since Napoleon.
৫। E. M. Winslow—The Pattern of Imperialism.
৬। Langer—The Diplomacy of Imperialism.
৭। Panikkar—Asia and the Western Dominance.
৮। J. Nehru—The Glimpses of World History.
৯। Fairbank—History of South-East Asia.

১· David Thomson.

তৃতীয় অধ্যায়

কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের পররাষ্ট্র নীতি ঃ ত্রিশক্তি আঁতাত ঃ সশস্ত্র শান্তির যুগ

(The Foreign Policy of Kaiser William II : Triple Entente : The Age of Armed Peace)

কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের নব পররাষ্ট্র নীতি (The New Course Policy of Kaiser William II) ঃ ১৮৯০ খ্রীঃ জার্মান সম্রাট কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম তাঁর রাজনৈতিক গুরু ও নব জার্মানীর রূপকার প্রধানমন্ত্রী বিসমার্ককে পদচ্যুত করে, সকল ক্ষমতা নিজ হাতে নেন। ১৮৯০ খ্রীঃ থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ ১৯১৮ খ্রীঃ পর্যন্ত জার্মানীর কর্ণধার ছিলেন কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম। নবীন সম্রাট কাইজারের এই ক্ষমতা গ্রহণকালকে (১৮৯০ খ্রীঃ) অনেকে জার্মানীর ইতিহাসের যুগ সন্ধিক্ষণ (Turning Point of German History) বলেন। কারণ কাইজার তার "নব নীতি" বা (New Course Policy) ১৮৯০ খ্রীঃ থেকেই নেন বলা হয়, যার ফলে বিসমার্কের যুগের পররাষ্ট্র নীতির মূল সূত্রগুলিকাইজার ত্যাগ করেন।কাইজারের জার্মানীসম্পর্কে বিখ্যাত আধুনিক গবেষক ইম্যানুয়েল জাইস (Immanuel Zeiss) এই প্রচলিত ধারণাকে ভিত্তিহীন মনে করেন। তাঁর মতে, ১৮৯০-৯৫ খ্রীঃ পর্যন্ত কাইজার আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে New Course বা নবনীতি অনুসরণ করলেও, বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে বিসমার্কীয় নীতি থেকে পুরাপুরি বিচ্যুত হননি। তাঁর মতে, ১৮৯০-৯৫-কে পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে Period of Indecision বা সঙ্কল্পহীনতার যুগ বলা যেতে পারে। ১৮৯৬ খ্রীঃ-কেই কাইজারের পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে Turning Point বা যুগ সন্ধিক্ষণ বলা চলে। কারণ এই খ্রীঃ থেকে কাইজার Welt Politik বা বিশ্ব রাজনীতিতে জার্মানীর প্রাধান্য স্থাপনের লক্ষ্য নেন এবং বিসমার্কীয় পররাষ্ট্র নীতির মূল সূত্রগুলি ছিন্ন করেন।

কাইজারের নব নীতি বা New Course Policy, কাইজার একমাত্র নিজ সিদ্ধান্ত দ্বারা গ্রহণ করেননি। আঁতাত ঐতিহাসিকরা (Entente Historians) কাইজারের বিসমার্কী নীতি থেকে বিচ্যুতি ও Welt Politik বা বিশ্ব রাজনীতি অনুসরণের জন্যে কেবলমাত্র কাইজারের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে দায়ী করেন।প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন আভ্যন্তরীণ শক্তির ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে কাইজার New Course বা নবনীতি নেন। প্রথমতঃ, বিসমার্কের পতনের পর জার্মান রাজনীতিতে বিভিন্ন প্রভাবশালী চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়। এই গোষ্ঠীগুলি আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতিকে প্রভাবিত করে। বিসমার্ক তাঁর ব্যক্তিত্বের জোরে এই চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী (Pressure group) গুলিকে নিয়ন্ত্রণে রাখেন। তাঁর অবর্তমানে তা করা যায়নি। এগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য হল ঃ (ক) কৃষিলবী (Agrarian Loby)। এই গোষ্ঠীতে ছিল রক্ষণশীল, যুদ্ধবাজ জাঙ্কার ও পূর্ব জার্মানীর ভূস্বামীরা। এরা জার্মানীতে আভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে স্থিতাবস্থা চাইতেন এবং শিল্পায়নের বিরোধী ছিলেন। বিদেশ থেকে সস্তা দরে খাদ্যশস্য রপ্তানির এঁরা বিরোধী ছিলেন; এজন্য যে তাঁদের জমিদারীর উদ্বৃত্ত শস্য তাঁরা দেশে চড়া দরে বিক্রির সুযোগ ভোগ করতে চান। (খ) প্যান জার্মান লবী ছিল ভয়ানক প্রভাবশালী জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠী। এঁরা চাইত যে, জার্মানী ইওরোপে ও উপনিবেশে প্রাধান্য স্থাপনের পক্ষপাতী ছিলেন। বিসমার্কের শক্তিসাম্য নীতি এঁরা ভাঙতে চান। (গ) শিল্প লবীও ছিল ভয়ানক শক্তিশালী। জার্মানীর

বুর্জোয়া, ধনী শিল্পপতিরা ছিল এই গোষ্ঠীর নেতা। বিসমার্কের আমলে জার্মানীর শিল্পায়নের উড্ডয়ন ঘটে। এজন্য এই মূলধনী ও শিল্পপতিশ্রেণী জার্মান অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলেন। তাঁদের দাবী ছিল যে, জার্মানীর আমদানি-রপ্তানি নীতির এবং উপনিবেশ নীতির পরিবর্তন দরকার। জার্মানীর উদ্বৃত্ত মাল একচেটিয়া বিক্রির জন্যে উপনিবেশ দখলের প্রয়োজন। হান্স ডেলব্রুক, জন সিকুয়েল প্রভৃতি বুদ্ধিজীবী ছিলেন এই গোষ্ঠীর মুখপাত্র। (ঘ) এছাড়া ছিল সামরিক লবী বা গোষ্ঠী। জার্মানীর পররাষ্ট্র নীতিতে সেনাপতিমণ্ডলীর প্রভাব গোড়া থেকেই ছিল। কাইজারের আমলে এই প্রভাব অত্যন্ত বাড়ে। সেনাপতি স্লিফেন, নৌ-সেনাপতি তিরপিৎস প্রত্যক্ষভাবে কাইজারকে স্থল ও নৌ-বাহিনীর নব নির্মাণের জন্যে চাপ দেন। স্লিফেন আগ বাড়িয়ে ভবিষ্যতে ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধ হলে বেলজিয়ামের পথে আক্রমণের এক আগাম পরিকল্পনা ছকে ফেলেন। তিরপিৎস কাইজারকে নৌ-নির্মাণে এমনভাবে প্রভাবিত করেন যে, এজন্য জার্মানীর সঙ্গে ব্রিটেনের তীব্র বিরোধ দেখা দেয়। সেনাপতিরা এক বিস্তারশীল জার্মানীর কথাই ভাবেন। (৫) এছাড়া ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু বুদ্ধিজীবি অধ্যাপক যাঁরা জার্মান জাতীয়তাবাদের পূর্ণতা লাভের জন্যে এক বিশ্বব্যাপী জার্মান প্রাধান্য লাভের কথা বলেন। কাইজার যদি ১৮৯৬ খ্রীঃ থেকে Welt Politik বা বিশ্বরাজনীতিতে বিশেষতঃ উপনিবেশ দখল ও নৌ-নির্মাণ নীতিতে ঝুঁকে পড়েন, তার পশ্চাতে এই সকল Pressure group বা চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর প্রভাব কম ছিল না।

কাইজারের প্রধানমন্ত্রীরা ছিলেন যথাক্রমে ক্যাপ্রিভি (১৮৯০-৯৫), হোহেন লো, ফন বুলো ও বেথম্যান হলোওয়েগ। এঁরা কেহই বিসমার্কের মত ব্যক্তিত্বশালী এবং প্রতিভাবান ছিলেন না। এঁরা অনেকেই বিভিন্ন প্রভাবশালী লবীর কাছে আত্মসমর্পণ করেন। কাইজার নিজে স্বৈরশাসক হলেও বুঝতেন কম। তিনি ছিলেন ভয়ানক আত্মম্ভরী, তোষামোদপ্রিয় এবং বাক্যবাগীশ লোক। জন্মকাল থেকে তাঁর শারীরিক পঙ্গুতার জন্যে তিনি হীনমন্যতায় ভুগতেন। বড় বড় কথা বলে তিনি তাঁর এই হীনমন্যতাকে চাপা দিতেন। কূটনৈতিক সংযম ও বাক্‌সংযম তাঁর ছিল না। ইম্যানুয়েল জাইসের মতে "জার্মান অভিজাত-বুর্জোয়া শাসকশ্রেণীর প্রভাব তিনি নিজ বাক্য ও আচরণে প্রকাশ করতেন।"

কাইজারের আমলে পররাষ্ট্র নীতির গঠনে উপরোক্ত বিভিন্ন প্রভাবগুলি বিশেষ সক্রিয় ছিল। তাই দেখা যায় যে, বিসমার্কের যুগের পর রাষ্ট্রনীতির সূত্রগুলিকে তিনি ছিঁড়ে ফেলেন এবং New Course বা নবনীতি গ্রহণ করেন। বিসমার্কীয় পররাষ্ট্র নীতির গোড়ার কথা ছিল : (ক) জার্মানী আত্মতৃপ্ত দেশ তার আর বিস্তারের দরকার নেই। (খ) জার্মানীর নৌ-বহরের দরকার নেই। (গ) জার্মানীর উপনিবেশের দরকার নেই। বিসমার্ক বলেন, "আমি উপনিবেশবাদী নই" (I am no colony man)। (ঘ) ফ্রান্সকে মিত্রহীন রেখে জার্মানীর নিরাপত্তা রক্ষা করতে হবে। (ঙ) এজন্য তিনি তিন সম্রাটের চুক্তি ও ত্রিশক্তি জোট গঠন করেন। রাশিয়ার সঙ্গে রি-ইনসিওরেন্স চুক্তির দ্বারা পরস্পরের বিরুদ্ধে অনাক্রমণ নীতি নেন।

কিন্তু কাইজার বিসমার্কীয় নীতির এই ভিত্তিগুলি নস্যাৎ করেন। তাঁর বিশ্বস্ত সচিব ফ্রেডারিখ হলষ্টিনের পরামর্শক্রমে তিনি রাশিয়ার সঙ্গে রি-ইনসিওরেন্স চুক্তি একতরফাভাবে নাকচ করেন। ফ্রেডারিখ হলষ্টিন কাইজারকে বোঝান যে, অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে দ্বিশক্তি চুক্তি ও রাশিয়ার সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি পরস্পর-বিরোধী ও জটিল। প্রধানমন্ত্রী ক্যাপ্রিভিও এই সচিবকে সামলাতে চেষ্টা করেননি। রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তি খারিজের ফলে জার বিরক্ত হন এবং ক্রমে ফ্রান্সের সঙ্গে মিত্রতার দিকে ঝুঁকে পড়েন। ফলে ফ্রান্সের মিত্রহীনতা দূর হয়। বিসমার্কীয় নীতির দুটি প্রধান সূত্রকে কাইজার নষ্ট করে জার্মানীকে বিপদে ফেলেন।

১৮৯৫ খ্রীঃ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী ক্যাপ্রিভি কোনক্রমে বিস্তার নীতি না নিয়ে কাজ চালিয়ে যান। তবে তিনি শিল্প লবীকে সমর্থন করায় জার্মানীতে অভূতপূর্ব শিল্প বিস্তার ঘটে। খনিজ শিল্প বিশেষতঃ কয়লা, লোহা, রাসায়নিক শিল্পে জার্মানী দ্রুত ইংলন্ডকে ধরে ফেলে। তিনি এজন্য বেশ কয়েকটি বাণিজ্য সন্ধি স্বাক্ষর করেন। এই শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারের মধ্যে জার্মানীর প্রসারণ নীতি বা ওয়েল্ট পলিটিকের (Welt Politik) বীজ ছিল। জার্মানীর অভূতপূর্ব শিল্প বিস্তারের ফলে জার্মানীর আত্মবিশ্বাস বহুগুণ বাড়ে। কাইজার নিজেকে এক শক্তিশালী রাষ্ট্রের কর্ণধার হিসেবে ভাবতে থাকেন। জার্মানীর কিছু শিল্পপতি ও বুদ্ধিজীবী দাবী জানান যে, উদ্বৃত্ত মাল বিক্রির জন্যে জার্মানীর উপনিবেশ দরকার। হ্যানস ডেলব্রুক উপনিবেশ গঠনের জন্যে আন্দোলন গঠন করে চাপ সৃষ্টি করেন। তিনি বলেন "ইংলন্ড যদি উপনিবেশ স্থাপন করে, তবে জার্মানীরও তা করা দরকার।" কাইজার বুঝেন যে, জার্মানীতে শিল্প বিস্তারের ফলে যেভাবে নগরবাসী মধ্যবিত্ত ও শ্রমিকের সংখ্যা বেড়েছে, সেহেতু শিল্পের স্বার্থে তাঁর বিস্তার নীতি গ্রহণ দরকার। জার্মানীর সমাজতন্ত্রী দল যেভাবে কাইজার সরকারের বিরোধিতা করছিল, সেদিক থেকে জনসাধারণের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দিতে কাইজার ওয়েল্ট পলিটিক বা ঔপনিবেশিক নীতি নেন। কাইজার এই সময় থেকে বিসমার্কের "জার্মানী একটি পরিতৃপ্ত দেশ" এই নীতিকে নাকচ করে বলতে থাকেন, "জার্মানী আদপেই পরিতৃপ্ত দেশ নয়। জার্মানী অসীম বিস্তারে সক্ষম।" কাইজার আরও বলেন যে, "বিশ্বের যেদিকে তাকাই, তা হল হয় ব্রিটিশ নতুবা ফরাসী উপনিবেশ। জার্মানীও সূর্যের নীচে বাস করে।"

ইতিমধ্যে কাইজার বিভিন্ন গোষ্ঠীর চাপে নৌ নির্মাণ নীতি গ্রহণ করেন। ক্যাপ্রিভির পতনের পর বৃদ্ধ প্রধানমন্ত্রী হোহেনলোর আমলে জার্মান নৌ-নির্মাণ নীতি গৃহীত হলে বিসমার্কের বিদেশ নীতির অপর একটি সূত্রকে কাইজার ছিঁড়ে ফেলেন। Welt politik কাইজারকে নৌ-নির্মাণ নীতি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে অথবা নৌ-নির্মাণ নীতি তাঁকে Welt politik এর পথে ঠেলে দেয় তা বলা কঠিন। শিল্প প্রসার, নৌ-নির্মাণ ও উপনিবেশবাদ বা Welt politik ছিল পরস্পরের সঙ্গে জৈব সংযোগযুক্ত। ইম্যানুয়েল জাইসের মতে, কেবলমাত্র সামরিক ও রাজনৈতিক প্রভুত্বের জন্যে কাইজার নৌ-নির্মাণ নীতি নেননি। লৌহ ও ইস্পাতশিল্পের মালিকরা চান যে, কাইজার তাঁর নৌ নির্মাণ নীতি নিলে জার্মানীর লৌহ-ইস্পাত শিল্পের দারুণ উন্নতি হবে। ক্রাপ কোম্পানী নৌ অস্ত্র নির্মাণের জন্যে উদগ্রীব হয়েছিল। জার্মানীর অধ্যাপকরা ছিলেন কট্টর জাতীয়তাবাদী ও প্যান জার্মান। তাঁরা নৌ-নির্মাণ নীতিকে জার্মানীর বিশ্বশক্তি হিসেবে বিকাশের ধাপ বলে মনে করতেন। জার্মান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আত্মশ্লাঘাকে পূরণের জন্যে নৌ-নির্মাণের দরকার হয়। রাজনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে জার্মানীর নৌ নির্মাণের দাবী নৌ-সেনাপতি তিরপিৎস তুলে ধরেন। তিরপিৎস বলেন যে, শিল্পদ্রব্য রপ্তানির বাজার ও উপনিবেশের ক্ষেত্রে ব্রিটেনই হল জার্মানীর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। ব্রিটেনের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্যে জার্মানীর চাই শক্তিশালী নৌবহর। প্যান জার্মানবাদীরা নৌ-বহরের জন্যে জেগে ওঠে। তারা এমন ভাব দেখায় যেন নৌবহর গঠিত হলেই জার্মানীর সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। তিরপিৎস বোঝান যে, জার্মানী প্রথম থেকেই সর্বাধুনিক যুদ্ধ জাহাজ গড়তে পারবে। ব্রিটেনকে তার পুরাতন জাহাজ ভেঙে বাড়তি খরচা করে আধুনিক জাহাজ তৈরি করতে হবে। তিরপিৎস বলেন তাঁর নৌ নির্মাণ নীতি হবে দ্বিমুখী। একদিকে যুদ্ধ জাহাজ নির্মাণ দ্বারা ব্রিটেনের সমান হওয়ার চেষ্টা। অপর দিকে ডুবো জাহাজ তৈরি করে যুদ্ধের সময় ব্রিটেনের জাহাজ ডুবিয়ে ব্রিটেনের শক্তি নামিয়ে আনা। ১৮৯৬ খ্রীঃ থেকে কাইজার বলে থাকেন "জার্মানীর ভবিষ্যৎ

সমুদ্রের আধিপত্য লাভের ওপরেই নির্ভর করছে" (The future of Germany lies on the Seas)।

এই ক্রিয়া-বিক্রিয়ার ফলে কাইজার ওয়েল্ট পলিটিক (Welt politik) নীতি নেন। ওয়েল্ট পলিটিক বলতে জার্মানী সঠিক কি চায় তা জার্মান নেতারা কখনও নির্দিষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেননি। সাধারণভাবে বলা যায় যে, ওয়েল্ট পলিটিক বলতে ইওরোপ মহাদেশের ক্ষেত্রে জার্মানীকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠা দান, বলকানে অর্থনৈতিক ও ঔপনিবেশিক আধিপত্য স্থাপন, নৌ-বহরের সম্প্রসারণ ও সামুদ্রিক প্রাধান্য লাভ, আফ্রিকায় সাম্রাজ্য বিস্তার, নিকট প্রাচ্যে বাণিজ্যিক আধিপত্য স্থাপন এবং দূরপ্রাচ্যে উপনিবেশ স্থাপন বুঝায়। ওয়েল্ট পলিটিকের অন্যতম প্রচারক ছিলেন হাইনবিখ-ট্রাইটসকি ও ম্যাক্সওয়েবার। এঁরা বলেন যে, জার্মানীর লোকসংখ্যা বৃদ্ধি, শিল্প বিস্তার প্রভৃতি ওয়েল্ট পলিটিক নীতিকে বাধ্যতামূলক করে। প্যান জার্মানবাদী ম্যাক্স ওয়েবার বলেন যে, জার্মান ইতিহাসের অনিবার্য পরিণতিই হল জার্মানীর বিশ্ব আধিপত্য। যেভাবে ব্র্যান্ডেনবার্গ রাজ্য প্রাশিয়াতে পরিণত হয়, প্রাশিয়া জার্মানীতে পরিণত হয়, সেভাবেই জার্মানী একটি বিশ্বশক্তি (world power)তে পরিণত হবে"। ম্যাক্স ওয়েবারের উপনিবেশবাদ ও সম্প্রসারণ তত্ত্ব গোটা জার্মানীতে দাবানলের মত ছড়ায়। কুর্ট রিজলার (Kurt Reisler) ওয়েল্ট পলিটিকের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা দেন যে, প্রতিবছর জার্মানীর লোকসংখ্যা ৮-৯ লক্ষ বাড়ছে। জার্মানীর Lebe usra um বা living space বা বাসস্থান চাই। জার্মানীর উদ্বৃত্ত শিল্পের বাজার চাই। সুতরাং উপনিবেশ দখল প্রয়োজন। নৌ-সেনাপতি ফন মূলার বলেন, "হয় জার্মানীর সামগ্রিক আধিপত্য চাই, নতুবা কিছুই চাই না" (All out or nothing)।

এভাবে কাইজার বিসমার্কীয় পররাষ্ট্র নীতির মূল সূত্রগুলি ছিন্ন করেন। এই বিস্তার নীতি অনুসরণ করে জার্মানীর হাতে যতটা উপনিবেশ ছিল, তদুপরি (ক) ১৮৯৭ খ্রীঃ চীনের কিয়াওটো ও শাংটুং অধিকার করা হয়। জার্মানী থেকে চীন পর্যন্ত জার্মান বাণিজ্য পোত চলাচল শুরু করে। সিমনোসেকির সন্ধির পর রাশিয়ার সঙ্গে যোগ দিয়ে জার্মান যুদ্ধ জাহাজ জাপানের বিরুদ্ধে প্রশান্ত মহাসাগরের মহড়ায় যোগ দেয়। (খ) জার্মান সংবাদপত্রগুলি ব্রিটেনের বিরুদ্ধে জনমতকে খোঁচাতে থাকে। (গ) দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্রিটেনের আধিপত্যের বিরুদ্ধে বুয়ার বিদ্রোহ দেখা দিলে, কাইজার (১৮৯৬ খ্রীঃ) বুয়ার রাষ্ট্রপতি ক্রুগারকে এক টেলিগ্রাম দ্বারা সাহায্যের আশ্বাস দেন। পরে ব্রিটেনের তীব্র প্রতিবাদে পিছু হঠেন। (ঘ) কাইজার তুরস্ক ভ্রমণে যান এবং তুরস্ক সুলতানের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেন। এই সময় (১৮৯৮ খ্রীঃ) বার্লিন-বাগদাদ রেলপথ নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়। এই রেলপথ তৈরি হলে বিশাল তুর্কীসাম্রাজ্যের বাজার ও কাঁচামাল জার্মানীর দখলে আসবে বলে ভাবা হয়। তুর্কী সুলতানের রাজ্য বা নিকট প্রাচ্য ছিল ব্রিটেন ও রাশিয়ার (sensitive area) বা স্নায়ুপ্রবণ অঞ্চল। এই অঞ্চলে জার্মান অনুপ্রবেশের চেষ্টা দুই শক্তিকে বিশেষ উৎকণ্ঠিত করে।(ঙ) জার্মানী দূরপ্রাচ্যে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ, ক্যারোলিন দ্বীপপুঞ্জ এবং স্যাডোয়া দ্বীপের কিছু অংশ অধিকার করে। কাইজারের ওয়েল্ট পলিটিক নীতি তাঁর তৃতীয় প্রধানমন্ত্রী ফন বুলোর আমলে বিশেষ অগ্রগতি লাভ করে। মিটেল ইওরোপা, মিটেল আফ্রিকা পরিকল্পনার কথা এই সময় বিশেষভাবে উচ্চারিত হয়।

কাইজারের নবনীতির প্রতিক্রিয়া ইওরোপীয় শক্তিগুলির মধ্যে বিশেষভাবে দেখা দেয়। রি-ইস্যুরেন্স চুক্তি রাশিয়ার সঙ্গে নাকচ করার পর রাশিয়ায় বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিলে মন্ত্রী হোহেনলো জারকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করেন। তাতে কোন কাজ হয়নি। ১৮৯৩ খ্রীঃ ফ্রাঙ্কো-রুশ চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে অনেক দেরীতে কাইজার বুঝেন যে, তাঁর ভুল হয়ে গেছে। ১৯০৪ খ্রীঃ

ইঙ্গ-ফরাসী চুক্তির পর কাইজার প্রমাদ গণেন। তিনি রাশিয়াকে ফরাসী মিত্রতা থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্যে রুশ-জার্মান সন্ধির প্রস্তাব দেন।[১] তিনি ১৯০৫ খ্রীঃ Bjorke বা জোর্কেতে এই সন্ধি প্রস্তাব দিলে জার তা নাকচ করেন।

ব্রিটেন কাইজারের ওয়েল্ট পলিটিক ও নৌ-নির্মাণ নীতির তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ব্রিটেনের কোন কোন রাজনীতিক মনে করতেন যে, জার্মানীর নৌ-নির্মাণ নীতি ব্রিটেনের পক্ষে সত্যিই বিপজ্জনক। জার্মানীর ঔপনিবেশিক নীতি অনেক কম বিপজ্জনক। যদি জার্মানী তার নৌ-নির্মাণ নীতিকে ব্রিটেনের প্রস্তাব মত সীমাবদ্ধ করে তবে ইঙ্গ-জার্মান মৈত্রী গঠন করা সম্ভব। কারণ এই সময় ফ্রান্স ও রাশিয়ার সঙ্গে উপনিবেশ নিয়ে ব্রিটেনের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছিল। রাশিয়ার সঙ্গে বিরোধের জন্যেই ব্রিটেন ১৯০২ খ্রীঃ রাশিয়ার শত্রু জাপানের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেছিল।

জার্মানীর কাছে মিত্রতার প্রস্তাব নিয়ে চেম্বারলেইন ও হ্যাল্ডেন (Haldiu) দুবার কাইজারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ব্রিটিশ নৌ-মন্ত্রী উইনস্টেন চার্চিল আবেদন করেন যে, "ইংলন্ডের পক্ষে নৌ-বহর হল তার বাঁচা-মরার প্রশ্ন এবং জার্মানীর ক্ষেত্রে নৌ-বহর হল বিলাসিতা মাত্র"। কাজেই কাইজার যেন নৌ-নির্মাণ নীতি সংযত করেন। কাইজার ও তাঁর প্রধানমন্ত্রী ফন বুলো ব্রিটেনের আবেদনে সাড়া দেননি। ফন বুলো বলেন যে, "জার্মানী তার হাত খোলা রাখতে চায়।" এর ফলে ব্রিটেন ১৯০৫ খ্রীঃ ইঙ্গ-ফরাসী আঁতাত এবং ১৯০৭-এ ইঙ্গ-রুশ আঁতাত গঠন করলে ত্রিশক্তি আঁতাত গঠিত হয়।

মরক্কোর সমস্যা

ইঙ্গ-ফরাসী মিত্রতার দৃঢ়তা পরীক্ষা করার জন্যে কাইজার ফরাসী উপনিবেশ মরক্কোর দিকে হাত বাড়ান। তিনি মরক্কোর সুলতানকে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সাহায্য দানের কথা বলেন। আগাদির বন্দরে ১৯১১ খ্রীঃ অকস্মাৎ প্যান্থার নামে একটি জার্মান রণতরী হাজির হয়। কিন্তু ইঙ্গ-ফরাসী যৌথ নৌ-মহড়ার ফলে, কাইজার মরক্কো হতে হাত ওঠান। এভাবে ভুল নীতির দ্বারা কাইজার ফ্রান্স, ইংলন্ড ও রাশিয়াকে তাঁর বিরুদ্ধে জোট গড়তে প্ররোচনা দেন। শেষ পর্যন্ত এই বিরোধ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্যে কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের দায়িত্ব

(Responsibility of Kaiser William II for the outbreak of First World War) : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্যে জার্মান সম্রাট কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম দায়ী ছিলেন কিনা এবিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক দেখা যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর প্যারিসের শান্তি বৈঠকে বিজয়ী মিত্রশক্তি জার্মানীকে যুদ্ধাপরাধী ঘোষণা করে। কাইজারকে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে শাস্তি দানের চেষ্টাও করা হয়। মিত্রশক্তির সমর্থক আঁতাতপন্থী ঐতিহাসিকেরাও কাইজারের নীতিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্যে দায়ী করে থাকেন।

জার্মান জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিক ভ্যালেন্টাইন (Valentine) উপরোক্ত মতের বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন যে, ত্রিশক্তি আঁতাত গঠনের পর ইওরোপের দুই বৃহৎ স্থলশক্তি ও বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নৌ-শক্তি একযোগে চারদিক থেকে জার্মানীকে বেষ্টন করে। এই বেষ্টিত (Encircled) অবস্থায় জার্মানী আক্রান্ত হওয়ার পর আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসেবে কাইজার অস্ট্রিয়ার পক্ষ নিয়ে যুদ্ধে যোগ দেন। (২) সৈন্যবলের দিক থেকে ফ্রান্স ও রাশিয়া ত্রিশক্তি আঁতাতের এই দুই শক্তির স্থলসৈন্যের সংখ্যা জার্মানী অপেক্ষা অনেক বেশী ছিল। তদুপরি, ব্রিটেন তার উপনিবেশ থেকে প্রচুর সেনা আমদানি করতে সক্ষম ছিল। ব্রিটিশ নৌ-বহর ছিল উত্তর সমুদ্র, বাল্টিক,

১· Immanuel Zeiss.

ইংলিশ চ্যানেলে অত্যন্ত শক্তিশালী। জার্মানীকে ব্রিটিশ একাই জলপথে ঘায়েল করতে সক্ষম ছিল। জার্মানীর নৌ-নির্মাণ হলেও তা ব্রিটেনকে বিপন্ন করার ক্ষমতা ধরত না। তদুপরি ছিল ফ্রান্সের বিশাল নৌ বহর, যা পশ্চিম ভূমধ্যসাগরে আধিপত্য ভোগ করত। সুতরাং সামরিক বলে জার্মানী কখনও ত্রিশক্তি আঁতাতের সমকক্ষ ছিল না।

জার্মান ঐতিহাসিক ওলফ্ গ্যাং হেইগ (Wolfgang Haig) বলেন যে, ইওরোপীয় শক্তিগুলি যথা ব্রিটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়া মনস্তাত্ত্বিক ও কূটনীতির দিক থেকে তাদের নিজ নিজ প্রাধান্য কায়েমী স্বার্থকে রক্ষা করতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ছিল। জার্মানীর মত একটি নতুন রাষ্ট্রের উন্নতি তারা সহ্য করতে পারেনি। জার্মানীর প্রধান দোষ এই ছিল যে, জার্মানী ইওরোপের বৃহৎ শক্তিগুলির অন্যতম হতে চেয়েছিল। এজন্যই জার্মানীর বিরুদ্ধে প্রতিহিংসামূলক মনোভাব নিয়ে এই শক্তিগুলি ভার্সাই সন্ধির দ্বারা জার্মানীকে ধ্বংস করতে চায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরেও একই কারণে জার্মানীকে ব্যবচ্ছেদ করা হয়।

মার্কিন ঐতিহাসিক জন ফে (Fay) তাঁর Origins of First World War গ্রন্থে বলেন যে, আঁতাতপন্থী ঐতিহাসিকরা যাই বলুন না কেন, ত্রিশক্তি আঁতাত গঠিত হলে জার্মানী বিপন্ন হয়। কাইজার তাতে কিছুটা ভুলভ্রান্তি করেন। আঁতাত শক্তিগুলি অস্ত্র আস্ফালনের চেষ্টা না করে ধৈর্য্য ধরে কূটনৈতিক আলোচনা অথবা আন্তর্জাতিক কংগ্রেস আহ্বান করে বিরোধের নিষ্পত্তি করতে পারত। মিত্রশক্তি সে চেষ্টা করেনি। ১৯১৩ খ্রীঃ পর কাইজারের ধারণা হয় যে, বলকানে যুদ্ধের জন্যে অষ্ট্রিয়া প্রস্তুত হচ্ছে। অষ্ট্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করা তাঁর সাধ্য নয় দেখে তিনি শেষ চেষ্টা হিসেবে ফ্রান্স ও রাশিয়ার সঙ্গে সমঝোতার চেষ্টা করেন। ফ্রান্সের সঙ্গে আপোষের আশায় তাঁর মাতা রানী ফ্রেডারিকাকে কাইজার ফ্রান্সে শুভেচ্ছা সফরে পাঠান। কিন্তু ফরাসী জনতা রানীকে অপমানিত করায় তিনি সফর বন্ধ করে দেশে ফিরে যান।

রাশিয়ার গোপন সহায়তা পেয়ে সার্বিয়া অষ্ট্রিয়াকে আঘাত করার জন্যে মরিয়া হয়। সেরাজেভোর হত্যাকাণ্ডের জন্যে সার্বিয়া সরকারের গোপন চক্রান্ত দায়ী ছিল। রুশমন্ত্রী আইজোভস্কি এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, একটি বড় রকমের যুদ্ধ না বাধলে রাশিয়ার ওপর চাপান বার্লিনের সন্ধির সামুদ্রিক শর্ত ভাঙা যাবে না। গর্ডন ক্রেইগের মতে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্যে জার্মানী একা দায়ী ছিল না। ফ্রান্সের আলসাস-লোরেন পুনরুদ্ধারের জন্যে যুদ্ধং দেহি মনোভাব, বলকানে অষ্ট্রো-রুশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ব্রিটেনের নৌ-আধিপত্য ও উপনিবেশে প্রাধান্য রক্ষার জন্যে যুদ্ধের প্রস্তুতি প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে ডেকে আনে।

এ সকল কথা বলার পরেও প্রশ্ন আসে যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্যে কাইজারের দায়িত্বকে লঘু করা যাবে না। অধুনা জার্মান ঐতিহাসিক ইম্যানুয়েল জাইস, জেমস জোল, ফ্রিৎস ফিশার প্রভৃতি এবিষয়ে নতুনভাবে আলোকপাত করেছেন। (১) ওয়েল্ট পলিটিক নীতি গ্রহণ করার ফলে কি আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে কাইজার তা ভালভাবে বিচার করেননি। বিসমার্কের অনুসৃত Satiation বা 'আত্মতৃপ্তি' নীতিকে ত্যাগ করা ঠিক কাজ হয়নি। ইম্যানুয়েল জাইসের মতে, কাইজারের উচিত ছিল অন্যান্য বিশ্বশক্তির সঙ্গে যোগ দিয়ে ঔপনিবেশিক নীতি অনুসরণ করা। তাহলে জার্মানীর বিরুদ্ধে বৃহৎ শক্তিগুলি এক জোট হত না। কিন্তু কাইজারের নীতিই ছিল, "Either whole or nothing" "হয় সবটা চাই, নতুবা কিছুই চাই না।" এর ফলে তিনি এক ঘরে হয়ে পড়েন। দ্বিতীয়তঃ, কাইজার একই সঙ্গে নৌ-নির্মাণ, উপনিবেশ দখল, দূরপ্রাচ্য ও আফ্রিকায় প্রসার নীতি গ্রহণ করেন। এর ফলে তাঁর বিরুদ্ধে সন্দেহ ও অবিশ্বাস তীব্র হয়। তিনি ধৈর্য্য ধরে একের পর এক নীতি অনুসরণ করার চেষ্টা করেননি। তৃতীয়তঃ, ওয়েল্ট পলিটিক বলতে কাইজার ঠিক কি চান, এবং কতটা চান তা তিনি নির্দিষ্টভাবে ব্যাখ্যা না করায়, তাঁর বিরুদ্ধে সন্দেহ ও অবিশ্বাস তীব্র হয়। তিনি একসঙ্গে প্রায় সকল বৃহৎ

শক্তির বিরুদ্ধে যেতে চেষ্টা করে ভুল করেন। তাঁর সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে তিনি ভেদনীতি খাটাতে ব্যর্থ হন।

কাইজার রাশিয়ার সঙ্গে রি-ইনস্যুরেন্স চুক্তির গুরুত্ব বোঝেননি। তাঁর অষ্ট্রিয়া-ঘেঁসা নীতির ফলে একেই জার সরকারের মনে সন্দেহ দেখা দেয়। কারণ অষ্ট্রিয়া ছিল বলকানে রাশিয়ার শত্রু। তদুপরি, তিনি রি-ইনস্যুরেন্স সন্ধি এককভাবে নাকচ করায় জার অপমানিত বোধ করেন। যদিও মন্ত্রী হোহেনলো জারের অসন্তোষ দূর করার চেষ্টা করেন, কিন্তু কাইজার রাশিয়ার ওপর কঠোর শর্তে বাণিজ্যিক সন্ধি স্থাপনের উদ্যোগ নিলে রাশিয়ার সঙ্গে বিচ্ছেদ পাকা হয়ে যায়। ১৮৯৩ খ্রীঃ ফ্রাঙ্কো-রুশ ও ১৯০৭-এ ইঙ্গ-রুশ আঁতাত স্থাপিত হওয়ার পর কাইজার রাশিয়াকে নিজ পক্ষে আনার যে সকল চেষ্টা করেন তা ছিল গাছের গোড়া কেটে, গাছের মাথায় জল ঢালার মতই ব্যর্থ চেষ্টা মাত্র। জাইসের মতে, কাইজারের এই প্রচেষ্টা যে আন্তরিক নয় তা জার বুঝে ফেলেন। তিনি বুঝেন যে, জার্মানির আসল উদ্দেশ্য ছিল ফ্রাঙ্কো-রুশ মৈত্রী জোট ভেঙে ফেলা। জার বুঝে ফেলেন যে, অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে দ্বিশক্তি চুক্তির ফলে জার্মানী অষ্ট্রিয়ার স্বার্থকেই নিজ স্বার্থ বলে জ্ঞান করত।

কাইজার ব্রিটেনের সঙ্গে প্রকৃত মিত্রতা চাননি। ওয়েল্ট পলিটিক নীতি গ্রহণের পর থেকেই জার্মানীতে একটি তীব্র ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব দেখা দিয়েছিল। তার সঙ্গে নৌ-নির্মাণ নীতি যুক্ত হলে ব্রিটেন বিপন্ন বোধ করে। জার্মানী যদি সত্যিই নৌ-নির্মাণ নীতিতে সফল হত তাহলে জার্মান নৌ বহর উত্তর সাগর ও ইংলিশ চ্যানেল ঢুকে ইংলন্ডের নিরাপত্তা বিপন্ন করত। তথাপি ব্রিটেন কাইজারের সঙ্গে আপোষের চেষ্টায় চেম্বারলেইন ও হ্যাল্ডেন মিশন জার্মানীতে পাঠিয়ে ব্যর্থ হয়। এরপর ব্রিটেন ত্রিশক্তি আঁতাত গঠনের জন্যে ব্যস্ত হয়। কাইজারের আপোষ বিরোধী নীতির ফলেই ব্রিটেন ত্রিশক্তি আঁতাত গঠন করে। জার্মান প্রধানমন্ত্রী ফন বুলো "খোলা হাত" নীতি নেওয়ায় তিনি ব্রিটেনের আপোষ প্রস্তাবে আন্তরিকতা দেখাননি। জার্মান ঐতিহাসিকরা ত্রিশক্তি আঁতাতের ফলে জার্মানী বেষ্টিত হয় বলে যে অভিযোগ করেন তার কোন ভিত্তি নেই। ত্রিশক্তি আঁতাতের অনেক আগেই জার্মান সেনাপতি স্লিফেন পরিকল্পনা তৈরি করেন। ফ্রাঙ্কো-রুশ আঁতাতের পরেই এই পরিকল্পনা রচনা করা হয়। এই পরিকল্পনায় ফ্রান্সের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক যুদ্ধের কথা ভাবা হয়েছিল। স্লিফেন পরিকল্পনায় রাশিয়ার সঙ্গে মৌখিক আপোষের কথা চালু রেখে এবং বলকানে অষ্ট্রিয়ার সেনা স্থাপন করে রাশিয়াকে নিরস্ত্র রেখে, জার্মানীর পূর্ণ শক্তি নিয়ে বেলজিয়ামের মধ্য দিয়ে ফ্রান্স আক্রমণের কথা বলা হয়। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে এই আক্রমণকে Preventive war বা "প্রতিরোধ মূলক যুদ্ধ" আখ্যা দেওয়া হয়। ১৯১৪ খ্রীঃ পর্যন্ত কাইজার বারে বারে স্লিফেন পরিকল্পনার কথা ভাবেন এবং অবশেষে ১৯১৪ খ্রীঃ তা প্রয়োগ করেন। আগাম যুদ্ধের কথা ভেবে ফ্রান্সকে আক্রমণের পরিকল্পনা রচনা প্রমাণ করে যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্যে কাইজারের আগ্রাসী নীতি দায়ী ছিল। তাঁর হাত আদৌ পরিষ্কার ছিল না । স্লিফেন পরিকল্পনার কথা মিত্রশক্তি জানতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, ত্রিশক্তি আঁতাত ছিল জার্মান আগ্রাসনের সম্ভাবনাকে contain বা সীমাবদ্ধ রাখার প্রচেষ্টা। এর বিরুদ্ধে জার্মানী গোড়া থেকেই "Eink reising" আইন ক্রিভ্যুর বা বেষ্টন করা হচ্ছে বলে সোরগোল তুলেছিল। হলষ্টিন, ফন বুলো তাঁদের রাইখষ্ট্যাগ বক্তৃতা ১৯০৬ 'বেষ্টনীর' কথা বলেন। ডয়েশ রিবিউ পত্রিকায় মার্শাল স্লিফেনও এ সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখেন। কিন্তু এই চীৎকার ছিল জার্মানীর প্রচার মাত্র। আসলে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে স্লিফেন পরিকল্পনা প্রয়োগের জন্যে "বেষ্টনীর' অভিযোগ তোলা হয়।" বেষ্টনীর অভিযোগ ছিল একটি "উড়ন্ত পরীর" গল্প মাত্র (A fairy tale)।

এই যুগের জার্মানী ছিল মহা আত্মগর্বিত দেশ। জার্মান সরকার মনে করতেন যেন তাঁরা বিশ্বে নব বিধান স্থাপনের অধিকারী। অন্য কোন দেশের কোন বক্তব্য থাকতে পারে কী না তাঁরা

স্বীকার করতেন না। টিউটনিক সভ্যতার ধারক, বাহকরূপে জার্মানী নিজেকে মনে করত। প্যান জার্মানবাদীরা বলত যে, জার্মান রাইখ, বিশ্ব রাইখে পরিণত হতে চলেছে। কাইজারও এই আত্মগর্বী মনোভাবের সামিল হন। কূটনৈতিক শিষ্টাচার ও বিনীত বাক্য ব্যবহার তিনি বর্জন করেন। ত্রিশক্তি আঁতাত গঠিত হলেও ব্রিটেন তখনও যুদ্ধ এড়িয়ে চলার কথাই ভাবত এবং ইওরোপে স্থিতাবস্থা চাইত। কাইজারের প্ররোচনামূলক নীতিই ত্রিশক্তি আঁতাতকে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের কথা ভাবতে বাধ্য করে। তিনি মরক্কো সংকট ও রাশিয়া সংকট সৃষ্টি করায় ত্রিশক্তি আঁতাতকে সামরিক চুক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়। কাইজার সহ জার্মান নেতারা জানতেন যে, ওয়েল্ট পলিটিক ও নৌ-নীতি যুদ্ধ অনিবার্য করবে। এজন্য তাঁরা ত্রিশক্তি আঁতাতকে জার্মানীর প্রসারণ নীতির বিরুদ্ধে একটি বাঁধ হিসাবেই দেখেন। যদি জার্মানী ১৯১৪ খ্রীঃ মিত্রহীন হয়, তা ছিল জার্মানীর ওয়েল্ট পলিটিক নীতির অনিবার্য পরিণাম।

ইতিমধ্যে জার্মানী তার প্রধান মিত্র অষ্ট্রিয়া ও বলকান সমস্যার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে। জার্মান নেতারা মনে করেন যে, ইওরোপে জার্মানীর জনসংখ্যার বিস্তার ও বাণিজ্য বিস্তারের উপযুক্ত স্থান হল বলকান। মিটেল ইওরোপা পরিকল্পনা অনুযায়ী, অষ্ট্রিয়াকে মুখপাত্র করে, বলকান থেকে রাশিয়াকে হঠিয়ে দিতে জার্মানী মনস্থ করে। ১৯১২ খ্রীঃ থেকেই কাইজার এসম্পর্কে মনঃস্থির করে ফেলেন। এজন্য যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হয়। কাজেই বলকানে অষ্ট্রিয়ার আগ্রাসন ও সার্বিয়ার বিরুদ্ধে অষ্ট্রিয়ার যুদ্ধের হুমকিতে কাইজার পূর্ণ সমর্থন দেন। অষ্ট্রিয়ার যুদ্ধমন্ত্রী কাউন্ট ইটজেনডর্ক ছিলেন যুদ্ধের পক্ষে। কিন্তু অষ্ট্রিয়ার মধ্যবিত্ত ও হাঙ্গেরীয় অভিজাতরা ছিলেন যুদ্ধের বিপক্ষে।

ঠিক এই সময় (১৯১৪ খ্রীঃ জুলাই) সেরাজেভো হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হলে অষ্ট্রিয়ার যুদ্ধবাদীরা সুযোগ পান। তথাপি অষ্ট্রিয়ার বিদেশ মন্ত্রী কাউন্ট বার্থোল্ড সার্বিয়ার সঙ্গে ভার্সাই সঙ্কটের মীমাংসায় আগ্রহ দেখান। কিন্তু কাইজার সার্বিয়ার বিরুদ্ধে চরমপত্র প্রেরণ ও যুদ্ধ ঘোষণায় অষ্ট্রিয়া সরকার বাধ্য করেন। জার্মান চ্যান্সেলর বেটম্যান হলেওয়ো জার্মানীর যুদ্ধবাজ গোষ্ঠীকে সংযত করতে কোন উদ্যোগ নেননি। কাইজার বিভিন্ন গোষ্ঠীর চাপের মুখে তাঁর প্রধানমন্ত্রীর কাছে সৎ পরামর্শ পাননি। ফলে তিনি যুদ্ধ ঘোষণার নীতি সমর্থন করেন। কাইজারের প্রাশিয় সেক্রেটারি ১৯১৪ খ্রীঃ ১৮ই জুলাই জার্মান সামরিক ও অসামরিক উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের এক গোপন নোট দ্বারা জানান যে, অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে সার্বিয়ার যুদ্ধ আসন্ন। সার্বিয়ার পিছনে আছে রাশিয়া। এই যুদ্ধে অষ্ট্রিয়ার পরাজয় হলে জার্মানীর দারুণ ক্ষতি হবে। জার্মানীর সকল কর্মচারী একথা স্মরণ রেখে যেন প্রস্তুত থাকে। সুতরাং বিভিন্ন দিক থেকে বিচার করলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব থেকে কাইজার অব্যাহতি পেতে পারেন না। তবে এই সঙ্গে বলা দরকার যে, অন্যান্য শক্তিগুলিরও হাত পরিষ্কার ছিল না।

ত্রিশক্তি আঁতাত (The Formation of the Triple Entente) : ১৮৯০ খ্রীঃ বিসমার্কের পতনের পর জার্মান সম্রাট দ্বিতীয় কাইজার উইলিয়াম তাঁর মন্ত্রী ফ্রেডারিক হলষ্টিনের পরামর্শে রাশিয়ার সঙ্গে অনাক্রমণমূলক রি-ইনস্যুরেন্স চুক্তি বাতিল করেন। এর ফলে রাশিয়ার মনে এই ধারণা জন্মায় যে, জার্মানী রাশিয়া অপেক্ষা অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে মিত্রতা বজায় রাখতে আগ্রহী। রুশ জারের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, বল্‌কানে রাশিয়ার বিরুদ্ধে অষ্ট্রিয়াকে জার্মানী সাহায্য করতে ইচ্ছুক। কাইজার রাশিয়ার সঙ্গে কোন আলোচনা না করে একতরফাভাবে রি-ইনস্যুরেন্স সন্ধি নাকচ করায় জার নিজেকে অপমানিত মনে করেন। তাঁর ধারণা হয় যে, রুশমৈত্রীকে কাইজার অবান্তর মনে করছেন। এমতাবস্থায় রুশ মন্ত্রীসভা স্থির

অষ্ট্রো-জার্মান চুক্তি স্থাপন ও রিইনস্যুরেন্স সন্ধি নাকচের প্রতিক্রিয়া

করে যে, জার্মান-অস্ট্রিয়া জোটের বিরুদ্ধে শক্তিসাম্য রক্ষার জন্যে রাশিয়ার উচিত ফ্রান্সের সঙ্গে জোটবদ্ধ হওয়া। ১৮৭০ খ্রীঃ ফ্রাঙ্কো-জার্মান যুদ্ধের পর থেকে ফ্রান্সের সঙ্গে জার্মানীর ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। সুতরাং মিত্রহীন ফ্রান্সের সঙ্গে রাশিয়া যোগ দিলে জার্মান জোটের বিরুদ্ধে শক্তিসাম্য স্থাপিত হবে বলে মনে করা হয়। রুশ মন্ত্রী কার্‌কফ (Karkoff) ছিলেন ফরাসী মৈত্রীর সমর্থক। তিনি জার তৃতীয় আলেকজান্ডারকে বোঝান যে, "রাশিয়ার কাঁধে চড়ে জার্মানী আজ এত বড় হয়েছে। অকৃতজ্ঞ জার্মানী এখন রাশিয়াকে পরিত্যাগ করেছে।"

ইতিমধ্যে জার্মান কাইজার কয়েকটি হঠকারী কাজ করায়, তা রুশ সরকারের পক্ষে অসহনীয় হয়ে পড়ে।[১] (১) বুলগেরিয়ার সিংহাসনে এক জার্মান রাজবংশ স্থাপন করার পর, জার্মান সেনাপতিদের দ্বারা বুলগেরীয় সেনাদল গঠনের চেষ্টা করা হলে, রাশিয়া অসন্তুষ্ট হয়। পূর্ব ইওরোপে জার্মান অনুপ্রবেশ ঘটলে রুশ স্বার্থ বিঘ্নিত হয়। (২) ১৮৯৭ খ্রীঃ রাশিয়ায় ভয়ানক অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেয়। রাশিয়ার মুদ্রা, রুবলের দাম দ্রুত পড়তে থাকে। এই অর্থ সঙ্কট কাটাবার জন্যে জার সরকার জার্মানীর নিকট ঋণ চান। কিন্তু কাইজার তা প্রত্যাখ্যান করেন। জার্মান সংবাদপত্রে বলা হয় যে, জার সরকার দেউলিয়া হয়ে গেছে। এজন্য জার অপমানিত জ্ঞান করেন। (৩) কাইজারের মন্ত্রী ফ্রেডারিক্ হলষ্টিন ছিলেন ঘোর রুশ বিরোধী। তিনি রাশিয়ার বিরুদ্ধে অপমানজনক মন্তব্য করেন। (৪) কাইজার ইংলন্ডের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনের আগ্রহ প্রকাশ করেন। এদিকে ইংলন্ডের সঙ্গে তিব্বত, ইরাণ প্রভৃতি দেশ নিয়ে রাশিয়ার বিবাদ ছিল। সুতরাং ইংলন্ডের সঙ্গে জার্মানী মিত্রতা স্থাপনের চেষ্টা করলে রাশিয়ায় জার্মানী সম্পর্কে সন্দেহ ও অবিশ্বাস বাড়ে।

কাইজারের রুশ বিরোধী নীতি

ফরাসী মন্ত্রী ডেলক্যাসি ফ্রান্সের মিত্রহীনতা দূর করার জন্যে রুশ মিত্রতার জন্যে গভীর আগ্রহ দেখান। রুশ নেতারা ফ্রান্সের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনের ইচ্ছা করায় ডেলক্যাসি সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন। রাশিয়ার অর্থসঙ্কট মোচনের জন্যে ফরাসী সরকার মাত্র ৩% সুদে বিরাট অঙ্কের অর্থ রাশিয়াকে ঋণ দেয়। ফরাসী সদিচ্ছার এই প্রকাশ রুশ সরকারকে প্রভাবিত করে। ফ্রান্স থেকে এক নৌ-বহর শুভেচ্ছা সফরে রাশিয়ার ক্রনষ্ট্যাড বন্দরে আসে। জার নিজে এই বহরের অভিবাদন নেন। ঐতিহাসিক রেনেকারীর মতে, প্রজাতন্ত্রী ফ্রান্সের প্রতি রাজতন্ত্রী জারের যে বিদ্বেষ ছিল তা দূর হয়ে যায়। ফরাসী নৌ-সেনাদের চমৎকার কুচকাওয়াজ দেখে জার হৃষ্টচিত্তে ফরাসী প্রজাতন্ত্রের জাতীয় সঙ্গীত শুনে, ফরাসী প্রজাতন্ত্রের ত্রিবর্ণ পতাকার নীচে দাঁড়িয়ে অভিবাদন নেন। এর পর রুশ সেনাপতি ওব্রুচেভ এবং ফরাসী সেনাপতি বউসডাফ্রি উভয় দেশের মধ্যে এক সামরিক চুক্তি সম্পাদন (১৮৯১ খ্রীঃ) করেন। এর পর ১৮৯৩ খ্রীঃ ফ্রাঙ্কো-রুশ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এতে স্থির হয় যে, যদি জার্মানী ফ্রান্সকে আক্রমণ করে অথবা জার্মানীর সমর্থন নিয়ে ইতালী ফ্রান্সকে আক্রমণ করে তবে রাশিয়া জার্মানীর বিরুদ্ধে সেনা সমাবেশ করবে। অপরদিকে, যদি জার্মানী রাশিয়াকে আক্রমণ করে, অথবা জার্মান সমর্থন নিয়ে অস্ট্রিয়া রাশিয়াকে আক্রমণ করে তবে ফ্রান্স জার্মানীর বিরুদ্ধে সেনা সমাবেশ করবে। এভাবে রুশ-ফরাসী জোট গঠিত হয়। ফ্রান্স বা রাশিয়ার কেউ জার্মানীর সঙ্গে স্বতন্ত্রভাবে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করবে না। ফ্রাঙ্কো-রুশ চুক্তি ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক চুক্তি। এর ফলে ফ্রান্সের মিত্রহীনতা দূর হয়। জার্মানীর বিরুদ্ধে জোট গঠনের সূচনা হয়।

ফ্রাঙ্কো-রুশ চুক্তি ১৮৯৪ খ্রীঃ

১· Rene Carrle—Diplomatic History of Europe. P. 209.

এদিকে জার্মান নৌ-সেনাপতি তিরপিৎসের নেতৃত্বে জার্মান নৌ-নির্মাণ ১৯০০ খ্রীঃ থেকে আরম্ভ হলে ব্রিটেনে আতঙ্ক দেখা দেয়। ব্রিটেনের নেতারা আশঙ্কা করেন যে, জার্মানী শীঘ্রই ব্রিটেনের নৌ-শক্তির সমান হবে। নৌ-শক্তি গঠন করে জার্মানী ব্রিটেনের সাম্রাজ্য গ্রাস করবে। জার্মান নৌ-বহর উত্তর সাগরে প্রাধান্য পেলে ব্রিটেনের নিরাপত্তা বিপন্ন হবে। জার্মানীর মধ্যপ্রাচ্যে তুর্কী সাম্রাজ্যে এবং দূর প্রাচ্যে বিস্তার নীতিও ব্রিটেনে উদ্বেগ সৃষ্টি করে। বুয়ার যুদ্ধের সময় কাইজারের শত্রুতার কথা ব্রিটেন ভোলেনি। এই পরিস্থিতিতে ব্রিটেনের একদল নেতা মনে করেন যে, ব্রিটেনের উচিত জার্মানীর সঙ্গে মিত্রতাবদ্ধ হওয়া। যেহেতু আফগানিস্থান, তিব্বত ও পারস্য এবং মাঞ্চুরিয়া নিয়ে ব্রিটেনের সঙ্গে রাশিয়ার বিবাদ ছিল। অপরদিকে মিশর ও মরক্কো নিয়ে ফ্রান্সের সঙ্গে ব্রিটেনের বিবাদ ছিল; সেহেতু ফ্রাঙ্কো-রুশ জোটের বিরুদ্ধে ইঙ্গ-জার্মান জোটের দ্বারা শক্তিসাম্য রক্ষা করা যাবে বলে মনে করা হয়। ব্রিটিশ মন্ত্রী চেম্বারলেইন ও কূটনীতিজ্ঞ লর্ড হলডেন ছিলেন এই মতের সমর্থক। (১) কিন্তু চেম্বারলেইনের মিত্রতা প্রস্তাবে কাইজার কর্ণপাত না করায় তিনি হতাশ হন। (২) লর্ড হলডেন জার্মানীতে মিত্রমিশন নিয়ে গেলে কাইজার তা অগ্রাহ্য করেন। তথাপি ১৯০২ খ্রীঃ পর্যন্ত ব্রিটেন জার্মানীকে কাছে আনার চেষ্টা চালায়। ১৯০২ খ্রীঃ ইঙ্গ-জাপান মৈত্রী ছিল রুশ বিরোধী জোট। যেহেতু ১৮৯৩ খ্রীঃ ফ্রাঙ্কো-রুশ আঁতাত দ্বারা রাশিয়া জার্মানীর শত্রু দেশে পরিণত হয়, সেহেতু ইঙ্গ-জাপান মিত্রতা চুক্তি দ্বারা ব্রিটেন একদিকে জাপানকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ব্যবহার করে, অপর দিকে জার্মানীকেও সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু কাইজার সরকারের তীব্র ব্রিটিশ বিরোধিতা ও নৌ নির্মাণ নীতি রচনা করার ফলে ইঙ্গ-জার্মান মিত্রতার সম্ভাবনা বিনষ্ট হয়।

জার্মানীর নৌ পরিকল্পনা : জার্মান মিত্রতাবাদী ব্রিটিশ নেতাদের বিফলতা

এমতাবস্থায় ব্রিটিশ মন্ত্রীসভা স্থির করে যে, ফ্রান্স ও রাশিয়ার সঙ্গে ঔপনিবেশিক বিরোধ মিটিয়ে ফ্রান্স ও রাশিয়ার সঙ্গে ব্রিটেনের জোটবদ্ধ হওয়া উচিত। ফরাসী মন্ত্রী থিওফিল ডেলক্যাসী ছিলেন অত্যন্ত ধীরবুদ্ধি লোক। তিনি বিবেচনা করেন ব্রিটেনের সঙ্গে ফ্রান্সের বিরোধের বিষয়গুলি হল গুরুত্বহীন। জার্মানীর সঙ্গে ফ্রান্সের বিরোধ হল মৌলিক। সুতরাং ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে বৃহৎ স্বার্থ রক্ষার জন্যে ফ্রান্সের কাজ করা উচিত।[১] এজন্য তিনি ব্রিটেনের সঙ্গে আপোষ-রফায় সম্মত হন। ব্রিটেনের রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড ফ্রান্স পরিদর্শনে গেলে তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন দেওয়া হয়। সপ্তম এডওয়ার্ড স্বদেশে এসে ব্রিটিশ মন্ত্রীসভাকে ফ্রান্সের আন্তরিকতার কথা বলেন।

ফ্রান্সের সহিত মীমাংসা সপ্তম এডওয়ার্ডের দৌত্য

এর ফলে ১৯০৪ খ্রীঃ ইঙ্গ-ফরাসী কনভেনশন বা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। (১) মিশরে ব্রিটেনকে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠায় বাধা না দিতে ফ্রান্স প্রতিশ্রুতি দেয়। (২) ব্রিটেন মরক্কোয় ফ্রান্সকে বাধা না দিতে প্রতিশ্রুতি দেয়। (৩) শ্যাম দেশ, মাদাগাস্কার, নিউ ফাউন্ডল্যান্ড প্রভৃতি স্থানে উভয় দেশ নিজ নিজ কর্তৃত্বের এলাকা স্থির করে। (৪) ইঙ্গ-ফরাসী সন্ধির গোপন শর্তে উভয় স্বাক্ষরকারী দেশ এই সন্ধির শর্তকে কার্যকরী করতে পরস্পরকে সাহায্য করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। (৫) ভূমধ্যসাগরে ফরাসী নৌ-বহর এবং ইংলিশ চ্যানেল ও উত্তর সমুদ্রে ব্রিটিশ নৌ-বহর দ্বারা জার্মানীর বিরুদ্ধে শক্তিসাম্য রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। ইঙ্গ-ফরাসী চুক্তিকে আঁতাত কর্ডিয়াল বা ঘনিষ্ঠ মিত্রতা বলা হয়। এর গুরুত্ব এই যে, এই সন্ধির দ্বারা ইংলন্ড ও ফ্রান্স জার্মানীর বিরুদ্ধে পরস্পরের স্বার্থরক্ষায় জোটবদ্ধ হয়। জার্মান নৌ-সেনাপতি তিরপিৎসের পরিকল্পনা ছিল বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ব্রিটেনের উপনিবেশ রক্ষার জন্যে ব্রিটিশ নৌশক্তিকে ছড়িয়ে দিতে বাধ্য করা হলে,

ইঙ্গ-ফরাসী চুক্তি ১৯০৫ খ্রীঃ

১· Gordon Craig. P. 307.

ইংলিশ চ্যানেল ও উত্তর সাগরে ব্রিটেনের নৌ-বহরের প্রবলতা হ্রাস পাবে। কিন্তু ইঙ্গ-ফরাসী সন্ধির দ্বারা ফরাসী নৌ-বহর ভূমধ্যসাগরে রক্ষার দায়িত্ব নিলে ব্রিটেন ইংলিশ চ্যানেল আত্মরক্ষা দৃঢ় করে।

ইতিমধ্যে দূর প্রাচ্যে রুশ-জাপান যুদ্ধে (১৯০৪—০৫ খ্রীঃ) জাপানের নিকট রাশিয়া পরাস্ত হয়। এর ফলে দূর প্রাচ্যে রুশ সাম্রাজ্য বিস্তারের সম্ভাবনা দূর হয়।রাশিয়ার এই পরাজয়ের ফলে ব্রিটেনের সঙ্গে রাশিয়ার মাঞ্চুরিয়া অঞ্চলে সাম্রাজ্য বিস্তার নিয়ে বিরোধের তীব্রতা কমে। দূর প্রাচ্যে পরাজয়ের পর রাশিয়া পুনরায় বলকানের দিকে দৃষ্টি দেয়। এজন্য জার্মানী ও অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে রাশিয়ার যুদ্ধের সম্ভাবনা বাড়ে। এমতাবস্থায় রাশিয়া ব্রিটেনের সঙ্গে মিত্রতা লাভে আগ্রহ দেখায়।

ব্রিটেনের সঙ্গে রুশ বিরোধের তীব্রতা হ্রাস

ব্রিটেনের দিক থেকে রুশ মিত্রতার প্রয়োজন অনুভূত হয়। জার্মানীর ন্যায় এক বিরাট স্থলশক্তিকে পরাস্ত করতে হলে একা ফ্রান্সের স্থলবাহিনী যথেষ্ট ছিল না। ফ্রান্স ও রাশিয়ার যুগ্ম বাহিনীর সাহায্যে জার্মান স্থল শক্তিকে পরাস্ত করা সম্ভব হবে বলে ব্রিটেন মনে করে। রাশিয়ার সঙ্গে যে সকল বিষয়ে ব্রিটেনের বিরোধ ছিল, তার মীমাংসার জন্যে ফরাসী মন্ত্রী ডেলক্যাসী মধ্যস্থতা করেন। ইঙ্গ-রুশ সন্ধির সম্ভাবনা দেখে কাইজার রাশিয়াকে প্রভাবিত করতে চেষ্টা করেন। তিনি জোরকে (Bjorke) নামক স্থানে জারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জারকে নিজ পক্ষে আনার চেষ্টা করেন। কিন্তু জার সরকার কাইজারের প্রস্তাবে বিশ্বাস করেন নি।ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত হ্যারল্ড নিকলসনের সঙ্গে রুশমন্ত্রী আইভোলস্কির আলোচনার ফলে ১৯০৭ খ্রীঃ ইঙ্গ-রুশ চুক্তি সম্পাদিত হয়।

ইঙ্গ-রুশ চুক্তি ১৯০৭ খ্রীঃ

ইঙ্গ-রুশ চুক্তির ফলে, (১) উভয় স্বাক্ষরকারী আফগানিস্থান ও তিব্বতের স্বাধীনতা রক্ষায় সম্মত হয়। (২) পারস্যের ক্ষেত্রে উভয় দেশ নিজ নিজ প্রভাবযুক্ত এলাকা স্থির করে নেয়। পারস্যকে তিনটি অঞ্চলে ভাগ করে দক্ষিণ পারস্যে ব্রিটিশ প্রভাব এবং উত্তর পারস্যে সিংহল, জর্জিয়া, আজেরবাইজান অঞ্চলে রুশ প্রভাব রক্ষার ব্যবস্থা হয়। মধ্য পারস্যে নিরপেক্ষতা রক্ষা করা হয়। এইভাবে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে আঁতাত বা মৈত্রী গঠিত হলে ইওরোপ দুটি শক্তি শিবিরে ভাগ হয়ে যায়। এক দিকে থাকে জার্মানী, অষ্ট্রিয়া, ইতালী, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, তুরস্ক সমর্থিত ত্রিশক্তি চুক্তি; অপর দিকে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়ার ত্রিশক্তি আঁতাত। ত্রিশক্তি আঁতাতে কোন সামরিক শর্ত না থাকলেও এর ভিত্তি ছিল খুবই দৃঢ়। এর পশ্চাতে সামরিক শর্তগুলি যথা সময়ে যুক্ত হয়। ত্রিশক্তি আঁতাতের ফলে ইও... শান্তি স্থাপিত না হয়ে উভয় শিবিরের মধ্যে সঙ্ঘর্ষ বাড়ে। পরিণামে ইহা বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হয়।[১]

ত্রিশক্তি আঁতাত গঠন

সশস্ত্র শান্তির যুগ (Age of Armed Peace) : ১৯০৪ খ্রীঃ থেকে ১৯১৪ খ্রীঃ এই এক দশকের ইওরোপীয় ইতিহাসকে সশস্ত্র শান্তির যুগ বা Age of Armed peace বলা হয়। David Thomson এই যুগকে "Period of international anarchy" বা আন্তর্জাতিক নৈরাজ্যের যুগ বলে অভিহিত করেছেন। এই দশকের মূল কথা ছিল ইওরোপের প্রধান শক্তিগুলির দুই প্রধান শিবিরে বিভক্ত হওয়া। জার্মানী, অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী ও ইতালী ত্রিশক্তি চুক্তি বা Triple Alliance গঠন করে। এই চুক্তিতে ক্রমে বুলগেরিয়া ও রুমানিয়াও যোগ দেয়। অপর দিকে ফ্রান্স রাশিয়া ও ব্রিটেন এই তিন শক্তি ট্রিপল আঁতাত বা ত্রিশক্তি জোট গঠন করে।

দুই সশস্ত্র শিবির গঠন

এই দুই পরস্পর-বিরোধী জোটের লক্ষ্য ছিল ইওরোপে শক্তিসাম্য স্থাপন করে শান্তি বজায় রাখা। এই দুই জোট প্রথমেই পরস্পরের বিরুদ্ধে আক্রমণের জন্যে গঠিত হয়, একথা মনে

১· David Thomson.

অস্ত্র প্রতিযোগিতা : যুদ্ধের পরিবেশ বৃদ্ধি

করার কারণ নেই।[১] জার্মানীর স্থলশক্তি ও নৌশক্তি এত দ্রুত বাড়ছিল যে, এর সঙ্গে সমতা রক্ষার প্রয়োজনে রাশিয়া ও ফ্রান্স জোটবদ্ধ হয় এবং পরে তাতে ব্রিটেন যোগ দেয়। কিন্তু গোড়ার দিকে এই জোট গড়ার যে উদ্দেশ্য ছিল বাস্তবে তাহা সফল হয়নি। বাস্তবে দুই জোট গঠনের ফলে শক্তিসাম্য ও শান্তি স্থাপিত না হয়ে যুদ্ধের সম্ভাবনা আরও তীব্রতর হতে থাকে। বিভিন্ন শক্তিগুলি অস্ত্র নির্মাণ প্রতিযোগিতায় মত্ত হয় এবং গোপন কূটনীতির আশ্রয় নিয়ে প্রতিপক্ষকে জব্দ করার চেষ্টা করে। যে ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বৈঠক ডেকে বিরোধীয় বিষয়গুলির শান্তিপূর্ণ মীমাংসা করা সম্ভব ছিল, বৃহৎ শক্তিগুলি তা করতে বিরত থাকে। তারা অস্ত্রের দ্বারা মীমাংসার কথা ভাবতে থাকে। এভাবে শক্তিসাম্যের দ্বারা শান্তিকে দৃঢ় করার পরিবর্তে শক্তির আস্ফালন দ্বারা শান্তিকে ধ্বংস করার চেষ্টা আরম্ভ হয়। প্রতি দেশ সাধ্যমত অস্ত্র নির্মাণ ও সৈন্য সংগঠনের কাজ করে।

এই অস্ত্র নির্মাণ এবং নৌ গঠনের মূলে ছিল প্রতি বৃহৎ শক্তির মনে অপর শক্তি সম্পর্কে ভয় এবং সন্দেহ। যদিও ব্রিটেনের নৌ-বহর ছিল শ্রেষ্ঠতম, তবুও ব্রিটেনের ভয় হয় যে, জার্মানী

নৌ-প্রতিদ্বন্দ্বিতা

শীঘ্রই ব্রিটেন অপেক্ষা শক্তিশালী হবে। ফলে ব্রিটেন তার নৌশক্তি বাড়িয়ে চলে। জার্মানীও এর সঙ্গে পাল্লা দিতে থাকে।যদিও জার্মানীর স্থলসেনা ছিল খুবই শক্তিশালী, তবুও জার্মানীর আশঙ্কা ছিল যে, ফ্রান্স ও রাশিয়ার যুগ্মশক্তি তাকে ধ্বংস করবে। এই আশঙ্কা ও ভীতির ফলে নৌ গঠন ও মারণাস্ত্র নির্মাণের প্রতিযোগিতা তীব্রতর হয়।

এই পটভূমিকায় এমন কয়েকটি আন্তর্জাতিক ঘটনা ঘটে যার ফলে ইওরোপ অনিবার্যভাবে বিশ্বযুদ্ধের দিকে আগাতে থাকে। (১) ১৯০৫-০৬ খ্রীঃ কাইজার অকস্মাৎ মরক্কোর টাঞ্জিয়ার

মরক্কোর ঘটনা

বন্দরে নেমে পড়েন। তিনি মরক্কোর সুলতানকে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সাহায্য দানের কথা বলেন। ১৯০৪ খ্রীঃ ইঙ্গ-ফরাসী আঁতাতের এবং ১৮৯৩-এ ফ্রাঙ্কো-রুশ আঁতাতের ফলে কাইজার সরকারের মনে অশান্তি দেখা দেয়। ইঙ্গ-ফরাসী আঁতাত কতটা মজবুত জার্মানী তা পরীক্ষা করে দেখতে চায়।দ্বিতীয়তঃ,কাইজার সরকারের ধারণা ছিল যে উপনিবেশের দখল নিয়ে ইংলন্ড-রুশ বিরোধ এত তীব্র ছিল যে, ইঙ্গ-ফরাসী জোট প্রকৃতপক্ষে হওয়া কঠিন। এই জোটের স্থিতিশীলতা পরীক্ষার উদ্দেশ্যে কাইজার টাঞ্জিয়ারে নামেন। এর ফলে ফ্রান্সের আশঙ্কা হয় যে, মরক্কোয় ফরাসী প্রভাব বিনষ্ট করার জন্যে কাইজার চেষ্টা করছেন। জার্মানীর সঙ্গে মরক্কোর আধিপত্য নিয়ে যুদ্ধের ভয়ে ফ্রান্স নত হতে চেষ্টা করে। কিন্তু মিত্র ইংলন্ড ফ্রান্সকে সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দিলে ফ্রান্স জার্মান প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করে। কাইজার মরক্কো উপলক্ষে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না। শেষ পর্যন্ত আলজেসিয়ার্স সম্মেলনে (১৯০৬ খ্রীঃ) কাইজার মরক্কোর ওপর ফরাসী আধিপত্য মেনে নেন। ইংলন্ডের চাপের কাছে জার্মানী নতি-স্বীকার করে। প্রথম মরক্কো সংকটে নাস্তানাবুদ হওয়ার পর কাইজার কিছুকাল মনমরা হয়ে থাকেন। বেটম্যান হলোওয়েন প্রধানমন্ত্রী হলে তাঁর পরামর্শে কাইজার ইঙ্গ-ফরাসী জোটের ওপর পুনরায় এক হাত নিতে চান। ১৯১১ খ্রীঃ জার্মান যুদ্ধ জাহাজ প্যান্থার মরক্কোর আগাদির বন্দরে ঢুকে পড়লে ইঙ্গ-ফরাসী জাহাজগুলি প্যান্থারকে ঘিরে ফেলে। কাইজার দাবী করেন যে, ফরাসী অধিকৃত কঙ্গো জার্মানীকে ছেড়ে দিলে তবেই জার্মান যুদ্ধ জাহাজ আগাদির বন্দর থেকে চলে যাবে। ইঙ্গ-ফরাসী মিত্র সরকার জার্মানীর দাবীর বিরুদ্ধে অনমনীয় মনোভাব দেখালে কাইজার বাধ্য হয়ে প্যান্থারকে ফিরিয়ে নেন।

১· David Thomson. P. 493.

(২) ইতালী ত্রিশক্তি চুক্তির সদস্য হলেও ইংলন্ড ও ফ্রান্সের সঙ্গে গোপন সম্পর্ক স্থাপন করে ত্রিপলি অধিকার করে। তুরস্কের নিকট থেকে বলপূর্বক ত্রিপলি গ্রাস করায় 'জোর যার মল্লুক তার' নীতি প্রকট হয়ে ওঠে।

ইতালীর ত্রিপলি অধিকার

(৩) এদিকে বলকান জাতিগুলি দেখে যে, তাদের জাতীয়তাবাদী দাবীগুলি পূরণের জন্যে বৃহৎ শক্তিগুলি সমর্থন করবে না। সুতরাং তারা বলকান লীগ গঠন করে তুরস্কের বিরুদ্ধে দুটি বলকান যুদ্ধ ঘোষণা করে। তুরস্ককে পরাজিত করে বলকানকে মুক্ত করা হয়। অতঃপর বলকানের বিভিন্ন অঞ্চল অধিকারের জন্যে বুলগেরিয়া ও সার্বিয়ার মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই বিরোধে বৃহৎ শক্তিগুলি জড়িয়ে পড়ে। জার্মানী ও অষ্ট্রিয়া বুলগেরিয়ার পক্ষ নিলে, রাশিয়া সার্বিয়ার পক্ষ নেয়।

বলকান যুদ্ধ

(৪) ইতিমধ্যে বার্লিনের সন্ধির শর্ত অগ্রাহ্য করে, অষ্ট্রিয়া, বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা নামে দুটি প্রদেশকে অষ্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে। এই প্রদেশ দুইটিতে স্লাভ জাতির লোক বসবাস করত। স্লাভদের সঙ্গে সার্বিয়ার জাতিগত ঐক্য ছিল। সুতরাং এই দুটি প্রদেশ অষ্ট্রিয়া অধিকার করায়, সার্বিয়া ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। এজন্য বলকান সমস্যাকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক বিরোধ তীব্র হয়।

বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা লইয়া অষ্ট্রো সার্বিয় দ্বন্দ্ব

(৫) এই সময় অষ্ট্রিয়ার যুবরাজ ফার্দ্দিনান্দ ও তাঁর পত্নী সেরাজেভো নামক স্থানে এক উগ্রপন্থী বসনিয় ছাত্র দ্বারা নিহত হন। এই হত্যাকাণ্ডের পিছনে সার্বিয়া সরকারের চক্রান্ত ছিল। ক্রুদ্ধ অষ্ট্রিয়া সরকার এজন্য সার্বিয়ার নিকট এক চরমপত্র পাঠায় এবং দুই দিনের মধ্যে দাবীগুলি পূরণের শর্ত দেয়। অষ্ট্রিয়া সরকার এই চরমপত্র দ্বারা বারুদের স্তুপে আগুন ধরিয়ে দেয়। সার্বিয়া চরমপত্রের কয়েকটি শর্ত মেনে বাকি শর্তগুলি অগ্রাহ্য করলে, অষ্ট্রিয়া সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।এর ফলে বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যায়।

সেরাজেভোর হত্যাকাণ্ড

পাঠ্যসূচী

১। Rene Carrie—Diplomatic History of Europe.
২। Fay—Origin of the World War.
৩। Gooch—History of Modern Europe.
৪। Oxford—Genesis of the War.
৫। David Thompson—Europe since Napoleon.

চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও ভার্সাই সন্ধি (১৯১৪—১৯১৯ খ্রীঃ)
(The First World War and the Treaty of Versaillis, 1914—1919)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ (The Causes of the First World War) : ১৮৭১ খ্রীঃ থেকে ১৯১৪ খ্রীঃ পর্যন্ত ইওরোপে কোন বড় ধরনের যুদ্ধ ঘটেনি। ১৯১২-১৩ খ্রীঃ বলকানে দুটি ছোটখাট যুদ্ধ হয়। কিন্তু বৃহৎ শক্তিগুলি এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েনি। ১৯১৪ খ্রীঃ জুলাই মাসে অষ্ট্রিয়ার যুবরাজ ফার্দিনান্দ ও যুবরানী সোফিয়া এক উগ্রপন্থী সার্ব সন্ত্রাসবাদীর হাতে নিহত হলে, এই ঘটনাকে উপলক্ষ করে অষ্ট্রো-সার্ব যুদ্ধ শুরু হয়। ক্রমে জার্মানী, রাশিয়া, ফ্রান্স, ব্রিটেন, ইতালী প্রভৃতি বৃহৎ শক্তিগুলি এবং তাদের সহকারী মিত্র শক্তিগুলি এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে বিজয়ী মিত্রশক্তি এই যুদ্ধের জন্যে কাইজারের জার্মানীকেই দায়ী করেন। জার্মান ঐতিহাসিকরা জার্মানীর স্বপক্ষে যুক্তি দেখান এবং যুদ্ধের জন্যে অন্যান্য শক্তিগুলিকেও দায়ী করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ফিৎস ফিশার, জেমস জোল ও ইম্যানুয়েল জাইস প্রভৃতি গবেষক নতুন গবেষণার আলোকে এই বিশ্বযুদ্ধের প্রধান দায়িত্ব কাইজারের জার্মানীর ঘাড়ে চাপিয়েছেন। বস্তুতপক্ষে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্যে কোন একটি কারণ গ্রহনীয় নয়। সংঘাতের ক্ষেত্র দীর্ঘ দিন ধরে তৈরি হয়। কাইজারের হঠকারী নীতি ১৯১৪ খ্রীঃ যুদ্ধকে অনিবার্য করে তোলে।

১৮৭৯ খ্রীঃ বিসমার্কের অষ্ট্রো-জার্মান দ্বিশক্তি চুক্তি ও পদে ১৮৮২ খ্রীঃ জার্মানী-অষ্ট্রিয়া-ইতালীর মধ্যে ত্রিশক্তি চুক্তি স্থাপিত হলেও তা ছিল আত্মরক্ষামূলক। বিসমার্ক ত্রিশক্তি চুক্তিকে কোন যুদ্ধের উদ্দেশ্যে রচনা করেননি। তিনি জার্মানীকে কেন্দ্র করে শক্তিসাম্য স্থাপনের চেষ্টা করেন মাত্র। কিন্তু দ্বিতীয় কাইজারের আমলে ত্রিশক্তি চুক্তি নতুন মাত্রা পায়। কাইজারের বিশ্ব রাজনীতিতে অনুপ্রবেশের ঘোষণা, কাইজারের ওয়েল্ট পলিটিক এবং নৌ-নির্মাণ নীতি, ত্রিশক্তি চুক্তিকে নতুন মাত্রা দেয়।

১৮৯৩ খ্রীঃ ফ্রাঙ্কো-রুশ আঁতাত এবং ১৯০৪খ্রীঃ ও ১৯০৭ খ্রীঃ ইঙ্গ-ফরাসী ও ইঙ্গ-রুশ আঁতাতের ফলে ত্রিশক্তি আঁতাত গঠিত হলে ইওরোপ শেষ পর্যন্ত ত্রিশক্তি চুক্তি বনাম ত্রিশক্তি আঁতাত এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শিবিরে বিভক্ত হয়। যদিও ত্রিশক্তি আঁতাত গোড়ায় ছিল এই তিন শক্তির মধ্যে ঔপনিবেশিক বিরোধের মীমাংসা মাত্র। কিন্তু ইঙ্গ-ফরাসী আঁতাতের নৌ শর্তগুলি শেষ পর্যন্ত ইওরোপে দুই শক্তি শিবিরের মধ্যে সামরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সূচনা করে। ইঙ্গ-ফরাসী আঁতাতের নৌ-শর্ত ছিল যে, ভূমধ্যসাগরে ফরাসী নৌ-বহর অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে কার্যকরী ভূমিকা নেবে এবং ব্রিটিশ স্বার্থরক্ষা করবে। উত্তর সাগর ও ইংলিশ চ্যানেলে ব্রিটিশ নৌ-বহর ইংলন্ড ও ফ্রান্সের উপকূল রক্ষা করবে। এর ফলে জার্মানী প্রভৃতি শক্তিগুলি মনে করে যে, ত্রিশক্তি আঁতাত দ্বারা ব্রিটেন ফাঙ্কো-রুশ জোটের স্থলশক্তির সঙ্গে নিজের নৌ শক্তিকে যুক্ত করল। এরপর জার্মানী অভিযোগ করতে থাকে যে, ত্রিশক্তি আঁতাত দ্বারা জার্মানীকে বেষ্টন করা হল। জার্মানী বিপন্ন হয়েছে। জার্মানীর আশঙ্কা হয় যে, ভবিষ্যতে ফ্রাঙ্কো-জার্মান সংঘাত হলে ব্রিটেন, ফ্রান্সের পক্ষ নিবে।

ত্রিশক্তি চুক্তি ও ত্রিশক্তি আতাঁত দ্বারা ইওরোপে শক্তিসাম্য স্থাপিত হয়নি। পরিবর্তে দুই শক্তি শিবিরের মধ্যে অবিশ্বাস ও আশঙ্কা বাড়ে। ব্রিটেন ও তার মিত্র রাষ্ট্রগুলি আশঙ্কার সঙ্গে লক্ষ্য করে যে, জার্মানী তার অস্ত্র নির্মাণের গতি দারুণ বৃদ্ধি করে চলেছে। জার্মান সম্রাট কাইজার ত্রিশক্তি আতাঁত ভাঙার জন্যে অতর্কিত আগ্রাসন যথা মরক্কো-সঙ্কট সৃষ্টি করছেন। জার্মানীর কল-কারখানাগুলি বিশাল অস্ত্রসম্ভার উগরে দিচ্ছে এবং শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করে তা বিশ্বের বাজারে ঢেলে দিতে চেষ্টা করছে। অপরদিকে জার্মান নেতারা আশঙ্কা করেন যে, ফ্রান্স সামরিক নখ-দন্তে সাজছে এবং রাশিয়াকে সমরাস্ত্র দিচ্ছে। ইঙ্গ-ফরাসী নৌ-বহর ভূমধ্যসাগর ও উত্তর সাগরে মহড়া নিচ্ছে। এতে উভয় শিবিরে সন্দেহ, অবিশ্বাস ভয়ানক বাড়ে। শান্তির বাতাবরণ নষ্ট হতে থাকে।

ত্রিশক্তি চুক্তি ও ত্রিশক্তি আতাঁত এভাবে ইওরোপে শেষ পর্যন্ত একটি সংঘাতের বাতাবরণ সৃষ্টি করে। ডেভিড টমসনের মতে, এই জোটগুলি প্রতিদ্বন্দ্বি শক্তির ভয়ে গড়া হয়। কোন বৃহৎ শক্তি জোটবদ্ধ না হয়ে একা ভয় পায়। মিত্রহীন হলে প্রতিদ্বন্দ্বীর হাতে পরাজয় ঘটতে পারে এই ভীতি ফ্রান্সকে ব্রিটেন ও রাশিয়ার সঙ্গে, ব্রিটেনকে ফ্রান্স ও রাশিয়ার সঙ্গে মিলিত করে। প্রতি শক্তি মানসিক দিক থেকে প্রতিদ্বন্দ্বীর হাতে আক্রমণের ভয়ে ভুগছিল। এরই পরিণামে ত্রিশক্তি আতাঁত গড়ে ওঠে। সুতরাং আতাঁত চুক্তির শর্তগুলি আক্রমণাত্মক না হলেও, অলিখিত ভাবে তা আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের কথা ভেবেই তৈরি করা হয়। ডেভিড টমসন মন্তব্য করেছেন যে, দুই শক্তি জোট গঠনের পশ্চাতে যে বিচার কাজ করেছিল তা হল, ইওরোপের ৫ বৃহৎ শক্তির মধ্যে যাতে ৩ এর (তিনের) জোটে ঢোকা যায় তার ব্যবস্থা করে। এই জোট গঠনের খেলায় ত্রিশক্তি আতাঁত বিরোধী শিবির অপেক্ষা দলে ভারী ছিল। কারণ ত্রিশক্তি আতাঁতে ছিল ব্রিটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়া। বিরোধী শিবিরে ছিল জার্মানী ও অষ্ট্রিয়া। ইতালীকে বৃহৎ শক্তি বলা যায় না। ত্রিশক্তি আতাঁত গঠিত হলে জার্মানী ভয় পেয়ে যায়।

এভাবেই রাজনৈতিক দিক থেকে কামানের নলে অদৃশ্যভাবে বারুদ জমা হতে থাকে। ১৮৭১-এর পর থেকেই ফ্রাঙ্কো-জার্মান বিরোধ ছিল কামানের নলে বারুদের প্রথম সঞ্চয়। ধাপে ধাপে অলক্ষ্যে বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমে বিরোধ তীব্র হতে থাকে। দুই শক্তি শিবিরে ইওরোপের বিভাজন ছিল তারই আত্মপ্রকাশ। বৃহৎ শক্তিগুলি জ্ঞাতসারে সক্রিয়ভাবে যুদ্ধ না চাইলেও, ইওরোপে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও কূটনৈতিক জোট পরিণামে যুদ্ধ ঘটায়। এজন্য ডেভিড টমসন বলেছেন যে, "প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে, এই যুদ্ধ ছিল অযাচিত ও অভাবিত। ১৮৭১ খ্রীঃ থেকে যে ঘটনাবলীর সূচনা হয়, এই যুদ্ধ ছিল তার চূড়ান্ত পরিণাম" (The most important thing about the First World War is that it was unsought, un-intended end product of a long sequence of events which began in 1871)। কোন ব্যক্তি, কোন জাতি এই যুদ্ধ ঘটার জন্যে বিশেষভাবে দায়ী ছিল না। জাতীয় সুরক্ষা, নিরাপত্তা রক্ষার জন্যে বৃহৎ শক্তিগুলির বিভিন্ন নীতি ও পদ্ধতির সম্মিলিত পরিণাম ছিল এই বিশ্বযুদ্ধ।

এখন দেখা যেতে পারে যে, কোন কোন বিশেষ আন্তর্রাষ্ট্রিক সংঘাতের পরিণামে অনাকাঙ্খিতভাবে এই যুদ্ধ বিশ্বকে বিড়ম্বিত করে। প্রথমতঃ, বিংশ শতকের শুরুতেই ইওরোপের দুই শক্তির গঠনে আমূল পরিবর্তন ঘটেছিল। একদিকে ছিল বিশ্বের ¼ অংশ ব্যাপী উপনিবেশ ও সাম্রাজ্যভোগী ব্রিটেন। বিশ্বের বাণিজ্য জাহাজের ৫০% ছিল ব্রিটেনের এবং বিশ্বের বাণিজ্যের সিংহভাগ ছিল ব্রিটেনের দখলে। কিন্তু ব্রিটেনের নিজস্ব ব্রিটিশ ও উপনিবেশের জনগোষ্ঠী বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে বসবাস করত। ব্রিটেনের নৌবল ছিল তৎকালীন বিশ্বে শ্রেষ্ঠ। ইওরোপের উদীয়মান শক্তি জার্মানী ব্রিটেনের সমকক্ষতা লাভের চেষ্টায়

ছিল। জার্মানী শিল্প উৎপাদনে ব্রিটেনের কাছাকাছি পৌঁছেছিল। জার্মানীর লোকবল ছিল ৫৬ মিলিয়ন এবং এই জনগোষ্ঠী ইওরোপের কেন্দ্রে বাস করত। জার্মান স্থল সৈন্য ছিল দুর্ধর্ষ ও যুদ্ধপটু। অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে মিত্রতার ফলে, জার্মানীর জনবল ও রসদ বৃদ্ধি পায়। জার্মানী নৌ-নির্মাণ নীতি গ্রহণ করায় জার্মান নৌবল বাড়ছিল।

এই পরিস্থিতিতে ইওরোপে স্থলশক্তি হিসেবে জার্মানীকে অপ্রতিহত মনে হয় এবং সমুদ্র পথে ব্রিটেন ছিল শক্তিধর। এক্ষেত্রে কোন প্রকৃত শক্তিসাম্য ইওরোপে ছিল না। নিজ নিজ ক্ষেত্রে জার্মানী ও ব্রিটেন ছিল শ্রেষ্ঠ শক্তি।

এই পরিস্থিতিতে জার্মানী নৌ-নির্মাণ নীতি নিলে স্বভাবতই ইঙ্গ-জার্মান প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়। ১৮৯৭, ১৮৯৮ এবং ১৯০০ খ্রীঃ জার্মানী নৌ-নির্মাণ আইন পাশ করে বড় ও মাঝারি পাল্লার যুদ্ধ জাহাজ এবং ডুবো জাহাজ নির্মাণ শুরু করায়, ব্রিটেনে আতঙ্ক দেখা দেয়। ১৯০৩ খ্রীঃ থেকে ব্রিটেন, জার্মানীর নৌ-নির্মাণের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে। একদিকে ব্রিটেন দ্রুত উত্তর সাগরীয় নৌ-বহর নামে নূতন একটি বহর নির্মাণ শুরু করে। অপরদিকে ইঙ্গ-ফরাসী চুক্তির দ্বারা ভূমধ্যসাগরে পাহারাদারীর দায়িত্ব ফরাসী নৌ-বহরকে দিয়ে, ব্রিটেন উত্তর সাগর ও ইংলিশ চ্যানেলে তার নৌ-শক্তিকে সংহত করে। এই নৌ-প্রতিযোগিতা নিঃসন্দেহে মানসিক দিক থেকে ব্রিটেন ও জার্মানীকে যুদ্ধের কাছাকাছি নিয়ে আসে। জার্মানী নৌ-শক্তি হ্রাস না করায় উভয় দেশের মধ্যে নৌ-প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পায়।

নৌ-প্রতিদ্বন্দ্বিতার সঙ্গে দেখা দেয় স্থল বাহিনী সংগঠন ও অস্ত্র নির্মাণের প্রতিযোগীতা। বিবাদমান শক্তিগুলি যুদ্ধ না চাইলেও, যুদ্ধের সম্ভাবনা থাকায় প্রস্তুত থাকতে চায়। ফ্রান্স ১৯১৩খ্রীঃ সৈন্য গঠন আইন দ্বারা প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের ৩ বছরের জন্যে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা চালু করে। রাশিয়া ৩½ বছরের জন্যে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা চালু করে। জার্মানীর বিরাট স্থলসেনার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিগুলি সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি ও অস্ত্র প্রতিযোগীতা শুরু করে। এর ফল ছিল যে, ১৯১২-১৪ খ্রীঃ মধ্যে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠী দুই প্রতিদ্বন্দ্বী সামরিক শিবিরে পরিণত হয়। প্রত্যেক জোট যতবেশী সম্ভব মারণাস্ত্র নির্মাণ শুরু করে। এর ফলে কূটনীতির ভাষায় কথা না বলে অস্ত্রের ভাষায় কথা বলার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। এই কারণে ঐতিহাসিক ল্যাংসাম মন্তব্য করেছেন যে, "এর পর ইওরোপের শান্তি যে কোন দুর্ঘটনায় বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়" (The peace of Europe rested on accident)।

১৯০৪ খ্রীঃ থেকে ইওরোপে আন্তর্জাতিক আইন ও বিধিগুলি ভাঙা শুরু হয়। ১৮৯৯ ও ১৯০৭ খ্রীঃ দুটি আন্তর্জাতিক আইন কংগ্রেস হেইগ নগরীতে অনুষ্ঠিত হলেও তাতে অবস্থার কোন উন্নতি হয়নি। আন্তর্জাতিক ঐক্যমত দ্বারা অস্ত্র হ্রাস অথবা আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ নিস্পত্তির চেষ্টা ব্যর্থ হয়। রাশিয়া অস্ত্রহ্রাসের প্রস্তাব দিলে সন্দেহ প্রকাশ করা হয় যে, কামান নির্মাণের জন্যে অর্থাভাব বশতঃ রাশিয়া আপাতত অস্ত্র হ্রাস চায়। অন্যান্য প্রস্তাবগুলিকে প্রত্যেক দেশ সন্দেহের চোখে দেখে। অস্ত্র হ্রাসের চুক্তি করার পর গোপনে অস্ত্র নির্মাণ চলবে বলে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়। আর্ন্তজাতিক রেডক্রস সম্মেলনেও অনুরূপ সন্দেহ-বিদ্বেষ দেখা যায়। ফলে আন্তর্জাতিক কংগ্রেস দ্বারা সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে না বোঝা যায়। "আন্তর্জাতিক নৈরাজ্য" (International Anarchy) তখন নিয়ম হয়ে যায়।

এই বিদ্বেষময় পরিবেশে যে কোন আন্তর্জাতিক সংঘাতকে কেন্দ্র করে যুদ্ধ বেধে যাবে বলে আশঙ্কা দেখা দেয়। যে বিরোধগুলি এই যুগে এই সময় ইওরোপকে যুদ্ধের দিকে ঠেলে নিয়ে যায়, তা ছিল ঃ—

(১) ব্রিটেন ও জার্মানীর ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা। জার্মানীর ওয়েল্ট পলিটিক নীতি। যার ফলে ব্রিটেনের আশঙ্কা হয় যে, কাইজার ব্রিটিশ উপনিবেশগুলি গ্রাস করতে চান। তুর্কী

সাম্রাজ্যে অনুপ্রবেশ দ্বারা তিনি ব্রিটিশ ভারতীয় উপনিবেশের ব্রিটেনের যোগাযোগের পথ বিচ্ছিন্ন করতে চান। (২) ফ্রাঙ্কো-ইতালীয় বিরোধ। ইতালী-ফ্রান্সের উত্তর আফ্রিকা সাম্রাজ্যে তার ন্যায্য হক আছে বলে মনে করত। এজন্য উভয় দেশের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। (৩) ইঙ্গ-জার্মান নৌ-প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে জার্মানীর নৌবল বাড়লে উত্তর সাগর ও ইংলিশ চ্যানেলে ব্রিটেনের উপকূল আক্রান্ত হবে বলে ব্রিটেন আশঙ্কিত হয়। এজন্য ইঙ্গ- জার্মান নৌ-প্রতিযোগিতা শুরু হয়। (৪) অষ্ট্রো-সার্ব বিরোধ। অষ্ট্রিয়া বার্লিনের সন্ধি ভেঙে বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা অধিকার করায় সার্বিয়া ক্রুদ্ধ হয়। এই দুটি অঞ্চলে সার্ব জাতির লোক বসবাস করত। এজন্য অষ্ট্রো-সার্ব বিরোধ তীব্র আকার নেয়। (৫) এই বিরোধকে কেন্দ্র করে বলকান অঞ্চলে যুদ্ধ বাধার তীব্র সম্ভাবনা দেখা দেয়।

এর সঙ্গে যুক্ত হয় জাতীয়তাবাদী সংঘাত। এই সংঘাত ছিল ক্রুর, নিষ্ঠুর ও উন্নত চরিত্রের। কোন ক্ষেত্রে এই জাতীয়তাবাদ ছিল সংকীর্ণ জাতীয় অহমিকা ও আত্মম্ভরীতার উদগ্র প্রকাশ। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে তা ছিল অতৃপ্ত, অপূর্ণ জাতীয়তাবাদের ক্রুদ্ধ অভিব্যক্তি। এই জাতীয়তাবাদী বিরোধগুলি ইওরোপকে অগ্নিকুণ্ডে পরিণত করে। যে কোন দুর্ঘটনা একটি যুদ্ধ ঘটাবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। জাতীয়তাবাদী সংঘাতের ক্ষেত্রে পুরাতন ফ্রাঙ্কিশ জাতীয়তাবাদ ছিল জার্মানীর বিরুদ্ধে ছোবল মারতে উদ্যত। ১৮৭১ খ্রীঃ থেকে জার্মানী খনিজ দ্রব্য সমৃদ্ধ ফরাসী অঞ্চল আলসাস ও লোরেন দখল করায় ফ্রান্স আহত সাপের মত ফুসছিল। ত্রিশক্তি আঁতাত গঠিত হলে ফ্রান্স পায়ের তলায় কূটনৈতিক জমিন পেয়ে, জার্মানীর বিরুদ্ধে আক্রমণের তোড়জোড় চালায়। (২) জার্মান জাতীয় অহমিকা-পূর্ণ জাতীয়তাবাদ ছিল অত্যন্ত নগ্ন, ক্রুর ও আত্মম্ভরী। জার্মানরা নিজেদের টিউটনিক সভ্যতার শ্রেষ্ঠ অবদান বলে গণ্য করত। অবিশ্বাস্যভাবে তিন যুদ্ধের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ হয়ে, বিসমার্কের মত উনিশ শতকের সেরা রাজনীর্তিবিদকে পেয়ে, অসাধারণ দ্রুত শিল্প গঠন করে এবং বিরাট, সাহসী স্থল বাহিনী গঠনের ফলে জার্মান্ জাতি অহঙ্কারে ফেটে পড়ছিল। জার্মান বিশ্ব-রাজনীতিকে একমাত্র জার্মানীর স্বার্থ ছাড়া অন্য দেশের স্বার্থকে অগ্রাহ্য করার মানসিকতা দেখা যাচ্ছিল। কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম ছিলেন এই উগ্র জাতীয়তাবাদী, প্যান জার্মানবাদী মানসিকতার সন্তান। জার্মান সেনাপতি ফন মূলার বলেন "হয় সবটা চাই, নতুবা কিছুই চাই না" (All out or nothing)। সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে দেওয়ার মানসিকতা জার্মানীকে গ্রাস করেছিল। (৩) এর সঙ্গে যুক্ত হয় বলকান অতৃপ্ত জঙ্গী জাতীয়তাবাদের সমস্যা। বিশেষতঃ উগ্র সার্ব বা দক্ষিণ স্লাভ জাতীয়তাবাদ বুলগেরিয়াকে হঠিয়ে ম্যাসিডোনিয়া ও গ্রাস দখল এবং দরকার হলে সশস্ত্র যুদ্ধের দ্বারা অষ্ট্রিয়ার হাত থেকে বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা দখল করতে বদ্ধ-পরিকর ছিল। (৪) ঔপনিবেশিক দ্বন্দ্বগুলি ১৯১৪ আগে মিটে গেলেও তজ্জনিত তিক্ততার অবসান তখনও হয়নি। এজন্যই ব্রিটেন ও জার্মানীর মধ্যে সম্পর্ক গড়ে উঠেনি। এই জটিল জাতীয়তাবাদী বিরোধগুলি, ইওরোপ দুই শক্তিশিবিরে বিভক্ত হলে, অনুকূল মাটি-জল-বাতাস পেয়ে তাজা হয়ে ওঠে। এই বিরোধগুলি অগ্নিকুণ্ডে জ্বলনের জন্যে আগুনের শলাকা হিসেবে কাজ করে।

ইওরোপ যখন দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শিবিরে বিভক্ত হয় এবং ইওরোপে আন্তর্জাতিক বিরোধের জন্যে যুদ্ধ বাধার আশঙ্কা দেখা দেয়, তখন প্রতি বৃহৎ শক্তির নৈতিক দায়িত্ব ছিল বিরোধের ক্ষেত্রকে সীমাবদ্ধ করা এবং শান্তিরক্ষার জন্যে নমনীয় নীতি গ্রহণ করা। কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম এই নৈতিক দায়িত্ব পালনে বিরত থাকেন। যদি যুদ্ধ দেখা দেয় তাকে সীমাবদ্ধ ও স্থানীয় যুদ্ধে পরিণত করা ছিল প্রধান কর্তব্য। কিন্তু কাইজার স্থানীয় যুদ্ধকে আন্তর্জাতিক যুদ্ধে পরিণত করার নীতি নেন। বলকানের সংঘাতের সঙ্গে তিনি পশ্চিম ইওরোপের সংঘাতকে জুড়ে দেন। তিনি যদি সেরাজেভোর হত্যাকাণ্ডের পর অষ্ট্রো-সার্ব যুদ্ধে নিজেকে না জড়াতেন তাহলে এই যুদ্ধ কিছুদিনের মধ্যে মিটে যেত। কিন্তু তিনি তা হতে দেননি।

মোট কথা, উনবিংশ শতকে যদি তুরস্ককে ইওরোপের রুগ্ন মানুষ বলা হয় তবে বিংশ শতকের গোড়ায় ইওরোপই ছিল এক রুগ্ন মানুষ। ইওরোপের বিভিন্ন অঙ্গে পচা ক্ষত দেখা দিয়েছিল। ইওরোপের বিভিন্ন শক্তিগুলি বিশেষতঃ জার্মানীর মধ্যে তথা মরণকুণ্ডে ঝাপ দেওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়।

এই পরিস্থিতিতে সেরাজেভোর হত্যাকাণ্ডকে উপলক্ষ্য করে বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঘটনাসমূহ (The Events of the World War I) :

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ জলে ও স্থলে উভয় ক্ষেত্রে বিস্তৃত হয়। স্থলভাগে ইওরোপ মহাদেশ ব্যাপী যুদ্ধ-বিগ্রহ চলে। জার্মানী পশ্চিম রণাঙ্গনে বেলজিয়াম দখল করে। বেলজিয়াম রক্ষার জন্যে ইংলন্ডের সকল প্রচেষ্টা বিফল হয়। অতঃপর জার্মান সেনাদল বেলজিয়াম ও রাইন সীমান্ত দিয়ে ফ্রান্সে বন্যার জলের মত ঢুকে পড়ে। ফরাসী রাজধানী প্যারিসের ১৫ মাইলের মধ্যে তারা এসে পড়ে। এর পর ফরাসী বাহিনী সেনাপতি যোসেফ জোফ্রির নেতৃত্বে প্রবল বাধা দেয়। তারা প্রতি ইঞ্চি জমির জন্যে লড়াই করে জার্মান বাহিনীকে ফরাসী সীমান্তের বাইরে ঠেলে দেয়। জার্মান ও ফরাসী বাহিনী ট্রেঞ্চ বা পরিখা খুঁড়ে তুমুল যুদ্ধ চালাতে থাকে।

ফ্রান্সের সাথে যুদ্ধ

ইতিমধ্যে ব্রিটেনের ট্যাঙ্ক বাহিনী ফ্রান্সের শক্তি বাড়ালে, ভার্দুনের যুদ্ধে মিত্রশক্তি জার্মান বাহিনীকে হঠিয়ে দেয়। জার্মানরা এর পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে সোমের যুদ্ধে মিত্রশক্তির বহু ক্ষয়-ক্ষতি করে। এদিকে ইতালী তার নিরপেক্ষতা ছেড়ে মিত্রপক্ষে যোগ দেয়। ইতালীর বিরুদ্ধে অষ্ট্রিয়া বাহিনী আক্রমণ চালায়। এভাবে কিছুকাল পশ্চিম রণাঙ্গনে জয়-পরাজয় অনিশ্চিত থাকে।

ভার্দুন ও সোমের যুদ্ধ

পূর্ব রণাঙ্গনে, প্রথমে রুশ সেনাদল জার্মানীর গ্যালিসিয়া প্রদেশে ঢুকে পড়ে। কিন্তু বিখ্যাত জার্মান সেনানায়ক হিন্ডেনবার্গের সহকারী সেনাপতি লুডেনডর্ফ রুশ সেনাদের জার্মানী থেকে ঠেলে দেন। ট্যানেনবার্গ ও অগাষ্টোভোর যুদ্ধে রুশদের প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতি হয়। ১৯১৫ খ্রীঃ সেনাপতি হিন্ডেনবার্গের পরিচালনায় জার্মান বাহিনী রাশিয়ার ইউক্রেন ও ক্রিমিয়া অধিকার করে।

পূর্ব রণাঙ্গনে ট্যানেনবার্গ ও অগাষ্টোভোর যুদ্ধ

এদিকে জার্মানীর মিত্র তুরস্ক, দার্দানালিস প্রণালীর ভেতর দিয়ে মিত্রশক্তির জাহাজ চলাচল বন্ধ করলে মিত্রপক্ষ গ্যালিপোলী আক্রমণ করে শোচনীয়ভাবে তুরস্কের হাতে পরাস্ত হয়। তাছাড়া মধ্যপ্রাচ্যে তুর্কী বাহিনীর বিরুদ্ধে কুৎ-এল-আমারার যুদ্ধে মিত্র বাহিনী বিফল হয়। শেষ পর্যন্ত ইংরাজ সেনা বাগদাদ অধিকার করতে সমর্থ হয়।

গ্যালিপোলীর যুদ্ধ

সামুদ্রিক যুদ্ধে জার্মান সাবমেরিন বা ডুবোজাহাজ বাহিনী মিত্রশক্তির জাহাজগুলির দারুণ ক্ষতি করতে সমর্থ হয়। ডগারব্যাঙ্ক ও হেলিগোল্যাণ্ডের নৌ-যুদ্ধে জার্মান ও ইংরাজ নৌ-বাহিনীর প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। এই দুই যুদ্ধে জার্মান নৌ-বহর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ফলে তারা ইংরাজ নৌ-বহরের সাথে সম্মুখ যুদ্ধ এড়িয়ে চলে।

ডগারব্যাঙ্কের নৌ-যুদ্ধ

যা হোক, ১৯১৭ খ্রীঃ রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লবের ফলে বিপ্লবী সোভিয়েত সরকার জার্মানীর সাথে ব্রেষ্টলিটভস্কের সন্ধির দ্বারা যুদ্ধ ত্যাগ করলে, পশ্চিম রণাঙ্গনে ইঙ্গ-ফরাসী বাহিনী বিশেষ সঙ্কটে পড়ে। পূর্ব রণাঙ্গনে যুদ্ধ বন্ধ হলে, পূর্ব রণাঙ্গনের জার্মান বাহিনী পশ্চিম রণাঙ্গনের সেনাদের সাথে যোগ দিয়ে ফ্রান্স ও বেলজিয়াম আক্রমণ করে। এই সময়ে মিত্র শক্তির পক্ষ নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জার্মানীর বিরুদ্ধে

ব্রেষ্টলিটভস্কের সন্ধি

যোগ দেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যোগদানের ফলে যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায়।

এমিয়েন্স ও ইপ্রেসের স্থল যুদ্ধে জয়-পরাজয় অমীমাংসিত থাকলেও দীর্ঘকাল একনাগাড়ে যুদ্ধ চলার দরুন জার্মানীর শক্তি ক্ষয় পায়। এদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য পেয়ে মিত্রশক্তি নতুন উদ্যমে যুদ্ধ আরম্ভ করে। মিত্রশক্তির প্রচারের ফলে জার্মানীর মনোবল ভেঙে যায়। অষ্ট্রিয়া, রুমানিয়া, তুরস্ক প্রভৃতি শক্তির পক্ষ নিয়ে একা জার্মানীর পক্ষে যুদ্ধ চালান সহজ কাজ ছিল না। এই সময় জার্মানীর গণতান্ত্রিক দল কাইজারের একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে, কাইজার স্বদেশ থেকে পালিয়ে যান। জার্মানীতে একটি প্রজাতান্ত্রিক সরকার স্থাপিত হয়। ১৯১৮ খ্রীঃ এই সরকার মিত্রশক্তির সাথে যুদ্ধ বিরতি চুক্তি স্বাক্ষর করলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়।

জার্মানীর শক্তি ক্ষয় ও পতন

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর পরাজয়ের কারণ (Causes of Germany's defeat in the World War I) : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের গোড়ার দিকে রণপরিকল্পনা, অস্ত্রশস্ত্র, সম্পদ ও লোকবল সকল দিক থেকে জার্মানী মিত্রশক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল। জার্মানীর কোলন নগরের পুল দিয়ে প্রতি ১০ মিনিটে একটি করে সামরিক ট্রেন চলত। জার্মানীর কামান ও ডুবোজাহাজের ক্ষমতা ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তা সত্ত্বেও কেন জার্মানী শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে পরাস্ত হয় তার ব্যাখ্যা জার্মান সামরিক ইতিহাসকারগণ দিয়েছেন।

জার্মানীর যে লোক ও অস্ত্রবল ছিল তার দ্বারা স্বল্পকালের যুদ্ধে জার্মানীর জয় ছিল সুনিশ্চিত। কিন্তু জার্মানীর পক্ষে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের ভার বহন করা সম্ভব ছিল না। অপর দিকে ত্রিশক্তি আঁতাতের সম্পদ ও শক্তি এমন ছিল যে, তারা দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের ভার বহন করতে পারত। ব্রিটেন ও ফ্রান্স তাদের উপনিবেশগুলি থেকে লোকবল ও অর্থ যোগাড় করে। কিন্তু জার্মানীর পক্ষে এভাবে শক্তি বৃদ্ধির কোন সুবিধা ছিল না। মিত্রপক্ষ এই কারণে যুদ্ধটিকে দীর্ঘায়িত করে। এই দীর্ঘ যুদ্ধে জার্মানীর দম ফুরিয়ে যায়।

দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে জার্মানীর অক্ষমতা

ইঙ্গ-ফরাসী নৌ-বহর সমুদ্রপথে জার্মানীকে অবরোধ করায়, বিদেশ থেকে জার্মানীর পক্ষে সামরিক দ্রব্য ও খাদ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। ভূমধ্যসাগরে ফরাসী নৌ-বহর এবং উত্তর সমুদ্রে ব্রিটিশ নৌ-বহর জার্মান উপকূলকে ঘিরে ফেলে। জার্মান ডুবোজাহাজ বা সাবমেরিন দ্বারা ইংলন্ডের জাহাজ ডুবিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করা হলেও তাতে আশানুরূপ কাজ হয়নি। তাছাড়া ব্রিটেন সাবমেরিন বিরোধী অস্ত্র আবিষ্কার করলে জার্মান সাবমেরিনের আক্রমণ ভোঁতা হয়ে যায়। হেলিগোল্যাণ্ডের নৌ-যুদ্ধে জার্মান নৌ-বহরের এমন ক্ষয়-ক্ষতি হয় যে, তারপর জার্মান নৌ-বহর ব্রিটিশ নৌ-বহরকে আক্রমণ করতে সাহস করেনি। জলপথে ইঙ্গ-ফরাসী শক্তির অপ্রতিহত ক্ষমতা তাদের সরবরাহ ব্যবস্থাকে অক্ষুণ্ণ রাখে। অপরদিকে এই বিষয়ে জার্মানীর দুর্বলতা তাকে শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণে বাধ্য করে।

জার্মানীর নৌ-শক্তির অভাব ঃ অস্ত্র সরবরাহে বাধা

জার্মানীর পরাজয়ের অন্যতম কারণ এই ছিল যে, ১৯১৭ খ্রীঃ পর্যন্ত জার্মানীকে পূর্ব ও পশ্চিম দুই রণাঙ্গণে সৈন্য সন্নিবেশ করে দুটি সীমান্তে যুদ্ধ করতে হয়। এর ফলে কোন একটি সীমান্তে জার্মানী পুরো সেনা সন্নিবেশ করতে পারেনি। যদি জার্মানী কূটনীতির দ্বারা রাশিয়াকে ইঙ্গ-ফরাসী শক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারত, তবে হয়ত গোড়ার দিকে জার্মানীর জয়লাভ সম্ভব হত। কিন্তু কাইজার ত্রিশক্তি আঁতাতে ভাঙন ধরাতে পারেন নি। ১৯১৭ খ্রীঃ রাশিয়া যুদ্ধ ত্যাগ করলে সেই শূন্যস্থান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পূরণ করে। মোট কথা, মিত্রশক্তির সম্মিলিত শক্তি জার্মানী অপেক্ষা বেশী ছিল।

দুই রণাঙ্গনের যুদ্ধে জার্মান শক্তির বিভক্তি

জার্মানী আক্রমণাত্মক যুদ্ধে পটু ছিল। আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে জার্মানীর জয়লাভ ছিল দুস্কর। আক্রমণের সামনে পিছু হঠে দাঁড়াবার মত বেশী জায়গা জার্মানীর ছিল না। যেক্ষেত্রে রাশিয়া তার বিরাট এলাকা থাকার ফলে পিছু হঠে শত্রুকে যুদ্ধের পর যুদ্ধ দিতে পারত, জার্মানী আক্রান্ত হলে তার এমন বিস্তৃত স্থান ছিল না যে রাশিয়ার মত পিছু হঠে যুদ্ধ দিতে পারে।

জার্মানীর আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের দুর্বলতা

তাছাড়া পশ্চিম রণাঙ্গনে জার্মানীর বিরূদ্ধে ফ্রান্স জনযুদ্ধ আরম্ভ করে। ফরাসী গণতন্ত্র জার্মানীর নিকট ১৮৭০ খ্রীঃ পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর ছিল। যুদ্ধের গোড়ার দিকে জার্মানী ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের দিকে এগোলে, ফরাসী জনসাধারণ প্রবল বিক্রমে জার্মান বাহিনীকে হঠিয়ে দেয়। ১৯১৭ খ্রীঃ জার্মানী পুনরায় ফ্রান্স আক্রমণের চেষ্টা করলে ফরাসী জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাধাদানে এগিয়ে আসে। সর্বশেষে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যোগদানের ফলে জার্মানীর পরাজয় নিশ্চিত হয়। মার্কিন দেশ তার বিপুর সমর সম্ভার, জনবলসহ মিত্রশক্তির পক্ষে যোগ দিলে, দীর্ঘ যুদ্ধে ক্লান্ত জার্মানীর পক্ষে যুদ্ধ জয়ের সকল আশা দূর হয়।

ফরাসীদের জনযুদ্ধ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগদানের কারণ (Causes of U. S. A.'s joining theWorld War I)ঃ ১৮২৩ খ্রীঃ হতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মনরো নীতি (Monroe Doctrine) অনুসরণ করে ইওরোপীয় রাজনীতি থেকে দূরে থাকে। ১৯১৪ খ্রীঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হলে মার্কিন দেশ ১৯১৭ খ্রীঃ পর্যন্ত এই যুদ্ধের আবর্ত হতে দূরে থেকে নিরপেক্ষতা রেখে চলে। কিন্তু ১৯১৭ খ্রীঃ, ৬ই এপ্রিল মার্কিন দেশ নিরপেক্ষতা ত্যাগ করে ইঙ্গ-ফরাসী মিত্রশক্তির পক্ষ নিয়ে যুদ্ধে নামে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মার্কিন দেশের যোগ দেওয়ার প্রত্যক্ষ কারণ ছিল, আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করে, নিরপেক্ষ দেশ মার্কিন জাহাজের ওপর মহাসমুদ্রে জার্মান সাবমেরিনের আক্রমণ। মার্কিন দেশ দাবী করত যে, নিরপেক্ষ মার্কিন দেশ, আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে, তাঁর বাণিজ্য জাহাজ যুদ্ধমান যে কোন দেশে পাঠাতে পারে। মার্কিন খাদ্য ও অস্ত্র বোঝাই জাহাজগুলি যাতে ব্রিটেনে না যেতে পারে, এজন্য জার্মানী মাঝসমুদ্রে তার জাহাজগুলিকে ডুবাতে থাকে। শেষ পর্যন্ত মার্কিন যাত্রীবাহী বিলাস তরণী লুসিট্যানিয়াকে জার্মান সাবমেরিন আটলান্টিক মহাসাগরে ডুবিয়ে দিলে, মার্কিন দেশের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়। এ বিষয়ে মার্কিন প্রতিবাদপত্র জার্মানী অগ্রাহ্য করলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

মার্কিন জাহাজের উপর সাবমেরিন হানা

মহাসমুদ্রে নিরপেক্ষ দেশ হিসেবে মার্কিন বাণিজ্য জাহাজ চলাচলের দাবীর পশ্চাতে আমেরিকার ঘনিষ্ঠ স্বার্থ ছিল। মার্কিন শিল্পপতিরা চায় যে, নিরপেক্ষ দেশ হিসেবে আমেরিকা জার্মানী, ব্রিটেন ও ফ্রান্সকে অস্ত্র ও রসদ বিক্রি করে ফুলে ফেঁপে উঠবে। এই অস্ত্র রসদের বড় ক্রেতা ছিল ব্রিটেন ও ফ্রান্স। জার্মানী তার শত্রুপক্ষকে ঘায়েল করার জন্যে মার্কিন সমরসম্পদ বাহী জাহাজে আঘাত করে। এতে মার্কিন উচ্চ মহল ও বণিক গোষ্ঠী ক্রুদ্ধ হয়।

দ্বিতীয়তঃ, জার্মানী যদি সাবমেরিন আক্রমণ দ্বারা আন্তর্জাতিক আইন ভাঙ্গে, তবে ব্রিটেন জার্মানীর উপকূল অবরোধ দ্বারা আইন ভেঙেছিল। এক্ষেত্রে আমেরিকা কূটনৈতিক প্রতিবাদ জানিয়ে নিশ্চেষ্ট থাকে। কিন্তু জার্মানীর ক্ষেত্রে আমেরিকা ক্ষেপে যায়। বোষ্টনের একটি সংবাদপত্রে আমেরিকার মনোভাব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। ব্রিটেনের নৌ-অবরোধের ফলে আমেরিকার আর্থিক ক্ষতি হচ্ছিল। তা অবশ্য সহনীয় ছিল। জার্মানীর সাবমেরিন আক্রমণের ফলে আমেরিকানদের জীবন হানি ঘটেছিল, যা সহনীয় ছিল না। আমেরিকার মতে যাত্রীবাহী জাহাজকে আক্রমণ করার আগে সতর্ক না করে আক্রমণ ছিল অসহনীয় অপরাধ।

তৃতীয়তঃ, ব্রিটেন জার্মান উপকূল অবরোধ করায়, মার্কিন নিরপেক্ষ বাণিজ্যে বাধা পড়লে, আমেরিকা ব্রিটেনের কাছে যে সকল প্রতিবাদ পত্র পাঠায়, ব্রিটেন তার উত্তরগুলি বিলম্বিত করে, যাতে আমেরিকার মাথা ঠাণ্ডা হতে সময় পায়। জার্মানীর কাছে আমেরিকা সাবমেরিন আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালে, জার্মানী চটজলদি, দাম্ভিক অভদ্রতাপূর্ণ উত্তর পাঠায়। অথবা, আমেরিকাকে সতর্ক করে দেয় যে, জার্মানী সাবমেরিন আক্রমণ করবে এটা জানা কথা। তথাপি আমেরিকানরা তা জেনে শুনে কেন যাত্রী জাহাজ চড়ে সমুদ্রপথে যায়। দোষটা আমেরিকার বলেই, জার্মান জবাবে দেখাবার চেষ্টা করা হয়। তাছাড়া জার্মানী অপমানজনক পরামর্শ দেয় যে, মার্কিনদের উচিত এসময় ঘরে বসে থাকা; ইওরোপে যাতায়াত হ্রাস করা। নরওয়ে, সুইডেন প্রভৃতি দেশ সাবমেরিন আক্রমণের ভয়ে তাই করছে। আমেরিকানদের এটাই কাজ করা উচিত। এই ধরনের জার্মান উত্তর, আমেরিকার জাতীয় সম্মান ও গর্বে আঘাত করে।

চতুর্থতঃ, লুসিটানিয়া ঘটনার পর, আমেরিকা লন্ডন ঘোষণা অনুযায়ী জার্মানীকে সাবমেরিন আক্রমণ বন্ধ রাখার জন্যে শাসানী দিলে, জার্মানী কিছুকাল সাবমেরিন আক্রমণ হ্রাস করে। কিন্তু ১৯১৭ খ্রীঃ জানুয়ারি মাসে জার্মানী পুনরায় ব্যাপক সাবমেরিন আক্রমণ শুরু করে। ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের চতুর্দিকে জার্মানী সাবমেরিন আক্রমণের বলয় তৈরি করে এবং মার্কিন সরকারকে জানিয়ে দেয় যে, এই বলয় ভেদ করে মার্কিন মালবাহী বা যাত্রীবাহী জাহাজ ঢুকানো মার্কিন নাগরিকের জীবনহানির জন্যে জার্মানী দায়ী হবে না এবং মার্কিন মালবাহী জাহাজ ঢুকলে জার্মানীর কোন দায় থাকবে না। জার্মানীর এই একতরফা ঘোষণা মার্কিন শাসক মহলে তীব্র বিরক্তি সৃষ্টি করে। ১৯১৬ খ্রীঃ দ্বিতীয়বার নির্বাচিত মার্কিন রাষ্ট্রপতি যুদ্ধ বন্ধ করে শান্তি স্থাপনের যে প্রয়াস শুরু করেন তাতে ছেদ পড়ে। স্বয়ং রাষ্ট্রপতি উইলসনকে সিদ্ধান্ত বদলে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামার কথা ভাবতে হয়।

মার্কিন নৌ-চলাচলের ওপর জার্মান সাবমেরিন আক্রমণের একটি অর্থনৈতিক দিক ছিল। মার্কিন ঐতিহাসিক টমাস বেইলীর মতে, ১৯১৬ খ্রীঃ জার্মানীর ব্যাপক সাবমেরিন আক্রমণের ফলে মার্কিন মালবাহী জাহাজগুলি বিনষ্ট হতে থাকে। মার্কিন বন্দরগুলিতে লক্ষ লক্ষ টন রপ্তানি যোগ্য গম ও শিল্পদ্রব্য পচতে থাকে। কারণ জার্মান সাবমেরিন থাকার ফলে এই মাল মিত্র শক্তির বন্দরে পৌঁছানো যায়নি। মার্কিন অর্থনৈতিক ধ্বসের সম্ভাবনা দেখা দিলে মার্কিন কংগ্রেস ও সেনেটের সদস্যরা চঞ্চল হয়। শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি উইলসন যুদ্ধ ঘোষণার কথা ভাবতে বাধ্য হন। উইলসন চিন্তা করে দেখেন যে, আমেরিকার সামনে তিনটি পথ খোলা ছিল, যথা:—(১) মার্কিন মাল ও যাত্রীবাহী জাহাজগুলিকে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের চারদিকে জার্মানী সাবমেরিন আক্রমণের যে গণ্ডী রচনা করে, তার বাইরে রাখা। কিন্তু ধনাঢ্য ও শক্তিশালী মার্কিন দেশের কাছে জার্মানীর এই হুমকীর কাছে মাথা নত করা ছিল অসম্মানজনক। (২) মার্কিন অহমিকা ও জাতীয় সম্মানের বড়াই না করে, নরওয়ে, সুইডেনের মত যতদূর সম্ভব নিরপেক্ষ থাকা। মার্কিন অধিবাসীর জীবনহানি ঘটলে বা মার্কিন জাহাজ বিনষ্ট হলে, তা নীরবে সহ্য করা। আমেরিকার মত দেশের পক্ষে এই নিষ্ক্রিয়তা গ্রহণ সম্ভব ছিল না। (৩) তৃতীয় পথ ছিল যুদ্ধ ঘোষণা। উইলসন এই তৃতীয় পথই বেছে নেন।

মার্কিন দেশের যুদ্ধে যোগদানের আরও বহু কারণ ছিল। মার্কিন দেশ মনে করত যে, ইওরোপে জার্মানীর ন্যায় একটি সামরিক শক্তির একক প্রাধান্য স্থাপিত হলে শক্তিসাম্য বিপন্ন হবে। ফ্রান্সের স্থলশক্তি ও ব্রিটেনের নৌশক্তি জার্মানীর হাতে ধ্বংস হলে, অতঃপর জার্মানী মার্কিন শক্তির মুখোমুখি হবে। সুতরাং ফ্রান্স ও ব্রিটেনকে সাহায্য দিয়ে জার্মানীর বিরুদ্ধে শক্তিসাম্য রক্ষার জন্যে মার্কিন দেশ যুদ্ধে নামে। ব্রিটিশ মন্ত্রী লর্ড গ্রে, মার্কিন দেশকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, "আমেরিকার মনে

মার্কিন নিরাপত্তার জন্যে শক্তি সাম্য রক্ষা

রাখা উচিত যে, আমরা আমাদের এবং আমেরিকার স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে যুদ্ধ করছি।" মার্কিন রাষ্ট্রপতি উইলসন মন্তব্য করেন যে, "গ্রে ঠিক কথা বলেছেন।" রাশিয়া ১৯১৭ খ্রীঃ যুদ্ধ ত্যাগ করলে, জার্মান সেনাদল পূর্ব রণাঙ্গন হতে পশ্চিমে এসে ফ্রান্স ও ব্রিটেনের বিরুদ্ধে বিরাট চাপ সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রে শক্তিসাম্য রক্ষার জন্যে মার্কিন দেশ যুদ্ধে যোগ দেয়।

তাছাড়া মার্কিন জনগোষ্ঠীর মধ্যে ইংরাজী ভাষাভাষী এ্যাংলো-স্যাক্সন গোষ্ঠীর লোক ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাদের পূর্বপুরুষদের মাতৃভূমি ইংলন্ডের বিপদে সাহায্যদানের জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে তারা চাপ দেয়।স্বয়ং রাষ্ট্রপতি উইলসনের মিত্রশক্তির প্রতি সহানুভূতি ছিল। উইলসনের ঘনিষ্ঠ ও প্রভাবশালী পরামর্শদাতারাও তাঁকে ইংলন্ডের অনুকূলে সিদ্ধান্ত নিতে প্রভাবিত করেন। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ফরাসী সাহায্যের কথা আমেরিকাবাসী ভোলেনি। ফ্রান্স আক্রান্ত হলে ফ্রান্সের প্রতি মার্কিন জাতির গভীর সহানুভূতি দেখা দেয়। মার্কিন কবি রবার্ট আন্ডারউড জনসন তাঁর একটি কবিতায় আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ফরাসী সেনাপতি লাফায়েতের বীরত্বের কথা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্বরণ করেন।বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতা অগ্রাহ্য করে জার্মানীর বেলজিয়াম আক্রমণ ও বেলজিয়ামে জার্মানসেনার নিষ্ঠুরতা ও বর্বর অত্যাচার মার্কিন জনমতকে জার্মানীর বিরুদ্ধে আলোড়িত করে।

পিতৃভূমি ইংলন্ডের প্রতি সমর্থন

ইতিমধ্যে জার্মান সেনাদের বর্বরতা সম্পর্কে ব্রিটিশ প্রচার অবিরাম মার্কিন নাগরিকদের কানে অতিরঞ্জিত সংবাদ পৌঁছে দিতে থাকে। ইংরাজ-ঘেঁষা মার্কিন সংবাদপত্রগুলিতে ব্রিটেনের জার্মান বিরোধী প্রচার ও বেলজিয়ামের যুদ্ধে জার্মান বর্বরতার কাহিনী ফলাও করে ছাপা হয়। এর ফলে মার্কিন জনমত প্রভাবিত হয়। এই সঙ্গে জার্মান সাবমেরিনের আক্রমণে মার্কিন নাগরিকের অবিরাম প্রাণহানির খবরও ছাপা হতে থাকে। এই প্রচারের জার্মান প্রতিবাদকে মার্কিনীরা আমল দেয়নি। মার্কিন সরকার ব্রিটেনের এই একতরফা প্রচারকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করেননি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একপেশে ব্রিটিশ ঘেঁষা জনমত দেখে জার্মানী আশঙ্কা বোধ করে। আমেরিকা থেকে সমরাস্ত্র ব্রিটেনে ও ফ্রান্সে পাঠান হলে, জার্মানী তা বন্ধ করার জন্যে মার্কিন কল-কারখানায় অন্তর্ঘাতমূলক কাজ শুরু করে। জার্মান গোয়েন্দা বাহিনী মার্কিন শ্রমিকদের ক্ষেপিয়ে কল-কারখানায় ধর্মঘট চালাবার চেষ্টা করে। জার্মান এজেন্টগণ মার্কিন পুলিশের হাতে ধরা পড়লে মার্কিন জনমত ক্ষিপ্ত হয়। এই সময় জার্মান পররাষ্ট্র সচিব জিমারম্যানের একটি গোপান বার্তা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলে আমেরিকা ক্রোধে ফেটে পড়ে। আমেরিকা শেষ পর্যন্ত মিত্রশক্তির পক্ষে যোগ দিলে, আমেরিকাকে শায়েস্তা করার জন্যে জিমারম্যান মেক্সিকোর সরকারকে ব্যবহার করার পরিকল্পনা করেন। আমেরিকার টেক্সাস, আরিজোনা, নব মেক্সিকো অঞ্চল একদা মেক্সিকোর অন্তর্ভূক্ত ছিল, এই সংবাদে মেক্সিকো জার্মানীর সহায়তায় এই স্থানগুলি দখল করার কথা বলা হয়।জার্মানীর এই সকল আপত্তিকর কাজকে মার্কিন সরকার শত্রুজনোচিত কাজ বলে গণ্য করেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগদানের পশ্চাতে মার্কিন দেশের বাণিজ্যিক স্বার্থ বিশেষভাবে ছিল। জার্মানীর বিরুদ্ধে ইঙ্গ-ফরাসী শক্তি সমরসম্ভার ও খাদ্য বিক্রয় করে মার্কিন দেশ ফুলে ফেঁপে উঠে। ইঙ্গ-ফরাসী শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্যাঙ্কগুলি থেকে যুদ্ধের খরচ চালাইবার জন্য বিরাট পরিমাণ অর্থ ঋণ নেয়। ১৯১৬ খ্রীঃ যুদ্ধের গতি মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে গেলে মার্কিন শিল্পপতি এবং ব্যাঙ্ক মালিক শ্রেণী ইংলন্ড ও ফ্রান্স পরিদর্শনে আসে। ডেভিসন এবং মর্গান প্রভৃতি বৃহৎ কোম্পানীর মালিকরা আশঙ্কা করে যে, মিত্রশক্তি পরাস্ত হলে তাদের সঙ্গে বাণিজ্য নষ্ট হবে। যে

মার্কিন বাণিজ্যিক স্বার্থরক্ষার চেষ্টা

বিরাট ঋণ মিত্রশক্তি মার্কিন দেশের কাছে নিয়েছে তা পরিশোধ হবে না। এজন্যে মার্কিন ধনকুবেররা মার্কিন সরকারকে মিত্রশক্তির পক্ষে যোগদানের জন্যে পরামর্শ দেয়।

সর্বশেষে প্রশ্ন আসে যে, অর্থনৈতিক অথবা মানবিক কারণগুলির মধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকার যোগদানের জন্যে কোনটি বেশী গুরুত্বপূর্ণ ছিল? যুদ্ধের পর একশ্রেণীর ঐতিহাসিক পিছন ফিরে সমুদয় কারণগুলি বিচার করে বলেন যে, মার্কিন শিল্পপতি, অস্ত্র নির্মাণ ও বিক্রেতারাই তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থের জন্যেই মার্কিন সরকারকে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণায় বাধ্য করে। ঐতিহাসিক টমাস বেইলী বলেন যে, এই মত পুরো না হলেও আংশিক সত্য। বেইলীর মতে, মানসিক কারণকে মোটেই উপেক্ষা করা ঠিক হবে না। জার্মানীর নিয়ন্ত্রণহীন সাবমেরিন আক্রমণ এবং মার্কিন নাগরিকদের প্রাণহানি মার্কিন দেশকে যুদ্ধের দিকে ঠেলে নিয়ে যায়। আমেরিকা মনে করত যে, জার্মানীর দোষেই তাকে যুদ্ধঘোষণা বাধ্য হয়ে করতে হয়। (The war, so far U.S.A. was concerned was made in Germany)।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল (The Results of the World War I) ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা এই যুগের আগের যে কোন যুদ্ধকে ছাড়িয়ে যায়। প্রায় ২৬ লক্ষ সেনা এই যুদ্ধে মারা পড়ে এবং ৭০ লক্ষ লোক আহত হয়। প্রচুর ধনসম্পত্তি বিনষ্ট হয়। বেলজিয়াম, ফ্রান্স ও জার্মানী এই যুদ্ধে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যুদ্ধজনিত মহামারী, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতির দরুন বহু প্রাণহানি হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার দীর্ঘকাল পরেও ইওরোপের জীবন স্বাভাবিক হয়নি। এই যুদ্ধে জার্মানী এমন ক্ষতিগ্রস্ত হয় যে, জার্মানীতে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। যুদ্ধ ফেরৎ জার্মান সেনাদল বেকার হয়ে পড়ে। কল-কারখানাগুলি মন্দার দরুন বন্ধ হয়ে যায়। মুদ্রাস্ফীতির দরুন জিনিসপত্রের দাম ভয়ানক বৃদ্ধি পায়। জার্মান মুদ্রা মার্কের দাম ভয়ানক হ্রাস পেলে জার্মানীর অর্থনৈতিক জীবন পঙ্গু হয়ে যায়।

যুদ্ধে প্রাণহানি, ক্ষয়ক্ষতি ও মুদ্রাস্ফীতি

বৈষয়িক ক্ষতি ও জীবনহানি ছাড়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধে দারুন নৈতিক অবক্ষয় দেখা দেয়। প্রথমতঃ, যুদ্ধের সময় বিভিন্ন রাষ্ট্র শত্রুর বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার চালায়। তারা শত্রুর ক্ষয়ক্ষতিকে বড় করে দেখায় এবং নিজেদের ক্ষতিকে কমিয়ে বলে। এই যুদ্ধের জন্যে শত্রুপক্ষই একমাত্র দায়ী এরূপ মিথ্যা ধারণা সৃষ্টি করা হয়। সরকারি স্তরে মিথ্যা প্রচার জনজীবনের নীতিবোধকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরও জনসাধারণ 'আমরা' ও 'তাহারা' (We and They), মিত্রশক্তি ও শত্রুশক্তি এই মনোভাব বেশ কিছুদিন ছাড়তে পারে নি। সংবাদপত্রগুলিও এই মিথ্যা প্রচারের শিকার হয়। মানবতাবোধ, সহিষ্ণুতা এবং শান্তিবাদ ফিরে আসতে যথেষ্ট সময় লাগে।

নৈতিক অবক্ষয় ঃ মিথ্যা প্রচার

রাজনৈতিক দিক থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এক সুদূর-প্রসারী পরিবর্তনের সূচনা করে। ইংলন্ড ও ফ্রান্স এই যুদ্ধে জয়লাভ করলেও তারা প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে। এজন্য মিত্রশক্তি তাদের পূর্ব ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। একদা ইঙ্গ-ফরাসী দেশ দুটি বিশ্বের প্রধান শক্তি ছিল। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির দরুন তারা বিশ্বের অন্যতম শক্তিতে পরিণত হয়। এদের স্থলে মার্কিন দেশ ও বলশেভিক রাশিয়া বিশ্ব রাজনীতিতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর প্রাধান্য বিস্তার করে। ইঙ্গ-ফরাসী শক্তির হাত থেকে বিশ্ব-রাজনীতির প্রাধান্য হাতছাড়া হয়।

ইঙ্গ-ফরাসী শক্তির বিশ্ব আধিপত্য নাশ ; মার্কিন দেশ ও রাশিয়ার উত্থান

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে জার্মানীতে দারুণ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এই যুদ্ধের পর জার্মানীর নব প্রতিষ্ঠিত প্রজাতন্ত্রী সরকার জার্মানীতে মজবুত শাসন স্থাপনে ব্যর্থ হয়। শেষ পর্যন্ত এডলফ

জার্মানীতে প্রজাতন্ত্র স্থাপন

হিটলার নামে এক ব্যক্তি জার্মান প্রজাতন্ত্রকে উচ্ছেদ করে জার্মানীর ওপর নাৎসী একনায়কতন্ত্র স্থাপন করেন। হিটলার ভার্সাই সন্ধিকে নস্যাৎ করে পুনরায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে পৃথিবীকে এগিয়ে দেন।

রাশিয়ার জার সরকার প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগ দিয়ে মহাভুল করেন। জারতন্ত্র তার স্বৈরাচারী শাসনের জন্যে রুশ জনসাধারণের ঘৃণার পাত্র ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার সেনাদলের পরাজয় ঘটলে, জারের বিরুদ্ধে রাশিয়ায় দারুণ বিক্ষোভ দেখা দেয়। জার বাধ্য হয়ে চতুর্থ ডুমার অধিবেশন ডাকেন। ডুমার অধিবেশন ডাকার অর্থই ছিল জারের স্বৈরতন্ত্রে বিফলতা স্বীকার করা। ডুমার নির্দেশে জার দ্বিতীয় নিকোলাস পদত্যাগ করেন। রাশিয়ায় জারতন্ত্রের অবসান হয়। জারতন্ত্রের পতনের ফলে রাশিয়ায় একটি বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র কিছুদিনের জন্যে স্থাপিত হয়। কিন্তু এর পশ্চাতে শ্রমিক, কৃষকদের সমর্থন না থাকায় এই প্রজাতন্ত্রকে ধ্বংস করে রাশিয়ার বলশেভিক দল সমাজতন্ত্র স্থাপন করে। এভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বিশ্বে প্রথম সমাজতান্ত্রিক সরকার গঠনের সুযোগ সৃষ্টি করে।

বলশেভিক বিপ্লব

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ শক্তি জার্মানীর আক্রমণ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হলে ব্রিটিশ উপনিবেশগুলিতে স্বাধীনতা আন্দোলন জোরদার হয়। ভারতবর্ষে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ১৯২০ খ্রীঃ অহিংস অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হয়। ভারতের আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ঔপনিবেশিক দেশগুলির মুক্তি আন্দোলনের সূচনা হয়।

ঔপনিবেশিক দেশে স্বাধীনতা আন্দোলন

সামাজিক দিক থেকে দেখা যায় যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে সাধারণভাবে নারী ও শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি ঘটে। যুদ্ধের সময় পুরুষেরা যুদ্ধে যোগ দিলে গৃহবধুরা গৃহকোণ ছেড়ে অফিসে, বিদ্যালয়ে, ক্ষেতে, খামারে, কারখানায় কাজ করতে বাধ্য হয়। যুদ্ধ শেষ হলে আর নারীরা গৃহের বদ্ধ জীবনে ফিরে যায়নি। ইওরোপে তারা পুরুষের পাশাপাশি মাথা উঁচু রেখে চলতে আরম্ভ করে। ইওরোপের শ্রমিকশ্রেণী যুদ্ধের সময় তাদের শক্তির কথা বুঝতে পারে। তারা বুঝতে পারে যে, শ্রমিক কলে, কারখানায় কাজ করলে তবেই যুদ্ধের মারণাস্ত্র নির্মিত হয়; সাধারণ লোকের নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য উৎপন্ন হয়। শ্রমিকের শ্রমের দ্বারাই রাষ্ট্রের সম্পদ উৎপন্ন হয়। বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনগুলি শ্রমিকের দাবী-দাওয়া সম্পর্কে তাদের সচেতন করে। রুশ বিপ্লবে শ্রমিক শ্রেণী লাভবান হলে, অন্যান্য দেশেও শ্রমিকের মঙ্গলের জন্যে রাষ্ট্রকে আইন রচনা করতে হয়। শ্রম ও শ্রমিকের মর্যাদা বাড়ে।

নারী মুক্তি

শ্রমিক জাগরণ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে প্রতি রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতিতে জনমতের প্রভাব বিশেষভাবে পড়ে। অতীতে বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে সাধারণ লোকের আগ্রহ কম ছিল। কিন্তু যুদ্ধের পর লোকে বৈদেশিক নীতির গুরুত্ব বুঝতে পারে। সংবাদপত্রের প্রসারের ফলে লোকে বৈদেশিক ঘটনা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়। এজন্য গোপন কূটনীতির (Secret diplomacy) স্থলে খোলা কূটনীতি চালু হয়। বিজ্ঞান, চিকিৎসা ও প্রযুক্তি বিদ্যার ক্ষেত্রে বিশ্বযুদ্ধের চাপে বিশেষ অগ্রগতি ঘটে। যুদ্ধের প্রয়োজনে এই আবিষ্কারগুলি ত্বরান্বিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আকাশ পথে পরিবহণ ও যুদ্ধের সূচনা হয়। বিমান নির্মাণের ক্ষেত্রে বিরাট বিপ্লব ঘটে।

জনমতের, সংবাদপত্রের প্রভাব বৃদ্ধি

উইলসনের চৌদ্দদফা (The Fourteen Points of Wilson) : ১৯১৮ খ্রীঃ মিত্রশক্তি উপলব্ধি করে জার্মানীর পতন আসন্ন হয়েছে। এই সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন ৮ই জানুয়ারি, ১৯১৮ খ্রীঃ মার্কিন কংগ্রেসের নিকট তাঁর শান্তি পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। এর নাম ছিল চৌদ্দ দফা শর্ত (Fourteen Points)। এই চৌদ্দ দফায় উইলসন চান যে, উল্লিখিত নীতির ওপর নির্ভর করে জার্মানী ও

চতুর্দশ নীতি

তার মিত্রদেশগুলির সঙ্গে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হবে। উইলসন আগাগোড়া নিজেকে শান্তি স্থাপনের অগ্রনী দূত বলে মনে করতেন। তিনি চান যে, তাঁর ঘোষিত শর্তগুলির ভিত্তিতে ইওরোপে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হলে, ইওরোপে শান্তি স্থায়ী হবে। বিশেষভাবে উইলসন চান যে, জাতি-সঙ্ঘ বা লীগ অব নেশনস প্রতিষ্ঠা করে তিনি আন্তর্জাতিক বিরোধের স্থায়ী মীমাংসার ব্যবস্থা করবেন। চতুর্দ্দশ দফায় বলা হয় যে ঃ —

শর্তসমূহ

(১) গোপন কূটনীতির স্থলে খোলাখুলিভাবে শান্তি চুক্তির শর্ত আলোচনা করা হবে। কোন গোপন চুক্তিকে সন্ধির শর্ত হিসেবে গ্রহণ করা হবে না। (২) মহাসমুদ্রে নিরপেক্ষ দেশের জাহাজ চলাচলের অবাধ অধিকারকে স্বীকার করা হবে। (৩) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সকল দেশের অবাধ অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে। (৪) প্রতি দেশের অস্ত্র হ্রাস করে আন্তর্জাতিক যুদ্ধের সম্ভাবনা দূর করতে হবে। (৫) উপনিবেশগুলির ওপর বিভিন্ন দেশের দাবী স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে বিচার করা হবে। (৬) রাশিয়ার অধিকৃত স্থানগুলি রাশিয়াকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। (৭) বেলজিয়ামের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা পুনঃস্থাপণ করা হবে। (৮) ঐতিহাসিক ন্যায়বিচারের জন্যে ফ্রান্সকে আলসাস ও লোরেন ফিরিয়ে দেওয়া হবে। (৯) ইতালীর জাতীয়তাবাদী আশা অনুযায়ী ইতালীর জাতীয় সীমান্ত নির্ধারণ করা হবে। (১০) অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্যের জনগণকে স্বায়ত্ব শাসনের সুযোগ দেওয়া হবে। (১১) বলকান রাজ্যগুলিকে স্বাধীনতা দান করা হবে। সার্বিয়ার ভূখণ্ডকে সমুদ্রের সঙ্গে সংযুক্ত করা হবে। (১২) তুরস্কের সুলতানের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত জাতিগুলিকে স্বায়ত্ব শাসনের অধিকার দেওয়া হবে এবং দার্দানালিস প্রণালীকে আন্তর্জাতিক জলপথ বলে ঘোষণা করা হবে। (১৩) স্বাধীন ও সার্বভৌম পোল্যাণ্ড স্থাপন করা হবে এবং স্বাধীন পোল্যাণ্ডকে সমুদ্রের সঙ্গে সংযুক্ত করা হবে। (১৪) ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও ভৌমিক অখণ্ডতা রক্ষার জন্যে এবং আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্যে বিভিন্ন জাতিগুলির সমবায়ে একটি সঙ্ঘ স্থাপন করা হবে।

চতুর্দশ নীতির গুরুত্ব

চতুর্দশ দফায় ১—৫ নং শর্তগুলি ছিল সাধারণ শর্ত এবং সকল দেশের প্রতি প্রযোজ্য। এই শর্তগুলির দ্বারা উইলসন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণগুলি যথা গোপন চুক্তি, ঔপনিবেশিক বিরোধ, বাণিজ্য শুল্ক এবং নিরপেক্ষ দেশের জাহাজ চলাচলের অবাধ অধিকার নিয়ে অস্ত্র প্রতিযোগিতা প্রভৃতি দূর করার চেষ্টা করেন। ৬—১৩ নং শর্তগুলির দ্বারা উইলসন বিশেষ বিশেষ দেশের অসন্তোষের কারণ দূর করার চেষ্টা করেন। ১৪ নং শর্ত দ্বারা জাতিসঙ্ঘ স্থাপনের পরিকল্পনা করেন। উইলসন চতুর্দশ দফা ছাড়া আরও কয়েকটি ঘোষণায় বলেন যে, চূড়ান্ত শান্তি চুক্তি রচনার সময় লক্ষ্য রাখাও হবে যেন ঃ—(১) প্রতি ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পক্ষের ওপর নিরপেক্ষ বিচার করা হয় এবং (২) যেন ভবিষ্যতে কোন অশান্তির কারণ সৃষ্টি না হয়। উইলসন আশা প্রকাশ করেন যে, "প্রথম বিশ্বযুদ্ধ হবে মানব জাতির শেষ যুদ্ধ। পৃথিবীতে আর এরূপ যুদ্ধ ঘটবে না।" মার্কিণ রাষ্ট্রপতি উইলসন-এর উল্লিখিত চতুর্দশ শর্তগুলির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ছিল।

চতুর্দশ দফার বৈশিষ্ট্য

প্রথমতঃ, চতুর্দশ দফায় পরাজিত জার্মানীর ওপর কোন শাস্তি বা প্রতিশোধ গ্রহণের কথা ছিল না। বরং এর সারমর্ম এই ছিল যে, শান্তিচুক্তি এমনভাবে রচনা করতে হবে যেন পরাজিত দেশগুলির মনে অসন্তোষ না জমা থাকে। দ্বিতীয়তঃ, জার্মানীর কাছ থেকে বিজয়ী দেশগুলি ক্ষতিপূরণ নিবে এমন কথা এতে ছিল না। তৃতীয়তঃ, একমাত্র জার্মানীকেই নিরস্ত্রীকরণ করা হবে একথা চতুর্দশ দফায় বলা হয়নি। সকল শক্তির অস্ত্র হ্রাসের কথা এতে বলা হয়। চতুর্থতঃ, ইওরোপের সকল জাতির স্বাধীনতা স্বীকার করে ইওরোপের পুনর্গঠনের কথা বলা হয়। এক জাতি ও এক রাষ্ট্র ছিল চতুর্দশ দফার মূল সূত্র

(Doctrine of one nation, one state)। পঞ্চমতঃ, বিজয়ী দেশগুলির একাধিপত্য স্থাপন করার কোন ইঙ্গিত এতে ছিল না। চৌদ্দ দফার পশ্চাতে মার্কিন স্বার্থরক্ষার নীতিও নিহিত ছিল। ইওরোপে শক্তিসাম্য স্থাপন করে মার্কিন দেশ তার নিরাপত্তাকে দৃঢ় করার চেষ্টা করে।

প্যারিসের শান্তি সম্মেলন, ১৯১৯ খ্রীঃ (The Congress of Paris, 1919) ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিজয়ী মিত্রশক্তি পরাজিত জার্মানী ও তার মিত্রদেশগুলির সঙ্গে শান্তি চুক্তি সম্পাদনের জন্যে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আহ্বান করে। প্যারিসের শান্তি সম্মেলনে পৃথিবীর মোট ৩২টি দেশের প্রতিনিধি যোগ দেয়।[১] প্রতিনিধিদের দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়, যথা মিত্র দেশ (The Allies) এবং সহকারী দেশ (Associated Powers)। মিত্রদেশগুলির মধ্যে ব্রিটেন, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইতালী ও জাপান ছিল প্রধান। এরাই ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ী। যা হোক, প্যারিসের শান্তি বৈঠকে প্রধান সিদ্ধান্তগুলি শেষ পর্যন্ত তিন প্রধানের ওপর বর্তায়। এই তিন প্রধান ছিলেন ফরাসী মন্ত্রী ক্লেমাঁসু, ব্রিটেনের মন্ত্রী লয়েড জর্জ এবং মার্কিন রাষ্ট্রপতি উইলসন। এঁদের মধ্যে উইলসন ছিলেন কিছুটা আদর্শবাদী ; ক্লেমাঁসু ছিলেন বাস্তববাদী এবং লয়েড জর্জ ছিলেন সুবিধাবাদী। উইলসন ইওরোপের পুনর্গঠনে যে আদর্শবাদ প্রয়োগ করার চেষ্টা করেন তা ক্লেঁমাসুর বাস্তববাদে ধাক্কা খায়। উইলসন অবশ্য কূটনীতি ও দৃঢ়তায় কম ছিলেন না। কিন্তু ক্লেমাঁসুর ব্যক্তিত্ব ও লৌহ কঠিন দৃঢ়তার নিকট তিনি অনেক ক্ষেত্রে আপোষ নীতি নিতে বাধ্য হন। শেষ পর্যন্ত তিন প্রধান যে নীতিগুলির ওপর ভিত্তি করে সন্ধি চুক্তি রচনায় একমত হন তাহা হল :— (১) জার্মানীকে সন্ধির দ্বারা এমন ভাবে দুর্বল করে রাখা হবে যার ফলে ভবিষ্যতে জার্মানী ইওরোপে সামরিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ না করতে পারে। (২) জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতি অনুসারে মধ্য ও পূর্ব ইওরোপের পুনর্গঠন করা হবে। (৩) এজন্য তুর্কী, রুশ ও হ্যাপসবার্গ সাম্রাজ্যকে ভেঙে ফেলা হবে। (৪) ফ্রান্সের নিরাপত্তা রক্ষার জন্যে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। (৫) ইওরোপে যাতে কোন শক্তি একক প্রাধান্য না পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হবে।

প্যারিসের সম্মেলনে গৃহীত নীতিগুলি

উপরোক্ত নীতি অনুসারে নিম্নলিখিত সন্ধিগুলি প্যারিসের শান্তি বৈঠকে রচিত হয়, যথা জার্মানীর সহিত ভার্সাইয়ের সন্ধি, অষ্ট্রিয়ার সহিত সেন্ট জার্মেইনের সন্ধি , হাঙ্গেরীর সহিত ট্রিয়াননের সন্ধি, বুলগেরিয়ার সহিত নিউলির সন্ধি এবং তুরস্কের সহিত সেভরের সন্ধি।

ভার্সাই-এর সন্ধি, ১৯১৯ খ্রীঃ (The Treaty of Versailles, 1919) ঃ বিজয়ী মিত্রশক্তির মতে, জার্মানী ছিল যুদ্ধ অপরাধী। সুতরাং সন্ধির শর্ত আলোচনার জন্যে জার্মানীকে প্যারিসের শান্তি বৈঠকে কোন সুযোগ না দিয়ে একতরফাভাবে জার্মানীর ওপর ভার্সাই সন্ধির শর্তগুলি চাপান হয়। শান্তি সম্মেলনে জার্মান প্রতিনিধিদলকে প্রতীক যুদ্ধবন্দী হিসেবে গণ্য করা হয়। জার্মান প্রতিনিধিদলকে প্রহরীর দ্বারা বেষ্টন করে সন্ধি স্বাক্ষর করতে আনা হয় এবং সন্ধি-স্বাক্ষরের পর তাদের প্রহরীর অধীনে বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়।

জার্মানীর প্রতি দুর্ব্যবহার

(ক) ভার্সাই সন্ধির ভৌগোলিক শর্তগুলি দ্বারা স্থির হয় যে জার্মানীর পশ্চিম সীমান্তে —(১) ঐতিহাসিক ন্যায় বিচার নীতি অনুসারে, জার্মানী ফ্রান্সকে আলসাস ও লোরেন প্রদেশ ফিরিয়ে দিবে। (২) বেলজিয়ামকে ইউপেন; মরিসনেট, ম্যালমেডি নামক জেলাগুলি জার্মানী ছেড়ে দিবে। (৩) জার্মানীর উত্তর

ভৌগোলিক শর্তাবলী

১· Thomas Bailay—Diplomatic Historyর মতে মোট ২৭টি দেশ যোগ দিয়েছিল।

সীমান্তে ডেনমার্ককে শ্লেজভিগ প্রদেশ জার্মানী ফিরিয়ে দিবে। গণভোটের দ্বারা শ্লেজভিগ প্রদেশের জনমত যাচাই করা হলে দক্ষিণ শ্লেজভিগ, জার্মানীর সঙ্গে যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করে। (৪) জার্মানী মেমেল অঞ্চল লিথুয়ানিয়াকে হস্তান্তর করে। (৫) জার্মানীর পূর্ব সীমান্তে পোজেন ও পশ্চিম প্রাশিয়া অঞ্চল জার্মানী পোল্যাণ্ডকে ছেড়ে দেয়। (৬) ঐতিহাসিক ন্যায় বিচার অনুসারে স্বাধীন ও সার্বভৌম পোল্যাণ্ড রাষ্ট্র স্থাপিত হয়। দীর্ঘকাল পরে পোল্যাণ্ড তার স্বাধীনতা ফিরে পায়। (৭) স্বাধীন পোল্যাণ্ড যাতে সমুদ্রের সঙ্গে যুক্ত হয়, এজন্যে জার্মানীর মধ্য



দিয়ে একটা যোগাযোগকারী রাস্তা (Corridor) পোল্যাণ্ডকে জার্মানী ছেড়ে দেয়। (৮) জার্মান বন্দর ডানজিগ জাতিসংঘ অধিগ্রহণ করে। জাতিসংঘ এই বন্দর পোল্যাণ্ডকে ব্যবহার করতে দেয়। (৯) জার্মানীর পূর্ব সীমান্তে সাইলেশিয়া প্রদেশটিকে গণভোটের দ্বারা তিন ভাগ করা হয়। একাংশ জার্মানীর সঙ্গে যুক্ত থাকে, অপরাংশ চেকোশ্লোভাকিয়া এবং তৃতীয় অংশ পোল্যাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়। (১০) জার্মানীর পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে যাতে ভবিষ্যতে জার্মানী ফ্রান্সকে আক্রমণ না করতে পারে এজন্য নিরাপত্তা বলয় রচনা করা হয়। ফ্রান্সের নিরাপত্তা রক্ষার জন্যে এই

সন্ধিতে বলা হয় যে, (ক) রাইনল্যান্ডে আপাততঃ ১৫ বছরের জন্যে মিত্রশক্তির দখলদার বাহিনী অবস্থান করে, ফ্রান্সকে নিরাপত্তার ছত্র দিবে। (খ) রাইন নদীর পূর্বতীরে জার্মান সামরিক ঘাঁটি রাখা যাবে না। (গ) যুদ্ধের সময় ফ্রান্সের কয়লাখনিগুলি জার্মানী ধ্বংস করার জন্যে, ১৫ বছরের জন্যে জার্মানীর কয়লাখনি সমৃদ্ধ সার জেলা ফ্রান্স দখল করবে। ১৫ বছর পরে গণভোট দ্বারা স্থির হবে এই জেলা কোন দেশ পাবে।

(খ) ভার্সাই সন্ধির ঔপনিবেশিক শর্ত অনুসারে আফ্রিকা ও দূরপ্রাচ্যের উপনিবেশগুলির ওপর জার্মানীর অধিকার লোপ করা হয়। জার্মানীর দূরপ্রাচ্যের উপনিবেশগুলি জাপানকে দেওয়া হয়। জার্মানীর অন্যান্য উপনিবেশগুলি জাতিপুঞ্জ অধিগ্রহণ করে ব্রিটেন ও ফ্রান্সকে ম্যান্ডেট হিসেবে শাসন করতে দেওয়া হয়।

ঔপনিবেশিক শর্তাবলী

(গ) ভার্সাই সন্ধির অর্থনৈতিক শর্তগুলির দ্বারা জার্মানীকে যুদ্ধ অপরাধী সাব্যস্ত করা হয়। যুদ্ধের দরুন মিত্রশক্তির ক্ষতিপূরণের জন্যে জার্মানীর ওপর ক্ষতিপূরণ চাপান হয়। (১) যুদ্ধে মিত্রশক্তির যে ক্ষয়ক্ষতি হয় তার দরুন মিত্রশক্তির অর্থের দ্বারা ক্ষতিপূরণ দিতে জার্মানীকে বলা হয়। জার্মানীর প্রদেয় ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ধার্যের জন্যে একটি ক্ষতিপূরণ কমিশন নিয়োগ করা হয়। এই কমিশনকে তিন বছরের মধ্যে চূড়ান্ত রিপোর্ট দিতে বলা হয়। আপাততঃ জার্মানী কিছু পরিমাণ অর্থ মিত্রশক্তিকে দিতে বাধ্য থাকবে বলা হয়। (২) রাইন নদীকে আন্তর্জাতিক জলপথ বলে ঘোষণা করা হয়। (৩) মিত্রশক্তিকে কয়লা, কাঠ ও অন্যান্য দ্রব্য সরবরাহ করতে জার্মানীকে বাধ্য করা হয়। (৪) ভার্সাই সন্ধির ২৩৪ ধারায় বলা হয় যে, মিত্রশক্তির দ্বারা উৎপন্ন শিল্পদ্রব্য বিক্রয়ের জন্যে জার্মানীর বাজারে মিত্রশক্তিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

অর্থনৈতিক শর্তাবলী

(ঘ) ভার্সাই সন্ধির পঞ্চম অনুচ্ছেদে সামরিক শর্তগুলির উল্লেখ করা হয়। সামরিক শর্তগুলির উদ্দেশ্য ছিল জার্মানী যাতে ভবিষ্যতে আক্রমণাত্মক ক্ষমতা লাভ না করতে পারে তার ব্যবস্থা করা। জার্মানীকে নিরস্ত্রীকৃত করে ফ্রান্সের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা। এজন্যে জার্মানীকে যুদ্ধ অপরাধী সাব্যস্ত করে জার্মানীর সামরিক শক্তি ধ্বংস করার ব্যবস্থা করা হয়। (১) জার্মানীর স্থল, জল ও বিমান বাহিনীকে বিলুপ্ত করার ব্যবস্থা করা হয়। (২) জার্মান সেনাপতিমণ্ডলীকে বরখাস্ত করা হয়। (৩) জার্মানীতে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা, বাধ্যতামূলকভাবে সেনাদলে যোগদান ব্যবস্থা লোপ করা হয়। (৪) হেলিগোল্যাণ্ডের নৌঘাঁটি বিলুপ্ত করা হয়। (৫) ভবিষ্যতে জার্মানীকে সমরাস্ত্র নির্মাণ করতে নিষেধ করা হয়। (৬) জার্মান যুদ্ধ জাহাজগুলিকে ইংলন্ডের হাতে তুলে দিতে বলা হয়। জার্মানী কেবলমাত্র ৬টি ছোট যুদ্ধ জাহাজ, ৩টি ছোট ক্রুজার, ৪টি ডেস্ট্রয়ার ও ১২টি সাবমেরিন রাখার অধিকার পায়। (৭) রাইন নদীর পশ্চিম তীরের ত্রিশ মাইলের মধ্যে সকল জার্মান দুর্গ ও সামরিক ঘাঁটি ভেঙে ফেলার আদেশ দেওয়া হয়। (৮) এই সামরিক শর্তগুলি কার্যকরী করার জন্যে জার্মানীতে মিত্রপক্ষের সেনাদল মোতায়েন রাখা হয় এবং একটি কমিশন নিয়োগ করা হয়।

সামরিক শর্তাবলী

(ঙ) এছাড়া জার্মান সম্রাট কাইজার ও তার সেনাপতিদের যুদ্ধ অপরাধী সাব্যস্ত করে তাঁদের বিচার করার জন্যে আদেশ দেওয়া হয়। (২) ভার্সাই সন্ধির প্রথম পরিচ্ছেদে বলা হয় যে, শান্তিপূর্ণভাবে আন্তর্জাতিক বিরোধ নিষ্পত্তি এবং বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্যে জাতিসঙ্ঘ স্থাপন করা হবে। এজন্যে একটি আন্তর্জাতিক আদালত গঠন করা হবে। এছাড়া শ্রমিক শ্রেণীর কল্যাণের জন্যে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠন স্থাপন করা হবে।

অন্যান্য শর্তসমূহ

জার্মান জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকেরা ভার্সাই সন্ধিকে একটি "জবরদস্তি সন্ধি" (Dictated Peace) বলে অভিহিত করেন। শান্তি সম্মেলনে যোগদানকারী জার্মান প্রতিনিধিদের সন্ধির শর্ত

একতরফা সন্ধি

আলোচনার অধিকার না দিয়ে এবং সন্ধির শর্ত সম্পর্কে জার্মান প্রতিনিধিদলের প্রতিবাদকে অগ্রাহ্য করে এই সন্ধি জার্মানীর ওপর একতরফাভাবে চাপান হয়। পরাজিত শক্তির প্রতি ন্যায় ও সুবিচার প্রদর্শন করে তার কৃতজ্ঞতা অর্জনের জন্যে কোন চেষ্টা বিজেতারা ভার্সাই বৈঠকে করেনি। যদিও উইলসন ঘোষণা করেন যে, "বিজয়ীর সন্ধি স্থাপন করা হবে না" (There will be a peace without victory) তবুও ভার্সাই সন্ধির ছত্রে ছত্রে বিজয়ী শক্তিগুলির ক্ষমতার আস্ফালন লিখিত ছিল। পরাজিত জার্মানীর ওপর প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টার জন্যে ন্যায় বিচারের প্রশ্নটি চাপা পড়ে যায়। ইংলন্ডের প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ জার্মানীকে শাসিয়ে বলেন যে, "যদি জার্মানী ভার্সাই শহরে সন্ধি স্বাক্ষর করতে রাজী না হয় তবে তাকে বার্লিনে বসে এই সন্ধি স্বাক্ষর করতে বাধ্য করা হবে। "এই কারণে জার্মান জাতীয়তাবাদীরা ভার্সাই সন্ধিকে ঘৃণা করে। এই সন্ধিকে তার "একতরফা সন্ধি" "ম্যাকিয়াভেলীয় সন্ধি" প্রভৃতি বাছা বাছা বিশেষণে অভিহিত করে। উগ্র জার্মান জাতীয়তাবাদীরা বলতে থাকে যে, যেহেতু জার্মানীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই সন্ধি চাপিয়ে দেওয়া হয়, সেহেতু এই সন্ধি পালনে জার্মানীর কোন নৈতিক বাধ্যবাধকতা নেই। পরবর্তীকালে জার্মানীর নাৎসীদল ভার্সাই সন্ধিকে "একতরফা সন্ধি" (Dictated Peace) বলে এমন তুমুল সমালোচনা চালায় যে, জার্মান জনমত তাতে গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। পরাজিত জার্মানীকে সন্ধি আলোচনার সুযোগ না দিয়ে একতরফাভাবে সন্ধি চাপানোর ফলে এই সন্ধির নৈতিক ভিত্তি নড়বড়ে হয়ে যায়।

ভার্সাই সন্ধির বিরুদ্ধে বলা হয় যে, এই সন্ধির পশ্চাতে ন্যায় নীতি (Equity) ও পারস্পরিক সুবিধা নীতি (Reciprocity) আদপেই ছিল না। (ক) জার্মানীকে যুদ্ধ অপরাধী

ন্যায় নীতির অভাব

ঘোষণা করা হলেও অন্যান্য শক্তিগুলি এই যুদ্ধের জন্যে কম দায়ী ছিল না অথচ যুদ্ধ অপরাধী বলে জার্মানীকে একঘরে রাখা হয়। জাতিসঙ্ঘের সদস্যপদ থেকে বহুকাল দূরে রাখা হয়। জার্মানীর ওপর বিভিন্ন শাস্তিমূলক শর্ত চালান হয়। (খ) ভার্সাই সন্ধির দ্বারা জার্মানীর অস্ত্র হ্রাস করা হলেও, বিজয়ী শক্তিগুলি তাদের নিজস্ব সমর সম্ভার অক্ষুণ্ণ রাখে। এর ফলে ন্যায় বিচার নষ্ট হয়। জার্মানীর ন্যায় এক বৃহৎ রাষ্ট্রকে এক ক্ষুদ্র পুলিশ বাহিনী রাখতে দেওয়া হয়। তার স্থল, জল, বিমান বাহিনী বিনষ্ট করে জার্মানীর সামরিক দন্ত উৎপাটন করা হয়।

জার্মানীর ন্যায় একটি বৃহৎ রাষ্ট্রকে ভার্সাই সন্ধির দ্বারা যেরূপভাবে অসামরিকীকরণ,

প্রতিশোধ নীতি

উপনিবেশের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়, ইতিহাসে তার তুলনা বিরল। মিত্রশক্তি তাদের নিজ নিজ উপনিবেশগুলি অক্ষুণ্ণ রেখে জার্মানীর উপনিবেশগুলি বাজেয়াপ্ত করে। লীগের বেনামীতে বিজয়ী শক্তিগুলি সেই উপনিবেশ দখল করে।

জার্মানীকে আশ্বাস দেওয়া হয় যে, চতুর্দশ দফা মেনে জার্মানী অস্ত্র সমর্পণ করলে, এই ১৪ দফার ভিত্তিতে শান্তি চুক্তি রচিত হবে। জার্মানী এই চতুর্দশ দফা গ্রহণ করে অস্ত্র সমর্পণ করে।

চর্তুদশ দফা ভঙ্গ

কিন্তু ভার্সাই সন্ধিতে চতুর্দশ দফাকে অগ্রাহ্য করা হয়। জার্মানীর মতে এটা ছিল তার প্রতি প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা। (ক) চতুর্দশ দফায় জার্মানী ক্ষতিপূরণ দেবে এমন কোন শর্ত ছিল না। কিন্তু ভার্সাই সন্ধির দ্বারা জার্মানীর ওপর এক বিরাট অঙ্কের ক্ষতিপূরণ চাপান হয়। যদিও জার্মানী ছিল পরাজিত, দুর্ভিক্ষ-পীড়িত, তবুও জার্মানীকে বিরাট পরিমাণ অর্থ দিতে বলা হয়। (খ) চতুর্দশ দফার ১—৪ ধারায় শর্তগুলি ভার্সাই সন্ধিতে প্রয়োগ করা হয়নি। (গ) চতুর্দশ দফায় সকল শক্তির নিরস্ত্রীকরণের কথা বলা হলেও ভার্সাই সন্ধির দ্বারা কেবলমাত্র জার্মানীকে নিরস্ত্রীকৃত করা হয়। চতুর্দশ দফায় 'এক জাতি এক রাষ্ট্র' নীতি ঘোষিত হলেও, জার্মানীর ক্ষেত্রে এই নীতি মান্য করা হয় নি।

ভার্সাই সন্ধির একটি বড় ত্রুটি ছিল যে, ইওরোপের ক্ষুদ্র, বৃহৎ সকল শক্তির ক্ষেত্রে জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করা হয়। 'এক জাতি, এক রাষ্ট্র' নীতিই ছিল ভার্সাই ও অন্যান্য শান্তি চুক্তিগুলির মূলসূত্র। কিন্তু জার্মানীকে এই জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার থেকে ভার্সাই সন্ধির দ্বারা বঞ্চিত করা হয়। সার অঞ্চলের জার্মান অধিবাসীদের ফ্রান্সের অধীনে রাখা হয়। শ্লেজভিগের জার্মানরা ডেনমার্কের অধীনে চলে যায়। ইউপেন, ম্যালমেডি ও মরিসনেটের জার্মানরা বেলজিয়ামের অধীনে যায়। পশ্চিম প্রাশিয়ার জার্মান অধিবাসী ও ডানজিগের জার্মানদের পোল্যান্ডের অধীনে, এবং সুদেতেন জেলার জার্মানদের চেকোশ্লোভাকিয়ার অধীনে স্থাপন করা হয়। এভাবে বহু জার্মানকে পিতৃভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন করে অন্য দেশে সংখ্যালঘুতে পরিণত করা হয়। সর্বোপরি, জার্মান ভাষাভাষী অস্ট্রিয়াকে জার্মানী থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। সেন্ট জার্মেইন সন্ধির ৮০নং ধারায় ও ভার্সাই সন্ধিতে অস্ট্রিয়াকে জার্মানী থেকে স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্ন রাখা হয়। এজন্যে জার্মান লেখকদের মতে, ভার্সাই সন্ধি ছিল একটি পক্ষপাতদুষ্ট, একতরফা সন্ধি।

জার্মান জাতীয়তাবাদের প্রতি অবিচার

ভার্সাই সন্ধির সমর্থনে গ্যাথোর্ন হার্ডি[১] প্রভৃতি ঐতিহাসিকেরা কিছু কিছু যুক্তি দেখান। তাঁরা বলেন যে, ইতিহাসে দেখা যায় প্রতি যুদ্ধের পর বিজয়ী শক্তি বিজিতের ওপর সন্ধি চাপিয়ে দেয়। সেই অর্থে প্রতি যুদ্ধের পর যে সকল সন্ধি রচিত হয় সেগুলি হল চাপিয়ে দেওয়া জবরদস্তি সন্ধি। ভার্সাই সন্ধিও একই নিয়মে রচিত হয়। সোভিয়েত রাশিয়ার ওপর জার্মানী নিজেই ১৯১৭ খ্রীঃ ব্রেস্টলিটভস্কের সন্ধি চাপিয়ে দেয়। সুতরাং ভার্সাই সন্ধি একতরফা সন্ধি হলে জার্মানীর আপত্তি করা অন্যায়। চতুর্দশ দফায় ক্ষতিপূরণের উল্লেখ না থাকলেও, ল্যান্সিং নোট (Lanshing Note) দ্বারা (৮ই ডিসেম্বর, ১৯১৮ খ্রীঃ) মার্কিন বিদেশমন্ত্রী জার্মানীকে জানান যে, জার্মানীকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। জার্মানী যদি যুদ্ধে জয়লাভ করত তবে জার্মানী মিত্রশক্তির ওপর কম কঠোর সন্ধি স্থাপন করত না। ভার্সাই সন্ধির দ্বারা যদি জার্মানীর অস্ত্র নির্মাণ বন্ধ করা হয় তার কারণ ছিল যে জার্মানীর আগ্রাসনের ফলেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ঘটেছিল। ভার্সাই সন্ধির স্বপক্ষে বলা হয় যে, যেক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানীকে ব্যবচ্ছেদ করা হয়, ভার্সাই সন্ধির দ্বারা জার্মানীর স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও মোটামুটি ভৌমিক অখন্ডতা রক্ষা করা হয়।

ভার্সাই সন্ধির সমর্থনে যুক্তি

ভার্সাই সন্ধির বিপক্ষে এবং এর সমর্থনে যাই বলা হোক না কেন, নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকেরা এই সন্ধির কয়েকটি ত্রুটি নির্দেশ করেন। প্রথমতঃ, এই সন্ধির পশ্চাতে মিত্রশক্তির উদ্দেশ্য ছিল জার্মানীকে স্থায়ীভাবে পঙ্গু করে রাখা। জার্মানীর প্রতি ন্যায় বিচার করা অপেক্ষা জার্মানীকে দুর্বল করে রাখার লক্ষ্যটিই গ্রহণ করা হয়। এই কারণে জার্মানীর কয়লা, লোহা প্রভৃতি খনিজ সম্পদ অধিগ্রহণ করে, জার্মানীকে ক্ষমতাহীন করা হয়। অর্থনৈতিক দিক থেকে বিধ্বস্ত জার্মান জাতি, ভার্সাই সন্ধিকে অন্যায় মনে করে, এজন্যে তারা শীঘ্রই এই সন্ধি ভেঙে ফেলে। রাইকার নামক ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছেন যে, হংসীকে খাদ্য না দিয়ে তার নিকট স্বর্ণডিম্ব প্রত্যাশা করা যেমন অবাস্তব; জার্মানীর কয়লা, লোহা প্রভৃতি সম্পদ অধিগ্রহণ করে জার্মানীকে ক্ষতিপূরণ প্রদানে বাধ্য করা ছিল অবাস্তব। জার্মানদের একাংশকে পিতৃভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন করে অন্যদেশে সংখ্যালঘুতে পরিণত করার ফলে শীঘ্রই আন্তর্জাতিক গোলমাল দেখা দেয়। জার্মানী তার নাগরিকদের প্রতিবেশী অজার্মান রাষ্ট্রে সংখ্যালঘু হয়ে থাকতে দিতে রাজী ছিল না। এজন্যে জার্মানী থেকে বিচ্ছিন্ন জার্মানদের জার্মান ভূমিতে ফিরিয়ে দিতে দাবী জানায়। জার্মান সংখ্যালঘুরা পিতৃভূমিতে ফিরে আসার জন্যে দারুণ গোলযোগ সৃষ্টি করে। ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীজ ভার্সাই সন্ধিতে

ভার্সাই সন্ধির মূল ত্রুটিসমূহ

১· Gathorn Hardy—Short History of International Affairs.

অঙ্কুরিত হয়। প্যারিসের শান্তি বৈঠকে জার্মানীকে শান্তি চুক্তি আলোচনার সুযোগ দিলে, পরবর্তী সময়ে এই সন্ধিকে জার্মানী "একতরফা সন্ধি" বা Dictated Peace বলতে পারত না। আলোচনার দ্বারা সন্ধির শর্ত স্থির করা হলে জার্মানী এই সন্ধির রক্ষার জন্যে নৈতিক দায়িত্ব দেখাতে বাধ্য হত। প্যারিসের শান্তি বৈঠকে সোভিয়েত রাশিয়াকে আমন্ত্রণ না করা বড় ভুল হয়েছিল। সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে কোন আলোচনা না করে রুশ-পোলিশ, রুশ-চেক ও রুশ-বাল্টিক সীমান্ত স্থির করায়, রাশিয়াও ভার্সাই সন্ধির বিরোধিতা করে।জার্মানীর পরে ভার্সাই সন্ধির দ্বিতীয় প্রতিবাদী দেশ ছিল সোভিয়েত রাশিয়া। ১৯৩৯ খ্রীঃ রুশ-জার্মান সহযোগিতায় ভার্সাই চুক্তি ভেঙে ফেলা হয়। ভার্সাই সন্ধির ফলে ইওরোপে শক্তি শূন্যতা দেখা দেয়। একদিকে জার্মানীকে ছাঁটাই করে দুর্বল করে ফেলা হয়; অপর দিকে হ্যাপসবার্গ ও জারের সাম্রাজ্য ভেঙে ফেলা হয়। এই রাজ্যগুলি. ভেঙে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি গড়া হয়, সেগুলি আত্মরক্ষায় অক্ষম ছিল। পরে নাৎসী দলের নেতৃত্বে জার্মানী এই সকল রাষ্ট্রের ওপর আগ্রাসন চালালে, শক্তিসাম্য না থাকায়, এই ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিকে রক্ষা করা যায়নি।

প্যারিসের শান্তি বৈঠকে নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলিকে আহ্বান করা হয়নি। নিরপেক্ষ দেশগুলি যোগদান না করায় শান্তি চুক্তিগুলি পক্ষপাতহীন, ন্যায্য চরিত্র পায়নি। বিজয়ীরা তাদের পরিকল্পিত সন্ধি ইচ্ছামত বিজিতের উপর চাপাতে পারে। নিরপেক্ষ দেশ হাজির থাকলে তাদের চাপে বিজয়ী দেশগুলি নমনীয় শর্তে সন্ধি করতে বাধ্য হত। তাহলে সন্ধি বেশী স্থায়ী হত। ভার্সাই সন্ধির দ্বারা ইওরোপে সংখ্যালঘু সমস্যা (Minority Problem) সৃষ্টি করা হয়। এক জাতি এক রাষ্ট্র নীতি নিয়ে নতুন রাষ্ট্র গঠনের সময় সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতির কথা ভেবেই তাদের স্বার্থে নতুন রাষ্ট্রগুলি গঠিত হয়। কিন্তু প্রতি নতুন দেশে অন্য জাতির বহু সংখ্যালঘু অধিবাসী থেকে যায়। তাদের কথা সন্ধিতে গণ্য করা হয়নি। এজন্য পরে সংখ্যালঘু সমস্যার চাপে সন্ধি ভেঙে পড়ে।

ভার্সাই সন্ধি সম্পর্কে ঐতিহাসিক ডেভিড টমসন মন্তব্য করেছেন যে, এই সন্ধিটি ছিল "ভুল জায়গায় নিদারুণ কঠিন এবং ভুল স্থানে উদারপন্থী" (Harsh in wrong places, lenient in wrong ways)। সন্ধি রচনার সময় মিত্রশক্তি অহেতুক কঠোরতা দেখান এবং সন্ধি রক্ষার সময় অনাবশ্যক দুর্বলতা বা উদারতা দেখান। যদি জার্মানীর ওপর ন্যায্য আচরণ ও শর্তের ভিত্তিতে সন্ধি স্থাপন করা হত তবে জার্মানী এই সন্ধি মানতে নৈতিক বাধ্যবাধকতা স্বীকার করত। এই সন্ধি ২০ বছরের মধ্যে এত সহজে ভেঙে পড়ত না।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর অন্যান্য শান্তিচুক্তিসমূহ (Other Peace Treaties after the World War I) : (i) প্যারিসের শান্তি বৈঠকে অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে সেন্ট জার্মেইন এন লাই (St. Germain en Lye)-এর সন্ধি স্বাক্ষর করে নিম্নলিখিত শর্ত স্থির করা হয়। (১) হাঙ্গেরী, যুগোশ্লাভিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যান্ড ও তুরস্কের স্বাধীনতা অষ্ট্রিয়া স্বীকার করে। আগে এই দেশগুলির কিছু কিছু অংশ হ্যাপসবার্গ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। (২) এই সন্ধির ৮০ নং ধারায় বলা হয় যে, অষ্ট্রিয়াকে জার্মানীর সঙ্গে যুক্ত করা যাবে না। (৩) দক্ষিণ টাইরল, ডালমাশিয়া ও ট্রিয়েষ্ট, ইতালীকে অষ্ট্রিয়া ছেড়ে দেয়। (৪) এছাড়া অষ্ট্রিয়া রুমানিয়াকে বুকোভিনা, যুগোশ্লাভিয়াকে বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা এবং পোল্যান্ডকে গ্যালিসিয়া ছেড়ে দেয়। (৫) কেবলমাত্র জার্মান ভাষাভাষী অঞ্চল নিয়ে অষ্ট্রিয়া পুনর্গঠিত হয়। হ্যাপসবার্গ সাম্রাজ্য ব্যবচ্ছেদ করা হয়। (৬) যুদ্ধের দরুন মিত্রপক্ষকে ক্ষতিপূরণ দিতে অষ্ট্রিয়াকে বাধ্য করা হয়।

সেন্ট জার্মেইন চুক্তি

(ii) বুলগেরিয়ার সঙ্গে নিউলীর সন্ধি (Treaty of Neuilly) ১৯১৯ খ্রীঃ স্বাক্ষরিত হয়। এই সন্ধি অনুসারে বুলগেরিয়া (১) ম্যাসিডোনিয়া প্রদেশ যুগোশ্লাভিয়াকে ছেড়ে দেয়। (২)

নিউলির চুক্তি

গ্রীসকে পশ্চিম থ্রেস এবং রুমানিয়াকে দোব্রুজা ছেড়ে দেয়। (৩) মিত্রশক্তিকে বুলগেরিয়া অর্দ্ধ লক্ষ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ দেয়। (৪) বুলগেরিয়ার অস্ত্র হ্রাস করা হয়।

(iii) হাঙ্গেরীর সঙ্গে ট্রিয়াননের (Trianon) ১৯২০ খ্রীঃ সন্ধি স্বাক্ষর করা হয়। এই সন্ধি অনুসারে ঃ (১) শ্লোভাকিয়া অঞ্চল চেকোশ্লোভাকিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত হয়। (২) ট্রান্সসিলভানিয়া যুক্ত হয় রুমানিয়ার সঙ্গে। (৩) ক্রোশিয়া যুক্ত হয় যুগোশ্লাভিয়ার সঙ্গে। (৪) হাঙ্গেরীর অস্ত্র ও সৈন্যদল হ্রাস করা হয়। (৫) মিত্রশক্তিকে ক্ষতিপূরণ দিতে হাঙ্গেরীকে বাধ্য করা হয়।

ট্রিয়াননের চুক্তি

(iv) তুরস্কের সঙ্গে সেভ্রের (Sevres) সন্ধি ১৯২০ খ্রীঃ স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু তুর্কীরা এই সন্ধির শর্ত প্রত্যাখ্যান করে যুদ্ধ ঘোষণা করলে, ল্যসেনের (Lausanne) সন্ধি ১৯২৩ খ্রীঃ দ্বারা শান্তি স্থাপিত হয়।এই সন্ধি অনুসারে ঃ (১) তুরস্কের সার্বভৌম অধিকার স্বীকৃত হয়। (২) স্মার্ণা, কনস্টান্টিনোপল ও পূর্ব থ্রেস তুরস্ককে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। (৩) মধ্য প্রাচ্যের আরব রাজ্য, জোর্ডান, প্যালেষ্টাইন, মেসোপোটামিয়া, সিরিয়া, হেজাজ তুরস্কের অধিকার মুক্ত করে লীগের অধীনে ইঙ্গ-ফরাসী ম্যানডেটে পরিণত করা হয়। (৪) দার্দানালিশ প্রণালী ও বসফোরাস উপসাগরকে আন্তর্জাতিক জলপথ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

সেভরের চুক্তি

পাঠ্যসূচী

১। S. B. Fay—Origins of the World War.
২। Gooch—Before the War.
৩। Albertini—The Origins of the War of 1914.
৪। Seton Watson—A study in the Origin of the Great War.
৫। Cruttwell—History of the Great War.
৬। Halevey—The Era of Tyrannies.
৭। Temperley—History of the Peace Conference.
৮। Keynes—Economic consequences of the Peace.
৯। G. Hardy—A Short History of International Affairs.

পঞ্চম অধ্যায়
রুশ বিপ্লব (১৯১৭ খ্রীঃ) : বলশেভিক শাসন
(The Russian Revolution of 1917 : The Bolshevik Government)

রুশ বিপ্লবের বিভিন্ন পর্যায়, ১৯১৭ খ্রীঃ (The various phases of the Russian Revolution of 1917) : ফরাসী বিপ্লবের ন্যায় রুশ বিপ্লব (১৯১৭ খ্রীঃ) হল আধুনিক যুগের ইতিহাসের এক প্রধান ঘটনা। ১৯১৭ খ্রীঃ রাশিয়ায় এক অথবা একাধিক বিপ্লব ঘটে। এ সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে তিন প্রকার মত দেখা যায়। রদেনষ্টিন (Rothenstein) নামক ঐতিহাসিকের মতে, রাশিয়ায় প্রকৃতপক্ষে তিনটি বিপ্লব ঘটে। এই তিনটি বিপ্লবের শেষ পাদে বলশেভিক দল লেনিনের নেতৃত্বে ক্ষমতা লাভ করে রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। রদেনষ্টিনের মতে,[১] ১৯০৫ খ্রীঃ জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রথম বিপ্লব ঘোষিত হয়। এর ফলে জারতন্ত্রের পতন সূচিত হয়। এর পর ১৯১৭ খ্রীঃ মার্চ মাসের বিপ্লবে ডুমা বা রুশ পার্লামেন্টের মাধ্যমে মধ্যবিত্ত ও বুর্জোয়া শ্রেণী ক্ষমতা অধিকার করে। জার ও অভিজাত তন্ত্রের পতন ঘটে। রাশিয়ায় প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়। ইহা ছিল রুশ বিপ্লবের দ্বিতীয় ধাপ। এর পর ১৯১৭ খ্রীঃ নভেম্বর মাসে (মতান্তরে অক্টোবর মাসে) বলশেভিক দল বুর্জোয়াদের বিতাড়িত করে শ্রমিকশ্রেণীর সাহায্যে সমাজতন্ত্র স্থাপন করে। এটি ছিল বিপ্লবের শেষ ধাপ। E. H. Carr প্রভৃতি ঐতিহাসিকেরা বলেন যে, রুশ বিপ্লবের দুটি পর্যায় ছিল। ১৯১৭ খ্রীঃ মার্চ মাসে জারতন্ত্রের পতন ও প্রজাতন্ত্র ঘোষণা দ্বারা রাজনৈতিক বিপ্লব সাধিত হয়। জারের স্বৈরতন্ত্রের পতন ঘটে। বুর্জোয়া শ্রেণী ক্ষমতা অধিকার করে। ১৯১৭ খ্রীঃ নভেম্বর মাসে বলশেভিক শ্রেণী শ্রমিকরাজ প্রতিষ্ঠা করলে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটে। রুশ বিপ্লবের একটি তৃতীয় ব্যাখ্যা রুশ সরকার দ্বারা প্রকাশিত পুস্তকে পাওয়া যায়। এই তৃতীয় মত অনুসারে ১৯১৭ খ্রীঃ দুটি বিপ্লব ঘটে। ১৯১৭ খ্রীঃ মার্চ মাসে জারতন্ত্রের পতনের ফলে 'বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব' সাধিত হয়। কিন্তু বুর্জোয়াশ্রেণী তাদের নিজ স্বার্থে বিপ্লবকে ব্যবহার করে। ফলে ১৯১৭ খ্রীঃ নভেম্বর মাসে 'সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব' ঘটে।

রুশ বিপ্লবের বিভিন্ন পর্যায়

১৯১৭ খ্রীঃ রুশ বিপ্লবের কারণ : মার্চ, ১৯১৭ খ্রীঃ বিপ্লবের কারণ (The Causes of the Russian Revolution of 1917) : ১৯১৭ খ্রীঃ রুশ বিপ্লবের কারণগুলি রুশ ইতিহাসের মধ্যেই নিহিত ছিল। উনবিংশ শতকে ইওরোপে পরিবর্তনের স্রোত বইতে আরম্ভ করে। কিন্তু জার সরকার যুগের গতি অগ্রাহ্য করে স্রোতের বিরুদ্ধে চলতে থাকে। ইওরোপে জুলাই ও ফেব্রুয়ারি বিপ্লব, ইতালী ও জার্মানীর জাতীয়তাবাদী যুদ্ধের ফলে পশ্চিম ইওরোপে পুরাতনতন্ত্রের কাঠামো ভেঙে উদারতন্ত্র, গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের অগ্রগতি ঘটে। কিন্তু জার সরকার এতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে স্বৈরশাসনকে অব্যাহত রাখেন। সর্বশেষ জার দ্বিতীয় নিকোলাসও তাঁর পিতার ন্যায় দমন নীতিতে বিশ্বাস করতেন। তাঁর মন্ত্রী প্লিভি ছিলেন

জার সরকারের রক্ষণশীলতা ও স্বৈরতন্ত্র

১· Rothenstein—History of U.S.S.R.

ভয়ানক স্বৈরাচারী। তিনি যে কোন গণতান্ত্রিক দাবীকে কঠোর হাতে দমন করতেন। গুপ্তচর ও পুলিশ দ্বারা তিনি জনসাধারণের স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার দমন করেন। বহু ছাত্র ও বুদ্ধিজীবি নির্বাসিত অথবা কারারুদ্ধ হন। এই ব্যাপক দমন নীতির ফলে রাশিয়ায় বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। যদি জার সরকার ধাপে ধাপে যুগের উপযোগী কিছু পরিবর্তন স্বীকার করত তবে সংস্কার-পন্থীরা বিপ্লবের দ্বারা জার সরকারকে ধ্বংস করার কথা ভাবত না। তারা বিশ্বাস করতে পারত যে, সংস্কারের দ্বারা কাঙ্খিত পরিবর্তন আনা যাবে। কিন্তু জার সরকারের সংস্কার-বিরোধী স্বৈরনীতি এই আশা নির্মূল করে। জার সরকারের পতন ছাড়া আর কোন উপায়ে রাশিয়ায় পরিবর্তন আনা যাবে না। একথা সকলে বুঝে ফেলে।

জারের স্বৈরশাসনের তলায় নবজাত বিপ্লবী ভাবধারার ফল্গুস্রোত রাশিয়ায় প্রবেশ করতে থাকে। নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে বহু সামরিক অফিসার পশ্চিম ইওরোপের মুক্ত সমাজ ও উদারতন্ত্রী শাসনে মুগ্ধ হন। ফরাসী বিপ্লবের গণতন্ত্রী ভাবধারা তাঁদের অনুপ্রাণিত করে। রুশ চিন্তাবিদ হার্জেন তাঁর উপন্যাসে সর্বপ্রথম এই তত্ত্ব প্রচার করেন যে, রাশিয়ার মুক্তির জন্যে 'স্বাধীনতা' বা গণতন্ত্র এবং কৃষকদের হাতে "ভূমি" এনে দেওয়া দরকার। ক্যার্নিশেভস্কি নামক চিন্তাবিদ ও সমাজতান্ত্রিক কৃষক শ্রেণীর অভ্যুত্থানের দ্বারা রাশিয়ার শোষণমূলক সমাজ ব্যবস্থাকে ভাঙবার কথা বলেন। কৃষকদের মধ্যে কমিউন বা স্বয়ং-শাসিত সংস্থা গঠনের জন্যে নারোদনিক বা সমাজতান্ত্রিক দল প্রচেষ্টা চালায়। বলশেভিক বা কমিউনিষ্ট বিপ্লবীরাও আপাততঃ জারের স্বৈরতন্ত্র ধ্বংসের উদ্দেশ্যে সোস্যাল ডেমোক্রাটদের সঙ্গে যোগ দেন। এই পরিস্থিতিতে রাশিয়ায় বিদ্রোহের সম্ভাবনা দেখা দেয়।

স্বৈরতন্ত্র বিরোধী আন্দোলন

১৯০৫ খ্রীঃ রুশ-জাপান যুদ্ধে জার সরকারের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। এর ফলে জার সরকারের দুর্বলতা প্রকটিত হয়। রাশিয়ার সর্বত্র গণতান্ত্রিক সংস্কার এবং কৃষকের হাতে ভূমি দেওয়ার দাবীতে বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। কল-কারখানায় শ্রমিকরা ধর্মঘট আরম্ভ করে। ভূমিদাসরা জমিদারদের ম্যানর বা খামার পুড়িয়ে দেয়। জমিদারের ম্যানেজার বা বেলিফদের হত্যা করে। সরকারি খাজনা দেওয়া বন্ধ করা হয়। ১৯০৫ খ্রীঃ সেন্টপিটার্সবার্গের শ্রমিকরা সম্রাটের নিকট এক স্মারকলিপি দেওয়ার জন্যে ফাদার গ্যাপন নামে এক ধর্মযাজকের নেতৃত্বে শোভাযাত্রা করে। এই শোভাযাত্রার ওপর জারের সেনাদল গুলি বর্ষণ করে বহু শ্রমিককে হত্যা করে। জারের সেনাদল প্রচুর রক্ত স্নানের দ্বারা ১৯০৫ খ্রীঃ-এর বিপ্লবকে দমন করে।

১৯০৫ খ্রীঃ-এর আন্দোলনকে রুশ বিপ্লবের প্রভাতী তারা বলা যায়। ১৯০৫ খ্রীঃ বিপ্লবে জারের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে শ্রমিক ও কৃষকেরা একযোগে লড়াই করে। এই শিক্ষা ১৯১৭ খ্রীঃ কাজে লাগে। ঐতিহাসিক রদেনষ্টিনের মতে, এই বিপ্লব ছিল ১৯১৭ খ্রীঃ-এর বিপ্লবের মহড়া।[১] ১৯০৫ খ্রীঃ এই বিপ্লবের গুরুত্ব অনুভব করে ট্রটস্কি মন্তব্য করেন যে, "বিপ্লব মৃত হয়েছে ঃ বিপ্লব দীর্ঘজীবি হোক" (The Revolution is dead : Long live the Revolution)। ১৯০৫ খ্রীঃ বিপ্লবের ফলে জারতন্ত্রের ভিত্তি ধ্বসে যায়। এই ধ্বসে পড়া স্বৈরতন্ত্রের সৌধ ১৯১৭ খ্রীঃ সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে। সুতরাং ১৯১৭ খ্রীঃ রুশ বিপ্লবকে একটি হঠাৎ ঘটে যাওয়া বিপ্লব বলা যায় না।

১৯১৭ খ্রীঃ ভূমি ও স্বাধীনতা আন্দোলন

এভাবে জার সরকারের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে বিপ্লবী ভাবধারা সক্রিয় হয়ে ওঠে। জার দ্বিতীয় নিকোলাসের কুশাসন জারতন্ত্রের পতন দ্রুত ডেকে আনে। বিপ্লবের প্রাক্কালে জারতন্ত্র প্রকৃতপক্ষে স্বৈরাচারী ছিল কিনা এ সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক আছে। একটি মত হল যে,

---

১· "Dress Rehearshal for the Revolution of 1917."

১৯০৭ খ্রীঃ নির্বাচনী আইন উদার করা হয়। ডুমা বা পার্লামেন্টের ক্ষমতা বাড়ে। শিক্ষা বিস্তারের ফলে জনসাধারণ অধিকার সচেতন হয়। সুতরাং বিপ্লবের প্রাকালে জারতন্ত্র আগের মত কঠিন স্বৈরতন্ত্র ছিল না। দ্বিতীয় মত এই যে, ডুমার কোন প্রকৃত ক্ষমতা ছিল না। জারের মন্ত্রীরা ডুমার কাছে দায়িত্ববদ্ধ ছিল না। জার নিজে ছিলেন ঘোর স্বৈরাচারী ও প্রতিক্রিয়াশীল শাসক। তিনি প্রধানতঃ সন্ত্রাস ও দমন-পীড়নের দ্বারাই শাসন চালাতেন। তাঁর হাতে বিশেষ ক্ষমতা থাকায় তিনি ডুমা বা পার্লামেন্টকে গ্রাহ্য করতেন না। তিনি জনমত উপেক্ষা করে রাশিয়াকে যুদ্ধে জড়িয়ে দেন।

দ্বিতীয় নিকোলাসের দমন নীতি : রাসপুটিনের ঘটনা

জার দ্বিতীয় নিকোলাসের রাণী আলেকজান্দ্রোভা, রাসপুটিন নামে এক ভণ্ড সন্ন্যাসীর প্রভাবে পড়েন। রাণীর সমর্থন পেয়ে রাসপুটিন উচ্চ রাজ কর্মচারী ও সেনাপতিদের অপদস্থ করে। জার নিকোলাস, রাসপুটিন এবং রাণীকে নিয়ন্ত্রণ করতে অসমর্থ হওয়ায় লোকে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা হারায়। অবশেষে প্রিন্স ইউসুপভ নামে এক অভিজাত রাসপুটিনকে গুলি করে হত্যা করেন। জার দ্বিতীয় নিকোলাস ছিলেন সঙ্কীর্ণ চিত্ত, অর্ধশিক্ষিত ও গোঁড়া লোক। তিনি বুঝতে পারেননি যে, তিনি ইতিহাসের স্রোতের বিরুদ্ধে চলার চেষ্টা করছেন। তাঁর প্রতিক্রিয়াশীল নীতির ফলে জারতন্ত্রের প্রতি রুশ জাতির ঘৃণা তীব্র হয়ে ওঠে।

জার সরকারের বৈদেশিক নীতির ব্যর্থতা জারতন্ত্রের পতনকে ত্বরান্বিত করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগদান ছিল জার সরকারের গভীর অদূরদর্শিতা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগ দেওয়ার মত প্রস্তুতি

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার সরকারের যোগদানের পরিণাম

রাশিয়ার ছিল না। রুশ জনমত ছিল এই যুদ্ধে যোগদানের ঘোর বিরোধী। রাশিয়ার শিল্প এমন মজবুত ছিল না, যা দীর্ঘ যুদ্ধের ভার বইতে পারত। রুশ কৃষি ছিল অনগ্রসর। রুশ জনসংখ্যা দ্রুত বাড়ছিল। দেশের মধ্যবিত্ত, কৃষক, শ্রমিকের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ ছিল। এই অবস্থায় জার সরকারের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া ছিল ঘোর অদূরদর্শিতা। দুই বছর যুদ্ধ চলবার পর, রাশিয়ার সর্বস্তরে বিরাট সঙ্কট দেখা দেয়। জার সরকার এই যুদ্ধে রুশ জাতির সহযোগিতা পাননি। জার সরকারের প্রতি ঘৃণা ও অবিশ্বাস তীব্র হয়। প্রথমতঃ, রুশ সেনাদলের মাত্র $\frac{১}{৩}$ অংশের হাতে পৃথক ধরনের রাইফেল ছিল। বাকিদের হাতে অস্ত্র ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, দুই বছরের মধ্যে জার্মানীর হাতে রুশ সেনাদলের বিরাট ক্ষয়ক্ষতি হয়। প্রায় এক মিলিয়ন রুশ সেনা নিহত হয়। বাকি রুশ সেনা জার্মান আক্রমণের সম্মুখে পিছু হঠতে বাধ্য হয়। ইউক্রেন ও ক্রিমিয়া জার্মানদের দখলে চলে যায়। রুশ সেনার মনোবল এমন ভেঙে যায় যে, তারা যুদ্ধ ত্যাগ করে শান্তি স্থাপনের জন্যে অস্থির হয়। কিন্তু জার সরকার যুদ্ধ ত্যাগ করতে রাজী ছিলেন না। এই সময় বলশেভিকরা সেনাদলের মধ্যে গোপন প্রচার চালায় যে, এই যুদ্ধ হল সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধ। বলশেভিকরা শাসন ক্ষমতা পেলে তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ ত্যাগ করবে। এজন্য সৈনাদলে হতাশা দেখা দেয়। বহু সেনা বলশেভিকদের প্রতি আনুগত্য জানায়।[১] তৃতীয়তঃ, যুদ্ধের ফলে রাশিয়ায় দারুণ অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দেয়। রাশিয়ার ১০ মিলিয়ন সেনার খাদ্য ও রসদপত্র যোগাতে জার সরকারের রাজকোষ শূন্য হয়ে যায়। বৈদেশিক সরকারের নিকট জার সরকারকে খুব কম করে ৩০০ মিলিয়ন রুবল ঋণ নিতে হয়। বড় বড় খামারগুলিতে লোকাভাবে কৃষিকর্ম বন্ধ হয়ে যায়। কৃষির উৎপাদন কমে গেলে শিল্প শহরগুলিতে খাদ্য সরবরাহে ঘাটতি দেখা দেয়। খাদ্যের দাম দারুণভাবে বাড়ে। ফলে শিল্প শ্রমিক ও শহরবাসী মধ্যবিত্তের মধ্যে বৈপ্লবিক মনোভাব দেখা দেয়। এদিকে রেলগাড়ীগুলিকে রণাঙ্গনে ও কারখানায় যুদ্ধের মাল পরিবহণের কাজে লাগান হলে কয়লা পরিবহণ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। বড় বড় কারখানার চুল্লীগুলি কয়লার অভাবে

১· And Quite Flows the Don—M. Solokov.

নিভিয়ে ফেলা হয়। সাধারণ লোকে দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্যে কয়লা না থাকায়, জ্বালানীর কষ্টে দিশাহারা হয়ে পড়ে। এই সঙ্গে যুদ্ধের খরচার দরুন জনসাধারণের ওপর করের হার বাড়তে থাকে। শহরগুলিতে খাদ্যসঙ্কট, গ্রাম ও শহরে জ্বালানী সঙ্কট, যুদ্ধ করের চাপ, কারখানায় অতিরিক্ত কাজ ও কম মজুরী প্রভৃতি কারণে শ্রমিক ও কৃষকের মধ্যে দারুণ অসন্তোষ দেখা দেয়।

কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন যে, যদি জার সরকার প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগ না দিত তবে জার সরকারের দুর্বলতা দেখা দিত না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগ না দিলে রুশ বিপ্লব ঘটত না।

রুশ বিপ্লবের অনিবার্যতা

এই অভিমত গ্রহণীয় নয়। কারণ আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার জন্যে জার সরকারের পতন ঘটতে বাধ্য ছিল। ১৮২৫ খ্রীঃ থেকে ১৯০৫ খ্রীঃ পর্যন্ত বেশ কয়েকবার জার সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্রোহ দেখা দেয়। ১৯০৫ খ্রীঃ বিপ্লবের পর থেকে জার সরকার পতনোন্মুখ হয়ে পড়ে। বিশ্বযুদ্ধে জার সরকারের পরাজয়, যুদ্ধজনিত অর্থনৈতিক সঙ্কট এই সরকারের পতনকে ত্বরান্বিত করে।

১৯১৭ খ্রীঃ রুশ বিপ্লবের প্রধান কারণ ছিল কৃষক ও শ্রমিকের দারিদ্র্য ও অনগ্রসরতা। তার সঙ্গে যুক্ত হয় সংখ্যালঘু জাতিগুলির বিক্ষোভ, মধ্যবিত্ত জাতীয়তাবাদীদের অসন্তোষ এবং বিপ্লবী গোষ্ঠী বিশেষতঃ সোস্যাল ডেমোক্র্যাট তথা বলশেভিক দলের বিপ্লবী কর্মপন্থা এই বিপ্লবের বারুদের গাদায় অগ্নিশলাকার কাজ করে। রুশ কৃষকদের দুরবস্থার সীমা ছিল না।

কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর অসন্তোষ

১৮৬১ খ্রীঃ ভূমিদাস উচ্ছেদ আইন এবং এর পরে ষ্টোলিপিন ভূমি সংস্কার চালু হলেও, রুশ কৃষকের দুঃখ-দারিদ্র্য বৃদ্ধি পায়। ষ্টোলিপিন সংস্কারের ফলে রাশিয়ায় কুলাক বা জোতদার বা জমিদার শ্রেণীর উদ্ভব হয়। জমির দাম বহুগুণ বাড়ে। এজন্য সাধারণ কৃষকের জমি খরিদ করার উপায় ছিল না। অপরদিকে প্রান্তিক কৃষকরা ভাল দাম পেয়ে জমি বিক্রি করে ভূমিহীন কৃষকে পরিণত হয়। ষ্টোলিপিন মীর বা গ্রামসভার জমির ওপর অধিকার লোপ করেন। কৃষকদের জমির মালিকানা দেন। অপর দিকে তিনি কুলাক বা জোতদার শ্রেণীকে কৃষকের জমি খরিদের জন্যে ঋণদানের ব্যবস্থা করেন। দরিদ্র কৃষকরা জোতদারের কাছে জমি বিক্রি করে দিলে ভূমিহীন কৃষকের সমস্যা অমীমাংসিত থেকে যায়। বলশেভিক দল কৃষকদের বুঝায় যে, তারা বিনা ক্ষতিপূরণে কৃষকদের হাতে জমি এনে দেবে।

রাশিয়ায় ২৪ লক্ষ শিল্প শ্রমিক ছিল। এদের দুঃখ-দুর্দশার অন্ত ছিল না। কম বেতন, বেশী খাটুনি এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ শ্রমিকের জীবনকে বিষময় করে। যুদ্ধের দরুন খাদ্যের দাম

শ্রমিক শ্রেণীর দুরবস্থা

শ্রমিক বিদ্রোহ

বাড়ার ফলে কম মজুরীতে খাদ্য কেনা তাদের পক্ষে দুস্কর হয়। জার সরকার শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের অধিকার স্বীকার করত না। এজন্য শ্রমিকদের দাবী আদায় করা ছিল কষ্টসাধ্য। বলশেভিক দল শ্রমিকদের মধ্যে গোপন প্রচার চালিয়ে তাদের সঙ্ঘবদ্ধ করে। বলশেভিক দল শ্রমিকদের বিপ্লবমুখী করে তোলে। তারা শ্রমিককে ৮ ঘণ্টা কাজ ও ন্যায্য বেতন এবং কম দামে খাদ্য দিতে প্রতিশ্রুতি দেয়। লায়োনেল কোচানের (Lionel Kochan) মতে, ১৯১০ খ্রীঃ রাশিয়ার মোট ২২২টি শিল্পে ধর্মঘট হয়। ১৯১৪ খ্রীঃ শিল্প ধর্মঘটের সংখ্যা ছিল ৪,০৯৮। ১৯১৪ খ্রীঃ যে সকল শ্রমিক ধর্মঘটে যোগ দেয় তাদের সংখ্যা ছিল ১২,৫০,০০০। ধর্মঘটের ফলে রাশিয়ার অর্থনৈতিক জীবন ঝাঁঝরা হয়ে যায়। জার সরকার পুলিশ দ্বারা ধর্মঘট দমনের চেষ্টা করলে শ্রমিকেরা জঙ্গী হয়ে ওঠে।

রাশিয়ার বিভিন্ন সংখ্যালঘু জাতি গোষ্ঠীগুলি, জারের রুশীকরণ নীতির জন্যে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। জার সরকার পোল, ফিন প্রভৃতি সংখ্যালঘু জাতিগুলিকে নিজ নিজ ভাষা শিক্ষা ও

রুশীকরণ নীতি

স্বায়ত্ব শাসনের অধিকার দিত না। রুশীকরণ নীতি অনুসারে সংখ্যালঘু জাতিগুলিকে রুশ ভাষা শিক্ষা করতে বাধ্য করা হয়। রুশ শাসনকর্তারা দমন নীতির দ্বারা সংখ্যালঘু জাতির অধিকার হরণ করে। এজন্য সংখ্যালঘু জাতিগুলি বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

রুশ বিপ্লবী দলগুলির মধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠীর বিভিন্ন মতাদর্শ ছিল। ১৮৯৮ খ্রীঃ রুশ সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক দল গঠিত হয়। এই দলের সদস্যরা দীর্ঘকাল জারের দমন-পীড়নের ফলে নির্বাসনে কাটান। এই দলের অধিকাংশ সদস্য মার্কসবাদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং রুশ শিল্প শ্রমিকের সাহায্যে জারতন্ত্রের পতন ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা তারা প্রচার করতেন। সোস্যাল ডেমোক্র্যাট দল শেষ পর্যন্ত দুটি উপগোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়। প্লেখানভ ও ট্রটস্কি প্রভৃতি এই বিপ্লবীদলের সঙ্গে জনতাকে যুক্ত করে গণবিদ্রোহের কথা বলেন। লেনিন চান যে দলের আদর্শ ও কাজে নিবেদিত প্রাণ লোকদের নিয়েই দল গঠিত হোক। বাইরে থেকে শ্রমিক শ্রেণীর সমর্থন আনার চেষ্টা করা হোক। লেনিন চান যে বিপ্লবের জন্যে আর দেরী করা উচিত হবে না। অপর গোষ্ঠী চান যে, অগ্রে বুর্জোয়া বিপ্লব হলে তারপর প্রলেতারীয় বিপ্লবের কথা ভাবা যাবে। লেনিনের মতবাদীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন। এজন্য তাঁদের বলা হয় বলশেভিক। অপর গোষ্ঠীরা সংখ্যালঘু বলে মেনশেভিক নামে পরিচিত হয়। অবশ্য এই দুই গোষ্ঠী জার সরকারের পতন তীব্রভাবে কামনা করত। এজন্য তারা জারের শাসনের বিরুদ্ধে কল-কারখানায় শ্রমিক ও সেনাদলে, সেনাদের মধ্যে মজবুত সংগঠন গড়ে তোলে। জারের পক্ষে সমাজতন্ত্রীদের গোপন পাঠচক্র, শ্রমিক সংগঠনের খোঁজ পাওয়া সম্ভব হয়নি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়া যোগ দিলে, প্রশাসনিক শিথিলতা বশতঃ সোস্যাল ডেমোক্র্যাটদের সংগঠন তাদের দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯১৭ খ্রীঃ বিপ্লবে এরাই প্রধান বর্ষাফলকের কাজ করে।

সোস্যাল ডেমোক্র্যাট দল

অবশেষে ১৯১৭ খ্রীঃ মার্চ মাসে বলশেভিকদের ডাকে পেট্রোগ্রাড শহরের কারখানাগুলিতে ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মঘটী শ্রমিকরা জার সরকারের ধ্বংস কামনা করে পেট্রোগ্রাড শহরের রাস্তায় রাস্তায় ধ্বনি দিতে থাকে। ৮ই মার্চ থেকে শ্রমিক ধর্মঘটের সঙ্গে পেট্রোগ্রাড শহরের জনতা সামিল হয়। জনতা গম, ময়দা প্রভৃতি খাদ্যের মজুতদারের গৃহ আক্রমণ করে। জার সরকার ধর্মঘটী শ্রমিকদের বিরুদ্ধে সেনাদল পাঠালে সেনারা শ্রমিকদের পক্ষ নেয়। এর ফলে পেট্রোগ্রাড শহরের ওপর জার সরকারের নিয়ন্ত্রণ বিনষ্ট হয়। কারণ পুলিশ ও সেনা জারের আদেশ মানতে রাজী হয়নি। এমতাবস্থায় বলশেভিকরা পেট্রোগ্রাড শহরের সংগঠিত শ্রমিকদের সহায়তায় একটি সোভিয়েত বা স্বশাসিত পরিষদ গঠন করে কল-কারখানাগুলি এই সোভিয়েতের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। শ্রমিক ও সেনাদলের প্রতিনিধিদের নিয়ে পেট্রোগ্রাড সোভিয়েত গঠন করা হয়। জারের সেনাদল পেট্রোগ্রাড দখল করতে ব্যর্থ হলে জার নিরুপায় হয়ে চতুর্থ ডুমা বা জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকেন। ডুমার নির্দেশে ১৪ই মার্চ ১০ সদস্যের অস্থায়ী কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি ও ডুমার নির্দেশে জার দ্বিতীয় নিকোলাস পদত্যাগ করেন। চতুর্থ ডুমার নির্দেশে এই দশ সদস্যের কমিটি নিয়ে রাশিয়ায় একটি অস্থায়ী প্রজাতন্ত্রী সরকার স্থাপিত হয়। লুভভ হন এই সরকারের রাষ্ট্রপতি এবং কেরেনেস্কি হন প্রধানমন্ত্রী। এভাবে জারতন্ত্রের অবসান ঘটে।

নভেম্বর ১৯১৭ খ্রীঃ বিপ্লবের কারণ বা বলশেভিক বিপ্লবের কারণ (The Causes of the Bolshevik Revolution or The Second Russian Revolution) : ১৯১৭ খ্রীঃ রাশিয়ায় ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের কারণগুলিই ছিল ১৯১৭ খ্রীঃ নভেম্বর বিপ্লবের কারণ। (আগে পৃঃ ৪৭৮ দ্রষ্টব্য)। ১৯১৭ খ্রীঃ মার্চ মাসে

দ্বিতীয় বিপ্লবের সূচনা

জারতন্ত্রের পতন ঘটে। জার সরকারের পতন ঘটলে লুভভ ও কেরেনেস্কির নেতৃত্বে রাশিয়ায় প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হয়। রুশ বিপ্লবের প্রথম পর্যায় সমাপ্ত হয়। কিন্তু রুশ বিপ্লব কেবলমাত্র প্রজাতন্ত্র ঘোষণার দ্বারা সম্পূর্ণ হয়নি। এই বিপ্লবকে পূর্ণ পরিণতিতে আনার জন্যে একটি দ্বিতীয় বিপ্লবের দরকার হয়। ১৯১৭ খ্রীঃ মার্চ মাসে জার সরকারের পতন হলে পেট্রোগ্রাড শহরে একই সঙ্গে দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী সরকাব স্থাপিত হয়। চতুর্থ ডুমা কর্তৃক নিযুক্ত অস্থায়ী প্রজাতন্ত্রী সরকার দাবী করে যে, তারাই হল প্রকৃত বৈধ সরকার। জারের পতনের পর সংবিধান অনুযায়ী তারাই হল বৈধ ক্ষমতার অধিকারী। কারণ যে চতুর্থ ডুমা সীমাবদ্ধ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত হয়, এই অস্থায়ী প্রজাতন্ত্র তারই নির্দেশে ঘোষিত হয়। জারের পদত্যাগের পর Law of Devolution অনুযায়ী এই প্রজাতন্ত্রই ছিল বৈধ সাংবিধানিক সরকার। অপর দিকে ৮ই মার্চ পেট্রোগ্রাডে শ্রমিক ধর্মঘটের ফলে সবকিছু অচল হয়। এই ধর্মঘট রুশ সোস্যাল ডেমোক্র্যাটদের দ্বারা এবং তাদের প্রভাবিত শ্রমিক সংগঠন দ্বারাই অনুষ্ঠিত হয়। জারের সেনাদল এই ধর্মঘটী শ্রমিকদের সঙ্গে সোস্যাল ডেমোক্র্যাটদের প্রভাবেই যোগ দেয়। বলশেভিকদের "শ্রমিককে রুটি, সেনাদের যুদ্ধের বদলে শান্তি এবং কৃষককে জমি" দানের প্রতিশ্রুতিই সকল শ্রেণীর জনতাকে এই ধর্মঘটের সামিল করে। এই পটভূমিকায় সোস্যাল ডেমোক্র্যাটদের বিশেষ সক্রিয় সংগঠন বলশেভিক গোষ্ঠী পেট্রোগ্রাড সোভিয়েত গঠন করে। বলশেভিকদের দ্বারা গঠিত পেট্রোগ্রাড সোভিয়েত ছিল দৃঢ় মূল। পেট্রোগ্রাড সোভিয়েতের অনুকরণে রাশিয়ার অন্যান্য শহরগুলিতেও স্থানীয় সোভিয়েত স্থাপিত হয়। কাজেই ১৯১৭ খ্রীঃ মার্চ থেকেই দুটি পরস্পর বিরোধী সংগঠন রাশিয়া শাসনের বৈধ অধিকার দাবী করে। অস্থায়ী প্রজাতন্ত্র বৈধ অধিকার দাবী করলেও, বলশেভিকদের মতে অস্থায়ী প্রজাতন্ত্রের এই দাবীর কোন ভিত্তি ছিল না। কারণ যে চতুর্থ ডুমা এই প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করে তা সর্বসাধারণের ভোটে নির্বাচিত হয়নি। তুলনামূলকভাবে পেট্রোগ্রাড সোভিয়েত ছিল শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিনিধি। এটি ছিল শ্রমিকদের সরকার গঠনের সংগঠন।

রুশ সোস্যাল ডেমোক্র্যাট দল বিশেষতঃ বলশেভিক গোষ্ঠীর মতে কেন্দ্রের প্রজাতন্ত্র ছিল রুশ বুর্জোয়াশ্রেণীর দ্বারা গঠিত। সুতরাং এই প্রজাতন্ত্র বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করত। এই

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি বলশেভিকদের বিরোধিতা

প্রজাতন্ত্রের দ্বারা শ্রমিক শ্রেণীর আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে না। বলশেভিক দল মনে করত যে, মেহনতী শ্রমিকদের দ্বারা সরকার গঠিত না হলে রাশিয়ায় প্রকৃত সমাজতন্ত্র স্থাপিত হবে না। সুতরাং বলশেভিক দল কেন্দ্রীয় প্রজাতন্ত্রের প্রতি আনুগত্য দেয়নি। তারা পেট্রোগ্রাড সোভিয়েতকে নিয়ে সরকার গঠনের উদ্যোগ নেয়।

এক্ষেত্রে একটি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে, গণভোট দ্বারা রাশিয়ার প্রজা সাধারণের মতামত জানা যেত। যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করত তারাই বৈধ অধিকার পেত। কিন্তু রাশিয়া তখনও বিশ্বযুদ্ধে জড়িত ছিল। প্রায় ১০ মিলিয়ন নাগরিক বিভিন্ন রণাঙ্গনে নিযুক্ত ছিল। যুদ্ধের জন্যে দেশে স্বাভাবিক অবস্থা বিদ্যমান ছিল না। কাজেই প্রজাতন্ত্রী নেতারা বলেন যে, দেশে স্বাভাবিক অবস্থা দেখা না দিলে সাধারণ নির্বাচন সম্ভব নয়। ততদিন চতুর্থ ডুমার দ্বারা নিযুক্ত এই অস্থায়ী প্রজাতন্ত্রই ছিল বৈধ সরকার। বলশেভিকরা অস্থায়ী প্রজাতন্ত্রের বৈধতা মানত না। তাদের আশঙ্কা ছিল যে, সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে হয়ত ভূমিস্বত্বলোভী কৃষকরা এবং ক্ষমতালোভী বুর্জোয়ারা তাদের ভোটের জোরে হঠিয়ে দিবে। সুতরাং এই শক্তি শূন্যতার সুযোগ নিয়ে ক্ষমতা দখল করা উচিত।

কিন্তু সোস্যাল ডেমোক্র্যাট দল এখনই রাষ্ট্রক্ষমতা অধিগ্রহণ করা উচিত কিনা, এ বিষয়ে একমত ছিল না। সোস্যাল ডেমোক্র্যাট দলের একটি গোষ্ঠী বিশেষতঃ মেনশেভিকগণ (আগে

মেনশেভিক ও বলশেভিক মতবাদ দেখ) মার্কসবাদের তাত্ত্বিক নীতিতে গভীর আস্থাশীল ছিল। মার্কসীয় তত্ত্ব অনুযায়ী তারা ত্রিস্তর বিপ্লব অর্থাৎ প্রথমে সামন্ততান্ত্রিক, তারপর বুর্জোয়া এবং সর্বশেষে প্রলেতারিয় বিপ্লবের তত্ত্বে আস্থাশীল ছিল। মেনশেভিকরা মনে করত যে, রাশিয়ায় শ্রমিকরাজ প্রতিষ্ঠার সঠিক সময় উপস্থিত হয়নি। এদের মতে, রাশিয়ায় সদ্যোমাত্র বুর্জোয়া বিপ্লবের দ্বারা বুর্জোয়াশ্রেণী ক্ষমতা পেয়েছিল। বুর্জোয়া শাসনের অবক্ষয় দেখা দিলে তবেই শ্রমিক বিপ্লবের উপযুক্ত সুযোগ আসবে। তার যথেষ্ট দেরী ছিল। শ্রমিক বিপ্লবের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। এই ধারণা হেতু মেনশেভিকরা কয়েকটি শহরে সোভিয়েত গঠন করলেও, তারা কেন্দ্রীয় সরকার গঠনে নিরুৎসাহ থাকে। বলশেভিকরাও ইতিকর্তব্য স্থির করতে পারেনি।

সোস্যাল ডেমোক্র্যাটদের দ্বিধা

এই সময়ে বলশেভিক নেতা লেনিন সুইজারল্যান্ডে নির্বাসন থেকে স্বদেশে ফিরে আসেন। তিনি ১৯১৭ খ্রীঃএপ্রিল মাসে তাঁর বিখ্যাত এপ্রিল থিসিস ঘোষণা করেন। এই থিসিসে লেনিন বলেন যে,—(১) ফেব্রুয়ারির বিপ্লবে বুর্জোয়া শ্রেণীর জয় হয়েছে। এতে শ্রমিকদের সন্তুষ্ট হওয়ার কিছু নেই। (২) বুর্জোয়া শাসনের তথাকথিত সঙ্কটের জন্যে অপেক্ষা করার দরকার নেই। বুর্জোয়া বিপ্লব ও শ্রমিক বিপ্লব এক সঙ্গে চলবে এবং শেষ পর্যন্ত শ্রমিকরা ক্ষমতা দখল করবে। লেনিন "ধারাবাহিক ও অবিচ্ছিন্ন বিপ্লবের" (Continued Revolution) কথা বলেন। তাঁর মতে, জারতন্ত্র ছিল সামন্ত শাসনের প্রতিনিধি। তার হাত থেকে মার্চ বিপ্লবে অস্থায়ী প্রজাতন্ত্র ক্ষমতা নিলে বুর্জোয়া বিপ্লব ঘটে গেছে। কিন্তু মার্কসীয় তত্ত্বের আক্ষরিক অর্থ নিয়ে "বুর্জোয়া সরকারের সঙ্কট দেখা দিলে তবে প্রলেতারিয় বিপ্লব হবে" এই মতকে লেনিন খারিজ করেন। তিনি বলেন, রাশিয়ার যা অবস্থা তাতে প্রলেতারিয় বিপ্লবের জন্যে অপেক্ষা করার প্রশ্ন নেই। এখনই অস্থায়ী প্রজাতন্ত্রের কাঁপা হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে হবে। বুর্জোয়ারা কোন প্রকৃত বিপ্লব করতে পারবে না। এরা ভীরু ও প্রতিক্রিয়াশীল। এরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকলে, রাশিয়ায় পুঁজিবাদকে দৃঢ়মূল করে ফেলবে। একটি সাধারণ নির্বাচনে যদি বুর্জোয়া প্রজাতান্ত্রিক গোষ্ঠী কোনক্রমে জয়লাভ করে, তবে তারা বৈধতা ও পায়ের তলায় মাটি পেয়ে যাবে। এখন তাদের শিকড় ছড়ায়নি। তাদের উৎপাটিত করার এটাই উপযুক্ত সময়। সুতরাং লেনিন এপ্রিল থিসিসে ঘোষণা করেন যে, "সোভিয়েতগুলিকে এখন সকল ক্ষমতা দিতে হবে" (All power to the Soviets)। (৩) শ্রমিকের স্বার্থে ক্ষমতা এখনই দখল করতে হবে। আর দেরী নয়। শ্রমিক সোভিয়েতগুলি শহর ও গ্রামে অবিলম্বে সকল ক্ষমতা অধিকার করবে। এরা কেন্দ্রীয় প্রজাতন্ত্রকে আনুগত্য দিবে না। (৪) বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রী সরকার জার্মানীর বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ চালাচ্ছে, তা হল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ। এতে রুশ জনগণ সহযোগিতা করবে না। (৫) তিনি রুশ সেনাদল ও শ্রমিকদের এই বিপ্লবে সামিল হওয়ার জন্যে আহ্বান জানান। সৈন্যদলকে সতর্ক করে লেনিন বলেন যে, সোভিয়েত সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা না করলে তার ফল ভোগ করতে হবে।

লেনিনের এপ্রিল থিসিস

এই পরিস্থিতিতে অস্থায়ী প্রজাতন্ত্রকে টিকে থাকতে হলে যে দৃঢ় নীতি নেওয়ার দরকার ছিল, তারা তা নিতে পারেনি। বলশেভিক দল লেনিনের এপ্রিল থিসিস গ্রহণ করে লেনিনের নেতৃত্বে যে সকল ব্যবস্থা নেয় তার মোকাবিলা করার মত ক্ষমতা কেন্দ্রীয় প্রজাতন্ত্রের ছিল না। অস্থায়ী প্রজাতন্ত্র কতকগুলি ভুলনীতির জন্যে জনসাধারণের অপ্রিয় হয়। (১) প্রজাতন্ত্র সেনাদল ও সর্বসাধারণের দাবী অগ্রাহ্য করে, যতদিন না রুশভূমি শত্রু জার্মানদের হাত থেকে মুক্ত হয়, ততদিন যুদ্ধ চালিয়ে যেতে সঙ্কল্প নেয়। যুদ্ধের দরুন দেশবাসীর দুঃখ-দুর্দশাকে তারা আমল দেয়নি। দেশপ্রেম নিয়ে তারা জাতিকে স্বার্থত্যাগ করতে ডাক দেয়। এতে তাদের

গণসমর্থন নষ্ট হয়। গ্যালিসিয়া উদ্ধারের জন্যে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে একটি অভিযান পাঠালে জার্মান সেনাপতি লুডেকডর্ফ তা চূর্ণ করে দেন। গ্যালিসিয়া অভিযান ব্যর্থ হলে, এই সরকারের প্রতি সকলের আস্থা নষ্ট হয়। (২) কৃষকরা ভূমিবন্টনের দাবী জানালে প্রজাতন্ত্রী সরকার কিভাবে ভূমিবন্টন করা হবে তার একটি সুন্দর খসড়া রচনা করে। কিন্তু তা কার্যকরী না করে জানান হয় যে, যুদ্ধে জয় হলে, সাধারণ নির্বাচনের পর এই খসড়া কার্যকরী করা হবে। এতে তারা কৃষকদের সমর্থন হারায়। বলশেভিকরা ক্ষমতা পেলে কৃষকদের জমি বন্টনের আগাম ঘোষণা দেয়। লেনিন বলেন যে, ভূমিহীন কৃষকদের বা গ্রামীণ প্রলিটারিয়েটকে জমি দিয়ে তাদের কুলাক বা জোতদারদের প্রভাব থেকে বিচ্ছিন্ন করা দরকার। (৩) শ্রমিকরা ৮ ঘন্টা কাজের সময় ধার্য করে আইন রচনা ও ন্যায্য মজুরী আইন দাবী করলে, অস্থায়ী প্রজাতন্ত্র একই উত্তর দেয় যে, যুদ্ধ শেষ হলে এই দাবী পূরণ করা হবে। শ্রমিক ও কৃষকরা অস্থায়ী প্রজাতন্ত্রের এই বিলম্বিত প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করেনি। সেনাদল এই হেরে যাওয়া যুদ্ধ অনর্থক চালাতে চায়নি। তারা শান্তি স্থাপনের জন্যে ব্যাকুল হয়। প্রজাতন্ত্রী সরকার এই দাবীর উল্টো দিকে চলার নীতি নিলে সাধারণ সেনাদের সমর্থন এই সরকার হারায়। (৪) প্রজাতন্ত্রী সরকারের নেতাদের মধ্যেও মতবিরোধ ছিল। বলশেভিকরা দাবী করে যে, "ক্ষতিপূরণ ও রাজ্য গ্রাসের কথা না ভেবে এখনই জার্মানীর কাছে শান্তি প্রস্তাব দেওয়া দরকার।" এ বিষয়ে প্রজাতন্ত্রীদের মধ্যে মতভেদ হয়। বিদেশমন্ত্রী সিলিকভ এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। বলশেভিকরা তাঁকে দক্ষিণ পন্থী প্রতিক্রিয়াশীল বলে চিহ্নিত করায় তিনি বিরক্ত হয়ে পদত্যাগ করেন। এরপর কেরেনেস্কি একাধারে প্রধানমন্ত্রী, বিদেশমন্ত্রী ও যুদ্ধমন্ত্রীর দায়িত্ব হাতে নেন।

কেরেনেস্কি ছিলেন একাধারে মধ্যপন্থী সমাজতন্ত্রবাদী দেশপ্রেমিক। তিনি যুদ্ধ চালিয়ে যেতে চান। গ্যালিশিয়া অভিযানে সরকারের পরাজয় হলে কেরেনেস্কি ধিকৃত হন। তাছাড়া তিনি পেট্রোগ্রাড সোভিয়েতের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় দৃঢ়তা দেখাতে পারেননি। সমাজতান্ত্রিক বিকাশের জন্যে তিনি মানসিক ও আদর্শগত দিক থেকে পেট্রোগ্রাড সোভিয়েতের সঙ্গে সহযোগীতা রেখে চলার নীতি নেন। তিনি তাঁর মন্ত্রীসভায় চেরনভ প্রভৃতি মেনশেভিক সদস্যদেরও স্থান দেন। বলশেভিকদের দাবী মেনে তিনি মন্ত্রীসভা থেকে দক্ষিণপন্থীদের প্রায় বহিষ্কার করেন। বলশেভিক সেনাদলে তাদের প্রভাব বিস্তার করে যে সকল সেনা কমিটি বা সেনা সোভিয়েত গঠন করে, তিনি তাতে বাধা দেননি। তাঁর আশা ছিল তাঁর মধ্যপন্থী সমাজতান্ত্রিক আদর্শ বলশেভিকদের সমর্থন আদায় করতে পারবে। কেরেনেস্কি এদিক থেকে ছিলেন অনেকটা ইউটোপীয়ান বা বাস্তবতাহীন আদর্শবাদী। কেরেনেস্কি সরকার সম্পর্কে মেনশেভিকদের মোহ থাকলেও, লেনিনের তা ছিল না। লেনিন চান যেভাবেই হোক বলশেভিক দলকে রাজনৈতিক ও শাসন ক্ষমতা হাতে নিতে হবে। সুতরাং কেরেনেস্কি সহযোগীতার হাত বাড়ালেও লেনিন সেই হাত ধরেননি। উগ্রপন্থী বলশেভিকের স্বভাবসিদ্ধ কটুভাষায় তিনি আপোষপন্থী সমাজতান্ত্রিকদের ধিক্কার জানান। লেনিন বলেন যে "১৯১৭ খ্রীঃ মার্চ মাসে বলশেভিকদের প্রতারণা করা হয়েছে।"[১] ১৯১৭ মার্চ বিপ্লবে জার সরকারের পতন প্রকৃতপক্ষে বলশেভিকরাই ঘটিয়েছিল। পেট্রোগ্রাডের শ্রমিক ধর্মঘট তারাই সফল করে। সুতরাং শাসন ক্ষমতা পেট্রোগ্রাড সেভিয়েতের প্রাপ্য ছিল। মাঝখান থেকে বিনা স্বার্থত্যাগে, বিনা আয়াসে বুর্জোয়া চতুর্থ ডুমার নির্দেশে প্রজাতন্ত্রীরা ক্ষমতা দখল করেছে। এই সরকারের কোন গণভিত্তি নেই। ক্ষমতা পেট্রোগ্রাড সোভিয়েতই নিবে।

এই পটভূমিকায় ১৯১৭ খ্রীঃ জুলাই মাসে (১৯১৭ খ্রীঃ) লেনিন পেট্রোগ্রাডে সর্ব রুশীয় সোভিয়েত কংগ্রেসের অধিবেশন ডাকেন। পেট্রোগ্রাড সোভিয়েতের অনুকরণে রাশিয়ার বিভিন্ন

১· Gusev and Namov—History of U.S.S.R.

শহরে ও গ্রামে যে সকল স্থানীয় সোভিয়েত স্থাপিত হয়, তাদের প্রতিনিধিরা এই কংগ্রেসে যোগ দেয়। এই প্রতিনিধিরা পেট্রোগ্রাড সোভিয়েতকেই প্রকৃত বৈধ কেন্দ্রীয় সরকার এবং পেট্রোগ্রাড সোভিয়েতের প্রধান লেনিনকেই সোভিয়েত রাষ্ট্রের বৈধ প্রধান রূপে ঘোষণা করে। লেনিন সর্ব রাশিয়া সোভিয়েত কংগ্রেস ডেকে পেট্রোগ্রাড সোভিয়েতের বৈধতা এবং কেন্দ্রীয় সরকার রূপে তার স্বীকৃতি আদায় করেন। এই সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে বলশেভিকরা ও তাদের সমর্থক গোষ্ঠী শ্রমিক ও নৌ-সেনা জুলাই মাসের মাঝামাঝি পেট্রোগ্রাডে এক অভ্যুত্থান ঘটায়। কিন্তু পরিকল্পনার অভাবে অভ্যুত্থান বিফল হয়। প্রজাতন্ত্রী সরকারের অনুগত সেনাদল ও সেনাপতি কর্নিলোভ এই বিদ্রোহ দমন করেন। লেনিন আত্মরক্ষার জন্যে রাশিয়া ছেড়ে ফিনল্যাণ্ড পালান। বলশেভিকদের মধ্যে দোষীদের শাস্তি দেওয়া হয়। কিন্তু সমাজতন্ত্রের প্রতি সহানুভূতিশীল প্রধানমন্ত্রী কেরেনেস্কি, "তরমিদডীয় প্রতি বিপ্লব" বা দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলতার ভয়ে বলশেভিকদের সংগঠনগুলি ভেঙে ফেলার চেষ্টা থেকে বিরত থাকেন।

কেরেনেস্কির এই সমাজতন্ত্রী ঝোঁকের জন্যে গোঁড়া প্রতিক্রিয়াশীল দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠী অসন্তুষ্ট হয়। তাদের মুখপাত্র হিসেবে সেনাপতি কর্নিলোভ আতর্কিত আক্রমণ দ্বারা একাধারে প্রজাতন্ত্রী সরকার ও পেট্রোগ্রাড সোভিয়েতকে উচ্ছেদের চেষ্টা করেন। কর্নিলোভ যুদ্ধ জানতেন, কিন্তু রাজনৈতিক বুদ্ধিতে ছিলেন কাঁচা। তিনি তাঁর অনুগত বাহিনীকে রাজনৈতিক মতবাদে অনুপ্রাণিত (Indoctrinate) না করার ফল ভোগ করেন। কর্নিলোভের আক্রমণের সম্মুখে কেরেনেস্কি সরকার আত্মরক্ষার ব্যবস্থা না করলেও, বলশেভিকরা তাদের অনুগত সশস্ত্র জঙ্গী শ্রমিক ও অনুগত সেনার সহায়তা পায়। যুদ্ধক্ষেত্রে বলশেভিক প্রচারযন্ত্র কর্নিলোভের সেনাদের অস্ত্রসহ তাদের পক্ষে যোগ দিতে প্ররোচনা দেয়। এই প্রচারে কাজ হয়। কর্নিলোভের সেনাদল প্রজাতন্ত্রী সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করে।

কর্নিলোভের বিদ্রোহ এবং বিদ্রোহ দমনে কেরেনেস্কি সরকারের ব্যর্থতা, প্রজাতন্ত্রের পতনের ঘন্টা বাজিয়ে দেয়। সেনাদল, শ্রমিক ও শহরের লোকেরা বুঝে যায় যে প্রজাতন্ত্রী সরকার নিষ্ক্রিয়, ক্ষমতাহীন ও লক্ষ্যহীন। বিপদের সময় এই সরকার নেতৃত্বদানে অক্ষম। সাধারণের জীবন ও সম্পত্তি এই সরকার রক্ষা করতে পারবে না। জুলাই বিদ্রেহের বিফলতার পর বলশেভিকদের ক্ষীয়মান জনপ্রিয়তা, কর্নিলোভ বিদ্রোহের পর পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হয়। লেনিন স্থির করেন যে, আর বিলম্ব করলে প্রজাতন্ত্রী সরকার নির্বাচনে ডেকে বৈধতা আদায় করে নেবে এবং ক্ষমতা সংগঠন করে ফেলবে। কর্নিলোভ বিদ্রোহের পর কেরেনেস্কি প্রজাতন্ত্র অনেকাংশে পেট্রোগ্রাড সোভিয়েতের সহায়তার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

অক্টোবর মাসে বলশেভিক নেতা ট্রটস্কি পেট্রোগ্রাড সোভিয়েতের সভাপতি নির্বাচিত হলে, লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক দল আসন্ন ক্ষমতা দখলের জন্যে প্রস্তুতি নেয়। পেট্রোগ্রাড সোভিয়েতের ৯ নং আদেশনামা দ্বারা লেনিন, রুশ সেনাদলকে প্রজাতন্ত্রী সরকারকে আনুগত্য না দিয়ে পেট্রোগ্রাড সোভিয়েতকে আনুগত্য দিতে আদেশ দেয়। নতুবা দেশদ্রোহী ঘোষণা করে কঠোর শাস্তিদানের হুমকি দেওয়া হয়। পেট্রোগ্রাড গ্যারিসন বা রাজধানীর সেনাদলে বলশেভিক কর্মীরা অনুপ্রবেশ করে এই সেনাদলের অনুগত্যে ফাটল সৃষ্টি করে। সেনাদলের সহযোগিতায় অস্ত্র যোগাড় করে জঙ্গী শ্রমিকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এভাবে প্রস্তুতির পর নভেম্বর ৬, ১৯১৭ খ্রীঃ মধ্যরাত্রে পেট্রোগ্রাড সোভিয়েতের জঙ্গী শ্রমিক নেতারা বাজধানী পেট্রোগ্রাডের সরকারি অফিসগুলি দখল করে নেয়। এর ফলে রাজধানী বলশেভিকের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। কেরেনেস্কি ও তাঁর সমর্থকরা রাজধানী থেকে পালান। নভেম্বরের ঘটনার ফলে রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লব ঘটে এবং বলশেভিকদের হাতে ক্ষমতা চলে আসে। অবশ্য এরপর প্রতি বিপ্লবী বিদ্রোহ দমন করে ও বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করে বলশেভিকদের গৃহীত ক্ষমতা রক্ষা করতে হয়।

বলশেভিকদের সফলতার কারণগুলি আমরা প্রজাতন্ত্রী সরকারের নেতিবাচক নীতি, এই সরকারের সাধারণ নির্বাচন ভীতি, প্রজাতন্ত্রী সরকারের যুদ্ধনীতি, কৃষক ও শ্রমিকদের নিজপক্ষে আনার জন্যে সংস্কার প্রবর্তনে ব্যর্থতা, খাদ্যসংকট ও শিল্প সামগ্রী সরবরাহে ব্যর্থতার মধ্যেই খুঁজে পাব। অপরদিকে বলশেভিকদের প্রতি আধা সমাজতন্ত্রী সরকারের নিয়ন্ত্রণে রাখার ব্যর্থতার মধ্যে খুঁজে পাব। অপরদিকে বলশেভিকদের সফলতার মূলে ছিল তাদের সংগঠন ও প্রচারকার্য। সোস্যাল ডেমোক্র্যাট দল মার্কসবাদকে সারসত্য জ্ঞান করে ১৯০৫ খ্রীঃ-র আগে থেকেই শ্রমিক সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করে। এজন্য রুশ শ্রমিকদের তারা ছিল নিজের লোক। সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলন দ্বারা তারা যেমন জার সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে, তেমনই তারা প্রজাতন্ত্রীদেরও ক্ষমতাচ্যুত করে। দ্বিতীয়তঃ, নিরন্তর প্রচার দ্বারা শ্রমিক,নিম্নমধ্যবিত্ত ও কৃষকদের কাছে বলশেভিকরাজের মাধ্যমে এক স্বর্ণ যুগ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখায়। আপাততঃ পরাজিত, হতাশাতাড়িত সেনাদলকে শান্তি এনে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি, কৃষককে জমি ও শ্রমিককে রুটি দেওয়ার তারা প্রতিশ্রুতি দেয়। এই প্রতিশ্রুতির জন্যে তারা এই সকল শ্রেণীর আস্থা অর্জন করে। তৃতীয়তঃ, লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিকরা বাস্তবমুখী, দূরদর্শী নীতি নিতে সক্ষম হয়। লেনিনের নেতৃত্ব, বাগ্মীতা, কূটনীতি ও যথাসময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা এই দলের জয়লাভ ঘটায়। চতুর্থতঃ, বলশেভির্কদের প্রতি কেরেনেস্কি সরকারের দুর্বলতা এবং কর্নিলোভ বিদ্রোহের পর কেরেনেস্কি সরকারের মধ্যপন্থী নীতির দেউলিয়াপনা বলশেভিকদের জয়লাভের পথ প্রশস্ত করে। শ্রমিক শ্রেণীর সহায়তা ছাড়া, রুশ সেনাদলের সহায়তা ছিল বলশেভিকদের জয়লাভের চাবিকাঠি।[১]

বলশেভিক শাসন ঃ বিপ্লবের স্থিতি, ১৯১৭—২৪ খ্রীঃ (The Bolshevik Government : Consolidation of the Revolution 1917—24) ঃ অক্টোবর ১৯১৭ খ্রীঃ বিপ্লব দ্বারা ক্ষমতা অধিকারের পর বলশেভিক নেতা লেনিন ও তাঁর সহযোগীরা রাশিয়াকে একটি সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত করার কাজে হাত দেন। বিপ্লবের প্রাক্কালে লেনিন শ্রমিকদের রুটি, কৃষকদের জমি ও সেনাদলকে শান্তিদানের প্রতিশ্রুতি দেন। তা পূরণের জন্যে বিপ্লবী সরকার আত্মনিয়োগ করে।

লেনিন সর্বপ্রথম জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধ করে শান্তি স্থাপনের কাজে হাত দেন। এই উদ্দেশ্যে সন্ধির শর্ত আলোচনার দায়িত্ব তাঁর সহকারী লিও ট্রটস্কিকে দেওয়া হয়। ট্রটস্কির প্রচেষ্টায় কাইজারের জার্মানীর সঙ্গে ব্রেষ্টলিটভস্কের সন্ধি (Treaty of Brestlitovsk) স্বাক্ষরিত হয়। এই সন্ধির দ্বারা রাশিয়া জার্মানীকে বহু স্থান ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। লেনিন বিশ্বাস করিতেন যে, রুশ বিপ্লবকে স্থায়ী করতে হলে যুদ্ধ বন্ধ করে অবিলম্বে শান্তি স্থাপন করা দরকার। এজন্য তিনি জার্মানীর প্রস্তাবিত সন্ধির কঠোর শর্তগুলি স্বীকার করেন। ব্রেষ্টলিটভস্কের সন্ধির দ্বারা পোল্যাণ্ড, তিন বাল্টিক রাজ্য, ফিনল্যাণ্ড, বাইলো রাশিয়া, ইউক্রেণ এবং ট্রান্সককেশিয়ার একাংশ রাশিয়াকে ত্যাগ করতে হয়। এছাড়া জার্মানীকে প্রচুর টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। মোট কথা এই সন্ধির দ্বারা ইওরোপীয় রাশিয়ার $\frac{১}{৪}$ অংশ এবং রুশ কয়লা ও লৌহ সম্পদের $\frac{৩}{৪}$ অংশ রাশিয়ার হাতছাড়া হয়। জার্মানীর সঙ্গে শান্তি স্থাপিত হলে বলশেভিক সরকার স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। শান্তি স্থাপনের পর আভ্যন্তরীণ সংগঠনের কাজে হাত দিতে বলশেভিক সরকার সক্ষম হয়। ব্রেষ্টলিটভস্কের সন্ধি লেনিনের কূটনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচায়ক ছিল।

ব্রেষ্ট লিটভস্কের সন্ধির শর্ত

১· বলশেভিক বিপ্লবের সন তারিখ সম্পর্কে বলা দরকার যে:- রুশ বিপ্লবী ক্যালেণ্ডার পুরাতন ইওরোপীয় ক্যালেণ্ডারের ১৩ দিন পরে ধরা হয়। সেই অর্থে পুরাতন ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী ১৯১৭ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারি বিপ্লবকে মার্চ বিপ্লব এবং ১৯১৭ খ্রীঃ অক্টোবর বিপ্লবকে নভেম্বর বিপ্লব বলা হয়।

(i) অতঃপর সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বলশেভিক সরকার পুরাতনতন্ত্রের প্রশাসনিক কাঠামোগুলিকে ভেঙে ফেলে। (১) ডুমা বা সংবিধান সভাকে বাতিল করা হয়। প্রজাতন্ত্রী সরকারের বহু সদস্যকে নির্বাসিত করা হয়। (২) মস্কো ও পেট্রোগ্রাড শহরের মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে ভেঙে দেওয়া হয়। কারণ এই মিউনিসিপ্যাল কমিউনগুলি ছিল বলশেভিক বিরোধী। (৩) জারের আমলের সিনেট ভেঙে দেওয়া হয়। (৪) জেমেষ্টভো বা জেলা পরিষদগুলিকেও ভেঙে দেওয়া হয়। এই জেলাপরিষদগুলি বুর্জোয়া সংবিধানের সমর্থক ছিল। (৫) সেনাদলে অফিসার নিয়োগের নিয়ম বদল করা হয়। সাধারণ সেনার মধ্যে যারা বিপ্লবের প্রতি অনুগত ছিল তাদেরই অফিসার নিয়োগ করা হয়। (৬) সেনাদলে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে পুরাতন আইন-কানুন লোপ করা হয়। সেনাদের মধ্যে পুরাতন শ্রেণীবিভাগ লোপ করা হয়। সরকারের সকল গুরুত্বপূর্ণ পদগুলিতে বিশ্বস্ত বলশেভিকদের নিয়োগ করা হয়।

পুরাতনতন্ত্রকে ধ্বংসের আইন

(ii) (১) রাশিয়ার জাতীয় গীর্জাকে রাষ্ট্র থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করা হয়। (২) গীর্জার ভূসম্পত্তিগুলি রাষ্ট্র অধিগ্রহণ করে। (৩) রুশ নাগরিকদের বিবাহ দান ও বিবাহ-বিচ্ছেদ দানের অধিকার গীর্জার হাত থেকে তুলে নেওয়া হয়। (৪) ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

ধর্মীয় সংস্কার

(iii) বলশেভিক সরকারের ১৯১৮-১৯২১ খ্রীঃ পর্যন্ত গৃহীত অর্থনীতিকে War Communism বা যুদ্ধকালীন "জরুরী সমাজতন্ত্র" বলা হয়। বলশেভিক সরকারের এই প্রথম পর্যায়ে শাসকদলের না ছিল শাসনের পূর্ব অভিজ্ঞতা, না ছিল অভিজ্ঞ-আমলাতন্ত্র। তদুপরি লেনিন প্রভৃতি কয়েকজন মাথাওয়ালা নেতা ছাড়া বাকি বলশেভিকরা ছিল উগ্রপন্থী এবং বাস্তবতাহীন, পুঁথিপড়া কমিউনিষ্ট। তারা অতি উৎসাহবশতঃ পুরাতনতন্ত্রের শিকড়সহ সবকিছু উপড়ে ফেলতে চেয়েছিল। তাছাড়া শ্রমিক সংগঠনের বলশেভিক নেতারা ছিল ভীষণ জঙ্গী। তাদের ওপর কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ ছিল না। ধীরে ধীরে পরিবর্তনের স্থলে এই অতি উৎসাহী বলশেভিকরা রাতারাতি পরিবর্তন আনতে উদগ্র হয়। বলশেভিকরা ১৯১৭ খ্রীঃ নভেম্বরে যখন ক্ষমতা গ্রহণ করে তখন রাশিয়ার শিল্প উৎপাদনের হার ছিল ১৯১৩ খ্রীঃ $\frac{৩}{৪}$ অংশ। কৃষি উৎপাদন ছিল আরও কম। রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছিল এবং দ্রব্য মূল্যের হার বেশ চড়া ছিল। প্রধান অর্থনৈতিক সমস্যা ছিল খাদ্য সঙ্কট এবং মূল্য বৃদ্ধি ও পরিবহনের সংকট। লেনিন প্রথমে মূল শিল্পগুলি যথা, অস্ত্র কারখানা, ব্যাঙ্ক এবং লৌহ, রেলপথ প্রভৃতি শিল্পের রাষ্ট্রীকরণ করেন। ভোগ্যপণ্যের শিল্পে তিনি হঠাৎ হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকেন। কিন্তু শ্রমিক সংগঠনগুলিকে তিনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি। এই শ্রমিক সংগঠনগুলি বলশেভিক বিপ্লবের পর শ্রমিকদের দীর্ঘ বঞ্চনার অবসান চায়। তারা ভাবে যে বেসরকারি মালিককে হঠিয়ে শ্রমিক সংগঠনগুলি কারখানা দখল করলে সমস্যার সমাধান হবে, শোষণের অবসান হবে। এজন্য বিভিন্ন শিল্প কারখানাগুলির অধিকার শ্রমিকরা বেসরকারিভাবে হাতে নিতে থাকে। এদিকে খাদ্যসংকট ও গৃহযুদ্ধের চাপ বাড়ে। এমতাবস্থায় লেনিন সিদ্ধান্ত নেন যে, সকল শিল্প কারখানা এবং বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ও কৃষি খামারগুলিকে রাষ্ট্র অধিগ্রহণ করবে। এজন্য আইন রচনা করা হয়। (১) কল কারখানা, খামার, ভূসম্পত্তি, ব্যক্তিগত সম্পত্তি সকল কিছুই অধিগ্রহণ করে রাষ্ট্রের সম্পত্তিতে পরিণত করা হয়। (২) উৎপাদন ও বণ্টন উভয় ব্যবস্থাই রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। শিল্প কারখানাগুলি সরকারি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। (৩) বৃহৎ জমিদারী, খামার, কুলাক বা জোতদারদের জমি এমনকি কৃষকদের জমিও রাষ্ট্রের সম্পত্তিতে পরিণত করা হয়। (৪) সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্যে কোন ক্ষতিপূরণ দান নিষিদ্ধ হয়। (৫) শ্রম দ্বারা জীবিকা অর্জন করতে

সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা

সকলকে বাধ্য করা হয়। (৬) ব্যক্তিগত সম্পত্তি লোপ হলে সমাজে শ্রেণীভেদ লুপ্ত হয়। (৭) রেশনিং দ্বারা খাদ্য বণ্টন আইন করা হয়। শহরের প্রতি পরিবারকে ব্রেড কার্ড বা রুটির কার্ড দেওয়া হয়। এই কার্ড অনুসারে খাদ্য বণ্টনের ব্যবস্থা করা হয়। (৮) ব্যাঙ্কগুলি জাতীয়করণ করা হয়। (৯) সরকারী ঋণ বাতিল করা হয়। (১০) বৈদেশিক ঋণ ও সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা হয়। (১১) শ্রমকেই একমাত্র মর্যাদা দান করা হয়। (১২) কুলাকশ্রেণী জমি না ছেড়ে দেওয়ার জন্যে সরকারি আইন অমান্য করলে কুলাকদের কড়া হাতে দমন করা হয়। এভাবে সমাজতন্ত্র স্থাপন করা হয়।

বলশেভিকরা রাষ্ট্র ক্ষমতা নভেম্বর বিপ্লবে গ্রহণ করলেও, প্রতিবিপ্লবী শক্তিগুলি তা নতশিরে মেনে নেয়নি। প্রতিবিপ্লবীদের সাম্যবাদী পরিভাষায় "শ্বেত প্রতিবিপ্লবী" (White counter revolutionaries) বলা হয়। এই শ্বেত গোষ্ঠীতে ছিলেন উৎখাত প্রাপ্ত প্রজাতন্ত্রী নেতা কেরেনেস্কি ও তাঁর সমর্থকগণ, জারের আমলের কোন কোন সেনাপতি, জমির অধিকারচ্যুত কুলাকগণ এবং ডন অঞ্চলের কিছু ভ্রান্ত কৃষক পরিবার প্রভৃতি। পশ্চিমী ধনতান্ত্রিক সরকারগুলি এশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লবের ফলে আশঙ্কা করে যে, এই বিপ্লব তাদের দেশে ছড়িয়ে পড়তে পারে। তাছাড়া ব্রেষ্টলিটভস্কের সন্ধির দ্বারা একতরফাভাবে যুদ্ধ ত্যাগ করে জার্মানির সঙ্গে সন্ধি করায় এই শক্তিগুলি কুপিত হয়। পশ্চিমী শক্তিগুলি প্রতিবিপ্লবীদের সহায়তা দিয়ে এবং রুশ সীমান্তে সেনা আক্রমণ ঘটিয়ে বলশেভিক সরকারকে উৎখাত করতে চায়। আভ্যন্তরীণ প্রতিবিপ্লবী বিদ্রোহ এবং বৈদেশিক আক্রমণের সাঁড়াশীর চাপে বলশেভিক সরকারকে চূর্ণ করার চেষ্টা করা হয়।

শ্বেতসন্ত্রাস ঃ প্রতিবিপ্লব

(iv) পশ্চিমী সরকারগুলি প্রতিবিপ্লবীদের অস্ত্র সরবরাহ করে। সাইবেরিয়া থেকে ইউক্রেইন পর্যন্ত রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে এই প্রতিবিপ্লবী শক্তি শ্বেত সন্ত্রাস (White Terror) চালাতে থাকে। ডন নদীর উপত্যকা ও কুবান উপত্যকার কসাক কৃষকরা বিপ্লবী সরকারের বিরোধিতা করে।[১] জারের আমলের সেনাপতিরা যথা ডেনিকিন, কোলচাক, যুডেনিখ্ প্রভৃতি এই প্রতিবিপ্লবী সরকারের পক্ষে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। প্রতিবিপ্লবী শ্বেত সেনারা জারিৎসিন বা ষ্ট্যালিনগ্রাড দখল করে একদিক থেকে মস্কোর দিকে ছুটে আসে। প্রতিবিপ্লবী সেনাপতি কোলচাক ৪০০০০ চেক সেনা নিয়ে ট্রান্স-সাইবেরীয় রেলপথ ধরে মস্কোর দিকে আসেন। এদিকে পশ্চিম ইওরোপীয় বাহিনী উত্তর সাগরের আর্কেঞ্জেল বন্দরে এবং অপরদিকে পোল্যান্ডের ভেতর দিয়ে এগিয়ে আসে।

লেনিনের নেতৃত্ব এবং তাঁর দুই সহকর্মী ট্রটস্কি ও ষ্টালিনের দক্ষতা বলশেভিক সরকারকে এই দারুণ বিপদ থেকে মুক্ত করে। ষ্টালিন, চেকা নামে এক গুপ্ত পুলিশ বাহিনী গঠন করেন।

বৈদেশিক শক্তিকে বাধা দান

এর সাহায্যে তিনি প্রতিবিপ্লবী এবং কুলাক বিদ্রোহীদের ধ্বংস করেন। ষ্ট্যালিন শ্বেত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লাল সন্ত্রাস চালান। বহু লোক চেকার হাতে নিহত হয়। আবার কমিউনিষ্ট সন্দেহে বহু নিরীহ লোককে শ্বেত সন্ত্রাসবাদীরা হত্যা করে। উভয়পক্ষের সন্ত্রাসে মোট ১৪ মিলিয়ন লোক নিহত হয়। ২ মিলিয়ন লোক দেশ ছেড়ে চলে যায়। এদিকে ট্রটস্কি সামরিক কমিশনার হিসাবে নিযুক্ত হয়ে শ্রমিক ও কৃষকদের সাহায্যে লালফৌজ নামে সেনাদল গঠন করেন। জারের আমলের প্রায় ৫০ হাজার দেশপ্রেমী সেনা অফিস্যার লাল ফৌজকে তামিল দান ও পরিচালনার দায়িত্ব নেয়। রুশজাতি ছিল স্বভাবতই দেশপ্রেমিক। বৈদেশিক আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশরক্ষার জন্যে তারা বলশেভিক সরকারকে সহায়তা দেয়। বরিস পাস্তেরন্যাকের বিখ্যাত উপন্যাস ডাঃ জিভাগোতে দেখা যায়

১· And Quite Flows the Don—M. Solokov.

যে, খাদ্য সমস্যা, মহামারীর আক্রমণ, রণক্লান্ত রুশজাতির কাছে তখন বেঁচে থাকাটিই ছিল একমাত্র পথ। রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাতে তারা রাজী ছিল না। তাছাড়া বিপ্লবী সরকারের প্রতি শ্রমিক ও দরিদ্রশ্রেণী ছিল অনুগত। সুতরাং রুশ সরকার শত্রুর বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ সৃষ্টি করে। বৈদেশিক শক্তিগুলির ধারণা ছিল যে, রুশ জনগণ তাদের মুক্তিদাতা মনে করে তাদের স্বাগত জানাবে। কিন্তু দেশপ্রেমিক রুশদের বিরোধিতার সম্মুখীন হয়ে বিদেশী শক্তিগুলি তাদের সেনা ফিরিয়ে নেয়। প্রতিবিপ্লবী সেনাদল ১৯১১ খ্রীঃ পেট্রোগ্রাড শহরের কাছাকাছি এসে পড়ে। কিন্তু লালফৌজের প্রতিরোধ ও জনসমর্থনের অভাবে তারা পিছু হঠতে বাধ্য হয়। শেষ পর্যন্ত বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক সরকার পূর্ণ জয়লাভ করে। রুশভূমি শ্বেত রুশদের সন্ত্রাসমুক্ত হয়। বিপ্লবী রুশ সরকার প্রতিবিপ্লবীদের নিষ্ঠুর শাস্তি দেয়। গুপ্ত পুলিশ বা চেকার হাতে বহু লোক মারা পড়ে। বহু বুর্জোয়াপন্থী সাদা রুশ বিদেশে পালিয়ে প্রাণ বাঁচায়।

প্রতিবিপ্লব দমন

রাশিয়ায় বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত হলেও পোল্যান্ডের সঙ্গে রাশিয়ার যুদ্ধ চলতে থাকে। পোল জাতি দীর্ঘকাল ধরে রাশিয়ার অধীনে ছিল। এজন্য পোলদের মধ্যে রাশিয়ার প্রতি বৈরী মনোভাব দেখা দেয়। তারা বিপ্লবী রুশ সরকারকে ধ্বংস করার সঙ্কল্প নেয়। তাছাড়া পোল জাতির উদ্দেশ্য ছিল রাশিয়ার শস্যাগার ইউক্রেনের বৃহৎ অংশ অধিকার করা। ইউক্রেনবাসীরা রুশ জাতির অন্তর্ভূক্ত ছিল না। তাদের মধ্যে স্বতন্ত্রতার বীজ বুনে ইউক্রেনকে রাশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করার চক্রান্ত করা হয়। রাশিয়ার প্রতিবিপ্লবী সেনাপতি র‍্যাঙ্গেল (Wrangle) পোলদের সামরিক সহায়তা দিলে পোলদের শক্তি বাড়ে। ফরাসী সরকারও পোলদের পক্ষ নেয়।

পোল যুদ্ধ

(v) পোল যুদ্ধে লালফৌজ বিরাট সফলতা দেখায়। সেনাপতি তুখাচেভস্কীর নেতৃত্বে লালফৌজ পোলদের হঠিয়ে পোল্যান্ডের রাজধানী ওয়ারশর নিকট চলে আসে। তুখাচেভস্কীর লক্ষ্য ছিল ওয়ারশ অধিকার করে পোলদের নতি স্বীকারে বাধ্য করা। কিন্তু মিত্রশক্তি পোল্যান্ডকে বাঁচাবার জন্যে কার্জন লাইন বরাবর যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করলে রাশিয়া বাধ্য হয়ে তা মেনে নেয়। রিগার সন্ধির দ্বারা রুশ-পোল যুদ্ধের অবসান ঘটে। ইউক্রেনের কিছু অংশ পোল্যান্ডের হাতে চলে যায়। রাশিয়ার অপরদিকের সীমান্ত সুরক্ষিত করার জন্যে রুশ সরকার প্রতিবেশী পারস্য, বাল্টিক রাষ্ট্রগুলি, রুমানিয়া ও তুরস্কের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করে।

কার্জন লাইন গঠন

প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক

(vi) লেনিন বৈদেশিক সমস্যাগুলিকে দৃঢ় হাতে মোকাবিলার পর আভ্যন্তরীণ সংগঠনের দিকে দৃষ্টি দেন। ১৯১৭ খ্রীঃ নভেম্বর মাসে ক্ষমতা অধিগ্রহণের পর এই মাসের শেষদিকে সংবিধান সভা গঠনের জন্যে একটি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। রাশিয়ার পক্ষে যতটা সম্ভব ততটা অবাধ নির্বাচন হয়। প্রায় ৪২ মিলিয়ন ভোট পড়ে। তার মধ্যে মাত্র ১০ মিলিয়ন বলশেভিকরা পায়। প্রায় ২০ মিলিয়ন ভোট বিভিন্ন মধ্যপন্থী বিপ্লবীরা পায়। অর্থাৎ জনতা উগ্র সমাজতন্ত্রের বদলে একটি মধ্যপন্থী সমাজতন্ত্র চায়। এই সংবিধানসভা ২৪ ঘণ্টা চলার পর লেনিনের নির্দেশে তা ভেঙে দেওয়া হয়। ১৯১৮ খ্রীঃ জুলাই মাসে অন্য রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ হয়। কেবলমাত্র বলশেভিকদের দ্বারা সোভিয়েত গঠন করে শাসনকার্য চালান হয়। লেনিন বলেন যে এটা অস্থায়ী ব্যবস্থা। পরে স্থায়ী সংবিধান চালু করা হবে। ১৯১৮ খ্রীঃ এই অস্থায়ী সংবিধান, ১৯২৪ খ্রীঃ বাতিল করা হয়। ১৯২৪ খ্রীঃ রাশিয়ায় একটি স্থায়ী সংবিধান গৃহীত হয়। এই সংবিধানে (১) রাশিয়াকে সংযুক্ত সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র (United Soviet Socialist Republic or U.S.S.R) বলে ঘোষণা করা হয়। এই সংযুক্ত প্রজাতন্ত্রে নিম্নলিখিত অঙ্গরাজ্য ছিল যথা, (ক) ইউক্রেইন, (খ) শ্বেত রাশিয়া, (গ)

সংবিধান রচনা

ট্রান্স ককেশিয়া, (ঘ) তুর্কমেন, (ঙ) উজবেগ, (চ) তাজিক। ১৯৩৬ খ্রীঃ এই অঙ্গরাজ্যের সংখ্যা দাঁড়ায় ১১। (২) দেশের রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা ৪টি সংস্থার মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়, যথা, (ক) সোভিয়েতগুলি (খ) C.P.S.U. অথবা সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টি, (গ) গুপ্ত পুলিশ, (ঘ) সেনাদল। (৩) দেশের শাসন ক্ষমতা সোভিয়েতগুলির হাতে রাখা হয়। জনসাধারণ ও সরকারের মধ্যে যোগসূত্র হিসেবে সোভিয়েতগুলি কাজ করে।

(৪) সোভিয়েত গঠনের জন্যে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা স্থির করা হয়, যথা (ক) প্রতি গ্রামে একটি করে গ্রামসভা বা গ্রামবাসীদের দ্বারা সোভিয়েত গঠন করা হয়। গ্রামবাসীদের মধ্যে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটে গ্রাম সোভিয়েত গঠিত হয়। (খ) গ্রাম সোভিয়েতগুলির সদস্যরা আঞ্চলিক সোভিয়েতে সদস্যদের নির্বাচন করে। (গ) আঞ্চলিক সোভিয়েতগুলি প্রাদেশিক সোভিয়েতের সদস্যদের নির্বাচন করে। (ঘ) প্রাদেশিক সোভিয়েতগুলি প্রজাতন্ত্রের সোভিয়েত সদস্যদের নির্বাচন করে। প্রজাতন্ত্রের সোভিয়েতের সদস্যরা কেন্দ্রীয় সোভিয়েত বা সুপ্রীম বা সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সদস্যদের নির্বাচন করে। (৫) ইউনিয়ন সোভিয়েত বা সুপ্রীম সোভিয়েতের সদস্য সংখ্যা হয় ২ হাজার। (৬) প্রতি বছর অন্ততঃ এক সপ্তাহ সুপ্রীম সোভিয়েতের সদস্যদের অধিবেশন ডাকার ব্যবস্থা করা হয়। সুপ্রীম সোভিয়েতের সদস্যরা ৩০০ সদস্য যুক্ত কেন্দ্রীয় কার্য নির্বাহক সমিতির (Central Executive Committee) সদস্যদের নির্বাচন করে। এই ৩০০ সদস্যের কার্য নির্বাহক সমিতির সদস্যরা ১০ জন সদস্যের প্রেসিডিয়াম বা মন্ত্রীসভা গঠন করে। এই মন্ত্রীসভা বা কাউন্সিল অব পিপলস কমিশার দেশের শাসন কাজ চালাবার প্রত্যক্ষ দায়িত্ব পায়। (৭) স্বয়ং লেনিন ছিলেন এই মন্ত্রীসভার প্রধান। তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি এই পদে থাকেন।

সোভিয়েত গঠন

(৮) রুশ সংবিধানে সোভিয়েতগুলিই শাসনব্যবস্থার বৈধ-সংস্থা ছিল। কিন্তু কার্যতঃ C.P.S.U. বা রাশিয়ার কমিউনিষ্ট দলই ক্ষমতার আসল অধিকারী ছিল। রাশিয়ায় C.P.S.U. বা রুশ কমিউনিষ্ট দল ছাড়া অন্য কোন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব ছিল না। (৯) সোভিয়েতের গঠনের অনুসরণে রুশ কমিউনিষ্ট দলকে বিভিন্ন স্তরের মতই গঠন করা হয়। গ্রাম হতে জেলা, প্রদেশ স্তর পার হয়ে কেন্দ্রীয় স্তর পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে গঠন করা হয়। C.P.S.U বা কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয়কমিটিরসদস্য সংখ্যা ছিল ৩০০০। এই কেন্দ্রীয় কমিটি ছিল সুপ্রীম সোভিয়েতের মতই সর্বোচ্চ সংস্থা। কেন্দ্রীয় কমিটির ৩০০০ সদস্য পলিটব্যুরোর সদস্যদের নির্বাচন করত। এই পলিটব্যুরোর সদস্যরাই ছিলেন আসল ক্ষমতার মালিক। এঁরা যে নীতি নির্ধারণ করতেন তা সরকার কার্যকরী করত। পলিটব্যুরোর সম্পাদক ছিলেন খুবই ক্ষমতাশালী লোক। অনেক সময় দেখা যায় যে, সোভিয়েতের সর্বোচ্চ সংখ্যা প্রেসিডিয়াম এবং C.P.S.U-র সর্বোচ্চ সংস্থা পলিটব্যুরোর সদস্য পদ একই লোকগুলি দখল করে থাকত। ১৯৩৬ খ্রীঃ সোভিয়েত সংবিধানের সংশোধন করা হয়। রুশ সংবিধানে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রকে প্রলেটারিয়েটের একনায়কতন্ত্র Dictatorship of the Proletariate বলা হয়।

সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টি

(vii) লেনিন ১৯২১ খ্রীঃ নব অর্থনীতি প্রবর্তন করেন। একে নেপ (N. E. P. = New Economic Policy) বলা হয়। ১৯১৭ খ্রীঃ বলশেভিক বিপ্লবের পর উগ্র মার্কসবাদীরা রাশিয়ায় সকল প্রকার ব্যক্তিগত সম্পত্তির লোপ করে। এর ফলে কৃষি ও শিল্পে দারুণ মন্দা দেখা দেয়। কৃষকেরা চাইত যে, তাদের ক্ষেতের উদ্বৃত্ত ফসল বাজারে চড়া দামে বিক্রি করে তাদের নিজ নিজ সচ্ছলতা বাড়াবে। কিন্তু বলশেভিক সরকার দেখেন যে, খাদ্যশস্য চড়া দামে বিক্রি হলে কারখানা শ্রমিক ও শহরবাসী মধ্যবিত্ত চড়া দামে খাদ্যশস্য কিনতে পারবে না। এজন্য সরকার আইন করেন যে, কৃষকদের

অর্থনৈতিক সংকট

উদ্বৃত্ত ফসল নগদ টাকায় করের বদলে দিতে হবে। কৃষকদের ওপর এজন্য জবরদস্তি করা হয় এবং জোর করে বাড়তি ফসল আদায়ের চেষ্টা করা হয়। কৃষকেরা এর প্রতিবাদে তাদের খোরাকীর মত জমি চাষ করে, বাকি জমি অনাবাদী রাখে। ফলে ১৯২০-২১ খ্রীঃ রাশিয়ায় দারুণ খাদ্য সঙ্কট দেখা দেয়। ভলগা ও ডন উপত্যকায় ১৯২০ খ্রীঃ দারুণ অনাবৃষ্টি ঘটে। এজন্য শস্যহানি হয়। রাশিয়ায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে গম আমদানি করে অবস্থার মোকাবিলা করা হয়। বিখ্যাত লেখক ম্যাক্সিম গোর্কী রাশিয়ায় গম পাঠাবার জন্যে মার্কিন জনগণের নিকট আবেদন করলে তাতে ফল হয়। এমতাবস্থায় লেনিন বুঝতে পারেন যে, রুশ সরকারের ভূমিনীতি পরিবর্তন করা দরকার। কারণ শস্যক্ষেত্রে উৎপাদন ১৯১৩ খ্রীঃ সীমারেখা থেকে শতকরা ৫০ ভাগ নীচে নেমে যায়। কলকারখানাগুলি ব্যাপক রাষ্ট্রীকরণ ও শ্রমিকদের দ্বারা অধিগ্রহণেরও কুফল দেখা দেয়। ১৯২১ খ্রীঃ রাশিয়ার শিল্প উৎপাদন ছিল ১৯১৩ খ্রীঃ সীমারেখার মাত্র ১৫% ভাগ। ৮৫% শিল্প উৎপাদন কমে যায়। পরিবহন ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। রেল ইঞ্জিনের এবং মালগাড়ী বা ওয়াগনের অভাবে কাঁচামাল পরিবহন, খাদ্য পরিবহনে সঙ্কট দেখা দেয়।

এই অবস্থার প্রতিকারের জন্যে লেনিন ১৯২১ খ্রীঃ উগ্রপন্থী মার্কসবাদীদের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে তার বিখ্যাত নেপ (NEP) বা নব অর্থনীতি প্রবর্তন করেন। এই নীতিকে প্রাগমেটিক সাম্যবাদ বা প্রয়োজনভিত্তিক সাম্যবাদ বলা হয়। এর অর্থ এই ছিল যে, রাশিয়ার প্রয়োজন বুঝে সাম্যবাদী নীতি প্রয়োগ করা হয়। মার্কসবাদকে অক্ষরে অক্ষরে প্রয়োগ করা হবে না। এই নব অর্থনীতির ভিত্তি ছিল যে, (১) ক্ষুদ্র জমির মালিক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়া হবে। এই ব্যবস্থার পশ্চাতে যুক্তি দেখান হয় যে, এই ধরনের কৃষক বা ব্যবসায়ীরা কাহাকেও শোষণ করে না। যে সকল শিল্প কারখানায় ২০ জনের মত শ্রমিক বা কর্মী কাজ করত, সেগুলি তাদের মালিককে ফেরৎ দেওয়া হয়। (২) এর ফলে নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। (৩) অপর দিকে বৃহৎ শিল্পপতি, ব্যবসায়ী ও জমিদারদের অস্তিত্ব নিষিদ্ধ করে সমাজতন্ত্রকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। বড় বড় কলকারখানার রাষ্ট্রায়ত্তকরণ বহাল রাখা হয়। কার্যক্ষেত্রে ১০% বড় বড় শিল্প ও মূল শিল্প কারখানাগুলি রাষ্ট্রের অধীনে থাকে। ৯০% শিল্প কারখানার বেসরকারিকরণ করা হয়। কিন্তু সরকারি মালিকানাধীন ১০% শিল্প কারখানায় মোট শ্রমিকের ৮০% কাজ করত। বাকি ২০% বেসরকারি মালিকানার অধীনে থাকে। ক্ষুদ্র চাষীদের জমির মালিকানা দেওয়া হয়। ক্ষুদ্র চাষী ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের মালিকানা দিয়ে ধনতন্ত্রকেও আংশিক স্বীকার করা হয়। এই ব্যবস্থাকে মিশ্র অর্থনীতি বলা যায়। (৪) কৃষকরা তাদের ক্ষেতের উৎপন্ন ফসল বাজার দরে বিক্রয়ের সুযোগ পায়। চাষীদের বলা হয় যে, তারা নগদ টাকায় কর আদায় না দিয়ে ফসলের ভাগ দেবে। পরে পুরো নগদ টাকায় কর আদায় চালু করা হয়। (৫) খাদ্যের মূল্যমান যাতে না বাড়ে সেদিকে দৃষ্টি রাখা হয়। (৬) বিদেশ থেকে মূলধন এনে শিল্প গঠনের নীতি গ্রহণ করা হয়। (৭) গরীব কৃষকদের করভার থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। (৮) কুলাক বা স্বচ্ছল কৃষকদের জমির ওপর কর বাড়ান হয়। এভাবে লেনিন তাঁর শাসনকালে বলশেভিক বিপ্লবকে সংহত করেন।

নব অর্থনীতি N E P

লেনিনের সর্বশেষ কৃতিত্ব ছিল বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের নিকট বলশেভিক সরকারের স্বীকৃতি লাভ। লেনিনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী চিকেরিনের কূটনীতির ফলে, ১৯২৪ খ্রীঃ ইংলন্ড সর্বপ্রথম রাশিয়াকে স্বীকৃতি দেয়। এর পর ফ্রান্স, ইতালী প্রভৃতি দেশগুলি সোভিয়েত রাশিয়াকে স্বীকৃতি দেয়। মার্কিন দেশ বহু পরে রুশ সরকারকে স্বীকৃতি জানায়।

বলশেভিক সরকারের স্বীকৃতি লাভ

লেনিনের কৃতিত্ব (The Achievements of Lenin) ঃ রুশ বিপ্লবের প্রধান নায়ক লেনিনের আসল নাম ছিল ভলাডিমির ইলিচ উলিয়ানভ। কাজান প্রদেশের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে ১৮৭০ খ্রীঃ লেনিনের জন্ম হয়। লেনিনের পরিবারের একটি বিপ্লবী ঐতিহ্য ছিল। তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জন্যে ফাঁসীতে প্রাণ দেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু, লেনিনের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। তিনি জারতন্ত্রের পতন ঘটাতে প্রতিজ্ঞা নেন। লেনিন ছিলেন খুবই মেধাবী ছাত্র। তিনি কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে ডিগ্রী পান। কিন্তু চাকুরী বা ওকালতি করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। ছাত্রজীবন থেকে তিনি মার্কসবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং সোস্যাল ডেমোক্র্যাট দলে যোগ দেন। বিপ্লবী কাজের জন্যে তিনি পুলিশের নজরে পড়েন ও স্বদেশ থেকে নির্বাসিত হন। তিনি সুইজারল্যান্ডে নির্বাসনে দিন কাটাতে থাকেন। সুইজারল্যান্ড থেকে তিনি গোপনে স্বদেশের সোস্যাল ডেমোক্র্যাট দলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন।

বিপ্লবী দলে যোগদান

বিদেশে নির্বাসনে থাকার সময়, রাশিয়ায় কিভাবে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায়, এজন্য লেনিন নিরন্তর চিন্তা করতেন। তিনি ইস্‌কারা পত্রিকায় বহু প্রবন্ধের দ্বারা রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের সঠিক পথ সম্পর্কে আলোচনা করেন। লেনিন বিশ্বাস করতেন যে, রাশিয়ায় পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে না। ইওরোপের বিভিন্ন দেশে ভ্রমণের ফলে তাঁর এই ধারণা জন্মায়। পশ্চিম ইওরোপের বিভিন্ন দেশ অপেক্ষা রাশিয়ার সমাজ পিছিয়ে ছিল। বহুদলীয় গণতন্ত্র রাশিয়ার পক্ষে উপযোগী নয় বলে তিনি মনে করতেন। তাছাড়া রুশ শ্রমিকদের শ্রেণী সংগ্রামের পথে মার্কসীয় তত্ত্ব অনুযায়ী অধিকার আদায়ের কথা তিনি ভাবতেন। এজন্য রুশী শ্রমিকদের মধ্যে মার্কসীয় তত্ত্ব প্রচার দ্বারা তাদের শ্রেণী চেতনা জাগরণের ওপর তিনি জোর দেন। শ্রমিকরাই হল বিপ্লবের হাতিয়ার। একমাত্র সর্বহারা শ্রমিকরাই বিপ্লব আনতে সক্ষম, একথা তিনি বিশ্বাস করতেন।

শ্রমিক বিপ্লবের আদর্শ

লেনিন অলস চিন্তাবিদ ছিলেন না। আদর্শকে কাজে রূপায়ণের ক্ষমতা তাঁর ছিল। তাঁর বাস্তবজ্ঞান ছিল খুবই প্রখর। তিনি কঠোর পরিশ্রম করতে পারতেন। নিজের বক্তব্যকে তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে বোঝাতে পারতেন। রাশিয়ায় বিপ্লব সফল হবে এবং শেষ পর্যন্ত শ্রমিকের জয় হবে বলে তিনি দৃঢ় বিশ্বাস করতেন।

বাস্তবজ্ঞান

১৯১৭ খ্রীঃ মার্চে বিপ্লবের পর, সোস্যাল ডেমোক্র্যাট দল যখন দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছিল এবং ভবিষ্যত কর্মপন্থা সম্পর্কে অনিশ্চিত ছিল, সেই সঙ্কট সময়ে লেনিন নির্বাসন থেকে স্বদেশে ফিরে আসেন। জার্মানীর কাইজার সরকার মনে করে যে, লেনিন স্বদেশে ফিরে কেরেনেস্কি সরকারের বিরোধিতা করবেন। তার ফলে জার্মানীর বিরুদ্ধে কেরেনেস্কি প্রজাতন্ত্রের যুদ্ধ প্রচেষ্টা বিড়ম্বিত হবে। এজন্য কাইজার সরকার তাঁকে স্বদেশে ফিরতে সাহায্য করে।

নির্বাসন হইতে মুক্তি

লেনিন রাশিয়ায় ফিরে এসে এপ্রিল থিসিস ঘোষণা করেন। তিনি সোস্যাল ডেমোক্র্যাটকে পরামর্শ দেন যে, অস্থায়ী প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে যেন কোন সহযোগিতা না করা হয়। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে, রাশিয়ায় বুর্জোয়া বিপ্লব সম্পূর্ণ হয়নি বলে বসে থাকলে চলবে না। বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রকে উচ্ছেদ করে শ্রমিকদের দ্বারা, শ্রমিকের স্বার্থে সরকারী ক্ষমতা দখল করতে হবে। ইতিহাস যে সুযোগ এনে দিয়েছে, তার সদ্ব্যবহার না করলে এই সুযোগ আর আসবে না। বুর্জোয়া সরকার এখনও তার শিকড় বিস্তার করতে পারেনি। একে ধ্বংস করার এটাই উপযুক্ত সময় আর দেরী করা উচিত নয়। লেনিনের ডাকে সংখ্যাগরিষ্ঠ কমিউনিষ্টরা সাড়া দেয়। তিনি ইস্‌কারা পত্রিকায়—"কি করতে হবে" শিরোনামায় এক প্রবন্ধে বিপ্লবের পন্থা সম্পর্কে জানিয়ে

দেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, এই যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থ রক্ষার জন্যে চলছে। বলশেভিক দল এই যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে সমর্থন করবে না।লেনিন বলেন যে, ১৯১৭ খ্রীঃ মার্চ বিপ্লবে জারতন্ত্রের পতন বুর্জোয়ারা ঘটায়নি। কমিউনিষ্ট শ্রমিক সংগঠনের লাগাতার ধর্মঘটের ফলে জার সরকারের পতন ঘটে। সুতরাং ন্যায্যভাবে জারের পতনের পর বলশেভিকদেরই ক্ষমতা পাওয়া উচিত। মাঝখান থেকে বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র ক্ষমতা গ্রহণ করে শ্রমিক ও বলশেভিকদের প্রতারণা করেছে। তিনি মেনশেভিকদের "এখনই শ্রমিক বিপ্লবের সময় নয়" এই আপত্তিকে ফুৎকারে উড়িয়ে দেন। তিনি তাঁদের পুঁথিপড়া কমিউনিষ্ট বলে বিদ্রূপ করেন।

"রুটি, জমি ও শান্তি" এই তিন ধ্বনি নিয়ে লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিকরা নভেম্বর বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়ে।শিকড়বিহীন অস্থায়ী প্রজাতন্ত্রের পতন ঘটে। বিপ্লব জয়যুক্ত হয়। লেনিন বিপ্লবী সরকারের প্রধান হন। নব গঠিত সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রের সম্মুখে যে অসংখ্য সমস্যা দেখা দেয়, নবগঠিত রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার জন্যে যে বিদেশী আক্রমণ আরম্ভ হয়, লেনিন তা পরাস্ত করে রুশ সমাজতন্ত্রকে জয়যুক্ত করেন। তাঁর কূটনীতি জ্ঞান এবং সঠিক পরিচালনার ফলে রুশ প্রজাতন্ত্র মহাবিপদের হাত থেকে রক্ষা পায়।

রুটি, জমি ও শান্তি-দানের প্রস্তাব

চরমপন্থী কমিউনিষ্টদের কাজের ফলে রাশিয়ায় খাদ্য, শিল্প ও অর্থনীতিতে সঙ্কট দেখা দিলে লেনিন পুঁথিগত কমিউনিজম ছেড়ে নব অর্থনীতি বা N. E. P. গ্রহণ করেন। এই নেপ বা নব অর্থনীতি ছিল তাঁর বাস্তবজ্ঞান ও দূরদর্শিতার পরিচায়ক। N. E. P. প্রবর্তনের ফলে ছোট চাষী ও ছোট ব্যবসায়ীরা বিপ্লবী সরকারকে আনুগত্য জানায়। লেনিন তাঁর নব অর্থনীতি দ্বারা মূলতঃ মার্কসবাদকে অক্ষুণ্ণ রাখেন। রাশিয়ার বাস্তব অবস্থা বুঝে তাঁকে সামান্য কিছু আপোষ করতে হয়। এজন্য লেনিনের নীতিকে মার্কসবাদ ও লেনিনবাদ বলা হয়।

নব অর্থনীতি

ইওরোপের ধনতন্ত্রী দেশগুলির সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে শত্রুতার কথা লেনিন ভাল রকম জানতেন। এজন্য তিনি তাদের সঙ্গে যে কোন মূল্যে আপোষের চেষ্টা না করে বিদেশী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে রাশিয়ার নিজ মর্যাদা অব্যাহত রাখেন। এর আগে তিনি জার্মানীর সঙ্গে শান্তি স্থাপন করে ব্রেষ্টলিটভস্কের সন্ধি স্বাক্ষর করেন। এই সন্ধি বহু ক্ষতি স্বীকার করে রাশিয়া ক্রয় করে। কিন্তু ইঙ্গ-ফরাসী শক্তি তাদের সঙ্গে পরামর্শ না করে জার্মানীর সঙ্গে একতরফা সন্ধি স্থাপনের জন্যে কুপিত হয়। প্যারিসের শান্তি বৈঠকে রাশিয়াকে আহ্বান না করে ভার্সাই সন্ধি স্বাক্ষরের ফলে পূর্ব ইওরোপে রুশ সীমান্ত রাশিয়ার মতামত ছাড়াই গঠন করা হয়। এজন্য লেনিন ভার্সাই সন্ধিকে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত বলে অভিহিত করেন। পশ্চিম ইওরোপীয় দেশগুলি নবগঠিত সোভিয়েত সরকারকে স্বীকৃতি না দিলে, লেনিন হতাশ হননি। তিনি এই বয়কটের প্রতিবাদে জার্মানীর সঙ্গে র‍্যাপালোর সন্ধি স্বাক্ষর করেন। এই সন্ধি পশ্চিমী দেশগুলিকে হতবুদ্ধি করে। শেষ পর্যন্ত সোভিয়েত সরকার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেন। ১৯২৪ খ্রীঃ এই মহানায়কের যখন জীবনদীপ নিভে যায় তখন সোভিয়েত রাশিয়া বিশ্বে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের পিতৃভূমি হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

ভার্সাই সন্ধির বিরোধিতা

লেনিনের রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিভা, সংগঠন শক্তি, লক্ষ্য স্থির করার পর তা কার্যে পরিণত করার ক্ষমতা সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। পশ্চিম ইওরোপের আরাম কেদারাশায়ী বুর্জোয়া রাজনীতিবিদ তিনি ছিলেন না। বহু ঝড় ঝাপটার মধ্য দিয়ে তিনি সমাজতান্ত্রিক রুশরাষ্ট্রের পত্তন করেন। যদিও সাম্যবাদীরা ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকাকে তাঁদের মতবাদ অনুযায়ী গুরুত্ব দেন না; লেনিনের ক্ষেত্রে তাঁরাও শ্রদ্ধানত শিরে তাঁর কৃতিত্ব স্বীকার করেন। মার্কসীয় বিমূর্ত তত্ত্বকে রাশিয়ার জীবনধারার উপযোগী করে তার Pragmative বা বাস্তব এবং সুযোগমত প্রয়োগের দ্বারা তিনি ফলিত সাম্যবাদের নতুন পথ বিশ্বকে দেখান। জে· এন· ওয়েস্টউড (J. N.

Westwood) তাঁর রাশিয়ার ইতিহাসে বলেছেন যে, "প্রখর রাজনৈতিক জ্ঞানের সাহায্যে, লেনিন মার্কসীয় তত্ত্বকে রাশিয়ার উপযোগী করে প্রয়োগ করেন। তাঁর নির্মম ও দৃঢ় ইচ্ছার প্রয়োগে তিনি কমিউনিষ্ট রাশিয়া নামক রাষ্ট্রকে গঠন করেন। বলশেভিক নেতাদের মধ্যে লেনিনই ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি তাঁর ভুল স্বীকার করার সততা ও সাহস দেখাতেন এবং ভুল স্বীকারের পর নীতি পরিবর্তন করার সাহস দেখাতেন" (ব্যক্তিগত জীবনে লেনিনের চরিত্র ছিল বৈচিত্র্যহীন, আনন্দময় হাস্য-পরিহাসহীন, নিঃসঙ্গ কিন্তু বুদ্ধিদীপ্ত)

লেনিনের চিন্তাধারার সফলতা স্বীকার করেও বলা যায় যে, ট্রটস্কি, ষ্ট্যালিন প্রভৃতি নিবেদিতপ্রাণ যোগ্য সহকর্মীর সহায়তা ছাড়া তিনি এতটা সফল হতেন কিনা তা অনেকে সন্দেহ করেন। গৃহযুদ্ধের সময় ষ্ট্যালিনের চেকা ও ট্রটস্কির লাল ফৌজ গঠিত না হলে তাঁর আদর্শের বাস্তবায়নের সুযোগ কমে যেত। দ্বিতীয়তঃ, ১৯১৭ খ্রীঃ জুলাই বিদ্রোহে বলশেভিকরা হঠকারিতা দেখায়। তার ফলে স্বয়ং লেনিনকে রাশিয়া ছেড়ে ফিনল্যান্ডে আশ্রয় নিতে হয়। প্রজাতন্ত্রী সরকারের বাস্তব জ্ঞানের অভাব, যুদ্ধ পরিচালনার জন্যে জেদ তাদের জনপ্রিয়তা হ্রাস করে। লেনিন তার সুযোগ নেন। উদারতন্ত্রী সমালোচকদের মতে, লেনিন পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন না এটা দুঃখের। তিনি ১৯১৭ খ্রীঃ সাধারণ নির্বাচন দ্বারা যে সংবিধান সভা গঠন করেন তাতে বলশেভিকরা সংখ্যালঘু হলে তিনি সেই সংবিধান সভা ভেঙে দেন। তিনি একদলীয় শাসনে বিশ্বাস করতেন। সংসদীয় গণতন্ত্রে অন্য দলের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগ করে নিতে তিনি রাজী ছিলেন না। এপ্রিল থিসিস সম্পর্কে ট্রটস্কীর প্রতিবাদ তিনি অগ্রাহ্য করেন। মেনশেভিকদের মতামতকে তিনি গ্রাহ্য করেননি। তাঁর মধ্যে এদিক থেকে ডিক্টেটরী প্রবণতা কোন কোন সমালোচক দেখেন। লেনিন অবশ্য বলেন যে, তিনি যদি ডিক্টেটরীতে বিশ্বাস করেন তা হবে সর্ববাদী বা প্রলিতারীয়দের ডিক্টেটরী প্রথা। তিনি রাশিয়াকে সমাজতন্ত্রের ছাঁচে ঢালাই করতে চান এবং তাতে সফল হন।

লেনিনের পর সোভিয়েত সরকারের আভ্যন্তরীণ সংগঠন ঃ ষ্ট্যালিনের শাসন নীতি (The internal organisation of Soviet Union after Lenin ঃ The administration under Stalin)ঃ ১৯২৪ খ্রীঃ লেনিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্ব নিয়ে লেনিনের দুই সহকর্মী ষ্ট্যালিন ও ট্রটস্কীর মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। স্ট্যালিন ছিলেন স্বরাষ্ট্র বিভাগ ও পুলিশ বিভাগের কর্তা এবং C P S U বা রুশ কমিউনিষ্ট দলের সম্পাদক। ট্রটস্কী ছিলেন সমর দপ্তরের কর্তা। ১৮৭৯ খ্রীঃ জার্জিয়া প্রদেশে এক দরিদ্র চর্মকারের গৃহে ষ্ট্যালিনের জন্ম হয়। ষ্ট্যালিন ছিলেন বলশেভিক দলের সেরা নেতাদের অন্যতম যিনি কৃষক শ্রেণী থেকে এসে দলের কর্মী হিসেবে উচ্চতম পদে আসেন। লেনিনের মত তিনি উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন না। এক গীর্জা বিদ্যালয়ে তিনি তাঁর ছাত্রজীবন কাটান। তিনি প্রথম হতে রুশ কমিউনিষ্ট দলের অত্যন্ত সক্রিয় ও সাহসী সদস্য ছিলেন। ১৯০৭—১৯১৭ খ্রীঃ মধ্যে তিনি ৭ বছর জেলেই কাটান। জেলে থাকার সময় তিনি নিজে প্রচুর পড়াশোনা করে সুশিক্ষিত হন। ১৯১৭ খ্রীঃ তিনি বলশেভিক দলের উচ্চ পদে ছিলেন এবং প্রাভদা পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ১৯১৭ খ্রীঃ বলশেভিক বিপ্লবে তাঁর বিশেষ ভূমিকা ছিল। ১৯১৭ খ্রীঃ নভেম্বর বিপ্লবের পর তিনি লেনিনের বিশ্বস্ত সহকর্মী এবং বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদ অধিকার করেন। গৃহযুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন স্বশস্ত্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত এবং গুপ্ত পুলিশ বা চেকার সংগঠক। লেনিনের মৃত্যুর আগে ষ্ট্যালিন ছিলেন C. P. S.U.-এর সম্পাদক। কাজেই সরকারি প্রশাসন যন্ত্র এবং দলীয় আমলাদের ওপর ষ্ট্যালিনের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিল। অপর দিকে ট্রটস্কী ছিলেন তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী। তিনি ছিলেন গোঁড়া বিপ্লবী। আপোষনীতিকে তিনি ঘৃণা করতেন। রুশ বিপ্লবে

ষ্ট্যালিন ও ট্রটস্কীর তুলনা

ট্রটস্কীরও বিশেষ অবদান ছিল। তিনিই লাল ফৌজ গঠন করে প্রতিবিপ্লবীদের দমন করেন। পদাধিকার বলে তিনি ছিলেন যুদ্ধ মন্ত্রী।

১৯২৪ খ্রীঃ ষ্ট্যালিন ও ট্রটস্কীর বিরোধ চরমে ওঠে। উভয়ের মধ্যে ব্যক্তিত্বের সংঘাত ছিল। এর সঙ্গে আদর্শের সংঘাত যুক্ত হয়। (১) ট্রটস্কী বলেন যে, কেবলমাত্র রুশদেশে সমাজতন্ত্রী বিপ্লব সফল হলেও তা স্থায়ী হবে না। ধনতন্ত্রী দেশগুলি এই বিপ্লবকে ধ্বংস করে ফেলবে। (২) সমাজতন্ত্রের সঙ্গে ধনতন্ত্রের খাদ্য-খাদক সম্পর্ক। উভয়ের মধ্যে সহাবস্থান অসম্ভব। (৩) সুতরাং সোভিয়েত রাশিয়ার উচিত অবিলম্বে বিশ্ববিপ্লবের জন্যে আত্মনিয়োগ করা। এজন্য অন্য দেশের শ্রমিকদের বিপ্লবের ডাক দেওয়া দরকার এবং বিপ্লবের জন্যে তাদের সাহায্য করা দরকার। (৪) ধনতন্ত্রী দেশের অর্থনৈতিক সাহায্য নিয়ে রাশিয়ায় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা চালু করা হল মার্কসবাদের বিচ্যুতি। (৫) সোভিয়েত সরকারের আসল কাজ হল বিশ্বের অন্যান্য দেশে পুঁজিবাদ বা ব্যক্তিগত মূলধনকে ধ্বংস করা। তিনি বিশ্ব বিপ্লব এবং স্থায়ী বিপ্লবের (Permanent Revolution) কথা বলেন।

ট্রটস্কীর বিশ্ববিপ্লববাদ

ট্রটস্কীর বক্তব্যের প্রতিবাদে একটি রাষ্ট্রে সাম্যবাদের বিকাশ সম্ভব (Communism in a single state) এই মর্মে ষ্ট্যালিন একটি থিসিস রচনা করেন। ষ্ট্যালিন বলেন যে, (১) সোভিয়েত রাষ্ট্রের আপাততঃ দরকার হল আভ্যন্তরীণ সংগঠন। এই সংগঠন এখন না করলে সোভিয়েত বিপ্লবের ক্ষতি হবে। (২) সোভিয়েত রাশিয়ার আপাততঃ বিশ্ব বিপ্লবের কথা ভাববার দরকার নেই। আপাততঃ রাশিয়াকে শক্তিশালী করে তোলা দরকার। (৩) এজন্য পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ওপর জোর দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। (৪) পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাফল্যের জন্যে রাশিয়ার বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন। বিশ্ব-বিপ্লবের কথা ভাবলে এই সাহায্য পাওয়া যাবে না। (৫) যদি সোভিয়েত রাশিয়ার সমাজতন্ত্র শক্তিশালী হতে পারে, তবে ভবিষ্যতে রাশিয়া বিশ্ব বিপ্লবের পিতৃভূমি হিসেবে বিদ্যমান থাকবে।[১]

স্টালিনের এক রাষ্ট্রে সাম্যবাদ

জিনোভিয়েভ, কামানেভ প্রভৃতি প্রভাবশালী নেতাদের সাহায্যে ষ্ট্যালিন ট্রটস্কীপন্থীদের রুশ কমিউনিষ্ট দল থেকে বহিষ্কার করেন। ট্রটস্কী সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে বহিষ্কৃত হন। তিনি মেক্সিকোতে আশ্রয় নেন। শেষ পর্যন্ত গুপ্তঘাতকের হাতে মেক্সিকোয় তাঁর মৃত্যু হয়। দল ও প্রশাসন যন্ত্রের ওপর ষ্ট্যালিনের নিয়ন্ত্রণ থাকার ফলে ট্রটস্কি তাঁর সঙ্গে এঁটে উঠতে পারেননি। ট্রটস্কিপন্থীদের দমনের পর ষ্ট্যালিন পলিটবুরোর প্রভাবশালী সদস্যদের বহিষ্কার করে তাঁর একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কাছে হাত দেন। জিনোভিয়েভ, কামানেভ ও বুখারিন প্রভৃতি প্রভাবশালী নেতাদের পলিটবুরো থেকে বহিষ্কার করে ষ্ট্যালিন তাঁর একনায়কতন্ত্র স্থাপন করেন। এই বহিষ্কার দ্বারা তিনি দলে অপ্রতিহত ক্ষমতা পান। ষ্ট্যালিন তাঁর মৃত্যুকাল (১৯৫৩ খ্রীঃ) পর্যন্ত এই চূড়ান্ত ক্ষমতা ভোগ করেন।

ষ্ট্যালিনের জয় : বিরোধী শক্তি দমন

ষ্ট্যালিনের লক্ষ্য ছিল সোভিয়েত রাশিয়াকে নিজ আদর্শ অনুযায়ী সংগঠন করা। তিনি এজন্য পলিটবুরো থেকে বিরোধী সদস্যদের বহিষ্কার করেন। ১৯২৬ খ্রীঃ যখন ষ্ট্যালিনীয় স্বৈরতন্ত্র স্থাপিত হয়, তখন রুশ শিল্প ও কৃষি উৎপাদন প্রাক-যুদ্ধকালীন সীমায় পৌঁছে যায়। এর থেকে বেশী উৎপাদন করতে হলে কারখানা ও যন্ত্রপাতির আধুনিকীকরণের দরকার হয়। ষ্ট্যালিন ১৯৩১ খ্রীঃ এজন্য মন্তব্য করেন যে, "উন্নত দেশগুলি অপেক্ষা আমরা ৫০ বছর পিছিয়ে আছি"। এজন্য তিনি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার

ষ্ট্যালিনের একনায়কতন্ত্র

১· Vide Lipson—Europe in the 19th and 20th Centuries.

মাধ্যমে রাশিয়ার বৈষয়িক উন্নতির কাজে হাত দেন। ষ্ট্যালিন ছিলেন ইস্পাতের মতই কঠোর। স্বদেশের জন্যে যা দরকার বলে তিনি মনে করতেন, দৃঢ় হাতে তিনি তাই করতেন। বহু ইওরোপীয় লেখক এজন্য ষ্ট্যালিনকে লৌহহৃদয় ডিক্টেটর বলে অভিহিত করেছেন। আইজাক ডায়েটশারের[১] মতে, ব্যক্তিগত জীবনে ষ্ট্যালিন ছিলেন অনুভূতিপ্রবণ। পরিবারের সকলকেই তিনি ভালবাসতেন। তাঁর অনুগত সহকারীদের তিনি স্নেহ করতেন। কিন্তু কোন নীতি গ্রহণ করে তা কাজে পরিণত করার সময় তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর। এক্ষেত্রে তিনি আপোষ করতেন না।

আধুনিক শিল্প গঠন

ষ্ট্যালিন রাশিয়ায় আধুনিক বৃহৎ ও মৌলিক শিল্প কারখানা গড়ার পরিকল্পনা করেন। এই নব শিল্পায়নের জন্যে মূলধন যোগাড় করতে, তিনি বিদেশে কৃষিপণ্য রপ্তানি দ্বারা তা সংগ্রহ করার লক্ষ্য নেন। কৃষিদ্রব্য রপ্তানি করার জন্যে রাশিয়ায় আধুনিক যান্ত্রিক কৃষি উৎপাদন ও বৃহৎ খামার গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সাবেকী ধরনের চাষবাস দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল না। এজন্য ষ্ট্যালিন যৌথ খামার বা কোলখোজ গঠনের সিদ্ধান্ত নেন। রাশিয়ার ২৫ মিলিয়ন কৃষি জমি মালিকের জমিকে তিনি কোলখোজ বা যৌথ খামারে পরিণত করার লক্ষ্য নেন। এই যৌথ খামারে ট্রাক্টর দ্বারা চাষ, বৈজ্ঞানিক প্রথায় বীজবপন ও সার প্রদান দ্বারা কৃষি বিপ্লব তিনি ঘটাতে চান। এর ফলে উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য বিদেশে রপ্তানি করে আধুনিক শিল্পের যন্ত্রাংশ ও কাঁচামাল যোগাড় তিনি করতে চান। যান্ত্রিক কৃষির ফলে কৃষি শ্রমিকের চাহিদা কমলে, সেই বাড়তি শ্রমিকদের কল-কারখানার কাজে নিয়োজিত করার কথা ভাবা হয়। যান্ত্রিক কৃষির ফলে খাদ্যশস্যের উৎপাদন খরচা কম হবে। তার ফলে খাদ্যশস্যের দাম কমলে, কলকারখানার শ্রমিকদের মজুরী হ্রাস করা যাবে। আদর্শগত দিক থেকে কোলখোজ গঠনের ফলে কৃষি উৎপাদনের ওপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ বাড়বে, এবং তা সমাজতন্ত্রকে জোরদার করবে। জমির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা সঙ্কুচিত হবে। সমাজে শ্রেণী বিভেদ হ্রাস পাবে।

যৌথ খামার প্রতিষ্ঠা

যৌথ খামার পরিকল্পনা রূপায়িত করা সহজ কাজ ছিল না। ১৯২৮-৩০ খ্রীঃ পর্যন্ত ২০টি করে ছোট খামারকে যৌথ করার চেষ্টা চালান হয়। এই পরিকল্পনা সফল হলে ক্ষুদ্র কৃষকের ছোট ছোট জমি ছাড়া আর সকল প্রকার কৃষি খামারগুলিকে কোলখোজে পরিণত করার কাজ হাতে নেওয়া হয়। কোলখোজে গৃহীত জমিতে ভুতপূর্ব মালিকরা যৌথ মালিকানা পায়। তারা এই খামারে যেমন নিজের জমিতে আগে কাজ করত সেভাবে কাজ করতে থাকে এবং কাজের সময় অনুযায়ী পারিশ্রমিক পায়। যৌথ খামার পরিচালনার জন্যে সরকার থেকে দলীয় ব্যক্তিদের ম্যানেজার নিয়োগ করা হয়। কোলখোজের উৎপাদিত ফসল কম দামে বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়।

কোলখোজে নিজ নিজ ব্যক্তিগত জমি ছেড়ে দিতে ছোট কৃষকরা ছাড়া প্রধানতঃ 'কুলাক' বা সম্পন্ন বড় কৃষকরা (জোতদারগণ) তীব্র বাধা দেয়। ক্রুদ্ধ ষ্ট্যালিন আদেশ দেন যে, "কুলাকদের ধ্বংস করা হোক"। O. G. P. U নামে এক গুপ্ত বাহিনীকে কুলাকদের ওপর লেলিয়ে দেওয়া হয়। প্রখ্যাত রুশ বিশেষজ্ঞ আইজ্যাক ডয়েৎসারের মতে, "শেষ পর্যন্ত যৌথ খামারকরণ প্রক্রিয়া এক সামরিক তাণ্ডবে পরিণত হয়"। গৃহযুদ্ধের রক্ত স্নানে হাজার হাজার কুলাক পরিবার লাল ফৌজের বুলেটে প্রাণ দেয়; অনেকে সাইবেরীয়ার বন্দী শিবিরে আজীবন শ্রমিকের কাজ করতে বাধ্য হয়। ক্রুদ্ধ কুলাক (জোতদারগণ) তাদের চাষের গরু, ঘোড়াকে মেরে ফেলে, চাষের যন্ত্রপাতি ভেঙে ফেলে, ক্ষেতের ফসল জ্বালিয়ে দেয়। বিদ্রোহী কুলাক ও কৃষকদের শায়েস্তা

১· Iassac Deutscher—Stalin.

করার জন্যে বিদ্রোহী গ্রামগুলিকে সেনাদল ঘিরে ফেলে মেশিনগান চালালে, কৃষকরা আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়। কুলাক ও কৃষকদের জমিগুলি কোলখোজে পরিণত করা হয়।[১] ১৯৩৭ খ্রীঃ নাগাদ ৯৯% কৃষি খামারগুলি কোলখোজে পরিণত হয়।

ষ্ট্যালিন রুশ শিল্পের প্রসার ও আধুনিকীকরণের পরিকল্পনা রচনা করেন। শিল্প বিস্তারের অঙ্গ হিসেবে তিনি কারিগরী ও সাধারণ শিক্ষা বিস্তারের ওপরও জোর দেন। এজন্য তিনি কয়েকটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা চালু করেন। পার্টি কর্মীদের তিনি প্রচার পুস্তিকা বিতরণ, জনমত গঠন এবং শ্রমিকদের উৎসাহিত করার দায়িত্ব দেন। যে সকল শ্রমিক বা শ্রমিকনেতা তাঁর পরিকল্পনার বিরোধিতা করে তাদের শাস্তি দেওয়া হয়। ১৯২৮-৩২ খ্রীঃ প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কয়লা, লোহা, ইস্পাত, বিদ্যুৎ: তৈল ও যন্ত্রপাতি প্রভৃতি ভারী শিল্প গঠনের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। ১৯৩২-৩৭ খ্রীঃ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেও একই নীতি বহাল রাখা হয়। বিদেশ থেকে উন্নত কারিগরী ও যন্ত্র আনা হয়। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ১৯৩৭-৪১ খ্রীঃ ভোগ্যপণ্যের উৎপাদনের কথা ভাবা হলেও, বিশ্বযুদ্ধের দরুন অস্ত্র নির্মাণ ও ভারী শিল্পের দিকেই ঝোঁক দিতে হয়। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল যে, বিশেষ পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ দ্বারা প্রতি শিল্পের গঠনে লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়। প্রতি কারখানা থেকে কত উৎপাদন করতে হবে তার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়। লক্ষ্যমাত্রা পূরণ না হলে কারখানা ম্যানেজার ও সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করা হয়। পরিকল্পনার কোন পরিবর্তন করা ছিল বে-আইনী কাজ। কয়লা, তৈল এবং পরিবহণ শিল্পের উন্নয়নে বিশেষ জোর দেওয়া হয়। রাস্তাঘাট তৈরি, ক্যানাল খনন প্রভৃতি কাজকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

এর ফলে শিল্প উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। কৃষি-প্রধান রাশিয়া একটি শিল্প-প্রধান দেশে পরিণত হয়। বিদ্যুৎ, রেলইঞ্জিন, ট্রাক্টর, রেলপথ, লোহা, ইস্পাত, কয়লা প্রভৃতির উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।

শিক্ষা-সংস্কার

শিক্ষা-সংস্কৃতির বিস্তারেও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় জোর দেওয়া হয়। রাশিয়ায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হয়। কারিগরী বিদ্যা ও বিজ্ঞান শিক্ষার ওপর জোর দেওয়া হয়। ছাত্রদের মার্কসবাদী দর্শনের মূল বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণের মন থেকে পুঁজিবাদী মনোবৃত্তি দূর করা। ধর্মনিরপেক্ষতাকে গ্রহণ করা হয়। গীর্জার প্রাধান্য নাশ করা হয়। গীর্জার সম্পত্তি রাষ্ট্রীয়করণ করা হয়। রাশিয়ায় নিরক্ষরতা দূর হয়। বেকার সমস্যা লোপ পায়। কারিগরী শিক্ষার বিরাট প্রসার ঘটে। ভারী শিল্পে সোভিয়েত রাশিয়া প্রায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমকক্ষ হয়। খাদ্য উৎপাদন দারুণ বাড়ে। সামরিক অস্ত্র-শস্ত্র নির্মাণে সোভিয়েত ইউনিয়ন স্বয়ম্ভর হয়। মোট কথা, বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তি হিসেবে সোভিয়েত দেশ আত্মপ্রকাশ করে। সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন করে ব্যক্তিগত মালিকানা লোপ করে দেশের সর্বসাধারণের মধ্যে সুবিধা ভাগ করে ষ্ট্যালিন রাষ্ট্র পরিচালনার এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। জারতন্ত্রের অনগ্রসরতার যুগ অতীত ইতিহাসে পরিণত হয়। ষ্ট্যালিনীয় শাসনকালের অপর একটি দিক ছিল প্রখ্যাত নেতাদের বহিষ্কার অথবা মৃত্যুদণ্ড দ্বারা ষ্ট্যালিনীয় ডিক্টেটরশিপের নিরঙ্কুশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা। ষ্ট্যালিন বনাম ট্রটস্কী পন্থীদের দ্বন্দ্ব এবং ট্রটস্কী ও তাঁর সমর্থকদের উৎখাতের কাজ সমাধা করে ষ্ট্যালিন ক্ষান্ত হননি। পলিটবুরো অথবা সুপ্রীম সোভিয়েত, অথবা সামরিক বিভাগের কোন ক্ষেত্রে তিনি তাঁর বিরুদ্ধ প্রতিবাদীদের তিষ্ঠাতে দেননি। ১৯৩৬-৩৮ খ্রীঃ মধ্যে তিনি প্রখ্যাত বলশেভিক নেতাগণ কামানেভ, জিনোভিয়েভ প্রভৃতির তথাকথিত বিচার অনুষ্ঠান দ্বারা দোষ স্বীকারের

১· I. Deutscher—Stalin.

স্বীকৃতি আদায় করেন। ষ্ট্যালিনের বিশ্বস্ত ভিসিনিস্কি এই সকল বিচারকার্যে অভিযোগ পরিচালনা করেন। পলিটবুরোর অধিকাংশ সদস্যের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। ১৯৩৪ খ্রীঃ কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় সমিতির ১৩৯ সদস্যের প্রায় ৯০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। বেশীর ভাগ সন্দেহভাজন সদস্যের মৃত্যুদণ্ড হয়। রাশিয়ার ১৫ জন সেনাপতি বা ফিল্ড মার্শালের মধ্যে ১৩ জন বন্দী হয়ে পদচ্যুত ও দণ্ডপ্রাপ্ত হন। বহু সহস্র রুশ বুদ্ধিজীবি, অধ্যাপক, ছাত্র, সাহিত্যিক কারারুদ্ধ বা নির্বাসিত হন। প্রত্যেকের কাছ থেকে দোষের স্বীকারোক্তি আদায় করা হয়। এই Parge বা বহিষ্কারের সম্ভাব্য কারণ হিসেবে ষ্ট্যালিনের বিরুদ্ধে সমালোচনার কণ্ঠরোধ ও তাঁর নিরঙ্কুশ একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার আকাঙ্খা ছিল। অথবা এটি তাঁর স্বৈরাচারী মনোবৃত্তির পরিচয় বলেও অনেকে মনে করেন।

ষ্ট্যালিনের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে পরবর্তীকালে বহু সমালোচনা দেখা গিয়াছে। রুশ রাষ্ট্রনায়ক ক্রুশ্চফ ছিলেন ষ্ট্যালিনবাদের প্রধান সমালোচক। তিনি C.P.S.U.-র কংগ্রেসে ষ্ট্যালিনের একনায়কতন্ত্রের ঘোর নিন্দা করেন। ষ্ট্যালিনের নির্দেশে বর্বরভাবে রক্তপাত ও হত্যার তীব্র সমালোচনা করা হয়। ষ্ট্যালিন ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন কমিয়ে ভারী শিল্প গঠন করেন বলে সমালোচনা করা হয়। এর ফলে রুশদের দৈনন্দিন জীবনের জন্যে যথেষ্ট ভোগ্যপণ্য পাওয়া যায়নি। তাছাড়া ষ্ট্যালিন পার্টিতে স্বৈরতন্ত্র চালান। স্বাধীনচিত্ত সদস্যদের ধ্বংস করেন। তিনি রাশিয়াকে একটি পুলিশী রাষ্ট্রে পরিণত করেন বলে ষ্ট্যালিনের বিরুদ্ধে সমালোচনা করা হয়।

ষ্ট্যালিনবাদের সমালোচনা

কিন্তু ঐতিহাসিক ন্যায়বিচারে ষ্ট্যালিনের মূল্যায়ন এখনও হয়নি। তিনি কিছুটা স্বৈরতন্ত্রবাদী ছিলেন এতে সন্দেহ নেই। তিনি ক্ষমতালোভী ও সন্দেহ-পরায়ণ ছিলেন। রুশ কমিউনিষ্ট পার্টির প্রখ্যাত এবং খাঁটি নেতাদের তিনি হয় বহিষ্কার করেন অথবা ধ্বংস করেন। একটি পরিসংখ্যান অনুসারে কমিউনিষ্ট পার্টির প্রায় ৮ লক্ষ লোক নিহত হন। লালফৌজের প্রায় ৩৫ হাজার অফিসার নিহত হন। কয়েকজন ফিল্ড মার্শালও এর মধ্যে ছিলেন।[১] তবে এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে, কেন ষ্ট্যালিন এই নীতি নেন তার প্রকৃত ব্যাখ্যা আজও পাওয়া যায়নি। অনেকে মনে করেন যে, ট্রটস্কী ও জিনোভিয়েভ গোষ্ঠীর চক্রান্ত দমনের জন্যে ষ্ট্যালিন এই রক্তপাত ঘটান। অপর একটি ব্যাখ্যা এই যে, গাড়ীকে চালাতে যেমন ইঞ্জিন লাগে, সেরূপ সর্বাত্মক রাষ্ট্রকে কার্যকর রাখতে হলে সন্ত্রাসের দরকার হয়।

ষ্ট্যালিনবাদের পক্ষে যুক্তি

যাইহোক, ষ্ট্যালিন সোভিয়েত ইউনিয়নের বৈষয়িক সমৃদ্ধি ঘটিয়ে তাকে পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ দেশে পরিণত করেন তাতে সন্দেহ নেই। তিনি ভারী শিল্প গঠন করার ফলে সোভিয়েত রাশিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঝুঁকি বহন করতে সক্ষম হয়। রাষ্ট্র সংগঠন এবং সমাজতন্ত্রের সার্থক প্রয়োগে তাঁর কৃতিত্ব অসামান্য।

কৃতিত্ব

ষ্ট্যালিনের সমালোচকদের মতে, তাঁর যৌথ খামার বা Collectivism নীতি রাশিয়াতে দুর্দশা সৃষ্টি করে। কৃষকরা জমি হারিয়ে কৃষিকার্যে উৎসাহহীন হয়ে পড়ে। যৌথ খামারগুলির উৎপাদন পড়তে থাকে। ম্যানেজাররা শাস্তির ভয়ে উৎপাদন সংক্রান্ত পরিসংখ্যান ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে দেখায়। যৌথ খামারের আগে যে সকল খামারে বহু উদ্বৃত্ত উৎপাদন হত, সেগুলিতেও উৎপাদনের হার কমে যায়। কৃষকরা উদ্যমহীন হয়ে যায়। তুলনামূলকভাবে ষ্ট্যালিনের শিল্প নীতি অনেকটা সফল হয়। তবে তিনি ভারী শিল্প গঠনের ওপর জোর দেন। ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন হ্রাস করায় রুশীদের জীবনে আয়াস ও আধুনিক প্রগতির ছাপ বেশী ছিল না।

১· Quoted by Gordon Craig. P. 863.

ষ্ট্যালিনের সকল দোষত্রুটি তাঁর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সার্থক নেতৃত্বের দ্বারা পূরণ হয়। রাষ্ট্র জগতে তিনি লৌহ মানব ও ইস্পাত কঠোর মানসিকতার প্রতীক হলেও, স্বয়ং উইনষ্টন চার্চিলের মতে ব্যক্তি ষ্ট্যালিন ছিলেন ভদ্র, আলাপী, অতিথি বৎসল, পারিবারিক জীবনে অনুরাগী। চার্চিল তাঁর Gathering Storm গ্রন্থে ষ্ট্যালিনের ব্যক্তি জীবনের ও তাঁর আতিথেয়তার প্রশংসা করেছেন।

সোভিয়েত পররাষ্ট্র নীতি, ১৯১৭—২৪ খ্রীঃ লেনিন যুগ (The Foreign Policy of Soviet Russia, 1917—24 during Lenin) : ১৯১৭ খ্রীঃ বলশেভিক বিপ্লবের পর বিপ্লবের ভাবধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে লেনিন জারের আমলের পুরাতনপন্থী বিদেশ নীতিকে বর্জন করেন। ১৯১৮ খ্রীঃ লেনিন জার্মানীর সহিত ব্রেষ্টলিটভস্কের সন্ধির দ্বারা শান্তি স্থাপন করেন। রাশিয়ার ভূমিখণ্ডের ¼ অংশ জার্মানীকে ছেড়ে দিয়ে এবং যুদ্ধের দরুন আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিয়ে তিনি চড়া মূল্যে এই সন্ধি ক্রয় করেন। লেনিন বলেন যে, এই যুদ্ধ হল সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধ। এই যুদ্ধ চালাতে রুশ সমাজতন্ত্রের কোন আগ্রহ নেই। আসলে বলশেভিক বিপ্লবের আভ্যন্তরীণ সংহতি স্থাপন এবং রাশিয়ার ওপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত থেকে রক্ষার জন্যে তিনি চড়া দামে শান্তি ক্রয় করেন।

ব্রেস্টলিটভস্কের সন্ধি

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে বলশেভিক রাশিয়া সরে দাঁড়াবার পর, সোভিয়েত সরকার মার্কসবাদী আদর্শ অনুসারে বিশ্ব বিপ্লবের লক্ষ্য ঘোষণা করে। E. H. Carr নামক ঐতিহাসিকের মতে, ইওরোপীয় কূটনীতির মূল কথা ছিল যে, শান্তির সময় একটি রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হাত দিবে না। কিন্তু সোভিয়েত সরকার এই চিরাচরিত নীতিকে অগ্রাহ্য করে বিশ্ব বিপ্লবের ডাক দেয়। রুশ নেতারা ইওরোপের বিভিন্ন দেশের শ্রমিকদের বুর্জোয়া শাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে বলেন এবং পরাধীন জাতিগুলিকে স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ করতে উৎসাহ দেন। মার্কসবাদ অনুসারে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের খাদ্য-খাদক সম্পর্ক ছিল। সুতরাং পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলিকে ধ্বংস করে বিশ্বের সকল নিপীড়িত শ্রমিকদের মুক্তিদান করা ছিল রুশ শ্রমিক সরকারের কর্তব্য। প্রথমে বিশ্ব যুদ্ধের চাপে ধনতন্ত্রী দেশগুলি দুর্বল হওয়ায়, এদের ধ্বংস করা সহজ হবে বলে কোন কোন সোভিয়েত নেতা মনে করেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন লিঁয় ট্রটস্কী, জিনোভিয়েভ প্রভৃতি। লেনিন বলেন যে, "বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেরূপ নির্ভুলভাবে ফলাফল বলা যায়, সেরূপ নির্ভুলতা নিয়ে আমি দেখতে পাচ্ছি যে পশ্চিম ইওরোপে সাম্যবাদের প্রসার আসন্ন।" (I see the spread of communism in the West lying in the nature of scientific prediction)।

বিশ্ববিপ্লবের লক্ষ্য

বিশ্ব বিপ্লবের লক্ষ্যকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্যে ১৯১৯ খ্রীঃ কমিনটার্ন বা আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট কংগ্রেস আহ্বান করা হয়। বিশ্বের কমিউনিষ্ট আন্দোলনকে সঠিক পথে চালনার জন্যে একটি দপ্তর গঠিত হয়। রুশ বিপ্লবী জিনোভিয়েভ কমিনটার্নের দায়িত্ব পান। বিভিন্ন দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্যে এই দপ্তর থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়। বিপ্লবের কৌশল ও প্রচার পদ্ধতি বুঝিয়ে দেওয়া হয়।

কমিনটার্ন গঠন

কমিনটার্ন গঠন করে বিশ্ব বিপ্লবের লক্ষ্য পূরণ সফল হয়নি। জার্মানির ব্যাভেরিয়া ও হাঙ্গেরী প্রভৃতি দেশে বিপ্লবী সরকার গঠিত হলেও, তা জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়া সরকারগুলি ধ্বংস করে ফেলে। ইংলন্ড ও ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে বুর্জোয়া সরকারগুলি এত শক্তিশালী ছিল যে, সেই দেশগুলিতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব করা আদপেই সম্ভব হয়নি। অধিকন্তু এই বুর্জোয়া সরকারগুলি বলশেভিক সরকারকে ধ্বংস করার জন্যে রুশ দেশে সামরিক আক্রমণ চালায়। বৈদেশিক আক্রমণ এবং রাশিয়ার অভ্যন্তরে প্রতি বিপ্লবের সাঁড়াশীর চাপে, রুশ সমাজতন্ত্রী সরকার আপাতত বিশ্ব বিপ্লবের লক্ষ্য ত্যাগ করে। অন্যদেশে

বৈদেশিক হস্তক্ষেপ

বিপ্লব ছড়িয়ে দেওয়া অপেক্ষা নিজ দেশে বিপ্লবকে রক্ষা করা বেশী দরকারী বলে মনে করা হয়। ১৯২০ খ্রীঃ নাগাদ বিশ্ব বিপ্লবের আওয়াজ সরকারের পক্ষ থেকে ত্যাগ করা হয়। মার্কসীয় তত্ত্বের দিক থেকে নীতিগতভাবে বিশ্ব বিপ্লবের নীতিকে স্বীকার করা হলেও, হাতে-কলমে সোভিয়েত রাশিয়া ১৯২০ খ্রীঃ পর তা করা থেকে অনেকটা বিরত থাকে। অন্যান্য জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রের মতই জাতীয় স্বার্থ এবং বিশ্ব বিপ্লবের নীতির মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে সোভিয়েত রাশিয়া জাতীয় স্বার্থকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দেয়। তবে মুখে বিশ্ব শ্রমিক বিপ্লবের কথা মাঝে মাঝে বলা হয় এবং মার্কসীয় গোঁড়ামি নিয়ে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের প্রতি ঘৃণা দেখান হয়। বলশেভিক বিপ্লবের পর সোভিয়েত সরকারের প্রধান সমস্যা ছিল বিভিন্ন রাষ্ট্রের কাছ থেকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি আদায় করা।

ইওরোপের প্রধান রাষ্ট্রগুলি এবং মার্কিন দেশ এককাট্টা হয়ে নবগঠিত সোভিয়েত সরকারকে স্বীকৃতি দিতে বিরত থাকে। স্বীকৃতির অভাবে সোভিয়েত সরকার অন্য দেশগুলির সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে অক্ষম হয়। দ্বিতীয়তঃ, পশ্চিমী নেতারা ভার্সাই সন্ধির দ্বারা পূর্ব ইওরোপের যে পুনর্গঠন করেন তাতে সোভিয়েত রাষ্ট্রের বক্তব্য রাখা সম্ভব হয়নি। কারণ প্যারিসের শান্তি বৈঠকে সোভিয়েত সরকারকে আহ্বান করা হয়নি। যে রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি তাকে আহ্বানের প্রশ্ন অবাস্তব বলে পশ্চিমী দেশগুলি বলতে থাকে।

সোভিয়েত সরকারের মিত্রহীনতা ও বুর্জোয়া প্রতিরোধ

এর ফল হয় যে, ব্রেষ্টলিটভস্কের সন্ধির দ্বারা রাশিয়া জার্মানীকে যে সকল স্থান হস্তান্তর করে, ভার্সাই সন্ধির দ্বারা সেই সকল স্থান রাশিয়াকে ফেরৎ দেওয়া হয়নি। অধিকন্তু প্যারিসের সম্মেলনে এক জাতি এক রাষ্ট্র নীতি প্রয়োগ করে ফিনল্যান্ড, ল্যাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া ও এস্থোনিয়াকে স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজ্য হিসেবে গঠন করা হয়। আগে এই রাজ্যগুলি জার সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত ছিল। এখন সেগুলিকে রাশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। পোল্যান্ডের সঙ্গে রাশিয়ার সীমান্ত কার্জন লাইন বরাবর স্থির করা হয়। মোট কথা, ভার্সাই সন্ধির দ্বারা রাশিয়ার পশ্চিম অঞ্চল ব্যবচ্ছেদ করা হয়। এইভাবে পশ্চিমী দেশগুলি সোভিয়েত সরকারকে দুর্বল করার নীতি নেয়।

ভার্সাই সন্ধির ফলে ক্ষতি

এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে লেনিন তাঁর পররাষ্ট্র নীতির লক্ষ্য পরিবর্তন করেন। তিনি উপলব্ধি করেন যে, নবগঠিত সোভিয়েত রাষ্ট্রের স্বীকৃতি না পেলে এই রাষ্ট্রের আরও ক্ষতি হতে পারে। তিনি জর্জ চিকেরিনকে বিদেশমন্ত্রী নিয়োগ করে, পশ্চিমী দেশগুলির কাছ থেকে সোভিয়েত সরকারের স্বীকৃতি লাভের নীতির ওপর জোর দেন। কেহ কেহ মনে করেন যে, পশ্চিমী দেশগুলির আস্থা লাভের জন্যে এই সময় তিনি N E P বা নব অর্থনীতির মাধ্যমে পুঁজিবাদের সঙ্গে কিছুটা আপোষ করেন। জর্জ চিকেরিন ছিলেন জারের আমলের কর্মচারী। তিনি কূটনীতিতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি ব্রিটেনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি ঘটাবার চেষ্টা করেন। অপর দিকে ব্রিটিশ বুর্জোয়ারা রাশিয়ার বিরাট বাজারে মাল বিক্রির জন্যে অস্থির হয়। রাশিয়াকে ব্রিটেন স্বীকৃতি না দিলে এই বাজার পাওয়া অসম্ভব ছিল। কিন্তু ফ্রান্সের তীব্র বিরোধিতার ফলে রাশিয়ার সঙ্গে ফ্রাঙ্কো-ব্রিটিশ সম্পর্কের উন্নতিতে বাধা দেখা দেয়। ফ্রান্স দাবী করে যে, ফ্রান্স সহ সকল বৈদেশিক শক্তির নিকট থেকে জার সরকার যে ঋণ নেয় তা সোভিয়েত সরকারকে পরিশোধ করতে হবে। রাশিয়ায় লগ্নী করা বিদেশী সম্পদ, যা সোভিয়েত সরকার বাজেয়াপ্ত করেছে তা পরিশোধ করতে হবে। রাশিয়ার নেওয়া ঋণ সম্পর্কে আলোচনার জন্যে জেনোয়ায় এক আন্তর্জাতিক অর্থ সম্মেলন আহূত হয়।

চিকেরিনের কূটনীতি : ফ্রান্সের শত্রুতা

জেনোয়ার সম্মেলনে জর্জ চিকেরিন ইওরোপের ক্ষুদ্র শক্তিগুলিকে বৃহৎ শক্তিগুলির স্বার্থপরতার বিরুদ্ধে একত্র করেন। তাছাড়া তিনি বলেন যে, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের বাজেয়াপ্ত অর্থের ক্ষতিপূরণ সোভিয়েত রাশিয়া দেবে। কিন্তু পশ্চিমী শক্তিগুলি রাশিয়ায় সামরিক হস্তক্ষেপের দরুন রাশিয়ার যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার জন্যে রাশিয়াকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এই সম্মেলন অর্থনৈতিক সমস্যার আলোচনার জন্যে আহূত হলেও, চিকেরিন এই আলোচনা সূচী না মেনে আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণ এবং সকল দেশকে বিশ্বের প্রাকৃতিক সম্পদ সমানভাবে বণ্টনের কথা বলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি জেনোয়া বৈঠক ত্যাগ করে জার্মানীর সঙ্গে র্যাপালোর সন্ধি (Treaty of Rapallo) ১৯২২ খ্রীঃ স্বাক্ষর করেন। র্যাপালোর সন্ধি ছিল পশ্চিমী দেশগুলির নিকট বিনা মেঘে বজ্রাঘাত। কারণ এই সন্ধির দ্বারা জার্মানী ও রাশিয়া দুই ভার্সাই-বিরোধী শক্তি জোটবদ্ধ হয়। জার্মানীতে সাম্যবাদের অনুপ্রবেশের সম্ভাবনা দেখা দেয়। জার্মানীর প্রতিবেশী ফ্রান্স এজন্য আতঙ্ক বোধ করে। র্যাপালোর সন্ধির (১৯২২ খ্রীঃ) দ্বারা স্থির হয় যে, (১) সোভিয়েত ভূমিতে জার্মান সেনাদের সামরিক তালিম ও অস্ত্র দেওয়া হবে। জার্মান সেনাপতিরা লালফৌজকে আধুনিক যুদ্ধের তালিম দেবেন। (২) জার্মানী সোভিয়েত রাশিয়াকে স্বীকৃতি দেবে এবং বাণিজ্যিক সুবিধা দেবে। এই সন্ধির ফলে ভার্সাই সন্ধির সামরিক শর্ত ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়। জার্মানীর রূঢ় জেলা ফ্রান্স অধিকারের জন্যে জার্মানীতে যে অর্থ সঙ্কট দেখা দেয়, তা মিটাতে রাশিয়া জার্মানীকে অর্থ সাহায্য করে।

র্যাপালোর সন্ধি

র্যাপালোর সন্ধির পর পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলি রুশ কূটনীতিকে সমীহ করে চলতে বাধ্য হয়। জর্জ চিকেরিন এই সময় ঘোষণা করেন যে, যে রাষ্ট্র সর্বাগ্রে রাশিয়াকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেবে, রাশিয়া সেই রাষ্ট্রকে বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা দেবে। এর ফলে ইংলন্ড, ইতালী ও ফ্রান্সের মধ্যে স্বীকৃতি দানের জন্যে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। ইংলন্ড ১৯২৪ খ্রীঃ সোভিয়েত ইউনিয়নকে সকল দেশের আগে স্বীকৃতি জানায়। এর পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া আর সকল রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেয়। মার্কিন দেশ বহু বিলম্বের পর ১৯৩৭ খ্রীঃ এই স্বীকৃতি দেয়।

সোভিয়েত সরকারের স্বীকৃতি দান

সোভিয়েত পররাষ্ট্র নীতি, ১৯২৪-৪৫ খ্রীঃ ষ্ট্যালিন যুগ (Soviet Foreign Policy, 1924-45: Stalin Period) : সোভিয়েত ইউনিয়নকে পশ্চিমী দেশগুলি স্বীকৃতি দিলেও, সোভিয়েত দেশ থেকে পশ্চিমে সাম্যবাদী বিপ্লবের প্রবাহ আসতে পারে, এই সন্দেহ দূর হয়নি। ইতিমধ্যে বুলগেরিয়ায় কমিউনিষ্ট অভ্যুত্থানের চেষ্টা হয়। চীনে কুয়ো-মিন-তাং-এ কমিউনিষ্ট অনুপ্রবেশ ঘটে। এই সকল কারণে ১৯২৭ খ্রীঃ পশ্চিমী দেশের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্পর্কের দারুণ অবনতি ঘটে। ইংলন্ডে অন্তর্ঘাতমূলক কাজের অভিযোগে ইংলন্ডের টোরী সরকার সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছেদ করে। পরে অবশ্য জানা যায় যে, ইংলন্ডের কয়লা শিল্পের ধর্মঘটের পশ্চাতে সোভিয়েত রাশিয়ার কোন হাত ছিল না। এজন্য ইংলন্ডের মনোভাব নরম হয়। পরে শ্রমিক দল ইংলন্ডে ক্ষমতা পেলে কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত হয়।

পশ্চিমী দেশের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি

এই সকল প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও সোভিয়েত রাশিয়া তার বৈদেশিক নীতিকে স্বাভাবিক নিয়মে পরিচালিত করে। ষ্ট্যালিন-ট্রটস্কী মতভেদের পর, ষ্ট্যালিন ক্ষমতা লাভ করলে, তাঁর 'জাতীয় কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রের' আদর্শ গৃহীত হয়। এর ফলে ষ্ট্যালিন অন্য দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপে বিরত থাকেন। আইজ্যাক ডায়েটশার (Issac Deutscher) নামক ঐতিহাসিক বলেছেন যে, ষ্ট্যালিন এই

ষ্ট্যালিনের কমিনটার্ন নীতির প্রতি ঔদাসীন্য

সময় কমিনটার্নের সঙ্গে সংশ্রব ত্যাগ করেন। তিনি কমিনটার্নকে একথা সমঝে দেন যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন তার জাতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্যে বৈদেশিক নীতি পরিচালনা করবে। পশ্চিমী দেশগুলি ষ্ট্যালিনের এই নীতির গুরুত্ব উপলব্ধি না করে ১৯২৫ খ্রীঃ লোকার্নো চুক্তি সম্পাদন করে। লোকার্নো কংগ্রেসে সোভিয়েত দেশকে আহ্বান করা হয়নি। এখানে সোভিয়েতের কোন বক্তব্য রাখার সুযোগ ছিল না। অধিকন্তু জার্মানীর পূর্ব সীমান্তে লোকার্নো চুক্তির দ্বারা পোল্যান্ড ও চেকোস্লোভাকিয়ার সঙ্গে ভার্সাই সীমান্ত আপোষে সংশোধন করার অধিকার জার্মানীকে দেওয়া হয়। এর ফলে রুশ সীমান্তের দিকে জার্মানীকে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। এতে ষ্ট্যালিন হতাশা বোধ করেন।

ইতিমধ্যে ১৯৩৩ খ্রীঃ জার্মানীতে নাৎসী দল এডলফ হিটলারের নেতৃত্বে ক্ষমতা দখল করলে, বিশ্ব রাজনীতিতে দারুণ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। রাশিয়ার বিরুদ্ধে নাৎসী আগ্রাসনের আশঙ্কা দেখা দেয়। হিটলার সোভিয়েত সরকারকে ধ্বংস করার ইচ্ছা গোপন করেননি। জার্মান আক্রমণের আশঙ্কায় সোভিয়েত ইউনিয়ন বিচলিত হয়। এদিকে জাপান লীগের আদর্শ অগ্রাহ্য করে মাঞ্চুরিয়া অধিকার করলে, রাশিয়া তার মঙ্গোলীয় সীমান্তের নিরাপত্তার জন্যে চিন্তিত হয়।

নাৎসী শক্তির উত্থান : সোভিয়েতের আশঙ্কা

এই অবস্থায় মার্শাল ষ্ট্যালিন স্থির করেন যে, জার্মানীর বিরুদ্ধে পশ্চিমী দেশের সঙ্গে মিত্রজোট গঠন করা দরকার। ১৯১৭ খ্রীঃ থেকে পশ্চিমী দেশগুলির সঙ্গে সোভিয়েত রাশিয়ার যে শীতল সম্পর্ক ছিল, তাকে তিনি উষ্ণতা দিতে চান। পশ্চিমী দেশগুলির আস্থা লাভের জন্যে তিনি ভার্সাই সন্ধিকে দৃঢ় সমর্থন জানান। ভার্সাই সন্ধির স্থিতাবস্থা রক্ষিত হলে, সোভিয়েত নিরাপত্তা রক্ষা হবে বলে আশা করা হয়। পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির সমর্থন লাভের আশায় ষ্ট্যালিন কমিনটার্ন আন্দোলন রদ করেন। সোভিয়েত রাশিয়া ১৯৩৪ খ্রীঃ লীগের সদস্য পদ গ্রহণ করে। লীগের আদর্শকে সোভিয়েত সরকার দৃঢ় সমর্থন জানায়। (১) ফ্রাঙ্কো-সোভিয়েত চুক্তি (১৯৩৫ খ্রীঃ) দ্বারা ফ্রান্স ও সোভিয়েত ইউনিয়ন কোন তৃতীয় শক্তির আক্রমণের বিরুদ্ধে পরস্পরকে সাহায্য করতে প্রতিশ্রুতি দেয়। বলা বাহুল্য যে, এই তৃতীয় শক্তি ছিল নাৎসী জার্মানী। (২) নব নিযুক্ত রুশ বিদেশ মন্ত্রী ম্যাক্সিম লিট্‌ভিনভ ইঙ্গ-ফরাসী সরকারের সঙ্গে নানাভাবে সদ্ভাব স্থাপনের চেষ্টা করেন। উপরোক্ত ১৯৩৫ খ্রীঃ সন্ধির দ্বারা ফ্রান্স ও সোভিয়েত রাশিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়াকে যৌথভাবে গ্যারান্টি দেয় যে, জার্মান আক্রমণের বিরুদ্ধে চেকোশ্লোভাকিয়াকে তারা সাহায্য করবে। রাশিয়া অবশ্য শর্ত দেয় যে, যদি ফ্রান্স চেকোশ্লোভাকিয়াকে সাহায্য করে, তবে রাশিয়া নিশ্চয়ই সাহায্য দিবে। ষ্ট্যালিন পশ্চিমী নেতাদের প্রভাবিত করার জন্যে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট, ফরাসী ও ইংরাজী ভাষা এবং আদব-কায়দায় পারদর্শী ম্যাক্সিম লিটভিনভকে বিদেশমন্ত্রী নিয়োগ করেন।

পশ্চিমী রাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগীতা নীতি

লিট্‌ভিনভ কর্তৃক অনুসৃত পশ্চিমী সহযোগিতা লাভের নীতি শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ব্রিটেনের টোরী শাসনকর্তারা ছিলেন ঘোর সোভিয়েত বিরোধী। রুশ রাষ্ট্রদূত মেইস্কির মতে ব্রিটিশ মন্ত্রী চেম্বারলেইন এই নীতি স্থির করেন যে, রুশ সাম্যবাদকে ধ্বংস করার জন্যে রুশ সীমান্তের দিকে জার্মান জঙ্গীবাদকে ঠেলে দেওয়া দরকার। এর ফলে সোভিয়েত সাম্যবাদ ও জার্মান নাৎসীবাদ পরস্পরের সঙ্গে সংঘাতে ধ্বংস হবে।[১] পশ্চিমী দেশগুলি এজন্য সোভিয়েত সরকারের সহযোগিতা নীতি অগ্রাহ্য করে।[২] ব্রিটেন ও ফ্রান্স ভার্সাই সন্ধি ভঙ্গ করে নাৎসী জার্মানীর অস্ত্রসজ্জার বিরোধিতা

ব্রিটিশ বিরোধিতা

১· Maisky—On Munich : Frederich Hartman—Relation of Nations.

২· অধুনা A. J. P. Taylor তোষণ নীতির অন্য প্রকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। Vide Origin of Second World War—A. J. P. Taylor.

করেনি। ১৯৩৪ খ্রীঃ জার্মানী ভার্সাই সন্ধি ভেঙে রুঢ় ও সার অঞ্চল দখল করলে ইঙ্গ-ফরাসী শক্তি নিষ্ক্রিয় থাকে। ১৯৩৮ খ্রীঃ ভার্সাই ও সেন্ট জার্মেইন সন্ধি ভেঙে হিটলার জার্মানীর সঙ্গে অষ্ট্রিয়ার সংযুক্তি করলেও ইঙ্গ-ফরাসী শক্তি তোষণ নীতি নেয়। ১৯৩৬ খ্রীঃ জার্মানী ও জাপানের মধ্যে অক্ষ চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে পশ্চিম সীমান্তে জার্মানী ও পূর্ব সীমান্তে জাপান কর্তৃক রাশিয়া আক্রমণের সম্ভাবনা দেখা দেয়। অবশেষে জার্মানী চেকোশ্লোভাকিয়ার একাংশ দাবী করে যুদ্ধের হুমকী দিলে, ফ্রাঙ্কো-সোভিয়েত চুক্তির (১৯৩৫) শর্ত অনুসারে উভয় শক্তি জার্মানীকে যৌথ বাধা দিলে, জার্মানীকে থমকে দাঁড়াতে হত। কিন্তু ব্রিটেনের প্ররোচনায়, ফ্রান্স ১৯৩৫ ফ্রাঙ্কো-সোভিয়েত চুক্তির শর্ত পালনে অস্বীকার করে। অধিকন্তু জার্মান তোষণ নীতি অনুযায়ী মিউনিখ চুক্তির দ্বারা চেকোশ্লোভাকিয়ার সুদেতেন জেলা জার্মানীকে হস্তান্তর করতে ব্রিটেন বিশেষ উদ্যোগ নেয়। ফ্রান্সও এই তোষণ নীতির সামিল হয়। মিউনিক চুক্তি সম্পর্কে ইঙ্গ-ফরাসী শক্তি রাশিয়ার সঙ্গে বিন্দুমাত্র পরামর্শের দরকার বোধ করেনি। হিটলার শেষ পর্যন্ত গোটা চেকোশ্লোভাকিয়া দখল করেন। জার্মান সীমান্ত রুশ সীমান্ত সংলগ্ন হলে রাশিয়ায় জার্মান আক্রমণের সম্ভাবনা ভীষণ বাড়ে। পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে রুশ সহযোগিতা নীতির ব্যর্থতা প্রকটিত হয়।

"পশ্চিমী দেশের সঙ্গে সহযোগিতা নীতি" বিফল হলে ষ্ট্যালিন লিটভিনভকে পদচ্যুত করে মোলোটোভকে বিদেশমন্ত্রী নিয়োগ করেন। মোলোটোভ ছিলেন পশ্চিম বিরোধী। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলি সোভিয়েত সরকারের মঙ্গল চায় না। ইতিমধ্যে পোল্যাণ্ড উপলক্ষে জার্মানীর সঙ্গে ইঙ্গ-ফরাসী শক্তির যুদ্ধের আসন্ন সম্ভাবনা দেখা দেয়। এই যুদ্ধের সম্ভাবনায় সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে জার্মানীর বিরুদ্ধে মিত্রতা চুক্তি গড়ার প্রয়োজনীয়তা ব্রিটেন শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারে। এজন্য মস্কোতে একটি প্রতিনিধি দল ব্রিটেন থেকে পাঠান হয়। কিন্তু ষ্ট্যালিন ও মোলোটোভ এই দলের সঙ্গে আলোচনায় বুঝতে পারেন যে, ব্রিটেন তখনও মনস্থির করতে পারেনি।

ষ্ট্যালিনের আত্মরক্ষার নীতি

এদিকে চতুর হিটলার জার্মানী বিরোধী জোট ভেঙে তাঁর একের পর এক নীতিকে কার্যকরী করার জন্যে ব্যস্ত হন।[১] এজন্য তিনি রাশিয়ার সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তির প্রস্তাব দেন। ষ্ট্যালিন ১৯৩৯ খ্রীঃ রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তির দ্বারা দুই স্বাক্ষরকারী দেশ ১০ বছরের জন্যে পরস্পরকে আক্রমণ না করতে প্রতিশ্রুতি দেয়। দুই দেশের মধ্যে বিরোধগুলি আলাপ-আলোচনায় মীমাংসা করতে রাজী হয়। এই সন্ধির একটি গোপন শর্তের দ্বারা উভয় দেশ পোল্যাণ্ডকে পরস্পরের মধ্যে ভাগ করার জন্যে রাজী হয় এবং ইওরোপে নিজ নিজ প্রভাবাধীন এলাকা স্থির করে। রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তির দ্বারা পূর্ব পোল্যাণ্ড, ফিনল্যাণ্ড দুই বাল্টিক রাষ্ট্রকে রাশিয়ার অধীনে, বাল্টিক পোল্যাণ্ড ও লিথুয়ানিয়া জার্মানীর অধীনে আনার ব্যবস্থা হয়। এই সন্ধির দ্বারা ষ্ট্যালিন মনে করেন যে, জার্মান আক্রমণের হাত থেকে তিনি রাশিয়াকে আপাততঃ রক্ষা করেছেন। জার্মানী মনে করে যে, জার্মানীর বিরুদ্ধে ইঙ্গ-ফরাসী জোট থেকে রাশিয়াকে বিচ্ছিন্ন করা গেছে। ইঙ্গ-ফরাসী শক্তির পতন জার্মান আক্রমণে ঘটলে, তখন একক রাশিয়াকে জার্মানীর আক্রমণ করা সহজ হবে। দুই পক্ষ জানত যে, এই সন্ধি স্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা কম। তবে আপাততঃ যুদ্ধ থেকে রাশিয়াকে নিরপেক্ষ রেখে ষ্ট্যালিন এই সন্ধির দ্বারা ভবিষ্যৎ জার্মান আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি নিতে পারেন। পশ্চিমী ঐতিহাসকরা রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তির জন্যে রাশিয়ার সুবিধাবাদী আদর্শহীন স্বার্থপর নীতির তীব্র নিন্দা করেন। কিন্তু তাঁরা ভুলে যান যে, ১৯৩৩-৩৮ খ্রীঃ পর্যন্ত পশ্চিমী শক্তিগুলির মিত্রতা লাভের জন্যে রাশিয়া আপ্রাণ চেষ্টা করে

রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি

১· Allan Bullok—Tyranny ; Hitler.

ব্যর্থ হয়। রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি ছিল ইঙ্গ-ফরাসী শক্তির অতি চালাকী এবং রাশিয়াকে কোণঠাসা করার নীতির পরিণাম। এজন্য তাদের দাম দিতে হয়।

১৯৪১ খ্রীঃ ব্রিটেন ছাড়া পশ্চিম ইওরোপের অধিকাংশ শক্তিকে পদানত করার পর হিটলার রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি ভেঙে রাশিয়া আক্রমণের উদ্যোগ নেন। জার্মানী আগে থেকেই পরিকল্পনা করে। এই পরিকল্পনা রূপায়নের পথে রাশিয়া ছিল প্রধান বাধা। রুমানিয়া ও বল্টিক রাষ্ট্রে পরস্পরের এক্তিয়ার নিয়ে বিরোধ উপলক্ষ করে জার্মানী রাশিয়া আক্রমণ করে (১৯৪১ খ্রীঃ)। জার্মানী ভালরকম তোড়জোড় করে তবে রাশিয়া আক্রমণ করে। নেপোলিয়নের মস্কো অভিযানের বিফলতার কথা হিটলার ও তাঁর সেনাপতিরা ভুলেননি। কিন্তু হিটলারের পরিকল্পনা সফল হয়নি। প্রথমতঃ, ইঙ্গ-মার্কিন মিত্রশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে আগের বিরোধ ভুলে গিয়ে Grand Alliance বা ব্রিটেন, মার্কিন দেশে, সোভিয়েত রাশিয়ার মহাজোট গঠন করে। সোভিয়েত রাশিয়াকে আর্কেঞ্জেল বন্দরের পথে প্রচুর রণসম্ভার সরবরাহ করা হয়। এর ফলে রাশিয়ার প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। দ্বিতীয়তঃ, রাশিয়ায় আক্রমণকারী জার্মান সেনা সংখ্যা অপেক্ষা রুশ সেনার সংখ্যা ছিল অনেক গুণ বেশি। দীর্ঘ যুদ্ধে জার্মানীর লোকক্ষয় হয়। পশ্চিম রণাঙ্গনে ইঙ্গ-মার্কিন আক্রমণের ভয়ে জার্মানীকে ফ্রান্সে বহু সেনা মোতায়েন রাখতে হয়। এজন্য রাশিয়া আক্রমণে জার্মানী যথেষ্ট সেনা পাঠাতে পারেনি। সেনা সংখ্যার স্বল্পতা রুশ প্রতিরোধ এবং রাশিয়ার ভয়ঙ্কর জলবায়ু, শীতে জার্মান আক্রমণের গতি মন্দীভূত হয়। তৃতীয়তঃ, জার্মান রণনীতি হিটলার ভুল পথে পরিচালিত করেন। জার্মান সেনাপতি ফিল্ড মার্শাল কাইটেল, ফিল্ড মার্শাল ফনবক প্রভৃতি চান যে, রাশিয়ার বড় বড় শহর, শিল্প কেন্দ্র, রেল জংশন, তৈলখনি অঞ্চল দখল করলে রাশিয়ার পরাজয় ঘটবে। হিটলার চান যে, ষ্ট্যালিনগ্রাদ শহর দখলের জন্যে জার্মানীর সর্বশক্তি নিয়োগ করা হোক। ষ্ট্যালিনগ্রাদ দখলকে তিনি তাঁর মর্যাদার লড়াই-এ পরিণত করেন। হিটলারের এই জেদী, একরোখা রণনীতির পরিণাম ছিল ভয়াবহ। রাশিয়ার চতুর ও অভিজ্ঞ ফিল্ড মার্শাল জুকভ ষ্ট্যালিনগ্রাদে রাশিয়ার মরনপণ প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। ফলে এই নগর দখলের জন্যে হিটলার তাঁর সর্বশক্তি প্রয়োগ করেও বিফল হন। মাসের পর মাস গড়িয়ে গেলেও ষ্ট্যালিনগ্রাদ জার্মানরা দখল করতে পারেনি। এদিকে হিটলারের শক্তি নিঃশেষিত হয়ে আসে। সুযোগ বুঝে লাল ফৌজ জার্মানদের প্রবল চাপ দিয়ে পিছু হঠতে বাধ্য করে। চতুর্থতঃ, রাশিয়ার এই সঙ্কট সময়ে বিলম্বে হলেও ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি ফ্রান্সের নর্মাণ্ডি উপকূলে নেমে পড়লে, জার্মানীর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খুলে যায়। জার্মানীকে বাধ্য হয়ে রাশিয়া থেকে সেনা সরিয়ে পশ্চিম রণাঙ্গনে আনতে হয়। এই সাঁড়াশী আক্রমণে ও জার্মানীর বিরুদ্ধে মিত্রশক্তির নৌ-অবরোধে জার্মানীর দম ফুরিয়ে আসে। পঞ্চমতঃ, হিটলারের আশা ছিল যে, জার্মান সেনা রাশিয়ায় ঢুকলে রাশিয়ার সাধারণ লোক বলশেভিক সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে। রুশরা হল অত্যন্ত দেশপ্রেমিক জাতি। বৈদেশিক আক্রমণের সম্মুখে তারা এক হয়ে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে মরণপন লড়াই চালায়। ষ্ট্যালিনের নেতৃত্বে তারা পূর্ণ আস্থা জানায়। অবশেষে জার্মান বাহিনী জার্মানীর পতন আসন্ন হলে রুশভূমি ত্যাগ করে। তাদের পিছু নিয়ে লাল ফৌজ পূর্ব ইওরোপ হয়ে জার্মানীতে ঢুকে পড়ে। বার্লিনের যুদ্ধে নাৎসী সরকারের পতন হয়।

পাঠ্যসূচী

১। E. H. Carr—History of Soviet Russia.
২। Rothenstein—History of soviet Russsia.
৩। Seton Watson—From Lenin to Kruschev.
৪। Angelica Balabaoff—Impressions of Lenin
৫। Isaac Deutscher—Stalin.
৬। J. F. Kennan—Soviet Foreign Policy.
৭। Ilya Ehrenbuag—Men., Years,. Life.

ষষ্ঠ অধ্যায়
লীগ অফ নেশনস
(League of Nations)

উৎপত্তি (Origin of the League of Nations) ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা, মানব জীবনের ধ্বংস ও সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি বুঝিয়ে দেয় যে, আধুনিক যুদ্ধগুলি খুবই ব্যাপক ধরনের হবে। এই যুদ্ধে সামরিক ও অসামরিক নাগরিকদের কোন পার্থক্য থাকবে না। শত্রুর মারণাস্ত্রে সকলেই সমানভাবে নিহত হবে। এই যুদ্ধ কেবলমাত্র যুদ্ধক্ষেত্রে আবদ্ধ থাকবে না। স্থল, জল, অন্তরীক্ষ সর্বত্র যুদ্ধ চলবে। শত্রুর বিমান অসামরিক লোকদের ও শহরগুলিকে ধ্বংস করবে। আধুনিক যুদ্ধের ফলে প্রাণ ও সম্পত্তির ক্ষতির সঙ্গে নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় সভ্যতাকে ধ্বংস করে ফেলতে উদ্যত হয়।

এমতাবস্থায় চিন্তাশীল ব্যক্তিরা ভাবতে থাকেন কিভাবে যুদ্ধের সম্ভাবনা বন্ধ করে আন্তর্জাতিক শান্তি স্থায়ী করা যায়। আসলে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিবাদ ও বিরোধ ঘটা যে কোন সময় সম্ভব ছিল। এই বিরোধের নিষ্পত্তির জন্যে বলপ্রয়োগের পরিবর্তে শান্তিপূর্ণ পন্থা গ্রহণের জন্যে চিন্তা-ভাবনা করা হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা এই চিন্তাধারাকে প্রবল করে। পোপ পঞ্চদশ বেনেডিক্ট ১৯১৭ খ্রীঃ আর যুদ্ধ না করে আপোষ ও আলোচনার দ্বারা আন্তর্জাতিক বিরোধ মিটাবার আবেদন করেন। ব্রিটেনে জেনারেল স্মাটস ফিলিমোর আন্তর্জাতিক সংস্থার দ্বারা আপোষে বিরোধ মিটাবার জন্যে প্রস্তাব দেন।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইওরোপে শান্তি স্থাপনের জন্যে চতুর্দশ নীতি (Fourteen Points) ঘোষণা করেন। এই চতুর্দশ নীতির ১৪ নং ধারায় উইলসন বলেন যে, সকল জাতির প্রতি ন্যায় বিচার এবং সকল জাতির স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্যে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা গড়তে হবে। প্যারিসের শান্তি সম্মেলনে উইলসনের প্রস্তাব উত্থাপিত হলে ১৯ সদস্যের এক কমিটিকে লীগের গঠনতন্ত্র রচনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। উইলসন এই সমিতির সভাপতি ছিলেন। এই সমিতি জাতি সঙ্ঘ বা লীগ অব নেশনস গঠনের জন্যে একটি খসড়া সংবিধান রচনা করে। এই খসড়ার নাম ছিল লীগ কভেন্যান্ট। জাপান এই খসড়ায় সকল জাতির সমান অধিকারের শর্ত ঢোকাতে চাইলে ব্রিটেনের প্রতিবাদে তা বিফল হয়। ভারত প্রভৃতি ব্রিটেনের উপনিবেশে স্বাধীনতার দাবী তোলা হয়। এজন্য জাপানের শর্ত গৃহীত হলে ব্রিটেনের সাম্রাজ্য হারাবার ভয় ছিল। প্যারিসের সম্মেলনে খসড়াটি অনুমোদিত হলে, ভার্সাই সন্ধির প্রথম খণ্ডে এই খসড়া গৃহীত হয়। এর ফলে লীগ অব নেশনস বা জাতি সংঘ স্থাপিত হয়।

লীগ অব নেশনসের গঠন ও উদ্দেশ্য (Formation and purpose of the League of Nations) ঃ জাতিসংঘের বা লীগের কার্য পরিচালনার জন্যে পাঁচজন স্থায়ী সদস্য নিয়ে একটি পরিষদ বা কাউন্সিল গঠিত হয়। এই পরিষদে চারজন অস্থায়ী সদস্য থাকবে ইহাও স্থির হয়। পাঁচজন স্থায়ী সদস্য ছিল ব্রিটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স, ইতালী ও জাপান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লীগে যোগদান না করায় স্থায়ী সদস্য পদে মাত্র ৪টি দেশ থাকে। লীগের সদস্য রাষ্ট্রকে আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা ছিল লীগ কাউন্সিলের দায়িত্ব।

বিভিন্ন সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে তা যদি রাজনৈতিক বিরোধ হত, তবে লীগ কাউন্সিল মীমাংসা করতে পারত। কিন্তু মীমাংসার সূত্র স্থির করার জন্যে কাউন্সিলের সদস্যদের একমত হওয়া বাধ্যতামূলক ছিল। আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণের জন্যে পরিকল্পনা রচনা করা ছিল লীগ কাউন্সিলের দায়িত্ব। মোট কথা, লীগের এক্তিয়ারে যাবতীয় বিষয়ে লীগ কাউন্সিল বিচার-বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত নিত। সংখ্যালঘু সমস্যা, ম্যাণ্ডেট সম্পর্কিত বিষয়, লীগের সচিবালয়ের কর্মচারী নিয়োগ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় ছিল কাউন্সিল বা পরিষদের হাতে। একমাত্র প্রসিজিওর বা প্রথাসিদ্ধ বিষয় ছাড়া অন্য যে কোন বিষয়ে পরিষদকে ঐক্যমত হয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হত। সদস্যরা ঐক্যমতে না এলে পরিষদের সিদ্ধান্ত বৈধ হত না। লীগ পরিষদের কার্যকারিতার ওপরেই লীগের সাফল্য প্রধানতঃ নির্ভরশীল ছিল।

লীগের অপর অঙ্গ ছিল লীগের সাধারণ সভা বা লীগ এ্যাসেম্বলী। লীগ এ্যাসেম্বলী বা সাধারণ সভায় লীগের সকল সদস্য যোগ দিতে পারত। লীগ এ্যাসেম্বলীর অধিবেশন অন্ততঃ বছরে একবার ডাকতে হত। জরুরী অবস্থায় সাধারণ সভার জরুরী অধিবেশন ডাকা হত। লীগের সাধারণ সভার আলোচনাসূচী লীগের মহাসচিব রচনা করতেন। সাধারণ সভায় প্রতি সদস্যের একটি করে ভোট ছিল। লীগের এক্তিয়ার ভুক্ত যাবতীয় বিষয় সাধারণ সভা আলোচনা করে বিভিন্ন পরামর্শ দিতে পারত। এ বিষয়ে সাধারণ সভা প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারত। লীগের সাধারণ সভার সদস্যদের মধ্য থেকে কমিটি নিয়োগ করে কোন বিষয়ে রিপোর্ট তৈরি করা যেত। তারপর সাধারণ সভা সেই রিপোর্ট আলোচনা করত। বিশ্বশান্তি সম্পর্কিত বিষয়ে সাধারণ সভা আলোচনা করত। লীগ পরিষদের হাতে যে দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল তার সম্পর্কেও এই সভা আলোচনা করতে পারত। লীগের বার্ষিক বাজেট এই সভা পাশ করত। $\frac{২}{৩}$ ভোটে এই সভা নতুন সদস্য গ্রহণ করত। সকল বিষয়ে সভার সদস্যদের ঐক্যমতে আসতে হত। লীগের সাধারণ সভার কোন প্রত্যক্ষ কার্যকরী ক্ষমতা ছিল না। এই সভা কেবলমাত্র পরামর্শ ও মতামত দিতে পারত।

লীগের কাজকর্ম চালাবার জন্যে একটি সচিবালয় ছিল। এতে সেক্রেটারী জেনারেল বা মহাসচিবের নির্দেশে কর্মচারীরা কাজ করত। সচিবালয়ের কাজ ছিল লীগ পরিষদ ও সাধারণ সভার কার্য তালিকা রচনা ; পরিষদ ও সাধারণ সভার নির্দেশকে কাজে রূপায়িত করা প্রভৃতি। এছাড়া লীগের অধীনে আন্তর্জাতিক শ্রম দপ্তর (I. L. O.) এবং আন্তর্জাতিক বিরোধের বিচারের জন্যে আন্তর্জাতিক আদালত স্থাপিত হয়।

লীগ অব নেশনসে বিশ্বশান্তি ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা (The League of Nations and International Peace and Security) : লীগ অব নেশনসের ১০—১৬ ধারা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। লীগের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধকে বন্ধ করে আন্তর্জাতিক শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষা। ১০ থেকে ১৬ ধারায় তার জন্যে ব্যবস্থা করা হয়। এজন্য এই ধারাগুলির বিশদ আলোচনা দরকার। (১) ১০নং ধারায় লীগের চুক্তিপত্রে বলা হয় যে, লীগের সদস্যদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং ভৌমিক অখণ্ডতা লীগ রক্ষা করবে। অর্থাৎ কোন শক্তি লীগের কোন সদস্যকে আক্রমণ করলে সেই সদস্য রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও রাজ্যসীমা রক্ষা করা হবে। (২) ১১ নং ধারায় যৌথ নিরাপত্তা নীতি গৃহীত হয়। এতে বলা হয় যে, লীগের কোন সদস্য আক্রান্ত হলে লীগের অপর সকল সদস্য এই আক্রমণকে তাদের ওপর আক্রমণ বলে মনে করবে। আক্রমণ করার বিরুদ্ধে লীগের সদস্যরা যৌথ বাধা দিবে। (৩) ১২ নং ধারায় বলা হয় যে, যদি কোন আন্তর্জাতিক বিরোধের ফলে আন্তর্জাতিক শান্তি বিপন্ন হয়, তবে সেই বিরোধ লীগ কাউন্সিল বা আন্তর্জাতিক আদালতের দ্বারা শান্তিপূর্ণ উপায়ে নিষ্পত্তি করা হবে।

লীগের হাতে বিষয়টি আসার পর তিনমাস যুদ্ধ বিরতি চলবে। (৪) ১৩ নং ধারায় বিবাদমান লীগ সদস্যদের লীগ কাউন্সিলের মধ্যস্থতা অথবা আন্তর্জাতিক আদালতের রায় মেনে চলতে অনুরোধ করা হয় এবং বলপ্রয়োগ থেকে বিরত থাকার জন্যে নির্দেশ দেওয়া হয়। (৫) ১৪ নং ধারায় আন্তর্জাতিক আদালত কিভাবে গঠিত হবে বলা হয়। (৬) ১৫ নং ধারায় বলা হয় যে, লীগ কাউন্সিল তার সদস্যদের সর্বসম্মতিক্রমে রাজনৈতিক বিরোধগুলির নিষ্পত্তি করবে এবং আন্তর্জাতিক আইনগত বিরোধগুলির আন্তর্জাতিক আদালত নিষ্পত্তি করবে। (৭) ১৬ নং ধারা ছিল নিরাপত্তার সর্বাপেক্ষা মূল্যবান শর্ত। এতে বলা হয় যে, যদি কোন লীগ সদস্য ১২, ১৩, ১৫নং শর্ত ভঙ্গ করে এবং লীগের আদর্শ অগ্রাহ্য করে যুদ্ধ আরম্ভ করে, তবে তাকে আক্রমণকারী ঘোষণা করা হবে এবং তার বিরুদ্ধে লীগের অপর সদস্যারা অর্থনৈতিক অবরোধ করতে বাধ্য থাকবে। ইচ্ছা করলে এই অপরাধী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। অপরাধী রাষ্ট্রকে লীগের সদস্য পদ থেকে ভোটের দ্বারা বহিষ্কার করা যেতে পারে।

পরে দেখা যায় যে, লীগের এই নিরাপত্তা শর্তগুলি ছিল ঘোরতর ত্রুটিপূর্ণ। এই কারণে লীগের পতন ঘটে। (১) ১৬ নং শর্ত বা শাস্তিমূলক শর্ত ছিল ত্রুটিপূর্ণ। কারণ কোন সদস্য ১২, ১৩ এবং ১৫ নং শর্ত ভঙ্গ করলে তবেই ১৬ নং শর্ত প্রযোজ্য ছিল। শুধু ১৩ নং শর্ত ভাঙলে এই শাস্তিমূলক শর্ত প্রযোজ্য ছিল না। ১০ নং শর্ত দ্বারা সদস্যদের স্বাধীনতা ও ভৌমিক অধিকার রক্ষার কথা বলা হয়। কিন্তু সদস্যদের এই অধিকার রক্ষার জন্যে লীগের আইনী ক্ষমতা দুর্বল ছিল। (২) লীগ যুদ্ধকে নিষিদ্ধ করে, কিন্তু আগ্রাসনেকে নিষিদ্ধ করেনি। সুতরাং কোন রাষ্ট্র আগ্রাসন বা অঘোষিত যুদ্ধ করলে লীগের আইনতঃ কিছু করার ছিল না। (৩) যে সকল রাষ্ট্র লীগের সদস্য ছিল না অথবা সদস্য পদ ত্যাগ করে, তাদের ওপর লীগের এক্তিয়ার ছিল না। (৪) কোন সদস্য আগ্রাসন করার পর লীগের সদস্য পদ ত্যাগ করায় লীগের প্রতি তার দায়-দায়িত্ব এড়াতে পারত। (৫) লীগ কাউন্সিলকে কোন বিষয়ে মীমাংসা করতে হলে ঐক্যমতে আসতে হত। সদস্যরা একমত না হলে বিরোধীয় রাষ্ট্রগুলি নিজ মতে চলতে পারত। (৬) ১৬ নং ধারায় সামরিক শাস্তি বাধ্যতামূলক না হওয়ায় অপরাধী রাষ্ট্রকে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক অবরোধ দ্বারা জব্দ করা সম্ভব ছিল না। (৭) লীগের সদস্য রাষ্ট্রগুলি নিজ নিজ সার্বভৌম অধিকারকেই মূল্য দেয়। লীগের আদর্শ অপেক্ষা জাতীয় স্বার্থকেই অগ্রাধিকার দেয়।

লীগ অব নেশনসের কার্যাবলী (Achievements of the League of Nations) : লীগ অব নেশনস স্থাপিত হওয়ার পর প্রায় এক দশক লীগের মর্যাদা সর্বোচ্চ সীমায় উপনীত হয়। এই যুগকে লীগের সুবর্ণ যুগ (Golden period) বলা হয়। এই সময় বৃহৎ শক্তিগুলির স্বার্থ-ঘটিত দ্বন্দ্ব প্রকটিত না হওয়ার ফলে লীগের পক্ষে আন্তর্জাতিক বিরোধগুলির নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়। লীগের কার্যকারিতা এই সময় বৃদ্ধি পায়। এই সময় লীগ যে বিরোধগুলির মীমাংসা করে তার মধ্যে কয়েকটি প্রধান বিষয় ছিল :—

(১) আল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ ঘটিত বিরোধ—বাল্টিক সমুদ্রের আল্যান্ড দ্বীপের অধিবাসীরা ছিল জাতিগত দিক থেকে সুইডেনের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং এজন্যে তারা সুইডেনের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছা করে। সুইডেনও এই দ্বীপের ওপর আধিপত্য দাবী করে। অপর দিকে ফিনল্যান্ড এই দ্বীপের ওপর তার সার্বভৌম অধিকার ভোগ করছিল। ফিনল্যান্ড এই দাবী ত্যাগ করতে রাজী ছিল না। সুইডেন ও ফিনল্যান্ড কোন দেশই জাতি সংঘের সদস্য ছিল না।কিন্তু ব্রিটেনের প্রস্তাব অনুযায়ী লীগ আল্যান্ডের বিষয়টি গ্রহণ করে। ফিনল্যান্ড এই বিরোধ তার আভ্যন্তরীণ বিষয় বলে লীগের হস্তক্ষেপের এক্তিয়ার অগ্রাহ্য করে। কিন্তু লীগ তাতে কর্ণপাত না করে বিষয়টি অনুসন্ধানের জন্যে তদন্ত কমিটি নিয়োগ করে। পরে কমিটির রিপোর্ট অনুসারে আল্যান্ড ফিনল্যান্ডের অধীনে রাখা হয়। কিন্তু এই দ্বীপের অধিবাসীদের স্বকীয়তা ও সংস্কৃতি, সম্পত্তি ও

জীবন রক্ষার জন্যে ফিনল্যান্ডকে নির্দেশ দেওয়া হয়। আলান্ডকে নিরপেক্ষ অঞ্চল বলে ঘোষণা করা হয়।

(২) সাইলেশিয়া প্রদেশের কিছু অংশ নিয়ে জার্মানী ও পোল্যান্ডের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। সাইলেশিয়ার পোল অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি পোল্যান্ড দাবী করে। লীগ কাউন্সিলের মধ্যস্থতায় উভয় দেশের সীমান্ত স্থির করা হলে উভয় দেশ তা মেনে নেয়।

(৩) ভিলনা নগরটি একদা লিথুয়ানিয়ার রাজধানী ছিল। পরে ১৯০২ খ্রীঃ পোল্যান্ড এই স্থানটি দখল করে। লিথুয়ানিয়া তার বৈধ স্থান দাবী করে। পোল্যান্ডের সঙ্গে লিথুয়ানিয়ার বিরোধ দেখা দেয়। ১৯২২ খ্রীঃ লীগের নির্দ্দেশে এক গণভোটের ফলে ভিলনা পোল্যান্ডে যোগ দিতে মত দেয়। এর ফলে ভিলনা পোল্যান্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়। লীগের নিযুক্ত কমিশন লিথুয়ানিয়া ও পোল্যান্ডের সীমান্ত স্থির করে দেয়।

(৪) করফুর ঘটনা, ১৯২৩ খ্রীঃ—গ্রীস ও আলবেনিয়ার সীমান্ত জরিপে নিযুক্ত জনৈক ইতালীর কর্মচারীকে গ্রীসে হত্যা করা হয়। মুসোলিনী বিষয়টি বিধিমত লীগের নিকট উত্থাপন না করে নিজ হাতে আইন নেন। ইতালীর নৌ-বহর গ্রীসের করফু দ্বীপের ওপর গোলাবর্ষণ করে দ্বীপটি অধিকার করে এবং গ্রীসের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ও ক্ষতিপূরণ দাবী করে। গ্রীস, লীগ অব নেশনসের নিকট আবেদন জানায়। লীগ কাউন্সিলে এই বিষয়ে বিতর্ক চলার সময়, প্যারিসে বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রদুতরা আলাদাভাবে মধ্যস্থতা করে বিষয়টির মীমাংসা করেন। ইতালীর নিকট গ্রীস ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং ক্ষতিপূরণ দেয়। করফুর ঘটনা প্রমাণ করে যে, ইতালী লীগের ওপর আস্থা না রেখেই নিজ হাতে আইন নেয়। এটা লীগের প্রতি অনাস্থার অভিব্যক্তি ছিল।

(৫) তুরস্ক ও ইরাকের মধ্যে সীমানা সংক্রান্ত বিরোধে লীগ-সীমানা নির্বারণের দায়িত্ব নেয়। এই সভায় কুর্দ উপজাতির বিদ্রোহে সীমানা কমিশনের কাজ ব্যাহত হলে, তুর্কী সেনারা কুর্দ জাতির ওপর ভয়ানক অত্যাচার করে। এজন্যে তুর্কী-ইরাক যুদ্ধ বাধার উপক্রম হয়। শেষ পর্যন্ত লীগের মধ্যস্থতায় বিবাদের আপাততঃ নিষ্পত্তি হয়।

(৬) গ্রীক-বুলগেরিয়া বিরোধ, ১৯২৫ খ্রীঃ—গ্রীস ও বুলগেরিয়ার সীমান্তে বহু জটিলতা এবং পরস্পর-বিরোধী দাবী ছিল। ১৯২৫ খ্রীঃ গ্রীস-বুলগেরীয় সীমান্তে দুজন গ্রীক সৈনিক নিহত হলে গ্রীস, করফু ঘটনার অনুকরণে বুলগেরিয়ার নিকট ক্ষতিপূরণ ও ক্ষমা প্রার্থনা দাবী করে। বুলগেরিয়া এ বিষয়ে তদন্তের প্রস্তাব দিলে গ্রীস তা অগ্রাহ্য করে সৈন্য পাঠায়। বুলগেরিয়া লীগের নিকট লীগ চুক্তিপত্রের ১০, ১১ নং ধারা অনুযায়ী আবেদন করলে লীগ অগ্রে গ্রীক সেনাকে বুলগেরিয়া থেকে পিছিয়ে আসতে আদেশ দেয়। গ্রীস ও বুলগেরিয়ার যুদ্ধ বিরতি ও গ্রীক সেনাদলকে বুলগেরিয়া ত্যাগ করতে লীগ বাধ্য করে। এর পর লীগ এক তদন্ত কমিশন বসায়। এই কমিশন গ্রীসের ক্ষতিপূরণের দাবী নাকচ করে এই যুক্তিতে যে, গ্রীসই ছিল আক্রমণকারী। এই কমিশন বলে যে, বুলগেরিয়া ক্ষয়ক্ষতির জন্যে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী। লীগ গ্রীসকে নির্দেশ দেয় যে, ৪২ হাজার পাউন্ড ক্ষতিপূরণ যেন বুলগেরিয়াকে দেওয়া হয়। এই বিরোধের ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় যে, করফুর ঘটনার সময় ইতালীর অন্যায় আচরণের নিন্দা লীগ করতে সাহস করেনি। কিন্তু দুর্বল গ্রীসের ক্ষেত্রে লীগ হঠাৎ পক্ষপাতমূলক আচরণ করে। এজন্যে লীগের মর্যাদা নষ্ট হয়।

এইভাবে ১৯৩০ খ্রীঃ পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের বিরোধে লীগ সাফল্যের সঙ্গে হস্তক্ষেপ করে। কিন্তু ১৯৩১ খ্রীঃ থেকে অকস্মাৎ লীগের মর্যাদায় দারুণ আঘাত আসে। পরিণামে লীগের পতন ঘটে। যে প্রধান ঘটনাগুলির দ্বারা লীগের মর্যাদা নষ্ট হয় তা হল :—

(১) জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ—জাপান ১৯৩১ খ্রীঃ চীন সরকার শাসিত মাঞ্চুরিয়া প্রদেশ আক্রমণ করে। জাপান ও চীন উভয়েই ছিল লীগ অব নেশনসের সদস্য। জাপান ছিল

লীগের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। জাপান মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করলে চীন লীগের নিকট ন্যায়-বিচারের আবেদন করে। এদিকে ব্রিটেন গোপনে জাপানকে সমর্থন করত। কারণ ব্রিটেনের আশঙ্কা ছিল যে, রাশিয়ার কমিউনিষ্ট সরকার মাঞ্চুরিয়ায় অনুপ্রবেশ করতে পারে। চীনের সঙ্গে কমিউনিষ্ট রাশিয়ার যোগ আছে বলে ব্রিটেন সন্দেহ করত। সুতরাং ব্রিটেনের প্রভাবে লীগ কাউন্সিলে জাপানের বিরুদ্ধে যথেষ্ট তৎপরতা দেখান হয়নি। বিশ্ব জনমত জাপানকে ধিক্কার জানালে এবং চীনা জাতীয়তাবাদীরা তুমুল গণ্ডগোল আরম্ভ করলে লীগের আদেশে লিটন কমিশনকে মাঞ্চুরিয়ায় তদন্ত করতে পাঠান হয়। ইতিমধ্যে জাপান মাঞ্চুরিয়ায়, মাঞ্চুকুয়ো নামে এক তাঁবেদার সরকার গঠন করে মাঞ্চুরিয়া আক্রমণের সকল দায়িত্ব অস্বীকার করে। লিটন রিপোর্টে জাপানকে আক্রমণকারী সাব্যস্ত করা হয়। জাপান এর প্রতিবাদে লীগের পদ ত্যাগ করে। লীগ জাপানের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বিরত থাকে। কারণ ব্রিটেন এরূপ কোন ব্যবস্থা পছন্দ করত না। মাঞ্চুরিয়ার ঘটনায় লীগ সর্ব প্রথম বড় ধরনের ব্যর্থতা বরণ করে। লীগের ওপর সদস্যদের আস্থা নষ্ট হয়।

(২) ইতালী-আবিসিনীয়া যুদ্ধ, ১৯৩৫ খ্রীঃ—এর পর লীগের ওপর দ্বিতীয় মারাত্মক আঘাত আসে। ইতালী ছিল লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং ইওরোপীয় সদস্য। অনেকে মনে করে যে, এশিয়ার দেশ জাপান আন্তর্জাতিক আইন-কানুনের তোয়াক্কা না করে লীগকে অগ্রাহ্য করে। ইওরোপের কোন দেশ তা করবে না। কিন্তু ইতালীর আচরণে সেই ধারণা মিথ্যা প্রমাণিত হয়।

১৯৩৫ খ্রীঃ আবিসিনীয়া সীমান্তের ওয়াল-ওয়াল গ্রামে ইতালীয় ও আবিসিনীয় সেনাদলের মধ্যে গুলি বিনিময় হলে আবিসিনীয়া লীগের নিকট ১০, ১১ নং ধারা অনুযায়ী আবেদন জানায়। এদিকে ব্রিটেন ও ফ্রান্স মনে করত যে, ইতালীর বিরোধিতা করিলে ফ্যাসিষ্ট ইতালী, নাৎসী জার্মানীর পক্ষে যোগ দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে জোট গড়বে। সুতরাং এই দুই শক্তি ইতালী তোষণ আরম্ভ করে। ওয়াল-ওয়াল ঘটনা উপলক্ষে লীগ যে কমিশন নিয়োগ করে কার্যতঃ তাকে অকার্যকরী করা হয়। কারণ কমিশনকে ওয়াল-ওয়াল কোন দেশের স্থান তা না দেখে গুলি বর্ষণের দায়িত্ব স্থির করতে বলা হয়। ফলে কমিশন রিপোর্ট দেয় যে, কোন দেশই দায়ী নয়।

ইতিমধ্যে ইতালীয় সেনা আবিসিনীয়া সীমান্তে সন্নিবেশ করা হলে আবিসিনীয়া ১০, ১১, ১২, ১৪ নং ধারা অনুযায়ী আবেদন করে। লীগ একের পর এক কমিশন নিয়োগ করে। কিন্তু এই কমিশনের রিপোর্টগুলি ইতালী নাকচ করে দেয়। অবশেষে ইতালীয় সেনা আবিসিনীয়া আক্রমণ করলে বিশ্ব জনমত ইতালীর বিরুদ্ধে উত্তাল হয়। এমতাবস্থায় গ্রেট ব্রিটেন ও ফ্রান্স নিজ দেশের জনমতের চাপে লীগের সভায় ইতালীকে আক্রমণকারী সাব্যস্ত করতে বাধ্য হয়। ইতালীর বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ ১৬ নং ধারা অনুযায়ী জারী হয়। কিন্তু ইতালী লীগের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে এবং লীগের সদস্য পদ ত্যাগ করে। ইতালীকে শাস্তিদানে লীগের অপারগতা লীগের অকর্মণ্যতা প্রমাণ করে। বৃহৎ শক্তিগুলির সহায়তা ছাড়া লীগ অচল একথাও প্রমাণিত হয়ে যায়।

ক্রমে লীগের দুর্বলতার সুযোগে যৌথ নিরাপত্তা ধ্বংস হতে থাকে। স্পেনের গৃহযুদ্ধে পরোক্ষভাবে কোন কোন শক্তি হস্তক্ষেপ করে। নাৎসী জার্মানী আগ্রাসন নীতি নেয়। মিউনিখ চুক্তির দ্বারা নাৎসী জার্মানীকে তোষণ করা হয়। এইভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হলে লীগ ধ্বংস হয়।

রাজনৈতিক বিরোধের নিস্পত্তিতে লীগ অব নেশনস ব্যর্থ হলেও অন্যান্য ক্ষেত্রে লীগ কার্যকরী হতে চেষ্টা করে। লীগ কাভন্যান্টে আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণ দ্বারা বিশ্বশান্তিকে রক্ষার

কথা বলা হয়। এজন্যে লীগের নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন ডাকা হয়। তার আগে লীগের প্রস্তুতি কমিটি বহু আলাপ-আলোচনা দ্বারা একটি নিরস্ত্রীকরণের খসড়া প্রস্তাব রচনা করে। কিন্তু লীগের সম্মেলনে আলোচনা শুরু হলে দেখা যায় যে, বৃহৎ শক্তিগুলি খসড়া প্রস্তাব গ্রহণে আন্তরিকতা দেখাচ্ছে না। প্রতি শক্তি যে সকল সংশোধনী প্রস্তাব দিচ্ছে তাতে বহু কারচুপী আছে। ইতিমধ্যে নাৎসী জার্মানী দাবী জানায় যে, যদি জার্মানীকে তার প্রধান শত্রু ফ্রান্সের সমান অস্ত্র রাখতে অনুমতি দেওয়া হয়, অথবা ফ্রান্সের অস্ত্র হ্রাস করে জার্মানীর সমান করা হয়, তবেই জার্মানী এই সম্মেলনে থাকবে নতুবা নয়। শেষ পর্যন্ত নাৎসী জার্মানী নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন বর্জন করলে, এই সম্মেলন ভেঙে যায়।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে লীগ বিফল হলেও অন্যান্য ক্ষেত্রে লীগ অনেকটা সফল হয়। লীগ কভেন্যান্টের ২৩ নং ধারা অনুযায়ী বিশ্ব স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যে স্থায়ী আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সংস্থা স্থাপিত হয় (১৯২৩ খ্রীঃ)। প্রাচ্যদেশে কলেরা ও প্লেগ দমনে লীগ সক্রিয় ভূমিকা নেয়। ম্যালেরিয়া দমনের জন্যে একটি কমিশন গঠিত হয় (১৯২৩ খ্রীঃ)।

এছাড়া লীগের নেতৃত্বে ১৯২০ খ্রীঃ ব্রাসেলসে একটি আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে স্বর্ণমান নিরূপণ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বাধা দূর করা, আন্তর্জাতিক পরিবহণ প্রভৃতি বিষয়ে সুপারিশ তৈরি করা হয়। এই সুপারিশগুলিতে বলা হয় যে, আন্তর্জাতিক স্তরে শ্রমিক, মূলধন ও মাল চলাচল অবাধে হওয়া দরকার। প্রতি দেশের আমদানি শুল্ক অন্য দেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ধার্য করা দরকার। বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের সহযোগিতামূলক মনোভাব গ্রহণের সুপারিশও করা হয়। এছাড়া লীগ দাস বাণিজ্য রদ করার উদ্যোগ নেয়।

মোট কথা, লীগ অব নেশনস রাজনৈতিক বিষয়ে সফল না হলেও, অন্যান্য বিষয়ে যথেষ্ট কার্যকরী ভূমিকা নেয়। ১৯২৮ খ্রীঃ নাগাদ সোভিয়েত রাশিয়া ও জার্মানী লীগের সদস্য হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া বিশ্বের প্রধান দেশগুলি লীগের সদস্য হয়। এজন্যে বলা হয় যে, ১৯২৪ খ্রীঃ পর্যন্ত লীগের সুবর্ণ যুগ চলে (up to 1924)।

লীগ অব নেশনসের বিফলতার কারণ (Causes of the failure of the League of Nations) ঃ লীগ অব নেশনসের বিফলতা ইহা প্রমাণ করে যে, বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যায় মানব জাতি অনেক দূর এগিয়ে গেলেও রাষ্ট্র পরিচালনা ও আন্তর্জাতিক ন্যায় নীতির ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে আছে। মানব জাতিকে বিশ্বযুদ্ধের মারাত্মক ধ্বংসলীলার হাত থেকে রক্ষার জন্যেই লীগ অব নেশনস স্থাপিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং লীগের বিফলতা সভ্যতার পক্ষে কলঙ্কজনক এতে সন্দেহ নেই।

লীগের বিফলতার কারণ লীগের গঠন ও লীগ চুক্তিপত্রের ত্রুটির মধ্যে অনেকটা দেখা যায়। যদিও লীগকে জাতি সঙ্ঘ বলা হত, পৃথিবীর সকল জাতি এই বিশ্বসভার সদস্য ছিল না। এই সভা প্রধানতঃ ইওরোপীয় শক্তিগুলিকে নিয়ে গঠিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লীগের সদস্য ছিল না। ফলে এই প্রবল শক্তির সাহায্য থেকে লীগ বঞ্চিত হয়। জার্মানী ও সোভিয়েত রাশিয়া দীর্ঘকাল লীগের সদস্য ছিল না। পরে জাপান ও ইতালী সদস্য পদ ত্যাগ করে। সুতরাং সকল বৃহৎ শক্তিগুলি একসঙ্গে কোন এক সময় লীগের সদস্য ছিল না। এজন্যে লীগ এদের পূর্ণ সহায়তা পায়নি।

লীগের সদস্যদের মধ্যে সকলের সমান অধিকার ছিল না। লীগ কাউন্সিলের স্থায়ী সদস্যরা অধিক ক্ষমতা ভোগ করত। এই স্থায়ী সদস্যদের প্রত্যক্ষ সাহায্য ছাড়া লীগের কোন সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করা যেত না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যোগ না দেওয়ার ফলে লীগকে প্রধানতঃ ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সাহায্যের ওপর নির্ভর করতে হয়। কিন্তু ব্রিটেন ও ফ্রান্স আন্তর্জাতিক ন্যায় নীতি রক্ষা

ও লীগের মর্যাদা রক্ষা অপেক্ষা তাদের জাতীয় স্বার্থকে বড় করে দেখত। ব্রিটেন কর্তৃক তোষণ নীতির দরুন জাপান ও ইতালীকে আগ্রাসনের জন্যে শাস্তি দেওয়া সম্ভব হয়নি। এমন কি ইতালীর বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ লীগ দ্বারা জারী হলে নিষিদ্ধ দ্রব্যগুলির তালিকা রচনার সময় ব্রিটেন ইচ্ছা করে পেট্রোলকে তালিকার বাইরে রাখে, যার ফলে ইতালীর সুবিধা হয়। মোট কথা, ব্রিটেন ও ফ্রান্স লীগের আদর্শ পুরোপুরি সমর্থন না করায় লীগ বিফল হয়।

তাছাড়া লীগ চুক্তিপত্রের নিরাপত্তার শর্তগুলির মধ্যে বহু ত্রুটি ছিল। (বিশদ বিবরণ পৃঃ ৯৭ দেখ)। লীগের যারা সদস্য ছিল না, তাদের ওপর লীগের কোন এক্তিয়ার ছিল না। লীগ কাউন্সিলের সদস্যরা একমত না হলে কোন সিদ্ধান্ত কার্যকরী করা যেত না। বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি নিজ নিজ স্বার্থের জন্যে একমত হবে না, এটাই ছিল স্বাভাবিক। লীগের হাতে আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা না থাকায় আক্রমণকারীকে শাস্তি দেওয়া প্রকৃতপক্ষে সম্ভব হয়নি। এই কারণে লীগের পক্ষে নিজ সিদ্ধান্ত কার্যকরী করা সম্ভব হত না। আগ্রাসী রাষ্ট্র লীগের নির্দেশ সহজে উপেক্ষা করতে পারত।

বৃহৎ শক্তিগুলির স্বার্থপরতা লীগের পতন ঘটায়। ব্রিটেন ও ফ্রান্স ছিল লীগের দুই প্রধান খুঁটি। এই দুই রাষ্ট্রের সহায়তা ছাড়া লীগের পক্ষে কোন কিছু করা সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু ব্রিটেন লীগের ওপর আস্থা না রেখে নাৎসী জার্মানীর তোষণ নীতি নেয়। ব্রিটেনের পরোক্ষ সমর্থনে নাৎসী জার্মানী লীগকে অগ্রাহ্য করে ভার্সাই সন্ধির শর্তগুলি একে একে ভেঙে ফেলে। ফ্রান্সও লীগের ওপর আস্থা না রেখে লোকার্নো চুক্তি, কেলগ-ব্রিয়াঁ চুক্তি প্রভৃতির দ্বারা তার নিরাপত্তা রক্ষার চেষ্টা করে। ব্রিটেন ও ফ্রান্সের এই দুমুখো নীতি লীগের মর্যাদা ও শক্তি নষ্ট করে।

জাপান ও ইতালী লীগের আদর্শ অগ্রাহ্য করে যথাক্রমে মাঞ্চুরিয়া ও আবিসিনীয়া আক্রমণ করলে লীগের মৃত্যুর ঘণ্টা বেজে যায়। এই দুই সদস্য রাষ্ট্রকে শাস্তিদানে লীগের ব্যর্থতা লীগের অকার্যকারীতা প্রতিপন্ন করে। তাছাড়া আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণে লীগের বিফলতা অস্ত্র প্রতিযোগিতাকে বৃদ্ধি করে। জার্মানী ভার্সাই সন্ধি অগ্রাহ্য করে সন্ধি করলে, লীগ জার্মানীকে নিরস্ত করতে সক্ষম হয় নি।

সর্বশেষে, লীগের গঠনতন্ত্র ও কাজকর্মে বহু ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল। লীগের সাধারণ সভার হাতে কার্যতঃ কোন ক্ষমতা ছিল না। অথচ অধিকাংশ দেশ ছিল সাধারণ সভার সদস্য। কার্যকরী ক্ষমতা ছিল লীগ কাউন্সিলের হাতে। এই কাউন্সিলে ব্রিটেন ও ফ্রান্স স্থায়ী সদস্য হিসেবে প্রাধান্য পেত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিজেতা দেশ হিসেবে, পরাজিত দেশগুলির আস্থা এই শক্তিগুলি পায় নি। সোভিয়েত ইউনিয়ন এজন্যে লীগকে বিজয়ী ধনতান্ত্রিক দেশগুলির ক্লাব বলে অভিহিত করত। লীগ এই দুই প্রধান সদস্যের প্রভাবে নিরপেক্ষ বা পক্ষপাতহীন কাজ করতে পারেনি। ক্ষুদ্র শক্তিগুলি ছোটখাট আগ্রাসন বা আইন ভাঙলে লীগ যেমন তৎপরতার সঙ্গে তাতে হস্তক্ষেপ করত, জার্মানী, জাপান, ইতালী আইন ভাঙলে ব্রিটেনের প্রভাবে লীগ তা ন্যায্য ব্যবস্থা নেয়নি। এজন্যে লীগের নৈতিক মর্যাদা বিনষ্ট হয়।

সপ্তম অধ্যায়

সুদূর প্রাচ্য ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত চীন ও জাপানের বিবর্তন (The Far-East : The Evolution of China and Japan up to the First World War)

চীন ঃ পূর্বকথা ঃ পূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্র চীন ছিল এক প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি। প্রাচীন যুগ থেকে চীনে বহু জ্ঞানী দার্শনিক জন্মগ্রহণ করেন। এঁদের মধ্যে কনফুসিয়াস ছিলেন চীনে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত দার্শনিক। তাঁর মতবাদ দীর্ঘকাল ধরে চীনা বুদ্ধিজীবিদের প্রভাবিত করে। ভৌগোলিক দিক থেকে চীন ছিল বিশাল দেশ। ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী চীন ছিল "চুং কুও" বা মধ্য সাম্রাজ্য (Middle Kingdom)। আকাশে সূর্যের চারদিকে যেমন উপগ্রহ থাকে, সেরকম মূল চীন দেশের চতুর্দিকে সীমান্তে অবস্থিত প্রতিবেশী অঞ্চল ছিল চীনের সামন্তদেশ। চীনা ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রীয় ধারণা অনুসারে এই অঞ্চলগুলিও ছিল চীনের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।

চীন দেশের পরিচয়

চীন দেশ, যেখানে চীনা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী বসবাস করত, উনবিংশ শতকে তার জনসংখ্যা ছিল ৩৭৫ মিলিয়ন। পীত নদী বা হোয়াংহো, ইয়াংসি উপত্যকায় এই জনগোষ্ঠী প্রধানতঃ বসবাস করত। চীনের মাঞ্চু (চীং) সম্রাটের আমলে মূল চীন দেশ ১৮টি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। গোটা চীন বা মাঞ্চু সাম্রাজ্যের ⅓ অংশ ছিল এই মূল চীনা ভূখণ্ড। উত্তরে পেকিং (অধুনা বেইজিং বলা হয়) এবং দক্ষিণে নানকিং ছিল সর্বাপেক্ষা বড় নগর। এছাড়া ছিল নানা প্রাদেশিক রাজধানী শহর এবং দক্ষিণ চীনের বন্দর নগরগুলি, যথা ক্যান্টন, সাংহাই, এ্যাময়, ফুচাও, নিংপো প্রভৃতি। চীনের মূল ভূখণ্ডের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অঞ্চল নিয়ে মহাচীন বা চীন বা মাঞ্চু সাম্রাজ্য গঠিত হয়। এই স্থানগুলিকেও চীনের Integral Part বা অঙ্গরাজ্য মনে করা হত। এগুলি ছিল ঃ (১) উত্তর-পূর্বে মাঞ্চুরিয়া, ১৭শ শতকে চীনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। মাঞ্চুরিয়ার এক বীর যোদ্ধা চীনের সিংহাসন দখল করে চীনে মাঞ্চু রাজবংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করে। ১৯১১ খ্রীঃ পর্যন্ত চীনে এই রাজবংশের শাসন বিদ্যমান ছিল। মাঞ্চুরা খাঁটি চীনা ছিল না। এজন্য জাত্যাভিমানী চীনারা মাঞ্চু রাজবংশকে ঘৃণা করত। সেই সঙ্গে মাঞ্চুরিয়াকে চীনের অবিভক্ত অঞ্চল বলে দাবী করত। (২) আমুর নদীর উপত্যকা অঞ্চল ছিল চীনের উত্তর-পূর্বে এক অনগ্রসর এলাকা। এই অঞ্চল কোরিয়ার উত্তরে অবস্থিত ছিল। (৩) কোরিয়াতে কোরিয় উপজাতি বাস করত। দীর্ঘকাল মাঞ্চু সম্রাট কোরিয়াকে তাঁর সামন্ত রাজ্য বলে দাবী করতেন। কোরিয়া থেকে চীং বা মাঞ্চু সম্রাটের কাছে নজরানা পাঠান হত। কোরিয়ার বৈদেশিক নীতি চীনই নিয়ন্ত্রণ করত। পরবর্তীকালে কোরিয়ার ওপর আধিপত্য নিয়ে উনবিংশ শতকের শেষে চীন-জাপান বিরোধ দেখা দেয়। (৪) মোঙ্গোলিয়া ছিল চীনের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল। এখানে তুর্কী, মোঙ্গোল প্রভৃতি যাযাবর যোদ্ধা উপজাতি বসবাস করত। উনবিংশ শতকের গোড়ায় মোঙ্গোলিয়ার জনসংখ্যা বেশী ছিল না। অর্ন্তমোঙ্গোলিয়া অঞ্চল, মাঞ্চুরিয়া সংলগ্ন। এই অঞ্চলে লোকসংখ্যা কিছু বেশী ছিল। মাঞ্চু সম্রাট এই অঞ্চলে প্রত্যক্ষ শাসন চালাতেন। বর্হিমোঙ্গোলিয়া অঞ্চলে যুদ্ধপ্রিয় মোঙ্গোল ও তুর্কীরা বাস করত। মোঙ্গোল খানেরা ছিলেন এই অঞ্চলের স্বাধীনতা-প্রিয় শাসক। চীং সম্রাট এই অঞ্চলে প্রত্যক্ষ শাসন করতেন না। খানদের কাছ থেকে

বশ্যতার স্বীকৃতি ও মাঝে মাঝে নজরানা আদায় করে সন্তুষ্ট থাকতেন। বর্হিমোঙ্গোলিয়ার উর্গা শহরে চীং সম্রাটের প্রতিনিধির দপ্তর ছিল। এখানে তিনি একদল সেনা সহ বর্হিমোঙ্গোলিয়ার ওপর ক্ষীণ আধিপত্য রক্ষা করতেন। (৫) চীনের পশ্চিমে ছিল সিংকিয়াং বা চীনা তুর্কিস্থান। (৬) তুর্কিস্থানের দক্ষিণে ভারত সীমান্ত সংলগ্ন তিব্বতকেও চীন তার আপন অঙ্গরাজ্য বলে মনে করত। আধুনিক কমিউনিষ্ট চীনের জাতীয় পতাকায় পাঁচ তারা, চীনের মূল ৫টি জাতির প্রতীক, যথা—চীনা, মাঞ্চু, মোঙ্গোল, তুর্কী ও তিব্বতী।

চীন দেশের চীং বা মাঞ্চু রাজবংশের সম্রাটগণ নিজেদের বিশ্বের মহা প্রতাপশালী রাজবংশ বলে গণ্য করতেন। চীনে বৌদ্ধ ধর্ম ও কনফুসিয় ধর্মমত (Confusianism) প্রচলিত ছিল।

চীনের ধর্মমত—
চীনের শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাস

চীং সম্রাটগণ ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে ইওরোপীয়দের চীনে অনুপ্রবেশের অনুমতি দেন। এই সময় চীনে পর্তুগীজ মিশনারীরা দক্ষিণ চীনে বেশ কিছু চীনাকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করে। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে ইওরোপের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক ছিল প্রধানতঃ বাণিজ্যিক। চীং সম্রাট এই সকল শ্বেতাঙ্গ বণিকদের তাঁর সামন্ত দেশ থেকে আগত করদ প্রজার মতোই গণ্য করতেন। চীন নাগরিকদের সঙ্গে সমমর্যাদা কখনও এই আগন্তুকদের দেওয়া হত না।

সপ্তদশ শতকের শেষ দিক থেকে চীনে ইওরোপীয় বণিকদের অনুপ্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়।

চীনের বিচ্ছিন্নতা

চীন বর্হিজগতের কাছে এক Forbidden Country বা নিষিদ্ধ, বর্হিসম্পর্কহীন দেশ রূপে পরিগণিত হয়। কেবলমাত্র চীনের দক্ষিণে ক্যান্টন বন্দরে নিয়ন্ত্রিতভাবে ক্যান্টন প্রথার মাধ্যমে (Canton System) কিছু ইওরোপীয় বণিক বাণিজ্য করার সুযোগ পায়।

ক্যান্টন প্রথার উৎপত্তি ও প্রথম অহিফেন বা ইঙ্গ-চীন যুদ্ধের কারণ (The Rise of Canton System and the Causes of the First Opium or Anglo-Chinese War) ঃ সপ্তদশ শতক থেকে উনবিংশ শতক পর্যন্ত ক্যান্টন প্রথা (Canton System)-এর মাধ্যমে চীন তার দরজার সামান্য অংশ নানা শর্তে ঈষৎ খুলে বাণিজ্যের সুযোগ ইওরোপীয়দের দিত। ক্যান্টন প্রথার বিভিন্ন দিক ছিল ঃ (১) ক্যান্টন বন্দরের সীমানায় একটি বেড়া বা প্রাচীর ছিল। বিদেশী বণিকদের এই সীমানার বাইরে থাকতে হত। এই সীমানার বাইরে ছিল তাদের বাসগৃহ, মালগুদাম, অফিসঘর এবং

ক্যান্টন প্রথা

ক্যান্টনের বন্দরে জাহাজ। ইওরোপীয়, বিশেষতঃ ইংরাজ বণিকদের চীনের ভেতর ঢুকতে কিছুতেই অনুমতি দেওয়া হত না। (২) চীনের উৎপাদিত মাল ক্যান্টন বন্দর পথে ইওরোপীয়দের বিক্রী করার জন্যে ১৭২০ খ্রীঃ একটি চীনা বণিক সংঘ বা কো-হং (Cohong) সম্রাটের আদেশে গঠিত হয়। এই কো-হং বা চীনা বণিক সংঘ ইংরাজ, ডাচ, পর্তুগীজ প্রভৃতি সকল বণিকের সঙ্গে একচেটিয়া বাণিজ্য করত। (৩) নিয়ম ছিল যে, এই বাণিজ্য বাবদ যে শুল্ক আদায় হত তা চীং সম্রাটের দপ্তরে কো-হং সংগঠন জমা দিবে। (৪) ইওরোপীয়দের সঙ্গে কো-হং এর বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ এবং ক্যান্টন অঞ্চলের শাসনের জন্যে চীং সরকার ক্যান্টনে এক চীনা ভাইসরয় বা সম্রাটের প্রতিনিধি তাঁকে সাহায্য করত। বৈদেশিক বাণিজ্যের চীনা অধ্যক্ষ, যাঁকে ইওরোপীয়রা নাম দেয় "হোপ্পো" (Hoppo)। কার্যতঃ হোপ্পোর নির্দেশেই কো-হং পরিচালিত হত। (৫) কো-হং-এর চীনা বণিকরা ক্যান্টনে তাদের ইওরোপীয় বাণিজ্যের জন্যে চীং সরকারকে মোটা কর দিত এবং সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের প্রচুর উৎকোচ দিত।[১]

১· Fair Bank—East Asia.

(৬) ক্যান্টনের ইওরোপীয় বাণিজ্যে প্রধান অংশীদার ছিল ব্রিটিশ বণিককুল। চীন থেকে সবুজ চা ও সাদা রেশম কিনে তারা চড়া দামে ইওরোপের বাজারে তা বিক্রী করত। এছাড়া তামা, দস্তা, চীনামাটির বাসন, হস্তশিল্পের জিনিষও তারা ক্যান্টনে খরিদ করত। এই বাণিজ্য ছিল খুব লাভজনক। (৭) ক্যান্টন প্রথা অনুযায়ী ক্যান্টন বন্দরে ইওরোপীয় বণিকদের ওপর চীং সরকার নানা নিয়ন্ত্রণ ও বাধা-নিষেধ চাপাত, যথা, (ক) চীং সরকারের চোখে যেহেতু বিদেশী ইওরোপীয় বণিকরা ছিল "বর্বর জাতি" (Barbarians) সেহেতু তারা কখনও চীনা নাগরিকের সমান মর্যাদা পেত না। (খ) তারা স্বদেশ থেকে তাদের মন্ত্রী ও পরিবারের মহিলাদের ক্যান্টনে আনতে পারত না। (গ) যাতায়াতের জন্যে পাল্কি বা চীনা ডুলি ব্যবহার করতে পারত না। (ঘ) ক্যান্টন বন্দরের নির্দিষ্ট প্রাচীরের ভেতরে যেতে পারত না। (ঙ) চীনের ভেতর বিদেশীদের অনুপ্রবেশ ছিল কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। (চ)তাদের চীনের খোলা বাজারে সাধারণ বণিকদের কাছে মাল খরিদের অধিকার ছিল না। একমাত্র কো-হং বণিকদের কাছে একচেটিয়া, চড়া দামে তাদের মাল খরিদ করতে বাধ্য করা হত। (৮) ক্যান্টনের সকল ইওরোপীয়দের চীনা ফৌজদারী আইন অনুযায়ী, কোন অপরাধ করলে বিচার করা হত। চীনা ফৌজদারী আইন, ইওরোপীয়দের মতে ছিল বর্বর ও মধ্যযুগীয়। মোট কথা, ক্যান্টন প্রথার মাধ্যমে ইওরোপীয় বণিকদের ওপর চীং সরকার একতরফাভাবে শর্ত চাপিয়ে দেন। কিন্তু চীনা বাণিজ্যের মুনাফার লোভে দীর্ঘকাল ইওরোপীয় বণিকরা এই বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা মেনে নিয়েছিল।

ক্যান্টন প্রথার বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা

ক্যান্টন প্রথা চালু হলেও ইওরোপীয় বণিকরা এই প্রথাকে ভেঙে ফেলে কো-হং এর ব্যবস্থার একচেটিয়া বন্দোবস্ত থেকে মুক্ত হতে চেষ্টা করে। চীনের ভিতর অনুপ্রবেশ দ্বারা সাধারণ চীনা বণিকদের কাছ থেকে অপেক্ষাকৃত কম দরে মাল খরিদ, চীনের বিভিন্ন সম্পদকে গ্রাস করার জন্যে তাদের বাসনা ছিল। বিশেষভাবে ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এই ভূমিকা নেয়। চীনের সঙ্গে সমান মর্যাদায়, সমান শর্তে বাণিজ্যের অধিকার লাভের জন্যে ব্রিটিশ সরকার কয়েকবার চীং সম্রাটের দরবারে দূত পাঠান। কিন্তু চীং সম্রাট ও পেকিং দরবার বৈদেশিক বণিক ও বৈদেশিক রাষ্ট্রকে সমান মর্যাদা দিতে আদপেই রাজী ছিল না। চীং সরকার দাবী করতেন যে, মাঞ্চু সম্রাট হলেন ঈশ্বর কর্তৃক নিযুক্ত এক স্বর্গীয় ব্যক্তি। বিদেশী শক্তিগুলি তাঁর করদ (Tribute paying), অনুগ্রহ প্রার্থী শক্তি। স্বর্গীয় সম্রাটের দরবারে কোন বিদেশী রাষ্ট্রের দূত; চীং সম্রাটের সঙ্গে সমমর্যাদা দাবী করতে পারে না। চীং সম্রাটের দরবারের আদব-কায়দা মেনে সম্রাটকে কাওতাও (Kotow) বা হীনতাসূচক অভিবাদন জ্ঞাপন করে, তারপর বক্তব্য পেশ করতে হবে। অপরদিকে ইওরোপীয় আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে প্রত্যেক রাষ্ট্রনায়ক সমমর্যাদার অধিকারী ছিলেন। সুতরাং কাওতাও প্রদর্শন করলে সাক্ষাৎপ্রার্থী রাষ্ট্র চীন সম্রাটের অধীনস্থ বা সামন্ত বলে গণ্য হতে পারত। দ্বিতীয়তঃ, চীং সম্রাট এই অনমনীয় মনোভাব নেন যে, চীনে যদি ইওরোপীয় জাতি বাণিজ্য করতে চায় তবে তাদের চীনের প্রচলিত ক্যান্টন প্রথা ও চীনের আইন মেনেই করতে হবে। এর কোন নড়চড় হবে না। তৃতীয়তঃ, ইওরোপীয় বণিকরা চাইত যে, ক্যান্টন বন্দরের নিয়ন্ত্রণ এড়াতে এবং বাণিজ্যের বিস্তারের জন্যে চীনের উপকূলের আরও নতুন বন্দর তাদের জন্যে খুলে দেওয়া হোক। চীং সরকার এতে রাজী ছিলেন না।

ইওরোপীয় ও চীনাদের সংঘাত—ক্যান্টন প্রথা ভঙ্গের চেষ্টা

ইংরাজ বণিকদের বক্তব্য বুঝিয়ে বলার জন্যে লর্ড আমহার্ষ্ট, লর্ড নেপিয়ার প্রভৃতি নেতাকে দূত করে চীনে পাঠানো হলে তাঁরা কাওতাও প্রথা ও চীং সরকারের অসহযোগিতা'র জন্যে সম্রাটকে তাঁদের বক্তব্য বোঝাতে সুযোগ পাননি।

ইতিমধ্যে চীং সরকারের চীনে অহিফেন আমদানী নিষিদ্ধ আইনকে (১৮০০ খ্রীঃ) অগ্রাহ্য করে ইওরোপীয় বণিকরা, বিশেষতঃ ইংরাজ বণিকরা ক্যান্টন বন্দরে প্রভূত বে-আইনী অহিফেন আমদানী করতে থাকে। চীনারা এর ফলে অহিফেন সেবনে আসক্ত হয়। নগদ টাকা দিয়ে চীনে মাল খরিদ না করে অহিফেনের বদলে চীনা রেশম, চা ও অন্যান্য দ্রব্য তারা নিয়ে যেতে থাকে। অহিফেন সেবন ব্যাপক আকারে দেখা দিলে চীনাদের নগদ টাকায় ইওরোপীয় অহিফেন সরবরাহ করতে থাকে। চীনে অহিফেন আমদানী এক লাভজনক বাণিজ্যে পরিণত হয়। ইংরাজ বণিকরা ভারতে চাষীদের অহিফেন উৎপাদন করতে বাধ্য করত। চীনে এই অহিফেন রপ্তানি করে তারা নগদ টাকা, অথবা চীনা রেশম, চা লুঠ করে নিয়ে যেত। ১৮০০—১৮২১ খ্রীঃ পর্যন্ত গড়ে বছরে ৪৫০০ পেটি আফিম ক্যান্টনে আমদানী করা হয়। ১৮৩৮ খ্রীঃ তা দাঁড়ায় বছরে ৪০,০০০ পেটিতে। প্রতি পেটিতে ১৩৩ পাউন্ড অহিফেন থাকত।

অহিফেন বিক্রী ও চীনের সমস্যা

এর ফলে চীং সরকার দেখেন যে (১) গোটা চীনা জাতি অহিফেনে আসক্ত হয়ে কর্মক্ষমতা, উদ্যম হারিয়ে ফেলছে। চীন যেন একটি মৃত মানুষের দেশে পরিণত হতে যাচ্ছে। চীনে ১২ মিলিয়ন লোক অহিফেনে আসক্ত হয়েছে। (২) চীন থেকে অর্থ ও সম্পদ অহিফেনের বদলে লুঠ হয়ে যাচ্ছে। (৩) চীং সরকার বৈদেশিক বাণিজ্য থেকে প্রাপ্য শুল্ক পাচ্ছেন না। (৪) কো-হং প্রথা ভেঙে পড়ছে। (৫) চীং সরকারের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে বিদেশীরা আফিম আনছে। (৬) সর্বোপরি চীনে আফিমের চোরাচালান ব্যাপকভাবে চলছে।

অহিফেন আমদানির কুফল

শেষ পর্যন্ত চীং সম্রাটের নির্দেশে চীং সরকারের এক প্রবীন কর্মচারী কমিশনার লিনকে চীনে অহিফেনের চোরাচালান বন্ধ করা এবং অহিফেন আমদানী নিষিদ্ধ করে তা কার্যকরী করার দায়িত্ব দেওয়া হয় (১৮৩৯ খ্রীঃ)। কমিশনার লিন অহিফেন আমদানী বন্ধ করার জন্যে ক্যান্টনের ইওরোপীয়দের ১৩টি ফ্যাক্টরী ও তাদের আবাসস্থল অবরোধ করেন। অবরুদ্ধদের মধ্যে ছিলেন ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধি ক্যাপ্টেন এলিয়ট। অবশেষে প্রায় ২০,০০০ পেটি আফিম ইওরোপীয়রা লিনের হাতে জমা দিতে বাধ্য হয়। লিন এই আফিম প্রকাশ্যে আগুনে পুড়িয়ে দেন। ক্যান্টনে অহিফেন ঘটিত অবরোধকে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ব্রিটিশ পতাকার অবমাননা এবং আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করার কাজ বলে ঘোষণা করেন।

ক্যান্টনে ইওরোপীয় কুঠী অবরোধ

তাছাড়া চীং সরকারের সঙ্গে অতিরাষ্ট্রিক অধিকার (Ex-territorial Rights) সম্পর্কিত বিরোধ ব্রিটিশ সরকারের বাধে। চীনে ব্রিটিশ বণিকদের বিরুদ্ধে চীং সরকারের কোন অভিযোগ থাকলে, ব্রিটিশ সরকার দাবী করেন যে অতিরাষ্ট্রিক অধিকার অনুযায়ী এই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে চীনের বিচারালয়ে, চীনের আইন অনুযায়ী বিচার করা যাবে না। ব্রিটিশ কনসাল অভিযোগ পেলে তিনি তাঁর কনসুলার আদালতে চীনের অভিযোগের বিচার করে ইওরোপীয় আইন অনুযায়ী শাস্তি দেবেন। চীং সরকার মনে করেন যে, এই দাবী ছিল চীনের সার্বভৌম ক্ষমতার ক্ষতিকারক।

অতি রাষ্ট্রিক অধিকার গত বিরোধ

ব্রিটিশ দূতদের অবমাননা এবং সমান শর্তে ব্রিটিশের সঙ্গে বাণিজ্যে চীনের অসম্মতির জন্যে ব্রিটিশ সরকার আগে থেকে ক্রুদ্ধ ছিলেন। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী চীনকে উন্মুক্ত করে অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ লাভের জন্যে ব্রিটিশ সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছিল। এখন অহিফেনের

প্রথম ইঙ্গ-চীন যুদ্ধের প্রকৃত কারণ

সেবনকে উপলক্ষ করে চীন আক্রমণের সুযোগ ব্রিটিশ সরকার নেন। অহিফেন সংক্রান্ত বিরোধ ছিল ইঙ্গ-চীন যুদ্ধের উপলক্ষ্য মাত্র। সুতরাং এই যুদ্ধকে অহিফেন যুদ্ধ বলা হলেও, এই যুদ্ধ ছিল ব্রিটিশের সাম্রাজ্যবাদী ও বাণিজ্যের জন্যে আগ্রাসন। উইলোবী ও রজাসের মতে, "বোষ্টন বন্দরে চায়ের পেটি সমুদ্র জলে নিক্ষেপ যেমন ইঙ্গ-মার্কিন যুদ্ধের কারণ ছিল না, সেরূপ কমিশনার লিনের ক্যান্টন অবরোধ ও অহিফেন ধ্বংস ইঙ্গ-চীন যুদ্ধের কারণ ছিল না।" অবশ্য চীং সরকার এই যুদ্ধকে চীনের ওপর অহিফেন চাপাবার জন্যে যুদ্ধ বলে গণ্য করতেন। ব্রিটিশ সরকার এই যুদ্ধকে চীং সরকারের কাছ থেকে সমান মর্যাদা আদায় করার প্রচেষ্টা বলে অভিহিত করেন এবং ব্রিটিশ পতাকার অবমাননার শাস্তি বলে ঘোষণা করেন। ওয়েন ল্যাটিমোর (Owen Latimore) The Making of Modern China গ্রন্থে বলেছেন যে, আসলে এই যুদ্ধ ছিল চীনে ব্রিটিশের অবাধ বাণিজ্যের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং চীনের বাণিজ্য বন্দর অধিকারের জন্যে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ। "যে জাতির ক্ষমতা ছিল জাহাজ ভর্তি শিল্পদ্রব্য নিয়ে চীনের বাজারে বিক্রীর জন্যে পাঠাবার এবং সেই জাহাজ পাহারা দিয়ে বন্দর খুলে দেওয়ার জন্যে যুদ্ধ জাহাজ পাঠাবার, তারাই এই যুদ্ধ সৃষ্টি করে" (The nations which had merchant ships to send and gun boats to accompany them... made the war)। যদি অহিফেনের কারণে যুদ্ধ হত তবে, যুদ্ধের পর নানকিং-এর সন্ধিতে সেই শর্তের উল্লেখ থাকত। নানকিং-এর সন্ধিতে অহিফেন সম্পর্কিত কোন শর্তের অনুল্লেখ প্রমাণ করে যে, প্রথম ইঙ্গ-চীন যুদ্ধের কারণ ছিল অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ।

প্রথম অহিফেন যুদ্ধের ফলাফল ও নানকিং-এর সন্ধি, ১৮৪২ খ্রীঃ (The Results of the First Opium War and the Treaty of Nanking, 1842) : ১৮৪০—৪২ খ্রীঃ প্রায় দু বছর ইঙ্গ-চীন যুদ্ধ চলার পর চীং সরকার পরাজয় স্বীকার করেন। চীনের সমাজব্যবস্থা, শাসনব্যবস্থা এবং সামরিক শক্তি ছিল পিছিয়ে পড়া। সুতরাং পুরাতন ধরনের জাঙ্ক বা পালতোলা যুদ্ধ জাহাজ নিয়ে ব্রিটিশের বাষ্পচালিত যুদ্ধ জাহাজ ও আধুনিক কামানের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া সম্ভব হয়নি। ১৮৪২ খ্রীঃ নানকিং-এর সন্ধির দ্বারা প্রথম ইঙ্গ-চীন যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে।

চীনের পরাজয় ও নানকিং-এর সন্ধি, -১৮৪২ খ্রীঃ

(১) চীন যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ ব্রিটেনকে ২১ মিলিয়ন মেক্সিকান ডলার ক্ষতিপূরণ দেয়। এই অর্থ থেকে ক্যান্টনে অহিফেন ধ্বংসের ক্ষতিও পূরণ করা হয়। (২) ক্যান্টন বন্দরে কো-হং প্রথা বা ক্যান্টন প্রথার অবসান ঘটান হয়। (৩) ব্রিটেনকে হংকং দ্বীপ ও দ্বীপ সংলগ্ন চীনের মূল ভূখণ্ডের কৌলুন অঞ্চল চীন হস্তান্তর করে। (৪) চীনের ৫টি বন্দর যথা ক্যান্টন, ফুচাও, এ্যাময়, নিংপো ও সাংহাই ব্রিটিশের অধিকারে সন্ধি বন্দর বা Treaty Port-এ পরিণত করা হয়। এই বন্দরে ইংরাজ বণিকরা অবাধ বাণিজ্যের অধিকার, অতিরাষ্ট্রিক অধিকার প্রভৃতি লাভ করে। এই সকল বন্দরে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, বিচার কাজের জন্যে ব্রিটিশ কনসাল নিযুক্ত হয়।

নানকিং-এর সন্ধি ছিল চীনে ইওরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের অনুপ্রবেশের বর্শাফলক। এই সন্ধি স্বাক্ষরিত হলে, অন্যান্য ইওরোপীয় জাতিগুলিও চীনের ওপর সমান শর্তে সন্ধি স্থাপন করে। ব্রিটেন নানকিং-এর সন্ধির পরিপূরক হিসেবে বুজের (Treaty of Bouge, 1843) সন্ধি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ওয়াংশিয়ার সন্ধি এবং ফ্রান্স হোয়ামপোয়ার সন্ধি (১৮৪৪ খ্রীঃ) চীনের ওপর চাপায়। এই সন্ধিগুলিতে "বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত জাতির" সূত্র (Most favoured nation clause) যোগ করা হয়। অর্থাৎ একটি রাষ্ট্র সন্ধির দ্বারা যে সকল অধিকার পাবে, অন্য রাষ্ট্রকেও

নানকিং-এর সন্ধির গুরুত্ব ও অন্যান্য বৈষম্যমূলক সন্ধি

তা দিতে হবে। চীনের ওপর এর ফলে একগুচ্ছ বৈষম্যমূলক সন্ধি চাপান হয়, যার ফলে চীনের সার্বভৌম অধিকার বিনষ্ট হতে থাকে। দ্বিতীয়তঃ, নানকিং-এর সন্ধি ছিল চীনে ইওরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী ও বণিক শক্তির অনুপ্রবেশের প্রথম পদক্ষেপ। চীনের বিশাল আকৃতি ও বিরাট লোকসংখ্যা থাকা সত্বেও, প্রথম ইঙ্গ-চীন যুদ্ধে তার শোচনীয় পরাজয়, চীনের পতনের ঘণ্টাধ্বনি বাজিয়ে দেয়। এর পর চীনের ওপর সন্ধির পর সন্ধি চাপিয়ে চীনকে ইওরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তিগুলি শোষণ করে ছিবড়েয় পরিণত করে। তৃতীয়তঃ, ৫টি সন্ধি বন্দরে ইওরোপীয়রা অবাধ বাণিজ্য শুরু করলেও, তারা চীং সরকারকে নির্দিষ্ট হারে মাত্র ৫% শুল্ক দিতে রাজী হয়। চীং সরকারের শুল্কখাতে আয় অত্যন্ত সীমিত হয়। চতুর্থতঃ, সন্ধি বন্দরগুলিতে অতিরাষ্ট্রিক অধিকার স্থাপিত হলে এই অঞ্চলগুলিতে চীনা আইন রদ হয়ে যায়। চীনের সমাজ বিরোধীরা মূল চীনে অপরাধ করে, চীনের আইন ও পুলিসকে অগ্রাহ্য করে সন্ধি বন্দরে আশ্রয় নিতে থাকে। পঞ্চমতঃ, নানকিং-এর সন্ধির ফলে চীং সরকার তার শ্রেষ্ঠত্বের ধ্যান-ধারণা বিসর্জন দিয়ে, ইওরোপীয় শক্তিগুলিকে সমান মর্যাদা দিতে বাধ্য হয়। চীনের ভাঙন প্রকট হয়। চীন যদিও তখনও পর্যন্ত তার কনফুসিয়বাদী সভ্যতাকে আঁকড়ে থাকে, তবে বুঝা যায় যে, চীনের সমাজ, শিক্ষা, প্রশাসন সকল কিছুর আধুনিকীকরণ না হলে চীনের স্বাধীনতা রক্ষা করা যাবে না। অবশ্য চীনের এই জ্ঞান সঠিকভাবে আসতে আরও কয়েকটি সাম্রাজ্যবাদী আঘাতের দরকার হয়। সর্বোপরি, মাঞ্চু সরকার চীনকে রক্ষায় অসমর্থ হলে চীনে তাইপিং বিপ্লব দেখা দেয়।

চীনে তাইপিং বিপ্লব, ১৮৫০ খ্রীঃ (The Taiping Revolution in China, 1850) ঃ ১৮৪০ খ্রীঃ থেকে চীনে একটি অন্তর্বিপ্লব আসন্ন হয়। বিভিন্ন কারণে চীনা জনসাধারণের মনে চীং বা মাঞ্চু সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ জমা হয়েছিল। রাজনৈতিক দিক থেকে চীনা দেশপ্রেমিকদের মনে চীং সরকারের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে ক্ষোভ জমা ছিল। চীনা দেশপ্রেমিকরা ছিল গোঁড়া এবং চীনের চিরায়ত কনফুসিয় মতবাদে দৃঢ় বিশ্বাসী। তারা মনে করত যে, মাঞ্চু বা চীং রাজবংশের দেহে খাঁটি চীনা রক্ত প্রবাহিত ছিল না। তাদের চোখে মাঞ্চু বা চীং রাজবংশ ছিল বিদেশী। এজন্য তারা চাইত যে, চীং রাজবংশের পতন ঘটিয়ে খাঁটি চীনা রাজবংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত করা দরকার। চীনা বা 'মিং' শাসন না থাকার জন্যই চীনের অগ্রগতি হয়নি, এখন বিদেশী ইংরাজদের হাতে চীনের পরাজয় ঘটছে। এজন্য এই দেশপ্রেমীরা ধ্বনি তোলে যে, "চীংদের বিতাড়িত কর; মিংদের পুনঃস্থাপন কর" (Throw back the Ching ; Bring back the Ming)। তাইপিং বিপ্লবে এই খাঁটি চীনা ভাবধারার শাসন প্রতিষ্ঠার জন্যে আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়।

চীনা জাতীয়তাবাদীদের মাঞ্চু বিরোধিতা

প্রথম ইঙ্গ-চীন যুদ্ধে চীনের শোচনীয় পরাজয় ছিল চীনবাসীদের কাছে অপ্রত্যাশিত। ইওরোপে শিল্প-বিপ্লব, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, জাতীয়তাবাদী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ফলে যে পরিবর্তনের স্রোত দেখা দেয়, বেশীর ভাগ চীনা তার কোন খোঁজ রাখত না। বিশ্বজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, তারা কূপমণ্ডুকের মত চীনের শ্রেষ্ঠত্ব, চীনের বিশাল সামাজিক ক্ষমতা প্রভৃতি ভ্রান্ত ধারণায় আচ্ছন্ন ছিল। এই সকল নাগরিকদের মনে প্রথম ইঙ্গ-চীন যুদ্ধে চীনের পরাজয় এক গভীর হতাশা সৃষ্টি করে। এজন্য তারা চীং বা মাঞ্চু সরকারকেই দায়ী করে। অজ্ঞাত বিদেশীরা তাদের শ্রেষ্ঠ যুদ্ধাস্ত্র এবং বিজাতীয় সভ্যতা ও ধর্ম নিয়ে চীনে প্রবেশ করায় রক্ষণশীল চীনবাসীরা আশঙ্কা করে যে, চীনের সভ্যতা ও স্বাধীনতা এই অনুপ্রবেশ সহ্য করতে পারবে না। এই সব কিছুর জন্যে তারা চীং সরকারকে দায়ী করে তার পতন ঘটাতে চায়।

প্রথম ইঙ্গ-চীন যুদ্ধে পরস্পরের প্রভাব

রাজনৈতিক ক্ষোভের পশ্চাতে অর্থনৈতিক কারণগুলি সক্রিয় ছিল। ১৮৪০ খ্রীঃ থেকে চীনের জনসংখ্যা দারুণ বাড়ছিল। সেই তুলনায় কাজের সুযোগ ও খাদ্য উৎপাদন চীনে ছিল না। মধ্য চীনে যে গ্র্যান্ড ক্যানাল (Grand Canal) পীত নদী ও ইয়াংসিকে যুক্ত করেছিল এবং যা ছিল পীত নদীর বন্যার জল নিকাশীর প্রধান পথ, তার সংস্কার না হওয়ায় বুজে যায়। দুর্নীতিগ্রস্থ প্রশাসন পীত নদীর বাঁধ মেরামতি ও গ্র্যান্ড ক্যানালের পলি তোলার কাজে বহু বছর অবহেলা করে। গ্র্যান্ড ক্যানালের পথে নৌকাযোগে উত্তর ও দক্ষিণ চীনের মধ্যে উদ্বৃত্ত অঞ্চল থেকে ঘাটতি অঞ্চলে খাদ্য পরিবহণ হত। এখন এই খাল বুজে যাওয়ায় খাদ্য ও মাল পরিবহণ বন্ধ হয়। ঘাটতি অঞ্চলে খাদ্যাভাবে হাহাকার দেখা দেয়। অবশেষে ১৮৫২ খ্রীঃ গ্র্যান্ড ক্যানালের পথে জল নিকাশী না হওয়ায় পীত নদের বন্যার জল নতুন খাতে শান্টুং প্রদেশ দিয়ে বইতে থাকে। পীত নদের বন্যা, খাদ্য সংকট এবং বন্যার জলে কৃষিক্ষেত্র প্লাবিত হলে চারদিকে দুর্ভিক্ষ ও হাহাকার দেখা দেয়। সাধারণ লোকে বিশ্বাস করত যে, ঈশ্বরের যে আদেশ বলে চীং সম্রাট রাজত্ব করতেন, ঈশ্বর সেই আদেশ প্রত্যাহার করায় দেশে এত দুর্দশা দেখা দিয়েছে। (The Mandate of Heaven has been withdrawn)। সুতরাং চীং সরকারকে এখন বিতাড়িত করা দরকার।

অর্থনৈতিক কারণ

ক্যান্টন বন্দর থেকে এতদিন ইওরোপীয়রা কো-হং বণিকদের মাধ্যমে মাল খরিদ করত। চীনের কিয়াংসি ও হুনান প্রদেশ থেকে সুদূর ক্যান্টন বন্দর পর্যন্ত আভ্যন্তরীন মাল পরিবহণের কাজ হাজার হাজার মালবাহী শ্রমিক করত। তাছাড়া নৌকাযোগেও মাল পরিবহনের জন্যে হাজার হাজার নৌকায় মাঝি ও সহকারীরা কাজ করত। প্রধানতঃ চা ও রেশম পরিবাহিত হত। এই সকল দরিদ্র শ্রমিকের এই মাল পরিবহণই ছিল একমাত্র জীবিকা। চীনের এই নদীপথ ও উপকূলের সমুদ্রপথে বহু জলদস্যু মালপত্র লুঠ করে জীবিকা অর্জন করত। এরকম হাজার হাজার বোম্বেটে দক্ষিণ চীনে ছড়িয়েছিল। এদের সঙ্গে গুপ্ত বিপ্লবীদের সংযোগ ছিল। ১৮৪২ খ্রীঃ নানকিং-এর সন্ধির পর এই মালবাহী শ্রমিক ও লুণ্ঠনজীবি বোম্বেটের জীবিকার বিরাট ক্ষতি হয়। যেহেতু চীনে চা ও রেশম উৎপাদনকারী অঞ্চল ছিল সাংহাই বন্দরের কাছাকাছি এবং যেহেতু নানকিং-এর সন্ধির দ্বারা সাংহাই বন্দর ইংরাজ বণিকদের হাতে আসে, সেহেতু আর ক্যান্টন বন্দর পর্যন্ত পরিবহণের দরকার ছিল না। নিকটস্থ সাংহাই বন্দরে চা ও রেশম সহজে চলে আসে। এজন্য হাজার হাজার মালবাহক জীবিকাচ্যুত হয়। এদিকে ব্রিটিশ যুদ্ধ জাহাজ চীনের দক্ষিণ উপকূলে জলদস্যুদের দমন করায় বোম্বেটেরাও জীবিকাচ্যুত হয়। এই ভাসমান, জীবিকাহীন শ্রেণী তাইপিং সেনাদলে নাম লেখায়।

শ্রমিক ও বোম্বেটেদের হতাশা

দক্ষিণ চীনের বিভিন্ন প্রদেশের ওপর চীং সম্রাটের নিয়ন্ত্রণ উত্তর চীন অপেক্ষা অনেক শিথিল ছিল। কোয়াংটুং, কোয়াংশি, দক্ষিণে হুনান প্রদেশে ক্যান্টনের বৈদেশিক বাণিজ্য, বৈদেশিক ভাবধারার অনুপ্রবেশের জন্যে চীং সম্রাটের প্রতি আনুগত্য ক্ষীণ ছিল। তাছাড়া এই অঞ্চলগুলি পিকিং (বেইজিং) থেকে অনেক দূরে অবস্থিত হওয়ায়, এই অঞ্চলে সম্রাটের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ শিথিল ছিল। তাছাড়া সরকারি কর্মচারি বা ম্যান্ডারিন সম্প্রদায় ছিল দুর্বিনীত, দুর্নীতিপরায়ণ। ইঙ্গ-চীন যুদ্ধে চীং সরকারের পরাজয়ের ফলে, এই অঞ্চলে বিদ্রোহ স্বভাবতই দানা বাঁধে।

দক্ষিণ চীনে শিথিল প্রশাসনের ফল

শেষ পর্যন্ত এই বিক্ষোভ সম্মিলিত হয়ে তাই-পিং বিপ্লবে পরিণত হয়। চীনে কমিউনিষ্ট বিপ্লবের আগে পর্যন্ত, যে কোন বিপ্লব একটি ধর্মীয় আবরণে দেখা দিত। তাই-পিং বিপ্লবেও

তার ব্যতিক্রম হয়নি। হুং-সিউ-চুয়ান (১৮১৪-৬৪ খ্রীঃ) নামে এক পণ্ডিত লোক, যিনি কনফুসিয়াসের দর্শণে বিজ্ঞ ছিলেন, এক সময় প্রোটেষ্টান্ট খ্রীষ্টীয় মিশনারীদের সংস্পর্শে আসেন এবং প্রোটেষ্টান্ট বাইবেল পাঠ করার পর, আদি বাইবেলের Ten Commandments বা দশটি ধর্মীয় আদেশের অনুকরণে চীনে তাই-পিং বা "প্রকৃত শান্তি" ধর্ম আন্দোলন শুরু করেন। হুং-এর সহকারী ছিলেন ফেং উন-শান এবং ইয়াং-শিউ-চিং প্রভৃতি। হুং প্রচার করেন যে, তিনি ঈশ্বর আদিষ্ট এক শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্যে ঈশ্বর কর্তৃক আদিষ্ট। এই শান্তির রাজ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠা করা হবে। তিনি তাঁর শিষ্যদের নিয়ে "ঈশ্বর উপাসক সঙ্ঘ" (God Worshippers Society) গঠন করেন। চীং সরকারের প্রতি অসন্তুষ্ট হাজার হাজার লোক, দরিদ্র কৃষক, জীবিকাহীন বেকার, ইয়াংসি উপত্যকার সমাজবিরোধী দস্যুরা, মালবাহক, নৌকা-মাঝি, জলদস্যু প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর লোক তাই-পিং গোষ্ঠীতে যোগ দেয়।

হুং-সিউ-চুয়ান ও তাঁর ধর্মীয় মতবাদ

হুং ক্রমে চীং বা মাঞ্চু রাজবংশের উচ্ছেদ দ্বারা চীনে নতুন ঐশ্বরিক রাজবংশ প্রতিষ্ঠা ও তাই-পিং আদর্শে গঠিত সমাজ ব্যবস্থা স্থাপনের ঘোষণা দেন। হুং নিজে স্বর্গীয় সম্রাট (তিয়েন-ওয়াং) উপাধি নেন। তিনি তাই-পিং বা স্বর্গীয় শান্তি নামটি প্রাচীন চীনা সাহিত্য থেকে গ্রহণ করেন। হুং-এর প্রধান সামরিক ও প্রশাসনিক সহকারি রূপে ইয়াং-শিউ-চিং দায়িত্ব নেন। তিনি পূর্ব চীনের রাজা ও প্রধান সেনাপতি রূপে নিজেকে ঘোষণা করেন। তাই-পিং বাহিনী উত্তর চীন আক্রমণের জন্যে এগিয়ে যায়। হুপে দখলের পর, নৌকাযোগে ইয়াংসি পার হয়ে, ১৮৫৩ খ্রীঃ তারা চীনের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর নানকিং দখল করে। এরপর তাই-পিং বাহিনী রাজধানী পিকিং দখলের জন্যে উত্তর চীনে অভিযান করে। কিন্তু কামান না থাকায় ও উত্তর চীনের প্রচণ্ড শীতে ক্লান্ত হয়ে, চীং সরকারের সেনাদের আক্রমণে তারা টিয়েন্টসিন থেকে পিছু হঠে আসে। নানকিং নগরে রাজধানী স্থাপন করে, দক্ষিণ চীনে তাই-পিং বিপ্লবীরা তাদের শক্তি সংহত করে। চীনের উর্বরা অঞ্চল ইয়াংসি উপত্যকা তারা প্রায় ১১ বছর অধিকারে রাখে এবং এই অঞ্চলে তাই-পিং শাসন প্রবর্তন করে।

চিং বংশের বিরোধিতা দক্ষিণ চীনে বিপ্লব

ইয়াংসি উপত্যকার অধিকৃত অঞ্চলে তাই-পিং গোষ্ঠী তাদের নিজস্ব ভাবধারা অনুযায়ী ভূমি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার চালু করে। তারা চীনে এক নতুন পরীক্ষা শুরু করে। ইয়াং-সিউ-চিং ছিলেন এই সংস্কারগুলির কার্যকরী প্রবক্তা। সংস্কারের ভাবধারাগুলি অবশ্য ছিল হুং-সিউ-চুয়ানের মস্তিষ্ক প্রসূত। বিপ্লবী বাহিনীর মধ্যে ইয়াং কঠোর শৃঙ্খলা স্থাপন করেন। ব্রহ্মচর্য পালন ছিল তাই-পিং বাহিনীর পক্ষে বাধ্যতামূলক। তাই-পিং নারী-পুরুষরা আলাদা স্থানে বাস করত। তাই-পিং সমাজে নারী-পুরুষের সমান অধিকার ছিল। নারীরাও শ্রমসাধ্য কাজ এবং সামরিক জীবন গ্রহণের অধিকার পায়। নারীদের পক্ষে হীনতাসূচক পায়ে কাঠের জুতা পরা নিষিদ্ধ করা হয়। নারীরাও অফিসার ও প্রশাসকের পদে নিযুক্ত হয়। ক্রীতদাস প্রথা, তন্ত্রমন্ত্র, কুসংস্কার, জুয়া খেলা, মদ্যপান, অহিফেন সেবন, ধূমপান নিষিদ্ধ করা হয়। চীং সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী চীনা পুরুষদের মাথায় বেশী চুল রাখা নিষিদ্ধ করা হয়। তাই-পিং সদস্যরা মাথার চুল না কেটে এমনিই রাখত। হুং নিজেকে ঈশ্বরের দ্বিতীয় পুত্র বলে দাবী করেন। মূর্তিপূজা ও মন্দিরে উপাসনা নিষিদ্ধ করা হয়।

তাই পিং সংস্কার ও তাই পিং সমাজ গঠন

তাই-পিং সমাজে সাম্যবাদী ধ্যান-ধারণা প্রচারিত ছিল। সকল তাই-পিং ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। এক প্রকার আদিম সাম্যবাদী আদর্শ নিয়ে তাই-পিং সমাজ গঠন করা হয়। ভূমিসংস্কার দ্বারা সামন্তপ্রথা ধ্বংস করে তাই-পিং সাম্যবাদ অনুযায়ী ভূমি বন্টণ করা হয়। পরির্বারের সদস্য অনুযায়ী পরিবার-পিছু জমি বন্টণ করা হয়। ২৫টি পরিবার নিয়ে একটি করে ইউনিট গঠন করা হয় এবং সেই অনুপাতে জমি বন্টণ করা হয়। সকল তাই-পিং সদস্যদের তাদের আয় সমবায় শিবিরে জমা দিতে হত এবং সমবায় থেকে তাদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা হত। তাই-পিং সদস্যদের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ, শিক্ষা ব্যবস্থা, সমবায় দ্বারা সমাধান করা হত। প্রতি তাই-পিং সদস্য এই সমাজব্যবস্থা রক্ষার জন্যে দরকার হলে অস্ত্রধারণে বাধ্য ছিল।

ভূমিসংস্কার ও তাই পিং সমাজতন্ত্র

কিন্তু তাই-পিং আদর্শে বহু বিচ্যুতি ঘটে। নেতাদের মধ্যে স্বার্থপরতা, অর্থ লোভ ও ক্ষমতার লড়াই দেখা দেয়। অনেক নেতা ব্রহ্মচর্য পালন না করে একাধিক পত্নী গ্রহণ করেন এবং কেন্দ্রীয় নেতাকে অগ্রাহ্য করে স্ব স্ব প্রাধান্য স্থাপন করেন। লি শিয়েন লুং (Li-Chien-Lung) প্রভৃতি ঐতিহাসিকের মতে, কমিউনিষ্ট চীনের রূপকার মাও-সে-তুং এর ভাবধারায়, তাই-পিং ভাবধারার প্রভাব আছে। তবে মূলতঃ এবং বিশদভাবে মাও-সে-তুং এর ভাবধারার ওপর তাই-পিং আদর্শের প্রভাব বিশেষ কিছু ছিল না। মাও মার্কসবাদকে চীনের উপযোগী করে প্রয়োগ করেন।

তাই পিং আদর্শের ত্রুটি বিচ্যুতি

তাই-পিং বিপ্লব শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। চীং সরকার ইওরোপীয়দের সহায়তায় যে New Model Army গঠন করেন, তার সাহায্যে তাই-পিং বিদ্রোহ চূর্ণ করা হয়। হুয়াং-এর সঙ্গে ইয়াং-এর মতভেদ দেখা দিলে, ইয়াং তাঁর নির্দেশে নিহত হন। অপর তাই-পিং নেতা শি-তা-কাই নতুন গোষ্ঠী গঠন করেন। নানকিং-এর পতন হলে হুয়াং আত্মহত্যা করেন। কনফুসিয় মতবাদে বিশ্বাসী চীনা বুদ্ধিজীবিরা চীং সরকারকে সাহায্য করায় জনমত তাই-পিং গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে চলে যায়।

তাই পিং বিপ্লবের অবসান

তাই-পিং বিদ্রোহের প্রভাব চীনের ওপর ছিল সুদুর-প্রসারী। এই বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ ফল ছিল যে, ইয়াংসি অঞ্চলের বহু সমৃদ্ধ প্রদেশ এই বিদ্রোহের ফলে ধ্বংস হয়, বহু লোক তাদের জীবিকা থেকে উৎখাত হয় এবং চীং সরকারের রাজস্ব সংগ্রহ ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এই বিদ্রোহ দমনের সময় চীনের "নব সেনাদল" বা New Model Army যে নিষ্ঠুরতা দেখায় তার ফলে বহু লোক হতাহত হয়। দ্বিতীয়তঃ, তাই-পিং বিদ্রোহের প্রকৃতি সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও, প্রায় সকল ঐতিহাসিক এই বিদ্রোহের পরোক্ষ ফলগুলির গুরুত্ব স্বীকার করেন। এই বিদ্রোহ ছিল চীনে মাঞ্চু বা চীং সরকারের শাসনব্যবস্থার প্রতি চীনা জনগণের গভীর অনাস্থার প্রকাশ। যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে এই বিদ্রোহ ঘটে তা দূর করতে চীং সরকার ব্যর্থ হন। মাঞ্চু সরকারের পতনের প্রথম লাল সঙ্কেত ছিল তাই-পিং বিপ্লব। তৃতীয়তঃ, এই বিদ্রোহ দমনে মাঞ্চু সরকারের প্রাথমিক বিফলতা প্রমাণ করে যে, মাঞ্চু শাসন ভেঙে পড়ছে। বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি চীং সরকারের এই দুর্বলতা দেখে চীনের ওপর তাদের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন জোরদার করে। তাই-পিং বিপ্লবের পরেই, দ্বিতীয় ইঙ্গ-চীন যুদ্ধ এবং পেকিং-এর সন্ধির দ্বারা বিদেশী শক্তির কাছে চীনের আত্মসমর্পণ ঘটে। চতুর্থতঃ, তাই-পিং বিদ্রোহে চীনা কৃষক শ্রেণীর স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন, এই ইঙ্গিত দেয় যে, চীনের অগ্রগতির জন্যে সামন্ত প্রথা লোপ করে ভূমিসংস্কারের সর্বাধিক প্রয়োজন আছে। সর্বশেষে, তাই-পিং বিদ্রোহের শিক্ষা পরবর্তীকালে চীনে কমিউনিষ্ট বিপ্লবের পথিকৃৎ মাও-সে-তুং নেন বলে

তাই পিং বিপ্লবের প্রভাব ও ফলাফল

অনেকে মনে করেন। এই বিদ্রোহ দমনের জন্যে চীং সরকার যে প্রাদেশিক সেনাদল গঠন করেন, ক্রমে সেই সেনাদের সেনাপতিরা নিজ নিজ অঞ্চলে অর্দ্ধস্বাধীন শাসকে পরিণত হন। এভাবে চীনে সামরিক একনায়কতন্ত্র বা War Lordism-এর পথ প্রশস্ত হয়।

দ্বিতীয় ইঙ্গ-চীন যুদ্ধ ঃ টিয়েন্টসিন ও পেকিং-এর সন্ধি ঃ চীনে ইওরোপীয় অনুপ্রবেশ (The Second Anglo-Chinese War : The Treaty of Tientsin and the Treaty of Peking : The European penetration in China) ঃ প্রথম ইঙ্গ-চীন যুদ্ধ ও নানকিং-এর সন্ধির দ্বারা (১৮৪২ খ্রীঃ) চীনে বাণিজ্যিক ও ভৌমিক অধিকার ইওরোপীয় শক্তিগুলি কিছুটা লাভ করে। কিন্তু নানকিং-এর সন্ধির দ্বারা এই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির ক্ষুধার পরিতৃপ্তি হয়নি। চীনে আরও বিস্তৃত অধিকার লাভের জন্যে তারা সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। ইংলন্ড তার শিল্প-বিপ্লবের সর্বোচ্চ সীমায় উপনীত হলে উদ্বৃত্ত শিল্পদ্রব্য বিক্রীর জন্যে বাজার দখলের চেষ্টায় ছিল। চীনের বিশাল বাজার দখল করা ছিল এই বণিক কোম্পানীগুলির লক্ষ্য। (২) ইঙ্গ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির অভিযোগ ছিল যে, চীং সরকার নানকিং-এর সন্ধির শর্তগুলি পালনে আগ্রহশীল নয়। বলপ্রয়োগ না করলে চীং সরকারকে সন্ধির শর্ত পালনে বাধ্য করা যাবে না। (৩) অতিরাষ্ট্রিক অধিকার (Right of Ex-territoriality) সংক্রান্ত বিষয়ে ইংলন্ডের সঙ্গে চীং সরকারের বিরোধ দেখা দেয়। চীং সরকারের দাবী ছিল যে, চীনে অপরাধ করে যদি কোন চীনা নাগরিক Treaty Port বা সন্ধি বন্দরে আশ্রয় নেয়, তবে তাকে গ্রেপ্তার করে চীনা কর্তৃপক্ষের হাতে দিতে হবে এবং চীনা আইনে তার বিচার হবে। অপরদিকে ইওরোপের কোম্পানীগুলি দাবী করে যে, সন্ধি বন্দরে তাদের চীনা অপরাধীদের রাজনৈতিক আশ্রয়দানের অধিকার আছে। যদি অপরাধীর বিচার হয় তবে সংশ্লিষ্ট দেশের কনসাল, সেই দেশের আইন অনুযায়ী বিচার করবেন। এ বিষয়ে তীব্র মতভেদ দেখা দেয়। (৪) ক্যান্টন বন্দরে আগের মতই শ্বেতাঙ্গ বণিকদের নীচু চোখে দেখা হত এবং বন্দরের নির্দিষ্ট এলাকার বাইরে তাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করা হয়। এজন্য ব্রিটেনের সঙ্গে চীং সরকারের বিরোধ দেখা দেয়। চীনের নবীন সম্রাট সিয়েন ফেং ছিলেন তীব্র ইওরোপীয় বিরোধী। ব্রিটিশ দূতদের কোন কথা তিনি কানে নিতে চাননি। সিয়েন ফেং মনে করতেন যে, এই "বিদেশী শয়তানরা" (foreign devils) ছলে, বলে চীন ও তার সম্পদ দখল করতে চায়। (৫) ১৮৫৪ খ্রীঃ থেকে ব্রিটেন ও আমেরিকা চীনের সঙ্গে স্বাক্ষরিত সন্ধি সংশোধন করে নতুন শর্ত গ্রহণের জন্যে চীং সরকারকে চাপ দেয়। এ বিষয়ে যে আলোচনা হয় তাতে বিদেশী শক্তিগুলি বুঝে ফেলে যে, বিনা বলপ্রয়োগে চীং সরকারকে নতুন শর্তে সন্ধি স্বাক্ষরে রাজী করা যাবে না। ১৮৫৩ খ্রীঃ আমেরিকা জাপানের ওপর একতরফাভাবে একগোছা বৈষম্যমূলক সন্ধি চাপালে চীন এই দৃষ্টান্ত দেখে ভয় পেয়ে যায়। সুতরাং সন্ধি পরিবর্তনে চীং সরকার রাজী হয়নি। (৬) এই পটভূমিকায় ব্রিটিশ বিদেশমন্ত্রী লর্ড পামারস্টোন ও ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন চীনকে আক্রমণের অজুহাত খোঁজার চেষ্টা করেন। (৭) ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন এর আগে ব্রিটেনের মিত্রশক্তি হিসেবে ক্রিমিয়ার যুদ্ধে যোগ দেন। এই যুদ্ধ শেষ হলে তিনি ইঙ্গ-ফরাসী মিত্রতাকে আরো জোরালো করার জন্যে ইংলন্ডের পক্ষ নিয়ে ইঙ্গ-চীন যুদ্ধে যোগ দেন। চীনে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে রত জনৈক ফরাসী ক্যাথলিক মিশনারী নিহত হলে, এই অজুহাতে তিনি ইংলন্ডের সঙ্গে যোগ দিয়ে ফরাসী সেনাদল চীন আক্রমণে পাঠান।

দ্বিতীয় ইঙ্গ-চীন যুদ্ধের কারণগুলি

দ্বিতীয় ইঙ্গ-চীন যুদ্ধে চীনা জাহাজগুলি ও উপকূলের দুর্গগুলি ইঙ্গ-ফরাসী গোলাবর্ষণে ধ্বংস হলে, চীং সম্রাট ১৮৫৮ খ্রীঃ টিয়েন্টসিনের সন্ধি স্বাক্ষর করেন। এই সন্ধির দ্বারা চীনের উপকূলে

দ্বিতীয় ইঙ্গ-চীন যুদ্ধে চীনের পরাজয় ও টিয়েন্টসিনের সন্ধি

আরও ১১টি বন্দর ইওরোপীয়দের অবাধ বাণিজ্যের জন্যে খুলে দেওয়া হয়। নানকিং-এর সন্ধির ৫টি বন্দর এর সঙ্গে যোগ করলে চীনের উপকূলে অবস্থিত ১১+৫ = মোট ১৬টি বন্দর ইওরোপীয় বণিকদের জন্যে চীন খুলে দেয়। চীনের রাজধানী পেকিংএ ইওরোপীয় জাতিগুলির দূতাবাস স্থাপনে চীং সম্রাট সম্মতি দেন। এই দূতাবাসের দূতরা চীনের কূটনৈতিক সমান অধিকার ভোগ করবে বলা হয়।

টিয়েন্টসিনের সন্ধি স্বাক্ষরের পর, এই সন্ধিকে কার্যকরী করতে চীং সরকার রাজী হননি। ইংরাজ ও ফরাসী দূতগণ ষ্টীমার যোগে পেকিং যাওয়ার চেষ্টা করলে; টাকু দুর্গ থেকে চীনা সেনা গোলা ছুঁড়ে ৪টি ব্রিটিশ গানবোট ডুবিয়ে দেয়। এর ফলে ইংরাজ সরকার ৪১টি যুদ্ধ জাহাজ ও ভারত থেকে ১০৫০০ শিখ সেনা এবং ফরাসী সরকার ৬০টি যুদ্ধজাহাজ, ৬৩০০ সেনা পেকিং আক্রমণের জন্যে পাঠায়। ইঙ্গ-ফরাসী সেনা চীনা বাহিনীকে পরাস্ত করে পেকিং নগরে ঢুকে পড়লে, চীং সম্রাট বাধ্য হয়ে পেকিং-এর সন্ধি, ১৮৬০ (Treaty of Peking, 1860) স্বাক্ষর করেন।

পেকিং-এর সন্ধি ১৮৬০

পেকিং-এর সন্ধির (১৮৬০ খ্রীঃ) দ্বারা টিয়েন্টসিনের সন্ধির শর্তগুলি মানতে চীং সম্রাট অঙ্গীকার দেন। (২) যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ মোটা টাকা ইঙ্গ-ফরাসী শক্তিকে সম্রাট দেন। (৩) হংকং দ্বীপের সংলগ্ন কৌলুন উপদ্বীপ ব্রিটেনকে হস্তান্তর করা হয়। (৪) ফরাসী ক্যাথলিক মিশনারীদের চীনে নিরাপদে ধর্মপ্রচার এবং ভূসম্পত্তি ক্রয় ও গীর্জা নির্মাণের অধিকার সম্রাট দেন। (৫) চীনের ১৬টি বন্দরে ইওরোপীয় বণিকরা চীং সম্রাটকে একটি যৎসামান্য বাণিজ্য শুল্ক দিতে স্বীকৃতি দেয়। (৬) ইওরোপীয় বণিকরা চীনে অতি রাষ্ট্রিক অধিকার পায়। (৭) সন্ধি বন্দরগুলির শাসন, বিচার ইওরোপীয় কনসালগণই করবেন বলে স্থির করা হয়। (৮) চীনে সন্ধি স্বাক্ষরকারী দেশগুলি "বিশেষ অনুগৃহীত বাণিজ্যের শর্ত" (Most favoured nation clause) ভোগ করার অধিকার পায়।

পেকিং-এর সন্ধির শর্তগুলি

পেকিং-এর সন্ধির[১] দ্বারা কার্যতঃ শুধু চীনের উপকূল নয়, চীনের অভ্যন্তর ভাগও ইওরোপীয় বণিকদের জন্যে খুলে দিতে হয়। সন্ধির শর্তে "১১টি বন্দর ও সংযুক্ত অঞ্চল" কথাটি থাকায় ধূর্ত ইওরোপীয় দূতরা ব্যাখ্যা করে যে, "সংলগ্ন অঞ্চল" কথাটির অর্থ হল, যে নদী বা পথ দেশের ভেতর দিয়ে উপরোক্ত বন্দরের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, তা বোঝায়। এই ব্যাখ্যার ফলে চীনের ভেতর ইওরোপীয় বণিকরা অবাধে প্রবেশ করতে থাকে। চীনের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক স্বাধীনতা বিনষ্ট হয়। দ্বিতীয়তঃ, পেকিংএ বিভিন্ন দেশের দূতাবাস স্থাপিত হলে, দূতরা কূটনৈতিক সমমর্যাদা লাভ করায়, মাঞ্চু সম্রাটের শ্রেষ্ঠত্বের দাবীও বিনষ্ট হয়। তৃতীয়তঃ, পেকিং-এর সন্ধির সূত্র ধরে ইওরোপের অধিকাংশ জাতি চীনের ওপর সমান শর্তে বাণিজ্যিক ও কূটনৈতিক শর্তযুক্ত সন্ধি চাপিয়ে দেয়। চতুর্থতঃ, চেফু কনভেনশন (Chefoo Convention) ১৮৭৬ খ্রীঃ দ্বারা চীনের আরও ৪টি বন্দর ইওরোপীয়দের জন্যে খুলে দিলে, গোটা ইয়াংসি উপত্যকায় কার্যতঃ ইওরোপীয়দের অনুপ্রবেশ সম্পূর্ণ হয়। চীনের যাবতীয় রপ্তানি ও আমদানী বাণিজ্য, এমনকি অন্তর্বাণিজ্য ইওরোপীয় বণিকরা দখল করে নেয়।

পেকিং-এর সন্ধির গুরুত্ব

চীনের ব্যবচ্ছেদ (১৮৫৩—১৮৯৯ খ্রীঃ) ঃ চীনে প্রভাবাধীন অঞ্চল গঠন (The Cutting of the Chinese Melon : The creation of Spheres of Influence in China, 1853—1899) ঃ নানকিং-এর সন্ধির দ্বারা চীং

---

১. আধুনিক উচ্চারণ বেইজিং।

সরকারের সামরিক দুর্বলতা প্রকটিত হলে ইওরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি চীনকে ব্যবচ্ছেদ করার জন্যে লালায়িত হয়। চীনের ওপর এই সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনকে ঐতিহাসিকরা নানা ভাবে ব্যাখ্যা করেন। হবসন তত্ত্ব অনুসারে শিল্প-বিপ্লবের ফলে এবং পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার দরুণ শিল্পপতি ও ব্যক্তি মালিকদের মুনাফা পাহাড়ের মত জমে যায় (Glut of Capital)। পুঞ্জীভূত মূলধনে লগ্নীর অভাবে ছাতা পড়তে থাকে। এই মূলধনীরা আরও বেশী মুনাফার লোভে নিজ নিজ সরকারকে উপনিবেশ দখলের জন্যে চাপ দেয়। তাদের উদ্দেশ্য ছিল নতুন উপনিবেশে মূলধন লগ্নী করে আরও মুনাফা লাভ করা। মার্কসীয় তত্ত্ববিদ লেনিন বলেন যে—(ক) কেবলমাত্র মুনাফা বিনিয়োগ নয়, উপনিবেশের শ্রমিকদের কম মজুরীতে কারখানায় খাটিয়ে, উপনিবেশের কাঁচামাল কম দামে কিনে শিল্প কারখানায় ব্যবহার করে এবং কারখানার তৈরী মাল উপনিবেশে একচেটিয়া বিক্রী করে এই সকল পুঁজিবাদীরা বিশ্বের সম্পদের বড় অংশ দখলে আনতে মনস্থ করে। চীনে ইওরোপীয় উপনিবেশ স্থাপন ছিল এই অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের প্রতিক্রিয়া। যেহেতু আফ্রিকা মহাদেশের কিছু অংশ ও এশিয়ায় চীন ও জাপান তখনও অনধিকৃত ছিল, সেহেতু মাংসলোলুপ শকুনির মত সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি অসহায় চীনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। চীনে এই সাম্রাজ্যবাদী প্রক্রিয়ার একটি দিক আমরা ওপরে আলোচনা করেছি। এই প্রক্রিয়ার ফলে চীনের বন্ধ দরজা জোর করে খুলে চীনের বন্দরগুলি ও চীনের বাণিজ্য ইওরোপীয় জাতিগুলি অধিকার করে। নানকিং, টিয়েন্টসিন ও পেকিং-এর সন্ধি দ্বারা এই পর্যায় সমাপ্ত হয়।

চীনে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের অনুপ্রবেশের কারণ : হবসন ও লেনিন তত্ত্ব

অতঃপর চীনের মূল ভূখণ্ডের এক একটি অংশে দখল নিয়ে এক একটি শক্তি নিজ নিজ একচেটিয়া বাণিজ্য ও রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের নীতি গ্রহণ করে। ঐতিহাসিক ভিন্যাকের মতে, (Vinacke—The History of the Far East in Modern Times) তরমুজের আকৃতি চীনকে, এই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি তরমুজের ফালির মত খণ্ড খণ্ড করে ভাগ করে নিতে থাকে। এজন্য তিনি চীনের ব্যবচ্ছেদ প্রক্রিয়াকে "চীনা তরমুজের বাঁটোয়ারা" (Cutting of the Chinese Melon) বলেছেন।

চীনের ব্যবচ্ছেদ

জার শাসিত রুশ সরকার চীনের অধিকৃত আমুর উপত্যকা ও মাঞ্চুরিয়ার পূর্ব উপকূল দখলের জন্যে পরিকল্পনা করে। তাই-পিং বিপ্লবে চীং সরকার দুর্দশাগ্রস্থ হলে এবং দ্বিতীয় ইঙ্গ-চীন যুদ্ধে পরাজিত হলে, চতুর রুশ রাজনীতিকরা চীনের ওপর আইগুনের সন্ধি (Treaty of Aigun) চাপিয়ে দেয়। এই সন্ধির দ্বারা আমুর নদীর মধ্যভাগের উপত্যকা অঞ্চল রাশিয়াকে হস্তান্তর করা হয়। আমুর নদীর দক্ষিণের উপত্যকায় চীন ও রাশিয়ার যুগ্ম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। উসুরি থেকে সমুদ্র পর্যন্ত এই অঞ্চল বিস্তৃত ছিল। ১৮৬০-এর পিকিং-এর সন্ধির দ্বারা আইগুনের সন্ধির শর্তকে চীন সম্রাট অনুমোদন করেন। এই সঙ্গে পূর্ব মাঞ্চুরিয়া বা মাঞ্চুরিয়ার উপকূল অঞ্চল রাশিয়াকে ছেড়ে দিতে হয়। ১৮৬০ খ্রীঃ রাশিয়া এই স্থানে ভ্লাডিভোস্টক বন্দর স্থাপন করে।

রাশিয়ার আগ্রাসন ও অঞ্চল গঠন

ফ্রান্স ইন্দো-চীন বা ভিয়েতনামের প্রতি দৃষ্টি দেয়। চীনের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত সংলগ্ন ইন্দো-চীন বা ভিয়েতনাম ছিল চীন সাম্রাজ্যের অঙ্গ। কিন্তু পেকিং-এর সন্ধির পর ফরাসী ঔপনিবেশিক দপ্তর কোচিন চীন (১৮৭৪ খ্রীঃ) দখল করে। আনাম প্রদেশ (১৮৮০ খ্রীঃ) ফ্রান্স অধিকার করে। চীনের প্রতিবাদে ফ্রান্স কান দেয়নি। অবশেষে ১৮৮৩-৮৫ খ্রীঃ ফ্রাঙ্কো-চীন যুদ্ধের পর ফ্রান্স গোটা ইন্দো-চীন বা ভিয়েতনাম তার নিজস্ব উপনিবেশে পরিণত করে এবং

ফরাসী অঞ্চল গঠন : ইন্দোচীন অধিকার

ক্যাম্বোডিয়া অঞ্চলকে তার রক্ষণাধীন অঞ্চলে (Protectorate) পরিণত করে। ১৮৮৭ খ্রীঃ এই সকল স্থান নিয়ে ইন্দো চীন ইউনিয়ন গঠন করা হয়। অতঃপর ফ্রান্স শ্যামদেশ বা থাইল্যান্ড দখলের উদ্যোগ দিলে শক্তিসাম্য বিনষ্ট হওয়ার ভয়ে ব্রিটেন প্রতিবাদ জানালে ফ্রান্স নিরস্ত হয়।

ইতিমধ্যে দূর প্রাচ্যে জাপান এক নবীন শক্তিরূপে উদিত হয়। জাপান পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে চীনে আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী নীতি নেয়। কোরিয়ার ওপর আধিপত্য উপলক্ষে ১৮৯৪-৯৫ খ্রীঃ প্রথম চীন-জাপান যুদ্ধে (বিশদ বিবরণ পরে জাপান অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য) চীন পরাজিত হয়ে সিমনোসেকির সন্ধি মেনে নেয়। কোরিয়ার ওপর চীন তার অধিরাজত্বের দাবী ত্যাগ করে। আপাতত ঃ কোরিয়া একটি নিরপেক্ষ দেশরূপে গণ্য হয়। ১৯১১ খ্রীঃ জাপান গোটা কোরিয়া গ্রাস করে নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করে। সিমনোসেকির সন্ধির দ্বারা চীন দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ার লিয়াও-টুং উপদ্বীপ জাপানকে ছেড়ে দেয়। অবশ্য রাশিয়া ও তার মিত্রশক্তির চাপে জাপান লিয়াও-টুং উপদ্বীপের ওপর তার দাবী ছাড়তে বাধ্য হয়। জাপান চীনের দক্ষিণ উপকূলে, দ্বিতীয় চীনা হিসেবে অবস্থিত তাইওয়ান বা ফর্মোজা দ্বীপে পেসকাডোরেস অঞ্চলে আধিপত্য পায়। চীনের ৪টি বন্দর জাপানের জন্যে খুলে দিতে হয়।

প্রথমচীন-জাপানযুদ্ধ এবং চীনে জাপানের আধিপত্য বিস্তার

প্রাচ্যের ক্ষুদ্রদেশ জাপানের হাতে মহাচীনের শোচনীয় পরাজয় বিশ্বের সর্বত্র বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। ইওরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির আশঙ্কা হয় যে, চীনের পতন আসন্ন এবং জাপান তার সামরিক শক্তির দ্বারা চীনের বৃহত্তর অঞ্চল গ্রাস করে নেবে। তার ফলে ইওরোপীয় শক্তিগুলি "চীনা তরমুজের" খণ্ডের ভাগ পাবে না। সুতরাং চীন-জাপান যুদ্ধের পর ইওরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি এক পাল শকুনির মত মৃতপ্রায় চীনের দেহাংশ গ্রাস করার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে। চীনের ব্যবচ্ছেদ শুরু হয়।

চীন-জাপান যুদ্ধের প্রভাব চীনের ব্যবচ্ছেদের উপক্রম

জার শাসিত রাশিয়া চীন-জাপান যুদ্ধের সময় চীনকে অর্থ ও অস্ত্র সাহায্য দিয়ে চীনের আস্থা অর্জন করে। এখন তার পুরস্কাররূপে রাশিয়া বলপ্রয়োগের ভীতি এবং পাশাপাশি মিত্রতা অর্থাৎ "গাজর ও যষ্টি" নীতি নিয়ে চীনের ওপর লি-লোভানভ সন্ধি চাপিয়ে দেয় (১৮৯৮ খ্রীঃ)। এই সন্ধির দ্বারা দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ার লিয়াও টুং উপদ্বীপ আপাততঃ ২৫ বছরের জন্যে চীন, জার সরকারকে লীজ বন্দোবস্ত দেয়। রাশিয়া দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ার ভেতর দিয়ে এক রেলপথ S. M. R (South Manchurian Railway) নির্মাণ করে, লিয়াও টুং উপদ্বীপের পোর্ট আর্থার ও ডাইরেন বন্দরকে রাশিয়ার ট্রান্স-সাইবেরীয় রেলপথের সঙ্গে যুক্ত করে নেয়। এর ফলে মাঞ্চুরিয়া প্রদেশে কার্যতঃ রাশিয়ার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আধিপত্য স্থাপিত হয়। এই সঙ্গে ট্রান্স-সাইবেরীয় রেলপথকে সোজাসুজি ভ্লাডিভোস্টক বন্দরের সঙ্গে যুক্ত করার জন্যে আমুর উপত্যকায় ৩৫০ মাইল চীনা এলাকায় রাশিয়া রেলপথ নির্মাণের অধিকার পায়। এর ফলে বরফ বিহীন সমুদ্রের সঙ্গে রেলযোগে তার সংযোগ স্থাপন করে। ভ্লাডিভোস্টকে এক রুশ নৌ-বহর গঠন করে প্রশান্ত মহাসাগরে আধিপত্য বিস্তারের পথ প্রস্তুত করে।

রাশিয়া কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া অধিকার ঃ S.M.R নির্মাণ

জাপান ও রাশিয়ার দৃষ্টান্ত দেখে ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানী প্রভৃতি শক্তিগুলি চীনকে খণ্ডখণ্ড করে দখলের কাজে লেগে যায়। ফ্রান্স ১৮৯৫ খ্রীঃ ফরাসী অধিকৃত ভিয়েতনামের টংকিং থেকে ইউনান পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণের অনুমতি চীনের কাছ থেকে আদায় করে। রাশিয়ার S. M. R-এর অনুকরণে হ্যানয়-লাল নদী রেলপথ নির্মিত হয়। ইউনান প্রদেশের খনিজ সম্পদ এই রেল যোগে ফ্রান্স নিয়ে আসতে থাকে। ১৮৯৭ খ্রীঃ ফ্রান্স পেকিং—হ্যাংকোও রেলপথ নির্মাণ করে চীনের

ইওরোপীয় শক্তিগুলির রাজ্য অধিকার—ফ্রান্স

গভীরে অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের বিস্তার ঘটায়।[১]

ফ্রান্সের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে কাইজারের জার্মানী ও ব্রিটেন চীনে নিজ নিজ "প্রভাবাধীন অঞ্চল" (Spheres of Influence) গঠনে দৃষ্টি দেয়। জার্মান রণতরী চীনের কিয়াও চো উপসাগরে আধিপত্য স্থাপন করে। জার্মানীর মিত্র রুশ জারের মাধ্যমে চীনকে কিয়াও চো অঞ্চল জার্মানীকে ছেড়ে দিতে কূটনৈতিক চাপ দেওয়া হয়। ১৮৯৭ খ্রীঃ চীং সরকার কিয়াও চো এবং শাং টুং প্রদেশের কিছু অঞ্চলে জার্মানীর "Spheres of Influence" প্রভাবাধীন অঞ্চল গঠনে স্বীকৃতি দেন।

জার্মানীর রাজ্য বিস্তার

জার্মানী ছিল ব্রিটেনের নৌ ও বাণিজ্য প্রতিদ্বন্দ্বী। কাইজার জার্মানী উপনিবেশ স্থাপন করায় ব্রিটিশ বণিকসভা ও বুর্জোয়ারা ব্রিটেনকে তার নিজ অঞ্চল চীনে গঠনের জন্যে প্রবল চাপ দেয়। ব্রিটিশ সরকার নানকিং ও পিকিং-এর সন্ধির পর থেকে চীনের বৈদেশিক বাণিজ্যের $\frac{৩}{৪}$ অংশ দখল করেছিল। সুতরাং অর্থনৈতিক দিক থেকে চীনে ব্রিটেন সুবিধাজনক স্থানে ছিল। এখন জনমতের চাপে ব্রিটিশ সরকার পোর্ট আর্থারের নিকটবর্তী ওয়াই হাইওয়ে বন্দরে তার লিজ বন্দোবস্ত কায়েম করে। চীং সরকারের নিকট ব্রিটেন শর্ত আদায় করে যে, যতদিন পোর্ট আর্থার বন্দর রাশিয়ার অধীনে থাকবে, ব্রিটেন ততদিন এই বন্দর অধিকারে রাখবে। অতঃপর ব্রিটেন ইওরোপীয় শক্তিগুলির রাজ্য গ্রাস করার মধ্যে একটি শক্তিসাম্য নীতি স্থাপন করার লক্ষ্য নেয়। যেহেতু রাশিয়া আমুর উপত্যকায়, জার্মানী শাং টুং এবং ফ্রান্স কেয়াংটং, কোয়াংশি, ইউনান অঞ্চলে Spheres of Influence গঠন করে, ব্রিটেন শক্তিসাম্য রক্ষার জন্যে ইয়াংসি উপত্যকাকে তার Spheres of Influence অঞ্চল বলে ঘোষণা করে। এটিই ছিল সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট অঞ্চল। সমুদ্র উপকূলে সাংহাই বন্দর, তার বিরাট পশ্চাদ্‌ভূমি (hinter land)। চীনে ইওরোপীয় মাল বিক্রয়ের বাজারের অর্দ্ধাংশ এই অঞ্চলে ছিল। তাছাড়া চীং সরকারের কাছ থেকে ২৮০০ মাইল দীর্ঘ রেলপথ নির্মাণের অধিকার ব্রিটেন পায়। তদুপরি ১৬টি সন্ধি বন্দর ব্রিটেনের হাতে ছিল।

ব্রিটিশ আধিপত্য বিস্তার

বিদেশী শক্তিগুলি চীনের বাণিজ্য, রেলপথ, ডাক বিভাগ, শুল্ক, খনিজ সম্পদ, সকল কিছু হস্তগত করে। বৈদেশিক শক্তিগুলি চীং সরকারের গলায় অর্থনৈতিক ফাঁস লাগাবার জন্যে দেনাদার চীং সরকারকে ২৫টি আন্তর্জাতিক ঋণদানকারী কোম্পানী গঠন করে ভাল সুদে টাকা ঋণ দেয়। চীনের বর্হিবাণিজ্যের শুল্ক এই ঋণ শোধ বাবদ কেটে নেওয়া হয়। সাংহাই ব্যাঙ্ক কর্পোরেশন ৭% সুদে ৩০ বছরের মেয়াদে চীং সরকারকে ঋণ দেয়। চীন-জাপান যুদ্ধের পর জাপানকে প্রদেয় ক্ষতিপূরণের টাকাও একইভাবে বৈদেশিক ঋণ নিয়ে যোগাড় করা হয়। এই বাবদে চীন ৪৭,৮২০,০০০ পাউণ্ড ঋণ নিয়ে ১০২,৩৬০,০০০ পাউন্ড সুদ বাবদ দিতে বাধ্য হয়। বক্সার বিদ্রোহের পর বক্সার ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্যে চীনকে আর একদফা ঋণ নিতে হয়।

চীনে ইওরোপীয় শক্তির অর্থ লগ্নীকরণ

উনবিংশ শতকের শেষ দিকে অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, সকলেই মনে করে যে, চীনের যেটুকু অংশ বাকী আছে, তা শীঘ্র ব্যবচ্ছেদ হয়ে যাবে। আপাততঃ বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্যে ব্যবচ্ছেদ মুলতুবী ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৮৯৮-৯৯ খ্রীঃ হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ দখল করার পর চীনের ব্যাপারে আগ্রহ দেখায়। গোটা ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জে মার্কিন অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলে, নিকটবর্তী চীনের ভূখণ্ডে বৃহৎ শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং নিজ নিজ রাজ্য স্থাপন আমেরিকার উদ্বেগের কারণ সৃষ্টি করে। মার্কিন সরকারও চীনের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্কে আবদ্ধ ছিল। মাঞ্চুরিয়া অঞ্চল

চীনে মার্কিনী স্বার্থ

১· Peffer—Railway Politics in China.

ছিল আমেরিকার উদ্বৃত্ত মালের বিক্রীর বাজার। এখন চীনের ব্যবচ্ছেদ শুরু হলে মার্কিন দেশ চীনে তার বাণিজ্যের ক্ষতির আশঙ্কা করে। আমেরিকা, ইওরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের মত চীনের বিশেষ এলাকা দখল করে উপনিবেশ গঠনে আগ্রহী ছিল না। আমেরিকা বাণিজ্যিক সাম্রাজ্যবাদ বা অদৃশ্য সাম্রাজ্যবাদ গঠনে আগ্রহী ছিল।

সুতরাং চীনের চূড়ান্ত ব্যবচ্ছেদ আসন্ন হলে, মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব স্যার জন হে (Sir John Hay) ১৮৯৯ খ্রীঃ তাঁর অতি বিখ্যাত "খোলা দ্বার" নীতি (Open Door Doctrine) ঘোষণা করেন। এই নীতির বৈশিষ্ট্য ছিল যে (১) চীনে যে জাতির যে Sphere of Interest থাকুক না কেন সকল রাষ্ট্র চীনের বাণিজ্যে সমান অধিকার পাবে। বিশেষ অধিকৃত এলাকা বলে অন্য জাতিকে বাণিজ্য থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। (২) কোন রাষ্ট্রের অধিকৃত এলাকায় যদি সন্ধি বন্দর থাকে, বা অন্য রাষ্ট্র আগে থেকে বাণিজ্যিক ব্যবস্থা ভোগ করে "বিশেষ অধিকৃত এলাকা" গঠনের জন্যে সন্ধি বন্দরের অন্য রাষ্ট্র যে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে তা রদ করা যাবে না, অথবা বিশেষ রাষ্ট্রের বাণিজ্যিক অধিকার সেখানে থাকলে তা রদ করা যাবে না। (৩) Spheres বা বিশেষ অধিকৃত অঞ্চলে সকল রাষ্ট্রকে সমান বাণিজ্য শুল্ক ও বন্দর শুল্ক, জাহাজ শুল্ক ধার্য করতে হবে। "বিশেষ অধিকার" বলে কোন রাষ্ট্র তদপেক্ষা কম হারে শুল্ক দানের বিশেষ অধিকার পাবে না। (৪) যে রাষ্ট্র "বিশেষ অধিকার" বা Sphere গঠন করবে তাকে অন্য রাষ্ট্রের সমান হারে রেল মাশুল দিতে হবে। (৫) এই অঞ্চলে শুল্ক ও মাশুল আদায়ের অধিকার, সন্ধি বন্দরে শুল্ক আদায়ের একমাত্র অধিকার চীং সরকারের হাতে দিতে হবে।

মার্কিন পররাষ্ট্র সচিবের খোলা দ্বার নীতি ঘোষণা

খোলা দ্বার (Open Door) নীতি ঘোষিত হলে, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, জাপান সকল শক্তি এই নীতি গ্রহণে স্বীকৃতি দিলে, আর চীনকে ব্যবচ্ছেদ করে লাভ নেই দেখে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি আপাততঃ নিরস্ত হয়। চীনের ব্যবচ্ছেদ আপাততঃ রদ হয়। তবে প্রবল সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির চাপের কাছে চীং সরকার সর্বদা নিরপেক্ষ ও সমতা রেখে শুল্ক নীতি পরিচালনা করতে সক্ষম ছিল না।

খোলা দ্বার নীতির ফলাফল

বক্সার বিদ্রোহ, ১৯০০ খ্রীঃ (The Boxer Revolt) : চীনে বৈদেশিক অনুপ্রবেশ এবং চীনের ব্যবচ্ছেদ চীনের অধিবাসীদের ওপর কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তা ঐতিহাসিকদের আলোচ্য বিষয়। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন যে, প্রথম ইঙ্গ-চীন যুদ্ধে চীনের পরাজয় এবং নানকিং-এর সন্ধির পর চীনবাসীর প্রতিক্রিয়া হিসেবে যেমন তাই-পিং বিদ্রোহ দেখা দেয়, উনবিংশ শতকের শেষে বৈদেশিক শক্তির দ্বারা চীন ব্যবচ্ছেদ হতে থাকায় সেরূপ বক্সার বিদ্রোহ দেখা দেয়। অবশ্য একথা সত্য যে, তাই-পিং বিদ্রোহ ছিল মূলতঃ চীং বা মাঞ্চু বংশের বিরুদ্ধে; অপরদিকে বক্সার বিদ্রোহ ছিল প্রধানতঃ বৈদেশিক শক্তিগুলির বিরুদ্ধে। তাই-পিং বিদ্রোহের ধ্বনি ছিল, "চীংদের বিতাড়িত কর, মিংদের ফিরিয়ে আন।" এই বিদ্রোহ ছিল মূলতঃ Dynastic অর্থাৎ চীং রাজবংশের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান। বক্সার বিদ্রোহ ছিল anti foreign বা বৈদেশিক শক্তির চীনে আধিপত্য স্থাপনের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান। কিন্তু এই সঙ্গে বলা দরকার যে, ১৮৯৯ খ্রীঃ আদিতে বক্সার বিদ্রোহ, তাই-পিং বিদ্রোহের মতই চীং বিরোধী ছিল। এই সময় বক্সারদের ধ্বনি ছিল "চীংদের বিতাড়িত কর, বৈদেশিক শয়তানদের ধ্বংস কর"। পরে চীং সম্রাজ্ঞী জু-সির কূটনীতির ফলে বক্সার বিদ্রোহ তার চীং বিরোধী চরিত্র ত্যাগ করে নিছক "বৈদেশিক আক্রমণকারী" চরিত্র ধারণ করে। দ্বিতীয়তঃ, চীনের যে কোন অন্তর্বিপ্লবে চীনের ধ্রুপদী দর্শণ, ধর্ম প্রভৃতির প্রভাব উনবিংশ শতকে দেখা যায়। তাই-পিং ও বক্সার বিদ্রোহের ক্ষেত্রে এই সাদৃশ্য লক্ষণীয়। তৃতীয়তঃ, উভয়

বক্সার বিদ্রোহের কারণ চীনে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা এবং চীনের আত্মসচেতনতা

বিদ্রোহ ছিল মূলতঃ সংস্কারবাদী ও জাতীয়তাবাদী। ভগ্নদশাগ্রস্থ চীনকে রক্ষণশীল চিরায়ত ভাবধারাকে জাগ্রত করে বলশালী করার চেষ্টা এই দুই বিপ্লবের ক্ষেত্রে দেখা যায়। বিশেষতঃ বক্সার বিদ্রোহে চীনা রক্ষণশীল জাতীয়তাবাদ ও Revivalism বা চীনা ভাবধারা ও আদর্শের পুনরুজ্জীবনের প্রচেষ্টা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। যেহেতু পাশ্চাত্য ভাবধারা অনুসরণ করে চীনকে পুনর্গঠনের প্রয়াস তখনও ছিল সুদূর-পরাহত, সেহেতু চীনের রক্ষণশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী বলপ্রয়োগ দ্বারা চীনকে বিদেশীদের কবল মুক্ত করার কথা ভাবে। বক্সার বিদ্রোহ ছিল এই চিন্তাধারার ফল।

বক্সার বিদ্রোহের বিভিন্ন কারণ ঐতিহাসিকরা নির্দেশ করেন। চীনে ইওরোপীয় অনুপ্রবেশের পর খ্রীষ্টীয় মিশনারীরা চীনে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে ব্যস্ত হয়। অসংখ্য চীনবাসী ক্যাথলিক ও প্রটেষ্টান্ট ধর্মে দীক্ষিত হয়। খ্রীষ্টধর্ম প্রসারের ফলে চীনের সামাজিক জীবনে ভাঙন দেখা দেয়। খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত চীনারা চীনের ধর্মবিশ্বাস ও চিরাচরিত প্রথাকে নিন্দা করে এবং ইওরোপীয় জীবনধারাকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে। এজন্য চীনা সমাজের সঙ্কীর্ণ চিত্ত, রক্ষণশীল লোকেরা বিরক্ত হয়। তারা চীনের সমাজে ভাঙন সৃষ্টির জন্যে খ্রীষ্টীয় মিশনারীদের দোষারোপ করে। ফরাসী ক্যাথলিক পাদ্রীরা জোর করে বহু চীনাকে ধর্মান্তরিত করায়, খ্রীষ্টানদের সম্পর্কে বৃহত্তর চীনা সমাজে ঘৃণা দেখা দেয়। বক্সার বিদ্রোহীদের খ্রীষ্টান বিরোধিতার এটিই ছিল কারণ। যেহেতু ইওরোপীয় অনুপ্রবেশকারীরা ছিল খ্রীষ্টান, সেহেতু বক্সার বিদ্রোহীদের রোষ তাদের ওপর পড়ে।

খ্রীষ্টীয় মিশনারীদের ধর্মপ্রচারে অসহিষ্ণুতা

বক্সার বিদ্রোহের পশ্চাতে সাধারণ দরিদ্র চীনবাসীদের অর্থনৈতিক অসন্তোষ প্রধান কারণ হিসেবে কাজ করে। পীত নদীতে ১৮৯৮ খ্রীঃ এক ভয়াবহ বন্যা দেখা দেয়। গোটা শাণ্টুং প্রদেশের ঘরবাড়ি, শস্যক্ষেত্র এই বন্যার জলে ভেসে যায়। এই সঙ্গে উত্তর চীনে অনাবৃষ্টির ফলে শস্যহানি হয়। একেই চীনারা ছিল ভয়ানক দরিদ্র। তদুপরি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে তারা সর্বস্বান্ত হয়। হাজার হাজার লোক ভবঘুরের মত অন্নাভাবে সর্বত্র ঘুরে বেড়াতে থাকে। এর সঙ্গে ইওরোপীয়রা রেলপথ নির্মাণের জন্যে চাষের জমি দখল করায় কৃষকদের অসন্তোষ বাড়ে। যারা মাল বহন করে বা নৌকা যোগে মাল পরিবহণ করে জীবিকা অর্জন করত, রেলপথ চালু হলে তাদের জীবিকা বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় তারা বিদ্রোহী কৃষকদের সঙ্গে যোগ দেয়। যেহেতু ইওরোপীয়রাই রেলপথ নির্মাণ করছিল, তাদের সম্মিলিত ক্রোধ তাদের ওপর বর্ষিত হয়।

অর্থনৈতিক কারণ

তাই-পিং বিপ্লবের পর থেকে চীনের ১৮টি প্রদেশে আইন-শৃঙ্খলার দারুণ অবনতি হয়। এই সুযোগে বহু গুপ্ত রাজনৈতিক সমিতি স্থাপিত হয়। এই সমিতিগুলি সশস্ত্র বিদ্রোহের দ্বারা চীং সরকারের পতন ঘটাতে চাইত। এখন বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীরা চীনকে ব্যবচ্ছেদের উদ্যোগ নিলে, এই গুপ্ত সমিতিগুলি "বিদেশী শয়তানদের" (Foreign devils) চীন থেকে বহিস্কার করার শপথ নেয়। মূলতঃ দারিদ্র ও কুসংস্কার চীনা জনসাধারণের মনে খ্রীষ্টবিরোধী এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি করে। বক্সার বিপ্লবীরাও ছিল এই ধরনের এক গুপ্ত সমিতির অঙ্গ।

গুপ্ত সমিতির প্রভাব

অষ্টাদশ শতকে উত্তর চীনে "শ্বেত পদ্ম সমিতি" নামে এক গুপ্ত সমিতি ছিল। চীং সম্রাট এই সমিতিকে দখল করায়, এই সমিতির সদস্যরা শাণ্টুং ও চিলি প্রদেশে গা ঢাকা দেয় এবং নাম বদল করে গুপ্ত সমিতি চালু রাখে। উনবিংশ শতকে এই সমিতির নাম ছিল 'আই-হো-চুয়ান', ইওরোপীয়রা এই কথাটির অর্থ দেয় "সত্যনিষ্ঠ, সমতাবদ্ধ মুষ্টি।" এই সমিতির সদস্যদের "বক্সার" (Boxer) বা মুষ্টিযোদ্ধা বলা হত তার কারণ তারা মন ও পেশীর সংযমের জন্যে মুষ্টিযুদ্ধ শিক্ষা করত এবং চলাফেরার

বক্সার সমিতি ও তার প্রভাব

সময় হাত মুষ্টিবদ্ধ রাখত। এই প্রথা ছিল এই সমিতির সদস্যদের বিশেষ আচার। কোন বক্সার দাবী করত যে, তারা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। এজন্য বিদেশী শক্তির বন্দুকের গুলি তাদের দৈহিক ক্ষতি করতে পারবে না। বক্সারগণ চীনের প্রাচীন বীরদের অনুকরণ করে নিজ নিজ নামকরণ করত এবং তারা চীনের পৌরাণিক দেব-দেবীর উপাসনা করত।

বক্সার বিদ্রোহীদের বৈদেশিক শাসন বিরোধিতা

বক্সার গোষ্ঠীর রাজনৈতিক মতামত গোড়ায় চীং বিরোধী ছিল। ১৮৯৯ খ্রীঃ পর্যন্ত তারা চীং সরকারের পতন দাবী করত। ১৮৯৯ খ্রীঃ থেকে তারা আন্দোলনের লক্ষ্য পরিবর্তন করে, "বিদেশী শয়তানদের ধ্বংস কর এবং চীং সরকারকে বাঁচাও" এই ধ্বনি তোলে। চীং বিরোধিতা ত্যাগ করে তারা খ্রীষ্টান ও বিদেশী শক্তিকে ধ্বংস করার প্রতিজ্ঞা নেয়।

সম্রাজ্ঞী জু-সির ভূমিকা

অনেকে বলেন যে, বক্সার বিদ্রোহীদের এই লক্ষ্য পরিবর্তনের পশ্চাতে চীনের শাসিকা বিধবা সম্রাজ্ঞী জু-সির কূটবুদ্ধি ও কিছু চীনা মন্ত্রী ও কর্মচারীর হাত ছিল। সম্রাজ্ঞী জু-সি দেখেন যে, বক্সার বিদ্রোহীদের যদি তিনি ঠিকমত পরিচালিত না করেন তবে এই বিদ্রোহীরা তাঁর বিরুদ্ধে চলে যাবে। জু-সি এজন্য বক্সার বিদ্রোহীদের কয়েকটি দাবী মেনে নেন ঃ (১) তিনি বক্সারদের স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সেনাদল গঠনের অনুমতি দেন। (২) তিনি দেশের সকল অঞ্চলে গোপন নির্দেশ দ্বারা বিদেশীদের বাধা দানের কথা বলেন। আসলে জু-সি চান যে, চীন-জাপান যুদ্ধে চীনের পরাজয়ের জন্যে জনসাধারণের মনে তাঁর রাজবংশের বিরুদ্ধে যে ক্ষোভ দেখা দেয় তা দূর করতে। বক্সারদের সহায়তায় চীনের শত্রু বিদেশী শক্তিকে সম্ভব হলে তিনি নির্মূল করতে চান। তিনি স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সেনা গঠন বৈধ ঘোষণা করায়, শাণ্টুং অঞ্চলে বক্সার সংগঠন বৈধতা লাভ করে। চীনের প্রাচীন যুগ থেকে এই মতবাদ প্রচলিত ছিল যে, দেশে যখন সংকট দেখা দিবে তখন জনসাধারণই তার সমাধানের জন্যে এগিয়ে আসবে। এখন বক্সার বিদ্রোহীদের বৈদেশিক শক্তির বিরুদ্ধে নিয়োজিত করে জু-সি চীনা জনগণের মনে সেই প্রাচীন ধারণাকে জাগিয়ে দেন।

কনফুসিয় মতবাদের প্রভাব

কনফুসিয় মতবাদের একটি তত্ত্ব ছিল যে, "জনগণ যা দেখে, ঈশ্বরই তা দেখেন; জনগণ যা শোনে, ঈশ্বরই তা শোনেন" (Heaven sees as the people see, Heaven hears as the people hear)। বক্সার বিদ্রোহীদের বৈদেশিক শক্তির বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণাকে, জু-সি জনগণের কণ্ঠস্বর বলেই ঘোষণা করেন।

বক্সার বিদ্রোহ; ধ্বংসলীলা

বক্সার বিদ্রোহীদের সঙ্গে চীং সরকারের মিত্রতার ফলে বিদ্রোহীদের শক্তি বৃদ্ধি পায়। সরকারি সেনাদল গোপনে বক্সারদের সহায়তা দেয়। "চীং সরকারকে মজবুত কর; বিদেশীরা নিপাত যাক" এই ধ্বনি দিয়ে বক্সার বিদ্রোহীরা বহু খ্রীষ্টান নারী-পুরুষকে হত্যা করে। এদের মধ্যে ধর্মান্তরিত চীনা খ্রীষ্টানরাই ছিল বেশী। অসংখ্য খ্রীষ্টীয় গীর্জা ধ্বংস হয়, ইওরোপীয় মিশনারী ও তাদের সহকারীদেরও হত্যা করা হয়। যদিও চীং শাসনকর্তা য়ুয়ান শি কাই শাণ্টুং প্রদেশ থেকে বক্সারদের বিতাড়িত করেন, বক্সারগণ চিলি প্রদেশে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে রাজধানী পেকিং-এ ঢুকে পড়ে এবং বিদেশী দূতাবাসগুলি অবরোধ করে। পেকিং-এ বহু খ্রীষ্টান নিহত হয়। দূতাবাসের কর্মচারীরা তাদের ক্ষীণ সম্বল সামান্য অস্ত্রবল দ্বারা কোনক্রমে আত্মরক্ষা করতে থাকে। সম্রাজ্ঞী জু-সি আন্তর্জাতিক আইন মেনে দূতাবাস রক্ষার দায়িত্ব নেননি।

বক্সারদের পরাজয়

প্রায় ১$\frac{১}{২}$ মাস পরে ইওরোপীয় শক্তিগুলির সম্মিলিত বাহিনী পেকিং-এ ঢুকে দূতাবাস উদ্ধার ও বক্সার বিদ্রোহীদের দমনের জন্যে ব্যবস্থা নেয়। দূতাবাস মুক্ত করার পর বিদেশী শক্তিগুলি অবিলম্বে চীং সরকারকে চরমপত্র দেয় যে, অবিলম্বে বিদ্রোহীদের দমনের ব্যবস্থা নিতে হবে। চীং সরকারের বক্সার বিরোধী

শাসনকর্তারা, যথা লি-হাং-চাং প্রভৃতি নিজ দায়িত্বে নিজ নিজ অঞ্চলে বক্সারদের দমন করেন। প্রায় ৪৫ হাজার বিদেশী সৈন্য উত্তর চীনের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহীদের দমন করে।

চীং সরকারের ওপর বিদেশী শক্তিগুলি বক্সার প্রোটোকোল চাপিয়ে দেয় (১৯০১ খ্রীঃ)। (১) ১০ জন উচ্চপদস্থ চীং কর্মচারীকে বক্সারদের সহায়তা দানের জন্যে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। (২) ১০০ জন কর্মচারীকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়। (৩) জার্মান ও অন্যান্য ইওরোপীয়দের হত্যার জন্যে চীং সরকার ক্ষমতা প্রার্থনা করেন। (৪) চীনের অভিজাত শ্রেণী বক্সারদের প্রতিরোধ না করায়, শাস্তি-স্বরূপ ৪৫টি শহরে সরকারি চাকুরীতে যোগদানের পরীক্ষা রদ করা হয়। (৫) দূতাবাস অঞ্চল রক্ষার জন্যে আলাদা সেনাদল ও রক্ষাপ্রাচীর নির্মাণ করা হয়। (৬) চীং সরকারের ২৫টি দুর্গ ভেঙে ফেলতে হয় এবং ১২০টি রেল জংশন ইওরোপীয় সেনাদলের দখলে রাখা হয়। (৭) ইওরোপীয় বণিকদের কাছ থেকে ৫% হারে শুল্ক আদায় করতে চীং সরকারকে প্রতিশ্রুতি দিতে হয়। কোন কারণে এই শুল্ক বাড়ানো যাবে না বলা হয়। (৮) চীং সরকারকে বক্সার বিদ্রোহে বিদেশীদের প্রাণহানি, ক্ষয়ক্ষতি ও সামরিক ব্যবস্থার ব্যয়ের দরুণ ৩৩৩ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা হয়। কিস্তিবন্দী হারে ৪০ বছর ধরে সুদসহ এই ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা হয়। (৯) দু বছরের জন্যে চীনে অস্ত্র আমদানী নিষিদ্ধ এবং অস্ত্র নির্মাণ নিষিদ্ধ করা হয়। এই শর্তগুলি স্বীকার করে জু-সি সিংহাসন ফিরে পান।

বক্সার প্রোটোকোল

বক্সার বিদ্রোহ বিফল হলেও, ঐতিহাসিক ক্লাইডের (Clyde) মতে, "এই বিদ্রোহ বৈদেশিক অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে চীনা জাতীয় প্রতিবাদের অভ্রান্ত ইঙ্গিত দেয়। চীনে অনুপ্রবেশ, সম্পদের শোষণের বিরুদ্ধে চীনা জাতি যে সহ্য করবে না, বক্সার বিদ্রোহ তার সঙ্কেত দেয়।" এই পটভূমিকায় মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব চীনে নতুন আগ্রাসন না করে, স্থিতাবস্থা রক্ষা এবং বাণিজ্যিক অধিকারের সমতা রক্ষার জন্যে "খোলা দ্বার" নীতিকে নিষ্ঠাভরে পালন করার পরামর্শ দেন। ব্রিটেন, জার্মানী প্রভৃতি দেশ মার্কিন পরামর্শকে যুক্তিযুক্ত বলে সমর্থন করে। জাপানের নতুন আগ্রাসনের সম্ভাবনা থাকায়, চীনের স্বাধীনতা ও সার্বভৌম অধিকারকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করার জন্যে, চীনে স্থিতাবস্থা নীতিকে এই শক্তিগুলি জোরদার করতে চেষ্টা করে। ব্রিটেন, জার্মানী, মার্কিন দেশ ঘোষণা করে যে, চীনের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার সুযোগে কোন দেশ চীনে আগ্রাসন চালালে তাতে যৌথ বাধা দেওয়া হবে। আসলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি তাদের অধিকৃত অঞ্চল রক্ষার জন্যে আর নতুন স্থান অধিকারের ঝুঁকি নেওয়া উচিত মনে করেনি। চীনের স্বার্থের জন্যে নয়, সাম্রাজ্যবাদীদের নিজ স্বার্থ রক্ষার জন্যেই "Thus far and no further" অর্থাৎ "আর অধিক ঝুঁকি গ্রহণ নয়, স্থিতাবস্থাই ভাল ব্যবস্থা" এই নীতি বৈদেশিক শক্তিগুলি নেয়।

বক্সার বিদ্রোহের ফলাফল

বহির্জগত থেকে বিচ্ছিন্ন জাপান ঃ পূর্ব কথা (Japan in her Isolation : Early History) ঃ আমরা যে দেশটিকে জাপান বলে জানি, জাপানীদের কাছে তার নাম হল 'দাই নিপ্পন' রা "সূর্যোদয়ের দেশ"। প্রাচীন যুগ থেকে জাপানবাসীরা বিশ্বাস করত যে, সূর্যের প্রথম রশ্মি তাদের দেশে ছোঁয়া লাগায়। জাপানের রাজবংশকে সূর্যদেবী থেকে উদ্ভূত বলে গণ্য করা হয়। এজন্য জাপানের রাজার নামের আগে থাকে 'সূর্যপুত্র'। জাপান এশিয়ার মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কতকগুলি দ্বীপের সমষ্টি নিয়ে গঠিত। জাপানের চারদিকে প্রশান্ত মহাসাগরের জলরাশি। এজন্য জাপানীরা আদিকাল থেকেই সমুদ্রপ্রবণ, নাবিক জাতি। জাপানীদের বেঁচে থাকতে হলে এশিয়ার মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যোগ রাখতে হয়। দ্বৈপায়ণ জাপান ও তার

জাপানের ভৌগোলিক অবস্থান

অধিবাসীরা এজন্য এশিয়ার মূল ভূখণ্ড ও জাপানের মধ্যে অবস্থিত জলরাশিকে তাদের দেশীয় পোতের সাহায্যে অবলীলায় পার হতে পারত। জাপানের উপকূলে নাগাসাকি, ইয়েদো, ওয়াকাহামা, হাকোডাটা, শিমোডো প্রভৃতি বন্দর ছিল।

প্রাচীন যুগ থেকে জাপানে তিনটি ধর্মের প্রভাব দেখা যায়, যথা শিন্তোধর্ম, বৌদ্ধধর্ম ও কনফুসিয় ধর্মমত। শিন্তোধর্ম আদিতে ছিল এক প্রকৃতি উপাসনা, যা ছিল সরল ও অনাড়ম্বর। শিন্তো ধর্মে বিভিন্ন দেবদেবীর মধ্যে সূর্যকেই প্রাধান্য দেওয়া হত। শিন্তোবাদ অনুসারে সূর্য ছিলেন স্ত্রী দেবতা, যাঁর থেকে জাপানের রাজবংশের উদ্ভব হয়। এজন্য জাপানের সম্রাটকেও শিন্তোধর্মে দেবতার বংশধর বলে সম্মান করা হত এবং তিনি ছিলেন শিন্তোধর্মের প্রধান পুরোহিত। শিন্তোধর্মে সম্রাট এবং ধর্ম ছিল অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কযুক্ত। সম্রাটকে ভালবাসা ও শ্রদ্ধা করাই ছিল জাপানীদের কাছে দেশকে ভালোবাসা। কারণ তারা সম্রাটকে দেশ থেকে আলাদা করে দেখত না। জাপানের বুদ্ধিজীবি শ্রেণী কোজুকি, নিহণ-জী (মতান্তরে নিহণ-শি) প্রভৃতি জাপানের প্রাগৈতিহাসিক যুগের লোকো কাহিনী ও ইতিহাসকে শিন্তোবাদের সঙ্গে যুক্ত কবে প্রাচীন গ্রন্থগুলির সম্পাদনা করেন। ঊনবিংশ শতকে এজন্য শিন্তোধর্ম নতুন প্রাণশক্তি পায়। এছাড়া চীন থেকে জাপানে বৌদ্ধ ও কনফুসিয় ধর্মমতের প্রসার ঘটে। চীনের প্রাচীন সভ্যতা ও কনফুসিয় দর্শণ থেকে জাপান বহু শিক্ষা নেয় এবং তাকে জাপানী ভাবধারায় নতুন করে গড়ে নেয়।

জাপানের ধর্মমত : শিন্তোবাদ

জাপানের প্রাচীন যুগে সম্রাটতন্ত্রই ছিল জাপানের শাসন ব্যবস্থার ভিত্তি। দৈব অধিকার বলে সম্রাটগণ বংশানুক্রমিকভাবে জাপানকে শাসন করতেন। জাপানের আদি সম্রাট ছিলেন জিম্মু তেন্নো। কালক্রমে সম্রাটের ক্ষমতা খর্ব হয়। জাপানের বিভিন্ন অঞ্চলে সামন্ত শ্রেণী নিজ নিজ এলাকায় স্বায়ত্ব শাসনের ক্ষমতা লাভ করে। সম্রাটের একনায়কতন্ত্র ও কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা এজন্য ক্ষয় পায়।

সম্রাটতন্ত্র

জাপানের অহিংসাবাদী বৌদ্ধ ধর্ম ও ক্ষাত্রপন্থী শিন্তোধর্ম সহাবস্থান করলেও, জাপানের রাজনীতিতে ক্ষাত্রধর্ম বা শিন্তোবাদের প্রভাব ছিল বেশী। জাপানের সোগা নামে এক সামন্ত জমিদারের পরিবার ছিল। এই সোগা পরিবারের কর্তা সোটুকুতাই সি ৬০০ খ্রীঃ সম্রাটের নাম করে শাসন ক্ষমতা অধিকার করেন। তিনি তাত্ত্বিক দিক থেকে সম্রাটকে নৈতিক শক্তির আধার বলে ঘোষণা করেন। এই সময় মিকাডো বা সম্রাটের রাজধানী 'নারা' শহরে অবস্থিত ছিল। শেষ পর্যন্ত সোগা গোষ্ঠীর হাত থেকে ফুজিয়ারা গোষ্ঠী শাসন ক্ষমতা কেড়ে নেয়। তারাও মিকাডো বা সম্রাটের তাত্ত্বিক ক্ষমতা জাহির করে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে মিকাডো ছিলেন তাদের হাতের পুতুল। যে মিকাডো ফুজিয়ারা গোষ্ঠীর বিরোধিতা করতেন, তাঁকে পদচ্যুত করে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীতে পরিণত করা হত। ফুজিয়ারা গোষ্ঠী তাদের সমর্থকদের মধ্যে জমি-জায়গা বন্টন করে এবং প্রতিদ্বন্দ্বী সামন্তদের দমিয়ে রাখে।

সোগা ও ফুজিয়ারা গোষ্ঠীর শাসন

প্রায় দুই শত বছর শাসন করার পর ফুজিয়ারা গোষ্ঠীর ক্ষমতায় ভাঙন ধরে। ফুজিয়ারা বংশের অধীনে যে সকল সামন্ত জমিদার ছিল তাদের বলা হত দাইমিও। এই দাইমিওদের সঙ্গে ফুজিয়ারা বংশের বিবাদ ঘটে। এই বিবাদের সুযোগে মিকাডো মিনামোতো ও তায়রা বংশীয় দাইমিওদের সহায়তায় ফুজিয়ারা শাসন ক্ষমতা ধ্বংস করেন (১১৫৬ খ্রীঃ)। কিন্তু মিকাডোর হাতে এর ফলে ক্ষমতা ফিরে আসেনি। মিনামোতো দাইমিও বংশের নেতা ওরিতোমো সকল ক্ষমতা হাতে নেন।

ফুজিয়ারা বংশের পতন : মিনামোতোদের উত্থান

ওরিতোমা মিনামোতো (১১৯২ খ্রীঃ) মিকাডোর কাছ থেকে সোগুণ উপাধি ও পদমর্যাদা

পান। সোগুণতন্ত্রের উদ্ভব হলে জাপানে দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা চালু হয়। সোগুণ কথাটির আক্ষরিক অর্থ হল মিকাডোর প্রধান সৈনাধ্যক্ষ। আসলে সোগুণই ছিলেন সব ক্ষমতার অধীশ্বর। মিকাডো ছিলেন রাষ্ট্রের আলঙ্কারিক প্রধান। তাঁর নতুন রাজধানী কিয়াতো নগরে নজরবন্দী অবস্থায় নির্বাসনে কাটাতে থাকেন। সোগুণগণ তাঁদের শাসনকেন্দ্র থেকে দাইমিওদের সহায়তায় ও সামুরাই বা অস্ত্রধারী বাহিনী ও ছোট জমিদারদের সহায়তায় শাসন চালাতে থাকেন।

সোগুণতন্ত্রের উদ্ভব : মিনামোতো সোগুণতন্ত্র

সোগুণের পদ নিয়ে বিভিন্ন দাইমিও বংশের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলতে থাকে। ১৩৩৩ খ্রীঃ মিনামোতো বংশের হাত থেকে সোগুণের পদ কেড়ে নেওয়া হয়। তারপর হোজো বংশ, আশিকাগো বংশ এবং সর্বশেষে তোকুগাওয়া বংশ সোগুণের পদ অধিকার করে। ১৬০৩—১৮৬৭ খ্রীঃ পর্যন্ত তোকুগাওয়া বংশের হাতে শোগুণের পদ একাদিক্রমে ছিল। তোকুগাওয়া শোগুণরা ইয়েদো বন্দরে রাজধানী স্থাপন করে শাসন চালাতেন।

তোকুগাওয়া শোগুণতন্ত্রের উদ্ভব

তোকুগাওয়া শোগুণদের আমলে জাপানে দাইমিও বা বৃহৎ সামন্তরা কয়েকটি স্তরে বিভক্ত ছিল। (১) ফুদাই দাইমিওরা ছিল তোকুগাওয়া শোগুণ বংশের অধীনস্থ বংশানুক্রমিক সামন্ত। ফুদাই দাইমিওরা তোকুগাওয়া শাসককেই তাদের Suzeraine বা অধিরাজ বলে মান্য করত। এই ফুদাই দাইমিওদের হাতে ছিল বিরাট সামন্ত জমিদারী। (২) ফুদাই দাইমিওদের অধীনে ছিল নিস্কর জমি ভাগকারী সশস্ত্র পরিবার (bannermen) বা জোতদার বা সম্মানিত গৃহস্থগণ। এই অধীনস্থ সামন্তদের হাতে যে জমি থাকত তাতে বছরে মাত্র ১০,০০০ কোকুশস্য উৎপাদিত হত। এই অধীনস্থ জোতদার সামন্ত ও তাদের ওপরওয়ালা ফুদাই দাইমিওদের সহায়তায় তোকুগাওয়া শোগুণ তাঁর শাসনযন্ত্রের বিভিন্ন পদে কর্মচারীর পদ পূর্ণ করতেন। যেহেতু এরা ছিল তোকুগাওয়া বংশের প্রতি আনুগত্য-পরায়ণ, সেহেতু এরাই শাসক শ্রেণী হিসেবে কাজ করত। জমির আয় বাদে চাকুরি সূত্রে তারা আয় ভোগ করত। (৩) তোকুগাওয়া বংশের প্রতি আনুগত্য-পরায়ণ ফুদাই দাইমিও ছাড়া, জাপানে আরও স্বাধীন বা অর্দ্ধ স্বাধীন দাইমিও ছিল। তাদের বলা হত "শিম্পান দাইমিও"। এরাও প্রচুর ও বৃহৎ জমিদারীর মালিকানা ভোগ করত। কিন্তু তোকুগাওয়া চক্রান্তে এই শিম্পানগণ কোন সরকারি পদ পেত না। এদের অধীনস্থ নিজস্ব সশস্ত্র বাহিনী ছিল। এই শিম্পান দাইমিওদের জমিদারীগুলি, তোকুগাওয়া জমিদারীর চারদিকে বেষ্টন করেছিল। এই শিম্পানগণ তোকুগাওয়াদের সঙ্গে রক্ত সম্পর্কিত হলেও, এরা ছিল জ্ঞাতি ও দূর সম্পর্কযুক্ত। (৪) তোকুগাওয়া জমিদারী এবং শিম্পান জমিদারীর পরিমণ্ডলের বাইরে ছিল "বর্হিজাপানের দাইমিও"গণ (Outer Daimiyos)। এদের বলা হত "তোজামা" দাইমিও। দক্ষিণ-পশ্চিম জাপান ছিল এদের অধিকারে। এই দাইমিওদের বৃহৎ জমিদারী, অনুগত সামন্ত এবং দূরত্বের জন্যে এদের ওপর তোকুগাওয়া শোগুণের নিয়ন্ত্রণ ছিল শিথিল। এই তোজামা দাইমিওদের মধ্যে পশ্চিম জাপানের মায়েদা বংশ তোকুগাওয়া শোগুণের প্রতি মিত্র-ভাবাপন্ন হলেও, পশ্চিম জাপানের চোষু এবং দক্ষিণ জাপানের শাতসুমা দাইমিওরা ছিল শত্রু-ভাবাপন্ন।

দাইমিও প্রথা ও তার বৈশিষ্ট্য

জাপানের সমাজ সামন্ত শ্রেণী বা দাইমিওদের বাদ দিয়ে ৪টি শ্রেণী ছিল যথা সামুরাই, কৃষক, কারিগর এবং বণিক। কার্যতঃ ছিল দুটি শ্রেণী, যথা সামুরাই ও বাকী সাধারণ লোক। সামুরাইগণ তাদের বংশমর্যাদার জন্যে বাকী জাপানবাসীদের থেকে নিজেদের স্বতন্ত্র মনে করত। সাধারণ জাপানীদের বংশমর্যাদা না থাকায় রাজনৈতিক বা সামাজিক ক্ষেত্রে তাদের প্রভাব বিস্তাব বা ব্যক্তিগত

জাপানের সমাজ ব্যবস্থা ৪টি শ্রেণী ও দাইমিও শ্রেণী

প্রতিভা থাকলেও তার জোরে উন্নতির কোন সম্ভাবনা ছিল না। সামুরাইদের সংখ্যা ৫% বা ৬% হলেও দাইমিও সামন্তশ্রেণীর নিজ নিজ জমিদারীর শাসনের কাজ, শোগুণ জমিদারী ও প্রশাসনের কাজে সামুরাইরা যোগ দিত। তাদের শিক্ষার হার যেমন বেশী ছিল, তেমন ছিল তাদের পরিশ্রম করার ক্ষমতা, যুদ্ধপ্রিয়তা এবং আনুগত্যদানের ক্ষমতা। কাজেই মাঝারি ও নিম্নপদগুলি ছিল সামুরাইদের একচেটিয়া অধিকারে এবং তাদের দ্বারা দাইমিও শাসিত রাজ্যগুলির শাসন নীতি প্রভাবিত হত।

বাকি সাধারণ জাপানবাসীর মধ্যে কৃষকদের কাজ ছিল জমি চাষ করা ও সামন্তপ্রভুকে নিয়মিত ফসলের ভাগ প্রদান করা। জাপানের অর্থনীতি ছিল কৃষির ওপর নির্ভরশীল। দাইমিও ও যোদ্ধা সামুরাইরা কৃষিজীবীদের উপস্বত্ব ভোগ করত। বণিকরা বাণিজ্য করত। কোন কোন বণিক শিক্ষা-দীক্ষায় নামী হলেও, জন্মকৌলিন্যের অভাবে তাদের বিশেষ উন্নতির সুযোগ ছিল না।

কৃষি অর্থনীতি

জাপানের বিচ্ছিন্নতার অবসান ঃ পাশ্চাত্য জাতির জাপানে অনুপ্রবেশ (The end of Japan's isolation : The Western intervention in Japan) ঃ ১৬৩৯ খ্রীঃ থেকে জাপান বহির্জগতের কাছে তার দরজা রুদ্ধ করে দেয়। খ্রীষ্টান মিশনারীরা জাপানে ঢুকে ধর্মপ্রচার করে বহু জাপানীকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করায়, জাপানের নেতাদের মনে আশঙ্কা জন্মায় যে, মিশনারীদের সঙ্গে ইওরোপীয় দেশের সেনাদল এসে জাপানের স্বাধীনতা বিনষ্ট করবে। বিশেষতঃ আমেরিকান মিশনারীদের জাপানে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে অতিরিক্ত উদ্যম প্রকাশ করায়, জাপানী কর্তৃপক্ষের মনে সন্দেহ দেখা দেয়। এজন্য জাপানে বিদেশীদের অনুপ্রবেশ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়। ইওরোপীয় বণিকদের মধ্যে একমাত্র ডাচ বণিকদের বছরের নির্দ্ধারিত সময়ের জন্যে জাপানের নাগাসাকি বন্দরে ঢুকতে দেওয়া হত। ডাচ উপনিবেশ ইন্দোনেশিয়া থেকে ডাচ বণিকরা জাহাজ যোগে পাশ্চাত্যের পণ্যসম্ভার আনত এবং জাপানের কাঁচামালের বিনিময়ে তারা তা বিক্রী করত। বছরের বাকী সময় জাপানের বন্দরগুলি ইওরোপীয় বণিকদের কাছে অবরুদ্ধ ছিল। তবে জাপানের নাগাসাকি বন্দরে চীনা বণিকরা সীমিতভাবে বছরের সকল সময় বাণিজ্য করতে পারত। তুষিমা উপসাগরের পথে কোরিয়া হয়ে জাপানের সঙ্গে বহির্বাণিজ্যের একটি ক্ষীণ স্রোত বহমান ছিল। জাপানী শোগুণরা, ডাচ বণিকদের কাছ থেকে বহির্জগতের খবরাখবর জোগাড় করতেন।

জাপানের বিচ্ছিন্নতা ঃ ডাচ বণিকদের সীমিত সুযোগ

চীনে পাশ্চাত্য অনুপ্রবেশ ঘটল, প্রতিবেশী জাপানের দিকে ইওরোপীয় বণিক জাতিগুলির নজর পড়ে। চীনের মতই জাপানের বন্ধ দরজা খুলে ফেলতে ইওরোপীয় জাতিগুলি আগ্রহী হয়। এদের মধ্যে মার্কিন জাতিই জাপানের দ্বার খুলতে এগিয়ে আসে। মার্কিন বাণিজ্য বিস্তৃত হলে আমেরিকার সানফ্রান্সিসকো থেকে চীনের সাংহাই যাত্রী মার্কিন জাহাজগুলির কয়লা, পানীয় জল প্রভৃতি সংগ্রহের জন্যে মধ্যবর্তী ঘাঁটি হিসেবে জাপানের বন্দরে সাময়িক অবস্থানের দরকার হয়। ঝড়-বাদলের সময় মার্কিন জাহাজ জাপানের বন্দরে আশ্রয় লাভ করতে চায়। কিন্তু জাপান তার জলসীমায় মার্কিন জাহাজগুলিকে ঢুকতে দিত না। মার্কিন বণিকরা জাপানকে উন্মুক্ত করে জাপানে একচেটিয়া বাণিজ্য বিস্তারের জন্যে আগ্রহ বোধ করে। এজন্য মার্কিন কংগ্রেসে বণিকরা আবেদন জানায়।

জাপানে মার্কিন অনুপ্রবেশের উদ্যোগ

এই সকল মার্কিন গোষ্ঠীর দাবিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফিলমোর চীনের মতই জাপানকে উন্মুক্ত করতে সিদ্ধান্ত নেন। মার্কিন সরকারের নির্দেশে কমোডোর পেরী ৪ খানি যুদ্ধজাহাজ সহ

১৮৫৩ খ্রীঃ ৮ই জুলাই জাপানের ইয়েদো উপসাগরে ঢুকে পড়েন। জাপানী জাহাজগুলি ও ইয়েদো (টোকিও) বন্দরের কর্তৃপক্ষ পতাকা নাড়িয়ে মার্কিন জাহাজকে বাইরে চলে যেতে নির্দেশ দেয়। পেরী এই নির্দেশ অগ্রাহ্য করে ইয়েদো (টোকিও) বন্দরে নোঙর করেন এবং তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে দাবি করেন যে, মার্কিন রাষ্ট্রপতির পত্র তিনি জাপানের সম্রাটের হাতে দিতে চান। সাধারণ জাপানী কর্মচারীরা কূটনৈতিক স্তরে তাঁর নিম্নপদস্থ বলে, তিনি তাদের সঙ্গে কোন আলোচনায় রাজী হননি। তিনি ভীতি প্রদর্শন করেন যে, তাঁর দাবী না মানলে জাপানকে তার ফল ভোগ করতে হবে। শেষ পর্যন্ত শোগুণের প্রতিনিধি পেরীর কাছ থেকে দাবীপত্র গ্রহণ করেন। পেরী জানান যে, পরের বছর বসন্তকালে তিনি ফিরে আসবেন এবং উত্তর নিয়ে যাবেন। পেরীর দেওয়া দাবীপত্রের কাগজে আধুনিক মারণাস্ত্রের জলছাপ দেওয়া ছিল।

কমোডোর পেরীর আগমন ১৮৫৩ খ্রীঃ

পেরী জাপান ত্যাগ করার পর শোগুণ ডাচ বণিকদের কাছ থেকে জেনে নেন যে, যে সকল অস্ত্রের ছবি দেওয়া আছে আমেরিকার তা সত্যিই আছে কিনা এবং আমেরিকার সামরিক শক্তি কিরূপ ডাচদের কাছ থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে, শোগুণ কৃতনিশ্চয় হন যে, মার্কিন সরকারকে জাপানের মধ্যযুগীয় সেনা, তরবারি, বল্লম নিয়ে প্রতিরোধ করা যাবে না। জাপানের ভিতরে শোগুণ শাসনের বিরুদ্ধে সাতসুমা ও চোষু দাইমিওগণ আগে থেকেই বিদ্রোহী হয়েছিলেন। জাপানের উদীয়মান বুর্জোয়া, সামুরাই ও বণিক শ্রেণী শোগুণ শাসনের অবসান কামনা করছিল। এমতাবস্থায় তোকুগাওয়া শোগুণ একক সিদ্ধান্ত নিতে সাহস করেননি। তিনি মিকাডো ও অন্যান্য দাইমিওদের কাছে পেরীর দাবীপত্র পাঠিয়ে তাদের মতামত চান।

জাপানের অবস্থা

জাপানের বুদ্ধিজীবি ও সামন্তশ্রেণীর একাংশ যাঁরা বহির্জগতের খবর রাখতেন তাঁরা পেরীর দাবী গ্রহণ করে আপাততঃ জাপানকে উন্মুক্ত করতে পরামর্শ দেন। তাঁরা যুক্তি দেখান যে, চীনের অহিফেন যুদ্ধে চীনের শোচনীয় পরাজয় প্রমাণ করেছিল যে, পশ্চিমী সামরিক শক্তির কাছে চীন ছিল তুচ্ছ। সুতরাং জাপানের পক্ষে সামরিক বাধা দ্বারা মার্কিন সরকারের দাবীকে নস্যাৎ করা অসম্ভব। এক্ষেত্রে আপাততঃ পেরির দাবী মেনে নিয়ে, জাপানের দ্রুত আধুনিকীকরণ এবং সামরিক শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা করাই উচিত। রক্ষণশীল গোষ্ঠী জাপানের বিচ্ছিন্নতা নীতিকে অব্যাহত রাখতে চায়। কিন্তু পেরীর জাপান ত্যাগের এক মাসের মধ্যে রুশ প্রশান্ত মহাসাগরীয় ৪ খানি যুদ্ধজাহাজ জাপানের নাগাসাকি বন্দরে জোর করে ঢুকে পড়লে রক্ষণশীল গোষ্ঠী ভয় পায়। রাশিয়া জাপানে নৌ-আক্রমণ চালাতে পারে এই সম্ভাবনায়, জাপান সরকার পেরীর দাবীপত্র মেনে নেয়।

জাপানকে উন্মুক্ত করার ব্যাপারে মতভেদ

১৮৫৪ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী মাসে কমোডোর পেরী ৭ খানি (মতান্তরে ৮ খানি) যুদ্ধজাহাজ সহ ইয়েদো বন্দরে ফিরে এলে শোগুণ সরকার ১৮৫৪ খ্রীঃ, ৩১শে মার্চ পেরী সন্ধিতে (Perry Treaty, 1854) স্বাক্ষর করেন। পেরী সন্ধির বা কানাগাওয়া সন্ধির দ্বারা জাপানের শিমোডা ও হাকোডাটা বন্দর দুটি খুলে দেওয়া হয়। (২) মার্কিন জাহাজগুলি এই দুই বন্দর থেকে কয়লা, রসদ সংগ্রহের অধিকার পায়। (৩) জাহাজ ডুবি হলে, আশ্রয়প্রার্থী মার্কিন নাবিকদের জাপান আশ্রয় দিতে রাজী হয়। (৪) শিমোডা বন্দরে একজন মার্কিন কনসাল থাকার শর্ত গৃহীত হয়। (৫) সীমিতভাবে এই দুটি বন্দরে মার্কিন বণিকরা বাণিজ্য করার অধিকার পায়। (৬) অন্য কোন জাতিকে বিশেষ অধিকার দিলে, মার্কিন বণিকদেরও সমান অধিকার (Most favoured nation) দিতে জাপান সরকার রাজী হয়।

পেরী সন্ধি ১৮৫৪ খ্রীঃ জাপানের উন্মুক্তি

ফলাফলের দিক থেকে কানাগাওয়া সন্ধি মার্কিন বণিকদের পক্ষে সন্তোষজনক ছিল না। জাপান অনিচ্ছা সহ্ তার বন্ধ দরজা অত্যন্ত অল্প ফাঁক করে, যার ফলে বহির্জগতের সঙ্গে জাপানের প্রত্যক্ষ সংযোগ গড়ে ওঠা সম্ভব ছিল না। মার্কিন ঐতিহাসিক টমাস বেইলীর ভাষায় "তথাপি পেরী সন্ধিকে বিশ্ব ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ লাল দিবস হিসেবে চিহ্নিত করা যায়" (A red letter day in the history of the world)। প্রথমতঃ, পেরী বা কানাগাওয়া সন্ধি ছিল কীলকের প্রান্তভাগ মাত্র। এই সন্ধির সূত্র ধরে জাপানের ওপর আরও একগুচ্ছ সন্ধি চাপিয়ে জাপানকে পুরা উন্মুক্ত করা শীঘ্রই সম্ভব হয়। দ্বিতীয়তঃ, বেইলীর মতে যদি জাপানে পেরী না আসতেন এবং জাপান তার বিচ্ছিন্নতা নীতি অনুসরণ করত, তবে শীঘ্রই রাশিয়া জাপানকে গ্রাস করে নিত। কারণ রাশিয়ার প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌ-বহর সহজে জাপানকে ব্যবচ্ছেদ করে ফেলত। তৃতীয়তঃ, পেরী সন্ধি স্বাক্ষরের ফলে জাপানের আভ্যন্তরীন ক্ষেত্রে বিরাট আলোড়ন ও পরিবর্তন ঘটে। ক্ষমতাপ্রিয় জাপানী শোগুণ কোন দিন, কোন ক্ষেত্রে সম্রাট অথবা অন্য সামন্তদের গ্রাহ্য করেন নি। এখন বৈদেশিক আক্রমণের সম্ভাবনায় তিনি তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করতে বাধ্য হন। এজন্য শোগুণতন্ত্রের পতনের ঘণ্টা বেজে ওঠে। শোগুণ শাসনের বিরুদ্ধে যে রুদ্ধ আক্রোশ জমা ছিল, কানাগাওয়া সন্ধির পর তা ফেটে পড়ে। এর ফলে শেষ পর্যন্ত শোগুণ শাসনের অবসান ঘটে। চতুর্থতঃ, দেশপ্রেমিক জাপানীরা উপলব্ধি করে যে, জাপানের স্বাধীনতা যদি রক্ষা করতে হয়, তবে জাপানের দ্রুত আধুনিকীকরণের প্রয়োজন। এজন্য সর্বস্তরে জাপানের সংস্কার প্রচেষ্টা অনুসরণ করা হয়। জাপান এক বিরাট শক্তিধর রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এই আধুনিকীকরণ ছিল পেরী সন্ধির পরোক্ষ ফল।

কানাগাওয়া বা পেরী সন্ধির গুরুত্ব

পেরী সন্ধির শর্তগুলি আমেরিকাবাসীদের ও বণিক মহলকে খুশি করেনি। এজন্য পত্র পত্রিকায় সমালোচনা হয়। পেরী সন্ধির শর্ত অনুযায়ী মার্কিন সরকার টাউনসেন্ড হ্যারিস নামে এক ব্যক্তিকে শিমোডা বন্দরে কনসাল নিযুক্ত করেন এবং তাঁকে জাপানের সঙ্গে একটি পুরা বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের দায়িত্ব দেন। জাপানের কর্তৃপক্ষ হ্যারিসকে অবাঞ্ছিত মনে করে কোণঠাসা করার চেষ্টা করেন। ধৈর্য্যের সঙ্গে দৃঢ়তা এবং প্রয়োজনে মার্কিন সমরযন্ত্রের ব্যবহারের ভয় দেখিয়ে, হ্যারিস শেষ পর্যন্ত শোগুণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁকে বুঝিয়ে বলেন যে, জাপানকে যদি চীনের পরিণাম থেকে রক্ষা করতে হয়, তবে বন্ধুত্বপূর্ণভাবে মার্কিন সরকারের সঙ্গে বাণিজ্য সন্ধি করা দরকার।

হ্যারিস দৌত্য

শেষ পর্যন্ত ১৮৫৮ খ্রীঃ, ২৯ জুলাই, হ্যারিস সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। (১) উভয় দেশের মধ্যে দূত ও কনসাল বিনিময় করার শর্ত গ্রহণ করা হয়। (২) উভয় দেশ পরস্পরের দূতকে সমান কূটনৈতিক মর্যাদা দিতে রাজী হয়। (৩) শিমোডা, হাকোডাটে ছাড়া জাপানের প্রধান বন্দরগুলির মধ্যে কানাগাওয়া, নাগাসাকি, নিয়াটা, ফোবে, ওসাকা বাণিজ্যের জন্যে খুলে দেওয়া হয়। (৪) এডো বা টোকিও ও ওসাকা বন্দরে বৈদেশিক দূত ও অন্যান্য ইওরোপীয়দের বাসস্থানের দাবী মেনে নেওয়া হয়। (৫) জাপানের সঙ্গে আমদানী ও রপ্তানি বাণিজ্য করার অধিকার জাপানী কর্তৃপক্ষ মেনে নেন। (৬) বাণিজ্য শুল্ক নিম্নহারে ধার্য করতে জাপানী কর্তৃপক্ষ প্রতিশ্রুতি দেন। (৭) জাপানে অবস্থানকারী আমেরিকানদের অতিরাষ্ট্রিক অধিকার জাপানী সরকার মেনে নেন। (৮) জাপানকে প্রয়োজনমত সমরাস্ত্র ও যুদ্ধজাহাজ সরবরাহ করতে মার্কিন সরকার রাজী হন। (৯) এই সকল অস্ত্র ব্যবহার করার শিক্ষাদানের জন্যে বিশেষজ্ঞ দল পাঠাতে মার্কিন সরকার রাজী হন।

হ্যারিস সন্ধি ১৮৫৮ খ্রীঃ

অন্যান্য ইওরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী বণিক জাতিগুলি আমেরিকার সঙ্গে জাপানের সন্ধি

স্বাক্ষরের অপেক্ষায় ছিল। হ্যারিস সন্ধি স্বাক্ষরিত হলে ডাচ, ইংরাজ, রুশ ও ফরাসীরা সমান শর্তে জাপানের ওপর একই প্রকার বৈষম্যমূলক সন্ধিগুলি (Unequal treaties) চাপিয়ে দেয়। এই সন্ধিগুলিকে একত্রে জাপান নাম দেয় "পঞ্চজাতির সন্ধি" (Treaties with Five Nations)। এইভাবে অবরুদ্ধ জাপানের দ্বার খুলে দিতে হয়।

অন্যান্য বৈষম্যমূলক সন্ধি

জাপানে শোগুণতন্ত্রের পতন এবং সম্রাটের পুনর্বাসন প্রক্রিয়া

(The Circumstances leading to the fall of the Shogunal government and the restoration of the Emperor) ঃ জাপানের শোগুণতন্ত্রের পতন আভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক উভয় কারণের সমন্বয়ে ঘটে। প্রকৃতপক্ষে শোগুণতন্ত্রের বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল ধরে আভ্যন্তরীণ অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে পেরী এবং হ্যারিস সন্ধির দ্বারা জাপানের দরজা বৈদেশিক শক্তির কাছে উন্মুক্ত করে দিলে, শোগুণতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। পরিণামে তোকুগাওয়া শোগুণতন্ত্রের পতন ঘটে। শোগুণতন্ত্রের পতন তথা জাপানের সম্রাটতন্ত্রের পুনঃ-প্রতিষ্ঠার পটভূমিকাকে আমরা বিভিন্ন দিক থেকে বিচার করতে পারি।

রাজনৈতিক দিক থেকে শোগুণ শাসনের বিরুদ্ধে আভ্যন্তরীণ অসন্তোষ তীব্র হয়। আমরা ইতঃপূর্বে আলোচনা করেছি যে, তোকুগাওয়া শাসনের তীব্র বিরোধী ছিল তোজামা দাইমিওগণ (Outer Daimyos)। এই তোজামা দাইমিওদের মধ্যে প্রধান বিরোধী শক্তি ছিল চোষু ও শাতসুমা গোষ্ঠী। এই দুই গোষ্ঠীর ক্ষমতাও ছিল অনেক বেশী। তোকুগাওয়া বংশের একচেটিয়া শাসন এবং ক্ষমতার দম্ভ ও অপব্যবহার এই তোজামা গোষ্ঠীকে বিদ্রোহী করে। এই দুই গোষ্ঠী তোকুগাওয়া বংশকে বিতাড়িত করে সম্রাটের ক্ষমতা পুনঃ-প্রতিষ্ঠার কথা ভাবে। সম্রাটের ক্ষমতা ফিরে এলে, সম্রাটের হাত দিয়ে তারা রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করত। এই কাঙ্খিত পরিবর্তনের পথে প্রধান বাধা ছিল তোকুগাওয়া শোগুণের পদমর্যাদা, বাস্তব ক্ষমতা, প্রশাসনিক যন্ত্রের ওপর নিয়ন্ত্রণ এবং সহায়ক দাইমিও গোষ্ঠীর সমর্থন।

চোষু ও শাতসুমা দাইমিওদের উচ্চাকাঙ্খা

তোকুগাওয়া বংশের শেষ শোগুণ ছিলেন ওডো (Odo)। শোগুণের অধীনস্থ বংশানুক্রমিক সামন্তরা দুদলে ভাগ হয়ে যায়। একটি গোষ্ঠী শোগুণকে দৃঢ় সমর্থন জানায়। অপর গোষ্ঠী মিটো প্রভৃতি সামন্ত নেতার নেতৃত্বে শোগুণের বিরোধিতা করে। তারা শোগুণের সামরিক দুর্বলতার কথা জানত। তারা একদিকে শোগুণের শাসনব্যবস্থার সংস্কার দাবী করে। অপরদিকে শোগুণ বৈদেশিক শক্তিকে বাধাদানে অপারগ দেখে, আপাততঃ জাপানের দরজা খুলে দিতে চাপ সৃষ্টি করে। তোকুগাওয়া শোগুণের সমর্থক সামন্তদের মধ্যে এই বিরোধ ও মতভেদ শোগুণতন্ত্রকে দুর্বল করে দেয়। শোগুণ তাঁর নিজের অধীনস্থ সামন্তদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে ব্যর্থ হওয়ায়, শোগুণের চিরশত্রু তোজামা দাইমিওগণ শোগুণতন্ত্রের পতন ঘটাতে উৎসাহী হয়।

শোগুণের সমর্থক দাইমিওদের বিরোধ

ইতিমধ্যে হ্যারিস সন্ধি স্বাক্ষর সম্পর্কে তোকুগাওয়ার সমর্থক গোষ্ঠীর মতভেদে বিব্রত শোগুণ, এই সন্ধির খসড়াটি সম্রাটের অনুমোদনের জন্যে পাঠান। শোগুণ আশা করেন যে, সম্রাট হ্যারিস চুক্তি অনুমোদন করলে সম্রাটের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ বৈদেশিক সন্ধির সমালোচক দাইমিওরা নিরস্ত হবে। দ্বিতীয়তঃ, তিনি তাঁর বিরোধীদের বলতে পারবেন যে, সম্রাটের অনুমতিক্রমে তিনি সন্ধি স্বাক্ষর করেছেন। কিয়াতো শহরে সম্রাট প্রথমে এই সন্ধি নাকচ করে দিলে শোগুণ আরও বিপদে পড়েন। শেষ পর্যন্ত সম্রাট হ্যারিস সন্ধিতে অনুমোদন দেন।

হ্যারিস সন্ধিতে সম্রাটের অনুমোদন প্রার্থনা

এতদিন শোগুণ সম্রাটকে অগ্রাহ্য করে নিজ খুশি মত শাসন চালাতেন। এখন তিনি হ্যারিস

সন্ধির অনুমোদন সম্রাটের কাছে প্রার্থনা করায়, একটি সাংবিধানিক জটিলতা দেখা দেয়। সম্রাটের অনুমোদন প্রার্থনা করে শোগুণ নিজেই স্বীকার করেন যে, জাপানের শাসনব্যবস্থায় সম্রাটই সার্বভৌম ক্ষমতার আধার। সুতরাং এরপর থেকে যে কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত তাঁকে সম্রাটের অনুমোদন ক্রমে নিতে হবে। শোগুণ ওডো ছিলেন নিঃসন্তান। তাঁর উত্তরাধিকারীকে তিনি দত্তক নিতে চাইলে, তিনি সম্রাটের অনুমোদন চাইতে বাধ্য হন। এক্ষেত্রে অনুমোদন পাওয়া যায়নি। তোকুগাওয়া বংশের পারিবারিক বিষয়েও সম্রাটের অনুমোদন প্রার্থনা দ্বারা শোগুণ সাংবিধানিক দিক থেকে নিজের ক্ষমতার হানি ঘটান। শোগুণতন্ত্র যে দুর্বল হয়েছিল তা প্রকটিত হয়ে পড়ে।

সম্রাটের অনুমোদন প্রার্থনার গুরুত্ব

একেই শোগুণ জাপানকে বৈদেশিক শক্তির কাছে খুলে দেওয়ায় সমগ্র দেশে সর্বসাধারণের কাছে ধিকৃত হন। তদুপরি তাঁর সমর্থক সামন্তদের অন্তর্বিরোধ এবং সাংবিধানিক দিক থেকে সম্রাটের লুপ্ত মর্যাদার পুনঃ-প্রতিষ্ঠা, শোগুণতন্ত্রের পতনের পথ প্রস্তুত করে। দেশপ্রেমিক জাপানীরা এবং জাপানের বুদ্ধিজীবি শ্রেণী মনে করে যে, শোগুণের শাসনে হয়ত শেষ পর্যন্ত জাপানের স্বাধীনতা বিনষ্ট হবে। বৈদেশিক শক্তিগুলি চীনের মতই, জাপানকে ব্যবচ্ছেদ করে ফেলবে। এরকম দুর্বিপাক ঘটার আগেই শোগুণের উচিত ক্ষমতা সম্রাটের হাতে তুলে দেওয়া। সম্রাটের নেতৃত্বে একটি জাতীয় সরকার গঠিত হলে, হয়ত জাপানকে বৈদেশিক শক্তির গ্রাস থেকে রক্ষা করা যাবে। মোট কথা, জাপানে বৈদেশিক শক্তিকে বিনা বাধায় অনুপ্রবেশের সুযোগ দিয়ে, জাপানবাসীর নৈতিক সমর্থন হারিয়ে ফেলেন।

শোগুণতন্ত্রের প্রতি অনাস্থা

ইতিমধ্যে বৈদেশিক সন্ধির অর্থনৈতিক কুফল জাপানে দেখা দেয়। একেই শোগুণের শাসনের ফলে জাপানী কৃষকরা ছিল দারিদ্রের পাঁকে নিমজ্জিত। সামন্ত শোষণ, কর্মচারীদের দুর্নীতির ফলে জনজীবন ছিল দুর্দশাগ্রস্থ। কৃষকরা ছিল করভারে জর্জরিত। জাপানে কৃষকরা বলত যে, সরকারকে রাজস্বের যোগান দেওয়ার জন্যেই জাপানী কৃষকের জন্ম হয়েছে। এই দরিদ্র, নিরানন্দময় জীবনে মুদ্রা অর্থনীতির প্রবর্তন এবং বৈদেশিক শক্তির সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি এক অর্থনৈতিক বিপর্যয় ডেকে আনে। হ্যারিস সন্ধি ও অন্যান্য ইওরোপীয় শক্তির সঙ্গে সন্ধির ফলে (ক) জাপান থেকে ব্যাপক হারে মূল্যবান সোনা বিদেশী বণিকরা রপ্তানি করতে থাকে। বিশ্বের অন্যত্র যখন ১ সোনার মুদ্রা সমান ছিল ১৫টি রৌপ্য মুদ্রা, তখন জাপানে বিনিময় হার ছিল ১ স্বর্ণ মুদ্রা সমান ৬ রৌপ্য মুদ্রা। এই বিনিময়ের সুযোগ নিয়ে ইওরোপীয় বণিকরা জাপানে ব্যাপক রূপা আমদানি করে তার বিনিময়ে সোনা রপ্তানি করে। এজন্য জিনিষপত্রের মূল্যমান দ্রুত পরিবর্তিত হয়। জাপানীরা তার সঙ্গে তাল রাখতে পারেনি। (খ) জাপানের নিত্য ব্যবহার্য ভোগ্যপণ্য চা, রেশমের সুতা, চাল প্রভৃতি ইওরোপীয়রা ব্যাপক রপ্তানি করলে, লোকের জীবনযাত্রা দুর্বিষহ হয়। রপ্তানি বৃদ্ধি পেলে এই সকল নিত্য ব্যবহার্য জিনিষের দাম বাড়ে। একেই লোকের হাতে টাকা ছিল না। তদুপরি মূল্যবৃদ্ধি এবং Inflation বা মুদ্রাস্ফীতি জনজীবনে দুর্দশা সৃষ্টি করে। এমন কি সামুরাই ও দাইমিও পরিবারগুলিও তাদের স্বচ্ছলতা হারিয়ে ফেলে। অপরদিকে ইওরোপীয়রা সুতা কাপড়, কলকারখানায় তৈরি শিল্পদ্রব্যের দ্বারা জাপানের বাজার ভরিয়ে দিলে, জাপানী কারিগর ও তাঁতিদের হাতে তৈরি মাল বিক্রী বন্ধ হয়। কারিগর শ্রেণী বেকার ও দুর্দশাগ্রস্থ হয়। সকলেই এই অর্থনৈতিক দুর্দশার জন্যে শোগুণকে দায়ী করে। লোকের ক্রোধ শোগুণ ও বৈদেশিক বণিকদের ওপর বর্ষিত হয়। দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হয়।

অর্থনৈতিক সঙ্কট

এই পরিস্থিতিতে ক্রুদ্ধ জনসাধারণ এবং সামুরাই দেশপ্রেমিকদের হাতে কয়েকজন বিদেশী বণিক ও কূটনীতিবিদ নিহত হয়। ১৮৫৯—১৮৬৩ খ্রীঃ পর্যন্ত মার্কিন, ইংরাজ প্রভৃতি মিলে

বৈদেশিক নাগরিকদের আক্রমণ

প্রায় ১২ জন বিদেশী নিহত হয়। ইওরোপীয় দূতরা এজন্যে শোগুণকে দায়ী করে প্রতি হত্যার ক্ষতিপূরণ বাবদ বিরাট অঙ্কের অর্থ শোগুণের কাছে আদায় করে। একেই জাপানের অর্থনৈতিক দুর্দশা এবং শোগুণের ব্যয় বৃদ্ধির ফলে শোগুণের অর্থনৈতিক সংকট চলছিল। তদুপরি ক্ষতিপূরণের বোঝা শোগুণের অর্থভাণ্ড শূন্য করে দেয়। অবশেষে ইয়েদো শহর বিদেশীদের পক্ষে নিরাপদ নয় দেখে, ইওরোপীয়দের বাসস্থান ইয়াকোহামা নগরে স্থানান্তরিত করে।

তোকুগাওয়া শোগুণ বংশের চিরশত্রু, পশ্চিম জাপানের দুই দাইমিও বংশ ছিল তীব্র বিদেশী অনুপ্রবেশ বিরোধী। শোগুণ জাপানকে বিদেশীদের কাছে খুলে দিলে, ক্রুদ্ধ চোষু ও শাতসুমাগণ ইওরোপীয় জাহাজ ও বাণিজ্যকে আক্রমণ করে। এই দুই দাইমিও শক্তি আগ্নেয়াস্ত্র নির্মাণ করে তার সাহায্যে ইওরোপীয়দের আক্রমণ করে। তোজুমা দাইমিও বা বর্হিজাপানের দাইমিওদের অধীনস্থ সামুরাইগণ এই আক্রমণে নেতৃত্ব দেয়। কিন্তু ইওরোপীয়দের প্রতি আক্রমণে চোষু ও শাতসুমা উভয় গোষ্ঠীই পরাজিত হয়। চোষুর ওপর বিদেশীরা শর্ত দেয় যে, হয় পশ্চিমী শক্তিকে নিরাপদে বাণিজ্যের অধিকার দিতে হবে নতুবা ৩,০০০,০০০ ডলার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। চোষু বাধ্য হয়ে প্রথম শর্ত মেনে নেয়। শাতসুমা অঞ্চলে রিচার্ডসন নামে এক ইংরাজ নিহত হলে ব্রিটিশ সরকার শোগুণকে ১০০,০০০ পাউন্ড ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করে।

পশ্চিমী দাইমিওগণের সঙ্গে ইওরোপীয়দের সঙ্ঘাত

ইওরোপীয়দের হাতে পরাস্ত ও নিগৃহীত হওয়ার পর শাতসুমা ও চোষু দাইমিও গোষ্ঠীর সকল ক্ষোভ তোকুগাওয়া শোগুণদের ওপর পড়ে। এই দুই দাইমিও গোষ্ঠী শোগুণতন্ত্র উচ্ছেদের জন্যে জোট বেঁধে সশস্ত্র আক্রমণ চালালে, জাপানে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। শোগুণতন্ত্রকে বেআইনী প্রতিপন্ন করার জন্যে সামুরাই বুদ্ধিজীবিরা জাপানের প্রাচীন ইতিহাসের ব্যাখ্যা করে দেখায় যে, সম্রাটই ছিলেন সকল ক্ষমতার আধার। শোগুণের ক্ষমতা লোপ করে সম্রাটের ক্ষমতা পুনঃ-প্রতিষ্ঠার জন্যে চোষু ও শাতসুমা গোষ্ঠী প্রতিজ্ঞা নেয়। জাতিকে সম্রাটের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা এবং শোগুণের নিয়ন্ত্রণ থেকে সম্রাটকে মুক্ত করার আহ্বান জানানো হয়। শোগুণের প্রতিনিধি ওগুরি টাডামাশাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো হলে, পশ্চিমের সামুরাই ও দাইমিও গোষ্ঠী সন্দেহ করে যে, মার্কিন অস্ত্র সাহায্য নিয়ে দাইমিও অভুত্থান দমনের জন্যে শোগুণ প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ১৮৬৬ খ্রীঃ চোষু ও শাতসুমা চুক্তি সম্পাদিত হলে, এই দুই গোষ্ঠীর সামুরাই বাহিনী শোগুণ বাহিনীকে যুদ্ধে পরাস্ত করে। শোগুণ ওডোর মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারী কেইকীকে পরাস্ত করে সম্রাটের প্রাসাদ দখল করা হয় এবং সম্রাটকে নিয়ন্ত্রণ মুক্ত করা হয়। ফুশিমি ও তোবার যুদ্ধে শোগুণ বাহিনীর চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে। শোগুণের রাজধানী এডো নগর বিদ্রোহীরা অধিকার করে, মিকাডো বা সম্রাটকে জাপানের প্রকৃত শাসনকর্তা ঘোষণা করা হয়। এই ঘটনাকে (১৮৬৭ খ্রীঃ) Restoration বা সম্রাটের ক্ষমতার পুনঃ-প্রতিষ্ঠা বলা হয়।

শোগুণতন্ত্র ধ্বংস ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে অভ্যুত্থান

মেইজী পুনঃ-প্রতিষ্ঠা ও তার প্রকৃতি (The Meiji Restoration and its character) ঃ শোগুণতন্ত্রের পতনের পর সম্রাটকে শোগুণের রাজধানী ইয়েদোর প্রাসাদে স্থাপন করা হয়। ১৮৬৭ খ্রীঃ বর্ষীয়ান সম্রাট কোমেইর মৃত্যু হলে তাঁর ১৪ বছর বয়স্ক পুত্র মুৎসুহিতো সিংহাসনে বসেন। যদিও তাত্ত্বিক দিক থেকে সম্রাটকেই সর্বময় ক্ষমতার আধার ঘোষণা করা হয়, তথাপি শোগুণের প্রশাসন যন্ত্র ভেঙে পড়ায়, নতুন প্রশাসন ব্যবস্থা, আমলাতন্ত্র, আইন প্রনয়ণের কেন্দ্র

সম্রাট মুৎসিহিতো ও জাপানের নবনেতাগণ

প্রভৃতি গঠনের দরকার হয়। কিশোর সম্রাট মুৎসুহিতোর কোন অভিজ্ঞতা অথবা প্রশাসন পরিচালনার ক্ষমতাও ছিল না। ১৮৬৭ খ্রীঃ বিপ্লবের নায়কদের পক্ষে সর্বজনগ্রাহ্য এক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা সহজ কাজ ছিল না। জাপানের যে সকল সামুরাই যুব নেতা ১৮৬৭ খ্রীঃ মেইজী বিপ্লবে মুখ্য ভূমিকা নেন, তাঁরাই কার্যকরী সংবিধান রচনার কাজে এগিয়ে আসেন। ঐতিহাসিক ফেয়ার ব্যাঙ্কের (Fair Bank) মতে, এই নব নেতাদের অসুবিধা ও অনভিজ্ঞতা যেমন ছিল, তেমন বেশ কিছু সুবিধাও ছিল। এই নব নেতারা কোন ঐতিহ্য বা পুরাতন নিয়মের দাস ছিলেন না। সুতরাং এঁরা প্রয়োজন অনুযায়ী এবং দূরদৃষ্টি নিয়ে সংস্কার প্রবর্তনের সাহস দেখান। দ্বিতীয়তঃ, কমোডোর পেরীর আগমনের পর যে ১৫ বছর অতিক্রান্ত হয়, সেই সময় জাপানের চিন্তাশীল ও দেশপ্রেমিকরা বুঝে ফেলেন যে, জাপানকে যদি বৈদেশিক অনুপ্রবেশ ও আধিপত্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হয়, তবে জাপানের আধুনিকীকরণ অত্যাবশ্যক। সর্বক্ষেত্রে জাপানকে অতীত বিলাস ত্যাগ করে পাশ্চাত্য জগতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। এজন্য সর্বাত্মক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা দরকার ছিল। কিন্তু জাপান কেবলমাত্র পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ করেনি। জাপানী জাতির মূল ভাবধারা, তার ঐতিহ্য, শিন্তোধর্ম মতকেও এই নব নেতারা যত্ন সহকারে রক্ষা করেন।

এই নব নেতাদের মধ্যে ইয়াকুরা, সাঞ্জো প্রভৃতি প্রতিভাবান, বাস্তববাদী, দূরদর্শী নেতা। তাঁরা সম্রাটকে আলঙ্কারিক পদমর্যাদা এবং রাষ্ট্রীয় ঐক্যের ও জাতীয় সার্বভৌমত্বের প্রতীক হিসেবে স্থাপন করেন। তাঁরা ১৮৬৮ খ্রীঃ কে জাপানের "মেইজী যুগ" বলে ঘোষণা করেন। মেইজী কথাটির অর্থ ছিল "আলোকপ্রাপ্ত শাসনব্যবস্থা"। জাপানের সম্রাট মিকাডো, মেইজী সম্রাটরূপে সংবিধানের শীর্ষে সর্বময় ক্ষমতার আধাররূপে আলঙ্কারিকভাবে পদে অধিষ্ঠান করেন।

সম্রাটকে আলঙ্কারিক আধিপত্য দান

প্রকৃত শাসন ক্ষমতা সম্রাটের নামে সামুরাই আমলাতন্ত্র, যারা জাপানে আলোকিত যুগ প্রবর্তন করে, তাদের হাতেই ছিল। মিকাডোর প্রাসাদ প্রশাসনের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। এখান থেকেই সম্রাটের নামে যাবতীয় আদেশনামা ঘোষিত হয়। সম্রাট সকল অর্থে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উৎসরূপে পরিগণিত হন। যদিও তাঁর কার্যকরী ক্ষমতা ছিল সীমিত।

১৮৬৮ খ্রীঃ ৬ই এপ্রিল মিকাডো "পঞ্চশর্তের শপথনামা" (Five Articles of Oath) ঘোষণা করেন। এই শপথনামায় বলা হয় যে : (১) অতীতের কুসংস্কার ও মধ্যযুগীয় কুরুচিপূর্ণ আচার-আচরণ বর্জন করে, জাপানকে যুক্তিপূর্ণ, আলোকিত পথে পরিচালনা করা হবে। (২) জাতীয় ঐক্য, সংহতি ও জাতীয় স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা হবে। সকল শ্রেণীর লোকের জীবিকা অর্জনের ও পেশার জন্যে কাজ করার পূর্ণ অধিকার দেওয়া হবে। (৩) সমাজে উঁচু, নীচু সকল শ্রেণীর লোকের সহযোগিতা নিয়ে রাষ্ট্র পরিচালিত হবে। সকল শ্রেণী হতাশা মুক্ত হয়ে নিজ নিজ শ্রেণীর আশা-আকাঙ্খা পূরণের সুযোগ পাবে। এই শর্তটির দ্যোতনা ছিল ব্যাপক। অর্থাৎ সামন্ত শ্রেণী এ পর্যন্ত যে সকল বিশেষ অধিকার ভোগ করত তা আর চালু থাকবে না। এটাই ছিল এই শর্তের মর্ম। (৪) আইন প্রণয়নের জন্যে জন প্রতিনিধিদের দ্বারা আইনসভা গঠন করা হবে। (৫) জাপানী সাম্রাজ্যের ভিত্তি মজবুত করার জন্যে বিশ্বের সকল স্থান থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণ করে, জাপানীদের শিক্ষা দান করা হবে। ফেয়ার ব্যাঙ্কের মতে, পঞ্চশর্তের মধ্যে শেষতম শর্তটিই ছিল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। এই শর্তের দ্বারা নব নেতারা আধুনিক পাশ্চাত্য ভাবধারার, পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে নব জাপান গঠনের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করেন। গোটা Restoration বা পুনর্বাসন আন্দোলনের মূল কথা ছিল, জাপানের আধুনিকীকরণ। আধুনিকীকরণের দ্বারাই জাপানকে শক্তিশালী করা যাবে এই বাস্তব দৃষ্টি নবনেতারা গ্রহণ

পঞ্চশর্তের শপথনামা

করেন। একমাত্র এই ব্যবস্থা দ্বারাই বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আগ্রাসন থেকে জাপান আত্মরক্ষা করতে পারবে, এই সার সত্য নবনেতারা বুঝে ফেলেন। উপরোক্ত "পঞ্চ শর্ত" (Five Articles) ছাড়া জাপানের রাষ্ট্র গঠনের অপর একটি অঘোষিত গুরুত্বপূর্ণ শর্ত ছিল, জাপানের নতুন শাসনব্যবস্থাকে এক কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থায় পরিণত করা। সম্রাটকে জাতীয় ঐক্য ও সকল ক্ষমতার প্রতীক হিসেবে স্থাপন করে, তাঁর নাম নিয়ে এই কেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়া চালু করা হয়।

সাত-চো-হি-তো সরকার গঠন

যেহেতু সাতসুমা, চোষু, হিজেন ও তোষা এই ৪টি প্রধান দাইমিও গোষ্ঠী ১৮৬৭ খ্রীঃ বিপ্লবে প্রধান ভূমিকা নেয়, সেহেতু সম্রাটের অধীনে প্রশাসন ব্যবস্থা এই ৪টি গোষ্ঠীর অধীনস্থ সামুরাইগণ অধিকার করে। এজন্য এই প্রশাসনকে "সাত-চো-হি-তো" সরকার বলা হয়। ৪টি দাইমিও গোষ্ঠীর নামের আদ্য অক্ষর নিয়ে এই নামকরণ করা হয়।

সানসোকু বা ৪টি প্রশাসনিক সংগঠন

সানসোকু (Sanshoku) বা সম্রাটের অধীনে ৪টি প্রশাসনিক সংস্থা গঠন করা হয়, যথা ঃ (ক) প্রধান পরিচালক। এই পদে রাজ পরিবারের কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হয়। (খ) উচ্চতর পরামর্শদাতাদের সভা। এই সভায় দরবারী অভিজাত ও প্রধান দাইমিওগণ সম্রাটকে পরামর্শ ও সহায়তা দিত। (গ) সানিও বা নিম্ন পরামর্শ সভা। ২০ জন সামুরাই বুদ্ধিজীবি এবং সামুরাই আমলাতন্ত্রের দ্বারা এই সভা গঠিত হয়। শেষ পর্যন্ত এই সভাই নীতি নির্ধারণ সহ সকল দায়িত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও রূপায়ণ করত। নবনেতাদের অধিকাংশ ছিল এই সভার সদস্য।

আইনসভা

উপরোক্ত ত্রিস্তর প্রশাসনিক সংগঠনের নীচে ছিল আইনসভা ও বিভিন্ন প্রশাসনিক দপ্তর বা বিভাগ।

১৮৮৯ খ্রীঃ সংবিধান

উপরোক্ত সংবিধান প্রয়োগ করার সময় বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে ১৮৭১ খ্রীঃ পর্যন্ত মেইজী সংবিধানের বেশ কিছু রদবদল করা হয়। শেষ পর্যন্ত ১৮৭১ খ্রীঃ ৩ই সেপ্টেম্বর পরামর্শদাতাদের সভাকে ভেঙে তিনটি কক্ষে পরিণত করা হয়। ১৮৮৯ খ্রীঃ চূড়ান্ত মেইজী সংবিধান যতদিন না গঠিত হয়, ততদিন ১৮৭১-এর সংশোধনী বহাল থাকে। এই সংশোধনী অনুসারে (১) সা-ইন বা আইনের খসড়া রচনাকারী পরিষদ; (২) উ-ইন বা মন্ত্রীসভা ও প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের কাজকর্মের তদারককারী পরিষদ; (৩) সি-ইন (See-in) বা আইনের খসড়াকে চূড়ান্ত অনুমোদন দানকারী সভা গঠিত হয়। সি-ইন সভা প্রশাসনিক ব্যাপারেও চূড়ান্ত তদারকি করার অধিকার পায়। কাউন্ট ইয়াকুরা প্রভৃতি দেশপ্রেমিক, প্রগতিশীল নবনেতার নেতৃত্বে এই পরামর্শদাতা সভা, প্রকৃত গণতান্ত্রিক না হলেও, গণতান্ত্রিক চরিত্র নেয়। জাপানের বিস্ময়কর সংস্কারগুলি এই সংবিধান ও নবনেতার উদ্যোগে সফল হয়।

সামন্ত শাসন লোপ

জাপানের প্রায় ২৬৫টি আঞ্চলিক সংগঠন বা 'হান' ছিল। এই আঞ্চলিক সংগঠন বা 'হান'গুলিকে কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনাধীনে আনার প্রধান বাধা ছিল দাইমিওদের আঞ্চলিক শাসন ক্ষমতা। সম্রাটের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে সর্বপ্রথম চোষু ও সাতসুমা দাইমিওগণ তাদের শাসনের অধিকার যুক্ত "হান নিয়োগপত্র" সম্রাটের হাতে ফিরিয়ে দেয়। এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে হিজেন, তোষা ও অন্যান্য দাইমিওগণও তাদের নিজ নিজ 'হান' বা জমিদারী শাসনের অধিকার সম্রাটের হাতে তুলে দেয়। আপাততঃ দাইমিওগণের স্বেচ্ছা-প্রণোদিত ক্ষমতা হস্তান্তরের পুরস্কারস্বরূপ সম্রাটের আদেশে তাদের হস্তান্তরিত "হানের" অস্থায়ী শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়। ১৮৭১ খ্রীঃ

আগষ্ট মাসে, অকস্মাৎ সম্রাটের এক আদেশনামার দ্বারা, "হান" বা দাইমিও শাসিত আঞ্চলিক শাসনব্যবস্থা লোপ করা হয়। এর ফলে বহু দাইমিও তাদের অধীনস্থ আমলা সামুরাইগণ শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণের অধিকার হারায়। দাইমিওদের প্রতিবাদে নতুন সরকার কর্ণপাত করেনি। গোটা জাপানকে কয়েকটি নতুন শাসন বিভাগে ভাগ করা হয়। জাপানকে মোট ৭৫টি অঞ্চলে ভাগ করে, প্রতি অঞ্চলের জন্যে কেন্দ্র থেকে, কেন্দ্রের প্রতি আনুগত্যশীল শাসনকর্তা নিয়োগ করা হয়।

এইভাবে জাপানের Restoration বা সম্রাটতন্ত্রের পুনর্বাসন করা হয়। কুইগাল নামক ঐতিহাসিক বলেন যে, ১৮৬৮ খ্রীঃ সংবিধান পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, সম্রাট তাঁর হৃতমর্যাদা এবং আলঙ্কারিক অধিকার ফিরে পান। প্রকৃত ক্ষমতা তাঁর হাতে ছিল না। তাঁর পরামর্শ সভাই প্রায় সকল ক্ষমতা করায়ত্ব করে। সুতরাং Restoration দ্বারা সম্রাট এবং তাঁর মর্যাদা Restored বা পুনঃ-স্থাপিত হয়, সম্রাটের Power বা ক্ষমতা পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অপরদিকে কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন যে, প্রাক্ শোগুণ যুগের ক্ষমতা সম্রাট ফিরে পান। সার্বিকভাবে বিচার করলে Restoration দ্বারা সম্রাট মাত্র এক আলঙ্কারিক পদের অধিকারী হন। প্রকৃত ক্ষমতা তাঁর ছিল না বলা চলে।

রেষ্টোরেশনের প্রকৃতি

জাপানের পুরাতনতন্ত্রের ধ্বংসসাধন এবং আভ্যন্তরীন সংস্কার দ্বারা আধুনিকীকরণ (The End of Old Order in Japan and her modernisation by internal reforms) ঃ শোগুণতন্ত্রের পতন এবং সম্রাটতন্ত্রের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা প্রকৃতপক্ষে পুরাতনের পুনরাবৃত্তি ছিল না। সম্রাট তাঁর হৃতমর্যাদা নিয়ে ফিরে এলেও, ১৮৬৮ খ্রীঃ সংবিধানে তাঁকে প্রকৃত ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। জাপানের মধ্যযুগীয়, সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা, ভূমিব্যবস্থা প্রভৃতিকে ভেঙে ফেলে জাপানের নব নির্মাণের নেতারা জাপানকে আশ্চর্যজনক দ্রুতগতিতে এক আধুনিক, প্রগতিশীল শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করেন। জাপানের নব দেশপ্রেমিক সামুরাই নেতাগণ ছিলেন এই নব নির্মাণের কারুকৃত। ১৮৬৮ খ্রীঃ সনদে জাপানকে পুনর্গঠিত করার যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় তাঁরা তা কার্যে রূপায়িত করেন।

জাপানের এই নব নির্মাণের জন্যে দরকার ছিল রাষ্ট্রের হাতে এক বিরাট অর্থভাণ্ডার গঠন করা। শোগুণ শাসন অবসিত হলেও, শোগুণ আমলের বিরাট সরকারি ঋণের বোঝা নতুন সরকারের কাঁধে চাপে। তদুপরি, প্রাদেশিক স্তরে হান বা প্রাদেশিক শাসনের দায়িত্ব থেকে দাইমিও ও তাদের আশ্রিত সামুরাইদের মুক্তি দেওয়ার ফলে, প্রাদেশিক শাসনের খরচার ভার কেন্দ্রের ওপর বর্তায়। দাইমিওগণ স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে তাদের জমিদারী ও শাসনস্বত্ব সম্রাটের হাতে তুলে দিলে (আগের পরিচ্ছেদে বিস্তারিত বিবরণ দ্রষ্টব্য) সম্রাট দাইমিও ও তাদের আশ্রিত সামুরাইদের ভরণপোষণের জন্যে ভাতা বরাদ্দ করেন। দাইমিওগণকে তাদের জমিদারীর আয়ের $\frac{১}{১০}$ পরিমাণ অর্থ ভাতা দেওয়া হয়। সামুরাইদের সংখ্যা ছিল ১৯ লক্ষ, জাপানের মোট লোকসংখ্যার ৫ বা ৬ ভাগ। সামুরাইদেরও ভাতা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। যদিও সেই ভাতার পরিমাণ ছিল তাদের আগেকার জমির আয়ের ৫০%।

সামুরাই ও দাইমিওদের ভাতা প্রদান

যাই হোক, এই ভাতা বাবদ বিরাট অর্থ, শোগুণের ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব এবং জাপানের পুনর্গঠনের ব্যয়, সকল কিছু মিলিয়ে এক বিরাট অঙ্কের টাকা যোগাড় করার দায়িত্ব নব নির্মাণ নেতাদের ওপর বর্তায়। এই অর্থ সঙ্কট থেকে পরিত্রাণ পেতে নতুন সরকার বিভিন্ন ব্যবস্থা নেয়।

অর্থনৈতিক সংস্কার

(১) জাপান সরকার অত্যন্ত অনিচ্ছা সহকারে লন্ডনের আন্তর্জাতিক ঋণ প্রদানকারী সংস্থার কাছ থেকে ৭% সুদে ৩৩,৩০,০০০ পাউন্ড ঋণ গ্রহণ

করে। এই অর্থে টোকিও-ইয়াকোহামা রেলপথ নির্মাণ করা হয় এবং দাইমিও, সামুরাইদের ভাতা বাবদ থোক টাকা মিটিয়ে দেওয়া হয়। (২) তোকুগাওয়া শোগুণদের দৃষ্টান্ত অনুসারে ধনশালী বণিক ও নাগরিকদের কাছ থেকে ৯,০০০,০০০ ইয়েন বাধ্যতামূলক ঋণ আদায় করা হয়। অনেক বণিক স্বেচ্ছায় আরও অতিরিক্ত অর্থ সরকারকে দেয়। (৩) ১৮৬৯ খ্রীঃ নতুন সরকার কাগজের মুদ্রা চালু করেন। সরকারের অনুগত মিৎসুই ও আরও দু-একটি বণিক কোম্পানীকে এই নোট ছাপাবার দায়িত্ব দেওয়া হয়। (৪) কাউন্ট ওকুমা অর্থমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করে বাজট প্রথা চালু করে, সরকারের আয়-ব্যয়ের মধ্যে সমতা আনার চেষ্টা করেন। (৫) যদিও বিদেশীদের কাছে মাল বিক্রী করে সন্ধি অনুযায়ী জাপান মাত্র ৫% শুল্ক পেত; এখন জাপানের বৈদেশিক বাণিজ্যে লক্ষনীয় উন্নতি হলে ৫% হারে শুল্ক বাবদ প্রচুর টাকা সরকারের কোষাগারে জমা পড়ে। (৬) দাইমিও ও সামুরাইদের প্রদেয় ভাতার পুনর্বিন্যাস করা হয়। (৭) কৃষকদের কাছ থেকে ফসলের ভাগের পরিবর্তে নগদ টাকায় রাজস্ব আদায় করা হয়। এই সঙ্গে ভূমি-রাজস্ব বৃদ্ধি করা হয়। এইভাবে কাউন্ট ওকুমা জাপানের বাজেটে সমতা আনেন এবং উন্নয়নের জন্যে অধিক অর্থের সংস্থান করেন।

অতঃপর নতুন সরকার জাপানে সামন্ত পথা বিলোপের কাজে হাত দেন। ১৮৭১ খ্রীঃ সামন্ত প্রথার ওপর প্রথম আঘাত হানা হয় (আগের পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। ১৮৭১-এর ঘোষণাপত্র দ্বারা হান বা সামন্ত জমিদারীগুলি বিলুপ্ত করা হয়েছিল। তার বিনিময়ে দাইমিও ও সামুরাইদের ভাতা দানের ব্যবস্থা করা হয়। "পঞ্চ শর্তের" সনদে উচ্চ-নীচ পার্থক্য দূর করে সমাজে সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা ১৮৬৮ খ্রীঃ বলা হয়। সামুরাই নেতারা এই নীতি কার্যে পরিণত করেন। দাইমিও ও সামুরাইগণকে থোক ক্ষতিপূরণ দানের বিনিময়ে তাদের ভাতা লোপ এবং জমির ওপর যাবতীয় স্বত্ব ত্যাগ করার জন্যে প্রস্তাব দেওয়া হয়। সামুরাইদের বার্ষিক ভাতার ৫/৬ গুণ ক্ষতিপূরণ এককালীন দিয়ে ভাতা প্রদান রদ করা হয়। ১৮৭৬ খ্রীঃ এক আইন দ্বারা দাইমিওদের থোক ক্ষতিপূরণ উদারভাবে ধার্য করা হয়। নগদ টাকার পরিবর্তে সরকারী বন্ডে (Bond) এবং বন্ড বাবদ সুদ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ঐতিহাসিকদের মতে, সামুরাইদের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের হার ছিল যৎসামান্য। এতে তাদের ভরণপোষণ সম্ভব হয়নি। কয়েক বছরের মধ্যে বহু সামুরাই পরিবার দারিদ্রের কবলে পড়ে। কিন্তু দাইমিওদের আশাতিরিক্ত হারে ক্ষতিপূরণ দানের ফলে, ১৮৮০ খ্রীঃ নাগাদ জাপানের আমানতী ব্যাঙ্কগুলির ৪০% মূলধন দাইমিওদের লগ্নী করা টাকা থেকে পাওয়া যায়। যাই হোক, দাইমিওগণ স্বেচ্ছায় জমিদারী স্বত্ব ছেড়ে দিলে এবং তার জন্যে ক্ষতিপূরণ দিলে, জাপানে দীর্ঘকাল প্রচলিত সামন্ত প্রথা লুপ্ত হয়। জমি ছিল তখনকার জাপানের অর্থনীতির চাবিকাঠি। তা সরকারের হাতে চলে আসায় নতুন বন্দোবস্ত কৃষকদের সঙ্গে করা হয়। এতে একদিকে সরকারের বিপুল আয় বাড়ে, অপরদিকে কৃষির উন্নতি হয়। আধুনিক প্রথায় বৈজ্ঞানিকভাবে চাষ-আবাদের কাজ চালু হয়।

সামন্ত প্রথা বিলোপ

দাইমিও ও সামুরাইগণ কয়েক বছর পরে বুঝতে পারে যে, জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ হয়ে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি নষ্ট হয়েছে এবং আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। এজন্য ১৮৭০-৭৩ খ্রীঃ পর্যন্ত চোষু অঞ্চলের সামুরাইগণ সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ১৮৭৩ খ্রীঃ এই বিদ্রোহকে বলা হয় সাগার (Saga) বিদ্রোহ। কেন্দ্রীয় সরকার দৃঢ় হাতে এই বিদ্রোহ দমন করেন। এরপর সাতসুমা অঞ্চলের ৪০ হাজার সাইগো সামুরাই টোকিও আক্রমণের চেষ্টা করে। কেন্দ্রীয় সেনাপতি ইয়ামাগাতা এই বিদ্রোহীদের ছত্রভঙ্গ করেন এবং কাগোশিমার যুদ্ধে চূড়ান্তভাবে পরাস্ত করেন। এর ফলে জাপানে সামন্তশ্রেণীর পুনঃ-প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা লুপ্ত হয়।

সাগার বিদ্রোহ দমন

সামন্ত প্রথার ফলে জাপানের জনসাধারণকে জন্মকৌলিন্যের ভিত্তিতে এতদিন বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হত। সমাজে সকল নাগরিকের সমান মর্যাদা ও অধিকার ছিল না। পঞ্চ শর্তের সনদে সমাজে উচ্চ-নীচের ভেদ লোপ করার কথা বলা হয়। ১৮৬৯ খ্রীঃ এক আইন দ্বারা সামাজিক শ্রেণীভেদ লোপ করা হয়। এতদিন সাধারণ লোকেদের পারিবারিক উপাধি ব্যবহার করা নিষিদ্ধ ছিল। এখন থেকে সকলে পারিবারিক উপাধি ব্যবহারের অধিকার লাভ করে। ধনী, নির্ধন সকলেই এই অধিকার পায়। সমাজে আইনের চক্ষে সকল নাগরিকের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাচীন অভিজাতগণ ও দাইমিওগণ যাতে এই বন্দোবস্তে ক্ষতিগ্রস্থ না হয়, এজন্য এই প্রাচীন বংশের সন্তানদের দরবারী অভিজাত রূপে বিশেষ মর্যাদা দান করা হয়। বাকী সকলে এমন কি সামুরাইগণ সমান মর্যাদা পায়।

সকল নাগরিকদের সমান সামাজিক মর্যাদা লাভ

জাপানকে শক্তিশালী করার জন্যে সামরিক সংস্কারকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। এতদিন সামুরাই শ্রেণী বংশানুক্রমিকভাবে যোদ্ধার বৃত্তি নিত। নতুন প্রেক্ষাপটে সামুরাইদের দ্বারা আধুনিক যান্ত্রিক বাহিনী গঠন সম্ভব ছিল না। এজন্য সামুরাইদের চিরাচরিতভাবে তরবারি ধারণের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়। একমাত্র সামুরাইদের দ্বারা সেনাদল গঠনের প্রথা লোপ করা হয়। ওমুরা মাসিজিয়া নামে এক চোষু সামুরাই জাপানের আধুনিক সেনাদল গঠনের কাজে হাত দেন। তিনি সমর শিক্ষণ বিদ্যালয়, অস্ত্র নির্মাণ কারখানা গঠন করেন। রক্ষণশীল সামুরাইগণ তাদের চিরাচরিত একচেটিয়া অধিকার বিনষ্ট হলে ওমুরাকে হত্যা করে। কিন্তু পরবর্তী চোষু সমর সংস্কারক ইয়ামাগাতা ওরিতোমো প্রধান সেনাপতি পদে নিযুক্ত হয়ে ফরাসীদের অনুকরণে স্থলবাহিনী গঠনের সূত্রপাত করেন। (২) তিনি হান সেনাদল বা সামন্ত প্রভুদের সেনাদলকে সরকারী সেনাদলে রূপান্তরিত করেন। (৩) ১৮৭৩ খ্রীঃ সেনাপতি ইয়ামাগাতা এক আইন দ্বারা ফরাসী সরকারের অনুকরণে প্রাপ্তবয়স্ক জাপানী পুরুষদের বাধ্যতামূলকভাবে সামরিক শিক্ষা গ্রহণের নিয়ম চালু করেন। এখন থেকে জাপানের প্রতি পুরুষ নাগরিক, যে কোন শ্রেণীর লোক হলেও সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করে সেনাদলে যোগদানের অধিকার পায়। (৪) পরে ইয়ামাগাতা রণকৌশল ও সেনা সংগঠনের ক্ষেত্রে জার্মান মডেল গ্রহণ করেন। (৫) জাপানের নৌ-বহর ব্রিটিশ মডেলে গঠিত হয়। জনৈক ব্রিটিশ এ্যাডমিরালের এজন্য সাহায্য নেওয়া হয়। জাপানের নৌ-সেনাপতির পদ গ্রহণ করেন শোগুণের পূর্বতন নৌ সেনাপতি এনোমোতো। সাতসুমা অঞ্চলে নৌ-শিক্ষণ কেন্দ্র এবং নৌ-দপ্তর স্থাপিত হয়। জাপানের সমর বাহিনীকে নিষ্ঠাভরে গঠন করার ফলে শীঘ্রই জাপানী সেনা দুদ্ধর্ষ হয়ে ওঠে।

সামরিক সংস্কার ঃ আধুনিকীকরণ ঃপ্রাপ্ত বয়স্কের সামরিক শিক্ষা

এই সঙ্গে জাপানের শিক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ করা হয়। পঞ্চ শর্তের শপথনামায় জাপানে বহির্বিশ্বের আলোকিত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা বলা হয়। সেই শর্ত পূরণের জন্যে (১) ভাতা দান করে মেধাবী ছাত্রদের ইওরোপ ও আমেরিকায় পাঠ গ্রহণের জন্যে পাঠানো হয়। (২) বিদেশে শিক্ষা সমাপন করে প্রত্যাগত এই সকল প্রাক্তন ছাত্ররাই ছিল নব জাপানের কারুকৃত। এঁদের মধ্যে ছিলেন ইতো, ইনুয়ে, ইয়ামাগাতা, মিগোমোতো প্রভৃতি জাপানের সুসন্তানগণ। (৩) জাপানে শিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করে বিদেশী বিশেষজ্ঞদের তাতে নিয়োগ করা হয়। খনিবিদ্যা, ধাতুবিদ্যা, যন্ত্রনির্মাণ, বাস্তুবিদ্যা, সাধারণ বিজ্ঞান, আইন প্রভৃতি শিক্ষার জন্যে বিদেশী বিশেষজ্ঞদের সহায়তা নেওয়া হয়। (৪) শিল্প কারখানা গঠন এবং শিল্পোন্নয়নের জন্যে শিল্পদপ্তর ১৩০ জন বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করে। ক্রমে জাপানের নিজের

শিক্ষা সংস্কার ঃ আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তন

নাগরিকরা দ্রুত বিজ্ঞান, কারিগরী, চিকিৎসা প্রভৃতি বিদ্যায় কৃতিত্ব অর্জন করে, জাপানের উন্নয়নের চাহিদা পূরণ করে। (৫) বিদেশী পুস্তক, পুস্তিকা ও প্রয়োজনীয় গ্রন্থগুলির জাপানী ভাষায় অনুবাদ করা হয়। এজন্য অনুবাদ সংস্থা গঠন করা হয়। অনুবাদ কার্যে, সর্বাপেক্ষা নামী ব্যক্তি ছিলেন ফুকুজাওয়া ইউকিচি। (৬) পাশ্চাত্য ধরনের পাঠ্যসূচী নিয়ে সরকার বিভিন্ন বিদ্যালয় স্থাপন করেন। মিশনারী ও বেসরকারী উদ্যোগকে বিদ্যালয় স্থাপনে উৎসাহ দেওয়া হয়। (৭) জাপানে ওয়াসেদা ও টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার কাজ চলে। নারী শিক্ষার উন্নতির জন্যে সুদা কলেজ ও নিহন যোশী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। জাপান দ্রুত গতিতে আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করে।

জাপানের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্যে শিল্প-কারখানা স্থাপনের উদ্যোগ সরকারী ও বেসরকারী স্তরে নেওয়া হয়। প্রধানতঃ বেসরকারী স্তরে শিল্প গঠনের ওপর জোর দেওয়া হয়।

শিল্প গঠন ঃ জাইবাৎসু শ্রেণী

জমি থেকে উৎখাত হওয়া সামুরাই শ্রেণী জাতীয় ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে শিল্প গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করে। জাপানের শিল্প মূলধনের ৪৪% দাইমিওরা তাদের ক্ষতিপূরণের অর্থ থেকে লগ্নী করে। যদিও অনভিজ্ঞতার দরুণ বহু সামুরাই শিল্পোদ্যোগ বিনষ্ট হয়, তবুও অনেকে বাণিজ্য জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং জাপানের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধশালী করে। এই নবীন শিল্পপতিদের মধ্যে ছিলেন আইওয়াসাকি ইয়াতারো, যিনি বাণিজ্য জাহাজ গঠনের শিল্পে অসাধারণ সাফল্য পান। কৃষকদের মধ্য থেকেও নতুন শিল্পপতির উদ্ভব হয়। এদের মধ্যে ব্যাঙ্ক শিল্প ও মূলধনী ব্যবসায়ে শিবুসাওয়া আইয়িচির নাম উল্লেখ্য। জাপানের এই নতুন শিল্পোদ্যোগী শ্রেণীকে জাইবাৎসু বলা হয়। এই শ্রেণী তাদের উদ্যম, প্রতিভা ও সংগঠন শক্তির জোরে জাপানকে এক প্রধান শিল্পায়ত দেশে পরিণত করে।

জাপানের নতুন সংবিধান ১৮৮৯ খ্রীঃ পাশ হলে জাপানে সম্রাটতন্ত্র থাকা সত্বেও এক প্রতিনিধিত্বমূলক আইন সভা ও শাসন ব্যবস্থা চালু হয়। জাপান সকল দিক থেকে পাশ্চাত্য

বৈষম্যমূলক সন্ধি নাকচ করণ

দেশগুলির সমকক্ষতা লাভ করে। জাপান তার নিজ শক্তি গঠনের পর জাপানের ওপর শ্বেতাঙ্গ বণিক দেশগুলির চাপিয়ে দেওয়া বৈষম্যমূলক সন্ধিগুলি নাকচ করে দেয়। জাপানের নবোদিত সামরিক ক্ষমতার ভয়ে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি এই নাকচ নীতিকে মেনে নেয়। জাপান পশ্চিমী দেশগুলির মত সাম্রাজ্যবাদী নীতি নিয়ে ১৮৯৪ খ্রীঃ চীন আক্রমণ করে এবং চীন-জাপান যুদ্ধে জয়লাভ করে তার শক্তির পরিচয় দেয়।

জাপানে সংবিধানের দাবীতে আন্দোলন (The Movement in Japan for a Constitution) ঃ Restoration বা সম্রাটের পুনর্বাসনের পর ১৮৬৮ খ্রীঃ যে সংবিধান রচিত হয়, তার নাম ছিল সা-চো-হি-তো সংবিধান। এই সংবিধানের ফলে সাতশুমা, চোষু, হিজেন, তোষা এই ৪টি দাইমিও গোষ্ঠীর লোকেদের হাতেই প্রায় সকল

মেইজী সংবিধান প্রবর্তনের কারণ ঃ (১) সামুরাই অসন্তোষ

ক্ষমতা ন্যস্ত হয়। এই গোষ্ঠীর সামুরাইগণই জাপান শাসন করতে থাকে। সম্রাট নিয়মতান্ত্রিক ক্ষমতার অধিকারী হন। অপরাপর গোষ্ঠীর সামুরাইগণ এজন্য নিজেদের বঞ্চিত মনে করে। জাপানে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র স্থাপন করে নির্বাচনের মাধ্যমে সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব লাভের জন্যে তারা সংবিধান সংশোধনের দাবী জানায়। ভিন্যাক (Vinacke) এই অভিমত দিয়েছেন।

ফেয়ার ব্যাঙ্ক মনে করেন যে, রাজনৈতিক ক্ষমতায় অংশ গ্রহণের জন্যে ইওরোপে

গণতান্ত্রিক আন্দোলন ঘটলেও, জাপানের ক্ষেত্রে তা ঘটেনি। আসলে গণতান্ত্রিক সংবিধান ও জাতীয় পার্লামেন্ট গঠন দ্বারা জাপানকে শক্তিশালী করার জন্যেই সংবিধান সংশোধনের দাবী তোলা হয়। ফেয়ার ব্যাঙ্কের মতে, জাপানের সাধারণ লোকের কাছে তখনও পর্যন্ত গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা অজ্ঞাত ছিল। নতুন সা-চো-হি-তো সরকার গোটা দেশের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ভোগ করত। আসলে সরকারী শাসকশ্রেণীর একাংশের মধ্যেই পার্লামেন্টারী প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রেরণা দেখা দেয়।

(২) সংবিধান রচনার পশ্চাতে জনগণের গণতান্ত্রিক দাবীর অনুপস্থিতি

জাপানের এই সংস্কারপন্থী নেতাগণ মনে করতেন যে, পশ্চিম ইওরোপীয় দেশগুলির এত ক্ষমতার উৎস হল, সেই সকল দেশের পার্লামেন্টারী সংবিধান। পশ্চিমী দেশের মতই জাপানে প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন চালু হলে, জাপান এই ইওরোপীয় জাতিগুলির সমমর্যাদা লাভ করবে বলে তাঁরা বিশ্বাস করতেন।

(৩) ইওরোপের পার্লামেন্টারী প্রথাব প্রতিজ্ঞা গ্রহণ

এছাড়া এই সংস্কারবাদী নেতাগণ ফরাসী বিপ্লবের শিক্ষা গ্রহণ করেন। স্বৈরতান্ত্রিক ফরাসী রাজতন্ত্রের ফরাসী বিপ্লবে পতন এবং বিপ্লবী ফ্রান্সের অগ্রগতির ইতিহাস তাঁদের অনুপ্রাণিত করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স এমনকি নবগঠিত জার্মানীর সংবিধান ব্যবস্থা তাঁদের অনুপ্রাণিত করে। এজন্য জাপানে অনুরূপ সংবিধান প্রবর্তনের দাবী তাঁরা জানান। ১৮৬৭ খ্রীঃ পঞ্চশর্তের সনদে নিয়মতান্ত্রিক সরকার গঠনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। এখন তা পূরণের জন্যে দাবী তোলা হয়।

(৪) ফরাসী বিপ্লবের শিক্ষা গ্রহণ

সরকারী ক্ষমতার পরিচালক সামুরাই আমলাতন্ত্রের মধ্যে সাইগো ও ইতাগাকি প্রভৃতি বুদ্ধিজীবি সামুরাই, রক্ষণশীল শাসক গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেন। ১৮৭৩ খ্রীঃ ইতাগাকি হিজেন ও তোষো গোষ্ঠীর আলোকপ্রাপ্ত সংস্কারবাদী সামুরাইদের সঙ্গে মিলিত হয়ে দেশপ্রেমিকদের প্রকাশ্য দল (Public Party of Patriots) নামে এক সংস্থা গঠন করেন। ইওরোপে পাঠ শেষ করে জাপানে প্রত্যাগত প্রগতিশীল ছাত্ররাও এতে যোগ দেয়। কাতাওকা কেনকিচি (Kataoka Kenakachic) নামে এক তোষা বুদ্ধিজীবি সামুরাই এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে ইতাগাকি "রিশিয়া" নামে সংগঠন স্থাপন করেন। ১৮৭৫ খ্রীঃ গণতন্ত্রের দাবীতে ওসাকা নগরে এক সম্মেলন ডাকা হয়। এই সম্মেলনে দাবী করা হয় যে, (১) সরকারের আইন, বিচার, প্রশাসনকে আলাদা করে ক্ষমতা বিভাজন নীতি চালু করতে হবে। (২) একটি জন নির্বাচিত সেনেট গঠন করতে হবে।

(৫) বুদ্ধিজীবি সম্মেলন : রিশিয়া

ইতিমধ্যে মন্ত্রীসভার অন্যতম মুখ্য সদস্য কাউন্ট ওকুমা ১৮৮১ খ্রীঃ মন্ত্রীসভার কাছে এক স্মারকপত্র পেশ করে দাবী জানান যে, ইংলন্ডের অনুকরণে পরের বছর পার্লামেন্ট নির্বাচন এবং পার্লামেন্টের কাছে দায়িত্বশীল মন্ত্রীসভা বা ক্যাবিনেট গঠন করতে হবে। ওকুমা ছিলেন মন্ত্রীসভার বিশিষ্ট সদস্য ইতোর প্রতিদ্বন্দ্বী। ওকুমার দাবীকে সমর্থন করে জাপানী সংবাদপত্রগুলিতে ঝড় তোলা হয়। ওকুমা মন্ত্রীসভা থেকে পদচ্যুত হয়ে, সংস্কারবাদী নেতা ইতাগাকির সঙ্গে জোট বাঁধেন। এই জোটে শাসক সামুরাই শ্রেণী থেকে বেশ কিছু নেতা যোগ দিলে, জাপানের সরকার তাঁদের শ্রেণী সমর্থন হারাতে থাকেন। সরকার সংস্কারবাদী আন্দোলনকারীদের প্রতি দমন নীতি প্রয়োগ করেন, রাজনৈতিক দলগুলিকে নিষিদ্ধ করা হয়। তথাপি শাসকশ্রেণী উপলব্ধি করেন যে, গণতন্ত্রের দাবীকে দমিয়ে রাখা যাবে না।

ওকুমার ভূমিকা ও সংস্কারবাদীদের জোট গঠন

ইওরোপীয় সংবিধান সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভের জন্যে মন্ত্রীসভা কাউন্ট ইটোকে ইওরোপ ভ্রমণে পাঠায় (১৮৮২ খ্রীঃ)। ইটো প্রধানতঃ জার্মান সংবিধানের প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি বার্লিনে

জাপানের নব সংবিধানে জার্মান সংবিধানের প্রভাব

অধ্যাপক আলবার্ট মোসে প্রভৃতির সঙ্গে জার্মান সংবিধানের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করেন। সম্রাটের ক্ষমতা খর্ব না করেও কিভাবে পার্লামেন্ট গঠন করা যায় তা তিনি জার্মান সংবিধান থেকে শিক্ষা নেন। ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সংবিধান তাঁকে বিশেষ প্রভাবিত করেনি। জাপানের নব সংবিধান ছিল প্রধানতঃ কাউন্ট ইটোর চিন্তাধারার ফল। ১৮৮৬ খ্রীঃ তিনি খসড়া সংবিধান রচনা করেন। সামরিক বাহিনীর প্রতিনিধি হিসেবে ইনোয়ে কোয়াশি তাঁকে সহায়তা দেন। এই খসড়া প্রিভি কাউন্সিল আলোচনার পর অনুমোদন করলে, ১৮৮৯ খ্রীঃ ১১ই ফেব্রুয়ারী এই নব সংবিধান ঘোষণা করা হয়।

মেইজী সংবিধান ও তার প্রকৃতি (The Meiji Constitution and its character) ঃ মেইজী সংবিধানের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল ঃ (১) সম্রাটের মর্যাদা এবং তাঁকে সকল ক্ষমতার আধাররূপে গণ্য করা হয়। সংবিধানটি যেন জাতিকে দান করছেন. এভাবেই সংবিধানের বয়ান রচিত হয়। ফলে ভবিষ্যতে দরকার মত সংবিধান সংশোধনের অধিকার সম্রাটের হাতে রাখা হয়। সম্রাট রাষ্ট্রের যে কোন ব্যক্তিকে অনুগ্রহ প্রদর্শন করার ক্ষমতা পান। সম্রাটকে পবিত্র এবং রাষ্ট্রীয় আইনের উর্দ্ধে রাখা হয় (Sacred and inviolable)। তিনিই রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার প্রতীক এবং প্রাচীন দৈবী বংশের উত্তরাধিকারী রূপে ভূষিত হন। সম্রাট তত্বগত দিক থেকে সকল প্রশাসনিক ক্ষমতা এবং ডায়েটের সম্মতিক্রমে আইন রচনার অধিকারী বলা হয়। অবশ্য এগুলি ছিল সম্রাটের তাত্বিক ক্ষমতা। কার্যতঃ তিনি প্রশাসন পরিচালনা বা আইন রচনা করতেন না। সেনাদল ও নৌ-বাহিনীর তিনিই ছিলেন প্রধান। মন্ত্রীরা ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কাছে দায়ী থাকবেন বলা হয়। মোট কথা, Restoration-এর পর সম্রাটতন্ত্রকে যে মর্যাদা দান করা হয়, নতুন সংবিধানে তাত্বিক দিক থেকে তা রক্ষা করা হয়।

মেইজী সংবিধানের বৈশিষ্ট্য (১) সম্রাটের ক্ষমতা

দ্বিকক্ষবিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি সভা বা ডায়েট গঠন করা হয়। উর্দ্ধকক্ষে উচ্চপদস্থ অভিজাতরা সদস্যপদ পায়। ব্যারন বা কাউন্টগণ সম্রাট কর্তৃক এই সভায় নিযুক্ত হতেন। আইনসভার নিম্নকক্ষের নাম ছিল প্রতিনিধি সভা (House of Representatives)। যে সকল প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ১৫ বছর একাদিক্রমে সরকারী কর প্রদান করেছিল, তারাই প্রতিনিধি সভার প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার পায়। এই নির্বাচকদের (Voter) সংখ্যা ১৮৯০ খ্রীঃ ছিল সর্বমোট ৪৫০,০০০। সমগ্র জনসংখ্যার ১% শতাংশ মাত্র। ডায়েটের হাতে আইন রচনার সকল ক্ষমতা অর্পন করা হয়। সম্রাটের তরফে ডায়েটই আইন রচনার অধিকার পায়। উচ্চকক্ষ বা অভিজাত সভা, নিম্নকক্ষের আইন রচনার অতিরিক্ত উচ্ছাস বা উদ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করত।

(২) ডায়েট বা আইনসভা

সম্রাট ডায়েটের অধিবেশন ডাকতেন। ইচ্ছা করলে তিনি ডায়েটের (প্রতিনিধি সভার) অধিবেশন মুলতুবী অথবা ভেঙে দিতে পারতেন। অর্থাৎ সম্রাটের নামে মন্ত্রীসভাই এই কাজ করতে পারত। ডায়েটের অধিবেশন বন্ধ থাকলে, সম্রাট অর্ডিন্যান্স ঘোষণা করতে পারতেন। ডায়েটের অধিবেশন বসলে ডায়েট এই অর্ডিন্যান্স অনুমোদন অথবা নাকচ করতে পারত। ডায়েটে কোন বিল পাশ হলে তা সম্রাটের অনুমোদন যুক্ত স্বাক্ষর পেলে তবেই তা আইনে পরিণত হত। মন্ত্রীসভার অনুমোদিত বিলগুলি ডায়েটে গৃহীত হলে, স্বভাবতই সম্রাটের অনুমোদন পাওয়া যেত। সুতরাং কার্যতঃ মন্ত্রীসভার দেওয়া বিলগুলিই ডায়েটে পেশ করা হত। ডায়েট বাজেট পাশ না করলে বাজেট বৈধ হত না। সেক্ষেত্রে পূর্ববর্তী সরকারের বাজেট অনুযায়ী কর ধার্য হত। ডায়েটের অনুমোদন ছাড়া নতুন কর বসান যেত না।

(৩) ক্যাবিনেট ও ডায়েটের সম্পর্ক

সম্রাট তাত্ত্বিক দিক থেকে প্রশাসনের প্রধান ছিলেন। তাঁর নামে মন্ত্রীসভাই প্রশাসন চালাত।

(৪) বিচার বিভাগ

বিচার বিভাগ আপাততঃ স্বতন্ত্র হলেও, বিচার বিভাগীয় মন্ত্রী বিচার বিভাগের তদারকি ও বিভিন্ন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতেন। এই মন্ত্রী ছিলেন মন্ত্রীসভার সদস্য। কাজেই বিচার বিভাগের ওপর পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ রাখা হয়।

অর্থনৈতিক ক্ষমতার ক্ষেত্রে প্রতিনিধি সভার হাতে যৎসামান্য ক্ষমতা ছিল। সরকারী কোষাগার, ক্ষতিপূরণ প্রদান, প্রশাসনিক কর প্রভৃতি বিষয়ে প্রতিনিধি সভার কোন এক্তিয়ার

(৫) আইনসভার সীমিত অর্থনৈতিক ক্ষমতা

ছিল না। প্রতিনিধি সভা বাজেট পাশ না করলে আগের বছরের বাজেট অনুযায়ী কর আদায়ের ব্যবস্থা থাকায়, মন্ত্রীসভাকে নিয়ন্ত্রণ করা প্রতিনিধি সভার পক্ষে সম্ভব ছিল না। একেই মন্ত্রীসভা পার্লামেন্টের কাছে দায়ী ছিল না, তদুপরি কর ও বাজেটের ওপর পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণ সীমিত হওয়ায়, প্রতিনিধি সভা ঠুঁটো জগন্নাথে পরিণত হয়। আসল ক্ষমতা বিশেষ শাসক গোষ্ঠীর হাতেই থেকে যায়।

দ্বিতীয়তঃ, মেইজী সংবিধান ছিল বহু পরস্পর-বিরোধী মতের সমন্বয়। একদিকে ওকুমার মত চরম গণতন্ত্রী অপরদিকে মোতোদো আইফুর মত কনফুসিয়াসপন্থী এবং সামরিক শক্তির

আইন সভার সীমিত ক্ষমতা

স্বায়ত্ব ক্ষমতার প্রবক্তা ইয়ামাগাতার মতামতের সমন্বয়ে সংবিধান গঠিত হয়। যদিও ইটোই ছিলেন সংবিধানের খসড়া রচয়িতা, তাঁকে দেশে প্রচলিত বিভিন্ন ভাবধারার মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হয়। তৃতীয়তঃ, ইটো পার্লামেন্টারী ব্যবস্থাকে স্বীকার করেও Restoration নেতাদের কর্তৃত্ব খর্ব না করে তাদের পরিচালিত মন্ত্রীসভার হাতে বেশ কিছু ক্ষমতা রাখেন। সংবিধানটি ছিল নমনীয়। প্রয়োজন হলে, জনমত বুঝে সম্রাটের নামে সংবিধানে সংশোধনী আনার অবকাশ রাখা হয়। এজন্য সংবিধানটি দীর্ঘস্থায়ী হয়।

মেইজী সংবিধানে বহু অস্পষ্টতা ও পুরস্পর-বিরোধীতা ছিল। (ক) সরকারের প্রশাসন যন্ত্রের ওপর ডায়েটের নিয়ন্ত্রণ স্থাপন কিভাবে স্থাপিত হবে তা ছিল অস্পষ্ট। ডায়েট বাজেট পাশ অথবা আইন পাশ করে প্রশাসনকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম ছিল না। কারণ আইনে সম্রাটের

মেইজী সংবিধানের অস্পষ্টতা

সম্মতি না পেলে তা চূড়ান্ত ছিল না। বাজেট পাশ না করলে, আগের বছরের বাজেট চালু থাকত। (খ) সেনাদল ও নৌ-বাহিনীর ওপর ডায়েটের এক্তিয়ার ছিল অস্পষ্ট। (গ) যদিও সম্রাটকে সংবিধানে সকল ক্ষমতার আধার এবং সংবিধানের নৈতিক শক্তির প্রতীক বলা হয়, সম্রাট কিভাবে দরকার হলে এই নৈতিক শক্তি প্রয়োগ করবেন বা ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন সে সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা ছিল না। (ঘ) যতদিন Restoration নেতারা ক্ষমতায় থাকেন এবং একমত থাকেন ততদিন তাঁরাই সংবিধানের আড়ালে নেতৃত্ব ভোগ করেন। অন্য কোন গোষ্ঠী ক্ষমতার এই মধুচক্রে ঢুকতে পারেনি। (ঙ) যদি প্রিভি কাউন্সিল বা হাইকোর্ট সম্রাটের নৈতিক ক্ষমতাকে ব্যাখ্যা করতেন তবে প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীসভা আইনতঃ তা মানতে বাধ্য ছিলেন না। (চ) ইতিমধ্যে সেনা ও নৌ-বিভাগের লোকেরা, যেহেতু সম্রাট ছিলেন এই বিভাগের প্রধান, তাঁর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রাখত। ডায়েটকে অগ্রাহ্য করে তারা সম্রাটের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করছে, এই অজুহাতে ডায়েটের নিয়ন্ত্রণ অগ্রাহ্য করত। (ছ) এই দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হয়ে ডায়েটের প্রভাবশালী সদস্যরা জনগণের প্রতিনিধি এই দাবীতে সংবিধানকে তাদের খুসীমত ব্যাখ্যার চেষ্টা করত এবং সম্রাটের নৈতিক শক্তিকেই তারা রূপ দিচ্ছে, এই দাবী করত।

মেইজী সংবিধানে পাশ্চাত্য সংবিধানের মতই জনসাধারণের বাক্ স্বাধীনতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রভৃতি অধিকার দান করে। জনগণের কর্তব্য হিসেবে সম্রাটের প্রতি আনুগত্য, কর প্রদান, সেনাদলে যোগদান করার উল্লেখ করা হয়। কিন্তু এই অধিকারকে মৌলিক অধিকার, অলঙ্ঘনীয়, অভঙ্গনীয় বলা হয়নি। জরুরী অবস্থার সময় সরকার জনগণের এই অধিকারগুলি সঙ্কোচন করতেন। তথাপি এই সংবিধানের সাহায্যে জাপানের অভূতপূর্ব অগ্রগতি ঘটে এবং জাপান বিশ্বের অন্যতম এবং এশিয়ার বৃহত্তম শক্তিতে পরিণত হয়।

মেইজী সংবিধানের জনসাধারণের মৌলিক অধিকার

জাপানে শিল্প-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ (The Industrial and Commercial Expansion of Japan) ঃ জাপানের নবনির্মাণের নেতারা প্রথম থেকেই অবহিত ছিলেন যে, জাপানকে যদি পশ্চিমী শক্তির সঙ্গে সমমর্যাদা লাভ করতে হয়, তবে জাপানের শিল্প-বাণিজ্যের বিস্তার অগ্রে প্রয়োজন। ইওরোপের ইতিহাস থেকে তাঁরা শিক্ষা নেন যে, শিল্প-বিপ্লবের পর ইওরোপ কিভাবে নববলে বলীয়ান হয় এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতির সাহায্যে সম্পদ সঞ্চয় করে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিতে পরিণত হয়। এই মডেল মোটামুটিভাবে জাপানের নেতারা গ্রহণ করেন।

শোগুণ যুগ থেকে জাপানে কিছু কিছু অস্ত্র কারখানা, জাহাজ নির্মাণ কারখানা ও লৌহ ঢালাই কারখানা ছিল। শোগুণ সরকার নাগাসাকিতে একটি লৌহ ঢালাই-এর কারখানা গঠন করেন। এই সামান্য Infra-structure বা অন্তর্কাঠামোর ওপর নির্ভর করে মেইজী জাপান কিভাবে তার বিশাল শিল্পোদ্যোগ গড়ে তোলে, তা নিয়ে অর্থনৈতিক ঐতিহাসিকরা বিস্তর মাথা ঘামিয়েছেন। রাশিয়ার মত কোন Substitution Process বা বিকল্প প্রক্রিয়া জাপানে সঠিকভাবে হয়নি। আবার ব্রিটেনের মত Spontaneous বা স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিল্প-বিপ্লব জাপানে হয়নি। সার্বিকভাবে বলা চলে যে, জাপানের শিল্পায়নে এক মিশ্র প্রক্রিয়া (Mixed Process) কার্যকরী হয়। সরকারের দিক থেকে রাজনৈতিক স্থিতি, শান্তি স্থাপন করে শিল্প বিকাশের পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়। মুদ্রাব্যবস্থার আধুনিকীকরণ, ব্যাঙ্ক গঠন, মূল শিল্পের জাতীয়করণ দ্বারা সরকার থেকে শিল্প গঠনের Infra-structure বা অন্তর্কাঠামো গঠন করা হয়। এর সঙ্গে যুক্ত হয় Entreprenures বা শিল্পোদ্যোগী শ্রেণীর শিল্প কারখানা গঠনের প্রাণান্তিক উদ্যোগ। এই উদ্যোগ কেবলমাত্র মুনাফা শিকারের লোভে শিল্পোদ্যোগীরা নেন তা বললে ভুল হবে। দেশপ্রেম, জাপানকে অন্য বৃহৎ রাষ্ট্রের সমকক্ষতা দানের ইচ্ছাও শিল্পোদ্যোগীদের কম ছিল না। সামুরাই শ্রেণী জমি ও ভাতাচ্যুত হয়ে বিকল্প জীবিকার সন্ধানে শিল্প গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করে। ইংলন্ডে ধর্ম-বিপ্লবের পর এ্যাংলিকান গীর্জা থেকে ও সরকারী, বেসরকারী পদ থেকে বহিস্কৃত পিউরিট্যানগণ যেরূপ দৃঢ়সঙ্কল্প নিয়ে ইংলন্ডে শিল্প গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করে, জাপানের সামুরাইগণ তাই করে।

জাপানে শিল্প বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য

সরকার থেকে সর্বপ্রথম দেশরক্ষা ও সামরিক প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে ভারী শিল্প গঠনের দিকে নজর দেওয়া হয়। শোগুণ যুগে এই কাজের সূচনা হয়। এখন তা ব্যাপকভাবে শুরু করা হয়। (১) শোগুণ যুগে জাহাজ নির্মাণের কাজ শুরু করা হয়েছিল। ১০৮টি ছোট ও মাঝারি জাহাজ শোগুণরা নির্মাণ করেন। এখন কোবে বন্দরে নতুন সরকার এক জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র স্থাপন করেন। নাগাসাকি ও ইয়াকোহামা বন্দরেও নৌ-নির্মাণ শিল্পের সূচনা হয়। ইওরোপীয় যুদ্ধ ও বাণিজ্য জাহাজ নির্মাণের কারিগরী প্রয়োগ করা হয়। সমুদ্রগামী জাহাজ

সরকারি উদ্যোগে ভারী শিল্পকে অগ্রাধিকার দান ও অস্ত্রশিল্প গঠন

নির্মাণের দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত মিৎসুবিশী কোম্পানীর হাতে দেওয়া হয়। (২) জাহাজ নির্মাণ ও রেলপথ নির্মাণের প্রয়োজন মেটাতে লোহা ঢালাই কারখানা স্থাপন করা হয়। শোগুণ যুগে ডাচদের সহযোগিতায় নাগাসাকিতে লোহা ঢালাই কারখানা স্থাপন করা হয়েছিল। এখন আরও কয়েকটি আধুনিক লোহা ঢালাই কারখানা স্থাপন করা হয়। সাতসুমা অঞ্চলে বৃহৎ লোহার কারখানা গঠন করা হয়। (৩) জাপানের পরিবহনের উন্নতিকল্পে রেলপথ নির্মাণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। টোকিও-ইয়াকোহামা, কোবে-ওসাকা- কিয়োতো রেলপথ ১৮৭৭ খ্রীঃ মধ্যেই তৈরি হয়ে যায়। এই সঙ্গে টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা দ্বারা জাপানের সকল বড় শহরকে যুক্ত করা হয়। ১৮৯৪ খ্রীঃ মধ্যে ২১১৮ মাইল রেলপথ নির্মিত হয়। (৪) জাপানে বেশ কয়েকটি অস্ত্র নির্মাণ কারখানা স্থাপন করা হয়। ব্রোঞ্জের কামানের স্থলে এখন থেকে উন্নত মানের আধুনিক দূরপাল্লার লোহার কামান তৈরি শুরু করা হয়। (৫) খনি শিল্পের উন্নতির জন্যে সরকার থেকে ব্যুরো অব মাইনস বা খনি দপ্তর গঠন করা হয়। ১৮৬৯—১৮৮০ খ্রীঃ মধ্যে ব্রিটেনের কারিগরী সহায়তায় আধুনিক ধরনের ৮টি কয়লাখনি চালু করা হয় এবং লোহার খনি থেকে লোহা তোলার কাজ জোরদার করা হয়। ১৯১২ খ্রীঃ মধ্যে জাপানে ১০০টি কয়লা ও লোহার খনি চালু হয়। (৬) ১৮৭১ খ্রীঃ সরকারী উদ্যোগকে জাপানের প্রথম যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারখানা স্থাপিত হয়। জাপানীরা জাতিগতভাবে হাতের কাজে পটু। সুতরাং ইঞ্জিনিয়ারিং ও যন্ত্রপাতি নির্মাণের শিল্প জাপানে ব্যাপক প্রসার লাভ করে। (৭) এই সঙ্গে সরকারী উদ্যোগে সিমেন্ট ও রাসায়নিক শিল্প, পশম ও বস্ত্রশিল্প গঠনে উদ্যোগ নেওয়া হয়। বস্ত্রশিল্প গঠনের কাজে বিদেশ থেকে আমদানী সস্তা সুতীবস্ত্রের সঙ্গে জাপানী বস্ত্রশিল্পকে কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা দ্বারা সাফল্য লাভ করতে হয়। (৮) জাপানে রেশম শিল্প বহুদিন ধরে চালু ছিল। এখন রেশম বস্ত্র উৎপাদনে যন্ত্রের ব্যবহার চালু হয়।

বেসরকারি উদ্যোগ

সরকারী শিল্পোদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারী শিল্পোদ্যোগকে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়। কাগজের মুদ্রা চালু করার ফলে শিল্প গঠনের উপযোগী মূলধনের যোগান সহজতর ছিল। মুদ্রা সংস্কারের সঙ্গে মার্কিনী ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার অনুকরণে ১৮৭৯ খ্রীঃ মধ্যে ১৫১টি জাতীয় ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। ১৮৮২ খ্রীঃ কেন্দ্রীয় সরকারী ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়।

রেশম শিল্প গঠন

বেসরকারী উদ্যোগে হোন্সু (Honsu) প্রদেশকে কেন্দ্র করে জাপানের বিরাট রেশম শিল্প গঠিত হয়। জাপানের বাইরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জাপানী রেশমের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। ১৮৮০ খ্রীঃ জাপানের রপ্তানি বাণিজ্যের ৪০% ছিল রেশম। রেশম রপ্তানি দ্বারা জাপান প্রভূত পরিমাণ বিদেশী মুদ্রা অর্জনে সক্ষম হয়। রেশমের সঙ্গে বেসরকারী বস্ত্র কারখানায় সুতী বস্ত্রের উৎপাদন বাড়ান হয়। জাপানীরা বিভিন্ন ধরনের সুতা তৈরির যন্ত্র আবিষ্কার করে। এই সুতায় বস্ত্র বয়ন ছাড়া, তৈরি সুতা বিশ্বের বাজারে রপ্তানি করা হয়। জাপানী সুতার চাহিদা সর্বত্র বাড়ে। মোট কথা, জাপান বস্ত্রশিল্পে উল্লেখ্য অগ্রগতি লাভ করে।

জাপানের দ্রুত আধুনিকীকরণে সফলতার কারণ (The causes of the rapid success of Japan in modernisation) : চীনে পাশ্চাত্য অনুপ্রবেশের ফলে চীং বংশ শাসিত চীন প্রায় ভেঙে পড়ে। বৈদেশিক জাতির কাছ থেকে চীন শিক্ষা নিতে অনিচ্ছা দেখায়। অপরদিকে জাপানে পাশ্চাত্য অনুপ্রবেশ ঘটলে জাপান, চীনের মত অসহায়, নিস্ফল প্রতিবাদে নিজেকে নিঃশেষ করেনি। জাপান বিজয়ী পাশ্চাত্য জাতির শ্রেষ্ঠত্বের কারণগুলি খুঁটিয়ে বিচার করে। অতঃপর জাপান অত্যন্ত দ্রুতগতিতে পাশ্চাত্যের অনুকরণে আধুনিকীকরণের কাজ শুরু করে। পরম নিষ্ঠাভরে, একাগ্র ভাবে আধুনিকীকরণের সাধনার

পুরস্কার জাপান লাভ করে। ১৮৬৭—১৮৯৪ এই ২৭ বছরের মধ্যে জাপান যেন দানবীয় শক্তিতে একশত বছরের উন্নয়নের কাজ সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়। শিক্ষা, সংবিধান, আইনের সংস্কার, শিল্প গঠন, সামরিক সংস্কার প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রে জাপান তার মধ্যযুগীয় খোলস পরিত্যাগ করে, আধুনিক যুগের অলিন্দে পূর্ণগৌরবে উদ্ভাসিত হয়। উদীয়মান সূর্যের দেশ জাপান এশিয়ার আকাশে এক উদীয়মান নব সূর্যের মতই দেখা দেয় এমন সময়, যখন ভারত ছিল ব্রিটিশের পদানত, ম্রিয়মান, দুর্দশাগ্রস্থ, চীন ইওরোপীয় অনুপ্রবেশে দারিদ্র পীড়িত ও ভগ্নদশা গ্রস্থ। জাপানের এই সাফল্যের রহস্য কি তা ঐতিহাসিকরা ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছেন।

দ্বীপময় জাপান, ভৌগোলিক দিক থেকে, এশিয়ার মূল ভূখণ্ডের প্রভাবে প্রাচীনকাল থেকে শিক্ষা, সংস্কৃতি গ্রহণে অভ্যস্ত ছিল। চীন থেকে জাপান অতীতে ধর্মমত ও সভ্যতার পাঠ নেয়।

জাপানের নব সভ্যতা, সংস্কৃতি আপন করার ক্ষমতা

সুতরাং জাপান অন্য দেশ থেকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা নিতে অভ্যস্ত ছিল। এ বিষয়ে তার কোন রক্ষণশীলতা বা ছুঁৎমার্গ ছিল না। পাশ্চাত্যের জাপানে অনুপ্রবেশের পর জাপান তাই সহজে ইওরোপ থেকে বিজ্ঞান, কারিগরী বিদ্যা, শিক্ষা, আইন ও সংবিধান সম্পর্কে শিক্ষা দ্রুত গ্রহণ করে, তা আত্মস্থ করে ফেলে। চীনের মত অহমিকা ও ভ্রান্ত আত্মগরিমা নিয়ে জাপান নিজেকে ক্ষয় করেনি।

জাপানের সমাজ ছিল সামন্ততান্ত্রিক পিরামিডের মতই উল্লম্বভাবে গঠিত। শোগুণ, তার নীচে দাইমিও, তার নীচে সামুরাই এবং সবার নীচে জাপানী কিষান। এই থাকবন্দী সমাজে

জাপানের উল্লম্ব সমাজ ব্যবস্থার প্রভাব

শৃঙ্খলা ছিল বিস্তর এবং উর্দ্ধতন শ্রেণীর আদেশ পালনের নিয়ম ছিল বদ্ধমূল। কনফুসিয় ভাবধারা ও নীতিবাদের প্রভাবে প্রতি শ্রেণী তাদের কর্তব্য পালন করা নৈতিক দায়িত্ব বলে মনে করত। সুতরাং Restoration-এর পর সম্রাট আধুনিকীকরণের ঘোষণা দিলে তা উল্লম্বভাবে (Vertically) সমাজের তলদেশ পর্যন্ত ফিল্টারের জলের মতই গড়িয়ে আসে। যান্ত্রিক শৃঙ্খলা নিয়ে জাপানবাসী এজন্য আধুনিকীকরণের কাজে আত্মনিয়োগ করে। কোন প্রশ্ন তুলে বিতর্ক করে, বাগাড়ম্বর দেখিয়ে জাতির প্রয়োজনীয় সংগঠনকে বিড়ম্বিত করেনি। ধর্মীয় বিশ্বাসের মতই, নিষ্ঠা নিয়ে আধুনিকীকরণের যজ্ঞে নিজেদের আহুতি দেয়।

জাপানীদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য হল প্রয়োগবাদ (Pragmatism)। জাপানবাসীদের বৌদ্ধিক গঠনই হল অপর জাতির উৎকর্ষতার কারণগুলি খুঁজে তা আত্মস্থ করা এবং অপর সভ্যতার জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে সার গ্রহণ করে তা নিজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা। পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক

জাপানের প্রয়োগবাদী চরিত্র

অগ্রগতি ও কারিগরী জ্ঞানকে আত্মস্থ করতে এজন্য জাপানের দেরী হয়নি। যে ক্ষেত্রে চীনের বুদ্ধিজীবিরা পাশ্চাত্যের সঙ্গে সংযোগের পর পাশ্চাত্যকে উপেক্ষা করে ভুলে থাকতে চান, জাপানের বুদ্ধিজীবিরা আগ্রহ সহকারে পাশ্চাত্যের কাছ থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা আহরন করেন। নতুনকে জানার কৌতূহল প্রবণতা ছিল জাপানের স্বাভাবিক চরিত্র। ডাচদের মাধ্যমে ডাচ ভাষা শিক্ষা করে, কমোডোর পেরীর জাপানে আসার আগেই, জাপানবাসীরা ইওরোপ সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করে।

চীনের বিশাল ভূখণ্ডের তুলনায়, জাপানের ভৌগোলিক বিস্তৃতি না থাকায়, জাপানের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। দাইমিও শাসনে জাপান বিভিন্ন 'হানে' বা শাসনকেন্দ্রে বিভক্ত

জাপানের ঐক্য

হলেও, জাপানবাসীরা ছিল একতাবদ্ধ। চীনের মত জাপানের বিভিন্ন আঞ্চলিক সংস্কৃতির ব্যবধান জাপানে ছিল না। জাপানে শিন্তো ধর্মমত জাপানীদের একটি স্বতন্ত্র ঐক্য ও শক্তি দেয়। এই ধর্মমতের ফলে সম্রাটের প্রতি জাপানীদের

শ্রদ্ধা ও আনুগত্য ছিল দ্বিধাহীন। জাপানবাসীদের কাছে সম্রাটই ছিলেন দেশ। সুতরাং সম্রাটের দ্বারা আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া চালু হলে, জাপানীরা তা সফল করতে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

জাপানের নব সামুরাই নেতাদের কথা ভোলা উচিত নয়। এই সামুরাই শ্রেণী যদিও আদিতে ছিল মধ্যযুগীয় যোদ্ধা; কিন্তু তাদের দেশপ্রেম, সম্রাটের প্রতি আনুগত্য এবং রাষ্ট্রের প্রয়োজনে আত্মত্যাগের ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। সম্রাটের আহ্বানে জাপানের দাইমিও ও সামুরাইগণ বিনা প্রতিবাদে তাদের জমিদারী স্বত্ব ও ভূমিস্বত্ব ছেড়ে দেয়। সামান্য ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে তারা এই আত্মত্যাগ দ্বারা জাপানের কৃষি ব্যবস্থায় শুধু বিপ্লব ঘটায় নি, গোটা জাতিকে এগিয়ে যেতে তারা সাহায্য করে। নব সামুরাই নেতাগণ জাপানের নব নির্মাণের কাজে আত্মোৎসর্গ করেন।

সামুরাইদের প্রভাব

জাপানের শিন্তো ধর্মমত, জাপানবাসীর মনে এক দেশপ্রেমের সৃষ্টি করেছিল; যা ছিল জাপানীদের কাছে ধর্ম বিশ্বাসের মতই পবিত্র। শিন্তোবাদের প্রভাবে জাপানবাসীরা পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান, সভ্যতা অনুকরণ করলেও, তাদের অন্তর্নিহিত জাপানী সত্তাকে হারিয়ে ফেলেনি। শিন্তো ধর্মের প্রভাবে এই ধর্মমত ও সম্রাট অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হন। শিন্তোবাদ থেকে জাপানবাসীরা সম্রাটের জন্যে প্রাণ বিসর্জনকে কর্তব্য কর্ম বলে ভাবতে শিখে। শিন্তোবাদ, সম্রাটবাদ ও জাতীয়তাবাদ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হয়ে যায়।

শিন্তো ধর্মের প্রভাব

জাপানের এই অসাধারণ অগ্রগতির কারণ ছিল জাপানের জাতীয়তাবাদ। অতীতে বিশাল চীনের ক্ষুদ্র প্রতিবেশী হিসেবে জাপান 'হীনমন্যতায়' (Inferiority Complex) ভুগত। এজন্য ত্রয়োদশ শতক থেকেই জাপানীরা একটি আত্মসচেতন জাতিতে পরিণত হয়। উনবিংশ শতকে জাপানের জাতীয়তাবাদ ছিল প্রখর। জাপানের বিভিন্ন দাইমিওগণের মধ্যে ভয়ঙ্কর বিরোধ থাকা সত্ত্বেও, জাপানের কোন দাইমিও বৈদেশিক শক্তির সঙ্গে দেশের স্বার্থ বিরোধী চুক্তি বা জোট তৈরি করা থেকে বিরত ছিল। জাতীয় স্বার্থকে প্রতি জাপানবাসী সর্বাগ্রে স্থান দিত।

জাতীয়তাবাদের প্রভাব

জাপানের অর্থনৈতিক অগ্রগতি বিশেষতঃ শিল্প গঠনের ভিত্তি তোকুগাওয়া যুগে তৈরি হয়েছিল। সপ্তদশ শতক থেকে জাপানে কৃষি-বিপ্লব ঘটে। ওসাকা ও এডো বন্দরে বিরাট শস্য রপ্তানি কেন্দ্র কৃষি-বিপ্লবের ফলে গড়ে উঠেছিল। শোগুণ সরকার কৃষির ওপর কর চাপালেও, শিল্পের ওপর কর হ্রাস করেন। এজন্য মিৎসুই প্রভৃতি বিরাট বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিষ্ঠান জাপানে গড়ে উঠেছিল। জাপানের বৈষয়িক উন্নতির ফলে জীবনযাত্রার মান ছিল উন্নত। ফেয়ার ব্যাঙ্কের মতে, তোকুগাওয়া যুগে জাপানের কৃষি ও শিল্পের অগ্রগতি, Restoration যুগের আধুনিকীকরণের পাদপীঠ রচনা করে। সামাজিক দিক থেকে দরিদ্র সামুরাইগণ তাদের পূর্বতন বংশাভিমান ত্যাগ করে সাধারণ জাপানী জনগণের সঙ্গে মিলে যাচ্ছিল। সমাজের থাকবন্দী ব্যবধান ভেঙে সমাজ আধুনিক হচ্ছিল। এদিকে গ্রামের ভূমিহীন শ্রমিকরা শিল্প শ্রমিকে পরিণত হচ্ছিল। ফেয়ার ব্যাঙ্ক বলেন যে, "জাপানের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়াকে সফল হতে দারুণ সাহায্য করে।"

তোকুগাওয়া যুগের সংগঠন

প্রথম চীন-জাপান যুদ্ধ (১৮৯৪-৯৫ খ্রীঃ) ও সিমনোশেকির সন্ধি, জাপানের পররাষ্ট্র নীতি, ১৮৬৭-১৮৯৫ খ্রীঃ (The First Sino-Japanese War (1894—95) and the Treaty of Shimonoseki : The Foreign policy of Japan (1867-95) ঃ পশ্চিমী শক্তির পদাঘাতে জাপানের

দরজা বিশ্বের কাছে উন্মুক্ত হওয়ার পর, জাপান আত্মসচেতন হয়। জাপান দ্রুতগতিতে তার আভ্যন্তরীণ আধুনিকীকরণের কাজ প্রায় ২½ দশকের মধ্যে সমাপ্ত করে। অতঃপর জাপান ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির কাছে জাপানের ওপর চাপিয়ে দেওয়া বৈষম্যমূলক সন্ধিগুলির বিলুপ্তি দাবী করে। ১৮৭১ খ্রীঃ জাপান থেকে বিভিন্ন রাষ্ট্রের কাছে এজন্য দূতমিশন পাঠানো হয়। কিন্তু গর্বিত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি জাপানের প্রস্তাবে কান দেয়নি। কিছু কিছু জাপানী নেতা এজন্য বলতে থাকেন যে, জাপানের বাহুবল প্রদর্শন না করলে পশ্চিমী শক্তিগুলিকে বৈষম্যমূলক সন্ধি প্রত্যাহারে বাধ্য করা যাবে না। এজন্য পশ্চিমী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরার মত সাহস তখনও জাপান অর্জন করতে পারেনি। কাজেই জাপানের প্রাচীন প্রতিদ্বন্দ্বী চীনের বিরুদ্ধে জাপান সাম্রাজ্যবাদী নীতি নেয়। চীনের বিরুদ্ধে জাপান সফল হলে, তার শক্তির আস্ফালনে পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলি বৈষম্যমূলক সন্ধি প্রত্যাহারে বাধ্য হবে বলে ভাবা হয়।

বৈষম্যমূলক সন্ধি অপসরণে প্রাথমিক বিফলতার ফল

পশ্চিমী শক্তিগুলির আগ্রাসনের সম্মুখে চীং সরকারের অসহায়তা জাপানের আত্মবিশ্বাস বাড়ায়। চীনের উত্তর-পশ্চিমে রাশিয়া ইলি প্রদেশ দখলের চেষ্টা করায় চীন সাফল্যের সঙ্গে তা প্রতিহত করলেও ১৮৮৪ খ্রীঃ ফ্রাঙ্কো-চীন যুদ্ধে ফরাসী নৌ-বহরের হাতে চীনের শোচনীয় পরাজয় জাপানের মনোবল বাড়ায়। জাপান বিশ্বাস করতে থাকে যে, জাপানের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তার প্রাচীন প্রতিদ্বন্দ্বী চীন আত্মরক্ষায় অক্ষম হবে।

ফ্রাঙ্কো-চীন যুদ্ধে চীনের পরাজয়ের পরোক্ষ ফল

যদিও ফ্রাঙ্কো-চীন যুদ্ধে পরাজয়ের পর চীনে জাতীয়তাবাদী শক্তি প্রবল হয় এবং চীনে "আত্মশক্তিগঠনে"র (Self strengthening Movement) আন্দোলন প্রবল হয়, কিন্তু চীনে প্রাচীন রক্ষণশীলতা, জাতীয় অহমিকাবোধ এত তীব্র ছিল যে, চীন পাশ্চাত্য সংস্কারকে আত্মস্থ করতে অক্ষম হয়। এই আত্মশক্তি গঠন আন্দোলনের একমাত্র নীট ফল ছিল যে, চীন একটি ক্ষুদ্র নৌ-বহর বা "পেইয়াং নৌ বাহিনী" গঠনে সক্ষম হয় এবং লি-হাং-চাং-এর উদ্যোগে একটি "নব আদর্শ সেনাদল" (New Model Army) গঠিত হয়। কিন্তু বিশাল চীনের আত্মরক্ষার প্রয়োজনের তুলনায় তা ছিল অকিঞ্চিৎকর। চীনের "আত্মশক্তি সংগঠন" প্রচেষ্টার ব্যর্থতা জাপানের আত্মবিশ্বাস আরও বাড়িয়ে দেয়।

চীনের পাশ্চাত্য সংস্কার গ্রহণে অক্ষমতার ফল

নবোদিত জাপানে একটি উগ্র জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়। এদের মধ্যে ছিল বেশ কিছু বুদ্ধিজীবি, শিল্পপতি জাইবাৎসু এবং সমর বিভাগের লোক। জাপানের এই জাতীয়তাবাদীদের বক্তব্য ছিল যে, (ক) জাপানের দ্বীপভূমিতে জাপানের লোকসংখ্যার সঙ্কুলান হচ্ছে না। এশিয়ার মূল ভূখণ্ডে বিস্তার লাভ করে জাপানকে তার "জীবনধারণের স্থান" (Living space) যোগাড় করতেই হবে। নতুবা জাপানের মূল ৪টি দ্বীপ ও সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্র দ্বীপগুলিতে জাপানের জনবসতি, খাদ্য সমস্যা প্রভৃতির সংস্থান হবে না। (খ) জাপানের জাইবাৎসু গোষ্ঠীর শিল্পপতিরা বলেন যে, জাপানের যে হারে শিল্পবিস্তার হচ্ছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে জাপানের খনিজ সম্পদ ও কাঁচামালের সরবরাহে অভাব দেখা দিবে। জাপানের নিজস্ব ভূমিতে লোহা, কয়লার মজুদ কম। তা শীঘ্রই ফুরিয়ে যাবে। শিল্পের জন্যে দরকারী কাঁচামাল তুলা, চামড়া, রবার ও রাসায়নিক দ্রব্যের সরবরাহ প্রয়োজনের তুলনায় কম। জাপানের শিল্প কারখানার উদ্বৃত্ত মাল বিক্রীর একচেটিয়া বাজারও নেই। জাপানের প্রয়োজন মিটে গেলে উদ্বৃত্ত শিল্পদ্রব্যের বিক্রীর বাজার না পেলে, জাপানের পুঁজিবাদী শিল্পের বিকাশ হবে না। যদি ইওরোপীয় জাতিগুলি চীনে বাজার দখল করে, তবে প্রতিবেশী জাপানেরও তাই করা দরকার।

জাপানের সাম্রাজ্যবাদের পশ্চাতে বিভিন্ন শক্তির গোষ্ঠী

(গ) জাপানের সমর নেতারা রণনীতি ও জাপানের ভৌগোলিক অবস্থানের পটভূমিতে বলেন যে, জাপানের আত্মরক্ষার জন্যে শুধু আধুনিক অস্ত্র সজ্জিত সেনাদল ও নৌ-বহর যথেষ্ট নয়। জাপান এত ছোট দেশ যে, আক্রান্ত হলে নিজের জমিতে দাঁড়িয়ে, দরকার মত পিছু হঠে লড়াই করার জায়গা নেই। জাপানের আত্মরক্ষার সামরিক বলয় কোরিয়া, মাঞ্চুরিয়া অঞ্চল নিয়ে গঠন করা দরকার। যেহেতু এই অঞ্চলগুলি ছিল চীনের দখলে, সেহেতু জাপানী সমর নেতারা দাবী করেন যে, জাপানের আত্মরক্ষার বহির্বলয় হিসেবে কোরিয়াকে জাপানের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণে আনা প্রয়োজন। জাপানের নৌ-সেনাপতিরা বলেন যে, কোরিয়া উপকূল থেকে জাপানের উপকূলের দূরত্ব এত কম যে, যে কোন ইওরোপীয় নৌ-শক্তি কোরিয়া দখল করলে, এক লাফে জাপানে এসে পড়বে। জাপান তার উপকূল রক্ষার সময় পাবে না। তাঁদের মতে ভৌগোলিকভাবে "কোরিয়া ছিল জাপানের হৃদপিণ্ডের প্রতি লক্ষ্য করে উদ্যত ছুরিকা বিশেষ" (Korea is a dagger pointed at the heart of Japan)। চীনে যে হারে ইওরোপীয় শক্তির অনুপ্রবেশ ঘটছে এবং কোরিয়ার দিকে রাশিয়ার দৃষ্টি যেভাবে পড়েছে, তাতে জাপানকে অবিলম্বে কোরিয়াকে নিজ নিয়ন্ত্রণে আনা দরকার। এইভাবে জাপানের জাতীয়তাবাদী, সাম্রাজ্যবাদী ও সামরিক গোষ্ঠী চীনের তৎকালীন সামন্ত রাজ্য কোরিয়া দখলের আওয়াজ তোলে।

লু-চু দ্বীপপুঞ্জ অধিকার

এশিয়ার মূল ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশের জন্যে কূটনৈতিক বর্ষাফলক হিসেবে জাপান, চীনের কাছে দাবী জানায় যে, ইওরোপের অন্যান্য শক্তিকে চীন যে সকল অধিকার দিয়েছে, জাপানকে সমান অধিকার দিতে হবে। চীং সরকার জাপানের এই দাবী নস্যাৎ করায়, ১৮৭৪ খ্রীঃ জাপান চীনের লু-চু দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করে। রাশিয়ার কাছ থেকে শাখালিন দ্বীপপুঞ্জের বিনিময়ে কিওরাইল অধিকার করে।

অতঃপর জাপান কোরিয়া উপদ্বীপের দিকে নজর দেয়। কোরিয়া দেশটির ওপর দীর্ঘকাল চীন Suzeraine বা অধিরাজত্ব দাবী করত। কিন্তু চীন Tribute System বা সামন্ত আনুগত্যের প্রতীক স্বরূপ কোরিয়ার কাছ থেকে নজরানা বা Tribute পেয়েই সন্তুষ্ট থাকত। এর বেশী কিছু ব্যবস্থা গ্রহনের ক্ষমতা চীনের ছিল না। চীন তার আভ্যন্তরীণ সঙ্কট নিয়ে ব্যস্ত ছিল। কোরিয়ার রাজা ছিলেন চীনের অধীনে এক সামন্ত রাজা; কোরিয়া ছিল এক দুর্বল পিছিয়ে-পড়া দেশ। সুযোগ বুঝে ইওরোপীয় জাতিগুলি বিশেষতঃ রাশিয়া কোরিয়ার প্রতি লোভী দৃষ্টি দেয়।[১] এই সময় কোরিয়ার শাসক শ্রেণীর মধ্যে দুটি গোষ্ঠী দেখা দেয়। পাশ্চাত্যপন্থী জাপানী সংস্কারক ফুকুজাওয়া ইউকিচির প্রভাবে, কোরিয়ার জাতীয়তাবাদী কিম-ওক-কুন প্রভৃতি দাবী করেন যে, কোরিয়াতে জাপানের সহযোগিতায় পাশ্চাত্য সংস্কার প্রবর্তন করা দরকার। অপরদিকে প্রতিদ্বন্দ্বী মিন গোষ্ঠী চীনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন এবং কোরিয়াকে বহির্জগত থেকে বিচ্ছিন্ন রাখার দাবী করে। জনৈক কোরীয় চীনপন্থী উগ্র মস্তিষ্ক ব্যক্তি সংস্কারপন্থী ও জাপানবাদী কিম-ওক-কুনকে হত্যা করলে জাপানে তীব্র ক্ষোভ ও বিরক্তি দেখা দেয়।

কোরিয়ায় চীনের সমমর্যাদা দাবী

জাপান অতঃপর কোরিয়া সম্পর্কে এক দুমুখো কূটনীতি অনুসরণ করে। একদিকে জাপান দাবী করে যে, কোরিয়ায় বিদেশী অনুপ্রবেশের সম্ভাবনা রোধ করার জন্যে কোরিয়া সরকারকে আধুনিক সংস্কার নীতি নিতে হবে। এ বিষয়ে চীনের সহযোগিতা নিতে জাপানের আপত্তি নেই। অপরদিকে জাপান দাবী করে যে, কোরিয়ার ওপর চীনের অধিরাজত্বের দাবী জাপান মানতে রাজী নয়। কোরিয়ায় চীন

১· Fair Bank—East Asia.

ও জাপানের সমান মর্যাদা ও অধিকার স্থাপন করতে হবে। কোরিয়ার রাজা আভ্যন্তরীণ গোলমাল দমনের জন্যে চীনের সাহায্য চাইলে চীন একটি ক্ষুদ্র সেনাদল কোরিয়ায় পাঠায়। সঙ্গে সঙ্গে জাপানও এক সেনাদল কোরিয়াতে নামিয়ে দিয়ে চীনের সঙ্গে তার সমান অধিকার দাবী করে।

চীনের প্রধানমন্ত্রী লি-হাং-চাং জাপানের সঙ্গে যুদ্ধের সম্ভাবনা এড়াবার জন্যে ১৮৮৫ খ্রীঃ জাপানের সঙ্গে লি-ইটো কনভেনশন নামে এক চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তির দ্বারা স্থির হয় যে, উভয় শক্তির কেহ অপরের সম্মতি ছাড়া কোরিয়াতে সেনাদল পাঠাবে না। কোরিয়াতে সংস্কারের কাজ জোরদার করা হবে। কোরিয়াকে নিরপেক্ষ দেশ হিসেবে গণ্য করা হবে। লি-হাং-চাং এই সন্ধির দ্বারা, ঐতিহাসিক ভিন্যাকের (Vinacke) মতে আইনতঃ কোরিয়ার ওপর চীনের অধিরাজত্বের (Suzerainty) দাবী ত্যাগ করেন। জাপানী কূটনীতির ফাঁদে তিনি পা দিয়ে ভুল করেন।

লি-ইতো কনভেনশন

ইতিমধ্যে টং-হ্যাক নামে এক গোষ্ঠী কোরিয়ায় বিদ্রোহ ও গণ্ডগোল সৃষ্টি করে। চীনের শাসকরা লি-ইটো চুক্তির পর নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে অনুশোচনায় ছিলেন। এখন টং-হ্যাক বিদ্রোহ দমনের অজুহাতে জাপানের সম্মতি ছাড়া চীন এক বিরাট সেনাদল কোরিয়াতে ঢুকিয়ে দিলে, জাপান জানায় যে, এর দ্বারা চীন লি-ইটো সন্ধি ভেঙে ফেলল। জাপানও এক বিরাট বাহিনী কোরিয়ায় পাঠিয়ে দেয়। জাপান চীনের সেনাবাহী জাহাজ কোশিং ডুবিয়ে দেয়। জাপান দাবী জানায় যে, চীন-জাপানের যুক্ত তত্ত্বাবধানে কোরিয়ায় আধুনিক সংস্কার চালু করতে হবে। চীন এই প্রস্তাবে রাজী না হলে, জাপান কোরিয়ার সিংহাসনে নিজের হাতের পুতুল বসিয়ে তার মাধ্যমে চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে প্রথম চীন-জাপান যুদ্ধ শুরু হয় (১৮৯৪ খ্রীঃ)।

টং-হ্যাক বিদ্রোহ ঃ কোরিয়ায় চীনের হস্তক্ষেপ

প্রথম চীন-জাপান যুদ্ধে ইওরোপীয় রণকৌশলে শিক্ষিত জাপানী সেনা ও নৌ-বহর চীনকে সহজে পরাস্ত করে। ইয়ালুর (Yalu) নৌ-যুদ্ধে জাপান চীনের গর্ব পেইয়াং নৌ-বহরকে আংশিক ধ্বংস করে এবং অবশিষ্ট নৌ-বহরকে ওয়াই-হা-ওয়ে বন্দরে অবরোধ করে। জাপানী স্থল সেনা মাঞ্চুরিয়ার দক্ষিণ ভাগে পোর্টআর্থার বন্দর অধিকার করে। অপর এক বাহিনী চীনের রাজধানী পিকিং আক্রমণের উদ্যোগ নিলে, চীনা প্রধানমন্ত্রী লি-হাং-চাং সন্ধি প্রার্থনা করলে, সিমনোসেকির সন্ধি (১৮৯৫ খ্রীঃ) দ্বারা প্রথম চীন-জাপান যুদ্ধের অবসান হয়।

প্রথম চীন-জাপান যুদ্ধ ১৮৯৪ খ্রীঃ

সিমনোসেকির সন্ধির (১৮৯৫ খ্রীঃ) দ্বারা স্থির হয় যে, (১) কোরিয়ার স্বাধীনতা চীন স্বীকার করবে। (২) জাপান কোরিয়া সরকারের সম্মতিক্রমে কোরিয়ায় হস্তক্ষেপ করলে চীনের কোন আপত্তি থাকবে না। (৩) ফরমোজা, পেস্কাডোরেস ও দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ার লিয়াও টুং উপদ্বীপ চীন জাপানকে ছেড়ে দেবে। (৪) লিয়াও টুং উপদ্বীপের পোর্টআর্থার বন্দরে জাপানী আধিপত্য চীন স্বীকার করবে। (৫) যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ জাপানকে ২০০ মিলিয়ন টীল ক্ষতি চীন দিবে। (৬) চীনের ৪টি বন্দর জাপানকে ব্যবহারের জন্যে চীন খুলে দিবে। (৭) পশ্চিমী শক্তিগুলি চীনে যে ধরনের বাণিজ্যিক চুক্তি স্থাপন করেছে, সমান শর্তে জাপানের সঙ্গে চীন বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষর করবে।

সিমনোসেকির সন্ধি

প্রথম চীন-জাপান যুদ্ধে জাপানের জয়লাভের ফলাফল (The Results and Consequences of Japanese victory in the Sino-Japanese war) ঃ প্রথম চীন-জাপান যুদ্ধের ফলাফল ছিল দূর প্রাচ্যের ইতিহাসে গভীর এবং সুদূরপ্রসারী। এই যুদ্ধে বিজয়ী জাপান অকস্মাৎ পূর্ব এশিয়ার রাজনৈতিক আকাশে এক নতুন তারকা রূপে দেখা দেয়। জাপানের সামরিক শক্তি, কূটনৈতিক দক্ষতা, পরিকল্পনা

অনুযায়ী কাজ করার ক্ষমতা ইওরোপীয় শক্তিগুলিকে চমকিত করে। এর আগে আর কোন এশিয় শক্তি এই দক্ষতা ও ক্ষমতার পরিচয় দিতে পারেনি। এই যুদ্ধে জাপানের জয় প্রমাণ করে যে, অতঃপর জাপানকে বাদ দিয়ে ইওরোপীয় শক্তিগুলি চীন তথা পূর্ব-এশিয়ার ব্যাপারে একতরফা সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না।

জাপানের আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা লাভ

প্রথম চীন-জাপান যুদ্ধে জাপানের জয় জাপানকে এক অসাধারণ মর্যাদায় ভূষিত করে। জাপানের আধুনিকীকরণ নীতির সফলতায় শুধু জাপানবাসীরা মোহিত হয়নি, চীন সহ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে সাড়া জাগায়। জাপানবাসীরা তাদের আধুনিক সংস্কারে আরও অধিকতর আস্থাশীল হয়। জাপানের আত্মবিশ্বাস এত প্রবল হয় যে, জাপান একতরফাভাবে তার ওপর ইওরোপীয় শক্তিগুলির চাপিয়ে দেওয়া বৈষম্যমূলক সন্ধিগুলিকে নাকচ করে দেয়। জাপানে অবস্থিত ইওরোপীয়দের অতি রাষ্ট্রিক অধিকার লোপ করা হয়। জাপানের আমদানি-রপ্তানী শুল্কের হার ৫% নির্দিষ্ট না রেখে জাপান তার ইচ্ছামত বাড়িয়ে দেয়। ইওরোপীয় বণিকরা জাপানের সিদ্ধান্ত মানতে বাধ্য হয়।

চীন-জাপান যুদ্ধে জয়লাভের ফলে জাপানের সাম্রাজ্যবাদী নীতি আরও উদগ্র হয়। অতঃপর জাপান কোরিয়াকে গ্রাস করার নীতি নেয় এবং ১৯১১ খ্রীঃ কোরিয়া জাপানের অন্তর্ভুক্ত হয়। জাপানের প্রসার নীতিতে বাধাদানের ফলে ১৯০৫ খ্রীঃ রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপান রাশিয়াকে পরাস্ত করে এবং ক্রমে ক্রমে মাঞ্চুরিয়া গ্রাসের নীতি নেয়। মোট কথা, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত জাপান এক নাগাড়ে তার আগ্রাসী নীতি অনুসরণ করে। এর ফলে পূর্ব এশিয়ায় পশ্চিমী শক্তির প্রতিষ্ঠিত শক্তিসাম্য ভেঙ্গে পড়ে।

লিয়াও-টুং উপদ্বীপ সম্পর্কে রাশিয়ার সঙ্গে বিরোধ

চীনের উপর এই যুদ্ধের প্রভাব কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। চীন-জাপান যুদ্ধ শুরু হলে চীন সহ বহু শক্তির মনে হয় যে, বিশাল চীনের শক্তির সামনে ক্ষুদ্রাকৃতি জাপান টিকতে পারবে না। জাপানের হাতে চীনের শোচনীয় পরাজয়, চীনে গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। (১) এর ফলে চীনের প্রধানমন্ত্রী লি-হাং-চাং-এর প্রভাব দ্রুত হ্রাস পায়। লি-র রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী চ্যাং-চি-টুং-এর প্রভাব বাড়তে থাকে। মাঞ্চু সরকার বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে লি অপেক্ষা চ্যাং-এর ওপর অধিক নির্ভরশীল হন। লির সহকারী য়ুয়ান-সি-কাই উত্তর চীনে নিজ দায়িত্বে সামরিক সংগঠনের কাজ শুরু করেন। (২) চীনের বহু দেশপ্রেমিক, জাপানের হাতে চীনের পরাজয়ের ফলে চীনের চিরাচরিত-ব্যবস্থার উপর আস্থা হারান। এঁরা চীনের রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার সমালোচনা করে, দ্রুত সংস্কার প্রবর্তনের দাবী জানান। চীং সরকারের দপ্তরে সংস্কারের দাবী জানিয়ে ঘন ঘন স্মারকলিপি পাঠান হয়। এই স্মারকলিপিগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ছিল কাং-ইউ-ওয়ের স্মারকলিপি (বিশদ বিবরণ পরে দ্রষ্টব্য)। এই স্মারকলিপি অনুসারে চীনে একশত দিনের সংস্কার (Hundred Days' Reforms) চালু হয়। এর পর থেকে "আত্মসংগঠন আন্দোলন" (Self strengthening Movement) জোরদার হয়। এই সংস্কারের লক্ষ্য ছিল চীনকে শক্তিশালী করে তোলা।

প্রথম চীন-জাপান যুদ্ধে চীনের উপর প্রভাব

চীন-জাপান যুদ্ধের সুদূরপ্রসারী পরোক্ষ ফল হিসাবে চীনে মাঞ্চু বা চীং রাজবংশের পতন ঘনিয়ে আসে। চীনের উদীয়মান জাতীয়তাবাদী নেতারা কৃতনিশ্চয় হন যে, চীং বংশের শাসনে চীন কোনদিন আধুনিক জগতে তার আত্মশক্তি লাভ করতে সক্ষম হবে না। মাঞ্চু শাসন অত্যন্ত সামন্ততান্ত্রিক, জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন এবং ঐতিহ্যবাহী, প্রাচীনপন্থী, সংস্কারবিমুখ, রক্ষণশীল শাসনব্যবস্থা। এই শাসনব্যবস্থার ত্রুটির জন্যেই জাপানের মত ক্ষুদ্র প্রতিবেশীর হাতে চীন

হেনস্থা হয়েছে। এর ফলে চীনা জাতীয়তাবাদী, চীনের ছাত্র সমাজ চীং সরকারের পতন কামনা করে। চীন-জাপান যুদ্ধের ১½ দশকের মধ্যে চীং সরকারের পতন ঘটে।

চীন-জাপান যুদ্ধের আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া ছিল গভীর ও সুদূরপ্রসারী। প্রথমতঃ, চীনের বিরুদ্ধে জাপানের অনায়াস জয়, পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলিকে হতচকিত করে। তারা শীঘ্রই উপলব্ধি করে যে, পূর্ব এশিয়ায় তাদের সমকক্ষ একটি নবশক্তির অভ্যুত্থান ঘটেছে। ইওরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি দেখে তারা তাদের ইচ্ছামত যে শক্তিসাম্য চীনে স্থাপন করেছিল, নবাগত জাপান তা ভেঙ্গে ফলতে উদ্যত হয়েছে। জাপানের অগ্রগতিতে এই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি ঈর্ষাবোধ করে।[১] দ্বিতীয়তঃ, ব্রিটেন এতদিন চীনের হিতাকাঙ্ক্ষীর ভূমিকা নিয়ে, চীনে আপন অধিকার ভোগ করত। বুদ্ধিমান ব্রিটিশ শাসকগণ পরিস্থিতি উপলব্ধি করে চীন-ঘেঁষা নীতি ত্যাগ করে জাপান-ঘেঁষা নীতি নেয়। তৃতীয়তঃ, জার শাসিত রাশিয়া জাপানের সাফল্যে ঈর্ষাকাতর এমনকি আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। আসলে রাশিয়া চীনের অন্তর্গত মাঞ্চুরিয়া অঞ্চলে অনুপ্রবেশের চেষ্টায় ছিল। সিমনোসেকির সন্ধির দ্বারা জাপান দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ার লিয়াও-টুং উপদ্বীপ অধিকার করায়, রাশিয়ার পরিকল্পনা রূপায়নে বাধা পড়ে। এজন্য রাশিয়া কূটনীতি ও বল প্রয়োগের ভীতি প্রদর্শন করে জাপানকে নিরস্ত করে। রাশিয়া চীং সরকারকে বুঝায় যে, জার সরকার এই বিপদের দিনে চীনের প্রতি বন্ধুত্ব জানাবে। ব্রিটিশ সরকার এখন চীনকে পরিত্যাগ করে জাপানমুখী হলেও, রাশিয়া তা করবে না।[২] অপরদিকে জার সরকার জাপানকে হুঁশিয়ারী দেয় যে, জাপান যেন লিয়াও-টুং উপদ্বীপ থেকে হাত উঠিয়ে নেয়। কারণ এই অঞ্চলে জাপানের অনুপ্রবেশের অর্থ হল কোরিয়াকে বিচ্ছিন্নকারী এবং চীনের ভিতর অনুপ্রবেশের বর্ষাফলক রচনা করা। জাপানকে ভীতি প্রদর্শনের জন্যে জার সরকার তার এবং মিত্র জার্মানী ও ফরাসী নৌবহরের এক মহড়ার, জাপানের সমুদ্রসীমা তুষিমা উপসাগরে অনুষ্ঠিত করে। জাপান বাধ্য হয়ে ৩০ মিলিয়ন টিল ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে লিয়াও টুং উপদ্বীপের উপর তার দাবী ত্যাগ করে। অবশ্য জার সরকারের চীনের প্রতি কপট মিত্রতা শীঘ্রই ধরা পড়ে যায়। জার সরকার, অসহায় চীনের উপর লি-লোবানভ চুক্তি চাপিয়ে দেয়। এই চুক্তির দ্বারা চীন আপাততঃ ২৫ বছরের জন্যে লিয়াও-টুং উপদ্বীপ বাশিয়াকে লীজ হিসেবে বন্দোবস্ত দেয়।

চীন-জাপান যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ফল ছিল চীনের ব্যবচ্ছেদের সূত্রপাত। জাপান তার বাহুবলে চীনের বিপুল অংশ গ্রাস করতে পারে, এই সম্ভাবনা দেখা দিলে, পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি চীনকে ব্যবচ্ছেদ করে নিজ নিজ Sphere of Influence বা প্রভাবাধীন অঞ্চলে পরিণত করার কাজ শুরু করে। ঐতিহাসিক ভিন্যাকের ভাষায়, "চীনা তরমুজকে ফালি ফালি করে বাঁটোয়ারা শুরু হয়" (Cutting of the Chinese Melon) (বিস্তারিত বিবরণ আগে চীনের ব্যবচ্ছেদ পরিচ্ছদ দ্রষ্টব্য)। ঐতিহাসিক ফেয়ার ব্যাঙ্কের মতে, "চীনের ব্যবচ্ছেদের জন্যে কামড়া-কামড়ি চীনে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নগ্ন আত্মপ্রকাশ ঘটায়।"

পরিশেষে, জাপানের মুখের গ্রাস লিয়াও-টুং উপদ্বীপ কেড়ে নিলে জাপান নতঃশিরে তা মেনে নেয়নি। রাশিয়ার বিরুদ্ধে জাপান এক দশকের মধ্যে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

১. Fair Bank—Ibid.
২. Ibid.

ইঙ্গ-জাপান মৈত্রীর পটভূমিকা ও ইঙ্গ-জাপান মৈত্রীর গুরুত্ব ঃ সিমনোসেকির সন্ধির পর জাপানের পররাষ্ট্র নীতি, ১৮৯৫—১৯০৫ খ্রীঃ (The Background of the Anglo-Japanese Alliance and its significance : The Japanese Foreign policy after the Treaty of Shimonoseki, 1895—1905) ঃ সিমনোসেকির সন্ধির পর (১৮৯৫ খ্রীঃ) যখন চীনের বিরুদ্ধে জাপান তার অনায়াস জয়ের উল্লাসে মত্ত হয়, তখন অপ্রত্যাশিত ভাবে রাশিয়া তার মুখের গ্রাস কেড়ে নেয়। জাপান লিয়াও-টুং উপদ্বীপ উপরোক্ত সন্ধির দ্বারা লাভ করায়, রাশিয়া আশঙ্কা করে যে, জাপান গোটা মাঞ্চুরিয়া ও বিখ্যাত পোর্ট আর্থার বন্দর অধিকার করে নিবে। রাশিয়া নিজে মাঞ্চুরিয়া অধিকারের জন্যে লালায়িত ছিল। সুতরাং রাশিয়া এবং তার মিত্র ফ্রান্স ও জার্মান নৌ-বহরের ভীতিপ্রদ নৌ-মহড়ার চাপে জাপান লিয়াও-টুং উপদ্বীপে তার সন্ধির দ্বারা অর্জিত অধিকার ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। জাপানী নেতারা এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, শীঘ্রই জাপানকে কোরিয়া ও মাঞ্চুরিয়ায় তার পরিকল্পিত আধিপত্য লাভের জন্যে রাশিয়ার সঙ্গে সংঘাতে নামতে হবে।

লিয়াও-টুং উপদ্বীপে রুশ হস্তক্ষেপ—জাপ-রুশ বিরোধ

জাপানী নেতারা উপলব্ধি করেন যে, রাশিয়ার ইওরোপীয় মিত্র ফ্রান্স ও জার্মানী এই ত্রিশক্তি জোটের বিরুদ্ধে তার একক শক্তিতে জয়লাভ করা আদপেই সম্ভব নয়। জাপানের সামনে দুটি পথ তখন খোলা ছিল, যথা—(১) রাশিয়ার সঙ্গে আপোষে কোরিয়া ও মাঞ্চুরিয়া পরস্পরের মধ্যে ভাগ করা। (২) রাশিয়ার বিরুদ্ধে পাল্টা জোট গড়ে জাপানের শক্তি বৃদ্ধি করা এবং তার জোরে যুদ্ধে রাশিয়াকে হঠিয়ে দেওয়া। মাঞ্চুরিয়া প্রদেশটিতে রাশিয়ার জার সরকার যে লোভাতুর দৃষ্টি দিয়েছিলেন, তা কারও কাছে অস্পষ্ট ছিল না। বক্সার বিদ্রোহ উপলক্ষে আন্তর্জাতিক সেনাদল এই বিদ্রোহ দমনের জন্যে চীনে ঢুকে পড়ে। বক্সার প্রোটোকোল স্বাক্ষরিত হলে, সকল বিদেশী শক্তি তাদের সেনা, চীন থেকে সরিয়ে নেয়। কিন্তু রাশিয়া নানা অজুহাতে মাঞ্চুরিয়া থেকে সেনা সরাতে চায়নি। শেষ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক চাপে এই সেনা অনেক দেরীতে অপসারণ করে। দ্বিতীয়তঃ, লি-লোভানভ সন্ধির দ্বারা জার সরকার লিয়াও-টুং উপদ্বীপ ২৫ বছরের লিজে চীনের হাত থেকে নিয়ে নেন। এই উপদ্বীপের পোর্ট আর্থার বন্দর থেকে, রাশিয়ার ট্রান্স-সাইবেরীয় রেলপথের হারবিন বন্দর পর্যন্ত রাশিয়া এক নতুন রেলপথ তৈরি করে। এই রেলপথের নাম ছিল S. M. R বা দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ান রেলপথ। এই সকল কারণে জাপানী নেতারা কৃত নিশ্চয় হন যে, জাপানকে যদি এশিয়ার মূল ভূখণ্ডে টিকে থাকতে হয়, তবে রাশিয়ার সঙ্গে সংঘাত অনিবার্য।

লি-লোভানভ সন্ধি ঃ রাশিয়ার লিয়াও টুং উপত্যকা দখল

জাপানী নেতাদের মধ্যে কাউন্ট ইটো ও তাঁর সমর্থকরা চান যে রাশিয়ার সঙ্গে এই শর্তে আপোষ করা হোক যে, কোরিয়ার ওপর জাপানের এবং মাঞ্চুরিয়ার ওপর রাশিয়ার অধিকার দুই শক্তি স্বীকার করে নিবে। কিন্তু প্রধান সেনাপতি ইয়ামাগাতা ও রাজনীতিবিদ কাটসুরা এই মত অগ্রাহ্য করেন। তাঁরা বলেন যে, কোরিয়া ও মাঞ্চুরিয়া উভয় অঞ্চলই জাপানের এক্তিয়ারভুক্ত (Sphere of influence) হওয়া উচিত। জাপানের জাইবাৎসু শ্রেণীও ইয়ামাগাতার অভিমত সমর্থন করে। জাপানের সমর নায়কগণ চান যে, অস্ত্রের জোরে রাশিয়াকে এই অঞ্চল থেকে হঠিয়ে না দিলে, জাপান তার পরিকল্পনাকে সার্থক করতে পারবে না। জাপানের শক্তি বৃদ্ধির জন্যে মিত্র জোট গঠন করা দরকার বলে তাঁরা অভিমত দেন।

জাপানের সমর নেতাদের মাঞ্চুরিয়া অধিকারের সঙ্কল্প

জাপানী নেতারা বিচার করে দেখেন যে, ফ্রান্স ও রাশিয়ার সঙ্গে ব্রিটেনের ভয়ঙ্কর

ঔপনিবেশিক দ্বন্দ্ব চলছে। ফ্রান্স ও রাশিয়া এজন্য ব্রিটেনের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ। সুতরাং ফ্রান্সের মিত্রতা জাপান পাবে না। কারণ ফ্রান্স হল জাপানের শত্রু রাশিয়ার মিত্র। জার্মানীর মিত্রতাও রাশিয়ার বিরুদ্ধে জাপানের কাজে আসবে না। কারণ দূরপ্রাচ্যে রাশিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করার কোন দায় জার্মানীর ছিল না। রাশিয়ার দ্বারা জার্মানীর চীনে অবস্থিত উপনিবেশ বিপন্ন হয়নি। তাছাড়া তখনও পর্যন্ত জার্মান কাইজার রুশ সরকারের সঙ্গে মিত্রতা রক্ষার চেষ্টায় ছিলেন। কাজেই জাপান দেখে যে, ব্রিটেনই একমাত্র শক্তি যার মিত্রতা পেলে জাপান তার শক্তি বহুগুণ বাড়াতে সক্ষম হবে। ব্রিটেন ছিল সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বিশ্বশক্তি। চীনে ব্রিটেনের স্বার্থ ছিল বিরাট। জাপানের প্রতিদ্বন্দ্বী রাশিয়ার সঙ্গে ভারত সীমান্তে আফগানিস্থানে, পারস্যে, তিব্বতে এবং চীনে ব্রিটেনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছিল। সুতরাং জাপানী নেতারা বিবেচনা করেন যে, ব্রিটেনের মিত্রতা লাভ করাই এখন জাপানের পররাষ্ট্র নীতির লক্ষ্য হওয়া উচিত। চীন-জাপান যুদ্ধের সময় ব্রিটেন জাপানের বিরোধিতা না করে নিরপেক্ষ ছিল। এই যুদ্ধের পর ব্রিটেন জাপানের প্রতি অনুকূল মনোভাব দেখায়। ব্রিটেন স্ব-ইচ্ছায় জাপানের সঙ্গে বৈষম্যমূলক চুক্তি প্রত্যাহার করে। এজন্য জাপ-ব্রিটেন সম্পর্কে অনুকূল বাতাস বইতে থাকে। জাপান এই পরিস্থিতির সুযোগ নেয়।

▶ ব্রিটিশের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনে জাপানের সিদ্ধান্ত

ব্রিটেনের দিক থেকে দূর প্রাচ্যে জাপানের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন লাভজনক মনে করা হয়। দীর্ঘদিন ধরে ব্রিটেন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ছিল মিত্রহীন ও বিচ্ছিন্ন। ব্রিটেন এতদিন কোন জোটে যোগ দিয়ে গণ্ডগোলে জড়িয়ে পড়তে চায়নি। এখন ইওরোপের ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন ঘটায় ব্রিটেন তার Isolation বা বিচ্ছিন্ন থাকার নীতি ত্যাগ করতে উদগ্রীব হয়। প্রথমতঃ, ইওরোপে কাইজার উইলিয়ামের Welt politik বা বিশ্ব রাজনীতিতে জার্মানীর অনুপ্রবেশ এবং এজন্য নৌ-নির্মাণ এবং উপনিবেশ দখল নীতি ব্রিটেনের আশঙ্কা বাড়ায়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইঙ্গ-জার্মান সংঘাত দেখা দেয়। দ্বিতীয়তঃ, ফ্রান্স ও রাশিয়ার সঙ্গে ব্রিটেনের ঔপনিবেশিক বিরোধ তীব্র হয়। তখনও পর্যন্ত এই বিরোধের নিষ্পত্তি হয়নি। তৃতীয়তঃ, চীনে উত্তর দিক থেকে রুশ অনুপ্রবেশ এবং জার্মানীর শাং-টুং ও কিয়াও-চো দখল ব্রিটেনকে শঙ্কিত করে। চীনের ইয়াংসি উপত্যকায় ও চীনের উপকূলে Treaty Ports বা সন্ধি বন্দরগুলিতে ছিল ব্রিটেনের বিশাল বাণিজ্যিক স্বার্থ। এই অধিকারকে নিরপেক্ষ রাখা এবং বিশ্বের অন্যত্র ব্রিটেনের ঔপনিবেশিক স্বার্থকে ফ্রান্স, রাশিয়া ও জার্মানীর আক্রমণ থেকে নিরাপদ রাখা, এই গুরু দায়িত্ব ব্রিটেনের একার পক্ষে বহন করা শক্ত ছিল। তদুপরি, জার্মানীর সঙ্গে ব্রিটেনের নৌ প্রতিযোগিতা দেখা দিলে ব্রিটেনের নিজ নিরাপত্তা বিপন্ন হয়। চতুর্থতঃ, বুয়ার যুদ্ধে (১৮৯৯—১৯০২ খ্রীঃ) ব্রিটেনের ২½ লক্ষ সেনা আফ্রিকায় আটকা পড়ার ফলে চীনের ইয়াংসি উপত্যকায় ব্রিটেনের আধিপত্য রক্ষায় উপযুক্ত সৈন্যবলের অভাব দেখা দেয়।

জাপানের মিত্রতা গ্রহণে ব্রিটেনের আগ্রহের কারণ

এই পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ নেতারা অনুভব করেন যে, পূর্ব এশিয়ায় জাপানের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপিত হলে, জাপানের সাহায্যে চীনে ব্রিটিশ স্বার্থ সহজে রক্ষা করা যাবে। দ্বিতীয়তঃ, চীনে রুশ অনুপ্রবেশ যেমন জাপান, তেমন ব্রিটেনের স্বার্থ বিরোধী। জাপানের সাহায্যে তা প্রতিহত করা যাবে। তৃতীয়তঃ, রুশ-জাপান যুদ্ধ হলে, অন্যত্র যথা পারস্য, ভারত সীমান্তে ও মধ্যপ্রাচ্যে রাশিয়া, ব্রিটেনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে দুর্বল হবে। চতুর্থতঃ, চীনে জার্মানীর নবোদিত আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জাপানী মিত্রতা কাজে লাগবে। সর্বোপরি, পূর্ব এশিয়ায় ব্রিটেনের বিচ্ছিন্নতা দূর হবে। এই সকল কথা বিবেচনা করে ব্রিটেনের ঔপনিবেশিক মন্ত্রী চেম্বারলেইন প্রভৃতি জাপানের সঙ্গে মিত্রতা চুক্তি স্থাপনে আগ্রহ দেখান।

জাপানের সঙ্গে মিত্রতায় ব্রিটেনের স্বার্থ

ব্রিটেনের একশ্রেণীর নেতা কাইজারের সঙ্গে নৌ-নির্মাণ ও Welt politik সংক্রান্ত বিরোধের আপোষ মীমাংসার আশায় কাইজারের সঙ্গে আলোচনা চালান। কাইজারের সঙ্গে আলোচনা নিস্ফল হলে পূর্ব এশিয়ায় ব্রিটিশ স্বার্থ রক্ষার জন্যে জাপানের সঙ্গে মৈত্রী প্রস্তাব হাউস অব কমন্সে সমর্থিত হয়। জাপান থেকে দায়িত্বশীল কূটনৈতিকদের একটি দল রাশিয়ার সঙ্গে আলোচনা বিফল হলে ব্রিটেনে আসেন। তাঁরা ১৯০২ খ্রীঃ ইঙ্গ-জাপান মিত্রতা চুক্তি স্বাক্ষর করেন। জাপানী মন্ত্রিসভা ও ডায়েট তা অনুমোদন করলে এই মিত্রতা চুক্তি পাকা হয়।

কাইজারের সঙ্গে ব্রিটেনের বিরোধের ফল

ইঙ্গ-জাপান মিত্রতা চুক্তিতে (১৯০২ খ্রীঃ) বলা হয় যে, (১) দুই স্বাক্ষরকারী চীন ও কোরিয়ার অখণ্ডতা রক্ষা করবে। উভয় দেশে যে স্থিতাবস্থা আছে তা রক্ষা করবে। তার অর্থ ইয়াংসি উপত্যকায় ব্রিটেনের স্বার্থ স্থিতাবস্থা রক্ষা হলে অক্ষুন্ন থাকবে। (২) দূর প্রাচ্যে শান্তি ও স্থিতাবস্থা রক্ষার জন্যে উভয় স্বাক্ষরকারী চেষ্টা করবে। (৩) Open Door নীতি অনুসারে চীন ও কোরিয়াতে সকল রাষ্ট্র বাণিজ্যের সমান সুযোগ পাবে। (৪) ইংলন্ড ও জাপানের স্বার্থ চীন ও কোরিয়ায় অক্ষুন্ন রাখা হবে। (৫) দুই স্বাক্ষরকারীর মধ্যে কেহ একজন কোন তৃতীয় শক্তির দ্বারা আক্রান্ত হলে, আক্রান্ত মিত্র তৃতীয় শক্তিকে বাধা দিবে। অপর স্বাক্ষরকারী নিরপেক্ষ থাকবে। (৬) যদি কোন চতুর্থ শক্তি আক্রমণকারী শক্তির সঙ্গে যোগ দেয় তবে অপর স্বাক্ষরকারী তার মিত্রের সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসবে। (৭) আপাততঃ এই মিত্রতা চুক্তি ৫ বছর বলবৎ থাকবে এবং ভবিষ্যতে নবীকরণ করা যাবে।

প্রথম ইঙ্গ- জাপান মিত্রতা চুক্তি ১৯০২ খ্রীঃ

ইঙ্গ-জাপান মিত্রতা চুক্তির গুরুত্ব ছিল পূর্ব এশিয়ার ইতিহাসে সুদূরপ্রসারী। (১) জাপান আপাততঃ নিশ্চিন্ত বোধ করে যে, রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ বাধলে ব্রিটেন, রাশিয়ার পক্ষে যোগ দিবে না; বরং রাশিয়ার বিরুদ্ধে শত্রুতামূলক নিরপেক্ষতা রক্ষা করবে। জাপান তার নিজ শক্তির জোরে রাশিয়াকে প্রতিহত করতে প্রস্তুতি নিতে পারবে। জাপানকে নিজের ঘর নিজেই গোছাতে হবে। (২) যদি জাপানের ... যুদ্ধের সময় ফ্রান্স অথবা জার্মানী ১৮৯৫ খ্রীঃ মত রাশিয়ার পক্ষে যো... দেয়, তবে ব্রিটেন জাপানকে সক্রিয় সহায়তা দিবে। ১৮৯৫ খ্রীঃ মত জাপান মিত্রহীন হয়ে অসহায় হবে না। ব্রিটেনের মত প্রবল শক্তির সহায়তা পেলে, জাপান হেলায় তার শত্রুজোটকে প্রতিহত করতে পারবে। (৩) জাপানী ঐতিহাসিক কাউন্ট ওকুমার (Count Okuma—The History of Japan) মতে, "The Anglo-Japanese Alliance became the hub of Japanese foreign policy" ইঙ্গ-জাপান চুক্তি জাপানের পররাষ্ট্র নীতির (১৯০২—২১ খ্রীঃ) নাভিকেন্দ্রে পরিণত হয়। এই চুক্তির বলে জাপান রুশ-জাপান যুদ্ধে রাশিয়াকে মিত্রহীন রাখতে পারে। ব্রিটেনের ভয়ে কোন শক্তি রাশিয়াকে সাহায্য দেয়নি। এই চুক্তির বলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে জাপান, চীনে অবস্থিত জার্মান উপনিবেশ অধিকার করে এবং চীনের ওপর একতরফাভাবে ২১ দফা শর্ত চাপায়। মোট কথা, দূর প্রাচ্যে জাপানী সাম্রাজ্যবাদের প্রসারের মূলে ছিল ইঙ্গ-জাপান মিত্রতা চুক্তি। (৪) এই চুক্তির অপর একটি পরোক্ষ ফল ছিল ১৯১১ খ্রীঃ জাপান কর্তৃক কোরিয়ার অন্তর্ভুক্তি। ব্রিটেনের নীরব সমর্থন জাপানকে এই কাজে সাহসী করে। (৫) অপর দিকে ব্রিটেনের দিক থেকে এই চুক্তি পূর্ব এশিয়ায় তার নিজ সাম্রাজ্য রক্ষার হাতিয়ারে পরিণত হয়। ব্রিটেনের আশ্রিত প্রহরীর মত জাপান দূর প্রাচ্যে ব্রিটিশ অধিকার ও ইয়াংসি উপত্যকায় ব্রিটিশ উপনিবেশ এবং চীনে সন্ধি বন্দরগুলিকে রক্ষা করে। ব্রিটেন যখন ইওরোপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্যাপৃত ছিল জাপান ব্রিটেনের স্বার্থ পূর্ব এশিয়ায় রক্ষা করে। জাপান যুদ্ধাস্ত্র প্রভৃতি মহাযুদ্ধের সময় ব্রিটেনকে সরবরাহ করে। সর্বোপরি, চীনে রাশিয়ার অনুপ্রবেশের

ইঙ্গ-জাপান মিত্রতা চুক্তির গুরুত্ব

ভীতি ব্রিটেনের দূর হয়। ব্রিটেনের Isolation বা বিচ্ছিন্নতা দূর হয়। ব্রিটেনের মত এক বৃহৎ শক্তির সঙ্গে সম মর্যাদায় চুক্তি স্থাপনের ফলে জাপানের আন্তর্জাতিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। এশিয়ার দেশ হিসেবে শ্বেতাঙ্গ জাতির উন্নত নাসিকা কুঞ্চন বন্ধ হয়। জাপানের গৌরবে এশিয়ার অন্য স্বাধীনতাকামী জাতিগুলির আত্মচেতনা বৃদ্ধি পায়।

১৯০৫ খ্রীঃ ইঙ্গ-জাপান চুক্তির নবীকরণ ও সংশোধন করা হয়। এই দ্বিতীয় চুক্তিতে ভারত, মাঞ্চুরিয়া, কোরিয়া ও চীনে উভয় শক্তি পারস্পরিক স্বার্থরক্ষার প্রতিশ্রুতি দেয়। ১৯১১ খ্রীঃ ইঙ্গ-জাপান চুক্তি তৃতীয় নবীকরণ করা হয়।

রুশ-জাপান যুদ্ধ, ১৯০৪—৫ খ্রীঃ (The Russo-Japanese War, 1904-5) : রুশ-জাপান যুদ্ধের পটভূমি প্রকৃতপক্ষে চীন-জাপান যুদ্ধের অব্যহতি পরেই তৈরি হয়। সিমনেসেকির সন্ধির দ্বারা জাপান দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ায় লিয়াও-টুং উপদ্বীপ লাভ করে।

রুশ-জাপান যুদ্ধের কারণ : সিমনোসেকির সন্ধিতে হস্তক্ষেপ

রাশিয়া এর আগে থেকেই মঙ্গোলিয়া অধিকারের পর শনৈঃ শনৈঃ মাঞ্চুরিয়ার দিকে আগাচ্ছিল। এখন জাপান দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ার অধিকার লাভ করায়, রাশিয়া চীনের সার্বভৌমত্বকে রক্ষার দাবী প্রভৃতি কূটনৈতিক কৌশল দ্বারা জাপানকে লিয়াও-টুং উপত্যকা থেকে বহিস্কারের নীতি নেয়। শেষ পর্যন্ত রাশিয়া তার দুই মিত্র শক্তি ফ্রান্স ও জার্মানীর সহায়তায় জাপানের উপকূলে এক নৌ-মহড়া দ্বারা জাপানকে ভীতি প্রদর্শন করে লিয়াও-টুং উপদ্বীপ ছাড়তে বাধ্য করে। জাপানের মুখের গ্রাস কেড়ে নিলে জাপান, রাশিয়াকে উচিত শিক্ষা দিতে চেষ্টায় থাকে।

ইতিমধ্যে রাশিয়া চীন সরকারকে লি-লেবানভ সন্ধির দ্বারা লিয়াও-টুং উপদ্বীপ ২৫ বছরের লীজে রাশিয়াকে হস্তান্তরে বাধ্য করে। এর ফলে রুশ সীমান্ত কোরিয়া স্পর্শ করে। জাপান

জাপানের সমর নেতাদের ভূমিকা

আশঙ্কা করে যে, রাশিয়া কেবলমাত্র মাঞ্চুরিয়া গ্রাস করে ক্ষান্ত হবে না, রাশিয়া কোরিয়াতেও অনুপ্রবেশ করতে পারে। জাপানী নেতাদের মতে, জাপানের নিরাপত্তা এবং জাপানের উদ্বৃত্ত জনসংখ্যার বাসস্থান, জাপানের কাঁচামাল ও খনিজ সম্পদের চাহিদা পূরণ এবং জাপানের শিল্প-কারখানার উদ্বৃত্ত মাল বিক্রির জন্যে কোরিয়া ও মাঞ্চুরিয়ায় জাপানের Spheres of influence বা প্রভাবাধীন অঞ্চল গঠন ছিল একান্ত আবশ্যক। জাপানের মন্ত্রী কাউন্ট ইটো রাশিয়াকে মাঞ্চুরিয়া ছেড়ে দিয়ে, কোরিয়ার উপর জাপানের নিরঙ্কুশ আধিপত্যের দাবী রাশিয়ার কাছ থেকে পেতে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু জাপানের প্রধান সেনাপতি ইয়ামাগাতা, নৌ সেনাপতি কাটসুরা মাঞ্চুরিয়া হাতছাড়া করতে রাজী ছিলেন না। জাপান তখনও পর্যন্ত রাশিয়ার সঙ্গে আলোচনা দ্বারা সমস্যার সমাধানে আগ্রহী ছিল।

ইতিমধ্যে বক্সার বিদ্রোহ উপলক্ষে কয়েক হাজার রুশ সেনা বক্সার বিদ্রোহীদের দমন এবং দক্ষিণ মাঞ্চুরীয় রেলপথ (S. M. R) ও পোর্ট আর্থার বন্দর রক্ষার অজুহাতে মাঞ্চুরিয়ায় ঢুকে পড়ে। ১৯০০ খ্রীঃ বক্সার বিদ্রোহ প্রশমিত হলেও, রাশিয়া মাঞ্চুরিয়া থেকে সেনা সরাতে রাজী হয়নি। অধিকন্তু ১৯০০ খ্রীঃ আলেক্সিয়েভ চেং (Alexiev Tsing Treaty) চুক্তির দ্বারা মাঞ্চুরিয়ায় রাশিয়া আধিপত্য সম্পর্কে চীনের কাছ থেকে বৈধ সম্মতি ও অনুমোদন আদায়ের চেষ্টা করে। চীনের প্রধানমন্ত্রী লি-হাং-চাং এই সন্ধির শর্ত প্রকাশ করেন। ব্রিটেন, জাপান ও

বক্সার বিদ্রোহে রাশিয়ার ভূমিকা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র Open Door বা খোলা দ্বার নীতি ভাঙ্গার চেষ্টা করায়, রাশিয়াকে শাসানি দিলে, রাশিয়া মাঞ্চুরিয়া থেকে সেনা অপসারণের জন্যে প্রতিশ্রুতি দেয়। আলেক্সিয়েভ-চেং চুক্তি বাতিল হয়।

রাশিয়ার এই আগ্রাসী নীতির পটভূমিকায় জাপান, রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধের সম্ভাবনা বুঝে ব্রিটেনের সঙ্গে ১৯০২ খ্রীঃ ইঙ্গ-জাপান মিত্রতা চুক্তি স্বাক্ষর করে (আগের পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য)।

ইঙ্গ-জাপান চুক্তি

জাপানের মতই ব্রিটেনও রাশিয়ার আগ্রাসনের ফলে চীন তার অধিকৃত অঞ্চল বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা করত। ভিন্যাকের মতে (Vinacke), ইঙ্গ-জাপান চুক্তি সাক্ষরিত হলে জাপানের হাত শক্ত হয়। জাপান রাশিয়ার বিরুদ্ধে প্রস্তুতি নেয়।

ফেয়ার ব্যাঙ্ক মনে করেন যে, ইঙ্গ-জাপান চুক্তির (১৯০২ খ্রীঃ) ফলে রুশ-জাপান যুদ্ধ অনিবার্য হয় একথা মনে করার কারণ নেই। জাপান ও ব্রিটেন উভয় শক্তি তখনও মাঞ্চুরিয়া থেকে আলোচনার মাধ্যমে রুশ সেনা অপসারণের আশা করত। কিন্তু মাঞ্চুরিয়া থেকে বিরোধী শক্তির হুমকিতে সৈন্য অপসারণ করাকে রুশ জার ও কিছু উগ্রপন্থী রাজনীতিক রাশিয়ার কূটনৈতিক পরাজয় বলে মনে করেন। তাঁরা অপসারণের নামে মাঞ্চুরিয়ার এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে সেনা সরান। রুশমন্ত্রী কাউন্ট উইটি আপোষ নীতি নিলে জার দ্বিতীয় নিকোলাস তাঁকে পদচ্যুত করেন। জার চীং সরকারের কাছে দাবী জানান যে ঃ (ক) মাঞ্চুরিয়া অন্য কোন শক্তিকে দেওয়া হবে না এই মর্মে চীং সরকারকে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। (খ) মাঞ্চুরিয়ায় রাশিয়াকে চীং সরকার একমাত্র বাণিজ্যের সুযোগ দিবেন। (গ) S. M. R. বা দক্ষিণ মাঞ্চুরিয় রেলপথে রাশিয়ার অধিকার রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। ব্রিটেনের পরামর্শে চীং সরকার রুশ দাবী নাকচ করেন।

মাঞ্চুরিয়ায় রুশ আগ্রাসী নীতি

এদিকে মাঞ্চুরিয়া থেকে রাশিয়ার পিছু হঠতে হলে বিরাট অর্থনৈতিক ক্ষতির ধাক্কা নিতে হত। এজন্য জার সেনা সরাতে চান নি। S. M. R. বা দক্ষিণ মাঞ্চুরিয় রেলপথ নির্মাণের জন্যে রাশিয়া প্রভূত পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেছিল। এই রেলপথ পোর্ট আর্থার বন্দর পর্যন্ত যুক্ত হওয়ার পর, পোর্ট আর্থার থেকে ডাইরেন বন্দর পর্যন্ত তার সম্প্রসারণ করা হয়। কিন্তু এই রেলপথে মাল পরিবহন তখনও পর্যন্ত বেশ ব্যয়সাধ্য ব্যাপার ছিল। কেবলমাত্র রুশ মাল বহন করে রেলপথ লাভজনক হচ্ছিল না। মন্ত্রী কাউন্ট উইটি চান যে, রেলের মাশুল হ্রাস করে, তিনি অন্য শক্তিগুলিকে এই রেলযোগে মাল পরিবহনে উৎসাহ দিবেন। উইটির পতনের পর জার চান যে, মাঞ্চুরিয়াতে রাশিয়ার একাধিপত্য স্থাপিত হলে, S.M.R. বা দক্ষিণ মাঞ্চুরিয় রেলপথ ছাড়া অন্য কোন পথে অন্য শক্তিগুলির মাঞ্চুরিয়ায় মাল পরিবহন নিষিদ্ধ করা হবে। এজন্য জার অকস্মাৎ ঘোষণা করেন যে, মাঞ্চুরিয়ার বিষয়ে তিনি জাপানের কথা বলার কোন এক্তিয়ার স্বীকার করেন না। রাশিয়া মাঞ্চুরিয়ায় যা করবে তা চীনের সম্মতিক্রমে করবে। এদিকে রাশিয়া মাঞ্চুরিয়ায় আরও নূতন সেনা আমদানী শুরু করে। এজন্য ১৯০৪ খ্রীঃ ৬ই ফ্রেব্রুয়ারী জাপান পোর্ট আর্থার বন্দরে রুশ নৌবহরকে টর্পেডো আক্রমণ করলে, রুশ-জাপান যুদ্ধ হয়।

রুশ-জাপান সংঘাত

পোর্টস মাউথের সন্ধি ও রুশ-জাপান যুদ্ধের ফলাফল (The Treaty of Portsmouth and the Aftermath of the Ruso-Japanese War): রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপানী সেনাপতিদের উন্নত রণকৌশল ও আত্মরক্ষা অপেক্ষা আক্রমণকেই কৌশল হিসেবে গ্রহণ করায় জাপানের জয়লাভ সুনিশ্চিত হয়। রুশ সেনাপতিরা আত্মরক্ষা মূলক রণকৌশল গ্রহণ করায় জাপানের সঙ্গে তাঁরা এঁটে উঠতে পারেন নি। জাপান পোর্ট আর্থারের রুশ নৌ বহরকে তারা নৌশক্তির দ্বারা অবরুদ্ধ করে পোর্ট আর্থার ও ডাইরেন বন্দর অধিকার করলে প্রশান্ত মহাসাগরে রুশ নৌবহর বিনষ্ট হয়। জাপানী স্থলসেনা কোরিয়ার ভিতর দিয়ে ইয়ালু নদীর তীরে রুশ বাহিনীকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করলে রুশসেনা পিছু হটতে বাধ্য হয়। শেষ পর্যন্ত মাঞ্চুরিয়ার সুবাস্তেনের যুদ্ধে পরাস্ত হলে রুশ সেনা মাঞ্চুরিয়ার শেষ

সীমায় পিছু হটে যায়। শেষ রক্ষার জন্যে রাশিয়া তার বাল্টিক নৌবহর ৫০০০ মাইল সমুদ্রপথ ঘুরে আফ্রিকার দক্ষিণ দিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে আনা হয়। সুয়েজ খালের পথ ব্রিটিশ সরকার আটকে রাখায় রাশিয়াকে আফ্রিকা হয়ে নৌবহর আনতে হয়। কিন্তু তুষিমা উপসাগরের নৌ যুদ্ধে জাপানের নৌ সেনাপতি টোগো (Togo) ৩৫টি রুশ যুদ্ধ জাহাজের ৩২টি ধ্বংস করায় রাশিয়া সন্ধি স্বাক্ষরে বাধ্য হয়।

জাপানের যুদ্ধ কৌশল

তুষিমার নৌ-যুদ্ধ ও রাশিয়ার পরাজয়

মার্কিন রাষ্ট্রপতি থিওডোর রুজভেল্ট তাঁর "Big Stick" বা "মুখে হাসি রাখা, হাতে রাখ একটি লম্বা লাঠি" এই নীতি নিয়ে রাশিয়া ও জাপানের মধ্যে প্রায় বাধ্যতামূলক মধ্যস্থতা করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মাঞ্চুরিয়ায় ও চীনে মার্কিন Open Door নীতিকে রক্ষা করে মার্কিন বাণিজ্য বহাল রাখা। ফলে জাপানকে মার্কিন পরামর্শ মতো সন্ধি করতে হয়।

রুজভেল্টের Bigstick নীতি

পোর্টসমাউথের সন্ধির (১৯০৫ খ্রীঃ) দ্বারা স্থির হয় যে ঃ (১) কোরিয়ায় জাপানের স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে হবে। (২) মাঞ্চুরিয়ায় চীনের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করা হবে।. (৩) দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ায় লিয়াও-টুং উপদ্বীপে রাশিয়া লীজের অধিকার জাপানকে রাশিয়া হস্তান্তর করবে এবং চ্যাং-চুন পর্যন্ত রাশিয়ার তৈরি S.M.R. রেলপথ জাপানকে হস্তান্তর করা হবে। (৪) শাখালিন দ্বীপের দক্ষিণ ভাগ জাপানকে রাশিয়া ছেড়ে দিবে। (৫) রাশিয়া এই যুদ্ধের জন্যে জাপানকে কোন ক্ষতিপূরণ দিবে না। (৬) রুশ সেনা মাঞ্চুরিয়া ত্যাগ করবে এবং রাশিয়া মাঞ্চুরিয়ার উপর তার দাবী ত্যাগ করবে।

রুশ-জাপান যুদ্ধের প্রভাব জাপান, চীন, এশিয়া এবং বৃহৎ শক্তিগুলি সকলকেই স্পর্শ করে। রাশিয়ার বিরুদ্ধে জয়লাভের ফলে এশিয়ার দেশ জাপান এক বিরল মর্যাদার অধিকারী হয়। ইওরোপের শ্বেতাঙ্গ এ্যাংলো-স্যাক্সন, টিউটনিক ও স্লাভ জাতিগুলি কৃষ্ণকায় এশিয়াবাসী সম্পর্কে যে হীন ধারণা পোষণ করত, অন্ততঃ জাপানের ক্ষেত্রে তারা সেই ধারণা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। ঐতিহাসিক কীটনের (Keeton) মতে জাপান বিশ্বে প্রথম শ্রেণীর শক্তির মর্যাদালাভ করে। দ্বিতীয়তঃ, জাপান এই যুদ্ধে জয়ের জন্যে যে রক্ত শুল্ক দেয়, জাপানী নেতাদের মতে পোর্টস মাউথের সন্ধির দ্বারা তা পূরণ হয় নি। মাঞ্চুরিয়ার ইয়ালুনদের ও মুকাডনের যুদ্ধে জাপানের কোয়াং টুং সেনা দল প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়। কিন্তু মার্কিণ রাষ্ট্রপতি থিওডোর রুজভেল্টের হস্তক্ষেপে জাপান মাঞ্চুরিয়ার উপর চীনের সার্ব্বভৌম অধিকার স্বীকার করতে বাধ্য হয়। এর অর্থ ছিল চীনের মাধ্যমে মার্কিণ মাঞ্চুরিয়ার অবাধ বাণিজ্য প্রতিষ্ঠিত করার ব্যবস্থা করে। যুদ্ধের দ্বারা জাপান যা জয় করে, সন্ধির দ্বারা তা হারাতে বাধ্য হয়। মার্কিণ সরকারের সঙ্গে সঙ্ঘাতে যেতে জাপান ১৯০৫-এ প্রস্তুত ছিল না। কাজেই জাপানকে Bitter Sweet বা তিক্ত-মিষ্ট স্বাদ যুক্ত সন্ধি গলায় ঢেলে দিতে হয়। এমন কি রাশিয়ার কাছ থেকে জাপান ক্ষতিপূরণের অর্থও পায়নি। মার্কিণ সরকারের এই স্বনিযুক্ত মধ্যস্থতাকে জাপান তার প্রতি শত্রুতাজনক কাজ বলে গণ্য করে। এর ফলে দূরপ্রাচ্যে জাপ-মার্কিণ প্রতিদ্বন্দ্বিতার বীজ উপ্ত হয়। বাস্তববাদী জাপান আপাততঃ এই সন্ধির দ্বারা যা পাওয়া গেছে, তা হজম করতে প্রয়াস চালায়। তৃতীয়তঃ, মার্কিণ সরকারের বিরোধীতার আশঙ্কায়, জাপান ১৯০৫ খ্রীঃ ইঙ্গ-জাপান চুক্তির দ্বিতীয় নবীকরণ করে। ব্রিটেনও দূর প্রাচ্যে মার্কিণঅনুপ্রবেশকে সন্দেহের চোখে দেখে। ফলে ইঙ্গ-জাপান চুক্তিতে সংশোধন করে বলা হয় যে, কোন তৃতীয় শক্তি দুই স্বাক্ষরকারীর কাহাকেও আক্রমণ করলে, উভয় স্বাক্ষরকারী যৌথ বাধা দিবে। চতুর্থতঃ, পোর্টস মাউথের সন্ধির দ্বারা কোরিয়ার উপর জাপানের একাধিপত্য স্বীকৃত হলে, জাপান আপাততঃকোরিয়াকে তার প্রত্যক্ষ শাসনে আনার নীতি নেয়। ১৯১১ খ্রীঃ কোরিয়া জাপানের অন্তর্ভুক্ত হয়। পঞ্চমতঃ, রুশ-জাপান যুদ্ধে

রুশ-জাপান যুদ্ধের ফলাফল জাপান

জয়লাভের ফলে জাপান সাম্রাজ্যবাদকে তার জাতীয় পররাষ্ট্র নীতিতে পরিণত করে। পূর্ব এশিয়ায় "সূর্যোদয়ের দেশ দাই "নিপ্পন" সাম্রাজ্যবাদী ক্লাবে নাম লেখায়। পশ্চিম ইওরোপ থেকে যন্ত্রবিদ্যা, বিজ্ঞান, কূটনীতি, সমর বিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে জাপান পশ্চিম ইওরোপের কুশিক্ষা অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদকেও আত্মীকরণ করে। জাপান তার সাম্রাজ্যবাদের সমর্থনে ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক যুক্তি দেখাতে থাকে। কিন্তু একদা যে সাম্রাজ্যবাদের আঘাতে জাপানের জাগরণ ঘটেছিল, এখন জাপান নিজেই সেই নীতিহীন সাম্রাজ্যবাদে আসক্ত হয়।

রুশ-জাপান যুদ্ধ চীনে গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। প্রাচীন সভ্যতা, ক্ষয়িষ্ণু সংস্কৃতির গর্বে গর্বিত ও কনফুসিয়বাদের শ্রেষ্ঠত্বে আচ্ছন্ন চীন এতকাল আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়াকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। চীন-জাপান যুদ্ধে চীনের পরাজয়, চীনের এই শ্রেষ্ঠত্বের স্বপ্নে প্রথম আঘাত হানে। রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপানের বিজয়, চীনা জাতীয়তাবাদীদের মন থেকে তাদের নিজ সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বের স্বপ্ন দূর করে দেয়। ইওরোপীয় শক্তি রাশিয়ার বিরুদ্ধে জাপানের জয় প্রমাণ করে যে, এশিয়ার ঝিমিয়ে পড়া জাতিগুলিকে নবজীবন দান করতে হলে আধুনিকীকরণই মহৌষধ। জাপান পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানকে যেভাবে আত্মস্থ করে জাপানের জাতীয় স্বার্থে নিয়োজিত করে, চীনের প্রগতিশীল ছাত্রসমাজ, জাতীয়তাবাদীরা জাপানের কাছ থেকেই তা শিখতে চায়। চীন থেকে শত শত ছাত্র জাপানে শিক্ষা গ্রহণের জন্যে যাত্রা করে। অনেকে ইওরোপে যায়। এই সকল সংস্কারকামী, জাতীয়তাবাদীরা জাপানে কেন্দ্র গঠন করে চীনে বিপ্লব প্রচেষ্টার দ্বারা প্রতিক্রিয়াশীল মাঞ্চু সরকারকে উচ্ছেদের চেষ্টা চালায়। এঁদের মধ্যে ছিলেন নব চীনের নায়ক ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেন। চীং সরকারের পতন এজন্য আসন্ন হয়। অপরদিকে, চীনের বহু নেতা সংস্কারের দাবী তুলেন। জাপানের দৃষ্টান্ত চীনকে গভীর ভাবে অনুপ্রাণিত করে। এই আবেগ ও আধুনিকীকরণ দাবীর প্রবাহে শেষ পর্যন্ত চীং সরকার ভেসে যায়। ১৯১১ খ্রীঃ কুয়োমিন তাং বিপ্লব ছিল রুশ-জাপান যুদ্ধের ফলে চীনে সংস্কার ও বিপ্লব প্রক্রিয়ার পরিণাম।

চীনে রুশ জাপান যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া

ইওরোপ ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে রুশ-জাপ্যান যুদ্ধের প্রভাব কম ছিল না। ফেরার ব্যাঙ্কের (Fair Bank) মতে, "জাপানের চমকপ্রদ বিজয় পূর্ব প্রশিয়ায় বৃহৎ শক্তিগুলির পারস্পরিক সম্পর্কে স্থিতাবস্থা আনে। চীনে সাম্রাজ্যবাদী প্রতিদ্বন্দ্বিতার চূড়ান্ত সীমা ছিল রুশ-জাপান যুদ্ধ।" এরপর আন্তর্জাতিক শক্তিগুলি চীনে আন্তর্জাতিক সহযোগীতার নীতি নেয়। ১৯০৪ খ্রীঃ ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে ইঙ্গ-ফরাসী আঁতাত স্বাক্ষরিত হলে উভয় শক্তির মধ্যে ঔপনিবেশিক প্রতিযোগীতা বন্ধ হয়। চীনেও উভয় শক্তি সহাবস্থান নীতি নেয়। (২) ১৯০৭ খ্রীঃ ফ্রাঙ্কো-জাপান সন্ধিরদ্বারা উভয় শক্তি চীনের স্বাধীনতা, ঐক্য ও চীনে খোলা দ্বার নীতি রক্ষা করতে অঙ্গীকার করে। এশিয়া ভূখণ্ডে উভয় শক্তি পরস্পরের অধিকৃত স্থান সম্পর্কে স্থিতাবস্থা মেনে নেয়। অর্থাৎ পরস্পরের Spheres of influence বা প্রভাবাধীন অঞ্চল রক্ষা করতে রাজী হয়। (৩) রাশিয়া জাপানের হাতে তার পরাজয়কে ভুলে গিয়ে, ১৯০৭ খ্রীঃ রুশ-জাপান সন্ধির দ্বারা চীনের ঐক্য ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেয়। এই চুক্তির গোপন শর্তে উত্তর ও দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া উভয়ের মধ্যে ভাগ করতে রাজী হয়। (৪) ১৯০৭ খ্রীঃ ইঙ্গ-রুশ আঁতাত দ্বারা ইংলণ্ড ও রাশিয়ার মধ্যে ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার নিষ্পত্তি হয়। এই সকল সন্ধির দ্বারা ইংলণ্ড, জাপান, ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে ঔপনিবেশিক স্বার্থ ও চীন সম্পর্কে স্থিতাবস্থার ভিত্তিতে সহাবস্থান ও মিত্রতা গঠিত হয়। কিন্তু জার্মানী ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে এই সন্ধিগুলির বাইরে রাখা হয়। মূলতঃ সন্ধিতে অংশগ্রহণকারী শক্তিগুলির spheres of influence বা প্রভাবাধীন অঞ্চল, Treaty ports বা সন্ধি বন্দর Open Door বা খোলা দ্বারা নীতির ভিত্তিতে

রুশ-জাপান যুদ্ধের আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া

পরস্পররের মধ্যে সহাবস্থান স্বীকার করে। এই সহাবস্থানের মধ্যে জাপানকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। রুশ-জাপান যুদ্ধের ফলে এবং ১৯০৫-এর অন্তর্বিপ্লবে রাশিয়া দুর্বল হলে, ব্রিটেনের ভারত সীমান্তে এবং চীনে রুশ আগ্রাসন সম্পর্কে ভীতি দূর হয়। এজন্যই ইঙ্গ-রুশ মৈত্রী, জাপ-রুশ মৈত্রী প্রভৃতি মৈত্রী চুক্তি গঠন সম্ভব হয়।

এশিয়ার পদানত স্বাধীনতাকামী জাতিগুলি রুশ-জাপান যুদ্ধে এশিয়ার শক্তি জাপানের জয়ে বিরাট অনুপ্রেরণা লাভ করে। শ্বেতাঙ্গ ইওরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তি; বিরাট আকৃতি রুশ ভাল্লুক, ক্ষুদ্র জাপানের হাতে পর্য্যুদস্ত হলে, ভারত, ফিলিপিন, ভিয়েতনাম এমনকি চীন আত্মবিশ্বাস ফিরে পায়। ইওরোপীয় শক্তিগুলি অপরাজেয় নয় এই সত্য তারা উপলব্ধি করে। এজন্য উপরোক্ত দেশগুলিতে শ্বেতাঙ্গ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলন জোরদার হয়। বাংলার কবি অতুলপ্রসাদ এই আত্মপ্রত্যয় ব্যক্ত করে জাতিকে জাগরণের বাণী শোনান "বল বল বল সবে; শত-বীণা-বেণুরবে, ভারত আবার জগত সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে"। এই সঙ্গীতে তিনি জাপানের বিজয়ের কথা জাতিকে স্মরণ করিয়ে দেন। বাংলায় বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন ও স্বদেশী আন্দোলনে নূতন প্রেরণা সঞ্চার হয়। ঐতিহাসিক ফেরার ব্যাঙ্ক এজন্য বলেছেন যে, "জাপানের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে সর্বত্র আধুনিক দেশপ্রেমিকরা ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের আধিপত্য হতে মুক্তি আন্দোলন শুরু করে" (Japanese example inspired modern patriots to stand up against western domination)। বিশের শতকের প্রথম দশকে পূর্ব এশিয়ায় এই উগ্র সাম্রাজ্যবাদ এইভাবে এই অঞ্চলে পশ্চিমী ঔপনিবেশিক বিস্তারের চূড়ান্ত সীমা নির্ণয় করে এবং এশীয় জাতীয়তাবাদের বীজ বপন করে এবং জাপানী সাম্রাজ্যবাদের পথ প্রস্তুত করে।

এশিয়ার জাগরণে রুশ-জাপান যুদ্ধের প্রভাব

রুশ-জাপান যুদ্ধের পর জাপানের সাম্রাজ্যবাদ ও পররাষ্ট্র নীতি ঃ একুশ দফা দাবী, ১৯০৫—১৯১৯ খ্রীঃ (Japanese imperialism after Russo-Japanese war and Japan's foreign policy; Twenty one Demands) ঃ প্রথম চীন-জাপান যুদ্ধে জাপানের বিজয় এবং এই যুদ্ধের এক দশকের মধ্যে রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপানের জয়, জাপানের আত্মবিশ্বাসকে সীমাহীনভাবে বৃদ্ধি করে। ফ্রাঙ্কেনষ্টাইনের মত ঘুম থেকে জেগে উঠে, জাপান তার আত্মশক্তি উপলব্ধি করে নিজেই বিস্মিত হয়। এর ফলে জাপান সাম্রাজ্যবাদী ও আগ্রাসী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। জাপানের সাম্রাজ্যবাদের লক্ষ্য ধাপে ধাপে বিস্তৃত হলেও, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্য্যন্ত জাপানের লক্ষ্য ছিল কোরিয়া ও মাঞ্চুরিয়ায় আধিপত্য স্থাপন এবং চীনে জাপানের অর্থনৈতিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা। জাপানের যুদ্ধবাজ সেনাপতিমণ্ডলী এই যুগে জাপানের পররাষ্ট্রনীতিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেন। তাছাড়া জাপানের বুদ্ধিজীবিদের একশ্রেণী জাপানী সাম্রাজ্যবাদের সমর্থনে বিভিন্ন যুক্তি প্রচার করেন। জাপানের জাইবাৎসু বা শিল্পপতি শ্রেণী ছিল এই আগ্রাসী পররাষ্ট্রনীতির ঘোর সমর্থক।

জাপানী সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব কোরিয়া মাঞ্চুরিয়া

রুশ-জাপান যুদ্ধের পর জাপান কোরিয়াকে পুরোপুরি গ্রাস করার উদ্যোগ নেয়। কোরিয়া বিপদ বুঝে আন্তর্জাতিক সহায়তা ও তার স্বাধীনতার স্বীকৃতি লাভের চেষ্টা করলে জাপান বলপূর্বক তা নিরস্ত্র করে। কোরিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করলে, জাপানী সেনারা এই বিদ্রোহ দমন করে। ১৯১০ খ্রীঃ জাপান কোরিয়াকে সম্পূর্ণভাবে আত্মসাৎ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত জাপান কোরিয়াকে নিরঙ্কুশভাবে অধীনস্থ রাখে।

জাপান কর্তৃক কোরিয়া গ্রাস

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জাপান তার শক্তি বৃদ্ধি ও কূটনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধির জন্যে ১৯০৫ খ্রীঃ ইঙ্গ-জাপান চুক্তির নবীকরণ করে। পুনরায় ১৯১১ খ্রীঃ এই চুক্তির নবীকরণ করে, ব্রিটেনের পরোক্ষ সমর্থনে তার সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনকে জোরালো করে। ১৯১৪ খ্রীঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে জাপান দেখে যে, ইওরোপীয় শক্তিগুলি এবং আমেরিকা ইওরোপের যুদ্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িয়ে পড়েছে। পূর্ব এশিয়ায় তাদের হস্তক্ষেপের আপাততঃ সম্ভাবনা নেই। জাপান এই শক্তিশূন্যতাকে কাজে লাগাতে তৎপর হয়। প্রথমতঃ, জাপানের মিত্র ইংলণ্ডের শত্রুদেশ ছিল জার্মানী। সুতরাং মিত্রের শত্রু নিজের শত্রু এই নীতি নিয়ে, জাপান দ্বিতীয় ইঙ্গ-জাপান চুক্তির শর্ত অনুসারে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। জাপানের গূঢ় উদ্দেশ্য উপলব্ধি করে ব্রিটেন জাপানকে যুদ্ধ ঘোষণা থেকে নিরস্ত করার চেষ্টা করে বিফল হয়। জাপানের এই যুদ্ধ ঘোষণার মূল কারণ শীঘ্রই বুঝা যায়। শত্রুদেশ হিসেবে চীনে অবস্থিত জার্মান উপনিবেশগুলি যথা, কিয়াও চো ও শাং টুং অঞ্চল জাপান অধিকার করে নেয়। চীনের প্রতিবাদ জাপান অগ্রাহ্য করে।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় ইঙ্গ জাপান চুক্তি ও জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা

পূর্ব এশিয়ায় শক্তিশূন্যতার সুযোগে জাপান চীনের ওপর আরও নূতন দাবীর শর্ত চাপিয়ে দেয়। জাপান জানত যে,গৃহযুদ্ধে দুর্বল চীন জাপানের বিরুদ্ধে আপাততঃ প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবে না। পশ্চিমী শক্তিগুলিও চীনকে রক্ষা করতে এ সময় এগিয়ে আসতে পারবে না। সুতরাং ১৯১৫ খ্রীঃ জাপান চীনা প্রজাতন্ত্রের উপর "একুশ দফা দাবী" (Twenty one Demands) চাপিয়ে দেয়। এই একুশ দফা দাবী মোট ৫টি ভাগে বিভক্ত ছিল। চীনের অন্যতম War Lord বা ভুঁই ফোড় সামরিক শাসক বিভিন্ন শক্তির কাছে এই আগ্রাসী দাবীর প্রতিকার চাইলে, জাপান একটি চরমপত্র দ্বারা চীন সরকারকে ২১ দফা দাবী মানতে বাধ্য করে। একুশ দফা দাবীর প্রধান দাবীগুলি ছিল নিম্নরূপ ঃ (১) শাং-টুং অঞ্চলে জাপানের অধিকার চীন সরকার মেনে নিবে। (২) অন্তর্মঙ্গোলিয়ার পূর্ব ভাগ এবং দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া অঞ্চলকে জাপানের spheres of influence বা প্রভাবাধীন অঞ্চল রূপে চীন স্বীকৃতি দিবে। (৩) দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া অঞ্চলে জাপানের লীজের মেয়াদ ৯৯ বছর করা হবে। (৪) মাঞ্চুরিয়ায় জাপানের কর্তৃত্ব ও একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার চীন মেনে নিবে। (৫) চীন তার সাম্রাজ্যের কোন অংশ, কোন বন্দর, খনি, বা রেলপথ অন্য কোন রাষ্ট্রের নিকট হস্তান্তর করতে পারবে না। (৬) মধ্য চীনের খনিজ পদার্থ ও শিল্প সমৃদ্ধ হ্যান-ইয়ে-পিং অঞ্চলে জাপানের বিশেষ অধিকার বা spheres of influence চীন মেনে নিবে। (৭) চীন সরকার জাপানের কাছে যে ঋণ গ্রহণ করেছিল তার পরিবর্তে এই অঞ্চলকে জাপানের একচেটিয়া অধিকারে ছেড়ে দিতে হবে।

চীনের উপর একুশ দফা দাবীস্থাপন

একুশ দফা দাবী ছিল জাপানের সাম্রাজ্যবাদের নগ্নরূপ। দুর্বল চীন প্রজাতন্ত্র এই দাবী মেনে নেয়। পরে অবশ্য চীন এই একুশ দফা দাবীর বিরুদ্ধে আইনী যুক্তি দেখায় যে, চীনের War Lord য়ুয়ান- শি-কাই ব্যক্তিগতভাবে একুশ দফায় সম্মতি দেন। এজন্য চীন প্রজাতন্ত্র দায়ী নয়। কারণ একুশ দফা দাবী চীনা পার্লামেন্টের অনুমোদনের জন্যে কোথাও বলা হয়নি। যাই হোক, আপাততঃ চীন একুশ দফা দাবীর চাপে নতজানু হয়।

চীনের প্রতিবাদ

ভিন্যাক (Vinacke), লাতুরেত (Laturette) প্রভৃতি ঐতিহাসিক একুশ দফা দাবীকে জাপানের রাজনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের নগ্নরূপ বলে মনে করেন। এই "একুশ দফার" কোন নৈতিক বা আইনী ভিত্তি ছিল না। জাপান গায়ের জোরে এই দাবী অসহায় চীনের উপর চাপায়। ফেয়ার ব্যাঙ্কের (Fair Bank) মতে, জাপানের ওকুমা মন্ত্রীসভা জাপানের অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থেই এই দাবী চীনের উপর

একুশ দফার জাপানী ব্যাখ্যা

চাপায়। তবে এই লেখক স্বীকার করেছেন যে, এশিয়ার মূল ভূখণ্ডে বিস্তার নীতির পাদপীঠ ছিল ২১ দফা দাবী।

যাই হোক, জাপানের বুদ্ধিজীবিরা এবং রাজনীতিকরা ২১ দফা দাবীকে জাপানের "এশিয়ায় মনরো নীতির" (Asiatic Monroe Doctrine) প্রয়োগ বলে দাবী করেন। তাঁরা বলেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি ল্যাটিন আমেরিকায় ইওরোপের অনুপ্রবেশ মনেরো নীতির দ্বারা বন্ধ করে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একচেটিয়া আধিপত্য স্থাপন করে, তবে পূর্ব এশিয়ায় জাপানও তা নায্যভাবে করতে পারে। সুতরাং একুশ দফা দাবীর দ্বারা জাপান, চীনকে তার মনরো নীতির অধীনে আনতে চায়। "এশিয়া এশিয়াবাসীদের জন্যে" জাপান এই ধূয়া তুলে তার আসল উদ্দেশ্য আড়াল করার চেষ্টা করে। কাউন্ট ওকুমা এবং ফুকুজাওয়া বলেন যে, জাপান চীনে আধুনিক সভ্যতা বিস্তারে আগ্রহী।

জাপানের এশিয়ার মনরোনীতি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র Lanshing Note দ্বারা জাপানকে সতর্ক করে যে, আন্তর্জাতিক শক্তির সম্মতি ছাড়া জাপান চীনে একতরফাভাবে যে শর্তগুলি চাপাল, মার্কিণ সরকার তার বৈধতা স্বীকার করবে না। জাপান এই সতর্কবাণীকে উপেক্ষা করে। ইতিমধ্যে বিশ্বযুদ্ধে জার্মান সাবমেরিনের আক্রমণে ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি শক্তির প্রচুর বাণিজ্য জাহাজ ধ্বংস হলে এই শক্তিগুলি জাপানের জাহাজকে মাল পরিবহনের কাজে লাগাতে অনুরোধ করে। জাপানের কাছ থেকে যুদ্ধাস্ত্রের সাহায্যও তারা চায়। চতুর জাপান সাহায্য দানের পরিবর্তে ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালির কাছে প্রতিশ্রুতি আদায় করে যে, যুদ্ধের পর শান্তি বৈঠকে এই শক্তিগুলি একুশ দফা দাবী অনুমোদন করবে। ভার্সাই শান্তি বৈঠকে মার্কিন রাষ্ট্রপতি উইলসন চৌদ্দ দফা (Fourteen Points) দ্বারা জাপানের একুশ দফা দাবীকে নস্যাৎ করার চেষ্টা করে বিফল হন। ভার্সাই সন্ধির দ্বারা জাপানের প্রধান দাবীগুলি স্বীকৃত হয়।

একুশ দফার সমর্থনে বৃটেন ফ্রান্সের সমর্থন লাভ : আমেরিকার অসম্মতি

চীনে মধ্যপন্থী সংস্কার আন্দোলন (The Reform Moderate Movement in China) : ইওরোপীয় এবং জাপানী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি নিদ্রাচ্ছন্ন যখন চীনকে ড্রাগনের মতো গিলে ফেলতে চেষ্টা করে, তখন চীন সম্পূর্ণভাবে অসাড়, নিদ্রাচ্ছন্ন ছিল না। চীন দুভাবে এই আগ্রাসনকে প্রতিরোধের চেষ্টা করে, যথা ঐতিহ্যগত প্রতিরোধ (Traditional Resistance)। চীনে তাই-পিং ও বক্সার বিদ্রোহগুলি একদিকে অপদার্থ চীন সরকারকে উচ্ছেদ অপরদিকে বৈদেশিক শক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করে। কিন্তু এই ঐতিহ্যগত প্রতিরোধ বিফল হয়। অপরদিকে চীনা দেশপ্রেমিক ও বুদ্ধিজীবিগণ চীনে আধুনিক সংস্কার, পাশ্চাত্য শিক্ষা, সামরিক সংস্কার প্রভৃতি প্রবর্তন দ্বারা চীনকে আত্মশক্তিতে বলীয়ান করতে চেষ্টা করেন। জাপানের আধুনিকীকরণের দৃষ্টান্ত তাঁদের অনুপ্রাণিত করে। চীনের এই সংস্কার আন্দোলনকে "আত্মশক্তি আন্দোলন" (Self-strengthening Movement) বলা হয়। চীন তার প্রাচীন ঐতিহ্য ও কনফুশিয় ভাবধারার প্রতি এত অন্ধ ও যুক্তিহীনভাবে অনুরক্ত ছিল যে, চীনে আধুনিক, পাশ্চাত্য সংস্কার প্রবর্তন করা সহজ কাজ ছিল না।

বৈদেশিক অনুপ্রবেশের ফলে ও জাপানের অনুসরনে চীনে আধুনিক সংস্কারের জন্য বুদ্ধিজীবীদের দাবী

Social Darwinism বা ডারউইনবাদের সামাজিক প্রয়োগতন্ত্রের ধারা চীনের বুদ্ধিজীবী ও দেশপ্রেমীদের একাংশ চীনে ধীরে ধীরে পাশ্চাত্য সংস্কার প্রবর্তন করতে চান। এঁরা ছিলেন gradualist বা ধীরে ধীরে দীর্ঘ সময় ধরে সংস্কার প্রবর্তনের পক্ষপাতী। চীনের প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে প্রাতীচ্যের নব ভাবের ক্রমিক সমন্বয়ে এঁরা বিশ্বাসী ছিলেন। এই Gradualist বা ক্রমিক পরিবর্তনপন্থীদের মুখপাত্র ছিলেন চ্যাং-চি-টুং। তাঁর গ্রন্থ চুয়ান-হুসে-পিয়ন থেকে তাঁর মতবাদের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁরা কনফুশিয়

সমাজব্যবস্থাকে অক্ষত রেখে সংস্কারের কথা বলেন। তাঁরা কনফুশিয়াসের তিন সমাজ বন্ধনের সূত্র, যথা, (ক) সম্রাট ও তাঁর কর্মচারীবর্গের মধ্যে প্রথমের প্রতি পরবর্তীদের প্রশ্নহীন আনুগত্য; (খ) পিতার প্রতি পুত্রের; (গ) স্বামীর প্রতি স্ত্রীর আনুগত্য রক্ষায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁরা চরমপন্থী সংস্কারবাদীদের ঘোর বিরোধী ছিলেন। কাজেই পাশ্চাত্য ব্যক্তি স্বাধীনতা, জনপ্রতিনিধি সভা, নাগরিক অধিকার প্রভৃতির তাঁরা বিরোধী ছিলেন। চ্যাং-চি-টুং চীনকে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে জাপানের শিক্ষা ব্যবস্থা অনুসারে শক্তিশালী করতে চান। এজন্য পেকিং বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, স্কুল-কলেজ স্থাপনে তাঁরা বিশেষ উৎসাহ দেখান। পাঠ্যসূচিতে কনফুশিয়বাদের সঙ্গে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যাশিক্ষার জন্যে জোর দেন। চ্যাং-এর নেতৃত্বে মধ্যপন্থীরা চীনে শিক্ষাগঠনে কিন্তু উৎসাহ দেখান। হান-ইয়াং-এ একটি লোহা ঢালাই কারখানা এবং হুপেতে লৌহখনির কাজ শুরু করা হয়। পেকিং-হ্যাঙ্কাও-ক্যান্টন রেলপথ নির্মাণ করা হয়। হুনান প্রদেশের শাসনকর্তার উদ্যোগে এই প্রদেশে জোরালোভাবে সংস্কার চালু করা হয়। হুনানের জোতদার শ্রেণী এই সংস্কারে উৎসাহ দেখায়।

মধ্যপন্থী সংস্কারক : সমন্বয়বাদ : চ্যাং-চি-টুং

মধ্যপন্থী, ক্রমিক সংস্কারবাদী বা Gradualist গণ কয়েকটি ব্যাপারে অনমনীয় ছিলেন, যথা, (ক) চীনে আধুনিক সংস্কারের গতি ধীরে চালাতে হবে। ৪০ বছর ধরে তাঁরা সংস্কারের চাকা এত ধীরে ঘোরান যে, তাতে কোনো অগ্রগতি অনুভূত হয় নি। (খ) চীং রাজবংশকে চীনাজাতীয় রাজবংশ হিসাবে গণ্য করে, এই রাজবংশের অধীনে সংস্কার করতে হবে। (গ) মাঞ্চু বা চীং রাজকর্মচারীদের কায়েমী স্বার্থ রক্ষা করতে হবে। (ঘ) কনফুশিয়াসের ভাবধারাকে মূলনীতি হিসেবে অনুসরণ করতে হবে। (ঙ) পাশ্চাত্য গণতন্ত্র ও সংবিধানকে তাঁরা চীনের পক্ষে গ্রহণযোগ্য মনে করতেন না।

মধ্যপন্থী সংস্কারবাদের সীমাবদ্ধতা

চরমপন্থী সংস্কার আন্দোলন : একশত দিবসের সংস্কার : কাং-ইউ-ওয়ে (Radical Reforms in China : Hundred Days Reforms : Kang-Yu-Wei) : চীন-জাপান যুদ্ধে চীনের বিপর্যয় চীনা জাতীয়তাবাদী সংস্কারপন্থীদের দ্বারা বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে। ক্ষুদ্র, একদা অনগ্রসর জাপানের এই সদম্ভ অভ্যুত্থান সকলকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে, নিষ্ঠাভরে জাতির উন্নতির জন্যে আধুনিক শিক্ষা, সংস্কার প্রবর্তন করলে, জাপানের মতোই শক্তিধর হওয়া সম্ভব। চীনে যে সকল Gradualist বা ক্রমপর্যায়ের মধ্যপন্থী সংস্কারবাদী ছিলেন, তাঁদের সংস্কার নীতিকে চরমপন্থী সংস্কারবাদীরা অকার্যকারী গণ্য করেন। আমূল সংস্কারসূচীর দ্রুত রূপায়ণ চীনকে বৈদেশিক আক্রমণকারীদের হাত থেকে রক্ষা করা যাবে না, এই ধারণা প্রবলভাবে জেগে ওঠে। এই চরমপন্থী, আমূল সংস্কারবাদীদের অগ্রগণ্য ছিলেন কাং-ইউ-ওয়ে, যাঁকে চীনের "Modern Sage" বা "আধুনিক ভাবধারার প্রবক্তা"রূপে গণ্য করা হয়।

ক্রমপন্থী সন্ত্রাসবাদীদের অপদার্থতা

কাং ছিলেন ক্যান্টনের এক সংস্কৃতিবান পরিবারের সন্তান। বিদ্যালয়ে পড়ার সময়ে তাঁর প্রতিভায় শিক্ষকরা চমকিত হন। কাং তাঁর প্রতিভাব জন্যে সচেতন হয়ে সহপাঠীদের হীনচোখে দেখতেন। তাঁর এক শিক্ষক তাঁকে পরামর্শ দেন যে, শ্রেষ্ঠত্বের মানসিকতা ত্যাগ করে তাঁর সেবার মানসিকতা গ্রহণ করা উচিত। কাং এই পরামর্শকে অনুসরণ করেন। তিনি কনফুশিয় দর্শন ও অন্যান্য শিক্ষায় পারদর্শিতা লাভ করে স্নাতক হওয়ার পর সরকারী চাকুরীর জন্যে প্রতিযোগীতা মূলক পরীক্ষায় ব্যর্থ হলে তাঁর জীবনের ধারা অন্য খাতে বইতে থাকে। তিনি শিক্ষাবিদ, ভাবুক ও সংস্কারক কাং-ইউ-ওয়েতে পরিণত হন। চীং সরকার তাঁর প্রতিভার সেবা না পেলেও, চীন জাতি তার

চরমপন্থী কাং-ইউ-ওয়ের জীবন

স্পর্শ লাভ করে। চাং হানলিন আকাদেমীর শিক্ষক এবং শেষ পর্যন্ত প্রধান অধ্যাপকের পদ পান।

কাং-ইউ-ওয়ের চিন্তাধারার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, চীনের প্রয়োজনীয় আধুনিক সংস্কারকে তিনি উপযুক্ত দার্শনিক তত্ত্ব ও চীনের প্রাচীন ঐতিহ্যের আধুনিক বিশ্লেষণের দ্বারা গ্রহণযোগ্য করেন। চীনের প্রাচীন তত্ত্ব "সান-জু" অর্থাৎ "নিজেকে জান; শত্রুকে জানতে চেষ্টা কর; তাহলে সাফল্য আসবে" তিনি নবভাবে প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বলেন যে, এর ফলে প্রাচীন ব্যবস্থার কি রক্ষা করা উচিত এবং কি ত্যাগ করা উচিত তাহলে জানা সম্ভব হবে। দ্বিতীয়তঃ, কাং-ইউ-ওয়ে কনফুশিয় দর্শন ও মতবাদের "নব পাঠ" (New Text) এবং এই পাঠের নব ব্যাখ্যা করেন। এতদিন কনফুশিয়াসের দার্শনিক মত হিসেবে যা চালু ছিল কাং-ইউ-ওয়ের মতে, তা ছিল হ্যান যুগের ভ্রান্ত ভাষ্য ও ব্যাখ্যা। তিনি চীনের ধ্রুপদী মতবাদ যা চৌলি ও আই-লিতে

কাং-ইউ-ওয়ের নব কনফুশিয়বাদ বিপ্লবের তিনস্তর

পাওয়া যেত তাকেও নস্যাৎ করেন। নব কনফুশিয়বাদী দর্শনকে তিনি খান খান করে দেন। তৃতীয়তঃ, কনফুশিয়াসের প্রচলিত পাঠকে নস্যাৎ করে তিনি ১৮৯৭ খ্রীঃ কু-জু-কাই-চি-কাও বা সংস্কারক হিসেবে কনফুশিয়াসের মতবাদকে নব ব্যাখ্যা দেন। চতুর্থতঃ, কাং তাঁর নব ব্যাখ্যায় বলেন যে ঃ (১) যে কোনো সমাজ ব্যবস্থা, বিশেষতঃ চীন, তিনটি পর্যায়ে এগিয়ে চলে, যথা, (ক) বিশৃঙ্খলা, ভাঙ্গন, অরাজকতা; (খ) শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা; (গ) তাই-পিং বা মহান শান্তি-শৃঙ্খলা, তাই-চুং বা মহান ঐক্য ও অগ্রগতি। কাং বলেন যে, চীনে বৈদেশিক আক্রমণ, অন্তর্বিপ্লব প্রভৃতি ছিল প্রথম পর্যায়। এখন তাঁর সংস্কার প্রচেষ্টার ফলে শান্তি প্রচেষ্টা বা দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হবে। শেষ পর্যন্ত আসবে তৃতীয় পর্যায়ে মহান শান্তি ও ঐক্য।

চীন-জাপান যুদ্ধের পর চীনের ব্যবচ্ছেদ শুরু হলে এবং জার্মানী কিয়াও-চো দখল করার পর কাং-ইউ-ওয়ে তাঁর পঞ্চম স্মারক লিপি সম্রাট কোয়াং-সুর কাছে পেশ করেন। এই সময় চীনের সর্বময় ক্ষমতার অধিশ্বরী ছিলেন বিধবা সাম্রাজ্ঞী জু-সি। তাঁর উত্তরাধিকারী কোয়াং-সু সাবালক হয়ে নিজ হাতে ক্ষমতা নিলে, বৃদ্ধা রানী সিংহাসনের অন্তরালে শক্তি হিসেবে থাকেন। দরবারে তাঁর সমর্থক গোষ্ঠী জুং-লু প্রভৃতি লোক প্রভাবশালী ছিলেন। নবীন সম্রাট কোয়াং-সু বৈদেশিক আক্রমণে উদ্বিগ্ন হয়ে, কাং-ইউ-ওয়ের স্মারক লিপিতে উৎসাহিত হন। তিনি কাংকে

কাং-ইউ-ওয়ে ও সুং-লুর যোগাযোগ

সাক্ষাৎকারের জন্যে ডাকেন। কাং-এর সঙ্গে আলোচনার ফলে নবীন সম্রাট কাং-ইউ-ওয়ের প্রস্তাবিত সংস্কার প্রবর্তনের জন্যে উদ্যোগ নেন। কাং তাঁকে বোঝান যে,রাশিয়ায় পিটার দি-গ্রেট, জাপানে মেইজী সম্রাটের মতোই চীনকে শক্তিশালী করার জন্যে তাঁকে দৃঢ় উদ্যোগ নিতে হবে। চীন হয় অগ্রগতির পথ গ্রহণ করবে অথবা ধ্বংস হয়ে যাবে।

কং-এর প্রস্তাব অনুযায়ী সম্রাট কোয়াং-সু বিভিন্ন আদেশনামার দ্বারা এই বৈপ্লবিক সংস্কার সূচী চালু করেন। (i) আভ্যন্তরীণ প্রশাসনকে কার্যকরী ও আধুনিক করার জন্যে ক্যাবিনেট প্রথা

অঘোষিত সংস্কারের আদেশনামা—১৮৯৮

চালু করা হয়। প্রায় ১২ জন মন্ত্রীর অধীনে বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে ১২টি দপ্তর গঠন করা হয়। (ii) ছয়টি বোর্ড বা সমিতি ও গ্র্যান্ড কাউন্সিল বা প্রধান পরামর্শদাতা সমিতির সাহায্যে প্রশাসন পরিচালনার প্রাচীন প্রথা পরিত্যক্ত হয়। (iii) কৃষি ও বাণিজ্য দপ্তর এবং এই বিভাগের মন্ত্রীর পদ তৈরি করা হয়। (iv) কাং-এর পরামর্শে সম্রাট কোয়াং-সু একটি জাতীয় সভা ও সংবিধান গঠন করা হবে বলে আশ্বাস দেন। (v) স্থানীয় প্রশাসনে সহায়তা দানের জন্যে স্থানীয় বুদ্ধিজীবীদের সহায়তায় স্থানীয় পরিষদ গঠনের ব্যবস্থার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। (vi) কনফুসিয় দর্শনে অভিজ্ঞতার

ভিত্তিতে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার মাধ্যমে সরকারী কর্মচারী নিয়োগ নাকচ করা হয়। (vii) সরকারী কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে গ্রাজুয়েটদের অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞান এবং প্রশাসনিক বুদ্ধির ভিত্তিতে নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। (viii) পাশ্চাত্য দেশ ও জাপানের অনুকরণে আধুনিক পাঠ্যসূচী সম্বলিত বিদ্যালয় ও কলেজ স্থাপন করা হয়। (ix) প্রাচীন চীনা সাহিত্যের বাধ্যতামূলক পাঠ্যসূচী বিদ্যালয়ে বর্জিত হয়। (x) চীনের আইন ও বিচার ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এজন্য ইওরোপীয় বিচার শাস্ত্র বা জুরিস প্রডেন্সের সাহায্যে ফৌজদারী আইন সংকলনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। (xi) অতিরাষ্ট্রীয় দাবীকে অগ্রাহ্য করা হয়। (xii) বিদেশে পঠন-পাঠনের জন্যে ছাত্রদের উৎসাহ দেওয়া হয়। (xiii) পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকারী সহায়তা দেওয়া হয় এবং বিভিন্ন কলেজগুলিকেও আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের জন্যে অনুদান দেওয়া হয়। (xiv) চীনে ডাক ব্যবস্থার সংস্কার এবং টেলিগ্রাফ চালু করা হয়। (xv) খনি বিদ্যা, চিকিৎসা বিদ্যা, কৃষি প্রভৃতির শিক্ষা ও ব্যবহারিক প্রয়োগে উৎসাহ দেওয়া হয়। (xvi) স্থল বাহিনী, নৌবহর নির্মাণে ও তার আধুনিকীকরণে উৎসাহ দেওয়া হয়। (xvii) ইওরোপীয় পাঠ্য ও গবেষণা গ্রন্থের চীনা অনুবাদ দ্বারা স্কুল-কলেজের ছাত্রদের হাতে তা পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়। (xviii) সাইনকিওর বা কর্মহীন সরকারী পদ ও কর্মহীন ভাতা দানের ব্যবস্থা রদ করা হয়। (xix) বৌদ্ধ মঠগুলিকে বিদ্যালয়ে পরিণত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। (xx) চীনের জাতীয় পতাকার সংস্কার করে মাঞ্চু বা চীং সরকারের পতাকার স্থলে চীনের জন্যে সবুজ রং-এর জাতীয় পতাকা চালু করা হয়। (xxi) সরকারী কর্মচারীদের দুর্নীতি দমনের জন্যে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হয়। কাং জাপানের সঙ্গে সিমনোসেকির সন্ধি নাকচ করার পরামর্শ দিলেও সম্রাট কোয়াং-সু তা কার্যে পরিণত করতে সাহস করেন নি।

১৮৯৮ খ্রীঃ ১১ই জুন থেকে ২১শে সেপ্টেম্বর এই একশত দিবস ধরে সম্রাটের ৪০টি আদেশনামার দ্বারা চীনকে আধুনিকীকরণের প্রচেষ্টা, শেষ পর্যন্ত বিফলতায় পর্যবসিত হয়। বৈদেশিক আক্রমণ থেকে চীনকে রক্ষা করার জন্যে এই একশত দিবসের সংস্কার ছিল, চীনের ইতিহাসে প্রথম উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা। পশ্চিমের যা শ্রেষ্ঠ তা গ্রহণ করে, চীনের প্রাচীন ভাবধারার যা শ্রেষ্ঠ, তার সঙ্গে সমন্বয় করার জন্যে এই সংস্কার ছিল এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। জাপানের অনুকরণে কাং-ইউ-ওয়ে ও নবীন সম্রাট এই সমন্বয়বাদী সংস্কার প্রবর্তনের চেষ্টা করেন। যদিও সাম্রাজ্ঞী জু-সি ও রক্ষণশীলদের বলিষ্ঠ হস্তক্ষেপে এই সংস্কারগুলিকে নাকচ করা হয়, তথাপি যে বিদ্যালয় ও কলেজগুলির প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল তা রদ করা যায় নি। এই নবশিক্ষার দ্বারা এক সংস্কারপন্থী নবীন প্রজন্মের সৃষ্টি হয়। এঁরা পরবর্তী সময়ে চীনের আধুনিক সংস্কারসূচী নিশ্চিতভাবে চালু করেন। দ্বিতীয়তঃ, জু-সির নির্দেশে কাং-এর বৈপ্লবিক কর্মসূচীগুলিকে নাকচ করা হলেও, মধ্যপন্থী সংস্কারগুলি যথা কর্মহীন সরকারী পদের অবলুপ্তি, শিক্ষা সংস্কারগুলি অব্যাহত থাকে। অপরদিকে, সম্রাট কোয়াং-সুর ৪০টি আদেশনামার অনেকগুলি রক্ষণশীল কর্মচারীদের বিরোধীতার ফলে আদৌ কার্যকরী করা হয় নি। তৃতীয়তঃ, সংস্কার প্রচেষ্টার দ্বারা শান্তিপূর্ণভাবে চীনের আধুনিকীকরণের উদ্যোগ ব্যর্থ হলে রক্ষণশীল জু-সি সরকারকে বিপ্লবের সম্মুখীন হতে হয়। চরমপন্থী সংস্কারবাদীদের একাংশ কৃত নিশ্চয় হন যে, চীং সরকারকে উৎখাত না করলে, চীনের অগ্রগতি হবে না। এর ফলে এক দশকের মধ্যে চীং সরকারের অগ্রগতি হবে না। এর ফলে এক দশকের মধ্যে চীং সরকারের পতন ঘটে। চতুর্থতঃ, সাধারণ চীনা নাগরিকরা জু-সির ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তনকে চীনের জীবনে অশনি সঙ্কেত বলে মনে করে। এজন্য বক্সার বিদ্রোহ

কাং-এর সংস্কার রক্ষাকরণ ও তার ফলাফল। কাং এর সংস্কারের সীমাবদ্ধতা ও প্রকৃতি

দেখা দেয়। যার ধ্বনি ছিল, "চীংকে উৎখাত কর, বিদেশীরা নিপাত যাক"। ধূর্তা সাম্রাজ্ঞী জু-সি আপাততঃ বক্সার বিদ্রোহীদের চীং বা মাঞ্চু বিরোধিতা ত্যাগ করে, বিদেশী বিরোধিতায় রাজী করান। (বক্সার বিদ্রোহ—আগের পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

কাং-ইউ-ওয়ের সংস্কার পরিকল্পনার ব্যর্থতার জন্যে বিভিন্ন কারণ উল্লেখ্য। (১) কাং তাঁর প্রগতিশীল সংস্কার প্রবর্তনের জন্যে সম্রাটের সহায়তা নেন। তিনি জনগণকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই সকল সংস্কার গ্রহণে অনুপ্রাণিত না করে, উপর থেকে সংস্কারগুলি চাপিয়ে দিতে চান। ফলে রক্ষণশীলরা বাধা দিলে, কাং-এর পশ্চাতে গণসমর্থন দেখা যায় নি। (২) সংস্কারগুলি ছিল এলিটিষ্ট বা উপরতলার লোকেদের পক্ষে, শিক্ষিত শ্রেণীর পক্ষে উপযোগী। তিনি চীনের মূল সমস্যা ভূমি ব্যবস্থার সংস্কারের কথা না বলায়,এই সংস্কারের মূল সুরের সঙ্গে যুক্ত হয় নি। (৩) কাং মাঞ্চু বা চীং রাজবংশের সহযোগিতায় সংস্কারের চেষ্টা করায় চরমপন্থী প্রজাতন্ত্রবাদীরা অসন্তুষ্ট হয়। কারণ তাঁরা অগ্রে মাঞ্চুবংশের উচ্ছেদ চাইতেন। (৪) সম্রাট কোয়াং-সু ও কাং উভয়ে আদর্শবাদী হলেও ছিলেন অভিজ্ঞতা হীন। এঁরা একসঙ্গে অনেকগুলি সংস্কার করার চেষ্টা করেন। এর ফলে বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্থ কায়েমী স্বার্থভোগী শ্রেণীর যৌথ বাধায় তাঁদের প্রচেষ্টা বিফল হয়। (ক) কর্মহীন পদগুলি লোপ করায় মাঞ্চু ভাতাভোগীরা মহা গণ্ডগোল সৃষ্টি করে। মাঞ্চু রাজবংশের লোকেরাও আশঙ্কিত হয়। (খ) মঠগুলি ভেঙ্গে বিদ্যালয় করার কথা বলায় বৌদ্ধ মঠবাসীরা তার প্রতিবাদ জানায়। (গ) সিভিল সার্ভিসে যোগদানের জন্যে পুরাতন পরীক্ষা ব্যবস্থা লোপ করায়, কনফুসিয় দর্শনে অভিজ্ঞ গ্রাজুয়েটদের চাকুরীর আশা বিলুপ্ত হলে, তারা ক্ষেপে যায়। (ঘ) দুর্নীতিগ্রস্থ কর্মচারীরাও এই সংস্কারের বিরোধিতা করে। (ঙ) এই সুযোগে বিধবা সাম্রাজ্ঞী জু-সি ও দরবারে তাঁর সমর্থক জুং-লু, সম্রাট কোয়াং-সুকে ক্ষমতাহীন করে, জুসি সকল ক্ষমতা নিজ হাতে নেন। সংস্কারগুলি নাকচ করা হয়। বহু সংস্কারপন্থীদের হত্যার আদেশ দেওয়া হয়। এইভাবে এই নাটকীয় সংস্কার প্রচেষ্টা বিফল হয়।

মাঞ্চু চীনের আত্মশক্তি গঠনের ও সংস্কারের শেষ প্রচেষ্টা, ১৯০২-১৯১১ খ্রীঃ (The last attempt for self-strengthening and late reform movement of Ching Government) ঃ কাং-ইউ-ওয়ের সংস্কার আন্দোলনের বিফলতার অর্থ এই ছিল না যে, চীং সরকার চিরতরে সংস্কারের হাওয়ার বিরুদ্ধে দরজা বন্ধ করেন। বক্সার বিদ্রোহের প্রবল আঘাত; বক্সার বিদ্রোহ দমনের জন্যে বিদেশী শক্তিগুলির চীনে সেনা আমদানী ও এই সেনাদলের কার্যকারিতা চীং সরকারের জ্ঞানচক্ষু খুলে দেয়। রক্ষণশীলরা বুঝতে পারেন যে, প্রাচীনপন্থার দ্বারা চীনকে আর কিছুতেই রক্ষা করা যাবে না। আসলে সাম্রাজ্ঞী জু-সি সংস্কারের বিপক্ষে ছিলেন না। কিন্তু কাং-ইউ-ওয়ে কনফুশিয়বাদকে বরবাদ করায় এবং দুর্নীতির মুলোচ্ছেদের উদ্যোগ নেওয়ায় সাম্রাজ্ঞী তাঁর পরিচিত জগত ও পরিবেশ হারাবার ভয়ে ভীতা হন। মূলতঃ প্রশ্ন ছিল এত দ্রুত সংস্কার হবে অথবা Graduation বা ধীরে সুস্থে সংস্কার হবে।

প্রাচীন পন্থার বিফলতার উপলব্ধি

বক্সার বিদ্রোহের পর জু-সি বা "প্রাচীনা বুদ্ধ" (Old Buddha), একদা কাং-ইউ-ওয়ের যে সকল সংস্কারকে নাকচ করেন, সেই সকল সংস্কারকে পুনরায় চালু করতে বাধ্য হন। কারণ তাঁদের আর বাঁচার কোনো উপায় ছিল না। জু-সি সিয়ানে তাঁর নির্বাসন থেকে রাজধানীতে ফিরে আসার আগেই (১৯০১ খ্রীঃ) ঘোষণা করেন যে, চীনের দুর্বলতা দূর করার জন্যে বৈদেশিক শক্তিগুলির সাফল্যের সূত্রগুলিকে চীন গ্রহণ করবে। কেবলমাত্র বৈদেশিক ভাষা ও কারিগরী শিক্ষা নিয়ে চীন তৃপ্ত থাকবে না। আরও গভীর সংস্কার করা হবে। Gradualist বা

ধীরে ধীরে সংস্কার পন্থার প্রবক্তা চ্যাং-চি-টুং সাম্রাজ্ঞীকে জানান যে, "ত্রিশ বছর আগে আধুনিক সংস্কারের বিরুদ্ধে যে জনমত ছিল; এখন তা নেই। চীনের জনগণ এখন বৈদেশিক রাষ্ট্রের ও নাগরিকের সমৃদ্ধির প্রশংসা করে। চীনের দারিদ্র্যের নিন্দা করে।"

জু-সির সংস্কারনীতি

চ্যাং-চি-টুং সহ নবপন্থার সংস্কারকরা বলেন যে, চীনকে অগ্রে নব শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন দ্বারা উন্নত ও প্রগতিশীল করতে হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে তাঁরা জনশিক্ষার পরিকল্পনায় হাত দেন নি। তাঁরা সীমিত আধুনিক শিক্ষার দ্বারা উপযুক্ত, যোগ্য আধুনিক প্রশাসক গঠনের দিকে জোর দেন। এজন্য সরকারী বিদ্যালয় ও কলেজ স্থাপন করে এই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে এক ঝাঁক উজ্জ্বল প্রতিভাবান ছাত্রদের প্রশাসকের পদে নিয়োগের নীতি নেন। পাশাপাশি কিছুকাল কনফুশিয়বাদী শিক্ষা ব্যবস্থাকেও চালু রাখা হয়।

শিক্ষা সংস্কার

শিক্ষা বিষয়ক নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ১৯০৫ খ্রীঃ পুরোপুরি পাশ্চাত্য বিদ্যালয়গুলির অনুকরণে আধুনিক পাঠ্যসূচী যুক্ত বিদ্যালয় ও কলেজ স্থাপনের নীতি গ্রহণ করা হয়। জাপান ও ইওরোপের বিভিন্ন দেশে পর্যবেক্ষক কমিশন নিয়োগ দ্বারা তাদের রিপোর্টের আলোকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিদ্যালয় স্তরে জাপানের শিক্ষাব্যবস্থাকে মডেল হিসেবে গ্রহণ করা হয়। ১৯০৫-এর রেগুলেশন দ্বারা, উচ্চ-প্রাথমিক শিক্ষা ৪ বছর, মাধ্যমিক ৫ বছর, উচ্চ বিদ্যালয় ৩ বছর; এবং যারা এর পর বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে যাবে তাদের জন্যে আরও ৩' বছরের পাঠক্রম চালু করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত হলে চু-জেন ডিগ্রী দানের ব্যবস্থা হয়। (২) শিক্ষা বিষয়ক কাজকর্ম পরিচালনা, বিদ্যালয়-কলেজগুলির পরিচালনার জন্যে শিক্ষা দপ্তর একজন শিক্ষামন্ত্রীর পদ সৃষ্টি করে গঠন করা হয়। (৩) পুরাতন কনফুশিয়পন্থী পরীক্ষা ব্যবস্থা, কনফুশিয়াসের দর্শনের উপর ৮টি প্রবন্ধ রচনা করলে ডিগ্রী দানের প্রথা লোপ করা হয়। প্রাইভেটে পরীক্ষা প্রদান নিষিদ্ধ হয়। বিদ্যালয়ে নিত্য পরিশ্রম ও শৃঙ্খলার মাধ্যমে বিদ্যার্জন বাধ্যতামূলক করা হয়। (৫) শিক্ষক-শিক্ষন বিদ্যালয় বা নর্মাল স্কুল স্থাপন করা হয়। (৬) কৃষি, কারিগরী এবং প্রশাসনিক বিশেষজ্ঞ গঠনের জন্যে স্বতন্ত্র বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। (৭) সন্ধিবন্দরগুলিতে ইওরোপীয় মডেলে বহু মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কয়েকটি কলেজ স্থাপিত হয়েছিল। সেই বিদ্যালয়গুলিকেও স্বীকৃতি দেওয়া হয়। (৮) উচ্চ-শিক্ষার জন্যে ছাত্রদের বিদেশে ভাতা দিয়ে পাঠানো হয়। বিশেষভাবে জাপানে হাজার কয়েক ছাত্র পড়তে যায়। (৯) পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকারী স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করা হয়। গোটাদেশে এই সম্মানিত বিশ্ববিদ্যালয়কে "পেইটা" (Peita) বলা হয়। (১০) বিদেশী গ্রন্থ ও পাঠ্যপুস্তকের চীনা অনুবাদের কাজ জোরদার করা হয়। (১১) প্রাদেশিক স্তরেও আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে উৎসাহ দেওয়া হয়। হুনান ও হুপে প্রদেশ এক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রগতি লাভ করে।

নবশিক্ষার বিভিন্নস্তর

চীনে সমাজ সংস্কারের কাজেও লক্ষ্য দেওয়া হয়। নারীদের কাঠের জুতা দ্বারা বাল্যকাল থেকে পা বেঁধে ফেলার প্রথা নিষিদ্ধ হয়। পুরুষদের মাথায় বেণী রাখার প্রথাকে নিন্দা করা হয়। মাঞ্চু ও চীনাদের মধ্যে বিবাহকে বৈধতা দেওয়া হয়। নারী শিক্ষায় উৎসাহ দেওয়া হয়। যে কোনো জীবিকা যে কোনো ব্যক্তি গ্রহণে কোনো বাধা থাকবে না বলা হয়।

সমাজ সংস্কার

চীনের সামরিক বাহিনী বিংশ শতকের গোড়ায় কয়েক ধরনের ছিল, যথা ঃ—(ক) সনাতন মাঞ্চু বাহিনী। যা ছিল এক শৃঙ্খলাহীন ভাতাভোগী ঢাল-তরোয়াল বাহী পাইক ফৌজ। (খ) আগ্নেয়াস্ত্রবাহী চীনা সেনা যারা সবুজ পতাকার তলায় যুদ্ধ করত। এদের অস্ত্রগুলি ছিল পুরোনো ধরনের এবং অফিসাররা যোগ্যতার ভিত্তিতে নিযুক্ত না হয়ে কেতাবী শিক্ষার ভিত্তিতে নিযুক্ত

হত। (গ) প্রাদেশিক সেনাদল, যা প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের দ্বারা স্থানীয় ভিত্তিতে সংগঠিত হত। (ঘ) চীনা মিলিটারী আকাদমীতে শিক্ষন প্রাপ্ত আধুনিক বাহিনী। চীন-জাপান যুদ্ধ ও রুশ-জাপান যুদ্ধের পর এই বাহিনীগুলির অপদার্থতা প্রমাণিত হয়। সুতরাং চ্যাং-চি-টুং ও য়ুয়ান-সি-কাই জার্মান ও জাপানী অফিসারদের সাহায্যে ভালো তালিম দিয়ে চীনের আধুনিক জাতীয় বাহিনী গঠন করেন। বাহিনীর অফিসারদের ভালোভাবে তামিল ও strategy বা রণকৌশল শিক্ষা দেওয়া হয়। অস্ত্র নির্মাণের জন্যে কারখানা স্থাপন করা হয়। ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির কাছ থেকে অস্ত্র খরিদ করা হয়। এর ফলে চীনে নতুন সেনাপতি ও সামরিক শ্রেণীর উদ্ভব হয়, যাদের মধ্যে য়ুয়ান-সি-কাই ছিলেন প্রধান। তাঁর ৬ ডিভিসন আধুনিক বাহিনীর নাম ছিল কোই-ইয়াং বাহিনী।

সামরিক সংস্কার

চীং সরকার প্রশাসনকে সচল ও কার্যকরী করার জন্যে বহু প্রশাসনিক সংস্কার চালু করেন। বৈদেশিক সম্পর্ক ও বৈদেশিক নীতি পরিচালনার জন্যে এক বৈদেশিক মন্ত্রীর অধীনে বৈদেশিক দপ্তর গঠন করা হয়। অনুরূপভাবে সমর, স্বরাষ্ট্র পুলিশ, বাণিজ্য, পূর্ত, রেলপথ প্রভৃতির জন্যে আলাদা দপ্তর গঠন ও মন্ত্রী নিয়োগ করা হয়।

সরকারী দপ্তর গঠন

আইন বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার চালু করা হয়। শেন-চিয়া-পেন নামে এক বিজ্ঞ ব্যক্তির প্রচেষ্টায় জাপান ও জার্মানীর ফৌজদারী আইন ব্যবস্থার ভিত্তিতে চীনের ফৌজদারী আইনবিধি সংকলন করা হয়। (২) কনফুশিয় পারিবারিক জীবন ধারা ও পরিবার প্রথাকে রক্ষা করা হয়। (৩) সম্রাট পরিবারের বাইরে সকল নাগরিককে আইনের চোখে সমান বলে গণ্য করা হয়। (৪) নারী, পুরুষ, ধনী, নির্ধন সকলকেই আইনে সমান মর্যাদা দেওয়া হয়। (৫) ১৯১০ খ্রীঃ তা-চিং-লু-পি বা চীনের ফৌজদারী আইনবিধির পূর্ণ সংস্কার করা হয়। অপরাধীকে দৈহিক নির্যাতন, অঙ্গচ্ছেদ, ফাঁসীদানের পর অপরাধীর মৃতদেহ সর্বসাধারণের দেখার জন্যে ঝুলিয়ে রাখা প্রভৃতি অমানবিক ব্যবস্থা লোপ করা হয়। (৬) দেওয়ানী আইনকে ফৌজদারী আইন থেকে পৃথক করা হয়।

আইন ও বিভাগীয় সংস্কার

চীং সরকার কর ব্যবস্থার সংস্কার দ্বারা সরকারী রাজস্ব বৃদ্ধির চেষ্টা করেন। প্রাদেশিক সরকারগুলি যাতে নিয়মিত কর আদায় করে কেন্দ্রে পাঠায় এজন্য চেষ্টা করা হয়। এজন্য অর্থদপ্তর গঠন ও অর্থমন্ত্রী নিয়োগ করা হয়।

কর সংস্কার

সাম্রাজ্ঞী জু-সি বা "প্রাচীনা বুদ্ধ" উপলব্ধি করেন যে, কিছু কিছু সাংবিধানিক সংস্কার দ্বারা চীং সরকারের পক্ষে গণসমর্থন লাভ করা কখনও সম্ভব হবে না। সংবিধান সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্যে তিনি জাপান এবং ইওরোপের বিভিন্ন দেশে কমিশন পাঠান। এই কমিশনগুলি সাম্রাজ্ঞীকে জানায় যে,জাপানের সংবিধানে যেমন সম্রাটই সংবিধান ও নাগরিক অধিকারের দাতা রূপে অবস্থান করেন, চীনের সংবিধান অনুরূপ হওয়া উচিত। ১৯০৮ খ্রীঃ সাম্রাজ্ঞী জু-সি ঘোষণা করেন যে, ৯ বছর বাদে একটি পূর্ণ সংবিধান তিনি দান করবেন। আপাততঃ (১৯০৮ খ্রীঃ) তিনি একটি অস্থায়ী সংবিধান চালু করবেন। এই অস্থায়ী সংবিধানে ক্ষমতা বিভাজন করা হয় এবং আইন-বিচার ও প্রশাসনিক বিভাগকে পৃথক করা হয়। সাম্রাজ্ঞী একটি জনপ্রতিনিধি সভা গঠন বা আইন সভা গঠনের উদ্যোগ নেন। সিংহাসনের হাতে প্রতিনিধিসভা আহ্বান,মুলতুবী ও ভঙ্গ করার ক্ষমতা রাখা হয়। সাম্রাজ্ঞী যুদ্ধ ঘোষণা ও শান্তি স্থাপনের অধিকার পান। নাগরিকদের বাক স্বাধীনতা প্রভৃতি মৌলিক অধিকার দেওয়ার কথা বলা হয়। দুই কক্ষ যুক্ত আইন সভা গঠনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।

সংবিধান চালু করার আগেই ১৯০৮ খ্রীঃ নভেম্বর মাসে জু-সির মৃত্যু হয়। সংস্কার ব্যবস্থার মুখ্য উদ্যোক্তা চ্যাং-চি-টু-এরও মৃত্যু হয়। এর ফলে সংবিধান কার্যকরী করা যায় নি। নূতন

সম্রাট সংবিধানের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তরে ভয় পান। চরমপন্থী চীনা জাতীয়তাবাদীরা এই সংবিধানকে "বিভ্রান্তিকর ও ধাপ্পাবাজি" বলে অভিহিত করেন। কারণ প্রস্তাবিত সংবিধানে মূল ক্ষমতা সিংহাসনের হাতে রাখা হয়। সংস্কার বিফল হলে, বিপ্লব অনিবার্য হয়ে পড়ে।

১৯১১ খ্রীঃ প্রজাতান্ত্রিক বিপ্লবের কারণ ঃ চীং রাজবংশের পতনের কারণ (The Causes of the Republican Revolution of 1911 : The Causes of the Downfall of the Ching Dynasty) ঃ ১৯১১ খ্রীঃ চীং রাজবংশের পতনের বীজ দীর্ঘকাল ধরে উপ্ত হয়। চীনে একটি প্রচলিত প্রবাদ ছিল যে, যখন ঈশ্বরের আশীর্বাদ কোন রাজবংশের ওপর থেকে প্রত্যাহৃত হয়, তখন দেশে নানা বিপর্যয় ঘটে।

চীং শাসনের নৈতিক ভিত্তির বিলুপ্তি

চীনা জনগণ বিশ্বাস করত যে, চীং রাজবংশের ওপর থেকে ঈশ্বরের নির্দেশ প্রত্যাহার করা হয়েছে (Mandate of heaven has been withdrawn)। এজন্যই বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে চীন বিপর্যস্ত; জনসংখ্যার ভারে ও দারিদ্র্যে জনসাধারণ বিপন্ন, ক্লান্ত ও হতাশাগ্রস্থ। চীং সরকার চীনা জনগণের আস্থা দীর্ঘকাল হারিয়েছিল। নৈতিক ভিত্তি বিনষ্ট হওয়ার ফলে এই সরকারের পতন যে কোন বড় ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে ঘটার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

চীং সরকারকে যুগোপযোগী করার জন্যে আন্তরিক প্রচেষ্টা দীর্ঘকাল ধরে ব্যাহত করা হয়। এই সরকার ছিল জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন, দুর্নীতিপূর্ণ, স্বৈরাচারী কর্মচারীদেব দ্বারা পরিচালিত। রাজধানী পিকিং-এ চীং সম্রাট তাঁর রাজ দরবারে আড়ম্বর, আদব-কায়দা ও সমর্থক

চীং স্বৈরতন্ত্রের বিচ্ছিন্নতা, দুর্নীতি ও গতিহীনতা

শাসক গোষ্ঠীর দ্বারা পরিবৃত থাকতেন। চীনা দেশপ্রেমিক ও সংস্কারপন্থীগণ মাঝে মাঝে সিংহাসনের কাছে যুগোপযোগী সংস্কারের দাবী জ্ঞাপন করে স্মারকলিপি দিলেও, সাম্রাজ্ঞী জু-সি সেই সকল স্মারকলিপিকে অগ্রাহ্য করেন। ফলে চীং শাসন ব্যবস্থা একটি জড়, গতিহীন, প্রাণশক্তিহীন শাসনব্যবস্থায় পরিণত হয়। সংস্কারের অভাবে সরকারের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে দুর্নীতি ও পশ্চাতগামিতা দেখা দেয় তা দূর করা যায়নি। সাম্রাজ্ঞীর দৈবাধিকার স্বত্ব এবং চীং কর্মচারীদের কায়েমী স্বার্থ সরকারকে একটি স্বৈর শাসনের পেষন যন্ত্রে পরিণত করে। জনকল্যান ও প্রজাপালনের দায়িত্ব গৌণ স্থানে চলে যায়। বলপূর্বক শাসন পরিচালনার দ্বারা, চীং সরকারের সেবক কর্মচারী ও সেবক সেনাদলের সহায়তায়, সকল প্রতিবাদ নস্যাৎ করে চীং স্বৈরশাসন চালু রাখা হয়।

এদিকে বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি চীনের ওপর তাদের সাম্রাজ্যবাদী ফাঁস লাগিয়ে চীনের স্বাধীনতা ও সভ্যতাকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়। চীং সরকার এই বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধে ব্যর্থ হলেও, আধুনিক সংস্কার, জন প্রতিনিধি সভা গঠন দ্বারা সরকারকে মজবুত

চীং সরকারের সংস্কার বিমুখতা

করতে বিরত থাকেন। ১৮৯৪-৯৫ খ্রীঃ চীন-জাপান যুদ্ধে চীনের শোচনীয় পরাজয়, চীং সরকারের পতনের প্রথম ঘণ্টা ধ্বনি করে। এই সময় নবীন সম্রাট কোয়াং-সু, সংস্কারক কাং-ইউ-ওয়ের সাহায্যে 'একশত দিবসের' সংস্কার প্রচেষ্টার পর, রক্ষণশীলদের বাধায় বিফল হন। সাম্রাজ্ঞী জু-সি পুনরায় ক্ষমতা অধিগ্রহণ করেন। এই পরিস্থিতিতে সংস্কারপন্থীরা যাঁরা আধুনিক সংস্কার দ্বারা চীং সরকারকে বাঁচাবার আশা করেন তাঁরা হতাশাগ্রস্থ হন। চীং সরকারের পতন ঘটতে থাকে।

বক্সার বিদ্রোহ এবং চীনকে ব্যবচ্ছেদের জন্যে সাম্রাজ্যবাদীদের প্রচেষ্টা চীং সরকারের মৃত্যু যন্ত্রণা ছাড়া আর কিছু ছিল না। ১৯০৮ খ্রীঃ সাম্রাজ্ঞী জু-সির মৃত্যু হলে পুরাতনতন্ত্রকে রক্ষা করার মত আর কোন ব্যক্তিত্ব চীং বংশে ছিল না। বুদ্ধিমতী জু-সি বক্সার বিদ্রোহের ইঙ্গিত

চীং সরকারের সংস্কার নীতি গ্রহণে অনুচিত বিলম্ব, চীনের পচনশীলতাকে তীব্র করে

সঠিকভাবে ধরেছিলেন। বক্সার বিদ্রোহীরা "চীং বংশকে ধ্বংস কর" দাবী প্রথমে তোলে। জু-সি বিদ্রোহীদের প্রতি সমর্থন দিয়ে, তাদের বিদ্রোহ বৈদেশিক শক্তির বিরুদ্ধে ঘুরিয়ে দেন। কিন্তু দেয়ালের লিখন তিনি ঠিকই পড়েন। এজন্য তিনি অবশেষে সংস্কার নীতি গ্রহণ করেন। এতদিনে মাঞ্চু সাম্রাজ্ঞীর মনে হয় যে, হয় সংস্কার, নতুবা পতন এ দুটি পথের বাইরে আর কোন পথ নেই। কাজেই চীং শাসনের অপরাহ্ন কালে তিনি সংস্কারের পতাকা উড়িয়ে দেন। এমনকি একটি সংবিধান ও জন প্রতিনিধিসভা আপাততঃ গঠনের আয়োজন করেন। (বিস্তৃত বিবরণ আগের পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। তিনি উপলব্ধি করেন যে, জন প্রতিনিধি সভার সহায়তায় শাসন চালু করলে তা মজবুত হবে। কিন্তু ততদিনে চীং সরকারের দেহে পচন অনেকদূর ছড়িয়ে যায়। শেষবেলায় সংস্কারের মৃদু প্রলেপ দ্বারা তা নিরাময় করা কঠিন ছিল। ইতিমধ্যে ১৯০৮ খ্রীঃ "প্রাচীনা বুদ্ধে"র মৃত্যু সংস্কার প্রচেষ্টায় যবনিকা পতন ঘটায়। ক্ষমতা হারাবার ভয়ে রক্ষণশীল শাসকরা কনফুশিয়বাদের খোলসে আত্মগোপন করে সংস্কার রদ করেন। চীং সরকারের পতন হতে আর দেরী হয়নি। ফেয়ার ব্যাঙ্ক বলেন যে, "প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন, জাতীয় ঐক্য স্থাপন এবং অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক পুনরুজ্জীবনের জরুরী কাজগুলিকে সমাধান করতে চীং সরকারের মর্মান্তিক শৈথিল্য ও দীর্ঘসূত্রতা ছিল এই সরকারের পতনের কারণ।"

১৯০১ খ্রীঃ পর জু-সির নির্দেশে যে বিলম্বিত সংস্কার প্রচেষ্টা শুরু হয়, ফেয়ার ব্যাঙ্কের মতে, তার মধ্যে লুকিয়েছিল চীং সরকারের পতনের বীজ। ফেয়ার ব্যাঙ্ক বলেছেন, "বিপ্লবীরা নয়, সংস্কারকরাই প্রধানতঃ ১৯১১ খ্রীঃ বিপ্লবের ক্ষেত্র রচনা করেন" (Reformers, not the revolutionists, mainly prepared the ground for the revolution)। বিলম্বিত চীং সংস্কারের যে প্রবল হাওয়া চীনে ঢোকান হয় তার সঙ্গে চীং বংশের ধ্বংসকামী বিপ্লবী মতবাদ এবং প্রাদেশিক বিচ্ছিন্নতাবাদ জোরদার হয়। চীং সংস্কারবাদের ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে প্রজাতন্ত্রী বিপ্লববাদের চোরা হাওয়া চীনের যুবসমাজের মনে ঢুকে পড়ে। চীন থেকে বিদেশে পঠন-পাঠনের জন্যে যে ছাত্রদের পাঠান হয়, তারা জাপান ও ইওরোপ থেকে সংবিধান, গণতন্ত্র ও জন প্রতিনিধি সভার আদর্শ চীনে বহন করে আনে। এমনকি চীনের নব সমর নায়কদের মধ্যেও এই সাংবিধানিক শাসনের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। বুদ্ধিজীবি, ছাত্র, সাংবাদিক, বণিক সকলেই চীং রাজতন্ত্র বিরোধী মুক্তপন্থী, উদারতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবী তোলে। চীং সংস্কারের ফলে যে প্রাদেশিক প্রতিনিধি সভাগুলি গঠিত হয়, তা ক্রমে কেন্দ্রীয় চীং সরকার বিরোধী এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাব নিলে, কেন্দ্রীয় চীং সরকারের পতন ঘটতে দেরী হয়নি।

বিলম্বিত চীং সংস্কারের পথে প্রজাতন্ত্রী বিধারার অনুপ্রবেশ

এই সঙ্গে কতকগুলি প্রত্যক্ষ কারণ যুক্ত হলে চীং রাজবংশের পতন হয় ও প্রজাতান্ত্রিক আদর্শ জয়যুক্ত হয়। (ক) জু-সির মৃত্যুর পর চীং সরকার যে সঙ্কটে পড়ে, তা থেকে তারা মুক্ত হতে পারত, যদি আগের মতই প্রাদেশিক স্তরে কনফুশিয় আদর্শে বিশ্বাসী জোতদার ও জেন্ট্রী শ্রেণীর সমর্থন পেত। কিন্তু চীনে শিক্ষাবিস্তার এবং বাণিজ্য বিস্তারের ফলে বহু জেন্ট্রী কনফুশিয় দর্শণে পারদর্শিতা পরীক্ষায় পাশ করে সরকারী চাকুরী গ্রহণ অপেক্ষা স্বাধীন ব্যবসা-শিল্পকে বরণীয় মনে করে। এজন্য বিদ্বান জেন্ট্রীদের মধ্যে সম্রাটতন্ত্রের প্রতি আনুগত্য এবং কনফুশিয় মূল্যবোধ হ্রাস পায়। সমাজে সমর্থক শ্রেণী লুপ্ত হতে থাকায় চীং শাসনের বিরোধী প্রজাতন্ত্রীরা প্রবল হয়। (খ) আগে ভূমি মালিক জেন্ট্রীরা জলসেচ, রাস্তাঘাট নির্মাণ,

চীনে শিল্প বাণিজ্যে পারদর্শী শ্রেণীর উদ্ভব : জনসংখ্যা বৃদ্ধি : অন্যান্য কারণ

আঞ্চলিক শান্তি রক্ষা প্রভৃতি দায়িত্ব বহন করত। এখন তারা বাণিজ্যমুখী হলে এই প্রয়োজনীয় কাজগুলি অবহেলিত হয়। এজন্য চীং সরকার নিন্দিত হয়। (গ) চীনে জনসংখ্যার বিরাট বিস্ফোরণ ঘটে। ৩৫০—৪০০ মিলিয়ন লোকসংখ্যার জীবিকা সংস্থানের জন্যে চীং সরকার কোন উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা নেননি। সরকারী ভূমিকরের অতিরিক্ত চাপ এবং রাজস্ব বিভাগের কর্মচারীদের দুর্নীতি কৃষকের জীবনকে হতাশাগ্রস্থ করে। এর ফলে প্রজাতন্ত্রীদের ভূমি সংস্কারের প্রতিশ্রুতি, ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেনের সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শ তাদের মনে দোলা দেয়। জনসংখ্যার চাপে দক্ষিণ চীনের লোকেরা স্বদেশ ছেড়ে জীবিকা অর্জনের জন্যে প্রতিবেশী দেশে শুধু নয়, মার্কিন দেশেও পাড়ি দেয়। বিদেশে আসার পর তারা নিজেদের দুরবস্থার কারণ বুঝতে পারে। দেশে ফিরে এলে তারা পুরাতনতন্ত্র ধ্বংসের কাজে সহায়তা দেয়। (ঘ) চীন-জাপান যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ এবং বক্সার বিদ্রোহের বিরাট ক্ষতিপূরণের বোঝা চীং সরকারের কাঁধে চাপলে, সরকার সাধারণ প্রজাদের ওপর কর বৃদ্ধি করে এই অর্থ তুলতে চেষ্টা করায়, দরিদ্র জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশার সীমা ছিল না।

এইভাবে গোটা চীন যখন বৈপ্লবিক পরিস্থিতির মুখে এসে পড়ে, সেই সময় চীং সরকারের রেলপথ নির্মাণ নীতিকে উপলক্ষ করে ১৯১১ খ্রীঃ প্রজাতন্ত্রী বিপ্লব শুরু হয়। চীনে বৈদেশিক সহায়তা বর্জন করে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা জোট বেঁধে, কখনও প্রাদেশিক সরকার জনসাধারণকে শেয়ার বিক্রী করে দেশীয় প্রচেষ্টায় রেলপথ নির্মাণের কাজ শুরু হয়। অর্থাভাবে এই প্রচেষ্টা বেশী দূর আগায় নি। কোন কোন অঞ্চলে রেলপথ নির্মাণের যেটুকু কাজ শুরু হয় তা অসমাপ্ত থাকে। ইতিমধ্যে ১৮৯৮ খ্রীঃ থেকে বৈদেশিক শক্তিগুলির চীনকে ব্যবচ্ছেদের প্রচেষ্টা শুরু হয়। নিজ নিজ Spheres of Influence বা প্রভাবাধীন অঞ্চলে বিদেশী শক্তিগুলি মূলধন লগ্নী করে রেলপথ নির্মাণ শুরু করে দেয়। রুশ-জাপান যৌথ উদ্যোগে মাঞ্চুরিয়ায়, জার্মান উদ্যোগে শাং-টুং প্রদেশে, ফরাসী উদ্যোগে ইউনান অঞ্চলে রেলপথ নির্মাণ করা হয়। এর ফলে স্থানীয় উদ্যোগে যে রেলপথ নির্মাণ শুরু হয়েছিল তা শুধু বন্ধই হয়নি, তাতে যারা টাকা লগ্নী করে তাদের সর্বস্বান্ত হওয়ার অবস্থা দেখা দেয়। চীং সরকার নিজ হাতে যে সকল রেলপথ নির্মাণ করেন সেগুলির জন্যে তাঁরা বিরাট বৈদেশিক ঋণ নেন। এখন ঋণ পরিশোধ করতে না পেরে রেলপথ জাতীয়করণের অজুহাতে চালু রেলপথগুলি এবং নতুন রেলপথ নির্মাণের অধিকার বিদেশী কোম্পানীগুলির হাতে তুলে দেন। সরকারকে ঋণ প্রদান করে সাম্রাজ্যবাদীরা অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের জাল বিছিয়ে দেয়। সরকারের পেটোয়া এবং ধূর্ত ব্যবসায়ী শেং-সুয়ান-হুই ছিলেন এই গোটা পরিকল্পনার স্রষ্টা। চীং সরকারের উচ্চ মহলে তাঁর বিরাট প্রভাব ও আর্থিক লেনদেনের ফলেই এই হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। শেং-এর প্রভাবে সম্রাট ১৯১১ খ্রীঃ এক আদেশনামার দ্বারা জানান যে, চীনা মূলধনে গঠিত রেলগুলি এখন থেকে জাতীয়করণ করা হল। সকলেই বুঝতে পারে যে, আসলে এই রেলপথ বিদেশী কোম্পানীকে বন্ধক দেওয়া হবে।

চীং সরকারের রেলপথ নির্মাণ নীতি ও অর্থনৈতিক সংকট

সরকারের এই আদেশের বিরুদ্ধে "রেলপথ সংরক্ষণ সমিতি" গঠিত হয়। সাধারণ লোক ও কৃষকরাও এই আন্দোলনের অংশীদার হয়। ধর্মঘট ও স্কুল-কলেজ বন্ধ করে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হয়। সে-চুয়ান প্রদেশে আন্দোলন তীব্র হলে, সরকারী বাহিনী ধর্মঘটী জনগণের ওপর গুলি বর্ষণ করলে আন্দোলন সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। উচাং-এর সেনাদল বিপ্লবীদের পক্ষ নেয়।

রেলপথ সংরক্ষণ সমিতি

এই সুযোগে ক্যান্টনে ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেনের নেতৃত্বে চীং বিরোধী আন্দোলনকারীরা শক্তিশালী হয়ে দক্ষিণ চীনের রাজধানী নানকিং দখল করে। নানকিং-এ ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেন (জানুয়ারী ১৯১২ খ্রীঃ) রাষ্ট্রপতি হিসেবে এক প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করেন। শেষ পর্যন্ত চীং সম্রাট পদত্যাগ করেন। চীনে প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হয়।

ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেনের উদয়

১৯১১ খ্রীঃ প্রজাতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিণতি ঃ য়ুয়ান-শি-কাই-এর রাষ্ট্রপতি পদলাভ (The Nemesis of the Republican Revolution of 1911 : The Rise of Yuan-Shi-Kai as President of the Republic) ঃ চীং সরকারের বিরুদ্ধে ১৯১১ খ্রীঃ রেলপথ হস্তান্তর উপলক্ষে সর্বত্র বিদ্রোহ দেখা দেয়। এই সুযোগে চীনের বিভিন্ন বিপ্লবীগোষ্ঠীকে বিশেষতঃ হুনানের বিপ্লবীদের একত্র সংগঠিত করে ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেন টুং-মেং-হুই বা সাধারণ মৈত্রী জোট নামে এক বিপ্লবী সংস্থা গঠন করেন। জাপানের রাজধানী টোকিও নগরেও এই সংগঠন করা হয়। বিদেশে অবস্থিত চীনা ছাত্ররা এই সংগঠনে যোগ দেন। মিন-পিয়াও নামে এক পত্রিকার দ্বারা চীনে টুং-মেং-হুই-এর আদর্শ প্রচার করা হয়। টুং-মেং-হুই-এর দুটি শাখা সাংহাই ও হ্যাংকাও-এ স্থাপিত হয়। স্থানীয় ছাত্র এবং উচাং-এর সেনাদল টুং-মেং-হুই-এর আদর্শে প্রভাবিত হয়ে বিপ্লবীদের পক্ষ নেয়।

চীনে ১৯১১ খ্রীঃ চীং বিরোধী বিপ্লবের সুযোগে উচাং-এর সেনাদল বিপ্লবী টুং-মেং-হুই-এর পক্ষ নিলে গোটা দক্ষিণ চীন ও উত্তর-পশ্চিম চীন বিপ্লবীদের প্রতি সমর্থন জানায়। এই পরিস্থিতিতে বিপ্লবী প্রজাতন্ত্রী আন্দোলনকে নেতৃত্ব দানের জন্যে ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেন সাংহাই বন্দরে নেমে পড়েন এবং চীনা প্রজাতন্ত্রের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। ১৯১২ খ্রীঃ নানকিং-এ তাঁর সরকারের কেন্দ্র স্থাপিত হয়।

এদিকে চীং সরকার বিদ্রোহ নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যর্থ হয়ে, চীনের নব সেনাদলের প্রাক্তন সংগঠক ও সেনাপতি এবং জবরদস্ত নেতা য়ুয়ান-শি-কাইকে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব দেন এবং সেনাদলের একাধিপত্য তাঁকে ছেড়ে দেন। য়ুয়ান-শি-কাই-এর প্রতি চীনের জাতীয় বাহিনীর বেশীর ভাগ অনুগত ছিল। য়ুয়ান পেকিং-এ তাঁর ক্ষমতা সংহত করেন। তিনি আপাততঃ চীং সরকারকে রক্ষা করার দায়িত্ব নেন। দক্ষিণে নানকিং প্রজাতন্ত্রী সরকার, উত্তরে য়ুয়ান-শি-কাই সমর্থিত চীং সরকারের মধ্যে এক গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দেয়। প্রজতন্ত্রী সরকারের প্রাথমিক ও মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল নেতিবাচক, অর্থাৎ চীং সরকারকে উৎখাত করা। দক্ষিণে এই লক্ষ্য আপাততঃ প্রবল হলেও, প্রজাতন্ত্র এরপর কি চায় সে সম্পর্কে অস্পষ্টতা ছিল।

ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেন এই সমস্যা উপলব্ধি করে ঘোষণা করেন যে, চীং সরকারের উচ্ছেদই শেষকথা নয়। তিনি সান-মিন-চু-আই বা তাঁর বিখ্যাত তিনটি মৌলিক লক্ষ্য যথা জনগণতন্ত্র, জনজাতীয় ঐক্য জাতীয়তাবাদ এবং জনসমাজতন্ত্র স্থাপনই তাঁর লক্ষ্য। আপাততঃ তাঁর সমস্যা ছিল উত্তর চীনে য়ুয়ান-শি-কাই সমর্থিত চীং সরকারের পদচ্যুতি। কারণ চীন দুটি পরস্পরবিরোধী আদর্শ শিবিরে ক্ষমতার কেন্দ্রে বিভক্ত হয়েছিল।

কূটবুদ্ধি য়ুয়ান-শি-কাই ছিলেন ম্যাকিয়াভেলীয় নীতিতে সিদ্ধহস্ত। তিনি দেখেন যে, তাঁর অধীনস্থ বাহিনীর সমর্থন ছাড়া চীং সম্রাটের টিকে থাকার কোন সম্ভাবনা নেই। অপরদিকে দক্ষিণ চীনের প্রজাতন্ত্রী সরকারের সঙ্গে গৃহযুদ্ধে জয়লাভ অনিশ্চিত। এমতাবস্থায় তিনি চীং সরকার ও প্রজাতন্ত্রীদের মধ্যে মধ্যস্থতা করেন। চীনে গৃহযুদ্ধ এড়াতে ডাঃ সান তাঁর মধ্যস্থতা মেনে নেন। শেষ পর্যন্ত স্থির হয় যে, চীং সম্রাট য়ুয়ান-চুং পদত্যাগ করবেন। ডাঃ

সান-ইয়াৎ-সেন রাষ্ট্রপতির পদ ত্যাগ করবেন। য়ুয়ান-সি-কাই রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণ করবেন। চীনে আপাততঃ একটি অস্থায়ী সংবিধান চালু হবে। য়ুয়ান সেই সংবিধান অনুযায়ী, পার্লামেন্টের সহায়তায় শাসন চালাবেন। এই চুক্তির পর চীং সম্রাট সুয়ান-চুং পদত্যাগ করেন। য়ুয়ান-শি-কাই রাষ্ট্রপতির পদে বসেন। ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেন পদত্যাগ করে তাঁর সমর্থকদের সহায়তায় কুয়ো-মিন-তাং নামে এক জাতীয় রাজনৈতিক দল গঠন করেন।

য়ুয়ান-শি-কাই যেমন তাঁর প্রভু মাঞ্চু সম্রাটের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে তাঁর পদত্যাগ ঘটান এবং নিজে রাষ্ট্রপতি হন, তেমন তিনি প্রজাতন্ত্রের প্রতিও বিশ্বাসঘাতকতা করেন। ১৯১২-১৯১৬ খ্রীঃ তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি গণতান্ত্রিক আদর্শ ত্যাগ করে প্রায় একনায়কের মতই চীনে শাসন চালান। দুর্নীতি, উৎকোচ প্রদান, নির্বিচারে বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ এবং স্বজনপোষণের ফলে তাঁর শাসনব্যবস্থা ভারাক্রান্ত ও গতিহীন হয়। তিনি নির্বাচিত পার্লামেন্টকে ভীতি প্রদর্শন, সংবিধান পরিবর্তন করে নিজেকে চীন সম্রাট হিসাবে স্থাপনের উচ্চকাঙ্ক্ষাকে অনুসরণ করেন। নানকিং-এর প্রজাতন্ত্রী আবহাওয়া থেকে পিকিং-এর রাজতন্ত্রী আবহাওয়ায় তিনি রাজধানী স্থানান্তর করেন। পার্লামেন্ট ভঙ্গ করে তিনি ১০ বছরের জন্যে রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণ করেন। তাঁর এই নতুন ক্ষমতাকে বৈধতা দানের জন্যে একটি মনগড়া সংবিধান চাপিয়ে দেন। এই সংবিধানের নাম ছিল "সাংবিধানিক চুক্তি"।

য়ুয়ান-শি-কাই-এর war lordism বা সামরিক একনায়কতন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেনের কুওমিন-তাং দল বিদ্রোহ ঘোষণা করলে সমরকুশলী য়ুয়ান-শি-কাই তাঁর সমর্থক বাহিনীর সাহায্যে তা দমন করেন। ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেন ও তাঁর প্রধান সমর্থকরা জাপানে আশ্রয় নেন। য়ুয়ান-শি-কাই অবশ্য নিজেকে সম্রাট হিসাবে ঘোষণার সুযোগ পাননি। বিশ্বযুদ্ধ এবং জাপানের আগ্রাসনের সম্মুখে চীনকে রক্ষা করাই ছিল তাঁর প্রধান সমস্যা। ইতিমধ্যে তিনি সকল স্তরে এমনকি নিজের অনুগত বাহিনীর সমর্থন হারাতে থাকেন। ১৯১৬ খ্রীঃ এই warlord বা সামরিক একনায়কের মৃত্যু হয়। চীনে আর রাজতন্ত্র ফিরে আসেনি।

য়ুয়ান সি-কাই-এর উচ্চাকাঙ্ক্ষা, প্রজাতন্ত্রের প্রতি তাঁর বিশ্বাসঘাতকতা নিন্দনীয় ছিল সন্দেহ নেই। যখন চীং সম্রাটের পতন ঘটে, য়ুয়ান-শি-কাই ছাড়া আর এমন কোন লৌহ মানব চীনে ছিলেন না, যিনি নেতৃত্ব স্থানে সক্ষম হতেন। যদি চীং সম্রাট পদত্যাগ না করে যুদ্ধনীতি নিতেন, তবে চীং সরকারের অনুগত বাহিনী দ্বারা নানকিং প্রজাতন্ত্রকে ধ্বংস করা শক্ত কাজ ছিল না চীনের গৃহযুদ্ধের সুযোগ জাপান নিত। কুয়ো-মিন-তাং-এর হাতে এমন কিছু শিক্ষিত, শক্তিশালী বাহিনী ছিল না যার দ্বারা তারা আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হত। য়ুয়ান-শি-কাই-এর উচ্চাকাঙ্ক্ষা মনোভাব যত দিন না স্পষ্ট হয়, ততদিন লোকে তাঁকেই ত্রাণকর্তা মনে করত। রাজতন্ত্র থেকে প্রজাতন্ত্রের বিবর্তনের পথে য়ুয়ান-শি-কাই-এর warlordism বা সমরনায়কতন্ত্র ছিল এক বাফার (Buffer) বা সাঁকুলীবোধক ব্যবস্থা মাত্র।

ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেনের কর্মধারা, ভাবধারা ও তাঁর মূল্যায়ন (The Ideas and Achievements of Dr. Sun-Yat-Sen) ঃ আধুনিক চীনের ইতিহাস রক্ষণশীলতার সঙ্গে প্রগতিশীলতার ঘাত-প্রতিঘাতের ঘটনায় মুখর। এই ঘাত-প্রতিঘাতের উপল খণ্ডগুলি অতিক্রম করে চীনের ইতিহাস পাহাড়ী স্রোতস্বিনীর মতই প্রবাহিত হয়েছে। চীনের এই বিবর্তনে পরিবেশ ও পরিস্থিতির সঙ্গে ব্যক্তির ভূমিকাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ঘুমন্ত ও অচেতন চীনকে জাগরণের ডাক যাঁরা দেন তাঁদের মধ্যে ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেনের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ্য। চীনের সংস্কারবাদীদের মধ্যে কাং-ইউ-ওয়েকে যদি "কনফুশিয়বাদের নবব্যাখ্যার ক্ষেত্রে মার্টিন লুথার" বলা হয় তবে সান-ইয়াৎ-সেনকে "আধুনিক চীনের জনক" (Father of Modern China) বলা যেতে পারে। যেক্ষেত্রে কাং ব্যর্থ হন,

সেক্ষেত্রে ডাঃ সান সফলতা লাভ করেন। কাং-ইউ-ওয়ে মাঞ্চু বা চীং রাজবংশকে নিয়মতান্ত্রিক শাসকে পরিণত করে, চীনের আধুনিকীকরণ করতে চান। ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেন উপলব্ধি করেন যে চীনের অনগ্রসরতা এবং বৈদেশিক আক্রমণে দুর্দশার প্রধান দায়িত্ব ছিল চীং রাজবংশের। পুরাতনতন্ত্রকে ধ্বংস করে নতুন চীন গঠন করতে হলে অগ্রে চীং রাজবংশের উচ্ছেদ চাই। কাং-ইউ-ওয়ে চীং সম্রাটের মাধ্যমে ওপর থেকে তাঁর সংস্কারগুলি চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করেন।

কাং-ইউ- ওয়েভ ডাঃ সান- ইয়াৎ- সেনের তুলনা

ডাঃ সান বিপ্লব ও গণবিদ্রোহের মাধ্যমে জনতার রাজনৈতিক চেতনার জাগরণ এবং প্রয়োজনীয় সংস্কারের জন্যে প্রচেষ্টা চালান। কাং কনফুশিয়াসের মতবাদের নবরূপায়ণ দ্বারা চীনকে গড়তে চান। ডাঃ সান বিশ্বের বিভিন্ন দেশ পরিক্রমার পর ফলিত জ্ঞানের আলোকে প্রজাতান্ত্রিক চীন গঠনের স্বপ্ন দেখেন। একটি ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে মিল ছিল তা হল উভয়েই ছিলেন দেশপ্রেমিক এবং সংস্কারপন্থী।

ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেন কোন অভিজাত পরিবারের সন্তান ছিলেন না। তাঁর আদি নাম ছিল সান-ওয়েন। সিয়াং সান-এর এক কৃষক পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতৃব্য তাই-পিং বিদ্রোহে যোগ দেন এবং তাঁর প্রভাবে ডাঃ সান বাল্যকালে তাই-পিং নেতা হুং-সিউ-চুয়ানকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেন। বিপ্লবী পরিবারে জন্মগ্রহণ করায় তাঁর মনে স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা বাল্যকাল থেকে উপ্ত হয়। বিদেশে বসবাসকারী তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আনুকূল্যে তাঁর বিদ্যাশিক্ষার সুযোগ হয়। খ্রীষ্টীয় মিশনারী বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন এবং হংকং-এর মেডিক্যাল কলেজে পাঠ সাঙ্গ করে তিনি চিকিৎসা ও শল্যবিদ্যায় ডিগ্রী পান। কিন্তু মাকাও-এর পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষের

ডাঃ সেনের প্রথম জীবন

বিরোধিতায় তিনি চিকিৎসকের বৃত্তি গ্রহণে বাধা পান। ছাত্রজীবন থেকে রাজনীতির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল। ১৮৮৫ খ্রীঃ ফ্রাঙ্কো-চীন যুদ্ধে চীনের পরাজয় তাঁকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। তিনি চীং সরকারের প্রধানমন্ত্রী লি-হাং-চাং-এর কাছে এক স্মারকলিপি পাঠান। লি তা অগ্রাহ্য করেন।

এরপর থেকে ডাঃ সান উপলব্ধি করেন যে, চীনের যাবতীয় দুর্দশার মূলে ছিল চীং বংশের দুর্নীতিপূর্ণ শাসন। তিনি চীং শাসন থেকে স্বদেশকে মুক্ত করার ব্রত গ্রহণ করেন। তিনি চীনের

সিং-চু- হুই গঠন

গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠন ট্রিয়াড সোসাইটিতে যোগ দেন এবং ১৮৯৪ খ্রীঃ সিং-চুং-হুই বা "চীনের জাগরণ সমিতি" গঠন করেন। এই সমিতির সাহায্যে তিনি ক্যান্টনের শাসন ব্যবস্থা উচ্ছেদের ব্যর্থ চেষ্টা করায়, সরকারী রোষের হাত থেকে বাঁচার জন্যে জাপানে আশ্রয় নেন। জাপানে নাম পরিবর্তন করে নাকায়মা" নামে ছদ্মবেশে তিনি কিছুকাল কাটান। লন্ডনে থাকার সময় স্থানীয় চীনা দূতাবাস তাঁকে বন্দী করে চীনে দণ্ডদানের জন্যে আনতে চেষ্টা করে। তাঁর শিক্ষক স্যার জেমস ক্যান্টলির প্রচেষ্টায় তিনি মুক্তি পান। ইতিমধ্যে তিনি অন্ততঃ ১০ বার বিদ্রোহ করার চেষ্টা করে বিফল হন।

এই সময় চীনে বিপ্লব ঘটাবার জন্যে বহু গোষ্ঠী আলাদাভাবে কার্যকরী ছিল। ডাঃ সান উপলব্ধি করেন যে, চীনের বিভিন্ন বিপ্লবী গোষ্ঠীগুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ না করলে চীং শাসন থেকে চীনের মুক্তি আসবে না। দ্বিতীয়তঃ, বিপ্লবী দলগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে প্রাণশক্তি দিতে হলে কেবলমাত্র নেতিবাচক আদর্শ চীং সরকারের উচ্ছেদের লক্ষ্য যথেষ্ট নয়। এর পরে চীনকে কিভাবে গড়তে হবে তার রূপরেখা না দিলে জনসাধারণের সাড়া পাওয়া যাবে না এবং বিপ্লবীরাও প্রেরণা পাবে না। কাং-ইউ-ওয়ে তাঁর নিজস্ব ধারণা অনুযায়ী কনফুশিয়বাদের নব

ডাঃ সেনের বিপ্লবী পন্থা

ব্যাখ্যার দ্বারা তাঁর অনুগামীদের যেমন প্রেরণা দিয়েছেন, ডাঃ সান মনে করেন যে, তাঁকেও অনুরূপভাবে বিপ্লবের আদর্শ জানাতে হবে। নতুবা চীনের তরুণ ছাত্রসমাজের সহযোগিতা পাওয়া যাবে না। এইজন্যে তিনি তাঁর "সান-মিন-চু-আই" বা ডাঃ সানের তিনটি নীতি ঘোষণা করেন।

সান-মিন-চু-আই-এর তিনটি নীতি ছিল মোটামুটি ভাবে (ক) জন-জাতীয়তাবাদ (Peoples' nationalism); (খ) জন-গণতন্ত্র (Peoples' democracy), (গ) জনগণের জীবিকার সংস্থান (Peoples' Livelihood)। ইওরোপের বহু দেশে ভ্রমণ এবং জাপানের

সান-মিন- চু -আই-এর ব্যাখ্যা

সংস্কার নীতি পর্যবেক্ষণ করে অভিজ্ঞতার আলোকে ডাঃ সান তাঁর তিন নীতি ঘোষণা করেন। মিন-পাও বা 'জনগণ' নামক পত্রিকায় এবং 'চায়না ট্রিবিউন' পত্রিকায় বিভিন্ন প্রবন্ধের মাধ্যমে ডাঃ সান তাঁর এই তিন নীতির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। (১) জাতীয়তাবাদ বা জন-জাতীয়তাবাদ কথাটির ব্যাখ্যা হিসেবে ডাঃ সান বলেন যে, এই জাতীয়তাবাদ প্রাথমিকভাবে মাঞ্চু বা চীং উপজাতির শাসনের বিরুদ্ধে বৃহত্তর চীনা জনগণের অথবা বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে চীনের জাতীয় স্বাধীনতা বুঝাত। কিন্তু এই জাতীয়তাবাদের মর্ম আরও গভীরে ছিল। চীন ভূখণ্ডে বসবাসকারী পঞ্চ জনগোষ্ঠী যথা চীনা, মাঞ্চু, তিব্বতী, মোঙ্গল ও তুর্কীদের জাতীয় ঐক্যের বাঁধনে আবদ্ধ করা। চীনের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীকে একটি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বন্ধনে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দিয়ে ঐক্যবদ্ধ করেন। ডাঃ সান তাঁর জাতীয়তাবাদের লক্ষ্য বলে গ্রহণ করেন। প্রাদেশিকতা, আঞ্চলিকতা ও

জাতীয়তাবাদ

গোষ্ঠীবদ্ধতার ঊর্ধ্বে একটি চীনা জাতীয় রাষ্ট্রের গঠনকেই ডাঃ সান তাঁর জাতীয়তাবাদের লক্ষ্য বলে গ্রহণ করেন। প্রাথমিক স্তরে তা মাঞ্চুবিরোধী, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, প্রজাতন্ত্রবাদী হলেও পরিণামে তা পঞ্চ জাতিগোষ্ঠীর রাষ্ট্রীয় ঐক্যকেই বোঝাত।

(ii) গণতন্ত্র বা জনগণতন্ত্র বা মিন-চুয়ান ছিল কনফুশিয়বাদের বিরোধী প্রজাতন্ত্রবাদ। একটি

গণতন্ত্র

সংবিধানের মাধ্যমে সকল নাগরিকের সমান অধিকার বা সাম্য প্রতিষ্ঠা ছিল তাঁর লক্ষ্য। মার্কিন দেশের মতই তিনি আইন, বিচার ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার পৃথকীকরণ চাইতেন। পঞ্চশক্তি সংবিধান রচনা ছিল তাঁর অন্যতম লক্ষ্য। গণতন্ত্রে তিনি জন প্রতিনিধি সভাকেই জনসাধারণের সার্বভৌমত্বের প্রতীক বলে মনে করতেন। এই সঙ্গে প্রশাসন বিভাগের মাধ্যমে তিনি কেন্দ্রীয়তাকে জোর দিতে চান।

(iii) ডাঃ সান-এর তৃতীয় নীতি ছিল জনগণের জীবিকার সংস্থান করা (Peoples' Livelihood)। চীনে কমিউনিষ্ট বিপ্লবের পর বলা হয় যে, চীনের কমিউনিষ্ট নেতারা বলেন যে, জনগণের জীবিকার সংস্থান বলতে ডাঃ সান মার্কসীয় সমাজতন্ত্রবাদ বুঝতেন। ফেয়ার ব্যাঙ্কের মতে এই মত ঠিক নয়। কারণ ডাঃ সান মার্কসীয় শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্বে আস্থাশীল

জনগণের জীবিকা

ছিলেন না। তিনি জমিকে সমানভাবে বণ্টন করে, সকল চীনা পরিবারের সরকারকে সমান কর প্রদান নীতি বলবৎ করতে চান। প্রকৃতপক্ষে "জনগণের জীবিকা" বলতে ডাঃ সান কি ভেবেছিলেন তা অস্পষ্ট। পরবর্তীকালের ব্যাখ্যাকাররা এক্ষেত্রে তাঁদের নিজস্ব চিন্তা ডাঃ সানের চিন্তাধারার ওপর আরোপিত করেছেন। চীনের মার্কসবাদী লেখকদের মতে, ১৯১১ খ্রীঃ "জিনঙ্গাই" বিপ্লব ছিল বুর্জোয়া বিপ্লব। যাই হোক, জনসাধারণের জীবিকা বলতে ডাঃ সান নিশ্চয়ই ব্যাঙ্ক প্রভৃতি রাষ্ট্রায়ত্তকরণ ও বিদেশী পুঁজি হঠিয়ে চীনের নিজস্ব শিল্প কারখানা গঠন ও জনগণের নিম্নতম জীবিকার ব্যবস্থা করার কথা বলেন। (চীনে কমিউনিষ্ট বিপ্লব পরের দিকের অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

অষ্টম অধ্যায়

ফ্যাসিষ্ট ইতালীর অভ্যুত্থান (১৯২২-৪৬ খ্রীঃ)
(The Rise of Italian Fascism, 1922-46)

যুদ্ধোত্তর ইতালী ঃ ফ্যাসিবাদের উদ্ভবের কারণ (Post-War Italy : Causes of the Rise of Fascism) ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইওরোপের কয়েকটি দেশে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার দ্রুত পতন ঘটে।[১] ইতালীতে গণতন্ত্রের পতন এবং স্বৈরতন্ত্রবাদী ফ্যাসিষ্ট শক্তির উদ্ভব যুদ্ধোত্তর ইওরোপের ইতিহাসের অন্যতম প্রধান ঘটনা। কাভ্যুরের নেতৃত্বে ইতালী ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পর, কাভ্যুর যে উদারতান্ত্রিক সংবিধান প্রবর্তন করেন, তাকে আদপেই প্রকৃত গণতন্ত্র বলা যায় না। ভোটাধিকার প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের ভিত্তিতে স্থাপিত না করে কাভ্যুরের নির্দেশে সম্পত্তির ভিত্তিতে ভোটাধিকার স্থাপন করা হয়। এর ফলে সরকার গঠনে সাধারণ লোকের কোন ভূমিকা না থাকায় এই সরকার সম্পর্কে জনসাধারণ নিস্পৃহ থাকে।[২]

ইতালীর গণতন্ত্রের দুর্বলতা

ঐক্যবদ্ধ ইতালীর সম্মুখে ১৮৭০ খ্রীঃ এমন কতকগুলি বিশেষ সমস্যা ছিল যার সমাধান করার চেষ্টা সরকারের কোন মন্ত্রীসভা করেনি। প্রথমতঃ, উত্তর ইতালী শিল্পে অগ্রসর ও মোটামুটি স্বচ্ছল হলেও, দক্ষিণ ইতালী ছিল অনগ্রসর অঞ্চল। উভয় অঞ্চলের মধ্যে অর্থনৈতিক সমতা আনার কোন চেষ্টা না করায় কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর দক্ষিণের আস্থা নষ্ট হয়। ফ্যাসিষ্ট নেতা মুসোলিনী এর পূর্ণ সুযোগ নেন। তিনি দক্ষিণ ইতালীর জনগণের নিকট কেন্দ্রীয় সরকারের বৈষম্য নীতি তুলে ধরেন। দ্বিতীয়তঃ, দক্ষিণ ইতালীর প্রধান সমস্যা ছিল মাফিয়া ও ডাকাত দলের উৎপাত। দক্ষিণে ম্যালেরিয়ার প্রকোপে শত শত লোক মারা যেত। কেন্দ্রীয় সরকার এই সকল সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেনি। এই বৈষম্যমূলক নীতি ইতালীর উদারতান্ত্রিক সরকারের পতন ঘটায় এবং ফ্যাসিবাদের পথ প্রস্তুত করে।

দক্ষিণ ইতালীর অনগ্রসরতা

ভৌগোলিক দিক থেকে ইতালীতে কয়লা ও লোহার মত খনিজ সম্পদ ছিল খুবই কম। ইতালীকে শিল্প গঠন করতে হলে বিদেশ থেকে কয়লা, লোহা যোগাড় করতে হত। এজন্যে ইতালী আফ্রিকা বা আলবানিয়ায় উপনিবেশ স্থাপন করে তার খনিজ দ্রব্যের সরবরাহ সুনিশ্চিত করতে চায়। ইতালী ইওরোপ মহাদেশ থেকে আল্পস পর্বতমালার দ্বারা বিচ্ছিন্ন। এজন্যে ইতালী তার তিনদিকে সমুদ্রের পথেই বর্হিযোগাযোগ করতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু ইতালীর তিনদিকে ঘিরে থাকা ভূমধ্যসাগরের জলরাশির উপর ইতালীর নিয়ন্ত্রণ ছিল না। ব্রিটেন ও ফ্রান্সের নৌ-বহর এই জলরাশি নিয়ন্ত্রণ করত। ভূমধ্যসাগরে আগমন-নির্গমনের তিনটি মুখ আছে। যথা, জিব্রালটার মুখ, সুয়েজ মুখ ও দার্দানালিশ মুখ। এই তিনটি মুখই ব্রিটিশ শক্তি নিয়ন্ত্রণ করত। কাজেই ইতালীর পক্ষে সমুদ্রপথে স্বাধীনভাবে বিস্তারের কোন রাস্তা খোলা ছিল না। ইতালী ছিল "ভূমধ্যসাগরের বন্দী"। এই সীমাবদ্ধতা দূরীকরণে ইতালী ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল দখল করতে চায়।

ভৌগোলিক অবস্থান

ইতালী প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগ দিলে ইতালীর ক্যাথলিক দল ও সমাজতন্ত্রী দল তার বিরোধিতা করে। কিন্তু শাসক উদারতন্ত্রী দল তা অগ্রাহ্য করে ইতালীকে যুদ্ধে জড়ায়। প্রথম

১· Gathorne Hardy—Short History of International Affairs.

২· Ibid.

প্যারিসের শান্তি বৈঠকে ইতালীর বিফলতা

বিশ্বযুদ্ধের পর প্যারিসের শান্তি বৈঠক থেকে ইতালী প্রায় খালি হাতে ফিরে আসায়, ইতালীবাসীদের মনে দারুণ হতাশা দেখা দেয়। ইতালীয় জাতীয়তাবাদীরা মনে করে যে, ইতালী এই যুদ্ধে রক্ত ও জীবন ব্যয় করলেও শূন্য হাতে ফিরে এসেছে।

ভার্সাই সন্ধির দ্বারা ইতালীর আশা-আকাঙ্ক্ষা মোটেই পূরণ হয় নি। ইতালী দাবী করত যে, এড্রিয়াটিক সাগরের অপর তীরে ট্রিয়েষ্ট, ট্রেন্টিনো ও ডালমাশিয়া অঞ্চল তাকে দিতে হবে। এড্রিয়াটিকের অপর তীরে ফিয়ুম বন্দরটিও ইতালী পাওয়ার আশা করত। এই স্থানগুলি পেলে এড্রিয়াটিক উপসাগরে ইতালীর একাধিপত্য স্থাপিত হতে পারত। কিন্তু ভার্সাই বৈঠকে এই স্থানগুলিকে নবগঠিত রাজ্য যুগোস্লাভিয়ার সঙ্গে যুক্ত করা হলে, ইতালী নিজেকে ভয়ানক বঞ্চিত বলে মনে করে। দ্বিতীয়তঃ, ইতালীর লোকসংখ্যা ছিল দ্রুত বর্দ্ধমান। এজন্য জার্মানীর উপনিবেশগুলি এবং উত্তর আফ্রিকার ফরাসী উপনিবেশের একাংশ ইতালী তার ন্যায্য প্রাপ্য বলে মনে করত। ভার্সাই সন্ধি বৈঠকে জার্মান উপনিবেশগুলি ব্রিটেন ও ফ্রান্স নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিলে এবং উত্তব আফ্রিকার ফরাসী উপনিবেশে স্থিতাবস্থা রক্ষা করা হলে, ইতালীর প্রতিনিধি কাউন্ট অর্ল্যাণ্ডো ভার্সাই সন্ধি বৈঠক ত্যাগ করেন। তখন থেকেই ইতালীতে উগ্র জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়। তারা বলতে থাকে যে, ইতালীর প্রাপ্য বলপূর্বক দখল করতে হবে। বর্তমান উদারপন্থী সরকার ইতালীবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে অক্ষম বলে তারা প্রচার চালায়। এভাবে ভার্সাই সন্ধির ফলে ইতালীতে এক উগ্র জাতীয়তাবাদী প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, যা শেষ পর্যন্ত ফ্যাসিষ্ট শক্তিতে পরিণত হয়।

ভার্সাই সন্ধিতে ইতালীর হতাশার কারণ

ক্যাথলিক ও সমাজতন্ত্রী দলগুলি যারা যুদ্ধে যোগদানের বিপক্ষে ছিল, তারা এজন্যে শাসক উদারতন্ত্রী দলকে অপদস্থ করার চেষ্টা করে। ইতালীয় রাজনীতির এই নেতিবাচক চরিত্র গণতন্ত্রকে দুর্বল করে দেয়। রাজনৈতিক দলগুলি জাতিকে বিপদ থেকে মুক্ত করা অপেক্ষা প্রতিপক্ষের সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠে। এই দোটানার মাঝে পড়ে জনসাধারণ ইতালীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

বিরোধী দলগুলির নেতিবাচক নীতি

এদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইতালীতে দারুণ অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দেয়। যুদ্ধ-ফেরৎ সেনাদল ছাঁটাই হয়ে যায়। এই সকল লোক কাজ না পেয়ে বেকার দশায় পড়ে। এজন্যে এরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। যুদ্ধের দরুন জিনিষপত্রের দাম অসম্ভব বৃদ্ধি পায়। খাদ্যাভাব ও শিল্পদ্রব্যের অভাব জন-জীবনকে দুর্দশাগ্রস্ত করে তুলে। সরকার জমিদারদের হাতে জমি ধরে রাখায় ভূমিহীন কৃষকরা অশান্ত হয়ে ওঠে। কলকারখানায় মজুরদের মজুরী না বাড়ায় শিল্পে ধর্মঘট একটি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয়। এই সঙ্গে চলে সমাজবিরোধীদের উৎপাত, মাফিয়াদের অত্যাচার। বেকার লোকেরা কাজের অভাবে সমাজবিরোধীদের সঙ্গে যোগ দেয়।

যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক সমস্যা

ইতালীর এই দুর্দশার মোকাবিলায় উদারতন্ত্রী সরকার চূড়ান্ত ব্যর্থতা দেখায়। উটপাখী যেমন মরুভূমিতে বালির ঝড়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে বালির মধ্যে মুখ গুঁজে দেয়, ইতালীর উদারপন্থী সরকার দেশের এই সকল সমস্যাগুলিকে উপেক্ষা করে টিকে থাকার চেষ্টা করে। এদিকে ইতালীর সমাজতান্ত্রিক দল ইতালীতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই মুক্তির একমাত্র পথ বলে প্রচার চালায়। সমাজতান্ত্রিক পত্রিকা "আভান্তি" ইতালীর শ্রমিক ও কৃষকদের দারুণভাবে প্রভাবিত করে। এর ফলে কৃষকরা জমিদারদের জমি এবং শ্রমিকরা মালিকের হাত থেকে

উদারপন্থী সরকারের ব্যর্থতা : সমাজতন্ত্রের প্রসার

কল-কারখানা দখল করতে আরম্ভ করে। অনেকে মনে করে যে, ইতালীতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব আসন্ন। স্যালভেমিনি প্রভৃতি ঐতিহাসিকদের মতে, যদি ইতালীর কমিউনিষ্ট দল দেশের এই গভীর বিপদের সময় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা না করত তবে হয়ত উদারতন্ত্রী সরকার ধীরে ধীরে বিপদ কাটিয়ে উঠত। কিন্তু নিরন্তর ধর্মঘট, রাস্তাঘাটে খন্ডযুদ্ধ, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের নামে প্রলিটারিয়েট শ্রেণীকে ক্ষেপিয়ে তোলার ফলে উদারতন্ত্রী সরকার অসহায় হয়ে পড়ে। বেশীর ভাগ লোক মনে করে যে, ইতালীর সামনে দুটি পথ খোলা ছিল, যথা হয় সমাজতন্ত্র প্রবর্তন অথবা একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা।

বুর্জোয়া শ্রেণীর হতাশা

ইতালীর শিল্পপতি ও হুটে বুর্জোয়া শ্রেণী উদারতন্ত্রী সরকারের ওপর আস্থা হারিয়ে একটি শক্তিশালী সরকার দ্বারা তাদের কায়েমী স্বার্থরক্ষার কথা চিন্তা করে। মুসোলিনীর নেতৃত্বে গঠিত ফ্যাসিষ্ট দলই একমাত্র ইতালীকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের হাত থেকে রক্ষা করতে সক্ষম বলে তারা মনে করে। ইতালীর তৎকালীন বিভিন্ন রাষ্ট্রনীতিক দলগুলির নিছক ক্ষমতার লোভ, নির্বাচনে কারচুপি ও ষড়যন্ত্র গণতন্ত্র সম্পর্কে লোকের আস্থা নষ্ট করে দেয়। ধনী বুর্জোয়াশ্রেণী ধারণা করে যে, এক্ষেত্রে একমাত্র ফ্যাসিষ্ট দলই দেশকে স্থিতিশীলতা দিতে পারবে। এজন্য তারা এই দলের পশ্চাতে প্রচুর অর্থ সাহায্য দেয়। উদারতন্ত্রী দলের মন্ত্রী নিত্তি ও জিওলিনির উদ্যমহীনতায় তারা বিশেষ বিরক্তি বোধ করে। ধনী বুর্জোয়া ও সাধারণ মধ্যবিত্তের সমর্থনপুষ্ট হয়ে ফ্যাসিষ্ট দল দ্রুত শক্তি বাড়িয়ে ফেলে।

ফ্যাসিষ্ট দল গঠন

যুদ্ধ-ফেরৎ বেকার সেনা এবং বেকার যুবকদের নিয়ে মুসোলিনী এক আধা সামরিক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করেন। তিনি এর নাম দেন ফ্যাসিষ্ট। মিলানের 'ফ্যাসিও' (Fascio) নামক সংগঠনের আদলে তিনি তাঁর দলটিকে গঠন করেন। ফ্যাসিষ্ট শব্দটি মূলতঃ ল্যাটিন ফ্যাসেস (Fasces) কথা হতে উদ্ভূত। ফ্যাসেস কথাটির অর্থ হইল বল বা শক্তি। মুসোলিনী তাঁর দলের ফ্যাসিষ্ট নাম দিয়ে একথা বুঝাতে চান যে, এই দল শক্তির দ্বারা রাষ্ট্র চালাবে। অতীতে বেনিটো মুসোলিনী ছিলেন সমাজতন্ত্রী দলের সদস্য এবং 'আভান্তি' পত্রিকার সম্পাদক। ১৮৮৩ খ্রীঃ মুসোলিনির জন্ম হয়। তিনি স্কুল শিক্ষকের বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে, সাংবাদিকতা ও রাজনীতিতে যোগ দেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯১৯ খ্রীঃ ফ্যাসিষ্ট দল গঠিত হলে তিনি এই দলে যোগ দেন। প্রথমদিকে এই দলের সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী না থাকলেও, মুসোলিনি বেকার যুবক ও যুদ্ধফেরৎ সেনাদের এই দলে আকৃষ্ট করেন। তিনি দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল ও বামপন্থী ধ্বংসাত্মক শক্তির হাত থেকে ইতালীকে রক্ষার কথা বলেন। তিনি তাঁর ফ্যাসিষ্ট আন্দোলনকে দলবিহীন জাতীয় আন্দোলন বলে দাবী করেন। মুসোলিনী ঘোষণা করেন যে, তিনি অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলতা থেকে দেশকে মুক্ত করবেন। তিনি কমিউনিষ্টদের তীব্র বিরোধিতা করেন।

১৯১৯ খ্রীঃ তিনি "ফ্যাসিষ্ট সংগ্রামী বাহিনী" গড়েন। ফ্যাসিষ্ট দলের স্বেচ্ছাসেবকরা কমিউনিষ্টদের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ দ্বারা কমিউনিষ্টদের সভা-সমিতি, ধর্মঘট ভেঙে ফেলে। শৃঙ্খলা রক্ষা ছিল ফ্যাসিষ্টদের অন্যতম মূল নীতি। এই কারণে মুসোলিনী ধর্মঘট ও কর্ম-বিরতির ঘোর বিরোধী ছিলেন। ইতালীর বুর্জোয়া শ্রেণী ফ্যাসিষ্ট দলকেই ত্রাণকর্তা মনে করে এই দলকে প্রচুর অর্থ সাহায্য করে। মুসোলিনী ফ্যাসিষ্ট স্বেচ্ছাসেবক বা স্কোয়াড্রিষ্টিদের (Squadristi) কালো পোষাকে সজ্জিত করেন। তিনি তাদের ফ্যাসিষ্ট প্রথায় অভিবাদন এবং কুচকাওয়াজ করতে শেখান। ফ্যাসিষ্টরা কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে দাঙ্গায় সফলতা দেখিয়ে বুর্জোয়াদের সমর্থন পায়।

১৯২১ খ্রীঃ নির্বাচনে ফ্যাসিষ্ট দল ভোটারদের ভীতি প্রদর্শনী করে ও অন্যান্য উপায়ে নির্বাচনের দ্বারা আইনসভায় মাত্র ৩১টি আসন পায়। (মতান্তরে ৩৫টি আসন)। ব্যালটের

মাধ্যমে ক্ষমতা লাভ অসম্ভব দেখে মুসোলিনী বল প্রয়োগে ক্ষমতা দখলের সিদ্ধান্ত নেন। মুসোলিনী দাবী করেন যে, তাঁকে প্রধান মন্ত্রীর পদে নিয়োগ করতে হবে। মুসোলিনী বলেন যে, "ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে বলপ্রয়োগ দ্বারা ইতিহাসের গতি নির্দ্ধারিত হতে দেখা যায়। ইতালীতে সেই সময় এসে গেছে।"

ফ্যাসিষ্ট শক্তির জয়

মুসোলিনীর ডাকে হাজার হাজার সশস্ত্র ফ্যাসিষ্ট স্বেচ্ছাসেবক রাজধানী রোমে ঢুকে পড়ে। রাজা তৃতীয় ভিক্টর ইম্যানুয়েল সেনাদলকে এই বিদ্রোহীদের দমনের জন্যে নির্দেশ দিতে রাজী না হওয়ায়, নির্বাচিত বৈধ মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করে। ভিক্টর ইম্যানুয়েল, মুসোলিনীকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন, যদিও তাঁর পক্ষে মাত্র ৩১ জন সদস্য আইন সভায় ছিল।

প্রধান মন্ত্রীর পদে বসার পর মুসোলিনী জরুরী ক্ষমতার সাহায্যে সরকারি প্রশাসন ও অন্য সকল দপ্তরে ফ্যাসীকরণ নীতি চালু করেন। সমাজতন্ত্রী দলকে চূর্ণ করা হয় এবং সমাজতান্ত্রিক পত্রিকা আভ্যন্তির কার্যালয় ধ্বংস করা হয়। ফ্যাসিষ্ট ঝটিকা বাহিনী ফ্যাসিবিরোধী সমালোচকদের মারপিট ও ক্যাষ্টর অয়েল সেবন করে নির্যাতন করে। আইন সভায় বিরোধীদের নিশ্চিহ্ন করা হয় এবং একদলীয় শাসন প্রবর্তিত হয়। ফ্যাসিষ্ট সন্ত্রাসের ভয়ে বিরোধীরা রাজনীতি ছেড়ে দেন। মাতেওত্তি (Matteotti) নামে এক বিখ্যাত সমাজতান্ত্রিককে হত্যা করা হয়। ১৯২৪ খ্রীঃ মুসোলিনী দুর্নীতিপূর্ণ নির্বাচনের মাধ্যমে ভোটদাতাদের ভীতি প্রদর্শন করে ৬৫% ভোট যোগাড় করেন। তিনি সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করেন। বিরোধী দলগুলিকে নিশ্চিহ্ন করা হয়। ১৯২৫ খ্রীঃ তিনি 'ইল-দুচে' বা 'নেতা' উপাধি নিয়ে ডিক্টেটরে পরিণত হন। এখন থেকে তাঁর আদেশনামাই বৈধ আইনে পরিণত হয়। তিনিই সর্বময় ক্ষমতার অধীশ্বর হন। পৌরসভা, বিদ্যালয়, অফিস, শ্রমিক সংগঠন সর্বত্রই ফ্যাসিষ্ট প্রাধান্য স্থাপিত হয়। মুসোলিনী ঘোষণা করেন যে, "দেশের সব কিছুই হবে রাষ্ট্রের অন্তর্গত; রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোন কিছুই থাকবে না; রাষ্ট্রের বাইরে কোন কিছুকে সহ্য করা হবে না।" প্রতিনিধি সভাকে রদ করা হয়। ১৯২৬ খ্রীঃ একটি আইন দ্বারা মালিক ও শ্রমিক ইউনিয়নগুলিকে নিয়ে কর্পোরেশন গঠনের ব্যবস্থা করা হয়। এই কর্পোরেশন শ্রমিকের মজুরীর হার, কাজ করার সময় প্রভৃতি বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার পায়। তাতে বিরোধের নিস্পত্তি না হলে ট্রাইবুন্যালের আদেশে চূড়ান্ত বিচার করার ব্যবস্থা হয়। ধর্মঘট ও লকআউটকে বেআইনী ঘোষিত হয়।

ফ্যাসীবাদের মূল নীতি (Principles of Fascism) ঃ ফ্যাসীবাদ সমাজতন্ত্রবাদের ন্যায় কোন গভীর সামাজিক দর্শন ছিল না। এই মতবাদ ছিল বেনিটো মুসোলিনী এবং তাঁর দার্শনিক বন্ধু জিওভানি জেনঁটিলের মস্তিষ্কপ্রসূত তত্ত্ব।[১] সমাজতন্ত্রবাদ বা গণতন্ত্রবাদ যেরূপ ইতিহাসের নিয়মে ঐতিহাসিক ভাবধারা রূপে আত্মপ্রকাশ করে, ফ্যাসীবাদের পশ্চাতে এইরূপ কোন ঐতিহাসিক পটভূমিকা ছিল না। ফ্যাসীবাদ ছিল আসলে ইতালীর সামাজিক অবক্ষয়ের যুগের একটি রাজনৈতিক ব্যভিচার। এটি ছিল মূলতঃ একটি নেতিবাচক চিন্তাধারা। লোকে যাকে সত্য এবং ধ্রুব বলে জ্ঞান করত ফ্যাসীবাদ তাকেই নস্যাৎ করত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইতালীয়দের চিন্তা বৈকল্য, রাজনৈতিক দলাদলি এবং অর্থনৈতিক দুরবস্থা ও অরাজকতার অবৈধ সন্তান হিসেবে ফ্যাসীবাদের আবির্ভাব হয়।

ফ্যাসীবাদের নেতিবাচক চিন্তাধারা

ফ্যাসীবাদের মূল কথা ছিল রাষ্ট্র, বল অথবা শক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং রাষ্ট্রকে বলের দ্বারা রক্ষা করতে হবে। জনমত, ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রভৃতি গণতান্ত্রিক প্রথাকে ফ্যাসীবাদ

১· Giovanni Gentile.

গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের বিরোধিতা

সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করত। মুসোলিনী বলেন যে, রাষ্ট্রই হল সর্বকালের আধার। ব্যক্তির উত্থান-পতনে রাষ্ট্রের কোন ক্ষয়ক্ষতি হয় না। রাষ্ট্রের বাইরে ব্যক্তির কোন আলাদা অধিকার নেই। মুসোলিনীর বক্তব্য এই ছিল যে, "দর্শন ও বক্তৃতা অপেক্ষা কাজের দাম বেশী।" গণতন্ত্র ও উদারতন্ত্র প্রভৃতি ভাবধারাকে ফ্যাসীবাদ সামাজিক বিশৃঙ্খলার কারণ বলে মনে করত। যে সরকার শক্তি অপেক্ষা ভোটের ওপর নির্ভর করে, সেই সরকার কোন কাজ করতে সক্ষম নয় বলে তিনি মনে করতেন। ফ্যাসীবাদীরা মনে করত যে, সমাজতন্ত্রবাদ হল একটি ভুল সিদ্ধান্ত। কারণ শ্রেণীহীন সমাজ একটি কল্পনার বিষয়। বাস্তবে তা সত্য হতে পারে না। গণতন্ত্রের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদকে ফ্যাসীবাদীরা ঘৃণা করত;

ফ্যাসীবাদ ব্যক্তি স্বাধীনতাকে অগ্রাহ্য করে রাষ্ট্রের ক্ষমতাকেই চূড়ান্ত মনে করত। এজন্য এরা ছিল কর্তৃত্ববাদী (Authoritorian)। রাষ্ট্রই হল শেষ কথা। (Everything in the State, nothing against the State, nothing outside the State)। ব্যক্তি রাষ্ট্রের প্রয়োজনে কাজ করতে বাধ্য। এর বাইরে তার কোন অস্তিত্ব নেই। শৃঙ্খলা রক্ষা ছিল প্রতি

রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ববাদ

নাগরিকের পবিত্র কর্তব্য। শৃঙ্খলাভঙ্গের অর্থই ছিল রাষ্ট্রদ্রোহিতা। সুতরাং রাষ্ট্রের অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে ফ্যাসীবাদে নাগরিকের প্রতিবাদের অধিকার ছিল না। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ফ্যাসীবাদে স্বীকার করা হত না। ফ্যাসীবাদের মন্ত্র ছিল "শক্তি, সাহস, আত্মোৎসর্গ, শৃঙ্খলা ও জয়।" এই নতুন মূল্যবোধে ফ্যাসীবাদ নাগরিকদের দীক্ষা দেয়। তাছাড়া ফ্যাসীবাদ বিশ্বাস করত যে, ডুচে বা মুসোলিনী ছিলেন মহামানব। ফ্যাসিবাদে এজন্য ব্যক্তি পূজা প্রকাশ পায়।

বেনেদিতো ক্রোচে[১] নামক দার্শনিকের মতে, "একটি ছেঁড়া কাপড়ের থলিতে যেমন ভিখারীরা খণ্ড খণ্ড কাপড়ের টুকরো কুড়িয়ে জমা করে, সেরূপ ফ্যাসীবাদ ছিল খণ্ড খণ্ড

সমালোচনা

ভাবধারার সমষ্টি এবং একটি ভিত্তিহীন সংস্কৃতি গঠনের বন্ধ্যা মানসিক প্রয়াস।[২] এতে কোন মৌলিকতা ছিল না। ফ্যাসিষ্টবাদের অধিকাংশ তত্ত্বগুলি ছিল ভুল অথবা ভণ্ডামিপূর্ণ।

ফ্যাসিষ্ট সরকারের আভ্যন্তরীণ সংগঠন (The Internal Reconstruction of Fascism) : মুসোলিনী ক্ষমতা অধিকার করার পর, সর্বপ্রথম সরকারি প্রশাসন যন্ত্রকে ফ্যাসিষ্ট দলের হাতের মুঠোয় আনার ব্যবস্থা করেন। তিনি সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টির গঠনতন্ত্রের আদলে গ্রাম স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত ফ্যাসিষ্ট দলকে স্থাপন

সরকারের ফ্যাসীকরণ

করেন। দলীয় পিরামিডের চূড়ায় থাকেন স্বয়ং ডুচে বা মুসোলিনী এবং তলায় থাকে গ্রামের পার্টি ইউনিটগুলি। ২০ জন বাছাই করা ফ্যাসিষ্ট নেতা নিয়ে কেন্দ্রীয় সভা বা ফ্যাসিষ্ট গ্র্যান্ড কাউন্সিল গঠিত হয়। যে সকল লোক পার্টির সদস্য অথবা বিশ্বাসভাজন ছিল তাদেরই একমাত্র সরকারি চাকুরীতে নিয়োগ করা হয়। কিশোর ও যুবকদের ফ্যাসিষ্ট সংগঠন "বালিল্লা" বা "আভ্যান্ত গার্দিয়া" বা "জিওভানি ফ্যাসিষ্ট" প্রভৃতি সংগঠনের সদস্য পদ গ্রহণ করে বিশ্বস্ততার প্রমাণ দিতে হত। তারপর তাদের চাকুরীর ব্যবস্থা করা হত। সেনাদল, পুলিশ, প্রশাসন সর্বস্তরের দায়িত্বশীল পদে ঝানু ফ্যাসিষ্টদের বসান হয়। 'স্কোয়াডিস্ট্রি' (squadistri) বা ব্যাসিট স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়মিত সেনা হিসেবে সেনাদলে ভর্তি করা হয়। ফ্যাসিষ্ট দল আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে নাগরিকদের ধন-সম্পত্তি রক্ষা, শৃঙ্খলা স্থাপন এবং একদলীয় শাসনকে দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করার নীতি নেয়।

১· Benedettu Croce.

২· "Fascism was a ragbag collection of ideas; a sterlic reaching towards a culture without basis".

সরকারী পদগুলি থেকে ফ্যাসিবাদ বিরোধী কর্মচারীদের বিতাড়িত করা হয়। পৌরসভা ও অন্যান্য স্বায়ত্ত্ব-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে জনপ্রতিনিধিদের বিতাড়িত করা হয়। পোডেষ্টা নামক কর্মচারীদের হাতে পৌরসভাগুলির পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। শিল্প শ্রমিক-মালিক বিরোধ দূর করার জন্যে শিল্প কর্পোরেশন স্থাপন করা হয়। মালিক ও শ্রমিকের প্রতিনিধি সমবায়ে এগুলি গঠিত হয়। ট্রেড ইউনিয়নগুলি ভেঙে দেওয়া হয়। শিল্প কর্পোরেশনের শ্রমিক আদালত স্থাপন করে (Labour Court) মালিক-শ্রমিক বিরোধের নিষ্পত্তি করা হয়। যে পক্ষ এই আদালতের রায় না মানত তাদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হত। কলকারখানায় ধর্মঘট ও লক-আউট নিষিদ্ধ করা হয়। বিভিন্ন কর্পোরেশন, সিন্ডিকের প্রতিনিধি নিয়ে একটি চেম্বার গঠিত হয়। এই চেম্বার অর্থনীতি, শিল্পীনীতি ও মজুরী নীতি নির্দ্ধারণ করার দায়িত্ব পায়। এই নীতিগুলি বাধ্যতামূলকভাবে প্রযুক্ত হত।

শিল্পনীতি

মুসোলিনী উৎপাদন বৃদ্ধি, শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার উপর জোর দেন। রেলগুলি কাঁটায় কাঁটায় সময় ধরে চলতে বাধ্য হয়। মুসোলিনী যোগাযোগের উন্নতির জন্যে বহু রাস্তাঘাট নির্মাণ করেন। এই রাস্তাগুলোর মধ্যে কয়েকটিকে এখনও ইওরোপের শ্রেষ্ঠ রাজপথ বলা যায়। স্থল, জল, বিমানবাহিনীর আধুনিকীকরণ দ্বারা ইতালীর সামরিক শক্তিকে বাড়ান হয়। জাতীয় বাহিনীকে ডুচে বা মুসোলিনীর নির্দেশ মানতে বাধ্য করা হয়। অর্থনীতির ক্ষেত্রে মুসোলিনী "অটার্কি" (Autarchy) বা স্বয়ম্ভরতার লক্ষ্য নেন। গম উৎপাদনের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। ফ্যাসিষ্ট শাসনকে বলা হয় 'গমের যুদ্ধ' (Battle of Wheat)। সরকারের ব্যয়সঙ্কোচ করে অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করা হয়। সুষ্ঠু-পরিচালনার দ্বারা রেল বিভাগের আয় বাড়ান হয়। তিনি শ্রমিক সনদ ঘোষণা করে ফ্যাসিষ্টপন্থী শ্রমিক ইউনিয়নগুলির সাহায্যে তা কার্যকরী করেন। ফ্যাসিষ্টপন্থী শ্রমিক ইউনিয়নগুলির সাহায্যে তিনি কল-কারখানায় উৎপাদন বাড়ান। বিদেশী মূলধন লগ্নী করে শিল্পের উন্নতি সাধন করা হয়।

শৃঙ্খলা, অর্থনীতি

শিক্ষা ক্ষেত্রে ফ্যাসিষ্ট সরকার প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার ঘটায় এবং বহু পরিমাণে নিরক্ষরতা দূর করে। বালক-বালিকাদের ফ্যাসিষ্ট ভাবধারায় দীক্ষিত করা হয়। শিক্ষার সঙ্গে স্বাস্থ্যের দিকেও ফ্যাসিষ্ট সরকার নজর দেয়। মশানাশক ঔষধ ব্যবহার ও জলাজমি পরিষ্কার করে ইতালীর মারাত্মক ব্যাধি ম্যালেরিয়াকে দমিয়ে ফেলা হয়। এই সঙ্গে গুণ্ডা, সমাজবিরোধী ও মাফিয়াদের ফ্যাসিষ্ট সরকার কড়া হাতে দমন করে। পুলিশ ও সেনাদল তাদের গুলি করে হত্যা করলে ইতালীয় জনজীবনে নিরাপত্তা বোধ ফিরে আসে।

শিক্ষা নীতি

ফ্যাসিষ্ট সরকারের আভ্যন্তরীণ সংস্কার নীতিগুলি ছিল আসলে চটকদারী ও চমকপ্রদ। মুসোলিনী কোন মৌলিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার না করায়, ইতালীর দারিদ্র্য বজায় থাকে। তিনি যে কর্পোরেটিভ শাসনব্যবস্থা চালু করেন তা ছিল একটি ভুয়া স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থা। ফ্যাসিবাদের সর্বাত্মক ক্ষমতা এবং ডুচের একনায়কতন্ত্রকে আড়ালে রাখার জন্যে এটি ছিল এক প্রকার মুখোস মাত্র।[১] মুসোলিনী আসলে এক দলীয় শাসন বা পার্টি শাসন স্থাপন করেন। সাধারণ লোক যারা ফ্যাসিষ্ট দলের সদস্য ছিল না, তারা অবহেলিত থাকে। মুসোলিনী বিরোধী দল ধ্বংস করে এবং সমাজের সকল স্তরে ফ্যাসিষ্ট সংগঠন করে একটি টোট্যালিট্যারিয়ান (Totalitarian) বা সর্বাত্মক একনায়কতন্ত্র স্থাপন করেন। নাগরিকদের ব্যক্তি স্বাধীনতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ধ্বংস করা হয়। মুসোলিনী একটি ভ্রান্ত অর্থনীতি অনুসরণ করেন। তিনি

ফ্যাসিষ্ট শাসন নীতির সমালোচনা

১· Benedittoy Croce.

জলপাইয়ের চাষ, ফলের চাষ কমিয়ে ও পশুচারণের জমি কমিয়ে সকল জমিতে গমের চাষ করেন। এর ফলে জলপাইয়ের তেল ও ফল রপ্তানি করে ইতালী যে বৈদেশিক মুদ্রা পেত তা নষ্ট হয়। এদিকে তিনি লোকসংখ্যা কমাবার জন্যে জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নাকচ করে দেন। মুসোলিনী বলেন যে, "সংখ্যা না বাড়লে মান বাড়তে পারে না।"[১] গৃহবধূদের অধিক সন্তান হলে তিনি তাঁদের পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা করেন। ফলে যেটুকু খাদ্য উৎপাদন বাড়ে তা বাড়তি লোক খেয়ে ফেলে। ইতালীয় দারিদ্র্য অচলায়তনে পরিণত হয়। লোকসংখ্যা বাড়ার ফলে ইতালীবাসীদের দারিদ্র্য তীব্র হয়। জনসাধারণের প্রতিবাদের কোন পথ খোলা ছিল না। বিরোধী দল না থাকায় এবং সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করায় সাধারণ লোকের প্রতিবাদ জানাবার কোন উপায় ছিল না। আর্থিক সঙ্কট ঘনীভূত হলে মুসোলিনী সাম্রাজ্য বিস্তার ও বৈদেশিক যুদ্ধে নেমে পড়েন। তিনি ভূমি সংস্কার করে কৃষকের হাতে জমি পৌঁছিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা না করায় কৃষির ফলন কমতে থাকে। এদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগ দিলে যুদ্ধের চাপে ইতালীর অর্থনীতি ভেঙে পড়ে। একনায়কতন্ত্র ও একদলীয় শাসনের চাপে জনসাধারণের হতাশা চরম সীমায় পৌঁছে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ দিকে, গণ অভ্যুত্থানে মুসোলিনী ও তাঁর উপপত্নী ক্লারা পেত্রাচ্চি নিহত হন। ক্রুদ্ধ জনতা তাঁর মৃতদেহ গাছের ডালে ঝুলিয়ে দেয়।[২] মার্কিন সেনাদল রোমে যাওয়ার পথে মৃতদেহ দুটিকে নিয়ে রোমে সমাহিত করে। এভাবে ফ্যাসিবাদ ইতালী থেকে মুছে যায়।

ফ্যাসিষ্ট ইতালীর পররাষ্ট্র নীতি (The Foreign Policy of Facist Italy) ঃ মুসোলিনী ইতালীর শাসনভার অধিগ্রহণের পর ঘোষণা করেন যে, ইতালী আদপেই "আত্মতৃপ্ত জাতি নয়। ভার্সাই ও অন্যান্য সন্ধির দ্বারা ইতালীর ওপর যে ঘোর অবিচার করা হয়েছে ইতালী তা সহ্য করবে না।" তিনি লীগ অব নেশনস বা জাতিসংঘকে ঘোর সমালোচনা করেন। তিনি লীগকে পশ্চিমী দেশগুলির স্বার্থরক্ষার সঙ্ঘ বলে অভিহিত করেন। মুসোলিনী বলেন যে, ইতালীর সাম্রাজ্যের ক্ষুধা মিটে নি। অন্যান্য দেশের পক্ষে সাম্রাজ্য দরকার না হতে পারে, কিন্তু ইতালীর ক্ষেত্রে উপনিবেশ অধিকার হল "আধ্যাত্মিক প্রয়োজনের" সামিল। সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্যে তিনি যুদ্ধ-বিগ্রহ করার হুমকি দেন। তাঁর পররাষ্ট্র নীতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ইতালীর সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ এবং ইওরোপের বৃহৎশক্তির অন্যতম হিসেবে ইতালীর প্রতিষ্ঠা। তিনি ফ্রান্স ও ব্রিটেনকেই ইতালীর সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের পথে প্রধান বাধা বলে মনে করতেন। যেহেতু এই দুই শক্তি ছিল ভার্সাই স্থিতাবস্থার রক্ষাকর্তা সেহেতু এই দুই শক্তিকে দুর্বল না করতে পারলে ইতালীর বিস্তারনীতিকে সফল করা কষ্টকর ছিল। মুসোলিনী তাঁর বিস্তার নীতির সমর্থনে ইতালীর লোকসংখ্যার চাপ, ভার্সাই সন্ধি বৈঠকে ইতালীর প্রতি অবিচার, ইতালীর ভৌগোলিক দাবী প্রভৃতি যুক্তি দেখান।

সাম্রাজ্যবাদ

মুসোলিনী তাঁর কথাকে কাজে পরিণত করার চেষ্টা করেন। ১৯২৩ খ্রীঃ জনৈক ইতালীয় সেনাপতিকে হত্যা করার অজুহাতে তনি গ্রীসের কর্ফু দ্বীপ অধিকার করেন। শেষ পর্যন্ত লীগ অব নেশনসের মধ্যস্থতায় তিনি মোটা ক্ষতিপূরণ নেন এবং গ্রীস ক্ষমা প্রার্থনা করার পর তিনি গ্রীসকে কর্ফু ফিরিয়ে দেন। কর্ফুর ঘটনার ফলে স্বদেশবাসীর কাছে মুসোলিনীর মর্যাদা দারুণ বৃদ্ধি পায়। মুসোলিনীর দাবী ছিল যে, আড্রিয়াটিক সাগরকে ইতালীর হ্রদে পরিণত করতে হলে, এই সাগরের উভয় উপকূলে ইতালীর প্রাধান্য স্থাপন দরকার। এজন্যে তিনি আড্রিয়াটিক সাগরের পূর্ব উপকূলে

কর্ফুর ঘটনা :
নেটানোর সন্ধি

১. "Without quantity there can not be any quality".
২. Schuman—International Politics.

যুগোশ্লাভিয়ার ফিউম (Fiūm) বন্দরের ওপর ইতালীর আধিপত্য দাবী করেন। ভার্সাই সন্ধির পর ইতালীর কবি ডানানজিও কিছু স্বেচ্ছাসেবক সহ এক সময় ফিউম দখল করেছিলেন। মিত্রশক্তির চাপে তখন ইতালী ফিউম ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল। এখন মুসোলিনী ক্ষমতায় আসার পর ফিউম সহ, যুগোশ্লাভিয়ার অন্তর্গত ইষ্ট্রিরা, ডালমাশিয়া, ইল্লিরিয়া, ট্রিয়েষ্ট, ট্রেনটিনো, দক্ষিণ টাইরল দাবী করেন। যুগোশ্লাভিয়া ফ্যাসিষ্ট ইতালীর নিরন্তর চাপের ফলে ফিউম বন্দর সহ যুগোশ্লাভিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ইতালীকে বাণিজ্যের অধিকার দেয়। নেটানোর সন্ধি ১৯২৫খ্রীঃ দ্বারা যুগোশ্লাভিয়া এই অধিকার দান করে। যুগোশ্লাভিয়ার সঙ্গে তারপরেও ইতালীর সম্পর্ক ভাল হয়নি। যুগোশ্লাভিয়ার ১৯২৯ খ্রীঃ স্যালোনিকা অঞ্চলের ওপর দাবী ইতালীর অনুকূলে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত ইতালী-যুগোশ্লাভ সম্পর্কের উন্নতি হয়নি।

ফরাসী বিরোধিতা

মুসোলিনীর এই বলপ্রয়োগ নীতি লক্ষ্য করে ইঙ্গ-ফরাসী শক্তি তাঁকে শান্ত করার চেষ্টা করে। ১৯২৫ খ্রীঃ লোকার্নো কংগ্রেসে ইতালীকে আহ্বান করা হয়। লোকার্নো চুক্তি স্বাক্ষরকারী দেশগুলির মধ্যে ইতালী স্থান পেলে তার মর্যাদা বাড়ে। কিন্তু ফ্রান্সের সঙ্গে নানা বিষয় নিয়ে ইতালীর বিরোধ তীব্র হতে থাকে। ইতালীর সঙ্গে ফ্রান্সের বিরোধের প্রধান কারণগুলি ছিল নিম্নরূপ—(ক) ইতালী পশ্চিম ভূমধ্যসাগরে ফ্রান্সের প্রতিপত্তি সহ্য করতে পারত না। (খ) উত্তর আফ্রিকার উপনিবেশগুলি যথা, মরক্কো, আলজেরিয়া প্রভৃতি স্থান ফ্রান্স তার উপনিবেশে পরিণত করায় মসোলিনী ক্রুদ্ধ হন। (গ) ইতালী থেকে পলায়িত ফ্যাসি বিরোধী ইতালীয়দের ফ্রান্স রাজনৈতিক আশ্রয় দেয়। এজন্যে মুসোলিনী অসন্তুষ্ট হন। (ঘ) ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন, ইতালীর স্যাভয় ও নীস অধিকার করেন। ইতালী এই স্থানগুলি ফেরৎ পায়নি। এজন্যে মুসোলিনী খুবই অসন্তুষ্ট ছিলেন। (ঙ) ইতালী ভার্সাই ও অন্যান্য শান্তি চুক্তিগুলি ইতালীর স্বার্থে সংশোধন করতে চায়। কিন্তু ফ্রান্স ভার্সাই সন্ধির স্থিতাবস্থা রক্ষায় বদ্ধপরিকর ছিল। (চ) টিউনিসিয়ায় ফরাসী বসবাসকারীদের তুলনায় ইতালীয় বসবাসকারীর সংখ্যা ছিল বেশী। এই যুক্তিতে মুসোলিনী টিউনিসিয়া দাবী করেন। কিন্তু ফ্রান্স তাতে কর্ণপাত করেনি। (ছ) পশ্চিম ভূমধ্যসাগরে ফরাসী নৌ-বাহিনীর আধিপত্য এবং ফ্রান্সের স্থল বাহিনীর শ্রেষ্ঠত্ব ইতালীর ঈর্ষার উদ্রেক করে। এজন্যে ইতালী ফ্রান্সের অস্ত্রহ্রাস দাবী করলে ফ্রান্স তা নাকচ করে দেয়। (জ) সাম্রাজ্য ক্ষুধায় জর্জরিত ইতালী বলকানে সাম্রাজ্য বিস্তারের স্বপ্ন দেখত। তার এই স্বপ্ন পূরণের পথে প্রধান বাধা ছিল ফ্রান্স। ফ্রান্স বলকান রাষ্ট্রগুলিকে নিয়ে জোট গঠন করার ফলে ইতালীর উচ্চাকাঙ্খা ব্যাহত হয়। ১৯৩৩ খ্রীঃ জার্মানীতে নাৎসী বিপ্লবের পর ফ্রান্স আশঙ্কা করে যে, নাৎসী জার্মানীর সঙ্গে ফ্যাসিষ্ট ইতালী যোগ দিলে ফ্রান্সের ঘোর বিপদ হবে। এজন্যে ফ্রান্স ইতালীর প্রতি তার পূর্বতন শত্রুতা নীতি ত্যাগ করে, ইতালীকে তোষণ করা শুরু করে। ১৯৩৫ খ্রীঃ ফ্রাঙ্কো-ইতালীয় সন্ধির দ্বারা উভয় দেশের ঔপনিবেশিক বিরোধের মীমাংসার চেষ্টা করা হয়। সোমালিল্যাণ্ডের কিছু অংশ ফ্রান্স ইতালীকে ছেড়ে দেয়।

আবিসিনীয়া আক্রমণ

ইতিমধ্যে মুসোলিনী আফ্রিকায় অবস্থিত আবিসিনীয়া বা ইথিওপিয়া রাজ্য অধিকার করতে সঙ্কল্প নেন। ইংলন্ড ও ফ্রান্স প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি আফ্রিকার সকল স্থান অধিকার করলেও একমাত্র আবিসিনীয়া ছিল তখনও সাম্রাজ্যবাদী থাবার বাইরে। এজন্যে ইতালী এই স্থানটির দিকে নজর দেয়। ১৮৯৬ খ্রীঃ ইতালী আবিসিনীয়া দখলের চেষ্টা করে এ্যাডোয়ার যুদ্ধে নগ্নপদ আবিসিনীয়দের নিকট পরাস্ত হয়। মুসোলিনী এই পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছা করেন। তিনি ইংলন্ড, ফ্রান্সের নিকট আবিসিনীয়া আক্রমণের জন্যে গোপন সমর্থন পান। জাপান লীগের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে মাঞ্চুরিয়া অধিকার করলে, জাপানকে শাস্তিদানে লীগের ব্যর্থতা মুসোলিনীর সাহস বাড়ায়।

মুসোলিনী তাঁর সাম্রজ্যবাদী নীতি সম্পর্কে কোন গোপনীয়তা রাখতেন ন। তিনি আবিসিনীয়া আক্রমণের আগে বলেন যে, "ইতালীর জনসংখ্যার চাপ কমাতে, কাঁচামালের অভাব পূরণ করতে উপনিবেশ দখল করা প্রয়োজন। অন্য দেশের কাছে উপনিবেশবাদ নৈতিক স্খলন হলেও, ইতালীর কাছে উপনিবেশ স্থাপন একটি আধ্যাত্মিক প্রয়োজন"। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর. ইতালীতে যে অর্থনৈতিক সঙ্কট ও বেকার সমস্যা দেখা দেয় তা মুসোলিনী তাঁর ফ্যাসিবাদী অর্থনীতির দ্বারা সাময়িকভাবে সমাধান করেন। ১৯৩০-এর অর্থনৈতিক সঙ্কটের পর থেকে ইতালীর অর্থনীতি আবার ভাঙতে থাকে। কিছুদিনের জন্যে রাস্তাঘাট, সরকারি বাড়ী তৈরি, জঙ্গল সাফাই, রেলপথ নির্মাণ দ্বারা কিছু লোককে কাজ দেওয়া সম্ভব হয়। ১৯৩০-এর পর উন্নয়নমূলক কাজ বন্ধ হয়ে গেলে ইতালীতে তীব্র বেকার সমস্যা দেখা দেয়। একটি সামরিক অভিযান দ্বারা মুসোলিনী এই সমস্যাকে আপাততঃ চাপা দিতে চান। যুদ্ধে বহু লোকের কর্ম সংস্থান হলে বেকারীর প্রশ্ন আপাততঃ চাপা পড়বে এবং যুদ্ধে জয় হলে দেশে তাঁর জনপ্রিয়তা বাড়বে এই আশায় তিনি আবিসিনিয়া আক্রমণের পরিকল্পনা নেন।

আবিসিনীয় সীমান্তের ওয়াল-ওয়াল গ্রামে ১৯৩৫ খ্রীঃ ইতালীয় ও আবিসিনীয় সেনার মধ্যে ক্ষুদ্র সংঘর্ষ হয়। আবিসিনীয়া লীগ অব নেশনসের নিকট এজন্যে ন্যায় বিচার প্রার্থনা করে। কিন্তু ইঙ্গ-ফরাসী চক্রান্তে ওয়াল-ওয়ালের ঘটনার কোন নিস্পত্তি হয়নি। লীগ কাউন্সিল ওয়াল-ওয়াল ঘটনার তদন্তের জন্যে একটি কমিশন নিয়োগ করে। ইঙ্গ-ফরাসী চক্রান্তে এই কমিশনকে বলা হয় যে, ওয়াল-ওয়ালে গুলিবর্ষণের জন্যে কে দায়ী একমাত্র কমিশন তা দেখবে। ওয়াল-ওয়াল অঞ্চল কার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত তা কমিশন দেখাবে না। ফলে কমিশন রিপোর্ট দেয় যে ওয়াল-ওয়ালে গুলিবর্ষণের জন্যে কেহ দায়ী নয়। কারণ দুই পক্ষ মনে করে যে, ওয়াল-ওয়াল তার নিজের জায়গা। ইতিমধ্যে আবিসিনীয় সীমান্তে ইতালী সৈন্য সমাবেশ করলে আবিসিনীয় সম্রাট হাইলে সেলাসী পুনরায় লীগের নিকট নিরাপত্তার আবেদন জানান। আবিসিনীয় সম্রাট লীগ সংবিধানের ১০, ১১ এবং ১৫ নং ধারা অনুযায়ী আবিসিনীয় সীমান্তে ইতালীর আক্রমণের ভীতির বিরুদ্ধে প্রতিকার প্রার্থনা করেন। এই ধারাগুলিতে আক্রমণ এবং আক্রমণের ভীতি উভয়কেই আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গের সামিল বলা হয়েছিল। সম্রাট হাইলে সেলাসীর অভিযোগক্রমে লীগ কাউন্সিল তিন সদস্যের এক কমিশন আবিসিনীয়া সম্পর্কে তদন্ত ও সুপারিশ করার জন্যে নিযুক্ত হয়। এই কমিশন আবিসিনীয়ায় অর্থনৈতিক অধিকার ইতালীকে এবং সম্রাট হাইলে সেলাসীর হাতে রাজনৈতিক অধিকার রক্ষার প্রস্তাব দিলে, মুসোলিনী তা প্রত্যাখান করেন। অতঃপর লীগ কাউন্সিল ৫ সদস্যের এক কমিশন নিয়োগ করে। এই কমিশন আবিসিনীয়ার পার্বত্য অঞ্চল .সম্রাটকে এবং উপকূল অঞ্চল ইতালীকে দেওয়ার সুপারিশ করে।[১] এই শর্ত গ্রহণ সাপেক্ষে আবিসিনীয়া সীমান্ত থেকে ইতালীয় সেনাদল প্রত্যাহারের সুপারিশ করা হয়। মুসোলিনী এই সুপারিশ অগ্রাহ্য করেন। এই সময় সম্রাট হাইলে সেলাসী আবিসিনীয় সীমান্তে লীগ কর্তৃক নিরপেক্ষ পরিদর্শক নিয়োগের যে প্রস্তাব দেন, ইতালী তোষণকারী ব্রিটেন ও ফ্রান্সের জন্যে এই সঙ্গত প্রস্তাব লীগ গ্রহণ করেনি।

অবশেষে লীগ কাউন্সিল আবিসিনীয় সমস্যার চূড়ান্ত সমাধানের জন্যে ১৫ সদস্যের এক কমিশন নিয়োগ করে। অবশ্য এই কমিশন থেকে ইতালীকে এইবার বাইরে রাখা হয়। লীগ কাউন্সিল কর্তৃক নিযুক্ত এই কমিশনের কার্যকালে আবিসিনীয়ায় কোন আগ্রাসন নিষিদ্ধ হয়। আগ্রাসন ঘটলে যুদ্ধ-বিরতি কার্যকর করার আদেশ দেওয়া হয়। ১৫ সদস্যের কমিশন যখন আবিসিনীয়ায় কার্যরত ছিল, সেই সময় ইতালী লীগের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে আবিসিনীয়া আক্রমণ করলে, লীগের মর্যাদা ও অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্ন দেখা দেয় (১৯৩৫ খ্রীঃ)।

১· Langsham—World since 1919.

লীগের নির্দেশ অগ্রাহ্য করায়, ইতালীর বিরুদ্ধে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও বিশ্বের অন্যান্য দেশে জনমত তীব্র হয়। নবোদিত আগ্রাসী শক্তি নাৎসী জার্মানীর সঙ্গে ফ্যাসিষ্ট ইতালী গাঁটছড়া বাধলে ইওরোপের ভার্সাই শক্তিসাম্য ভেঙে পড়ার ভয়ে ব্রিটেন ও ফ্রান্স ভীত হয়ে পড়ে। কারণ এই দুই শক্তি (জার্মানী ও ইতালী) ছিল ঘোরতর ভার্সাই বিরোধী। সুতরাং ইতালীকে তোষণ করে হাতে রাখার জন্যে ব্রিটেন ও ফ্রান্স চেষ্টা করে। ব্রিটেনের মন্ত্রী স্যামুয়েল হোর ও ফ্রান্সের মন্ত্রী পিয়ের নাভাল আবিসিনিয়া ব্যবচ্ছেদ করে এক একাংশ ইতালীকে দিতে গোপন পরিকল্পনা করেন। এই খসড়ার কথা প্রকাশিত হলে ইংলন্ড ও ফ্রান্সে জনমত উত্তাল হয়।

জনমতের চাপে লীগ কাউন্সিলের সভায় ব্রিটেন ও ফ্রান্স ইতালীকে যুদ্ধ অপরাধী সাব্যস্ত করে এবং এই সিদ্ধান্ত লীগ এ্যাসেম্বলীর অনুমোদনের জন্যে লীগ এ্যাসেম্বলীর কাছে পেশ করে। লীগ এ্যাসেম্বলী ইতালীকে যুদ্ধ অপরাধী ঘোষণা করে ইতালীর বিরুদ্ধে ১৬ নং ধারা অনুযায়ী অর্থনৈতিক অবরোধ জারী করে। ঐতিহাসিক ল্যাংসামের মতে, ইতালীকে নিষিদ্ধ দ্রব্যের তালিকা প্রস্তুতের সময় ইতালী তোষণ নীতি অনুসারে পেট্রল ও কয়লা তালিকার বাইরে রাখা হয়। সুয়েজ খাল দিয়ে ইতালীর যুদ্ধাস্ত্র সরবরাহের রাস্তাও ব্রিটেন খোলা রাখে।[১] নাৎসী জার্মানী লীগের ঘোষিত অবরোধ গ্রাহ্য না করে ইতালীকে যুদ্ধাস্ত্র সরবরাহ করে। এইভাবে আইন ভঙ্গকারী আগ্রাসী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লীগের অর্থনৈতিক অবরোধের প্রথম পরীক্ষাকে ব্রিটেন ও ফ্রান্স বানচাল করে দেয়। ইতিমধ্যে ৭ মাসের মধ্যে ইতালীয় সেনা আবিসিনীয়দের বাধা চূর্ণ করে রাজধানী আদ্দিস আবাবা দখল করে। সম্রাট হেইলে সেলাসী ইংলণ্ডে আশ্রয় নেন। ইতালী আবিসিনীয়াকে তার রাজ্যভুক্ত করে নেয়।

ইতালী আবিসিনীয়া দখল করাব পর ব্রিটেন ও ফ্রান্স তোষণ নীতির চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা দেখায়। ব্রিটেন লীগের সভায় প্রস্তাব দেয় যে, যেহেতু আবিসিনিয়া সরকারের আর অস্তিত্ব নেই, সেহেতু ইতালীর বিরুদ্ধে লীগের ঘোষিত অবরোধ প্রত্যাহার করা হোক। এই প্রস্তাব লীগ গ্রহণ করার পর ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ আবিসিনীয়ার ওপর ইতালীর অধিকার মেনে নেয়। ইতালী অবশ্য তাকে যুদ্ধ অপরাধী ঘোষণা করার প্রতিবাদে লীগের সদস্যপদ আগেই ত্যাগ করেছিল।. এখন সোমালিল্যাণ্ড, ইরিট্রিয়া ও আবিসিনীয়া নিয়ে ইতালীর আফ্রিকার সাম্রাজ্য গঠিত হয়। আবিসিনীয় আক্রমণ দ্বারা, ইতালী লীগের যৌথ নিরাপত্তার আদর্শকে চূরমার করে দেয়। তার নগ্ন আগ্রাসন নীতিকে প্রকাশ করে। আবিসিনীয়া যুদ্ধের সময় লীগের নির্দেশে সকল দেশ ইতালীকে বয়কট করলেও নাৎসী জার্মানী ইতালীকে যথেষ্ট সাহায্য দেয়। এজন্যে জার্মান-ইতালী মিত্রতার সূত্রপাত হয়। ব্রিটেন ও ফ্রান্স, ইতালীকে তোষণ করা সত্ত্বেও হাতে রাখতে ব্যর্থ হয়।

ইতালী কেবলমাত্র যুগোশ্লাভিয়ার ওপর ক্ষমতা বিস্তার ও আবিসিনীয়া দখল করে সন্তুষ্ট হয়নি। ইতালী বলকানে আলবানিয়া গ্রাস করার নীতি নেয়। ইতালীতে আহমদজগু নিজ আধিপত্য স্থাপনের পর, তিনি ইতালীর সহায়তায় আলবানিয়ায় উন্নয়নমূলক কাজ শুরু করেন। আলবানিয়ার উন্নয়নের জন্যে ইতালী অর্থ বিনিয়োগ করে। ১৯২৫ খ্রীঃ টিরানার সন্ধির দ্বারা আলবানিয়া ও ফ্যাসিষ্ট ইতালীর মধ্যে যৌথ নিরাপত্তা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ইতালী আলবানিয়ার ওপর প্রাধান্য স্থাপন করার ফলে যুগোশ্লাভিয়া নিজের নিরাপত্তা সম্পর্কে আশঙ্কিত হয়। ইতালো-যুগোশ্লাভ সম্পর্কের অবনতি ঘটে। ইতিমধ্যে আহমদজগু আলবানিয়ার রাজপদ গ্রহণ করে ইতালীর হাত থেকে আলবানিয়াকে মুক্ত করার চেষ্টা করলে মুসোলিনী ১৯৩৯ খ্রীঃ আলবানিয়া আক্রমণ করে ইতালীর সঙ্গে আলবানিয়ার সংযুক্তি স্থাপন করেন।

১· R. D. Cornwell—World History

আবিসিনীয়া যুদ্ধের পর, মুসোলিনী স্পেনের পপুলার ফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী সেনাপতি ফ্রাঙ্কোর পক্ষ গিয়ে স্পেনের গৃহযুদ্ধে যোগ দেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল স্পেনে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর নেতৃত্বে ফ্যাসিষ্ট শাসন স্থাপন করে ফ্রান্সকে বেষ্টন করা। তাছাড়া মিত্র ফ্রাঙ্কোর সহায়তায় পশ্চিম ভূমধ্যসাগরে ফ্রান্সের নৌ প্রতিপত্তি তিনি ধ্বংস করার কথা ভাবেন। এজন্যে স্পেনের পপুলার ফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে ফ্যাসিষ্ট সেনাপতি জেনারেল ফ্রাঙ্কোকে স্পেনের শাসন ক্ষমতা লাভে মুসোলিনী প্রত্যক্ষ সহায়তা দেন। ফ্রান্স ও ব্রিটেন সহ ইওরোপের ২৭টি রাষ্ট্র স্পেনের গৃহযুদ্ধে হস্তক্ষেপ না করে নিরপেক্ষ থাকার সিদ্ধান্ত নিলেও মুসোলিনী তা গ্রাহ্য করেননি। আবিসিনীয়ার যুদ্ধে জয়লাভের ফলে তাঁর আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়। নাৎসী জার্মানীও, ইতালীর সঙ্গে স্পেনের গৃহযুদ্ধে ফ্রাঙ্কার পক্ষ নেয়। হিটলার তাঁর নবগঠিত জার্মান বিমান বহরের ধ্বংসকারী শক্তি স্পেনের গৃহযুদ্ধে পরীক্ষা করেন। শেষ পর্যন্ত জেনারেল ফ্রাঙ্কো স্পেনের গৃহযুদ্ধে জয়লাভ করেন।

রোম-বার্লিন অক্ষচুক্তি গঠন ঃ ইতালো-জার্মান সম্পর্ক (The Formation of the Rome-Berlin Axis : Italo-German Relations) ঃ নাৎসী জার্মানীর নেতা হিটলার, ফ্যাসিষ্ট নেতা মুসোলিনীর সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনের জন্যে এগিয়ে আসেন। হিটলারের উদ্দেশ্য ছিল ভবিষ্যতে পশ্চিমী শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ইতালীকে মিত্র হিসেবে ব্যবহার করা। নাৎসী নেতা হিটলার ফ্রান্সকে জার্মানীর প্রধান শত্রু বলে মনে করতেন। ইতালো-জার্মান মৈত্রীজোট গঠিত হলে ফ্রান্স পূর্ব ও দক্ষিণে যথাক্রমে জার্মানী ও ইতালীর দ্বারা বেষ্টিত হবে বলে হিটলার আশা করেন। তার ফলে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জার্মানীর অনেক সুবিধা হবে হিটলার একথা ভাবেন। দ্বিতীয়তঃ, ফ্রাঙ্কো-ব্রিটিশ গণতান্ত্রিক জোটের বিরুদ্ধে তিনি নাৎসী-ফ্যাসিষ্ট জোট গড়ে তুলতে চান। ইতালী ছিল জার্মানীর মতই ভার্সাই সন্ধি বিরোধী শক্তি। কাজেই উভয়ে জোট বেঁধে ভার্সাই স্থিতবস্থা ভেঙে ফেলা যাবে বলে হিটলার মনে করেন। এই সকল বিচারের ভিত্তিতে তিনি ফ্যাসিষ্ট ইতালীর সঙ্গে মৈত্রী গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন।

রোম-বার্লিন অক্ষচুক্তি ও আলবানিয়া অধিকার

মুসোলিনীও হিটলারের মৈত্রী প্রস্তাবে সাড়া দেন। আবিসিনীয়া যুদ্ধের সময় লীগের বয়কট উপেক্ষা করে হিটলার ইতালীকে সমরাস্ত্র সরবরাহ করলে মুসোলিনী হিটলারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি জার্মান রাষ্ট্রদূতকে বলেন, "ফ্যুয়েরারকে জানাবেন এজন্যে আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ রইলাম"। অতঃপর জার্মানী ভ্রমণের সময় জার্মানীর সমরসজ্জা দেখে মুসোলিনীর প্রত্যয় হয় যে, আগামী যুদ্ধে নাৎসী জার্মানীর জয় সুনিশ্চিত। হিটলার ইতালীয় ঔপনিবেশিক দাবীর প্রতি সমর্থন জানালে মুসোলিনী স্বভাবতই জার্মান মৈত্রীর প্রতি আকৃষ্ট হন। ইতালীর বিদেশমন্ত্রী কাউন্ট চিয়ালেকে হিটলার আশ্বাস দেন যে, ইতালীর ঔপনিবেশিক দাবী ও ভূমধ্য সাগরীয় অঞ্চলে আধিপত্যের আকাঙ্খাকে জার্মানী সমর্থন করবে। ইতালীর লক্ষ্য ছিল উত্তর আফ্রিকার ফরাসী উপনিবেশ অধিকার করা। যেহেতু ফ্রান্স ছিল জার্মানীর পয়লা নম্বর শত্রু, সেহেতু জার্মানীর সাহায্যে ফ্রান্সকে দমিয়ে ফেলার জন্যে মুসোলিনী জার্মানীর সঙ্গে মিত্রতা বদ্ধ হন। জার্মানী ও ইতালীর মধ্যে এ্যান্টি-কমিন্টার্ন চুক্তি স্থাপিত হয়। এই চুক্তি ক্রমে রোম-বার্লিন অক্ষ চুক্তিতে পরিণতি লাভ করে। ১৯৩৮ খ্রীঃ মিউনিক বৈঠকে মুসোলিনী সভাপতিত্ব করে চেকোশ্লোভাকিয়ার একাংশ যাতে জার্মানী পায় তার ব্যবস্থা করে। এর বিনিময়ে জার্মান সমর্থন-পুষ্ট হয়ে ইতালী ১৯৩৯ খ্রীঃ আলবেনিয়া অধিকার করে।

১৯৩৯ খ্রীঃ সেপ্টেম্বর মাসে পোল্যাণ্ডে জার্মান আক্রমণের প্রতিবাদে, ইংলণ্ড ও ফ্রান্স জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। মুসোলিনী নাৎসী জার্মানীর ঘনিষ্ঠ মিত্র হলেও এই যুদ্ধে

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগদান

কিছুদিন নিরপেক্ষ থাকেন। এর পশ্চাতে মুসোলিনীর দুটি উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমতঃ, তাঁকে অগ্রাহ্য করে নাৎসী নেতা হিটলার রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করায় তিনি বিরক্ত হন। এ্যান্টি-কমিন্টার্ন চুক্তির দ্বারা নাৎসী জার্মানী ও ফ্যাসিষ্ট ইতালী কমিউনিষ্ট রাশিয়ার বিরোধিতা করার জন্যে যে নীতি নেয় হিটলার রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তির দ্বারা সেই নীতি থেকে বিচ্যুত হন। মুসোলিনী ক্ষোভ প্রকাশ করেন যে, রুশ-জার্মান চুক্তি করার আগে হিটালার তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করার দরকার মনে করেননি। দ্বিতীয়তঃ, যুদ্ধের গতি কোন দিকে যাবে তাহা না বুঝে তিনি জার্মানীর পক্ষে যোগ দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। যদি যুদ্ধের গতি জার্মানীর বিপক্ষে যেত তাহলে তিনি নিরপেক্ষতা রক্ষা করে ইতালীর স্বার্থরক্ষা করতে পারতেন। সুতরাং হিটলার পোল্যাণ্ড আক্রমণে উদ্যত হলে মুসোলিনী জানিয়ে দেন যে, আপাততঃ ইঙ্গ-ফরাসী মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে জার্মানীকে একাই যুদ্ধ করতে হবে। ইতালী এখন যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত নয়। আসলে উপরোক্ত দুটি কারণে তিনি নিরপেক্ষ থাকেন। হিটলারের অনুরোধে কর্ণপাত করেননি। শেষ পর্যন্ত হিটলারের অনুরোধে জার্মানীর কারখানায় কাজ করার জন্যে কিছু শ্রমিক এবং জার্মানীর কৃষিক্ষেত্রে কাজ করার জন্যে কিছু কৃষক পাঠান।

এদিকে হিটলার দ্রুতগতিতে পোল্যাণ্ডের যুদ্ধ শেষ করে, পশ্চিম দিকে মুখ ঘুরিয়ে ডেনমার্ক, সুইডেন দখলের পর ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। ফ্রান্সের মিত্র ব্রিটেন উত্তর ফ্রান্স ও বেলজিয়ামে যে সেনা সন্নিবেশ করে তার পতন ঘটে। ডানকার্কের যুদ্ধে ইংলন্ডের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। ফ্রান্সের ভেতর জার্মান বাহিনী ঢুকে পড়ে। ফ্রান্সের পতন আসন্ন হয়। এতদিনে মুসোলিনী সুনিশ্চিত হন যে, মিত্রশক্তির পরাজয় ঘটতে চলেছে। এই সময় তিনি যদি ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন তাহলে জার্মানীর সঙ্গে যে ফাটল দেখা দিয়েছিল তা জোড়া লাগবে। ফ্রান্স পরাজিত হলে, উত্তর আফ্রিকায় ফ্রান্সের উপনিবেশগুলি ইতালী দখল করতে পারবে। জার্মান আক্রমণে ফ্রান্সের পতন আসন্ন হয়েছিল। সুতরাং ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেও ইতালীকে বেশী কিছু কষ্ট করতে হবে না। সুযোগ বুঝে মুসোলিনী ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ১৯৪০ খ্রীঃ যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এইভাবে ফ্যাসিষ্ট ইতালী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। হিটলার ও মুসোলিনীর মধ্যে ১৯৪০ খ্রীঃ মিউনিকে এক বৈঠকে মুসোলিনী ফ্রান্সের কাছ থেকে স্যাভয়, নীস, ফরাসী সোমালিল্যাণ্ড, টিউনিস এবং ব্রিটেনের অধীনস্থ মাল্টা দাবী করেন। হিটলার মুসোলিনীর এই ঔপনিবেশিক দাবীকে সমর্থন করেন। ইতিমধ্যে জার্মানী ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে সম্পর্কের অবনতি হলে, ১৯৪১ খ্রীঃ নাৎসী জার্মানী সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণ করে। নাৎসী জার্মানীর মিত্র হিসেবে ফ্যাসিষ্ট ইতালীও রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। জার্মান সেনাদল যখন রুশ যুদ্ধে পরাক্রম দেখাতে ব্যস্ত ছিল, সেই সুযোগে মুসোলিনী উত্তর আফ্রিকায় ফরাসী ও ব্রিটিশ উপনিবেশ আক্রমণ করেন। হিটলার এই হটকারী অভিযান থেকে মুসোলিনীকে নিরস্ত করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। উত্তর আফ্রিকায় ইতালীর সাম্রাজ্য স্থাপনের জন্যে তাঁর দীর্ঘ দিনের লালিত স্বপ্নকে মুসোলিনী পূরণের এই সুযোগ ছাড়তে রাজী হননি। যখন ফ্রান্স পরাজিত, হতমান, ব্রিটেন ডানকার্কের পরাজয়ের পর নিজেকে গুটিয়ে নেয়, রাশিয়া জার্মানীর হাতে পরাভূত হতে চলছিল, তখন এই শক্তির শূন্যতার মহা সুযোগকে মুসোলিনী কাজে লাগাতে চেষ্টা করেন। ইতালীয় সেনা, প্রধান সেনাপতি, মার্শাল গ্রাৎসিয়ানীর নেতৃত্বে বানের জলের মতই উত্তর আফ্রিকায় মিত্রশক্তিকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি পাল্টা আঘাত হানে। এল-আলমিনের ঐতিহাসিক কামানের লড়াই-এ ইতালীয় সেনাঘাটিগুলি ছিন্ন ভিন্ন হয়। বেনগাজীর পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে ব্রিটিশ সেনাপতি ফিল্ড মার্শাল মন্টগোমারী এবং মার্কিন সেনাপতি জেনারেল প্যাটন পাল্টা আক্রমণ দ্বারা ১৯৪২ খ্রীঃ থেকে

আলজেরিয়া, মরক্কো, টিউনিস, মিশর ও উত্তর আফ্রিকা পুনরুদ্ধার করে। হিটলারের বিরুদ্ধে এতদিন মুসোলিনী যে উগ্র আত্মবিশ্বাস নিয়ে কথা বলতেন তা ফুটো বেলুনের মতই চুপসে যায়। ঐতিহাসিক এ্যালন বুলকের মতে, (Allan Bullock) মুসোলিনী প্রায় নতজানু হয়ে আফ্রিকা যুদ্ধে ইতালীকে বাঁচাতে হিটলারের সাহায্য চান। হিটলার মুসোলিনীর মুর্খতার জন্যে কূটনৈতিক তিরস্কারের পর তাঁর বিখ্যাত যুব সেনাপতি ফিল্ড মার্শাল রোমেলকে আফ্রিকায় পাঠান।

কিন্তু আফ্রিকার যুদ্ধের গতি ইতালীর অনুকূলে আর ছিল না। রাশিয়ার যুদ্ধে ব্যস্ত থাকায় জার্মানীর পক্ষে আফ্রিকায় বাহিনী পাঠান সম্ভব হয়নি। সেনাপতি রোমল তাঁর অসাধারণ ও অদ্ভুত রণকৌশল দ্বারা মিত্রশক্তির জয়কে বিলম্বিত করেন মাত্র। শেষ পর্যন্ত রোমেল হিটলারের আদেশে আফ্রিকা ছেড়ে চলে যান। ইতালীর প্রধান সেনাপতি ফিল্ড মার্শাল গ্রাৎসিয়ানি তাঁর সেনাদল সহ বন্দী হন। আফ্রিকা যুদ্ধে মুসোলিনীর শোচনীয় পরাজয় ঘটে।

ইতালীতে ইতিমধ্যে ফ্যাসিষ্ট বিরোধী জনমত উত্তাল হয়ে ওঠে। এতদিন ধরে মুসোলিনী গণতন্ত্রের টুঁটি টিপে ধরে যে ফ্যাসিষ্ট একনায়কতন্ত্র স্থাপন করেন তার বিরুদ্ধে ইতালীতে জনরোষ দেখা দেয়। যুদ্ধজনিত অর্থসঙ্কট, বেকার সমস্যা, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বুদ্ধিজীবিদের অসন্তোষ মুসোলিনীর সরকারের পতন আসন্ন করে। মিত্রশক্তির প্রচারও এজন্য কম দায়ী ছিল না। ১৯৪৩ খ্রীঃ ইতালীতে এই গণ অভ্যুথানের ফলে মুসোলিনী পদচ্যুত ও বন্দী হন। কিন্তু নাৎসী নেতা হিটলার তাঁর মিত্রের পতন ঘটতে দিতে রাজী ছিলেন না। জার্মান বাহিত প্যারাসুট বা ছত্রীবাহিনী ঝটিকা আক্রমণ দ্বারা মুসোলিনীকে মুক্ত করে। তাঁর শত্রুদের নিষ্ঠুরভাবে দমন করা হয়। কিন্তু শেষ রক্ষা করা যায়নি। ইঙ্গ-মার্কিন মিত্রশক্তি উত্তর আফ্রিকা থেকে ইতালীর উপকূলে সামুদ্রিক পথে অকস্মাৎ অবতরণ করে, রোম অভিমুখে অভিযান চালালে ইতালীয় জনগণ মিত্রশক্তিকে বরণ করে নেয়। ইতালীয় জাতীয়তাবাদীরা মুসোলিনী ও তাঁর রক্ষিতা ক্লারা পেত্রাচ্চিকে হত্যা করে মৃতদেহ গাছের ডালে ঝুলিয়ে দেয়। ইতালীয় বাহিনী মিত্রপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। মার্কিন সেনা রোমের পথে যাওয়ার সময় মুসোলিনী ও তাঁর উপপত্নীর মৃতদেহ দেখতে পায়। এই মৃতদেহ রোমে এনে সমাহিত করে। এইভাবে ইতালীর ফ্যাসিষ্ট শাসনের অবসান হয়।

ইতালীতে ফ্যাসিষ্ট শাসনের পতনের কারণ (The causes of the collapse of Fascism in Italy) ঃ ইতালীতে ফ্যাসিষ্ট সরকারের পতনের জন্যে বিভিন্ন কারণ দায়ী ছিল। ইতালীর বুর্জোয়া গণতন্ত্র ধ্বংস করে মুসোলিনী যে ফ্যাসিষ্ট সরকার গঠন করেন তার শিকড় ছিল খুবই কমজোরী। ইতালীর বুর্জোয়া গণতন্ত্রের দুর্নীতি ও দুর্বলতায় যখন লোকে হতাশাগ্রস্থ হয়, মুসোলিনী তার সুযোগ নিয়ে ফ্যাসিষ্ট শাসন স্থাপন করেন। তিনি জনগণের ভোটে অথবা নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসেননি। নির্বাচনে ফ্যাসিষ্টরা মাত্র ৩৫টি আসন পায়। মুসোলিনী বলপ্রয়োগ দ্বারা শাসন ক্ষমতা দখল করেন। এজন্য ফ্যাসিষ্ট শাসনের কোন গণতান্ত্রিক ভিত্তি ছিল না। যতদিন মুসোলিনীর হাতে সামরিক ক্ষমতা ছিল ততদিন তিনি প্রতিবাদীদের দমিয়ে ক্ষমতায় থাকেন। কিন্তু আফ্রিকার যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে ইতালীর ভাবমূর্তি মলিন হয়। ইতালীর সামরিক ক্ষমতা ভয়ানকভাবে হ্রাস পায়।

আফ্রিকার যুদ্ধে যোগদানের পর ইতালীর সামরিক বিপর্যয় দেখা দিলে, মুসোলিনী বাধ্য হয়ে হিটলারের ওপর নির্ভরশীল হন। এতদিন তিনি জার্মান ডিক্টেটরের বিরুদ্ধে যে স্বতন্ত্রতা ও স্বাধীনতা দেখান তার কিছুই তিনি রক্ষা করতে পারেন নি। ইতালী কার্যতঃ নাৎসী জার্মানীর লেজুড়ে পরিণত হয়। মুসোলিনীর রাজ্যলিপ্সা ও আফ্রিকা যুদ্ধে যোগদানের ফলে ফ্যাসিষ্ট ইতালীর পতন ত্বরান্বিত হয়। বেনেডিতো ক্রেসের মতে, একেই ফ্যাসিষ্ট শাসন ছিল একটি

বলদর্পী, নেতিবাচক একদলীয় শাসন। এই শাসনব্যবস্থার না ছিল গণতান্ত্রিক, না ছিল সমাজতান্ত্রিক, না ছিল নৈতিক ভিত্তি। ইতিহাস ও রাষ্ট্র বিজ্ঞানের স্বীকৃত তত্ত্ব ও তথ্যের বিরুদ্ধে ফ্যাসীবাদ ছিল একটি কৃত্রিম ব্যবস্থা। সুতরাং এই ধরনের শাসনব্যবস্থা বেশীদিন চালতে পারত না। আপনার দুর্বলতায় আপনিই ভেঙে পড়ত।

মুসোলিনীর রাজ্যলিপ্সা, বলপূর্বক আবিসিনীয়া, আলবেনিয়া অধিকার ইতালীকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এক আগ্রাসী দস্যু রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত করে। সুযোগ সন্ধানী মুসোলিনী ফ্রান্সের পতন আসন্ন হলে মুসোলিনী মনে করেন জার্মানীর কাঁধে ভর করে, পরাজিত ফ্রান্সের উত্তর আফ্রিকা উপনিবেশগুলি সহজেই দখল করতে সক্ষম হবেন। ইতালীর নিজস্ব সামরিক দুর্বলতাকে তিনি বুঝতে চাননি। আফ্রিকার, প্রাথমিক যুদ্ধের সাফল্যে তিনি আত্মহারা হন। কিন্তু এ্যাংলো-আমেরিকান প্রতি আক্রমণে ইতালী অসহায় অবস্থায় পড়ে। ইতালীর মিত্র নাৎসী জার্মানী তখন রুশ যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকায় ইতালীকে পুরা সাহায্য দিতে পারেনি। তাছাড়া হিটলারের বৈদেশিক নীতির পরিকল্পনায় পূর্ব ইওরোপ ছিল মুখ্য লক্ষ্য। আফ্রিকায় রাজ্যবিস্তারে নাৎসী জার্মানীর আপাততঃ আগ্রহ ছিল না। কাজেই দুর্বল ইতালী এ্যাংলো-মার্কিন আক্রমণে ধরাশায়ী হয়। দীর্ঘ যুদ্ধ চালনার মত শক্তি মুসোলিনীর ছিল না।

সর্বশেষে, ইতালীর রণপরিকল্পনা এবং উপযুক্ত সমরনেতার অভাব ছিল। মিত্রশক্তির ফিল্ড মার্শাল মন্টগোমারী ও জেনারেল প্যাটনের তুলনায়, ইতালীর প্রধান সেনাপতি ফিল্ড মার্শাল গ্রাৎসিয়ানী ছিলেন ম্লান ও প্রতিভাহীন। মিত্রশক্তি আফ্রিকার উত্তর উপকূল থেকে ইতালীতে অবতরণ করার পরিকল্পনা করায় ফ্যাসিষ্ট সরকারের পতনের ঘণ্টা বেজে যায়। চার্চিল, রুজভেল্ট ও ষ্ট্যালিনকে বোঝান যে, দক্ষিণ ইওরোপের উপকূল অনেকটা কুমীরের মতই দেখতে। কুমীরের পেটের তল হল সর্বাপেক্ষা নরম জায়গা। সেই স্থান হল ইতালী। ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী ইতালীর উপকূলে নেমে পড়লে ইতালীর জাতীয়তাবাদী, গণতান্ত্রিক শক্তি উৎসাহিত হয়ে ফ্যাসিষ্ট সরকারকে উচ্ছেদ করে ফেলে। মিত্রশক্তির অগ্রগতি প্রতিহত করার মত শক্তি ইতালীর ছিল না। তাছাড়া নৌ-বাহিনীর অভাবে ভূমধ্যসাগরের পথে ইঙ্গ-মার্কিন সেনার ইতালী অভিযান মুসোলিনী ঠেকাতে পারেন নি।

পাঠ্যসূচী

১। Ernst Molte—Three faces of Fascism.
২। Seton Watson—Italy from Liberalism to Fascism.
৩। G. Megaro—Mussolini in the Making.
৪। Elizabeth Wiskemann—Fascism in Italy.
৫। Core wall—History of the world.

নবম অধ্যায়

ক্ষতিপূরণ সমস্যা
(The Reparation Problem)

ক্ষতিপূরণ সমস্যার উদ্ভব (The Origin of the Reparation Problem) ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিজয়ী মিত্রশক্তি পরাজিত জার্মানীর নিকট ক্ষতিপূরণ আদায় করবে কিনা এই প্রশ্ন বড় আকারে দেখা দেয়। ক্ষতিপূরণ আদায় ছিল আন্তর্জাতিক আইনের একটি পুরাতন বিধি। যুদ্ধের সময় ইঙ্গ-ফরাসী সরকার নিজ নিজ দেশের জনগণকে আশ্বাস দেয় যে, যুদ্ধের পর জার্মানীর কাছ থেকে অসামরিক জনগণের যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা ক্ষতিপূরণ আদায় করে পূরণ করা হবে। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ফ্রান্স তার অসামরিক নাগরিকদের আগাম ক্ষতিপূরণ প্রদান শুরু করে এই আশায় যে, পরে জার্মানীর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করে তা পূরণ করা হবে। ব্রিটেন ও ফ্রান্স স্থির করে যে, কেবলমাত্র অসামরিক নাগরিকদের ক্ষয়ক্ষতি বাবদ ক্ষতিপূরণ নয়। যে সকল মিত্রপক্ষের সেনা আহত হয়েছে অথবা যুদ্ধে আহত হয়েছে তাদের পরিবারবর্গের ভরণপোষণের জন্যও ক্ষতিপূরণ আদায় করা হবে। এছাড়া মিত্রশক্তির যে সকল বাণিজ্য জাহাজ জার্মান সাবমেরিনের আঘাতে ডুবে গেছে সেজন্যও জার্মানীর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করা হবে।

প্যারিসের সন্ধি বৈঠকে ইঙ্গ-ফরাসী শক্তি জার্মানীর সঙ্গে সন্ধির অন্যতম শর্ত হিসেবে ক্ষতিপূরণ দাবী করে। যদিও উইলসনের চতুর্দশ নীতিতে ক্ষতিপূরণের শর্ত ছিল না। কিন্তু ইঙ্গ-ফরাসী শক্তির অনমনীয় মনোভাব দেখে মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব ল্যান্সি এক নোট দ্বারা (৮ই ডিসেম্বর, ১৯১৮ খ্রীঃ) জার্মানীকে জানান যে, জার্মানীকে যুদ্ধের দরুণ মিত্রশক্তিকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

ভার্সাই সন্ধি বৈঠকে জার্মানী কত টাকা ক্ষতিপূরণ বাবদ দিবে তা স্থির করার জন্যে একটি কমিশন নিয়োগ করা হয়। এই কমিশনকে ১৯২১ খ্রীঃ মধ্যে চূড়ান্ত রিপোর্ট দিতে বলা হয়। আপাততঃ ভার্সাই সন্ধির ২৩১-৩৫ নং ধারায় ক্ষতিপূরণ প্রদানের শর্ত ধার্য করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভার্সাই সন্ধি স্বাক্ষর না করার জন্যে ক্ষতিপূরণ কমিশনে যোগ দেয়নি। এজন্য ফ্রান্স এই কমিশনের সভাপতি নির্বাচিত হয়। এদিকে জার্মানীর বিরুদ্ধে ফ্রান্স প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্যে তীব্র প্রতিশোধমূলক মনোভাব নেয়। সুতরাং জার্মানীর কাছ থেকে সর্বোচ্চ পরিমাণ ক্ষতিপূরণ আদায় করে অর্থনৈতিক দিক থেকে জার্মানীকে ফ্রান্স পঙ্গু করতে চায়। ফ্রান্সের ইচ্ছা ছিল ক্ষতিপূরণ সমস্যাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার। ভবিষ্যতে জার্মানীর পুনর্গঠন যাতে বিলম্বিত হয়, ফ্রান্স এজন্য ক্ষতিপূরণ প্রশ্নকে ব্যবহার করতে চায়। এদিকে ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ কেইনস (Keynes) ব্রিটেনকে সতর্ক করেন যে, "ক্ষতিপূরণ প্রাপক ও প্রদানকারী উভয়ের পক্ষেই ক্ষতিকারক" (Reparation is damaging both to the given and the receiver)। এজন্য ব্রিটেন মাঝারি অঙ্কের ক্ষতিপূরণের বেশী জার্মানীর কাছে দাবী করার বিরোধিতা করে। তাছাড়া যুদ্ধের আগে জার্মানী ছিল ব্রিটিশ শিল্পদ্রব্যের বড় ক্রেতা। যুদ্ধের পর জার্মানীর ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি করা ছিল ব্রিটেনের নীতি। বড় অঙ্কের ক্ষতিপূরণ আদায় করলে জার্মানীর ক্রয়ক্ষমতা লোপ পেত। কিন্তু ক্ষতিপূরণ কমিশনে মার্কিন সদস্য না থাকায় এবং ব্রিটেন কোনঠাসা হয়ে পড়ায়, ফ্রান্স কমিশনের সভাপতি হিসেবে Casting Vote দ্বারা তার

ক্ষতিপূরণ ধার্য করার ক্ষেত্রে ইঙ্গ-ফরাসী মতভেদ

সিদ্ধান্ত চাপাতে চেষ্টা করে। শেষ পর্যন্ত মিত্রশক্তি স্থির করে যে, শুধু নগদ অর্থ নয়, তিন প্রকারে যথা আংশিক নগদ সোনা-রূপায়, আংশিক মালপত্রের দ্বারা ও আংশিক জার্মান শিল্পী, কারিগর, শ্রমিকদের পরিশ্রম দ্বারা ক্ষতিপূরণ চাওয়া হবে। কেইনস সতর্ক করে দেন যে, শুধুমাত্র নগদে অথবা জিনিষপত্রে অথবা জার্মান শ্রমিকের বিনা পারিশ্রমিকের শ্রম নিলে গ্রহণকারী দেশের হয় মুদ্রাস্ফীতি, অথবা মালের বিক্রীতে মন্দা অথবা বেকার সমস্যা দেখা দেবে। এজন্য তিনি মিশ্রপন্থায় আদায়ের পরামর্শ দেন।

অতঃপর প্রশ্ন দেখা দেয় যে, জার্মান ক্ষতিপূরণ বাবদ যে অর্থ পাওয়া যাবে তা মিত্রশক্তির মধ্যে কিভাবে বণ্টন করা হবে। স্বভাবতই ফ্রান্স সর্বোচ্চ পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দাবী করে এই যুক্তিতে যে, জার্মান আক্রমণে ফ্রান্সেরই সর্বাধিক ক্ষতি হয়। স্পা (Spa) নগরে মিত্রশক্তির বৈঠকে পুনরায় ব্রিটেন কোনঠাসা হয়। কারণ বেলজিয়াম, ইতালী প্রভৃতি সদস্য ফ্রান্সের দাবী সমর্থন করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্ষতিপূরণ সম্পর্কিত বৈঠকে না থাকার ফলে ব্রিটেন মিত্রহীন ছিল। Spa বৈঠকে স্থির হয় যে, জার্মানীর কাছ থেকে যে ক্ষতিপূরণ আদায় হবে ফ্রান্স পাবে তার ৫২%, ব্রিটেন ২২%, ইতালী ১০%, বেলজিয়াম ৬·৫%, জাপান ও পর্তুগাল ১·৫% পাবে।

ইতিমধ্যে ক্ষতিপূরণ কমিশন ১৯২১ খ্রীঃ তাদের রিপোর্ট দাখিল করে। এই রিপোর্টে বলা হয় যে, আধুনিক যুগের যুদ্ধ এত ব্যয়সাপেক্ষ যে কোন দেশের পক্ষে তার ক্ষতিপূরণ প্রদান অসম্ভব। কাজেই জার্মানীকে শুধু অসামরিক সম্পত্তির ক্ষয়-ক্ষতি বাবদ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এই ক্ষতিপূরণের পরিমাণ হবে ৬৬,০০০,০০,০০০ পাউন্ড। এই রিপোর্ট পাওয়ার পর মিত্রশক্তি লণ্ডন বৈঠকে মিলিত হয়ে রিপোর্ট গ্রহণ করে। লণ্ডন শিডিউল বা লণ্ডন তালিকা অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। ক্ষতিপূরণ বাবদ মোট অর্থকে দুভাগে ভাগ করে। ক্ষতিপূরণের অর্থের একাংশ ৪২ বছরের বার্ষিক কিস্তিতে পরিশোধ করতে বলা হয়। ক্ষতিপূরণের অপর অংশ ৩০ বছরের কিস্তিতে মিটিয়ে দিতে বলা হয়। জার্মানীর এই ব্যবস্থার নাম ছিল "লণ্ডন শিডিউল" বা "লণ্ডন তালিকা"। জার্মানী এই দুই ধরনের কিস্তির টাকা বছর বছর নিয়মিতভাবে শোধ করবে বলা হয়। কিস্তির খেলাপ হলে জার্মানীর ওপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে জার্মানীর শিল্পাঞ্চল রূঢ় (Ruhr) অধিকারের কথা বলা হয়। জার্মানী প্রতিবাদ জানায় যে, ক্ষতিপূরণের অর্থ অনেক বেশী করে ধরা হয়েছে। যুদ্ধ বিধ্বস্ত জার্মানী খাদ্য সঙ্কট ও বেকার সমস্যায় জর্জরিত। জার্মানীর পক্ষে এই বিরাট অঙ্কের ক্ষতিপূরণ দান সম্ভব নয়। কিন্তু মিত্রশক্তি এই প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে, লণ্ডন শিডিউল অনুযায়ী জার্মানীকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের নির্দেশ দেয়।

এদিকে জার্মানীতে অর্থনৈতিক ধ্বস দেখা দিয়েছিল। জার্মানীতে বেকার সমস্যা, খাদ্য সঙ্কট এবং কলকারখানায় শ্রমিক ধর্মঘট জার্মানীকে পঙ্গু করে ফেলে। জার্মানীতে মুদ্রাস্ফীতি এত ভয়াবহ রূপ নেয় যে, প্রতিদিন জার্মান মুদ্রার বা মার্কের দাম পড়তে থাকে। জার্মানী লণ্ডন শিডিউল অনুযায়ী একটি কিস্তি প্রদান করে, তার আর্থিক দুরবস্থার জন্যে কিস্তি প্রদান তিন বছরের মূলতুবী রাখার আবেদন জানায়। কিন্তু জার্মানীকে মাত্র ৬ মাস সময় দেওয়া হয়। জার্মানী এর ফলে কিস্তি পরিশোধ করতে পারেনি।

জার্মানীর ক্ষতিপূরণ প্রদান উপলক্ষে ফ্রান্স ও ব্রিটেনের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। ব্রিটেন জার্মানীর কিস্তি খেলাপকে ইচ্ছাকৃত না মনে করে পরিস্থিতির চাপে ঘটেছে বলে জার্মানীর প্রতি উদার ব্যবহারের সুপারিশ করে। আসলে ব্রিটেন জার্মানীর অর্থনৈতিক ধ্বস সকলের পক্ষে ক্ষতিকারক বলে মনে করত। জার্মানীর অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন না হলে জার্মানীর পক্ষে ব্রিটিশ মালের ক্রয় ক্ষমতা বাড়বে না বলে ব্রিটেন চায় ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে জার্মানীর প্রতি উদারতা দেখানো হোক। অপর দিকে, ফ্রান্স জার্মানীর প্রতি প্রতিহিংসা নীতি অনুসরণ করতে চায়। নতুন

ফরাসী মন্ত্রী রেমণ্ড পয়েনকারী (Poincare) চান ফ্রান্সের নিরাপত্তা বৃদ্ধির জন্যে জার্মানীকে পঙ্গু করে রাখতে। ক্ষতিপূরণ সমস্যাকে তিনি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির হাতিয়ারে পরিণত করেন।

১৯২২ খ্রীঃ ক্যানে (Cannes) বৈঠকে ব্রিটেনের উদার শর্তে জার্মানীর ক্ষতিপূরণ প্রদানের প্রস্তাবের ফ্রান্স তীব্র সমালোচনা করে। জার্মানী ক্ষতিপূরণের কিস্তি খেলাপ করায় ফ্রান্স জার্মানীর বিরুদ্ধে লণ্ডন শিডিউল অনুযায়ী শাস্তি-মূলক শর্ত প্রয়োগের দাবী জানায়। এই ব্যাপারে বেলজিয়াম ও ইতালীর সহযোগীতা পেলে ফ্রান্সকে রোখা ব্রিটেনের পক্ষে সম্ভব হয়নি। লণ্ডন বৈঠকে জার্মানীর কিস্তি খেলাপের প্রশ্নটি আলোচনা শুরু হলে ব্রিটেনের এ্যাডভোকেট জেনারেল যুক্তি দেখান যে : (১) জার্মানীর কিস্তি খেলাপ ইচ্ছাকৃত নয়। পরিস্থিতির চাপে জার্মানী কিস্তির খেলাপ করেছে। সুতরাং শাস্তিদানের প্রশ্ন আসতে পারে না। (২) লণ্ডন শিডিউলে মিত্রশক্তি একমত হয়ে শাস্তির শর্ত জুড়েছিল। এখন শাস্তি প্রয়োগ করতে হলে সকলকে একমত হতে হবে। ব্রিটেন শাস্তি প্রদানে আপত্তি জানাচ্ছে। এজন্য আইনতঃ শাস্তি প্রদান করা যাবে না। (৩) ব্রিটিশ প্রতিনিধি বলেন যে, ফ্রান্সের এ পর্যন্ত প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ জার্মানী পরিশোধ করেছে। অন্য শক্তির প্রাপ্য যদিও বাকি। ক্ষতিপূরণ হিসেবে ফ্রান্সের কেবলমাত্র কিছু কাঠ প্রাপ্য আছে। এক্ষেত্রে জার্মানীকে শাস্তিদানের জন্যে ফ্রান্সের হৈচৈ করা উচিত নয়। (৪) ব্রিটিশ প্রতিনিধি আবেদন করেন যে, ফ্রান্স যেন কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে বাড়াবাড়ি না করে। ফ্রান্স যেন Commonsense limit বা সাধারণ বাস্তব জ্ঞান না হারায়। অবশেষে, তিনি ব্যঙ্গ করে বলেন যে, "ইতিহাসে কাষ্ঠ সংক্রান্ত কেলেঙ্কারীর নজির বেশী নেই। একমাত্র যে নজির আছে তা হল কাঠের ঘোড়া সংক্রান্ত কেলেঙ্কারী। ফ্রান্স যদি কাঠ সরবরাহ না করায় শাস্তিমূলক শর্ত প্রয়োগ করে তা হবে ইতিহাসে দ্বিতীয় কাঠ সম্পর্কিত কেলেঙ্কারী"। ফ্রান্স ও বেলজিয়াম ব্রিটেনের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে, শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে জার্মানীর রূর অঞ্চলে সেনাদল পাঠায়।

ফ্রাঙ্কো-ব্রিটিশ মতভেদ ও রূঢ় দখল

ঐতিহাসিক গ্যাথোর্ন হার্ডির মতে, "ফ্রান্স কর্তৃক রূর দখল একটি প্রথম শ্রেণীর আন্তর্জাতিক সঙ্কটের সৃষ্টি করে" (The occupation of Ruhr created an international crisis of first magnitude)। প্রথমতঃ, ভাইমার জার্মান সরকার রূর অধিকারের প্রতিবাদে রূর অঞ্চলে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ সৃষ্টি করে। জার্মান শ্রমিক ও ইঞ্জিনিয়ারগণ রূরের কলকারখানায় কাজ বন্ধ করে দেয়। খনি মালিকগণ কয়লা ও লোহা উৎপাদন হ্রাস করে। সাধারণ জার্মান নাগরিকরা ফরাসী দখলকারী দলের সঙ্গে পুরো অসহযোগিতা নীতি নেয়। দ্বিতীয়তঃ, রূর জেলার কলকারখানা চালু রাখার জন্যে ফ্রান্সকে নিজ দেশ থেকে ইঞ্জিনিয়ার ও শ্রমিক আনাতে হয়। এই ব্যবস্থা ছিল বেশ ব্যয়বহুল। এজন্য ফ্রান্সের প্রচুর অর্থ ক্ষয় হতে থাকে। তৃতীয়তঃ, জার্মানদের অসহযোগিতা এবং অজানা জার্মান যন্ত্রপাতি চালাতে ফরাসী যন্ত্রবিদরা দুর্ঘটনায় মারা পড়লে ক্রুদ্ধ ফরাসী সেনা নিরস্ত্র জার্মান নাগরিকদের ওপর গুলি বর্ষণ করে। জার্মান শিল্পপতি ও খনি মালিকদের গ্রেপ্তার করা হয়। বেশ কিছু জার্মান শ্রমিককে বিতাড়িত করা হয়। রূর অঞ্চলের জার্মান ব্যাঙ্কগুলির আমানত বাজেয়াপ্ত করা হয়। ফ্রান্সের এই স্বৈরাচারী কাজের জন্যে ইওরোপীয় জনমত জার্মানীর প্রতি সহানুভূতিশীল হয়। ফ্রান্সের নৈতিক পরাজয় ঘটে। ফ্রান্সের বাড়াবাড়ির ফলে ফ্রান্সের ন্যায্য দাবী সম্পর্কে ইওরোপীয় জনমত উদাসীন হয়ে যায়। চতুর্থতঃ, রূর অঞ্চল দখলে রাখতে ও কলকারখানার কাজকর্ম চালু রাখতে ফ্রান্সকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। যতই দিন যেতে থাকে ততই ফ্রান্স ব্যয়বহুলতার চাপে অস্থির হয়ে পড়ে। পঞ্চমতঃ, জার্মানীর ওপর প্রতিশোধ নিতে ফ্রান্স রূর অঞ্চলে অবরোধ ঘোষণা করে। অর্থাৎ রূর

রূর অধিকার ও তার প্রতিক্রিয়া

অঞ্চলের উৎপাদিত পণ্য জার্মানীতে সরবরাহ করা নিষিদ্ধ করা হয়। ষষ্ঠতঃ, এর ফলে ধ্বসে পড়া জার্মান অর্থনীতিতে ভয়ানক গভীর ধ্বস দেখা দেয়। জার্মানীতে মুদ্রাস্ফীতি তুঙ্গে উঠে যায়। ভাইমার প্রজাতন্ত্রের পতন এজন্য ত্বরান্বিত হয়। মুদ্রাস্ফীতিতে জার্মানী নাস্তানাবুদ হতে থাকে। ভাইমার সরকারের বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষয় পায়। E. H. Carr এজন্য মন্তব্য করেছেন যে, "দুটি কারণের ফলে ভাইমার প্রজাতন্ত্রের পতন ঘটে, যথা—ক্ষতিপূরণ সমস্যা ও পয়েনকারীবাদ এবং ভার্সাই-এর সন্ধি"।সপ্তমতঃ,ভাইমার জার্মানীকে ঘায়েল করার উদ্দেশ্যে ফ্রান্স, জার্মানীর রাইনল্যান্ডে এক বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন গড়ে তুলে। দেশপ্রেমিক জার্মানগণ এই বিচ্ছিন্নতাবাদী সরকারকে সমর্থন না করায়, ফরাসী মন্ত্রী পয়েনকারি জেলখাটা দাগী আসামীদের সাহায্যে এই বিচ্ছিন্নতাবাদী সরকার গঠন করেন। উদ্দেশ্য ছিল জার্মানীকে ব্যবচ্ছেদ করা। ফরাসী সেনাদল এই নব রাইন প্রজাতন্ত্রকে রক্ষাকবচ দেয়। জার্মানীর প্রতিবাদে কোন ফল হয়নি।

ফ্রাঙ্কো-ব্রিটিশ সম্পর্ক : রুর অবরোধের ফল

ফ্রান্সের এই নীতির ফলে ফ্রাঙ্কো-ব্রিটিশ সম্পর্কে ফাটল ধরে। একেই ব্রিটেনের আপত্তি অগ্রাহ্য করে ফ্রান্স রুর দখল করেছিল। তদুপরি, ভার্সাই সন্ধির শর্ত ভেঙ্গে ফ্রান্স রাইন অঞ্চলে এক বিচ্ছিন্নতাবাদী তাঁবেদার সরকার গঠন করলে ব্রিটেনের বিরক্তি চরম সীমায় ওঠে। যেহেতু বিশ্বযুদ্ধের পর ফ্রান্সের হাতে ছিল ইওরোপের সর্ববৃহৎ স্থলবাহিনী, সেহেতু ফ্রান্সের এই উদ্ধত আচরণ ব্রিটেন অসহনীয় মনে করে। আসলে জার্মানী ভেঙ্গে পড়লে ইওরোপ ভূখণ্ডে ফ্রান্সের একচ্ছত্র অধিকার স্থাপিত হত। এর ফলে শক্তিসাম্য বিনষ্ট হত। এজন্য ব্রিটেন পয়েনকারী সরকারকে সতর্ক করে দেয় যে, রাইনল্যান্ডে ফ্রান্স বেআইনী কাজ করছে। ফ্রান্স নিজেকে সংযত না করলে ব্রিটেন রাইন প্রজাতন্ত্র গঠনের বিষয়টি লীগের সভায় তুলবে এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থা সমর্থন করবে। ব্রিটেনের হুমকিতে কাজ হয়। পয়েনকারি রাইন প্রজাতন্ত্রের ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করেন। এই প্রজাতন্ত্রের পতন ঘটে। ব্যয়বহুল রুর অবরোধ চালু রাখতে ফ্রান্সের রাজকোষ শূন্য হয়। জার্মানী এজন্য ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্থ হয়। জার্মানী ক্ষতিপূরণ প্রদান একেবারে বন্ধ করে দেয়। এই অচলাবস্থা কাটাতে আমেরিকা ডাওয়েজ পরিকল্পনা চালু করে।

ডাওয়েজ পরিকল্পনা ও ইয়ং পরিকল্পনা এবং মিত্রশক্তির ঋণ (The Dawes Plan and the Young Plan and The Inter Allied Debt) :

রুর অধিকার এবং তারপর ক্ষতিপূরন সমস্যায় অচল অবস্থা দেখা দেয়। এদিকে ফ্রান্স ও ব্রিটেন যুদ্ধের সময় যে মার্কিন ঋণ গ্রহণ করেছিল, ফ্রান্স তার পরিশোধ বন্ধ করে দেয়। ফ্রান্স যুক্তি দেখায় যে, জার্মানী যদি ক্ষতিপূরণের অর্থ দেয় তবে ফ্রান্স মার্কিণ ঋণ পরিশোধ করবে। মার্কিন সরকার জানান যে, (১) ফ্রান্স যখন ঋণ নেয়, তখন জার্মানীর ক্ষতিপূরণ প্রদানের কোন কথাই ছিল না। উভয় ঋণের মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই। (২) জার্মানীর অক্ষমতার জন্যে মার্কিন সরকারের প্রাপ্য অর্থ পরিশোধ ফ্রান্সের বন্ধ করা বেআইনী। (৩) ফ্রান্স ও ব্রিটেন মার্কিন ঋণের টাকা আভ্যন্তরীন খাতে খরচ করেছে। যুদ্ধের জন্যে খরচ করেনি। সুতরাং জার্মানীর প্রদেয় ক্ষতিপূরণের সঙ্গে মার্কিন সরকারকে প্রদেয় ঋণ যুক্ত করা যায় না। মার্কিন সরকারের কোন যুক্তিতে ফ্রান্স কর্ণপাত করেনি। এমতাবস্থায় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বলডুইন প্রস্তাব দেন যে, মার্কিন সরকারের উচিত ক্ষতিপূরণ প্রদানে জার্মানীর সমর্থ বিবেচনা করে সেইমত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ডাওয়েজ পরিকল্পনার পটভূমি

আমেরিকা এই প্রস্তাব গ্রহণ করে। এই সময় জার্মানীর শাসন ক্ষমতায় ষ্ট্রাসম্যান আসেন। তিনিও রুর অঞ্চলে জার্মানীর 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ প্রত্যাহার করে সহযোগিতার হাত বাড়ান। ফ্রান্সের মারকুটে মন্ত্রী পয়েনকারী রুর অবরোধে বিফল হওয়ায় তাঁর প্রভাব হ্রাস পায়।

এই পরিস্থিতিতে মার্কিন সেনাপতি জেনারেল চার্লস ডাওয়েজের সভাপতিত্বে ডাওয়েজ কমিটি নিযুক্ত হয়। এই কমিটি যে সুপারিশগুলি করে তার নাম ছিল ডাওয়েজ পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনায় বলা হয় যে ঃ—(১) ক্ষতিপূরণ সমস্যা নিয়ে রাজনীতি করা চলবে না। ক্ষতিপূরণকে পুরো অর্থনৈতিক প্রশ্ন হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। এর থেকে রাজনীতিকে পৃথক রাখতে হবে। (২) লণ্ডন শিডিউল দ্বারা জার্মানীর ক্ষতিপূরণের জন্যে যে বার্ষিক কিস্তি ধরা হয়েছিল তার হার ছিল চড়া। জার্মানীর বর্তমান আর্থিক অবস্থায় এই চড়া হারে কিস্তি পরিশোধ সম্ভব নয়। (৩) এজন্য জার্মানী কম হারে বার্ষিক কিস্তি পরিশোধ করে দীর্ঘকাল ধরে ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে। (৪) ক্ষতিপূরণের প্রদেয় বার্ষিক কিস্তিকে দুভাগ করা হয়। তার একভাগ ছিল জরুরী। যা জার্মানী বছর বছর দিতে বাধ্য ছিল। অপর ভাগের প্রদেয় বার্ষিক কিস্তি জার্মানীর আর্থিক সঙ্কট দেখা দিলে মিত্রশক্তির অনুমোদন ক্রমে সাময়িক মুলতুবী রাখা যেত। (৫) জার্মানীর আভ্যন্তরীন সম্পদের ক্ষেত্রগুলি জার্মানীকে ফিরিয়ে দিতে হবে। মিত্রশক্তির এগুলি দখল করে থাকা চলবে না। (৬) রূর অঞ্চল থেকে ফরাসী সেনা অপসারণ করতে হবে। (৭) জার্মানীর মুদ্রাস্ফীতি রোধ করার জন্যে জার্মানী রাইখ মার্ক নামে নতুন নোট চালু করবে। (৮) জার্মানীর আর্থিক পুনরুজ্জীবনের জন্যে মিত্রশক্তি মূলতঃ মার্কিন দেশ জার্মানীকে ঋণ দিবে। (৯) ক্ষতিপূরণ কমিশন লোপ করা হবে।

ডাওয়েজ পরিকল্পনা

ডাওয়েজ পরিকল্পনা জার্মানীর ষ্ট্রাসম্যান সরকারের কাছে আপাততঃ গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়। ক্ষতিপূরণ সমস্যা থেকে রাজনীতিকে পৃথক করার ব্যবস্থা করায় ক্ষতিপূরণ সমস্যা জটিলতা মুক্ত হয়। ক্ষতিপূরণ আদায় ও বন্টনের দায়িত্ব এখন থেকে এজেন্ট জেনারেল স্যার পার্কার গিলবার্টের ওপর ন্যস্ত হওয়ায় ক্ষতিপূরণ সমস্যার সমাধান সহজ হয়। দ্বিতীয়তঃ, জার্মানীকে মার্কিন ঋণ প্রদান করার ফলে জার্মানীর আপাততঃ অর্থনৈতিক উন্নতির সূচনা ঘটে। এই ঋণের অর্থে জার্মানী তার আংশিক পুনর্গঠন, আংশিক ক্ষতিপূরণ দিতে সক্ষম হয়। ফ্রান্সের সঙ্গে জার্মানীর রাজনৈতিক সম্পর্কের উন্নতি হয়। ফ্রান্স রূঢ় অঞ্চল থেকে সেনা সরিয়ে নেয়। মিত্রশক্তি লন্ডন বৈঠকে ডাওয়েজ কমিশনের রিপোর্ট গ্রহণ করে। ডাওয়েজ রিপোর্টের সঙ্গে ব্রিটেনের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় যে, এখন থেকে জার্মানী ক্ষতিপূরণের প্রদেয় কিস্তি যদি খেলাপ করে তবে ক্ষতিপূরণ কমিশন সর্বসম্মত হলে জার্মানীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না। ডাওয়েজ পরিকল্পনা গ্রহণের ফলে ভাইমার জার্মানীর সঙ্গে ব্রিটেন ফ্রান্সের যে সম্পর্কের উন্নতি হয় তার ফলে ১৯২৫ খ্রীঃ লোকার্নো চুক্তি সাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির দ্বারা ফ্রান্স ও জার্মানীর মধ্যে পারস্পরিক আগ্রাসন ও সীমান্ত ভেঙে ফেলার আশঙ্কা দূর হয়। তবে জার্মানী জানায় যে, ডাওয়েজ পরিকল্পনাকে জার্মানী একটি সাময়িক ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করেছে। ক্ষতিপূরণ সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান করতে হলে ক্ষতিপূরণের মোট অর্থের পরিমাণ হ্রাস করতে হবে। তৃতীয়তঃ, ডাওয়েজ পরিকল্পনায় জার্মানীর বার্ষিক ক্ষতিপূরণের হার কমানো হলেও জার্মানীর মূল আপত্তি যথা ক্ষতিপূরণের মোট অঙ্ক কমাতে হবে। সে বিষয়ে কোন ব্যবস্থা হয়নি। চতুর্থতঃ, মার্কিন ঋণের ওপর নির্ভর করে জার্মানী ক্ষতিপূরণের কিস্তি মেটাতে থাকে। জার্মানীর নিজস্ব আর্থিক উন্নয়নের কোন ব্যবস্থা এবং মুদ্রাস্ফীতি হ্রাসের ব্যবস্থা এই পরিকল্পনায় ছিল না।

ডাওয়েজ পরিকল্পনার সুফল ও ত্রুটি

এই কারণে জার্মানী অপর একটি চূড়ান্ত পরিকল্পনা রচনার দাবী জানালে, এজেন্ট জেনারেল স্যার পার্কার গিলবার্ট তা সমর্থন করেন। বিশেষতঃ রাইনল্যাণ্ডের ওপর জার্মানীর পূর্ণ অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার দাবী তিনি বিশেষভাবে সমর্থন করেন। এই সকল সমস্যা

ইয়ং পরিকল্পনা

সমাধানের জন্যে মার্কিন ব্যাঙ্কার স্যার আওয়েন ইয়ং-এর সভাপতিত্বে ইয়ং কমিশন গঠিত হয়। ইয়ং পরিকল্পনা (১৯২৯ খ্রীঃ) দ্বারা বলা হয় যে, (১) ক্ষতিপূরণের অর্থের ভোট $\frac{1}{3}$ অংশ হ্রাস করা হল। (২) অবশিষ্ট অর্থ জার্মানী প্রতি বছর ১০০০০০০০০ হিসেবে ৩৭ বছর ধরে দিবে। (৩) অপর কিছু অর্থ ২২ বছরের কিস্তিতে জার্মানী মিত্রপক্ষকে যুদ্ধ ঋণ পরিশোধ হিসেবে দেবে। (৪) জার্মানীর অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দিলে মিত্রশক্তির আবেদন ক্রমে জার্মানী ২ বছরের জন্যে ক্ষতিপূরণ প্রদান মুলতুবী রাখতে পারবে। (৫) B.I.S বা ব্যাঙ্ক অব ইন্টারন্যাশনাল সেটেলমেন্টের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ আদায় ও মিত্রশক্তির মধ্যে হারাহারি ভাবে বণ্টন করার ব্যবস্থা হবে। (৫) রাইনল্যান্ডের ওপর কর্তৃত্ব জার্মানীর হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। ১৯৩৪ খ্রীঃ ৩০শে জুনের মধ্যে মিত্রশক্তি রাইনল্যান্ড ছেড়ে দেবে। (৬) এখন থেকে ক্ষতিপূরণ পরিশোধের দায়িত্ব জার্মানীর ওপর বর্তাবে। (৭) জার্মানীতে রেন্টেন মার্ক নামে নতুন নোট চালু করা হবে। (৮) নোট ছাপাবার দায়িত্ব ও নোটের হিসেব-নিকাশ রাইখ ব্যাঙ্কের ওপর ন্যস্ত করা হল। (৯) ক্ষতিপূরণ কমিশনের জার্মানীর ওপর আর কোন এক্তিয়ার থাকল না। (১০) জার্মানীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যে মার্কিন ঋণ দানের ব্যবস্থা ইয়ং পরিকল্পনায় রাখা হয়। (১১) ইয়ং পরিকল্পনার শর্তগুলি গ্রহণ করার পর মিত্রশক্তি একটি নতুন শর্ত জুড়ে দেয় যে, ভবিষ্যতে জার্মানী যদি কিস্তির খেলাপ করে তবে লীগ অব নেশনসের সভায় তা আলোচনা করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ইয়ং পরিকল্পনার সাফল্য

লোকার্নো চুক্তির মিত্রতার আবহাওয়ায় ইয়ং পরিকল্পনা গৃহীত হলে আন্তর্জাতিক শক্তির সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আমেরিকা ও ব্রিটেনের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে জার্মানী ক্ষতিপূরণের কিস্তি মেটাতে থাকে। হেইগ সম্মেলনে (১৯৩০ খ্রীঃ) ব্রিটেন আপত্তি জানায় যে, জার্মান ক্ষতিপূরণের ভাগ তাকে কম হারে দেওয়া হয়েছে। ফ্রান্স এই আপত্তি সমর্থন করায় ব্রিটেনের প্রাপ্যের হার বাড়ানো হয়। জার্মানীর অপর মিত্র রাষ্ট্র অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়ার প্রদেয় ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে হেইগ সম্মেলনে মীমাংসা হয়।

অকস্মাৎ এক কালবৈশাখীর ঝড়ের মত আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সঙ্কট ও মন্দা ১৯৩০ খ্রীঃ সোভিয়েত রাশিয়া ব্যতীত আমেরিকা ও ইওরোপের সকল দেশে মহামারীর মত ছড়িয়ে পড়ে।

ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থার সংকট

হুভার মারটেরিয়াম

ফলে জার্মানীর যেটুকু উন্নতি ঘটেছিল তা মন্দার ঝাপটায় ঝরে পড়ে। যে মার্কিন ঋণের ওপর জার্মানীর উন্নয়ন দাঁড়িয়েছিল, মন্দার দরুন তা বন্ধ হয়ে গেলে জার্মানী ক্ষতিপূরণ প্রদানে অক্ষম হয়ে পড়ে। জার্মানী মার্কিন রাষ্ট্রপতি হার্বার্ট হুভারের কাছে ইয়ং পরিকল্পনার শর্ত অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ প্রদান মুলতুবী রাখার আবেদন জানালে, প্রেসিডেন্ট হুভার, হুভার মরেটোরিয়াম (Hoover Moratorium) বা মুলতুবী নামা অনুসারে ২$\frac{১}{২}$ বছরের জন্যে (মতান্তরে ১ বছরের জন্যে) ক্ষতিপূরণ প্রদান ও জার্মানীকে ঋণ প্রদান মুলতুবী রাখে। কিন্তু অর্থনৈতিক মন্দা ও জার্মানীর ভয়ঙ্কর মুদ্রাস্ফীতির কারণে জার্মানীর পক্ষে পুরো ক্ষতিপূরণ প্রদান আর আদপেই সম্ভব ছিল না। এদিকে জার্মানীতে নাৎসী দল শক্তিশালী হয়ে ওঠে। নাৎসী দল ছিল ভার্সাই শক্তি ও ক্ষতিপূরণ প্রদানের ঘোর বিরোধী। নাৎসী নেতা হিটলারের মতে, জার্মানীকে যুদ্ধ অপরাধী ঘোষণা করাই ছিল চরম অন্যায়। ক্ষতিপূরণ প্রদান ছিল জার্মানীর জাতীয় অপমান এবং জার্মানীর শত্রুদের চক্রান্ত মাত্র।

এমতাবস্থায় বিপদ বুঝে মিত্রশক্তি লুজান বৈঠকে (Lausanne Conference, 1932) মিলিত হয়ে স্থির করে যে, জার্মানী আর বার্ষিক কিস্তিতে ক্ষতিপূরণ না দিয়ে সর্বমোট, এককালীন ১৫ কোটি পাউণ্ড প্রতীক ক্ষতিপূরণ (Token Reparation) দিলে মিত্রশক্তি

ক্ষতিপূরণের দাবী আর তুলবে না। আসলে মিত্রশক্তি প্রমাণ করতে চেয়েছিল যে, ক্ষতিপূরণের দাবী অবৈধ নয়। মূলতঃ লুজান সম্মেলনের সিদ্ধান্ত ছিল ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে মিত্রশক্তির পিছু হঠার ইঙ্গিত। এতদিন ধরে জার্মানী যে অভিযোগ করেছিল যে, ক্ষতিপূরণের অর্থ বেশী করে ধরা হয়েছে, ইয়ং পরিকল্পনার দ্বারা মোট ক্ষতিপূরণের $\frac{1}{3}$ অংশ হ্রাস করার ফলে জার্মানীর অভিযোগের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন লুজান সম্মেলনে মাত্র ১৫ কোটি পাউণ্ড দাবী করার অর্থ ছিল যে—(ক) জার্মানীর ওপর চড়া হারে ক্ষতিপূরণ ধার্য্য করা হয়েছিল। (খ) ক্ষতিপূরণ আদায় দ্বারা জার্মানী যে যুদ্ধ অপরাধী তা প্রমাণ করা। ঠিক এখানেই জার্মানীর নাৎসী দলের নীতিগত আপত্তি ছিল যে, নৈতিক কারণে জার্মানী ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য নয়। যুদ্ধের জন্যে একা জার্মানী দায়ী ছিল না; মিত্রশক্তিও দায়ী ছিল। সুতরাং ১৯৩৩ খ্রীঃ নাৎসী দল ক্ষমতায় এলে ক্ষতিপূরণ আদায় করা সম্ভব ছিল না। ১৯৩৭ খ্রীঃ জার্মানী সরকারিভাবে ক্ষতিপূরণের অবসান ঘোষণা করলে, মিত্রশক্তি নীরব থেকে দীর্ঘশ্বাস মোচন করে।

ক্ষতিপূরণ সমস্যার বিফলতার কারণ (Causes of the Failure of the Reparation Settlement) : ক্ষতিপূরণ সমস্যার সমাধানে বিফলতার জন্যে বিভিন্ন কারণ ছিল। নৈতিক দিক থেকে বিবেচনা করলে জার্মানীকে একতরফাভাবে যুদ্ধ অপরাধী ঘোষণা করে যুদ্ধজনিত ক্ষয়ক্ষতিপূরণ করতে বলা হয়। জার্মানীর নৈতিক আপত্তি ছিল যে, মিত্রশক্তি ও জার্মানী সকলেই ছিল বিশ্বযুদ্ধের জন্যে দায়ী। সে ক্ষেত্রে শুধু জার্মানীকে যুদ্ধ অপরাধী একতরফাভাবে ঘোষণা করে জার্মানীকে শাস্তি-স্বরূপ ক্ষতিপূরণ প্রদানে বাধ্য করার নীতিকে জার্মান বুদ্ধিজীবি, জনসাধারণ, জাতীয়তাবাদী ও নাৎসী দল মেনে নিতে রাজী ছিল না।

বাস্তব দিক থেকে আধুনিক যুদ্ধ হল সর্বাত্মক ও অত্যন্ত ব্যয়-বহুল যুদ্ধ। এই যুদ্ধে বিজয়ী শক্তি যেমন ক্ষতিগ্রস্থ হয়, পরাজিত শক্তি তদপেক্ষা বহু গুণ বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়। যুদ্ধের পরাজয় পরাজিত শক্তির অর্থনীতিকে ভেঙে চুরমার করে দেয়। তদুপরি ক্ষতিপূরণের দাবী ছিল অযৌক্তিক ও অমানবিক। অষ্টাদশ শতকের যুদ্ধ-বিগ্রহে ক্ষতিপূরণ নেওয়া হলেও বিংশ শতকের আধুনিক সর্বাত্মক যুদ্ধের পর কোন শক্তির পক্ষে ক্ষতিপূরণ প্রদান ছিল অসম্ভব।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানী সকল দিক থেকে ভগ্নদশায় পড়েছিল। কাইজার সরকারের ফেলে যাওয়া পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপের ভেতর থেকে নব জার্মানীকে উদ্ধার করাই ছিল এক কঠিন সমস্যা। তদুপরি জার্মানীতে দেখা দেয় কমিউনিষ্ট বনাম জাতীয়তাবাদী গণতন্ত্রীদের গৃহযুদ্ধ। এই সঙ্গে জার্মানী বেকার সমস্যা, খাদ্য সঙ্কট, যুদ্ধ ফেরৎ বেকার সেনাদলের অশান্তিতে ভুগছিল। মুদ্রাস্ফীতি, শিল্প-কারখানায় ধর্মঘট জার্মান জনজীবনকে অচল করে ফেলে। জার্মানীর এই দূরবস্থার জন্যে ভাইজার প্রজাতন্ত্র দায়ী ছিল না। দায়ী ছিল পূর্বতন কাইজার তন্ত্র। এক্ষেত্রে মিত্রশক্তির উচিত ছিল মানবিক কারণে ক্ষতিপূরণের দাবী ত্যাগ করা। অন্ততঃ পক্ষে নিম্নতম ক্ষতিপূরণ দাবী করা। কিন্তু ফ্রান্স প্রতিহিংসা নীতি দিয়ে উচ্চতম অঙ্কে ক্ষতিপূরণ দাবী করায় জার্মান জনমত ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিরুদ্ধে চলে যায়।

ফ্রান্স ক্ষতিপূরণের প্রশ্নকে নিছক অর্থনৈতিক সমস্যা হিসেবে না দেখে, এই সমস্যাকে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যবহার করায় ক্ষতিপূরণের প্রশ্নে জার্মানীতে বিপরীত আবেগ দেখা দেয়। পয়েনকারিবাদ ও তাঁর প্রতিহিংসা নীতির স্বার্থে ক্ষতিপূরণ সমস্যাকে ব্যবহার করায় জার্মানীতে তীব্র আপত্তি ওঠে। ক্ষতিপূরণের সমাধান এজন্য ব্যাহত ও বিলম্বিত হয়।

ব্রিটেনের সঙ্গে ক্ষতিপূরণের প্রশ্নে ফ্রান্সের মতভেদ ও মনান্তর ছিল ক্ষতিপূরণ সমস্যার ব্যর্থতার একটি বড় কারণ। পায়েনকারি ব্রিটেনের আপত্তিগুলি একতরফাভাবে নাকচ করে ক্ষতিপূরণের সিংহ ভাগ (৫২%) ফ্রান্স নিয়ে নেয়। ব্রিটেনের আপত্তি অগ্রাহ্য করে ফ্রান্স রুর

অঞ্চল দখল করে। ফ্রাঙ্কো-ব্রিটিশ মতবিরোধ গোড়া থেকেই ক্ষতিপূরণ সমস্যা সমাধানের পথ বন্ধ করে দেয়। ফ্রান্সের উগ্রনীতি পায়েনকারীবাদ ক্ষতিপূরণ ফ্রান্সের ন্যায্য সমাধানকে ব্যাহত করে। ব্রিটেন ক্ষতিপূরণের আদায়ের ব্যাপারে উদাসীনতা দেখায়। ব্রিটেনের সহযোগিতা ছাড়া ফ্রান্সের একার পক্ষে এই সমস্যার সমাধান আদপেই সম্ভব ছিল না।

শেষ পর্যন্ত মার্কিন হস্তক্ষেপ, ডাওয়েজ ও ইয়াং পরিকল্পনার দ্বারা ক্ষতিপূরণ প্রশ্নের বাস্তব সমাধানের পথ তৈরি করা হয়। কিন্তু বিশ্ব অর্থনৈতিক সঙ্কটের ফলে ইয়াং পরিকল্পনাকে কার্যকরী করা যায়নি। হুভার মরেটো বিয়ামের জার্মানী আর ক্ষতিপূরণ দেয় নি। আসলে মার্কিন ঋণ বন্ধ হলে জার্মানীর ক্ষতিপূরণ প্রদান বন্ধ হয়।

সর্বশেষে, জার্মানীর নাৎসী সরকারের ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিরুদ্ধে অনমনীয় মনোভাব ক্ষতিপূরণের দাবীকে সমাধিস্থ করে।

দশম অধ্যায়

নিরাপত্তার সন্ধানে ফ্রান্স এবং নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা
(The French Quest for Security; The Problem of Disarmament)

ফ্রান্সের নিরাপত্তার সমস্যা ছিল ভার্সাই-উত্তর যুগের ইওরোপের একটি বৃহৎ সমস্যা। ই·এইচ· কার (E.H. Carr) এজন্য মন্তব্য করেছেন যে, "১৯১৯ খ্রীঃ পর ইওরোপের ঘটনাবলীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং স্থায়ী একক সমস্যা ছিল ফ্রান্সের নিরাপত্তার দাবী" (The most important and persistent single factor in European affairs in the years following 1919 was the French demand for security)। জার্মানীর বিরুদ্ধে জয়ের উল্লাস স্মিমিত হওয়ার আগেই ফরাসী জাতীয়তাবাদী নেতারা ফ্রান্সের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা সম্পর্কে বিপদজ্ঞাপক লাল চিহ্ন দেখতে পান।

ফ্রান্সের নিরাপত্তার ভাঙনের কারণ

সপ্তদশ শতক থেকে নেপোলিয়নের যুগ পর্যন্ত ফ্রান্স ছিল ইওরোপের শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তি। ১৮৭০ খ্রীঃ ফ্রাঙ্কো-জার্মান যুদ্ধে ফ্রান্সের শোচনীয় পরাজয় ফ্রান্সের এই ক্ষমতাকে চুরমার করে দেয়। তখন থেকেই জার্মানীর শক্তিকে ফ্রান্স ভয় পেতে শুরু করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ফ্রান্স শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করলেও ফরাসীরা জানত যে, এই জয় একমাত্র মার্কিন ও ব্রিটিশ শক্তির সহযোগিতার ফলে লাভ করা গেছে। এই জয়ের জন্যে ফ্রান্সের কোন অবদান নেই। ১৯১৪ খ্রীঃ জার্মান আক্রমণের ৬ সপ্তাহের মধ্যেই ফ্রান্সের পতন হোত, যদি না ব্রিটিশ সেনা ফ্রান্সকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসত। সুতরাং ভবিষ্যতে পুনরায় জার্মান আক্রমণ হলে ফ্রান্সের আত্মরক্ষার কোন উপায় ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, অতীতে জার্মান দুবার ফ্রান্সকে আক্রমণ করে খতম করার চেষ্টা করে। অদূর ভবিষ্যতে জার্মানী আবার এই চেষ্টা করবে বলে ফ্রান্স আশঙ্কা করত। তৃতীয়তঃ, ১৯১৯ খ্রীঃ জার্মানী পরাজিত শক্তি হলেও নতুনভাবে আগ্রাসী শক্তি হিসেবে জার্মানীর পুনরায় গড়ে ওঠার সুযোগ ছিল। (ক) জার্মানীর লোকসংখ্যা ছিল ১৯০৫ খ্রীঃ ৬০ মিলিয়ন। গড়ে প্রতি দশ বছরে জার্মানীর লোকসংখ্যা ৫ মিলিয়ন হারে বাড়ছিল। ফ্রান্সের জনসংখ্যা ৪০ মিলিয়নে দাঁড়িয়েছিল। মোটেই জনসংখ্যা বাড়েনি। (খ) খনিজ সম্পদের দিক থেকে জার্মানী ফ্রান্স অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল। (গ) জার্মানী বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যায় ছিল ইওরোপের সেরা দেশ। নিত্য নতুন যন্ত্রপাতি, কারখানার উদ্ভাবনে জার্মানী ছিল দক্ষ। (ঘ) শিল্পদ্রব্যের উৎপাদনে জার্মানী ১৯১৪ খ্রীঃ ব্রিটেনের সমকক্ষ ছিল। ফ্রান্স কোনদিন শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে জার্মানীর ধারে-কাছে যেতে পারেনি। (ঙ) জার্মান সেনাপতিমণ্ডলী ছিল সামরিক সংগঠন বিশেষজ্ঞ। তাদের সঙ্গে ফ্রান্স পাল্লা দিতে সমকক্ষ ছিল না। (চ) সর্বোপরি, জার্মান জাতির ইতিহাস চেতনা ছিল প্রখর। তারা ভোলেনি যে, অতীতে ফ্রান্সের কূটনীতির ফলে জার্মানী ব্যবচ্ছেদ হয়ে একটি দুর্বল দেশে পরিণত হয়েছিল। তারা জানত যে, জার্মানীকে খতম করতে ফরাসী রাজনীতিকরা সতত চেষ্টিত। কাজেই ১৯১৯ খ্রীঃ বিজয়ের আনন্দ ফ্রান্সের কাছে bitter sweet বা তিক্ত-মিষ্ট বলে মনে হয়েছিল।

এজন্য প্যারিসের শান্তি সম্মেলনে ফরাসী মন্ত্রী ক্লেমাঁসু, রাজনীতিক রেমণ্ড পয়েনকারি প্রভৃতি মিত্রশক্তির কাছে ফ্রান্সের নিরাপত্তার জন্যে রক্ষাকবচ দাবী করেন। (১) ফ্রান্স

নিরাপত্তার জন্যে ফ্রান্সের দাবীগুলি

ভৌগোলিক গ্যারান্টি হিসেবে (Physical Guarantee) দাবী করে যে, রাইন নদী পর্যন্ত জার্মান ভূখণ্ডকে ফ্রান্সের সঙ্গে চিরকালের জন্যে যুক্ত করতে হবে। রাইন পর্যন্ত সীমানা পেলে ফ্রান্স আগ্রাসী জার্মানীকে রুখতে পারবে। (২) রাইন নদীর ওপর যে সেতুগুলি ছিল তার নিয়ন্ত্রণ ফ্রান্সের হাতে দিতে হবে। রাইনের পূর্ব তীরে সেতুমুখে ফরাসী সামরিক ঘাঁটি রাখা হবে। ফ্রান্স তার স্মারকলিপিতে জানায় যে, রাইনের পশ্চিম তীরে জার্মানীর অবস্থান ফ্রান্সের পক্ষে বিপজ্জনক। ফ্রান্সের এই ভৌগোলিক গ্যারান্টির দাবী ভার্সাই সন্ধিতে পূর্ণ হয়নি। উইলসনের "এক জাতি এক রাষ্ট্র নীতির" ডুবো পাহাড়ে ফ্রান্সের দাবী ধাক্কা খেয়ে ডুবে যায়। ব্রিটেন ও আমেরিকা জানায় যে, ফ্রান্সের দাবী মেনে নিলে রাইনল্যাণ্ডের ৫ মিলিয়ন জার্মান অধিবাসী তাদের পিতৃভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ফ্রান্সের পদানত হবে। এই ব্যবস্থা জাতীয়তাবাদ নীতি-সম্মত নয় এবং জার্মানীর সঙ্গে ফ্রান্সের এই ব্যবস্থার ফলে চিরকাল বিরোধ চলবে।

ফ্রান্সের রাইন সীমান্ত দাবী নাকচ করে তার বিনিময়ে ভার্সাই সন্ধির দ্বারা বলা হয় যে—(১) মিত্রশক্তির সেনাদল ১৫ বছরের জন্যে রাইন নদীর পশ্চিম অঞ্চল দখল করে থাকবে। (২) রাইনল্যাণ্ডকে একটি অসামরিক অঞ্চল বলে ঘোষণা করা হয়। এখানে জার্মান সেনাদলের প্রবেশ এবং সামরিক ঘাঁটি ও দুর্গ স্থাপন নিষিদ্ধ করা হয়। রাইনল্যাণ্ডে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে কেবলমাত্র জার্মান পুলিশ বাহিনী ব্যবহার করা যাবে বলা হয়। ফ্রান্স অবশ্য এই ব্যবস্থায় হতাশ হয়।

ভার্সাই সন্ধির দ্বারা রাইনল্যাণ্ডের অসামরিকীকরণ

ফ্রান্স অতঃপর দ্বিতীয় দাবি করে যে, ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ফ্রান্সকে এই গ্যারান্টি (Productive gurantee) দিবে যে, ফ্রান্স জার্মানীর দ্বারা আক্রান্ত হলে, এই জার্মান আগ্রাসন থেকে তাদের নিজেদের রাজ্যকে আক্রমণের সমান গুরুত্ব দিয়ে, এই দুই শক্তি ফ্রান্সের আত্মরক্ষার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়বে। ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি এই শর্ত পূরণে গোড়ায় ইচ্ছুক ছিল। কিন্তু মার্কিন সেনেট ভার্সাই সন্ধি নাকচ করার ফলে আমেরিকা এই ব্যাপারে হাত গুটিয়ে নিলে ব্রিটিশ এককভাবে গ্যারান্টি দিতে অস্বীকৃতি জানায়। ফ্রান্স মনে করে যে, তাকে মিত্রশক্তি প্রতারণা করল।

ইঙ্গ-মার্কিন গ্যারান্টি দাবী ও বিফলতা

ফ্রান্স এক্ষেত্রে লীগ অব নেশানস্-এর যৌথ নিরাপত্তার শর্তগুলির সাহায্যে তার নিজের নিরাপত্তাকে সুরক্ষিত করার চেষ্টা করে। ১০ নং থেকে ১৬ নং ধারার মাধ্যমে লীগ কভেন্যান্ট সদস্য রাষ্ট্রগুলির নিরাপত্তা রক্ষার ব্যবস্থা করেছিল। ১০ নং ধারায় লীগ সদস্য রাষ্ট্রের ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেয়। ১১নং ধারায় যৌথ নিরাপত্তার শর্তে বলা হয় যে, লীগের কোন সদস্য আক্রান্ত হলে লীগের সকল সদস্য সেই আক্রমণ তাদের নিজেদের ওপর আক্রমণ গণ্য করে আক্রান্ত সদস্যের পাশে দাঁড়াবে। ১৬নং ধারায় আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে বাধ্যতামূলক অর্থনৈতিক, কূটনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বয়কটের ব্যবস্থা ছিল। এই ধারায় আরও বলা হয় যে, লীগের সদস্যরা আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে ঐচ্ছিক সামরিক ব্যবস্থাও নিতে পারবে। কিন্তু জেনিভায় লীগের অধিবেশনে বহু সদস্য ১০, ১১ এবং ১৬ নং ধারা সংশোধন করে এবিষয়ে সদস্য রাষ্ট্রের যৌথ নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব হ্রাস করতে চেষ্টা করে। জেনিভায় একটি সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, ১৬ নং অনুযায়ী আক্রমণকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ ঘোষণা কখন এবং কিভাবে করা হবে তা লীগ কাউন্সিল স্থির করবে। অর্থাৎ আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক অবরোধ ঘোষণা করার স্থলে লীগ কাউন্সিল কালহরণের নীতি নিতে পারবে। তাছাড়া অন্যান্য সদস্য সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের বিরুদ্ধে জোরদার মত প্রকাশ করলে, ফ্রান্স বুঝে ফেলে যে, লীগের সংবিধানকে সংশোধনী দ্বারা মজবুত না করলে

লীগের মাধ্যমে ফ্রান্সের নিরাপত্তার সন্ধান

লীগের দ্বারা তার নিরাপত্তা রক্ষার আশা সুদূর পরাহত হবে।

১৯২৩ খ্রীঃ ফ্রান্স পারস্পরিক খসড়া চুক্তির (Draft Treaty of Mutual Assistance) নামে এক খসড়ার দ্বারা লীগের নিরাপত্তার শর্ত সংশোধনের প্রস্তাব দেয়। এই খসড়ায় ফ্রান্স প্রস্তাব করে যে :—(১) আগ্রাসনকে আন্তর্জাতিক অপরাধ বলে ঘোষণা করা হবে। (২) আগ্রাসন বা যুদ্ধ শুরু হলে তার ৪ দিনের মধ্যে লীগ কাউন্সিল আগ্রাসনকারী বা আক্রমণকারী রাষ্ট্রের নাম ঘোষণা করবে। (৩) আগ্রাসনকারী রাষ্ট্রকে আগ্রাসনের জন্যে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।(৪) লীগের সকল সদস্য আক্রান্ত রাষ্ট্রকে সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য দিতে বাধ্য থাকবে। খসড়া চুক্তি আলোচনার সময় এই চুক্তি প্রস্তাবে বহু ত্রুটি দেখা দেয়।(ক) আগ্রাসন অপরাধ ঘোষণা করা হলেও আগ্রাসনের কোন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। (খ) খসড়া প্রস্তাবে নিরস্ত্রীকরণের কথা বলা হয়। কিন্তু সদস্য রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষার ব্যবস্থা না হলে নিরস্ত্রীকরণ সম্ভব ছিল না। ব্রিটেনের আপত্তিতে ফ্রান্স খসড়া প্রস্তাব প্রত্যাহার করে।

পারস্পরিক খসড়া চুক্তি ১৯২৩

খসড়া চুক্তি প্রত্যাহারের পর ব্রিটেনের উদারনৈতিক মন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড ও ফরাসী মন্ত্রী হেরিয়ট একটি নতুন প্রস্তাব দ্বারা লীগের নিরাপত্তার শর্তগুলির ত্রুটি দূর করতে উদ্যোগ নেন। এই পরিস্থিতিতে লীগের কিছু সদস্য জেনিভা প্রোটোকোল (Geneva Protocol) নামে একটি খসড়া প্রস্তাব পেশ করেন। এই প্রস্তাবে বলা হয় যে:—(১) জেনেভা প্রোটোকোল যে সকল রাষ্ট্র স্বাক্ষর করবে তাদের মধ্যে বিবাদ দেখা দিলে তা P.C.I.J. বা আন্তর্জাতিক আদালতের রায়ে বাধ্যতামূলকভাবে মিটিয়ে নিবে। (২)আন্তর্জাতিক আইন বহির্ভূত রাজনৈতিক বিরোধগুলি লীগ কাউন্সিলে বিচার করা হবে। (৩) লীগ কাউন্সিল সর্বসম্মতভাবে কোন রায় দিতে বিফল হলে, কাউন্সিল একটি সালিশী কমিটি নিয়োগ করবে। এই সালিশী কমিটির রায় বিবাদমান পক্ষগুলি মানতে বাধ্য থাকবে। (৪) জাপানের প্রস্তাব অনুসারে জেনিভা প্রোটোকোলে বলা হয় যে, যদি কোন দেশের আভ্যন্তরীণ বিবাদ এমন গুরুত্ব নেয় যে তার ফলে আন্তর্জাতিক শান্তি বিঘ্নিত হতে পারে, তাহলে, লীগ কাউন্সিলের মধ্যস্থতার জন্যে ১১ নং ধারা অনুযায়ী আবেদন করা যাবে। যে পক্ষ লীগের কাছে এই সালিশী প্রস্তাব আনবে সেই পক্ষকে আক্রমণকারী চিহ্নিত করা হবে না। (৫) লীগ কাউন্সিল বা P.C.I.J. বা শালিশী কমিটি যে দেশকে আক্রমণকারী ঘোষণা করবে, সেই দেশকে যুদ্ধ বা আগ্রাসনের জন্যে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা হবে। আক্রমণকারী দেশের বিরুদ্ধে ১৬ নং ধারা অনুযায়ী অর্থনৈতিক অবরোধ এবং প্রয়োজন হলে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। (৬) যে রাষ্ট্র লীগ কাউন্সিল বা P.C.I.J. বা সালিশী কমিটির রায় মানবে না সেই দেশকে আক্রমণকারী ঘোষণা করা হবে। (৭) যদি লীগের অধিকাংশ রাষ্ট্র জেনিভা প্রোটোকোল গ্রহণ করে তবে ১৯২৫ খ্রীঃ ১৫ই জুন লীগ নিরস্ত্রীকরণের সম্মেলন ডাকবে। কারণ নিরাপত্তার সঙ্গে নিরস্ত্রীকরণের প্রশ্নটি গভীরভাবে জড়িত।

জেনিভা প্রোটোকোলের শর্তাবলী

জেনিভা প্রোটোকোল অনেক দিক থেকে লীগের নিরাপত্তামূলক শর্তগুলির ছিদ্র বন্ধ করতে চেষ্টা করে। যদিও ১৬ নং ধারাকে ফ্রান্সের প্রস্তাবমত বাধ্যতামূলক সামরিক শর্ত যোগ করে জোরালো করা হয়নি, তবুও মোটামুটিভাবে এই খসড়া ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির সমর্থন পায়। ফ্রান্সও এতে সমর্থন জানায়। কিন্তু জেনিভা প্রোটোকোল দ্বারা ভার্সাই সন্ধির স্থিতাবস্থার কোন সংশোধনের ব্যবস্থা না থাকায় জার্মানী ও সোভিয়েত ইউনিয়ন খুশি হয়নি। জেনিভা প্রোটোকোলের বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি আসে ব্রিটেনের কাছ থেকে। বাধ্যতামূলক মীমাংসা সূত্রে ব্রিটেন আপত্তি জানায় যে, লীগ

জেনিভা প্রোটোকোলের ত্রুটি ও বিফলতা

কাউন্সিলের রায় আক্রান্ত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে গেলে, সেই কারণে আক্রান্ত রাষ্ট্র লীগ কাউন্সিলের রায় না মানলে, আক্রান্ত রাষ্ট্রই জেনিভা প্রোটোকোল অনুযায়ী আক্রমণকারীতে পরিণত হবে। ব্রিটেনের এই আপত্তি যুক্তি সঙ্গত ছিল। নতুন প্রধানমন্ত্রী আস্টেন চেম্বারলেইন জেনিভা প্রোটোকোলের বিরোধিতা করায় এবং ব্রিটিশ উপনিবেশগুলির আভ্যন্তরীণ বিরোধ লীগের বিচার্য করার বিরুদ্ধে আপত্তি জানালে জেনিভা প্রোটোকোল পরিত্যক্ত হয়। লীগের চুক্তিপত্রের সংশোধনের মাধ্যমে, লীগের সহায়তায় ফ্রান্সের নিরাপত্তাকে মজবুত করার প্রচেষ্টা বিফল হয়।

E. H. Carr-এর মতে, জেনিভা প্রোটোকোলের বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে:—(১) নিরাপত্তা ও যুদ্ধকে বেআইনী ঘোষণার সঙ্গে নিরস্ত্রীকরণের প্রয়োজনীয়তা সর্বপ্রথম প্রোটোকোলে স্বীকৃত হয়। (২) সকল প্রকার বিরোধকে বাধ্যতামূলক নিষ্পত্তি ব্যবস্থার অধীনে এনে জেনিভা প্রোটোকোল যুদ্ধকে প্রকৃতভাবে বে-আইনী করার চেষ্টা করে। (৩) লীগের নিরাপত্তার শর্তগুলির ছিদ্রকে বাধ্যতামূলক নিষ্পত্তির শর্তের দ্বারা বন্ধ করা হয়। (৪) লীগ কাউন্সিল কোন বিরোধে একমত হতে না পারলে সালিশী কমিশনের রায়কে বাধ্যতামূলক করা হয়। (৫) আভ্যন্তরীণ বিরোধের ক্ষেত্রেও লীগের নিষ্পত্তির শর্ত যোগ করা হয়। কিন্তু জেনিভা প্রোটোকোলের দুর্বলতা এই ছিল যে, এতে আগ্রাসনের কোন যুক্তি সঙ্গত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। যে পক্ষ সালিশের শর্ত মানবে না তাকেই আক্রমণকারী চিহ্নিত করার মধ্যে হঠকারিতা ছিল। কারণ সালিশের রায় যদি পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে আক্রান্ত শক্তির বিরুদ্ধে দেওয়া হত, আক্রান্ত শক্তি তা না মানলে তাকে আক্রমণকারী চিহ্নিত করা ছিল হঠকারিতা মাত্র। তৃতীয়তঃ ই· এইচ· কারের মতে, লীগ চুক্তিপত্রের ১৬ নং ধারার ত্রুটি দূর করে ১৬ নং ধারাকে মজবুত না করার ফলে এবং বাধ্যতামূলকভাবে সামরিক শক্তি প্রকাশের শর্ত এড়িয়ে যাওয়ার ফলে জেনিভা প্রোটোকোল ফ্রান্সের চোখে অপ্রচুর ও অপ্রয়োজনীয় মনে হয়েছিল।

জেনিভা প্রোটোকোলের গুণাগুণ বিচার

লীগের বাইরে চুক্তিজোট গঠন দ্বারা ফ্রান্সের নিরাপত্তা লাভের চেষ্টা ঃ (I) ফ্রান্স এমতাবস্থায় তাঁকে ভবিষ্যৎ জার্মান আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে ব্রিটিশ গ্যারান্টি লাভের জন্যে ব্রিটেনের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। ১৯২২ খ্রীঃ ব্রিটেন শেষ পর্যন্ত জার্মান আক্রমণের বিরুদ্ধে ফ্রান্সকে সহায়তাদানের গ্যারান্টি দিতে রাজী হয়। কিন্তু ফরাসী মন্ত্রী রেমন্ড পয়েনকারি Either the whole or, nothing, হয় সবটা চাই; নতুবা কিছুই চাই না নীতি নিয়ে ব্রিটেনের কাছে দাবী করেন যে জার্মান আক্রমণ হলে, ব্রিটেন কত সংখ্যক সেনা, কত সংখ্যক কামান প্রভৃতি ফ্রান্সের সাহায্যে পাঠাবে তা নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করে সামরিক চুক্তি করতে হবে। ব্রিটিশ মন্ত্রীসভা এখন থেকে বাঁধাধরা সামরিক শর্তে চুক্তি করে ব্রিটেনকে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্যে ক্ষতিগ্রস্ত করতে রাজী না হলে ফ্রাঙ্কো-ব্রিটিশ আত্মরক্ষা চুক্তির সম্ভাবনা লোপ পায়।

ফ্রাঙ্কো-ব্রিটিশ চুক্তির বিফলতা

(II) ফ্রান্স অতঃপর জার্মানীর চতুর্দিকের প্রতিবেশী শক্তিগুলির সঙ্গে সামরিক জোট তৈরি করে জার্মানীকে বেষ্টনীবদ্ধ করার নীতি নেয়। উনিশ শতকে ফ্রান্স এই পন্থা আগে নিয়েছিল। ফ্রান্স এখন একই পথের পথিক হয়। ১৯২০ খ্রীঃ ফ্রাঙ্কো-বেলজিয়াম চুক্তির দ্বারা জার্মানীর উপর-পশ্চিম সীমান্তে জোট গড়ে তুলে। জার্মান আক্রমণ হলে ফ্রান্স ও বেলজিয়াম পরস্পরকে সামারিক সহায়তা দিতে প্রতিশ্রুতি দেয়।

ফ্রাঙ্কো-বেলজিয়াম চুক্তি

(III) ভার্সাই সন্ধির দ্বারা নব গঠিত পোল্যান্ডের ছিল ৩০ মিলিয়ন অধিবাসী। পোলরা পোড় খেয়ে বেশ মারকুটে হয়ে উঠেছিল। জার্মানী ও রাশিয়ার সঙ্গে ছিল পোল্যান্ডের সীমান্ত নিয়ে তীব্র জটিলতা ও বিরোধ।কাজেই জার্মান বিরোধী পোল্যান্ডের সঙ্গে ফ্রান্স সামরিক ও রাজনৈতিক জোট গড়ে তুলে জার্মানীকে পূর্ব সীমান্তে

ফ্রাঙ্কো পোলিশ চুক্তি

বেষ্টন করার নীতি নেয়। ১৯২১ খ্রীঃ ফ্রাঙ্কো-পোলিশ মিত্রতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর সঙ্গে একটি গোপন সামরিক চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়। ফ্রান্স থেকে প্রচুর সমরাস্ত্র পোল সেনাদলের জন্যে পাঠান হয়। পোল্যান্ডের রাজধানী ওয়ারশতে একটি ফরাসী সামরিক মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মিশন পোলিশ সেনাদলের প্রশিক্ষণ এবং জার্মানীর পূর্ব সীমান্তে রণনীতির পরিকল্পনা গঠন করে।জার্মানী ছিল ফ্রান্স ও পোল্যান্ডের সাধারণ শত্রু। কাজেই ফ্রাঙ্কো-পোলিশ সন্ধির দ্বারা জার্মান আক্রমণের বিরুদ্ধে পারস্পরিক সাহায্যের ব্যবস্থা ও সামরিক সহায়তা দানের নীতি গৃহীত হয়।

(IV) হ্যাপসবার্গ সাম্রাজ্যকে ১৯১৯-এর শান্তি চুক্তির দ্বারা ভেঙে ফেলায় তিনটি রাষ্ট্রের বিশেষভাবে উদ্ভব হয়। এরা ছিল চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া এবং রুমানিয়া। ভার্সাই সন্ধির সঙ্গে এই তিন রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ যোগ না থাকলেও সেন্ট জার্মেইন ও ট্রিয়াননের সন্ধির ফলেই এই তিন রাষ্ট্র লাভবান হয়। কিন্তু এই সঙ্গে চেকোশ্লোভাকিয়ার মহা ভয় ছিল যে, অষ্ট্রিয়া হাঙ্গেরী পুনরায় তাকে গ্রাস করে নিবে। যুগোশ্লাভিয়ার বিরোধ ছিল ইতালীর সঙ্গে। রুমানিয়া ভয় করত হাঙ্গেরীকে। ফ্রান্সের উদ্যোগে এই তিন শক্তির যে জোট গঠিত হয় তার নাম ছিল "ক্ষুদ্র আঁতাত" (Little Entente)। ফ্রান্স অন্তরালে থেকে কূটনীতি ও অস্ত্রের সাহায্য দিয়ে ক্ষুদ্র আঁতাতকে মজবুত করে। এতে ফ্রান্সের লাভ হয় যে, এই তিন আঁতাত শক্তি ফ্রান্সকে ভার্সাই চুক্তি রক্ষায় সহায়তা দিতে প্রতিশ্রুতি দেয়। বিনিময়ে ফ্রান্স ক্ষুদ্র আঁতাতকে তাদের সম্ভাব্য আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সাহায্য দিতে রাজি হয়। দ্বিতীয়তঃ, এর ফলে ফ্রাঙ্কো-বেলজিয়ান বা ফ্রাঙ্কো-পোলিশ সন্ধির মত প্রত্যক্ষভাবে ভার্সাই সন্ধির স্থিতাবস্থার রক্ষার ব্যবস্থা না থাকলেও ফ্রান্স তার নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে লিটল আঁতাত শক্তিকে গ্রহণ করায়, ফ্রান্সের কাঁধে ভার্সাই সন্ধি রক্ষার দায়িত্বের সঙ্গে অন্যান্য শান্তি চুক্তিগুলি রক্ষার দায়িত্ব চাপে। ফ্রান্স ইওরোপে ১৯১৯-এর স্থিতাবস্থা রক্ষার পুলিশী দায়িত্ব নিজের কাঁধে চাপিয়ে নেয়। এর মূল লক্ষ্য ছিল জার্মানীকে ভার্সাই সন্ধি সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখা। পূর্ব ইওরোপে জার্মানীকে আর পা ফেলতে না দেওয়া। এজন্য পোল্যান্ডকে লিথুয়ানিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়াকে অষ্ট্রিয়া, রুমানিয়াকে হাঙ্গেরী ও যুগোশ্লাভিয়াকে ইতালীর বিরুদ্ধে ফ্রান্স সাহায্য দিতে প্রতিশ্রুতি দেয়। ১৯২০-২৪ খ্রীঃ এজন্য ফ্রান্সের শক্তি ও মর্যাদা সর্বোচ্চ সীমায় পৌছে যায়।

লিটল আঁতাত চুক্তি

ক্ষুদ্র আঁতাত ও তার গুরুত্ব

লোকার্ণো চুক্তি (Locarno Treaty) : ১৯২৪ খ্রীঃ ডাওয়েজ পরিকল্পনার ফলে ক্ষতিপূরণ সমস্যার একটি আপাততঃ সমাধান খুঁজে পাওয়া যায়। এর ফলে ফ্রাঙ্কো-জার্মান তিক্ততা হ্রাস পায় এবং উভয় শক্তির মধ্যে বাস্তবতাবোধ দেখা দেয় যে, বিরোধিতা নয় একমাত্র আপোষ ও আলোচনার পথেই ফ্রাঙ্কো-জার্মান নিরাপত্তার সমস্যার সমাধান হতে পারে। ফ্রান্সের শাসনব্যবস্থায় প্রতিহিংসাপন্থী পয়েনকারীর পতন, মধ্যপন্থী হেরিওটের অস্থায়ী শাসন এবং আপোষপন্থী আরিস্তিদি ব্রিয়াঁর ক্ষমতা লাভ জার্মানীর সঙ্গে সীমান্ত সংক্রান্ত বিরোধের মীমাংসার পথ খুলে দেয়। এদিকে জার্মানীতে গুষ্টাভ ষ্ট্রাসম্যান ক্ষমতায় এলে ফ্রান্সের সঙ্গে পূর্বতন বিরোধের কথা ভুলে একটি পারস্পরিক অনাক্রমণ চুক্তির প্রস্তাব দেন। তিনি প্রস্তাব দেন যে, জার্মানী এই অনাক্রমণ চুক্তিতে আলসাস-লোরেনের ওপর তার দাবি ছেড়ে দেবে। জেনিভা প্রোটোকোলের বিফলতার ফলে ফ্রান্স তার নিরাপত্তার জন্যে চিন্তিত ছিল। ব্রিটেন ষ্ট্রাসম্যানের প্রস্তাবকে গ্রহণযোগ্য মনে করায় এবং ভার্সাই সন্ধির দ্বারা স্থিরীকৃত ফ্রাঙ্কো-জার্মান সীমান্তে স্থিতাবস্থা রক্ষায় গ্যারান্টি দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করায় ফ্রান্স উৎসাহ বোধ করে। তবে ইংলন্ড আগাম জানিয়ে দেয় যে, ফ্রাঙ্কো-জার্মান সীমান্ত সম্পর্কে ব্রিটেন গ্যারান্টি দিতে প্রস্তুত থাকলেও

লোকার্ণো চুক্তির পটভূমি

জার্মানীর পূর্ব সীমান্তে পোল্যান্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়ার ক্ষেত্রে ইংলন্ড কোন গ্যারান্টি দেবে না। জার্মানীকে লীগের সদস্যপদ দানের প্রস্তাবও ফ্রান্স করে। ১৯২২ খ্রীঃ র‍্যাপালো (Rapallo) সন্ধির দ্বারা রুশো-জার্মান আত্মরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। জার্মানী আশঙ্কা করে যে, লীগ কভেন্যান্টের ১৬নং ধারা অনুযায়ী ভবিষ্যতে কোন কারণে রাশিয়ার বিরুদ্ধে এই ধারা প্রয়োগ করা হলে র‍্যাপালো চুক্তি স্বাক্ষর করার জন্যে জার্মানীর পক্ষে ১৬নং ধারার দায়িত্ব পালনে বাধা দেখা দেবে। তখন ব্রিটেন ও ফ্রান্স জার্মানীকে আশ্বাস দেয় যে, জার্মানী তার ভৌগোলিক ও সামরিক স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে ১৬নং ধারার দায়িত্ব পালন করবে।

এইভাবে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে লোকার্ণো কংগ্রেসের পথ পরিস্কার করা হয়। ১৯২৫ খ্রীঃ সুইজারল্যান্ডের লোকার্ণো শহরে ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, বেলজিয়াম, ইতালী, পোল্যান্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রতিনিধিরা এক অভূতপূর্ব মিত্রতা ও সখ্যতার আবহাওয়ায় লোকার্ণো চুক্তি স্বাক্ষরের জন্যে প্রস্তুত হন। লোকার্ণোতে ফ্রাঙ্কো-জার্মান ও অন্যান্য শক্তিগুলির মধ্যে যে সদিচ্ছা ও মৈত্রীর পরিবেশ দেখা দেয়, তাকে বলা হয় Locarno Spirit বা লোকার্ণোর মৈত্রীর ভাবধারা। ১৯১৯ খ্রীঃ থেকে ফ্রাঙ্কো-জার্মান ও ইঙ্গ-ফরাসী মতভেদ, রূঢ় দখল, প্রতিহিংসা নীতি প্রভৃতির ফলে ইওরোপে শান্তির বাতাবরণ বিনষ্ট হয়েছিল। ১৯১৯ খ্রীঃ অস্ত্রের যুদ্ধ বন্ধ হলেও, কূটনীতি ও অর্থনীতির যুদ্ধ চলছিল। লোকার্ণোর মিত্রতাপূর্ণ ভাবধারার ফলে এই তিক্ত, কটু ও সংঘাতময় যুগের অবসান হল। পারস্পরিক বিশ্বাস ও সদিচ্ছার যুগের সূচনা হয়। এজন্য ঐতিহাসিক ল্যাংস্যাম (Langsham) মন্তব্য করেছেন যে, "লোকার্ণো সন্ধির দ্বারা এক যুগের অবসান ও নতুন একটি যুগের সূচনা হয়" (Locarno marked the end of one epoch and the beginning of another)। ব্রিটিশ মন্ত্রী চেম্বারলেইনও মন্তব্য করেন যে, "লোকার্ণো ছিল যুদ্ধ ও শান্তির বছরগুলির মধ্যে প্রকৃত বিভাজন রেখা"। (Locarno was the real dividing line between the years of war and the years of peace)। যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধ পরবর্তী ঠাণ্ডা লড়াই, স্নায়ু যুদ্ধসকল কিছুকে লোকার্ণো অতীতের ঘটনায় পর্যবসিত করে এবং নতুনভাবে পারস্পরিক আস্থা ও সহাবস্থানের যুগ শুরু হয়। এই মনোভাবকে "লোকার্ণোর ভাবধারা" বা Locarno spirit বলা হয়। লোকার্ণোর সন্ধি অপেক্ষা লোকার্ণোর ভাবধারা কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না।

লোকার্ণোর ভাবধারা ও তার গুরুত্ব

লোকার্ণো কংগ্রেসে মোট ৭টি নিম্নবর্ণিত চুক্তি সম্পাদন করা হয় ঃ

I. পারস্পরিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার সাধারণ চুক্তি (General Treaty of Mutual Peace and Security) ঃ এই সন্ধিতে স্বাক্ষরকারী ছিল ফ্রান্স, জার্মানী, বেলজিয়াম, ব্রিটেন ও ইতালী। এই সন্ধিতে বলা হয় যে : (ক) জার্মানী ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের সঙ্গে ভার্সাই সন্ধির দ্বারা স্থিরীকৃত সীমান্ত মেনে চলবে। অর্থাৎ জার্মানী আলসাস ও লোরেনের ওপর তার দাবী ত্যাগ করল। (খ) ফ্রান্স ও বেলজিয়ামও অনুরূপ প্রতিশ্রুতি দেয় যে, তারা জার্মানীর সঙ্গে ভার্সাই সীমান্ত মেনে চলবে। (গ) জার্মানী রাইন অঞ্চলের অসামরিকীকরণ মেনে চলবে। (ঘ) জার্মানী আত্মরক্ষার কারণ ছাড়া আর কোন কারণে ফ্রান্স ও বেলজিয়ামকে আক্রমণ করবে না। (ঙ) ফ্রান্সও আত্মরক্ষার কারণ ছাড়া আর কোন কারণে জার্মানীকে আক্রমণ করবে না। (চ) যদি এই তিন স্বাক্ষরকারীর কেহ আত্মরক্ষার জন্যে অস্ত্র গ্রহণে বাধ্য হয়, তাহলে তা তৎক্ষণাৎ লীগ কাউন্সিলকে জানাতে হবে। (ছ) যদি তিন স্বাক্ষরকারী কেহ চুক্তি ভঙ্গ করে অপর স্বাক্ষরকারীর সীমানা ভঙ্গ করে তবে অপর স্বাক্ষরকারীরা সম্মিলিতভাবে আক্রমণকারীকে প্রতিরোধ করবে।

লোকার্ণোর সন্ধিগুলি

(জ) ইংলন্ড ও ইতালী এই চুক্তির গ্যারান্টর হিসেবে স্বাক্ষর দেয়।

II. জার্মানী-ফ্রান্স ও জার্মানী-বেলজিয়ামের মধ্যে বিরোধের বাধ্যতামূলক নিস্পত্তির জন্যে দুটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই সন্ধিতে বলা হয় যে, স্বাক্ষরকারী দেশগুলি পরস্পরের মধ্যে কোন বিরোধ দেখা দিলে তা বাধ্যতামূলকভাবে শান্তিপূর্ণ উপায়ে নিস্পত্তি করবে। কেহ কাহাকেও আক্রমণ করবে না। ফ্রান্স-বেলজিয়াম ও জার্মানীর মধ্যে ভার্সাই সীমান্ত হল চূড়ান্ত। এ নিয়ে কোন বিরোধ নিস্পত্তি যোগ্য হবে না। এছাড়া অন্য কোন বিষয়ে বিরোধ হলে তা নিস্পত্তি করা হবে।

III. জার্মানী-পোল্যাণ্ড ও জার্মানী-চেকোশ্লোভাকিয়ার মধ্যে দুটি বাধ্যতামূলক নিস্পত্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এতে বলা হয় যে, স্বাক্ষরকারী দেশগুলির মধ্যে কোন বিরোধ দেখা দিলে তা যুদ্ধ দ্বারা সমাধান করা যাবে না। বাধ্যতামূলক সালিশী ব্যবস্থা দ্বারা তা নিস্পত্তি করতে হবে।

IV. ফ্রান্স-পোল্যাণ্ড ও ফ্রান্স-চেকোশ্লোভাকিয়ার মধ্যে দুটি পারস্পরিক আত্মরক্ষার শর্ত যুক্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এতে বলা হয় যে, লোকার্ণো চুক্তি ভেঙে কোন দেশ স্বাক্ষরকারী দেশের যে কোন শক্তিকে আক্রমণ করলে, আক্রান্ত দেশের পক্ষে অন্য স্বাক্ষরকারীরা যোগ দিবে।

উপরোক্ত ৭টি সন্ধিই ছিল লোকার্ণো কংগ্রেসের ফসল। আপাততঃ কিছুদিনের জন্যে লোকার্ণোর সন্ধিগুলি ফ্রান্সের নিরাপত্তার সমস্যাকে সমাধান করে। ফ্রান্স আপাততঃ সন্তুষ্ট হয়। অপরদিকে, জার্মানীর পূর্ব সীমান্তে পোল্যাণ্ডও চেকোশ্লোভাকিয়ার সঙ্গে ভার্সাই সীমান্ত সংশোধনের সুযোগ পায়। এইভাবে লোকার্ণো সন্ধি একদিকে ফ্রান্সের নিরাপত্তার সমস্যা এবং জার্মানীর ভার্সাই সন্ধি সংশোধনের দাবীর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে আপাততঃ সক্ষম হয়। লোকার্ণো সন্ধির অন্যান্য গুরুত্ব আগেই বলা হয়েছে।

লোকার্ণো সন্ধির গুরুত্ব

তথাপি লোকার্ণো সন্ধি ত্রুটিমুক্ত ছিল না। এজন্য বলা হয় যে, লোকার্ণো ছিল এক ভয়ঙ্কর দর্শন কাকতাড়ুয়ার মতই, যার প্রকৃতপক্ষে ইওরোপীয় শান্তি রক্ষা করার ক্ষমতা ছিল না। প্রথমতঃ, লোকার্ণো চুক্তির দ্বারা যেন জার্মানীর দুই দিকে দুই রকম সীমান্ত গঠন করা হয়। জার্মানীর সঙ্গে ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের সীমান্ত ছিল যেন পবিত্র, অপরিবর্তনীয় ও অলঙ্ঘনীয়। ইংলন্ড ও ইতালী এই ভার্সাই সীমান্তকে রক্ষা করার গ্যারান্টি দেয়। জার্মানীও এই সীমান্ত মেনে নিতে প্রতিশ্রুতি দেয়। অপরদিকে, জার্মানীর পূর্ব সীমান্ত ছিল যেন কম পবিত্র এবং শান্তিপূর্ণভাবে পরিবর্তনীয়। ব্রিটেনের চোখে জার্মানীর সঙ্গে ফ্রাঙ্কো-বেলজিয়ান সীমান্ত ছিল প্রথম শ্রেণীর। এই সীমান্তে স্থিতাবস্থা রাখতে ইংলন্ড গ্যারান্টি দেয়। অপরদিকে, পোল্যাণ্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়ার সঙ্গে জার্মানীর সীমান্ত ছিল ইংলন্ডের চোখে দ্বিতীয় শ্রেণীর। এই সীমান্তে নিরাপত্তা ও স্থিতাবস্থা রক্ষার জন্যে ব্রিটিশ গ্যারান্টি পাওয়া যায়নি। কারণ ব্রিটেন এই সীমান্তকে পরিবর্তনযোগ্য মনে করত। তবে বিনা যুদ্ধে শান্তিপূর্ণভাবে এই পরিবর্তন ব্রিটেন চাইত। লোকার্ণো চুক্তি সম্পর্কে ব্রিটেনের এই দ্বৈতনীতির ফলে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, জার্মানীর পূর্ব সীমান্তে পরিবর্তন ঘটলে ব্রিটেনের আপত্তি ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, ই, এইচ, কারের (E.H.Carr) মতে, শেষ পর্যন্ত লোকার্ণো সন্ধি ভার্সাই সন্ধি ও লীগ কভেন্যান্টের ধ্বংস সাধন করে। ভার্সাই সন্ধি স্বাক্ষরিত হওয়ার সময় থেকেই জার্মানী বলে আসছিল যে, এই সন্ধি রচনায় জার্মানীর মতামত না নিয়ে তার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন লোকার্ণো সন্ধির দ্বারা জার্মানীর কাছ থেকে ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের সঙ্গে তার ভার্সাই সীমান্ত মেনে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি নেওয়া হল। এর আইনগত অর্থ এই দাঁড়াল যে, জার্মানী স্বেচ্ছায় ভার্সাই সন্ধির যে শর্ত মেনে নেবে তা হবে বৈধ। আর যে শর্ত জার্মানী স্বেচ্ছায়

লোকার্ণো চুক্তির ফলাফল ও সমালোচনা

মানবে না তা হবে অবৈধ। ভার্সাই সন্ধি যে জার্মানীর মতে Dictated Treaty ছিল, লোকার্ণো সন্ধির দ্বারা ভার্সাই সীমান্ত মেনে নেওয়ার জন্যে জার্মানীর প্রতিশ্রুতি আদায় দ্বারা তা পরোক্ষভাবে স্বীকার করা হল। ই, এইচ· কারের মতে, লোকার্ণো সন্ধি লীগ কভেন্যান্টেরও আইনগত ক্ষতি করে। জার্মানীর পশ্চিম সীমান্তে ইংলন্ড গ্যারান্টি দেয়, জার্মানীর পূর্ব সীমান্তে দেয়নি। এর দ্বারা এই নীতি প্রতিষ্ঠিত হল যে, প্রত্যক্ষ স্বার্থ জড়িত না থাকলে কোন রাষ্ট্র লীগের সদস্য হলেও ভার্সাই সীমান্ত রক্ষায় তার কোন বাধ্য-বাধ্যকতা নেই। চতুর্থতঃ, জার্মানী এর ফলে পূর্ব সীমান্তে ভার্সাই সন্ধির দ্বারা স্থাপিত সীমারেখা পরিবর্তনের পরোক্ষ স্বীকৃতি পায়। তবে জার্মানীকে শর্ত মানতে হয় যে, আলোচনা ও সালিশী দ্বারা জার্মানীকে এই সীমান্ত পরিবর্তন করতে হবে, যুদ্ধের দ্বারা নয়। পঞ্চমতঃ, জার্মানীর পূর্ব সীমান্তে ভার্সাই সন্ধির দ্বারা স্থাপিত পোলিশ কোরিডর, ডানজিগ বন্দরে পোল্যান্ডের আধিপত্য, সাইলেশিয়ার কয়লা খনিগুলির হস্তান্তর কোন দেশপ্রেমিক জার্মানের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। ভবিষ্যতে জার্মানী এই সকল স্থান পুনরধিকার করবে না এরকম কোন গ্যারান্টি জার্মানী লোকার্ণো চুক্তিতে দেয়নি। কিছুদিন পরে ষ্ট্যাসমান বলেন যে, "তাঁর লক্ষ্য হল এক সীমান্ত মেনে নিয়ে অপর সীমান্তকে সংশোধন করা"।[১] কাজেই লোকার্ণো চুক্তির দ্বারা ইওরোপে পুরোপুরি শান্তি স্থাপিত হয় একথা বলা যায় না। ষষ্ঠতঃ, ক্লেঁমাসু তাঁর দেশের রাজনীতিকদের সতর্ক করেন যে, লোকার্ণো চুক্তি ফ্রান্সকে প্রকৃত নিরাপত্তা দিতে পারেনি। জার্মানীর বিরুদ্ধে এই সন্ধিতে যে নিষেধাজ্ঞা ও ফ্রান্সের স্বার্থে যে গ্যারান্টিগুলি দেওয়া হয়েছে তার কোন মূল্য নেই। "All the safeguards will be washed away"। এই গ্যারান্টিগুলি যথাসময়ে বিফল হবে। সপ্তমতঃ, ফ্রান্সকে তার পূর্ব সীমান্তে প্রদত্ত ব্রিটিশ গ্যারান্টির সঙ্গে সহায়ক কোন ফ্রাঙ্কো-ব্রিটিশ সামরিক চুক্তি ছিল না। ফলে ফ্রান্সকে প্রদত্ত গ্যারান্টি কার্যকরী করতে প্রয়োজনীয় ব্রিটিশ সৈন্য ও রসদ সরবরাহের ব্যবস্থা যুক্ত সন্ধি ছিল না। অপরদিকে, জার্মানীকেও ফরাসী আক্রমণের বিরুদ্ধে ব্রিটেন গ্যারান্টি দিলে, দুই গ্যারান্টি রক্ষার জন্যে সামরিক দায়িত্ব ব্রিটেন নেয়নি। মোট কথা, ইঙ্গ-ফরাসী গ্যারান্টি ও ইঙ্গ-জার্মান গ্যারান্টির দ্বারা ব্রিটেন ফ্রাঙ্কো-জার্মান সীমান্তে স্থিতাবস্থা রক্ষার জন্যে যে বিশাল দায়িত্ব গ্রহণ করে, তা পূরণ করার ক্ষমতা ব্রিটেনের একার ছিল না। অষ্টমতঃ, লোকার্ণো কংগ্রেস থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নকে বাইরে রাখা হয়। ফলে সোভিয়েত নেতাদের মনে আশঙ্কা দেখা দেয় যে, জার্মানীর পূর্ব সীমান্তে ব্রিটেনের গ্যারান্টি না দেওয়ার অর্থ ছিল জার্মানীকে পূর্বদিকে রুশ সীমান্তের দিকে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা। ফলে রাশিয়া লোকার্ণো চুক্তিকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বলে মনে করে। নবমতঃ, যদিও পোল্যান্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়ার সঙ্গে ফ্রান্স পারস্পরিক আত্মরক্ষা চুক্তি করে, তথাপি পূর্ব ইওরোপে এই দেশগুলিকে এককভাবে জার্মান আগ্রাসন থেকে রক্ষা করার ক্ষমতা ফ্রান্সের ছিল না। অধিকন্তু লোকার্ণো চুক্তির দ্বারা জার্মানীকে আক্রমণ না করার প্রতিশ্রুতি দানের ফলে পোল-জার্মান বা চেক-জার্মান বিরোধে ফ্রান্সের হস্তক্ষেপ করার সুযোগ সীমিত হয়ে যায়।

এই ত্রুটিগুলি থাকা সত্ত্বেও লোকার্ণো চুক্তি আপাততঃ ইওরোপে নিরাপত্তার বিধান করতে সক্ষম হয়। যুদ্ধের পর এই সর্বপ্রথম ফ্রান্স ও জার্মানীর মধ্যে এক নিরপেক্ষ সমতা রক্ষা করা সম্ভব হয়। জার্মানী লীগের সদস্যপদ পায়। জার্মানীর ললাট থেকে যুদ্ধ অপরাধীর কলঙ্ক চিহ্ন আপাততঃ মুছে দেওয়া হয়।

১· Pinson—Modern Germany.

V কেলগ-ব্রিয়াঁ চুক্তি বা প্যারিসের শান্তি চুক্তি, ১৯২৮ খ্রীঃ (Kellogg-Briand Treaty or Peace Pact of Paris, 1928) : ১৯২৫ খ্রীঃ লোকার্ণো চুক্তির ফলে যে উজ্জ্বল আশাবাদ সৃষ্টি হয় তা ৪ বছরের মধ্যে অনেকটা ফিকে হয়ে যায়। লোকার্ণো চুক্তির ত্রুটিগুলি ফ্রান্সকে আতঙ্কিত করে। ইতিমধ্যে মার্কিন দেশের রাজনৈতিক মহলে যুদ্ধকে বে-আইনী ঘোষণার জন্যে একটি দৃঢ়মত দেখা দেয়। এই সুযোগে ফরাসী মন্ত্রী আরিস্তিদি ব্রিয়াঁ মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব স্যার ফ্রান্সিস কেলগের নিকট আমেরিকা ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ বর্জন করার সন্ধি স্বাক্ষরের প্রস্তাব দেন।

ব্রিয়াঁর উদ্দেশ্য ছিল যে, মার্কিন দেশের মত এক মর্যাদা-সম্পন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধ বর্জন চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে ফ্রান্সের মান-মর্যাদা বাড়বে। যেহেতু আমেরিকার দ্বারা ফ্রান্স আক্রমণের সম্ভাবনা ছিল না, সেহেতু আমেরিকা এই ধরনের সন্ধিতে সহজে রাজী হবে। ফ্রান্সের এই মনোভাব বুঝে মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব ফ্রান্সিস কেলগ প্রস্তাব দেন যে, দ্বি-পাক্ষিকের বদলে প্রস্তাবিত চুক্তিকে বহু পাক্ষিক করা দরকার। মার্কিন উদ্যোগে, ব্রিটেন, জাপান, ইতালী এই ধরনের একটি যুদ্ধ বর্জন চুক্তিতে সম্মতি জানালে, কেলগ প্রথমে ১৭টি রাষ্ট্রের সম্মতি এই যুদ্ধ বর্জন চুক্তির স্বপক্ষে লাভ করেন। কেলগ অংশ গ্রহণকারী দেশগুলিকে আশ্বস্ত করেন যে, তাদের আত্মরক্ষার জন্যে যুদ্ধের অধিকারকে ক্ষুন্ন করা হবে না। প্রথমে মোট ১৫টি দেশ শেষ পর্যন্ত ৬৫টি দেশ এই যুদ্ধ বর্জন চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। এই চুক্তিতে গোড়া ব্রিয়াঁ ও কেলগ উদ্যোগ নেন বলে এই চুক্তিকে কেলগ-ব্রিয়াঁ চুক্তি বলা হয়। যেহেতু চুক্তিটি ১৯২৮ খ্রীঃ প্যারিসে বিভিন্ন রাষ্ট্রের দ্বারা স্বাক্ষরিত হয়, সেহেতু এই চুক্তির পোষাকী নাম হল প্যারিসের শান্তিচুক্তি, ১৯২৮ খ্রীঃ।

যুদ্ধ বর্জন চুক্তি স্থাপনে মার্কিন উদ্যোগ

কেলগ-ব্রিয়াঁ চুক্তিতে বলা হয় যে :—(১) স্বাক্ষরকারী দেশগুলি যুদ্ধকে জাতীয় নীতি হিসেবে গ্রহণ না করতে এবং জাতীয় স্বার্থ ও অধিকার রক্ষার জন্যে যুদ্ধকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার না করতে অঙ্গীকার করছে। (২) স্বাক্ষরকারী দেশগুলির মধ্যে বিবাদ বা যে কোন আন্তর্জাতিক বিবাদ শান্তিপূর্ণভাবে মিটিয়ে নিতে স্বাক্ষরকারীরা অঙ্গীকার করছে। (৩) স্বাক্ষরকারী দেশগুলি ছাড়া অন্য রাষ্ট্রগুলিও এই চুক্তিতে যোগ দিতে পারবে।

কেলগ-ব্রিয়া। চুক্তির শর্ত

কেলগ-ব্রিয়াঁ চুক্তির দ্বারা যে কোন বিবাদের ক্ষেত্রে যুদ্ধকে বর্জন করে, আন্তর্জাতিক শান্তি স্থাপনের প্রচেষ্টা সর্বোচ্চ সীমায় উপনীত হয়। মার্কিন ভাষায় এই সন্ধিকে এজন্য বলা হয়, "সকল প্রকার যুদ্ধকে বে-আইনী ঘোষণাপত্র" (Outlaury of war)। লীগ কভেন্যান্টে যুদ্ধকে বে-আইনী ঘোষণা করা হলেও, কোন কোন ক্ষেত্রে যুদ্ধ বৈধ ছিল। যেমন লীগ কাউন্সিল সর্ব-সম্মত না হলে বিরোধীয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারত না। ফলে বিরোধীয় পক্ষ কাউন্সিলের বিফলতার জন্যে যুদ্ধ করতে পারত। এখন সকল প্রকার যুদ্ধকে বে-আইনী ঘোষণা করে, স্বাক্ষরকারী ৬৫টি রাষ্ট্র যাদের সংখ্যা ছিল লীগের সদস্য সংখ্যা অপেক্ষা বেশী, জাতীয় নীতি হিসেবে যুদ্ধকে গ্রহণ না করার অঙ্গীকার দিলে, লীগ কভেন্যান্ট অপেক্ষা কেলগ-ব্রিয়াঁ চুক্তির গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয়তঃ, জাতিসঙ্ঘের বাইরে এতগুলি রাষ্ট্রের যুদ্ধকে জাতীয় নীতি হিসেবে গ্রহণ না করার অঙ্গীকার ছিল এক ঐতিহাসিক ঘটনা।

কেলগ চুক্তির গুরুত্ব

কিন্তু শীঘ্রই দেখা যায় যে, কেলগ-ব্রিয়াঁ চুক্তি ছিল একটি কাগুজে চুক্তি। এর বাস্তব ভিত্তি ছিল খুবই দুর্বল। প্রথমতঃ, এই চুক্তি যুদ্ধকে বে-আইনী ঘোষণা করলেও আগ্রাসন বা অঘোষিত যুদ্ধ বা আক্রমণকে বে-আইনী ঘোষণা না করায়, আগ্রাসনের সম্ভাবনা থেকে যায়। দ্বিতীয়তঃ, এই সন্ধির অঙ্গীকার অনুযায়ী যুদ্ধ বর্জন না করে কোন স্বাক্ষরকারী যুদ্ধে অংশ নিলে তার শাস্তির কোন ব্যবস্থা এই সন্ধিতে

কেলগ-ব্রিয়া চুক্তির ত্রুটি

ছিল না। এটি ছিল একটি গুরুতর ত্রুটি। সুতরাং স্বাক্ষরকারী দেশের সততার ওপরে এই সন্ধি নির্ভরশীল ছিল। সন্ধি ভঙ্গকারীকে এই সন্ধি মান্য করতে বাধ্য করার কোন ব্যবস্থা সন্ধিতে ছিল না। তৃতীয়তঃ, ফ্রান্স বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই চুক্তির দুই মূল প্রস্তাবক মনে করত যে, আত্মরক্ষার জন্যে যুদ্ধকে কেলগ-ব্রিয়াঁ সন্ধিতে বে-আইনী বলা হয়নি। সুতরাং সকল প্রকার যুদ্ধ এই সন্ধিতে নিষিদ্ধ হয়, এই তাত্ত্বিক ধারণার সঙ্গে বাস্তবের কোন মিল ছিল না। আমেরিকার পথ ধরে ব্রিটেন জানিয়ে দেয় যে, ব্রিটেন তার উপনিবেশগুলির ওপর কোন আক্রমণ হলে তা তার আত্মরক্ষার বিষয় বলে মনে করে যুদ্ধ করবে। মার্কিন সরকার আত্মরক্ষার যুদ্ধের পরিমণ্ডলের ভেতর মনরো নীতিকে অন্তর্ভুক্ত করেন। ফলে আমেরিকা মহাদেশে কোন ইওরোপীয় শক্তির হস্তক্ষেপ অথবা আমেরিকা মহাদেশের ভেতর মার্কিন আধিপত্য স্থাপনের নীতি মার্কিন আত্মরক্ষার পরিমণ্ডলের ভেতর এসে যায়। এর ফলে যুদ্ধকে জাতীয় নীতি হিসেবে গ্রহণ না করার উচ্চ নৈতিক ঘোষণার সঙ্গে স্বাক্ষরকারী দেশগুলির বাস্তব নীতির ফারাক দেখা দেয়। আত্মরক্ষার যুদ্ধ বলতে কি তা প্রত্যেক দেশ নিজেই বিচার করার অধিকার জাহির করে। তৃতীয়তঃ, কেলগ-ব্রিয়াঁ চুক্তি লীগের মর্যাদা খর্ব করে। লীগকে উপেক্ষা করে, লীগের বাইরে যুদ্ধ বর্জন চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে যেন একথাই প্রকটিত হয় যে, আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা ও যুদ্ধ বর্জনের জন্যে লীগের আইন বিধি যথেষ্ট নয়। কোন দেশ নিজে থেকে যুদ্ধ-বর্জন চুক্তিতে স্বাক্ষর না করলে, লীগের ১০—১৬ নং শর্তের দ্বারা তাকে যুদ্ধ ত্যাগ নিতে বাধ্য করা কঠিন। চতুর্থতঃ, কেলগ-ব্রিয়াঁ চুক্তি ভঙ্গকারীকে শায়েস্তা করার জন্যে লীগের ১৬ নং ধারা ব্যবহার না করার ফলে এই চুক্তি একটি কাগুজে বাঘে পরিণত হয়।

তথাপি ই, এইচ, কারের মতে "অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও প্যারিসের শান্তি চুক্তি ছিল একটি দিকচিহ্ন" কারণ আধুনিক যুগের ইতিহাসে প্যারিসের শান্তি চুক্তির মত বিশ্বব্যাপী রাষ্ট্রের স্বাক্ষরযুক্ত (৬৫টি রাষ্ট্র) সন্ধি এর আগে দেখা যায়নি। সোভিয়েত ইউনিয়নও তার প্রাথমিক আপত্তি ত্যাগ করে এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। এই চুক্তির সাফল্য স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রগুলির আন্তরিকতার ওপর নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু জাপান (১৯৩১ খ্রীঃ) ও ইতালী (১৯৩৫ খ্রীঃ) এই চুক্তির শর্ত ভেঙে ফেলে। তথাপি বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্র একমত হয়ে যুদ্ধকে জাতীয় নীতি থেকে বর্জন করার যে শপথ প্যারিসের চুক্তিতে নেয় তার গুরুত্ব হ্রাস পায়নি। কারণ প্যারিসের চুক্তিরক্ষা করার নৈতিক দায়িত্ব ছিল স্বাক্ষরকারী দেশগুলির। এই চুক্তি সকল প্রকার যুদ্ধকে বে-আইনী ঘোষণা করে, কিন্তু কোন যুদ্ধকারীর বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা নেয়নি। লীগ কোন কোন যুদ্ধকে নিষিদ্ধ করে শাস্তির ব্যবস্থা করে এবং কোন কোন যুদ্ধ বৈধ ঘোষণা করে। লীগের শর্তভঙ্গকারীর শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়। আসলে লীগের শাস্তিদান নীতির সঙ্গে, প্যারিসের সন্ধির সকল প্রকার যুদ্ধকে বে-আইনী ঘোষণার নীতির মিলন ঘটান দরকার ছিল। তা করা সম্ভব হয়নি।

আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণ প্রচেষ্টা (The efforts of International Disarmament) ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বে এই প্রত্যয় দেখা দেয় যে, যুদ্ধ বন্ধ করে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণকে সফল করা দরকার। আইন করে যুদ্ধকে বে-আইনী বলা হলেও, যাদের হাতে অস্ত্র থাকে তারা অস্ত্রের ভাষায় কথা বলতে চেষ্টা করে, শান্তির ভাষাকে অগ্রাহ্য করে। ভার্সাই সন্ধিতে জার্মানীর সার্বিক নিরস্ত্রীকরণের সময়, বিজয়ী মিত্রশক্তি ঘোষণা দেয় যে, সকল রাষ্ট্রের অস্ত্র হ্রাসের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে জার্মানীর নিরস্ত্রীকরণ করা হোল। এর পর লীগ চুক্তিপত্রের ৮ম ধারায় বলা হয় যে, "জাতীয় নিরাপত্তার সঙ্গে সংগতি রেখে প্রতি জাতির নিরস্ত্রীকরণ দ্বারা বিশ্বশান্তি রক্ষার ব্যবস্থা করা হবে।"

নিরস্ত্রীকরণের প্রয়োজনীয়তা

১৯২০ খ্রীঃ লীগ কাউন্সিল "অস্থায়ী মিশ্র কমিশন" নামে এক কমিশন গঠন করে নিরস্ত্রীকরণ পরিকল্পনা রচনার জন্যে প্রথম পদক্ষেপ নেয়। ১৯২২ খ্রীঃ পদাতিক সেনার সংখ্যা হ্রাস করার জন্যে ব্রিটেন এই কমিশনে প্রস্তাব দেয় যে, পদাতিক সেনার সংখ্যা কমিয়ে ফ্রান্সকে ৬ ইউনিট, ইতালী ৪ এবং ব্রিটেনকে ৩ ইউনিট হারে পদাতিক সেনা রাখার অধিকার দেওয়া হোক। প্রতি ইউনিট সমান ৩০ হাজার সৈন্য ধরতে হবে। কিন্তু ইওরোপের বিভিন্ন দেশের সামরিক বিশেষজ্ঞগণ এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করায়, প্রস্তাবটি পরিত্যক্ত হয়। ১৯২২-১৯২৫ খ্রীঃ পর্যন্ত লীগের নেতৃত্বে নিরস্ত্রীকরণ ব্যবস্থার বিশেষ কোনও অগ্রগতি হয়নি। যদিও লীগের বাইরে ১৯২১ খ্রীঃ ওয়াশিংটন চুক্তির দ্বারা নৌ-শক্তি হ্রাস সন্ধি জাপান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইতালীর মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়।

অস্থায়ী মিশ্র কমিশনের প্রচেষ্টা ও বিফলতা

১৯২৫ খ্রীঃ লোকার্ণো চুক্তির পর, জার্মানী সকল রাষ্ট্রের নিরস্ত্রীকরণের জন্যে লীগ চুক্তিপত্রের ৮ম ধারাকে কার্যকরী করার জন্যে চাপ দেয়। ফলে লীগ কাউন্সিল ১৯২৫ খ্রীঃ নিরস্ত্রীকরণের জন্যে একটি প্রস্তুতি কমিশন নিয়োগ করে। জার্মানী, সোভিয়েত রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে এই কমিশনে যোগ দিতে আহ্বান জানানো হয়। ১৯২৭ খ্রীঃ ব্রিটিশ, ফরাসী ও জার্মান প্রতিনিধিরা নিরস্ত্রীকরণের জন্যে আলাদা আলাদা খসড়া পেশ করেন। এই খসড়াগুলির মধ্যে বহু পার্থক্য ও পরস্পর-বিরোধী প্রস্তাব ছিল। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায় যে, (১) যেক্ষেত্রে ব্রিটেন, আমেরিকা ও জার্মান সকল প্রকার সামরিক শিক্ষিত সেনার সংখ্যা হ্রাসের প্রস্তাব দেন, সেক্ষেত্রে ফ্রান্স সক্রিয়ভাবে সামরিক চাকুরীতে নিযুক্ত সেনার সংখ্যা হ্রাস করতে রাজী হয়। (২) জার্মানী দাবী করে যে, ভার্সাই সন্ধির দ্বারা তার ওপর যে সকল মারণাস্ত্র নির্মাণের নিষেধাজ্ঞা চাপান হয়, এখন সকলের জন্যে সেই সকল মারণাস্ত্র নির্মাণ নিষিদ্ধ করা হোক। ফ্রান্স বিকল্প প্রস্তাব দেয় যে, মারণাস্ত্র নির্মাণ নিষিদ্ধ না করে, অস্ত্র নির্মাণ খাতে বাজেট বরাদ্দ কমানো হোক। প্রস্তুতি কমিশন এই পরস্পর-বিরোধী প্রস্তাবে সামঞ্জস্য বিধান না করে সকল প্রস্তাবগুলি নথিবদ্ধ করে তার কাজ শেষ করে।

প্রস্তুতি কমিশনের কার্যকলাপ

ইতিমধ্যে লীগের বাইরে ১৯২৭ খ্রীঃ জেনিভা নৌ সম্মেলন ডাকা হয় এবং ১৯৩০ খ্রীঃ লন্ডন নৌ-সম্মেলনে আটলান্টিক মহাসাগরে ইঙ্গ-মার্কিন নৌ-প্রতিযোগিতা হ্রাস করা হয়। ব্রিটেন এই সমুদ্রে তার ক্রুজারের সংখ্যা ৭০ থেকে ৫০-এ নামায়।

লীগের বাইরে লণ্ডন নৌ চুক্তি

অবশেষে লীগের চুক্তিপত্রের ৮নং ধারার বাধ্য-বাধকতা বশতঃ ১৯৩২ খ্রীঃ লীগের সম্মেলন আহূত হয়। প্রায় ৬১টি দেশের প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগ দেন। এই সম্মেলনে ব্রিটিশ বিদেশ মন্ত্রী সভাপতিত্ব করেন। ইতিমধ্যে নির্বাচনে তিনি পার্লামেন্টের সদস্যপদ না পাওয়ায় বেসরকারি ব্যক্তি হিসেবে সম্মেলনে সভাপতির কাজ চালান। সম্মেলনের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের সংযোগ ক্ষীণ হয়। প্রস্তুতি কমিশন ১৯২৫ খ্রীঃ যে প্রস্তাবগুলি সঙ্কলন করে তা ছিল পরস্পর-বিরোধী। তা থেকে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে কোন পথ খুঁজে পাওয়া যায়নি। ফ্রান্স বিশ্বশান্তি রক্ষা ও নিরস্ত্রীকরণ বলবৎ করার জন্যে লীগের অধীনে এক আন্তর্জাতিক পুলিশ বাহিনী গঠনের প্রস্তাব দেয়। বৃহৎ শক্তিগুলি তাদের যুদ্ধ জাহাজ, সাবমেরিন, বিমান ও ভারী কামানগুলি লীগের এই সেনাদলের অধীনে যাতে রাখে ফ্রান্স সেই প্রস্তাব দেয়। ব্রিটেন ও আমেরিকা জাতীয় সার্বভৌম রাষ্ট্রের ওপরে একটি আন্তর্জাতিক বাহিনীর খবরদারী ব্যবস্থার তীব্র বিরোধিতা করে। জার্মানীর মতে প্রকৃত নিরস্ত্রীকরণ এড়াবার জন্যে এটি ছিল ফ্রান্সের

বিশ্ব নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন, ১৯৩২

ফ্রান্সের ভূমিকা

একটি কূটকৌশল। ফ্রান্স সেই প্রস্তাবকে কার্যকরী করার জন্যে কোন চাপ সৃষ্টি করেনি। কিন্তু যখনই কোন ন্যায্য নিরস্ত্রীকরণ প্রস্তাব কোন সদস্য দেয়, ফ্রান্স তৎক্ষণাৎ তার নিরাপত্তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ না হলে গ্রহণীয় নয় বলে জানিয়ে দেয়।

ব্রিটিশ প্রস্তাব

সম্মেলনে ব্রিটিশ প্রতিনিধি প্রস্তাব দেন যে, সংখ্যাগত নিরস্ত্রীকরণ অপেক্ষা মারণাস্ত্রের গুণগত নিরস্ত্রীকরণ (Qualitative limitation) করা উচিত। যে সকল অস্ত্র আক্রমণাত্মক ব্যবহার করা হয় তা নিষিদ্ধ করা হোক। কিন্তু এই প্রস্তাব আলোচনার সময় বিশেষজ্ঞরা জানিয়ে দেন যে, কোন অস্ত্র আক্রমণাত্মক এবং কোনটি রক্ষণাত্মক তার পার্থক্য নির্ণয়ে সদস্যরা ও বিশেষজ্ঞরা একমত নন। বহু সদস্য ট্যাঙ্ককে আক্রমণাত্মক অস্ত্র হিসেবে নিষিদ্ধ করতে চান। কিন্তু ফ্রান্স জানায় যে, ৭০ টনের বেশী ভারী ট্যাঙ্কই একমাত্র আক্রমণাত্মক।

জার্মানীর ভূমিকা ও ম্যাকডোনাল্ড পরিকল্পনা

এই সম্মেলনে একমাত্র জার্মানী আগাগোড়া নির্দিষ্ট প্রস্তাব রাখে যে, ভার্সাই সন্ধিতে যে মারণাস্ত্রকে আক্রমণাত্মক বলে নিষিদ্ধ করা হয়, তাকেই এখন সকলের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ করা হোক। ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ জার্মান প্রস্তাবে ছিদ্র খোঁজার চেষ্টা করে। শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে আমেরিকা প্রস্তাব দেয় যে, এ সকল বিতর্কে না গিয়ে সকল দেশ তাদের সেনা, অস্ত্র, নৌবল $\frac{1}{3}$ হ্রাস করবে। ব্রিটেন এই প্রস্তাব নাকচ করে দেয়। শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড তাঁর নামিত ম্যাকডোনাল্ড পরিকল্পনা পেশ করেন। এতে ইওরোপের বিভিন্ন দেশের কত সংখ্যক পদাতিক সেনা, কত পরিমাণ অস্ত্র, জাহাজ প্রভৃতি হ্রাস করা দরকার তার সংখ্যা দেওয়া হয়। কিন্তু সদস্যদের আন্তরিকতার অভাবে এই প্রস্তাব ব্যর্থ হয়।

ইতিমধ্যে জার্মানীর শাসন ক্ষমতায় নাৎসী নেতা এডলফ হিটলার আসেন। নাৎসী দলের অভ্যুত্থানে ভীত ফ্রান্স অবশেষে প্রস্তাব দেয় যে, (১) প্রথম ৪ বছর যাতে আর কোন দেশ সামরিক শক্তি না বাড়ায় এজন্য আন্তর্জাতিক তত্বাবধানের ব্যবস্থা করা হোক। ৪ বছর পরে প্রকৃত অস্ত্র ও সেনা হ্রাসের কাজ শুরু করা হোক। ফরাসী প্রস্তাব ব্রিটেন, আমেরিকা প্রভৃতি দেশ সমর্থন করে। কিন্তু নাৎসী সরকার দ্বিধাহীন ভাষায় জানায় যে, ফ্রান্সের হাতে এখন এত অস্ত্র ও সেনা আছে যে জার্মানী এই প্রস্তাবকে গ্রহণে অক্ষম। হয় জার্মানীকে ফ্রান্সের সমপরিমাণ ও সমসংখ্যক অস্ত্র ও সেনাবল গঠনে অনুমতি দেওয়া হোক, অথবা ফ্রান্সের অস্ত্র হ্রাস করে জার্মানীর সমান করা হোক। যেহেতু তার প্রস্তাব ফ্রান্স গ্রহণ করেনি, সেহেতু জার্মানী নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন বর্জন করে। এর ফলে কার্যতঃ বিশ্ব নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের পতনের ঘণ্টা বেজে যায়। এর পরে জার্মানী আরও অভিযোগ জানায় যে, যদি ফ্রান্স জার্মানীর প্রস্তাবে রাজীও হয়, অন্যান্য শক্তি তাদের সামরিক বল হ্রাস না করায় জার্মানী আর নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে যোগ দেবে না।

হিটলারের নিরস্ত্রীকরণ নীতির বিরোধিতা ও নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের বিফলতা

ইতিমধ্যে জার্মানী তার সমরসজ্জা শুরু করায়, ফ্রান্সের পক্ষে জার্মান প্রস্তাব গ্রহণ অসম্ভব হয়। এমনকি ব্রিটেন ফ্রান্সের নিরাপত্তার জন্যে গ্যারান্টি দিতে রাজী হলেও ফ্রান্স, জার্মানীর সঙ্গে সমক্ষমতা যুক্ত বাহিনীর প্রস্তাব নাকচ করে দেয়। বিশ্ব নিরস্ত্রীকরণের আশা নির্মূল হয়ে যায়।

একাদশ অধ্যায়
বিশ্ব অর্থনৈতিক সঙ্কট
(The World Economic Crisis)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে (১৯১৮ খ্রীঃ) প্রায় এক দশকের মধ্যে এক বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা সোভিয়েত ইউনিয়ন ছাড়া প্রায় সকল দেশে দেখা দেয়। এই মন্দা সর্বপ্রথম আমেরিকায় দেখা দেয়। মার্কিন শেয়ার বাজারে অকস্মাৎ ধ্বস নামে এবং ওয়াল ষ্ট্রীটের শেয়ার মার্কেটে হাহাকার দেখা দেয়। মার্কিন ব্যাঙ্কগুলি শেয়ার বাজারে বহু টাকা লগ্নী করেছিল। ফলে ব্যাঙ্কগুলিও দরজা বন্ধ করে। দুমাসের মধ্যে মার্কিন বিনিয়োগকারীরা ৪০,০০০ মিলিয়ন ডলার হারায় এবং ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ায় আমানতকারী জনগণ সর্বস্বান্ত হয়।

আমেরিকায় মন্দা

আমেরিকা থেকে এই মন্দা অর্থনৈতিক ভূমিকম্পের মত ইওরোপে ও এশিয়ায় ছড়ায়। ইওরোপের অধিকাংশ দেশের মুদ্রা ডলারের দামে বাঁধা ছিল এবং ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ আমেরিকাকে যুদ্ধকালীন ঋণ মেটাত। জার্মানী মার্কিন ঋণ গ্রহণ করে তার অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা চালাচ্ছিল। এই সকল দেশ মার্কিন অর্থনৈতিক মন্দার ধাক্কায় দারুণ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। কেবলমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে মার্কিন বা ইওরোপীয় দেশগুলির অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিল না বলে মন্দার ধাক্কা এখানে দেখা যায়নি। অনেকে বলেন যে, কমিউনিষ্ট অর্থনীতিতে সকল কিছুই পরিকল্পনা ও জনসাধারণের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে করা হত। উদ্বৃত্ত উৎপাদন এবং সেই মালের রপ্তানির সমস্যা সোভিয়েত ইউনিয়নের ছিল না বলে সোভিয়েত ইউনিয়ন বেঁচে যায়। মার্কিন ঋণ প্রদান বন্ধ হওয়ায় জার্মানীর অবস্থা সর্বাপেক্ষা শোচনীয় হয়।

মার্কিন দেশে মন্দার প্রথম প্রকাশ ও তার প্রভাব

এই মহামন্দার সঠিক কারণ জানা যায়নি। বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও অর্থনীতিবিদ মহামন্দার বিভিন্ন কারণ উল্লেখ করেন।

গ্যাথোর্ন হার্ডির মতে, যুদ্ধের সময় মার্কিন দেশ প্রচুর যুদ্ধাস্ত্র তৈরি করে তা রপ্তানি করত। যুদ্ধ শেষে এই অস্ত্র রপ্তানি বন্ধ হলে মার্কিন ভারী শিল্পে দারুণ আঘাত পড়ে। লোহা ও কয়লা শিল্পের ওপর তার প্রভাব পড়ে। এছাড়া যুদ্ধের সময় থেকে বিভিন্ন ভোগ্যপণ্য, খাদ্যশস্য এবং শিল্পদ্রব্য মার্কিন দেশ ইওরোপকে রপ্তানি করত। সেই চাহিদার ফলে মার্কিন শিল্পদ্রব্যের ও খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়ান হয়েছিল। এখন যুদ্ধ শেষে ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ তাদের নিজ নিজ শিল্প ও খাদ্য উৎপাদনের ওপর জোর দিলে আমেরিকার রপ্তানি বাণিজ্যে ঘাটতি দেখা দেয়।

মার্কিন ভারী শিল্পদ্রব্যের রপ্তানী হ্রাস

দ্বিতীয় একটি কারণ হিসেবে বলা হয় যুদ্ধ ঋণ পরিশোধ ও পণ্য ক্রয় বাবদ ইওরোপ থেকে প্রচুর সোনা মার্কিন দেশে পাঠাতে হয়। এজন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সোনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভাণ্ডারে জমা হয়। এজন্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। যারা মার্কিন দেশের মাল কিনত অথবা যারা মার্কিন দেশকে ঋণ পরিশোধ করত তাদের স্বর্ণভাণ্ডার শূন্য হয়ে গেলে তারা আর মার্কিন মাল খরিদ অথবা মার্কিন

সোনা রপ্তানির সমস্যা

দেশের প্রাপ্য ঋণের টাকা পরিশোধ করতে পারেনি। এজন্য মার্কিন উদ্বৃত্ত শিল্প ও খাদ্যদ্রব্য গুদামে পচতে থাকে। তার ক্রেতা ছিল না। অধিকন্তু মন্দা দেখা দিলে বিভিন্ন দেশ তাদের যতটুকু সোনা বা মূল্যবান ধাতু ছিল তা বাঁচাবার জন্যে শুল্ক প্রাচীর তুলে মাল আমদানী বন্ধ করার চেষ্টা করায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ভয়ানক মন্দা দেখা দেয়। এই সকল দেশ আমদানী বন্ধ করায় মন্দা চেপে বসে।

এক্ষেত্রে একমাত্র যে পথ খোলা ছিল, তা হল মার্কিন সঞ্চিত ডলার বিভিন্ন দেশকে ধার দিয়ে তাদের স্বর্ণ মান বৃদ্ধি করা এবং ডলার গ্রহণকারী দেশগুলিকে স্বাভাবিক মাল আমদানী-রপ্তানি নীতি গ্রহণে উৎসাহিত করা। কিন্তু মার্কিন দেশের ধনভাণ্ডারে ডলার উপছে পড়লেও, তা দীর্ঘমেয়াদী ঋণ হিসেবে বিনিয়োগে আমেরিকা রাজী হয়নি। তার কারণ ছিল যে, ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ যুদ্ধের সময় ব্রিটেন থেকে গৃহীত ঋণ পরিশোধে ঢিলেমি করায়, ঋণ প্রদানের অভিজ্ঞতা সুখকর ছিল না। রুশ জার সরকার বিরাট আন্তর্জাতিক ঋণ গ্রহণ করার পর উত্তরাধিকারী বলশেভিক সরকার সেই ঋণ নাকচ করায়, জার্মানী ক্ষতিপূরণ পরিশোধে আপত্তি করায়, মার্কিন ধনকুবেরদের এই ধারণা হয় যে ঋণগ্রহীতা দেশগুলি ঋণ পরিশোধে অনিচ্ছা দেখায়। এজন্য মার্কিন সিন্ধুকের ডালা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

মার্কিন পুঁজির বিনিয়োগে অনিচ্ছা

তৃতীয়তঃ, যুদ্ধের সময় আমেরিকা ও কানাডার গম ইওরোপের মিত্রশক্তি ব্যাপক আমদানী করত। এখন যুদ্ধের পর ইওরোপের কৃষিতে জোয়ার দেখা দিলে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা প্রভৃতি দেশের খাদ্যশস্য ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের রপ্তানি অকস্মাৎ হ্রাস পায়। মার্কিন কৃষক, কানাডার গম উৎপাদক, ব্রাজিলের কফি খামারের মালিক অকস্মাৎ দেখে যে, তাদের পণ্যের দাম পড়ে গেছে, চাহিদাও নেই। একে টাকার দাম পড়ে যায়, অপরদিকে লোকের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পেলে কৃষিপণ্য ও শিল্পদ্রব্যের চাহিদা দারুণ ক্ষয় পায়। এতে কৃষিপণ্যের রপ্তানিকারক দেশগুলির অর্থনীতিতে ধ্বস নামে। ক্রমে এই সঙ্কট এক দেশ থেকে অন্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে। কৃষিপণ্য, কাঁচা মালের উৎপাদন ও বিক্রির সঙ্গে শিল্পদ্রব্যের বাজারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। কৃষিপণ্যের বিপণনের সঙ্কট ও নিম্নমুখী দাম শিল্পদ্রব্যের উৎপাদনকেও ব্যাহত করে। চাহিদার অভাবে কল-কারখানাগুলি বন্ধ হয়ে যায়। অসংখ্য শ্রমিক বেকার হয়।

ইওরোপে মার্কিন ও কানাডার গম আমদানী হ্রাসের ফল

মার্কিন ডলার লগ্নীর সঙ্গে জার্মান ক্ষতিপূরণ প্রদানের সমস্যা যুক্ত হয়ে আরও অবস্থা জটিল হয়। ডাওয়েজ ও ইয়ং পরিকল্পনা অনুসারে মার্কিন ঋণ জার্মানীকে দেওয়া হয়। জার্মানী এই ঋণের টাকা কিছু ক্ষতিপূরণ খাতে দেয়, বাকি টাকা উন্নয়ন খাতে খরচ করে। ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি এই ক্ষতিপূরণের টাকা পেয়ে মার্কিন যুদ্ধ ঋণ শোধ করে। এখন জার্মানীকে মার্কিন ঋণ প্রদান মহামন্দার জন্যে স্থগিত করা হলে, জার্মানরা ক্ষতিপূরণের অর্থপ্রদান রদ করে। হুভার মরেটোরিয়াম অনুযায়ী ২$\frac{১}{২}$ বছরের জন্যে ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং মার্কিন ঋণ শোধ রদ করা হয়। কিন্তু তাতে অবস্থায় বিশেষ উন্নতি হয়নি। কারণ জার্মান অর্থনীতি পুরো মার্কিন ঋণের ওপর নির্ভরশীল ছিল। কাজেই তা ধ্বসে পড়ে। অপরদিকে, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ ক্ষতিপূরণ পাওয়ার আশায় আগেই সেই বাবদে প্রদেয় টাকা খরচ করে ফেলে।

ক্ষতিপূরণ সমস্যার প্রভাব

অনেকের মতে শুধু সোনার রপ্তানি নয়, রূপার অতিরিক্ত আমদানী বৃদ্ধি মুদ্রামূল্য হ্রাসের প্রধান কারণ ছিল। এর ফলে যে সকল দেশে রৌপ্যমান প্রচলিত ছিল সেখানে রূপার অতিরিক্ত

রূপার আমদানী বৃদ্ধির ফল

আমদানীর ফলে টাকার দাম পড়তে থাকে। লোকের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়। টাকার দাম পড়ে গেলে লোকে কৃষি ও শিল্পজাত পণ্য ক্রয় করতে অক্ষম হয়। মালের চাহিদা দ্রুত ক্ষয় পেলে, কল-কারখানা বন্ধ হয়, কৃষিতে উদ্বৃত্ত পণ্য বিক্রির অভাবে পচতে থাকে। সকল কিছু অচল হয়ে যায়।

মোট কথা, ১৯২৯-৩০ খ্রীঃ-এর মহামন্দার কোন একটিমাত্র কারণ ছিল না। উপরোক্ত সকল কারণের সমন্বয়ে এই মহামন্দা দেখা দেয়।

মহামন্দার ফলাফল (The Results of the World Economic crisis)ঃ ১৯৩০-এর মহামন্দার প্রতিক্রিয়া ছিল তাৎক্ষণিক এবং সুদূরপ্রসারী। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ধনতন্ত্রী মুক্ত দুনিয়ার ওপর এত বড় আঘাত আর কখনও ঘটেনি। মহামন্দা ছিল যেন এক রক্তপাত হীন যুদ্ধ যার ফলে বিশ্ব অর্থনীতিতে বিরাট ধ্বস দেখা দেয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ধনতন্ত্রী বিশ্বের অর্থনৈতিক লেনদেন ছিল না। এজন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন এই মহামন্দার হাত থেকে বেঁচে যায়। এর ফলে অনেক দেশে কমিউনিষ্ট রাশিয়ার পঞ্চবার্ষিকী

আদর্শ গত প্রভাব

পরিকল্পনা ভিত্তিক অর্থনীতির প্রতি আগ্রহ দেখা দেয়। অনেকে বলতে থাকেন যে, ইওরোপে শিল্প-বিপ্লবের ফলে যে ধনতন্ত্রী সমাজ গঠিত হয়েছে, যার মূলমন্ত্র হল অধিক উৎপাদন ও অধিক মুনাফা, এই মহামন্দা হল তারই কুফল, এজন্য বহু লোক ধনতন্ত্রী অর্থনীতি ও উদারতন্ত্রী, বুর্জোয়া শাসনব্যবস্থার প্রতি আস্থা হারায়। উদারতন্ত্রী মূল্যবোধ, গণতান্ত্রিক আদর্শ বিপন্ন হয়।

দ্বিতীয়তঃ, গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে মহামন্দার সর্বনাশা প্রভাব বেশী তীব্র ছিল। এজন্য

উদারতন্ত্র ও গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা হ্রাস

গণতান্ত্রিক ও উদারতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার ওপর লোকের আস্থা নষ্ট হয়। কারণ উদারতান্ত্রিক সরকারগুলি এই মহামন্দার ধাক্কা সামলাতে পারেনি। উদারপন্থার অঙ্গ অবাধ বাণিজ্য, মুক্ত অর্থনীতি, সীমাহীন উৎপাদন দ্বারা সীমাহীন সম্পদ অর্জন, শিল্প-বাণিজ্যে সরকারি হস্তক্ষেপ না করা প্রভৃতি ভাবধারা ধিকৃত হয়। উদারতন্ত্রী সরকারগুলিতে সর্বত্র ফাটল দেখা দেয়।

তৃতীয়তঃ, উদারতন্ত্র ও গণতন্ত্রের প্রতি আস্থাহীনতা দেখা দিলে তার বিকল্প হিসেবে কোন কোন দেশ ফ্যাসীবাদ বা নাৎসীবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়, কোন কোন দেশ বলশেভিক সাম্যবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক সরকারের ব্যর্থতার ফলে কিছু লোক

ফ্যাসীবাদ ও ডিক্টেটর শিপের প্রভাব বৃদ্ধি

ভাবতে থাকে যে একদলীয়, একনায়কতন্ত্র শাসনের কেন্দ্রীয়তা থাকলে এরকম বিপর্যয় রোখা যেত। অনেকে অর্থনৈতিক মন্দা, বেকারত্ব, মুদ্রা মূল্য হ্রাসের ফলে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হতাশাগ্রস্থ হয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণী যারা ছিল গণতন্ত্রের প্রধান স্তম্ভ তারাই জার্মানী প্রভৃতি দেশে আশাহত হয়। এজন্য ডিক্টেটরশিপ বা একনায়কতান্ত্রিক, একদলীয় শাসনের দিকে ঝোঁক বাড়ে। অপর দিকে, বহু মধ্যবিত্ত ও শ্রমিক সাম্যবাদের মধ্যে মুক্তির পথ খোঁজে। মোট কথা, কিছুদিনের জন্যে মহামন্দার ফলে রাজনৈতিক মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটে।

জার্মানীর ক্ষেত্রে এই মহামন্দার ফল ছিল ভয়াবহ। একেই বিশ্বযুদ্ধে অর্থনৈতিক ধ্বস ও ক্ষতিপূরণের বোঝায় জার্মানী ছিল ডুবন্ত অবস্থায়। ডাওয়েজ ও ইয়ং পরিকল্পনার দ্বারা জার্মানীতে মার্কিন ঋণের প্রবাহ বইলে জার্মানী তাতে কিছুটা স্বস্তি পায়। জার্মানীর নিজস্ব অর্থনীতি ছিল ভাঙা-চোরা। তার মাঝে মহামন্দার ধাক্কায় জার্মানীর নাভিশ্বাস দেখা দেয়।

জার্মানীর ওপর মহামন্দার প্রভাব

প্রথমতঃ, মার্কিন ঋণের সমর্থন না থাকায়, জার্মানীর কাগজের মুদ্রা বা মার্কের দাম ভয়ানকভাবে বাড়তে থাকে। শেষ পর্যন্ত দোকানদারেরা এই মার্ক নিতে রাজী হয়নি। তারা ব্রিটিশ পাউন্ড বা মার্কিন ডলার দাবী করে।

একদা যে সকল জার্মান ধনকুবেরের ঘরে কোটি কোটি মার্ক মূল্যের নোট জমা ছিল, মার্কের বাজার পড়ে গেলে তারা হঠাৎ গরীব হয়ে যায়। সমাজে ভয়ানক ওলোট-পালোট ঘটে যায়। দ্বিতীয়তঃ, জার্মানীর রপ্তানি বাণিজ্য ১৯২৯ খ্রীঃ ৬৩০,০০০,০০০ পাউন্ড থেকে পরের বছর ২৮০,০০০,০০০ পাউন্ডে নেমে আসে। জার্মানীর আমদানী বাণিজ্য ৬৭০,০০০,০০০ পাউন্ড থেকে ২৩০,০০০,০০০ পাউন্ডে নেমে যায়। জার্মানীর নথিভুক্ত বেকারের সংখ্যা ১৯২৯ খ্রীঃ ২,০০০,০০০ থেকে ১৯৩২ খ্রীঃ ৬,০০০,০০০ দাঁড়ায়। এই পরিসংখ্যান প্রমাণ করে যে, জার্মানীর অর্থনৈতিক ধ্বস কত গভীর ছিল। তৃতীয়তঃ, জার্মানীর ভাইমার প্রজাতন্ত্রের প্রতি জার্মান জনসাধারণের আস্থা বিনষ্ট হয়। জার্মানীর ১৯৩৩ খ্রীঃ সাধারণ নির্বাচনে পার্লামেন্টে নাৎসী সদস্যদের সংখ্যা ১২ থেকে ১০৭-এ দাঁড়ায়। বলা বাহুল্য, নাৎসীরা ছিল একনায়কতন্ত্রবাদী, ভাইমার বিরোধী, ভার্সাই বিরোধী গোষ্ঠী। চতুর্থতঃ, এই মন্দার ধাক্কা থেকে বাঁচতে জার্মানী ও অষ্ট্রিয়া উভয় দেশ শুল্ক জোট গঠন করে। কিন্তু ফ্রান্স তার নিরাপত্তার আশংকায় এই জোট গড়ার বিরোধিতা করে। ফ্রান্সের বক্তব্য ছিল যে, অর্থনৈতিক জোট শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক জোটে পরিণত হবে, যা ভার্সাই সন্ধি ও লীগের শর্ত বিরোধী। ব্রিটেন যদিও এই জোটের বিরোধী ছিল না, ফ্রান্সের চাপে ব্রিটেনকে লীগের সভায় বিষয়টিকে হেইগ আদালতের কাছে বিচার্য হিসেবে পাঠান হয়। হেইগ আদালত এই জোটকে অবৈধ ঘোষণা করে। ফরাসী, ব্রিটিশ, পোলিশ বিচারকরা এই রায় দিলে জার্মানী তা পক্ষপাতদুষ্ট বলে মনে করে। পঞ্চমতঃ, অষ্ট্রো-জার্মান অর্থনৈতিক জোট ভেঙে গেলে জার্মানীর অর্থনৈতিক দুর্দশা, মুদ্রাস্ফীতি চরমে ওঠে। ভাইমার প্রজাতন্ত্রের পতনের শেষ ঘণ্টা বেজে যায়। নাৎসী নেতা হিটলার ১৯৩৩ খ্রীঃ ক্ষমতা দখল করেন।

এই মহামন্দার ফলে ইওরোপে অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ বা Economic nationalism প্রবল হয়ে ওঠে। প্রতি রাষ্ট্র উচ্চ শুল্ক প্রাচীর তুলে অন্যদেশ থেকে মাল আমদানী বন্ধ করতে চেষ্টা করে। এজন্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বড়রকমের ধাক্কা খায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও মনরো নীতির দোহাই দিয়ে ইওরোপের অর্থনৈতিক জটিলতা ও ইওরোপীয় মাল আমদানী থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে চেষ্টা করে। ব্রিটেন স্বর্ণমান ত্যাগ করে রৌপ্যমান গ্রহণ করে। অটোয়া (Ottowa) চুক্তির দ্বারা কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলিকে নিয়ে আলাদা নির্দিষ্ট পারস্পরিক শুল্ক হার স্থির করে। এইভাবে বিভিন্ন দেশ আঞ্চলিক অর্থনৈতিক শুল্ক গঠনের চেষ্টা করে। এই অর্থনৈতিক স্বতন্ত্রতা স্থাপনের চেষ্টা, ঐতিহাসিক ল্যাংসামের মতে, ইওরোপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিমণ্ডল রচনা করে। কোন কোন দেশ ভাবতে থাকে যে, এই আন্তর্জাতিক মহামন্দাকে কাটাতে হলে যুদ্ধই হল একমাত্র পথ।

অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের উদ্ভব

এই মহামন্দার হাত থেকে বাঁচতে ১৯৩৩ খ্রীঃ মার্চ মাসে বিশ্ব অর্থনৈতিক সম্মেলন আহুত হয়। প্রায় ৬৪টি দেশ এই সম্মেলনে যোগ দেয়। ফ্রান্স ও তার সহায়ক দেশগুলি জেদ ধরে যে মুদ্রা মূল্যের স্থিতি হলে তবেই শুল্ক প্রাচীর হ্রাস করা হবে। মার্কিন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট অবশ্য ব্রিটেনের সঙ্গে একমত হন যে, শুল্ক হ্রাস সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ অত্যন্ত জরুরী। মুদ্রামূল্য স্থির করে পুরে শুল্ক হ্রাসের কথা ভাবা উচিত নয়। এই মতভেদের ফলে আন্তর্জাতিক সম্মেলন ভেঙে যায়। E. H. Carr-এর মতে, বিশ্ব অর্থনৈতিক সম্মেলন ব্যর্থ হওয়ার প্রধান কারণ এই যে, সম্মেলনের সদস্যরা বিশ্ব অর্থসঙ্কটের সমাধানের আশু পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যবস্থা না করে মহামন্দার পূর্ববর্তী যুগের মত মুদ্রামানের স্থিরত্ব এবং তার সঙ্গে শুল্ক হ্রাসের প্রশ্নকে জড়িত করেন। আসলে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত জাতীয় অর্থনীতি প্রাধান্য পাচ্ছিল। এভাবেই মহামন্দার পর বিশ্ব অর্থনৈতিক কাঠামো নতুনভাবে গড়ে ওঠে।

আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্মেলন ও তার ব্যর্থতা

দ্বাদশ অধ্যায়

যুদ্ধোত্তর জার্মানী ঃ নাৎসী জার্মানীর উত্থান

(Germany after World War: Rise of Nazi Germany)

ভাইমার প্রজাতান্ত্রিক জার্মানীর উত্থান ও পতন (The Rise and fall of Weimer Republican Germany) ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ দিকে কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম জার্মানীতে জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর পরাজয় গর্বিত জার্মান জাতির মনে দারুণ অসন্তোষ সৃষ্টি করে।এই পরাজয়ের জন্যে তারা কাইজারকে দায়ী করে। যুদ্ধের শেষে জার্মানীতে দারুণ অর্থনৈতিক দুরবস্থা ও খাদ্যাভাব দেখা দেয়। এজন্য জার্মানীতে কাইজারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘটে। কিয়েল বন্দরের জার্মান নৌ-সেনা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। সোভিয়েত রাশিয়ার অনুকরণে শ্রমিক ও সেনাদের নিয়ে কিয়েলে একটি সোভিয়েত স্থাপিত হয়। কিয়েলের অনুকরণে জার্মানীর কয়েকটি শহরে সোভিয়েত স্থাপিত হয়। দক্ষিণ জার্মানীর ব্যাভেরিয়ায় একটি সমাজতন্ত্রী সোভিয়েত স্থাপিত হয়। জার্মানীতে অন্তর্বিদ্রোহ দেখা দিলে কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম পদত্যাগ করে হল্যান্ডে আশ্রয় নেন। জার্মানীর সমাজতান্ত্রিক নেতা ফ্রেডারিখ্ এবার্টের (Ebert) নেতৃত্বে জার্মানীতে একটি প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হয়।

যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতি: প্রজাতন্ত্র ঘোষণা

জার্মানীর এই প্রজাতন্ত্রের পশ্চাতে কোন দৃঢ় দলীয় সমর্থন ছিল না। জার্মানীর সমাজতন্ত্রী দল ছিল বহুধা বিভক্ত। এদের বেশীর ভাগই ছিল ভূতপূর্ব সমাজতন্ত্রী। এরা ভূমি ও অর্থনৈতিক সংস্কার দ্বারা প্রজাতন্ত্রকে শক্তিশালী করার লক্ষ্য ত্যাগ করে।

অপর দিকে জার্মান কমিউনিস্ট দল যার নাম ছিল স্পার্টাসিস্ট (Spartatcist) দল, তার উদ্দেশ্য ছিল এক সমাজতান্ত্রিক সরকার স্থাপন। কিন্তু তাদের সমর্থকের সংখ্যা এত কম ছিল যে, তাদের দ্বারা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করা সম্ভব ছিল না। যাই হোক, স্পার্টাসিস্ট দল সামরিক অভ্যুত্থানের দ্বারা সরকারি ক্ষমতা দখলের পরিকল্পনা করে। স্পার্টাসিস্ট নেতা কার্ল লাইবনিখ্‌ট ও রোজা লাক্সোমবার্গের নেতৃত্বে এই দল ১৯১৯ খ্রীঃ জানুয়ারি মাসে বার্লিন নগরী দখলের চেষ্টা করে। প্রজাতান্ত্রিক সরকারের প্রধান এবার্ট ও তাঁহার সহকর্মীরা বার্লিনে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। শেষ পর্যন্ত সরকারের সমর্থক স্বেচ্ছাবাহিনী বা ফ্রি কোর (Free corps)লালপন্থী স্পার্টাসিষ্টদের হঠিয়ে বার্লিন নগরীকে অবরোধ মুক্ত করে। ফ্রি কোর বা স্বেচ্ছা সেনাদল ছিল প্রধানতঃ বুর্জোয়া সমর্থিত। এই সেনাদল বহু স্পার্টাসিষ্টদের হত্যা করে। উত্তেজিত জনতা দুই প্রধান কমিউনিষ্ট বা স্পার্টাসিষ্টদের নেতা রোজা লাক্সোমবার্গ ও লাইবনেখ্‌টকে হত্যা করে। সরকারি বাহিনী ব্যাভেরিয়ার প্রতিবাদী কমিউনিষ্ট সরকারকেও দমন করে। এছাড়া মিউনিখে কমিউনিষ্ট বিদ্রোহ দমন করা হয়।

জার্মান সমাজতন্ত্রী দলের বিদ্রোহ

কমিউনিষ্ট বিদ্রোহ দমনের পর অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট এবার্ট প্রজাতন্ত্রের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন। এই নির্বাচনের ফলে জাতীয় সভার মোট ৪২৩ জন সদস্যের মধ্যে ১৬৫ জন

প্রজাতন্ত্রের সংবিধান

এবার্টের সমর্থক নির্বাচিত হয়। জাতীয় সভা এবার্টকে স্থায়ী রাষ্ট্রপতি পদে নিয়োগ করে। জাতীয় সভা বিখ্যাত ভাইমার (Wiemer) সংবিধান গ্রহণ করে। ভাইমার সংবিধান ছিল কাগজ-কলমে অসাধারণ গণতান্ত্রিক সংবিধান। এই সংবিধানে জার্মান রাইখকে একটি ঐক্যবদ্ধ শৃঙ্খলাপূর্ণ রাষ্ট্রে পরিণত করা হয়। সংবিধানের মূল কঁথা ছিল যে, জনসাধারণের সার্বভৌমত্বের ওপরেই সরকার নির্ভরশীল থাকবে। এই সংবিধানে বলা হয় যে, "জার্মান প্রজাতন্ত্র জার্মান জনগণের সার্বভৌম শক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।" ভাইমার প্রজাতন্ত্রের কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে সেনাদল, অর্থদপ্তর এবং যোগাযোগ, বৈদেশিক নীতি, মুদ্রা, শুল্কনীতি, রেল প্রভৃতি দপ্তরের ভার রাখা হয়। কেন্দ্রে অঙ্গরাজ্যগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে রাইখষ্ট্যাগ সভা গঠিত হলেও এই সভার আইন রচনার ক্ষমতা ছিল না। নিম্নকক্ষ আইন পাশ করলে তা কিছুদিন মূলতুবী রাখতে পারত। আসল ক্ষমতা ছিল নিম্নকক্ষ বা রাইখষ্ট্যাগের হাতে। এই সভার সদস্যরা ২০ বছর বয়সী জার্মান নরনারীদের গোপন ভোটে নির্বাচিত হত। ভাইমার সংবিধানে রাষ্ট্রপতি ৭ বছরের জন্যে সর্ব সাধারণের ভোটে নির্বাচিত হবেন বলা হয়। অর্থাৎ ভাইমার সংবিধানে মার্কিন সংবিধান থেকে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি এবং ব্রিটিশ ও সুইস সংবিধান থেকে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের আদর্শ গ্রহণ করা হয়। যদিও তাত্ত্বিক দিক থেকে রাষ্ট্রের কার্যনির্বাহক ক্ষমতা ছিল রাষ্ট্রপতির হাতে, আসলে তা ছিল চ্যান্সেলর বা প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীসভার হাতে। রাষ্ট্রপতি এই চ্যান্সেলরকে মনোনয়ন করতেন। কিন্তু চ্যান্সেলর ও তাঁর মন্ত্রীসভা তাঁদের কাজের জন্যে রাইখষ্ট্যাগের কাছে দায়ী থাকবেন। ভাইমার সংবিধানে একসঙ্গে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি ও নির্বাচিত পার্লামেন্টের ব্যবস্থা এই সংবিধানকে আদর্শ গণতান্ত্রিক সংবিধানে পরিণত করে। ৮ নং ধারা অনুযায়ী জরুরী অবস্থা দেখা দিলে নাগরিক স্বার্থ রক্ষার জন্যে রাষ্ট্রপতি বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারতেন। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার জার্মানীর সকল প্রদেশের ওপর সরাসরি কর আদায়ের অধিকার পায়। এই সংবিধানে সুইস সংবিধানের মত রেফারেণ্ডামের ব্যবস্থা ছিল। জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সম্পর্কে জনমত যাচাই করে তবে ব্যবস্থা গ্রহণের কথা সংবিধানে বলা হয়। আইন প্রনয়ণে জনগণের প্রস্তাবকে গুরুত্ব দেওয়ার বিধান রাখা হয়। এই সংবিধানে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার রক্ষা' গ্যারান্টি দেওয়া হয়, যথা—বাক্ স্বাধীনতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং ধর্মীয় অধিকার রক্ষার স্বাধীনতা, আইনের চক্ষে সকল নাগরিকের সমান অধিকার, ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের অধিকার প্রভৃতি।

ভাইমার সংবিধান একটি আদর্শ গণতান্ত্রিক সংবিধান হলেও, এই সংবিধানকে কার্যকরী করার জন্যে প্রয়োজনীয় সামাজিক পরিবর্তন জার্মানীতে ঘটেনি। কাইজার ও জার্মানীর বিভিন্ন রাজারা পদত্যাগ করলেও, কাইজারের আমলের আমলাতন্ত্র, জমি মালিক শ্রেণী, সামরিক বৃত্তিধারী শ্রেণী, শিল্পপতি শ্রেণী জার্মানীতে তাদের আধিপত্য ভোগ করতে থাকে। এই ধরণের আধা সামন্ততান্ত্রিক, আধা বুর্জোয়া সমাজের ওপর ভাইমার সংবিধান খাপ খাওয়াতে পারেনি। ময়ূর পুচ্ছধারী দাঁড়কাকের গায়ে বসান ময়ূরের পালকগুলি যেমন উদ্ভট ও কৃত্রিম মনে হয়, জার্মানীর কর্তৃত্ববাদী, সামন্ত ও বুর্জোয়া সমাজে ভাইমার সংবিধান মূল শিকড় খুঁজে পায়নি। অধিকন্তু যুদ্ধে জার্মানীর পরাজয় ও ভাইমার সরকারের প্রতিষ্ঠা সমকালীন ঘটনা হওয়ার ফলে সাধারণ জার্মানদের মনে ভাইমার প্রজাতন্ত্রকেই যুদ্ধে পরাজয় ও ভার্সাই সন্ধির জন্যে দায়ী করার প্রবণতা দেখা দেয়। জাতীয়তাবাদী নাৎসী দল এই ঘৃণ্যতম মিথ্যা ইতিহাস বিরোধী মত প্রচার করে যে, ভাইমার সরকারই ভার্সাই সন্ধির জন্যে দায়ী। নতুবা জার্মানী যুদ্ধ চালু রাখলে জিতে যেত। আধা সামন্ত, আধা বুর্জোয়া, সামরিক ও আমলা শাসিত সমাজে ভাইমার গণতন্ত্রের জন্যে কোন আবেগ ছিল না।

ভার্সাই সন্ধিকে জার্মান পার্লামেন্টের চূড়ান্ত অনুমোদন দানের বিষয়টি প্রজাতান্ত্রিক

সরকারের সম্মুখে বিশেষ প্রধান সমস্যা হিসেবে দেখা দেয়। দক্ষিণপন্থী জাতীয়তাবাদী ও নাৎসী দল এই সন্ধি অনুমোদনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। এমনকি একজন জার্মান সেনাপতি এই পরিকল্পনা দেন যে, ভার্সাই সন্ধি অগ্রাহ্য করে পূর্ব জার্মানী থেকে মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ চালান দরকার। শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি এবার্টের উন্মাদনাময়ী ভাষণে অভিভূত হয়ে জাতীয় পরিষদের সদস্যরা ভার্সাই সন্ধিতে স্বীকৃতি দেন। এবার্ট বুঝেছিলেন যে, পরাজিত জার্মানীর পক্ষে ভার্সাই সন্ধি স্বাক্ষর ছাড়া গতি নেই। কিন্তু সাধারণ জার্মানরা সেকথা বুঝত না। তাদের চোখে ভার্সাই সন্ধি ছিল এক অতি নিষ্ঠুর, রক্তাক্ত সন্ধি; যে সন্ধিতে প্রজাতন্ত্রী সরকার স্বাক্ষর দেয়। ভাইমার প্রজাতন্ত্রের যেটুকু জনপ্রিয়তা ছিল, তা এজন্য বিনষ্ট হয়।

ভার্সাই সন্ধির অনুমোদন

ভাইমার প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হবার পর জার্মানীর বিভিন্ন বিরোধী শক্তি এই প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়ে ওঠে। প্রজাতন্ত্রের সমর্থনে কোন শক্তিশালী রাজনৈতিক দল এগিয়ে না আসায় এই প্রজাতন্ত্র ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ে। চরম দক্ষিণপন্থী ও চরম বামপন্থী শক্তিগুলি সর্বদা এই সরকারের পতন ঘটাতে চেষ্টা করে। দক্ষিণপন্থী নাৎসী দল এই প্রচার চালায় যে, ভাইমার সরকার হল জার্মান জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতক। এই সরকার ভার্সাই সন্ধিকে স্বীকার করে জার্মানীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

দক্ষিণপন্থী বিদ্রোহ

এদিকে প্রজাতন্ত্রী সরকারের বেশীর ভাগ কর্মচারীরা ছিল কাইজারের আমলের। এরা প্রজাতন্ত্রের প্রতি মোটেই অনুগত ছিল না। সরকারের নীতি না মান্য করে এরা স্বেচ্ছামত কাজ করতে থাকে। প্রজাতন্ত্রী সরকার এদের নিয়ন্ত্রণে আনতে অক্ষম হয়। বিদ্যালয়ের ছাত্রদের পাঠদানের সময় কাইজার সরকার ও ভাইমার সরকারের তুলনা করে কাইজার সরকার কত ভাল ছিল তা ছাত্রদের বোঝাতে থাকেন। পুলিশ ও প্রশাসনও দক্ষিণপন্থী মতের প্রভাবে প্রজাতন্ত্রী সরকারের প্রচ্ছন্ন বিরোধীতা চালায়। প্রজাতন্ত্রী সেনাদলের অধিকাংশ সেনা ও অফিসার কাইজারের রাজতন্ত্রী আদর্শের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখায়। এমন কি প্রধান সেনাপতি হ্যান্স ফন শেক্ট (Hans Von Seeckt) কেন্দ্রীয় সরকারের অজ্ঞাতে জার্মান সেনার প্রশিক্ষণের জন্যে সোভিয়েত সরকারের সঙ্গে গোপন ব্যবস্থা করেন। তিনি লোকার্নো চুক্তির গোপন শর্তগুলি সোভিয়েত সরকারকে জানিয়ে দেন। এইভাবে সরকারি কর্মচারীদের আনুগত্যের অভাবে ভাইমার প্রজাতন্ত্রের মৃত্যুর ঘণ্টা বাজিয়ে দেয়।

সরকারি কর্মচারীদের আনুগত্যের অভাব

মিত্রশক্তি ভার্সাই সন্ধির শর্ত অনুসারে জার্মান সেনাদলকে ভেঙে দেওয়ার জন্যে দাবী জানায়। এই দাবী অনুযায়ী, প্রজাতন্ত্রী সরকার নৌ-বাহিনীর একাংশ ভেঙে দেওয়ার আদেশ দিলে উলফগ্যাং ক্যাপ নামে এক ব্যক্তির নেতৃত্বে জার্মান নৌ-সেনা বার্লিন দখল করে এক প্রতিদ্বন্দ্বী সরকার (১৯২০ খ্রীঃ) ঘোষণা করে। জার্মান কমিউনিষ্টরা এই সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে ধর্মঘট ডাকলে এর পতন ঘটে। যুদ্ধ ফেরৎ বেকার পদচ্যুত সেনাদল আর গ্রামের নিরানন্দময় জীবনে ফিরে যেতে রাজী ছিল না। এই বাতিল সেনাদলকে বলা হত Free Corps বা ফ্রাই কোর। এদের সঙ্গে প্রজাতন্ত্র বিরোধী দক্ষিণপন্থীদের, বিশেষতঃ নাৎসী দলের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। প্রজাতন্ত্রী সরকারের সামরিক অফিসাররা বেশীরভাগ প্রজাতন্ত্রের অনুগত ছিলেন না। তাঁরা গোপনে ফ্রিকোরকে অস্ত্র সরবরাহ করতেন। দক্ষিণপন্থীরা ভাবতেন যে, প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের জন্যে ফ্রিকোরের সহায়তা লাগবে। নাৎসী দল ক্রমে এদের নিজস্ব জঙ্গী বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করে এবং ব্যাভেরিয়াকে কেন্দ্র করে দক্ষিণপন্থীরা প্রজাতন্ত্র বিরোধী চক্রান্ত চালায়। এইভাবে দক্ষিণপন্থী বিদ্রোহ প্রজাতন্ত্রী সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করে।

ক্যাপ বিদ্রোহ

একই সঙ্গে জার্মানীতে বামপন্থী বিদ্রোহ দেখা দেয়। জার্মান কমিউনিষ্ট দল ব্যাভেরিয়াতে একটি প্রতিদ্বন্দ্বী সরকার ঘোষণা করে। কেন্দ্রীয় সরকার এই স্বতন্ত্রতাবাদী আন্দোলন দমনে বিফল হয়। শেষ পর্যন্ত হিটলারের নাৎসী বাহিনী গৃহযুদ্ধ দ্বারা ব্যাভেরিয়ার বিপ্লব ধ্বংস করে। এর ফল এই হয় যে, নাৎসী দল সাধারণ লোকের আস্থা অর্জন করে। প্রজাতন্ত্রী সরকার অযোগ্য প্রমাণিত হয়।

বামপন্থী বিদ্রোহ

এদিকে জার্মানীর অর্থনৈতিক দুরবস্থা তীব্র হয়ে ওঠে। মুদ্রাস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি জার্মানীর জনজীবনকে দুঃসহ করে তোলে। ঐতিহাসিক E. H. Carr-এর মতে, "ভার্সাই সন্ধি অপেক্ষা মুদ্রাস্ফীতি ছিল ভাইমার জার্মানীর পক্ষে প্রধানতর বিপদ।"[১] সর্বাপেক্ষা বিপদ এই হয় যে, বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলি জার্মান মুদ্রার বিনিময় হার অত্যন্ত বৃদ্ধি করে। এজন্য জার্মান মুদ্রার দাম দ্রুত পড়তে থাকে। ১৯১৪ খ্রীঃ এক মার্কিন ডলারের সমান ছিল জার্মান ৪·২ মার্ক; ১৯১৬ খ্রীঃ তা দাঁড়ায় ৮·৯ মার্ক। একটি পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে, ১৯১৪ খ্রীঃ ১ পাউন্ড সমান ছিল ১৫ জার্মান মার্ক। ১৯২২ খ্রীঃ তা দাঁড়ায় এক পাউন্ড সমান ৭৬০ জার্মান মার্ক। ১৯২৩ খ্রীঃ তা দাঁড়ায় ৭২,০০০ মার্ক। একই বছরের নভেম্বর মাসে তা দাঁড়ায় ১৬,০০০ মিলিয়ন মার্কে। কোন সরকারের পক্ষে এরপর টিকে থাকা কঠিন ছিল। এই মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সমতা রেখে উৎপাদন না বাড়ায় মূল্য আরও বাড়তে থাকে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় মিত্রশক্তিকে প্রদেয় ক্ষতিপূরণের অর্থের চাপ। ভাইমার সরকার জার্মান জনসাধারণের ওপর ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্যে কর স্থাপন না করে, সরকারি আয় থেকে তা পরিশোধের চেষ্টা করে। মুদ্রার ঘাটতি পূরণের জন্যে তারা প্রচুর কাগজের নোট ছাপায়। এর ফলে মুদ্রার মান আরও নামতে থাকে। জিনিষপত্রের দাম বৃদ্ধি পায়। যারা বেতনভোগী স্থায়ী আয়ের লোক ছিল জিনিষপত্রের দাম বাড়লে তাদের অবস্থার দারুণ অবনতি ঘটে। একমাত্র যাদের কিছু জায়গা জমি ছিল তারা কোনক্রমে রক্ষা পায়। মুদ্রাস্ফীতি ভাইমার সরকারের পক্ষে এক মারাত্মক অভিশাপে পরিণত হয়। ইতিমধ্যে ১৯৩০ খ্রীঃ বিশ্ব অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দেয়। এজন্য জার্মান প্রজাতন্ত্র মার্কিন ঋণ থেকে বঞ্চিত হয়। এর ফলে জার্মানীর ব্যাঙ্ক ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ হয়ে যায়। দেশে হাহাকার দেখা দেয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণী ভাইমার সরকার সম্পর্কে হতাশাগ্রস্ত হয়ে নাৎসী দলের প্রচারে প্রভাবিত হয়। মুদ্রাস্ফীতির ফলে বেতনভোগী ও পেনসনভোগী মধ্যবিত্তদের সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীরও দুর্গতি বাড়ে। ভাইমার প্রজাতন্ত্রের এই দুর্গতির সুযোগে বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থী উভয় গোষ্ঠীর চরমপন্থীরা কেন্দ্রীয় সরকার দখলের জন্যে চেষ্টা চালায়। জার্মানীর হামবুর্গে (Hamburg) একটি কমিউনিষ্ট অভ্যুত্থান ঘটে। ব্যাভেরিয়া থেকে নাৎসী দলও অভ্যুত্থানের ডাক দেয়। এই সময় প্রধানমন্ত্রী গুস্তাফ ষ্ট্রাসম্যান সংবিধানের ৪৮ ধারা অনুযায়ী জরুরী ক্ষমতা হাতে নিয়ে দৃঢ় হাতে হামবুর্গের বিদ্রোহ দমন করেন। ব্যাভেরিয়ার রাজ্য সরকারকে নাৎসী পুটস বা ক্ষমতা অধিকারের প্রচেষ্টা দখলে বাধ্য করেন। আপাততঃ ভাইমার প্রজাতন্ত্র রক্ষা পায়।

মুদ্রাস্ফীতি ও অর্থনৈতিক দুরবস্থা

দেশের এই সঙ্কট সময়ে গাষ্টাভ ষ্ট্রাসম্যান নামে এক বিশিষ্ট রাজনীতিজ্ঞ হাল ধরার চেষ্টা করেন। তিনি পশ্চিমী শক্তির সঙ্গে আপোষ নীতি নিয়ে তাদের সাহায্যে জার্মানীর উন্নয়নের চেষ্টা করেন। তাঁর নীতির নাম ছিল পরিপূর্ণতা নীতি (Policy of Fulfilment)। এর সাহায্যে তিনি ক্ষতিপূরণ সমস্যা ও ভার্সাই সন্ধির

ষ্ট্রাসম্যানের নীতি

১· "Inflation was a greater distress to Germany than the Versailles Treaty.

কঠোর শর্তগুলি সংশোধনের আশা করেন।[১] ষ্ট্রাসম্যানের এই নীতি মোটামুটিভাবে সফল হতে থাকে। ১৯২৪ খ্রীঃ ডাওয়েজ পরিকল্পনা (Dawes Plan) দ্বারা জার্মানীকে প্রদেয় ক্ষতিপূরণ কিস্তির অর্থের পরিমাণ হ্রাস করা হয়। জার্মানীকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঋণ দেয়। ১৯২৫ খ্রীঃ বিখ্যাত লোকার্নো চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির ফলে আপাততঃ ফরাসী-জার্মান বিরোধ প্রশমিত হয়। জার্মানী, ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের সঙ্গে ভার্সাই সীমান্ত স্বীকার করে। পোল্যান্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়ার সঙ্গে সকল প্রকার বিরোধ শান্তিপূর্ণভাবে মিটিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ১৯২৮ খ্রীঃ জার্মানী কেলগ-ব্রিয়া চুক্তিতে স্বাক্ষর দেয়। জার্মানী লীগ অফ নেশনসের সদস্য পদ লাভ করে।[২] ক্ষতিপূরণ সমস্যার চূড়ান্ত সমাধানের জন্যে ১৯২৯ খ্রীঃ ইয়ং পরিকল্পনা (Young Plan) রচিত হয়। এর দ্বারা জার্মানীর প্রদেয় মোট ক্ষতিপূরণের পরিমাণ হ্রাস করা হয়। জার্মানীকে সহজ কিস্তিতে ক্ষতিপূরণের অর্থ পরিশোধ করতে দেওয়া হয়। জার্মানী মার্কিন ঋণ পায়।

ষ্ট্রাসম্যানের মৃত্যু

কিন্তু ১৯২৯ খ্রীঃ ষ্ট্রাসম্যানের অকস্মাৎ মৃত্যু ঘটার ফলে জার্মানী থেকে শেষ বিচক্ষণ রাজনীতিবিদের তিরোধান ঘটে। ভাইমার প্রজাতন্ত্রকে রক্ষা করার মত কোন নেতা না থাকায়, এই প্রজাতন্ত্রের ধ্বংসের পথ প্রস্তুত হয়। জার্মান যুবশক্তি প্রজাতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি আস্থাহীন হয়ে পড়ে। বেকার সমস্যা, অর্থনৈতিক দুর্দশায় জর্জরিত জার্মানী প্রতিক্রিয়াশীল নাৎসীবাদ ও বামপন্থী সমাজতন্ত্রবাদের মধ্যে দোলায়িত হতে থাকে। এই সময় জার্মানীকে স্থিতি দান করার মত শক্তি নব-নিযুক্ত রাষ্ট্রপতি ফিল্ড মার্শাল হিন্ডেনবুর্গের ছিল না।

মহামন্দার ফলাফল

ইতিমধ্যে ১৯৩০ খ্রীঃ জার্মানীতে মহামন্দার ধাক্কা লাগে। এই মারাত্মক আঘাতে ভাইমার প্রজাতন্ত্রের যেটুকু প্রাণশক্তি ছিল তা শেষ হয়ে যায়। এই প্রজাতন্ত্রের আর রক্ষা পাওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না। প্রথমতঃ, মহামন্দার ফলে মার্কিন ঋণ বন্ধ হলে জার্মানীতে অর্থনৈতিক ধ্বস দেখা দেয়। জার্মানীতে কাগজের মুদ্রার দাম বা মার্কের দাম ভয়ানকভাবে পড়তে থাকে। (ওপরের দেওয়া পরিসংখ্যান দ্রষ্টব্য)। দ্বিতীয়তঃ, এই মহামন্দার ফলে ভাইমার গণতন্ত্রের প্রতি সাধারণ লোকের আস্থা নষ্ট হয়। মহামন্দাকে রোখার জন্যে প্রজাতন্ত্র অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে শুল্ক জোট বা অর্থনৈতিক জোট গঠনের উদ্যোগ নিলে ফ্রান্সের বিরোধীতায় এই প্রচেষ্টা ত্যাগ করতে হয়। এর ফলে প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে জার্মান বুর্জোয়া শ্রেণী ক্ষেপে যায়। এই সুযোগে নাৎসী দল ও কমিউনিষ্টরা ১৯৩০ খ্রীঃ-এর নির্বাচনে বহু আসন দখল করে।

নাৎসী দলের উত্থান

ইতিমধ্যে দক্ষিণপন্থী নেতা এডলফ হিটলার তাঁর "বিয়ার হল অভ্যুত্থান" দ্বারা জার্মানীতে নাৎসী বিপ্লবের সূচনা করেন। তিনি জার্মান বেকার যুবক ও যুদ্ধ ফেরৎ সেনাদল নিয়ে তাঁর আধা সামরিক S. A. বা ঝটিকা বাহিনী গঠন করেন। জার্মানীতে সাধারণ নির্বাচনের সময় তিনি জার্মান কমিউনিষ্ট ও সমাজতন্ত্রীদের সভাগুলিকে S. A. বা ঝটিকা বাহিনী দ্বারা ভেঙে দেন। কল-কারখানার শ্রমিক ইউনিয়নগুলিকেও তিনি এই বাহিনী দ্বারা ভেঙে ফেলেন। জার্মান পার্লামেন্ট অগ্নিদগ্ধ হলে তিনি কমিউনিষ্টদের এজন্য দায়ী করে মিথ্যা প্রচার চালান। ১৯৩১ খ্রীঃ অর্থনৈতিক সঙ্কটে জার্মানীর ভাইমার সরকারের অর্থনীতি ভেঙে পড়ে। এই সুযোগে নাৎসীদল বেকারদের চাকুরীদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে জনপ্রিয়তা বাড়ায়। সাধারণ নির্বাচনে তারা ১২ জন সদস্যের স্থলে আইনসভায় ১০৭ জন

১· A. J. P. Taylor—Origins of the Second World War.
২· E. H. Carr.

সদস্য লাভ করে। এর ফলে নাৎসী দল একক-সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে নির্বাচিত হয়। রাষ্ট্রপতি হিন্ডেনবুর্গ নাৎসী নেতা এডলফ হিটলারকে প্রধানমন্ত্রী বা চ্যান্সেলর নিয়োগ করেন। হিটলার চ্যান্সেলর হয়ে ভাইমার সংবিধানের ৪৮নং ধারা প্রয়োগ করে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে সংবিধান ও পার্লামেন্ট মূলতুবী করেন। এর ফলে হিটলার সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হন। রাষ্ট্রপতি হিন্ডেনবুর্গের মৃত্যু হলে হিটলার একাধারে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী উভয় ক্ষমতা নিজহাতে সংহত করে নাৎসী শাসন চালু করেন। এভাবে জার্মানীর ভাইমার প্রজাতন্ত্রের পতন ঘটে।[১]

ভাইমার সরকারের বিদেশ নীতি ঃ গুস্তাফ ষ্ট্রাসম্যানের বিদেশ নীতি (The Foreign Policy of the Weimer Republic : The Policy of Gustav Stressemann) ঃ কাইজারের পতনের পর জার্মানীতে যে ভাইমার প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়, সেই সরকারকে কাইজারের যুদ্ধ নীতির পরিণাম হিসেবে আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক ধ্বস ও বিশৃঙ্খলা ছাড়াও কাইজারের বৈদেশিক নীতির ভয়াবহ ফল ভুগতে হয়। কাইজারের পতনের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধে জার্মানীর পতন প্রায় চূড়ান্ত হয়ে যায়। প্রজাতন্ত্রকে সিদ্ধান্ত নিতে হয় যে জার্মানী আর যুদ্ধ চালিয়ে যাবে অথবা আত্মসমর্পণ করবে। জার্মানীকে যে অবস্থায় কাইজার রেখে যান এবং মিত্রশক্তি যেভাবে জার্মানীকে নৌ-অবরোধ ও স্থল বাহিনীর দ্বারা পর্যুদস্ত করে তারপর যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার কোন অর্থই ছিল না। কিন্তু আত্মগর্বিত জার্মানরা পরাজয়কে বাস্তব সত্য বলে মানতে কিছুতেই রাজী ছিল না। অথচ ১৯১৮ খ্রীঃ নভেম্বরে জার্মানীর সামরিক পরাজয় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

প্রজাতন্ত্রী সরকারের যুদ্ধে আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত ঃ জার্মান জনমতের বিরোধিতা

এমতাবস্থায় ভাইমার প্রজাতন্ত্র উইলসনের চতুর্দশ নীতির ভিত্তিতে এই নীতি মেনে নিয়ে আত্মসমর্পণ করে। ভাইমার সরকার এ সময় দৃঢ়ভাবে জানায়নি যে, কাইজারের ঘোষিত যুদ্ধের পরিণাম বহন করতে উত্তরাধিকারী প্রজাতান্ত্রিক সরকারের কোন দায়িত্ব নেই। এ ব্যাপারে তারা দৃঢ়তা দেখাতে ব্যর্থ হয়। প্যারিসের সন্ধি বৈঠকে প্রজাতন্ত্র সন্ধির শর্ত আলোচনার জন্যে একটি প্রতিনিধি দল পাঠায়। মিত্রশক্তি জার্মানীকে যুদ্ধ অপরাধী ঘোষণা করে। তারা এই প্রতিনিধি দলকে সন্ধির শর্ত আলোচনার কোন সুযোগ দেয়নি। মিত্রশক্তি ভার্সাই সন্ধির খসড়া রচনা করে প্রতিনিধিদলকে সে সম্পর্কে মতামত জানাতে স্বল্প সময় দেয়। প্রতিনিধিদল যে আপত্তিগুলি তুলে তা একতরফাভাবে নাকচ করে, প্রতিনিধিদলকে ভার্সাই সন্ধিতে স্বাক্ষর দানের দাবী জানান হয়। নতুবা জার্মানীতে বিমান হানার হুমকি দেওয়া হয়। অগত্যা জার্মান প্রতিনিধিদল অসহনীয় অপমানের মধ্যে ভার্সাই সন্ধি স্বাক্ষর করেন।

সন্ধি বৈঠকে ভাইমার প্রতিনিধিদের অবমাননার মধ্যে সন্ধি স্বাক্ষর

এখন প্রশ্ন দাঁড়ায় প্রজাতান্ত্রিক সরকার এই সন্ধিকে চূড়ান্ত অনুমোদন (Ratification) দেবেন কিনা। জার্মান জনমত ছিল এ বিষয়ে বিভ্রান্ত। বেশীর ভাগ জার্মান তখনও বিসমার্কীয় যুগে জার্মানীর অপরাজেয়তার দিবাস্বপ্নে মশগুল ছিল। অস্ত্র সমর্পণ ও যুদ্ধ বিরতিকে তারা পরাজয় বলে মানতে চায়নি। জার্মান জাতীয়তাবাদী দলগুলি তাদের প্রচারের মাধ্যমে জার্মানদের বিশ্বাস করতে সক্ষম হয় যে, প্রজাতন্ত্রী সরকার দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে অস্ত্র সমর্পণ ও ভার্সাই সন্ধিতে স্বাক্ষর করেছে। জার্মানী যুদ্ধ চালালে যুদ্ধে জয়লাভ

ভার্সাই সন্ধির চূড়ান্ত অনুমোদন দান ও তার জাতীয় প্রতিক্রিয়া

১· W. Shirer—The Rise and Fall of the Third Reich

করত। এই আত্মবঞ্চনামূলক মানসিকতার চোরাবালিতে দাঁড়িয়ে প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি এবার্ট (Ebert)কে বাস্তব ও রূঢ় সত্যের সম্মুখীন হতে হয়। রাইখষ্ট্যাগের সদস্যদের সন্ধিতে অনুমোদন দানের প্রাথমিক বিরোধিতা তিনি তাঁর যুক্তিপূর্ণ বাগ্মীতার দ্বারা জয় করেন। আইনসভা ভার্সাই সন্ধিকে অনুমোদন দেয়।

অতঃপর ক্ষতিপূরণ সমস্যা সম্পর্ক ফ্রাঙ্কো-জার্মান বিরোধ দেখা দেয়। জার্মানীর অভিযোগ ছিল যে ঃ (১) ক্ষতিপূরণ প্রদানে জার্মানী অপারক। জার্মানীর অর্থনৈতিক দুর্দশার কারণে ক্ষতিপূরণের দাবী মকুব করা উচিত। (২) ক্ষতিপূরণের জন্যে ধার্য অর্থের পরিমাণ নায্য দাবী অপেক্ষা অনেক বেশী। জার্মানীর এই আপত্তি নস্যাৎ করে লন্ডন সিডিউল অনুযায়ী জার্মানীকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হলে, জার্মানী একটি কিস্তি প্রদান করে। জার্মানীর অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণে আপাততঃ কিস্তি পরিশোধে মূলতুবী চায়। ফ্রান্স এই দাবী নাকচ করে, কিস্তি খেলাপের শাস্তি হিসেবে জার্মানীর রূঢ় অঞ্চল অধিকার করে। জার্মানী প্রতিবাদে রূঢ় অঞ্চলে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ নীতি নিলে, ফ্রান্স জার্মানীকে ধ্বংস করার জন্যে প্রতিহিংসামূলক নীতি নেয়।

ক্ষতিপূরণ সমস্যা ও ফ্রান্স কর্তৃক রূর অধিকার

ফ্রান্স রূঢ় অঞ্চলে তার সেনাদল দ্বারা দমন নীতি নেয়। রূঢ় অঞ্চলে অবরোধ ঘোষণা করে, রূঢ়ের শিল্পদ্রব্য জার্মানীতে প্রেরণ বন্ধ করে। রাইন অঞ্চলে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন দ্বারা রাইন অঞ্চলকে জার্মানী থেকে ভেঙে ফেলার চেষ্টা করে।

ফ্রান্সেব প্রতিহিংসা নীতি

এই পারাস্থাতে ফ্রাঙ্কো-জার্মান বিরোধিতায় ব্রিটেন মধ্যপন্থা নীতি নিলেও জার্মানী তুষ্ট হয়নি। ইতিমধ্যে র্মানীতে একটি মত দেখা যায় যে, যেহেতু ভার্সাই সন্ধির শর্তগুলি জার্মানীকে ধ্বংস করার জন্যে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, তা থেকে জার্মানীকে নিস্কৃতি পেতে হলে, অপর ভার্সাই বিরোধী শক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে জার্মানীর মিত্রতা স্থাপন করা দরকার। কাইজারের আমলের জেনারেল স্কেক্ট রাশিয়ার সহযোগীতায় ভার্সাই সন্ধির ৫ম অনুচ্ছেদ ভেঙে জার্মান সেনাদল গঠনের প্রস্তাব দেন। জার্মান কূটনীতিকরা বলেন যে, জার্মানীর পূর্বসীমায় পোল্যান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্র স্থাপন করে এবং এই রাষ্ট্রগুলিকে ফরাসী গ্যারান্টি দিয়ে যে বেষ্টনী রচনা করা হয়েছে, তা, রাশিয়ার সহায়তায় ভেঙে ফেলা যাবে। এজন্য ১৯২০ খ্রীঃ জার্মানী ও সোভিয়েত রাশিয়া র‍্যাপালোর সন্ধি (Rapallo Treaty) স্বাক্ষর করে। র‍্যাপালোর সন্ধির দ্বারা ঃ (১) উভয় স্বাক্ষরকারী পরস্পরকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেয়। (২) উভয় স্বাক্ষরকারী পরস্পরের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করতে রাজী হয়। (৩) এই সন্ধির শর্ত অনুযায়ী জার্মান সেনাদলকে রুশভূমিতে সমর শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়। গ্যাথোর্ন হার্ডির মতে, "র‍্যাপালোর সন্ধি পশ্চিমী দেশগুলির কাছে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতই ছিল" (Bolt from the blue)। এই সন্ধির দ্বারা দুই ভার্সাই বিরোধী শক্তির জোট গঠন এবং ভার্সাই সন্ধির পঞ্চম অনুচ্ছেদ ভেঙে রাশিয়ার সহায়তায় জার্মানীর সামরিক শক্তি বৃদ্ধির সম্ভাবনায় ফরাসী সরকার কাতর হয়ে পড়ে। ব্রিটেনের আশঙ্কা হয় যে, রাশিয়া থেকে কমিউনিজমের বন্যা জার্মানীতে ঢুকে পড়তে পারে।

রুশ-জার্মান সম্পর্ক ও র‍্যাপালোর সন্ধি

ইতিমধ্যে ক্ষতিপূরণ সমস্যা ও ফ্রাঙ্কো-বেলজিয়ান বাহিনী দ্বারা রূঢ় অধিকারের ফলে ফ্রাঙ্কো-জার্মান সম্পর্কের অত্যন্ত ক্ষতি হয়। শেষ পর্যন্ত ডাওয়েজ পরিকল্পনার ফলে ক্ষতিপূরণের প্রশ্নের অচল অবস্থা দূর হয়। প্রতিশোধ নীতির প্রবক্তা ফরাসী মন্ত্রী রেমন্ড পয়েনকারীর পতনের ফলে ফ্রাঙ্কো-জার্মান সম্পর্কে কিছুটা উন্নতি দেখা দেয়।

ডাওয়েজ পরিকল্পনা ও ক্ষতিপূরণ প্রশ্নের সরলীকরণ

এই পরিস্থিতিতে ফ্রান্স তার নিরাপত্তার জন্যে অনুসন্ধান অবিরাম চালাচ্ছিল। ভাইমার জার্মানীর নতুন চ্যান্সেলর গুস্তাফ ষ্ট্রাসম্যান ক্ষমতায় এসে ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি Ebert বা এবার্টের নীতি পরিবর্তন করেন। ষ্ট্রাসম্যানকে ঐতিহাসিক এ· জে· পি· টেইলার জার্মানীর রাষ্ট্রনায়ক বিসমার্কের সঙ্গে তুলনা করেছেন। টেইলারের মতে, ইতিহাস জার্মানীতে তিন বিসমার্কের সৃষ্টি করেছে, যাঁরা হলেন, স্বয়ং বিসমার্ক, ষ্ট্রাসম্যান ও হিটলার। বিসমার্ক ভিয়েনা সন্ধির দ্বারা বিভক্ত জার্মানীকে যুদ্ধের দ্বারা ঐক্যবদ্ধ করেন। ঐক্য স্থাপিত হলে, তিনি যুদ্ধ নীতি ছেড়ে কূটনীতির দ্বারা জার্মানীর ঐক্য রক্ষা করেন এবং জার্মানীর ক্ষমতাকে সংহত করেন। ষ্ট্রাসম্যান ভার্সাই সন্ধির দ্বারা বিভক্ত ও বিধ্বস্ত জার্মানীকে, যুদ্ধ না করে, কেবলমাত্র কূটনীতির দ্বারা এ ব্যবচ্ছেদকে দূর করে জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী করার নীতি নেন। অপরদিকে এডলফ হিটলার একই পরিস্থিতিতে যুদ্ধের দ্বারা কার্যসিদ্ধির চেষ্টা করেন। এজন্য ঐতিহাসিক টেইলারের মতে, "ষ্ট্রাসম্যান ছিলেন উত্তম বিসমার্ক।" তিনি প্রায় বিনা যুদ্ধে উদ্দেশ্য সিদ্ধির কাছে পৌঁছে যান। তাঁর অকাল মৃত্যুর ফলে তাঁর পরিকল্পনা সফল হয়নি। ষ্ট্রাসম্যানের নীতিকে "Policy of Fulfilment" বা পরিপূর্ণতা নীতি বলা হয়।

ষ্ট্রাসম্যানের কূটনীতি ঃ এ· জে· পি· টেইলারের অভিমত

ঐতিহাসিক হেনরী পিনসনের মতে, ষ্ট্রাসম্যান একটি গোপন পত্রে প্রাশিয়ার যুবরাজের কাছে তাঁর লক্ষ্য ও নীতি ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন যে, (১) তিনি জার্মানীর এক সীমান্তে (পশ্চিম সীমান্তে) ভার্সাই সীমান্ত মেনে নিয়ে, জার্মানীর অপর সীমান্তে (পূর্ব সীমান্তে) তা ভেঙে ফেলার ব্যবস্থা করবেন। দ্বিতীয়তঃ, রাশিয়ার সঙ্গে মিত্রতা করে জার্মানীর প্রধান সমস্যা অর্থাৎ ভার্সাই সন্ধির পরিবর্তন করা যাবে না। পশ্চিমী শক্তিগুলির আস্থা অর্জন করতে পারলে তবেই জার্মানী ভার্সাই সন্ধি সংশোধন করতে পারবে। এজন্য ফ্রাঙ্কো-জার্মান সীমান্তে ভার্সাই সীমারেখা জার্মানী মেনে নিলে ফ্রান্সের ও ব্রিটেনের আস্থা পাওয়া যাবে। এই আস্থা লাভ করলে জার্মানী পূর্ব সীমান্তে পরিবর্তনের সুযোগ পাবে। তৃতীয়তঃ, ষ্ট্রাসম্যান বলেন যে, ১২ মিলিয়ন জার্মান পিতৃভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। জার্মানী যদি পশ্চিমী শক্তির আস্থা পায় তবে জার্মানী লীগের সদস্যপদ পাবে। লীগের সদস্য হিসেবে জার্মানী এই ১২ মিলিয়ন জার্মানদের মুখপাত্র হয়ে কাজ করতে পারবে। চতুর্থতঃ, পশ্চিমী শক্তির আস্থা পেলে তারা জার্মানী থেকে দখলদার বিদেশী বাহিনী প্রত্যাহার করবে। জার্মানী বিদেশী শক্তির কবলমুক্ত হয়ে আপন সংগঠনে হাত দিতে পারবে।

ষ্ট্রাসম্যানের বিদেশ নীতির লক্ষ্য

ষ্ট্রাসম্যানের এই পরিপূর্ণতা বা Fulfilment Policyর ফল ছিল লোকার্ণোর সন্ধি (১৯২৫ খ্রীঃ) (বিশদ বিবরণ নিরাপত্তার সন্ধানে অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। এই সন্ধির দ্বারা ষ্ট্রাসম্যান ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের সঙ্গে ভার্সাই সীমান্ত মেনে নেন। বিনিময়ে পোল্যান্ড ও চেকোস্লোভাকিয়ার সঙ্গে জার্মান সীমান্ত শান্তিপূর্ণভাবে সংশোধনযোগ্য গণ্য করা হয়।

লোকার্ণোর সন্ধি

ষ্ট্রাসম্যান ক্ষতিপূরণ সমস্যার সমাধানে যথেষ্ট সফলতা লাভ করেন। তিনি এই সমস্যা সমাধানের পদক্ষেপ হিসেবে রূঢ় জেলায় নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ তুলে নেন। ১৯২৬ খ্রীঃ ডাওয়েজ পরিকল্পনা দ্বারা ক্ষতিপূরণ সমস্যার একটি অস্থায়ী সমাধান করা হয়। ফ্রান্স রূঢ় থেকে সেনাদল ও অবরোধ প্রত্যাহার করে। মার্কিন ঋণ পাওয়ার ফলে জার্মানী আপাততঃ অর্থনৈতিক ধ্বংসের মুখ থেকে ফিরে আসে। ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত লর্ড ডার্বেননের (Lord D' Abenon) সহায়তায় তিনি ক্ষতিপূরণ সমস্যার চূড়ান্ত সমাধানের একটি জমিন তৈরি করেন। এর ফলে ১৯২৯ খ্রীঃ ইয়ং পরিকল্পনা দ্বারা ক্ষতিপূরণ সমস্যার সন্তোষজনক সমাধানের পথ খুঁজে পাওয়া যায়। এর আগে জার্মানী

ডাওয়েজ ও ইয়ং পরিকল্পনা

লীগ অব নেশনসের সদস্য পদ গ্রহণ করে। ইয়ং পরিকল্পনা ও লোকার্ণো চুক্তির ফলে জনসাধারণের মনে এক দারুণ আশাবাদ সৃষ্টি হয়।

ষ্ট্রাসম্যান পশ্চিমী দেশগুলির সঙ্গে মিত্রতা ও সমঝোতা নীতি নিয়ে চললেও, তিনি ম্যাকিয়াভেলীয় পন্থা অনুযায়ী চলতেন। এই কূটনৈতিক ধুরন্ধর ইঙ্গ-ফরাসী শক্তির ওপর চাপ সৃষ্টি করে জার্মানীর স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে কমিউনিষ্ট রাশিয়াকে ব্যবহার করেন। লোকার্ণো চুক্তির পরের বছর (১৯২৬ খ্রীঃ) ষ্ট্রাসম্যান রাশিয়ার সঙ্গে বার্লিনের চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এতে ফ্রান্স বেশ আশঙ্কিত হয়। তবে ষ্ট্রাসম্যান বলেন যে, "তাঁর নীতি হল কোন বড় সিদ্ধান্ত না নেওয়া ও সঙ্ঘাত এড়িয়ে চলা। এভাবেই জার্মানী শক্তিশালী হবে।"

ষ্ট্রাসম্যানের রুশ নীতি ও তার গুরুত্ব

১৯৩০ খ্রীঃ এই প্রতিভাবান রাষ্ট্রনীতিকের মৃত্যু যে শূন্যতা সৃষ্টি করে, জার্মানীর এমন কেহ ছিল না, যিনি তা পূরণ করতে পারেন। লোকার্ণো চুক্তির মোহ কেটে যাওয়ার পর ফ্রান্স ষ্ট্রাসম্যান সম্পর্কে বাস্তব দৃষ্টি লাভ করেন। ফ্রান্সের অভিযোগ ছিল যে, ষ্ট্রাসম্যান শান্তিকামীর ছল করলেও তিনি আসলে শান্তিকামীর ভান করে জার্মানীর শক্তি বাড়াবার নীতি নেন। তিনি ছিলেন ষড়যন্ত্রপরায়ণ ও কপট রাজনীতিজ্ঞ (Finassieren) ফিনাসিরেন। তিনি লোকার্ণো চুক্তি করা সত্বেও জার্মান সেনাপতি সেক্টকে রুশ সহযোগীতায় পূর্ব জার্মানীতে সেনাদল গঠনে বাধা দেননি। জার্মানীর অবস্থান সম্পর্কে ইঙ্গ-ফরাসী মতভেদকে তিনি বিশেষ কাজে লাগান। অপরদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নকে ব্যবহার করে ইঙ্গ-ফরাসী শক্তির ওপর চাপ সৃষ্টি করেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় জার্মানী থেকে মিত্রপক্ষের সেনা প্রত্যাহার করা হয়। এটা ছিল তাঁর বড় সাফল্য। ব্রিটেনের ভয় হয় যে, জার্মানীর বিরুদ্ধে কঠোর হলে জার্মানী পুরা সোভিয়েতপন্থী হয়ে যাবে। জার্মানীকে পশ্চিমমুখী রাখতেই জার্মানী থেকে মিত্রপক্ষের সেনা অপসারণ করা হয়। তিনি ভার্সাই সন্ধির শান্তিপূর্ণ পরিবর্তন ঘটাতে অনেকটা সফল হন। কিন্তু ইওরোপে শান্তির প্রতিষ্ঠাতা রূপে তাঁকে নোবেল পুরস্কার দান করা হলেও, তাঁর এই ভূমিকা সমালোচনার উর্দ্ধে নয়।

ষ্ট্রাসম্যানের কৃতিত্ব

ভাইমার প্রজাতন্ত্রের পতনের কারণ (The Causes of the collapse of the Weimer Republic) ঃ কাইজারের পতনের পর ভাইমার সংবিধান দ্বারা জার্মানীতে একটি প্রকৃত গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের চেষ্টা হয়। কিন্তু এই প্রজাতন্ত্রী সরকার মাত্র ১৩ বা ১৪ বছরের মধ্যে ধ্বংস হয়। এই ধ্বংসস্তূপের ওপরে নাৎসী একনায়কতন্ত্র স্থাপিত হয়। ভাইমার প্রজাতন্ত্রের পতন সম্পর্কে বিভিন্ন কারণ দেখা যায়। ডেভিড টমসনের মতে, বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর পরাজয় ও ভার্সাই সন্ধি স্থাপনের আবহাওয়ার মধ্যে ভাইমার প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়। বহু জার্মানের চোখে এজন্য জার্মানীর পরাজয় ও ভাইমার প্রজাতন্ত্র স্থাপন সমার্থক ছিল। এজন্য প্রজাতন্ত্রের জনপ্রিয়তা ছিল না। ভাইমার সংবিধানে আনুপাতিক হারে প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা থাকায় জার্মানীতে বেশ কয়েকটি দল আইনসভায় সদস্য পাঠাবার সুযোগ পায়। এই দলগুলির মধ্যে প্রায় সবকটিই প্রজাতন্ত্রের আদর্শে বিশ্বাসী ছিল না। যখন গোড়ায় ভাইমার সংবিধান রচিত হয় তখন সোস্যাল ডেমোক্র্যাট ও ক্যাথলিক সেন্টার দল যুক্তভাবে এই সংবিধান রচনায় উদ্যোগ নেয়। কিন্তু পরবর্তী সময়ের নির্বাচনে সোস্যাল ডেমোক্র্যাট দল আর আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। যারা প্রকৃতই ভাইমার সংবিধানের প্রতি আনুগত্য দেয়, তাদের অভাবে এই সংবিধান স্থায়ী হয়নি। বাকী যে দলগুলি আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের জোরে পার্লামেন্টে নির্বাচিত হয়, তারা প্রজাতন্ত্রবাদ সম্পর্কে ছিল উদাসীন। এজন্য বলা হয় যে, ভাইমার প্রজাতন্ত্র ছিল, "প্রজাতন্ত্রীশীল প্রজাতন্ত্র।"

ভাইমার সংবিধানে আনুপাতিক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রতিনিধি নির্বাচনের ফল ঃ সোস্যাল ডেমোক্র্যাট দলের ক্ষমতাচ্যুতি

ভাইমার সংবিধান দ্বারা একটি আদর্শ প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান রচিত হয়। কিন্তু এই সংবিধানকে কার্যকরী করার জন্যে উপযুক্ত সামাজিক পরিকাঠামো গঠন করা হয়নি।

ভাইমার প্রজাতন্ত্রের প্রতিকূল সামাজিক পরিবেশ ও তার প্রভাব

শাসনব্যবস্থায় কাইজারের যুগের রাজতন্ত্রবাদী আমলারাই বহাল ছিল। এই আমলারা প্রজাতন্ত্রের নির্দেশ মান্য করত না। জার্মানীর বিচারবিভাগে ও সমাজব্যবস্থায় কাইজারের যুগের সামন্ততান্ত্রিক ও বুর্জোয়া শিল্পপতিরাই প্রাধান্য ভোগ করত। এই শ্রেণীগুলির প্রজাতন্ত্র সম্পর্কে ঘোর অনীহা ছিল। এরা ছিল রাজতন্ত্রবাদী অথবা স্বৈরতন্ত্রবাদী। ডেভিড টমসনের মতে, এই সামাজিক পরিকাঠামোর মধ্যে প্রজাতন্ত্রের টিকে থাকার সম্ভাবনা ছিল ক্ষীণ। আর· ডি· কর্ণওয়েল বলেছেন যে, "ভাইমার প্রজাতন্ত্র জার্মানীর পরাজয়কালে জন্মলাভ করায় এবং জনসাধারণের সক্রিয় সমর্থন না পাওয়ায়, গোড়া থেকে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ হতে থাকে" (The Weimer Republic, born in defeat and with little positive support from the people, could hardly have a more sormy beginning)[১]।

ভাইমার প্রজাতন্ত্রের পতনের জন্যে আভ্যন্তরীণ কারণ অপেক্ষা বৈদেশিক কারণ কম ছিল না। জার্মানীর ভিতর সমাজের প্রভাবশালী শ্রেণী জার্মান গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব দেখায়।

ইঙ্গ-ফরাসী শক্তির দায়িত্ব

ইঙ্গ-ফরাসী শক্তি জার্মান গণতন্ত্রকে রক্ষার জন্যে প্রয়োজনীয় সহানুভূতি ও দায়িত্ববোধ দেখায়নি। যুদ্ধের শেষ দিকে মিত্রশক্তি বলে যে, জার্মান জনগণের সঙ্গে তাদের বিরোধ নেই, কাইজার সরকারের সঙ্গেই তাদের বিরোধ। পরে দেখা যায় যে, এই ঘোষণা ছিল মিত্রশক্তির কপট প্রচার মাত্র। মিত্রশক্তির বোঝা উচিত ছিল যে, ভাইমার প্রজাতন্ত্র বিশ্বযুদ্ধের জন্যে দায়ী ছিল না। স্বৈরতন্ত্রের অনুরাগী জার্মান জাতিকে গণতন্ত্রের প্রতি অনুরাগী করা হলে, আখেরে তা মিত্রশক্তির ও ইওরোপীয় শান্তির পক্ষে লাভজনক হবে। সুতরাং মিত্রশক্তির উচিত ছিল ভাইমার সরকারের ওপর নমনীয়, মৃদু শর্তে সন্ধি স্থাপন করা। ক্ষতিপূরণের দাবী ত্যাগ করে যুদ্ধে বিক্ষত জার্মান প্রজাতন্ত্রকে পায়ের ওপর দাঁড়াতে সাহায্য করা। এই দায়বদ্ধতা ইঙ্গ-ফরাসী গণতন্ত্র ভগিনী জার্মান গণতন্ত্রের প্রতি পালন না করে, জার্মানীর ওপর এক প্রতিহিংসামূলক সন্ধি চাপান ছিল ঘোর অদূরদর্শিতা। এর ফলে উগ্রপন্থী জার্মান জাতীয়তাবাদী দলগুলি একদিকে ভার্সাই সন্ধি ছিঁড়ে ফেলার ডাক দেয়, অপরদিকে ভার্সাই সন্ধি স্বাক্ষরকারী জার্মান প্রজাতন্ত্রকে "বিশ্বাসঘাতক", "দেশদ্রোহী" প্রভৃতি বাছা বাছা বিশেষণে অভিহিত করে। ই· এইচ· কার বলেছেন, "ভাইমার প্রজাতন্ত্রের পতনের জন্যে পয়েনকারীবাদ (Poincarism) এবং মুদ্রাস্ফীতি বিশেষভাবে দায়ী ছিল।" এই পয়েনকারীবাদ হল ভাইমার জার্মানীর প্রতি ফ্রান্সের প্রতিহিংসা নীতি। এর ফলে ভাইমার প্রজাতন্ত্র ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ভাইমার সংবিধানের অপর একটি বড় ত্রুটি ছিল সংবিধানের ৪৮নং ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে সংবিধানকে মূলতুবী রাখার অধিকার এবং প্রয়োজনে সংবিধানের কোন কোন বিশেষ ধারা রদ বা মূলতুবী করার অধিকার।

ভাইমার সংবিধানের ৪৮ ধারার অপব্যবহার

৪৮নং ধারাকে নীতি-সম্মত ও নায্যভাবে প্রয়োগ করতে হলে, রাষ্ট্রপতির পদে একজন নীতিপরায়ণ, গণতন্ত্রের প্রতি আস্থাশীল ও সংবিধানের প্রতি আনুগত্যপরায়ণ লোকের দরকার ছিল। জার্মানীর জনগণের এর আগে গণতন্ত্র সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। কাজেই তার সুযোগ নিয়ে যদি

১· R. D. Cornwell—World History.

কোন ন্যায়নীতিহীন রাষ্ট্রপতি ক্ষমতায় আসতেন, তবে তিনি ৪৮নং ধারার অপব্যবহার করে প্রজাতন্ত্রকে ধ্বংস করতে পারতেন। কার্যতঃ হিন্ডেনবুর্গের মৃত্যুর পর হিটলার ক্ষমতায় এসে ৪৮নং ধারার সাহায্যে সংবিধান রদ করে দেন।

এই প্রজাতন্ত্র যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ধাক্কা সামলাতে পারেনি। একদিকে মহাযুদ্ধের পর জার্মান অর্থনীতিতে দেখা দেয় বিরাট ধ্বস। তার সঙ্গে যুক্ত হয় ক্ষতিপূরণের দাবী। জার্মানীতে সোনার সঞ্চয় কমে যাওয়ার ফলে জার্মান মার্কের দাম ভয়ানকভাবে পড়তে থাকে।

জার্মানীতে অর্থনৈতিক বিপর্যয় মুদ্রাস্ফীতি ও তার প্রভাব

এই মার্কের দামের সুস্থিতি আনতে না পারায় মুদ্রাস্ফীতির চাপে জার্মান অর্থনীতি ধ্বসে পড়ে। ১৯১৪ খ্রীঃ ১ ব্রিটিশ পাউণ্ড সমান ছিল ১৫ জার্মান মার্ক। ১৯২৩ খ্রীঃ নভেম্বরে ১ ব্রিটিশ পাউণ্ড সমান হয় ১৬,০০০ মিলিয়ন মার্ক। মুদ্রার দাম পড়ে গেলে প্রজাতন্ত্র সীমাহীন কাগজের নোট ছাপাই করে মূল্যমানে সুস্থিতি রাখার ব্যর্থ চেষ্টা করে। তাতে ফল হয়নি। ১ কাপ কফি কিনতে এক তাড়া কাগজের মার্কের দরকার হয়। শেষ পর্যন্ত জার্মান মুদ্রার গ্রহণযোগ্যতা বিনষ্ট হয়।

এর সঙ্গে মহামন্দার ধাক্কা ভাইমার প্রজাতন্ত্রের আসন্ন পতনের ঘণ্টা বাজায়। ই· এইচ· কারের মতে, এর ফলে জার্মানী রপ্তানি বাণিজ্য ৬৩০,০০০,০০০ পাউণ্ড থেকে এক বছরে (১৯৩২ খ্রীঃ) ২৮০,০০০,০০০ পাউণ্ডে নেমে যায়। জার্মানীর নথীভুক্ত বেকারের সংখ্যা

মহামন্দার ফলাফল

২,০০০,০০০ থেকে ৩ বছরে ৬,০০০,০০০ সংখ্যায় দাঁড়ায়। যে সরকারের রাজনৈতিক শিকড় সমাজের গভীরে ছিল না, বিরোধী দলগুলির অনেকেই ভাইমার সংবিধানের প্রতি অনুগত ছিল না, সেই সরকারের পক্ষে এত বড় অর্থনৈতিক ধ্বস থেকে নিজেকে রক্ষা করা ছিল প্রায় অসম্ভব। রবার্ট এরগ্যাং[১] এর মতে, "অর্থনৈতিক মন্দা ভাইমার প্রজাতন্ত্রের প্রতি মৃত্যুবাণ ছুঁড়ে দেয়" (It was, however, from the economic depression that the Weimer Republic received its mortal blow)। ভাইমার সরকার এই মহামন্দার মোকাবিলায় ব্যর্থ হলে প্রজাতন্ত্র বিরোধী দলগুলি বিশেষতঃ নাৎসীদল ভাইমার সরকারের পতন ঘটাতে তীব্রতর চেষ্টা শুরু করে। ভার্সাই সন্ধি, যুদ্ধে পরাজয়, মহামন্দা সকল কিছুর জন্যে তারা ভাইমার প্রজাতন্ত্রকে দায়ী করে প্রচারের ঢাক পেটাতে থাকে। নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী যারা এতদিন ছিল ভাইমার প্রজাতন্ত্রের প্রধান খুঁটি, তারা মহামন্দার ফলে বিভ্রান্ত হয়ে, নাৎসী প্রচারে প্রভাবিত হয়। বেকার শ্রমিকরাও মন্দার খপ্পরে কর্মহীন হয়ে প্রজাতন্ত্রের প্রতি আস্থা হারায়। এই সুযোগে নির্বাচনে নাৎসীদল সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করে রাইখষ্ট্যাগ দখল করলে প্রজাতন্ত্রের পতনের শেষ ঘণ্টা বেজে ওঠে। অর্থনৈতিক সঙ্কট জনতার বৌদ্ধিক ও মাঙ্গলিক চিন্তাকে ঘোলাটে ও আচ্ছন্ন করে দেয়। নাৎসীরাই এই সময় যেন পরিত্রাতার ভূমিকায় নামে। লোকে মনে করে যে নাৎসীরাই কর্মে নিযুক্তি, রাজনৈতিক স্থায়িত্ব, সামাজিক শান্তি ও অর্থনৈতিক সঙ্কট থেকে দেশকে মুক্ত করতে পারবে।

নাৎসী সরকারের আভ্যন্তরীণ নীতি (Internal Policy of the Nazi Government in Germany) : নাৎসী নেতা এডলফ হিটলার ক্ষমতা লাভ করার পর প্রথমেই বিরোধী দলগুলিকে ধ্বংস করে নাৎসী দলের একচ্ছত্র শাসন প্রতিষ্ঠার নীতি নেন। (১)

বিদ্রোহী দলের বিলুপ্তি নাৎসী একনায়ক শাসন

জার্মানীর সমাজতান্ত্রিক দলগুলিকে অন্তর্ঘাতমূলক কাজের মিথ্যা অভিযোগে দায়ী করে তিনি নিষিদ্ধ করেন। (২) ক্যাথলিক দল স্ব-ইচ্ছায়

১· Robert Ergang—Europe Since Waterloo.

বিলুপ্তি ঘোষণা করে। (৩) জার্মান গণতন্ত্রী দলও অনুরূপভাবে স্ব-ইচ্ছায় বিলুপ্ত হয়। (৪) অবশেষে ১৯৩৩ খ্রীঃ ১৪ই জুলাই হিটলার একটি জরুরী আইন দ্বারা নাৎসী দলকেই একমাত্র বৈধ রাজনৈতিক দল ঘোষণা করে নাৎসী একদলীয় একনায়কতন্ত্র স্থাপন করেন। জার্মানীর ১৭টি প্রদেশের শাসনকর্তা হিটলার নিজেই নিযুক্ত করেন। এই শাসনকর্তাদের সাহায্যে প্রাদেশিক প্রশাসনের নাৎসীকরণ করা হয় এবং সকল ক্ষমতা কেন্দ্রে হিটলারের হাতেই ন্যস্ত হয়। এই প্রাদেশিক শাসনকর্তারা হিটলার কর্তৃক নিযুক্ত হয়ে প্রদেশের শাসন থেকে অ-নাৎসী কর্মচারীদের বরখাস্ত করেন। সকল পদে একমাত্র নাৎসীদেরই নিয়োগ করা হয়। হিটলার এখন ফ্যুয়েরার (Feuhrer) উপাধি নেন। রাষ্ট্রপতি হিণ্ডেনবুর্গের মৃত্যুর পর হিটলার একাধারে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা নিজ হাতে কেন্দ্রীভূত করেন। নাৎসী প্রচার যন্ত্রগুলি জার্মান জনসাধারণকে এই কথা বুঝায় যে, নাৎসী দলই একমাত্র এলাইট (Elite) বা আলোকপ্রাপ্ত দল। জার্মানীর উন্নতি একমাত্র এই দলের দ্বারাই সম্ভব হবে। নাৎসী দলকে সর্ব্বাত্মক করা হয়। জার্মানীর ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনও এই দলের হাত থেকে নিস্কৃতি পায়নি। সাধারণ নিম্নবিত্ত লোকেদের বাসস্থান বা মাটির বাড়িগুলির ওপরেও একজন করে দলীয় ওয়াডেন নিযুক্ত হয়। বিদ্যালয়, অফিস, কারখানা, গ্রামসভা সকল ক্ষেত্রে নাৎসী সংগঠন নিযুক্ত হয়।

বিরোধী দলগুলিকে বে-আইনী ঘোষণার পর ব্যাপক ধর-পাকড় ও হত্যার মাধ্যমে।বিরোধী নেতাদের নিশ্চিহ্ন করা হয়। শ্রমিকদের ট্রেড-ইউনিয়নগুলিকে ভেঙে ফেলা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রমিক ইউনিয়নগুলি ভেঙে ফেলতে শ্রমিকরা রাজী না হলে হিটলারের SS বা ঝটিকা বাহিনীর সাহায্যে তা চূরমার করা হয়। ইউনিয়নের বদলে নাৎসী পরিকল্পিত শ্রমিক ফ্রন্টে শ্রমিকদের যোগ দিতে বাধ্য করা হয়। শ্রমিক ফ্রন্ট শ্রমিকদের মধ্যে নাৎসী মতবাদ প্রচার করে এবং শ্রমিকদের দ্বারা শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধির ওপর জোর দেয়। অন্য কোন দলের শ্রমিক সংগঠনকে স্বীকৃতি দেওয়া রদ করা হয়। নাৎসী দলের ক্ষমতা লাভের আগে হিটলার SA নামে এক জঙ্গী শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন করেছিলেন। এই সংগঠনে প্রায় ২ মিলিয়ন শ্রমিক সদস্য ছিল। এই দল খাঁটি সমাজতন্ত্র চাইত, নাৎসীদের মেকি সমাজতন্ত্রে S.A নেতা Roehm এর আস্থা ছিল না। ক্ষমতায় আসার পর এই দলকে বিপজ্জনক মনে করে, হিটলারের ঝটিকা বাহিনী খণ্ডযুদ্ধে S.Aকে ধ্বংস করে। Roehm ও অন্য নেতাদের প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়।

শ্রমিক বিরোধ দমন

হিটলার জানতেন যে, সরকারি কর্মচারীদের পূর্ণ সহযোগিতা ছাড়া তাঁর লক্ষ্যকে কার্যকরী করা যাবে না। সরকারি কর্মচারীদের নাৎসীকরণ (Nazification) করা হয়। নাৎসী দলের আদর্শের প্রতি বিরোধী বা উদাসীন কর্মচারীদের বরখাস্ত করা হয়। একমাত্র নাৎসী নেতা হিটলারের প্রতি অনুগত ও নাৎসী দলের আস্থাভাজন লোকেদের সরকারি চাকুরী দেওয়া হয়। যাদের পরিবারে অ-জার্মান এবং ইহুদীদের সঙ্গে বিবাহ-সম্পর্ক ছিল তাদের সরকারি চাকুরীর অনুপযোগী বলে ঘোষণা করা হয়।

সরকারি কর্মচারীদের নাৎসীকরণ

জার্মানীর বিচার ব্যবস্থা ঢেলে সাজান হয়। রাষ্ট্রদ্রোহিতা, সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র প্রভৃতি রাজনৈতিক অপরাধের বিচারের জন্যে স্বতন্ত্র আদালত গঠন করা হয়। এর নাম হয় গণ আদালত বা পিপলস কোর্ট (Peoples Court)। এই আদালতে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা কোন আইনজীবির সাহায্য নিতে চাইলে তার জন্যে সরকারের অনুমতি নেওয়ার নিয়ম করা হয়। জার্মান বিচার বিভাগ থেকে অ-নাৎসী বিচারকদের বিতাড়িত করা হয়।

বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতা লোপ

নাৎসী গুপ্ত পুলিশ বা গেষ্টাপো এবং ঝটিকা বাহিনী যে কোন নাগরিককে গ্রেপ্তার ও বিনা বিচারে আটক রাখার অধিকার পায়। আটক ব্যক্তিদের বন্দী নিবাসে বিনা বিচারে দীর্ঘকাল বন্দী রাখার ব্যবস্থা করা হয়। সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের দৈহিক শাস্তিদানের নিয়ম করা হয়। এভাবে হিটলার জার্মানীতে একটি দমনমূলক পুলিশী শাসন স্থাপন করেন। জার্মানী থেকে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয়। সমগ্র জাতিকে Regimentation বা নাৎসী ছাঁচে ঢেলে ফেলা হয়। রাষ্ট্র অথবা রাষ্ট্রনায়ক হিটলার সর্ব শক্তিমান নেতায় পরিণত হন।

পুলিশী শাসন

ভবিষ্যৎ জার্মান নাগরিকেরা যাতে নাৎসী সংস্কৃতিকে শ্রেষ্ঠ মনে করে এর আলোকেই জীবন গঠন করে, এজন্য জার্মানীর শিক্ষা ব্যবস্থাকে নাৎসী ছাঁচে ঢেলে ফেলা হয়। বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অ-জার্মান এবং ইহুদী শিক্ষকদের বিতাড়িত করা হয়। পাঠ্য পুস্তকগুলিকে নাৎসী আদর্শে রচনা করা হয়। নাৎসী সরকারের অনুমোদিত পাঠ্য পুস্তক ছাড়া, অন্য সকল প্রকার পাঠ্য পুস্তক নিষিদ্ধ করা হয়। জার্মানীর ইতিহাসের পাঠ্য পুস্তককে ঢেলে সাজান হয়। জার্মান জাতির শ্রেষ্ঠত্ব এবং ইহুদী বিদ্বেষকে ইতিহাসের বিষয়বস্তু করা হয়। স্বাধীনচেতা শিক্ষাব্রতী ও বিজ্ঞানীরা জার্মানী ত্যাগ করে চলে যেতে বাধ্য হন। জার্মান বিদ্যালয়গুলি নাৎসীবাদের দীক্ষাদান ও প্রচার কেন্দ্রে পরিণত হয়। বিদ্যালয় থেকে হাজার, হাজার ছাত্র-ছাত্রীকে বাধ্যতামূলকভাবে নাৎসীদলের সদস্য কার্ড নিতে হয়। জার্মানীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সর্বত্র ঘোষণা করা হয় যে—"জার্মানী একটি জাতি, একটি দল ও একজন নেতার" আদর্শে বিশ্বাসী (one people, one party, one fuehrer—Ein Volk, ein Reich, ein Fuehrer)।

নাৎসী শিক্ষা নীতি

জার্মান জাতীয়তাবাদকে তীব্রতর করার জন্যে জাতিবৈরী ভাবধারার ব্যাপক প্রচার করা হয়। জার্মানরা আর্য জাতির বংশধর এবং শ্রেষ্ঠ জাতি, এই তত্ত্ব সর্বদা প্রচারিত হয়। এর সঙ্গে তীব্র ইহুদী বিদ্বেষ প্রচারিত হয়। অসংখ্য জার্মান ইহুদী জার্মান বন্দী শিবিরে নিহত হন। জার্মান শিশুদের ইহুদী বিদ্বেষে দীক্ষা দেওয়া হয়। পথে ঘাটে সর্বত্র জার্মান ইহুদীরা নির্যাতিত হন। বহু ইহুদী নির্যাতনের ফলে জার্মানী ছাড়তে বাধ্য হন। আলবার্ট আইনস্টাইনের ন্যায় বিশ্বের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী জার্মানী ছেড়ে আমেরিকায় আশ্রয় নেন। জার্মান যুবশক্তি নাৎসীবাদের প্রভাবে আত্মহারা হয়ে হিটলারকে শ্রেষ্ঠ মানব মনে করে। তাঁর উপাধি হয় ফ্যুয়েরার। নাৎসীদলের ইহুদি বিদ্বেষের কোন তুলনা ছিল না। জাতিগত বৈরতার এত ঘৃণ্য উদাহরণ বড় একটা দেখা যায় না। জার্মানীতে পুরুষানুক্রমে বাস করার পরেও, হিটলারের এক আদেশে ইহুদি জার্মানরা জার্মানীতে অবাঞ্ছিত, ক্ষতিকারক, ঘৃণিত সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। শুধু সরকারি চাকুরী নয়, চিকিৎসা, শিক্ষা, যে কোন বৃত্তি থেকে তাদের বহিষ্কার করা হয়। ইহুদিদের জমি মালিকানার অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়।

জাতিবৈরিতা : ইহুদী বিদ্বেষ

নাৎসী সরকার বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ ডাঃ শাখটের সাহায্যে জার্মানীর অর্থনৈতিক দুরবস্থার আপাততঃ প্রতিকার করতে সমর্থ হয়। বেকার সমস্যা দূর করার জন্যে জার্মান কল-কারখানা, স্কুল-কলেজে শিফট্ বা পালা প্রথা চালু হয়। এর ফলে কর্মসংস্থান বাড়ে। এই সঙ্গে উৎপাদন বাড়ে। বেকারের সংখ্যা হ্রাসের জন্যে নাৎসী দল প্রচার চালায় যে, নারীদের গৃহে গৃহকর্ম করাই উচিত; গৃহের বাইরে তাঁদের কোন কাজ নেই। সন্তান পালন, গীর্জা বা ধর্মচর্চা ও রন্ধন তাঁদের প্রধান কর্তব্য (kinder, kirche and kuche)। কর্মে নিযুক্ত অবিবাহিতা জার্মান নারীদের বিবাহের জন্যে রাষ্ট্রঋণ দেওয়া হয় এই শর্তে যে, বিবাহের পর তাঁরা চাকুরী ছেড়ে সংসার ধর্ম পালন করবেন। নারীদের অফিস, কারখানার চাকুরী থেকে হঠাবার ফলে কিছু পদ খালি হলে সেই পদে নাৎসী

অর্থনৈতিক সংস্কার ও কর্মসংস্থান

যুবকদের নিয়োগ করা হয়। হিটলার কর্ম সংস্থান বৃদ্ধির জন্যে বিরাট নির্মাণ কার্য, আধুনিক মোটর বাস বা অটোব্যান নির্মাণ, বাসগৃহ নির্মাণের কাজে জোর দেন। তিনি বন্দর, নতুন সরকারি অফিসঘর নির্মাণের দ্বারা কর্মসংস্থান বাড়ান। শহরে বাসগৃহের মালিকদের গৃহ সংস্কারের জন্যে ঋণ দেওয়া হয় এবং খামার মালিকদের অতিরিক্ত লোক নিয়োগের শর্তে ঋণ দেওয়া হয়। এভাবে তিনি কর্মসংস্থান বাড়িয়ে জার্মানীতে চমক সৃষ্টি করেন। ১৯৩৪ খ্রীঃ জার্মান অস্ত্রসজ্জা শুরু হলে বহু লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়। জার্মানীতে বেকার সমস্যা হ্রাস পায়। এজন্য নাৎসী দলের জনপ্রিয়তা বাড়ে।

এই সকল ব্যবস্থার সমবেত ফল ছিল যে, ১৯৩৬ খ্রীঃ থেকে জার্মানীতে উৎপাদনের হার অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়। প্রতি নাগরিকের মোট আয় প্রায় ১৫% বাড়ে। কিন্তু এই বৃদ্ধির পশ্চাতে যে ফাঁকি ছিল তখন তা লোকের চোখে পড়েনি। আলাদীনের প্রদীপের সাহায্যে অকস্মাৎ বেকার সমস্যার আংশিক সমাধান এবং উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে লোকের চোখ ধাঁধিয়ে যায়। একথা চাপা পড়ে যায় যে : (১) ট্রেড ইউনিয়নগুলি ভেঙে দিয়ে লেবার ফ্রন্টের সাহায্যে হিটলার শ্রমিকদের একই বেতনে বহু ঘণ্টা বেশী কাজ করতে বাধ্য করছেন। (২) তুলনামূলকভাবে শ্রমিকদের ঘণ্টা-পিছু মজুরী হ্রাস করেছেন। (৩) খাদ্যদ্রব্যের দাম আগের অপেক্ষা বৃদ্ধি পাচ্ছে। (৪) নাৎসী দল শ্রমিকদের কোন কোন ক্ষেত্রে বিনা বেতনে স্বেচ্ছা শ্রম দিতে বাধ্য করছেন। (৫) বিদ্যালয়ে সৎ, নিরপেক্ষ, প্রগতিশীল শিক্ষার স্থলে নাৎসী প্রচার শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। (৬) বিদ্যালয় থেকে ছাত্রদের নাৎসী মতবাদে মগজ ধোলাই করে তাদের রোবটের মত স্বাধীন, যুক্তিবাদী চিন্তাশক্তির বিকাশ থেকে বঞ্চিত করে পার্টির দাসে পরিণত করা হচ্ছে। (৭) ন্যায্য প্রতিবাদকে সন্ত্রাস দ্বারা দমন করায়, গৃহস্থ, চাকুরীজীবি, বুদ্ধিজীবি সৎ প্রতিবাদের জন্যে সাহস দেখাতে অক্ষম। (৮) জার্মানীর অর্থনৈতিক স্বাস্থ্য প্রকৃত ভাল হয়নি। প্রচারের দ্বারা কৃত্রিম তথ্য দেওয়া হচ্ছে। ১৯৩৬ খ্রীঃ চতুর্থ বার্ষিকী পরিকল্পনার দ্বারা জার্মানীকে খাদ্য, শিল্প, অস্ত্রে স্বয়ম্ভর করার লক্ষ্য গৃহীত হলে জার্মানীর সর্বস্তরে কর্মচাঞ্চল্য দেখা দেয়। জার্মান জাতি যেন এক নতুন আবেগে কর্মপ্রবাহে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এভাবে হিটলার তাঁর সর্বাত্মক রাষ্ট্রকে (Totalitarian State) পরিচালিত করেন।

হিটলারের আভ্যন্তরীণ নীতির ফলাফল

নাৎসী বিপ্লবের সফলতার কারণ ও তার গুরুত্ব (The causes of the success and the significance of the Nazi Revolution in Germany) : ভাইমার প্রজাতন্ত্রের ধ্বংসস্তূপের ওপর নাৎসী একদলীয় স্বৈরতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা কেবলমাত্র জার্মানীর নয়, গোটা ইওরোপের ইতিহাসের পক্ষে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল। নিরপেক্ষভাবে বলা যায় যে, ভাইমার সরকারের দুর্বলতা ও সঙ্কটগুলি নাৎসী বিপ্লবের পথ তৈরি করে। জার্মানীর সমাজের শাসক, প্রশাসক ও শিল্পপতি শ্রেণীর বড় অংশ প্রজাতন্ত্রের আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিল না। অপরদিকে জার্মানীর অধিকাংশ রাজনৈতিক দলগুলিও প্রজাতন্ত্রকে রক্ষা অপেক্ষা দলীয় স্বার্থকে বেশী গুরুত্ব দেয়। এই ব্যাপারে নাৎসী দল ছিল অগ্রগণ্য। প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে তারা তীব্র প্রচার দ্বারাই জনপ্রিয়তা লাভ করে।

নাৎসী দল ছিল গোড়ায় কাঠামোহীন একটি অখ্যাত রাজনৈতিক দল। ১৯২১ খ্রীঃ হিটলার এই দলের সভাপতির পদ পেলে তিনি দলের প্রচারযন্ত্রকে কাজে লাগিয়ে অসংখ্য সদস্য জোগাড় করেন। তিনি ব্যাভেরিয়াতে অতর্কিত আক্রমণের (Putsch) দ্বারা ক্ষমতা দখলের বিফল চেষ্টার ফলে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। তাঁর বিচারের সময় সংবাদপত্রে তিনি বিপুল প্রচার পান। নয় মাস পরে কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি দলকে সাময়িকভাবে সংগঠন করেন।

১৯২৯ খ্রীঃ মহামন্দা এবং জার্মানীতে মুদ্রাস্ফীতি-জনিত ধ্বংসের সুযোগ নিয়ে হিটলার শুধু প্রজাতন্ত্রকে জার্মানীর দুর্গতির জন্যে দায়ী করলেন না, তিনি জাতীয়তাবাদী নেতা হুগেন বার্গ ও তাঁর পত্রিকাগোষ্ঠীর সাহায্যে প্রচার চালান যে, জার্মানীর মুক্তি প্রজাতন্ত্র ও ভার্সাই সন্ধির পথে আসবে না। তিনি আগে ভার্সাই সন্ধিকে আক্রমণ করেছিলেন, এখন ১৯২৯ খ্রীঃ থেকে জাতীয়তাবাদী পত্রিকার সাহায্যে তীব্র ভার্সাই বিরোধী প্রচার চালান। প্রজাতন্ত্রকে তিনি ভার্সাই সন্ধির স্বাক্ষরকারী হিসেবে জার্মানীর অশেষ দুর্গতি, ভার্সাই সন্ধির দ্বারা জার্মানীর ব্যবচ্ছেদের ও ক্ষতিপূরণের বোঝার জন্যে দায়ী করেন। জার্মান মধ্যবিত্ত শ্রেণী যারা ছিল প্রজাতন্ত্রের সমর্থক তারা নাৎসী প্রচারে প্রভাবিত হতে থাকে। অর্থনৈতিক মন্দা, মুদ্রার মূল্যমানের হ্রাসে বিধ্বস্ত জার্মান মধ্যবিত্তরা নাৎসী প্রচারের ফলে নাৎসী দলকেই পরিত্রাতা মনে করে।

কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, ভার্সাই সন্ধির কঠোর শর্তাবলীই ছিল জার্মানীতে নাৎসী দলের জনপ্রিয়তার কারণ। দেশপ্রেমিক জার্মান মধ্যবিত্ত, শ্রমিক ও জনসাধারণের চোখে ভার্সাই সন্ধি জার্মানীর প্রতি প্রতিহিংসামূলক সন্ধি। এই সন্ধি শুধু একতরফা ছিল না। এই সন্ধি জার্মানীর খনিজ সম্পদ, জনসম্পদ জার্মানী থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিল। পোল্যাণ্ডের সঙ্গে জার্মানীর এক অসহনীয় সীমান্ত গঠন করেছিল। ভার্সাই সন্ধির বিরুদ্ধে তীব্র প্রচার দ্বারা নাৎসী দল জনপ্রিয়তার পারদকে উঁচুতে তুলে দেয়। নাৎসী দলই ভার্সাই সন্ধির দ্বারা জার্মানীর হৃত মর্যাদা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম এই ধারণা তারা জনমনে সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। এই কারণে ভার্সাই সন্ধি ও তার বিরুদ্ধে নাৎসী দলের নিরন্তর প্রচার নাৎসী দলের সাফল্যের অন্যতম কারণ ছিল বলা চলে।

জার্মানীতে কমিউনিষ্ট আন্দোলন বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই চলছিল। কাইজারের পতনের পর জার্মানীতে সোভিয়েত মডেলে কমিউনিষ্ট বিপ্লব ঘটাবার চেষ্টা চলে। প্রজাতন্ত্রী সরকারের দুর্বলতার জন্যে কমিউনিষ্টদের দমন করা সম্ভব হয়নি। কলকারখানায় ধর্মঘট ও রাজনৈতিক গণ্ডগোল সৃষ্টি করে কমিউনিষ্টরা নাৎসীদের মতই সরকার দখলের আশা করত। এমন কি তারা মিউনিখে একটি প্রতিদ্বন্দ্বী সরকারও গঠন করেছিল। আইনসভার নির্বাচনে কমিউনিষ্ট দলের সদস্য সংখ্যা ১৯৩০ খ্রীঃ ৭৭, ১৯৩২ খ্রীঃ ৮৯-এ দাঁড়ায়। একই বছরে দ্বিতীয় নির্বাচনের ফলে কমিউনিষ্ট দলের আসন সংখ্যা ১০০তে পৌঁছে যায়।

জার্মানীতে কমিউনিষ্টদের শক্তি বৃদ্ধি-হলে রক্ষণশীল অথচ দেশপ্রেমিক বেশ কিছু জার্মান তা পছন্দ করেনি। জার্মান শিল্পপতি ও উচ্চ বুর্জোয়ারা জার্মানীতে কমিউনিষ্ট বিপ্লবের আশঙ্কায় অস্থির হয়। যেহেতু দুর্বল ও সহনশীল জার্মান প্রজাতন্ত্রী সরকার কমিউনিষ্টদের দমনে আগ্রহ দেখায়নি, এই সকল ধনকুবের শিল্পপতিরা নাৎসী দলকে তাদের পরিত্রাতা মনে করে। নাৎসী স্বেচ্ছাসেবক ও ঝটিকা বাহিনী গঠন, নাৎসী প্রচারযন্ত্রকে জোরদার করার জন্যে, জার্মান শিল্পপতিরা নাৎসী দলের স্বার্থে তাঁদের টাকার থলির ফাঁস আলগা করে দেন। এই টাকার জোরে হিটলার S.S. বা ঝটিকা বাহিনী গড়েন। যুদ্ধ ফেরৎ বেকার সেনা ও বেকার যুবকদের নিয়ে তিনি জঙ্গী যুববাহিনী গড়েন। তার সাহায্যে তিনি কমিউনিষ্টদের সঙ্গে অবিরাম সংঘর্ষ দ্বারা কমিউনিষ্টদের কোণঠাসা করে ফেলেন। বলপ্রয়োগে কলকারখানায় শ্রমিক ধর্মঘট ভেঙে দেন। এর ফলে জার্মান বুর্জোয়ারা নাৎসী দলের অনুগত হয়ে পড়ে। তাদের অর্থের সাহায্যে ও নির্বাচনে জোর খাটিয়ে নাৎসীরা ১৯৩৩ খ্রীঃ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে সরকার গঠন করে। সরকারে ঢোকার পর আর নাৎসীদের পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি।

জার্মানীর অর্থনৈতিক বিপর্যয় এবং এই বিপর্যয় কাটাতে প্রজাতন্ত্রী সরকারের ব্যর্থতা এক গভীর হতাশা সৃষ্টি করে। নাৎসী দল এই সঙ্কটের সময় জার্মান বেকার, মধ্যবিত্ত, শ্রমিক সকলকে বোঝায় যে, নাৎসীরা ক্ষমতায় এলে এই সকল সমস্যার সমাধান তারা করবে।

নাৎসীরা জার্মান কৃষকদের সকল প্রকার সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দেয়। তারা ছোট দোকানদার, ব্যবসায়ী শ্রেণীকেও সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতি দেয়। সর্বোপরি বেকার সমস্যার সমাধানের প্রশ্নকে ক্ষমতা পেলে নাৎসীরা অগ্রাধিকার দেবে, এই প্রতিশ্রুতি তারা দেয়। মুদ্রাস্ফীতিতে জর্জরিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীকেও নাৎসীরা বোঝাতে সক্ষম হয় যে, তারা ক্ষমতায় এলে এই সমস্যা থাকবে না।

নাৎসী দল ক্ষতিপূরণ প্রদানের তীব্র বিরোধিতা করে। জার্মান জাতির আত্মাভিমানকে তারা জাগিয়ে তোলে এবং এভাবেই জনগণের সমর্থন আদায় করে নেয়। নতুবা নাৎসীবাদে এমন কিছু মৌলিকতা ছিল না যা জনসাধারণকে আকৃষ্ট করতে পারে। আসলে হতাশাগ্রস্থ জার্মানীতে নাৎসী দলই একমাত্র ভার্সাই সন্ধির ও ক্ষতিপূরণের বিরোধিতা করে এবং জার্মানী যুদ্ধে পরাজিত হয়নি, বিশ্বাসঘাতকতা করে আত্মসমর্পণ করা হয়েছে, এই মিথ্যা প্রচার দ্বারা জার্মান জাতীয়তাবাদীদের সহায়তা পায়।

নাৎসী দলের বিরুদ্ধে প্রজাতান্ত্রিক সরকার দৃঢ়তা দেখাতে ব্যর্থ হন। অনুরূপভাবে, বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি জোট বেঁধে নাৎসী প্রচারের বিরোধিতায় বিফল হয়। একমাত্র জার্মান কমিউনিষ্ট দল নাৎসী বিরোধিতা চালায়। কিন্তু নাৎসীরা বলপ্রয়োগ, মিথ্যাপ্রচার দ্বারা কমিউনিষ্টদের কোণঠাসা করে। তাছাড়া জার্মান জনগণও কমিউনিষ্টদের সমর্থন করেনি। ফলে নাৎসী দল উগ্র হয়ে ওঠে। তারা যুদ্ধ ফেরত বেকার সেনাদের নিয়ে বেসরকারি ঝটিকা বাহিনী গড়লেও সরকার তাদের বাধা দেয়নি। অধিকন্তু নাৎসীদের প্রতি সহানুভূতিশীল সেনাপতিরা তাঁদের গোপনে অস্ত্র সরবরাহ করেন। নাৎসীদের ইহুদি বিদ্বেষকে জার্মানরা পরোক্ষ সমর্থন দেয়। কারণ জার্মানীর বড় ব্যাঙ্ক ও শিল্প কারখানার মালিকরা ছিল ইহুদি। এই সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নাৎসীদের জাতিবৈরতা এবং জার্মানদের শ্রেষ্ঠ আর্যজাতির বংশধর প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক প্রচার দ্বারা নাৎসী দল, সাধারণ জার্মানদের আত্মবিশ্বাস বাড়ায় এবং নিজেরা জনপ্রিয়তা পায়।

নাৎসী বিপ্লবের পশ্চাতে নাৎসী নেতা এডলফ হিটলারের অবদান ছিল সর্বাধিক। ভেঙে পড়া জার্মান জাতিকে তিনি তাঁর নেতৃত্ব ও ভাষণের সম্মোহনী শক্তিতে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে দেন। তিনি জার্মান জাতির পূর্ব গৌরবের কথা সকল সময় বলে জাতির মনোবল বাড়াতে সক্ষম হন। জার্মান যুবশক্তি হিটলারকে মুক্তিদাতা বলে ভাবতে শুরু করে। একদা ভবঘুরে রাজনীতিবিদ যে জার্মানীর মুক্তিদাতাতে পরিণত হন, তারজন্যে হিটলারের ভেতরের আগুনের তেজকে স্বীকার করা উচিত। ইঙ্গ-মার্কিন সিনেমাতে হিটলারকে যে রকম ভাঁড়ের মত দেখানো হয়, তা ঐতিহাসিক সত্য নয়। হিটলার কোন বিদেশী ভাষা না জানলেও, নিজস্ব জার্মান ভাষায় তাঁর দখল ছিল অসাধারণ। তাঁর বাক্ বিভূতি দ্বারা জনতাকে আকর্ষণ করার ক্ষমতার তুলনা নেই। তাঁর বক্তৃতায় শ্রোতারা অভিভূত হত। শ্রোতাদের মনের কথাকে, তাদের দুর্দশা, জাতীয় অপমানে হতাশাকে হিটলার ভাষা দেন ও প্রতিরোধের শক্তি দেন। তাঁর শ্রোতাদের যন্ত্রণাকে তিনি বাঙময় করে তুলতেন। শ্রোতাদের হৃদয়ে প্রতিজ্ঞার আগুন তিনি জ্বালাতে পারতেন। হিটলার তাঁর সহকর্মীদের বাছাই করার সময় তাদের বংশ কৌলিন্য দেখেন নি। তিনি তাদের গুণ ও তাঁর প্রতি আনুগত্য দেখেন। তাঁর নিম্ন বুর্জোয়া সুলভ আড়ম্বরহীন খাদ্য ও জীবনধারা, জার্মান জাতির শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে অহমিকাবোধ, তাঁর অসম্ভব কর্মশক্তি, মানসিক ধৈর্য্য হিটলার উপকথার (Hitler Legend) সৃষ্টি করেছিল। জার্মানীর সর্বত্র ফেডারিক দি গ্রেট, বিসমার্ক ও হিটলারের ছবি ঝুলত। এই গণসম্মোহনী শক্তির দ্বারা তিনি নাৎসী দলকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করেন। সর্বোপরি, তাঁর ছিল অসাধারণ সংগঠনী প্রতিভা। ভেঙে পড়া নাৎসী দলকে তিনি যেভাবে সংগঠন করেন তার তুলনা নেই।

নাৎসী জার্মানীর পররাষ্ট্র নীতি (The Foreign Policy of Nazi Germany) : নাৎসী জার্মানীর পররাষ্ট্র নীতির লক্ষ্য কি ছিল এ বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক দেখা যায়। এ্যালান বুলক[১] প্রভৃতি ঐতিহাসিকদের মতে, হিটলারের বৈদেশিক নীতির প্রথম লক্ষ্য ছিল ইওরোপে জার্মানীকে প্রধান শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা। হিটলারের বিদেশ নীতির চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শক্তি হিসেবে জার্মানীর আত্মপ্রকাশ। হিটলার তাঁর মূল লক্ষ্যগুলিকে গোপন রেখে ভার্সাই সন্ধির দ্বারা জার্মান জাতীয়তাবাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের অভিযোগ তুলেন। এই অজুহাতে তিনি ভার্সাই সন্ধির শর্তগুলি একের পর এক ভেঙে ফেলেন। তাঁর আপাততঃ লক্ষ্য ছিল ইওরোপে জার্মানীর একাধিপত্য স্থাপন।

নাৎসী বৈদেশিক নীতিব লক্ষ্য

এ· জে· পি· টেইলার নামক ঐতিহাসিক উপরোক্ত অভিমত অগ্রাহ্য করেন।[২] তাঁর মতে, হিটলারের বিশ্বব্যাপী জার্মান সাম্রাজ্য স্থাপনের লক্ষ্য সম্পর্কে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি। উইনস্টন চার্চিল তাঁর Gathering Storm গ্রন্থে অভিমত দিয়েছেন যে, হিটলারের উদ্দেশ্য ছিল জার্মানীকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত করা। ইওরোপসহ উপনিবেশগুলিকে দখল করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। যে কোন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পক্ষে প্রধান প্রয়োজন হল নৌ-বাহিনী গঠন। কিন্তু হিটলার নৌ-বাহিনীকে গুরুত্ব দেননি। তিনি ভূমধ্যসাগরের গুরুত্বপূর্ণ জলপথকে দখলে রাখার জন্যে কোন চেষ্টা করেননি। দ্বিতীয়তঃ, উত্তর আফ্রিকার গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিগুলি হাতে রাখার জন্যে তাঁর কোন ব্যগ্রতা ছিল না। উত্তর আফ্রিকার যুদ্ধে তাঁর আগ্রহ ছিল না। জার্মানীর মিত্র ফ্যাসিষ্ট ইতালী উত্তর আফ্রিকার যুদ্ধে বিপদে পড়লে, তাকে সাহায্যের জন্যে তিনি সামান্য সেনা, রণসম্ভার ও সেনাপতি রোমেলকে আফ্রিকায় পাঠান। তৃতীয়তঃ, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ব্রিটেনের সঙ্গে মিত্রতা রক্ষার জন্যে হিটলার বারংবার চেষ্টা চালান। কাইজার ইংলন্ডের বিরোধিতা দ্বারা· যে ভুল করেন, হিটলার তাহা পরিহার করার চেষ্টা করেন। চতুর্থতঃ, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি তিনি কোন সহানুভূতি দেখাননি। কারণ ভারত ছিল ব্রিটিশ উপনিবেশ। তাতে ব্রিটিশের সঙ্গে তাঁর মিত্রতার আশা বিনষ্ট হত।

এ· জে· পি টেইলাবেব অভিমত

এ· জে· পি· টেইলারের মতে, হিটলারের আসল লক্ষ্য ছিল পূর্ব ইওরোপে জার্মান সাম্রাজ্যের প্রসার। এই লক্ষ্য পূরণের জন্যে তিনি ভার্সাই সন্ধির শর্তগুলিকে ভেঙে জার্মানীর শক্তি বৃদ্ধির ব্যবস্থা করেন। তাঁর চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল পূর্ব ইওরোপে জার্মান সাম্রাজ্য বিস্তার দ্বারা জার্মানীর "লেবেনসরাউম" (Lebensraum) বা জার্মানদের বাসস্থান বিস্তৃত করা। হিটলারের কূটনীতি এমন বাঁকা পথে চলত যে, তাঁর লক্ষ্য সম্পর্কে ইওরোপে দারুণ বিভ্রান্তি দেখা দেয়। তিনি ভার্সাই সন্ধির কঠোর সমালোচনা এবং রুশী সাম্যবাদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে ব্রিটেনের রক্ষণশীল সরকারকে বিভ্রান্ত করেন। হিটলার বিশ্বব্যাপী জার্মান সাম্রাজ্য স্থাপন করতে চান কিনা তা নিশ্চিত না হলেও, আপাততঃ তাঁর বৈদেশিক নীতিতে ৪টি লক্ষ্য তিনি নেন একথা স্পষ্ট বোঝা যায়। এই ৪টি লক্ষ্য ছিল, যথাক্রমে, (১) জার্মানীর নিরস্ত্রীকরণের ব্যবস্থা ভেঙে জার্মানীর অস্ত্রসজ্জা করা; (২) জার্মানীর স্বার্থ-বিরোধী যে শর্তগুলি ভার্সাই সন্ধিতে ছিল তা ভেঙে ফেলা; (৩) জার্মানীর ভৌগোলিক সীমার বাইরে যে সকল জার্মান ছিল তাদের জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত করা; (৪) পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব ইওরোপে জার্মানীর আধিপত্য বিস্তার দ্বারা Lebensraum। সৃষ্টি করা।

পূর্ব ইওবোপে প্রসার

১· Alan Bullock—Hitler—A Study in Tyrranny.

২· A.J.P. Taylor—Origin of the Second World War.

১৯৩৩ খ্রীঃ ক্ষমতা লাভের পরেই হিটলার বিশ্ব নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন থেকে জার্মান প্রতিনিধিকে প্রত্যাহার করে চমক সৃষ্টি করেন। হিটলার দাবী করেন যে, হয় জার্মানীকে অস্ত্র বাড়াবার অনুমতি দেওয়া হোক, নতুবা ফ্রান্সের অস্ত্র কমিয়ে জার্মানীর সমতুল্য করা হোক। ফ্রান্স, জার্মানীর প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করলে, নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে জার্মানীর প্রতি বৈষম্যের অজুহাতে জার্মান প্রতিনিধি বের হয়ে যান। এই সঙ্গে জার্মানী লীগের সদস্য পদ ত্যাগ করে। হিটলারের উদ্দেশ্য ছিল নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন বর্জন করে জার্মানীর অস্ত্রসজ্জার নীতিকে পূর্ণতা দেওয়া। এই সম্মেলনে জার্মানী যদি নিরস্ত্রীকরণ চুক্তিতে স্বাক্ষর করত, তবে তার অস্ত্রসজ্জাতে বাধা পড়ত। নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে তিনি এমন একটি দাবী তোলেন যা ফ্রান্স কখনও মানতে পারত না। লীগের সদস্য হিসেবে লীগের চুক্তিপত্রের আদর্শ অনুসরণ করতে জার্মানী ইচ্ছুক ছিল না। এই কারণে জার্মানী এই সভার সদস্যপদ বর্জন করে। নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন বর্জনের পর হিটলার দেখাতে চান যে, তাঁর অস্ত্র নির্মাণের নীতি জাতি সমর্থন করে।

নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন বর্জন

এর পর ১৯৩৪ খ্রীঃ হিটলার পোল্যান্ডের সঙ্গে পোল-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদন করেন। এই চুক্তির দ্বারা ১০ বছরের জন্যে জার্মানী ও পোল্যান্ড পরস্পরকে আক্রমণ না করতে প্রতিশ্রুতি দেয়। পরস্পরের বিরোধ শান্তিপূর্ণ উপায়ে মিটিয়ে নেওয়ার কথা এই চুক্তিতে বলা হয়। পোল-জার্মান চুক্তি ছিল হিটলারের "পাশবিক কূটনীতির" (Brutal diplomacy) একটি দৃষ্টান্ত। জার্মানীর বিরুদ্ধে ফ্রান্স ও পোল্যান্ড যে পারস্পরিক রক্ষা জোট গঠন করেছিল তা হিটলার এই চুক্তির দ্বারা ভেঙে ফেলেন। জার্মানীর কাছ থেকে অনাক্রমণের প্রতিশ্রুতি পেয়ে পোল্যান্ড ফ্রান্সের ওপর নির্ভরশীলতা ত্যাগ করে। এই চুক্তির দ্বারা লোকার্ণো সন্ধির (১৯২৫ খ্রীঃ) ফ্রাঙ্কো-পোলিশ পারস্পরিক আত্মরক্ষা চুক্তি বাতিল হয়ে যায়। এর ফলে ফ্রান্সের ক্ষমতা কমে যায় এবং জার্মানীকে বেষ্টন করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। পোল-জার্মান চুক্তির আর একটি তাৎপর্য্য ছিল যে, জার্মানীর কাছ থেকে অনাক্রমণের নিশ্চয়তা পেয়ে পোল্যান্ড রুশ সীমান্তে রাশিয়ার সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার ব্যূহ তৈরি করে।

পোল-জার্মান চুক্তি

সেন্ট জার্মেইন সন্ধির ৮০নং ধারায় এবং ভার্সাই সন্ধির দ্বারা জার্মানী এবং অষ্ট্রিয়াকে পৃথক রাষ্ট্র হিসেবে রাখার কথা বলা হয়। কিন্তু হিটলার জার্মান জাতির ঐক্য স্থাপনের জন্যে জার্মানীর সঙ্গে অষ্ট্রিয়াকে সংযুক্ত করার পরিকল্পনা নেন। হিটলারের জন্ম হয় অষ্ট্রিয়ায়। তিনি ছাত্র জীবন থেকে ছিলেন প্যান জার্মানবাদী (Pan Germanist) বা জার্মান জাতির ঐক্যে বিশ্বাসী [১] তিনি বলেন যে, প্রাশিয় মন্ত্রী বিসমার্ক জার্মানী থেকে অস্ট্রিয়াকে বহিষ্কার করলেও, অষ্ট্রিয় মন্ত্রী হিটলার অষ্ট্রিয়াকে জার্মানীর সঙ্গে সংযুক্ত করবেন। তিনি এই নীতির নাম দেন "আনস্লুস" (Anschluss)।

অষ্ট্রিয়া নীতি

আনস্লুস নীতিকে কার্যকরী করার জন্যে হিটলার, অষ্ট্রিয়ায় নাৎসী দলের শাখা স্থাপন করেন। এদের গোপনে অস্ত্র সরবরাহ করা হয়। ১৯৩৪ খ্রীঃ অষ্ট্রিয় নাৎসীরা অকস্মাৎ একটি Putsch বা সামরিক অভ্যুত্থান ঘটায়। অষ্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী ডলফাস এই অভ্যুত্থানের ফলে নিহত হন। নাৎসী বিদ্রোহীরা সরকারি অফিস ও বেতারকেন্দ্র অধিকার করে। কিন্তু অষ্ট্রিয়ার রাষ্ট্রপতি অনুগত সেনাদল দ্বারা এই বিদ্রোহ দমন করেন। ইওরোপীয় দেশগুলি, অষ্ট্রিয়ার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হিটলারের হস্তক্ষেপের নিন্দা জানায়। ইতালীর ফ্যাসিষ্ট নেতা মুসোলিনীর নির্দেশে ইতালীয় বাহিনী অষ্ট্রিয়ার সমর্থনে এগিয়ে আসে। এই অভূতপূর্ব পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে

১· Alan Bullock—Ibid.

জার্মান-নাৎসী সরকার অষ্ট্রিয়ার বিদ্রোহের সঙ্গে তার সম্পর্ক অস্বীকার করে। পোল্যান্ড ও অষ্ট্রিয়ায় নাৎসী নীতির সুদূর-প্রসারী কুফল বুঝে, ফরাসী মন্ত্রী লুই বার্থু (Louis Barthou) ইওরোপে একটি নাৎসী বিরোধী জোট গঠনের জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। কিন্তু ফ্রান্সের মার্সাই বন্দরে তিনি আততায়ীর হাতে নিহত হন। এর ফলে জার্মানীর বিরুদ্ধে জোট গঠনের চেষ্টা পরিত্যক্ত হয়। ১৯৩৫ খ্রীঃ ১৫ বছর পূর্ণ হলে, ভার্সাই সন্ধির শর্ত অনুসারে সার জেলায় গণভোট দ্বারা এই জেলা ফ্রান্স অথবা জার্মানীতে থাকবে সে সম্পর্কে জনমত যাচাই-এর ব্যবস্থা করা হয়। ভোটে সার জেলার সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী জার্মানীতে যোগ দিতে চাইলে, হিটলার অস্বাভাবিক দ্রুততায় সার জেলাকে জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত করেন। যদিও সন্ধির শর্ত অনুযায়ী এই স্থান জার্মানীতে ফেরত যায়, হিটলার এমনভাব দেখান যেন তিনি সার জয় করে নিচ্ছেন।

বার্থুর হত্যা

অতঃপর হিটলার আকস্মিকভাবে ১৯৩৫ খ্রীঃ ৮ই মার্চ ঘোষণা করেন যে, তিনি ভার্সাই সন্ধির ৫নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জার্মানীর নিরস্ত্রীকরণের শর্ত মানবেন না। তিনি বলেন যে, জার্মান পদাতিক বাহিনীকে ৩৬ ডিভিসনে পরিণত করা হবে এবং বায়ু বাহিনী গঠন করার কাজ এগিয়ে চলছে।[১]

হিটলার এই ঘোষণা দেওয়ার পর পশ্চিমী শক্তির কি প্রতিক্রিয়া হয় তিনি তা তীক্ষ্ণভাবে লক্ষ্য করেন। জার্মানীর অস্ত্রসজ্জায় শঙ্কিত ব্রিটেন, ইতালি ও ফ্রান্স ষ্ট্রেসা সম্মেলনে (১৯৩৫ খ্রীঃ) মিলিত হয়ে, কঠোর ভাষায় জার্মানীর অস্ত্রসজ্জা নীতিকে নিন্দা করে। জার্মানীকে আর অস্ত্রসজ্জা না করার জন্যে সতর্ক করে দেয়। লীগের সাধারণ সভাতেও কঠোর ভাষায় জার্মানীর অস্ত্রসজ্জা নীতির নিন্দা করা হয়। কিন্তু জার্মানীকে শুধুমাত্র নিন্দা করা হয়। কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যে জার্মানীর নীতির মূল্যায়ণ সম্পর্কে মতভেদ থাকায় নেওয়া হয়নি।

হিটলার ধূর্ত কূটনীতির পরিচয় দিয়ে ঘোষণা করেন যে, (১) জার্মানীর অস্ত্রসজ্জা কারও বিরুদ্ধে হচ্ছে না। (২) তিনি প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সন্ধির দ্বারা অনাক্রমণের গ্যারান্টি দিতে রাজি আছেন। (৩) জার্মানী-ফ্রান্সের সীমানা মেনে চলতে প্রস্তুত। হিটলারের এই আশ্বাসের টোপ ব্রিটেন গিলে ফেলে। ফলে ইঙ্গ-জার্মান আলোচনা শুরু হয়। এই পরিস্থিতিতে ব্রিটেন নাৎসী জার্মানীকে তোষণ করার নীতি নেয়। ১৯৩৫ খ্রীঃ ব্রিটেন ইঙ্গ-জার্মান নৌ-চুক্তি সম্পাদন করে। এই চুক্তির দ্বারা ইংলন্ডের নৌ-বহরের শক্তির শতকরা ৩৫% হারে জার্মানীকে জাহাজ নির্মাণ করতে বলা হয়। ইঙ্গ-জার্মান নৌ-চুক্তি ছিল হিটলারের কূটনীতির একটি বিরাট সফলতা। প্রথমতঃ, এই চুক্তির দ্বারা জার্মানী ইংলন্ডের সহানুভূতি পায়। ফলে জার্মানীর স্থল ও বায়ু সেনা বৃদ্ধিতে ইংলন্ড জোর আপত্তি না জানিয়ে নীরব থাকে। ফ্রান্স এককভাবে জার্মান অস্ত্রসজ্জার বিরুদ্ধে আপত্তি জানালে তা নিষ্ফল হয়। ষ্ট্রেসা ফ্রন্ট ভেঙে যায়। এইভাবে হিটলার ভার্সাই সন্ধির পঞ্চম অনুচ্ছেদ ভেঙে জার্মানীকে ইওরোপের শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তিতে পরিণত করেন। ব্রিটেনের বিরুদ্ধে জার্মান বিরোধী জোট গঠনে ব্যর্থ হয়ে ফ্রান্স নিরুপায় হয়ে পড়ে। পোল-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তির দ্বারা হিটলার জার্মানীর বিরুদ্ধে পোল-ফরাসী জোট ভেঙে ফেলেন। এখন ইঙ্গ-জার্মান নৌ-চুক্তির দ্বারা তিনি ব্রিটেনকে জার্মানীর পক্ষে আনায়, ফ্রান্স মিত্রহীন, জোটহীন হয়ে নিরুপায় হয়। কারণ ব্রিটেন নীতিগতভাবে মেনে নেয় যে, জার্মানীর অস্ত্রসজ্জার অধিকার ছিল। ফ্রান্স শেষ পর্যন্ত তার আত্মরক্ষার জন্যে ফ্রাঙ্কো-সোভিয়েত পারস্পরিক আত্মরক্ষা চুক্তি (১৯৩৫ খ্রীঃ), স্বাক্ষর করে। ফ্রান্সের বহু রাজনীতিক এই চুক্তির বিরোধী হলেও এখন প্রাণের

জার্মানীর অস্ত্রসজ্জা ও ষ্ট্রেসা কনফারেন্স

১· Gordon Craig.

ভয়ে একদা নিন্দিত সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে ফ্রান্স করমর্দন করে। এই সন্ধিতে তৃতীয় শক্তি অর্থাৎ জার্মান আক্রমণের বিরুদ্ধে ফ্রান্স ও সোভিয়েত রাশিয়া পরস্পরকে সাহায্য করতে রাজী হয়। চুক্তির অপর শর্ত ছিল চেকোশ্লাভাকিয়াকে জার্মান আক্রমণ থেকে উভয় শক্তি রক্ষা করবে।

এদিকে ইতালী আবিসিনিয়া আক্রমণ করলে, ইওরোপীয় শক্তিগুলি সেই সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। হিটলার এই সুযোগে ১৯৩৬ খ্রীঃ জার্মানীর রাইনল্যান্ড অধিকার করেন। ভার্সাই ও

রাইনল্যান্ড অধিকার

লোকার্ণো সন্ধির দ্বারা জার্মানী যে রাইন অঞ্চলকে অসামরিক এলাকা হিসেবে গণ্য করতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল হিটলার তা ভঙ্গ করেন। ফ্রান্স ইচ্ছা করলে জার্মানীর রাইনল্যান্ড অধিকার একাই প্রতিরোধ করতে পারত। কারণ তখনও পর্যন্ত ফ্রান্স অস্ত্র ও সৈন্যদলে জার্মানীর অনেক উঁচুতে ছিল। কিন্তু ফ্রান্সে একদল ধনী শিল্পপতি ও বুর্জোয়া ছিলেন ঘোর সোভিয়েত বিরোধী। ১৯৩৫ খ্রীঃ এর ফ্রাঙ্কো-সোভিয়েত সন্ধিতে তাঁরা রুষ্ট হন; এখন যদি ফ্রান্স রাইনল্যান্ড রক্ষার প্রশ্নে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামত, তবে, অবধারিতভাবে ফরাসী মিত্র রাশিয়াও যুদ্ধে নামত। এই শিল্পপতি ও ধনিক শ্রেণী এজন্য দাবী তোলেন যে, "হিটলার ভাল; ষ্ট্যালিন খারাপ" (Better Hitler than Stalin)। ফলে ফরাসী সরকার জার্মানীর রাইনল্যান্ড দখলের বিরুদ্ধে মৌখিক প্রতিবাদ জ্ঞাপন ছাড়া আর কোন বৈধ ব্যবস্থা নেয়নি। ব্রিটেনের মনোভাব ছিল তোষণমূলক। ব্রিটেনের প্রভাবশালী টোরী শাসক দল মনে করতেন যে, জার্মানীর নিজের জায়গায় আধিপত্য রাখতে যদি জার্মানী সৈন্য পাঠায় তাতে আপত্তি ন্যায়সঙ্গত নয়। দ্বিতীয়তঃ, এ্যালান বুলকের (Allan Bullock) মতে, ফ্রান্স যখন সোভিয়েত মৈত্রী নিল তখন ব্রিটেনের এ ব্যাপারে হাত ধুয়ে ফেলাই ভাল। তৃতীয়তঃ, জার্মানীর পদাতিক সেনার বল বাড়লে ব্রিটেনের ক্ষতি নেই, নৌ-বাহিনী ও বিমান বাহিনী বাড়লে ক্ষতি। শেষের দুটি ব্যাপারে জার্মানী শক্তি না বাড়াতে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ। চতুর্থতঃ, ভার্সাই সন্ধি এমন অলঙ্ঘনীয় সন্ধি নয় যে, ন্যায্য দাবীর জন্যে তা পরিবর্তন করা যাবে না। রাইনল্যান্ডে জার্মানীর ন্যায্য জাতীয় দাবী আছে। এই মতভেদের সুযোগ নিয়ে হিটলার ঘোষণা করেন যে, যেহেতু ফ্রান্স লোকার্ণো সন্ধির মর্মসূত্র ভেঙে সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে সন্ধি করেছে, সেহেতু জার্মানী আর লোকার্ণো সন্ধি মানতে নৈতিকভাবে বাধ্য নয়। রাইনল্যান্ড অধিকার এজন্যই করা হোল।

আবিসিনীয় যুদ্ধে, জার্মানী লীগের নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করে ইতালীকে সমর্থন জানায়। অতঃপর স্পেনের গৃহযুদ্ধে জার্মান বায়ু সেনাদল, স্পেনের সেনাপতি জেনারেল ফ্রাঙ্কোর

রোম-বার্লিন অক্ষচুক্তি

সমর্থনে যুদ্ধ করে। স্পেনের গৃহযুদ্ধে হিটলার জার্মান বায়ুসেনার শক্তি ভালভাবে পরীক্ষা করেন। এর কিছুদিন পরে ফ্যাসিষ্ট ইতালীর সঙ্গে নাৎসী জার্মানী কমিউনিষ্ট বিরোধী চুক্তি (Anti Commintern Pact) সম্পাদন করে। ক্রমে এই চুক্তি রোম-বার্লিন অক্ষচুক্তিতে পরিণত হয়। রোম-বার্লিন অক্ষচুক্তির গুরুত্ব এই ছিল যে, এই চুক্তির দ্বারা জার্মান-ইতালী জোট ফ্রান্সকে বেষ্টন করে ফেলে। ইওরোপে নতুন শক্তি সাম্য গড়ে ওঠে।

১৯৩৭ খ্রীঃ হিটলার Anschluss বা আনস্লুস পরিকল্পনাকে রূপদানের কাজে হাত দেন। তিনি জার্মান পার্লামেন্ট বা রাইখষ্ট্যাগে একটি ঐতিহাসিক বক্তৃতা দেন।[১] এই বক্তৃতায় তিনি

আনস্লুশ নীতি

রুশী কমিউনিজমের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেন এবং পশ্চিমী গণতন্ত্র বিশেষতঃ ব্রিটেনের প্রতি তাঁর প্রচ্ছন্ন সমর্থন জানান। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেইন এর ফলে জার্মান তোষণ নীতি গ্রহণ করেন। ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড

১· Shirer—Rise and Fall of Third Reich. Allan Bullock—Hitler.

হ্যালিফ্যাক্স এক সাক্ষাৎকারে হিটলারকে জানান যে, যদি জার্মানী শান্তিপূর্ণ উপায়ে ভার্সাই সন্ধি পরিবর্তন করে তবে তাতে ব্রিটেনের আপত্তি নেই। ডানজিগ, চেকোশ্লোভাকিয়া এবং অষ্ট্রিয়ার ক্ষেত্রে জার্মানীর দাবীর প্রতি ব্রিটেনের নৈতিক সমর্থন আছে।

অষ্ট্রিয়া অধিকার

ব্রিটেনের নিকট সবুজ সঙ্কেত পেয়ে হিটলার অষ্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী সুশনিগের (Schuschnigg) নিকট দাবী জানান যে, অষ্ট্রিয়ার নাৎসী নেতা সিয়েস ইনকার্ট (Sives Inquhart)-কে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদে নিয়োগ করতে হবে। অষ্ট্রিয়া সরকারের অর্থদপ্তর এবং বৈদেশিক দপ্তরের দায়িত্ব নাৎসীপন্থী নেতাদের দিতে হবে। অষ্ট্রিয়ার নাৎসী দলকে বৈধ ঘোষণা করতে হবে। নতুবা জার্মান বাহিনী অষ্ট্রিয়া আক্রমণ করবে। সুশনিগ্ হিটলারের চাপের নিকট নতি স্বীকার করেন। তিনি হিটলারের দাবী সম্বলিত দলিলে স্বাক্ষর দেন। দেশে ফিরে আসার পর সুশনিগ্ অষ্ট্রিয়ার জনগণের গণভোট নেওয়ার ব্যবস্থা করেন এই মর্মে যে, অষ্ট্রিয়ার জার্মানরা জার্মানীর সঙ্গে সংযুক্তিতে ও হিটলারের দাবীগুলি মানতে রাজী আছে কিনা? ১৩ই মার্চ, ১৯৩৮ খ্রীঃ গণভোটের দিন হিটলার চরমপত্র দেন যে, হয় গণভোট রদ করতে হবে, অথবা জার্মান সেনা অষ্ট্রিয়া আক্রমণ করবে। সুশনিগ্ বাধ্য হয়ে গণভোট রদ করেন। তিনি এই সঙ্গে পদত্যাগ করেন। অষ্ট্রিয়ার নাৎসী নেতা সিয়েস অষ্ট্রিয়ার সরকার গঠন করেন। এর কিছুকাল পরে সিয়েস ইনকার্টের আহ্বানে জার্মান সেনা অষ্ট্রিয়ায় প্রবেশ করে। একটি কৃত্রিম গণভোট দ্বারা হিটলার জার্মানীর সঙ্গে অষ্ট্রিয়ার সংযুক্তি পাকা করে নেন। হিটলার জানান যে, ৯৯·৭৫% ভোট জার্মানীর সংযুক্তির পক্ষে দেওয়া হয়েছে। আসলে প্রকৃত ভোটদাতারা সন্ত্রাসের ভয়ে ভোট দিতে পারেনি। তবে একথাও সত্য যে, বহু অষ্ট্রিয়াবাসী এই সংযুক্তির পক্ষে ছিল। আনস্লুশ বা জার্মানীর সঙ্গে অষ্ট্রিয়ার সংযুক্তির ব্যাপারে লর্ড হ্যালিফ্যাক্সের দ্বারা ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী তাঁর অগ্রিম সম্মতি দেন। সংযুক্তির পর ব্রিটেন এই দৃষ্টিভঙ্গী নেয় যে, জার্মানী তার জাতীয়তাবাদী আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্যে যদি জার্মান ভাষাভাষী অষ্ট্রিয়াকে সংযুক্ত করে তাতে আপত্তির কিছু নেই। বিশেষতঃ বেশীর ভাগ অষ্ট্রিয়ান যখন এই সংযুক্তির পক্ষে তা সমর্থন যোগ্য। ফ্রান্স হতাশ হয়ে নিষ্ক্রিয় থাকে। রোম-বার্লিন অক্ষচুক্তির ফলে এবারে মুসোলিনীর দিক থেকে এই সংযুক্তিতে ১৯৩৪ খ্রীঃ মত বাধা আসেনি। হিটলার সংযুক্তির আগে মুসোলিনীর মনোভাব জানতে চাইলে, মুসোলিনী বলেন যে, "তিনি অষ্ট্রিয়াকে পাহারা দিয়ে ক্লান্ত হয়েছেন। জার্মানীর এখন দ্রুত কাজ সমাধা করা উচিত।" আনস্লুশের ফলে জার্মানী মধ্য দানিয়ুব অঞ্চলে ঢুকে পড়ে। জার্মানীর পরবর্তী লক্ষ্য হয় চেকোশ্লোভাকিয়া। বলকান অঞ্চলে এবার জার্মানীর প্রসারের ক্ষেত্র তৈরি হয়। হিটলার এজন্য আত্মপ্রসাদ লাভ করেন।

সুদেতেন সমস্যা

অষ্ট্রিয়া অধিকারের পর হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়ার দিকে নজর দেন। চেকোশ্লোভাকিয়ার সুদেতেন জেলাতে ৩½ মিলিয়ন জার্মান অধিবাসীরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। এই অঞ্চল ছিল জার্মানীর সীমান্ত সংলগ্ন। হিটলারের নির্দেশে সুদেতেন জেলায় নাৎসী তৎপরতা বাড়ে। হেনলিয়েন নামে এক নাৎসী নেতা দাবী করেন যে, সুদেতেন অঞ্চলকে জার্মান পিতৃভূমিতে ফিরিয়ে দিতে হবে। হিটলার জার্মান জাতীয়তাবাদের অজুহাতে সুদেতেন জার্মানদের দাবীর প্রতি প্রত্যক্ষ সমর্থন জানান। এমন কি তিনি জার্মান রাইখের স্বার্থে বলপ্রয়োগে সুদেতেন জেলা অধিকারের হুমকি দেন। এদিকে ফ্রাঙ্কো-রুশ আত্মরক্ষা চুক্তি অনুসারে ফ্রান্স ও রাশিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়াকে জার্মান আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল। হিটলার সুদেতেন অঞ্চল আক্রমণ করার হুমকি দিলে ফ্রান্স ও রাশিয়ার সঙ্গে জার্মানীর যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দেয়। সোভিয়েত নেতা ষ্ট্যালিন জানান যে, রাশিয়ার ফ্রাঙ্কো-রুশ চুক্তি অনুযায়ী, ফ্রান্স যদি প্রথমে তার সৈন্য সংস্থান করে তবে সোভিয়েত

রাশিয়া পিছিয়ে থাকবে না। সোভিয়েত রাশিয়া সন্ধির শর্ত অনুসারে চেকোশ্লোভাকিয়াকে রক্ষার চেষ্টা করবে।

চেম্বারলেইনের তোষণ নীতি

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেইন জার্মান তোষণ নীতি অনুযায়ী জার্মানীকে বিনা বাধায় সুদেতেন জেলা ছেড়ে দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। কারণ তিনি মনে করতেন যে, এই স্থান ছিল জার্মানীর প্রাপ্য। তাছাড়া জার্মানী পূর্ব ইওরোপের দিকে প্রসারিত হলে রুশ সাম্রাজ্যবাদের প্রসার রোধ হবে বলে তিনি ভাবেন। লয়েড জর্জ ও উইনস্টন চার্চিল এই সময় চেম্বারলেইনকে পরামর্শ দেন যে, ব্রিটেনের উচিত রাশিয়ার সঙ্গে জোট গড়ে জার্মান আগ্রাসনকে রোধ করা। আপাততঃ ব্রিটেনের উচিত ফ্রান্স ও রাশিয়ার পক্ষ নেওয়া। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেইন এই পরামর্শে কর্ণপাত করেননি।

মিউনিখ চুক্তি

চেম্বারলেইন, হিটলারের সঙ্গে বার্খটেসগাডেনে এবং গডেসবার্গে দুবার সাক্ষাৎ করেন। তিনি চেক সরকারকে সুদেতেন জেলা জার্মানীকে ছেড়ে দিতে রাজী করান। মিউনিখ্ বৈঠকে মুসোলিনী, ফরাসী মন্ত্রী দালাদিয়ের এবং হিটলারের সঙ্গে তিনি মিলিত হন। মিউনিখ্ চুক্তির (১৯৩৮ খ্রীঃ) দ্বারা সুদেতেন জেলা জার্মানীকে ছেড়ে দেওয়া হয়। হিটলার প্রতিশ্রুতি দেন যে, "সুদেতেন জেলাই হল ইওরোপের নিকট তাঁর শেষ দাবী।" সুদেতেন জেলা ছাড়া অবশিষ্ট চেকোশ্লোভাকিয়ার স্বাধীনতা তিনি স্বীকার করেন। মিউনিখ্ চুক্তির দ্বারা হিটলার বিনাযুদ্ধে চেকোশ্লোভাকিয়ার ⅓ অংশ দখল করেন। সোভিয়েত রাশিয়াকে এই বৈঠকে আহ্বান না করায় সোভিয়েত সরকারের সঙ্গে পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হয়। জার্মানীর বিরুদ্ধে পশ্চিমী ও সোভিয়েত জোট গঠনের সম্ভাবনা দূর হয়। হিটলারের কূটনীতি জয়যুক্ত হয়। তিনি বিনা যুদ্ধে শুধু মৌখিক হুমকির দ্বারা ভার্সাই সন্ধিকে অগ্রাহ্য করে, সুদেতেন জেলা জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত করেন। মিউনিখ্ চুক্তি ছিল ব্রিটেনের জার্মান তোষণ নীতির পরাকাষ্ঠা এবং হিটলারের নিকট ফ্রাঙ্কো-ব্রিটিশ শক্তির আত্মসমর্পণ।

প্রাগ অধিকার

মিউনিখ্ চুক্তির কিছুকালের মধ্যেই হিটলার এই চুক্তিকে ছেঁড়া কাগজের ন্যায় অগ্রাহ্য করেন। চেকোশ্লোভাকিয়ার ভেতর তিনি দারুণ অন্তর্ঘাত সৃষ্টি করেন। হিটলারের প্ররোচনায় শ্লোভাক জাতি চেকদের শাসন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্যে মহা গণ্ডগোল সৃষ্টি করে। জার্মান সীমান্তে গণ্ডগোল সৃষ্টির অজুহাতে হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়াকে জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত করেন।

পোল নীতি : ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিরোধ

হিটলার মিউনিখ্ চুক্তি ভেঙে অবশিষ্ট চেকোশ্লোভাকিয়া গ্রাস করলে চেম্বারলেইন তাঁর তোষণ নীতির বিফলতা বুঝতে পারেন। শেষ পর্যন্ত ইংলন্ড ও ফ্রান্স যুক্তভাবে জার্মানীর আগ্রাসন রোধ করতে কৃতসঙ্কল্প হয়। চেকোশ্লোভাকিয়া অধিকারের পর হিটলার পোল্যান্ডের দিকে দৃষ্টি দেন। তিনি ডানজিগ্ বন্দর দাবী করেন এবং মেমেল দখল করেন। এর ফলে বোঝা যায় যে, পোল্যান্ডে তাঁর আগ্রাসন আসন্ন। এমতাবস্থায় ইঙ্গ-ফরাসী শক্তি পোল্যান্ডের স্বাধীনতা রক্ষার গ্যারান্টি দেয়। পোল্যান্ড আক্রমণের বিরুদ্ধে হিটলারকে সতর্ক করে দেওয়া হয়। কিন্তু জার্মানী পোল্যান্ড আক্রমণের জন্যে কৃতসংকল্প হলে বিশ্বযুদ্ধ আসন্ন হয়ে পড়ে।

হিটলারের একের পর এক নীতি

ব্রিটিশ সরকার জার্মানীর বিরুদ্ধে রাশিয়ার সঙ্গে জোট গড়ার চেষ্টা করে। জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধ অনিবার্য দেখে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দপ্তরের সহকারী সচিব উইলিয়াম ষ্ট্যাং-এর নেতৃত্বে একটি মিশন মস্কোতে পাঠান হয়। এদিকে হিটলার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মস্কোয় ব্রিটিশ মিশনের উপস্থিতি লক্ষ্য করেন। তিনি অনুভব করেন যে, এই জোট গঠিত হলে, জার্মানীকে তার পূর্ব ও পশ্চিম দুই সীমান্তে এক সঙ্গে যুদ্ধ

করতে হবে। কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম এই ভুল করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাস্ত হন। সুতরাং হিটলার "একের পর এক" (One by One Policy) নীতি গ্রহণ করেন। তিনি রাশিয়ার মিত্রতা থেকে পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে প্রথমে পশ্চিমী দেশগুলিকে পরাস্ত করার নীতি নেন।

হিটলারের নির্দেশে জার্মান পররাষ্ট্র মন্ত্রী রিবেনট্রপ একটি মৈত্রীমিশন সহ মস্কোতে উপস্থিত হন। রুশ নেতা ষ্ট্যালিন ও রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী মলোটোভ মিউনিখ্ চুক্তির জন্যে ব্রিটেনের বিশ্বস্ততায় সন্দিহান ছিলেন। মস্কোতে প্রেরিত ব্রিটিশ্ মৈত্রীমিশন রুশ নেতাদের শর্ত পূরণে ব্যর্থ হলে তাঁরা এই মিশন বাতিল করে দেন। রুশ সরকার জার্মান মিশনের সঙ্গে রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি (১৯৩৯ খ্রীঃ) স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তির দ্বারা দুটি দেশ ১০ বছরের জন্যে পরস্পরকে আক্রমণ না করতে প্রতিশ্রুতি দেয়। পরস্পর বিরোধের বিষয়গুলি শান্তিপূর্ণ উপায়ে মিটিয়ে নিতে রাজী হয়। এই সন্ধির গোপন শর্ত দ্বারা দুই স্বাক্ষরকারী দেশ পরস্পরের মধ্যে পোল্যান্ডকে ভাগ করতে রাজী হয়। দুই স্বাক্ষরকারী পূর্ব ইওরোপে নিজ নিজ প্রভাবযুক্ত এলাকা স্থির করে। জার্মানী তৃতীয় কোন শক্তির দ্বারা আক্রান্ত হলে, রাশিয়া নিরপেক্ষ থাকার প্রতিশ্রুতি দেয়। রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি ছিল হিটলারের কূটনৈতিক দক্ষতার চূড়ান্ত নিদর্শন। এর দ্বারা হিটলার জার্মান-বিরোধী জোট গঠনের সম্ভাবনা দূর করেন। তিনি আপাততঃ রাশিয়াকে নিরপেক্ষ রেখে ভবিষ্যতে রাশিয়া আক্রমণের ব্যবস্থা করেন।

রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি

জার্মান সেনা ১৯৩৯ খ্রীঃ ১লা সেপ্টেম্বর পোল্যান্ড আক্রমণ করলে, ইঙ্গ-ফরাসী শক্তি জার্মানীর বিরুদ্ধে ১৯৩৯ খ্রীঃ ৩রা সেপ্টেম্বর যুদ্ধ ঘোষণা করে। এইভাবে বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধে ফ্রান্স ও ইংলন্ডের প্রাথমিক পরাজয়ের পর, হিটলার ১৯৪১ খ্রীঃ রাশিয়াকে আক্রমণ করেন।

মিউনিখ্ চুক্তি ও তার গুরুত্ব (The Munich Treaty and its significances) : ভার্সাই সন্ধি গোষ্ঠীর অন্যতম সন্তান ছিল পূর্ব ইওরোপের চেকোস্লোভাকিয়া। এই নবজাতক রাষ্ট্রটিতে ছিল ৭½ মিলিয়ন চেক, ২ মিলিয়ন স্লোভাক, ৩½ মিলিয়ন জার্মান, ¾ মিলিয়ন মডিয়ায় ও ½ মিলিয়ন রুটেন। নব গঠিত চেক রাষ্ট্রটির পক্ষে এজন্য টিকে থাকা কঠিন ছিল। চেকোস্লোভাকিয়া ছিল একটি প্রজাতন্ত্র। প্রথম রাষ্ট্রপতি মাসারিক (Massaryek) ও দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি বেনেস (Benes) বহু যত্নে চেক দেশে গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা ও মূল্যবোধের লালন করেন। চেকোস্লোভাকিয়া একটি ক্ষুদ্র অথচ বেশ মজবুত সেনাদল গঠন করে। শিল্প গঠনে চেকরা অসাধারণ কৃতিত্ব দেখায়। চেক দেশের বিখ্যাত SKODA কারখানা ছিল জগৎ বিখ্যাত।

আনস্লুশ অষ্ট্রিয়ার সংযুক্তির পর জার্মানীর সীমানা চেক দেশ ছুঁয়ে গেলে হিটলার তাঁর রাজ্য বিস্তার পরিকল্পনার পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে চেক দেশকে বেছে নেন। চেকোস্লোভাকিয়ার সঙ্গে জার্মানীর বিরোধের বিষয় ছিল, চেক রাষ্ট্রের সুদেতেন জেলার ৩½ মিলিয়ন জার্মানের পিতৃভূমিকে সংযুক্তির প্রশ্ন। যেহেতু সুদেতেন জেলা ছিল ভার্সাই সন্ধির আগে জার্মানীর সাইলেশিয়া প্রদেশের অঙ্গ, যেহেতু ভার্সাই সন্ধির অস্ত্রোপচার দ্বারা ৩½ মিলিয়ন জার্মান, মূল্যবান কয়লাখনিসহ এই জেলা চেক রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, সেহেতু জার্মান জাতীয় রাষ্ট্র বা তৃতীয় রাইখ গঠনের জন্যে হিটলার সুদেতেন জেলার পুনঃ-সংযুক্তি দাবী করেন। অজুহাত হিসেবে সংখ্যালঘু জার্মানদের ওপর সংখ্যাগুরু চেকদের অত্যাচারের কথা তিনি প্রচার করেন। আসল ব্যাপার এই ছিল যে, সুদেতেন জার্মানরা ছিল শিক্ষা, বাণিজ্য ও বিভিন্ন বৃত্তিতে চেকদের অপেক্ষা অনেক অগ্রসর

সুদেতেন সমস্যার কথা

ছিল। চেক রাষ্ট্র গঠিত হলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনগ্রসর চেক ও শ্লোভাকদের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হলে জার্মান সংখ্যালঘুরা বৈষম্যের অভিযোগে মহা শোরগোল তোলে। এই সময় হিটলারের নির্দেশে সুদেতেন জার্মানদের নিয়ে হেনলিয়েন নামে এক স্থানীয় জার্মান সুদেতেন নাৎসী দল গঠন করেন।

মহামন্দার প্রভাব

১৯৩০-এর মহামন্দা চেক রাষ্ট্রকেও ভীষণ ক্ষতিগ্রস্থ করে। শিল্পে অগ্রসর সুদেতেন জার্মানরাও দারুণ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। বহু জার্মান বেকার দশায় পড়ে, বহু জার্মান কারখানা বন্ধ হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে চেকদের বৈষম্যমূলক আচরণ অপেক্ষা মহামন্দাই সুদেতেন জার্মানদের বেশী ক্ষতির কারণ ছিল।

সুদেতেন জার্মানদের জাতীয়তাবাদ

এই পরিস্থিতিতে নাৎসী প্রচারযন্ত্র সুদেতেন জার্মানদের প্রতি চেক সরকারের দমন নীতি ও বৈষম্যের অভিযোগের ঝড় তোলে। সুদেতেন নাৎসীরাও পিতৃভূমি জার্মানীতে ফিরে যাওয়ার দাবী তোলে। তারা নানা সন্ত্রাসবাদী কাজের দ্বারা চেক সরকারের সুস্থিতি বিনষ্ট করার চেষ্টা করে। ইতিমধ্যে ১৯৩৮এ আনস্লুশের পর পিতৃভূমিতে ফিরে যাওয়ার জন্যে সুদেতেন জার্মানদের আবেগ উত্তাল হয়ে ওঠে। যদি অষ্ট্রিয়া জার্মানীর সঙ্গে যুক্ত হয়, তবে ৩ই মিলিয়ন জার্মানকে পিতৃভূমি থেকে ভার্সাই সন্ধির দ্বারা বিচ্ছিন্ন করার পর কেন তারা জার্মানীতে পুনরায় যুক্ত হবে না, এই দাবী প্রবল ও বাঁধভাঙ্গা হয়ে ওঠে।

চেক সরকারের আপোষ নীতির বিফলতা

নাৎসী নেতা হিটলার এই পরিস্থিতির পুরো সুযোগ নেন। সুদেতেন জার্মানদের প্রতি বৈষম্য ও দমনমূলক ব্যবস্থার অভিযোগে তিনি এই জেলা জার্মানীর সঙ্গে সুযুক্তির দাবী জানান। এমনকি প্রয়োজনে যুদ্ধের হুমকি দেন। তাঁরই ইঙ্গিতে সুদেতেন নাৎসীরা এমন সব দাবী তোলে, যা চেক সরকারের পক্ষে গ্রহণ করা আদপেই সম্ভব ছিল না। নতুবা পরিস্থিতি বিবেচনা করে জার্মানীর সঙ্গে সংযুক্তির দাবী ছাড়া সুদেতেন জার্মানদের আর সব দাবী পূরণে চেক সরকার রাজী ছিলেন। কিন্তু সুদেতেন নেতা হেনলিয়েন আপোষ চাননি।

সুদেতেন জেলার প্রতি হিটলারের লোভের কারণ

হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রতি লোভাতুর দৃষ্টি দেন। সুদেতেন জেলার ওপর তাঁর দাবী ছিল অজুহাত মাত্র। হিটলার ছিলেন প্যান জার্মানিষ্ট। অষ্ট্রিয়ার পূর্ব সময়ে অধীনস্থ এই রাজ্যটির স্বাধীন অবস্থান প্যান জার্মানবাদী হিটলারের চোখের বালি ছিল। চেকোশ্লোভাকিয়ার শিল্প কারখানা বিশেষতঃ S. K. O. D. A কারখানার ওপর তাঁর বিশেষ লোভ ছিল। পূর্ব ইওরোপে সাম্রাজ্য প্রসার ছিল হিটলারের বিদেশ নীতির মূল সূত্র। কাজেই এই নীতির অঙ্গ হিসেবে তিনি চেকোশ্লোভাকিয়া গ্রাস করতে চান। সুদেতেন জার্মানদের ওপর বৈষম্যমূলক আচরণের অজুহাতে তিনি অতৃপ্ত জার্মান জাতীয়তাবাদকে পূর্ণ করতে চান।

সুদেতেন জেলার সংযুক্তি সম্পর্কে ফ্রাঙ্কো-রুশ চুক্তির বাধা—ব্রিটিশ নীতি

হিটলারের এই রাজ্যলিপ্সা পূরণ করার পথে বাধা ছিল ফ্রাঙ্কো-রুশ আত্মরক্ষা সন্ধি, যার দ্বারা উভয় শক্তি চেকোশ্লোভাকিয়া-রক্ষার জন্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল। কিন্তু ফ্রান্সের দালাদিয়ের মন্ত্রীসভার চেকোশ্লোভাকিয়ার জন্যে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার কোন আগ্রহ ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, ব্রিটেনকে ত্যাগ করে কেবলমাত্র সোভিয়েতের সঙ্গে চুক্তির ওপর নির্ভর করে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে ফ্রান্সের আপত্তি ছিল। এদিকে যেখানে ব্রিটেনের স্বার্থ জড়িত ছিল না এবং ব্রিটিশের নিরাপত্তার প্রশ্নও জড়িত ছিল না, তার জন্যে ব্রিটেনের রক্ত ক্ষয় করতে ব্রিটিশ সরকারের আপত্তি ছিল। এমতাবস্থায় ব্রিটেন কি দৃষ্টিভঙ্গী নেয় তার ওপরে সবকিছু নির্ভর করছিল। ব্রিটিশ হাউজ অব কমন্সের সভায় সদস্যদের ব্যগ্র প্রশ্নের উত্তরে

২৪শে মার্চ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেইন ঘোষণা করেন যে, "যদি চেকোশ্লোভাকিয়ার স্বাধীনতা রক্ষার কারণে, ব্রিটেনের মিত্র ফ্রান্স যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে, তাহলে ঘটনার অনিবার্য চাপ, সরকারী ঘোষণা অপেক্ষা অনেক বেশী কার্যকরী হবে" (If our ally France became involved in war for this cause, the inexorable pressure of facts might well prove more powerful than formal pronouncements)। এই ধোঁয়াটে ঘোষণা থেকে অনেকে মনে করেন যে, চেক যুদ্ধে ফ্রান্স জড়ালে, ব্রিটেন ফ্রান্সের পাশে থাকবে।

আসলে চেম্বারলেইন যুদ্ধের ঝুঁকি নিতে চাননি। তিনি লর্ড রানসিম্যানকে চেকোশ্লোভাকিয়ায় পাঠিয়ে চেক সরকারকে জার্মানীর সঙ্গে আপোষে রাজী হওয়ার জন্যে চাপ সৃষ্টি করেন। এদিকে ফ্রাঙ্কো-রুশ চুক্তি অনুযায়ী ফ্রান্স যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে, ব্রিটেনের পক্ষে নিরপেক্ষ থাকাও মুশকিল ছিল। এই সময় পোল্যান্ড ও রুমানিয়া ঘোষণা করে যে, তাদের দেশের মধ্য দিয়ে রুশ বাহিনীকে চেকোশ্লোভাকিয়া মুখে যেতে তারা রাস্তা দেবে না। তারা রুশ সরকারকে বিশ্বাস করে না। অপরদিকে রাশিয়া লীগের সভায় ঘোষণা করে যে, নাৎসী আগ্রাসন বন্ধের জন্যে চুক্তি অনুযায়ী ফ্রান্স যদি সেনা সমাবেশ করে তবে রাশিয়া তার দায়িত্ব পালন করবে।

ফ্রাঙ্কো-রুশ চুক্তি প্রয়োগে বাধা

এই ঘোষণা ফ্রান্সের ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করে। যুদ্ধ ঘোষণা অথবা সন্ধি ভঙ্গ করে মর্যাদাহানি এই দুই সঙ্কট থেকে ফ্রান্স মুক্তির পথ খুঁজছিল। ফ্রান্সের প্রভাবশালী মহল "ষ্ট্যালিন থেকে হিটলার ভাল" এই আওয়াজ তোলেন। এই পরিস্থিতিতে পোল্যান্ড ও রুমানিয়ার অসহযোগিতা ফ্রান্সকে উৎসাহিত করে। ফ্রান্স ব্রিটেনের জার্মান তোষণ নীতির সামিল হয়ে, তার দায়িত্ব থেকে মুক্ত হতে চায়।

ফ্রান্সের নমনীয়তা

চেম্বারলেইন নিজেই হিটলারের সঙ্গে শর্ত আলোচনার জন্যে জার্মানীতে বার্খটেস গ্যাডেনে হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। আলোচনার ফলে তাঁর ধারণা হয় যে, ৩২ মিলিয়ন জার্মান অধ্যুষিত সুদেতেন জেলা ফেরত পেলে হিটলার সন্তুষ্ট হবেন। তিনি লন্ডনে ফিরে এসে ফরাসী প্রধানমন্ত্রী দালাদিয়েরের সঙ্গে আলোচনার পর, সুদেতেন জেলা জার্মানীকে ছেড়ে দিতে চেক সরকারকে রাজী করান। স্থির হয় যে, চেকোশ্লোভাকিয়ার যে সকল স্থানের ৫০% অধিবাসী জার্মান, সেই অঞ্চল জার্মানীকে ছেড়ে দিতে হবে। চেক প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেন যে, ফ্রান্স ও ব্রিটেনের অসহনীয় চাপের ফলে তিনি এই প্রস্তাব মেনে নিচ্ছেন। চেম্বারলেইন অতঃপর সুদেতেন জেলা হস্তান্তরের প্রস্তাব নিয়ে গোডেসবার্গে হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু হিটলার সুদেতেন জেলার পরিবর্তে তাঁর দাবীর মাত্রা বৃদ্ধি করেন। তিনি চেকোশ্লোভাকিয়ার অন্যান্য অঞ্চলও চান। এর ফলে মীমাংসা ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়। ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মনোভাব কঠোর হয়। হিটলার তাঁর দরাদরি নীতির জন্যে মনে মনে আফশোষ করেন। কারণ যুদ্ধের হুমকি দিলেও, ফ্রান্স, ব্রিটিশ, রাশিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়ার যুক্ত বাহিনীর বিরুদ্ধে তাঁর যুদ্ধের শক্তি ছিল না। সন্ধি স্থাপনের আর একটি সুযোগ পেলেই তিনি তা লুফে নিতে রাজী ছিলেন।

চেম্বারলেইনের হিটলার তোষণ নীতি

চেম্বারলেইন আপোষের শেষ চেষ্টা হিসেবে, হিটলারের মিত্র মুসোলিনীকে অনুরোধ করেন যাতে তিনি গডেসবার্গ প্রস্তাবে হিটলারকে রাজী করাতে পারেন। হিটলার এবারে প্রস্তাবটি লুফে নেন। তবে তিনি শর্ত দেন যে, সন্ধি বৈঠকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চেকোশ্লোভাকিয়াকে রাখা চলবে না। ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮ খ্রীঃ জার্মানীর মিউনিখ্‌ নগরে মিউনিখ্‌ চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তিতে স্থির হয় যে, (১) ১লা থেকে ১০ই অক্টোবরের মধ্যে সুদেতেন জেলা থেকে চেক সেনা, সরকারি কর্মচারীদের প্রত্যাহার করা হবে। (২) এই সময় সীমার মধ্যে জার্মান বাহিনী ধাপে ধাপে সুদেতেন জেলার

মিউনিখ চুক্তি

দখল নেবে। (৩) ৪ সপ্তাহের মধ্যে চেক সরকার সুদেতেন জার্মানদের চেক পুলিশ ও সেনাদল থেকে মুক্তি দেবেন। (৪) ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইতালী সুদেতেন জেলা ও অবশিষ্ট চেকোশ্লোভাকিয়ার মধ্যে সীমান্ত শীঘ্রই নির্দেশ করে দেবে। (৫) ব্রিটেন ও ফ্রান্স অবশিষ্ট চেকোশ্লোভাকিয়ার স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা রক্ষার গ্যারান্টি দেয়।

মিউনিখ চুক্তি স্থায়ী হয়নি। আগের পরিচ্ছেদে, কিভাবে ৬ মাসের মধ্যে হিটলার মিউনিখ চুক্তি ভেঙে অবশিষ্ট চেকোশ্লোভাকিয়া দখল করেন তা আলোচনা করা হয়েছে। এই বহুল সমালোচিত ও বহু নিন্দিত চুক্তি সম্পর্কে বিচার করতে হলে প্রথম যে প্রশ্ন দেখা দেয় তা হল এই চুক্তি অনিবার্য ছিল কিনা, অথবা এই চুক্তি এড়ান সম্ভব ছিল কিনা। কোন কোন লেখকের অভিমত হল যে, ব্রিটেন যদি তার নৈতিক দায়িত্ব পালন করত এবং ফ্রান্সের পিছনে দাঁড়াত, তবে ফ্রাঙ্কো-সোভিয়েত চাপের ফলে হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে তাঁর থাবা সরিয়ে নিতে বাধ্য হতেন। চেম্বারলেইনের জার্মান তোষণ নীতির পরাকাষ্ঠা ছিল মিউনিখ চুক্তি। ব্রিটেনের তোষণ নীতির জন্যেই চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রতি ফ্রাঙ্কো-সোভিয়েত গ্যারান্টিকে কার্যকরী করা যায়নি। দ্বিতীয়তঃ, এই অভিমত দেওয়া হয় যে, সুদেতেন জেলা উপলক্ষে যখন সঙ্কট তীব্র হয়ে ওঠে, তখন রুশ বিদেশমন্ত্রী ম্যাক্সিম লিটভিনভ বেশ কয়েকবার লীগের সভায় দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেন যে, ফ্রাঙ্কো-সোভিয়েত চুক্তি অনুযায়ী ফ্রান্স তার সেনা সন্নিবেশ করলেই, সোভিয়েত ইউনিয়ন তার সকল শক্তি নিয়ে চেকোশ্লোভাকিয়া রক্ষার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়বে। রাশিয়ার এই ঘোষণাকে কোনই গুরুত্ব না দিয়ে ইঙ্গ-ফরাসী শক্তি হিটলারকে তোষণ করে সুদেতেন জেলা ছেড়ে দেন। যদি রুশ ঘোষণাকে মূল্য দেওয়া হত তবে মিউনিখ চুক্তির দরকার হত না।

মিউনিখ চুক্তি এড়ান সম্ভব ছিল কিনা

সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত মেইস্কি তাঁর On Munich নামে এক পুস্তিকায় অভিযোগ করেছেন যে, সোভিয়েত সরকারের প্রতি বদ্ধ শত্রুতা ও বিদ্বেষবশতঃ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিউনিখ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। মেইস্কির মতে, ব্রিটেনের রক্ষণশীল দলের শাসক শ্রেণী সর্বদাই সমাজতান্ত্রিক রুশী সরকারের ধ্বংস কামনা করত। এই যুগে ব্রিটিশ বৈদেশিক নীতি পার্লামেন্টে বাদানুবাদ করে স্থির না করে, ব্রিটিশ শাসক শ্রেণী পার্লামেন্টের বাইরে গোপনে স্থির করত। লেডী এ্যাষ্টরের (Lady Astor) সালো বা বৈঠকখানায় এই নীতি টোরী নেতারা স্থির করতেন। সেখানে স্থির করা হয় যে, কমিউনিষ্ট রাশিয়া হল ব্রিটেনের বৃহৎ বিপদ, জার্মান আগ্রাসন হল ক্ষুদ্র বিপদ। সুতরাং নাৎসী জার্মানীকে চেকোশ্লোভাকিয়ার পথে রুশ সীমান্তের দিকে ঠেলে দিয়ে রুশ-জার্মান যুদ্ধের দ্বারা রাশিয়াকে ধ্বংস করা দরকার। বৃহৎ বিপদ ও ক্ষুদ্র বিপদের মধ্যে সংঘাত ঘটিয়ে ইংলন্ড আধিপত্য রাখতে চায়। কমিউনিজমের লাল বন্যার বিরুদ্ধে বাঁধ তৈরির জন্যে নাৎসী জার্মানীকে পূর্ব ইওরোপে বিস্তারের অবাধ সুযোগ করে দেওয়া হয়। এজন্যই চেক সমস্যায় সোভিয়েত সহায়তা দানের প্রস্তাবকে ইঙ্গ-ফরাসী শক্তি অগ্রাহ্য করে।

মিউনিখ চুক্তির সমালোচনা

উইনষ্টন চার্চিল ব্রিটিশ হাউস অব কমন্সে এবং তাঁর Gathering Storm গ্রন্থে অপর একটি দিক থেকে মিউনিখ্ চুক্তির সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে, চেম্বারলেইনের মিউনিখ্ চুক্তি ছিল একটি দুর্ভাগ্যজনক, ভুল সিদ্ধান্ত। তিনি মিউনিখ্ চুক্তিকে "এক প্রথম শ্রেণীর বিপর্যয়" (a disaster of first magnitude) বলে মন্তব্য করেন। চার্চিলের মতে, চেম্বারলেইন এই চুক্তির দ্বারা যে বিশেষ ভুলগুলি করেন তা হল; (ক) ১৯৩৮ খ্রীঃ ব্রিটেন হিটলারের দাবীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালে, ব্রিটেনের পক্ষে অনেক বেশী সুবিধা হত। তিনি চেকোশ্লোভাকিয়ার সুসজ্জিত ৪০ ডিভিসন সেনা, রুশ সেনা, ফরাসী সেনা ও ব্রিটিশ সেনার সম্মিলিত আক্রমণে

মিউনিখ চুক্তির ত্রুটি : চার্চিলের অভিমত

আগ্রাসী জার্মানীকে ধ্বসিয়ে দিতে পারতেন। ১৯৩৯ খ্রীঃ তিনি যখন জার্মানীর বিরুদ্ধে অর্থাৎ এক বছর পরে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নেন তখন রাশিয়ার সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়ে গেছে এবং চেক রাষ্ট্রের পতন হয়েছে। (খ) হিটলার যে তাঁর প্রতিশ্রুতি রাখবেন না, একথা চেম্বারলেইন বুঝতে চাননি। মিউনিখ্ বৈঠকে তিনি যখন প্রতিশ্রুতি দেন যে, "সুদেতেন জেলাই হল ইওরোপের কাছে তাঁর শেষ ভৌগোলিক দাবী" (Sudeten land is my last territorial demand on Europe), তখন তিনি একটি বড় ভাঁওতা দেন। ব্রিটিশ ও ফরাসী প্রধানমন্ত্রী এই ভাঁওতায় ভুলে যান। হিটলার ছিলেন যেন এক আন্তর্জাতিক দস্যু যিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে জানতেন না। কাজেই ৬ মাসের মধ্যে হিটলার মিউনিখ্ সন্ধি ভেঙে অবশিষ্ট চেক দেশ অধিকার করেন এবং পরের বছর পোল্যান্ডের ওপর দাবী চাপান। (গ) হিটলারের এই সাহস হয় এজন্য যে চেম্বারলেইনের তোষণ নীতি (Policy of Appeasement)-এর ফলে তাঁর বিশ্বাস জন্মায় যে, ইঙ্গ-ফরাসী শক্তি তাঁকে বাধা দিতে সাহসী নয়। পশ্চিমী গণতন্ত্র প্রতিবাদ করে কিন্তু প্রতিরোধে সক্ষম নয়। (ঘ) এক আগ্রাসী, আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গকারী উদ্ধত রাষ্ট্রের কাছে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর করুণ আত্মসমর্পণ ব্রিটিশ গণতন্ত্রের মর্যাদা নষ্ট করে। চেম্বারলেইন নিজে অযাচিতভাবে জার্মানীতে গিয়ে হিটলারের কাছে সন্ধির প্রস্তাব নিবেদন করেন। ঐতিহাসিক ফ্রেডারিক হার্টম্যানের ভাষায় "শেষ পর্যন্ত মিউনিখ্ চুক্তির সোনার থালায় চেকোশ্লোভাকিয়াকে হিটলারের কাছে নিবেদন করা হয়।" (ঙ) চেকোশ্লোভাকিয়া ছিল এক নিরীহ, শান্তিবাদী প্রজাতন্ত্র। সেই দেশকে হিটলারের আগ্রাসী দাবীর কাছে বলিদান ছিল এক ভয়ানক নৈতিক অধঃপতন এবং জঙ্গী অশুভ শক্তির কাছে নতিস্বীকার। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী দাবী করেন যে, "ব্রিটেনের ইতিহাসে দ্বিতীয় বারের জন্যে একজন প্রধানমন্ত্রী শান্তি ও সম্মান এনেছেন। তিনি আশা করছেন যে এই শান্তি বর্তমান প্রজন্ম ভোগ করতে পারবে" (Peace with honour... a peace of our times)। চার্চিল বলেন যে, "প্রধানমন্ত্রী যদি মিউনিখ্ চুক্তির দ্বারা সম্মান অর্জন করেন, তাহলে ইংরাজী অভিধানে সম্মান কথাটির অর্থ পরিবর্তন করতে হবে। শান্তি তিনি রক্ষা করতে পারবেন না।"

মিউনিখ্ চুক্তি সম্পর্কে সমালোচনাকারী বিভিন্ন মহলের মতামত ওপরে আলোচনার পর এই সন্ধির স্বপক্ষে কিছু যুক্তি উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমতঃ, যদিও সোভিয়েত রাশিয়া কয়েকবার খোলা শর্ত দেয় যে, ফ্রান্স সেনা সমাবেশ করলে, সোভিয়েত রাশিয়া ১৯৩৫ খ্রীঃ-এর সন্ধির শর্ত অনুযায়ী তার দায়িত্ব পূরণ করবে, সোভিয়েত রাশিয়ার এই প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। E. H. Carr-এর মতে, এই সময় ষ্ট্যালিন তাঁর সেনাপতিদের বহিষ্কার করেন। এজন্য সোভিয়েত রাশিয়ার সামরিক শক্তির যোগ্যতা সম্পর্কে ইওরোপে অবিশ্বাস দেখা দেয়। দ্বিতীয়তঃ, চেকোশ্লোভাকিয়াকে প্রদত্ত গ্যারান্টি পূরণের জন্যে ফ্রাঙ্কো-রুশ কোন সামরিক শর্তযুক্ত সন্ধি ছিল না। এমনকি রাশিয়া ও ফ্রান্স সামরিক বিষয়ে কোন আলোচনা করেনি। কেবলমাত্র ফ্রান্স সেনা সন্নিবেশ করলে, রাশিয়া তাই করবে, এই কথাই বলছিল। কত সেনা, কখন, কোথায় সন্নিবেশ করা হবে এবিষয়ে উভয় পক্ষ কোন আলোচনায় আগ্রহ দেখায়নি। কাজেই ফ্রাঙ্কো-রুশ চুক্তির খুব বেশী মূল্য ছিল না। তৃতীয়তঃ, পোল্যান্ড ও রুমানিয়া তাদের দেশের মধ্যে দিয়ে রুশ সেনা প্রেরণে অসম্মতি জানালে রুশ প্রতিশ্রুতি অর্থহীন হয়ে পড়ে। সুতরাং ফ্রান্স সেনা সন্নিবেশ করে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে, রুশ সেনার পথ রুদ্ধ থাকায়, রাশিয়ার যোগদান অনিশ্চিত হয়েছিল। চতুর্থতঃ, চেম্বারলেইন মনে করতেন যে, চেকোশ্লোভাকিয়াকে ফ্রান্সের পক্ষে রক্ষা করা ভৌগোলিক দিক থেকে অসম্ভব ছিল। কারণ চেক রাষ্ট্র ও ফ্রান্সের মধ্যে ছিল জার্মানীর ভৌগোলিক অবস্থান। পঞ্চমতঃ, রাশিয়ার সঙ্গে ত্রিশের দশকে ব্রিটিশ ও ফরাসী গণতন্ত্রের

মিউনিখ চুক্তির স্বপক্ষে যুক্তি

আদর্শগত ব্যবধান ছিল গভীর। ব্রিটেন ও ফ্রান্স সম্পর্কে ষ্ট্যালিনের অবিশ্বাস ছিল যেমন গভীর, পশ্চিমী গণতন্ত্রেরও রুশ কমিউনিষ্ট নেতাদের সম্পর্কে ঘোর অবিশ্বাস ছিল। কাজেই ফ্রাঙ্কো-সোভিয়েত মৈত্রী থাকা সত্ত্বেও ফরাসী প্রধানমন্ত্রী এই চুক্তির দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেতে ব্যগ্র ছিলেন। ষষ্ঠতঃ, চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রেসিডেন্ট বেনেস জার্মান আক্রমণের সম্ভাবনা দেখা দিলে পশ্চিমী শক্তির কাছেই সাহায্য চান। তিনি রাশিয়ার কাছে সাহায্য চাননি। কারণ চেকরা মনে করত যে, চেকোশ্লোভাকিয়া গ্রাস করার ব্যাপারে নাৎসী জার্মানী ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। উভয় দেশকে একই রং-এ রঞ্জিত করা যায়। সপ্তমতঃ, ফরাসী সরকার নিজ দেশের প্রভাবশালী গোষ্ঠীর চাপে ব্রিটেনের অনুগত হয়ে তোষণ নীতি নেন। কারণ ফরাসী বুর্জোয়ারা আওয়াজ তোলেন যে, "হিটলার খারাপ, ষ্ট্যালিন আরও খারাপ।" এই যুক্তির ভিত্তিতে বিচার করলে মিউনিখ্ সন্ধিকে সমর্থন করা যায়। কারণ ব্রিটেন ও ফ্রান্স যখন যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত ছিল না, রাশিয়ার সহায়তা ছিল সন্দেহজনক তখন অবশিষ্ট চেক রাষ্ট্রকে মিউনিখ চুক্তির দ্বারা রক্ষার জন্যে চেষ্টা করা হয়।

মিউনিখ চুক্তির বিরুদ্ধে চার্চিলের সমালোচনার উত্তর চেম্বারলেইন তাঁর Pacification of Europe গ্রন্থে তাঁর তোষণ নীতি বিশেষতঃ মিউনিখ চুক্তির সমর্থনে বিভিন্ন যুক্তি দেখিয়েছেন।

চেম্বারলেইন মিউনিখ চুক্তির দ্বারা প্রকৃত তোষণ নীতি নেন কিনা

প্রথমতঃ, ১৯৩৮ খ্রীঃ ব্রিটেনের যুদ্ধের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয়নি। এজন্য সময়ের প্রয়োজন ছিল। মিউনিখ চুক্তির দ্বারা ব্রিটেন তার অস্ত্রসজ্জার জন্যে সময় কিনে নেয়। নতুবা ১৯৩৮-এ ব্রিটেন যুদ্ধে নামলে বিপর্যয় হত। দ্বিতীয়তঃ, ভার্সাই সন্ধি এমন একটি পবিত্র সন্ধি ছিল না, যা অপরিবর্তনীয় বা অলঙ্ঘনীয় বলে গণ্য হওয়ার যোগ্য। এই সন্ধির বিরুদ্ধে জার্মানীর অভিযোগগুলি ছিল অনেক ক্ষেত্রে ন্যায্য। যদি শান্তিপূর্ণ পথে ভার্সাই সন্ধি সংশোধন করে জার্মানীকে তার নায্য প্রাপ্য স্থান দেওয়া হয়, তাতে ক্ষতি কোথায়। সকলেই বিশ্বাস করত যে, জার্মানীর অভিযোগের প্রতিকার হলে জার্মানী শান্ত হবে, যুদ্ধের কথা ভাববে না। তৃতীয়তঃ, হিটলার মিউনিখ সম্মেলনে প্রতিশ্রুতি দেন যে, "সুদেতেনল্যান্ড ফেরত পেলে, তাঁর আর কিছু দাবী নেই।" যদি হিটলার কথার খেলাপ করেন, সেজন্য তিনিই দায়ী। চতুর্থতঃ, ব্রিটেনের অস্ত্রসজ্জা বাড়লে জার্মানী আর নতুন দাবী তুলতে সাহস করবে না বলেই তিনি বিশ্বাস করতেন। এই অস্ত্রসজ্জার কাজ এগিয়ে নিতে মিউনিখ চুক্তি সাহায্য করে। পঞ্চমতঃ, ইওরোপীয় জনগণ, ব্রিটিশ জাতি তখনও শান্তি কামনা করত। একটি শান্তিকামী জনগণকে অকস্মাৎ যুদ্ধের ফুটন্ত কড়াই-এ নিক্ষেপ করা যায় না। যুদ্ধের মানসিকতা গড়ে তুলতে সময় দরকার হয়। মিউনিখ চুক্তি সেই সময় এনে দেয়।

মিউনিখ চুক্তির দুর্বলতা

চেম্বারলেইন যাই বলুন না কেন তাঁর দুটি বড় ভুল হয়েছিল। প্রথমতঃ, হিটলারের প্রতিশ্রুতিতে তাঁর বিশ্বাস করা উচিত হয়নি। তিনি এবং ফরাসী মন্ত্রী দালাদিয়ের বিশ্বাস করতেন যে, হিটলার সুদেতেন জেলা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সীমিত। ডেভিড টমসন বলেন যে, এখানেই ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মহা ভুল করেন। হিটলার One by One Policy নিয়ে চলছিলেন। সুদেতেন জেলা নিয়ে তিনি সন্তুষ্ট থাকবেন, এই ধারণা করা ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর উচিত হয়নি। দ্বিতীয়তঃ, ব্রিটেন যদি চেকোশ্লোভাকিয়াকে রক্ষা করার জন্যে যুদ্ধে নামত তবে ফ্রান্স ছাড়া রাশিয়াকে মিত্র হিসেবে পেত। ইতিহাসে দেখা গেছে একা ফ্রান্স বা ব্রিটেন বা রাশিয়া জার্মানীকে রুখতে সক্ষম নয়। কাজেই যে মহাজোটের জন্যে ১৯৩৯ খ্রীঃ তিনি অস্থির হন, ১৯৩৮ খ্রীঃ তিনি সেই জোট গঠনের সুযোগ হেলায় হারান। এজন্য ব্রিটেন ও ফ্রান্সকে কঠিন মূল্য দিতে হয়।

মিউনিখ চুক্তির ফলাফল ছিল তাৎক্ষণিক ও সুদূর-প্রসারী। মিউনিখ চুক্তি লিখিত কাগজের কালি শুকাবার আগেই হিটলার তা ভেঙে ফেলেন। তিনি গোটা চেকোশ্লোভাকিয়া গ্রাস করেন। দ্বিতীয়তঃ, এই চুক্তির ফলে রাশিয়ার সঙ্গে ব্রিটেনের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। ষ্ট্যালিন এই চুক্তিকে সোভিয়েত দেশের প্রতি আগ্রাসনে উৎসাহদান বলে আশঙ্কা করেন। এর ফলে রাশিয়া পশ্চিমী রাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতা স্থাপনের নীতি ত্যাগ করে। রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তির পথ প্রস্তুত হয়। মিউনিখ চুক্তি বিরাট আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। পশ্চিমী গণতন্ত্র এই চুক্তির দ্বারা হিটলারের কাছে অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করায় পশ্চিমী গণতন্ত্র যে দুর্বল ও যে কোন মূল্যে যুদ্ধ থেকে অব্যাহতি লাভে ইচ্ছুক তা স্পষ্ট হয়ে যায়। এর ফলে ভার্সাই স্থিতাবস্থা, যার রক্ষক ছিল প্রধানতঃ ব্রিটেন ও ফ্রান্স, তার অন্তিম লগ্ন ঘনিয়ে আসে। একটিও গুলি খরচ না করে হিটলার সুদেতেন জেলা, বোহেমিয়া, মোরভিয়া, চেক শিল্পাঞ্চল, চেক কয়লাখনি অঞ্চল দখল করে, পরবর্তী আগ্রাসনের জন্যে প্রস্তুত হন। তাঁর পরবর্তী লক্ষ্য ছিল পোল্যান্ড। হিটলার বিশ্বাস করতে শুরু করেন যে, তাঁকে বাধাদানের ক্ষমতা ইঙ্গ-ফরাসী শক্তির নেই। ইতালীও মিউনিখ চুক্তির পর আগ্রাসনে উন্মুখ হয়। পশ্চিমী গণতন্ত্রের হৃতসর্বস্ব অবস্থা দেখে মুসোলিনীরও সাহস বেড়ে যায়। মুসোলিনী দাবী করেন যে, আবিসিনিয়া দখলের ফলে এই উপনিবেশে যাওয়ার জন্যে সুয়েজ খালের ওপর ইতালীর অংশীদারী চাই। ইতালী ব্রিটেনের অস্ত্রসজ্জাকে তীব্র নিন্দা জানায় এবং আলবানিয়া গ্রাস করার উদ্যোগ নেয়। দূরপ্রাচ্যে রোম-বার্লিন অক্ষচুক্তির অংশীদার জাপান ইঙ্গ-ফরাসী শক্তির পক্ষাঘাত দশায় উৎসাহিত হয়ে চীনের সাংহাই দখল করে এবং ব্রিটিশ অধিকৃত হংকং দ্বীপকে চীনর মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করে। জাপান পূর্ব এশিয়ায় এশিয়াটিক মনরো নীতি ঘোষণা করে। সর্বশেষে, হিটলার মিউনিখ চুক্তি ভেঙে চেকোশ্লোভাকিয়া দখল করলে ব্রিটেনের চৈতন্যের উদয় হয়। চেম্বারলেইন জার্মান তোষণ নীতি ত্যাগ করেন (Munich marked the end of appeasement policy)। তিনি মিউনিখ চুক্তির দ্বারা আপাততঃ যে যুদ্ধ বিরতির সুযোগ পান, সেই সুযোগ ব্রিটেনের অস্ত্র নির্মাণের কাজে ব্যাপক ব্যবহার করা হয়। ইঙ্গ-ফরাসী শক্তি মিউনিখ সন্ধিকেই জার্মানীর প্রতি তোষণ নীতির শেষ ধাপ হিসেবে গণ্য করে। ইওরোপে শান্তির দিনগুলি দ্রুত শেষ হয়ে আসে। বিশ্বযুদ্ধের দামামা বাজতে শুরু করে। ঠিক এক বছর পরে তা শুরু হয়ে যায়। কারণ পশ্চিমী গণতন্ত্র বুঝতে পেরেছিল যে, যদি তাদের আদর্শ ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে রক্ষা করতে হয়, তবে অস্ত্রের ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষা কাজ করবে না।

মিউনিখ চুক্তির ফলাফল

ব্রিটিশ তোষণ নীতি ও তার সমালোচনা (The British Policy of Appeasement and its criticism) : ১৯৩৩ খ্রীঃ নাৎসী জার্মানীর উত্থানের পর ব্রিটিশ সরকার জার্মান সমরবাদ, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রত্যাশিত দৃঢ়তা ও প্রতিরোধ দেখাননি। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বলডুইন ও তাঁর পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেইন ভার্সাই সন্ধির বিরুদ্ধে জার্মানীর অভিযোগগুলিকে সহানুভূতির চোখে দেখেন। ব্রিটিশ সংবাদপত্রগুলির প্রচারের ফলে ব্রিটিশ জনমতেরও ধারণা হয় যে, ভার্সাই সন্ধির দ্বারা অনায্যভাবে কতকগুলি ক্ষেত্রে জার্মানীর ওপর শর্ত চাপাবার ফলে জার্মানীতে প্রতিবাদ ও আন্তর্জাতিক শান্তির বিঘ্ন দেখা দিয়েছে। ব্রিটেন এই যুগে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও তার উপনিবেশ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে চায়। ইওরোপে শান্তি থাকলে ব্রিটেন নিশ্চিন্ত হয়ে তার বাণিজ্য করার সুযোগ পেত। সুতরাং উপরোক্ত কারণে জার্মানীর বিরুদ্ধে ভার্সাই স্থিতাবস্থা কঠোরভাবে রক্ষা করার কাজে ব্রিটেন ঢিলা দেয়।

তোষণ নীতির উদ্ভবের কারণ

বলডুইন ১৯৩৫ থেকে ১৯৩৭ খ্রীঃ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর পদে ছিলেন। তাঁর প্রধানমন্ত্রীত্ব কালে নাৎসী জার্মানীর প্রতি উদার নীতির সূত্রপাত দেখা যায়। তিনি ১৯৩৫ খ্রীঃ ইঙ্গ-জার্মান নৌ-চুক্তি স্বাক্ষর করে নীতিগতভাবে জার্মানীর অস্ত্রসজ্জা নীতিকে স্বীকৃতি দেন। এই সময় ইংলন্ড চায় যে, ইওরোপে জার্মান স্থলবাহিনী নিয়ে ইংলন্ডের মাথাব্যথা নেই। জার্মানী উপরোক্ত চুক্তির দ্বারা ব্রিটিশ নৌ-বহরের ৩৫% বেশী যুদ্ধ জাহাজ নির্মাণ না করার প্রতিশ্রুতি দিলে ব্রিটেন সন্তুষ্ট হয়।

বলডুইন মন্ত্রীসভার জার্মান অস্ত্রসজ্জাকে সমর্থন

১৯৩৭ খ্রীঃ মাঝামাঝি নেভিল চেম্বারলেইন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসার পর প্রকৃতপক্ষে তোষণ নীতির রূপায়ণ ঘটে। চেম্বারলেইনের প্রধানমন্ত্রীত্ব কালে নাৎসী জার্মানী ও ফ্যাসিষ্ট ইতালী এই দুই আগ্রাসী শক্তিকে ব্রিটেন তোষণ করে। ইতালী ১৯৩৫ খ্রীঃ লীগের নির্দেশ ও আইনবিধি অমান্য করে ইথিওপিয়া আক্রমণ করলেও ব্রিটেন ও ফ্রান্স ইতালীকে বাধা দেয়নি। অধিকন্তু কৌশলে হোর-লাভাল চুক্তির দ্বারা আবিসিনিয়া ব্যবচ্ছেদ করে আবিসিনিয়ার উত্তম এবং বৃহৎ অংশ ইতালীকে দিতে চেষ্টা করে। শেষ পর্যন্ত জনমতের চাপে এই উদ্যোগ বিফল হয়। লীগের স্থিতাবস্থা ও আইন ভঙ্গকারী আগ্রাসী ইতালীকে লীগ চুক্তিপত্রের শর্ত অনুযায়ী শাস্তি দিতে ব্রিটেনের স্পৃহা ছিল না। শেষ পর্যন্ত জনমত ও লীগের সাধারণ সভার সদস্যদের চাপে ব্রিটেন ইতালীর বিরুদ্ধে ১৬নং ধারা অনুযায়ী অর্থনৈতিক অবরোধে যোগ দিতে রাজী হয়। অর্থনৈতিক অবরোধ কমিটির প্রধান ছিলেন ব্রিটেন ও ফ্রান্স। এই দুই দেশের কার্যকরী সহায়তা ছাড়া লীগ ঘোষিত অর্থনৈতিক অবরোধ তামাশায় পরিণত হত। ইতালীকে নিষিদ্ধ দ্রব্যের তালিকা প্রস্তুত করার সময় ব্রিটেন ইচ্ছাকৃতভাবে পেট্রলকে উক্ত তালিকার বাইরে রাখে। যার ফলে ইতালীর আবিসিনিয় যুদ্ধে জয়লাভের পথ সুগম হয়। ইতালী আবিসিনিয়া জয় করার পরেও লীগ ঘোষিত অবরোধ চালু ছিল এবং এই অবরোধের দীর্ঘায়িত ফল ফলতে শুরু করেছিল। ইতালীর সঞ্চিত লোহা, কয়লা শেষ হয়ে গেলে অবরোধের ফলে ইতালীর দুর্দশার সূচনা হয়। ঠিক এই সময় ব্রিটেনের প্রস্তাবের ফলে লীগ অবরোধ প্রত্যাহার করে। ব্রিটেন যুক্তি দেখায় যে, আবিসিনিয়ার রাষ্ট্র হিসেবে যখন আর অস্তিত্ব নেই তখন ইতালীর বিরুদ্ধে অবরোধ করে লাভ নেই।

চেম্বারলেইনের ইতালী তোষণ নীতি

ব্রিটেনের এই আচরণ ছিল বিশুদ্ধ ফ্যাসিষ্ট ইতালীকে তোষণ নীতি। ব্রিটেনের ভয় ছিল যে, ফ্যাসিষ্ট ইতালীর বিরোধিতা করলে, ইতালী নাৎসী জার্মানীর সঙ্গে জোট বাঁধবে। এই দুই যুদ্ধবাজ ভার্সাই বিরোধী শক্তির জোট হলে ইওরোপের শক্তিসাম্য বিনষ্ট হবে এবং ভার্সাই স্থিতাবস্থা ভেঙে পড়বে। ফ্রান্স বিশেষভাবে ইতালী-জার্মান জোট গঠনকে তার নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক মনে করত। কিন্তু ব্রিটেন ভুলে যায় যে, তোষণ নীতির দ্বারা ফ্যাসিষ্ট ইতালীকে থামান যাবে না এবং ইতালী-জার্মান জোট রদ করা যাবে না। ইতালীর প্রতি ব্রিটেনের এই তোষণ নীতি ছিল নিন্দনীয় এবং ক্লীব নীতি। এর ফলে নিরীহ, শান্তিপ্রিয় রাষ্ট্র আবিসিনিয়ার শুধু পতন হয়নি, লীগের মর্যাদা বিনষ্ট হয়। ইতালী ও জার্মানীর জোট গঠিত হয়। এই জোট ইওরোপের শক্তি সাম্যকে ভেঙে ফেলে।

ইতালী তোষণ নীতির ফল

নাৎসী জার্মানীর প্রতি চেম্বারলেইনের তোষণ নীতি ছিল ইওরোপের শক্তিসাম্য ও স্থিতাবস্থার ধ্বংসকারী। এই নীতি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পথ তৈরি করে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেইন ১৯৩৭ খ্রীঃ মে মাসে ক্ষমতায় আসার পর পূর্ববর্তী বলডুইন মন্ত্রীসভার লক্ষ্যহীন নীতি ত্যাগ করেন। এ· জে· পি· টেইলারের মতে, চেম্বারলেইন একটি সুনির্দিষ্ট বিদেশ নীতি নিতে চান। তাঁর এই নীতির নাম ছিল "ইওরোপে

চেম্বারলেইনের নাৎসী তোষণ নীতির ব্যাখ্যা : ভার্সাই সন্ধির সংশোধন

শান্তি স্থাপন" (Pacification of Europe)। চেম্বারলেইনের এই নীতির মূলে ছিল নাৎসী জার্মানী সম্পর্কে ভার্সাই স্থিতাবস্থাকে অলঙ্ঘনীয়, অপরিবর্ত্তনীয় বলে গণ্য করা। তিনি তৎকালের উদারপন্থীদের মতই মনে করতেন যে, জার্মানীর প্রতি ভার্সাই সন্ধির দ্বারা কোন কোন ক্ষেত্রে অবিচার করা হয়েছিল। চেম্বারলেইন ভার্সাই সন্ধির দ্বারা জার্মানীর প্রতি অবিচারের তিনটি ক্ষেত্র নিরূপণ করেন, যথা : (১) অষ্ট্রিয়ার ৬ মিলিয়ন জার্মানকে, চেকোশ্লোভাকিয়ার ৩½ মিলিয়ন এবং ডানজিগের ৫০ হাজার জার্মানকে অন্যায়ভাবে জার্মানী থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। এর প্রতিবিধান করা দরকার। তাঁর সমালোচকরা বলেন যে, হিটলার তাঁর ওপরে এই দাবীগুলির সমাধান চাপিয়ে দেন। এ· জে· পি· টেইলারের মতে ব্যাপারটি ছিল ঠিক তার বিপরীত। চেম্বারলেইন ইওরোপের শান্তিকে দৃঢ় করার জন্যে নাৎসী জার্মানীকে এই তিন সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিত দেন।

এ· জে· পি· টেইলারের অভিমত

চেম্বারলেইন মনে করতেন যে, কেবল বলপ্রয়োগ দ্বারা জাতিগত বিরোধের স্থায়ী মীমাংসা হয় না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতা এই শিক্ষা দিয়েছিল। ব্রিটেনের উদারপন্থী ও শ্রমিক দলের বহু নেতা এই তিন স্থানের ওপর জার্মানীর দাবী ন্যায্য বলে মনে করতেন। সুতরাং চেম্বারলেইন কেবল একাই জার্মান তোষণ নীতির উদ্ভাবন করেননি। ব্রিটেনের যে সকল নেতা জার্মান দাবীর নায্যতা স্বীকার করতেন তাঁরা হিটলারকে তাঁর ইহুদি নির্যাতন, স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের জন্যে নিন্দা মন্দ করতেন। তাঁরা চাইতেন যে, যতদিন হিটলার ক্ষমতায় থাকবেন ততদিন এই দাবীগুলি পূরণ না করাই উচিত।

জার্মানীর দাবীর প্রতি ব্রিটেনের দৃষ্টিভঙ্গী

চেম্বারলেইনের সঙ্গে তাদের এইটুকু প্রভেদ ছিল যে, চেম্বারলেইন মনে করতেন "হিটলারবাদ হল ভার্সাই সন্ধির অবিচারের কুফল। ভার্সাই সন্ধির অন্যায় শর্তগুলির সংশোধন করা হলে হিটলারবাদের ক্ষতিকারক ও মন্দ দিকগুলি লোপ পাবে।" যেক্ষেত্রে উদারতন্ত্রীরা মনে করতেন যে, জার্মান দাবীগুলি সঠিক ও যুক্তিযুক্ত, কিন্তু হিটলার ছিলেন মন্দ লোক, সেক্ষেত্রে তাঁরা জার্মানী ও হিটলারকে আলাদা করে ভাবেন, চেম্বারলেইন তা ভ্রান্ত বলে মনে করতেন। তাঁর চোখে হিটলারবাদ ছিল ভার্সাই ক্ষতের বিস্ফোটক। এই ক্ষত নিরাময় হলে বিস্ফোটকও নিরাময় হবে। সুতরাং চেম্বারলেইনের তথাকথিত তোষণ নীতি তাঁর ওপরে হিটলার চাপিয়ে দেন এই ধারণার ভিত্তি নেই। চেম্বারলেইন নিজ বিচারে এই নীতি গ্রহণ করেন। তবে জার্মানীর প্রতি তথাকথিত তোষণ নীতি প্রকাশের ক্ষেত্রে চেম্বারলেইন কোন কোন ক্ষেত্রে হিটলারের কূটকৌশল ও পাশবিক নীতির কাছে নতিস্বীকার করেন।

হিটলার চেম্বারলেইনের ওপর তোষণ নীতি চাপাননি

চেম্বারলেইনের এই নীতিকে উইনষ্টন চার্চিল মিউনিখ সন্ধির সমালোচনার সময় Policy of Appeasement বা তোষণ নীতি নাম দেন। কিন্তু চেম্বারলেইনের মতে, তাঁর নীতির এই নামকরণ দুর্ভাগ্যজনক। তাঁর নীতিকে Pacification of Europe বা ইওরোপে শান্তি স্থাপনের প্রচেষ্টা বলাই সঙ্গত।

যাই হোক, চেম্বারলেইন তাঁর উপরোক্ত নীতি স্থির করার পর তাঁর বিদেশ সচিব লর্ড হ্যালিফাক্সকে হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে পাঠান। এই সাক্ষাতকারের সময় হিটলার যা শুনতে চেয়েছিলেন, হ্যালিফ্যাক্স তাই শোনান। তিনি অষ্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া ও ডানজিগের প্রশ্ন তোলেন। তিনি জানান যে, ইংলন্ড চায় যে এই তিন ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ বিবর্তনের

হিটলারের কাছে চেম্বারলেইনের আপোষ প্রস্তাব

পথে পরিবর্তন করা হবে এবং যথাসময়ে তা করা হবে। ইংলন্ডের একটি শর্ত হল যে, শান্তিপূর্ণ উপায়ে এবং সুদূর-প্রসারী গোলযোগ ছাড়া এই সমস্যার সমাধান করা হবে।

অষ্ট্রিয়ার সংযুক্তি
ব্রিটিশ নীতি

সুতরাং হিটলার এতদিন যাই দাবী করুন না কেন, এই সর্বপ্রথম ব্রিটেন তাতে সক্রিয়ভাবে তার প্রতিক্রিয়া জানায়। এর ফলে ভার্সাই স্থিতাবস্থার পরিবর্তনের সূচনা হয়। চেম্বারলেইনের তোষণ নীতির ফলে হিটলার বিনা রক্তপাতে অষ্ট্রিয়াকে জার্মানীর সঙ্গে সংযুক্ত করে (১৯৩৭ খ্রীঃ) তাঁর আনস্লুশ নীতিকে রূপ দেন। ব্রিটিশ দূত নেভিল হেণ্ডারসন জার্মান সরকারকে জানান যে, যদি বিনা রক্তপাতে শান্তিপূর্ণ উপায়ে এই সংযুক্তি প্রক্রিয়া জার্মানী সম্পন্ন করতে পারে তবে ব্রিটেন আপত্তি করবে না।[১]

চেক সমস্যা ও রাশিয়ার বাধাদানের প্রস্তাব

অষ্ট্রিয়ার সংযুক্তির পর হিটলার চেক রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত সুদেতেন জেলার ৩২ মিলিয়ন জার্মান অধিবাসীসহ এই জেলাটি জার্মান জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের অজুহাতে দাবী করেন। চেকোশ্লোভাকিয়ার স্বাধীনতা ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্যে ফ্রাঙ্কো-সোভিয়েত গ্যারান্টি ছিল। সোভিয়েত বিদেশমন্ত্রী ম্যাক্সিম লিটভিনভ লীগের সভায় সুনির্দিষ্ট ঘোষণা দেন যে, উপরোক্ত চুক্তির শর্ত অনুসারে ফ্রান্স যদি তার সেনা সন্নিবেশ করে, তবে সোভিয়েত রাশিয়া তার দিক থেকে দায়িত্ব পালনে যথাসাধ্য করবে। ফ্রান্স ব্রিটিশ সহায়তা ছাড়া জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতে ভয় পাচ্ছিল। সব কিছুই ব্রিটিশ সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভরশীল ছিল।

রুশ-ব্রিটিশ ফ্রান্স জোট গঠনের সুযোগ ত্যাগ জার্মানীর প্রতি নরম নীতি : মিউনিখ চুক্তি

চেম্বারলেইন জার্মান আগ্রাসন রোখার জন্যে ইঙ্গ-ফরাসী-রুশ জোট গঠনের সুযোগ নাকচ করে, জার্মান তোষণ নীতি নেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, সুদেতেন জেলার ওপর জার্মানীর দাবী ন্যায্য। ভার্সাই সন্ধির দ্বারা জার্মানী থেকে ৩২ মিলিয়ন বিচ্ছিন্ন জার্মানকে পিতৃভূমিতে ফিরিয়ে দিলে ইওরোপ এক অনাবশ্যক যুদ্ধের হাত থেকে রক্ষা পাবে। জার্মানীর দাবী ছিল সীমিত। সুদেতেন জেলা ফেরত পেলে জার্মানীর জাতীয়তার ভিত্তিতে দাবীর আর একমাত্র ক্ষেত্র ছিল ডানজিগ। সুতরাং সুদেতেন জেলা ফিরিয়ে দিলে এক সঙ্গে ন্যায় বিচারও করা হবে, জার্মানীকে অতঃপর শান্তি নীতি নিতে নৈতিকভাবে বাধ্য করা যাবে। কারণ এরপর জার্মানীর আর কোন বৈধ দাবী ছিল না। সুদেতেন সমস্যা মিটে গেলে অবশিষ্ট চেকোশ্লোভাকিয়া এই বিরক্তিকর সমস্যা থেকে নিস্কৃতি পাবে। ফ্রান্সও ব্রিটেনের প্রস্তাবে সম্মত ছিল। এই কারণে চেম্বারলেইন অযাচিতভাবে দুবার জার্মানী যান এবং শেষ পর্যন্ত ১৯৩৮ খ্রীঃ মিউনিখ চুক্তির দ্বারা সুদেতেন জেলা জার্মানীকে হস্তান্তর করতে চেকোশ্লোভাকিয়াকে বাধ্য করেন।

তোষণ নীতির স্বপক্ষে এ. জে. পি. টেইলারের যুক্তি

চেম্বারলেইনের তথাকথিত তোষণ নীতির স্বপক্ষে ও বিপক্ষে বহু সমালোচনা আছে। বিপক্ষ যুক্তিগুলি এই গ্রন্থে আগের পরিচ্ছেদে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। চেম্বারলেইনের নীতির পক্ষে বলা হয়ে থাকে যে, উইনস্টন চার্চিল তাঁর ন্যায্য সমালোচনা করেননি। চার্চিল সর্বদাই (Power Politics) বা বলপ্রয়োগ নীতির ভাষায় কথা বলতে অভ্যস্ত। তিনি ন্যায় নীতির ভাষায় কথা বলতে জানেন না। তিনি ভুলে যান যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে বলপ্রয়োগ নীতির অনুসরণের ফল ভাল হয়নি। ইওরোপ একটি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল। সুতরাং তিনি চেম্বারলেইনের শান্তিবাদী নীতির মর্ম গ্রহণে অক্ষম। দ্বিতীয়তঃ, চার্চিল

১. Vide Allan Bullock.

সর্বদাই মনে করেন যে, জাতীয়তাবাদের কোন দাম নেই। Security বা নিরাপত্তাই একমাত্র বিচার্য প্রশ্ন। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ও তার পরবর্তী অভিজ্ঞতা কি এই শিক্ষা দেয়নি যে, জাতীয়তাবাদের দাবীকে বলপূর্বক দমিয়ে রাখা যায় না এবং তা নিরাপত্তাকে ধ্বসিয়ে দেয়। তৃতীয়তঃ, অষ্ট্রিয়া, সুদেতেন জেলা ও ডানজিগের ওপর জার্মান দাবী যে জাতীয়তাবাদ সম্মত ও বৈধ ছিল সে বিষয়ে কোন প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং জার্মানীর প্রাপ্য জার্মানীকে দিয়ে যদি বৃহত্তর যুদ্ধ বন্ধ করা যায় তাতে অন্যায় কোথায়? চতুর্থতঃ, বলপ্রয়োগ নীতি নিলেও চেকোশ্লোভাকিয়াকে জার্মান আগ্রাসন থেকে রক্ষা করা যেত না। পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলি থেকে চেক দেশ গোটা জার্মানীর দ্বারা বিচ্ছিন্ন ছিল। পঞ্চমতঃ, মিউনিখ চুক্তির দ্বারা ব্রিটেনের অস্ত্রসজ্জার জন্যে মূল্যবান সময় পাওয়া যায়। ষষ্ঠতঃ, সোভিয়েত দেশ যদি সত্যিই সাহায্য করতে চাইত, পোল্যান্ড ও রুমানিয়া সোভিয়েত সেনাদলের আসার পথ দিতে রাজী না হওয়ায় সোভিয়েত প্রস্তাবের কোন গুরুত্ব ছিল না। সপ্তমতঃ, হিটলার প্রতিশ্রুতি দেন যে, "সুদেতেন জেলাই হল ইওরোপের কাছে তাঁর শেষ দাবী।" এই প্রতিশ্রুতিকে বিশ্বাস করা হয়েছিল।

আসলে জার্মান তোষণ নীতির প্রধান দুর্বলতা এই ছিল যে, চেম্বারলেইন বিশ্বাস করতেন যে হিটলারের দাবী অষ্ট্রিয়া, সুদেতেন জেলা ও ডানজিগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। এই দাবীগুলি পূরণ করলে আর কোন সমস্যা থাকবে না। তাঁর এ ধারণা ছিল ভ্রান্ত। হিটলারের দাবী অন্ততঃ গোটা পূর্ব ইওরোপের ওপর ছিল। তাছাড়া তিনি ইওরোপে আধিপত্য চাইতেন। হিটলারকে বিশ্বাস করা তাঁর ভুল হয়, চার্চিলের এই সমালোচনা সঙ্গত। দ্বিতীয়তঃ, ১৯৩৮ খ্রীঃ তিনি যদি সোভিয়েত সাহায্য নিতেন তাহলে ত্রিশক্তি জোট জার্মানীকে বেষ্টন করে নিরস্ত করত। অবশ্য আর একটি মত হল যে, জার্মানীর শক্তি এই জোটের অপেক্ষা ১৯৩৮ খ্রীঃ অনেক বেশী ছিল। এ· জে· পি· টেইলারের মতে, চেম্বারলেইনের নীতির মধ্যে স্ব-বিরোধিতা ছিল। যদি তিনি দৃঢ় বিশ্বাস করতেন যে, জার্মানীর ন্যায্য প্রাপ্য চুকিয়ে দিলে ইওরোপে শান্তি আসবে, তবে তিনি কেন জোর অস্ত্রসজ্জা শুরু করেন? এই দুই নীতি কি স্ব-বিরোধী ছিল না?

তোষণ নীতির বিফলতা ও ত্রুটি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্যে নাৎসী জার্মানীর দায়িত্ব (Responsibility of Nazi Germany for the outbreak of the Second World War) :

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইওরোপের ইতিহাসের একটি অতি বিতর্কিত প্রশ্ন হল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্যে নাৎসী জার্মানীর একনায়কতন্ত্রী শাসক এডলফ হিটলার কতটা দায়ী ছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যেমন একশ্রেণীর জার্মান ঐতিহাসিক এই যুদ্ধের জন্যে কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের দায়িত্ব স্খালন করার চেষ্টা করেন, ফ্রিৎস ফিশার ও ইম্যানুয়েল জাইস কাইজারের দায়িত্বতত্ত্বকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা দেন, অনুরূপভাবে ইংরাজ ঐতিহাসিক এ· জে· পি· টেইলার এনকাউন্টার পত্রিকায় এবং তাঁর Origins of the Second World War গ্রন্থে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্যে হিটলারের দায়িত্ব সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার প্রতিবাদ করেছেন। ট্রেভর রোপার ও এসমণ্ড রবার্টসন প্রভৃতি টেইলার তত্ত্বকে খণ্ডনের চেষ্টা করেছেন। সুতরাং আগে একতরফাভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্যে হিটলারকে যেভাবে দায়ী করা হত, এখন তা সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্যে হিটলারের যে কারণে দায়িত্ব ধার্য করা হয়, তা অত্যন্ত স্পষ্ট। (১) তিনি ক্ষমতায় আসার পর জার্মান অস্ত্রসজ্জার জন্যে বিশ্ব নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন বর্জন করায়, এই সম্মেলন ভেঙে যায়। তিনি ফ্রান্সের সঙ্গে জার্মানীর অস্ত্র সমতার জন্যে এক অসম্ভব দাবী তুলে সম্মেলন ত্যাগ করেন। (২) তিনি পোল-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তির দ্বারা জার্মানীর বিরুদ্ধে শক্তি সাম্য হিসেবে গঠিত ফ্রাঙ্কো-পোলিশ চুক্তিকে অকার্যকরী করে পূর্ব ইওরোপে

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্যে হিটলারের দায়িত্ব কি ছিল?

ফরাসী প্রভাব খর্ব করেন। (৩) তিনি ১৯৩৪ খ্রীঃ অষ্ট্রিয়ার নাৎসী দলের সাহায্যে অতর্কিত আক্রমণে অষ্ট্রিয়া দখলের ব্যর্থ চেষ্টা করেন। (৪) ১৯৩৫ খ্রীঃ তিনি জার্মানীর অস্ত্রসজ্জা শুরু করেন এবং ৩৬ ডিভিসন জার্মান পদাতিক বাহিনী গঠনের লক্ষ্য ঘোষণা করেন। (৫) ১৯৩৫ খ্রীঃ তিনি ইঙ্গ-জার্মান নৌ-চুক্তির দ্বারা জার্মানীর অস্ত্রসজ্জার বিরোধী ও ভার্সাই সন্ধির ৫ম অনুচ্ছেদের সমর্থক ইঙ্গ-ফরাসী জোট ভেঙে ফেলেন। ইংলন্ড হিটলারের পাশবিক কূটনীতি ও ধাপ্পায় প্রভাবিত হয়ে পরোক্ষভাবে জার্মান অস্ত্রসজ্জার দাবী মেনে নেয়। ফ্রান্স এককভাবে জার্মান অস্ত্রসজ্জার প্রতিরোধে সক্ষম হয়নি। (৬) ১৯৩৬ খ্রীঃ হিটলার ভার্সাই ও লোকার্ণো সন্ধির শর্ত, যথা রাইনল্যান্ডের অসামরিকীকরণ নীতি ভেঙে রাইনল্যান্ডে জার্মান সেনা সমাবেশ করেন। এর ফলে ফ্রান্সের নিরাপত্তার প্রশ্ন তীব্রভাবে দেখা দেয়। (৭) সম্ভাব্য ইঙ্গ-ফরাসী ও রুশ জোটে ফাটল ধরাবার জন্যে হিটলার সোভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধে বিষোদগার করেন, যাতে কমিউনিষ্ট বিপ্লবের ভয়ে ভীত ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী জার্মানীর প্রতি নরম নীতি নেন। (৮) ১৯৩৭ খ্রীঃ হিটলার অষ্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী সুশনিগকে জার্মানীর সঙ্গে অষ্ট্রিয়ার সংযুক্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করেন এবং নাৎসী নেতা ও মন্ত্রী সিয়েস ইস্পার্টের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে জার্মান সেনাদলকে অষ্ট্রিয়ায় ঢুকিয়ে সংযুক্তিকে বাস্তবায়িত করেন। (৯) হিটলার সুদেতেন জেলার ৩½ মিলিয়ন জার্মান সংখ্যালঘুর ওপর চেক সরকারের কল্পিত দমন নীতির অভিযোগে চেক রাষ্ট্র আক্রমণের হুমকি দেন এবং চেক দেশকে রক্ষা করার জন্যে ফ্রাঙ্কো-সোভিয়েত চুক্তিকে অকার্যকরী করে দেন। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী যুদ্ধ এড়াবার জন্যে মিউনিখ চুক্তির দ্বারা জার্মানীকে সুদেতেন জেলা ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করেন এবং হিটলার প্রতিশ্রুতি দেন যে, "সুদেতেন জেলাই হল ইওরোপের কাছে তাঁর শেষতম দাবী।" কিন্তু এই সন্ধি ও প্রতিশ্রুতি ভেঙে তিনি ৬ মাসের মধ্যে অবশিষ্ট চেক দেশ দখল করেন। (১০) অতঃপর তিনি লিথুয়ানিয়ার কাছ থেকে মেমেল অধিকার করেন এবং পোলিশ করিডর দাবী করেন। (১১) ব্রিটেন ও ফ্রান্স হিটলারের আগ্রাসন ও সন্ধি-ভাঙার নীতিতে বিরক্ত হয়ে পোল্যান্ডকে রক্ষার গ্যারান্টি দেয় এবং জার্মানীকে সতর্ক করে দেয়। জাতিগত দিক থেকে ও ন্যায্যতার দিক থেকেও পোল্যান্ডের ওপর হিটলারের কোন বৈধ দাবী ছিল না। (১২) যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখে, যাতে তাঁর বিরুদ্ধে ব্রিটিশ-ফ্রান্স-রুশ জোট না গঠিত হয় এজন্য তাঁর পাশবিক কূটনীতির দ্বারা হিটলার ১৯৩৯ খ্রীঃ রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তির দ্বারা রাশিয়াকে নিরপেক্ষ রাখেন এবং সর্বশক্তি দিয়ে পশ্চিম রনাঙ্গণে ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও ব্রিটেনকে আক্রমণ করেন।

হিটলারের যুদ্ধ নীতির লক্ষ্য সম্পর্কে চার্চিলের অভিমত

এই তথ্যগুলির পটভূমিকায় এবং হিটলারের আগ্রাসন ও ধাপ্পাবাজী নীতির জন্যে দীর্ঘকাল ধরে পশ্চিমী জনমত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্যে হিটলারকেই দায়ী করেছে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনষ্টন চার্চিল তাঁর Gathering Storm গ্রন্থে হিটলারের আগ্রাসন নীতির লক্ষ্য ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, কেবলমাত্র ইওরোপে আধিপত্য স্থাপন হিটলারের লক্ষ্য ছিল না। তিনি যদিও ভার্সাই সন্ধির বিচারের বিরুদ্ধে প্রচার চালান ও জার্মান জাতীয়তাবাদের পরিপূর্ণতা দাবী করেন, এটা ছিল তাঁর কূটকৌশল। সুতরাং জার্মানীর জাতীয়তাবাদী সীমারেখা পেলে হিটলার সন্তুষ্ট হওয়ার লোক ছিলেন না। তাঁর প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল ভার্সাই সীমারেখাকে জার্মান জাতীয়তাবাদী দাবী পূরণের ছলে পূর্ব ইওরোপে আধিপত্য বিস্তার। এই যুদ্ধে তিনি রাশিয়াকে নিরপেক্ষ রেখে ব্রিটেন ও ফ্রান্স এই দুই গণতান্ত্রিক শক্তিকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা করেন। এই দুই শক্তির উপনিবেশগুলি গ্রাস করাও তাঁর অন্যতম লক্ষ্য ছিল। এরপর তিনি সোভিয়েত সরকারকে পরাস্ত করে ইওরোপে একাধিপত্য চান। তাঁর চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল ইওরোপে আধিপত্যের পর

বিশ্বব্যাপী জার্মান আধিপত্য ও সাম্রাজ্য স্থাপন। এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্যেই তিনি ধাপে ধাপে এগোতে থাকেন।

হিটলারের পূর্ব ইওরোপ জয় নীতি

হিটলারের যুদ্ধ নীতির অপর একটি ব্যাখ্যা দেওয়া হয় যে, হিটলার আগাগোড়া পূর্ব ইওরোপ দখলের পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করেন। পূর্ব ইওরোপকে তিনি জার্মান উপনিবেশে পরিণত করতে চান। হিটলার বলেন যে, জার্মানীর পশ্চিম সীমান্তে ছিল প্রাচীন দেশ ও প্রাচীন সীমান্ত। এই দিকে জার্মানীর বিস্তার সম্ভব নয়। তিনি পূর্ব ইওরোপে জার্মান সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্যেই Lebensraum-এর ধূয়া তোলেন।

এ· জে· পি· টেইলারের অভিমত

এ· জে· পি· টেইলার Encounter পত্রিকায় এক প্রবন্ধে এবং তাঁর Origins of the Second World War গ্রন্থে বিশ্বযুদ্ধের জন্যে হিটলারের দায়িত্ব এবং এই যুদ্ধে তাঁর লক্ষ্য সম্পর্কে নতুন মূল্যায়ন করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্রকাশিত বিভিন্ন নাৎসী জার্মান দলিলপত্র ও অন্যান্য উপাদানের সাহায্যে তিনি এই মূল্যায়ণ করেন। টেইলার বলেছেন যে, তিনি হিটলারের দায়িত্ব সম্পর্কে যে মত দিচ্ছেন তা তাঁর স্বদেশীয় সরকারের মতের বিরোধী হলেও, ঐতিহাসিক সত্যের খাতিরে তিনি তা উল্লেখ করতে বাধ্য। তাঁর উদ্দেশ্য হিটলারের দোষ স্খালন করা নয়, যা সত্য তাই বলা।

হিটলারের আগ্রাসী নীতি সম্পর্কে প্রমাণের অভাব

যাঁরা বলেন যে, হিটলার তাঁর পরিকল্পিত আধিপত্য বিস্তারের জন্যে সেনাদল ও অস্ত্র নির্মাণ করেন, টেইলারের মতে তাঁরা ভুলে যান যে, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়াও বিপুল অস্ত্র নির্মাণ করছিল। কিন্তু তাদের দোষ না দিয়ে কেবল জার্মান অস্ত্রসজ্জাকেই নিন্দা করা হয়। দ্বিতীয়তঃ, যদি হিটলার তাঁর সেনাপতিদের ব্রিটেন ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে রণ পরিকল্পনা রচনার নির্দেশ দেন, তবে ব্রিটেনও তার সেনাপতিদের ১৯৩৫ খ্রীঃ জার্মানীর বিরুদ্ধে রণ পরিকল্পনা রচনার নির্দেশ দিয়েছিল। ফ্রান্সও পিছিয়ে ছিল না। তৃতীয়তঃ, বেশ কিছু ঐতিহাসিক প্রথম থেকে এই দৃষ্টিভঙ্গী নেন যে, হিটলার হলেন দুষ্ট প্রকৃতির লোক। এরপর তাঁরা তাঁর দুষ্ট ও নিন্দাভাজন কাজের প্রমাণ খোঁজার চেষ্টা করেন। এই অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যে ইতিহাস কলঙ্কিত হয়েছে। তাঁরা হিটলারের তথাকথিত যুদ্ধপ্রিয়তার সমর্থনে যে সকল প্রমাণ উপস্থিত করেন, এই রকম প্রমাণ অন্য শক্তি সম্পর্কে থাকলেও তাঁরা তা ব্যবহার করেন না। এই একপেশে দৃষ্টি নিয়ে তাঁরা হিটলারের কাজের বিচার করেন।

ভার্সাই সন্ধির দাসত্ব থেকে হিটলার জার্মানীকে মুক্ত করতে চান

ব্রিটেন ভার্সাই সন্ধির স্থিতাবস্থা রক্ষা করাকেই ইওরোপে শান্তি রক্ষা বলে মনে করত; অপর দিকে জার্মানীর চোখে ভার্সাই স্থিতাবস্থা ছিল জার্মানীর দাসত্বের স্থায়িত্ব মাত্র। শুধু হিটলার নয়, সকল জার্মান দেশপ্রেমিক একথা মনে করত। এই দাসত্ব থেকে মুক্তি বলতে ১৯১৮ খ্রীঃ মার্চ মাসে জার্মানীর যে রাজ্যসীমা ছিল তার পুনরুদ্ধার, মধ্য ইওরোপে জার্মানীর আধিপত্যের পুণঃপ্রতিষ্ঠা, জার্মানীর অস্ত্র নির্মাণের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন বুঝাত। হিটলার তাঁর বৈদেশিক নীতিতে যে কাজগুলি ১৯৩৮ খ্রীঃ পর্যন্ত সম্পন্ন করেন (এই পরিচ্ছেদের গোড়ায় তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে) তা ছিল ভার্সাই দাসত্ব থেকে মুক্তির প্রচেষ্টা মাত্র, তার বেশী কিছু নয়। ভার্সাই স্থিতাবস্থা থেকে জার্মানীর মুক্তিলাভ (Liberation) হলেই মধ্য ইওরোপে জার্মানীর আধিপত্য (domination) ফিরে আসে। এক্ষেত্রে Liberation ও domination ছিল একই মুদ্রার দুইটি দিক।

হিটলার নিশ্চিত ছিলেন যে, জার্মানীর বড় ধরনের দীর্ঘ যুদ্ধে জয়লাভের মত শক্তি নেই।

তিন বৃহৎ শক্তির জোটের বিরুদ্ধে জার্মানীর জয় হবে না তা তিনি ভাল রকম জানতেন। কাজেই হিটলার বিশ্বযুদ্ধ বা General War চান এই মতের কোন ভিত্তি নেই (Far from wanting war, a general war was the last thing he wanted)। হিটলার সর্বাত্মক যুদ্ধ না করে যুদ্ধের সুফল পেতে আগ্রহী ছিলেন। সেই সুফল তাঁর হাতে মিত্রশক্তি তুলে দেয়। কারণ ব্রিটেন ও ফ্রান্স প্রথমে জার্মান আক্রমণের ভয়ে তোষণ নীতির দ্বারা আত্মসমর্পণ করে; পরে তারা এই নীতি ছেড়ে যুদ্ধের ভাষায় কথা বলে। হিটলার যুদ্ধ ইওরোপের ওপর চাপাননি। মিত্রশক্তি তাঁকে তোষণ নীতির দ্বারা আগ্রাসী করে। পরে তারা চটে গিয়ে যুদ্ধে নামে।

হিটলার প্রথমে বড় যুদ্ধের পক্ষপাতী ছিলেন না

১৯৩৬ খ্রীঃ পর্যন্ত জার্মানীর অস্ত্রসজ্জা বলতে কিছুই ছিল না। তবে এ সম্পর্কে প্রচার ছিল। নাৎসী প্রচারযন্ত্র জার্মান অস্ত্রের হুমকী দিয়ে বিনা যুদ্ধে প্রায় কাজ হাসিল করে। এই প্রচার ও ইঙ্গ-ফরাসী ভীতির ফলে ১৯১৮ খ্রীঃ সীমান্তের কাছাকাছি স্থানে জার্মানী পৌঁছে যায়। জার্মান প্রচার যন্ত্রের গর্জন "রুটি মাখনের আগে অস্ত্র নির্মাণ" ছিল এক ধাপ্পা। আসলে জার্মানী অস্ত্রের আগে রুটি মাখনের যোগানকেই গুরুত্ব দেয়। এবিষয়ে অস্ত্র বিশেষজ্ঞ বার্টন ক্লিনের (Burton Klein) এর পরিসংখ্যান দেখা যেতে পারে। হিটলার দাবী করেন যে, তিনি ১৯৩৯ খ্রীঃ ৯০ মিলিয়ন মার্ক জার্মান অস্ত্রসজ্জার জন্যে ব্যয় করেন। বাস্তবে ১৯৩৮-৩৯ খ্রীঃ জার্মানীর সামরিক ও অসামরিক মোট ব্যয় এত টাকা ছিল না। ক্লিন বলেন যে, অস্ত্র নির্মাণে বাজেটের বৃহৎ অংশ খরচ করে হিটলার তাঁর জনপ্রিয়তা নষ্ট করতে চাননি। হিটলার কোন বড় যুদ্ধের প্রস্তুতি করেননি। কারণ তিনি এরকম বড় যুদ্ধের কথা ভাবেননি।

বার্টন ক্লিনের পরিসংখ্যান তত্ত্ব : জার্মানীর অস্ত্রবল সম্পর্কে পশ্চিমী অতিশয়োক্তি

হিটলারের কূটনীতি ছিল বড় যুদ্ধের প্রস্তুতির ভাঁওতা দিয়ে, সেই প্রস্তুতি না করা। ১৯৩৬ খ্রীঃ পর হিটলার কিছু অস্ত্র নির্মাণ শুরু করেন। তবে এইসময় ব্রিটেন ও ফ্রান্সও অস্ত্র নির্মাণ শুরু করেছিল। অস্ত্র নির্মাণের দ্রুততায় জার্মানী তার প্রতিপক্ষদের পিছনে ফেলে দেয়নি। ১৯৩৮-৩৯ খ্রীঃ জার্মানী তার মোট রাজস্বের ১৫% অস্ত্র নির্মাণে বরাদ্দ করেছিল। ব্রিটেনও একই পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করে। ১৯৩৯ খ্রীঃ যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় তখন জার্মানীর ছিল ১৪৫০টি আধুনিক জঙ্গী বিমান, ৮০০ বোমারু বিমান, গ্রেট ব্রিটেন ও ফ্রান্সের হাতে ছিল ৯৫০টি জঙ্গী ও ১০০০ বোমারু বিমান। জার্মানীর হাতে ছিল ৩৫০০টি ট্যাঙ্ক, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের হাতে ছিল ৩৮৫০টি ট্যাঙ্ক। যদিও মিত্রশক্তির গোয়েন্দা দপ্তর মনে করত যে, জার্মানী তার মারণাস্ত্রের যে সংখ্যা ঘোষণা করছে, আসলে তার দ্বিগুণ অস্ত্র জার্মানীর হাতে ছিল। এটি অনুমান ও সন্দেহ মাত্র। কারণ তারা বিশ্বাস করত যে, হিটলার বিশ্বযুদ্ধের পরিকল্পনা করে তার প্রস্তুতি নিয়েছেন।

জার্মানীর বাজেট বড় যুদ্ধের জন্যে জার্মানীর প্রস্তুতির তত্ত্বকে সমর্থন করে না

নুরেমবার্গ আদালতে হিটলারের বিশ্বযুদ্ধের সমর্থনে যে হসবাখ স্মারক লিপি (Hossbach Memo) ব্যবহার করা হয় এবং যে স্মারকলিপির ওপর নির্ভর করে হিটলারকে দায়ী করা হয়, তা আসল দলিল নয়। হসবাখের সহকারী কার্কবাখ তা সংক্ষিপ্ত আকারে পেশ করেন। কার্কবাখের সারসংক্ষেপ ও হসবাখের আসল মেমো চিরতরে হারিয়ে গেছে। কোন দলিলের কপি তা সঠিক কিনা না জেনে তথাকথিত হসবাখ দলিলের ওপর নির্ভর করা যায় না। যে কপিটি নুরেমবার্গ আদালতে পেশ করা হয় তাতে এমন কিছু নেই যার জোরে হিটলারকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্যে দায়ী করা যায়।

হসব্যাখ মেমোর দুর্বলতা

হিটলার যদি ইওরোপের বাইরে সাম্রাজ্য চাইতেন তবে তিনি নৌ-বাহিনী নির্মাণে শিথিলতা

নৌ-বাহিনী গঠনে হিটলারের অবহেলা প্রমাণ করে তিনি Welt politik চাননি

দেখাতেন না। নৌ-বহর ছাড়া বিশ্বশক্তি হিসেবে স্থান লাভ করা ছিল কল্পনা। তিনি স্থল ও বিমান বাহিনীকেই প্রাধান্য দেন। তাছাড়া ইওরোপের কোন শক্তিকে এশিয়ায় উপনিবেশ রাখতে হলে সুয়েজ ও উত্তর আফ্রিকায় দখলদারী রাখা অত্যাবশ্যক। হিটলার আফ্রিকার যুদ্ধকে গুরুত্ব দেননি। মুসোলিনীর অনুরোধে আফ্রিকায় তিনি নামমাত্র সাহায্য পাঠান। এমনকি হিটলারের বিশ্বাস ছিল যে, হয়ত শেষ পর্যন্ত ব্রিটেনের সঙ্গে তার সন্ধি হবে।

এনকাউন্টার পত্রিকায় হিউ ট্রেভর রোপার ঐতিহাসিক টেইলারের মতের তীব্র প্রতিবাদ করেন। এসমগু রবার্টসন টেইলারের যুক্তিগুলির বিরুদ্ধে বিভিন্ন ঐতিহাসিকদের সমালোচনাকে সঙ্কলন করেছেন। তা হল ঃ (১) হিটলার জার্মান জনমতের চাপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রণোদিত হন এই মতের ভিত্তি নেই। ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৩২ খ্রীঃ হিটলার কর্নেল ফনরিখ্‌সিয়ানকে এক পত্রে জার্মান জনগণ সম্পর্কে তাঁর তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করেন। তিনি তাঁর নেতৃত্বে অধঃপতিত জার্মান জনগণকে উদ্ধারের আশা প্রকাশ করেন। (২) যদিও অধ্যাপক বাটারফিল্ড ও তাঁর ছাত্র ডেসমন্ড উইলিয়ামস স্বীকার করেন যে, টেইলারের ব্যাখ্যায় কিছু সত্যের শাঁস লুকিয়ে আছে; কিন্তু হিটলার তাঁর পূর্ববর্তী রাজনীতিকদের মতই জার্মানীর ন্যায্য সীমানা কেবলমাত্র পুনরুদ্ধার করতে চান, এই মত গ্রহণীয় নয় বলে মনে করেন। (৩) টেইলার তাঁর ব্যাখ্যায় হসবাখ প্রোটোকলকে কোনই গুরুত্ব দেননি। অথচ এই দলিলে নিশ্চিতভাবে হিটলারের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সিদ্ধান্ত উল্লিখিত আছে। এইচ· কক নামক ঐতিহাসিক হসবাখ স্মারকলিপির যে পুনর্ব্যাখ্যা করেছেন, টেইলার তা এড়িয়ে গেছেন। (৪) হিটলার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিকল্পনা করেন অথবা ব্রিটেন ফ্রান্সের ভুলের সুযোগ নিয়ে জার্মান সীমান্তের পুনর্বিন্যাস করেন এটি তর্কসাপেক্ষ বিষয়। টেইলার দেখাতে চান যে, হিটলারকে ব্রিটেন ও ফ্রান্স সুযোগ করে দেয়। তিনি এই দেশের ওপর নিজে থেকে দাবী চাপাননি। এ সম্পর্কে এ্যালান বুলক বলেন যে, দুটিই সত্যি। ব্রিটেন ও ফ্রান্স সুযোগ করে দেয় এবং হিটলারের দাবীর চাপে এই সুযোগ দেওয়া হয়। এই দুটি কথাই সত্য। (৫) জার্মানীর অস্ত্রসজ্জা ব্রিটেন ও ফ্রান্স অপেক্ষা বেশী ছিল না এই মতের সমর্থনে টেইলার, বাটন ক্লিনের দেওয়া যে তথ্যের উল্লেখ করেছেন তাতে জার্মান অস্ত্রসজ্জার সঠিক হিসেবে নেই। অর্থনৈতিক ঐতিহাসিক এ্যালান মিল ওয়ার্ড, বার্নিস ক্যারল প্রভৃতির মতে হিটলার যুদ্ধের প্রয়োজনের কথা মনে রেখে জার্মানীর অর্থনৈতিক পরিকল্পনা করেন। তবে এডমন্ড রবার্টসনের মতে, জার্মানীর অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে হিটলারের লক্ষ্য সম্পর্কে মন্তব্য করা যায় না। কারণ হিটলারের লক্ষ্য কি ছিল তা বোঝার জন্যে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কোন সাহায্য করে না। (৬) হিটলার কেবলমাত্র ক্ষমতা ও আধিপত্যের লোভে যুদ্ধের পথে পা বাড়ান তা ঠিক নয়। তাঁর মনে প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছাও কার্যকরী ছিল। এজন্য তাঁর নীতি ও কথায় স্ব-বিরোধিতা দেখা যায়।

এ· জে· পি· টেইলারের মত খণ্ডনের জন্যে যুক্তিগুলি

যাই হোক, এখনও পর্যন্ত বেশীর ভাগ ঐতিহাসিক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্যে প্রধানতঃ হিটলারের আগ্রাসী নীতিকেই দায়ী করেন। তবে এ· জে· পি· টেইলারের ব্যাখ্যাতেও কিছুটা সত্য আছে যে, হিটলার উপনিবেশ ও ইওরোপের বাইরে আধিপত্য চান কিনা সে সম্পর্কে কোন নিশ্চিত প্রমাণ নেই। হিটলার তাঁর আগ্রাসন প্রধানতঃ পূর্ব ইওরোপে সীমাবদ্ধ রাখেন। এর ফলেই বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে জার্মানীর বিরুদ্ধে মহাজোট গঠনে ব্যর্থতা (The Failure of the West to form a grand alliance against Nazi Germany) : পোল্যান্ড উপলক্ষে নাৎসী জার্মানীর সঙ্গে পশ্চিমী ইঙ্গ-ফরাসী শক্তির সংঘাত আসন্ন হলে, ব্রিটেনের জাতীয় নেতাদের মধ্যে চার্চিল প্রস্তাব দেন যে, এই অবস্থায় জার্মানীর বিরুদ্ধে শক্তিসাম্য রক্ষার জন্যে ব্রিটেনের উচিত, অতীতের তিক্ততা ভুলে গিয়ে কমিউনিষ্ট রাশিয়ার সঙ্গে মিত্র জোট গঠন করা। তাহলে জার্মানী দুই ফ্রন্টে যুদ্ধ করিতে বাধ্য হবে, জার্মান বাহিনী দুর্বল হবে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এই পরামর্শ অনুযায়ী স্বভাবসিদ্ধ ঢিলেঢালা ভাবে মস্কোতে একটি মিশন পাঠান। এই মিশনের নেতা ছিলেন ব্রিটেনের পররাষ্ট্র বিভাগের আন্ডার সেক্রেটারী উইলিয়াম ষ্ট্র্যাং। ব্রিটেনের কোন মন্ত্রী, বা পার্লামেন্টের বিশিষ্ট সদস্যকে এই মিশনের নেতা না করার কুফল অচিরেই ফলে।

পোল্যান্ড উপলক্ষে যুদ্ধের প্রাক্কালে মস্কোর সঙ্গে মিত্রতার প্রস্তাব

সোভিয়েত রাশিয়ায় ইতিমধ্যে ব্রিটেনের সঙ্গে সহযোগিতা স্থাপনের নীতি পরিত্যক্ত হয়েছিল। পশ্চিমী-ঘেঁসা লিটভিনভের স্থলে পশ্চিমী বিরোধী মলোটোভকে ষ্ট্যালিন বিদেশ দপ্তরের ভার দেন। মিউনিখ্ চুক্তির পর ষ্ট্যালিনের ধারণা হয় যে, পশ্চিমী দেশগুলি রাশিয়ার সহযোগিতা চায় না। এমনকি এ· জে· পি· টেইলারের মতে, ইঙ্গ-ফরাসী-জার্মানীর ধনতন্ত্রী জোট গঠন করে রাশিয়াকে ভেঙে ফেলতে ব্রিটেন ইচ্ছা করে এমন একটি ধারণা ষ্ট্যালিনের ছিল। এই অবিশ্বাসের বাতাবরণের মাঝে ব্রিটিশ মিশন মস্কোতে মিত্র চুক্তি স্বাক্ষরের জন্যে আসে।

মিউনিখ চুক্তির পর সোভিয়েত নীতির দিক্ পরিবর্তন পশ্চিমের সহযোগীতা গ্রহণের নীতি ত্যাগ

ব্রিটেনের কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে ব্রিটিশ মিশনের নেতা হিসেবে না পাঠাবার ফলে এবং একজন মাঝারি আমলাকে ব্রিটিশ মিশনের প্রধান হিসেবে নিয়োগ করায় ব্রিটেনের আন্তরিকতা সম্পর্কে রুশ নেতাদের মনে সন্দেহ দেখা দেয়। তাছাড়া পদমর্যাদায় রুশ বিদেশমন্ত্রী মলোটোভের সমান ব্রিটিশ মিশনের প্রধান ছিলেন না। এটা ছিল কূটনৈতিক শিষ্টাচার বিরোধী। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ব্রিটিশ মিশনকে ধীরে ও বিলম্বিত লয়ে কথাবার্তা চালাতে নির্দেশ দেন। চেম্বারলেইন কেন এই নির্দেশ দেন তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। যাই হোক, ব্রিটিশ মিশনের সঙ্গে একটি ফরাসী মিশনও রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তি করতে মস্কোতে আসে।

মস্কোতে ব্রিটিশ মিশন গঠনের ক্রটি এবং মিশনের ধীরে চলার নীতি

মলোটোভ ও ষ্ট্যালিন মিউনিখ চুক্তির পর পশ্চিমী শক্তির সঙ্গে সহযোগিতা হবে না এটা ধরে নেন। তথাপি তাঁরা পশ্চিমী মিশনের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন এজন্য যে, মস্কোর বিরুদ্ধে যাতে ইঙ্গ-ফরাসী-জার্মান জোট না গড়ে ওঠে। সম্ভব হলে এবং রুশ শর্ত পূরণ হলে তবেই পশ্চিমী রাষ্ট্রের সঙ্গে সোভিয়েত মৈত্রী স্থাপন করা হবে এই মনোভাব মলোটোভ নেন। মলোটোভ এজন্য শর্ত দেন যে : (১) পোল্যান্ডের ভেতর দিয়ে যুদ্ধের জন্যে প্রয়োজন হলে রুশ সেনাকে যাতায়াতের অধিকার দিতে হবে। (২) তিন বাল্টিক রাজ্যের (এস্থোনিয়া, ল্যাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া) ওপর রাশিয়ার অধিকার এবং রাশিয়ার সঙ্গে সংযুক্তি মেনে নিতে হবে। (৩) ব্রিটেন ও ফ্রান্সকে নির্দিষ্ট ও অবিচল প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে, জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হলে, এই দুই শক্তি রাশিয়ার পক্ষ নিয়ে যুদ্ধে নামবে।

মলোটোভের নীতি : পশ্চিমী মিশনের কাছে তিন শর্ত পূরণের দাবী

রাশিয়ার এই তিন শর্ত সম্পর্কে ব্রিটেন জানায় যে : (১) পোল্যান্ড তার ভূখণ্ডের ভেতর রুশ সেনাকে ঢুকতে দিবে না। পোল্যান্ড আশঙ্কা করে যে, অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে তারা বুঝেছে যে, রুশ সেনা পোল্যান্ডে ঢুকলে আর ফেরত যাবে না। (২) তিন বাল্টিক রাজ্য হল

স্বাধীন, সার্বভৌম ও লীগের সদস্য। সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে তাদের সংযুক্তি আন্তর্জাতিক আইন, ভার্সাই সন্ধি ও লীগের আদর্শ বিরোধী। (৩) তৃতীয় প্রস্তাব সম্পর্কে ব্রিটেনের আপত্তি ছিল না। ব্রিটেনের এই জবাব পাওয়ার পর রাশিয়া আলোচনা মুলতুবী রাখে।

হিটলার কর্তৃক মস্কোতে সন্ধির জন্যে জার্মান মিশন প্রেরণা ঃ রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইঙ্গ-জার্মান -ফরাসী জোট গঠনের সম্ভাবনা দূর করতে জার্মান মিশন গ্রহণ

ইতিমধ্যে হিটলার রুশ নেতাদের কাছে মস্কোতে জার্মান রাষ্ট্রদূত শূলেনবার্গের দ্বারা অনুরোধ জানান যে, নাৎসী জার্মানী রাশিয়ার সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদনের জন্যে কূটনৈতিক মিশন মস্কোতে পাঠাতে চায়। রাশিয়া কিছু দ্বিধার পর এবং হিটলারের বারম্বার অনুরোধে এই মিশন মস্কোতে পাঠাতে অনুমতি দেয়। এই পরিস্থিতিতে রাশিয়া বিভিন্ন বিরোধী গোষ্ঠীর মধ্যে আলোচনার দ্বারা তার সুবিধাজনক শর্ত আদায়ের সুযোগ পায়। বিশেষভাবে ব্রিটেন তখনও পর্যন্ত রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনে বিলম্ব করার নীতি নেওয়ায় রুশ নেতাদের বিরক্তি দেখা দেয়। অতীতে ব্রিটেনের জার্মান তোষণ নীতি এবং রাশিয়ার ব্রিটেনের সঙ্গে সহযোগিতা নীতির প্রতি ব্রিটেনের অবজ্ঞার স্মৃতি রুশ নেতাদের ভারাক্রান্ত করেছিল। ব্রিটিশ কূটনৈতিক মিশন রাশিয়ার তিনটি দাবীর প্রথম দুটিকে নাকচ করায় মস্কোর নেতাদের ক্ষোভ দেখা দেয়। এখন জার্মানী অনাক্রমণ চুক্তি দ্বারা আসন্ন যুদ্ধের সময় রাশিয়ার নিরপেক্ষতা কিনতে চাইলে, ক্রেমলিন নেতাদের হাতে তুরুপের তাস এসে যায়।

ফ্রান্সের রুশ দাবী পূরণের চেষ্টার বিফলতা ঃ মনোটোভের পশ্চিমী বিরোধিতা ঃ ইঙ্গ-রুশ সন্ধি স্থাপনের জন্যে চাপ সৃষ্টি

ফরাসী মিশন বেগতিক দেখে রাশিয়ার তিনটি দাবী মানতে রাজী হলেও, মলোটোভ সন্তুষ্ট হননি। তিনি ফরাসী মন্ত্রীকে ভর্ৎসনা করে বলেন, "পোল্যান্ড দয়া করে রাজী হলে তবে রুশ সেনা পোল্যান্ডের পথে ঢুকতে পারবে, এখন আর সে অবস্থা নেই। রাশিয়া পোল্যান্ডের দয়া চায় না। পোল্যান্ডকেই রাশিয়ার দয়া চাইতে হবে।" মলোটোভ অকস্মাৎ ইঙ্গ-ফরাসী মিশনের সঙ্গে মুলতুবী আলোচনা শুরু করে দেন। তিনি ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিনিধিদের অবাক করে বলেন যে, "রাশিয়া এখন প্রথম দুটি দাবী তুলে নিচ্ছে। এখন ব্রিটিশ মিশন অবিলম্বে তৃতীয় শর্তের ভিত্তিতে সন্ধি স্বাক্ষর করুক; রাশিয়া এজন্য প্রস্তুত আছে।" ব্রিটিশ মিশনের প্রধান উইলিয়াম ষ্ট্র্যাং এই শর্তে ইঙ্গ-রুশ চুক্তির অনুমোদন স্বদেশ থেকে আনার জন্যে কিছু সময় চান। তিনি অজুহাত দেখান যে, তাঁর সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করার ক্ষমতাপত্র নেই। এতে মলোটোভ ও ষ্ট্যালিন চটে যান। একেই তিনি ব্রিটিশের চুক্তি প্রস্তাবের আন্তরিকতায় সন্দেহ করতেন। এখন তা সঙ্কটের চেহারা নেয়। আসলে জার্মান বিদেশমন্ত্রী রিবেনট্রপ, রাশিয়ার সব ভৌগোলিক দাবী মেনে নিয়ে অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরের প্রস্তাব দিলে, ক্রেমলিন নেতারা ব্রিটেনের সঙ্গে রাশিয়ার ভৌগোলিক দাবী অপূর্ণ রেখে অনিশ্চয়তামূলক চুক্তি করতে আগ্রহ দেখাননি। তুলনায় জার্মান প্রস্তাব রাশিয়ার কাছে লাভজনক ছিল। অতঃপর ইঙ্গ-ফরাসী মিশন মস্কো ত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

মহাজোট গঠনের বিফলতার দায়িত্ব নিরূপণ

এভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে জার্মান বিরোধী ইঙ্গ-ফরাসী-রুশ মহাজোট গঠনের সম্ভাবনা বিনষ্ট হয়। এজন্য প্রধান দায়িত্ব ব্রিটেনের ছিল এতে সন্দেহ নেই। অতীতে জার্মান তোষণ নীতির ফলে তিক্ততা, পোল্যান্ড সম্পর্কে ব্রিটেনের স্নায়ুপ্রবণতা, ও শেষ পর্যন্ত জার্মানীর সঙ্গে একটি আপোষের আশায় তাঁরা মহাজোট গঠনের সুবর্ণ সুযোগ হারান।

রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি ও তার সমালোচনা (The Russo-German Non-Aggression Pact and its criticism) ঃ পোল্যান্ড

উপলক্ষে নাৎসী জার্মানীর সঙ্গে পশ্চিমী শক্তির যুদ্ধ বাধার উপক্রম হলে, সমগ্র বিশ্বকে চমকিত করে নাৎসী জার্মানী ও সোভিয়েত রাশিয়া পরস্পরের মধ্যে ১৯৩৯ খ্রীঃ এক অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করে। নাৎসী জার্মানী এতদিন ধরে সোভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধে যে আক্রমণাত্মক মনোভাব দেখাচ্ছিল এবং সোভিয়েত সাম্যবাদের বিরুদ্ধে যে ঘৃণা প্রকাশ করছিল, তার ফলে এই দুই শক্তির মধ্যে সঙ্ঘাতকেই লোকে প্রাকৃতিক নিয়মের মতই স্বতঃসিদ্ধ বলেই মনে করত। এখন উভয় শক্তির মধ্যে অনাক্রমণ চুক্তি বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

রুশ-জার্মান চুক্তি

একথা সত্য যে, ১৯৩৯ খ্রীঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মুখে দাঁড়িয়ে হিটলারই এই চুক্তির জন্যে বিশেষ উদ্যোগ নেন। এই চুক্তির জন্যে হিটলারের উদ্দেশ্য ছিল পরিস্কার। এ্যালান বুলকের মতে, এই চুক্তি ছিল হিটলারের One by One নীতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তিনি দুই রণাঙ্গনে একই সঙ্গে যুদ্ধ চাননি। যদি তাঁর বিরুদ্ধে ব্রিটেন-ফ্রান্স-রাশিয়ার আঁতাত গঠিত হত, তবে হিটলারকে পূর্ব রণাঙ্গনে রাশিয়া ও পশ্চিমে ফ্রান্স ও ব্রিটেনের বিরুদ্ধে একই সময়ে যুদ্ধ করতে হত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে দুই রণাঙ্গনের যুদ্ধে জড়িয়ে কাইজার বিপদে পড়েন। জার্মান সেনাপতিদের এতে আপত্তি ছিল। সুতরাং কূটবুদ্ধি হিটলার এই অনাক্রমণ চুক্তির দ্বারা রাশিয়াকে নিরপেক্ষ রাখেন এবং তিনি পূর্ণশক্তি নিয়ে পশ্চিম রণাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ১৯৪১ খ্রীঃ পশ্চিমের যুদ্ধে সফলতার পর তিনি এই সন্ধি ভেঙে রাশিয়া আক্রমণ করেন। তখন রাশিয়া ছিল মিত্রহীন।

রুশ-জার্মান চুক্তির কারণ : হিটলারের One by One নীতি

দ্বিতীয়তঃ, হিটলার এই চুক্তির দ্বারা পূর্ব ইওরোপে তাঁর বিস্তার নীতিকে সফল করেন। মিউনিখ্ চুক্তির পর পূর্ব ইওরোপে তাঁর বিনা যুদ্ধে প্রসারের আর কোন সুযোগ ছিল না। পূর্ব ইওরোপে প্রসারে তাঁর প্রধান বাধা আসত সোভিয়েত সরকারের কাছ থেকে। এখন এই চুক্তির ফলে উভয় স্বাক্ষরকারী নিজ নিজ অঞ্চল ভাগ করে নিতে পারে।

পূর্ব ইওরোপে বিনাযুদ্ধে জার্মানীর বিস্তৃতি

তৃতীয়তঃ, এই চুক্তির দ্বারা হিটলার তাঁর শত্রু ব্রিটেন ও ফ্রান্সকে মিত্রহীন করেন। এ· জে· পি· টেইলারের মতে, হিটলার আশা করেন যে, রুশ মিত্রতা না পাওয়ায়, ব্রিটেন ও ফ্রান্স জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামার কথা ভাববে না। শেষ পর্যন্ত পোল্যান্ডকে নিয়ে একটি মিউনিখ ধরনের চুক্তি করে পশ্চিমী গণতন্ত্র পিছু হঠবে। তাহলে তিনি বিনা যুদ্ধে তাঁর অভীষ্ট পূরণ করতে পারবেন।

ব্রিটেন ও ফ্রান্সকে মিত্রহীন করা এবং মিউনিখ ধরনের চুক্তি করতে বাধ্য করা

নাৎসী নেতা হিটলারের উদ্দেশ্য বোঝা গেলেও সোভিয়েত সরকার কেন এত দ্রুতগতিতে এই সন্ধি স্বাক্ষরে রাজী হন, তার ব্যাখ্যা পরিস্কার নয়। এসমন্ড রবার্টসনের (Esmond Robertson) মতে, মূলতঃ সোভিয়েত রাশিয়া রুশ-জার্মান চুক্তি দুটি কারণে স্বাক্ষর করেন। প্রথমতঃ, সোভিয়েত সরকারের ভয় ছিল যে, এই চুক্তি যদি রাশিয়া না করে, তবে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জার্মানী চুক্তিবদ্ধ হতে পারে। রাশিয়ার বিরুদ্ধে ব্রিটেনের কঠোর মনোভাব এই আশঙ্কা সৃষ্টি করে। দ্বিতীয়তঃ, জার্মান সাম্রাজ্যবাদ যেভাবে পূর্ব ইওরোপের পথে প্রসারিত হচ্ছিল, তা প্রতিহত করতে হলে এই ধরনের একটি চুক্তির প্রয়োজন ছিল। রুশ-জার্মান মৈত্রী জোট গড়া হলে পূর্ব ইওরোপে রুশ সীমান্ত সুরক্ষিত হত। তৃতীয়তঃ, বাল্টিক রাজ্যগুলি ও পোল্যান্ড, যা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে জারের সাম্রাজ্যের ভেতর ছিল, তা আবার ফিরে পেতে রুশ-জার্মান চুক্তি সহায়ক ছিল। চতুর্থতঃ, এসমন্ড রবার্টসন বলেন যে, Totalitarian বা সর্বাত্মক রাষ্ট্রগুলির পক্ষে আদর্শবাদ অপেক্ষা বাস্তববাদকেই প্রাধান্য দান করা হয়ে থাকে। কাজেই আদর্শের কথা ফেলে রেখে বাস্তব সুবিধার জন্যেই রাশিয়া এই চুক্তি

রুশ মনোভাব সম্পর্কে এসমন্ড রবার্টসনের ব্যাখ্যা

করে। এর আগে ১৯২২ খ্রীঃ রাশিয়া ও জার্মানীর মধ্যে যদি র‍্যাপালো চুক্তি হতে পারে তবে ১৯৩৯ খ্রীঃ রুশ-জার্মান চুক্তি গঠনে বাধা ছিল না।

রুশ-জার্মান চুক্তিতে হিটলারের আগ্রহ রুশ নেতাদের প্রলুব্ধ করে

কাজেই হিটলার যখন ১৯৩৯-এর আগষ্টে ষ্ট্যালিনকে জানান যে, "জার্মানী ও রাশিয়ার স্বার্থের মধ্যে প্রকৃত কোন সংঘাত নেই। বাল্টিক ও কৃষ্ণ সাগরের মধ্যে এমন কোন প্রশ্ন নেই যার সমাধান উভয় দেশের মধ্যে সন্তোষজনকভাবে করা যায় না" তখন ষ্ট্যালিন অনুকূল মনোভাব নিয়ে সাড়া দেন। মলোটোভ শর্ত দেন যে, অগ্রে রুশ-জার্মান বাণিজ্যিক চুক্তি হবে, তারপর রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি হবে। ২১শে আগষ্ট, ১৯৩৯ খ্রীঃ রুশ-জার্মান বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ২৩শে আগষ্ট, ১৯৩৯ খ্রীঃ রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উভয় দেশের মধ্যে কোন দীর্ঘ, তিক্ত, বিতর্কিত আলোচনা হয়নি।

রুশ-জার্মান চুক্তির শর্তাবলী

রুশ-জার্মান চুক্তির প্রকাশ্য শর্ত ছিল যে, (১) রাশিয়া ও জার্মানী অন্ততঃ ১০ বছরের জন্যে কেহ কাহাকেও আক্রমণ না করার প্রতিশ্রুতি দেয়। (২) দুই স্বাক্ষরকারীর মধ্যে কোন বিবাদ দেখা দিলে তা শান্তিপূর্ণভাবে মিটিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। (৩) কোন তৃতীয় শক্তি বা একাধিক শক্তি যদি দুই স্বাক্ষরকারীর কাহাকেও আক্রমণ করে, তবে অপর স্বাক্ষরকারী আক্রমণকারীর সঙ্গে যোগ না দিতে অঙ্গীকার করে। (৪) রুশ-জার্মান চুক্তির গোপন শর্তে বলা হয় যে, (ক) পূর্ব ইওরোপে দুই স্বাক্ষরকারী নিজ নিজ প্রভাবাধীন অঞ্চল (spheres of influence) স্থির করে নেয়। (খ) যদি তিন বাল্টিক রাজ্য, ফিনল্যান্ড, পূর্ব পোল্যান্ড ও বেসারাবিয়ায় কোন পরিবর্তন করা হয়, তাহলে এই স্থানগুলি সোভিয়েত সীমানাভুক্ত হবে। (গ) লিথুয়ানিয়ার উত্তর সীমান্ত সোভিয়েত ও জার্মানীর প্রভাবাধীন অঞ্চলের সীমান্ত হবে। (ঘ) এই শর্তগুলি গোপন রাখা হবে। (ঙ) পোল্যান্ডে রুশ-জার্মান সীমান্ত সান, ভিশ্চুলা নদী ও নারার্ড দ্বারা চিহ্নিত হবে।

রুশ-জার্মান চুক্তির পক্ষে যুক্তি

রুশ-জার্মান চুক্তির দ্বারা রাশিয়া বিশ্বযুদ্ধ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেয়। নাৎসী আক্রমণের বিরুদ্ধে যখন ফ্রাঙ্কো-ব্রিটিশ শক্তি মরণপন সংগ্রামে লিপ্ত ছিল, তখন সোভিয়েত রাশিয়া তার নিরপেক্ষতার দ্বীপের সবুজ ঘাসে শুয়ে সূর্যস্নান করে আর আড়মোড়া ভাঙে। দ্বিতীয়তঃ, তার নিরাপত্তা বলয় রচনার জন্যে এবং ব্রেষ্টলিটভস্কের সন্ধিতে হস্তান্তরিত ভূমি পুনরুদ্ধারের জন্যে রাশিয়া ইঙ্গ-ফরাসী শক্তির কাছে যা দাবী করে, এখন রুশ-জার্মান চুক্তিতে রাশিয়া তা পেল। ব্রেষ্টলিটভস্কের সন্ধি এখন ছেঁড়া কাগজে পরিণত হল। এই চুক্তির দ্বারা পূর্ব ইওরোপে জার্মান অগ্রগতি রুদ্ধ হল। যাঁরা বলেন যে, সোভিয়েত সরকার এই নিরপেক্ষতা নীতি নিয়ে পশ্চিমী শক্তির পিছে ছুরিকাঘাত করল, তাঁরা পরিস্থিতি বিচারের কথা ভুলে যান। এই অবস্থায় রাশিয়া রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি ছাড়া আর কি করতে পারত? ১৯৩৩ খ্রীঃ থেকে রাশিয়া এক নাগাড়ে পশ্চিমী শক্তির সঙ্গে সহযোগিতা দিতে চেয়েছিল। সেই সহযোগিতার হাত ফিরিয়ে দেওয়া হয়। অবশেষে মিউনিখ চুক্তি রুশ নেতাদের সহযোগিতা নীতির অবসান ঘটায়। অবশেষে ব্রিটেন যখন রুশ মৈত্রী চায় তখন তার আন্তরিকতায় যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। (বিস্তৃত বিবরণ আগের পরিচ্ছেদ দেখ)। পোল্যান্ড উপলক্ষে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সহযোগী হিসেবে যদি যুদ্ধে নামতে হয়, তার আগে রাশিয়া আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্যে একটি নিরাপত্তা বলয় হিসেবে বাল্টিক রাজ্য চায়। মিত্রশক্তি তাতে রাজী ছিল না। অথচ রাশিয়ার ভয় ছিল যে, পশ্চিমী শক্তির মিত্র হিসেবে যুদ্ধে নামলে জার্মান আক্রমণের পূর্বমুখী ঝড় তাকেই বেশী আঘাত করবে। সেক্ষেত্রে রাশিয়া নিজেকে যুদ্ধ থেকে সরিয়ে নিরপেক্ষ রাখাই উচিত ভাবে। এই সঙ্গে তার কাঙ্খিত নিরাপত্তা বলয় সে পেয়ে যায়। ভবিষ্যতে জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুতির সময় পায়।

অপরদিকে পশ্চিমী ঐতিহাসিকরা রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তির তীব্র সমালোচনা করেন। যে নাৎসী সরকারকে সোভিয়েত রাশিয়া "নাৎসী পশু" (Nazi Beasts) বলে মনে করত, সেই আগ্রাসী, বর্বর সরকারের সঙ্গে ইওরোপের এই সঙ্কট সময়ে রাশিয়ার চুক্তি ছিল শুধু আদর্শবাদের বিচ্যুতি নয়, একপ্রকার বিশ্বাসঘাতকতা। হিটলারকে দুই রণাঙ্গনে যুদ্ধ করার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে, তাঁরা নাৎসী আগ্রাসন যন্ত্রকে ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও ব্রিটেনের দিকে ঠেলে দেন। এর ফলে ১৯৪০ খ্রীঃ ফ্রান্সের পতন ও ডানকার্কের যুদ্ধে ব্রিটেনের বিপর্যয় ঘটে। এককথায় পশ্চিমী লেখকদের মতে, রুশ-জার্মান চুক্তির দ্বারা পশ্চিমী দেশের পৃষ্ঠে সোভিয়েত রাশিয়া ছুরিকাঘাত করে। আরও বলা হয় যে, রাশিয়া হিটলারের সঙ্গে পোল্যান্ডকে ভাগ করে নেয়, যে পোল্যান্ডের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে পশ্চিমী দেশগুলি যুদ্ধের ঝুঁকি ঘাড়ে নেয়।

রুশ-জার্মান চুক্তির বিপক্ষে যুক্তি

নিরপেক্ষভাবে বিচার করলে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে রাশিয়ার সঙ্গে পশ্চিমী শক্তির মহাজোট গড়ে না ওঠার প্রধান দায়িত্ব ছিল ব্রিটেনের। এজন্য রাশিয়াকে দোষী করে লাভ নেই। ব্রিটেন মিউনিখ চুক্তি পর্যন্ত যে জার্মান তোষণ নীতি অনুসরণ করে তাতে রাশিয়ার ক্ষুব্ধ হওয়ার কারণ ছিল। ১৯৩৯ খ্রীঃ আগষ্ট মাসে ব্রিটেনের দীর্ঘসূত্রতার কারণে রাশিয়া জার্মানীর সঙ্গে চুক্তি ছাড়া আর কিই বা করতে পারত? যদি রাশিয়া জার্মানীর সঙ্গে জোট দ্বারা পোল্যান্ডকে ব্যবচ্ছেদ করে, তবে তা মিউনিখ চুক্তি অপেক্ষা গর্হিত কাজ ছিল না। এসমন্ড রবার্টসনের (Esmond Robertson) মতে, দুটি কাজই সমান খারাপ ছিল। জার্মানীর আগ্রাসনে সোভিয়েত নিশ্চেষ্টতা ছিল মিউনিখ চুক্তির দ্বারা জার্মানীর হাতে চেক রাষ্ট্রকে বলিদানের মতই নিন্দনীয়। আইজ্যাক ডয়েৎসার অবশ্য রাশিয়াকে সমর্থন করে বলেন যে, ষ্ট্যালিন রাশিয়ার আত্মরক্ষার জন্যে পূর্ব পোল্যান্ড ও বাল্টিক রাষ্ট্র নিয়ে একটি রক্ষা বলয় তৈরি করতে চান। অন্য দেশের স্বাধীনতা বিনষ্ট করে এই তথাকথিত বলয় রচনা অবশ্য নৈতিক দিক থেকে সমর্থনীয় নয়। তবে রাশিয়া ব্রেষ্টলিটভস্কের সন্ধি নস্যাৎ করার সিদ্ধান্ত নেয় একথাই ঠিক। এসমন্ড রবার্টসন বলেন যে, নাৎসী জার্মানীর মতই সোভিয়েত রাশিয়াও ছিল শোধনবাদী (Revisionist)। তবে শেষ পর্যন্ত রুশ-জার্মান চুক্তি রাশিয়াকে জার্মান আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারেনি। ১৯৪১ খ্রীঃ নাৎসী জার্মানী সোভিয়েত দেশকে আক্রমণ করলে ষ্ট্যালিনকে ১৯৩৯-এর রুশ-জার্মান চুক্তির সুবিধাবাদের মূল্য দিতে হয়। হিটলারের প্রতিশ্রুতিতে আস্থার কঠিন দাম তাঁকে দিতে হয়।

রুশ-জার্মান চুক্তির মূল্যায়ণ

আসলে রুশ-জার্মান চুক্তি স্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। (এই চুক্তির বিফলতার কারণ দশম অধ্যায়, পৃ ঃ ৯৪ দ্রষ্টব্য)। রুশ নেতাদের একথা ১৯৩৯-এ বোঝা উচিত ছিল। প্রথমতঃ, পূর্ব ইওরোপে প্রসারণবাদী নাৎসী জার্মানী রুশ-জার্মান চুক্তির দ্বারা স্থির করা সীমারেখা মানতে রাজী হয়নি। পশ্চিমের পরাজয়ের পর হিটলার পূর্ব ইওরোপে ঝাঁপ দেন। দ্বিতীয়তঃ, রুমানিয়া, লিথুয়ানিয়ার ওপর রুশ অধিকার নিয়ে জার্মানীর সঙ্গে বিরোধ দেখা দেয়। তৃতীয়তঃ, যদি এ্যালান বুলকের ব্যাখ্যা সত্য হয় তবে হিটলারের নীতি ছিল One by One। পশ্চিমের যুদ্ধ শেষ হলে তিনি পূর্বে দৃষ্টি দেন। চতুর্থতঃ, হিটলার আশঙ্কা করতেন যে, টিলজিটের সন্ধি ভেঙে রাশিয়া যেমন নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে ব্রিটেনের পক্ষ নেয়, সোভিয়েত সরকার হয়ত শেষ পর্যন্ত নিরপেক্ষতা ভেঙে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির পক্ষে চলে যাবে। তার আগেই তিনি রাশিয়া আক্রমণ করেন।

রুশ-জার্মান চুক্তির বিফলতার কারণ

পাঠ্যসূচী

১। A. Hitler—Mein Kampf.
২। Alan Bullock—Hitler—A Study in Tyranny.
৩। A. J. P. Taylor—The Origins of Second World War
৪। W. Shirer—Rise and fall of the Third Reich.
৫। D. Schoenbaum—Hitler's Social Revolution.
৬। W. Churchill—The Gathering Storm.
৭। A. Werth—The Twilight of France.
৮। Wheeler-Bennett—Munich.
৯। K. Feiling—N. Chamberlaine.

ত্রয়োদশ অধ্যায়

স্পেনের গৃহযুদ্ধ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

(The Spanish Civil War and the Second World War)

স্পেনের গৃহযুদ্ধের কারণ ও ফলাফল (The Causes and Significance of the Spanish Civil War) : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর স্পেনে দক্ষিণপন্থী রাজতান্ত্রিক শক্তির সঙ্গে প্রজাতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রীদের বিরোধ দেখা দেয়। স্পেনের রাজা ত্রয়োদশ আলফোনসো, প্রিমো-ডি-রিভেরা নামে এক মন্ত্রীর সাহায্যে দেশ শাসন করেন। প্রিমো-ডি-রিভেরা ১৯২৩-১৯৩০ খ্রীঃ পর্যন্ত একনায়কের ন্যায় শাসনকার্য চালান। ১৯৩০ খ্রীঃ ব্যাপক গণ-আন্দোলন ও সেনা বিদ্রোহের সম্মুখীন হয়ে রিভেরা পদত্যাগ করেন। রাজা আলফোনসো জমিদার শ্রেণী ও সেনাবাহিনীর সহায়তা নিয়ে সরকার গঠনের চেষ্টা করেন। কিন্তু ১৯৩১ খ্রীঃ প্রজাতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রীরা নির্বাচনে জয়লাভ করে 'রাজতন্ত্র ধ্বংস হোক' এই দাবী জানালে আলফোনসো পদত্যাগ করেন। ১৯৩১ খ্রীঃ স্পেন একটি প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়। স্পেনের এই প্রজাতন্ত্র যে সংবিধান প্রবর্তন করে তাকে "সকল শ্রেণীর শ্রমিকের" প্রজাতন্ত্র নাম দেওয়া হয়। ২৩ বছর বয়স্ক সকল স্প্যানিশ নরনারী ভোটাধিকার পায়। ৪ বছর অন্তর সাধারণ নির্বাচন দ্বারা পার্লামেন্ট গঠনের বিধান দেওয়া হয়। প্রজাতন্ত্রের সভাপতি ৬ বছরের জন্যে নির্বাচিত হন।

রিভেরা একনায়কতন্ত্র

১৯৩১—১৯৩৬ খ্রীঃ পর্যন্ত এই নবজাত প্রজাতন্ত্র বহু বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হয়। দক্ষিণপন্থী রাজতন্ত্রীরা এবং বামপন্থী নৈরাজ্যবাদীরা এই প্রজাতন্ত্রকে ধ্বংস করবার চেষ্টা চালায়। এই প্রজাতান্ত্রিক সরকার রাষ্ট্রপতি জামোরা ও প্রধানমন্ত্রী ম্যানুয়েল আজানার নেতৃত্বে নানাবিধ প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তন করে। বৃহৎ জমিদারীগুলি বাজেয়াপ্ত করে, বৃহৎ শিল্পগুলিকে রাষ্ট্রের হাতে নিয়ে শ্রমিক ও কৃষকদের রক্ষার জন্যে আশ্বাস দিয়ে প্রজাতন্ত্রী সরকার সমাজতান্ত্রিক আদর্শ অনুসরণ করে। স্পেনের অন্তর্গত ক্যাটালোনিয়া প্রদেশে বিচ্ছিন্নতাবাদ প্রশমনের জন্যে ক্যাটোলোনিয়াকে স্বায়ত্ব শাসনের অধিকার দান করা হয়। ১৯৩৫ খ্রীঃ সাধারণ নির্বাচনের ফলে পার্লামেন্টে বামপন্থী সমাজতন্ত্রীদের প্রাধান্য বাড়লে, প্রজাতন্ত্রী সরকার কৃষকদের জমির অধিকার দেয় এবং গীর্জা প্রভৃতির জাতীয়করণ করা হয়। স্পেন থেকে জেসুইট ও ফ্যাসিবাদীদের বহিষ্কার করা হয়। যে সকল সরকারি কর্মচারী ফ্যাসিবাদী মনোভাবের অনুরাগী ছিল তাদের নির্বাসিত করা হয়। জেনারেল ফ্রাঙ্কো ক্যানারি দ্বীপে নির্বাসিত হন।

স্প্যানিস প্রজাতন্ত্রের প্রগতিশীল শাসন

প্রজাতন্ত্রী সরকারের সমাজবাদী নীতিতে অখুসী হয়ে দক্ষিণপন্থীরা এই সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। স্পেনের সামরিক বিভাগে বহু অফিসার ছিল রাজতন্ত্রী। তারা প্রজাতন্ত্রী সরকারের কাজে বিরক্ত হয়। স্পেনের শ্রমিক ও কৃষকরা যারা প্রজাতন্ত্রের সমর্থনে ভোট দেয় তারাও প্রজাতন্ত্রী সরকারের ধীর গতি সংস্কারে বিরক্ত হয়। প্রজাতন্ত্রের এই জনপ্রিয়তার হ্রাসের সুযোগে এই সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার ষড়যন্ত্র করা হয়। স্পেনের উপনিবেশ মরক্কোয় অবস্থিত

ফ্রাঙ্কোর বিদ্রোহ : প্রতিদ্বন্দ্বী সরকার গঠন

স্পেনীয় সৈন্যদল পপুলার ফ্রন্ট বা প্রজাতন্ত্রী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বজা তুলে। জেনারেল ফ্রাঙ্কো ক্যানারি দ্বীপ থেকে চলে আসেন এবং এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন। তিনিও একটি প্রতিদ্বন্দ্বী সরকার ঘোষণা করেন। ফ্রাঙ্কো সেনাদলসহ মরক্কো থেকে দক্ষিণ স্পেনে চলে আসেন। স্পেনের রাজতন্ত্রী, ফ্যাসিবাদী, অভিজাত প্রভৃতি সকল প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী ফ্রাঙ্কোর পক্ষ নেয়। ফ্রাঙ্কোর বাহিনীতে পেশাদারী সেনারা ছিল। তিনি রাজধানী মাদ্রিদের অভিমুখে সেনাদল পরিচালনা করেন। প্রজাতন্ত্রী সরকার অনুগত সেনাদল ও সমর্থক সহ ফ্রাঙ্কোকে বাধা দেয়। প্রজাতন্ত্রী সরকারের পক্ষে ছিল বামপন্থীরা, কিছু স্বেচ্ছাসেবক ও শ্রমিক সেনা। ইতিমধ্যে জার্মানী ও ইতালী ফ্রাঙ্কো সরকারকে স্বীকৃতি দেয়। এইভাবে স্পেনের গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয়।

স্পেনের গৃহযুদ্ধ ক্রমে একটি ক্ষুদ্র বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হয়।[১] এই গৃহযুদ্ধে বৈদেশিক শক্তিগুলিও জড়িয়ে পড়ে। স্পেনের প্রজাতন্ত্রী সরকারে কমিউনিষ্টদের আধিপত্য থাকায়, পশ্চিমের বুর্জোয়া দেশগুলি মনে করে যে, স্পেনে কমিউনিষ্ট বিপ্লব ঘটতে যাচ্ছে। বিশেষতঃ জার্মানী ও ইতালীর এই ধারণা বদ্ধমূল হয়।

ইতালীর হস্তক্ষেপ

স্পেনে সাম্যবাদী বিপ্লবের সম্ভাবনাকে নির্মূল করার জন্যে ফ্যাসিষ্ট ইতালীতে তৎপরতা দেখা দেয়।[২] ফ্যাসিষ্ট নেতা মুসোলিনীর উদ্দেশ্য ছিল স্পেনে ফ্রাঙ্কোর একনায়কতন্ত্র স্থাপন করে, ইতালীর শত্রু ফ্রান্সকে বেষ্টন করা। তিনি স্প্যানিশ মরক্কোর মাধ্যমে উত্তর আফ্রিকায় ফরাসী উপনিবেশে অনুপ্রবেশ করার লক্ষ্য নেন। স্পেনের সাহায্যে জিব্রাল্টার অধিকার করে ভূমধ্যসাগরে ইতালীয় আধিপত্য স্থাপন করাও ছিল মুসোলিনীর অন্যতম লক্ষ্য। এই কারণে, ফ্যাসিষ্ট ইতালী ফ্রাঙ্কোর সমর্থনে স্পেনে সেনাদল ও সমরাস্ত্র পাঠায়। নাৎসী জার্মানীও ফ্রাঙ্কোর পক্ষ নিয়ে স্পেনে বায়ুসেনা পাঠায়। পর্তুগালও ফ্রাঙ্কোর পক্ষ সমর্থন করে। অপরদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন পপুলার ফ্রন্ট বা বৈধ প্রজাতন্ত্রী সরকারকে সমর্থন জানায়।[৩] স্পেনের এই গৃহযুদ্ধে ফ্যাসিষ্ট নেতা মুসোলিনী কেন উৎসাহ ভরে ফ্রাঙ্কোর পক্ষ নেন তার কারণ আলোচনা করা হল। নাৎসী জার্মানী কেন ইতালীর সঙ্গে যোগ দিয়ে ফ্রাঙ্কোর পক্ষ নেয় তা পরিস্কার নয়। অনেকের মতে, হিটলার তাঁর নবগঠিত বিমান বহর বা লুফৎভাফের কার্যকারিতা পরীক্ষা করতে চান। তাছাড়া স্পেনে ডিক্টেটর হিসেবে ফ্রাঙ্কোর জয় হলে ইওরোপে তৃতীয় ডিক্টেটরী শাসন দেখা দিত। এর ফলে ফ্রান্স ও ব্রিটেনের গণতন্ত্র বেষ্টিত হত। সোভিয়েত সরকার ফ্রাঙ্কোর বিরুদ্ধে প্রজাতন্ত্রী সরকারকে সাহায্য বিভিন্ন কারণে করেন। কমিউনিষ্ট ঘেঁসা প্রজাতন্ত্র স্পেনে স্থাপিত হলে পশ্চিম ইওরোপে সোভিয়েত প্রভাব বাড়ত। এর ফলে পশ্চিমী গণতন্ত্রের সঙ্গে ফ্যাসিষ্টবাদী সরকারগুলির বিচ্ছেদ দেখা দিত।

এমতাবস্থায় ব্রিটেন ও ফ্রান্স সকল দেশকে স্পেনের গৃহযুদ্ধে নিরপেক্ষতা রক্ষার জন্যে অনুরোধ জানায় এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধি দ্বারা স্পেনে বৈদেশিক শক্তির হস্তক্ষেপ বিরোধী সমিতি গঠন করে। স্পেনের বিবাদী দুই পক্ষকে কোন বৈদেশিক শক্তির পক্ষ থেকে যুদ্ধের উপকরণ না পাঠাবার প্রস্তাব নেওয়া হয়। কিন্তু ইতালী, জার্মানী ও পর্তুগাল এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে ফ্রাঙ্কোকে সাহায্য পাঠাতে থাকে। এর ফলে সোভিয়েত সরকারও প্রজাতন্ত্রী সরকারকে সাহায্য পাঠায়। ফ্রাঙ্কোর বাহিনী মাদ্রিদের নিকটবর্তী হলে অক্ষশক্তি ফ্রাঙ্কোর সরকারকে স্বীকৃতি জানায়। এর পর বহু ইতালীয় ও জার্মান সেনা ফ্রাঙ্কোর পক্ষে যুদ্ধ

আন্তর্জাতিক নিরপেক্ষতা ভঙ্গ : ইতালী, জার্মানী ও রাশিয়ার ভূমিকা

১· Langsham—World Since 1919.

২· E. H. Carr—International Relations.

৩· Ibid.

করার জন্যে স্পেনে ঢুকে পড়ে। এদিকে কমিউনিষ্ট ও ফ্যাসিবিরোধী স্বেচ্ছাসেবকেরা স্পেনের প্রজাতন্ত্রী সরকারের সমর্থনে যুদ্ধ করে। বিখ্যাত মার্কিন লেখক আর্নেষ্ট হেমিংওয়ে এই যুদ্ধে প্রজাতন্ত্রী সরকারের স্বপক্ষে যুদ্ধ করেন। স্পেনের গৃহযুদ্ধের পটভূমিকায় তাঁর উপন্যাস "ফর হুম দি বেল টোলস" (For whom the Bell Tolls) একটি ধ্রুপদী সাহিত্য হিসেবে স্বীকৃত হয়।

স্পেনের গৃহযুদ্ধ এই প্রকারে একটি ক্ষুদ্র বিশ্বযুদ্ধের আকৃতি নেয়। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই যুদ্ধে বহু রাষ্ট্র জড়িয়ে পড়ে। স্পেনের গৃহযুদ্ধের বিস্তৃতির ফলে লীগ অব নেশনসের আদর্শ অকার্যকরী প্রতিপন্ন হয়। অক্ষশক্তি আন্তর্জাতিক আইন এবং লীগের আদর্শ অগ্রাহ্য করে স্পেনের গৃহযুদ্ধে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ করে। স্পেনে ফ্রাঙ্কোর ফ্যাসিষ্ট সরকার জয়লাভ করায় পশ্চিম ইওরোপে ফ্যাসিবাদী প্রভাব বাড়ে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ (The Causes of the Second World War) : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মিত্রশক্তি পরাজিত জার্মানীর ওপর যে ভার্সাইয়ের সন্ধি চাপিয়ে দেয় তা জার্মানী স্বীকার করতে রাজী ছিল না। জার্মান জাতীয়তাবাদী নেতারা মনে করতেন যে, এই সন্ধির দ্বারা জার্মানীর ওপর ঘোর অবিচার করা হয়। ভার্সাই সন্ধির দ্বারা জার্মানীকে চিরতরে পঙ্গু করে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। জার্মান জাতির এই মানসিকতা হেতু ভার্সাই সন্ধি ভাঙার প্রবণতা দেখা দেয়। জার্মান জাতীয়তাবাদী দলগুলি জার্মান জাতিকে বোঝায় যে, ভার্সাই সন্ধি না ভাঙলে জার্মানীর সমস্যার সমাধান হবে না এবং জার্মানীর প্রকৃত মুক্তি আসবে না। এই ভার্সাই বিরোধী প্রচার ও মানসিকতা জার্মান জাতিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পথে ঠেলে নিয়ে যায়।

ভার্সাই সন্ধির ত্রুটি

ভাইমার প্রজাতন্ত্রের পতন জার্মানীকে দ্রুত যুদ্ধের পথে ঠেলে দেয়। ভাইমার প্রজাতন্ত্রই ভার্সাই সন্ধি স্বাক্ষর করে এবং ভাইমার পার্লামেন্টে এই সন্ধি অনুমোদিত হয়। ভাইমার সরকার এই সন্ধির সংশোধন চাইলেও তাঁরা পুরোপুরি সন্ধি ভেঙে, বল প্রয়োগের নীতি থেকে দূরে থাকেন। এই প্রজাতন্ত্র ছিল সহনশীল ও শান্তিবাদী। নাৎসী দল এই প্রজাতন্ত্রকে উচ্ছেদ করে ক্ষমতা দখল করায় যুদ্ধ ত্বরান্বিত হয়।

ভাইমার প্রজাতন্ত্রের পতন কেবলমাত্র আভ্যন্তরীণ কারণে ঘটেনি। ফরাসী মন্ত্রী রেমন্ড পয়েনকারীর ক্রুর ও প্রতিশোধমূলক নীতি এই প্রজাতন্ত্রের দুর্বলতা সৃষ্টি করে। ফ্রান্স ভুলে যায় যে, ভাইমার প্রজাতন্ত্রের স্থলে ভার্সাই বিরোধী নাৎসীরা ক্ষমতায় এলে সন্ধি ভেঙে পড়বে, যুদ্ধ বেধে যাবে। ফরাসী সরকারের অদূরদর্শী নীতিও ভার্সাইবাদী ভাইমার সরকারের পতনের জন্যে দায়ী ছিল।

নাৎসী নেতা হিটলার ছিলেন ভার্সাই সন্ধির তীব্র বিরোধী। তিনি ১৯৩৩ খ্রীঃ জার্মানীর শাসন ক্ষমতা লাভ করেন। তিনি ছিলেন ক্রুর ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক। আন্তর্জাতিক আইন এবং ন্যায়নীতিকে তিনি গ্রাহ্য করতেন না। ভার্সাই সন্ধির বিরুদ্ধে তিনি এমন তীব্র প্রচার চালান যে, বিশ্বের জনমত এই সন্ধির বিরুদ্ধে যায়। এই সুযোগে ভার্সাই সন্ধির অবিচারমূলক শর্তগুলি ভাঙার ছলে তিনি ইওরোপের শক্তিসাম্য ভেঙে জার্মানীর সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করেন। ১৯৩৫ খ্রীঃ থেকে তিনি জার্মানীর অস্ত্রসজ্জা শুরু করেন।

হিটলারের ভার্সাই সন্ধির বিরোধিতা

নাৎসী জার্মানীর বৈদেশিক নীতির লক্ষ্য কেবলমাত্র ভার্সাই সন্ধির জার্মানীর প্রতি অবিচারমূলক শর্তগুলিকে পরিবর্তন করা ছিল না। ঐতিহাসিক সাক্ষ্য প্রমাণ হতে এটা স্পষ্ট হয়

যে, হিটলারের বৈদেশিক নীতির প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল ভার্সাই সন্ধি ভেঙে জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং সামরিক দিক থেকে শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত করা। তারপর পূর্ব ইওরোপে জার্মান সাম্রাজ্য স্থাপন করা।[১] উইনষ্টন চার্চিল তাঁর গ্যাদারিং ষ্টর্ম (Gathering Storm) গ্রন্থে বলেছেন যে, হিটলারের লক্ষ্য ছিল ইওরোপে জার্মান আধিপত্য স্থাপন এবং ইওরোপের প্রধান শক্তিগুলিকে ধ্বংস করা। কাজেই হিটলার ইওরোপের শান্তি ও স্থিতাবস্থাকে ভেঙে যুদ্ধের পথ প্রস্তুত করেন।

হিটলারের আগ্রাসী নীতি

এই উদ্দেশ্যে তিনি বিশ্ব নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন বর্জন করেন। হিটলার জার্মানীর এমন বিরাট অস্ত্রসজ্জা করেন যে, ইওরোপের যে কোন শক্তি জার্মানীর তুলনায় নগণ্য ছিল। তিনি সেন্ট জার্মেইন সন্ধি ভেঙে অষ্ট্রিয়াকে জার্মানীর সঙ্গে সংযুক্ত করেন। পূর্ব ইওরোপে রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে তিনি চেকোস্লোভাকিয়া অধিকার করেন। অবশেষে তিনি ১৯৩৯ খ্রীঃ পোল্যান্ড আক্রমণ করেন। সুতরাং নাৎসী আগ্রাসনের ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয় এতে সন্দেহ নেই।

হিটলার কর্তৃক আন্তর্জাতিক চুক্তি ভঙ্গ

হিটলার তাঁর কূটনীতির দ্বারা ইওরোপের প্রধান বিরোধী শক্তিগুলিকে বিভ্রান্ত ও বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন। এজন্য তাঁর কূটনীতিকে 'পাশবিক' (Brutal diplomacy) আখ্যা দেওয়া হয়। তিনি যখন কোন দেশের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করতেন তিনি মনে মনে জানতেন যে, দরকার হলে এই সন্ধি তিনি ভেঙে ফেলবেন। ফলে অপর স্বাক্ষরকারী তাঁর ওপর আস্থা স্থাপন করে বিপদগ্রস্ত হত। উদাহরণস্বরূপ পোল-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি, মিউনিখ্ চুক্তি ও রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তির কথা বলা যায়। এই চুক্তিগুলি হিটলার সম্পাদন করেন। পরে সুবিধাজনক সময়ে সন্ধিগুলি ভেঙে ফেলেন। দ্বিতীয়তঃ, তাঁর সম্ভাব্য শত্রুরাষ্ট্রগুলি যাতে জার্মানীর বিরুদ্ধে জোট বাঁধতে না পারে এজন্য তিনি কূটনীতির দ্বারা তাদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলতেন। তিনি রুশ সাম্যবাদের প্রতি তীব্র বিরোধিতা দেখিয়ে কমিউনিষ্ট বিদ্রোহের ভয়ে ভীত ইংলন্ডকে নিজ পক্ষে আনেন, পরে তিনি ইংলন্ড ও ফ্রান্সকেই আক্রমণ করেন। তিনি রুশ-জার্মান চুক্তির দ্বারা রাশিয়াকে নিরপেক্ষ রাখেন। ১৯৪১ খ্রীঃ পশ্চিমের যুদ্ধ শেষ হলে, তিনি রাশিয়াকে আক্রমণ করেন। এইভাবে তাঁর মারাত্মক কূটনীতির দ্বারা হিটলার ইওরোপের শক্তিসাম্য ধ্বংস করেন।

হিটলারের কূটনীতি : শক্তিসাম্য ধ্বংস

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধার জন্যে ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেইনের জার্মান তোষণ নীতি কম দায়ী ছিল না। ব্রিটেনের টোরী মন্ত্রীসভা মনে করত যে, রুশ সাম্যবাদের লাল বন্যাকে রোধ করার জন্যে নাৎসী জার্মানীকে ব্যবহার করা দরকার। জার্মানী দুর্বল হয়ে ভেঙে পড়লে পূর্ব ইওরোপ থেকে রুশী সাম্যবাদ অবাধে জার্মানীর পথে পশ্চিমে ঢুকে পড়বে। এর ফলে পশ্চিমের বুর্জোয়া গণতন্ত্রগুলি ধ্বংস হতে পারে। সুতরাং চেম্বারলেইন জার্মান তোষণ নীতির দ্বারা ভার্সাই সন্ধির বিরুদ্ধে জার্মানীর ন্যায্য জাতীয়তাবাদী দাবীগুলি পূরণের নীতি নেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি নাৎসী জার্মানীর শক্তি ও অস্ত্র বৃদ্ধিতে বাধা দেয়নি। নাৎসী জার্মানী ভার্সাই সন্ধি ভেঙে একের পর এক রাজ্য দখল করলে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেইন নিশ্চেষ্ট থাকেন। জার্মান-বিরোধী জোট গঠনের জন্যে ইংলন্ডের সঙ্গে সহযোগিতার প্রস্তাব সোভিয়েত ইউনিয়ন দিলে চেম্বারলেইন তা নাকচ করেন। অবশেষে সুদেতেন অঞ্চলে জার্মানীর যুদ্ধের হুমকির বিরুদ্ধে ফ্রান্স ও সোভিয়েত রাশিয়া যুক্ত বাধা দানের চেষ্টা করলে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী তা ব্যাহত করেন। তিনি মিউনিখ্ চুক্তির দ্বারা জার্মানীকে সুদেতেন অঞ্চল ছেড়ে দেন। এই তোষণ নীতি নাৎসী জার্মানীকে সাহসী এবং আত্মম্ভরী করে তোলে। চার্চিল

ব্রিটেনের তোষণ নীতি

১· A. J. P. Taylor—Origins of Second World War.

এবং বহু ঐতিহাসিক মনে করেন যে, ১৯৩৬ খ্রীঃ হিটলার রাইনল্যান্ড দখল করলে, সন্ধি ভাঙার জন্যে যদি এই সময় ফ্রাঙ্কো-ব্রিটিশ শক্তি জার্মানীকে আক্রমণ করে শাস্তি দিত, তবে পরে জার্মানী এত বাড়াবাড়ি করতে সাহস পেত না। কারণ তখনও পর্যন্ত জার্মানী অস্ত্রবলে বলীয়ান ছিল না। অন্ততঃপক্ষে ১৯৩৮ খ্রীঃ চার্চিলের দাবী অনুযায়ী ত্রিশক্তি (ব্রিটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়া) একযোগে সুদেতেন জেলা উপলক্ষে জার্মানীকে আঘাত করলে ফল ভাল হত। কিন্তু নেভিল চেম্বারলেইনের জার্মান তোষণ নীতিই জার্মানীকে আগ্রাসী হতে সাহস যোগায়।

ব্রিটিশ সরকার তাঁর বাণিজ্যিক ও সাম্রাজ্যের স্বার্থের জন্যে লীগের আদর্শকে অগ্রাহ্য করে জাপান, ইতালীকেও তোষণ করে। জাপান ১৯৩১ খ্রীঃ মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করলে, জাপানের দ্বারা দূর প্রাচ্যে রুশ শক্তি জব্দ হবে, এই বিশ্বাসে ব্রিটেন নিশ্চেষ্ট থাকে। ব্রিটেনের আশা ছিল যে, জাপানকে মাঞ্চুরিয়া দখল করতে দিলে, দূর প্রাচ্যে ব্রিটিশ উপনিবেশে জাপান হস্তক্ষেপ করবে না। ইতালী ১৯৩৫ খ্রীঃ আবিসিনীয়া আক্রমণ করলে ফ্রাঙ্কো-ব্রিটিশ শক্তি ইতালীর আগ্রাসনকে পরোক্ষ সমর্থন জানায়। ইতালীর বিরুদ্ধে লীগের শাস্তিমূলক ব্যবস্থাকে অকার্যকরী করে ব্রিটেন ও ফ্রান্স হোর-লাভাল গোপন চুক্তির দ্বারা আবিসিনীয়া ব্যবচ্ছেদ দ্বারা ইতালীর সাম্রাজ্যবাদকে প্রশমিত করার কলঙ্কজনক চেষ্টা করে। লীগের দ্বারা অনুষ্ঠিত অর্থনৈতিক অবরোধ যাতে ইতালীর বিরুদ্ধে কার্যকরী না হয় এজন্য ব্রিটেনের চাপে তৈল বা পেট্রলকে নিষিদ্ধ বস্তুর তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়। এইভাবে ব্রিটেন তোষণ নীতির দ্বারা অক্ষশক্তির সাম্রাজ্যবাদী ক্ষুধাকে বাড়ায়। ব্রিটেনের আশা ছিল যে, এর ফলে ব্রিটিশ বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য রক্ষা পাবে। কিন্তু ১৯৩৯ খ্রীঃ ব্রিটেনের নীতির ভ্রান্ত দিক প্রকট হয়ে ওঠে।

ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থরক্ষা

ফ্যাসিষ্ট ইতালীর আগ্রাসন নীতি এবং পূর্ব এশিয়ায় জাপানের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বিশ্বশান্তিকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। ইতালীর দ্বারা আবিসিনীয়া আক্রমণ, স্পেনের গৃহযুদ্ধে হস্তক্ষেপ এবং আলবেনিয়া অধিকার আন্তর্জাতিক শান্তিকে বিঘ্নিত করে। জাপান কর্তৃক ১৯৩১ খ্রীঃ মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ এবং ১৯৩৬ খ্রীঃ দ্বিতীয়বার চীন আক্রমণ এশিয়ার শান্তিকে ধ্বংস করে। এই দেশগুলির আগ্রাসনের পথ ধরে নাৎসী জার্মানী ব্যাপক আকারে আগ্রাসন আরম্ভ করে। জাপান, জার্মানী ও ইতালী অক্ষশক্তি জোট গড়ে পরস্পরের সহায়তায় সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন চালায়। অক্ষশক্তির তিন সদস্যই ছিল ১৯১৯ এর শান্তি চুক্তির প্রতি বিক্ষুব্ধ। অক্ষশক্তি গঠনের উদ্দেশ্যই ছিল বিশ্বের শক্তিসাম্যকে ভেঙে এই তিন শক্তির অনুকূলে আনার ব্যবস্থা করা। রোম-বার্লিন-টোকিও অক্ষচুক্তি গঠিত হলে বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা প্রবল হয়ে ওঠে।

ইতালী ও জাপানের আগ্রাসন নীতি

ইওরোপের দুই শিবিরে বিভক্তি

সোভিয়েত ইউনিয়ন নাৎসী আগ্রাসনের ফলে ইওরোপে দারুণ অনিশ্চয়তা লক্ষ্য করে ইঙ্গ-ফরাসী শক্তির সঙ্গে সহযোগিতা দ্বারা ১৯৩৩-৩৮ খ্রীঃ নাৎসী আক্রমণ রোধ করার চেষ্টা করে। কিন্তু সোভিয়েত নেতারা ১৯১৯ খ্রীঃ বিশ্ব বিপ্লবের যে হুমকি দেন তা বুর্জোয়াপন্থী দেশগুলির ভীতি সৃষ্টি করে। এর ফলে ইঙ্গ-ফরাসী শক্তি সোভিয়েত সহযোগিতার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। অবশেষে ১৯৩৯ খ্রীঃ পোল্যান্ড উপলক্ষে জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধ আসন্ন হলে ইংলন্ড সোভিয়েত সহযোগিতা লাভের জন্যে চেষ্টা করে। কিন্তু ইংলন্ডের প্রস্তাবের আন্তরিকতায় সন্দিহান হয়ে রুশ নেতারা নাৎসী জার্মানীর সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদন করেন। পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলি ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে পারস্পরিক আস্থার অভাব নাৎসী জার্মানীকে আগ্রাসন নীতি গ্রহণে সুযোগ দেয়। জার্মানীর বিরুদ্ধে জোট গঠনের ব্যর্থতার জন্যে পশ্চিমী রাজনীতিজ্ঞরা প্রধানতঃ দায়ী হলেও,

সোভিয়েত নীতির বিফলতা, রুশ-জার্মান চুক্তি

সোভিয়েত নেতারাও দায়ী ছিলেন। রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তির দ্বারা হিটলার রাশিয়া থেকে ইঙ্গ-ফরাসী শক্তিকে বিচ্ছিন্ন করে 'একের পর এক' নীতি (One by One policy) অনুসরণ করেন। যদি সোভিয়েত নেতারা ১৯৩৯ খ্রীঃ একটু ধৈর্য দেখাতেন তবে ১৯৩৯ খ্রীঃ গ্রান্ড এ্যালায়েন্স বা জার্মানীর বিরুদ্ধে মহাজোট গড়া যেত। যদি ব্রিটিশ সরকার রাশিয়ার প্রতি মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহার করতেন তবে রুশ নেতাদের আস্থা বাড়ত।

সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের সংঘাত

আসলে সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে অনিবার্য করে তোলে। ভার্সাই ও অন্যান্য সন্ধির দ্বারা ইঙ্গ-ফরাসী শক্তিগুলি নিজ নিজ সাম্রাজ্য ও বাণিজ্যকে বৃদ্ধি করে বিশ্বে তাদের নিজ নিজ আধিপত্য রক্ষা করে। ব্রিটিশ শিল্পপতিরা উপনিবেশের বাজার থেকে মুনাফা লুঠতে ব্যস্ত থাকে। জার্মানীর ন্যায় একটি শিল্প ও কারিগরী দক্ষতা সম্পন্ন জাতি ভার্সাই সন্ধির নাগপাশে বাঁধা থাকবে এই আশা ছিল অবাস্তব। সুতরাং জার্মানীর শক্তি বাড়লে ইঙ্গ-ফরাসী বাণিজ্য ও উপনিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা ছিল। জার্মানী আপাততঃ ভার্সাই সন্ধি ভেঙে পূর্ব ইওরোপে সাম্রাজ্য বিস্তারের নীতি নেয়। জার্মানীর এই কাজও ইঙ্গ-ফরাসী শক্তির সন্দেহের উদ্রেক করে। এদিকে জাপান দেখে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ওয়াশিংটন চুক্তির দ্বারা (১৯২১ খ্রীঃ) চীনে তার ২১ দফা দাবীকে নস্যাৎ করে চীনে মার্কিন বাণিজ্য কায়েম করছে। ব্রিটেন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তার অবাধ বাণিজ্য চালাচ্ছে। জাপানের ন্যায় শিল্পে সমৃদ্ধ এবং সামরিক জাতি এটা সহ্য করতে প্রস্তুত ছিল না। ফলে জাপান সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের নীতি নেয়। এই কারণে বিশ্বযুদ্ধ বাধে। এই সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনকে প্রতিহত করার মত শক্তি জাতিসঙ্ঘ বা লীগ অব নেশনসের ছিল না।

গণতন্ত্র বনাম একনায়কতন্ত্র : সমাজতন্ত্র বনাম একনায়কতন্ত্র

বিংশ শতকের ত্রিশের দশকে বিশ্ব অনেকগুলি আদর্শগত শিবিরে বিভক্ত হয়। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিরোধের সঙ্গে আদর্শগত বিরোধ বিশ্বযুদ্ধকে অনিবার্য করে তোলে। পশ্চিমী গণতন্ত্রগুলি পার্লামেন্টারী শাসনে আস্থাশীল ছিল। কিন্তু তাদের অর্থনীতি ছিল বুর্জোয়া ঘেঁসা। সমাজতান্ত্রিক সংস্কার দ্বারা ব্যক্তিগত মালিকানা লোপ করার তারা পক্ষপাতী ছিল না। এদিকে সোভিয়েত রাশিয়া ছিল মার্কসীয়-লেনিনীয় সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী। মালিকের মুনাফা ও সম্পত্তির অধিকারে তারা বিশ্বাস করত না। এজন্য পশ্চিমী গণতন্ত্রগুলি ছিল সোভিয়েত রাশিয়ার ওপর ক্ষিপ্ত। অপরদিকে নাৎসী ও ফ্যাসিষ্ট আদর্শ অনুসারে একদলীয় একনায়কতন্ত্রই ছিল শ্রেষ্ঠ। গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক ভাবধারাকে তারা ঘৃণা করত। এদিকে ইওরোপের বাইরে, ভারতবর্ষে, চীনে উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম আরম্ভ হয়। এইভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে বিশ্ব অনেকগুলি আদর্শগত শিবিরে বিভক্ত হয়।

উপসংহারে বলা যায় যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ তীব্র। প্রধান মতগুলি হল সংক্ষেপে নিম্নরূপ : (১) ভার্সাই সন্ধির মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীজ লুকিয়েছিল। জার্মানী এই সন্ধির অন্যায় শর্তগুলি পরিবর্তনের উদ্যোগ নিলে বিরোধ ও যুদ্ধ দেখা দেয়। এ· জে· পি· টেইলারের মতে, জার্মানীর ন্যায্য দাবীগুলি পূরণ করে জার্মানীকে ১৯১৮ খ্রীঃ মার্চের সীমান্ত ফিরিয়ে দিলে হিটলার সন্তুষ্ট হতেন। (২) অপর একটি মত হল যে, চেম্বারলেইনের জার্মান তোষণ নীতিই আসলে যুদ্ধের জন্যে দায়ী ছিল। যদি ১৯৩৯ খ্রীঃ ফ্রান্স ও ব্রিটেন জার্মানীকে বাধা দিত তবে হিটলার দমে যেতেন। (৩) এ· জে· পি· টেইলারের মতে, হিটলার ইওরোপে প্রভুত্ব চাননি। তাঁর অনেকগুলি দাবী ছিল ন্যায্য। (৪) চতুর্থ একটি মত হল যে, যদি ব্রিটেন ও ফ্রান্স কমিউনিষ্ট রাশিয়াকে দূরে না রেখে মিত্র হিসেবে নিতেন তবে ত্রিশক্তি আঁতাতের চাপে হিটলার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নামার সাহস পেতেন না। (৫) তবে বেশীরভাগ ঐতিহাসিক মনে করেন যে, হিটলারই ছিলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্যে দায়ী। উপরোক্ত সকল কারণগুলির সমন্বয়েই বিশ্বযুদ্ধ ঘটে।

চতুর্দশ অধ্যায়
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঃ যুদ্ধোত্তর শান্তি চুক্তি ঃ ঠাণ্ডা লড়াই
(World War II : Post War Complications about Peace Treaties : Cold War)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিবরণ (Outlines of the World War II) ঃ ১৯৩৯ খ্রীঃ ১লা সেপ্টেম্বর নাৎসী বাহিনী পোল্যান্ড আক্রমণ করায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত হয়। পোল্যান্ড আক্রমণ করার জন্যে ৩রা সেপ্টেম্বর ব্রিটেন ও ফ্রান্স, জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অক্ষশক্তির পক্ষে প্রধান পক্ষ ছিল নাৎসী জার্মানী, ফ্যাসিষ্ট ইতালী ও জাপান। এই যুদ্ধে গোড়ার দিকে অক্ষশক্তির প্রধান প্রতিপক্ষ ছিল ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মিত্রশক্তি। পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অন্যতম প্রধান হিসেবে ১৯৪১ খ্রীঃ মিত্রশক্তির পক্ষে যোগ দেয়। ১৯৪১ খ্রীঃ জার্মানী, সোভিয়েত রাশিয়ার নিরপেক্ষতা অগ্রাহ্য করে রাশিয়া আক্রমণ করলে, সোভিয়েত রাশিয়াও মিত্রশক্তির অন্তর্ভুক্ত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ স্থল, জল, অন্তরীক্ষ সব ক্ষেত্রে তীব্রভাবে চলে। ইওরোপ, উত্তর আফ্রিকা এবং দূর প্রাচ্যের রণাঙ্গনে এই যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া সমুদ্রের বুকে ভুমধ্যসাগর, আটলান্টিক মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরে বহু নৌযুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যুদ্ধমান শক্তিগুলি

১৯৩৯ খ্রীঃ ১লা সেপ্টেম্বর পোল্যান্ডের পশ্চিম সীমান্ত পথে পোল্যান্ডের উত্তর ও দক্ষিণ দুই দিক দিয়া জার্মান বাহিনী সাঁড়াশী আক্রমণ চালায়। জার্মানীর মোটর ও ট্যাঙ্ক বাহিত স্থল বাহিনী, দূরপাল্লার কামান ও বিমান বাহিনীর আক্রমণে পুরাতন ধরনের অস্ত্রে-সজ্জিত অশ্বারোহী পোল বাহিনী পরাস্ত হয়ে পূর্ব পোল্যান্ডে পিছু হঠে যায়। কিন্তু ১৭ই সেপ্টেম্বর রুশ বাহিনী অকস্মাৎ পূর্ব পোল্যান্ড আক্রমণ করে। রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তির শর্তে জার্মানী, পোল্যান্ডের কিছু অংশ রাশিয়াকে দিতে স্বীকৃতি দেয়। সেই কারণে রাশিয়া পূর্ব পোল্যান্ড আক্রমণ করে অধিকার করে। অবশ্য রাশিয়া প্রকাশ্যে এই আক্রমণের কারণ হিসেবে জানায় যে, জার্মান আক্রমণ থেকে রুশ সীমান্ত সংলগ্ন পূর্ব পোল্যান্ডকে রক্ষার জন্যেই রাশিয়ার নিরাপত্তার স্বার্থে এই আক্রমণ করা হয়। পূর্ব ও পশ্চিমে আক্রান্ত হলে পোল্যান্ডের পতন ঘটে। পোল সরকার ইংলন্ডে আশ্রয় নিয়ে নির্বাসিত পোল সরকার চালাতে থাকে। জার্মান অধিকৃত পোল্যান্ডে জার্মানদের বিরুদ্ধে পোল জাতীয়তাবাদীদের গুপ্ত প্রতিরোধ তীব্রভাবে চলতে থাকে।

পোল্যান্ড আক্রমণ ঃ জার্মান ও রুশ আক্রমণে পোল্যান্ডের পতন

পোল্যান্ডের পতনের পর সোভিয়েত রাশিয়া সম্ভাব্য জার্মান আক্রমণ থেকে তার সীমান্তকে দৃঢ় করার উদ্দেশ্যে তিন বাল্টিক রাজ্য—এস্থোনিয়া, ল্যাটভিয়া ও লিথুয়ানিয়ার ওপর তার নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করে। পরে ফিনল্যান্ডকে রাশিয়া তার আধিপত্য ও সামরিক নিয়ন্ত্রণ মানতে আহ্বান জানায়। ফিনল্যান্ড এতে রাজী না হলে রাশিয়া ফিনল্যান্ড আক্রমণ করে অধিকার করে।

রাশিয়া কর্তৃক বাল্টিক রাজ্যগুলি ও ফিনল্যান্ড অধিকার

জার্মানী কর্তৃক পোল্যান্ড আক্রমণ কাল থেকে (সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ খ্রীঃ ১৯৪০ খ্রীঃ)- ফ্রান্স আক্রমণ পর্যন্ত ইঙ্গ-ফরাসী মিত্রশক্তি জার্মানীর বিরুদ্ধে কাগজ কলমে যুদ্ধ ঘোষণা করলেও হাতে-কলমে কোন যুদ্ধে লিপ্ত হয়নি। পশ্চিম রণাঙ্গণে

ফ্রাঙ্কো-জার্মান সীমান্ত বরাবর উভয় পক্ষে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুতি চালালেও কোনও আক্রমণ হয়নি। এজন্য এই যুদ্ধকে উইনষ্টন চার্চিল তাঁর Gathering Storm গ্রন্থে Phony War বা ভুতুড়ে যুদ্ধ আখ্যা দিয়েছেন। তবে এই সময়ে সমুদ্রবক্ষে জার্মান ইউবোট বা ডুবো জাহাজের ব্যাপক আক্রমণে বহু ব্রিটিশ বাণিজ্য জাহাজের সলিল সমাধি হয়। বিখ্যাত ব্রিটিশ যুদ্ধ জাহাজ কারেজার্স (H. M. S. Courageours) এবং রয়্যাল ওক (H. M. S. Royal Oak) এই সময় জার্মান সাবমেরিনের আক্রমণে ডুবে যায়।

ভুতুড়ে যুদ্ধ বা Phony war

পোল্যান্ডের পতনের পর নাৎসী জার্মানী উত্তর ইওরোপের স্ক্যান্ডিনেভিয়ার দেশগুলিকে অধিকারের পরিকল্পনা করে। জার্মান সমর বিভাগ এই পরিকল্পনার নাম দেয়—"Weserbung"। উত্তর ইওরোপে ডেনমার্ক ও নরওয়ে আক্রমণের পশ্চাতে জার্মানীর সামরিক লক্ষ্য ছিল নিম্নরূপ : (১) এই দুই দেশের বন্দর থেকে ডুবো জাহাজ দ্বারা উত্তর সমুদ্র ও টেমস নদীর মোহানায় ব্রিটিশ জাহাজ চলাচল ও বাণিজ্যকে ধ্বংস করা। (২) নরওয়ের বন্দর থেকে উত্তর আটলান্টিকে নৌ-অভিযান পরিচালনা। (৩) মার্কিন দেশ থেকে ব্রিটেনে যুদ্ধাস্ত্র আমদানী বন্ধ করা। (৪) নরওয়ে ও ডেনমার্কের খাদ্যসম্ভার জার্মানীর স্বার্থে ব্যবহার করা।

স্ক্যান্ডিনেভিয়া আক্রমণ

১৯৪০ খ্রীঃ ৯ই জুলাই জার্মান যান্ত্রিক বাহিনী বা প্যানৎসার বাহিনী ডেন সীমান্ত পার হয়ে ঝড়ের বেগে রাজধানী কোপেনহেগেনে ঢুকে পড়ে। রাজা ক্রিশ্চিয়ান বাধাদান নিস্ফল দেখে জনসাধারণকে জার্মান আধিপত্য সাময়িকভাবে মেনে নিতে পরামর্শ দেন। এদিকে নাৎসী সমর্থক নরওয়ের দেশদ্রোহীরা নরওয়ের দেশদ্রোহী সেনাপতি মেজর কুইসলিং-এর নেতৃত্বে নরওয়ের বন্দর ও বিমানক্ষেত্রগুলি দখল করে। জার্মান বাহিনী আকাশ পথে প্যারাশুট দ্বারা এবং সমুদ্র পথে নরওয়ের উপকূলে নেমে পঞ্চম বাহিনী বা কুইসলিং-এর লোকেদের সাহায্যে নরওয়ে দখল করে নেয়। ব্রিটিশ নৌ-বহর এত বিলম্বে নরওয়ে রক্ষার জন্যে আসে যে, তখন তাদের পক্ষে আর কিছু করণীয় ছিল না।

ডেনমার্ক ও নরওয়ের পতন

নরওয়ে ও সুইডেনে জার্মান আধিপত্য স্থাপিত হলে ইঙ্গ-ফরাসী সরকারের নিস্ক্রিয়তা তীব্রভাবে সমালোচিত হয়। ফ্রান্সে দালাদিয়ের মন্ত্রীসভার পতন ঘটে এবং পল রেনো (Paul Reynaud) প্রধানমন্ত্রীর পদে বসেন। ব্রিটেনে চেম্বারলেইন পার্লামেন্টে ধিকৃত হন এবং তাঁর প্রতি অনাস্থা দেখান হয়। চেম্বারলেইন পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। উইনষ্টন চার্চিলের নেতৃত্বে জাতীয় বা সর্বদলীয় মন্ত্রীসভা গঠিত হয় এবং যুদ্ধ পরিচালনায় নতুন উদ্যম দেখা যায়।

ব্রিটেনে চেম্বারলেইন মন্ত্রীসভার পতন চার্চিলের উত্থান

এদিকে হিটলার উত্তর ইওরোপে আধিপত্য স্থাপনের পর পশ্চিমে মুখ ফেরান। যদিও হিটলার ১৯৩৭ খ্রীঃ বেলজিয়াম ও হল্যান্ডের নিরপেক্ষতা রক্ষার জন্যে প্রতিশ্রুতি দেন, তাঁর স্বভাবসিদ্ধ কপটতা অনুসারে ১৯৪০ খ্রীঃ তিনি সেই প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হন। ফ্রান্সকে ধ্বংস করার জন্যে বেলজিয়াম ও হল্যান্ডের পথে ফ্রান্সে প্রবেশ করা তাঁর পক্ষে আবশ্যক হয়। কারণ ফ্রাঙ্কো-জার্মান সীমান্তে আত্মরক্ষার জন্যে ফ্রান্স ম্যাজিনো লাইন নামে এক দুর্ভেদ্য ব্যূহ তৈরি করেছিল। এখন ফ্রাঙ্কো-বেলজিয়াম সীমান্তে কোন ফরাসী ব্যূহ না থাকায় এই পথে জার্মান বাহিনীর পক্ষে ফ্রান্সে ঢুকে পড়া সহজ ছিল।

নেদারল্যান্ডস আক্রমণের সূচনা

বেলজিয়াম ও নেদারল্যান্ডে নাৎসী বাহিনী ব্লিৎসক্রীগ বা ঝটিকা আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণে জার্মান বাহিনী যে গতিশীলতা ও নিখুঁত সামরিক পরিকল্পনার পরিচয় দেয় তা সমগ্র

বিশ্বকে স্তম্ভিত করে। ১০ই মে, ১৯৪০ খ্রীঃ নাৎসী বাহিনী বেলজিয়াম, লাক্সেমবার্গ ও হল্যান্ড এই তিন দেশকে একযোগে আক্রমণ করে। লাক্সেমবার্গের সামরিক শক্তি তেমন কিছু না থাকায় তার দ্রুত পতন ঘটে। নেদারল্যান্ড বা হল্যান্ডে হাজারে হাজারে জার্মান ছত্রী বাহিনী বিমান থেকে ঝাঁপ দিয়ে ডাচ বন্দর, রেল জংশন ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি অধিকার করে। এর ফলে ডাচ্ বাহিনীর যোগাযোগ ব্যবস্থা ও যাতায়াত রুদ্ধ হয়। এই সুযোগে জার্মান যান্ত্রিক বাহিনী কামানে, বিমানে ও ট্যাঙ্কের সাহায্যে হল্যান্ডের অধিকাংশ স্থান অধিকার করে। তিন দিনের মধ্যে হল্যান্ডের পতন ঘটে। রানী উইলহেলমিনা ইংলন্ডে আশ্রয় নেন।

ব্লিৎসক্রীয় : হল্যান্ডের পতন

বেলজিয়াম অবশ্য তীব্র বাধা দেয়। বেলজিয়ামের বাহিনী আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত ছিল। বেলজিয়ামে ব্রিটিশ বাহিনী নেমে পড়ে। কিন্তু জার্মান সেনাপতিদের পরিকল্পনার সামনে ব্রিটিশ ও বেলজিয়ান বাহিনী এঁটে উঠতে অপারগ হয়। দুই সপ্তাহের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর নাৎসী দল ব্রাসেলস, আন্তওয়ার্প প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ নগর অধিকার করলে বেলজিয়ামের পতন ঘটে। ২৮শে মে রাজা লিওপোল্ড আর বৃথা বাধা না দিয়ে বেলজিয়ান সেনাদের আত্মসমর্পণের আদেশ দেন। ব্রিটিশ ও বেলজিয়ান বাহিনী ডান দিকে পিছু হঠে।

বেলজিয়ামের পতন

বেলজিয়ামের যুদ্ধ চলার সময়েই জার্মান বাহিনী ফরাসী সীমান্ত পার হয়ে ফ্রান্স আক্রমণ করে। ফরাসী সেনাপতি ওয়েগাঁ আশা করেছিলেন যে, জার্মান বাহিনী ফ্রান্সের পূর্ব সীমান্তে ম্যাজিনো লাইনে প্রতিহত হবে। কিন্তু জার্মান সেনাপতি মণ্ডলীর রণপরিকল্পনা এমন উচ্চমানের ছিল যে, সেনাপতি ওয়েগাঁর আশা নির্মূল হয়ে যায়। ফ্রান্সের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল ছিল নদী-নালা ও জলা-জঙ্গলে পূর্ণ। এই অঞ্চলে জার্মান ট্যাঙ্ক বাহিনী চলাচল করতে অপারগ হবে একথা ভেবে, এই অঞ্চল রক্ষার জন্যে কোন প্রতিরোধ গড়া হয়নি। জার্মান ইঞ্জিনিয়ারগণ ফ্রান্সের নদী ও খালগুলির ওপর অস্থায়ী পুল তৈরির সাজ-সরঞ্জাম আগে থেকেই প্রস্তুত করে। এর সাহায্যে দক্ষিণ ফ্রান্সের নদী ও খাল অঞ্চল দিয়ে জার্মান ট্যাঙ্ক ও যান্ত্রিক বাহিনী বা প্যানৎসার ফ্রান্সের ভেতর ঢুকে পড়ে। এই বাহিনী আড়া-আড়ি ফ্রান্স পার হয়ে ইংলিশ চ্যানেলের উপকূলে এ্যাবেভিল বন্দরে উপস্থিত হয়। এদিকে অপর একটি জার্মান বাহিনী বর্শার ফলার মত ম্যাজিনো লাইনে আঘাত করে তা বিদীর্ণ করে। ফ্রান্সের বৃহত্তর সেনাদল এই বাহিনীকে বাধা দিতে ব্যস্ত থাকে। অপর দিকে বেলজিয়াম সীমান্ত অরক্ষিত থাকায় এই স্থান দিয়ে একটি তৃতীয় জার্মান বাহিনী উত্তর ফ্রান্সে ঢুকে, এ্যাবেভিলে অবস্থিত অগ্রবর্তী জার্মান বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্যে ছুটে যায়। এ্যাবেভিলে অবস্থিত বাহিনী এবং বেলজিয়াম সীমান্ত দিয়া ঢুকে পড়া বাহিনী ছিল জার্মান সমরযন্ত্রের সাঁড়াশীর দুই বাহু। এই দুই বাহু যুক্ত হলে ফরাসী, ইংরাজ ও অন্যান্য মিত্র বাহিনী ফ্রান্সের ভূমিতে বেষ্টিত হত এবং আত্মসমর্পণে বাধ্য হত।

ফ্রান্স আক্রমণ ও জার্মানীর বেষ্টন নীতি

মিত্রশক্তির সেনাপতিরা বিপদ বুঝে এবং ফ্রান্সে আর বাধাদান নিস্ফল দেখে ইংলিশ চ্যানেলের ডানকার্ক বন্দরের দিকে সেনাদলকে দ্রুত পিছু হঠিয়ে নেন। জার্মান সাঁড়াশী আক্রমণ থেকে বাহিনীকে রক্ষার জন্যে ডানকার্ক হতে জাহাজ যোগে সেনাদলকে ইংলিশ চ্যানেল পার করে ইংলন্ডে আনার চেষ্টা করা হয়। যদি এই বাহিনীকে রক্ষা করে ইংলন্ডে না আনা যেত তবে ইঙ্গ-ফরাসী বাহিনীর প্রধান অংশ জার্মানীর হাতে বন্দী হত এবং মিত্রশক্তির পক্ষে আর যুদ্ধ চালান সম্ভব হত না। সুতরাং জার্মান বোমারু বিমানের গোলা, জার্মান কামানের আক্রমণ উপেক্ষা করে ৬ দিনের মধ্যে ইঙ্গ-ফরাসী নৌ-বাহিনী ও বাণিজ্য জাহাজ

ফ্রান্সের পতন : ডানকার্কের অপসারণ ইতালীর যুদ্ধ ঘোষণা

৩,৩০,০০০ ইঙ্গ-ফরাসী-বেলজীয় সেনাকে ইংলিশ চ্যানেল পার করে ইংলন্ডে সরিয়ে আনে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল ডানকার্কের অপসারণকে "আশ্চর্যজনক-নিস্কৃতি" (A miracle of deliverence) বলে অভিহিত করেন। ফ্রান্সের বৃহত্তর ভাগ জার্মান সেনা অধিকার করে। ফ্রান্সের অবশিষ্ট অংশে জার্মানীর তাঁবেদার ভিসি সরকার স্থাপিত হয়। ফ্রান্সের পতনের ফলে সমগ্র বিশ্ব চমকিত হয়। আপাতদৃষ্টিতে সকলেই মনে করে যে, ইওরোপের জার্মানীর পদানত হতে আর দেরী নেই। ইতিমধ্যে ফ্রান্সের পতন আসন্ন দেখে জার্মানীর মিত্র ফ্যাসিষ্ট ইতালী মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং এর ফলে নাৎসী জার্মানীর হাত আরও মজবুত হয়। ছয় সপ্তাহের মধ্যে হল্যান্ড, বেলজিয়াম ও ফ্রান্সকে পরাস্ত করে জার্মানী তার অসাধারণ পরিচালনা শক্তি ও পরিকল্পনা রূপায়ণের ক্ষমতার পরিচয় দেয়।

জার্মান নায়ক ফ্যুয়েরার অতঃপর আশা করেন যে, এই ব্যাপক পরাজয় ও হতাশাজনক পরিস্থিতির ফলে ব্রিটেন স্ব-ইচ্ছায় জার্মানীর সঙ্গে শান্তি স্থাপনের প্রস্তাব দেবে। কিন্তু ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন যে, ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের স্বাধীনতার যুদ্ধ এখন ব্রিটেন থেকেই চলবে। ব্রিটেন শেষ রক্তবিন্দু দ্বারা জার্মানীর প্রতিরোধ করবে। ইংলন্ডের জনসাধারণও তাদের পিতৃভূমিকে শেষ রক্তবিন্দু দ্বারা রক্ষার পণ করে। এদিকে জার্মান প্রচার সচিব ডঃ গোয়েবলস জার্মান সেনাদের আশ্বাস দিয়ে বলেন যে—"আর একটি মাত্র যুদ্ধে জার্মানীর জয় হলেই শান্তির ঘণ্টা বাজতে শুরু করবে।"

যুদ্ধ পরিচালনায় ব্রিটেনের পণ

যেহেতু ব্রিটিশ নৌ-বাহিনী ইংলিশ চ্যানেলে তাদের আধিপত্য দ্বারা ইংলন্ডের উপকূলকে জার্মান আক্রমণ থেকে রক্ষা করে, সেহেতু জার্মান সেনার পক্ষে ইংলন্ডের উপকূলে অবতরণ করা সম্ভব হয়নি। ইংলন্ডের নৌবহর জার্মানীর স্থলসেনার দ্বারা ব্রিটেন আক্রমণের আশাকে নির্মূল করে দেয়। এর ফলে আকাশ পথে বিমান হানা দ্বারা ইংলন্ডকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার রণনীতি জার্মানী গ্রহণ করে। ৮ই আগষ্ট, ১৯৪০ খ্রীঃ থেকে ইংলন্ডের ওপর জার্মানীর ঐতিহাসিক বোমা বর্ষণ আরম্ভ হয়। শত শত জার্মান বোমারু বিমান লন্ডন নগরসহ, ব্রিটেনের ডক, কল-কারখানা, রেলজংশন, সেনাছাউনি প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বোমা বর্ষণ করে। ১৫ই আগষ্ট ১৯৪০ খ্রীঃ, ১০০০ জার্মান বোমারু বিমান ব্রিটেনে আক্রমণ চালায়। প্রথমে দিনের বেলায় তারপরে ব্রিটিশ বিমান বিধ্বংসী কামান ও যোদ্ধ বিমানের বাধা এড়াতে রাত্রিকালে বোমা বর্ষণ চলে। কিন্তু ব্রিটেন গোড়ার দিকে বিমান হানায় খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হলেও শীঘ্রই বিমান আক্রমণের প্রতিরোধ তৈরি করে। ব্রিটিশ বিমান বিধ্বংসী কামান ও ব্রিটিশ জঙ্গী বিমানের পাল্টা আক্রমণে আগষ্ট থেকে অক্টোবরের মধ্যে জার্মানীর ২৩৭৫টি বিমান ধ্বংস হয়। এদিকে ব্রিটিশ রাজকীয় বিমান বহর R. A. F. জার্মানীতে পাল্টা বোমা বর্ষণ আরম্ভ করে। ২৫শে আগষ্ট, ১৯৪০ খ্রীঃ বার্লিনের ওপর প্রথম ব্রিটিশ বিমান হানা চালান হয়। খোদ জার্মানীর ওপর বিমান হানার ফলে জার্মানদের মনোবল ভাঙতে থাকে। ক্রমে R. A. F. বা ব্রিটিশ রাজকীয় বিমান বহর জার্মানীর শিল্পাঞ্চল রূঢ় জেলা, লোহার কারখানা, রেলজংশন, কোলন নগর প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি বিমান আক্রমণে ধ্বংস করে। ব্রিটেনের বিমান হানাব ফলে জার্মানীর প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতি হয়। R. A. F. দ্বারা জার্মানীর ওপর প্রবল বিমান আক্রমণের ফলে হিটলার ব্রিটেনে বিমান আক্রমণ ধীরে ধীরে কমিয়ে দেন। ব্রিটেনের যুদ্ধে (Battle of Britain) জার্মানী জয়লাভে অসমর্থ হয়।

ব্রিটেনের যুদ্ধ ঃ জার্মানীর বিফলতা

ইওরোপের স্থল ও আকাশ পথে যখন জার্মানীর সঙ্গে মিত্রশক্তির মরণপণ যুদ্ধ চলে, সেই সময় সমুদ্রপথে এবং ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণে উত্তর আফ্রিকাতেও যুদ্ধের ক্ষেত্র প্রসারিত হয়। আটলান্টিক মহাসাগর ও ভূমধ্যসাগরের বুকে ব্রিটিশ ও ব্রিটেনে পণ্য বহনকারী মার্কিন জাহাজগুলি জার্মান সাবমেরিনের তীব্র আক্রমণের

আটলান্টিক নৌযুদ্ধ

কবলে পড়ে। উত্তর ফ্রান্স ও নরওয়ের ঘাঁটি থেকে জার্মান ডুবো জাহাজগুলি সহজে আক্রমণ চালায় এবং টেমস নদীর মোহানায় মাইন পাতে। ১৯৪১ খ্রীঃ মার্চ মাসে এক সপ্তাহে জার্মানী মিত্র শক্তির ২৯টি বাণিজ্য ও যুদ্ধ জাহাজ ডুবিয়ে দেয়। এই অবস্থায় ব্রিটেনকে সাহায্যের জন্যে মার্কিন বাণিজ্য জাহাজ পাঠান হয়।

এদিকে ফ্যাসিষ্ট ইতালী ব্রিটেন ও ফ্রান্সের বিপর্যয়ের সুযোগে উত্তর আফ্রিকায় অবস্থিত ইঙ্গ-ফরাসী উপনিবেশগুলি অধিকার করার চেষ্টা চালায়। এই উদ্দেশ্যে ইতালীয় বাহিনী প্রধান সেনাপতি মার্শাল গ্রাৎসিয়ানীর পরিকল্পনা অনুযায়ী দুই দিক দিয়ে উত্তর আফ্রিকায় আক্রমণ চালায়। একটি বাহিনী পূর্ব আফ্রিকা থেকে উত্তর দিকে এগোয়; অপর বাহিনী লিবিয়া থেকে মিশরের দিকে এগোতে থাকে। দুই বাহিনী সংযুক্ত হয়ে উত্তর আফ্রিকা থেকে সর্বপ্রথম ব্রিটিশ শক্তিকে উতখাৎ করার চেষ্টা করে। মিশরমুখী ইতালীয় বাহিনীকে সিদ্দি বরাণীতে ইংরাজ সেনাপতি লর্ড ওয়াভেল কিছুকাল আটকে দেন। এই সুযোগে ভারত থেকে রাজপুত ও জাঠ সেনা আসলে লর্ড ওয়াভেলের ক্ষমতা বাড়ে। লর্ড ওয়াভেল পাল্টা আক্রমণ দ্বারা মিশর এবং বেন-গাজী অধিকার করেন। বেন-গাজীর যুদ্ধে ১৪০,০০০ ইতালীয় সেনা ও প্রধান সেনাপতি মার্শাল গ্রাৎসিয়ানী ব্রিটেনের হাতে বন্দী হন। আফ্রিকার যুদ্ধে ইতালী চূড়ান্ত পরাজয়ের সম্মুখীন হয়।

উত্তর আফ্রিকায় ইতালীর পরাজয়

এই অবস্থায় ইতালীকে পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষার জন্যে হিটলার তাঁর কনিষ্ঠতম ফিল্ড মার্শাল ও যান্ত্রিক যুদ্ধে বিশারদ রোমেলকে আফ্রিকায় পাঠান। রোমেল ছিলেন অসাধারণ রণনিপুণ সেনাপতি। ইংরাজরা তাঁকে "মরুভূমির শৃগাল" (Desert Fox) আখ্যা দেয়। রোমেল ইতালীয় রণ-পরিকল্পনার স্থলে নিজস্ব রণ-পরিকল্পনা রচনা করেন। দশ দিনের মধ্যে তিনি পাল্টা আক্রমণে ইংরাজদের মিশর ছাড়তে বাধ্য করেন এবং বিখ্যাত ব্রিটিশ ঘাঁটি তোব্রুক (Tbruk) অধিকার করেন। ইংরাজ সেনাপতি ফিল্ড মার্শাল মণ্টগোমারী এল-আলমিনে সমুদ্রে পিঠ রেখে পরিখার আড়ালে কোন রকমে জমিতে পা রাখেন।

উত্তর আফ্রিকার যুদ্ধে জার্মান সেনাপতি রোমেলের ভূমিকা

ইতিমধ্যে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী আফ্রিকার যুদ্ধকে বিশেষ গুরুত্ব দিযে সেনা, রসদ এবং অস্ত্র মণ্টগোমারীর সাহায্যে পাঠান। এল-আলমিনে ব্রিটিশ বাহিনী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সেরা কামানের লড়াই দ্বারা জার্মান বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। রোমেল স্বদেশ থেকে সাহায্যের অভাবে পিছু হঠতে বাধ্য হন। ইতিমধ্যে মার্কিন বাহিনী সেনাপতি প্যাটনের ও ব্রাড়লীর নেতৃত্বে ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেয়। ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর পাল্টা আক্রমণে উত্তর আফ্রিকা অক্ষশক্তির হাতছাড়া হয়। মিত্র বাহিনী ফরাসী, উত্তর আফ্রিকাও অধিকার করে নেয়।

রোমেলের পরাজয় ঃ উত্তর আফ্রিকায় মিত্র শক্তির জয়

১৯৪১ খ্রীঃ মার্চ মাসে জার্মানী বলকান উপদ্বীপের দিকে দৃষ্টি দেয়। বলকান থেকে জার্মান সেনার খাদ্য ও রসদ সরবরাহ এবং পূর্ব ইওরোপে জার্মান উপনিবেশ স্থাপন ছিল হিটলারের লক্ষ্য। প্রথমে বুলগেরিয়ার ওপর জার্মানী এক বশ্যতামূলক মিত্রতা চুক্তি চাপিয়ে দেয়। জার্মান বাহিনী বুলগেরিয়া অধিকার করে। যুগোশ্লাভিয়া জার্মানির বশ্যতা চুক্তি গ্রহণে রাজী না হলে জার্মান সেনা আকাশ ও স্থলপথে ঝটিকা আক্রমণ বা ব্লিৎসক্রীগ দ্বারা যুগোশ্লাভিয়া দখল করে। রুমানিয়াও জার্মানীর দ্বারা অধিকৃত হয়। অতঃপর জার্মান প্যানৎসার বা যান্ত্রিক বাহিনী গ্রীসে ঢুকে পড়ে। স্বদেশপ্রেমিক গ্রীকরা তীব্র বাধা দিয়ে পরাস্ত হয়। ২৬শে এপ্রিল জার্মান বাহিনী গ্রীসের রাজধানী এথেন্স অধিকার করে। এইভাবে সমগ্র বলকান অঞ্চল জার্মানীর পদানত হয়।

জার্মানীর বলকানে অনুপ্রবেশ

রুমানিয়া ও বলকানে জার্মান আক্রমণের ফলে বোঝা যায় যে, জার্মানী-সোভিয়েত রাশিয়ার সীমান্তের দিকে এগোচ্ছে। যখন ব্রিটেনের যুদ্ধ চলছিল তখনই হিটলার রাশিয়া আক্রমণের খসড়া পরিকল্পনা তৈরি করেন। এই পরিকল্পনার মূল কথা ছিল সর্বাধিক কম সময়ের মধ্যে রাশিয়ার যুদ্ধ শেষ করা। কারণ নেপোলিয়ন রাশিয়ার যুদ্ধকে দীর্ঘায়িত করে যে মারাত্মক ভুল করেন, হিটলার সেই সম্ভাবনা এড়িয়ে চলার নীতি নেন। রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি (১৯৩৯ খ্রীঃ) ভেঙে কেন হিটলার রাশিয়া আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন তা এই স্থানে বিশদ আলোচনার অবকাশ নেই। সংক্ষেপে বলা যায় যে,—(১) রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তির প্রতি জার্মান নেতা হিটলার একনিষ্ঠ ছিলেন না। তাঁর নিকট এই চুক্তি ছিল একটি কৌশলগত বিষয় মাত্র। ঐতিহাসিক এ্যালান বুলকের মতে, "One by one tactics অর্থাৎ রাশিয়াকে এই চুক্তির দ্বারা নিরপেক্ষ রেখে প্রথমে পশ্চিমী শক্তিগুলিকে ধ্বংস এবং পরে রাশিয়াকে ধ্বংস করা এই One by one নীতিকে সার্থক করার জন্যেই হিটলার এই চুক্তি করেন। ১৯৪১ খ্রীঃ পশ্চিমের যুদ্ধ শেষ হলে তিনি স্বভাবতই রাশিয়ার দিকে দৃষ্টি দেন। (২) ব্রিটেনের যুদ্ধে জার্মানীর বিমান বহরের নিদারুণ ক্ষতি ঘটলে হিটলার আশঙ্কা করেন যে, এই সুযোগে রাশিয়া জার্মানীকে পূর্ব দিক থেকে আক্রমণ করবে। রাশিয়ার বিরাট লোকবলের কথা হিটলার জানতেন। সুতরাং এই সম্ভাবনাকে রোধ করার জন্যে তিনি আগুয়ান হয়ে রাশিয়া আক্রমণ করেন। (৩) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গোড়ার দিকে জার্মানীকে প্রভূত খাদ্য ও রসদ রাশিয়া সরবরাহ দেয়। রাশিয়া দূর প্রাচ্য থেকে রবার, টিন, নিকেল সাইবেরিয়ার পথে এনে জার্মানীকে সরবরাহ করে। কিন্তু পশ্চিম ইওরোপে ফ্রান্সের পতনের পর রুশ নেতারা জার্মানীর সামরিক শক্তি সম্পর্কে আতঙ্ক বোধ করেন। এই সকল সরবরাহ বন্ধ করা হয়। এজন্য জার্মানী ক্রুদ্ধ হয়। (৪) সোভিয়েত সরকার দার্দানালিস প্রণালীর ওপর রুশ নৌ আধিপত্য দাবী করলে জার্মানী আপত্তি জানায়। (৫) জে· এফ· কেনান নামক লেখকের মতে, রুশ-জার্মান মতবিরোধের মূল কারণ ছিল রুমানিয়া, তিন বাল্টিক রাজ্য সম্পর্কে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে মতপার্থক্য। রাশিয়ার উত্তরোত্তর শক্তি বৃদ্ধি জার্মানীর আশঙ্কা বাড়ায়। হিটলার এই আশঙ্কা করেন যে, রাশিয়া শেষ পর্যন্ত জার্মানীকে আক্রমণ করবে। আক্রান্ত হওয়া অপেক্ষা আক্রমণ করাকেই তিনি সুবিধাজনক নীতি মনে করেন। ঐতিহাসিক এ্যালান বুলকের মতে, হিটলার পূর্ব ইওরোপে জার্মান আধিপত্য স্থাপনকে তাঁর বিশেষ নীতি হিসেবে নেন। পূর্ব ইওরোপে জার্মানীর আধিপত্য স্থাপনের পথে রাশিয়া প্রধান বাধা ছিল।

জার্মানীর রাশিয়া আক্রমণের কারণ

২২শে জুন, ১৯৪১ খ্রীঃ ভোর ৪টায় নেপোলিয়ন যেই দিন রাশিয়া আক্রমণ করেন, ঠিক সেই দিনেই হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করেন। রুশ অধিকৃত পোল্যান্ড দখল করার পর, জার্মান বাহিনী কার্জন লাইন ভেঙে ১৭ই জুলাই স্মোলেনস্ক শহরে উপনীত হয়। জার্মান সেনা লেনিনগ্রাডকে তাদের কামানের পাল্লায় ধরে ফেলে এবং দক্ষিণে কিয়েভ ও ওডেসা বন্দর অধিকার করে। কিন্তু আগষ্ট মাস থেকে রাশিয়ার প্রতিরোধের তীব্রতা বাড়লে জার্মানীর অগ্রগতি মন্দীভূত হয়। তথাপি ৫ মাসের যুদ্ধে জার্মান বাহিনী রাশিয়ার ৬,১৪,০০০ বর্গ মাইল স্থান অধিকার করে। ইতিমধ্যে রুশ সেনাপতি মার্শাল জুকভ যুদ্ধের দায়িত্ব নিলে রুশ সেনার মনে নব আশার মুকুল জেগে ওঠে। তারা নব বলে বলীয়ান হয়ে জার্মান বাহিনীকে বাধা দেয়। গেরিলা হানায় জার্মান সরবরাহ ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে। জার্মানী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রাশিয়া জয়ে ব্যর্থ হলে তার সমগ্র পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যায়। রাশিয়ায় জার্মানীর পরাজয়ের পথ প্রস্তুত হয়।

রুশ-জার্মান যুদ্ধ

জার্মানী রাশিয়াতে তার চূড়ান্ত পরাজয়ের আগে শেষবারের মত উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করে। এইবার জার্মান সেনাপতিরা পরিকল্পনা করে যে, ভল্গা ও ককেসাস অঞ্চল ধরে আক্রমণ

চালালে রাশিয়া সাবাড় হয়ে যাবে। ১৯৪১-৪২ খ্রীঃ বসন্তকালে এই দ্বিতীয় আক্রমণের সূচনা হয়। এই অঞ্চল থেকে রাশিয়ার খাদ্য, খনিজ দ্রব্য ও শিল্পদ্রব্য সরবরাহ হত। সুতরাং এই অঞ্চল ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। জার্মান বাহিনী ডন উপত্যকায় রোষ্টোভ দখলের পর, একটি শাখা ককেসাস ও কৃষ্ণ সাগরের দিকে ছুটে চলে। অপর শাখা ভল্গার উপত্যকায় স্ট্যালিনগ্রাড অধিকারের চেষ্টা করে। রুশ বাহিনী স্ট্যালিনগ্রাড রক্ষার জন্যে মরণপণ সংগ্রামে রত হয়। প্রতি গৃহ, প্রতি রাস্তায়, রুশ সেনা গণপ্রতিরোধ চালাতে থাকে। জার্মান বাহিনীও জেদের সঙ্গে শহর দখলের জন্যে চেষ্টা চালায়। এই সময় রুশ সেনাপতি মার্শাল জুকভ তার একটি বাহিনীর দ্বারা স্ট্যালিনগ্রাডের ১৪ ডিভিসন জার্মান সেনাকে ঘিরে ফেলেন। জার্মানরা প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করেও রুশ ব্যূহ ভেদ করতে অসমর্থ হয়। স্ট্যালিনগ্রাডে জার্মান বাহিনীর পতন ঘটে। রুশ আক্রমণে ৩,৩৮,০০০ জার্মান সেনার মাত্র ৮০ হাজার জীবিত ছিল। ৮০ হাজার সেনা ও ১৬ জন জার্মান সেনাপতি স্ট্যালিনগ্রাডে রুশদের হাতে বন্দী হয়; বাকি সকলে নিহত হন।

জার্মানীর দ্বিতীয় রুশ অভিযান

স্ট্যালিনগ্রাডের যুদ্ধ

স্ট্যালিনগ্রাডের জয়ের পর রুশ বাহিনী নবীন উদ্যমে পাল্টা আঘাত হানে। খারকোভ, রোষ্টোভ রাশিয়ার হস্তগত হয়। জার্মানীতে লোকবলের অভাব বশতঃ বাধাদান সম্ভব হয়নি। রুশ সেনা জার্মানদের ঠেলে নিয়ে পোল্যান্ডের পথে জার্মানীর সীমান্তের দিকে ছুটে চলে।

রাশিয়ার পাল্টা আক্রমণ

১৯৪৩ খ্রীঃ হতে যুদ্ধের গতি অক্ষ শক্তির প্রতিকূলে যায়। ইতালী উত্তর আফ্রিকার যুদ্ধে পরাজিত হলে মিত্রশক্তি ভূমধ্যসাগর পার হয়ে ইতালী আক্রমণের পরিকল্পনা করে। ১৯৪৩ খ্রীঃ জুলাই মাসে মিত্রশক্তির নৌ-বহর সিসিলী দ্বীপ অধিকার করে। মিত্রশক্তির আগমনে নিপীড়িত ইতালীয় জনসাধারণ ফ্যাসিষ্ট সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ নীতি নেয়। হিটলার ইতালী রক্ষার জন্যে জার্মান সেনা পাঠালে মিত্রশক্তিকে ইতালী জয়ের জন্যে প্রচুর রক্তক্ষয় করতে হয়। মিত্রবাহিনী নৌ-বহরের সাহায্যে দক্ষিণ ইতালীতে জার্মান প্রতিরোধ এড়িয়ে উত্তর ইতালীতে অবতরণ করে। অবশেষে জার্মান সেনার বাধা চূর্ণ করে ১৯৪৩ খ্রীঃ শেষ দিকে রোম অধিকার করে। জনসাধারণ মুসোলিনী ও তাঁর উপপত্নী ক্লারা পেত্রাচ্চিকে ফাঁসীতে হত্যা করে। মিত্রবাহিনী এই দুটি মৃতদেহ রোমে এনে সমাহিত করে।

মিত্রশক্তির ইতালী অভিযান : মুসোলিনীর পতন : ইতালী অধিকার

ষ্ট্যালিন, রুজভেল্ট ও চার্চিলের মধ্যে চুক্তি হয় যে, রাশিয়ার ওপর জার্মানীর চাপ হ্রাস করার জন্যে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি ফ্রান্সে জার্মানীর বিরুদ্ধে একটি দ্বিতীয় রণাঙ্গন খুলবে। দীর্ঘদিন অপেক্ষার পর রুশ বাহিনী জার্মান আক্রমণের বিপদ কাটিয়ে পাল্টা আক্রমণ আরম্ভ করলে এই দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৪৪ খ্রীঃ ৫ই জুন ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী ইংলন্ড থেকে ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে, ফ্রান্সের নর্মান্ডি উপকূলে নেমে পড়ে। অঙ্কের মত নির্ভুল হিসেবে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী জার্মান উপকূল রক্ষী কামান, মাইনক্ষেত্র ও বাহিনীর বাধা পার হয়ে ফ্রান্সের মাটি দখল করে। ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি জার্মান বাহিনীর পিছনে ১০০০ ছত্রীবাহিনী নামিয়ে দেয়। এরা জার্মান বাহিনীর পিছনের যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংস করে এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি অধিকার করে। প্রায় ৪ হাজার জাহাজ মিত্রশক্তির সেনাদের ইংলিশ চ্যানেল পার করে।

ফ্রান্সে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির অবতরণ : দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টি

ডানকার্কের পরাজয়ের পর ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী পুনরায় ফ্রান্সে নামলে জার্মানদের মনোবল ভেঙে পড়ে। তথাপি হিটলারের নির্দেশে জার্মান সেনা প্রতি ইঞ্চি জমির জন্যে লড়তে থাকে। কিন্তু সেনা সংখ্যা, অস্ত্রবল ও বিমান বলে মিত্রশক্তি জার্মান বাহিনী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হওয়ায় জার্মানীর বাধাদান নিষ্ফল হয়। ফ্রান্সের তুলোঁ, মার্সাই, নিস, লায়নস একে একে মিত্র বাহিনী অধিকার করে নেয়। তারা

ফ্রান্সে মিত্রবাহিনীর অগ্রগতি : প্যারিসের মুক্তি

জার্মান সেনাকে পূর্বদিকে জার্মান সীমান্তের দিকে ঠেলে দেয়। প্যারিস অধিকারকারী জার্মান বাহিনী হিটলারের নির্দেশ অনুযায়ী এই ঐতিহাসিক নগরকে ধ্বংস না করে আত্মসমর্পণ করে।

অতঃপর ইঙ্গ-মার্কিন মিত্র বাহিনী দুইভাগে ভাগ হয়ে, এক অংশ মার্কিন বাহিনী সেনাপতি প্যাটনের নেতৃত্বে জার্মান সীমান্তের দিকে ছুটে চলে। অপর ভাগ অর্থাৎ ব্রিটিশ ও কানাডীয় বাহিনী বেলজিয়াম থেকে জার্মানদের হঠিয়ে দেয়। ৬ই সেপ্টেম্বর মার্কিন সেনাপতি আইসেনহাওয়ার জার্মানীর সিগ্‌ফ্রিড্ লাইনের সম্মুখীন হন। এই সময় জার্মানীর প্রবীণ সেনাপতি ফিল্ডমার্শাল রুণড্স্টেড এক তীব্র পাল্টা আক্রমণ দ্বারা মিত্রবাহিনীকে ৫০ মাইল পিছু হঠিয়ে দেন। ইঙ্গ-মার্কিন মিত্রবাহিনী মিউজ নদী বরাবর পিঠ রেখে আত্মরক্ষা করে। জার্মানীর এই প্রতি-আক্রমণের নাম ছিল "বুলগের যুদ্ধ" (Battle of Bulge)। পশ্চিম রণাঙ্গনে জার্মান সামরিক শৌর্যের এই যুদ্ধই ছিল শেষ সঙ্গীত। এর পর জার্মান শক্তি দ্রুত ভেঙে পড়ে।

বুলগের যুদ্ধ ঃ মিত্রবাহিনীর সাময়িক পশ্চাদপসরণ

ইঙ্গ-মার্কিন মিত্রবাহিনী মিউজ উপত্যকা থেকে প্রতি আক্রমণ দ্বারা পুনরায় জার্মান বাহিনীকে বিতাড়িত করে এবং দ্রুত জার্মানীর ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করে। পশ্চিম রণাঙ্গনে ৮টি স্থানে একযোগে আক্রমণ দ্বারা সিগ্‌ফ্রিড লাইন ভেঙে ফেলা হয়। এর ফলে মিত্রবাহিনীর সম্মুখে বার্লিনের রাস্তা খুলে যায়। অপরদিকে রুশী লালফৌজ পোল্যান্ড পার হয়ে বার্লিনের উদ্দেশ্যে আগাতে থাকে। দুই দিক থেকে আক্রান্ত হয়ে জার্মান বাহিনী সাঁড়াশীর চাপে পিষ্ট হয়ে যায়। ১৩ই এপ্রিল লালফৌজ ভিয়েনা অধিকার করে, বার্লিনের দিকে মুখ ফেরায় এবং দ্রুত ছুটতে থাকে।

মিত্রবাহিনী ও লালফৌজের যুগপৎ আক্রমণ

এখন প্রশ্ন দেখা দেয় যে, কোন বাহিনী আগে বার্লিনের দখল নিবে। জার্মান সমর দপ্তর থেকে প্রস্তাব দেওয়া হয় যে, যদি ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী ইচ্ছা করে তবে রুশদের হাত থেকে বার্লিনকে বাঁচাবার জন্যে জার্মান কর্তৃপক্ষ বিনাযুদ্ধে মিত্রবাহিনীকে বার্লিন ছেড়ে দেবে। কিন্তু মার্কিন রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হওয়ার আশঙ্কায় এই প্রস্তাব নাকচ করেন। ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী বার্লিনে প্রবেশ না করে এলব নদী বরাবর দাঁড়িয়ে যায়। কারণ ভূতপূর্ব মার্কিন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট ইয়াল্টা বৈঠকে ষ্ট্যালিনকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, রুশ সেনাদলকেই বার্লিন ঢোকার অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। চার্চিল অবশ্য ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর প্রধান সেনাপতি আইসেনহাওয়ারকে বার্লিন দখলের পরামর্শ দেন। কিন্তু ট্রুম্যানের নির্দেশে এবং রুশ সহকারী প্রধান সেনাপতির প্রতিবাদে আইসেনহাওয়ার বার্লিন অধিকারে বিরত থাকেন। লালফৌজ বার্লিন দখল করলে জার্মানীর পতন হয়।

রুশ লালফৌজের বার্লিন অধিকার ঃ জার্মানীর পতন

দূর প্রাচ্যের যুদ্ধ (The War in the Far East) ঃ ওয়াশিংটন বৈঠকে (১৯২১ খ্রীঃ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন চুক্তির দ্বারা জাপানের সাম্রাজ্যবাদকে ছেঁটে ফেলে। পঞ্চশক্তি চুক্তির দ্বারা জাপানের নৌশক্তিকে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ করা হয়। জাপানকে ইঙ্গ-জাপান মিত্রতা চুক্তি খারিজ করতে বাধ্য করে মিত্রহীন করা হয়। জাপান চীনের ওপর যে একুশ দফা দাবী চাপায় তা নাকচ হয়ে যায়। মার্কিন বাণিজ্যের স্বার্থে জাপানকে Open Door বা খোলা দ্বার বাণিজ্য নীতি মানতে বাধ্য করা হয়। তদবধি জাপান মনে করতে থাকে যে, দূরপ্রাচ্যে তার ক্ষমতা বিস্তারের পথে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি প্রধান বাধা-স্বরূপ। এই দুই শক্তি পূর্বে হাওয়াই দ্বীপে পার্ল হারবারে মার্কিন নৌঘাটি এবং পশ্চিমে মালয়ের সিঙ্গাপুরে ব্রিটিশ নৌঘাটি স্থাপন করে

জাপ-মার্কিন সম্পর্কের অবনতির কারণ ঃ ওয়াশিংটন চুক্তি

জাপানকে দুই দিক থেকে সাঁড়াশীর বাহুর মত চেপে ধরে। জাপান ১৯৩১ খ্রীঃ মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করে এবং ১৯৩৬ খ্রীঃ দ্বিতীয় চীন-জাপান যুদ্ধ দ্বারা তার হৃতক্ষমতা পুনরুদ্ধারের কাজে হাত দেয়।

ইওরোপে রোম-বার্লিন অক্ষচুক্তির দ্বারা ফ্যাসিষ্ট ইতালী ও নাৎসী জার্মানী ইঙ্গ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হলে জাপান এই জোটে যোগ দিয়ে রোম-বার্লিন-টোকিও অক্ষ জোট গঠন করে। ১৯৩৯-১৯৪১ খ্রীঃ পর্যন্ত জাপান ইওরোপে যুদ্ধের গতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে এবং এই সঙ্গে তার নিজের সামরিক প্রস্তুতি দ্রুত বাড়াতে থাকে। জাপানকে স্থির করতে হয় যে, জাপান মঙ্গোলিয়া সাইবেরিয়ার পথে রাশিয়া আক্রমণ করবে অথবা রাশিয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে দূর প্রাচ্যে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিকে আক্রমণ করবে। বাস্তববাদী জাপান বুঝতে পারে যে, ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিই জাপানের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী এবং রাশিয়ার সঙ্গে জাপানের স্বার্থগত বিরোধ এখনই বিশেষ তীব্র নয়। এদিকে ষ্ট্যালিন রাশিয়ার ওপর আসন্ন জার্মান আক্রমণের আশঙ্কায় ছিলেন। তিনি হিসেব করেন যে, জার্মানীর মিত্র হিসেবে জাপান যদি পূর্ব দিক থেকে রাশিয়া আক্রমণ করে, তবে পশ্চিমে জার্মানী ও পূর্বে জাপানের আক্রমণে রাশিয়া বিধ্বস্ত হবে। সুতরাং তিনি জাপানের সঙ্গে জাপ-রুশ অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করেন। জাপানও হিসেব করে দেখে যে, ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে জাপানকে সফল হতে হলে রুশ সীমান্তে নিরপেক্ষতা রাখা দরকার। এজন্য জাপান রাশিয়ার সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করে।

জাপানের অক্ষশক্তি জোটে যোগদান : রুশ-জাপান অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর

১৯৪১ খ্রীঃ, ৭ই ডিসেম্বর ভোর ৭-৫৫তে ৪৬টি জাপানি যুদ্ধ ও বিমানবাহী জাহাজের বহর হাওয়াই দ্বীপে মার্কিন নৌঘাঁটি পার্লহারবার অকস্মাৎ আক্রমণ করে। মার্কিন সেনাপতিরা এই আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত না থাকায়, প্রশান্ত মহাসাগরে, মার্কিন নৌবহর, এই আক্রমণে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়। দূরপ্রাচ্যে জাপানকে বাধাদানের ক্ষমতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে ফেলে। পার্লহারবার ধ্বংসের পরদিন ৮ই ডিসেম্বর, ১৯৪১ খ্রীঃ জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজো সরকারিভাবে আমেরিকা ও তার মিত্রশক্তিগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন।

পার্লহারবার আক্রমণ

আমেরিকার আশঙ্কা ছিল যে, পার্লহারবারে পতনের পর জাপানী নৌ-বহর অরক্ষিত মার্কিন পূর্ব উপকূলে সরাসরি আক্রমণ চালাবে। কিন্তু বাস্তববাদী জাপানী সেনাপতি আমেরিকার দিক হতে মুখ ফিরিয়ে গুয়াম, ওয়েক, মিডওয়ে ও ফিলিপিনে মার্কিন ঘাঁটিগুলি ধ্বংস করেন। গুয়াম ও ওয়েক দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করে জাপান দূর প্রাচ্যে মার্কিন নৌঘাঁটি স্থাপনের আপাতঃ সম্ভাবনা করে।

গুয়াম ও ওয়েক দ্বীপপুঞ্জ অধিকার

জাপানের মূল বাহিনী জলে ও স্থলে, এবং অপর বাহিনী বিমানের সহায়তায় চীনের দক্ষিণে ফরাসী উপনিবেশ ইন্দো-চীন বা ভিয়েৎনাম অধিকার করে। জাপানী নৌ-বহর চীনের দক্ষিণে ব্রিটিশ অধিকৃত নৌবন্দর হংকং অধিকার করে। হংকং-এর পতনের পর জাপানী সেনা উত্তর দিক থেকে স্থলপথে এবং দক্ষিণে সমুদ্র পথে ব্রিটিশ উপনিবেশ মালয় আক্রমণ করে অধিকার করে। মালয়ের বিখ্যাত রবার বাগিচাগুলি জাপানের হাতে চলে যায়। ব্রিটিশ নৌ-বাহিনীর সেরা যুদ্ধজাহাজ প্রিন্স অফ ওয়েলস ও সহকারী ক্রুজার রিপালস জাপানী নৌ-বাহিনীকে প্রবল বাধা দিলে, আত্মঘাতী দুর্ধর্ষ জাপানী বোমারু বিমান চালকদের আক্রমণে দুটি জাহাজ ধ্বংস হয়। এই দুই জাহাজের ধ্বংসের ফলে মালয়ে বিখ্যাত ব্রিটিশ নৌঘাঁটি সিঙ্গাপুর বিপন্ন হয়ে পড়ে। ১৯৪২ খ্রীঃ ১৫ই ফেব্রুয়ারী জাপানী সেনা সিঙ্গাপুরে নেমে পড়ে। সিঙ্গাপুর থেকে শ্বেতাঙ্গ সেনাদের অপসারণ করা হলেও, ব্রিটিশ ভারতীয় সেনারা জাপানীদের হাতে বন্দী হয়। সিঙ্গাপুরের

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অভিযান : ইন্দোচীন, মালয়, সিঙ্গাপুর অধিকার

পতনের ফলে গোটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দরজা জাপানের নিকট খুলে যায়।

সিঙ্গাপুর দখলের পর জাপানী বাহিনী ডাচ উপনিবেশ পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ অর্থাৎ মার্তামান উপসাগর পার হয়ে সুমাত্রা, জাভা, বালি প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করে। মিত্রশক্তির নৌ-বহর বাধা দিলেও তা বিধ্বস্ত হয়। ডাচ সেনাদল প্রবল বাধাদানের পর আত্মসমর্পণ করে। জাপানী সেনাদলের অপর শাখা মালয় থেকে ব্রহ্মদেশে ঢুকে পড়ে। ব্রহ্মদেশ থেকে ব্রিটিশ সেনাকে ভারতের মাটিতে পিছিয়ে আনা হয়। ৮ই মার্চ, ১৯৪২ খ্রীঃ জাপান ব্রহ্মের রাজধানী রেঙ্গুন অধিকার করে। জাপানের সমর্থিত ও অস্ত্রসজ্জিত আজাদ হিন্দ বাহিনী নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নির্দেশে ব্রহ্ম সীমান্ত থেকে ভারতের মুক্তিযুদ্ধের জন্যে ভারতের মণিপুর ও আসাম সীমান্তে আক্রমণ চালায়।

পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও ব্রহ্মদেশ অধিকার ঃ ব্রিটিশ শক্তির বিপর্যয়

প্রশান্ত মহাসাগরের অপর প্রান্তে ফিলিপিনে জাপানী বাহিনী ম্যানিলা এবং মার্কিন নৌ-ঘাঁটি ক্যাভাইট অধিকার করে। মার্কিন সেনাপতি ম্যাক আর্থার বাতান উপদ্বীপে আত্মরক্ষা করেন। এইভাবে পশ্চিমে ভারত সীমান্ত থেকে পূর্বে ফিলিপিন পর্যন্ত বিরাট অঞ্চল জাপানের কুক্ষিগত হয়।

ফিলিপিন অধিকার

ইওরোপের যুদ্ধে জার্মানী দুর্বল হয়ে পড়ার পরই মিত্রশক্তি জাপানের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক পাল্টা আক্রমণের প্রস্তুতি আরম্ভ করে। চার্চিল ঘোষণা করেন যে—গাছের কাণ্ড কেটে দিলে যেমন শাখা-প্রশাখা শুকিয়ে যায় ইওরোপে নাৎসী শক্তির পতন হলে অন্যান্য অক্ষ শক্তির পতন ত্বরান্বিত হবে। ১৯৪২ খ্রীঃ মে মাসে কোর‍্যাল সির (Coral Sea) নৌ-যুদ্ধে জাপান প্রথম পরাজয়ের স্বাদ অনুভব করে। ১৯৪৩ খ্রীঃ গুয়াদালক্যানাল ও বিসমার্ক সমুদ্রের যুদ্ধে মার্কিন নৌবহরের আক্রমণে জাপানের প্রভূত ক্ষয়ক্ষতি হয়। ঐ বছরের জুলাই মাসে রক্তাক্ত যুদ্ধে মার্কিন নৌ-সেনা সলোমোন দ্বীপপুঞ্জ ও গিলবার্ট দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করে।

জাপানের বিরুদ্ধে মিত্র শক্তির পাল্টা আক্রমণ ঃ কোর‍্যাল সী, গুয়াদাল ক্যানালের যুদ্ধ

১৯৪৪ খ্রীঃ থেকে জাপানকে পূর্বদিকে জেঃ ম্যাক আর্থারের নেতৃত্বে এবং পশ্চিম দিকে লর্ড লুইস মাউন্টব্যাটেনের নেতৃত্বে দুই কম্যান্ড দ্বারা আক্রমণের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৪৪ খ্রীঃ জাপানের বিখ্যাত নৌ-ঘাঁটি মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ মার্কিন নৌ-সেনাপতি এ্যাডমিরাল নিমিৎস আক্রমণ করেন। ৮ হাজার জাপানী সেনা রক্তাক্ত যুদ্ধের পর বন্দী হয় ও ২০ দিন অবিশ্রান্ত যুদ্ধের পর গুয়াম দ্বীপপুঞ্জ মার্কিন সেনা অধিকার করে। একই বছর অক্টোবর মাসে আমেরিকা ফিলিপিন অধিকার করে।

মার্শাল ও গুয়াম দ্বীপপুঞ্জ আমেরিকার পুনর্দখল

অতঃপর মিত্রশক্তি জাপানের মূল ভূখণ্ডের ওপর আক্রমণ চালাবার পরিকল্পনা করে। জাপান তার আত্মরক্ষার জন্যে সমুদ্র পথে যে বলয় রচনা করেছিল তা ১৯৪৪ খ্রীঃ নাগাদ মিত্রশক্তি কিভাবে ভেঙে ফেলে তা আগে বলা হয়েছে। জাপানের সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী ঘাঁটি হিসেবে ওকিনেওয়া দ্বীপকে বেছে নেওয়া হয়। এ পর্যন্ত মিত্রশক্তির বোমারু বিমানের পাল্লার মধ্যে জাপান না থাকায়, জাপানে কোন বিমান আক্রমণ চালান সম্ভব হয়নি। ওকিনেওয়া অধিকার করলে এই স্থান থেকে জাপানে বিমান হানা চালান সহজ হবে বলে ভাবা হয়। জাপানের শহরগুলিতে আগুনে বোমা নিক্ষেপ করলে জাপানের জনসাধারণের কাঠের তৈরি ঘরগুলি দগ্ধ করা সহজ হবে বলে মনে করা হয়।

ওকিনেওয়া অধিকারের পরিকল্পনা

ওকিনেওয়া দ্বীপটি ছিল ৬০ মাইল লম্বা ও ২—২০ মাইল চওড়া। ৭০ হাজার জাপানী সেনা, ৫০০ কামান দ্বারা দ্বীপটিকে রক্ষার ব্যবস্থা করা ছিল। মার্কিন নৌ-বহর থেকে প্রচণ্ড গোলা বর্ষণের পর ১৪০০ জাহাজে বাহিত হয়ে প্রায় ১ লক্ষ মিত্র সৈন্য ওকিনেওয়ায় নেমে পড়ে (১লা এপ্রিল, ১৯৪৫ খ্রীঃ)। তিন মাস অবিশ্রান্ত যুদ্ধের পর ৭২৮৩ মার্কিন সেনাকে বলি দিয়ে এই দ্বীপ অধিকার করা সম্ভব হয়। প্রায় সকল জাপানী সেনা মৃত্যু পর্যন্ত লড়াই করে দ্বীপটি রক্ষার চেষ্টা করে। ওকিনেওয়া দ্বীপে জাপানী সেনার প্রতিরোধের চেহারা মার্কিন সরকারকে এই বিশ্বাসে স্থিত করে যে, হাতাহাতি যুদ্ধে জাপান দখল করতে হলে যে লোকবলের দরকার আমেরিকার তা নেই। সুতরাং মার্কিন সরকার জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকি বন্দরে দুটি আনবিক বোমা ফেলার পর, জাপান আর বাধাদান নিস্ফল দেখে আত্মসমর্পণ করে। এইভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়।

ওকিনেওয়াব যুদ্ধ ঃ
জাপানের চূড়ান্ত পরাজয়
হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে
আনবিক বোমা বর্ষণ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর পরাজয়ের কারণ (The causes of the collapse of Germany in the Second World War) ঃ ইতিহাস তার নিজের গতিতে চলে; ইতিহাস কোন ছক বা প্যাটার্ন মানে না। ঐতিহাসিকরাই ইতিহাসের ওপর প্যাটার্ন আরোপ করেন। যে নাৎসী জার্মানী ১৯৩৯ খ্রীঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে সমগ্র বিশ্বকে চমকিত, ভীত, সন্ত্রস্ত করে তার বিজয় বৈজয়ন্তী ইওরোপের দেশে দেশে উড়িয়ে দেয়, তখন কেহই ভাবতে পারেনি যে, সেই জার্মানী ১৯৪৫ খ্রীঃ মে মাসে আত্মসমর্পণ করবে। জার্মানীর পতন নানা কারণে ঘটেছিল।

প্রথমতঃ, হিটলার হয়ত প্রকৃতই দেশপ্রেমিক ছিলেন। তিনি নিশ্চয়ই দেশপ্রেমিক হিসেবে জার্মানীকে ভার্সাই সন্ধির বাঁধনের জাল থেকে মুক্তি দিতে চান। কিন্তু তিনি নিজ দেশবাসী জার্মান জাতিকে এমন কোন আদর্শ, উদার শাসনব্যবস্থা উপহার দেননি, যার জন্যে জার্মান জাতি তাঁর বৈদেশিক নীতিকে সফল করতে সর্বস্ব পণ করবে। চিন্তাশীল, বুদ্ধিজীবি জার্মানরা ভাবতে বাধ্য হন যে, তাঁরা কি জার্মানীর মঙ্গলের জন্যে যুদ্ধ করবেন, অথবা একটি পাশবিক, মানবতা বিরোধী, স্বৈরাচারী সরকারের খেয়াল চরিতার্থ করার জন্যে যুদ্ধে জার্মান জাতিকে বলিদান দেবেন।

মোট কথা, নাৎসীদলের স্বৈরশাসন, ব্যক্তি স্বাধীনতার বিলোপ, জার্মান জাতিকে যন্ত্রের মত ব্যবহার, নাৎসী দলের পাশবিক আধিপত্য, একদলীয় এক নায়কের শাসন জার্মান জনগণকে ক্লান্ত ও হতাশাগ্রস্থ করে। যুদ্ধের প্রথম দিকে যুদ্ধ জয়ের মদিরা পান করে কিছুদিনের জন্যে জার্মান জাতি চাঙ্গা হলেও যখন শক্ত ও কঠিন প্রতিরোধ দেখা দেয়, যখন স্বর্বস্ব পণ করে যুদ্ধ করার দরকার হয়, তখন জার্মান জাতি নাৎসীবাদের প্রতি তাদের আস্থা রাখতে পারেনি। নাৎসী শাসন ছিল সন্ত্রাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত। যখন যুদ্ধে নাৎসীদের পরাজয়ের সূচনা দেখা দেয়, তখন দেশের ভিতর নাৎসীবাদের প্রতি সুপ্ত ঘৃণা জেগে ওঠে। এজন্য ঐতিহাসিকরা প্রশ্ন করেন যে, জার্মান জাতি এই যুদ্ধ চেয়েছিল, অথবা হিটলার তাদের ওপর এই সর্বনাশা যুদ্ধ চাপিয়ে দেন। যদি আমরা ঐতিহাসিক শিরারের[১] কথা বিশ্বাস করি, রাশিয়া অভিযানের পর থেকেই জার্মান সেনাপতিরা বলতে থাকেন যে, দেশ বড়, হিটলার বড় নন। সুতরাং দেশকে বাঁচাতে হলে হয় সন্ধি চাই, নতুবা হিটলারকে সরিয়ে দেওয়া উচিত। যুদ্ধের শেষ দিকে এজন্য হিটলারের প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র কয়েকবার হয়। জার্মান জাতি ভার্সাই সন্ধির প্রতিকার চায়, হিটলারতন্ত্র চায়নি ও তাঁর চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধ চায়নি। এই পরিস্থিতিতে যুদ্ধের শেষ দিকে জার্মানদের মনোবল ভেঙে পড়ে।

১· Shirer—Rise and Fall of the Third Reich.

সামরিক দিক থেকে হিটলার ও তাঁর সেনাপতিরা কতকগুলি ভুল সিদ্ধান্ত নেন যা জার্মানীর পতন ঘটায়। জার্মানীর যে লোকবল ও সম্পদ ছিল তার দ্বারা কোন দীর্ঘ, বিলম্বিত, রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে জার্মানীর জয়লাভ ছিল অসম্ভব। ব্রিটেনের উপনিবেশের সম্পদ ও লোকবল, মার্কিন সরকারের সম্পদ ও লোকবল এবং রাশিয়ার লোক সম্পদের বিরুদ্ধে জার্মানীর একক শক্তিতে যুদ্ধে জয়লাভ ছিল অসম্ভব। জার্মানীর মিত্রশক্তির মধ্যে ইতালী ছিল জার্মানীর কাঁধে বোঝা স্বরূপ। ইতালী জার্মানীর সাহায্যে বিশেষ আসেনি, বরং ইতালীকেই সাহায্য করতে জার্মানীর বহু ক্ষয়ক্ষতি হয়। সুতরাং জার্মান সেনা ও রুশদের ক্ষয় পূরণ করার ব্যবস্থা ছিল সীমাবদ্ধ। তুলনামূলকভাবে মিত্রশক্তির লোকবল ও সম্পদ ছিল সীমাহীন। দীর্ঘ যুদ্ধে তাই জার্মানীর দম ফুরিয়ে যায়।

হিটলার তাঁর উদ্ধত, ক্রুর ও আত্মম্ভরী আচরণের জন্যে জার্মানীর প্রতিভাবান সেনাপতিদের আস্থা হারান। তিনি ছিলেন ভয়ানক প্রভুত্বপরায়ণ ও সন্দেহ রোগগ্রস্থ। বিখ্যাত জার্মান সেনাপতিদের রণ পরিকল্পনাকে এই ক্ষমতালোভী লোকটি অনায়াসে তছনছ করে সেনাপতিদের ওপর তিনি তাঁর আনাড়ি পরিকল্পনা চাপিয়ে দিতে অভ্যস্ত ছিলেন। কোন সেনাপতি ও অফিসারকে তাঁর ন্যায্য সম্মান ও পদমর্যাদা অনুযায়ী প্রাপ্য সম্মান তিনি দিতেন না। তাঁর খামখেয়ালী, হামবড়া, সবজান্তা কাজকর্মে পরিকল্পিত রণনীতি লাইনচ্যুত হত। অনেক সময় তিনি সেনাপতিদের সন্দেহ করতেন। তাঁর বিখ্যাত তরুণ প্রতিভাবান সেনাপতি রোমেলের মৃত্যু রহস্যজনক। রোমেলের অভাবে জার্মান সামরিক মস্তিষ্ক দুর্বল হতে বাধ্য হয়। রুশ অভিযানের ক্ষেত্রেও, শিরারের মতে, তিনি ভয়ানক গোঁয়ার্তুমি দেখান। জার্মান সেনাপতিমণ্ডলী স্টালিনগ্রাড দখলের জন্যে মর্যাদার লড়াই করতে তাঁকে নিবারণ করতে চেষ্টা করে বিফল হন। তাঁর এই দুর্বলতাকেই রুশ সেনাপতি মার্শাল জুকভ স্টালিনগ্রাডে ব্যবহার করে জার্মানীর বিষদাঁত ভেঙে দেন।

রাশিয়া অভিযান ছিল হিটলারের সমর নীতির চরমতম ভুল সিদ্ধান্ত। অনেকে বলেন যে, হিটলার যদি রাশিয়া আক্রমণ না করতেন তবে রাশিয়াই হিটলারকে আক্রমণ করত। এই ধারণার কোন প্রকৃত ভিত্তি আছে কিনা সন্দেহ। কারণ সোভিয়েত দেশ ১৯৪১ খ্রীঃ আত্মরক্ষার প্রস্তুতি ভালভাবে করতে পারেনি। এজন্যই প্রথম দিকে রুশ যুদ্ধে জার্মানীর এত চমকপ্রদ সাফল্য আসে। কিন্তু হিটলারের ভাবা উচিত ছিল যে, সোভিয়েত দেশের সাধারণ লোক দেশপ্রেমিক এবং রাশিয়ার নেতৃত্বে ছিল এক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সাহসী সরকার। রাশিয়ার বিখ্যাত শীতের সমস্যা তো ছিলই। কোনক্রমে সময়সূচির মধ্যে যুদ্ধ শেষ না হয়ে, যুদ্ধ বিলম্বিত হলে বিপদ ছিল অনিবার্য। আসলে তাই ঘটেছিল। যদি হিটলার সেনাপতিদের মতামত অগ্রাহ্য করে স্টালিনগ্রাড দখলের মর্যাদার লড়াই-এ সময়ক্ষেপ না করতেন তবে হয়ত তিনি রক্ষা পেতেন। তাছাড়া পূর্ব ইওরোপ নিয়ে তাঁর রাশিয়ার সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসা উচিত ছিল। যুদ্ধ না করে আপোষের নীতি নিলে হিটলারের এই সর্বনাশ হত না। আসলে তিনি সাফল্যের পর সাফল্য ভোগ করে সীমাজ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। এজন্য তাঁকে চরম মূল্য দিতে হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মিত্রশক্তির পক্ষ নিয়ে যুদ্ধে নামার পর অস্ত্র, লোকবল ও সম্পদের পাল্লা মিত্রশক্তির দিকে ভারী হয়। জার্মানীর সীমিত সম্পদ নিয়ে এরপর যুদ্ধে জয়লাভ অনিশ্চিত হয়। যদিও জার্মানীর মিত্র, অক্ষশক্তির কনিষ্ঠতম সদস্য জাপান দূরপ্রাচ্যে মার্কিন ঘাঁটি পার্লহারবার প্রভৃতি আক্রমণ করে আমেরিকার পশ্চাতে ছুরিকাঘাত করে; কিন্তু মার্কিন পেন্টাগণ ও প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট আপাততঃ ইওরোপের যুদ্ধকেই মুখ্য স্থান দেন। জার্মান ইউবোটের আক্রমণ দ্বারা মার্কিন দেশকে ঘায়েল করা সম্ভব ছিল না। ব্রিটেন ও রাশিয়ার উত্তর সীমায় মার্কিন সমরোপকরণ পৌঁছাতে থাকায় যুদ্ধের গতি ফিরে যায়। আফ্রিকার যুদ্ধে কোণঠাসা

ব্রিটিশ সেনাপতি মন্টগোমারি, মার্কিন সেনাপতি প্যাটন ও মার্কিন বাহিনীর সহায়তা পেয়ে আফ্রিকা থেকে অক্ষশক্তিকে হঠিয়ে দেন।

ইঙ্গ-মার্কিন রণ পরিকল্পনা অনুসারে আফ্রিকার উত্তর উপকূল থেকে ইতালীতে নৌ-অভিযান দ্বারা ইতালীতে মিত্রবাহিনী নেমে পড়লে জার্মানী ভয়ানক সঙ্কটে পড়ে। যদিও ইতালীতে মোতায়েন জার্মান সেনা মিত্রশক্তিকে তীব্র বাধা দেয়, মিত্র বাহিনী সেই বাধা ভেদ করে রোম অধিকার করে। চার্চিলের মতে, কুমিরের পেটের তলা যেমন নরম ও দুর্বল, ইওরোপের দক্ষিণে ইতালী ছিল সেই কুমীরের পেট। মুসোলিনী নিহত হলে, হিটলার মানসিক দিক থেকে ভেঙে পড়েন। জার্মান বাহিনীর মনোবল নষ্ট হয়।

সামরিক দিক থেকে জার্মানীর পতনের অপর কারণ ছিল ১৯৪৪ খ্রীঃ ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর ফ্রান্সের উত্তর উপকূলে নর্মান্ডিতে অবতরণ। এটি ছিল একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। জার্মানী এতদিন One by one নীতিকে সফলভাবে প্রয়োগ করে পশ্চিমী শক্তির পতনের পর পূর্ব রণাঙ্গনে রাশিয়ার বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল। এখন ফ্রান্সের উপকূলে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর অবতরণের ফলে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খুলে গেলে জার্মানী সাঁড়াশীর দুই বাহুর মধ্যে প্রবল চাপে অসহায় হয়। যদি কূটনীতির দ্বারা জার্মানী ইংলন্ডকে নিরস্ত করতে পারত, তাহলে হয়ত যুদ্ধের গতি অন্যরকম হত। অতীতে মিত্রতা চুক্তি স্থাপন ও তা ভাঙার ব্যাপারে জার্মানীর রেকর্ড এত খারাপ ছিল যে, ব্রিটেনের কাছে হিটলার বারে বারে সন্ধি প্রস্তাব দিলেও চার্চিল তাতে কর্ণপাত করেননি। এখন দ্বিতীয় রণাঙ্গনে বিশাল ইঙ্গ-মার্কিন ফৌজ এবং বিমানবহর ভূমি ও আকাশ কাঁপিয়ে জার্মানীর ওপর দানবীয় শক্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়লে, জার্মানীর পতন হতে দেরী হয়নি।

ভৌগোলিক দিক থেকে জার্মানীর defence of depth বা আত্মরক্ষার জন্যে, এক যুদ্ধে পরাস্ত হলে পিছু হঠে পুনরায় যুদ্ধ দেওয়ার মত বিস্তৃত ভূভাগ ছিল না। রাশিয়া যেমন পিছু হঠে হঠে যুদ্ধ দেয়, জার্মানীকে ভূগোল সে সুযোগ দেয়নি। জার্মানীর দুদিকে ছিল দুই প্রাচীন মহা বলশালী শক্তি ফ্রান্স ও রাশিয়া। এজন্যই জার্মানী সর্বদাই আক্রমণাত্মক যুদ্ধ করে, যাতে নিজের দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ দিতে না হয়। যে মূহুর্তে জার্মানী পূর্বে রুশ ও পশ্চিমে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির যুগপৎ আক্রমণের সম্মুখীন হয়, সেই মূহুর্তে জার্মানীর পতনের ঘণ্টা বেজে যায়। কারণ তাকে পিছু হঠে নিজ দেশের ভিতর যুদ্ধ দিতে হয়, দেয়ালে পিঠ রেখে।

জার্মানী যুদ্ধে দ্রুত জয়লাভের জন্যে বহু নতুন মারণাস্ত্র ও ব্লিৎসক্রীগ রণকৌশল আবিস্কার করে। প্রথম দিকে এগুলি জার্মানীকে চমকপ্রদ সাফল্য এনে দেয়। কিন্তু মিত্রশক্তিও বসে ছিল না। ব্রিটিশ ও মার্কিন বিমানবহর, বিশেষতঃ R. A. F. প্রাথমিক ধাক্কা কাটাবার পর জার্মানীর শিল্পাঞ্চল, রেলষ্টেশন, তৈল কারখানা, শহরগুলিতে ব্যাপক বোমা নিয়মিতভাবে ফেলতে থাকে। তাতে জার্মানীর ভয়ানক ক্ষয়ক্ষতি হয়। জার্মান সাবমেরিনের বিরুদ্ধে Depth Charge নামক বিস্ফোরক অস্ত্রের ব্যবহার ব্রিটিশ যুদ্ধ জাহাজগুলি করায় সাবমেরিন আক্রমণে ভাঁটা পড়ে। মোট কথা, মিত্রশক্তিও অস্ত্রবলে জার্মানীকে পিছনে ফেলে দেয়।

হিটলার জার্মান নৌ-বহর নির্মাণে শিথিলতা দেখিয়ে মহা ভুল করেন। তিনি তাঁর যান্ত্রিক বাহিনী বা প্যানৎসার, পদাতিক, ট্যাঙ্ক ও লুফৎভাফে বা বিমান বহরের উপরেই বেশী নির্ভর করতেন। দীর্ঘ ও বিলম্বিত যুদ্ধের জন্যে সরবরাহ ঠিক রাখতে নৌ-বহরের ভয়ানক দরকার হয়। তাছাড়া অস্ত্র ও রসদ সরবরাহের সমস্যা তো ছিলই। নৌ-বহর না থাকায় ব্রিটেনের যুদ্ধে তাঁকে পরাজয় বরণ করতে হয়। যদিও তাঁর বিশ্বস্ত সহচর গোয়েরিং তাঁকে আশ্বাস দেন যে, ব্রিটেনকে বিমান আক্রমণ দ্বারা তিনি ধ্বংস করবেন, তা বাস্তবে সম্ভব হয়নি। হাজার হাজার বিমান ১৪ ঘণ্টা বোমা বর্ষণ করেও ব্রিটেনকে নতজানু করতে পারেনি। ইংলিশ চ্যানেলে ব্রিটিশ

নৌ-বাহিনীর দাপট জার্মান বাহিনীকে চ্যানেল পার হতে সুযোগ দেয়নি। নৌ-বলের অভাবে ভারত ও মার্কিন দেশ থেকে ব্রিটেনের জন্যে সরবরাহ এলে জার্মানী তা রদ করতে ব্যর্থ হয়। এদিকে মিত্রশক্তির জাহাজগুলি প্রথম মহাযুদ্ধের মতই জার্মানীর উপকূলে ব্লকেড শুরু করায় জার্মানীর সরবরাহ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়।

জার্মান সেনাদল ও পুলিশ ছিল ভয়ানক অত্যাচারী। যে দেশে তারা দখল নিত সেই দেশকে তারা নিঃস্ব ও অবনত থাকতে বাধ্য করত। এর ফলে ফ্রান্সে, গ্রীসে, যুগোশ্লাভিয়ায় জার্মান দখলদারী বাহিনীর বিরুদ্ধে স্থানীয় অধিবাসীরা মুক্তি যুদ্ধ ও অন্তর্ঘাত চালায়। এই মুক্তিযুদ্ধ দমাতে জার্মানীর বহু সেনা নিয়োগ করতে হয়। জার্মানী যদি অধিকৃত দেশে নেপোলিয়নের মত জনহিতকর সংস্কার চালু করত, তবে জার্মানী স্থানীয় লোকেদের সমর্থন পেত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বৃহৎ শক্তি সম্মেলন (Large Power Conference in the time of Second World War) : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলার সময় অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যমত হয়ে যুদ্ধ পরিচালনা, অক্ষশক্তির কবলমুক্ত দেশগুলি সম্পর্কে যুদ্ধকালীন সাময়িক ব্যবস্থাদি গ্রহণ উপলক্ষে মিত্রশক্তির শীর্ষস্থানীয় নেতারা মাঝে মাঝে মিলিত হয়ে সিদ্ধান্ত নেন। এই সিদ্ধান্তগুলি কেবলমাত্র যুদ্ধের গতিকে প্রভাবিত করেনি, বিশ্বের ভবিষ্যৎ ইতিহাসকেও প্রভাবিত করে। দ্বিতীয়, বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বের বহু দেশের ভাগ্য এই সকল সম্মেলনে নির্দ্ধারণ করা হয়। এই কারণে এই সম্মেলনগুলি ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে।

(১) ১৯৪১ খ্রীঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ব্রিটেন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের লেন্ড এ্যান্ড লীগ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির বলে এই দুই দেশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রসদ, অস্ত্র সরবরাহ করে।

(২) ১৯৪১ খ্রীঃ আগষ্ট মাসে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল ও মার্কিন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট বিখ্যাত আটলান্টিক সনদ (Atlantic Charter) ঘোষণা করেন। এই চার্টার বা সনদে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির এই যুদ্ধের লক্ষ্য সম্পর্কে ঘোষণায় বলা হয় যে : (১) যুদ্ধমান গণতন্ত্র কোন আগ্রাসন, কোন দেশের ভূমি দখলে রাখার জন্যে এই যুদ্ধ করছেন না। (২) এই যুদ্ধরত গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি প্রতি দেশের জনগণের ইচ্ছানুযায়ী সরকার গঠনের অধিকারকে স্বীকৃতি জানাচ্ছে। (৩) যে দেশগুলিকে বলপূর্বক অধিকার করা হয়েছে, সেই সকল দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব পুণঃপ্রতিষ্ঠাই ঘোষণাকারীদের লক্ষ্য। (৪) এই যুদ্ধে ফ্যাসিষ্ট শক্তির হাত থেকে শুধু মুক্তিলাভ নয়, যোগদানকারী দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শ্রমিকদের অবস্থার উন্নয়নও অন্যতম লক্ষ্য। (৫) নাৎসী স্বৈরাচারের ধ্বংসের পর, যুদ্ধে যোগদানকারী মিত্রশক্তি এমন একটি শান্তি স্থাপন করতে চান যার ফলে প্রত্যেক জাতি নিজ ভৌগোলিক সীমার মধ্যে নিরাপদে বাস করতে সক্ষম হবে।

আটলান্টিক সনদ উইলসনের চতুর্দশ নীতির মতই জার্মান বিরোধী জোটভুক্ত রাষ্ট্রগুলির নৈতিক ঐক্যকে দৃঢ় করে। কিন্তু যুদ্ধের পর এই সকল প্রতিশ্রুতি বিজয়ী শক্তি ভুলে যান।

II. ১৯৪২ খ্রীঃ ১লা জানুয়ারী ২৬টি জাতি সম্মিলিতভাবে আটলান্টিক সনদের ভিত্তিতে অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

III. ১৯৪২ খ্রীঃ ষ্ট্যালিন, চার্চিল ও রুজভেল্ট মিলিত হয়ে জার্মানীর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার পরিকল্পনা করেন এবং কয়েকটি গোপন চুক্তিতে আবদ্ধ হন।

IV. ১৯৪৩ খ্রীঃ কাসাব্লাঙ্কা সম্মেলনে রুজভেল্ট, চার্চিল ও ফরাসী নেতা দ্য গল একত্রে মিলিত হয়ে শত্রুপক্ষ বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ না করা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে প্রতিজ্ঞা নেন।

V. একই বছরে কাইরো সম্মেলনে রুজভেল্ট, চার্চিল ও চীনের রাষ্ট্রপতি চিয়াং কাইশেক মিলিত হয়ে স্থির করেন যে, বিজয়ী মিত্রশক্তির মধ্যে ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধের পর কোন

নতুন দেশে রাজ্য বিস্তার করবে না। চিয়াং কাইশেককে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে, ১৮৯৫ খ্রীঃ থেকে জাপান যে সকল স্থান অধিগ্রহণ করেছে তা জাপানকে ছেড়ে দিতে বাধ্য করা হবে। ফরমোজা সহ চীনের প্রাপ্য স্থান চীন ফেরৎ পাবে। কোরিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করা হবে।

VI. ১৯৪৩ খ্রীঃ নভেম্বর মাসে রুজভেল্ট, চার্চিল ও ষ্ট্যালিন তেহরানে মিলিত হয়ে একটি গোপন সামরিক চুক্তি করেন। এই চুক্তিতে যুদ্ধ শেষ হলে ইরানকে স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিতে স্বীকার করা হয়।

VII. ১৯৪৪ খ্রীঃ ডাম্বারটন ওকসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, চীনের প্রতিনিধিরা এবং পরে রাশিয়া যোগ দেয়। এই বৈঠকে একটি আন্তর্জাতিক জাতিপুঞ্জ গঠণের পরিকল্পনা করা হয়।

VIII. একই বছর সেপ্টেম্বর মাসে কুইবেকের সম্মেলনে মিলিত হয়ে রুজভেল্ট ও চার্চিল জার্মানীর অধিকৃত অঞ্চল সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেন। অবশেষে ষ্ট্যালিন ও তাঁর বিদেশমন্ত্রী মলোটোভ যোগ দিলে স্থির হয় যে, বুলগেরিয়া ও রুমানিয়ায় রুশ সেনার দখলদারী ও গ্রীসে ব্রিটেনের সেনার দখলদারী মেনে নেওয়া হবে।

ইয়াল্টা সম্মেলন ও ইয়াল্টা চুক্তি, ১৯৪৫ খ্রীঃ (The Yalta Conference and the Yalta Pact) ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর কিভাবে বিশ্বশান্তি স্থাপিত হবে সে বিষয়ে বিজয়ী শক্তিগুলি যেমন আগ্রহ দেখায় এবং পূর্ব পরিকল্পনা প্রস্তুত করে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিজয়ী শক্তিগুলির মধ্যে সেরকম আগ্রহ দেখা যায়নি। বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে যে পারস্পরিক অবিশ্বাস ছিল, তা জার্মান আক্রমণের চাপে কিছুকাল চাপা থাকলেও, জার্মানীর পতন আসন্ন হলে পুরাতন ফাটল আবার দেখা দেয়। যাই হোক, আপাততঃ জার্মানীর পতন যেহেতু আসন্ন হয়, সেহেতু ইওরোপের পুনর্গঠণের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সমাধানের জন্যে নেতারা ইয়াল্টায় সমবেত হন (১৯৪৫ খ্রীঃ)। এই সকল প্রশ্নের মীমাংসার জন্যে ১৯৪৫ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী মাসে তিন প্রধান রুজভেল্ট, চার্চিল ও ষ্ট্যালিন রাশিয়ার ক্রিমিয়া প্রদেশের ইয়াল্টা নগরীতে সমবেত হন। এই সম্মেলন ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই তিন রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর ভাগ্য-নিয়ন্তা। তাঁদের সাহায্যের জন্যে ইয়াল্টায় বিভিন্ন পররাষ্ট্র মন্ত্রীরা যথা, মলোটোভ, ইডেন ও ষ্টেটনাস আসেন। সামরিক বিষয়ে পরামর্শ দানের জন্যে রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে সমর বিশারদরা আসেন। তাছাড়া রাষ্ট্রপ্রধানদের সেনাপতিগণ ও বহু বিশেষজ্ঞ, আইনবিদ ও কূটনীতিক এই সম্মেলনে যোগ দেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলার সময় ইয়াল্টার মত এত আড়ম্বরপূর্ণ অথচ গুরুত্বপূর্ণ মিত্রপক্ষীয় সম্মেলন আর হয়নি। ফ্রেমিং (Flemming) নামক ঐতিহাসিকের মতে, ইয়াল্টা সম্মেলনে তিন রাষ্ট্রপ্রধান অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে আলোচনা করেন। রুজভেল্ট এই সময় ষ্ট্যালিনের প্রতি আস্থা দেখান।[১] চার্চিল তাঁর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস গ্রন্থে বলেছেন যে, রুশ সরকার তাঁদের প্রতি অসাধারণ আতিথেয়তা ও সৌজন্য দেখান।[২]

ইয়াল্টা সম্মেলনের পটভূমিকা

ইয়াল্টার হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে তিন রাষ্ট্রপ্রধান যুদ্ধোত্তর ইওরোপে এবং যুদ্ধমান দূর প্রাচ্য সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেন ঃ—(১) যেহেতু জার্মানীর পতন আসন্ন হয়, সেহেতু জার্মানী সম্পর্কে স্থির হয় যে, (ক) জার্মানীর পতনের পর মিত্রশক্তি জার্মানীকে ৩টি প্রধান অঞ্চলে ভাগ করে তিন শক্তির সেনাদল দ্বারা অধিকার করা হবে। এই তিন অঞ্চল ছিল রুশ, মার্কিন ও ব্রিটিশ অধিকৃত অঞ্চল। (খ) চার্চিল ও রুজভেল্টের অনুরোধে ষ্ট্যালিন রাজী হন যে, ফ্রান্সকেও জার্মানীর একটি

ইয়াল্টার চুক্তিসমূহ ঃ জার্মানী সম্পর্কে চুক্তি

১· Hoorwitz—From Yalta to Vietnam.

২· W. Churchill—History of Second World War Series.

অঞ্চলে দখল করতে দেওয়া হবে। কিন্তু রাশিয়া এই শর্ত আরোপ করে যে, ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিকৃত অঞ্চল থেকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে ফ্রান্সকে তার অঞ্চল স্থাপন করতে দেওয়া হবে। সোভিয়েত অধিকৃত অঞ্চল থেকে কোন স্থান ফ্রান্সকে দেওয়া হবে না। (গ) প্রতিটি অঞ্চলে একই প্রকার আইন ও শাসন প্রবর্তনের জন্যে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশন স্থাপিত হবে। এতে ৪টি শক্তি যথা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার প্রতিনিধি থাকবে। (ঘ) জার্মানীকে নিরস্ত্রীকৃত, অনাৎসীকৃত, গণতান্ত্রীকৃত এবং একচেটিয়া মুনাফাভোগী কার্টেল মুক্ত করা হবে। (ঙ) সোভিয়েত নেতা ষ্ট্যালিন দাবী করেন যে, জার্মানীকে মিত্র শক্তির ক্ষয়ক্ষতির জন্যে ২০ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং এর অর্দ্ধাংশ রাশিয়া পাবে। চার্চিল ও রুজভেল্ট ক্ষতিপূরণ গ্রহণের সম্পর্কে নীতিগত সম্মতি দিলেও ক্ষতিপূরণের পরিমাণ সম্পর্কে আপত্তি জানান।

ইয়াল্টা বৈঠকে যুদ্ধোত্তর পোল্যান্ড সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। (১) জার্মানীর পতনের পর স্বাধীন পোল্যান্ড রাষ্ট্র গঠনের জন্যে তিন প্রধান একমত হন। (২) পোল্যান্ডের পূর্ব সীমান্ত অর্থাৎ রাশিয়া ও পোল্যান্ডের সীমান্ত কার্জন লাইন বা রেখা বরাবর রাখা হবে বলে স্থির হয়। এর ফলে প্রাক-যুদ্ধকালীন পোল্যান্ডের প্রায় অর্দ্ধাংশ বা ৪৭% রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়। (৩) পোল্যান্ডের পূর্ব সীমান্ত অর্থাৎ জার্মানী ও পোল্যান্ড সীমান্ত ষ্ট্যালিন ওডার-নীসি রেখা বরাবর দাবী করেন। কিন্তু চার্চিল ও রুজভেল্ট এতে আপত্তি জানান। শেষ পর্যন্ত এই সীমান্তের প্রশ্নটি ভবিষ্যতের জন্যে মূলতুবী রাখা হয়। (৪) পোল্যান্ডে কোন প্রকার সরকার স্থাপিত হবে এ সম্পর্কে তিন প্রধানের কোন নির্দিষ্ট ঐক্যমত না হলেও, একথা স্থির হয় যে, পোল্যান্ডে অবাধ, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে পোল সরকার গঠিত হবে। সর্বসাধারণের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ব্যালট বা গোপন ভোট নেওয়া হবে। কিন্তু এই সঙ্গে ষ্ট্যালিন শর্ত জুড়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন যে, পোল্যান্ডে যে সরকার হবে তা সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি মিত্রভাবাপন্ন এবং সোভিয়েত রাশিয়ার পক্ষে গ্রহণযোগ্য হওয়া চাই। অপর দিকে, চার্চিল শর্ত জোড়ার চেষ্টা করেন যে, ১৯৩৯ খ্রীঃ নাৎসী আক্রমণের সময় পোল্যান্ডের যে বৈধ সরকার উতখাৎ হয়ে লন্ডনে আশ্রয় নেয় ও নির্বাসিত পোল সরকার গঠন করে, তাকে এই নির্বাচনে যোগদানের অধিকার দিতে হবে। শেষের দুটি শর্ত সম্পর্কে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ইয়াল্টায় হয়নি বলে অধিকাংশ পশ্চিমী লেখক দাবী করেন। অপরদিকে, সোভিয়েত লেখকেরা বলেন যে, ষ্ট্যালিনের শর্ত গৃহীত হয়। অপরদিকে ১৯৪১ খ্রীঃ জার্মানী রাশিয়া আক্রমণ করলে পোল্যান্ডের কমিউনিষ্টদের সাহায্যে মস্কোতে একটি নির্বাসিত পোলিশ কমিউনিষ্ট সরকার গঠিত হয়েছিল। লাল ফৌজ জার্মানী দখল করার সঙ্গে সঙ্গে এই নির্বাসিত কমিউনিষ্ট সরকারকে রাশিয়া পোল্যান্ডে ক্ষমতায় স্থাপন করে। শেষ পর্যন্ত মার্কিন ও ব্রিটেনের প্রস্তাব ছিল যে, যদি এই কমিউনিষ্ট সরকারের ভিতর লন্ডনে নির্বাসিত সরকারের কিছু সদস্য নিতে রাশিয়া রাজী হয়, তাহলেও চলবে। ষ্ট্যালিন তাতে রাজী না হওয়ায় নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনের শর্ত দেওয়া হয়।

পোল্যান্ড সম্পর্কে চুক্তি

তিন প্রধান ইয়াল্টার ঘোষণাপত্র দ্বারা (Yalta Communique) যে সকল দেশকে জার্মান অধিকার থেকে মুক্ত করা হবে সেই দেশগুলির পুনর্গঠনে মূলনীতি ব্যাখ্যা করেন। এই ঘোষণাপত্রে বলা হয় যে, (১) ইওরোপে যে সকল পরিবর্তন সাধন হবে তা আটলান্টিক সনদের (Atlantic Charter) সঙ্গে সঙ্গতি রেখে করা হবে। বলা বাহুল্য, আটলান্টিক সনদে বলা হয়েছিল যে, প্রতি জাতির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে অক্ষুণ্ণ রাখা হবে। (২) এই ঘোষণাপত্রে আরও বলা হয় যে, অক্ষশক্তির মিত্র স্থানীয় দেশগুলির জনসাধারণকে আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে যে, তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক

ইয়াল্টার ঘোষণাপত্র

সমস্যাবলীর গণতান্ত্রিক উপায়ে সমাধান করা হবে। (৩) এই উদ্দেশ্যে তিন প্রধান আশ্বাস দেন যে, আত্মসমর্পণ করার পর এই দেশগুলিতে অন্তবর্তী সরকার গঠন করা হবে। স্বাধীন ও অবাধ গণতান্ত্রিক নির্বাচন দ্বারা এই দেশগুলির স্থায়ী সরকার গঠিত হলে তাদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে এবং তাদের সঙ্গেই শান্তি চুক্তি স্থাপিত হবে।

দূর প্রাচ্য সম্পর্কেও ব্রিটেন ও আমেরিকার সঙ্গে সোভিয়েত রাশিয়ার ইয়াল্টায় চুক্তি হয়। যেহেতু তখনও জাপান পূর্ণ উদ্যমে যুদ্ধ চালাচ্ছিল এবং জাপানের মূল ভূখণ্ডে মিত্র শক্তির সেনা নামার কোন ব্যবস্থা হয়নি, সেহেতু প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট তাঁর সমরনায়কদের পরামর্শ নেন। জাপানের শক্তি এবং জাপানী সেনার আত্মরক্ষার ক্ষমতা লক্ষ্য করে মার্কিন সেনাপতিরা আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে,—(১) জাপানের শ্রেষ্ঠ স্থলসেনা মাঞ্চুরিয়ায় রাখা আছে। এই সেনাদলকে মাঞ্চুরিয়ায় আবদ্ধ রাখার জন্যে সোভিয়েত শক্তির সাহায্য দরকার। (২) জাপানে অবতরণের পর হাতাহাতি যুদ্ধে জাপানের অসংখ্য সেনার মোকাবিলার মত লোকবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেই। ব্রিটেনের সেনাদল ভারতসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ব্যস্ত থাকবে। সুতরাং জাপানকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করতে হলে সোভিয়েত সামরিক শক্তির সাহায্য দরকার। তখনও পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে আণবিক বোমা আসেনি। কাজেই জাপান দখলের জন্যে পদাতিক সেনার দরকার হয়।

দূর প্রাচ্যের যুদ্ধে রাশিয়ার যোগদান সম্পর্কে চুক্তি

এমতাবস্থায় ইয়াল্টা বৈঠকে রুজভেল্ট অনুরোধ করেন যে, জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রাশিয়াকেও যোগ দিতে হবে। ষ্ট্যালিন এক্ষেত্রে প্রথমে রাশিয়ার যোগ দেওয়ার ব্যাপারে অনিচ্ছা প্রকাশ করে কারণ দেখান যে রাশিয়া রণক্লান্ত; রুশ জনমত আর যুদ্ধ চায় না। শেষ পর্যন্ত তিনি বলেন যে, যদি তাঁর কয়েকটি শর্ত পূরণ করা হয় তবে তিনি জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দিবেন। রুজভেল্ট ষ্ট্যালিনের এই গোপন শর্তগুলি স্বীকার করেন। শর্তগুলিতে বলা হয় যে—(১) বহিঃ-মঙ্গোলিয়ায় স্থিতাবস্থা (অর্থাৎ রাশিয়ার প্রাধান্য) স্বীকৃত হবে। (২) কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জে রাশিয়ার আধিপত্য স্বীকার করা হবে। (৩) শাখালিন দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণ ভাগ রাশিয়াকে ছেড়ে দিতে হবে। (৪) মাঞ্চুরিয়ায় রুশসেনার অবস্থান স্বীকৃতি পাবে। (৫) দক্ষিণ মাঞ্চুরীয় রেলপথ, পোর্ট আর্থার, ডাইরেন বন্দরদ্বয় রুশ-চীন দ্বৈত নিয়ন্ত্রণে থাকবে। (৬) মাঞ্চুরিয়ার ওপর চীনের সার্বভৌম অধিকার রাশিয়া স্বীকার করবে। এই শর্তের পরিপ্রেক্ষিতে রাশিয়া দূর প্রাচ্যে জাপানের বিরুদ্ধে সেনা সমাবেশে রাজী হয়। জার্মানীর আত্ম-সমর্পণের তিন মাসের মধ্যে উপরোক্ত শর্ত সাপেক্ষে রাশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দিতে রাজী হয়।

রাশিয়াকে দেওয়া শর্তাবলী

ইয়াল্টা বৈঠকে জাতিপুঞ্জ বা U. N. O গঠন সম্পর্কে ইঙ্গ-মার্কিন-রুশ মত বিনিময় হয়। ষ্ট্যালিন জাতিপুঞ্জে সোভিয়েত রাশিয়ার যোগদান সম্পর্কে শর্ত আরোপ করেন যে, জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভায় সোভিয়েত রাশিয়া ছাড়া বাইলো রাশিয়া এবং ইউক্রেনের স্বতন্ত্র আসন ও ভোটাধিকার থাকবে। মার্শাল ষ্ট্যালিন এই দাবী দ্বারা সোভিয়েত স্বার্থ এবং জাতিপুঞ্জে সোভিয়েত গরিষ্ঠতা রক্ষার চেষ্টা করেন। রুজভেল্ট ও চার্চিল এই দাবী স্বীকার করেন।

জাতিপুঞ্জ গঠন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত

এইভাবে ইয়াল্টা বৈঠকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশ্ব সম্পর্কে তিন প্রধান কিছু কার্যকরী সিদ্ধান্ত নেন। ইয়াল্টা সম্মেলন থেকে ফিরবার পর রুজভেল্ট ঘোষণা করেন যে,—"ক্রিমিয়ার সম্মেলন থেকে এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে এসেছি যে, শান্তি স্থাপনের পথে আমরা শুভযাত্রা আরম্ভ করেছি।" চার্চিলও তাঁর মার্কিন সহযোগীর মতের প্রতিধ্বনি করে হাউস অফ কমন্সে বলেন যে—"আমি বিশ্বাস করি, এই পার্লামেন্ট একথা

ইয়াল্টা চুক্তির গুরুত্ব

অনুভব করবে যে, যে বন্ধন তিন শক্তিকে গ্রথিত করেছে এবং তাদের পারস্পরিক আস্থা সৃষ্টি করেছে তা আরও দৃঢ় হবে।"

কিছুদিনের মধ্যে ইয়াল্টার উচ্চাশা ও আদর্শবাদ লুপ্ত হয় এবং পূর্ব ও পশ্চিমী শক্তিগুলির মধ্যে নগ্ন ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও ঠাণ্ডা লড়াই যুদ্ধকালীন মিত্রতার পরিবেশকে কলুষিত করে। ইয়াল্টার অব্যবহিত পরেই রুজভেল্টের অকস্মাৎ মৃত্যু হয়। উপ-রাষ্ট্রপতি হ্যারী ট্রুম্যান মার্কিন রাষ্ট্রপতির পদে বসেন। এদিকে ব্রিটেনে সাধারণ নির্বাচনে চার্চিল ও তাঁর দল পরাস্ত হয়। শ্রমিক দলের জয়লাভের ফলে এই দলের নেতা ক্লেমেন্ট এটলী ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হন। এই দুই নেতা ছিলেন নবাগত এবং স্ট্যালিনের সঙ্গে তাঁদের কোন যোগাযোগ ও বোঝাপড়া ছিল না। ফলে নেতাদের মধ্যে আস্থার অভাব দেখা দেয়। দ্বিতীয়তঃ, রুজভেল্টের দূরপ্রাচ্য সম্পর্কীয় ইয়াল্টা শর্তগুলি মার্কিন কংগ্রেস, মার্কিন সেনাপতিমণ্ডলী বা পেন্টাগণের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এজন্য আমেরিকায় এই সমালোচনা করা হয় যে—"রুজভেল্ট ইয়াল্টায় স্ট্যালিনের নিকট আত্মসমর্পণ করেন" (Yalta Surrender)। রবার্ট শেরউড মন্তব্য করেছেন যে, "জার্মানী ও জাপানের পূর্ণ পরাজয়ের পর বিশ্বে যে সকল সমস্যা দেখা দেয় তার অনেকগুলিই ইয়াল্টা চুক্তি থেকে উদ্ভূত বলে মনে করা হয়।"

এই চুক্তির সমালোচনা

প্রকৃতপক্ষে ইয়াল্টা চুক্তি সম্পর্কে এই সকল অভিযোগের কোন ভিত্তি নাই। পূর্ব-পশ্চিম ঠাণ্ডা লড়াই আরম্ভ হলে সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে ইঙ্গ-মার্কিন সম্পর্কের অবনতি ঘটে। সেই পটভূমিকায় ইয়াল্টা চুক্তিকে বিচার করে "আত্মসমর্পণ" আখ্যা দেওয়া হয়। ট্রুম্যান ও তাঁর পরামর্শদাতারা ভুলে যান যে, পারস্পরিক আস্থার ভিত্তিই ছিল ইয়াল্টা চুক্তির মূলে। জাপানের সেনাবলের বিরুদ্ধে রুশ সাহায্য আণবিক বোমা ব্যবহারের আগে দরকারী মনে হয়। সেজন্য দূর প্রাচ্যে কিছু সুযোগ সুবিধা রাশিয়াকে দিতে হয়। অপরদিকে বিচার করলে দেখা যাবে যে, ইয়াল্টা চুক্তিতে কতকগুলি সমস্যার সমাধান না করে ধামাচাপা দেওয়া হয় এবং কতকগুলি সমস্যার এমন সমাধান হয় যে, পরে সে বিষয়ে তীব্র মতভেদ দেখা দেয়। ইয়াল্টা চুক্তিকে রুজভেল্টের রুশ তোষণ বলা না গেলেও, পোল্যাণ্ডের প্রায় ৪৭% রাশিয়াকে ছেড়ে দেওয়ার পরেও পোল্যাণ্ডে রুশ প্রভাবিত লুবলিন সরকার গঠন এবং ১৯৪৭ খ্রীঃ ইয়াল্টা চুক্তির পরে নামেমাত্র নির্বাচন করে লুবলিন সরকারের তথাকথিত বৈধতা প্রতিষ্ঠা, ইয়াল্টা চুক্তির প্রতি রুশ ন্যায় বিচারের নিদর্শন নয় বলে বহু ঐতিহাসিক মনে করেন। দ্বিতীয়তঃ, পোল্যাণ্ডের পশ্চিম সীমান্ত জার্মানীর ওডার-নাইসী নদী পর্যন্ত বিস্তারের দাবী পশ্চিমী দেশগুলি ইয়াল্টাতে ধামাচাপা দেয়। পরে এ নিয়ে বহু গণ্ডগোল হয়। লাল ফৌজ যেহেতু এই অঞ্চলে দখলদার ছিল, সেহেতু কাগজ-কলমে না হলেও হাতে-কলমে এই অঞ্চল তারা দখলে রাখে। তৃতীয়তঃ, জার্মানীর ক্ষতিপূরণের বিষয় নিয়ে ভবিষ্যতে পশ্চিমী দেশের সঙ্গে রাশিয়ার তীব্র মতবিরোধ হয়। চতুর্থতঃ, ইয়াল্টা চুক্তির কালি শুকাবার আগেই রুশ বিদেশমন্ত্রী ভিসিনিস্কির হস্তক্ষেপে রুমানিয়ার রাজা মাইকেল তাঁর কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা বরখাস্ত করে রাশিয়ার মনোনীত কমিউনিষ্ট মন্ত্রীসভা গঠনে বাধ্য হন।[১] সুতরাং ইয়াল্টা চুক্তির মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াই-এর বীজ নিহিত ছিল।

পটসডাম সম্মেলন (The Potsdam Conference) : রুজভেল্টের মৃত্যুর পরেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সোভিয়েত রাশিয়ার সম্পর্কের অবনতি ঘটে। নব-নিযুক্ত প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান রুমানিয়া ও পোল্যাণ্ডে সোভিয়েত নীতি লক্ষ্য করে এই ধারণা করেন যে, সোভিয়েত রাশিয়া ইয়াল্টা চুক্তির শর্তগুলি রক্ষা করছে না। ইয়াল্টা চুক্তি সম্পাদনের পর

১· Vide Robert Ergang.

স্বদেশে ফিরে এসে রুজভেল্ট নিজেই আক্ষেপ করেন যে, রাশিয়া ইয়াল্টার সদিচ্ছার দাম দিচ্ছে না। ইতিমধ্যে রুজভেল্ট দেহত্যাগ করেন। মার্কিন উপরাষ্ট্রপতি হ্যারি ট্রুম্যান রাষ্ট্রপতির পদে বসেন। ১৯৪৫ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী মাসে ইয়াল্টা চুক্তির সময়কাল হতে জুলাই মাস পর্যন্ত মার্শাল ষ্ট্যালিন এমন কতকগুলি কাজ করেন যে, তার ফলে পূর্ব-পশ্চিম সম্পর্কে ফাটল ধরে। প্রথমতঃ, পোল্যান্ডে লুবলিন (Lublin) সরকারকে লাল ফৌজের ছাতার নীচে শুধু আশ্রয় দেওয়া হয়নি, পোল্যান্ডে অ-কমিউনিষ্ট নেতাদের বন্দী বা অন্তরীণ করা হয়। স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার খর্বিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, হাঙ্গেরীর কাছ থেকে সোভিয়েত রাশিয়া এক বিরাট অঙ্কের ক্ষতিপূরণ দাবী করে এবং ১৯৪৪ খ্রীঃ মস্কোপন্থী কমিউনিষ্ট ইমরেনাগির মাধ্যমে ভূমি-সংস্কার করা হয়, যাতে কমিউনিষ্টদের জনপ্রিয়তা বাড়ে। তৃতীয়তঃ, রুমানিয়ায় ১৯৪৪-খ্রীঃ কমিউনিষ্ট পার্টির মাত্র ৪০০ সদস্য ছিল। ১৯৪৪ এর মার্চ মাসে রুশ মন্ত্রী ভিসিনিস্কির হস্তক্ষেপে রুমানিয়ায় কমিউনিষ্ট শাসন স্থাপিত হয়। চতুর্থতঃ, বুলগেরিয়ায় লাল ফৌজ ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিষ্টরা ক্ষমতা দখল করে এবং অ-কমিউনিষ্টদের দমন করে। পঞ্চমতঃ, চেকোশ্লোভাকিয়ায় কোয়ালিশন সরকার গঠিত হলেও গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি কমিউনিষ্টরা অধিকার করে নেয়। ষষ্ঠতঃ, যুগোশ্লাভিয়াতে স্থানীয় কমিউনিষ্ট দল মার্শাল টিটোর নেতৃত্বে জার্মানদের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করে। ষ্ট্যালিন যুগোশ্লাভ কমিউনিষ্টদের নিজ পছন্দমত কমিউনিষ্ট শাসন গঠনের অধিকার দেন। সপ্তমতঃ, আলবানিয়ায় কমিউনিষ্ট গেরিলাগণ সরকার দখল করে নেয়। অষ্টমতঃ, এছাড়া পূর্ব জার্মানী ও পূর্ব অষ্ট্রিয়া লাল ফৌজ দখল করায় এই স্থানগুলিতেও লাল ফৌজের ছত্রছায়ায় কমিউনিষ্ট শাসন গড়ে ওঠে। মোট কথা, ইয়াল্টা চুক্তির কয়েক মাসের মধ্যেই পূর্ব জার্মানী সহ গোটা পূর্ব ইওরোপে রুশ তাঁবেদার কমিউনিষ্ট শাসন স্থাপিত হয়। এই সকল স্থানে রুশ লালফৌজ দখলদারী থাকায় কমিউনিষ্ট দলগুলি তার সুযোগ নিয়ে অ-কমিউনিষ্টদের উৎখাত করে দেয়। ইয়াল্টা চুক্তিতে আটলান্টিক চার্টারের ভাবধারা অনুযায়ী এই সকল স্থানে অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনের কোন ব্যবস্থা হয়নি। এর ফলে একদা যারা ইয়াল্টা চুক্তির ফলে আনন্দে আত্মহারা হয়, তারা এখন মুষড়ে পড়ে। রুজভেল্ট ইয়াল্টা চুক্তির পরিণাম দেখে অনুতপ্ত হন এবং জার্মানীতে ইঙ্গ-মার্কিন শান্তি চুক্তির শর্ত নমনীয় করতে সঙ্কল্প নেন। এজন্য ষ্ট্যালিন রুজভেল্টকে ভর্ৎসনা করেন। রুজভেল্ট তদুত্তরে ষ্ট্যালিনকে আমেরিকার জার্মান নীতিকে "ন্যক্কারজনক ভ্রান্ত ব্যাখ্যা" (Vile misrepresentations) বলে মৃদু তিরস্কার করেন। এদিকে ইয়াল্টা চুক্তি অনুযায়ী জাপান আক্রমণের জন্যে রাশিয়া মাঞ্চুরিয়ায় সেনা সমাবেশ করে। কিন্তু মার্কিন সমরবিভাগ জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকি শহরে এ্যাটম বোমা নিক্ষেপের সিদ্ধান্ত নিলে, রাশিয়াকে আর জাপানের ভূখণ্ডে নামার সুযোগ দেওয়া হয়নি। এজন্য রুশ নেতারা বিরক্তি বোধ করেন। এইভাবে ইয়াল্টা চুক্তির অব্যবহিত পরেই পূর্ব-পশ্চিমের মধ্যে মন কষাকষি শুরু হয়। আপাততঃ প্রধান সমস্যাগুলি যথা জার্মানী ও তার মিত্রদেশের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন, ইওরোপের পুনর্গঠন প্রভৃতি সমস্যার সমাধানের জন্যে পটসডামের সম্মেলনে শীর্ষ নেতারা পুনর্বার মিলিত হন (১৭ জুলাই, ১৯৪৫ খ্রীঃ)।

পটসডামে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ

এই সম্মেলনে যুদ্ধকালীন পুরাতন নেতাদের মধ্যে একমাত্র ষ্ট্যালিন ছিলেন। চার্চিল নির্বাচনে পরাস্ত হওয়ায় এই সম্মেলন ত্যাগ করেন। তাঁর স্থলে বিজয়ী শ্রমিকদলের নব-নিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী এটলী যোগ দেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের মৃত্যু হওয়ায় তাঁর পদের উত্তরাধিকারী রূপে হ্যারী ট্রুম্যান পটসডাম সম্মেলনে যোগ দেন। ঐতিহাসিক ফ্রেমিং বলেন যে, পুরাতন নেতাদের মধ্যে একটি পারস্পরিক আস্থা ও বোঝাপড়া ছিল। ষ্ট্যালিনের সঙ্গে নতুন নেতাদের সেরকম কিছু ব্যক্তিগত আন্তরিকতা ও আস্থা ছিল না। এটা বেশ খারাপ ব্যাপার ছিল সন্দেহ নেই। প্রকৃতপক্ষে, এই সম্মেলনে

নেতাদের মধ্যে মতৈক্য হয়নি। জার্মানীর সঙ্গে শান্তি চুক্তি রচনার ব্যাপারে ইঙ্গ-মার্কিন ও রুশ নেতাদের মধ্যে বিস্তর মতপার্থক্য দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত তিন নেতা ঘোষণা করেন যে, বিজয়ী শক্তিদের পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের সম্মেলনে শান্তি চুক্তির খসড়া রচনা করা হবে। (২) পটসডাম সম্মেলনে জার্মানীকে আশ্বাস দেওয়া হয় যে, জার্মান জাতির স্বাধীনতা রক্ষা করা হবে। (৩) জার্মানীর অনাৎসীকরণ, অসামরিকীকরণ, গণতান্ত্রিকরণ ও জার্মান শিল্প কোম্পানী বা কার্টেলগুলিকে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই কথাগুলির ব্যাঞ্জনা বেশ ব্যাপক ছিল। (ক) অনাৎসীকরণের অর্থ ছিল জার্মানী থেকে নাৎসী সমবাদ, নাৎসী সংস্কৃতি, জাতিগত অহমিকাবোধ, নাৎসীবাদী ইতিহাস প্রভৃতি নির্মূল করা হবে। যাতে ভবিষ্যতে পুনরায় এই ক্ষতিকারক আদর্শবাদ জার্মানীতে শিকড় বিস্তার না করতে পারে। (খ) জার্মানীতে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, সহনশীলতা, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব, অবাধ নির্বাচন, নাগরিক স্বাধীনতা প্রভৃতির পুনঃ-প্রতিষ্ঠা করা হবে। (গ) অসামরিকীকরণ, অর্থাৎ জার্মানীকে নিরস্ত্র করা, সামরিক কলেজগুলিকে উৎখাত করা, অস্ত্রনির্মাণ কারখানাগুলি ভেঙে ফেলা হবে। (ঘ) অ-কার্টেলকরণ অর্থাৎ জার্মানীর দানবাকৃতি মূলধনীদের পরিচালিত বিবিধমুখী শিল্প কারখানাগুলিকে ধ্বংস করা হবে। (৪) জার্মানীর পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ নীতি ঘোষণা করা হয় এবং জার্মান সামরিক বাহিনী ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। জার্মানীতে ভবিষ্যতে কোন সমরাস্ত্র নির্মাণ করা নিষিদ্ধ করা হয়। (৫) জার্মানীর সোভিয়েত অধিকৃত অঞ্চল থেকে শিল্পকেন্দ্র ও যন্ত্রপাতি রাশিয়াকে তুলে নিয়ে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ নিতে সম্মতি দেওয়া হয়। (৬) পূর্ব প্রাশিয়ার একাংশ ও ডানজিগ বন্দর পোল্যান্ডকে এবং কোনিগসগ্রাৎস শহর রাশিয়াকে হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। (৭) জার্মানীকে মিত্রপক্ষের দখলদারী সেনার অধীনে রাখার জন্যে ৫টি অঞ্চলে ভাগ করা হয়।[১] জার্মানীর পূর্বাংশ রাশিয়ার এবং পশ্চিমাংশ ব্রিটেন, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে রাখার ব্যবস্থা হয়। প্রতি অঞ্চল সেই অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত সেনাপতির শাসনে থাকে। চারজন সেনাপতি একত্রে মিত্রপক্ষীয় নিয়ন্ত্রণ পরিষদ গঠন করেন। (৮) বার্লিন নগর যদিও সোভিয়েত এলাকার ভেতর ছিল, বার্লিনকে ৪ ভাগে ভাগ করে অধিকার করা হয়। (৯) যতদিন না জার্মানীর সঙ্গে সন্ধি হয় ততদিন অস্থায়ীভাবে পোল-জার্মান ভৌগোলিক সীমানা ওডার-নাইসী নদী বরাবর ধার্য করা হয়। (১০) পোল্যান্ডকে ডানজিগ, আপার ও লোয়ার সাইলেশিয়া, পূর্ব ব্র্যান্ডেনবার্গ, পোমিরানিয়া এবং পূর্ব প্রাশিয়ার দক্ষিণ ভাগ দেওয়া হয়। (১১) ফ্রান্সকে আলসাস-লোরেন দেওয়া হয়। (১২) বেলজিয়াম ইউপেন ও ম্যালমেডি পায়। (১৩) সুদেতেন জেলা পুনরায় চেকোস্লোভাকিয়াকে দেওয়া হয়। (১৪) অষ্ট্রিয়াকে দখলে রাখার জন্যে কয়েকটি সামরিক অঞ্চলে ভাগ করা হয়। (১৫) অষ্ট্রিয়াকে জার্মানী থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। (১৬) নাৎসী যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও দণ্ডদানের ব্যবস্থা করা হয়। (১৭) পরাজিত অক্ষশক্তি ও তার মিত্র দেশগুলির সঙ্গে সন্ধির খসড়া রচনার দায়িত্ব পটসডাম সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের সম্মেলনের ওপর অর্পন করা হয়। (১৮) পারস্য থেকে মিত্রবাহিনী অপসারনের ব্যাপারে মতৈক্য হয়।

এইভাবে পটসডাম সম্মেলনের সমাপ্তি হয়। ফ্রেমিং-এর মতে, পটসডাম সম্মেলনের বাহ্যিক মতৈক্যের আড়ালে লুকিয়েছিল ইঙ্গ-মার্কিন জোট বনাম রাশিয়ার গভীর মতানৈক্য। এর ফলে পটসডাম সম্মেলন থেকেই পূর্ব-পশ্চিম ঠাণ্ডা লড়াই প্রকাশ্যে এসে পড়ে। পরবর্তী পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের সম্মেলনে শান্তি চুক্তি রচনার ক্ষেত্রে তীব্র মত বিরোধ দেখা দেয়। এই মত বিরোধের প্রধান ক্ষেত্র ছিল জার্মানী।

১· Carlton Hayes—Contemporary Europe Since 1870.

পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী শান্তিচুক্তিগুলি (The Foreign Ministers conferences and the Peace Treaties after the World War II) : পটসডামের শীর্ষ সম্মেলনে বৃহৎ শক্তির নেতারা স্থির করেন যে, বিজিত দেশগুলির সঙ্গে শান্তিচুক্তি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট দেশগুলির পররাষ্ট্র মন্ত্রীরা আলাপ-আলোচনার দ্বারা শান্তিচুক্তির খসড়া রচনা করবেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী বৈঠকে ক্ষুদ্র শক্তিগুলিকে আলোচনায় অংশ নিতে দেওয়া হলেও, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বৃহৎ চার শক্তির হাতেই রাখা হয়। চার বৃহৎ শক্তির প্রতিনিধি ছিলেন আমেরিকার বার্ণেস, ব্রিটেনের বেভিন, ফ্রান্সের বিদো ও রাশিয়ার মলোটোভ। ইতিমধ্যে ইয়াল্টা চুক্তি থেকে রাশিয়ার তথাকথিত বিচ্যুতি ও পটসডাম সম্মেলনের মতানৈক্য চার বৃহৎ শক্তির মধ্যে প্রচুর উত্তাপ সৃষ্টি করেছিল। কাজেই পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলনে তার ছায়া পড়ে। আলোচনা বৈঠক দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়, যথা ব্রিটেন, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তাঁদের সমর্থক ১৫টি রাষ্ট্র, অপরদিকে রাশিয়া ও তার অনুগত দেশগুলি ছিল।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন

I. শেষ পর্যন্ত ১৯৫৯ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী মাসে জার্মানী ছাড়া অপর পরাজিত শক্তিগুলির সঙ্গে সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। (১) ইতালীর সঙ্গে সন্ধির দ্বারা স্থির করা হয় যে, ইতালী মোট ৩৬০ মিলিয়ন ডলার (মতান্তরে ৩০০ মিলিয়ন ডলার) ক্ষতিপূরণ দেবে। এর মধ্যে যুগোশ্লাভিয়া একাই ১২৫ মিলিয়ন ডলার, গ্রীস ১০৫ মিলিয়ন এবং আবিসিনিয়া ২৫ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ পাবে। (২) ইতালী আড্রিয়াটিকের দ্বীপগুলি ট্রিয়েষ্ট ছাড়া যুগোশ্লাভিয়াকে ছেড়ে দেবে। (৩) ডোডেকানিজ দ্বীপপুঞ্জ গ্রীসকে এবং তার উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের কিছু অংশ ফ্রান্সকে ছেড়ে দেবে। (৪) ইতালীর আফ্রিকা সাম্রাজ্যের অন্তর্গত লিবিয়া, সোমালিল্যান্ড ও ইরিট্রিয়ার ওপর ইতালীর অধিকার লোপ করা হল। এই আফ্রিকা সাম্রাজ্য এখন জাতিপুঞ্জের ট্রাষ্টিশিপের হাতে থাকবে। (৫) ট্রিয়েষ্ট, ইষ্ট্রিয়া ও ভেনেসিয়ার একাংশ এখন স্বাধীন অঞ্চলরূপে ঘোষিত হল। (৬) ইতালীর আফ্রিকা উপনিবেশ এখন জাতিপুঞ্জের অছি পরিষদের হাতে থাকলেও, এগুলির ভবিষ্যৎ জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভায় স্থির করা হবে। (৭) ইথিওপিয়া ও আলবানিয়ায় ইতালীর ঔপনিবেশিক অধিকার লোপ করা হল। সম্রাট হাইলে সেলাসী আবার ইথিওপিয়ার অধিকার ফিরে পেলেন। (৮) ইতালীর সামরিক শক্তি হ্রাস করা হল। ফ্রান্স ও যুগোশ্লাভ সীমান্তে সকল ইতালীয় দুর্গ ও সামরিক ঘাঁটি ভেঙে ফেলা হল। ইতালীর যুদ্ধ জাহাজের সংখ্যা হ্রাস করে ২টি ও ক্রুজার ৪টি, যুদ্ধ বিমান ২০০ এবং সেনাসংখ্যা ২$\frac{১}{২}$ লক্ষ করা হল।

ইতালীর সঙ্গে সন্ধি

II. রুমানিয়ার সঙ্গে সন্ধির দ্বারা রুমানিয়া ট্র্যানসিলভানিয়া ফেরৎ পায়। এই স্থান ১৯৪০ খ্রীঃ হাঙ্গেরী দখল করে। রুমানিয়া বেসারাবিয়া ও বুকোভিনা সোভিয়েত ইউনিয়নকে এবং দক্ষিণ দোব্রুজা বুলগেরিয়াকে হস্তান্তর করে। রুমানিয়ার সেন্যসংখ্যা হ্রাস করা হয়।

রুমানিয়ার সঙ্গে সন্ধি

III. বুলগেরিয়ার সঙ্গে সন্ধির দ্বারা (১৯৪৭ খ্রীঃ) বুলগেরিয়া দক্ষিণ দোব্রুজা লাভ করে। গ্রীসকে ৪৫ মিলিয়ন ও যুগোশ্লাভিয়াকে ২৫ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। বুলগেরিয়ার সৈন্যসংখ্যা হ্রাস করা হয়।

বুলগেরিয়ার সঙ্গে সন্ধি

IV. হাঙ্গেরী ৩০০ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ দেয়।[১] এর বেশীর ভাগ অর্থ রাশিয়া পায়। ট্রানসিলভ্যানিয়া প্রদেশ রুমানিয়াকে ছেড়ে দেয়। হাঙ্গেরী তার রাজ্যের অন্তর্গত দানিয়ুব নদীর দক্ষিণ ভাগ চেকোশ্লোভাকিয়াকে ছেড়ে দেয়। হাঙ্গেরীর সৈন্যবল হ্রাস করা হয়।

হাঙ্গেরীর সঙ্গে সন্ধি

১· Carlton Hayes—Ibid.

V. ফিনল্যান্ডের সঙ্গে সন্ধির দ্বারা কোটসামো, কারেলিয়া ও ফিনল্যান্ড উপসাগরীয় কিছু অঞ্চল সোভিয়েত রাশিয়াকে ছেড়ে দিতে হয়। এছাড়া পোরখান অঞ্চলও রাশিয়াকে দিতে হয়। ১৯৪১ খ্রীঃ সীমারেখা ফিনল্যান্ড লাভ করে। ফিনল্যান্ডের উপকূলে রাশিয়াকে একটি নৌ-ঘাঁটি লীজ দিতে হয় এবং ৩০০ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ রাশিয়াকে দিতে হয়। ফিনল্যান্ডের অস্ত্রবল হ্রাস করা হয়।

ফিনল্যান্ডের সঙ্গে সন্ধি

VI. জার্মানীর ও অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে শান্তিচুক্তি স্থাপনের ব্যাপারে সোভিয়েত মন্ত্র মলোটোভের সঙ্গে মার্কিন মন্ত্রী বার্নেস ও ব্রিটেনের কেভিনের সঙ্গে তীব্র মতভেদ ও বাদানুবাদের ফলে এই দুটি দেশের সঙ্গে সন্ধি রচনা আপাততঃ স্থগিত থাকে।

অষ্ট্রিয়া ও জার্মানীর সঙ্গে সন্ধি স্থগিতকরণ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানী ও তার সমস্যা (Germany after World War II and the problems facing her) ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিজয়ী শক্তিগুলির পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের সম্মেলনে ইতালী প্রভৃতি পাঁচটি দেশের সঙ্গে সন্ধি স্বাক্ষর করা সম্ভব হয়, জার্মানীর সঙ্গে সন্ধি স্বাক্ষরের বিষয়ে রুশ মন্ত্রী মলোটোভের সঙ্গে পশ্চিমী শক্তির মন্ত্রীদের তীব্র মতবিরোধের ফলে আপাতঃ কোন শান্তি চুক্তির খসড়া রচনা সম্ভব হল না। এই মতবিরোধের বিভিন্ন কারণগুলির মধ্যে প্রধান ছিল যে, সোভিয়েত নেতারা জার্মানীতে এমন একটি সরকার চান যা হবে পোল্যান্ড, রুমানিয়া প্রভৃতির মতই সোভিয়েত ইউনিয়নের client বা satelite উপগ্রহ বিশেষ। আইজাক ডয়েৎসার[১] তাঁর ষ্ট্যালিনের ওপর লিখিত জীবনীগ্রন্থে বলেছেন যে, দুটি কারণে সোভিয়েতের এই দাবীকে অন্যায় বলা চলে না। (১) জার্মানী অন্ততঃ দুবার রুশ পশ্চিম সীমান্ত ভেঙে অতীতে রাশিয়াকে আক্রমণ করে বিধ্বস্ত করার উপক্রম করেছিল। (২) জার্মানীতে উগ্র জাতীয়তাবাদী সরকার গঠিত হলে রাশিয়ার দিক থেকে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা ছিল। সুতরাং জার্মানীতে মিত্রভাবাপন্ন অথবা তাঁবেদার সরকার গঠনের দাবীর মধ্যে ষ্ট্যালিনের আগ্রাসী মনোভাব প্রকটিত হয়, আইজ্যাক ডয়েৎসার একথা মনে করেন না। পূর্ব ইওরোপ ও পূর্ব জার্মানী নিয়ে ষ্ট্যালিন সম মনোভাবাপন্ন, মিত্ররাষ্ট্র গঠন দ্বারা রাশিয়াকে রক্ষার জন্যে একটি সুরক্ষিত বেষ্টনী (Cordon Sanitaire) গঠন করতে চায়।

জার্মানীর সঙ্গে সন্ধি সম্পর্কে রুশ শর্তগুলি

অপরদিকে ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জার্মানীতে রুশ মডেলের সরকার স্থাপনের ঘোর বিরোধী ছিল। তাদের যুক্তি ছিল যে, যুদ্ধোত্তর পূর্ব ইওরোপে লাল ফৌজের দখলদারীর সুযোগে সোভিয়েত ইউনিয়ন যেভাবে সর্বত্র মস্কোতে শিক্ষণ প্রাপ্ত, মস্কোপন্থী সরকার গঠন করে, সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাম্রাজ্য গঠন করছে, জার্মানীতে তা হতে দেওয়া হবে না। পোল্যান্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়ায় কমিউনিষ্ট শাসন নির্বাচন ছাড়াই স্থাপন করায়, রাশিয়ার সঙ্গে পশ্চিমী দেশগুলির এমনিতেই সম্পর্ক খারাপ হয়েছিল। এখন জার্মানী নিয়ে বিতর্ক দেখা দেয়।

পশ্চিমী গণতন্ত্রের বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গী

ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন নিয়ে রাশিয়া সর্বোচ্চ ক্ষতিপূরণ আদায় দাবী করে প্রস্তাব দিলে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মান ক্ষতিপূরণের তিক্ত অভিজ্ঞতা পশ্চিমী দেশগুলি ভোলেনি। কাজেই জার্মানীর অর্থনীতির ক্ষতি না করে ক্ষতিপূরণ নিতে পশ্চিমী দেশগুলি দাবী করে। রুশ অধিকৃত পূর্ব জার্মানী থেকে বহু কলকারখানা, মূল্যবান যন্ত্রপাতি রাশিয়া ক্ষতিপূরণ বাবদ নিয়ে যায়। পশ্চিমী দেশের অধিকৃত অঞ্চল থেকেও রাশিয়া ইয়াল্টা চুক্তি অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ বাবদ কলকারখানার যন্ত্রাংশ দাবী করে। এদিকে

ক্ষতিপূরণের শর্তে মতভেদ

১· Isaac Dentscher—Stalin.

কলকারখানা ভেঙে গেলে জার্মানীর অর্থনৈতিক ধ্বস দেখা দিতে থাকে। সুতরাং পশ্চিমী শক্তিগুলি তাদের প্রাপ্য ক্ষতিপূরণের শর্ত ত্যাগ করে। এতে রাশিয়ার সঙ্গে বিবাদ ঘটে। জার্মানীর প্রতি শিথিলতা ও পক্ষপাত দেখাবার অভিযোগ মলোটোভ তোলেন। মলোটোভের একঘেয়ে, ক্লান্তিকর, দীর্ঘ বক্তৃতা তাঁদের স্নায়ুকে পীড়িত করছে বলে মার্কিন মন্ত্রী মন্তব্য করেন।

মলোটোভের বিভিন্ন অভিযোগের মধ্যে ছিল যে ঃ (১) ফ্রান্স সমগ্র জার্মানীর জন্যে যুক্ত অর্থনৈতিক কমিশনে যোগ দিতে রাজী হচ্ছে না। (২) পশ্চিমী শক্তির অধিকৃত অঞ্চল থেকে রাশিয়ার প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া হচ্ছে না। (৩) সমগ্র জার্মানীর জন্যে একটি সরকার এবং তাতে কমিউনিষ্ট প্রতিনিধি গ্রহণের রুশ প্রস্তাবে পশ্চিমী শক্তি সম্মতি দিচ্ছে না। বিশেষতঃ ফরাসী প্রেসিডেন্ট দ্য গল রুশ প্রস্তাবের ঘোর বিরোধিতা করেন।

রাশিয়ার অভিযোগের কারণ

তাছাড়া জার্মানীকে নাৎসীবাদ থেকে মুক্ত করার কাজে উভয় পক্ষ আন্তরিকতার অভাব দেখায়। মার্কিন ঐতিহাসিক রবার্ট এরগ্যাং-এর মতে, রুশ অধিকৃত অঞ্চলে ভূতপূর্ব নাৎসীদের নামে মাত্র শোধন করে পপুলার ফ্রন্ট নামক কমিউনিষ্ট দলের সভ্য করে নেয়। অপরদিকে পশ্চিমী অধিকৃত অঞ্চলে নামকরা প্রধান নাৎসী নেতাদের গ্রেপ্তার ও বিচার ছাড়া সাধারণ নাৎসীদের শোধন করার কোন চেষ্টা করা হয়নি। আসলে পশ্চিমী শক্তিগুলি রুশ সাম্যবাদের বিরুদ্ধে জার্মানীর প্রতিরোধ শক্তিকে ভেঙে দিতে ইচ্ছুক ছিল না। কেবলমাত্র মিত্রপক্ষীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশন (Allied Control Commission) জার্মানীতে নাৎসী আইনবিধি ও নাৎসী সংগঠনগুলি ভেঙে দেন। বিদ্যালয়গুলিকে নাৎসী প্রভাব মুক্ত করা হয় এবং গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে নাৎসীদের বিতাড়িত করা হয়। কিন্তু এই ধরপাকড় বা পদচ্যুতির কাজ বেশীদূর এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। পশ্চিমী শক্তিগুলি উপলব্ধি করে যে, তাহলে পশ্চিম জার্মানী দুর্বল হয়ে পড়বে এবং কমিউনিজমের প্রভাব পশ্চিমে বাড়বে।

অনাৎসীকরণ নীতি প্রয়োগে অবহেলা ও তার কারণ

জার্মানীর যে সকল নাৎসী নেতা যুদ্ধাপরাধে জড়িত ছিলেন, একটি আন্তর্জাতিক সামরিক আদালতে বা নুরেমবার্গ আদালতে তাঁদের বিচার করা হয়। মোট ২৪জন জার্মান নেতাকে অভিযুক্ত করা হয় এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসেবে জার্মান সরকারের কাছ থেকে দখল করা দলিলপত্রাদি ব্যবহার করা হয়। এর মধ্যে ১২ জন জার্মান নেতাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলেও, হিটলারের দক্ষিণ হস্ত এবং বিমান বাহিনীর অধ্যক্ষ গোরিং বিষপানে আত্মহত্যা করেন। ৩ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়, এর মধ্যে আছেন হের হেস, যিনি এখনও কারাদণ্ড ভোগ করছেন। অর্থনীতিবিদ ডঃ শাখটকে মুক্তি দেওয়া হয়। নুরেমবার্গ আদালতের বিচারের রায় কিছুদিনের জন্যে বিশ্ব জনমতকে আলোড়িত করে। একদিকে আন্তর্জাতিক আইন, লীগের আইন, কেলগ-ব্রিয়াঁ চুক্তি প্রভৃতি ভঙ্গের জন্যে জার্মানী যেমন দোষী ছিল, কিন্তু সেই দোষ ছিল জার্মান রাইখের পরিচালকদের। সেনাপতি ও কর্মচারীরা তাঁদের হুকুম তামিল করেন। এজন্য তাঁরা শাস্তিযোগ্য কিনা এ বিষয়ে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেন। দ্বিতীয়তঃ, যুদ্ধের সময় মিত্রশক্তিও অনেক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আইন ভাঙে, জার্মানীর অসামরিক লোকেদের ওপর বোমা ফেলে, তার কোন বিচার হয়নি। যাই হোক, নুরেমবার্গ আদালতের রায় একটি নীতি প্রতিষ্ঠিত করে যে, আন্তর্জাতিক আইন ভাঙলে সহজে অব্যাহতি নেই।

জার্মান যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের সমস্যা

অতঃপর চার বিজয়ী শক্তির মধ্যে জার্মানীর পুনর্গঠন নিয়ে তীব্র বিরোধ দেখা দেয়। পূর্ব ইওরোপের পোল্যান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে উৎখাত হওয়া জার্মানরা পশ্চিম জার্মানীতে আশ্রয়ের জন্যে ভীড় করায়, জার্মানীর সমস্যা আরও জটিল হয়। শেষ পর্যন্ত পশ্চিমী শক্তিবর্গ

পশ্চিমীশক্তির F.R.G গঠন

(১৯৪৬ খ্রীঃ) প্রস্তাব দেয় যে, প্রাচীন প্রাশিয়াকে ১৭টি ভাগে বিভক্ত করে পশ্চিমী শক্তির অধীনে ১২টি ও সোভিয়েতের অধীনে ৫টি খণ্ড রাখা যেতে পারে।[১] এই ১৭টি খণ্ড নিয়ে জার্মানীতে একটি Federation বা যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা যেতে পারে। রাশিয়া এই প্রস্তাবে রাজী না হলে ব্রিটিশ ও মার্কিন সেনার অধিকৃত অঞ্চলকে যুক্ত করে Bizonia Scheme বা দুই জার্মানীর সংযুক্তি চালু করা হয়। পরে ফ্রান্স তাতে তার অধিকৃত অঞ্চল যুক্ত করায় Trizonia Scheme বা তিন অঞ্চলের যুক্ত জার্মানী গঠন করা হয়। এই তিন অঞ্চলে একই মুদ্রা ব্যবস্থা, অসামরিক শাসন ব্যবস্থা গঠন করা হলে, রাশিয়া ইয়াল্টা সন্ধি ভাঙার জন্যে তীব্র প্রতিবাদ জানায় এবং ঠাণ্ডা লড়াই তীব্র হয়। ১৯৪৮ খ্রীঃ লন্ডন সম্মেলনে ব্রিটেন, ফ্রান্স, মার্কিন দেশ, বেলজিয়াম, হল্যান্ড একমত হয় যে, সমগ্র জার্মানীর জন্যে ঐক্যবদ্ধ সংবিধান যতদিন না গঠিত হবে ততদিন তিন মিত্রশক্তির অধিকৃত পশ্চিম জার্মানীকে নিয়ে জার্মান প্রজাতান্ত্রিক সরকার (F. R. G বা Federal Republic of Germany) গঠিত হবে। এই প্রজাতন্ত্রে গণভোটে পার্লামেন্ট বা ফেডারেল ডায়েট নির্বাচিত হবে। এই প্রজাতন্ত্রের হাতে পশ্চিম জার্মানীর শাসনভার দেওয়া হবে এবং মিত্রপক্ষের সামরিক শাসনের অবসান ঘটবে। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে F.R.G. সরকার বিপুল উদ্দীপনায় গঠিত হয় এবং এই সরকারের রাষ্ট্রপতির পদে বসেন থিওডোর হেস এবং প্রধানমন্ত্রী হন কনরাড এ্যাডেন্যুর। এই সরকারের রাজধানী বন (Bonn) নগরীতে স্থাপিত হয়। F.R.G তার নিজের আইন, মুদ্রা, পুলিশ, শাসনব্যবস্থা গঠন করে এবং পশ্চিম জার্মানীর অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের কাজে হাত দেয়।

স্বভাবতই ঠাণ্ডা লড়াই-এর পরিপ্রেক্ষিতে F.R.G সরকার গঠিত হলে সোভিয়েত ইউনিয়ন তা বিপজ্জনক, প্রতারণামূলক ও আগ্রাসনমূলক সিদ্ধান্ত বলে পশ্চিমী শক্তিগুলিকে আক্রমণ

G.D.R গঠন

করে। রাশিয়া প্রচার চালায় যে, এই নব গঠিত F.R.G.কে অস্ত্রে সজ্জিত করে রুশ এলাকা আক্রমণের ছক তৈরি করা হচ্ছে। যাই হোক, পশ্চিমী শক্তির দ্বারা F.R.G গঠনের ফলে পূর্ব জার্মানীর রুশ অধিকৃত অঞ্চল নিয়ে রাশিয়া একটি পাল্টা সরকার গঠন করে। এই সরকারের নাম ছিল G. D. R বা German Democratic Republic। পশ্চিমী ঐতিহাসিকদের মতে, পশ্চিম জার্মানীতে যেমন সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে F.R.G. ডায়েট গঠিত হয়, রুশ অধিকৃত অঞ্চলে কোন সাধারণ নির্বাচন করা হয়নি। মস্কোতে শিক্ষাপ্রাপ্ত কমিউনিষ্ট নেতা অটো গ্রোটেওলের নেতৃত্বে সোস্যাল ইউনিটি পার্টি নামে এক কমিউনিষ্ট দলের বাছাই করা লোকদের সাহায্যে ১৯৪৮ খ্রীঃ একটি তথাকথিত "জন পরিষদ" (People's Council) গঠিত হয়। ১৯৪৯ খ্রীঃ এই জন পরিষদকেই পার্লামেন্ট বা Chamber বলে ঘোষণা করা হয় এবং এই তথাকথিত পার্লামেন্ট সোভিয়েত মডেলে একটি সংবিধান ঘোষণা করে, যার ফলে G.D.R. সরকার বা জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতান্ত্রিক সরকার ঘোষিত হয়। এইভাবে জার্মানী পূর্ব অর্থাৎ রুশ অধিকৃত এবং পশ্চিম অর্থাৎ পশ্চিম অধিকৃত দুই জার্মানীতে ভাগ হয়ে যায়। দুই জার্মানীতে দুই পক্ষের তাঁবেদার সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

পূর্ব-পশ্চিম দুই বিবাদমান শক্তি শিবিরের ঠাণ্ডা লড়াই-এর ফলে জার্মানীর সঙ্গে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর ছিল সুদূর-পরাহত। অধিকন্তু এই দুই শিবির জার্মানীকে দুভাগে ভাগ করে দুটি আলাদা

পশ্চিম জার্মান বা F.R.G সরকারের অগ্রগতি

রাষ্ট্র গঠন করে। বিসমার্ক যে জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করেন, যে ঐক্যবদ্ধ জার্মানীকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরেও ব্যবচ্ছেদ করা হয়নি, এখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সেই জার্মানী দুভাগে ব্যবচ্ছেদ হয়ে যায়। এই ব্যবচ্ছেদ জার্মান জনগণের ইচ্ছানুযায়ী হয়, তা বলা যায় না। বিজয়ী শক্তিগুলি

১· Carlton Hayes. P. 702.

ঠাণ্ডা লড়াই ও শক্তিসাম্যের কারণে জার্মানীকে ব্যবচ্ছেদ করেন। জার্মান জাতির জাতীয়তাবাদী ঐক্যকে এজন্য বলি দেওয়া হয়। মিত্রশক্তির অর্থনৈতিক সহায়তায় পশ্চিম জার্মানী বা F. R. G. দ্রুত উন্নতি লাভ করে। পশ্চিম জার্মানীর কল-কারখানাগুলি পশ্চিমী শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখার ফলে F. R. G-র শিল্প উৎপাদনের হারও দ্রুত বাড়তে থাকে। এই সঙ্গে পশ্চিম জার্মানীর জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উঁচু হতে থাকে। পরিশ্রমী, আত্মবিশ্বাসী জার্মান জাতি F. R. G. সরকারের মুক্ত অর্থনীতির সুযোগে শীঘ্রই যুদ্ধের ক্ষত নিরাময় করে নবীন উদ্যমে গঠনের কাজ চালায়। যে জার্মানীর প্রতি ৪টি বাড়ির ১টি মিত্রশক্তির বোমা বর্ষণে ভেঙে গিয়েছিল, সেই F. R. G. নতুন চেহারা ও যৌবনের তেজী স্বাস্থ্য নিয়ে গড়ে ওঠে। ফ্রান্সের সঙ্গে জার্মানীর যে সীমান্ত ঘটিত ও খনিজ সম্পদ ঘটিত বিবাদ ছিল তা BENELUX গোষ্ঠীর মধ্যস্থতায় সন্তোষজনকভাবে মিটে যায়। F. R. G. অস্ত্রবলেও বলীয়ান হয়।

তুলনামূলকভাবে রুশ অধিকৃত পূর্ব জার্মানী ও শাসক G. D. R. ছিল ভয়ানক দরিদ্র অর্থনৈতিক সমস্যায় জর্জরিত এবং পূর্ব ইওরোপ থেকে বিতাড়িত জার্মান শরণার্থীদের ভারে জর্জরিত। রুশ নিয়ন্ত্রিত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির শাসন মেনে, পূর্ব জার্মানী বা G. D. R-এর খোলাখুলি প্রতিযোগীতামূলক অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বেসরকারী স্তরে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগ ছিল না। পোল্যান্ড প্রভৃতি আর পাঁচটা রুশ তাঁবেদার সরকারকে যেমন রুশ নিয়ন্ত্রণ ও পরিকল্পনা মেনে কাজ করতে হয়, G. D. R-এর তা থেকে ব্যতিক্রম ছিল না। দুই জার্মানীর এই বৈষম্যমূলক অবস্থা ছিল দৃষ্টিকটু এবং জার্মান জাতির মানসিক হতাশার কারণ। পশ্চিম জার্মানী বা F. R. G. মার্কিন অর্থনৈতিক সহায়তা Marshall Plan অনুযায়ী ঋণ গ্রহণ করে তার অর্থনীতিকে চাঙ্গা করলে, সোভিয়েত নেতারা ভয়ানক ক্রুদ্ধ হন।

পূর্ব জার্মানী বা G.D.Rএর দারিদ্র্য ও অনগ্রসরতা

১৯৪৮ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে সোভিয়েত সরকার অকস্মাৎ পশ্চিম বার্লিনের সঙ্গে সংযোগ রক্ষাকারী রাস্তা এবং রেলপথ ও খালের পথ দিয়ে পশ্চিম জার্মানীর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেন। স্মরণ রাখা দরকার যে, ইয়াল্টা চুক্তি অনুযায়ী বার্লিনকে চার ভাগে ভাগ করা হয়। শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ, মার্কিন ও ফরাসী শাসিত বার্লিন মিলে পশ্চিম বার্লিন গঠিত হয়। বাকী অংশ ছিল সোভিয়েত শাসিত পূর্ব বার্লিন। পশ্চিম বার্লিন সোভিয়েত শাসিত পূর্ব জার্মানীর মধ্য দিয়ে রেল ও রাস্তা দ্বারা পশ্চিম জার্মানীর সঙ্গে যুক্ত ছিল। এখন এই যোগাযোগের পথ অবরোধ করা হলে পশ্চিম বার্লিনের ২ মিলিয়ন জার্মানের না খেতে পেয়ে মরা ছাড়া পথ ছিল না। সোভিয়েত নেতারা বার্লিন অবরোধ দ্বারা পশ্চিমী শক্তিকে শিক্ষা দিতে চান। পশ্চিমী শক্তি বার্লিন অবরোধের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্যে প্রতিজ্ঞা করেন। প্রায় ১১ মাস ধরে মিত্রপক্ষ বিমান দ্বারা আকাশ পথে ২ মিলিয়ন পশ্চিম বার্লিনের জার্মানদের ২½ মিলিয়ন টন খাদ্য, কয়লা, তেল, ঔষধ প্রভৃতি সরবরাহ করেন। মিত্রপক্ষীয় সেনা পশ্চিম বার্লিন রক্ষার জন্যে আকাশ পথে নেমে পড়ে। সমগ্র বিশ্ব বিস্ময়ে এই অভূতপূর্ব আকাশ পরিবহণ লক্ষ্য করে। সোভিয়েত সরকার শেষ পর্যন্ত পশ্চিম বার্লিনের যোগাযোগকারী রাস্তা খুলে দেন। বার্লিন অবরোধ বিফলতায় পর্যবসিত হয়। তাদের অধিকৃত অঞ্চল রক্ষার জন্যে পশ্চিমী শক্তির ঐক্য ও দৃঢ় মনোবল লক্ষ্য করে রাশিয়াকে আগ্রাসন ত্যাগ করে সহাবস্থান নীতি নিতে বাধ্য হতে হয়।

সোভিয়েত সরকার কর্তৃক বার্লিন অবরোধ ও পশ্চিমী শক্তির চ্যালেঞ্জ গ্রহণ

সোভিয়েত সরকার লক্ষ্য করেন যে, পশ্চিম বার্লিনের জীবনযাত্রার স্বচ্ছলতা ও কর্মসংস্থানের লোভে দরিদ্র, অনগ্রসর পূর্ব বার্লিন থেকে লোকে পশ্চিমে পালাচ্ছে। এই

বার্লিন প্রাচীর নির্মাণ : দুই জার্মানী

অভিপ্রয়াণ বন্ধের জন্যে সোভিয়েত অধিকৃত বার্লিনের সীমানা বরাবর ঐতিহাসিক বার্লিনের প্রাচীর নির্মাণ করা হয়। লোক পালাতে চেষ্টা করলে রক্ষীরা তাদের গুলি করে নিহত করে। ৯০-এর দশকে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর দুই জার্মানী পুনরায় এক হয়ে গেছে এবং বার্লিনের প্রাচীর ভেঙে ফেলা হয়েছে। এখন ভবিষ্যৎ বলতে পারে জার্মানী ইওরোপের ইতিহাসে পুনরায় কি ভূমিকা নেবে?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইওরোপের চিত্র : পূর্ব ইওরোপে রুশ আধিপত্যের প্রকৃতি (The Profile of Europe after the World War II : The Nature of Soviet occupation in East Europe) : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অক্ষশক্তির পতনের পর বিজয়ী ইওরোপীয় শক্তিগুলির অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জনবল, জাতীয় সম্পদ, শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষয়ক্ষতির ধাক্কায় বিজয়ী ব্রিটেন, ফ্রান্স

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্ব শক্তিসাম্যের পরিবর্তন : স্পেঙ্গলার তত্ত্ব : মার্কিন দেশ ও রাশিয়ার উত্থান

প্রভৃতি দেশগুলিতে আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক ধ্বস দেখা দেয়। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। যুদ্ধের প্রত্যক্ষ আক্রমণের ক্ষয়ক্ষতি মার্কিন দেশকে স্পর্শ করেনি। একদা স্পেঙ্গলার (Spengler) তাঁর Decline and Downfall of the European Civilisation গ্রন্থে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে, ইতিহাসের গতিতে ইওরোপীয় সভ্যতার ধারক ও বাহক প্রাচীন দেশগুলির প্রভাব-প্রতিপত্তি ক্ষয় পেয়ে যাবে। ইওরোপের দুই প্রান্তিক রাষ্ট্র পূর্বে রাশিয়া এবং পশ্চিমে মার্কিন দেশ তাদের বিশাল জনবল ও সম্পদ নিয়ে প্রভূত্ব অর্জন করবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইওরোপে যেন স্পেঙ্গলারের ভবিষ্যৎবাণী ফলতে চলেছিল বলে অনেকে মনে করেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটেন তার বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য হারাতে থাকে এবং হীনবল হয়ে পড়ে। জার্মানীর বোমা বর্ষণে ব্রিটেনের লন্ডন সহ বড় শিল্প শহরগুলি, বন্দর ও ডকগুলি প্রায়

ব্রিটেনের অর্থনৈতিক সঙ্কট

ধ্বংস হয়েছিল। ঘরবাড়িগুলি ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়। ব্রিটেনের অর্থনীতি ভেঙে পড়ে, বিশ্বের বাজারে ব্রিটিশ পণ্য রপ্তানি বন্ধ হয়। কৃষিক্ষেত্রগুলি অনাবাদী পড়ে থাকে। যন্ত্রপাতি, সার ও বীজের যোগান দেওয়া সম্ভব ছিল না। ফলে ব্রিটেনে খাদ্য সঙ্কট দেখা দেয়। আমেরিকা থেকে গম আমদানী করে খাদ্য সঙ্কটের মোকাবিলা করতে হয়। যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থাও ভেঙে পড়ে। কাঁচামাল ও কয়লার সরবরাহের অভাবে কল-কারখানায় ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন হ্রাস পায়। এই যুদ্ধে ব্রিটেনের প্রায় ৪ লক্ষ লোক নিহত হয়, বহু লক্ষ লোক আহত হয়। ব্রিটেনের বৈদেশিক বাণিজ্য ৫০% হ্রাস পায় এবং বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩০০০ মিলিয়ন পাউন্ড। যুদ্ধে ১৭০০ মিলিয়ন জাতীয় সম্পত্তি বিনষ্ট হয়। ব্রিটেন তার ভূতপূর্ব উপনিবেশগুলি দখলে রাখতে অসমর্থ হলে, একে একে ছেড়ে চলে যায়। ভারতবর্ষ থেকে ১৯৪৭ খ্রীঃ ব্রিটেন তার আধিপত্য ত্যাগ করে। অর্থনৈতিক সঙ্কটের সঙ্গে যুদ্ধ ফেরৎ সেনাদের ভাতা প্রদান ও পুনর্বাসনের সমস্যা দেখা দেয়। ব্রিটেনকে বাধ্য হয়ে তার স্থল ও নৌ-বহর হ্রাস করতে হয়। ব্রিটেনের সামরিক শক্তি খর্বিত হয়।

ফ্রান্স ছিল ইওরোপের গণতন্ত্রের অপর প্রধান স্তম্ভ। ফ্রান্সের অবস্থা ছিল ব্রিটেনের অপেক্ষা বহুগুণ খারাপ। ১৯৪০ খ্রীঃ নাৎসী আক্রমণের ফলে ফ্রান্সের একাংশ জার্মানীর প্রত্যক্ষ শাসনে চলে যায়। যে অংশ জার্মানী অধিকার করেনি সেখানে নাৎসী তাঁবেদার ভিসি সরকার স্থাপিত হয়। ১৯৪৪ খ্রীঃ মিত্রশক্তি ফ্রান্সে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার পর আফ্রিকায় স্বাধীন ফরাসী সরকারের প্রতিষ্ঠাতা সেনাপতি দ্য গল ফ্রান্সে ফিরে এলে, জার্মান অধিকার মুক্ত, ফরাসীরা

ফ্রান্সে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সঙ্কট

তাঁকে সাগ্রহে বরণ করে। দ্য গল জার্মান শাসন মুক্ত ফ্রান্সে এক স্বাধীন ৪র্থ প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করেন। কিন্তু নির্বাচনে দেখা যায় যে, আইনসভায় কোন দল নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা পায়নি। তিনটি প্রধান দল যথা কমিউনিষ্ট, সোস্যালিষ্ট ও M.R.P. কোয়ালিশন সরকার গঠন করলেও অংশগ্রহণকারী দলগুলির মধ্যে মনান্তরের জন্যে কোন মন্ত্রীসভা স্থায়ী হতে পারেনি। সংবিধানে প্রেসিডেন্ট বা রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা কম থাকার ফলে তিনিও স্থায়ী সরকার গঠনে অক্ষম হন। ১৯৪৬—১৯৫৮ খ্রীঃ পর্যন্ত প্রায় ১৪ জন প্রধানমন্ত্রী একের পর এক ক্ষমতায় এসে চলে যেতে বাধ্য হন। এদিকে ফ্রান্সের শিল্প ও আভ্যন্তরীণ অর্থনীতির ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা ও ধর্মঘটে ফ্রান্স ধ্বংসের পথে চলে। ফ্রান্সের বৈদেশিক নীতিতেও তার প্রাপ্য মর্যাদা দেওয়া হয়নি। ইয়াল্টা, পটসডাম শীর্ষ সম্মেলনে ফ্রান্সকে আহ্বান জানানো হয়নি। তবে দ্য গলের দাবীর ফলে অধিকৃত জার্মানীর একটি অঞ্চল ফ্রান্সের অধীনে রাখা হয়।

ফ্রান্সে মার্শাল পরিকল্পনার সুফল : দ্য গলের ৫ম প্রজাতন্ত্র ও স্থিতি স্থাপন

ফ্রান্সে রাজনৈতিক টানা পোড়েনের মাঝে অর্থমন্ত্রী জঁা মোনেৎ মার্শাল পরিকল্পনার বরাদ্দ অর্থ ও স্বদেশের সম্পদকে কাজে লাগিয়ে ভারী শিল্প গড়ে তোলেন। ১৯৫৮ খ্রীঃ চতুর্থ প্রজাতন্ত্র লোপ করে পঞ্চম প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করার পর থেকে দ্য গলের ক্ষেত্রে ফ্রান্স দ্রুত উন্নতি লাভ করে এবং ইওরোপের অন্যতম প্রধান শক্তিতে পরিণত হয়।

সার্বিকভাবে বলা যায় যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে পশ্চিম ইওরোপের দুই গণতান্ত্রিক শক্তি নড়বড়ে হয়ে পড়ে। ফ্রান্স, ইতালী সহ অধিকাংশ দেশে বিশ্বযুদ্ধের পর নির্বাচনের ফলে বামপন্থী বা কমিউনিষ্টরা যথেষ্ট সংখ্যক সদস্যপদ লাভ করে এবং কোয়ালিশন সরকার গঠনে বাধ্য করে। রাশিয়ার যুদ্ধে নাৎসী জার্মানীর পরাজয় রাশিয়ার মর্যাদা বৃদ্ধি করে। এই সুযোগে পশ্চিমী গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে কমিউনিষ্টরা ভোটে ভাল ফল করতে থাকে। তাছাড়া নাৎসী শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধে প্রধান ভূমিকা নেওয়ায় কমিউনিষ্টদের জনপ্রিয়তা বাড়ে। ফলে অধিকাংশ দেশে যুদ্ধোত্তর নির্বাচনে কমিউনিষ্ট দলের সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়। কিন্তু পশ্চিমী গণতন্ত্রে আশঙ্কা দেখা দেয় যে, কমিউনিষ্টরা প্রলেতারিয় শ্রেণী বিপ্লব দ্বারা ক্ষমতা দখল করে নিতে পারে। রুশ কমিনফর্মের নির্দেশে তারা চালিত হচ্ছে। এজন্য কোয়ালিশন সরকারগুলি সন্তোষজনকভাবে কাজ করতে পারেনি। ফ্রান্স ও ইতালী ছিল পশ্চিম ইওরোপে কমিউনিষ্টদের শক্ত ঘাঁটি। কল-কারখানায় লাগাতার ধর্মঘট প্রভৃতির কারণে কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে একটি জাতীয়তাবাদী দল গড়ে ওঠে।

পশ্চিমী দেশের নির্বাচনে কমিউনিষ্ট দলগুলির সফলতা ও সরকারী ক্ষমতা লাভ

পশ্চিম ইওরোপের অন্যান্য দেশগুলি যথা বেলজিয়াম, হল্যান্ড, ডেনমার্ক প্রভৃতি জার্মান অধিকার থেকে মুক্তিলাভের পর গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠন করে ধীরে ধীরে অর্থনৈতিক অগ্রগতি লাভ করে। মার্শাল পরিকল্পনা অনুযায়ী ঋণ গ্রহণ করে দ্রুত আর্থিক উন্নতি ঘটায়।

স্ক্যান্ডিনেভিয়ান রাষ্ট্রগুলির অবস্থা

পূর্ব ইওরোপে সোভিয়েত অধিকৃত অঞ্চলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যে ধ্বংস ও ভাঙন দেখা দেয় তা সোভিয়েতপন্থী তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলির শাসনে মেরামত করা যায়নি। পূর্ব-পশ্চিম ঠাণ্ডা লড়াই-এর ফলে উভয় পক্ষের নীরব যুদ্ধ প্রস্তুতি চলায় গঠনমূলক কাজে ভাঁটা পড়ে। ইয়াল্টা চুক্তিতে রাশিয়াকে পূর্ব প্রাশিয়ার বৃহৎ অংশ, চেকোশ্লোভাকিয়ার কার্পাথে-রুঠেনিয়া অঞ্চল এবং রুমানিয়ার বুকোভিনা অঞ্চল ছেড়ে দেওয়া হয়। গোটা পূর্ব ইওরোপ, গ্রীস বাদে জার্মানীর হাত থেকে মুক্ত হলে

পূর্ব ইওরোপে সোভিয়েত আধিপত্য

সোভিয়েত লাল ফৌজের দখলদারীতে থাকে। যতদিন না এই দেশগুলির সঙ্গে মিত্রপক্ষের সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়, ততদিন লাল ফৌজের দখলে এই অঞ্চল রাখা হয়। তবে ইয়াল্টা চুক্তিতে স্থির ছিল যে, লাল ফৌজের দখলদারী থাকলেও এই অঞ্চলে অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠন করা হবে। বিজয়ী পশ্চিমী শক্তিগুলির এমন লোকবল ও অর্থবল ছিল না যে, তারা এই বিস্তৃত অঞ্চল জার্মান কবলমুক্ত হলে, দখলদারীতে রাশিয়ার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। রাশিয়ার হাতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ছিল বিশ্বের সর্বোচ্চ সংখ্যক স্থলবাহিনী। কাজেই এই দায়িত্ব মিত্রশক্তি রাশিয়ার ওপর ছেড়ে দেয়। যতদিন রুজভেল্ট জীবিত ছিলেন ততদিন ষ্ট্যালিনের সঙ্গে তাঁর আস্থাসূচক বোঝাপড়া থাকায় এই ব্যবস্থা করা হয়। এই অঞ্চলে রুশ সেনাদলের আধিপত্য Physically বা শারীরিকভাবেই ছিল। কারণ জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় এই অঞ্চলগুলি লাল ফৌজই মুক্ত করেছিল। এলব ও আড্রিয়াটিক পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চলই লাল ফৌজের দখলে ছিল। যুদ্ধ ক্লান্ত পশ্চিমী গণতন্ত্রগুলির নিজ নিজ দেশে জনমত, তাদের দেশবাসীদের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে স্বদেশে ফিরিয়ে আনতে এমন চাপ দেয় যে, ব্রিটেন, ফ্রান্স বা মার্কিন দেশের পক্ষে উপরোক্ত অঞ্চলে সেনা পাঠাবার কোন প্রশ্নই ছিল না।

পরবর্তী সময়ে দেখা গেল যে, পূর্ব ইওরোপের এই দখলীকৃত অঞ্চলে রাশিয়া তার নিজ মনোমত প্যাটার্নের এক শ্রেণীর তাঁবেদার সমাজতান্ত্রিক সরকার স্থাপন করে। এই প্যাটার্নটি ছিল নিম্নরূপ:—(১) যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে পোল্যান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি দেশে যে সরকার বিদ্যমান ছিল এবং জার্মানী সেই দেশ অধিকার করায় কোন কোন সরকার বিদেশে চলে গিয়ে নির্বাসিত সরকার চালু করে। লাল ফৌজ দখলদারী নেওয়ার পর, সেই সরকারগুলিকে রাশিয়া ফ্যাসিষ্ট আখ্যা দেয় এবং ক্ষমতায় ফিরতে কোন সুযোগ দেয়নি। উদাহরণস্বরূপ, লন্ডনে পোল্যান্ডের নির্বাসিত সরকারের কথা বলা যায়। (২) এর স্থলে পপুলার ফ্রন্ট (Popular Front) নামধারী এক ধরনের সরকার লাল ফৌজ অধিকৃত দেশগুলিতে চাপান হয়। এই সরকার দৃশ্যতঃ কোয়ালিশন সরকার হলেও গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি যথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, সামরিক মন্ত্রী, প্রচার ও অর্থমন্ত্রীর পদগুলি মস্কোতে শিক্ষণপ্রাপ্ত, বিশ্বস্ত স্থানীয় কমিউনিষ্ট নেতাদের হাতে রাখা হয়। (৩) এর পরবর্তী পর্যায়ে রাশিয়ার নির্দেশে এবং স্থানীয় লাল ফৌজের সেনাপতির সহায়তায় মস্কোতে বিশেষ শিক্ষণ প্রাপ্ত স্থানীয় কমিউনিষ্ট নেতাকে সরকার গঠন করতে দেওয়া হয় এবং অকমিউনিষ্ট সদস্যদের বহিষ্কার করে স্থানীয় কমিউনিষ্ট পার্টির ডিক্টেটরশিপ গঠন করা হয়। (৪) অতঃপর এই পার্টি ডিক্টেটরশিপের নেতৃত্বে সোভিয়েত মডেলে একটি সংবিধান রচনা করে নিয়ন্ত্রিত নির্বাচনের মাধ্যমে তা বৈধ ঘোষণা করা হয়। (৫) অতঃপর এই সংবিধানের সমর্থক শ্রেণী, তা যত ক্ষুদ্রই হোক, বৈধ ও অবৈধ প্রশাসনিক বা প্রশাসন বহির্ভূত পেশী ক্ষমতা দ্বারা সংবিধান বিরোধী বা সংবিধানের প্রতি নিরপেক্ষ লোকেদের প্রয়োজন নিশ্চিহ্ন করে দেয় অথবা সন্ত্রাস দ্বারা নিষ্ক্রিয় করে রাখে। (৬) এই মডেলে গঠিত সরকারগুলির মস্তিষ্ক ও স্নায়ু সোভিয়েত নেতাদের কাছে বাঁধা ছিল। তারা স্বাধীনভাবে সমাজতান্ত্রিক পথে নিজ নিজ দেশে কোন প্রকার সংস্কার বা আইন চালু করতে পারত না। তাহলে সোভিয়েত নেতারা রক্তচক্ষু দেখিয়ে অথবা লাল ফৌজের সাহায্যে অবাধ্য তাঁবেদারকে ধরাশায়ী করে ফেলতেন। এরকম ঘটনা পোল্যান্ডে গোটোওয়ালের, হাঙ্গেরীতে ইমরেলেগি এবং চেকোশ্লোভাকিয়ায় আলেকজান্ডার ডুবচেকের বিরুদ্ধে ঘটেছিল। অথচ এঁরা ছিলেন প্রত্যেকে খাঁটি সমাজতন্ত্রবাদী। তাঁরা চান নিজ নিজ দেশের উপযোগী করে মস্কো মডেলের বাইরে সমাজতন্ত্রকে গড়ে তুলতে। তাঁদের এজন্য শোচনীয় পরিণাম ভোগ

সোভিয়েত সাম্রাজ্যবাদ : পূর্ব ইওরোপে রাশিয়ার নেতৃত্বে পপুলার ফ্রন্ট সরকার গঠন ও তার প্রকৃতি

করতে হয়। যতদিন ষ্ট্যালিন জীবিত ছিলেন (১৯৫৩ খ্রীঃ) ততদিন ঐতিহাসিক দ্বিটা আইয়োনেস্কুর মতে, পূর্ব ইওরোপে সোভিয়েত মডেলের সমাজতন্ত্র থেকে সামান্যতম বিচ্যুতি, স্থানীয় জাতিগত চেতনা, আত্মবিকাশের আকাঙ্খাকে লৌহমুষ্টিতে চেপে রাখা হয়।[১]

পূর্ব ইওরোপের এই সোভিয়েত করণ প্রক্রিয়ার উপরোক্ত রাজনৈতিক দিক ছাড়া আরও বিভিন্ন দিক ছিল। সোভিয়েত নেতারা জানতেন যে, সোভিয়েতের মতাদর্শ ও সোভিয়েতপন্থী শাসন ব্যবস্থাকে ধরে রাখতে হলে একটি বিশেষ ধরনের অর্থনৈতিক প্যাটার্ন ও সাংস্কৃতিক প্যাটার্ন গঠন করা দরকার। নতুবা ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া এই ব্যবস্থা উপযুক্ত অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভিত্তির অভাবে ভেঙে পড়বে। এজন্য রাজনৈতিক কমিউনাইজেশন বা সোভিয়েটাইজেশন বা সোভিয়েতকরণের সঙ্গে সঙ্গে সহকারী অর্থনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে এক বিশেষ ছাঁচে ঢেলে ফেলার ব্যবস্থা করা হয়।

সোভিয়েত করণ নীতি

রাজনৈতিক স্তরে সোভিয়েত মডেলে গঠিত সরকারগুলির বিশেষ ধরনের নামকরণ করা হয়, যথা, 'জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট' (National Liberation Front) ফাদারল্যান্ড ফ্রন্ট, জাতীয় স্বাধীনতা ফ্রন্ট (National Independence Front) প্রভৃতি। এগুলি ছিল একই ছাঁচে ঢালা সোভিয়েতপন্থী সরকার ছাড়া আর কিছু নয়।

সোভিয়েত করণের রাজনৈতিক প্রক্রিয়া

দ্বিতীয়তঃ, পূর্ব ইওরোপের এই নবগঠিত পপুলার ফ্রন্ট সরকারগুলি ভূমিসংস্কার এবং জাতীয়তাবাদ প্রচারে বিশেষ উদ্যোগ নেয়। প্রাক-যুদ্ধকালীন সরকারগুলি ছিল বুর্জোয়া ও সামন্তপন্থী। তারা মূলধনী শ্রেণী ও জমি মালিকদের স্বার্থরক্ষা করত। এটাই ছিল তৎকালীন সরকারগুলির মারাত্মক ত্রুটি। এখন কমিউনিষ্ট প্রভাবিত পপুলার ফ্রন্ট সরকার ভূমিসংস্কারকে অগ্রাধিকার দেয়। তার ফলে এক অনুগামী কৃষক শ্রেণী এই সরকারকে সমর্থন করে, সরকারের প্রচারে প্রভাবিত হয়। বৃহৎ জমিদারীগুলিকে বাজেয়াপ্ত করে কৃষকদের মধ্যে ভূমি বণ্টন করা হয়। দ্বিতীয়তঃ, বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির ছিদ্র অন্বেষণ করে তাদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রচার দ্বারা নিশ্চিহ্ন করা হয়। ক্রেমলিন নেতারা পূর্ব ইওরোপের জনগণকে একথা বোঝান যে, পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে তাদের সোভিয়েত দেশের সঙ্গে এক হয়ে চলা দরকার। পোল্যান্ড, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরী, চেকোশ্লোভাকিয়া সর্বত্রই একই প্যাটার্নে ক্ষমতা অধিগ্রহণ ও সংগঠন চালু করা হয়।

ভূমিসংস্কার ও ভূমিবণ্টন নীতির মাধ্যমে অর্থনৈতিক সোভিয়েত করণ

জনমতকে প্রভাবিত করার জন্যে ক্লাব, লজ, খেলাধূলার সংগঠনগুলিকেও কমিউনিষ্ট প্রচারের ভিতর আনা হয়। যে সকল সাংবাদিক বা বেতার প্রচারক কমিউনিষ্টপন্থী সংবাদ পরিবেশনে অস্বীকার করেন তাঁরা পদচ্যুত হন। বিচার বিভাগের স্বাধীন চিত্ত বিচারকদের পদচ্যুত করে বিচার বিভাগের কমিউনিষ্টকরণ করা হয়। আইনজীবিদের নতুন ভাবে "আইনজীবি পরীক্ষা" দিয়ে তবেই এই পেশা অনুসরণের জন্যে লাইসেন্স দেওয়া হয়। বিদ্যালয়গুলি থেকে অকমিউনিষ্ট শিক্ষকদের বিতাড়িত করা হয়। যে বাণিজ্য বা শিল্প প্রতিষ্ঠানে ৫০ জনের বেশী কর্মী কাজ করতেন সেগুলির রাষ্ট্রীয়করণ করা হয়। নতুন শিল্পদ্যোগী বা বাণিজ্যকারীদের লাইসেন্স পেতে হলে পুলিশের কাছ থেকে সন্তোষজনক রিপোর্ট যোগাড় করতে বাধ্য করা হয়। যে সকল জমি মালিকের ১২৫ একর জমি ছিল তা বাজেয়াপ্ত করা হয়। যাদের জমির পরিমাণ এই সীমার নীচে ছিল তাদের যৌথ খামারে যোগ দিতে বাধ্য করা হয়।

সাংস্কৃতিক সোভিয়েত করণ ভূমিবণ্টন

১· Carlton Hayes—Europe after 1870.

প্রচলিত শাসনব্যবস্থার সমালোচকদের নানাভাবে হেনস্থা করে মুখ বন্ধ করতে বাধ্য করা হয়। বুলগেরিয়ার বিখ্যাত কমিউনিষ্ট নেতা জর্জ দিমিত্রভ বলেন যে, "সোভিয়েত রাশিয়ার শাসন এবং পূর্ব ইওরোপে পপুলার ডেমোক্রেসীর শাসন একই মুদ্রার দুইটি দিক। কৃষক ও শহুরে শ্রমিকের সমন্বয়ের ওপর এই ব্যবস্থা নির্ভরশীল। এই ব্যবস্থা হল প্রলিটারিয়েটের একনায়কতন্ত্র।"

দমণ নীতি

তাঁবেদার কমিউনিষ্ট দেশগুলিতে জমির রাষ্ট্রীয়করণ ও বন্টনের পর, সোভিয়েতের নির্দেশে যৌথ খামার প্রতিষ্ঠার জন্যে কৃষকদের বাধ্য করার চেষ্টা করা হলে গণ্ডগোল দেখা দেয়। আঞ্চলিক কমিউনিষ্ট পার্টিগুলি এতে আপত্তি জানায় এবং তাদের জনপ্রিয়তা বিনষ্ট হবে বলে আপত্তি জানায়। পূর্ব ইওরোপের কমিউনিষ্ট সরকারগুলিকে মস্কোর নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যে কমিনফর্ম (Cominform) গঠন করা হয়।

যৌথ খামার গঠনে বিফলতা : কমিনফর্ম গঠন

পূর্ব ইওরোপের এই সোভিয়েতকরণ ভাল অথবা মন্দ ছিল এ বিষয়ে ঐতিহাসিকরা একমত নন। অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা নিরপেক্ষভাবে বিচার করতে অক্ষমতা দেখিয়েছেন। পশ্চিমী ঐতিহাসিকরা এই ব্যবস্থার যে সমালোচনাগুলি করেন তার মধ্যে প্রধান হল: স্ববাধ, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে বিভিন্ন দলকে নির্বাচনে লড়াই করার সুযোগ না দিয়ে, ওপর থেকে এই সোভিয়েতপন্থী শাসন চাপান হয়। দ্বিতীয়তঃ, এই একদলীয় সন্ত্রাসবাদী শাসনে জনমত প্রতিফলিত হয়নি এবং ন্যায্য প্রতিবাদের কণ্ঠরোধ করা হয়। তৃতীয়তঃ, স্বাধীন ও অবাধ সমাজব্যবস্থাকে বিনষ্ট করা হয়। ব্যক্তির স্বাধীন জীবনযাত্রার অধিকার হরণ করা হয়। সকলকে এক ছাঁচে ঢালাই করা লোহার কাঠামোর মধ্যে বাস করতে বাধ্য করা হয়। চতুর্থতঃ, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রুদ্ধ করা হয়। উইনষ্টন চার্চিল তাঁর ফুলটন বক্তৃতায় বলেন যে, "সমগ্র ইওরোপ ষ্টেটিন থেকে ট্রিয়েষ্ট পর্যন্ত আজ লৌহ যবনিকার আড়ালে চলে গেছে। যেন একটি প্রাগৈতিহাসিক অতিকায় পক্ষী আজ পশ্চিমী সভ্যতাকে গিলে ফেলতে উদ্যত হয়েছে।" মার্কিন রাষ্ট্রপতি হ্যারি ট্রুম্যানের অভিযোগ ছিল যে, ইয়াল্টার প্রতিশ্রুতি মত অবাধ নির্বাচনের শর্তকে অগ্রাহ্য করে কূটনৈতিক কৌশল দ্বারা সোভিয়েতপন্থী সরকার চাপান হয়।

পূর্ব ইওরোপের সোভিয়েতকরণ নীতির সমালোচনা

পশ্চিমী অভিযোগগুলি নিঃসন্দেহে কিছুটা অতিশয়োক্তিপূর্ণ। এর উত্তরে সোভিয়েতের দিক থেকেও বেশ কিছু বলার ছিল। প্রথমতঃ, পশ্চিমী রাষ্ট্রনেতারা যে নির্বাসিত সরকারগুলি ক্ষমতায় ফিরে না আসায় হতাশা প্রকাশ করেন, সেগুলি ছিল সামন্ততান্ত্রিক অথবা ধনতান্ত্রিক সরকার। যুদ্ধের আগে তারা এমন কিছু জনহিতকর কাজ করেনি যেজন্য তারা ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার নৈতিক দাবী করতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, পশ্চিমী নেতারা যে নির্বাচন দাবী করেন তা ছিল বুর্জোয়াপন্থী নির্বাচন। সোভিয়েত রাশিয়া তা সমর্থন করে না। তৃতীয়তঃ, সোভিয়েতপন্থী শাসনেই মেহনতী জনসাধারণ কর্মসংস্থান, ভূমি-স্বত্ব ও উন্নত জীবনযাত্রার মুখ দেখতে পায়। চতুর্থতঃ, পশ্চিমী গণতন্ত্র বুর্জোয়াপন্থী গণতন্ত্র। সেখানে কল-কারখানায় শ্রমিককে শোষণ করে মুষ্টিমেয় লোক সুফল ভোগ করে। পঞ্চমতঃ, পশ্চিমী বুর্জোয়া ও তাদের তাঁবেদার সরকারগুলি সাম্রাজ্যবাদী কল-কারখানায় উদ্বৃত্ত উৎপাদন করে তা উপনিবেশে বিক্রী করে শোষণ চালায়। মেহনতী মানুষেরা ন্যায্য মজুরী ও ছুটির অভাবে ধুঁকতে থাকে। ষষ্ঠতঃ, পূর্ব ইওরোপের প্রাক-যুদ্ধকালীন বিরাট মাল বিক্রীর বাজার হাতছাড়া হওয়ার ফলেই, সোভিয়েত দেশের বিরুদ্ধে পশ্চিমী প্রচার করা হয়। পূর্ব ইওরোপ স্বয়ম্বর হয়ে, Comecon প্রভৃতির মাধ্যমে,

পূর্ব ইওরোপের সোভিয়েতকরণের স্বপক্ষে যুক্তি

রাশিয়া সহ পূর্ব ইওরোপ এক পরস্পরের সাহায্যকারী অভিন্ন অর্থনৈতিক অঞ্চলে পরিণত হয়। সপ্তমতঃ, পশ্চিমী দেশগুলি যে মার্শাল পরিকল্পনার অর্থ সাহায্যের জোরে ফেঁপে ওঠে, তা ছিল মার্কিন ডলার সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব। মার্শাল পরিকল্পনা অনুযায়ী অর্থ সাহায্য লাভ নিতে সাহায্যগ্রাহী দেশকে তার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব খর্ব করতে হয়। অষ্টমতঃ, গোটা পশ্চিমী দুনিয়া ট্রুম্যান নীতি, মার্শাল পরিকল্পনা ও ন্যাটো চুক্তির মার্কিনী সাম্রাজ্যবাদী ফাঁদে আবদ্ধ। এদের উদ্দেশ্য হল রাশিয়া সহ ইওরোপের সমাজতান্ত্রিক সভ্যতাকে ধ্বংস করা।

প্রকৃতপক্ষে উভয় পক্ষ ঠাণ্ডা লড়াই-এর ভাষায় পরস্পরের স্থাপিত ব্যবস্থাকে দোষারোপ করে। আসল কথা ছিল পূর্ব ইওরোপে সোভিয়েত প্রাধান্য ও সোভিয়েতপন্থী শাসন স্থাপিত হলে পশ্চিমী শক্তিধর রাষ্ট্রগুলি ক্রুদ্ধ, ভীত ও আশঙ্কিত হয়। ক্রুদ্ধ এজন্য যে, যুদ্ধজয়ের ভাগীদার হিসেবে এবং যুদ্ধোত্তর শাসন ব্যবস্থা সর্বসম্মতভাবে গঠনের অধিকার অনুযায়ী তাদের বিনা মতে পূর্ব ইওরোপে সোভিয়েত তাঁবেদার সরকার গঠিত হয়। পশ্চিমী শক্তির আশা ছিল যে, অবাধ ও সাধারণ নির্বাচন হলে কমিউনিষ্টরা ক্ষমতা দখল করতে পারবে না। তারা ভীত ও আশঙ্কিত হয় এজন্য যে, পূর্ব জার্মানী বা এলব (Elb) নদী পর্যন্ত সোভিয়েত আধিপত্য বিস্তৃত হওয়ার ফলে, সোভিয়েত আধিপত্য দ্রুত পশ্চিম ইওরোপে ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। নাৎসী জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ জয়ের ফলে, ষ্ট্যালিনগ্রাডের লড়াই-এর লরেল পাতার মুকুট ষ্ট্যালিন মস্তকে ধারণ করেন। তথাকথিত দুর্বল সোভিয়েত রাশিয়া এক মহা শক্তিধর দেশরূপে দেখা দেয়। এ বিষয়ে কোন সন্দেহই ছিল না যে, সোভিয়েত পদাতিক বাহিনী শুধু ভাল যোদ্ধা নয়, তারা কমিউনিষ্ট আদর্শে দীক্ষিত। এজন্য যুদ্ধে তাদের মনোবল ছিল কঠোর। সোভিয়েত সরকারের হাতে তখন ছিল বিশ্বের শ্রেষ্ঠ এবং সর্বোচ্চ সংখ্যক পদাতিক বাহিনী, ভাল যান্ত্রিক বাহিনী।

পূর্ব ইওরোপে সোভিয়েত ব্যবস্থা গঠনের ফলে শক্তিসাম্যের পতন ও পশ্চিম ইওরোপের সোভিয়েত আক্রমণের

পশ্চিমী সরকারগুলির পক্ষে সোভিয়েত আক্রমণের ভয় ছিল। তদপেক্ষা বেশী ভয় ছিল যে, ইতালী ও ফ্রান্সে নির্বাচনে কমিউনিষ্ট পার্টি দ্রুত ক্ষমতা লাভ করার ফলে পূর্ব ইওরোপের মতই পশ্চিম ইওরোপে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটে যেতে পারে। তাছাড়া পূর্ব ইওরোপের সঙ্গে পশ্চিমের বাণিজ্যিক আদান-প্রদান বন্ধ হওয়ায় পশ্চিমী ধনতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলি বিরক্ত হয়। সুতরাং তারা সোভিয়েত ব্যবস্থার দোষত্রুটি ধরে উপরোক্ত ধরনের প্রচার চালায়। তাদের মতে সোভিয়েত অধিকারের বাইরের পৃথিবী ছিল "Free World" বা মুক্ত দুনিয়া।

পশ্চিমী ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পূর্ব ইওরোপে বাণিজ্যের ক্ষতি

অপরদিকে Isaac Deutscher প্রভৃতি নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকদের মতে, পূর্ব ইওরোপে সোভিয়েতপন্থী তাঁবেদার সরকার প্রতিষ্ঠার মূল কারণ ছিল সোভিয়েতের ভবিষৎ নিরাপত্তার বিধান করা। অতীতে অন্ততঃ তিনবার রাশিয়া তার পশ্চিম সীমান্তের পথে আক্রান্ত হয়েছিল। প্রতিবারই প্রবল পরাক্রান্ত পশ্চিমী শক্তি রুশ ভূমি অধিকার করে রাশিয়াকে প্রায় নতজানু করে ফেলে। ভবিষ্যতে যাতে এরকম ঘটনা না ঘটে তার সুযোগ ষ্ট্যালিন পেয়ে তার সদ্ব্যবহার করেন মাত্র। পূর্ব ইওরোপে রুশ প্রভাব বিস্তার পশ্চিমের প্রতি আক্রমণমূলক উদ্দেশ্যে করা হয়নি। রাশিয়া তার আত্মরক্ষার জন্যে সোভিয়েত সীমান্ত সংলগ্ন অঞ্চলে (সংশ্লিষ্ট মানচিত্র দ্রষ্টব্য) যথা পোল্যান্ড, রুমানিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়ায় তার কর্তৃত্বমূলক শাসন চাপায়। এই অঞ্চলটি ছিল যেন রুশ আত্মরক্ষার ব্যূহ। রুশ ভূমিতে শত্রু সেনা প্রবেশের আগে এই দেশগুলির জমিনে তাদের কঠোর লড়াই দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এই সকল অঞ্চলে ভূমি সংস্কার ও কারখানার রাষ্ট্রায়ত্তকরণ দ্বারা কৃষক ও শ্রমিকদের সোভিয়েত

Isaac Deutscher এর অভিমত ষ্ট্যালিনের রক্ষাব্যূহ রচনার চেষ্টা

ব্যবস্থার অনুগত করা হয়। এই পরিমণ্ডলের বাইরে পূর্ব জার্মানী, হাঙ্গেরী প্রভৃতি দেশ ছিল রাশিয়ার আত্মরক্ষার বহির্পরিমণ্ডল। এখানে সমমনোভাবাপন্ন, সমাদর্শযুক্ত সরকার গঠন করা হয়। রাশিয়া নিজেই ছিল রণক্লান্ত ও বিধ্বস্ত। সুতরাং রাশিয়ার আক্রমণমূলক বৈদেশিক নীতি গ্রহণের প্রশ্ন ছিল অবাস্তব চিন্তা।

ঠাণ্ডা লড়াই-এর উদ্ভব

সুতরাং ইওরোপ এই দুই শিবিরে ভাগ হওয়ার ফলে পারস্পরিক অবিশ্বাস ও আগ্রাসনের আশঙ্কায় ঠাণ্ডা লড়াই শুরু হয়। উভয় অঞ্চলের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ১৯৫৩ খ্রীঃ আগে আসেনি। উভয় পক্ষ পরস্পরের সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার নিন্দা ও দোষক্রটি প্রচার করতে থাকেন, যার কিছু অংশ আগে উল্লেখ করা হল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সোভিয়েত রাশিয়া (Soviet Russia after the World War II) ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার বিজয় বিশ্বকে বিস্মিত ও মুগ্ধ করে। হিটলারের ব্লিৎসক্রীগ বা যান্ত্রিক বাহিনীর ঝটিকা আক্রমণে পশ্চিম ইওরোপ যেভাবে স্বল্পকালের মধ্যে ধরাশায়ী হয় তার ফলে সকলেই মনে করে যে, নাৎসী আক্রমণ থেকে সোভিয়েত রাশিয়া নিস্তার পাবে না। কিন্তু বিশ্ববাসী আশ্চর্য হয়ে দেখে যে, নাৎসী সমরযন্ত্রের চাকা, কুরুক্ষেত্রে মহাবীর কর্ণের রথের চাকার মতই রাশিয়ার মাটি গ্রাস করে নিয়েছে। তার গতি নিশ্চল এবং হিটলারের সেনাপতিরা তা আর টেনে তুলে সচল করতে অক্ষম। ক্রমে আক্রমণকারীরা হতবল হয়ে, পালাতে থাকে, পলায়ন হয় ধ্বংসের মরণ ফাঁদ। লাল ফৌজ পিছু হঠা জার্মানদের পিছন নিয়ে পূর্ব জার্মানী পর্যন্ত চলে আসে।

জার্মান আক্রমণ রোধে রাশিয়ার সফলতা ও জার্মানীর পরাজয়ের ফলে রাশিয়ার অভুতপূর্ব ক্ষমতা বৃদ্ধি

এই জয়ের জন্যে রাশিয়াকে কম মূল্য দিতে হয়নি। প্রায় ১০ মিলিয়ন রুশ সেনা যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করে, ১৫ মিলিয়ন সাধারণ নাগরিক নিহত হয়। রাশিয়ার লোকসংখ্যার $\frac{১}{১০}$ ভাগ এই যুদ্ধে চিরতরে হারিয়ে যায়। তথাপি রুশ জনগণ যুদ্ধের উদ্যমে ক্ষান্তি দেয়নি। তার প্রধান কারণগুলির মধ্যে ছিল মার্শাল ষ্ট্যালিনের অসাধারণ নেতৃত্ব, ধৈর্য, জাতিকে উজ্জীবিত করার ক্ষমতা। দ্বিতীয়তঃ, রুশবাসীর দেশপ্রেম যা এই যুদ্ধকে জনযুদ্ধে পরিণত করে। এই যুদ্ধে রাশিয়ার অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতির সীমা ছিল না। রাশিয়ার গৃহপালিত পশুর অধিকাংশ জার্মানরা খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে।[১] পশ্চিম রাশিয়ার শহর ও গ্রামগুলির একটিও অক্ষত ছিল না। সেগুলি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। একমাত্র পূর্ব ইউরাল অঞ্চলের কিছু কল-কারখানা অক্ষত ছিল। চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে সেগুলিকে বেশী সময় খাটাবার ফলে যন্ত্রপাতি ক্ষয় পায়। অধিকাংশ কয়লাখনির ভেতরে জল ঢুকে যায়, অথবা আগুন জ্বলতে থাকে। রাশিয়ার শ্রমিকদের মধ্যে যারা তখনও কর্মক্ষম ছিল, তারা ছিল পরিশ্রান্ত ও প্রয়োজন অপেক্ষা সংখ্যায় কম।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জয়লাভের জন্যে রাশিয়ার আত্মত্যাগ ও যুদ্ধে ক্ষয়ক্ষতি

যুদ্ধ শেষ হলে ষ্ট্যালিনের প্রধান কাজ ছিল রাশিয়ার জন্যে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য সামনে রেখে পুনর্গঠনের কাজ করা। শিল্পের ক্ষেত্রে তিনি ভারীশিল্প গঠনের কাজে জোর দেন। ভোগ্য পণ্যের উৎপাদনকে গৌণ স্থান দেওয়া হয়। কারণ রাশিয়াকে বৃহৎ শক্তি হিসেবে উঠে দাঁড়াতে হলে ভারী শিল্প গঠন ছাড়া পথ ছিল না। এজন্য ভোগ্য পণ্যের সঙ্কট চলতেই থাকে। ষ্ট্যালিন দেশবাসীকে দুঃখবরণ করতে বাধ্য করেন। যাতে রাশিয়া যন্ত্রশিল্পে, রেল, বিমান, মারণাস্ত্রের উৎপাদনে পিছিয়ে না থাকে, যাতে যথেষ্ট পরিমাণ লোহা, ইস্পাত, কয়লা ও খনিজ সম্পদ উৎপন্ন হয়, সেদিকে তিনি তীক্ষ্ণ নজর রাখেন।

যুদ্ধোত্তর যুগে ষ্ট্যালিনের ভারী শিল্প গঠন নীতি ও ভোগ্য পণ্যের উৎপাদন হ্রাস

১. Flemming—Original of Cold War.

১৯৪৬ খ্রীঃ চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ শুরু হলে, তা ১৯৫০ খ্রীঃ মধ্যেই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে সক্ষম হয়। অনেকে এই সাফল্যের জন্যে দুটি কারণ নির্দেশ করেন। প্রথমতঃ, পূর্ব ইওরোপের সোভিয়েত তাঁবেদার অঞ্চল থেকে প্রচুর কাঁচামাল, খনিজ সম্পদ ও শ্রমিকের যোগান রাশিয়া পায়। দ্বিতীয়তঃ, ষ্ট্যালিনের ডিক্টেটরীয় শাসন ও কমিউনিষ্ট পার্টির শ্রমিকদের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণের ফলে উৎপাদনের কাজ যন্ত্রের মত মসৃণভাবে এগিয়ে ছিল। কোন ধর্মঘট, কর্মবিরতি তা ব্যাহত করতে পারেনি। শ্রমিকদের নিম্ন মজুরী দেওয়া হলেও তারা কোন প্রতিবাদ করতে পারত না। পার্টি, রাষ্ট্র ও পুলিশ সর্বত্র কঠোর সন্ত্রাসের দ্বারা পার্টির নির্দেশিত নীতিকে রূপায়ণ করত। কম মজুরী দানের ফলে রাষ্ট্র পরিচালিত শিল্প কারখানায় যে মুনাফা হত, তা নতুন শিল্প কারখানা গঠনের কাজে বিনিয়োগ করা হয়। শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান ছিল বেশ নীচু। সরকারি রেশন থেকে যতটা খাদ্য, যতগুলি পোষাক, জুতা পরিবারের জন্যে বরাদ্দ ছিল, তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হত। কারণ ভোগ্যপণ্যের উৎপাদনকে গৌণ স্থান দেওয়ার ফলে ভোগ্যপণ্যের সরবরাহ চাহিদার তুলনায় ছিল ভয়ানক কম। রাশিয়া ধনী হলেও, রুশ জনগণ দরিদ্র জীবন-যাপনে বাধ্য হয়।[১]

৪র্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ ও ষ্ট্যালিনীয় সন্ত্রাসের প্রবর্তন

কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যবস্থাকে জার্মান আক্রমণকারীরা ধ্বংস করেছিল। ঘোড়া, গরুগুলিকে তারা নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করে এমনভাবে ধ্বংস করে যে, লাঙল টানতে যথেষ্ট ঘোড়া বা গরু অবশিষ্ট ছিল না। যৌথ খামার বা কোলখোজগুলি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে পারত না। কারণ, কৃষি শ্রমিক, ট্রাক্টর, সার ও বীজের যথেষ্ট অভাব ছিল। যেক্ষেত্রে রাশিয়া ১৯১৩ খ্রীঃ ৮৬ মিলিয়ন টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করত, ১৯৪০ খ্রীঃ উৎপাদন হত ৯০ মিলিয়ন টন, সেক্ষেত্রে ১৯৪৮ এর উৎপাদন ছিল ৮০ মিলিয়ন টন। পূর্ব ইওরোপের তাঁবেদার দেশ থেকে রাশিয়া খাদ্যশস্যের ঘাটতি পূরণ করত। ১৯৫০ খ্রীঃ বিশিষ্ট কমিউনিষ্ট নেতা নিকিতা ক্রুশ্চেফকে কৃষিব্যবস্থা সংগঠণের দায়িত্ব দেওয়া হলে, তিনি ২৫০,০০০ যৌথ খামারকে সংযুক্ত করে ৯৫,০০০ বৃহৎ খামারে পরিণত করেন। এই বৃহৎ খামারগুলিতে ট্রাক্টর, বৈজ্ঞানিক প্রথায় সার প্রয়োগ, উন্নত বীজ প্রয়োগ দ্বারা ফলন বাড়ান হয়। ক্রুশ্চেফ অবশ্য কৃষি নগর বা Agro-town গড়তে চেয়েছিলেন। কিন্তু ষ্ট্যালিন তাতে রাজি হননি। কৃষিতেও শিল্পের মতই যান্ত্রিক কেন্দ্রীকরণ ও শৃঙ্খলাপূর্ণ আবাদ দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়।

যৌথ খামার বা কোলখোজ গঠন

এইভাবে মার্শাল ষ্ট্যালিন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অল্পদিনের মধ্যে ধ্বসে পড়া রাশিয়াকে তাঁর একনায়কতন্ত্রের মাধ্যমে পায়ের ওপর দাঁড় করাতে সক্ষম হন। তবে এজন্য রুশ জনগণকে আধুনিক সভ্যতার ভোগ্যপণ্যের আস্বাদ ও আরাম তিনি ভোগ করতে দেননি। গোটা জাতিকে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় খাটান হয়। এই সফলতার কথা বিভিন্ন দেশের কমিউনিষ্ট পার্টিগুলি বিশ্বের সর্বত্র প্রচার করে। সোভিয়েত পত্রপত্রিকাগুলিও সরকারের প্রচারযন্ত্রের কাজ করে। আসলে শহরের অবস্থা যেমনই হোক গ্রামাঞ্চলের অবস্থা ছিল বেশ ভাঙাচোরা। সেই সকল স্থানে যুদ্ধের ক্ষতচিহ্ন তখনও দগদগে ছিল। মফস্বলের রেল ষ্টেশনগুলি ছিল দরিদ্র, জীর্ণ দশাগ্রস্থ। পরিবহণের জন্যে পশ্চিমের মত ভাল ভাল রাস্তা ও যথেষ্টসংখ্যক পরিবহণের জন্যে মালবাহী ট্রাক ছিল না। রেলের সংখ্যা কম হওয়ার জন্যে যাত্রীরা ইচ্ছামত পরিভ্রমণ করতে পারত না। স্থানীয় পার্টি অফিস ও পুলিশের কাছে যাওয়ার আগে পাশ নিতে হত।

ষ্ট্যালিনীয় স্বৈরতন্ত্রের অপরদিক সন্ত্রাস ও দমণ নীতি

১· R. D. Cornwell—World History.

এর উদ্দেশ্য ছিল রেলের ওপর চাপ কমান। মোট কথা ভোগ্যপণ্য, ভ্রমণ, পোষাক প্রভৃতির সরবরাহ চাহিদার তুলনায় ছিল ভীষণ রকম কম। তবুও ষ্ট্যালিন ভেঙে পড়েন নি। তিনি দৃঢ় লক্ষ্য নিয়ে রাশিয়ার ভারী শিল্প গঠন, আধুনিক অস্ত্র নির্মাণ করে পশ্চিমের সঙ্গে শক্তিতে সমান সমান থাকার ব্যবস্থা করেন।

ষ্ট্যালিনীয় স্বৈরতন্ত্র ও সোভিয়েত সংবিধান

যুদ্ধোত্তর রাশিয়ায় সংবিধান যাই হোক না কেন, মার্শাল ষ্ট্যালিনই ছিলেন দেশের অবিসংবাদী নায়ক। তাঁর নামে জাঁদরেল রুশ কমিউনিষ্ট নেতারাও কেঁপে যেতেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ জয়ের গৌরব তাঁকে এমন এক অসাধারণ মহিমা দান করেছিল যে, রাশিয়ার বাইরেও তাঁর সম্পর্কে সর্বত্র সম্ভ্রম ও প্রশংসাসূচক বাক্য উচ্চারিত হত। পশ্চিমী সংবাদপত্রগুলি "ষ্ট্যালিনের রাশিয়া" কথাটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করত। তিনি কদাচিৎ প্রকাশ্যে জনতার মুখোমুখি হতেন অথবা জনতার উদ্দেশ্যে নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া ভাষণ দিতেন না। সরকারি দপ্তরের কাজে ও নীতি নির্দ্ধারণের কাজে তিনি অমানুষিক পরিশ্রম করতেন। কোন কমিউনিষ্ট নেতা কখনও তাঁর জীবিতকালে তাঁর সমালোচনার সাহস দেখাতে পারেননি। এই অক্ষমতাকে তাঁরা "গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতা" নামে এক উদ্ভট নাম দিয়ে ঢাকা রাখতেন। আসলে তিনি দলের সেরা নেতাদের কারও কোন মতের তোয়াক্কা করতেন না। তিনিই ছিলেন একাধারে রাষ্ট্রপ্রধান ও C. P. S. U সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টির ফার্ষ্ট সেক্রেটারী। কাজেই রাষ্ট্রীয় ও দলীয় দুই ক্ষমতাই তিনি নিজ হাতে কেন্দ্রীভূত করেন।

ষ্ট্যালিনীয় সন্ত্রাসের কুফল

কমিউনিষ্ট দলের গোটা সংগঠন তাঁরই অঙ্গুলি হেলনে চলত। কারও কিছুই বলার ছিল না। সুপ্রীম সোভিয়েতের কোন নেতার তাঁর প্রতি আনুগত্য সম্পর্কে সন্দেহ হলে তাঁর আর রক্ষা ছিল না। বিখ্যাত রুশ নেতা বুলগানিনের ভাষায়, "সেই ব্যক্তিকে হয় যাবজ্জীবন কারাবাস অথবা Labour Camp-এ শ্রমিকের কাজ করে তাঁর মগজ ধোলাই করা হত।" কখনও রহস্যজনকভাবে কারও কারও মৃত্যু হত। পরবর্তীকালে রুশ নেতা ক্রুশ্চেভ বলেন যে, "আসলে ষ্ট্যালিন ছিলেন এক রুগ্ন মানুষ, যিনি সর্বদাই সন্দেহের বিষে জর্জরিত ছিলেন এবং এজন্য সন্দেহভাজন অথবা তাঁর সমান দক্ষ ব্যক্তিদের নির্যাতন করে দমিয়ে দিতেন।" মোট কথা, ১৯৩৯—১৯৫২ খ্রীঃ পর্যন্ত রুশ সংবিধানও C.P.S.Uর সংবিধান যাই থাকুক না কেন ষ্ট্যালিন তা অগ্রাহ্য করে তাঁর একনায়কতন্ত্র চালু রাখেন। এজন্য এই সময় কমিউনিষ্ট দল ও তার যৌথ নেতৃত্বের আদর্শ বলতে বিশেষ কিছুই ছিল না।

ষ্ট্যালিনের শাসনের মূল্যায়ণ : আধুনিক বিশাল শক্তিধর সোভিয়েত রাষ্ট্রের নির্মাতা

তার অর্থ এই নয় যে, ষ্ট্যালিন ছিলেন হিটলারের মত এক রক্তপিপাসু, যুক্তিহীন, উন্মত্ত, ক্ষমতালোভী লোক। যদিও তাঁর মৃত্যুর পর রুশ কমিউনিষ্ট পার্টির অনেক ভুক্তভোগী শীর্ষস্থানীয় নেতা ষ্ট্যালিনবাদকে যারপরনাই নিন্দা করেছেন, ইতিহাসের বিচারে ষ্ট্যালিন তাঁর দোষত্রুটি সত্ত্বেও তাঁর প্রশংসা দাবী করতে পারেন। মানুষ হিসেবে তাঁর ব্যবহার ভালই ছিল। ব্রিটিশ মন্ত্রী উইনষ্টন চার্চিলকে কেহ কখনও ষ্ট্যালিনের অনুরাগী লোক বলবে না। তিনি Gathering Storm গ্রন্থে ষ্ট্যালিনের আতিথেয়তা, শিষ্ট ব্যবহারের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। মস্কো সম্মেলনের পর গৃহমুখী চার্চিলকে ষ্ট্যালিন স্বয়ং তাঁর ডাসা (Dacha) বা বাসগৃহে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যায় এবং উৎকৃষ্ট সুরা ও উত্তম খাদ্য মাদাম ষ্ট্যালিনের স্বহস্তে পরিবেশন করেন। চার্চিল এজন্য তাঁর স্বভাবসিদ্ধ কমিউনিষ্ট বিরোধিতা সত্ত্বেও মানুষ হিসেবে ষ্ট্যালিনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। ভারতের রাষ্ট্রদূত দার্শনিকপ্রবর স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণের প্রতি তিনি যে ব্যক্তিগত সম্মান ও ভালবাসা দেখান তা প্রতি ভারতবাসী

জানেন। অথচ রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন আশ্চর্য্যরকম Rigid বা আপোষ বিরোধী এবং দলীয় কর্মীদের ওপর কঠোর ছিলেন। সম্ভবতঃ রাশিয়ার ইতিহাস এজন্য দায়ী। রাশিয়া হল অর্দ্ধ ইওরোপীয়, অর্দ্ধ এশিয় দেশ। জার শাসনের যুগে স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের মাধ্যমে এই বহুজাতিক, অনগ্রসর সাম্রাজ্যে ঐক্য রক্ষা করা হয়। রুশ বিপ্লবের পর বিশেষতঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর একদিকে ঠাণ্ডা লড়াই-এর ভয়াবহতা থেকে আত্মরক্ষা, অপরদিকে রাশিয়াকে বৃহৎ শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিতে ষ্ট্যালিন এই স্বৈরতান্ত্রিক নীতি নেন। তাঁকে সমালোচকরা "কমিউনিষ্ট জার" বলে ব্যাখ্যা করলেও, তাঁর স্বদেশ প্রেম ও দেশ গঠনের কৃতিত্ব সকল সমালোচনার উর্দ্ধে। এই সঙ্গে তাঁর অতিরিক্ত সন্দেহ প্রবণতা, সহকর্মীদের প্রতি দমন নীতি, জনমতের কণ্ঠরোধ নিন্দার যোগ্য।

সার্বিক বিচারে ষ্ট্যালিনীয় শাসনের ভাল, মন্দ দুই দিক ছিল। ষ্ট্যালিনীয় শাসন অবিমিশ্র মন্দা ছিল না। তাঁর শাসনে রাশিয়ার বৈষয়িক উন্নতি, পূর্ব ইওরোপে রুশ আধিপত্যের কথা আগে বলা হয়েছে। এর পাশাপাশি তাঁর সহকর্মীদের বহিষ্কার, পুলিশী শাসনের কথাও বলা হয়েছে। ষ্ট্যালিন ১৯৫৩ খ্রীঃ কর্কট রোগের আক্রমণে যখন ৭৩ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন, রাশিয়াতে তাঁর স্থান পূরণ করার মত আর কোন নেতা দেখা যায়নি। তিনি যে কৃতিত্ব রেখে যান তা অ-ষ্ট্যালিনীকরণ দ্বারাও ম্লান করা যায়নি। ষ্ট্যালিনের জীবনীকার আইজ্যাক ডয়েৎসার যথার্থই বলেছেন যে, "ষ্ট্যালিন যখন দেশের হাল ধরেন তখন রাশিয়ায় ছিল কাঠের লাঙলের যুগ, তাঁর মৃত্যুকালে রাশিয়ার হাতে ছিল আনবিক বোমার স্তূপ।" মিলোভান জিলাস অবশ্য বলেন যে, "আধুনিক ইতিহাসের নায়কদের মধ্যে ষ্ট্যালিন ছিলেন সর্বাপেক্ষা নিষ্ঠুর ও স্বৈরাচারী নেতাদের অন্যতম।" ষ্ট্যালিনের কঠোর সমালোচক, সহকর্মী নিকিতা ক্রুশ্চেফ বলেছেন যে, "জার পিটার দি গ্রেটের মতই, ষ্ট্যালিন বর্বরতাকে, বিকল্প বর্বরতার দ্বারা প্রতিহত করেন। তাঁর মহত্ব সম্পর্কে সন্দেহ নেই।"

ষ্ট্যালিনীয় শাসনের ফলাফল

পূর্ব-পশ্চিম ঠাণ্ডা লড়াই (The Cold War) ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে ১৯৪১ খ্রীঃ হতে অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে যে রুশ-মার্কিন-ব্রিটিশ মিত্রজোট গঠন করা হয়, এই মিত্রজোট পারস্পরিক সহায়তার দ্বারা অক্ষশক্তির পতন ঘটায়। জার্মানীর পতনের সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন অবিশ্বাস মাথা তুলে দাঁড়ায়। ইয়াল্টা বৈঠকে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ও চার্চিল শেষবারের মত মিলিত হন ৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৫ খ্রীঃ। ইয়াল্টা থেকে ফিরে আসার পর প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের অকস্মাৎ মৃত্যু হয়। তাঁর স্থলে আসেন উপরাষ্ট্রপতি হ্যারী ট্রুম্যান। ইংলন্ডে প্রধানমন্ত্রী উইনষ্টন চার্চিলও নির্বাচনে পরাস্ত হয়ে পদত্যাগ করেন। তাঁর স্থলে আসেন শ্রমিক দলের প্রধানমন্ত্রী এটলী। পুরাতন নেতাদের এই অকস্মাৎ পরিবর্তনের ফলে মিত্রশক্তির মধ্যে যুদ্ধকালীন পারস্পরিক বোঝাপড়া বিনষ্ট হয়। নব-নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রপতি হ্যারী ট্রুম্যানের শাসনকালে রুশ-মার্কিন সম্পর্কের পরিবর্তনের সূচনা হয়। ঐতিহাসিক ফ্লেমিং (Flemming)-এর মতে, ট্রুম্যান ছিলেন বৈদেশিক সম্পর্ক বিশেষতঃ রুশ-মার্কিন সম্পর্ক বিষয়ে অনভিজ্ঞ। মার্কিন পেন্টাগণ বা সেনাপতিমণ্ডলী রুজভেল্টের রুশ নীতির প্রতি প্রসন্ন ছিল না। তাঁরা রুজভেল্টের দ্বারা স্বীকৃত ইয়াল্টা চুক্তিকে "আমেরিকার আত্মসমর্পন নীতির পরাকাষ্ঠা" বলে মনে করতেন। পেন্টাগণ ছিল যুদ্ধবাজ সেনাপতিদের দপ্তর। এই দপ্তরের প্রধান এ্যাডমির্যাল লিহি (Admiral Leahy) ট্রুম্যানকে বোঝান যে, এখন সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে দৃঢ় নীতি নেওয়া দরকার। পূর্ব ইওরোপে রুশ প্রাধান্য ও মাঞ্চুরিয়ায় লাল ফৌজের অবস্থান মার্কিন নেতাদের ঈর্ষা ও বিরক্তির কারণ হয়। ট্রুম্যানও বাস্তব অবস্থা না বুঝে পেন্টাগণের পরামর্শে রাশিয়া সম্পর্কে কড়া নীতি নেন।

মার্কিন রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যানের ওপর পেন্টাগণের প্রভাব

ইতিমধ্যে সোভিয়েত সরকারও পূর্ব ইওরোপে তাঁদের প্রভাব-প্রতিপত্তি দৃঢ় করার কাজে হাত দেন। ঐতিহাসিক আইজ্যাক ডয়েৎসার-এর মতে, সোভিয়েত রাশিয়ার এই প্রচেষ্টা ছিল আত্মরক্ষামূলক। রাশিয়ার পশ্চিম সীমান্ত পথে অর্থাৎ পোল্যান্ড ও বাল্টিক সীমান্তের পথে রাশিয়া জার্মানীর দ্বারা আক্রান্ত হয়। সুতরাং ষ্ট্যালিন ইয়াল্টা বৈঠকেই একথা জানান যে, পোল্যান্ড, রুমানিয়া প্রভৃতি প্রতিবেশী দেশে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি মিত্র ভাবাপন্ন সরকার ছাড়া অন্য কোন সরকার রাশিয়া বরদাস্ত করবে না। রাশিয়ার আত্মরক্ষার জন্যে এটি খুবই দরকারী নীতি। কিন্তু ট্রুম্যান মনে করেন যে, রুমানিয়া ও পোল্যান্ডে সোভিয়েত প্রভাব বৃদ্ধি ছিল সোভিয়েত আগ্রাসন এবং ইয়াল্টা চুক্তির বিরোধী। এইভাবে মত পার্থক্য দেখা দেয়।

পূর্ব ইওরোপে রুশ নীতি

পোল্যান্ডে পোল কমিউনিস্টদের দ্বারা লাল ফৌজের আশ্রয়ে সরকার গড়া হলে মার্কিন প্রশাসন অত্যন্ত বিরক্ত হয়। রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী মলোটোভ ট্রুম্যানকে শুভেচ্ছা জানাতে এলে, ট্রুম্যান কড়া ভাষায় পোল্যান্ডে ইয়াল্টা চুক্তি অনুসারে অবাধ নির্বাচন না হওয়ায় ক্ষোভ দেখান। ট্রুম্যানের ভাষা সম্ভবতঃ কূটনৈতিক ভব্যতাযুক্ত ছিল না। এজন্য মলোটোভ মন্তব্য করেন যে—"ট্রুম্যান মিজুরী প্রদেশের খচ্চরতাড়কদের ভাষায় তাঁর সঙ্গে কথা বলেন।"

ট্রুম্যান মলোটোভ সাক্ষাৎকার

এইরূপ মত-বিরোধের পটভূমিকায় পটসডাম শীর্ষ সম্মেলন জুলাই, ১৯৪৫ খ্রীঃ অনুষ্ঠিত হলে স্বভাবতঃই কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ঐক্যমতে পৌঁছান সম্ভব হয়নি। শান্তিচুক্তি রচনার বিষয়ে ঐক্যমত না হওয়ায়, এই বিষয়টি বৈদেশিক মন্ত্রীদের সম্মেলনে স্থির করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। জার্মানী ও তার সহযোগী দেশগুলির সঙ্গে কিভাবে শান্তি চুক্তি স্থাপন করা হবে এই বিষয়ে তীব্র মতভেদ দেখা দেয়।

পটসডাম সম্মেলনে মত-পার্থক্য

পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের সম্মেলনে পূর্ব-পশ্চিম ঠাণ্ডা লড়াই স্পষ্টভাবে প্রকটিত হয়। প্রথমতঃ, জার্মানীর প্রদেয় ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি ক্ষতিপূরণ আদায়ে নারাজ হয়। সোভিয়েত রাশিয়া অভিযোগ করে যে, ইয়াল্টা বৈঠকে ক্ষতিপূরণ গ্রহণ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত হলেও এখন জার্মানীর সামরিক শক্তিকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্যে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি ক্ষতিপূরণের দাবী নাকচ করছে। সোভিয়েত রাশিয়া ইয়াল্টা সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০ বিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণের অর্ধেক ১০ বিলিয়ন ডলার রাশিয়াকে অবশ্যই দিতে হবে বলে দাবী করেন। এই বাবদে তাঁরা পূর্ব জার্মানী থেকে কল-কারখানার যন্ত্রাংশ তুলে নিয়ে যান। পশ্চিমী শক্তি অধিকৃত পশ্চিম জার্মানী থেকে $\frac{১}{৪}$ ভাগ ক্ষতিপূরণ দাবী করেন। পশ্চিমী শক্তিগুলি এ ব্যাপারে কঠোর মনোভাব নেন। দ্বিতীয়তঃ, যে প্রশ্ন নিয়ে তীব্র মতভেদ হয় তা হল, শান্তি চুক্তি হলে জার্মানীতে কি ধরনের সরকার গঠন করে শান্তি চুক্তি করা হবে। সোভিয়েত সরকার জার্মানীতে সম-মনোভাবাপন্ন, সম-আদর্শযুক্ত সরকার ছাড়া অন্য কোন ধরনের সরকার বরদাস্ত করতে রাজী ছিলেন না। ফলে জার্মানীর সঙ্গে শান্তি চুক্তি সম্পাদন করা যায়নি। তৃতীয়তঃ, জার্মান-পোল সীমান্ত রাশিয়ার দাবীমত ওডাব-নাইসি রেখায় মেনে নিতে পশ্চিমী শক্তি অস্বীকার করে। চতুর্থতঃ, জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইয়াল্টা চুক্তিমত রাশিয়াকে অংশগ্রহণের সুযোগ না দিয়ে আণবিক বোমার সাহায্যে জাপান দখলের জন্যে রাশিয়া প্রতিবাদ জানায়। এইভাবে রাশিয়ার সঙ্গে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত বিরোধ তীব্র হতে থাকে। আসল কথা ছিল পূর্ব ইওরোপের ওপর রাশিয়ার তাঁবেদার সরকার স্থাপন পশ্চিমী শক্তিগুলি কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না। পোল্যান্ডে গ্রোটোওয়াল্ডের দ্বারা, বুলগেরিয়ায় দিমিত্রির দ্বারা,

পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলনে তীব্র মতভেদ : ঠাণ্ডা লড়াই

রুমানিয়ায় কমিউনিষ্ট শাসন স্থাপন করায় পশ্চিমী দেশগুলি ভয়ানক চটে যায়। তারা রাশিয়ার এই কাজকে সোভিয়েত সাম্রাজ্যবাদ ছাড়া আর কিছু ভাবতে রাজী ছিল না। যেহেতু রাশিয়ার হাতে তখন ছিল বিশাল সেনা ও সমরযন্ত্র তার দ্বারা রাশিয়া ইচ্ছা করলে পশ্চিমী দেশ আক্রমণ করতে পারত। পশ্চিমী গণতন্ত্রগুলি যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক সঙ্কট, বেকার সমস্যায় দুর্দশায় পড়েছিল। নির্বাচনে ফ্রান্স ও ইতালীতে কমিউনিষ্টরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে কমিউনিষ্ট কোয়ালিশন সরকার গঠন করে। এই অবস্থায় রুশ আগ্রাসনের ভয়ে পশ্চিমী গণতন্ত্রগুলি ভীত হয়ে পড়ে।

এই সময় ব্রিটেনের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও পশ্চিমী জগতের প্রভাবশালী নেতা উইনষ্টন চার্চিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরিদর্শনে আসেন। তিনি Fulton Speech বা ফুলটনে প্রদত্ত বক্তৃতায় মার্কিন দেশকে সোভিয়েত আগ্রাসন সম্পর্কে সতর্ক করেন। চার্চিল বলেন যে—ইওরোপের একাংশ ষ্টেটিন থেকে ট্রিয়েষ্ট পর্যন্ত সোভিয়েত লৌহ যবনিকার (Iron Curtain) আড়ালে চলে গেছে। যদি মার্কিন দেশ এখনই সতর্ক না হয় তবে সমগ্র ইওরোপ শীঘ্রই সোভিয়েত রাশিয়া গ্রাস করবে। চার্চিল বলেন যে, রাশিয়া এখন কেবলমাত্র ইওরোপ নয়, এশিয়া, আফ্রিকার সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশগুলিকেও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার মুখোসে নিজের তাঁবেদার করতে চলেছে। একটি প্রাগৈতিহাসিক অতিকায় পক্ষীর মত সোভিয়েত ইউনিয়ন এখন ইওরোপীয় সভ্যতা গ্রাস করতে উদ্যত। গণতান্ত্রিক জগৎ বা Free World-কে রক্ষা করার দায়িত্ব এখন মার্কিন দেশের। চার্চিলের ফুলটন বক্তৃতা মার্কিন শাসক মহলে দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করে।

চার্চিলের ফুলটন বক্তৃতা

চার্চিলের বক্তৃতার পর মার্কিন শাসক শ্রেণীর একটি বড় অংশ দাবী করেন যে, আমেরিকার এখন কর্তব্য হল সোভিয়েত অধিকৃত অঞ্চল থেকে ইওরোপকে মুক্ত করা। সিনেটর ভ্যান্ডেনবার্গ এই মর্মে এক প্রস্তাব সিনেট সভায় উত্থাপন করেন। মার্কিন পেন্টাগন একই নীতি চাচ্ছিল। সুতরাং প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের ওপর Liberation বা সোভিয়েত অঞ্চল থেকে ইওরোপকে মুক্ত করার জন্যে বিভিন্ন গোষ্ঠী থেকে চাপ আসে।

মার্কিন বৈদেশিক নীতির লক্ষ্য সম্পর্কে বিতর্ক

এই সময় Foreign Affairs পত্রিকায় "Mr. X" ছদ্মনামে এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটির লেখক ছিলেন রাশিয়ায় ভূতপূর্ব সহকারী মার্কিন রাষ্ট্রদূত জর্জ· এফ· কেনান (George F. Kennan)। কেনান ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের ছাত্র। তিনি জঙ্গী মার্কিন নেতাদের অযথা আতঙ্কিত হয়ে যুদ্ধং দেহি মনোভাব ত্যাগ করার পরামর্শ দেন। কেনান যে বিকল্প মত দেন তাকে বলা হয় Containment Theory বা সীমাবদ্ধ রাখার বা সহাবস্থানের তত্ব। কেনান তাঁর প্রবন্ধে বলেন যে, (১) রাশিয়া এখন আগ্রাসী নয়। রুশ জনগণ রণক্লান্ত, হতাশাগ্রস্থ ও দুর্দশা পীড়িত। ষ্ট্যালিন চেষ্টা করলেও রাশিয়াকে আগ্রাসী যুদ্ধে নামাতে সক্ষম হবেন না। (২) রুশ জনগণ এখন শান্তিকামী, একথা ভোলা উচিত নয়। (৩) কোন টোট্যালিট্যারিয়ান রাষ্ট্র যতই শক্তিশালী হোক না কেন, জনমতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতে সাহস করবে না। সুতরাং পশ্চিম ইওরোপে এখন রুশ আগ্রাসনের ভয় নেই। (৪) রাশিয়া এখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ক্ষত নিরাময়ে ব্যস্ত। নতুন কোন যুদ্ধের ঝুঁকি রাশিয়া নেবে না। (৫) রুশ বুদ্ধিজীবিরা শান্তি চান ও সহাবস্থান চান। তাঁরা ষ্ট্যালিনকে বোঝাচ্ছেন যে, কমিউনিজম যদি প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিক মতবাদ হয়, তবে তা আপন নিয়মে, ইতিহাসের নিজের গতিতে তা অন্য দেশে স্থান লাভ করবে। সোভিয়েত রাশিয়াকে বিশ্ব-বিপ্লবের জন্যে কেন কাঠখড় পোড়াতে হবে? ইতিহাসই কমিউনিজমকে জয়ী করবে। (৬) সুতরাং

'X' প্রবন্ধ ও কনটেইনমেন্ট নীতির যৌক্তিকতা প্রচার কেনানের মতামত

বিশ্ব-বিপ্লবের জন্যে রাশিয়ার আত্মত্যাগ করার দরকার কি? (৭) তার অর্থ এই নয় যে, রাশিয়া বিশ্ব-বিপ্লব থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখবে। যেখানে অনুকুল পরিস্থিতি থাকবে এবং আভ্যন্তরীণ কারণে স্বতঃস্ফূর্ত বিপ্লব ঘটবে, সেখানে রাশিয়া নিশ্চয় সহায়তা দিবে। নতুবা বিপ্লব রপ্তানি করা যাবে না। (৮) কেনান পরামর্শ দেন যে, এক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাথা গরম করে Liberation War বা মুক্তিযুদ্ধের ঝুঁকি নেওয়ার কোনই দরকার নেই। মার্কিন সরকারের উচিত সোভিয়েত প্রভাব যে অঞ্চলে আছে তাকে সেই অঞ্চলে সীমাবদ্ধ রাখা (Containment)। সেই সীমা ভেঙে কোন কোন স্থানে সোভিয়েত রাশিয়া বা তার তাঁবেদার রাষ্ট্র আগাতে চাইলে তাকে ঠেলে তার পূর্ব সীমায় ফিরিয়ে দেওয়া অথবা স্থিতাবস্থায় রাখা। এই নীতির নাম হয় Containment। রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান ও তাঁর মন্ত্রীসভা জর্জ এফ. কেনানের যুক্তিকে মেনে নেন এবং মার্কিন নীতি অতঃপর Containment নীতি অনুসারে পরিচালিত হয়।

সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে এই সময় ১৯৪৭ থেকে পশ্চিমী শক্তিগুলির সঙ্গে সম্পর্কের প্রচণ্ড অবনতি ঘটেছিল। পারস্পরিক অবিশ্বাস তীব্রতম ছিল। সুতরাং মার্কিন Containment নীতিকে সোভিয়েত সরকার পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীদের বেড়াজাল নীতি বলে ঘোষণা করেন।

ট্রুম্যান নীতির উদ্ভবের পটভূমি

প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান যখন কেনানের নীতি নিয়ে পর্যালোচনায় রত ছিলেন সেই সময় ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে দুটি গোপন নোট মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্র সচিব ডিন এ্যাকিসনের হাতে আসে। এই নোটে ব্রিটেন জানায় যে, (১) গ্রীসে ব্রিটেনের দখলদারী সেনা ব্রিটেন আর বেশী দিন রাখতে সক্ষম নয়। গ্রীস, জার্মানী, ট্রিয়েষ্ট ও অষ্ট্রিয়াতে দখলদারী সেনা রাখার ব্যয়ভার বহন করতে ব্রিটেন অক্ষম। ব্রিটেন আপাততঃ গ্রীস থেকে দখলদারী সেনা সরাবে। এদিকে গ্রীক কমিউনিষ্টরা, যুগোশ্লাভ, হাঙ্গেরীয় ও অষ্ট্রিয় কমিউনিষ্ট এবং তাদের পশ্চাতে সোভিয়েত ইউনিয়নের সহায়তায় গ্রীসের বৈধ রাজতন্ত্রী সরকারকে উৎখাতের জন্যে ভয়ানক গৃহযুদ্ধ চালাচ্ছে। ব্রিটিশ সেনা স্থিতাবস্থা রক্ষা করছে। এই সেনাদল অপসারিত হলেই গ্রীস কমিউনিষ্টদের হাতে চলে যাবে। পূর্ব ভূমধ্যসাগরে পশ্চিমী আধিপত্যের শেষ চিহ্ন লোপ পাবে। (২) তুরস্কের সঙ্গে রাশিয়ার মন্ত্রো চুক্তি (Montreaux Convention) ভেঙে রাশিয়া নতুন চুক্তি গঠনের জন্যে তুরস্ককে চাপ দিচ্ছে। এই নতুন চুক্তিতে রাশিয়া দার্দানালিস ও বস্ফোরাস প্রণালীতে অবাধ রুশ নৌ চলাচলের অধিকার চায় এবং তুরস্কে বিশেষ বাণিজ্যিক অধিকার চায়। ব্রিটেন সতর্ক করে যে, রাশিয়া তুরস্কে ঢুকতে পারলে মধ্যপ্রাচ্যের তৈলখনি অঞ্চলগুলিতে আধিপত্য পেয়ে যাবে। (৩) ইরানে যুদ্ধকালীন দখলদারী শেষ হলেও রুশ সেনা উত্তর ইরান ছাড়ছে না। রুশ প্রভাবিত তুঁদে (Tudeh) দল উত্তর ইরানের তৈল সমৃদ্ধ আজেরবাইজান প্রদেশ রাশিয়াকে হস্তান্তরের জন্যে চাপ দিচ্ছে।

এই নোট পাওয়ার পর ট্রুম্যান আর কালবিলম্ব না করে Containment নীতির প্রথম ধাপ হিসেবে ১৯৪৭ খ্রীঃ ট্রুম্যান ডকট্রীন ঘোষণা করেন। মার্কিন কংগ্রেসের অধিবেশনে ট্রুম্যান বলেন যে, "মার্কিন পররাষ্ট্র নীতির উদ্দেশ্য হল এমন একটি আন্তর্জাতিক পরিবেশ গঠন করা

ট্রুম্যান নীতি ঘোষনা

যার ফলে সকল জাতি স্বাধীনভাবে, বলপ্রয়োগ ছাড়াই বসবাস করতে পারে। ... আমরা আমাদের এই আদর্শকে কখনও কার্যকরী করতে পারব না, যদি আমরা স্বাধীন দেশের স্বাধীন জনগণকে, তাদের জাতীয় ঐক্য ও স্বাধীনতার ওপর সর্বাত্মক রাষ্ট্রের আক্রমণ প্রতিরোধে সাহায্য করতে বিরত থাকি।... যেখানে বৈধভাবে গঠিত সরকারগুলিকে সশস্ত্র সংখ্যালঘুরা আগ্রাসন দ্বারা উচ্ছেদের চেষ্টা করবে, সেখানে মার্কিন দেশ বৈধ রাষ্ট্রকে ক্ষমতায় রাখতে সাহায্য করবে। ... আমেরিকা মনে করে যে,

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সর্বাত্মক রাষ্ট্রের আগ্রাসন বিশ্বশান্তি বিনষ্ট করবে এবং পরিণামে আমেরিকার নিরাপত্তা বিনষ্ট হবে।"

ট্রুম্যানের ঘোষণা অনুসারে আপাততঃ গ্রীস ও তুরস্ক সরকারকে ৪০০ মিলিয়ন ডলার মূল্যের সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য দান করা হলে, এই দুই দেশে কমিউনিষ্ট হস্তক্ষেপ বন্ধ হয়। ট্রুম্যান নীতি ক্রমে বিশ্বের সর্বত্র মার্কিন দেশের মিত্র রাষ্ট্রগুলিকে নিয়ে একটি বলয় রচনা করে। এই বলয়ের বাইরে সোভিয়েত প্রভাবকে সীমিত রাখা হয়। দক্ষিণ কোরিয়া বা ভিয়েতনাম বা বার্লিন কোন স্থানে এই বলয় কমিউনিষ্ট শক্তি ভাঙতে চেষ্টা করলে স্থানীয় প্রক্সি যুদ্ধের (Proxy War) দ্বারা বা সীমিত যুদ্ধের দ্বারা আক্রমণকারীকে বলয়ের বাইরে ঠেলে ফেলে দেওয়া হয়।

ট্রুম্যান নীতির ফলাফল

ট্রুম্যানের নীতির পরিপূরক ছিল মার্শাল পরিকল্পনা। মার্কিন পররাষ্ট্রসচিব জেনারেল জর্জ মার্শাল ১৯৪৭ খ্রীঃ জুন মাসে এই পরিকল্পনা হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সভায় ঘোষণা করেন। মার্শাল বলেন যে, যেখানে দারিদ্র, হতাশা ও লোকসংখ্যা বেশী সেখানেই কমিউনিজম শাখা-প্রশাখা ছড়ায়। সুতরাং যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইওরোপের দারিদ্র দূর না করলে ইওরোপকে কমিউনিজমের হাত থেকে বাঁচানো যাবে না। মার্শাল ইওরোপের যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশগুলিকে মার্কিন অর্থ সাহায্য দিতে প্রস্তাব দেন, যাতে সাহায্য প্রাপ্ত দেশগুলির অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন ঘটে। যাতে তারা ব্যক্তিগত অথবা সমষ্টিগতভাবে কমিউনিজমের প্রসার রোধ করতে সক্ষম হয়। ১৯৪৬-৪৭ খ্রীঃ শীতকালে প্রচণ্ড শীত, বরফ পাতে ইওরোপের কৃষির প্রচুর ক্ষতি হয়। এই অর্থনৈতিক দুর্বিপাকের সুযোগ কমিউনিষ্টরা ধর্মঘট ও অন্তর্ঘাত চালায়। ইতালী ও ফ্রান্সের সরকার এর ফলে কমিউনিষ্টদের দখলে আসার সম্ভাবনা দেখা দেয়। মার্শাল আশঙ্কা করেন যে, এই অর্থনৈতিক ধ্বংস বন্ধ করতে না পারলে ফ্রান্স ও ইতালী কমিউনিষ্টদের দখলে চলে যাবে। এমনকি ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে কমিউনিষ্টদের লাল বন্যা লন্ডনকে গ্রাস করবে। মার্শাল পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রস্তাব দেওয়া হয় যে ঃ—(১) সাহায্য গ্রহণকারী দেশগুলি একটি ইওরোপীয় অর্থনৈতিক সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হবে (O. E. E. C; Organisation of European Economic Co-operation)। (২) এই O.E.E.C. সদস্যভুক্ত দেশগুলি তাদের নিজস্ব সম্পদ এবং মার্শাল পরিকল্পনায় প্রাপ্ত সম্পদ পরস্পরের প্রয়োজনে ব্যবহার করবে। (৩) যে সাহায্য আমেরিকা দিবে তা প্রত্যেক সদস্যের চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে দেওয়া হবে। (৪) আপাততঃ ১৯৪৮ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে মার্কিন দেশ ৫$\frac{১}{২}$ বিলিয়ন ডলার সাহায্য দেয়। (৫) পরবর্তী বছরগুলিতে আরও সহায়তা বৃদ্ধি করা হয়। (৬) মার্শাল পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল ইওরোপের স্থায়ী এবং সুদূরপ্রসারী অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন।

মার্শাল পরিকল্পনা

মার্শাল পরিকল্পনা পূর্ব-পশ্চিম ঠাণ্ডা লড়াইয়ের আগুনে ঘি ঢেলে দেয়া। এই পরিকল্পনা ইওরোপের সকল দেশের জন্যে খোলা ছিল। একমাত্র স্পেনকে এতে যোগ দিতে আহ্বান করা হয়নি। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী সাহায্য কিভাবে গ্রহণ করা যেতে পারে তা আলোচনার জন্যে প্যারিসে ইওরোপীয় বৃহৎ শক্তিগুলির বিদেশ মন্ত্রীদের এক বৈঠক ডাকেন। ব্রিটিশ ও ফরাসী মন্ত্রীদ্বয় এ ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগ নেন। প্যারিসের সম্মেলনে রুশমন্ত্রী মলোটোভ অত্যন্ত তীব্রভাবে মার্শাল পরিকল্পনাকে আক্রমণ করেন। (১) তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন যে, এই পরিকল্পনাকে স্বাগত জানাবার আগে ব্রিটেন ও ফ্রান্স তাঁর সঙ্গে আলোচনার দরকার বোধ করেনি। (২) এই পরিকল্পনাকে তিনি ডলার সাম্রাজ্যবাদ বলে সমালোচনা করেন। (৩) এই পরিকল্পনাতে রাশিয়া বা তাঁর তাবেদার দেশগুলি কোনভাবে যোগ দিবে না বলে তিনি জানান। (৪) এই পরিকল্পনা গ্রহণ করলে গ্রহীতা দেশের

মার্শাল পরিকল্পনার ফলাফল

স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিনষ্ট হবে বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন। (৫) শেষ পর্যন্ত মার্শাল পরিকল্পনাকে আমেরিকার নীরক্ত সাম্রাজ্যবাদ আখ্যা দিয়ে তিনি ক্রোধে সম্মেলন ত্যাগ করেন। ইওরোপে "দাসত্বের দিন" (Enslavement of Europe) ঘনিয়ে এসেছে বলে তিনি হতাশা প্রকাশ করেন।

মার্শাল পবিকল্পনার ফলতা ব্রাসেলস চুক্তি

অতঃপর ঠাণ্ডা লড়াই ঘনীভূত হয়। ব্রিটেন, ফ্রান্স সহ ইওরোপের মোট ১৬টি দেশ মার্শাল পরিকল্পনায় যোগ দেয়। রাশিয়ার চাপে পূর্ব ইওরোপের ৮টি দেশ মার্শাল পরিকল্পনায় যোগদানে বিরত থাকে।[১] ইওরোপ দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে যায়। একদিকে থাকে ট্রুম্যান নীতি ও মার্শাল পরিকল্পনা সমর্থনকারী ১৬টি দেশ।[২] অপরদিকে রাশিয়া ছাড়া তার তাবেদার ৮টি দেশ। মার্শাল পরিকল্পনার পর BENELUX অর্থাৎ বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস ও লাক্সেমবার্গ একত্রে একটি সাধারণ শুল্ক নীতি গ্রহণ করে পারস্পরিক বাণিজ্যের উন্নতির জন্যে চুক্তি করে। ১৯৪৮ খ্রীঃ মার্চ মাসে ব্রিটেন ও ফ্রান্স এতে যোগ দিয়ে ব্রুসেলস সন্ধি জোট গঠন করে। যাতে বলা হয় যে, ৫০ বছরের জন্যে স্বাক্ষরকারী দেশগুলি পারস্পরিক আত্মরক্ষা, সংস্কৃতি বিনিময় ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার জন্যে চুক্তিবদ্ধ হয়। তুরিন চুক্তি দ্বারা তুরস্ককেও এই শুল্ক জোটের অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়।

মার্শাল পরিকল্পনা ও ব্রাসেলস চুক্তির রুশ প্রতিক্রিয়া

মার্শাল পরিকল্পনা এবং ব্রাসেলস সন্ধিজোট গঠন করায় সোভিয়েত ইউনিয়ন দারুন ক্ষিপ্ত হয়। সোভিয়েত নেতারা ধারণা করেন যে, মার্শাল পরিকল্পনার সহায়তায় পশ্চিমের এই দেশগুলি মার্কিন রাষ্ট্রের মতই রুশ বিরোধী জোটে পরিণত হবে। দ্বিতীয়তঃ, ইওরোপের পশ্চিম ভাগে অর্থনৈতিক ভাঙ্গনের ফলে কমিউনিষ্ট দলগুলি নির্বাচনে যে সফলতা পাচ্ছিল তা বিনষ্ট হবে। তৃতীয়তঃ, পশ্চিম ইওরোপের রুশ প্রভাব বিস্তারের পথ বন্ধ হবে। চতুর্থতঃ, যদি পশ্চিম জার্মানীর F.R.G.-কে মার্শাল পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হয় তবে পশ্চিম জার্মানীর অর্থনৈতিক উন্নয়ন শুধু জ্যামিতিক হারে বাড়বে না, সেই সঙ্গে অস্ত্রবলও বাড়ার সম্ভাবনা আছে। পশ্চিমের হাতে আণবিক বোমা থাকায় স্বভাবতই সোভিয়েত রাশিয়া আতঙ্কিত ছিল।

রুশ প্রতিক্রিয়া কমিনফর্ম গঠন

মার্শাল পরিকল্পনা ও ব্রাসেলস সন্ধির প্রত্যুত্তরে রাশিয়া ১৯৪৭ খ্রীঃ সেপ্টেম্বরে Comin Form বা Communist Information Bureau গঠন করে। কমিনফর্ম ছিল ১৯৪৩ খ্রীঃ লোপ করা কমিনটার্নের আধুনিক রূপ। এর উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব ইওরোপের কমিউনিষ্ট-শাসিত ৮টি রাজ্যকে রাশিয়ার কঠিন নিয়ন্ত্রণে রাখা। তাবেদার সরকারগুলির যে-কোন নীতি কমিনফর্মের অনুমোদন ছাড়া কার্যকরী হতে না দেওয়া। পশ্চিম ইওরোপ ও আমেরিকার কমিউনিষ্ট দলগুলিকে কঠোর শৃঙ্খলায় এনে মস্কোর নির্দেশিত প্রচার চালাতে বাধ্য করা। আপাততঃ তাদের কাজ ছিল মার্শাল পরিকল্পনার বিরুদ্ধে প্রচার করা ও আমেরিকার আণবিক বোমা নির্মাণের বিরুদ্ধে জনমত গঠন। যতদিন না রাশিয়া আণবিক বোমা নির্মাণে সক্ষম না হয় ততদিন বিশ্বজনমতকে আমেরিকার আণবিক শক্তির বিরুদ্ধে প্রভাবিত করে আমেরিকার হাত বেঁধে রাখা। এদিকে U.N.O.-র সভায় রাশিয়া এই ভঙ্গী নেয় যে, বিশ্বশান্তি রক্ষা ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার জন্যে নিবেদিত। মার্কিন দেশই বিশ্বশান্তি বিনষ্ট ও দৃশ্য এবং অদৃশ্য সাম্রাজ্যবাদে লিপ্ত। মার্কিন নীতি এমন মোটা

১· আলবানিয়া, বুলগেরিয়া, পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, ফিনল্যাণ্ড, হাঙ্গেরি, রুমানিয়া ও যুগোশ্লাভিয়া।

২· ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালী, বেলজিয়াম, অষ্ট্রিয়া, ডেনমার্ক, আয়ার, গ্রীস, আইসল্যান্ড, লাক্সেমবার্গ, নরওয়ে, পর্তুগাল, সুইডেন, সুইজারল্যাণ্ড, তুরস্ক।

দাগের ও নগ্ন ধরনের ছিল যে, সোভিয়েত রাশিয়ার এই প্রচারে যে অন্ততঃ কিছু সত্য আছে তা লোকে বিশ্বাস করে।

মার্শাল পরিকল্পনার বিরুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ার দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়া ছিল চেকোশ্লোভাকিয়ায় বৈধ সরকার ধ্বংস করে কমিউনিষ্ট সরকারের জবর দখল প্রতিষ্ঠা। চেকোশ্লোভাকিয়ায় একটি কোয়ালিশন সরকার থাকলেও কমিউনিষ্টরা সহযোগী দলগুলিকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করত। কমিউনিষ্ট পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশে গোপন পুলিশ অকমিউনিষ্টদের নির্যাতন ও নিপীড়ন করত। এজন্য অকমিউনিষ্ট দলগুলির রাগ ছিল। এখন তারা মার্শালের পরিকল্পনা গ্রহণে উদ্যোগী হলে, চেক গণতন্ত্রকে ধ্বংস করার জন্যে অষ্ট্রিয়া থেকে লাল ফৌজ এনে বৈধ সরকার ভেঙ্গে ফেলা হয়। সেন্সর প্রথার দ্বারা সকল প্রতিবাদের কণ্ঠরোধ করা হয়। মস্কোতে শিক্ষণপ্রাপ্ত চেক কমিউনিষ্ট নেতাদের দ্বারা চেকোশ্লোভাকিয়ার কমিউনিষ্ট-করন করা হয়। দক্ষিণ আমেরিকার বোগোটায় প্যান আমেরিক্যান কংগ্রেসে লাতিন কমিউনিষ্টরা সশস্ত্র অরাজকতা সৃষ্টি করায় মার্কিন নৌ-সেনার দ্বারা তা দমন করা হয়।

চেকোশ্লোভাকিয়ায় কমিউনিষ্ট শাসন প্রতিষ্ঠা

মার্শাল পরিকল্পনার বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন সর্বাপেক্ষা মারাত্মক আঘাত হানে ১৯৪৮ খ্রীঃ ১লা এপ্রিল পশ্চিম বার্লিনকে স্থলপথে অবরোধ দ্বারা (বিস্তৃত বিবরণ আগে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানী শীর্ষক পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। সোভিয়েত ইউনিয়ন এই অবরোধ দ্বারা পশ্চিম বার্লিনকে সোভিয়েত এলাকার সঙ্গে মিশিয়ে ফেলতে চেষ্টা করে। খাদ্য ও অন্যান্য সরবরাহের অভাবে পশ্চিম বার্লিন আত্মসমর্পণে বাধ্য হবে বলে আশা করা হয়। কিন্তু ইঙ্গ-মার্কিন-ফরাসী মিত্রশক্তি ১১ মাস ধরে পশ্চিম বার্লিন আকাশপথে সরবরাহ দিতে থাকায় ৩ মিলিয়ন জার্মান রক্ষা পায়। ঠাণ্ডা লড়াই চূড়ান্ত সীমায় উপনীত হয়। পশ্চিমী মিত্রশক্তি পশ্চিম বার্লিন রক্ষার জন্যে জলের মত অর্থ ব্যয় করে। তাদের যুক্তি ছিল যে, পশ্চিম বার্লিন রক্ষা করতে না পারলে, পশ্চিম জার্মানীর মনোবল ভেঙ্গে পড়বে। পশ্চিম জার্মানীও রাশিয়ার হাতে চলে যাবে। সোভিয়েত আগ্রাসন তখন রাইন নদী পার হয়ে ফ্রান্সের, ইতালীর দরজায় এসে যাবে। শেষ পর্যন্ত বার্লিন অবরোধ নিস্ফল হলে, সোভিয়েত রাশিয়া পশ্চিম বার্লিনের যোগাযোগকারী স্থলপথ পুনরায় খুলে দেয়। এটি ছিল মস্কোর নীতিগত ও কৌশলগত পরাজয়।

বার্লিন অবরোধ ঠাণ্ডা লড়াইয়ের চূড়ান্ত পর্যায়

এদিকে যুগোশ্লাভিয়া দেশ যা এতদিন সোভিয়েত কমিউনিষ্ট ব্লকের বড় অংশীদার ছিল তার সঙ্গে মস্কোর বিচ্ছেদ ঘটে। কমিন ফর্ম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মস্কোর নির্দেশে কমিন ফর্মের তত্ত্বাবধনায় ভারী শিল্প গঠন, ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন হ্রাস, যৌথ খামার স্থাপন, প্রশাসন ও অর্থনীতির কঠোর কেন্দ্রীকরণ এবং অকমিউনিষ্টদের সরকারী কাজ থেকে বহিস্কারের জন্যে মস্কো মডেল গ্রহণের তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলির ওপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করা হয়। ব্রাসেলস সন্ধি পশ্চিমে গঠিত হলে তার অনুকরনে কমেকন (Comecon or Communist Economic Union) গঠন করা হয়। কমেকনের সহায়তায় তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলির উপর যৌথ অর্থনীতি চাপানো হয়। কিন্তু যুগোশ্লাভিয়ার কমিউনিষ্ট নেতা মার্শাল টিটো এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। আলবানিয়াও যুগোশ্লাভিয়ার পথ ধরে। তিনি যুগোশ্লাভিয়ার ওপর রুশ মডেলের অর্থনীতি চাপাতে অস্বীকার করেন এবং যুগোশ্লাভিয়া, বুলগেরিয়া ও রুমানিয়ার জোট গঠনের প্রচেষ্টাকে রাশিয়া প্রতিহত করায় বিরক্ত হন। ১৯৪৮ খ্রীঃ যুগোশ্লাভিয়াকে কমিন ফর্ম থেকে বহিস্কার করা হয়। রাশিয়ার সঙ্গে যুগোশ্লাভিয়ার বিরোধ শুধু নীতিগত ছিল না, অনেকটা ব্যক্তিগতও ছিল। জার্মানীর হাত থেকে যুগোশ্লাভিয়ার মুক্তিযুদ্ধ যুগোশ্লাভরাই করে এবং টিটো তাতে নেতৃত্ব দেন।

যুগোশ্লাভিয়ার সোভিয়েত শিবির ত্যাগ

লাল ফৌজ অন্যান্য দেশের মত যুগোশ্লাভিয়াকে মুক্ত করেনি। সুতরাং টিটো দাবী করতেন যে, রাশিয়ার তাঁবেদারী করার তাঁর দরকার নেই। তিনি যুগোশ্লাভিয়ার অবস্থার উপযোগী Pragmatic Communism চালাতে চান। ঠিক যতটা দরকার ততটাই তিনি প্রয়োগ করতে চান। টিটোর দৃষ্টান্ত দেখে ষ্ট্যালিন অন্যান্য তাঁবেদার রাষ্ট্রে "সম্ভাব্য টিটোদের" নিশ্চিহ্ন করেন।

যাই হোক, পশ্চিম ও মধ্য ইওরোপে ক্রমে কমিউনিজমের অগ্রগতি মন্দীভূত হয়। কেবলমাত্র মার্শাল পরিকল্পনা এজন্য দায়ী ছিল একথা মনে করলে ভুল হবে। মার্শাল পরিকল্পনার ফলে পশ্চিমের অর্থনৈতিক অগ্রগতি হয় এবং এজন্য পশ্চিম ইওরোপে কমিউনিজমের অগ্রগতি ব্যাহত হয়নি। এগুলি অবশ্য ছিল সহকারী কারণ। আসলে পশ্চিমী দেশগুলিতে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও জাতীয়তাবাদ এত প্রখর ও অভঙ্গনীয় ছিল যে, অর্থনৈতিক ধ্বস রোধ হলে সেই মূল্যবোধ আবার জেগে ওঠে। ব্যক্তি স্বাধীনতা, মৌলিক অধিকার, জীবিকার স্বাধীনতা, মত প্রকাশের অধিকার সহ মোটামুটি অর্থনৈতিক স্থিতি পশ্চিমকে তারা হারানো সভ্যতা ও মূল্যবোধ ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে। একদা নাৎসী জার্মানীর বিরুদ্ধে পশ্চিমী গণতন্ত্রের যে ঘৃণা দেখা দিয়েছিল এখন রুশী কমিউনিজমের বিরুদ্ধেও একই ঘৃণা দেখা যায়। এব্যাপারে পশ্চিম ইওরোপের উদারতন্ত্রী, রক্ষণশীল, শ্রমিক দল, সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে মতপার্থক্য ছিল না।

পশ্চিম ও মধ্য ইওরোপে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পুনর্জাগরণ: সোভিয়েত সাম্যবাদী আদর্শের অগ্রগতি বোধ

এই ঠাণ্ডা লড়াই যে কোনো মুহূর্তে গরম যুদ্ধে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। সেরকম কোন বিপর্যয় ঘটলে পশ্চিমী গণতন্ত্রগুলি সশস্ত্র যুদ্ধে এককভাবে আত্মরক্ষায় অক্ষম ছিল। কারণ রাশিয়ার অধীনে ৪ মিলিয়ন লালফৌজ পুরা যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত ছিল। এখন রাশিয়া দাবী করছিল যে, তার হাতে আণবিক বোমা এসে গেছে। ১৯৪৯ খ্রীঃ সেপ্টেম্বর মাসে রাশিয়া প্রথম আণবিক বোমা বিস্ফোরণের পরীক্ষা চালায়। বার্লিন অবরোধ দ্বারা রাশিয়া ইচ্ছা করলে পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলিকে কিভাবে কোনঠাসা করার ক্ষমতা রাখত রাশিয়া তার পরিচয় দিয়েছিল।

এমতাবস্থায় ঠাণ্ডা লড়াই চললেও, যে কোন সময় তা সশস্ত্র সংঘাতে পরিণত হতে পারত। ব্রাসেলস চুক্তিভুক্ত দেশগুলির পক্ষে সোভিয়েত আগ্রাসন রুখে দেওয়া সম্ভবপর ছিল না। ১৯৪৮ খ্রীঃ থেকে মার্কিন দেশ, ঠাণ্ডা লড়াই ও তজ্জনিত বড় যুদ্ধের আশঙ্কায় নিজস্ব অস্ত্রসজ্জা করছিল এবং আণবিক অস্ত্রভাণ্ডারও মজুত করছিল। এখন ব্রাসেলস চুক্তির ভিতর মার্কিন দেশকে যুক্ত করাতে পশ্চিমী আত্মরক্ষাব্যূহ আরো জোরদার হবে মনে করা হয়। এজন্য ১৯৪৯ খ্রীঃ N.A.T.O. চুক্তির দ্বারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১১টি দেশের সঙ্গে ২০ বছরের জন্যে আত্মরক্ষামূলক সামরিক চুক্তি সম্পাদন করে।[১] পরে গ্রীস ও তুরস্ক (N.A.T.O.) ন্যাটোর অন্তর্ভুক্ত হয়। ন্যাটো চুক্তি বা উত্তর আটলান্টিক চুক্তি সংস্থায় বলা হয় যে : (১) যদি চুক্তিবদ্ধ দেশগুলির বাইরের কোন রাষ্ট্র চুক্তিভুক্তদের যে কোন রাষ্ট্রের উপর সশস্ত্র আক্রমণ করে, তবে N.A.T.O. চুক্তির অপর সদস্যরা এই আক্রমণকে তাদের নিজেদের ওপর আক্রমণ বলে মনে করবে। ১৯৫৫ খ্রীঃ পশ্চিম জার্মানী বা F.R.G.-কেও ন্যাটো চুক্তিভুক্ত করা হলে রাশিয়া ক্রোধে হুতাশন হয়। রাশিয়ার যুক্তি ছিল যে, জার্মানীর হাতে পুনরায় অস্ত্র তুলে দিয়ে সোভিয়েত সরকারকে আক্রমণের ছক তৈরি করা হচ্ছে। পশ্চিমী শক্তির যুক্তি ছিল যে, পূর্ব

১· এই দেশগুলি ছিল : (১) ব্রিটেন, (২) ফ্রান্স, (৩) ইতালী, (৪) নরওয়ে, (৫) আইসল্যাণ্ড, (৬) ডেনমার্ক (৭) নেদারল্যাণ্ডস, (৮) বেলজিয়াম, (৯) লাক্সেমবার্গ, (১০) পর্তুগাল, (১১) কানাডা।

ইওরোপে সোভিয়েত সাম্রাজ্য ও ওয়ারস সামরিক চুক্তির সম্ভাব্য আগ্রাসনের প্রথম লক্ষ্য হল F.R.G.। তাকে বাঁচাতে N.A.T.O. চুক্তির অন্তর্ভুক্ত করা হল। ন্যাটোর পরিচালনার জন্যে সদস্য দেশগুলির বিদেশমন্ত্রীদের দ্বারা একটি কাউন্সিল গঠন করা হয়। বছরে অন্ততঃ একবার এই কাউন্সিলের অধিবেশন বসার ব্যবস্থা করা হয়। সদস্য দেশগুলির সামরিক মন্ত্রীদের দ্বারা N.A.T.O.-র সুরক্ষা পরিষদ গঠন করা হয় এবং এই সুরক্ষা পরিষদের অধীনে N.A.T.O. সেনাপতিমণ্ডলীকে স্থাপন করা হয়। N.A.T.O.-কে প্রথমে অস্ত্রসজ্জার ব্যয় নির্বাহের জন্যে আমেরিকা ১ বিলিয়ন ডলার অর্থ সাহায্য দেয়। মার্কিন সেনাপতি প্রখ্যাত ডুইট ডি আইজেন হাওয়ারের নেতৃত্বে প্রথম N.A.T.O. সংগঠন গঠন করা হয়। N.A.T.O.-র হাতে ছিল মোট ২৫ ডিভিসন পদাতিক সেনা। সেই তুলনায় সোভিয়েত গোষ্ঠীর হাতে ছিল ২৪০ ডিভিসন পদাতিক সেনা। সুতরাং N.A.T.O. ভুক্ত দেশগুলিকে আত্মরক্ষা ও শক্তিসাম্যের জন্যে আণবিক বোমার ওপরেই বা ক্ষেপণাস্ত্রের ওপরেই নির্ভর করতে হয়। ব্রিটেন ও ফ্রান্সও আণবিক বোমা নির্মাণ করে।

N.A.T.O. চুক্তিতে যোগদানের ফলে মার্কিন দেশ তার চিরাচরিত Isolation বা 'একা চলো' নীতি ত্যাগ করে। আমেরিকা বহু বিচার-বিবেচনার পর এই সিদ্ধান্ত নেয়। যাঁরা মনে করেন যে Containment নীতিকে কার্যকরী করার জন্যেই আমেরিকা N.A.T.O. চুক্তিতে যোগ দেয় তাঁরা আংশিকভাবে ঠিক কথা বলেন। আসলে দূরপাল্লার বোমারু বিমানের আবিষ্কার, আণবিক বোমা বহনকারী দূরপাল্লার বোমারু বিমান, দূরপাল্লার আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্রের আবিষ্কার, রাশিয়ার হাতে হাইড্রোজেন বোমার অস্তিত্ব এবং মহাকাশে রুশ স্পুটনিকের জয়যাত্রা আমেরিকাকে কম্পিত করে। দুই মহাসমুদ্রের ভৌগোলিক আত্মরক্ষার বলয় আর মার্কিন দেশকে বৈদেশিক আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে সক্ষম নয়, একথা আমেরিকা বুঝে ফেলে। সুতরাং N.A.T.O চুক্তিতে যোগ দিয়ে আমেরিকা শুধু পশ্চিম ইওরোপকে সম্ভাব্য কমিউনিষ্ট আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে প্রয়াস করেনি; তার নিজের নিরাপত্তার স্বার্থে তাকে N.A.T.O.-তে যোগ দিতে হয়।

মার্কিন দেশের Isolation নীতি ত্যাগ করে NATOতে যোগদানের কারণ

N.A.T.O. জোট গঠিত হলে ঠাণ্ডা লড়াই চরম সীমায় ওঠে। রাশিয়া মনে করে যে, N.A.T.O. জোটের দ্বারা এবং আণবিক অস্ত্রের সাহায্যে তাকে আক্রমণের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। রুশ নেতারা N.A.T.O.-র বিরুদ্ধে বিস্তর আক্রমণাত্মক ভাষা ব্যবহার করেন। N.A.T.O. জোট অবশ্য ঘোষণা করে যে N.A.T.O. সদস্যরা আঞ্চলিক নিরাপত্তার কারণে জোট গঠন করলেও U.N.O.-র নীতি ও আদর্শের অনুগামী থাকবেন। কিন্তু ইওরোপ দুই শক্তি শিবিরে ভাগ হওয়ার দরুন U.N.O. কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ঐক্যমতে আসতে পারেনি। N.A.T.O. গোষ্ঠী U.N. Assembly-তে গড়ে ৪০টি এবং U.N. Security Council-এ গড়ে ৬টি জোটের অধিকারী হওয়ায়, সোভিয়েত প্রতিনিধি তীব্র বক্তৃতার পর ভেটো প্রদান করে বৃহত্তর সদস্যের সিদ্ধান্তকে বানচাল করতে থাকেন। বিশেষভাবে জার্মানীকে N.A.T.O.-র অন্তর্ভুক্ত করায় সোভিয়েত ইউনিয়ন তীব্র প্রতিবাদ জানায়।

U.N.O.তে F.R.G. র NATOতে যোগদানের বিরুদ্ধে সোভিয়েত বিরুদ্ধতা

ইতিমধ্যে ১৯৫০ খ্রীঃ কোরিয়ার যুদ্ধ চলে। এই গ্রন্থে ইওরোপের বাইরে ঠাণ্ডা লড়াই আলোচ্য বিষয় নয়। সুতরাং কোরিয়ার যুদ্ধ সম্পর্কে এখানে কোন আলোচনার অবকাশ নেই। যাই হোক, ১৯৫৩ খ্রীঃ মার্শাল ষ্ট্যালিনের মৃত্যুর পর ইওরোপে ঠাণ্ডা লড়াই কিছুটা মন্দীভূত হয়। রাশিয়া ইতিমধ্যে পরমাণু বোমা আবিষ্কার করে এবং মহাকাশে যুরি গ্যাগারিন মহাকাশ যান

দ্বারা পরিক্রমা দ্বারা তার শক্তির পরিচয় দেয়। তথাপি N.A.T.O. চুক্তির বিরুদ্ধে শক্তিসাম্য স্থাপনের জন্যে রাশিয়া পূর্ব ইওরোপের তার তাঁবেদার দেশগুলি নিয়ে Warsaw Pact নামে এক চুক্তি জোট গঠন করে। এই চুক্তি জোট ছিল N.A.T.O. জোটের প্রত্যুত্তর। Warsaw চুক্তি জোটের শর্ত অনুসারে রাশিয়া পূর্ব ইওরোপে তার সেনাদল রাখার অধিকার পায়। Warsaw চুক্তি, (১৯৫৫ খ্রীঃ) অনুসারে কোন সদস্য প্রতিবেশী দেশে অকমিউনিষ্ট নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলে Warsaw চুক্তি অনুযায়ী সেই অপরাধী দেশে সেনাদল পাঠিয়ে স্থিতাবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা যেত। এই অনুযায়ী ১৯৫৩তে পূর্ব জার্মানী, ১৯৫৬তে হাঙ্গেরী এবং ১৯৬৮তে চেকোশ্লোভাকিয়ায় সোভিয়েত মডেলের কমিউনিজম থেকে বিচ্যুতির অভিযোগে লালফৌজের দ্বারা বিদ্রোহ দমন করা হয়।

রাশিয়ার পরমাণু অস্ত্র লাভ ও আত্মরক্ষার কবচ হিসাবে Warsaw চুক্তি গঠন

এইভাবে ইওরোপ ঠাণ্ডা লড়াইয়ের ফলে দুই শক্তি শিবিরে বিভক্ত হয়। যুদ্ধকালীন সৈন্য ও মৈত্রীর আর কোনই চিহ্ন অবশিষ্ট ছিল না। জার্মানীর ঐক্যের প্রশ্নটি অমীমাংসিত থেকে যায়। জার্মান-পোল্যাণ্ড সীমান্তের প্রশ্নও অমীমাংসিত থাকে। তবে অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে শান্তিচুক্তি ১৯৫৫ খ্রীঃ স্বাক্ষরিত হয়। ইওরোপের বাইরে কোরিয়া, ভিয়েতনাম, আরব-ইসরায়েল, ভারত-পাকিস্তান, আফ্রিকায় কঙ্গোর প্রশ্ন প্রভৃতি ঠাণ্ডা লড়াই এই গ্রন্থের বিচার্য বিষয় নয়।

পঞ্চদশ অধ্যায়
জাতিপুঞ্জের প্রতিষ্ঠা
(The Founding of the United Nations)

জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠার পটভূমিকা (Attempts to lay the foundation of the U. N. O.) : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বশান্তি রক্ষা ও আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্যে জাতিসঙ্ঘ বা লীগ অফ নেশনস স্থাপিত হয়। কিন্তু ১৯৩১ খ্রীঃ হতে লীগের ব্যর্থতা প্রকটিত হতে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ১৯৩৯ খ্রীঃ আরম্ভ হলে লীগের মৃত্যুর ঘণ্টা বেজে যায়। লীগের পতন হলেও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উত্তেজনা প্রশমন ও শান্তি স্থাপনের জন্যে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা থেকে যায়। লীগের পতনের ফলে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয় তা পূরণ করার দরকার বৃহৎ শক্তিগুলি অনুভব করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যেই মিত্রশক্তির নেতারা একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের কথা ভাবতে থাকেন। অবশেষে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বা ইউনাইটেড নেশনস অর্গানাইজেশন স্থাপন দ্বারা এই উদ্দেশ্যকে বাস্তবরূপ দান করা হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি

১৯৪১ খ্রীঃ মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল আটলান্টিক মহাসাগরের বুকে আগাষ্টা যুদ্ধজাহাজে মিলিত হয়ে আটলান্টিক সনদপত্র ঘোষণা করেন। এই সনদে একটি বৃহত্তর স্থায়ী আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ স্থাপনের ইঙ্গিত দেওয়া হয়। আটলান্টিক সনদে বলা হয় যে, (১) সনদে যোগদানকারী সকল দেশ সমান মর্যাদা ও সার্বভৌমত্বের অধিকারী হবে। (২) সকল প্রকার বিবাদ শান্তিপূর্ণ উপায়ে নিষ্পত্তি করবে। (৩) প্রতি দেশের জনসাধারণ তাদের ইচ্ছামত শাসনতন্ত্র গঠনের অধিকার পাবে। ১৯৪২ খ্রীঃ ২৬টি জাতির সম্মিলিত ঘোষণাপত্রে আটলান্টিক সনদের প্রতি আস্থাজ্ঞাপন করা হয়। এই ২৬ জাতির সম্মেলনে সর্বপ্রথম জাতিপুঞ্জ বা United Nations কথাটি ব্যবহার করা হয়। ১৯৪৩ খ্রীঃ মস্কো সম্মেলনে ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, চীন একটি ঘোষণাপত্র প্রকাশ করে। এই ঘোষণাপত্রের চতুর্থ অনুচ্ছেদে বলা হয় যে :—"আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্যে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শান্তিপ্রিয় রাষ্ট্রগুলির সার্বভৌমতার ও সমমর্যাদার ভিত্তিতে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা চার শক্তি স্বীকার করছে।" এইভাবে মস্কোর ঘোষণাপত্রে মিত্রশক্তি একটি আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ স্থাপনের নীতি ঘোষণা করে।

আটলান্টিক সনদ ও জাতিপুঞ্জ ঘোষণাপত্র

১৯৪৪ খ্রীঃ ডাম্বারটন ওকস সম্মেলনে চতুঃশক্তি (ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত রাশিয়া ও কুয়োমিন তাং চীন) সমবেত হয়ে পরিকল্পিত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের জন্যে বিভিন্ন প্রস্তাব গ্রহণ করে। ১৯৪৫ খ্রীঃ ইয়াল্টা বৈঠকে ডাম্বারটন ওকস প্রস্তাবগুলি তিন রাষ্ট্রপ্রধান গ্রহণ করেন এবং এই সঙ্গে রাশিয়া ছাড়া বাইলো রাশিয়া ও ইউক্রেনকে জাতিপুঞ্জে সদস্যপদ দানের রুশ প্রস্তাব গৃহীত হয়। স্যানফ্রান্সিসকোতে পরবর্তী সম্মেলনে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বা United Nations-এর সদস্যদের যোগদানের জন্যে আহ্বান জানান হয়।

ডাম্বারটন ওকস্ ও ইয়াল্টা সিদ্ধান্ত

১৯৪৫ খ্রীঃ স্যানফ্রান্সিসকো সম্মেলন ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সম্মেলনে যে সকল রাষ্ট্র

অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিয়ত ছিল তাদের আহ্বান করা হয়। প্রথমে ৪৬টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি যোগ দেয়। পরে আরও ৪টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি যোগ দেয়। এই মোট ৫০টি জাতির প্রতিনিধিদের সম্মতিক্রমে জাতিপুঞ্জের সনদ গৃহীত হয়। স্যানফ্রান্সিসকো সম্মেলনের উদ্যোক্তা ছিল ৪ প্রধান। ২৪শে অক্টোবর, ১৯৪৫ খ্রীঃ জাতিপুঞ্জের সনদ চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়। এর ফলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বা United Nations Organisation স্থাপিত হয়। যাতে জাতিপুঞ্জের বৈঠকে অক্ষশক্তি ছাড়া অন্য শক্তিগুলির মধ্যে বিতর্ক না হয় এজন্য প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ইয়াল্টা বৈঠকে সোভিয়েত ইউনিয়নের ইউক্রেন, বাইলো রাশিয়া এবং রাশিয়া এই তিন ভোটের অধিকারে রাজী হন (আগে দেখ)। ল্যাটিন আমেরিকার রাষ্ট্রগুলি যাতে ঝামেলা সৃষ্টি না করে এজন্য মার্কিন সিনেটের অনুমোদন ক্রমে রুজভেল্ট এ্যাক্ট অফ চপুল্টেপেক (Act of Chaupultepec) চুক্তির দ্বারা U. N. O.তে আমেরিকার আত্মরক্ষার ব্যাপারে ল্যাটিন দেশগুলি সহমত হতে রাজী হয়।

স্যানফ্রান্সিকো সম্মেলন ঃ জাতিপুঞ্জের সনদ গ্রহণ

জাতিপুঞ্জের সংগঠন এবং জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য ও সনদের বৈশিষ্ট্য (The Organisation of the U.N.O and its aims and characteristics of the U.N. Charter) ঃ জাতিপুঞ্জের সনদ দ্বারা জাতিপুঞ্জের ছয়টি শাখার গঠনতন্ত্র, কার্যক্রম স্থির করা হয়। এই ছয় শাখা ছিল যথাক্রমে ঃ—(১) সাধারণ সভা (General Assembly) ; (২) নিরাপত্তা পরিষদ (Security Council) ; (৩) জাতিপুঞ্জের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দপ্তর (Economic, Social & Cultural Council) ; (৪) অছি পরিষদ (Trusteeship Council) ; (৫) আন্তর্জাতিক আদালত (International Court of Justice) ; (৬) জাতিপুঞ্জের কার্যনির্বাহক দপ্তর (The Secretariat of the U. N. O.)।

জাতিপুঞ্জ

নিরাপত্তা পরিষদ

জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভা

জাতিপুঞ্জের কার্যনির্বাহক দপ্তর ঃ সেক্রেটারিয়েট

অছি পরিষদ

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ

আন্তর্জাতিক আদালত

সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে নিযুক্ত বিশেষ সংস্থা

জাতিপুঞ্জের সনদের প্রস্তাবনায় (Preamble) জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সম্পর্কে বলা হয় যে ঃ—"আমরা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্যগণ...... এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে,

জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

আমরা, পরবর্তী প্রজন্মদের যুদ্ধের মড়ক হতে, যে যুদ্ধ দুবার মানব জাতির অশেষ দুঃখ-দুর্দশা সৃষ্টি করেছে…, তা থেকে রক্ষা করার জন্যে একটি আন্তর্জাতিক সংঘ, যার নাম জাতিপুঞ্জ তা গঠন করলাম।" জাতিপুঞ্জের প্রাথমিক ও প্রধান লক্ষ্য হল (১) আন্তর্জাতিক যুদ্ধ নিরোধ, উত্তেজনা প্রশমন এবং আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ বিরোধের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তি করা। (২) আন্তর্জাতিক শান্তি স্থাপন ছাড়া মানব জাতির কল্যাণ ও অর্থনৈতিক প্রগতির জন্যে জাতিপুঞ্জ কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই উদ্দেশ্যে জাতিপুঞ্জের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিষদ গঠন করা হয়েছে। (৩) যে সকল সদস্য জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠায় অংশ নেয় তাদের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য বলা হয়। জাতিপুঞ্জের দরজা নব প্রতিষ্ঠিত জাতিগুলির জন্যেও উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। যদি কোন নবীন রাষ্ট্র জাতিপুঞ্জের সদস্য পদ চায় তবে তাকে শান্তিকামী ও জাতিপুঞ্জের আদর্শে আস্থাশীল হতে হবে। সাধারণ সভার সদস্যদের $\frac{২}{৩}$ সমর্থন এবং নিরাপত্তা পরিষদের অনুমোদন পেলে তবেই জাতিপুঞ্জের সদস্য পদ লাভ করা যায়। অর্থাৎ নিরাপত্তা পরিষদের কোন স্থায়ী সদস্য ভেটো দিলে নতুন সদস্য পদের দরখাস্ত খারিজ হয়ে যায়।

জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভা আইনতঃ বছরে অন্ততঃ একবার অনুষ্ঠিত হয়। নিরাপত্তা পরিষদ বিশেষ জরুরী কারণে সাধারণ সভার অধিবেশন অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরা চাইলে সাধারণ সভার বিশেষ অধিবেশন ডাকা যেতে পারে। সাধারণ সভার সকল সদস্য রাষ্ট্রের সমান ভোটাধিকার আছে। সাধারণ সভার সদস্যদের সকলকে একমত হয়ে কোন প্রস্তাব নিতে হবে এমন কোন আইন নেই। সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের ভোটেই প্রস্তাব গৃহীত হতে পারে। সাধারণ সভায় জাতিপুঞ্জের সনদের এক্তিয়ারভুক্ত যে কোন বিষয়ে আলোচনা ও প্রস্তাব গ্রহণ করা যায়। সাধারণতঃ আন্তর্জাতিক উত্তেজনা ও বর্ণ-বৈষম্য অথবা আগ্রাসন সম্পর্কে সাধারণ সভায় বিতর্ক হয়। সাধারণ সভার গৃহীত প্রস্তাবকে কার্যকরী করতে হলে প্রথমতঃ $\frac{২}{৩}$ সংখ্যাগরিষ্ঠতা দরকার। কিন্তু সাধারণ সভা নিরাপত্তা পরিষদের সম্মতি ছাড়া কোন বিষয়ে প্রস্তাব নিতে পারে না এবং প্রস্তাব কার্যকরী করার জন্যে তাকে নিরাপত্তা পরিষদের ওপর নির্ভর করতে হয়। ১৯৫০ খ্রীঃ কোরিয়া যুদ্ধের সময় জাতিপুঞ্জের সনদের সংশোধন করে Unite for Peace প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রস্তাব অনুসারে বিশ্বশান্তি বিপন্ন হবে এরকম কোন বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণে নিরাপত্তা পরিষদ বিফল হলে তা সাধারণ সভায় আনা যাবে। সাধারণ সভার $\frac{২}{৩}$ ভোটে যা সিদ্ধান্ত হবে তাকেই কার্যকরী করা যাবে। মোট কথা, ইদানীংকালে সাধারণ সভার ক্ষমতা বাড়ান হয়েছে। ১৯৪৫ খ্রীঃ যেখানে সাধারণ সভার সদস্য ছিল ৫০, ১৯৬৬ খ্রীঃ তা দাঁড়ায় ১২২। কাজেই বৃহৎ শক্তিগুলির পক্ষে এখন ইচ্ছামত সাধারণ সভায় কোন প্রস্তাব পাশ করান সম্ভব নয়। তাছাড়া তৃতীয় বিশ্বের নিরপেক্ষ দেশগুলি, যথা, ভারত প্রভৃতিকে ঠাণ্ডা লড়াই-এর যুগে কোন বৃহৎ শক্তির চাটুকারিতায় রাজী করান যায়নি। সুতরাং জাতিপুঞ্জে এখন সাধারণ সভা বেশ গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছে। বিশেষতঃ Unite for Peace প্রস্তাব গ্রহণের পর নিরাপত্তা পরিষদকে টপকে সাধারণ সভা সিদ্ধান্ত নিতে এখন সক্ষম।

সাধারণ সভার গঠন ও ক্ষমতা

নিরাপত্তা পরিষদ হল জাতিপুঞ্জের হৃদপিণ্ড। জাতিপুঞ্জের সনদ অনুযায়ী আন্তর্জাতক শান্ত ও নিরাপত্তা রক্ষার প্রাথমিক ও প্রধান দায়িত্ব এই পরিষদের। এই সভায় ১১ জন সদস্যের মধ্যে ৫ জন স্থায়ী সদস্য ও ৬ জন অস্থায়ী সদস্য। ৫ স্থায়ী সদস্য জাতিপুঞ্জের পাঁচ উদ্যোক্তা ও অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে বিজয়ী ৫ শক্তি যথা; ব্রিটেন, ফ্রান্স, চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়া জাতিপুঞ্জের সনদ অনুসারে ৫ স্থায়ী সদস্যের ভেটো বা বিশেষ ক্ষমতা আছে। পরিষদের কার্যধারা (Procedural) সংক্রান্ত

নিরাপত্তা পরিষদের গঠন ও ক্ষমতা

ব্যাপারে ভেটো প্রয়োগ করা যায় না। ১১ সদস্যের মধ্যে ৭ সদস্য ঐক্যমত হলেও কার্যধারা স্থির করা যায়। কিন্তু কার্যধারা ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে স্থায়ী পাঁচ সদস্যের সম্মতি প্রয়োজন। কোন এক স্থায়ী সদস্য আপত্তি বা ভেটো প্রয়োগ করলে আর এই বিষয়ে নিরাপত্তা পরিষদ আগাতে পারে না। নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশন বছরের সব সময় চলে। স্থায়ী ৫ সদস্য পদাধিকার বলে সদস্য থাকে। বাকী ৬ অস্থায়ী সদস্য ২ বছরের জন্যে সাধারণ সভার দ্বারা নির্বাচিত হয়। নিরাপত্তা পরিষদ জাতিপুঞ্জের যাবতীয় রাজনৈতিক কাজকর্মের কেন্দ্রস্থল। আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষা ও উত্তেজনা প্রশমনের প্রধান দায়িত্ব এই সভার হাতে ন্যস্ত। ১৯৬৫ খ্রীঃ থেকে নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যের সংখ্যা ৬ থেকে বাড়িয়ে ১০ করা হয়েছে। এখন ১০ + ৫ = এই ১৫ সদস্যের মধ্যে ৯ সদস্যের ঐক্যমত হলেই সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। কিন্তু ৫ বৃহৎ সদস্যের যে কোন এক সদস্য ভেটো প্রদান করলে নিরাপত্তা পরিষদ ঠুটো জগন্নাথে পরিণত হয়। মার্কিন দেশ ও রাশিয়া নিরাপত্তা পরিষদের সভায় বহু বার ভেটো দিয়েছে।

যেহেতু বিশ্বশান্তি রক্ষার প্রাথমিক দায়িত্ব নিরাপত্তা পরিষদের হাতে, সেহেতু বছরের প্রায় সব সময় এই পরিষদের অধিবেশন চলে। নিরাপত্তা পরিষদের গৃহীত সিদ্ধান্ত U. N. O.র সাধারণ সদস্যরা সাধারণতঃ মেনে নেয়। ঠাণ্ডা লড়াই-এর ফলে রুশ-মার্কিন বিরোধের কারণে নিরাপত্তা পরিষদে ঘন ঘন ভেটো প্রদান করায়, নিরাপত্তা পরিষদ বিশ্ব শান্তি রক্ষায় তার দায়িত্ব পালনে সর্বদা সক্ষম হয়নি। এজন্য জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভার ক্ষমতা ক্রম বর্দ্ধমান। নিরাপত্তা পরিষদের ব্যর্থতার জন্যেই সাধারণ সভার ক্ষমতা বাড়ছে। N.A.T.O, Warsaw Pact প্রভৃতি গঠনের ফলে বৃহৎ শক্তিগুলি U.N.O. অপেক্ষা এই সকল আঞ্চলিক জোটের ওপর নিরাপত্তার জন্যে বেশী নির্ভরশীল হয়েছে. U.N.O.-র সম্মান ও মর্যাদা এতে বাড়েনি। বৃহৎ শক্তিগুলি অনেক সময় তাদের সিদ্ধান্তকে U.N.O. সমর্থন করবে এটাই চায়, তা ন্যায্য বা অন্যায্য যাই হোক না কেন। সাধারণ সভায় তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির সংখ্যা বাড়ার ফলে এখন বৃহৎ শক্তির ইঙ্গিতে U.N.O. চলে না। বৃহৎ শক্তিগুলি কোন কোন সময় U.N.O-কে By pass বা পাশ কাটিয়ে নিজ সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার চেষ্টা করে। কিন্তু সব সময় তা সম্ভব নয়।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ, অছি পরিষদ

জাতিপুঞ্জের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদকে (ECOSOC) মানব অধিকার রক্ষা এবং মানব সমাজের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে। জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, শিক্ষা-বিষয়ক সূচী গ্রহণ এবং অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের জন্যে এই পরিষদ বিভিন্ন কর্মসূচী নেয়। সাধারণ সভা ১৮ জন সদস্যকে তিন বছর অন্তর এই পরিষদের সদস্য হিসেবে নিবার্চন করে। ১৯৬৫ খ্রীঃ থেকে এই সভার সদস্য সংখ্যা বাড়িয়ে ১৮ থেকে ২৭ জন করা হয়েছে। এই সভার অধিবেশন বছরে দুবার বসে। এই সভা মানব জাতির বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে ব্যবস্থা নেয় এবং কমিশন নিয়োগ করে, যথা ঃ—(ক) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী, (খ) মানবাধিকার রক্ষার কর্মসূচী, (গ) নারীদের অধিকার রক্ষা, (ঘ) ক্ষতিকারক নেশার বস্তু (Narcotic drug) ব্যবহার ও বিক্রী নিয়ন্ত্রণ, (ঙ) আঞ্চলিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন, (চ) যুদ্ধের ফলে বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের সাহায্য প্রদান, (ছ) I.L.O. বা আন্তর্জাতিক শ্রমিক সঙ্ঘের নিয়ম অনুযায়ী যে কোন দেশের শ্রমিক ইউনিয়নগুলিকে U.N.O.-র স্বীকৃত নিয়ম অনুযায়ী সুযোগ-সুবিধা ভোগে সাহায্য করা।

জাতিপুঞ্জের এই অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের অধীনে ৪টি অর্থনৈতিক সংস্থা গঠন করা হয়। (১) I.M.F (International Monetary Fund) বা আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংস্থা আন্তর্জাতিক স্তরে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার মানের স্থায়িত্ব বিধান বা সেই দেশের আর্থিক ও বাণিজ্যিক উন্নতির জন্যে ঋণ প্রদান বা সাহায্য প্রদান করা। (২) বিভিন্ন দেশের খাদ্য ও কৃষির

উন্নতির জন্যে একটি সংস্থা—রোম থেকে কাজ করে। যে কোন দেশের খাদ্য উৎপাদনে কারিগরী সাহায্য এই এজেন্সী থেকে দেওয়া হয়। (৩) W.H.O (World Health Organisation) বা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মারাত্মক মহামারী বা স্থায়ী রোগগুলির কারণ নির্ণয় ও নিরাময় করায় সাহায্য করে। মহামারীর জীবাণু নির্মূল করার জন্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। (৪) I.A.E.A (International Atomic Energy Agency) বা আন্তর্জাতিক আনবিক গবেষণা সংস্থা দ্বারা আনবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ কাজ ও গঠনমূলক কাজের জন্যে গবেষণার ব্যবস্থা করা হয়। (৫) UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation) বা জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক উন্নয়ন সংঘ দ্বারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নিরক্ষরতা দূরীকরণ কর্মসূচী, শিক্ষার উন্নতি, সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের ব্যবস্থাদি করা। জাতিপুঞ্জের অছি পরিষদের (Trusteeship Council) দায়িত্ব হল লীগের ম্যান্ডেটভুক্ত দেশগুলির, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে শত্রুপক্ষের কাছ থেকে দখল করা স্থানগুলির এবং যদি কোন বিবাদী স্থানে নিরপেক্ষতা রক্ষার জন্যে জাতিপুঞ্জ তা হাতে নেয়, সেই সকল স্থানের প্রশাসনিক ব্যবস্থা গঠন, শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা। ১৯৪৫ খ্রীঃ অছি পরিষদের হাতে ছিল লীগ অব নেশনসের ম্যান্ডেটভুক্ত ১১টি দেশের দায়িত্ব। ক্রমে এই ম্যান্ডেটগুলিকে স্বাধীনতা দান করা হয়। ১৯৬৬ খ্রীঃ অছি পরিষদের হাতে মাত্র ৩টি দেশের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। অছি পরিষদ তার হাতে ন্যস্ত দেশগুলির পরিদর্শন এবং প্রশাসনিক উন্নতির জন্যে নির্দেশ দিতে পারে।

লীগ অব নেশনস-এর আমলে হল্যান্ডের হেইগ্ নগরে আন্তর্জাতিক আদালত স্থাপিত হয়েছিল। লীগের পতনের পর এরূপ একটি আদালত গঠনের প্রয়োজনীয়তা বুঝে জাতিপুঞ্জের সনদে আন্তর্জাতিক আদালত গঠনের ব্যবস্থা করা হয়। এই আদালতের কাজ হল দুই বা একাধিক বিবাদমান পক্ষ তাদের বিরোধের বিষয় স্বেচ্ছায় এই আদালতে নিষ্পত্তির জন্যে রাজী হলে তার নিষ্পত্তি করা, অথবা বিরোধ সম্পর্কে আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে পরামর্শ দান করা ইত্যাদি। সাধারণতঃ হেইগ আদালতের রায় কোন বিবাদী পক্ষ চাপতে বাধ্য নয়। এই আদালতে কোন বিরোধীর বিষয় সম্পর্কে মতামত চাওয়া হলে, এই আদালত তার আইনগত দিকগুলি সম্পর্কে মত দিতে পারে। এই আদালতে ১৫ জন বিচারক আছেন। আদালতের রায় সর্বসম্মত না হলে সংখ্যাগরিষ্ঠের রায়ই বৈধ মনে করা হয়। জাতিপুঞ্জের কাজকর্ম পরিচালনার জন্যে একটি কার্যনির্বাহী দপ্তর (Secretariat) গঠন করা হয়। এই দপ্তর জাতিপুঞ্জের যাবতীয় রিপোর্ট রচনা, নিরাপত্তা পরিষদ ও সাধারণ সভার অধিবেশনের ব্যবস্থা করে এবং বিভিন্ন সদস্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সেক্রেটারী জেনারেলের নির্দেশে চিঠিপত্র বিনিময় করে। জাতিপুঞ্জের কার্যনির্বাহী পরিষদের প্রধান হলেন মহাসচিব বা সেক্রেটারী জেনারেল (Secretary General)। ইনি নিরাপত্তা পরিষদের অনুমোদনক্রমে সাধারণ সভার দ্বারা নির্বাচিত হন। মহাসচিব জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভার অধিবেশন আহ্বান, নিরাপত্তা পরিষদে রিপোর্ট প্রদান, নিরাপত্তা পরিষদের নির্দেশ কার্যকরী করা ও আরও বহু গুরুতর দায়িত্ব পালন করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক নগরের ইষ্ট নদীর তীরে রাষ্ট্রপুঞ্জের সদর কার্যালয় অবস্থিত।

আন্তর্জাতিক আদালত ও কার্যনির্বাহক দপ্তর

লীগ অফ নেশনসের ত্রুটিগুলি লক্ষ্য করে জাতিপুঞ্জের সনদ এমনভাবে রচনা করা হয় যে, যাতে জাতিপুঞ্জ বিশ্বশান্তি রক্ষা ও যুদ্ধ নিরোধের কাজে সফলতা পায়। এজন্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর স্বাক্ষরিত শান্তি চুক্তিগুলির প্রশ্নকে জাতিপুঞ্জের সনদের এক্তিয়ারে রাখা হয় নি। কারণ আশঙ্কা করা হয় যে, শান্তি চুক্তি সম্পর্কে তিক্ততা ও বিরোধ জাতিপুঞ্জকে দুর্বল করতে পারে।

জাতিপুঞ্জের সনদে জাতিপুঞ্জকে যেটুকু সামরিক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তা লীগের ছিল না। জাতিপুঞ্জের সনদে একথা বলা হয়েছে যে, যদি নিরাপত্তা পরিষদ শান্তিপূর্ণ উপায়ে আগ্রাসন বন্ধ ও শান্তি রক্ষায় অসমর্থ হয়, তবে প্রয়োজনে নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে জাতিপুঞ্জ আগ্রাসনকারীর বিরুদ্ধে সামরিক শক্তি ব্যবহার করা যাবে। সনদে বলা হয়েছে যে, নিরাপত্তা পরিষদ আগ্রাসনকারীর বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেবেন। রাষ্ট্রপুঞ্জের মহাসচিব সদস্য দেশগুলিকে প্রয়োজনীয় সেনা, অস্ত্র ইত্যাদি পাঠাতে নির্দেশ দিবেন। সেই সেনাদল জাতিপুঞ্জের পতাকার নীচে জাতিপুঞ্জের মনোনীত সামরিক দপ্তরের নির্দেশে কাজ করবে। এই দিক হতে জাতিপুঞ্জের সনদে লীগের সংবিধানের দুর্বলতা দূর করার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে কার্যক্ষেত্রে জাতিপুঞ্জের ব্যর্থতা লক্ষ্য করা যায়। কারণ জাতিপুঞ্জের সকল কাজ নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যদের অনুমোদনক্রমে পরিচালিত হয়। কোন সদস্য ভেটো প্রদান করলে এ বিষয়ে আর আগান যায় না। পূর্ব-পশ্চিম ঠান্ডা লড়াইয়ের দরুণ স্থায়ী সদস্যরা পক্ষপাতদুষ্টভাবে ভেটো প্রদান করে জাতিপুঞ্জের মর্যাদা ও ক্ষমতাকে বিনষ্ট করেছেন এবং জাতিপুঞ্জকে লীগের মতই গুরুত্বহীন প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার ব্যবস্থা করেছেন।

জাতিপুঞ্জের সনদের বৈশিষ্ট্য

জাতিপুঞ্জের কার্যকলাপ (The Activities of the U.N.O.) : জাতিপুঞ্জের সদর দপ্তর নিউ ইয়র্কের ম্যানহাটানে অবস্থিত। জাতিপুঞ্জের প্রথম সাধারণ সম্পাদক ছিলেন নরওয়ের ট্রিগভী লী। পারস্যে রুশ অধিকার এবং গ্রীসে ব্রিটেনের অধিকার সম্পর্কে জাতিপুঞ্জে সর্বপ্রথম মামলা শুরু হয়। ১৯৪৭ খ্রীঃ থেকে ঠান্ডা লড়াই শুরু হলে নিরাপত্তা পরিষদ যাতে বিবাদী বিষয়ে কোন ব্যবস্থা নিতে না পারে এজন্য রাশিয়া পুনঃ পুনঃ ভেটো ক্ষমতা ব্যবহার করে। একই বছরে ব্রিটেন জাতিপুঞ্জে প্যালেস্টাইন সমস্যা উত্থাপন করলে জাতিপুঞ্জ নিযুক্ত কমিশন প্যালেস্টাইন ব্যবচ্ছেদের সুপারিশ করে। ১৯৪৯ খ্রীঃ চিয়াং-কাই-শেখের কুয়ো-মিন-তাং সরকার চীনের মূল ভূখন্ড হতে কমিউনিস্টদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে ফর্মোজা দ্বীপে আশ্রয় নিলে, রাশিয়া-চীনের কমিউনিস্ট সরকারকে নিরাপত্তা পরিষদে কুয়ো-মিন-তাং-এর বদলে স্থায়ী পদ প্রদানের প্রস্তাব করে। মার্কিন ভেটোর ফলে এই প্রস্তাবনা নাকচ হয়।ফর্মোজার চীন সরকারই নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য হিসেবে বিদ্যমান থাকে। এর প্রতিবাদে রাশিয়া নিরাপত্তা পরিষদ সহ U.N.O. সকল সভা ও কমিটি বর্জন করে। পরে রাশিয়াকে এই ভুল সিদ্ধান্তের জন্যে অনুতাপ করতে হয়।

১৯৫০ খ্রীঃ ২৫শে জুন দক্ষিণ কোরিয়া এবং কোরিয়ায় নিযুক্ত জাতিপুঞ্জের পরিদর্শক কমিশন রিপোর্ট পাঠায় যে, উত্তর কোরিয়া দক্ষিণ কোরিয়াকে ৩৮° ডিগ্রী অক্ষাংশ সীমা.পার হয়ে আক্রমণ করেছে। যেহেতু নিরাপত্তা পরিষদে রাশিয়া ইচ্ছে করে অনুপস্থিত ছিল সেহেতু নিরাপত্তা পরিষদ রাশিয়ার অনুপস্থিতিতেই কোরিয়ায় যুদ্ধ বিরতি প্রস্তাব ঘোষণা করে এবং U.N.O.-র সকল সদস্যকে U.N. Charter অনুযায়ী সৈন্য পাঠিয়ে কোরিয়ায় যুদ্ধ বন্ধের জন্যে কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ জানায়। মার্কিন দেশ জাপান থেকে তারা সেনাদল দুদিনের মধ্যে দক্ষিণ কোরিয়ায় নামিয়ে দেয় এবং এই সেনাদল জাতিপুঞ্জের পতাকার নীচে যুদ্ধ শুরু করে দেয়। আমেরিকার সমর্থক প্রায় ১৬টি দেশ তাদের সেনা পাঠায় এবং অপর ৪৫টি দেশ নানাভাবে সহায়তা দেয়। ভারত নিরপেক্ষ ভূমিকা নিলে মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব ভারতকে জব্দ করার জন্যে জাতিপুঞ্জের সনদ অনুযায়ী সেনা পাঠাতে চাপ দেন। ভারত শেষ পর্যন্ত একটি মেডিক্যাল মিশন পাঠাতে বাধ্য হয়।

ইতিমধ্যে রাশিয়া নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে ফিরে আসে। রাশিয়া এসে আপত্তি জানায় যে, নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য অনুপস্থিত থাকলে, সেই অনুপস্থিতি কালে গৃহীত সিদ্ধান্ত

অবৈধ এবং তা কার্যকরী করা যায় না। সুতরাং কোরিয়ায় জাতিপুঞ্জের পতাকার নীচে সেনা প্রেরণ অবৈধ। দ্বিতীয়তঃ, এখন কোরিয়া সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদ কোন সিদ্ধান্ত নিতে চেষ্টা করলে রাশিয়া ভেটো দিতে শুরু করে। পশ্চিমী জোটের যুক্তি ছিল যে, নিরাপত্তা পরিষদের কোন স্থায়ী সদস্য অনুপস্থিত থাকতে পারে না, কারণ সে স্থায়ী সদস্য। সুতরাং তার ইচ্ছাকৃত অনুপস্থিতি কালে গৃহীত সিদ্ধান্ত সে মেনে নিতে বাধ্য। সুতরাং এখন রাশিয়ার উচিত দক্ষিণ কোরিয়ার পক্ষে রাষ্ট্রপুঞ্জের সেনাদলে যোগ দেওয়া। উত্তর কোরিয়া ছিল রুশ সমর্থিত। সুতরাং রাশিয়া এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে। রাশিয়ার ভেটো দানের দ্বারা নিরাপত্তা পরিষদের কাজ কর্ম অচল করা হলে, ১৯৫০ খ্রীঃ রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সভা রাষ্ট্রপুঞ্জের সংবিধান সংশোধন করে Unite for peace প্রস্তাব পাশ করে। এই প্রস্তাবে বলা হয় যে, ভেটো প্রদানের জন্যে কোন আন্তর্জাতিক সঙ্কটে নিরাপত্তা পরিষদ অকার্যকারী হলে, জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভার বিশেষ জরুরী অধিবেশন ডেকে বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে। প্রয়োজন হলে সাধারণ সভা সকল সদস্যকে আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে অস্ত্র গ্রহণের ডাক দিতে পারে। রাশিয়া এই প্রস্তাবকে বে-আইনী বলে অগ্রাহ্য করে।

তা হলেও কোরিয়ার যুদ্ধে U.N.O. বিশেষতঃ General Assembly বা সাধারণ সভার যথেষ্ট মর্যাদা বাড়ে। যদিও আমেরিকা কমিউনিষ্ট চীনকে U.N.O.-র সদস্য পদ দানের ঘোর বিরোধী ছিল, U.N.O.-র মহা সম্পাদক কমিউনিষ্ট চীনকে সদস্য পদ দানকে সমর্থন করেন। যেহেতু তিনি উত্তর কোরিয়াকে আগ্রাসী বলে ঘোষণায় বিরোধিতা করেন নি, সেহেতু রাশিয়ার মতে তিনি ছিলেন ব্রিটেন আমেরিকার হাতের পুতুল। তাঁর সেক্রেটারী জেনারেল হিসেবে পুনঃ নির্বাচনের বিরুদ্ধে রাশিয়া ভেটো দেয়। যেহেতু আমেরিকা জানায় যে, অন্য কোন প্রার্থীর নাম প্রস্তাব করা হলে মার্কিন ভেটো দেওয়া হবে, শেষ পর্যন্ত উভয় পক্ষ আরও তিন বছরের জন্যে ট্রিগভী লী-কে মহা সম্পাদকের কাজ করতে দিতে রাজী হয়। তথাপি রাশিয়া তাঁকে বয়কট করে চলায় ট্রিগভী লী নিজে থেকে ১৯৫২ খ্রীঃ নভেম্বরে পদত্যাগ করেন। তাঁর স্থলে আসেন দ্যাগ হ্যামার শিয়েল্ড। ১৯৫০-১৯৫৬ খ্রীঃ ভিয়েতনামের যুদ্ধ চলে। যেহেতু এই যুদ্ধ U.N.O.-কে এড়িয়ে চালান হয় এবং বৃহৎ শক্তিগুলি ভিয়েতনাম প্রশ্ন U.N.O.-তে তুলতে রাজী হন নি, সেহেতু ভিয়েতনাম যুদ্ধে U.N.O. দর্শকের ভূমিকা নেয়। তার অর্থ এই নয় যে ড্যাগ হ্যামার শিয়েল্ড U.N.O.-র মর্যাদা ও ভূমিকা পালনে যত্নশীল ছিলেন না। যেক্ষেত্রে ট্রিগভী লী "সাবধানী বিবেচনা প্রয়োগ না করে প্রচারের উপর জোর দেন", হ্যামার শিয়েল্ড প্রচার এড়িয়ে একান্তে আপোষ রক্ষার নীতির উপর জোর দেন। তাঁর আমলে U.N.O. রাজনীতির ক্ষেত্রে তত সফল না হলেও, UNESCO ও অন্যান্য গঠনমূলক কাজে U.N.O. বিশ্বের এক অপরিহার্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। U.N.O -র সাধারণ সভায় সদস্য সংখ্যা ৫২ থেকে ৬৩ হলে সাধারণ সভায় বিতর্ক, প্রস্তাব গ্রহণের কাজ অনেক বেশী প্রাণবন্ত ও খোলাখুলি হয়। U.N.O.-এর সাধারণ সভায় সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত এশীয় দেশগুলি বা তৃতীয় বিশ্ব দেশগুলি জোট নিরপেক্ষ নীতি অনুকরণ করায়, পূর্ব-পশ্চিম দুই বৃহৎ শক্তির পক্ষে U.N.O.-কে ঠান্ডা লড়াই-এর স্বার্থে আর ব্যবহার করা সহজ কাজ ছিল না। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির ভোটের সমর্থন না পেলে কোন প্রস্তাব রাশিয়া বা আমেরিকার পক্ষে পাশ করান সহজ কাজ ছিল না। বান্দুং সম্মেলনে আফ্রো-এশিয়াটিক দেশগুলি জোট নিরপেক্ষতা নীতি গ্রহণ করায় U.N.O.-র ভাবমূর্তি অনেক বেশী উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

ঠিক এই সময় ১৯৫৬ খ্রীঃ সুয়েজ সঙ্কট ঘটে। ১৩ই অক্টোবর সুয়েজ সঙ্কট সমাধানের জন্যে নিরাপত্তা পরিষদের গৃহীত ৬টি প্রস্তাব রাশিয়া ভেটো দ্বারা রদ করে। এরপর ২০শে অক্টোবর ইজরায়েল মিশর আক্রমণ করলে, ইজরায়েলের মিত্র হিসেবে ব্রিটেন ও ফ্রান্স মিশর আক্রমণ

করতে চায়। কারণ সুয়েজ খাল মিশর জাতীয়করণ করায় ব্রিটেন ও ফ্রান্স মিশরকে উচিত শিক্ষা দিতে উদগ্রীব ছিল। এখন ইজরায়েল মিশরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করায় ফ্রান্স ও ব্রিটেনের সুয়েজ খাল রক্ষার অজুহাতে মিশরের বিরুদ্ধে যোগদানের সুযোগ এসে যায়। কিন্তু ব্রিটেন ও ফ্রান্স মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কোন পরামর্শ না করে সিদ্ধান্ত নেয়। ডেসমন্ড ক্রাউলির মতে, এটাই ছিল ব্রিটেনের সর্বাপেক্ষা বড় কূটনৈতিক ভুল। ৩০শে অক্টোবর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিরাপত্তা পরিষদে প্রস্তাব দেয় যে, এই পরিষদের সকল সদস্য আপাততঃ মিশরের যুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করা থেকে বিরত থাকুক। ফলে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সুয়েজ যুদ্ধে যোগদানের পথ রুদ্ধ হতে বসে। ফলে ব্রিটেন ও ফ্রান্স এই প্রস্তাবে ভেটো দান করে।

সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকার উদ্যোগে Unite for Peace Resolution, 1950 অনুযায়ী সুয়েজের সমস্যা U.N.O.-র সাধারণ সভার গোচরে আনা হয়। ইতিমধ্যে ব্রিটেন ও ফ্রান্স মিশরে সেনা প্রেরণ করেছিল। সাধারণ সভায় ভয়ানক উত্তপ্ত বিতর্ক হয়। ভারত প্রভৃতি তৃতীয় বিশ্বের জোট নিরপেক্ষ দেশগুলি কড়াভাষায় ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব ও Gunboat displomacy-কে ধিক্কার জানায়। এমনকি ব্রিটিশ ও ফরাসী আগ্রাসনকারীদের বহিষ্কারের জন্যে জাতিপুঞ্জের সেনাদল পাঠাবার হুমকি দেয়। শেষ পর্যন্ত সাধারণ পরিষদ অবিলম্বে যুদ্ধ বিরতি এবং আগ্রাসনকারী দেশের সেনাদল সরিয়ে নিতে নির্দেশ দেয়। ব্রিটেন নতি স্বীকার করে জানায় যে, যদি জাতিপুঞ্জ ক্যানাল সমস্যার সমাধান করতে পারে তাহলে তারা সেনা সরিয়ে নিবে।

এই অবস্থায় সেক্রেটারী জেনারেল ড্যাগ মিশরে U.N.O. জরুরী শান্তিবাহিনী প্রেরণের খসড়া পেশ করেন। দশটি নিরপেক্ষ দেশ থেকে ৫০০০ সেনা মিশরে পৌঁছে যায়। ব্রিটেন ও ফ্রান্স মিশর ছেড়ে যায়। ইস্রায়েল বহু অনিচ্ছা সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক চাপে স্থিতাবস্থা ফিরিয়ে দেয়। ১৯৬৭ খ্রীঃ পর্যন্ত U.N.E.F. (United Nations Emergency Force) বা U.N. বাহিনী মিশর ও ইস্রায়েলীদের মধ্যে বাফার হিসেবে কাজ করে।

সুয়েজের ঘটনায় U.N.O.-র ভূমিকা U.N.O.-র মর্যাদা বাড়ায়। U.N.O. সুয়েজের ক্ষেত্রে অন্ততঃ দেখাতে সক্ষম হয় যে, সদস্যরা একমত হলে U.N.O. যুদ্ধমান দেশকে যুদ্ধ বন্ধ করতে বাধ্য করতে সক্ষম। U.N.E.F.-এর ন্যায্য ব্যবহার করলে যুদ্ধকারী দেশগুলিকে যুদ্ধ থামাতে বাধ্য করা সম্ভবপর। ১৯৬০ খ্রীঃ কঙ্গোর ক্ষেত্রেও U.N.E.F. ব্যবহার করা হয়। সুয়েজ ঘটনায় U.N. সেক্রেটারী জেনারেলের যে বিশেষ Executive ক্ষমতা আছে তা প্রমাণিত হয়।

কিন্তু একই সময়ে রুশ আধিপত্যের বিরুদ্ধে (১৯৫০ খ্রীঃ) হাঙ্গেরীয় জাতীয় কমিউনিষ্টরা বিদ্রোহ ঘোষণা করলে, রুশ ট্যাঙ্ক বাহিনীর হাঙ্গেরী আক্রমণের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা পরিষদে পশ্চিমী শক্তি প্রস্তাব উত্থাপন করলে এবং হাঙ্গেরীয় প্রধানমন্ত্রী ইমরেনাগী U.N.O.-র সহায়তা চাইলে রাশিয়া নিরাপত্তা পরিষদে। হাঙ্গেরীয় বিষয় আলোচনার বিরুদ্ধে veto প্রদান করে। প্রশ্নটি U.N.O.-র সাধারণ সভায় আনা হলে রাশিয়াকে নিন্দা করে প্রস্তাব গ্রহণের বেশী কিছু করার সাহস এবং U.N. Charter অমান্য করার জন্যে ধিক্কার জ্ঞাপন ছাড়া আর কোন কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া যায় নি। আণবিক শক্তিধর, মহাশক্তির রাশিয়ার বিরুদ্ধে কিছু বলপ্রয়োগমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মত সাহস U.N. সাধারণ সভা দেখাতে পারে নি। ভারতের মত তথাকথিত জোট নিরপেক্ষ দেশের অবস্থা ছিল আরও করুণ। যে ভারতবর্ষ সুয়েজের ব্যাপারে কথা বলেছিল, সেই ভারতবর্ষ হাঙ্গেরীর ব্যাপারে নিন্দাসূচক প্রস্তাব গ্রহণের সময় 'হাঙ্গেরীর বিষয়টি পরিষ্কার নয়' এই অজুহাতে ভোটদানে বিরত থাকে। এজন্য মার্কিন প্রতিনিধি উপহাস করে বলেন যে, ভারতের নিরপেক্ষতা হল এই যে, তার নিরপেক্ষতার দন্ডটি রাশিয়ার

দিকে ৪৫° কোণে হেলে আছে। যাই হোক, হাঙ্গেরীর ঘটনা U.N.O.-র সম্মান ও মর্যাদা বাড়ায় নি। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধার ভয়ে পশ্চিমী দেশগুলি হঠে যায়। এই গ্রন্থে আমাদের আলোচনার সীমারেখা ১৯৫৫-৫৬ খ্রীঃ পর্যন্ত। এরপরের U.N.O. এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিষয়বস্তু এবং ইওরোপের বাইরে ঠান্ডা লড়াই, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন এই গ্রন্থের পরিকল্পতার অন্তর্গত হয়।

ষোড়শ অধ্যায়
উনবিংশ ও বিংশ শতকের সাহিত্য, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি
(Literature, Science and Culture of the 19th and 20th Centuries)

রোমান্টিকতাবাদ (Romanticism)ঃ উনবিংশ শতকের মধ্য ভাগ পর্যন্ত ইওরোপের বিভিন্ন দেশের সাহিত্য, শিল্প, ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের ক্ষেত্রে এক বিশেষ ভাবধারার প্রভাব লক্ষ্য করা যায় যাকে রোমান্টিকতাবাদ বলা হয়। অষ্টাদশ শতকের শেষ দিক থেকে এই নব ভাবধারার উদ্ভব হয়। উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগ ছিল এই ভাবধারার পূর্ণ বিকাশের যুগ। এজন্য মন্তব্য করা হয়েছে যে, "In the history of thought, literature and fine arts the first half of the nineteenth century is often called the Age of Romanticism"। চিন্তাধারার বিকাশ, সাহিত্য এবং চারুকলার ইতিহাসে উনিশ শতকের প্রথমার্দ্ধকে "রোমান্টিকতাবাদের যুগ" বলা হয়ে থাকে।

রোমান্টিকতাবাদ বলতে সঠিক কি বুঝায় সে বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিস্তর মতভেদ আছে। জার্মান দার্শনিক হেগেলের মতে, "রোমান্টিক সাহিত্য বা শিল্প হল বহির্জগতের উপর অন্তর্জগতের বিজয় ঘোষণা"। যুক্তি ও বুদ্ধি কৌলিন্য ছিল অষ্টাদশ শতকে সাহিত্য ও শিল্পের আদর্শ। অষ্টাদশ শতকের সাহিত্য ও শিল্প রচনার ক্ষেত্রে শিল্পীর স্বতঃস্ফূর্ত মননের প্রকাশ ছিল নিষিদ্ধ। অষ্টাদশ শতকে সাহিত্য ও শিল্পকে Neo classicism বা নব ক্লাসিকবাদ বা ধ্রুপদীবাদে বেঁধে রাখাই ছিল নিয়ম। একটি বিশেষ ধরনের ফর্ম (Form) গঠনশৈলী এবং যুক্তিবাদের মধ্যে শিল্পকে আবদ্ধ রাখা হত। শিল্পীর নিজের মনে যা স্বতঃস্ফূর্তভাবে জেগে উঠত তার প্রকাশ ছিল নিষিদ্ধ। আলোকিত যুক্তিবাদী দর্শন এবং নব ধ্রুপদীবাদের লৌহ-শৃঙ্খলে সাহিত্য, শিল্পের সৃষ্টিকে বেঁধে রাখাই ছিল তখনকার প্রথা। সাহিত্য বা শিল্প রচনায় ফর্মুলা ও প্রচলিত প্রথাকে ভেঙে স্বতঃস্ফূর্ত মননের প্রকাশকে ঘৃণা করা হত। আবেগ, প্রেরণা, মনোজগতের বিবিধ তরঙ্গভঙ্গকে শিল্প বা কাব্যের মাধ্যমে প্রকাশকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। বুদ্ধি বিভাষা ও ফর্মুলাকেই শিল্প রচনায় প্রাধান্য দেওয়া হত।

নব ক্লাসিকতাবাদ বা নবধ্রুপদীবাদ তর্জ্জনী তুলে সাহিত্যের সৃষ্টিকে শাসন করত। লর্ড চেষ্টারফিল্ড তাঁর পুত্রকে শিক্ষাদানের জন্যে যে সকল বিধি বিধান দেন তার মধ্যে একটি ছিল যে "যুক্তিবাদীরা কখনও হাস্য পরিহাস করে না"। সংস্কৃতিবান বলে পরিচিত হতে হলে নিজ মতের স্বতঃস্ফূর্ততার ও কল্পনাকে চাপা রেখে পরিশীলিত রুচি প্রকাশকেই শোভনীয় আচরণ বলে গণ্য করা হত। এই নব ক্লাসিক জীবনবাদকে ম্যাথ্যু প্রায়র (Mathew Prior) কয়েকটি বাক্যে প্রকাশ করেছেন; যথাঃ—

"ভালবাসা, ঘৃণা, আনন্দ বা ভীতিহীন হয়ে,
তারা জীবন কাটাত নিস্তরঙ্গভাবে।
আকাঙ্ক্ষাহীন, দায়হীন, হাস্য-পরিহাসহীন হয়ে,
তারা বেঁচে থাকত এবং মৃত্যুবরণ করত।"

সভ্য সমাজের এই ছক বাঁধা জীবনযাত্রা সাহিত্য ও শিল্পকেও প্রভাবিত করে। রোমান্টিকতাবাদ ছিল এই ছক বাঁধা, কৃত্রিম, মৃতপ্রায় জীবনবোধের বিরুদ্ধে এক প্রকার

বিদ্রোহ বিশেষ। খাঁচাবদ্ধ জীবনকে মুক্ত করে স্বাভাবিক সৃজনশীলতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে চিন্তাকে প্রসারিত করাই ছিল রোমান্টিকতাবাদের কাজ। এজন্যেই হেগেল বলেছেন, "রোমান্টিকতাবাদ হল বহির্জগতের ওপর অন্তর্জগতের বিজয় বৈজয়ন্ত্রী উড়িয়ে দেওয়া।" যুক্তি ও বুদ্ধির ফর্ম বা ছক ভেঙে কল্পবাদ ও অনুভূতিকে প্রাধান্য দান ছিল রোমান্টিকতাবাদের প্রকৃতি। রোমান্টিকতাবাদীরা যুক্তি অপেক্ষা অনুভূতি এবং তার শৈল্পিক প্রকাশকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন। জার্মান রোমান্টিকতাবাদী নোভালিস (Novalis) বলেন যে, "The heart is key to the world" বিশ্বভুবনকে হৃদয় দিয়ে অনুভব করাই বিশ্বরহস্য বোঝার শ্রেষ্ঠ পথ। জার্মানীর মহাকবি গ্যোটে (মতান্তর গ্যয়টে) (Goethe) বলেছেন যে, "অনুভূতিই হল সবকিছু" (Feeling is everything)।

আসলে ইওরোপীয় সাহিত্য, শিল্প দুই মেরুর মধ্যে দোদুল্যমান। এক মেরুতে আছে Classicism বা Neo classicism বা নব ধ্রুপদীবাদ অপর মেরুতে আছে Romanticism বা রোমান্টিকতাবাদ। রোমান্টিক শিল্পী আত্মমগ্ন। অনুভূতি থেকেই তার সত্যজ্ঞানের উদ্ভব, শিল্প বা সাহিত্যভাবনার বিকাশ ঘটে। ধ্রুপদী সাহিত্যিক মস্তিষ্ককে বেশী খাটান, তিনি মুক্তির প্রত্যয়ে দৃঢ় এবং তা একটি বিশেষ ফর্মে তা প্রকাশ করতে অভ্যস্ত। অষ্টাদশ শতকের শিল্পী, সাহিত্যকারেরা এজন্য হৃদয়ের আবেদনে সমৃদ্ধি পাননি, যদিও প্রজ্ঞা তাঁদের কাছে অধরা ছিল না। ঊনবিংশ শতকের কবি ও শিল্পীরা অনুভূতি ও প্রেরণাকে শিল্পসুষমায় মণ্ডিত করে প্রকাশ করেছেন। হার্ডার, গ্যোটে, নোভালিস, র‍্যাঁবো যুক্তির জগত থেকে পলায়ন করে অনুভূতির জগতে বিচরণ করেছেন। কৃত্রিমভাবে মনোভাব প্রকাশকে তাঁরা ঘৃণা করেছেন। হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে উৎসারিত আনন্দ বা বেদনার অনুভূতিকে শৈল্পিকভাবে স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ করেছেন। নব ক্লাসিকবাদীরা কল্পনাকে যেভাবে বল্গা দিয়ে বেঁধে রাখতেন, তা খুলে দিয়ে কল্পনার অবাধ অসীম আকাশে মুক্ত বিহঙ্গের মত তাঁদের কাব্য, উপন্যাস পাখা মেলে উড়ে চলেছে। রোমান্টিকতাবাদীরা বিশ্বাস করেন যে, প্রকৃত প্রতিভাকে কোন ছক বা বাঁধা নিয়মের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা সম্ভব নয়। তা সকল বাধা ভেঙে আপন বেগে দুকূল ভাসিয়ে অনুভূতির জোয়ার বইয়ে দেয়।

ওপরের আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, কোন সাহিত্য কর্ম যদি যুক্তির পথে সৃষ্ট হয়, এই সঙ্গে লিখনভঙ্গীতে ছন্দ, মিলের নিয়ম রক্ষা করে রচিত হয় সেই সাহিত্যকর্মকে আমরা নবধ্রুপদী বা Neo-classical এবং কোন সাহিত্য বা শিল্পকর্ম যদি কল্পনা, অনুভূতিকে আশ্রয় করে রচিত হয় তবে তাকে আমরা রোমান্টিক বলব। যেহেতু অনুভূতি ও কল্পনা ব্যক্তিবিশেষে পৃথক, সেহেতু রোমান্টিকতাবাদী কাব্যে ব্যক্তির নিজস্ব অনুভূতি ও কল্পনার বিকাশকেই প্রধান উপজীব্য মনে করা হয়। এজন্য রোমান্টিক সাহিত্য ও শিল্পের বিস্তার অসীম ও সুদূর প্রসারী। কারণ প্রতি মানুষের অনুভূতি ও কল্পনা আলাদা। তার প্রকাশভঙ্গীও আলাদা। Neo-classic-রা যেমন একটি ছকে কাব্যলক্ষ্মীকে বেঁধে রাখেন রোমান্টিক শিল্পীদের প্রকাশভঙ্গী ও বিষয়বস্তুর কোন ধরা বাঁধা নিয়ম নেই। তার বিস্তার ক্ষেত্রও সীমাহীন।

রোমান্টিকতাবাদের উদ্ভবের বিভিন্ন কারণ দেখা যায়। সপ্তদশ শতকের শেষ দিক থেকে ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টান্ট উভয় ধর্ম চিন্তায় ভক্তের অন্তর্নিহিত ভক্তিবাদ ও তার অনুভূতির স্ফুরণ ভক্তিসঙ্গীতগুলিতে বিকশিত হতে থাকে। প্রাণহীনভাবে শুধুমাত্র গীর্জায় প্রার্থণা মন্ত্র উচ্চারণ ও গীর্জার যাজকদের নির্দেশিত নিষ্প্রাণ অনুষ্ঠানে লোকে শান্তি ও তৃপ্তি পেত না। প্রোটেস্টান্ট জার্মানীতে ভক্তিবাদ, আধ্যাত্মবাদ, ভক্তের হৃদয়ের গভীর অনুভূতি তাঁর রচিত ধর্মসঙ্গীত বা গদ্য রচনাগুলিতে দেখা দেয়। ভক্তের হৃদয়ে ঈশ্বরের আসন এবং ঈশ্বরের উপলব্ধি

নিষ্প্রাণ ধর্মীয় আচরণ অপেক্ষা গুরুত্ব পেতে থাকে। ভক্তের মরমীয়া আকুতি তাঁর ব্যক্তিগত ঈশ্বরোপ লব্ধির প্রকাশ হিসাবে স্বীকৃত হয়।

ইংলন্ডে কোয়াকার, ব্যাপটিষ্ট, মেথডিষ্ট সম্প্রদায়ের খ্রীস্টানরাও আধ্যাত্মবাদের অনুভূতি ও তার প্রকাশকে বিশেষ মূল্য দেন। জন ওয়েসলি "The religion of heart" হৃদয়ে আধ্যাত্মবাদের উপলব্ধিকেই প্রকৃত খ্রীষ্টধর্ম বলে অভিহিত করেন। বিশেষভাবে মেথডিষ্ট সম্প্রদায়ের প্রচারকরা ঈশ্বরের অনুভূতি লাভকেই শ্রেষ্ঠ ও সারবস্তু হিসাবে গণ্য করেন। মেথডিষ্ট প্রচারকগণ তাঁদের প্রচারের সময় আবেগে, উচ্ছ্বাসে আপ্লুত হতেন। তাঁরা বলতেন "প্রতি আত্মা ও হৃদয় হোক প্রভু যীশুর অতিথি; তাহলে আর কেহ পতিত থাকবে না।" জ্যাকোবিন যুগে ফরাসী ক্যাথলিক গীর্জার শিরোমণি "নত্রে দামে" (Notre dame) গীর্জায় যুক্তির দেবীকে প্রতিষ্ঠা করলেও ক্যাথলিক খ্রীষ্টানদের হৃদয়ে শিহরণ জাগেনি যতদিন না সুলেখক আধ্যাত্ম্যবাদী সেতো ব্রিয়াঁ তাঁর The spirit of Christianity রচনা না করেন।খ্রীষ্টধর্মের মহামহিম, মানবতাবাদী ঐশ্বর্যকে তিনি পাঠকের অনুভূতির স্তরে ঢুকিয়ে দেন। ঈশ্বরের অনুভূতির অনির্বচনীয় স্পর্শ তিনি পাঠকের হৃদয়ে জাগিয়ে দেন। তাঁর ভাষা যেন প্রত্যয়ের গভীর তলদেশ থেকে উৎসারিত হয়েছিল, তাঁর ভাব ছিল মহিমাময়। এক সমালোচকের মতে খ্রীষ্টধর্মে ভাববাদ নিয়ে বহু বিতর্ক, নাস্তিক্য, সন্দেহের স্তর পার হয়ে সেতো ব্রিয়াঁর রচনা ধর্মীয় রোমান্টিকতাবাদের, বিশেষতঃ ক্যাথলিক ভাববাদ ও মরমীয়াবাদের জয়পতাকা উড়িয়ে দেয়। এভাবেই ইওরোপে রোমান্টিকতাবাদের উদ্ভব হয়।

এখন রোমান্টিকতাবাদের বৈশিষ্ট্য বা মূল সূত্রগুলি কি, যার জন্যে তাকে আমরা নব ধ্রুপদীবাদ (Neo-classical) থেকে তাকে আলাদা করে দেখতে পারি? আগেই আমরা দেখেছি যে রোমান্টিকতাবাদে হৃদয়, আবেগ, অনুভূতি এবং কল্পনাই প্রধান। রোমান্টিক সাহিত্যের দ্বিতীয় দিক হল প্রকৃতি প্রেম। এ যেন কবির ভাষায়, "দাও ফিরে সে অরণ্য; লও এ নগর।" নাগরিক সভ্যতার বঞ্চনা, ছলনা, প্রাত্যহিক জীবনধারণের গ্লানি থেকে এক ঝলক মুক্তি, উদ্ধার প্রকৃতির কোলে। যেখানে কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ সেন্ট মেরী হ্রদের দূষণহীন নীলজলের বুকে ভেসে থাকা রাজহংসের বক্র গ্রীবা সঞ্চালনের জলছবি দেখে নাগরিক জীবনের ক্লেদকে ভুলতে চেয়েছিলেন। শুধু কবি বা ঔপন্যাসিকরাই নয়, রোমান্টিকতাবাদী দার্শনিকরাও সভ্য নাগরিক জীবনের কুটিলতা ও মানবিক দূষণ থেকে মুক্তির জন্যে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা খুঁজতে বলেন। একদা যেখানে নব ক্লাসিকতাবাদী ডঃ জনসন জলদ গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করেছিলেন, "যে ব্যক্তি লণ্ডন নগরের সৌন্দর্যে বিরক্ত সেই ব্যক্তি জীবন সম্পর্কে হতাশাগ্রস্থ।" এই নব ক্লাসিসিষ্টরা একদা গ্রামজীবন, তার দারিদ্র, বর্বরতা, নোংরামি নিয়ে ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চন করে তা লেখায় প্রকাশ করেছিলেন। গ্রামজীবনকে তাঁরা একঘেয়ে, ক্লান্তিকর, বৈচিত্রহীন বলে নিন্দাও করেন। কবি ড্রাইডেন তাঁর "The Wind Gallant" কাব্যে গ্রাম জীবনকে অরণ্যে পশুর মত বিচরণকারী জীবনের সঙ্গে তুলনা করতে ভুলেন নি। রোমান্টিকতাবাদ এই নগরমুখী, কৃত্রিম, জীবনের ক্লেদময়, পঙ্কিল পরিবেশ থেকে প্রকৃতির মধ্যে প্রাণের আরাম ও মুক্তি খুঁজে পান। অবশ্য কাউপারের (Cowper)-এর মত কোন কোন কবি আধা গ্রাম বা শহুরে গ্রামকেই ভালবেসেছেন "প্রকৃতিকে যেখানে সংস্কৃতি বাগানের মত ছেঁটে সাজিয়েছে, যা রুচিশীল " (Nature in her cultivated trim; Dresses to his taste)। আবার ওয়ার্ডসওয়ার্থ Tintern Abbey কবিতায় প্রকৃতির মধ্যে "Elevated thoughts, a sense sublime, whole dwelling is in the setting Sun." অনির্বচনীয় মহিমাময় অনুভূতি, মহান অত্যুচ্চ ভাব যেন অস্তমান সূর্যের রশ্মিচ্ছটার মত তাঁর মনোজগতকে আলোকের সন্ধান দিয়েছিল" এই অনুভূতি পেয়েছেন।

রোমান্টিকতাবাদের তৃতীয় দিক হল আদিম মানুষের মধ্যে অকৃত্রিম সৌন্দর্যের অন্বেষণ। এ যেন শিল্পী রামকিঙ্করের শান্তিনিকেতনের ভাস্কর্যে সাঁওতাল যুবক যুবতীর অস্তগামী সূর্য ম্লান করে ঘরে ফেরার শিল্পসাধনা। তাই রোমান্টিক কবিরা আমেরিকান ইন্ডিয়ান, দক্ষিণ সমুদ্রের আদিম দ্বীপবাসী জীবনযাত্রার মধ্যে খাদহীন সৌন্দর্যের আস্বাদ খুঁজে পান। পৃথিবীর অজানা অঞ্চলে Explorer বা আবিষ্কার করা সেই সকল স্থানের আদিবাসীদের সরল জীবনের যে সৌন্দর্যের কথা বলেন তা রোমান্টিক লেখকদের প্রভাবিত করে।

রোমান্টিক সাহিত্যে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার জলছবি তাঁদের শৈল্পিক লেখনীতে অসামান্য হয়ে ধরা দিয়েছে। নব ধ্রুপদী সাহিত্যে সাধারণ মানুষের জীবন নিয়ে সাহিত্য সাধনাকে মূল্যহীন মনে করা হত। তাই দেখা যায় শেক্সপিয়ারের নাটকে রাজা, অভিজাত ও সেনাপতিরাই তাঁর সাহিত্যে প্রাধান্য পেয়েছেন। যুক্তিবাদীরা মনে করতেন যে, যেহেতু সাধারণ লোকেরা আবেগ দ্বারা তাড়িত হয় তারা সংস্কৃতিবান উচ্চশ্রেণী অপেক্ষা হীন। রোমান্টিক সাহিত্য রাজা, অভিজাতকে ত্যাগ করে সাধারণ মানুষের জীবনকেই সাহিত্যের উপজীব্যরূপে গ্রহণ করে। রোমান্টিকবাদের মতে, উচ্চশ্রেণীর সাম্রাজ্যের কৃত্রিম সংস্কৃতির দূষণমুক্ত সুন্দর ও অবাধজীবনের জলছবি কেবলমাত্র সাধারণ মানুষের জীবনেই খুঁজে পাওয়া যায়।

এই সঙ্গে রোমান্টিকতাবাদ লোকোসঙ্গীত, লোকোগাথাকে সংগ্রহ করে সাহিত্যের সমৃদ্ধি ঘটান। লোকোগীতির স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তির মধ্যে তাঁরা কৃত্রিমতাহীন অনুভূতির প্রকাশ দেখেন। এভাবে হারিয়ে যাওয়া লোকোগীতি, লোকো গাথা এবং উচ্চকাঙ্ক্ষার সংগ্রহ ও সম্পাদনা রোমান্টিক সাহিত্য চর্চার অঙ্গে পরিণত হয়। ১৭৬৫ খ্রীঃ ইংরেজ সাহিত্যিক পার্শি তাঁর রেলিকস অব এনসিয়েন্ট ইংলিশ পোয়েট্রি বা প্রাচীন ইংরাজী কাব্য সংগ্রহ প্রকাশ করেন। হার্ডার (Herder) ১৭৭৮ খ্রীঃ জার্মান লোকো কবিতা সংগ্রহ ফোকস্লিডার (Volksleider) সঙ্কলন করেন।

রোমান্টিকবাদী সাহিত্য অবহেলিত মধ্য যুগের মধ্যে রোমান্টিক সাহিত্যের বহু বিষয় বস্তু খুঁজে পান। ক্লাসিকতাবাদী সাহিত্যিকরা মধ্যযুগকে অন্ধকারাচ্ছন্ন বলে উপেক্ষা করেন। রোমান্টিকতাবাদীরা মধ্যযুগে ন্যায় বিচার, শিভ্যালরী, রোমান্স খুঁজে পান। জার্মানীর ফেডারিখ হার্ডেনবার্গ, যিনি নোভালিস নামেই বেশী পরিচিত মধ্যযুগের দারিদ্র্যের মধ্যে পবিত্রতা ও মানবতা দেখতে পান। স্যার ওয়ালটার স্কটের ইংরাজী উপন্যাস ও কবিতাগুলি মধ্যযুগকে বর্ণবহুল করে। যুবকেরা শার্লামেইনের অনুকরণে মাথায় কেশরক্ষা এবং বারবাঘোসার অনুকরণে দাড়ি রাখা শ্লাঘার বিষয় মনে করত। মুখোশ পড়া বলনাচ এবং ললনাদের সেন্ট লুই এর যুগের গহনার প্যাটার্ন জনপ্রিয়তা লাভ করে। আসলে রুক্ষ বাস্তব ও কঠোর বর্তমান থেকে পলায়নী মনোবৃত্তিই রোমান্টিকতাবাদীদের মধ্য যুগের প্রতি অনুরাগ বাড়ায়।

রোমান্টিকতাবাদের বিভিন্ন ধারা আলোচনার পর আমরা সাহিত্যে, শিল্পে ও ভাস্কর্যে কিভাবে রোমান্টিকতা বিকশিত হয় তা আলোচনা করতে পারি।

কান্ট-হেগেল বেন্থামের রোমান্টিক মতবাদ

উনবিংশ শতকে প্রকৃতপক্ষে রোমান্টিকতাবাদের বিকাশ ঘটে। ফরাসী বিপ্লবের যুগে সন্ত্রাসের রাজত্ব এবং নেপোলিয়নের যুদ্ধের ভয়াবহতা যুক্তিবাদের প্রতি বহু বুদ্ধিজীবীর আস্থা বিনষ্ট করে। ফলে এক শ্রেণীর চিন্তাবিদ ও সাহিত্যিকরা রোমান্টিকবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। প্রকৃতি, জনসাধারণের জীবনধারার মধ্যে সৌন্দর্য ও শান্তি তাঁরা খুঁজে পান। সাহিত্য ও শিল্পে তাই বর্ণিত হয়। দার্শনিক কান্ট তাঁর দর্শনে 'আদর্শবাদ' (Idealism) ও 'চেতনা' (Spirit)-র গুরুত্ব প্রচার করেন। কান্টের প্রচারিত আদর্শবাদ নেপোলিয়নীয় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জার্মান

জাতির দেশপ্রেমরূপে আত্মপ্রকাশ করে। হেগেলের (Hegel) ইতিহাসের ব্যাখ্যা রোমান্টিকবাদকে নতুন গতি দেয়। হেগেল বলেন যে, "মানুষ হিসেবে মানুষ স্বাধীনভাবে বাঁচার অধিকারী।"[১] তৃতীয়তঃ, ইংরেজ দার্শনিক জেরেমি বেন্থাম এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, "যে কোন প্রকার রাষ্ট্রের অধীনে ব্যক্তি তার স্বাধীনতা ভোগ করতে অধিকারী।"

ফরাসী বিপ্লবের ফলে যে জাতীয়তাবাদের উদ্ভব তা রোমান্টিকতাবাদের বিস্তারের বিরাট ক্ষেত্র সৃষ্টি করে। জাতীয়তাবাদ অনুসারে প্রতি জাতি নিজ নিজ জাতীয় রাষ্ট্রের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করার চেষ্টা করে। প্রতি জাতি নিজস্ব আবেগ, ভাবপ্রবণতাকে দেশপ্রেমের মাধ্যমে প্রকাশ করে। সাহিত্য, ইতিহাস, শিল্প জাতীয় চেতনা বিকাশের মাধ্যম হিসাবে গৃহীত হয়। জাতীয় গৌরব ও মর্যাদা গঠনের জন্যে অতীত ইতিহাস হতে জাতির গৌরবের কাহিনীকে বের করে তাকে আবেগ ও ভাবপ্রবণতার সাহায্যে প্রকাশ করা হয়। এভাবে রোমান্টিকতাবাদের উদ্ভব হয়। ক্লাসিকের লৌহবন্ধন ছিন্ন করে সাহিত্য, শিল্পে সৃষ্টি আপন জোয়ারে ভেসে চলে। আবেগ ও ভাবপ্রবণতা তাতে গতি সৃষ্টি করে।

দেশপ্রেম ও ইতিহাসের আবেগময় বিশ্লেষণ

অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ১৭৫০ খ্রীঃ টমাস গ্রে তাঁর এলিজি (Elegy) বা ব্যালাডগুলি রচনা করেন। জেমস ম্যাকফারসনের ওসিয়েন (Ocean) (১৭৬৫ খ্রীঃ) কাব্য ছিল ইংরাজী সাহিত্যে রোমান্টিকতাবাদের প্রভাতী তারকা। জার্মান মহাকবি গ্যেটের (Gothe) রচনা (The Sorrows of Werther) সরোজ অব ভার্থার এবং শিলার দি রবারস (The Robbers) রোমান্টিক রীতিতে রচনা করেন। জার্মান রোমান্টিক সাহিত্যের আদিগুরু ছিলেন জেনাথান গটফ্রিড হার্ডার (১৭৪৪-১৮০৩ খ্রীঃ)। তাঁরই প্রভাবে জার্মান রোমান্টিক সাহিত্যে Streem and Drang নামে একটি গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়। স্বয়ং মহাকবি গ্যেটেও এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এদের পরে জার্মান রোমান্টিক সাহিত্যে নোভালিস, ফ্রেডারিখ শ্লেগেল প্রভৃতি জার্মান সাহিত্যকারগণ জার্মান "রোমান্টিক গোষ্ঠী" (Romantic School) গঠন করেন। এই রোমান্টিক গোষ্ঠীর লেখকরা মধ্যযুগের ইওরোপ, সামন্তপ্রথা, শিভ্যালরি ও ক্রুসেড সম্পর্কে অতিশয়োক্তিপূর্ণ বর্ণনাবহুল রচনা প্রকাশ করেন।

ফরাসী সাহিত্যে রোমান্টিকতাবাদের প্রকৃত পথিকৃত ছিলেন সেতো ব্রিয়াঁ। তাঁর রচনা জিনিয়াস অব ক্রিশ্চিয়ানিটি এবং আত্তালা (Atala) ছিল বিখ্যাত রোমান্টিক রচনা। লামার্টিনের রচনা মেডিটেশনস (Meditations) একটি আবেগপূর্ণ রচনা। তাছাড়া ভিক্টর হুগোর রোমান্টিক রচনাবলী ফরাসী জাতিকে উত্তাল করে দেয়। ১৮২৭ খ্রীঃ ভিক্টর হুগো তাঁর ক্রমওয়েল নামাঙ্কিত নাটকে সর্বপ্রথম ফরাসী সাহিত্যে সেতো-ব্রিয়াঁর রোমান্টিক ঐতিহ্যকে নবরূপে প্রকাশ করেন। অতঃপর তাঁর সর্ববিখ্যাত রোমান্টিক রচনা হারমনি (Hermani) প্রকাশিত হয়। ১৮৩১ খ্রীঃ তাঁর হাঞ্চ ব্যাক অব নটারদাম প্রকাশিত হয়। হুগোর মধ্যযুগীয়বাদ ও রোমান্টিকতা ফারসী পাঠক শ্রেণীকে উদ্বেল করে। তাঁর অপর বিখ্যাত রচনা হল লা মিজারেবল।

ইংরাজী সাহিত্যে কোলরিজ ও ওয়ার্ডসওয়ার্থের যুগ্ম সম্পাদনায় লিরিক্যাল ব্যালাডস (Lyrical Ballads) নামক কাব্যগ্রন্থ ১৭৯৮খ্রীঃ প্রকাশিত হয়। এতে প্রকৃতি ও মানুষের জীবনের মধ্যে সৌন্দর্যের বর্ণনা করা হয়। এই গ্রন্থটিকেই ইংরাজী সাহিত্যের প্রথম শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক রচনা বলা যায়। বায়রণ, শেলী, কীটস ও স্যার ওয়াল্টার স্কট ইংরাজী সাহিত্যে রোমান্টিকতার প্লাবন সৃষ্টি করেন।

১· "Man as man is free."

ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাঁর রোমান্টিক রচনা সম্পর্কে বলেন যে, সাধারণ মানুষের সরল গ্রাম্যজীবনের ছবির মধ্যেই অনুভূতির গভীরতা ও অকৃত্রিমতাকে খুঁজে পাওয়া যায়। সাধারণ লোকের কথ্য ভাষা কেই সাহিত্যের উপযুক্ত বাহন হিসেবে গ্রহণ করার তিনি পরামর্শ দেন। মহাকবি বায়রণ ছিলেন এক রোমান্টিকতাবাদী যিনি নিজের দুঃখ, বেদনা ও আনন্দের অভিব্যক্তিকে কাব্য ও শিল্পের ভাষায় প্রকাশ করেন। লর্ড বায়রণের মানসিক আবেগ ও উচ্ছ্বাস ছিল সমুদ্র তরঙ্গের মত গর্জনশীল যা সকল কিছুকেই ভাসিয়ে দিত। এজন্য তিনি পর্বত বা সমুদ্র তীরের বেলায় বসে তাঁর হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করতে ভালবাসতেন। তাঁর বিখ্যাত রচনাগুলির মধ্যে চাইল্ড হ্যারল্ড ও ডন জুয়ান উল্লেখ্য। ইংরাজী সাহিত্যে পার্সি শেলী ছিলেন রোমান্টিক গীতিকাব্যের (Lyrics) শ্রেষ্ঠ রূপকার। তাঁর কাব্যে প্রকৃতি প্রেম ও মানবতাবাদের যুগলবন্দী সুর ঝঙ্কার প্রমিথিয়ুস আনবাউণ্ড কাব্যে ধ্বনিত হয়েছে।শেলীর প্রকৃতি প্রেমমূলক বিখ্যাত কবিতাগুলির মধ্যে দি স্কাইলার্ক (The Skylark), ওড টু দি ওয়েস্ট উইন্ড (The Ode to the West Wind), দি ক্লাউডস (The Clouds) প্রভৃতি চিরায়ত, শাশ্বত রচনা। যতদিন ইংরাজী সাহিত্য থাকবে তা অমলিন গৌরবে বিরাজ করবে। সর্বশেষে, জন কীটসের (John Keats) নামও উল্লেখ্য। কীটস সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি ইংরাজী ভাষার কাব্যলক্ষ্মীকে নবধ্রুপদী বাদের বন্ধন মুক্ত করে, কবিতার আকাশে মুক্ত পক্ষ গগন বিদারী বিহঙ্গের মত বিচরণ করেন। তাঁর ধ্রুব বিশ্বাস ছিল যে "A thing of beauty is a joy forever"। তাঁর কাব্যগুলির মধ্যে Endymion, Ode to the Nightingale প্রভৃতি বিখ্যাত। সমালোচক ম্যাথু আর্ণল্ডের মতে "একমাত্র শেক্সপিয়ার ছাড়া ইংরাজী সাহিত্যের অপর কোন লেখক কীটসের সাবলীলতা, সৌন্দর্যের অনুভূতির ধারে কাছে আসতে পারেন না। আলফ্রেড টেনিসন ইংরাজ জাতির স্বদেশপ্রেম-মূলক রাজা আর্থার, লেডি অফ শ্যালট প্রভৃতি কাব্য রচনার দ্বারা ধনী-দরিদ্র সকল ইংরাজের মনে আবেগ সৃষ্টি করেন। ইংরাজী গদ্য সাহিত্যে থ্যাকারে, চার্লস রীড, জর্জ এলিয়ট রোমান্টিকতা প্রবর্তন করেন। সর্বোপরি, বিখ্যাত ঔপন্যাসিক চার্লস ডিকেন্স তাঁর রচনায় স্বদেশপ্রেম, নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ইংরাজদের জীবনের সীমাবদ্ধতা ও বেদনা চিত্রিত করেন। ইংলন্ডের শিক্ষা ব্যবস্থা ও বিচার ব্যবস্থার সমালোচনা তাঁর উপন্যাসে প্রতিধ্বনিত হয়। ডিকেন্স ছিলেন রোমান্টিকতাবাদের ভাষ্যকার।

ইংরেজী সাহিত্যে রোমান্টিকতার প্লাবন

রুশ সাহিত্যে টুর্গেনিভের রচনায় বিষাদ ও দুঃখবাদ থাকলেও, রুশী সমাজের অবক্ষয়ের চিত্র তাঁর রচনায় ধরা পড়ে। ফাদারস এ্যান্ড চিলড্রেন (১৮৬২ খ্রীঃ) হ'ল টুর্গেনিভের বিখ্যাত রচনা। ডষ্টয়েভস্কি ছিলেন আশাবাদী লেখক। তিনি রুশী সমাজের দারিদ্র্যের মধ্যেও মঙ্গলের বীজ লক্ষ্য করেন। তিনি ছিলেন দেশপ্রেমিক লেখক। রুশী কৃষকদের প্রতি সহানুভূতি তাঁর ছিল অত্যন্ত গভীর। তাঁর বিখ্যাত রচনার নাম ক্রাইম এ্যান্ড পানিশমেন্ট।

রুশ সাহিত্যে রোমান্টিকতা

রোমান্টিকতাবাদ উনবিংশ শতকের চিত্রশিল্পে তার ছাপ ফেলে। স্প্যানিশ চিত্রশিল্পী গোয়ার (Goa) আঁকা স্পেনে নেপোলিয়নের শাসনের আমলে অত্যাচারের দৃশ্যগুলি দেশপ্রেমের ভাবধারায় অভিসিঞ্চিত ছিল। গোয়ার (Goa) আঁকা স্পেনের নিসর্গ চিত্রগুলি ও স্প্যানিশ জীবন যাপনের দৃশ্যগুলির সম্পর্কে গোয়ার নিজস্ব অনুভূতি ও উপলব্ধি তাঁর চিত্রগুলিকে অনির্বচনীয় সুষমায় মণ্ডিত করে ছিল। রোমান্টিক চিত্রকর হিসেবে তিনি নব ক্ল্যাসিকবাদের ফর্মকে ভেঙে তাঁর অনুভূতিকে চিত্রের ভাষায় প্রকাশ করেন। নিসর্গ চিত্রগুলিতে তাঁদের উজ্জ্বল রং-এর ব্যবহার অতুলনীয়। ইংলন্ডের রোমান্টিক শৈলীর চিত্রকর কনষ্টেবল নিসর্গ চিত্র রচনায় তাঁর অসামান্য মহান কীর্তি

চিত্রশিল্পে রোমান্সবাদের বিকাশ

রেখে গেছেন। তাঁর চিত্রকর্মের প্রধান উপজীব্য হল ব্যক্তিগত উপলব্ধি। প্রকৃতির সব কিছু দান, আলো, বাতাস, বৃক্ষকে তিনি তাঁর অনুভূতির রং-এ রাঙিয়ে এঁকেছেন। এই অনুভূতি ছিল প্রায় সাধারণ মানুষের অধরা এক অতীন্দ্রিয় অনুভূতি। তাঁর চিত্রাবলীকে বুঝতে ও ভালবাসতে চাই এক উচ্চ মননশীলতা। তবেই দর্শক শিল্পীর প্রাণের স্পন্দন তাঁর অঙ্কিত চিত্রে অনুভব করতে পারবেন। তুলনামূলকভাবে টার্নার প্রকৃতির ভীষণ, ভয়ঙ্কর, ভয়াল রূপকে ভালবেসে এঁকেছিলেন ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালার আস্ফালন, উত্তুঙ্গ পর্বতশৃঙ্গের , নীল আকাশের নীচে, উষ্ট্রের গ্রীবার মত নিঃসঙ্গ একাকীত্ব, যা একই সঙ্গে মহান ও করুণ। শস্যক্ষেতের সোনালী ফসলের ওপর ঝঞ্ঝার মঞ্জীর বেঁধে উন্মাদিনী কালবৈশাখীর নৃত্য তাঁকে মুগ্ধ করত। তাঁর তুলিতে এই উপলব্ধি ফুটে উঠত।

ফ্রান্সে নেপোলিয়নের যুগে ডেভিড অথবা দাভিদ (David) বিপ্লবের বহু মহিমময় মুহূর্তকে তাঁর তুলির টানে ধরে রাখেন, যা এখন ইতিহাসের অমূল্য সম্পদ বলে বিবেচিত হয়। আঁতোয়ান (Antoin) ও জেরার (Gerard) নেপোলিয়নীয় যুগের ভাবনাকে চিত্রে রূপায়িত করেন। থিওডোর জেরিকাল্ট (১৭৯১—১৮২৪ খ্রীঃ) ধ্রুপদী যুগের সংযমের মধ্যেও ব্যক্তিগত অনুভূতিকে প্রকাশ করতেন। তাঁর ঐতিহাসিক বিষয়ের চিত্রে এজন্য নাটকীয় মুহূর্তগুলি স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ত। নেপোলিয়নের পতনের যুগের বেদনাময় দৃশ্যগুলি তাঁর তুলির টানে অমর হয়ে গেছে। বিশেষভাবে নেপোলিয়নের মহান বাহিনীর বিধ্বস্ত অবস্থায় রাশিয়া থেকে প্রত্যাবর্তন (The Return from Russia) অথবা একটি ঘোড়ায় টানা গাড়ীতে এক আহত সৈনিকের ম্লান, বেদনাময় মুখচ্ছবি (An Wounded Soldier in a Cart) কখনও ভোলা যায় না। তাঁর শ্রেষ্ঠ চিত্র দি র‍্যাফ্‌ট অব মেডুসা (১৮১৮ খ্রীঃ) (The Raft of Medussa) এখন প্যারিসের লুভরের চিত্রশালায় সযত্নে রক্ষিত আছে। দি র‍্যাফ্‌ট অব মেডুসা ছবিটি প্রদর্শনীতে দেখান হলে ফ্রান্সের শিল্প সমালোচকদের মধ্যে সমালোচনা ও সমর্থনের ঝড় বয়ে যায়। ছবিটির অঙ্কন শৈলী, রঙের ব্যবহার, বিষয়বস্তু নিয়ে নব ধ্রুপদী ও রোমান্টিকতাবাদীদের মধ্যে দ্বৈরথ যুদ্ধ শুরু হয়। এক আধুনিক কলা সমালোচকের মতে, এই চিত্রটিতে মানব অনুভূতির গভীর ও বিপুল বিস্তারের অভূতপূর্ব প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

রোমান্টিক চিত্রকলার সার্বভৌম সম্রাট ছিলেন ইউজিন দেলাক্রোয়া (Eugene Delacraiy)। তাঁর চিত্রে উজ্জ্বল রং ও রেখার ব্যবহার অতুলনীয়। দেলাক্রোয়া প্রচলিত অঙ্কন রীতির শৈলী ভেঙে ফেলেন। ইতিহাসের গতিপথে তাঁর ছিল কল্পনার অবাধ বিচরণ। ঐতিহাসিক ঘটনাগুলিকে উজ্জ্বল রং ও রেখার টানে এবং পরিবেশের সঙ্গে তাঁর নিজস্ব অনুভূতি মিশিয়ে, তিনি যে চিত্রগুলি সৃষ্টি করেন তা ছিল এক কথায় অনির্বচনীয়। তাঁকে এজন্য বিখ্যাত ভিনিসীয় চিত্রকর রুবেনসের (Rubens) সঙ্গে তুলনা করা হয়। তাঁর ঐতিহাসিক চিত্রগুলিতে মধ্যযুগের বহু ঐতিহাসিক ঘটনা কল্পনার রং-এ রঞ্জিত। এগুলির মধ্যে ক্রুসেডারদের কনষ্ট্যান্টিনোপলে অনুপ্রবেশ (Entrance of the Crusadors into Constantinople) এবং টেম্পলারস ক্যারিয়িং অফ রোয়েনা (Templers carrying off Rowena) অতিশয় বিখ্যাত। দেলাক্রোয়া তাঁর যুগের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্যে জনতার আকুতিকে তাঁর চিত্রে জীবন্ত করেছেন। চিত্রটির নাম লিবার্টি লিডিং দি পিপল (Liberty Leading the People)। ১৮৩০ খ্রীঃ জুলাই বিপ্লবের পটভূমিকায় এই চিত্রটি রচিত হয়। গ্রীসের স্বাধীনতা যুদ্ধে তুর্কী জানিজারি সেনাদের বর্বরভাবে কিয়সের গ্রীক খ্রীষ্টানদের ধর্মোন্মত্ত হত্যাকাণ্ড "দি মাসাকার অব স্কিও" (The Massacre of Scio) (১৮২৪ খ্রীঃ) রচনা সারা খ্রীষ্টজগতে শিহরণ ও চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। ক্লাসিকধর্মী চিত্র সমালোচক দেলাক্রোয়ার এই রচনাকে "চিত্রশিল্পের হত্যা" (massacre of painting) বলে নিন্দা করলেও, Liberty বা

স্বাধীনতার বেদীমূলে গ্রীক খ্রীষ্টানদের ইসলামীয় তুর্কী সেনার কাছে এই আত্মদানের দৃশ্য ইওরোপকে শিহরিত করে। এজন্য এক সমালোচক বলেছেন, "ইতিহাসের দেবী উনবিংশ শতকের এই দশকগুলির জন্যে সম্মানের উত্তরীয় রাজনীতিকদের স্কন্ধে আরোপিত না করে রোমান্টিক সাহিত্যিক ও শিল্পী বিশেষতঃ দেলাক্রোয়ার স্কন্ধেই আরোপিত করেন।" এছাড়া ফরাসী রোমান্টিক যুগের দেলাক্রোয়ার পরে অন্যতম বিখ্যাত চিত্রশিল্পী ছিলেন দেলারুশে (Delaroche)। ফরাসী শিল্পী কোরোট ছিলেন নিসর্গ দৃশ্যের শ্রেষ্ঠ চিত্রকর। তাঁর ল্যান্ডস্কেপগুলি ছিল বর্ণময় ও স্বপ্নালু। কোরোট ছিলেন গ্রামাঞ্চলের দৃশ্য আঁকায় বিখ্যাত। ইংলন্ডে র‍্যাফায়েল পূর্বযুগের রোমান্টিক চিত্রশিল্পী হিসেবে রোসেটি, বার্নজোনসের নাম উল্লেখ্য।

সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও রোমান্টিক ভাবধারার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। রোমান্টিক যুগের আগের সঙ্গীত ছিল ক্লাসিক্যাল বা ধ্রুপদী। এই সঙ্গীতে গলার কাজ, সুরের খেলা, রাগ, রাগিনীর বিশুদ্ধ প্রকাশকেই শ্রেষ্ঠ মনে করা হত। সঙ্গীতের মধ্যে আবেগ বা গায়কের নিজস্ব সৃষ্টির উচ্ছাস প্রকাশের কোন স্থান ছিল না। সেবাষ্টিয়ান বাখ্ ছিলেন এই ক্ল্যাসিক্যাল সঙ্গীতধারার শ্রেষ্ঠ সুরকার। এ ছাড়া ছিলেন মোৎসার্ট রোমান্টিক ধারার সঙ্গীতে গায়কের আবেগ ও অনুভূতিকে সুরের বর্ণনায় সোনালী সূর্যের রশ্মির মত ছড়িয়ে দেওয়ার নতুন রীতি চালু হয়। জাতীয় সঙ্গীত রচনা, লোক-সঙ্গীতের সংগ্রহ এবং প্রচার দ্বারা ক্লাসিকতাবাদকে বর্জন করা হয়। রোমান্টিক যুগের সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ রূপকার ছিলেন লুডভিগ বিঠোফেন (Ludwig Beethoven)। যদিও বিঠোফেন ছিলেন গোড়ায় ধ্রুপদী বা ক্ল্যাসিক্যাল বাদী। কিন্তু ক্রমে তিনি তাঁর সঙ্গীতে ব্যক্তিগত অনুভূতি ও আবেগকে মূর্ছনা দেন। এই পর্যায়ে তাঁর সুরগুলির মধ্যে প্যাষ্টোর‍্যাল সিম্ফনি (Pastoral Symphony) উল্লেখ্য। গ্রাম্য নৃত্যের উচ্ছাস, মেষপালকের বাতাসে ভেসে যাওয়া সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা, পাখীর কাকলী তাঁর এই কম্পোজিশনটিতে ধরা আছে। এই পর্যায়ের অপর রচনাগুলির মধ্যে এগমন্ট ও ক্যারিওল্যানাসের নাচ উল্লেখ্য। তিনি সাতটি সিম্ফনি রচনা করেন। ফ্রাঞ্জ শুবার্ট ছিলেন রোমান্টিক যুগের সঙ্গীতের প্রকৃত ভাষ্যকার। যদিও কোন কোন সমালোচক তাঁকে ক্ল্যাসিক্যাল সঙ্গীত যুগের স্রষ্টা বলেন। প্রকৃতপক্ষে শুবার্ট (Schubert) তাঁর মৃত্যুকালে প্রায় ১১০০ সুরের কম্পোজিশন রেখে যান। যখন যে ভাব ও অনুভূতি তাঁর মনে এসেছিল তাকে তিনি সুরে রূপান্তরিত করেন। তাঁর সিম্ফনি ও কোয়ার্টেটগুলি সবই গীতিকাব্যের (Lyric) ধর্মী। সুর সৃষ্টি ছাড়াও কাব্যময় সঙ্গীত রচনাতে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর এই সঙ্গীত ও সুরগুলির মধ্যে একটি ব্যাপক জনপ্রিয় সঙ্গীত হল "Hark, Hark, the Lark; who is Sylvioz"। মাত্র ৩২ বছর বয়সে এই প্রতিভার অকাল প্রয়াণ ঘটে। এছাড়া ছিলেন বরার্ট শুম্যান, পোলিশ সুরস্রষ্টা শোপাঁ (Chopin) (১৮০৯-১৮৪৯ খ্রীঃ)। শোপাঁ প্রধানতঃ পিয়ানোর মাধ্যমেই তাঁর সুরকে ছড়িয়ে দিতেন। তাঁর সম্পর্কে বলা হয় যে, পিয়ানোর মাধ্যমে সিম্ফনী রচনার তিনিই ছিলেন প্রথম ও শেষ রূপকার। তাঁর সঙ্গীতে পোল জাতির ধ্রুপদী ঐতিহ্য, অতীত ঐতিহাসিক গৌরবের সঙ্গে পোল্যান্ডের পরাধীনতার মর্মবেদনা উৎসারিত হয়েছে। যৌবনে তিনি প্যারিসে থেকেই সঙ্গীত চর্চা করেন। তাঁর জীবনকালে তিনি আর্থিক স্বচ্ছলতার মুখ দেখেন নি। এমন কি তাঁকে ছাত্রদের বাড়ীতে সঙ্গীত শিখিয়ে জীবিকা অর্জন করতে হত। কিন্তু এই প্রাণ ধারনের গ্লানির মধ্য থেকেই স্বর্ণকমলের মত তাঁর সপ্তসুর নানা বর্ণে ফুটে উঠে। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মহিমা বিকশিত হয়ে চিরন্তণে পরিণত হয়।

সঙ্গীতে রোমান্টিকতা প্রকাশ

রোমান্টিক যুগের অপর দিকপাল সঙ্গীতকার ফেলিবা মেণ্ডলসন। জার্মান রোমান্টিক সঙ্গীতের অন্যতম গুরু ছিলেন এই ধনীর সন্তান, যিনি মহাকবি গ্যেটের ভাষায়," কখনও

অশ্রুজল সিক্ত শুষ্ক রুটি ভক্ষণ করেন নি"। তাঁর সঙ্গীতে যদিও বেদনা ও বিষাদের দিক অনুপস্থিত, তথাপি জীবনের পানপাত্র ভরে উচ্ছল আনন্দের উষ্ণ সঙ্গীতের সুর তিনি জার্মান জাতিকে প্রাণভরে পান করান। স্বয়ং মহারানী ভিক্টোরিয়াও ছিলেন তাঁর গুণ-গ্রাহিনী। তাঁর প্রধান কম্পোজিনগুলির মধ্যে "মধ্যরাত্রির স্বপ্ন" (A Midsummer Night's Dream) প্রভৃতি বিখ্যাত।

এছাড়া রোমান্টিক যুগের অপর সঙ্গীতকারদের মধ্যে নিঃসন্দেহে জার্মানীর ভাগনারের (Wagner) ও ইতালীর ভারদির (Verdi) নাম উল্লেখ্য। ভাগনার সিম্ফানির নানা দিক নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন। তার ফলে অপেরা সঙ্গীতে তিনি যুগান্তর ঘটিয়ে দেন। ক্ল্যাসিক্যালের ফর্ম ভেঙ্গে ফেলে ভাগনার তাঁর ভাবরূপ, ধ্বনি ও কাব্য প্রাণকে সঙ্গীতের মধ্যে ঢেলে দেন। এক কথায় তাঁর অপেরা সঙ্গীতে রোমান্টিক সঙ্গীত পূর্ণতা পায়। ভাগনারের সঙ্গীতে একাধারে কল্পনা, শোপেন হাওয়ারের দার্শনিকতা, মেলোডির ঝঙ্কার প্রভৃতির অনির্ব্বচনীয় উপলব্ধি লাভ শ্রোতার ঘটে।

এছাড়া রোমান্টিক সঙ্গীতের জগতে নামকরা ছিলেন চেইকোভস্কি, ব্রামস, লিস্‌ট প্রভৃতি। ইতালীয় সঙ্গীতে রোসিনি, বেল্লিনি ও দোনিজেত্তি ছিলেন বিশেষ বিখ্যাত। এঁরা ছিলেন অপেরা-ধর্মী সঙ্গীত ও সুর রচনায় দক্ষ।

সাহিত্য, শিল্প ও সঙ্গীতের ন্যায় স্থাপত্য শিল্পেও রোমান্সবাদের প্রভাব পড়ে। গ্রীক ও ল্যাটিন ধর্মী ক্ল্যাসিক স্থাপত্যশৈলীর স্থলে মধ্যযুগের গথিক স্থাপত্যের প্রতি আগ্রহ বাড়ে। গ্রীক ও ল্যাটিন রীতির গম্বুজ ও থামের পরিবর্তে ছুঁচালো চূড়া ও খিলানের দিকে নির্মাতাদের ঝোঁক বাড়ে। হোরেস ওয়ালপোল তাঁর কাসল অব ওট্রান্টায় সর্বপ্রথম গথিক স্থাপত্যর প্রতি আগ্রহ দেখান। ইংলণ্ডের ওয়েষ্ট মিনিষ্টার প্রাসাদ, পার্লামেন্ট ভবনের নির্মাণের রোমান্টিক-শৈলী বা গথিকশৈলীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ফ্রান্সে ভায়োলেট-লে-ডাক (Violette-Le-Dac) গথিক রীতিতে বিখ্যাত নটরডাম-গীর্জার[১] পুননির্মাণ করেন। জার্মানীর নব গথিক শৈলীর স্থাপত্যকে মহাকবি গ্যেটে জার্মান জাতির গৌরবময় বৈশিষ্টের দৃষ্টান্ত বলে অভিহিত করেন। ১৮২০ খ্রীঃ থেকে সেতো ব্রিয়াঁ এবং শ্লেগেল গথিকস্থাপত্যের গুণগান শুরু করায়, ইওরোপে গথিক ধর্মী মধ্যযুগীয় স্থাপত্য আবার জনপ্রিয়তা পায়। গথিক স্থাপত্যে আধুনিক শিল্পীমনন যুক্ত করে ফ্রান্স ও জার্মানীতে বহু আশ্চর্য সুন্দর স্থাপত্য রোমান্টিক ধর্মী স্থাপত্যের সাক্ষ্য বহন করছে। ১৮৩৪ খ্রীঃ লণ্ডনের ওয়েষ্ট মিনিষ্টার প্রাসাদ অগ্নিদগ্ধ হলে নতুন পার্লামেন্ট ভবনটি অসাধারণ সুন্দর গথিক রীতিতে নির্মিত হয়। ভিক্টোরীয় যুগে বহু সরকারী, বেসরকারী বাড়ী, রেলষ্টেশন, কেন্দ্রীয় ডাকঘর গথিক রীতিতে নির্মিত হয়ে ইংলন্ডের স্থাপত্যকে সমৃদ্ধ করে।

স্থাপত্য

স্থাপত্যের সঙ্গে রোমান্টিক যুগে ইওরোপে ভাস্কর্যেরও বিকাশ ঘটেছিল। এই যুগের প্রখ্যাত ভাস্করদের মধ্যে একটি মানসিক পরিবর্তন ঘটেছিল। সুন্দরী নগ্ন রমনী দেহের মডেল মণ্ডিত ভাস্কর্যকে ক্ল্যাসিক্যাল ধর্মী বলে এঁরা পরিত্যাগ করেন। তার স্থলে দরিদ্র শ্রমজীবীর জীবন যাপন, গৃহহীন কোয়েসারদের বাসস্থানকে এঁরা ভাস্কর্যের বিষয়বস্তু হিসেবে নেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন সমাজতন্ত্রবাদী চিন্তাধারায় প্রভাবিত। এই গোষ্ঠীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন দোমিয়ের। তাঁর ভাস্কর্য "দি রিফিউজিজ" এক অপূর্ব কীর্তি। এছাড়া কুবার্তের ভাস্কর্য ষ্টোন ব্রেকারস মনে করিয়ে দেয় শান্তিনিকেতনের রামকিঙ্করের ভাস্কর্য।

১· ফরাসী উচ্চারণ "নত্রে দামে"।

সংগঠিত মার্কসীয় সমাজতন্ত্রবাদের ইতিহাস (The History of Organised Marxian Socialism): এই গ্রন্থের আগের অধ্যায়ে আমরা ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রবাদ ও মার্কসীয় বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের কথা আলোচনা করেছি (আগে অধ্যায়ে পৃঃ দ্রষ্টব্য)। মার্কসীয় তত্ত্ব তাঁর আমলে ও তাঁর পরে বহু প্রশংসিত আবার বহু সমালোচিত হয়েছে। এমনকি তথাকথিত কোন কোন মার্কসবাদী রাষ্ট্রেও মার্কসের মূল তত্ত্বের কিছু কিছু অংশ বর্জিত হয়েছে। তবে ধনতন্ত্রবাদ বা পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে মার্কসের যুদ্ধ ঘোষণা এখনও স্তব্ধ হয়নি। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শ্রমিক ও খেটে খাওয়া মানুষ এবং নিম্ন মধ্যবিত্তরা এখনও মার্কসবাদের মধ্যে মুক্তির পথ খোঁজেন। কারণ মার্কসবাদ যে প্রচণ্ড আশাবাদ সৃষ্টি করেছিল যে, দরিদ্রের দারিদ্র বিধির বিধান বা চিরন্তন নয়। ইতিহাস তাদের জন্যে একদিন মুক্তি আনবেই। এই আশাবাদ এখনও মার্কসবাদকে বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে আদরনীয় করেছে।

মার্কসবাদ আন্তর্জাতিক আন্দোলন রূপে ১৮৬৪ খ্রীঃ থেকেই শুরু হয় বলা যায়। কমিউনিষ্ট ম্যানিফেষ্টো গ্রন্থে মার্কস "সকল দেশের পলিটারিয়েটদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।" তাঁরা তখন ভাবতেন যে ২/৪ বছরের মধ্যে ধনতন্ত্রবাদ ধ্বংস হয়ে যাবে। ১৮৪৮ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের বিফলতা থেকে মার্কস শিক্ষা নেন যে, ধনতন্ত্র ধ্বংস এত সহজে হবে না। এজন্যে ১৮৬৪ খ্রীঃ লন্ডনে মার্কস ও এঙ্গেলস ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কিং মেনস এসোসিয়েশন গঠন করেন। এই সমিতির পরিচালনায় ১৮৬৬-৬৯ খ্রীঃ পর্যন্ত ৪টি কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। ১৮৬৪ খ্রীঃ এই সমিতিকে এজন্যে First International বা প্রথম আন্তর্জাতিক বলা হয়। কিন্তু অন্তঃকলহের ও আদর্শগত ব্যবধানের ফলে প্রথম আন্তর্জাতিক ভেঙ্গে যায়। মাইকেল বাকুনিন নামে নৈরাজ্যবাদী দার্শনিক দাবী করেন যে, প্রলিতারীয় বিপ্লবের লক্ষ্য হওয়া উচিত রাষ্ট্রব্যবস্থার অবলুপ্তি। কারণ তাঁর মতে, রাষ্ট্রই হল সর্বাপেক্ষা বড় শোষণ যন্ত্র। তাছাড়া ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয় যুদ্ধের পর সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। ১৮৭৬ খ্রীঃ প্রথম আন্তর্জাতিক ভেঙ্গে যায়।

প্রথম আন্তর্জাতিক ভেঙ্গে গেলে সমাজতন্ত্র জাতীয় স্তরে পালিত হয়। এই সময় জার্মানীতে ফার্দিনান্দ লাসেল ইউনিভার্সাল জার্মান ওয়ার্কিং মেনস এসোশিয়েশন গঠন করেন। ১৮৭৫ খ্রীঃ বিভিন্ন গোষ্ঠীর সমবায়ে জার্মান সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি গঠিত হয়। ১৮৭১ খ্রীঃ জার্মানীর রাইখষ্ট্যাগে এই দল ৩৪·৮% ভোট পায়। ১৯১২ খ্রীঃ থেকে এই দল জার্মান পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। ফ্রান্সে কতকগুলি ছোট ছোট সমাজতন্ত্রী দল প্রথমে গড়ে উঠে। ১৮৯৩ খ্রীঃ জঁা জোয়ারেস ফ্রান্সে ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট সোস্যালিষ্ট দল গঠন করেন। ১৯০৫ খ্রীঃ ফ্রান্সে সোস্যালিষ্ট দলগুলি সমবেত হয়ে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল গঠন করে। ১৯১৪ খ্রীঃ ফরাসী পার্লামেন্টে এদের সদস্যসংখ্যা ছিল ১০২। ব্রিটেনেও সমাজতন্ত্রের হাওয়া ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে বইতে থাকে। ১৮৮৪ খ্রীঃ কিছুসংখ্যক ব্রিটিশ বুদ্ধিজীবি ফেবিয়ান সোসাইটি (Fabian Society) স্থাপন করেন। ফেবিয়ান গোষ্ঠী সঠিক অর্থে মার্কসবাদী সমাজতন্ত্রে ও শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্বে বিশ্বাস করতেন না। তাঁরা আন্দোলন দ্বারা পার্লামেন্ট থেকে শ্রমিকের জন্যে প্রয়োজনীয় আইন পাশ করানো যাবে মনে করতেন। বিখ্যাত সাহিত্যিক জর্জ বার্নার্ড শ, এইচ· জি· ওয়েলস প্রভৃতি ছিলেন ফেবিয়ান দলের সদস্য। ক্রমে রাশিয়াতে C. P. S. U. দলটি বিশ্বে মার্কসবাদের প্রধান প্রবক্তায় পরিণত হয়। ১৯১৭ খ্রীঃ রুশ-বিপ্লবের পর C. P. S. U. রাশিয়ার রাষ্ট্র ক্ষমতা অধিকার করে সমাজতন্ত্রকে বাস্তব রূপদানের নীতি নেয়। সমস্ত বিশ্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটাবার জন্যে কোন কোন মার্কসবাদী নেতা জেহাদ ঘোষণা করেন। রাশিয়ার উদ্যোগে মার্কসবাদী সমাজতন্ত্র একটি বিশ্বব্যাপী আন্দোলনে পরিণত হয়। এছাড়া বেলজিয়াম, হল্যান্ড,

ইতালীতেও সমাজতান্ত্রিক দল গঠিত হয়। চীনে মার্কসবাদের প্রভাবে চীনের প্রাচীন কনফুসিয়বাদ পিছু হঠতে থাকে।

১৮৮৯ খ্রীঃ প্যারিসে আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের বিস্তৃতির জন্যে দ্বিতীয় ইন্টারন্যাশনাল স্থাপিত হয়। কিন্তু এই দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকে যোগদানকারী জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলগুলির মধ্যে কোন মতৈক্য ছিল না। এই আন্তর্জাতিকের বামপন্থী গোষ্ঠী তখনও শ্রেণীসংগ্রাম ও আন্তর্জাতিক বিপ্লবের তত্ত্বে অবিচল থাকেন। দক্ষিণপন্থীরা অন্যান্য গণতান্ত্রিকদলের সাহায্যে সরকার গঠন করে সমাজতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তনের কথা বলেন। বামপন্থীরা দক্ষিণপন্থীদের "শোধনবাদী" (Revisionist) আখ্যা দেন। প্রতি দেশের সমাজতান্ত্রিক দলগুলি অতঃপর সংস্কারবাদী বা Reformist এবং বিপ্লববাদী বা Revolutionary দুটি পরস্পর-বিরোধী গোষ্ঠীতে ভাগ হয়ে যায়। এর ফলে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে ভাঁটা পড়ে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রতি দেশের সমাজতন্ত্রবাদীরা আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রের প্রতি আনুগত্য অপেক্ষা নিজ নিজ জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনকে উচিত মনে করে।

ডারউইনের বিবর্তনবাদ ও তার সামাজিক প্রতিক্রিয়া (Darwinism and its social importance) : উনবিংশ শতকের ইওরোপ ব্যবহারিক সভ্যতা ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রয়োগের যেমন কেন্দ্রস্থল ছিল, তেমনই মননশীলতার ক্ষেত্রেও উনবিংশ শতকের ইওরোপ ছিল বিশ্বের কেন্দ্রস্থল। বিজ্ঞান, রাজনীতি, সমাজ, দর্শণ ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে মনীষার দ্যুতি ইওরোপ থেকে বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছিল। বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানব মনীষার এই আবিষ্কারগুলিকে জার্মান দার্শনিক G. W. F. Hegel একটি সার্বিক দার্শনিক সূত্রের দ্বারা গ্রথিত করেন। হেগেলের এই তত্ত্বের নাম ছিল Dialectics বা দ্বন্দ্বতত্ত্ববাদ। হেগেলবাদ এই শিক্ষা দেয় যে, জীবন ও সভ্যতা একটি চলমান স্রোত যা নিয়ত থিসিস, এ্যান্টিথিসিস ও সিন্থেসিস প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলছে। হেগেলীয় সমন্বয় তত্ত্বকে কার্ল মার্কস সমাজের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের পথে ব্যাখ্যা করেন।

এই পটভূমিকায় বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন জীবজগতের বিবর্তনের ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক তত্ত্বের উদ্ভাবন করেন, যাকে আমরা ডারউইনবাদ বলি। ডারউইনের এই তত্ত্ব কেবলমাত্র মৌলিক ছিল না। তা জীব বিজ্ঞানের জগতে ছিল এক বৈপ্লবিক আবিষ্কার। ১৮৫৯ খ্রীঃ তাঁর প্রথম গ্রন্থ The Origin of Species প্রকাশিত হলে বুদ্ধিজীবি মহলে মহা আলোড়ন শুরু হয়। ১৮৭১ খ্রীঃ তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ The Descent of Man প্রকাশিত হয়।

ডারউইনের তত্ত্বের সারাৎসার এই ছিল যে : (১) ভূস্তরের বিভিন্ন স্তরে খনন কার্যের ফলে তিনি যে জীবাশ্মগুলির নমুনা সংগ্রহ করেন তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তিনি এই প্রত্যয়স্থিত হন যে, এখন যে সকল প্রাণীর অস্তিত্ব আমরা দেখতে পাই, তারা বহু হাজার, লক্ষ লক্ষ বছর ধরে বিবর্তনের পথে বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছে। আদিতে এই সকল প্রাণীরা বর্তমান আকৃতি ও প্রকৃতিতে ছিল না। এমন কি মানুষও আদিতে আধুনিক যুগের মানুষের মত ছিল না। বহু বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান যুগের মানুষ ও প্রাণীর উদ্ভব হয়েছে।

ডারউইন তত্ত্বের দ্বিতীয় মৌলিক ও বৈপ্লবিক দিক হল Theory of Natural Selection। এর অর্থ হল যে, প্রতিকূল পরিবেশ, প্রকৃতি, জলবায়ু ও অন্যান্য প্রাণীর সঙ্গে বেঁচে থাকার নিরন্তর প্রবহমান সংগ্রামে যে প্রাণীগুলি নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছে তারাই আধুনিক যুগে বিভিন্ন প্রাণী বা মনুষ্য রূপে টিকে আছে। যারা পরিবেশ, প্রকৃতি, জলবায়ু ও সহবাসী প্রাণীদের সঙ্গে সংগ্রামে নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারেনি তারা আজ

ডাইনোসেরাসের মত অবলুপ্ত হয়ে গেছে। ভূগর্ভস্থ ফসিল বা জীবাশ্মগুলি থেকে একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে Theory of Natural Selection বা জীবজগতের মধ্যে বেঁচে থাকার সংগ্রামে যারা বিবর্তনের সঙ্গে নিজেদের দ্রুত ও সহজে খাপ খাওয়াতে পেরেছে তারাই টিকে আছে। Survival of the fittest অর্থাৎ যারা পরিবর্তনকে গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছে, দুর্বলকে পেছনে ফেলে অথবা গ্রাস করে এগিয়ে গেছে তারাই টিকে আছে। এইভাবে যোগ্যতমের বেঁচে থাকার অধিকার আবহমান কাল ধরে চলছে এবং চলতে থাকবে। যে প্রাণীগুলি বা বৃক্ষলতা এই Natural Selection বা প্রাকৃতিক নির্বাচনে নিজেকে সর্বোত্তম প্রমাণ করতে পারবে তারাই ভবিষ্যতে টিকে থাকবে।

ডারউইনের বিবর্তনবাদের বৈশিষ্ট্য ছিল যোগ্যতমের বেঁচে থাকার অধিকার তত্ত্ব (Survival of the fittest)। প্রাণীজগতে বেঁচে থাকার জন্যে নিরন্তর প্রতিযোগিতা চলছে। এই প্রতিযোগিতায় যারা যোগ্যতম একমাত্র তারাই শেষ পর্যন্ত বিবর্তনের পথে এগিয়ে চলে। যাদের এই যোগ্যতা নেই অথবা প্রতিযোগিতা করার শক্তি নেই তারা লুপ্ত হয়। ব্যাঘ্র হরিণকে খাদ্য হিসেবে ভক্ষণ করে। হরিণ দ্রুত পালিয়ে প্রাণ বাঁচায়। যে শ্রেণীর হরিণ পলায়নে অক্ষম তারাই লুপ্ত হয়। অপরদিকে হরিণ লুপ্ত হলে খাদ্যাভাবে ব্যাঘ্রের শ্রেণী লুপ্ত হয়। যে শ্রেণীর ব্যাঘ্র বিকল্প খাদ্য গ্রহণে সক্ষম তারাই টিকে থাকে। মোট কথা, প্রাণীজগতে নিরন্তর প্রতিযোগিতা চলে। এতে যোগ্যরাই জয়লাভ করে। ডারউইন তাঁর The Descent of Man গ্রন্থ প্রকাশ করার পর মানুষের বিবর্তন তত্ত্বে আদিম গুহাবাসী মানবের পূর্বপুরুষের সঙ্গে বর্তমান সভ্য মানুষের বিবর্তন সূত্রে রক্ত সম্পর্কের কথা বলেন। প্রাণীদের মত মানুষও প্রকৃতি ও পরিবেশের সঙ্গে নিরন্তর সংগ্রামের মধ্যে যারা সর্বোত্তম তারাই আজকের পৃথিবীর সভ্য মানুষ নামে পরিচিত। সুতরাং মনুষ্য বা জীবন সৃষ্টিতে ঈশ্বরের কোন হাত নেই। পরিবেশ, প্রকৃতির বিবর্তনের পথেই প্রাণশক্তি নিয়ে মানুষ এসে গেছে। মানুষ বা প্রাণীর দেহের নানা খুঁটিনাটি পরিবর্তন এভাবেই এসে গেছে। একটি জিরাফ তার লম্বা গলা শুধু বংশ পরম্পরায় গলা টান টান করে লম্বা করেনি। তার প্রকৃতি ও পরিবেশ, উঁচু উঁচু গাছ থেকে পাতা খেয়ে বাঁচার জন্যেই সে হাজার হাজার বছরের চেষ্টায় লম্বা গলার অধিকারী হতে পেরেছে। সুতরাং ভবিষ্যতে মনুষ্য ও প্রাণী জগতে কারা টিকে থাকবে তা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়ানোর শক্তির ওপর। বেঁচে থাকার জন্যে চলছে এই নিরন্তর সংগ্রাম।

যোগ্যতমের বাঁচিয়া থাকার অধিকার

ডারউইন ঈশ্বর কর্তৃক প্রাণী ও মানুষের সৃষ্টির তত্ত্বকে অগ্রাহ্য করেন। তাঁর মতে, মানুষ অতি নিম্নস্তরের জীব হতে ক্রমবিবর্তনের পথে মানুষের আকৃতি ও প্রকৃতি পেয়েছে। সমানভাবে পশু ও পক্ষী বিভিন্ন স্তর পার হয়ে বিবর্তনের পথে বর্তমান স্তরে এসেছে।

ক্রমবিবর্তন

ডারউইনের মতবাদকে টি· এইচ· হাক্সলে ও আর্নষ্ট হেকেল বিশেষ ব্যাখ্যাসহ প্রচার করেন। ডারউইনবাদের ব্যাখ্যায় তাঁরা বলেন যে, সমাজ ও সভ্যতার যে অগ্রগতি ঘটেছে তা সবই বিবর্তনের ফল। প্রতিযোগিতার ফলেই উচ্চতর প্রজাতির উদ্ভব হয়েছে।

হাক্সলে ও হেকেল

ডারউইনবাদকে অবলম্বন করে প্রজননতত্ত্বকে বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। যেহেতু Survival of the fittest বা যোগ্যতমরাই শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকে, সেহেতু বুদ্ধিমান বা জড়বুদ্ধি লোকদের জন্ম নিয়ন্ত্রণ করে, বুদ্ধিমান মানুষদের দ্বারা প্রজনন করে মানব সমাজের অগ্রগতির কথা ভাবা হয়।

প্রজননতত্ত্ব

ডারউইনের বিবর্তনবাদ, সমাজ বিজ্ঞান ও দার্শনিক চিন্তাধারার ওপর গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি

করে। ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্ব খ্রীষ্টীয় দর্শন, ঈশ্বরবাদ এবং খ্রীষ্টীয় সৃষ্টিতত্ত্বকে নস্যাৎ করে। খ্রীষ্টীয় তত্ত্ব ছিল যে ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করেছেন। ডারউইনের মতবাদ তাকে নস্যাৎ করে। কারণ ডারউইন বলেন যে, বিবর্তনের পথে মানুষ সৃষ্ট হয়েছে। এতে ঈশ্বরের কোন হাত নেই। এজন্য গোঁড়া খ্রীষ্টানরা ডারউইনকে নাস্তিক আখ্যায় অভিহিত করেন। দ্বিতীয়তঃ, হেগেলীয় দ্বন্দ্ববাদ প্রভৃতি তত্ত্বের মূল্য ডারউইনের বিবর্তনবাদের প্রভাবে কমে যায়। লোকে ভাবতে আরম্ভ করে যে, বিবর্তনের গতি হল অনিবার্য। সুতরাং এক্ষেত্রে মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন দাম নেই।[১] বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে বেঁচে থাকার দ্বন্দ্বই শেষ পর্যন্ত ইতিহাসের গতি নির্দ্ধারণ করবে। ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর কোন কিছুই নির্ভর করবে না। আসল কথা হল বেঁচে থাকার জন্যে প্রতিযোগিতায় জয়ী হওয়া। T. S. Huxley ডারউইন তত্ত্বকে আরও প্রাঞ্জল করে বলেন যে, "মানুষের প্রগতি হল ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছার নিরপেক্ষ ঘটনা। পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে যুঝে চলার ক্ষমতায় দক্ষতার ফল মাত্র" (Human progress is the ressort of impersonal progress, the blind product of species for survival by a very long term adaptation to environment)।

ডারউইনবাদের সামাজিক প্রয়োগ

এর ফলে পুরাতন আধ্যাত্মিক, নৈতিক মূল্যবোধ নিরর্থক মনে হয়। এই বস্তুবাদী তত্ত্ব মানুষকে যেন এক বিবর্তনের পথে এক অসহায় যান্ত্রিক জীবনে পরিণত করে। দ্বিতীয়তঃ, যে সকল রাজনীতিবিদ সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধে বিশ্বাস করতেন, তাঁরা ডারউইনের "যোগ্যতমরাই বাঁচবার অধিকারী" (Survival of the fittest) এই তত্ত্বের মধ্যে তাঁদের কাজের সমর্থন খুঁজে পান। উগ্র জাতীয়তাবাদী অথবা ক্ষমতাতত্ত্ববাদী (Real politik) নীতির ভক্তরা জাতিগুলি ও রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহকে যোগ্যতমের বেঁচে থাকার প্রয়াস বলে ঘোষণা করেন। যাঁরা জাতিগত শ্রেষ্ঠতায় বিশ্বাস করতেন তাঁরা ডারউইনবাদের সাহায্যে কোন বিশেষ জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন এবং অন্য জাতিকে নিকৃষ্ট বলে প্রচার করেন। মুনাফা শিকারী ও মূলধনী শ্রেণী বলতে থাকে যে, যোগ্যতার পুরস্কার হিসেবেই তারা মুনাফা ও মূলধনের অধিকারী। অক্ষম ও অযোগ্যরাই 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' (Natural selection) নিয়মে শোষিত হতে বাধ্য। ডারউইনের তত্ত্বের সামাজিক প্রয়োগ দ্বারা বুর্জোয়া পুঁজিপতিদের অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার শ্রেষ্ঠত্বকে সমর্থন জানান হয়। ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্ব 'যোগ্যতমের বাঁচবার অধিকার তত্ত্বে'র সামাজিক ব্যাখ্যায় প্রতি শ্রেণীর লোক নিজ নিজ মতবাদের পক্ষে যুক্তি আবিষ্কারের চেষ্টা করে। ইওরোপের এক শ্রেণীর লোক ইওরোপীয় জাতি ও সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলে। জার্মান চিন্তাবিদ কার্ল হাসোফার (Karl Hausafar) প্রভৃতি ভূ-রাজনৈতিক তত্ত্বের (Geo-Political) দ্বারা জার্মান জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করেন। মানুষের ব্যক্তিগত আচরণের ক্ষেত্রে মায়া, মানবতা অপেক্ষা স্বার্থপরতা, লোভ, হিংসা, প্রতিযোগিতা যোগ্যতমের বেঁচে থাকার অধিকার হিসেবে গণিত হয়।

পুঁজিবাদ ও জাতীয়তাবাদ

ডারউইনের পরিবেশের প্রভাবে প্রাণী জগতে বিবর্তন তত্ত্ব, সমাজতন্ত্রবাদের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। রুশোর যুগ থেকে কার্ল মার্কসের যুগ পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক চিন্তাবিদরা এই কথা বলতেন যে, অর্থনৈতিক প্রভাবের ফলেই সমাজে ঘাত-প্রতিঘাত এবং শ্রেণী-সংঘাত দেখা যায়। মার্কস ইতিহাসের যে ব্যাখ্যা করেন তাতে ইতিহাসের অর্থনৈতিক বা বস্তুবাদী ব্যাখ্যাকেই গ্রহণ করা হয়। সমাজের এক শ্রেণী সমাজের সম্পদ অধিকার করে অপর সকলকে শোষণ করে। শোষক শোষিতের

সমাজতন্ত্রবাদ ও ডারউইনবাদ

১· D. Thomson—P. 257.

শ্রেণী সংগ্রামের দ্বারা ইতিহাস এগিয়ে চলে। ইতিহাসের এই বস্তুবাদী ব্যাখ্যা ডারউইনের বিবর্তনবাদ দ্বারা সমর্থিত হয়। কারণ ডারউইন বলেন যে, পরিবেশের প্রভাবে প্রাণী জগতে বিবর্তন ঘটে। সমাজতান্ত্রিক চিন্তাবিদ্‌রা সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থাকে এক্ষেত্রে পরিবেশ বলে ব্যাখ্যা করেন। তাঁরা শ্রেণী সংগ্রামকে যোগ্যতমের বাঁচার চেষ্টা বলে মনে করেন।

অপরদিকে ব্রিটেনের ফেবিয়ান সমাজতন্ত্রবাদীরা (Fabian Socialist) বলতে থাকেন যে, যেহেতু ডারউইন 'বিবর্তনের' (Evolution)-এর কথা বলেছেন সেহেতু শ্রেণীবিপ্লব বা শ্রেণী সংগ্রামের পথে নয়, অর্থনৈতিক বিবর্তনের পথেই সমাজতন্ত্র ধাপে ধাপে আসবে। ডারউইনবাদের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন তত্ত্বকে আশ্রয় করে তাঁরা ভয়ঙ্কর শ্রেণীবিপ্লব দ্বারা সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাকে অবৈজ্ঞানিক বলে মনে করেন।

ফেরিয়ানবাদ

এইভাবে 'সামাজিক ডারউইনবাদ' (Social Darwinism) ইতিহাস ও দর্শনের ব্যাখ্যাকে প্রভাবিত করে। ইতিহাস গবেষণার ক্ষেত্রে মানব সভ্যতার ইতিহাসের ধারাবাহিকতা তত্ত্বকে গ্রহণ করা হয়। এজন্য প্রত্নতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, ভূতত্ত্বের সাহায্যে ঐতিহাসিক গবেষণার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়। খননকার্যের দ্বারা মাটির ভেতর থেকে প্রাচীন গ্রীক, রোম, মিশর, ব্যাবিলনীয়, সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কার করা হয়। নৃতত্ত্ববিদ্‌রা নরকঙ্কাল ও প্রাণীদের জীবাশ্ম পরীক্ষা করে মানব ও প্রাণী জগতের বিবর্তন লক্ষ্য করেন।

মনোবিজ্ঞানের অগ্রগতি ঃ সিগমুণ্ড ফ্রয়েড (Progress of Psychology : Sigmund Freud) ঃ উনবিংশ শতকে রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, জীববিদ্যা, পদার্থবিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে মনোবিদ্যা বা মনোবিজ্ঞানের বিশেষ অগ্রগতি ঘটে। এই যুগে আত্মা থেকে মনকে পৃথক বস্তু হিসেবে গণ্য করে মনোবিকলনকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিশ্লেষণ করা হয়। এর আগে মনোবিদ্যাকে দর্শনের একটি শাখা হিসেবে গণ্য করা হত। এর ফলে আত্মা বিষয়ক আলোচনা প্রাধান্য পেত। কিন্তু উনবিংশ শতকে মনকে বিজ্ঞানের পৃথক বিষয় হিসেবে গণ্য করা হয়। অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষার ভিত্তিতে মনোবিদ্যাকে বৈজ্ঞানিকভাবে চর্চা করা হয়। মনের প্রকাশ যেহেতু দেহের মাধ্যমে ঘটে, সেহেতু দৈহিক প্রকাশগুলি পর্যবেক্ষণ করে মনের অবস্থা বোঝার চেষ্টা করা হয়।

মনের প্রকাশ তিন প্রকারে ঘটতে পারে, যথা, চিন্তা, অনুভূতি, ইচ্ছা বা ক্রিয়া দ্বারা। এই তিন দিক হতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ দ্বারা মনের বিকাশভঙ্গী বোঝার চেষ্টা করা হয়। মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে বিভিন্ন মতবাদ দেখা যায়। এদের মধ্যে ভুন্ডট্ (Wundt) নামক জার্মান মনোবিজ্ঞানী (১৮৭৪ খ্রীঃ) সর্বপ্রথম মনোবিদ্যার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রচার করেন। তিনি বলেন যে, মনের বিশেষ অবস্থাগুলি বিশ্লেষণ করাই মনোবিদ্যার কাজ। ব্রেন্টানো (Brentano) নামক অপর মনোবিদ বলেন যে, মনের ক্রিয়ার সঙ্গে বাহ্যবস্তুর সম্পর্ক আছে। মনোবিদদের কাজ হল কি পরিস্থিতিতে বাহ্যবস্তুর সঙ্গে কিরূপ প্রতিযোজনের ফলে কিরূপ মানসিক ক্রিয়া ঘটে তা লক্ষ্য করা। ব্রেন্টানোর ক্রিয়াবাদ মূলক মনস্তত্ত্ব ক্রমে জনপ্রিয়তা পায়। জে· আর· এঙ্গেল প্রভৃতি মনোবিদরা ক্রিয়াবাদের ওপর নির্ভর করে মনোবিজ্ঞান রচনা করেন। ক্রিয়াবাদী বা আচরণবাদী মনস্তত্ত্ববাদ সোজা কথায় হল এই যে, মানুষের আচরণগুলি লক্ষ্য করলে তার আচরণের মনস্তাত্ত্বিক কারণ বুঝতে পারা যায়। ১৮৯০ খ্রীঃ রুশ অধ্যাপক পাভলভ (Pavlov) একটি কুকুরের ওপর মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা করে দেখেন যে, দিনের একটি নির্দিষ্ট সময়ে ঘড়িতে ঘণ্টা বাজলেই কুকুরটির ক্ষুধাবোধ হত। জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জন ওয়াটসন এই আচরণবাদী মনস্তত্ত্ব (behaviorism) এই মতের প্রতিষ্ঠা করেন। যে কোন ব্যক্তির আচরণ গতি বিশ্লেষণ করে সেই ব্যক্তির মানসিকতা, চেতনাবোধ, উপলব্ধি প্রভৃতি নিরূপণ করা সম্ভব। এই behaviorism-এর ব্যবহারিক প্রয়োগ দ্বারা চাকুরীতে নিয়োগের আগে সেই

ব্যক্তির মননশীলতা, মানসিক প্রবণতা, উপস্থিত বুদ্ধি প্রভৃতি নির্ণয় করা যায়।

মনোবিজ্ঞানবাদ ক্রমে নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়। এইগুলির মধ্যে প্রধান হল গেষ্টাল্টবাদী এবং সর্বপ্রধান হল ফ্রয়েডবাদী মনোবিজ্ঞান। গেষ্টাল্ট শব্দের অর্থ হল আকার বা রূপ ইংরাজীতে ফর্ম বা প্যাটার্ন। গেষ্টাল্টবাদীরা বলেন যে কেবলমাত্র বিশ্লেষণের দ্বারা মনের স্বরূপ বোঝা যায় না। ১৯১২ খ্রীঃ জার্মানীতে প্রথম গেষ্টাল্টবাদের উদ্ভব হয়। ম্যাক্স ভের্টথাইমের (Max Wertheimer) হলেন এই মতবাদের প্রধান প্রবক্তা। গেষ্টাল্টবাদের মূল কথা হল আমরা সকল বস্তুকে সমগ্রভাবে প্রত্যক্ষ করি, কোন বস্তু পৃথক পৃথক ভাবে প্রত্যক্ষ করি না। যেমন অনেকগুলি মোটরগাড়ি যদি একই দিকে এক সঙ্গে ছুটতে থাকে, আমরা তাদের গতিকে প্রত্যক্ষ করি। দ্বিতীয় গেষ্টাল্টবাদীদের মতে, কোন বস্তুর মূর্তি তার পটভূমি বা ক্ষেত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা ঠিক নয়। নদীতীরেব কোন বৃক্ষকে আমরা তীর থেকে পৃথক করে দেখি না। আমরা যখন একটি চতুস্কোণ চিত্র দেখি, তখন শুধু তার ৪টি বাহু, ৪টি সমকোণ দেখি না। আমরা ৪ বাহু, ৪ কোণ সহ পুরা চতুস্কোণ ক্ষেত্রটিকেই দেখি। এই যুক্তির দ্বারা গেষ্টাল্টবাদীরা বলেন যে, কোন বিশেষ অবস্থায় আমরা কাজ করার সময় সমগ্র অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই প্রতিযোজক ক্রিয়া করি। গেষ্টাল্টবাদীরা মনে করেন যে, সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ ব্যক্তি মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। সুতরাং সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ হল ব্যক্তিমনকে বুঝবার ক্ষেত্র।

মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে অধ্যাপক সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের অবদান যুগান্তকারী। ১৮৫১ খ্রীঃ এই মনীষীর জন্ম হয় চেকোশ্লোভাকিয়ায় এক ইহুদী পরিবারে। তিনি ভিয়েনা নগরকেই তাঁর কর্মস্থল হিসেবে বেছে নেন। ফ্রয়েডীয় তথ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যে, তিনিই প্রমাণ করেন যে—মনোবিকলন বিদ্যা, শারীর বিদ্যা, পদার্থ বিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞন থেকে পৃথক। মনোবিকলন তত্ত্ব নিজেই একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞান। মনোবিদ্যার এমন বহু ক্ষেত্র আছে যারা সঙ্গে Physiology বা শারীরবৃত্ত বিদ্যার কোনোই সম্পর্ক নেই। Behaviorism বা আচরণবাদ দ্বারাও কোনো ব্যক্তির মানসিক অবস্থা বোঝা যাবে না। ফ্রয়েড মনের প্রতিক্রিয়া ব্যক্তির আচরণকে প্রভাবিত করে বলে বলেন। ফ্রয়েড মানুষের মনকে তিনটি প্রকোষ্ঠ বা স্তরে ভাগ করেন যথা, (১) নিজ্ঞান মন বা অবচেতন মন বা ইদ (Id); (২) প্রাকচেতন মন (Pre-conscious) বা Ego (ইগো); (৩) চেতন বা বিবেকশীল মন (Super-Ego)। ফ্রয়েড মনে করতেন যে, ইদ বা সচেতন স্তরে মানুষের মনে বহু কামনা-বাসনা লুক্কায়িত থাকে। এই কামনা-বাসনাগুলি প্রধানতঃ কামজ বা যৌন রং-এ রঞ্জিত। মানুষের মনের তলায় এই ভাবগুলি সঙ্গোপনে লুকিয়ে থাকে। মানুষ অনেক সময় তাঁর অস্তিত্ব টের পায় না। যেহেতু আমাদের সমাজব্যবস্থায় এই ইচ্ছাগুলি পূরণ হওয়ার উপায় নেই, সেহেতু এই ইচ্ছাগুলি সচেতন স্তরে অবদমিত অবস্থায় থাকে। কিন্তু এই ইচ্ছাগুলি লোপ না পেয়ে মনের তলায় থেকে যায়। কখনো যদি এই অবদমিত ইচ্ছা বা ইদের বহিঃপ্রকাশ ঘটে তাহলে সেই ব্যক্তি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে তার কাজ ও ইচ্ছার সংঘাত ঘটে।

মানুষের মনের দ্বিতীয় স্তরে ইগো বা অহং হল একটি অবচেতন স্তর। অহং বা ইগো হল মনের বিচক্ষণতার আধার। ইগো একদিকে সমাজ, অপরদিকে ইদ বা আদিম প্রবৃত্তির মধ্যে আপোধ-নিষ্পত্তি করে। ইহা একবার ইদ বা অবচেতন মনের দাবী মেটাবার চেষ্টা করে আর একবার বহির্জগতে সমাজের নীতি পালনের চেষ্টা করে। যে সব কামনা-বাসনা সমাজনীতির বিরোধী ইগো বা অহং তাকে চেপে রাখে এবং অবচেতন স্তরে ফেরত পাঠায়।

মনের তৃতীয় বা আরো উন্নত স্তরে আছে সুপার ইগো বা অধিশাস্তা। একে বিবেক বুদ্ধি বলা যায়। যখন ইগো বা অহং দুর্বল হয়ে পড়ে অধিশাস্তা বা সুপার ইগো তাকে শক্তি জোগায়। যদি

ইগো বা অহং দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ইদ তাকে পরাজিত করার উপক্রম করে; আদিম কামনা-বাসনা ব্যক্তিকে জর্জরিত করার উপক্রম করে তখন সুপার ইগো বা অধিশাস্তা জগতে ভালো-মন্দের প্রশ্ন, উচিত-অনুচিতের প্রশ্ন দ্বারা ইগোকে শক্তি দান করে। সমাজের নীতিবোধ, ধর্মবোধ, পরিবারের নীতিবোধ থেকে সুপার ইগো তৈরি হয়। যদি এত চেষ্টা সত্ত্বেও ইগো পরাস্ত হয়, ইদ জয়লাভ করে তবে সেই ব্যক্তির মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়। তার মধ্যে অবচেতন মনের আদিম কামজ প্রবৃত্তি জাগরিত হয়। এই প্রবৃত্তি হল লিবিডো (Libido)। ফ্রয়েড তাঁর মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বে এভাবে (ক) অবচেতন স্তরের অপূর্ণ কামনা-বাসনা, অপূর্ণ যৌন তাড়না, (খ) এই অবচেতনকে Igo দ্বারা অবদমিত রাখা, (গ) তজ্জনিত মানসিক সংঘাতের ফলে মানসিক ভারসাম্য হীনতার কথা বলেছেন।

ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ তত্ত্ব আধুনিক যুগে বহুলাংশে গৃহীত হয়েছে। আধুনিক শিল্প-সভ্যতা ও নগর জীবন বড়ই জটিল। এই সমাজে অনেক সময় শিশু তাঁর পিতা-মাতার নিকট প্রকৃত যত্ন ও ভালোবাসা পায় না। এই অপূর্ণ ক্ষুধা শিশুর অবচেতন মনে থেকে যায়। বয়সকালে তা নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করে। আধুনিক যুগের জীবনে বহু জটিলতা ও সমাজে নানা ঘাত-প্রতিঘাত মানুষের ব্যক্তিগত জীবন ও মানসিক শান্তিকে খুবই প্রভাবিত করে। এই কারণে ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণ এই যুগে বিশেষ কার্যকরী। কারণ মনের গোপন ইচ্ছা ও তাঁর অপূর্ণতার জন্যে depression চাপে লোকে এমন ভুগতে থাকে যে, তার ফলে লোকের বহু মানসিক সঙ্কট দেখা দেয়। ফ্রয়েডীয় নীতির দ্বারা তার কারণ আবিষ্কার করা সম্ভবপর হয়েছে। এমনকি ঐতিহাসিকরাও ইতিহাসের বিখ্যাত ব্যক্তিদের যথা এডলফ হিটলার প্রভৃতির কাজকর্ম, ইহুদী নির্যাতন নীতি প্রভৃতি ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যার দ্বারা বোঝার চেষ্টা করেন। ফ্রয়েডের রচিত গ্রন্থগুলির নাম হল Interpretation of Dreams এবং Civilisation and its Discontents।

পদার্থবিদ্যা ও আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব (Physics and the Theory of Relativity of Albert Einstein) : বিংশ শতকে বিজ্ঞানের অসাধারণ জয়যাত্রার ফলে মানুষ প্রায় অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। মহাশূন্যে ভেলা ভাসিয়ে মানুষ গ্রহান্তরে যাত্রা করেছে। চাঁদে ও মঙ্গলগ্রহে আজ মানুষ পা রাখতে সক্ষম হয়েছে। একদা যা ছিল কবির রঙীন কল্পনামাত্র আজ তা বাস্তবে পরিণত হয়েছে। আণবিক শক্তি আবিষ্কার করে মানুষ আজ সৃষ্টিকে ধ্বংস করতে সক্ষম। আণবিক শক্তির গঠনমূলক ব্যবস্থার দ্বারা আজ গ্রহে রকেট পাঠান সম্ভব হয়েছে। জীববিদ্যার ক্ষেত্রে এতই অগ্রগতি ঘটেছে যে "জিন" পর্যন্ত পরিবর্তন করা সম্ভব বলে বিজ্ঞানীরা মত দিচ্ছেন। বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে অগ্রগতি হলেও পদার্থবিদ্যার অগ্রগতি বোধ হয় আজ সর্বাধিক। পদার্থবিদ্যায় তাপ ও বাষ্পের সাহায্যে যন্ত্রচালনা দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধি শিল্প-বিপ্লবের সূচনা করে। অন্তর্দাহ্য ইঞ্জিনের (Internal Combustion system) আবিষ্কার একটি যুগান্তর ঘটায়। এর ফলে ভূতলে মোটর গাড়ি ও আকাশে বিমান পরিবহনের পথ প্রস্তুত হয়। ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত গ্যাসকে জ্বালানি এবং আলো প্রদানের জন্যে ব্যবহার শুরু হয়। এই যুগে লন্ডনের রাস্তায় গ্যাসের বাতি জ্বলত। কলিকাতাতেও সম্ভবতঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত রাস্তায় গ্যাসের বাতি জ্বলত। তারপর এল বিদ্যুৎ বা Electricity। বিদ্যুতের আবিষ্কার ও ব্যবহারিক প্রয়োগ মানুষের ব্যবহারিক জীবনযাত্রায় ঘটল বিপ্লব। একদা এক অধ্যাপক তামার ও লোহার তারের সংযোজনে যে বৈদ্যুতিক চুম্বকের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন তা কালক্রমে মহা শক্তিতে পরিণত হয়ে ডায়নামো অর্থাৎ বিদ্যুৎ ও চুম্বক যন্ত্রের সমন্বয়ে মহাশক্তিধর যন্ত্রে পরিণত হয়, যার সাহায্যে ঘরে ঘরে আলো জ্বলে, পাখা চলে। পদার্থবিদ্যার এই অগ্রগতি ছিল ভয়ানক দ্রুত। ফলিত পদার্থবিদ্যার সাহায্যে অটোমোবাইল, বিমান, বেতার, টেলিগ্রাফ বিভিন্ন যন্ত্রপাতি চালু হয়ে যায়। ফলিত রসায়ন বরফ তৈরি থেকে, ক্যামেরা ফিল্ম,

নকল রবার কত কিছুই আবিষ্কার করে মানুষের আরামের ব্যবস্থা করে। একদা গ্যালিলিও ও নিউটন পদার্থবিদ্যার যে অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার করেন পরবর্তী যুগের আবিষ্কার তা ছাপিয়ে অনেক দূর এগিয়ে যায়। বস্তু ও তার গতি সম্পর্কে বহু নতুন তথ্য সংযোজিত হয়।

বিংশ শতকে পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে তিনটি মৌলিক আবিষ্কার পূর্ববর্তী সকল আবিষ্কারকে পিছনে ফেলে দেয়। এই তিনটি তা হল কোয়ান্টাম তত্ত্ব, আপেক্ষিক তত্ত্ব এবং আণবিক তত্ত্ব। জার্মান পদার্থবিদ ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক (Max Planck) ১৯০১ খ্রীঃ কোয়েন্টাম তত্ত্ব (Quantum Theory) আবিষ্কার করেন। প্ল্যাঙ্ক বলেন যে, পদার্থের শক্তির স্ফূরণ ও বিলয় কিছু সময় অন্তর অন্তর হয়, অবিরাম এই স্ফূরণ হয় না। এই স্ফূরণ ও বিলয় অনেকটা জোয়ার ও ভাঁটার মতোই চলে। এই নির্দিষ্ট সময় অন্তর স্ফূরণকে বলা হয় কোয়ান্টা (Quanta)। সেহেতু এই তত্ত্বের নাম কোয়ান্টাম তত্ত্ব।

অতঃপর এলবার্ট আইনস্টাইন তাঁর আপেক্ষিত তত্ত্ববাদ উদ্ভাবন করেন। আধুনিক পদার্থবিদ্যাকে আইনস্টাইন তাঁর দুটি উদ্ভাবন দ্বারা এক বিপ্লব ঘটিয়ে দেন। এই দুটি তত্ত্ব হল আপেক্ষিক তত্ত্ববাদ বা Theory of Relativity এবং ঐক্যবদ্ধ ক্ষেত্রতত্ত্ব বা Unified Field Theory। আর্লবার্ট আইনস্টাইন ছিলেন এক জার্মান ইহুদি গণিতজ্ঞ ও বিজ্ঞানী এবং মানবতাবাদী। তিনি নাৎসী যুগে এডলফ হিটলারের অত্যাচারে জার্মানী ত্যাগ করে আমেরিকায় আশ্রয় নেন। তাঁর আপেক্ষিক তত্ত্ব ও ঐক্য ক্ষেত্র তত্ত্বের উপর নির্ভর করে আণবিক বিজ্ঞান ও মহাকাশ বিজ্ঞানের গবেষণার সূত্রপাত হয়েছে।

আলবার্ট আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ববাদের সারমর্ম হল আমরা যাকে নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয় মনে করি প্রকৃতপক্ষে তা নাও হতে পারে। কারণ কোনো বিষয় সম্পর্কে নির্দিষ্ট ধারণা যে ব্যক্তি বিষয়টি যেমনভাবে দেখে তার উপর নির্ভর করে। যেমন দিন ও রাত্রি এই দুটি কথা আপেক্ষিক। কারণ পৃথিবীর এক অংশে যখন দিন অন্য অংশে তখন রাত্রি। আমরা যে স্থানটিকে উপর বলি সেই স্থানটি ঘুরিয়ে রাখলে হবে নীচ; আবার যেটা নীচ বলি সেইটি ঘুরিয়ে রাখলে হবে উপর। তাহলে এই দাঁড়ায় যে, ব্যক্তি যেমন দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি দেখে তেমনভাবে তা বিচার করে।

আইনস্টাইন বলেন যে, গতি বা Velocityও অনুরূপভাবে আপেক্ষিক। কোনো চলমান বস্তুর সঙ্গে বাতাস ও অন্যান্য শক্তির সংঘর্ষ বা Friction সেই বস্তুর গতিকে রোধ করে বা কমিয়ে দেয়। আলোর গতি কোনো বাধার সম্মুখীন হলে কমে যায়। শব্দের গতি আলোর গতি অপেক্ষা কম। আলোর গতিও আপেক্ষিক। আইনস্টাইন সময়ের আপেক্ষিক তত্ত্বও প্রমাণ করেন। মানুষ খুবই আনন্দের মধ্যে থাকলে মনে হয় সময় তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে গেল; দুঃখ-কষ্টের সময় মনে হয় যে সময় কাটতে চায় না। আমরা যখন বলি অমুক সময় তখন সঠিকভাবে সেই সময় হতে পারে না। কারণ ঘটনা ঘটা এবং বলার মধ্যে পৃথিবী আহ্নিক গতিতে ঘুরে যায় এবং পরিস্থিতির বদল হয়।

আইনস্টাইনের আপেক্ষিকবাদ তত্ত্ব গ্যালিলিও ও নিউটনের আমল থেকে জ্যোতির্বিজ্ঞানের যে সকল তত্ত্ব চিরন্তন বলে স্বীকৃত হত তাকে ভিত্তিহীন করে দেয়। এই কারণে বিংশ শতকের বিজ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভা হিসেবে আইনস্টাইন স্বীকৃতি পেয়েছেন। নিউটন গণিতের বিষয়ে বেশ কিছু সমস্যার সমাধান করতে পারেন নি। তিনি আলোর গতি সম্পর্কে যে তত্ত্ব দেন তা ত্রুটিপূর্ণ প্রমাণিত হয়েছে। তাছাড়া নিউটন ইথার সম্পর্কে যে তত্ত্ব প্রচার করেন, এখন বৈজ্ঞানিকরা ইথার কণিকার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। নিউটনের গণিতে আলোকের গতির সঙ্গে বুধ গ্রহের অভিকর্ষের সামঞ্জস্য ছিল না। আইনস্টাইন এই সমস্যার সমাধান করেছেন। আকাশে যে নক্ষত্ররাজি আছে তার রশ্মি সূর্যের আলোকে প্রবেশ করে বহুগুণ বক্র পথে বিকীর্ণ হয়।

আইনস্টাইনের এই আপেক্ষিক তত্ত্ব পদার্থের বিকিরণ ও তার সময়গত গাণিতিক ধারণাকে আমূল বদলে দিয়েছে। ডারউইনের মতোই আইনস্টাইনও বলেছেন যে, জড়জগত ও তার শক্তি এবং অভিব্যক্তিতে একটি অবিরাম পরিবর্তন চলেছে। কাজেই সময় ও কাল সম্পর্কে আমরা কোনো স্থায়ী ধারণা করতে পারি না। তৃতীয় যে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার পদার্থবিদ্যায় যুগান্তর ঘটিয়েছে তা ১৯১১ খ্রীঃ স্যার আর্নেষ্ট রাদারফোর্ডের আণবিক তত্ত্ব। রাদারফোর্ড রঞ্জন রশ্মি, X. Ray এবং অণুর (atom) মধ্যে এক সম্পর্ক আবিষ্কার করেন। রাদারফোর্ড বলেন যে, প্রতি অ্যাটম বা অণু কতকগুলো প্রোটন বা পরমাণুর সমষ্টি যার মধ্যে পরা ও অপরা ইলেকট্রন আছে। অর্থাৎ সৌরমন্ডলের সঙ্গে তুলনা করলে প্রোটনকে সূর্য এবং ইলেকট্রন কণিকাগুলিকে উপগ্রহ বলা চলে। রাদারফোর্ডের এই তত্ত্বের সঙ্গে ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্বকে নীলস বোর (Nieles Bour) নামে এক ড্যানিস পদার্থবিদ সংযুক্ত করলে আধুনিক আণবিক শক্তি তত্ত্বের (Atomic Theory) উদ্ভব হয়। আণবিক তত্ত্ব নীলস বোর উদ্ভাবন করার পর ইওরোপ ও আমেরিকার বহু পদার্থবিজ্ঞানী এই তত্ত্বের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান। তখন দেখা যায় যে, রেডিয়াম ও ইউরেনিয়াম অণু (Atom) কে ভেঙে ফেলা সম্ভব। এই atom বা অণুকে ভেঙ্গে ফেলার ফলে যে প্রচণ্ড তাপ ও আলো বিকীর্ণ হয এবং অণু থেকে পরমাণুতে ভাঙ্গার এই প্রক্রিয়া যে ভয়ঙ্কর তাপ, কম্পন, অগ্নি ছড়ায় তা পার্থিব সবকিছু জিনিষকে নিমেষে ধ্বংস করতে সক্ষম। এর নাম হল আণবিক শক্তি (Atomic energy)। এই শক্তিকে মানুষের মঙ্গলজনক কাজে লাগিয়ে উৎপাদন ও যন্ত্র চালনায় হয়তো ভবিষ্যতে ব্যবহার করা যাবে। যখন কয়লা ও খনিজ তৈল আর লভ্য থাকবে না তখন আণবিক শক্তিই হয়তো সভ্যতাকে রক্ষা করবে। আণবিক তত্ত্বের উদ্ভাবন আজকের যুগে "matter" বা পদার্থের ধারণাকে পরিবর্তন করেছে। আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ববাদ বিশ্ব ও সৌরমণ্ডলের গ্রহ-উপগ্রহের অবস্থান, আলোকবর্ষ প্রভৃতি বিষয়ের পুরাতন ধারণাকে নস্যাৎ করেছে। আইনস্টাইন আজ প্রমাণ করেছেন যে, space বা ক্ষেত্র হল বক্র প্রায় গোলকের মতোই। সুতরাং যেখান থেকে অভিযাত্রা শুরু আবার সেখানেই ফিরে আসা। এরপর ১৯২৭ খ্রীঃ জার্মান পদার্থবিদ হাইজেনবার্গ Principle of Indeterminacy বা অনির্দিষ্টবাদ তত্ত্বের উদ্ভাবন করেছেন। হাইজেনবার্গের মতে, atom বা অণুর অন্তর্গত কোনো কোনো পরমাণু (Electron) নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলতে জানে না। সুতরাং Electron গুলি সকল সময় সকল ক্ষেত্রে একই রকম প্রতিক্রিয়ার অধীনে থাকবে তার কোনো মানে নেই। কাজেই বেশির ভাগ ইলেকট্রনের আচরণ লক্ষ্য করে আমরা একটি সম্ভাব্য সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি মাত্র। শতকরা ১০০% ইলেকট্রন এই নিয়ম মেনে চলবে এমন কোনো কথা নেই। ইনসিওরেন্স (Insurance) কোম্পানীগুলি অকালে মৃত্যু হলে ক্ষতিপূরণ দেয়। কিন্তু ইনসিওরেন্স কোম্পানীগুলি জানে যে, বেশির ভাগ লোকের অকাল মৃত্যু হবে না। এই তথ্যের উপরেই তারা ইনসিওরেন্স (Insurance) ব্যবসা চালায়। Electron গুলির ক্ষেত্রেও আমরা বেশির ভাগ Electron-এর আচরণ দেখে সিদ্ধান্ত নিই। তাতে মাঝে মাঝে বিচ্যুতি হতে পারে। আণবিক তত্ত্ব আজ শুধু মানুষের মঙ্গলের জন্যে ব্যবহার করা হচ্ছে না। এইসঙ্গে আণবিক বোমা (Atom Bomb) রাষ্ট্রবিশেষ নির্মাণ করে আজ তৃতীয় বিশ্বের গরীব জাতিগুলিকে ভীতি প্রদর্শন করছে। আণবিক শক্তিকে ভবিষ্যতে কোন পথে নিয়োজিত করা হবে তা একমাত্র ভবিষ্যৎ ইতিহাসই বলবে।

পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের মতোই জীবন বিজ্ঞানেরও উন্নতি কম হয় নি। যদিও পদার্থবিদ্যার মতো চমকপ্রদ কিছু জীবন বিজ্ঞানে ঘটে নি, তথাপি জীবন বিজ্ঞানের গবেষণা ও অগ্রগতি শারীর বিদ্যা, ভেষজ বিজ্ঞান, শল্যবিদ্যা প্রভৃতির ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব পরিবর্তন এনেছে। শরীরের কোষগুলির নিরন্তর আনুবীক্ষণিক পরীক্ষার ফলে আজ মানুষের জীবনকে নিরাপত্তা দানের

জন্যে খাদ্যের সঙ্গে বিভিন্ন ভিটামিনের ব্যবহার চালু হয়েছে। ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্বের উপর আরো গবেষণা করে বিবর্তনতত্ত্বের ভিত্তি বহুভাবে প্রসারিত করা হয়েছে। মেন্ডেলের (Mendel) বংশগতি তত্ত্বের উপর বহু গবেষণা হয়েছে। টমাস মর্গান (Thomas Morgan) ক্রমোজোম (Chromosoms) নামে জীবকোষের ভিতর এক তন্তুর অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছেন যা বংশগতি তত্ত্বের বিভিন্ন দিক জানতে সাহায্য করে। জীবদেহে ও উদ্ভিদে এই ধরনের যুগ্ম ক্রমোজোম বা জেন (Gen) এর অবস্থান দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, একটি মাছিতে ৪ জোড়া, একটি আপেলের গাছে ৭ জোড়া, গমের বীজে ৮ জোড়া ক্রমোজোম আছে। এই জেনগুলির পুরুষ ও নারী জেনের বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় সংযোজনদ্বারা ক্রমোজোমের সংখ্যা বানানো যায়। একই জাতিগোষ্ঠীভুক্ত হলেও কেন এক ব্যক্তির গুণাবলী কেন অপর ব্যক্তি থেকে আলাদা হয়, জীবন বিজ্ঞান আজ তার কারণ খুঁজে পেয়েছে। মোট কথা, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীবনবিজ্ঞান, শারীরতত্ব, মনোবিদ্যা সর্বক্ষেত্রে বিংশ শতকের গবেষণার অগ্রগতি এক উচ্চতম স্তরে এসে গেছে। প্রকৃতির রহস্যকে আজ মানুষ বহুল পরিমাণে ভেদ করেছে। বিজ্ঞানকে সমাজের ও মানুষের মঙ্গলের কাজে নানাভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

এর পাশাপাশি সমাজ বিজ্ঞানও (Social Science) পিছিয়ে নেই। আজকার যুগে ঐতিহাসিক, নৃতাত্ত্বিক, অর্থনীতিবিদ, সমাজতত্ত্ববিদ তাঁদের অধীত বিদ্যাকে প্রয়োগ করে মানুষ, সমাজ এবং রাষ্ট্রের বিবর্তন ও তার অগ্রগতির বিভিন্ন দিক নিয়ে কাজ করছেন। আজকে সমাজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তথ্য ও তত্ত্বের সমন্বয় দ্বারা সমাজের বিবর্তনের Law বা নিয়মাবলী বোঝার চেষ্টা চলছে। এজন্য সমাজ বিজ্ঞানের গবেষণায় তা ইতিহাস বা নৃতত্ব যাই হোক না কেন, Field Work বা হাতে-কলমে তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণা বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানব জাতির প্রাচীন জীবনধারা, রাষ্ট্রচিন্তা, সমাজ-গঠন, সাংস্কৃতিক জীবন কিভাবে বিবর্তিত হয়ে বর্তমানকালে এসে গেছে এ সম্পর্কে আজ ভূরিভূরি তথ্য যোগাড় করা হয়েছে; যার থেকে বিভিন্ন Law বা বিবর্তনের নিয়ম খোঁজা চলছে। এর দ্বারা ভবিষ্যতের পথে আমরা কোন দিকে যাব তা জানার চেষ্টা চলছে।

সমাজ বিজ্ঞান ও ইতিহাস চর্চা

তথাপি আজও সমাজের, রাষ্ট্রের বিবর্তন সম্পর্কে গবেষকদের সংশয় দূর হয় নি। বৈজ্ঞানিক নৈর্ব্যক্তিকতা নিয়ে আজ কোনো ভবিষ্যৎবাণী করা সম্ভব নয়। এজন্য ১৯১৬ খ্রীঃ ইতালীয় অধ্যাপক বেনে দিতো ক্রোচে (Bene Detto Croce) নাটকীয়ভাবে ঘোষণা করেন যে, বৈজ্ঞানিকভাবে নৈর্ব্যক্তিক ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টা আজ বোধ হয় পণ্ডশ্রম। যাঁরা আজ objective facts বা নৈর্ব্যক্তিক, নিরপেক্ষ তথ্যের দ্বারা ইতিহাস রচনার জন্যে গর্ববোধ করেন, তাঁদের জানা দরকার যে তথ্য নির্বাচন এবং তথ্যের বিশ্লেষণের সময় তাঁরা নিজেদের মনোজগতের নিজ্ঞান নির্বাচন (sub-conscious selection) অনুযায়ী তথ্যকে সাজান ও ব্যাখ্যা করেন। তাঁরা কল্পনা করেন যে, তাঁরা নিরপেক্ষভাবে ইতিহাস রচনা করে বিবর্তনের ধারাকে বোঝাতে চেয়েছেন। কার্যতঃ তাঁরা আপেক্ষিক তত্ত্ববাদ ভুলে যান। তাঁরা ভুলে যান যে, ইতিহাসে আজ পদার্থবিদ্যার মতোই কোন absolute truth বা চূড়ান্ত অপরিবর্তনীয় সত্য নেই। সব সত্যই relative বা আপেক্ষিক। সোসিওলোজির ক্ষেত্রেও একই কথা বলা চলে যে, এক প্রজন্মের সমাজতত্ত্ব পরবর্তী প্রজন্মের গবেষণার ফলে পরবর্তী প্রজন্মের লেখকের ব্যক্তিগত ধারণার কুফল ছাড়া আর কিছু নয়। তাই আজ আগাষ্টকোমতে, হার্বার্ট স্পেনসার পরবর্তী প্রজন্মের কাছে বাতিল হচ্ছেন। তাঁদের রচনা পাঠের প্রয়োজনীয়তা এই যে তাঁদের সমকালীন যুগকে বুঝতে তা সাহায্য করে। তাঁরা তাঁদের যুগকে কিভাবে দেখছেন তা জানতে সাহায্য করে। ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজ দর্শন সব ক্ষেত্রে Enlightenment বা জ্ঞানদীপ্তি অগ্রগামী। সংশয় থেকে আবার নতুন তথ্য ও তত্ত্বের উৎপত্তি হচ্ছে। Doubt is the

beginning for the quest for truth. সংশয় আজ বিজ্ঞান ও মানববিদ্যা সর্বক্ষেত্রে নতুন সত্যকে জানতে সাহায্য করছে। ইতিহাসের ক্ষেত্রেও আজ absolute truth নেই। তা খোঁজার জন্যে নিরন্তর গবেষণা, অন্বেষণ চলছে এবং চলতে থাকবে। মানুষের মনীষার এই দুর্দম, দুর্বার অভিযান বিংশ শতকের চরিত্র। পরবর্তী শতককে তা পথ প্রদর্শন করবে।

উনবিংশ ও বিংশ শতকের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলি যেমন একদিকে মানব সভ্যতাকে এগিয়ে দিয়েছে তেমনই বিজ্ঞানকে মানব কল্যাণের কাজে নিয়োজিত না করে মারণাস্ত্র তৈরীর কাজেও লাগান হচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদীরা এই মারণাস্ত্র দ্বারা রাজ্যজয়ের যুদ্ধে লিপ্ত হচ্ছে। এর ফলে মানব সভ্যতার সঙ্কট দেখা দিয়েছে।

আদর্শ প্রশ্নাবলী (Model Questions)

ইওরোপের ইতিহাস, ১৭৮৯-১৮৭০ খ্রীঃ

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

১। ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্কালে ইওরোপের ও ফ্রান্সের সামাজিক অবস্থা কি ছিল?

২। মার্কান্টাইলবাদ কাকে বলে? ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্কালে ইওরোপের অর্থনৈতিক অবস্থা কি ছিল?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১। জ্ঞানদীপ্তি কাকে বলে? জ্ঞানদীপ্তির ফলাফল কি ছিল?

২। ফরাসী বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্বে ফ্রান্সের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার বিবরণ সংক্ষেপে দাও।

৩। "ফরাসী রাজতন্ত্র ছিল আসলে সামন্ত রাজতন্ত্র"—১৭৮৯ খ্রীঃ ফরাসী রাজতন্ত্র সম্পর্কে ডেভিড টমসনের এই মন্তব্য বিশদভাবে ব্যাখ্যা কর।

৪। ফরাসী বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্বে ফ্রান্সের অভিজাত শ্রেণী ও তাদের বিশেষ অধিকারের বিবরণ দাও।

৫। বুর্জোয়া কাদের বলা হয়? অভিজাত শ্রেণী ও বুর্জোয়া শ্রেণী ফরাসী বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্বে কি অধিকার ভোগ করত? এদের পারস্পরিক সম্পর্ক কিরূপ ছিল?

৬। ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্কালে ফ্রান্সের অর্থনৈতিক অবস্থা কিরূপ ছিল?

৭। "ফ্রান্স ছিল ভুল অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একটি প্রকাণ্ড যাদুঘর"—এই মন্তব্য ব্যাখ্যা কর।

৮। অষ্টাদশ শতকে ফ্রান্সে আলোকিত ভাবধারার প্রচারকদের সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১। ফরাসী বিপ্লবের অর্থনৈতিক কারণগুলি বিশ্লেষণ কর। এই অর্থনৈতিক সঙ্কট কি এই বিপ্লবকে অনিবার্য করে?

২। অষ্টাদশ শতকে ফ্রান্সের উৎপাদন ও বিনিময় ব্যবস্থার পরিবর্তন কিভাবে সামাজিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে? এজন্য ফরাসী বিপ্লব কিভাবে ঘটে তাহা ব্যাখ্যা কর।

৩। ফরাসী বিপ্লবের পশ্চাতে দার্শনিকদের প্রভাব কিরূপ কার্যকরী হয়েছিল তাহা বিশ্লেষণ কর।

৪। সংক্ষিপ্ত টীকা দাও :—স্পিরিট অব লজ; কনট্রাক্ট সোসিয়েল; ফিজিওক্র্যাট তত্ত্ব।

৫। ফরাসী বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্বে ফরাসী জনসাধারণের উপর দার্শনিকদের মতবাদের প্রভাব কিরূপ ছিল তাহা পর্যালোচনা কর।

৬। ফরাসী বুর্জোয়া শ্রেণীর উপর দার্শনিকদের ভাবধারার প্রভাব কিরূপ ছিল তাহা বিশ্লেষণ কর। এই প্রভাবের কি ফল দেখা যায়?

৭। ফরাসী বিপ্লব ঘটবার জন্যে ফরাসী বুর্জোয়া শ্রেণীর অসন্তোষ কিরূপ কাজ করেছিল তাহা ব্যাখ্যা কর।

৮। ফ্রান্সের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য ফরাসী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে কিভাবে প্রভাবিত করে তাহা ব্যাখ্যা কর। এর ফল কি হয়?

৯। "ফরাসী রাজতন্ত্র সামন্ত শ্রেণীর বিশেষ অধিকারের সমস্যা দূর করতে ব্যর্থ হওয়ায়, ফরাসী বিপ্লব ঘটে" (Fisher)—এই অভিমতের তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

১০। ফরাসী বিপ্লব ১৭৮৯ খ্রীঃ ঘটা কি অনিবার্য ছিল?

১১। "ফ্রান্সের তৃতীয় শ্রেণী বিত্ত ও জ্ঞান লাভ করার অনিবার্য পরিণতি হিসেবে ফরাসী বিপ্লব দেখা দেয়" (Mignet)—এই অভিমতের তাৎপর্য ও যৌক্তিকতা বিচার কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১। বুরবোঁ রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে ফ্রান্সের কোন্ শ্রেণী প্রথমে বিদ্রোহ করে? এই বিদ্রোহের কারণ ও ফলাফল ব্যাখ্যা কর।

২। বুরবোঁ রাজতন্ত্রের অর্থ সঙ্কটে শোষণের ব্যাপারে ফরাসী অভিজাত শ্রেণীর ভূমিকা কি ছিল তাহা বিশ্লেষণ কর।

৩। ১৭৮৯ খ্রীঃ ফরাসী অভিজাত শ্রেণীর বিদ্রোহ কিভাবে বুর্জোয়া বিদ্রোহে পরিণত হয় তাহা ব্যাখ্যা কর।

৪। ব্রিঁয়া ও ক্যালোনের কর সংস্কার প্রস্তাব কি ছিল? অভিজাত শ্রেণী এর বিরুদ্ধে কি প্রতিক্রিয়া দেখায়? তার ফল কি ছিল?

৫। কি পরিস্থিতিতে রাজা ষোড়শ লুই জাতীয় সভা বা স্টেটস জেনারেলের অধিবেশন ১৭৮৯ খ্রীঃ ডাকেন তাহা ব্যাখ্যা কর। এর ফল কি হয়?

৬। কিভাবে ফ্রান্সের স্টেটস জেনারেল বা জাতীয় সভা, সংবিধান সভায় রূপান্তরিত হয়? ১৭৯১ খ্রীঃ পর্যন্ত ফ্রান্সের সংবিধান সভার কার্যাবলী আলোচনা কর।

৭। ফ্রান্সে কিভাবে বুর্জোয়া বিপ্লব ঘটে তাহা আলোচনা কর। এর ফল কি হয়?

৮। সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ : (ক) টেনিস কোর্টের শপথনামা; (খ) প্যারিসের বিদ্রোহ; (গ) প্যারিস কমিউন প্রতিষ্ঠা; (ঘ) মহা আতঙ্ক।

৯। সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ : (ক) জাতীয় সভার ১১ই আগস্টের ঘোষণা। (খ) অক্টোবরের ঘটনা।

তৃতীয় অধ্যায়

১। ব্যক্তি ও নাগরিকের ঘোষণায় কি বলা হয়? ১৭৯১ খ্রীঃ সংবিধানে তাহা কিরূপভাবে গৃহীত হয় আলোচনা কর।

২। ১৭৯১ খ্রীঃ সংবিধানে রাজার ও আইন সভার ক্ষমতা কিরূপ ছিল? এই সংবিধান কেন স্থায়ী হতে পারেনি?

৩। সংবিধান সভার কার্যাবলী আলোচনা কর। এর কি ত্রুটি ছিল?

৪। তিন থেকে চারটি বাক্যের মধ্যে টীকা লেখ : (ক) মানব জাতির অধিকারের ঘোষণাপত্র; (খ) ১৭৯১ খ্রীঃ নির্বাচন আইন ও আইন সভার ক্ষমতা; (গ) সিভিল কনস্টিটিউশন অব ক্লার্জি; (ঘ) সাসপেন্সিভ ভেটো।

চতুর্থ অধ্যায়

১। দ্বিতীয় ফরাসী বিপ্লবের কেন প্রয়োজন হয়? এই বিপ্লবের ফল কি ছিল?

২। সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের (১৭৯১ খ্রীঃ) কেন পতন ঘটে? কিভাবে রাজতন্ত্রের পতন ঘটে তাহা আলোচনা কর।

৩। তিনটি থেকে চারটি বাক্যের মধ্যে টীকা লেখ :—(ক) ১০ই আগস্ট, ১৭৯২ খ্রীঃ-এর ঘটনা; (খ) দ্বিতীয় ফরাসী বিপ্লবের ফল; (গ) সেপ্টেম্বর হত্যাকাণ্ড।

পঞ্চম অধ্যায়

১। ফ্রান্সের জাতীয় মহাসভা বা জাতীয় সম্মেলন (National Convention) কি কি বিপদের সম্মুখীন হয়? সন্ত্রাসের রাজত্বের মাধ্যমে কিভাবে জাতীয় মহাসভা এই সকল বিপদ থেকে মুক্তি পায়?

২। জিরন্ডিষ্ট ও জ্যাকোবিন দলের মধ্যে কি পার্থক্য ছিল? কেন জিরন্ডিষ্টদের পতন ঘটে?

৩। জ্যাকোবিন দলের উত্থান ও তাদের কৃতিত্ব বিচার কর।

৪। রোবসপিয়ারের আদর্শ ও নেতৃত্বের বিচার কর।

৫। জাতীয় সম্মেলনের শাসনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৬। সন্ত্রাসের রাজত্ব বলতে কি বোঝায়? এর তাৎপর্য কি ছিল? এর স্বপক্ষে ও বিপক্ষে কি যুক্তি দেখান হয়?

৭। বিপ্লবী ফ্রান্স কেন বৈদেশিক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে তাহা আলোচনা কর।

৮। তিনটি থেকে চারটি বাক্যের মধ্যে টীকা লেখ ঃ—(ক) ষোড়শ লুইয়ের প্রাণদণ্ড, (খ) জিরন্ডিষ্ট দলের নীতি, (গ) জন-নিরাপত্তা সমিতি, (ঘ) লা-ভেন্ডির বিদ্রোহ ও ফলাফল, (ঙ) রোবসপিয়ারের সংস্কার সমূহ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

১। ডাইরেক্টরীর শাসনের প্রকৃতি কি ছিল? ডাইরেক্টরীর পতনের কারণ কি ছিল?

২। ডাইরেক্টরীর বৈদেশিক নীতি আলোচনা কর।

৩। তিন থেকে চারটি বাক্যের মধ্যে টীকা লেখ ঃ—(ক) ব্যাবেয়ুফের বিদ্রোহ, (খ) কাম্পো ফোর্মিওর সন্ধি, (গ) নেপোলিয়নের মিশর অভিযান।

সপ্তম অধ্যায়

১। ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ শাসনের জন্যে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট যে সমস্ত ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন সেগুলি সম্বন্ধে আলোচনা কর। তাঁর সংস্কারগুলি ফরাসী বিপ্লবের আদর্শের সাথে কত দূর সঙ্গতিপূর্ণ ছিল?

২। "নেপোলিয়ন ছিলেন বিপ্লবের সন্তান"—এই মন্তব্যের তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

৩। নেপোলিয়নের অসামরিক সংস্কারগুলি কি ছিল? এতে ফরাসী বিপ্লবের আদর্শগুলি কিভাবে প্রতিফলিত হয়?

৪। ফ্রান্সে নেপোলিয়ন কেন তাঁর একনায়কতন্ত্র স্থাপনে বিফল হন?

৫। ফরাসী বিপ্লবের ফলাফল আলোচনা কর।

৬। তিনটি থেকে চারটি বাক্যের মধ্যে টীকা লেখ ঃ—(ক) কোড নেপোলিয়ন, (খ) কনকর্ডাট, (গ) কনসুলেটের সংবিধান, (ঘ) ফরাসী বিপ্লবের সামাজিক ফলাফল।

অষ্টম অধ্যায়

১। প্রেসবার্গের সন্ধি (১৮০৫ খ্রীঃ) এবং টিলজিটের সন্ধির (১৮০৭ খ্রীঃ) পর সম্রাট নেপোলিয়ন কর্তৃক জার্মানীর পুনর্গঠনের বিবরণ দাও। টিলজিটের সন্ধিতে কি গোপন শর্ত ছিল?

২। নেপোলিয়নের বৈদেশিক নীতির লক্ষ্য ইওরোপে ফরাসী বিপ্লবের আদর্শ প্রচার করা ছিল কিনা তাহা আলোচনা কর।

৩। নেপোলিয়নের ইওরোপ জয়ের লক্ষ্য কি ছিল?

৪। এ্যামিয়েন্সের সন্ধি (১৮০২ খ্রীঃ) কেন ভেঙ্গে যায়? এর কি ফল দেখা দেয়?

৫। টিলজিটের সন্ধির শর্তগুলি আলোচনা কর। এই সন্ধি কেন স্থায়ী হয়নি এবং রাশিয়ার সঙ্গে নেপোলিয়নের বিরোধের কারণ কি ছিল?

৬। নেপোলিয়ন কিভাবে জার্মানী ও ইতালিকে পুনর্গঠন করেন? এই পুনর্গঠনের দ্বারা তিনি কি ফরাসী আদর্শকে প্রচার করেন?

৭। মহাদেশীয় প্রথা বা কন্টিনেন্টাল সিষ্টেম বলতে কি বুঝায়? এর প্রয়োগ নেপোলিয়নের ভাগ্যকে কিভাবে প্রভাবিত করে?

৮। মহাদেশীয় প্রথার উদ্দেশ্য কি ছিল? ইহা কেন বিফল হয়?

৯। পেনিনসুলার যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল আলোচনা কর।

১০। নেপোলিয়নের পতনে নিম্নলিখিত কোন্ বিষয়টি বেশি কার্যকর ছিল—স্পেনের যুদ্ধ অথবা মস্কো অভিযান?

১১। তিনটি থেকে চারটি বাক্যের মধ্যে টীকা দাও :—(ক) একশত দিবসের রাজত্ব; (খ) জার্মানীর মুক্তি সংগ্রাম; (গ) বোরোডিনোর যুদ্ধ; (ঘ) টেরেসভেড্রার ব্যূহ; (ঙ) বার্লিন ডিক্রী; (চ) গ্রান্ড ডাচি অফ ওয়ারস; (ছ) কনফেডারেশন অফ রাইন; (জ) ওয়াটার্লুর যুদ্ধ।

নবম অধ্যায়

১। নেপোলিয়নের পতনের কারণগুলি কি?

২। ফ্রান্সে ও ইওরোপে নেপোলিয়নের জনপ্রিয়তা কেন বিনষ্ট হয়?

৩। "নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যের অন্তর্নিহিত, আত্মঘাতী, স্ববিরোধ তাঁর পতনের জন্যে দায়ী ছিল"—ডেভিড টমসনের এই অভিমতের তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

অথবা, নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যের প্রকৃতি কি ছিল? ইহা তাঁর পতনের জন্যে কিভাবে দায়ী ছিল?

৪। মহাদেশীয় প্রথা নেপোলিয়নের পতনকে কিভাবে ত্বরান্বিত করে তাহা আলোচনা কর।

৫। তিনটি থেকে চারটি বাক্যের মধ্যে টীকা লেখ :—(ক) মস্কো অভিযানের ফলাফল; (খ) নেপোলিয়নের পতনে ইংলন্ডের ভূমিকা।

দশম অধ্যায়

১। ভিয়েনা সম্মেলনের কার্যাবলী বর্ণনা কর। ভিয়েনা ব্যবস্থার মূলে কি কি নীতি ছিল?

২। ভিয়েনা চুক্তি ছিল "প্রকাশ্য প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা"—এই অভিমতের যৌক্তিকতা বিচার কর।

৩। ভিয়েনা চুক্তিতে ন্যায্য অধিকার ও শক্তিসাম্য নীতিগুলি কিভাবে প্রয়োগ করা হয়? ইহা শেষ পর্যন্ত কেন ব্যর্থ হয়?

অথবা, ভিয়েনা সন্ধির দ্বারা ইওরোপে যে স্থিতাবস্থা স্থাপিত হয় তাহা কেন বিফল হয়?

৪। "ভিয়েনা চুক্তি ছিল মোটামুটিভাবে বিজ্ঞ ও রাষ্ট্রনৈতিক যুক্তিসম্মত চুক্তি"—এই অভিমত কতদূর সমর্থনযোগ্য তাহা আলোচনা কর।

৫। ইওরোপীয় শক্তি সমবায়ের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি ছিল? শক্তি সমবায়ের পতনের কারণ বিশ্লেষণ কর।

৬। ইওরোপীয় শক্তি সমবায়ে অষ্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী মেটারনিক কি ভূমিকা নেন? তার কি ফল হয়?

৭। ইওরোপীয় শক্তি সমবায়ের বিফলতার কারণ আলোচনা কর।

৮। ইওরোপীয় শক্তি সমবায়ের কার্যাবলী ও কৃতিত্ব আলোচনা কর।

৯। তিনটি থেকে চারটি বাক্যের মধ্যে টীকা লিখ :—(ক) নায্য অধিকার নীতি; (খ) শক্তিসাম্য নীতি; (গ) ভিয়েনা সন্ধির দ্বারা জার্মানীর পুনর্গঠন; (ঘ) পবিত্র চুক্তি; (ঙ) চতুঃশক্তি সন্ধি; (চ) ট্রপোর প্রটোকোল বা ঘোষণাপত্র; (ছ) শক্তি সমবায়ের বিরুদ্ধে ক্যানিংয়ের নীতি।

একাদশ অধ্যায়

১। সঠিক উত্তর চিহ্নিত কর : (ক) ১৮১৫ খ্রীঃ ভিয়েনা চুক্তির প্রকৃতি স্থিতাবস্থামূলক/ পরিবর্তনশীল ছিল। (খ) স্থিতাবস্থার পরিপূরক ছিল নায্য অধিকারবাদ/ জাতীয়তাবাদ। (গ) স্থিতাবস্থার প্রধান থাম ছিল ক্যাথলিক/ জাতীয় গীর্জা। (ঘ) বুদ্ধিজীবি শ্রেণী ক্যাথলিক/ জাতীয় গীর্জার সমর্থক ছিল। (ঙ) ফরাসী বিপ্লব/ ভিয়েনা চুক্তি সামন্ত শ্রেণীর অধিকারগুলিকে চূর্ণ করেছিল। (চ) ইওরোপে উনবিংশ শতকে লোকসংখ্যার বিস্ফোরণের ফলে প্রতিক্রিয়াশীলতা/ পরিবর্তনশীলতা মজবুত হয়। (ছ) বুর্জোয়া শ্রেণী ছিল পরিবর্তনশীলতা/ প্রতিক্রিয়াশীলতার প্রধান কর্মী। (জ) শিল্প-বিপ্লবের ফলে পুঁজিবাদী/ সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির উদ্ভব হয়।

২। ভিয়েনা চুক্তির পর স্থিতাবস্থার যে শক্তিগুলি সক্রিয় ছিল তাদের সম্পর্কে আলোচনা কর।

৩। পরিবর্তনশীলতা বলতে কি বুঝায়? ভিয়েনা চুক্তির পর কি শক্তিগুলি পরিবর্তনশীলতার স্বপক্ষে সক্রিয় ছিল?

৪। ১৮১৫—১৮৫০ খ্রীঃ পর্যন্ত স্থিতাবস্থা ও পরিবর্তনশীলতার সংঘাত বিশ্লেষণ কর।

দ্বাদশ অধ্যায়

১। নেপোলিয়নের পতনের পর ফ্রান্সের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার কথা আলোচনা কর।

অথবা, পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত বুরবোঁ রাজবংশের শাসনে ফ্রান্সের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা আলোচনা কর।

২। অষ্টাদশ লুই ও দশম চার্লসের শাসনকালে সমাজে কেন শ্রেণী সংঘাত দেখা দেয়?

৩। ফ্রান্সে ১৮৩০ খ্রীঃ জুলাই বিপ্লব কি অনিবার্য ছিল?

অথবা, "পুনঃপ্রতিষ্ঠিত বুরবোঁ রাজবংশের পতন একটি পূর্ব নির্ধারিত সিদ্ধান্ত ছিল না"—ডেভিড টমসনের এই মন্তব্যের যৌক্তিকতা বিচার কর।

৪। অষ্টাদশ লুইয়ের মধ্যপন্থা নীতি কেন বিফল হয় তাহা আলোচনা কর।

অথবা, ফ্রান্সে জুলাই বিপ্লবের কারণ পর্যালোচনা কর।

৫। ফ্রান্সে জুলাই বিপ্লবের ফলাফল কি ছিল?

অথবা, ফ্রান্সের বাইরে এই বিপ্লবের ফল কি হয়?

৬। বেলজিয়ামের স্বাধীনতার যুদ্ধ সম্পর্কে কি জান তাহা লিখ।

৭। মেটারনিকতন্ত্র বলতে কি বুঝায়? ইহা কিরূপে প্রযুক্ত হয়?

৮। মেটারনিকতন্ত্রের পক্ষে ও বিপক্ষে কি যুক্তি দেখান হয়? মেটারনিকের বিফলতার কারণগুলি কি ছিল?

৯। 'মেটারনিক ছিলেন ইওরোপীয় রক্ষণশীলতার মন্ত্রী।' এই অভিমতের ব্যাখ্যা কর। মেটারনিকতন্ত্রের পতনের কারণ কি ছিল?

১০। মেটারনিকের দার্শনিক মত কি ছিল? তাঁর কৃতিত্ব বিচার কর।

১১। তিনটি থেকে চারটি বাক্যের মধ্যে টীকা লিখ :—(ক) অষ্টাদশ লুইয়ের সনদ; (খ) শ্বেত সন্ত্রাস; (গ) ভিলীলের নীতি; (ঘ) জুলাই অর্ডিন্যান্স; (ঙ) কার্লসবাড ডিক্রী।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

১। শিল্প-বিপ্লব কাকে বলে? শিল্প-বিপ্লবের ফলাফল কি ছিল?

২। সর্বপ্রথম কোন্ দেশে শিল্প-বিপ্লব আরম্ভ হয়? কেন এই দেশে সর্বপ্রথম শিল্প-বিপ্লব ঘটে তার কারণ আলোচনা কর।

৩। শিল্প উৎপাদনের "Take off" কাকে বলে? ইংলন্ডে কোন্ সময় ইহা ঘটে? ইংলন্ডে শিল্প-বিপ্লবের বিকাশের জন্যে প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক সুযোগ কিভাবে কাজ করেছিল?

৪। ইংলন্ডে সর্বপ্রথম শিল্প-বিপ্লব ঘটবার জন্যে হবসন নামক ঐতিহাসিকের তত্ত্বগুলি আলোচনা কর।

৫। ইংলন্ডে প্রথম বয়ন শিল্পকে কেন্দ্র করে শিল্প-বিপ্লব আরম্ভ হবার পর তাহা বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিভাবে অগ্রগতি লাভ করে তাহা আলোচনা কর।

৬। ইংলন্ডে শিল্প-বিপ্লবের বিকাশ আলোচনা কর।

৭। ফ্রান্সে কিভাবে শিল্প-বিপ্লব ঘটে তাহা আলোচনা কর। ফ্রান্স শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে কেন ইংলন্ড থেকে পিছিয়েছিল তার কারণ ব্যাখ্যা কর।

৮। রাশিয়ায় কি কারণে সর্বাপেক্ষা দেরীতে শিল্প-বিপ্লব আরম্ভ হয়? ১৮৬০ খ্রীঃ পর কি কি কারণে রাশিয়ায় শিল্প-বিপ্লব ঘটে?

অথবা, "১৮৬১ খ্রীঃ রাশিয়ার ইতিহাসে একটি যুগ-সন্ধিক্ষণ ছিল"।—গ্রেগরী গ্রসম্যানের এই মন্তব্যের ব্যাখ্যা কর।

৯। ইওরোপের বিভিন্ন দেশে শিল্প-বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

১০। শিল্প-বিপ্লবের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ফল কি ছিল?

১১। তিনটি থেকে চারটি বাক্যের মধ্যে টীকা লিখ : (ক) ইংলন্ডের শিল্প-বিপ্লবে বাষ্পীয় ইঞ্জিনের প্রভাব; (খ) বয়ন শিল্পে কি আবিষ্কার ঘটে? তার প্রভাব কি ছিল? (গ) পরিবহন ব্যবস্থায় শিল্প-বিপ্লবের ফলে কি উন্নতি ঘটে? (ঘ) রাশিয়ায় ভূমিদাস প্রথা উচ্ছেদের সঙ্গে রুশ শিল্প-বিপ্লবের সম্পর্ক; (ঙ) রাশিয়া ও জার্মানীতে শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে সরকারি ভূমিকা; (চ) কুটির শিল্পের ওপর শিল্প-বিপ্লবের প্রভাব এবং এর ফলাফল; (ছ) শিল্প-বিপ্লবের কুফল সম্পর্কে লেনিনের অভিমত।

চতুর্দশ অধ্যায়

১। ১৮৪৮ খ্রীঃ ফরাসী বিপ্লবের কারণগুলি আলোচনা কর। এই বিপ্লবে সমাজতন্ত্রবাদীদের ভূমিকা কি ছিল?

২। ফ্রান্সে জুলাই রাজতন্ত্রের কেন পতন ঘটে? জুলাই রাজতন্ত্রের বৈদেশিক নীতি এর জন্যে কিরূপ দায়ী ছিল?

৩। ১৮৪৮ খ্রীঃ ফ্রান্সের ফেব্রুয়ারী বিদ্রোহের পশ্চাতে পাতি বুর্জোয়া শ্রেণীর ভূমিকা আলোচনা কর।

অথবা, "১৮৪৮ খ্রীঃ বিপ্লবকে বুদ্ধিজীবির বিপ্লব" বলা কতদূর সঙ্গত তাহা আলোচনা কর।

৪। ফ্রান্সে ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের ফলাফল আলোচনা কর। এই বিপ্লবের ফলে কোন্ শ্রেণীর হাতে শাসন ক্ষমতা চলে যায়?

৫। ফ্রান্স ও ইওরোপের অন্যান্য দেশে ১৮৪৮ খ্রীঃ বিপ্লবের সাধারণ চরিত্র কি ছিল? এই বিপ্লবগুলিতে কি ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব দেখা যায়?

অথবা, ইওরোপের বিভিন্ন দেশে ১৮৪৮ খ্রীঃ বিপ্লবের ধারা ও বৈশিষ্ট্য কি ছিল?

৬। ১৮১৫ খ্রীঃ ভিয়েনা চুক্তির দ্বারা স্থাপিত ইওরোপীয় কাঠামো কিভাবে ফেব্রুয়ারী বিপ্লব (১৮৪৮ খ্রীঃ) দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তা আলোচনা কর।

৭। তিনটি থেকে চারটি বাক্যের মধ্যে টীকা লিখ :—(ক) সংস্কারের ভোজসভা; (খ) লুই ফিলিপের ব্যক্তি শাসন বা একনায়কতন্ত্র; (গ) ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্ট।

৮। ফেব্রুয়ারী বিপ্লবেব বিফলতার কারণগুলি আলোচনা কর।

পঞ্চদশ অধ্যায়

১। ফ্রান্সে দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়? এর দ্রুত পতনের কারণ আলোচনা কর।

২। সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ :—(ক) জুনের গৃহযুদ্ধ।

ষোড়শ অধ্যায়

১। তৃতীয় নেপোলিয়নের আভ্যন্তরীন শাসন নীতি কি ছিল? তাঁর জনপ্রিয়তা হ্রাসের কারণ কি?

২। তৃতীয় নেপোলিয়নের বৈদেশিক নীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

৩। তৃতীয় নেপোলিয়নের বৈদেশিক নীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর। এই নীতির কি ফল দেখা দেয়?

৪। ১৮৭০ খ্রীঃ ফ্রাঙ্কো-জার্মান যুদ্ধে তৃতীয় নেপোলিয়ন কেন মিত্রহীন হয়ে পড়েন তা ব্যাখ্যা কর। এজন্য তৃতীয় নেপোলিয়ন অথবা বিসমার্ক কেন দায়ী ছিলেন?

অথবা, "ফ্রাঙ্কো-জার্মান যুদ্ধ ছিল একটি দ্বৈত যুদ্ধ। এতে কোন তৃতীয় শক্তি জড়িত ছিল না"—ডেভিড টমসনের এই উক্তির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

৫। তৃতীয় নেপোলিয়নের কৃতিত্ব কি ছিল? তাঁকে "ক্ষুদ্র নেপোলিয়ন" বলা সঙ্গত কিনা বিচার কর।

৬। তৃতীয় নেপোলিয়নের পতনের প্রধান কারণ হিসেবে তাঁর বৈদেশিক নীতিকে দায়ী করা যায় কিনা বিচার কর।

অথবা, "১৮৬০ খ্রীঃ থেকে দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের পতনের সূচনা হয়"—বেরীর (Bury) এই উক্তির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

৭। "তৃতীয় নেপোলিয়ন ছিলেন ভাগ্য-বিড়ম্বিত ব্যক্তি"—এই উক্তির যথার্থতা প্রমাণ কর।

৮। তৃতীয় নেপোলিয়নের পতনের কারণ কি ছিল?

৯। তিনটি থেকে চারটি বাক্যের মধ্যে টীকা লিখ :—(ক) তৃতীয় নেপোলিয়নের শিল্প নীতি; (খ) তৃতীয় নেপোলিয়নের ইতালীয় নীতি; (গ) তৃতীয় নেপোলিয়নের সঙ্গে ইংলন্ডের সম্পর্ক।

সপ্তদশ অধ্যায়

১। ইতালীর ঐক্য বিধানে কাভ্যুরের অবদান সম্পর্কে আলোচনা কর।

২। ইতালীর ঐক্য স্থাপনে ম্যাৎসিনীর অবদান কি ছিল তা ব্যাখ্যা কর। ম্যাৎসিনীর লক্ষ্য কেন পূরিত হয় নি?

৩। কাভ্যুরের নেতৃত্বে ইতালীর মুক্তি যুদ্ধের ফলে ম্যাৎসিনীর বা চরমপন্থীদের আশা-আকাঙ্ক্ষা কিভাবে পূর্ণ হয় তা বিশ্লেষণ কর।

৪। ইতালীর ঐক্য কিভাবে সফল হয় তা আলোচনা কর।

৫। ইতালীর মুক্তি আন্দোলনে ম্যাৎসিনী, কাভ্যুর ও গ্যারিবল্ডীর কৃতিত্বের তুলনামূলক আলোচনা কর।

৬। "ম্যাৎসিনী ছিলেন ইতালীর পুনর্জাগরণে আধ্যাত্মিক শক্তি, নব ইতালীর প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ"—এই মন্তব্যের যথার্থতা বিচার কর।

৭। তিনটি থেকে চারটি বাক্যের মধ্যে টীকা লিখ :—(ক) ইয়ং ইতালী দল; (খ) গ্যারিবল্ডী; (গ) ইতালীর মুক্তি যুদ্ধে তৃতীয় নেপোলিয়নের ভূমিকা; (ঘ) প্লোমবিয়ারের সন্ধি।

অষ্টাদশ অধ্যায়

১। জার্মানীর ঐক্যের জন্যে ১৮১৫-১৮৪৮ খ্রীঃ পর্যন্ত উদারপন্থী আন্দোলনের বিবরণ দাও। এই আন্দোলন কেন ব্যর্থ হয়?

২। ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্টের উদ্ভব, কার্যকলাপ ও বিফলতা আলোচনা কর।

৩। তিনটি থেকে চারটি বাক্যের মধ্যে টীকা লিখ :—(ক) বারশেনশাফট; (খ) প্রাশিয়ায় জাতীয়তাবাদী সংস্কার; (গ) ওয়ার্টবার্গ ফেষ্টিভ্যাল; (ঘ) জোলভেরাইন; (ঙ) ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্ট।

ঊনবিংশ অধ্যায়

১। ১৮৫০ খ্রীঃ থেকে প্রাগের সন্ধি (১৮৬৬ খ্রীঃ) পর্যন্ত জার্মানীর ঐক্য বিধানের কাহিনী বর্ণনা কর।

অথবা, ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্ট ভঙ্গের পর থেকে অষ্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত জার্মানীর ঐক্যের বিবরণ দাও।

২। বিসমার্কের নেতৃত্বে জার্মানীর ঐক্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৩। অষ্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধ ও ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয় যুদ্ধের কারণ এবং ফলাফল আলোচনা কর।

৪। ১৮৭০ খ্রীঃ ফ্রাঙ্কো-জার্মান যুদ্ধের ফলাফল ইওরোপে কিভাবে দেখা যায়?

৫। তিনটি থেকে চারটি বাক্যের মধ্যে টীকা লিখ :—(ক) রক্ত ও লৌহ নীতি বলতে কি বোঝায়; (খ) গ্যাষ্টিনের সন্ধি; (গ) প্রাগের সন্ধি; (ঘ) স্পেনের সিংহাসনে উত্তরাধিকারের সমস্যা; (ঙ) সেডানের যুদ্ধ।

বিংশ অধ্যায়

১। ১৮৭১ খ্রীঃ থেকে ১৮৯৩ খ্রীঃ পর্যন্ত বিসমার্কের বৈদেশিক নীতির সমালোচনামূলক আলোচনা কর।

২। জার্মানী ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পর বিসমার্ক কিভাবে জার্মানীর আভ্যন্তরীণ সংগঠন করেন?

৩। ত্রিশক্তি চুক্তি কাকে বলে? কিভাবে ইহা গঠিত হয়?

৪। বিসমার্কের শিল্প নীতি, ক্যাথলিক নীতি ও সমাজতন্ত্রবাদের প্রতি নীতি আলোচনা কর। এর ফল কি হয়?

৫। বিসমার্ক ১৮৭৯ খ্রীঃ পর কিভাবে ফ্রান্সকে মিত্রহীন করেন তাহা আলোচনা কর।

৬। ১৮৭৯ খ্রীঃ পর বিসমার্কের বৈদেশিক নীতি কতদূর সফল হয়? এই নীতির বৈশিষ্ট্য ও ত্রুটি আলোচনা কর।

৭। তিনটি থেকে চারটি বাক্যের মধ্যে টীকা লিখ :— (ক) যুদ্ধাতঙ্ক বা war scare ; (খ) ত্রিশক্তি চুক্তি ১৮৭৯ খ্রীঃ; (গ) তিন সম্রাটের জোট; (ঘ) কুলটুর ক্যাম্প; (ঙ) বিসমার্কের শিল্প নীতি।

একবিংশ অধ্যায়

১। জার প্রথম আলেকজান্ডারের আমলে রাশিয়া ইওরোপের এক শ্রেষ্ঠ শক্তি হতে কেন সাধারণ শক্তিতে পরিণত হয় তাহা আলোচনা কর।

২। জার প্রথম আলেকজান্ডারের শাসন ও বৈদেশিক নীতি আলোচনা কর।

৩। জার প্রথম নিকোলাসের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি আলোচনা কর।

৪। জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের সংস্কারগুলির বিবরণ দাও। তাঁকে "মুক্তিদাতা জার" কেন বলা হয়?

৫। রাশিয়ার সার্ফ বা ভূমিদাসের অবস্থা কি ছিল? ১৮৬১ খ্রীঃ ভূমিদাস উচ্ছেদ আইন দ্বারা ভূমিদাসরা কতদূর উপকৃত হয় তাহা আলোচনা কর।

৬। তিনটি থেকে চারটি বাক্যের মধ্যে টীকা লিখ :—(ক) ডেকাব্রিস্ট বিদ্রোহ; (খ) নিহিলিস্ট বিদ্রোহ; (গ) ভূমিদাস উচ্ছেদ আইন।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

১। পূর্বাঞ্চল সমস্যা কাকে বলে? গ্রীসের ১৮১৫-১৮৪০ খ্রীঃ পর্যন্ত পূর্বাঞ্চল সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা কর।

২। গ্রীসের স্বাধীনতার যুদ্ধ সম্পর্কে কি জান তাহা লিখ।

৩। কি কি কারণে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ হয়? এই যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফলগুলি আলোচনা কর।

৪। প্যারিসের সন্ধির দ্বারা পূর্বাঞ্চল সমস্যার সমাধান কিরূপে হয়? এই সমাধান কেন স্থায়ী হয় নি?

৫। ক্রিমিয়ার যুদ্ধ ঘটবার পশ্চাতে জার নিকোলাস ও ব্রিটিশ মন্ত্রীসভার ভূমিকা আলোচনা কর। এই যুদ্ধ অনিবার্য ছিল কি?

৬। তিনটি থেকে চারটি বাক্যের মধ্যে টীকা লিখ :—(ক) পূর্বাঞ্চল সমস্যা কাকে বলে; (খ) গ্রীক রেনেসাঁস; (গ) ফিলকি হেটাইরিয়া; (ঘ) গ্রোটোর চাবির সমস্যা; (ঙ) প্যারিসের সন্ধির সামুদ্রিক শর্ত; (চ) প্যানস্লাভ আন্দোলন; (ছ) বুলগেরিয়ার হত্যাকান্ড; (জ) তরুণ তুর্কী।

৭। প্যারিসের সন্ধি কিভাবে ব্যর্থ হয়ে পুনরায় পূর্বাঞ্চল সমস্যার সঙ্কট দেখা দেয় তাহা আলোচনা কর।

৮। বার্লিনের শান্তি বৈঠক (১৮৭৮ খ্রীঃ) কেন আহূত হয়? এর পশ্চাতে ব্রিটেনের কি ভূমিকা ছিল?

৯। বার্লিনের সন্ধির দ্বারা পূর্বাঞ্চল সমস্যার কিভাবে সমাধান হয়? বার্লিনের সন্ধি প্রথম মহাযুদ্ধকে ত্বরান্বিত করে কেন বলা হয়?

১০। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত আগে যে বলকান যুদ্ধ হয় তার বিবরণ দাও।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

১। তৃতীয় ফরাসী প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি থিয়ার্সের শাসন নীতি আলোচনা কর।

২। টীকা লিখ :—(ক) প্যারিস কমিউনের বিদ্রোহ; (খ) বুলাঞ্জিস্ট আন্দোলন; (গ) ড্রেইফুবা ঘটনা।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

১। ধনতন্ত্রবাদের উৎপত্তি ও এর ফলাফল আলোচনা কর।

২। সমাজতন্ত্রবাদ বলতে কি বুঝায়? আদি সমাজতন্ত্রবাদ বা ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রবাদ সম্পর্কে কি জান?

৩। প্রধান শিল্পগুলি সম্পর্কে কার্ল মার্কসের মতবাদ লিখ।

৪। মার্কস সমাজতন্ত্রবাদের কি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করেন তাহা আলোচনা কর। তাঁর শ্রেণীসংগ্রাম তত্ত্ব ব্যাখ্যা কর।

৫। মার্কসীয় সমাজতন্ত্রবাদের কি সমালোচনা করা হয়?

৬। নৈরাজ্যবাদ কাকে বলে? বাকুনিনের নৈরাজ্যবাদী ভাবধারা ব্যাখ্যা কর।

৭। তিনটি থেকে চারটি বাক্যের টীকা লিখ ঃ—(ক) Laissez Faire বা হস্তক্ষেপ না করা নীতি; (খ) সেন্ট সাইমন; (গ) রবার্ট আওয়েন; (ঘ) লুই ব্ল্যাঙ্ক; (ঙ) ইতিহাসের দ্বন্দ্ববাদী ব্যাখ্যা; (চ) শ্রেণীসংগ্রাম তত্ত্ব; (ছ) মার্কসীয় মূলতত্ত্ব।

বিশ্বের ইতিহাস, ১৮৭০-১৯৫০ খ্রীঃ

প্রথম অধ্যায়

১। উনবিংশ শতকের গোড়ায় কেন ব্রিটেনের টোরীদল জনপ্রিয়তা হারায় তাহা ব্যাখ্যা কর।

২। ভিক্টোরীয় যুগের মধ্যপন্থা বলতে কি বুঝায়? ১৮৩২ খ্রীঃ ভোটাধিকার আইন ও শস্য আইন প্রত্যাহারে ইহা কিভাবে প্রতিফলিত হয়?

৩। নেপোলিয়নের পতনের পর কিভাবে হুইগ দল জনপ্রিয়তা পায় ও ক্ষমতা লাভ করে তাহা ব্যাখ্যা কর।

৪। ডিস্‌রেইলীর পররাষ্ট্র নীতি আলোচনা কর। তাঁর নীতির ফল কি হয়?

৫। ১৮৭৭ খ্রীঃ পূর্বাঞ্চল সমস্যা সম্পর্কে ব্রিটিশ নীতি ব্যাখ্যা কর। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে ব্রিটেনের পররাষ্ট্রনীতিতে কি সমস্যাগুলি দেখা দেয়? ব্রিটেন কিভাবে তার সমাধান করে?

৬। ডারহাম রিপোর্টের নীতিগুলি কি ছিল? এর দ্বারা ব্রিটেনের ঔপনিবেশিক নীতি কিভাবে প্রভাবিত হয়?

৭। ব্রিটেনে ভোটাধিকার ও সমাজতন্ত্রবাদের প্রসার সম্পর্কে আলোচনা কর।

৮। ব্রিটেনে শ্রমিকদলের উৎপত্তি এবং ক্ষমতা লাভের ইতিহাস পর্যালোচনা কর।

৯। তিনটি থেকে চারটি বাক্যের মধ্যে টীকা লিখ ঃ—(ক) ম্যানর প্রথা; (খ) বেন্থামের হিতবাদ বা উপযোগিতাবাদ; (গ) শস্য আইন; (ঘ) উইলিয়াম কবেট; (ঙ) ক্যাটোস্ট্রীট চক্রান্ত; (চ) মনরো নীতি; (ছ) লর্ড গ্রের রিফর্ম বিল; (জ) ১৮৩২ খ্রীঃ ভোটাধিকার আইন; (ঝ) চার্টিস্ট আন্দোলন; (ঞ) রিচার্ড কবডেন; (ট) বার্লিন সন্ধি সম্পর্কে ডিসরেইলীর মন্তব্য; (ঠ) ডারহাম রিপোর্ট; (ড) স্ট্যাটুট অফ ওয়েস্টমিনিস্টার; (ঢ) নব টোরীবাদ; (ণ) ফেবিয়ানবাদ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১। সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব সম্পর্কে হবসন ও লেনিনের তত্ত্ব আলোচনা কর। উনবিংশ শতকে সাম্রাজ্যবাদের বিস্তারে তাহা কিরূপ কার্যকরী ছিল দেখাও।

২। সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভবের কারণগুলি বিশ্লেষণ কর। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণগুলির বিশদ ব্যাখ্যা দাও।

৩। আফ্রিকাকে কিভাবে সাম্রাজ্যবাদীরা ব্যবচ্ছেদ করে তাহা আলোচনা কর।

৪। সাম্রাজ্যবাদের কারণে কিভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ঘটে তাহা আলোচনা কর।

৫। তিন বা চার বাক্যের মধ্যে টীকা লিখ ঃ—(ক) নব সাম্রাজ্যবাদ; (খ) সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে লেনিনের ব্যাখ্যা; (গ) সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে হবসনীয় ব্যাখ্যা; (ঘ) সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে জন সিলীর অভিমত; (ঙ) সেসিল রোডস পরিকল্পনা; (চ) দ্বিতীয় লিওপোল্ডের সাম্রাজ্যবাদী

নীতি; (ছ) ১৮৮৫ খ্রীঃ বার্লিনের সন্ধি; (জ) ফ্যাশোডার ঘটনা; (ঝ) সিমনোসেকীর সন্ধি; (ঞ) পোর্টসমাউথের সন্ধি; (ট) খোলা দ্বার নীতি।

তৃতীয় অধ্যায়

১। জার্মান সম্রাট দ্বিতীয় কাইজার উইলিয়াম কিভাবে বিসমার্কের অনুসৃত বৈদেশিক নীতিগুলি বর্জন করেন তাহা দেখাও। এর ফলে জার্মানীর উপর কি প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

২। জার্মান সম্রাট দ্বিতীয় কাইজার উইলিয়ামের 'নব পন্থা' (New course) আলোচনা কর। এর কি ফল হয়?

৩। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে ইঙ্গ-জার্মান সম্পর্ক আলোচনা কর। কি কারণে এই সম্পর্ক সফল হয় নি?

৪। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ঘটবার জন্যে কাইজারের জার্মানী প্রকৃতপক্ষে দায়ী ছিল কি না তাহা ব্যাখ্যা কর।

৫। কি আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দরুণ ত্রিশক্তি আঁতাত গঠিত হয়?

৬। 'সশস্ত্র শান্তির যুগ' বলতে কি বুঝায় তাহা ব্যাখ্যা কর। এই যুগে আন্তর্জাতিক শক্তিসাম্য কিভাবে রক্ষিত হয়? কি কারণে এই শান্তি ভেঙ্গে যায়?

৭। তিন বা চার বাক্যের মধ্যে টীকা লিখ ঃ—(ক) 'নব পন্থা' নীতি; (খ) রি-ইনসুরেন্স সন্ধি; (গ) ক্রুগার টেলিগ্রাম; (ঘ) কাইজারের নৌ পরিকল্পনা; (ঙ) আগাদিরের সম্মেলন; (চ) ফ্রাঙ্কো-রুশ চুক্তি ১৮৯৪ খ্রীঃ (ছ) ইঙ্গ-ফরাসী চুক্তি ১৯০৪ খ্রীঃ; (জ) সশস্ত্র শান্তির যুগ; (ঝ) মরক্কোর ঘটনা; (ঞ) সেরাজেভোর হত্যাকান্ড।

চতুর্থ অধ্যায়

১। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কারণগুলি আলোচনাপূর্বক এই যুদ্ধের দায়িত্ব কার ছিল তাহা সংক্ষেপে লিখ।

২। অতৃপ্ত ও জঙ্গী জাতীয়তাবাদ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্যে কতটা দায়ী ছিল তাহা আলোচনা কর।

৩। জার্মানীর ঔপনিবেশিক ক্ষুধা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ঘটার জন্যে কতদূর দায়ী ছিল?

৪। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ হিসেবে "সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদ" কিরূপ দায়ী ছিল তাহা বিশ্লেষণ কর।

৫। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর পরাজয়ের কারণ কি ছিল?

৬। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রকৃত কি উদ্দেশ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির পক্ষ নেয় তাহা আলোচনা কর। মার্কিন রাষ্ট্রপতি উইলসন যুদ্ধোত্তর শান্তির কি পরিকল্পনা করেন?

৭। "প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এক নূতন পৃথিবী সৃষ্টি করে"—এই উক্তির যথার্থতা বিচার কর।

৮। বিশ্বের রাজনীতি, সমাজব্যবস্থা ও অর্থনীতির উপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া পর্যালোচনা কর।

৯। উইলসনের "চৌদ্দ দফা" কি ছিল? ভার্সাই সন্ধির দ্বারা ইহা প্রকৃতপক্ষে কতদূর গৃহীত হয় তাহা বিশ্লেষণ কর।

১০। ভার্সাইয়ের সন্ধির শর্তগুলি কেন ইওরোপে স্থায়ী শান্তি স্থাপনে ব্যর্থ হয় তাহা ব্যাখ্যা কর

১১। ভার্সাইয়ের সন্ধির শর্তগুলি কি ছিল? জার্মানী এর বিরুদ্ধে কি প্রতিবাদ জানায় এবং তাহা কতদূর যুক্তিসঙ্গত ছিল?

১২। "ভার্সাই সন্ধিকে কঠোর ও নিষ্ঠুর সন্ধি" বলা যায় কি?

১৩। "ভার্সাই সন্ধির মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীজ নিহিত ছিল।"—এই মন্তব্যের সারবত্তা বিচার কর।

১৪। "দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অনুসৃতি মাত্র"—এই উক্তির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

১৫। তিন বা চারটি বাক্যে টীকা লিখ ঃ— (ক) সেরাজেভোর হত্যাকান্ড; (খ) ভার্দুনের যুদ্ধ; (গ) ব্রেস্টলিটভস্কের সন্ধি; (ঘ) লুসিট্যানিয়ার সন্ধি; (ঙ) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের উপর বলশেভিক বিপ্লবের প্রভাব; (চ) ক্ষতিপূরণ সমস্যা; (ছ) ক্রেমাঁসুর নীতি; (জ) ভার্সাই সন্ধিতে জার্মান-পোল সীমান্ত গঠন; (ঝ) কেন ভার্সাই সন্ধিকে জবরদস্তি সন্ধি বলা হয়; (ঞ) লান্সিং নোট; (ট) সেভরের সন্ধি।

পঞ্চম অধ্যায়

১। ১৯১৭ খ্রীঃ জারতন্ত্রের পতনের কারণ ব্যাখ্যা কর।

২। ১৯১৭ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের তাৎপর্য ও কারণগুলি ব্যাখ্যা কর।

৩। ১৯১৭ খ্রীঃ অক্টোবরে বলশেভিক দলের বিপ্লবের কারণ ও এর গুরুত্ব আলোচনা কর।

৪। রুশ বিপ্লবের (১৯১৭ খ্রীঃ) কয়টি পর্যায় ছিল? এর কারণ কি ছিল?

৫। দ্বিতীয় রুশ বিপ্লব বলতে কি বুঝায়? এর কেন প্রয়োজন হয়?

৬। "প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্যে জারতন্ত্রের পতন ত্বরান্বিত হয়"— এই উক্তির যথার্থতা বিচার কর।

৭। লেনিন কিভাবে নবোদিত সমাজতন্ত্রী শ্রমিক সরকারকে স্থিতিশীল করেন তাহা আলোচনা কর।

৮। ১৯১৮ খ্রীঃ রুশ সংবিধান এবং সোভিয়েত কমিউনিস্ট দল গঠন সম্পর্কে আলোচনা কর।

৯। বলশেভিক বিপ্লবের সফলতা এবং বিপ্লবী সরকারের স্থিতি রক্ষায় লেনিনের অবদান আলোচনা কর।

১০। ষ্ট্যালিন-ট্রটস্কি দ্বন্দ্বের মূল কারণগুলি কি ছিল? ষ্ট্যালিন কিভাবে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও যৌথ খামারকে সফল করেন?

১১। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী যুগে সোভিয়েত রাশিয়ার বৈদেশিক নীতির বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

১২। বিশ্ব-বিপ্লবের লক্ষ্যের সঙ্গে রুশদেশের জাতীয় স্বার্থ কতদূর সঙ্গতিপূর্ণ ছিল? ষ্ট্যালিন এর কোনটিকে গুরুত্ব দেন তাহা উদাহরণসহ আলোচনা কর।

১৩। বলশেভিক বিপ্লবের অব্যবহিত পর থেকে লেনিনের মৃত্যু পর্যন্ত রুশ নীতি ও এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। এই নীতি কেন বিফল হয়?

১৫। ১৯১৮ খ্রীঃ পর ষ্ট্যালিনের বৈদেশিক নীতির লক্ষ্য ও যৌক্তিকতা বিচার কর।

১৬। সোভিয়েত ও পশ্চিমী জার্মান বিরোধী সমঝোতা কেন ১৯৩৯ খ্রীঃ ব্যর্থ হয় তার কারণ ও দায়িত্ব বিশ্লেষণ কর।

১৭। ষ্ট্যালিন কি কারণে রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করেন? এই চুক্তি ১৯৪৫ খ্রীঃ কেন ভেঙ্গে যায়?

১৮। "প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার যোগদানের ফলে রুশ বিপ্লব ঘটে"—এই অভিমতের যথার্থতা বিচার কর।

১৯। তিন বা চারটি বাক্যে টীকা লিখঃ (ক) 'ভূমি ও স্বাধীনতা' আন্দোলন; (খ) পেট্রোগ্রাডের ধর্মঘট; (গ) স্টোলিপিন সংস্কার; (ঘ) এপ্রিল থিসিস; (ঙ) ব্রেস্টলিটভস্কের সন্ধি; (চ) লালফৌজ; (ছ) সোভিয়েত গঠন; (জ) সোভিয়েত কম্যুনিস্ট পার্টির গঠন; (ঝ) নব অর্থনীতি; (ঞ) যৌথ খামার প্রথা; (ট) পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা; (ঠ) কমিনটার্ন; (ড) চিকেরিণ; (ঢ) লিনভিনৎ নীতি; (ণ) রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি।

ষষ্ঠ অধ্যায়

১। লীগ অফ নেশনস কেন গঠিত হয়? এর পতনের কারণ কি?

২। লীগ অফ নেশনসের সংগঠন ও কার্যাবলীর বিবরণ দাও।

৩। লীগ অফ নেশনসের দ্বারা আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা কিরূপ রক্ষিত হয়?

৪। লীগের পতনের জন্যে লীগ চুক্তিপত্রের ত্রুটি এবং বৃহৎ শক্তিগুলির স্বার্থপরতা কতদূর দায়ী ছিল?

সপ্তম অধ্যায়

১। চীনে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির অনুপ্রবেশ সম্বন্ধে যা জান লেখ।

২। তাই-পিং বিদ্রোহের কারণ ও ফলাফলের বিবরণ দাও।

৩। বক্সার বিদ্রোহ কাকে বলে? এই বিদ্রোহ কেন ঘটে? এই বিদ্রোহের ফলাফল সম্বন্ধে যা জান লেখ।

৪। তিয়েনসিনের সন্ধি থেকে সিমোনোসেকির সন্ধি পর্যন্ত চীনে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির বিস্তার লিপিবদ্ধ কর।

৫। ১৯১১ খ্রীঃ চীনা বিপ্লবের গুরুত্ব বর্ণনা কর। এই বিপ্লবের নেতা কে ছিলেন? তাঁর সম্বন্ধে যা জান লেখ।

৬। চীনে একশত দিবসের সংস্কার আন্দোলন ও তার ফলাফলের বিবরণ দাও?

৭। ১৮৬৭ খ্রীঃ জাপানের ইতিহাস বর্ণনা কর।

৮। শোগুণতন্ত্রের অধীনে জাপানের ইতিহাসের বিবরণ দাও।

৯। মেইজি পুনঃপ্রতিষ্ঠা (Restoration) বলতে কি বোঝায়? মেইজি যুগে জাপানের পুনর্গঠনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ কর।

১০। চীন-জাপান যুদ্ধের কারণ ও সিমোনোসেলির সন্ধির বিবরণ দাও।

১১। রুশ-জাপান যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা কর।

১২। তিন বা চারটি বাক্যে টীকা লিখঃ—(ক) কো-হং বণিক সঙ্ঘ; (খ) নানকিং-এর সন্ধি; (গ) 'খোলা দ্বার নীতি' (open door policy); (ঘ) আই-হো-য়োয়ান; (ঙ) কাং-ইউ-ওয়ে-এর সংস্কার; (চ) ৪ঠা মে-এর আন্দোলন; (ছ) হ্যারিস মিশন; (জ) সেকুগাওয়া শোগুণ; (ঝ) মেইজি সংবিধান; (ঞ) পোর্টসমাউথের সন্ধি, ১৯০৫ খ্রীঃ।

অষ্টম অধ্যায়

১। ইতালীতে ফ্যাসিবাদের উদ্ভবের কারণ আলোচনা কর।

২। ফ্যাসিবাদ বলতে কি বুঝায়? এর মূল নীতি কি ছিল?

৩। ফ্যাসিস্ট সরকারের আভ্যন্তরীণ সংগঠন কি ছিল? এর ত্রুটিগুলি ব্যাখ্যা কর।

৪। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর ইতালীর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অসন্তোষের কারণ কি ছিল? মুসোলিনী তাহা কিভাবে সমাধানের চেষ্টা করেন?

৫। আবিসিনীয় আক্রমণের পশ্চাতে মুসোলিনীর কি উদ্দেশ্য ছিল? ইতালীর উপর এই যুদ্ধে যোগ দেওয়ার কি প্রতিক্রিয়া দেখা যায়?

৬। রোম-বার্লিন অক্ষচুক্তি গঠন ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিস্ট ইতালীর যোগদানের পশ্চাতে মুসোলিনীর কি উদ্দেশ্য ছিল? কিভাবে রোম-বার্লিন চুক্তি গঠিত হয়?

৭। তিন বা চারটি বাক্যে টীকা লিখ ঃ—(ক) ফ্যাসিস্ট; (খ) স্কোয়াড্রিন; (গ) দুচো; (ঘ) ফ্যাসিবাদে রাষ্ট্রের উৎপত্তি তত্ত্ব; (ঙ) অটার্কি; (চ) ফ্যাসিস্ট শিল্প নীতি; (ছ) "গমের যুদ্ধ"; (জ) সর্বাত্মক রাষ্ট্রবাদ; (ঝ) ওয়াল-ওয়ালের ঘটনা; (ঞ) কমিউনিস্ট বিরোধী চুক্তি।

নবম অধ্যায়

১। ভাইমার প্রজাতন্ত্রের পতনের কারণ আলোচনা কর। এই পতন অনিবার্য ছিল কি না তাহা বিশ্লেষণ কর।

২। ভার্সাই সন্ধি অথবা যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক সঙ্কট এর কোনটি ভাইমার প্রজাতন্ত্রের পতনের জন্যে বেশী দায়ী ছিল তাহা আলোচনা কর।

৩। নাৎসী বিপ্লবের সফলতার জন্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কারণগুলি আলোচনা কর। এই বিপ্লব কি অনিবার্য ছিল?

৪। নাৎসী সরকার কিভাবে জার্মানীর নাৎসীকরণ করে তাহা ব্যাখ্যা কর।

৫। নাৎসী বিপ্লব বলতে কি বুঝায়? জার্মানীর উপর এর কি প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়?

৬। জার্মানীর নাৎসী সরকারের বৈদেশিক নীতির ফলে কিভাবে ১৯১৯ খ্রীঃ-এর আন্তর্জাতিক শক্তিসাম্য ভেঙ্গে পড়ে তা আলোচনা কর।

৭। নাৎসী জার্মানীর বৈদেশিক নীতির মূল লক্ষ্য কি ছিল? নাৎসী নেতা হিটলার তাহা কিভাবে পূরণের চেষ্টা করেন?

৮। নাৎসী জার্মানীর পূর্ব ইওরোপে আগ্রাসন নীতির বিবরণ দাও। এই নীতিকে সফল করার জন্যে নাৎসী নেতা হিটলার কি কূটনৈতিক ব্যবস্থা নেন তা পর্যালোচনা কর।

৯। সুদেতেন সমস্যা হতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত হিটলারের কূটনীতির বিবরণ দাও। হিটলারের এই সময়ে সফলতার কি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়?

১০। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘটার জন্যে হিটলারের বৈদেশিক নীতি কিরূপ দায়ী ছিল?

১১। তিন থেকে চারটি বাক্যে টীকা লিখ ঃ— (ক) ব্যাভেরিয়ার বিপ্লব; (খ) স্পার্টাসিস্ট দল; (গ) ভাইমার সংবিধান; (ঘ) যুদ্ধোত্তর জার্মানীর মুদ্রাস্ফীতি; (ঙ) স্ট্রাসম্যানের পরিপূর্ণতা নীতি; (চ) জার্মানীর নাৎসীকরণ; (ছ) নাৎসী সরকারের জাতি বৈরতা; (জ) পোল-জার্মান নীতি; (ঝ) বার্থুর হত্যা; (ঞ) আনস্লাস নীতি; (ট) সুদেতেন সমস্যা; (ঠ) চেম্বারলেইনের তোষণ নীতি; (ড) মিউনিখ চুক্তি; (ঢ) রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি।

দশম অধ্যায়

১। স্পেনের গৃহযুদ্ধে কারণ কি ছিল? এই যুদ্ধকে কেন 'ক্ষুদ্র বিশ্বযুদ্ধ' বলা হয়?

২। স্পেনের গৃহযুদ্ধে কিভাবে বিভিন্ন বৈদেশিক শক্তি হস্তক্ষেপ করে তাহা আলোচনা কর। এ বিষয়ে জাতিসংঘের কি ভূমিকা ছিল?

৩। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণগুলি ব্যাখ্যা কর। এই যুদ্ধের জন্যে নাৎসী জার্মানীর আগ্রাসন নীতি কতটা দায়ী ছিল?

৪। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্যে নাৎসী সরকারের দায়িত্ব পর্যালোচনা কর। এ বিষয়ে অধ্যাপক এ·জে·পি· টেইলারের অভিমত বিশদভাবে আলোচনা কর।

৫। যে কোন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের কারণ সম্পর্কে লেনিন যে অভিমত দিয়েছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ হিসাবে তার যথার্থতা বিচার কর।

৬। তিন বা চারটি বাক্যে টীকা লিখ ঃ— (ক) স্পেনের পপুলার ফ্রন্ট সরকারের পতনের

কারণ; (খ) চেম্বারলেইনের জার্মান তোষণ নীতি; (গ) জাপানের মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ; (ঘ) হিটলারের 'একের পর এক' নীতি; (ঙ) ওয়াশিংটন চুক্তি ১৯২১ খ্রীঃ।

একাদশ অধ্যায়

১। সঠিক উত্তর দাও : (ক) নাৎসী বাহিনী কোন্ তারিখে পোল্যান্ড আক্রমণ করে? (খ) ব্রিটেন ও ফ্রান্স কোন্ তারিখে নাৎসী জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে? (গ) নাৎসী জার্মানী কবে সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণ করে? (ঘ) Phony war কাকে বলা হয়? (ঙ) ব্লিৎসক্রীগ কাকে বলে ও সর্বপ্রথম কোথায় ইহা প্রযুক্ত হয়? (চ) ডানকার্কের আশ্চর্যজনক নিষ্কৃতি কাকে বলে? (ছ) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্রান্সের কোন খ্রীঃ পতন হয়? (জ) ব্যাটল অফ ব্রিটেন কোন খ্রীঃ হয়? (ঝ) 'মরুভূমির শৃগাল' কোন্ সেনাপতি কোন্ যুদ্ধে আখ্যা পান? (ঞ) এল-আলমিনের যুদ্ধ কবে কোথায় হয়? (ট) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগ দেয়? (ঠ) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তি কবে এবং কোথায় দ্বিতীয় রণাঙ্গন রচনা করে? (ড) কোন সেনাদল সর্বপ্রথম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বার্লিন অধিকার করে? (ঢ) পার্লহারবারে কবে কে কাকে আক্রমণ করে? (ণ) সিঙ্গাপুর কবে জাপান অধিকার করে? (ত) ইয়াল্টা চুক্তি কবে কাদের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়? (থ) পটসডাম সম্মেলন কবে কাদের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়? (দ) ফুলটন বক্তৃতা কে, কবে কি উপলক্ষে দেন?

২। ১৯৩৯—১৯৪১ খ্রীঃ পর্যন্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিবরণ ও জার্মানীর ভূমিকা আলোচনা কর।

৩। রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি ভঙ্গ ও জার্মানীর রাশিয়া আক্রমণের কারণগুলি আলোচনা কর। এই প্রসঙ্গে রুশ প্রতিরোধের চিত্র সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৪। জাপানের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগদানের কারণ এবং পার্লহারবার অভিযান আলোচনা কর।

৫। ইয়াল্টা চুক্তি ও তার গুরুত্ব আলোচনা কর।

অথবা

ইয়াল্টা চুক্তির ফলে কিভাবে ঠান্ডা লড়াইয়ের সূত্রপাত হয় তা আলোচনা কর।

৬। পূর্ব-পশ্চিম ঠান্ডা লড়াইয়ের কারণ বিশ্লেষণ কর।

অথবা

ট্রুম্যান নীতি ও মার্শাল পরিকল্পনার পটভূমিকা আলোচনা কর।

দ্বাদশ অধ্যায়

১। (ক) আটলান্টিক সনদ কারা কবে কোথায় ঘোষণা করেন? (খ) কোন্ খ্রীঃ কোথায় জাতিপুঞ্জের সনদ প্রথম গৃহীত হয়? (গ) জাতিপুঞ্জের প্রথম অধিবেশনে কয়টি দেশ যোগ দেয়? (ঘ) Unite for Peace প্রস্তাব কোন্ খ্রীঃ কি উপলক্ষে গৃহীত হয়? (ঙ) নিরাপত্তা পরিষদে মোট কতজন সদস্য এবং কতজন স্থায়ী সদস্য? (চ) অছি পরিষদে কতজন সদস্য এবং কয় বছর অন্তর এই সদস্যরা নির্বাচিত হন? (ছ) জাতিপুঞ্জের অধিবেশন কোথায় অনুষ্ঠিত হয়? (জ) জাতিপুঞ্জের কার্যাবলী ও কর্মসূচী কে পরিচালনা করেন?

২। জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠার পটভূমিকা কি ছিল? জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন সংগঠনগুলি আলোচনা কর।

৩। জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আলোচনা কর। নিরাপত্তা পরিষদ এবং সাধারণ সভার গঠন ও ক্ষমতাবলী বিশ্লেষণ কর।

৪। জাতিপুঞ্জের সনদের লক্ষ্য ও বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

১। রোমান্টিকতাবাদ কাকে বলে? সাহিত্যে রোমান্টিকতার বিবরণ দাও।

২। চিত্রশিল্প ও সঙ্গীতে রোমান্টিকতার বিকাশ আলোচনা কর।

৩। ডারউইনের বিবর্তনবাদ কিভাবে সামাজিক ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তাহা আলোচনা কর।

৪। সমাজতন্ত্রবাদের উপর বিবর্তনবাদের প্রভাব আলোচনা কর।

৫। তিন বা চারটি বাক্যে টীকা লিখ ঃ— (ক) রোমান্টিকতাবাদের মূল সূত্র কি ছিল? (খ) রোমান্টিক মতবাদ কি? (গ) ইতিহাসে রোমান্টিকতাবাদ কি? (ঘ) ডিকেন্সের রচনায় রোমান্টিকতা কিভাবে প্রকাশ পায়? (ঙ) ভিক্টর হিউগোর রচনায় রোমান্টিকতা কি ছিল? (চ) দস্তয়েভস্কির মধ্যে রোমান্টিকতা কিভাবে প্রকাশিত হয়? (ছ) ডেলাক্রোয় কে ছিলেন? (জ) বিটোফেন কে ছিলেন? (ঝ) ভাগ্‌নারের নাম কিজন্য বিখ্যাত? (ঞ) প্রাকৃতিক নির্বাচন বলতে কি বুঝায়? (ট) ফেবিয়ানবাদ কাকে বলে? (ঠ) ফ্রয়েডীয় মনোবাদ বলিতে কি বুঝায়? (ড) ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতি এবং তার সামাজিক প্রতিক্রিয়া আলোচনা কর।
